সচিত্র সহস্র এক

আরব্য রজনী

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আরব্য রজনীর গল্প পৃথিবীর সব দেশের শিশু ও কিশোর কিশোরীদের কাছে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি বয়স্কদের কাছেও কম সমাদৃত নয়। তাইতো পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশেই এর গল্প-গুলি বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির সবই যে নিছক কাল্পনিক কাহিনী তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যতার ছোঁয়াও রয়েছে আর রয়েছে ঐতিহাসিক সত্যতা। যেমন খলিফা হারুণ-অল-রসিদের কথাই ধরা যাক না কেন। আরব্য রজনীর গল্পে যেমন তাঁকে আমরা একজন মহাধার্মিক, সুশাসক ও প্রজা হিতৈষী বাদশাহরূপে দেখতে পাই ঠিক ইতিহাসের পাতায়ও আমরা তাঁর একই চারিত্রিক গুণাবলীর পরিচয় পাই। আরব দুনিয়ার মোটামুটি ভৌগোলিক বিবরণ ও প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগেকার আরব-দুনিয়ার সামাজিক চিত্র ও সুলতান-বাদশাহদের জাঁকজমকের চিত্রও আমরা আরব্য রজনীরগল্পগুলির মাধ্যমে পেতে পারি। অতএব গল্পের দিকটি ছেড়ে দিলেও এর ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভের গুরুত্বও আমাদের কাছে কম নয়। আর-গল্প? গল্পগুলি কাল্পনিক হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও মনে হয় যেন সম্পূর্ণ বাস্তব দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমাদের ঘরের, আমাদের পরিবারের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা আর আশা-হতাশাকে, যেন লেখনী মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে অতিরঞ্জিত যেসব ঘটনা আমাদের মনের খোরাক জোগানোর জন্য, অবসাদ দূর করে আনন্দ দানের মাধ্যমে আমাদের মনকে সরস-সতেজ করে তোলার দিকটির কথা বিবেচনা করে মনে হয় এরও দরকার রয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশে বহুল প্রচলিত প্রায় সব ভাষাতেই কোন না কোনভাবে আরব্য রজনীর গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রচুর সংখ্যক আরব্য-রজনী প্রকাশিত হয়েছে। আবার বাছাই করা গল্প নিয়ে পৃথক পৃথক নামেও কম বই প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে 'আলিফ লায়লা' কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠোপযোগী। 'সচিত্র সহস্র এক আরব্য রজনী' নাম দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশের ইচ্ছা আমার দীর্ঘ দিনের! কিন্তু সুযোগের অভাবে সে ইচ্ছা এতদিন আমার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শ্রীযুক্ত দেবাশিস সরকার মহাশয় বইটি অনুবাদ করে দিয়ে আমার সে ইচ্ছাকে আজ বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হ'ল। বইটিকে সবদিক থেকে সুন্দর করে তোলার জন্য কোনই কার্পণ্য করিনি। সুধী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 'সচিত্র সহস্র এক আরব্য রজনী' যদি সমাদৃত হয় তবে আমার এতদিনের প্রয়াস সার্থক হবে।

বিনীত

শ্যামাপদ সরকার

অনুবাদকের নিবেদন

আরব্য রজনীর গল্প আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত। বিশ্বের বহুল প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে এমন ভাষা খুব কমই আছে যে ভাষায় সম্পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত আরব্য রজনীর গল্প অনূদিত হয়নি।

বাংলা ভাষাতেও ইতিপূর্বে ভুরি ভুরি অতিসংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ আরব্য রজনী প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া এর অংশ বিশেষ অবলম্বন করেও পৃথক পৃথক বই প্রকাশিত হয়েছে, এদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর', 'আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ' ; 'মর্জিনা আবদাল্লা', 'সিন্দবাদের কাহিনী' প্রভৃতি।

আরব্য রজনীর কাহিনীকে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রায় তিনশ' বছর আগেকার আরব দুনিয়ার ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত দরকার। আরব্য রজনীর গল্পগুলি যদিও বাদশাহ শাহরিয়ার-এর বেগম শাহরাজাদ-এর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে তবু গল্পগুলির পটভূমি আরব দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ, নদীর মধ্যে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস, সাগরের মধ্যে আরব সাগর আর উল্লেখযোগ্য বন্দর বসরাহ প্রভৃতির নাম আলোচ্য গ্রন্থে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব সে সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু অন্ততঃ

ধারণা থাকা অবশ্যই দরকার আরব মুলুক মরুভূমি প্রধান। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এর অবস্থিতি। আরব সাগর, লোহিত সাগর আর পারশ্য উপসাগর মুলুকটিকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখে এ মুলুকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

সুবিশাল কিছু অনুচ্চ পর্বত আরব দুনিয়ার অভ্যন্তরভাগকে দ্বিখণ্ডিত করে সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে মুলুকের অধিকাংশ অঞ্চলে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি আর বালি, মাঝে মাঝে কাঁটা জাতীয় গাছ। বিশেষ করে খেজুর গাছের ঝোপে ঘেরা মরুদ্যান রয়েছে।

বালির প্রাধান্য থাকার জন্য সে দেশের মাটি অনুর্বর। সমুদ্র আরব মুলুককে তিনদিক থেকে ঘিরে রাখার জন্য সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলগুলো অপেক্ষাকৃত উর্বর।

ভূমি কৃষিযোগ্য ভুট্টা, জোয়ার, বজরা, গম প্রভৃতি সেখানকার কৃষিজাত ফসল। মরুদ্যানগুলিতে খেজুর প্রচুর পাওয়া যায়। বাগিচাগুলির মধ্যে আঙুর, পেস্তা, আখরোট উল্লেখযোগ্য। সেখানকার মানুষ খুবই কর্মঠ। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।

আপাতদৃষ্টিতে আরব মুলুককে অনেকে কেবল দিগন্ত জোড়া ধূ-ধূ মরুভূমি বলেই মনে করে থাকেন। আসলে তা নয়, বালির রাজ্যে সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। আবার কোথাও পেঁজা তুলোর মত ধবধবে বরফে ঢাকা পর্বত শৃঙ্গের অস্তিত্বও রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে যেমন মরুভূমি ও মরুদ্যানের উল্লেখ দেখা যায়, তেমনি একাধিক স্থানে পাহাড়ের বিবরণ পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থে বার বার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটোর উল্লেখ নজরে পড়ে। কৃষি কাজ ছাড়া যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবেও এদের গুরুত্ব কম নয়। সওদাগরী কারবারের জন্য নদী দুটো আলোচ্য গ্রন্থটি রচনাকালের সবচেয়ে বড় অবলম্বন ছিল।

আরব মুলুকের উত্তর-পশ্চিমে এক সময় ফিনিসীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। আরবরা আসিরীয় ও ইহুদীদের মত মিশ্র জাতি।

আরব্য রজনীর গল্পগুলি যে-পটভূমিতে রচনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় আরবরা তখন দুটো প্রধান গোষ্ঠিতে বিভক্ত ছিল—মরুবাসী বেদুইন আর শহরবাসী। আলোচ্য গ্রন্থেও দেখা যায় বেদুইনরা যাযাবর প্রকৃতির। কোন একটি বিশেষ স্থানে দীর্ঘদিন বসবাস করা তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। কিছুদিন কোন একস্থানে থাকার পর তারা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। ব্যস, পাতাতাড়ি গুটিয়ে যাত্রা করে নতুন কোন স্থানের উদ্দেশ্যে। আলোচ্য গ্রন্থেও দেখা যায় ঘরবাড়ী তৈরী করে তারা স্থায়ীভাবে বাস করতে উৎসাহী ছিল না আজ শত শত বৎসর পরেও তাদের এ-বিশেষ দিকটির

কিছুমাত্র পরিবর্তন নজরে পড়ে না। তারা তাঁবু গুটিয়ে ছাগল, ভেড়া, উট প্রভৃতি নিয়ে এক জায়গা ছেড়ে অন্য কোন মরুদ্যানের কাছাকাছি স্থানে তাঁবু টানিয়ে-নতুন করে অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলে।

অলোচ্য গ্রন্থে বেদুইনদের পোষা 'গ্রে হাউন্ড' জাতীয় শিকারী কুকুরের উল্লেখ দেখা যায়। পশুগুলিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই পশুপালন ছাড়াও উট আর ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে তাবুর অদূরবর্তী শহরে সওদাগরী কারবারেও তাদের কেউ কেউ লিপ্ত থাকত। আবার সুযোগ সুবিধা মত লুঠতরাজকেও কেউ কেউ পেশা হিসাবে বেছে নিত। আলোচ্যগ্রন্থ এদের 'বাদাবী দস্যু' বলে বহুস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সমাজ গোষ্ঠী বা উপজাতির একজন নেতা গোছের ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল যাকে 'শেখ' বলে সম্বোধন করা হত। আলোচ্য গ্রন্থের বহুস্থানে শেখদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবরা, বিশেষ করে মরু অঞ্চলের যাযাবররা গণতন্ত্রের প্রতি বিশেষ আস্থাভাজন ছিল। তারা 'শেখ'দের প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে স্বাধীনভাবে, নিজেদের মর্জি মাফিক চলাতেই বিশেষ উৎসাহী ছিল। তবু কোন কোন ক্ষেত্রে তারা 'শেখ'দের কবল থেকে অব্যাহতি পায় নি।

বর্তমান সংকলনের একাধিক স্থানে সওদাগর সমিতির উল্লেখ দেখা যায়। সুলতান-বাদশাহ সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কবল থেকে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই সওদাগররা জোট বাঁধতে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহী হত। গণতন্ত্রের প্রতি তারা ছিল বিশেষ আস্থাভাজন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সওদাগর সমিতির সদস্যরা নির্বাচিত হতেন।

তখনকার দিনে আরব-সমাজে সরাব পান, বাঈজীর নাচ-গান ও জুয়াখেলা মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। ব্যাভিচার চলত অবাধে, যত্রতত্র। যুদ্ধচলাকালীন কোন পক্ষ শত্রুপক্ষের কোন নারীকে বন্দী করতে পারলে বা কোন নারী যুদ্ধবন্দী হলে তার ওপর বলাৎকারে ইজ্জৎ নষ্ট করার ব্যাপার সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থেও এরকম ঘটনার বহু নজীর দেখা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থের বহু গল্পে 'মেহমান' অর্থাৎ অতিথির প্রতি বিশেষ সমাদরের উল্লেখ দেখা যায়। মেহমানকে সন্তুষ্ট করতে গৃহকর্তা সাধ্যমত চেষ্টায় ব্রতী হত। মেহমানের অমর্যাদা, অনাদর ও অবহেলা আরব-সমাজে বিশেষ গুণাহ বলে বিবেচিত হত। মেহমানের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য গৃহকর্তা নিজের জান কবুল করতেও কসুর করত না। অবশ্য এখনও তাদের সমাজে মেহমান পরম সমাদর লাভ করে থাকে।

আরব্য রজনীর কাহিনীতে বার বার খলিফাদের, বিশেষ করে খলিফা হারুণ-অল-রসিদের কথা নানাভাবে উল্লেখ দেখা যায়। কোন এক সময়ে খলিফারাই ইসলাম বিজয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা যে কেবল মাত্র ধর্মগুরু হিসাবেই সমাজে পরিগণিত ছিলেন তা নয়। বরং বলা চলে, তাঁরা একাধারে অমন ধর্মীয় ক্রিয়া কাণ্ডের নির্দেশাদি দান করতেন তেমনি অপরদিকে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবেও যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন।

ধর্মগুরু হজরত মহম্মদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ফলে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলে আরব রাজ্যের ধর্মীয় ক্রিয়া কাণ্ড পরিচালনা এবং রাষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা কাঁর ওপর অর্পণ করা যেতে পারে তা নিয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অবশেষে মুশকিল আসানের জন্য আরব মুলুকের নেতৃস্থানীয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একমত হয়ে হজরত মহম্মদ-এর প্রধান শিষ্য আবু বকরকে খলিফার পদে অভিষিক্ত করলেন।

আবু বকরের পর খলিফার পদ লাভ করেন যথাক্রমে ওমর, উমান এবং আলি। আলির পরে খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হন মোয়াবিয়া। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি বাইজেন্টিয়ান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে উত্তর-আফ্রিকা জয় করে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন।

হারুণ-অল-রসিদ ছিলেন আব্বাসীয় বংশোদ্ভুত। ইতিহাসে তাঁকে শ্রেষ্ঠ খলিফা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচ্য আখ্যায়িকাও একই বক্তব্য সমর্থন করা হয়েছে। বাগদাদ ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি যেমন ছিলেন একজন সুশাসক ও প্রজাদরদী তেমনি একজন বীর যোদ্ধা বলে সমগ্র আরব দুনিয়ায় তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আলোচ্য

আখ্যায়িকায় বলা হয়েছে, তাঁর আমলে খিলাফৎ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সর্বাধিক হয়েছিল। টাইগ্রিস নদীর তীবরর্তী তার রাজধানী বা বাগদাদ নগরটি ঐশ্বর্য ও শিল্প সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে খলিফা হারুণ-অল-রসিদের অগাধ ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। আর দেখা যায় তিনি তার উজির জাফর আর দেহরক্ষী মাসরুরকে নিয়ে প্রজাদের জীবন যাত্রা প্রণালী, সুখ-দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা নিজের চোখে দেখার জন্য প্রায় প্রতি রাত্রেই ছদ্মবেশ ধারণ করে নগর পরিদর্শনে বেরোতেন।

প্রকৃতপক্ষে আরবরাই ইউরোপবাসীদের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার ঘেরাটোপ বেরিয়ে মুক্তিলাভের উপায় বাৎলে দেয়। আলোচ্য গ্রন্থে যেসব জাঁকজমক পূর্ণ প্রাসাদের বিবরণ দেখা যায় তাতে করে স্বীকার করতেই হয় শিল্প ও স্থাপত্য-বিদ্যায় আরবরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে খলিফা হারুণ-অল-রসিদের বিবরণ থেকে যা জানা যায় তাতে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সমসাময়িক কালে আরব দুনিয়ায় স্থাপত্যবিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছিল। আরব্য রজনীর গল্পে বাগদাদে খলিফার সুবিশাল প্রাসাদ, বিশাল মসজিদ, ইস্‌পাহানের জুমা মসজিদের যে শিল্প নৈপুণ্যের বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে আমাদের বিস্মিত হতেই হয়।

আরব্য রজনীর গল্পগুলি ছাড়া ইতিহাসেও বহু নজীর পাওয়া যায় যে, প্রাচ্যে বাগদাদ নগরী ও পশ্চিমে কর্ডোভা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নতুন নতুন চিন্তাধারার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়, আর তা প্রায় চারশ' বছর ধরে সমগ্র বিশ্বের এক বিরাট ভগ্নাংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

স্যার উইলিয়াম মুয়ার (Sir William Muir) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "দি ক্যালিফেট" নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—মুসলিমদের কাছ থেকেই ইউরোপ তার লুপ্তপ্রায় গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শন ফিরে পেতে সক্ষম হয়। তাঁরাই ইউরোপের নবজাগরণের (Renaissace) সূচনায় অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করে। তখন কায়রো, বাগদাদ এবং কর্ডোভা প্রভৃতি উন্নত নগর থেকে জ্ঞানের আলো ইউরোপ মহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

আরব্য রজনীর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির বহুস্থানে ধর্মমন্দির 'কাবা শরিফের' এর উল্লেখ আছে। এখানে একটি পবিত্র কালো পাথর আছে। আরবরা বিশ্বাস করে সভ্যতার প্রাক্‌কালে, অতিপ্রাচীনকালের কোন এক সময়ে এটি বেহেস্ত থেকে এখানে পতিত হয়েছিল, এ কালো পাথরটি 'বেহেস্তের' দান হিসাবে তামাম দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে অতি পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। এটিকে পবিত্র কাবা শরিফের একটি দেয়ালের গায়ে সযত্নে গেঁথে রাখা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রতি বছর অগনিত পুণ্যার্থী পবিত্র কাবাকে প্রদক্ষিণ করে।

ইসলাম ধর্মের এক সুপবিত্র ও মহান কর্তব্য 'হজ'। হজ-এর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাবা শরিফকে প্রদক্ষিণ করা।

ইতিহাস বলে, মানি নামধারী মদিনা নিবাসী এক প্রবীন ফকির দরবেশ নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পয়গম্বর বলে প্রচার করেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রচার করেন যে, তাঁর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মই বিশ্বের প্রচারিত ধর্মগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ ধর্ম।

এক সময় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একজন জ্ঞানী ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন জঈদ। সত্যসন্ধানী ব্যক্তি হিসাবে তাঁর খ্যাতি তামাম আরব দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি একবার কর্তব্য নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে হতাশার সঙ্গে বলেছিলেন 'আমি কত ঈশ্বরের উপাসনায় নিজেকে লিপ্ত রাখব 'এক ঈশ্বর, নাকি বহু ঈশ্বর?"

'ইসলাম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ-র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। এ ধর্মে ও মতে যারা বিশ্বাসী তারাই সমাজে মুসলিম বা মুসলমান বলে পরিচিত।

হজরত মহম্মদ মুসলিম রাষ্ট্রে এবং ইসলামের প্রধান ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হন। আর মক্কা ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এ স্থানটিকে অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয় আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থে গল্পগুলিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে, গল্পের পরিবেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য বাংলা ভাষায় বিদেশী বহু শব্দ—যেমন আরবী শব্দ আছিলা, আরজি, আলাদা, আক্কেল, আয়েশ, আলোয়ান, ইজারা, ইজ্জৎ, উসুল, উজির, নাজির, এক্‌তিয়ার, এলাকা, এলেম, কুজ্জা, কবুল, কর্ম্ম, আল্লাহ, কিতাব, ইয়াদ, গলদ, তল্লাশ, তসবির, দৌলত, দুনিয়া, দোজখ, বজবুত, হামাম, আদৎ, পয়দল, গোসল, গোস্‌সা প্রভৃতি। আবার কিছু ফারসি শব্দও ব্যবহার করেছি যেমন—ফতুর, পেয়ালা, আওয়াজ, মজলিস, হাকিম, হারাম, মালুম প্রভৃতি। আর আলখাল্লা, উজবুক, বিবি, চাবুকি বেগম প্রভৃতি তুর্কী শব্দও কাহিনী ব্যক্ত করতে গিয়ে ব্যবহার করেছি।

আরবী-ভাষায় রচিত হাজার এক রজনীর গল্পসমৃদ্ধ 'আলিফ লায়লা' বিশ্বের এক অনন্য সাহিত্যসম্ভার বলে সাহিত্য সাধক ও জ্ঞানীগণ বিশ্বাস করে থাকেন। গল্প পড়তে ও শুনতে সবদেশের ও সব বয়সের মানুষই ভালবাসেন। তাইতো বিশ্বের সব দেশের ও সব শ্রেণীর মানুষ যাতে এর গল্পগুলির রসাস্বাদন করতে সক্ষম হন সেদিকে দৃষ্টি রেখে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বহুল প্রচলিত ভাষায় 'অলিফ লায়লা' অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতদিন পরেও এর অন্তর্ভুক্ত ছোট-বড় ও ভিন্ন ভিন্ন পটভূমির ও স্বাদের গল্পগুলির কদর এতটুকু কমেনি। এদিক থেকে বিচার করে বলা চলে অলিফ লায়লার কাহিনী অমর।

আজ পর্যন্ত আলিফ লায়লা অর্থাৎ আরব্য রজনীর গল্প-ইংরাজী ভাষায় যত অনূদিত হয়েছে তাদের মধ্যে ডঃ জে. সি. মাদ্রুস-এর গ্রন্থখানিকেই পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। আরব্য রজনীর গল্পগুলি সবই সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। কিন্তু কাল্পনিক কাহিনীগুলিকে কেটে ছেটে বিশ্বাসযোগ্য ও রসোত্তীর্ণ করে তোলার দিকটির কথা বিবেচনা করে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যেতে পারে ডঃ জে, সি, মাদ্রুস সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থটিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী-গুণীজন কর্তৃক বেশী সমাদৃত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশে দেশে আরব্যরজনীর গল্পগুলি বিভিন্ন কলেবর নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির অধিকাংশ এক একটি মূলগ্রন্থের খুবই সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। বাংলা ভাষাতেও বহুদিন থেকেই ছোট ছোট গল্পাকারে, পুস্তিকাকারে আরব্যরজনীর মূল গ্রন্থের অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়েছে ও সব বয়সের মানুষের দ্বারা সমাদৃত অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ণ কলেবর নিয়ে হাজার এক আরব্যরজনীর গল্প সমৃদ্ধ বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা খুবই সামান্য।

ইংরাজী ভাষায় অনূদিত আরব্য রজনী গ্রন্থগুলির মধ্যে স্যার আর বার্টন-এর গ্রন্থটিকেও নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি অবিশ্বাস্য, অতিরঞ্জিত, অতিবিকৃত অংশগুলি কাটছাট করে আরব্যরজনী অনুবাদ করেন। তিনিও ডঃ জে, সি, মাদ্রুস এর মত মূলকাহিনীর বাস্তবতার দিকটির প্রতি সুতীক্ষ্ম রেখে অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

'সচিত্র সহস্র এক আরব্য রজনী' গ্রন্থটি রচনাকালে আমি ডঃ জে, সি, মাদ্রুস-এর গ্রন্থটিকে প্রাধান্য দিলেও স্যার আর বার্টন-এর গ্রন্থের কোন কোন গল্পকে এ গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর একটি কথা খোলাখুলি ভাবে বলে রাখা দরকার 'সচিত্র সহস্র এক আরব্যরজনী' গ্রন্থটি ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে চলা হয়েছে। জটিল ও রহস্যময় অংশগুলিকে আক্ষরিক অনুবাদের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা সম্ভব নয় বলেই এপথ অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। আর এরই ফলে গল্পগুলিকে রসোত্তীর্ণ করাও সম্ভব হয়েছে। সর্বসাধারণের' বিশেষ করে স্বল্প শিক্ষিত পাঠক পাঠিকাদের কথা বিবেচনা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদের দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে গল্পগুলিকে অধিকতর সহজবোধ্য ও রসসিক্ত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। আশাকরি এতে অধিকাংশ পাঠক পাঠিকার কাছে আরব্য রজনীর গল্পগুলি বিশেষ সমাদৃত হবে।

'প্রায় তিনশ' বছর আগে 'আলিফ লায়লা'র গল্পগুলি ইউরোপ মহাদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এ্যান্টনি গ্যালা নামে এক প্রবীণ ফরাসী পণ্ডিত আরব্য রজনীর গল্পগুলিকে ইউরোপের গল্পপ্রিয় নরনারীর কাছে পৌঁছে দেয়ার সুমহান ব্রত পালন করেন। তিনি আরবী ভাষায় লেখা থেকে ফরাসী ভাষায় আরব্য রজনীর গল্পগুলি অনুবাদ করে ফরাসী ভাষাভাষীদের কাছে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরব্য রজনীর কাহিনীগুলিকে পাশ্চাত্যবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের কাছে সমাদৃত করে তোলা। তবে এ কথা বলা যেতে পারে, তিনি আরব্য রজনীতে উল্লেখিত মূল চরিত্রগুলির দিকে গুরুত্ব আরোপ না করে অলৌকিক ও অতীব উপভোগ্য কাহিনীগুলির দিকেই আলোকপাত করতে অধিকতর উৎসাহী হয়েছেন। যেমন মনে করা যেতে পারে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ যিনি আরব্যর জনীর একটি বড় ভগ্নাংশ জুড়ে রয়েছেন। যাঁর ঐতিহাসিক সত্যতা এবং গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্টই। এ্যান্টনি গ্যালা সাহেব এ চরিত্রটিকে একেবারেই কোণঠাঁসা করে রেখেছেন। নিছক অনিচ্ছায় যেন দু-চারটি কথা তার সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হয়েছেন। আর বিকৃত যৌবনের দিকটির দিকেই তার নজর বড্ড বেশী ছিল। মোদ্দা কথা, তিনি সত্যের সঙ্গে খাদের পরিমাণ এত বেশী পরিমাণে মিশিয়ে ফেলেছেন যার ফলে এতে ঐতিহাসিক সত্যতা অনেকাংশে মার খেয়েছে।

আঠারা শ' আটত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এইচ. টোরেন্স আরব্য রজনীর গল্পগুলির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি অনুসন্ধানের ফলে এর বহুগল্প সংগ্রহ করতে সম্ভব হন। এবার তিনি অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘনিরলস সাধনার ফলে তিনি প্রথম খণ্ডটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বিধাতার নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাসে শুরু করার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অল্প বয়সে অনন্ত সুন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। তাঁর কাজ অপূর্ণই রয়ে গেল।

আঠারশ' একাশি খ্রীষ্টাব্দে আরব্যরজনীর গল্পগুলির অনুবাদের কাজে নতুন করে মনোনিবেশ করেন স্যার জে. পেইন। তিনি শুরু করলেন, মূল কাহিনীর সম্পূর্ণ ও প্রায় আক্ষরিক অনুবাদের কাজ। দীর্ঘ তিন বছরের কিছু বেশী সময় ধরে তিনি আরব্যরজনীর গল্পগুলি সংগ্রহ, গবেষণা ও অনুবাদের কাজে লেগে থাকেন। তাঁর দীর্ঘ নিরলস সাধনার ফসল আরব্য রজনীর অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে ই. ডব্লু. ল্যান্স সাহেবও আরব্যরজনীর গল্পগুলি অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিছু রসাত্মক গল্প সৃষ্টি করা। সেগুলি বিভিন্ন গল্পের আসরে পরিবেশন করে সহজে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন সম্ভব হয়। তিনি একাজে যথেষ্টই সাফল্য লাভ করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

আঠার শ' পঁচাশি খ্রীষ্টাব্দে আলিফ-লায়লা অর্থাৎ আরব্যরজনীর অনুবাদের কাজে এগিয়ে আসেন স্যার আর. কার্বন। তিনি সর্বপ্রথমে ফরাসী পণ্ডিত স্যার এ্যান্টনি গ্যালা, বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক স্যার জে. পেইন, নিরলস গবেষক ও ইংরেজ লেখক ই. ডব্লু. ল্যান্স প্রভৃতির অনূদিত গল্পগুলিকে একত্রিত করে তা থেকে অতি অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, বিকৃত অংশগুলিকে সাধ্যমত পরিহার করে সর্বসাধারণের পাঠযোগ্য অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তবে এ-ও অবশ্য উল্লেখ্য যে, স্যার আর. বার্টন সাহেবও ইংরেজী ভাষায় আরব্য রজনীর গল্পগুলি লেখার সময় মূলকাহিনীর দিকে যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। আর কাহিনীগুলির যে অংশ অবিশ্বাস্য, অতিরঞ্জিত বলে মনে করা যেতে পারে সেগুলিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিহার করে গল্পগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলায় তিনি সচেষ্ট হন।

বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক ও গবেষক ডঃ জে. সি. মাদ্রুস আলিফ লায়লা বা আরব্যরজনীর গল্পগুলিকে যথাযথভাবে অনুবাদের নিরলস সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। আলিফ লায়লা কিশোর-কিশোরীদের পাঠযোগ্য নয়। বরং বলা যেতে পারে তা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। এর পাতায় পাতায় যৌন বিষয়ে এমন সব বর্ণনা দেয়া আছে যা কেবল প্রাপ্তবয়স্কদেরই পাঠযোগ্য। অতএব সঠিক অনুবাদ করতে হলে, এর স্বাদ পুরোপুরিভাবে পাঠককে দিতে

হলে সে সব অংশকে পরিহার করে অনুবাদ করলে মূল কাহিনী থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরে যেতে হয়। আর এরই ফলে কাহিনী ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। তাই জে. সি. মাদ্রুস সাহেব আরব্যরজনীর গল্পগুলিকে পরিপূর্ণ রূপদানের উদ্দেশ্যে নিরলস সাধনায় ব্রত হন। তাঁর ব্যবহৃত সহজ-সরল ভাষা, এবং উপস্থাপনার চমৎকার কৌশলের জন্য তার অনূদিত গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ আকৃষ্ট করে।

এক কাল্পনিক উপাখ্যানের মাধ্যমে আলিফ লায়লার কাহিনীগুলি সূতোয় গাঁথা ফুলের মত একের পর এক এসে হাজির হয়েছে। আর হাজার এক কাহিনীরও সূত্রপাত হয় নিছকই কল্পনার পথ ধরে। এর বিষয়বস্তু মোটামুটি এরকম—বাদশাহ শাহরিয়ার এর অনুজ সমরখন্দের অধিপতি শাহজামান হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর প্রিয়তমা বেগম তারই রসুইখানায় এক নিগ্রো পাচকের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত। এমন জঘন্য অভাবনীয় দৃশ্য দেখে তাঁর মাথায় খুন চেপে গেল। নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তিনি তরবারির আঘাতে উভয়ের দেহই দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন।

শাহরিয়ার প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। একমাত্র অনুজকে দীর্ঘদিন পরে কাছে পেয়ে বাদশাহ শাহরিয়ার খুশীতে ডগমগ হয়ে তাকে আলিঙ্গন করেন।

কিন্তু শাহজামানের মনে তিলমাত্র আনন্দও নেই, তাঁকে সর্বদা গোমড়া মুখে বসে থাকতে দেখে বাদশাহ শাহরিয়ার যার পর নাই ভাবিত হয়ে পড়েন। কিন্তু অনুজের কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে তিনিও বিষণ্ণতার মধ্যে কাল যাপন করতে থাকেন। একদিন বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে শিকারে যান। শাহজাদা কিছুতেই অগ্রজের সঙ্গে শিকারে যেতে রাজী হলেন না। তিনি প্রাসাদে নিজের কক্ষের জানালার ধারে বসে বিষণ্ণমনে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করতে লাগলেন। এক সময় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য তাঁর নজরে পড়ল। দেখলেন, প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় অগ্রজ শাহরিয়ারের খুবসুরৎ নওজোয়ান বেগম তাঁর দৈত্যাকৃতি নিগ্রো মেহেবুবের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত। এমন এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য চাক্ষুষ করায় তাঁর মনের বিষণ্ণতা ও হাহাকার অনেকাংশে লাঘব হল। তিনি বুঝলেন, কেবলমাত্র তাঁর বেগমই নয়, আদতে নারী জাতটাই বিশ্বাসঘাতিনী ও ছলনাময়ী। দুনিয়ার অধিকাংশ মরদই হয়ত তাঁর বিবির অশুভ কামনা থেকে রেহাই পায় না। অতএব তিনিও তো দুনিয়ারই একজন। তবে কেনই বা তিলে তিলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবেন? মন থেকে বিষাদ-হাহাকার নিঃশেষে মুছে ফেলে দিলেন। মুখে ফুটিয়ে তুললেন হাসির রেখা।

অগ্রজ শাহরিয়ার পরদিন শিকার থেকে ফিরে অনুজ শাহজামানের মানসিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করে যার পর নাই বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসাবাদ ও পীড়াপীড়ির ফলে শাহজামান অগ্রজের কাছে বাগিচায় দেখা তার বেগমের ব্যাভিচারের দৃশ্যটির কথা ব্যক্ত করলেন। বাদশাহ শাহরিয়া-র কিছুতেই তা বিশ্বাস করলেন না প্রমাণ চাইলেন। শাহজামানের পরামর্শে তিনি সে রাত্রে শিকারে যাবার নাম করে প্রাসাদেই আত্মগোপন করে রইলেন। যথা সময়ে দেখলেন তাঁর কলিজার সমান বেগম নিগ্রো নওজোয়ানের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। ব্যস, তাঁর মাথায় খুন চেপে গেল। তিনি নিজেহাতে বেগমকে কোতল করে মনের জ্বালা নেভালেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আজ থেকে একটি সতী নারীকেও তিনি অসতী হতে দেবেন না। আর প্রতি রাত্রে একটি করে কুমারী মেয়ে তাঁর বেগম হয়ে প্রাসাদে আসবে।

তিনি সারারাত্রি তাকে নিয়ে সম্ভোগে মেতে থাকবেন। শেষে ভোর হওয়ার আগেই তাকে নিজহাতে কোতল করবেন। এভাবে চলতে চলতে এক সময় দেশে কুমারী মেয়ের অভাব দেখা দিল। এবার দেশে কুমারী বলতে রয়েছে একমাত্র তাঁর উজিরের লেড়কি শাহরাজাদ। শেষ পর্যন্ত নিজের মেয়ের অন্যান্য হতভাগিনীদের মতো হাল হবে ভেবে বৃদ্ধ উজিরের কলিজা শুকিয়ে গেল। ব্যাপার বুঝতে পেরে তার শাহরাজাদ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন

বাদশাহের তরবারি থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল তাঁর জানা আছে। তবু দুরু দুরু বুকে বৃদ্ধ উঁজির তাঁর নওজোয়ান লেড়কি শাহরাজাদকে নিয়ে প্রাসাদে গিয়ে বাদশাহের হাতে তুলে দিলেন।

বাদশাহ শাহরিয়ারের শয্যায় শুয়ে শাহরাজাদ অঝোরে কাঁদছেন কেন কারণ জানতে চাইলে বললেন, তাঁর এক অভিন্ন হৃদয় ছোট বহিন আছে, রাত পোহাবার আগে তাকে কিছু সময় নিজের কাছে রাখতে চান।

বাদশাহের হুকুমে উজিরের প্রাসাদ থেকে তাঁর ছোট লেড়কি দুনিয়াজাদকে কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। দুনিয়াজাদ তার বহিনজীর কাছে কিস্‌সা শোনানোর জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। শাহরাজাদ এবার বাদশাহের কাছ থে'কে অনুমতি নিয়ে কিস্‌সা বলা শুরু করলেন।

তাঁর মুখের কিস্‌সা শুনে বাদশাহ অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কিস্‌সাটি খতম হওয়ার আগেই ভোর হয়ে গেল। কিন্তু কিস্‌সাটি শেষ পর্যন্ত না শুনে বেগমকে কোতল করতে বাদশাহ শাহরিয়ার কিছুতেই উৎসাহ পেলেন না। শাহরাজাদ এমন করে বাদশাহ শাহরিয়ার ও তাঁর ছোট বহিন দুনিয়াজাদকে কিস্‌সা শুনিয়ে হাজার এক রজনী অতিক্রম করে দিলেন।

বেগম শাহরাজাদ হাজার এক রজনী কিস্‌সা বলার পর তবে থামলেন। বাদশাহ শাহরিয়ার ও শাহরাজাদের মোলাকাতের বা কিস্‌সা শুরু করার পর থেকে কিস্‌সা শেষ করার মধ্যবর্তী সময়ে তাঁদের তিনটি পুত্র জন্মলাভ করে।

কিস্‌সা শুনিয়ে খুসী করার বিনিময়ে শাহরাজাদ বাদশাহ শাহরিয়ারের কাছে কিছু ইনাম প্রার্থনা করলেন। বাদশাহ খুশী হয়ে তাঁকে ইনাম দিতে সম্মত হলেন।

বেগম শাহরাজাদ এবার শিশু তিনটিকে বাদশাহের সামনে হাজির করে বললেন—জাঁহাপনা কিস্‌সা শুনিয়ে আপনাকে খুশী করা ছাড়াও ইতিমধ্যে আপনার ঔরসজাত এ তিনটি শিশু পুত্রকে আমি গর্ভে ধারণ করে জন্মদান করেছি। সব কিছুর বিনিময়ে আমিএখন আপনার কাছে আমার প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি। তবে এ-ও জানবেন, আমার নিজের জন্য নয়, এদের মুখের দিকে তাকিয়েই আজ আমি বেঁচে থাকতে আগ্রহী। আমার অবর্তমানে এরা যে অনাথ হয়ে পড়বে জাঁহাপনা।

বাদশাহ শাহরিয়ার শাহরাজাদ-এর অনুরোধ রক্ষা করলেন। শুধু কি এই? তিনি সমরখন্দ থেকে ছোট ভাই শাহজামানকে তলব করে আনালেন। কাজীর তলব পড়ল। কাজী সাহেব বাদশাহ শাহরিয়ার ও শাহরাজাদের আর শাহজামান ও দুনিয়াজাদের শাদীর শাদীনামা তৈরী করলেন। বাদশাহী জাঁকজমকের সঙ্গে তাদের শাদী মিটে গেল।

বাদশাহ শাহরিয়ার তাঁর দরবারের অনুলেখককে বেগম শাহরাজাদ কথিত হাজার এক রজনীর কিস্‌সাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য হুকুম দিলেন। এভাবে আরব্য রজনীর কিস্‌সা সম্পূর্ণ হয়েছে।

আমার অনেক দিনের সাধ ছিল 'সচিত্র সহস্র এক আরব্য রজনী' নাম দিয়ে একটি বই প্রকাশ করি। কিন্তু সুযোগের অভাবে আমার সে সাধ পূর্ণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এতদিনের সে সাধ আজ বাস্তবে পরিণত করলেন কামিনী প্রকাশালয়ের স্বত্বাধিকারী এবং আমার পরম আত্মীয় ও সুহৃদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ সরকার মহাশয়। বইটিকে সবদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

বইটি যদি সুধীগণ কর্তৃক সমাদৃত হয় তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

বিনীত

দেবাশিস সরকার

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪০১

বাদশাহ শারিয়ার এবং বাদশাহ শাহজামানের কিস্‌সা

প্রাচ্যের সুলতানিয়তের শাসক শাহেনশাহ, শসন বংশের শাসক। দীর্ঘাকৃতি, সুদেহী, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা শাহেনশাহ সমগ্র প্রাচ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ছিলেন। বড়টি ছিলেন সুঠামদেহী ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। আর ছোটটি অপেক্ষাকৃত খর্বকায় তবে বিচক্ষণ।

শাহেনশাহ-র দুই পুত্রই যুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে যেমন অভিজ্ঞ ছিলেন তেমনি ঘোড়ায় চড়াতেও তাদের সমতুল্য কেউ ছিলেন না।

ছোট ভাইয়ের তুলনায় বড় ভাই যেমন দেহে অমিত শক্তি রাখতেন তেমনি বুদ্ধিও ছিল অতুলনীয়।

দুই ভাই যে কেবলমাত্র যুদ্ধবিদ্যায়ই বিশারদ ছিলেন তা-ই নয়। প্রজাদের প্রতি তাঁদের দয়া-মায়া-মমতাও ছিল অপরিসীম। আবার প্রজাদের কাছেও তাঁরা ছিলেন চোখের মণির মতই ভালবাসার পাত্র। প্রজারা তাঁদের পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন।

বড় ভাইয়ের নাম ছিল বাদশাহ শারিয়ার। আর ছোট ভাইকে সবাই বাদশাহ শাহজামান নামে চিনত।

শাহজামান ছিলেন সমরখন্দের অন্তর্গত আল-আজম নামক অঞ্চলের শাসক। তিনি ছিলেন প্রজাদের খুবই হিতাকাঙ্খী। শাসক হিসাবে তাঁর ছিল আকাশছোঁয়া খ্যাতি।

প্রজাপালন, শাসন এবং প্রতিপত্তিতে উভয় ভাই-ই উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হতে পেরেছিলেন।

বাদশাহ শারিয়ার এবং শাহজামান-এর মধ্যে অভাবনীয় হৃদ্যতার সম্পর্ক বর্তমান ছিল। কেউ, কাউকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না। দীর্ঘদিন উভয় ভাইয়ের মধ্যে এ হৃদ্যতার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। বছর কুড়ি উভয় ভাইয়ের মধ্যে দেখা নেই। তাই তাঁকে একবারটি চোখের দেখা দেখার জন্য বাদশাহ শারিয়ার-এর মন-প্রাণ কেঁদে উঠল।

বাদশাহ শারিয়ার একদিন উজিরকে ডেকে বললেন—'তোমাকে একবারটি বাদশাহ শাহজামান-এর কাছে যেতে হবে। তাকে বলবে, তাকে দেখার জন্য আমার মন বড়ই উতলা হয়েছে। আর যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

বাদশাহের নির্দেশে উজির উপযুক্ত প্রহরী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেন সমরখন্দের অন্তর্গত আল-আজম প্রদেশের উদ্দেশ্যে। দু'দিন আর দু'রাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন প্রৌঢ় উজির। উজির যথা সময়ে শাহজামান-এর দরবারে উপস্থিত হলেন।

বাদশাহকে কুর্নিশ করে তার বড় ভাই বাদশাহ শারিয়ার-এর ঐকান্তিক আগ্রহের কথা ব্যক্ত করলেন।

বড় ভাইয়ের অভিপ্রায়ের কথা শুনে শাহজামান তো মহা খুশি। তিনি উজিরকে বললেন—'যত শীঘ্র সম্ভব আমি যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি আজই যাত্রা করব।'

বাদশাহের নির্দেশে বেছে বেছে উট, খচ্চর ও কিছু গাধা নেওয়া হ'ল। আর পথে বিশ্রামের জন্য সঙ্গে নেওয়া হ'ল কয়েকটি দামী তাঁবু।

দেশের কয়েকজন বাছাই করা মল্লবীর আর গাট্টা গোট্টা কয়েকজন ক্রীতদাসকে প্রহরী হিসেবে সঙ্গে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল।

যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন হ'লে প্রবীণ উজিরের ওপর রাজ্যরক্ষার ক্ষমতা অর্পণ করে বাদশাহ শাহজামান সুসজ্জিত উটের পিঠে উঠলেন। যাত্রা করলেন বড় ভাইয়ের অভিলাষ পূর্ণ করতে।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে বাদশাহ শাহজামান নিজ রাজ্য থেকে বেশ কিছু দূরবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে গেলেন।

অকস্মাৎ বাদশাহ সবাইকে থামতে বললেন। সর্বনেশে কাণ্ড, ভয়ানক একটি ভুল করে ফেলেছেন তিনি। বড় ভাইকে যে মূল্যবান জিনিসটি উপহার দেবেন বলে বেছে রেখেছিলেন সেটিই ব্যস্ততার জন্য সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছেন।

অনন্যোপায় হয়েই উটের মুখ ঘুরিয়ে আবার নিজ রাজ্যের দিকে যাত্রা করলেন তিনি।

প্রাসাদে ফিরে বাদশাহ শাহজামান সোজা হারেমের উদ্দেশে পা বাড়ালেন। সেখান থেকে সোজা চলে এলেন তাঁর পেয়ারের খাস বেগমের কামরায়।

বেগমের কামরার দরজায় পৌঁছেই বাদশাহ শাহজামান আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। নিজের চোখ দুটোর ওপরও যেন আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

বাদশাহ শাহজামান-এর খাস বেগম সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা। দেখলেন, এক কুচকুচে কালো নিগ্রো ক্রীতদাস যুবকের সঙ্গে তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গভীর ঘুমে মগ্না।

বাদশাহ শাহজামান চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর্তনাদ করে উঠলেন—'হায় খোদা, এ কী দৃশ্য দেখছি! তবে কি আমার এতদিনের পেয়ার মহব্বত সবই মিথ্যে, কাঁচের স্বর্গে বাস করেছি আমি! মাত্র তো কয়েক ঘণ্টা আগেই আমি প্রাসাদ ছেড়েছি। এটুকু সময়ের মধ্যেই এমন অবিশ্বাস্য অপ্রীতিকর জঘন্য কাণ্ড ঘটে গেল! যদি বড় ভাইয়ের রাজ্যে কিছুদিন থাকতাম তবে তো কত কাণ্ডই না জানি ঘটত!

অস্থিরচিত্ত বাদশাহ শাহজামান অতর্কিতে কোষবদ্ধ তরবারিটি টেনে হাতে তুলে নিলেন। শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে কোপ বসিয়ে দিলেন। উভয়ের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। সব খতম।

ব্যস, আর মুহূর্তমাত্রও দেরী না করে উটের পিঠে চেপে বসলেন অস্থিরচিত্ত বাদশাহ শাহজামান। যাত্রা করলেন বড় ভাইয়ের রাজ্যের উদ্দেশে।

দু'দিন দু'রাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে উটের পিঠে বসে বাদশাহ শাহজামান বড় ভাইয়ের প্রাসাদে পৌঁছে গেলেন।

দীর্ঘদিন পর দু'ভাইয়ের মিলন ঘটল। ছোটভাইকে এতদিন পর কাছে পেয়ে বাদশাহ শারিয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁকে বুকে জড়িয়ে বহুভাবে আদর করলেন। লাভ করলেন পরম তৃপ্তি।

শাহজামান-এর মনে কিন্তু এতটুকুও শান্তি নেই। মুখের হাসি নির্বাসিত। চোখের তারায় হতাশার ছাপ। তাঁকে নিয়ে বড় ভাই যে আনন্দে মেতেছেন তাতে যোগদান করতে তিনি কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছেন না। সাধ্যমত সংক্ষেপে তাঁর কথার উত্তর দিয়ে কেবল দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করছেন।

একই প্রশ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা শাহজামান-এর ভেতরটিকে কুরে কুরে খেতে লাগল—এ কী করে সম্ভব হ'ল। যাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে পেয়ার মহব্বত দিলাম, সে কিনা তাকে দু' পায়ে মাড়িয়ে পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'ল! এমন জঘন্য মনোবৃত্তি কি করে তার হ'ল! আমার ফুলের মত পবিত্র মহব্বতের মূল্য সে কি না এভাবে দিল! তবে কি পেয়ারমহব্বতের কোন মূল্যই তামাম দুনিয়ার কোথাও নেই? সবই কি মিথ্যা? সবই কি ভুয়ো?

শাহজামান সর্বক্ষণ একান্তে মুখ গোমড়া করে বসে নিজের নসীবের কথা ভাবেন আর থেকে থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বাদশাহ শারিয়ার-এর মনে কিন্তু ছোট ভাইয়ের ব্যাপারটি সন্দেহের উদ্রেক করল। ভাবলেন, নিজের রাজ্য আর বেগমকে ছেড়ে এসে হয়ত শান্তি-স্বস্তি পাচ্ছে না। তাই তার চোখে-মুখে নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছায়া, মনে অন্তহীন হাহাকার। কারো সঙ্গে যেচে কথাবার্তা বলা তো দূরের কথা খানাপিনাও ছেড়ে দিয়েছে। একেই বলে মহব্বত আর বিবির চিন্তা।

এক সময় বাদশাহ শারিয়ার ছোট ভাইয়ের কাছে এসে সমবেদনার স্বরে বল্‌লেন—'ভাইয়া, এখানে আসার পর থেকে তোমাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। হতাশা আর হাহাকার সম্বল করে প্রহর কাটাচ্ছ। ব্যাপার কি, আমার কাছে খোলসা করে বল।'

শাহজামান চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'ভাইজান আমার বুকের ভেতরে আগুন জ্বলছে, তারই জ্বালায় আমি প্রতিনিয়ত দগ্ধে মরছি।'

—'সে কী কথা ভাইয়া! হঠাৎ এমন কি ঘটল যার জন্য তোমার মনের কোণে এমন অশান্তি দানা বেঁধেছে! বল, সব কিছু খুলে বল আমাকে।'

শাহজামান অপ্রতিভ মুখে, হতাশ দৃষ্টিতে ভাইজানের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'আমাকে ক্ষমা করবে, আমি কিছুতেই আমার অশান্তি আর হতাশার কথা মুখ ফুটে তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারব না। আমার গোস্‌তাকি মাফ ক'র ভাইজান।'

বাদশাহ শারিয়ার ব্যাপারটিকে নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করতে উৎসাহী হলেন না। ভাবলেন, নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। পীড়াপীড়ি করে কাজ হবে না, উচিতও নয়। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বল্‌লেন—'ঠিক আছে, চলো আমরা দু' ভাই শিকারে যাই। এতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনটা হাল্কা হবে।'

—'ভাইজান, শিকারে যেতে আমি ভেতর থেকে কোনো রকম তাগিদ পাচ্ছি না। তুমি বরং একাই ঘুরে এসো। আমি সঙ্গে থাকলে আমার হতাশা আর নিরানন্দ তোমার শিকারের আনন্দকেই বরবাদ করে দেবে। তার চেয়ে বরং তুমি একাই ঘুরে এসো। আমি প্রাসাদেই থাকি।'

বাদশাহ শারিয়ার আর পীড়াপীড়ি করলেন না। একাই লোক-লস্কর নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন।

যে-ঘরে শাহজামান-এর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার দক্ষিণদিকের জানালা খুললেই সুন্দর এক বাগিচা। কত সব দেশী বিদেশী ফুল আর ফলের গাছের বিচিত্র সমারোহ সেখানে। জানালা খুললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মনলোভা বাগিচাটি।

সে-রাত্রে শাহজামান জানালার ধারে দাঁড়িয়ে উদাস ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাগিচার ফোয়ারাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

অকস্মাৎ প্রাসাদের পিছনের দরজাটি খুলে গেল। ব্যস, হুড়মুড় করে বাগানে ঢুকে গেল কুড়িটি ক্রীতদাস ও কুড়িটি ক্রীতদাসী। পরমুহূর্তেই দেখ গেল স্বয়ং বেগম সাহেবাকে। তিনিও তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সবাই নগ্ন, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। বাগিচার বিভিন্ন প্রান্তে, নিরালায় গিয়ে বসল তারা জোড়ায় জোড়ায়।

ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা জোড়াবেঁধে যে যার পছন্দমত জায়গায় চলে যাওয়ার পর বেগম সাহেবা গলা ছেড়ে হাঁক দিলেন—'মাসুদ! মাসুদ!'

বেগম সাহেবার আহ্বান কানে যেতে না যেতেই বিশালদেহী এক নিগ্রো যুবক লম্বা-লম্বা পায়ে বেগমের কাছে ছুটে এল। তাকে পুতুলের মত কোলে তুলে নিয়ে পরম আনন্দে বার কয়েক চুম্বন করল। পুলকে-আনন্দে অভিভূত করে তুলল বেগম সাহেবার দেহ-মন। চোখের তারায় দেখা দিল কাম-তৃষ্ণার সুস্পষ্ট ছাপ। বিবস্ত্রা প্রেমাকুল বেগম সাহেবাকে কোলে করে নিগ্রোটি কয়েক পা এগিয়ে সবুজ ঘাসের আস্তরণের ওপর আলতো করে শুইয়ে দিল। তারপরই শুরু হয়ে গেল দৈত্যাকৃতি নিগ্রোটির বল্গাহীন পেষণ। সে সঙ্গে বেগম-সাহেবার কুসুম-কোমল দেহ পল্লবটিকে দলন -পেষণে সে

বার বার পিষ্ট করতে লাগল। আবেশে জড়ানো তাঁর আঁখি দুটো পুলকানন্দে বার বার অর্দ্ধনিমিলিত-নিমিলিত হতে লাগল। আর মনের মধুর আবেগ আর নিরবচ্ছিন্ন রোমাঞ্চ বার বার উপচে পড়তে লাগল। এ যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দকে হঠাৎ হাতের মুঠোয় পেয়ে উভয়ে পুরো পুরি উপভোগ করে নিচ্ছেন। সারা রাত্রি ধরে দৈত্যাকৃতি নিগ্রো যুবকটি বেগম সাহেবার কুসুম কোমল দেহটিতে বার বার আলিঙ্গন, চুম্বন, দলন আর পেষণের মাধ্যমে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলল, নিজের যৌবনক্ষুধাকেও পুরোপুরি নিবৃত্ত করে নিল।

বেগম সাহেবা আর নিগ্রো যুবকের ব্যাভিচারের দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে শাহজামানের মন একটু শান্ত হ'ল। প্রবোধ পেল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠলেন—'হায় খোদা! আমার বড় ভাইয়ার নসীব দেখছি আমার চেয়েও মন্দ!'

বাদশাহ শাহজামান-এর বুকের ওপর থেকে বিশালায়তন পাথরটি সরে যাওয়ায় যেন বেশ হাল্কা মনে হ'ল এবার। সরাবের বোতলটি হাতে তুলে নিলেন। গলায় ঢেলে দিলেন। ঢগঢগ করে সবটুকু সরাব গিললেন। তাঁর দেহে হৃত বলশক্তি ফিরে এল। ফিরে পেলেন মানসিক স্বস্তি।

শাহজামান ভোররাত্রে শয্যা নিলেন। কখন যে জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঘরে ঢুকে মেঝেতে লুটোপুটি খেতে শুরু করেছে, বিন্দুমাত্রও হুঁস তাঁর নেই।

বাদশাহ শারিয়ার বেশ বেলায় শিকার সেরে প্রাসাদে ফিরে এলেন। ছোটভাইয়া শাহজামান তখন আরাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চেখবুজে রাত্রির ঘুমের ঘাটতিটুকু পূরণ করছেন। তিনি তাঁকে ডাকলেন। কুশলবার্তাদি নিলেন।

ভাইকে একটু বেশ হাসিখুশি দেখে বাদশাহ শারিয়ার বিস্ময় বোধ করলেন। কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'ভাইয়া, এক রাত্রির মধ্যে এমন কী তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল যার ফলে তবিয়ত সুস্থ দেখছি, মেজাজ মর্জিও কেমন বদলে গেছে, তোমার ব্যাপার কি বল তো?'

শাহজামান এবার মুখ খুললেন—'বলছি শোন, উজিরের মুখে তোমার আকুল আহ্বানের কথা শুনে আনন্দে আমার মন-প্রাণ চনমনিয়ে উঠেছিল। একটি দিন দেরী করতেও আমার মন সরছিল না। কতক্ষণে তোমার সঙ্গে মিলিত হ'ব সে ভাবনা আমার মনকে পেয়ে বসল। লোক-লস্করসহ উজিরের সঙ্গেই পথে নামলাম। কিছুটা পথ পেরোতে না পেরোতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল ব্যস্ততার জন্য একটি দরকারী জিনিস আনা হয়ে ওঠে নি। বাধ্য হয়ে আবার প্রাসাদে ফিরে যেতেই হ'ল। কিন্তু প্রাসাদে খাস বেগমের ঘরের দরজায় গিয়েই আমার নসীবের করুণতম পরিণতির মুখোমুখি হলাম। যার ফলে মুহূর্তে তামাম দুনিয়া আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ল। আমাকে মুহূর্তের জন্যও যে-বেগম চোখের আড়াল করতে পারে না সে-ই কিনা বিবস্ত্রা অবস্থায় এক ধুমসো নিগ্রো যুবকের আলিঙ্গানাবদ্ধ হয়ে পরম শান্তিতে বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার চোখে-মুখে প্রসন্নতার সুস্পষ্ট ছাপ। এক নজরে দেখেই মনে হ'ল সারা জীবনে

আমার বেগম এই বুঝি প্রথম শান্তি ও তৃপ্তির স্বাদ পেল। ব্যস, আমার শিরায় শিরায় খুন টগবগিয়ে উঠল। শরীরের সবটুকু খুন যেন শিরে চেপে গেল। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। ব্যস্ত-হাতে কোমর থেকে তরবারীটি টেনে নিলাম। দু'টুকরো করে দিলাম আমার শান্তি-সুখ কেড়ে নেওয়া শয়তান দুটোকে।' মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে শাহজামান আবার মুখ খুললেন—'ভাইজান, কেন আমার শান্তি-সুখ অন্তর্হিত হয়েছিল, বললাম। কিন্তু কিভাবে আবার হৃত-শান্তি ফিরে পেয়েছি সে-কথা জানতে চেয়ে আবার পীড়াপীড়ি করলে আমি কিন্তু বড়ই বিব্রত বোধ করব।'

ছোট ভাইয়ের কথার গুরুত্ব না দিয়ে কৌতূহলী ও উৎকণ্ঠিত বাদশাহ শারিয়ার তবুও তাঁকে বার বার বলতে লাগলেন—'হায় খোদা! এত করে বলা সত্ত্বেও তুমি আমার অশান্ত মনকে শান্ত করতে এতটুকুও উৎসাহী হচ্ছ না! কেন তোমার এত দ্বিধা-সঙ্কোচ? আমি আর সইতে পারছি না! বল, সবকিছু খুলে বলে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর ভাইয়া।'

শাহজামান আর মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পারলেন না। দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে গতরাত্রে যে-অবিশ্বাস্য নক্কারজনক ঘটনাকে চাক্ষুষ করেছেন সবই সবিস্তারে তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন।

সবকিছু শুনে বাদশাহ শারিয়ার কিছুমাত্রও বিশ্বাস করতে পারলেন না।

ম্লান হেসে শাহজামান বল্‌লেন—'আমি কিছুমাত্রও মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে যা পুরোপুরি সত্য সে-ছবিই তোমার চোখর সামনে তুলে ধরেছি মাত্র। একে তুমি সেই-অবিশ্বাস্য জঘন্যতম দৃশ্যটির প্রতিচ্ছবিও মনে করতে পার। আমি তোমাকে হাতেনাতে প্রমাণ করে দেখাতে পারি। তবে তোমাকে আবার শিকারে যাবার ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। ভাইজান, প্রচার করে দাও, তুমি আবার শিকারে যাবে। ব্যস, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই গোপনে আমার ঘরে এসে আত্মগোপন করে থাকবে। তারপর নিজের চোখের সামনেই তাদের খেল্‌ দেখতে পাবে। চাক্ষুস করার এমন অপূর্ব সুযোগ হাতের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও মিছে কেন আমার কথায় আস্থাবান হয়ে নিজেকে কষ্ট দেবে ভাইজান? আজ রাত্রেই তো সে পরিকল্পনা করতে পার।'

ব্যস, বাদশাহ শারিয়ার-এর নির্দেশে সর্বত্র প্রচার করে দেওয়া হ'ল, তিনি গত রাত্রের মত আজও শিকারে যাবেন। আবার সাজসাজ রব উঠল।

যথা সময়ে বাদশাহ শারিয়ার উটের পিঠে চেপে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে মহাধূমধাম করে শিকারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বনের এক চিলতে সমতল প্রান্তরে বাদশাহ শারিয়ার-এর তাঁবু পড়ল। সন্ধ্যার অন্ধাকার নেমে আসার কিছু পরে তিনি তার দুই বিশ্বস্ত নোকরকে ডেকে বললেন—'আমি কিছু সময়ের জন্য তাঁবু ছেড়ে অন্যত্র যাব। কেউ, এমন কি উজির এলেও বলবি, আমার তবিয়ত বিগড়েছে। কারো সঙ্গেই দেখা করা সম্ভব নয়।'

রাত্রি একটু বাড়তে বাদশাহ শারিয়ার কালো বোরখায় নিজেকে ঢেকেঢুকে তাঁবু থেকে গোপনে বেরিয়ে অতি সন্তর্পণে প্রাসাদে শাহজামান-এর ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন।

প্রাসাদের দক্ষিণদিকের জানলা খুলে, ফুল-ফলের বাগিচার দিকে মুখ করে দু'ভাইয়া অন্ধকার ঘরে বসে রইলেন। উভয়ের চোখেই অনুসন্ধিৎসার ছাপ। কারো মুখেই কোন কথা নেই।

বাদশাহ শারিয়ারকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। এক সময় প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল বিবস্ত্র কুড়িজন ক্রীতদাস আর কুড়িজন ক্রীতদাসী। তারপরই দেখা গেল বাদশাহ শারিয়ার-এর খাস বেগম সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা অবস্থায় বাগানে এসে দাঁড়ালেন। অস্বস্তিতে ভরপুর। অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন 'মাসুদ!—মাসুদ!' মুহূর্তের মধ্যেই যুবক-নিগ্রোটি আড়াল থেকে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। বিবস্ত্রা বেগম সাহেবার কাছে গেল। তারপরই চুম্বন, দলন, পেষণ আর সম্ভোগের মাধ্যমে পুলকানন্দ লাভ করতে লাগল সারারাত্রি ধরে। বেগম সাহেবা যেন এই প্রথম পুরুষের মধুর আলিঙ্গনে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। বাদশাহ শারিয়ার নিজের চোখ দুটোর ওপরও যেন আস্থা হারিয়ে ফেল্‌লেন। লজ্জায়, ঘৃণায় আর অপমানে তার সর্বাঙ্গে বিশ্রী এক অনুভূতি দেখা দিল।

বাদশাহ শারিয়ার-এর মন থেকে সংসারের মোহ চিরদিনের মত নিঃশেষে মুছে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাইয়া শাহজামানকে বলল—'ভাইয়া, আর নয়। এ পাপের নরকপুরীতে এক মুহূর্তও আর নয়। যেখানে প্রেম মূল্যহীন, মহব্বতের আপমৃত্যু ঘটেছে। পাপাচার,

ব্যভিচার আর বিশ্বাসঘাতকতা সবার উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে সেখানে থেকে নিজেকে আর বঞ্চিত করতে চাই না। চল, আজই আমরা প্রাসাদ, রাজৈশ্বর্য আর ঘিবির মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ি। যেদিকে দু' চোখ যায় চলে যাই। খুঁজে দেখি, আমাদের মত নসীব বিড়ম্বিত আর কেউ আছে কি না।'

ভোরের আলো ফোটার আগেই শারিয়ার ছোট ভাইয়া শাহজামান-এর হাত ধরে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। নসীব সম্বল করে তাঁরা হারা উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলেন। এক সময় সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হলেন। একটি গাছের ছায়ায় বসে তারা ক্লান্তি অপনোদন করতে লাগলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল দু' ভাই গাছে হেলান দিয়ে, পাশাপাশি গা-ঘেঁষাঘেষি করে বসে বিশ্রাম নিলেন। এক সময় তাঁরা দেখলেন, সমুদ্রের মঝখানে ধোঁয়ার একটি কুণ্ডলি আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

দু'ভাইয়া অতর্কিতে সোজা হয়ে বসে পড়লেন। বিস্ময়, বিস্ফারিত চোখে অলৌকিক দৃশ্যটির ওপর নজর রেখে চলতে লাগলেন। এক সময় দেখলেন ধোঁয়ার কুণ্ডলিটি থেকে অতিকায় একটি আফ্রিদি দৈত্যের উদ্ভব ঘটেছে। অভাবনীয় দৃশ্যটি দেখে দু'ভাইয়া যেন কুঁকড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। তাড়াতাড়ি গাছের ডালে উঠে বসলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অতিকায় আফ্রিদি দৈত্যটি উপকূলের দিকে ফিরল। তারপর বাতাসে ভর করে এগিয়ে আসতে লাগল বিশ্রামরত দু' ভাইয়ার দিকে। ব্যাপার দেখে তাঁদের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। আফ্রিদি সামান্য এগোতেই আরও অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য তাঁদের নজরে পড়ল। দেখলেন তার মাথায় রয়েছে পর্বতপ্রমাণ এক বাক্স।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আফ্রিদি গাছটির তলায় হাজির হ'ল। বিশালায়তন বাক্সটিকে নামাল। তার ভেতর থেকে একটি বেশ বড়সড় ও ভারি সিন্দুক বের করল। ব্যস, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক রূপসী। পরমা সুন্দরী তন্বী যুবতী। বেহেস্তের পরীদের সৃষ্টি করার পর অবশিষ্ট সৌন্দর্যটুকু যুবতীটির গায়ে লেপে দেওয়া হয়েছে। নতুবা বেহেস্তের পরীদেরই একজন এই রূপসী তন্বী যুবতীটি। তাঁর রূপের আভায় চোখ দুটো যেন ঝলসে দিচ্ছে। বেহেস্তের পরীটির আলোকচ্ছটায় যেন গাছের তলা ও তাঁর চারদিকের অনেকখানি অংশ উদ্ভাসিত।

আফ্রিদি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে রূপসী পরীটির রূপ সৌন্দর্য দেখতে লাগল। তারপর আবেগ-মধুর সম্ভাবণে বলতে লাগল 'মেহবুবা, আজ তোমার শাদী হবার কথা ছিল। আমি পেয়ারের সাহজাদীকে শাদীর আসর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। ব্যস, তারপর থেকেই আমার আঁখির নিদ উবে গেছে। অবসাদে আজ আমার তবিয়ত কাহিল হয়ে পড়েছে। এখন আমি নিদ যাব। তোমার কোলে শির রেখে নিদ যাব।'

রূপসী তন্বী যুবতীটির কোলে মাথা রেখে অতিকায় আফ্রিদি দৈত্যটি ঘুমিয়ে পড়ল। মুহূর্তেই গভীর ঘুমে বেহুঁস হয়ে পড়ল।

রূপসী তন্বী যুবতীটি এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরাতে গাছের ডালে অবস্থানরত দু' ভাইয়াকে দেখতে পেল। অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত আফ্রিদির মাথাটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। দু' ভাইকে ইসারা করে বুঝিয়ে দিল দৈত্যের ঘুম সহসা ভাঙবে না। তোমরা নির্ভয়ে নেমে এসো।

রূপসী তন্বী যুবতীটির কাছ থেকে অভয় পেয়ে দু' ভাইয়া কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন বটে। তবু তাদের ফ্যাকাসে মুখ অধিকতর ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখের তারার ভীতিও হতাশাটুকু গাঢ়তর হ'ল।

রূপসী এবার অভয় দিতে গিয়ে বল্‌ল—'আল্লা তাল্লার নামে হলফ করে বলছি, তোমাদের কোন অনিষ্টই হবে না। আমার কথায় ভরসা রেখে গাছ থেকে নেমে এসো। আর যদি নেহাৎই আমার হুকুম তামিল না কর তবে তোমাদের নসীবে দুঃখ আছে। দৈত্যকে জাগিয়ে দেব। গলাটিপে মেরে ফেলবে তোমাদের। এখনও সময় আছে, নেমে এসো, আমার কলিজাটাকে শান্ত কর। কলিজার আগুনে পানি ঢেলে আমাকে শান্তি দাও, তৃপ্ত কর! তোমরা ভোগ কর আমাকে।'

বাদশাহ শারিয়ার আর তাঁর ভাইয়া গাছের ডালে বসে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কাটিয়ে আল্লাতাল্লার ওপর নিজেদের নসীবকে অর্পণ করে তারা দুরুদুরু বুকে অপরূপার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

রূপসী তন্বী যুবতীটি মুহূর্তের মধ্যে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। আবেশে জড়ানো কামাতুর চোখ দুটো মেলে দু' ভাইয়ার দিকে তাকাল। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—'তোমরা এক এক করে আমার কলিজার জ্বালা নেভাও। চুম্বন, দলন, পেষণ আর সম্ভোগে সম্ভোগে আমাকে উতলা করে তোল। অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরছি আমি। আমাকে তৃপ্ত কর, শান্তি দাও।'

দু' ভাইয়া পরস্পরের চোখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। কে আগে যাবে?

রূপসী তন্বী যুবতী অস্থিরকণ্ঠে বলে উঠল—'দেরী কোরো না, চলে এসো। কলিজার জ্বালায় আমি জ্বলেপুড়ে খাঁক হচ্ছি! দেরী করলে কিন্তু আমি আফ্রিদিকে ডাকতে বাধ্য হ'ব, বলে দিচ্ছি।'

দু' ভাইয়া নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে একের পর এক রূপসী যুবতীকে সম্ভোগের তৃপ্তি দানে লিপ্ত হলেন। তার কলিজা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কামাতুরা যুবতীকে সঙ্গদান করলেন। নিজেরাও কম তৃপ্তি পেলেন না।

পরিতৃপ্তি লাভ করে রূপসী যুবতীটি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—'নারীর কামজ্বালা নির্বাপিত করে তৃপ্তিদানের কৌশল তোমাদের দু' জনেরই দেখছি খুব ভাল রপ্ত আছে!'

রূপসী যুবতীটি এবার একটি থলির ভেতর থেকে একগোছা আঙটি বের করে তাঁদের চোখের সামনে ধরল। মিষ্টি-মধুর স্বরে উচ্চারণ করল— এগুলো কি বলতে পার?'

দু' ভাইয়ার চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

রূপসী যুবতীটিই মুশকিল আসান করতে গিয়ে বলল—'ইতিপূর্বে আফ্রিদির চোখের আড়ালে যাদের দিয়ে আমি সম্ভোগের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করেছি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি করে আঙটি নিয়ে এখানে গেঁথে রেখেছি। এ গোছাটিতে একশ' সত্তরটি আঙটি রয়েছে। এগুলো আমার কাজের স্মৃতিস্বরূপ। তোমরা দু' জনেও আমাকে একটি করে আঙটি দাও স্মৃতির গোছায় গেঁথে রাখি। ভবিষ্যতে আঙটি দুটো দেখলেই আজকে তোমাদের দ্বারা যে সম্ভোগের তৃপ্তি পেয়েছি সে কথা আমার মনের কোণে ভেসে উঠবে।'

বিস্ময়ে অভিভূত শারিয়ার আর তাঁর ভাইয়া কথা না বাড়িয়ে নিজ নিজ অঙ্গুলি থেকে আঙটি খুলে রূপসী যুবতীর হাতে তুলে দিলেন।

রূপসী যুবতী ঠোঁটের কোণে পরিতৃপ্তির হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে এবার বলল—'এ হতচ্ছাড়া দৈত্য আফ্রিদি আমাকে শাদীর আসর থেকে জবরদস্তি ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে। তারপরই ওই লোহার সিন্দুকটায় বন্দী করে দেশ-দেশান্তরে, বন-বনান্তরে আর পাহাড়ে-মরুতে মাথায় করে হরদম ঘুরে বেড়িয়েছে। আমাকে নিয়ে তার হরবকত ডর, যদি হাতছাড় হয়ে যাই। তাই সমুদ্রের অতল গহ্বরে রেখেছে আমাকে। কিন্তু হতচ্ছাড়া শয়তান দৈত্যটা তো একটা আস্ত আহাম্মক। লেড়কিদের চরিত্রের কথা তো তার বিলকুল অজ্ঞাত। আসলে আমরা, লেড়কিরা কলিজার তৃপ্তির জন্য যা চাইব যে করেই হোক লাভ না করে শান্ত হ'ব না। লেড়কিদের আটকে রেখে সতর্কতার সঙ্গে চোখে চোখ রেখেও কেউ তাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও কোনদিন সক্ষম হবে না।

বাদশাহ শারিয়ার এবং তার ভাইয়া শাহজামান তার কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ভাবলেন,—'বিশালদেহী, অমিত শক্তিধর ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দৈত্যের এত সতর্কতা সত্ত্বেও রূপসী যুবতীটি কেমন করে তাকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে চলেছে তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর তো বটেই, রীতিমত অবিশ্বাস্যও। আর তারা দু' ভাইয়া তাঁদের বিবিকে রক্ষা করার জন্য কতটুকুই বা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন? কিছুমাত্র না। বিশ্বাসঘাতকতা তো তারা করবেই।'

রূপসী যুবতী ও দৈত্য আফ্রিদির কিস্সা শুনে এবং তাঁর ভাইয়া শাহজামান কিছুটা অন্ততঃ স্বস্তি পেলেন। তাঁরা এবার নিজ নিজ প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

বাদশাহ শারিয়ার প্রাসাদে ফিরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত তাঁর খাস বেগমের কামরায় হাজির হলেন। তরবারির আঘাতে বেগমের শিরচ্ছেদ করে ফেললেন। আর হারেমে যত ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসী ছিল সবাইকে খতম করার নির্দেশ দিলেন।

বাদশাহ শারিয়ার উদ্ভ্রান্তের মত চেঁচিয়ে উজিরকে তলব করলেন। বৃদ্ধ উজির দুরুদুরু বুকে ছুটে এসে কুর্নিশ করে আদেশের অপেক্ষায় বাদশাহের সামনে দাঁড়ালেন।

বাদশাহ মুখের গাম্ভীর্যটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বল্লেন—'উজির, আমার হুকুম শোন, আজ থেকে প্রতি রাত্রে একটি করে কুমারী লেড়কি আমার ঘরে হাজির করবে। আমি সারা রাত্রি তাকে নিয়ে সম্ভোগে লিপ্ত থাকব। আর পূর্ব-আকাশে রক্তিম ছোপ ফুটে ওঠার আগেই তাকে নিজে হাতে খতম করব। সে যাতে তার কলঙ্কিত দেহ পবিত্র বলে অন্য কোনো পুরুষকে দান করে প্রতারণা করতে না পারে। মনে রেখো, আমার হুকুম তামিল না করলে তোমার শিরটা গর্দান থেকে নেমে যাবে। যাও, হুকুম তামিলের কথা ভাব গে।'

বৃদ্ধ উজির আর কিছু না হোক অন্ততঃ জানের মায়ায় তিন তিনটি বছর এক নাগাড়ে প্রতিরাত্রে একটি করে কুমারী লেড়কি বাদশাহের শোবার ঘরে হাজির করে চল্লেন।

ব্যাপার দেখে রাজ্য জুড়ে মানুষের, বিশেষ করে কুমারী লেড়কি এবং তাদের আব্বাদের মনে অন্তহীন হাহাকার আর হাহুতাশ সম্বল হয়ে দাঁড়াল। অনেকে লেড়কিকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল।

প্রজারা একদিন যে বাদশা শারিয়ারকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করত আজ তিনিই তাঁদের চোখে সাক্ষাৎ শয়তানে পরিণত হয়েছেন। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে খোদার কাছে তাঁরা নালিশই শুধু নয়, প্রতিনিয়ত তাঁর মৃত্যু কামনা করে।

বাদশাহ শারিয়ার-এর কোনদিকেই বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বেহেস্ত বা দোজাকেরও পরোয়া করেন না। কিন্তু এদিকে যে দেশে কুমারী লেড়কির আকাল পড়ে গেছে সে তো উজিরের ভালই জানা আছে। তিনি পড়লেন মহাফাঁপরে। কোথায় পাবেন নবাবের বাঞ্ছিত কুমারী! আবার সন্ধ্যায় খালি হাতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে জান নিয়ে ফিরে আসতে হবে না। উজিরের নিজের অবশ্য পরমা সুন্দরী দুটো মেয়ে রয়েছে। উভয়েই কুমারীও বটে। রূপে গুণে একেবারে চৌখস। বড়টির নাম শাহরাজাদ আর ছোটটির নাম দুনিয়াজাদ। বড়টির ইতিহাসে অগাধ পাণ্ডিত্য। আবার গান বাজনায়ও বিশেষ পারদর্শিনী। সে আব্বাজানের বিষণ্ণতা লক্ষ্য করে তাঁর মনের আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ জানতে চাইল।

বৃদ্ধ উজির বেটিকে সব কথা খুলে বল্‌লেন। আব্বাজানের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে শাহরাজাদ তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌ল—'আব্বাজান, কেন তুমি সামান্য একটি ব্যাপার নিয়ে একেবারে আসমান-জমিন ভেবে মরছ! আজ রাত্রেই বাদশাহ শারিয়ার-এর সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে দাও। আমার নসীবের কথা ভেবে উতলা হয়ো না। আমার দেহে যদি সাচ্চা মুসলমানের খুন থেকে থাকে তবে দেখবে আমি আবার জান নিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবই। আর যদি নেহাৎই বাদশাহের হাতে জান দিতে হয় তবে এমন কোন কাজ করে মরব যেন ভবিষ্যতে তামাম দুনিয়ার কোন লেড়কিকে আর শয়তানটার শিকার হতে বা রাজ্য ছেড়ে ভেগে যেতে না হয়। পুরো ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

বলদ, গাধা ও গৃহকর্তার কিস্‌সা

উজির বল্‌লেন—'বেটি আল্লাহ-র দোয়া থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না এটুকু ভরসা আমার আছে। তবে একটা কথা। তুমি কিন্তু তোমার প্রকৃত পরিচয় নবাবের কাছে গোপন রাখবে। তোমাকে এবার বলদ, গাধা আর গৃহকর্তার কিস্‌সা শোনাচ্ছি—'কোন এক সময়ে এক নদীর ধারে কুটীর বেঁধে এক পশুপালক বাস করত। তার বাড়ির চারদিকে পশুচারণযোগ্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তার ঘরের লাগোয়া ছিল বলদ আর গাধাটার থাকার গোয়াল। মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বলদটা গোয়ালে ঢুকে দেখে গাধাটা দানাপানি খেয়ে উজাড় করে, খড়ের বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বিভোর হয়ে নিদ যাচ্ছে।

গাধাটার কাজ রোজ একবার মনিবকে পিঠে বয়ে খামারের চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা। ব্যস, তারপরই তার ছুটি, অখণ্ড অবসর। খানাপিনা কর আর নাক ডাকিয়ে নিদ যাও।

বলদের উপস্থিতিতে গাধার নিদ ছুটে গেল। বলদটা তাকে আক্ষেপ করে বল্‌ল—'ভাইয়া, সুখের জীবন বটে তোমার! তুমি যেসব খানা পাও তার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আর অন্য সব আরামের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সুখ কিছু ছিল বটে তোমার নসীবে!'

তাদের মনিব গোয়ালের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলদের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরবর্তী উক্তি শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল।

বলদটা বলে চল্‌ল—'আমার মত নসীব তো আর তোমার নয় যে সকাল-সন্ধ্যা খেটে খেটে হাড় কয়লা হবে। খেটে খেটে আমার জান কেমন কয়লা হয়েছে, চেয়ে দেখ? আর ভাল ভাল খানাপিনা ও দীর্ঘ বিশ্রামে দিন দিন তোমার গোস্ত কেমন ফুলে ফেঁপে উঠছে, লক্ষ্য করলেই বুঝতে পরবে। আমাকে ভোর হওয়ার আগেই জোয়াল কাঁধে নিতে হয়। আর রেহাই পাই সন্ধ্যার আন্ধার নেমে এলে।'

বলদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে গাধার মন গলে গেল। সে এবার মুখ খুল্‌ল—'ভাইজান, তোমার দুঃখে আমার কলিজাটা বার বার কেঁকিয়ে উঠছে। তোমাকে চমৎকার একটা ফন্দি ফিকির বাৎলে দিতে পারি। কাল ভোরে নোকরটা যখন তোমাকে নিতে আসবে তখন তুমি ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে থাকবে। কিছুতেই উঠে দাঁড়াবে না। তারপর নচ্ছার নফরটা তোমাকে পিটিয়ে পাটিয়ে যে করেই হোক মাঠে নিয়ে যাবেই। তারপর জোয়াল কাঁধে চাপাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কিছুতেই জোয়ালটাকে ঘাড়ে নেবে না। সে তবু বলপ্রয়োগ করতে থাকবে। জোর করে জোয়ালটাকে তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিলেও দু'-

এক কদম গিয়ে জমিনে টান টান হয়ে শুয়ে পড়বে। শত গুঁতো গাঁতাতেও উঠবে না। তবেই দেখবে তোমাকে ছাড়ান দেবে।'

মনিব উৎকর্ণ হয়ে সব শুনল। সকাল হলেই তার নজরে পড়ল, গাধা বলদকে যে ফন্দি শিখিয়ে দিয়েছিল সে হুবহু সে সবই অবলম্বন করেছে।

মনিব তখন নোকরকে বল্ল—'এক কাজ কর, বলদটাকে গোয়ালে রেখে গাধাটার কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে দে।'

মনিবের নির্দেশে নোকর এবার গাধার কাঁধে জোয়াল জুড়ে উদয়াস্ত তাকে দিয়ে জমি চাষ করাল। দিনের শেষে গাধা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে গোয়ালে ফিরলে বলদটা বল্ল—'ভাইজান, আজ একটু বিশ্রাম পেয়ে হাড় ক'টা যেন একটু স্বস্তি পেল। আল্লাতাল্লা তোমায় দোয়া করবেন। এসো, আমরা মনের সুখে একটু গল্প করি।'

গাধা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—'গল্প আর আমার মধ্য থেকে বেরোচ্ছে না ভাইজান। তোমার দুঃখের কথা ভেবে ভেবেই আমার কলিজাটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে! মনিবের কথায় যা বুঝলাম, তোমাকে বোধ হয় আর রাখবেন না।'

বলদটা সচকিত হয়ে বল্ল—'রাখবেন না! রাখবেন না মানে? তবে কি আমায় জবাই করবে নাকি হে?'

'—না। কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেবে তোমাকে। নফরটাকে বলছিল, বলদটা যদি মরে যায় তবে বহুৎ টাকা লোকসানের দায় ঘাড়ে চাপবে। তার চেয়ে বরং কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দি, তুই কি বলিস?' মনিবের কথা শোনার পর থেকে ভয়ে দুঃখে আমি একেবারে কুঁকড়ে ছিলাম। তোমায় যদি কসাইয়ের হাতে তুলেই দেয় তবে আমি এত বড় গোয়ালে কি করে যে একা একা থাকব ভেবেই অস্থির হচ্ছি!'

ব্যস, এবার বলদটা আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। গামলা থেকে খড় খেতে লাগল। শরীরে তাগদ না বাড়ালে সে লাঙল টানবে কি করে। খেতে খেতে গাধাকে বল্ল—'ভাইজান, আগাম খবর দিয়ে তুমি আমার কী উপকারই যে করলে তা আর ভাষায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়! কাল থেকে এমন আচরণ করব যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

মনিব গোয়ালের পিছনে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে বলদ আর গাধার কথোপকথন সবই শুনল।

পরদিন সকালে নোকরটা গোয়ালে ঢুকে দেখে বলদটা একেবারে সুস্থ—স্বাভাবিক। এবার সে গাধাটার পরিবর্তে বলদটাকে নিয়েই মাঠের দিকে হাঁটা জুড়ল। গাধাটা তাদের ফেলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল।

মনিব তার স্ত্রীকে একটা মজা দেখাবার কথা বলে মাঠে নিয়ে গেল। নোকরটা বলদের কাঁধে জোয়াল তুলে দিতেই সে এমন ভাব দেখাল যেন লাঙল জোড়ার আর তর সইছে না তার। লাঙল জুড়তেই সে লম্বা লম্বা পায়ে মাঠময় ঘুরে জমি চষতে শুরু করল। ব্যাপার দেখে মনিব যেন হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাবার উপক্রম হ'ল। মালিকের স্ত্রী কিছু বুঝতে না পেরে বল্ল—'কি গো, কি হ'ল তোমার? এমন করে হাসছ যে বড়! হয়েছে কি বলবে তো? আমায় দেখেই কি তবে তোমার এমন হাসি পাচ্ছে?'

—'কী যে বল বিবিজান, নিজেই জান না। তোমায় দেখে হাসতে যাব কেন গো। তোমায় নিয়ে কি আজ থেকে ঘর করছি যে, এতদিন এত বছর পর তোমাকে দেখে তামাশায় আমার হাসির উদ্রেক ঘটবে? আজ থেকে এক শ' কুড়ি বছর আগে তোমায় নিয়ে ঘর বেঁধেছি। আজ আমার বয়স কত তা আমার মালুম নেই। একদিন তুমি ছিলে আমার চাচার লেড়কি। তারপর তা থেকে বিবিজান হয়ে পাশে রয়েছ। ঘর করছ, কেন আমি হাসছি সবই খুলে বলব, তবে এখন নয়। তাতে হাসতে হাসতে যদি দম বন্ধ হয়ে আমার মৃত্যু হয় তবু বলব। বাড়ি গিয়ে লেড়কা-লেড়কিদের ডাকবে, মোল্লা-মৌলভীদের সাক্ষ্য রাখবে। বাড়ি, জমি-জিরাত সব লেখাপড়া করে দিয়ে তারপর সব খোলসা করে তোমায় বলব। তখন আমার যদি মৃত্যুও হয় কোনই আক্ষেপ থাকবে না।'

মনিবের অনুরোধে লেড়কা-বুড়া, মোল্লা-মৌলভী সবাই তাঁর বাড়ি হাজির হলেন। তার মুখে সব কথা শুনে সবাই মনিবাণিকে বোঝাতে চেষ্টা করল—'শোন, তোমার মরদ বুড়ো হয়েছে। একগাদা লেড়কা লেড়কি নিয়ে তোমাকে যে পথে বসতে হবে। তাই আমরা সবাই বলছি, তোমার জেদ সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।'

মনিবাণি কিন্তু এত সহজে দমবার পাত্রী নয়। তার ওই এক কথা—'আমাকে নিয়ে আমার মরদ হাসি ঠাট্টা করেছে। কিছুতেই আমি তা বরদাস্ত করব না।'

উপায়ন্তর না দেখে মনিব কোঁদাল নিয়ে গোয়ালের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বিরাট একটা গর্ত খুঁড়ল। এখানে তাঁকে গোর দেওয়া হবে এবার হাসির রহস্য ফাঁস করার প্রস্তুতি নিল। বলদ আর গাধার বৃত্তান্ত সবার সামনে বলার জন্য তৈরি হ'ল।

মনিবের একটা ইয়া তাগড়াই মোরগ রয়েছে। পঞ্চাশটা মুরগীর সঙ্গে সে থাকে। তাকে নিয়ে মুরগীরা সুখে দিনাতিপাত করে। আর একটা তেজী কুকুরও আছে তার।

মনিব হঠাৎ শুনতে পেল কুকুরটা মোরগটার ওপর খুব হম্বিতম্বি শুরু করে দিল—'তোর কি বোধগম্যি কিছুই নেই? আমাদের মনিব মরতে বসেছেন আর তুই কিনা আনন্দে লাফালাফি নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিস!'

মোরগটা নিজের পরিবারের মুরগীদের নিয়ে মহানন্দে দিন কাটায়। কারো ঝুটঝামেলায় থাকে না। অন্য কে কি করছে তা নিয়ে তার কিছুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। কুকুরটা মোরগকে তার মনিব আর মনিবাণির বৃত্তান্ত সব বল্ল। সবকিছু শুনে মোরগটা বল্ল—'এ কী

সর্বনেশে কথা গা! হায় খোদা! আমাদের মনিব মাটির মানুষ। সাদাসিদে। বুদ্ধির লেশমাত্রও নেই। আমি একা পঞ্চাশটা মুরগীকে বশে রেখেছি আর তিনি একটামাত্র বিবিকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারেন না! একটা জামের ডাল দিয়ে পিঠে ঘা কতক দিলে বাপ্ বাপ্ বলে সোজা হয়ে যায়। বজ্জাত বিবিকে বশ করতে লাঠিই একমাত্র সম্বল।'

মনিব পাশে দাঁড়িয়ে মোরগের মুখে সব কিছু শুনে আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। বিবির কাছে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বল্‌ল—'আমার শোবার ঘরে চল। গোপন রহস্যের কথা সব বলব তোমাকে।'

মনিব এবার বাগানে গিয়ে একটা জামের ডাল ভেঙে আনল। বিবিকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। দরজার খিল বন্ধ করল। বিবির গালে আচমকা এক চড় কষিয়ে দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। জামের ছড়িটা দিয়ে তাকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করল। যত আঁখির পানি ফেলে ততই মারে।

মনিবের বিবি কেঁদেকেটে বল্‌ল—'আমি আর হাসিঠাট্টার কারণ জানতে চাই না। আর মেরো না! মরে যাব! আর মেরো না আমায়!' সে এবার ঘরের বাইরে এসে আত্মীয়-বন্ধু, গ্রামবাসী আর মোল্লা-মৌলভীদের বল্‌ল—'আজ আমি সত্যি খুশি! আমার আর কিছুই জানার নেই।'

মনিবের বিবির কথা শুনে সবাই যে যার বড়ি ফিরল।

মনিব আর তার বিবি এরপর আরও বহুকাল সুখে ঘর-সংসার করল।

কাহিনী শেষ করে বৃদ্ধ উজির লেড়কির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

তাঁর লেড়কি শাহরাজাদ বল্‌ল—'আব্বাজান, আমার অভিপ্রায় তো অনেক আগেই তোমার কাছে ব্যক্ত করেছি।'

বৃদ্ধ উজির আর কথা না বাড়িয়ে বেটিকে শাদীর সাজে সাজতে বল্‌লেন।

বৃদ্ধ উজির লাঠি ভর দিয়ে বাদশাহকে খবর দিতে ছুটলেন আজ রাত্রের জন্য তার বাঞ্ছিতা কুমারী লেড়কি সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

এদিকে শাহরাজাদ তার ছোট বহিন দুনিয়াজাদকে বল্‌ল—'শোন, আমি এক রাত্রের জন্য বাদশাহের বেগম হতে চলেছি। আমি সময়মত তোকে ডেকে পাঠাব। তুই কিন্তু যাবি। শাদী হয়ে গেলে আমাকে নিয়ে বাদশাহ যখন শোবার ঘরে যাবার জন্য উদ্যোগ নেবেন তখন তুই আব্দার করবি—দিদি কিস্‌সা শোনাও—দিদি কিস্‌সা শোনাও। নইলে আমার চোখে নিদ আসবে না। প্রয়োজনে একটু-আধটু কান্নাকাটিও করবি। আমি তখন কিস্‌সা শুরু করব। ব্যস, এতেই বাদশাহকে কুপোকাৎ করতে হবে। দেখবি, চালটা কেমন জব্বর হয়।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ উজির ফিরে এলেন। বধূবেশে সজ্জিতা বড়মেয়ে শাহরাজাদকে নিয়ে, বিষণ্ণমনে বাদশাহ শারিয়ার-এর প্রাসাদের দিকে পা-বাড়ালেন।

বাদশাহ শারিয়ার তাঁর রাত্রের খোরাক রূপসী যুবতীটিকে দেখে উল্লসিত হলেন। আপন মনে বলে উঠলেন—'খুবসুরৎ! জবরদস্ত পাত্রী যোগাড় করেছ উজির! তোমার নজর আছে বলতে হবে!'

বাদশাহের মুখের দিকে চোখ পড়তেই শাহরাজাদ-এর মুখ খড়িমাটির মত ফ্যাকাসে হয়ে এল। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল। যথোচিত ভঙ্গিতে বাদশাহকে কুর্নিশ করল।

বাদশাহ শারিয়ার এবার রূপসী শাহরাজাদ'কে আদরে-আহ্লাদে অভিভূত করে তোলার চেষ্টা করলেন। কাঁধে হাত দিয়ে তাকে নিয়ে গেলেন শোবার ঘরে। দরজার খিল বন্ধ করে দিলেন। পাশে বসালেন।

শাহরাজাদ ওড়নায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বাদশাহ তাঁর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌লেন— 'সুন্দরী, কাঁদছ কেন? আমার বেগম হয়েছ, তোমার কাছে এ-তো সৌভাগ্যের কথা! ভয়ের কি-ই বা আছে, বুঝছি না তো। তুমি আমার পেয়ারের জান—আমার কলিজা। কি চাও তুমি, নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পার। তোমার কোন আশাই অপূর্ণ রাখব না। মুখফুটে একবারটি শুধু বল, কি চাও তুমি!'

শাহরাজাদ চোখ মুছতে মুছতে বল্‌ল—জাঁহাপনা, আমার একটা ছোট্ট বহিন রয়েছে। আমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও সে থাকতে পারে না। স্বস্তি পায় না। আমাকে ছাড়া সে হয়ত ঘুমোতেই পারবে না।

নির্ঘুম অবস্থায় রাত্রি কাটাবে। কেঁদেকেটে আকুল হবে। তাকে একবারটি চোখের দেখা দেখবার জন্য আমার কলিজাটা উথালি পাথালি করছে।'

বাদশাহ শারিয়ার মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'ব্যস, এটুকুই তোমার আব্দার! আর এরই জন্য তুমি এমন করে চোখের পানি ফেলছ! আমি নোকরকে পাঠিয়ে তোমার বহিনকে এখানে আনানোর ব্যবস্থা করছি।'

এক কর্মচারীকে পঠিয়ে বাদশাহ শারিয়ার তাঁর বিবির বহিন দুনিয়াজাদকে আনালেন। ঘরে ঢুকেই দুনিয়াজাদ তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে, হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। সে কী কান্না। কে বলবে, এর মধ্যে পরিকল্পনা রয়েছে?

শাহরাজাদ তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে, আদরে-আহ্লাদে শান্ত করলেন। এবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

বাদশাহ শারিয়ার এতক্ষণ পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। চোখের পাতায় একটু তন্দ্রা এসেছিল। দুনিয়াজাদ-এর কান্না আর শাহরাজাদ-এর নানা প্রবোধবাক্যে তাঁর তন্দ্রা টুটে গেল। তারপর হিংস্র জানোয়ারের মত হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সাঁড়াশীর মত আঁকড়ে ধরলেন ফুলের মত পবিত্র কুমারী শাহরাজাদকে।

শাহরাজাদ খোদা তাল্লার কাছে মিনতি জানাল—'হে খোদা, হিংস্র জানোয়ারটার অত্যাচার সহ্য করার মত শক্তি-সাহস আমায় দাও!'

টুকরো টুকরো কথা আর ধস্তাধস্তিতে দুনিয়াজাদ-এর ঘুম ভেঙে গেল। দিদিকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'আজ তুমি আমায় কিস্‌সা শোনাবে না? শোনাও কিস্‌সা।'

শাহরাজাদ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন—'শোনাব বহিন। নিশ্চয়ই শোনাব।'

—'রোজ রাতে তুমি যেমন কিস্‌সা বলে ঘুম পাড়াও, তেমনি আজও বল। তোমার মুখের কিস্‌সা কেবল আমি কেন, যেকোন মানুষই মুগ্ধ হয়ে শুনবে। বল, কিস্‌সা বল, শুনি।'

—'বহিন, রোজ রাত্রের সঙ্গে আজকের রাত্রের যে ফারাক। তবে অবশ্য, বাদশাহ যদি শুনতে আগ্রহী হন তবে অবশ্যই কিস্‌সা বলব।'

দু' বোনের কথায় বাদশাহ শারিয়ার-এর কৌতূহল হ'ল। বল্‌লেন—'বেগম শোনাও তোমার কিস্‌সা। দেখি, তোমার কিস্‌সা আমায় কেমন মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, সুবহ হবার আগে কিস্‌সা যেন খতম হয়।'

আফ্রিদি দৈত্য ও সওদাগরের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা শুরু করলেন—'কোন এক সময়ে এক দেশে এক সওদাগর বাস করত। অগাধ ধন-দৌলতের মালিক। টাকার কুমীর। তামাম দুনিয়ায় তার মত বিত্তবান দ্বিতীয় কেউ ছিল না। এক সময় সেই-সওদাগর দেশ-বিদেশে চক্কর মেরে বেড়াচ্ছিল। ইচ্ছা ভাল কিছু সমানপত্তর খরিদ করবে।

মাথার ওপরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত সূর্যটা হরদম চোখ রাঙিয়ে চলেছে। ক্লান্ত-অবসন্ন সওদাগর এক গছতলায় ঘোড়া থেকে নামল। রশি দিয়ে ঘোড়াটাকে গাছের সঙ্গে বাঁধল। নদীর পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। এবার ঝোলা থেকে খানা বের করে যেই না মুখে তুলতে যাবে অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠল অতিকায় এক আফ্রিদি দৈত্য। পাহাড়ের মত উঁচালম্বা চেহারা। হাতে তার এক কাটারী। গর্জে উঠল—'ওঠ, আমি তোমাকে হত্যা করব! জলদি কর, আমি তোমার কলিজা চাই।'

—'আমার অপরাধ?' সওদাগর করজোড়ে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল।

—'তুমি খুনী। আমার একমাত্র লেড়কাকে তুমি খুন করেছ।

খানাপিনা করার সময় একটা ফল খেয়ে আঁটিটা ছুড়ে ফেলেছিলে, মনে পড়ছে? তারই আঘাতে আমার বাপজান মারা গিয়েছিল। আমি আজ তার বদলা নেব। তোমার জান নিয়ে ছাড়ব। কলিজাটা টেনে বের করব। ওঠ, জলদি উঠে পড়।'

আফ্রিদি দৈত্য কথাটা বলেই রাগে ফুঁসতে লাগল। তার বুকের ভেতরে যেন কামারের হাঁফর চলেছে।

সওদাগর চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'তুমি দৈত্যরাজ। বহুত খুব তাকত ধর। তোমার লেড়কাকে যদি মেরেই থাকি তবে জানবে আমি অবশ্যই নিজের অজান্তে তা করেছি। গুণাহ করলেও নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত। তবু তুমি আমাকে যে শাস্তি দেবে আমি তা নির্দ্বিধায় মেনে নেব। তবে মৃত্যুর আগে মেহেরবানি করে আমাকে একবারটি আমার আত্মজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিলে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।'

অতিকায় আফ্রিদি দৈত্য এবার চোখ গোল গোল করে সওদাগরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

সওদাগর আগের মতই কাঁপা কাঁপা গলায় বলে চল্‌ল—'আমার অগাধ ধন-দৌলত রয়েছে। সেসব আমার বিবি আর লেড়কা-লেড়কিদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাই। তারপর আমায় মার-কাট যা খুশি করতে পার বাধা দেব না।'

আফ্রিদি দৈত্যটা তেমনি রোষপূর্ণ অথচ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সওদাগরের দিকে।

সওদাগর বলে চল্‌ল—'তুমি হয়ত জান না যে, আমি সওদাগরী কাজকর্মে লিপ্ত। এসব কাজে প্রচুর ধার বাকি থাকতে বাধ্য। আমারও কিছু পাওনাদার রয়েছে। গোরে যাওয়ার আগে তাদের পাওনা গণ্ডার কানাকড়ি পর্যন্ত আমি মিটিয়ে দিতে চাই। নইলে বেহেস্তে তো দূরের কথা দোজাকেও আমার ঠাঁই হবে না। জান দেওয়ার ব্যাপারে আমার মোটেই ভয় ডর নেই। আমার কথায় আস্থা রেখে মাত্র কয়েকদিনের জন্য যদি ছেড়ে দাও তবে আমি সবকিছু মিটিয়ে ফিরে এসে তোমার হাতে নিশ্চিন্তে জান দিতে পারি। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি অবশ্যই তোমার কাছে ফিরে আসব।'

আফ্রিদি দৈত্য বল্‌ল—'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। ঠিক আছে, তোমায় ছুটি দিলাম। কাজ সেরেই আমার কাছে ফিরে আসা চাই, খেয়াল থাকে যেন।'

ছুটি পেয়ে সওদাগর দেশে ফিরে গেল। যার, যা পাওনাগণ্ডা ছিল, মিটিয়ে দিল। বিবি আর লেড়কা-লেড়কিদের কাছ থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেবার জন্য তৈরি হ'ল। সব কিছু শুনে সবাই তাকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করল। মায়ায় মোহিত হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। বিচ্ছেদ-বেদনা যতই কঠিন হোক তাকে সে-আফ্রিদি দৈত্যের খোঁজে বেরোতেই হ'ল। সবাই বহুত আঁখির পানি ঝরাল।

এপথ-সেপথ হয়ে সওদাগর এক সময় নদীর ধারের সেই-গাছটার তলায় হাজির হ'ল। গাছের তলায় বসে নিজের নসীবের কথা ভেবে আঁখির পানি ফেলতে লাগল।

তখন এক বুনো ছাগলকে দঁড়ি দিয়ে বেঁধে এক জোয়ান মরদ হঠাৎ সওদাগরের সামনে এসে দাঁড়াল। সওদাগরকে কাঁদতে দেখে সে বল্‌ল—'কি হে সওদাগর, তোমার আঁখিতে পানি, ব্যাপার কি? এমন মনমরা হয়ে বসে কেন হে?'

সওদাগর চোখের পানি মুছতে মুছতে নিজের বরাতের কথা তাকে বল্‌ল।

যুবকটা ম্লান হেসে বল্‌ল—'আচ্ছা, এক কিস্‌সা শোনালে তো ভাইজান! মুখের জবান রাখার জন্য তুমি যে নিজের জান দিতে এসেছ তা কিন্তু তামাম দুনিয়ার কেউ-ই বিশ্বাস করবে না।

এমন সময় আর এক যুবক দুটো শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাছের তলায় এল। সওদাগরের নসীবের সে-ও আদ্যোপান্ত শুনল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আর এক যুবক সেখানে হাজির হ'ল। তার সঙ্গে দুটো খচ্চর রয়েছে। মাদী খচ্চর। সে-ও সওদাগরের নসীবের কথা শুনে একেবারে হাঁ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় উঠল। বালি আর শুকনো পাতায় চারিদিক ছেয়ে গেল। তার কেন্দ্রস্থলে একটা বালির স্তম্ভ ওপরের দিকে উঠে যেতে লাগল। বালির স্তম্ভটা এবার গাছটার দিকে

এগোয়। চোখের পলকে বালির স্তম্ভটা অতিকায় এক আফ্রিদি দৈত্যের আকৃতি ধারণ করল।

আফ্রিদি দৈত্যটা এবার হাতের ঝকঝকে চকচকে তরবারিটা উঁচিয়ে গর্জে উঠল—'সওদাগর, এগিয়ে এসো, আমি তোমায় খুন করব। আমার বেটাকে খুন করেছ তুমি। তোমাকে খুন করে আমি বদলা নেব।' সওদাগর মৃত্যুভয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল।

প্রথম মিঞার কিস্‌সা

আফ্রিদি দৈত্যটার হুঙ্কারে ভীত না হয়ে যুবকদের মধ্য থেকে বুনো ছাগলের মালিক প্রথম মিঞা এগিয়ে এসে বল্‌ল—মেহের্‌বান, বান্‌দার গুনাহ্‌ মাফ কর। আমি তোমায় আমার এ-বুনো ছাগলটার কিস্‌সা শোনাতে চাই। আমার কিস্‌সা যদি তোমার দিলে খুশ্‌ আনতে পারে তবে সওদাগরের গেস্তাকি মাফ করে দেবে, কথা দাও।'

আফ্রিদি দৈত্য ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'বহুত আচ্ছা! তোমার কিস্‌সা যদি আমার দিলে খুশ্‌ উৎপাদন করতে পারে তবে সওদাগরের তিন ভাগ গোস্‌তাকীর এক ভাগ আমি হাসিমুখে মাফ করে দেব, কথা দিচ্ছি।'

এবার বুনো ছাগলের মালিক-যুবকটি তার কিস্‌সা শুরু করল—'হে দৈত্যাধিপতি, আমার সঙ্গে এই যে বুনো-ছাগলটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু আসলে অবশ্যই কোন জন্তু নয়। আমার চাচার লেড়কি। চাচাতো বোন। আমি একে শাদী করেছি। এখন আমার বিবি। ত্রিশটা বছর আমরা এক সঙ্গে পাশাপাশি কাছাকাছি রয়েছি। শৈশবেই এ যাদুবিদ্যা রপ্ত করে নিয়েছিল।

আমার আপশোষ একটাই, ত্রিশ বছর এক সঙ্গে ঘর করলাম বটে কিন্তু একটাও ছেলেপুলে আমাদের হ'ল না। মনের দুঃখে শেষ পর্যন্ত বাড়ির নোকরাণির গর্ভে লেড়কা পয়দা করে আপশোষ দূর করলাম।

আমার লেড়কা যখন পনের বছরে পা দিল তখন আমাকে অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়েছিল।

আমার বিবি আমার অনুপস্থিতির ফায়দা লুটল। সে যাদুবলে 'আমার বেটাকে বাছুর আর তার মা'কে গাই করে ফেল্‌ল।

কিছুদিন পর আমি ঘরে ফিরে বিবিকে জিজ্ঞেস করলাম—'কি গো, আমার বেটা আর তার মাকে দেখছি নে যে? তারা কোথায় গেছে?'

আমার কথার উত্তরে বিবি আমাকে মিথ্যে কথা বল্‌ল, আমার বেটা ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে আর তার মা মরে গেছে। গোর দেওয়া হয়েছে। সামনে ঘাস-লতা পয়দা হয়ে জঙ্গল হয়ে গেছে।

বিবির কথায় আমার কলিজাটা কুঁকড়ে গেল। আঁখি দুটো দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি কান্নাকাটি করে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক সময় আমাদের পরবের দিন এল—বক্‌রি ঈদ। গাই, মহিষ বা ছাগল যার, যা সামর্থ্য কোরবানি করার পরব।

খোদাতাল্লাকে যখন মানি তখন আমাদেরও কিছু না কিছু কোরবানি করতেই হয়। নোকরটাকে পাঠালাম একটা তাগড়াই গাই বা বলদ যা-ই হোক খরিদ করে আনার জন্য। সে একটা ইয়া বড় গাই খরিদ করে নিয়ে এল। আমি অস্ত্র নিয়ে তার দিকে এগোতেই দেখলাম, আঁখি দুটো দিয়ে পানির বন্যা নেমে এসেছে। আর বিশ্রী স্বরে ডাকাডাকি করছে। হাতের অস্ত্রটা ফেলে দিলাম। কিছুতেই মন চাইল না। নোকরটাকে বল্‌লাম 'তুই যদি পারিস কোরবানি কর। আমার মন সরছে না।'

আসলে তো আমার জানা নেই, যেটাকে আমি কোরবানি করতে চাইছি সে অন্য দশটা গাইয়ের মত সাধারণ গাই নয়। আমার বেটার মা। আমার দাসীকে যাদুবলে গাই বানিয়ে রাখা হয়েছে।

আমার মন সরল না বটে, আমার নোকরটা কিন্তু মুহূর্তে কাজ হাসিল করে ফেল্‌ল।

জবাই করার পর এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য আমার নজরে পড়ল। দেখি, আমার নোকরাণির ধড় আর মুণ্ডুটা খুনের মধ্যে পড়ে বার-কয়েক লাফালাফি দাপাদাপি করে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নিথর হয়ে রইল। দুঃখ-যন্ত্রণায় আমার মনটা বিষিয়ে রইল।

এবার লোকটাকে আরও কিছু মোহর দিয়ে বল্‌লাম—'যা একটা বাছুর কিনে আন। সে এবার একটা মোটাসোটা ইয়া তাগড়াই বাছুর নিয়ে এল। আমার কাছাকাছি আসতেই বাছুরটা আমার পা দুটোর কাছে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। দু' আঁখিতে পানির ধারা ' ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপছে। কিছু যেন বলতে চাইছে। ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না। নীরবে আঁখি দিয়ে পানি ঝরাচ্ছে।

আমার বুকের ভেতরে কলিজাটা বার বার মোচড় মেরে উঠতে লাগল। বিষিয়ে উঠল দিলটা। নোকরটাকে বল্‌লাম—'বাছুরটাকে জবাই করতে কিছুতেই আমার মন সরছে না। একে ছেড়েই দেওয়া যাক। তুই বরং অন্য একটা গাই খরিদ করে নিয়ে আয় গে।

কিস্‌সাটা বলতে বলতে শাহরাজাদ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে।

ব্যস, এ পর্যন্ত গল্পটা বলে তিনি থেমে গেলেন, আর এগোলেন না। দুনিয়াজাদ দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'কী সুন্দর তোমার কিস্‌সা! কী মিষ্টি তোমার গলা! আর বাচনভঙ্গিও চমৎকার!'

শাহরাজাদ ওড়নাটা গোছগাছ করতে করতে বল্‌ল—'আরে, আসল কিস্‌সা তো শুরুই হয় নি। বহিন, যদি খোদা এ-জানটা রক্ষা করেন তবে কাল রাত্রে অবশিষ্টটুকু শোনানোর বাসনা রইল।'

দুনিয়াজাদ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বাদশাহ শারিয়ার বিবির কোলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলেন। বাদশাহের ঘুম-কাতর চোখ দুটো বুজে আসতে চাচ্ছে। তিনি আপনমনে বলে উঠলেন—'সত্যি বিবি, ভারী সুন্দর কিস্‌সাই শুরু করেছিল! নসীব মন্দ তাই শেষ হ'ল

না।' 'আবার বলে উঠলেন, এমন একটা কিস্‌সার শেষটুকু না শোনা পর্যন্ত বিবিকে তো কিছুতেই কোতল করা যাবে না।' এরকম ভাবতে ভাবতে তিনি বিবির ওপর কাৎ হয়ে ঘুমের শিকার হলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠল। যখন তিনি চোখ মেলে তাকালেন তখন জানলার বাইরে আলোর রোশনাই। বেগম শাহরাজাদ সে রাত্রের মত জানে বেঁচে গেলেন।

বৃদ্ধ উজির নিঃসন্দেহ যে, অন্যদিনের মত বাদশাহ তাঁর বেটি শাহরাজাদকেও নির্ঘাৎ কোতল করেছেন।

বাদশাহ শারিয়ার অন্যদিন সকালে দরবারে এসে তাঁর বিবির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। সেদিন কিন্তু তা আর করলেন না।

বৃদ্ধ উজির বাদশাহের আচরণে বিস্মিত হলেন। একী অবিশ্বাস্য কাণ্ড! তবে কি তাঁর জান শাহরাজাদ বেঁচে রয়েছে? ব্যাপারটা তাঁর

কাছে কেমন জটিল রূপ ধারণ করল।

বাদশাহ শারিয়ার দরবারে সারাদিন কাজে ডুবে রইলেন। সূর্য-পশ্চিম-আকাশে হেলতে না হেলতেই হারেমে, বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। কোনরকম ভূমিকা না করেই সরাসরি বল্‌লেন— 'পেয়ারী, তোমার কিস্‌সা শুরু কর। তোমার মুখের কিস্‌সা কেবল তোমার বহিনেরই নয়, আমার দিলও কেড়ে নিয়েছে।'

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'বাছুরটার আচরণে বুনো ছাগলের মালিক-যুবকের মন গলে গেল। সে নোকরকে ডেকে বল্‌ল —'বাছুরটাকে গোয়ালে বেঁধে রেখে অন্য আর একটা গাই নিয়ে আয়।' নোকরটা মনিবের আদেশ পালনের জন্য উদ্যোগ নিতে লাগল। এদিকে আফ্রিদি দৈত্যটা আপন মনে বলে উঠল—'এ কী অবিশ্বাস্য গল্পরে বাবা! শুনতে শুনতে দম যে বন্ধ হয়ে আসতে চায়!'

বুনোছাগলের মালিক-যুবকটা কিস্‌সা বলতে লাগল—'আমার বিবি, আমার চাচার সে-লেড়কি বুনো-ছাগলটা তখন অদূরে দাঁড়িয়ে। আমি বাছুরটাকে জবাই করতে অস্বীকার করলে সে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে ব'লে উঠল—'বাছুরটাকে ছেড়ে দিও না, জবাই কর। প্রচুর গোস্ত পাওয়া যাবে এর গা থেকে।'

বিবির কথাতেও আমার মন নরম হ'ল না। নোকরটাকে বল্‌লাম, —'এটাকে রেখে বেশতাগড়াই দেখে অন্য আর একটা গাই নিয়ে আয় গে।'

তার পরদিনের কথা। নোকরটা ব্যস্ত হয়ে এসে বল্‌ল—'হুজুর, এক বুড়িকে ধরে আমার লেড়কি ভাল জাদুবিদ্যা রপ্ত করেছিল। বুড়িটা এখন আমার বাড়িতে মেহমান হয়ে বাস করছে। কাল বাছুরটাকে আমার লেড়কির কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটাকে দেখামাত্র আমার লেড়কি বোরখা দিয়ে মুখ ঢেকে ফেল্‌ল। ব্যাপারটা আমার কাছে তাজ্জব ঠেকল। আমি ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মানুষই সেখানে ছিল না যাকে দেখে আমার লেড়কি অমন লজ্জা শরম বোধ করতে পারে। তারপর বাছুরটাকে দেখামাত্র তার চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক দেখা গেল। পরমুহূর্তেই দু'আঁখি বেয়ে পানি গড়াতে লাগল। সে আঁখি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'আব্বাজান, তুমি কি বাছুরটার ব্যাপার কিছু জান? এ যে আসলে বাছুর নয়, মানুষ—জানতে কি? নইলে আমার কাছে নিয়ে এলে কেন?'

লেড়কির কথায় আমার কলিজাটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মানুষ? মানুষের লেড়কা! কি সব যা তা বলছিস, মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না! আর হাসলিই বা কেন, কাঁদলিই বা কেন? এর মধ্যে কি রহস্য রয়েছে খোলসা করে বল।'

'—শোন আব্বাজান, বাছুরটা আমাদের মালিকের জোয়ান লেড়কা। যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে এর বিমাতা একে মানুষ থেকে বাছুরে পরিণত করে রেখেছে। আর এর মাকে করেছে গাই। তাই আমি হাসি চেপে রাখতে পারি নি। তার মা গরুটাকে তোমরা জবাই করেছ শুনেই আমার আঁখি দুটো বেয়ে পানি নেমে এল।'

হুজুর, আমার লেড়কির কথা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। তাকে বল্‌লাম—'এমন তাজ্জব কাণ্ড কি হওয়া সম্ভব? এ কথা শোনার পর থেকে সারাটা রাত্রি আমি বসে কাটিয়েছি। আমার নিদ যেন আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আঁধার কাটতে না কাটতেই আমি হন্তদন্ত হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

নোকরের মুখে এমন তাজ্জব ব্যাপার শুনে আমি তার সঙ্গে যাত্রা করলাম। তখন আমার একমাত্র চিন্তা কি করে আমার বাছার জীবনরক্ষা করা যাবে। তাকে একবারটি দেখার জন্য আমার মন উথালি পাথালি করতে লাগল। উঠোনে পা দিতেই নোকরের রূপসী

লেড়কী আমাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালমন্দ করল। আর হতভাগ্য বাছুরটা আমার পায়ের কাছে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।'

লেড়কিটা তখন বল্‌ল—'হুজুর, একে আপনি চিনতে পারেন নি? এ যে আপনার বেটা।'

—'বাছা, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে আমার কলিজার সমান বেটাকে ফিরিয়ে দাও। তুমি যা পুরস্কার চাইবে, দেব।'

—'হুজুর, আমি দুটো শর্তে আপনার পুরস্কার স্বরূপ অর্থ বা ধনদৌলত নিতে পারি। প্রথম শর্ত আপনার বেটার সঙ্গে আমার শাদী দিতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আপনার বিবিকে আমি আমার পছন্দ মত একটা জানোয়ার বানিয়ে দেব। বলুন হুজুর, আমার শর্ত মানতে রাজি তো? বলুন, তবে যাদুবিদ্যার দ্বারা আপনার লেড়কাকে বাছুর থেকে মানুষে পরিণত করে দেই।'

'দৈত্যরাজ, আশা করি আমার তখনকার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারছেন? নোকরের লেড়কির শর্তে আমি সম্মত হয়ে গেলাম।'

আমার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে নোকরের লেড়কি ছোট্ট একটা তামার রেকাবি নিয়ে এল। তাতে পানি ভর্তি। পানির দিকে মুখ রেখে চাপাস্বরে কি সব আওড়াতে লাগল। তারপর গণ্ডুষ ভরে পানিটুকু নিয়ে এবার অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল—'আল্লহ যদি বাছুর পয়দা করে থাকেন তবে তুমি বাছুরই রয়ে যাবে। আর যদি কোন ডাইনী যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে তোমায় মানুষ থেকে বছুরে পরিণত করে দিয়ে থাক তবে খোদার দোয়ায় তুমি প্রকৃত রূপ, মনুষ্য রূপ ফিরে পাও।'

বাছুরটা এবার ধীরে ধীরে মনুষ্য রূপ, আমার লেড়কার রূপ ফিরে পেল। আমি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে সদ্য ফিরে পাওয়া আমার বাছাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

আমার লেড়কা তখন আমার কাছে আদ্যোপান্ত ঘটনা ব্যক্ত করল। সব শুনে আমি তখন বললাম—'বাপজান, যে তোমার প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে দিয়েছে তার সঙ্গে তোমার শাদী দেব, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

শাদীতে আমার লেড়কাও আপত্তি করল না। সে রাত্রেই তাদের শাদী দিলাম।

নোকরের লেড়কি আমার বেটার বৌ হয়ে ঘরে এল। এবার আমার চাচার লেড়কি, আমার বিবিকে যাদুবিদ্যার বলে বুনো-ছাগলে পরিণত করে দিলে।

তারপর বেটার ওপর সব ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে আমার বিবি বুনো-ছাগলটিকে নিয়ে আমি হারা উদ্দেশ্যে ঘর-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ত্রিশ বছর একে নিয়ে সুখে-দুঃখে ঘর করেছি।

এখান দিয়ে যাবার সময় সওদাগরকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার করুণতম কাহিনী শুনে আমার বড় মায়া হ'ল। সব বৃত্তান্ত শুনে আমার কৌতূহল কম হয় নি। এর শেষ কোথায় দেখার জন্য এখানে রয়েই গেলাম।

আফ্রিদি দৈত্য এবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ার উপক্রম হ'ল। সে বল্‌ল—'ঠিক আছে, সওদাগরের তিন ভাগের এক ভাগ গুনাহ আমি মাফ করে দিলাম।'

দ্বিতীয় মিঞার কিস্‌সা

এবারে শিকারী কুকুর দুটোর মালিক দ্বিতীয় মিঞা আফ্রিদি দৈত্যকে কুর্ণিশ জানাল। সে বল্‌ল—'দৈত্যরাজ আমার কাহিনী শুনলে তুমি এতই অবাক হয়ে যাবে যে, মুখ দিয়ে রা পর্যন্ত বেরোবে না। যে কিস্‌সা এইমাত্র শুনলে তার চেয়ে এটা অনেক, অনেক বেশী চটকদার। আমার কিস্‌সা যদি বাস্তবিকই তোমার দিলকে একটু-আধটুও নাড়া দেয় তবে সওদাগরের গুনাহ্-র অল্প হলেও মাফ করে দিও তুমি।'

আফ্রিদি দৈত্য মুচকি হেসে বল্‌ল—'তাই হবে যুবক। তোমার কিস্‌সা শুরু কর।'

যুবক এবার কুকুর দুটোর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বল্‌ল—'এ-শিকারী কুকুর দুটো কিন্তু মেটেই সাধারণ কুকুর নয়। আমার দু' ভাইয়া, সহোদর ভাইয়া। উভয়েই আমার বড়। আমাদের আব্বাজান মৃত্যুসজ্জায় তিন হাজার মোহর তিন বেটার নামে ভাগ করে দিয়ে যান। আমার অংশ দিয়ে আমি একটা দোকান খুলে বসলাম। আমার ভাইজনরাও আলাদা আলাদা দোকান খুল্‌ল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার ভাইজানদের একজন দোকান গুটিয়ে এক সওদাগরের সঙ্গে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ভিন্ দেশে পাড়ি জমাল।

এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমার সে ভাইজান নিঃস্ব-রিক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরল। আমি তাকে বল্‌লাম—'তোমাকে তো হাজারবার নিষেধ করেছিলাম সওদাগরের কাজে ভিন্‌দেশে গিয়ে কাজ নেই। কিছুতেই সে-কথা কানে নিলে না। হয়ত বা খোদাতাল্লার এটাই মর্জি ছিল। তাই তো তোমার নসীব এরকম হ'ল।'

বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে এবার এনে আমার দোকানে বসালাম।

নদীর পানিতে গোসল করে এলো সে। আমার ভাল পোশাক আশাক পরালাম। তারপর দু' ভাইয়া খানাপিনা খেলাম। একথা-সেকথার মাঝে তাকে বল্‌লাম—'ভাইজান, এক বছরে দোকানে মুনাফা ভালই হয়েছে। আসল তো রয়েই গেছে। তার ওপর হাজার দিনার নগদ মুনাফা। তুমি তার অর্ধেক নিয়ে নাও। আবার দোকান সাজিয়ে বস। দেখবে তাতেই ভাল চলে যাবে। বেশী মুনাফার দরকার কি। অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকলে জীবনে সুখের হদিস পাওয়া যায়। কথায় আছে, অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।'

আমার বাৎলানো বুদ্ধি সে নিল। আবার পসরা সাজিয়ে বসল।

কিছু দিন এভাবে কাটার পর এক সকালে আমার দু' ভাইয়া

আমার বাড়ি হাজির হ'ল। বল্‌ল—'একদল সওদাগর বাণিজ্যের উদ্দেশে ভিনদশে যাচ্ছে। তারাও সাব্যস্ত করেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গ দেবে।

আমি সবিস্ময়ে তাকালাম।

তারা বল্‌ল—'দোকানদারীতে কোনরকমে পেটের ভাত হতে পারে বটে কিন্তু আমীর হওয়া সম্ভব নয়। তারা আমীর হওয়ার জন্য অত্যুগ্রাহী। আমাকেও তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য জোর জবরদস্তি শুরু করে দিল।

আমি আপত্তি জানাতে গিয়ে বল্‌লাম—'সে কী, বাণিজ্যে যাবে কি হে? একবার গেলে তাতেই তো শখ মেটার কথা। আবারও যাওয়ার জন্য নাচাকুদা শুরু করে দিয়েছে! শরম হওয়া উচিত!'

আমার কাছ থেকে ধাঁতানি খেয়ে তারা তখনকার মত নরম হ'ল বটে কিন্তু মাঝে মাঝেই একথা-সেকথা পেড়ে লালসার জালে আমাকে আটকাতে কসুর করল না। বাণিজ্য করে কত ফকির আমীর বাদশা হয়ে গেল এমন সব কথাও কৌশলে আমার কানে তুলতে কসুর করল না। কিন্তু আমি কিছুতেই নরম হলাম না।

মুখ ব্যাজার করে তারা সেদিনও ফিরে গেল বটে কিন্তু বাণিজ্যের ভূত তাদের মাথা থেকে নামল না। নানা কৌশলে আমাকে রাজী করাতে চেষ্টা করতে লাগল। আমিও যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের প্রতিবারই ফিরিয়ে দিলাম। পর পর দু' বছর ধরে তারা প্রয়াস চালাবার পর এক সময় আমি আর গররাজি হতে পারলাম না। তাদের কথায় মত দিতে গিয়ে বল্‌লাম —'ঠিক আছে, দু' বছরে তোমরা কে কি কামিয়েছ আমার সামনে রাখ। কারবারের হালৎ আগে দেখি।

আমার কথা মত তারা দু' হাজার দিনার এনে আমার সামনে রাখল। আলোচনার মাধ্যমে তিন ভাই একমত হলাম, তিন হাজার দিনার নিয়ে আমরা বাণিজ্যে যাব। আর বাকী তিন হাজার মাটিতে পুঁতে রেখে দেব। বলা তো যায় না, আর-উপার্জন করতে গিয়ে যদি লোকসান হয় তবে আর কেঁদে কূল পাওয়া যাবে না। এতে দেশে ফিরে আর অথৈ পানিতে পড়তে হবে না।

আমার পরামর্শে সম্মত হ'ল। মাথা পিছু এক হাজার করে দিনার নিয়ে মণিহারী মালপত্র কিনে নৌকো বোঝাই করলাম।

খোদাতাল্লার নাম নিয়ে আমরা তিনজন নৌকো জলে ভাসালাম।

প্রায় একমাস নৌকো চালিয়ে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ এক বন্দরে আমাদের নৌকো ভেড়ালাম, একদিন থেকে দশ দিনার লাভে একটা জিনিস বেচে আবার নোঙর তুল্‌লাম। এবার আমাদের লক্ষ্য আরও বড় কোন বন্দর, কোন বড় শহর। কয়েকদিন পর এক বন্দরে আবার নৌকো নোঙর করলাম।

কেনা-বেচা চালাতে চালাতে এক রূপসী-যুবতীর সঙ্গে আমাদের চিন পরিচয় হ'ল। খুবই গরীব। ছেঁড়া-ফাঁটা কাপড় পোশাক ছাড়া এমন পোশাক তার নেই যা দিয়ে ভালভবে লজ্জা নিবারণ করতে পারে। সে আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। আর এ-ও বল্‌ল, আমাদের সাহায্যের বিনিময়ে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সওদা করা পর্যন্ত সব কাজই করতে রাজী। নগরে থাকার আস্তানা। তিনকূলে আপনজন বলতে কেউ-ই তার নেই।

যুবতীটির কথা শুনে মনে হ'ল সে উঁচু বংশোদ্ভূতই বটে।

আমি তাঁকে আমার নৌকায় তুলে নিলাম। কামকাজ মন চাইলে করবে, না চাইলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, কই বাৎ নেহি।'

রূপসী-যুবতী এবার একটু সাহস পেয়ে বল্‌ল—'তা-ই যদি হয় তবে আমাকে শাদী করে নিজের কাছে রাখতে আপত্তি কোথায়!'

যুবতীর কথাগুলো আমার খুব মনে ধরে গেল। উপরী পাওনা তার অঢেল রূপ আর দেহের অনন্য যৌবনের জোয়ারটুকু। ভাবলাম বিদেশ বিভূঁইয়ে যদি এমন এক রূপসী-যুবতীর সঙ্গ লাভ করা যায় মন্দ কি? অমত করতে মন চাইল না। নৌকোয় তুলে নিলাম অপরূপাকে। সাগরের পানিতে ভাল করে গোসল করিয়ে আমার বাঞ্ছিতা রূপসীকে সাফসুতরা করে নিলাম। পরিয়ে দিলাম দামী পোশাক। আঁখির কোলে সুরমা আর গায়ে ছিঁটিয়ে দিলাম দামী আতর। ভাল খানাপিনা দিয়ে তার মন ভরিয়ে তুল্‌লাম। নৌকোর গলুইয়ে বসে ফুরফুরে বাতাসে উভয়ে কতই না গল্প করলাম। ভবিষ্যতের রঙীন খোয়াবে মন প্রাণ ভরে তুল্‌লাম।

আমারা খুব সহজেই পরস্পরকে কাছে টেনে নিলাম। মাথার ওপর কুমড়োফালি চাঁদ। তারই ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সাগরের বুকে। আমি তার হাতে একটা হাত রাখলাম। বিস্ময় মাখনো দৃষ্টিতে তার

রূপ-সৌন্দর্য পান করতে লাগলাম। তার নরম হাতের ছোঁয়ায় আমার বুকের মধ্যে কলিজাটা যেন চনমনিয়ে উঠতে লাগল। আমরা ক্রমেই ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলাম। ঝিরঝিরে বাতাসে মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলতে লাগল। তার তুলতুলে বুকে আমার মুখটাকে গুঁজে দেবার জন্য চিত্ত-চাঞ্চল্য বোধ করতে লাগলাম। নৌকার গলুইয়ে আর বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। কামোন্মাদনা আমাকে উত্যক্ত করতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে উঠে পড়লাম। তার নিটোল সরু কটিদেশ কখন আমার চঞ্চল হাত দুটো বেষ্টন করে ফেলেছে বুঝতেই পারি নি। সে আবেশে জড়ানো আঁখি দুটো মেলে, নীরব চাহনিতে অপলক দৃষ্টিতে আমার যৌবনাক্রান্ত দেহটাকে যেন জরীপ করতে লেগে গেল। সে যেন বাস্তবিকই এক অনাস্বাদিত আনন্দ। তার উত্তপ্ত বক্ষটিকে আমার বক্ষের সঙ্গে সাপ্টে নিয়ে কোনরকমে শোবার ঘরে ফিরে এলাম। শুইয়ে দিলাম কচি ঘাসের মত নরম বিছানায়। আমার কামতপ্ত প্রশস্ত বক্ষের চাপে সে যেন কোন এক অন্ধকার অতল গহ্বরে তিলে তিলে হারিয়ে যেতে লাগল। কারো মুখে কোন ভাষা নেই, আঁখিতে আঁখি রেখে কথা। উভয়ের মধ্যেই কেবল আবেগ উচ্ছ্বাস আর পরস্পরের আত্মদানের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভের সুতীব্র বাসনা বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

দিন যায়, সপ্তাহ কাটে। আমাদের মহব্বত ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে বাড়তে লাগল।

আমাদের সুখটুকু আমার ভাইয়া দু'জনের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করতে পারল না। ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে খাঁক হয়ে যেতে লাগল তারা। আমি বয়সে কনিষ্ঠ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাদের বয়স অপেক্ষাকৃত বেশী। আমার মত যৌবনের উন্মাদনা তো আর তাদের দেহ-মনকে এমন করে উত্যক্ত করে না। কোন রূপসী তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না তো সে দোষ কেন আমার। আমাদের ওপর, আমাদের ঘরে তাদের ঈর্ষাজর্জরিত কৌতূহলী চোখগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল। আর আমাদের নিয়ে সর্বদা ফুসুর ফাসুর করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। এক সময় দরজার ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে, দেওয়ালের ফাঁকে চোখ রেখে তারা দেখতে লাগল আমি কিভাবে আদরে সোহাগে বিবির মধ্যে কামোন্মদনা জাগিয়ে তুলি। সে কিভাবে নিজের দেহের স্পর্শে আমাকে হিংস্র জন্তুতে পরিণত করে সম্ভোগের প্রেরণা জোগায়—তারা সে সবের ওপর গোপনে নজর রাখতে লাগল। এমনকি আমাদের একান্ত গোপন কার্যকলাপও তারা চুপিসারে দেখে নিতে লাগল। আর এরই মাধ্যমে তারা তাদের বিকৃত বাঞ্ছা পূরণে লিপ্ত থাকত। আমার বুঝতে বাকী রইল না শয়তান তাদের কাঁধে চেপেছে। সহজে নামার নয়।

আমার দুই বড় ভাইয়া কেবলমাত্র আমাদের গোপন দৃশ্যাবলী দেখে তৃপ্ত হতে পারল না। আরও জঘন্যতম পরিকল্পনায় লিপ্ত হল। এক রাত্রে আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গভীর নিদ্রায় ডুবেছিলাম। তারা অতি সন্তর্পনে ঘরে ঢুকে আমাদের দু'জনকে তুলে নৌকার ছইয়ের বাইরে নিয়ে গেল। নির্মমভাবে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে

দিল। তখনই এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে খেতে আমি দেখতে পেলাম, আমার বিবি অতিকায় এক জিনির আকৃতি ধারণ করে আমাকে পুতুলের মত কাঁধে তুলে নিল। এবার দিব্যি লম্বা লম্বা পা ফেলে নির্বিবাদে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে তীরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। এক অজানা-অচেনা দ্বীপে নিয়ে গেল আমাকে। নির্জন-নিরালা দ্বীপের জমাটবাঁধা অন্ধকারে নামিয়ে দিয়ে চোখের পলকে সে অন্তর্ধান হ'ল। ভোরের আলো ফুটে উঠলে সে আবার আমার কাছে এল। দুষ্টুমিভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মধুর সুরেলা কণ্ঠে বলল—'আমায় চিনতে পারছ? কে আমি, বলতে পার?'

তার সুবিশাল বপুটির দিকে আমি নীরব চাহনি মেলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

সে ফিক করে হেসে বলল—"এই দেখ, তুমি দেখছি সত্যি আমায় চিনতে পারছ না। আমি তোমার বিবি। অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি। খোদাতাল্লার ওপর আমার বড়ই আস্থা। তাঁর বাসনা হয়ত এরকমই ছিল। আর তার দোয়া থাকলে অসম্ভব বলে কিছু থাকে না। তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়ে যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলে—আমি তা বিস্মৃত হই নি। আজ তোমাকে প্রাণে বাঁচাতে পেরে কী যে আনন্দ পাচ্ছি তা ভাষায় বুঝানো যাবে

না! আমি আজই তোমার শয়তান ভাই দুটোকে খুন করে প্রতিশোধ নেব।'

আমার ভাইদের হত্যা করবে শুনে মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠল। আমি আৎকে উঠে বললাম—'তুমি আর যা-ই কর, আমার ভাইদের খুন কোরো না। কথায় আছে, মূর্খের অশেষ দোষ। উপকারীর উপকারের প্রতিদান কিভাবে দিতে হয় তা তাদের অজানা। উপকারীর সর্বনাশ করতেও দ্বিধা করে না। শয়তানরা চেষ্টা করেও ভাল হতে পারে না। আর সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় শাস্তি মনে করা যেতে পারে।'

জিনি চেঁচিয়ে ওঠে—'অসম্ভব! শয়তান দুটোকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না। আমি কোতল করব। মৃত্যুই তাদের একমাত্র প্রাপ্য।'

কথা বলতে বলতে সে আমাকে কাঁধে তুলে নিল। আকাশপথে উড়তে আরম্ভ করল। আমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। এবার সোজা গাছতলায় গিয়ে পুঁতে রাখা দিনারগুলো তুলে ফেললাম। দোকানে গেলাম। দরজা খুলে দেখি সবই ঠিকঠাক আছে। বন্ধ করে বাড়ি ফিরলাম। দেখি, দুটো শিকারী কুকুর আমার দরজায় বাঁধা। আমাকে দেখেই তারা কেঁদে আকুল হতে লাগল। কাছে গেলাম। তারাও এগিয়ে এল। আমার জোব্বার কিনারা কামড়ে ধরে টানতে লাগল। ব্যাপার কি মাথায় এল না। ঠিক তখনই আমার বিবি জিনির আবির্ভাব ঘটল। মুচকি হেসে বলল—'এ-শিকারী কুকুর দুটো তোমার দু'ভাই। আমার ছোট বহিন যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী, সে বলেছে এরা দশ বছর কুকুর হয়েই থাকবে। কেউ এদের মানুষের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।'

এবার দশ বছর পূর্ণ হ'ল। আমি কুকুররূপী আমার ভাইজানদের নিয়ে পথে নেমেছি। জিনি-র সে-বহিনের খোঁজ করে বেড়াচ্ছি। তার দেখা মিললে অনুরোধ করব যাতে সে আমার ভাইজানদের আগের চেহারা ফিরিয়ে দেয়। তার খোঁজে পয়দল চলতে চলতে এখানে গাছটার তলায় এদের দেখা পেলাম। এরাই সওদাগরের দুঃখের কিস্‌সা বলল। অপেক্ষায় আছি দেখি, এর শেষ কোথায়।

তৃতীয় মিঞার কিস্‌সা

দ্বিতীয় যুবকের কিস্‌সা শেষ হলে খচ্চরের মালিক তৃতীয় মিঞা আফ্রিদি দৈত্যকে কুর্নিশ করে বলল—মেহেরবান, আমার কিস্‌সা শুনলে তাক লেগে—'

—'তোমার কিস্‌সা? তোমারও আবার কিস্‌সা আছে নাকি হে? বল, শুনি কেমন তোমার কিস্‌সা।' আফ্রিদি দৈত্য মুচকি হেসে বলল।

এবার খচ্চরের মালিক তৃতীয় যুবক বলল—'দৈত্যশ্রেষ্ঠ, এই খচ্চরটা কিন্তু সত্যিকারের খচ্চর নয়। আমার বিবি। যাদু বলে তাকে খচ্চরের রূপ দেওয়া হয়েছে। একবার আমি ভিনদেশে গিয়েছিলাম। বছরখানেক পরে বাড়ি ফিরেই বিবির সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্দরমহলে গেলাম। আমার মাথাটা অকস্মাৎ চক্কর মেরে উঠল। দেখি আমার বিবি এক নিগ্রো নোকরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মৌজ করে প্রেমালাপ করছে। মুখে আদিরসের জোয়ার, আর হাত দুটো তার শৃঙ্গারে লিপ্ত। কোনদিকে হুঁসমাত্রও নেই। উভয়ে যেন ভিন্
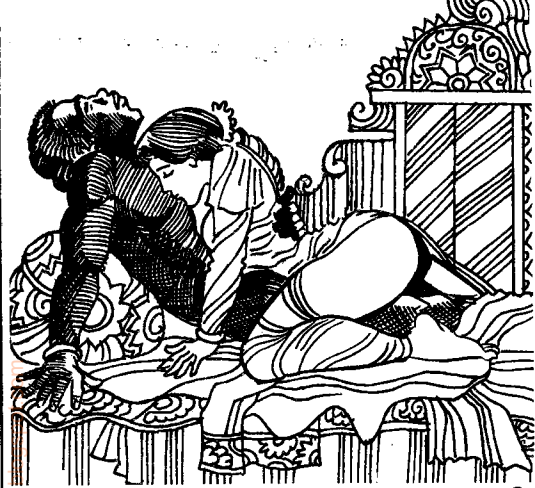
লোকে বিচরণ করছে। ক্রমে তাদের মধ্যে উত্তেজনা জাগছে। আমি দরজার ফুটোয় চোখ রেখে তাদের প্রেম-পীরিতি দেখতে লাগলাম। অকস্মাৎ আমার বিবি আমাকে দেখে ফেল্‌ল। তড়াক্ করে চৌকি থেকে নেমে দেয়ালের তাক থেকে জলের বাটি মুখের কাছে তুলে নিয়ে ফিসফিস্ করে কি সব মন্ত্র আওড়াল। তারপর তা গণ্ডুষ ভরে তুলে নিয়ে আমার গায়ে ছিঁটিয়ে দিল। ব্যাপারটা আমি আগে লক্ষ্য করিনি। ব্যস, মুহূর্তে আমি কুকুরের রূপ পেয়ে গেলাম। তারপর আমাকে দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

মনের দুঃখে আমি নগরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। একদিন পেটের জ্বালায় এক মাংসের দোকানে গেলাম। ফেলে দেওয়া হাড়গোড় মুখে নিয়ে চিবোতে লাগলাম। আমাকে দেখে কষাইয়ের বড়ই দয়া হ'ল। সঙ্গে করে সে তার বাড়ি নিয়ে গেল।

কষাইয়ের যুবতী লেড়কি আমাকে দেখেই ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে তার আব্বাজানকে বকাবকি করতে লাগল—'তুমি একজন পরপুরুষকে কেন একেবারে অন্দর মহলে নিয়ে এলে? এটা তো সাধারণ কুকুর নয়, পুরুষ মানুষ। এক শয়তানী একে তুক্ করে কুকুরে পরিণত করে দিয়েছে। তোমার ইচ্ছা থাকলে আমি এর মানুষের রূপ ফিরিয়ে দিতে পারি।'

—'বেচারার কী কষ্ট, চোখে দেখা যায় না। তুমি একে মানুষে

পরিণত করে দাও। এর কষ্টে আমার কলিজাটা উথাল পাথাল করছে।'

কষাইয়ের লেড়কি এক বাটি জল নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াল। তারপর সে-জল আমার গায়ে বার বার ছিঁটিয়ে দিল। আমি আবার আগের সে-মানুষের রূপ ফিরে পেলাম।

আমি বললাম—'সুন্দরী, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আমার শয়তানী বিবিকে আমি খচ্চরে পরিণত করে দিতে চাই। তোমার দ্বারা কি সম্ভব?'

কষাইয়ের লেড়কি আবার সে-বাটিটা ভরে জল নিল। আগের মতই বিড়বিড় করে কি যেন বলল। এবার বাটিটা আমার হাতে দিয়ে বলল—'তোমার বিবি যখন নিদ যাবে তখন এ-জল তার গায়ে দিয়ে মনে মনে যা ভাববে সে সে-রূপই পাবে।'

এবার আফ্রিদি দৈত্যের দিকে ফিরে সে বল্‌ল—'দৈত্যশ্রেষ্ঠ এ-খচ্চরটাই আমার সে বিবি। যাদুকরী বিবি!'

আফ্রিদি দৈত্যের মুখে প্রসন্নতার ছাপ ফুটে উঠল। এবার সে বল্‌ল—'সওদাগর আমি তোমার সব গুনাহ মাফ করে দিলাম। তুমি মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পার।'

ইতিমধ্যে পূর্ব-আকাশে ভোরের আলো উঁকি মারতে শুরু করেছে। শাহরাজাদ কিস্‌সা শেষ করতেই দুনিয়াজাদ তার গলা জড়িয়ে বলল—'কী সুন্দর! কী সুন্দর কিস্‌সা-ই না তুমি জান দিদি!'

—'এ আর এমন কি সুন্দর কিস্‌সা বহিন। প্রাণে বাঁচলে দেখবি কাল আরও কত সুন্দর কিস্‌সা শোনাব।'

বাদশাহ শারিয়ার ভাবলেন, একে কোতল করে এমন সুন্দর কিস্‌সা শোনা থেকে কিছুতেই বঞ্চিত হওয়া যায় না। বিবি শাহরাজাদ্-এর কোলে মাথা রেখে তিনি নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সারাদিন দরবারে নানা কাজে লিপ্ত থাকার পর বাদশাহ্ শারিয়ার সন্ধ্যার কিছু পরে অন্দরমহলে এলেন।

রাত্রে তাড়াতাড়ি পানাহার সেরে ঢুকলেন শোবার ঘরে। দুনিয়াজাদ তার দিদির গলা জড়িয়ে ধরে আব্দারের স্বরে বলল, 'কিস্‌সা শুরু কর।'

আফ্রিদি দৈত্য ও জেলের কিস্‌সা

শাহরাজাদ কিস্‌সা বলতে লাগল—কোন এক সময়ে এক বুড়ো জেলে সাগরের পাড়ে কুটীর বানিয়ে তার বিবি আর লেড়কা-লেড়কী নিয়ে বাস করত। রোজদিন মাত্র পাঁচবার সে জাল ফেলত। এক দুপুরে জাল ফেল্‌ল। একটা গাছের গুড়ি তুলল। আবার জাল ফেল্‌ল বুঝল ভারি কোন জিনিস জালে আটকা পড়েছে। অনেক আশা করে জাল গুটিয়েই আর্তনাদ করে উঠল—'হায় আল্লা!' সে দেখল, একটা মরে ফুলেফেঁপে যাওয়া গাধা জালে জড়িয়ে রয়েছে। তার দিলটা মোচড় মেরে উঠল। নিজেকে প্রবোধ দিল, খোদাতাল্লার বুঝি এটাই মর্জি। গাধাটাকে জাল থেকে বের করে আবার জালটাকে জলে ছুঁড়ল। ব্যস, এবার আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। অস্বাভাবিক ভারি ঠেকল। কিছুতেই জাল গোটাতে পারছে না। ঘেমে নেয়ে একাকার। শেষ পর্যন্ত অনেক ধকল সহ্য করে জাল গুটিয়ে দেখে অতিকায় একটা মাটির জালা। মোহর টোহর নয়, পচা পাঁকে ভর্তি। বিষণ্নমনে জাল থেকে জালাটাকে বের করে নদীর ধারে কাৎ করে রাখল। আল্লাহর নাম নিয়ে আবার জাল ফেল্‌ল। এবারও একই সমস্যা। ভীষণ ভারি ঠেকল। কোনরকমে কাঁকিয়ে কুঁকিয়ে জাল গুটিয়ে দেখে এক গাদা হাড়ি-কলসি ভাঙা আর ছোট-বড় কাঁচের টুকরো।

এবার আকাশের দিকে মুখ করে বলতে লাগল—'খোদা, তোমার কি মর্জি জানি না! চার চারবার জাল ফেলে নসীবে কিছুই জুটল না। এবারই শেষ। দেখি, তোমার কি মর্জি।'

কথা বলতে বলতে বুড়ো জেলেটা শেষবারের মত জালটা জলে ছুঁড়ে মারল। এবার সে বুঝল নির্ঘাৎ বিশাল একটা পাথরের টুকরো জালে আটকেছে। বার-কয়েক টেনে এক আঙুলও নড়াতে পারল না। এবার অনেক চেষ্টার পর একটা তামার জালা তুলে আনল। জালাটার মুখ আটকানো। সিলমোহর ব্যবহার করা হয়েছে। দাউদের পুত্র সুলেমানের নাম তাতে খোদাই করা। বুড়ো জেলের হতাশা অনেকাংশে হ্রাস পেল। ভাবল, এর দাম নেহাৎ কম নয়। কম করে হলেও দশটা দিনার তো এর বিনিময়ে মিলবেই।

বুড়ো জেলে এবার জালাটাকে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে হতাশ হ'ল। পেল্লাই ভারি। ভাবল কি, অগেকার দিনে আমির-বাদশারা ঘড়া ঘড়া মোহর মাটির তলায় পুঁতে রাখত। যদি নসীবে সেরকমই কিছু জুটে যায়। হায় খোদা, তবে একদিনেই আমীর বনে যাব! সবই খোদার মর্জি।

কিন্তু মুখে সিলমোহর আঁটা। মুখটা না খোলা পর্যন্ত কিছুই বোঝার জো নেই। ধারাল একটা কাটারি দিয়ে বহুত খুব কায়দা-কসরৎ করে জালার মুখটা খুলতে পারল। ব্যস, মুহূর্তে ধোঁয়ার কুণ্ডলি ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। চোখের পলকে ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে ফেল্‌ল। তারপর তা একটা আফ্রিদি দৈত্যের অবয়ব ধারণ করল। তার হাত-পা দুটো অতিকায়। মাথাটাও বিরাট একটা ঝুড়ির মত। মুখটা পর্বতের গুহার মত। দাঁতগুলো শ্বেত পাথরের টুকরোর মত চকচক করছে। নাকের ছিদ্রদুটো বাঁশের চোঙার মত, চোখ দুটো গোল-আলুর মত জ্বলজ্বলে, মাথায় যেন শনের বন গজিয়েছে।

পর্বত প্রমাণ ভয়াল দর্শন আফ্রিদি দৈত্যটাকে দেখেই বুড়ো জেলের কলিজাটা শুকিয়ে গেল। আত্মা যেন খাঁচা ছাড়া হয়ে পড়ার

জোগাড়। ভাল ক'রে চোখ পর্যন্ত খুলতে পারল না।

আফ্রিদি দৈত্য গর্জে উঠল—'আল্লাহকে ছাড়া আমি দুনিয়ায় আর কাউকেই পরোয়া করি না। আল্লাহ-র পয়গম্বর স্বয়ং সুলেমান।'

এবার করজোড়ে নিবেদন করল—'মেহেরবান সুলেমান, দোহাই তোমার। আমাকে মেরে ফেলো না। আমি এক মুহূর্তের জন্যও তোমার মতের বিরুদ্ধে যাব না। তোমার কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব না।'

বুড়ো জেলে এবার মনে সাহস অবলম্বন করে বল্‌ল—'দৈত্যশ্রেষ্ঠ আফ্রিদি, বাদশাহ সুলেমানের ভয়ে তুমি এমন কুঁকড়ে যাচ্ছ! সুলেমান তো আঠার শ' বছর আগেই দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেছেন তোমার গোস্তাকীই বা কি ছিল যার জন্য বাদশাহ সুলেমান তোমাকে জালাটার মধ্যে পুরে রেখেছিল?'

বুড়ো জেলের কথায় আফ্রিদি দৈত্যের কলিজাটা যেন ভিজে গিয়ে কিছু স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্‌ল—'খোদাতাল্লা ছাড়া আর করো ওপরেই আমার তিলমাত্র আস্থাও নেই। তাঁর কাছ থেকে তোমার জন্য খুব সুন্দর একটা খবর নিয়ে এসেছি।'

জেলে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বল্‌ল—'কি? কি সে চমৎকার খবর? মেহেরবানি করে বল, কি খবর নিয়ে এসেছ?'

'মৃত্যু... তোমার মৃত্যুর খবর। আর সে মৃত্যু হবে এক ভয়ঙ্কর উপায়ে!'

মৃত্যুর কথায় জেলের কলজেটা যেন আচমকা ডিগবাজি খেয়ে উঠল। মুখটা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল। সে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে বল্‌ল—'আমার কসুর কি যার জন্য তুমি আমার জান খতম করতে চাইছ? দীর্ঘকাল জালাটার মধ্যে বন্দী ছিলে। কষ্ট পাচ্ছিলে আমি তোমায় বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়েছি। এটাই যদি আমার কসুর, আর এরই জন্য যদি আমাকে জান দিতে হয় তবে আর আমার কিছুই বলার নেই।'

আফ্রিদি দৈত্য যেন জেলের কথা শুনতেই পায় নি এমন ভাব করে বল্‌ল—'তুমি নিজেই বল, কিভাবে তুমি মরতে চাইছ।'

জেলে এবার করজোড়ে বল্‌ল—'আমার গোস্তাকি কি তা তো বলবে? কেন আমাকে তোমার হাতে জান দিতে হবে?'

আফ্রিদি দৈত্য এবার বল্‌ল—'তোমাকে তবে একটা কিস্‌সা শোনাচ্ছি তাতেই তোমার সওয়ালের জবাব পেয়ে যাবে।—তুমি হয়ত জেনে থাকবে, আমি সক্-হর-অল্ জিনি। বাদশাহ সুলেমানের এক বিদ্রোহী নফর ছিলাম। আমাকে টিট করার জন্য সুলেমান একবার উজির আশাফ-ইবন বারাখ্যাকে পাঠান। আমি গায়ে অসুরের শক্তি ধরি। তবু সে আমাকে কব্জা করে ফেলে। বন্দী করে সুলেমানের দরবারে হাজির করল। সুলেমান মিষ্টি মুখেই আমাকে বল্‌ল—'তোমার গোস্তাকী আমি মাফ করে দিতে পারি যদি আমার বিশ্বস্ত নোকর হয়ে থাকতে রাজী হও। আমি তাঁর কথায় সম্মত হলাম না। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলাম। এবার অতিকায় একটা তামার জালায় আমাকে পুরে তার মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর বদশাহ সুলেমানের মোহর খোদাই করে দিল জালাটার মুখে। এবার সাগরে ফেলে দিল আমাকেসহ জালাটাকে।'

পানির তলায় জালাবন্দী হয়ে মনের দুঃখে দিন গুজরাণ করতে লাগলাম। তখন শপথ করলাম, এক শ' বছরের মধ্যে কেউ আমাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিলে তার জীবনকে সুখ-সাচ্ছন্দে ভরিয়ে তুলব। কিন্তু আমার নসীব খারাপ। কারো দোয়া হ'ল না। দ্বিতীয় শতকে শপথ নিলাম, কেউ আমাকে মুক্তি দিলে তার ঘর তামাম দুনিয়ার হীরে-জহরৎ আর ধন-দৌলতে ভরে দেব। এবারও কারো দোয়া হ'ল না। এভাবে চার শ' বছর পানির তলায় জালাবন্দী হয়ে কষ্ট পেতে লাগলাম। তারপর আমি আবারও এক শপথ করলাম, যে আমাকে উদ্ধার করবে আমি তাকে তিনটি বর দেব। যা সে চাইবে তা-ই পাবে। কিন্তু কারো দেখা পেলাম না। এবার আমি আর শান্ত থাকতে পারলাম না। রীতিমত ক্ষেপে গেলাম। রাগে-দুঃখে-অপমানে ফেটে পড়ার যোগাড় হলো। এবার প্রতিজ্ঞা করলাম, আমাকে যে মুক্ত করবে সে-হতচ্ছাড়াকে আমি কোতল করব। আমার বন্দী-

জীবন অব্যাহতই রইল।'

নসীবের ফেরে তুমি এসে এবার হাজির হলে। আমাকে মুক্তি দিলে। কিন্তু আমি যে শপথ করে রেখেছি। শপথ রক্ষা আমাকে করতেই হবে। তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি, তুমি নিজেই বেছে নাও কি ভাবে মরতে চাও '

আফ্রিদি দৈত্যের কথায় বুড়ো জেলের তো কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে একেবারে কাঠ। সে করজোড়ে বার বার পাণভিক্ষা করতে লাগল।

আফ্রিদি দৈত্য কোন কিছুতেই ভুলবার নয়। বার বারই বলতে লাগল—'তোমার খুশিমত পথ বেছে নাও, কিভাবে তুমি মৃত্যু বরণ করতে আগ্রহী।'

বুড়ো জেলে কেঁদে কেটে বলতে লাগল—'কেন আমাকে জান দিতে হবে? আমি তো জীন্দেগীতে কোন গুনাহ করিনি যে, আমার অপমৃত্যু ঘটতে পারে।'

আফ্রিদি দৈত্যর মুখে সেই একই কথা—'দেরী কোরো না। কি-ভাবে জান দিতে চাও তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল।'

এবার বুড়ো জেলের মাথায় সুন্দর একটা মতলব এল। সে চোখ মুছতে মুছতে বল্‌ল—'তুমি তো আমাকে খুন করবেই। কিন্তু আমার গুনাহ কি, না-ই বা বল্‌লে। পানি থেকে আমি এ-তামার জালাটা তুলেছি। জালার মুখ খুলেছি, মিথ্যা তো নয়। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমার এ-অতিকায় দেহটা এ-জালাটার মধ্যে কি করে ছিল? আমি কেন, এরকম একটা গাঁজাখুরি কথা কেউ কি বিশ্বাস করবে? অবশ্যই না।' বুড়ো জেলের কথায় আফ্রিদি দৈত্য ক্ষোভে—অপমানে রীতিমত ফুঁসতে লাগল। জেলের গলাটিপে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল—'ঠিক আছে, আগে তোমার সন্দেহ দূর করছি।' কথা বলতে বলতে জালাটার মধ্যে নিজের অতিকায় দেহটাকে দিল ঢুকিয়ে। ব্যস, জেলে সঙ্গে সঙ্গে জালাটার মুখ দিল বন্ধ করে।'

কিস্‌সার এ অংশ পর্যন্ত বলে বেগম শাহরাজাদ থামলেন।

চতুর্থ রাত্রে বাদশাহ আবার এলেন।

শাহরাজাদ কিস্‌সা ফাঁদলেন—'জেলে বুড়ো সে তামার জালাটার মুখ বন্ধ করে আপন মনে হাসতে লাগল। তারপর গলা ছেড়ে বলল—'হতচ্ছাড়া আফ্রিদি, তোকে আবার সাগরের পানিতে ডুবিয়ে দেব। আর নিজে সাগরের ধারে কুটীর বেঁধে বাস করব। অন্য কোন হতভাগা যাতে এখানে জাল ফেলে আর নিজের মৃত্যু ডেকে না আনে। আর ঢোল পিটিয়ে চারদিকের গ্রামবাসীকেও ব্যাপারটা জানিয়ে দেব। দেখব, কে তোকে অথৈ পানি থেকে উদ্ধার করে!'

তামার জালাটা ভাঙার ক্ষমতা দৈত্যর নেই। ফলে অসহায়ভাবে জালার মধ্যে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে আর্তনাদ জুড়ে দিল। অনেকভাবে অনুরোধ করতে লাগল—'তোমার কোন ক্ষতিই করব না। তামাম দুনিয়ার হীরে-জহরৎ ধন-দৌলতে তোমার ঘর ভরে দেব।'

হেকিম রায়ান উজির ও বাদশাহ্ উনানের কিস্‌সা

বুড়ো জেলে হেসে বল্‌ল—'হাকিম রায়ান ও বাদশাহ উনানের উজির-এর কিস্‌সা বলছি শোন—অতি প্রাচীনকালে রুম দেশে যার নামে সুন্দর এক নগর ছিল। সেখানে প্রবল পরাক্রান্ত এক সুলতান রাজত্ব করতেন। সৈন্যসামন্ত, নোকর-নোকরাণী আর ধনদৌলত কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। কিন্তু দুঃখ তাঁর একটাই ছিল, সারা গায়ে ধগ্‌ধগে কুষ্ঠ। বহু হেকিম, বৈদ্য, তাবিজ, শেকড় ব্যবহার করেও নসীব ফেরাতে পারেন নি। রোগজ্বালায় দগ্ধে মরতে লাগলেন।

এক সকালে সুলতানের দরবারে এক অতি বৃদ্ধ হাজির হ'ল। রায়ান হেকিম ব'লে সবাই জানে তাকে। নানা ভাষায় তার পাণ্ডিত্য ছিল। বহুরকম বিদ্যা তার আয়ত্বে ছিল। দরবারে হাজির হয়ে সুলতানকে কুর্নিশ করে বল্‌ল—'হুজুরের দুরারোগ্য বিমারির খবর পেয়ে ছুটে আসছি। আমার বিশ্বাস, আপনার বিমারি আমি সরিয়ে তুলতে পারব। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করতেও ভরসা হয় না। আপনি এ দেশের সুলতান। মস্ত বড় আদমি। আমার সঙ্গে জান পহছান নেই। আমার দেওয়া দাওয়াই কোন্ ভরসায়ই বা সেবন করবেন?'

সুলতান বল্‌লেন—'না-ই থাকল জান পহছান। আমার বিমারি যদি সারিয়ে তুলতে পার বিস্তর ধনদৌলত পাবে। কেবল মাত্র তুমিই নও, তোমার বংশপরম্পরা আমার দরবার থেকে মাসোহারা পাবে। আর আমার দরবারের প্রধান পারিষদ করে রাখব তোমাকে।' সুলতান এবার একটা বহুমূল্য শাল হেকিম রায়ানকে উপহার দিলেন।

—'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন জাঁহাপনা। আমার দাওয়াই আপনার বিমারি সারিয়ে তুলবেই।'

—'তবে কাল থেকেই ইলাজ শুরু কর।'

হেকিম রায়ান গাছগাছড়া নিয়ে বসে গেল দাওয়াই বানাতে। একটা দাওয়াই বানিয়ে একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির মধ্যে তার কিছু অংশ ঢুকিয়ে নিল। লাঠিটার মুখ বন্ধ করে দিল। অবশিষ্টটুকু অন্য একটা বাঁশের চোঙের মধ্যে রেখে দিল। এবার একটা ফাঁপা পোলো বল তৈরি করে তার ভেতরেও কিছুটা দাওয়াই ঢুকিয়ে দিল।

হেকিম এবার লাঠি এবং পোলো বলটি নিয়ে সুলতানের দরবারে হজির হ'ল। সেগুলো সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এদুটো দিয়ে আপনাকে পোলো খেলতে হবে। শরীর ঘেমে গেলে বেশী করে পানি দিয়ে গোসল ক'রে ফেলবেন। ব্যস, আর কিছুই করতে হবে না। এটাই আপনার বিমারির ইলাজ। এতেই বিমারি সেরে

যাবে।' হেকিম রায়ানের ইলাজের বিধান অনুযায়ী সুলতান উনান তাঁর সভার উজির, আমীর, ওমরাহ প্রভৃতিকে নিয়ে ময়দানে গেলেন। ঘোড়ার পিঠে চেপে শুরু করলেন পোলো খেলা। সর্বাঙ্গ ঘামে জবজবে হয়ে উঠলে খেলা বন্ধ করে প্রাসাদে ফিরে এলেন। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ভাল ক'রে গোসল করলেন।

রাত্রে বিছানা আশ্রয় করতেই আঁখির পাতায় নিদ জড়িয়ে এল।

সকালে হেকিম রায়ান সভায় আসতেই উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে সুলতান উনান বল্‌লেন—'হেকিম সাহেব, তোমার দাওয়াই আমার তবিয়ত অনেকটা ভাল করে দিয়েছে। আরাম মালুম হচ্ছে।' রায়ান'কে প্রচুর উপহারে তিনি সন্তুষ্ট করলেন।

হেকিম রায়ান-এর পরামর্শ মত সুলতান উনান-এর ইলাজ চলেছে। এদিকে ক্রমে তাঁর দেহের কুষ্ঠের দাগগুলি মিলিয়ে যেতে লাগল। রোজই সকালে রায়ান দরবারে উপস্থিত হলে প্রচুর বকশিস দিয়ে সুলতান উনান তাঁকে খুশি করেন।

সামান্য এক হাকিমকে দু'হাতে বকশিস দেবার ব্যাপারটা উজিরের সহ্য হ'ল না। চোখ টাটাতে লাগল। দরবারে উজিরের খাতির সবচেয়ে বেশী ছিল এতদিন। কিন্তু আজ তাঁর জায়গায় সর্বাধিক খাতির পাচ্ছে হেকিম। অসহ্য একেবারেই অসহ্য। উজির ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরতে লাগলেন।

পরদিন সকালে হেকিম রায়ান দরবারে এলে সুলতান উনান মসনদ থেকে উঠে ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের পাশে বসালেন। এরকম খাতির একমাত্র উজিরেরই প্রাপ্য। এ দৃশ্যে উজির ছাড়াও নাজির, আমির, ওমরাহ প্রভৃতিদের অনেককেই ক্ষুব্ধ করল।

ঈর্ষান্বিত উজির রাগে-দুঃখে অপমানে ফুঁসতে লাগলেন। আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখে সুলতানের সামনে এসে কুর্নিশ করে বল্‌লেন—'জাহাপনা আল্লাতাল্লার কাছে আপনার সুখী ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি! আপনার কাছে একটা আর্জি আছে। যদি অনুমতি করেন—'

—'কি? কি সে-আর্জি? যা বলতে চাইছেন নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পারেন।

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে বকশিস গ্রহণ করে না, শ্রদ্ধার লেশমাত্রও যার মধ্যে নেই তাকে দান করার অর্থই হচ্ছে অযোগ্যকে ও অপাত্রে দান করা।'

সুলতান উনান গর্জে উঠলেন—'ধানাইপানাই রেখে যা বলতে চাইছেন, খোলসা করে বলুন। কে সে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি? কাকে দান করে আমি ভস্মে ঘি ঢালছি?'

উজির এবার মনে সাহস অবলম্বন করে, হেকিমের দিকে, অঙ্গুলি নির্দেশ করে বল্‌লেন—'এ-ই সেই দানের অযোগ্য ব্যক্তি। এরকম বেইমান তামাম দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর একজন আছে কিনা সন্দেহ। আপনি দরাজ হাতে যেভাবে বিলোতে শুরু করেছেন তাতে দেখা যাবে শীঘ্রই আপনার তহবিল শূন্য হয়ে গেছে।'

সুলতান উনান ধমক দিয়ে উঠলেন—'মুখ সামলে কথা বলবেন! আপনার স্পর্ধা তো কম নয়! আমার কাজের সমালোচনা করছেন!' আর কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তা হয়ত আপনি নিজেও জানেন না। হেকিম সাহেব আমার জান ফিরিয়ে দিয়েছেন। নইলে এতদিনে হয়ত আমার অশ্রয় হ'ত গোরস্থানের মাটির তলায়। উপকারীর ঋণ শোধ হয় না। আমার বিশ্বাস, আমার রাজ্যটা তাঁর হাতে তুলে দিলেও তাঁর প্রাপ্যের চেয়ে কমই দেওয়া হ'ত। আসলে আপনার দিল জুড়ে রয়েছে ঈর্ষা। তাই এরকম উক্তি প্রকাশ করতে পারলেন। এক সময় আমার এক সভাসদ এরকম ঘটনাসম্বালত বাদশাহ সিন্‌বাদের কিস্‌সা আমাকে শুনিয়েছিল।'

হেকিম রায়ান সুলতানের অনুমতি নিয়ে দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন।

কিস্‌সা বলতে বলতে বেগম শাহরাজাদ দেখেন, প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় প্রভাতের আলো ফুটতে শুরু করেছে। তিনি কিস্‌সা বলা এবার বন্ধ করলেন।

দুনিয়াজাদ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বল্‌ল—'বহিনজী, তোমার মুখের কিস্‌সা যত শুনি ততই যেন শুনতে মন চায়।'

বেগম শাহরাজাদ মুচকি হেসে বল্‌লেন—'বহিন, যদি আমার জান বাঁচে তবে আরও কত সুন্দর সুন্দর কিস্‌সা শোনাতে পারব!'

বাদশাহ মনে মনে বল্‌লেন—'এমন সুন্দর কিস্‌সা শোনার লোভে অন্ততঃ একে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

সিনবাদ ও বাজপাখির কিস্‌সা

পঞ্চমরাত্রে বাদশাহ শারিয়ার-এর আগ্রহে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা ফাঁদলেন—'জাঁহাপনা, সেই সুলতান উনান তাঁর উজিরকে নানা ভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন। বাদশাহ সিনবাদ যেমন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় বাজপাখিটাকে হত্যা করে অনুশোচনায় জ্বলে পুঁড়ে খাঁক হয়েছিলেন আপনি চান আমিও তেমনি জ্বলে পুড়ে মরি?'

সুলতান বল্‌লেন—'বলছি তবে শুনুন,—কোন এক সময়ে কার নগরে এক বাদশাহ রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ছিল বাদশাহ সিনবাদ। ঘোড়ায় চড়া, মাছ ধরা, শিকার আর খেলকুদ প্রভৃতিতে তিনি খুবই উৎসাহী ও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর একটা পোষা বাজপাখি ছিল। প্রাণাধিক ভালবাসতেন তাকে। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা সেটাকে কাছে কাছে রাখতেন। এমন কি শিকারে যাওয়ার সময়ও পাখিটা তাঁর সঙ্গে থাকত। পানি খাওয়ার জন্য একটা সোনার বাটি, সোনার শিকল দিয়ে তার গলায় বেঁধে রাখা হ'ত।

বাজপাখিটার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক একদিন দরবারে বাদশাহকে এসে বল্‌ল—'হুজুর, আজকের রাত্রিটা শিকারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মন চাইলে চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

লোকলস্কর, অস্ত্রশস্ত্র আর বিশ্রামের জন্য তাঁবু প্রভৃতি গুছিয়ে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে বাদশাহ সিনবাদ শিকারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

এক পাহাড়ের গায়ে প্রশস্ত এবং প্রায় সমতল এক জায়গা দেখে তাঁবু ফেলা হ'ল। শিকারের জন্য জাল পাতা হ'ল। কিন্তু কার্যত একটা বুনো-ছাগল ছাড়া জালে কিছুই আটকালো না।

বাদশাহ সিনবাদ সবাইকে সতর্ক করে দিলেন—'বুনো-ছাগলটাকে যেন পালাতে দেওয়া না হয়। যার কাছ থেকে ওটা পালাবে তার গর্দান নিয়ে ছাড়ব।'

খুবই সতর্কতার সঙ্গে জাল গুটিয়ে বুনো-ছাগলটাকে বাদশাহের কাছাকাছি নিয়ে আসা হ'ল। সেটা পিছনের পা দুটোতে ভর দিয়ে প্রায় সোজা হয়ে বিচিত্র এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সামনের পা দুটো জোড়া করে বাদশাহের দিকে তুলে ধরল। ব্যাপারটা এমন, সে যেন তাকে সালাম জানাচ্ছে। এতে বাদশাহসহ সবাই সরবে করতালি দিয়ে উঠল। তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করল বুনো-ছাগলটা। আচমকা এক লাফ দিয়ে বাদশাহকে ডিঙিয়ে একেবারে লম্বা দিল। দ্রুতগতিতে গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটছিল। মুহূর্তে বাদশাহ নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বুনো-ছাগলটার পিছু নিলেন। তাঁর একটামাত্র টুকরো কথা শোনা গেল —'আমার হাত থেকে পালিয়ে কেউ-ই রেহাই পায় নি। যে করেই হোক তোকে আমি ধরবই ধরব।'

বেশ কিছুক্ষণ পর গভীর জঙ্গলে বুনো-ছাগলটার হদিস মিলল বটে কিন্তু কিছুতেই তাকে নাগালের মধ্যে পেলেন না। কাজ হাসিল করল তাঁর জিগরি দোস্ত বাজপাখিটা। সে বাতাসের বেগে উড়ে গিয়ে সুতীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে বুনো ছাগলটার চোখের মণি দুটো গেলে দিল। বিকট আর্তনাদ করে সেটা হুমড়ি খেয়ে ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল। ব্যস, খেল্ খতম!

বাদশাহ সিনবাদ বহুকষ্ট করে বুনো-ছাগলটার গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে ঘোড়ার জিনের তলায় লটকে দিলেন। এবার তাঁবুর দিকে যাত্রা করলেন। কিছুদূর এসে তিনি এবং তাঁর বাহন তাগড়াই ঘোড়াটা—উভয়েই পিয়াসে পাগল। পানি বিনা জান রাখা দায়। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তিনি একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে ছোট্ট একটা তলাও দেখতে পেলেন। কাছে যেতেই তিনি অবাক মানলেন। তলাওটার পানি যেন খুবই ঘন মনে হ'ল—থকথকে। আটাগোলা সিন্নির মত।

বাদশাহ সিনবাদ তার জিগরি দোস্ত বাজপাখির গলা থেকে সোনার

বাটিটা খুলে ওই থকথকে পানি নিয়ে এলেন। বাজপাখিটার সামনে ধরলেন পানিভর্তি বাটিটাকে। সে পানি তো পান করলই না, উপরন্তু ঠোঁট দিয়ে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে বাটিটাকে দূরে ফেলে দিল। সিনবাদ তার আচরণে খুব বিরক্ত হলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার গিয়ে একবাটি পানি নিয়ে এলেন। এবার ঘোড়াটার মুখের সামনে ধরামাত্র বাজপাখিটা উড়ে গিয়ে ডানা দিয়ে ধাক্কা মেরে বাটিটাকে ফেলে দিল। রাগে গস্‌গস্ করতে করতে বাদশাহ কটিদেশ থেকে তরবারি টেনে নিয়ে দিলেন সজোরে এক কোপ বসিয়ে। ব্যস, চোখের পলকে তার একটা ডানা কেটে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে খুন বেরিয়ে এল। বাদশাহ আপন মনে ব'লে উঠলেন—'এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। নিজে তো খেলই না, অন্য কাউকেও পানি খেতে দেবে না! বাঃ চমৎকার মতলব! বাজপাখিটার কিন্তু নিজের যন্ত্রণাকাতর দেহের দিকে কিছুমাত্রও নজর নেই। ঘাড় তুলে সে মাথার ওপরের গাছটাকে দেখতে লাগল। বাদশাহ সিনবাদ এবার ঘাড় ঘুরিয়ে গাছটার দিকে চোখ ফেরাতেই চমকে উঠলেন। দেখলেন, গাছের ডালে অসংখ্য ময়াল সাপ ঝুলছে। তাদের মুখ থেকে হরদম লাল জাতীয় তরল পদার্থ বেরিয়ে তলাও-এ পড়ছে। কৃতকর্মের জন্য তিনি অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে খাঁক হতে লাগলেন।

বিষণ্ণ মনে বাদশাহ সিনবাদ প্রাসাদে ফিরে এলেন। ছালছাড়ানো বুনো ছাগলটাকে রান্না করার জন্য রসুইকরকে নির্দেশ দিলেন। আহত বাজপাখিটা এতক্ষণ জীবিত ছিল। এবার মাথা কাৎ করে পড়ে গেল। ব্যস, খতম।

বাদশাহ সিনবাদ আর্তনাদ করে উঠলেন—'আমার জিগরি

দোস্তকে আমি নিজেহাতে খতম করেছি!'

কিস্‌সা শেষ করে বাদশাহ উনান এবার থামলেন।

বৃদ্ধ উজির এবার সবিস্ময়ে বল্‌লেন—'হুজুর, আপনার এ কিস্‌সার সঙ্গে আমার বক্তব্যের সম্পর্ক কি, বুঝতে পারলাম না তো! আপনি হয়তো বলতে চাইছেন, বাদশাহ সিনবাদ তাঁর জান, তাঁর জিগরি দোস্ত বাজপাখিকে নিজে হাতে খুন করার জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছিলেন, ঠিক কিনা? কিন্তু হেকিম রায়ান কি আপনার সত্যিকারের জিগরি দোস্ত? অবশ্যই না। লোকটা ধান্দাবাজ, জাহাপনা, আপনি এখন বুড়ো হেকিমের মোহে অন্ধ। তার দোষ-গুণ সম্বন্ধে বিচার করার মত বিবেচনাবোধ আপনার লোপ পেয়েছে। আপনি কি সেই উজির আর বাদশাহের লেড়কার কিস্‌সা জানেন? বাদশাহের লেড়কাকে খতম করতে গিয়ে উজির নিজেই জান দিয়েছিলেন। আপনি নিজের কবর নিজেই খুড়তে চলেছেন।'

বাদশাহ রায়ান জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে উজিরের দিকে তাকালেন।

উজির তাঁর কিস্‌সা শুরু করলেন—'কোন এক দেশে এক বাদশাহ রাজত্ব করতেন। তাঁর একটা লেড়কা ছিল। শিকার আর ঘোড়ায় চড়ার দিকে তার ছিল খুব ঝোঁক। এক উজিরের ওপর লেড়কার দেখভালের দায়িত্ব বর্তাল। এ-কাজকে উজির মোটেই সুনজরে দেখলেন না। তার সম্মান এতে নাকি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এ থেকে তিনি রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজতে লাগলেন। দরবারে বসতে না পারলে উজিরের সম্মান থাকে নাকি ছাই।

এক সকালে উজির বাদশাহের লেড়কাকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকারে বেরোলেন। পথে তাদের সামনে বিচিত্র দর্শন এক জন্তুকে দেখতে পেলেন তাঁরা। হতচ্ছাড়াটা পথ আগলে দাঁড়িয়ে। বাদশাহের লেড়কা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জন্তুটাকে ধরার জন্য। কিন্তু পারল না। সেটা চোখের পলকে কোথায় গা-ঢাকা দিল। কিন্তু ফয়দা যেটুকু তা হ'ল সে পথ হারিয়ে ফেল্‌ল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অচেনা পথে কাঁদতে কাঁদতে সে পথ চলতে লাগল।

কিছুদূর যেতেই পথের ধারে এক লেড়কিকে সে দেখতে পেল। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। খুবসুরৎ দেখতে। সে লেড়কিটাকে জিজ্ঞাসা করল—'কে গা তুমি? এমন করে কাঁদছ কেন?'

লেড়কিটা বল্‌ল—'আমি হিন্দের শাহজাদী। আমার দলের লোকদের হারিয়ে ফেলেছি। বড়ই অসহায় হয়ে পড়েছি।'

বাদশাহের লেড়কা হিন্দের শাহজাদীকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। কিছুদূর গিয়ে পথে একটা ভাঙাচোরা পোড়ো বাড়ি দেখতে পেল।

শাহজাদী ঘোড়া থামাতে বল্‌ল। সে একবারটি 'ছোট-বাথরুম'-এ যাবে। সে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল। বদশাহের লেড়কা ঘোড়া নিয়ে সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও শাহজাদী ফিরছে না দেখে তার কৌতূহল হ'ল। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে পোড়ো বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল। আড়াল থেকে দেখতে পেল, শাহজাদী এক রাক্ষসীর অবয়ব ধারণ করেছে। ঘরের ভেতরে আরো দুটে রাক্ষসী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বুড়ো আর বুড়ি রাক্ষসী। মেয়েটা বল্‌ল —'আজ তোমাদের জন্য একটা মোটাসোটা মানুষ ধরে এনেছি। জিভ দুটোকে বেশ একটু ঝালিয়ে নিতে পারবে।'

বুড়ি-রাক্ষসী বল্‌ল—'তাই বুঝি? কোথায় রেখেছিস বেটি? নিয়ে আয়। তার গোস্তে উপোষ ভঙ্গ করি।'

কথাগুলো কানে যেতেই বাদশাহের লেড়কার কলিজা শুকিয়ে গেল। কোনরকমে সে জান নিয়ে ভাগতে চেষ্টা করল। পারল না।

এরই মধ্যে রাক্ষসী-মেয়েটা আগের সে রূপবতীর চেহারা নিয়ে দরজার বাইরে চলে এসেছে। বাদশাহের লেড়কাকে বল্‌ল—'কি ব্যাপার তোমার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ, কাঁপছ, ব্যাপার কি?'

—'বোধ হয় আমি শত্রুর ডেরায় এসে পড়েছি।'

—'শত্রুর ডেরায়? তুমিই তো বলেছিলে তুমি নাকি বাদশাহের লেড়কা। তবে ধনদৌলত নিয়ে তাদের বশীভূত করে ফেলছ না কেন? শত্রুকে বশ করতে আবার দেরী হয় নাকি?'

—'এরা ধনদৌলতে ভুলবার নয়। আমার গায়ের নরম গোস্তের দিকে এদের নজর।'

মেয়েটা চমকে উঠল। ভাবল, তবে কি আমার ফন্দি ফিকিরের কথা জানতে পেরে গেছে? তবে তো একে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এবার বাদশাহের লেড়কাকে লক্ষ্য করে বল্‌ল—'তবে এক কাজ কর, আল্লাতাল্লার নাম কর। একমাত্র তিনিই যদি পারেন রক্ষা করতে।'

বাদশাহের লেড়কা এবার হাঁটুগেড়ে বসে আল্লাতাল্লার নাম করতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরে আঁখি খুলে দেখে মেয়েটা এরই মধ্যে ভেগেছে।

বাদশাহের লেড়কা সুযোগ বুঝে সেখান থেকে চম্পট দিল। প্রাসাদে ফিরে সে তার বাবার কাছে ঘটনার বিবরণ দিল। সব শুনে বাদশাহ তো রেগে একেবরে কাঁই। উজির নিজের কাজে গাফিলতি করার জন্যই তাঁর লেড়কা বিপদে পড়েছিল। এমনও হ'তে পারে এর সঙ্গে তাঁরও সাঁট রয়েছে। ঘাতক ডেকে তাঁর গর্দান নেবার আদেশ দিলেন।

কিস্‌সা শেষ করে উজির বাদশাহ উনানকে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমার মনে যদি এরকম কোন কুমতলব রয়েছে প্রমাণ হয় তবে আপনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন হাসিমুখে তা বরণ করে নেব। এরপরও আমি বলছি, যাকে আপনি দরাজ হাতে পুরস্কার দিয়ে তার

মন ভরতে প্রয়াসী হচ্ছেন, সে আপনার শত্রু ছাড়া মিত্র অবশ্যই নয়। আপনি শুনে রাখুন, সে ভিন্‌দেশের গুপ্তচর। সে আপনার জান খতম করার ফিকির খুঁজছে। এমনকি আমার জান যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

বাদশাহ বল্‌লেন—'তবে আমার এখন কর্তব্য কি?'

দরবারে আপনার সামনে তাকে হাজির হতে বলুন হুজুর। যত শীঘ্র সম্ভব তার গর্দান নেবার ব্যবস্থা করুন। আপনার গায়ে কাঁটার আঁচড় দেওয়ার আগেই তার জান নিয়ে নিন।'

বাদশাহের নির্দেশে এবার হেকিম রায়ান-এর খোঁজে দূত ছুটল। রায়ান খবর পেয়ে নিজেই ব্যস্ত হয়ে দরবারে ছুটে এলেন। হতভাগ্য তো জানেনও না মৃত্যু তাঁর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। কেবল হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

বাদশাহ উনান গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—'আপনি কি জানেন হেকিম সাহেব, কোতল করব বলে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি?'

—'কিন্তু আমার অপরাধ কি তা তো অবশ্যই বলবেন, আশা করি।'

'—আমার সভাসদরা আমাকে ফুঁসলাচ্ছে, আপনি নাকি গুপ্তচর বৃত্তি নিয়ে আমার সভায় অবস্থান করছেন? আমাকে গোপনে খুন করার চক্রান্ত নাকি আপনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে? তাই আমার জান বাঁচাতে হলে আপনাকে আগেভাগেই কোতল করতে হবে।' কথা বলতে বলতে বাদশাহ করতালি দিয়ে ঘাতককে ডাকলেন।

ঘাতক এসে কুনির্শ করে বাদশাহের সামনে দাঁড়াল।

বাদশাহ উনান বল্‌লেন—' এ বিশ্বাসঘাতককে কোতল করতে হবে। নিয়ে যাও।'

হেকিম রায়ান সবিস্ময়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমি আপনাকে দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত করেছি। তার প্রতিদান দিচ্ছেন আমার গর্দান নিয়ে? চমৎকার আপনার বিবেক, চমৎকার আপনার মানবিকতা!'

—'আমার সাফ কথা শুনুন হেকিম সাহেব, আপনার ওপর থেকে আমার বিশ্বাস উবে গেছে। সামান্য একটা লাঠির সাহায্যে ইলাজ করে আপনি যখন আমার এমন কঠিন বিমারি সারিয়ে তুলতে পেরেছেন তখন আপনার অসাধ্য কোন কাজই নেই। তাই আপনার গর্দান নেবার মাধ্যমেই আমি আমার জীবনের নিরাপত্তা আনতে চাই। ফুলের গন্ধ বা অন্য কোন কিছুর গন্ধ শুকিয়েও আমাকে হত্যা করা আপনার পক্ষে অসাধ্য নয়।'

—'জাঁহাপনা, আপনার বিচারে এ-পুরস্কার কি আমার কাজের উপযুক্ত প্রাপ্য বলে মনে করব?'

—'মৃত্যু—হ্যাঁ, মৃত্যুই আপনার একমাত্র প্রাপ্য।'

হেকিম রায়ান নিঃসন্দেহ হলেন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। নিশ্চিন্ত মৃত্যুর চিন্তায়, তাঁর দু' চোখের কোণ বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। কর্মফল কৃতকর্মের ফল। উপযাচক হয়ে উপকার করতে এসে নিজের জান দিতে হচ্ছে। একেই বলে চরমতম দুর্গতি। গ্রহের ফের ছাড়া আর কি-ই বা একে ভাবা যেতে পারে? চমৎকার বিচার! নসীবের ফের।

ঘাতক হেকিম রায়ানকে আর কিছু বলার বা ভাববার সুযোগ না দিয়ে আচমকা একটি কালো কাপড় দিয়ে তাঁর চোখ দুটো বেঁধে ফেল্‌ল। তারপর কোমর থেকে এক ঝটকায় তরবারি খুলে নিয়ে তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হ'ল।

হেকিম রায়ান আর্তনাদ করে বল্‌লেন—'এ আপনি করছেন কি জাঁহাপনা! মৃত্যুদণ্ডাদেশ তুলে নিন! আমাকে মুক্তি দিন। নইলে খোদা আপনাকে ক্ষমা করবেন না। আপনার সর্বনাশ অবধারিত!'

—'বাদশাহ উনান একবার যে হুকুম দেয় তা কি করে প্রত্যাহার করতে হয় তার জানা নেই।'

—'হায় আল্লাহ! এ-ই কি তোমার বিচার! এ যে সেই কুমীরের শয়তানীর মত কাণ্ড ঘটতে চলেছে!'

—'কুমীরের কিস্‌সা কি বলুন তো শুনি।'

—'না জাঁহাপনা, জান দেবার পূর্ব মুহূর্তে আপনাকে সে-কাহিনী আর না-ই বা শোনালাম, আমাকে জান বাঁচিয়ে দিন, খোদা আপনার মঙ্গল করবেন।'

হেকিম রায়ান যখন মৃত্যুর জন্য নিজের মনকে তৈরি করছেন। ঠিক তখনই পারিষদদের মধ্য থেকে কয়েকজন বাদশাহের কাজের প্রবল আপত্তি তুললেন। তারা করজোড়ে প্রার্থনা করলেন—'জাঁহাপনা, যে লোকটি আপনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে নবজীবন দান করলেন আপনি কিনা তাঁরই জান নেবার জন্য কবুল করেছেন। মেহেরবানি করে ওকে মুক্তি দিন।'

বাদশাহ উনান গর্জে উঠলেন—'অসম্ভব! আপনারা জানেন লোকটি অমিত ক্ষমতার অধিকারী। যে লোক সামান্য উপায়ে আমার বিমারির ইলাজ করে সারিয়ে তুলেছে সে অতি সহজেই আমার জানও নিয়ে নিতে পারে। তাঁকে জিইয়ে রেখে আমি আমার নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে উৎসাহী নই। তাকে খতম করে দেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।'

কাঁদতে কাঁদতে হেকিম এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, জান যখন এবার দিতেই হবে তখন কিছু সময়ের জন্য আমাকে একবারটি আমার বাসায় যাবার অনুমতি দিন। ঘরদোর অগোছাল রেখেই আমি আপনার তলব পেয়ে ছুটে এসেছি। সেগুলো সব গোছগাছ করে বন্ধু ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আপনার দরবারে আবার ফিরে আসব, কবুল করছি।'

বাদশাহ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিমেলে হেকিমের দিকে তাকালেন।

হেকিম বলে চল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমার ঘরে কতকগুলো

হেকিমী কিতাব রয়েছে। সেগুলো নিয়ে এসে মৃত্যুর আগে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। সেগুলোতে বিমারির কথা আর তাদের ইলাজের পরামর্শও দেওয়া রয়েছে।'

—'কিতাব? কেমন কিতাব সে-সব?'

—'বিমারি আর ইলাজ দু'-ই পাবেন। আমার মুণ্ডুটি যখন ধড় থেকে নামিয়ে ফেলবেন তখন কিতাবের তিন নম্বর পাতা খুলে তৃতীয় ছত্রটির দিকে চোখ রাখলে দেখবেন আমার কাটা মুণ্ডুটি কথা বলবে।'

—'সে কী কথা! এ যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড। মুণ্ডুটি ধড় থেকে নামিয়ে দিলে সেটি কথা বলবে! এ কী ভূতুড়ে কাণ্ডরে বাবা!'

—'হ্যাঁ। আমি সারাজীবনে যেসব অলৌকিক বিদ্যা অর্জন করেছি এটি তাদেরই একটি বিশেষ বিদ্যা।'

বাদশাহ উনান-এর কৌতূহল হল। প্রহরীকে নির্দেশ দিলেন, কড়া প্রহরায় হেকিম রায়ানকে তার বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য।

হেকিম রায়ানকে তাঁর বাসা থেকে ঘুরিয়ে প্রহরীরা কড়া প্রহরায় দরবারে নিয়ে এল। তাঁর এক হাতে প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপি আর অন্য হাতে দাওয়াইয়ের বাক্স। কিছু ধূলো জাতীয় ওষুধ রয়েছে বাক্সটিতে। এবার বাক্সটি থেকে সামান্য মিহি গুঁড়ো ওষুধ একটি রেকাবিতে ঢেলে বাদশাহকে বল্‌লেন—'হুজুর, ধড় থেকে আমার মুণ্ডুটি নামিয়ে দেবার পর খুন বন্ধ করার জন্য মুণ্ডুটিতে সামান্য দাওয়াই লাগিয়ে দেবেন। আর এ-ই সেই কিতাব। তবে আমার মুণ্ডুচ্ছেদ না করা পর্যন্ত এ কিতাব ভুলেও খুলবেন না যেন। মুণ্ডুটির খুন বন্ধ হয়ে যাবার পর কিতাব খুলে কিতাবের পাতাটি বের করবেন।

বাদশাহ উনান-এর শিরায় শিরায় তখন উত্তেজনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হেকিমের কথা ভাল করে শোনাও সম্ভব হ'ল না। দাওয়াইয়ের কিতাবটি হাতে পেয়েই তাঁর নির্দিষ্ট পাতাটি খুলে ফেল্‌লেন। পর পর দুটো পাতা উল্টে দেখেন কিতাবটিতে কিছুই লেখা নেই। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি—'হেকিম, এ কী রকম ধোঁকাবাজি কারবার! আপনার কিতাবে যে কিছুই লেখাঝোকা নেই!'

ম্লান হেসে হেকিম বল্‌লেন—'আছে জাঁহাপনা। নিশ্চয়ই লেখা আছে। পাতা উল্টে যান। দেখবেন লেখা ঠিকই পাবেন।'

হেকিমের কথায় বাদশাহ, আরও পাতা ওল্টাতে চেষ্টা করেন। ব্যস, খেল শুরু হয়ে গেল। তাঁর সর্বাঙ্গ ক্রমেই কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল। চোখ-মুখ ক্রমেই লাল হয়ে এল। মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরোতে লাগল। পর মুহূর্তে মাথায় চক্কর মারতে লাগল। টাল সামলাতে না পেরে ধপাস্ করে মাটিতে বসে পড়লেন। মুখে কোন কথা নেই। কেবল অস্ফুট স্বরে গোঙাতে লাগলেন—'বিষ! শক্তিশালী বিষ! বিষের জ্বালা সর্বাঙ্গে। বিষ! বিষ! ব্যস, কণ্ঠরোধ হয়ে এল। সব খতম।

এবার দৈত্যের দিকে ফিরে বল্‌লেন—'দৈত্যশ্রেষ্ঠ, বল তো এ-কিস্‌সা থেকে তুমি কোন্ শিক্ষা লাভ করলে? যে আদমি অন্যায় কাজে ব্রতী হয় না খোদাতাল্লা সর্বদা তাকে রক্ষা করেন। তুমি বিনা কসুরে আমার জান নিতে চেয়েছিলে। তিনি তোমাকে উচিত শিক্ষাই দান করলেন।'

শাহরাজাদ কিস্‌সা শেষ করলে তাঁর ছোটবোন দুনিয়াজাদ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে উঠল—'চমৎকার! তুমি এমন মনলোভা সব কিস্‌সা ফাঁদতে পার যা হাজার বছর ধরে শুনলেও সাধ মেটেনা বহিনজী!'

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'বহিন, এর চেয়েও সুন্দর ভুরিভুরি কিস্‌সা আমার মাথায় রয়েছে। যদি জান বাঁচে তবে এর চেয়ে ঢের ভাল ভাল সব কিস্‌সা তোমাকে শোনাতে পারব।'

বাদশাহ শারিয়ার বিবি শাহরাজাদ-এর কোলে মাথা রেখে, ভোরের হিমেল হাওয়া পেয়ে অকাতরে ঘুমোতে লাগলেন।

পরদিন ষষ্ঠ রজনী। রাত্রে আবার বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে, বেগম শাহরাজাদ-এর কাছে এলেন।

শাহরাজাদ কোনরকম ভূমিকা না করেই কিস্‌সা ফাঁদলেন—'এবার সে-জেলে আফ্রিদি দৈত্যকে বল্‌ল—'এক সময় আমি তোমার ফাঁদে আটকা পড়েছিলাম। এবার কিন্তু তোমাকে পুরোপুরি আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছি। কৌশলে তোমাকে আবার তোমার জালাটার মধ্যে আবদ্ধ করেছি। ব্যস, আবার তোমাকে জালাসহ সাগরের পানিতে ডুবিয়ে দেব। দেখি, তুমি কি করে—'

জেলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই আফ্রিদি দৈত্য করুণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠল—'না, আমাকে সাগরের পানিতে আবার ফেলো না। খোদার দোহাই! আমাকে জালাটি থেকে বের করে দাও।

মেহেরবানি করে আমাকে মুক্তি দাও। বাঁচাও আমাকে। তোমার প্রতি যে আচরণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম তার জন্য আমি মর্মাহত, দুঃখিত, লজ্জিত! এমন নিষ্ঠুর হোয়ো না। কথায় আছে—কৃতকর্মের জন্য যদি কোন অধম অনুশোচনায় দগ্ধ হয় তবে তাকে মাফ করে দিতে হয়। আমাকে মুক্তি দিলে তোমাকে আমি আতিকাহ্ আর উমান-এর কিস্সা শোনাব, কথা দিচ্ছি। আমাকে একবার জালা তেকে মুক্তি দাও, যত কিস্সা তুমি শুনতে চাও প্রাণভরে তোমাকে শোনাব।'

বিদ্রূপের হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে জেলে বল্ল—'আর বোকামি করি কখনও! তোমাকে মুক্তি দিলে তুমি আমার জান না নিয়ে ছাড়বে নাকি?'

রঙিন মছলির কিস্সা

আফ্রিদি দৈত্য হাউমাউ করে কেঁদে বল্ল—'বিশ্বাস কর, তোমার কোন ক্ষতি তো আমি করবই না বরং খোদার নামে হলফ করে বলছি তোমাকে আমি আমির-বাদশাহ করে দেব। মেহেরবানি করে একটিবার অন্ততঃ আমাকে সুযোগ দিয়ে দেখ।'
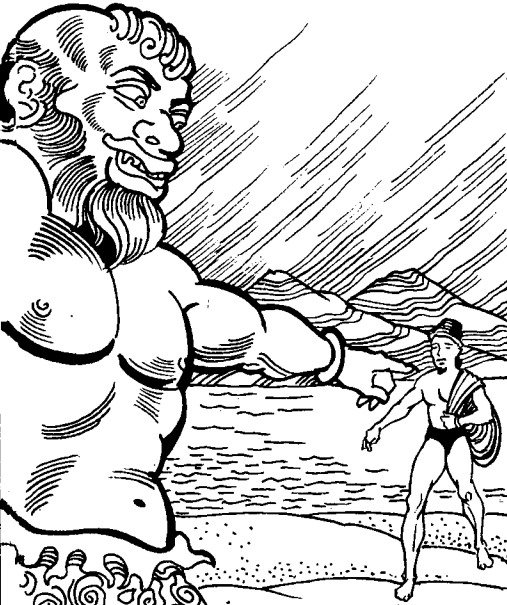
বুড়ো জেলের পক্ষে আর মনকে শক্ত রাখা সম্ভব হ'ল না। দৈত্যের চোখের পানি তার মনকে ভিজিয়ে দিল। ফলে জালার মুখটি আবার খুলে দিল।

ব্যস, মুহূর্তে ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেল। ধোঁয়ার কুণ্ডলি থেকে আবার জন্ম নিল অতিকায় দৈত্য আফ্রিদি। পূর্বের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। ব্যাপার দেখে জেলের কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। কাঁপা কাঁপা গলায় বল্ল—'তুমি খোদাতাল্লার নামে শপথ করেছ। বাদশাহ উনান-এর কিস্সার কথা স্মরণ কর। তিনি তাঁর উপকারীর জান নিতে চেয়েছিলেন বলে খোদাতাল্লা কিন্তু তাকে মাফ করেন নি। তুমি আমার অনিষ্ট করতে উদ্যত হলে তোমাকেও অবশ্যই মার্জনা করবেন না, জেনে রাখ।'

আফ্রিদি দৈত্য এবার মুখ খুলল—'এসো আমার পিছন পিছন।' কথাটি বলেই সে হাঁটা জুড়ল। জেলে তার কথায় ভরসা রাখতে পারে না। ভাবল, আবার কোন বদ মতলব করছে, কে জানে। অবশেষে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এক সময় সে দৈত্যকে অনুসরণ করল। দৈত্য জেলেকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গেল। একটা সরোবরের ধারে গিয়ে দৈত্য থামল। জেলেও দাঁড়িয়ে পড়ল।

দৈত্য এবার গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল—'এ-সরোবরে জাল ফেল।'

জেলে মুহূর্তকাল সরোবরের স্বচ্ছ জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—লাল, নীল, হলুদ আর সবুজ প্রভৃতি রঙের মছলির ঝাঁক। জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। জাল ফেলতেই বিভিন্ন রঙের চারটি মছলি জালে পড়ল।

আফ্রিদি দৈত্য বল্ল—'জেলে ভাইয়া, মছলি চারটি নিয়ে সুলতানের দরবারে হাজির হও। দেখবে, তিনি তোমাকে বহুৎ, বহুৎ মোহর বকশিস দেবেন। ব্যস, তুমি একেবারে আমির বনে যাবে।'

দৈত্য এবার বল্ল—'এবার আমি বিদায় নিচ্ছি। কাল আবার এখানে এসে জাল ফেলবে। আবার বিচিত্র রঙের মছলি জালে উঠবে। সেগুলো বিক্রি করেই তোমার পরিবারের ভরণ পোষণ দিব্যি চলে যাবে। মনে রেখো, রোজ একবারের বেশী এখানে জাল ফেলো না যেন।'

আফ্রিদি দৈত্যের পরামর্শ অনুযায়ী জেলে চার রঙের মছলি চারটি নিয়ে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হ'ল। মছলিগুলো দেখে সুলতান তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ার জোগাড় করলেন।

কয়েকদিন আগেই রুমের বাদশাহ বকশিসস্বরূপ এক নিগ্রো পরিচারিকাকে পাঠিয়েছেন। সুলতান তাঁকেই মছলি চারটে রান্নার দায়িত্ব দিলেন।

সুলতান উজিরকে ডেকে বল্লেন—'জেলেকে সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা করুন। চার শ' দিনার পুরস্কার স্বরূপ তাকে দিয়ে দিন।'

জেলে চার চার শ' দিনার নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরল। বিবিকে বল্ল—'ভাল ভাল খানা পাকাও। লেড়কা-লেড়কিদের পেট ভরে আজ খেতে দাও।'

এদিকে নিগ্রো পরিচারিকা মাছ চারটে কুটে, বেছে আর ধুয়ে কড়াইয়ে ভাজতে শুরু করল। সবে মছলির এক পিঠ ভেজেছে। অন্য

পিঠ ভাজার জন্য যেই মছলির টুকরোগুলোকে ওল্টাতে শুরু করল তখনই ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। রান্নাঘরের একদিককার দেয়াল দু' ভাগ হয়ে গেল। তাদের ফাঁক দিয়ে এক রূপসী তন্বী যুবতী ধীর-পায়ে বেরিয়ে এল। বাস্তবিকই অপরূপা। তার রূপের জৌলুস চোখ ঝলসে দিতে চায় যেন। তার হাতে ফাঁপা একটি বাঁশের টুকরো। সে নাচতে নাচতে কড়াইটির কাছে গেল। বাঁশের টুকরোটির এক প্রান্ত মুখে লাগাল। অন্য প্রান্তটি কড়াইয়ের ওপর ধরে মিষ্টি মধুর স্বরে বল্‌ল—'মছলি ভাইয়া, মছলি ভাইয়া, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ!'

কড়াইয়ে আধ-ভাজা মছলির টুকরোগুলো লাফাতে লাফাতে জবাব দিল—'শুনছি, শুনতে পাচ্ছি।'

রূপসী-যুবতী আর মছলিগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে পরিচারিকা নিগ্রো মেয়েটি তো ভয়ে ডরে একেবারে পৌনে মরা হয়ে যাবার জোগাড়।

রূপসী যুবতী এবার আরও অত্যাশ্চর্য এক কাণ্ড করল। হঠাৎ কড়াইটিকে ধরে চুলার ওপর উপুড় করে দিল। মছলিগুলো সব জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে গেল। তারপর সে লেড়কি অদৃশ্য হয়ে গেল। ফাঁক হওয়া দেয়ালটি আবার জোড়া লেগে গিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে এল।

পরিচারিকা নিগ্রো মেয়েটি যখন সংজ্ঞা ফিরে পেল তার অনেক আগেই মছলিগুলো পুড়ে ভস্মে পরিণত হয়েছে। সে আতঙ্কে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল — 'আমার যে আজ গর্দান নেবে! কী সর্বনাশ হ'ল গো! এ কী ঘটে গেল! আমাকে যে একেবারে খতম করে ফেলবে গো!'

নিগ্রো পরিচারিকাটির বুকফাটা আর্তনাদে বৃদ্ধ উজির ছুটে এসে দেখলেন, সব পুড়ে ছাই।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন — 'তোমার নসীবে যে আজ কী আছে খোদাই জানেন! এখন মছলি-পোড়া ছাই নিয়ে সুলতানের সামনে হাজির হও, তিনি তোমার জান নিয়ে ছাড়বেন।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে উজিরকে মছলির ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বল্‌ল।

নিগ্রো পরিচারিকার কিস্‌সা শুনে উজির ক্রুর হাসি হাসলেন। তার কথাটিকে আমলই দিলেন না। চোখ-মুখ বিকৃত করে বল্‌লেন—'যত সব বুজরুকি!'

জেলের ডাক পড়ল আবার! উজির তাকে আরও চারটি মছলির ফরমাস দিলেন।

জেলে ওই সরোবর থেকে আরও চারটি মছলি ধরে সুলতানের প্রাসাদে দিয়ে গেল। পরিচারিকাটি মছলি কেটে, ধুয়ে হলদি মাখাল। তারপর কড়াইয়ের গরম তেলে দিল ছেড়ে। মছলিগুলোর একপিঠ ভাজা হলে পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

ব্যাপার দেখে তো উজির হতভম্ব। মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির এ পর্যন্ত বলে থামলেন। ঘরের বাইরে ইতিমধ্যেই পাখীর কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। পূর্ব-আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে।

সপ্তম রাত্রি সমাগত। বাদশাহ শারিয়ার-এর নির্দেশে বেগম শাহরাজাদ আবার তাঁর কিস্‌সা শুরু করলেন —'হ্যাঁ, প্রথম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সে রূপসী যুবতীটি যখন কড়াইটিকে উপুড় করে উনানের জ্বলন্ত আগুনে মছলির টুকরোগুলোকে ফেলে দিল উজির আর বিশ্বাস না করে পারলেন না।

উজির এবার ব্যাপারটিকে সুলতানের কানে তুলতে বাধ্য হলেন। সুলতান ঘটনার বিন্দু বিসর্গও বিশ্বাস করতে পারলেন না। গাঁজাখুরি কিস্‌সা বলে হেসেই উড়িয়ে দিলেন ব্যাপারটিকে।

উজিরের নির্দেশে জেলেটি আবার ওই সরোবর থেকে চারটি মছলি ধরে দরবারে পৌঁছে দিল। চারশ দিনার বকশিস নিয়ে সে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরল।

সুলতান স্বয়ং রসুইখানায় হাজির হলেন। মছলির আজগুবি কাণ্ডকারখানা নিজের চোখে দেখবেন।

নিগ্রো পরিচারিকাটি কড়াইয়ের তেলে মছলিগুলো ছ্যাৎ করে ছেড়ে দিল। সেগুলোর একপিঠ ভাজা হয়ে গেলে এবার পূর্বঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল না। দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে রূপসী যুবতীর পরিবর্তে এবার হাজির হ'ল এক ইয়া তাগড়াই নিগ্রো যুবক। রীতিমত জানোয়ারের মত চেহারা। প্রথম দর্শনেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বাঁশের চোঙের পরিবর্তে তার হাতে গাছের ছোট্ট একটি ডাল।

আগন্তুক নিগ্রো যুবকটি কর্কশ স্বরে বল্‌ল — 'মছলি ভাইয়া! মছলি ভাইয়া!'
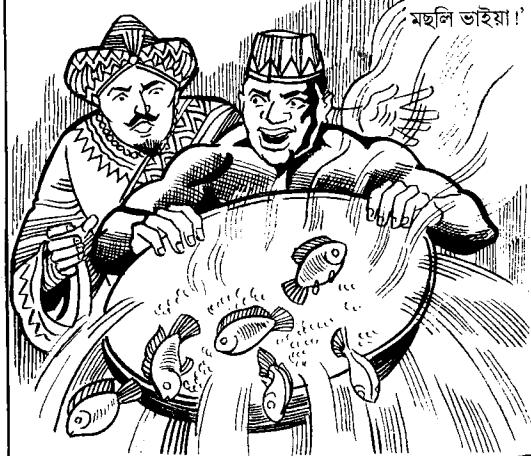
আধভাজা মছলিগুলো কড়াইয়ের ভেতরে নাচতে নাচতে বলতে লাগল — 'কি? কি বলছ — বল, আমরা শুনছি।'

ভয়াল দর্শন নিগ্রো যুবকটি এবার কড়াইটিকে ধরে সপাং করে উপুড় করে দিল। মছলির টুকরোগুলো জ্বলন্ত উনানের আগুনে পড়ে মুহূর্তেছাই হয়ে গেল।

ব্যস, নিগ্রো যুবকটি যে - পথে এসেছিল সে - দেয়ালের ফাঁক দিয়েই কর্পূরের মত উবে গেল।

সুলতান বল্‌লেন — 'উজির সাহেব, এর মধ্যে কোন্ গোপন রহস্য রয়েছে তা আমাদের ভেদ করতেই হবে। আর রহস্যভেদ করতে হলে সে - জেলেকেই সবার আগে ডাকা দরকার।'

সুলতানের তলব পেয়ে বুড়ো জেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। সুলতান এবার আর তাকে মছলি এনে দেওয়ার ফরমাস দিলেন না। সে কোত্থেকে মছলি আনে সে তলাওটি দেখতে ইচ্ছুক। বুড়ো জেলে সুলতানকে নিয়ে পাহাড়ের ওপরের সরোবরটির উদ্দেশে যাত্রা করল। সঙ্গে চললেন সৈন্যসামন্ত আর উজির - নাজির প্রভৃতি পারিষদরা।

সরোবরটির ধারে পৌঁছেই সবাই বিস্ময়াপন্ন হলেন। রঙ - বেরঙের কত সব মছলি সাঁতার কেটে কেটে খেলা করছে।

সুলতান বল্‌লেন — 'এ সরোবার এবং মছলিগুলির রহস্যভেদ না করে আমি এ - জায়গা ছেড়ে কিছুতেই যাব না।'

সুলতান এবার প্রবীণ ও বিচক্ষণ উজিরকে ডেকে বল্‌লেন, তাঁর তাঁবুর চারদিকে প্রহরী নিযুক্ত করতে। আর তিনি একা রাত্রে পাহাড়ের ধার-কাছ এবং সরোবরের চারদিক ঘুরে দেখবেন। সরোবর ও মাছের রহস্য উদ্ধার করার জন্য কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন তিনি! আর কেউ যেন তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানতে না পারে।'

রাত্রি গভীর হলে সুলতান ছদ্মবেশ ধারণ করে একা নির্জন পার্বত্য অঞ্চল ও সরোবর প্রদক্ষিণে বেরিয়ে পড়লেন। সারারাত্রি ধরে হাঁটাহাঁটি করারপর রাত্রির চতুর্থ প্রহরে কুচকুচে কালো বড়সড় একটি বস্তু তাঁর নজরে পড়ল। মনটি আনন্দে নেচে উঠল। ভাবলেন, রহস্যটি বুঝি এবার ভেদ করা সম্ভব হবে। কিন্তু গুটিগুটি পায়ে কাছে যেতেই তাঁর ভুল ভেঙে গেল। দেখলেন, কুচকুচে কালো পাথরে তৈরী একটি প্রাসাদ। তার সামনে একটি সিংহ দরজা। তার একটা পাল্লা বন্ধ, দ্বিতীয়টি পুরোপুরি খোলা। প্রথমে দরজার কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে কারো কণ্ঠস্বরই ভেসে এল না। এবার গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করলেন, কেউ সাড়া দিল না। এবার গলা ছেড়ে বলতে লাগলেন — 'আমি তৃষ্ণার্ত পথিক। তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়েছি! ভেতরে কে আছ, একটু পানি দিয়ে আমার জান বাঁচাও!'

সুলতানের কণ্ঠস্বর শূন্য প্রাসাদে বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কিন্তু তাঁর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে কারও কণ্ঠস্বরই ভেতর থেকে ভেসে এল না।

ভীত সন্ত্রস্ত পায়ে, দুরু দুরু বুকে সুলতান প্রাসাদের একেবারে ভেতরে ঢুকে গেলেন। তাঁর সামনেই পড়ল মনোরম এক ফোয়ারা। আর তার চারদিকে চারটে সোনার সিংহ। ফোয়ারার পানি এসে সিংহগুলোর গা ধুইয়ে দিচ্ছে। আর? ফোয়ারার পানির সঙ্গে থেকে থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে পান্না, হীরে, চুনী আর মুক্তো। সে গুলো চারদিকে স্তূপাকারে জমা হচ্ছে।

প্রাসাদের দেয়ালে রঙ বে-রঙের নাম জানা-অজানা কত সব বিচিত্র আকৃতি ও রঙ বিশিষ্ট পাখি। সবাই বন্দী। ওড়ার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। সোনার জালে সবাই বন্দী।

ঘুরে ঘুরে সুলতান এক সময় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের মধ্য দিয়ে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি এক জায়গায় ধপাস্ করে বসে পড়লেন। ক্লান্তি আর সকালের হিমেল হাওয়ায় তার চোখ দুটো বার বার বুজে আসতে চাইল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। হঠাৎ সুললিত সঙ্গীত-ধ্বনি তার কানে এল। তন্দ্রা টুটে গেল। উৎকর্ণ হয়ে সঙ্গীত লহরী শুনে তার উৎসস্থল আবিষ্কারের চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। বড়ই করুণ, বড়ই মর্মান্তিক সে - গানের মর্মার্থ। সুলতান উঠে পড়লেন। পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করে। কয়েক পা এগোতেই বহুমূল্য একটি পর্দায় বাধা পেলেন। বেশ চওড়া একটি দরজায় সেটিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।
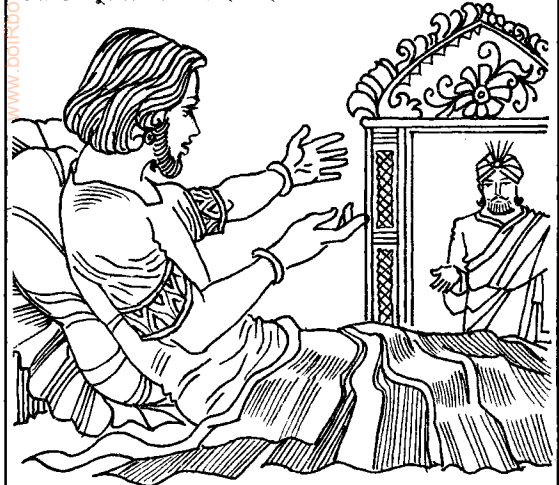
সুলতান হাত বাড়িয়ে পর্দাটি সামান্য ফাঁক করতে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক যুবকের মুখ। সে পালঙ্কে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। অনন্য তার রূপ। হরিণের মত টানা টানা চোখ। আপেলের মত টকটকে তার গাল দুটো। উন্নত নাসিকা, মুক্তার মত

ঝকঝকে তার দাঁত আর মাথায় মখমলের মত চকচকে একরাশ ঝাঁকড়া চুল। সত্যিই এক সুন্দরকান্তি যুবকই বটে।

সুলতান ঘরে ঢুকে গেলেন। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—'আমার নসীবের কী জোর যে, তোমার দেখা পেয়ে গেলাম।'

পালঙ্কের অর্ধশায়িত যুবকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'আমি গোড়াতেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আমার দেহ নিঃসার। উঠে বসা তো দূরের কথা এমন কি নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার নেই।'

সুলতান মুখে আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করলেন। এবার বললেন — 'ওই যে সরোবরটি যাতে বিচিত্র রঙ বিশিষ্ট মছলি রয়েছে তার কিস্‌সা কি তোমার জানা আছে? মানে মছলির কথা বলছি, জান কি কিছু? যদি তোমার জানা থাকে তবে আমার কাছে সে - কিস্‌সা ব্যক্ত কর। আর একটু আগে তোমাকে বিষাদের গান গাইতে শুনলাম। কেন-ই বা তুমি এরকম গান গাইছ? তোমার ব্যথা কোথায়? কেনই বা তোমার এ-দুঃখ, হতাশা আর অন্তহীন হাহাকার?

—'নসীব! নসীবের ফেরেই আজ আমার এ-দুর্গতি!' কথা বলতে বলতে যুবকটি তার গায়ের বহুমূল্য শালটিকে শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। ব্যস, সুলতানের চোখের সামনে ফুটে উঠল অতীব মর্মান্তিক এক দৃশ্য। যুবকটির দেহের নিম্নাংশ শ্বেতপাথরের তৈরী, আর কোমরের ওপরের অংশ রক্ত মাংসে গড়া।

যুবকটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল — 'হুজুর বলছি তবে শুনুন, বিচিত্র প্রকৃতির রঙিন মাছ আর তার নসীবের কিস্‌সা। আমার বাবা ছিলেন এক সুলতান। বিশাল অঞ্চলের অধিপতি। দেশের নাম বল্‌লাম না, আর বললেও আপনার পক্ষে তার হদিস পাওয়া একেবারেই অসাধ্য। তিনি সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মসনদে বসলাম আমি। চাচাতো বহিনকে শাদী করে জীবনসঙ্গিনী করলাম। নিজের কলিজার চেয়েও সে আমাকে পেয়ার করত। হাসি-আনন্দের মধ্যে পাঁচটি বছর কাটল।

এক সকালে সে গোসল করতে গেল। যাবার সময় পাচককে ভাল ভাল খানা পাকাতে বলে গেল। আমি তখনও পালঙ্ক ছেড়ে উঠিনি। আমার শিয়রে এবং পায়ের কাছে বসে দুই ক্রীতদাসী বাতাস করছে। চোখে তখনও নিদ ভর করে রয়েছে।

হঠাৎ আমার কানে এল, ক্রীতদাসীরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে বাতচিত করছে হুজুরের কী নসীবের ফের! এমন এক জেনানাকে তিনি বিবির আসনে বসিয়েছেন! রোজ রাতে একটি করে নতুন মরদানা চাই-ই চাই। তিনিই কিনা আমাদের বিবি! ভাবতেও শরম লাগে। আমাদের সাদাসিদা হুজুরের সাদা মনের সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করছেন হুজুরাণি।'

— 'হুজুরের সাধ্য কি তাঁর শয়তানি ধরেন। রোজ রাত্রে তিনি হুজুরের সরাবের সঙ্গে সাদা কি যেন এক গুঁড়া মিশিয়ে দেন। ব্যস, একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন সারারাত্রি। তখন হুজুরাণি তার ফয়দা লুঠতে মেতে যান। ভোরে আবার হুজুরের নাকের কাছে কি যেন একটা দাওয়াইয়ের শিশি ধরেন। তাঁর নিদ টুটে যায়।

তাদের বাক্যালাপ শোনার পর আমার সর্বাঙ্গ কেমন যেন অসাড় হয়ে পড়তে থাকে। মাথাটা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। মুহূর্তে খড়িমাটির মত ফ্যাকাশে হয়ে যায় আমার মুখ।

কিছুক্ষণ বাদে আমার বেগম গোসল সেরে ঘরে ঢুকল। অন্যদিনের মত তার ঠাণ্ডা হাতটি আলতো করে আমার কপালে ধরে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সোহাগিনী বিবি আমার!

রাত্রি হ'ল। আমার বেগম বহুমূল্য সরাবের বোতল আর পেয়ালা নিয়ে এল। অন্য রাত্রের মতই এক পেয়ালা সরাব ঢেলে হাসির ঝিলিকমাখা মুখে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি তার অলক্ষ্যে সরাবটুকু পিকদানিতে ফেলে দিলাম। তারপর অন্যদিনের মতই পালঙ্কে গা - এলিয়ে দিলাম। ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। মন আমার তার গতিবিধির ওপর।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তাকে পালঙ্ক থেকে খুবই সন্তর্পণে নামতে দেখলাম। হুরিপরীর মত সেজে নিল ঝটপট। ব্যস, এবার দরজা খুলে খুবই সাবধানে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি তড়াক্ করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমি গোপনে তার পিছু নিলাম। প্রাসাদ ছেড়ে, সিংহ দুয়ার অতিক্রম করে লম্বা লম্বা পায়ে সে চল্‌ল শহরের সীমান্তের দিকে। সে নিচুস্তরের মানুষরা যে-অঞ্চলে বাস করে তাদেরই একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে ঢুকে গেল।

আমি বাড়িটার পিছনের দিকে চলে গেলাম। দেয়ালের এক ছিদ্রে চোখ রেখে ভেতরের কীর্তিকলাপ দেখতে লাগলাম। ঘরের ভেতরে ছিল এক ইয়া গাট্টাগোট্টা এক জোয়ান মরদ। নিগ্রো ক্রীতদাস।

আমার কলিজা, আমার পেয়ারের বিবি ঘরে ঢুকে হাসিমাখা মুখে হতচ্ছাড়া কালোমোষ নিগ্রোটিকে কুর্নিশ করল। সে যেন তার কেনা বাঁদী। নিগ্রোটা বাঁদরের মত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার ওপর তম্বি করতে লাগল। যেন নবাব - বাদশা তার বাঁদীকে ধমকাচ্ছে—হতচ্ছাড়ি এত দেরী করলি কেন? পাড়ার সবাই হাড়িয়া খেয়ে যার যার মরদানিকে নিয়ে মজা লুঠছে! আর তুই কিনা রাত কাবার করে এলি!'

—'গোসা কোরো না মেরে জান! তোমাকে তো বলেছি চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার শাদী হয়ে গেছে। তার চোখে ধূলা দিয়ে তবে তো আসব। হুজুর জানতে পারলে সে আমার জান খতম করে দেবে। নচ্ছারটাকে আমি জানোয়ারের মত ঘেন্না করি। তবু তাকে হাতে রাখলে আমাদের দু'জনেরই মঙ্গল। সুলতানকে না চাইতে পারি, কিন্তু তার সোনা - চাঁদি আর মোহর তো মিঠা বটে।'

— 'মুখ বন্ধ কর হারামজাদি! আর বকবক করতে হবে না। তোর

বাহানা শোনার মত আর ধৈর্য আমার নেই। অনেক ছলাকলাই তো দেখিয়েছিস। এবার সত্যি করে বল তো কোন পেয়ারের নাগরের গলায় এতক্ষণ লটকে ছিলি? তোর তুলতুলে নরম শরীরটা দিয়ে কার মন চাঙা করে এলি। খুব রসে মজে গিয়েছিস তাই না? আর কোনদিন যদি দেরী হয় তবে আর তোর নরম-গরম বুকে আমাকে জাপ্টে ধরে সাধ মেটাতে পারবি না, বলে রাখছি, বুঝেছিস? তুই বাজারের বারো ভাতারকে নিয়ে পড়েছিস এখন। একজনকে দিয়ে তোর তৃষ্ণা মিটবে কেন?'

পঙ্গু সুলতান এবার বল্‌লেন — 'শুনুন হুজুর, আমার নসীবের ফেরের কথা খুলে বলছি আপনাকে — শয়তান নিগ্রোটার ধাঁতানি খেয়ে আমার বেগম ওড়নায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ব্যাপার দেখে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। মন চাইছিল, ছুটে গিয়ে তার ধড় থেকে গর্দানটা এক কোপে নামিয়ে দিই।

যা-ই হোক, আমার বেগম ধুমসো নিগ্রোটার হাতে - পায়ে ধরে কান্নাকাটি করার পর তার মনটা একটু ভিজল। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। নিজে হাতে তার গায়ের ওড়নাটা খুলে দরজায় ছুড়ে ফেলে দিল। খুলে ফেল্‌ল তার ঘাগরাটা। তারপর তার কামিজ, কোমরবন্ধ, কাঁচুলি যা কিছু তার গায়ে ছিল এক এক করে খুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। বল্‌লে বিশ্বাস হবে না আপনার, পরপুরুষের সামনে আমার বিবস্ত্রা বিবিকে দেখে শরমে আমার মুখ লাল হয়ে গেল। কিন্তু আমার বিবি? সে উলঙ্গ কালাপাহাড়টাকে বুকের ওপর জাপ্টে ধরে দিব্যি পড়ে রইল। আমার তখন হুঁশ হ'ল, তাঁর শরম লাগবে কেন? নিজের দেহের জ্বালা নেভাতেই তো সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে এখানে ছুটে এসেছে।

আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল বিবির নির্লজ বিশ্বাসঘাতকতা দেখে। একটা পরপুরুষকে কোন নারী, বিশেষ করে আমার বিবি হাসিমুখে বুকের ওপর তুলে নিতে পারে এ যে আমার কাছে খোয়াবেরও অতীত। আর ওই শয়তান কালাপাহাড়টা নিজের চওড়া বুকের তলায় আমার বিবিকে ফেলে হরদম দলন-পেষণ চালাতে লাগল। আর আমার বিবি? আবেশে জড়ানো কামতৃষ্ণাতুর আধ - বোজা আঁখি দু'টি মেলে প্রাণ ভরে সম্ভোগ - সুখ লুঠে নেবার জন্য উতলা হয়ে উঠল। চোখে - মুখে তার এক অনাস্বাদিত স্বর্গীয় সুখ ভোগের লক্ষণ ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। উভয়ের নাসারন্ধ্র দিয়ে তপ্ত শ্বাসবায়ু নির্গমনের শব্দ অস্পষ্ট হলেও আমার কানে ভেসে এল।

না, আর পারলাম না, নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। মাথায় খুন চেপে গেল। শিরা - উপশিরায় খুনের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। আমার গায়ে তখন যেন হিংস্র বাঘের শক্তি ভর করল। আচমকা এক লাথি মেরে দরজাটা দিলাম ভেঙে। এক লাফে ঢুকে গেলাম ঘরের ভেতরে।

এক ঝটকায় কোমর থেকে তরবারিটা টেনে নিয়ে শয়তান নিগ্রোটার শিরে আঘাত করলাম। গলগল করে খুন বেরিয়ে এল। বিবস্ত্রা বেগমকে কোনরকমে পোশাকে ঢেকে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে এলাম প্রাসাদে।
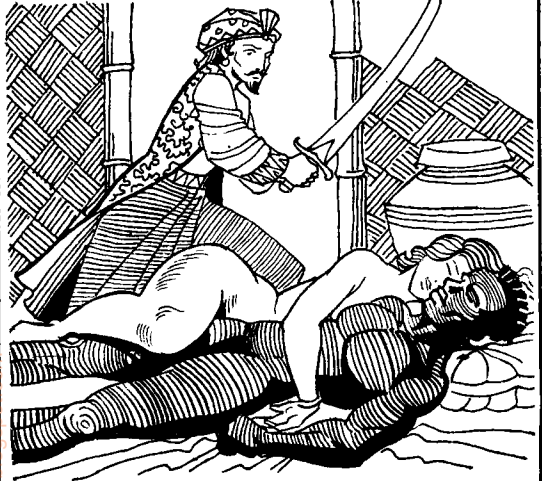
কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলে বেগম শাহরাজাদ থামলেন। পরের রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন - 'সুলতান ভেবেছিলেন, তাঁর বেগমের মেহবুব ষণ্ডামার্কা নিগ্রোটা বুঝি তরবারির আঘাতে দোজাকের পথে পাড়ি জমিয়েছে। কিন্তু নিগ্রোর জান, এত সহজে তো খতম হওয়ার নয়। গুরুতর আহত হ'ল বটে কিন্তু জান খতম হ'ল না। টিকে গেল।

এদিকে আমার বিবি পরদিন সকালে কালো কামিজ, কালো ওড়না প্রভৃতি গায়ে চাপিয়ে নিল। আমাকে বল্‌ল, কাল তার মা মারা গেছে। তাই শোকবস্ত্র গায়ে চাপিয়েছে। এক বছর শোক পালন করবে। একটা শোক - ভবন বানিয়ে দিতে হবে। এক বছর ধরে সেখানে শোক পালনের মাধ্যমে মায়ের বেহেস্তলাভের জন্য আল্লাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করবে।

আমি তার ইচ্ছায় বাধা দিলাম না। প্রাসাদের অদূরে ছোট্ট একটা বাড়ি তৈরী করালাম তার সে এক বছর শোক পালনের জন্য।

ভোরে আর সন্ধ্যার আগে আমার বিবি শোক - ভবনে যেত। গলা ছেড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাতাল্লা-র কাছে মায়ের শান্তির জন্য প্রার্থনা করত।

আমার বিবির আসল উদ্দেশ্য শোক পালন নয়, অন্য। সে তার

পেয়ারের শয়তান নিগ্রোটাকে শোক - ভবনে এনে গোপনে তার ক্ষতস্থানে ইলাজ চালাতে লাগল। দু' - চারদিন পর আমার মনে খটকা লাগল। ব্যাপার কি? শোক পালন ; নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন সেখানে চলে?

একদিন সন্তর্পণে আমি বিবির পিছু নিলাম। কয়েক হাত দূর থেকে মনে হল বেগম মায়ের জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছে। কিন্তু কাছে যেতেই আমার ভুল ভেঙে গেল। বুঝলাম, কান্না নয়, বিষাদের সুরে পেয়ারের নিগ্রোটাকে গান শোনাচ্ছে। গানের মাধ্যমে প্রেম নিবেদনের প্রয়াস।

আমার বেগম আর ষণ্ডামার্কা শয়তান নিগ্রোটা যখন গানে গানে একেবারে মাতোয়ারা তখন আমি তরবারি হাতে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গান শেষ হতেই আমি গর্জে উঠলাম— ' শয়তানি, এই বুঝি তোর মায়ের জন্য শান্তি - প্রার্থনা!' কথা বলতে বলতে তরবারি দিয়ে সজোরে এক কোপ বসিয়ে দিলাম। কাজ হ'ল না। এক ঝটকায় সে কয়েক হাত দূরে সরে গেল। পর মুহূর্তেই হেড়ে গলায় শাপবাক্য উচ্চারিত হ'ল— 'আমার অলৌকিক শক্তি নিয়োগ করে, তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার কোমরের নিম্নাংশ শ্বেতপাথরে পরিণত হয়ে যাক।'

ব্যস, আমার নসীবের খেল শুরু হয়ে গেল। আমার নিম্ন অঙ্গ শ্বেত পাথরে পরিণত হয়ে গেল। আর দেহের উর্ধ্বাংশ রয়ে গেল মানুষের স্বাভাবিক দেহ।' কথা বলতে বলতে অভাগা সুলতানের দু'আঁখির কোল বেয়ে পানির ধারা নেমে এল।

সুলতান চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন— 'তোমার চাচাতো বহিন, তোমার বিবি এখন কোথায় জান কি?'

অদৃষ্ট বিড়ম্বিত যুবকটা এবার চোখের মনি দুটো খোলা জানালার দিকে ঘুরিয়ে বল্‌ল— 'ওই যে, ছোট্ট কুঠিবাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেখানে শয়তান নিগ্রোটাকে নিয়ে মনের আশ মিটিয়ে জীবন - যৌবন উপভোগ করছে।'

— 'এখানে, তোমার কাছে মোটেও আসে না?'

— 'আসে। রোজ একবার করে গুলিখাওয়া বাঘিনীর মত গর্জাতে গর্জাতে এসে হাজির হয়। চরম আক্রোশে আমার পিঠে সপাং সপাং করে ঘা কতক চাবুক কষিয়ে দিয়ে নিত্যকর্ম সম্পন্ন করে।'

— 'শোন, আল্লাতাল্লা ব'লে যদি কেউ থাকেন তবে তাঁর নামে কসম খেয়ে আমি বলছি, তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি আমি অবশ্যই দেব।' দাঁতে দাঁত চেপে সুলতান বল্‌লেন।

সকাল হ'ল। সুলতান এবার শোক - ভবনের দিকে পা বাড়ালেন। তরবারি হাতে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ছোট্ট প্রাসাদটিতে। শয়তান নিগ্রোটা পালঙ্কের ওপরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সুলতান হাতের তরবারিটা দিয়ে সজোরে এক কোপ বসিয়ে দিলেন। মুহূর্তে কালো - পাহাড়টা দু'টুকরো হয়ে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে তাজা খুন বেরিয়ে এল। এবার তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে এক পাহাড়ে ফেলে দিয়ে এলেন।

কাজ এখনও মেটেনি। এবার পিশাচিনী বেগমটাকে সাবাড় করতে হবে। তিনি আবডালে দাঁড়িয়ে রইলেন সুযোগের প্রতীক্ষায়। বেশ কিছুক্ষণ পর হতভাগ্য সুলতানের ঘরে চাবুক হাতে ঢুকলেন। ব্যস্ত - পায়ে ঘরে ঢুকেই তাঁর পিঠে সপাং সপাং করে চাবুক চালাতে লাগলেন। গর্জন করতে লাগলেন — 'আমার মহব্বতে তুমি কাটারী চালিয়েছ! তোমাকে কোন ক্ষমা নয়।'

প্রাসাদ থেকে ফিরে এবার হন্তদন্ত হয়ে বেগম শোক - ভবনে ঢুকলেন। তাঁর পেয়ারের নিগ্রোটার অদর্শনে উন্মাদিনীর মত তিনি গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় বেগম এক অদৃশ্য কণ্ঠের বাণী শুনতে পেলেন - 'আমার আদেশ পালন কর নি কেন?' তিনি ভাবলেন, নির্ঘাৎ খোদাতাল্লার বাণী। তাই কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্‌লেন— 'খোদা, তোমার কোন্ আদেশ আমি পালন করিনি, বল?'

— 'তোমার স্বামীকে রোজ চাবুকের ঘা মার কেন? তুমি জান না, চাবুকের আঘাত আমার পিঠে এসে পড়ে। পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি কান দাওনি!'

— 'আমায় কসুর মার্জনা করুন খোদা। এখন আমার প্রতি কি হুকুম, বলুন?'

— 'যদি নিজের ভাল চাও তবে তোমার স্বামীকে শাপমুক্ত কর। তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে দাও।'

— 'করছি। এখনি করছি খোদা। আমার কসুর নিও না। আমি এখনি গিয়ে সুলতানের স্বাভাবিক দেহ ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

বেগম উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে প্রাসাদে ফিরে এলেন। গণ্ডুষ ভরে জল নিয়ে অস্ফুটস্বরে কি সব বল্‌লেন। মন্ত্র পড়া জলটুকু তাঁর স্বামীর গায়ে ছিঁটিয়ে দিলেন। এবার তাঁর স্বামীর দেহের শ্বেতপাথরের অংশটুকু ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা ফিরে পেল।

আবার অদৃশ্য অলৌকিক বাণী শোনা গেল— ' এবার তোমার কাজ হচ্ছে, সরোবরের মছলিগুলোকে তুমি বন্দী করে রেখেছ কেন? তাদের মুক্ত করে দিতে হবে।'

বেগম এবার উর্ধ্বশ্বাসে সরোবরের দিকে ছুটলেন। কিস্‌সা বলার ফাঁকে বেগম শাহরাজাদ জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বুঝলেন, সকাল হতে আর দেরী নেই।

দুনিয়াজাদ বল্‌ল— ' বহিনজী, তোমার কিস্‌সা আমাকে উতলা করে দেয়। তুমি এমন সুন্দর কিস্‌সা—,

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে শাহরাজাদ ম্লান হেসে বল্‌লেন— ' যদি জানে বেঁচে থাকি তবে এর চেয়ে আরও কত সুন্দর কিস্‌সা শোনাতে পারব যা শুনলে মনে হবে আবারও শুনি।'

পরের রাত্রে যথা সময়ে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে হাজির হলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন— সেই শয়তানী বেগম সরোবরের তীরে এসে গন্ডুষ ভরে পানি নিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন সব বল্‌লেন। এবার হাতের পানিটুকু সরোবরে ছিঁটিয়ে দিলেন। ব্যস, মছলিগুলো সব এক একজন মানুষের রূপ ধারণ করল। তারা সবাই সুলতানেরই সৈন্য। মনুষ্য দেহ ফিরে পেয়ে সবাই নিজ নিজ পরিবারের লোকজনের কাছে চলে গেল।

শয়তানী বেগম আবার প্রাসাদে ফিরে এলেন। করজোড়ে নিবেদন করলেন — ' খোদা, তোমার আদেশে মছলিগুলোকে মনুষ্যদেহ ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি এবার বল, আমার আর কি করণীয় রয়েছে?'

অন্তরাল থেকে এবার বাণী ভেসে এল — ' না, আর কিছু না। আর কিছুই করতে হবে না।' মুহূর্তের মধ্যে সুলতান ছুটে এসে তার মুন্ডুটা ধড় থেকে নামিয়ে দিলেন। এবার বল্‌লেন — নিজের স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার ফল খোদাতাল্লার আদেশেই দিলাম। দোজকে গিয়ে এবার বাকী গুনাহর জ্বালা ভোগ কর গে শয়তানী।'

শয়তানী বেগমকে খুন করে সুলতান প্রাসাদে ফিরে এলেন। শাপমুক্ত সুলতানের কাছে সব বিবরণ ব্যক্ত করলেন।

সুলতান এবার বিদায় নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন। শাপমুক্ত সুলতান তাঁর সঙ্গ নিলেন। তার দেশে বেড়াতে যেতে চান।

শাপমুক্ত সুলতানকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘটনার আদ্যোপান্ত উজিরের কাছে ব্যক্ত করলেন। তাঁর মুখে সব শুনে বৃদ্ধ উজিরের তো শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম।

সুলতান এবার জেলেকে ডেকে পাঠালেন। তার সংসারের খোঁজ খবর নিলেন। তার এক লেড়কিকে নিজে শাদী করে বিবির মর্যাদা দিলেন। আর এক লেড়কির সঙ্গে শাপমুক্ত সুলতানের শাদী দিলেন। এভাবে জেলে দেশের মধ্যে একজন আমীরে পরিণত হয়ে গেল।

তিন রূপসী ও কুলির রোমাঞ্চকর কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ এবার বল্‌লেন—'বহিনজী, এর চেয়ে আরও অনেক ভাল ভাল কিস্‌সা আমার ঝোলায় রয়েছে। এবার শোন, এক কুলি আর তিন লেড়কির কিস্‌সা।'

বাগদাদ নগর।

কোন এক সময়ে বাগদাদ নগরে এক সুদর্শন যুবক একাকী বাস করত। তার পেশা ছিল কুলিগিরি। সে ছিল একদমই একা। তিনকুলে তার ছিল না বলতে কেউ-ই ছিল না। শাদীও করেনি।

এক সকালে কুলি যুবকটা একটা খালি ঝুড়ি নিয়ে রাস্তায় বসেছিল। যদি কোন আমির মালপত্র বয়ে দেবার জন্য তাকে তলব করে, এ আশাতেই তার এখানে বসে থাকা।

এমন সময় সে দেখতে পেল এক রূপসী যুবতী তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার রূপের আভা ঠিকরে পড়ছে। কুলিটার কাছে এসে ওড়নাটা সামান্য সরিয়ে বল্‌ল — 'কি গো, যাবে নাকি?'

একে রূপসী - যুবতী, তার ওপর এমন মিষ্টি - মধুর সুরেলা কণ্ঠে বল্‌ল — ' কি গো, যাবে নাকি?' কথা তো নয় যেন সুগন্ধি ফুলের মধু কেউ তার কানে ঢেলে দিয়েছে।

যুবক - কুলিটা পাশ থেকে ঝুড়িটা হাতে তুলে নিয়ে যুবতীটিকে অনুসরণ করল।

রূপসী - যুবতীটা কিছু দূর গিয়ে রাস্তার ধারের এক বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল। এক বৃদ্ধা দরজা খুলে দিল। তার হাতে কয়েকটা দিনার দিয়ে রূপসী যুবতীটা বল্‌ল — ' এক বোতল ভাল সরাব নিয়ে এসো।'

বৃদ্ধা দিনার ক'টা ট্যাকে গুঁজে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক বোতল সরাব নিয়ে বৃদ্ধা ফিরে এল। রূপসী যুবতীর হাতে তুলে দিল সেটা।

যুবতীটা সরাবের বোতলটাকে ঝুড়িতে দিয়ে আবার ব্যস্ত-পায়ে হাঁটতে লাগল। কুলিটা তাকে অনুসরণ করে পথ চলতে লাগল। কিছুটা পথ গিয়ে ফলের দোকান থেকে বহুরকম ফল কিনে কুলির ঝুড়িতে তুলে দিল। ফলওয়ালাকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে আবার হাঁটা জুড়ল। কিছুটা পথ পাড়ি দিতে না দিতেই এক মস্ত মাংস-বিক্রেতার দোকানে ঢুকে পাঁচ সের মাংস কিনে ঝুড়িতে বোঝাই করল। তারপর মিষ্টির দোকানে ঢুকে ভাল কিছু মিষ্টি কিনে কুলির ঝুড়িতে দিল। তার সওদা করার রকমসকম দেখে কুলিটা রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

কুলিটা এবার তার মনের বিরক্তিটুকু নিজের কাছে জমা রেখেই মুচকি হেসে বল্‌ল —' আগে যদি এরকম হবে জানা থাকত তবে না হয় একটা খচ্চর ভাড়া করে দিতাম। তুমিই বল, এত সব মালপত্র কি একজন মানুষের পক্ষে বহন করা সম্ভব?'

কুলির মজার কথা শুনে রূপসী - যুবতী ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা ফুটিয়ে কেবল নীরবে মিটি মিটি হাসল। মুখে কিছুই বল্‌ল না। আবার হাঁটতে শুরু করল যুবতীটা। কুলিটা ঝুড়ি মাথায় তাকে অনুসরণ করতে লাগল। যুবতীটা এবার একটা আতরের শিশি, গোলাপ পানি আর দশ বোতল পরিষ্কার দামী মদ কিনে ঝুড়িতে রাখল। এবার একটি বড় সড় পিচকিরি কিনল সে। সব শেষে কিনল

আলেকজান্দ্রিয়ার সুন্দর সুন্দর কিছু মোমবাতি।

কুলিটা এবার মালবোঝাই ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে সেই যুবতীর পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এক সুরম্য অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় টোকা দিল বার কয়েক। দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে এক কিশোরী। উদ্ভিন্না কিশোরী। তার গা থেকে রূপের আভা যেন ছিটকে বেরোচ্ছে। দেহে যৌবনের সমাগম ঘটলে সে নিঃসন্দেহে এক রূপ - সৌন্দর্যের আকরে পরিণত হবে। কুলিটা মাথা থেকে ঝুড়িটা নামাতে নামাতে আড়চোখে কিশোরীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল। তার কোমর স্বাভাবিকের চেয়ে সরু। সুগঠিত স্তন দুটো সবে একটু একটু করে উঁকি দিচ্ছে। ঘাসের ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট ফুল যেমন উঁকি দেয় ঠিক তেমনি এ দুটোকে মনে হ'ল কুলি - যুবকটার চোখে। চোখ দুটো হরিণীর মতই টানা টানা। উন্নত নাসিকা। আপেলের মত লালচে আভা গাল দুটোতে সুস্পষ্ট। সব মিলিয়ে তার কুসুম - কোমল দেহ পল্লবটি পুরুষের দেহ - মনকে কাছে টানে। দেয় শান্তি-সুখের প্রতিশ্রুতি।

কুলিটা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আপন মনে ব'লে উঠল — 'সাত সকালেই এমন অপরূপা যুবতী ও কিশোরীর মুখোমুখি দাঁড়ানোর সৌভাগ্য খোদাতাল্লার আশীর্বাদ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। হায় খোদা! তোমার মেহেরবানীর হদিস মানুষের অজানা।

যুবতী এবার তুলতুলে কোমল সুদৃশ্য পা দুটো ধীর - মন্থর তালে ফেলে ফেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। কুলিটা তাকে অনুসরণ করল। সুসজ্জিত এক বিশালায়তন ঘর। ঘরের একধারে মনলোভা কারুকার্যশোভিত পালঙ্কের ওপরে মখমলের চাদর বিছানো। তারই ওপরে শুয়ে আর এক অপরূপা। ঘুমে অচৈতন্যা। তার কামিজটা পায়ের দিকে একটু বেশী রকমই উঠে গেছে। মেয়েটা পিছন ফিরে শুয়ে। তার ভারি ও চওড়া নিটোল নিতম্ব দুটো যেন ছাঁচে গড়া। কোন সুদক্ষ শিল্পী যেন নিপুণভাবে গড়ে তুলেছে। দুটো পাহাড়ের ঢেউ যেন বার বার বাধা পেয়ে নেমে এসেছে পাদদেশের দিকে। সরু কোমরটা ধীর - মন্থর গতিতে, সবদিকে সমতা বজায় রেখে ক্রমে চওড়া হতে হতে নিতম্ব দুটোর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আবার ওপরের দিকেও সৃষ্টিকর্তা একই নির্মাণ-কৌশল প্রয়োগ করেছেন। কোমর থেকে ক্রমে চওড়া হতে হতে বুক আর পিঠটাকে মনলোভা করে তৈরী করা হয়েছে। নিতম্বের ও পরের অনাবৃত কোটিদেশ আর গ্রীবার অংশ বিশেষের অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে যুবক-কুলিটা যেন নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেল্ল। এমন সময় তার বরাত আরও খুলে গেল এক ঝটকায়। মেয়েটা ঘুমের ঘোরেই অধিকতর স্বস্তির প্রত্যাশায় পাশ ফিরল। কুলিটার বুকের ভেতরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চের আবির্ভাব ঘটল।
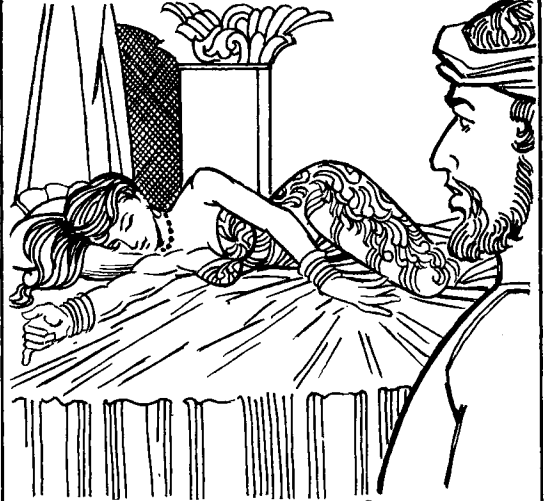
মনে হ'ল কলিজাটা বুঝি উসখুসানি শুরু করে দিয়েছে। এক লহমায় তার কুসুম-কোমল মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করা মাত্রই তার বুকের ভেতরে এমন অভাবনীয় তোলপাড়ানি শুরু হয়ে গেছে, রোমাঞ্চে মন-প্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিস্ময়াভিভূত কুলিটা আপন মনে বলে উঠল — 'মুখ নয় তো যেন শিশিরে ভেজা আধ - ফোটা পদ্ম, মেঘমুক্ত প্রভাতের শুকতারা। আর- - - না, আর ভাবতে পারল না সে। তার সর্বাঙ্গ যেন কেমন শিথিল হয়ে আসছে।

রূপসী তন্বী যুবতীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চকিত চপল চোখ দুটো মেলে তাকাল। সুরেলা কণ্ঠে বল্ল — তোমরা এমন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে যে!' এবার তার বহিনজীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বল্ল — ' ওর মাথায় অতবড় একটা বোঝা, নামিয়ে দাও!'

কথা বলতে বলতে অপরূপা বিছানা ছেড়ে নেমে এল। দু'জনে ঝুড়িটা ধরাধরি করে কুলির মাথা থেকে নামাল। বড়জন দুটো দিনার কুলিটার দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বেরনো তো দূরের কথা কোন কথাও বলতে পারল না। কেবল বিস্ময় মাখানো দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বহু বাঞ্ছিতা অপরূপাদ্বয়ের মুখের দিকে।

বড় লেড়কিটা বল্ল — 'কিগো, তোমার প্রাপ্য তো বুঝেই পেয়েছ, তবে আবার দাঁড়িয়ে যে বড়? মজুরি আরও কিছু চাচ্ছ কি? ঠিক আছে, এই নাও আর এক দিনার।'

কুলিটা যেন এবার সম্বিৎ খুঁজে পেল। সে ব্যস্ত হয়ে বল্ল— 'না, মজুরির ব্যাপার নয়। আমার মজুরি মাত্র এক দিনার। তোমরা এমনিতেই দু'দিনার দিয়েছ। আবার কেন দিতে যাবে?'

— 'তা-ই যদি হয় তবে যে এখনও দাঁড়িয়ে?'

— 'দেখ, যদি কিছু মনে না কর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমাদের কারো দেহেই রূপ বা যৌবন কোনটারই অভাব নেই, যে কোন যুবকের মন জয় করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু তোমরা একা থাক কেন, ভাবছি! কোন পুরুষ তোমাদের সঙ্গে নেই কেন? কোন কিছু যদি ভোগ করাই না যায় তবে তা থাকা আর না থাকা তো সমান কথাই। তোমাদের দেহের এ অঢেল রূপ আর অফুরন্ত যৌবনের কি-ই বা মূল্য? আর রূপ থাক আর না-ই থাক যৌবন যখন আছে তার তাড়না তো কম-বেশী থাকতে বাধ্য। মানুষ কামনা আর লালসার বশ, কথাটা তো মিথ্যা নয়। কোন পুরুষকে যদি নারী তার দেহসুধা পান করাতে না পারে তবে তার জীবনই তো বৃথা। নিজেকে পুরুষের কাছে মেলে ধরা, নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই তো লেড়কিদের কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায়।'

— 'আমরা কুমারী, আজও কুমারীত্বকে সযত্নে পোষণ করছি। পর-পুরুষের সান্নিধ্য আমাদের বিপদ ঘটাতে পারে। মজা লুঠে পালিয়ে যাবে। আর তার কৃতকর্মের দায় ভার বইতে হবে আমাদের। এরকম আশঙ্কাতেই আমরা সতর্কতার সঙ্গে পুরুষদের এড়িয়ে চলেছি, আজও চলছি।' বড় লেড়কিটা বল্‌ল।

— 'তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখতে পার। বিশ্বাসঘাতকতার লেশমাত্রও পাবে না। আরও এমন সব কথা বলতে লাগল যাতে করে স্পষ্টই বুঝা গেল, খোদাতাল্লার মর্জিতে কুলিগিরি করে বটে কিন্তু কালির অক্ষর কিছু পেটে আছে।

কুলি যুবকের কথা ও আচরণে লেড়কি তিনজনই খুব মুগ্ধ হ'ল। মেজ লেড়কিটার মধ্যে একটু দুষ্টুমি বুদ্ধি ভর করল। সে বড়টার কানে কানে বল্‌ল — ' একে নিয়ে একটু রঙ্গ তামাশা করলে কেমন হয়?' বড় লেড়কিটা এবার কুলিটাকে বল্‌ল — ' কি গো, সঙ্গে মালকড়ি আছে কিছু? খালি হাতে তো আর মজা লোটা যায় না।'

— 'সে আমি পাব কোথায়, বল তো! কুলিগিরি করে দিন চালাই, দেখতেই তো পাচ্ছ। আর যেটুকু আছে তা তোমাদের কাছে হাতের ময়লার সামিল। কি - ই বা তোমাদের কাজে লাগবে, বল? ঠিক আছে —' কথা বলতে বলতে সে ঝুড়িটা হাতে তুলে নিয়ে এবার বেরোবার উদ্যোগ করল। ঠিক তখনই মেজো লেড়কিটা আচমকা তার একটা হাত ধরে ফেল্‌ল। 'ছিঃ! পুরুষ মানুষের এত গোসা করলে কি চলে! আর পয়সা ছাড়া মেয়েদের খুশি করা যায়, শুনেছ কোথাও? পাত্তি ফেল, মজা লুঠো।' কথাটা বলেই সে মন মাতাল করা হাসিতে ফেটে পড়ার জোগাড় হ'ল। বড় লেড়কিটাও তার সঙ্গে যোগ দিল।

বড় বহিনদের কাণ্ড দেখে ছোট লেড়কিটা বেশ রাগত স্বরেই বল্‌ল — 'তোমরা একে সোজা-সরল পেয়ে কী আরম্ভ করেছ, বলতো? সওদা করতে গিয়ে তো নোটের বাণ্ডিল উড়িয়ে এলে। তোমাদের কাছে যদি পয়সাটাই বড় হয় তবে এর হয়ে আমিই তোমাদের চাহিদা পূরণ করে দেব। কেমন পেশীবহুল এর শরীর আর কেমন চওড়া ছাতিটা! এ একাই আমাদের তিনজনের পিয়াস মেটাতে পারবে।'

মেজো মেয়েটা বল্‌ল — 'কি রে, তুই যে একেবারে মজে গেছিস দেখছি! যাক গে, চুলোয় যাক এর টাকাকড়ি। পাত্তির দরকার নেই।' এবার সে কুলি যুবকটার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌ল — ' এসো গো মনের মানুষ, আমরা এবার একটু মন খোলসা করে গল্পটল্প করি।'

অন্য দু'বহিনও এবার তাকে সমর্থন করল। সুরার পাত্র আর পেয়ালা নিয়ে এল। পেয়ালার পর পেয়ালা সুরা উজাড় হতে লাগল। আর সে সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-মস্করার জোয়ার বয়ে চল্‌ল।

কয়েক পেয়ালা সুরা গলায় ঢেলে কুলি যুবকটা খোশ মেজাজে গান ধরল। তার কিন্নর কণ্ঠের গানে তিন বোন তন্ময় হয়ে গেল।

আর এক পেয়ালা সুরা এনে ছোট লেড়কিটা তার ঠোঁটের কাছে ধরল। এক নিঃশ্বাসে পেয়ালাটা উজাড় করে দিয়ে সে এবার গানের তালে তালে নাচতে লেগে গেল।

লেড়কি তিনটাও আর নিজেদের সামলে রাখতে পারল না। তারা পালা করে যুবকটার কোমর ধরে নাচতে লাগল। তার কিন্তু বড় লেড়কিটার দিকেই আকর্ষণ বেশী। বার বার তাকে জড়িয়ে ধরেই নাচতে থাকে। ব্যাপারটা তার মনঃপুত হ'ল না। ঈর্ষা চেপে রাখতে পারল না। মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। দু' চোখ দিয়ে ক্রোধানল ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল। ছোট লেড়কিটা অস্থির হয়ে পড়েছে। সে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে কুলি-যুবকটাকে দমাদ্দম কিল - চড় মারতে আরম্ভ করল। আর রাগে ফুলতে লাগল।

কুলি যুবকটা বাধ্য হয়ে পালা করে তিন বহিনকেই জড়িয়ে ধরে নেচে আনন্দ দিতে লাগল। কিছুক্ষণ এভাবে সুখদান ও সুখলাভের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এক সময় সে মেজো লেড়কিটাকে আলতো করে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। বারান্দা পেরিয়েই ফুল বাগিচা। হাজারো রূপ আর গন্ধের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে বাগিচার গাছে গাছে। যেন কোন্ দৈত্য সবার অলক্ষ্যে স্বর্গোদ্যানটাকে তুলে নিয়ে এসে এখানে বসিয়ে দিয়েছে।

কুলি যুবকের আচরণে ছোট লেড়কি রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। সে উন্মাদিনীর মত ছুটে গিয়ে তার চুল ধরে টানতে লাগল, দমাদ্দম কিল-চড়-ঘুষি মেরে আনন্দের ঘাটতিটুকু পূরণে প্রয়াসী হ'ল। তার নরম হাতের স্পর্শ কুলি যুবকটির মধ্যে ক্রোধের পরিবর্তে পুলকের সঞ্চারই করল।

এদিকে দীর্ঘ সময় ধরে কুলি যুবকের পৌরুষ দীপ্ত দেহের ছোঁয়া পেয়ে পেয়ে মেজো লেড়কিটার মধ্যে এক অনাস্বাদিত

ভবান্তর ঘটতে থাকে। সে নিজের দেহপল্লবটাকে তার কাঁধ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে প্রশস্ত বুকের সঙ্গে নিজেকে লেপ্টে দিল। গলাটা জড়িয়ে ধরে আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়ল। মাদকতায় পরিপূর্ণ চোখ দুটো মেলে অপলক দৃষ্টিতে তার ভরা যৌবনকে দেখতে লাগল। তুলতুলে নরম ও রক্তাভ ওষ্ঠ দুটোকে এগিয়ে নিয়ে গেল কুলি যুবকটার পৌরুষভরা ওষ্ঠ দুটোর কাছে। কখন যে উভয়ের ওষ্ঠ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তারা কেউ বুঝতেও পারে নি। কামোন্মাদনা বশত লেড়কিটা যুবকের নিচের ওষ্ঠটা কামড়ে ধরল। জোরে... আরও জোরে। দাঁত প্রেম বোঝে না, মায়াও নেই তার। দাঁতের কাজ দাঁতগুলো করল। যুবকের নিচের ওষ্ঠটায় তার দাঁত বসে গেল। তিরতির করে রক্ত বেরোতে লাগল। কিছুমাত্র হুঁশ কারো নেই। পুরুষের ওষ্ঠের রক্তের স্বাদ সে এই প্রথম পেল। আরও শক্তি প্রয়োগ করে সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল যুবকটার নগ্ন ও প্রশস্ত বুকটাকে। একজন পুরুষ মানুষের শরীরে এত শান্তি-সুখ যে লুকিয়ে থাকতে পারে তা সে এর আগে কোনদিন বোঝে নি।

যুবকটার বুকের মধ্যে ইতিমধ্যে মহাসাগরের তুফান শুরু হয়ে গেছে। সে তাঁকে আঁকড়ে থাকা মেজো লেড়কিটাকে নিয়ে মেঝেতে ধপাস করে বসে পড়ল। আর ছোটটাকে নিচে শুইয়ে দিল। তার সদ্য উঁকি দেওয়া যৌবনের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। লেড়কিটার চোখের তারায় কাছে টানার ইঙ্গিত। ঠোঁটে দুষ্টুমি ভরা হাসি। অসহ্য যন্ত্রণা। বুকের ভেতরে জ্বলন্ত আগুন। আর বাইরে পিষ্ট হবার দুরন্ত বাসনা। যুবকটা কখন কৃপা করবে সে প্রতীক্ষায়
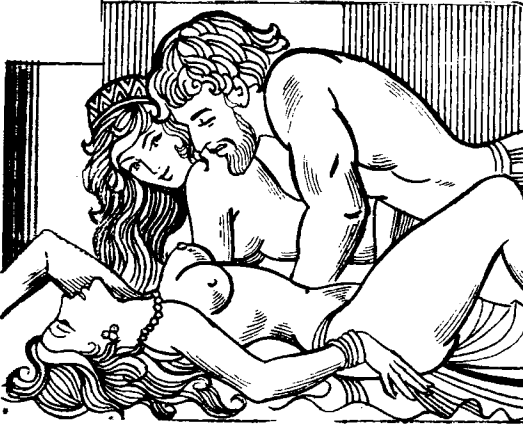
থাকা তার পক্ষে সাধ্যাতীত। অধৈর্য হাতটা দিয়ে তার পেশীবহুল বলিষ্ঠ হাতটাকে জড়িয়ে ধরল। অস্থিরভাবে নিজের বুকের ওপরে রাখল। দু' হাতে জাপ্টে ধরে শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চাপ প্রয়োগ করল। দলন-পেষণের জন্য সে একেবারে মাতোয়ারা।

উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে এক মনোরম সরোবর। সাদা আর লাল পদ্মের বিচিত্র সমারোহ ঘটেছে সরোবরের পানিতে। ফুরফুরে হাওয়ার তালে তালে আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে তার স্বচ্ছ পানি। বড় লেড়কিটা সরোবরের ধারে 'এসে দাঁড়াল। তার চোখের তারায় অবর্ণনীয় মাদকতা ভর করেছে। বাতাসে' তির্‌তির্‌করে দুলছে তার গায়ের ওড়নাটা। না, বৃথা কালক্ষয় করতে রাজি নয় সে। এক ঝটকায় গা থেকে ওড়নাটা খুলে নিয়ে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেল্‌ল। এবার খুব ব্যস্ত - হাতে খুলে ফেল্‌ল কামিজের বোতাম ক'টা। শরীর থেকে নামিয়ে ফেল্‌ল সেটাকে। ভেতরের সরু একফালি অঙ্গবাস ছাড়া আর কিছুই রইল না তার যৌবনভরা দেহপল্লবে। উন্মাদিনী প্রায় সে নেমে গেল জলে। অঞ্জলিভরে জল নিল। যুবকটার গায়ে বার বার ছিঁটিয়ে দিতে লাগল। আর চোখের ভাষায় বলতে লাগল — ' ওগো, মনময়ূর, সরোবরের জল আমার কলিজার জ্বালা নিভাতে অক্ষম। এসো, তুমি নেমে এসো। একমাত্র তোমার উষ্ণবক্ষই আমার দেহ-মনের জ্বালা নেভাতে পারবে।'

কিন্তু কে যাবে? কি করেই বা যাবে তার পিয়াস মেটাতে। যুবকটার দেহ-মন যে অসার হয়ে পড়েছে। ভেজা পোশাক পরিচ্ছদ গায়ে নিয়েই অলস-অবশ হয়ে সরোবরের তীরে সে পড়ে রয়েছে।

মেহবুবার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নগ্ন প্রায় বড় লেড়কিটা জল থেকে উঠে এল। এক চিলতে কাপড় যা তার ভরা যৌবনকে কোনরকমে সামলেটামলে রেখেছিল, জলে ভিজে যাওয়ায় তা-ও যেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। তার উদ্ভিন্ন যৌবনচিহ্ন এখন স্পষ্টতর হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। বাঁধনমুক্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

জল থেকে উঠে এসেই বড় লেড়কিটা আছাড় খেয়ে পড়ে অচৈতন্য প্রায় যুবকটার ওপর। মুহূর্তে যুবকটার মধ্যে সংজ্ঞা ফিরে আসে। সে তার সুদৃঢ় হাত দুটো বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কামোন্মাদিনী বড় লেড়কিটাকে। তার বক্ষের উষ্ণতা ভেজা কাপড়ের চিলতেটার শৈত্যকে লোপ করে দিয়ে যুবকের প্রশস্ত বক্ষের আড়ালে ডুব দিল। যেন হারিয়ে যেতে, নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দেওয়াতেই তার যত আনন্দ, যত সুখ। মেয়েটা যুবকের পেশীবহুল হাতের পেষণে বার বার কুঁকিয়ে উঠতে থাকে। তবু তার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে উৎসাহী নয় মোটেই। পুরুষের হাতের পেষণ, দলন তার নির্যাতনের মাধ্যমেই যৌবন - জ্বালা, দেহের কামনা - বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করে।

এক সময় বড় লেড়কিটার অবসন্ন দেহপল্লবটা যুবকের বুকের ওপর ঢলে পড়ে।

মেজো লেড়কি এবার নিজেকে বসনমুক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সরোবরের জলে। কিছু সময় অস্থিরভাবে সাঁতার কাটল। তারপর

ব্যস্ত-পায়ে উঠে এল জল থেকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল কামোন্মাদনা লাঘবের উদ্দেশ্যে যুবকটার ওপর। আবার শুরু হ'ল দলন, পেষণ, মাতন, সম্ভোগ।

এবার আসন্ন যৌবনা ছোট লেড়কিটা সরোবরের পানিতে

কয়েক মুহূর্ত কাটিয়ে উঠে এল। ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ে থাকা যুবকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হ'ল পূর্বরীতি অনুসারে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি। দীর্ঘ সময় ধরে যুবকটার কাছ থেকে সঙ্গসুখ নিঙড়ে নিয়ে ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ল তার তাজা ফুলের মত দেহটা।

কুলি-যুবকটা কিছুক্ষণ পরিতৃপ্ত দেহ-মনে ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ে থাকার পর উঠে বসল। ধীর-পায়ে এগিয়ে গিয়ে নামল সরোবরে। দীর্ঘ সময় ধরে গোসল করে সাফসুতরা হয়ে উঠে এল। বড় লেড়কির শিয়রে গিয়ে বসল। তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌ল — 'সুন্দরী, তোমাকে ছেড়ে যাওয়া যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

লেড়কিটা তার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে বল্‌ল — 'তুমি ছেড়ে যেতে চাইলে বা আমি ছাড়ব কেন? একবার যখন তোমাকে বুকে ঠাই দিয়েছি তখন আর তোমাকে ছাড়ব, ভাবছ কি করে মেহবুব আমার?'

ভাবাপ্লুত মনে টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে তারা যে কখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তা নিজেরাই জানে না। আর হবে না-ই বা কেন? কয়েক ঘণ্টা ধরে দেহ ও মন উভয়ের ওপর দিয়ে যে কী ধকল গেছে তা আর কহতব্য নয়।

সন্ধ্যার কিছু পরে বড় লেড়কিটার ঘুম ভাঙল। অন্য সবাইকে ডাকাডাকি করে তুলল।

কুলি যুবকটা ঘুম থেকে উঠে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুতি নিল।

কিন্তু যেতে চাইলেই বা তাকে যেতে দেয় কে? তিন বোনই তার পথ আগলে দাঁড়াল। একটামাত্র রাত্রি তাদের সঙ্গদান করার জন্য বার বার মিনতি জানাল। তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। বাধ্য হয়েই সেখানে তাকে রয়ে যেতে হ'ল।

বড় লেড়কিটা কুলি যুবকটার হাত ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল — 'নাগর আমার, চল তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। দরজার পাল্লায় কি লেখা রয়েছে, দেখবে চল।'

দরজার কাছাকাছি গিয়ে বড় লেড়কিটা দরজার পাল্লার গায়ের একটা লেখার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করল। সেখানে লেখা রয়েছে — 'তোমার কাছে সুখদায়ক কি বিষাদময় তা নিয়ে ভেবো না। যা করার নির্দেশ দেবে তা-ই নির্বিবাদে পালন করবে। অন্যের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে যেয়ো না।'

কুলি যুবকটা লেখাটা পড়ার পর বল্‌ল — 'আমি এর আদেশ অমান্য করব না, কথা দিচ্ছি।'

ইতিমধ্যেই প্রাসাদের বাইরের বাগানে পাখিদের কলরব শুরু হয়ে গেছে। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দশম রাত্রি।

বাদশাহ শারিয়ার-এর অনুরোধে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা শুরু করলেন — এদিকে রাত্রি গভীর হওয়ার আগেই মেয়ে তিনটা কুলি যুবকটাকে নিয়ে খানাপিনা করতে বসল। সবে তার খাবারের থালা কাছে টেনে নিয়েছে এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

বড় লেড়কিটা উঠে দরজা খুলে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাসি হাসি মুখে ফিরে এসে বল্‌ল — 'আজ যে কার মুখ দেখে সকাল হয়েছিল তাই ভাবছি। তিনজন বিদেশী আমাদের বাড়িতে থাকতে চাইছে। কারো মুখেই দাড়ি-গোঁফ দেখলাম না। আর সবারই বাঁ চোখ কানা। আর তাতে কলুর বলদের মত ঠুলি বাঁধা। রমদেশের অধিবাসী বলেই মনে হ'ল। ভালই হ'ল। তারা থাকলে সারা রাত্রি ধরে আনন্দে দেহ-সুখ মিটিয়ে নেওয়া যাবে।'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ছোট লেড়কিটা এক দৌড়ে গিয়ে আগন্তুকদের ভেতরে নিয়ে এল।

আগন্তুকরা ভেতরে ঢুকে যুবকটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকে ভাল করে দেখে নিল। তারপর নিজেদের মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে বলাবলি করল—'এ-যুবকটাও বোধ হয় আমাদের মতই কালান্দার ফকির। এখানে আশ্রয় নিয়েছে।'

এবার প্রচুর খানা আর কয়েক বোতল মদ দিয়ে তিন বহিন কালান্দার ফকিরদের আপ্যায়ন করল।

খানাপিনা সারার পর তিন বহিন কালান্দারদের গান শোনাবার জন্য বায়না ধরল। কালান্দররা গাইবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। এমন সময় আবার দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

খলিফা হারুন-অল-রসিদ নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। প্রতিরাত্রেই এরকম বেরোন। তবে এক একদিন এক এক অঞ্চলে যান। আজকে এদিকেই পালা। খলিফা একা নন। তাঁকে সঙ্গদান করেন উজির, জাফর-অল-বারমাকি, আর যুবক তরবারি বাহক মসরুর। প্রজাদের সুখ-সুবিধা, অসুবিধা-সমস্যা প্রভৃতি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্যই তাঁর এরকম মহৎ প্রয়াস। এ-পথ দিয়ে যাবার সময় বাড়িটার ভেতর থেকে গান-বাজনার শব্দ শুনে ব্যাপার কি দেখার জন্য তাঁর কৌতূহল হ'ল। উজির জাফর-অল-বারমাকিকে বল্লেন—'বাড়ির ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা কর। তবে আমার পরিচয় যেন বুঝতে না পারে।'

উজির জাফর-অল-বারমাকি এগিয়ে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। ছোট লেড়কি দরজা খুলে দিল। উজির বল্লেন—'বাছা, আমরা তিবারিয়া দেশের সওদাগর। স্থানীয় এক সওদাগরের বাড়িতে উঠেছি। সামান্য লটবহর যা ছিল সব তার বাড়িতে গচ্ছিত রেখে নগরটা ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়েছিলাম। এখন অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি। বাড়িটা ঠিক চিনতে পারছি না। আজকের রাত্রিটা তোমাদের এখানে আশ্রয় দিলে বড়ই উপকার হয়। খোদা তোমাদের ভালই করবেন।'

তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ছোট লেড়কিটা ভেতরে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিরে এল। আশ্রয় প্রার্থীদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল।

তাঁরা ভেতরে যেতেই বড় লেড়কিটা দরজার লেখাটা তাঁদের পড়তে বল্ল। পড়া শেষ হলে তাঁরা বল্লেন—'হ্যাঁ, আমরা এ-নির্দেশ মেনে নিতে রাজি আছি।'

এবার তাদের নিয়ে গিয়ে কালান্দারদের পাশে বসতে দিল।

খলিফা ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য খানা আর দামী সরাব নিয়ে এল। খলিফা বল্লেন—'বাছা, আমি যে হজযাত্রী। এসব স্পর্শ করি না।' এবার তাঁর জন্য গোলাপ পানির সরবৎ বানিয়ে আনল।

খলিফা দেখলেন কালান্দারদের প্রত্যেকেরই বাঁ-চোখ কানা।

এবার বড় লেড়কিটা কুলি যুবকটাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেল। দুটো নিকষ কালো কুকুরকে শেকলে বেঁধে নিয়ে এল। দুটোই মাদি কুকুর। এবার কুলি যুবকটাকে একটা চাবুক ধরিয়ে দিয়ে বল্ল—'চালাও চাবুক। এ মাদিটাকে কয়েক ঘা বেশী দেবে। শুরু হ'ল সপাং সপাং চাবুকের ঘা। মাদি কুকুরটা অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁই কেঁই শুরু করে দিল। এবার তাকে কুলি যুবকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে দ্বিতীয় কুকুরটাকে চাবুক মারতে বল্ল। কুলি যুবকটা অবার নিষ্ঠুর ভাবে চাবুক চালাতে লাগল। তারপর তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার প্রথম কুকরটাকে এগিয়ে দিল। এভাবে পালা করে চাবুকের ঘা মারার ব্যবস্থা করা হ'ল।

খলিফা এবার সবিস্ময়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে উজির জাফরকে বল্লেন—'লেড়কিটাকে জিজ্ঞেস করে দেখ তো কুকুর দুটোর ব্যাপার কি?'

উজির বল্লেন—'জাঁহাপনা, এ ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

মেজো বহিন এবার ছোট বহিনের হাত ধরে বল্ল—'চল, আমরা প্রতি রাত্রের মত প্রচলিত প্রথা অনুসারে যা-যা করা দরকার, সব করি।'

ছোট লেড়কিটা একটু বটুয়া নিয়ে এল। তার ভেতর থেকে একটা বাঁশি বের করল। সুর করে বাজাতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ বাজাবার পর মেজো বহিনটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—থামো থামো বহিন। খোদাতাল্লা তোমাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।'

এক সময় সে উম্মাদের মত নিজের পোশাক আশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল্ল। সংজ্ঞা হারিয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

লেড়কি তিনটার ব্যাপার দেখে খালিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর মন কেঁদে উঠল।

এবার বড় লেড়কিটা তার চোখে-মুখে জলের ছিঁটা দিয়ে সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল। নতুন পোশাক পরিয়ে দিল।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ আবার উজির জাফর-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে আগের মতই ফিসফিসিয়ে বল্লেন—'লেড়কির সারা গায়ে চাবুকের দাগ। কেমন কালসিটে পড়ে গেছে লক্ষ্য করেছ?'

উজির জাফর বল্লেন—'জাঁহাপনা, মুখ বুজে সবকিছু দেখে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

খালিফা হারুণ-অল-রসিদ এবার বল্লেন—'তা না হয় হ'ল। কিন্তু মাদি কুকুর দুটোকে চাবুক মারা আর তার পিঠের কালো দাগগুলো আমার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করছে। রহস্য! গভীর রহস্য! এর রহস্যভেদ আমাকে করতেই হবে।'

— 'জাঁহাপনা, দরজার ওই শপথ বাক্যের কথা ভুলে যাবেন না। কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার অর্থ হচ্ছে শর্ত লঙ্ঘন করা।'

এবার মেজো লেড়কিটা ওই বাঁশিটা বাজাতে আরম্ভ করল। সেই করুণ-মর্মান্তিক সুর। পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সে তার পোশাক আশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল্ল। ব্যস, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্ল। সারা গায়ের চাবুকের দাগ খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর চোখের সামনে ভেসে উঠল। বড় মেয়েটা আবার পূর্ব কৌশলে তার চোখে-মুখে জলের ছিঁটা দিল। সে সংজ্ঞা ফিরে পেল।

একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তিন তিনবার সে-ঘটনার পুনরাবৃত্তি

ঘটান হ'ল।

খালিফা হারুণ-অল-রসিদ আর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। তিনি আগের মতই অনুচ্চ কণ্ঠে কালান্দারদের বল্লেন—'মশাইরা, রহস্যটা কি বলতে পারেন?'

—'আমরা তো আরও ভাবছিলাম, আপনাকে পুছতাছ করব।'

—'তাই বলুন, আমাদের মত আপনারাও এখানে প্রথম এসেছেন?'

—'আমর মনে হয়, ওই যুবকটা কিছু জানলেও জানতে পারে।'

তাঁদের কথোপকথন কুলি যুবকটা শুনতে পেল। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বলে উঠল—'আমিও আপনাদেরই মত এখানে প্রথম এসেছি। আপনারা এসেছেন রাত্রে আর আমি এসেছি দুপুরের কিছু পরে। ব্যস, এটুকুই যা তফাৎ। এর চেয়ে বরং পথের ধারে শুয়ে রাত্রি কাটনো অনেক ভাল ছিল মশাই।'

তাঁরা সাতজন একমত হলেন। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা দরকার, জানা দরকার আসল রহস্যটা কি। তারা সংখ্যায় সাতজন পুরুষ মানুষ। আর তারা মাত্র তিনজন। তা-ও আবার মেয়েছেলে। এত ভয়ের কি আছে? তাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতেই হবে। আর দরজার গায়ে লেখা শর্ত?'

কালান্দারদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল—'আমরা শর্ত পালন না করলে লেড়কি তিনটাকে অপমান করা হবে না তো আবার? তার চেয়ে বরং অবশিষ্ট রত্রিটুকু কোনরকমে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে সুবহ হতে না হতেই আমরা যে যার পথে চলে যাব।'

এবার উজির জাফর বল্লেন—'ঘণ্টা খানেক বাদে আমরা এখান থেকে কেটে পড়ব। আর আপনার কাছে অন্ততঃ ব্যাপারটা অজ্ঞাত থাকবে না। আজ না হয় কাল জানতে পারবেনই।'

—'আমার পক্ষে এত সময় অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'

সবাই উসখুস করছে ব্যাপারটা জানার জন্য। সমস্যা দেখা দিল, পুছতাছ করবে কে? অনেক কথার পর ঠিক হ'ল কুলি যুবকটাই তাদের কাছে এর কারণ জানতে চাইবে।

কুলি যুবকটা বার কয়েক ঢোক গিলে বল্ল—'তোমাদের কুকুর দুটোর ব্যাপার কি, আমরা জানতে চাইছি। কেন তাদের এরকম নির্মমভাবে চাবুক মারলে? কেনইবা আবার তাদের আদর করলে? তোমাদের শরীরে চাবুকের কালসিটে পড়া দাগ কি করে হ'ল?'

—'এটা কি তোমার একার, নাকি সবারই কৌতূহল?'

—'একমাত্র জাফর ছাড়া আমরা সবাই ব্যাপারটা নিয়ে বড়ই ভাবিত।'

—'তোমরা শর্ত ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত। আতিথ্য গ্রহণের আগে দরজার লেখা পড়ে শর্ত করেছিলে। তোমাদের শর্তভঙ্গের শাস্তি পেতেই হবে।' কথা বলতে বলতে বড় লেড়কিটি হাতের চাবুকটা দিয়ে তিনবার মেঝেতে আঘাত করা মাত্র সাতজন গাট্টাগোট্টা দৈত্যের মত বিশালদেহী নিগ্রো ঘরে ঢুকল। ক্রোধে তর্জন গর্জন শুরু করে দিল। সবার হাতেই চকচকে তরবারি।

বড় লেড়কি হুকুম দিল—'এদের একটার সঙ্গে আর একটা পিঠমোড়া করে বাঁধ।' চোখের পলকে নিগ্রো দৈত্যগুলো হুকুম তামিল করল।

কুলি যুবকটা কেঁদে কেটে বল্ল—'আমায় তোমরা কোতল করো না। সর্বনাশের মূল এক চোখওয়লা কালান্দার ফকিরগুলো। তারা এখানে না থাকলে এসব কিছুই ঘটত না।'

বড় লেড়কিটা হো হো করে হাসতে শুরু করল।

বেগম শাহরাজাদ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বুঝতে পারল ভোরের আলো ফুটতে আর দেরী নেই। সে কিস্‌সা বন্ধ করল। বাদশাহ শারিয়ার বেগমের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

একাদশ রাত্রি

বাদশাহ শারিয়ার যথাসময়ে বেগম শাহরাজাদ-এর ঘরে এলেন।

ছোটবোনের আগ্রহে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'শুনুন জাঁহাপনা। বড় বোন সরবে হেসে উঠলে সবাই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে উঠল। সবার মনেই এক ভাবনা, কি হয়—কি হয়।' হাসি থামিয়ে সে বল্ল—'তোমাদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় দিয়েছিলাম। যাকগে। এবার তোমরা সবাই এক এক করে আত্মপরিচয় দাও। তোমাদের কথায় যদি বুঝি তোমরা সত্যই বিপদে পড়ে আশ্রয় ভিক্ষা করনি তবে তোমাদের মৃত্যু অবধারিত।'

বড় মেয়েটা এবার কালান্দর ফকির তিন জনকে লক্ষ্য করে বল্ল —'বল তো, তোমরা কি সহোদর ভাই?'

—'না মালকিন। আমরা তিনজন তিন দেশের বাসিন্দা। আমরা সর্বত্যাগী। বিষয় সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই। কোনরকমে জানটাকে টিকিয়ে রেখেছি।'

—'তোমরা কি জন্ম থেকে কানা? নাকি পরবর্তীকালে একটা করে চোখ—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই একজন কালান্দার বলে উঠল—'না। আমি কানা হয়ে জন্মাই নি। জন্মের পর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ডের ফলে চোখটাকে হারাতে হয়েছে।'

বাকি দু'জনও একই কথা বল্ল। তাদের জীবনও বৈচিত্র্যময় ঘটনায় ভরপুর।

বড় লেড়কিটা এবার আগ্রহান্বিত হয়ে বল্ল—'তোমাদের

জীবনের বিচিত্র ঘটনাগুলো আমি শুনতে আগ্রহী, তোমরা এক এক করে তোমাদের জীবনকাহিনী আমাকে শোনাও। তোমাদের কথা শুনে আমি যদি বুঝি তোমরা সত্যই দয়া পাওয়ার যোগ্য তবে মুক্তি দিয়ে দেব। অন্যথায়—'

কুলি যুবকটা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল—'আমি সত্যই গরীব, দীন দুঃখী কিনা তা-তো তোমাদের অজানা নয়। আমার জীবনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলতে যা কিছু সবই আজ দিনের বেলাতেই ঘটেছে। তা-তো তোমরা ভালই জান। আর সে কথা দশজনের সামনে, এরকম ভরাহাটে বলা সমীচীনও নয়। তাই বলছি কি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

—'ভাল কথা, তুমি এখনকার মত রেহাই পেলে, তোমার কথা পরেই না হয় শুনব। যাও, বিশ্রাম করগে।'

—'না, আমি এ জায়গা ছেড়ে যাব না। অবশ্যই না, এদের কাহিনী শুনব।'

প্রথম কালান্দার ফকিরের কিস্‌সা

বড় লেড়কিটার নির্দেশে প্রথম কালান্দার তার কিস্‌সাটা শুরু করতে গিয়ে বল্‌ল—'আমি সবার আগে বলছি কেন আমার মুখ দাড়ি-গোফ শূন্য। আর আমার বাঁ চোখটা কেন কানা তা-ও আপনার কাছে ব্যক্ত করব। আমি এক বাদশাহের ছেলে ছিলাম। অন্য আর এক দেশের বাদশাহ ছিলেন আমার চাচা। অতএব বুঝতেই পারছেন আমি হেলা-ফেলার মত ছিলাম না। যাকগে, আমার আব্বাজী আর চাচাজীর মধ্যে খুবই মনের মিল ছিল। একটা ঘটনার দ্বারাই এর পরিচয় কিছুটা পেতে পারবেন। আমার জন্মের দিনই চাচাজীরও এক লেড়কা জন্মাল।

আমরা দু' ভাই কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা দিলাম। আমাদের পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী কিছুদিন বাদে বাদে আমরা চাচাজীর কাছে গিয়ে কিছুদিন করে থেকে আসতাম। শেষবার সেখানে যখন গিয়েছিলাম তখন আমার ভাইজান আমাকে বল্‌ল,—'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আশা করি অবশ্যই অমত করবে না। কথা দাও, না বলবে না।'

আমার পেটে তখন সরাব। গলা পর্যন্ত। নেশায় বিভোর। আমি টলতে টলতে বল্‌লাম—'খোদাতাল্লার নামে হলফ করে বলছি, তুমি যা বলবে আমি হাসিমুখে সে তা-ই করব। বল, কি তোমার কথা।'

—'এক কাজ কর, তুমি একে নিয়ে গোরস্তানের চালাটায় গিয়ে বোসো। আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।' আমার হাতে এক যুবতীকে তুলে দিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

আমি খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়েছি। কথা রাখতেই হ'ল। যুবতীটার হাত ধরে গোরস্তানে হাজির হলাম। চালাঘরটায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদেই সে-ও সেখানে গেল। তার এক হাতে কিছু প্লাস্টার আর অন্য হাতে জলের পাত্র। আর বোগলে ছিল একটা কুড়াল। চালাঘরটার অদূরে অতিকায় একটা পাথরের চাঁই পড়েছিল। সে কুড়াল দিয়ে পাথরটাকে টুকরো করতে গিয়ে তাতে একটা সুড়ঙ্গের দেখা পেল। তারপর নিচের একটা পাথর সরিয়ে ফেলতই সুদৃশ্য এক প্রাসাদ চোখে পড়ল। আমার ভাইজান যুবতীটাকে নিয়ে সে-সুড়ঙ্গ পথে নেমে গেল।

যাবার আগে আমাকে বলে গেল, 'ভাইজান, তুমি এ-জায়গা ছেড়ে যাবার আগে পাথরের টুকরোগুলো সুড়ঙ্গের মুখে দিয়ে প্লাস্টার দিয়ে লেপে দিয়ে যেয়ো। কেউ যেন বুঝতে না পারে এর তলায় কিছু আছে।'

আমি তার অনুরোধে পাথর চাপা দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করলাম প্লাস্টার দিয়ে লেপে যেমন ছিল ঠিক তেমনটি করে রেখে চাচাজীর প্রাসাদে ফিরে এলাম।

প্রাসাদে ফিরে শুনি চাচাজী শিকারে বেরিয়েছেন। সারা রাত্রি শুয়ে-বসে অস্থিরভাবে কাটালাম। আমার চাচা বা চাচাতো ভাইয়া কেউ-ই ফিরল না। বিশেষ করে চাচাতো ভাইয়া না ফেরায় আমার মনটা বড্ড চঞ্চল হয়ে পড়ল। শেষ রাত্রের দিকে আবার গোরস্তানের সে পাথরটার কাছে গেলাম। তার খোঁজ করলাম। কোন হদসিই মিল্‌ল না। বিষণ্ণ মনে প্রাসাদে ফিরলাম।

পর পর সাতটা দিন আমি নিদারুণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটালাম। কিন্তু আমার চাচাতো ভাইয়া তবু ফিরল না। শেষ পর্যন্ত হতাশা আর হাহাকার সম্বল করে আমি নিজের দেশে ফিরলাম।

আমাদের নিজের শহরে পা দিতেই আমাকে এক অপ্রত্যাশিত

ঘটনার মুখোমুখি হতে হ'ল। একদল সশস্ত্র লোক অতর্কিতে আমাকে ঘিরে ফেল্‌ল। আমি দেশের বাদশাহের ছেলে—শাহজাদা। আর যারা আমাকে বন্দী করেছে সবাই আমার আব্বাজীর অনুগত কর্মচারী। নিজের দেশে, নিজের আব্বাজীর সৈন্যরা আমাকে বন্দী করায় বিস্মিত হবারই তো কথা।

আমার নিজের দুরবস্থার চেয়ে আব্বাজীর অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুকের মধ্যে কলিজাটা উথালি পাথালি করতে লাগল। ভাবলাম, তবে আব্বাজীর নির্ঘাৎ কিছু ঘটে গেছে। তিনি হয়ত ইহলোকে আর নেই।

আমার ধারণা অমূলক নয়। এক সহৃদয় সৈনিক আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'তোমার আব্বাজী জানে বেঁচে নেই। উজির আর সেনাপতি চক্রান্ত করে তাকে নিকেষ করে দিয়েছে। উজির এখন মসনদে বসেছেন। তাঁরই হুকুম তামিল করতে আমরা তোমার হাতে শেকল পরাতে বাধ্য হয়েছি।'

আমি আব্বাজীর শোকে চোখের পানি ফেলতে লাগলাম। তারা আমাকে শেকল পরিয়ে উজিরের সামনে হাজির করল।

আমার ওপর উজিরের অনেক দিনের খার ছিল। উজির একদিন বাগানে পায়চারি করছিলেন। আমি পাখি শিকার করতে গিয়ে তীর ছুঁড়েছিলাম। তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। উজিরের চোখে গিয়ে বিঁধল। ব্যাস, একেবারে কানা। কিন্তু আমার বাবার ভয়ে আমার উপর কোন প্রতিশোধই নিতে পারলেন না!

শেকলবাঁধা অবস্থায় আমাকে উজিরের সামনে দাঁড় করানো হ'ল।

উজির গর্জে উঠলেন—'কোতল কর! গর্দান নাও। খতম কর।'

আমি সচকিত হয়ে বল্‌লাম—'আগে আমাকে বলুন, আমার কি অপরাধ। তারপর আমার গর্দান নেন আপত্তি করব না।'

এবার শান্তস্বরে উজির আমাকে কাছে যেতে বল্‌লেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। তিনি আচমকা নখের আঘাতে আমার বাঁ-চোখটা ঘায়েল করে দিলেন। গলগল করে খুন বেরিয়ে এল। এতেও সন্তুষ্ট হতে পারল না। ঘাতকদের হুকুম দিলেন, —'একে একটা কাঠের বাক্সে ভরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। সেখানে টুকরো টুকরো করে কেটে মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়ে আসবে। শেয়াল-কুকুর আর শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক একে। যা, নিয়ে যা।'

বাক্সবন্দী অবস্থায় আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে এল।

আমাকে বাক্সটা থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করল। চোখের যন্ত্রণায় আমি তখন ছটফট করছি। ভাবলাম, এরকম অসহ্য যন্ত্রণায় একদিন তো উজিরও কাৎরেছিলেন। একটা মানুষের চোখ কানা করে দেওয়া যে কী মর্মান্তিক কাজ। তা তখন আমি বেশী করে উপলব্ধি করলাম। তাই তিনি আমার চোখ কানা করেও তৃপ্ত হলেন না, মৃত্যুদণ্ড দিয়ে পুরোপুরি প্রতিশোধ নিলেন।

ঘাতক আমার আব্বাজীর খুবই বিশ্বস্ত। আব্বাজীর কাছ থেকে উপকৃতও হয়েছে বহুবার। তাই আমাকে ছেড়ে দিল। তবে বার বার সাবধান করে দিল, আমি যেন ভুলেও দেশের মাটিতে কোনদিন পা না দিই। দিলে তবে মৃত্যু অবধারিত।

আমাকে বাঁ চোখটা হারাতে হ'ল সত্য, কিন্তু জানটা রক্ষা হয়ে গেল।

পাহাড়, জঙ্গল আর মরুভূমি ডিঙিয়ে বহুৎ খুব তখলিফ সহ্য করে ফিরে এলাম চাচাজীর প্রাসাদে। আমার দুর্ভাগ্য এবং আব্বাজীর মৃত্যু সংবাদে তিনি বাচ্চা লেড়কার মত হাউহাউ করে কাঁদলেন, চোখের পানি ঝরালেন।

চাচাজীর মনে তখন লেড়কার শোক জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে। কতজনকেই সে লেড়কার কথা পুছতাছ করেছেন তা গল্পগাঁথা নেই। কিন্তু কেউ তার হদিস দিতে পারে নি।'

চাচার চোখের পনি আর দীর্ঘশ্বাস আমাকে কাতর করে তুল্‌ল। অনন্যোপায় হয়েই তাঁর লেড়কার সে-কাণ্ডকারখানার কথা বল্‌লাম।

চাচাজী আমার মুখে সবশুনে ব্যস্ত পায়ে সে-গোরস্তানে গেলেন। আমাকে এবং কিছু সৈন্য সামন্তও সঙ্গে নিলেন। অনেক চেষ্টার পর সে-রহস্যজনক সুড়ঙ্গটার হদিস মিল্‌ল। অতিকায় পাথরের চাঁইটা সরিয়ে আমরা সুড়ঙ্গটার মধ্যে সিঁধিয়ে গেলাম। সুড়ঙ্গ-পথে সামান্য নামতেই আমরা ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। জমাট বাঁধা ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। চাচাজী আমাকে অভয় দিতে গিয়ে বললেন কিছু ডর নেই। খোদার নাম জপ কর। সব ডর্ কেটে যাবে।

ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সুবিশাল এক ঘরে আমরা পৌঁছে গেলাম। এক পাশে একটা পালঙ্ক। আমার চাচাতো ভাই আর সে রহস্যময়ী নারী পরস্পরকে আলিঙ্গন করে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মশ্মরী টাঙানো ছিল। কাছে গিয়ে মশারীর একটা কোণ তুলতেই আমার সর্বাঙ্গে অভাবনীয় কম্পনের সৃষ্টি হ'ল। শরীরের সব কটা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল। দেখ্‌লাম, আমার চাচতো ভাই আর মেয়েটা উভয়েই ভষ্মীভূত।

আমার চাচাজী, উন্মাদের মত কেঁদে উঠলেন। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগলেন—'তোর উচিত শাস্তি হয়েছে রে হতচ্ছাড়া! খোদাতাল্লা তোর বিচার করবেন। তোর যোগ্য স্থান দোজাক। তুই দোজাকেই যা।' কথা বলতে বলতে চাচাজী পা থেকে চপ্পল খুলে উন্মাদের মত মৃত ও ভষ্মীভূত লেড়কাকে পিটাতে লাগলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এটুকু বলার পর থামলেন। জানলার

রাত্রির বন্দিশায় ইতিমধ্যেই ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটতে শুরু করেছে।

দ্বাদশ রজনী

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগমের কাছে এলেন।

শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—কালান্দর বাদশাহ হারুণ-অল-রসিদ, উজির জাফর, কুলি-যুবক প্রমুখের সামনে তাঁর জীবনের করুণতম দিনগুলোর কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বল্ল—আমার চাচা পায়ের চপ্পল খুলে আমার মৃত চাচাতো ভাইয়ের মাথায় আঘাত করামাত্র মাথাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে কাঠকয়লার মত ছড়িয়ে পড়ল। আমি চাচজীকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম।

চাচাজী চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন—'কার গুণাহর জন্য আমার লেড়কার এ রকম হাল হয়েছে, জান? আর তার পাশে নসিব বিড়ম্বিত লেড়কীটাই বা কে জান? আমার লেড়কী। শৈশব থেকেই সে বহিনের সঙ্গে অনাচার করছে। কী গুণাহ ভেবে দেখ তো। খোদা এ রকম গুণাহ কখনও মাফ করবেন, ভেবেছ? আমি তাকে বহুভাবে শাসন করেছি, মারধোর করেছি, ডরও কম দেখাইনি। কিছুতেই কিছু হল না। পরকালে দোজাকেই হবে তার একমাত্র স্থান। এরকম ডরও বহুবার দেখিয়েছি। কিন্তু পরিণতি ভস্মে ঘি ঢালা।'

চাচাজী আবার হাউমাউ করে কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, বল্‌লেন—'বেটা, তুই আর আমি একই রকম অভাগা। তোর আব্বাজী গেছে আর আমার গেছে লেড়কা। আজ থেকে তুই-ই আমার বেটা। আজ থেকে তুই আমাকে আব্বাজী ডাকবি।'

আমরা প্রাসাদে ফিরে এলাম।

দরবারে পা দিতেই শোনা গেল, সীমান্তে শত্রু সৈন্য জড়ো হয়েছে। চাচাজীর রাজ্য আক্রমণ করেছে। আমরা সাধ্যমত যত শীঘ্র সম্ভব সৈন্য প্রস্তুত করে নিলাম। বৃথা চেষ্টা। ইতিমধ্যে, শত্রুসৈন্য প্রবল বিক্রমে নগরে ঢুকে পড়েছে। আকস্মিক প্রবল আক্রমণের মুখে আমাদের সৈন্যরা খড়কুটোর মত উড়ে গেল।

আমাদের বুঝতে দেরী হ'ল না, আক্রমণকারী আমার আব্বাজীর হত্যাকরী।

সে-উজির চাচাজীর রাজ্য আক্রমণ করেছে শুনে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। অস্ত্র ধারণ করে লড়াইয়ে নামার জন্য বদ্ধপরিকর হলাম। কিন্তু মুখোমুখি লড়াইয়ে নামা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে দেখতে পেলেই তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য আমি। দাঁতে দাঁত চেপে আমাকে হত্যা করার চেষ্টায় মেতে উঠবে।

অতর্কিতে আমার মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেল। ব্যস্ত হাতে ক্ষুর চালিয়ে আমার মুখের দাড়ি-গোঁফ চেঁছে ফেল্‌লাম। গায়ে

একটা ছেঁড়া পশমের চাদর জড়িয়ে নিলাম। এবার ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করতে করতে বেরিয়ে গেলাম নগর থেকে।

আমি অশেষ ক্লেশ সহ্য করে বাগদাদ নগরে হাজির হলাম। অনেকেরই মুখেই খলিফা হারুণ-অল-রসিদের কথা শুনেছি। আর তিনি আল্লাহ-র পয়গম্বর। এত বড় নগর বাগদাদ। রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না। কোথায় গেলে সে মহাত্মার দেখা পাব ভাবছি। দ্বিতীয় কালান্দার-এর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে আবার বল্ল—'পথের বাঁকে ওনার দেখা পেয়ে গেলাম।' এবার তৃতীয় কালান্দার'কে দেখিয়ে বল্ল—'আমরা দু'জনে যখন কথা বলছি তখনই ইনি সেখানে উপস্থিত হলেন। আমরা সবাই এখানে পরদেশী। তাই রাত্রিটুকু কাটাবার ইচ্ছায় আপনার বাড়ির কড়া নাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।'

আশা করি আপনারা আমার বাঁ-চোখ কানা হওয়া এবং দাড়ি-গোঁফহীন মুখের কাহিনী শুনে সত্য ঘটনা বুঝতে পারলেন।

প্রথম কালান্দার-এর কথায় প্রীত হয়ে বড় মেয়েটা তাঁকে মুক্তি দিল।

দ্বিতীয় কালান্দার ফকিরের কিস্‌সা

প্রথম কালান্দার ফকির তাঁর কিস্‌সা শেষ করলে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ জাফর-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌লেন— 'কী মর্মান্তিক কাহিনী শোনালেন ফকির সাহেব! এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা সচরাচর ঘটে না।'

প্রথম কালান্দার ফকির তাঁর জীবন-কাহিনী শুনিয়ে মুক্তিলাভ করলে দ্বিতীয় কালান্দর ফকির এগিয়ে এসে তার জীবন-কথা শুরু করলেন।

আপনারা যে আমার কানা চোখটা দেখছেন, আমি কিন্তু মোটেই কানা চোখ নিয়ে জন্মলাভ করিনি। আর আমার গায়ে যে ফকিরের আলাখাল্লা দেখতে পাচ্ছেন তা-ও কিন্তু আমার গায়ে উঠেছে
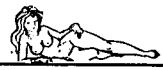
অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্য দিয়েই।

আমার আব্বাজীও বাদশাহ ছিলেন। আমি ছিলাম বাদশাহের পেয়ারের বেটা।

আমার আব্বাজান বাদশাহ, অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হলেও যথেষ্ট বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আমাকেও উচ্চশিক্ষাদান করতে ত্রুটি করেন নি। পৃথিবীর সেরা সেরা বইয়ের পাহাড় ছিল আমাদের প্রাসাদে। আমি ছিলাম বইয়ের পোকা।

দেখুন, নিজের গুণগান করা উচিত নয়। আমারও সেরকম ইচ্ছা নেই। তবে প্রসঙ্গক্রমে কিছুতো বলতেই হবে।

আমার বিদ্যা-বুদ্ধি আর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা কেবল আমাদের রাজ্যেই নয় প্রতিবেশী রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

একবার সমরখন্দের এক বাদশাহ আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি আব্বাজীর অনুমতি নিয়ে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ তাঁর রাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। বাদশাহের ভেট, জাহাজ বন্দর ছাড়ল। একমাস অতিক্রান্ত, তখন এক বন্দরে আমার জাহাজ নোঙর করল। আমার সঙ্গের উট আর ঘোড়াগুলোকে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। তাদের পিঠে উপহারগুলো চাপিয়ে রওনা হলাম। মাত্র ঘণ্টা-খানেকের পথ। হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। ঝড় থামলে চারদিকে তাকালাম। অজানা-অচেনা মরুভূমিতে আমরা এগিয়ে চলেছি। অতর্কিতে একদল সশস্ত্র মরু-ডাকাত আমাদের ঘিরে ফেল্ল। আমি বল্লাম, বাদশাহের জন্য উপঢৌকন নিয়ে চলেছি। পাত্তা দিল না। তারা আচমকা তরবারির আঘাতে আমার এক ক্রীতদাসকে হত্যা করে বসল। তার খুন দেখে আমরা যে যেদিকে পারলাম দৌড়ে ভাগতে লাগলাম। কারো কথা ভাবার অবকাশ নেই।

এক সময় ছবির মত সুন্দর এক নগরে হাজির হলাম। শহরের পথে এক দর্জির কারখানা চোখে পড়ল। ছেঁড়া কাপড়ে তাপ্পি মারছে।

আমাকে দেখেই দর্জি মুচকি হাসল। বিদেশী অনুমান করেই হয়ত তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। আমি পাল্টা হাসিতে তাকে তুষ্ট করলাম। গুটিগুটি তার দোকানে উঠে গেলাম। আমার পরিচয় নিল। তার মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। বল্ল—'তুমি হয়ত জান না যে, এ দেশের শাহেনশাহ তোমার বাবার সব চেয়ে বড় শত্রু। তোমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার পিছনে রহস্য হচ্ছে তোমাকে খুনের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়া। খবরদার কাউকে তোমার পরিচয় দেবে না। তবে কিন্তু এখানে করো কাছে আশ্রয় পাওয়াই তোমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠবে।

দর্জি আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করল। রাত্রে খানাপিনা করাল। পাটি পেতে শুতে দিল।

তিনদিন দর্জির আশ্রয়ে রইলাম।

একদিন দর্জি কাজ করতে করতে বল্ল—'এমন কোন কাজ জান কি যা দিয়ে তুমি রুটির জোগাড় করতে পারবে?'

—'কিন্তু কোন্ বিদ্যা যে এখানে আমার রুটি রোজগারের কাজে লাগতে পারে তা তো জানি না ভাই। তবে আইন বিষয়ে আমার পাণ্ডিত্য রয়েছে। দর্শন আর সাহিত্যেও যথেষ্ট দখল রয়েছে। আর হিসাবশাস্ত্রে নিজেকে একজন বড় পণ্ডিত বলেই আমি মনে করি।'

দর্জি ব্যাজার মুখে বল্ল—'ভাইজান এ সব বিদ্যা এখানে অচল। অর্থোপার্জনই এখানকার মানুষের একমাত্র লক্ষ্য।'

আমি হতাশার স্বরে বল্লাম—'কিন্তু এসব ছাড়া যে অন্য কোন কাজই আমি রপ্ত করতে পারিনি।'

মুহূর্তকাল গম্ভীর মুখে ভেবে বল্ল—'ঠিক আছে, ব্যাপারটা খোদাতাল্লার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক। তিনিই দোয়া করে যা হোক একটা বিহিত করে দেবেন।'

দু'দিন বাদে দর্জি একটা কুড়াল এনে আমার হাতে দিয়ে বল্ল—'ভাইজান, জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে এসে নগরে বিক্রি করলে রুটির জোগাড় হয়ে যাবে। যাও, তাই কর।'

দর্জির পরামর্শ মত জঙ্গল থেকে কাঠ এনে নগরে বিক্রি করে পেটের জোগাড় করতে লাগলাম। আশ্রয় দর্জিই দিল। এক বছর কেটে গেল।

এক সকালে গভীর জঙ্গলে ঢুকে একটা বিশাল মরাগাছ কাটতে লাগলাম। কয়েক কোপ দিতেই গাছের গোড়া থেকে কুড়োলের সঙ্গে একটা তামার বালা উঠে এল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে উন্মাদের মত মাটি কাটতে লাগলাম। কিছুটা মাটি কাটতেই আমার চোখের সামনে একটা কাঠের মাচা ভেসে উঠল। অবাক মানলাম। ব্যস্ত-হাতে মাচাটা সরিয়ে ফেলতেই আরও বেশী অবাক মানলাম। আচমকা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'হায় আল্লা!' এক সুরম্য অট্টালিকা দেখে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। তর্ তর্ করে নিচে নেমে গেলাম। আরও অবাক মানলাম, যখন একটা বিশালায়তন ঘরের দরজায় পৌঁছলাম। নিজের চোখ দুটোর ওপরও যেন আস্থা হারিয়ে ফেল্লাম। দেখি এক অষ্টাদশী সুসজ্জিত একটা পালঙ্কের ওপর শুয়ে। অপরূপা! খুব-সুরৎ! রূপের আভায় চোখ দুটো ঝল্সে দিচ্ছিল! মনে হ'ল বেহেস্তের পরীদের সৃষ্টি করার পর অবশিষ্ট সৌন্দর্যটুকু এ-অপরূপার গায়ে সযত্নে লেপে দেওয়া হয়েছে।

আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে অপরূপা চোখ মেলে তাকাল। মিষ্টি-মধুর সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'তুমি কি মানুষ নাকি কোন দৈত্য গো?'

আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বল্লাম—'আমি মানুষ। সত্যিকারের মানুষ।'

মেয়েটি সবিস্ময়ে বল্‌ল—'মানুষ! কি করে এখানে এলে? বিশ বছর আমি মানুষ তো দূরের কথা মানুষের ছবি পর্যন্ত দেখতে পাই নি।

—সবই আল্লাতাল্লার মর্জি। তিনিই আমাকে তোমার এখানে নিয়ে এসেছেন। এতদিন ধরে নসীবের ফেরে যা কিছু তকলিফ সহ্য করেছি আজ তোমাকে চোখের সামনে দেখে সব মন থেকে মুছে গেল।

রূপসী যুবতী ধৈর্য ধরে আমার দুঃখ-দুর্দশার কথা সব শুনল। আমি থামলে সে এবার তার কিস্‌সা শোনাতে লাগল—শোন মনের মানুষ, ইফতিমাসের লেড়কী আমি। চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার শাদী হবে পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। নসীব মন্দ। শাদীর দিনে আমাকে বাজমুস দৈত্যের লেড়কা জারসিজ চুরি করে নিয়ে যায়। বহু জায়গায় ঘুরে এখানে এনে বন্দী করে। আমার কল্পনার কোন অভাবই সে রাখে নি। সারা রাত্রি আমার সঙ্গে থাকে আমাকে উপভোগ করে। সুবহ হলেই পরিতৃপ্ত মন নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। ব্যস, সন্ধ্যার আগে তার টিকির নাগালও পাওয়া যায় না। আবার কখনও দীর্ঘদিন সে এমুখো হয় না। চারদিন আগে এসেছিল। আরও ছয়দিন পর আবার আসার কথা। এর পাশেই একটা ছোট্ট কুঠরি আছে। তার দেওয়ালে একটা লেখা রয়েছে। দু ছত্র মন্ত্র। তার গায়ে হাত রেখে দৈত্যটাকে ডাকলেই মুহূর্তে এখানে হাজির হয়। ছয় দিনের মধ্যে পাঁচদিন তুমি নির্বিবাদে এখানে কাটাতে পার। নিশ্চিন্তে আমাকে সঙ্গদান করতে পার। সে ফিরে আসার আগে এখান থেকে কেটে পোড়ো।'

আমি রূপসী যুবতীর প্রস্তাবে সম্মত হলাম।

আমার মুখে থাকার কথা শুনে সে রীতিমত উল্লসিতা হয়ে পড়ল। উচ্ছ্বাসে-আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় বসাল। তার হাতের স্পর্শে আমার সর্বাঙ্গে কেমন যেন এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ জাগল। বুকের মধ্যে কলিজাটা নাচন কোদন জুড়ে দিল। ভাবলাম রূপসী যুবতীর স্পর্শে যদি মন এমন পাগলপারা হয়ে ওঠে তবে সম্ভোগে না জানি তার পরিমাণ কত গুণ বৃদ্ধি পায়। অভাবনীয় উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল যখন সে আমার সর্বাঙ্গে তেল মর্দন করে গোসল করাল। আর আমিও তার যৌবন ভরা দেহে নিজ হাতে তেল মর্দন করে গোসল করিয়ে দিলাম। তার চোখের তারার দুষ্টুমিভরা হাসি আমার কলিজাটাকে উথাল পাথাল করে দিতে লাগল। সে গোসল সেরে খাটে উঠে এল। অতর্কিতে নাবালিকাসুলভ এক কাজ করে বসল। এক ধাক্কা দিয়ে আমাকে আবার জলে ফেলে দিল। নিজেও ঝপ্ করে জলে পড়ল। ডুব-সাঁতার দিয়ে আমার একটা পা চেপে ধরল। দীর্ঘ সময় ধরে চল্‌ল আমাদের জলকেলী। আমার বুকের উপর চেপে এল। কাঁধে হাত
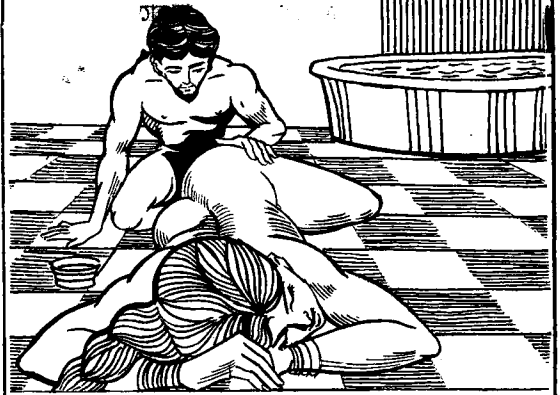
দুটো তুলে দিয়ে আমার বুকের সঙ্গে নিজেকে লেপ্টে নিল। থাকল অনেকক্ষণ। আমার মধ্যে তখন শিহরণের পর শিহরণ ঘটে চলেছে। অদ্ভুত, অনাস্বাদিত শিহরণ। মনে হল এ সুখ ছেড়ে বেহেস্তে যেতেও আমি রাজি নই।

এক সময় আমরা ক্লান্ত দেহে সায়র থেকে উঠে এলাম। ষোড়ষোপচারে মধ্যাহ্ন ভোজন সারলাম উভয়ে। জলকেলীর ধস্তাধস্তিতে শরীরে অবসাদ অনুভব করছিলাম। দিবানিদ্রার মাধ্যমে ক্লান্তি অপনোদন করে নিলাম। সন্ধ্যার কিছু পরে রূপসীর নরম হাতের স্পর্শে আমার নিদ্রা টুটে গেল। আমি চোখ মেলে তাকালাম। সে তার তুলতুলে নরম শরীরটাকে আমার ওপর ছেড়ে দিল। আমার শরীরটাকে নিয়ে শিশুর মত খেলায় মেতে উঠল। আমি হাত বাড়িয়ে ওকে আরও নিবিড় করে নিলাম প্রশস্ত বুকটার মধ্যে। সে চনমনিয়ে উঠল। আমার ঠোঁটের কাছে নিজের ঠোঁট দুটো নিয়ে এল। উষ্ণ অনুভূতি। শিহরণ। রোমাঞ্চ। আমার বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। সে দলিত, মথিত, পিষ্ট হওয়ার জন্য উন্মুখ। আমার যৌবনকে পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। রক্তে মাতন জেগেছে। তার পক্ষে নিজেকে সংযত রাখা তো সম্ভবও নয়। আমিও ক্ষুধাতুর নেকড়ের মত চেপে ধরলাম তার যৌবনের জোয়ার লাগা আঠার বছরের তুলতুলে শরীরটাকে। তার ঐকান্তিক আগ্রহ আর আমার নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার আগ্রহ একাকার হয়ে গেল।

গোপন করব না, তার দেহসুধা পান করে আমি যে তৃপ্তি সেদিন পেয়েছিলাম আজও তা আমার মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে।

রূপসী যুবতী চাওয়া ও পাওয়ার মধ্য দিয়ে তার ক্লান্ত-অবসন্ন দেহটাকে আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে লাগল। এক সময় একটু দম নিয়ে বল্‌ল—'আমার মন চাইছে আমার কলজেটা ছিঁড়ে এনে তোমাকে দিয়ে দেই।'

আমি বল্লাম—'তোমাকে শয়তান দৈত্যটার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি কিছুতেই এখান থেকে যেতে পারব না।'

সে আমার লোমশ বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বল্ল—'কেন মিছে ভেবে অস্থির হচ্ছ নাগর আমার! দৈত্য তো দশদিন বাদে বাদে এখানে আসে।'

—'তা হোক গে। আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমার দেহটাকে উপভোগ করুক তা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না।' কথা বলতে বলতে আমি উন্মাদের মত ছুটে গেলাম পাশের ঘরের দেয়ালের লেখাটার কাছে। একটা কুড়াল দিয়ে সজোরে আঘাত করতে লাগলাম তার গায়ে।

বেগম শাহরাজাদ দেখলেন প্রাসাদের বাইরের প্রকৃতির গায়ে প্রভাতের আলোর ছোপ দেখা দিয়েছে। কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ত্রয়োদশ রজনী

বাদশাহ শারিয়ার বেগমের কাছে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ বল্লেন—'জাঁহাপনা, দ্বিতীয় কালান্দার তার জীবনের ঘটনা বলতে লাগল।'

তারপর আমার জীবনে কি ঘটল শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে শুনুন। আমি দেয়ালের লেখাটার গায়ে কুড়াল দিয়ে আঘাত করা মাত্রই যুবতী আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বল্ল—'আল্লাতাল্লার দোহাই, তুমি এখান থেকে চলে যাও। যত শীঘ্র পার পালাও। দৈত্য এসে পড়ল বলে। তোমাকে মেরে ফেলবে। আমাকেও ছেড়ে কথা কইবে না। জানে বাঁচতে চাও তো পালাও।

আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে-সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলাম তার দিকে দৌড়োলাম। উদ্‌ভ্রান্তের মত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। প্রেম আর সম্ভোগের সাধ মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। ভয়ে কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। বিপদের ওপর বিপদ। এতদূর এসে হঠাৎ মনে পড়ল, কুড়াল আর জুতো জোড়া তো সে-রূপসীর ঘরে ফেলে এসেছি। লম্বা লম্বা পায়ে ফিরে গেলাম। নসীবের ফের আর কাকে বলে! ফিরে এসেই দৈত্যের ফাঁদে পড়ে গেলাম। দৈত্য বীর বিক্রমে, ফিরে আসতে লাগল। বাতাসকে অস্থির-চঞ্চল করে তুলল তার হাত-পায়ের আস্ফালনে আর সুতীব্র হুঙ্কারে। পাহাড়ের মত সুবিশাল দেহধারী দৈত্যটা ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে হাজির হ'ল। তার চেহারাটা এক লহমায় দেখামাত্র আমার বুকের ভেতরে কোন্ অদৃশ্য হাত যেন হরদম হাতুড়ি পিটতে লাগল। সত্যি যেমন বীভৎস তেমনি কদাকার তাকে দেখতে।

রূপসী-যুবতীটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে গর্জে উঠল—'এটাকে কি বলে? আমি আরও ভাবলাম কোন অঘটন ঘটেছে, নির্ঘাৎ কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তুমি।'

রূপসী যুবতী ভয়ে-ডরে পৌনে মরা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্ল—'কিছুই তো হয় নি। নেশায় টলতে টলতে গিয়ে ওই লেখার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।'

দৈত্যটা এত সহজে ভুলবার নয়। তা ছাড়া ঠিক তখনই আমার জুতো জোড়া আর কুড়ালটা তোর চোখে পড়ে গেল। চরম আক্রেশে গর্জে উঠল—'শয়তানী কোথাকার! আমাকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা! এগুলো কার?'

—'বিশ্বাস কর। এর আগে আমি এগুলো দেখি নি। তুমি না দেখালে হয়ত আমার চোখেই পড়ত না। আমি তো ভাবছি, তুমিই হয় তো কোন সময় সঙ্গে করে এনেছিলে, খেয়াল নেই।'

—'চুপ কর শয়তানী! এখনও সময় আছে, বল কার এগুলো?' কথা বলতে বলতে রূপসী যুবতীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড আক্রোশে তার গায়ের জামা কাপড় টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে তাকে একেবারে উলঙ্গ করে ফেল্ল। এক ঝটকায় উপুড় করে শুইয়ে দিল। হাত-পা সব মাটির সঙ্গে গেঁথে দিল। তারপর নৃশংস অত্যাচারে মেতে উঠল ক্রোধোন্মত্ত দৈত্যটা। সে কী বীভৎস দৃশ্য!

আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টেনে টেনে সিঁড়ির কাছে এলাম। নিজের আচরণে অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতে লাগলাম। নিজের সামান্য দেহক্ষুধা নিবৃত্ত করতে গিয়ে তাকে বিপদের মুখে ছুঁড়ে দিলাম। এ গুণাহ আল্লাতাল্লা ক্ষমা করবেন কি না জানি না।

বিষণ্ণ মুখে দর্জির কাছে ফিরে এলাম। আমাকে দেখে যেন সে আনন্দে নাচতে লাগল। বল্ল—'সবাই কাঠ নিয়ে ফিরে এল আর তোমার দেখা নেই। আমি সারারাত্রি নির্ঘুম অবস্থায় বসে কাটিয়েছি। ধরেই নিয়েছিলাম, জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে তুমি নির্ঘাৎ খুন হয়েছ। জানোয়ার তোমাকে ছিঁড়ে-খাবলে খেয়েছে। তোমাকে দেখে

[illegible]।'

[illegible] এবের রূপসী যুবতী আর ভয়ঙ্কর সে দৈত্যটার কথা তাকে [illegible] বললাম।

হঠাৎ কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল। দর্জি ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছে ফিরে এসে বল্ল—'এক পার্শী এসেছে তোমার জুতো জোড়া আর কুড়ালটা নিয়ে, তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

বস্, আমার মাথাটা দপ দপ করে উঠল। গায়ে কাঁপুনি আর বুকের মধ্যে হাতুড়ির ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। কিছুতেই দরজায় অপেক্ষমান লোকটার কাছে যেতে উৎসাহী হলাম না।

দর্জি আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যাতে আমি তার সঙ্গে গিয়ে একটিবার অন্ততঃ দেখা করি। সে এবার বল্ল—'পার্শি ভদ্রলোকটা নাকি বনের ধারে কাঠুরেদের আস্তানায় গিয়েছিলেন তোমার খোঁজে। তারা তোমার জুতোজোড়া দেখেই চিনতে পারে। তারপর ঠিকানা দিয়ে আমার এখানে পাঠিয়ে দেয়।'

আমি আল্লাতাল্লার নাম করতে করতে প্রাণ হাতে নিয়ে পার্শি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি দরজাটা সামান্য ফাঁক করে আগন্তুক পার্শিটাকে ভাল করে দেখার জন্য দরজাটা একটু ফাঁক করতেই সে চোখের পলকে আমার একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেল্ল। বুঝলাম দৈত্যের হাত। মানুষের হাত কখনও এমনটি হয় না। এক হেঁচকা টানে আমাকে বাইরে বের করে নিল। এবার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ধপাস করে পাতাল পুরীতে ফেলে দিল। আমার সামনে পড়ে সে রূপসী-যুবতী। রক্তাপ্লুত তার দেহটা। ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দৈত্যটা গর্জন জুড়ে দিল—'তোর পিরিতের নাগরকে নিয়ে এসেছি। দেখ তো চিনতে পারিস কিনা?'

—'আমি কাউকেই চিনি না। আমার কোন নাগরটাগর নেই।' তারপর আমাকে এক লহমায় দেখে নিয়ে বল্ল—'কই, একে তো আমি দেখিও নি কোনদিন।'

—'চিনিস না? দেখিস নি কোনদিন? মিথ্যা কথা বলার আর জায়গা পাস নি! তুই একে নিয়ে মজা লুটিস নি, বল শয়তানি? এই নে তরবারি। যদি তোর নাগর না-ই হয়ে থাকে তবে আমার সামনে একে কেটে দু' টুকরো করে ফেল।'

মেয়েটা তরবারিটা নিয়ে আমার দিকে এক পা এগিয়ে এল। আমি চোখের মণিতে সকরুণ মিনতি জানালাম। তা দেখে সে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।—'তোমার জন্যই আজ আমার কলিজাটা টুকরো টুকরো হচ্ছে!' কথাটা বলতে বলতে হতের তরবারিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বুদ্ধির ঢেকি দৈত্যটা তার কথার মারপ্যাচ বুঝল না। সে এবার তরবারিটা কুড়িয়ে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্ল—'তোমার পিয়ারি দোস্তের গর্দানটা নামিয়ে নিতে পারলে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। যাও, ওর গর্দানটা ধড় থেকে নামিয়ে দাও।'

আমি ভাবলাম, নিজের জানের বিনিময়ে তার গর্দানটা নামিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা মোটেই সঙ্গত নয়। এত অত্যাচার সহ্য করেছে তো কেবল মহব্বতের খাতিরেই। কিন্তু করি-ই বা কি? চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। পারলাম না। তরবারিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। এবার দৈত্যের দিকে ফিরে বল্লাম—'তুমি দৈত্য কুলের সম্রাট। তোমার কটাক্ষে দুনিয়া থরথরিয়ে কাঁপে। তুমি তো নিজের

চোখেই দেখলে, আমি তার তিলমাত্রও ক্ষতি কোনদিন করিনি বলেই তো সে আমার জান নিতে পারল না। আমিই বা বিনা অপরাধে তার গর্দান নিতে কি করে উৎসাহী হই, তুমিই বল?'

দৈত্যটা এবার বিশ্রী স্বরে গর্জে উঠে বল্ল—'বুঝেছি, তোমাদের মহব্বত খুবই গাঢ় গয়ে উঠেছে। কেউ-ই কাউকে ছাড়তে পারছ না।'

নিষ্ঠুর দৈত্যটা বিকট চিৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে তুলে আমার মেহবুবার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীব্র আক্রোশে তার হাত-পাগুলো কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল্ল। হাতের তরবারিটা আর একবার তার মাথার ওপর উঠে গেল। আমার মেহবুবা আর্তনাদ করে উঠল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। যখন চোখ মেলে তাকালাম, দেখি তার দ্বিখণ্ডিত দেহটা জমাট বাঁধা খুনের মধ্যে গড়গড়ি খাচ্ছে।

হিংস্র দৈত্যটা হাতের খুন জড়ানো তরবারিটা প্রচণ্ড বিদ্বেষে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এবার আমার দিকে তাকিয়ে, হাড়িতে মুখ ঢুকিয়ে কথা বলছে এরকম গলায় বল্ল—'শোন মানুষের বাচ্চা, আমাদের

দৈত্য-সমাজের নিয়ম ব্যাভিচারিণীর একমাত্র শাস্তি জান নেওয়া। মৃত্যু। হতচ্ছাড়ি লোচ্চার মাগীটাকে বিয়ের রাতে চুরি করে এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। বিশ সাল সে আমাকে সঙ্গ দিল। আমি দিলাম দেহের সুখ। কিন্তু সে সুখ তার দিলটাকে ভরিয়ে দিতে পারল না। আমি বিশ বিশটা সাল ধরে যা পারি নি, একদিনেই তুমি তা পেরে গেলে। তার দিলটাকে ধরতে পারলে। আমি অবাক মানছি বটে। কিন্তু নিজের চোখে তো কিছু দেখি নি। তোমাদের লোচ্চামি তো আর চোখের সামনে দেখতে পাই নি। কিন্তু আমার মন কইছে কি, আমার ধারণাই ঠিক বটে। কিন্তু শুধুমাত্র ধারণার বশে তোমার জান আমি নিতে চাই না। তবে তোমাকে একেবারে রেহাইও দেব না। আমার যাদুবলে তোমাকে একটা জানোয়ার বানিয়ে দেব। তুমি নিজেই বল, কোন্ জানোয়ার তুমি হতে চাও?'

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। ভাবলাম, তবু জানটা তো বাঁচবে। বাঘ, সিংহ, গাধা, খচ্চর—কোনটা হলে যে আমার সুবিধা হবে বুঝতে পারলাম না।

আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে শয়তান দৈত্যটা শোঁ শোঁ শব্দে বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে গেল। পাহাড় থেকে এক মুঠো ধূলো নিয়ে ফিরে এল। বিড়বিড় করে কি যেন সব বলে সেগুলো দিল আমার ওপর ছড়িয়ে। ব্যস, মুহূর্তে আমার বুকের তীব্র আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। আমি মনুষ্যদেহ ছেড়ে বানরে পরিণত হয়ে গেলাম। ছোটখাটো দেহ, চারটে পা আর বড় বড় লোমে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেল। নচ্ছার দৈত্যটা বিশ্রি সুরে হেসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হায় আমার নসীব! অগাধ বিদ্যা, বুদ্ধি আর জ্ঞান নিয়ে আমি বানর জীবন যাপন করতে লাগলাম। একেই বলে নসীবের ফের। মনের দুঃখে সমুদ্রের তীরে গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

একদিন গাছের ডালে বসে লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে গা চুলকাচ্ছি। এমন সময় একটা জাহাজকে তীরের কাছ দিয়ে যেতে দেখে তার মাস্তুলে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এক সময় নেমে গেলাম ডেকের ওপর। আমাকে দেখেই জাহাজের নাবিক আর লস্কর সবাই লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। একজন তরবারি উঁচিয়ে ধরল। আমি কৌশলে তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিলাম। লোকগুলো হঠাৎ ঘাবড়ে গেল। আমি গালে হাত দিয়ে কাঁদতে লেগে গেলাম। তারা বুঝল, আমি আশ্রয়প্রার্থী।

জাহাজের ক্যাপ্টেন আমার মনের কথা বুঝলেন। আমি যে তাদের কোন ক্ষতি করতে চাইছি না, আশ্রয় ভিক্ষা করছি বুঝতে পারলেন। দোয়া করলেন। আমাকে ডেকে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন। আমাকে তিনি যা যা বললেন, বুঝতে পারলাম সবই। কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে পারলাম না। কিচির মিচির শব্দ করে, ঘাড় কাৎ করে, ইঙ্গিতে সাধ্যমত তাঁর কথার জবাব দিলাম।

ক্যাপ্টেনের অনুগ্রহে আমি তাঁর ব্যক্তিগত নোকরের পদে নিযুক্ত হলাম। আমার কাজকর্মে কোন খুঁত রাখতাম না। ক্যাপ্টেন তো মহাখুশি।

পঞ্চাশ দিন এক নাগাড়ে জাহাজ চালিয়ে এক বন্দরে জাহাজ নোঙর করলেন।

দেশের সুলতানের আমিররা এসে ক্যাপ্টেনকে কুর্নিশ করল। খাতির করল খুবই। তারা জানাল, দেশের উজির কিছুদিন হ'ল বেহেস্তে যাত্রা করেছেন। দু'-চারদিন রোগভোগেই মারা গেছেন। নানা বিদ্যায় বিশারদ একজন উজিরের খোঁজ করেছেন সুলতান। তেমন কাউকেই পাচ্ছেন না। জাহাজে কোন সর্বগুণান্বিত ব্যক্তি থাকলে তিনি সুলতানের কাছে হাজির হতে পারেন।

কথা বলতে বলতে আমির - ওমরাহরা একটা জড়ানো কাগজ খুলে সুলতানের ইচ্ছার কথা ক্যাপ্টেনকে দেখালেন। ব্যস, জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে প্রত্যেক কর্মী আমার নাম লিখে তাতে সানন্দে স্বাক্ষর দান করলেন।

সুলতানের আমির ওমরাহরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আমি যাতে তাদের দ্বিধা দূর করতে পারি তার জন্য তাড়াতাড়ি দোয়াত কলম এনে আমার সামনে রাখলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন।

আমি সুন্দর হস্তাক্ষরে কিছু শায়ের লিখে ফেল্‌লাম। আমার পাণ্ডিত্যে তারা মুগ্ধ হ'ল। বিস্ময়বোধ করল যার পর নাই। আমাকে নিয়ে হাজির করল সুলতানের সামনে। সুলতান আমার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। চকমকা পোশাক পরতে দিলেন। আমাকে উজির পদে বহাল করলেন। আর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে প্রচুর মোহর ইনাম স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। আমি ভূমিতে দু'হাত ছুঁইয়ে সুলতানকে সালাম জানালাম।

আমার জন্য সুন্দর একটা কুরশি বন্দোবস্ত করা হ'ল। দেওয়া হ'ল কাগজ-কলম। আমি শায়ের লিখে লিখে সুলতানের হাতে তুলে দিতে লাগলাম। সুলতান তো পড়ে মহাখুশি। স্তম্ভিতও কম হন নি।

আমার অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানগম্যির কথা সুলতান তাঁর আদরের লেড়কীকে না জানানো পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাকে ডাকালেন। সে ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে ফেল্‌ল। রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বল্‌ল — 'আব্বাজান, এক বিদেশীর সামনে আমাকে আচমকা হাজির করিয়ে তুমি ঠিক কাজ কর নি। তুমি যাকে বানর দেখছ, তিনি প্রকৃতপক্ষে বানর নন। এক বাদশাহের লেড়কা। ফার দেশের বাদশাহ। তার আব্বাজানের নাম বাদশাহ ইফতি মারাস। আফ্রিদি দৈত্য জারসিজ যাদুবলে একে বানরে পরিণত করেছে। এর জ্ঞান বুদ্ধির তুলনা একমাত্র সাগরের

সঙ্গেই চলতে পারে। নসীবের ফেরে আজ এ হেয় জীবন যাপন করছে, লোকের করুণার পাত্র হয়ে দিন গুজরান করছে।'

সুলতান সব শুনে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি ঘাড় কাৎ করে জানালাম, যা শুনেছেন সবই সত্যি। আমার বিড়ম্বিত জীবনের কিস্‌সা শুনে সুলতান তো একেবারে থ বনে গেলেন। তিনি এবার লেড়কিকে জিজ্ঞেস করলেন — ' বেটি এত সব কথা তুমি কি করে জানলে, বল তো?'

—'যাদুবলে। আমার শৈশবে আমাকে দেখভাল করার জন্য যে বুড়ি পরিচারিকাকে রেখে দিয়েছিলে তিনি যাদুবিদ্যা খুবই ভাল জানতেন। আমাকে তাঁর বিদ্যার কিছু কিছু দান করেছিলেন। তারপর থেকে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছি সবার অলক্ষ্যে। আব্বাজান, তুমি মন করলে, আমি এক লহমায় তোমার এ সুবিশাল মহলটাকে অদৃশ্য করে দিতে পারি। আবার তোমার নগরটাকে বানিয়ে দিতে পারি বিশাল এক মরুভূমি। এক গণ্ডুষ পানি কেবল দরকার। ব্যস, যা খুশি আমি করে ফেলতে পারি।'

—'ভারি তাজ্জব ব্যাপার দেখছি! তোমার যাদুবিদ্যার কথা বিন্দু-বিসর্গও তো আমি জানতাম না! তবে এক কাজ কর, যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে তুমি এর আসল দেহ ফিরিয়ে দাও। আদমির দেহ দান কর। তার মত জ্ঞানী-গুণী তামাম দুনিয়ায় খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না। আমি দরবারে তাকে পাকাপাকিভাবে উজির করে রাখতে চাচ্ছি।'

সুলতানের লেড়কি রাজি হ'ল। আমার বুকটা খুশি-আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল।

এমন সময় প্রাসাদের বাইরে, বাগিচায় পাখিদের ছুটোছুটি আর কিচির - মিচির শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চতুর্দশ রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগমের কাছে ফিরে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন —' শুনুন জাঁহাপনা, বড় মেয়েটার কাছে দ্বিতীয় কালান্দার নিজের জীবন কথার অবশিষ্ট অংশ বলতে গিয়ে বল্‌লেন—'শাহজাদী একটা ছুরি এনে তার ফলা দিয়ে মেঝেতে হিব্রুভাষায় কি যেন লিখল। এবার ছুরির ফলাটা দিয়েই তার চারদিক একটা বৃত্ত অঙ্কন করল। তারপর অবোধ্য ভাষায় অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব বলতে লাগল। ব্যস, দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ভয়ানক দুর্যোগ। সারা বাড়িটা দুলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার কেটে গিয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে এল। সবার চোখের সামনে দেখা দিল ভয়াল আফ্রিদি দৈত্য। নাম তার জারসিজ। শাহজাদী নির্বিকার, আর আমরা সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম।

আফ্রিদি জারসিজ কর্কশ স্বরে গর্জে উঠল —'তোমার কাণ্ড আমাকে অবাক করেছে। যে - বিদ্যা আয়ত্ব করেছিলে তাকে তুমি ধরে রাখতে সক্ষম হলে না। আমাদের মধ্যে শর্ত হয়েছিল, কারো কাজে আমরা প্রতিবন্ধকতা করব না, ক্ষমতাও জাহির করব না কারো বিরুদ্ধে। তুমি সে কথা রাখলে না। এর জন্য উচিত শিক্ষা তোমাকে পেতেই হবে।'

কথা বলতে বলতে আফ্রিদি দৈত্য জারসিজ এক অতিকায় হিংস্র সিংহের রূপ পরিগ্রহ করল, শুরু করে দিল তীব্র গর্জন। সে কী

গর্জন! আমার বুকের ভেতরে কলিজাটা তো দাপাদাপি শুরু করে দিল।

শাহজাদীর জন্য আমি কম ভাবিত হয় নি। ভাবলাম হিংস্র জানোয়ারটা বুঝি এক্ষুণি তাঁর হাড়-মাস চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু সে - ও কমতি কিসে? মুহূর্তে নিজের মাথার একটা চুল ছিঁড়ে নিয়ে বারকয়েক অনুচ্চকণ্ঠে কি যেন বল্‌ল। হাতের চুলটা সুতীক্ষ্ণ একটা তরবারিতে পরিণত হয়ে গেল। এক কোপে সিংহের মুণ্ডুটাকে ধড় থেকে নামিয়ে দিল। এবার ঘটল আরও অত্যাশ্চর্য এক ঘটনা। সিংহের কাটা মুণ্ডুটা বিশাল একটা কাঁকড়া বিছের রূপ ধারণ করল। শাহজাদীও যাদুর খেল দেখাতে লাগল। ইয়া বড় একটা বিষধর কালনাগিনীর রূপ পরিগ্রহ করে ফেল্‌ল। শুরু হ'ল কাঁকড়া

বিছে আর কালনাগিনীর তুমুল লড়াই। বেগতিক দেখে কাঁকড়া বিছেটো শকুনিতে পরিণত হ'ল। আর কালনাগিনীটা ঈগলের রূপ পরিগ্রহ করল। আবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হ'ল। এতেও আফ্রিদি সুবিধা করতে পারল না। শকুনি বনবিড়ালে পরিণত হ'ল আর ঈগলটা নেকড়ে বাঘের রূপ ধারণ করল। এবার লড়াই করতে গিয়ে বনবিড়ালটা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে বিড়ালটা ইয়া পেল্লাই একটা ডালিমের রূপ ধরে প্রাচীরের ওপর চলে গেল। নেকড়েটা লাফিয়ে প্রাচীরের ওপরে উঠতেই ডালিমটা শূন্যে উঠে যেতে চেষ্টা করল। পারল না, প্রাসাদের কার্নিশের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। আর নেকড়ে বাঘটা? মুহূর্তে মুরগীর রূপ ধারণ করে ডালিমের দানাগুলো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খেতে লাগল। একটামাত্র দানা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলিই উদরস্থ করল। কিন্তু শেষ দানাটা মেঝের একটা ফাঁটলে সিঁধিয়ে গেল। ঠোঁট দিয়ে বের করার চেষ্টা করল। পারল না। আমাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলতে চাইল। তার মনের কথা আমরা কেউই অনুধাবন করতে পারলাম না। পরে অবশ্য অনুমান করেছিলাম, শেষ দানাটা খাওয়ার জন্য পাথরটাকে আমাদের ভেঙে দিতে বলছিল। আর তারই ফলে আফ্রিদি দৈত্য জারসিজকে পুরোপুরি হজম করে ফেলতে পারত। কিন্তু নসীবের ফের কে রুখবে।

দীর্ঘ নিরলস চেষ্টার পর পাথরের ফাঁটল থেকে যাও ডালিমের দানাটাকে বের করে আনল তাও সেটা মুরগীটার ঠোঁট থেকে চৌবাচ্চার জলে ছিটকে পড়ল। ব্যস, সেটা সঙ্গে সঙ্গে একটা মাছে পরিণত হয়ে গেল। তবুও ছাড়া নেই। মুরগীটা এবার পানকৌড়ীতে পরিণত হয়ে মাছটাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। আবার চল্‌ল তুমুল লড়াই। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে পানকৌড়ীটার আর দেখা মিলল না। জল থেকে উঠে এল সেই অতিকায় আফ্রিদি দৈত্য জারসিজ। কিন্তু তার সেই বীভৎস রূপ আর নেই। জলন্ত অঙ্গার। ধিক্‌ধিক্ করে অঙ্গার জ্বলছে। আর নাক, মুখ আর চোখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে।

আমরা সবাই নীরবে চোখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলাম। সবার মনেই একই জিজ্ঞাসা, শাহজাদীর কি হ'ল? আরও কয়েক মুহূর্ত পরে সে ধীরে ধীরে জল থেকে উঠে এল। সেই রূপ। রূপসী কুমারী যুবতীর সে রূপ নিয়ে সে জল থেকে উঠে এল। আগুনে দগ্ধ।

তারা উভয়েই আমাদের দিকে এগোতে লাগল। ভয়ে আমাদের কলিজা চিপসে গেল। কোথায় পালাব? পথ যে বন্ধ। কয়েক পা এগিয়েই আফ্রিদি দৈত্য জারসিজ ধড়াস্ করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার শুরু হ'ল তুমুল লড়াই। অতর্কিতে এক টুকরো অঙ্গার ছুটে এসে আমার বাঁ চোখটাকে কানা করে দিল। আর একটা টুকরো এসে লাগল সুলতানের মুখে। কিছুটা অংশ পুড়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আর একটা অঙ্গারের টুকরো এসে সুলতানের হারেমের খোজার বুকে আঘাত করল। সে মারা গেল।

এক সময় বেকায়দায় পড়ে আফ্রিদি দৈত্য জারসিজ বুকফাটা আর্তনাদ করে আল্লাতাল্লার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগল। তারপরই তার অতিকায় দেহটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অঙ্গারের তেজ ক্রমে স্তিমিত হতে লাগল। তারপরই তার দেহটা ভস্মে পরিণত হয়ে গেল।

শাহজাদী এবার গণ্ডুষ ভরে পানি নিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র
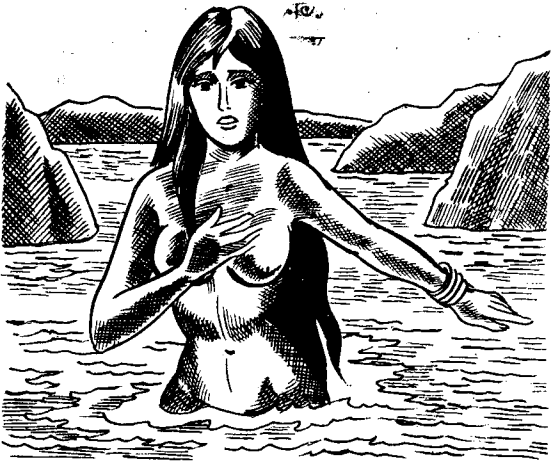
আওড়ে আমার গায়ে ছিঁটিয়ে দিয়ে বল্‌ল — 'তুমি তোমার আগের রূপ ধারণ কর।' ব্যস, আমি বানর রূপ থেকে মনুষ্যরূপ ফিরে পেলাম। কিন্তু আমার বরবাদ হয়ে যাওয়া চোখটা ফিরে পেলাম না। আবার সুলতানের মুখেও রয়ে গেল পোড়া দাগ।

শাহজাদী এবার সুলতানের দিকে সামান্য এগিয়ে এসে বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌ল — 'আব্বাজী, এবার আমারও বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি যদি ডালিমের শেষ দানাটা উদরস্থ করতে পারতাম তবে আর কোন চিন্তাই থাকত না। আফ্রিদি দৈত্য জারসিজ - এর মৃত্যু ঘটত। হয়ত খোদাতাল্লার এটাই মর্জি ছিল। আমার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আফ্রিদি সুবিধা করতে না পেরে শেষ অস্ত্রটাকে আঁকড়ে ধরল। অগ্নিকুণ্ডের দরজা খুলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি চাইনি সে আত্মঘাতী হোক। তবে তো তার আংশিক হলেও জয় হবে। তাই আমিও তার পিছন পিছন অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলাম। আল্লার মর্জিই বটে। নইলে সে আত্মহত্যা করলে তো

আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। আগুনে ঝাঁপ দিতে যাব কেন? কথা বলতে বলতে শাহজাদী মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে গেল তার রূপ লাবণ্য আর আঠারো বছরের যৌবনভরা শরীরটা।

লেড়কীর আকস্মিক মৃত্যুতে সুলতান কেঁদে আকুল হলেন। দু' চোখের কোল বেয়ে হরদম পানি গড়াতে লাগল। নিজের কাজের জন্য বহুভাবে অনুশোচনা প্রকাশ করতে লাগলেন। কেন সে বানরকে মানুষের রূপ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আকুল হয়েছিলেন সে - কথাই বুক চাপড়ে বার বার বলতে লাগলেন।

সুলতানের দরবারে, প্রাসাদে আর প্রজাদের ঘরে ঘরে নেমে এল শোকের ছায়া। কারো মনে সুখ নেই, নেই এতটুকু শান্তি।

সুলতানের এবার আমার ওপর নজর পড়ল। তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌লেন — 'বাছা, তুমি আসাতেই আমার বুকের একটা পাঁজর খুলে গেল। যদিও আমার নসীবেরই ফের এটা, তবু তোমাকে বলছি, এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও তুমি বরং চলে যাও। আমার লেড়কী তো তার নিজের জান দিয়ে তোমাকে আফ্রিদি দৈত্য জারসিজ-এর হাত থেকে রেহাই দিয়ে, ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার মনুষ্যরূপ। ব্যস, আর নয় তুমি আমার রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও।' দ্বিতীয় কালান্দার এবার বড় মেয়েটার দিকে ফিরে, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল — ' বিশ্বাস করুন, আমার তখন নিজের ওপর খুব রাগ হ'ল। আমার জন্য এমন তরতাজা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একটা লেড়কী অকালে জান দিল! খোদাতাল্লার দরবারে এখন কি গুণাহ না আমি করেছি! অনুশোচনার জ্বালায় দগ্ধ হতে হতে আমি সুলতানের প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। এবার শুরু হ'ল উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলা। এভাবে এক সময় হাজির হলাম এ - বাগদাদ নগরে।

বাগদাদে নাকি কারো কোনরকম দুঃখ নেই। দেশের ছোট - বড় প্রতিটা মানুষের জন্য এখানে যাবতীয় সুখের অঢেল ব্যবস্থা রয়েছে। এক সময় ফকিরের বেশে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বাগদাদের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এখানে এলাম। দাড়ি - গোঁফ কামিয়ে ইতিমধ্যেই আমি বিলকুল কালান্দর ফকির বনে গিয়েছি। এখান থেকে অদূরবর্তী মোড়ের কাছে এসে আমারই মত আর এক কালান্দার ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল। তার দাড়ি - গোঁফ কামানো, বাঁ চোখ কানা। এবার তৃতীয় কালান্দার ফকিরকে দেখিয়ে বল্‌ল — একটু বাদে ইনি এসে আমাদের সঙ্গে মিললেন। তৃতীয় কালান্দার। তারও দাড়ি - গোঁফ কামানো, আর বাঁ চোখ কানা।

আমরা তিন কালান্দার মিলে পথ চলতে লাগলাম। এখানে এসে রাত্রের জন্য আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগলাম। সামনে এ - বাড়িটা দেখতে পেয়ে কড়া নাড়লাম।

দ্বিতীয় কালান্দার ফকির বল্‌ল — 'আমার জীবনের সুখ - দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা তো শুনলেনই। আপনারা এবার যদি চান তৃতীয় কালান্দার ফকিরের জীবনের ঘটনাবলী শুনতে পারেন।'

তৃতীয় কালান্দার ফকিরের কিস্‌সা

দ্বিতীয় কালান্দার ফকির তার জীবনের ঘটনাবলী পেশ করার মাধ্যমে তার বাঁ চোখ হারানো এবং দাড়ি-গোঁফ কামানোর কারণ বর্ণনা করল।

এবার বড় মেয়েটার নির্দেশে তৃতীয় কালান্দার ফকির তার জীবনের ঘটনাবলীর কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বল্‌ল — ' শুনুন, আমার বিড়ম্বিত জীবনের কিস্‌সা। প্রথম আর দ্বিতীয় কালান্দার ফকিরের কিস্‌সা যেমন রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরপুর আমার জীবনে তেমনি কোন চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে নি যা শুনিয়ে আপনাদের তৃপ্ত করতে পারব। কিন্তু আমি যা কিছু বলব তার এক শ' ভাগই সত্য, তিলমাত্র খাদও তার মধ্যে নেই।'

প্রথমে আমার বাঁ চোখ হারানোর কথা আপনাদের শোনাচ্ছি। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের দোষেই তা হারিয়েছিলাম। আমার আব্বাজী ছিলেন এক দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাদশাহ। পরবর্তীকালে আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আব্বাজীর মসনদে বসেছিলাম। আমার কাছ থেকে সুবিচার পেয়ে প্রজারা সুখেই দিনাতিপাত করত।

বাল্য ও কৈশোরের সে দুরন্তপনার দিনগুলো থেকেই আমার সমুদ্র যাত্রার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। এর কারণ হয়ত এ- ই ছিল যে, আমাদের রাজ্যের রাজধানী - নগরটা ছিল সাগরের লাগোয়া। সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ নিকট ও দূরবর্তী দ্বীপগুলো আমাদের অধিকারভুক্ত ছিল। আমি মাঝে-মধ্যেই যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে মাসখানেক ধরে চক্কর মেরে বেড়াতাম সমুদ্রের বুকে, দ্বীপে দ্বীপে। আমি একবার জাহাজ নিয়ে আমার অধিকৃত দ্বীপগুলো পরিদর্শনে বেরিয়ে ভয়ঙ্কর সমুদ্র - ঝড়ের মুখোমুখি হলাম। সারাদিন, সারারাত্রি ধরে চলল ঝড়ের তাণ্ডব আর সমুদ্রের ফোঁসফোঁসানি।

সকাল হলে দেখি, আমার জাহাজগুলো ছোট্ট একটা দ্বীপের চড়ায় আটকা পড়ে গেছে। অসহায় বোধ করলাম।

আমি জাহাজগুলোকে নিয়ে মহাফাঁপরে পড়লাম। সাগর তখন একেবারে শান্ত-সৌম্য। কেউ ধারণাও করতে পারবে না যে গতরাত্রি পর্যন্ত সাগর প্রলয়ঙ্কর ছিল।

দুইদিন আটকা পড়ে থাকার পর নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই জাহাজে পাল তুলে দিয়ে আবার সাগরে ভাসলাম।

নিরবচ্ছিন্নভাবে কুড়িদিন পাল তোলা জাহাজে কাটালাম। কিন্তু হারাণো পথের হদিস তবু পেলাম না। সাগরে ভাসছি তো ভেসেই চলেছি। কোথায় চলেছি, কোন্‌দিকে যে চলেছি কিছুই জানা নেই।

ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। হতাশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল — 'হুজুর, সাগরের এদিকে আমি এর আগে আর কোনদিন আসি নি। এটা একেবারেই অজানা - অচেনা অঞ্চল।'

মনটা বিষিয়ে উঠল। উপায়ান্তর না দেখে সাগরের পানিতে একজন ডুবুরিকে নামিয়ে দিলাম। কিছু সময় বাদে সে ভুস্ করে ভেসে উঠল। সাঁতরে জাহাজের কাছে এল। দড়ির মই বেয়ে উঠে এল জাহাজে। সে বল্ল — 'জাঁহাপনা, সাগরের ওদিকে অতিকায় সব মাছ সাঁতরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। আর দেখলাম একটা পাহাড় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। তার কিছু অংশ কালো আর অবশিষ্টাংশ সাদা।'

ডুবুরির কথা শেষ হতে না হতেই ক্যাপ্টেন হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বল্ল—'আর নিস্তার নেই জাঁহাপনা ডুবুরি যে-পাহাড়টার খোঁজ নিয়ে এসেছে সেটা সাধারণ পাহাড় নয়। তার গায়ে গেঁথে দেওয়া আছে সহস্রাধিক চুম্বকের বর্শা। আমাদের জাহাজ তার দিকে এগোতে থাকলে তীব্র আকর্ষণে কাছে টেনে নেবে। ব্যস, শেষ পর্যন্ত জাহাজ হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়বে তার গায়ে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমাদের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। এখন আল্লাতাল্লার নাম করা ছাড়া উপায় নেই। সকাল হলেই আমরা চুম্বক-পাহাড়ের দৌলতে জান খোয়াব। আজ পর্যন্ত যত নাবিক এপথে এসেছে কেউই জান নিয়ে ফিরতে পারে নি। আমাদেরও ফিরে যাওয়ার ভরসা নেই।

চোখের পানি মুছতে মুছতে ক্যাপ্টেন এবার বল্ল—'জাঁহাপনা। পাহাড়ের মাথায় একটা গম্বুজ রয়েছে। তার মাথায় এক ব্রোঞ্জের তৈরি ঘোড়সওয়ার। তার মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম। ডান হাতে তরবারি আর বাঁ হাতে ঢাল। যতদিন ওই ব্রোঞ্জের মূর্তিটা পাহাড়ের চূড়ায় থাকবে ততদিন আর কারো রেহাই নেই। তবে কোনক্রমে তাকে ওখান থেকে ফেলে দিতে পারলে আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকবে না।

আমি দু'বাহু ওপরে তুলে বল্লাম—'হায় খোদা, এমনকি গোস্তাকি করেছি তোমার কাছে যার জন্য এমন ফাঁদে ফেলে দিলে? অথৈ সাগরে জান দিতে হবে!' নিরবচ্ছিন্ন হতাশা আর হাহাকারের মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটালাম। ভোরের আলো ফুটে উঠল সাগরের বুকে।

ক্যাপ্টেন আমার কাছে ছুটে এসে বল্ল—'জাঁহাপনা, আমরা চুম্বক-পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জাহাজগুলো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। এখন খোদাতাল্লার নাম করুন। পরপারে যাবার জন্য মনকে শক্ত করে বাঁধুন।'

ক্যাপ্টেনের কথাই বাস্তবে পরিণত হ'ল। বিকট শব্দ করে জাহাজ গিয়ে আছড়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে। মুহূর্তে ভেঙেচুরে একসার হয়ে গেল। উত্তাল-উদ্দাম সাগরের বুকে পড়ে আমরা কে যে কোথায় ছিটকে পড়লাম তার হদিস মিল্ল না।

ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালি করে আমি হারা উদ্দেশ্যে এগিয়ে চল্লাম। এত কষ্ট করেও আমি কিন্তু হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিইনি। দাঁতে দাঁত চেপে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলাম। সে আর কতক্ষণ? আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্লাম। কতক্ষণ যে অচৈতন্য অবস্থায় কাটিয়েছিলাম তা আমার নিজেরই জানা ছিল না। সংজ্ঞা ফিরলে দেখলাম, এক বালির চড়ায় আমি চিৎ পটাং হয়ে পড়ে। আল্লাহ-র ওপর বিশ্বাস আরও অনেকাংশে বেড়ে গেল আমার।

সামনেই অভিশপ্ত পাহাড়টা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। বালির চড়া ছেড়ে পাহাড়ের কাছে গেলাম। সামনেই একটা পথ নজরে পড়ল। এঁকেবেঁকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে গেছে।

খোদার নাম নিয়ে আঁকাবাঁকা পথটা ধরে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। মনে আমার অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা।

বেগম শাহরাজাদ দেখলেন ভোরের আলো একটু একটু করে উঁকি দিতে শুরু করেছে। তিনি কিস্সা বন্ধ করলেন।

পঞ্চদশ রজনী

যথা সময়ে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্সা শুরু করলেন—তৃতীয় কালান্দার ফকির তার জীবনের ঘটনাবলী বলে চল্ল—'খোদার নাম নিয়ে আমি যখন পাহাড়ের খাড়া পথ বেয়ে ধীর-মন্থর গতিতে উঠছিলাম তখন হঠাৎ এক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকে হতে হ'ল।

...সের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেল। বাতাসের সঙ্গে লড়াই ...র খাড়া পথ বেয়ে ওপরে উঠতে খুবই তকলিফ হতে লাগল।

অমানুষিক তকলিফ সহ্য করে আমি এক সময় বহু আকাঙ্ক্ষিত চূড়ায় উঠতে সক্ষম হলাম। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আমি ডগমগ। গম্বুজটার নীচে শুয়ে পড়লাম। অনভ্যস্থ পা দুটো টনটন করছে। মনে অফুরন্ত উন্মাদনা বটে, কিন্তু শরীর ক্লান্ত-অবসন্ন। ফুরফুরে বাতাস পেয়ে ক্লান্ত চোখের পাতা দুটো বুজে এল। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলাম কে যেন বলছে—'শোন কসিব-এর লেড়কা, তুমি যেখানে শুয়ে আছ, সেখানে, তোমার ঠিক পায়ের কাছে সামান্য গর্ত খুড়লেই একটা তীর আর ধনুক মিলবে। এ দুটো দৈবশক্তি সম্পন্ন। ধনুকে তীর সংযোজন করে ঘোড়সওয়ারটার গায়ে আঘাত করলে তবেই ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ারের মূর্তিটা হুমড়ি খেয়ে সাগরের পানিতে পড়বে। তোমার কাজে দুনিয়ার মানুষ বড়ই উপকৃত হবে। যেখান থেকে ধনুকটা তুলেছিলে সেখানেই সেটাকে রেখে আগের মতই মাটিচাপা দিয়ে দেবে।'

ব্রোঞ্জের মূর্তিটা সাগরে পড়ামাত্র সাগরের উন্মাদনা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। পানি ফুলে ফেঁপে উঠতে উঠতে তোমার পায়ের তলায় পাহাড়ের চুঁড়ার সমান হয়ে যাবে। ঠিক তখনই তোমার চোখে পড়বে একজন একটা ছোট্ট নৌকো নিয়ে তোমার কাছে এসেছে। তোমার মনে হবে, ঘোড়সওয়ার। ঘোড়সওয়ার আর ডিঙির লোকটাকে একই ছাঁচে গড়া মনে হবে। আসলে কিন্তু তোমার চোখের ভুলের জন্যই উভয়কে অবিকল একই রকম মনে হবে। নৌকো আরও কিছুটা এগিয়ে এলে তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে পাটাতনের ওপর একগাদা মড়ার খুলি। তা দেখে তুমি আবার মুষড়ে পোড়ো না যেন। লোকটার নৌকোটা নিয়ে আসার উদ্দেশ্য তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে আসা।

খবরদার! নৌকোয় পা দেওয়ার পর থেকে যতক্ষণ তাতে থাকবে ততক্ষণ ভুলেও যেন খোদাতাল্লা-র নাম উচ্চারণ কোরো না।

নৌকোয় ওঠার পর থেকে শুরু করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে দশদিন নৌকোর দাঁড় বেয়ে তোমার দেশের কাছাকাছি শান্ত সমুদ্রের বুকে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে। সামনেই এক বণিকের নৌকো দেখতে পাবে। বণিক তোমাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে তোমার বন্দরে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল। ব্যস্ত-হাতে পায়ের তলার মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম। সামান্য খুঁড়তেই বাঞ্ছিত তীর-ধনুকটা চোখে পড়ল। তুলে নিলাম।

ব্রোঞ্জের মূর্তিটার গায়ে তীরটা গিয়ে আঘাত করতেই সেটা হুড়মুড় করে ভেঙে সাগরের পানিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাগর উত্তাল উদ্দাম রূপ ধারণ করল। তারপরই দ্রুত ফুলে ফেঁপে উঠতে উঠতে পানি পাহাড়ের চুড়াটার সমান উঁচুতে উঠে গেল। তারপরই একজন ছোট্ট একটা নৌকো নিয়ে আমার কাছে এল। নৌকোর পাটাতনের তলা থেকে একগাদা মড়ার খুলি উঁকি মারতে লাগল। দেখতে সে-ঘোড়সওয়ারটার মত হলেও আসলে একই লোক নয়।

একেবারে কাছে যেতে আমার ধারণা স্পষ্ট হ'ল যে, লোকটা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। পিতলের তৈরি মূর্তি। তার বুকে একটা সীসার ফলক। দৈববাণী খোদাই করা।

আমি নিঃশব্দে নৌকোয় উঠে বসতেই লোকটা নৌকো বাইতে শুরু করল। দশদিন এক নাগাড়ে নৌকোয় কাটালাম। দশদিন পরে সমুদ্রটাকে পরিচিত মনে হ'ল। বড়ই আনন্দ হ'ল। দু' হাত তুলে খোদাকে ধন্যবাদ জানালাম।

ব্যস, মুহূর্তে ঘটে গেল বিপর্যয়। পিতলের মূর্তিটা আমাকে প্রচণ্ড আক্রোশে দু' হাতে তুলে সাগরের পানিতে ছুড়ে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই নৌকো ও রহস্যজনক সে-পিতলের মূর্তি দু-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আবার সাগরের পানি সম্বল করে ভাসতে লাগলাম। সারাদিন অবিশ্রান্ত লড়াই চালিয়ে খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল সাগরের বুকে। হঠাৎ ঢেউয়ের তাণ্ডব গেল বেড়ে। আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল উপকূলের দিকে। এক সময় ঢেউয়ের ঝাপটায় তীরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম।

সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। জামা-কাপড় খুলে বালির ওপর শুকোতে দিলাম। জায়গাটা সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। চারদিকে কেবল পানি আর পানি।

আমার নিজের ওপর খুব রাগ হতে লাগল। ভাবলাম, সামান্য একটা ভুলের জন্য আমাকে এরকম করে খেসারত দিতে হচ্ছে।

হতাশাজর্জরিত মনে দ্বীপের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে হঠাৎ নিজেকে ভাগ্যবান মনে হতে লাগল। একটা জাহাজ নজরে পড়ল। দ্বীপের দিকেই এগোতে দেখলাম। কিন্তু মনের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। ভাবলাম, আবার নতুনতর কোন-বিপদে পড়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এরকম আশঙ্কা করে তাড়াতাড়ি একটা গাছের মগডালে উঠে বসলাম। পাতার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। এক সময় জাহাজটা কূলে ভিড়ল। দশ-বারোজন গাট্টাগোট্টা নফর নেমে এল একটা করে কোদাল-হাতে। কূল থেকে কিছুদূরে এক জায়গার মাটি কাটতে লাগল ব্যস্ত হাতে। মনে হ'ল, কিছু খুঁজছে নফরগুলো। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত। সামান্য খোঁড়াখুঁড়ির পর তারা একটা গুপ্ত দরজা পেয়ে গেল। এবার জাহাজ থেকে কতগুলো বড় সড় পেটিকা এনে গুপ্ত দরজাটা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিল। সেগুলোর মধ্যে দামী খাবার দাবার এবং মদ ভর্তি রয়েছে। কয়েকটা পেটিকায়

দামী পোশাক পরিচ্ছদও রয়েছে দেখলাম। সব মিলিয়ে একটা পরিবারের যা কিছু দরকার সবই জাহাজটাতে ছিল।

এবার জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা হ'ল এক অশিতিপর বৃদ্ধকে। কেবল বার্ধক্য নয় জরাব্যাধিও তার ওপর ভর করেছে মনে হ'ল। বৃদ্ধের পিছন পিছন সুদর্শন এক কিশোরও জাহাজ থেকে নেমে এল। আর তাদের দেখভাল করছে কয়েকজন নফর। বৃদ্ধটি থপ্ থপ্ করে হেঁটে গুপ্ত দরজায় গেল। অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করল। কিছু সময় কেটে গেল নিঃশব্দে। এক সময় সে-কিশোরটি ছাড়া অন্যান্য সবাই এক এক করে গুপ্ত দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এল।

বৃদ্ধকে নিয়ে সবাই জাহাজে উঠে গেলে জাহাজ আবার অথৈ সাগরের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

আমি গাছ থেকে নেমে এলাম। ব্যস্ত-হাতে মাটি সরিয়ে গুপ্ত দরজাটা বের করলাম। তার মুখে একটি পাথর চাপা দেওয়া। অতি কষ্টে সেটাকে সরিয়ে ফেলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল সঙ্কীর্ণ একটা সিঁড়ি। ভেতরে আবছা অন্ধকার। সিঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে নেমে গেলাম নিচে। হঠাৎ চমকে গেলাম। এক সুদৃশ্য ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। মূল্যবান শ্বেত পাথরের মেঝে। আসবাবপত্র যা কিছু একটি পরিবারের দরকার সবই ঘরে সাজানো রয়েছে। আমি পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিতেই কিশোর বালকটিকে দেখতে পেলাম। সোনার পালঙ্কে শরীর এলিয়ে দিয়ে সোনার পাখায় বাতাস খাচ্ছে। আমাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই সে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেল। আমি তাকে অভয় দিতে গিয়ে বল্‌লাম—'আমাকে দিয়ে তোমার কোনই অহিত সাধিত হবে না। আমি দত্যি-দানো নই, সাধারণ মানুষ। এক বাদশাহের লেড়কা। আবার আমি নিজেও এক দেশের বাদশাহ। তোমার কোন অনিষ্ট তো করবই না বরং মৃত্যুর কবল থেকে তোমাকে উদ্ধার করতেই আমার এখানে আগমন। তারা তোমাকে এখানে বন্দী করে রেখে গেছে। তোমাকে এ-পাতালপুরী থেকে আমি উদ্ধার করতে এসেছি।'

আমার কথায় কিশোর বালকটার উৎকণ্ঠা দূর হ'ল। মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

কিশোর বালকটির চোখ-মুখ দেখে মনে হ'ল কোন আমির-ওমরাহের ঘরের ছেলে। তার চেহারায় সারল্যের ছাপ। আমাকে কাছে ডাকল। ঘরের ভেতরে যেতেই সামান্য সরে গিয়ে পালঙ্কের ওপরে আমাকে বসতে দিল।

আমাকে পাশে বসিয়ে কিশোর বালকটি মিষ্টি-মধুর স্বরে কেটে কেটে বলতে লাগল—'শুনুন বাদশাহ্, তারা আমাকে এখানে বন্দী করে রেখে যায় নি। আমাকে হত্যা করতে নয়, আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই তারা আমাকে এখানে লুকিয়ে রেখে গেছে।'

আমার আব্বাজী সর্বজন পরিচিত। তুমিও তার নাম অবশ্যই শুনে থাকবে। তামাম দুনিয়ায় তাঁর মত বড় জহুরি আর দ্বিতীয় কেউ নেই। আমির আদমি। খানদানি বংশ আমাদের। বাবার বুড়ো বয়সে আমার জন্ম হয়েছে। খুবই আদুরে।

আমার জন্মের পর এক প্রখ্যাত গণৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করেন, পিতা-মাতার জীবদ্দশাতেই আমি বেহেস্তে চলে যাব। আর এ-ও বলেছেন, আমার পনের বছর বয়সে বাদশাহ কাসিবের লেড়কা আমাকে হত্যা করবে। তিনি তার গণনার ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন বাদশাহ কাসিবের পুত্র সাগরের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে এক দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেবে। সেখানকার পাহাড়ের চুঁড়ার ব্রোঞ্জের তৈরি এক ঘোড়সওয়ারকে সাগরের পানিতে ফেলে দিয়ে হাজার হাজার নাবিকের জীবনরক্ষা করবে। গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর থেকে আমার আব্বাজী আমাকে বাদশাহ কাসিবের লেড়কার ভয়ে পনের বছর ধরে নানাভাবে রক্ষা করে চলেছে।

কিছুদিন আগে চারদিকে খবর হয়ে গেছে, বাদশাহ কাসিবের লেড়কা নাকি সে-ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ারটাকে পাহাড়ের চুঁড়া থেকে সাগরের পানিতে ফেলে দিয়েছে। খবরটা কানে যাওয়ার পর থেকেই আমার আব্বাজী আমাকে নিয়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। আমার বৃদ্ধ জরাজীর্ণ আব্বাজীর শরীর দ্রুত কাবু হয়ে পড়তে থাকে। আমার আম্মা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন।

কিশোর বালকটার মুখে গণৎকারের কথা শুনে রাগে আমার মাথায় খুন চেপে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। যত্তসব মিথ্যাবাদী ভণ্ড গণৎকারের দল। অযথা মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। তাদের ধরে কচুকাটা করলেও গায়ের ঝাল মেটে না। এমন সুন্দর সহজ-সরল ফুলের মত পবিত্র এক কিশোরকে হত্যা করবে এমন নরাধম দুনিয়ায় কেউ আছে! আমি কিশোর বালককে লক্ষ্য করে বল্‌লাম—'তুমি মিছে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পোড়ো না ভাইয়া। আমি তোমাকে রক্ষা করবো। আমি থাকতে তোমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। চল্লিশদিন আমি তোমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করব। উক্ত সময় অতিক্রান্ত হলে আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার আব্বাজানের কাছে যাব। তুমিই হবে আমার সত্যিকারে জিগরি দোস্ত। আমার মসনদে তোমাকেই আমি অভিষিক্ত করে যাব। কথা দিচ্ছি।'

আমার কথায় লেড়কাটা আশ্বস্ত হ'ল। আমার ওপর তার মনে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর ভালবাসার সঞ্চার হ'ল।

পাতালপুরীতে আমাদের কোন অসুবিধাই হ'ল না। রাশীকৃত খাবার, পোশাক পরিচ্ছদ আর অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বৃদ্ধ জহুরী সেখানে জড়ো করে রেখে গেছেন।

জহুরীর কিশোর ছেলেটা আমাকে কাছে পেয়ে যে স্বস্তি ও

আনন্দ পেয়েছে তা বুঝলাম সারা রাত্রি তার সুনিদ্রার মধ্য দিয়ে। মনে হ'ল বহুদিন পর সে এরকম স্বস্তিতে ঘুমোতে পেরেছে।

আমরা নিজেদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের গল্পকথা, খেলাধূলা আর হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে লাগলাম। কিশোরটার মন থেকে তার আম্মা আর আব্বাজীর অভাব মুছে গেল। মৃত্যুভয়ও কিছুমাত্র রইল না। আমাদের পারস্পরিক আন্তরিকতাই উভয়কে পাতালপুরীর জীবনেও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে রেখেছে।

এক সকালে সে আমাকে বল্‌ল—'ভাইজান, আজ আমি ঘরে ফিরে যাব। আমার আব্বাজী আমাকে নিয়ে যেতে আসবেন। আমি তাকে গরম পানি দিয়ে ভাল করে গোসল করালাম। সোনার জরি দিয়ে কাজকরা দামী পোশাক পরিয়ে দিলাম। সে সেজেগুজে একটা আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তার আব্বাজীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ভাইয়া, কি খাবে বল?'

—'তরমুজ। আমাকে একটু তরমুজ দাও ভাইজান।'

—'আমি একটা তরমুজ নিয়ে তার আরাম-কেদারার পাশে রাখলাম। আরাম-কেদারার মাথার ওপর দেওয়ালে একটা বড়সড় ছুরি ঝুলানো ছিল। একটা টুল টেনে নিয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়ালাম। ছুরিটিকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য গোড়ালি দুটোকে উঁচু করতেই তার মনে দুষ্টুমি বুদ্ধির উদয় হল। আমার উঁচু গোড়ালির তলায় সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আচমকা সুড়সুড়ি দেওয়ায় একটা পা ভুঁচু করতেই হ'ল। ব্যস, আর দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। আমি তার আরাম-কেদারার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। হাতের ছুরিটা অতর্কিতে তার বুকে গেঁথে গেল। গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী হাতে নাতে ফলে গেল। বার-কয়েক ছটফট করে কিশোরটার রক্তাপ্লুত শরীরটা এলিয়ে পড়ল।

আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলার মত ভাষা আমার নেই। আমি জহুরীর কিশোর লেড়কার রক্তাপ্লুত নিঃসাড় দেহটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদলাম, উন্মাদের মত দাপাদাপি করতে লাগলাম।

বৃদ্ধ জহুরীর সন্ধ্যাবেলা ছেলেকে নিয়ে যেতে আসার কথা। তখন আমার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সামনে আমি কোন্ মুখে দাঁড়াব? কি বলে তাঁকে প্রবোধ দেব? বৃদ্ধপিতার সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমি চোখের সামনে দেখতে পারব না। কিছুতেই না।

চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আমি পাতালপুরীর প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। গুপ্ত দরজাটা পাথরচাপা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই।

কিন্তু দূরে চলে যেতেও মন সরল না। পুরো ব্যাপারটা কোথাও আত্মগোপন করে থেকে নিজের চোখে দেখার জন্য চিত্তে-চাঞ্চল্য বোধ করতে লাগলাম। নইলে বৃদ্ধের নোকরগুলো আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে।

আগেকার সে-গাছটার মগডালে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা আমি গাছের ডালে কাটানোর পর সে জাহাজটা এসে তীরে ভিড়ল। দশজন নোকর পরিবেষ্টিত হয়ে সে-অশিতিপর বৃদ্ধ আগের মতই লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলেন। সঙ্গের নোকরদের বল্‌লেন—'নিয়ে এসো আমার প্রাণনিধিকে।'

বৃদ্ধ নোকরদের নিয়ে থপ্‌থপ্ করে আমার গাছটার নিচের গর্তটার মুখের সামনে এল। সেদিকে চোখ পড়তেই সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—'এ কী কাণ্ড! মনে হচ্ছে কেউ সদ্য মাটি খুঁড়ে রেখেছে, কি ব্যাপার? তবে কি আমার লেড়কা জিন্দা নেই?'

বৃদ্ধের সঙ্গের নোকরগুলো ব্যস্ত হাতে মাটি সরিয়ে গর্তের মুখটা খালি করল। বৃদ্ধ উন্মাদের মত ছেলের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কে-ই বা সাড়া দেবে? যাকে বুকে ফিরে পাওয়ার জন্য বৃদ্ধটি প্রায় উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাকে যে আমি অনিচ্ছায় হলেও নিজের হাতে খতম করেছি। সে আজ চিরনিদ্রায় শায়িত। তার ঘুম কেউ ভাঙাবে সাধ্য কি!

নফররা বিষণ্ণমুখে বৃদ্ধকে পাতালপুরীর প্রাসাদে নিয়ে গেল ধরাধরি করে।

কিছুক্ষণ বাদে নোকররা বৃদ্ধের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে নিয়ে ওপরে উঠে এল। সে মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করাই তো দুষ্কর।

বৃদ্ধ তখন লেড়কার নাম ধরে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন।
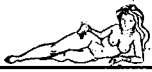
এবার নোকরগুলো ছুরিকাবিদ্ধ রক্তাপ্লুত নিঃসাড় শিশুর দেহটাকে ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে এল। গাছটার ছায়াতেই তার লাসটাকে গোর দেওয়া হ'ল। আর পাতাল পুরীতে যেসব দ্রব্য সামগ্রী ছিল সবই জাহাজে তুলে নেওয়া হ'ল। জাহাজ ছেড়ে দিল।

জাহাজ চলে গেলে আমি গাছ থেকে নেমে বিষণ্নমনে ছোট্ট সে-দ্বীপটার এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারদিকে কেবল জল আর জল। ডাঙার কোন চিহ্নও চোখে পড়ল না। কিন্তু আমাকে যে তীরের সন্ধান পেতেই হবে।

একদিন গাছের তলায় বিষণ্ণ মনে শুয়েছিলাম, অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য নজরে পড়ল। দেখলাম, অভাবনীয় উপায়ে সাগরের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালির চড়া সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি আশান্বিত হয়ে হাঁটতে লাগলাম। ভাবলাম, কোথায় এর শেষ, কোথায় গিয়ে পৌঁছায় দেখাই যাক না। হেঁটে হেঁটে পুরো দিনটা কাবার করে দিলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে দেখতে পেলাম আসল মাটিতে আমি হাঁটছি, এক সময় যা সমুদ্রের তীর ছিল। খোদাতাল্লার প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

আমি উল্লসিত মনে বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে হেঁটে চলেছি। কিছুদূরে আগুন জ্বলছে দেখলাম। ভাবলাম, অবশ্যই কোন জনবসতি সেখানে আছে। আগুন জ্বেলে কেউ ভেড়াও পোড়াতে পারে। আশান্বিত মন নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে লাগলাম। কাছে যেতেই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দেখি বিশালায়তন একটা পিতলের তৈরি প্রাসাদ। বিকালের বিদায়ী সূর্যের লালচে আভা পড়ায় মনে হয় পিতলের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

আমি প্রাসাদের সিংহদরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই দশজন ষণ্ডামার্কা লোক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সুপুরুষ। কিন্তু অবাক মানলাম যে, সবারই বাঁ-চোখ কানা। একটু পরে এক অতিবৃদ্ধ তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। গায়ের চামড়া ঢিলা হয়ে পড়লেও এক নজরে দেখলেই মনে হয় এক সময় তিনি সুপুরুষ ছিলেন। জরা-ব্যাধিতে জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছেন।

অশিতিপর বৃদ্ধটি আটজন গাট্টাগোট্টা লোকসহ আমার দিকে এগিয়ে এলেন আর বাকি দু' জন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি প্রথমে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ ও অন্যান্যরা আমাকে হেসে স্বাগত অভিনন্দন জানালেন। আমার কলিজায় জল এল। মন থেকে ভয়-ডর নিঃশেষে মুছে গেল। আমি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানালাম।

বৃদ্ধ আমাকে তাঁর প্রাসাদে স্বাগত জানালেন। আমি তাদের সবার সঙ্গে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। আমার বিড়ম্বিত জীবনের কথা তাদের কাছে, বিশেষ করে বৃদ্ধের কাছে ব্যক্ত করলাম। আমার জন্য তারা নানাভাবে দুঃখ প্রকাশ করল। বৃদ্ধ আমার পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর বৃদ্ধটি আমাকে সঙ্গে করে প্রাসাদটি ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

আমাকে সুউচ্চ একটি কারুকার্যশোভিত প্রাসাদে আসনে বসতে দেওয়া হল। বৃদ্ধ নিজে বসলেন মূল্যবান ভেলভেটে মোড়া গালিচায় আর অন্যান্যরা নিজ নিজ কুর্সি দখল করল।

আমাকে বলা হ'ল চুপ করে বসুন কিছুক্ষণ। আমরা এখন আপনার জন্য প্রার্থনা করছি।

নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্য দিয়ে কিছুটা সময় কেটে গেল। এক সময় প্রার্থনা শেষ করে বৃদ্ধসহ সবাই আঁখি খুলে তাকালেন।

তারপর বৃদ্ধের সঙ্গী দশজন আর আমি দামী সুরা ও মুখরোচক খাদ্যবস্তু দিয়ে ভোজন সারলাম।

বৃদ্ধের আতিথ্যে আমি মুগ্ধ হলাম। ভাবা যায়, নিজের হাতে আমার উচ্ছিষ্ট থালাবাসন সাফ করলেন! কিন্তু মুখে একটি কথাও বল্‌লেন না।

দশজন যুবকদের মধ্য থেকে এক সুদর্শন যুবক একটু রাগত স্বরেই বল্‌ল—'প্রার্থনা জানাবার জন্য দরকারী সামগ্রী এখনও আনলে না?'

বৃদ্ধ নীরবে পাশের ঘরে চলে গেলেন। মূল্যবান সার্টিনের কাপড়ে মোড়া দশ বারে দশটা পাত্র আর দশটি জ্বলন্ত চিরাগবাতি আর ধূপদানি এনে প্রত্যেক যুবকের সামনে একটা করে রাখলেন। আমার সামনে কিছুই রাখলেন না।

এবার যুবকেরা নিজ নিজ পাত্র হাতে নিয়ে ঢাকনা খুলে ফেল্‌ল। দেখা গেল, চিরাগবাতির কালি, চুলার ছাই এবং কাজল মাখানো প্রত্যেকটি পাত্র। পাত্রের ঢাকনা খুলেই সবাই ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লেগে গেল। আঁখির পানি ফেলতে ফেলতে কান্নাপ্লুত কণ্ঠে সবাই বল্‌ল—'আমাদের কৃতকর্মের, আমাদের পাপের ফল।' এবার তারা নিজ নিজ পাত্র থেকে চিরাগবাতির কালি আর ধূপের ছাই নিয়ে মুখে মেখে নিল। আর তর্জনী দিয়ে কাজল নিয়ে ডানচোখে পরল।

ভোরে কালি-কাজল সব মুছে মূল্যবান পোশাক পরে কেতাদুরস্ত হয়ে গেল। কে বলবে, এরাই রাত্রে অবিশ্বাস্য কৌশলে প্রার্থনা করে সং সেজেছিল।

তাদের বিচিত্র সব কাজকর্ম সম্বন্ধে মনে অদম্য কৌতূহল জমা হলেও সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে সংযত রাখতেই হ'ল। কারণ, বৃদ্ধ আমাকে বার বার বলে দিয়েছিলেন—কোন কথা বলবে না। সর্বদা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে।

অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানার মধ্যে তিনদিন তিনরাত্রি কেটে গেল। রোজ তাদের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দেখলাম। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। একদিন বলেই ফেল্‌লাম—'আচ্ছা,

আপনাদের এসব আচরণের অর্থ কি? যদিও এসব ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরকম অত্যাশ্চর্য সব কাণ্ড চোখের সামনে দেখে মুখবুজে থাকাও তো যায় না। আমার নসীবে যা থাকে থাক, তবু আমাকে আজ শুনতেই হবে। আপনাদের সবার বাঁ-চোখ কানা কেন? আর রোজ রাত্রে আপনারা কেনই বা ছাই আর কাজল চোখে-মুখে মাখেন? এসবের অর্থ কি আমাকে বলতেই হবে।'

—'কেন এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, জানতে চাইছ। নিষেধ করা সত্ত্বেও এসব প্রশ্ন করে নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারতে উৎসাহী হচ্ছ কেন, বুঝছি না তো!'

—'নসীবে যা আছে তা-তো ঘটবেই। তবু আমি জানতে আগ্রহী। বলুন, এসব কাণ্ডকারখানার অর্থ কি?'

—'শোন, তোমার কৌতূহলের জন্য তোমাকেও বাঁ-চোখটি কিন্তু খোয়াতে হবে,জেনে রেখো।'

—'পরোয়া করি না। তবু আমাকে কৌতূহল মেটাতেই হবে। জীবনভর একটা জমাট বাঁধা কৌতূহল জগদ্দল পাথরের মত বুকে করে বয়ে নিয়ে বেড়নোর চেয়ে বাঁ-চোখটি যদি বিনিময়ে খোয়াতে হয় তবু ভাল। আপনারা বলুন, বরাত ঠুঁকে আমি সব শুনব।'

—'শোন তবে, আমরা নিজেদের দোষেই নিজ নিজ বাঁ চোখ খুইয়েছি। তোমাকেও নিজেরই দোষে খোয়াতে হবে। আর মনে রেখো, বাঁ চোখ খোয়াবার পর কিন্তু এখান থেকে তোমাকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। তোমার ঠাঁই এখানে হবার নয়। কারণ এখানে মাত্র দশজনের জায়গা রয়েছে। এগারোজনকে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব তোমার—।'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই সে বৃদ্ধ একটি ভেড়া নিয়ে ঘরে এলেন। জ্যান্ত ভেড়া। নিঃশব্দে একটি সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলা দিয়ে সেটাকে জবাই করলেন। ছালচামড়া মুক্ত করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ষণ্ডামার্কা বাঁচোখ কানা যুবকদের একজন বল্ল—'শোন, তোমাকেভেড়ার চামড়াটির মধ্যে পুরে প্রাসাদের ওপরে ফেলে রেখে দিয়ে আসা হবে। একটি রুম পাখি উড়ে এসে তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যাবে। রুম পাখি অতিকায় এবং অমিত শক্তিধর। একটি হাতীকে ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যাওয়াও তার পক্ষে সমস্যা নয়। কারণ, সে ভাববে তুমি সত্যিকারের একটা ভেড়া। যা-ই হোক তোমাকে নিয়ে গিয়ে বসবে একটি পাহাড়ের চুঁড়ায়। তোমার গোস্ত দিয়ে উদরপূর্তির ইচ্ছায়ই রুম পাখিটি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। ভাল কথা, তোমাকে ভেড়ার চামড়ায় ভরার আগে একটা ছুরি দিয়ে দেয়া হবে। সুযোগ মত যাতে চামড়া কেটে তুমি নিজেকে মুক্ত করতে পার। ঘাবড়ে যেয়ো না। রুম পাখি মানুষের গোস্ত খায় না। ফলে চামড়ার ভেতর থেকে তোমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে পাখিটি হতাশ হয়ে শূন্যে ডানা মেলবে।

তুমি এবার হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হবে সুবিশাল এক প্রাসাদে। কম করেও এ প্রাসাদের দশগুণ বড় তো হবেই। মনে করতে পার তার প্রায় সবটুকুই সোনার পাত দিয়ে মোড়া। মনে হবে বুঝি খোয়াব দেখছ। এবার বলছি আসল কথা। এ-প্রাসাদেই তোমাকে বাঁ-চোখটি খোয়াতে হবে। আর কি ভাবে, তাই না? আমরা দশজনে এক এক করে যেভাবে বাঁ-চোখ হারিয়েছি তোমাকেও খোয়াতে হবে একই রকম ভাবে। আর রোজ রাত্রে আমরা তার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে মানসিক স্বস্তি লাভ করি।'

যুবকটি যখন আমার কাছে তাদের কাণ্ডকারখানার কথা বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করছিল তখন অন্যান্যরা ভেড়ার চামড়াটাকে তৈরি করে নিতে লাগল। তার বক্তব্য শেষ হলে তারা আমার হাতে একটা ছুরির ফলা ধরিয়ে দিল। বল্ল—'পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে চামড়া কেটে বেরনোর কাজে এটি ব্যবহার কোরো। এবার আমাকে ভেড়ার চামড়ার থলিটাতে ভরে মুখ সেলাই করে দিল। কাঁধে করে প্রাসাদের মাথায় রেখে এল। তার একটু বাদেই বুঝলাম আমি মহাশূন্যে ভেসে চলেছি। প্রকাণ্ড একটি রুম পাখি আমাকে ঠোঁটে করে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে রাখল। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে ছুরির ফলা দিয়ে চামড়াটি কেটে বেরিয়ে এলাম।

রুমপাখিটি যাকে ভেড়া ভেবে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে মানুষের রূপে দেখে ভড়কে গেল। হতাশ হয়ে উড়ে পালাল। একটি পাখি কত বড় এবং কী ভয়ঙ্কর রূপবিশিষ্ট হতে পারে একে দেখার আগে আমার সে ধারণা তিলমাত্র ছিল না।

আর নয়। এবার আমি লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে নামতে লাগলাম। সুবিশাল সে সুরম্য অট্টালিকার খোঁজ আমাকে পেতেই হবে। যুবক দশজন মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে আমাকে যেসব কথা বলেছিল তা থেকে আমি মোটামুটি একটি ধারণা নিয়ে নিতে পেরেছিলাম। সেসব কথা অন্তরের অন্তঃস্থলে আঁকা রয়েছে। কিন্তু এখন বাস্তবে যা চোখের সামনে দেখছি তাতে করে মনে হচ্ছে তারা প্রাসাদটি সম্বন্ধে তেমন কিছুই বলে নি।

একের পর এক করে নিরানব্বইটি চন্দনকাঠের কারুকার্যমণ্ডিত অতিকায় দরজা ডিঙিয়ে প্রাসাদ অভ্যন্তরের বড়সড় একটি ঘরে এসে দাঁড়ালাম। আরে ব্বাস! কেবল হীরা, মানিক, পান্না, চুনি প্রভৃতি বহুমূল্য সব পাথরের ছড়াছড়ি। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

এবার হাঁটতে হাঁটতে একটি ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, চল্লিশজন পরমা সুন্দরী যুবতী বিচিত্র কায়দায় বসে। প্রত্যেকেই ষোড়শী, বা বড়জোর অষ্টাদশী। বেহেস্তের হুরীপরীদের চেয়ে তারা কোন অংশে কম

সুন্দরী নয়। আবার বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তাদের একের সঙ্গে অন্যের দৈহিক সাদৃশ্য রয়েছে পুরোদস্তুর।

রূপসী যুবতীরা আমাকে দেখামাত্র মুচকি হেসে সাদর সম্ভাষণ জানাল।

তারা সানন্দে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটি উচ্চাসনে বসাল। আমি যেন তাদের মেহমান এরকম আদর-আপ্যায়ন করতে লাগল। আমার হুকুম তামিল করার জন্য তারা ব্যস্ত। আমার সামান্য সুখ উৎপাদন করাই যেন তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ।

তাদের মধ্যে দু'জন মখমলের তোয়ালে ও মৃদু গরম পানি নিয়ে এল আমার পা ধুইয়ে দেবার জন্য। একজন বদনা থেকে পানি ঢেলে ঢেলে পা ধুইয়ে দিল আর দ্বিতীয়জন তোয়ালে দিয়ে যত্ন করে মুছিয়ে দিল। আহারান্তে রূপসী যুবতীরা আমাকে ঘিরে বসল। বিভিন্ন কৌশলে আমাকে আদর করতে লাগল। এক সময় আমার জীবনকথা শোনানোর জন্য অনুরোধ করল।

রূপসী যুবতীরা এখানে যেন নির্বাসন-জীবন যাপন করছে। হাসি-খুশী-আনন্দ কাকে বলে তারা ভুলেই গেছে। আমাকে কাছে পেয়ে তারা যেন এই প্রথম হাসি-আনন্দের স্বাদ পেল। সবার মধ্যেই খুশীর আমেজ। অফুরন্ত হাসির ছোপ। তাদের সবার মুখে একটাই কথা—'তুমি আদর দিয়ে দিয়ে আমাদের মন-প্রাণ ভরিয়ে দাও। ভালবেসে কাছে টেনে নাও। দাও অনাবিল আনন্দের স্বাদ।'

রূপসী যুবতীদের আব্দার আগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। আমার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা তাদের কাছে ব্যক্ত করলাম।

সারাদিনের কর্মক্লান্ত সূর্যটি বিদায় নেবার জন্য উন্মুখ। তারই রক্তিম ছোপ পড়েছে পশ্চিম-আকাশের গায়ে। এক সময় অদূরবর্তী ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিল রক্তিম সূর্যটি। প্রকৃতির কোলে শুরু হয়ে গেল আলো-আঁধারির খেল। তারই কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে এল রাত্রির অন্ধকার।

প্রাসাদের কক্ষগুলোতে জ্বলে উঠল মোমবাতির আলো। ঝলমলিয়ে উঠল বিশালায়তন প্রাসাদটি।

রূপসী যুবতীরা এবার উৎকৃষ্ট সরাবের পাত্র আর পেয়ালা নিয়ে এল। একের পর এক পেয়ালার সরাব উজাড় হতে লাগল। তারপরই শুরু হ'ল বাজনার তালে তালে গান আর নাচ। আমি সরাবের পেয়ালা নিয়েই মজে রইলাম। তাদের নাচ পুরুষের হৃদয়ে দোলা দেয়। রক্তে জাগায় মাতন।

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে এল। নাচ-গান বন্ধ হ'ল। রূপসীদের একজন আমার একটি হাত জড়িয়ে ধরে মিষ্টি-মধুর স্বরে বল্‌ল—'রাত্রি তো অনেক হ'ল, এবার শোবে চল। আমরা চল্লিশজন রয়েছি। এর মধ্যে যাকে তোমার মনে ধরে তাকেই আজ রাত্রের জন্য বেছে নাও। সে-ই হবে তোমার আজ রাত্রের মহব্বতের বেগম, শয্যা-সঙ্গিনী। সে-ও তোমাকে মহব্বত-ভালবাসায় ভরিয়ে দেবে। এ নিয়ে আমাদের কারো মনেই কিছুমাত্রও ঈর্ষার উদয় হবে না। হবেই বা কেন? আমরা চল্লিশ বহিন তো পালা করে তোমাকে আজ না হোক কাল তো পাবই। তোমাকে সঙ্গদানের মাধ্যমে নিজে সুখ পাব, আবার তোমাকেও সুখে-আনন্দে ভরপুর করে তুলব।

এ তো এক মহাসমস্যার ব্যাপার রে বাবা, কী ফাঁপরেই না পড়া গেল। সে-মুহূর্তে আমার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কাকে ফেলে কাকে নেই। সবাই একই রকম সুন্দরী। কারো দেহে তিলমাত্রও খুঁত নেই।

মাথা খাঁটিয়ে উপায় একটি বের করে ফেল্‌লাম বটে। চোখ বুজে আচমকা একজনের হাত চেপে ধরলাম। চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম এক রূপসী-ষোড়শীর হাত ধরে আমি দাঁড়িয়ে। তার চোখে-মুখে যুদ্ধ জয়ের অপার আনন্দ।

আমাকে টু-শব্দটা পর্যন্ত করার সুযোগ না দিয়ে সে আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল পাশে এক সজ্জিত ঘরে। পালঙ্কের ওপর মখমলের চাদর পাতা। সাগরের ফেনার মত নরম বিছানায় নিয়ে গিয়ে বসাল আমাকে। আমাকে অমৃততুল্য মধু পান করাল নিরবচ্ছিন্নভাবে চল্লিশবার। চাওয়া আর পাওয়া, দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে দিয়ে

সুখের রাত্রিটি যেন চোখের পলকে কেটে গেল।

প্রতিটি রাত্রি আমার কাছে নিত্য নতুন আনন্দের ফোয়ারা নিয়ে হাজির হতে লাগল। চল্লিশটি বহিন এক এক করে আমাকে অমৃত সাগর মথিত করে সুখ দান করতে লাগল। নারীর সবথেকে মূল্যবান সম্পদ সতীত্ব তা-ই স্বেচ্ছায়, হাসি আর আনন্দের মধ্য দিয়ে আমার কাছে নিবেদন করল।

চল্লিশটি সুখের রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেলে রূপসী যুবতীদের মুখে নেমে এল বিষাদের কালো ছায়া। আর এখানে নয়। তাদের এবার বিদায় দিতেই হবে। তারা কেঁদে কেটে বলতে লাগল—'আমাদের নসীবের ফের! নইলে অতীতে এক সুপুরুষ পেয়েও হারিয়ে ছিলাম। তারপরই পেলাম তোমাকে। তা-ও আজ ছেড়ে যেতে হচ্ছে। তারা সবাই আমাদের মন সুখে-আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল খুবই সত্য বটে। কিন্তু আজ তুমি যে-আনন্দ দিলে তা সত্যিই অতুলনীয়, এক অনাস্বাদিত আনন্দ। তোমার পৌরুষের তুলনা একমাত্র সিংহের পৌরুষের সঙ্গেই তুলনীয়। সারাটা বছর আমরা প্রেম জ্বালায় জর্জরিত হই। প্রেমজ্বালায় জর্জরিত দেহ-মন নিয়ে পথ চেয়ে বসে থাকি কবে আমাদের নাগর এসে দরজায় দাঁড়াবে। বুকে টেনে নেবে। সোহাগে-আদরে মন-প্রাণ ভরিয়ে তুলবে। আল্লাতাল্লা বছরান্তে একজন করে সুঠামদেহী যুবক আমাদের উপহার দেন। তোমাকেও একই নিয়মে পাঠিয়েছেন। তুমি আমাদের মহব্বতের আগুনে শান্তিবারি সিঞ্চন করতে গিয়ে যে-সুখ আর তৃপ্তি দিলে তা অতীতে যেমন কেউ দিতে পারে নি তেমনি ভবিষ্যতেও কেউ দিতে পারবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম।'

আমি সবিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বল্লাম—'কেন? আমাকে কেন তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে? তোমাদের সান্নিধ্যে কেন আমি আর থাকতে পারব না, বলবে কি?'

—'শোন, আমাদের আব্বাজী এখানকার বাদশাহ। আমরা চল্লিশ বহিন একই বাবার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছি বটে কিন্তু আমাদের সবার মা আলাদা। আমরা প্রাসাদে অবস্থান করি সারা বছর ধরে। বছর পূরণের চল্লিশদিন বাকি থাকতে খোদাতাল্লা একজন করে সুদেহী যুবককে পাঠিয়ে দেন আমাদের কাছে। আমাদের যৌবনরক্ষার জন্যই এ-ব্যবস্থা। চল্লিশদিন অতিক্রান্ত হলে আমরা আবার আব্বা আর আম্মাদের কাছে চলে যাই। আজ সে-দিন। আজ তোমাকে ছাড়তে হবে, চলে যেতে হবে তাদের কাছে। তোমার মত যৌবনের ভরা জোয়ার কারো মধ্যেই দেখি নি। তোমার অকৃত্রিম-অফুরন্ত মহব্বত আমাদের মন-প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু মন না চাইলেও তোমাকে ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবেই।'

—'তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে গেলেও আমার পক্ষে এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তোমরা আব্বা-আম্মার সঙ্গে মোলাকাত সেরে এসো গিয়ে। আমি তোমাদের প্রতীক্ষায় এখানেই থাকব।'

আমার কথায় তারা উল্লসিত হ'ল। প্রাসাদের সবগুলো ঘরের চাবির গোছা আমার হাতে তুলে দিল। তারপর বল্ল—'প্রাসাদের সব ঘরে যেতে পারবে। কিন্তু প্রাসাদের যেদিকে বাগিচা আছে খবরদার সেদিকের দরজা ভুলেও যেন খুলো না। যদি আমাদের কথা অগ্রাহ্য করে সে-দরজা খোল তবে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলনের পথ কিন্তু চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে, খেয়াল রেখো।'

পরদিন আমার হাতে প্রাসাদের চাবির গোছা দিয়ে রূপসী যুবতীরা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বিদায় নিল।

রূপসী যুবতীরা বিদায় নিলে বিশাল প্রাসাদটা আমি একা আগলাতে লাগলাম। মন খুবই বিষিয়ে উঠল। অফুরন্ত হাসি আনন্দ উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে দিন যে কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। আজ আমি একা যেন গোরস্তান আগলাচ্ছি। আজ আমার সামনে জমাটবাঁধা হাহাকার আর হাহুতাশ সম্বল। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে বার বার মৃত্যুর কথাই আমার অন্তরের অন্তস্থলে ভেসে উঠতে লাগল।

প্রথম দরজাটি খুলতেই আমার চোখের সামনে বেহেস্তের বাগিচার মত মনলোভা এক ফল-ফুলের বাগিচা ভেসে উঠল। চাবি ঘুরিয়ে দ্বিতীয় দরজাটি খুল্‌লাম। কেবলই জানা-অজানা রঙ-বেরঙের কত সব ফুলগাছের বিচিত্র সমারোহ যে এখানে ঘটেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। এমন চিত্তাকর্ষক অনন্য সৌন্দর্য অন্য কোথাও আছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। আমার অন্তরাত্মা পুলকে নেচে উঠল। মনের কোণে বার বার একই কথা ভেসে উঠতে লাগল, আমি কি সত্যি জেগে, নাকি ঘুমের ঘোরে খোয়াব দেখছি?

চাবি ঘুরিয়ে প্রাসাদের তৃতীয় দরজাটি খুলে ফেল্‌লাম। এবার বাগিচার অন্য এক প্রান্ত চোখের সামনে ভেসে উঠল। পাখি। গাছের ডালে ডালে কত রঙ আর কতই না আকৃতি বিশিষ্ট পাখির একত্র সমাবেশ ঘটেছে এখানে। তাদের খেলা দেখতে দেখতে চোখ দুটো বুজে এল। কখন যে আমার চোখের পাতা দুটো এক হয়ে এসেছিল, বুঝতেই পারি নি। ঘুমের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে ঘাসের বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম।

পাখির কাকলিতে সকাল হ'ল। চাবির গোছাটি হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে দেখলাম। চতুর্থ দরজাটি খুল্‌লাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সুপ্রশস্ত এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। চন্দন কাঠের অতিকায় চল্লিশটি দরজা প্রাঙ্গণটিকে ঘিরে রেখেছে। প্রত্যেকটি দরজার গায়েই সুদক্ষ শিল্পীর মনলোভা কারুকার্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

এ কৌতূহলের শিকার হয়ে একটি দরজা খুলে ফেল্‌লাম। আমি যেন মুক্তার সাগরে পড়ে গেলাম। রাশি রাশি বস্তা বস্তা মুক্তা ঘরের মেঝেতে রাখা রয়েছে। আর এক একটির আকৃতিও এমনই বিশাল যা এর আগে কোনদিন প্রত্যক্ষ করার বরাত আমার হয় নি। পাশের ঘরে যেতেই আমার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'হায় আল্লাহ!' এযে রুবী আর হীরার পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। তারপরের ঘরে ঢাই করে রাখা হয়েছে পান্না। তার পাশের ঘরে পর্বত সমান সোনা। ইয়া বড় বড় সোনার তালের পর্বত। আর একটি ঘরে মোহরের ঢিবি। তার পরেরটিতে ছাদ পর্যন্ত স্তরে স্তরে সাজানো রূপোর বাট। তার পরেরটিতে রৌপ্যমুদ্রার পাহাড়।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—'হায় খোদা! এত ধন-রত্ন তো আমার সারা রাজ্যেও নেই!'

আমার অখণ্ড অবসর। নেই বলতে কিছুই করার নেই। ফলে চাবি ঘুরিয়ে এক একটি দরজা খুলে প্রাসাদের কোথায় কি রয়েছে দেখে বেড়াতে লাগলাম। এবার একটিমাত্র চাবি বাকি রয়েছে। আর আমার অদেখা রয়েছে একটিমাত্রই ঘর। তবেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। সে-মুহূর্তেই রূপসী যুবতীদের সতর্কবাণীর কথা আমার মনের কোণে ভেসে-এ উঠল চাবিটি ভুলেও ব্যবহার কোরো না। কৌতূহলের শিকার হয়ে চাবি ঘুরিয়ে ঘরটি খুললেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার এবং অচেনাকে চেনার কৌতূহল আমার মনকে প্রতিনিয়ত নাড়া দেয়। এবার তাদের আর একটি কথা মনের কোণে ভেসে উঠল—'যদি কৌতূহলের শিকার হয়ে চাবি ঘুরিয়ে ঘরের দরজাটি খোল তবে আর কোনদিনই আমাদের দেখা হবে না। মেহেবুব তোমাকে হারানোর ইচ্ছা আমাদের মোটেই নেই। আমাদের অনুরোধটি রাখবে আশা করছি। ওই দরজার ত্রি-সীমানায়ও যেয়ো না।'

উদ্ভিন্ন যৌবনা রূপসীদের পাওয়ার লোভ আর ঘরের ভেতরে এমন কি আছে তা দেখার অদম্য কৌতূহল—এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে আমি প্রায় বে-সামাল হয়ে পড়লাম। কোনটিকে আমি বেছে নেব, তাদের যৌবনের জোয়ারলাগা সুখ ও তৃপ্তিদায়ী দেহ, নাকি ঘরের ভেতরের বস্তু দেখা? তাদের মহব্বত অনন্য সৌন্দর্যের স্বাদ আর দেহলতা আস্বাদনের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি লাভের কথা এ জন্মে আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। একের পর এক করে চল্লিশটি রাত্রি আমি উদ্ভিন্ন যৌবনা রূপসীর দেহলতা দলন, পেষণ, চুম্বন আর সম্ভোগের মধ্য দিয়ে নিজে স্বর্গীয় সুখ লাভ করেছি আবার তাদেরও দিয়েছি অপার আনন্দ। সে-সুখ চিরদিনের মত বিসর্জন দিতে কোন্ আহাম্মকের মন চায়?

আমার সর্বনাশের চূড়ান্ত হবে, নারীদেহ সুখ, স্বর্গসুখ চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে জেনেও আমি অদম্য কৌতূহলের শিকার হয়ে এক নিঃশ্বাসে তালার ভেতরে চাবিটি ঢুকিয়ে দিলাম। বরাত ঠুকে চাবিটি ঘোরালাম। ব্যস, দরজাটা আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু হায়! কিছুই আমার চোখে পড়ল না। উৎকট একটি গন্ধ ছাড়া কিছুই উপলব্ধিও করতে পারলাম না।

আশ্চর্য ব্যাপার তো। উৎকট গন্ধটি ক্রমে উগ্র থেকে উগ্রতর হতে লাগল। আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিমানি শুরু হয়ে গেল। আর কোন্ অদৃশ্য হাত যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটিয়ে চল্‌ল। ব্যস, তারপরই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম। তারপরই সব বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল।

কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরল তখন ধীরে ধীরে উঠে পাশের ঘরের ভেতরটা দেখার জন্য ধীর পায়ে এগোতে লাগলাম। দরজাটি ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল মোমবাতির মিষ্টি মধুর আলোর অপরূপ রশ্মি। মোমবাতির আলোয় দেখলাম, ঘরের কোণে রয়েছে একটি কালো ঘোড়া। খুবই মোটাসোটা। তার কপালে সাদা একটা তারা। সামনের ডান-পায়ে আর পিছনের বাঁ-পায়ে সুদৃশ্য সাদা তারার মোজা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর পিঠের

সোনার জিনে মোমবাতির আলো পড়ে চকচক করছে। একটি গামলায় খাবার আর একটিতে খাবার জল রাখা রয়েছে।

ছেলেবেলা থেকেই বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার হিসাবে আমার খুব নাম ডাক ছিল। বহু তেজী দৌড়বীর ঘোড়াকে আমি বহুবার দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছি। তাই এমন মোটাসোটা ও তেজী কালো ঘোড়াটি দেখেই আমার খুব লোভ হ'ল।

লোভের বশবর্তী হয়ে কালো সে ঘোড়াটাকে বাগিচায় এনে দাঁড় করালাম। কিন্তু যখন তাকে নিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম তখন সে জগদ্দল পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। এমন বেয়াড়া জানোয়ার আমি জন্মেও দেখিনি। অধৈর্য হয়ে ঘা কতক চাবুক কষিয়ে দিলাম। মুহূর্তে তার দেহের দু' পাশ থেকে দুটো সুদৃশ্য পাখা বেরিয়ে এল। পাখা দুটো যে চমৎকার ভাবে গোটানো ছিল আগে দেখতেই পাই নি। আমি তড়াক্ করে লাফিয়ে তার পিঠের জিনের ওপর বসে পড়লাম। দু' হাতে শক্ত করে লাগাম ধরলাম। এবার পা দুটো দিয়ে তার পেটের দু'পাশে বার-কয়েক গুঁতো দিতেই সে বাতাসের বেগে শূন্যে উঠতে শুরু করল। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা আর বনবাদাড় অতিক্রম করে আমার কালোমাণিক পঙ্খীরাজটা আমাকে নিয়ে বাতাসের বেগে এগিয়ে চলল। দেহ-মনে এক অনাস্বাদিত পুলক অনুভব করতে লাগলাম।
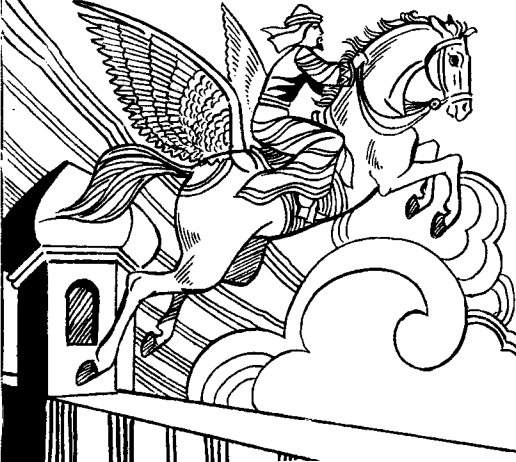
এক সময় এক ছাদের ওপর ধীরে ধীরে নামল আমার পঙ্খীরাজ। আমি ব্যস্ত হয়ে নামতে গেলাম। আচমকা তার একটি ডানার আঘাত লাগ্ল আমার বাঁ - চোখে। আমি আর্তনাদ করে চোখটি চেপে ধরলাম। এ-সুযোগে সে আকাশে ডানা মেল্ল। চলে গেল একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

আমি বাঁ-চোখের যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে সিঁড়ি ভেঙে

কিছুটা নিচে নামতেই বাঁ-চোখ কানা যুবক দশজন আমার সামনে আবির্ভূত হ'ল।

তারা ক্রুদ্ধস্বরে বল্ল—'কতবার নিষেধ করেছিলাম, পাত্তাই দাওনি তখন। এখন? আর এ-ও তো বলেছিলাম এখানে দশজনের বেশী স্থান সঙ্কুলান হবার নয়। আমরা তো দশজন আগে থেকেই রয়েছি। তোমাকে কিছুতেই জায়গা করে দেওয়া সম্ভব নয়। মানে মানে কেটে পড়।

একজন মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বল্ল—'তোমাকে একটি বুদ্ধি দিচ্ছি, বাগদাদ নগরে চলে যাও। সেখানকার খালিফা হারুণ-অল-রসিদ পরম মহানুভব। তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের খ্যাতি তামাম দুনিয়ায় কে না জানে। তাঁর কাছে গেলে তোমার বসবাসের যা হোক একটি বিহিত হয়েই যাবে।'

আমি যেন অথৈ সাগরে পড়ে গেলাম। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেল্লাম। কালান্দার ফকিরের সাজে সজ্জিত হলাম। পরিচিত জনও বুঝতে পারবে না, আমি বাদশাহ কাসিব-এর বেটা। বাগদাদে পৌঁছে চৌরাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কোথায় যাব, কোথায় গেলে আমার ঠাঁই মিলতে পারে। এমন সময় আরও দু'জন কালান্দার ফকিরের দেখা পেয়ে গেলাম। তাদেরও দাঁড়ি-গোঁফ কামানো আর বাঁ-চোখ কানা। তারপরই এ-বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লাম। আপনারা মেহেরবানি করে আশ্রয় দিলেন।

তৃতীয় কালান্দার ফকিরের কাহিনী শুনে তিন বহিনের মধ্যে বড়টি বল্ল—'ফকির সাহেব, তোমার কাহিনী আমাদের মুগ্ধ করেছে। তোমাকে আমরা মুক্তি দিলম। তুমি যেখানে খুশী যেতে পার।'

এবার উজির জাফর ছোট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে

বললেন—'আমাদের যা কিছু কথা সবই তো তোমার কাছে ব্যক্ত করেছি। আমার জীবনে তো এর চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি যা বলে তোমাদের হর্ষ উৎপাদন করতে পারি।'

বড় লেড়কিটি মুচকি হেসে বল্ল—'যাক গে, তোমাদেরও মুক্তি দিলাম। যে, যেখানে খুশী চলে যাও, আপত্তি নেই।'

লেড়কি তিনটির কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ প্রাসাদে ফিরলেন। নির্ঘুম অবস্থায় নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে তিনি রাত্রি কাটালেন।

জুবেদার জীবনকথা

পরদিন সকালে দরবারে গিয়ে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ জাফরকে ডেকে বল্লেন—'যতশীঘ্র সম্ভব সে-লেড়কি তিনটি আর তাদের কুচকুচে কালো কুকুর দুটোকে দরবারে হাজির কর।'

তিন বহিন বোরখার আড়ালে নিজেদের ঢেকে নিয়ে দরবারে খলিফা ও তাঁর পারিষদদের সামনে হাজির হল।

উজির জাফর বল্লেন—'কালরাত্রে আমরা যখন তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে আমাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করেছিলাম। এখন তোমরা খলিফা হারুণ-অল-রসিদের দরবারে উপস্থিত হয়েছ। তোমরা এখানে যা কিছু বলবে তাতে কিন্তু ভুলেও কিছু মাত্র মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। আমরা তোমাদের পরিচয় এবং মাদী কুকুর দুট্যোর কথা জানতে চাচ্ছি। বল, এ ব্যাপারে তোমাদের কি বলার আছে?'

বড় লেড়কিটি এবার এগিয়ে এসে যথোচিত কায়দায় কুর্নিশ করে বলতে শুরু করল—'জাঁহাপনা, আপনার সামনে মিথ্যা বলার ইচ্ছা আমার নেই, সম্ভবও নয়। আমার জীবন-কথা এমনই অদ্ভুত যে, নিতান্তই অবিশ্বাস্য মনে হবে। মিথ্যার প্রলেপের সন্ধান পাবেন না।'

বেগম শাহরাজাদ এ পর্যন্ত বলতেই প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের পাখিদের কলকোলাহল শুরু হয়ে গেল। তিনি কিস্সা বন্ধ করলেন।

ষোড়শ রজনী

বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগমের কাছে আস্‌তেই তিনি আবার কিস্সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা,' তারপর বড় মেয়েটি তাদের কাহিনী ব্যক্ত করতে গিয়ে বল্ল—'আমার নাম জুবেদাহ। আমার মেজো বহিনের নাম আমিনাহ আর ছোট বহিন কহিমাহ। আমাদের তিনজনেরই আব্বা একজন, আম্মা অবশ্য আলাদা আলাদা। আমার বাবার বড় বিবির গর্ভে আমার জন্ম। আমার আরও দু'জন সহোদরা ছিলেন। তাঁরা আমার চেয়ে বড় ছিলেন। আর দুই বিবির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে আমিনাহ ও কহিমাহ।

মৃত্যুকালে আমার আব্বাজী পাঁচ হাজার দিনার রেখে যান। আব্বাজী মারা গেলে কহিমা ও আমিনা তাদের আম্মার কাছে চলে যায়। আমরা তিন বহিন রয়ে গেলাম বাড়িতেই।

এক সময় আমার বড় বহিনদের শাদী হয়ে গেল। তারা আব্বাজীর রেখে যাওয়া দিনারের ভাগ দিয়ে বাণিজ্য করার ধান্দা করল। ভগ্নীপতিদের একজন তার যা কিছু অর্থ ছিল সব নিয়ে নৌকায় চাপলেন। সওদাগরী ব্যবসা করার জন্য ভিন দেশে যাত্রা করলেন। তারপর অন্যজনও একই ব্যবসার জন্য জাহাজ নিয়ে ভিন দেশের উদ্দেশে পাড়ি জমালেন। আমার বড় বহিনরাও নিজ নিজ স্বামীর সঙ্গ নিলেন।

আমি একা বাড়ি আগলাতে লাগলাম। এক এক করে চার চারটি বছর কেটে গেল। তারপর সব খুইয়ে তারা ভিখারী হয়ে ঘরে ফিরে এল। জীর্ণ তাদের বেশ। শীর্ণকায় দেহ। মাথার চুল পর্যন্ত রুক্ষ। এমতাবস্থায় আমি তাদের প্রথমে চিনতেই পারি নি। নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পর তবে চিনতে পারলাম যে, তাঁরা আমার বড় বহিন।

আমার ভগ্নীপতিরা যা কিছু সওদা করেছিল সবই লুঠপাট করে নিল। এমন কি একটি দিনারও তাঁদের সম্বল ছিল না। বেকায়দায় পড়ে তাঁরা আমার বড় বহিনদের এক শহরে ফেলে গা-ঢাকা দেয়। পালিয়ে যায়। একবস্ত্র সম্বল তাদের। দু' বছরের মধ্যে একদিনও গোসল করতে পারে নি। সবই খোদাতাল্লার মর্জি।

বাড়ি ফিরে আসার পর আমি আমার বড় বহিনদের যা কিছু দরকার সবই সরবরাহ করলাম। নতুন করে বাঁচার ধান্দা করতে বল্লাম। কবুল করলাম, আমার সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা থেকে তারা কোনদিনই বঞ্চিত হবে না।

আমার বড় বহিনরা আমার কাছেই থেকে গেল। আমি মূলধন দিয়ে তাদের ব্যবসায় লাগিয়ে দিলাম।

একদিন আমার বড় বহিনরা আবার শাদীর চিন্তা করল। তাদের ইচ্ছার কথা আমাকে জানাল। আমি সবিস্ময়ে বল্লাম—'সে কী কথা! আবারও শাদী! একবার শাদী করে তো তোমাদের যথেষ্টই শিক্ষা হয়েছে। আজ কালকার মানুষ প্রায় সবই ঠগ, আর বিশ্বাসঘাতক। প্রকৃত মানুষ নেই বল্লেই চলে।'

আমার কথা তারা শুনল না। নিজেরাই গোপনে পাত্র নির্বাচন করে ফেল্ল। ফলে অনন্যোপায় হয়েই আমি তাদের শাদীতে মত দিলাম এবং পাশে দাঁড়িয়ে যাবতীয় ব্যবস্থাদি করলাম।

শাদীর পর আমার বড় বহিনরা তাদের স্বামীদের সঙ্গে আবার সওদাগরী ব্যবসা করার জন্য ভিন্ দেশে পাড়ি জমাল।

কয়েক মাস পেরোতে না পেরোতেই এবারও পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তারা সবকিছু নষ্ট করে একেবারে নিঃস্ব-রিক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরল। আর এবারের স্বামীরাও আগের দুজনের

মতই এক জনবহুল বন্দরে তাদের ফেলে রেখে চম্পট দিল। তারা এসে গোমড়া মুখে আমার সামনে দাঁড়াল। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আমার কাছে নানাভাবে অনুশোচনা শুরু করল। আমি প্রবোধ দিলাম। তারা নিজেরাই বল্‌ল—'ভুলেও আর কোনদিন শাদীর পিঁড়িতে বসব না।' আমি তাদের আবার নতুন করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রেরণা দিতে লাগলাম।

আমরা তিন বহিন আবার এক সঙ্গে বছর খানেক কাটালাম। এবার বাণিজ্যে যাবার জন্য আমি উৎসাহী হয়ে পড়লাম। আমার বড় বহিনরাও আমার পিছু নিল। আমার জাহাজ ভাসল। আমার যা কিছু অর্থকড়ি ছিল তার অর্ধেক বাড়িতেই গোপন স্থানে মাটির তলায় পুঁতে রেখে গেলাম। অবশিষ্টাংশ নিলাম সঙ্গে। নইলে সব খুইয়ে বাড়ি ফিরতে হলে দুর্গতির সীমা থাকবে না।

আমাদের জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। কাপ্টেন ব্যাজার মুখে একদিন বল্‌লেন—'আমরা নসীবের ফেরে পড়েছি। পথভ্রষ্ট হয়েছি। বহু চেষ্টার পর একটি বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো সম্ভব হ'ল। জানা গেল বন্দরটি ডিসেম্বার্ক নামে পরিচিত।

খোদাতাল্লার নাম নিয়ে নগরের পথে চলতে লাগলাম। প্রথম দর্শনেই আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। পথের ধারে যত বাড়ি চোখে পড়ল সেগুলো সবই কুচকুচে কালো, কষ্টিপাথরের তৈরি। আরও বিস্মিত হলাম যখন দেখলাম, দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েও আমরা কোন মানুষের দেখা পেলাম না। আবার দোকান-বাজার সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দামী দামী দ্রব্য সামগ্রীতে দোকান একেবারে ঠাসা। কিন্তু কোন দোকানেই দোকানির দেখা পেলাম না।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটি চৌরাস্তার কাছে এলাম। এবার চারজন চারদিকে হাঁটা জুড়লাম। উদ্দেশ্য মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও চকচকে পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয় করা।

আমি একা একা কিছুদূর অগ্রসর হতেই বিশালায়তন একটি প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলাম। সোনার তৈরি তার সিংহদরজাটি, প্রাসাদের দরজা পর্যন্ত খাঁটি সোনার। দরজাটি ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতেই আমাকে থমকে যেতে হ'ল। সুসজ্জিত বিশালায়তন কক্ষে মণি মাণিক্য খচিত মনলোভা এক সিংহাসনে বাদশাহ উপবিষ্ট। তার উভয় পার্শ্বে নিজ নিজ সোনা ও রূপার আসনে উজির-নজির এবং আমির-ওমরাহরা অবস্থান করছেন। কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে, সবাই যেন নিষ্প্রাণ। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নিথর। ভাবলাম এ কী কারো অভিশম্পাতের জের?

আমি দরবারকক্ষ ডিঙ্গিয়ে হারেমে প্রবেশ করলাম। সেখানেও সোনার ছড়াছড়ি। বেশ কয়েকজন বেগম সোনার পালঙ্কে গা-এলিয়ে দিয়ে শুয়ে। তাদের সবার পাশেই সোনার পাখা হাতে পরিচারিকারা কেউ দাঁড়িয়ে আবার কেউ বা রূপোর জলচৌকিতে বসে। এখানেও কারো প্রাণের স্পন্দন আছে বলে মনে হ'ল না।

এবার পাশের আর একটি ঘরে ঢুকলাম। সেটি আরও মনোরম করে সাজানো।

এক এক করে অনেকগুলো কক্ষে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু ক্রমেই আমার বিস্ময় গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠল। প্রাসাদের কোথাও কোন জীবন্ত মানুষের দেখা পেলাম না। তবে এটুকু নিঃসন্দেহ হলাম যে, একদিন না একদিন এরা সবাই রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত মানুষই ছিল। ব্যাপারটি জানবার জন্য আমার অন্তরের অন্তস্থলে কৌতূহল জমাট বাঁধতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার! এতবড় একটি প্রাসাদে কোনই জীবন্ত মানুষের দেখা পেলাম না যার কাছ থেকে এখানকার রহস্যের কথা জানতে পারব। তবে এমন নিদর্শন আমার সামনে আছে যাতে করে আমি নিশ্চিত হতে পারছি কোন না কোন জীবন্ত মানুষের অস্তিত্ব এখানে রয়েছে। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত আমার বাঞ্ছিত জীবন্ত মানুষের খোঁজে প্রাসাদের সর্বত্র হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। আমি ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বাদশাহের ঘরে ফিরে এলাম। দরবার কক্ষে নয়। বাদশাহের শয়নকক্ষে। শয্যায় গা এলিয়ে দিলাম। শিয়রে একখণ্ড কোরাণ শরিফ রাখা ছিল। বিছানায় শুয়ে, ঘুমোবার আগে পর্যন্ত আমি বহুদিন ধরে কয়েক পাতা করে কোরাণ পড়ি। মন পরিষ্কার থাকে, আনন্দের সঞ্চার হয়। সোনার পাত দিয়ে যত্ন করে বাঁধানো কোরাণটি হাতে তুলে নিলাম। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে কয়েকটি উপদেশামৃত পাঠ করলাম। তারপর ধর্মগ্রন্থটি যথাস্থানে রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করলাম।

না, কিছুতেই দু' চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। মাঝরাত্রি পেরিয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন সুমিষ্ট স্বরে কোরাণের বাণী সুর করে পাঠ করছে। উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত। কোরাণের বাণীই বটে।

তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। কণ্ঠস্বরটি অনুসরণ করলাম। একটি জ্বলন্ত চিরাগ নিয়ে কণ্ঠস্বরটি অনুসরণ করে বিশালায়তন এক ঘরে ঢুকলাম। মনমুগ্ধকর কারুকার্যশোভিত একটি মসজিদ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সবুজ একটি বাতি টিম টিম করে জ্বলছে। আর মেঝেতে বসে পশ্চিম দিকে মুখ করে এক সুদর্শন যুবক মিষ্টি-মধুর সুরে কোরাণের বাণী পাঠ করে চলেছে। আমি যে তার পাশে, প্রায় গা-ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছি কিছুমাত্র খেয়ালও তার নেই।

কোরাণ পাঠরত যুবকটির পাশে দাঁড়িয়ে একটি কথাই আমার মনে বার বার জাগছিল, পাষাণ পুরীতে ছোট-বড় সবাই যখন প্রস্তরীভূত হয়ে পড়ে আছে তখন এ-যুবকটি কি করে অব্যাহতি পেল। রক্ত-মাংসের মানুষই রয়ে গেল। যদি সে মুহূর্তে প্রাসাদের

বাইরে থেকে থাকত তবু তো অভিশাপ এড়াতে পারা সম্ভব ছিল না। কারণ, প্রাসাদের বাইরেও তো কোন প্রাণবন্ত প্রাণীর দেখা মেলে নাই। তবে? কি করে এ-যুবকটি প্রাণ নিয়ে টিকে রইল?

আমি তাকে সালাম জানিয়ে বল্‌লাম—'ভাইজান, তোমার মধুরস্বরে কোরাণের বাণী পাঠ আমার মন-প্রাণকে মুগ্ধ করেছে। পাঠ করে যাও। আল্লাহর পবিত্র নাম শুনে জীবন ধন্য করি। মেহেরবানি করে পাঠ বন্ধ করো না।'

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্‌ল। তারপর তেমনি মধুর স্বরে বল্‌ল—'তোমার কথা আমি রাখব সুন্দরী। তার আগে আমাকে বল, তুমি কি করে এখানে, এ-প্রাসাদে এলে?'

তার বাঞ্ছা পূরণ করতে গিয়ে আমি তাকে আমার আদ্যোপান্তকাহিনী বল্‌লাম। তারপর তার নিটোল-নিখুঁত মুখের দিকে তাকালাম। অতি অপরূপ তার দেহসৌষ্ঠব। চোখ ফেরানো দায়। আমার দেহ-মনে রোমাঞ্চ জাগল। অন্তরের অন্তস্থলে যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁক করে দিতে লাগল আমাকে। প্রথম পরিচয়ে মুহূর্তেই নিজেকে নিঃস্ব রিক্ত করে কাউকে যে বিলিয়ে দেওয়া সম্ভব এর আগে কোনদিন বুঝিনি। আমার সবকিছু যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। আমার কথা শেষ করে তাকে বল্‌লাম—'আমার বৃত্তান্ত তো শোনালাম, এবার তবে তোমার কথা কিছু বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।'

অনিন্দ্য সুন্দর যুবকটি এবার তার কাহিনী শুরু করল—'আমার আব্বা এক সময় এ-নগরের সুলতান ছিলেন। প্রজারা তাকে অন্তর দিয়ে পেয়ার করত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তিনিও তাদের নিজের সন্তানের মতই স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে আগলে রাখতেন। কিন্তু আল্লাহর মর্জিতে এখানকার মানুষজন, পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ

সবই পাথরে পরিণত হয়ে যায়। আর ওই যে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখছ তিনিই আমার আব্বা। আর হারেমে প্রস্তরিভূত যে প্রধানা বেগমকে পালঙ্কের ওপর অর্ধ শায়িত দেখে এসেছিলে তিনিই আমাব গর্ভধারিণী।

আমার আব্বা এবং আম্মা উভয়েই যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। তারা ছিলেন অস্বাভাবিক রকম নাস্তিক। ঈশ্বরটিশ্বর মোটেই মানতেন না। কি করেই বা মানবেন? তাঁরা উভয়েই যে শয়তান নারদুন-এর বশীভূত। তাকেই মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছেন।

আমার আব্বার বিয়ের বহুদিন পর আমার জন্ম হ'ল। আমি তাঁদের একমাত্র লেড়কা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমি তাঁদের চোখের মনি হয়ে পলে পলে বাড়তে লাগলাম। আমার আব্বা আমার ওপর দুটো ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আমি যেন বড় হয়ে তাঁর মসনদের মর্যাদা রাখতে পারি। আর তাঁর একান্ত আরাধ্য শয়তান নারদুন-এর প্রতি আস্থাভাজন হই।

আগেই বলেছি আমার আব্বার আল্লাহের প্রতি কিছুমাত্রও বিশ্বাস তো ছিলই না বরং অন্তরে অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আর তাঁর প্রাসাদে ও দরবারে আল্লাহর নামাজ পড়া তো দূরের কথা তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ কবা নিষেধ ছিল। কিন্তু প্রাসাদে এক মহিলা লুকিয়ে চুরিয়ে আল্লাহ-র নামগান করত। নামাজ পড়ত। পয়গম্বর হজরত মহম্মদ-এর নাম করত। কিন্তু বাইরে, বিশেষ করে আমার বাবার কাছে প্রকাশ করত, সে যেন পরম নাস্তিক। তার মত ইসলামের শত্রু দ্বিতীয় একজন নেই। আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সে-বৃদ্ধার ওপর বর্তাল। বাবা তাকে বলেদিলেন—'আমার একমাত্র লেড়কাকে ভবিষ্যৎ যোগ্য সুলতানরূপে গড়ে তোলাই হবে তোমার একমাত্র কর্তব্য। সে যেন আমার বংশের এবং আমার মুখ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়। আর তাকে আমার উপাস্য নারদুন-এর শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত করবে।'

বৃদ্ধা রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। আমি অবশ্যই তাকে আপনার মনের মত করে তৈরি করতে পারব। সে হবে আদর্শ মানব আর আদর্শ সুলতান।'

আমার আব্বাকে কথা দেওয়ার পর সে কিন্তু গোপনে আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করল। শয়তান নারদুন-এর নামও আমাকে উচ্চারণ করতে দিল না। আমাকে কোরাণ শরিফ পাঠ করে শোনাতে লাগল। আল্লাহ-র মহিমার কথা, তাঁর ফরমানের কথা আমাকে নিয়মিত শোনাত। আমিও সর্বান্তকরণে আল্লাহ-র ফরমান মান্য করে পরম অস্তিক হয়ে উঠলাম।

আমাকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে বৃদ্ধা প্রায়ই বলত—'খবরদার, এ সব কথা যেন তোমার আব্বার কানে ভুলেও তুলো না। তিনি

টের পেলে কেলেঙ্করীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে। খেয়াল থাকে যেন। তবে কিন্তু আমার গর্দান যাবে। আমার ইচ্ছা, তোমাকে একজন আদর্শ মানব করে তুলি। এর জন্য চাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্-র প্রতি অটুট বিশ্বাস। নারদুন-এর উপাসক তোমার আব্বা অধর্মের পথে, অসত্যের পথে আর ধ্বংসের পথে অন্ধের মত ছুটে চলেছেন। তিনি শয়তানের উপাসক। নারদুন এক সাক্ষাৎ শয়তান। সে সর্বনাশের আর ধ্বংসের পথপ্রদর্শক। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও জীবনের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য ও ঔদার্য কাকে বলে তা তার অজ্ঞাত। অতএব তুমি অন্তরের প্রেম-ভালবাসা নিঙড়ে মানুষদের আপন করে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন কর। আদর্শ মানব হয়ে ওঠ।'

আমার ঈশ্বরীয় পাঠদান প্রায় শেষ করে একদিন আল্লাহ্-র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসী বৃদ্ধাটি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বেহেস্তের পথে যাত্রা করলেন।

এক মধ্যরাত্রে আল্লাহ নিদ্রিত নগরবাসীকে স্বপ্ন দেখালেন—'আর ঘুমিয়ে থেকো না। জাগ। আমিই একমাত্র উপাস্য। আমার অঙ্গুলি হেলনেই দুনিয়ার সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ব প্রপঞ্চে যা কিছুর অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছ সবই আমার সৃষ্টি। আমাতেই সৃষ্টি। আবার ক্ষয়ও আমাতেই। যাদুকর নারদুন-এর মায়া-মোহে তোমরা অন্ধ হয়ে আমাকে অস্বীকার করছ। পাপের সাগর থেকে তোমাদের উদ্ধার করে তোমাদের যথার্থ মুক্তির পথের সন্ধান দিতে তারা অক্ষম। তোমাদের মুক্তিদানের ক্ষমতা কিছুমাত্রও তাদের নেই। পাপ, অন্যায় আর ব্যাভিচারই যে তার একমাত্র অবলম্বন। আমার মধ্য দিয়েই তোমরা একদিন মুক্তির স্বাদ পাবে। সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

পাখির ডাকে ভোর হ'ল। সূর্য উঠতে না উঠতেই নগরবাসীরা দলে দলে কাতারে কাতারে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। সবার মুখেই ভীতি আর হতাশার ছাপ। সুলতান সব শুনে সরবে হেসে উঠলেন—' মুষড়ে পোড়ো না। আমাকেও শয়তানটি ওই একই রকম স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আর শাসিয়েছে তার কথামত না চললে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। ধুৎ, কিছু করতে পারবে না। নারদুনকে দিয়ে আমি সব ঠাণ্ডা করে দেব। ওসব বাজে চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেল। নারদুনই রক্ষা করবেন। তিনি সর্বশক্তির আধার। তোমরা নির্ভয়ে বাড়ি ফিরে যাও।'

সুলতানের কথা শুনে প্রজারা আশ্বস্ত হয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। পুরো একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। প্রজারা অভিশপ্ত রাত্রির ভয়ঙ্কর সে-স্বপ্নের কথা ভুলে গেল। তারপর আবার একই রকম দৈববাণী হ'ল। এখনও সময় আছে। তোমরা আমার আদেশ পালন কর। শয়তান নারদুন-এর কাছ থেকে তোমাদের বিশ্বাস-ভক্তি তুলে এনে আমার প্রতি আস্থাবান হও। অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে বলে রাখছি!'

সুলতানকে আবার সব কিছু জানানো হ'ল। তিনি এবারও পাত্তাই দিলেন না। উপরন্তু বজ্রগম্ভীর সুরে হম্বিতম্বি করলেন। নারদুনে বিশ্বাস রাখ! অগ্নির আরাধনা কর! ব্যস, সর্ব-বিঘ্ননাশ হয়ে যাবে। একমাত্র তিনিই দিতে পারেন মুক্তিপথের নির্দেশ।'

তারপরের বছর এক মাঝ-রাত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। একই স্বরে দৈববাণী হ'ল। আল্লাহ্-র ফরমান জারি হ'ল।

প্রজারা আবারও সুলতানের শরণাপন্ন হ'ল। সুলতান কিন্তু একই জেদ বজায় রাখলেন।

ব্যস, আর দেরী নয়। আল্লাহ্-র ফরমান অনুযায়ী কাজ না করায় প্রজাদের ভয়ঙ্কর এক ঘটনার মুখোমুখি হতে হ'ল। আকাশের গায়ে দেখা দিল এক উল্কাপিণ্ড। চোখের পলকে নগর জুড়ে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। ব্যস, সব শেষ। নগরে যত মানুষ ছিল সবাই চোখের পলকে পাষাণ মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেল। কেবলমাত্র-মানুষই নয়, গরু, ছাগল, ভেড়া, উঠ, গাধা আর খচ্চরগুলো পর্যন্ত বাদ গেল না। সবাই প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। ইসলামে বিশ্বাসী, আল্লাহ্-র প্রতি অকৃত্রিম আস্থাবান কেবল আমিই অব্যাহতি পেয়ে গেলাম।

ব্যস, এ-নগরীর সবাই পাষাণমূর্তি আর আমি একাই শুধু রয়ে গেলাম রক্ত-মাংসের প্রাণবন্ত মানুষ। নিঃসঙ্গ আমি সারাদিন কোরাণ শরিফ পাঠ করে, আল্লাহ্-র নামগান করে দিন গুজরান করি। সুন্দরী, এতদিন পর রক্ত-মাংসের প্রাণবন্ত মানুষ তোমাকে কাছে পেয়ে আমার মনে যে কী আনন্দ হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারব না! অনেকদিন পর প্রাণ খুলে দুটো কথা যে বলতেপারছি তা আল্লাহর দোয়াতেই।'

আমি তার আচরণে মুগ্ধ হলাম। আর তার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে তার প্রতি সহানুভূতিতে মন-প্রাণ ভরে উঠল। সমবেদনার সুরে বল্লাম—'এ-পাষাণপুরী ছেড়ে আমাদের বাগদাদ নগরীতে চল না কেন। সেখানে কেউ কারো প্রতি ঈর্ষা করে না। আল্লাহ্-র পীর হারুণ-অল-রসিদ সেখানকার শাসক। সুলতান। প্রজাবৎসল সুলতান। কেউ কোনদিন সাহায্য প্রার্থনা করে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে, শোনা যায় নি। ইসলাম ধর্মের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে জান পহচান হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গভীর তত্ত্বের সন্ধান পাবে যাতে তোমার আল্লাতাল্লার ওপর আস্থা বাড়বে। আর দ্বিধা-সংকোচ নয়। চল। আজই পাষাণপুরী ছেড়ে বেরিয়ে পড়া যাক। আর আমি এতদিন যে নিকা করিনি তা-ও হয়তো আল্লাতাল্লার মর্জিতেই। তোমাকে জুটিয়ে দেবেন বলেই হয়ত আমাকে এতদিন তিনি নিঃসঙ্গ করে রেখেছেন। বাগদাদে গিয়ে আমরা শাদী-নিকা করে স্বর্গ রচনা করি। উপলব্ধি করি জীবনের

প্রকৃত স্বাদ।'

বেগম শাহরাজাদ এ-পর্যন্ত বলে তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সপ্তদশ রজনী

বাদশাহ শারিয়ার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে বেগমের ঘরে উপস্থিত হলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—জাঁহাপনা, জুবেদা তখন বাদশাহের পুত্রের মহব্বতে মাতোয়ারা।

বাদশাহের পুত্রের ঘরেই জুবেদা রাত্রিবাস করল। সকাল হ'ল। জুবেদা বাদশাহের পুত্রের পালঙ্কে, তার পায়ের কাছে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

জুবেদা তার পরের ঘটনা সম্বন্ধে খালিফা হারুণ-অল-রসিদ'কে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, সকাল হতেই আমি চোখ মেলে তাকালাম। দেখি, বাইরের বাগানে অনেক আগেই সূর্যের আলো পৌঁছে গেছে।'

মণি-মাণিক্য প্রভৃতি বহু মূল্য রত্ন যত বেশী সম্ভব পোটলা বেঁধে নিলাম। এবার বাদশাহের পুত্রকে নিয়ে আমার দেশের উদ্দেশ্যে পা-বাড়ালাম।

জাহাজে পৌঁছে দেখি আমার অদর্শনে বড় বহিনরা খুবই মুষড়ে পড়েছেন। সবার চোখে মুখে হতাশা আর উৎকণ্ঠার ছাপ।

আমি নবাগত বাদশাহের পুত্রের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলাম। আর এ-ও বল্‌লাম—'বাদশাহের ছেলে আমার মেহবুব। আমার সঙ্গে বাগদাদ নগরে যাবে। আমরা শাদী করে সুখে ঘর-সংসার করব।' তারপর গত রাত্রে যা কিছু ঘটেছিল সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। আমার বড় বহিনেরা ছাড়া জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে খালাসীরা পর্যন্ত সবাই আমার কথায় খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল। এর একটিই কারণ—ঈর্ষা। যার ধন-সম্পদ অপরিমেয় এমন
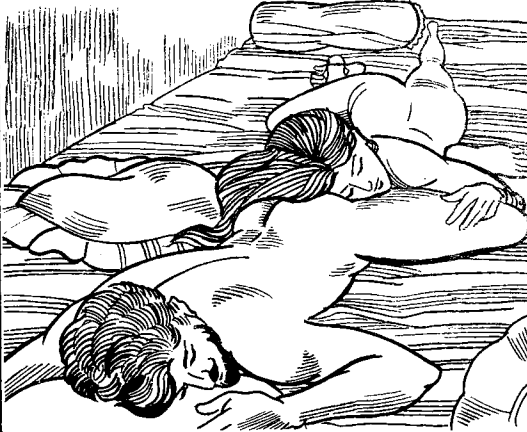
এক বাদশাহের পুত্রকে শাদী করতে চলেছি শোনার পর তো তাদের মাথা ঠিক থাকার কথাও নয়।

আমাদের জাহাজ আবার নোঙর তুলল। আমার মেহবুব সর্বদা এঁটুলির মত আমার গায়ে গায়ে লেগে থাকে। আমরা মহব্বতের সায়রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলাম।

আমার বড় বহিনরা ঈর্ষা করলে তো কিছু আর করার নেই। তারা তো শাদী করে ঘর বেঁধেছিলই। কিন্তু নসীবে জুটেছিল দু'জন প্রবঞ্চক। মধু খেয়ে প্রবঞ্চনা করে চম্পট দিয়েছে, তার জন্য আমরা তো কোন অংশেই দায়ী নই।

অনুকূল বাতাস পেয়ে আমাদের জাহাজ তীর বেগে ছুটতে শুরু করল। ক'দিন-ক'রাত্রি অনবরত জাহাজ চালিয়ে ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজকে বন্দরে নোঙর করাল। আমরা স্বদেশে পৌঁছে গেলাম।

আমরা বাড়ি পৌঁছে সামান্য বিশ্রাম নিলাম। তারপর ভাল করে গোসল সেরে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নিলাম।

রাত্রির অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এল। আমরা জাহাজের মধ্যে যে, যার মত শুয়ে পড়লাম। এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চকর অনুভূতির মধ্যে আমি নির্ঘুম রাত্রি কাটাতে লাগলাম। আমার ঈর্ষাকাতরা বড় বহিনেরা ঘুমনো তো দূরের কথা চোখের পাতা দুটো পর্যন্ত এক করল না।

আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আমার বড় বহিনরা আমাদের চ্যাঙদোলা করে সাগরের পানিতে ফেলে দিল। বরাত ভাল যে, আমরা দুজনই সাঁতার জানি। উত্তাল-উদ্দাম সাগরের সঙ্গে লড়াই করে করে আমরা কোনরকমে ডাঙায় উঠলাম।

সকাল হলে বুঝলাম, এলোমেলো ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে জাহাজ থেকে আমরা অনেক দূরে চলে গিয়েছি।

সমুদ্র সৈকত থেকে তীরের দিকে উঠতে গিয়ে সরু একটি পথের হদিস পেলাম। কিছুটা পথ যেতে না যেতেই চোখে পড়ল অতিকায় একটি সাপ ছোট্ট একটি সাপকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ছোট সাপটার জন্য মায়া হ'ল। হাত বাড়িয়ে একটি পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে বড় সাপটিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলাম। ব্যস, মুহূর্তে তার মাথাটা থেঁৎলে গেল। মরে গেল হিংসুক সাপটা।

চোখের পলকে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। ছোট সাপটা আমারই চোখের সামনে ডানা মেলে শূন্যে উড়ে যেতে লাগল।

আমার দেহ-মন উভয়ই ক্লান্ত। সাগরের সঙ্গে লড়াইয়ের জের তখনও আমার দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। ক্লান্ত দেহে পথের ধারের একটি গাছের তলায় বসে পড়লাম। কখন যে দু' চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমি বুঝতেই পারি নি।

ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে তাকাতেই আমার পায়ের কাছে এক হাবসী যুবতীকে বসে থাকতে দেখলাম। অবলুশ কালো। কিন্তু

চোখ-মুখ ভারী সুন্দর। বুঝলাম আমার পা টিপে দিচ্ছিল এতক্ষণ।

আমি সবিস্ময়ে বল্‌লাম—'তুমি কে গা? আমার কাছে এমন কি প্রত্যাশা করছ যে আমার পদসেবা করতে লেগে গেলে?'

—'তুমি তখন আমার জান বাঁচিয়েছিলে। আমি আসলে একটি জিনিয়াই। সাপের রূপ ধরে তখন পালাতে চেষ্টা করছিলাম। একটি জিনি আমার চরমতম শত্রু বড় সাপের রূপ ধরে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তার বাসনা ছিল আমার উপর বলৎকার করে। তুমি আমার ইজ্জত আর জান বাঁচিয়েছ। সে কৃতজ্ঞতাতেই তোমার পদসেবা করছিলাম। আর একই কারণে জাহাজ থেকে তোমার বড় বহিনদের তুলে নিয়ে এসেছি। ওই দেখ, যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে তাদের কালো কুত্তি করে রেখেছি। অবশ্য তোমার মন চাইলে তাদের পূর্বেকার সে-রূপও আমি ফিরিয়ে দিতে পারি।

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লাম—'দরকার নেই। তারা কালো কুত্তী হয়েই থাক। কিন্তু আমার মেহবুব, সে-বাদশাহের লেড়কার কোন হদিস দিতে পার?'

হাবসী মেয়েটির মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বল্‌ল—'আমি দুঃখিত। আমি পৌঁছবার আগেই সে

ইহলোক ত্যাগ করে আল্লাতাল্লার সঙ্গে মিলিত হতে চলে গেছে। তার সাঁতার জানা না থাকায় পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গিয়েছিল।

বড় বহিনদের ওপর রাগে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। মন চাইছিল গলা টিপে তাদের একেবারে নিকেষ করে দেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর পারলাম না। একই গর্ভে জন্ম কিনা। মায়া হ'ল।

হাবসী মেয়েটি তখন এক হাতে কুত্তী দুটোকে আর অন্য হাতে আমাকে আলতো করে ধরে শূন্যে উড়ল। নামল এসে আমার স্বদেশ বাগদাদে। আমার বাড়ির দরজায় নিয়ে সে আমাকে নামাল।

আমি যেসব ধন দৌলত জাহাজে তুলেছিলাম সবই দেখলাম আমার আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছে। আমি যখন গাছতলায় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম তখনই নাকি জিনিয়াই এগুলো এখানে রেখে গেছে।

জিনিয়াই বিদায় নিতে চাইল। যাবার আগে বল্‌ল—'সুলেমান-এর নির্দেশ অনুযায়ী কুত্তি দুটোকে রোজ তিন শ' ঘা বেত্রাঘাত করবে। যদি কোনদিন বেত্রাঘাত করতে ভুলে যাও তবে আমি অকস্মাৎ হাজির হব। আর এদের আগের রূপ ফিরিয়ে দেব।'

তারপর থেকে আমি প্রতিরাত্রেই ওদের নির্দিষ্ট সংখ্যক বেত্রাঘাত করে আসছি।

বড়বোন জুবেদা তাঁর জীবনকথা শেষ করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার কথা তো আপনার কাছে ব্যক্ত করলাম! এবার আমার বহিন আমিনা তার জীবনের অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনিয়ে আনন্দ দান করতে প্রয়াসী হবে।

আমিনার জীবনকথা

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মেজো বোন আমিনা তার জীবনকথা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আমার বড় বহিন, তাঁর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, আব্বাজী গোরে যাওয়ার পর আমরা কে কোথায় গেলাম। তার কথায় ছিল, আমি আম্মার কাছে গিয়ে বড় হতে লাগলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার আম্মা এমন এক বুড়ো বণিকের সঙ্গে আমার শাদী দিলেন যার গোরে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। ধন-দৌলতের কুমীর কিন্তু সামর্থ্য কিছুই তার ছিল না। এক বছর পেরোবার আগেই আমার বুড়ো স্বামী বেহেস্তে চলে গেলেন। আমি আশি হাজার সোনার মোহরের মালিক হলাম। আমির-বাদশাহের কাছাকাছি তখন আমার ধন-সম্পদ। গহনা আর দামি পোশাকে আমার ঘর ভরে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই মুড়ি-মুড়কির মত মোহর উড়িয়ে আমি ফতুর হয়ে গেলাম।

এক সকালে এক থুড়্থুড়ে বুড়ি আমার কাছে হাজির হ'ল। একেবারেই কদাকার তার চেহারা। এর আগে অবশ্যই তাকে কোথাও দেখিনি।

আমার সামনে এসে কুর্নিশ করল। ফ্যাসফেঁসে গলায় বল্‌ল—'একটা অনাথ লেড়কিকে আমি লালন পালন করে আজ ইয়া ডাগরটি করে তুলেছি। আজ রাত্রে তার শাদী, কিন্তু আমার হাত একেবারে শূন্য। তোমার দয়া দাক্ষিণ্যের কথা অনেক শুনেছি। তোমার মনে যা চায় আমার হাতে দিয়ে একটি অনাথ মেয়ের গতি করতে সাহায্য কর। আর একটি অনুরোধ, মেহেরবানি করে তোমাকে একবারটি আমার কুড়ে ঘরে পায়ের ধূলো দিতেই হবে।

সন্ধ্যার আগে আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, আবার পৌঁছেও দিয়ে যাব।'

আমি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলাম।

আমি বিকেল পড়তেই আমার জড়োয়ার গহনাপত্র ও সোনার জরি দেওয়া পোশাক পরিচ্ছদ গায়ে চাপিয়ে তৈরি হয়ে বুড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই বুড়িটি আমার বাড়ির দরজায় দেখা দিল।

আমার এক গাট্টাগোট্টা নোকরকে সঙ্গে নিয়ে আমি বুড়ির সঙ্গে যাত্রা করলাম। বিশালায়তন এক বাড়িতে সে আমাদের নিয়ে গেল। বাদশাহের প্রাসাদের ঢঙে বাড়িটি তৈরি। শাদীর উপযুক্ত করে ফুল-মালা আর রঙ বে-রঙের ঝাড়বাতি প্রভৃতি দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সেটিকে।

বুড়িটি আমাকে নিয়ে বড়সড় একটি ঘরে ঢুকল। তার আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে ঘরটি এমন নিপুণভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে যার বর্ণনা দিতে গেলে রাত্রি কাবার হয়ে যাবে, জাঁহাপনা।

সুনিপুণ হাতে তৈরি কারুকার্য শোভিত একটি পালঙ্কের ওপর আধা শোওয়া অবস্থায় এক রূপসী যুবতীকে দেখতে পেলাম। যাকে বলে একেবারে অপরূপা।

আমাকে দেখেই মেয়েটি হাসির প্রলেপ মুখে এঁকে ব'লে উঠল—'আমাদের নসীবের কী জোর যে, তোমার পায়ের ধূলো আমাদের জীর্ণ কুটীরে পড়ল!' কথা বলতে বলতে সে পালঙ্ক থেকে নেমে এসে আমার হাত দুটো ধরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

মেয়েটি এবার বল্‌ল—'তোমাকে একটি কথা বলার জন্য বড়ই মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করছি। শোন, আমার একটি ভাই আছে। সুঠাম দেহী। যথার্থই সুপুরুষ। অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী। তোমার রূপ দেখে সে পাগল। তোমাকে শাদী করে জীবনসঙ্গিনী করার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। বুড়িকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম কৌশলে তোমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। আমি বলব, আমার ভাই তোমার পাশে দাঁড়াবার অনুপযুক্ত অবশ্যই নয়। তুমি বরং এক কাজ কর। তাকে নিজের চোখে দেখে তবেই তোমার মতামত ব্যক্ত কর।'

আমি তার কথায় সম্মতি জানালাম।

আমার সম্মতি পেয়ে মেয়েটি দু'বার করতালি দিল। ব্যস, একটি দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। এক সুপুরুষ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে যুবকটির রূপ-সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। সত্যই রূপবান যুবকই বটে। কোন পুরুষের দেহে এমন রূপের জৌলুষ থাকতে পারে আমি ভুলেও কোনদিন ভাবিনি।

আমি যখন মুগ্ধ নয়নে যুবকটির রূপ-সৌন্দর্য পান করে চলেছি তখনই এক বৃদ্ধ মৌলভী আর চারজন সাক্ষী ঘরে ঢুকলেন।

আমার সম্মতি পাওয়ার পর মৌলভী শাদীর কবুলনামা তৈরি করলেন। সাক্ষীরা তাতে স্বাক্ষরদান করল।

কাজ সেরে মৌলভী ও সাক্ষীরা বিদায় নিলেন।

আমার সদ্য শাদী করা স্বামী একটি কোরাণ শরীফ তুলে নিয়ে বল্‌ল—'মেহবুবা, পবিত্র গ্রন্থটি স্পর্শ করে তুমি একটিবার বল, তুমি আমার, শুধুই আমার। আমাকে ছেড়ে ভুলেও কোথাও যাবে না। আর অন্য কোন পুরুষের প্রতি আসক্তি জন্মাতে মনকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেবে না।'

আমি কোরাণ শরিফ হাতে নিয়ে উচ্চারণ করলাম, তুমি আমার স্বামী, তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষের প্রতি ঝুঁকব না।

আমার স্বামী আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে মুহূর্তে আমার মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল। পুরুষের দেহের স্পর্শসুখ যে কী মধুর আমি সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম। মুহূর্তে আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। মাদকতা জাগল আমার দেহ-মনে। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। এক অনাস্বাদিত পুলকানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলাম আমি।

আমার স্বামীর বোন অনেক আগেই আমাদের কক্ষ ছেড়ে চলে গেছে। ঘরে তখন আমি আর আমার ভাল মানুষ স্বামীটি ছাড়া আর কেউ-ই নেই। আমার পরমতম প্রাপ্তির প্রথম রাত্রি।

ইতিপূর্বেও আমার একবার শাদী হয়েছিল। এক হাড় গিল্‌গিলে বুড়োর সঙ্গে। কিন্তু সে আমার দেহ স্পর্শও করতে পারে নি। আমাকে স্পর্শ করার মত সামর্থ্য বা মানসিকতা কোনটিই তার ছিল না। কিন্তু সে রাত্রে? আমার স্বামী এক মধুরতম শুভ লগ্নে আমার কুমারীত্বকে ছিনিয়ে নিল। না, ছিনিয়ে নেয় নি। আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তার হাতে নারীর অমূল্য সম্পদ কুমারীত্বকে তুলে দিলাম। আর সেই সঙ্গে তার পেশীবহুল হাতও সুপ্রশস্ত বুকের দলন, পেষণ, মর্দনের মাধ্যমে মনুষ্য জীবনের পরম প্রাপ্তি সম্ভোগ-সুখ পুরোপুরি উপভোগ করলাম। আমার স্বামী কখনও ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে, বুকে বুক রেখে আমাকে অমৃত পান করাতে লাগল। আবার কখনও বা তার বলিষ্ঠ জানুদ্বয়ের পেষণে আমার জানুদ্বয়কে পিষ্ঠ করে অবর্ণনীয় পুলকানন্দ দান করতে লাগল। সম্ভোগে নাকি পিষ্ট হয়ে—কিসে যে বেশী সুখ তা বোঝার মত ক্ষমতা তখন আমার অন্তর থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আমার আঠার বছরের যৌবনভরা দেহপল্লবটিকে তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি স্থবিরের মত পালঙ্কের ওপর এলিয়ে পড়ে রইলাম। ও যেমনভাবে খুশি ছিঁড়ে কুঁড়ে উপভোগ করুক আঠার

বছর ধরে সযত্নে রক্ষিত আমার দেহটিকে। উদ্দাম আনন্দানুভূতি আর চাওয়া পাওয়ার মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ রাত্রিটি যেন মুহূর্তে কেটে গেল।

এক-দুই-তিন করে ত্রিশটি রাত্রি যে কি করে ফুরিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না।

এক সকালে কিছু কেনাকাটা করার জন্য স্বামীর অনুমতি নিয়ে বুড়িটিকে সঙ্গে করে বাজারে গেলাম। কয়েকটি পছন্দমত দামী শাড়ি কিনলাম। দাম দিতে গিয়ে পড়লাম ফ্যাসাদে। দোকানি দাম নিতে চাইল না। বল্‌ল—আপনি এই প্রথম আমার দোকানে এলেন। আজকের কাপড় ক'টি আপনাকে উপহারস্বরূপ দিলাম। আমি ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারলাম না। রেগে গিয়ে বল্‌লাম—'দাম না নিলে আপনার শাড়ি রেখে দিন। বিনা মূল্যে আমি—'

বুড়ি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌ল—'কেন মিছে পীড়াপীড়ি করছ? ভালবেসে যদি উনি শাড়ি ক'টি দিয়েই থাকেন নিতে আপত্তি কিসের বুঝছি না তো!'

আমি কিছু বলার আগেই দোকানি এবার বল্‌ল—'আপনি মিছেই রাগের অপব্যবহার করছেন। আমি না হয় উপহারই দিলাম। কি-ই বা দাম যে, এর জন্য আপনার প্রবল আপত্তি থাকতে পারে! বিনিময়ে কেবলমাত্র আপনার মধুমাখা ঠোঁট দুটো চুম্বন আশা করছি। মেহেরবানি করে—'

আমি বুঝলুম নচ্ছার বুড়িটি কুমতলবের শিকার হয়ে আমাকে এ-দোকানে ঢুকিয়েছে।

আমি সবে অধিকতর ক্ষোভ প্রকাশ করতে যাব অমনি বুড়িটি বল্‌ল—'তুমিও পার বাপু। এতগুলো টাকার সাড়ির বিনিময়ে একটি বা দু'টি চুম্বন দিলে কি তোমার ঠোঁট দুটো ক্ষয় হয়ে যাবে? তুমি ভাবতে পারছ না, তার বাসনা পূর্ণ করলে সোনা-রূপা আর মণি মাণিক্য তোমার গা-ঢেকে দেবে।'

—'অসম্ভব। আল্লাহর নামে আমি স্বামীর কাছে কবুল করেছি কোন পুরুষের প্রতিই আমি আকৃষ্ট হ'ব না। আমার স্বামী জানতে পারলে পরিণাম কি হবে, বুঝতে পারছ?'

—'আরে ধ্যুৎ! তুমি যে এমন হদ্দ বোকা তা-তো জানতাম না! কি করে জানবে? আমরা তিনজন ছাড়া একটি কাক পক্ষীও জানতে পারবে না। যাও এগিয়ে যাও। হাতে পাওয়া জিনিস পায়ে ঠেলতে নেই।'

বুড়ির পীড়াপীড়িতে রাজি হতে বাধ্য হলাম। লোকটি আচমকা আমাকে জড়িয়ে ধরে একটি চুম্বন করল। কথা ছিল একটি মাত্র চুম্বনই সে করবে। কিন্তু পরমুহূর্তে সে আমাকে হিংস্র জানোয়ারের মত চেপে ধরল। আচমকা একটি ধাক্কা দিয়ে কোনরকমে নিজেকে

মুক্ত করে নিলাম। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। সংজ্ঞা লোপ পেল আমার। কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল বলতেপারব না। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি বুড়ি আমার মাথাটি কোলে নিয়ে বসে। গালের ক্ষতস্থানটি দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। দোকানি আতঙ্কে দোকান ছেড়ে পালিয়েছে।

বুড়ি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিল—বাছা, যা হবার তা-তো হয়েই গেছে। বাড়ি গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বে। ভাব দেখাবে যেন বুখার হয়েছে। বাঁ-দিকের গালটি চাপা দিয়ে রাখবে। কারো নজরে যেন না পড়ে। ও মাত্র দু' দিনের ব্যাপার। ব্যস, দাগটাগ কোথায় উধাও হয়ে যাবে।'

বুড়ির পরামর্শে বাড়ি ফিরে বাঁ-দিকে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। তার ওপর একটি চাদর চাপিয়ে দিলাম। বুখার।

আমার স্বামী এসে সবিস্ময়ে বল্‌ল—'তোমার তবিয়ত তো আচ্ছাই ছিল। এরই মধ্যে এমন কি বুখার হ'ল যে একেবারে বিছানা আশ্রয় করতে হ'ল?'

আমার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে সে সচকিত হয়ে বলে উঠল—'আরে ব্বাস! তোমার গালটি এমন করে কেটে গেছে! কি করে এমন সর্বনাশ হ'ল?'

—'আর বোলো না, নসীবের ফের। বাজারে যাওয়ার পথে এক বুড়ো লকড়ি বেচতে যাচ্ছিল। অন্যমনস্কতার জন্য আচমকা ধাক্কা লেগে একটু ঘায়েল হয়। দু'দিনেই শুকিয়ে মিলিয়ে যাবে।

আমার স্বামী রেগেমেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌ল—'হারামি, কাঠুরেদের ধরে এনে আমি জবাই করে ছাড়ব!'
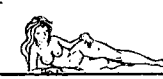
আমি কাতর মিনতি করতে লাগলাম—'ছিঃ মাথা গরম কোরো না।আমারও তো দেখে পথ চলাটা উচিত ছিল। তার ওপর কয়েকটি ছেলে আবার রাস্তায় গুলি-ডাণ্ডা খেলছিল। আমার বরাত মন্দ। অন্যকে দোষ দিয়ে কি করবে?'

—'হতচ্ছাড়ি চুপ করে থাক। তুই ডাইনি! বিশ্বাসঘাতিনী। একটি মিথ্যে ঢাকতে হাজার মিথ্যে কথা টেনে আনছিস। কোরাণ শরিফ স্পর্শ করে হলফ করার পরিণতি কি এ-ই?'

—'হারামজাদি। এবার মজাটা টের পাবি।' কথা বলতে বলতে সে বার তিনেক মেঝের ওপর পা ঠুকে আওয়াজ করতেই চোখের পলকে সাত সাতটি হাবসি ক্রীতদাস এসে কুর্নিশ করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াল। স্বামীর নির্দেশে তারা আমাকে আছাড় মেরে মেঝেতে ফেলে দিল। সুতীক্ষ্ণ তরবারি উঁচিয়ে ধরল একজন। সবার চোখ জবা ফুলের মত লাল যেন আমাকে টুকরো টুকরো করে চিবিয়ে খেয়ে নেবে।

আমার স্বামী কর্কশ গলায় গর্জে উঠলেন—'হারামজাদিকে কোতল কর। কেটে টুকরো টুকরো করে নেকড়ে দিয়ে খাওয়াবি। একমাত্র এতেই তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে।'

আমি কাতর মিনতি জানালাম—'আমাকে যখন তুমি কোতলই করবে তখন একটু বিলম্ব করলে এমন আর কি ক্ষতি হবে। গোরে যাবার আগে তোমাকে একটি কথা বলে যাচ্ছি—'যদি মহব্বতের বাতি নিজে হাতে জ্বালিয়েই ছিলে তখন তাকে আবার নেভাতে এত উৎসাহী হয়ে পড়েছ কেন? আর ফুলকে যদি এমন করে অনাদরে ঝরিয়েই দেবে তবে আর কেন মিছে সোহাগ করে তাকে ফুটাতে গেলে?'

—'চুপ কর শয়তানি ডাইনি কোথাকার। তোর মুখে মহব্বতের বুলি শোভা পায় না। তোর পিরিতের মরদগুলোকে ছেড়ে কেন আমার দিলটায় এমন করে দাগা দিতে এলি? তোর রূপ যৌবন আমাকে পাগল করেছিল। মহব্বত করতে শখ হয়েছিল। মোহান্ধ হয়ে পড়েছিলাম। আজ মোহ টুটে গেছে আমার।

আমার চোখের কোল বেয়ে পানি ঝরতে লাগল। ভাবলাম, তার অবিশ্বাস তো অমূলক নয়। কিন্তু এর জন্য আমি কতটুকু দায়ী? কতটুকু গুণাহ আমার হয়েছে?

আমার স্বামীর আচরণে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। আমার গুণাহের কথা তো তার অজ্ঞাত। কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই তার মেহবুবার জান নিচ্ছে! একেবারে কোতল! আবার এ-ও ভাবলাম— আসলে পুরুষের কাছে পেয়ার মহব্বত ছেলের হাতের মোয়ার মত। মেহবুবা বলে মনের মানুষটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ভোগ করে করে বেস্বাদ হয়ে গেলে ছলে-বলে-কৌশলে দূরে ছুঁড়ে দিল। একটি নারী, একটি যৌবন আর একই মাংসপিণ্ড কতদিন আর স্বাদ লাগতে পারে।

আঁখির পানি মুছতে মুছতে ডুকরে কেঁদে বল্‌লাম—'কোতল তো আমাকে তুমি করবেই। নসীবের ফেরে জান আমাকে দিতেই হবে। আমার মত বোকা মেয়ের নসীবে-এর চেয়ে বেশী আর কি-ই বা জুটতে পারে।'

ষণ্ডামার্কা হাবসী যুবকটি আবার আমাকে লক্ষ্য করে হাতের তরবারিটি উঁচিয়ে ধরল। এমন সময় সে-বুড়িটি থপ্ থপ্ করে ঘরের দরজার সামনে এসেই সচকিত হয়ে বলে উঠল—'একে মেরো না বাছা! জান নেয়ার মত গুস্তাকী কিছু করেনি। আমি তোমাকে পেটে না ধরলেও মায়ের মত করে মানুষ করেছি। বুকের স্তন দিয়ে তোমার জান টিকিয়ে রেখেছিলাম একদিন। যদি লঘু পাপে এমন গুরুদণ্ড দাও তবে আল্লাতাল্লা তোমাকে, কিছুতেই মাফ করবেন না।'

বুড়ির কথা আমার স্বামী ফেলতে পারল না। আমার গুস্তাকী

মাফ করল কিনা জানি না। তবে সে এবারের মত আমার জান নিল না। আবার তেমনি গর্জন করে উঠল—'ঠিক আছে, জান নেব না। কিন্তু এমন এক ক্ষতচিহ্ন এর দেহে এঁকে দেব যে, যা আমৃত্যু তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেবে।'

আমার স্বামী তখন হাবসী নোকরদের বিদায় দিল। বুড়িকে বাইরে যেতে বল্‌ল। তারপর বলপূর্বক আমার অঙ্গের যাবতীয় আচ্ছাদন খুলে একেবারে উলঙ্গ করে দিল। একটি চাবুক নিয়ে

ক্রোধোন্মত্ত সিংহের মত আমাকে একের পর এক আঘাত হানতে লাগল। কতক্ষণ যে আমার ওপর দৈহিক নির্যাতন করেছিল, বলতে পারব না। কারণ কয়েক ঘায়ের বেশী চাবুকের ঘা আমি সহ্য করতে পারিনি। সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। সংজ্ঞা ফিরে পেলে দেখি, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অসংখ্য ক্ষত। চুঁইয়ে চুঁইয়ে খুন ঝরছে।

বুড়ি কোত্থেকে যেন ভাল দাওয়াই এনে দিল। নিজে হাতে ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ দিয়ে দিতে লাগল। ক্ষত শুকোতে দেরী হ'ল না। কাল রাত্রে এ ক্ষত চিহ্নগুলোই আপনারা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

মাস চারেক পর আমি ঘর থেকে বেরোতে পারলাম। দরজার বাইরে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক ধ্বংস স্তূপ। কে বা কারা যেন চরম আক্রোশে বাড়িটিকে বিরাট একটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে দিয়েছে। অন্য সব বাড়ি অক্ষতই রয়ে গেছে। আমার স্বামীর দেখা পেলাম না। কেউ তার কোন হদিসও দিতে পারল না। বুক ভরা দুঃখ-যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে এলাম আমার ছোট বহিন কহিমা-র আশ্রয়ে। আমার দু' বহিন জুবেদা ও কহিমা আমার নসীবের বিড়ম্বনার কথা শুনে ব্যথিত-মর্মাহত হ'ল। আমাকে নানা ভাবে প্রবোধ দিল তারা। মানুষ তো কেবল একচেটিয়া সুখের প্রত্যাশাই করে। কিন্তু খোদাতাল্লার মর্জি যে তা নয়। দুঃখের পরিমাপই তিনি বেশী দেন। ফলে মানুষ সুখের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

আমরা তিন বহিন এবার থেকে এক সঙ্গে বাস করতে লাগলাম। স্বামী-নিকার ধারকাছ দিয়েও গেলাম না। আমরাই দোকানপাট সারি, রান্নাকাই, ভাগজোক করে আহার করি। আমাদের দু' বহিনের বড় জুবেদা-র মর্জি মাফিকই আমাদের সংসার চলতে লাগল।

বেশ কয়েক বছর দিব্যি কাটিয়ে দিলাম। কোন পুরুষের সাহচর্য ছাড়াই। তারপর কুলি-যুবকটিকে পেলাম আমাদের কাছে। হাসি-মস্করা আর দৈহিক সুখ ভোগের মধ্য দিয়ে পরমানন্দে আমাদের সে-দিন কেটেছিল। আমাদের অনুরোধে সে রাত্রেও আমাদের কাছে রয়ে গিয়েছিল। তারপর এল বাঁ-চোখ কানা, দাড়ি-গোঁফ কামানো কালান্দার ফকির। তারপর যা কিছু ঘটেছে, সবই তো আপনারা অবগত আছেন।

মেজো বোন আমিনা-র জীবন কথা খালিফা হারুণ-অল-রসিদকে মুগ্ধ করল।

ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন বহিনের শাদী

অষ্টাদশ রজনী

বাদশাহ শারিয়ার মধ্যরাত্রের কিছু আগে বেগম শাহরাজাদ-এর মহলে উপস্থিত হলেন।

কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন — 'জাঁহাপনা, খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর ফরমাস অনুযায়ী জুবেদা-র ছোট বহিন কহিমা সে-কালো কুত্তী দুটোকে এবং বাঁ-চোখ-কানা কালান্দার ফকির তিনজনকে তাঁর সামনে উপস্থিত করল।

লিপিকাররা খলিফার সামনে দুটো পাণ্ডুলিপি পেশ করল। তিনি বড় বহিন জুবেদা এবং মেজ বহিন আমিনার জীবন কথা লিখে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ দুটো তারই পাণ্ডুলিপি।

খলিফা এবার জুবেদাকে কাছে ডাকলেন। সে এলে তিনি নির্দেশ করলেন, যে জিনিয়াহ তার বড় দুই বহিনকে মানুষ থেকে কুত্তীতে পরিণত করেছিল তাদের ঠিকানা তাঁকে দেওয়ার জন্য।

জুবেদা বল্‌ল — 'জাঁহাপনা, এবারই তো আমাকে বিপদে ফেল্‌লেন। তাদের পাত্তা তো আমার জানা নেই।'

—'তবে তাকে পাওয়ার উপায় কি?'

—'জাঁহাপনা, তাকে কাছে পাওয়ার জন্য আমাদের যখনই দরকার পড়ে তখনই একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করি। ব্যস, সে আমাদের সামনে হাজির হয়।'

—'ভাল কথা, কি সে পদ্ধতি জানতে পারি কি?'

বড় বহিন জুবেদা এবার নিজের মাথা থেকে দু'গাছি চুল ছিঁড়ল। সে-দুটো খলিফার হাতে দিয়ে বল্‌ল — 'জাঁহাপনা, এ-দু'টোকে আগুনে পুড়িয়ে দিন। পুড়ে একেবারে নিঃশেষ হওয়া মাত্র জিনিয়াহ আমাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে।'

খলিফা চুল দু'গাছি এক কর্মচারীর হাতে দিলেন। বল্‌লেন — 'আগুন জ্বেলে এদের পুড়িয়ে দাও।'

খলিফার নির্দেশ পালিত হ'ল। চুল দু'গাছি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মাত্র সমগ্র প্রাসাদটি প্রবল ভূমিকম্পের মত দুলতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত ধরে প্রাসাদটি দুলে আবার স্বাভাবিক হ'ল। ব্যস, এবার দরজার কাছে দর্শন দিল এক কুদর্শনা হাবশী যুবতী।

জুবেদা হাবশী যুবতীকে হাতের ইশারা করে কাছে ডাকল। সে এগিয়ে এলে জুবেদা বল্‌ল — 'জাঁহাপনা, এ-ই সেই 'জিনিয়াহ, এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।'

জিনিয়াহ এবার খলিফার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। যথোচিত কায়দায় কুর্নিশ করল।

খলিফা বল্‌লেন — ' তোমার কথা আমি জানতে চাই। তুমি

নিজ মুখে বল, কিভাবে তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল?'

—'জাঁহাপনা, এক সময় এ-যুবতীর অনুগ্রহে আমার প্রাণ বেঁচেছিল। আমি তারই প্রতিদান স্বরূপ এর কিছু উপকার করতে প্রয়াসী হয়েছিলাম। এর জন্য কিছু করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।'

জাঁহাপনা, এই যে কুত্তী দুটোকে দেখতে পাচ্ছেন এরা উভয়েই এ - যুবতীর বড় বহিন। বড়ই বিশ্বাসঘাতিনী। সুযোগ বুঝে এরা তার প্রাণনাশের চেষ্টা করতেও কসুর করে নি। তাদের মনোভাবের কথা আমি নিজ ক্ষমতাবলে জানতে পারি। তখনই আমি এর বিহিত করে ফেলি। তাদের কুত্তীতে পরিণত করে দিই।'

খলিফা হারুণ - অল - রসিদ মুহূর্তের জন্য কুত্তী দুটোর দিকে তাকালেন। জিনিয়াই বল্‌ল — 'জাঁহাপনা, অবশ্য আপনি যদি এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন তবে আমি আবার যাদুবলে এদের পূর্বশ্রী ফিরিয়ে আনতে পারি। অর্থাৎ মন্ত্রবলে আবার এদের মনুষ্যদেহ দান করতে আমি সক্ষম।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খলিফা বল্‌লেন — 'জিনিয়াহ, আমার বিশ্বাস এদের কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল এরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। অতএব এদের আর কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি তো বলেইছ, তোমার যাদুবিদ্যার বলে এদের পূর্বশ্রী মনুষ্যদেহ আবার ফিরিয়ে দিতে পার। তবে তা - ই কর, এদের আবার মানুষ করে দাও।

—'জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য।'

—'হ্যাঁ, তুমি শীঘ্র এদের মনুষ্যদেহ দান কর। তারপর আমি আমিনা-র ব্যাপারটি ভেবে দেখছি, কি করা যায়। হ্যাঁ, সে যা কিছু বল্‌ল সবই যদি সত্য হয় তবে যেভাবেই হোক, তার স্বামীর সন্ধান আমাদের পেতেই হবে। তার জন্য যদি আমাকে আমার তামাম রাজ্য জুড়ে খোঁজখবর করতে হয় তবু আমি দ্বিধা করব না। আমার দেশে এমন অন্যায় - অবিচার আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। এর হিল্লে আমি করবই।'

এবার জিনিয়াই খলিফাকে কুর্নিশ করে বল্‌ল — 'জাঁহাপনা, আপনার আদেশ শিরোধার্য। আপনার বাঞ্ছা পূরণ করতে গিয়ে আমি এখনই এদের মনুষ্য দেহ ফিরিয়ে দিচ্ছি।' এবার সে হাত কচলে বিনম্র বিনয়ের সঙ্গে বল্‌ল — 'জাঁহাপনা, এর আগে একটি কথা আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই।'

—'কথা? কি সে - কথা?'

—'আমিনার স্বামীর খোঁজে আপনাকে তামাম রাজ্য ঢুঁড়ে বেড়াতে হবে না। সে আপনার কাছাকাছিই অবস্থান করছে। আপনি হাত বাড়ালেই হাতের মুঠোর মধ্যে তাকে পেয়ে যেতে পারেন।'

—'সে কী কথা! আমার কাছেই রয়েছে, অথচ আমি তাকে জানি না! কে? কে সে, বল তো?'

—'আপনার লেড়কা। আপনার লেড়কা অল-আমিন।'

জিনিয়াহ-র মুখ থেকে কথাটি বেরোতে না বেরোতেই দরবার কক্ষে নেমে এল অখণ্ড নীরবতা। সবাই নির্বাক-নিস্তব্ধ।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর মুখে নেমে এল লজ্জা, অপমান আর ঘৃণার ছাপ। বিষাদের কালোছায়া। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি হতাশার দৃষ্টিতে জিনিয়াহ-র দিকে তাকালেন।

জিনিয়াই এবার খলিফার আদেশ কার্যকরী করার জন্য তৎপর হ'ল। একটি পাথরের বাটিতে সামান্য পানি আনাল। পানির পাত্রটি হাতে নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব মন্ত্র আওড়াল। মন্ত্র পড়া শেষ হলে পানিটুকু গণ্ডুষ ভরে হাতে নিল। আবার একই রকমভাবে বিড়বিড় করতে করতে হাতের পানিটুকু কুত্তী দুটোর গায়ে ছিঁটিয়ে দিল। তার যাদুবিদ্যা কার্যকরী হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে কুত্তীর দেহ পরমা সুন্দরী দুটো মেয়ের দেহে পরিণত হতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুই যুবতী নিজ দেহ ফিরে পেয়ে খলিফাকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করল। রূপসী দুই যুবতী। জুবেদা ও তার অন্য দুই বহিনের চেয়ে এদের রূপের আভা কোন অংশে কম নয়।

দরবার কক্ষের সবাই বিস্ময়ভরা চোখে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

দরবার কক্ষে এতক্ষণ অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছিল। কারো মুখে টু-শব্দটিও ছিল না। তখন কি খলিফাও নীরবতার মধ্য দিয়ে জিনিয়াহ-র কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছিলেন? না। জিনিয়াহ একটু আগে তাঁর লেড়কা অল-আমিন সম্বন্ধে যে উক্তি করেছে তা নিয়েই তিনি আকাশ পাতাল ভেবে চলেছেন। তিনি আপন মনে ব'লে উঠলেন — তার কথাটি কি বিশ্বাস করার মত? এ-ও কি অল-আমিন-এর পক্ষে সম্ভব? সে না হয়ে অন্য কেউ হলেও না হয় ভেবে দেখা যেত। কিন্তু — না খলিফা হারুণ-অল-রসিদ আর ভাবতে পারছেন না।

কিন্তু জিনিয়াহদের কথা অবিশ্বাস করাও তো যায় না। তারা সর্বজ্ঞ। সর্বত্র তাদের অবাধ গতি। তামাম দুনিয়ার খবর তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। অতএব তার কথাটিকে পাগলের প্রলাপ ব'লে উড়িয়ে দিতে পারলেন না তিনি। অনন্যোপায় হয়ে উজির জাফরকে বল্‌লেন — 'আমার লেড়কা অল-আমিনকে দরবারে হাজির করার ব্যবস্থা কর।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই অল-আমিন দরবারে উপস্থিত হয়ে আব্বাজীকে কুর্নিশ করে এক পাশে দাঁড়াল।

খলিফা লেড়কাকে জিনিয়াহ-র কথা বল্‌লেন। কথাটি শুনে সে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে আব্বাজীর মুখের দিকে পরমুহূর্তেই জিনিয়াহ-র দিকে

তাকাল। তারপর সে যে বিবৃতি দিল তা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া কিছুই বলা যায় না। তার বক্তব্য শোনার পর তাকে তেমন দোষী বলে মনে হ'ল না।

খলিফা কিন্তু লেড়কার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সে তার বক্তব্যে আসলের চেয়ে খাদই যে বেশী সংযোজন করেছে বুঝতে পারলেন। তিনি উজিরকে বললেন — 'মৌলভীকে তলব কর। তাকে বলবে, শাদীর ব্যবস্থা করতে। আর যা কিছু লাগে সবই যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে।'

খলিফার তলব পেয়ে মৌলভী হন্তদন্ত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলেন। খলিফা তাঁকে শাদীর কবুলনামা লিখতে নির্দেশ দিলেন।

মৌলভী অল - আমিন - এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমিনা-র শাদী দিলেন। তারপর প্রথম কালান্দার ফকিরের সঙ্গে শাদী দিলেন বড় বহিন জুবেদা-র।

আর অন্য দুই বহিনের শাদী হ'ল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কালান্দার ফকিরের।

খলিফা নিজে? তিনি নিজে শাদী করলেন ছোট বহিন কহিমাকে।

শাদী হয়ে গেল। খানাপিনাও হ'ল খুবই। রাজ্যের প্রজারাও কম আনন্দ করল না।

শাদী হ'ল। সবাই আনন্দও করল প্রাণভরে। কিন্তু এদের সবার বসবাসের জন্য মহলও তো চাই। খলিফার নির্দেশে কারিগররা লেগে গেল সবার জন্য পৃথক পৃথক মহল বানাতে। সুদক্ষ কারিগররা চমৎকার সব মহল বানিয়ে ফেল্‌ল অল্প সময়ের মধ্যেই।

খলিফা নিজে উপস্থিত থেকে মহলগুলো সুন্দর করে বসবাসযোগ্য করে সাজিয়ে দিলেন।

সবাই নিজ নিজ মহলে সুখে ঘর সংসার করতে লাগল।

খণ্ডিত নারী ও তিন আপেলের কিস্‌সা

এক সন্ধ্যার কিছু আগে খলিফা হারুন-অল-রসিদ উজির জাফরকে তাঁর প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন।

উজির ব্যস্ত হয়ে খলিফার সামনে উপস্থিত হলেন। কুর্নিশ করে বললেন —'জাঁহাপনার কি আদেশ ?'

—'আজ এখনই আমি নগর পরিদর্শনে বেরুবো। আমার কাছে চারদিক থেকে বহু অভিযোগ এসেছে। আমি ঘুরে ঘুরে সবকিছু নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছুক। ওয়ালি আর নগরপালকরা নাকি কর্তব্যকর্মে অবহেলা করছে। যদি অভিযোগ সত্য হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। কঠোর শাস্তিদান করতেও আমি কুণ্ঠিত হব না।'

উজির জাফর বললেন—'জাঁহাপনা, আপনার আদেশ শিরোধার্য, আজ রাত্রেই তবে বেরুনো যাক।'

সন্ধ্যার কিছুপরে খলিফা, উজির জাফর এবং খলিফার নিজস্ব দেহরক্ষী প্রাসাদ ছেড়ে পথে নামলেন।

পথ চলতে চলতে তাঁরা পথের বাঁকে এক জেলের দেখা পেলেন। বুড়ো জাল মাথায় করে মাছ ধরে ফিরছে। পথ চলতে চলতে জেলেটি অদ্ভুত কণ্ঠে স্বগতোক্তি করতে লাগল—'সবই নসীবের ফের। তার ওপর যে দুর্দিন পড়েছে উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও রুটির জোগাড় করতে পারি না। গুড়া বাচ্চাগুলো খিদের জ্বালায় ছটফট করে। খোদা, এ কী তোমার বিচার, তোমার মর্জি কিছুই বুঝি না।'

বুড়োকে দেখে খলিফা তার কাছে গেলেন। পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন—'ভাইয়া, তোমার কিসের কারবার, বলবে কি?'

—'জেলে আমি। নদীতে মছলি ধরি। বুড়ো হয়েছি। হাড়-মাস ঠিক কাজ করতে চায় না। দেহের কলকজ্জা বেইমানি করে হরবকত। জোয়ান বয়সের মত খাটতে পারি নে।'

—'আজ মছলি পাওনি?'

—'দেখছেনই তো মাথায় জাল আর হাতে খালি ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছি। সারাটা দিন নদীর ধারে ধারে ঢুঁড়ে বেড়ালাম। শরীর কাহিল হ'ল। ঘাম ঝরল খুবই। কিন্তু একটি মছলিরও দেখা মিলল না। আজ রোজগারপাতি কিছুই হল না। গুড়া বাচ্চাদের মুখে কি দেব, ভাবছি। তারা তো পেটে কিল মেরে আমার জন্য পথ চেয়ে বসে।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বলল—'মালিক, খোদাতাল্লার কাছে আমি হরবকত আর্জি জানাই—'খোদা, আর কেন? দুনিয়ার বহুত খেলাই তো দেখলাম। এবার দোয়া করে তোমার কাছে টেনে নাও। আর পারছিনে সংসারের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে।'

—'আমি একটি কথা বলছি, মর্জি হলে রাজি হতে পার।'

—'বলুন মালিক, শুনি আপনি—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই খলিফা বলতে শুরু করলেন—'আমার সঙ্গে তোমাকে টাইগ্রিস নদীর ধারে যেতে হবে।'

—'মালিক, যদি কিছু রোজগারের ধান্দা হয় তবে আমি জাহান্নামেও যেতে রাজি আছি। টাইগ্রিস নদী তো সামান্য ব্যাপার।'

—'টাইগ্রিসের পানিতে তোমার জাল ফেলবে। জালে যা ধরা পড়বে সেটি আমার হবে। আর যদি খালি জাল উঠে আসে তবু তোমাকে বিমুখ করব না। আমি তোমাকে পারিশ্রমিক বাবদ এক শ' দিনার দেব।'

বুড়ো জেলেটি চোখে-মুখে অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের ছাপ এঁকে

খলিফার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

খলিফা বলে চললেন—'হ্যাঁ, মুখে যা বলছি, কাজেও তা-ই হবে। তোমাকে দিয়ে আজ আমি আমার বরাতের পরীক্ষা করতে চাচ্ছি। তুমি রাজি তো?'

বুড়ো জেলেটি কোন কথা না বলে টাইগ্রিস নদীর পথে হাঁটা জুড়ল।

উল্লসিত বুড়ো নদীর তীরে পৌঁছেই ঝপ্ করে পানিতে জালটি ছুঁড়ে মারল। প্রায় বৃত্তাকারে পানির ওপরে জালটি ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে অপেক্ষা করে জাল গুটাতে শুরু করল। জালে এক ভারি কি যেন আটকেছে মনে হ'ল তার। মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। ভাবল, আল্লাহ মুখ তুলে তাকিয়েছেন। কোনরকমে জালটি গুটিয়ে তীরে তুলে আনতেই বুড়োর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। হতাশায় চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল সম্পূর্ণ মুখটি। একটা বাক্স জালে বেঁধে উঠে এসেছে। বেজায় ভারি। জাল ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। টানাটানি করে কোনরকমে পাড়ে তুলল। তালাবন্ধ। বুড়ো জেলে খলিফার কাছ থেকে নগদ এক শ' দিনার বুঝে নিয়ে বেজায় খুশী হয়ে ঘরে ফিরল।

খলিফার নির্দেশে উজির জাফর এবং রক্ষী মসরু কাঁধে বয়ে বাক্সটা প্রাসাদে নিয়ে এল।

মসরু একটি হাতুড়ি নিয়ে এসে বাক্সের তালাটি ভেঙে ফেলল। ডালাটি ফাঁক করেই চমকে উঠল। হায় আল্লা! এ যে কতকগুলো শুকনো তালপাতা বোঝাই! হাল ছাড়ল না। ব্যস্ত-হাতে তালপাতাগুলো সরাতে লাগল। এবার একটা কার্পেট তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কার্পেটটি বের করতেই দেখা গেল সাদা একটি বোরখা। মসরুর কৌতূহল বেড়ে গেল। ব্যাপারটি নিয়ে খলিফার মধ্যেও কম উৎসাহের সঞ্চার হ'ল না।

খলিফা বললেন—'মসরু, বোরখাটি তোল, দেখা যাক, আর কি আছে রহস্যজনক এ বাক্সটিতে।'

খলিফার আদেশে মসরু এবার বোরখাটি সামান্য তুলেই চমকে উঠে এক লাফে অনেকখানি পিছিয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল—'হায় আল্লাহ!'

খলিফা বললেন—'কি ব্যাপার মসরু? তুমি হঠাৎ ভড়কে গেলে যে? কি আছে বাক্সের ভেতরে?'

—'জাহাপনা, লাশ! বীভৎস ব্যাপার! একটি লেড়কিকে টুকরো টুকরো করে কেটে বাক্সের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।

সামান্য এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভেতরে উঁকি দিতেই খলিফার সর্বাঙ্গে কম্পন শুরু হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর দৃশ্যই বটে, তাঁর শরীরের সব কটি স্নায়ু এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—'জাফর, আমার রাজত্বে এমন সব অমানবিক কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে। অসম্ভব! আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। তোমরা সব থাক কোথায়? তোমাদের কাড়ি কাড়ি দিনার দিয়ে পুষছি কিসের জন্য, বুঝছি না তো। কী বীভৎস
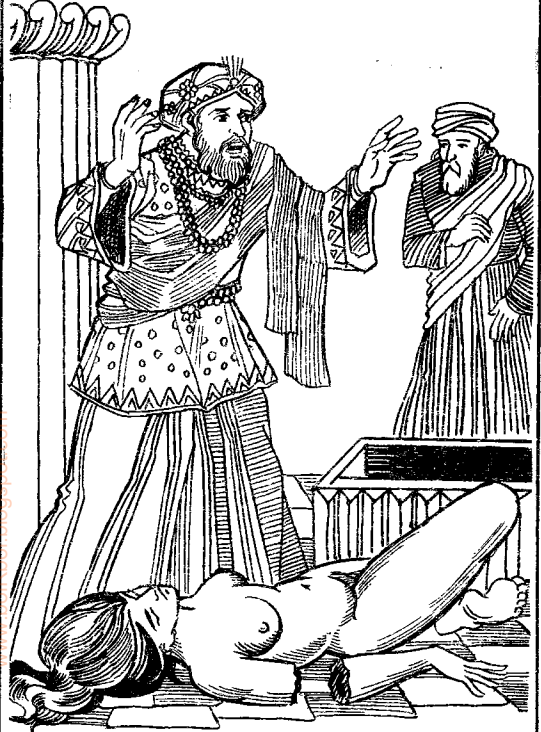
ব্যাপার! কী নৃশংস আচরণ! মানুষ মানুষকে খুন করছে, আমি যে কল্পনাও করতে পারি না!'

উজির জাফর নিতান্ত অপরাধীর মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে অসহায়ভাবে হাত কচলাতে লাগলেন।

খলিফা বলে চললেন—'তোমরা আমাকে প্রায়ই মিথ্যা প্রবোধ দাও, এমন ন্যায় বিচারের দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমার কথা মনে রেখো জাফর, অনেক ধোঁকা আমাকে দিয়েছ তোমরা। আর নয়। তোমাকে আমি তিনদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে খুনীকে পাকড়াও করে আমার সামনে হাজির করা চাই। আর যদি ব্যর্থ হও তবে তোমার গর্দান নেওয়া হবে। না, গর্দান নিয়ে তোমার শাস্তির পরিমাণ কমানো হবে না। সদর দরজায় কাঠের পাল্লার গায়ে পেরেক গেঁথে তোমাকে হত্যা করা হবে, মনে রেখো।

শুধুমাত্র তোমাকে হত্যা করেই নিবৃত্ত হব না। তোমার বংশের প্রত্যেকের গর্দান নেওয়া হবে। বংশে বাতি দেওয়ার কাউকে রাখব না। তিন-দিন—মাত্র তিনদিন সময় তোমাকে দিলাম। এ অন্যায়ের প্রতিকার না করলে অন্তিম বিচারের সময় আমি আল্লাহ-র কাছে কি জবাবদিহি করব?'

মৃত্যুভয়ে কাতর জাফর কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরলেন। এতবড় বাগদাদ নগর। কোথায় ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হত্যাকারীর খোঁজ করবেন? আর হত্যাকারী কি সামনে সাক্ষী কাউকে রেখে হত্যা করে? আর যদি কেউ দেখেই থাকে তবে তো নিজেই ছুটে এসে নবাবের দরবারে অভিযোগ করত। কী কঠিন সমস্যা রে বাবা! বিনা কারণে শেষ পর্যন্ত গর্দানটি দিতেই হবে? আবার নিছক সন্দেহের বশে কাউকে ধরে নিয়ে এসে শূলে চড়ালেও বেইমানি করা হবে, অবিচারের দায়ে আল্লাহ-র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কোথায় যাবেন উজির জাফর? কাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবেন এ নিয়ে মহা ধন্দে পড়ে গেলেন। কাউকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে খলিফার সামনে হাজির করে দিতে পারলে তাঁর নিজের ও পরিবারের সবার জান বাঁচতে পারে বটে, কিন্তু নিরীহ-নিরপরাধ একটি লোকের জান নিয়ে তবেই তা সম্ভব হতে পারে। না, এরকম একটি অধর্মের কাজ তিনি প্রাণ গেলেও করতে পারবেন না।

এক এক করে তিনটি দিন অতিবাহিত হল। উজির জাফর-এর প্রাণ ওষ্ঠাগত। এবার আর কেউ তাঁর জান বাঁচাতে পারবে না। ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে সন্ধ্যার কিছু পরে খলিফার সামনে হাজির হলেন। তাঁর নিজের জান এর জন্য যত না ভাবিত তার চেয়ে অনেক বেশী করে ভাবছেন তার পরিবারের চল্লিশজন নিরীহ মানুষের জন্য। তাঁর অযোগ্যতা অক্ষমতার জন্য শেষ পর্যন্ত পরিবারের সবার গর্দান যাবে এ যে ভাবলেও গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে। উজির জাফরকে খালি হাতে ফিরতে দেখে হারুণ-অল-রসিদ তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। গুলিবিদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠলেন—'অপদার্থ কোথাকার! তোমার গর্দান আমি নেবই।'

খলিফা এবার বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'জল্লাদ! জল্লাদ!' খলিফার তলব পেয়ে জোয়ান মরদ জল্লাদ পড়ি কি মরি করে ছুটে এল। খলিফা বললেন—'নিয়ে যাও জাফর'কে। সদর-দরজার কাঠের পাল্লায় পেরেক গেঁথে একে লটকে রাখবে।'

খলিফার অমানবিক হুকুমের কথা শুনে নগরের সবাই তো একেবারে থ বনে গেল। আতঙ্কিতও কম হল না। এমন একজন প্রবীণ, তার ওপর শিক্ষিত, নানাগুণে গুণান্বিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির ওপর খলিফার আকস্মিক ক্রোধের কারণ কি-ই বা থাকতে পারে তার কিছুই অনুমান করতে পারল না কেউ। তবে এটুকু অনুমানে বুঝল, বড় রকমের কোন গুস্তাকী না করলে কারো জান, এমন কি সবংশে নিধন করতে পারে না।

উজির জাফরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পেরেকবিদ্ধ করে হত্যা করার যাবতীয় কাজ শেষ। এখন শুধুমাত্র হাতুড়ির ঘায়ে পেরেক ঠোকার কাজটুকু বাকী।

এমন সময় এক যুবক অকস্মাৎ কৌতূহলী জনতার ভিড় ঠেলে খলিফার কাছে এসে বলল—'জাঁহাপনা, আপনি সুবিবেচক, আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ, বিনাদোষে উজির জাফরকে হত্যা করে নিজের গায়ে কলঙ্কের কালিমা লেপন করবেন না। ওঁকে মুক্তি দিন। আপনি বরং আমাকে হত্যা করে তামাম দুনিয়ার ন্যায় বিচারের স্বাক্ষর রাখুন। কারণ, মেয়েটির হত্যাকারী আমি। আমিই তাকে হত্যা করে সিন্দুক-বন্দী করে টাইগ্রিসের পানিতে ফেলেছিলাম। এতে তাঁর তো কসুর নেই।'

অজ্ঞাত যুবকটির কথা শেষ হতে না হতেই এক বৃদ্ধ এসে খলিফার সামনে দাঁড়াল। যথোচিত কায়দায় কুর্নিশ করে বলল—'জাঁহাপনা, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। ও ঝুট বাত কইছে। কসুর যা কিছু আমিই করেছি। আমার জান নিয়ে উচিত বিচার করুন। ওকে খালাস করে দিন।'

যুবক বলল—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি করে ওর কথায় কান দেবেন না। এত বয়স হয়েছে যে, ওর দিমাক ঠিকমত কাজ করছে না। মেয়েটিকে আমিই খতম করেছি। কসুর আমার। শাস্তি আমারই প্রাপ্য।'

বৃদ্ধ তখন এগিয়ে গিয়ে মিনতির স্বরে বলল—'বাছা, কেন ঝুটমুট ঝামেলা করছ! তোমার বয়স কম। জীবনে সাধ-আহ্লাদ অনেকই বাকি। আমার তো এমনিতে গোরে যাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এ নড়বড়ে দেহটার পরিবর্তে যদি তোমার, উজির সাহেবের এবং তাঁর পরিবারের এতগুলো লোকের জান বাঁচে তবে আর আমার জান দিতে আপত্তিটা কোথায়, বুঝছি না তো?'

পরিস্থিতি খুবই জটিল। এর উচিত মীমাংসা সম্ভব নয় বুঝে খলিফা ঘাতককে হুকুম দিলেন—'উজিরকে ছেড়ে দিয়ে এদের দু'জনেরই গর্দান নাও। ল্যাটা চুকে যাক।'

উজির জাফর প্রতিবাদ করে ওঠেন —'হুজুর, এতে কিন্তু ন্যায় বিচারের পরিবর্তে অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। একজনের অপরাধে দু'জনের জান নেওয়াকে মোটেই ন্যায় বিচার বলা যাবে না।'

যুবকটি উন্মাদের মত চেঁচিয়ে ওঠে—'জাঁহাপনা, আমার কথা শুনুন, আমি আল্লাহ-র নামে হলফ করে বলছি, আমি, আমি নিজের হাতে হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছি।'

—'প্রমাণ? প্রমাণ কি?' খলিফা বল্লেন।

খলিফার হুকুমে যুবকটি হত্যার ঘটনাটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বিবরণ দিল।

—'ঠিক আছে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। ভাল কথা, হত্যা তুমিই করেছ স্বীকার করে নিচ্ছি, কিভাবে তুমি হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছিলে, বল্লে। কিন্তু কেন তুমি এমন নৃশংস একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছ, তা তোমাকে বলতে হবে।'

—'বলব। তা-ও বলব জাঁহাপনা।'

—'আর একটি কথা তোমাকে বলতে হবে, লেড়কিটিকে হত্যা করার পর তুমি লাশটি গায়েব করার উদ্দেশে টাইগ্রিসের পানিতে লুকিয়ে রেখেছিলে, স্বীকার করলাম। কিন্তু এখন আবার কেন নিজের কসুর প্রমাণ করার জন্য এমন তৎপর হলে?'

—'তা-ও বলব, জাঁহাপনা। আমি এক এক করে সব বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন। যে-নারীকে আমি হত্যা করেছি সে ছিল আমার বিবি। মৌলভী সাক্ষী রেখে শাদী করেছিলাম। শাদীর পর অনেক দিন আমরা এক সঙ্গে ঘর করেছিলাম। আমার তিনটি লেড়কাকে সে গর্ভে ধারণ করেছিল। আমাকে সে নিজের জানের চেয়েও বেশী মহব্বত করত। এ মাসের প্রথমের দিকে তার বুখার হয়। একেবারে বিছানায় আশ্রয় নেয়। সবচেয়ে বড় হেকিমকে ডেকে ওর ইলাজের ব্যবস্থা করলাম। প্রচুর পয়সা ঢাললাম। কিন্তু তার বুখার কমা তো দূরের কথা বরং বেড়েই চলল।'

এক সকালে আমাকে কাতর স্বরে বলল—'বুখার আমার মুখের স্বাদ কেড়ে নিয়েছে। ভাল একটি আপেল হলে হয়ত দু'চার টুকরো খাওয়া যেত।'

আমি ভাল আপেলের খোঁজে নগরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত চুঁড়ে বেড়ালাম। প্রকৃত ভাল আপেল বলতে যা বুঝায় তার খোঁজ পেলাম না কোথাও। কিন্তু আমার ব্যর্থতার কথা তার কাছে ফাঁস করিনি। ভাবলাম, সকালে আপেলের বাগিচায় গিয়ে খোঁজ করে দেখব যদি আপেল জোগাড় করা সম্ভব হয়।

সক্কালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক এক করে অনেকগুলি আপেলের বাগিচায় চুঁড়লাম। গাছ ফাঁকা। একটিও আপেল কোথায় দেখতে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত এক বুড়ো মালি বলল—'বাছা একমাত্র বসরাহর বড় বাজারে গেলে ভাল আপেল মিললেও মিলতে পারে। সেখানে দু-চারটে আপেল আমদানি হয় বটে। কিন্তু সবই খলিফার প্রাসাদে চলে যায়। যদি তা থেকে বলে কয়ে একটি আপেল জোগাড় করতে পার।'

আমি আশান্বিত হয়ে বিবিকে বললাম—'এবার হয়ত তোমাকে আপেল খাওয়াতে পারব।'

—'তুমি আপেলের জন্য কেন এমন হন্যে হয়ে চুঁড়ে বেড়াচ্ছ? বাজারে যদি না পাওয়া যায় তাতে তো তোমার কোন কসুর নয়।' কথাটি বলেই আমার বিবি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমার মনটি খুবই বিষিয়ে উঠল। নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হ'ল। বসরাহ পনের দিনের রাস্তা। যত কষ্টই হোক, বিবিটি বুখারে কাহিল হয়ে পড়েছে। যদি একটি অন্তত আপেলের জোগাড় করা সম্ভব হয়।

বসরাহর বাজারে গিয়ে কোনক্রমে তিনটি আপেল জোগাড় করা সম্ভব হ'ল। ব্যস, আর দেরী নয়। সোজা ঘরে ফিরে এলাম। আপেল নিয়ে ফিরে এলাম ঘরে, বিবির কাছে। সোৎসাহে আপেল তিনটি ওর হাতে তুলে দিলাম। সে কিন্তু খুব খুশী হল না। নিস্পৃহ ভাবে আপেল তিনটি নিয়ে বালিশের পাশে রেখে দিল।

বিবির রকম সকম আমাকে ভাবিয়ে তুলল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম আমার অনুপস্থিতিকালে ওর বুখার খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আমি নিজেকে ওর সেবায় সঁপে দিলাম।

এমন সময় একদিন দেখি এক নিগ্রো যুবক একটি আপেল হাতে আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহল হয়। লম্বা লম্বা পায়ে তার কাছে গিয়ে বললাম—'কি হে, এমন অসময়ে আপেল কোথায় পেলে, বল তো?'

—'কোথায় আবার পাব? আমার মেহবুবা আমাকে বকশিস দিয়েছে।'

—'মেহবুবা? কে তোমার মেহবুবা? কোথায়ই বা থাকে?'

—'তাঁতীপাড়ায় যে তলাওটি আছে, তার পশ্চিম দিকের বাড়ির মালিকের বিবি আমার মেহবুবা। ওর মরদটি একেবারে বোকার হদ্দ। বিবিকে নিজের কলিজার চেয়েও বেশী পেয়ার করে। বিবির বিমার হয়েছে। ওর মরদ পনের দিন হাঁটাহাঁটি করে বসরাহর বাজার থেকে তিনটে আপেল এনে বিবির হাতে তুলে দিয়েছে, তারই একটি আমার মেহবুবা আমাকে দিয়েছে।'

কথাটি কানেই যেতেই আমার মনটি যার পর নাই বিষিয়ে উঠল। মাথায় রক্ত ওঠার জোগাড় হ'ল। মাথাটি চক্কর মেরে উঠল। দুনিয়ার সব কিছু মূল্যহীন মনে হ'ল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরলাম। বিবিকে কিছু বললাম না। সবার আগে গেলাম তার ঘরে। দেখলাম, তার বালিশের ধারে তিনটির মধ্যে দুইটি আপেল রয়েছে।

তারপরই আমার মাথাটা চক্কর মেরে উঠল। কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল বুঝতেই পারি নি। যখন আমার হুঁস হ'ল তখন দেখি, আমার হাতের ছুরিটি তার বুকে আমূল গেঁথে রয়েছে। হাতলটি তখনও আমার মুঠোর মধ্যে ধরা, আমার কলিজা এক মুহূর্তে শুকিয়ে একেবারে চিপসে গেল। আমি নিজের হাতে বিবিকে হত্যা করেছি। আমাকে শূলে চড়তেই হবে। হঠাৎ মাথায় একটি চমৎকার ফন্দি খেলে গেল। একটি বাক্স নিলাম। বিবির লাশটিকে টুকরো টুকরো করে ফেললাম। ভরলাম বাক্সটির মধ্যে। বোরখা আর কার্পেটের গায়ে রক্তের ছোপ লেগে গেছে। সেগুলোও বাক্সের

মধ্যে ভরে ফেললাম। এবার সবার ওপরে কিছু তালের পাতা চাপা দিয়ে দিলাম। তালা আটকে দিলাম বাক্সের আঙটাটির গায়ে। তারপর বাক্সটিকে মাথায় করে বয়ে নিয়ে টাইগ্রিসের পানিতে ফেলে দিয়ে তখনকার মত ব্যাপারটিকে সামাল দিলাম।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে যুবকটি কাতরস্বরে বলল—'জাঁহাপনা, আপনি ন্যায়ের পূজারী। আল্লাহ-র পয়গম্বর হয়ে দুনিয়ায় অবস্থান করছেন। আমার অপরাধের কথা তো শুনলেনই, এবার আমার প্রাণদণ্ড দিয়ে আপনার কর্তব্য পালন করুন।'

আমার বিবির মৃতদেহসমেত বাক্সটি টাইগ্রিসের জলে ডুবিয়ে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরে দেখি আমার বড় লেড়কাটি ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমি ধমকের সুরে বললাম—'হয়েছে কি রে, এমন করে কান্নার কি আছে?'

চোখ ডলতে ডলতে সে বলল—'আব্বাজী, আম্মার বালিশের পাশ থেকে একটি আপেল নিয়ে রাস্তার ধারে বসে খেলছিলাম। তিনি জানতেও পারেন নি। তখন গাট্টাগোট্টা একটি নিগ্রো সে পথ দিয়ে যাবার সময় আমার হাত থেকে আপেলটি ছিনিয়ে নিয়ে পালায়।'

ছেলের রকম সকম দেখে বুঝলাম, আপেলটি খুইয়ে ভয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকে নি। সেই থেকে দরজায় বসে কেঁদেই চলেছে। আমিও বাক্সটি নিয়ে বেরোবার সময় সে দরজার ধারে বসে থাকলেও আতঙ্ক ও ব্যস্ততার জন্য লক্ষ্য করি নি। কিন্তু তার মাকে যে আমি বেহেস্তে পাঠিয়ে দিয়েছি বিন্দুবিসর্গও তো তার জানা নেই।

রাগে-দুঃখে আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম—হতচ্ছাড়া নিগ্রোটি এমন একটি কথা বলে সব কিছু তোলপাড় করে দিয়ে গেল। তবে তো আমার বিবি একেবারে নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ ছিল। আর আমি কিনা অন্যের কথা শুনে তার কলজেটিকে টুকরো টুকরো করে দোজকে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করলাম। হত্যার পাপ আমাকে কালনাগিনীর মত দংশন করতে লাগল। সদ্য কন্যাহারা আমার শ্বশুর আর আমি সারা রাত্রি কেঁদে ভাসালাম।

জাঁহাপনা, পাঁচদিন আগে আমি এই নিষ্ঠুর হাত দুটো দিয়ে আমার কলিজার চেয়ে বড় বিবিকে হত্যা করেছি। তারপর থেকে ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে খাঁক হচ্ছি। আপনার কাছে আমার একটিই মাত্র প্রার্থনা, আমার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ন্যায় বিচার করুন। আমাকেও কৃত গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিন।

সব কিছু শুনে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ আর্তনাদ করে উঠলেন—'হারামি কাঁহাকার! হারামি নিগ্রোটিকে ধরে এনে শূলে চড়াবার ব্যবস্থা কর জাফর। ঝুট বলে সে এতবড় সর্বনাশ করেছে। যাও, যেখানে পাও খুঁজে বের কর।'

নিগ্রো রাইহানের কাহিনী

উনিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহর

খণ্ডিত নারী এবং আপেলের কাহিনী প্রায় শেষ করে শাহরাজাদ এবার নিগ্রো যুবক রাইহান-এর কাহিনী শুরু করলেন—জাঁহাপনা, তারপর কি হ'ল বলছি শুনুন—খলিফা হারুণ-অল-রসিদ নিজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিঃসন্দেহ হলেন হত্যাকারী যুবকটি প্রকৃতপক্ষে দোষী নয়। পথচারী নিগ্রো যুবকটি তাকে মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে উত্তেজিত করার জন্যই সে হঠাৎ মাথা গরম করে এমন একটি নিষ্ঠুরতম কাজ করে ফেলেছে। আর একথা শুনে খলিফা রেগেমেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেলেন।

ক্রোধোন্মত্ত খলিফা উজিরকে ডেকে বললেন—'হতচ্ছাড়া সে নিগ্রো যুবককে দরবারে হাজির করতেই হবে। যেখানে থাক, পাতালে লুকিয়ে থাকলেও আমি তাকে চাই। তাকে শূলে না চড়ানো পর্যন্ত আমার স্বস্তি নাই। আর যদি তাকে ধরে আমার সামনে হাজির করতে না পার তবে সে-শূলে তোমাকেই চড়তে হবে, খেয়াল রেখো।'

খলিফার কথায় উজির জাফর-এর চোখে নতুন করে পানি দেখা দিল। তিনি কেঁদে কেটে বলতে লাগলেন—হায় খোদা! তোমার এ কী মর্জি! তুমি কি আমার জান না নিয়ে ছাড়বেই না? এ যাত্রায় যা হোক করে জানটি রেহাই পেল বটে কিন্তু আর হয়তো এ-জান টিকবে না। এখন তুমিই একমাত্র ভরসা।

উজির জাফর পৌনেমরা হয়ে পুরো তিনটি দিন ঘরের কোণে বসে চোখের পানি ফেললেন। বাড়ির সীমানার বাইরে বেরোলেন না। ভাবলেন ইতিমধ্যে খলিফার ক্রোধ প্রশমিত হলে হতেও পারে। পাল্টে যেতে পারে তাঁর নির্মম নিষ্ঠুর মৃত্যু।

এদিকে খলিফার ক্রোধ এক তিলও প্রশমিত হ'ল না। জাফর লোকমারফৎ খবর নিয়ে জানতে পারলেন, তিনি নির্দিষ্ট দিনের প্রতীক্ষায় নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন। জাফর নির্ঘাৎ নিগ্রো যুবকটিকে তার সামনে হাজির করবেন। আর যদি ব্যর্থ হন তবুও বিকল্প ফরমাস তো জারি করেই রেখেছেন।

জাফর এক সময় বাধ্য হয়ে খলিফার সামনে হাজির হলেন। তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উইল তৈরী করে ফেললেন। এবার শেষ বিদায় নেবার পালা। বিবি ও ছেলেদের কাছ থেকে চোখের পানির বিনিময়ে বিদায় নিলেন। দুয়ারের কাছে তাঁর ছোট্ট মেয়েটি দাঁড়িয়ে। তাকে কোলে তুলে শেষ চুম্বনটি দিতে গিয়ে কোলে তুলে নিলেন। তার কামিজের জেবে ছোট কি যেন একটি রয়েছে বুঝলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'বেটি, এটা কি?'

—'আপেল। নিগ্রো যুবক রেহান চার-পাঁচদিন আগে এটি আমাকে দিয়েছিল।'

'আপেল' আর 'নিগ্রো যুবক' কথা দুটো কানে যাওয়া মাত্রই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন—'বেটি, আপেল! নিগ্রো যুবক!'

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। রেহানকে তলব করে আনলেন।'

উজির জাফর-এর তলব পেয়ে রেহান উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। জাফর জিজ্ঞাসা করলেন—'কোথা থেকে আপেলটি পেয়েছিলি, সত্যি করে বল।'

—'হুজুর, পথের ধারে কয়েকটি লেড়কা ও লেড়কি এটি নিয়ে লোফালুফি খেলছিল। আমি এক লেড়কাকে ছোট্ট করে একটি চড় মেরে এটা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম।'

—'কেন? এর উদ্দেশ্য কি ছিল?'

—'আমার ছোট লেড়কিকে দেব বলেই সেদিন অন্যায়ভাবে লেড়কাটির কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। সে কেঁদে কেঁদে বলছিল—"এটি নিও না। আমার আম্মার খুব বিমার, আমাকে খুব বকাবকি করবে। আমি তাকে না বলে চুপি-চুপি এটি নিয়ে এসেছি।" আমি তার চোখের পানির কোন দাম না দিয়েই এটি নিয়ে চলে এসেছি।'

জাফর এবার নতুনতর সমস্যার মুখোমুখি হলেন। নিগ্রো যুবক রেহান তাঁরই নোকর। সে ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত শুনলে নানা জন নানা কথা বলাবলি করবে। রসসিক্ত করে কল্পিত কাহিনীর জাল বুনতেও দ্বিধা করবে না। তবে এখন উপায়?

নসীবে যা আছে তাকে খণ্ডাবে কে? অনন্যোপায় হয়ে উজির জাফর নিগ্রো যুবক রেহানের হাতে শিকল পরিয়ে নিয়ে এলেন খলিফার দরবারে।

খলিফা রেহানের-এর মুখ থেকে আপেলের বৃত্তান্ত শুনে একেবারে থ বনে গেলেন। অবাক হবার মত কথাই বটে। অতি সামান্য একটি ব্যাপার কেমন জটপাকিয়ে সর্বনাশের চূড়ান্ত ঘটাতে পারে এর আগে কোনদিন শোনা তো দূরের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

জাফর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'জাঁহাপনা, নসীব যখন মন্দ হয়, আল্লাহ যখন মুখ ঘুরিয়ে থাকেন তখন এমন জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়ে আদমীর জান খতম হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আপেল আর নিগ্রো নোকর রেহান-এর নির্বুদ্ধিতাকে অবলম্বন করে নসীব খেল দেখিয়েছে।'

জাফর এবার মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বললেন—'জাঁহাপনা, এর চেয়ে বিস্ময়কর কাহিনী ঘটেছিল উজির নূর-অল-দিন আর তাঁর ভাই সামস্-অল-দিন এর জীবনে।'

খলিফা কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ একে বললেন—'কি ঘটেছিল দু'ভাইয়ের জীবনে, বল তো?'

—'জাঁহাপনা, আপনার বাঞ্ছা অবশ্যই পূরণ করব। তার আগে আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ—আমার নিগ্রো নোকর রেহান-এর মৃত্যু দণ্ডাদেশ দয়া করে মকুব করে দিন। আসলে এটি এক বোকার হদ্দ। কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিচ্ছু নেই। জাঁহাপনা, যা ঘটে গেছে তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। অতীতের কথা ভেবে বর্তমানকে উপেক্ষা করা মোটেই সমীচীন নয়।'

—'তোমার ইচ্ছাকেই পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আমি রেহানকে মুক্তি দিলাম। রেহান নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে দড়ি ছেঁড়া গরুর মত মালিকের বাড়ির দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

উজির সামস-অল-দিন ও নূর-অল-দিন-এর কিস্সা

উজির জাফর খলিফা হারুণ-অল-রসিদ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উজির সামস-অল-দিন ও নূর-অল-দিন এর কিসসা শুরু করতে গিয়ে বললেন—জাঁহাপনা, কোন এক সময় মিশরে মহাধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ এক সুলতান রাজত্ব করতেন। তাঁর বৃদ্ধ উজির ছিলেন একজন যথার্থই জ্ঞানী, বিভিন্ন বিষয়ে তার পারদর্শিতা ছিল অনন্য। উজির সাহেবের দুই যমজ পুত্র ছিল। তাদের একজনের নাম ছিল সামস-অল-দিন আর দ্বিতীয় জন ছিল নূর-অল-দিন। তাদের রূপ ছিল অসাধারণ। চোখ ফেরানো দায়। যেন তারা বেহেস্তের দূত।

মর্তে নেমে এসেছে আদমির সুরত নিয়ে।

এক সময় বৃদ্ধ উজির দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। সুলতান দু'ভাইয়াকে উজিরের পদে বহাল করলেন।

এক সকালে দু ভাইয়া দরবারে যাবার পথে পরস্পরের মধ্যে কথালাপ করছিল। বড় ভাইয়া বলল—'আমাদের বয়স হয়েছে এবার আমাদের শাদী করে বিবি ঘরে আনা দরকার। আর মিছে দেরি করলে গুড়া বাচ্চাদের মানুষ করে যেতে পারব না। বিদ্যাশিক্ষা, নোকরি আর শাদী দিয়ে ঘর-সংসার পেতে দিয়ে যেতে পারব না।'

—'শাদী? তোমার মর্জি মাফিকই কাজ হবে।'

—'শাদীর পর তো এমনও হতে পারে ভাইয়া, আমার লেড়কি হ'ল আর তোমার হ'ল লেড়কা। তখন তো আমার লেড়কির সঙ্গে তোমার লেড়কার শাদী দিতে হবে, তখন?'

—'আমার লেড়কাকে তোমার লেড়কির জন্য তবে কত সোনার দিনার দিতে হবে?'

—'আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি পুরো তিন হাজার সোনার দিনার আমি তোমার লেড়কার কাছ থেকে নেব। তিনটি বড় গাঁও জায়গীর আর তিনটি খামারও দাবী করব আমি। সাফ কথা শোন, তোমার লেড়কা যদি এতে রাজি না হয় তবে আর আমাদের মিছে কথাকাটাকাটি করে লাভ নেই। প্রসঙ্গটি এখানেই চাপা দিয়ে দেওয়া ভাল।'

—'ভাইয়া, তুমি মিছেই তিক্ততা সৃষ্টি করতে চাইছ। ও ভাইয়া আর বহিন মিলে ঘর বাঁধবে এতে আবার দিনারের কচকচানি আসে কি করে, বুঝছি না তো।'

—'তা হোক গে, আগে দেনা-পাওনার ব্যাপারটিরই ফয়সালা হয়ে যাওয়া উচিত। ঠিক আছে, আমি কসম খাচ্ছি তোমার লেড়কার সঙ্গে আমার লেড়কির শাদী দেব না। কিছুতেই দেব না। আমার লেড়কি টাইগ্রিসের জলে ভেসে আসবে নাকি?' রাগে গস্ গস্ করতে করতে সামস-অল-দিন বলল। বড় ভাইয়ার আচরণে নূর-অল-দিনও রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সে-ও রীতিমত উত্তেজিত স্বরেই বড় ভাইয়ার উদ্দেশ্যে কথাটি ছুঁড়ে দিল—'আরে রাম—রাম! আমার ছেলেও রূপেগুণে সবার সেরাই হবে। তখন তোমার মত কত মেয়ের বাপ পিছন পিছন ঘুর ঘুর করবে, দেখে নিও। এখন ব্যাপারটি চাপা দাও'।

বড় ভাইয়া বলল—'তোর দেমাক দেখে অবাক হচ্ছি। ঠিক আছে, কাল সুবহে তো আমি সুলতানের সঙ্গে বেরোচ্ছি, তখন আমি তোর ঔদ্ধত্য ও কার্পণ্যের কথা সুলতানের কানে তুলবই। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

পরদিন ভোরে নবাব উজির সামস-অল-দিনকে নিয়ে নীল

নদের তীরে এলেন। পালকী চেপে ভ্রমণ শুরু করলেন। জিজায় পিরামিড দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা। এদিকে বড় ভাইয়ার আচরণে নূর-অল-দিন খুবই ক্ষুব্ধ হ'ল। মনস্থ করল, এ-সুলতানিয়তেই আর থাকবে না। অন্যত্র গিয়ে নোকরি জোগাড় করে নেবে। সে নোকরকে দিয়ে নিজের ছাই রঙের খচ্চরটি তৈরী করিয়ে নিল।

নোকরটি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'হুজুর, আপনার আদেশ আমি এক্ষুণি পালন করছি। কিন্তু কোথায় যাবেন, মেহেরবানি করে এ-অধমটির কাছে বলবেন কি?'

—'কোথায় যে যাব তা আমিও ঠিক জানি না। তবে সবার আগে কালিব নগরে যাব। সেখানে দু'তিন দিন থাকার পর যেদিকে দু'চোখ যায় খচ্চরটিকে নিয়ে যাত্রা করব। মিছে আমার পাত্তা জানার চেষ্টা করিস নে। এ-স্বার্থপর, হিংসা, দ্বেষ আর রেষারেষির মধ্যে আমার আর এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই।'

নূর-অল-দিন তাঁর বাহন ছাই রঙের খচ্চরটির পিঠে চেপে অজানা উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দুপুরের দিকে বুলবেশা নগরে হাজির হ'ল। ইতিমধ্যেই কায়রো নগর পেরিয়ে এসেছে। একটি সরাইখানার দরজায় খচ্চরটিকে ছেড়ে দিয়ে খাওয়া দাওয়া করার জন্য ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর অত্যাবশ্যকীয় কিছু সামগ্রী কেনাকাটা সেরে আবার খচ্চরের পিঠে চেপে বসল। এবার হাজির হ'ল জেরুজালেম নগরে। নূর-অল-দিন পথশ্রমে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বিশ্রাম না নিলে আর চলছে না। খচ্চরটির পিঠ থেকে গালিচা আর কম্বল নামিয়ে তাকে চরতে দিল। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে তার

বড় ভাইয়াকে খোয়াবের মধ্যে দেখল। তারা দু'জনে গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে দেখল। আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল। হুড়মুড় করে উঠে বসল। তার মন-প্রাণ অস্বাভাবিক বিষিয়ে উঠল। সে বড় ভাইয়া আত্মীয় কুটুম্বদের ছেড়ে এসেছে বটে কিন্তু তাদের চিন্তা তার মাথা থেকে কিছুতেই নামছে না দেখে যারপর নাই বিস্মিত হ'ল।

সকাল হ'ল। নূর-অল-দিন আবার গাধার পিঠে চাপল। সন্ধ্যার কিছু আগে আলেপ্পো নগরে গাধা দাঁড় করাল, একটি সরাইখানার সামনে গাধাটিকে বেঁধে সে ভেতরে ঢুকে গেল। খানাপিনা সেরে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠে জায়গাটিকে ঘুরে ঘুরে দেখল। খুবই ভাল জায়গা। মনে ধরে গেল।

দুপুরের কিছু আগে আবার সে যাত্রা শুরু করল। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে নামবে একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। সংসারের স্বার্থপরতা দ্বেষ আর হানাহানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসে আজ সে যাযাবর জীবন সম্বল করেছে। পথই আজ তার একমাত্র অবলম্বন।

এবার সে সুবিখ্যাত নগর ও বন্দর বসরাহতে পৌছল। স্থানীয় ও বহিরাগত বহু সওদাগর প্রতিদিন এখানে জড়ো হয়, দ্রব্যসামগ্রী কেনা বেচা করে।

নূর-অল-দিন একটি ছোট্ট সরাইখানায় ঢুকে খানাপিনা সারল। সরাইখানার মালিক খানসাহেবের এক কর্মচারীকে নিয়ে সে এবার নগর পরিভ্রমণে বেরল। পাহাড়ী পথ। ঘন ঘন চড়াই-উৎরাই। অনভ্যস্ত পা দুটো সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। নগরের কেন্দ্রস্থল অসমতল হলেও খুব বেশী উঁচু-নিচু নয়।

নূর-অল-দিন খচ্চরটির পিঠে চড়ে বসরাহ নগর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। সরাইখানার বালক কর্মীটি পাশে পাশে পায়ে হেঁটে চলেছে। বসরাহ-র উজির নিজের বাড়ির জানালা দিয়ে শহরের শোভা দেখছেন। অকস্মাৎ সুদর্শন যুবক নূর-অল-দিনকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হলেন। এক নোকরকে বললেন—'এক ছুটে দেখে আয় তো খচ্চরটির পিঠে কে যাচ্ছে? আর সঙ্গের ওই লেড়কাটিকে ডেকে নিয়ে আসবি।'

সরাই-বালকটি এলে উজির নূর-অল-দিন-এর পরিচয় জানতে চাইলেন। সে কিছুই বলতে পারল না। তবে খানসাহেবের সরাইখানায় আজই প্রথম এসেছেন, তার সঙ্গের সমানপত্তর বহুমূল্যবান। নবাব, বাদশাহ বা সুলতানই কেবল সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

উজির খানসাহেবের সরাইখানার ঠিকানাটি নিয়ে সরাই-বালকটিকে বিদায় দিলেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই উজির সরাইখানায় এসে খানসাহেবের সঙ্গে মোলাকাৎ করলেন। উজিরের অত্যুগ্র আগ্রহে খানসাহেব অতিথি নূর-অল-দিন'কে ডেকে আনলেন।

নূর-অল-দিন উজিরকে অভ্যর্থনা করে ঘোড়া থেকে নামিয়ে সরাইখানায় নিয়ে গেল। একটি ছোট্ট খাটিয়া পেতে বসতে দিল।

কথা প্রসঙ্গে উজির বল্‌লেন—'সে কী বাছা! তুমি আমাদের দেশের মেহমান। আর তুমি কিনা এরকম একটি ভাঙাচোরা সরাইখানায় পড়ে থাকবে, হতেই পারে না, আমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবে চল। তোমার কোন আপত্তিই শুনব না।'

নূর-অল-দিন বহুভাবে আপত্তি করল। ধোপে টিকল না। অনন্যোপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত উজিরের বাড়িতে তাকে আতিথ্য গ্রহণ করতেই হল।

খানাপিনা সেরে গল্প করতে বসে প্রসঙ্গক্রমে উজির তাকে বল্‌ল—'বাছা, তোমার মনের কথা খোলসা করে বল তো—এত পথ পাড়ি দিয়ে তুমি আমাদের দেশ এ-বসরাহ নগরে এলে কেন? নিছকই দেশভ্রমণের তাগিদে, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?'

—'না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এখানে অবশ্যই আসিনি। নিছকই ঘুরে ঘুরে দেশ দেখতে দেখতে এখানে এসে পড়েছি। মিশরের সুলতানের উজির ছিলেন আমার আব্বাজী। তিনি বেহেস্তে গেলে আমরা দু'যমজ ভাই উজিরের পদে বহাল হই। কিন্তু সংসারের স্বার্থপরতা, লোভ, নীচমনোবৃত্তি প্রভৃতি দেখে বিতৃষ্ণায় আমার মন-প্রাণ বিষিয়ে ওঠে। ভাবলাম কি, এ-জায়গা তো আমার জন্য নয়। চারদিকে স্বার্থপর মানুষের ভিড়ে আমার প্রাণ তো ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছে। বিরক্ত হয়ে খচ্চরটিকে নিয়ে হারা উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে নিত্য নতুন দেশ দেখে বেড়াব, এই তো চাই। ব্যস, একদিন সত্যি সত্যি কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেলাম।

নূর-অল-দিন-এর যুবক বয়সেই ঘর-সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জেগেছে দেখে উজির সবিনয়ে বল্‌লেন—'এ কী কথা! আজ বয়স কম, রঙিন স্বপ্নে মসগুল হয়ে পড়েছ। কিন্তু চিরদিন তো আর এ-মনোভাব স্থায়ী হবে না। তারপর একদিন দেহের তাকতও কমতে থাকবে। পথ চলার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলবে। তখন কিন্তু তোমার নিজের দেহকেই এক বাড়তি বোঝা বলে মনে হবে, জেনে রাখ। তুমি সুন্দরের পিয়াসী, খুবই সত্য। কিন্তু এ-সুন্দরকে তো চিরদিন সুন্দর বলে মনে হবে না। বিতৃষ্ণা জন্মাবে। তামাম দুনিয়া চুঁড়ে চুঁড়ে না বেড়িয়ে এক জায়গায় বসেই সব সৌন্দর্যকে উপভোগ করা সম্ভব।' বৃদ্ধ উজির খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি। অমিত বুদ্ধির আধার। এমন সুদর্শন এক যুবককে পেয়ে তার মনে অদম্য উৎসাহ জাগল। মনস্থির করে ফেললেন, নিজের লেড়কিকে এর হাতে তুলে দেবেন। শাদী দিয়ে সুলতানকে অনুরোধ করে শেষে দরবারে একটি

নোকরি জোগাড় করে দেবেন।

উজির নিজের প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে মেহমান নূর-অল-দিন-এর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এক সকালে বৃদ্ধ উজির নূর-অল-দিনকে বল্‌লেন—'বাছা, আমি বুড়ো হয়েছি। আর নোকরি করার মন নেই, তাই উজিরের পদ থেকে এবার বিদায় নেব ভাবছি। সুলতানকে বলে আমার পদে তোমাকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করব। তার আগে আমার বেটির সঙ্গে তোমার শাদীর ব্যাপারটি মিটিয়ে নিতে চাই। আমার বেটিকে তো তুমি দেখেছই। সে যে খুবসুরৎ তা আমি নিজমুখে না-ই বা বললাম। বিচারের ভার আমি তোমার হাতেই দিচ্ছি। তারপর যদি মন চায় আমার বেটিকে শাদী করে তোমার জীবন-সঙ্গিনী করে নিতে পারবে।'

কথাটি শুনে নূর-অল-দিন-এর খুবই শরম হ'ল। শির নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় সঙ্কোচে লজ্জাতুর কণ্ঠে বলল—'এতে আমার আর কি বলার থাকতে পারে? আপনি ভাল বুঝে যা হয় করুন।'

নূর-অল-দীন-এর সম্মতি পেয়ে বৃদ্ধ উজিরের মনে আনন্দ যেন আর ধরে না। খুশীতে একেবারে ডগমগ। প্রাসাদের অন্দর মহলেও খুশীর জোয়ার বয়ে চলল।

উজির খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে তার বেটির শাদীর আয়োজন করলেন। আত্মীয়-বন্ধুরা কব্জী ডুবিয়ে খানাপিনা করল। দামী সরাবের বন্যা বয়ে চলল।

নিমন্ত্রিত মেহমানরা বিদায় নিলে উজির নূর-অল-দীনকে হামামে পাঠালেন। সঙ্গে দু'জন নফর গেল। হামামে যাওয়ার ব্যাপারটি সে দেশের প্রচলিত প্রথা। জামাতা বাবাজীকে হামাম থেকে গোসল সেরে বেরিয়ে লেড়কির আব্বাজীর হাত থেকে নতুন পোশাক পরতে হয়। তারপর সুসজ্জিত খচ্চরের পিঠে চেপে নগর পরিভ্রমণে বেরোবেন।

নূর-অল-দীন খচ্চরের পিঠে চেপে নগর পরিভ্রমণ করে ফিরে এল। উজির অপেক্ষা করছেন। জামাতা বাবাজীকে অভ্যর্থনা করে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন।

বেগম শাহরাজাদ দেখলেন ভোরের আলো ফুটতে আর বিলম্ব নেই। এবার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

রাত্রে আবার বাদশাহ শারিয়ার এলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সে উজির তার জামাতা নূর-অল-দীন'কে অভ্যর্থনা করে অন্দরমহলে নিয়ে ফুলমালায় সুশোভিত একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

নূর-অল-দীন দেখল তার বিবি সোনার জরিবুটি দেওয়া ঝলমলে পোশাক পরে সুসজ্জিত পালঙ্কের ওপর অপেক্ষা করছে।
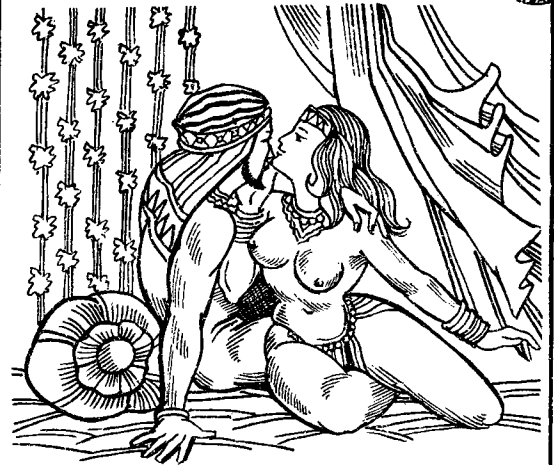
আজ তার জীবনে সবচেয়ে মধুর রাত্রি। সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত। আজই প্রথম চরম আনন্দের স্বাদলাভে জীবন ধন্য হবে।

নূর-অল-দীন সদ্য শাদীকরা বিবিকে পাশে বসিয়ে দেশ-বিদেশের বহু চটকদার গল্প শোনাল।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। নূর-অল-দীন তার বিবিকে বুকে টেনে নিল। একে অন্যের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল। দোহে মিলে এক ও অভিন্ন। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না।

ছোট ভাইয়া নূর-অল-দীন যখন সদ্যবিবাহিতা বিবিকে নিয়ে আনন্দে মসগুল হয়ে দিন কাটাচ্ছে তখন তার বড় ভাইয়া সামস-অল-দীন সুলতানের সঙ্গে গীজের পিরামিড দেখে বাড়ি ফিরল। দেখে, নূর-অল-দীন বাড়িতে অনুপস্থিত।

নফরের মুখে সামস-অল-দীন শুনল, ক'দিন আগে তার ছোট ভাইয়া খচ্চরের পিঠে চেপে কোথায় গেছে। ব্যস্ আর বাড়ি ফেরে নি। কোথায় গেছে, কবে ফিরবে কিছুই নাকি বলে যায় নি।

সামস-অল-দীন ছোট ভাইয়ার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। তার বুঝতে কিন্তু বাকি রইল না যে, রাগের মাথায় সেদিন যেসব অসঙ্গত কথা বলেছে তারই ফলে তার ভাইয়া ঘর-সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেছে। নিজের কাজের জন্য খুবই মর্মাহত হ'ল সে।

উপায়ন্তর না দেখে সামস-অল-দীন সুলতানের কাছে সবকিছু খোলসা করে বললেন, সুলতান ব্যাপারটিতে মনে খুবই ব্যথা পেলেন।

ব্যথিত মর্মাহত সুলতান বহু দেশের দরবারে দূত পাঠিয়ে নূর-অল-দীন-এর খবরাখবর নিতে লাগলেন। বৃথা চেষ্টা। দূতরা এক এক করে খালি হাতে ফিরে এল। দূতদের কেউ-ই কিন্তু বসরাহ

রাজ্যে যায় নি। কেন যে তারা একটিমাত্র রাজ্য বাদ দিল এ নিয়ে কারো মনেই কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় নি।

ছোট ভাইয়ার খোঁজ না পেয়ে সামস-অল-দীন বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। একমাত্র নিজের দোষেই সে তার প্রাণপ্রতীম ভাইকে হারিয়েছেন। তার শোক ক্রমে মন থেকে মুছে যেতে যেতে এক সময় একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। স্বাভাবিকতা ফিরে পেল সে।

সামস-অল্ল-দীন বিয়ে শাদী করে ঘর বাঁধল। তার জীবনে আবার হাসি আনন্দের জোয়ার নেমে এল।

আল্লাহ-র মর্জি মানুষের বুঝা ভার। তা নইলে ছোট ভাইয়া নূর-অল-দীন-এর শাদীর রাতেই বড় ভাইয়া সামস-অল-দীন-এর বিয়ে কি করে সম্ভব হ'ল? আরও আছে—নূর-অল-দীন-এর বিবি যে-রাত্রে অন্তঃসত্ত্বা হ'ল সে-রাত্রেই সামস-অল-দীন-এর বিবিও গর্ভে সন্তান ধারণ করল! আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি! একমাত্র আল্লাহর খেয়ালের ফলেই এমনটি সম্ভব হতে পারে।

নূর-অল-দীন-এর শাদীর ব্যাপার স্যাপার মিটে গেলে বৃদ্ধ উজির তাকে নিয়ে সুলতানের দরবারে হাজির হলেন। সুদর্শন নূর-অল-দীন'কে প্রথম দর্শনেই সুলতানের মধ্যে স্নেহের উদ্রেক ঘটল। বৃদ্ধ উজির প্রস্তাব দেওয়ামাত্রই তিনি তাকে উজিরের পদে বহাল করতে সম্মত হলেন।

সুলতানের নির্দেশে বৃদ্ধ উজির তার জামাতা নূর-অল-দীনকে উজিরের কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিলেন।

নূর-অল-দীন উজিরের পদলাভ করলেন। সেই সঙ্গে সুন্দর বাসস্থল, আসবাবপত্র, নফর, খচ্চর ও ঘোড়া প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যা কিছু দরকার সবই পেল।

যথাসময়ে নূর-অল-দীন-এর এক লেড়কা জন্মগ্রহণ করল। আবার ঠিক সেদিনই তার দেশের বাড়িতে তার বড় ভাইয়ার একটি লেড়কী জন্মায়। নূর-অল-দীন তার লেড়কার নাম রাখল হাসান-বদর-অল-দীন।

এদিকে সুলতানের দরবারে নূর-অল-দীন-এর খুবই সুখ্যাতি। সে যেমন কাজকর্মের দিক থেকে বিচক্ষণ তেমনি ব্যবহারও খুবই মধুর। সবার সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলে। সুলতান তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার বেতন বাড়িয়ে দিলেন বেশ কিছু দিনার। হবে না-ই বা কেন? রাজস্বও যে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উজির যখন মারা গেলেন তখন হাসান-বদর-অল-দীন-এর ওমর মাত্র চার সাল। উজিরের মৃত্যুতে সে পদে আসীন হয় নূর-অল-দীন। উজিরের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সর্বদাই কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয় তাকে। তা সত্ত্বেও বেটার শিক্ষা দীক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলত। ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ে অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রভূত জ্ঞানলাভ করল। তার ওমর যখন বারো সাল হ'ল তখন মৌলভী নূর-অল-দীন-'কে বলল—'তোমার বেটাকে আমার আর কিছু দেবার নেই। আমার বিদ্যা সবই ওকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি।'

নূর-অল-দীন তার বেটা হাসানকে নিয়ে সুলতানের দরবারে হাজির হ'ল। তাকে দেখে সুলতান চমৎকৃত হলেন। তার রূপগুণে তিনি যারপর নাই মুগ্ধ হলেন। তিনি উজির নূরকে ডেকে বললেন—'আমার হুকুম, তুমি রোজ দরবারে আসার সময় তোমার বেটা হাসান'কে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।'

উজির নূর সোল্লাসে বলল—'জী হুজুর। অবশ্যই নিয়ে আসব, আপনার হুকুম তামিল করব, কথা দিচ্ছি।'

তারপর থেকে উজির নূর রোজ তার বেটা হাসান'কে সঙ্গে করে দরবারে নিয়ে যায়। সুলতান তাকে পাশে বসিয়ে খুব আদর যত্ন করেন।

উজির নূর-অল-দীন-এর সংসার হাসি-আনন্দের মধ্যেই কাটতে লাগল।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন নূর-অল-দীন বিমারে পড়ল। বিমার ক্রমেই বেড়ে চলল। অভিজ্ঞ হেকিম ডাকা হ'ল। কোন ফল হ'ল না। হেকিম জবাব দিয়ে গেল।

নূর-অল-দীন বুঝল, দিন ঘনিয়ে এসেছে। বেটা হাসান'কে ডেকে বলল—'বেটা, আল্লাহ-র কাছ থেকে আমার ডাক এসেছে। আমাকে চলে যেতেই হবে। এ-সংসার তো সরাইখানারই নামান্তর মাত্র। দু'চারদিনের জন্য আসা। মায়া মোহে জড়িয়ে থাকা বৈ তো নয়। এবার মায়া কাটিয়ে বিদায় নেব। আবার বেহেস্তে ফিরে যাব। সেখানে কেবল সুখ-আনন্দ। আনন্দের ছড়াছড়ি।'

বেটা, আমার যা কিছু কর্তব্য সবই খতম করেছি। মাত্র একটি কাজই করার বাকি রয়ে গেছে। তোমাকে সে-কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছি। কায়রোতে আমার এক বড়ভাই আছে। তার নাম সামস-অল-দীন। সুলতানের উজিরের পদে বহাল রয়েছে। আমিও সেখানকার উজির ছিলাম এক সময়। সামান্য একটি কারণে বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমার মতবিরোধ ঘটে, আর তারই ফলে আমি স্বদেশ ত্যাগ করে বহুদেশ ঘুরে এখানে হাজির হই। এবার হাসান-এর দিকে চোখ রেখে বলল—'কাগজ-কলম নিয়ে আমার সামনে বোসো।'

হাসান তাড়াতাড়ি এক টুকরো তুলোট কাগজ আর কলম নিয়ে বাপের সামনে বসল। নূর বলল—'বেটা, আমি যা যা বলছি লিখে নাও।'

নূর কবে কায়রো ত্যাগ করেছিল, কবে ও কিভাবে বসরাহ নগরে হাজির হয়েছিল, কবে সুলতানের সঙ্গে পরিচয় হয়, কবে

উজিরের লেড়কিকে শাদী করে, কবে তার বিবি অন্তঃসত্ত্বা হয়, কবে হাসান-এর জন্ম হয় প্রভৃতি বিবরণ দিল আর হাসান সবকিছু হুবহু লিখে নিল। তারপর নূর বলল— 'বেটা, কাগজটি যত্ন করে রেখো। সময় মত বের করবে, অশেষ উপকারে আসবে, আর আমার মৃত্যুর পর একবারটি তুমি স্বদেশ থেকে ঘুরে এসো, আমার বড় ভাইয়াকে বোলো, তার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলাম না বলে আমি বড়ই মর্মবেদনা নিয়ে যাচ্ছি।'

সে ঘটনার মাত্র একদিন পরেই নূর-অল-দীন-এর মৃত্যু হ'ল। পুত্র হাসান-বদর-অল-দীন চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে তার আব্বার গোর দিল। শোকে খুবই ভেঙে পড়েছে, কোন কাজেই মন নেই। সর্বদা মনমরা হয়ে বসে থাকে। সুলতান তাকে উজিরের পদে বহাল করবেন বলে দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য বারবার তলব পাঠান। কিন্তু হাসান-এর কিছুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই।

হাসান একটি মাত্র কাজকেই এ-মুহূর্তে অবশ্য করণীয় জ্ঞান করছে। তাকে কায়রোতে যেতে হবে। তার বাবার শেষ বাঞ্ছা তাকে পূরণ করতেই হবে।

এদিকে হাসান-এর আচরণে সুলতান যারপর নাই অপমানবোধ করলেন। ক্রোধোন্মত্ত সুলতান তাঁর কয়েকজন সিপাহীকে আদেশ দিলেন—'হাসান যেখানে, যে-অবস্থাতেই থাক না কেন, হাতে শিকল পরিয়ে আমার সামনে হাজির কর।'

সুলতানের হুকুমে সৈন্যরা হাসান'কে শিকল পরিয়ে দরবারে হাজির করার জন্য ছুটল। সময়মত হাসান-এর এক বিশ্বস্ত অনুচর তাকে সতর্ক করে দিল। তাড়াতাড়ি এ সুলতানিয়ৎ ছেড়ে যাবার জন্য অনুরোধ করল।

অনুচরটির কথা শুনে হাসান প্রমাদ গুণল। সে অনুচরটির কাছ থেকে কিছু দিনার ধারস্বরূপ নিয়ে দীন ভিখারীর সাজে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে পথে নামল। ভাবল, তার আব্বার গোরস্থানে গিয়ে রাত্রিটুকু কাটিয়ে নেবে। তারপর রাত্রির চতুর্থ প্রহরে সে যখন তার বাবার গোরস্থানে বসে চোখের পানি ফেলছে তখন হঠাৎ এক জু অভাবনীয়ভাবে সেখানে হাজির হ'ল। বসরাহ-র ধনকুবের বণিক। সরবে হেসে বলল—'হুজুর, আপনি হঠাৎ এখানে কেন ?'

—'আরে, আর বোলো না! আজ দুপুরে এক খোয়াব দেখেছি, আমার বাবা যেন বলছেন, আমার কবরের ধারে একবারটি যাস্। একটি জরুরী কথা তোকে বলব।'

তারপর আশায় বুক বেঁধে এখানে এসে বসে আছি। চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত আওয়াজ করে জু বলল—'আপনার বাবার মত ভাল মানুষ দ্বিতীয় আর একজন দেখিনি। আহারে! কী স্নেহই না করতেন আমাকে! একটি কথা আপনাকে বলার জন্য ছটফট করছি। বলার সুযোগ আর হয় নি। আপনার আব্বার যে জাহাজের ব্যবসা ছিল আশাকরি আপনার অজানা নয়। তাঁর সঙ্গে আমার কথা একরকম পাকাপাকিই হয়ে গিয়েছিল, আমি তার জাহাজ কিনে নেব। কিন্তু জাহাজটি হস্তান্তর হওয়ার আগেই তিনি বেহেস্তে চলে গেলেন। আপনি চাইলে আমি একটি জাহাজ নগদ এক হাজার দিনারের বিনিময়ে কিনে নিতে ইচ্ছুক।'

হাসান বণিকটির কথায় আপত্তি করতে না পেরে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে একটি জাহাজ তার কাছে বেচে দিল। আর একটি রসিদও লিখে দিল—"আমি হাসান-বদর-অল-দীন, পরলোকগত উজির নূর-অল-দীন-এর একমাত্র ছেলে—আপনার কাছ থেকে নগদ এক হাজার দিনার বুঝে পেয়ে (পিতার) সম্প্রতি আমার একটি সওদাগরী জাহাজ বিক্রি করলাম। আর এ-ও কথা থাকছে, আমার যে জাহাজটি বন্দরে প্রথম ভিড়বে সেটিই আপনার হাতে তুলে দেব।" হাসান দলিলটিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করে জু-এর হাতে তুলে দিল। সে বহুভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিল। হাসান রাত্রির অন্ধকারে আবার একা বসে রইল। তৃতীয় প্রহরে আব্বাজীর সমাধি সৌধের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নিঃঝুম নিস্তব্ধ গোরস্থানে গভীর রাত্রে প্রেতাত্মাদের আগমন ঘটে। আর আসে জীন ও পরীরা। তখন এক জিনিয়াহ সেখানে হাজির। খুবসুরৎ হাসান'কে দেখে তার মনে পুলকের সঞ্চার ঘটে। সে নিজেও খুবসুরৎ দেখতে। হাসান'কে দেখামাত্রই সে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু তখন তার ঘুম ভাঙাল না। ভাবল, একটু ঢুঁড়ে এসে একে জাগিয়ে গল্পগুজব করবে। আবার পাখা মেলল।

আকাশ পথে ঢুঁড়তে গিয়ে অন্য এক জিনিয়াহর সঙ্গে তার দেখা হয়। সে কায়রো নগর থেকে আসছে। কুশলবার্তাদি আদান-প্রদানের পর জিনিয়াহ তাকে নিয়ে গোরস্থানে এল একটি জিনিস দেখাবার লোভ দেখিয়ে।

হাসান-এর যৌবনভরা দেহের রূপ সৌন্দর্য দেখে জিনিয়াহও

মুগ্ধ হয়ে গেল। জিনি বলল—'উজির নূর-অল-দীন-এর বেটা হাসান নাকি তামাম দুনিয়ার যুবকদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু এ-যুবকও তো খুবসুর-ৎই বটে। কমতি কিসে? আর কায়রোর উজির সামস-অল-দীন-এর বেটিকেও দেখেছি। কী সুরৎ! হুরী পরীর-মত দেখতে। এর শাদী যদি কোন দিন হয় তবে একমাত্র সে-লেড়কিকেই এর পাশে মানাবে।

—'আমি সে-লেড়কিকে কোনদিন চোখে দেখি নি। তার কথা শুনিও নি কোনদিন।'

—'তবে বলছি শোন, এমন রূপ-যৌবনের আকর লেড়কিটি খুবই হতভাগিনী।'

উজিরের খুবসুরৎ লেড়কি দেখে সুলতানের মাথা বিগড়ে যাওয়ার জোগাড়। উজিরকে একদিন বললেন—'শোন, তোমার বেটিকে আমি শাদী করতে চাই। তুমি রাজি হয়ে যাও।'

চমকে উঠে উজির বলল,—'জাঁহাপনা, আমার গোস্তাকী মাফ করবেন। আপনার তো আর অজানা নয় আমার ছোট ভাইয়া নূর-অল-দীন বিবাগী হয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছে। আমাদের মধ্যে একদিন কথা হয়েছিল, আমার বেটির সঙ্গে তার বেটার শাদী দেব। আমি জেনেছি, তার বেটা বসরাহতে আছে। জোয়ান মরদ হয়েছে। আমার ভাই কিছু দিন আগে বেহেস্তে গিয়েছে। আমি যদি কথার খিলাফ করি তবে আমার গুনাহ হবে, ঠিক কিনা? ছোট ভাইয়া বেহেস্তে গিয়েও স্বস্তি পাবে না। জাঁহাপনা আমাকে সত্যরক্ষা থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনি সুলতান, আপনি মন করলে তামাম দুনিয়ার খুবসুরৎ লেড়কির হাট বসিয়ে দিতে পারেন প্রাসাদের সামনে।'

উজিরের কথায় সুলতান রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তাকে প্রত্যাখ্যান করে উজির রীতিমত অপমান করেছে। কোথায় সানন্দে বেটিকে সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে বাপ-বেটির জীবন ধন্য করবে, তা না করে মুখের ওপরে প্রত্যাখ্যান! ক্রোধোন্মত্ত সুলতান রাগে গস্ গস্ করতে করতে তার এক হতকুৎসিত সহিসের সাহায্যকারীকে তলব দিলেন। একেবারে অষ্টাবক্র চেহারা। সোজা হয়ে কোনদিনই সে দাঁড়াতে পারে নি। ভাঙাচোরা কিছু হাড়গোড় জোড়া দিয়ে যেন তার চেহারাটিকে গড়ে তোলা হয়েছে।

সুলতানের তলব পেয়ে অষ্টাবক্র লোকটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কুর্নিশ সেরে দুরু দুরু বুকে দাঁড়াল। ভেবেছে, নির্ঘাৎ কোন অমার্জনীয় কসুর করে ফেলেছে। নইলে খোদ সুলতানের দরবারে তার ডাক পড়বে কেন?

তাকে দেখেই সুলতান বললেন—'আজ রাত্রেই তোমার শাদী হবে, তৈরী থেকো।'

শাদীর কথা শুনে অষ্টাবক্র লোকটি মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হ'ল। তার বুকের ভেতরে কলিজাটি বার বার মোঁচড় খেতে লাগল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে, বারকয়েক ঢোক গিলে বলল—'জাঁহাপনা, আমার রূপ নিয়ে সবাই মস্করা করে। নসীবের ফের ভেবে মুখবুজে হজম করি সব অপমান নির্যাতন। আজ আপনিও—'

সুলতান ধমকের সুরে বললেন—'বাজে কথা রাখ। আমি পরিচারক-পরিচারিকাদের বলে দিচ্ছি তোমাকে গোসল করিয়ে শাদীর পোশাকে সাজিয়ে দিতে। ঝটপট তৈরী হয়ে নাও, আজ রাত্রেই শাদী হবে।'

সুলতানের প্রাসাদে হাসি-আনন্দের তুফান বয়ে চলল। অষ্টাবক্র লোকটির শাদী হবে, আনন্দের ব্যাপারই বটে। মেয়েরা তাকে বরবেশে সাজাতে গিয়ে কত রকমেরই যে মস্করায় মেতে উঠল বলে শেষ করা যাবেনা।

কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলে বেগম শাহরাজাদ থামলেন। ভোরের পূর্বাভাস লক্ষিত হ'ল। বাদশাহ শারিয়ার প্রফুল্ল চিত্তে বিবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্দরমহল ত্যাগ করলেন।

একুশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার যথা সময়ে অন্দরমহলে বেগমের কাছে এলেন। বেগম শাহরাজাদ কিসসা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, তারপর সে-জিনিয়াহ কি বলল শুনুন—সে-যুবতীর তুল্য রূপ-সৌন্দর্য দুনিয়ার কারোরই নেই, কথাটি কিন্তু বাড়িয়েই বলছ তুমি। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি নে, তোমার সে সিৎ-অল-হুসন-এর চেয়ে এ-যুবতী বেশী সুন্দরী। না, কিছুতেই তা সম্ভব নয়।'

—'আমার কথা বিশ্বাস কর। এক তিলও বাড়িয়ে বলি নি, তার তুল্যা সুন্দরী তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও দ্বিতীয় কাউকেই পাবে না। আমি তার উপযুক্ত একটি পাত্রের খোঁজেই ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি। তোমার এ-যুবকের সঙ্গে কিন্তু চমৎকার মানাবে। শোন আমার সাফ কথা। হতচ্ছাড়া ওই অষ্টাবক্র লোকটি ওর জীবন বরবাদ করে দিক এটি আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। তুমি যদি রাজি থাক তবে সুন্দর এ-যুবকটিকে নিয়ে আমরা কায়রোর পথে উড়ে যাই।' আফ্রিদি বলল। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হাসান'কে বয়ে নিয়ে জিনিয়াহ আর আফ্রিদি কায়রোর পথে উড়ে চলল। বাতাসের মত তীব্র গতিতে তারা আকাশ পথে অগ্রসর হতে লাগল।

কায়রো নগরে উজিরের প্রাসাদে শাদীর তোড়জোড় চলেছে। শানাই বাজছে। খানাপিনা চলছে হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে। মৌলভী শাদীর ব্যবস্থাদিতে ব্যস্ত। নচ্ছার অষ্টাবক্র লোকটি দামী পোষাক গায়ে চাপিয়ে গম্ভীর মুখে বসে। দামী আতরের খুসবু বেরোচ্ছে তার গা থেকে। জিনিয়াহ রাস্তার ধারের একটি আবছা অন্ধকার

কবর ওপর ঘুমন্ত হাসান'কে শুইয়ে দিল। এক সময় তার ঘুম ভাঙলে চোখ মেলে তাকাল। জায়গাটি কেমন অপরিচিত মনে হল. সে গোরস্থান তো এটি নয়। তবে? কোন জায়গা? ধীরে ধীরে উঠে বসতেই সামনে দৈত্যাকৃতি দাড়ি-গোঁফহীন একটি লোককে দেখে চমকে উঠল। আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে চিৎকার করার জন্য সে সবে মুখ খুলতে যাবে অমনি দৈত্যাকৃতি লোকটি মুখের কাছে আঙুল নিয়ে ইশারায় তাকে থামতে বলল।

দৈত্যাকৃতি লোকটি এবার হাসান-এর হাতে একটি জলন্ত মোমবাতি ধরিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে এল সুলতানের প্রাসাদে। অনুচ্চ কণ্ঠে বলল—'নিমন্ত্রিত মেহমানদের ভিড়ে মিশে যাও। আমাকে ভয় কোরো না। আমি এক জীন। তোমার মঙ্গলের জন্যই এখানে তোমাকে নিয়ে এসেছি। এটা কায়রো নগরের সুলতানের মহল। এক শয়তান কুঁজো, অষ্টাবক্র লোকের সঙ্গে উজির সামস-অল-দীন-এর লেড়কির শাদী হবার কথা। তারই রোশনাই চলেছে। গিয়ে দেখ, ফুলের মত ফুটফুটে লেড়কিটি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। তুমি মেহমানদের ভিড়ে মিশে যাও। হতচ্ছাড়া কুঁজো অষ্টাবক্রটি যখন খচ্চরের পিঠে চাপবে তখন তুমি মোমবাতি হাতে তার কাছাকাছি থাকবে। তোমাকে সবাই বরাত ভাববে। বরের ঘনিষ্ঠ লোক ভেবে মান্য করবে তোমাকে।

এক সময় দেখবে জনানারা ওড়না পেতে ধরবে তোমার সামনে। তুমি কামিজের পকেটে হাত চালিয়ে দেবে। দেখবে হাতে এক মুঠো সোনার মোহর উঠে আসবে। মায়া করবে না। মোহরগুলো তাদের ওড়নায় ছুঁড়ে দেবে। এমন ভাব দেখাবে যেন একটি মোহর তোমার কাছে খুবই তুচ্ছ বস্তু। যতবার পকেটে হাত ঢোকাবে ততবারই মুঠো ভরে মোহর উঠে আসবে। পকেট কখনই খালি হবেনা। হামাম থেকে প্রাসাদের দরজা পর্যন্ত খইয়ের মত মোহর ছিঁটোতে থাকবে। এবার হতচ্ছাড়া ওই অষ্টাবক্রটিকে নিয়ে যাবে সুসজ্জিত একটি ঘরে। একমাত্র বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষ মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু তোমাকে সে-ঘরে ঢুকতেই হবে। একটু উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করবে। তবেই সহজে কাজ হাসিল করতে পারবে। কিছু সোনার মোহর ছড়িয়ে দিলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। কথা কটি বলেই জিনিয়াহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বরবেশে অষ্টাবক্র লোকটি খচ্চরের পিঠে চাপল। তাকে ঘিরে নাচতে নাচতে চলল একদল নাচনেওয়ালি। গলায় মুক্তোর মালাটি দেখে মনে হচ্ছে যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসান মোমবাতি হাতে এগিয়ে গিয়ে খচ্চরটির লাগাম দখল করে ফেলল। হাসানের যৌবনভরা রূপ-সৌন্দর্য দেখে সবাই তো একেবারে থ বনে গেল। প্রাসাদের দরজায় যেতেই একদল জনানা ওড়না পেতে ধরল হাসান-এর সামনে। জিনিয়াহ-র পরামর্শমত সে বার বার পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো মুঠো সোনার মোহর বের করে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে ছিঁটোতে লাগল। যেন এ-ক'টি মোহর তার কাছে খুবই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার।

প্রাসাদের অন্দরমহলে যেতেই হাসান অষ্টাবক্র লোকটির হাত ধরে টানতে টানতে সুসজ্জিত একটি ঘরে ঢুকে পড়ল। মুঠো মুঠো মোহর ছিঁটোতে পারলে কোন কাজই অসাধ্য নয়। একদল লেড়কি অষ্টাবক্র লোকটিকে নিয়ে ফুলমালায় সুসজ্জিত একটি মঞ্চের ওপর বসাল। বরবেশে বসে থাকা তার দিকে কারোই নজর নেই। নয় থেকে নব্বই সব বিবিরা লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে রূপ-যৌবনের জোয়ারলাগা হাসান'কে বার বার দেখতে লাগল। চোখ সরাতে চায় না কেউ। একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে সবাই নারাজ। যেন বিরাট লোকসান হয়ে যাবে। সবার মুখেই এক কথা—'এমন সুন্দর একটি জোয়ান হাতের কাছে রয়েছে অথচ এমন কদাকার অষ্টাবক্রটির হাতে ফুলেরমত সুন্দর তরতাজা মেয়েটাকে তুলে দিচ্ছে! এর চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে পানিতে ফেলে দেওয়া ঢের ভাল ছিল!'

এমন সময় সে-ঘরে বৃদ্ধ মৌলভী আর শাদীর পাত্রী সিৎ-অল-হুসন প্রবেশ করলেন।

একটি সুসজ্জিত আসনে রূপ-সৌন্দর্যের আকর উদ্ভিন্ন যৌবনা পাত্রী হুসনকে বসানো হ'ল। তার রূপের আভা চোখ ঝলসে দেয়। যেন সারা বিশ্বের সৌন্দর্য রাশি কুড়িয়ে এনে জড়ো করা হয়েছে এর দেহপল্লবটিতে। এর রূপের জৌলুষের কাছে বেহেস্তের হুরী পরীদের সৌন্দর্যও বুঝি হার মানবে। তার উন্নত বক্ষের ওপর আলতোভাবে দোল খাচ্ছে মখমলের ওড়নাটি। মনে হবে মুকুলিত

যৌবনচিহ্ন দুটো ওড়নার আড়াল থেকে যেন বার বার উঁকি দিচ্ছে। জানাচ্ছে নিজেদের সজীব উপস্থিতি। সেদিকে আচমকা চোখ পড়ায় হাসান-এর বুকের ভেতরের কলিজাটি আছাড়ি পাছাড়ি করতে থাকে। অসংখ্য হিরে জহরৎ খচিত মাথার টিকলিটি যেন বাতাসের চাপে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে। তার রূপের আভায় ব্যবহৃত অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেছে। মন-পাগল-করা এমন রূপ হাসান আগে কোনদিন দেখেনি।

হাসান মঞ্চের পাশে একটি কুরশি পেতে বসে। হুসন নিজের কুরশি ছেড়ে উঠে ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে এল। কোন পুরুষের মধ্যে যে এমন রূপের ঝিলিক থাকতে পারে তা এর আগে কোনদিন প্রত্যক্ষ করা তো দূরের কথা কারো মুখে শোনেও নি কোনদিন। সে তার ধাবার মুখে শুনেছিল, তার চাচার বেটা নাকি এরকম চাঁদের মত সুন্দর দেখতে। কিন্তু এ কোন যুবক। এ-ই তার চাচার বেটা নয় তো? হুসন-এর হাত দুটো নিসপিস করতে লাগল। এক অভাবনীয় অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসল। অস্থির হয়ে অকস্মাৎ যুবক হাসান-এর কাঁধে নিজের নিটোল হাত দুটো রেখে মিষ্টি-মধুর স্বরে বলে উঠল—'আমার মেহবুব! এ-ই আমার স্বামী, আমার কলিজা।' তার চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। এবার অপেক্ষাকৃত ভারি গলায় উচ্চারণ করল—'হায় আল্লা! মনের মত এমন সুন্দর পাত্র হাতের মুঠোয় থাকতে তুমি কিনা আমাকে ওই বাঁদর মুখো হতচ্ছাড়া অষ্টাবক্রটির হাতে সঁপে দিচ্ছ। আমার ওপর মেহেরবানি কর, মুখ তুলে তাকাও।'

এদিকে অষ্টাবক্র লোকটির লম্ফঝম্ফ দেখে কে! সে রাগে গস্ গস্ করতে করতে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। তার কাণ্ড দেখে লেড়কি-বিবিরা তো হেসে গড়াগড়ি যাবার উপক্রম।

প্রথা অনুযায়ী পাত্রী এবার প্রদক্ষিণ-পর্ব শুরু করল। সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হবে সুপ্রশস্ত ঘরটিকে। হুসন প্রতিবারে ঝলমলে পোশাক পাল্টে এসে ঘরটিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। উপস্থিত যুবতীরা হুসন'কে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদক্ষিণের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতে লাগল। প্রতিবার প্রদক্ষিণ সেরে হাসান-এর মুখোমুখি করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। নাচনেওয়ালিরা বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গি করে নাচতে লাগল। বর-কনের মধ্যে কাম প্রবণতা জাগিয়ে তোলাই তাদের নাচের একমাত্র উদ্দেশ্য। কামভাব জাগিয়ে তুলে তাদের উত্তেজিত করার প্রয়াস।

শাদীর মঞ্চে এবার দু'জন বসে। একজন বরবেশধারী কদাকার সে-অষ্টাবক্রটি আর দ্বিতীয় জন হাসান।

একটু বাদে শাদীর মঞ্চে হাসান'কে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আর অষ্টাবক্রটি বিষণ্ণমুখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। এবার শাদীর মঞ্চে বসে থাকা হাসান-এর কাছে বিবির বেশে সুসজ্জিতা হুসন ধীরপায়ে এগিয়ে এল। স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে সোহাগ কামনা করল। আবেগ-মধুর স্বরে বলল—'মেহবুব আমার! আমাকে সোহাগে সোহাগে ভরিয়ে তোল। তোমার কোলে তুলে নাও আমাকে। আমার সতের বছরের যৌবনভরা দেহপল্লবটি তোমার হাতে সঁপে দিলাম। তুমি একে ভোগ কর, আমাকে দাও সম্ভোগসুখ।

যুবক হাসান-এর শিরা-উপশিরার রক্তের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল। কেবলমাত্র একখানা চাদরে ঢাকা ছিল হুস্‌ন-এর যৌবনের জোয়ারলাগা দেহটি। হেঁচকাটানে সেটিকে শরীর থেকে খুলে ফেলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের মেঝেতে। ব্যস্ত হাতে নিজের পাতলুনটিকেও খুলে দূরে ফেলে দিল। একটি সাদা ও সাধারণ টুপি মাথায় পরে নিল, হুসন উবু হয়ে বসে তার ইজেরের রশিটি ধরে আচমকা একটি হেঁচকা টান মারল। চোখের পলকে সেটি ছিঁড়ে গেল। কিন্তু হুসন-এর পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। চিৎ হয়ে মখমলের চাদরের ওপর পড়ে গেল। হাসান সরবে হেসে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। সে সাঁড়াশির বাঁধনে আটকা পড়ল হুসন। সে-ও দু'হাতে জাপটে ধরল তার বহু আকাঙ্ক্ষিত পুরুষটির পেশীবহুল নগ্ন দেহটিকে। হাসির তুফানে হুসনও যোগ দিল। সে তুফানে তলিয়ে গেল উত্তাল-উদ্দাম দুই নারী-পুরুষ। পুরুষের বাহুর সকাম আকর্ষণ যে এত মধুর হুসন আগে কখনও বোঝে নি। নিজের কুসুম কোমল-মাংসপিণ্ডদ্বয়কে তার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। ক্রমে তার দেহ-মন অসাড় হয়ে পড়তে লাগল। অতিশয় আনন্দানুভূতি যে মানুষের মনে এমন করে রোমাঞ্চের সঞ্চার করতে পারে তা সে এই প্রথম বুঝল। ব্যস, তারপরই তারা উভয়েই যেন কোন আনন্দ-সাগরের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর তারা ক্লান্ত অবসন্ন অথচ প্রসন্নচিত্তে পুরু মখমলের চাদরটির ওপর গা এলিয়ে দিল। উভয়ের শ্বাসক্রিয়া ঘন ঘন চলতে লাগল। কারো মুখে কোন কথা নেই। নীরবে সদ্য লব্ধ সুখটুকু উপলব্ধি করতে লাগল। অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করে হাসান নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মত হুস্‌ন-এর সরু কটি দেশে আলতো করে একটি হাত রেখে বল্‌ল—'আমি নিঃসন্দেহ, তোমার জীবনে আমিই প্রথম পুরুষ।'

হুস্‌ন জীবনের প্রথম পুলকানন্দের মাধ্যমেই অন্তঃসত্ত্বা হ'ল। সে মধুযামিনীতে তারা পনেরবার সঙ্গম-সুখ ভোগ করল। তারপরই তাদের চোখগুলো ক্রমে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করল। ঘুমে বারবার জড়িয়ে আসতে লাগল চোখের পাতা। আর নয়। আর সম্ভব নয়। মানুষের শরীর তো বটে। এত ধকল সইবে কেন? তারা ঘুমে ঢলে পড়ল। গভীর ঘুমে এক সময় আচ্ছন্ন হয়ে

পড়ল।

জিনি এগিয়ে এল। জিনিয়াহ-র সঙ্গে দেখা। তাদের সুখনিদ্রা

দেখছে। জিনি অনুচ্চকণ্ঠে বলল—'আর দেরী নয়, একটু বাদেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। যুবকটিকে গোরস্থানের যে-জায়গা থেকে তুলে এনেছিলাম সেখানেই আবার রেখে আসতে হবে।'

জিনিয়াহ ঘুমন্ত হাসান'কে নিজের পিঠে তুলে নিয়ে শূন্যে উঠে গেল। পাখার ঝাপটায় বাতাস কেটে এগিয়ে চলল বাঞ্ছিত সে-গোরস্থানের দিকে। জিনি উড়তে থাকে পাশাপাশি কাছাকাছি। হঠাৎ জিনি-র মধ্যে কামভাব জাগ্রত হয়। জিনিয়াহ-র ওপর বলাৎকার করার জন্য উদ্যত হয়। পিঠে তার ঘুমন্ত যুবক হাসান। তাকে তো আর ফেলে দিয়ে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। অন্য সময় হলে সে তার বাঞ্ছা পূরণে বাধা দিত না। কিন্তু জিনি-র কাম-প্রবৃত্তি একবার জাগ্রত হলে আর রক্ষা নাই। প্রলয় কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। ভয়াল-ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ তো আর অন্ধ নন। তিনিই পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। হঠাৎ দেখা গেল জিনি-র দেহটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। তারপরই অতিকায় জ্বলন্ত দেহটি মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। দাউ দাউ হাউ হাউ করে জ্বলতে লাগল সিরিয়ার অন্তর্গত দামাস্কাস নগরীর এক পথের ধারে। জিনিয়াহও নামল সেখানে। পিঠের ঘুমন্ত যুবকটিকে পথের ধারে শুইয়ে দিল। ব্যস, একেবারে উধাও হয়ে গেল সে। একেই বলে বরাত। হাসান একা পড়ে রইল।

সকাল হলে নগরের দ্বার খুলে দেওয়া হ'ল। শুরু হ'ল মানুষের যাতায়াত। সবাই বিস্ময়ভরা চোখে অনিন্দ্য সুন্দর যুবক হাসান-এর দেহকান্তি দেখে যারপর নাই মুগ্ধ হ'ল। গায়ে কেবল রাত্রের পোশাক। আর মাথায় অতিসাধারণ একটি টুপি।

এক সময় হাসান-এর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকাল। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা এক দেশের পথের ধারে সে শুয়ে। আর তাকে ঘিরে রয়েছে একদল কৌতূহলী নগরবাসী। সে চিৎকার করে বলে উঠল—'আমি কোথায়? এ কোন দেশ? আমি এখন কোথায় আছি? তোমরাই বা কারা?'

পথচারীদের একজন বলল—'তোমাকে আমরা এখানে, এভাবেই পড়ে থাকতে দেখেছি। এ নগরের নাম দামাস্কাস। তুমি এখানে এলেই বা কি করে? কে তুমি? থাক কোথায়?'

—'আমিও তো একই কথা ভাবছি। কাল রাত্রে আমি তো কায়রো নগরে ছিলাম। আর এখন দামাস্কাসে?'

হাসান-এর কথায় পথচারীরা হো হো করে হেসে উঠল। হাসবার মত কথাই বটে। কায়রো আর দামাস্কাসের মধ্যেকার ফারাকটুকুর কথা ভেবেই তাদের হাসির উদ্রেক হয়েছে। কেউ কেউ তাকে বদ্ধ পাগল ভেবে রসিকতা শুরু করে দিল।

এক প্রবীণ এগিয়ে এসে বলল —'বাপু সত্যি করে বল তো ব্যাপারটি কি? তোমার কথাবার্তা আমাদের মনে কেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে।'

—'গত সন্ধ্যায় আমি বসরাহতে ছিলাম। মাঝরাত্রে ছিলাম কায়রো নগরে। আর এখন দেখছি, দামাস্কাসের রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছি।' হাসান কথা বলতে বলতে উঠে হাঁটতে লাগল। তার পিছন পিছন চলল একদল ছেলে বিভিন্ন কৌশলে রঙ্গ-তামাশা করতে করতে।

এদিকে কায়রো নগরের প্রাসাদে সদ্য বিবাহিতা রূপসী-যুবতী সিৎ-অল-হুস্নর ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে তার স্বামী হাসান অনুপস্থিত। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘরের চার দিকে সে তাকাতে লাগল। না, সে ছাড়া ঘরে দ্বিতীয় কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। তার দু'চোখ বেয়ে পানির ধারা নেমে এল।

সামস্-অল-দীন এসব ব্যাপার কিছুই জানে না। সে সারারাত্রি নিজের প্রাসাদের ছোট্ট একটি ঘরে কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সুলতান ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে হতচ্ছাড়া অষ্টাবক্র লোকটার সঙ্গেই তার একমাত্র পরমা-সুন্দরী, আদরের দুলালী হুস্ন-এর বিয়ে দিয়ে গায়ের ঝাল মিটিয়েছেন। তাই সে বেটির কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। বিশ্বাস করার মত কথাও নয় যে, এমন একটি গাঁজাখুরি গল্পকে সত্যি বলে মেনে নেবে। মনে ধন্ধ জমাট বাঁধল।

সমস্-অল-দীন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'কী সব বাজে বকছিস বেটি! তা-ই যদি হয় তবে তোর সে খুবসুরৎ বরটি গেল কোথায়?'

এমন সময় প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় পাখির কলধ্বনি শোনা

গেল। ভোরের পূর্বাভাস। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

বাইশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরের অংশটুকু শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বৃদ্ধ উজির তাঁর কিস্‌সা ব'লে চলেছেন আর খলিফা হারুণ-অল-রসিদ মন্ত্রমুগ্ধের মত একাগ্রচিত্তে শুনছেন। সদ্য বিবাহিতা হুসন তার স্বামীর খোঁজে ছোট-ঘরের দিকে এগোতেই হতচ্ছাড়া অষ্টাবক্রের মুখোমুখি হ'ল। অষ্টাবক্রের চোখে মুখে ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। তার মনে হ'ল হতচ্ছাড়া জিনি বুঝি আসছে। উজিরের সুন্দরী লেড়কিকে তো পেলই না। তার ওপর সারা রাত্রি যে অত্যাচার তাকে সইতে হয়েছে তা সারা জীবন মনে থাকবে। এ-জন্মের মত শাদীর সাধ তার মিটে গেছে।

হুস্‌ন স্বামীকে না পেয়ে কোন কথা না বলে পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল। এমন সময় সেখানে এল উজির সামস্‌-অল-দীন। তাকে দেখেই অষ্টাবক্র কাঁপতে কাঁপতে করজোড়ে ব'লে উঠল—'জিনি মহাশয়, দোহাই তোমার, আর আমাকে শাস্তি দিও না। কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন ভুলেও বিয়ের আসরমুখো হ'ব না।'

সামস্‌-অল-দীন ধমকের সুরে বল্‌ল—'চুপ কর হারামজাদা! জিনিটিনি কাউকে আমি চিনি না। আমি সুলতানের উজির।'

অষ্টাবক্র লোকটি এবার উজিরকে চিনতে পেরে তড়পানি শুরু করে দিল—'ও আপনি? আমি আরও ভাবলাম বুঝি সেই জিনি। চলে যান এখান থেকে। আপনি আর সুলতান একজোট হয়ে আমাকে মিছিমিছি এমন হেনস্থা করেছেন। আমার জীবনটিই একেবারে বরবাদ করে দিয়েছেন। বেশ তো ছিলাম। শাদীর লোভ দেখিয়ে—পালান এখান থেকে। জিনি আফ্রিদি এসে পড়লে মজা কাকে বলে আপনাকেও টের পাইয়ে দেবে!'

উজির বলল—'এসো, এদিকে এসো।'

—'ক্ষেপেছেন মশাই! জিনি আফ্রিদির আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমি এক পা-ও এখান থেকে নড়ছি না। সারারাত্রি ধরে যে শাস্তি ভোগ করেছি ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। রোদ না ওঠা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।'

এবার উজির তার কাছে জানতে চাইল—'আফ্রিদি তাকে কিভাবে হেনস্তা করেছে, কি কি বলেছে।'

অষ্টাবক্র তাকে সারা রাত্রির ঘটনা এক এক করে সবই খুলে বল্‌ল।

উজির এবার পুবদিককার একটি জানালা খুলে দিয়ে বলল—'শোন, সকাল হয়ে গেছে অনেক আগেই। ওই দেখ, ঝলমলে রোদ। এবার তুমি এখান থেকে পালাও।'

ব্যস, অষ্টাবক্র এবার এক দৌড়ে বাইরে চলে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে সুলতানের সামনে এসে দাঁড়াল। সুলতানকে তার সারারাত্রির দুর্ভোগের কথা সবিস্তারে বল্‌ল।

আবার এদিকে উজির সামস্‌-অল-দীন তার বেটি সিৎ-অল-হুস্‌ন-র কাছে ফিরে এল। বলল—'বেটি, সব কিছু শুনে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। আমি কি তবে পাগলই হয়ে গেলাম! এমন তাজ্জব ব্যাপার তো বাপের জন্মে কোনদিন শুনিনি। আসল ব্যাপারটি কি খুলে বল তো শুনি।'

—'আব্বাজান, এ আবার খুলে বলার কি আছে? সে-সুদর্শন যুবকটি গত রাত্রে সবারই মন কেড়ে নিয়েছিল। তার সঙ্গেই আমি গতরাত্রি কাটিয়েছি। তুমি আমার আব্বাজান, বলতে শরম লাগছে, তবু বলছি, গতরাত্রেই আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি।' এবার প্রমাণস্বরূপ তার স্বামীর বাদশাহী টুপি, পাতলুন আর মোহরের থলি প্রভৃতি দেখিয়ে বলল—'আব্বাজান, সবকিছুই তার।'

উজির বাদশাহী টুপিটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন—'বেটি, এ টুপি তো বসরাহর আমিররা ব্যবহার করে বলে জানি।'

এবার পাতলুনটি হাতে তুলে নিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে তার কোমরের সেলাইটি খুলে ফেললেন। একটি তুলোট কাগজ বেরিয়ে এল। কাগজটির ভাজ খুলেই উজির সামস্‌-অল-দীন সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন—'বেটি, এই দেখ আমার নুর-অল-দীন-এর স্বাক্ষর যুক্ত দলিল!'

উজির টাকার থলেটিতে এক হাজার সোনার মোহর দেখতে পেল। সে বণিকের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা এগুলো। সে জাহাজ ক্রয়ের দলিল এটি, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে হাসান-অল-দীন-এর কাছ থেকে একটি জাহাজ ক্রয় করেছে বণিকটি। সবকিছু প্রমাণ পেয়ে ও দলিলটি পড়ে সামস্‌-অল-দীন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড় হলেন। কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ বুক চাপড়ে কান্না জুড়ে দিল—'ভাইয়া, আমার ওপর অভিমান করে তুমি বিবাগী হয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছিলে। জন্মের মত চলে গেলে। আজ তুমি আমাদের সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে!' এবার লেড়কির দিকে ফিরে বললেন—'বেটি হাসান বদর-অল-দীন তোমার চাচাতো ভাইয়া। ওর সঙ্গেই তোমার শাদী হওয়ার কথা ছিল। সামান্য—খুবই তুচ্ছ একটি ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল। ব্যস তাতেই আমার ভাইয়া দেশ ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেল। যাক বেটি, আঠারো বছর পর আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার কী যে আনন্দ হচ্ছে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি এক হাজার সোনার মোহর ওর কাছে বিয়ের যৌতুক হিসেবে চেয়েছিলাম, তাই সে রেখে গেছে।'

উজির আর বৃথা কালক্ষয় না করে ব্যস্ত পায়ে সুলতানের দর-

কক্ষে উপস্থিত হ'ল। তুলোট কাগজটি তার হাতে দেয়। সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করে। সবকিছু শুনে সুলতান একে আল্লাহ-র লীলা বলেই মনে করেন।

উজির আবার তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে লেড়কি হুস্ন-এর কাছে ফিরে আসে। হাসান এখনও ফেরে নি। বেলা বেড়ে চলে। কিন্তু তবু সে না ফেরায় খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

হুস্ন সবিনয়ে বল্ল—'আব্বাজী, সে ঘর ছেড়ে কি করে যে বেরলো তা-ই তো আমি ভাবছি। আমি ঘুমে অচৈতন্য ছিলাম। দরজা জানলা সবই বন্ধ। অথচ ঘুম থেকে জেগে দেখি, সে ঘরে নেই। আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

বেগম শাহরাজাদ ভোরের পূর্বাভাস পেয়ে তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলন। খানিক বাদে বাদশাহ শারিয়ার দরবারকক্ষের উদ্দেশে পা-বাড়ালেন।

তেইশতম রজনী

বাদশাহা সারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কাছে এসে তিনি আবার কিসসা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আশা করি আপনার অবশ্যই খেয়াল আছে উজির জাফর, খলিফা হারুণ-অল-রসিদ'কে গল্প শোনাচ্ছেন।'

উজির সামস্-অল-দীন নিঃসন্দেহ হ'ল যে, তার ভ্রাতুষ্পুত্রই তার বেটি হুস্নকে শাদী করেছে। শাদীর রাত্রেই তার জামাতা উধাও হয়ে গেছে। আর কবে যে সে ফিরবে তা একমাত্র আল্লাতাল্লাই বলতে পারেন। শাদীর বাসর সজ্জা ভেঙে ফেলার আগে তার খুঁটিনাটি সব বিবরণ উজির একটি কাগজে লিখে রাখল। বলা তো যায় না, ভবিষ্যতে এটি কোন কাজে হয়ত লেগে গেলেও যেতে পারে।

এদিকে উজিরের সদ্য বিবাহিতা লেড়কি যা অনুমান করেছিল তা-ই সত্যি হ'ল। শাদীর প্রথম রাত্রে তারা যে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিল তাতেই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। নয় মাস পরে ফুটফুটে এক লেড়কা প্রসব করল সে। আব্বাজীর মত অপরূপ। এক ঝলক তাকালেই চোখ ঝলসে দেয়। নবজাতকের নামকরণ করা হ'ল—আজীব। আজীব শব্দের অর্থ চমৎকার! সাত বছর বয়সে তাকে কায়রোর এক বিখ্যাত মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেওয়া হ'ল। পাঁচ বছর বাদে অর্থাৎ বারো বছর বয়সে সে মাদ্রাসার পাঠাভ্যাস সাঙ্গ করে।

এ-মাদ্রাসায় পাঠাভ্যাসকালে একদিন আজীব-এর সঙ্গে তার সহপাঠীদের বচসা হয়। শেষে তা তুমুল ঝগড়ার রূপ নেয়। সবাই জোট বেঁধে মৌলভীর শরণাপন্ন হয়।

মৌলভী তাদের একটি ফন্দি শিখিয়ে দেন।

মৌলভীর ফন্দিটিকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে আজীব-এর সহপাঠীদের একজন বলে, আজ আমরা ভারি মজার একটি খেলা

করতে চাই। তোমরা যদি রাজি থাক তো বল, খেলাটি শুরু করি। ছাত্রটির কথায় সবাই একবাক্যে সম্মতি জানাল। আজীবও সোল্লাসে সম্মতি দিল।

শুরু হ'ল সে-মজার খেলাটি। এক ছাত্র বলল—'তোমরা জানো আমার নাম নবী। আমার আব্বার নাম ঈজ-অল-দীন আর আমার আম্মার নাম নবীয়াহ।'

অন্য আর এক ছাত্র বলল—'আমার নাম নাজীব। আমার আব্বার নাম মুস্তাফা আর আম্মার নাম জামিনাহ।

এবার এল আজীব-এর পালা। সে সগর্বে নিজের নাম বলতে গিয়ে বলল আজীব। আম্মার নাম বলল সিৎ-অল-হুস্ন। আর আব্বার নাম বলল মিশরের উজির সামস্-অল-দীন।

তার কথা শেষ হওয়া মাত্র সহপাঠীরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল 'ধ্যুৎ। তিনি তোর আব্বা কি করে হবেন রে! যত্তসব তাপ্পিমারা কথা! তিনি তো তোর আম্মার আব্বাজী। তুই আব্বার নাম জানিস না। তোর সঙ্গে আজ থেকে আমাদের মেলকুদ বন্ধ।'

এমন সময় মৌলভী এসে বললেন—'বেটা, ওদের কথাই ঠিক বটে। উজির তোমার আব্বা নন। তোমার দাদা মশাই হন। তোমার আব্বা যে কে তা আমাদেরও সঠিক জানা নেই। এক অদ্ভুত দর্শন অষ্টাবক্র লোকের সঙ্গে তোমার আম্মার শাদী হয়েছিল, সবাই জানে। কিন্তু সে নাকি আদৌ তোমার আম্মার সঙ্গে সহবাস করে নি। সে সবার কাছে প্রচার করে বেড়াতে লাগল, এক জীন এসে নাকি তোমার আম্মার গর্ভে সন্তান পয়দা করে গিয়েছিল। অতএব

তোমার দোস্তরা যা বলেছে, সবই সত্য। এরকম লেড়কাকে আমরা 'জারজ' বলি। তাই তোমাকে আমি একটি মাত্রই উপদেশ দিচ্ছি, তোমার অহঙ্কার একটু কমাও বেটা। স্বভাব-চরিত্র একটু নম্র কর।'

মাদ্রাসা-ছুটি হলে আজীব সোজা বাড়ি এসে তার আম্মাকে সরাসরি প্রশ্ন করল—'আমার আব্বা কে? কি নাম তার? কোথায় থাকেন তিনি?'

—'উজির। তোমার বাবা তো উজির।'

—'ঝুট! বাজে কথা! উজির সামস-অল-দীন তো আমার আব্বা নন। তিনি তো তোমার আব্বা। আমার আব্বার নাম কি?'

উপায়ান্তর না দেখে সিৎ-অল মুখে কলুপ এঁটে বসে থাকে। কি-ই বা জবাব দেবে? আজীব এবার রীতিমত ক্ষেপে গিয়ে বলল—'তাড়াতাড়ি বল, নইলে এক্ষুণি তরবারি দিয়ে আমার গলা কেটে ফেলব, বলে দিচ্ছি।'

চমকে উঠে সিৎ-অল বলল—'বলছি শোন বেটা, আমার শাদীর রাত্রে তার সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ দেখা। সে অপরূপের রূপের আগুনে আমার দেহ-মন, আমার সব সত্তা ও সঞ্চয় সবই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাকে আমার মন-প্রাণ-দেহ সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি। আমার সবকিছু নিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। তারপর অনেক শীত-বসন্ত একে একে পার হয়ে গেছে। তবু সে ফেরেনি। আজও তার পথচেয়ে দিন গুণছি।'

কথা বলতে বলতে সিৎ-অল ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। বালক আজীবও তার আম্মার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

উজিরের কাছে খবর যায়, আজীব তার পিতৃ-পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল।

উজির খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে লেড়কি হুস্‌ন্‌-র ঘরে ছুটে আসে। চোখ মুছতে মুছতে সিৎ-অল বলে—'আব্বাজী, বেটা আমার কাছে তার পিতৃ-পরিচয়, বংশ-পরিচয় জানতে চায়। তার মাদ্রাসার দোস্তরা নাকি এ-নিয়ে অনেক মন্দকথা তাকে বলেছে। তাই হয়ত মনে ব্যথা পেয়েছে, উদ্বেল হয়ে উঠেছে।'

উজির এবার একমাত্র নাতিকে কোলে বসিয়ে এক এক করে বলতে লাগল—তার ছোট ভাইয়া নূর-অল-দীন কেন বিবাগী হয়ে দেশত্যাগী হয়েছে। বসরাহ-তে গিয়ে সেখানকার উজিরের লেড়কিকে শাদী করে ঘর সংসার পাতে। তাদের সন্তান হাসান। তারপরই নূর বেহেস্তে চলে যায়। তোমার আম্মার শাদীর রাত্রে তার আকস্মিক ও অলৌকিক আবির্ভাব ঘটে। ভোর হবার আগেই আবার একই অলৌকিক উপায়ে অন্তর্ধান করে। ব্যাপারটি আজও রহস্যের আড়ালেই রয়ে যায়।' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে এবার বলল—'চল আমরা বসরাহ-তে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। এখানে আমাদের কাছে নিয়ে আসি। আমরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আর আপত্তি করতে পারবে না।'

উজির দুপুরের কিছু আগে দরবারে সুলতানের সঙ্গে দেখা করল। সব বৃত্তান্ত তাঁর কাছে নিবেদন করল।

সুলতান খুশি হয়ে বললেন—'উজির তোমাকে বরং কিছুদিনের জন্য ছুটি দিচ্ছি, বসরাহ-তে গিয়ে খোঁজ করে দেখ। আমার বিশ্বাস, বসরাহ বা তার কাছাকাছি কোন না কোন জায়গায় তার দেখা পাবেই।'

উজির সুলতানের পরামর্শ ও নিজের ঐকান্তিক আগ্রহে আজীব ও কয়েকজন নফরকে নিয়ে বসরাহ-র পথে পা-বাড়াল। পৌঁছল দামাস্কাস নগরে, দামাস্কাস সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ নগর। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও সুন্দর মসজিদ এখানেই অবস্থিত।

সবাই যখন মসজিদ দেখে বেড়াচ্ছে তখন আজীব উজিরের ভৃত্য সাইদকে নিয়ে নগর দেখতে বেরল। বিপদ হ'ল এখানেই। পথচারীরা ভিড় করে সুদর্শন আজীব'কে দেখতে লাগল। রূপ-সৌন্দর্যের এমন সমাবেশ কোন পুরুষের দেহে সচরাচর দেখা যায় না। ক্রমে মহিলারাও দরজা ও জানালা খুলে তাকে দেখে জীবন ধন্য করতে উৎসাহী হয়ে উঠল। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড।

কৌতূহলী জনতার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে সাইদ উপায়ান্তর না দেখে আজীবকে নিয়ে একটি মিঠাইয়ের দোকানে গিয়ে মাথা গুঁজল। এ-দোকানেই একদিন হাসান-বদর-অল-দীন পথের বদমায়েশ যুবকদের তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়েছিল। আর প্রায় বারো বছর ধরে এ-দোকানেই আশ্রয় নিয়ে সে বাস করছে। তিন বছর আগে দোকানি সংসারের মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে চলে গেছে। এখন হাসানই দোকানের মালিক বনে গেছে। বেদানার হালুয়া এ-দোকানের মিঠাইয়ের মধ্যে সবথেকে নাম করা খাবার। তামাম দামাস্কাস নগর ঢুঁড়ে এলেও এমন সুন্দর হালুয়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। হাসান্‌-এর তৈরীর কৌশল তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছিল।

আজীব অকস্মাৎ দোকানের ভেতর ঢুকে গেলে হাসান্‌ অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখতে লাগল। চেয়ে রইল অপলক চোখে। প্রথম দর্শনেই কেমন যেন ভালবেসে ফেলল ছেলেটিকে। এক সময় বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলল—'বেটা, তোমাকে কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকছে। কোথায় তোমাকে দেখেছি, বল তো? আমার নিজের হাতে তৈরী একটু মিঠাই তোমাকে খাওয়াতে চাই, আপত্তি নেই তো?'

আজীব তার সঙ্গী সাইদ-এর দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল—'লোকটিকে খুবই দুঃখী মনে হচ্ছে। কিসের যেন একটি অভাব তার ভেতরটিকে মরুভূমি করে দিয়েছে। একদিন হয়ত আমারই মত তার একটি লেড়কা ছিল। হয়ত সে দুনিয়া ছেড়ে

চলে গেছে। আমি আমার আব্বার খোঁজে টুঁড়ে বেড়াচ্ছি, আর অভাগা লোকটি হয়ত তার লেড়কাকে ফিরে পেতে ব্যাকুল।' কথা বলতে বলতে সে মিঠাইয়ের জন্য হাত বাড়াল।

সাইদ সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটি টেনে নিয়ে বলল—'আরে করছ কি? উজির সাহেব শুনলে গোসা করবেন যে! আমার গর্দান নিয়ে ছাড়বেন। তুমি উজিরের বেটা। তোমার কত ইজ্জত। এরকম একটি দোকানে দাঁড়িয়ে মিঠাই খেলে তোমার ইজ্জত থাকবে কোথায়, শুনি?'

হাসান এবার ছল ছল চোখে ব'লে ওঠে—'তোমার মত বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত নফর তামাম দুনিয়া টুঁড়ে এলেও দ্বিতীয়টি আর মিলবে না। তাই তো নিজের শিরের মনির তুল্য অন্তরের ধনকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন।'

দাওয়াইয়ে কাজ হয়েছে। নফর সাইদ-এর তিড়িক্কি মেজাজ কিছুটা শান্ত হ'ল। সে আজীব'কে নিয়ে দোকানের বাঁশের মাঁচাটায় বসল।

হাসান প্রফুল্লচিত্তে কিছু গরম বেদানার হালুয়া এনে আজীব-এর হাতে দিল। আজীব আর সাইদ পরম তৃপ্তিতে মুখরোচক হালুয়াটুকু আহার করল।

এদিকে হাসান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আজীব'কে দেখতে লাগল। যত দেখছে ততই যেন অজ্ঞাতকুলশীল বালকটির ওপর তার মায়া বেড়ে যাচ্ছে।

হাসান আজীব-এর পাশে, একেবারে গা-ঘেঁষে বসল। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলল—'বাছা, তোমার কথা শোনার জন্য আমার মন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যা হোক কিছু বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।'

আজীব চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'আমার কথা আর কিই বা শুনবে? আমি বড়ই দুঃখী, আমার বাবা আজ কোথায়, কিভাবে আছেন কিছুই জানি না। আমার আম্মা আর দাদু দেশ-দেশান্তরে তাঁর খোঁজে টুঁড়ে বেড়াচ্ছেন। হয়ত খুঁজতে খুঁজতে তামাম দুনিয়া টুঁড়ে ফিরতে হবে তাঁকে। খোদাতাল্লার মর্জি নসীবে কি আছে তিনিই জানেন।' কথাটি বলেই বালক আজীব চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হাসান তার কথায় ব্যথিত-মর্মাহত হ'ল বটে কিন্তু আজীব যে তারই লেড়কা ধারণাও করতে পারল না।

সাইদ এবার হাসান-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আজীব-এর হাত ধরে পথে নামল। কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল। দেখে, হাসান তাদের পিছন পিছন আসছে। ভাবল, লোকটির মাথায় কোন বদ মতলব নেই তো? নইলে পিছু নেবে কেন?

হাসান্ মুচকি হেসে বলল—'নগরের বাইরে একটু জরুরী কাজ রয়েছে, তাই ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গেই চলে যাই। কথা বলতে বলতে পথ পাড়ি দেওয়া যাবে।'

সাইদ এবার একটু বেশ উত্তেজিত কণ্ঠেই বলল—'তুমি কি আমাদের তিষ্ঠোতে দেবে না? একটু হালুয়া খাইয়ে রাজ্যি জয় করে নিয়েছ মনে হচ্ছে!'

হাসান তার আকস্মিক কথাটিতে ফুটা বেলুনের মত চিপসে গেল। কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ করে বলল—'এমন বাজে কথা বলছ কেন? পথ তো আর কারো একার নয়।'

আজীব তাকে সমর্থন করে বলল—'ঠিকই তো, খোদার তৈরী পথে সব মুসলমানেরই সমান অধিকার। আমাদের তাঁবুর দিকে গেলে না হয় আচ্ছা করে সাজা দিয়ে দেওয়া যেত।'

কিছুদূর গিয়ে তারা হাসবার-এর পথ ধরল। হাসবার-এ তাদের তাঁবু ফেলা হয়েছে। হাসানও মোড় ঘুরল তাদের সঙ্গেই।

আজীব এবার ভাবল, লোকটির মতলব নির্ঘাৎ ভাল নয়। কোন ধান্দায় পিছু নিয়েছে। সে একটি পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। সেটি হাসান-এর কপালে আঘাত হানল। খুন বেরিয়ে এল। সাইদ আজীব-এর হাত ধরে এক দৌড়ে তাঁবুতে হাজির হয়ে গেল।

হাসান নিজের বোকামির জন্য অনুতপ্ত হ'ল। দোকান বন্ধ করে তাদের পিছু নেওয়াটাই কাল হয়েছে। ফিরে এসে হতাশা জর্জরিত মনে আবার সে দোকানে বসল।

উজির সামস-অল-দীন দু'দিন দামাস্কাস নগরীতে কাটিয়ে তাঁবু গোটাবার নির্দেশ দিলেন। পথে ছোট-বড় ও অখ্যাত-অবজ্ঞাত বহু নগরী পেরিয়ে তারা এক সময় বসরাহতে হাজির হ'ল।

বসরাহতে সুলতানের দরবারে মেহমান হয়ে উঠল। সুলতানকে কুর্নিশ করে বলল—'জাঁহাপনা, আমি আপনার প্রাক্তন উজির নূর-

অল-দীন-এর বড় ভাই, সম্প্রতি মিশরের সুলতানের উজিরের পদে বহাল রয়েছি।'

সুলতান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'আমার নসীব মন্দ তাই নূর-অল-দীন-এর মত একজন সাচ্চা উজিরকে হারাতে হয়েছে, আহা! বড় ভাল লোক ছিল। আর তার বেটা হাসান সে-ও ছিল আমার চোখের মনির মতই আদরণীয়। আল্লাহর বিচিত্র মর্জি। সেও আজ আমাকে ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে। তবে নূর-অল-দীন-এর বিধবা বিবি এখানে, এ-বসরাহ নগরেই রয়ে গেছে। বেটা যদি কোনদিন ফিরে আসে সে আশায় আশায় দিন গুণে চলেছে।

সুলতানের মুখে নূর-এর বিবির কথা শুনে সামস-অল-দীন তার সঙ্গে একবারটি মোলাকাৎ করার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠল, সুলতান তাকে সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

সামস-অল-দীন নূর-এর প্রাসাদ তুল্য সুবিশাল ইমারতে উপস্থিত হ'ল। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করল। সামনেই একটি ঘরের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ল। এক রূপসী দরজা খুলে, ওড়নায় মুখ ঢেকে দরজার এক ধারে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। হাসান নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে দরজা বন্ধ করে সে শোকজ্বালায় জর্জরিত হচ্ছে। ঘরের কেন্দ্রস্থলে একটি তাজিয়া সাজিয়ে রেখেছে। হাসান আর ইহজগতে নেই এ-বিশ্বাসের বশবর্তিনী হয়েই সে এর আয়োজন করেছে। তার স্মারক হিসাবেই এটি নির্মাণের উদ্দেশ্য। তাজিয়াটির সামনে বসে সে অহর্নিশি চোখের পানি ফেলে আর ব'লে—'তাজিয়া, সে কি ইহজগৎ ত্যাগ করে তোমার কোলেই চিরশান্তি লাভ করেছে? তাকে কি আর কোনদিন আমার চামড়ার চোখ দুটো দিয়ে দেখতে পাব না? সে এক নওজোয়ান। শাদীর রাত্রের সাজে সজ্জিত হয়ে সে তো আশমানের তারার মেলায় তোমার কোলে শুয়েই বিশ্রাম করছে।

নূর-এর স্ত্রী, হাসান-এর মায়ের মুখে এরকম বিলাপ শুনে সামস-অল-দীন দরজা থেকে এক পা-ও নড়তে পারল না। স্থবিরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

এক সময় হাসান-এর মা চোখ মুছতে মুছতে আবার দরজার কাছে এল। আগন্তুক সামস-অল-দীন নিজের পরিচয় দিল, হাসান-এর মা তাকে অভ্যর্থনা করে ঘরের ভেতরে নিয়ে কুরশি এগিয়ে দিল বসার জন্য।

কুরশিটি টেনে বসে সে সব ঘটনা খুলে বলল—'তার বেটির শাদীর রাত্রে কিভাবে সুকৌশলে ঘরে ঢোকে, কিভাবে বেটির সঙ্গে শাদী হয়, কিভাবে তারা সহবাস করে আর কিভাবেই বা ভোর হওয়ার আগেই বাসর ঘর থেকে সে উধাও হয়ে যায় সবই এক এক করে সবিস্তারে বর্ণনা করে। এবার আজীব'কে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে—'তোমার নাতি। তোমার বংশের একমাত্র সন্তান। একে বুকে নিয়ে শোক-তাপ লাঘব কর।'

নূর-এর বিবি সামস-অল-দীন-এর মুখে সব ঘটনা শুনে নিঃসন্দেহ হ'ল, তার কলিজার সমান পুত্র হাসান তবে আজও জীবিত, ধারে-কাছেই কোথাও না কোথাও আছে।

এদিকে আজীব এবার দাদীর কোলে মুখ গুঁজে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

সামস-অল-দীন বল্‌ল— 'এখন বসে কাঁদার সময় নয় বহিন, কামিজ বদলে নাও। যত শীঘ্র সম্ভব আমরা মিশরের দিকে যাত্রা করব। যে করেই হোক হাসানকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের।

কয়েকজন নফর-দাসী নিয়ে উজির সামস-অল-দীন -এর সঙ্গে মিশরের পথে যাত্রা করল। তারা এবার বসরাহ নগরের পথে চলতে লাগল।

তারা আবার দামাস্কাস নগরে পৌঁছল। তাঁবু গাড়ল। আগের সে-জায়গাতেই তারা এবারও বাস করতে লাগল, দু'তিনদিন এখানে থাকার ইচ্ছা।

পরদিন সকালে উজির হাটের দিকে গেল। কিছু কেনাকাটা করা দরকার। আজীব এবার সাইদ'কে নিয়ে সে- হালুইকর লোকটিকে একবারটি দেখে আসার জন্য পা-বাড়াল।

নগরের এখানে-ওখানে ঘুরে, কতসব মজার মজার জিনিস দেখতে দেখতে তারা সে-হালুইকরের দোকানে গেল।

আজীব'কে দোকানে ঢুকতে দেখে হালুইকর হাসান অবাক হয়ে গেল।

আজীব বলল—'আমার সেদিনের সে কাজের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। পরিণামে কি হবে চিন্তা না করেই আমি তোমাকে লক্ষ্য করে পাথরের টুকরোটি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। আজ মাফ চাইতে এসেছি।

—'আমার কিছু হয় নি। সেরে গেছে। যাক গে, একবারটি ভেতরে আসবে কি বাছা?'

আজীব দোকানের ভেতরে গিয়ে বাঁশের তৈরী বেঞ্চে বসল।

একটি রেকাবিতে কিছু বেদানার হালুয়া এনে তার সামনে ধরে বলল—'মেহেরবানী করে এটুকু খেয়ে নাও বাছা। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আমি কেবল তোমার কথাই ভেবেছি।'

আজীব হাসতে হাসতে বলল—'তুমি তো যে-সে লোক নও হে! সেদিন আদর করে হালুয়াও খাওয়ালে আবার সর্বনাশের ধান্দা করতেও ছাড়লে না। চুপি চুপি আমাদের পিছু নিয়েছিলে। আমার কাছে হলফ কর, আর পিছু নেবার ধান্দা করবে না। যদি করই তবে কিন্তু আর কোনদিন তোমার দোকানমুখো হ'ব না।'

—'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, আর তোমার পিছু নেব না।'

আজীব এবার হাসানের হাত ধরে টেনে তার পাশে বসিয়ে বলল—'আমাদের সঙ্গে আল্লাতাল্লার কাছে প্রার্থনা কর, আমার হারিয়ে যাওয়া আব্বাজীকে যেন খুঁজে বের করতে পারি।'

হাসান কিন্তু নির্নিমেষ চোখে আজীব-এর মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল। কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপমাত্রও নেই।

আহারাদি শেষ হবার পরও তারা প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় ধরে টুকরো টুকরো অনেক কথাই আলোচনা করল।

তাঁবুতে যখন তারা ফিরল তখন দেখল সবাই আজীব-এর জন্য পথ চেয়ে তাঁবুর বাইরে বসে, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

এবার উঠে গিয়ে একটি রেকাবিতে কিছুটা বেদানার হালুয়া এনে আজীবকে খেতে দিল। বসরাহতে থাকাকালীন প্রায়ই এরকম মুখোরোচক খাবার তৈরী করে সবাইকে খাওয়াত। হাসান-এর আম্মী বলল—'এর তৈরীর কৌশল আমার নিজস্ব আবিষ্কার। তোর বাবা খুবই পছন্দ করত। নিজেও এরকম হালুয়া তৈরীর কৌশল আমার কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল। তামাম দুনিয়াটি ঘুরে এলেও এরকম বেদানার হালুয়া আর কোথাও পাবি না।'

—'কি যে বলছ দাদি, নিজেই জান না! একটু আগেই আমি আর সাইদ বাজারের এক দোকানে কী সুন্দর বেদানার হালুয়া খেয়ে এলাম। আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে বলছি, এর এক বিন্দুও ঝুটা নয়। হালুয়ার কী সুন্দর খুসবু, বলে বোঝাতে পারব না।'

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ দেখল ভোর হয়ে আসছে। তিনি কিসসা থামালেন।

ছাব্বিশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার যথা সময়ে অন্দরমহলে বেগমের কামরায় এলেন, বেগম শাহরাজাদ কিসসার অবশিষ্ট অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, আজীব-এর কথা শুনে তার দাদি রেগেমেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। সাইদ'কে বলল—'হতচ্ছাড়া কোথাকার! বাজারের যে-সে দোকানে নিয়ে গিয়ে একে ঢুকিয়েছিলি, সাহস তো কম নয়, তোর!'

—'আল্লাহ-র দোহাই! বিশ্বাস করুন, আমরা কোন দোকানে ঢুকিনি। এক হালুইকরের দোকানের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম মাত্র। তাই বলে—।'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই আজীব বলল—'সাইদ মিথ্যে কথা বলিস নে। আচ্ছা, তুই বুকে হাত দিয়ে বল তো আমরা সকালে হালুইকরের দোকানে গিয়ে বেদানার হালুয়া খেয়ে আসি নি?'

আজীব-এর দাদি এবার ব্যস্ত-পায়ে উজিরের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়। সাইদ আজীব'কে নিয়ে যেখানে-সেখানে যাওয়া শুরু করেছে।

সাইদ উজিরের কাছেও মিথ্যা কথা বলে। আজীব'কে নিয়ে যে সে হালুইকরের দোকানে গিয়েছিল, উভয়েই বেদানার হালুয়া খেয়ে এসেছে—পুরো ব্যাপারটি অস্বীকার করে।

কিন্তু আজীব বার বার নিজের কথাই বলতে থাকে। উজিরের বুঝতে বাকি রইল না, সাইদ নিজের কসুর চাপা দিতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটিই অস্বীকার করছে।

আজীব-এর মুখে হালুইকরের তৈরী হালুয়ার ভূয়সী প্রশংসা শুনে তিনি সাইদ'কে বার বার ধমকাতে লাগলেন।

আজীব-এর দাদি এবার একটি রেকাবি এনে সাইদ-এর হাতে দিয়ে বলল—'এতে করে আধ দিনার দিয়ে ওই দোকান থেকে বেদানার হালুয়া নিয়ে আয়। আজীব-এর দাদুকে আমার তৈরী হালুয়া এবং দোকানের হালুয়া দুটোই খেতে দেব। তিনি খেয়ে, বিচার করে বলবেন—কোন হালুয়া বেশী সুস্বাদু।'

দোকানি রেকাবিতে হালুয়া দিয়ে তার ওপরে কিছু গুলাব পানি ছিটিয়ে দিয়ে সাইদ-এর হাতে তুলে দিল। সাইদ তাঁবুতে ফিরে হালুয়ার রেকাবিটি আজীব-এর দাদির হাতে দিল। সে সঙ্গে সঙ্গে রেকাবিটি থেকে এক টুকরো হালুয়া তুলে মুখে ফেলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। সে নিঃসন্দেহ হ'ল, এ-হালুয়া নির্ঘাৎ তার বেটা হাসানের হাতের তৈরী। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। উজির খবর পেয়ে ছুটে এল। জল-বাতাস দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলল।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে হাসান-এর মা আর্তনাদ করে উঠল—'হাসান! হ্যাঁ এটি আমার বেটা হাসান-এর হাতের তৈরী হালুয়াই বটে! আমার বেটা হাসান-এর হাতের তৈরী হালুয়া না হয়েই যায় না।'

উজির জনা বিশেক নফরকে সঙ্গে দিয়ে সাইদ'কে পাঠাল মিঠাইওয়ালাকে ধরে নিয়ে আসার জন্য।

এতেও উজির আশ্বস্ত হতে পারল না। নিজে একটি টাট্টুর পিঠে চেপে মিশরের সুলতানের দেওয়া পরোয়ানাটি নিয়ে হুকুমদারের সঙ্গে দেখা করলেন।

হুকুমদার জিজ্ঞাসা করল—'কাকে কয়েদ করতে চান আপনি বলুন তো?'

—'বাজারের এক হালুইকরকে আমার হাতে তুলে দিন।'

—'ঠিক আছে, আমি এখুনি সিপাহী পাঠাচ্ছি।'

হুকুমদারের হুকুম পেয়ে একদল সশস্ত্র সিপাহী ছুটল হালুইকর হাসান'কে ধরে আনার জন্য।

উজির তাঁবুতে ফিরল।

হুকুমদারের সৈন্য সামন্তরা হৈ হৈ করতে করতে হালুইকর

হাসান-এর দোকানে ঢুকল। পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

বন্দী হাসান পথে আসতে আসতে ভাবছে—'হায় খোদা! এক রেকাবি হালুয়া শেষ পর্যন্ত এমন পরমাদ ঘটাতে পারে, স্বপ্নেও ভাবিনি।'

চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বন্দী হাসান উজির'কে বলতে লাগল—'হুজুর মেহেরবান, আপনার কাছে কী এমন গুনাহ করেছি যে, আমাকে কোমরে রশি পরতে হ'ল?'

—'সত্যি করে বলবে, বেদানার হালুয়া কি তুমিই বানিয়েছিলে?'

—'জী হুজুর । কাজটি কি বে-আইনী?'

—'বে-আইনীর চেয়ে বড় কিছু যদি থাকে তবে তুমি তা-ই করেছ। আমাদের সঙ্গে তোমাকে কায়রো নগরে যেতে হবে।'

উজির হাসান-এর মাকে এসব কিছুই জানাল না।

উজির তাঁবু গুটিয়ে সদলবলে কায়রো নগরের উদ্দেশে যাত্রা করল।

পথে আহারের জন্য হাসান-এর হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। খানাপিনার পর আবার পিঠমোড়া করে বেঁধে উটের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল। কেটে গেল বেশ কয়েকটি দিন। উজির এক সকালে নতুন করে যাত্রা করার আগে হাসান'কে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল-'এখনও সময় আছে, সত্যি করে বলবে। বেদানার হালুয়া কি তুমিই নিজে হাতে বানাও? ঝুট বললে জিভ কেটে নেব বলে দিচ্ছি।'

—'হুজুর, আমি নিজে হাতেই রোজ বানাই।'

আবার উটের পিঠে তোলা হল কয়েদী হাসান'কে।

কায়রোর সীমানায় পৌঁছে উজির ছুতোর মিস্ত্রিকে তলব করল। সে এসে কুর্নিশ করে সামনে দাঁড়াল। উজির বল্‌ল—'যত শীঘ্র সম্ভব বন্দীর মাপে একটি ক্রুশচিহ্ন বানিয়ে আন, তাতে এ কয়েদী হতচ্ছাড়াটিকে রশি দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে মোষের গাড়ীর পিছনে বেঁধে দাও।'

হাসান হাউমাউ করে কেঁদে বলল —'হুজুর মেহেরবান, আমি শাস্তি ভোগ করতে চলেছি, কিন্তু কি যে আমার গুনাহ তা-ই আজ অবধি জানতে পারলাম না।'

— 'গুনাহ? গুনাহ অবশ্যই তোমার হয়েছে। ওগুলো কি হালুয়া বানিয়েছিলে? মরিচের গুড়া পরিমাণ মত ব্যবহার করতে পার নি।'

—'হুজুর' এরকম একটি সামান্য ব্যাপারে এমন গুরুদণ্ড-একেবারে ফাঁসির হুকুম। এরজন্য আপনি আমাকে রশি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে রেখেছেন! দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র খানা দিয়েছেন। এত কষ্ট দিয়েও শান্তি পাননি্? আবার হুকুম দিয়েছেন আমাকে ফাঁসি দিয়ে মারার জন্য। কথা বলতে বলতে হাসান-এর দু'চোখে পানির ধারা নেমে এল। মাথায় হাত দিয়ে পথের মাঝে বসে পড়ল। ভাবতে লাগল নিজের নসীবের কথা।

উজির মুচকি হেসে বল্‌ল—'কি হে, অমন করে কি ভাবছ?'

—'কি আবার ভাবব! ভাবছি, আপনার মত একটি উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারীর ওপর একটি রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে সুলতান কি করে যে নিশ্চিন্ত থাকেন। ভেবে অবাক হচ্ছি। বেদানার হালুয়ায় মরিচের গুঁড়ার পরিমাণ ঠিক হয় নি বলে একটি লোককে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। চমৎকার! চমৎকার বিচার! কাজীর বিচারকেও আপনার হুকুমনামা হার মানিয়ে দিচ্ছে।'

—'আমি তোমার মত আহাম্মকের সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার কাজে ফাঁকি না দাও এ-ই সবার আগে আমাকে বিচার করে দেখতে হবে।'

মুখে বিষাদের হাসি ফুটিয়ে তুলে হাসান বলল—'কিন্তু কি করে? আমাকে খুন করার পর আমার কাজের বিচার করবেন নাকি বাঁচিয়ে রেখে, কাজ করিয়ে নিয়ে তবে সত্যি ফাঁকি দেই কিনা দেখবেন?'

—'দেখাদেখি সব সারা। রোজই তো এরকম হালুয়া তৈরী করে কাজে গলতি করছ। রোজ গুণাহ করে করে পাহাড় বানিয়ে

ফেলেছ। সত্যি বলতে কি মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও বড় কোন সাজাই দেখছি তোমার জন্য বরাদ্দ করা দরকার ছিল।'

—'ঠিক আছে। আপনার যা দিল চায় করতে পারেন। উন্মাদের সঙ্গে বচসায় ফল তো কিছু হয়ই না বরং অশান্তি বাড়ে।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। উজির তার নফরদের হুকুম দিল, হাসান'কে কাঠের বাক্সে পুরে তার তাঁবুতে রেখে দিতে।

উজির ঘরে ফিরল। সে প্রথমেই হাসান-এর আম্মা আর সিৎ-অল-হুস্ন-এর সঙ্গে মোলাকাৎ করল। লেড়কিকে ডেকে বলল—'বেটি তোর দুঃখের দিন হয়ত এতদিনে ঘুচল। যা, খুব ভাল করে সেজেগুজে আয়। তাকে এক্কেবারে সাথে নিয়ে এসেছি। শাদীর রাতের সাজগোছের কথা খেয়াল আছে তো? ঠিক সেভাবেই পরিপাটি করে সাজবি। ভাল কথা, সিন্দুকের কাগজটিতে তো সেদিনের সাজের বিবরণ লেখাই আছে। একবারটি না হয় চোখ বুলিয়ে নে।'

হুস্ন-এর অন্তরের অন্তঃস্থলে আনন্দের তুফান বয়ে চলল। তার ঘরটিকে হুবহু সেরকম করে বাসর ঘর সাজিয়ে তুল্‌ল শাদীর রাত্রে যেমন করে সাজানো হয়েছিল। তাজ্জব বনে যাওয়ার মত ব্যাপারই বটে।

উজির এবার সিন্দুক খুলে হাসানের বিয়ের রাত্রের ইজের, পাতলুন, টুপি আর তার মোহরের থলিটি কুর্শির ওপরে রাখল। মোহরের থলিটিতে এক হাজার সোনার মোহর এবং ইহুদী বণিকের লেখা জাহাজের দলিলটি রয়েছে। এবার পাতলুনটির জেবের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল নূর-অল-দীন-এর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রটি।

উজির হুসনকে বল্‌ল—'বেটি, শাদীর রাত্রে পালঙ্কের ওপর ঠিক যে-কায়দায় তুমি শুয়েছিলে হুবহু সেভাবে শুয়ে পড়। আমি যাচ্ছি, হাসান'কে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

উজির লেড়কির কাছ থেকে এবার জামাতা হাসান-এর কাছে এল। হাসান ঘুমে বিভোর। উজিরের নির্দেশে দু'জন নফর তার পাতলুন, কামিজ যা কিছু রয়েছে সব খুলে একেবারে বিবস্ত্র করে ফেল্‌ল। এবার কেবলমাত্র একটি রেশমী চাদর লুঙ্গির মত করে জড়িয়ে দিল তার কোমরে। আর মাথায় একটি টুপি পরিয়ে দিল। এবার ধরাধরি করে হুস্ন-র ঘরের গালিচার ওপর শুইয়ে দিয়ে চুপিসারে ঘরছেড়ে বেরিয়ে এল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে হাসান-এর ঘুম টুটল। চোখ মেলে তাকাল। চোখের মণি দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিকে তাকাল। বিস্ময়ে হতবাক হ'ল। যত দেখছে ততই যেন সে বিস্ময়ের ঘোরে তলিয়ে যাচ্ছে। এবার পালঙ্কটির দিকে আবার চোখ ফেরাল। চিনতে পারল! হ্যাঁ, সেদিনের সে-পালঙ্কটিই তো বটে। আর পালঙ্কের ওপর যে শুয়ে সে-ই তো তার মনময়ূরী হুস্ন। এ কী স্বপ্ন, নাকি বাস্তব? সে তো কত দিন আগেকার কথা। সবকিছু যেন তার কাছে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। সে সবিস্ময়ে ভাবল, তাকে তো পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছিল। উজিরের হুকুম ছিল ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে একেবারে স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে এসে ফেলা হয়েছে তাকে।

হাসান অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকাতেই তার বহুপরিচিত ও বহুদিনের সাথী বসরাহর নক্সাযুক্ত চমৎকার টুপিটি চোখে পড়ল। এবার দেখল মোহরের থলিটাকে। ব্যস্ত-হাতে খুলে দেখল এক হাজার সোনার মোহর আর সে-বণিকের স্বাক্ষরযুক্ত জাহাজ বিক্রির দলিলটি। খাটের কোনায় তার পাতলুনটি পরিপাটি করে রাখা, জেবের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল নূর-অল-দীন-এর স্বাক্ষরযুক্ত ঠিকুজী-পত্রখানা। এক নজর চোখ বুলিয়ে নিঃসন্দেহ হ'ল, সেটিই বটে। সে আরও বেশী ধন্ধে পড়ে গেল। কোন কিছুকেই অস্বীকার করতে পারছে না। আবার মেনে নিতেও উৎসাহ পাচ্ছে না। এ কী সমস্যা রে বাবা!

এবার হুস্ন-এর দিকে চোখ ফেরাল। হ্যাঁ, কিছুমাত্রও ভুল হয়নি তার। এ তার সে বহু আকাঙ্ক্ষিতাই বটে। তার সে-মেহবুবা। তার জীবনের প্রথম আনন্দ-সুখ প্রদায়িনী। গুটি গুটি এগিয়ে গেল পালঙ্কের দিকে। কাছে, একেবারে পালঙ্কের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার যৌবনের জোয়ারকে নতুন করে চাক্ষুষ করতে লাগল।

হাসান দুরু দুরু বুকে পালঙ্কের ওপর উঠে বসল। মেহবুবার গালের কাছে হাতটি নিয়ে গিয়েও আবার টেনে নিয়ে এল। হুস্ন ঘুমের ভান করে বিছানায় আগের মতই এলিয়ে পড়ে রইল। দু'চারটে ছোট ছোট কোঁকড়ানো কুচকুচে কালো চুল হুস্ন-এর কপালের ওপর পড়েছে। এগুলো তার ঘুমের সৌন্দর্যকে আরও অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

হাসান বিস্ময় বিস্ফারিত কামাতুর চোখ দুটো মেলে হুস্ন-এর আধফোঁটা পদ্মের মত মুখটির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর দ্বিধাজড়িত হাত দিয়ে আলতো করে তার কপালের ওপর জড়ো হওয়া চুলগুলোকে সরিয়ে দিল।

হাসান-এর হাতের ছোঁয়া পেয়ে হুস্‌ন ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। এমনই কোন এক সুযোগের প্রতীক্ষায় ঘুমের ভান করে পড়েছিল এতক্ষণ। এবার আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে হাসান'কে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌ল—'মেহবুব, অমন করে কি দেখছ? কি আছে আমার মুখে? সারারাত ধরে তো প্রাণ ভরে খেলে। এতেও আশ-মেটেনি তোমার? আরও মন চাইছে? কিন্তু আর কি করে সম্ভব, বল তো? ভোর হয়ে এল যে। আমার যা কিছু সম্পদ আঠারো বছর ধরে কামাতুর মানুষগুলোর কাছ থেকে আগলে আগলে রেখেছিলাম সবই তো তোমাকে উজাড় করে দিয়েছি।' কথা বলতে বলতে কামবিকারে দু'হাতে তাকে বুকের মধ্যে সজোরে চেপে ধরে বল্‌ল—'আমার দেহের গোপন সম্পদগুলো তোমার মনকে কি তুষ্ট করতে পেরেছে বল তো মেহবুব?' এবার আচমকা নিজের ঠোঁট দুটো দিয়ে হাসান-এর ঠোঁট দুটো আঁকড়ে ধরল। আলতো একটি কামড় দিয়ে বলল—'সারা রাত্রি ধরে আমাকে ময়দা ডলার মত পেশাই করেছ। কামড়ে কামড়ে ঠোঁট দুটোতে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দিয়েছ। আর যেটুকু বাকি ছিল পূরণ করে দিলাম, এবার পিয়াস মিটেছে তো?'

সোনা মানিক আমার, এখন আর নয়। ভোরবেলা লোকে দেখে ফেল্‌লে লজ্জার ব্যাপার হবে। আমার যা কিছু সম্পদ সবই তো তোমার কাম-জ্বালায় শান্তিবারি সিঞ্চন করার জন্যই। সবই তো তোমার। শুধু তোমার, থাকবেও শুধু তোমারই জন্য।'

হাসান এবার হুস্‌ন-র বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বল্‌ল—'আমি কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? হালুইকর সেজে দোকানদারি করেছিলাম খোয়াবের মধ্যে? সন্ধ্যাবেলা ফুটফুটে

একটি লেড়কা আর তার নফর কে আমার নিজের হাতে তৈরী হালুয়া খাইয়েছিলাম। ব্যস, খানিক বাদে একদল ষণ্ডামার্কা লোক এসে আমার দোকানটি ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। আমাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে উজিরের তাঁবুতে নিয়ে গেল। উজিরের হুকুমেই নাকি তারা আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। উজিরের অজুহাত হালুয়াতে নাকি মরিচ পরিমাণ মত দেওয়া হয় নি।'

হুস্‌ন তার একটি হাত টেনে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বল্‌ল—'হাতদুটো আবার কেটেটেটে যায় নি তো?'

হাসান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বল্‌ল—'তোমার মাথাটাথা খারাপ হ'ল নাকি! খোয়াবের মধ্যে হাত বাঁধলে কাটাকাটি হয় নাকি কখনও। সত্যি সত্যি বাঁধলে না হয় সম্ভাবনা থাকত। তারপর আরও আছে। পিঠমোড়া করে বেঁধেও খুশী হতে পারে নি। আবার বলে কিনা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করবে!'

হুস্‌ন আঁতকে উঠে বলল—'ওমা, সে কি কথা গো! আমার সোনা মানিককে মারবে, কার এমন সাধ্য!'

—'আরে তুমিও যেমন! বলছি না, সবই খোয়াবের ব্যাপার।'

—'হ্যাঁ গো, ঠিকই বলেছ। খোয়াবের মধ্যে অনেক কিছুই হতে পারে বটে।' আচমকা কপালের দিকে হাসান-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুস্‌ন ব'লে উঠল—'হ্যাঁ গা, তোমার কপালে কিসের দাগ দেখা যাচ্ছে যেন?'

কপালে হাত বুলাতে বুলাতে হাসান বলল—'তাই তো, তবে তো খোয়াব টোয়াব মিথ্যে! ছেলেটির পিছন পিছন হাঁটার সময় সে রেগে গিয়ে একটি পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। কপালে লেগে কেটে গেল। খুন ঝরল বহুত। দাওয়াই লাগিয়ে ক্ষতটি শুকোতে হয়।' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে এবার সে বলল—'কী ঝকমারিতেই না পড়া গেল! একবার ভাবি খোয়াব, আবার মনে হয় কিছুতেই খোয়াব হতে পারে না। সবকিছু কেমন জট পাঁকিয়ে যাচ্ছে।'

—'আমার কথা শোন সোনা মানিক, ওসব উদ্ভট ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ভেবে মিছে মনটিকে বিষিয়ে তুলো না।' কথা বলতে বলতে হুস্‌ন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মন-প্রাণ উতলা করা হুস্‌ন-এর আঠার বছরের নিটোল স্তন দুটোর ফাঁকে মুখ গুঁজে পরমতৃপ্তির স্বস্তিতে এলিয়ে পড়ে রইল। না, আর কিছুই ভাবতে পারছে না সে। ভাবা সঙ্গতও নয়। অতীতের জের হিসাবে বর্তমানকে কল্পনা করে মন-প্রাণ বিষিয়ে তোলা নিতান্তই বোকামি।

পরম স্বস্তিতে হাসান-এর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। কখন যে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারে নি।

ঘুম ভাঙার পর হাসান যখন চোখ মেলে তাকাল তখন সূর্য গুটি
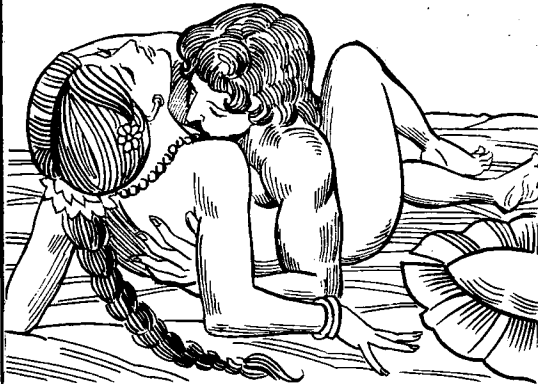
গুটি আকাশের গা-বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। চোখ মেলে তাকিয়েই সামনে উজিরকে দেখতে পেল। সচকিত হয়ে তার দিকে সভয়ে তাকাল। উজির সেই অত্যাচারী উজির।

উজির সামস-অল-দীন একটি কুর্শিতে বসল। এবার মুচকি হেসে বলল—'বাপজান, তুমি আমার ছোট ভাইয়া নুর-অল-দীন-এর বেটা। তোমাকে আমি বহুত দুঃখ দিয়েছি। তুমি যে আমার বেটির স্বামী আর আজীব-এর আব্বা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই আমাকে কিছু চাতুরীর আশ্রয় নিতেই হয়েছে। গতকাল রাত্রে তোমার টুকরো টুকরো কথাবার্তা শুনে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি। আসলে আমার ভাইয়া নুর-এর সঙ্গে আমার সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্যই এতসব কেলেঙ্কারী হয়েছে।'

উজির দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই আজীব ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল। হুস্‌ন হেসে বলল—'বেটা, তোর আব্বাজীর কথা জিজ্ঞেস করছিলি না? এই যে তোর আব্বাজী।'

আজীব দেখল, সে হালুইকর। কি ভাবল, কে জানে? তারপরই ছুটে গিয়ে হাসান-এর গলা জড়িয়ে ধরল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসান-এর মা-ও সেখানে উপস্থিত হ'ল। 'বেটা! মেরে লাল!' ব'লে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল।

এ-পর্যন্ত ব'লে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

কুঁজো, ইহুদী হেকিম, দর্জি ও নাপিতের কিস্‌সা

পরদিন বাদশাহ শারিয়ার যথাসময়ে অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর ঘরে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ কোনরকম ভুমিকা না করেই কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার বাগদাদের এক দর্জি, কুঁজো, ইহুদী হেকিম, খ্রীস্টান দালাল এবং নাপিতের কিস্‌সা বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন।'

চীনদেশের এক ছোট্ট নগরে এক দর্জি বাস করত। লোকটি খুবই আমুদে, দিলদরিয়াও বটে। দোকান নিয়ে সর্বদা পড়ে থাকে। কোন ঝামেলায় নিজেকে জড়ায় না।

দর্জিটি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই রোজগার করে। অবশিষ্ট সময়টুকু আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দেয়।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লে হাতের কাজ ফেলে উঠে পড়ে। বিবিকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে যায়। দু'জনে মনের সুখে নদীর ধার দিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর দেশ-বিদেশের গল্প বলে।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও বিকেলের দিকে দর্জি সস্ত্রীক বেড়াতে বেরিয়েছিল। নদীর ধার দিয়ে বেড়িয়ে ফেরার সময় পথে এক কুঁজোর সঙ্গে দেখা হ'ল। লোকটি কুঁজো তো বটেই, বরং অষ্টাবক্র, মানে হাড়গোড় একেবারে ভাঙাচোরা। একেবারেই বিচিত্র তার চেহারা।

দর্জি আর তার স্ত্রীকে দেখেই কুঁজোটি হঠাৎ সরবে হাসতে শুরু করে দিল। অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে অকারণে কুঁজোকে হাসতে দেখে দর্জি ও তার স্ত্রী উভয়ের কাছেই ব্যাপারটি কৌতূহলের উদ্রেক করল।

কুঁজোর কাছে ব্যাপারটি ভাল ঠেকল না। সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে একটু বেশ রাগত স্বরেই বলল—'কি ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এমন দাঁত বের করে হাসছ যে বড়?'

—'হাসি পেলে হাসব না?' কথাটি বলেই আবার হো হো রবে হাসতে লাগল।

হাসি থামিয়ে এক সময় দর্জিটি বলল—'আমাদের বাড়ি যাবে? রাত্রে এক সঙ্গে বসে খানাপিনা করবে, গল্প করবে আর রাত্রিটি আমাদের বাড়িতেই হাসি-আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটাবে, রাজি?'

দর্জির প্রস্তাবে কুঁজো এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল। দর্জি কুঁজোটিকে সঙ্গে করে দোকানে এল।

রাত্রে তারা তিনজনে এক সঙ্গে খানাপিনা করতে বসল। খেতে খেতে দর্জি একটু তামাশা করার জন্য এক টুকরো মছলি নিয়ে কুঁজোর মুখে গুঁজে দিল। ছোট্ট একটি মানুষ সে। অতবড় টুকরোটি কোনরকমে মুখে ধরলেও চিবোতে পারবে কেন? কিন্তু উগরে ফেলারও উপায় নেই। এদিকে আবার দর্জি কুঁজোটির হাত ধরে বলতে লাগল—'ভাইয়া, খুব ভাল মছলি, ফেলো না। খেয়ে নাও। নইলে আমি খুব গোসা করব কিন্তু। দুঃখও কম পাব না।'

বহু চেষ্টা চরিত্র করে মছলির টুকরোটি কোনরকমে গিলতে পারলেও বিপদ এড়াতে পারল না। একটি বেশ শক্ত কাঁটা তার গলায় আটকে গেল।

গলায় কাঁটা নিয়ে কুঁজোটি মাটিতে পড়ে কাৎরাতে শুরু করল। অসহ্য যন্ত্রণায় সারারাত্রি কষ্ট পেল। সকাল হবার কিছু পরেই লোকটি মারা গেল।

বেগম শাহরাজাদ দেখলেন, ভোর হয়ে আসছে। পাশের বাগিচার ডালে ডালে পাখীদের পাখার ঝটপটানি শুরু হয়ে গেছে। শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পঁচিশতম রজনী

মধ্যরাত্রির কিছু আগে বাদশাহ শারিয়ার ব্যস্ত-পায়ে অন্দর-মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর ঘরে এলেন।

শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, দর্জির মেহমান সে-কুঁজোটি তো গলায়-মাছের

কাঁটা ফুটে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু দর্জি আর তার বৌ সে ব্যাপার দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, দর্জি অসহায় দৃষ্টি মেলে বিবির মুখের দিকে তাকাল।

দর্জির বিবি বল্‌ল—'পথের বিপদ ঘরে আনাই কাল হয়েছে। কি আর করবে, আপদটিকে কাঁধে তোল।'

দর্জি কুঁজোর লাসটিকে কাঁধে তোলার চেষ্টা করল। তার বিবি বলল—'ছেড়ে দাও, আমিই যা বিহিত করার করছি। একটি ছেঁড়া চাদর জড়িয়ে দর্জির বিবি কুঁজোর লাসটিকে কাঁধে তুলে নিল। এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করল। দর্জি তাকে অনুসরণ করতে লাগল। দর্জির বিবি নানারকম সুর করে কাঁদতে কাঁদতে পথ পাড়ি দিচ্ছে। দর্জিও থেকে থেকে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠছে। পথে লোকজন কাউকে দেখলে তাদের যৌথ কান্নার স্বর দ্বিগুণ বেড়ে যাচ্ছে। দর্জির বিবি থেকে থেকে বিলাপ করতে লাগল। আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল গো! আমার বেটা বুঝি আর বাঁচবে না গো। আমি কাকে নিয়ে থাকবো গো! অকালে আমার বেটার বসন্ত হ'ল কেন গো? এ কী কাল বসন্ত হ'ল। সারা গায়ে গুঁটি, ধগধগে ঘা। আমার বেটা বুঝি আর বাঁচবে না গো!'

পথচারীরা ভাবল, দর্জির লেড়কার বসন্ত রোগ হয়েছে। অবস্থা খুবই সঙ্গীন। হয় তো হেকিমের কাছে যাচ্ছে। শেষ চেষ্টা করে দেখবে যদি বাঁচিয়ে তোলা যায়। ফলে পথচারীরা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের আর বিরক্ত করল না।

দর্জির বিবি ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে এক বুড়ো ইহুদী হেকিমের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল।

এক ইয়া মোটা ও কুচকুচে কালো মাঝ-বয়সী নফরাণী দরজা খুলে দিল। দর্জির বৌ তাকে একটি সিকি দিয়ে বলল—'এটা তোমার বকশিস। আমার বেটার বহুত বিমার। হেকিম সাহেবকে তাড়াতাড়ি ডেকে দাও।'

নফরাণীটি সিকিটি কামিজের জেবে ঢুকিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে থপ্‌ থপ করে ওপর তলায় উঠে গেল।।

দর্জির বিবি দর্জিকে বলল—'এই সুযোগ, চল লাশটি সিঁড়িতে রেখে আমরা চম্পট দেই।'

যে-কথা সেই কাজ। চাদর-জড়ানো কুঁজোর লাসটিকে সিঁড়িতে ফেলে রেখে দর্জি আর তার বিবি তিন লাফে হেকিমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

বুড়ো হেকিমের কাছে গিয়ে বলল—'এক রোগী এসেছে। অবস্থা খুব খারাপ। জলদি চলুন। নিচে, সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছে।'

বুড়ো হেকিম ব্যস্ততার জন্য চিরাগ নেওয়ার কথা ভুলে গেল। পরিচিত সিঁড়ি। কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে বুড়ো হেকিম নিচে নামতে লাগল। নিস্তেজ চোখের মণি। আবছা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারল না। ফলে আচমকা কি যেন একটি বড়সড় বস্তু পায়ে লাগল। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে বুড়ো হেকিম সিঁড়ি থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

বরাত ভাল যে, কুঁজোর লাসটি সিঁড়ির শেষ ধাপে রাখা ছিল। ফলে হেকিমকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে হ'ল না।

হেকিমের পড়ে যাওয়ার শব্দ ও বিকট আর্তনাদের নফরাণী ও হেকিমের বিবি চিরাগ বাতি নিয়ে ছুটে এল। তাকে টানাটানি করে তুলল। চোট তেমন লাগে নি।

চিরাগ বাতির আলোয় হেকিম ও তার স্ত্রী দেখল সিঁড়ির গায়ে একটি চাদর-জড়ানো কুঁজোমত লোক মরে পড়ে রয়েছে। হেকিমের তো শিরে বজ্রাঘাত হবার জোগার। কী সর্বনেশে কাণ্ডরে বাবা! লোকটি তবে মরেই গেছে।'

হেকিম ভাবল, রোগীর লোকজনরা তাকে সিঁড়িতে চাদর গায়ে দিয়ে বসিয়ে রেখে হয়ত ধারে কাছেই কোথাও রয়েছে। আর দুর্বল শরীর সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার ধকল সইতে না পেরে জানটা বেরিয়ে গেছে।

হেকিম নিঃসন্দেহ হ'ল, সে-ই কুঁজোটির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে। তাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে এসে তার হাতেই হতভাগাটিকে জান দিতে হ'ল। সর্বনাশ! লোক জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে। শূলে চড়ানোও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

হেকিমের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে একটি ফন্দি এসে গেল। সে আর তার বিবি চাদর দিয়ে লাসটি ভাল করে মুড়িয়ে নিল। ধরাধরি করে

সিঁড়ি ভেঙে নিয়ে গেল ছাদে! তার বাড়ির লাগোয়া সুলতানের প্রাসাদ। আর কোন চিন্তা ভাবনা নয়। লাসটিকে তারা ছুঁড়ে দিল সুলতানের বাড়ির ছাদ লক্ষ্য করে। বরাত মন্দ। লাসটি সুলতানের বাড়ির ছাদে না পড়ে পড়ল রসুইকরের রসুইখানার গায়ে।

একটু বেশী রাত্রে সুলতানের প্রাসাদের কাজ সারতে রসুইকরের বেশ দেরী হয়। তার মহলের দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটি লোক মরে পড়ে রয়েছে। একেবারে বাঁকাচোরা হয়ে পড়েছে। হয়ত লোকটি খাবার চুরি করে খেতে এসে হঠাৎ মারা গেছে। কিন্তু যে কারণেই মরুক না কেন, দোষ অবশ্যই তার ঘাড়েই পড়বে। সবাই ধরেই নেবে লোকটি চুরি করে খাবার খেতে এসেছিল। ধরা পড়ে বেদম প্রহার সহ্য করতে না পেরে জান বেরিয়ে গেছে। এখন উপায়? লাসটির কি গতি হবে?

উপায়ান্তর না দেখে রসুইকর লাসটিকে নিয়ে হাটের কাছে এক দোকানের বন্ধ দরজার সামনে বসিয়ে দিয়ে চম্পট দিল।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এক খ্রীস্টান গলা পর্যন্ত সরাব ঢুকিয়ে টলতে টলতে কোনরকমে পথ পাড়ি দিচ্ছে আর জড়ানো গলায় বলছে—'ব্যস, আর দেরী নেই, যীশু এলেন বলে। তখন দেখব, চাঁদুরা কোথায় পালাও। আমাকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা! আমার মাথায় মদ ঢেলে দিয়ে ইয়ার্কি করার মজা তখন টের পাইয়ে দেবেন। এতবড় বুকের পাটা তোদের। যীশু এসেই তোদের এক-একটি ধরে কচুকাটা করবেন। দেরী নেই, যীশু এক্ষুণি এসে পড়বেন।'

আঁকা বাঁকা পায়ে আরও কয়েক পা গিয়ে সে এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। লাসটি তখন তার ঠিক পিছনেই দোকানের বন্ধ-দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। হতচ্ছাড়া মাতালটি ভাবল, তার পিছনে কে যেন ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিপদ মাথার ওপরে অনুমান করে সে ঝট করে ঘুরেই সজোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিল লাসটির মুখে। চেঁচিয়ে উঠল—'হারামি কাঁহাকার! আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ধান্দায় ছিলি, তাই না? এবার বোঝ কত ধানে কত চাল! মাটিতে পড়ে থাকা লাসটির চুল মুঠোকরে ধরে মাতালটি এবার গর্জে উঠল—'ওঠ—ওঠ হারামি কাঁহাকার! তোকে একেবারে খুনই করে ফেলব!'

মাতালটির চেঁচামেচিতে হাটের ক'জন দোকানির ঘুম ভেঙে গেল। ছুটোছুটি করে এসে দেখে, মাতালটি কুঁজো লাসটির চুলের মুঠি ধরে এলাপাথাড়ি ঘুঁষি চালিয়ে যাচ্ছে।

দোকানিরা বলল—'সাহেব বাবা, এবার লোকটিকে মারা ছেড়ে দাও। চুরি করতে এসে শিক্ষা যথেষ্টই পেয়েছে।'

খ্রীস্টান মাতালটি এবার কুঁজোর লাসটির চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে বল্‌ল—'যা হারামি, এবারের মত ছেড়েই দিলাম।'

লাসটি এবার ধপাস করে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

দোকানিরা লাসটি ধরে ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কি করে নিঃসন্দেহ হ'ল, হতভাগাটি মরেই গেছে। তারা গলা ছেড়ে চিৎকার করতে লাগল—'কে, কোথায় আছ, এসো। দেখে যাও কী সর্বনেশে কাণ্ড! এক খ্রীস্টান এক মুসলমানকে খুন করেছে!'

চিৎকার শুনে প্রহরায় নিযুক্ত দু'জন লোকও অন্যান্যদের সঙ্গে ছুটে এল। পাহারাদাররা মাতাল খ্রীস্টানটির কোমরে দড়ি পরিয়ে কোতোয়ালের বাড়ি নিয়ে গেল। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে তার ঘুম ভাঙাল। কোতোয়াল ঘটনার বিবরণ শুনে মাতাল খ্রীস্টানের ফাঁসির হুকুম দিল। কোমরে দড়ি বেঁধে নগরের পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হবে প্রথমে। তারপর হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে ফাঁসি দেওয়া হবে।

মাতাল খ্রীস্টানটির গলায় যখন ফাঁসির দড়ি পরানো হচ্ছে ঠিক তখনই সুলতানের রসুইকর ছুটে এসে বল্‌ল — 'এ-নিরপরাধ খ্রীস্টানটিকে কেন মিছে হত্যা করছ। কুঁজো লোকটিকে মেরেছি তো আমি।'

কোতোয়াল বলল—'বললেই তো হবে না, প্রমাণ কি?'

—'গতকাল রাত্রে সুলতানের রসুইখানার পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। আমি একটি চ্যালা কাঠ দিয়ে এক ঘা দিতেই এলিয়ে পড়ল। ব্যস, একেবারে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল! আমি চুপি সাড়ে লাসটিকে হাটে রেখে চম্পট দেই।'

কোতোয়ালের নির্দেশে জল্লাদ রসুইকরের গলায় দড়ি পরাল। ঠিক তখনই সে-ইহুদী হেকিম হন্তদন্ত-হয়ে ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'এ কী জবরদস্তি কাজ করছেন? লোকটিকে খুন করলাম আমি আর ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছেন এ-নিরীহ রসুইকরটিকে! একে ছেড়ে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন।'

অগত্যা কোতোয়াল বুড়ো হেকিম'কে ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ দিল।

জল্লাদ বুড়ো হাকিমকে নিয়ে বধ্যভূমিতে দাঁড় করাল।

ফাঁসির দড়ি তার গলায় পরাতে যাবে তখনি ভিড়ের মধ্য থেকে চিৎকার শোনা গেল—'আরে, করছ কী! করছ কী! কাল সন্ধ্যার কিছু আগে আমি আর আমার বিবি বেড়িয়ে ফেরার পথে দেখলাম, এক রাস্তার মোড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে কুঁজোটি হাসছে। খুব রাগ হ'ল। লোকটি খুবই রসিক ছিল। আমার বিবির লোকটির চেহারার অস্বাভাবিকতাটুকু দেখে খুবই মায়া হ'ল। তাকে বাড়ি নিয়ে এলাম। রাত্রে খেতে বসে মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে লোকটি হঠাৎ মারা গেল। চাদরে মুড়িয়ে লাসটিকে এ-বুড়ো হেকিমের বাড়ির সিঁড়িতে রেখে দিয়ে চম্পট দিয়েছিলাম। কাঁটা সমেত মাছের টুকরোটি আমিই জোর করে তার মুখে গুঁজে

দিয়েছিলাম। অতএব আমিই তো ওর মৃত্যুর কারণ। বুড়ো হেকিম ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে লাসটির সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। অতএব আমাকেই ফাঁসির দড়ি অবশ্যই গলায় পরতে হয়।'

জল্লাদ দর্জির গলায় ফাঁসির দড়ি পরাবার উদ্যোগ নিল। ব্যাপারটি এরই মধ্যে সুলতানের কানে পৌঁছে গেছে। কুঁজো অষ্টাবক্রটি তাঁর খুবই স্নেহের পাত্র ছিল। সে মদের ঘোরে টলতে টলতে দর্জির ও তার বিবির সামনে এলে তারা তাকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। তারপর কিভাবে তার মৃত্যু হয়, সে-অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কোতোয়াল, ইহুদি হেকিম, সুলতানের রসুইকর প্রভৃতি। তারপর দর্জিকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবার আয়োজন করা হয়।

সুলতান দর্জির ফাঁসি রদ করার জন্য ফরমান জারি করে এক ঘোড়সওয়ারকে পাঠালেন।

কোতোয়াল ছুটে এলেন সুলতানের কাছে। ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন। সুলতান সব শুনে যারপার নাই বিস্মিত হলেন।

এবার সে-খ্রীস্টানটি দরবারে উপস্থিত হ'ল। যথোচিত অভিবাদন করে বলল—'জাঁহাপনা, এর চেয়ে অনেক, অনেক বেশী বিস্ময়কর কিস্‌সা আমার জনা আছে। আপনি যদি তা শুনতে উৎসাহী হন তবে আমি শুরু করতে পারি।'

সুলতান অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বল্‌লেন—'আমি আগ্রহী, শুরু কর তোমার কিস্‌সা।'

খ্রীস্টান যুবকের কিসসা

খ্রীস্টানটি তার কিসসা শুরু করতে গিয়ে বলল—'জাঁহাপনা, আপনি দীন দুনিয়ার মালিক। আমি এক বিদেশী, খ্রীস্টান। আমার জন্মভূমি কায়রো। বিভিন্ন দেশ ঢুঁড়ে শেষ পর্যন্ত আপনার সুলতানিয়তে এসে থিতু হলাম। শুরু করলাম কারবার। দালালীর কারবার। আমার আব্বাজীও এ-কারবারই করতেন। বলতে পারেন এটি আমাদের বংশগত কারবার। আব্বাজী বেহেস্তে গেলে আমিই কারবারের সর্বেসর্বা হলাম।

এক সকালে গাধার পিঠে চেপে এক যুবক আমার কাছে এল। সুদর্শন যুবক, তার চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আগন্তুক যুবকটির দিকে তাকালাম। সে কামিজের জেব থেকে এক মুঠো ক্ষীরার বীজ বের করে আমার সামনে ধরে বল্‌ল—'এখন দর কত যাচ্ছে, বলুন তো?'

—'একশ দিরহাম।'

—'ঠিক আছে, আপনি তবে খান-অল-জয়ালী বিজয় দরওয়াজের কাছে চলুন। আমি অপেক্ষা করব।'

ক্ষীরার বীজগুলি আমার সামনে রেখে সে বিদায় নিল। আমি ক্ষীরার বীজগুলো নিয়ে এক মহাজনের কাছে গেলাম। সে এক'শ দশ দিরহাম দর দিয়ে কিনতে রাজি হল, আমার দশ দিরহাম করে লাভ হবে।

আমি খ্রীস্টানটির কাছ থেকে পঞ্চাশ মন বীজ কিনে ফেললাম। যুবকটি বল্‌ল, আপনি তবে প্রতিমনে দশ দিরহাম করে দালালি পেয়ে যাচ্ছেন। মাল নিয়ে যান৷ আপনার দালালির পাঁচ শ' দিরহাম কেটে বাকি সাড়ে চার হাজার আপনার কাছেই জমা রাখবেন। আমি সুবিধামত সময়ে গিয়ে বাকি সেগুলো নিয়ে আসব।

সেদিন আমার মোট এক হাজার দিরহাম রোজগার। পাঁচশ' পাই বীজের মালিক যুবকটির কাছ থেকে আর পাঁচশ' পাই মহাজনের কাছ থেকে।

প্রায় এক মাস পরে যুবকটি এলে তার প্রাপ্য সাড়ে চার হাজার দিরহাম তাকে দিতে চাইলাম। সে আরও কিছুদিন পরে নেবে বল্‌ল। তার কাছে নাকি রাখার একটু অসুবিধা।

প্রায় এক মাস পরে যুবকটি এল। আমি দিরহামগুলো নিতে বল্‌লে সে আরও কিছু দিন আমার কাছেই জমা রাখতে বল্‌ল।

আরও মাস খানেক পরে একদিন আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই চিৎকার করে বল্‌ল—'এখন আর নামব না। জরুরী কাজে যাচ্ছি। সন্ধ্যার দিকে এ পথেই যাব। তখন দিরহামগুলো নিয়ে যাব।'

আমি সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পর থেকেই দিরহামগুলো

...তর অপেক্ষায় বসে রইলাম। কিন্তু সে ফিরল না।

...এক মাস পরে হঠাৎ একদিন সে উদয় হল। আমি ...রের থলেটি এনে তার সামনে রাখলাম। এবারও সে নিল না।

...রও বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এক বিকেলে টাট্টুর পিঠে ...প যুবকটি হাজির হল। চকমকে পোশাক পরিহিত। আমি ...গুলো এনে তাকে দিতে চাইলাম। বল্লাম—'পরের গচ্ছিত ...লত যে কী দুশ্চিন্তার ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া জানে ...। এগুলো নিয়ে আমাকে চিন্তামুক্ত কর।'

—'কিছু মনে করবেন না, আর ক'দিন দয়া করে ধৈর্য ধরুন।'

...পায় হয়ে তার অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলাম।

...দিন যুবকটিকে খানাপিনা করতে অনুরোধ জানালাম। রাজি ... সাধ্যমত আয়োজন করলাম। সে পরিতৃপ্তিসহকারে সবকিছু ... একটি জিনিস দেখে অকস্মাৎ আমার মনটি মোচড় দিয়ে ... সে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁ-হাত দিয়ে খেলো। ভাবলাম ...ভাবে হয়ত তার ডান হাতটি জখম হয়ে গিয়েছিল।

...রটি আমার মনে আরও বেশী কৌতূহল সঞ্চার করল ...লাম ডানহাতের সাহায্য না নিয়েই সে তার বাঁ-হাতটি ...ধুয়ে ফেল্‌ল।

...জিজ্ঞাসা করলে সে ম্লান হেসে গায়ের চাদরটি সরিয়ে ...ল, তার ডানহাতটি কব্জির কাছ থেকে কাটা।

...র কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে যুবকটি বল্‌ল —হুজুর, ... একবার কায়রো নগরে গিয়েছিলাম। এক সরাইখানায় ...কে থাকতে হয়েছিল। বিক্রি করার জন্য বিভিন্নরকম পোশাক ...য়েছিলাম। উটের পিঠ থেকে নফর সমানপত্র নামাল। ...নার জন্য তাকে একটি দিনার দিয়েছিলাম। পথশ্রমে ক্লান্ত ... শরীর বিছানার আশ্রয় পেতেই এলিয়ে পড়লাম। গভীর ...চ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সমানপত্র উটের পিঠে চাপিয়ে ব্যবসা ... ধান্দায় নফরটিকে নিয়ে শহরের বাজারে গেলাম। বরাত ... একের পর এক বহু মহাজনের দরজায় ঘুরেও একটি জামা ...ভও কাউকে গছাতে পারলাম না। আর যে দাম দিতে চাইল ... আমার ক্রয়মূল্যের চেয়েও কম।

সবশেষে এক দালাল বল্‌ল—'হুজুর অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ...নে যা কিছু করে আপনাকেও তাই করতে হবে। সমানপত্র যা আছে সব ধারে বেচে দিন। মাল দেয়ার সময় হুণ্ডি করিয়ে দেব। একমাস পর প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার তারা কিস্তি দেয়। দু ...হে মাত্র দু'দিন আসে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে যাবার জন্য। ...বটি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হ'ল। ব্যস, দালাল ...কৎ সবকিছু বিক্রি হয়ে গেল। নগদ অর্থকড়ি কিছুই পেলাম না। ক্রেতারা হুণ্ডির কাগজ তৈরী করে দিল।

সন্ধ্যায় গ্রাম্য মেয়েদের নাচাগানা দেখে মেজাজ একটু চাঙা করে সরাইখানায় ফিরলাম। একমাস ধরে বহুত মজা লুটলাম। দালালটি খুবই কর্মতৎপর। ঘুরে ঘুরে বেশ কিস্তির টাকা আদায় করে এনে দেয়।

একদিন এক রেশম কাপড়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। গল্পটল্প করে মেজাজ একুট শেরিফ করে নেওয়ার ইচ্ছা। দোকানি আমার প্রায় সমবয়সী। খুবই মিশুকে ও আড্ডাবাজ। একথা-সেকথার ফাঁকে সে আমাকে বল্‌ল, আমার চেহারাছবি নাকি লেড়কিদের খুব পছন্দ। এরকম বহু কথা শুনে আমার কালিজাটি একেবারে চনমনিয়ে উঠল।

এরই মধ্যে বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে এক জেনানা এসে আমার সামনে বসল। কাপড় কিনতে আগ্রহী। তার গা থেকে ভুরভুর করে দামী আতরের খুসবু বেরিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। বোরখার নাকাবটি এতই পাতলা যে তার মধ্য দিয়ে কাঁচা হলুদের মত তার গায়ের রঙ যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ছুঁচলো নাক। হরিণীর মত ডাগর ডাগর চোখ। কপালের ওপর দু-চারগাছ কোঁকড়ানো চুল তার মুখের সৌন্দর্যকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। একটু আগেই দোকানির কথা আমার কলিজায় আদি রসের সঞ্চার ঘটিয়েছে। তার পর-মুহূর্তেই বেহেস্তের পরীটি মুখোমুখি এসে বসল। এক লহমায় তার দিকে তাকাতেই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। কলিজাটি উথালি পাথালি শুরু করে দিল। একটু পরেই নিঃসন্দেহ হলাম, সে-ও আমার দিকে কম ঝুঁকে পড়েনি। বোরখার

নাকাবটি সামান্য সরিয়ে আচমকা আঁখি-বাণ আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। আমার কলিজাটি অকস্মাৎ যেন ডিগবাজী খেয়ে ধীরে ধীরে আবার সোজা হ'ল।

এক সময় অভাবনীয় মিষ্টি-মধুর স্বরে সে দোকানিকে বল্‌ল, —'সোনার জরির কাজকরা ভাল মসলিন দেখাতে পারেন?'

দোকানি একের পর এক শাড়ী তার সামনে রাখতে লাগল। একটি হাতে তুলে নিয়ে দাম জিজ্ঞাসা করল। দাম শুনে বল্‌ল—'কিন্তু আমার সঙ্গে তো এত দিনার নেই। আমি বরং এটি নিয়ে যাচ্ছি। বাকি দিনার পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

—'কিছু মনে করবেন না। এতগুলো দিনার দাম, ধারে দেওয়া যাবে না। মহাজন সামনেই বসে। দুঃখিত, দাম নিয়ে এসে পরেই না হয়—'

—'ছিঃ! এরকম আচরণ করছেন! এতদিন ধরে হাজার হাজার দিনার লেনদেন হয়েছে। কোনদিন বাকি ফেলে রেখেছি, বলুন?' শাড়ীটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবার বল্‌ল—'আসলে আপনারা শুধু সমানপত্র কেনাবেচাই করেন। আসল নকল খদ্দের চিনতে পারেন না।' তার যৌবনভরা দেহপল্লবটিকে এক ঝটকায় টুল থেকে তুলে নিয়ে ক্রোধমত্তা সিংহীর মত গটুমটু করে চলে গেল।

ব্যাপারটি আমার কাছে মোটেই সৌজন্যের পরিচায়ক বলে মনে হল না। মেয়েটি খুবই অপমানিত হয়েছে। লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে আমি তার পথ আগলে দাঁড়ালাম। মুখ কাচুমাচু করে বল্‌লাম— 'দেখুন, যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। আপনি চলুন, শাড়ীটি নিয়ে যান।'

—'দেখুন, দোকানির আচরণ বাস্তবিকই শিষ্টতা বহির্ভূত।' এবার নাকাবের ফাঁক দিয়ে দু'চোখের বাণ ছুঁড়ে বল্‌ল— 'কেবলমাত্র আপনার দিকে তাকিয়েই যেতে পারি।'

আমি অপরিচিতা হরিণীটিকে দোকানে নিয়ে গিয়ে এগার'শ দিরহাম মূল্যের শাড়ীটি দোকানির কাছ থেকে নিয়ে হাতে তুলে দিলাম। বিনিময়ে দোকানিকে একটি রসিদ লিখে দিলাম।

এবার মুচকি হেসে মেয়েটিকে বল্‌লাম—'প্রতি বৃহস্পতিবার আমি এ তল্লাটে আসি। মন চাইলে শাড়ীটির দাম দিতেও পারেন নইলে আমার তরফের উপহার এ মনে করতে পারেন।'

মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁত ক'টি মেলে ধরে অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিমায় হেসে লেড়কিটি বল্‌ল—'এত সুন্দর আপনার ব্যবহার যে, আর বলার নয়। এমন মহানুভব মানুষ আজকাল সচরাচর চোখেই পড়ে না। খোদাতাল্লার দোয়ায় আপনার হয়ত অনেক ধন-দৌলত আছে। তবুও যে আমাকে একবার মাত্র দেখেই আমার চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছেন সে আপনার অপরিমিত অভিজ্ঞতার জন্যই হয়ত সম্ভব হয়েছে। যদি মেহেরবানী করে গরীবের কুটীরে একবারটি পায়ের ধূলো দেন তবে ধন্য হ'ব।'

আমার ভেতরে কামস্পৃহা ত চড়াক করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সাহসে ভর করে বলেই ফেল্‌লাম—'সুন্দরী, আমাকে বাড়িতে আমন্ত্রণই যখন জানাতে পারলেন তখন আর বিভেদের প্রাচীরটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে আমার কলিজাটিকে কেন মিছে পীড়া দিচ্ছেন? ওড়নার নাকাবটি সরিয়ে ফেলে ওই কমলবদন দেখে মনপ্রাণ শান্ত করার সুযোগ দিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করব।'

মেয়েটি নাকাব তুলে নিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল। হঠাৎ চার চোখের মিলন ঘটে যাওয়ায় শরমে তার মুখাবয়বটি সিঁদুরে মেঘের মত রক্তাভ হয়ে উঠল। আকস্মিক শরমে চোখ নামিয়ে নিল কিন্তু আড়চোখে আমাকে দেখার লোভ সামলাতে পারল না। ঠোঁটের কোণের দুষ্টুমিভরা হাসির রেখাটুকু মুহূর্তের জন্যও মিলিয়ে যায়নি।

আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন এক অনাস্বাদিত ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। হৃদস্পন্দন দ্রুততর হ'ল। রক্তের গতি বৃদ্ধি পেয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

লেড়কিটি আবার মুখ খুলল—'আমার ঠিকানা দোকানির কাছেই পেয়ে যাবেন। আশা করি অবশ্যই আমার বাড়ি আসছেন, কি বলেন?'

আমি কিছু বলার আগেই সে শাড়ীটি হাতে নিয়ে দোকান ছেড়ে রাস্তায় নেমে গেল। আমি তার ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লাম।

সারাটি দিন সে-অপরূপার ডাগর ডাগর চোখের মন-পাগল করা চাহনি, বিচিত্র ভঙ্গিতে ভ্রূ-নাচানো, ঠোঁটের কোণের কামোদ্দীপক হাসি—আমার মনকে পীড়া দিতে লাগল।

সরাইখানায় পৌঁছে রাত্রে খানাপিনা করতে আর মন চাইল না। শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল না। মন-প্রাণ যদি সুস্থির না-ই থাকে তবে ঘুম তো আসতে পারে না। মাঝ-রাত্রি পর্যন্ত নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে বিছানায় পড়ে ছটফট করলাম। বাকি রাত্রিটুকু কাটালাম অস্থিরভাবে পায়চারি করে।

কাকডাকা ভোরে গোসল সেরে ঝকমকে দামী পোশাক পরে নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে বদর-অল-দীন-এর দোকানে গেলাম। আমার পোশাককে কেন্দ্র করে বদর রঙ্গ-তামাশায় মেতে উঠল।

আমার আকাঙ্ক্ষিতা সে অপরূপা গুটিগুটি পায়ে দোকানে ঢুকল। সে কিন্তু ভুলেও দোকানির দিকে চোখ ফেরাল না। সর্বক্ষণ আমার মুখের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ রাখল। কুশল বার্তাদি আদান-প্রদান হ'ল আমার মধ্যে। তারপর উঠতে উঠতে বল্‌ল—'আপনার কোন লোক আছেন, একবারটি আমার সঙ্গে বাড়ি যেত? আপনার প্রাপ্য দিনার ক'টি তার হাতে দিয়ে দিতাম।'

—'আপনি কেন সে শাড়ীটির জন্য এমন উতলা হচ্ছেন, বুঝছি না! এত ব্যস্ততা কিসের? পরে যা হয় দেখা যাবে। সামান্য ক'টা দিনারের অজুহাতে হয়ত দেখবেন কোনদিন আপনার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছি।'

ফিক করে হেসে উঠল লেড়কিটি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল বিচিত্র ভঙ্গিতে। থলি খুলে এগার'শ দিরহাম আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌ল— 'অজুহাতের দরকার হবে না। যখন দিল চায় চলে যাবেন। চলি।'

দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটা জুড়ল। একটি ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হ'ল। দিরহামগুলো আমার হাতে দেওয়ার সময় তার হাতের আঙুলগুলো প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশী সময়ই আমার হাতের তালু স্পর্শ করেছিল। তার কি হ'ল। কতটুকু কি পেল আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে মুহূর্তের স্পর্শেই আমার শরীরের শিরা উপশিরাগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে উঠেছিল। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে পড়েছিল। কোন নারীর সামান্য স্পর্শে এত সুখ-উৎপাদন করতে পারে তা আমার অন্ততঃ জানা ছিল না। আমার বুঝতে বাকি রইল না মনময়ূরী জালে আটকা পড়েছে। আপন মনে হাসলাম।

আমিও দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। তার পিছু নিলাম। কিন্তু হঠাৎ সে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মনটি অস্বাভাবিক বিষিয়ে উঠল। এমন সময় তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে আমার সামনে এসে মুচকি হেসে বলল—'মেহেরবানি করে আমার মালকিনের ঘরে একবারটি পায়ের ধূলো দেবেন? তিনি আপনার সঙ্গে জরুরী কিছু কথা বলতে আগ্রহী।'

—'বহুত আচ্ছা। চল, এখনই যাওয়া যাক।'

একটি দোকানের পাশে তাঁর সঙ্গে দেখা। চোখে ইশারা করে জানালো পাশের এক নিরিবিলি জায়গায় আমাকে যেতে হবে। আমি তার নির্দেশিত প্রাচীরের ধারে চলে গেলাম। পরমুহূর্তেই সে-ও সেখানে হাজির হ'ল। 'সে বোরখার নাকাব সরিয়ে মিনতির দৃষ্টিতে তাকাল। বল্‌ল—'আঃ তোমাকে দেখামাত্র আমার বুকের ভেতরে কেমন যেন এক অভাবনীয় রোমাঞ্চ অনুভব করছি। শিরায় শিরায় জেগেছে মাতন। আমার রাত্রের ঘুম তুমি কেড়ে নিয়েছ পরদেশী। কেন এমন হ'ল? তুমি কি যাদুবিদ্যা জান? তোমার যৌবন আমাকে মাতাল করে দিয়েছে। মেহবুব, আমার মধ্যে কেন তুমি এমন কামাগ্নি জাগিয়ে তুলেছ?'

—'আমার অবস্থাও ঠিক একই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে মেহবুবা। তোমার আঁখি-বাণ আমার কলিজাটিকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। কেন? কেন আমি এমন—।'

আমাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে উঠল 'মেহবুব। তুমি যাবে আমার ঘরে? তোমাকে বুকের মধ্যে না পাওয়া পর্যন্ত আমার কলিজা ঠাণ্ডা হবে না। আজ নয়। কাল বিকেলে একটি খচ্চরের পিঠে চেপে আমার ঘরে এসো। জিজ্ঞেস করবে সিনডিক রবাক-এর ঘরের ঠিকানা।'

আমি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললাম—'মেহবুবা, অবশ্যই যাব। নইলে যে আমার কলিজাও শান্তি বারি পাবে না।'

পরদিন দুপুর পোরোতে না পেরোতেই আমি একটি রুমালে পঞ্চাশটি সোনার মোহর বেঁধে আমার মনময়ূরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। লাল রঙের একটি বাড়ির সামনে আমি খচ্চরের পিঠ থেকে নামলাম।

আমি দু'পা এগিয়ে দরজার কড়া নাড়লাম। দুটো খুবসুরৎ লেড়কি এসে দরজা খুলে আমার সামনে দাঁড়াল। এক নজরে দেখেই মনে হ'ল তারা যেন বেহেস্ত থেকে সবে দুনিয়ায় নেমে এসেছে। নতুবা পরীদেরই কেউ হবে হয়ত।'

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে রূপসীদের একজন বলল—'আসুন হুজুর। আমাদের মালকিন আপনার পথ চেয়ে সকাল থেকে বসে। রাতভর আপনার সুরতের চিন্তায় কাটিয়েছেন। আপনি তার খুশী উৎপাদন করুন হুজুর।'

আমি অপরূপাদের পিছন পিছন সুন্দর বাড়িটির ভেতরে ঢুকে গেলাম। সদর-দরজা থেকে শুরু করে উঠোন, বারান্দা, ঘরের মেঝে সবই বহুমূল্য শ্বেতপাথরের তৈরী। তারা আমাকে নিয়ে সুসজ্জিত একটি ঘরে মেহগনি কাঠের একটি কুর্শিতে বসাল।

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলা হলে বেগম শাহরাজাদ দেখলেন প্রাসাদের বাইরে ভোরের আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। তিনি এবার কিসসা বন্ধ করলেন।

ছাব্বিশতম রজনী

সন্ধ্যার কিছু পরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। উপস্থিত হলেন বেগমের কামরায়।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন— 'জাঁহাপনা, কায়রোর সে-খ্রীস্টান দালাল তার কিস্‌সা বলে চললেন।' অধীর আগ্রহে, একাগ্রচিত্তে সুলতান তার কাহিনীর পরবর্তী অংশ শুনতে লাগলেন। খ্রীস্টান দালালটি এবার বলল— 'জাঁহাপনা, সেই যুবকটি বলতে লাগল আমার জান, আমার কলিজা সে-রূপসী মণি-মুক্তার গহনায় নিজেকে সাজিয়ে তুলে ধীর-পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। পরণে তার অতিমিহি ঢাকাই মসলিম। তবু মনে হ'ল সে যেন একেবারেই নগ্না। তার নিটোল স্তন দুটো খুবই স্বচ্ছ। আর নিতম্ব, উরু, জঙ্ঘা সবই পরিষ্কার আমার আঁখি দু'টির সামনে ধরা দিচ্ছে। নগ্না এক নারীর মুখোমুখি যেন আমি দাঁড়িয়ে।

ঠোঁটের কোণে অত্যাশ্চর্য এক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমার মেহবুবা, আমার পেয়ারের বেগম আমার পাশে, একেবারে গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। তার আঠারো বছরের যৌবনভরা দেহের উষ্ণ উপস্থিতি ঢাকাই মসলিনে ঢেকে রাখতে পারল না।

আমি নীরব চাহনি মেলে তার যৌবনকে চাক্ষুষ করতে লাগলাম। কি করব, কি বলব সহসা গুছিয়ে উঠতে পারলাম না। সেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল। আচমকা আমার মুখটিকে তার উষ্ণ-নিটোল বুকে চেপে ধরল। আমি যেন মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। এতদিন শুধু ভেবেই এসেছি, কি এমন অমৃতভাণ্ড নারীর
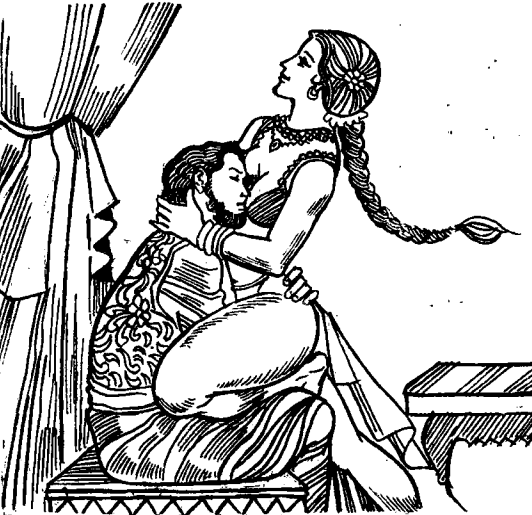
উন্নত স্তন দুটো যার ক্ষণিক স্পর্শের লোভে পুরুষরা ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়? আজ বুঝলাম, কেবল অমৃতই নয়। তাতে রয়েছে আকর্ষণীয় মাদকতা গুণ। পর মুহূর্তেই যে তার পদ্মের পাঁপড়ির মত সুন্দর ঠোঁট দুটোকে নামিয়ে এনে আমার ঠোঁটে রাখল। আহারে! কী সে সুখ, কী যে স্বস্তি তার বিচার করার ভাষা আমার জানা নেই। আমার ঠোঁট—ওর ঠোঁট—মধু বিনিময় —তৃপ্তি! আমি কি করব, কিসে যে বেশী সঙ্গসুখ অনুভব করতে পারব সে বোধশক্তি হারিয়ে ফেললাম।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। উন্মাদিনীর মত তার বুকের সঙ্গে আমার প্রশস্ত বুকটিকে চেপে ধরল। আমি তার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত দুটোকে চালিয়ে দিয়ে শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে চেপে ধরলাম। আমার একেবারে বুকের সঙ্গে সে লেপ্টে রয়েছে। তবু মনে হ'ল, আরও, আরও কাছে তাকে পাওয়ার জন্য মন প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে আবেশে জড়িত, কামাতুর চোখ দুটো মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আবেগ-মধুর স্বরে বলল 'মেহবুব আমার' আজকের এ-সন্ধ্যা আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত। ওগো পরদেশী, তুমি আজকে কি সুখ, কী অবর্ণনীয় তৃপ্তি আমাকে দিলে তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না!'

আমি তার আপেলরাঙা কপোলে আলতো করে একটি চুম্বন দিয়ে বললাম—'সুন্দরী, আমার অবস্থাও তোমারই মত। আজ এই প্রথম মহব্বতের স্বাদ পেলাম। মহব্বত যে কী মধুর বস্তু তা আজই প্রথম উপলব্ধি করলাম। ওগো সুখদায়িনী, আমার কলিজা আজ অমৃতের স্বাদ পেয়ে ধন্য হল।'

সে আমার পৌরুষের চিহ্ন সম্বলিত লোমশ বুকে মাথা গুঁজে আবার মধুর স্বরে বলল—'আমি এর আগে কোনদিন কোন পুরুষের কাছ থেকে মহব্বত পাইনি। আমার শাদী হয়েছিল। এক বুড়া আমার জীবনে এসেছিল। অগাধ ধন-দৌলতের মালিক। কিন্তু নারীকে প্রকৃত সুখ আস্বাদন করানোর মত ছিল না বলতে, কিছুই ছিল না। আমার কাছে সে ছিল অভিশাপ মাত্র। আজ তুমি আমাকে পেয়ার মহব্বতে ভরিয়ে দাও, আকুল প্রাণকে শান্ত-স্নিগ্ধ কর, তৃপ্ত কর আঠার বছরের অতৃপ্ত মনকে। আমিও আমার সযত্নে রক্ষিত সম্পদ তোমাকে উজাড় করে দেব। আমার এ-দেহ আর এ-মন সবই তোমার মেহেবুব।'

রাত্রে পানাহার করলাম পাশাপাশি বসে। তারপর আমরা জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। পাশের বাগিচা থেকে ফুরফুরে বাতাস এসে আমাদের কামোন্মাদ দেহ দুটোকে স্নান করিয়ে দিতে লাগল। শীতল বায়ুর স্নান। এক সময় আমরা কখন যে আরও কাছাকাছি হতে শুরু করেছিলাম তা বলতে পারব না। কখন যে আমি তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলাম তা-ও যেন নিজেরই অজান্তে ঘটেছিল। উভয়ে এবার নতুন খেলায় মশগুল হয়ে পড়লাম।

ক্রমে একে অন্যের কাছে হারিয়ে যেতে লাগলাম। তার ...টি ছাড়া পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্রও হুঁস ছিল না।

কখন যে মোমবাতিটি গলতে গলতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে বুঝতেই পারি নি। আর কতক্ষণ যে আমরা পরম প্রিয় অন্ধকারের মধ্যে কাটিয়েছিলাম তা-ও সঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারব না। কতক্ষণ যে সে আমার বাহুলগ্না হয়ে ছিল তার হিসাবই আমাদের কার ছিল না। আমার জীবনে এমন মধুঝরা রাত্রি এর আগে কোনদিনই আসে নি।

এক সময় রাত্রি পোহাল। ভোরের আলো জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে নেমে এলাম।

আমি আমার পরম সুখদায়িনী মেহবুবার কাছ থেকে বিদায় নেবার উদ্যোগ নিলাম। আমাকে দু'বাহুর বন্ধনীতে জড়িয়ে ধরে আবেগভরা কণ্ঠে বলল—'মেহবুব, আবার কবে তোমাকে আমার বুকের মাঝে ফিরে পাব? কবে তোমার যৌবন আমার যৌবনভরা দেহটিকে সুখদান করবে?'

—'আজই। আজ রাত্রেই আবার আমরা মিলিত হ'ব।'

সরাইখানায় গিয়ে ভাল করে গোসল করলাম। আমার শরীরের অংশ বিশেষের প্যাচপ্যাচানি দূর হ'ল। সামান্য কিছু নাস্তা করে বাজারে তাগাদায় বেরোলাম।

সন্ধ্যার কিছু আগে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা কামিজের জেবে ঢুকিয়ে উঠলাম আমার পক্ষীরাজ খচ্চরটির পিঠে।

আমি মেহবুবাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বারবার চুম্বনের মধ্য দিয়ে বিহ্বল করে তুললাম। নেশা। সুরার নেশার চেয়েও শক্তিশালী নেশার ঘোরে সারাটি রাত্রি কি করে যে কেটে গেল বুঝতেও পারি নি।

সকালে অবার সরাইখানায় ফিরে এলাম। পঞ্চাশটি সোনার মোহর তার বালিশের তলায় রেখে এসেছি।

সারারাত্রি শরীর ও মনের ওপর খুবই ধকল গেছে। অত্যাচার। গোসল সেরে বিছানায় আশ্রয় করতেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

সন্ধ্যার কিছু পরে আবার পঞ্চাশটি সোনার মোহর জেবের মধ্যে ঢুকিয়ে উঠলাম আমার প্রিয়সঙ্গী খচ্চরটির পিঠে।

এভাবে একের পর এক রাত্রি আমরা পরস্পরের বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে কাটিয়ে দিতে লাগলাম।

একদিন আমি ঠাহর করলাম। আমি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়েছি। সঙ্গে অর্থ যা ছিল কমতে কমতে একেবারে চরম দুরবস্থায় এসে পৌঁচেছে। অর্থ চাই। মোহর। সোনার মোহর। রোজ পঞ্চাশটি করে সোনার মোহর যে আমার চাই-ই চাই। কিন্তু কোথায় পাব? কাছে কিছু পাওনা নাই। হারা উদ্দেশ্যে রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, এক সিপাহীর পিছনে কিছু লেড়কা ভিড় করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। আমি ভিড় ঠেলে তার গা-ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ তার জেবে আমার গা ঠেকল। বুঝলাম, মোহরের থলে। আলতো করে তুলে নিলাম। পারলাম না। সামলাতে পারলাম না। সিপাহীটি চেঁচিয়ে উঠল—'আমার মোহরের থলে গেল কোথায়?' আচমকা আমার মুখে একটি ঘুষি লাগল। বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই সে-পথে কোতোয়ালকে দেখা গেল। আমাকে তল্লাসী করা হ'ল। জেব থেকে সিপাহীর মোহরের থলিটি পাওয়া গেল।

বামালসহ হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। অস্বীকার করার উপায় নেই। কোতায়ালের নির্দেশে আমার হাত দুটো কেটে ফেলার ব্যবস্থা করা হ'ল। ডান হাতটি কাটার পরে পথচারীরা অনুরোধ করল যাতে অন্য হাতটি, আমার এ-বাঁ হাতটি কাটা না হয়।

কোতোয়াল অনুরোধ রক্ষা করল।

আমাকে নিয়ে পাশের দাওয়াখানায় গেল। দাওয়াই দিয়ে প্রয়োজনীয় ইলাজ করল বুড়ো হেকিম।

এবার আমি বেঁ-হুসের মত হাঁটতে হাঁটতে আমার মেহবুবার বাড়ির দরজায় কখন যে হাজির হয়েছি, বুঝতেই পারিনি।

রাত্রের মেহবুব সকালেই হাজির হয়েছি দেখে সে খুবই অবাক হ'ল। আমার কাটা-ডানহাতটি রুমালে ঢাকা। সে কিছু বুঝতে পারে নি। কিন্তু খেতে বসে বাঁ-হাত দিয়ে খেতে দেখে সে অবাক হ'ল।

আমি তাকে শঙ্কামুক্ত করতে গিয়ে বললাম —'হাতে একটি ফোঁড়া উঠেছে। বেঁধে রেখেছি।'

আমার হাতের ব্যথা কমাবার জন্য সে আমাকে সরাব এনে দিল। পর পর দু'গ্লাস গলায় ঢেলে দিলাম।

শরীর এলিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখলাম, আমার হাতের বাঁধনটির কিছুটা হেরফের হয়েছে। বুঝলাম, ঘুমন্ত অবস্থায় হাতের বাঁধন খুলে সে দেখেছে। তারপরে আবার বেঁধেছেঁদে রেখেছে। খুব লজ্জা হ'ল। সে কিন্তু কিছু বল্‌ল না, একটিও প্রশ্ন করল না।

আমার ঘুম ভাঙতেই সে নীরবে এক পেয়ালা সরাব এনে আমার মুখের সামনে ধরল। আমিও নিতান্ত বাধ্য ছেলের মত এক চুমুকে সবটুকু সরাব গলায় ঢেলে দিলাম।

আমি বেরোতে চাইলাম। সে রুখে দাঁড়াল। বলল—'আগে তোমার হাতের ইলাজ করাতে হবে। এখান থেকে এক পা-ও কোথাও যেতে পারবে না।'

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে কৃত-অপরাধের জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আর বারবার বলতে লাগলাম—'আমি চোর। চুরি করতে গিয়েছিলাম। ধরা পড়ে আমার এ-শাস্তি হয়েছে।'

—'কেঁদো না সোনা মাণিক। কেন ও কাজ করতে গেলে, বল তো?' লেড়কিটি নিজেকেই দোষী সব্যস্ত করেছে। রোজ রাত্রে ফুর্তি করার জন্য পঞ্চাশটি করে সোনার মোহর তো আমাকেই দিয়ে গেছে। এভাবেই তো সে আজ আমির থেকে ফকির বনে গেছে। আমার গায়ে - মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সে বল্‌ল—'মেহবুব আমার, কোথাও যেতে হবে না তোমাকে। আমার জন্যই তো তোমার এরকম হয়েছে। আমাকেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।'

—'আমি তো আর গুঁড়া লেড়কা নই যে, তুমি আমার এ-দশার জন্য দায়ী হবে। আমি তো স্বেচ্ছায়ই এগিয়ে এসেছি। কেন মিছে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ, অপরাধী বোধ করছ?' কথা বলতে বলতে তাকে বুকে টেনে নিলাম। বাঁ-হাতটি তার পিঠে আলতো ভাবে বুলাতে লাগলাম। বল্‌লাম—'কেন তুমি মিছে নিজেকে অপরাধী মনে করে কষ্ট পাচ্ছ? নিজের দোষেই তো আমি ডান-হাতটি খুইয়েছি। আমার নির্বুদ্ধিতাই এর জন্য দায়ী।'

—'সে যা-ই হোক, আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে দিচ্ছিনে। তোমাকে আমি শাদী করে জীবনসঙ্গী করে নেব। আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে সবই তোমার হাতে তুলে দেব। ব্যবসা করবে। তাতেই আমাদের সুখে-দুঃখে কোনরকমে দিন গুজরাণ হয়ে যাবে।'

তার কথা শুনে আমি তো একেবারে থ বনে গেলাম। অন্তর থেকে পেয়ার করতে না পারলে তো এমন কথা বলা সম্ভব নয়। সে আমাকে নিয়ে গেল তার লোহার সিন্দুকের কাছে। নগদ অর্থ, সোনাদানা, হিরে-জহরৎ যা কিছু তার ছিল সবই দেখাল। আর দেখলাম আমার দেওয়া মোহরগুলো তেমনি ভাগে ভাগে সাজানোই রয়েছে। সবই আমার হাতে তুলে দিয়ে সে বল্‌ল—'নাও, এগুলো দিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু করে দাও। আমাদের বাঁচতে হবে। আর তার জন্য তোমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, মনে রেখো।'

আমি নতুন করে আশার আলো দেখতে পেলাম। নতুন জীবনের খোয়াব আমার মধ্যে ভর করল।

একটি ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। আমার মেহবুবার মধ্যে সর্বক্ষণ কেমন যেন এক অকথিত ব্যথা যন্ত্রণা কাজ করে চলছিল। ঘুমের ঘোরেও প্রায় বলতো—'আমি, হ্যাঁ আমিই ওর এ-হালতের জন্য দায়ী। আমার জন্যই তো তাকে ডান হাতটি খোয়াতে হ'ল। এ-দুঃখ আমি কোথায় রাখব! আমার মত হতভাগিনীর মরণ হওয়া এর চেয়ে ঢের ভাল।'

আমি তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে বলতাম—'মেহবুবা, কেন সব ভুল বকছ বল তো? আমার একটি হাত ছাড়া তো আর

কিছুই যায় নি। তারজন্য এত মর্মবেদনা ভোগ করছ কেন? একটি হাত তো রয়েই গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, যার জন্য এতসব সেই তুমি তো আমার পাশেই রয়েছ।'

হায় খোদা, আমরা কিন্তু সারাজীবন একসঙ্গে কাটাতে পারলাম না। কী বিমারী যে তার ওপর ভর করল, আমি বুঝতেই পারিনি। দূরদূরান্ত থেকে হেকিম নিয়ে এসে ইলাজ করালাম। কিন্তু তার বিমারী সারল না। দিন দিন শুধুই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগল। বুঝতে দেরী হ'ল না, আমার কাটা-হাতটির চিন্তাতেই তার ওপর এমন বিচিত্র বিমারী ভর করেছে।

না, কোন চেষ্টাতেই ফল পাওয়া গেল না। কোন হেকিমের দাওয়াই-ই ধরল না। একদিন আমাকে ফেলে সত্যিই সে বেহেস্তে চলে গেল।

সে মারা যাওয়ায় তার যাবতীয় ধনদৌলতের মালিক আমি হলাম। মনে মনে বল্লাম—'হায় আল্লা, একী হ'ল। এত ধন-দৌলত আমার কোন্ কাজে লাগবে? অর্ধেক বিক্রি করে দিলাম। পঞ্চাশ মন ক্ষীরার বীজ ছিল, যা আপনার কাছে বিক্রি করেছি। বিষয় সম্পত্তি যা আছে বেচে দেওয়ার ধান্দায় ঘুরছিলাম বলে আপনার কাছে এসে ক্ষীরার বীজের দাম নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এখন আর নেওয়ার ইচ্ছাও নেই। আমি চাই, তা দিয়ে আপনি ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হোন। আপনার উন্নতি আমাকে আনন্দিত করবে, মনে রাখবেন।

যুবকটি বল্ল —'এ-ই আমার জীবন কথা। তাই তো আজ আপনার ঘরে বাঁ-হাত দিয়ে খানা খেলাম, সরাব পান করালম।'

জাঁহাপনা, আমি যুবকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বল্লাম,—'তোমার করুণার কথা জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারব না'।

—'দেখুন, আজ আপনার সে-চার হাজার দিরহাম আমার কাছে খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। ধন-দৌলতের পাহাড় গড়ে ফেলেছি আমি। বাগদাদ নগরে সম্প্রতি আমি এক কারবার আরম্ভ করেছি। আপনি আমার সঙ্গে কারবার করতে আগ্রহী হলে খুশীই হ'ব।'

আমি এক কথাতে রাজি হয়ে গেলাম। আলেকজান্দ্রা আর কায়রো থেকে সমানপত্র এনে চড়া দামে বিক্রি করে কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে দিনারের কুমীর হয়ে গেলাম। কাল রাত্রে সরাব একটু বেশীই গিলে ফেলেছিলাম হুজুর। তারপরই কুঁজো ওই অষ্টাবক্রটির লাস নিয়ে ফ্যাঁসাদে পড়ে যাই।

বেগম শাহরাজাদ দেখলেন ভোর হয়ে এল বলে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতাশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার রাত্রে অন্দরমহলে বেগমের ঘরে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ কোনরকম ভূমিকার অবতারনা না করেই কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন— 'জাঁহাপনা, সে খ্রীস্টান দালাল তার জীবনকথা শেষ করে সুলতানকে বল্ল—'হুজুর, কুঁজো অষ্টাবক্র সে-লোকটির মৃত্যুর জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তবে বলব তার নসীবই একমাত্র দায়ী।'

সুলতান কিন্তু এত সহজে দমবার পাত্র নন। তিনি পূর্ব স্বর অনুসরণ করে বললেন—'তোমাদের কারো রেহাই নেই। এক এক করে আমি সব ক'টিকে কোতল করব। আমার দরবারের এক হাস্য রসিককে তোমরা খুন করেছ। আর আমি তোমাদের ছেড়ে দেব ভেবেছ?'

এবার সুলতানের রসুইকর বল্ল— 'জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন তবে আমি আমার কাহিনী শুরু করি।'

—'ঠিক আছে। তোমার বক্তব্যও তবে শোনাই যাক।'

— 'শুনুন জাঁহাপনা। আমর কিস্‌সা শুনে যদি আপনার মেজাজ শরিফ হয়, আমার কথা সত্য বলে মনে করেন তবে যারা আপনার চোখে অপরাধী মনে হচ্ছে আশা করি সবাইকে মাফ করে দেবেন।'

সুলতান মুখের গাম্ভীর্যটুকু অব্যহিত রেখেই বললেন—'আচ্ছা, পরের কথা পরেই না হয় ভাবা যাবে। কিস্‌সা শুরু কর। সত্যি যদি মজার ব্যাপার কিছু থাকে তখন বিচার-বিবেচনা করে দেখব।'

—'জাঁহাপনা, গতকাল আমার এক জিগরি দোস্তের বাড়ি

শাদীর ভোজ খেতে গিয়েছিলাম। বহু লেখাপড়া জানা এবং গুণীজন সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। খানা সাজানো হ'ল। কত রকম যে পাকসাক হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। তাদের মধ্যে জিরবাজা নামে রসুন ও মশলাপাতি সহযোগে পাক করা একটি বিশেষ খাবারও ছিল। একজন ছাড়া আমরা সবাই রসুনের জিরবাজা চেটেপুটে খেতে লাগলাম।

আমরা তাকে খাওয়াবার জন্য বার বার কোসিস করতে লাগলাম। বল্‌লাম —'সামান্য একটুখানি চেখেই দেখুন না।'

—'না, খাব না। এ-জিরবাজা খাওয়ার জন্য আমাকে একবার খুবই খেসারত দিতে হয়েছিল।'

ব্যস, এ পর্যন্তই। আমরা তাকে জিরবাজা খাওয়ার জন্য বেশী জুলুম করলাম না। কিন্তু ঘটনাটি কি? কেন এবং কিভাবে তাকে খেসারত দিতে হয়েছিল তা বলার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলাম আমরা।

এবার সে বল্‌ল — 'যদিও কোনদিন জিরবাজা খাই তবে খাওয়ার আগে আমি কম করেও চল্লিশবার সাবান, চল্লিশবার সোডা এবং পটাশ দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে নিয়ে তবেই খাব।'

বাড়ির মালিক তার হাত ধোওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো এবং এক বদনা পানি আনিয়ে দিলেন।

আমরা তার দুটো জিনিস গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিলাম— 'প্রথমতঃ খুবই আস্তে আস্তে সে খাচ্ছিল, আর দ্বিতীয়তঃ তার দু'হাতেরই বুড়ো আঙুল নেই, কাটা। আমরা খানাপিনা বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একজন তো কৌতূহল নিবৃত্ত করতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে বসল—'বলুন তো, আপনার হাত - পায়ের আঙুলগুলো খোয়ালেন কি করে?'

—'আমার আব্বাজী একজন বণিক ছিলেন। বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর সময় তার ব্যবসা খুবই রমরমা ছিল। সরাবের দিকে তাঁর ছিল খুবই ঝোঁক। বিভিন্ন দেশ থেকে সেরা সরাব এনে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে পান করতেন। আর দেশ-বিদেশের নামকরা বাইজীদেরও তিনি জোগাড় করে এনে গানের মজলিস বসাতেন। পরিণামে যা হবার তা-ই হ'ল। মৃত্যুর পর তার বিশাল দেনার বোঝা চাপল আমারই ঘাড়ে। আমি অবশ্য অল্প অল্প করে সবার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিলাম। ব্যবসায় নেমে পড়লাম। একদিন চকমকে পোশাক পরিহিতা এক যুবতী খচ্চরের পিঠে চেপে আমার দোকানে এল। বোরখার নাকাবের ফাঁক দিয়ে তার মুখের যে-অংশটুকু উঁকি মারছিল তাতেই আমার কলিজাটি চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। হায় আল্লা! মানুষের মুখ এত সুন্দরও হয়! তার পিছনে ও সামনে একজন করে খোজা যুবক, পাহারাদার।

সুন্দরী খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে ধীর-মন্থর পায়ে বাজারের দিকে এগোতে চেষ্টা করল। খোজাদের একজন পথরোধ করে দাঁড়াল— 'ওদিকে যাবেন না মালকিন! ও পথটি মোটেই ভাল নয়। সে তার কথায় পাত্তা না দিয়ে সে-পথেই হাঁটা জুড়ল। আমার দোকানটি খুব সুন্দর করে সাজানো বলে ভেতরে ঢুকে এল। মিষ্টি-মধুর-সুরেলা কণ্ঠে বল্‌ল— 'একটি ভাল শাড়ী কিনতে চাই। আছে কি? থাকলে দেখাতে পারেন।'

আমি ব্যস্ত হাতে দোকানে যত ভাল ভাল শাড়ী ছিল দেখাতে লাগলাম। তার পছন্দ হ'ল না। আমি অন্য কয়েকটি দোকান থেকে কয়েকটি শাড়ি আনিয়ে দেখালাম। সে কোথাও গেল না। আমার দোকানে বসেই সব দেখল।

এক সময় সে মুচকি হেসে বল্‌ল— 'সে কী, মেয়েদের পোশাকের দোকান খুলে বসেছেন, আর তাদের কি এবং কেমন চাহিদা খোঁজ রাখেন না?'

আমি হাত কচলে বল্‌লাম— 'মাফ করবেন, একে আমি নতুন ব্যবসা শুরু করেছি, অভিজ্ঞতাও নেই বল্‌লেই চলে।'

—'অভিজ্ঞতা নেই? কেন? শাদী-নিকা করেননি?'

—'সে সুযোগ আর হ'ল কই?'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সে আচমকা আমাকে লক্ষ্য করে চোখের বাণ ছুঁড়ে দিল।

সে কিছু কাপড় চোপড় বাছল। দাম পাঁচ হাজার দিরহাম। তার কথা মত আমি সেগুলো বেঁধে ছেঁদে দিলাম।

খোঁজা প্রহরীদের একজন কাপড়গুলো হাতে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। আর রূপসী যুবতীটি দোকান থেকে বেরিয়ে খচ্চরের পিঠে গিয়ে বসল।

আমি বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

কাপড়ের দামের কথা মুখ দিয়েই বেরলো না। দাম তো দিলই না, এমন কি কবে দেবে তা পর্যন্ত বল্‌ল না। কাপড়গুলো অন্য দোকান থেকে জোগাড় করে এনেছিলাম। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের দাম শোধ দিয়ে দেব। একী মহা দায়রে বাবা!

এক সপ্তাহ চলে গেল। সে-রূপসীর আসা তো দূরের কথা দাম পর্যন্ত পাঠাল না। ঠিকানাও জানি না যে, তাগাদা দিতে যাব। আচ্ছা যাঁতাকলে পড়া গেল! পাওনাদারদের কাছ থেকে আরও এক সপ্তাহের সময় চেয়ে নিলাম।

নসীবের জোর আছে আমার। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিন খচ্চরের পিঠে চেপে সে-রূপসী আমার দোকানে এল, একটি সোনার হার আমাকে দিয়ে বল্‌ল— 'এটি বিক্রি করে যা দাম হয় তা নিয়ে আপনার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিন।'

আরও কয়েকটি কাপড় চাইল।

পাশের দোকান থেকে কিছু ভাল ভাল কাপড় দেখালাম। পছন্দ করল। দশ হাজার দিরহাম দাম হ'ল। আগের দিনের মতই খোজা প্রহরী কাপড়ের গাট্টি নিয়ে পথে নামল।

আর রূপসী যুবতীটি নিজে গিয়ে বসল খচ্চরের পিঠে। আমি এবারও নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। দাম চাওয়া দূরের কথা টু-শব্দটিও করতে পারলাম না।

আগের বারে ছিল পাঁচ হাজার, এবারে দশ হাজার দিরহামের দায় ঘাড়ে চাপল। কী ঝকমারিতেই না পড়া গেল!

ঠগবাজ মেয়েদের কথা আগে বহুবার শুনেছি। আজ একেবারে নিজেই আমি তার খপ্পরে পড়লাম। আসলে তার রূপের জালে জড়িয়েই আমার এ-সর্বনাশ ঘটল।

শেষ পর্যন্ত দোকানপাট বেচে দেনা শোধ করব মনস্থ করেছি ঠিক তখনই একদিন আমার রূপসী সশরীরে হাজির হ'ল। আমার সামনে একটি থলি রাখল। ওজন করে দেখি, আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশীই আছে। সে বল্‌ল, —'আপনার কাছেই সব রেখে দিন।'

আমার রূপসী আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল— 'শাদীটাদী করবেন না?'

—'বিয়ে শাদী আর নসীবে আছে?'

—'এমন সুঠাম সুশ্রী আপনি, যে কোন লেড়কির তো আপনাকে দেখেই উতলা হয়ে পড়ার কথা।'

—'একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোন মেয়েই এরকম প্রসঙ্গ ভুলেও আমার সঙ্গে পাড়ে না।'

সে নীরবে এমন ভঙ্গীতে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল যা দেখে আমার বুকের ভেতরে কলিজাটি রীতিমত উথালি পাথালি শুরু করে দিল।

একটি চমৎকার ফন্দি মাথায় এল। দোকান থেকে বেরিয়ে রূপসীর সঙ্গী খোজাটির হাতে একমুঠো দিনার দিয়ে বল্‌লাম— 'শোন, তোমার মালকিনের মহব্বতে আটকা পড়ে গেছি। তুমি আমার হয়ে তাকে মহব্বত জানাবে। এখন এগুলো রাখ, পরে আরও পাবে।'

—'আমাকে আর আপনার হয়ে ওকালতি করতে হবে না হুজুর। অনেক আগে থেকেই আমার মালকিন মহব্বতের শায়রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বুঝছেন না, কেন ঘুরে ফিরে তিনি এখানে আসেন?'

আমি দোকানে ফিরে এলাম। সে ঠোঁট টিপে হেসে বল্‌ল— 'কি? কি পরামর্শ করে এলেন?'

—'না, পরামর্শ আবার কিসের? আপনাদের ঠিকানাটি জিজ্ঞেস করছিলাম।'

—'কেন বলুন তো? আমি না এলে আর দেখাশোনা না হলে আপনি মর্মবেদনা অনুভব করবেন বুঝি?' উঠতে উঠতে বল্‌ল— 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। আজ উঠি।'

—'একটি কথা বলার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় নি। আপনার রক্ষীটি আমার হয়ে আপনাকে বলবে।'

মুচকি হেসে সে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি তার অদর্শনে পৌনেমরা হয়ে গেলাম। রোজই পথ চেয়ে থাকি।

একদিন তার খোজা রক্ষীটি বিষণ্ণমুখে এসে বল্‌ল, তার মালকিন অসুস্থ। শয্যা নিয়েছেন।

আমি তার পরিচয় জানতে চাইলাম।

—'খলিফা হারুন-অল-রসিদ-এর বেগম জুবেদার পালিতা কন্যা আমার মালকিন। বেগম একে দত্তক নিয়েছিলেন। সেদিন মায়ের অনুমতি নিয়ে আপনার কাছে মালপত্র কিনতে এসেছিল। মেয়ে পছন্দসই সওদা করে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর মা খুবই খুশী হল। একদিন তিনি মায়ের কাছে আপনার কথা পাড়লেন। আপনাকে মনে ধরেছে, আম্মার কাছে তা বল্‌লেন। বেগম সাহেবা আপত্তি করলেন না, তবে নিজের চোখে পাত্রকে দেখে তবেই লেড়কির কথায় পুরোপুরি মত দেবেন। নিকা শাদীর ব্যবস্থা করবেন। এখন আপনার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। আপনি কি বেগম সাহেবার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে রাজি আছেন?'

—'আমি তো একপায়ে খাড়া। কিন্তু কবে, কোথায় তার সঙ্গে মোলাকাৎ হতে পারে, বল।'

—'আজ সন্ধ্যাতেই। টাইগ্রিস নদীর ধারে বেগম জুবেদার যে বড় মসজিদ রয়েছে সেখানে আপনি নামাজ করতে যাবেন। নামাজ

সেরে ঘুমিয়ে পড়বেন। তারপরের কর্তব্য আমার।'

আমি খোজা প্রহরীটির পরামর্শমত টাইগ্রিসের ধারের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লাম। তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কাকডাকা ভোরে কাঠের বাক্স ও খোজা ক্রীতদাসে ভর্তি একটি নৌকো ঘাটে ভিড়ল। আমার প্রাণ-প্রেয়সী সে-সুন্দরীও সঙ্গে রয়েছে দেখলাম। সে আমাকে আদরে-সোহাগে বিহ্বল করে তুলে বল্‌ল— 'এ বাক্সে তোমাকে পুরে তালাবন্ধ করে নিয়ে যাব। করলও তা-ই।'

তালা খুলে আমাকে যখন বাক্স থেকে বের করা হ'ল তখন তাকিয়ে দেখি, আমি প্রাসাদাভ্যন্তরে অবস্থান করছি। দাসী পোশাক পরিয়ে দিল আমাকে। এবার বেগম জুবেদা এসে হাজির হলেন। আমাকে বসতে বলে আমার নাম-ধাম-পেশা প্রভৃতি জিজ্ঞেস করলেন। আমার কথায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট হলেন। মুচকি হেসে বল্‌লেন —'দিন দশেকের মধ্যেই তোমাদের শাদীর ব্যবস্থা করে ফেলব। আর সে-দশদিন তুমি আমাদের প্রাসাদেই থেকে যাবে।'

নৌকো থেকে অতিকায় কয়েকটি বাক্স মাঝিমাল্লারা ধরাধরি করে নামাল। তাদের মধ্যে আমার পরিচিত সে-খোজাটিও রয়েছে দেখলাম। আমার মেহবুবা বাদশাহের লেড়কি তার পাশে। আমাকে তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছার কথা বল্‌ল। আদর-সোহাগ ত করল খুব করে। তারপর আমাকে বাক্সবন্ধী করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা বল্‌ল। আমি মুচকি হেসে বাক্সের ভেতরে ঢুকে বসলাম। তালা বন্ধ করা হ'ল। তোলা হ'ল নৌকোয়। বাক্স খুলে বের করার পর চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি, আমি হারেমে অবস্থান করছি। খোজার নির্দেশে ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কুড়িজন সুদেহী ও সুশ্রী যুবতী পরিচারিকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।'

বেগম জুবেদা ধীর-মন্থর গতিতে, সুন্দর ভঙ্গিমায় সুপ্রশস্ত নিতম্ব দুলিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার নাম, সাকিন ও পেশা প্রভৃতি এক এক করে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর মুচকি হেসে বল্‌লেন—'আমি প্রীত। দশদিনের মধ্যে তোমাদের শাদী-নিকা দেব। এ-ক'দিন প্রাসাদেই তুমি থাকবে।'

একদিন খলিফা যৌতুকস্বরূপ দশ হাজার সোনার মোহর পাঠিয়ে দিলেন। বেগম নিজে দিলেন পঞ্চাশ হাজার দিনার। কাজী উপস্থিত হয়ে শাদীর কবুলনামা লিখলেন। সাক্ষীরাও যথা সময়ে এসে গেল। আমাদের শাদীর কাজ মিটে গেল। জোরদার খানাপিনার ব্যবস্থা হ'ল। সরাবের জোয়ার বয়ে গেল। আমি আশ মিটিয়ে 'জিরবাজা' খেলাম। লোভ সামলাতে না পেরে মাত্রাতিরিক্তই হয়ে গিয়েছিল। উঠে হাত মুখ ধোয়ার মত ক্ষমতাও যেন ছিল না।

তারপর জনানারা আমাদের নিয়ে কী সব স্ত্রী আচার করল আনন্দ করে। তারপর নিয়ে যাওয়া হ'ল ফুল-শয্যার সজ্জিত বাসর

ঘরে।

একদল পরিচারিকা আমার সদ্য শাদী করা বিবিকে নিয়ে এল। প্রচলিত প্রথানুযায়ী তাকে একেবারে বিবস্ত্রা করা হ'ল। সবার সামনে তার শরীরের যৌবনচিহ্নগুলিকে আমার কাছে তুলে ধরাতে সে যেন শরমে মরে যাচ্ছিল। তার গালদুটো হঠাৎ পাকা আপেলের মত লাল হয়ে উঠল। সে হাত দুটো দিয়ে নিজের শরীরের গোপন জায়গাগুলিকে চাপা দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বরাত ভাল যে, পরিচারিকারা তাকে উলঙ্গ অবস্থায় পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে বাসরঘর ছেড়ে গেল।

আমি আর আমার মন-ময়ূরী বিবি ছাড়া ঘরে তৃতীয় কোন প্রাণী নেই। আমরা পাশাপাশি গা-ঘেঁষাঘেঁষী করে শুয়ে। আমি এক ঝটকায় তার যৌবনের জোয়ার লাগা বিবস্ত্র দেহটিকে বুকে টেনে নিলাম। ব্যস্, শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে অকস্মাৎ সে আমাকে একটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল — 'মরে গেলাম। মেরে ফেল্‌ল। কী উৎকট গন্ধ। আর পারছিনা — মরে গেলাম। 'আমি ব্যস্ত হয়ে বল্‌লাম—'কি? কি হ'ল মেহবুবা?'

—'রসুন! জঙ্গলীটি রসুন খেয়ে এসেছে। কী উৎকট গন্ধ গা বমি বমি করছে আমার। আজ-জঙ্গলী-বনমানুষকে আমি শাদী করে জীবনসঙ্গী করেছি। আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি অসভ্য জঙ্গলীটি এমন করে রসুনের ভক্ত। হতচ্ছাড়াটি ভুলেও আগে বলে নি তার এ কু-অভ্যাসের কথা।'

আমি তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলাম। থামিয়ে দিয়ে সে খেঁকিয়ে উঠল— 'একটি কথাও বোলো না। রসুন

যদি খেয়েই থাক তবে কেন গরম পানি দিয়ে ভাল করে হাত মুখ ধোও নি?' কথা বলতে বলতে সে রুমালে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

আমি তাকে হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করালম, এক ঝটকায় আমার কাছ থেকে বেরিয়ে তিন লাফে পাশের ঘরে চলে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একটি চামড়ার চাবুক নিয়ে ফিরে এল। সুতীব্র আক্রোশে আমার পিঠে সপাং সপাং করে চাবুকের ঘা মারতে লাগল। আমি বিস্ময় ও যন্ত্রণায় বারবার কুঁকড়ে যেতে লাগলাম। আমার দুই জঙ্ঘার মাঝখানে প্রচণ্ড জোরে চাবুকের ঘা পড়ায় আমি পালাবার শক্তিটুকু হারিয়ে ফেল্লাম।

এবার তারস্বরে কোতোয়ালকে ডাকল। সে এলে হিংস্র বাঘিনীর মত গর্জে উঠল — 'একে নিয়ে যাও। যে-হাত দিয়ে এ রসুন খেয়েছে সে-হাতটি কব্জি থেকে কেটে ফেল।'

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পরিচারিকারা ছুটে এল। তারা আমার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবারের মত ছেড়ে দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগল। আমার বিবি ক্ষমা করল। কিন্তু বে-কসুর খালাস করে দিতে রাজি নয়।

বাসরঘরে আমাকে একা ফেলে রেখে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিল। জানালা দিয়ে পানি খানা দিত। আমার বিবি দশদিন পর পরিচারিকাদের নিয়ে দরজা খুলে আমার কাছে এল। পরিচারিকাদের লক্ষ্য করে বল্ল —'এর গায়ে এমন একটি চিহ্ন এঁকে দেব যাতে জিরবাজা'র কথা এর স্মরণ থাকে।'

আমার বিবির নির্দেশে পরিচারিকারা আমাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল্ল। তারপর ধারালো একটি ছুরি দিয়ে ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ করে আমার হাত পায়ের সব ক'টি বুড়ো আঙুল একেবারে গোড়া থেকে কেটে ফেল্ল। কী যন্ত্রণাদায়ক, কী মর্মান্তিক ও অমানবিক কাজ। লঘু অপরাধে এমন গুরুদণ্ডের কথা আপনারা কেউ শুনেছেন কোনদিন?

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আমি উন্মাদের মত চিৎকার করে বলতে লাগলাম— 'ভবিষ্যতে আর কোনদিন ভুলেও জিরবাজা খাব না। আর যদি খাইও তবে চল্লিশবার পটাশ, চল্লিশবার সাবান এবং চল্লিশবার সোডা দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে তবেই খাব।'

—'দোস্ত, আমার জিরবাজা না খাওয়ার জন্য আমার গোস্তাকি মাফ করবেন। আমি বিবির কাছে হলফ করেছিলাম। সে আজ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে বটে। কিন্তু কসম তো খোদাতাল্লার নামেই করেছিলাম।'

রসুইকর এবার বলল— 'জাঁহাপনা, আমি সে বাগদাদের বণিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম —'খোদাতাল্লার নামে শপথ করে জিরবাজা ছাড়লেন, ভাল কথা। কিন্তু পরিণামে কি হ'ল?'

—'খোদাতাল্লার নামে শপথ করায় আমার বিবির দিলটি একটু গলে গেল। আমাকে মাফ করে দিল। তারপর আমরা বেশ কিছুদিন অন্য দশজন মিঞা-বিবির মতই এক সঙ্গে ঘর- সংসার করেছিলাম।

আমার বিবি পঞ্চাশ হাজার সোনার মোহর দিল একটি বাড়ি কেনার জন্য। সুন্দর একটি বাড়ি কিনালম। একবছর আমরা সেখানে বাস করেছি। বছর পেরোবার আগেই সে দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তের পথে যাত্রা করল। ব্যস, সব বেচে দিয়ে আমি হারা উদ্দেশ্যে পথে নেমে পড়লাম। বহু দেশের পানি খেয়ে শেষ পর্যন্ত আপনাদের মুলুকে এসে হাজির হলাম।

রসুইকর বলল— 'জাঁহাপনা, বাগদাদের বণিকের কাহিনী সংক্ষেপে আপনার দরবারে পেশ করলাম।'

নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে যে, যার আস্তানার পথে পা বাড়ালাম। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। তারপর কুঁজোটির লাশ নিয়ে যা কিছু কাণ্ড ঘটেছে সবই তো এক এক করে শুনলেন।

চীন দেশের বাদশাহ এবার বিতৃষ্ণার সঙ্গে বললেন —'তোমরা যে, যা কিস্‌সা শোনালে তাদের একটিও চমকপ্রদ নয়। ঘটনার বাঁধন তো নেই-ই। এর চেয়ে বরং হতভাগ্য কুঁজোটির মৃত্যুর কাহিনী অনেক বেশী আকর্ষণীয়। অতএব তোমাদের ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হচ্ছেই।'

ইহুদী হেকিমের কিস্‌সা

বাদশাহ যখন ক্রোধ প্রকাশ করে কুঁজোটির মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত লোকগুলোর শাস্তির চিন্তা করছেন তখন বৃদ্ধ ইহুদী হেকিম বলল—'জাঁহাপনা, এবার আমাকে কিছু বলার জন্য মেহেরবানী করে সুযোগ দিন। আশা করি আমার কিস্‌সা আপনাদের মনে দাগ কাটতে পারবেই।'

বাদশাহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিলেন।

বৃদ্ধ ইহুদী হেকিম তার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বলল— 'জাঁহাপনা, কিস্‌সাটি আমি কিশোর বয়সে শুনেছিলাম। আমি তখন দামাস্কাসে বাস করি। হেকিমি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করছি। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠ শেষ করে আমি এদিকে ঝুঁকি।'

এক সকালে স্থানীয় সুবেদার পেয়াদা পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বিশাল ইমারতের লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে সুসজ্জিত একটি ঘরে ঢুকলাম। দেখি মেহগনি কাঠের কারুকার্য মণ্ডিত পালঙ্কে এক কিশোর শুয়ে রোগশয্যায়। আমি সমবেদনার স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম— 'কি হয়েছে বাছা?'

সে নীরবে, চোখের ইশারায় কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করল। আমি হাত দেখতে চাইলে সে বাঁ-হাতটি বাড়িয়ে দিল। এরকম

অশিষ্ট আচরণে আমি খুবই ক্ষুব্ধ হলাম। ভাবলাম সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক, সাধারণ সৌজন্যবোধটুকুও শেখেনি। বাঁ-হাতের নাড়ি দেখে দাওয়াই দিয়ে এলাম। তারপর দিনও গেলাম। পরদিনও যেতে হ'ল। দশদিন চিকিৎসা করে তার রোগ কিছু নিরাময় করা গেল। সুবেদার ইনাম দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করলেন। আর দামাস্কাসের প্রধান হাসপাতালে চাকুরী দিয়ে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। প্রতিদিনই একবার করে আমার রোগীটিকে দেখতে যাই। কিন্তু একটি ব্যাপার আমার মনের কোণে বার বার উঁকি দিতে লাগল— 'সে রোজই কেন বাঁ-হাতটি এগিয়ে দেয়? সত্যি কি সৌজন্যবোধের অভাবই এর জন্য দায়ী নাকি অন্য কোন গূঢ় কারণ এর পিছনে রয়েছে? দশদিন পরে গরমজলে গামছা ভিজিয়ে তার গা মুছিয়ে দিতে বল্লাম। সুবেদার অনুরোধ করলেন এ-কাজটিও যেন আমি উপস্থিত থেকে সম্পন্ন করি। তার পা-জামা কামিজ সব খুলে ফেলতেই আমার আঁখিতে প্রথম ধরা পড়ল— তার ডান-হাতটি কাটা। আর সারা গায়ে চুবকের দাগে ভর্তি।

আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। যুবকটি বল্ল—'হেকিম সাহেব, খুবই অবাক হচ্ছেন, তাই না? অবাক হবার কথাই বটে। এ কিন্তু আমার জন্মলগ্ন থেকে ছিল না।

সে অদ্ভুত কিস্‌সা অবশ্যই বলব। তবে এখন নয়, পরে।'

যুবক আমাকে নিয়ে ওপর তলার এক নিরিবিলি ঘরে গেল। রসুইকারকে খবর পাঠাল ভেড়ার কাবাব করে সেখানে পাঠিয়ে দিতে।

খেতে খেতে একথা সে কথার পর আমি তাকে বল্লাম— 'আপনার প্রতিশ্রুত সে-কাহিনী এখন বলবেন কি?'

যুবকটি বাঁ-হাতে ভেড়ার কাবাবের থালাটি কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন—'শুনুন তবে আমার কাহিনী বলছি— মসুল নগরে আমার জন্ম হয়েছিল। খানদানি পরিবার। আমার আব্বা আর চাচারা দশ ভাই। আমার আব্বা সবার বড়। আমার দাদামশাই নিজেই দশ লেড়কাকেই শাদী দিয়ে ঘর-সংসার পেতে দিয়ে যান। আমার বাবা ছাড়া আমার চাচাদের কারোরই কোন বাচ্চাটাচ্চা হয় নি। তাই আমি ছিলাম চাচাদের চোখের মণি। আদরের দুলাল।

এক জুম্মাবারের ঘটনা। সেদিন আমার আব্বা আর চাচারা মসুলের বৃহত্তম মসজিদে নামাজ পড়তে গেলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যাই। নামাজের পর অন্যান্য সবাই মসজিদ ছেড়ে নিজের নিজের ঘরে ফিরল। আমার আব্বা আর চাচারা কেবল রয়ে গেলেন। চাচারা বাণিজ্য করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মিশরে যাওয়াই সাব্যস্ত করলেন। নীলনদের তীরে সে দেশের প্রধান নগর ও বন্দর। দুনিয়ার বহুত দেশ ঢুঁড়ে বেড়িয়ে তাঁরা বুঝেছেন, মিশরের মত মনোরম দেশ তামাম দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি আর নেই। সেখানে গেলে নাকি মনে হয় দুনিয়ার দুঃখকষ্ট ভুলে ভিনমুলুকে অবস্থান করছি।

বেহেস্তের মত সুন্দর এক দেশ চাক্ষুষ করার জন্য আমার দিল ছটফটানি শুরু করে দিল। আব্বাকে আমার ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা জানালাম। প্রথমে আমাকে এত দূরে পাঠাতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত আমি আশাহত হ'ব ভেবে দামাস্কাস পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসব, এ শর্তে রাজি হলেন।

আমাদের জাহাজ মসুলি বন্দর থেকে দামাস্কাসের উদ্দেশে যাত্রা করল। আলেপ্পো নগর হয়ে পৌঁছলাম দামাস্কাস নগরে। জানা-অজানা গাছপালা আর ফুল ফলের বাগিচায় ভরা বেহেস্তের মত সুন্দর দামাস্কাস নগর। তারই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কল্লোলিনী নীলনদ। আমি এক সরাইখানায় মাথা গোঁজলাম আর চাচারা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে নগরে ঘোরাফেরা করতে চলে গেলেন। তারা মসুল থেকে আনা সমানপত্র বেচলেন। আবার দামাস্কাস থেকে দুষ্প্রাপ্য বহু কিছু সওদা করে জাহাজ বোঝাই করলেন।

আমার চাচারা কাজ মিটিয়ে যাত্রার উদ্যোগ নিলেন। আমার দামাস্কাস ছেড়ে যেতে মন চাইল না। রয়ে গেলাম। তারা আমার মুনাফার বখরা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন।

আমি নীলনদের লাগোয়া সুন্দর একটি বাড়ি ভাড়া করলাম। ভাড়া দু' দিনার।

এক বিকালে নদীর দিকে মুখ করে আমি বারান্দায় বসে সরাব পান করছি। দেখলাম, এক রূপসী যুবতী আমার সামনে এসে দাড়াল। অষ্টাদশী বলা যাবে না—ষোড়শী।

তার নাকাবের ফাঁক দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে, সাধ্যমত তার নজর এড়িয়ে ফুলের মত সুন্দর মুখটিকে দেখার লোভটুকু সামলাতে পারলাম না। মুহূর্তের মধ্যেই সে বোরখাটি খুলে পাশে রাখল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ার জোগাড় হ'ল। রূপের আভায় আমার আমাকে সচকিত করে তুল্‌ল। কোন মানুষের মুখ এত সুন্দর হতে পারে ইতিপূর্বে কল্পনাও করতে পারি নি।

আমাকে অবাক করে দিয়ে রূপসী বল্‌ল — 'কি গো ভাল মানুষ, একা একা বসে যে? বিবি কোথায়?'

—'বিবি পাব কোথায়? শাদী হলে তো বিবি পাশে থাকবে।'

—'সে কী গো! এমন জোয়ান বয়স। দেহে যৌবন বন্দী হয়ে রয়েছে। আর বলছ কিনা, শাদী হয় নি! কথা বলতে বলতে আমাকে লক্ষ্য করে আঁখির বাণ ছুঁড়ে মারল। এবার বল্‌ল— 'মেয়েছেলে ছাড়া রাত কাটাও — বলছ কি! এমন এক নাগর পেলে সব মেয়েই মনে করবে যে আসমানের চাঁদ হাতে পেয়েছে।'

আমি খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলাম, একে নতুন জায়গা একেবারেই ভিনদেশ। তার ওপর এমন রূপসী এক যুবতী যাকে কোনদিন চোখেও দেখিনি। সে যদি প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই এমন সব কথা বলে তবে যেকোন যুবাই মিইয়ে যেতে বাধ্য! আমি সামান্য সরে গিয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে বসলাম।

মেয়েটি কিন্তু অধিকতর সাহসিকতার পরিচয় দিল। আচমকা আমার একটি হাত চেপে ধরে সুন্দর ভঙ্গিতে চোখ-মুখ বিকৃত করে বলে উঠল— 'কী ন্যাকামি রে! মন বলছে খাই খাই, আর মুখে বলছে সাধ নেই।'

কথাটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই এক ঝটকায় আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। গলা জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গেল। ব্যস, আছাড় মেরে নিজে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। বুকের কাপড়টুকু পাশে পড়ে গেল। আর পায়ের কাপড় উঠে গেল হাঁটু ছাড়িয়ে উরুর ওপরে —নিতম্বের কাছাকাছি। আমার শিরা-উপশিরায় রক্তের গতি অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেল। এক অভূতপূর্ব মাদকতা ভর করল আমার দেহ-মনে। আমি কি করব ভেবে ওঠার আগেই তার তুলতুলে হাত দুটো দিয়ে আমাকে সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল। যেকোন পুরুষের পক্ষেই আকাঙ্ক্ষিত তার যৌবনের জোয়ারলাগা বুকে আমার প্রশস্ত বুকটি একেবারে লেপ্টে গেল। কী যে রোমাঞ্চ জাগল আমার মনে, আর আগুণের বন্যা বয়ে চলল শিরায় শিরায়। অনাস্বাদিত পুলকে আমি বিমোহিত হয়ে পড়লাম। এবার সে তার স্পঞ্জের মত নরম, আপেলরাঙা ঠোঁট দুটোকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আমার ঠোঁট স্পর্শ করল। অপূর্ব কৌশলে আমার নিচের ঠোঁটটিকে কামড়ে ধরল। উন্মাদিনী প্রায় দিল এক কামড় বসিয়ে। সে-ও যেন মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মুক্তোর মত ঝকঝকে তার দাঁতের চাপে আমার ঠোঁট যে কখন কেটে গেছে তা উপলব্ধি করার মত বোধশক্তি সে মুহূর্তে আমার মধ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল, অস্বীকার করার উপায় নেই। আমিও যেন তখন উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছিলাম। এক ঝটকায় তার কোটিদেশ থেকে ফিন ফিনে কাপড়ের টুকরোটি খুলে ছুড়ে ফেললাম মেঝেতে। তারপর? তারপর কি হ'ল সে-কথা কারো কাছে মুখফুটে বলার নয়।'

—আর? তার রূপ সাগরে একেবারে তলিয়ে গেলাম। তার যৌবনের উন্মাদনা আমাকে গ্রাস করে ফেল্‌ল। সে-ও আমার যৌবনদীপ্ত সুঠাম দেহের দলন, পেষণ ও সম্ভোগসুখ লাভ করে পরম তৃপ্তিতে কানায় কানায় মনকে ভরে নিতে লাগল। দীর্ঘ সময় ধরে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গসুখ লাভ করে তৃপ্তিটুকু একেবারে নিঃশেষে নিঙড়ে নিয়ে এক সময় বিছিন্ন হলাম।

সে-রাত্রের স্মৃতি, জীবনের প্রথম সম্ভোগ-সুখের কথা কোনদিন আমার মন থেকে মুছে যাবে না। শুনেছি, জীবনের প্রথম সহবাসের রাত্রির কথা নাকি সবারই অন্তরের অন্তঃস্থলে আমৃত্যু জাগরুক থাকে। হতেই হবে, কারণ বেহেস্তে সুখের ছড়াছড়ি হলেও সে-রাত্রে আমি যে সুখ ও তৃপ্তি লাভ করেছিলাম তার চেয়ে বেশী কিছু সেখানে যে নেই হলফ করে আমি বলতে পারি।

ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরে অনেক বেলা পর্যন্ত আমি বিছানা আঁকড়ে পড়েছিলাম। আমার সে-রাত্রের বেগম সে লেড়কিটিও অচৈতন্যের মত পড়েছিল। আমি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি সে বিবস্ত্রা হয়ে আমার গলায় একটি হাত তুলে দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আমি বিমুগ্ধ নয়নে তার দেহপল্লবটিকে এবার খুটিয়ে খুটিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। এমন যৌবনের মাতনলাগ রূপসী-যুবতীর দেহকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কুরেকুরে খেয়ে আমার সম্ভোগসুখ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল সে কি ঘুমের ঘোরে দেখা খোয়াব, নাকি বাস্তব?

আমার মনময়ূরী, আমার কলিজা রূপসীটি এক সময় চোখ মেলে তাকাল। আমি পাশে বসে বুভূক্ষুর মত তার যৌবনভরা নগ্নপ্রায় দেহটিকে নিরীক্ষণ করছি বুঝতে পেরে অকস্মাৎ তার মধ্যে লাজশরম ভর করল। রাত্রে স্বেচ্ছায় নিজেকে সঙ্গ দিয়েছিল সেই দিনের আলোয় যেন লাজে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। অতর্কিতে হাত দুটোকে নিজের বুকের ওপর তুলে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মত কাপড়টিকে কোমরে জড়িয়ে নিল।

রূপসী নিজেকে একটু সামলে নেওয়ার পর আমি তার দিকে দশটি সোনার মোহর বাড়িয়ে দিলাম। সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল

—'মেহবুবা আমার, মোহর নিয়ে আমি কি করব? তুমি যেমন আমার যৌবনসুধা পান করে তৃপ্তি লাভ করেছ তেমনি তোমার ওই সুঠাম দেহ আমাকে কম তৃপ্তি দেয় নি। এ সুখ যে পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমেই একমাত্র পাওয়া সম্ভব। তুচ্ছ মোহরের প্রশ্ন তো এর মধ্যে আসতে পারে না। তুমি আমার কলিজার সমান বুঝতে পারো নি?'

এবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল আমার মেহবুবা। আমিও দু'পা এগোলাম। সে আমার মাথার দু'পাশে হাত রেখে আমার মুখটিকে নিজের মুখের কাছে নিয়ে গেল। চুম্বন করল। আলতো করে দুগালে হাত বুলিয়ে সোহাগ করল প্রাণভরে। তারপর আমার দু'কাঁধে তার হাত দুটোকে রেখে সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারণ করল — 'আমার মেহবুব, আমার দিলকা কলিজা, তিনদিন পর আবার আমাদের দেখা হবে, দৈহিক মিলন ঘটবে।' বটুয়া থেকে কয়েকটি দিনার বের করে আমার হাতে গুজে দিতে গিয়ে বল্‌ল— 'মেহবুব আমার, একটি কথা বলছি, আমায় ভুল বুঝে আমাকে কষ্ট দিও না যেন। আগামী দিনের যাবতীয় খরচ আমি করব।' এবার সে বটুয়া থেকে কয়েকটি দিনার বের করে আমার হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে বল্‌ল— 'এগুলো তোমার কাছে রেখে দাও মেহবুব। যা কিছু দরকার মনে করবে, কিনে রেখো।'

আমি তার কথায় প্রতিবাদ করে অসন্তোষ উৎপাদন করতে উৎসাহী হলাম না। দিনার ক'টি হাত পেতে নিতে গিয়ে বল্‌লাম — 'তা-ই হবে মেহবুবা।'

সে ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমিভরা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে বিদায় নেওয়ার পর এক-একটি দিন যেন আমার কাছে এক-একটি বছরে পরিণত হ'ল। আমার বুকের ভেতরটি যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। যাবার সময় যেন গোপনে আমার কলিজাটি চুরি করে নিয়ে গেছে।

চার-চারটি দিন যে আমি কিভাবে অন্তহীন হাহাকার ও হাহুতাশের মধ্যে কাটিয়েছিলাম তা বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই।

চতুর্থ সন্ধ্যার কিছু আগে নিজেকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করে আমার প্রাণ-প্রেয়সী আমার বারান্দায় হাজির হ'ল। বারান্দায় পা দিয়েই সে বিদ্যুৎগতিতে গায়ের ওড়নাটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার কামাতুর মনের তাড়নায় সে জ্বলে পুড়ে খাঁক হচ্ছে। তাঁর মনোহিনী রূপের আগুন আমার গায়েও তারই মত জ্বালা ধরিয়ে দিল। আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। তাকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিলাম। ক্ষুধাতুর নেকড়ের মত একলাফে তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। শুইয়ে দিলাম পালঙ্কের ওপর। সে আমার কণ্ঠলগ্ন অবস্থাতেই আমার ঠোঁট দুটোকে কামজ্বালায় কামড়ে ধরল। তারপর সারারাত্রি আমরা যে কিভাবে কাটিয়েছি তার একমাত্র সাক্ষী ওই উৎপীড়িত পালঙ্কটি। তার যদি ভাষা প্রকাশের উপায় থাকত তবে যথার্থ বর্ণনা দিতে পারত। আর আমি? অসম্ভব। উন্মত্তপ্রায় অবস্থায় আমরা যে কিভাবে সারাটি রাত্রি নির্মম অবস্থায় কাটিয়েছিলাম তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে বাস্তবিকই সাধ্যাতীত। পূব-আকাশে রক্তিম ছোপ দেখা দিলে সে আমার কাছ থেকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল। আমার জীবনের দ্বিতীয় সহবাসরাত্রি কাটিয়ে সে বিদায় নিল। যাবার সময় সে বিদায়-চুম্বন সেরে বলে গেল— 'মেহবুব আমার, চারদিনের দিন সন্ধ্যায় আবার আমি তোমার সঙ্গসুখ লাভের প্রত্যাশা নিয় এসে হাজির হ'ব।'
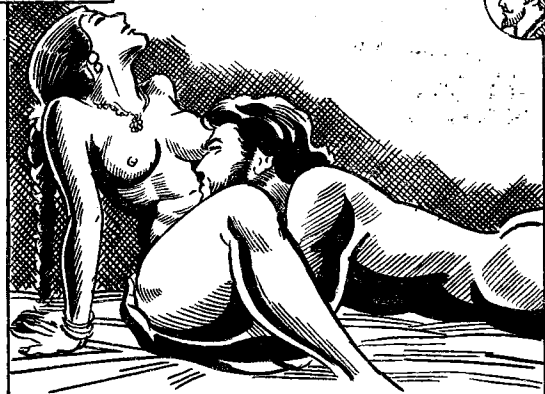
সত্যি এবারও চুতুর্থদিন সন্ধ্যার আগে সে আমার গরীবখানায় হাজির হ'ল। মনমৌজী সাজে সে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে দেখলাম। সামান্য কিছু খানাপিনা সেরেই আমি তাকে জাপ্টে ধরে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে নিলাম। তার চোখের তারার ভাষায় সে আমাকে বুঝিয়ে দিল তোমার যৌবনের সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে ছিঁড়েফুঁড়ে খাও। সম্ভোগের মধ্য দিয়ে আমাকে একেবারে শেষ করে দাও মেহবুব। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইলাম। উভয়ের নগ্নদেহ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। তার মন আকুল হ'ল কাছে আসার, আরও কাছে আসার জন্য। কিন্তু আমি যে তাকে সজোরে বুকে চেপে ধরে একেবারে আমার সঙ্গে লেপ্টে নিয়েছি। আর কি করে সম্ভব?

সকাল হল। বিদায় মুহূর্তে সে আমার কাঁধে তার হাত দুটো রেখে প্রশ্ন করল — 'মেহবুব আমার, সত্যি করে বল দেখি, তিন দিন আমাকে সম্ভোগ করে তোমার কেমন লাগল?'

—'হঠাৎ তোমার মুখে এ প্রশ্ন কেন মেহবুবা? তোমাকে কাছে পাওয়ার পর আমার কাছে বেহেস্তের সুখও তুচ্ছ বোধ হচ্ছে।

আমার যৌবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি তোমার যৌবনের জোয়ারলাগা দেহভোগের মাধ্যমে। তোমাকে ছাড়া বাঁচার কথা আমি যে কল্পনাও করতে পারিনি। তোমার চেয়ে রূপসী পৃথিবীতে অন্য কেউ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

সে ঠোঁট টিপে হেসে বল্‌ল— 'আমার চেয়ে সুন্দরী দেখ নি? সামনের দিন দেখতে পাবে। তাকে দেখলে তোমার চোখ দুটো ঝলসে যাবে।'

কথা বলতে বলতে আমার হাতে কুড়িটি মোহর দিয়ে বল্‌ল — 'আজ থেকে চতুর্থদিন আবার আমার দেখা পাবে। আর একটি কথা, নতুন যে মানুষকে নিয়ে আসব তার আপ্যায়নের ত্রুটি হয় না যেন।'

সে এবারও কথা রেখেছে। চতুর্থদিন সন্ধ্যার আগে সে আমার দরজায় হাজির হ'ল। সঙ্গে একটি লেড়কি বয়স তার চেয়ে কম। সে ঠিকই বলেছিল। সত্যি এক অপরূপাকে আমার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বেহেস্তের পরীদের তৈরীর পর অবশিষ্ট সৌন্দর্যটুকু নিয়ে এসে যেন এর গায়ে লেপে দেওয়া হয়েছে।

আমি সরাবের গ্লাসটি খালি করে ঠোঁট থেকে নামালাম। আমার মেহবুবা আমার দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে ব'লে উঠল — 'কি মিঞা, তোমার জন্য এমন রূপসীকে নিয়ে এলাম। একটু সোহাগটোহাগ কর একে। এমন রূপ যৌবনের একত্র সমাবেশ ঘটেছে এর দেহে, মনে দোলা লাগছেনা? একটু আধটু চেখে দেখ, মালুম হবে।'

আমি যে এমন বোকার হদ্দ তা আগে জানতাম না। তার কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলাম — 'তা তুমি যদি নেহাৎই বল তবে একবারটি রসাস্বাদন করে দেখতে পারি।'

—'চমৎকার। পুরুষ মানুষের মত কথাই বটে। আজ রাত্রে একে সম্ভোগ করে অধিকতর সুখ লাভ কর। এতে আমার আনন্দই হবে।'

আমার মেহবুবা মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। আর আমি নবাগতা রূপসীকে নিয়ে পালঙ্কের ওপরে শুলাম। আমি বিছানায় শুয়েই উদ্ভিন্ন যৌবনা নতুন মেয়েটিকে সম্ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। হব না-ই বা কেন? তাকে প্রথম দর্শনেই আমার রক্তে যে মাতন লেগে গেছে। বুকের ভেতরে কলিজাটি শুরু করে দিয়েছে রীতিমত নাচন কোদন। আর তারই অত্যুগ্র কামনা আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-চৈতন্যকে নির্মূল করে দিয়েছে। সে মেঝেতে শুয়ে ঘুমের ভান করে ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে রইল। আর আমি পালঙ্কের ওপরে নবাগতা রূপসীকে নিয়ে হিংস্র নেকড়ের মত সম্ভোগে মেতে ওঠলাম। তার ষোল বছরের দেহটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়ার জন্য উন্মাদের মত আচরণ করতে লাগলাম। কতক্ষণ ধরে এবং কিভাবে আমি কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছিলাম সবকিছু আমার পরে আর মনে পড়ে নি। কতক্ষণ পরে ক্লান্তদেহে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম তা-ও বলতে পারব না।

সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন দেখি আমার বাঁ-হাতটি রক্তে জবজব করছে। দেখামাত্রই আমার মনে হয়েছে বুঝি বা ঘুমের ঘোরে খোয়াব দেখছি। যখন আমার ভেজা বালিশটি ঘাড়ের কাছে চপচপ করতে লাগল তখন আমার দ্বিধা কেটে গেল। আমি যেন অতর্কিতে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। এ-তো খোয়াব নয়, সম্পূর্ণ সত্য। সম্ভোগক্লান্ত মেয়েটিকে জানাবার জন্য তার মাথা ধরে ব্যস্ত হাতে সজোরে নাড়া দিতেই আমার শীররের সব ক'টি স্নায়ু একসঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। তার ছিন্ন মুণ্ডুটি বালিশ থেকে গড়িয়ে বিছানায় পড়ে গেল। এমন এক পৈশাচিক দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হবে খোয়াবের মধ্যেও কোনদিন ভাবতেও পারি নি। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, শরীর হিম হয়ে আসছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — 'হায় আল্লাহ! এখন আমি করি কি?'

আমি উন্মাদের মত পালঙ্কের ওপর থেকে নিচের দিকে উঁকি দিলাম। বড়-লেড়কিটির বিছানা শূন্য। ঘরের দরজা খোলা, ভেজানো। উদ্‌ভ্রান্তের মত এক লাফে পালঙ্ক থেকে নামলাম। দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। না, সে উধাও। কোথাও সে নেই। বাইরে যাবার দরজার ছিটকিনি খোলা। দরজা ভেজানো।

যে উপযাচক হয়ে পর পর তিন দিন সম্ভোগ সুখে আমার দেহ-মনকে তৃপ্তি দিয়েছিল সে-ই আজ আমার কলিজাটিকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেছে। কিন্তু আমি এখন করি কি? পালঙ্কের ওপর পড়ে থাকা যুবতীর লাশটিকে কি করে সামাল দেব। শরীর অবশ হয়ে পড়তে লাগল। লোক জানাজানি হয়ে গেলে প্রথমে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে সাদর অভ্যর্থনাসহ গারদে নিয়ে ভরবে।

কী উটকো বিপদ ঘাড়ে চাপল। সবই নসীবের ফের। নইলে এমনটি হবে কেন? মৃতার সাকিন তো দূরের কথা, এমন কি নাম পর্যন্ত আমার জানা নেই। কোতোয়ালের কাছে কি যে জবাবদিহি করব তা ভেবেই আমি পৌনেমরা হয়ে গেলাম। আমার মাথায় চট করে একটি ফন্দি খেলে গেল। এক দৌড়ে একটি খন্তা এনে উন্মাদের মত ঘরের মেঝেতে গর্ত খুঁড়তে লাগলাম। তারপর আপদটির লাশ, তার কাপড়চোপড়, বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর প্রভৃতি যা কিছুতে রক্তের ছোপ লেগেছিল সবই গর্তে ঢুকিয়ে মাটিচাপা দিয়ে দিলাম।

তারপর নিজে সাফসুতরা হয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে বললাম — 'আমি জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। কাজ মিটলেই ফিরে আসব।' এক বছরের ভাড়া আগাম মিটিয়ে দিলাম। আমার একাজের স্বপক্ষে যুক্তি ছিল, আমি ঘর ছেড়ে দিলে অন্য কেউ ঘরটি ভাড়া করবে। তখনই আমার কুকর্মের কথা ফাঁস হয়ে যাবে। এতে পুরো একটি বছরের জন্য তো অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কায়রো পৌঁছেই আমার চাচাজীদের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেল। আমাকে দেখেই তাঁরা উল্লসিত হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কায়রো পৌঁছেতেই আমার পকেট ফাঁকা হয়ে গেল। চাচাজীরাই আমার সার্বিক দায়িত্ব নিলেন।

কায়রোতে কিছুদিন থাকার পরই চাচাজীরা কাজকাম মিটিয়ে স্বদেশে ফেরার উদ্যোগ করল। আমি আরও কিছুদিন থেকে কায়রো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তারা আমার পকেটে দিনারের গোছা পুরে দিয়ে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করল।

আমি পর পর তিন বছর দামাস্কাসের বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া মিটিয়ে দিলাম।

তিন তিনটি বছর পেরিয়ে যাবার পর ভাবলাম ইতিমধ্যে নির্ঘাৎ ব্যাপারটি চাপা পড়ে গেছে। সবাই ভুলে গেছে। এবার দামাস্কাসে গিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথমেই শোবার ঘরে গেলাম। ঘরময় ধুলো ছড়ানো রয়েছে দেখলাম। কিন্তু ঘরে যা কিছু ছিল সবই জায়গামত ঠিকঠাকই রয়েছে। বিছানাটি সামান্য উল্টাতেই আমার সর্বাঙ্গে অবাঞ্ছিত শিহরণ অনুভব করলাম। একটি জড়োয়া হাঁসুলী। সে রূপসীর গলায় দেখেছিলাম বটে। শোয়ার পূর্বমুহূর্তে হয়তো গলা থেকে খুলে রেখেছিল।

কায়রোতে তিন বছর কাটাতে গিয়ে চাচাদের দিয়ে যাওয়া দিনার প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। এ অবস্থায় এতখানি সোনা হাতে পেলে মন তো চাঙা হয়ে উঠবেই। ভুলেও কি তখন ভাবতে পেরেছিলাম সবই ডাইনীর কারসাজি! হারটি জোব্বার জেবে ঢুকিয়ে দিলাম। ঘরে তালা বন্ধ করে বাজারে গেলাম। আজই বেচে না দিলে নতুনতর কোন বিপদ এসে ঘাড়ে চাপতে পারে।

আমি এক জহুরীকে হারটি দিলাম। সে উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর আমাকে বসিয়ে রেখে মহাজনের ঘরে গেল। একটু বাদে ঘুরে এসে বল্‌ল—'হারগাছা নকল সোনা আর ঝুটো মুক্তোর তৈরি। যদি আসল হ'ত এক হাজার দিনার দাম পেতেন। কিন্তু বর্তমানে এক হাজার দিরহাম বড়জোর এর দাম পেতে পারেন।'

আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। বল্‌লাম—'আমার একটু তাড়া আছে। মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি দামটা মিটিয়ে দিন।'

কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলার পর বেগম শাহরাজাদ দেখলেন, বাইরের বাগিচায় পাখির কিচির মিচির শুরু হয়ে গেছে। ভোরের পূর্বাভাস। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আঠাশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হলে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সে-ইহুদী হেকিম তার কিস্‌সা বলে চলেছে—'আমি ব্যস্ততা প্রকাশ করায় জহুরীর সন্দেহ হ'ল। সে ভাবল, হারগাছা চোরাই মাল না হয়েই যায় না। হয় কারো গলা বা সিন্দুক থেকে ঝেঁপেছে নয়তো কারো হারিয়ে যাওয়া মাল কুড়িয়ে পেয়েছে।

জহুরী আমাকে মুখে কিছুই বল্‌ল না। আমাকে আগের মতই বসিয়ে রেখে আবার মহাজনের ঘরে যাবার নাম করে বেরিয়ে গেল।

একটু বাদেই ইয়া দশাসই চেহারার এক সিপাহী এসে কোন কথা না বলে আমার হাতে কড়া পরিয়ে দিল। টেনে হিঁচড়ে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে গেল।

কোতোয়ালের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলাম—'হুজুর এ-হারগাছা আমি এক মেয়েকে মহব্বতের স্মারক হিসেবে উপহার দিয়েছিলাম। নসীবে বেশী দিন সে টিকল না। দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেল। তারপর আমার হারগাছা আমার হাতেই ফিরে আসে।'

—'কোন্ দোকান থেকে, কত দাম দিয়ে কিনেছিলে, বল তো!'

—'হুজুর, সে কথা আজ আর ঠিকঠাক স্মরণে নেই। তবে হাজার দুই দিরহাম হয়ত নিয়েছিল। আর কায়রোর এক জহুরীর কাছ থেকে কিনেছিলাম।'

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কোতোয়ালের হাতের চাবুকটি আমার পিঠে বার কয়েক আছড়ে পড়ল। আমি কোমরভাঙা সাপের মত দেহটিকে যন্ত্রণায় বার বার মোচড় মারতে লাগলাম। চাবুকের ঘা মারতে মারতে কোতোয়াল বল্‌ল—'গাঁজাখুরি গপ্প শোনাচ্ছ, তাই না? তোমার কেনা হারগাছার দাম কত তা তোমারই জানা নেই। এবার জানতে পারবে এর দাম কত। এখনও সময় আছে,

কোত্থেকে এটি ঝেঁপেছ, বল?' আবার চাবুকের ঘা পড়ল।

আমি যন্ত্রণাকাতর দেহটিকে বার বার কোঁকড়াতে কোঁকড়াতে কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্‌লাম—'বিশ্বাস করুন, আমি এটি চুরি করিনি।'

আবার চাবুক সক্রিয় হ'ল। পরপর কয়েকটি ঘা বসিয়ে দিয়ে কোতোয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন—'এত দামী হার তোর কাছে এল কি করে হারামজাদা? এ তো রাজা, বাদশা আর উজিরের ঘরে ছড়া থাকার কথা নয়।'

চাবুকের ঘা খেয়ে খেয়ে আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল—'এক মহাজনের গদি থেকে হারগাছা আমি চুরি করেছি।' মিথ্যে বলা ছাড়া সে-মুহূর্তে আমার উপায় কিছু ছিল না।

চুরির ব্যাপারটি স্বীকার করে নেয়ার কারণ হচ্ছে, চুরির দায়ে বড় জোর আমার একটি অঙ্গ খোয়াতে হবে। কিন্তু হত্যার ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে গেলে নির্ঘাৎ গর্দান যাবে। তখন প্রাণদণ্ডই হবে আমার একমাত্র শাস্তি।

কোতোয়ালের নির্দেশে সিপাহীরা আমার ডান হাতটি কেটে ফেল্‌ল। এমন একটি মজার খবর বাতাসে ভর করে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। বাড়িওয়ালা সাফ জবাব দিলেন—'তোমাকে নিয়ে নগর তোলপাড় হচ্ছে। আমার বাড়ি থেকে মানে মানে কেটে পড়। আজই অন্য কোথাও চলে যাও ভাই।'

আমার কাতর মিনতিতে বাড়িওয়ালা একটু নরম হলেন। বাড়ি খোঁজার জন্য দিন কয়েক সময় দিলেন।

কি করি, কোথায় যাই? কার কাছে গিয়ে আশ্রয় পাই? কাটা হাত নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়াও তো সম্ভব নয়। তামাম দুনিয়ার লোক জানে, চুরি করলে ডান-হাত কাটা যায়। আঁখি দুটো দিয়ে পানির ধারা নেমে এল। বানিয়ে কোন একটি কিস্‌সা দাঁড় করালে কি মুলুকের কেউ বিশ্বাস করবে আমার কথা? অবশ্যই না।

কি যে করি ভেবে পেলাম না। আমার হাত কাটার ব্যাপারটি রাষ্ট্র হয়ে গেছে। বাসা খুঁজতে বেরনোরও সমস্যা রয়েছে। আমাকে কে-ই বা আশ্রয় দেবে? আল্লাহ্-র ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণেই পড়ে রইলাম।

আমি তন্ময় হয়ে আমার নসীবের কথা ভেবে চলেছি। এমন সময় অকস্মাৎ কাঁটামারা বুটের গম্ভীর আওয়াজে সচকিত হয়ে তাকালাম। দেখলাম, আমার সামনে সেনাবিভাগের প্রধান দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সুবেদারের নির্দেশে আমাকে বন্দী করলেন।

হাতকড়া পরিয়ে সুবেদারের দরবারে আমাকে হাজির করা হ'ল। একদল লোক সেখানে ভিড় করে অপেক্ষা করছে। কার জন্য? হয়ত বা আমারই জন্য। তাদের ভিড়ে আমার বাড়িওয়ালা এবং সে জহুরী দু'জনও রয়েছেন।

সুবেদার সাহেব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন—'কোতোয়াল
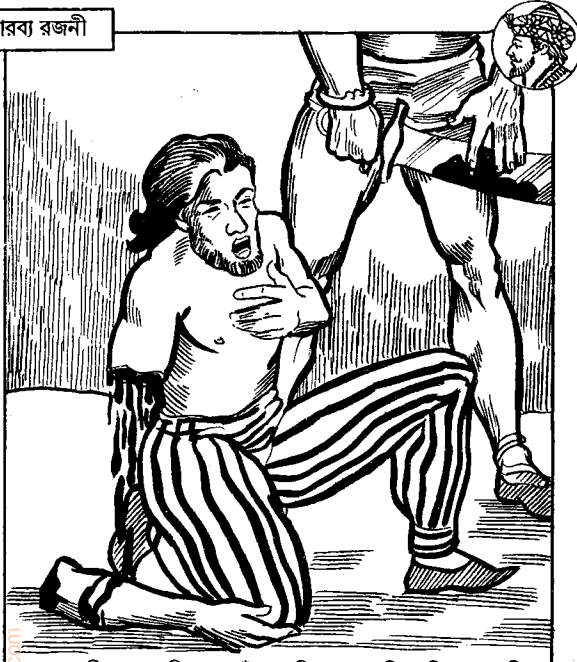
তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করিয়েছে, তুমি নাকি এ-জহুরীর দোকান থেকে হারছড়া চুরি করেছ? কিন্তু জহুরীর কথা তো সত্য নয়। হারটি তো আমার মেজো লেড়কির। আমার বড় লেড়কির সঙ্গে সে বেড়াবার নাম করে তিন বছর আগে এক বিকেলে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। সে-যাওয়াই তার অন্তিম যাওয়া। তারপর সে আর ঘরে ফেরে নি। তুমি যদি সাচ বাৎ বল তবে আর তোমাকে কোন শাস্তি দেব না, কথা দিচ্ছি। আজ হারছড়া ফিরে পেয়ে অনুমান করছি সে আর দুনিয়ায় নেই।' কথা ক'টি বলেই সুবেদার আমার হাতকড়া খুলে দিতে বল্‌লেন। আমি ধরেই নিলাম, মৃত্যু আমার শিয়রে। কেউ-ই আমার জান রক্ষা করতে পারবে না।

সুবেদার অন্যান্য সবাইকে দরবারকক্ষ ছেড়ে চলে যেতে বল্‌লেন। এত বড় একটি ঘরে কেবল আমরা দু'জন, আমি আর সুবেদার রয়ে গেলাম। তিনি আমাকে নিচু গলায় বল্‌লেন—'বেটা আমাকে ব্যাপারটি কি, বল তো? আমার বিশ্বাস, তোমার দ্বারা কোন ন্যক্কারজনক কাজ করা সম্ভব নয়। তোমার চোখ-মুখ বলছে, তুমি অভিজাত ঘরের ছেলে। আমি যদি তোমার রক্ষাকর্তা হয়ে পিছনে দাঁড়াই তবে কেউ-ই তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড়টি কাটতে পারবে না। অতএব তুমি নির্ভয়ে যা কিছু ঘটনা, বলতে পার। সে-কাহিনী যত মর্মান্তিকই হোক না কেন তুমি আমার কাছে ব্যক্ত কর।'

আমি শিশুর মত হাউমাউ করে কেঁদে ফেল্‌লাম। ডুকরে ডুকরে কেঁদে বল্‌লাম—'আপনি আমাকে শাস্তি দিন আর না-ই দিন আমি সব কিছু আপনাকে খুলে বলবই। অন্ততঃ নিজের স্বার্থের তাগিদে

আপনাকে সব বলতে চাই। আমি চাই সব কিছু বলে নিজের বুক থেকে পাথরের বোঝাটি হাল্কা করতে।

আমি তিন বছর আগেকার সে ঘটনাটি বলতে শুরু করলাম। সবার আগে বল্‌লাম প্রথম লেড়কিটির কথা। আমার সঙ্গে তিন রাত্রি বাস করে সে যা কিছু করেছিল, কিছুই গোপন করলাম না। তার পর কবে এবং কেন দ্বিতীয় লেড়কিটিকে এনেছিল তা-ও বল্‌লাম। আমাদের পালঙ্কে শুতে দিয়ে নিজে ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছিল তা-ও বাদ দিলাম না। আমরা ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাত্রে ছোট লেড়কিটিকে হত্যা করে সে-বাড়ি থেকে চম্পট দিয়েছিল তা-ও বল্‌লাম।

সুবেদারের দু' আঁখির কোল বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। তিনি রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন—'বড় লেড়কিটিও আমারই লেড়কি। কৈশোরে পা দিয়েই সে দ্রুত খারাপ হয়ে যেতে থাকে। উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত বলতে পার। ঘরে কাউকে না বলে বাইরে রাত্রি কাটাতে শুরু করে। মানা করলে পাত্তা দিত না। বহু শাসন করে, কঠোর শাস্তি দিয়েও কিছুতেই তাকে বশে রাখা যায় নি। যত চরিত্রবান ছেলেই হোক না কেন তাকে সে পাঁকে টেনে নামাতোই। ভাবলাম, শাদী-নিকা দিলে বুঝি তার চারিত্রিক দোষগুলি কেটে যাবে। কোন ফলই হ'ল না। বরং বছর দুই যেতে না যেতেই তার স্বামীটি সামান্য রোগভোগে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। কামজ্বালা নির্বাপিত করার অপূর্ব সুযোগ এল তার হাতে। মিশরের মেয়েদের যা কিছু খারাপ স্বভাব সবই সে রপ্ত করে নিয়েছিল। এবার আমি নিঃসন্দেহ হলাম। মিশর থেকে ফিরে এসে তোমার কাঁধেই ভর করেছিল। সে পর পর তিন রাত্রি তোমার ঘরে, তোমার সঙ্গে সহবাস করেছে।

আমি ক্ষুব্ধ হলাম যখন দেখলাম সে তার মেজো বহিনকেও তার পথে নামিয়েছে। আমি সর্বদা মেজো মেয়েটিকে সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দিতে লাগলাম। আসলে মিশরের লেড়কিদের মত উচ্ছৃঙ্খল লেড়কি তামাম দুনিয়া চক্কর মেরে এলেও অন্য কোন দেশে দেখা পাওয়া যাবে না। নিজের কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত করতে প্রয়োজনে সে নিজের লেড়কাকেও খুন করতে পারে।

আমার মেজো লেড়কির বয়স ছিল খুবই কম। উঠতি বয়স। কামপ্রবৃত্তি কি সবে সে বুঝতে শিখেছে। এ বয়সে মেয়েদের, বিশেষ করে তাদের অভিভাবককে একটু চোখ-কান খুলে রাখতেই হয়। কিন্তু আমার পক্ষে তো অন্দরমহলে পড়ে থেকে লেড়কিদের সামলানো সম্ভব নয়। তার ওপর বড় লেড়কির কায়দা-কৌশলের সঙ্গে আমি সত্যি পেরে উঠছিলাম না। তাই মেজো লেড়কিটিকে নিয়ে সে মাঝে-মধ্যেই অন্যত্র রাত্রিবাস করত।

একদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেই দেখি বড় লেড়কিটি হাউমাউ করে মরাকান্না জুড়ে দিয়েছে। আমি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে ডুকরে ডুকরে কেঁদে বল্‌ল—'আমি তাকে নিয়ে সন্ধ্যায় বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে সে হারিয়ে গেল কিছুতেই হদিস করতে পারলাম না।' আজ তোমার কথায় বুঝতে পারছি, সে তোমার সঙ্গেই সে-রাত্রি কাটিয়েছিল।

আজ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার মেজো লেড়কিটিকে খুন করার জন্যই বড় লেড়কিটি তাকে তোমার ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। আদতে তার রূপ-সৌন্দর্য তার বহিনজী সহ্য করতে পারছিল না। জ্বলন্ত ঈর্ষার বশেই সে এ-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল।'

সুবেদার সাহেব এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'বেটা, এখন বুঝতে পারছি, বিনা অপরাধেই তোমাকে ডান হাতটি খোয়াতে হয়েছে। আমি তার জন্য অনুতপ্ত। যা ঘটেছে তা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তুমি নতুন করে জীবন শুরু কর।'

—'আপনার অনুতাপ জ্বালার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এ রকম একটি কাটা হাত নিয়েও তো আমার পক্ষে নিজের মুলুকে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন?'

—'আমারও ইচ্ছে নয় তুমি এ-জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যাও। বেটা, আমার তিন লেড়কি, একটিও লেড়কা নেই। আমার ছোট লেড়কিকে শাদী করে এখানেই সংসার-জীবন যাপন কর, আমার ইচ্ছা। সে সুন্দরী। সচরাচর এমন রূপ দেখা যায় না।'

—'আপনার মর্জি অনুযায়ীই আমি চলব। তবে মুলুকে আমার আব্বাজী নাকি বেহেস্তে গেছেন। আমার প্রাপ্য বিষয়-সম্পত্তির একটি বিহিত করতে চাই।'

—'চমৎকার। আজই আমি একজন উচ্চপদস্থ কর্মীকে সেখানে পাঠাচ্ছি। তোমার যা কিছু প্রাপ্য বুঝে নিয়ে আসবে। ও নিয়ে তুমি ভেবো না বেটা।'

আমি এবার সুবেদারের ছোট লেড়কিকে শাদী করে সংসার-জীবন শুরু করলাম। বিবি আমার মনের মতই হয়েছে। আমাকে নিজের কলিজার মতই মনে করে।

ইহুদী হেকিম বলতে লাগল—'জাঁহাপনা, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সে-যুবকের মুখের কিস্‌সা শুনতে লাগলাম। একমাত্র সুবেদারের উদার, বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায় বিচারের ফলেই সে বার আমি নিশ্চিত যমের দুয়ার থেকে ফিরে আসতে পেরেছিলাম।'

সুবেদার তাঁর জামাতার রোগ নিরাময়ের পর প্রচুর দিনার আমাকে উপহার দিলেন। প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে গেলাম আমি। তা দিয়ে দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। নানা মুলুক ঢুঁড়ে আমি আপনার মুলুকে হাজির হলাম। তারপর শাদী করে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি।'

—'জাঁহাপনা, কে বা কারা যে আমার বাড়ির সিঁড়িতে কুঁজোটিকে ফেলে রেখে গিয়েছিল তার হদিস পাওয়া যায় নি।'

চীনের সুলতান এবার মুচকি হেসে বল্‌লেন—'তোমার কিস্‌সাটি মন্দ জমাও নি হেকিম। তবে কুঁজোটির মৃত্যুর ঘটনার কাছে তোমার কিস্‌সা কোণঠাসা হয়ে পড়তে বাধ্য। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তোমাদের কাউকেই ছেড়ে দেওয়া চলে না। মৃত্যু তোমাদের অপরিহার্য।'

ইহুদী হেকিমের কিস্‌সা শেষ হলে সে-দর্জি এগিয়ে এল। সুলতানকে লক্ষ্য করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, সবার কিস্‌সাই তো শুনলেন। আমার কথা কিছু শুনলে আনন্দিত হই।'

—'ঠিক আছে, শুনছি, তবে তোমার কিস্‌সা। যদি আমার মনে ধরে তবে তুমি মুক্তি পাবে।'

দর্জি তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, অদৃষ্টবিড়ম্বিত এ কুঁজোর মৃত্যুর আগে আমি এক বাড়িতে প্রীতিভোজের আসরে যোগদান করতে গিয়েছিলাম। সেখানে নবাবের বহু সম্মানিত ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। নিমন্ত্রিতরা সবাই এসে এক এক করে জড়ো হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, গৃহকর্তাকেই দেখা যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ বাদে এক সুদর্শন যুবককে নিয়ে তিনি নিমন্ত্রিতদের কাছে এলেন। যুবকটি কেবল সুদর্শনই নয় মূল্যবান পোশাকে সজ্জিতও বটে। পোশাকের মধ্য দিয়ে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, সে বাগদাদের অধিবাসী।

যুবকটির দিকে চোখ পড়তেই আমার মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠল। দেখলাম, যুবকটির একটি পা খোঁড়া। হাসিখুশী মুখ নিয়ে সে আমাদের কাছে এল বটে। কিন্তু আসরে সবার সঙ্গে বসার পরই তার মুখে কেমন এক অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল। গৃহকর্তা প্রবোধের স্বরে বল্‌লেন—'ধৈর্য ধরে বস বেটা। কেন, এভাবে চলে যাবে, আমি কি এমন কসুর করলাম, বলবে কি? না বল্‌লে, বুঝবো কি করে। আমাকে বল, হয়েছে কি?'

—'এখানে নিমন্ত্রিত মেহমানদের মধ্যে এমন একজন রয়েছেন যাকে আমি নিদারুণ ঘৃণা করি। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, একসারিতে বসে খানাপিনা করা তো দূরের কথা তার সঙ্গে বসবো না পর্যন্ত। তাই আমি এ জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক। আমি তার নাম প্রকাশ করে আপনার আমন্ত্রিতদের কাউকে দুঃখ দিতে চাই না জাঁহাপনা।'

—'কিন্তু বেটা, তুমিও তো আমার নিমন্ত্রিত—মেহমান। তোমাকেও তো আমি চলে যেতে দিতে পারি না। তোমার গোস্‌সার কারণ কি? কি জন্যই বা তোমাকে এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে?'

অনন্যোপায় হয়ে নিমন্ত্রিত যুবকটি নিমন্ত্রিত নাপিতের প্রতি তর্জনী নির্দেশ করে বল্‌ল—'হুজুর, এর জন্যই আমাকে পা-টি খোয়াতে হয়েছে। আর এরই জন্য আমাকে স্বদেশ চীন ত্যাগ করতে হয়েছে। সে আমার জীবনে সাক্ষাৎ রাহুরূপে কাজ করছে। কসম খেয়েছি, জীবনে এর মুখ দেখব না কোনদিন। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়েছি কি, জীবনে কোনদিন এর সঙ্গে এক সারিতে বসব না। এক সারিতে বসে পানাহার করব না, কোন উৎসব-অনুষ্ঠানেও এর সঙ্গে যোগদান করব না। দেশান্তরি হয়েও একে এড়াতে পারছি না। ছিনে জোঁকের মত যেন আমার সঙ্গে এ সেঁটে রয়েছে।'

কথাটি শুনে নাপিত প্রতিবাদে মুখর হওয়া তো দূরের কথা, মুখতুলে তাকাতে পর্যন্ত পারল না।

আমাদের বিশেষ অনুরোধে সে-যুবক আমাদের তার কিস্‌সা শোনাতে গিয়ে বল্‌ল—'আমার আব্বাজী বাগদাদের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সওদাগর ছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থই একজন অর্থের কুমীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন খুবই মিশুকে সদালাপী, ভদ্র ও বিনয়ী। বিদ্যা-শিক্ষাতেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। আমি পাঠাভ্যাস সাঙ্গ করার পর পরই আমার আব্বাজী দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে চলে গেলেন। আমি তাঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা লাভ করলাম।

অগাধ পৈত্রিক সম্পত্তি হাতে আসায় আমি আড়ম্বর-প্রিয় হয়ে উঠলাম। খানাপিনা সাজসজ্জার বহর আমার বেড়ে গেল মাত্রাতিরিক্ত। মোদ্দা কথা, বিলাস বহুল জীবনের মধ্যে আমি তলিয়ে থাকলাম। তবে হ্যাঁ, কোন লেড়কির প্রতি আমার আকর্ষণ তো ছিলই না, এমন কি তাদের ধারে কাছেও ঘেঁষতাম না।

একদিন আমি পথের ধারের বাড়ির রোয়াকে বসেছিলাম। তখন বিকেল। সন্ধ্যের আগে আগে। হঠাৎ আমার সামনের বাড়ির জানালায় এক রূপসী তন্বী যুবতীকে দেখতে পেলাম। রূপ আর যৌবনের এমন অভাবনীয় মিলন সচরাচর দেখা যায় না। এক মুহূর্তে আমার মন থেকে লেড়কিদের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাবটি নিশ্চিহ্ন হয়ে উবে গেল। তাকে দেখামাত্রই মহব্বতের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লাম। আমার মনময়ূরীটি কিন্তু আমার দিকে এক লহমার জন্য তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল। একটু বাদেই জানালাটি বন্ধ করে চলে গেল। আমার মনে তখন মহব্বতের নেশা চেপেছে। জানালাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমি রোয়াকে ঠায় বসে রইলাম। কিন্তু জানালাটি আর খুল্‌লই না। অনন্যোপায় হয়ে আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে-বাড়ির রোয়াক থেকে উঠে নিজের বাড়ি ফিরে এলাম।

কিন্তু হায়! সে-রূপসীর কাছে আমার মন বাঁধা পড়ে গেল। স্বস্তি হারিয়ে ফেল্‌লাম। তাকে যতই মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করি মন ততই তার দিকেই ধেয়ে যায়। এ-ত মহামুশকিলে পড়া গেল। পরিস্থিতি এক সময় এমন ভয়াবহ রূপ নিল যে, তাকে না পেলে

যেন আমার জীন্দেগীই বরবাদ হয়ে যাবে। আমার কাম কাজ সব শিকেয় উঠল।

তারপর থেকে প্রায়ই সে-রোয়াকে গিয়ে জানালাটির দিকে তাকিয়ে তীর্থের কাকের মত বসে থাকি। মনে মনে হাপিত্যেশ করি তাকে একবারটি চোখে দেখার জন্য।

একদিন দেখলাম, নোকর-নফরসহ সুলতানের কাজী এক খচ্চরের পিঠে চেপে সে-বাড়িটির দরজায় এলেন। দরজাটি খুলে গেল। তারা সবাই বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। বুঝতে পারলাম এটি কাজীর বাড়ি। আবার দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লাম। বুকভরা হাহাকার আর হাহুতাশ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

রূপসী যুবতীটির চিন্তায় চিন্তায় আমার তবিয়ত খারাপ হয়ে গেল। বিছানা আশ্রয় করলাম। নোকররা হেকিম ডাকতে চাইল। বাধা দিলাম। মহব্বতের বিমারি। হেকিম তার ইলাজ করতে পারবে কেন!

আমার বিমারির কথা শুনে আত্মীয়-বন্ধু ও প্রতিবেশীরা এসে আমাকে দেখে যায়। নানারকম উপদেশ দিতেও কসুর করে না।

একদিন এক অপরিচিতা বুড়ি আমার ঘরে এল। আমরা দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোন আদমি সে-ঘরে ছিল না। বুড়ি প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্‌ল—'বেটা, তোমার কি হয়েছে আমাকে বল তো শুনি। যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারি, কোশিসের কসুর করব না।'

আমি কোনরকম দ্বিধা না করে বুড়িকে সবকিছু খুলে বল্‌লাম। তাকে না পেলে আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে এমন কথাও বলতে কসুর করলাম না।

সবকিছু শুনে বুড়ি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'বেটা, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু সে সুলতানের কাজীর লেড়কি। কাজী সাহেব খুবই বদমেজাজের লোক।' মুহূর্তকাল ভেবে বুড়িটি এবার বল্‌ল—'তবে ভরসা হচ্ছে, কাজী আর তাঁর বেটি একই বাড়িতে বাস করলেও তাদের উভয়ের মহল ভিন্ন। এক তলায় কাজী নিজে থাকেন। আর তাঁর লেড়কি থাকে দোতলায়। নোকর-নকরানী কড়া পাহারায় তাকে রাখে। শোচো মাৎ বেটা, আমি একটি না একটি ফিকির বের করতে পারবই।'

আমি বুড়ির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।

পরদিন বুড়ি আবার আমার বাড়ি এল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই সে কোন সুখবর নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাকে হতাশ করে দিয়ে বুড়ি বল্‌ল—'বেটা, আমি হেরে গেলাম। পারলাম না। লেড়কিটির কাছে প্রস্তাব দিতেই আমাকে গালাগালি দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমি নাকি তাকে কুপথে নামার জন্য উৎসাহিত করছি। এমন কি শাস্তির ভয়-ডরও আমাকে কম দেখায় নি। 'বেটা, আমি আশাহত হয়ে হালছাড়ার পাত্রী নই। যে করেই হোক তাকে আমি পথে ভেড়াবোই।'

বুড়ির কথায় আমি বাণবিদ্ধ চিড়িয়ার মত ছটফট করতে লাগলাম। আবার বিছানায় আশ্রয় নিলাম। খানাপিনা পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম।

কয়েকদিন পর আবার আমার হিতকারিণী বুড়ির দেখা পেলাম। তার মুখে হাসি। বুকে আনন্দের জোয়ার। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু অব্যাহত রেখেই বল্‌ল—'বেটা, কাজ অনেকখানিই এগিয়েছে। মিঠাই খাওয়াতে হবে কিন্তু।'

—'মিঠাই খাবে এ আর বড় কথা কি গো। কিন্তু কিভাবে, কতখানিই বা কাজ হাসিল করলে, শুনি?'

—'লেড়কিটিকে বল্‌লাম—তোমার জন্য একটি তাজা লেড়কা আজ মরতে বসেছে। সে হয়ত আর বাঁচবেও না বেশীদিন।'

আমার কথায় লেড়কিটি তো মূর্চ্ছা যাওয়ার জোগাড়। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বল্‌ল—'সে কী কথা! আমার জন্য একজনের জান যেতে বসেছে! আমি তার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি বলতে পার?'

—'তুমি অবশ্য জেনেশুনে কিছু কর নি। তোমার দিল্ পাগল-করা রূপ-যৌবন তার কলিজাটিকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। আর তার সে বিমারি সরানোর ক্ষমতা হেকিমের দাওয়াইয়ের নেই। একমাত্র তুমিই তার স্বস্তি ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে পার বেটি।'

আমার দাওয়াইয়ে কাজ হয়েছে দেখলাম। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'তোমার সে লেড়কাটি কে? কোথায় থাকে? আমি কি কোনদিন দেখেছি তাকে?'

—'বেটি, সে আমার পেটের লেড়কা না হলেও তার চেয়েও বড় কিছু। এই তো ক'দিন আগেই সে তোমাকে সামনের ওই বাড়ির বেলক থেকে দেখেছে। ব্যস, তোমার মহব্বতে মজে গেছে। তখন থেকেই সে তোমার খুবসুরৎ রূপ দেখে পাগল হয়ে গেছে। শয্যা নিয়েছে। এখন তার জান নিয়ে টানাটানি। তোমার পিয়ার-মহব্বত-সোহাগই একমাত্র তার জান রক্ষা করতে পারে।'

ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখে লেড়কিটি বল্‌ল—'সে কী, আমার জন্য শুভ সে জান কবুল করেছে!'

—'সবই তো বল্‌লাম বেটি। এখন তুমি যা ভাল মনে কর তা-ই করবে। তোমার মতামত নিয়ে গিয়ে তার কাছে পেশ করব।'

—'তুমি যত শীঘ্র পার গিয়ে তাকে জানাও আমি তার জন্য মর্মবেদনা ভোগ করছি। কাল নামাজের পর তার পথ চেয়ে আমি বসে থাকব। তাকে বলবে, আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। তবে এ-ও বলো, আব্বাজান নামাজ পড়ে আসার আগেই তাকে বিদায় নিতে হবে।'

বুড়ির কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের কথা শুনে মোহরের থলি থেকে কয়েকটি দিনার তার হাতে গুঁজে দিলাম।

আমার দিল্‌টি তখন খুশীতে টগবগ করতে থাকে। ক'দিন নাওয়া-খাওয়া নেই। চোখে-মুখে কালির ছোপ, মুখ ভর্তি দাড়ি। এক নোকরকে বল্‌লাম, একটি নাপিত ডেকে আনতে। সে রাস্তার মোড় থেকে এক নাপিতকে ধরে নিয়ে এল। এ-ই সে নাপিত জাঁহাপনা। আমার জীবনের সাক্ষাৎ অভিশাপ। আমার রাহু, দুষ্টগ্রহ।

প্রথম দেখা হওয়া মাত্রই সে কুর্নিশ করে বল্‌ল—'খোদাতাল্লার দোয়ায় আপনার সব দুঃখ-যন্ত্রণা কেটে যাবে। আসবে নিরবচ্ছিন্ন সুখ। আবার খুশীতে আপনার দিল ডগমগিয়ে উঠবে। এমন এক দাওয়াই আমার জানা আছে যাতে আপনি হৃত শান্তি-সুখ ফিরে পাবেন।'

আমি মুচকি হেসে বল্‌লাম—'জলদি আমার চুল ছেঁটে দাও। তোমার দাওয়াইয়ের কথা পরে না হয় এক সময় শুনব।' এবার সে ব্যস্ততার লক্ষণ প্রকাশ করল। তার যন্ত্রপাতির কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে লাল শালুতে মোড়া একটি পোটলা বের করল। আমি ধরেই নিলাম ক্ষুর, কাঁচি প্রভৃতি বের করছে। কিন্তু আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। পোটলার ভেতর থেকে সে বের করল একটি জ্যোতিষী কিতাব। আর একটি আর্শি, সাত মুখওয়ালা আর্শি। বিচিত্র তার গড়ন, সে রৌদ্রে গেল। আয়নাটি থেকে সূর্যরশ্মি কিতাবটির পাতার গায়ে প্রতিফলিত করে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরগুলো পড়তে লেগে গেল। এক সময় আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌ল—'হুজুর, আজ হিজরী সাত শ' তেষট্টি সন আর দশই শকর শুক্রবার। খোদাতাল্লাহ-র কাছে আজ যে, যা চাইবে তা-ই পাবে। আজ বৃহস্পতি আর মঙ্গল একই ঘরে অবস্থান করছে। এখন ঘড়িতে সাতটা ছয় মিনিট। এ-সময়ে ক্ষৌরকর্মের পক্ষে-প্রকৃষ্ট সময় হুজুর। আর এরই ফলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে। শোনলাম, আজ আপনি মেহবুবার সঙ্গে মোলাকাত করতে যাচ্ছেন। আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলেই জ্ঞান করছি। আপনার এ-প্রয়াসের ফল খুবই ভাল হতে পারে, আবার মন্দ হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আপনার মেহবুবার সঙ্গে মোলাকাতের পরিণাম কি হবে তা আমি এ-কিতাব দেখে, গণনার মাধ্যমে নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার ওস্তাদের নির্দেশ, যেন কিছু না বলি। এতে আমার লব্ধ বিদ্যার দাম্ভিকতাই প্রকাশ পাবে। তাই আমি জানলেও আপনাকে কিছুই বলতে আগ্রহী নই।'

আমি বিরক্তি প্রকাশ করলাম—'খুব হয়েছে! তোমার বকবকানি থামাও বাপু। আমার খুবই তাড়া রয়েছে। যদি পার খুব তাড়াতাড়ি চুল ছেঁটে আমাকে অব্যাহতি দাও!'

—'ঠিক আছে। হুজুর যা বলবেন আমি তা-ই করব। চুল ছাঁটাই আমার পেশা। এ ছাড়া হেকিমি বিদ্যাও আমার ভালই জানা আছে। বহুত আদমির দুরারোগ্য বিমারি আমি সারিয়ে দিয়েছি। আবার আপনাকে আমি এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে দেব যার ফল হাতে নাতে পেয়ে যাবেন। আমি অর্থ চাই না। কোন বদমতলবও আমার নেই। আপনার হিত সাধিত হোক এটাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আপনি চাইলে আমি আপনার কাছে সারা বছর রোজ এসে আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে বিধান দিয়ে যেতে রাজি আছি। এর জন্য আমাকে পারিশ্রমিক কিছুই দিতে হবে না। আবার ক্ষৌরকর্ম করে দিতেও রাজি আছি। এর জন্যও আমি কোন অর্থ প্রত্যাশা করি না। এবার বসুন, যার জন্য আজ ডেকেছেন। ক্ষৌরকর্ম করে দিচ্ছি।'

আমি উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলাম—'তুমি দেখছি আমাকে

পাগল না করে ছাড়বে না হে! তোমার মতলবখানা কি, সত্যি করে বল তো? আমার মন চাইছে, ওই ক্ষুরটি দিয়ে তোমার ধড় থেকে মুণ্ডটি নামিয়ে দেই।'

কিস্‌সার এ পর্যন্ত ব'লে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। পূর্ব-আকাশে রক্তিম ছোপ উঁকি দিতে লাগল।

উনত্রিশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, যুবক ছোঁড়াটি যখন নাপিতের ঘ্যান ঘ্যানানিতে অধৈর্য হয়ে বল্‌ল—ক্ষুর দিয়ে নাপিতটির গলাটি নামিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন নাপিতটি মুচকি হেসে বল্‌ল—'হুজুর আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার বিশ্বাস আমি মিছেই বকবক করি, আদতে কিন্তু আদৌ তা নয়। আমার ছ'টি ছোট ভাইয়া আছে। তাদের সবার কীর্তির কথা বলছি। আমার বড় ভাইয়ার নাম অল বাকবুক। এর অর্থ পূর্ণ কলসি থেকে জল ঢালার সময় যে অদ্ভুত এক শব্দের উদ্ভব হয়।

আমার দ্বিতীয় ভাইয়ার নাম অল-হাদ্দার। এর অর্থ উটের শব্দ—কণ্ঠস্বর।

আর তৃতীয়জনের নাম অল-বাক্‌বক্। এর অর্থ মোরগের ডাক।

চতুর্থ ভাইয়ার নাম অল-কুজ-খুসবান। এর অর্থ কলসী ঠুকলে যে আওয়াজের উদ্ভব হয়।

আর পঞ্চম ভাইয়ার নাম অল-আসার। এর অর্থ উট পড়ে গেলে যে আওয়াজের উদ্ভব হয়।

ষষ্ঠজনের নাম শাক্কাশিক। এর অর্থ গুগলি ফাটালে যে আওয়াজের উদ্ভব হয়।

আর সপ্তম জন আমি নিজে। আমার নাম সামিত। এর অর্থ হ'ল মৌনব্রতী। কম কথা বলার লোক।

আমি যত চুপ করতে বলি নাপিতের বকবকানি ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কান একেবারে ঝালাপালা করে দিল! অনন্যোপায় হয়ে এক নোকরকে ডেকে বল্‌লাম—'আমার চুল ছাঁটার সাধ মিটে গেছে। ভিক্ষে চাইনে কুত্তা ঠেকা। হতচ্ছাড়া নাপিতটিকে সিকি দিনার দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দে।'

আমার কথায় নাপিতটি গোস্‌সা না করে বরং মুচকি হেসেই বল্‌ল—'হুজুর, আপনি হয়ত ভাবছেন, যে এত অবান্তর কথার ফুলঝুরি ছোটায় তার নামের অর্থ আবার মৌনব্রতী ? কিন্তু আসলে আমি নিজে যেমন বাজে কথার ধার কাছ দিয়েও যাই না তেমনি কেউ বল্‌লে বরদাস্তও করতে পারি না।'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নাপিত আবার মুখ খুলল—'আপনার কাজ হাসিল করে দেওয়ার জন্যই আমার এখানে আসা। একটি কানাকড়ির প্রত্যাশাও আমার নেই। তা ছাড়া পরিশ্রম বিনা পারিশ্রমিক নেয়াও তো অর্থহীনই বটে। খোদাতাল্লার কাছে এর জন্য কি কৈফিয়ৎ দেব? তবে আমি এ জন্যই দুঃখিত যে, আমার দাম আপনি বুঝতেই পারলেন না। একমাত্র আপনার আব্বাজীই আমার গুণের কদর বুঝতে পেরেছিলেন।

একদিনের কথা বলছি হুজুর—আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্র পাশে বসালেন। নিজের বাঁ-হাতটির দিকে আমার দৃষ্টি অকর্ষণ করে বল্‌লেন—'আমার এখানটিতে একটি ফোঁড়া হয়েছে। সামান্য খুনও বেরিয়েছে তা থেকে। জ্যোতিষ, বিচার করে দেখ তো এতে আমার কোন অমঙ্গল হবে কিনা?'

তার অনুরোধে আমি এ জ্যোতিষ-গ্রন্থটি বের করে পাতা উল্টে এক জায়গায় থামলাম। দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। সূর্যের উচ্চতা পরিমাপ করে দেখলাম। গণনা করে বল্‌লাম, সেদিন, সে ক্ষণে খুন ঝরার জন্য বিপদের আশঙ্কা। বেশ বড় রকমের কোন বিপদই আপনার সামনে রয়েছে। আমি গ্রহকে বশীভূত করার ব্যবস্থা করছি, ভাববেন না। আজ বারোটা বত্রিশ মিনিট একুশ সেকেণ্ডে আপনার ফোঁড়াটি কাটার সবচেয়ে ভাল সময়।

ব্যস। সময় বিচার করে ফোঁড়াটির গায়ে ছুরির আঁচড় মারলাম। দাওয়াই দিলাম। আপনার আব্বাজী খুশী হয়ে আমাকে স্বর্ণমুদ্রা ইনাম দিলেন।

আমি খেঁকিয়ে ওঠলাম—'এতক্ষণ ভেবেছিলাম তোমার মাথায় ছিটটিট আছে। এখন দেখছি, মাথার মগজ বলে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বদ্ধ পাগল।' নাপিত বল্‌ল— 'হুজুর, আপনি এখন কামোন্মাদ।

ভয় ভাববেন না। আমি বিলকুল হেজামত করে দেব। এসব বিদ্যা আমার খুব ভালই রপ্ত রয়েছে। আল্লাহ-র একটি বাণীর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুনুন—অন্যের দোষত্রুটি মার্জনা করে, নিজের ক্রোধকে যে প্রশমিত করে রাখে আল্লাতাল্লা তার ওপর প্রসন্ন ও সহায় হন।

হুজুর, প্রতিদিন, প্রতিবার নামাজান্তে এ-বাণী এক শো আটবার জপ করলে সর্ব বিঘ্ন নাশ হতে পারে। আর আপনার দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তিও হবে। আমাকে যে-সব ঝুটাবাত আপনি বলেছেন তার জন্য ত্রুটি স্বীকার বা মার্জনা ভিক্ষাও আপনাকে করতে হবে না। কারণ, আমি নিজগুণে সে সব কথা সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে গেছি। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনে, আজ আপনি এমন ক্রোধপরায়ণ হয়ে পড়ছেন কেন? আপনার আব্বাজী কিন্তু সর্বদা আমার উপদেশ অনুযায়ী বলতেন—'গুণীজনের উপদেশ পালনে যে উৎসাহী হয় তাকে কোনই বিপদের সম্মুখীন হতে হয় না।' খোদাতাল্লার এ উপদেশামৃত প্রতিনিয়ত জপ করবেন। দুনিয়ায় উপদেশ দেওয়ার লোক ভুরি ভুরি পাবেন, কিন্তু যোগ্যতা ক' জনের আছে, বলবেন কি? আমার তো মনে হয় তামাম দুনিয়া ঘুরে এলেও আমাকে ছাড়া উপদেশ দেওয়ার যোগ্য আদমি দ্বিতীয় আর একজন পাবেন না, কেউ পায়ও নি। আর কথা বাড়িয়ে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। আবার হয়ত চেঁচিয়ে উঠবেন, নিকাল যাও হিয়াসে! কিন্তু আমাকে দেখছেন তো কেমন অটুট ধৈর্য। খোদাতাল্লা আমাকে এটি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, একমাত্র আপনার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান-বোধের জন্যই তো আপনাকে উপযাচক হয়ে এতগুলো উপদেশ দিতে গেলাম। তিনি আজ বেহেস্তে গেছেন বলেই আপনাকে উপদেশগুলি দেওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করছি। নইলে খোদাতাল্লার কাছে নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করব।'

আমি উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলাম—'আল্লাহ, একী মহা দায়ে পড়া গেল! একী অসহনীয় উৎপীড়ন! তোমার কাছে কাতর মিনতি করছি পরামানিক ভাইয়া, আমাকে এবার রেহাই দাও। নইলে গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে সদর-দরজার বাইরে দিয়ে আসব তোমাকে।'

হায় নসীব আমার! অপমান, ক্ষোভ এবং হম্বিতম্বি কোন কিছুকেই সে পাত্তা দিচ্ছে না!

হতচ্ছাড়াটি আবার বলতে শুরু করল—'আমি বুঝছি আপনি ক্ষুব্ধ। আমার প্রতি ঈষৎ উষ্মাও প্রকাশ করছেন। আসলে প্রবীণদের তো নবীনদের তুলনায় সহ্য-ধৈর্য একটু আধটু বেশীই ধরতে হয়। হুজুর আমার আর এখন এসবে উষ্মার সঞ্চার হয় না। সত্য বলতে কি, আমি তো বুঝতেই পারছি, পেয়ার মহব্বতে আপনার মাথা এখন আর ঠিক মত কাজ করছে না। তবে ইলাজ করলে, ঠিকঠাক দাওয়াই দিলে আপনার বিমারি সারতে বাধ্য। ভাববেন না, আমিই দাওয়াই দিয়ে নিরাময় করে তুলব। আজ মনে পড়ছে, আপনি যখন গুড়া বাচ্চা ছিলেন তখন মক্তবে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার সময় কত অত্যাচারই না আপনি আমার ওপর করতেন, সে সব মনে আছে?'

আমি গুলি খাওয়া শেরের মত গর্জে উঠলাম—'পরামানিক ভাইয়া, মেহেরবানি করে এবার ছাড়ান দাও। আমার হাতে অনেক কাজ। চুল ছাঁটাই আজকের মত শিকেয় তুলে রাখছি। আর যদি নেহাৎই'—কথা বলতে বলতে আমার গায়ের পশমী আলোয়ানটি ফ্যাস্ করে দু' টুকরো করে ফেল্‌লাম।

নাপিতটি এবার কেমন একটু ভড়কে গেল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষুর হাতে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার মাথাটিকে তার দু' হাঁটুর ফাঁকে আঁকড়ে ধরে মাথায় ক্ষুর চালাতে লাগল। সামান্য একটু জায়গায় ক্ষুর বুলিয়ে আবার তার বক্তিমে শুরু করল—'আসল কথা কি জানেন? কাঁধে শয়তান না চাপলে অধৈর্যের উদ্ভব হয় না, থাক গে, আর কিছু বলব না। কারণ, আমার প্রতি আপনার মনে তো কিছুমাত্র আস্থা নেই।'

—'দোহাই তোমার পরামানিক ভায়া! আমার হাতে সময় খুবই কম।'

—'হ্যাঁ, এবার বুঝলাম বটে, আপনার সময়ের খুব অভাব। কিন্তু কে বলেছে, আপনার সময়ের খুবই অভাব? হতেই পারে না। কোন্ হতচ্ছাড়া আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে বলেছে? দরকার হলে আমিই বলব, কখন তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কখন গতি করতে হবে ধীর-মন্থর। অহেতুক ব্যস্ততার ফলে কিন্তু ক্ষতির বোঝাই বইতে হবে। আমাদের পীর-মহম্মদের বক্তব্য কি জানেন কি? দুনিয়ায় যা কিছু খুবসুরৎ সবই ধীরে সম্পন্ন হয়েছে। তাই বলছি কি, কোন কাজেই ব্যস্ততা প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। আপনার ব্যস্ততার কথা জানতে পারলে মূল্যবান কিছু উপদেশ দিতে পারতাম। আমার কথায় আবার যেন গাল ফুলাবেন না। আপনার সামনে খুবই সুসময়, দিব্য চোখে দেখছি।'

ব্যস, চুলছাটা এ পর্যন্ত রয়ে গেল। সে তার জ্যোতিষীর কিতাবটি খুলে বসল। সূর্যের আলোয় মেলে ধরে কি সব ছাইপাশ দেখতে লাগল নিবিষ্ট চিত্তে।

এক সময় আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌ল—'কি সব বাজে কথা বলেন যাদের মাথামুণ্ডু নেই। কই, আপনার ব্যস্ততার কথা তো উল্লেখ দেখছি না। আমার গণনায় ভুলচুক হবার জো নেই। দুপুরে নামাজের সময় আপনার কাজ করার পক্ষে উপযুক্ত সময়। তার আগে ব্যস্ত হয়ে কোন ফল পাবেন না। অন্ততঃ তিন ঘণ্টা অনায়াসে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিতে পারেন।'

আমি এবারও দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করে বলে উঠলাম—'বাপু, সত্যি আমি আর পারছি না! এবার রেহাই দাও।'

সে এবার আর কোন কথা না বলে আলতো করে ক্ষুরটি তুলে নিয়ে আমার মাথায় চালাতে লাগল। খুবই সামান্য অংশ কামাল। বুঝলাম, ইচ্ছে করেই ধীর-হাতে ক্ষুর টানছে।

ব্যস, আবার তার কিস্‌সা শুরু করল—'হুজুর, আপনার ব্যস্ততা সত্যি আমাকে বিমর্ষ করে তুলেছে। আপনার আব্বাজী আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন তা তো জানেনেই। আপনিই যদি—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লাম—'আজ নামাজের সময় আমাকে আমার মেহবুবার বাড়ি যেতে হবে। নামাজ শেষ হবার আগে পালাতে হবে। নইলে তার বাবার খপ্পরে পড়তে হবে। তারপর এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ সারতে হবে। তাই তোমাকে আবারও অনুরোধ করছি, একটু হাত চালিয়ে চুলটা ছেঁটে আমাকে ছেড়ে দাও।'

—'হায় খোদা। তাই তো, আমার তো বাজারই সারা হয় নি!'

—'তোমাকে আর বাজারে যেতে হবে না। আমার বাড়িতেই—গোস্ত আর সরাব আছে খানাপিনা সেরে যেয়ো। একটু হাত চালিয়ে আমার চুল ছেঁটে দাও বাপু।'

—'চমৎকার কথা! কি কি পাকসাক হয়েছে মেহেরবানি করে বলবেন কি হুজুর?'

—'বিরিয়ানি, দো-পিঁয়াজী, গোস্তের চপ, আর গোস্তের বটি—তোমার যা-যা দরকার নিয়ে যাও।'

—'একটু চেখে দেখার সুযোগ করে দেবেন হুজুর?'

রসুইকরকে দিয়ে সব রকম খানা একটু একটু করে তার চেখে দেখার জন্য আনিয়ে দিলাম। সরাবও দিলাম এক বোতল।

সে সব কটি বাটি থেকে একটু একটু করে চেখে দেখে বলল—'আপনার মত এমন দরাজ মন আর ক'জনের আছে!'

—'ঠিক আছে। এবার আমার চুল ছাঁটার ব্যাপারটি শেষ কর। আমার বেরোবার সময় হয়ে এসেছে।'

এবার ক্ষুরটি সে হাতে তুলে নিল। বার দু'-তিন আমার মাথায় সেটি বুলিয়ে নিয়ে আবার তার পাঁচালি জুড়ে দিল। 'আজকে আপনার কাছ থেকে যে ঔদার্যের পরিচয় পেলাম তারজন্য ধন্যবাদ জানালে তা আপনার আব্বাজীকেই জানাতে হয়। কারণ, আপনার যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সবই তো উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার আব্বাজীর কাছ থেকেই পেয়েছেন।'

তারপর এক সময় নাপিত বল্‌ল—'হুজুর, আমার ঘরে আসুন না একবারটি। খানাপিনা আর নাচগানের আয়োজন করা যাবে। মেজাজ শরিফ হয়ে যাবে। কাজকর্ম যা কিছু হাতে রয়েছে সেরে একটু রাত্রি করে এলেও চলবে। আমি বলছি, খুব আনন্দ পাবেন। কারণ, বহুত জ্ঞানী-গুণীজনের সমাবেশ ঘটবে।'

আমি রেগেমেগে বল্‌লাম—'তুমি তোমার জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে থাক গে। আমার দরকার নেই। তুমি মেহেরবানি করে আমার চুল ছাঁটার কাজটুকু সেরে দাও, তা হলেই কৃতার্থ হ'ব।'

'ঠিক আছে, তাড়াতাড়িই সেরে দেব। আমি খানা আর সরাব টরাব এক দৌড়ে বাড়িতে রেখে আসি গে।'

আমি রীতিমত গর্জে উঠলাম—'বাজে ধান্দা রাখ! আগে আমার চুল ছেঁটে দাও। তারপর তুমি জাহান্নামে যাও, দেখতে যাব না। আগে আমার কাজ—'

—'একা? একা যাবেন? আপনাকে একা ছাড়তে কিছুতেই দিল আমার সরছে না।'

আমার কোন কথাই সে পাত্তা দিল না। অধৈর্য প্রকাশ করলাম—'কী করছ তুমি! আমি যে তখন থেকে বলছি আমার তাড়া আছে কানেই ঢুকছে না তোমার!'

—'ভাল কথা তো। তাড়া যখন আছে তখন তাড়াতাড়িই তো যেতে হবে। কিন্তু আমি বলছি কি, বাগদাদ নগর তো আর এই এতটুকু নয় যে, যেখানে খুশী একা একা চলে যাবেন। এখানে পায়ে পায়ে বিপদ জড়িয়ে থাকে।'

—'রাখ তো তোমার প্যানপ্যানানি! আমার চুল ছেঁটে দিয়ে মানে মানে বিদায় হও।'

সে এবার ব্যস্ত হাতে ক্ষুর চালাতে লাগল। হায় আমার নসীব! চুল ছাঁটা শেষ হলে দেখি নামাজের সময় পেরিয়ে গেছে, রাগে-দুঃখে আমার মাথায় খুন চাপার জোগাড় হ'ল।

নাপিত আমার দেওয়া খাবারদাবার ও সরাবের বোতল নিয়ে

বাড়ির দিকে হাঁটা জুড়ল।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। এক দৌড়ে হাজির হলাম কাজীর বাড়ি। দরজা খোলাই রয়েছে দেখলাম। ঘরে ঢুকে দরজাটি দিলাম বন্ধ করে। সে বুড়ি ভেতরেই রয়েছে দেখলাম।

বাড়ির বাইরে কিসের যেন চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। মনে খটকা লাগল। আমি দৌড়ে আসার সময় কিছু লোক আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল। হয়ত চোরটোর ভেবে থাকবে। তারাই হয়ত পিছু নিয়েছে। কাজীর বাড়ি চুরি করতে ঢুকেছি অনুমান করেছে।

আমার মেহবুবা জানালার ছিদ্রে চোখ রেখে দেখল, কাজী খচ্চরের পিঠ থেকে নামছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে হতচ্ছাড়া সে নাপিতটি। আর দশবারজন লোকও সঙ্গে রয়েছে।

শুনে তো আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে একেবারে কাঠ। আমাকে অভয় দিতে গিয়ে আমার পিয়ারী, আমার মেহবুবা বল্‌ল—'ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমার আব্বাজান সচরাচর আমার ঘরে আসেন না।'

হতচ্ছাড়া নাপিত যখন নিঃসন্দেহ হ'ল আমি ইতিমধ্যেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছি তখন সে গলাছেড়ে বিলাপ জুড়ে দিল—'আমার কী সর্বনাশ হ'ল গো! তোমরা কে আছ, আমার মনিবকে বাঁচাও! কাজী সাহেব তাঁকে খুন করে ফেল্‌লেন! খুন! কাজী সাহেব আমার মনিবকে খুন করে ফেল্‌লেন!' কাঁদতে কাঁদতে সে দু' হাতে নিজের গায়ের জোব্বাটি ছিঁড়েছুঁড়ে একাকার করে ফেল্‌ল। আর নিজের চুল ছেঁড়ার অভিনয় করতে লাগল।

কৌতূহলী পথচারীরা নাপিতের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করল।

নাপিত তো কেঁদেকেটে একসার—'আমার মনিব কাজীর বাড়ি ঢুকে পড়েছেন। কাজী তাকে গরুপেটা করছেন। তোমরা সবাই আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে চল। কেন তিনি আমার মনিবকে এমন বে-ধড়ক পিটছেন, জিজ্ঞেস করি গে।'

পথচারীরা রেগে কাঁই হয়ে গেল। কাজী ক্ষমতাবান বলে একটি লোককে অহেতুক মারধোর করবেন তা তো হতে দেওয়া যায় না।

নাপিতের সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতরে ঢোকার উদ্যোগ নিল। দরজার কড়া নাড়তে শুরু করল।

ব্যাপার দেখে কাজী বেচারা তো হতভম্ব। এক নিগ্রো নফর দরজা খুলে দিল। পথচারীরা বেজায় চিৎকার জুড়ে দিল। কিন্তু কি যে বক্তব্য বোঝা গেল না।

নাপিত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কাজী সাহেব, আপনি আমার মনিবকে মারধোর করছেন কেন? তার অপরাধ কি?'

—'ব্যাপার কি, কিছুই তো আমি বুঝছি না! কে তোমার মনিব? কাকেই বা আমি মারধোর করলাম? খোল্‌সা করে বল তো, কি হয়েছে?'

—'হবে আবার কি, নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোলে কি আর সব কিছু টের পাওয়া যায়? সব খোয়া গেল আপনার।'

কাজী গর্জে উঠলেন—'বাজে কথা রেখে সত্যি করে বল, ব্যাপার কি? বাছা, তোমার মনিবটি কে? আমার বাড়িতেই বা তার কি দরকার?'

—'হাসালেন কাজী সাহেব! তামাম দুনিয়ার লোক জানে আমার মনিবের সঙ্গে আপনার লেড়কির ইয়ে, মানে পিয়ার মহব্বত রয়েছে। আর আপনি জানেন না, বিশ্বাস করতে হবে আমাকে! রোজ, আপনার বাড়ি তিনি তো রোজই আসেন।'

—'সে কী কথা! আমার লেড়কির নামে এরকম বদনাম! আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।'

—'এখন আর বরদাস্ত না করে উপায় কি, বলুন? গোড়ায় দিলেন আস্কারা। আর এখন লাগাম টেনে ধরলে চলবে কেন? সব জেনে শুনে না জানার ভান করলে কি আর ব্যাপার থেমে থাকবে? আগেই নিজের লেড়কিকে সতর্ক করা উচিত ছিল। শুধু আমি কেন, এই যে এত লোক এখানে জড়ো হয়েছে, জিজ্ঞেস করুন, একই কথা সবাই বলবে।'

কাজী সাহেব তার লেড়কির চরিত্র নিয়ে এরকম জঘন্য সব কথাবার্তা শুনে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

পথচারীদের কোলাহল নতুন করে শুরু হ'ল। তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল—'আমরা মকানটি তল্লাসী করে দেখতে চাই। এর মনিবের কি দশা করা হয়েছে।'

আমি প্রমাদ গণলাম। এবার সবাই যদি হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে আর খানাতল্লাসী শুরু করে তবেই কম্ম ফতে।

আমার মেহবুবা একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে আমাকে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল। আমি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেলাম।

দরজা খুলে দিতেই সবাই হুড়োহুড়ি করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। সব ঘর, বারান্দা, গলি প্রভৃতি আতিপাতি করে খুঁজল। কোথাও কাউকে না পেয়ে আমার মেহবুবার ঘরে এল। তা-ও আমাকে পেল না। সবাই হতাশ হয়ে ফিরে গেল। ধূর্ত নাপিত হাল ছাড়ল না। কাঠের বাক্সটির কাছে এসে দাঁড়াল। বাক্সের ডালাটি ফাঁক করল। আমার চোখে চোখ পড়তেই দম্ করে ডালাটি বন্ধ করে দিল।

আমি বুঝলাম, নাপিত এবার আমাকে সমেত বাক্সটি মাথায় তুলে নিল। রাস্তায় এসে বাক্সটিকে দম্ করে ফেলে দিল। বাক্সের ডালাটি গেল খুলে। আমি রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়লাম। তখনই আচমকা চোট লেগে আমি পা-টি হারাই। খোঁড়া হয়ে যাই। সেখান থেকে উঠে তাড়াতাড়ি একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ি। আমাকে আর ধরে কে।

বেগম শাহরাজাদ দেখলেন, ভোর হয়ে এল বলে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন। বাদশাহ শারিয়ার নিজের কাজে চলে গেলেন।

ত্রিশতম রজনী

রাত্রি গভীর হলে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন।

কোনরকম ভূমিকা না করেই বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সেই দর্জিটি তার কিস্‌সা বলে চল্‌ল—খোঁড়াটি ভোজের আসরে তার জীবনের করুণতম অধ্যায়ের কথা বলছে। উপস্থিত সবাই অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল।

আমি তো গলির মধ্যে ঢুকে কোনরকমে জানটি বাঁচালাম। তবু আমি দৌড় বন্ধ করলাম না। নাপিত আমার পিছনে আঠার মত লেগে রইল। দৌড়োতে দৌড়োতে সে চিৎকার করে বলতে লাগল—'হুজুর, একটু থামুন। আমার কথা শুনুন। এখন স্বীকার করছেন তো আমি না থাকলে আপনি জানে বাঁচতেন না। আপনাকে তো আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম, আমাকে সঙ্গে না নিয়ে মোটেই পা-বাড়াবেন না। তবু অনুমানের ওপর নির্ভর করে এসে না পড়লে কী কেলেঙ্কারী হয়ে যেত, ভেবে দেখেছেন? এখন আর দৌড়োবার দরকার নেই। দাঁড়ান।'

নাপিত আমার কাছাকাছি চলে এলে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লাম—'ভাই, আমাকে এবার অন্ততঃ রেহাই দাও। আমার পিছু ছাড়। দোহাই তোমার, আমাকে একটু দম ফেলে বাঁচতে দাও। তুমি কি আমার জান খতম না হওয়া পর্যন্ত আমার পিছন ছাড়ছ না?'

আমি আবার দৌড়ে এক দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানিকে বল্‌লাম, 'আমাকে আপনার দোকানের ভেতরে একটু লুকিয়ে থাকার সুযোগ দিন। আমার খুবই বিপদ। পরে সব খুলে বলছি আপনাকে।'

দোকানি কি বুঝল, কে জানে? তার আলমারির পিছনে আমাকে লুকিয়ে থাকার সুযোগ দিল।

সব শুনে দোকানি আমাকে বল্‌ল—'তোমার পা না সারা পর্যন্ত এখানেই থেকে যাও। আমার দোকানে নাপিতের মত কোন বদমায়েস লোকই ঢুকতে পারবে না।'

এবার থেকে নাপিতের ওপর বিরক্তির পরিবর্তে আমার মনে ভীতি মিশ্রিত ঘৃণার সঞ্চার হ'ল। মনস্থির করে ফেল্‌লাম মুলুক ছেড়েই চলে যাব। এরকম বদমায়েশ লোক যখন পিছনে লেগেছে তখন আর এ মুলুকেও থাকছি না। খোদাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করছি, নচ্ছার নাপিতের বংশ নিপাত যাক।

আমার ব্যবসাপত্র যা ছিল সব সস্তা দামে ঝেড়ে দিলাম। সামান্য জমিজমা যা ছিল তা আমার এক অভিন্ন হৃদয় বন্ধুকে তদারকির ভার দিয়ে দিলাম। ব্যাস, হারা উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সাগর-মহাসাগর, পাহাড়, মরু পেরিয়ে বহু মুলুক ঘুরে হাজির হলাম আপনার দেশে। মুলুক চীনদেশে। ভাবলাম, আর কিছু না হোক অন্ততঃ আমার শনি সে-নাপিতের পাল্লায় আর পড়তে হচ্ছে না। কিন্তু নসীবের ফের, এখানে এসেও সাক্ষাৎ সে-যমটির খপ্পরে পড়তে হ'ল। আবার পালিয়ে যাওয়ার ফিকির খুঁজতেই হ'ল।

কথাটি বলেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নাপিত তখন নিতান্ত অপরাধীর মত বিমর্ষ মুখে বসে রইল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এমন একটি নিরীহ-নিরপরাধ যুবকের জিন্দেগী বরবাদ করার ধান্দা করছ কেন হে?'

—'আপনারা কিন্তু আমার প্রতি অবিচারই করছেন। আমি তার ভাল ছাড়া মন্দ করার চিন্তা করি নি। আমার পরামর্শ অনুযায়ী চল্‌লে তাকে এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হ'ত না। আর তার পায়ের কথা যদি বলেন আমি বলব একটি পা গেছে কিন্তু জান রক্ষা পেয়েছে। সেদিন আমি কৌশল প্রয়োগ না করলে অবশ্যই তাকে জান খোয়াতে হ'ত। কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে সে কিন্তু আমাকে অভিশাপই দিয়ে গেল। যাক গে, খোদাতাল্লা এর বিচার করবেন।

আপনারা তো আমাকে দেখছেন। আমি কি অনাবশ্যক কথা বলি, নাকি বিবেকহীনের মত কোন কাজ করেছি? তবে আমার ছয় ভাই ক্ষমতা রাখে বটে! আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝবেন, আমার জ্ঞান কত গভীর।

আপনারা তো জানেন, বাগদাদ আমার স্বদেশ। আমি দেশ ছেড়ে

আসার সময় সে-দেশের সুলতান ছিলেন অল-মাসতানাসির বিল্লাহ্। ধার্মিক প্রবর বলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। তাঁর সুলতানিয়তে জ্ঞানী-গুণীদের খুবই কদর ছিল।

খলিফার কাছে একবার খবর গেল, নগরের প্রান্তে দশজন সমাজ-বিরোধীর এক আখড়া রয়েছে। সুখবরটি শোনামাত্র সুলতান সিপাহীদের কড়া নির্দেশ দিলেন তাদের বন্দী করে কয়েদখানায় পুরে দিতে।

আমি এক বিকেলে টাইগ্রিস নদীর ধার দিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণ সারছিলাম। এমন সময় দেখি, নৌকায় দশজন লোক বসে। নোঙর তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে। ভাবলাম এরা নদীপথে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোচ্ছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাদের নৌকোয় উঠে পড়লাম। আমি তো বলেছিই, আমি মিতভাষী। নিতান্ত দরকার ছাড়া মুখ খুলি না। তাই তাদের অনুমতি না নিয়েই নৌকোয় উঠে গেলাম। সবে নোঙর তুলেছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে একদল সাদা পোশাক পরিহিত সিপাহী অতর্কিতে নৌকাটিকে ঘিরে ফেল্ল। আমাকে সহ সবাইকে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হ'ল। হাজির করল সুলতানের দরবারে।

খলিফা সবকিছু শুনে বাজখাই গলায় গর্জে উঠলেন—'যাও, এদের বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাও। দশজনকে একের পর এক কোতল কর।' আমি তো মিতভাষী, একটি কথাও বল্লাম না।

জল্লাদ তার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে এক এক করে দশজনের গর্দান নিল। বধ্যভূমি খুনে মাখামাখি, আমি এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শেষবারের মত আল্লাতাল্লাকে স্মরণ করতে লাগলাম।

জল্লাদ এবার হাতের অস্ত্রটি পাশে নামিয়ে রাখল। সুলতান সবিস্ময়ে বল্লেন—'এ কী রকম কাজ হে? একজন যে বাকি রয়ে গেল।'

জল্লাদ কুর্নিশ করে জবাব দিল—'হুজুর, আপনার আদেশ মতই কাজ হয়েছে। গোস্তাকী মাফ করবেন, আপনি দশজনকে কোতল করতে বলেছেন। আপনি গুণে দেখুন, দশটি লাশ আর দশটি শির এখানে আছে কিনা।'

সুলতানের মনে আছে, দশজনকে কোতল করতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল। সে হুকুম যথাযথভাবে পালিত হয়েছে।

আমাকে নিয়ে সুলতানের মুখোমুখি দাঁড় করানো হ'ল। তিনি সবিস্ময়ে বল্লেন—'কে তুমি? মকান কোথায়? এ সমাজ-বিরোধীদের দলে তুমি ভিড়লে কি করে?'

আমি তো কথা কম বলি। কিন্তু এবার মুখ খুলতেই হল্। বললাম—'জাঁহাপনা, আমি কথা খুব কম বলি ব'লে সবার কাছে আমি 'সীমিত' বলে পরিচিত। আমি কথা কম বলি বলে আপনি জল্লাদকে ভুল হুকুম করেছেন বুঝেও মৌন হয়েই ছিলাম। কারণ, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাছাড়া অন্যের ব্যাপারে অহেতুক মাথা না ঘামানোও আমার একটি বড় গুণ। আমার পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা ক্ষৌর-কাজ। আমাকে নিয়ে সাত ভাই আমরা। আর আপনি জানতে চেয়েছেন, সমাজবিরোধীদের দলে আমি কি করে ভিড়লাম! ট্রাইগ্রিস নদীর তীর ধরে বেড়াবার সময় দেখলাম, এ-দশজন লোক নৌকো নিয়ে নদীতে বেড়াতে যাচ্ছে। নিঃশব্দে নৌকোয় উঠে পড়লাম। আপনার সিপাহীরা তখন নৌকো ঘেরাও করে আমাকে সহ সবাইকে বন্দী করে হাজির করে আপনার দরবারে। তখনই আমি বুঝেছিলাম, লোকগুলো মৌনব্রতী। আমিও তো কথা কম বলি, তাই মৌন হয়েই ছিলাম।

আপনি জল্লাদকে হুকুম করলেন কোতল করতে। আমি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিলাম। টু-শব্দটিও করলাম না। আমি তো নিঃসন্দেহ যে, খোদাতাল্লা নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করবেন।

আমার আচরণে, বিশেষ করে কথাবার্তায় সুলতান আমার ওপর খুবই প্রসন্ন হলেন। হবে নাই বা কেন? আমার মত মিতভাষী, বিদ্যান, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও সাহসী ব্যক্তি তো সচরাচর দেখাই যায় না।

নাপিত এবার বল্ল—'আপনারা তো একটু আগেই নিজ কানে শুনলেন খোঁড়াটি আমার নামে কি সব মিথ্যা, বদনাম দিয়ে গেল। আমার জন্যই নাকি তাকে পা-টি হারাতে হয়েছে।'

সুলতান অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে বললেন—'আচ্ছা মিঞা, তুমি একটু আগে তোমার ছয় ভাইয়ার কথা বলেছ। তারা কি তোমার মতই বিদ্যান, বুদ্ধিমান, সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলাম—'না জাঁহাপনা, মোটেই না। আমার সঙ্গে আমার ভাইয়াদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। আশমান-জমিন ফারাক যাকে বলে। তাদের সঙ্গে আমার তুলনা করে আমাকে কিন্তু ছোটই করলেন। তারা সব ব্যাপারেই একেবারে আনাড়ী। নিরেট মূর্খ, একেবারে হদ্দবোকা। অপরের ছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, আর হীন মনের ধারক আমার ভাইয়াগুলো। তাদের চেহারার মধ্যেও যথেষ্ট খুঁত দেখতে পাবেন। একজন কানা, একজন ল্যাংড়া, একজন অন্ধ—দু' চোখই খুইয়েছে, কারো মুখ পোড়া, কেউ কালা—কানে একেবারেই শোনে না, আর একজনের তো নাকই নাই।'

নাপিত এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার গুণবান ভাইয়াদের কথা এক এক করে বলছি। আশা করি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকে তাদের সম্বন্ধে আপনি সম্যক ধারণা করে নিতে পারবেন। জাঁহাপনা, আমার বড় ভাইয়ার নাম বাকবুক। সে ল্যাংড়া। তার এরকম নামকরণের কারণ, সে সর্বদা মুখে এমন এক আওয়াজ করে যা বাস্তবিকই অদ্ভুত। কানায় কানায় ভর্তি কলসি থেকে জল ঢালার সময় যে আওয়াজের উদ্ভব হয় ঠিক সে রকম আওয়াজ সে সর্বদা মুখ দিয়ে করে থাকে।

নাপিতের প্রথম ভাইয়া বাকবুকের কিস্‌সা

আমার বড় ভাইয়া বাকবুক বাগদাদ নগরের এক নামকরা দর্জি ছিল। এক লব্ধ প্রতিষ্ঠ বণিকের কাছ থেকে সে দোকান ঘরটি ভাড়া নিয়েছিল। সে ছিল নিচতলায় আর ওপরতলায় থাকত বাড়িওয়ালা। নিচতলার একধারে একটি কলুর ঘানি ছিল।

একদিন আমার বড় ভাইয়া কাপড় সেলাই করছিল।

কাজের ফাঁকে তাকিয়ে দেখে ওপরতলার বারান্দায় এক খুবসুরৎ বিবি দাঁড়িয়ে রাস্তার আদমি দেখছে। পরে অবশ্য সে জেনেছিল, বাড়িওলার বিবি। তার সুরৎ দেখে আমার বড় ভাইয়া মনে মনে তাকে মহব্বত করে ফেলে। মহব্বতে একেবারে মাতোয়ারা। তার সেলাইয়ের কাজ শিকেয় উঠল।

একদিন দোকান খুলেই আমার বড় ভাইয়া কাপড় আর সূঁচ-সূতো নিয়ে বসল। কাজে মন নেই। ওপর তলার বারান্দার দিকে চোখ। কিন্তু তার মেহবুবা, সে-বিবি আর এল না। কাপড় সেলাই করতে গিয়ে সূঁচের ডগা দিয়ে সে আঙুলে হাজার ছিদ্র করে ফেল্‌ল। কিন্তু তার মনময়ূরীর দেখা মিল্‌ল না মুহূর্তের জন্যও। রুজি রোজগার বন্ধ। বাজার-হাট করবে কি দিয়ে? সংসারের হালৎ সসমিরা হয়ে দাঁড়াল।

ব্যাপারটি অবশ্য পরে খোলসা হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করেই বাড়িওয়ালার বিবি আমার বড় ভাইয়াকে নাচানোর মতলব নিয়েছিল। দুটো উদ্দেশ্য ছিল তার—প্রথমতঃ তার রোজগারপাতি বন্ধ করা আর দ্বিতীয়তঃ তার কলিজায় মহব্বতের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। সে নাকি এর আগেও তার ডাগর ডাগর চোখের বাণে বহুত লেড়কাকে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

পরদিন সুবহে বাড়িওয়ালা একটি রেশমী কাপড় নিয়ে আমার বড় ভাইয়ার দোকানে হাজির হ'ল। তার বায়না, কাপড়টি দিয়ে কয়েকটি কোর্তা সেলাই করে দিতে হবে।

আমার বড় ভাইয়া তো মহাখুশী। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কুড়িটা কোর্তা বানিয়ে ফেল্‌ল। কোর্তা পেয়ে বাড়িওয়ালা তার ওপর খুবই সন্তুষ্ট হ'ল।

কোর্তা বুঝে নিয়ে বাড়িওয়ালা মজুরি দিতে গেল। আমার বড় ভাইয়া কিছুতেই মজুরি নিতে চাইল না। নেবেই বা কি করে? ঠিক তখনই যে তার মেহবুবা, বাড়িওয়ালার বিবি ওপর তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতে ইশারা করেছে যেন মজুরি না নেয়। বাড়িওয়ালা শত পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও সে মজুরি নিল না।

এদিকে আমার বড় ভাইয়ার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কোর্তার জেবে একটি কানাকড়িও নেই। বাড়িতে চুলা পর্যন্ত জ্বলে নি। তার ধারণা হ'ল স্বামীকে বিনা মজুরিতে পোশাক বানিয়ে দিলে তার বিবি তার দিকে ঝুঁকবে।

হায়রে আহাম্মক কাঁহাকার! মাথায় গোবর পোরা। না হলে ধরতে পারল না যে, তারা স্বামী-স্ত্রীতে যুক্তি করে তাকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি হাসিল করে নিয়েছে।

পরদিন দোকান খুলতে না খুলতেই একগাদা কাপড় নিয়ে বাড়িওয়ালা ফিন হাজির হ'ল। কতগুলি পাতলুন বানিয়ে দিতে বল্‌ল। শুরু হ'ল অমানুষিক পরিশ্রম। তৈরি করে ফেল্‌ল তার ফরমাস অনুযায়ী কতকগুলো পাতলুন।

পাতলুনগুলো বুঝে পেয়ে বাড়িওয়ালা কোর্তার জেবে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে মজুরির কথা জিজ্ঞাসা করল। ঠিক সে মুহূর্তেই দরজার ছিদ্র দিয়ে একটি চোখ দেখতে পেল। তার বুঝতে দেরী হ'ল না চোখের মালিকটি কে। আমার বড় ভাইয়া তো তখন ধরতে গেলে পৌনে মরা। এক চোখেই ইশারা করে বাড়িওয়ালার বিবি তাকে মজুরি নিতে বারণ করল, এবারও ফোকটে এতগুলো পাতলুন তাকে করে দিতে হ'ল।

জেব এখনও ফাঁকা। বাড়ির সবাই উপোষ করে কাটাচ্ছে। আমার বোকা বড় ভাইটি এবারও বুঝতে পারল না বাড়িওয়ালা ও

তার বিবি ফন্দি করে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বোকা গাধা কোথাকার।

বাড়িওয়ালা এবার বল্‌ল—'তুমি আমার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করেছ। তার প্রতিদান স্বরূপ আমার বিবি তোমার জন্য কিছু করতে অত্যুগ্র আগ্রহী। আমাদের বাড়িতে এক ঝি কাজ করে। খুবসুরৎ না হলেও তাকে কুৎসিত বলা যায় না। তাকে শাদী করে সুখে ঘর সংসার কর।'

আমার বোকা অপদার্থ বড় ভাইয়া এক কথাতেই তাদের পাতা ফাঁদে মাথা গলিয়ে দিল। শাদীর প্রস্তাবটিকে পায়ে ঠেলতে পারল না। তাদের শাদী হয়ে গেল। নিচতলার ঘানির ঘরে তাদের বাসর সাজানো হ'ল। রাত একটু বেশী হলে আমার আহম্মক বড় ভাইয়া বাসর ঘরে গেল।

আমার বড় ভাইয়া তার সদ্য শাদী করা বিবির মধ্যে ঔদাসিন্য লক্ষ্য করল। সে গোড়াতেই সাফাই গাইল—'আজ কিছু হবে না। তোমার সাধ পূরণ করার সাধ্য আজ আমার নেই। আজ আমি অশুচি হয়েছি। এ অবস্থায় সহবাস তো দূরের কথা এক বিছানায় বসাও বারণ। আজকের রাতটুকু তুমি এখানে একাই থাক মেহবুবা। আমি ওপর তলায় গিয়ে শুয়ে পড়ছি।' কথা বলতে বলতে তার বিবি গটমট করে ওপর তলায় চলে গেল।

এদিকে আমার বড় ভাইয়া ঘানির ঘরে সজ্জিত বাসরে একা রয়ে গেল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আমার বড় ভাইয়ার নিদ টুটে গেল। মালিক কলু এবার বলদের পরিবর্তে দিল তাকে জোয়ালের সঙ্গে

জুড়ে। সে কর্কশ গলায় গর্জে উঠে বল্‌ল—সে ঘানি টানবে না। ব্যস, আর যাবে কোথায় সপাং-সপাং করে তার পিঠে চাবুক পড়তে লাগল। ফলে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সারাটি দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে সে ঘানি টেনে চল্‌ল।

হতচ্ছাড়া বাড়িওয়ালা দোতলার বারান্দা থেকে আমার বড় ভাইয়ার তকলিফ দেখে নীরবে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হওয়ার ঠিক আগে আমার বড় ভাইয়ার কাঁধ থেকে ঘানির জোয়াল নামানো হ'ল। তার মুখ দিয়ে তখন ফেনা বেরোবার উপক্রম হ'ল। চাবুকের ঘায়ে তার পিঠ ছড়ে গিয়ে বেশ কয়েক জায়গা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে খুন বেরোচ্ছে। বাড়িওয়ালা এসে নাকে কান্না জুড়ে দিল। সমবেদনা প্রকাশ করল নানাভাবে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'মনে কর বড় রকমের একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম তবে কি আর এতবড় অঘটন ঘটতে পারত?'

বাড়িওয়ালা চোখে-মুখে কৃত্রিম বিষাদের ছাপ এঁকে বিদায় নিলে চাকরানীটি এল। তার মুখেও কৃত্রিম বিষাদের ছায়া। বল্‌ল—'আহা রে! আমার মেহবুবকে এমন করে গরুপেটা করেছে! কলু বেটা এমন অমানুষ আগে জানা ছিল না তো! ওদিকে আমার মালকিন তোমার নসীবের কথা শুনে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন। এমন মারাত্মক ভুলের কথা উল্লেখ করে তিনি স্বামীর সঙ্গে রীতিমত কোমরবেঁধে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছেন।'

চাকরানী বিদায় নিলে আমার বড় ভাইয়ার কাছে এল তার বিয়ের সাক্ষী। তদের বিয়ের কবুলনামায় যে একমাত্র সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছিল, সে লোকটি এল। তার সঙ্গীন অবস্থা দেখে সে বহুভাবে অনুশোচনা প্রকাশ করল। তারপর বল্‌ল—'তুমি এক কাজ কর দোস্ত, নচ্ছার লেড়কিটিকে তালাক দাও। তারই জন্যই তোমার ওপর যত নির্যাতন নিপীড়ন হয়েছে।'

—'তালাক? তালাক দিতে হলে অর্থ ব্যয় হবে তা জোগাড় করাই আমার পক্ষে কঠিন সমস্যা।'

সাক্ষীটি চলে যাবার পর সে-চাকরানী আবার ভাল মানুষের মত মুখ করে আমার বড় ভাইয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'আমার মালকিন তোমার জন্য পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। তোমার মহব্বতে সে একেবারে পাগল হয়ে গেছে গো! তার কলিজাটি তোমার জন্য আঁকুপাকু করছে! আমার সবচেয়ে বড় ভয় তুমি যদি তাকে পিয়ার-মহব্বৎ করতে অস্বীকার কর তবে সে হয়ত আত্মহত্যাই করে বসবে। একটি বার তোমাকে কাছে না পেলে, তার যৌবনভরা দেহটির মূল্য যে এক কানাকড়িও নেই। একটিবার তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, চুম্বন করে মানবজীবন ধন্য করতে নিতান্ত আগ্রহী। আর আজ রাত্রে

তোমাকে শয্যাসঙ্গী করে মজা লুঠতে চায়। আমার কথা বিশ্বাস করতে বলছি না, ওপরের বারান্দার দিকে তাকালেই চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে।'

আমার বড় ভাইয়া বাকবুক যেন আহ্লাদে একেবারে গলে গেল। ওপরের বারান্দার দিকে চোখ ফেরাতেই বাড়িওয়ালার বিবি আচমকা সুরমা আঁকা চোখের বাণ মারল। আর করজোড়ে কাতর মিনতি জানাল। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, রাত্রে বাড়িওয়ালা থাকবে না। আর বুঝাল আমার এ-জান এ-কলিজা কেবলমাত্র তোমার ভোগের জন্যই সযত্নে রক্ষা করছি। তোমাকে আমার যৌবন-সুধা দান করতে না পারলে বেবাক মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

তার ক্ষোভ নিমেষে উবে গেল। চোখের ভাষায় জানিয়ে দিল। যাবে—অবশ্যই যাবে। আজ রাত্রিই হবে জীবনের প্রথম মধুরাত্রি। দেয়া-নেয়া পর্ব।

সারাদিন অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে আমার বড় ভাইয়া কাটাল। তার খুনে মাতন লাগল।

কিন্তু বাড়িওয়ালা ও তার বিবি যে নতুন ফাঁদ পাতার পরিকল্পনা করে চলেছে বোকা হাঁদাটি জানতেও পারল না।

রাত্রি গভীর হলে চাকরানীটি গুটিগুটি এসে তার দরওয়াজায় কড়া নাড়ল। সে দরওয়াজা খুলে বেরিয়ে গেল। চাকরানীর সঙ্গে পা টিপে টিপে ওপর তলায় গেল। বিবি তাকে বসতে দিয়ে বল্‌ল—'মেহবুব আমার! তোমার জন্য আমার কলিজা উথালি পাথালি করছে। তুমি আমার জান। আমার দিল্‌টি জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি শান্তিপানি ছিটিয়ে জ্বালা জুড়াও। নাও, সম্ভোগের মাধ্যমে আমাকে তৃপ্তি দাও, নিজে তৃপ্ত হও।'

আমার আহম্মক বড় ভাইয়া তো ভাবে একেবারে গদগদ হয়ে ওঠে। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করতে থাকে।

বাড়িওয়ালার বিবি আবেগ মিশ্রিত স্বরে বলে—'মেহবুব আমার! একটু অপেক্ষা কর। আগে খানাপিনা কর। তারপর সারারাত ধরে চলবে আমাদের পিয়ার মহব্বতের নেশা।' আমার বড় ভাইয়া আচমকা পায়ে কাঁটা ফুটে আহত ব্যক্তির মত আবার কুরশিতে বসে পড়ল। নিজের আচরণের জন্য যারপরনাই লজ্জিত হয়। সারারাত যাকে দলন, পেষণ আর সম্ভোগ করবে তাকে সামান্য আলিঙ্গন-চুম্বনের জন্য এমন উতলা হয়ে পড়েছে! তার মেহবুবা নিশ্চয়ই তাকে বুভুক্ষু ভিখারীর মত জ্ঞান করছে। ছিঃ তার কাছে কত ছোট হতে হ'ল!

এমন সময় বাড়িওয়ালা আচমকা ঘরে ঢুকল। তার পিছন পিছন ঢুকল দু'জন নিগ্রো গুণ্ডা। কোন কথা নেই, তারা ঘরে ঢুকেই আমার বড় ভাইয়াকে এলোপাথাড়ি কিল-চড়-লাথি মারতে লাগল। তারপর শুরু হ'ল চাবুকের কেরামতি। পিঠ কেটে খুন বেরোতে লাগল। সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সংজ্ঞা একটু ফিরতেই এবার তাকে নিয়ে কোতোয়ালের সামনে হাজির করল। তিনি সবকিছু শুনে দু'শঘা বেত লাগাবার হুকুম দিলেন। বেতের আঘাতে সারা গা দিয়ে খুন ঝরতে লাগল। এবার তার হুকুমে উটের পিছনে বেঁধে সারা নগর ঘোরানো হ'ল তার ক্ষত বিক্ষত দেহটিকে। উটটি এক সময় আচমকা লাফিয়ে ওঠায় সে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে। তখনই তার পায়ের হাড় ভেঙে যায়। সে ল্যাংড়া হয়ে পড়ে। কোতোয়াল কিছুদিনের জন্য তাকে নগর থেকে বের করেও দিয়েছিল। এখন আমার সঙ্গেই বাস করছে।'

আমার বড় ভাইয়া বাকবুক-এর কিস্‌সা শুনে খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ তো হেসে মাটিতে গড়াগড়ি যাবার উপক্রম হলেন।

নাপিতের দ্বিতীয় ভাইয়া অল-হাদ্দারের কিস্‌সা

খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ যখন আমার বড় ভাইয়ার বোকামির কথা শুনে হেসে মাটিতে গড়াগড়ি যাবার উপক্রম হলেন তখন আমি হাত কচলে নিবেদন করলাম—'জাঁহাপনা, আমার দ্বিতীয় ভাইয়া অল-হাদ্দার-এর কিস্‌সা শুনলে তো আপনি বোধ হয় মূর্চ্ছাই যাবেন। তার কাণ্ডকারখানার কথা সংক্ষেপে বলছি শুনুন—তার অল-হাদ্দার নামকরণের কারণ হচ্ছে, সে উটের গলার মত নিজের গলাটিকে একবার সামনের দিকে লম্বা করে বাড়িয়ে দিত আবার পরক্ষণেই টেনে পিছনের দিকে নিয়ে যেত। তার ভঙ্গিটি বাস্তবিকই ছিল খুবই বিচিত্র। সব মিলিয়ে তার চেহারা ছবি ছিল একেবারেই কদর্য। অকারণে সে লেড়কিদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে কত যে বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসত তার ইয়ত্তা নেই।

একদিন পথে এক বুড়ি তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—'বাছা, তোমাকে একটি বাৎ বলার জন্য ক'দিন ধরেই কলিজা উথালি পাথালি করছে। তবে আমার কথা রাখবে কিনা তা তোমার মর্জি।'

মুচকি হেসে হাদ্দার বল্‌ল—'ঠিক আছে, বলই না শুনি কি বাৎ বলতে চাইছ? সব শুনে বলব, তোমার কথা রাখতে পারব কিনা।'

—'বাছা, তবে একটি শর্ত আছে। আমার বাৎ শুনে আনাড়ীর মত কোন বাৎ বলবে না বা কোন প্রশ্ন করে বসবে না। শোন, তোমাকে আমি চমৎকার একটি জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি একবার সেখানে গেলে তোমার দিল্‌ আর সেখান থেকে আসতে চাইবে না। পাহাড়ী নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। ডাবের পানির মত স্বচ্ছ তার পানি। চারদিকে ফুল আর ফলের বাহার—বিচিত্র সমারোহ। সরাব বেরিয়ে আসছে ঝর্ণা দিয়ে। আর বেহেস্তের পরীর মত খুবসুরৎ যুবতীদের মেলা। দেখামাত্র

তারা তোমাকে ঘিরে ধরবে। তোমাকে চুম্বন করবে, জড়িয়ে ধরবে আর সোহাগে সোহাগে তোমার দিল্ ভরিয়ে তুলবে। হুরী পরীদের দেশে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু বাছা, একটি শর্ত তোমাকে পালন করতেই হবে।

—'দুনিয়ায় এত আদমি থাকতে তুমি আমাকেই বা বাছলে কেন?'

—'বেটা, আগেই তো সাফাই গেয়ে রেখেছি অকারণে প্রশ্নের অবতারণা করবে না। কৌতূহল জাগলে তাকে জোর করে দমন কর। কোন প্রশ্ন নয়।'

আর কোন কথা না বলে বুড়ি হাদ্দার'কে নিয়ে গেল সুরম্য এক অট্টালিকায়। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই হাদ্দার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, চারটি খুবসুরৎ যুবতী বিভোর হয়ে গান গাইছে।

নবাগত হাদ্দার'কে দেখে চারজনের মধ্যে যার সুরৎ সবচেয়ে বেশী সে উঠে এসে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল। গালিচা পেতে বসতে দিল। সরাব এনে দিল। হাদ্দার পান করল। আর এক পেয়ালা নিয়ে এসে দিল। হাদ্দার সরাবের পেয়ালাটি ঠোঁটের কাছে নিতেই লেড়কিটি তার গালে আচমকা এক চড় বসিয়ে দিল।

হাদ্দার রেগেমেগে চলে আসার উদ্যোগ নেয়। বুড়ি চোখের ভাষায় তাকে উঠতে বারণ করে।

হাদ্দার শপথ করেছিল, তাই বাধ্য হয়ে বসে পড়ল। যুবতীটি আবার তাকে বার বার কিল-চড়-থাপ্পড় মারতে লাগল।

হাদ্দার মুখ বুজে সব বরদাস্ত করল। টু-শব্দটিও করল না। কারণ, সে যে বুড়ির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এবার যুবতীটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। হাদ্দার-এর কোর্তা পাতলুন সব খুলে ফেল্‌ল। এবার সে একেবারে উলঙ্গ।

এবার আর একটি যুবতী উঠে এসে তার দাড়ি ধরে মৃদু এক টান দিয়ে বল্‌ল—'মেহবুব, আমি দাড়ির খোঁচা সহ্য করতে পারি না। দাড়ি কামিয়ে এসো। পাশের ঘরে সব ব্যবস্থা রয়েছে।'

হাদ্দার বুড়িটির সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে দাড়ি-গোঁফ এমন কি ভুরু পর্যন্ত কামিয়ে এল।

যুবতীদের একজন তার সর্বাঙ্গে লাল আর সাদা রঙ দিয়ে ডোরা কেটে দিল। মুখও বাদ দিল না। এবার তার দিকে তাকিয়ে যুবতীরা সবাই সমস্বরে হো হো করে হেসে উঠল।

প্রথম যুবতীটি আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌ল—'তোমার রূপে আমি মুগ্ধ। একটু নাচো তো দেখি কেমন পারো।'

হাদ্দার বুঝতে পারল—তার সঙ্গে রসিকতা করছে। মুখ ব্যাজার করে সে পিছন ফিরে দাঁড়াল। যুবতীটি তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে এবার বলল—'মেহবুব আমার, বিশ্বাস কর, তামাশা করছি না।
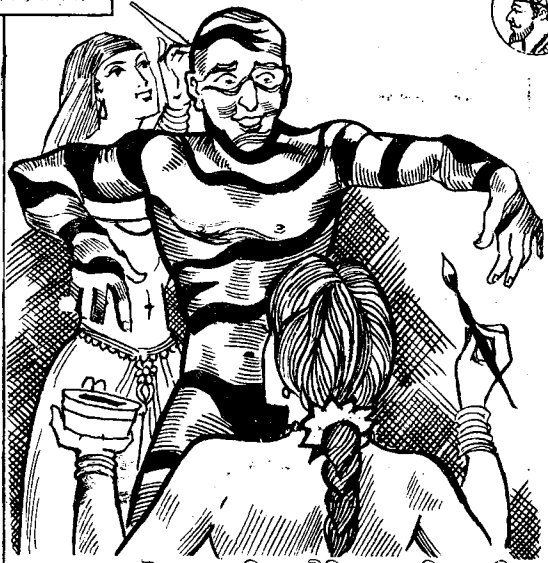
তোমার রূপ-যৌবন আমার দিল্‌কে রীতিমত নাড়া দিয়েছে। বিশ্বাস রাখ, আমি মুগ্ধ। একটু নাচ মেহেবুব। তারপর আমরা মহব্বতের খেলায় মাতব।'

হাদ্দার এবার উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিল। অনভ্যস্থ হাত-পা ছোড়ার ফলে ফুলদানি, আতরদানি, সরাবের পেয়ালা সব দুমদাম পড়ে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। যুবতীরা তো একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরে হেসেই অস্থির।

এবার প্রথম যুবতীটি নিজের গায়ের পোশাক এক এক করে খুলে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল, আর হাদ্দার-এর মধ্যে কামোন্মাদনা জাগিয়ে তোলার বিচিত্র সব অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল।

হাদ্দার-এর সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগল। শিরায় শিরায় খুনের গতি বৃদ্ধি পেল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। না, আর পারছে না সে। খুনে তার মাতন লেগে গেছে।

বুড়ি বল্‌ল—'বাছা, এখানকার প্রচলিত এক রীতির কথা তোমাকে বলছি। লেড়কিটি ছুটে পালাতে চাইবে, তোমাকে ধরে ফেলতে হবে তাকে। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে তাকে ধরে ফেলা। যদি ধরতে পার তবেই সে তোমার শয্যা-সঙ্গিনী হবে।'

কিন্তু লেড়কিটি যখন এঘর-ওঘর দৌড়ে বেড়াতে লাগল তখন বহু চেষ্টা করেও হাদ্দার তাকে ধরতে পারল না।

ভোরের পূর্বাভাস পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একত্রিশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার যথা সময়ে অন্দরমহলে বেগমের ঘরে

এলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সে-দর্জি চীনদেশের সুলতানের কাছে তার কিস্‌সা বলে চল্‌ল—জাঁহাপনা, বাগদাদের সুলতানের কাছে নাপিতটি তার দ্বিতীয় ভাইয়া অল-হাদ্দা র-এর বোকামির কথা বলতে লাগল। হাদ্দার তখন লেড়কিটির পিছন পিছন হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই সে তাকে ধরতে পারছে না। ছুটতে ছুটতে লেড়কিটি এক সময় একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। হাদ্দার ভাবে, এবার আর তাকে আটকায় কে? লেড়কিটিকে অবশ্যই ধরে ফেলবে। কিন্তু নসীবের ফের! ঘরের ভেতরটি ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাতটিকেও ভাল করে দেখা যায় না, লেড়কিটিকে ধরবে কি করে? বাধ্য হয়ে সে অন্ধের মত হাতাতে লাগল। অন্ধকারে কখন যে সে বারান্দায় এসে পড়েছে, বুঝতেই পারে নি। তখনই ঘটল বিশ্রী ব্যাপারটি। বারান্দার কার্ণিশে পা পড়ামাত্র একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচে রাস্তার ওপরে। পাশেই একটি মুচি তাবুর তলায় বসে জুতো সেলাই করে। মুচিটি দেখল, বিচিত্র এক লোক, দাড়ি-গোঁফ কামানো। এমন কি ভুরু পর্যন্ত তার নেই। আর মুখ ভর্তি লাল-সাদা ডোরাকাটা। আচমকা এসে পড়েছে তার দেকানের একেবারে সামনে। ভাবল, কোন না কোন অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। মুচির দশাসই চেহারা। সে আমার ভাইয়া হাদ্দারকে পিঠ মোড়া করে বেঁধে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে গেল।

কোতোয়ালের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুচি এবার বল্‌ল—'হুজুর, শয়তানটি বোধ হয় চুপি চুপি উজির সাহেবের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল।' ব্যস, বেশ করে উত্তম মধ্যম দেওয়া হ'ল তাকে। একেবারে হাড়গোড় ভেঙে দেবার জোগাড় করল।

কোতোয়ালের নির্দেশে হাদ্দারকে নগর থেকে বের করে দেওয়া হ'ল। আমি লোকমুখে তার দুরবস্থা ও বহুভাবে হেনস্থা হওয়ার খবর পেয়ে ছুটে যাই। গোপনে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসি। লুকিয়ে রাখি যাতে কাক পক্ষীও টের না পায়। বরাত গুণে আজ সে পঙ্গু। আমার ওপরে নিজের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করছে।

জাঁহাপনা, আমার দ্বিতীয় ভাইয়ার জীবনকথা তো শুনলেন এবার আমার তৃতীয় ভাইয়ার কথা বলছি।

বাক্‌বকের কিস্‌সা

নাপিত এবার তার তৃতীয় ভাইয়া বাকবক-এর কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আমার তৃতীয় ভাইয়া বাগদাদ নগরের ভিখারীদের দলের সর্দার। সে একেবারেই অন্ধ। মোটেই চোখে দেখে না। একদিন সে এক আমীরের বাড়ির দরজায় ভিক্ষার জন্য হাজির হ'ল।

তার ভিক্ষা চাওয়ার কৌশল ভারি চমৎকার। মুখে বলবে না, 'ভিক্ষা দাও গো'। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র বলবে—'কই গো, কেউ আছো নাকি?'

বাড়ির লোক দরজা খোলার আগে জিজ্ঞেস করে—'কে?' সে নির্বাক। কারণ দরজা খোলার আগেই অনেকে বলে—'এখন হবে না গো, হাত খালি নেই। অন্য জায়গায় দেখ'। দরজা খুলে অন্ধ লোককে চোখের সামনে দেখলে মায়া হতে বাধ্য। আর অন্য কেউ হলে যা দিত তার চেয়ে বেশীই তাকে দেয়। যাকে বলে করুণার-ব্যাপার-স্যাপার।

একদিন হ'ল কি, সে এক বাড়ির দরজায় গিয়ে হাঁক দিল 'কই গো, কেউ আছো নাকি?'

পরমুহূর্তেই ওপরতলা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'কে? কে গো?'

আমার ভাইয়া বাক্‌বক মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু বাদে একজন কাশতে কাশতে দরজা খুলতে এল—'কে? দরজায় কে? কথা বলছে না কেন? কে গো?' দরজা খুলে দিল।

দরওয়াজা খোলার শব্দ শুনে বাক্‌বক কাতর স্বরে বল্‌ল—'আমি অন্ধ মালিক। এক মুঠো ভিক্ষা দিয়ে জানটা বাঁচান।'

বাড়ির লোকটি বিচিত্র এক কাণ্ড করল। তার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে সোজা তিন তলার ছাদের ওপর তুল্‌ল। অন্ধ বাক্‌বক ভাবল, লোকটি খুবই দয়ালু। সামান্য কিছু ভিক্ষা না দিয়ে পেট পুরে খাইয়ে দেবে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারল। লোকটি রীতিমত ধমকাতে লাগল—'আমি চিৎকার করে গলা ফাটালাম কে? কে ওখানে? তখন সাড়া দিলে না কেন? আমাকে মিছে তিন তলা থেকে নিচে নামালে কেন? হারামি কাঁহিকার! তোমাকে আমি তিন তলা থেকে ধাক্কে নিচে ফেলে দেব!' পরমুহূর্তে বল্‌ল—'ঠিক আছে, আজ ছেড়ে দিলাম। ভুলেও আর কোনদিন এরকম করবে না, খেয়াল থাকে যেন। যাও পালাও।'

বাক্‌বক সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় লাঠি হড়কে পড়ে গেল। গড়িয়ে একেবারে নীচে চলে এল। চোট পেয়েছে। কয়েক জায়গা ছড়েও গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা।

যন্ত্রণাকাতর শরীরে পথে নামল। দু'জন অন্ধ সঙ্গী জুটে গেল। তারা জিজ্ঞাসা করল—'কি গো সর্দার, গোঙাচ্ছ মনে হচ্ছে! কি ব্যাপার, কেউ মারধোর করল নাকি?'

তার কথার উত্তরে বাক্‌বক নিজের নসীবের কথা বল্‌ল। তারা তাকে সেদিনের মত ঘরে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিল। তাদের একজন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে রাজি

হ'ল।

তারা যখন এরকম পরিকল্পনা করছে ঠিক তখনই এক চোর সেখানে হাজির হ'ল। সে অন্ধদের পিছু নিল।

অন্ধ-বন্ধুটি বাক্‌বককে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য ঘরে ঢুকলে চোরটিও বিড়ালের মত পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের পাটাতন থেকে একটি শিকে ঝুলছে দেখে চোরটি সেটি ধরে পাটাতনের ওপরে উঠে গেল।

বাক্‌বক ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা টাকার থলি বের করে তা থেকে এক দিরহাম অন্ধ বন্ধুটিকে দিল রুটি-তরকা কিনে আনার জন্য। বাকি দিরহাম গুণে দেখল থলিতে দশ হাজার দিরহাম রয়েছে। এগুলো তার সারাজীবনে ভিক্ষা করে সঞ্চিত অর্থ।

বাক্‌বক-এর অন্ধ-বন্ধুটি রুটি-তরকা নিয়ে এলে ভাগ করে খেতে লাগল। এমন সময় চোরটি পাটাতনের ওপর থেকে সন্তর্পণে নেমে এল। তাদের পাশে বসে রুটিতে ভাগ বসাল। অন্ধ দু'জন তার কারসাজির কথা জানতেও পারল না।

আমার ভাইয়া বাক্‌বক-এর কান খুবই পরিষ্কার। সে চোয়াল নাড়ার শব্দ শুনে বুঝতে পারল তৃতীয় আদমি সংগোপনে রুটি-তরকা খেয়ে চলেছে। সে আচমকা চিৎকার করে উঠল—'চোর—চোর—চোর!' তার সঙ্গে তার অন্ধ-বন্ধুটি গলা মিলিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল।

চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এল।

বাক্‌বক চিৎকার করতে করতে তার হাত দুটোকে এদিক-ওদিক চালাতে লাগল। চোরের হাতের সঙ্গে তার হাতটি ঠেকে যাওয়া মাত্র সে খপ্ করে ধরে ফেল্‌ল। এবার নিজের পথচলার লাঠি দিয়ে তাকে দমাদম পিটতে লাগল।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীদের আসতে দেখে চোরটি চোখ বন্ধ করে বসে পড়ল। তাদের বল্‌ল, আমরা সবাই অন্ধ। এক সঙ্গে ভিক্ষা করি। এতদিন ভিক্ষা করে আমার ভাগের দশ হাজার দিরহাম জমেছে। আমার প্রাপ্য আজ বুঝে নিতে এসেছি। এরা আমাকে দিরহামগুলি তো দিচ্ছেই না, উপরন্তু চোর চোর বলে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জমা করছে। দোস্ত, তোমরা যখন চলেই এসেছ তখন আমাকে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে চল। সেখানেই আমাদের বিচার হবে। চোরের কথা শুনে আমার ভাইয়া বাকবক-এর তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম।

তারা সবাই কোতোয়ালের শরণাপন্ন হ'ল। দিরহাম-এর থলিটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করল।

চোর কোতোয়ালের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করল। সে সঙ্গে দাবী করল তার প্রাপ্য দশ হাজার দিরহাম।

বাক্‌বক প্রতিবাদ করল। সে বল্‌ল—'হুজুর। লোকটি চোর। আমাদের সঙ্গে তার কোনদিন সম্পর্ক ছিল না, আজও নেই। দিরহাম-এর ভাগ সে কি করে প্রত্যাশা করে? কোতোয়াল পড়লেন মহাসমস্যায়। কি ভাবে ঘটনাটির নিষ্পত্তি করবেন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।

কোতোয়ালের সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে গিয়ে চোরটি বল্‌ল—'হুজুর, আচ্ছা করে ঘা কতক দিন তবেই দেখবেন বাছাধনরা সত্যি কথা বলতে পথ পাবে না।'

পরামর্শটি কোতোয়ালের খুবই মনে ধরল।

কোতোয়ালের নির্দেশে এক সিপাহী চাবুক হাতে পিটুনি শুরু করার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

চোরটি বল্‌ল—'হুজুর, আমাকে দিয়েই চাবুকের ব্যবহার শুরু করুন।' বার কয়েক চাবুকের ঘা-খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে ফেল্‌ল। আসলে সে ভুলেই গিয়েছিল যে, সে অন্ধের অভিনয় করছে।

ব্যাপার দেখে কোতোয়াল তো বিস্ময়ে হতবাক্। চোরটি এবার বল্‌ল—'হুজুর, আমারা কেউ অন্ধ নই। ভিক্ষে করার জন্য আমরা এটিকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করি। বাকী তিনজনও আমারই মত। আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। চাবুক চালালেই সব কিছু ফয়সালা হয়ে যাবে। খালি পয়সা রোজগারই নয় ফাউ হিসেবেও এতে কিছু পাওয়া যায়।'

—'ফাউ? সে কী হে, এতে আবার ফাউয়ের ব্যাপার কি থাকতে পারে, বুঝিয়ে বল তো?'

—'অন্ধরা বাড়ির ভেতরে চলে গেলেও কেউ কিছু মনে করে না। এদের দ্বারা বাড়ির জনানাদের আব্রু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। অন্দরমহলে ঢুকে আমরা চোখ খুলে দিলে মেয়েরা খুবই অবাক হয়। সারা জীবন যারা পর পুরুষের মুখ দেখতে পায় নি তারা সঙ্গলাভে খুশী হয়। আর সুখ ছাড়া ভিক্ষার মাত্রাও যায় বেড়ে।'

এবার কোতোয়ালের হুকুমে বাক্‌বক আর তার সঙ্গীর পিঠে সপাং সপাং করে চাবুক পড়তে লাগল। কিন্তু কিছুতেই চোখ মেলে না তারা। কোতোয়াল ভাবলেন—হারামজাদারা বাস্তু ঘুঘু, পয়লা নম্বরের শয়তান। বল্লেন—'জোরসে চাবুক চালাও।' এবার তারা সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তবু চাবুক চালানো অব্যাহত রইল। এবার সিপাহীরা তাদের চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে শহরের বাইরে ফেলে দিয়ে এল।

কোতোয়াল এবার থলে থেকে তিন হাজার দিরহাম দিয়ে বল্লেন—'পালাও এখান থেকে। বাকি দিরহাম তাদের দু'জনের জন্য রইল। চোর হাতে স্বর্গ পেল। খুশি হয়ে নাচতে নাচতে বিদায় নিল। কোতোয়াল বাকি দিরহাম নিজের জেবে পুরলেন।

আমি ভাইয়া বাক্‌বক-এর দুরবস্থার কথা জানতে পেরে তাকে খুঁজে বের করি। নিজের কাছে নিয়ে আসি। সেবাযত্নের মধ্য দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলি। এখন আমিই তার খানা-কাপড় দেই। ভিক্ষে করতে দিই না। জাঁহাপনা, আপনি হয়ত এবার আমার মহত্বের কথা আর অস্বীকার করতে পারবেন না।

খলিফা খুশী হয়ে এক শ' দিনার পুরস্কার দিয়ে আমাকে বিদায় দিতে চাইলেন।

আমি সবিনয় নিবেদন রাখলাম—'জাঁহাপনা, এখনও তো আমার তিন ভাইয়ার জীবনকাহিনী শোনার বাকি আছে। শুনবেন না?'

খলিফা অল-মুসতানসির মুচকি হেসে বল্লেন—'বল। তোমার বাকি ভাইয়াদের কিস্‌সা, আমি শুনব।'

অল-কুজের কিস্‌সা

খলিফা অল-মুসতানসিরের সম্মতি পেয়ে আমি আমার চতুর্থ ভাইয়া অল-কুজ-এর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্লাম—'জাঁহাপনা, আমার এ-ভাইয়ার পুরো নাম খুশবান অল-কুজ। তার নামের অর্থ হ'ল কোন কিছু দিয়ে কাঁসার কুঁজো ঠুকলে যে আওয়াজ উত্থিত হয়, ঠিক তা। সে ছিল এক কষাই। বাগদাদে ছিল তার বেশ বড়সড় কারবার। তার দোকানের মত ভাল গোস্ত তামাম বাগদাদ নগর ঢুঁড়ে এলেও কোথাও মিলত না। তাই সহজেই সে দিনারের পাহাড় বানিয়ে ফেল্‌ল। কিন্তু জাঁহাপনা, বিত্ত-সম্পদ তো সবার নসীবে চিরদিন টেকে না।

এক সকালে পাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা এক বুড়ো অল-কুজ-এর দোকান থেকে কিছু গোস্ত খরিদ করল। ঝকঝকে চকচকে রুপোর দিনারে দাম মিটিয়ে বিদায় নিল। তার সে দিনারগুলোকে সে অন্য একটি থলির মধ্যে আলাদা করে রেখে দিল।

এবার থেকে বুড়োটি রোজই কিছু করে গোস্ত কিনে আর চকচকে রুপোর দিনারে দাম মিটায়। অল-কুজ সেগুলোকে আলাদা থলেটিতে জমা করতে থাকে। ভাবল, আরও কিছু দিনার জমাতে পারলে এক জোড়া লড়াকু ভেড়া খরিদ করবে। ভেড়ার লড়াই দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে।

এক সকালে দোকানে খোদ্দেরের চাপ একটু সামলে সে বুড়োর দেওয়া দিনারের থলেটা খুল্‌ল। ভাবল, গুণে দেখবে, কত জমল। থলে হাতে নিতেই তার চক্ষু চড়কগাছ। থলে ফাঁকা। দিনারের নামগন্ধও নেই। সে আপন মনে বলে উঠল—'হায় আল্লাহ! এ কী ভুতুড়ে কাণ্ড!' অন্য কারবারীদের কাছে কপাল চাপড়ে তাজ্জব কাণ্ডটির কথা বল্‌ল। কেউ-ই তার কথা বিশ্বাস করল না। আষাঢ়ে গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দিল।

তারপর দিন বুড়ো যথারীতি গোস্ত খরিদ করতে এল। ব্যস, আর যাবে কোথায়। অল-কুজ এক লাফে গদি থেকে নেমে বুড়োকে পিঠ মোড়া করে বেঁধে ফেল্‌ল। এবার তার দাড়ি-গোঁফ কামাতে লেগে গেল। সে সঙ্গে লাথি-কিল-চড় তো ফাউ। বুড়ো গরুচোরের মত মুখবুজে সব সহ্য করল।

বুড়ো কোনরকম চিৎকার চেঁচামেচি না করে কেবল অনুচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল—'আরে করছ কি! আমাকে ছেড়ে দাও।'

অল-কুজ তাকে উত্তম মধ্যম দেয় আর বলে—'এখনই হয়েছে কি, মেরে তোমার মেরুদণ্ড গুঁড়ো করে ছাড়ব যাদুকর।'

বুড়ো বলে—'কী সব ঝুটমুট কথা বলছ! তুমি আমাকে ভেড়ার গোস্তের নাম করে দিনের পর দিন মানুষের গোস্ত দিয়ে ঠকিয়েছ। আর এখন উল্টে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ, আমি যাদুকর, জুয়াচোর, ঠগ্‌!'

সেখানে মজা দেখার জন্য যারা জড়ো হয়েছিল সবাই তো তাদের বচসা শুনে অবাক। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—'সে কী কথা! এতকাল আমাদের মানুষের গোস্ত খাইয়েছে!'

বুড়ো রীতিমত জোর গলায়ই বলে উঠল—'হ্যাঁ—হ্যাঁ, মানুষের গোস্ত। ভেড়ার গোস্তের নাম করে মানুষের গোস্ত বিক্রি করে প্রতারণা করে খদ্দেরদের সঙ্গে।'

অল-কুজ যত চিৎকার করে বলে, ঝুট বাৎ। বুড়ো তার চেয়ে জোরে গলা চড়িয়ে বলে—'না, ঝুট নয়, আমার বাৎ-ই সাচ। মানুষের মাংসই শয়তানটা বিক্রি করে।'

বুড়ো সবাইকে নিয়ে জবাইয়ের ঘরে গেল যেখানে ভেড়া জবাই করে, গোস্ত টুকরো টুকরো করে ঝুলিয়ে রেখেছে। বুড়ো ঘরের কোণের দিকে তর্জনি নির্দেশ করে বল্‌ল—'আপনারা কি বলতে চান ওগুলো ভেড়ার মুণ্ডু? আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওগুলো মানুষের মুণ্ডু।'

সবাই মুণ্ডু তিনটির দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠে বল্‌ল—'হায় আল্লা! এ কী দেখছি! এ কী পৈশাচিক কাণ্ড!'

ব্যস, আর দেরী নয় উপস্থিত সবাই বারুদের স্তূপের মত এক সঙ্গে জ্বলে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়ল অল-কুজ-এর ওপরে। কিল-চড়-লাথি সমানে চালাতে লাগল। আমার নিরপরাধ ভাইয়া যতই চিৎকার করে বলে—'বুড়োর কথা তোমরা বিশ্বাস কোরো না। ও যাদুকর। যাদুবলে ভেড়ার মুণ্ডুকে মানুষের মুণ্ডু বানিয়েছে। কিন্তু কে, কার বাৎ শোনে। বরং কিল-চড়ের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল।

সবাই মিলে আমার ভাইয়াকে পিটিয়ে আধ-মরা করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল কোতোয়ালের কাছে। সব কিছু শুনে কোতোয়াল তাকে তিন শ' ঘা বেত বরাদ্দ করলেন। তারপর ঘাড় ধরে মুলুক থেকে তাড়িয়ে দিল। তার স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি ছিল সবই বাজেয়াপ্ত করল। সবই নসীবের ফের। বাজারে লোকগুলো যখন তাকে মারধোর করছিল তখন তার বাঁ-চোখটি কানা হয়ে যায়।

সে অনন্যোপায় হয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে নিজের মুলুক ছেড়ে অন্য মুলুকে চলে গেল।

ভিন দেশে গিয়ে সে এবার এক মোড়ের মাথায় জুতো সেলাই করতে বসে যায়।

একদিন সে আপন মনে জুতো মেরামত করছে, এমন সময় একদল সিপাহী চিৎকার করতে করতে এগোতে লাগল—'সব হট যাও। রাস্তা খালি কর। হট যাও।'

অল-কুজ ব্যস্ত হয়ে তার জুতো মেরামত করার সরঞ্জাম সরাতে না সরাতে ঘোড়ায় চেপে দেশের সুলতান সে-পথে এলেন।

এক চোখে ঠুলি পরা অল-কুজকে দেখেই সুলতান ঘোড়া দাঁড় করালেন। চিৎকার করে উঠলেন—'সব রুখ যাও!'

কানা লোক অযাত্রা। এমন অশুভ লক্ষণ দেখে তাঁর আর শিকারে যাওয়া হ'ল না।

সুলতান গর্জে উঠলেন—'অপয়া লোকটি আমার যাত্রায় বাধা দিয়েছে। উচিত শিক্ষা দাও একে।'

সুলতানের আদেশ পাওয়া মাত্র তার দেহরক্ষীরা অল-কুজ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেধড়ক মারধোর করে গলা ধাক্কা দিয়ে পথের ধারে ফেলে দিল।

সুলতান শিকারে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে রাগে গস্‌গস্ করতে করতে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

অল-কুজ যন্ত্রণাকাতর দেহে কোনরকমে তার ডেরায় ফিরে এল। সে তার অপরাধ কিছু ভেবে পেল না। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল সুলতান কানা লোককে একদম বরদাস্ত করতে পারে না। তাই সিপাহীদের ঢালাও হুকুম দেওয়া আছে, এক চোখ খুইয়েছে এরকম কোন লোককে দেখামাত্র কোতল করবে।

অল-কুজ ভাবল কোতল করার আদেশই যদি সুলতান দিয়ে থাকেন তবে সিপাহীরা তাকে রেহাই দিল কেন? নিজেই এর উত্তর বের করে ফেল্‌ল। মারধোর খেয়ে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লে সিপাহীরা নির্ঘাৎ ভেবেছিল সে মরেই গেছে। মড়াকে আর তো ফাঁসি দেওয়া বা শূলে চড়ানো যায় না। তাই তার জানটি টিকে গেল।

অল-কুজ এবার এমন এক মুলুকে হাজির হ'ল যেখানে কোন সুলতানের অস্তিত্ব নেই।

ক' দিন নিরাপদেই কাটল। এক বিকালে অল-কুজ পাহাড়ের গা দিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে পড়ল। ভাবল, সৈন্য আসছে। ভয়ে তার কলিজা শুকিয়ে গেল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। পথের ধারে ভাঙাচোরা একটা বাড়ি দেখতে পেল। পোড়ো বাড়ি। আর কথা নেই সোজা বাড়িটির ভেতর ঢুকে গেল। হ্যাঁ, তার ধারণা অভ্রান্তই বটে। বাড়িটিতে কেউ-ই থাকে না। সে একটি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে থাকে। এমন সময় ঘটে গেল একেবারেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড। অতির্কিতে দু'জন গাট্টাগোট্টা লোক পিছন দিক থেকে খপ্ করে তার ঘাড় ধরে ফেল্‌ল। তারা সমস্বরে গর্জে উঠল—'হতচ্ছাড়া শয়তান কোথাকার! তিন-তিনটে দিন আমরা তোমার

খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি! আর তুমি আমাদের নিয়ে লুকোচুরি খেলছ!' কথা বলতে বলতে তারা তাকে বেধড়ক পিটতে শুরু করল। প্রায় আধমরা করে তাকে নিয়ে গেল কোতোয়ালের দরবারে।

অল-কুজ চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তার নসীবের কথা, কোতোয়ালের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল। তিনি তার কথা বিশ্বাস করলেন না। তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে ভেবে সিপাহীদের হুকুম দিলেন 'উলঙ্গ করে চাবুক মারো মিথ্যাবাদী কানাটিকে।'

তার জোব্বা আর পাতলুন খুলতেই সিপাহীদের চোখের সামনে ভেসে উঠল, সারা গায়ে চাবুকের কালসিটেপড়া দাগ।

কোতোয়াল সবিস্ময়ে বল্লেন—'এসব কি হে! চুরি করে উপহার পেয়েছ বুঝি? কোথায়? কোথায় ধরা পড়েছিলে, সত্যি করে বল!'

অল-কুজ কেঁদেকেটে বল্ল—'হুজুর, চুরি আমি কোনোদিনই করিনি। তবে চাবুক খেয়েছি বহুবার। কেন এবং কার কার কাছ থেকে এসব উপহার পেয়েছি সবই আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছি আপনি হয়ত খেয়াল করেন নি।'

—'চুপ কর হারামজাদা মিথ্যাবাদী কাঁহিকার। সারা গায়ে চাবুকের দাগ জ্বল জ্বল করছে! আর বলে কিনা চুরি করে নি। মিথ্যা কথা বলার আর জায়গা পাও নি। চালাও চাবুক। চাবুকের ঘায়ে খুন বের করে তবে ছাড়ান দেবে।'

সিপাহী এবার শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে গুণে গুণে এক শ' ঘা চাবুক মারল। কেটে খুন ঝরল কয়েক জায়গায়। এবার উটের পিছনে আচ্ছা করে বেঁধে নগরের পথে পথে ঘোরানো হ'ল।

আমার ভাইয়া অল-কুজ শয্যা নিল। তার দুর্গতির কথা শুনে আমি ছুটে গেলাম। এক রাত্রে চুপিচুপি তাকে বাগদাদ নগরে নিয়ে এলাম। হেকিম ডেকে দেখালাম। তিনি দাওয়াই দিলেন। দীর্ঘদিন ইলাজের পর সে মোটামুটি সুস্থ হ'ল। তবে সে প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। একই আম্মার পেটে জন্ম। তাকে তো আর আমার মত উদার, সদাশয় ও পরদুঃখকাতর আদমির পক্ষে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তার যাবতীয় দায় দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিলাম।

অল-আসারের কিস্সা

খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ নাপিতের চতুর্থ ভাইয়া অল-কুজ-এর কিস্সা শুনে বিস্ময়বোধ করলেন।

নাপিত এবার বল্ল—'হুজুর, আপনাকে আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেই হবে। এবার আপনাকে আমার পঞ্চম ভাইয়া অল-আসারের কিস্সা শোনাতে চাই। তবে কথা দিচ্ছি, আমি সাধ্যমত সংক্ষেপে আমার কিস্সা শেষ করব।'

খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ মুচকি হেসে বল্লেন—'তুমি যখন অল-আসার-এর কিস্সা না শুনিয়ে ছাড়বেই না তবে তাড়াতাড়ি শুরু কর। তবে খেয়াল থাকে যেন সংক্ষেপে তোমার কিস্সা শেষ করবে।'

—'জী হুজুর। অল-আসার-এর শরীরের তুলনায় পেটটি ছিল ইয়া বড়। মনে করতে পারেন ছোটখাটো একটি মাটির জালা তার পেটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বেশী নড়াচড়া করলে যেন জালাটি খসে পড়ে যাবে এমন ভাব নিয়ে সে ধীর-মন্থর গতিতে পথ চলত। প্রায় সারাদিন চোখ বন্ধ করে চৌকির ওপর পড়ে থাকত। আমাদের আব্বা যে পরিমাণ নগদ অর্থ রেখে গিয়েছিলেন তা ভাগ বাটোয়ারা করে প্রত্যেকে মাথাপিছু একশ' দিরহাম পাই। অনেক ভেবে অল-আসার কাঁচের বাসনপত্রের কারবার শুরু করল। গলির মোড়ে পসরা সাজিয়ে বসল। একদিন দোকানে বসে সে ভাবতে লাগল এক শ' দিরহাম দিয়ে মালগুলি খরিদ করেছি। কম করেও দু' শ' দিরহাম তো বিক্রি হবেই। তখন পুঁজি হবে দু'শ' দিরহাম। বিক্রি করব চার শ' দিরহামে! এভাবে মূলধন বেড়ে যখন মোটা অঙ্কে দাঁড়াবে তখন কাঁচের কারবার ছেড়ে দিয়ে আতরের কারবারে নেমে পড়বে। সে এর-ওর মুখে শুনেছে এক দিরহামের আতর নাকি পাঁচ দিরহামে বিক্রি হয়। আর এ-ও ভাবল তখন আর গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বাসনপত্রের দোকানে যাঁড়ের মত চেঁচাবে না। 'আতর নেবে গো......আতর নেবে গো।' একটি বড়সড় ঘর নিয়ে রীতিমত দোকান খুলে বসবে। তার ভাবনা কিন্তু এখানেই থমকে গেল না। মোটা লাভে কিছুদিন আতর বিক্রি করে মূলধন এক সময় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে যখন সে অনায়াসে একটি হাতী কিনে ফেলতে পারবে। সে কিনবেও তা-ই। তারপর দেখনাই একটি ইমারত কেনার ইচ্ছা আছে। দারোয়ান, পরিচারক ও পরিচারিকারা সর্বদা তার হুকুম তামিল করার জন্য অবশ্যই সতর্ক থাকবে। পরিচারকদের কেউ থাকবে অন্দরমহলে আবার কেউ বা বাইরের কাজকর্মে লিপ্ত থাকবে। দেশ-বিদেশ থেকে খুবসুরৎ সব বাঈজী এসে নাচবে। বসবে ওস্তাদী গানের আসর। আর শাদী ? ও হো, উজিরের খুবসুরৎ লেড়কি ছাড়া আমাত্য টামাত্যের লেড়কির তো প্রশ্নই ওঠে না। কেনই বা রাজি হবে। ধনদৌলতের দিক থেকে সে যেমন আমীর বাদশার তুল্য বিবেচিত হবে তেমনি ঝকঝকে চকচকে পোশাকেও সেজেগুজে থাকবে। এমন কি ঘোড়ার জিনেও হীরে-মুক্তো, মণি-মাণিক্য ব্যবহার করবে সে। আর নগরীর সেরা মণিকারকে দিয়ে বানাবে গহনাপত্র যা দেখে কেউ-ই চোখ ফেরাতে পারবে না। মাঝে-মধ্যে ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত হয়ে বেরোবে নগর পরিক্রমায়। যাতায়াত করবে উজিরের সমতুল্য ব্যক্তিদের প্রাসাদে। তারা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে সুসজ্জিত কামরায় নিয়ে বসাবে।

সমাদর করবে সাধ্যাতীত।

সে কাকে শাদী করবে, কবে শাদী করে বিবিকে ঘরে আনবে তা সে নিজেই নির্ধারণ করবে। লেড়কির আব্বারা তাকে কন্যাদান করার জন্য ঘুর ঘুর করবে। সে পাত্রীর আব্বাকে সাফ কথা জানিয়ে দেবে, শাদীর যাবতীয় খরচ খরচা সে-ই করবে। ঝলমলে পোশাক আর হীরে-জহরতের সাজে তার বিবি সলজ্জ মুখটিকে মখমলের চেয়েও মূল্যবান ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখবে। রূপসী যুবতীর রূপের আভায় চোখ ঝলসে দেবে। আমার বিবিকে এক নজরে দেখলেই মনে হবে বুঝি বেহেস্ত থেকে কোন হুরী পরী বুঝি জমিনে নেমে এসেছে। শাদীর পর সে সেজেগুজে তার সামনে তার রূপের পসরা নিয়ে দাঁড়াবে। নানা ছলাকলার মাধ্যমে তার মন জয় করার জন্য সাধ্যাতীত প্রয়াস চালাবে। তার দিকে চোখের বাণ মারবে। কাতর অনুরোধ জানাবে। সে নীরব থাকবে। আচার-আচরণে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলবে যেন তার মত কত সব রূপসী অতীতে রূপ-যৌবন দান করে জীবন ধন্য করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। সে পাত্তাও দেয় নি।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলার পর ভোরের পূর্বাভাস পেয়ে কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

বত্রিশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হলে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন। গেহম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরের অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, নাপিত তার পঞ্চম ভাইয়া অল-আসার-এর কিস্‌সা বলে চল্‌ল—'আমার ভাইয়া অল-আসার তার কাঁচের বাসনপত্র সাজিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্নে মজে রইল। সে এবার ভাবছে, বাসর ঘরের যাবতীয় স্ত্রী-আচার মিটে গেলে সে নফরকে একটি রেকাবিতে পাঁচ শ' সোনার মোহর এনে তার সামনে এসে দাঁড়াতে বলবে। সেগুলো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে ঘরময় ছড়িয়ে দেবে। তা কুড়োবার জন্য বাসর ঘরে উপস্থিত সবাই ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দেবে। পাশের ঘরটি তাদের ফুলশয্যার জন্য সুন্দর করে সাজানো থাকবে। জনানারা তাকে আর সদ্য শাদীকরা বিবিকে নিয়ে সে-ঘরে যাবে। বিবির সহচরীরা শ্রদ্ধা-ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাকে কুর্নিশ করবে। আর সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের অগ্রাহ্য করে ঘরের ভেতরে ঢুকে যাবে। তাদের একজন ব্যস্ত হয়ে গুলাবী সরবৎ এনে তার সামনে ধরবে। তার বিবি তখন তাকে বুকে পাওয়ার জন্য ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠবে। সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার অনুনয় বিনয়কে এড়িয়ে চলবে। নিরাসক্ত ভাব দেখাবার উদ্দেশ্যে থাকবে এই যে, রূপসীদের প্রতি তার কোন মোহই নেই। গোড়াতেই যদি তার বিবি বুঝতে পারে যে, তার রূপ আর যৌবন দেখে সে পাগল তবে তো সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। যত কষ্টই হোক নিজেকে সে সংযত রাখবেই।

তার অনীহা দেখে তার শাশুড়ি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে কাতর মিনতি জানাবে। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলবে—'বাছা, আমার লেড়কি নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক। কোন পাপই তার সতীত্বকে নষ্ট করতে পারে নি। কোন পুরুষকে সঙ্গদান করা তো দূরের কথা কেউ তার পবিত্র কুমারীত্বের দিকে হাত পর্যন্ত বাড়াতে পারে নি। যাও বাছা, আমার লেড়কিকে বুকে টেনে নাও, শয্যাসঙ্গিনী কর। তার যৌবনসুধা পান করে নিজে তৃপ্ত হও, তাকেও সুখদান কর। তার বিবির দু' গাল বেয়ে চোখের পানির ধারা নেমে আসবে। চোখের ভাষায় তার মধ্যে কামতৃষ্ণা জাগাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠবে। সে বিরক্তি প্রকাশ করবে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে সে বিবিকে সজোরে এক লাথি মারবে। ব্যস, তন্দ্রা ভাব কেটে গেল। বিবিকে এমন-জোরে এক লাথি মারবে যে সে ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়বে।

লাথি সে মারল বটে। কিন্তু তার লাথি তো খোয়াবে দেখা, কল্পিত। বিবিকে অবশ্যই নয়। আসলে লাথি মারল তার দোকানের কাচের জিনিসপত্রের গায়ে। কাজ যা হবার তা হয়েই গেল। বাসনপত্র ভেঙেচুরে একসার হয়ে গেল। একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল তার দোকান। পুঁজি গেল বরবাদ হয়ে। সব খতম। এখন পেটে কিল মেরে উপোষ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বপ্ন আর বাস্তবে যার আসমান-জমিন ফারাক তার নসীবে এ রকমটিই ঘটে থাকে। অল-আসার মাথায় হাত দিয়ে ভাঙাচোরা বাসনপত্রের দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল।

আমার ভাইয়া অল-আসার যখন সবকিছু খুইয়ে কেঁদে আকুল হচ্ছে তখন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের জনানা পরিচারিকা পরিবেষ্টিতা হয়ে সে-পথ দিয়ে যাচ্ছেন। তাকে কাঁদতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরিচারিকাকে বল্‌লেন—একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটি দেখে আসার জন্য। পরিচারিকাটি ফিরে এসে জানাল—যুবকটি গলির মোড়ে দোকান সাজিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নের ঘোরে লাথি মেরে দোকানের জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। পুঁজি খতম, তাই কেঁদে আকুল হচ্ছে।

সম্ভ্রান্ত মহিলাটি পরিচারিকাকে কিছু সোনার মোহর দিয়ে বল্‌লেন—'এক কাজ কর, এগুলো তাকে দিয়ে এসো। আর বোলো যেন আবার নতুন করে দোকান সাজিয়ে নেয়।'

পরিচারিকাটি আমার ভাইয়া অল-আসারকে পাঁচ শ' সোনার মোহর দিয়ে বল্‌ল—'এগুলো রাখ। এ দিয়ে আবার তোমার দোকান সাজিয়ে বোসো।'

অল-আসার এক সঙ্গে পাঁচ শ' সোনার মোহর এর আগে কোনদিন দেখে নি। সে ভাবল, এবার আমি আমীর আদমি বনে গিয়েছি।

ব্যস, সবার আগে সুন্দর একটি মকান ভাড়া করে ফেল্‌ল সে। এক দুপুরের আগে শুয়ে ভাবছে, কি ধরনের ব্যবসা ফাঁদবে। কতরকম ব্যবসার কথাই না ভাবল। কিন্তু কোন ব্যবসাই মনে ধরছে না। এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলেই এক বুড়ির মুখোমুখি হ'ল। চেনা জানা তো দূরের কথা এর আগে কোনদিন সে তাকে দেখেছে বলেও মনে হ'ল না।

বুড়িটি বল্‌ল—'বাছা, আজ জুম্মাবার। দুপুরের নামাজের সময় হয়ে এসেছে। তোমার এখানে নামাজটি সেরে নিতে চাচ্ছি।'

অল-আসার বুড়িকে ভেতরে নিয়ে গেল।

বুড়ি নামাজ সারল। আমার ভাইয়া ধর্মপ্রাণা বুড়ির ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে দুটো সোনার মোহর দিতে চাইল। বুড়ি আপত্তি জানাল। বল্‌ল—'বাছা, মোহর দুটো যদি নিতান্তই দিতে চাও তবে যার কাছ থেকে নিয়েছিলে তাকেই না হয় ফেরৎ দিয়ে দাও। আমার এসবের দরকার নেই।'

অল-আসার তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ভাবল—সে কী! আমার কথা বুড়িটি জানল কি করে! 'আচ্ছা বল তো, সে কি তোমার পরিচিতা? তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পার? এ কাজটুকু করে দিলে বড়ই খুশী হতাম।'

—'সে-রূপসী তোমাকে সোনার মোহরগুলো কেন দিয়েছিল, বলতে পার? তোমার উমর দেখে। তোমার যৌবনই তার কাছে একমাত্র কাম্য। আল্লার দোয়ায় ধন দৌলত সে প্রচুরই পেয়েছে। কিন্তু তার স্বামীটি একেবারেই অক্ষম। ধ্বজভঙ্গ। এমন এক ভরাযৌবন যার দেহে তার বরাতের কথা একবার ভেবে দেখ! কাম-পিপাসা তাকে কুরেকুরে খাচ্ছে। কিন্তু স্বামী তার কামজ্বালা নিবৃত্ত করতে অক্ষম। আল্লাহর কী নির্মম পরিহাস। তার রূপ-যৌবন সবই ব্যর্থ। তার কাছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমি এসেছি। চল, চট করে বেরিয়ে পড় বাছা।'

আমার ভাইয়ার কলিজাটি তিরতির করে নাচতে লেগে গেল। খুশীতে একেবারে ডগমগ হয়ে পড়ল। সেদিন এক পলকে তাকে চোখে দেখার পর থেকে বড়ই মর্মপীড়া বোধ করছিল। আল্লাহ-ই আজ সে সুযোগ করে দিয়েছেন।

বুড়িটি তাকে নিয়ে তার খোয়াবের বিবি, তার মধুমিতার বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। সে হাঁটতে হাঁটতে বল্‌ল—'আমি বহুতদিন তার ওখানে নোকরি করছি। সে চায় কথা কম, কাজ চায় বেশী। তোমার যৌবনশক্তি যদি তাকে তৃপ্তি দিতে পারে জানবে তোমার নসীব ফিরে গেছে। রূপসীর যৌবনের জোয়ার লাগা শরীরটিই কেবল নয়। অগাধ ঐশ্বর্যও তোমার হাতে চলে আসবে।'

—অল-আসার-এর কলিজাটি চনমনিয়ে উঠল। সে আপন মনে বলে উঠল—হায় খোদা! আমার যৌবনের এত যে দাম আগে তো কোনদিন জানতাম না। লেড়কিটিকে তৃপ্তি দিতে পারলে সারা জিন্দেগী পায়ের ওপর পা তুলে কাটানো যাবে! রূপসীটিকে খুশী করার জন্য আমি কিছুমাত্র কসুর করব না।

বুড়ি একটি বিশালায়তন মকানের সামনে এসে দাঁড়াল। বিশেষ এক কায়দায় দরজার কড়া নাড়ল। সঙ্কেত ধ্বনিও বলা যেতে পারে। এক গ্রীক নোকরানী দরজা খুলে তাদের ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে দরজার পর্দাটি পর্যন্ত সব কিছুতে ঐশ্বর্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন। মখমলের পর্দা ঠেলে এক অষ্টাদশী ঘরে ঢুকল। তার রূপের আভায় পুরো ঘরটি যেন হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠল। তার রূপের যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার মত ভাষা আমার নেই জাঁহাপনা। তার সেই চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে চেয়ে রইল। চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না।

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না জাঁহাপনা, লেড়কিটি একেবারেই বে-শরম। লজ্জা শরম কাকে বলে জানা নেই। ঘরে ঢুকেই আমার ভাইয়া অল-আসারকে চোখের বাণ মেরে বসল। নিজে হাতে দরজাটি বন্ধ করে তার পাশে, একেবারে গা-ঘেঁষে বসে পড়ল। জানা নেই চেনা নেই এমন এক পরপুরুষের সঙ্গে এমন আচরণ কেউ করতে পারে, ভাবতেও উৎসাহ পাওয়া যায় না। তার পাশে বসেই রূপসীটি তার গলাটি জড়িয়ে ধরল। নিজের মুখটি তার মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আলতো করে চুম্বন করল। একবার নয়। পরপর তিন বার। আমার ভাইয়া অল-আসার দেহে এক অবর্ণনীয় শিহরণ অনুভব করল। রোমাঞ্চে ভরে উঠল তার প্রাণ-মন। শিরা-উপশিরায় শুরু হ'ল রক্তের মাতন।

রূপসী-যুবতীর চোখে কামতৃষ্ণার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল। তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। কোনরকমে মখমলের চাদর বিছানো পালঙ্কে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। তার দেহের যৌবন চিহ্নগুলো যেন অল-আসারকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিতে লাগল। তার পক্ষে আর দূরে থাকা সম্ভব হ'ল না। হিংস্র নেকড়ের মত তার যৌবনভরা দেহটির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরই শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। যুবতীটি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এক সক্ষম নওজোয়ানের কাছে নিজের রূপ-যৌবনকে সঁপে দিতে পেরে কী যে এক অনাস্বাদিত আনন্দের জোয়ারে ভেসে চল্‌ল তা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। ঘণ্টাখানেক ধরে তারা পারস্পরিক চাওয়া-পাওয়া, দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে চরমতম শান্তি-সুখ-পরিতৃপ্তি লাভ করল। তারপর অল-আসারকে বসিয়ে রেখে যুবতীটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বিশেষ করে বলে গেল 'আবার কোথাও চলে যেয়ো না। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থেকো।'

রূপসী যুবতীটি ঘর ছেড়ে যেতেই অন্য এক দরওয়াজা দিয়ে ইয়া তাগড়া এক নিগ্রো বীরদর্পে সে-ঘরে ঢুকল। তার একহাতে চাবুক আর অন্য হাতে সুমসৃণ এক ছোরা। কথা নেই বার্তা নেই ঘরে ঢুকেই সে অল-আসারকে অশ্লীল-অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে সপাং সপাং করে চাবুক মারতে লাগল। নিরবচ্ছিন্ন চাবুকের ঘা সে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না। সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

নচ্ছার নিগ্রোটি ভাবল, অল-আসার-এর জান খতম হয়ে গেছে। তার মোহরের থলিটি নিয়ে গুটি গুটি কেটে পড়ল।

নিগ্রোটি ঘর ছেড়ে গেলে এক ধুমসো নিগ্রো যুবতী একটি পাত্র হাতে ঘরে ঢুকল। পাত্রটি লবণ পূর্ণ। চাবুকের আঘাতে অল-আসার-এর গায়ের ছড়ে যাওয়া ক্ষতগুলিতে সে লবণ ছিঁটিয়ে দিতে লাগল।

এমন সময় সে-বুড়িটি ছুটে এসে মায়া কান্না জুড়ে দিল। কপাল চাপড়ে আমার ভাইয়ার দুরবস্থার জন্য কেঁদে আকুল হ'ল।

এবার মায়াবিনী বুড়িটি আমার ভাইয়ার নিঃসাড় দেহটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে উঠোনের এক ধারের একটি ছোট্ট কুঠরির মধ্যে রেখে এল।

এবাড়িতে রোজ যারা ঢোকে তারা আর জান নিয়ে ফিরে যেতে পারে না। শয়তান নিগ্রোটি চাবুক মেরে কাহিল করার পর বাকি কাজটুকু ছোরাটি দিয়ে মেরে দুনিয়া থেকে তাকে চালান দিয়ে দেয়, তখন বুড়িটি নিয়ে যায় কুঠরিটিতে। নুন ছিঁটিয়ে দেওয়া হয় বলে সহজে পচে না। দুর্গন্ধও বেরোয় না।

অল-আসার দু' দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কুঠরিটির ভেতরে পড়ে থাকার পর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল। উঠে বসল। আমার ভাইয়া জানে বেঁচে গেল।

তখন মাঝ-রাত্রি। জ্যোৎস্নার আলো জানালা দিয়ে খুপরির ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। বার কয়েক লাফালাফি করে সে জানালাটি ধরতে পারল। এবার জানালা-পথে বাইরে বেরিয়ে এল।

ব্যস, এবার সোজা বাড়ি ফিরে এল।

আমি হেকিম ডেকে আনলাম। তিনি রোগীকে দেখে মোক্ষম দাওয়াই দিলেন। তার গায়ের কাটা-ছেড়া ঘা শুকিয়ে গেল।

রোগ নিরাময়ের পর আমার ভাইয়া প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করে বসল। কঠিন প্রতিজ্ঞা। বদলা সে নেবেই নেবে। সে নোংরা রূপসী-যুবতী, নচ্ছার বুড়ি, শয়তান নিগ্রো আর তার ধুমসো স্ত্রী কাউকেই সে রেহাই দেবে না।

আমার ভাই অল-আসার এক চমৎকার ফন্দি বের করল মাথা খাটিয়ে। দাড়ি-গোঁফ পারসীদের কায়দায় ছাঁটল। গায়ে চাপাল প্রায় পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে আসা কোর্তা। বিশেষ কায়দায় তৈরি পাৎলুন পরল। গালের কাছে জুলফি লাগাল। তার মাথায় চাপাল পারসী-টুপী। কোর্তার পকেটে গুঁজল আধ-ফোঁটা গোলাপ, পারসী আতর ছিঁটিয়ে দিল কোর্তা, পাতলুন ও টুপী—সবকিছুতে। ব্যস, একেবারে কেতাদুরস্ত পারসী সাহেব বনে গেল।

এবার অল-আসার হাজির হ'ল সে-বাড়িটির দরজায়। নচ্ছার বুড়িটিকে দরজায়ই পেয়ে গেল। পারসী কায়দায় সেলাম জানিয়ে বুড়িকে পারসী ভাষায় জিজ্ঞেস করল—'ধারে কাছে কোন মণিকারের দোকান আছে কি?'

বুড়ি ধরেই নিল আগন্তুক যুবক পরদেশী। পারসী। পারসীরা মোটা ধন-দৌলত নিয়ে ভিনদেশে আসে। অতএব এ-ও নির্ঘাৎ ধনকুবের।

বুড়ির চোখ দুটো হঠাৎ জ্বল জ্বল করতে থাকে। বলে—'বাছা, মণিকারের দোকান খোঁজ করছ কেন?'

—'আমি অতি সম্প্রতি একটি দ্রব্য বিক্রি করে নগদ ন' শ' সোনার দিনার পেয়েছি। সুযোগ পেলে যাচাই করে দেখতাম দিনারগুলো কি আসল, নাকি—আর আমাদের পারসী মুদ্রায় এর মূল্য কত তা-ও জানার ইচ্ছা।'

বুড়ি সোল্লাসে তাকে নিয়ে মণিকারের দোকানের উদ্দেশে পা-বাড়াল। অল-আসার পথ চলতে চলতে কোর্তার ওপর থেকেই হাত বুলিয়ে ছোরাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিল।

বুড়ি একটি বড়সড় মণিকারের দোকানের সামনে অল-আসারকে ছেড়ে দিয়ে নিজে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। এতে বরং তার সুবিধেই হ'ল। দোকানির সঙ্গে দু'-চারটে অপ্রয়োজনীয় কথা বলেই বেরিয়ে এল।

বুড়ি এবার তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এল সেই-যুবতীটির বাড়ি। অল-আসার-এর অবশ্য এরকমই ইচ্ছে।

বুড়ি তাকে নিয়ে আগেকার সেই ঘরটিতে যায়। একটু বাদে রূপসী-যুবতীটি আসে। পূর্বের সেই ভঙ্গিতে তিন-চার বার চুম্বন করে। খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর এক এক করে পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে যুবতীটি দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে বলে যায় 'আবার যেন কোথাও চলে যেয়ো না। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থেকো।'

অল-আসার কোর্তার ওপরে হাত বুলিয়ে দেখে নিল, ছুরিটি

জায়গামতই আছে বটে। যুবতীটি বেরিয়ে যেতেই ছুরি ও চাবুক হাতে সে গাট্টাগোট্টা নিগ্রোটি তেমনি হুঙ্কার দিয়ে বীরদর্পে ঘরে ঢুকল। বাজখাই গলায় গর্জে ওঠে—'হারামজাদা, এখানে কেন এসেছিস। কার হুকুমে অন্দর মহলে—'

নিগ্রোটির কথা শেষ হবার আগেই অল-আসার বল্‌ল—'কেন মিছে তড়পাচ্ছ? কেন এসেছি, ওই সুন্দরীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। এই তো তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে, জিজ্ঞেস কর।'

নিগ্রোটি পিছন দিকে ঘাড় ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে অল-আসার কোর্তার তলা থেকে যন্ত্রচালিতের মত ছোরাটি বের করে তার পিঠে আমূল গেঁথে দিল। পরমুহূর্তে নুনের পাত্র হাতে ধুমসী নিগ্রো মেয়েটি ঘরে ঢুকল। অল-আসার এক কোপে তার ধড় থেকে গলাটা নামিয়ে দিল। এবার বুড়িটি এল আগের মতই নাচতে নাচতে। দরজার আড়াল থেকে এক লাফে বেরিয়ে এসে অল-আসার তার বুকে ছোরাটি গেঁথে দিয়ে বল্‌ল—'যেয়ে খদ্দের ধরে নিয়ে আসার শখ তোর চিরদিনের মত মিটিয়ে দিলাম হতচ্ছাড়ি!'

অল-আসার এবার এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে সে-রূপসী যুবতীটিকে খুঁজতে লাগল। এমন সময় পাশের ঘরের চৌকির তলায় কিসের যেন খট্‌ ক'রে শব্দ হ'ল। দরজায় দাঁড়িয়েই উপুড় হয়ে উঁকি দিল। দেখল, তার বাঞ্ছিতা সে-যুবতীটি হামাগুড়ি দিয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে। তাকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে বেরিয়ে এল। তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'আমার কোন কসুর নেই।' আমাকে এখানে শয়তানগুলো জোর করে আটকে রেখে ব্যবসা ফেঁদেছে। আমার রূপ-যৌবনকে কাজে লাগিয়ে লাখ লাখ দীনার কামাচ্ছে। কড়া পাহারা। বেরিয়ে যে চলে যাবো তার উপায় নেই।

অল-আসার সঙ্গে সঙ্গে হাতের ছোরাটিকে আর ব্যবহার করতে পারল না। কলিজাটির মধ্যে হঠাৎ কেমন মোচড় মেরে উঠল। আর কিছু না হোক, দু'-দুটো দিন তার রূপ-যৌবনকে ভোগ করেছে। নিবৃত্ত করেছে কাম-পিপাসা।

আমার ভাইয়া অল-আসার-এর দিল্‌ এবার কেমন দুর্বল হয়ে যায়। যুবতীটিকে বল্‌ল—'তুমি এখানে এলে কি করে?'

—'আমার নসীবের কথা আর বোলো না। ওই নচ্ছার বুড়িটিই যত নষ্টের মূল। আমার জীবন একেবারে বরবাদ করে দিল। সে তোমাকে যেমন ভুলিয়ে ভালিয়ে এনেছিল ঠিক তেমনি রোজ একজন করে মরদ ধরে নিয়ে আসে নানা কৌশলে। তার সবকিছু কেড়ে নিয়ে জানে মেরে দেয়। আমাদের ঘরে এক সময় নোকরি করত বুড়িটি। এক শাদীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে একদিন তার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। আমার আব্বা আর আম্মা তাকে খুবই বিশ্বাস করতেন। তাই নির্দ্বিধায় তাঁরা আমাকে তার সঙ্গে ছেড়েছিলেন। বুড়ি আমাকে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে না নিয়ে কৌশলে এখানে নিয়ে এল। ব্যস, বন্দী

হয়ে গেলাম। নিগ্রো দস্যুটি আমাকে ধর্ষণ করে। হরণ করে আমার সতীত্ব। তারপর ছোরা তুলে ভয় দেখায় আমি তাদের পছন্দ মত লোককে দেহদান না করলে ধড় থেকে গর্দান নামিয়ে দেবে।'

আমার ভাইয়া অল-আসার এবার মুখ খুল্‌ল—'দেহ বিক্রি করে এতদিনে তো দিনারের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছ। সেগুলো এখন কোথায় বল তো?'

—'আছে। সবই মজুত আছে। ওই যে সিন্দুকটি দেখতে পাচ্ছ, সবই ওটার মধ্যে জমিয়ে রাখা হয়েছে।'

আমি তাকে নিয়ে সিন্দুকটির কাছে গেলাম। আমি কিছু বলার আগেই সে ব্যস্ত-হাতে সিন্দুকটির ডালা খুলে ফেল্‌ল। ভেতরে উঁকি দিতেই আমার চোখ ঝলসে গেল। মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হ'ল।

যুবতীটি বল্‌ল—'মেহবুব, সোনার মোহর আর দিনারগুলো নিয়ে চল, আমরা এখান থেকে চম্পট দেই।' কথা বলতে বলতে সে এক দৌড়ে কয়েকটি বস্তা নিয়ে এল। সোনার মোহর ও দিনারগুলো বস্তায় বোঝাই করল।

পেল্লাই ভারি হয়ে গেল বস্তাগুলি। আমার ভাইয়া অল-আসার কুলি নিয়ে এল।

কুলি জোগাড় করতে যে সময়টুকু দেরী হয়েছে এরই মধ্যে যুবতীটি সোনার মোহরের বস্তাটি নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে চম্পট দিয়েছে। খাঁচা ভেঙে পাখি পালিয়েছে।

ব্যাপার দেখে অল-আসার আশাহত হ'ল বটে। কিন্তু হাল ছাড়ল না। ঘরের দামী জিনিসপত্র যা কিছু ছিল সব চট করে একটি বস্তায় বোঝাই করে ফেল্‌ল। এবার দিনারের বস্তা ও জিনিস বোঝাই বস্তা দুটো ঘরে রেখে সদর-দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভাবল, পরদিন দুটো খচ্চর এনে এসে বস্তা দুটো বাড়ি নিয়ে যাবে।

পরদিন খুব ভোরে দুটো তাগড়াই খচ্চর নিয়ে ফিরে এল। খচ্চর দুটোকে সদর-দরজায় বেঁধে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। বস্তা দুটো টানা হেঁচড়া করে দরজায় আনতেই তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কলিজাটি মোচড় দিয়ে উঠল। দেখল, সিপাহীরা সারা বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। তারা তাকে হাতকড়া পরিয়ে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে গেল।

কোতোয়ালের কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিল। তারপর দিনার আর মূল্যবান মালপত্রের বস্তা দুটো এবং বাড়িটিতে যা কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল সব সে এবং কোতোয়াল ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। কোতোয়াল তাতে রাজি তো হলই না উপরন্তু সিপাহী দিয়ে তাকে রাজ্যের বাইরে বের করে দেয়। জিনিসপত্র আর মোহর বোঝাই বস্তা দুটো কোতোয়াল একাই ভোগ করবে। কাউকে ভাগ দিতে সে মোটেই উৎসাহী নয়। তাই অল-আসারকে ভিন দেশে চালান দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। আমি লোক মারফৎ খবর পেয়ে গোপনে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসি। পাছে কেউ টের পায় এ-আশঙ্কায় ঘর থেকে মোটেই বেরোতে দেই না।

শাক্কাশিকের কিস্‌সা

নাপিত তার পঞ্চম ভাইয়া অল-আসার-এর কিস্‌সা শেষ করে এবার বল্‌ল—জাঁহাপনা, আমার পাঁচ ভাইয়ার কিস্‌সা তো শুনলেন। এবার আমার ষষ্ঠ ভাইয়া শাক্কাশিক-এর কিস্‌সা আপনার দরবারে সংক্ষেপে পেশ করছি—আমার ষষ্ঠ ভাইয়া সবার কাছে শাক্কাশিক ব'লে পরিচিত ছিল। সে কথা বলার সময় মনে হ'ত বুঝি কোন ভাঙা কাঁসর বাজছে। সে ছিল খুবই গরীব। অন্যের কাছে হাত পেতে সে দিন গুজরান করত। আমাদের আব্বাজী বেহেস্তে যাওয়ার সময় যে অর্থকড়ি রেখে গিয়েছিলেন, তা ভাগ বাটোরা করে আমরা প্রত্যেক ভাইয়া মাথাপিছু একশ' দিরহাম করে লাভ করি। তা-ও তার নসীবে টিকল না। একদল দুর্বৃত্ত তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

সত্যি কথা বলতে কি আমার এ-ভাইয়াটি ছিল একেবারেই ন্যালাক্ষ্যাপা। তাই সবাই তাকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করে মজা লুঠত, তাই অনেক আমীর-ওমরাহরা ডেকে নিয়ে তার তামাশা দেখত, বিনিময়ে তাকে খানাপিনা করাত।

এক দুপুরের দিকে শাক্কাশিক এক আমীরের বাড়ির দরজায় হাজির হ'ল। উদ্দেশ্য একটু-আধটু রঙ্গ-তামাশা দেখিয়ে পেটপুরে খানাপিনার ব্যবস্থা করে নেয়া।

সে প্রহরীকে সন্তুষ্ট করে গুটিগুটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়। বাড়ির মালিক বারমাকী সাহেব। এক সময় খলিফার বংশানুক্রমে উজিরের চাকুরি করত। সদর-দরজা পেরিয়েই সামনে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দেখতে পেল। নসীব ঠুকে সিঁড়িবেয়ে ওপরে উঠে গেল। সামনেই বিরাট একটি ঘর পেয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। ঘরের কেন্দ্রস্থলে আরাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে এক অতি বৃদ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে। তার পায়ের শব্দে বৃদ্ধের তন্দ্রা টুটে গেল। জিজ্ঞেস করলেন—'কে তুমি বাছা? কি চাও?'

—'সারাদিন পেটে দানাপানি পড়ে নি।'

—'এ কী কথা শোনালে বাছা! আমি তো জানতাম, বাগদাদ নগরীতে কেউ-ই ভুখা থাকে না। তোমার কথায় আজ আমার ধারণা পাল্টে গেল। তুমি ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করছ আর আমি কিনা সাত ব্যঞ্জন দিয়ে খানাপিনা সেরে আরামে দিন গুজরান করছি! কী অন্যায় কথা বল দেখি!'

বৃদ্ধ এবার বল্‌লেন—'বাছা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আজ আমরা একসঙ্গে খানাপিনা সারব।' এবার নফরকে ডেকে বল্‌লেন—'টেবিলে দু'জনের খানা সাজিয়ে দাও।'

আমার ভাইয়া শাক্কাশিক বৃদ্ধের পাশাপাশি বসে বাদশাহী খানা দিয়ে ভোজ সারল। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুই মুখে দিলেন না। থালা-বাটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতটি মুখের কাছে নিলেন। অভিনয় করার ভঙ্গিতে শুধু মুখ চিবোতে লাগলেন। আর থেকে থেকে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা খানা! বহুৎ আচ্ছা!'

শাক্কাশিক বৃদ্ধের ব্যাপার স্যাপার কিছুই ঠাহর করতে পারল না। আড়চোখে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। সে কিন্তু থালা চেটেপুটে খেল।

বৃদ্ধ বাস্তবিকই দিলদরিয়া। শাক্কাশিককে নিজের কাছে রেখে দিলেন। তাঁর ওখানেই থাকা-খাওয়া উভয় ব্যবস্থাই হয়ে গেল। তারপর আরও বিশ সাল বৃদ্ধ জিন্দা ছিলেন। পুরো বিশটি সাল সে নিশ্চিন্তে বৃদ্ধের ঘাড়ে বসে হাত-পা গুটিয়ে জীবন ধারণ করল।

বৃদ্ধটি কবরে গেলে তাঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কোতোয়াল গ্রাস করল। ব্যস, আমার ভাইয়া শাক্কাশিক-এর নসীব পুড়ল। কোতোয়াল তাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। উপায়ান্তর না দেখে সে মক্কার পথে পা-বাড়াল। পথে মরু-ডাকাতরা তার সব কিছু ছিনতাই করে নিল। সে এক বস্ত্র সম্বল হয়ে পড়ল। উপরন্তু তাকে ক্রীতদাস করে তারা নিয়ে গেল। ডাকাত-সর্দারের বাড়ি ক্রীতদাস রূপে তার দিন কাটিতে লাগল। সেখানে অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়।

ডাকাত সর্দারের বিবি ছিল খুবসুরৎ। বয়সও খুবই কম। দেহে তার উত্তাল-উদ্দাম রূপের জোয়ার। বেহেস্তের হুরীর মত দেখতে। দেহের যৌবনচিহ্নগুলো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়।

সর্দার ডাকাতি করতে বেরোলেই তার কচি কাঁচা বিবিটি আমার ভাইয়ার কাছে চলে আসত। নানা ছলাকলার মাধ্যমে তার যৌবনজ্বালার কথা বুঝাতে চেষ্টা করত। আচমকা গা থেকে কামিজটি খুলে ফেলে বলত—'আরে, আমার দিকে একবারটি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখই না গো ভাল মানুষের পো। আমার এ-রূপ, দেহের যৌবনের জোয়ারের কদর বুড়া সর্দারের কি আর বুঝার ক্ষমতা আছে নাকি। একা একা যৌবন-জ্বালায় দগ্ধে মরি। তুমি কি আদমি, নাকি পাথরে তৈরি। শরম কিসের? এসো, আমার বুকে এসো, আমাকে দলাই মলাই করে একেবারে শেষ করে ফেল। আমি আর জ্বালা সইতে পারছি না! তুমি আমার যা কিছু আছে ভোগ করে আমার জ্বালা নেভাও মেহবুব। কথা বলতে বলতে সে শাক্কাশিক-এর হাত দুটোকে নিজের তুলতুলে বুকের ওপর রেখে আচমকা চোখের বাণ মারে।

শাক্কাশিক আচমকা তার হাতটি টেনে নেয়। মুখ বিকৃত করে বলে—'এ আবার কি! এসব আমি পছন্দ করি না।'

—'সে কী হে! এমন জোয়ান মরদ, পছন্দ করনা! তুমি কি ইয়ে, মানে খোজা নাকি? তোমার কি ইয়ে টিয়ে নেই?'

রোজই এভাবে চলতে থাকে। ডাকাত-সর্দার বেরিয়ে যাওয়া মাত্র তার খুবসুরৎ জোয়ান বিবি শাক্কাশিক-এর কাছে আসে। পোশাক খুলে উলঙ্গ হয়। গা-ঘেঁষে বসে। তার মধ্যে কামতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু আমার ভাইয়া যে অন্য জগতের মানুষ। কিছুতেই তার মধ্যে কামপ্রবৃত্তি ও উত্তেজনা জাগিয়ে তুলতে পারেনি ডাকাতের সে-যুবতী বিবি। যখন কিছুতেই কিছু হয় না তখন প্রলোভন দেখায়—'শোন, আমার কথা রাখলে, আমার কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত করলে আমি তোমাকে এখান থেকে পালাবার ফন্দি ফিকির করে দেব। এবার বুঝে দেখ, কি করবে।'

ডাকাত-সর্দারের বিবির কথায় তার মনে আশার সঞ্চার হয়, ভাবে, আমি আমার যৌবনশক্তি দিয়ে তার দেহ-মনকে সুখ দিতে পারলে ভয়ঙ্কর এ-দস্যুর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব, কম কথা! মুক্তির আনন্দ তাকে পেয়ে বসল। সে মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে ডাকাতের অষ্টাদশী বিবির নগ্ন দেহটিকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরল। বুকের মধ্যে লেপ্টে নিল। তার মুখের কাছে নিজের মুখটিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। চুম্বন করল। চুম্বনে চুম্বনে তাকে উতলা করে তুল্‌ল। যুবতীটির নগ্ন দেহটি বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ে।

বনহরিণীর মত ডাগর ডাগর চোখ দুটো আবেশে জড়িয়ে আসতে চায়। একটি যুবকের মধ্যে কামোন্মাদনা জাগিয়ে তোলার জন্য যা কিছু করা দরকার কোন প্রায়াসই সে বাদ দিল না। আমার ভাইয়া শাক্কাশিক ক্রমে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত হয়ে উঠল। তার দেহের খুনে মাতন লাগে। ঝাঁপিয়ে পড়ে যুবতীটির নগ্ন দেহের ওপর। তারপর? না, তারপর আর কিছু সম্ভব হ'ল না। অতর্কিতে দরজায় এসে দাঁড়ায় ডাকাত সর্দার। ভয়ঙ্কর তার চাহনি। বীভৎস তার মুখের ভাব। গুলি খাওয়া শেরের মত গর্জে ওঠে—'শয়তান, আমার বিবিকে নিয়ে মজা লুঠছিস! তোর বুকের পাটা তো কম নয়! আমার কলিজায় হাত দেওয়ার মজা তোকে টের পাইয়ে দিচ্ছি।' কথা বলতে বলতে কোমর থেকে ছোরা টেনে নিয়ে শক্কাশিক-এর ঠোঁট দুটো টেনে ধরে কুচ করে কেটে দিল। আবার তর্জন গর্জন শুরু করল—'তুই যে-লিঙ্গটি দিয়ে আমার বিবিকে ভোগ করেছিস সেটা কেটে এমন অবস্থা করে দেব জিন্দেগীতে যাতে আর কারো বিবিকে ভোগ করতে না পারিস।' এবার হিংস্র জানোয়ারের মত আমার ভাইয়া শাক্কাশিক-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হ'ল ধস্তাধস্তি। এক সময় বাগে পেয়ে সে তার পুরুষাঙ্গটি কেটে ফেল্‌ল।

আমার ভাইয়া শাক্কাশিক সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে এলিয়ে পড়ল। ডাকাত-সর্দার তাকে মৃত ভেবে একটি খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে সেটিকে পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দেয়। পাহাড়ের গায়ে সে খচ্চরের পিঠ থেকে পিছলে পড়ে গেল।

সে-পথে আমাদের মহল্লার কয়েক জন মক্কায় হজ করতে যাওয়ার সময় আমার ভাইয়া শাক্কাশিককে দেখে চিনতে পারে। তাদের মুখে শুনে আমি উদভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হই। বাড়ি গিয়ে আমি হেকিম ডেকে গোপনে ইলাজের ব্যবস্থা করি। হেকিমের দাওয়াইয়ে তার দেহের ক্ষতগুলি শুকিয়ে যায়। তারপর থেকে সে আমার ঘাড়ে চেপেই দুঃখের দিনগুলো গুজরান করতে থাকে।

নাপিত এবার খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহকে লক্ষ্য করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এবার আপনিই বিচার করে দেখুন, আমি কেমন পরোপকারী, স্বল্পভাষী, জ্ঞানী ও মহাপ্রাণ।'

খলিফা বল্‌লেন—'ঠিক বলেছ হে, তোমার মত এমন এক সর্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিজের কাছাকাছি রেখে স্বার্থপরতার পরিচয় দিতে চাই না। তোমার গুণাবলী তামাম দুনিয়ার আদমির মধ্যে সঞ্চারিত হোক। এই বলে তিনি আমাকে বাগদাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর এ মুলুক-সেমুলুক ঘুরে আপনার মুলুকে চীন দেশে এসে হাজির হয়েছি। আমি হলফ করেছি, খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ যতদিন না গোরে যাচ্ছে ততদিন আর বাগদাদমুখো হচ্ছি না। এবার আপনারাই বিচার করে বলুন তো, আমি কি সত্যি বেশী বকবক করি, নাকি মিতভাষী? আমার তো বিশ্বাস, তামাম দুনিয়াটি ঢুঁড়ে এলে আমার মত আর একটি মিতভাষী পাবেন না। আর দূরদর্শিতার বিচার? সে যুবককে তো আমি দু'হাতে বারণ করেছিলাম যেন তিনি নতুন কোন কাজে হাত না দেন। তার সময় খুবই খারাপ যাচ্ছে এ কথাও বলতে ভুলি নি। সে আমার কথায় কান দিল না। আমি মোক্ষম সময়ে সেখানে হাজির না হলে লেড়কিটির আব্বা কাজীর হাতে নির্ঘাৎ তার জান খতম হয়ে যেত। আমার চেষ্টাতেই একটি পা খোয়ালেও জান তো রক্ষা পেল। বেইমান কাঁহাকার! একবার সুকরিয়া পর্যন্ত জানাল না বেইমানটি।

নাপিত তার বকবকানি থামালে উপস্থিত সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। হায় আল্লাহ! কান একেবারে ঝালাপালা করে দিল! এ-ই যদি স্বল্পভাষীর নমুনা হয় তবে আর তামাম দুনিয়ায় বকবক করার লোক কেউ-ই নেই। হতচ্ছাড়া শয়তানটির জন্যই ছেলেটির পা গেছে। আজ সে খোঁড়া। চুল ছাটতে গিয়ে কথার ফুলঝুরি না ছোটালে সময়মত সে লেড়কিটির কাছ থেকে সরে পড়তে সক্ষম হ'ত। তারপর পৌঁছতে দেরী করলেও যদি বকবকানি জুড়ে না দিত তবে কিছুতেই কাজীর হাতে সে ধরা পড়ত না। বৃথা চিৎকার চেঁচামেচি করে লোক জানাজানি করে সর্বনাশ ঘটায়। মনে হ'ল দর্জিটি যেন আমাদের বলছে, নাপিতের বদমাসির জন্যই কেলেঙ্কারীটি ঘটেছিল। সব সর্বনাশের মূল নাপিতকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ছোট্ট একটি কামরায় আটক করা হ'ল। তারপর আমি

খানা খেলাম। দামী সরাব গলা পর্যন্ত গিল্‌লাম। বিকেলের দিকে বিবির জন্য পোটলা বেঁধে খানা নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

আমাকে দেখেই আমার সোহাগের বিবি তম্বি জুড়ে দিল—'কোন চুলোয় সারাটি দিন কাটিয়ে এলে? আমাকে বাড়িতে একা ফেলে কোথায় কার রঙে মজেছিলে? আমাকে নিয়ে এখনই যদি বেড়াতে না বেরোও তবে আমি কাজীর শরণাপন্ন হব। তোমাকে তালাক দিয়ে গায়ের ঝাল মিটাব।'

আমি নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ। কাজীটাজীর ঝামেলায় না গিয়ে আমার রূপসীকে নিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোলাম। বেরিয়ে ঘরে ফেরার পথে কুঁজোটির মুখোমুখি হলাম। সে গলা পর্যন্ত সরাব গিলেছে। বদ্ধ মাতাল। আমরা বলাবলি করলাম উন্মত্ত প্রায় কুঁজোটিকে সঙ্গে করে ঘরে ফিরলে চুটিয়ে মজা করা যাবে তাকে নিয়ে। তাকে বলতেই সে সঙ্গে সঙ্গে রাজিও হ'ল।

আমার বিবি পরপুরুষের সামনে বেরোয় না। কিন্তু তার মতে, কুঁজোটি তো আর অন্য দশজন মানুষের মত নয়। তাকে একটি খেলার পুতুল জ্ঞান করত।

আমরা বাড়ি পৌঁছে গল্পগুজবে মেতে গেলাম। কুঁজোটি তার অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখাতে আগ্রহী। আমার বিবি খেতে বসে তার মুখে জবরদস্তি এক টুকরো মাছ গুঁজে দেয়। গলায় কাঁটা বেঁধে। হতচ্ছাড়া কুঁজোটি মারা গেল।

আমার বিবিই উপায় করল। নিজে তার লাশটি কোলে তুলে নিয়ে হেকিমের বাড়ি যায়। সুযোগ বুঝে তার বাড়ির সিঁড়ির মুখে সেটি ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে।

জাঁহাপনা, এর পরে কি কি ঘটনা ঘটেছিল আপনারা তো সবই শুনেছেন। হেকিম, পাচক, খ্রীস্টান, দালাল প্রভৃতির কথা বলেছি। এবার আপনিই বলুন জাঁহাপনা, আপনার এ-কুঁজোর ও তার মৃত্যুর কিস্‌সার চেয়ে সে খোঁড়া যুবক বণিক ও নাপিত আর তার ছয় ভাইয়ার কিস্‌সা থেকে রোমাঞ্চকর নয় কি?'

—'সত্যি তোমার কিস্‌সা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। কিন্তু সে বিচিত্র চরিত্রের নাপিতটিকে আমি একবারটি নিজের চোখে দেখার জন্য কৌতূহল বোধ করছি। তাকে হাজির কর। মৃত্যুর পর তার সমাধি স্থলে আমি স্মৃতিসৌধ গড়ব। যাও, খুঁজে আন।'

—'জাঁহাপনা, খুবই সাধারণ কাজ। আমি আপনার হুকুম তামিল করছি।'

দর্জি এবার সুলতানের সিপাহীদের নিয়ে নাপিতের খোঁজে বেরোলো। ঘণ্টা খানেক পরে নাপিতকে নিয়ে তারা প্রাসাদে ফিরল। নব্বইয়ের কাছাকাছি তার উমর। চুল-দাড়ি সবই শনপাটের মত ধবধবে মফেদ।

নাপিতকে দেখে সুলতান হেসে হেসে বল্‌লেন—'শোন, তোমার কিস্‌সা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি।'

—'জাঁহাপনা, এর চেয়ে কত মজার মজার কিস্‌সা আমার মাথায় হরবকত ঘুরপাক খাচ্ছে। কত কিস্‌সা শুনবেন আপনি? সাতদিন সাত রাত্রি ধরে কিস্‌সা বল্‌লেও আমার ভাণ্ডার নিঃশেষ হবে না। কিন্তু জাঁহাপনা, আমাকে আর একটি কথার জবাব দিন। এ-খ্রীস্টান, এ-কুঁজো আর এ-ইহুদির লাশ এখানে আসা কি করে সম্ভব হ'ল? আমার বিশ্বাস, পুরো ব্যাপারটিই ভুলের জন্য ঘটেছে।'

সুলতান মুখ খুল্‌লেন—'ভাল কথা, তবে বলছি।' তিনি এবার কুঁজোর আকস্মিক মৃত্যু থেকে শুরু করে খ্রীস্টান দালালের ফাঁসির আদেশ হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা সবিস্তারে তার সামনে তুলে ধরলেন।

নাপিত এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি করে কাউকে বলুন কুঁজোর লাশটির ওপর থেকে কাপড়টি সরাতে।'

সুলতানের হুকুমে এক যুবক-কর্মী কুঁজোর ওপর থেকে কাপড়টি সরিয়ে নিল।

নাপিত এবার তার কাছে এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, কুঁজোটির জান যে খতম হয়েছে এতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। দুনিয়ার কোন হেকিম-বৈদ্যই একে জিন্দা করতে পারবে না। কিন্তু আমি পারব।'

নাপিতের কথায় সভায় উপস্থিত সবাই, এমন কি সুলতান পর্যন্ত সরবে হেসে তার কথাটি উড়িয়ে দিলেন।

নাপিত কিন্তু তাদের উপহাসে এতটুকুও বিচলিত হ'ল না। সে কোমর থেকে একটি সান্না বের করে কুঁজোর মুখের ওপর ঝুঁকল। সান্না দিয়ে তার মুখ থেকে এক টুকরো শক্ত ভাজামাছ বের করে আনল। ব্যস, নিঃসাড় কুঁজোটি নড়ে চড়ে উঠল। এবার সে চোখ মেলে তাকাল। সবার চোখের সামনে নাপিত যেন ভোজবাজীর খেল দেখাল।

নাপিত এবার নীরবে চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুল্‌ল, এ যেন তার কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার। ইচ্ছা করলে সে আরও আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে সক্ষম।

সুলতান বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বল্‌লেন—'নাপিত, জিন্দেগীতে আমি বহুত তাজ্জব ব্যাপার চোখের সামনে দেখেছি বটে। কিন্তু মরা আদমিকে জিন্দা করা, এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কোথাও দেখি নি। এ-কুঁজো আমার দরবারের বিদূষক। এর অবর্তমানে কেবল আমার দরবারেই নয়, রাজ্যের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। তোমাকে প্রথম দর্শনেই আমার যেন মালুম হয়েছিল, তোমার ভেতরে এমন এক সম্পদ রয়েছে সাধারণ আদমি যার হদিস পায় না।'

সুলতান এবার তাঁর কুঁজোকে তার যথোপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত করে দরবারে বসালেন।

সুলতান নাপিতকে লক্ষ্য করে সোল্লাসে বল্‌লেন—'শোন, আজ থেকে তুমি আমার দরবারের দ্বিতীয় বিদূষকের পদে অভিষিক্ত হলে। আর আমার ব্যক্তিগত ক্ষৌরকারের পদও তোমাকে দান করলাম। তুমি হবে আমার কাছের ও প্রিয় মানুষ।

বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বলতে বলতে মুহূর্তের জন্য মৌন হলেন। তারপর বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এ-কিস্‌সাটি এখানেই শেষ হয়েছে। এর চেয়েও অনেক অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক কিস্‌সা আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা রয়েছে যা শুনলে আপনি তাজ্জব বনতে বাধ্য। অবশ্য আপনি যদি আগ্রহী হন তবে আমি এখনই তা শুরু করতে পারি।'

আলীনূর ও আনিস-অল-জালিসের কিস্‌সা

বাদশাহ শারিয়ার এবার বল্‌লেন—'দর্জি ও নাপিতের কিস্‌সার চেয়েও চিত্তাকর্ষক কিস্‌সা আবার হতে পারে নাকি? ঠিক আছে, শুনি, তোমার কি সে কিস্‌সা।'

বেগম শাহরাজাদ উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে আলীনূর ও আনিস-অল-জালিস-এর কিস্‌সা শোনাচ্ছি।'

শুনুন জাঁহাপনা, কোন এক সময় রাজত্ব করতেন মহম্মদ ইবন সুলেমান অল—যিনি বসরাহ-র সুলতান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ার অবতার। অসহায় দীন-দুঃখীদের চোখের মণি।

সুলতানের দরবারে দু' জন উজির ছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল কা-কন-এর পুত্র অল-ফাদল আর দ্বিতীয় জনের নাম সাবীর-এর পুত্র মইন।

উজির অল-ফাদল সদাশয়, মহানুভব এবং প্রেম ও দয়ার পূজারী। আর মইন ছিলেন অল-ফাদল-এর সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। রাজ্যের কোন লোককেই তিনি দিল্ থেকে মেনে নিতে পারতেন না। মেজাজ যেন সর্বদা তিরিক্ষী হয়েই থাকত। কেউ ছোটখাট কোন ভুলচুক বা গলতি করে ফেল্‌লে কঠিন শাস্তিদান করে কর্তব্য পালন করতেন। উজির অল-ফাদলকে তার আচার আচরণের জন্য সবাই যারপর নাই শ্রদ্ধা করত। কিন্তু মইনকে তার চেয়ে অনেক বেশী অশ্রদ্ধার চোখে দেখত সকলে।

এক সকালে সুলতানের দরবারে উজির ফাদল-এর তলব হ'ল। উজির কুর্নিশ সেরে সুলতানের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুলতান এবার বল্‌লেন—'বসরাহের বাজারে নাকি খুবসুরৎ সব ক্রীতদাসী আমদানি হয়েছে। তুমি যাও, পছন্দ করে একটি ক্রীতদাসী কিনে আনবে। খালি সুরৎই নয় স্ব'ভাব চরিত্রের দিকেও নজর দেবে।'

উজির অল-ফাদল খচ্চরের পিঠে চেপে চল্‌লেন সুলতানের হুকুম তামিল করতে। কোর্তার জেবে দশ হাজার মোহর সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটি কিন্তু উজির মইন-এর চোখে মোটেই সুবিধার মনে হ'ল না। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পিত হলে কার না গাত্রদাহ হয়?

বাজারে পৌঁছে অল-ফাদল ক্রীতদাসীদের দালালগুলিকে হেঁকে জড়ো করলেন। সুলতানের চাহিদার কথা জানালেন। দালালরা গম্ভীর মুখে বল্‌ল—'আপনি যেমন সুরৎ ও স্বভাব চরিত্রের কথা বলছেন সেরকম ক্রীতদাসী এ বাজারে পাওয়ার উপায় নেই। এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দামের ক্রীতদাসী এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিলেই পেয়ে যাবেন। ব্যস, এর বেশী কিছু আশা করা যায় না।'

—'ভাল কথা, এখানে যাদের জড়ো করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকেই বাছাই করে সবচেয়ে বেশী সুরৎ ও সভ্য ভব্য যে তাকেই আমার সামনে হাজির কর।'

দালালরা ছুটল ক্রীতদাসী বাছাই করতে। হন্যে হয়ে ঘুরে সবচেয়ে বেশী সুরৎ ও আচার আচরণ যার সবচেয়ে ভাল যে ক্রীতদাসী পেল তার দাম এক হাজার দিনারও নয়।

উজির অল-ফাদল-এর চোখে-মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। অল-ফাদল বল্‌লেন—'তবে উপায়?'

—'হুজুর এ-মাসের শেষের দিকে কিছু আচ্ছা আচ্ছা ক্রীতদাসী আসার কথা আছে। তখন না হয় খুঁজে পেতে সবচেয়ে সুরৎ যার বেশী মনে হবে তাকেই নিয়ে যাবেন।'

উজির অল-ফাদল দরবারে ফিরে গিয়ে সুলতানকে সব কথা বল্‌লেন—'ঠিক আছে, তোমাকে আরও কয়েক দিন সময় দিলাম। তবে খেয়াল থাকে যেন দুনিয়ার সেরা ক্রীতদাসী আনতে হবে।'

কয়েকদিন যেতে না যেতেই এক দালাল উজিরের কাছে এসে জানাল, 'সুলতান যেমন চাইছেন ঠিক সেরকম এক যুবতী ক্রীতদাসীর খোঁজ পাওয়া গেছে। তার স্বভাব চরিত্রও খুবই ভাল।'

—'বহুত আচ্ছা। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার যুবতী ক্রীতদাসীকে নিয়ে এস।'

এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই দালালটি এক তন্বী যুবতী ক্রীতদাসীকে তাঁর সামনে হাজির করল। লম্বা ধাঁচের চেহারা। উদ্ভিন্ন যৌবনা। নিতম্ব প্রশস্ত, কোমর সরু। স্তন যুগল খুবই সুগঠিত। যত্ন আত্তির ফলে একেবারেই নিটোল। ষোড়শী বা অষ্টাদশী হবে বড় জোর। হরিণের মত ডাগর ডাগর চোখ দু'টি। চপল চাপল তার চাহনি। গায়ের রঙ আপেলের মত। গাল দুটোর বৈশিষ্ট্য এই যে, সে হাসলে দু' গালে মনলোভা টোল পড়ে।
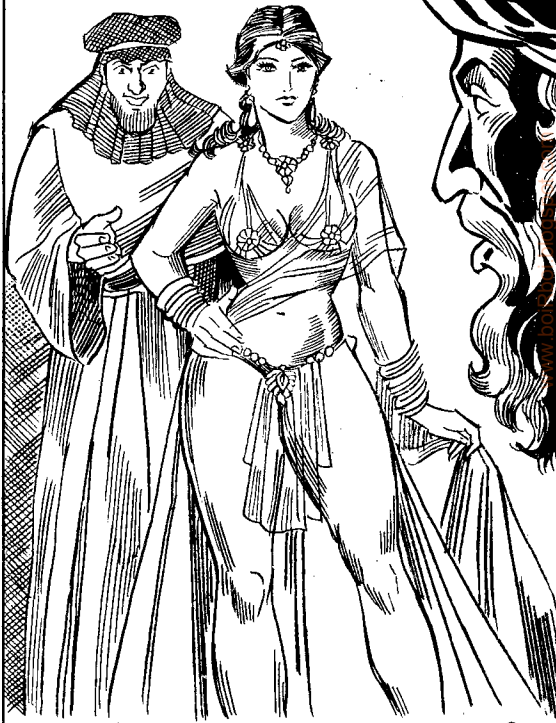
উজির অল-ফাদল ভাবলেন—এমন রূপের পসরা সাজিয়ে সুলতানের সামনে যুবতীটিকে হাজির করলে তাঁর কলিজাটি নির্ঘাৎ চনমনিয়ে উঠবে। সুলতান এমন রূপসী-যুবতীকে দেখলে অবশ্যই চিত্ত চাঞ্চল্য বোধ করবেন। উজির এবার তার নাম জিজ্ঞেস করলেন—'সুন্দরী তোমার নাম কি, বল তো?'

—'আনিস-অল-জালিস।'

উজির ক্রীতদাসীটির দাম জানতে চাইলে দালাল বল্‌ল—'দশ হাজার দিনার। এর মালিক এ দামই আমার কাছে দাবী করেছে।'

—'ঠিক আছে, এর মালিককে তলব কর। সে এলে তার হাতেই আমি দাম দেব।'

ক্রীতদাসীটির মালিক এল। ক্রীতদাসীটির জন্য সে-ও দশ হাজার দিনারই দাবী করল। এর দাম এত বেশী হওয়ার পিছনে কারণ দেখাল—'হুজুর, লেড়কিটির ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, আইন, দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে খুবই দখল রয়েছে। এমন সর্ব বিষয়ে পারদর্শিনী সচরাচর দেখা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, আজ পর্যন্ত এর চরিত্রে এতটুকুও কালির ছিটে পড়েনি। আবার হাস্যরস সম্বন্ধেও এর যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে।'

—'তোমার সব কথাই আমি বিশ্বাস করছি।' উজির অল-ফাদল তার হাতে দশ হাজার দিনার তুলে দিলেন।

ক্রীতদাসী যুবতীটির মালিক তার প্রাপ্য বুঝে পেয়ে বল্‌ল—'আমার একটি অনুরোধ আছে হুজুর। সুলতানের সামনে একে আজই হাজির করবেন না। পথশ্রমে এর রূপ সৌন্দর্য অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে। আট-দশদিন আপনার কাছে থাকতে দিন। এর মধ্যে এর হৃত-সৌন্দর্য ফিরে আসবে। তারপর সুলতান একে প্রথম দর্শন করলে দেখবেন এর রূপ-সৌন্দর্য কেমন ফুটে বেরোয়।

অল-ফাদল তার পরামর্শানুযায়ী কাজ করলেন। নিজের প্রাসাদের এক কক্ষে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অল-ফাদল-এর একটি যুবক লেড়কা রয়েছে। যেমন তার অনন্য সাধারণ রূপ ঠিক তেমনই বহুগুণের সমাবেশ ঘটেছে তার মধ্যে। তার নাম আলী নূর। আনিস-এর কথা কিছুই তার জানা নেই। শুধুমাত্র জানে টাকা দিয়ে কেনা এক ক্রীতদাসী। কিন্তু কার জন্য এবং কত টাকার বিনিময়ে এসব কিছুই সে জানে না।

এদিকে উজির আনিস'কে তার থাকার ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—'শোন বাছা, দশ - বারোদিন এখানে থেকে পথের ক্লান্তি দূর করে একটু তরতাজা হয়ে নাও। একটি কথা কিন্তু মনে রেখো, আমার এক যুবক ছেলে রয়েছে। হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। তার সুরৎ কিন্তু খুবই। নিজেকে একটু সামলে টামলে রেখো। যদি তার হাতে নিজেকে সঁপে দাও তবে কিন্তু সুলতানের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না। তার চোখ দুটোয় লেড়কি ভোলানো যাদু আছে। তার চোখের দিকে লেড়কিরা তাকালেই মহব্বতে পড়ে যায়। এ-তল্লাটের কোন লেড়কি তার হাত থেকে রেহাই পায় নি। তাই বলছি কি, সাবধানে থাকবে। এক খোজা বামন তোমার সব কাজ করে দেবে। তুমি ভুলেও ঘর থেকে বেরিয়ো না। তার চোখে যদি পড় তবেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে, খেয়াল রেখো। মজার কথা হচ্ছে, তাকে তোমার মন পাওয়ার জন্য প্রয়াসী হতে হবে না। তুমিই

সোৎসাহে নিজেকে তার হাতে সঁপে দেয়ার জন্য উন্মাদিনীর মত হয়ে যাবে।'

আনিস ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল।

নসীব। নসীবের ফের এড়াবার উপায় কি! পরদিন খোজা বামনটি আনিস'কে নিয়ে হামাম থেকে আতর মেশানো পানিতে গোসল করিয়ে নিয়ে এল। সোনার জরির কাজ করা কামিজ ও সালোয়ার পরিয়ে দিল। গায়ে মাখতে দিল বহুমূল্য প্রসাধন সামগ্রী। উজিরের বিবি তার রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। পঞ্চমুখে তার প্রসংশা করলেন। আদর - সোহাগও কম করলেন না।

আনিস অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্‌ল।

তাকে নিজের ঘরে বসিয়ে উজিরের বিবি হামামে গেলেন গোসল করতে। দুই খোজা পরিচারককে বলে গেলেন, কাউকে যেন তার কাছে আসতে না দেয়।

উজিরের বিবি ঘর ছেড়ে গেলে আনিস পোশাকের অনাবশ্যক অংশগুলি খুলে রেখে পালঙ্কে গা এলিয়ে দিল। তার ঠিক কিছুক্ষণ বাদেই আম্মার সঙ্গে দেখা করার জন্য নূর সে-ঘরের দিকে আসে। দরওয়াজায় পা দিতেই খোজা বামন দুটো তার পথ আগলে দাঁড়ায়। তারা বলে—'হুজুর, মালকিন তো নেই, হামামে গেছেন গোসল সারতে। ঘরে ছোট-মালকিন রয়েছেন, পাহারা দিচ্ছি।'

কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে নূর বল্‌ল—'ছোট মালকিন? সে আবার কে হে? কে, কোত্থেকে এনেছে?'

—'সে কী হুজুর, আপনি কিছুই জানেন না? উজির সাহেব সুলতানের জন্য খরিদ করে এনেছেন।'

নূর - এর কৌতূহল হ'ল। ঘরে ঢুকতে চায়। খোজা বামন দুটো বার বার অনুরোধ করে ঘরে না ঢোকার জন্য। সে জবরদস্তি ঘরে ঢুকলে মালকিন তাদের জান খতম করে দেবেন একথাও বলে।

নূর তাদের শত অনুরোধ ও কাকুতি মিনতির কিছুমাত্র মূল্য না দিয়ে সে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে।

আনিস খোজা বামনদের কথায় সচকিত হয়ে পড়ে। দরজায় উজিরের উচ্ছৃঙ্খল পুত্র নূর - এর আগমন ঘটেছে বুঝতে তার বাকি রইল না। উজির তো তাকে তাঁর পুত্ররত্নটি সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। বারবার বলেছেন, কিছুতেই যেন তার মুখোমুখি না হয়।

আনিস- এর অন্তরের অন্তঃস্থলে নূরকে একটিবার চোখে দেখার জন্য কৌতূহল হয়। জানতে ইচ্ছা করে, কি আছে তার চোখের তারায় যা দেখলে যুবতীরা পিয়ার মহব্বতে একেবারে মজে যায়? তবে এ-ও প্রতিজ্ঞা করে কিছুতেই নিজেকে তার হাতে সঁপে দেবে না। অতীতে বহু সুপুরুষই তো তার পিছন পিছন ঘুর ঘুর করেছে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সবাইকে সে দূরে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু নূর-এর মধ্যে এমন কি আছে যে, নিজেকে বশে রাখতে পারবে না! কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে সে দরওয়াজার পাল্লাটি সামন্য ফাঁক করে নূর'কে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তো যুবক নূর-এর চোখের দিকে তাকানো মাত্র তার কলিজাটি আচমকা কেমন যেন মোচড় মেরে ওঠে। রক্তে মাতন জাগে। মাথার স্নায়ুগুলো এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে ওঠে। মুহূর্তে আনিস যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। দরওয়াজা বন্ধ করে পালিয়ে যেতে গিয়েও থমকে গেল। পালাতে আর পারল না।

এদিকে নূর-ও আনিস-এর রূপ-সৌন্দর্য বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে লাগল। এমন রূপের জৌলুষ তামাম বসরাহ নগরে দ্বিতীয় কারো মধ্যে দেখা যাবে না। কত সব রূপসী - যুবতী বিবস্ত্রা হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বেচ্ছায় নিজের রূপ - যৌবন তার হাতে তুলে দিয়ে পুলকানন্দে ভেসেছে। কিন্তু এ-যুবতীটি যে একেবারেই অনন্যা।

আলি নূর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। অতর্কিতে দরওয়াজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। ভীতা - সন্ত্রস্তা হরিণীর মত আনিস ঝট করে দরওয়াজা থেকে সরে যায়। পালঙ্কের কাছে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। তাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বলতে মন থেকে উৎসাহও পাচ্ছে না। না পারে ফেলতে, না পারে গিলতে। এ কী বিষম দায়রে বাবা!

নূর এগিয়ে গিয়ে আনিস-এর মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার হাত বাড়িয়ে তার মুখটি তুলে ধরে বলে—'সুন্দরী, এমন করে নিজেকে সরিয়ে রেখো না। মুখ তোল। আমার দিকে তাকাও একবারটি।'

আনিস আবেগ-মধুর স্বরে উচ্চারণ করতে চায়—তা যে হবার নয়। তোমার আব্বা উজির সাহেবকে যে আমি কথা দিয়েছি, তোমার সংশ্রবে যাব না।' কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও সে এ ধরনের কোন প্রতিবাদ-বাক্য মুখে উচ্চারণ করতে পারল না।

আনিস চোখের ভাষায় নূর'কে বল্‌ল—'বোসো। আমার পাশে বোস।'

নূর তার সম্মতি পেয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে তার মনময়ূরী রূপ-সৌন্দর্যের আকর আনিস'কে দু'হাতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তার মুখের কাছে নিজের মুখটিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঠোঁটে ঠোঁট দুটো রেখে উন্মাদের মত ঘষতে থাকে। চুম্বন করে বার বার। চুম্বনে চুম্বনে আনিস-এর বুকে উত্তেজনামিশ্রিত রোমাঞ্চের সঞ্চার ঘটে। সর্বাঙ্গে জাগে এক অনাস্বাদিত শিহরণ।

নূর এবার এগিয়ে এসে দড়াম করে দরওয়াজাটি বন্ধ করে দেয়। খোজা বামন দুটো প্রমাদ গণে। এ কী সর্বনাশা কাণ্ড! মালিক জানতে পারলে যে তাদের জানে মেরে ফেলবেন।

নূর যখন কিছুতেই দরজা খুলে আনিস-এর কাছ থেকে বেরিয়ে
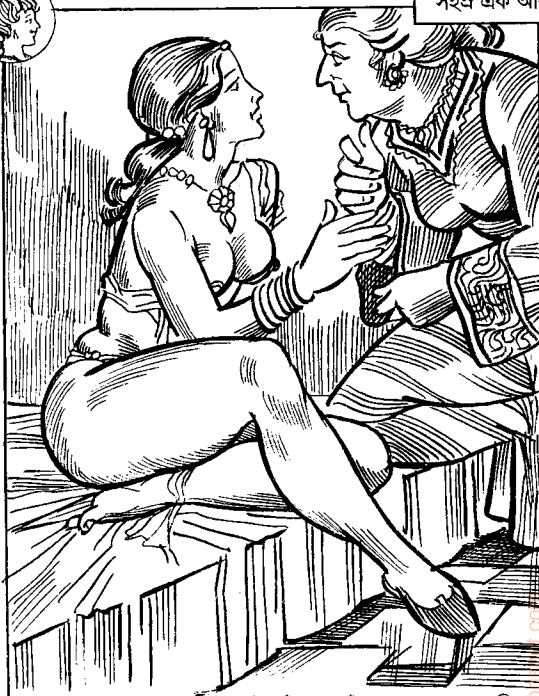
এল না তখন খোজা বামন দুটো কাঁদতে কাঁদতে তাদের মালকিন-এর কাছে গেল দুঃসংবাদটি দেবার জন্য। উজিরের বেগম তখন সবে গোসল সেরে হামাম থেকে বেরিয়েছেন।

খোজা বামনদের মুখে দুঃসংবাদটি শোনামাত্র উজিরের বেগম লম্বা লম্বা পায়ে ঘরে ফিরে এলেন। দরজার কাছে পৌঁছেই থমকে গেলেন। দেখেন, বিবস্ত্রা আনিস পালঙ্কের ওপর গা-এলিয়ে দিয়ে অবসন্নের মত পড়ে। তার চোখের তারায় তৃপ্তির ছাপ। মুখে আতঙ্ক।

উজিরের বেগম সচকিত হয়ে বলেন—'কি? কি হয়েছে বেটি?'

—'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার জীবনের পরম সম্পদ লুঠে নিয়ে দস্যু গা-ঢাকা দিয়েছে। আজ আমি নিঃস্ব-রিক্ত-সর্বশান্ত!'

—'তোমার এত বড় সর্বনাশ করে গেল, আর তুমি তা নীরবে হজম করলে? উজির সাহেব জানতে পারলে পরিস্থিতি কি হবে, ভেবে দেখেছ কি?'

—'আমি প্রবল আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু তিনি যে আমাকে অন্যরকম বোঝালেন—উজীর সাহেব নাকি গোড়াতে সুলতানকে ভেট দেবার জন্যই দশ হাজার দিনার দিয়ে আমাকে খরিদ করেছিলেন। কিন্তু পরে নাকি মনস্থ করেছেন, আপনার লেড়কার সঙ্গে আমার শাদী দেবেন। আমার অবস্থার কথা মেহেরবানি করে একবারটি বিবেচনা করে দেখুন। আমি অর্থের বিনিময়ে কেনা বাঁদী। হুকুম তামিল করাই আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।'

উজিরের বেগম দুঃখে-আতঙ্কে কপাল চাপড়াতে লাগলেন। উজিরকে কি বলবেন তাই নিয়ে তিনি ভেবে অস্থির হলেন। এতবড় একটি অন্যায়কে মুখ বুজে হজম করার পাত্র তিনি নন। কথাটি শোনামাত্র লেড়কার গর্দান নেওয়ার হুকুমই হয়ত দিয়ে বসবেন।

উজির ফাদল জরুরী কাজে অন্দর মহলে এলেন। বেগমের আঁখির পাতা ভেজা দেখে বিস্মিত হলেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার, কাঁদছ কেন? হয়েছে কি? হঠাৎ এমন কি ঘটল যে—'

বেগম আঁখি মুছতে মুছতে বললেন—'তোমার কাছে কিছুই লুকোবার ইচ্ছে আমার নেই। তুমি হলফ কর, আমি যে অনুরোধ করব তার বাইরে কোন কাজ করবে না। আমার কথা না রাখলে আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর থাকবে না।'

—'তুমি নির্দ্বিধায় তোমার বক্তব্য পেশ করতে পার। কথা দিচ্ছি, তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজই করব না।'

স্বামীর কাছ থেকে আশা পেয়ে বেগম এবার বেটা নূর-এর কীর্তির বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। লেড়কিটিকে ধাপ্পা দিয়ে সে তার ইজ্জত নষ্ট করেছে, এ-কথা বলতেও ভুললেন না।

সব শুনে উজির হায় হায় করে উঠলেন। কপাল চাপড়ে বলতে লাগলেন—'হায় আল্লাহ, এ কী করলে! সুলতানের কাছে আমি কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব!'

স্বামীকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বেগম বল্‌লেন—'বিপদের সময় এমন করে মুষড়ে পড়লে বিপদ তো আরও বেশী করে ঘাড়ে চাপবে! মনকে শক্ত করে বাঁধ। আমি দশ হাজার দিনার তোমাকে দিচ্ছি। সুলতানকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।'

—'দিনার নয়, ইজ্জতই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে! দশ হাজার দিনার জোগাড় করার মত ক্ষমতা কি আমার নেই? কথাটি শুনেই সুলতান নির্ঘাৎ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। আমাকে কোতল করার নির্দেশ দিয়ে বসাও কিছুমাত্র তাজ্জবের ব্যাপার নয় নূর-এর আম্মা!'

—'মিছেই তুমি ঘাবড়ে গিয়ে এমন কাহিল হয়ে পড়ছ। সুলতান তো আর আনিস-এর কথা কিছু জানেন না। আমি, তুমি, নূর আর আনিস ছাড়া ব্যাপারটি তো আর অন্য কারোরই জানা নেই। আমরা ফাঁস না করলে কাক পক্ষীও জানতে পারবে না। আর উজির মইন-এর কথা যদি ভাব যে, সে সুলতানের কানে বিষ ঢেলে তাকে উত্তেজিত করে তুলবে তারও কোন সম্ভবনা নেই। সে-ও তো আনিস-এর কথা জানে না। জানতেও পারবে না কোনদিন।'

বেগমের কথায় উজির ফাদল কিছুটা আশ্বস্ত হলেন বটে, তবু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বল্‌লেন—'তুমি কি ভাবছ, উজির মইন-এর কানে কথাটি কোনদিন যাবে না? বাতাসেরও কান আছে। সে ঠিকই

কোনদিন না একদিন আমাদের গোপন কথা টের পেয়ে যাবে। সে যে অহরহ সর্বনাশের ধান্দায় সর্বদা নিজেকে লিপ্ত রাখে।'

এমন সময় প্রাসাদের বাইরের বাগানে পাখির কলরব শুনে বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন, ভোরের আলো ফুটে উঠতে আর দেরী নেই। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তেত্রিশতম রজনী

বাদশাহ্ শারিয়ার যথা সময়ে অন্দর মহলে বেগম সাহেবার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, উজির ফাদল তাঁর বেগমকে বল্লেন, নূর-এর আম্মা, উজির মইন আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা যে-কোন উপায়েই হোক বের করবেই। আর তা সুলতানের কানে পৌঁছে দিতে অবশ্যই কসুর করবে না।'

বেগমের পরামর্শে উজির ফাদল কিন্তু বরাত ঠুকে শেষ পর্যন্ত রূপসী যুবতী আনিস'কৈ নিজের প্রাসাদেই রেখে দিলেন। আদতে তাঁর বেটা নূর-এর কথা ভেবেই তাকে এমন একটি বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁদে পা দিতে হ'ল। সে দিন দিনই কেমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। এমন এক রূপসী ও সর্বগুণান্বিতা লেড়কিকে যদি তার গলায় লটকে দেওয়া যায় তবে হয়ত তার বহির্মুখী মন ঘরে বাঁধা পড়বে। আবার লেড়কিটির কথাও কম ভাবেন নি। সুলতানের হারেমে হাজার অনেক বেগম রয়েছেন। আনিস গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে সংখ্যা একটি বাড়বে। ব্যস, এ পর্যন্তই। বুড়ো সুলতান দু'-চারদিন নাড়াচাড়া করে ডাবের খোসার মত তাকেও হারেমে অন্যান্যদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। একটি লেড়কির রূপ-যৌবন চিরদিনের মত খতম হয়ে যাবে।

বেগম বল্লেন—'জাঁহাপনা, বেটার এখন উমর হয়েছে। শাদী দিয়ে সংসারী করার চেষ্টা করতে হবে। নইলে তার বাইরের ঝোঁক কমবে না। আনিস পরমা সুন্দরী, অষ্টাদশী। তার ওপর তার মধ্যে বহুগুণের সমাবেশ ঘটেছে। তামাম দুনিয়া খুঁজে এমন সর্বগুণান্বিতা দ্বিতীয় আর একটি লেড়কি পাবে না। তোমার বেটাও তো তাকে খুবই পছন্দ করে। তাই বলছি কি, তাদের চার হাত এক করে দাও। তারা সুখে ঘর করুক। আমাদের মাথা থেকেও দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে যাক।'

উজির কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। নূর অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল। উজির তার বেটার জন্য ঠায় বসে রইলেন। বেটাকে যেতে দেখে দাঁড় করালেন। তখনও তার মন থেকে ক্ষোভ-অপমানের জ্বালা পুরোপুরি মুছে যায় নি।

নূর তার আব্বাকে সামনে দেখে সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কৃতকর্মের ভীতি তার মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে। তাই আব্বাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই দুম্ করে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। নিজের কাজের জন্য বহুভাবে মাফ চাইতে থাকে।

বেটার কান্না দেখে উজিরের মন গলে যায়। তিনি হাত বাড়িয়ে বেটাকে বুকে তুলে নিলেন। সস্নেহে বল্লেন—'বেটা, এখন আর তুমি সেই ছোট্টটি নও। উমর হয়েছে। নিজের ভাল-মন্দ বোঝার মত জ্ঞানও তোমার যথেষ্টই হয়েছে। এবার বিয়ে শাদী করে ঘর বাঁধ। আমার সম্পত্তি ও কিছু ধন-দৌলত রয়েছে; ধীরে ধীরে বুঝে নাও। আনিস আমার ঘরে বহু হয়ে আসার যোগ্যা বটে। তার রূপ-যৌবন, ও নানা গুণ রয়েছে যা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে মধুময় করে তুলতে সক্ষম হবে। তোমার সঙ্গে তার শাদী দেয়ার পরিকল্পনা আমি ও তোমার আম্মা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি। তবে আমার বিশেষ নির্দেশ থাকবে শাদীর পর কিন্তু আমি আর তোমার কোনরকম বদখেয়ালকে বরদাস্ত করব না। তোমার বর্তমানের যত বেলেল্লাপনা সব ছেড়েছুড়ে মনকে ঘরমুখী করতেই হবে।'

নূর তার আব্বার কথায় সম্মতি দেয়।

উজির অল-ফাদল-এর প্রাসাদে শাদীর রোশনাই। মহাধূমধাম করে তিনি লেড়কার শাদী দিলেন।

এদিকে উজির ফাদল দশ হাজার দিনার দিয়ে অন্য একটি খুবসুরৎ লেড়কি হাট থেকে খরিদ করে আনলেন। তাকে সুলতানের প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

কুচক্রী উজির মইন তলে তলে সব খবর সংগ্রহ করে ফেল্লেন। কিন্তু তিনি মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন। উপযুক্ত সুযোগের প্রত্যাশায় প্রহর গুণতে লাগলেন। তিনি ভালই জানেন, উজির ফাদল বর্তমানে সুলতানের সুনজরে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলে সুলতানের কান ভারী করতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারা। অতএব সুযোগ চাই। উপযুক্ত সুযোগের জন্য ধৈর্য ধরতেই হবে।

সুযোগ সন্ধানী উজির মইন-এর হাতে সুযোগ আসতে বেশী দেরী হ'ল না। অল-ফাদল কঠিন বিমারিতে পড়লেন। শয্যাশায়ী। মাত্র দু' দিন টিকেছিলেন। তারপরই বেহেস্তের পথে পা বাড়ালেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে লেড়কাকে কাছে ডাকলেন। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন—'বেটা, আমার বেহেস্তের ডাক এসেছে। এবার দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতেই হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে চলবে। আর একটি কথা, আনিস বস্তুত আচ্ছা লেড়কি। রূপ-যৌবন ছাড়া অগাধ বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারিণীও বটে। চলার পথে সমস্যার মুখোমুখি হলে তার বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে ভুল কোরো না যেন। নসীবকে মেনে চলবে। আল্লাহ-র ওপর আস্থা রেখে দিন গুজরান করবে।'

সুলতানের উজির অল-ফাদল দেহরক্ষা করেছেন। বসরাহ

নগরীতে শোকের ছায়া নেমে এল। নূর আড়ম্বরের সঙ্গে আব্বার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করল। তার বিবি আনিস সর্বদা তার কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে সব কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে ব্যবস্থা করল।

আব্বার মৃত্যুর পর নূর-এর মধ্যে আশাতীত পরিবর্তন লক্ষিত হ'ল। খানাপিনা ধরতে গেলে তার উঠেই গেছে।

এক সকালে নূর তার ঘরে বসে আব্বার স্মৃতিচারণে মগ্ন। এমন সময় দরওয়াজার কড়া নাড়ার শব্দ তার কানে এল। দরওয়াজা খুলতেই তার সমবয়সী এক নওজোয়ান ঘরে ঢুকে এল। তার বাবার দোস্তের লেড়কা। সে সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে নূরকে বল্ল—'দোস্ত, এমন করে ভেঙে পড়লে কি করে চলবে বল দেখি? দুনিয়ায় কেউ-ই চিরদিন থাকে না। দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আজ না হোক কাল সবাইকে দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। শোক না করে বরং একে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেওয়া উচিত।'

নূর কিন্তু সব বুঝেও যেন কিছুই বোঝে না। সে আব্বাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। তার দোস্ত এবার বল্ল—'তুমি বরং এক কাজ কর, সব ইয়ার দোস্তদের একদিন ডেকে খানাপিনা করাও। এতে শোক তাপ কিছুটা কেটে গিয়ে দিল হাল্কা হতে পারে।'

নূর ভাবল, পরামর্শটি মন্দ নয়। এতে সবার সঙ্গে মোলাকাতও হবে। হাসি-মস্করার মধ্যে মনের তাপ-জ্বালা হাল্কা হতে পারে। আলি তা-ই মনস্থ করল।

জিগরী দোস্তের পরামর্শে আলী নূর সেদিন সন্ধ্যাতেই ইয়ার দোস্তদের নিমন্ত্রণ করল।

নূর-এর নির্দেশে পরিচারক-পরিচারিকারা বাড়িটিকে সুন্দর করে সাজাল। প্রত্যেকটি কামরাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এমন করে তোলা হ'ল যেন কোন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই ইয়ার দোস্তরা এক এক করে নূর-এর বৈঠকখানায় জড়ো হতে লাগল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চল্ল নাচা-গানা হৈ হুল্লোড় আর খানাপিনা। জিন্দেগীকে আজ যেন সে নতুন করে উপভোগ করল।

আলী নূর আগেকার সে হাসি-আনন্দময় জীবন ফিন ফিরে পেল। এবার থেকে প্রায় প্রতি রাত্রেই সে পালা করে সওদাগর ইয়ার দোস্ত ও আমীর ওমরাহদের নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ি আনতে লাগল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে খানাপিনা, নাচা-গানা আর হৈ হুল্লোড়।

আনিস-এর কিন্তু প্রথম থেকেই স্বামীর এসব কাজে আপত্তি ছিল। তার যুক্তি আমীর-বাদশাহদেরই এসব মানায়। তার পক্ষে অবশ্যই নয়। তাই এসব বন্ধ করতে পরামর্শ দিল। নইলে অচিরেই পথের ভিখারী বনে যেতে হবে এরকম কথাও সে বলতে ভোলে নি।

নূর কিন্তু তার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। সে বরং বলে আমি উজিরের বেটা, এসব একটু-আধটু না করলে ইজ্জত থাকবে কেন? আর সমাজে মান-ইজ্জতই যদি না থাকে তবে দুনিয়ায় থাকা আর না থাকা দু'-ই সমান। আর অমীর-ওমরাহদের হাতে রাখলে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেকে লিপ্ত করে আয়-উপার্জন কোন ব্যাপারই নয়।

কিছুদিনের মধ্যেই তার বিবি আনিস-এর কথাই বাস্তব রূপ নিল। নূর-এর জেব ফাঁকা। ইয়ার দোস্তদের নিয়ে মজলিস বসানো তো দূরের কথা তার এখন নিজের সংসারই অচল হয়ে পড়ল। কিন্তু ইয়ার দোস্তদের ঢেউ বন্ধ হ'ল না। তারা রোজ সন্ধ্যা হতে না হতে তার বাড়ির বৈঠকখানায় এসে জড়ো হতে থাকে। সে উপায়ান্তর না দেখে একদিন দোস্তদের কাছে নিজের আর্থিক পরিস্থিতির কথা বলে। পরামর্শ চায় কি করে অর্থোপার্জন করে সংসারের দুরবস্থা ফেরাতে পারবে।

নূর-এর দোস্তরা সবাই একথা-সেকথা বলে কেটে পড়ে। ইয়ার-দোস্তরা বিদায় নিলে তার বিবি আনিস সে-ঘরে এল। সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সবই শুনছিল। এবার স্বামীর গায়ে-মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বল্ল—'এখন আর ভেবে দিলকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। এ যে ঘটবে আমি তো আগেই বহুবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। দুনিয়ার নিয়মই তো এ-ই। দুর্দিনে কোন দোস্তকেই কাছে পাবে না।'

নূর বলে—'এরা মুখ ঘুরিয়ে বলে গেলেও আমার সব দোস্তরা অবশ্যই এরকম আচরণ করবে না। কোন কোন দোস্ত আছে যারা

আমার জন্য জান কবুল করতেও কসুর করবে না।'

—'শোন, তোমার সব দোস্তকে আমি দেখি নি বটে। তাদের চরিত্র সম্বন্ধেও আমি অজ্ঞ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজ এ দুঃসময়ে সবার কাছ থেকেই একই আচরণ পাবে।'

নূর আর কথা বাড়াল না। তখনকার মত প্রসঙ্গটি সেখানেই চাপা পড়ে রইল।

পরদিন কাক-ডাকা সকালে আলী নূর এক দোস্তের ঘরে গেল। নিগ্রো দাসীকে দিয়ে খবর পাঠাল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এসে গম্ভীর মুখে বল্‌ল—'মনিব বল্‌লেন, তিনি বাড়ি নেই।'

নূর আশাহত দিল্ নিয়ে অন্য আর এক দোস্তের বাড়ি গেল। তার কাছ থেকেও একই রকম আচরণ পেল। একের পর এক করে দশ দশজন দোস্তের দরজায় দরজায় সে ঢুঁড়ে বেড়াল। খালিহাতেই সবার কাছ থেকে ফিরতে হ'ল। কিন্তু এদিকে তার ঘরে একটিও দানা নেই। দুপুরে হাঁড়ি চাপানো সংস্থান পর্যন্ত নেই। এখন উপায়? খালি হাতে সে বিবির সামনে গিয়ে কোন্ মুখে দাঁড়াবে।

আলী নূর ঘরে ফিরলে আনিস ম্লান হেসে বল্‌ল—'কি, তোমাকে আমি বলিনি, দোস্তদের কাছ থেকে কেমন আচরণ তুমি পেতে পার?' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বল্‌ল—'দামী ও অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যা আছে কিছু কিছু বেচে দাও।' নূর করলও তা-ই। কিন্তু বসে খেলে বাদশার ধন দৌলতও দু' দিনে ফুরিয়ে যেতে বাধ্য।

নূর অর্থোপার্জনের কোন ফিকির করতে না পেরে একদিন চোখের পানি ঝরাতে থাকে। আনিস সেখানে হাজির হয়। স্বামীর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—'পুরুষ মানুষকে কাঁদতে নেই। এতে তো জনানাদের একচেটিয়া অধিকার। তুমি তো জানই আমার রূপের জৌলুষ দেখে তোমার আব্বাজী একদিন আমাকে দশ হাজার সোনার দিনার দিয়ে কিনেছিলেন। আমি মনে করি এখন তার চেয়ে খুব কম দাম পাবে না। সে অর্থ দিয়ে বাণিজ্য কর। দু' দিনে তোমার হালৎ ফিরে যাবে। আমাদের পেয়ার-মহব্বতে কোনদিনই ঘাটতি হবে না। আল্লাহ-র দোয়া থাকলে আমরা একদিন না একদিন আবার মিলিত হবই।

আলী নূর বিবির কথায় সচকিত হয়ে ওঠে। তাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বলে—'তা হয় না মেহবুবা। তোমাকে হারিয়ে জান বাঁচবে না আমার। শান্তির তাগিদে আমাকে জান দিতে হবে।'

আনিস তবু একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়েই নূর তার কলিজা আনিসকে বাজারে নিয়ে গেল। ক্রীতদাসীদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিল। বসরাহ-র ক্রীতদাসীর বাজার তামাম দুনিয়ার মধ্যে সেরা। দুনিয়ার বাদশাহ, সুলতান, উজির আর আমিররা এখান থেকে তাদের মন পছন্দ্ ক্রীতদাসী কিনে নিয়ে গিয়ে তাদের রূপ-যৌবন ভোগের মাধ্যমে জিন্দেগী সার্থক করে তোলে। এখান থেকেই আনিস উজিরের বাড়ি যায়। তার লেড়কা নূর-এর কণ্ঠলগ্না হয়। আবার একই উদ্দেশ্যে, তাকে এসে বসরাহ-র বাজারে ক্রীতদাসীদের সারিতে আজ দাঁড়াতে হয়। একেই বলে নসীব। খোদাতাল্লার মর্জি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-দালালটি সেখানে হাজির হয়। আনিস'কে দেখেই চিনতে পারে। মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে সে নূরকে বলে—'হুজুর, আপনি একে পেলেন কোথায়? উজির সাহেব তো একে সুলতানের বাঁদী করার জন্য আমারই কাছ থেকে খরিদ করেছিলেন। দাম পেয়েছিলাম পুরো দশ হাজার দিনার। কিন্তু হাত বদলে এ আপনার হাতে এল কি করে?'

নূর অতর্কিতে তার মুখ চেপে ধরে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে—'আরে করছ কি ভাইয়া! এর নাম আনিস-ই বটে। কিন্তু সুলতান যে বাঁদী করার জন্য কিনেছিলেন কারো কাছে ফাঁস কোরো না। তোমাকে আসল ঘটনা খুলে বলছি, আমার শত্রুর অভাব নেই। কাছে এসো। আমাদের গোপনে সব কাজ সারতে হবে। আজ আমার দিন গুজরান করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন ফন্দি ফিকির করতে না পেরেই তো একে বাজারে এনে দাঁড় করিয়েছি। এ আমার কলিজার সমান, আশা করি অনুমান করতে পারছ?'

দালালটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'হুজুর, সবই খোদাতাল্লার মর্জি। সবই নসীব। নসীবকে এড়াবেন সাধ্য কি? আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। আমি সবচেয়ে বেশী দামে একে বেচার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আপনি মুখ বুজে থাকবেন দাম দস্তুর যা করার আমিই করছি।'

দালালটি এবার আনিস'কে পছন্দমত এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে গলা ছেড়ে তার গুণগান করতে থাকে। 'বেহেস্তের হুরী তামাম দুনিয়া ঢুঁড়েও এমন আর একটি লেড়কি মিলবে না।'এর শরীরে যেমন রূপের বাহার তেমনি বহুগুণে গুণান্বিতাও বটে। একমাত্র জহুরীই রতন চিনতে পারে। পছন্দ করার মত নজর থাকা চাই। সমঝদার আদমী ছাড়া এর কদর বুঝবে না।' এমন আরও বহু কথা বলে দালালটি চিল্লাতে লাগল।

দালালটির কথায় মজে গিয়ে এক বণিক এগিয়ে এল। বোরখার নাকাবটি তুলে দেখল। প্রথম দর্শনেই তার দিল মজে গেল। ব্যস, হেঁকে বসল চার হাজার সোনার মোহর। দালালের মন ভরল না।

সুলতানের উজির মইন তখন বাজারে ক্রীতদাসী পছন্দ করে বেড়াচ্ছেন। হাঁটতে হাঁটতে আনিস-এর কাছে এলেন।

উজির মইন'কে দেখেই দালালটি নতজানু হয়ে কুর্নিশ করল। মইন বল্‌লেন—'এ ক্রীতদাসীটিকে আমি খরিদ করতে চাই। দাম কত?'

—'হুজুর, এক বণিক চার হাজার সোনার দিনার দাম হেঁকেছে। আপনি এবার মেহেরবানি করে বলুন, কি দাম দেবেন?'

—'আমি সাড়ে চার হাজার সোনার দিনার দিচ্ছি।'

আনিস সেদিনের সেরা ক্রীতদাসী। ঠিক মত নিলাম হলে চড় চড় করে দাম উঠত। কিন্তু বদমেজাজী উজির মইন-এর ভয়ে কেউ আর দাম হাঁকতে কোশিস করল না, সাহস পেল না।

উজির মইন এবার বল্‌লেন—'আর কোন কথা নয়। পুরো সাড়ে চার হাজার সোনার মোহরই পাবি। ক্রীতদাসীটিকে আমার ওখানে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

আলী নূর কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে সবই শুনল। মাত্র সাড়ে চার হাজার সোনার দিনার দাম শুনে তার দিল মোচড় দিয়ে ওঠে। দালালটি বোঝায়—'হুজুর, আপনার বিবির ওপর শকুনের নজর পড়েছে। নেকড়ের মত একবার যখন নচ্ছারটি এর দিকে থাবা বাড়িয়েছে তখন এর বেশী দাম ও দেবে না। আবার খরিদ না করে হতাশ হয়েও ফিরবে না। সে আপনার আব্বাজীর সঙ্গে জিন্দেগী ভর শত্রুতা করে গেছে। তার কোনই ক্ষতি করতে পারেন নি। আজ তিনি বেহেস্তে। আর শয়তান মইন সুলতানের দরবারে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছেন। দুনিয়াকে সরা জ্ঞান করছেন। তাঁর সঙ্গে আপনারা বিবাদ করতে পারেন বটে, কিন্তু আমি নাচার হুজুর। হেরফের কিছু করতে গেলে আমার ধড় থেকে গর্দান নামিয়ে দেবে।'

নূর হতাশার স্বরে বলে—'তবে এখন উপায়? যদি উচিত দামই না পেলাম, বেঁচে থাকার মত ফিকিরই যদি নাই হয় তবে আর আমার বিবি, আমার কলিজাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে যাব কেন?'

—'দর দস্তুর হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। বেফাঁস কিছু করতে গেলে উজির মইন আমাকে জানে খতম করে দেবে।' মুহূর্তকাল ভেবে দালালটি এবার বল্‌ল—'হুজুর, একটি ফন্দি করা যেতে পারে। আমি যখন একে নিয়ে উজিরের বাড়ির দিকে যেতে থাকব তখন আপনি ছুটে গিয়ে খপ্ করে এর হাত চেপে ধরবেন। বল্‌বেন—'হতচ্ছাড়ি, চল্‌লি কোথায়? তুই কি ভেবেছিস, আমি সত্যিই তোকে বেচে দেয়ার জন্য বাজারে নিয়ে এসেছি! আর যাতে ঝগড়া, খিটমিট না করিস, আমার ওপরে হাত না চালাস সে জন্যই একটু ভয় ডর দেখাতে এনেছিলাম। আর কোনদিন যদি বে-ফাঁস কিছু করিস তবে কিন্তু সত্যি সত্যি বাজারে বেচে দিয়ে যাব। খুব হয়েছে, এখন বাড়ি চল—এমন সব কথা বলবেন হুজুর।'

নূর বল্‌ল—'জব্বর ফন্দি বাৎলেছ দোস্ত! ঠিক আছে, তোমার কায়দা-কৌশলকেই কাজে লাগাব।'

দালালটি আনিস'কে নিয়ে উজির মইন-এর বাড়ির দিকে সবে দু' পা এগিয়েছে অমনি নূর ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার গালে আলতো করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বল্‌ল—'হারামজাদী! বজ্জাত মাগী কাঁহাকার! চলেছিস কোথায় শুনি? কিলিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে দেব বলে দিচ্ছি! জিন্দেগী ভর অনেক জ্বালিয়েছিস, হাড্ডি পোড়া পোড়া করে ছেড়েছিস। আর যদি কোনদিন বেলাল্লাপনা করিস তবে সত্যি সত্যি তোকে বাজারে বেচে দিয়ে যাব। আজ তোর গোস্তাকী মাফ করে দিচ্ছি বটে। ভবিষ্যতে এরকম হলে তোর নসীব সত্যি সত্যি এ বাজারে নিয়ে আসবে, মনে রাখবি।' কথা বলতে বলতে নূর আনিস'কে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে।

ব্যাপার দেখে মইন এগিয়ে এসে ধমকের স্বরে বলে—'আরে, এ হচ্ছে কী! একে নিয়ে কোথায় চল্‌লে হে? আমি সাড়ে চার হাজার সোনার দিনারের বিনিময়ে একে খরিদ করে নিয়েছি।'

—'ঘরের বিবিকে বাজারে বেচতে হবে এরকম হালৎ এখনও হয় নি আমার।'

—'বকবকানি রাখ বাছাধন। তোমার সংসারের হালতের কথা আমার আর জানতে বাকী নেই। হাড়িতে ছুঁচো ডিগবাজী খাচ্ছে। দিন গুজরান করাই তোমার এখন দায়। যাক, হুজ্জতি বাঁধাবার কোসিস না করে মানে মানে এখান থেকে কেটে পড়। আমি সাড়ে চার হাজার সোনার দিনার দিয়ে খরিদ করেছি। একে আমার ঘরেই নিয়ে যাব।' কথা বলতে বলতে তিনি আনিস-এর দিকে হাত বাড়ান।
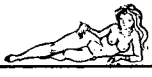
আলী নূর তাঁর হাতটি চেপে ধরে বলে—'ঝামেলা করবেন না। শুধুহাতেই বাড়ি ফিরে যান, বলে দিচ্ছি।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি ধস্তাধস্তি। উজির আর উজিরের লেড়কার বিবাদ। এর মধ্যে বাজারের সাধারণ আদমীরা নাক গলাতে চাইল না। তারা বিপদ এড়াতে মানে মানে সরে পড়ল সেখান থেকে।

এদিকে যুবক নূর-এর সঙ্গে বৃদ্ধ উজির হাতাহাতি করে টিকতে পারবেন কেন। ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই সে উজিরকে সমানে কিল-চড়-লাথি মারতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উজির পথের ওপর পড়ে যায়। সংজ্ঞা

হারিয়ে এলিয়ে পড়ে। নূর এবার শান্ত হ'ল। সে বিবি আনিসকে নিয়ে ঘরের দিকে হাঁটা জুড়ল।

কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পর উজির মইন সংজ্ঞা ফিরে পান। উঠে বসেন। কামিজ, পাতলুন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। হাত-পাও ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। খুন ঝরছে। উঠে গা থেকে ধুলো ঝাড়লেন, কোনরকমে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সুলতানের দরবারে হাজির হলেন।

সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান-এর গোড় দুটো চেপে ধরে উজির মইন কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'জাঁহাপনা, আমি আপনার উজির। আমার গায়ে হাত তোলার অর্থ হচ্ছে, আপনার ইজ্জৎ নষ্ট করা। আপনি আলী নূর'কে সিপাহী পাঠিয়ে পিঠ মোড়া করে বেঁধে দরবারে হাজির করুন। বিচার করে উচিত শাস্তি দিন। নইলে সে কিন্তু আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতেও পিছ পা হবে না।'

সুলতান উজির মইন-এর মুখে সব কিছু শুনে হঠাৎ এরকম ঘটনার কারণ জানতে চাইলেন।

উজির মইন আসল ঘটনার সঙ্গে সাধ্যমত খাদ মিশিয়ে সুলতানের কাছে পেশ করলেন। তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন—'জাঁহাপনা, আমি ক্রীতদাসীর বাজারে গিয়েছিলাম বেহেস্তের হুরী পেলে আপনার জন্য খরিদ করে আনব। আপনাকে ভেট দেব। হঠাৎ এক খুবসুরৎ লেড়কি দেখেই দিলটি দুর্বল হয়ে পড়ল। নাকাব সরিয়েই চিনতে পারি। আপনার হয়ত স্মরণ আছে, একবার উজির অল-ফাদল'কে দশ হাজার সোনার মোহর দিয়ে এক ক্রীতদাসী খরিদ করার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। এ খুবসুরৎ লেড়কিকে তিনি তখন খরিদ করে আনেন। তামাম আরব দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও এমন দ্বিতীয় আর একটি লেড়কি মিলবে না। উজির অল-ফাদল কিন্তু লেড়কিটিকে আপনার জন্য খরিদ করলেও আপনাকে না দিয়ে গোপনে তাঁর প্রাসাদে রেখে দিলেন। অন্য একটি ক্রীতদাসী খরিদ করে আপনাকে ভজিয়ে দেন। তারপর একে তার বেটা নূরের সঙ্গে শাদী দেয়। এখন অভাবের দায়ে নূর একে বেচার জন্য বাজারে নিয়ে যায়। নিলাম হয়, সাড়ে চার হাজার সোনার দিনার দাম হেঁকে আমি খরিদ করে নেই। জাঁহাপনা, আপনাকে ভেট দেওয়ার জন্যই আমি খরিদ করেছিলাম তামাম আরব দুনিয়ার সবচেয়ে সুরৎ লেড়কিটিকে। শেষমেষ আলী নূর বেগড়া বাঁধায়। মত পাল্টে বলে কিনা বেচবে না। আমাকে খিস্তি খেউড় করে। সে বলতে চায় প্রয়োজনে কোন খ্রীস্টান বা ইহুদীর কাছে সস্তাদামে তার বিবিকে বেচতে রাজি লেকিন সুলতানকে এক লাখ দিনারের বিনিময়েও দেবে না। আমি পীড়াপীড়ি করলে সে রেগেমেগে বলে—আপনি নাকি বুড্ডা। গোরে যাবার সময় হয়েছে। এরকম আদমির পক্ষে তার বিবির কদর দেওয়া সম্ভব নয়। জাঁহাপনা, আমার একটি মাত্র কসুর ছিল আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, সুলতানকে এরকম অকথ্য ভাষায় কথা বলা সঙ্গত নয়। ব্যস, আর যাবে কোথায়। আলী নূর গুলি খাওয়া শেরের মত আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। হেঁচকা টানে খচ্চরের পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে সমানে কিল-চড়-লাথি মারতে থাকে। আমি বুড্ডা হয়েছি। তার ওপর সুলতানের উজির। পথের মাঝে মারদাঙ্গা করতে গেলে আমারই ইজ্জৎ যাবে। তাই মার খেয়েও বদলা নেয়ার কোসিস থেকে বিরত থাকলাম। সে আরও সুযোগ পেয়ে গেল। পিটতে পিটতে আমাকে বেহুঁস অবস্থায় ফেলে রেখে লেড়কিটিকে নিয়ে ভেগে গেল। আর আমার অবস্থা

তো দেখছেনই।'

সুলতান মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে মুখ খুল্‌লেন—'আপনার সঙ্গে দেহরক্ষী ছিল না? তারা কি দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল?'

—'ছিল জাঁহাপনা। আমি উজির বটে। আবার আলী নূরও তো উজিরের বেটা। তার খাতিরও তো আপনার সুলতানিয়তে কম নয়। তাছাড়া কে না জানে জাঁহাপনা সে এক সময় নামকরা এক মস্তান ছিল। এসব কথা বিবেচনা করে তারা নীরব দর্শক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।'

—'এক কাজ করুন। চল্লিশজন সিপাহী পাঠিয়ে দিন আলী নূরকে বন্দী করে দরবারে হাজির করবে। আর তার বিলকুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করে দিন। আর সে খুবসুরৎ লেড়কিটিকেও যেন দরবারে নিয়ে আসে।'

উজির মইন-এর মুখে শয়তানের হাসি ফুটে উঠল। সে যা চেয়েছিল পেলও তা-ই।

এদিকে সুলতানের দরবারের এক নওজোয়ান পারিষদ সুলতানের হুকুমটি শোনামাত্র ইতিমধ্যেই সবার চোখের আড়ালে দরবার ছেড়ে যায়। আলী নূর-এর আব্বা একে খুব পিয়ার করতেন। আলী নূর-এর জিগরী দোস্তও বটে।

ইতিমধ্যে, আলী নূর-এর বেগম, ঘটনার নায়িকা আনিস উজির মইন-এর ব্যাপারটি নিয়ে বড়ই দুর্ভাবনায় পড়েছে। ঘটনাটি যে ওখানেই মিটে যায় নি, ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে—নূরকে বোঝাতে লাগল।

এমন সময় সে-নওজোয়ান পারিষদটি ছুটতে ছুটতে গিয়ে আলী নূর-এর বাড়ির কড়া নাড়ল।

দরওয়াজার কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে নূর দরওয়াজা খুলতে এগোয়। আনিস আতঙ্কিত হয়ে বলে—'আমার মন বলছে সুলতানের ফৌজ তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তুমি পিছনের দরওয়াজা দিয়ে পালাও।' নূর পাত্তা দেয় না।

শেষ পর্যন্ত আনিস নূরকে ভেতরের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই দরওয়াজা খুলতে চায়। নূর রাজি হয়।

আনিস দরওয়াজা খুলে দেখে নূর-এরই জিগরি দোস্ত।

আগন্তুক নওজোয়ানটি বল্‌ল—'সুলতান আপনাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিয়ে সিপাহী পাঠাচ্ছেন। যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে ভেগে যান। এই নিন চল্লিশ দিনার। এ দিয়ে যতদূর সম্ভব চলে যান। শয়তান মইন নিজে সিপাহীদের সঙ্গে রয়েছেন। শীঘ্র ভেগে যান।'

আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। নূর তার বিবি আনিসকে নিয়ে পিছনের দরওয়াজা দিয়ে পথে নামল। গলি ঘুপছি দিয়ে বসরাহ বন্দরে হাজির হ'ল।
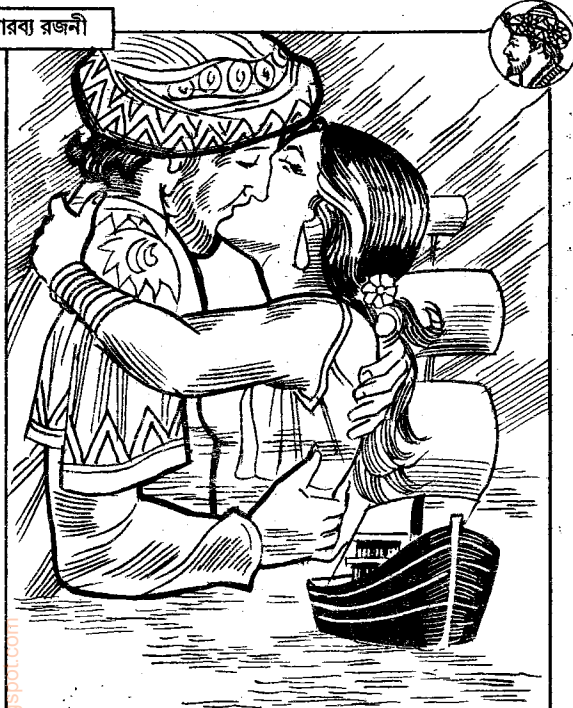
নূর তার বিবিকে নিয়ে বাগদাদগামী জাহাজে চেপে বসল। এদিকে উল্লসিত উজির মইন সিপাহী নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে উজির অল-ফাদল-এর বাড়ি এসে মুষড়ে পড়লেন। দেখেন চিড়িয়া ভাগ গিয়া। রাগে-দুঃখে-অপমানে তিনি ক্ষেপা কুত্তার মত হয়ে গেলেন, বাজখাই গলায় সিপাহীদের হুকুম দিলেন—'যাও, তামাম বসরাহ নগর ঘিরে ফেল। জোর তল্লাসী চালাও। যেখানে থাকে, পাতালে লুকিয়ে থাকলেও আমি তাকে চাই। সিপাহীরা চিরুনি-তল্লাসী চালাল কিন্তু আলী নূর বা তার বিবি কারোরই হদিস পেল না। কাজ যা হ'ল তা হচ্ছে তামাম বসরাহ তোলপাড় করে কিছু নিরীহ-নিরপরাধ আদমীকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে চাবুক চালিয়ে সিপাহীরা কর্তব্য পালন করল।

এ পর্যন্ত বলার পর বেগম শাহরা জাদ দেখলেন ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চৌত্রিশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগমের কামরায় এলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতানের সিপাহীরা যখন শিকার না পেয়ে ব্যাজার মুখে উজির মইন-এর সামনে হাজির হ'ল তখন আলী নূর তার বিবিকে নিয়ে জাহাজে বসে দোল খাচ্ছে।

উজির মইন বিষণ্ণ মনে সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিতান্ত অপরাধীর মত হাত কচলে নিবেদন করলেন—'জাঁহাপনা, শিকার ভাগ গিয়া। তামাম বসরাহ নগরে চিরুনি তল্লাসী চালালাম। আলী নূর বা তার বিবি খুবসুরৎ সে-লেড়কির কোন হদিসই মিল্‌ল না।'

সুলতান গুলিখাওয়া শেরের মত গর্জে উঠলেন—'অপদার্থ নিষ্কর্মার ঢেকী কাঁহাকার! নগরীর সব প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিয়ে তল্লাসী চালাও। হুলিয়া জারি কর, যে হদিস দিতে পারবে তাকে এক হাজার সোনার দিনার বকশিস দেওয়া হবে।'

হায় মূর্খের দল! কে হদিস দেবে? বকশিসই বা নেবে কে? যাদের জন্য এত তোড়জোড় তারা যে ইতিমধ্যেই বাগদাদ নগরে পৌঁছে গেছে।

বিদায়ী সূর্য শেষ রক্তিম আভাটুকু আশমানের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বিদায় নেবার জন্য তৈরি। বাগদাদ বন্দরে নেমে এল আধা-আলো আর আধো-আন্ধার। ঠিক এমনই এক মুহূর্তে আলী নূর তার বেগম আনিস-এর হাত ধরে বাগদাদ বন্দর থেকে বেরিয়ে নগরে প্রবেশ করল। অজানা-অচেনা নগর। হারা উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে তারা একটি বাগিচার কাছে এসে দাঁড়াল। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাগিচাটি। পাশেই একটি দরওয়াজা পেয়ে তারা ভেতরে ঢুকে গেল। খুবই সুন্দর বাগিচা।

নির্জন-নিরালা বাগিচায় নূর তার বিবি আনিস'কে নিয়ে রাত্রি কাটাল। বাগিচার মালিক কে তাদের জানা নেই।

পাখির ডাকে সকাল হ'ল। নূর এবার আনিসকে নিয়ে বাগিচাটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সামান্য এগিয়েই মালীর দেখা পেয়ে গেল। তার নাম ইবরাহিম। বুড়ো। যৌবনে পা দিয়েই বাগিচাটির তদারকির কাজ নেয়। আর এর মালিক স্বয়ং বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ। তাঁর অবসর বিনোদনের কেন্দ্র এটি। দিনের শেষে অবসাদগ্রস্ত দেহে তিনি মাঝে মধ্যে এখানে আসেন। মুক্ত বাতাস আর ফুলের খুসবুতে কিছু সময় অবস্থান করে শরীর ও মনকে চাঙা করে তোলেন। বাগিচাটির কেন্দ্রস্থলে একটি সুরম্য প্রাসাদ। পয়তাল্লিশটি জানালা দিয়ে সুগন্ধি বাতাস প্রসাদটিতে যাতায়াত করে। সোনার চিরাগবাতি অন্ধকার দূর করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এরকম এক শান্ত-সৌম্য পরিবেশে কখন সখন গানের মজলিসও বসে। দুনিয়ার সেরা ওস্তাদ গাইয়ে ইশাকও মাঝে মধ্যে খলিফাকে তাঁর মিষ্টি-মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়ে যান।

নূর আর আনিসকে দেখে বুড়ো মালী তার নিস্তেজ চোখের মণি দুটোতে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তাকায়। খলিফার বাগিচায় সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। দরওয়াজার কাছে ফলকের গায়ে একথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা কিন্তু এরা ঢুকল কোন্ সাহসে? কলিজার জোর আছে বলতেই হয়।

বুড়ো মালী ইবরাহিম রাগে ফুলতে ফুলতে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই সে যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আদতে কাছে গিয়ে তাদের চেহারা ছবি দেখে সে সচকিত হয়ে পড়ল। ভাবল এরা নিশ্চয়ই ভিন্‌দেশীয়। এ বাগিচার ব্যাপার-স্যাপার জানে না। আর নির্ঘাৎ কোন বাদশাহ বা সুলতানের, নিদেন পক্ষে কোন উজিরের লেড়কা-লেড়কি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সামনে বাগিচা পেয়ে ঢুকে পড়েছে।

বুড়ো মালী ইবরাহিম বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে নূর আর আনিস-এর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'তোমরা কে গা? তোমাদের ঘর কোথায়? ভিন্‌দেশী মুসাফির নাকি?'

আলী নূর ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়—'আপনার অনুমান অভ্রান্ত বটে। আমরা ভিন্‌দেশীয় মুসাফির। রাত্রে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে বাগিচায় ঢুকে পড়েছিলাম। গোস্তাকি মাফ করবেন। আমরা এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি।' কথা ক'টি বলেই সে আনিসকে নিয়ে বেরোবার উদ্যোগ নেয়।

বুড়ো মালী তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। সস্নেহে বলে—'সে কী বেটা, চলে যাবে কোথায়? তোমরা ভিন্ দেশ থেকে এসেছ। আমার মেহমান। কোরাণের বহু জায়গায় তো বলাই আছে—'পথশ্রমে যারা ক্লান্ত-অবসন্ন, যারা ভিন দেশী তাদের সঙ্গে

মেহমানের মত আচরণ করবে।' বেটা আল্লাহ-র উপদেশ তো আমি ফেলতে পারব না। তবে যে বেহস্ত তো দূরের কথা দোজকের দরওয়াজাও আমার জন্য খোলা থাকবে না। এ-বাগিচার মালিক যদিও খলিফা হারুণ-অল-রসিদ কিন্তু আমারও মনে করতে পার। আমরা তিন পুরুষ ধরে একে বুকে করে আগলে রেখেছি। ফলে এতে আমার অধিকারও একেবারে কম নয়।'

বুড়ো মালী ইবরাহিম, আলী নূরও তাঁর বিবি আনিসকে সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে পুরো বাগিচাটি দেখাল। কোন্ গাছের কি নাম, কোন্‌টিতে কি ধরনের ফুল ধরে, কোন্‌টি কোন্ ফলের গাছ সবই এক এক করে সব বুঝিয়ে দিল।

আলী নূর বিবি আনিসকে নিয়ে বুড়ো মালী ইবরাহিম-এর মেহমান হয়ে থেকে গেল। ইবরাহিম তাদের নিয়ে প্রাসাদের একটি কক্ষে প্রবেশ করল। সেখানে সরাবের আলমারি কয়েকটি রয়েছে। সরাবের বোতলে ঠাসা। খলিফার মেহমান যারা আসেন তাদের আপ্যায়নের জন্যই এগুলো ব্যবহার করা হয়।

বুড়ো ইবরাহিম আলমারি খুলে সরাবের বোতল আর পেয়ালা এনে নূর-এর সামনে রাখল। নূর বোতলের ছিপি খুলে নাকের সামনে ধরল। চমৎকার খুসবু বেরোচ্ছে। খুবই দামী সরাব। সে আর লোভ সামলাতে পারল না। বোতল ধরেই ঢক্ ঢক্ করে পুরো বোতল গলায় ঢেলে দিল।

ইবরাহিম আর এক বোতল নিয়ে এল। নূর তা থেকে এক পেয়ালা বিবি আনিসকে দিয়ে বাকি সবটুকু ঢেলে দিল নিজের গলায়।

আনিস হাতের পেয়ালাটি ইবরাহিম-এর দিকে এগিয়ে দিল। সে জিভ কেটে বল্‌ল—'হায় খোদা! আমি আজ থেকে তেরো বছর আগেই সরাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।'

ইতিমধ্যে আলী নূরকে সরাবের নেশা বেশ জেঁকে ধরেছে। মাত্রাতিরিক্ত সরাব গলায় ঢালায় সে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেহুঁশ হয়ে এলিয়ে পড়ল।

মালী ইবরাহিম বুড়ো হয়েছে বটে। কিন্তু তার মন থেকে ভোগতৃষ্ণা নিঃশেষে অন্তর্হিত হয় নি। উদ্ভিন্ন যৌবনা রূপের আকর আনিস-এর যৌবনচিহ্নগুলি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল। কিছু করার সাধ্য তেমন না থাকলেও সাধ কিছু রয়েছেই। রূপসী যুবতীকে দেখে যতটুকু চোখ ও মনের তৃপ্তি পাওয়া যায়।

আনিস পড়ল মহা সমস্যায়। হাতে সরাবের পেয়ালাটি তখনও ধরা রয়েছে। মালীকে বল্‌ল—'দেখুন না ও সরাব গিলে এরই মধ্যে কেমন প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। আদতে একা একা সরাব খেয়ে আনন্দ নেই।'

মালী ইবরাহিম এবার একটু নরম হয়ে বল্‌ল—'তা বাছা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এক পেয়ালা সরাব খাচ্ছি।'

কথা বলতে বলতে ইবরাহিম আলমারি খুলে আর এক বোতল সরাব নিয়ে এল। তা থেকে নিজে এক পেয়ালা খেল, আর কিছুটা দিল আনিসকে।

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ দেখলেন, প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় পাখির আনাগোনা আর কিচির-মিচির শুরু হয়ে গেছে। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পঁয়ত্রিশতম রজনী

যথা সময়ে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কাছে এলেন।

শাহরাজাদ কোনরকম ভূমিকা না করেই কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, তারপরের ঘটনা কি ঘটেছিল বলছি শুনুন'—বুড়ো মালী ইবরাহিম আনিস-এর হাত থেকে আর এক পেয়ালা সরাব নিয়ে ঠোঁটের কাছে যেই না তুলতে গেল অমনি ভাল করে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা নূর আচমকা উঠে বসে বলে উঠল—'আমি যখন বল্‌লাম তখন ঢঙ করে বললে হজ করে তের বছর সরাব ছোঁও নি—আর ছোঁবেও না। কতই না বাহানা করলে! আর এখন খুবসরৎ লেড়কির কথায় হজটজের কথা ভুলে গেলে দেখছি!'

—'আরে ভাইয়া, সে সব কিছু না। দায়ে পড়ে পেয়ালা হাতে নিতেই হ'ল। তুমি সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়লে। লেড়কিটি বল্‌ল, আমি একেলা কি করে সরাব খাই, মন চায় না। তাই এক-আধ পেয়ালা—'

—'এক-আধ পেয়ালার নমুনাই বটে এটা। কথা জড়িয়ে আসছে, শরীর দুলছে, রীতিমত টলছ। আর বলছ কিনা এক-আধ পেয়ালা!'

মালী ইবরাহিম তার কথার আর জবাব দিতে পারল না। আদতে জবাব দেবার মত ক্ষমতাই তার নেই। নেশার ঘোরে কাৎ হয়ে ঢলে পড়ার জোগাড় হ'ল।

ক্রমে রাত্রি হ'ল। বুড়ো মালী ইবরাহিম টলছে। ভাল করে দাঁড়াবার ক্ষমতাও তার নেই। টলতে টলতেই প্রাসাদের বাতিগুলি জ্বালিয়ে দিল। ইতিমধ্যে নেশা আরও বেশী করে চেপে ধরল তাকে। কোনরকমে দেয়াল ধরে ধরে একটি আরাম কেদারায় গিয়ে বসল। ব্যস, বুঁদ হয়ে পড়ে রইল।

আলী নূর প্রাসাদের জানলাগুলো খুলে দিল। বাগিচা থেকে হিমেল হাওয়া ছুটে এসে সরাবের নেশাকে আরও চাঙা করে তুল্‌ল।

এদিকে প্রাসাদের জানলাগুলো খুলে দেওয়ায় প্রাসাদের ভেতরের আলো বাগিচায় গিয়ে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর প্রাসাদ থেকে বাগিচার

প্রাসাদটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। প্রাসাদের ঘরে ঘরে চিরাগবাতির উজ্জ্বল আলো জ্বলছে দেখে খলিফার কৌতূহল হ'ল। তিনি উজির জাফর অল-বারসাকীকে পাঠালেন ব্যাপার কি দেখে আসার জন্য।

জাফর ছুটলেন খলিফার নির্দেশ পালনের জন্য। খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে এসে খলিফাকে জানালেন, বুঁড়ো মালী এক দম্পতিকে প্রাসাদটি ভাড়া দিয়েছে। সে এখন খেয়াল খুশী মত কাজ করে বেড়াচ্ছে। খলিফাকে তোয়াক্কাই করে না।'

খলিফা বল্‌লেন—'শোন জাফর, ইবরাহিম আমার বহুদিনের কর্মী। বংশ পরম্পরায় তারা আমাদের নোকরি করছে। তাকে আমি ভাল ভাবেই চিনি। আমার অজান্তে সে আমার প্রাসাদ ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জন করবে আমি এ-কথা বিশ্বাস করতেও উৎসাহ পাচ্ছি না। তবু তুমি যখন বলছ তখন কিছু না কিছু ব্যাপার রয়েছেই। চল, একবারটি দেখে আসি গে, আদৎ ব্যাপারটি কি।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ বিদেশী সওদাগরের ছদ্মবেশ ধারণ করে উজির জাফর এবং দেহরক্ষী মাসরুর'কে সঙ্গে নিয়ে পথে নামলেন।

বাগিচায় ঢুকে খলিফা ভাবলেন, হঠাৎ করে প্রাসাদে ঢুকলে আসল রহস্যটি হয়ত উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কোথাও আত্মগোপন করে থেকে দেখতে হবে ব্যাপারটি কি? মাসরুর-এর কাঁধে চেপে খলিফা ও উজির একটি ঝাঁকড়া গাছে উঠে তার ডালে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের নজরে পড়ল ঘরে তিনটি আদমি রয়েছে। তাদের একজন তো সুপরিচিতই—ইবরাহিম। অন্য দু'জন যুবক-যুবতী। খুবসুরৎ। তাদের হাতে সরাবের পেয়ালা। ইবরাহিম-এর হাতে সরাবের পেয়ালা দেখে খলিফা তো ভিমরি খাবার জোগাড়। তা-ও আবার নেশায় বুঁদ। আপন মনে বলে উঠলেন—'তোবা—তোবা!'

খলিফা বল্‌লেন—'জাফর আমার মনে হচ্ছে, এরা ভিন্ দেশী। মুসাফির। কিন্তু আমার বাগিচায় কেন ও কি করে এরা এল!'

এমন সময় মালী ইবরাহিম একটি ফ্লুট এনে আনিস-এর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'বেটি, বাজাতে পার? বাজাও তো শুনি।'

ব্যাপার দেখে খলিফা রাগে গজ্‌গজ্ করতে লাগলেন। ওস্তাদ ইশাক যে বাজনা বাজান তা অন্যের হাতে দেখলে রাগ তো হওয়ারই কথা। তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌লেন—'জাফর, বেসুরো ফ্লুট বাজালে সবাইকে আমি কোতল করব। না না, শূলে চড়াব সবাইকে।'

উজির জাফর অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'যদি বেসুরো না বাজায়? সুর-তাল ঠিক ঠিক রেখে বাজালে কি করবেন জাঁহাপনা?'

—'তবে? তবে তোমাকে চড়াব শূলে। আর তাদের ছেড়ে দেব।' জাফর ব'লে ওঠে—'হায় খোদা, তবে যেন লেড়কিটি বেসুরোই বাজায়।'

এমন সময় উদ্যান-প্রাসাদ থেকে ফ্লুটের চমৎকার সুর ভেসে এল। খলিফা বার বার তার তারিফ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ মুগ্ধচিত্তে ফ্লুটের বাজনা শোনার পর খলিফা বল্‌লেন—'জাফর, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। তারা কারা, কেনই বা আমার বাগানে এসেছে জানার জন্য আমার দিল অস্থির হয়ে পড়ছে। আর আমার প্রাসাদে এমন গুণীজনের আগমন ঘটল আর আমিই জানতে পারলাম না। তাজ্জব ব্যাপার!'

উজির জাফর বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, তাদের এমন এক আনন্দোচ্ছল মুহূর্তে আমাদের উপস্থিতি বে-রসিকের মত কাজ হবে নাকি?'

খলিফা জাফর-এর কথায় নিজেকে সামলে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এলেন। একাই প্রাসাদের ধার কাছ দিয়ে একটু হাঁটা চলা করে কিছু উদ্ধার করার প্রত্যাশায় এগিয়ে গেলেন। তিনি গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চললেন। কিছুটা এগোতেই বিশাল এক তলাও। মাটির তলা দিয়ে নালা কেটে টাইগ্রীস নদী থেকে পানি এনে তলাওটিকে সর্বদা কানায় কানায় ভর্তি রাখার ব্যবস্থা। কতরকম মছলির যে বিচিত্র সমাবেশ ঘটানো হয়েছে তা গোনাগাঁথা নেই।

নিঝুম-নিস্তব্ধ রাত্রি। খলিফা তলাও-এর ধার দিয়ে ঘুরে অন্য ধারে আসতেই দেখলেন, এক জেলে চুরি করে তলাও-এ জাল ফেলে মছলি ধরছে। খলিফা তাকে ডাকলেন। নাম তার করিম। করিম ধরা পড়ে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খলিফার সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে কৃতকর্মের জন্য নানা ভাবে মাফ চাইতে লাগল।

খলিফা তাকে পোশাক খুলে উলঙ্গ হতে বল্‌লেন। করিম জেলে ভাবল, উলঙ্গ করে বুঝি বিশেষ কোন শাস্তি দেবেন। সে কেঁদে ওঠে।

খলিফা ঠোঁটের কাছে তর্জনি নিয়ে বলেন—'চুপ—চুপ! একদম চিল্লাবি না! টু-শব্দটি করলে গর্দান নেব বলে দিচ্ছি।'

করিম জেলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক এক করে চোগা চাপকান সব খুলে ফেল্‌ল। একেবারে উলঙ্গ।

এদিকে খলিফাও নিজের গা থেকে যাবতীয় পোশাক খুলে ফেলে একেবারে বিবস্ত্র হলেন। নিজের পোশাকগুলো করিমকে পরালেন। আর নিজের গায়ে চাপিয়ে নিলেন করিম-এর তেলচিটে পড়া চোগা চাপকান। পোশাকের ভেতরে ছারপোকার মেলা। কুটকুট করে তাকে কামড়াতে লাগল।

করিম খলিফাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌ল—'ও কিছু না জাঁহাপনা। নয়া আদমি আর নয়া খুন পেয়ে একটু ফুর্তি করে খাচ্ছে। পেট ভরে গেলে আর কামড়াবে না। গরীবের কথা মিলিয়ে নেবেন। দেখবেন, আপনার সঙ্গে এক সময় ঠিক সমঝোতা হয়ে গেছে।'

বার কয়েক অস্থিরভাবে লাফালাফি ছটফটানি করার পর খলিফা ছারপোকার ব্যাপারটিকে কোনরকমে সামলে নিলেন।

খলিফা নিজের আঙুল থেকে হীরা জহরৎ বসানো একটি আংটি খুলে করিম জেলেকে দিলেন। তার ধরা মাছগুলো রেখে দিয়ে বল্‌লেন—'যা, বাগিচার সীমানার বাইরে চলে যা।'

করিম জেলে খলিফার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে জাল-মছলি সব ফেলে চোঁ-চাঁ দৌড় মারল।

এবার করিম-জেলের পোশাকে সজ্জিত খলিফা গুটি গুটি উদ্যান-প্রাসাদে ঢুকে গেলেন। ইবরাহিম'কে সামনে পেয়ে আদাব জানালেন। এবার বল্‌লেন—'আপনার জন্য কিছু মছলি নিয়ে এসেছি হুজুর।'

আনিস কৌতূহলাপন্না হয়ে এগিয়ে আসে মছলি দেখার জন্য। উল্লসিত হয়।

ইবরাহিম ধমক দিয়ে ওঠে—'বেটা হতচ্ছাড়া জেলে কাঁহাকার! আমার মেহমানরা কি তোর কাঁচা মছলি খাবে নাকি রে? ঘটে বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই দেখছি! মছলি কেটে-ধুয়ে-ভেজে নিয়ে আনতে পারিস নি?'

জেলের পোশাকে সজ্জিত খলিফা চোখ-মুখ কাচুমাচু করে বল্‌লেন—'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর! আমি এখনি মছলিগুলো ভেজে আনছি।'

—'ওদিকে কোণার ঘরটি রসুইখানা। তেল-মসলা সবই মজুদ আছে। আচ্ছা করে ভেজে নিয়ে আয়।'

খলিফা পড়লেন এবার মহা ফাঁপরে মছলিগুলো কাটা, ধোয়া বা ভাজা কোনটিই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না দেখে উজির জাফর-এর শরণাপন্ন তাঁকে হতেই হ'ল।

খলিফা এবার জাফর-এর কাছে গিয়ে সব বৃত্তান্ত জানালেন। তিনি জাফর-এর সাহায্যে মছলিগুলো খুব কড়া করে ভেজে হুকুমদাতা বুড়ো মালী ইবরাহিম-এর কাছে নিয়ে গেলেন।

ইবরাহিম খলিফাকে তার কাজের জন্য বহুভাবে শুকি্রিয়া জানাল।

আলী নূর, আনিস এবং ইবরাহিম মৌজ করে ভাজা মছলিগুলো খেতে লাগল।

আলী নূর খুশী হয়ে জেলের বেশধারী খলিফাকে তিন দিনার ইনাম দিল। খলিফা দিনার তিনটে কপালের সঙ্গে সেঁটে নিলেন। বুঝাতে চাইলেন—হুজুরের ইনাম মাথায় রাখলাম।

খলিফা এবার করজোড়ে নিবেদন করলেন—'হুজুর মেহেরবান, আমার একটি আর্জি আছে। যদি মেহেরবানি করে—'

আলী নূর ভাবল, তিন দিনারে আদমিটির মন ভরে নি। কিন্তু করারও তো কিছু নেই। দোস্ত তাকে মাত্র চল্লিশটি দিনার দিয়েছিল। জাহাজ ভাড়া গেছে পাঁচ দিনার। মোট আট দিনার এরই মধ্যে চলে গেছে। আর রয়েছে বত্রিশটি। দু'-দু'জন লোক, বিদেশ বিভুঁই। বত্রিশ দিনার খরচ হতে কতক্ষণ। তারপর?

মুচকি হেসে আলী নূর খলিফার কথার জবাব দেয়—'আর্জি? বল শুনি, কি আর্জি তোমার?'

—'হুজুর, দূর থেকে হুজুরানির বাজনা শুনে দিল্ ভরে গেছে। মন চাইছে তেনার গলার একটি গান শুনতে। যদি মেহেরবানি করে একটি গানা—'

আলী নূর তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ব'লে উঠলেন—'গানা? গানা শুনবে? বেশ তো, তোমার দিল যখন চাইছে জরুর শোনাবে। কিন্তু কোন ধরনের গানা তোমার পছন্দ, বল?'

হাত কচলে খলিফা বল্‌লেন—'জী, হুজরানি কি সব কিসিমের গানাই জানেন?'

আনিস এবার মুখ খুল্‌ল—'খেয়াল, কাওয়ালী, ঠুংরী—কোন্ গানা তোমার পছন্দ, বল?'

খলিফা চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ভাবতে লাগলেন—লেড়কিটি বলে কী রে! সব গানাই জানে দেখছি! তাজ্জব ব্যাপার তো! এবার মুখ খুল্‌লেন—'যদি মেহেরবানি করে একটি দরবারী কানাড়া শোনান তো বহুৎ আচ্ছা হয়।'

আনিস সবিস্ময়ে খলিফার দিকে তাকায়। ভাবতে লাগল লোকটি বলছে কী! দরবারী কানাড়া শোনার খেয়াল? এবার খলিফার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'সে কী হে! তুমি মছলি ধরে দিন গুজরান কর, দরবারী কানাড়ার কি বুঝবে?'

—'দেখুন, মছলি ধরে দিন গুজরান করি। ভাল কিছুই শিখি নি। সুযোগও পাইনি কোনদিন। তবে শুনতে দিল্ চায়। যদি মেহেরবানি করে—'

—'ঠিক আছে। তোমার মন যখন চাইছে তখন আমি অবশ্যই শোনাব। 'আনিস এবার গানা ধরল। মন-প্রাণ ঢেলে দরবারী কানাড়া গাইতে লাগে।

খলিফা আত্মমগ্ন হয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত গানা শুনতে লাগলেন। সত্যি ওস্তাদ ইশাক ছাড়া অন্য কেউ যে এমন গানা গাইতে পারে তাঁর ধারণাই ছিল না।

দীর্ঘ সময় ধরে মন-প্রাণ সঁপে দরদ দিয়ে আনিস গানা গাইল। গানা শেষ হলে খলিফা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বহুভাবে গায়িকার তারিফ করলেন।

খলিফা আবেগের সঙ্গে বল্‌লেন—'হুজুরানি, এমন আচ্ছা গানা আপনি কোথায় শিখেছেন? আপনার গানা শুনে আমার দিল্ উদাস হয়ে গেল!'

আলী নূর হেসে বল্‌লেন—'জেলে ভাইয়া, আমি গানাটানা বুঝি না। ওর গানা আমার কাছে কদর পায় না। তুমি বরং একে নিয়ে যাও।

তোমার ঘরে রাখবে। তোমাকে চিরদিনের জন্য একে দিয়ে দিচ্ছি। নিয়ে যাও।'

কথা বলতে বলতে আলী নূর উঠে দাঁড়ায়। বিবি আনিস-এর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য তৈরি হয়।

আনিস কেঁদে ওঠে—'মেহবুব, আমাকে ফেলে তুমি কোথায় চল্‌লে? তোমার কি দিল্-দরদ বলতে কিছুই নেই! যদি আমাকে এভাবে ফেলেই ভেগে যাবে তবে একটি কথা বলছি, শুনে যাও।' কথাটি বলেই সে শিশুর মত হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ এমন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হয়ে বড়ই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। ভাবলেন, এ কী তাজ্জব ব্যাপার! লেড়কিটি কি তবে তার বিবি নয়, শাদী করেনি একে? শাদী করা বিবি নয়? কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে এবার তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। সবিনয়ে নিবেদন করলেন—'হুজুর, একটি কথা বলছি, মেহেরবানি করে গোস্‌সা করবেন না। আমি আপনার আব্বাজীর চেয়ে বয়সে হয়ত বড়ই হ'ব। তাই বলছি কি, আপনাদের দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কথা আমার কাছে খুলে বলুন। আপনাদের মুশকিল আশান করতে কোসিসের ত্রুটি করব না। সত্যি করে বলুন তো হুজুর, লেড়কিটিকে কি ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছেন, নাকি আপনার শাদী করা বিবি?'

আলী নূর বল্‌ল—'আরে, ওসব ব্যাপার মোটেই না। আমাদের জীবনের কিস্‌সা, দুঃখদরদের কথা, নসীবের খেল তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। তা ছাড়া সে অনেক কথাও বটে।'

—'হুজুর, মেহেরবানি করে যদি কিছু বলেন তবে আমি আপনাদের মুশকিল আশানের কসুর করব না, কথা দিচ্ছি।'

—'তুমি যখন না শুনেই ছাড়বে না তখন সংক্ষেপে আমাদের দুঃখের কথা তুলে ধরছি, শোন। নূর এবার সুলতানের হুকুম অনুযায়ী বাজার থেকে আনিসকে কিনে আনার পর থেকে বাগদাদে ও খলিফার বাগিচায় আসা পর্যন্ত সব ঘটনা খোলাখুলি ব্যক্ত করল।'

আলী নূর তার কিস্‌সা শেষ করলে খলিফা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'হুজুর, এখন আপনাদের দিল্ কি চাইছে?'

—'চাওয়া চাওয়ির ব্যাপার কিছু আর নেই জেলে ভাইয়া। দু' চোখ যে দিকে চায় হাঁটা জুড়ব। এর শেষ কোথায় আল্লাতাল্লাই জানেন।'

—'হুজুর, দেখতেই তো পাচ্ছেন, সামান্য এক জেলে আমি। মছলি ধরে দিন গুজরান করি। তবে বসরাহ-র সুলতান আমাকে দোস্ত জ্ঞান করেন। খাতিরটাতিরও করেন খুবই, তাজ্জব ব্যাপার মনে হচ্ছে, তাই না? আদৎ ব্যাপার হচ্ছে ছেলেবেলায় আমরা একই মক্তবে মৌলভী সাহেবের কাছে পড়ালিখা করি। কিন্তু তিনি সুলতান হওয়ার পরও আমাকে ভুলে যান নি। সে সুলতানের বেটা। সুলতান বেহেস্তে গেলে সে সুলতান বনে গেল। আর আমি? কোন পথ না পেয়ে কাঁধে জাল তুলে নিলাম। তুমি যদি বসরাহতে ফিরে যেতে মন কর তবে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। আশা করি তোমাদের মুশকিল আশান হয়ে যাবে। আমার অনুরোধ তিনি ফেলতে পারবেন না বলেই আমি মনে করি।'

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ দেখলেন, ভোর হতে আর দেরী নেই। বাধ্য হয়ে তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছত্রিশতম রজনী

প্রায় মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার ফিন বেগম সাহেবার ঘরে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আলী নূর

ও আনিস-এর তকলিফ দূর করার চিন্তা নিয়ে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ বল্লেন—'আপনারা চাইলে আমি সুলতানকে একটি হাত-চিঠি লিখে দিতে পারি।'

—'ঠিক আছে। একটি চিঠি তবে লিখেই দাও। দেখি চেষ্টা করে যদি পোড়া নসীবটিকে ফেরাতে পারা যায়।'

খলিফা কাগজ-কলম চাইলে ইবরাহিম দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে নিয়ে এল।

খলিফা ব্যস্ত-হাতে চিঠি লিখতে লাগলেন। তিনি চিঠির বক্তব্যে লিখলেন, চিঠিটি হাতে পাওয়া মাত্র বসরাহ্-র সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান যেন একে হুকুমনামা মনে করে পত্রবাহক আলী নূরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এতদিন তাকে সুলতানের পদে অবস্থান করার যে অধিকার তাঁকে দিয়েছিলেন তা আজ থেকে খারিজ করা হ'ল। আর সে অধিকার দেওয়া হ'ল নওজোয়ান আলী নূরকে।'

চিঠি লেখা শেষ করে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ টিপ সহি দিয়ে খামে ভরলেন। আঠা দিয়ে খামের মুখ ভাল করে বন্ধ করে সেটি আলী নূর-এর হাতে দিলেন।

আলী নূর কিন্তু খলিফার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। তবে একেবারে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিতেও উৎসাহ পেল না। মনে মনে বল্ল—'নসীবে যা আছে হবে। দেখাই যাক না আল্লাতাল্লার কি মর্জি।'

আলী নূর তার বিবি আনিসকে জেলের বেশধারী খলিফার কাছে রেখে বসরাহ্-র উদ্দেশে পা বাড়াল।

মালী ইবরাহিম কিন্তু ব্যাপারটিকে মোটেই সুনজরে দেখল না। সে গোঁৎ গোঁৎ করতে লাগল—'নচ্ছার জেলে! শয়তানী করার আর জায়গা পাস নি! সামান্য মাছভাজা খাইয়ে নগদা নগদ তিন তিনটি মোহর নিলি। উপরি পাওনাস্বরূপ গানা শুনলি। শেষ পর্যন্ত লেড়কাটিকে ভাঁওতা দিয়ে দিলি ভাগিয়ে! এখন ফুলের মত খুবসুরৎ লেড়কিটিকে নেওয়ার মতলবে আছিস! নাহি কভি নাহি—আমি থাকতে এতবড় একটি অবিচার কিছুতেই হতে দিচ্ছিনে। আমার দাবী আগে। আমিই তাদের এখানে আশ্রয় দিয়েছি। নইলে আধাআধি বখরা তো চাই-ই। তিন মোহরের আধা বখরা, আর লেড়কির বখরা চাই-ই চাই। লেড়কিটি আগে আমার পিয়াস মিটাবে। তারপর ছিবড়ে টিবড়ে যা পড়ে থাকবে তা তোর দিকে ছুঁড়ে দেব। নইলে তুই বেটা লেড়কিটিকে নিয়ে ভাগবি, একেবারে বে-পাত্তা হয়ে যাবি। তখন আমার আঙুল চোষা ছাড়া গত্যান্তর থাকবে না।'

মালী ইবরাহিম-এর মুখ থেকে এরকম সব অশ্লীল-অশ্রাব্য কথা শুনে খলিফা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। জানালার ধারে গিয়ে সঙ্কেত-ধ্বনির সাহায্যে দেহরক্ষী মাসরুরকে ডাকলেন।

মাসরুর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে খলিফাকে কুর্নিশ করে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াল। তার হুকুম পেয়ে ইবরাহিমকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কাজে মন দিল।

উজির জাফরও ছুটে এলেন। তাঁর হাতেই জেলেটি যাবার আগে খলিফার পোশাক জমা দিয়ে গিয়েছিল। খলিফা এবার নিজের পোশাকে সজ্জিত হলেন।

ইবরাহিম যেন একেবারে আশমান থেকে পড়ল। সে খলিফার গোড়ে লুটিয়ে পড়ে বার বার মাফি মাঙতে লাগল।

খলিফা এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লেন—'তোমার ব্যবহার আমাকে স্তম্ভিত করেছে ইবরাহিম। তোমার মত একজন ধর্মভীরু আদমি যে এরকম বে-শরম বেতমিসের মত অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করতে পারে তা ভাবতে আমি উৎসাহ পাচ্ছি নে। আজকের মত মাফ করে দিলাম। ভবিষ্যতে এরকম কোন আচরণ তোমার কাছ থেকে পেলে কিন্তু গর্দান নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।'

খলিফা এবার আনিস-এর দিকে ফিরে মুচকি হেসে বল্লেন—'সুন্দরী, আশাকরি তুমি ইতিমধ্যেই আমার আসল পরিচয় পেয়ে গেছ। এবার চল আমার প্রাসাদে গিয়ে থাকবে।'

খলিফা আনিসকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। আর দাসী, খোজা প্রভৃতিকে তার পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন। সবার ওপরে কড়া হুকুম দিলেন, তার কোনরকম তকলিফ হলে গর্দান যাবে।

এদিকে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর চিঠি নিয়ে আলী নূর বসরাহ্-র সুলতান মহম্মদ সুলেমান-এর দরবারে হাজির হ'ল। সে সুলতানকে কুর্নিশের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন না করেই এগিয়ে গিয়ে হাতের চিঠিটি তার হাতে তুলে দিল।

খামের মুখ ছিঁড়ে, চিঠিটা বের করে সুলতান চোখের সামনে ধরলেন। হাতের লেখা দেখে চিনতে তাঁর অসুবিধা হ'ল না যে, খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর পাঠানো চিঠিই বটে। জাল জুয়াচুরি নয় মোটেই। তার মুখে হঠাৎ বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠল।

চিঠি পড়া শেষ করে সুলতান বিষণ্ণ মুখে উজির মইন এবং অন্যান্য পারিষদদের উদ্দেশ্যে বল্লেন—'মহামান্য খলিফা হারুণ-অল-রসিদ আল্লাহ্-র পয়গম্বর আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তাও বটে। তাঁর হুকুম আমি তামিল করতে বাধ্য। শোন মইন, আমীর-ওমরাহদের খবর পাঠাও। চারজন কাজীকে তলব কর। সবার উপস্থিতিতে আমি এ-অজ্ঞাত পরিচয় নওজোয়ানকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে বসরাহ্-র শাসনভার এর হাতে তুলে দেব। খলিফার হুকুম তামিল করে আমি দায়মুক্ত হতে চাই।'

উজির মইন এগিয়ে এসে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল—'জাঁহাপনা,

আপনার দিমাকটিমাক খারাপ হয়ে গেল নাকি? হঠাৎ করে এতবড় একটি কাজ করে ফেলবেন! ব্যাপারটি নিয়ে ভাবুন সত্যি-মিথ্যা যাচাই করুন। আমার তো দিল্ বলছে চিঠিটা জাল।' এবার চিঠির তলায় খলিফার স্বাক্ষরযুক্ত অংশটুকু কৌশলে ছিঁড়ে ফেলে বল্‌ল— জাঁহাপনা, আমি আগেই ভেবেছিলাম, জাল চিঠি নিয়ে এসে নওজোয়ানটি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছে। আরও ভেবে দেখুন, খলিফার চিঠিই যদি এটি হবে তবে সাদা কাগজে তিনি লিখতে যাবেন কেন। এতবড় একটি হুকুমনামা নিজের শীলমোহর-যুক্ত কাগজে না পাঠিয়ে তিনি কিছুতেই সামান্য এক চিল্‌তে সাদা কাগজ ব্যবহার করতেন না। আরও বড় কথা হচ্ছে, এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি চিঠি এর হাতে না দিয়ে তিনি অবশ্যই দূত মারফৎ পাঠাতেন। ঠিক কিনা?'

সুলতান মহম্মদ সুলেমান উজির মইন-এর কথায় থমকে গেলেন।

উজির মইন এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমি আপনাকে জোর গলায়ই বলছি, এ-নওজোয়ান ঠগ। জাল চিঠি নিয়ে এসে আপনাকে ঠকিয়ে আপনার মসনদ দখল করতে চাইছে। আগে একে কয়েদখানায় আটক করুন। তারপর বাগদাদে খলিফার কাছে দূত পাঠান। ব্যস, দেখবেন তবেই সব হিল্লে হয়ে যাবে।'

কথা বলতে বলতে মইন চিঠিটিকে মুখে পুরে বার কয়েক চিবিয়ে, ডেলা পাকিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলেন।

সুলতান বিস্ময় প্রকাশ করে বল্‌লেন—'এ তুমি কি করলে মইন! যদি এটি খলিফারই চিঠি হয়ে থাকে তবে তাকে কতখানি—'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই উজির মইন বলে উঠলেন—'আমি তো বলছি জাঁহাপনা, কিছুতেই এটি খলিফার চিঠি নয়। হারামী জাল চিঠি নিয়ে এসে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছে। সবার আগে একে আচ্ছা করে ঘা-কতক দেওয়া দরকার। পিঠমোড়া করে বেঁধে মোক্ষম দাওয়াই আমি দিয়ে দিচ্ছি। একবারটি আমার হাতে শয়তানটিকে তুলে দিন। এমন দাওয়াই দেব যে, জিন্দেগীভর মনে থাকবে। জাঁহাপনা, চিঠি দিয়ে খলিফার কাছে দূত পাঠান। প্রয়োজনে এক পারিষদকেও সঙ্গে দিন। ব্যস, আদৎ ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবে।'

সুলতান এতক্ষণে উজির মইন-এর কথা বিশ্বাস করলেন। হুকুম দিলেন, চালাও বেত। আসল কথা কবুল না করা পর্যন্ত বেত বন্ধ করবে না।

সুলতানের আদেশে কয়েকজন সিপাহী আলী নূরকে পিঠমোড়া করে বেঁধে মেঝেতে ফেলে দিল। এবার চল্‌ল সপাং-সপাং শব্দে অনবরত বেত। উজিরের সুখী লেড়কা, বেতের ঘা বেশীক্ষণ সইতে পারল না। ঘা-কতক খাওয়ার পরই সম্বিৎ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবার ধরাধরি করে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল কয়েদখানায়। আর কয়েদখানার প্রধানের ওপর কড়া হুকুম দেওয়া হ'ল, রোজ সকাল-সন্ধ্যায় যেন তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। যে করেই হোক তাকে দিয়ে আদৎ ব্যাপার কবুল করাতে হবে।

কয়েদখানার প্রধান আলী নূরকে চিনতে পারল। সে নূর-এর আব্বা উজির অল-ফাদল-এর এক বড় ভক্ত। সে সাধ্য মত নূরকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিল। নূরকে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'হুজুর, আমি আলতো করে আপনার গায়ে বার কয়েক চাবুক ঠেকানো মাত্রই মরার মত হাত-পা এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকবেন। বাহানা করবেন, যেন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন। আমার ওপর হুকুম, আপনি যে ঠগ, প্রবঞ্চক, জালিয়াত তা স্বীকার করাতেই হবে। একটু বাদেই শয়তান মইন আসবে, ঘাপটি মেরে পড়ে থাকুন। ডাকলেও সাড়া দেবেন না। আমি বলব হরদম বেত খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়েছেন।'

এক-দুই-তিন করে পুরা চল্লিশটি দিন কেটে গেল। মইন-এর কাছে কয়েদ খানার প্রধান খবর পাঠায়, রোজ সকাল - সন্ধ্যা জোর বেত চালানো হচ্ছে, কিন্তু কয়েদী তার কসুর কবুল করে নি।

একচল্লিশতম দিন। বসরাহ্-র সুলতানের কাছে বাগদাদ থেকে বহুমূল্য ভেট এল। সুলতান বিস্মিত হলেন। কিন্তু আদৎ ব্যাপার ধারণাও করতে পারলেন না। যারা ভেট নিয়ে এসেছে তাদের কাছ থেকে কোন কথা বের করতে পারলেন না।

এদিকে সুলতান তো ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। উজিরও আমীর-ওমরাহদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তারাও বিস্ময়ের ছাপ চোখে - মুখে এঁকে মুখে কলুপ এঁটে বসে থাকা ছাড়া কোন সৎপরামর্শই দিতে পারলেন না।

তবে কোন কোন পারিষদ অনুমানের ওপর নির্ভর করে বল্‌লেন—'জাহাপনা, খলিফা হয়ত নতুন সুলতানকে ভেট পাঠিয়ে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

উজির মইন-এর পরামর্শে সুলতান আলী নূর'কে জানে খতম করে দেওয়ার চিন্তা করলেন।

সুলতান-এর হুকুমে বসরাহ নগরের সর্বত্র ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হ'ল উজির অল-ফাদল-এর লেড়কা ঠগ আলী নূর-এর গর্দান নেওয়া হবে। আগামীকাল সকালে উৎসাহীদের গর্দান নেওয়ার দৃশ্য দেখার জন্য জমায়েত হতে জানানো হচ্ছে।

পরদিন সকাল হতে না হতেই দরবার কক্ষের সামনে দলে দলে কাতারে কাতারে উৎসাহী নগরবাসীরা জমায়েত হতে লাগল।

যথা সময়ে উজির মইন কয়েদখানায় হাজির হলেন। কয়েদখানার প্রধান বাধ্য হয়ে দরওয়াজা খুলে দিল।

আলী নূর বিষণ্ণমুখে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এল। গম্ভীর স্বরে বল্‌ল—'শয়তান মইন, তুমি কি করছ তা নিজেই জান না।

তামাম দুনিয়ার আদমি তোমার শয়তানী ধরতে না পারলেও ওপরওয়ালার চোখে তো আর ধোঁকা দিতে পারবে না। আল্লাহ-র হাত থেকে তুমি কিছুতেই ছাড়া পাবে না। তোমার কুকর্মের শাস্তি তোমাকে দেবেন-ই দেবেন।'

মইন তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে ফুটিয়ে তুল্‌লেন। আলী নূর-এর কথার কোন জবাব না দিয়ে রক্ষীদের হুকুম করলেন, তাকে খচ্চরের পিঠে আচ্ছা করে বাঁধতে।

এদিকে দরবার কক্ষের সামনে নগরবাসী যারা জমায়েত হয়েছিল তারা আলী নূর-এর নামে ধ্বনি দিতে দিতে কয়েদখানার দিকে ছুটে আসতে লাগল। তাদের দাবী, নতুন সুলতান আলী নূর-এর মুক্তি দিতে হবে। আর শয়তান মইন-এর মৃত্যুকামনা করতে লাগল সবাই।

আলী নূর তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করে। জনতার উদ্দেশ্যে বল্‌ল—'দোস্তরা, উতলা হয়ো না। ধৈর্যে বুক বাঁধ। বিচারের ভার আল্লাহ-র ওপর ছেড়ে দাও। মইন আমার ওপর যে জবরদস্তী করছে তার শাস্তিবিধান আল্লাহ-ই করবেন।'

মইন-এর ধমক খেয়ে রক্ষীরা খচ্চরের পিঠে বেঁধে রাখা আলী নূর'কে নিয়ে জনসমুদ্র ভেদ করে অগ্রসর হওয়ার কোশিস করল। খচ্চরটি ধীর পায়ে এগিয়ে চল্‌ল। মৃত্যুপথযাত্রী আলী নূর মুখে জোর ক'রে হাসি ফুটিয়ে তুলে সবাইকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। এক সময় আলী নূর'কে নিয়ে খচ্চরটি সুলতানের দরবার-কক্ষের সামনে হাজির হ'ল।

আলী নূর এবার গলা ছেড়ে বলতে লাগল—'দোস্তগণ, তোমরা শুনে রাখ, আমি কোন কসুর করি নি, এমন কোন কাজ করি নি যার ফলে আমার গুণাহ হতে পারে। আমাকে জবরদস্তি প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। আমার গর্দান নিয়ে এরা কিন্তু আল্লাহ-র কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। আল্লাহ এর বিচার করবেন-ই।'

শয়তান মইন প্রাসাদের নিরাপদ স্থান থেকে চিৎকার করে জল্লাদকে বলতে লাগলেন—'দেরী করছ কেন? ওর ধড় থেকে শিরটি নামিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি কর।'

এবার ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল একদল ঘোড়ার খুরের গম্ভীর আওয়াজ। জনকোলাহল স্তব্ধ হ'ল। সবাই উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজটিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল এক সেনাবাহিনী প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হ'ল। তাদের সঙ্গে রয়েছেন খলিফার উজির জাফর অল-বারমাকী।

উজির জাফর-এর আগমনবার্তা পেয়ে সুলতান মহম্মদ সুলেমান ব্যস্ত হয়ে প্রাসাদ থেকে নেমে এলেন। উজির জাফর বল্‌লেন—'স্বয়ং খলিফাই চিঠি লিখে আলী নূর'কে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটি অবশ্যই আসল, জাল নয়। তিনি ভুলেও ভাবতে পারেন নি যে, তাঁর হুকুম কেউ তামিল না করে অগ্রাহ্য করতে সাহসী হতে পারে। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, আলী নূর-ই বসরাহ-র মসনদে বসে প্রজা পালন করছেন। সে তার বিবি আনিসকে খলিফার হাতে সঁপে দিয়ে এসেছিল। কথা ছিল, বসরাহ-র মসনদে বসে সে তার বিবিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে। খলিফা তাকে মাত্র একটি রাত্রির জন্য শয্যসঙ্গিনী করেছিল। ব্যস, আর তার সঙ্গে মোলাকাত হয় নি। তারপরই তিনি নিজের কাজে ডুবে যান। আনিস-এর কথা তাঁর আর খেয়ালই ছিল না। একমাস বাদে খলিফা হঠাৎ প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কান্না শুনতে পেয়ে থমকে যান। পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, আলী নূর-এর বাঁদী আনিস কাঁদছে।

নিতান্ত অপরাধীর মত মন নিয়ে খলিফা আনিস-এর কামরায় গেলেন। তাঁকে দেখেই আনিস-এর কান্না আরও বেড়ে গেল। খলিফা এবার আলী নূর-এর ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। এক মাসের ওপর হয়ে গেল, অথচ তার কোন পাত্তা নেই। নির্ঘাৎ কোন না কোনো বিপদ তার হয়েছে।

আনিস-এর কক্ষ থেকে বেরিয়ে খলিফা, আমাকে তলব করলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে ছুটে যেতেই বল্‌লেন—'বসরাহ থেকে আলী নূর-এর খবর সংগ্রহ করতে। আর মহম্মদ সুলেমান তার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন এ-ও জানাতে বল্‌লেন। খলিফার নির্দেশে আমি সিপাহীদের নিয়ে এখানে আসি।'

উজির জাফর এবার বল্‌লেন—'আলী নূর এখন কোথায়? তাকে আমার কাছে আন। 'সুলতান মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে দু'জন রক্ষীকে পাঠালেন আলী নূর-এর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে তার সামনে হাজির করার জন্য।

উজির জাফর-এর পক্ষে ব্যাপারটি বুঝতে দেরী হ'ল না। আলী নূর আসার আগেই তাঁর নির্দেশে সৈন্যরা সুলতান মহম্মদ সুলেমান এবং উজির মইন'কে বন্দী করল।

উজির জাফর সমবেত জনতার মাঝে প্রচার করে দিলেন বসরাহ-র মসনদে সুলতানের পদে আলী নূর'কে অভিষিক্ত করা হবে।

প্রজারা উল্লসিত হয়ে আলী নূর-এর অভিষেকের আয়োজন করতে লাগল। সুলতানের প্রাসাদ থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বত্র সাজ সাজ রব উঠে গেল।

যথা সময়ে উজির জাফর আলী নূরকে বসরাহ-র সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। তিন দিন-তিন রাত্রি ধরে রাজ্য জুড়ে উৎসব পালিত হ'ল।

তিন দিন বাদে উজির জাফর আলি নূর'কে নিয়ে বাগদাদে উপস্থিত হলেন। খলিফার সঙ্গে মোলাকাত করলেন। খলিফা নিজের কটিদেশ থেকে তরবারি খুলে আলী নূর-এর হাতে তুলে দিয়ে বল্‌লেন—'এটি দিয়ে মইন-এর শিরচ্ছেদ করবে।'

মইন তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদেকেটে বল্‌লেন—'বেটা, তোমার দেহে খানদানি বংশের খুন রয়েছে। তুমি কারো অনিষ্ট করতে পারবে না, জানি। তোমার বংশের সবাই ছিলেন ক্ষমাধর্মের পূজারী। তুমিও আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে বংশের গৌরব অবশ্যই অব্যাহত রাখবে, আমার বিশ্বাস।'

আলী নূর-এর পক্ষে খলিফার আদেশ মান্য করা সম্ভব হ'ল না। কিছুতেই মইন-এর ধড় থেকে তার মুণ্ডুটি নামিয়ে দিতে পারল না। শেষ পর্যন্ত খলিফার আদেশে তাঁর দেহরক্ষী মাসরুর কাজটি হাসিল করল।

আলী নূর এবার খলিফার কাছে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে জানাল—'জাঁহাপনা, বসরাহ-র সুলতানের পদ লাভ করে মসনদে বসার ইচ্ছা আমার আগেও কোনদিন ছিল না, বর্তমানেও নেই আমাকে আপনি দোয়া করে আপনার কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে দিন তবেই আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।'

খলিফা আলী নূর-এর ইচ্ছার মূল্য দিলেন। তাঁর নিজের প্রাসাদের অদূরে একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ তৈরী করালেন। সেখানে আলী নূর তার বিবি আনিস'কে নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করতে লাগল। আর খলিফা তাকে দরবারের অন্যতম পার্ষদরূপে নিযুক্ত করলেন।

খলিফা মহম্মদ সুলেমান'কে ক্ষমা করলেন। তাঁকে পুনরায় বসরাহ-র সুলতানের পদে নিযুক্ত করলেন।

উজির মইন পরলোকগত। সুলতান মহম্মদ সুলেমান নুতুন উজির বহাল করলেন। বসরাহ-র প্রজারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সওদাগর আয়ুব ও ঘানিমের কিস্‌সা

আলী নূর ও আনিস-এর কিস্‌সা শেষ করে বেগম শাহ্‌রাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আপনার যদি দিল্‌ চায় তবে এর চেয়েও অনেক, অনেক রোমাঞ্চকর কিস্‌সা আপনাকে শোনাতে পারি।

বাদশাহ শারিয়ার বেগমের কোলে শির রেখে শুয়ে, মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'কি সে কিস্‌সা? কেমন রোমাঞ্চকর কিস্‌সা শুনি?'

জাঁহাপনা, এবার আপনাকে শোনাব সওদাগর ঘানিম আয়ুব-এর কিস্‌সা। জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে এক দেশে এক সওদাগর বাস করত। তার নাম ছিল ঘানিম আয়ুব।

সওদাগর আয়ুব-এর এক বেটা ও এক বেটি ছিল। তার বেটার নাম ঘানিম আর বেটিটির নাম ছিল ফিৎনা। তারা উভয়েই খুবসুরৎ ছিল। এক পলক দেখলে কার সাধ্য চোখ ফেরায়।

এক সময় মাত্র কয়েকদিনের বিমারিতে সওদাগর আয়ুব দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে চলে গেল। তার বিষয় আশয় ছিল অগাধ। সবাই বলাবলি করত সওদাগর আয়ুব নাকি দিনারের কুমীর ছিল। অগাধ ধনদৌলতের মালিক।

বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর ভোর হয়ে এল। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাঁইত্রিশতম রজনী

রাত্রির প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্যদিনের মতই অন্দর মহলে বেগমের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বিশাল সম্পদ ও দিনারের পাহাড় রেখে সওদাগব আয়ুব বেহেস্তে চলে গেল। তার সম্পত্তির মালিক হ'ল বেটা ঘানিম আর বেটি ফিৎনা।

সওদাগর মারা যাবার সময় তার কারবারের কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে যায়। বাগদাদে পাঠাবার জন্য একশ' গাঁট সিল্কের মূল্যবান কাপড়চোপড় বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সময়াভাবে আর পাঠানো হয়ে ওঠে নি। আর সে সঙ্গে একশ' বোতল গুলাবের নির্যাসও জোগাড় করেছিল। সেগুলোও পাঠাতে পারে নি। সবই গুদামে জড়ো করা ছিল।

আব্বার মৃত্যুর পর তার বেটা নওজোয়ান ঘানিম বাগদাদে যাওয়ার মন করল। তার ইচ্ছা, যে কাপড় আর গুলাবের নির্যাস

জড়ো করা রয়েছে সেগুলো সেখানে নিয়ে গিয়ে বেচে আসবে।

একদিন যুবক ঘানিম ঘরে আম্মা ও বহিনকে রেখে কাপড় আর গুলাবের নির্যাসের বোতলগুলি নিয়ে জাহাজে উঠল। জাহাজ বাগদাদের পথে ছুটে চল্‌ল।

বাগদাদ বন্দরে নেমে প্রথমেই ঘানিম সুন্দর একটি বাড়ি ভাড়া করল। বাড়িতে বিশালায়াতন একটি গুদাম ঘর। সব মালপত্র গুদামজাত করে ঘানিম বাগদাদ নগরটি দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ল। এখানে তার আব্বা দীর্ঘদিন ব্যবসা করে গেছে। অনেকেই তাকে চিনত। ফলে আব্বার পরিচয় দিয়ে ঘানিম সহজেই এখানকার মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে যেতে লাগল। আর কাপড় ও গুলাবের নির্যাস বেচে প্রচুর মুনাফা পিটতে লাগল। আর হবে নাই বা কেন? সিল্কের এমন সেরা কাপড় আর এমন মিষ্টি ও দীর্ঘস্থায়ী গুলাবের নির্যাস যে সচরাচর মেলেই না।

দেখতে দেখতে পুরো একটি বছর কেটে গেল। এক বিকেলে ঘানিম কয়েকটি কাপড় নিয়ে বাজারে গেল। বাজারের ফটকে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল। দোকানপাট সব বন্ধ। এমন কি ফটকটি পর্যন্ত খোলা হয় নি।

ঘানিম দু'পা পিছিয়ে এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলে একজন খুব বড় ব্যবসায়ী মারা গেছে। দোকানীরা তার মরদেহ নিয়ে গোরস্তানে গেছে।

ঘানিমও গোরস্তানের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। লম্বা-লম্বা পায়ে কিছুদূর যেতেই এক মসজিদের সামনে ভিড় দেখতে পেল। বুঝল, মরদেহ সেখানে নামানো হয়েছে। দোকানিরা তাদের দুঃসময়ে এক পরদেশীকে দেখে খুশীই হ'ল।

অনেক রাত্রে গোর দেওয়া হ'ল।

ঘানিম ভাবল, এত রাত্রি হয়ে গেল। গুদাম অরক্ষিত রয়েছে। তালা ভেঙে সব কিছু চুরি করে নেওয়া কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। সে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। নিঝুম-নিস্তব্ধ চারদিক, সে ছুটতে ছুটতে বেশী দূরে যেতে পারল না। সামনেই বিশাল এক ঝোপ-ঝাড় পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। শেয়াল, পেঁচা, ভোঁদড় আর রাতজাগা কত সব পাখির বিচিত্র ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ পরিস্থিতিতে কি কর্তব্য সহসা ভেবে উঠতে পারল না। এমন সময় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি হল। কুচকুচে কালো অতিকায় এক জানোয়ারের মত কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ে তার সর্বাঙ্গে ঘাম বেরোতে লাগল। এবার সে উপায়ান্তর না দেখে পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে ঘানিম একটি গোরস্থানে ঢুকে পড়ল। এখন আর তার মন থেকে গুদাম আর সমানপাত্রের চিন্তা পালিয়ে গেছে। নিজের জান বাঁচানোর চিন্তাই সবচেয়ে বড় বলে দেখা দিয়েছে।

দু'পা এগিয়েই ঘানিম একটি বড়সড় সমাধি দেখতে পেল। কোন আমীর-ওমরাহকে হয়ত এখানে গোর দেওয়া হয়েছে। তার চলাফেরা তো দূরের কথা দাড়িয়ে থাকার মত ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে। অনন্যোপায় হয়ে সে সমাধি সৌধটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। তার আগেই সদর দরজাটি বন্ধ করে দিয়েছিল। রাত্রি ক্রমে গভীর হতে থাকে। ঘানিম এবার দেখতে পেল একটি জ্বলন্ত লণ্ঠন তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে কুঁকড়ে যেতে লাগল। মুহূর্তে একটি জব্বর ফন্দি তার মাথায় এল। পাশের একটি সুউচ্চ নারকেল গাছে তরতর করে উঠে পড়ল। চোখের পলকে গাছের একদম মাথায় চলে গেল। গাছের মাথায় বসে সে দেখতে পেল, লণ্ঠন নিয়ে তিনটি ইয়া লম্বা-চওড়া নিগ্রো এগিয়ে আসছে। দু'জন মাথায় করে অতিকায় একটি বাক্স বহন করছে। আর তৃতীয় জনের হাতে লণ্ঠন ও একটি কোদাল।

নিগ্রোদের একজন বলল—নির্ঘাৎ গোরস্থানের ভেতরে কোন লোক আছে। নইলে দরজা বন্ধ করল কে? আমরা তো একটু আগেই দরজাটি খুলে রেখে গিয়েছিলাম।

অন্য দু'জন তাকে সমর্থন করল।

এদিকে ঘানিম -এর অবস্থা সঙ্গীনই, আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে সে যে কোন সময় ধপাস্ করে নারকেল গাছের মাথা থেকে পড়ে যেতে পারে। আর নিজে থেকে যদি না-পড়ে তবে নিগ্রোগুলো নির্ঘাৎ তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নেবে।

আগন্তুক নিগ্রোদের একজন প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকল। তার পর সদর-দরজা খুলে সঙ্গীদের ভেতরে নিয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে তারা কাঁধ থেকে বাক্সটি নামাল।

নিগ্রোদের একজন বলল্—'কী লম্বা পথ রে! ফুরোতেই চায় না! কখন যে বাক্সটা কাঁধে নিয়েছি মনেই নেই। আমি ভাই একটু বিশ্রাম টিশ্রাম না করে এক কোদাল মাটিও কাটতে পারবো না। তোরা যদি পারিস করগে যা। এই আমি এখানে বসে পড়লাম। কথা বলতে বলতে সে তার দশাসই শরীরটিকে ধপাস্ করে মাটিতে ফেলে দিল। তার সঙ্গীরাও পাশে বসল।

অন্য একজন বলল—'ভাইয়া, হাঁটাহাঁটিতে শরীর কাহিল। চোখে নিদ জড়িয়ে রয়েছে। এত রাত্রে চুপচাপ বসে থাকলে নিদ চলে আসবে। তবেই কম্ম ফতে। একদম সকালের আগে নিদ টুটবে না। তার চেয়ে বরং আমরা আপন আপন খোজা হবার কাহিনী বলে সময় কাটাই।

তার সঙ্গীরা তাকে সমর্থন করল।

বেগম শাহরাজাদ জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় একটু একটু ভোরের আলো দেখা দিতে শুরু

করেছে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটত্রিশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগমের ঘরে এলেন।

নিগ্রো সাবারের খোজা হওয়ার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, নিগ্রোদের মধ্যে সাবার নামে এক নিগ্রো তার খোজা হবার কাহিনী শুরু করল—শোন, তখন আমি মাত্র পাঁচ সালের লেড়কা। আমার আব্বা আর আম্মা তখন আমাকে বাগদাদের বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয়। আমাকে কেনে সুলতানের দেহরক্ষী। তার একটি লেড়কি ছিল, তখন তার ওমর তিন সাল।

আমার কাজ ছিল মালিকের ঘর দুয়ার সাফসুতরা রাখা। আর তার বেটির সঙ্গে কাজের ফাঁকে খেলকুদ করা। আর আমরা এক সঙ্গে গানা করতাম, নাচতাম—আর কত কি মজার মজার কাণ্ড করতাম বলে শেষ করা যাবে না।

এক সময় আমার ওমর হ'ল বারো সাল আর তার দশ। তখন একদিন আমি গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করছিলাম। এক লেড়কী এসে অতর্কিতে আমার চোখ দুটো চেপে ধরল। আমি বুঝেও না বোঝার ভান করলাম। আমার পিঠের সঙ্গে তার বুক আর তলপেটটি ক্রমে লেপ্টে গেল। সদ্য উঁকি দেওয়া তার ছোট্ট স্তন দুটোর স্পর্শ আমি স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম। সে আরও জোরে আমার পিঠে চাপ দিল। বুঝলাম, তার স্তন দুটো আমার পিঠের চাপে পিষ্ট হওয়াতে সে মনে-মনে রোমাঞ্চ অনুভব করছে। আমি তার দিকে ঘাড় না ঘুরিয়েই তার তুলতুলে নরম হাতদুটোকে বার বার দলাই মালাই করতে লাগলাম। এক অনাস্বাদিত মধুর অনুভূতিতে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসতে লাগল। শিরায় শিরায় বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। কেবল আমার কথাই বা বলি কেন লেড়কীটির অবস্থাও আমার মত সঙ্গীন হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কারো মুখে কোন কথা নেই। নীরবে অনুভূতির মাধ্যমে চাওয়া ও পাওয়া সাধ্য মত মিটিয়ে নিচ্ছিলাম উভয়েই। তাকে ছাড়ার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটিই আমার ছিল না। তারও ইচ্ছা ছাড়াছাড়ি না হয়ে আমার গায়ের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে লেপ্টে থাকে।

আমি আর তার হাত দুটো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। ক্রমশঃ আমার হাত দুটো সরীসৃপের মত তার হাত দুটো বেয়ে ওপরে উঠে তার গলায় গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হ'ল। তারপরই নিচের দিকে নামার জন্য হিসপিস করতে লাগল। নামলও দু'-এক ইঞ্চি। ব্যস, কিভাবে, কি হয়ে গেল বুঝলাম না। সে বাতাসে এক ঝাঁক হাসি ছড়িয়ে দিয়ে আমার বাহু বন্ধন থেকে এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপরই পিছন ফিরে দৌড়ে পালাল।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। যা ভেবেছি ঠিক তাই, সে বেশী দূর গেল না। হয়ত বা তার শরীর ও মন দু'-ই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। নইলে সামান্য এগিয়েই একটি মোটাসোটা গাছের গুঁড়ির ওপর গা এলিয়ে দেবে কেন? আমি ছুটে গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপরই শুরু হয়ে গেল জাপ্টাজাপ্টি। সে আমাকে দু'বাহুর বেষ্টনীতে আবদ্ধ করে ফেলল। আমিও সজোরে তাকে চেপে ধরলাম আমার বুকের মধ্যে। আমাকে যেন আদিম হিংস্র পাশবিকতা পেয়ে বসল। সে যে কি করতে, কি করলে চরম তৃপ্তি লাভ করবে ভেবেই পাচ্ছিল না। নইলে আমার ডান হাতে সজোরে কামড় বসাতে যাবেই বা কেন। দুটো দাঁত বসে গেল আমার হাতে। তিরতির করে রক্ত বেরোতে লাগল। গ্রাহ্যই করলাম না। আমিও কামোন্মত্ত নেকড়ের মত তাকে চুম্বন করতে গিয়ে তার নিচের ঠোঁটটি কামড়ে ধরলাম। কতক্ষণ এ-অবস্থায় ছিলাম বলতে

পারব না। আমি তার সরু কোমরটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার আরও কাছে আনার চেষ্টা করলাম। সে মোচড়ামুচড়ি দিতে লাগল। আবার শুরু হ'ল ধস্তাধস্তি। আচমকা আমার হাতের চাপে তার কামিজটির বেশ কিছুটা অংশ ছিঁড়ে গেল। যৌবনের জোয়ার আসার পূর্ব মুহূর্তের দৃশ্য প্রথম আমার চোখে পড়ল। সে এক ঝটকায় হাত দু'টো বুকের কাছে তুলে নিয়ে বুকটাকে ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

আমাদের কারোর হুঁস ছিল না যে আকাশে মেঘ জমতে জমতে কখন যে পুরো আকাশটিকে ছেয়ে ফেলেছে। মুহূর্তে ঝড় উঠল, প্রবল ঝড়। তারপরই শুরু হয়ে গেল মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা কতক্ষণ জল-ঝড় উপেক্ষা করে সে গাছের গুঁড়িটির ওপর পড়েছিলাম আজ আর তা মনে করতে পারছি না।

লেড়কিটির ছেড়া কামিজটা ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গিয়েছিল। দু'হাতে তার ছেড়া অংশটুকু জাপ্টেজুপ্টে ভীত সন্ত্রস্ত মনে বাড়ি ঢুকল। তার আম্মা খুবই বুদ্ধিমতী। লেড়কির চোখ-মুখ ও ছেঁড়া কামিজ দেখে ব্যাপার বুঝতে ভুল হ'ল না। তার লেড়কিটিও আম্মার রক্ত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে কিছুই গোপন করতে পারল না। তবে তার আম্মা বকাঝকা করে লোক জানাজানি করার চেয়ে চেপেচুপে রাখতেই বেশী আগ্রহী হ'ল।

লেড়কিটির আব্বা ছিল খুব বদ্‌রাগী। সে রেগে গেলে কোনদিকে তার হুঁস থাকত না। আমি তো ভাবলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে তার লেড়কিরও গর্দান নিয়ে ছাড়বে।

তার আম্মা লেড়কির শাদীর জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। এক নাপিতের লেড়কার সঙ্গে শাদীর কথাও চলছিল। তড়িঘড়ি তার সঙ্গে যোগাযোগ করল শাদীর দিন পাকা করে ফেল্‌ল।

লেড়কিটি অদ্ভুত এক আব্দার করে বসল। শাদী করতে সে রাজি আছে বটে। কিন্তু আমাকে তার সঙ্গে যেতে হবে। তার আম্মা পড়ল মহাফাঁপরে। এখন উপায়? সহজেই এক উপায়ও বের করে ফেল্‌ল। এক সকালে নাপিত ডেকে আনা হ'ল। আমি এসবের কিছুই জানতম না। নাপিত এলে আমাকে হঠাৎ পিঠ-মোড়া করে বেঁধে ফেল্‌ল। তারপর খোজা করে দিল আমাকে। লেড়কিটির শাদী হয়ে গেল। তাকে দেখভাল করার জন্য আমাকেও তার শ্বশুরালে পাঠিয়ে দিল। আমি বহুৎ দিন সেখানে ছিলাম। এক সময় তার আম্মা ও আব্বা এক এক করে বেহেস্তে চলে গেল। কিছুদিন বাদে তার স্বামীটিও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

তারপর আমি সুলতানের প্রাসাদে নোকরি পেয়ে গেলাম। ব্যস, পাকাপাকি ভাবে এখানেই দিন কাটাচ্ছি।

নিগ্রো কাফুরের খোজা হওয়ার কিস্‌সা

এবার কাফুর নামে এক নিগ্রোর পালা। সে তার খোজা হওয়ার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌ল—'আমার ওমর তখন আট সাল। আমি তখন থেকেই পুরোপুরি লম্পট হয়ে উঠেছিলাম। মিথ্যা কথা বলার স্বভাব তো ধরতে গেলে আমার খুনের সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল। আর সৎ কাজের ধার কাছ দিয়েও আমি যেতাম না। তা ছাড়া যতরকম কু-বিদ্যা আছে সবই আমি সে সময় থেকেই রপ্ত করে ফেলেছিলাম। তবে আমি মিথ্যা কথা বলতাম বটে। কিন্তু সব সময় নয়। সারা বছরের মধ্যে বেছেবেছে মাত্র একবার মিথ্যা কথা বলতাম। তবে হ্যাঁ তাতেই সারা বছরের শোধ তুলে নিতাম। মোক্ষম সে চাল। তার জন্য আমার মালিকদের প্রভূত ক্ষতির বোঝা বইতে হয়েছে। একবার এরকমই জব্বর এক মিথ্যা চাল চালতে গিয়েই আমাকে খোজা হতে হয়।

যখনকার কথা বলছি তখন আমি এক বণিকের অধীনে দিন গুজরান করছিলাম। সে ক্রীতদাসের কারবার করে। আমার আগের মালিকের কাছ থেকে সে সস্তা দামে আমাকে খরিদ করে নিয়েছিল। তারপর সে আবার বেচার জন্য নিয়ে ক্রীতদাস কেনা-বেচার হাটে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। নীলামে দর উঠল দু'শ দিরহাম। আর দস্তরি কুড়ি দিরহাম। বেচার সময় বণিক বলেই দিয়েছিল কামকাজ আমি খুবই ভাল পারি। কিন্তু দোষ একটিই। প্রতি বছরে একবার করে মিথ্যা কথা বলি।

আমার নয়া মালিক আমাকে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত রাখার জন্য পড়ানোর মত করে বুঝাতে লাগল। এক-দু'করে দু'-দু'টি মাস কেটে গেল। আমার মালিক ভাবল কি তার দাওয়াইয়ে কাজ হয়েছে। ভুলেও আমি আর মিথ্যা কথা বলব না।

এক সন্ধ্যায় মালিক আমাকে এক আমীর আদমির বাড়িতে নিয়ে গেল। বাগিচার ঠিক মাঝখানে সুন্দর সে ছোট্ট বাড়িটি। তার মুখে শুনলাম, সেখানে নাচা, গানা আর খানাপিনা হবে। তখন ইয়ার দোস্তরা এক এক করে জমায়েত হতে লাগল।

মালিক আমাকে এক সময় বল্‌লেন—'বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আলমারির ওপরে দশ জোড়া তাশ ফেলে এসেছি। আমার খচ্চরটি নিয়ে গিয়ে চটকরে নিয়ে আয়গে।'

আমি খচ্চরের পিঠে চেপে বাড়ি ফিরলাম। সদর-দরজা থেকে বিলাপ পেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকলাম। আমার কান্না শুনে মালিকের বিবি আর তার লেড়কি ছুটে এল। আমি কান্না অব্যাহত রেখেই বল্‌লাম—'মালিক মারা গেছে।' কাঁদতে কাঁদতে এবার বল্‌লাম—বাগিচার প্রাচীরের ওপারে উঠে একটি মুসম্বি লেবুর গাছ থেকে লেবু পাড়তে গিয়ে পড়ে যায়। একেবারে ফেঁটেফুঁটে ধপাস। ব্যস খেল্ খতম। এখন কি উপায় মালকিন?'

আমার কথা শুনে বাড়িতে কান্নার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। কে, কার চেয়ে বেশী জোরে কেঁদে শোক প্রকাশ করতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় যেন সবাই মেতে গেল। তখন সবাই প্রায় উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়েছে। বাড়ির থালা বাসন আসবাবপত্র সব ভেঙেচুরে শোক প্রকাশ করতে লাগল। লেপ, তোষক, চাদর ও কাঁথা প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। সব মিলে এক বীভৎস কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

এবার শুরু হ'ল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শোক প্রকাশ। চুল খুলে, বোরখা ফেলে দিয়ে উন্মাদিনীর মত কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে

সবাই ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এসে নানা ভাবে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল। কেউ বা দেওয়ালে আলকাতরা মাখিয়ে শোকের চিহ্নটিকে অধিকতর স্পষ্ট করার কাজে লেগে গেল।

'প্রতিবেশীরা বলাবলি করতে লাগল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। অতএব সবার আগে ঘটনাটিকে কোতোয়ালের নজরে আনা দরকার।'

প্রতিবেশীদের কয়েকজন আমার মালকিনকে নিয়ে কোতোয়ালের বাড়ির দিকে হাঁটা জুড়ল।

আমি দেখলাম, এতক্ষণে সুযোগ পাওয়া গেছে। দশ জোড়া তাস নিয়ে আবার খচ্চরটির পিঠে চেপে বসলাম।

বেগম শাহরাজাদ ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

উনচল্লিশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার প্রায় মধ্যরাত্রে অন্দরমহলে বেগমের কাছে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, নিগ্রো খোজা কাফুর তার খোজা হওয়ার কিস্‌সা বলে চলেছে। সে এবার বল্‌ল—আমি খচ্চরের পিঠে চেপে বাগিচার সে-বাড়িতে বিলাপ পেড়ে হাউমাউ করে কেঁদে মালিকের সামনে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম। কেঁদেকেটে বল্‌লাম—'হুজুর, আমি আর বলতে পারছি না! কে যেন আমার গলা চেপে ধরছে। আমি পারব না! মালিকের পায়ের কাছে পড়ে আমি বুক চাপড়ে কাঁদছি আর সমানে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছি।

মালিকের পীড়াপীড়িতে আমি কান্নার বেগ কমিয়ে কোনরকমে বলতে লাগলাম—আমি খচ্চরের পিঠে চেপে বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখি বাড়ির সামনে হাজার হাজার আদমি জড়ো হয়েছে। আমার তখন মাথায় বাজপড়ার উপক্রম হ'ল।

মালিকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হ'ল। তিনি ক্ষেপে গিয়ে আমাকে প্রায় মেরেই বসেন। বলেন—'হারামজাদা, তখন থেকে শুধু কাঁদছে আর ধানাইপানাই করছে। এত্ত লোক কেন, কি হয়েছে আর তুই-ই বা এমন বিলাপ পেড়ে কাদছিস কেন?'

—হুজুর, প্রথমে আমি লক্ষ্যই করিনি যে, আমাদের বাড়িটি একেবারে ধসে পড়েছে। বাড়ির কোন আদমি তো দূরের কথা হাঁস, মুরগি, বখরি, গাই কিছুই জিন্দা নেই। সব খতম। দেয়ালচাপা পড়ে সবাই মারা গেছে।'

ব্যস, আর যাবে কোথায়। খেল শুরু হয়ে গেল। আমার মনিব কাঁদতে কাঁদতে চুল-দাড়ি টেনে টেনে ছিড়তে লাগলেন। ইয়ার-দোস্তরা তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ধরাধরি করে তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই বিপরীত দিক থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। একটু পরেই দেখা গেল যেন শোক-মিছিল এগিয়ে আসছে। মিছিলের সামনে আমার মালকিন। গায়ে বোরখা নেই। মাথার চুল এলোমেলো। উন্মাদিনী যেন ধেয়ে আসছেন।

আমার মালিক তখন যেন হঠাৎ আশমান থেকে জমিনে পড়েছেন। হতভম্ব।

মালকিন ছুটতে ছুটতে এসে মালিকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। লেড়কা—লেড়কিরা এসে কাঁদতে কাঁদতে আব্বাকে জড়িয়ে ধরে।

আমার মালিকের আর ব্যাপারটি বুঝতে বাকি রইল না। আমার কারসাজিতেই যে এমন বিচ্ছিরি ব্যাপারটি ঘটেছে বুঝতে পেরে আমার কোর্তা চেপে ধরে দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলেন—'হারামজাদা, হতচ্ছাড়া পাজি কাহাকার।' বলেই সজোরে আমার চোয়ালে মোক্ষম একটি ঘুষি চালিয়ে দিলেন। ব্যস, আমার ওপর সমানে কিল, চড় আর লাথির বৃষ্টি পড়তে লাগল।

আমি মালিকের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌লাম—'মালিক, আমাকে কেন মিছে মারধোর করছেন। বণিকের কাছ থেকে আমাকে যখন কিনেছিলেন তখন রসিদে তো আমার চরিত্রের এ-বিশেষ গুণটির কথা উল্লেখ করাই ছিল। আমার সম্বন্ধে সবকিছু জেনেশুনে তবেই তো আমাকে বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন। আর মিথ্যা রসিকতার কথা যদি বলেন তবে মনে করতে পারেন এটা পুরোটা অবশ্যই নয়, আধখানা রসিকতামাত্র, আরও আধখানা তো রয়েই গেছে।'

মিছিলের সঙ্গে কোতোয়ালও ছিলেন। তাঁর নির্দেশে আমার পিঠে ঘন ঘন চাবুক পড়তে লাগল।

আমি মালিকের বাসন কোসন আসবাবপত্র আর লেপ-তোষক প্রভৃতি নষ্ট করেছি এই অজুহাতে মালিক আমাকে খোজা করে দিলেন। খোজার বাজারদর সাধারণ ক্রীতদাসের চেয়ে বেশী বলে আমাকে আবার ক্রীতদাসের বাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এভাবে বার বার বিক্রি হতে হতে এক সময় এক খলিফা আমাকে কিনে নিয়ে গিয়ে হারেমের কাজে লাগিয়ে দিল।

নিগ্রো বুখাইতের খোজা হওয়ার কিস্‌সা

কাফুর নামে নিগ্রো যুবকটি তার খোজা হবার কিস্‌সা বলার পর এবার বুখাইত নামে এক যুবক একটু নড়ে চড়ে বসে তার কিস্‌সা শুরু করল। সে বল্‌ল—'আমার খোজা হবার কিস্‌সা তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। সত্যি বলতে কি, আমার জীবনের ঘটনা যেমন এলোমেলো তেমনি খুবই দীর্ঘও বটে। তবে কাটছাঁট দিয়ে সাধ্যমত অল্প কথায় বলছি। আমি এক বাড়ি ক্রীতদাসরূপে থাকতাম। আমার মালকিনটির বয়স ছিল কম। ছিমছাম চেহারা। যাকে বলে একেবারে ডাঁসা পেয়ারার মত। আমি কাজের ফাঁকে তাঁর দিকে আঁড় চোখে তাকিয়ে থাকতাম। চেষ্টা করতাম তাঁর মনের খবর নিতে। সে তাঁর শরীরের যৌবনচিহ্নগুলো ঢেকেঢুকে রাখলেও মাঝে মধ্যে তার কাপড় চোপড় কেমন বেসামাল হয়ে পড়ত। তার নিটোল স্তনদুটোর এক বিরাট ভগ্নাংশই কামিজের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারত। আসলে সে দুটো ছিল এতই বড় যে কামিজের তলায় বন্দী হয়ে থাকতে চাইত না। বিদ্রোহ করত। আমার সুযোগ সন্ধানী চোখ দুটো সে-সুযোগের প্রতীক্ষায় সর্বদা ছোঁক ছোঁক করত। আর থেকে থেকে আমার খুনে ধরে যেত মাতন। নিজেকে আর সংযত রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। একদিন আমার মালিক এক জরুরী কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। আমরা দুটোমাত্র প্রাণী বাড়িতে। আমার মাথার দুষ্ট পোকাগুলো কিলবিলিয়ে উঠল। আমার কুড়ি বছরের যৌবনকে আর নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে

পারলাম না। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মালকিনের ওপর। তারপর কি হ'ল আশাকরি আর খুলে বলার দরকার নেই। সেদিনের সে সাময়িক আনন্দানুভূতিই আমার কপাল পোড়ার একমাত্র কারণ।

আমার মালিক বাড়ি এসে সবকিছু শুনলেন। আমাকে নিয়ে ছোট্ট এক কামরায় তালাবন্ধ করে রেখে দিলেন। পরদিন সকালে নাপিত এসে পুরুষের যা অমূল্য সম্পদ সেটি ছেদন করে আমাকে সারা জীবনের মত খোজা করে দিল।

আমার জীবনের দুঃখের কিস্‌সা যদি আরও খোলাখুলি শুনতেই চাও পরে না হয় একদিন সুযোগ-সুবিধামত শোনাব। আজ চল। কোদাল চালিয়ে গর্ত করার কাজটি সেরে ফেলা যাক।

এবার তিন নিগ্রো যুবক বাক্সটির মাপে একটি গর্ত খোঁড়ার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেল। কঠোর পরিশ্রম করে বাঞ্ছিত গর্তটি খুঁড়ল। তারপর ধরাধরি করে তার মধ্যে বাক্সটি ঢুকিয়ে দিল। ব্যস্ত হাতে মাটিচাপা দিল। তারপর তারা কোদাল আর লণ্ঠনটি নিয়ে গোরস্থান ছেড়ে গেল।

সওদাগর আয়ুব ও ঘানিমের কিস্‌সার শেষাংশ

নিগ্রো যুবক তিনটি বিদায় নিলে ঘানিম নারকেল গাছ থেকে নামল। ব্যস্ত-হাতে মাটি তুলে বাক্সটিকে গর্ত থেকে বের করে আনল। পাথর দিয়ে আঘাত করে তালাটি ভেঙে ফেল্‌ল। বাক্সের ডালা তুলতেই সচকিত হ'য়ে পড়ল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ার জোগাড়। শরীরের সবক'টি স্নায়ু যেন একসঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। এক রূপসী তন্বী যুবতী চোখবুজে শুয়ে খুবসুরৎ লেড়কি ঘুমিয়ে রয়েছে। তার পরনে সোনার জরির কাজ করা বহুমূল্য সিল্কের পোশাক। জড়োয়া হার, হীরের নাকছাবি, টায়রা, বিছা আর হীরা জহরত ব্যবহৃত তাগা—সবই রয়েছে একনজরে দেখলেই মনেহয় কোন বাদশাহ বা সুলতান নিদেন পক্ষে কোন প্রখ্যাত উজিরের লেড়কি।

ঘানিম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এক সময় তার বুকের ওপর হাত রাখল। বেশ গরমই বোধ হ'ল তার। নিঃসন্দেহ হ'ল, জীবিত। নাকের কাছে কোন ওষুধ ধরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। তার নাকের কাছে নিজের নাকটি এগিয়ে নিল। হ্যাঁ, ওষুধের গন্ধ পেল।

লেড়কিটি ঘুমে একেবারে অচৈতন্য। বার-কয়েক আলতো করে ধাক্কা দিল, কোনই সাড়া নেই। নাকের ছিদ্রপথে সরু একটি কাঠি ঢুকিয়ে শুড়সুড়ি দিল। মনে হ'ল নাকটি সরিয়ে নিতে চাচ্ছে। তারপর বার কয়েক হাঁচি দিল। আরও কয়েক মুহূর্ত এভাবে থাকার পর এক সময় চোখ মেলে তাকাল রহস্যময়ী লেড়কিটি। মনে হল

লেড়কিটি যেন তার সামনের সবকিছুকে আবছা দেখছে। তখনও তার মধ্য থেকে তন্দ্রাভাব কাটে নি।

এক সময় লেড়কির ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল কিছু বলতে চাইছে। প্রায় অস্ফুট অস্পষ্টতার স্বর। উৎকর্ণ হয়ে শোনার পর ঘানিম তার কথায় টুকরো টুকরো দু'-একটি শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে পারল। 'এ-ক-টু পা-নি, এ-ক-টু পা-নি দা-ও। কী গ-র-ম! বা-তা-স, এ-ক-টু বা-তা-স!'

ব্যস, আবার এলিয়ে পড়ল। চোখ গেল আগের মতই বন্ধ হয়ে।

মিনিট খানেক যেতে না যেতেই এবার অধিকতর স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলতে লাগল — 'বাতাস! রাজিয়া, সীতারা আয়, আমার কাছে আয়। একটু বাতাস কর! উঃ কী গরম! সব জ্বলেপুড়ে গেল।

কে জবাব দেবে? কোথায় তার রাজিয়া, আর কোথায়ই বা সীতারা। কে-ই বা তার কাছে যাবে বাতাস করবে। ঘানিম আর বাক্সের ভেতরে শায়িতা লেড়কিটি ছাড়া ধারে-কাছে কেউ থাকলে তো তার কথায় সাড়া দেবে।

এবার তার দৃষ্টি যেন কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে আসছে মনে হ'ল। সে অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরাতে লাগল। এক সময় আর্তনাদ করে উঠল—'আমি কোথায়? আমি এখানে, গোরস্থানে কেন? কে আমাকে এ-গোরস্থানে নিয়ে এল? আমার প্রাসাদ? প্রাসাদের হারেম? আমার নোকর, নফর আর খোজারা সব গেল কোথায়? খোদা—কে এরকম সর্বনাশ আমার করল? কোন বেইমান আমাকে গোরস্থানে পাঠাল?'

লেড়কিটি এবার ঘানিমের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। ঘানিম বল্‌ল—'রূপসী, আমি ঘানিম ইবন আয়ুব। প্রাসাদ ছেড়ে এ নির্জন গোরস্থানে এসে পড়লেও তোমার ভয়-ডরের কোন কারণ নেই। আমি থাকতে তোমার কোন ক্ষতিই কেউ করতে পারবে না, বিশ্বাস রাখ। যদি পারি তোমার উপকারই করব, সর্বনাশ করতে তিলমাত্র চেষ্টাও করব না, বিশ্বাস রাখতে পার। খোদাতাল্লা হয়ত তোমার সাহায্যের জন্যই আমাকে এখানে এনে ফেলেছেন। নইলে আমার এখানে আগমন তোমার আগমনের মতই একেবারে অপ্রত্যাশিতই বটে।'

লেড়কিটি এবার বল্‌ল—'আমি কি খোয়াব দেখছি? তা নইলে এখানে, এ-গোরস্থানে এলাম কি করে?'

ঘানিম এবার তিন খোজা নিগ্রো যুবকের কীর্তির কথা তার কাছে ব্যক্ত করল।

লেড়কিটি এবার যেন কিছুটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে। ঘানিমকে বল্‌ল—'এক কাজ কর। আমি বাক্সের মধ্যে যেমনটি ছিলাম ঠিক তেমনি রেখে তালা দাও তারপর একটি খচ্চর জোগাড় করার কোসিস কর। তোমার ঘরে আমাকে নিয়ে চল। আমার সব কথা, আমার করুণ কাহিনী তোমাকে শোনাব।'

সকাল হতে না হতেই ঘানিম একটি খচ্চর জোগাড় করে ফেল্‌ল। তার পিঠে বাক্সটি চাপিয়ে নিজের ভাড়া বাড়ির দিকে যাত্রা করল। তার বাসায় পৌঁছোতে একটু বেলাই হয়ে গেল।

কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলার পর ভোর হয়ে আসছে বুঝতে পেরে বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করল।

চল্লিশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার আজ অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই বেগম শাহরাজাদ-এর কাছে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাহাপনা, ঘানিম খচ্চরের পিঠ থেকে লেড়কিটিকে বাক্স সমেত নামিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ডালা খুলে তাকে বের করে তাকে পালঙ্কে বসাল। সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিমেলে ঘরের সব কিছু দেখতে লাগল।

ঘানিম লেড়কিটি থেকে যথা সম্ভব দূরে। খাটের এক কোণে বসল। ব্যাপারটি কিন্তু লেড়কিটির মনের মত হ'ল না। সে সরতে সরতে একেবারে ঘানিম-এর গা-ঘেঁষে বসল। খিল্ খিল্ করে

হেসে বল্‌ল—'তুমি যেন আমার সঙ্গে কেমন করছ। এত দূরে বসলে কখনও ভাল লাগে ছাই। দূরে দূরেই যদি রাখবে তবে গোরস্থান থেকে নিজের ঘরে নিয়ে এলে কেন?'

ঘানিম কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এক সময় আমতা আমতা করে বলে—'বলছিলাম কি, মানে—।

—'থাক খুব হয়েছে! এবার দেখতো ঘরে খাবার কিছু আছে কিনা। খিদেতে পেটের ভেতরে আগুন জ্বলছে। ঘানিম উঠে গিয়ে বয়ম থেকে কয়েকটি লাড্ডু এনে লেড়কিটির সামনে রাখল।

সে একটি লাড্ডু তুলে নিয়ে ঘানিম-এর মুখে পুরে দিল। লেড়কিটির আঙুল ঘানিম-এর ঠোঁট দুটো স্পর্শ করা মাত্র কেমন এক বিচিত্র অনুভূতি তার দেহ মনে জাগে। সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের শিহরণ দেখা গেল। সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কোন নারীর দেহের স্পর্শ এর আগে সে আর মুহূর্তের জন্যও অনুভব করে নি। জীবনের নতুনতর 'স্বাদ', নতুনতর উত্তেজনা, নতুনতর আনন্দ সে আজ অনুভব করল।

লেড়কিটি আরও সামান্য কাছে ঘেঁষে বসল। নিজের মুখটি তার মুখের কাছাকাছি নিয়ে গেল।

ঘানিম নির্বিকার। ভেতরের উত্তেজনাকে জোর করে প্রশমিত করল। লেড়কিটি এবার অভিমানের স্বরে বলল—'আহা, এমন লজ্জা শরম তো ভাল নয়।'

ঘানিম এবারও নির্বাক ও নির্বিকার রইল। চোখের তারা দু'টো জ্বল জ্বল করতে থাকে।

লেড়কিটি আবেগ মধুর স্বরে বলল—' আরে, এমন করলে তো চলবে না। আমাকে ঘরে নিয়ে এসে অনাদর করবে। আমি যে আজ তোমার মেহমান গো। মেহমানকে আদর-আপ্যায়ন করতে হয় তাও বুঝি তোমার জানা নেই? লাড্ডু এনে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করতে চাচ্ছ নাকি? খাইয়ে দেবে না? আমাকে খাইয়ে দাও।'

ঘানিম একটি লাড্ডু নিয়ে ওর মুখে গুঁজে দেয়। তারপর বদনা থেকে জল দিতে গিয়ে তার কামিজে কিছুটা জল ফেলে দেয়। লজ্জা, আতঙ্ক ও ব্যস্ততার জন্য এমন একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গেল।

লেড়কিটি বলল—'এতে কিছু হবে না। কিন্তু তোমার ঘরে কি অতিরিক্ত কামিজটামিজ আছে?'

—'কামিজ? আমি কামিজ পাব কোথায়? আমি কি শাদী করেছি যে কামিজ থাকবে?'

—'তাই বল। তবে তো তুমি একেবারে সতী গো।'

ঘানিম দৌড়ে গিয়ে একটি শুকনো তোয়ালে নিয়ে এল। লেড়কিটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

ঘানিম বল্‌ল—'হাসছ কেন? এতে আবার হাসার কি হ'ল, বুঝছি না তো। তোয়ালেটি দিয়ে মুছে ফেল।'

—'থাক, মুছতে হবে না। একটু-আধটু ভেজাটেজা থাকা ভাল। নইলে আবার তোমার মত কাঠখোট্টা হয়ে যাব যে!'

লেড়কিটি ঘানিমকে দিয়ে সরাবের বোতল আনাল। নিজে খেল, ঘানিমকেও খাওয়াল। খুব মৌজ করে খেল। সরাবের নেশায় লেড়কিটির চোখ দুটো আবেশে জড়িয়ে আসতে লাগল। সে ঘানিম-এর কোলে মাথা রেখে শরীর এলিয়ে দিল। ঘানিম-এর দেহ মনে এক অনাস্বাদিত পুলকের সঞ্চার হয়। শিরায় উপশিরায় রক্তের গতি ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। এরকম অনুভূতির স্বাদ এর আগে কোনদিনই সে পায় নি।

লেড়কিটির চোখ দুটো আবেশে ঢুল ঢুল হয়ে আসতে থাকে। আবেগ মধুর স্বরে বলে —'তুমি যেন একটা কি! কিছু বোঝ না! হাতের আঙুলগুলো দিয়ে আমার মাথায় একটু বিনি কেটে দাও না গো।'

কয়েক মুহূর্ত পরে লেড়কিটি অনুযোগের স্বরে বলে—'এ হচ্ছে কি, শুনি? একে বুঝি মাথায় হাত বোলানো বলে?'

ঘানিমের শরমে মরে যাবার জোগাড় হল। আসলে কখন যে লেড়কিটির মাথা থেকে হাতটি তার গালে নেমে এসেছিল তা সে নিজেই জানে না। ফলে আচমকা হাতটি তুলে নিয়ে এল। আবার মাথায় রেখে আলতোভাবে চুলে বিনি কাটতে লাগল।

লেড়কিটি আনন্দানুভূতিতে চোখ দুটো বন্ধ করে ঘানিম-এর কোলে পড়ে থাকে।

ঘানিম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে লেড়কিটির আপেল রাঙা তুলতুলে ঠোঁট দুটোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে। আবার মাথা থেকে হাতটি নেমে এল তার বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভার মত টুকটুকে গাল দুটোর ওপর। মসৃণ, নরম ও নিটোল, আঃ কী বাহার! কী বাহার!

লেড়কিটি আবার সরবে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বল্‌ল—কি গো, হেরে গেলে দেখছি? হাতটি যে আবারও মাথা থেকে গালে নেমে এল। এবার বুঝলাম, তুমি যতই ভেজা বেড়ালের মত থাক না কেন, আসলে কিন্তু তা নয়। এক কাজ কর। আর এক বোতল সরাব নিয়ে এসো। নেশার ঝোঁক কেটে গেলে দিনটিই বরবাদ হয়ে যাবে।

তারা সারাদিন সরাব পান, গানা-বাজনা, হাসি-তামাশা প্রভৃতির মাধ্যমে কাটিয়ে দিল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল বাগদাদ নগরীর বুকে।

ঘানিম তার মেহমানকে নিয়ে পালঙ্কের ওপরে বসে তার অতীত-জীবনের কথা শোনায়।

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়। তারা আরও কাছাকাছি একেবারে গা-ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বসে।

সারাদিন ঘানিম নিজেকে সংযত রেখেছে। যৌবনের ক্ষুধা তাকে উত্তেজিত করেছে, খুনে জাগিয়েছে মাতন। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছে। কিন্তু এবার তার দেহ-মন দুটো যেন তার আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে লাগল। সে লেড়কিটিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল নিজের ঠোঁট দুটোকে তার তুলতুলে ঠোঁট দুটোর ওপর রাখল। চুম্বন করল, এক-দুই-তিন করে বহুবার।

লেড়কিটি ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠল—'সত্যি মেহবুব, এবার মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে পৌরুষত্ব রয়েছে। পুরুষ মানুষ যদি সত্যিকারের পুরুষের মত না হয় তবে কোন লেড়কিরই মন ভরে না। পুরুষের দাঁতের কামড়ে আমার ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরার মধ্যেই আনন্দানুভূতি। আর? তোমার হাত দুটো আমার যৌবনকে পিষ্ট করবে, তোমার প্রশস্ত বুকের চাপে আমার শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হবে তবেই তোমাকে সত্যিকারের পুরুষ মানুষ ব'লে মনে হবে। কোথায় তুমি আমার মধ্যে কামস্পৃহা জাগিয়ে তুলবে তা নয় তো আমি লেড়কি হয়ে তোমার যৌবনকে সারাদিন ধরে উদ্দীপিত করলাম।'

—'তুমি এমন করে বলছ কেন? আমার জীবনে প্রথম নারী তুমি। তাই লজ্জা শরম একটু তো হওয়াই স্বাভাবিক।'

ক্রমে রাত্রি গভীর হয়। ঘানিম আর লেড়কিটি আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বেশ কিছু সময় পড়ে রইল। লেড়কিটির খুনে মাতন লাগে, ক্রমে কামোন্মাদন জাগে।'
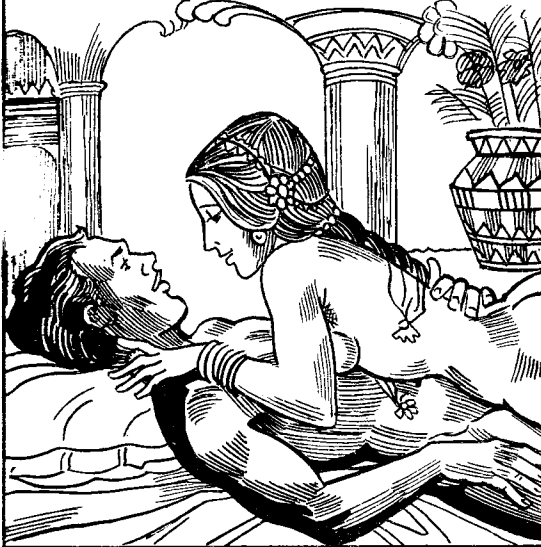
কিন্তু ঘানিম নিজেকে সংযত রাখে।

লেড়কিটি আব্দারের সুরে বলে —'মেহবুব, কেবলমাত্র আলিঙ্গন, শোষণ আর দলনে যে আমার মন ভরবে না। আমার সম্ভোগ-তৃষ্ণা—'

এত উতলা হচ্ছো কেন, বলতো? তুমি বা আমি—কেউ-ই তো আর এখান থেকে ভেগে যাচ্ছি না যে, যা কিছু দেনা-পাওনা আজ রাত্রের মধ্যেই মিটিয়ে নিতে হবে।'

লেড়কিটি ঘানিম-এর গালে একটি টোকা দিয়ে বল্‌ল —'মেহেবুব, তোমাকে কিছুতেই চাঙ্গা করে তুলতে পারছিনে এটাই আমার কাছে তাজ্জব ব্যাপার মনে হচ্ছে। জান, আমাকেই একদিন না একদিন চলে যেতেই হবে।'

ঘানিম তার মুখটি লেড়কিটির বুকের মধ্যে গুঁজে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে বল্‌ল—'তুমি চলে যাবে? কেন যাবে? কোথায় যাবে?'

—'স্বেচ্ছায় যাব না। ওরা আমাকে খুঁজে বের করবেই। তারপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে এখান থেকে।'

লেড়কিটি এবার তার জীবনের কিস্‌সা বলতে লাগল—আমি খালিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর বাঁদী। খুবই পিয়ারের বাঁদী। আমাকে তিনি আদর করে কুৎ-অল-কুলুব বলে সম্বোধন করেন। খুব কম বয়স থেকে আমি তাঁর প্রাসাদে বাস করছি। আমার সুখ উৎপাদনের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। হীরা-জহরৎ,মনি-মাণিক্য দিয়ে আমার গা-সাজিয়ে রেখেছেন। আমার রূপ-সৌন্দর্যের কদর দিতে গিয়ে অধিকাংশ রাত্রিই তিনি আমার মহলে কাটাতেন। আমার এরকম দহরম মহরম সবার, বিশেষ করে বেগম জুবেদা বরদাস্ত করতে পারত না। হিংসায়-রাগে-দুঃখে-অপমানে সে সর্বদা জ্বলে-পুড়ে খাঁক হ'ত। তাই সে তার চক্ষুশূল আমাকে দুনিয়া থেকে সরাবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'ল। ফিকির খুঁজতে লাগল। গত রাত্রে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করল। খলিফা মহলের বাইরে। খলিফা সুবায় গেছেন বিদ্রোহী প্রজাদের কব্জা করতে।

আমার নোকরানীর সংখ্যা বারোজন। তাদের একজনের সঙ্গে জুবেদার সাঁট রয়েছে। গতরাত্রে অন্যদিনের মত আমাকে সরবৎ দেয়। তাতে বিষ মেশানো ছিল।

সরবতের ব্যাপারটি আমাকে ধন্দে ফেলে। মন মোচড় মেরে ওঠে। মন শক্ত করে জেগে থাকলাম। বিষক্রিয়া শুরু হ'ল। কিছুক্ষণ বাদে নোকরানীটি এসে আমাকে শুতে বলল। আমিও আর বসে থাকতে পারছিলাম না। তার কথামত পালঙ্কে গেলাম। কাৎ হয়ে পড়ে গেলাম। ব্যস, তারপরই উদ্ভট একটি উগ্র গন্ধ অনুভব করলাম। হাত-পা—সর্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসতে চাইলেও আমার চেতনা একেবারে লোপ পায় নি। সব কিছু শুনতে পাচ্ছি,

বুঝতে পারছি, কিন্তু মনের ভাব ব্যক্ত করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছি।

আমার কানে এল, জুবেদা আমার কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে—কাফুর, বুখাইত আর সাবাবকে ঠিক করা আছে। তাদের বল কাঠের বাক্সটি নিয়ে এসে ঝটপট কাজ হাসিল করে ফেলতে। তিন খোজা এল। আমার নিঃসার দেহটিকে অতিকায় কাঠের বাক্সটিতে ঠেঁসে ভরে দিল।

আবার জুবেদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে গোর দিয়ে আয়। রাত্রেই—ভোর হবার আগেই মহলে এসে আমাকে জানাবি।

আমি শুনছি, বুঝছি সবই। কিন্তু কিছুই বলতে পারছি না, করতে তো পারছিই না। তখন আমার কী মর্মান্তিক অসহায় অবস্থা একবারটি ভেবে দেখ মেহেবুব।

একটি কথা কি জান মেহেবুব, আমি তখন নিঃসার হয়ে পড়ে থাকায় ভালই হয়েছে। দাওয়াই ধরে নি বুঝলে জুবেদা হয়ত ছোরা দিয়ে আমার কলিজাটি ছেঁদাই করে দিত। পাঠিয়ে দিত একেবারে বেহেস্তে।

মেহেবুব, পরবর্তী যা কিছু ঘটনা সবই তো তোমার চোখের ওপরেই ঘটেছে। সবই খোদার মর্জি। তুমি পরদেশী। গোরস্থানে তখন তো তোমার যাবার কথা নয়। অথচ তুমি সেখানে ছিলে। খোদার মর্জি না হলে এ কী হওয়া সম্ভব ছিল, বল?

ঘানিম রুদ্ধশ্বাসে রূপসী তন্বী যুবতী কুল-অল-কুলুব-এর কিস্‌সা শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দেয়। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। আপন মনে সে বলে ওঠে—'হায় খোদা! এ আমি কি করতে চলেছি। পয়গম্বর খলিফা হারুন-অল-রশিদের পিয়ারী! তাকে স্পর্শ করলেও গুনাহ হবে, যেতে হবে দোজকে, ঘানিম খাট থেকে নেমে একটি কুর্শিতে গিয়ে বসল। কুৎ-অল-কুলুব এর কারণ ঠাহর করতে পারল না। সে সবিনয়ে বলে—'সে কী মেহেবুব, ওখানে চলে গেলে যে বড়!

—'তুমি খলিফার পিয়ারী, তোমার দিকে নজর দিলে আমি যে অন্ধা হয়ে যাব। তুমি খাটে শোও। আমি নিচে বিস্তারা বিছিয়ে শুয়ে পড়ব।

—'পাগল কাহাকার! তা-ই আবার হয়। খাটে চল, এক সঙ্গে শোবে। আমি তোমাকে বলছি। গুণাহ-ই যদি কিছু হয়, তো আমার হবে।'

ঘানিম প্রবল আপত্তি তোলে। পুরো রাত্রি কুর্শিতে বসেই কাটায়। কাকডাকা সকালে সে বাজারে চলে গেল। বাদশাহী খানা খরিদ করল। ঘরে মেহমান, তার দিলখুশ্ করার জন্য গুলাব পানি, আতর, মনমৌজী রঙ বে-রঙের ফুল আরও খুঁটিনাটি কত সব সমানপত্র খরিদ করে ঘরে ফিরল।

কুৎ-অল একটু আগ পর্যন্ত নিদ যাচ্ছিল। ঘানিম'কে দেখে আড়মোড়া ভেঙে খাট থেকে নামল।

কুৎ-অল বল্‌ল—'এর মধ্যে বাজার সেরে এলে? আমাকে একেলা ফেলে —'

—'আরে তুমি খলিফার পিয়ারী, আমার মেহমান। আদর-আপ্যায়নের গল্‌তি হলে আমার গর্দান যাবে যে।' কথা বলতে বলতে সে নাস্তার ঠোঙা বের করে ভাগ করার উদ্যোগ নিল।

কুৎ-অল বাধা দিল। গোস্‌সা করে বল্‌ল—'নাস্তা টাস্তা ফেলে রাখ। আমার কাছে এসো। পেটের ধান্দা রেখে আমার কাছে সর্বদা থাকতে হবে। খানাপিনা করার লোভে আমি এখানে আসি নি, শুনে রাখ।' কথা বলতে বলতে হেঁচকা টান মেরে তাকে খাটে শুইয়ে দেওয়ার কোসিস করে। ঘানিম বেগড়া দেয়। সবিস্ময়ে বলে—'আরে করছ কি! আমি তোমার নফর। তোমার হুকুম তামিল করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারি না।'

—'নফর? হুকুম তামিল? তবে আমি তোমাকে হুকুমই করছি, আমার কাছে এসো। নইলে ধড় থেকে তোমার শির নেমে যাবে।'

—'শির নামাও। গর্দান নাও বা শূলে চড়াও —তোমার দিল যা চায় করতে পার। কিন্তু মেহেরবাণি করে ওসব কাজ কামের হুকুম কোরো না। আমি অক্ষম।'

ঘানিম বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। কুৎ-অল বিদ্যুৎগতিতে তার কাছে আসে। দু'হাতে সাঁড়াশীর মত আঁকড়ে ধরে। জোর করে তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। চুম্বন করে। শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে তার ঠোঁটে ঠোঁট দুটো ঘষতে থাকে। অস্থির হয়ে পড়ে। রক্তে মাতন লেগে যায়। দাঁত দিয়ে ঘানিম এর নিচের ঠোঁটটি কামড়ে ধরে। খুন! তিরতির করে খুন ঝরতে থাকে তার ঠোঁট থেকে।

কুৎ-অল উন্মাদিনীর মত ঘানিম'কে আঁকড়ে ধরে। নিজের বুকের ওপর তার সুপ্রশস্ত যৌবনভরা বুকটিকে সজোরে চেপে ধরে। জোরে —'আরও জোরে —আরও। দিল চাইছে এভাবে নিজের জান খতম করে দেয়।

ঘানিম আর্তনাদ করে ওঠে—আরে করছ কী! করছ কী। মলিকের ভক্ত কুত্তা কি মন করলেই শের বনে যেতে পারে? অসম্ভব! আমাকে ছেড়ে দাও।' এক ঝটকায় নিজেকে কুৎ-অল-এর বাহু বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। কুৎ-অল নিজেকে সামলে নেয়। কামিজ অগোছাল। আশাহত বাঘিনীর মত শুয়ে পড়ে থাকে।

ঘানিম বারন্দায় গিয়ে বাঁশী বাজাতে থাকে। করুণ সুর। মন পাগল করা সুরে নিজেকে সঁপে দেয়। বিভোর হয়ে পড়ে।

হাসি-আনন্দের মধ্যে আবার নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। ঘানিম বারান্দায় বাঁশী হাতে তারাভরা আশমানের দিকে উদাস ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কুৎ-অল এসে তার গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়। তার মাংসল ও তুল-তুলে নরম উরুদেশ ঘানিম-এর পিঠ স্পর্শ করে। ঘানিম-এর সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। শিরা-উপশিরায় খুন চনমনিয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে কলিজাটি অস্থির হয়ে ওঠে। কুৎ-অল আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়। তার তলপেট ঘাড়ের ওপর—মাথা স্পর্শ করে। ঘানিম-এর বুকের ভেতরে কাল বৈশাখীর ঝড়—উত্তাল, উদ্দাম সমুদ্রের আছাড়ি পাছাড়ি চলতে থকে। নিজেকে আর বশে রাখা সম্ভব হবে কিনা, কে জানে?

খোদা তার সহায় হলেন। কুৎ-অল কি ভেবে গুটি গুটি পায়ে যেমন এসেছিল ঠিক তেমনি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে যায়। খাটের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। ঘানিম শোনে। মর্মাহত হয়। কিন্তু দিলকে কিছুতেই দুর্বল হতে দেয় না। গোড়ার দিকে তার.মনকে একটু-আধটু প্রশ্রয় দিয়েছিল বটে। কিন্তু কুৎ-অল-এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর থেকে নিজেকে সে পুরোপুরি গুটিয়ে নেয়। আর কুৎ-অল মর্মবেদনায়, না পাওয়ার হতাশায় জ্বলে-পুড়ে খাঁক হতে থাকে।

বাগদাদে খবর আসে বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করে খলিফা প্রাসাদে ফিরছেন। খবরটি তার খাস বেগম জুবেদা-র কানেও পৌঁছায়। তিনি ভয়ে মুষড়ে পড়েন। কুৎ-অল-এর হদিস না পেয়ে তিনি যে কোন্ মূর্তি ধারণ করবেন তা ভেবেই তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁর খুব পেয়ারের বুড়ি ক্রীতদাসীকে বলেন, এখন উপায়?'

ফোকলা দাঁতে হেসে বুড়ি বলে—'এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন বেগম সাহেবা? মোক্ষম এক ফন্দি-ফিকির বাৎলে দিচ্ছি। কাঠমিস্ত্রীকে দিয়ে কুৎ-অল-এর একটি পুতুল গড়িয়ে নিন। প্রাসাদের গায়ে এক গোর তৈরী করে সেটিকে গোর দিয়ে দিন। আর কুৎ-অল সর্বদা যেভাবে হীরা-জহরৎ মণি-মাণিক্যের গহনা ব্যবহার করত পুতুলটিকে সেসব পরিয়ে দিতে হবে। খলিফা সন্দেহের বশে গোর খুঁড়িয়ে দেখতে চাইলে ওপর থেকে গহনাপত্র দেখেই নিঃসন্দেহ হয়ে যাবেন। আবার মাটি চাপা দিয়ে দেবার হুকুম দেবেন। আর যদি নেহাৎই তার লাশ হাত দিয়ে দেখতে চান তবে আপনি বাঁধা দিয়ে বল্‌বেন—কুৎ-অল-এর লাশ বিবস্ত্র করে গোর দেওয়া হয়েছে। নিজের বিবি হলেও তার বিবস্ত্র লাশ স্পর্শ করা পুরুষের ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। তবেই ধর্মভীরু খলিফা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবেন।'

জুবেদা বুড়ি ক্রীতদাসীর বুদ্ধির তারিফ করলেন। জুবেদা তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন। নিশ্চিন্ত।

খলিফা বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করে প্রাসাদে ফিরলেন, প্রাসাদের সদর-দরজার কাছে এক সমাধি দেখে থমকে গেলেন। আর নফর থেকে শুরু করে প্রাসাদের সবার পরনে শোকের চিহ্নবাহী কালো পোশাক। তাঁর খাস বেগম জুবেদাও কালো পোশাক ধারণ করেছেন।

খলিফা নীরবে কুৎ-অল-এর কক্ষে গেলেন। কেউ নেই। খা-খা করছে। জুবেদা চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন—কুৎ-অল দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেছে। আমি নিজে তদ্বির-তদারকি করে যথোচিত মর্যাদায় তাকে গোর দিয়েছি।'

খলিফা পথের ধকল সহ্য করে ক্লান্ত-অবসন্ন। তার ওপর সর্বাধিক প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা। যারপরনাই মর্মাহত হলেন। কোনরকমে নিজের কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কুৎ-অল-এর ভাবনা তাঁর দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল। মহল ত্যাগ করার সময় যে লোক একেবারে সুস্থ-স্বাভাবিক ছিল তার মৃত্যু তো ভাবিয়ে তোলার কথাই বটে। পরদিন সুবা হওয়ার আগে তিনি ঘরের দরজা খুললেন না। দুপুরের কাছাকাছি তাঁর কক্ষে উজির জাফরের তলব হ'ল। জাফর এলে বললেন—'গোর খুঁড়ে আমি কুৎ-অল-এর লাশ দেখতে চাই। ব্যবস্থা কর।'

খলিফার অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে জুবেদার তো কলিজা শুকিয়ে কাঠ। বুড়ি ক্রীতদাসী পরামর্শ দিল—'কাঁদো কাঁদো মুখ করে হুজুরের পাশে গিয়ে দাঁড়ান বেগম সাহেবা। ঘাবড়াবেন না, সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।'

খলিফা সামনে দাঁড়িয়ে গোর খোঁড়ালেন। পুতুলের গায়ে হীরে-জহরৎ, মনি-মুক্তোর গহনাপত্র দেখে তাঁর মনে আর দ্বিধা রইল না। গোরে মাটিচাপা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। উজির জাফরকে বল্‌লেন—'সাতদিন সাতরাত্রি কোরাণ পাঠ হবে কুৎ-অল-এর গোরের সামনে। মৌলভীকে খবর দাও।'

বেগম শাহরাজাদ এ-পর্যন্ত বলার পর কিস্‌সা বন্ধ করলেন। সকাল হ'ল। বাদশাহ শাহরিয়ার দরবারের দিকে পা বাড়ালেন।

একচল্লিশতম রজনী

বাদশাহ সারাদিন নানা কামকাজের মধ্যে ডুবে রইলেন। রাত্রি একটু গভীর হলে তিনি অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর অসমাপ্ত কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন —'জাঁহাপনা, কুৎ-অল-এর নকল সমাধির পাশে সাতদিন সাতরাত্রি জাঁক ক'রে কোরাণ পাঠ করা হ'ল। খলিফা পানাহার ত্যাগ করলেন। নিজের কক্ষের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে চুপচাপ শুয়ে কাটালেন দিনের পর দিন। দু'জন ক্রীতদাসী তাঁর পরিচর্যায় লিপ্ত রইল।

এক দুপুরে খলিফা চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। ক্রীতদাসী দু'জন তাঁর পদসেবা করতে করতে সাধ্যমত গলা নামিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল 'খলিফা কী কাণ্ডই না করছেন। এক নকল কবরের পাশে কোরাণ পাঠ করিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছেন। রূপসী কুৎ-অল কোথায় পড়ে রইলেন তার হদিস নেই। আর এদিকে জাঁক করে কোরাণ পাঠ করে তার বেহেস্তের পথ সাফ সুতরা করার আয়োজন। হাসির মত কাণ্ডই বটে।'

দ্বিতীয়জন বল্‌ল—'বেগম জুবেদা তাকে ওষুধ দিয়ে বেহুঁস করে কোথায় চালান দিয়ে দিয়েছেন তা কাকপক্ষী ও টের পায়নি। বেহুঁস কুৎ-অলকে কাঠের বাক্সে পুরে যে-তিনজন খোজা নিগ্রো রাত্রির অন্ধকারে প্রাসাদ থেকে নিয়ে গিয়েছিল তারা ছাড়া আর কেউ-ই কিছু জানে না। জব্বর ফন্দি করেছিলেন বেগম জুবেদা।'

—'তবে কি বেহুঁস কুৎ-অল'কে জ্যান্ত কবর দিয়ে খতম করা হয়েছে?'

—'খোদাতাল্লা যাকে খতম না করেন তাকে সামান্য মানুষ খতম করবে, সাধ্য কি? শুনেছি বাগদাদ নগরের ঘানিম ইবন নামে এক যুবক বণিকের ঘরে নাকি তিন দিন গুজরান করছেন। বুড়ি দাসী আরও কত কথাই না আমাকে বলেছে। তবে অনেক কিরা কাটিয়ে তবেই আমাকে গোপনে এসব কথা বলেছে।'

আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যেন খলিফা তড়াক করে উঠে বসলেন। উজির জাফর'কে ডাকলেন। রাগে-দুঃখে তার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল।

উজির হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন। খলিফা গর্জে উঠলেন, এখনই ফৌজ নিয়ে নগরে যাও। ঘানিম ইবন নামে বণিককে খুঁজে বের কর। যেখান থেকে, যেমন করে পার আমার সামনে হাজির করা চাই-ই চাই।'

খলিফার হুকুম তামিল করতে উজির জাফর চল্লিশজন সৈন্য নিয়ে ঘানিম-এর খোঁজে বাগদাদ নগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

ঘানিম তখন সবে নাস্তা নিয়ে বসেছে। বাড়ির বাইরে সৈন্যরা কোলাহল করতে করতে বাড়ি ঘিরে ফেল্‌ল।

বিপদ মাথার ওপরে। এখন উপায়? উপায় কুৎ-অলই বুদ্ধি খরচ করে বের করে ফেল্‌ল। ঘানিম-এর হাতে একটি ভাঙা বালতি আর ঝাড়ু ধরিয়ে দিল। আর তার মাথায় গামছা দিয়ে বেঁধে দিল এক ফেটি। কে বলবে, জমাদার ময়লা পরিষ্কার করতে আসে নি।

ঘানিম বল্‌ল—'আমার জান বাঁচাবার বন্দোবস্ত তো করলে। কিন্তু কুৎ-অল, তোমার কি হালৎ হবে ভেবে দেখেছ? তোমাকে কয়েদ করে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে কুৎ-অল বল্‌ল—'আমার জন্য পরোয়া করিনা। আমাকে নিয়ে তো তারা খলিফার সামনেই হাজির করবে। তারপর তাকে কি করে বশ করতে হয় সে কায়দা আমার ভালই রপ্ত করা আছে। তুমি আগে জান নিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে ভাগ।'

উজির জাফর বীরদর্পে ঘরে ঢুকলেন, কুৎ-অল খাটের ওপর বসে। তার গায়ের অলঙ্কার তেমনি রয়েছে। জাফর যথার্থ ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে বল্‌লেন—'আপনি এখানে কি করে এলেন মালকিন?'

—'আমার নসীবেই আমাকে এখানে টেনে এনেছে।'

—'মালকিন, জাহাপনার হুকুম নিয়ে ছুটে এসেছি ঘানিম ইবন আয়ুব নামে নওজোয়ানকে কয়েদ করে নিয়ে যেতে। আপনি কি তার হদিস দিতে পারেন?'

—'ঠিকানা আমার জানা নেই। তবে তার আম্মার বিমারী, তাই আজ কয়েক দিন এক সুবহে সে এ-বাড়ি ছেড়ে গেছে। শুনেছি, দামাস্কাসে তিনি থাকেন।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উজির জাফর বল্‌লেন—'মালকিন, আপনি কি মেহেরবানি করে আমার সঙ্গে প্রাসাদে যাবেন?'

—'যাব। অবশ্যই যাব। আমি এরকমই কোন ফিকির খুঁজছিলাম।'

উজির জাফর কুৎ-অল'কে নিয়ে খলিফার সামনে হাজির করলেন। খলিফাকে কুর্নিশ করে বল্‌লেন—'আমরা পৌছোবার বেশ কয়েক দিন আগে ঘানিম বাগদাদ ছেড়ে দামাস্কাসে চলে গেছে. সেখানে তার আম্মা আর এক বহিন থাকে।'

—'খলিফা কুৎ-অল'কে জিজ্ঞাসা করলেন—'শুনেছি, ঘানিম নওজোয়ান! তার ওমর কত?'

—'চব্বিশ-পঁচিশ সাল। খুব সৎ ও ধর্মপরায়ণ নওজোয়ান। আমাকে সে বে-ইজ্জত করেনি।'

—'চুপ কর! তোমাকে আর তার হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। এক নওজোয়ানের সঙ্গে এতদিন কাটাতে তোমার শরম লাগল না! তোমার কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আগুনের কাছে ঘি থাকলে কিছু না কিছু গলবেই।' এবার তাঁর দেহরক্ষী মাসরুর'কে ডেকে বললেন—'একে পিঠমোড়া করে বেঁধে অন্ধকার কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দাও।'

ক্রোধোন্মত্ত খলিফা এবার দামাস্কাসে একদল সিপাহী পাঠিয়ে দিলেন ঘানিমকে হাতকড়া পরিয়ে বাগদাদে নিয়ে আসার জন্য। তাদের সঙ্গে দামাস্কাসের সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান অল জেনি-র নামে একটি চিঠিও দিয়ে দিলেন। ঘানিম ইবন আয়ুব নামে এক নওজোয়ান বণিক আছে যেন প্রেরিত সৈন্যদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

খলিফার চিঠি নিয়ে সেনাবাহিনী বাতাসের বেগে দামাস্কাসের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বিশদিনের পথ আটদিনে পাড়ি দিয়ে তারা মহম্মদ ইবন সুলেমান-এর দরবারে হাজির হ'ল। সুলতানের হাতে খলিফার চিঠি তুলে দিলে রক্ষী সৈন্যদের নিয়ে সুলতান স্বয়ং ঘানিম-এর বাড়ি হাজির হলেন। তার বাড়ি ঘেরাও করা হ'ল।

সৈন্যদের কোলাহল শুনে ঘানিম-এর বহিন ফিৎনা বেরিয়ে এল। সে সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে বলল —'ভাইয়া তো এক সালের ওপর বাগদাদে ব্যবসা করতে গেছে।'

কয়েকদিন আগে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি এসে খবর দিয়েছে ঘানিম দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেছে। বাড়ির উঠোনে তার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি সমাধিসৌধও বানানো হয়েছে। সুলতান খলিফার নির্দেশে তার আম্মা ও বহিনকে বিবস্ত্র করে দুপুর রোদে পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। একনাগাড়ে তিন দিন তিন রাত্রি দাঁড় করিয়ে রাখার পর শহর থেকে দূর দূর করে তাগিয়ে দিলেন। বেগম শাহরাজাদ বললেন—'জাঁহাপনা এবার চলুন আমরা ঘানিম-এর তল্লাসি করে দেখি, সে কোথায় আছে, কি করছে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটেই চলেছে। বাগদাদ নগর ছেড়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। শেষ পর্যন্ত এক গ্রামের এক মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরদিন নামাজ পড়তে এসে গ্রামের লোকজন দেখল, এক নওজোয়ান বেহুঁশ হয়ে পড়ে। তারা সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুলল। খানাপিনা তারাই জোগাতে লাগল পালা করে।

মসজিদের বারান্দা হ'ল ঘানিম-এর আশ্রয়স্থল। একমাস এখানেই পড়ে রইল।

একদল বণিক উটে চড়ে বাগদাদ নগরে যাচ্ছিল। গ্রামবাসী অনুরোধ করল তাকে বাগদাদের হাসপাতালে পৌঁছে দিতে। তারা সম্মত হ'ল। উটের পিঠে চাপিয়ে তাকে নিয়ে বণিকরা বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করল।

বাগদাদে পৌঁছে বণিকের দল ঘানিম'কে হাসপাতালের বারান্দায় বসিয়ে রেখে নিজেদের কাজে চলে গেল। এক দোকানি তাকে দেখে চিনতে পারে। তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল। হেকিম ডেকে ইলাজ করাল। কিছুদিন দাওয়াই খাইয়ে কিছুটা সুস্থ সবল করে ফেল্‌ল।

বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন ভোর হয়ে এল বলে। তিনি এবার কিস্‌সা বন্ধ করলেন। ভোরের আলো ফুটে উঠলে বাদশাহ শারিয়ার নিজের কক্ষে চলে গেলেন।

বিয়াল্লিশতম রজনী

প্রায় মাঝ রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন। শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ঘানিম ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল। এদিকে কুৎ-অল অন্ধকার ঘরে বন্দী-জীবন যাপন করতে লাগল। সে-বুড়িটি সর্বদা দরজায় বসে তাকে পাহারা দেয়। কড়া পাহারা বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দমন করার কাজে খলিফা ডুবে রইলেন। কুৎ-অল-এর কথা ভুলে গেলেন। একদিন খলিফা প্রাসাদে ঢোকার মুখে কান্নার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বুঝলেন কুৎ-অল কাঁদছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। শুনতে পেলেন কুৎ-অল কাঁদতে কাঁদতে বলছে—'ঘানিম কেন তুমি আমার জান বাঁচাতে গেলে। তা না হলে তো গোরস্থানে মাটি চাপা পড়ে আমি খতম হয়ে যেতাম। জানটিকে টিকিয়ে রেখেই বা ফয়দা কি হ'ল? আমাকে সঙ্গদান করনি, সহবাস করনি তা-তো আমি খলিফাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না। তবে কেন তুমি নিজেকে সংযত রেখে
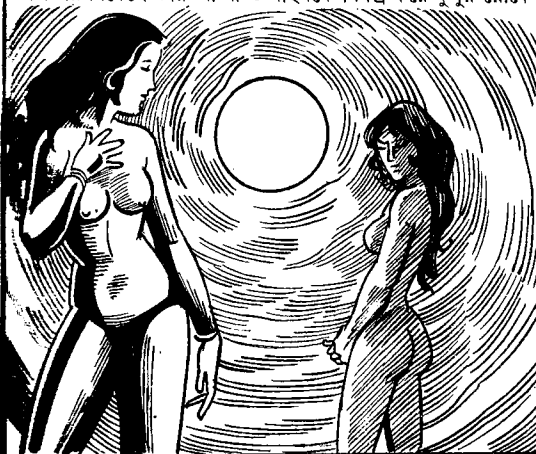
আমার দেহভোগ থেকে বঞ্চিত হলে? তুমি যেখানেই থাক, যখনই তোমাকে কয়েদ করতে পারুন—খলিফা একদিন না একদিন তোমাকে হাতকড়া পরিয়ে শূলে চড়াবেন, নতুবা গর্দান নেবেন। তার পেয়ারের জনানার ইজ্জত বাঁচিয়ে তোমার কোন মুনাফা হ'ল। আর কেউ না জানুক, না বুঝুক আমি তো মর্মে মর্মে অনুভব করেছি এতগুলো নিঃসঙ্গ রাত্রি তোমাকে কী মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। তার বকশিস পেলে জান খতমের আদেশ। আর তোমার আম্মা আর বহিনের নির্যাতন। দুনিয়ায় যতদিন থাকবে আমার সঙ্গে তোমার আর মোলাকাৎ হবে না। তবে শেষ বিচারের দিন আমাদের আর খলিফার নির্দেশ কাউকে দূরে রাখতে পারবে না। তখন আমরা কাছাকাছি মুখোমুখী হবই। কোন আইন, কোন হুকুমই আমাদের তখন আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না সেদিন।

এবার খলিফা হারুণ-অল-রশিদ-এর কানে জল ঢুকল। তিনি এবার নিঃসন্দেহ হলেন যে ঘানিম এবং কুৎ-অল নির্দোষ। তিনি প্রহরীকে নির্দেশ দিলেন—কুৎ-অলকে কয়েদখানা থেকে বের করে নিয়ে এসো। কুৎ-অল এলে তিনি নিজের কৃতকর্মের জন্য বার বার মার্জনা ভিক্ষা করতে লাগলেন। আর বললেন—'মেহবুবা, তোমাকে বিনা কারণে কয়েদখানায় আটক করে কষ্ট দিয়েছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। প্রতিদান স্বরূপ তুমি আমার কাছে যা প্রার্থনা করবে পূর্ণ করব।'

চোখ মুছতে মুছতে কুৎ-অল বল্‌ল—'জাহাপনা, আমার নিজের জন্য আমি এতটুকুও ভাবিত নই। বিনা দোষে, আমাদের, বিশেষ করে আমার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে এত ত্যাগ স্বীকার করল সেই নির্দোষ-নিরপরাধ ঘানিমকে মার্জনা করুন।'

—'মার্জনা করব কাকে, বলতে পার মেহবুবা? তামাম বাগদাদ আর দামাস্কাস নগর চষে ফেলেও যাকে ধরা গেল না, কোন হদিসই মিলল না, তাকে আমি কিভাবে মার্জনা করে বুকে টেনে নেব, বলতে পার? তবে কথা দিচ্ছি, তুমি আমার সবচেয়ে পেয়ারের বাঁদী। তবু আমি তোমাকে তার কাজের পুরস্কার স্বরূপ তার হাতে তুলে দেব। আর তুমি যদি পার তার খোঁজ করতে পার।'

কুৎ-অল-এর দিলটা খুশিতে ডগমগ করে উঠল। শুকিয়ে যাওয়া কলিজাটি যেন জীবনীশক্তি ফিরে পেল। খলিফার কাছ থেকে হাজার খানেক দিনার নিয়ে দু'জন খোজাকে পথপ্রদর্শক ও রক্ষী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল তার মেহেবুব ঘানিমের খোঁজে।

কুৎ-অল পথে নামল। এখানে ওখানে খোঁজ করতে করতে বাগদাদ নগরের এক বৃদ্ধ বণিকের মুখে শুনতে পেল, ঘানিম দিন কয়েক আগে হাসপাতালের ফটক থেকে এক পরদেশীকে তুলে নিয়ে বাড়িতে রেখেছে। হেকিমকে দিয়ে ইলাজ করিয়ে প্রায় সুস্থ-স্বাভাবিক করে তুলেছে।

কুৎ-অল উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বল্‌ল—'আমি তাকে একবারটি দেখতে চাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে সুযোগ করে দেন বড়ই উপকার হয়।'

বণিক কাজে ব্যস্ত। তার পক্ষে কাজ ফেলে এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তার এক বালক-কর্মচারীকে দিয়ে কুৎ-অল কে তাঁর বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করল। কুৎ-অল বণিককে সুকরিয়া জানিয়ে পথে নামল।

কুৎ-অল বণিকটির বাড়ি গিয়ে দেখে ঘানিম বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে বিশ্রাম করছে। হাড্ডিসার চেহারা। দেখলে চেনাই যায় না। কুৎ-অল উচ্ছ্বসিত আবেগে জড়িয়ে ধরল তাকে। সোহাগে-আদরে ভরিয়ে তুল্‌ল। খলিফা তাদের চার হাত এক করে দেবার অভিপ্রায় জানিয়েছেন, একথা জানাতেও ভুল্‌ল না। কুৎ-অল সঙ্গে নিয়ে আসা এক হাজার দিনার বণিকের বিবির হাতে দিয়ে বল্‌ল—মেহেরবানি করে বড় হেকিমকে নিয়ে ওর ইলাজ করাবেন। ভাল দাওয়াই ও ফল-দুধ দেবেন। পরে আরও দিনার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কুৎ-অল ঘানিমকে সে বণিকের বাড়িতেই রেখে দিল। আর একটু সুস্থ না হলে তাকে খলিফার প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এত দূরের পথ। পথের ধকল সইতে পারবে না। কুৎ-অল এবার ঘানিম ও বণিকের বিবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিল।

পরদিন দুপুরের পর কুৎ-অল আবার বণিকের বাড়ি এল ঘানিম'কে দেখতে।

বণিক বল্‌ল—'বেটি, গতকাল তুমি বিদায় নেবার পর এক ভিখারী আমার গুদামে এসেছিল। মনে হ'ল পরদেশী। মনে হ'ল ভিক্ষে সিক্ষে করে দিন গুজরান করে। পরে বাতচিত করে বুঝলাম, তুমি যার খোঁজ করছ তারাও তারই খোঁজে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। ঘানিম-ইবন-আয়ুবকে খুঁজছে। তাদের আস্তানার ঠিকানা আমি রেখে দিয়েছি। এক সরাইখানার বারান্দায় রাত্রি কাটায়। আর দামাস্কাসে নাকি তাদের ঘর।'

দামাস্কাসের নাম শুনেই কুৎ-অল চম্‌কে উঠে। আপন মনে বলে ওঠে, তবে কি ঘানিম-এর আম্মা আর বহিন!

কুৎ-অল -এর অনুরোধে তার বালক-কর্মচারীটি এক দৌড়ে গিয়ে এক জনানা আর লেড়কিকে নিয়ে এল। কুৎ-অল্প তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল, তারা ঘানিম-এর আম্মা আর বহিনই বটে। সে হাতের দিনারের থলিটি বণিকের হাতে দিয়ে বল্‌ল—'আপনি আমাদের জন্য অনেকই করেছেন। আরও একটি অনুরোধ করে আপনাকে বিব্রত করতেই হচ্ছে। মেহেরবানি করে এদের দু'জনেরও দেখ-ভাল করবেন। খোদা আপনার ভাল

করবেন।'

বণিক মুচকি হেসে বল্‌ল—'বেটি, আমি সাধ্যমত এদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করব।'

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তেতাল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন — 'জাঁহাপনা, কুৎ-অল বণিকের হাতে দিনারের থলেটি এবং ঘানিম-এর আম্মা ও বহিনকে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিল।

দু'দিন বাদে কুৎ-অল আবার সে বণিকের বাড়ি তার মেহবুব ঘানিম -এর সঙ্গে মিলিত হতে গেল। ঘানিম এখন অনেক সুস্থ। হাঁটাচলা করতে পারে। বণিক ও তার বিবিকে বহুভাবে সুক্‌রিয়া জানিয়ে সে ঘানিম ও তার মা-বহিনকে নিয়ে খলিফার প্রাসাদে এল।

খলিফা তখন খাস মহলে বিশ্রামে রত। এক তলার একটি ঘরে ঘানিম আর তার আম্মা ও বহিনকে বসিয়ে রেখে কুৎ-অল খলিফার কামরায় গেল। সব বৃত্তান্ত তাঁকে জানাল।

খলিফার নির্দেশে সে ঘানিম আর তাঁর আম্মা ও বহিনকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেল। ঘানিম খলিফাকে যথোচিত ভঙ্গিমায় কুর্নিশ জানিয়ে বল্‌ল—'বান্দা হাজির জাঁহাপনা।'

খলিফা সংক্ষেপে তার কুশল বার্তাদি নিলেন। তার পরে মুচকি হেসে বল্‌লেন — 'শোন, তুমি আমার ছোটা ভাইয়ার মত। ভুল করে তোমার প্রতি অবিচার করেছি। আশা করি আমার মুখের দিকে চেয়ে ওসব কথা মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেবে। কুৎ-অল-এর মুখে হয়ত শুনে থাকবে আমি আমার পিয়ারের বাঁদীকে তোমার হাতে সঁপে দেব মনস্থ করেছি। অবশ্য যদি তুমি একাজে স্বেচ্ছায় সম্মত হও তবেই —'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঘানিম ব'লে উঠল—জাঁহাপনার হুকুম তামিল করতে আমি দোজকেও যেতে রাজি আছি।'

—'আর একটি কথা। আমি ভুল করে তোমার আম্মা ও বহিনের ওপরও কম অবিচার করিনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি তাদের বে-ইজ্জতই করেছি। এর জন্য আল্লাহ আমার গুণাহ মার্জনা করবেন না। আমার কৃত-অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের চিন্তাও আমি করে রেখেছি। তোমার আম্মার আমৃত্যু ভরণপোষণের ভার আমি তোমার নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। মেহমানের মত নয় আপনজনের মত আমার প্রাসাদে তিনি থাকবেন। আর তোমার বহিন ফিৎনাকে আমি শাদী করে বেগমের মর্যাদা দেব। তোমার কোন ওজর আপত্তিই আমি শুনতে নারাজ।'

উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ঘানিম বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এ তো আমার কাছে আশমানের চাঁদ হাতে পাওয়ার সামিল! ওজর-আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না।'

—'আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তারা একদিন যা হারিয়েছে তা ফেরৎ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই ঘানিম। তাই অনন্যোপায় হয়েই আমাকে এ-পথ বেছে নিতে হ'ল। এতে তোমার কুণ্ঠিত বা শরমের ব্যাপার কিছু নেই।'

এবার খলিফা কাজীকে তলব করলেন। কাজী এলে তাকে দিয়ে দু'টি শাদীর কবুলনামা বানিয়ে নিলেন। তার একটি খলিফা ও ফিৎনার আর দ্বিতীয়টি ঘানিম ও কুৎ-অল এর শাদীর কবুলনামা।

সেদিনই খলিফা হারুণ-অল-রশিদ-এর প্রাসাদে শাদীর আয়োজন করা হ'ল। একে খলিফার শাদী তার ওপর দু'-দু'টি শাদী একই রাত্রে, একই প্রাসাদে সম্পন্ন হচ্ছে। কম কথা! বাদশাহী খানাপিনার ব্যবস্থা করা হ'ল। আর দামী সরাবের ঢালাও ব্যবস্থাতো রয়েছেই। মহাধুমধামের সঙ্গে শাদীর পাঠ চুকল। খলিফার প্রাসাদে তিনদিন উৎসবের রোসনাই বয়ে চল্‌ল।

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ঘানিম আর কুৎ-অল কুলব-এর কিস্‌সা তো শুনলেন। এবার আপনি যদি উৎসাহী হন তবে আমি উমর-অল-নুমান এবং তার লেড়কাদের কিস্‌সা শুরু করতে পারি।'

বাদশাহ অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বল্‌লেন—'মেহবুবা, তোমার কিস্‌সা আমার দিল কেড়ে নিয়েছে। তুমি নির্দ্বিধায় কিস্‌সা শুরু করতে পার।

বাদশাহ উমর-অল-নুমান এবং তাঁর লেড়কার কিস্‌সা

বাদশাহ শারিয়ার-এর উৎসাহে বেগম শাহরাজাদ উমর-অল-নুমান এবং তার লেড়কাদের কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বাগদাদে উমর-অল-নুমান নামে এক বাদশাহ রাজত্ব করতেন। খলিফাদের রাজত্বের শেষের দিককার কথা। তিনি ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় যথার্থই বিশারদ। আসলে অস্ত্র চালনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ-ই ছিল না। দোর্দন্ড প্রতাপশালী বাদশাহ প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপরই আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ দিগ্বীজয়ী বীর জুলিয়াস সীজারও তাঁর অস্ত্রকে সমীহ করতেন।

বাদশাহ উমর-এর একমাত্র লেড়কার নাম ছিল সারকান। সে-ও তার আব্বার মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। আর তার রূপও ছিল অনন্য। একমাত্র লেড়কা বলেই হয়ত বাদশাহ উমর তাকে নিজের

কলিজার চেয়েও পেয়ার করত। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, তিনি বেহেস্তে গমন করলে একমাত্র লেড়কা সারকান-ই তাঁর মসনদে বসবে।

বাদশাহ উমর চার-চারটি শাদী করেছিলেন। প্রথম-তিন বিবির গর্ভে কোন সন্তানাদি পয়দা না হওয়ায় তাঁকে চতুর্থবার শাদী করতে হয়। তাঁরই গর্ভে লেড়কা সারকান পয়দা হয়। চার বিবি ছাড়াও তাঁর হারেমে তিনশ' ষাটটি রক্ষিতা ছিল। তারা যেমন ছিল নানা দেশের তেমনি নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ছিল। তারা প্রাসাদের হারেমের তিনশ' ষাটটি পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে বাস করত। আর হারেমটি ছিল বারোটি আলাদা আলাদা মহলে বিভক্ত। বাদশাহ পৃথক্ পৃথক্ রক্ষিতার ঘরে প্রতিরাত্রি কাটাতেন। ফলে এক এক রক্ষিতা বছরে একবার মাত্র তাঁর সহবাসের সুযোগ পেত। ফলে রক্ষিতারা তাঁর এ ব্যবস্থায় খুবই সন্তুষ্ট ছিল।

এক সকালে বাদশাহ দরবারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঠিক তখনই তাঁর কাছে এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ছুটে এল। তাঁকে সোল্লাসে জানাল, তাঁর সফিয়া নামে এক রক্ষিতা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। যথা সময়ে সফিয়ার এক লেড়কি জন্ম নিল।

এক বৃদ্ধ খোজা এসে বাদশাহকে লেড়কি পয়দা হওয়ার কথা জানাল।

লেড়কি পয়দা হয়েছে শুনে বাদশাহের একমাত্র পুত্র সারকান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌ল। নইলে বাদশাহের পর সেও সিংহাসনের দাবীদার হ'ত। জিন্দেগীভর দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতে হ'ত। এ পর্যন্ত বলে শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন। প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে ভোরের পূর্বাভাষ দেখা দিল।

পঁয়তাল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন। বেগম শাহরাজাদ কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বাদশাহের রক্ষিতা লেড়কি প্রসব করলে শাহজাদা সারকান ভাবল জোর বাঁচা বেঁচে গেছি! একাই সে মসনদে বসে রাজ্য শাসন করতে পারবে। ভাগ বাটোয়ারার প্রশ্নই ওঠে না। সে অবশ্য পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল, যদি নেহাৎই লেড়কা জন্মগ্রহণ করে তবে তাকে যে করেই হোক খতম করে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলবে।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। এক বিহানে সে বুড়ি ক্রীতদাসী এসে বাদশাহ উমরকে জানায়—'হুজুর, সে-রক্ষিতা আরও একটি সন্তান প্রসব করেছেন। এবার আর লেড়কি নয়, লেড়কা।'

এখানে বুড়ির কাছথেকে লেড়কা পয়দা হওয়ার কথা জানতে পারলনা।

বাদশাহ উমরকে গ্রীক সম্রাট এ-রক্ষিতাটিকে ভেট স্বরূপ দান

করেছিলেন। তাই বাদশাহের লেড়কা পয়দা হয়েছে খবর পেয়ে গ্রীক সম্রাট তাঁকে ভেট পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন!

নবজাতক জন্মগ্রহণ করায় বাদশাহের প্রাসাদে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। নাচা-গানার মজলিস বসল। বহুত খানাপিনা হ'ল। সরাবের জোয়ার বয়ে চল্‌ল। লেড়কির নাম রাখা হয়েছিল নুজাত-অল-জামান আর সদ্যোজাত লেড়কার নামকরণ করা হ'ল দু-অল-মাকান।

এবার থেকে বাদশাহ উমর বুড়ি ক্রীতদাসীটি মারফৎ প্রত্যহ প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর রক্ষিতার লেড়কা ও লেড়কিটির খবর নিতে লাগলেন।

এখানে লেড়কা পয়দা হওয়ার খবর জানেনা কিন্তু বহুদিন পরে খোজা ক্রীতদাসের কাছে জানতে পারে।

এদিকে শাহজাদা সারকান তার আব্বার রক্ষিতা গর্ভবতী শুনে সে প্রাসাদে অবস্থান করছিল গোপন কুমতলব নিয়ে। কিন্তু এ হ'ল প্রথম সন্তান লেড়কিটির বেলায়। তারপর দ্বিতীয় সন্তান লেড়কা যখন পয়দা হ'ল, তখন? লেড়কার কথা সে বিন্দুবিসর্গও জানে না। কারণ, লেড়কিটি পয়দা হবার কিছুদিন বাদেই তাকে বাদশাহের নির্দেশে ভিন্‌দেশ আক্রমণে যাত্রা করতে হয়েছিল। পুরো চার-চারটি সাল তাকে বাগদাদ থেকে বহুদূরে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। এক খোজা ক্রীতদাসের মুখে সে বাদশাহের লেড়কা পয়দা হওয়ার খবর জানতে পারে। সে বুঝল, তার সবচেয়ে বড় শত্রু বাগদাদে চাঁদের কলার মত তিলে তিলে বেড়ে চলেছে। বহুদেশ, বহুরাজ্য সে একের পর এক জয় করেও সৈন্যদের সঙ্গে

দিল-খুলে বিজয়োৎসবে যোগদান করতে পারল না।

এদিকে এক সকালে বাদশাহ উমর অল-নুমান পারিষদদের নিয়ে দরবারকক্ষে অবস্থান করছেন ঠিক তখনই কয়েকজন আমীর ওমরাহ ও রইস আদমী দরবারে প্রবেশ করলেন। বাদশাহকে যথোচিত ভঙ্গিতে কুর্নিশ করলেন।

আগন্তুকদের একজন কুর্নিশ সেরে বল্লেন—'জাঁহাপনা, আমরা রোম সম্রাট আফ্রিদুন-এর দরবার থেকে আসছি। আপনি যদি এতে অখুশী হন তবে আমরা এ মুহূর্তে আপনার দরবার ত্যাগ করব। আর যদি খুশীমনে আমাদের গ্রহণ করতে পারেন তবে আসন গ্রহণ করব। আমাদের সম্রাট গ্রীস, ইয়োনিয়ার এবং রোমের অধীশ্বর। তিনিই আপনার দরবারে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমাদের আগমনের কারণ, সিসারিয়ার প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট হারদুব অকস্মাৎ হাজার হাজার নিরীহ প্রজার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছেন।'

—'কিন্তু অকারণে তো আক্রমণ করার কথা নয়। এর পিছনে কোন্ অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে বলে আপনারা অনুমান করছেন?

—'হ্যাঁ, কারণ অবশ্যই রয়েছে জাঁহাপনা। আমাদের এক সেনাপতি কিছুদিন আগে মরু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সৈন্য নিয়ে যাবার সময় অকস্মাৎ এক রত্নভাণ্ডারের হদিস পান। তামাম দুনিয়া জয় করে সম্রাট আলেকজান্দার এখানে তার লুঠ করা ধনদৌলত লুকিয়ে রেখেছিলেন। হীরা-জহরৎ, মণি-মানিক্য যা কিছু ছিল তাদের মধ্যে তিনটি অমূল্য সম্পদ গ্রহরত্ন ছিল যার ব্যবহারে যেকোন কঠিন বিমারি সেরে যায়। আমাদের সেনাপতি এসব পাথরের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। যা-ই হোক সে সব ধন দৌলত উদ্ধার করে সেনাপতি সুলতানকে ভেট দেবার বাসনা নিয়ে কনস্তানতিনোপলের পথে যাত্রা করলেন। জাহাজ বন্দর ছাড়ল। এর কিছু পরেই খবর পাওয়া গেল, সিসারিয়ার অধিপতি হারদুব আমাদের রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমাদের সেনাপতি তার আক্রমণ প্রতিরোধে চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। ধনদৌলত লুঠ করে ভেগে যায়। তখন সে অমূল্য গ্রহরত্ন তিনটিও নিয়ে যায়। আমাদের সম্রাট বিশাল সৈন্যবাহিনী ভেজলেন হারদুব'কে দমন করতে। তারা পরাজিত হয়ে কেউ প্রাণ দেয়, কেউ বা লড়াই ছেড়ে ভেগে যায়। পর পর দু'জাহাজ নৌ-বাহিনী ভেজলেন। তারাও খতম হয়ে গেল।

জাঁহাপনা, আমাদের সম্রাট এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন-বটে। কিন্তু হাল ছাড়তে পারছেন না। হারদুব'কে দমন করার প্রবল বাসনা নিয়ে তিনি আমাদের আপনার দরবারে ভেজলেন। আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আপনি আমাদের সম্রাটের এ-দুর্দিনে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি খুশী হয়ে জাহাজ বোঝাই করে আপনার জন্য ভেট পাঠিয়েছেন। আপনার অনুমতি পেলে আমরা আপনার দরবারে নিয়ে আসি। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার অভিপ্রায়ের কথা আমাদের ব্যক্ত করুন।'

কিস্সার এ পর্যন্ত বলার পর বেগম শাহরাজাদ দেখলেন, বাগিচায় পাখির কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। ভোরের পূর্বাভাষ। তিনি কিস্সা বন্ধ করলেন।

ছেচল্লিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ পরের রাত্রে আবার কিস্সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আফ্রিদুন-এর প্রেরিত দূতগণ বল্লেন, —'আমাদের সম্রাট যেসব ভেট পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে পঞ্চাশটি খুবসুরৎ গ্রীসের কুমারী লেড়কি রয়েছে। আর আছে গ্রীসের সুশ্রী ও সুদেহী নওজোয়ান। মণিমুক্তা যা কিছু আছে তা ছাড়া যেসব সোনাদানা পাঠিয়েছেন তার পরিমাণ কম করেও এক হাজার সের তো হবেই।'

বাদশাহ উমর-এর মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। তিনি বললেন—'ঠিক আছে, তোমাদের সম্রাটের পাঠানো ভেট দরবারে নিয়ে এসো। আমি তা সানন্দে গ্রহণ করলাম।'

আগন্তুক মেহমানদের সেবা যত্নের ব্যবস্থা করে বাদশাহ উমর তার বৃদ্ধ উজিরকে নিয়ে মন্ত্রণা কক্ষে পরামর্শের জন্য বসলেন। বাদশাহের অভিপ্রায়ের কথা শুনে বৃদ্ধ উজির চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বল্লেন—'জাহাপনা, একটি কথা আমাদের ভুললে চলবে না, সম্রাট আফ্রিদুন বিধর্মী — কাফের, খ্রীস্টান। তাঁর প্রজারাও বিধর্মী। আবার তার শত্রুপক্ষও বিধর্মী— কাফের। অতএব দেখা যাচ্ছে লড়াই বেঁধেছে খ্রীস্টানে-খ্রীস্টানে। অতএব আমাদের আপত্তির কিছুমাত্রও কারণ থাকার কথা নয়। এতে ইসলাম ধর্মের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আমার পরামর্শ যদি চান তবে আমি বলব, কনস্তানতিনোপলের সম্রাট আফ্রিদুন-এর সাহায্যার্থে আপনার বীরপুত্র সারকান'কে সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করুন। আপনার সাহায্যে আফ্রিদুন যদি সিসারিয়ার সম্রাটকে পর্যুদস্ত করতে পারে তাতেই গৌরব। কিন্তু সামান্য সিসারিয়ার সম্রাটকে পরাজিত করতে যদি স্বয়ং আপনাকেই সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হয় তা কিন্তু আপনার পক্ষে মোটেই গৌরবের হবে না। যেহেতু আফ্রিদুন-এর প্রেরিত ভেট আপনি গ্রহণ করছেন, আপনাকে সৈন্য পাঠাতেই হবে। নতুবা শীঘ্র খবর পাঠান, আগন্তুকগণ যেন তাদের ভেট জাহাজ থেকে না নামান।'

বাদশাহ উমর বল্লেন —' তাদের আনীত ভেট গ্রহণ করব বলে স্বীকৃতি যখন দিয়েই দিয়েছি তখন আফ্রিদুন-কে সাহায্য অবশ্যই আমাকে করতে হবে। আপনার বিচক্ষণতার পুরস্কার স্বরূপ আমি আপনাকে আমার সেনাপতির পদে বহাল করলাম। আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে আমার লেড়কা

সারকান যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করবে।

শাহজাদা সারকান প্রাসাদে ফিরে এল। বৃদ্ধ উজির দানদান এবং প্রচুর সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। বিশদিন বিশরাত্রি ক্রমান্বয়ে পথ অতিক্রম করে সম্রাট আফ্রিদুন-এর সঙ্গে মিলিত হ'ল। বিদায় মুহূর্তে সুলতান উমর অল-নুমান সাত বাক্স সোনার মোহর দিয়ে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেন সেগুলো নিজের জিম্মায় রেখে দেন।

সম্রাট আফ্রিদুন বিশাল প্রান্তরে সারিবদ্ধভাবে সারকান ও তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন। সেখানেই তাদের তিনদিন বিশ্রাম নিতে রাখলেন।

সারকান-এর তাঁবুর অদূরে শত্রু শিবির। সম্রাট হারদুব সেখানে সসৈন্যে অবস্থান করছেন।

সারকান মনস্থ করল, আগেভাগে রাস্তাঘাট সম্বন্ধে জেনে নেবে। তাই এক রাত্রে দেহরক্ষী ছাড়াই গোপনে বেরিয়ে পড়ল অঞ্চলটি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেওয়ার জন্য। ঘোড়া নিয়ে এক সময় একা এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। শুধু গাছগাছলা আর ঝোপঝাড়। মনুষ্য বসতির নামগন্ধও নেই। রাত্রির প্রথম প্রহর ঘোড়ার পিঠেই কাটাল। শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। পথশ্রমে ঘোড়াটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। একটি গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বাঁধল। এবার সেটিকে বেশ মোটাসোটা একটি গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে ক্লান্তি অপনোদনের চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবার ঘোড়ার পিঠে ওঠে। আবার এগিয়ে চল্‌ল গাছপালা অতিক্রম করে।

এক সময় সারকান শুনতে পেল জনানার গলার হাসির রোল। সারকান ভাবল, এতরাত্রে এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে জনানা কোথা থেকে এল। তবে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও জনবসতি আছে। তল্লাশ করে জনবসতির নামগন্ধও পেল না। কিন্তু জনানা কণ্ঠের হাসির রোল আরও স্পষ্টতর হ'ল। কাছে, খুবই কাছে এগিয়ে এল রহস্যজনক হাসির শব্দ। ব্যাপারটি সারকান-এর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। ভাবল নির্ঘাৎ কোন ভূত-পেত্নীর ব্যাপার। এরকম পরিস্থিতিতে খোদাতাল্লার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। জিন্দা রাখেন কি মারঢালেন যা হয় তিনিই করবেন।

সারকান কৌতূহলের শিকার হয়ে পড়ে। হাসির রহস্যভেদ তাকে করতেই হবে। ঘোড়ার পিঠ থেকে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল। একটি গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বেঁধে পায়ে হেঁটে হাসির শব্দটিকে অনুসরণ করতে থাকে। কিছুদূর গিয়েই সে একটি স্রোতস্বিনী নদীর ধারে পৌঁছল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাল। হঠাৎ চাঁদের আলোয় উঁচু মিনারযুক্ত একটি প্রাসাদ তার নজরে পড়ল। তার বিশ্বাস, সে-রহস্যজনক হাসির রোল প্রাসাদটির দিক থেকেই ভেসে আসছে। দুরুদুরু বুকে প্রাসাদটির দিকে এগোতে লাগল। এক সময় আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেল, প্রাসাদের সামনের এক চিলতে প্রাঙ্গণে দশটি খুব-সুরৎ লেড়কি বৃত্তাকারে বসে হাসাহাসি করছে। এবার তাদের টুকরো টুকরো কথাও তার কানে এল। আরবী ভাষায় বাক্যালাপ করছে। লেড়কিদের একজন বলছে, এমন ক্ষ্যাপা হলে কি কুস্তি লড়া যায়। এর জন্য চাই কায়দা কৌশল আর দেহের তাগদ। কথা বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়িয়ে অন্যান্যদের আহ্বান জানায়। আমাকে হারাতে হবে, খেয়াল থাকে যেন।

একটি লেড়কি মুখ কাচুমাচু করে উঠে এল। প্রথম লেড়কিটি তাকে আছাড়ে কুপোকাৎ করে দেয়। এবার এল আর একটি। তাকেও এক পটকান দিল। এভাবে সবাই এক এক করে তার হাতে ঘায়েল হ'ল।

এমন সময় পাশের ঝোপের আড়াল থেকে এক বুড়ি বেরিয়ে এল। প্রথম লেড়কিটিকে ধমক দিয়ে বল্‌ল—'এদের ন্যাকা বোকা পেয়ে খুব যে রঙ নিচ্ছিস। লড়াইয়ের সাধ যদি এতই হয়ে থাকে

চলে আয় আমার সঙ্গে লড়বি। মস্করা নয়, লড়বি তো চলে আয়। মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি।

বেগম শাহরাজাদ দেখলেন, ভোর হয়ে এল ব'লে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতচল্লিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন। বললেন —'জাঁহাপনা, বুড়ির কথায় প্রথম লেড়কিটির আঁতে ঘা লাগল। সে বল্‌ল — তুমি বুঝি খুবই প্যাচ-পায়জার রপ্ত করেছ, তাই নয়? তোমার বড়াই দেখে আমার দিল্ বলছে, একবার লড়ে তোমার লড়াইয়ের সাধ মিটিয়ে দেই।'

রাগে গস্‌গস্ করতে করতে বুড়িটি এবার বল্‌ল—'ঠিক আছে, দেখাই যাক কে, কাকে মজা টের পাইয়ে দেয়। কিন্তু এসব পোশাক আশাক পরে তো আর কুস্তি লড়া যাবেনা।' কথা বলতে বলতে সে তা গায়ের সবকিছু এক এক করে খুলে ফেল্‌ল। মায় ইজেরটি পর্যন্ত। একেবারে উলঙ্গ হয়ে পড়ল। ইয়া দশাসই চেহারা, তার ওপর একেবারে উলঙ্গ হয়ে পড়ায় বুড়িটিকে কী যে বীভৎস দেখাতে লাগল তা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যি সাধ্যাতীত। বুড়িটি কেবল নিজেই উলঙ্গ হ'ল না, প্রথম যুবতীটির গা থেকেও যাবতীয় পোশাক খুলিয়ে উলঙ্গ করে নিল।

বিবস্ত্রা যুবতীটি সারকানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। সারকান তার অনন্য রূপ-সৌন্দর্য আর যৌবনভরা দেহটির দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতরে কলিজাটি লাফালাফি দাপাদাপি শুরু করে দিল। কোন মানবীর দেহে এমন সৌন্দর্য আশ্রয় করতে পারে এ যেন তার কল্পনারও অতীত।

এবার শুরু হ'ল কুস্তি। শুরুতেই বুড়িটি জব্বর এক প্যাঁচ কষল। যুবতীটি সুরুৎ করে পিছলে বেরিয়ে এল। এবার সে তার বাঁ-হাতটি বুড়ির দুই জঙ্ঘার ফাঁক দিয়ে চালিয়ে দেয়! আর ডান-হাতটি রাখে তার ঘাড়ে। পরমুহূর্তেই এক ঝটকায় বুড়িটির বিশালায়তন বপুটিকে এক পটকান দিয়ে দেয়। বুড়িটি আছাড় খেয়ে পড়ে কোঁৎ করে ওঠে।

যুবতীটি এবার এগিয়ে গিয়ে বুড়িটিকে হাত ধরে তুলতে তুলতে বলে —'তোমার দোষেই এমনটা হ'ল। তুমিই তো আগ বাড়িয়ে লড়তে এসেছিলে। চোট লাগে নি তো?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য লেড়কি সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে রইল। বুড়িটিও ক্লান্ত দেহে এলিয়ে পড়ে রইল। কেবলমাত্র প্রথম যুবতীটি জেগে রইল।

সারকান ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। এগিয়ে চল্‌ল প্রাসাদটির দিকে। এক সময় ঘোড়া থামিয়ে আচমকা চিৎকার করে ওঠে। 'সব
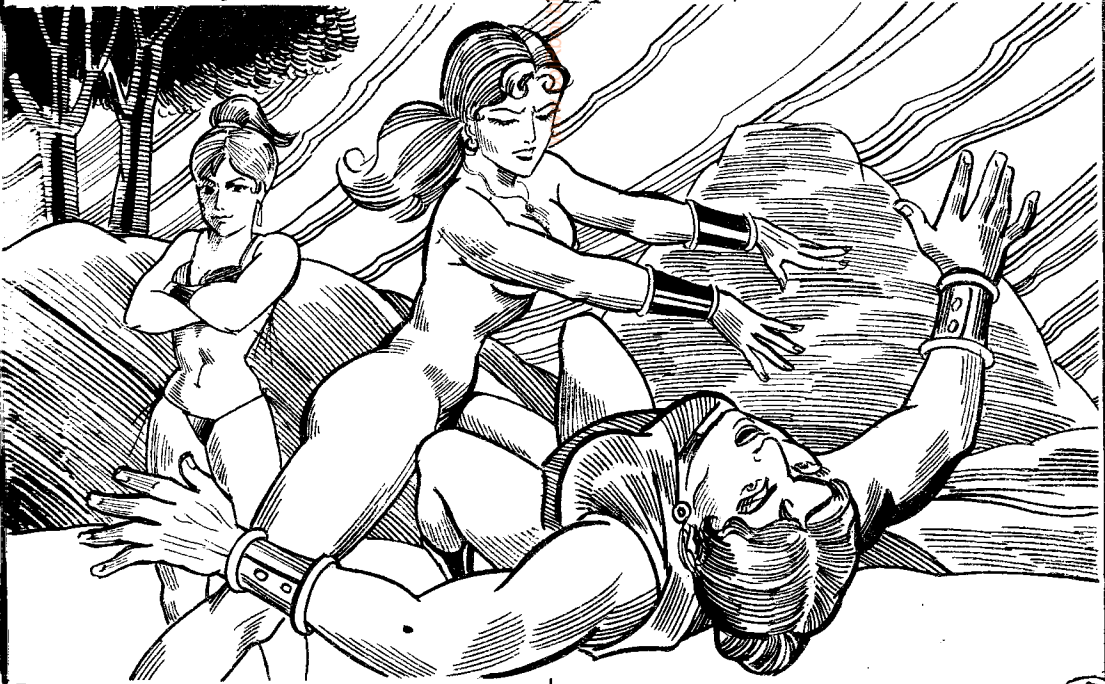
শক্তির আধার। সবাই শক্তিধর।'

যুবতীটি অতর্কিতে চোখ ঘুরিয়ে সারকান'কে দেখতে পায়। মাত্র পাঁচ-সাত হাত চওড়া নদীটি একলাফে পেরিয়ে গেল। পিছন ফিরে দাঁড়ায়। মিষ্টি-মধুর স্বরে বলে—'কে তুমি? কে? আমাদের শান্তির নীড়ে এসে শান্তি ভঙ্গ করছ কেন? কে তুমি? মিথ্যার আশ্রয় নিলে কিন্তু এখান থেকে জান নিয়ে ফিরতে পারবে না। আমি একবার মাত্র হুঙ্কার দিলে চার হাজার খ্রীস্টান সৈন্য ছুটে এসে তোমাকে ঘিরে ধরবে। সত্যি করে বল, তোমার অভিলাষ কি। যদি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে থাক তবে আমি অবশ্যই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছবার ব্যবস্থা করব।'

—'আমি এক ভিন্‌দেশীয় মুসলমান। আজকের রাত্রে সঙ্গদান করার জন্য কয়েকটি খুবসুরৎ লেড়কির খোঁজ করে বেড়াচ্ছি। তোমার দশটি বাঁদী আমাদের কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত করতে পারবে বলেই মনে করছি। আপত্তি না থাকলে আমাদের তাঁবুতে নিয়ে যেতে পারি। কি, রাজি?'

—'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ। দেখ, তোমার আসল উদ্দেশ্য কি, খুলে বল। নইলে আমার সৈনিকদের তলব করতে বাধ্য হ'ব, বলে দিচ্ছি। তুমি যদি সত্যি মুসাফির হয়ে থাক তবে তুমি আমার বাঁদীদের ভোগ করার জন্য নিয়ে যেতে পারবে। তবে আমার সঙ্গে এক হাত কুস্তি লড়তে হবে। আমাকে যদি তোমার পিঠে তুলে নিয়ে যেতে পার তবেই বাঁদীরা তোমার সঙ্গে যাবে। আর যদি লড়াইয়ে হেরে যাও তবে তোমাকে আমার নফর হয়ে থাকতে হবে, রাজি?'

—'রাজি। খালিহাতেই আমি তোমার সঙ্গে লড়ব। আমি হেরে গেলে যত দিনার মুক্তিপণ চাও পাবে। আর তুমি হারলে আমার সুলতানের উপহারের আমগ্রী হবে।'

লেড়কি এক লাফে আবার নদীটি পেরিয়ে সারকান-এর কাছে আসে। মুখোমুখি দাঁড়ায়। মুচকি হেসে বলে —'তুমি তবে আমার হাতে মান-ইজ্জৎ হারাতেই চাইছ?'

সারকান বল্‌ল—'শোন, তোমার এলাকায় যখন ঢুকেই পড়েছি তখন একটু সোহাগ টোহাগ না করে গেলে যে নিজেকে অপরাধী মনে হবে সুন্দরী। তোমার রূপ আমার দিলে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। এমন এক রূপসী এরকম এক জঙ্গলে কিন্তু একেবারেই বে-বানান। তোমাকে আমি আমাদের বাগদাদ নগরে নিয়ে যেতে চাই, যাবে?'

—'হায় খোদা! পাগলের মত কি সব যা-তা বলছ! বাগদাদে ঘোড়াদেরই ভাল মানায়। সেখানকার বাদশাহ উমর-অল-নুমান-এর হারেমে নাকি তিনশ' ষাটটি রক্ষিতা রয়েছে। রোজ রাত্রে নাকি তিনি এক একজন করে রক্ষিতাকে সম্ভোগ করে তৃপ্ত হন। আর তুমি কিনা আমাকে সেই নেকড়েটার খপ্পরে ফেলার চেষ্টা করছ। বছরে মাত্র একটি রাত্রি সে আমাকে সঙ্গদান করবে। হিংস্র জানোয়ারের মত আমার দেহটিকে ছিঁড়েফেঁড়ে খেয়ে সকাল হলেই বিদায় নেবে। ব্যস, তারপর পুরো একটি বছর আর তার দেখা মিলবে না। খোদা রক্ষা করুন! জান গেলেও তার ফাঁদে পা দিতে আমি রাজী নই। আর তুমি যদি সে-শয়তান বাদশাহের লেড়কা স্বয়ং সারকানও হও তবু আমি তোমার সঙ্গে যেতে নারাজ।'

—'সারকান সম্বন্ধে তুমি কিছু না জেনেই বোধ হয় এরকম উক্তি করছ।'

—'জানি না আবার? সে আমাদের দেশের সীমান্তে তাঁবু ফেলেছে। আমাদের সম্রাট হারদুব'কে শায়েস্তা করার জন্য সে আফ্রিদুন-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে চলেছে। সে আমাদের শত্রু —'পরমতম শত্রু। আমার মন চাইছে দৌড়ে গিয়ে ওর ধড় থেকে শিরটি নামিয়ে দেই।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটচল্লিশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার-এর আগ্রহে বেগম শাহরজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন — 'জাঁহাপনা, বাদশাহের লেড়কা সারকান বুঝতে পারল লেড়কিটি তাঁর ওপর খুবই ক্ষিপ্ত। তাই নিজের পরিচয় চেপে রেখে লেড়কিটির পিছন পিছন চল্‌ল।

সু-বিশাল এক প্রাসাদে পৌঁছল তারা। লেড়কিটি সুসজ্জিত একটি কক্ষে সারকানকে নিয়ে গেল।

কক্ষটির কেন্দ্রস্থলে একটি পালঙ্ক পাতা রয়েছে। পালঙ্কের ওপর মখমলের একটি চাদর।

সারকান পালঙ্কের ওপর শুয়ে পড়ল। লেড়কিটি পাশের ঘরে চলে গেল। দু'জন বাঁদী সারকান-এর পরিচর্যায় লিপ্ত হ'ল।

দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেল। লেড়কিটির আর কোন পাত্তা নেই। সারকান বাঁদীদের জিজ্ঞাসা করল —'তোমাদের মালকিন আমাকে এখানে শুতে ব'লে সেই যে কোথায় চলে গেল আর ফিরল না। সে এখন কোথায় কি করছে বলতে পার?'

বাঁদীদের একজন বল্‌ল—'হায় খোদা! আপনি বুঝি ওনার অপেক্ষায় জেগে রয়েছেন? তিনি তো নিজের কামরায় গিয়ে ঘুমোচ্ছেন।'

—'ঘুমোতে গেল। আমাকে এভাবে একা ফেলে তিনি নিজে গেলেন ঘুমোতে! চমৎকার।'

বাঁদীরা নানারকম সুখাদ্যের থালি সাজিয়ে খানা নিয়ে এল। বুভুক্ষুর মত সেগুলো উদরস্থ করল। তারপর নিয়ে এল দামী সরাব। তা-ও গলা পর্যন্ত পুরে নিল। এবার সে একটু ধাতস্থ হল।

সারকান পালঙ্কের ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে তার সৈন্য সামন্তের

কথা ভাবল। অজানা অচেনা জায়গা। পরদেশ! রাত্রির অন্ধকারে যদি শত্রুসৈন্য তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তবেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তার আব্বা বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সৈন্যদের ফেলে কোথাও যেন না যায়। কিন্তু সে তো তাদের অন্ধকার প্রান্তরে ফেলে নিজে বিলাসব্যসনে ডুবে রয়েছে।

সারকান অস্থির হয়ে ওঠে। একে সৈন্যদের চিন্তা তার ওপর লেড়কিটির অপ্রত্যাশিত অনুপস্থিতি।

লেড়কিটির কোন পরিচয়ই সারকান জানে না। আর এ বিশালায়তন প্রাসাদটি কি কোন বাদশাহ বা সুলতানের, নাকি কোন ধনী সওদাগরের কিছুই তার জানা নেই। এমন কত সব টুকরো টুকরো চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে এক সময় নিজের অজান্তে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল।

কাকডাকা সকালে সারকান চোখ মেলে তাকিয়েই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। দেখে খুবসুরৎ সে-যুবতীটি মূল্যবান ও ঝকঝকে-চকচকে পোশাক ও মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কারাদিতে সজ্জিতা হয়ে জনা বিশেক বাঁদী পরিবেষ্টিতা হয়ে বসে। তার মন পাগল করা রূপে সে মুগ্ধ। দুনিয়ার সবকিছু তার মন থেকে মুছে গেল। মুছে গেল যুদ্ধের কথা, অপেক্ষমান সৈন্যদের কথা আর পিতার উপদেশ সমূহ। রূপসী যুবতীটির রূপের সায়রে সে একেবারে হাবুডুবু খেতে লাগল।

নিতম্ব নাচিয়ে, বক্ষ দুলিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে সে-অপরূপা উঠে এল। দু'পা এগিয়ে সে তার মনমোহিনী রূপের ডালি সারকানের সামনে মেলে ধরে দাঁড়াল। ঠোঁট টিপে টিপে হাসল। তারপর এক সময় চোখের বাণ মারল তাকে লক্ষ্য করে। সারকান তো আবেগে —উচ্ছ্বাসে একেবারে গলে যাওয়ার জোগাড় হল। মিষ্টি-মধুর স্বরে এবার সে বল্‌ল—' কি গো ভাল মানুষ, তোমার ব্যাপার স্যাপার তো তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

সারকান নির্বাক। নিষ্পলক চোখে তার রূপ-সৌন্দর্যটুকু নিঃশেষে নিঙড়ে নেওয়াতে মগ্ন। তার কথা শোনা বা উত্তর দেয়ার মত মানসিকতা সারকানের নেই।

সে এবার তার যৌবনের জোয়ারলাগা দেহপল্লবটিকে আলতো করে দুলিয়ে বল্‌ল— 'তুমি যে সারকান, ভুলেও আমার কাছে প্রকাশ করলে না তো! তবে তো তুমি দুর্ধর্ষবীর ও প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ উমর-অল-নুমান-এর লেড়কা। এমন এক বীরের লেড়কা হয়ে তুমি কি করে নিজের পরিচয় গোপন করতে পারলে, ভেবেই পাচ্ছিনা!'

সারকান বুঝল, হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। আর পরিচয় গোপন করতে গেলে তা হবে নিছকই ব্যর্থ প্রয়াস। এতে মুনাফা তো কিছুই হবে না বরং আখেরে লোকসানের বোঝাই বইতে হবে।

—'রূপসী, তোমার অনুমান অভ্রান্ত। আমি আর কিছু-ই বলতে চাই না। সে মুখও আমার নেই। তোমার দিল যা চায় সে-সাজা-ই তুমি দিতে পার।'

—'সারকান, এনিয়ে তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টই হবে না। তুমি আমার প্রাসাদে মেহমান। তোমার ক্ষতি বা অমর্যাদা কেউ করতে চাইলেও আমি রুখে দাঁড়াব। তোমার ইজ্জৎ রাখা আমার কর্তব্য বলেই আমি মনে করি।'

সারকান তার রূপ-সৌন্দর্যে মজে গেলেও তার কথার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারল না। চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে ভাবতে লাগল। মুখে সহানুভূতি দেখিয়ে বিষ খাইয়ে যদি জান খতম করে দেয়, তখন?

তাজ্জব ব্যাপার! সারকান-এর চোখের তারায় সে যেন তার দিলটিকে দেখে ফেল্‌ল। তস্‌বির যেমন দেখা যায়, ঠিক সেরকম। নইলে সে কি ক'রে বলল—'কেন মিছে ডর করছ? কোনই ডর নেই, বিষটিষ কিছু খাওয়াব না। আমার দিল্‌ যদি এরকম কিছু চাইত তবে গত রাত্রেই কাজ হাসিল করে ফেলতে পারতাম। একমাত্র তুমি আমার মেহমান বলেই আমি তা করি নি, ভবিষ্যতেও করব না। একবার তোমাকে যখন খাতির করেছি, আর ডর ভয়ের কিছু নেই।'

সারকান -এর জন্য রক্ষিত খাবারের থালি থেকে একটি লাড্ডু তুলে নিয়ে রূপসী - যুবতীটি নিজের মুখে পুরে চিবোতে লাগল। এক সময় কচি লেড়কির মত খিল খিল করে হেসে বল্ল—' কি গো, এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো, তোমাকে জহর খাইয়ে খতম করার ধান্দা আমার ছিল না?'

এবার তারা দু'জনে পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে নাস্তা সারল। লেড়কিটি পেয়ালায় সরাব ঢেলে তার মেহমানকে দিল, নিজেও একটু-আধটু পান করল।

ইতি মধ্যেই প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় ভোরের পূর্বাভাষ লক্ষিত হয়।

বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

উনপঞ্চাশতম রজনী

রাত্রির প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন।

বেগম শাহ্‌রাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সে-সকালে বাদশাহ উমর অল-নুমান-এর লেড়কা সারকান আর সে রূপসী যুবতী নাস্তা সারতে সারতে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এমন সময় এক বাঁদী চারটি খুবসুরৎ লেড়কিকে সঙ্গে নিয়ে সে কামরায় এল। তাদের কারো হাতে বাঁশী, কারো চিনারা, কারো বা মিশরের গীটার আর একটি লেড়কির হাতে বীণ।

রূপসী-যুবতীটি হাত বাড়িয়ে বাঁশীটি নিয়ে মনে দোলা লাগানো সুর তুলে তন্ময় হয়ে বাজাতে লাগল। অন্যান্যরা নিজনিজ বাদ্যযন্ত্রে মন দিল। সব মিলিয়ে সে যেন এক মনমোহিনী বেহেস্তের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল।

সারকান বিমুগ্ধ চিত্তে সে সঙ্গীত-লহরী শুনতে শুনতে এক সময় তন্ময় হয়ে যায়। পালঙ্কের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখের পাতা বন্ধ করে পড়ে থাকে।

এক সময় রূপসী-যুবতীটি অন্য এক লেড়কির হাতে বাঁশীটি তুলে দিয়ে কিন্নর কণ্ঠে গান ধরে। সারকান যেন পুলক সায়রে ভাসতে থাকে।

গান শেষ হলে রূপসী-যুবতীটি ঠোঁট টিপে টিপে হেসে বলে—'কিগো, ভাল মানুষ, কিছু বুঝলে কি? কেমন লাগল? আমার গানা কি তোমার দিলে দাগ কাটতে পারল?'

—'তোমার গানের ভাষা আমার কাছে একেবারেই অবোধ্য! কিন্তু সুর কিছু কিছু ধরতে পেরেছি। আর কেমন লেগেছে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলব, তোমার গানা আমার দিল্ কেড়ে নিয়েছে। আমি কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, নিজেই বলতে পারব না। তোমার কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম।'

একে সরাবের নেশা তার ওপর গানে-গানে দিল্ মাতোয়ারা হয়ে সারকান এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। একেবারে বে-হুঁস হয়ে গেল। সারকান সারাদিন পালঙ্কের ওপর অচৈতন্য হয়েই পড়ে রইল। রাত্রিও কাটল গভীর ঘুমের মধ্যেই।

সকাল হ'ল। সারকান চোখ মেলে তাকাল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। তারই সেবায় নিযুক্ত এক বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করল—'কি হে, তোমার মালকিন কোথায়?'

—'তাঁর নিজের কামরায়। আপনার ঘুম ভাঙলে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার হুকুম রয়েছে।'

সারকান বাঁদীটির সঙ্গে অন্দরমহলে রূপসী-যুবতীটির কামরায় গেল। সে তখন পালঙ্কের ওপর সুন্দর ভঙ্গিতে শুয়ে। মখমলের চাদরটি যেন তার রূপ-সৌন্দর্যকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

রূপসী-যুবতীটির নির্দেশে এক বাঁদী সরাবের বোতল আর পেয়ালা এনে তাদের সামনে রাখল। সারকান এক পেয়ালা সরাব যুবতীটির দিকে বাড়িয়ে দিল! আর এক পেয়ালা নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে নিল। যুবতীটি এবার গান ধরল। দিল উজার করে সে একের পর এক গান গাইল।

সারকান তন্ময় হয়ে রূপসী যুবতীটির কিন্নরকণ্ঠের গান শুনতে লাগল। ক্রমে সে যেন গানের সুরের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে বহু দূরে, অন্য এক লোকে চলে গেল। সেখানে যেন শুধুই গান আর গান।

সারকান-এর চোখের পাতায় সবে একটু তন্দ্রা আশ্রয় করল। ঠিক সে-মুহূর্তেই একদল লোকের হুড়োহুড়ির শব্দে তার তন্দ্রা টুটে গেল। চোখ মেলেই দেখে এক দুর্ধর্ষ সেনাপতি তরবারি হাতে, রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। সে বিশ্রী স্বরে গর্জে উঠল—'সারকান, আজ তোমাকে বাগে পেয়েছি।'

সারকান সচকিত হয়ে ঝটকরে সোজাভাবে বসে পড়ল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে, জোর করে বুকে সাহস সঞ্চার করে বল্ল—'কে? কে তুমি? কি চাও?'

রূপসী-যুবতীটিকে লক্ষ্য করে দরজায় দণ্ডায়মান সেনাপতি এবার আগের চেয়ে মোলায়েম স্বরে বল্ল—'মহামান্যা রাজকুমারী ইরবিজা, এ-আগন্তুক যুবকের পরিচয় কি আপনার জানা আছে? এ হচ্ছে বাগদাদের বাদশাহ উমর অল-নুমান-এর একমাত্র লেড়কা সারকান। প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা। নিজের পরিচয় গোপন করে আমাদের আস্তানায় ঢুকে পড়েছে। দুর্গে হানা দিয়েছে। আমাদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার অভিপ্রায়ে —'

রূপসী-যুবতীটি এবার মুখ খুল্‌ল—'কী সব বাজে কথা বলছ! এ তো এক পরদেশী, মুসাফির। কোন ষড়যন্ত্র বা গোপন অভিপ্রায় নিয়ে সে এখানে আসে নি। আমি তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি। আমার মেহমান।'

—'আমার ওপর মিছে গোসা করবেন না রাজকুমারী। আমরা সংবাদ পেয়েছি, বীরযোদ্ধা সারকান এখানে আত্মগোপন করে রয়েছে। আপনার পিতার নির্দেশে আমি তাকে গ্রেপ্তার করে তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে ছুটে এসেছি।'

—'চমৎকার! এরকম একটি আজগুবি খবর আমার পিতাকে কে-ই বা দিল!'

—'আমাদের বুড়ি বাঁদী রাজা মশাইকে গোপনে খবরটি পৌঁছে দিয়েছে।'

—'বুঝেছি, সেই ধুমসো বুড়িটি কাল রাত্রে আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে এসে নাজেহাল হয়েছিল। আর সে রাগের বসেই এরকম এক খবর পৌঁছে দিয়ে আমার পিতাকে আপনাদেরও বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দেয়।'

—'রাজকুমারী কিছু মনে করবেন না, আপনিই বরং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাইছেন। আমরা বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিন্ত হয়েছি, এ-ই সারকান। আপনি নির্দ্বিধায় একে আমার হাতে তুলে দিয়ে আপনার পিতার ও দেশের মঙ্গল সাধন করুন। জেনে রাখবেন, সারকানকে কব্জা করতে পারলে আফ্রিদুন'কে আমরা অনায়াসেই পরাস্ত করতে সক্ষম হ'ব।'

ইরবিজা-র চোখে-মুখে জ্বলন্ত ক্রোধের ছাপ ফুটে উঠল। সে বেশ রাগত স্বরেই এবার বল্ল—'কে তুমি? তোমার পরিচয় কি, জানতে পারি কি?'

—'মহামান্যা রাজকুমারী, আমার নাম মাসুরা। মাউসুরা আমার পিতা। আর তার পিতার নাম কাসিরদা। আপনার পিতার পদাতিক বাহিনীর সেনাপতির পদে আমি নিযুক্ত।'

—'আমি তোমার কাছে একটিমাত্র কথার জবাব চাই। কার আদেশে তুমি প্রাসাদের অন্দরমহলে, আমার কক্ষের দরজা পর্যন্ত এসেছ, আগে আমাকে বল।'

—'শুনুন রাজকুমারী, আমার কৃতকর্মের জন্য প্রাণদণ্ড হওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। আমি তো সম্রাটের দাসানুদাস। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র কর্তব্য। তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি একে আমার হাতে তুলে দিয়ে আমাকে কর্তব্য পালনের সুযোগ দিন।'

—'আমি এখনও বলছি, আমি একজন অজানা—অচেনা মানুষকে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। আর এ-ও ঠিক তেমনি সত্য যে, এ পরদেশী, আমার মেহমান। এর সঙ্গে সারকান-এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে, আমি ভেবে পাচ্ছি না। আর এ যদি সত্যি সত্যিই সারকান হয়েও থাকে তবু তো এ আমার মেহমান। মেহমান যত অন্যায়ই করুক না কেন সে অ-বধ্য। এর প্রতি অত্যাচার -অবিচার আমি মেনে নেব না, কিছুতেই না। আমি এর সঙ্গে বসে খানাপিনা করেছি। তারপরও যদি এর ক্ষতি করি সে হবে চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা। সেনাপতি মাসুম, আমার অভিপ্রায়ের কথা তো শুনলেই এবার তুমি গিয়ে আমার পিতার কাছে আমার নামে যা খুশী বলতে পার। আর জবাবদিহি যদি করতেই হয় তবে তার কাছেই করব? তোমার কাছে অবশ্যই নয়।'

মাসুরা তবু দরজা থেকে একচুলও নড়ল না। অধিকতর বিনয়ের সঙ্গে এবার নিবেদন করল — 'রাজকুমারী, আপনি যতই ক্রুদ্ধ হন না কেন আমি কিন্তু সারকান'কে না নিয়ে এখান থেকে ফিরতে পারব না। এর দেখা পেয়েও আমার পক্ষে সম্রাটের সামনে খালি-হাতে গিয়ে দাঁড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনার পিতা সম্রাট হারদুব কড়া নির্দেশ দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, যেকোন মূল্যে সারকান'কে তাঁর সামনে হাজির করতে হবে।'

রাজকুমারী ইরবিজা গুলিখাওয়া বাঘিনীর মত গর্জে ওঠে —'সেনাপতি মাসুরা, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি অধিকারের সীমা অতিক্রম করছ। ভুলে যেয়োনা, এটি যুদ্ধক্ষেত্র নয়। আমার ব্যাক্তিগত ব্যাপার স্যাপারে তোমার হস্তক্ষেপ করতে আসা মোটেই সঙ্গত নয়। আর যদি তা কর তবে তার ফল পেতেও দেরী হবে না, মনে রেখো। তুমি যদি আমার মেহমান'কে সারকান সন্দেহে হাতকড়া পরাতে চাও তবে কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই

তোমাকে করতে হবে।'

রাজকুমারী ইরবিজা সারকান-এর হাতে ঢাল তরবারি তুলে দিল। এবার সেনাপতি মাসুরা'কে বল্‌ল—'ঠিক আছে, তোমরা এক এক করে এর সঙ্গে লড়াই করবে এসো। তারপরও যদি তোমাদের মধ্যে একে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার মত কেউ জীবিত থাক তখন হাতকড়া পরিয়ো, আমি টু-শব্দটিও করব না।'

সেনাপতি মাসুরা এবার সত্যি সত্যি সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। হাত কচলে নিবেদন করে— 'রাজকুমারী, আমার হয়েছে উভয় সঙ্কট। সারকানকে না নিয়ে খালি হাতে ফিরে গেলে আপনার আব্বা আমার ওপরে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যাবেন আবার যদি একে বন্দী করি তবে আপনার রক্তচক্ষু আমার ওপর বর্ষিত হবে। ঠিক আছে আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ীই কাজ হবে। আমি এবং আমার সঙ্গে উপস্থিত যোদ্ধারা সারকান-এর সঙ্গে অসি—যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছি। যেহেতু আমি সেনাপতি তাই আমিই সবার আগে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হই।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর দেখলেন ভোর হতে আর দেরী নেই। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পঞ্চাশতম রজনী

রাত্রির প্রায় দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগমের কক্ষে এলেন। বেগম শাহরাজাদ কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই কিস্‌সা শুরু করলেন — 'জাহাপনা, সেনাপতি মাসুরা সারকান-এর সঙ্গে অসিযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল। ইরবিজা তাকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে বল্‌ল—'মনে রেখো, তোমার দলের কেউ ভুলেও যদি শর্ত লঙ্ঘন করে তবে আমি কিন্তু আমার সম্মানীয় মেহমানকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

সারকান এতক্ষণ নীরবে তাদের কথোপকথন শুনছিল। এবার সে মুখ খুল্‌ল— 'সুন্দরী, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার ছিল। কেবলমাত্র একজনের সঙ্গে লড়াই করা আমার রীতি বহির্ভূত কাজ। তবু তুমি যখন এ-রকমই ব্যবস্থা করেছ, মেনে নিলাম।'

এবার সারকান এবং মাসুরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হ'ল। মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই। মাসুরা কিন্তু বেশীক্ষণ লড়াই অব্যাহত রাখতে পারল না। চোখের পলকে সারকান -এর তরবারি ঝলসে উঠল। এক কোপে মাসুরা-র গর্দান থেকে তার মাথাটি মেঝেতে ছিটকে পড়ল। ফিনকি দিয়ে খুন বেরিয়ে এল। সব খতম।

সারকান-এর যুদ্ধ-কৌশল ও তার বীরত্ব চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে ইরবিজা যারপর নাই মুগ্ধা হয়। ইতিপূর্বে এর ওর মুখে তার শৌর্যবীর্যের কথা শুনেছিল বটে। আজ চাক্ষুষ করে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'ল।
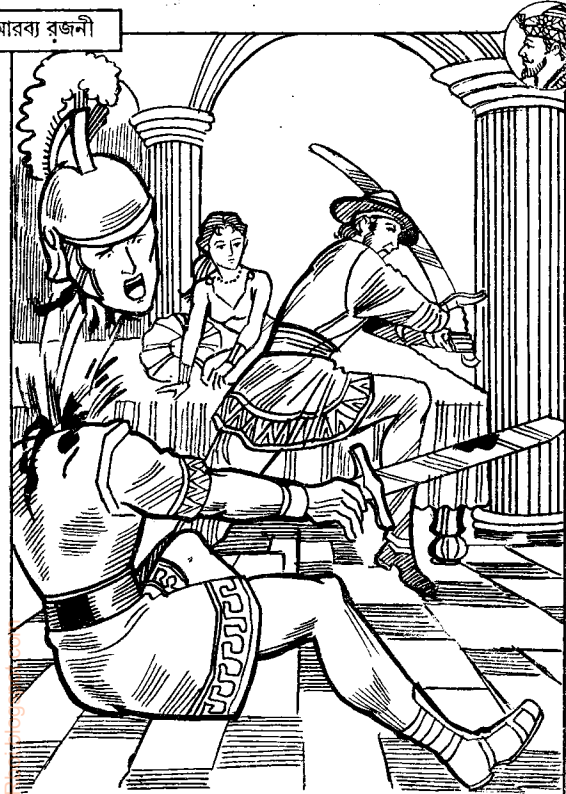
মাসুরা-র ছিন্ন মুণ্ডুটি তাজা খুনে মাখামাখি হয়ে মেঝেতে পড়ে রইল।

এবার মাসুরা-র এক ভাই তরবারি হাতে এগিয়ে এল। বিশাল তার চেহারা। অসুরকেও যেন হার মানাবে। সারকান -এর সামনে এসেই সে অতর্কিতে তরবারি চালিয়ে দিল। ব্যস, তরবারি আর ঘুরে তার দিকে আসতে পারল না। তার বাঁটটি তার হাতে মুঠো করাই রইল। সুমসৃণ ইস্পাতের টুকরোটি ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। ব্যস, তার ছটফটানি মুহূর্তে খতম হয়ে গেল। কিন্তু নিরস্ত্রকে আঘাত করা বীরোচিত কর্ম নয়। ইরবিজা দেয়াল থেকে একটি তরবারি টেনে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। আবার শুরু হল লড়াই। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সারকানের হাতের তরবারিটি তার তলপেটে গেঁথে গেল। একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়। বিকট আর্তনাদ করে পাহাড়ের মত অতিকায় যুবকটি আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে বার কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করল। ব্যস, তারপরই সব ঠাণ্ডা।

এবার একের পর এক নয়। শর্তের কথা ভুলে এক সঙ্গে সবাই এগিয়ে আসে। এক মিনিটও তারা সারকানের তরবারির সামনে টিকতে পারল না।

এক ঘন্টার মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশ জন যোদ্ধা ধরাশায়ী হয়ে গেল। রাজকুমারী ইরবিজা এবার দ্বাররক্ষীদের তলব করে। তারা কোরবাণির বকরীর মত কাঁপতে কাঁপতে তার সামনে দাঁড়ায়। ইরবিজা গর্জে ওঠে — তোমরা, এতগুলো জোয়ান মরদ পাহারায় নিযুক্ত ছিলে। আমার হুকুম ছাড়া এতগুলো লোক কি করে আমার অন্দরমহলে প্রবেশ করল, জবাব দাও।

দ্বাররক্ষীরা কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দেয় — 'মালকিন, প্রধান সেনাপতিকে বাধা দেওয়ার সাহস বা ক্ষমতা আমাদের কোথায় বলুন? সম্রাটের হুকুমনামা নিয়ে তিনি এসেছেন, আমরা তো এ ব্যপারে অসহায়, বিবেচনা করে দেখুন।'

ক্রোধোন্মত্তা রাজকুমারী ইরবিজার নির্দেশে সারকান দ্বাররক্ষীদের সবাইকে কোতল করল।

ইরবিজা এবার বীরশ্রেষ্ঠ সারকানকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। আবেগে-উচ্ছ্বাসে বার কয়েক চুম্বন করল। নিজের যৌবনভরা বক্ষে সারকানে-র সুপ্রশস্ত বক্ষটি স্থাপন করে মন্ত্রমুগ্ধার মত দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ তারা পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল সে হিসাব করার মত মানসিকতা তাদের কারোরই ছিল না। এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ইরবিজা সারকানে-র বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের বেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করল। তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসাল। নিজে বসল তার পাশে। কাছাকাছি, একেবারে গা-ঘেঁষাঘেষি করে। তার একটি হাত নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে মৃদু মৃদু চাপ দিতে দিতে বল্‌ল—'আমার নিজের কথা এবার তোমাকে শোনাতে চাই। আমার নাম যে ইরবিজা তা-তো তুমি আগেই শুনেছ। আর আমি যে সম্রাট হারদুব -এর কন্যা তা-ও এখন আর তোমার অজানা নেই। যে - মোটাসোটা বুড়িটিকে গত রাত্রে আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে দেখেছিলে সে আমার পিতার পুরনো বাঁদী। একবার আমার পিতা কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হন। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ধুমশো বুড়িটি সেবা যত্নের মাধ্যমে তার রোগ নিরাময় করে। তারপর থেকেই সে আমার পিতার প্রিয় পাত্রী হয়ে ওঠে। এ দুর্গ-প্রাসাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সে কৌশলে হস্তগত করে। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরদিনই সাপ আর নেউলের মত। সে যে আজকের ঘটনাটি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আমার পিতার কানে তুলবে তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। আমি খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলেছি, এরকম কথা বলে আমার বিরুদ্ধে আমার পিতার কান সে ভারী করে তুলবে, ধরেই নিয়েছিলাম।'

সারকান মন্ত্রমুগ্ধের মত ইরবিজা-র কথা শুনতে লাগল। এক সময় বল্‌ল— 'সুন্দরী, এ-ফাঁদ থেকে তোমার অব্যাহতি পাওয়ার কি কোন উপায়ই নেই?'

—'উপায় একটিই, আমার দেশের বাড়ি চলে যাওয়া। আমাকে যেতেও হবে তা-ই, আর এ-ব্যাপারে তোমার সক্রিয় সাহায্য - সহযোগিতা আমি প্রত্যাশা করছি।'

—'শোন, তোমার জন্যই আজ আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। অতএব তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব। কিন্তু একটি কথা, তুমি কি তোমার আব্বার সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাচ্ছ?'

—'এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথই আমার সামনে খোলা নেই। অদূর ভবিষ্যতে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যার কাছে পিতা-কন্যার সম্পর্ক আর স্নেহ-মায়া মমতা অতীব তুচ্ছ। তোমাকে আমি আর একটি অনুরোধ করছি, যত শীঘ্র সম্ভব তোমার ছাউনি গুটিয়ে বাগদাদে ফিরে যাও।'

সারকান সবিস্ময়ে বল্‌ল—'কিন্তু তা কি করে সম্ভব, সুন্দরী? আমার আব্বা যে তোমার আব্বার সঙ্গে লড়াই করার জন্য সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে এখানে ভেজলেন। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার আব্বা আমার কোন অনিষ্টই করতে পারবেন না। যুদ্ধের কারণ তুমি জান কিনা আমার ঠিক জানা নেই। সংক্ষেপে বলছি, শোন। তোমার আব্বা কনস্তান্তিনোপলের সম্রাট আফ্রিদুন -এর জাহাজে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুঠ করে নেন। জাহাজে প্রচুর সোনাদানা ছাড়াও হীরা জহরত আর মণি-মুক্তা ছিল। আর ছিল অলৌকিক শক্তির আধার তিনটি অমূল্য সম্পদ-তিনটি পাথর। তাই —'

সারকানকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই ইরবিজা বলতে শুরু করে — 'তোমরা যা কিছু শুনেছ, সবই এক পক্ষের মতামতই শুনেছ। আসল ব্যাপারটির ধারে-কাছ দিয়েও যাওনি। এবার আসল ঘটনাটি আমার মুখে শোন, তবেই তোমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যাবে। সবকিছু খোলসা হয়ে যাবে। আমরা প্রতি বছর বড়দিনের উৎসব এখানে, এ-দুর্গ-প্রাসাদে পালন করি। সাত-সাতটি দিন বিভিন্ন আনন্দ -অনুষ্ঠানের মধ্যে কাটে। এ বছর সম্রাট আফ্রিদুন নিমন্ত্রিত হয়ে সপরিবারে বড়দিনের উৎসবে যোগদান করতে আসেন। দেশে ফিরে যাবার সময় তাঁর কন্যা সোফিয়া'কে আমার পিতার হাতে তুলে দিয়ে যান। সে যে এখন তোমার পিতার প্রধানা রক্ষিতা হয়ে বাগদাদে অবস্থান করছে, আশাকরি তোমাকে বলে দিতে হবে না। সম্প্রতি সে একটি সন্তানের জননী। আমার পিতা বন্ধুত্বের খাতিরে সোফিয়াসহ পাঁচটি রূপসী গ্রীক কুমারীকেও পাঠান।

এদিকে খেল অন্য দিকে মোড় নেয়। সম্রাট আফ্রিদুন ধরে নিলেন, তাঁকে অপমান করার জন্যই আমার পিতা তাঁর পাঠানো ভেট তোমার পিতার হাতে অর্পণ করেছেন। ব্যস, গরম তেলে জলের ছিঁটা পড়ল। রাগে গস্ গস্ করতে করতে আমার পিতাকে তিনি পত্রাঘাত করে বসলেন। তার পত্রের মূলবক্তব্য, তাঁর প্রেরিত ভেট সফিয়া এখন বাগদাদের সম্রাট উমর অল-নুমান-এর প্রাসাদে সামান্য রক্ষিতা হিসেবে দিন যাপন করছে। এটি তাঁকে অপমান করার একটি কৌশল ছাড়া কিছু নয়। সব শেষে কড়া ভাষায় শাসাতেও ছাড়লেন না।

পত্র পাঠ করে তো আমার পিতা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার জোগাড় হলেন। সম্রাট আফ্রিদুন-এর ভয়ে নয়, নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জা-শরমের জন্য। কিন্তু সোফিয়া'কে ফেরৎ নিয়ে আসাও সম্ভব নয়। কারণ সে যে ইতিমধ্যে সম্রাট উমর-অল-নুমান-এর কন্যার জননী হয়ে গেছে। আমার পিতা তার কাছে এরকম বক্তব্য উল্লেখ করে অনুশোচনা-পত্র পাঠালেন।

কাটা-ঘায়ে নুনের ছিঁটা পড়ল। পত্র পেয়ে আফ্রিদুন ব্যাপারটিকে অনিচ্ছাকৃত বলে মনে করতে পারলেন না কিছুতেই। গুলিখাওয়া শেরের মত ক্ষেপে গেলেন। তিনি যুক্তি দেখাতে লাগলেন, তাঁর মেয়ে মুসলমানের হারেমে আশ্রয় লাভ করে জঘন্য জীবন যাপন করছে। এবার আফ্রিদুন-এর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি ভর করে। শত্রু দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে হবে। তাই বহুমূল্য উপহার সামগ্রী তিনি তোমার পিতার কাছে পাঠালেন। আর মনগড়া কিস্‌সা বলে তাঁর মনজয় করতে প্রয়াসী হলেন। সোনাদানা হীরা-জহরত এবং অলৌকিক গুণ সম্পন্ন পাথর প্রভৃতির মুখরোচক কিস্‌সা ফেঁদে তোমার পিতার মন জয় করল। তার প্রতিদান স্বরূপ তোমার পিতা তোমাকে দশ হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠালেন তার পক্ষ হয়ে আমার পিতাকে শায়েস্তা করার জন্য। তুমি একটু আগে তিন গ্রহরত্নের কথা বলছিলে, মনে আছে? আসলে কিন্তু সেগুলো তার কন্যা সোফিয়ার কাছেই ছিল। গ্রীসে গিয়ে সে সেগুলো আমার পিতার হাতে গচ্ছিত রাখে। তারপর আমি কৌশলে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সে পাথর তিনটি হাতিয়ে নিয়েছি। সুযোগমত তোমাকে দেখাব।'

এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজকুমারী ইরবিজা বল্‌ল—'হে বীর সারকান, আমার অনুরোধ, তুমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কর।'

—'ইরবিজা, আমার চোখে এতদিন ঠুলি পরানো ছিল। এক ঝটকায় আজ তুমি তা খুলে দিলে। আমি আজই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করব। যদি আপত্তি না থাকে তবে তুমিও আমার সঙ্গে চল।'

—'তাই হবে। তুমি তাঁবু গুটিয়ে সৈন্যদের যাত্রার জন্য তৈরী কর। আমি অচিরেই তোমার সঙ্গে মিলিত হ'ব। তারপর এক সঙ্গে বাগদাদের পথে যাত্রা করব।'

উভয়ে চোখের জলে বুক ভাসায়। সারকান ইরবিজা-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিষণ্ণ মুখে ঘোড়ার পিঠে চাপল।

সারকান কিছুদূর যেতে না যেতেই এক অবিশ্বাস্য ঘটনার মুখোমুখি হয়। দেখে, তিনজন যুবক ঘোড়া হাঁকিয়ে তার দিকে আসছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার ভুল ভেঙে যায়। দেখল, তার উজির দানদান এবং দু'জন আমীর। তার খোজেই তারা তিনদিন ধরে ঘোড়া নিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

সারকান কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই উজির দানদান'কে সম্রাট আফ্রিদুন-এর কুমতলবের কথা খুলে বল্‌ল।

তারা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ছাউনিতে পৌঁছল। সারকান-এর অনুরোধে উজির সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাগদাদের পথে যাত্রা করলেন। আর সারকান একা রয়ে গেল। তিনদিন পরে ইরবিজা আসার কথা। তাকে নিয়ে সে ঘোড়া হাঁকিয়ে সৈন্যদের ধরে ফেলতে পারবে দানদানকে সে বলেছিল। তবে সে কেবলমাত্র একশ'জন সেনাপতিকে নিজের সঙ্গে রেখে দিল।

উজির সৈন্যদের নিয়ে যাত্রা করার কিছু পরেই একশ' জন ঘোড়সওয়ার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সারকান-এর সামনে এসে দাঁড়াল। সে কিছুমাত্র আতঙ্কিত না হয়ে তার দলের সেনাপতিদের নির্দেশ দিল শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য। চোখের পলকে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ বেঁধে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা বে-গতিক দেখে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কোনরকমে পিতৃদত্ত জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

ব্যর্থ মনোরথ খ্রীস্টান সৈন্যরা ফিরে গিয়ে তাদের সেনাপতির কাছে নিজেদের অক্ষমতার কথা জানায়। সেনাপতি ফিকির খুঁজতে

থাকে, কিভাবে সারকানকে একটু কড়কে দেওয়া যায়।

সারকান-এর সেনাপতিরা ঘোড়ার পিঠে চেপে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে শত্রুসৈন্যদের খোঁজ করে চলেছে। তাদের মধ্যে একজন দলছাড়া হয়ে যায়। ব্যস, আচমকা একটি দড়ির ফাঁস এসে তার গলায় আটকে যায়। দড়ির এক প্রান্ত এক শত্রুসৈন্যের হাতে। সে দড়ির মাথা ধরে টানতে টানতে তাকে একটি গুহার মধ্যে নিয়ে যায়। আকস্মিক ঘটনাটি সারকান'কে ভাবিয়ে তুল্‌ল। সে একের পর এক সেনাপতিকে পাঠাল তার হদিস নিয়ে আসতে। কেউ আর ফিরল না। এ ভাবে কুড়িজন সেনাপতি বে-পাত্তা হয়ে গেল। দুর্ধর্ষ সব যোদ্ধারা তার হদিস না আনতে পারায় সারকান অস্থির হয়ে পড়ল।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আর সেখানে থাকা নিরাপদ নয় আশঙ্কায় সারকান ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ক্রোধোন্মত্ত সারকান মনস্থ করে, সকাল হলে সে নিজেই যাবে ব্যাপারটি সম্বন্ধে যা হোক একটি হিল্লে করার জন্য। প্রয়োজনে লড়াই করবে। পরীক্ষা করে দেখবে, তার কব্জিতে কত শক্তি ধরে।

সকাল হ'ল। সারকান একটিমাত্র অসি সম্বল করে পাহাড়ের ওপর উঠে গেল। এক উপত্যকার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়ল জনা পঞ্চাশেক ঘোড়সওয়ার তীরবেগে তার দিকে ধেয়ে আসছে। সবাই সশস্ত্র। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা তার কাছে পৌঁছে গেল। সারকান ক্রোধোন্মত্ত শের-এর মত অসি নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে তাদের দলের সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল। কিন্তু কেউ কাউকে ঘায়েল করতে সক্ষম হ'ল না।

সারাদিন চল্‌ল উভয় পক্ষের অস্ত্রের ঝনঝনানি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে উভয়কে রণেভঙ্গ দিতেই হ'ল।

সকাল হতেই আবার শুরু হ'ল তুমুল লড়াই। একবার সারকান আশার আলো দেখতে পায়। পরমুহূর্তেই আবার পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। খ্রীস্টান সেনাপতির অগ্রগতি লক্ষিত হয়। কিছুক্ষণ পরে আবার সারকান ও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারছে না। এক সময় অস্ত্র চালাতে চালাতে খ্রীস্টান সেনাপতি ঘোড়ার পিঠ থেকে হড়কে নিচে পড়ে যায়। সারকান তার হাতের তরবারিটি মাথার ওপর তুলে, শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে যেই কোপ বসাতে যাবে অমনি নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হয় —'থামো খুব হয়েছে। তুমি না বিশ্ববিজেতা দুর্ধর্ষ বীর উমর অল-নুমান-এর পুত্র বীরযোদ্ধা সারকান? আর তুমিই কিনা একটি অসহায় নিরস্ত্র নারীর ওপর বীরত্ব প্রদর্শন করতে বদ্ধ-পরিকর হলে? লজ্জা শরম বলতে তোমার কিছুই নেই দেখছি!'

—'আরে ইরবিজা, তুমি দু'দিন ধরে আমার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলে, আর আমি কিনা তোমাকে চিনতেই পারলাম না!'
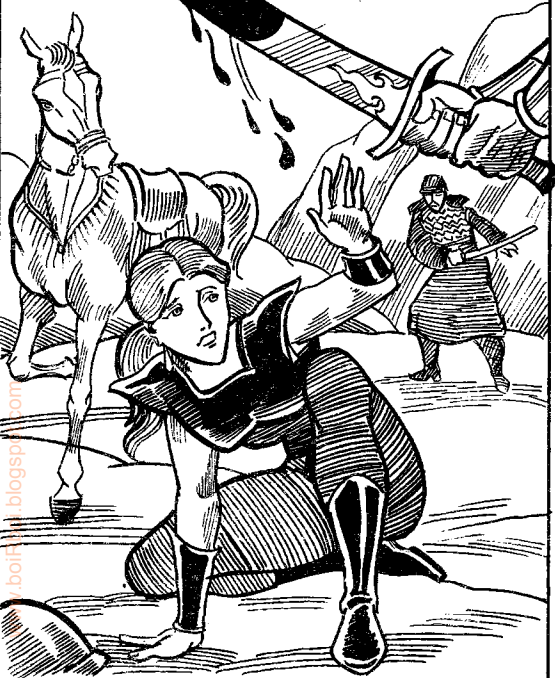
ইরবিজা সরবে হেসে জবাব দিল —'তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যই আমাকে এ পথ অবলম্বন করতে হয়েছে প্রিয়তম। যাকে নিয়ে সারাটা জীবন কাটাব, একটু-আধটু যাচাই করে নেব না?' এবার অন্যান্যদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বল্‌ল—'এই যে এদের দেখছ, কেউ-ই কিন্তু পুরুষ নয়, নারী। তোমার বিশজন সেনাপতিকে এরাই বন্দী করে আমার কাছে জমা দিয়েছে। তারা ভালই আছে।'

সারকান এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে তার মেহবুবা ইরবিজা'কে আলিঙ্গন করল। চুম্বনের মাধ্যমে তার বীরত্বের পুরস্কার দিল। আর বল্‌ল—'বীরাঙ্গনা নারী আমি জীবনে বহুত দেখেছি বটে। কিন্তু তুমি সত্যি অনন্যা।'

এবার তারা সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাগদাদের পথে যাত্রা করল। এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করল।

একান্নতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার মাঝ-রাত্রে অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ -এর কক্ষে এলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কিছুদুর গিয়ে সারকান তার এক সেনাপতিকে বল্‌ল—'তুমি তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বাগদাদে গিয়ে আমার আব্বাজানকে বল যে, আমি অত্যল্পকালের মধ্যেই বাগদাদে পৌঁছে যাচ্ছি।'

কুড়িদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘোড়াছুটিয়ে সারকান ইরবিজা ও অন্যন্যাদের নিয়ে বাগদাদে তাদের প্রাসাদে পৌঁছল।

সারকান দরবারে উপস্থিত হয়ে তার আব্বা বাদশাহ উমর অল-নুমান'কে কুর্নিশ জানিয়ে ইরবিজার উপস্থিতির কথা ব্যক্ত করল। সে সঙ্গে ইরবিজা-র মুখ থেকে শোনা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বলে। সম্রাট হারবুদ -এর কন্যা ইরবিজা। খ্রীস্টান। সে-ই সারকান'কে পাষণ্ড আফ্রিদুন -এর কবল থেকে রক্ষা করেছে, কথাটিও বলতে সে ভুলল না।'

আর ইরবিজা সর্বগুণে গুণান্বিতা। এমন কি যুদ্ধবিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শিনী। তামাম আরব দুনিয়াতে এমন কোন বীরযোদ্ধা নেই যে অসিযুদ্ধে ইরবিজা'কে পরাস্ত করতে পারে। আর এ-ও বলে যে, সে-ই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে এনেছে।'

লেড়কার মুখে ইরবিজা-র ভূয়সী প্রশংসা শুনে সম্রাট উমর অল-নুমান-এর অন্তরের অন্তঃস্থলের হিংস্র পশুটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

সারকান তার আব্বার পাশবিক প্রবৃত্তির কথা অনুমানও করতে পারে না। সে আব্বার অত্যুগ্র আগ্রহে ইরবিজা'কে প্রাসাদ থেকে নিয়ে এসে দরবারে তার আব্বার সামনে হাজির করল।

খ্রীস্টান ইরবিজা অনভ্যস্ত হাতে বাদশাহকে কুর্নিশ করে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করে মাথানিচু করে অদূরে দাঁড়িয়ে রইল।'

বাদশাহ উমর অল-নুমান ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'সুন্দরী, তোমার রূপ গুণে আমি মুগ্ধ।'

পিতৃতুল্য বাদশাহের মুখে 'সুন্দরী' শব্দটি শুনে ইরবিজা স্তম্ভিত হয়ে যায়। সবিনয়ে নিবেদন করে —'জাঁহাপনা, কিছু মনে করবেন না। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার মুখে 'সুন্দরী' শব্দটি আমার কাছে কেমন যেন অসঙ্গত বলেই মনে হয়।'

শয়তানের মত ঠোঁট টিপে টিপে হেসে বাদশাহ বল্‌লেন —'এর মধ্যে তুমি যে আবার অসঙ্গত কি দেখছ, বুঝছিনা আম্মা, বহিন, বেটি সবই তো একই লেড়কি। একের সঙ্গে অন্যের ফারাক কি আছে? যাক গে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপার স্যাপারের কথা পরেই না হয় আলোচনা করা যাবে। আমার বেটা সারকানকে তুমি নাকি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছ। তার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে তোমার ওপর বেইমানিই করা হবে। আর একটি কথা, সে অলৌকিক গুণ সম্পন্ন পাথর তিনটি নাকি তোমার হেফাজতেই রয়েছে? আমি একবারটি চোখে দেখতে চাচ্ছি। অবশ্য যদি—'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই ইরবিজা বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনি দেখবেন, এতে আর আপত্তির কি আছে? বাদশাহের অনুমতি নিয়ে সে দরবার কক্ষ ত্যাগ করল।

ইরবিজা এবার একটি রূপোর ছোট্ট বাক্স নিয়ে ব্যস্ত-পায়ে দরবারে, বাদশাহের কাছে হাজির হয়। বাক্সটি খুলে অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন গ্রহরত্ন তিনটি বের করতে করতে বাদশাহকে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, সত্যি বলতে কি, 'আপনাকে উপহার দেবার জন্যই আমি গ্রহরত্ন তিনটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' এবার তিনটি অত্যুজ্জ্বল পাথর বাদশাহের হাতে তুলে দিল।

গ্রহরত্ন তিনটির দিকে চোখ পড়তেই বাদশাহ উমর অল-নুমান-এর দিল্ নেচে ওঠে। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে জিন্দেগীতে হীরে-জহরৎ, মণি-মাণিক্য বহুতই দেখেছেন বটে কিন্তু এমন অভাবনীয় দ্যুতিযুক্ত পাথর কোনদিনই চোখে দেখেন নি।

এদিকে পাথর তিনটি ফিরিয়ে দেওয়ার অজু হাতে তিনি ইরবিজা-র ডান-হাতটি চেপে ধরেন। মুহূর্তে চোখে-মুখে ফুটে

ওঠে আদিম হিংস্র পাশবিকতার সুস্পষ্ট ছাপ।

ইরবিজা বাদশাহের আচরণে যারপরনাই স্তম্ভিত হয়। সে ঝট করে নিজের হাতটি নরাধম বাদশাহের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

বাদশাহ পরিস্থিতিটি সামাল দিতে গিয়ে বল্‌ল—'তোমার থাকার জন্য অন্দরমহলের একটি ঘর সাজিয়ে দিতে বলেছি। আশা করি ইতিমধ্যে খোজা ভৃত্যরা সেটিকে তোমার ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে পেরেছে।'

ইরবিজা এবার বাদশাহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার জন্য নির্দ্ধারিত ঘরে চলে গেল।

বাদশাহ এবার লেড়কা সারকান -এর হাতে একটি পাথর দিয়ে বল্‌লেন—'বেটা, এ পাথরটি তোমার কাছে রেখে দাও। একটি তোমাকে দিলাম। একটি তোমার বহিন নুজাৎ'কে আর একটি তোমার ছোট ভাইয়া দু'-অল-মাকান-এর জন্য রেখে দেব।'

—'আমার ছোট ভাইয়া? দু'-অল-মাকান?'

—'অবাক হচ্ছ নাকি? তুমি কি শোন নি, নুজাত-এর সহোদর এক ভাইয়া পয়দা হয়েছে? ও হ্যাঁ, তুমি তো নুজাত-এর জন্মের পর থেকেই যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে বাইরে-বাইরে কাটিয়েছ, জানবেই বা কি করে।' লেড়কার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে নিয়ে বাদশাহ এবার হেসে বল্‌লেন—'বেটা, এর জন্য তোমার মন খারাপের তো কিছু নেই, আমি তো ফরমান জারি করেই রেখেছি, আমি বেহেস্তে গেলে তুমিই হবে মসনদের দাবীদার।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সারকান অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করল—'খোদাতাল্লা তাদের সুখ-শান্তিতে রাখুন।' বাদশাহকে কুর্নিশ জানিয়ে সারকান তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

সারকান বিষণ্নমুখে উদ্ভূত নতুনতর সমস্যাটির কথা ভাবতে ভাবতে ইরবিজা-র কামরায় হাজির হয়। তার কাছে ব্যাপারটি ব্যক্ত করে।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে সারকান এবার বল্‌ল—'আরও বড় দুঃসংবাদ আছে মেহবুবা। আমার কাছে আজ যা অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয় সে তোমাকেও হয়ত একদিন আমি খুইয়ে বসব। আমার নসীবই আজ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আমার আব্বাজীর লালসা মাখানো নজর পড়েছে তোমার দিকে। তোমার রূপ-সৌন্দর্য আর তোমার যৌবনের ঢেউলাগা শরীরের দিকে শকুনের নজর যখন একবার পড়েছে তখন আর নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়।'

সারকান-এর কথা শুনে ইরবিজা চমকে ওঠে। এবার সে মুখ খুল্‌ল—'তবে দেখছি, আমার আশঙ্কা মিথ্যা নয়। আমিও লক্ষ্য করেছিলাম, তার লালসা মাখানো দৃষ্টি। কিন্তু তুমি এ-ও শুনে রাখ, আমি সম্রাট হারদুব-এর কন্যা। আমি জীবিত থাকতে তিনি লালসা পরিপূর্ণ করার জন্য আমাকে স্পর্শও করতে পারবেন না। যেকোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আত্মরক্ষা করার মত হিম্মৎ আমার অবশ্যই রয়েছে। আমি ভেবে পাচ্ছিনা, তার হারেম তো নারীর গোয়াল। তবে আবার এ-বয়সে সে আমার দিকে —'

তার, মুখের কথা শেষ হবার আগেই সারকান বলে উঠল—'মেহবুবা, একে বলে নেশা। নারী সম্ভোগের নেশা আমার আব্বার খুনের সঙ্গে মিশে রয়েছে, থাকবেও আমৃত্যু। শোন, আমি ক'দিনের জন্য জরুরী কাজে বাগদাদের বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে

আমরা আবার মিলিত হব।'

সারকান বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই বাদশাহ শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে তার পেয়ারের রক্ষিতা সোফিয়ার কামরায় প্রবেশ করেন। কোনরকম ভূমিকা না করেই সরাসরি প্রশ্ন করেন—'তুমি যে কনস্‌তান্‌তিনোপলের সম্রাট আফ্রিদুন-এর লেড়কি একথা আমার কাছে গোপন রেখেছিলে কেন? সম্রাটের কন্যাকে রক্ষিতা করে রেখে আমি সম্রাটকে অবমাননাই করেছি। জানলে যোগ্য সম্মান অবশ্যই দিতাম।'

—'জাঁহাপনা, আপনার খাস বেগম যে ইজ্জত পায় তার চেয়ে কম ইজ্জত নিয়ে তো আমি আপনার কাছে নেই। আপনি মেহেরবানি করে আমার গর্ভে দু' দুটো সন্তান দিয়েছেন, এ কী কম গৌরবের?'

...বাদ্‌শাহ উমর এবার অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন গ্রহরত্ন দুটো সোফিয়া-র হাতে তুলে দিয়ে বল্‌লেন—'এ দুটো নুজাৎ আর মাকান-এর গলায় পরিয়ে দাও।'

পাথর দুটো হাতে নিয়েই চমকে উঠে বলে—'এ পাথর দুটো সর্বরোগ হরণ করার ক্ষমতা রাখে। আমার আব্বা আমাকে যৌতুকস্বরূপ এ-পাথর তিনটি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, জাঁহাপনার হাতে এগুলো কি করে এল! সম্রাট হারদুব কি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সর্বস্ব খুইয়েছেন?'

—'সম্রাট হারদুব-এর লেড়কি এখন আমার হারেমে বাস করছে। তারই কাছ থেকে উপহারস্বরূপ এগুলো পেয়েছি।'

—'আপনি কি তাকে শাদী করে বেগম করে নেবেন, মনস্থ করেছেন?'

—'সে রকম পাকাপাকি কিছু মনস্থ করিনি এখনও। প্রস্তাবও দেইনি। প্রস্তাব দিলে প্রত্যাখ্যান করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তবে অস্বীকার করব না সোফিয়া, তার সুরৎ একটিবার মাত্র দেখেই আমি পাগল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছি। এ রকম সুরৎ আর যৌবনের সহাবস্থান এর আগে আর আমার নজরে পড়ে নি। সত্যি বলতে কি, বেহেস্তের হুরী পরীদের তৈরি করে অবশিষ্ট সুরৎটুকু এনে যেন তার গায়ে কোন নিপুণ শিল্পী লেপে দিয়েছে। এমন উন্নত বক্ষ খুব কম লেড়কিরই দেখা যায়। আর চলার সময় নিতম্ব দুটো যেভাবে দোলা খায় এক নজর দেখলেই কলিজাটি যেন দরকচা মেরে যায়। এমন কোন মরদ নেই যে নিজেকে সংযত রাখতে পারে!' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বল্‌লেন—'জানি না, ইরবিজার সুরৎ আর যৌবন ভোগ করা আমার নসীবে আছে কি না।'

সোফিয়া চোখের তারায় প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে নির্নিমেষ চোখে বাদশাহের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাদশাহ এবার অধিকতর মোলায়েম স্বরে বল্‌লেন—'সোফিয়া, যদিও ব্যাপারটি নিয়ে আমার অনেক আগেই চিন্তা ভাবনা করা উচিত ছিল। সে যা হবার হয়ে গেছে। এবার কি বলছি শোন—আমার মহব্বতের নিদর্শন স্বরূপ তোমার বসবাসের জন্য নয়া একটি মহল বানিয়েছি। রক্ষিতাদের সঙ্গে তোমাকে থাকতে দিয়ে আমি খুবই কসুর করে ফেলেছি। নয়া মহলটিতে তুমি আমার বিবির মর্যাদা নিয়ে নুজাৎ আর মাকানসহ বাস করবে। আর তোমার খরচ খরচা বাবদ দশহাজার দিনার মাসোহারা মঞ্জুর করেছি।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে সোফিয়া সোহাগে-আহ্লাদে ব'লে ওঠে—'বাদশাহ পেয়ার মহব্বতের মর্যাদা স্বরূপ আমাকে যা কিছু দেবেন আমি নির্দ্বিধায় মাথা পেতে নেব। আজ আমার রূপ-যৌবনের পূর্ণ মর্যাদা পেলাম।'

বাদশাহের কথায় সোফিয়া দুরভিসন্ধির গন্ধও পেল না। আসলে বাদশাহ চাইছেন, যেন তেন প্রকারেন সোফিয়া'কে অন্যত্র চালান করে দেওয়া। রূপসী যুবতী ইরবিজা'কে নিয়ে যে খেলায় মাততে চলেছেন তা যেন সোফিয়া ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।

বাদশাহ উমর প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকার হতে না হতেই ইরবিজার কামরায় উপস্থিত হন। তার মন গলাবার জন্য নানারকম প্রলোভন দেখাতে থাকেন।

ইরবিজা কিন্তু তাকে মোটেই আমল দেয় না। সে মুখের ওপরই ব'লে বসে—'জাঁহাপনা, আপনার রক্ষিতা বা বেগম কোন কিছু হবার আকর্ষণই আমার নেই। আর এরকম কোন আশার বশবর্তী হয়েও আমি নিজের দেশ ছেড়ে আসি নি। আপনার ছেলের বান্ধবী হয়ে থাকতে এসেছি। আপনি যদি আপত্তি করেন তবে আমি আমার পিতার কাছেই ফিরে যাব।'

কামনার জ্বলন্ত আগুন বুকে নিয়ে আশাহত বাদশা অন্দর মহল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

কামনার জ্বালায় দগ্ধ হতে হতে বাদশাহ একদিন নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই বৃদ্ধ উজির দানদান'কে বলেন—'শুনুন, ইরবিজার যৌবনভরা দেহটি আমার কলিজাটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দিয়েছে। তার দেহসুধা দিল ভরে পান করতে না পারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। এভাবে আর কিছুদিন চল্‌লে আমি যে পাগল হয়ে যাব উজির।'

—'জাঁহাপনা, এত অধৈর্য হলে চলবে কেন? ধৈর্য ধরুন। সবুরে মেওয়া ফলে, জানেন তো? আপনাকে একটি ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি। এবার যখন ইরবিজার ঘরে যাবেন তখন কিছু ঘুমের দাওয়াই সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। সরাবের সঙ্গে খাইয়ে দেবেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন ঘুমে একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়বে। এই মোকায় আপনি কাজ হাসিল করে নেবেন। তার ইজ্জৎ নষ্ট করবেন। সম্পূর্ণ চেতন হলে তখন সে বুঝবে জনানাদের অমূল্য সম্পদ কুমারীত্ব তার হরণ করা হয়েছে। গোড়ার দিকে অবশ্য আপনার ওপর ক্ষেপে একেবারে কাঁই হয়ে যাবে। কিন্তু অচিরেই স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে। তখন আপনার দিকে একটু একটু ক'রে ঝুঁকতে থাকবে।'

বৃদ্ধ উজির দান্‌দান-এর পরামর্শ মত শেরওয়ানীর জেবে কিছু ঘুমের দাওয়াই নিয়ে বাদশাহ গুটিগুটি ইরবিজার কামরায় এলেন, বিষণ্ণ মুখে বল্‌লেন—'ইররিজা, আমি ক'দিনের জন্য বাগদাদের বাইরে চলে যাচ্ছি। জরুরী কিছু কাজ পড়েছে। তাই আমার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশী সময় অবস্থান করি। আর একটু খানাপিনার আয়োজন করতে পারলে ভাল হয়। আর কিছু না হোক, ভাল সরাব একটু হলেই চলে যাবে।'

ইরবিজা সরাব নিয়ে এসে সোনার পেয়ালায় কিছুটা ঢেলে

দিল। সে নিজে খেতে অনাগ্রহী। বাদশাহের অনুরোধে শেষে সে রাজী হয়। পর পর তিন পেয়ালা খেয়ে নিল্। এবার বাদশাহ শেরওয়ানীর জেব থেকে ঘুমের দাওয়াইয়ের পুরিয়াটি বের করে ইরবিজার চোখের আড়ালে সরাবের পেয়ালায় দিল ঢেলে। ইরবিজা জানতেও পারল না কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল।

ইরবিজা এবার সরাব পান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। বাদশাহের অনুরোধেও না। তখন বাদশাহ বলেন—'ঠিক আছে, তুমি সামান্য খাও। তারপর পেয়ালার অবশিষ্ট সরাব না হয় আমিই খাচ্ছি।'

ইরবিজা বাদশাহের অনুরোধ শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারল না। পেয়ালা থেকে সামান্য একটু সরাব পান করে সরাব সমেত পেয়ালাটি বাদশাহের হাতে তুলে দিল। ইরবিজা ওষুধ মেশানো সরাব খুব সামান্যই পান করেছিল।

বাদশাহ দেখলেন, মহাসমস্যা। কিছুতেই যে তাকে বাগে ফেলা যাচ্ছে না। ঘুমের ওষুধের পুরিয়া শেরওয়ানীর জেবে আরও একটি আছে বটে। কিন্তু সেটিকে কোন্ কৌশলে কাজে লাগানো যেতে পারে বাদশাহ ভাবতে লাগলেন।

ইরবিজা টেবিল থেকে খাবার থালিটি নিয়ে এসে বাদশাহের সামনে রাখল। এবার পানির পাত্রটি আনার জন্য টেবিলের দিকে পা বাড়াতেই বাদশাহ শেরওয়ানীর জেব থেকে বের করে হাতে রাখা ঘুমের ওষুধটুকু এক টুকরো গোস্তের গায়ে মাখিয়ে দিল।

ইরবিজা পানির পাত্র নিয়ে ফিরে এল। বাদশাহ বল্লেন—'তুমি আগে এক টুকরো না খেলে আমি কি করে খাই বল তো?' কথা বলতে বলতে দাওয়াই মাখানো গোস্তের টুকরোটি তার মুখের সামনে ধরলেন। সে আপত্তি করলেও বাদশাহের অনুরোধের কাছে তা নস্যাৎ হয়ে গেল।

এবার ঘুমের দাওয়াই কাজ শুরু করে দিল, ইরবিজার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। আর বসে থাকতে পারল না। পালঙ্কের ওপর এলিয়ে পড়ল। বাদশাহ এবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বাদে বাদশাহ উমর ইরবিজার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সরাবের নেশায় টলতে টলতে চুপি চুপি নিজের কামরায় গিয়ে পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই খাটের ওপর শুয়ে পড়লেন। ব্যস্ তারপরই নেশার ঘোরে এলিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বাদে বৃদ্ধা ক্রীতদাসী ইরবিজার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখের সামনে এমন কোন বীভৎস দৃশ্য দেখবে সে কল্পনাও করতে পারে নি। সে দেখল, ইরবিজা মরার মত এলিয়ে পড়ে রয়েছে। শয্যা এলোমেলো। মখমলের চাদরটির কিছু অংশ পালঙ্ক থেকে ঝুলে পড়েছে। ইরবিজা বিবস্ত্রা। একেবারেই বিবস্ত্র মাথার চুল এলোমেলো। নিচের ঠোঁটটিতে দাঁতের দাগ।

সামান্য কেটে গেছে। চুইয়ে চুইয়ে খুন ঝরছে। অভিজ্ঞা বৃদ্ধার বুঝতে আর বাকি রইল না, যে কেউ-ই হোক একটু আগেই ইরবিজার সতীত্ব নষ্ট করে পালিয়েছে। বৃদ্ধটি এবার ভীতা-সন্ত্রস্তা হয়ে তার কাছে এগিয়ে যায়। দুরু দুরু বুকে গায়ে হাত দিয়ে দেখল, হৃদস্পন্দন ঠিকই আছে বটে। তবে একেবারে বে-হুঁস। আর গাল বেয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। ব্যাপারটি এবার তার কাছে আরও পরিষ্কার হ'ল। ওষুধ খাইয়ে বে-হুঁস করে কোন এক শয়তান তার সর্বনাশ করে গা-ঢাকা দিয়েছে। ভাবল, এ-অবস্থায় পোশাক পরান সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না দেখে একটি চাদর তার গায়ে চাপা দিয়ে বৃদ্ধা দ্রুত ঘড় ছেড়ে গেল।

সকাল হ'ল। বেশ বেলাতেই ইরবিজার ঘুম ভাঙল। ঠোঁটটিতে সামান্য ব্যথা অনুভব করল। হাত দিল। চুঁইয়ে পড়া খুন জমাট বেঁধে শুকিয়ে রয়েছে। বুঝতে বাকি রইল না গতরাত্রে তার সর্বস্ব খোয়া গেছে। উঠে বসার চেষ্টা করল। তল পেটে তিরতির করে ব্যাথা হচ্ছে। বার কয়েক হাত বোলাল সেখানে। ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বিবস্ত্রা অবস্থাতেই মিনিট কয়েক পালঙ্কের ওপর বসল। অগোছাল বিছানাটির দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকাল। চাদরের এক জায়গায় চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। খুনের দাগ। চাদরের গায়ে শুকনো খুনের দিকে তাকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

এমন সময় বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি বিষণ্ণমুখে ঘরে ঢুকল। ইরবিজা তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বৃদ্ধা নানাভাবে তাকে প্রবোধ দিতে থাকে। তারপর বল্ল—'গতরাত্রে আপনাকে

ঘুমের দাওয়াই খাইয়ে শয়তান আপনার ইজ্জৎ হানি করে গেছে। নাশ করেছে আপনার সতীত্ব।'

চোখের পানি মুছতে মুছতে ইরবিজা গর্জে ওঠে—'এর বদলা আমি নেব-ই নেব।'

বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি ম্লান হাসল। বল্‌ল—'বদলা? বদলা কি করে আপনি নেবেন, মাথায় আসছে না। সামান্যা একজন রক্ষিতা আপনি, বাদশাহের হারেমে আপনার ঠাঁই।'

—'না, আমি তাঁর বাঁদী বা রক্ষিতা কিছুই নই। তবে আশ্রিতা বটে। আমার পিতা সম্রাট হারদুব। শৌর্যে-বীর্যে এর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শয়তান দুর্বৃত্তকে কি করে সমুচিত শিক্ষা দিতে হয় তা তাঁর ভালই জানা আছে।'

বৃদ্ধা বল্‌ল—'এত উতলা হবেন না। তড়িঘড়ি কিছু করতে গেলে সব ভেস্তে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা করে ফন্দি আঁটুন কিভাবে শয়তানকে টিট করা যায়।'

ইরবিজা এবার থেকে আর ঘরের বাইরে তেমন বেরোয় না। অধিকাংশ সময় ঘরে দরজা এঁটে শুয়ে বসে দিন কাটায়। বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি তার একমাত্র সঙ্গিনী। দরজা বন্ধ করে উভয়ে বসে ফন্দি আঁটে কি করে শয়তান উমরকে কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়া যায়।

এভাবে ইরবিজা নিজেকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রায় মাস দুই কাটাল। সে এবার বুঝতে পারে, সে সন্তানসম্ভবা, মা হতে চলেছে। সর্বদা চোখের পানি ফেলে। বৃদ্ধা ক্রীতদাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে এ-অবস্থায় তার করণীয় কি। সারকান বাগদাদে অনুপস্থিত। কোথায় গেছে, কবে আসবে কিছুই সে জানে না।

বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি পরামর্শ দিল, যে করেই হোক শয়তান বাদশাহ উমর-এর খপ্পরের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তাকে চলে যেতে হবে।

ইরবিজা বলে—'চলে তো যাব, কিন্তু কোথায় যাব? কার কাছে যাব? ঠিক আছে। আবার সিসিরিয়াতে আমার আব্বার কাছেই ফিরে যাব। আমার আব্বা আমার ওপর যতই বিরূপ হোন না কেন আমাকে ফেলে অন্ততঃ দেবেন না। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান।'

—'হ্যাঁ, আমিও এরকম কথাই ভাবছি।'

—'কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে, প্রহরীবেষ্টিত এ-প্রাসাদ থেকে পালাব কি করে? আর সঙ্গে কোন পুরুষ না থাকলে লোকে নানারকম সন্দেহ করবে। বদমায়েশরা পিছনে লাগবে।'

—'ব্যাপারটি আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি ঠিক একটি না একটি উপায় বের করতে পারবই।'

—'কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব, আমি তো ভাবতেই পারছি না!'

—'শুনুন, প্রাসাদের দ্বাররক্ষীদের প্রধান একজন নিগ্রো। হতচ্ছাড়াটির পয়সার খুব লোভ। হাতে কিছু পড়লে সে পারে না এমন কাজ নেই। তাকে কোনরকমে পটিয়ে সঙ্গে নিয়ে নিতে পারলে দু' দিকই রক্ষা পাবে। পথে কেউ তার পিছনে লাগতে সাহস পাবে না, ভাববেও না কিছু।'

বৃদ্ধা ক্রীতদসীটি নিগ্রোটির সঙ্গে কথা বলে। সে সারা জীবন দ্বাররক্ষীর কাজ করে যে অর্থোপার্জন করবে তার চেয়ে বেশী অর্থ তাকে দেওয়ার লোভ দেখায়। আর উপরি পাওনাস্বরূপ সিসিরিয়ার সম্রাটের দ্বাররক্ষীর চাকুরিটি তো ফাউ হিসাবে পেয়ে যাবে।

বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটির প্রস্তাবে দ্বাররক্ষীদের প্রধান নিগ্রোটি রাজী হয়ে গেল। একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি ইরবিজার কক্ষে এসে দ্বাররক্ষীদের প্রধান নিগ্রোটির সম্মতির কথা জানাল। আর তাকে এ-ও বল্‌ল—'আগামী জুম্মাবারে বাদশাহ নামাজ সেরে শিকারে বেরোবেন। সেদিনই আমরা প্রাসাদের খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব। আর নিগ্রোটি অদূরে তিনটি খচ্চর নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে।'

নির্দিষ্ট দিনে বাদশাহ উমর ইয়ার দোস্তদের নিয়ে শিকারে বেরিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধা ক্রীতদাসী এবার তৎপর হয়ে ওঠে। ইরবিজার হীরা-জহরৎ প্রভৃতি যা কিছু গহনাপত্র রয়েছে সব কিছু একটি ভাঙাচোরা সাধারণ বাক্সে ভরে নিল। আর ইরবিজাকে অতি সাধারণ এক পোশাকে সাজিয়ে নিল। নবাব-বাদশাহের মেয়ে ভাববার কিছুমাত্র অবকাশ নেই।

রাত্রি একটু গভীর হলে বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি খোদাতাল্লার নাম নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে ইরবিজাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নিগ্রোটি সেখানে তিনটি খচ্চর নিয়ে অপেক্ষা করছে। সে এগিয়ে এল। ইরবিজাও বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটিকে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে যাত্রা শুরু করল।

রাত্রির চতুর্থ প্রহর। নিগ্রোটি ইরবিজা ও বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটিকে নিয়ে নগরের বাইরে পৌঁছে গেল। এবার তারা অনেক নিরাপদ বোধ করল। নির্জন নিরালা অঞ্চল। ধারে-কাছে জনবসতি আছে বলে মনে হ'ল না।

সারারাত্রি খচ্চরের পিঠে বসে বসে ইরবিজা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। নিগ্রোটি ইরবিজা-র শরীরের অবস্থা চিন্তা করে একটি ঝাঁকড়া গাছের তলায় খচ্চর দাঁড় করাল। ঘাসের ওপর চাঁদর বিছিয়ে দিয়ে ইরবিজা ও বৃদ্ধাকে একটু জিরিয়ে নিতে বলল। ভোর হলে আবার খচ্চরের পিঠে উঠবে।

ইরবিজা যেন হাতে স্বর্গ পেল। শরীর খুবই ক্লান্ত। অন্য সময় হলে কোন সমস্যার ব্যাপারই ছিল না। সে যে অন্তঃসত্ত্বা। এ শরীরে

অবসাদ একটু-আধটু ভর করেই থাকে।

গাছের তলায়, চাঁদরের ওপর শরীর এলিয়ে দিতেই ঘুমে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটির চোখও ঢুলুঢুলু। নিগ্রোটি বল্‌ল—'আপনারা নিশ্চিন্তে নিদ যান, আমি জেগে পাহারা দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইরবিজা ও বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এক সময় অবাঞ্ছিত এক আওয়াজে ইরবিজার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে তাকিয়েই চমকে ওঠে। দেখে নিগ্রোটি হিংস্র নেকড়ের মত লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। উলঙ্গ, একেবারেই উলঙ্গ। মুখে শয়তানের হাসি। হাতের তরবারিটি উঁচিয়ে ধরা।

বিশ্রী স্বরে হেসে নিগ্রোটি বল্‌ল—'কি গো, ডর লাগছে নাকি? বাদশাহ তোমার সতীত্ব তো খতমই করে দিয়েছেন। আসলি মাল তো তাঁর ভোগেই লেগে গেছে। এখন ছিবড়ে টিবড়ে যেটুকু পড়ে রয়েছে তা নিয়ে মিছে বড়াই করতে যেয়ো না। এদিক-ওদিক বিলিয়ে দাও, আমরা হতভাগারা লুটেপুটে খাই।'

—'হারামজাদা! ছোটলোক নচ্ছার কোথাকার! সামান্য একটি তরবারি দিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছিস! শুনে রাখ, আমার শরীরে এক ফোঁটা খুন থাকতে তুই আমাকে হাতের মুঠোয় পাবি না। কথা বলতে বলতে সে নিগ্রোটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না। বেগতিক দেখে নিগ্রোটির হাতের তরবারিটি অতর্কিতে তার বুকে গেঁথে দেয়। বিকট আর্তনাদ করে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গলগল করে খুন বেরোতে লাগল। বার কয়েক আছাড়ি-পিছাড়ি করে ইরবিজার খুনে ভেজা শরীরটি এলিয়ে পড়ল। সব শেষ। ইরবিজা অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তের পথে যাত্রা করল।

এদিকে ভোর হতে আর দেরী নেই দেখে বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

বাহান্নতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার রাত্রে অন্দরমহলে বেগমের ঘরে এলেন। বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, শয়তান নিগ্রোটির হাতে সম্রাট হারদুব-এর একমাত্র কন্যা ইরবিজা নিষ্ঠুরভাবে জান দিল।

কাজ হাসিল করে নিগ্রোটি তার ধনরত্নের বাক্সটি নিয়ে পাহাড়ের দিকে চম্পট দিল। বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি অসহায় দৃষ্টি মেলে তার ফেলে যাওয়া পথের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এমন সময় এক অশ্বারোহী বাহিনী সেখানে উপস্থিত হ'ল। তাদের পোশাক আশাক দেখে বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি বুঝতে পারল এরা ইরবিজার আব্বা সম্রাট হারদুব-এর বাহিনী। কাছে আসতেই দেখা গেল তাদের সঙ্গে স্বয়ং সম্রাট হারদুবও রয়েছেন। কন্যার রক্তাপ্লুত নিঃসার দেহটি দেখেই তিনি গুলিবিদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠলেন—'কে? কে এমন নৃশংস কাণ্ডটি করল? কার এমন সাহস যে এমন করে আমার সর্বনাশ করল!'

বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটির মুখে সম্রাট হারদুব শুনল বাগদাদের বাদশাহ উমর-অল-নুমান-এর নিগ্রো দ্বাররক্ষী ইররিজাকে খুন করে পাহাড়ের দিকে চম্পট দিয়েছে। আর বাদশাহ স্বয়ং তার ওপর বলাৎকার করে তার সতীত্ব হরণ করেছে একথাও বৃদ্ধা সবিস্তারে বল্‌ল।

সম্রাট হারদুব আগেই শুনেছিল বাগদাদের বাদশাহের লেড়কা সারকান ইরবিজাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগদাদে নিয়ে যায়। তারপর প্রাসাদে উমর-এর বাদী করে রেখেছে। একথা শোনার পরই তিনি বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কৃতকর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাগদাদের পথে যাচ্ছিলেন। পথে এ-দুর্ঘটনার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।

সম্রাট হারদুব গর্জে উঠলেন—'শয়তান উমর, আমার এত বড় সর্বনাশ তুমি করলে! এর বদলা আমি নেব-ই নেব!'

বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটি এবার চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'হুজুর, শয়তান উমর-এর ওপর বদলা নেবার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে খুবসুরৎ লেড়কিকে টোপ ফেলা। গোটা পাঁচেক খুবসুরৎ যুবতী লেড়কি সংগ্রহ করুন। তারপর তাদের মুসলমানী

আদব কায়দা শিখিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। খানদানি মুসলমানের ঘরের লেড়কির মত তাদের গড়ে তুলতে হবে। উমর-এর হারেমে তিনশ' ষাটটি বাঁদী রয়েছে। সারা বছর ধরে শয়তানটি রোজ একটি একটি লেড়কিকে জানোয়ারের মত ভোগ করে। তাদের যৌবনের জোয়ার লাগা দেহটিকে সারা রাত্রি ধরে ছিঁড়েফেঁড়ে খায়। ইরবিজার সঙ্গে একশ'টি খ্রীস্টান কুমারী গিয়েছিল। তারা সবাই তার হারেমে আশ্রয় পেয়েছে। তাদেরও শয়তান উমর ভোগ করে চলেছে। হুজুর, ওই যে, বল্লাম জনা পাঁচেক কুমারী লেড়কিকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে আমার হাতে তুলে দিন। তারপর দেখবেন, কি করে শয়তানটিকে ঘায়েল করি। তার কাম-লালসা আমি চিরদিনের মত ঘুচিয়ে ছাড়ব।'

বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটির কথা শুনে সম্রাট হারদুব-এর মনে আশার সঞ্চার হ'ল। বল্লেন—'শোন, আমি দু'-একদিনের মধ্যেই আমার রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। তারপর খুবসুরৎ পাঁচটি লেড়কি বাছাই করে তোমার হাতে তুলে দেব। তুমি পছন্দ মাফিক লোক নিয়োগ করে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে তোমার মনের মত করে তৈরি করে নেবে।'

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ দেখলেন, ভোর হয়ে এল। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিপান্নতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার রাত্রির দ্বিতীয় যামে অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, সম্রাট হারদুব তার দেশে ফিরে বৃদ্ধা ক্রীতদাসীটির ফরমাস মত পাঁচটি খুবসুরৎ লেড়কি জোগাড় করে মুসলমানী কায়দা কানুন শিখিয়ে তাদের মনের মত করে তৈরি করে নেয়ার পর তার হাতে তুলে দিলেন।

এদিকে বাদশাহ উমর অল-নুমান শিকার সেরে প্রাসাদে ফিরে এলেন। অন্দর মহলে গিয়ে দেখেন, ইরবিজা নেই। কামরা ফাঁকা। চিড়িয়া ভাগ গিয়া।

বাদশাহ উমর শিকার হাত ছাড়া হওয়ায় হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জে উঠলেন। দ্বাররক্ষীদের প্রধানের তলব হ'ল। শুনলেন, সে-ও ভেগেছে। দ্বাররক্ষীরা জান হাতে নিয়ে কুরবাণির ফাঁসির মত ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

বাদশাহের লেড়কা সারকান তখন বাগদাদের বাইরে ছিল। প্রসাদে ফিরে এসে শোনে, ইরবিজা বৃদ্ধা ক্রীতদাসী ও রক্ষীদের প্রধানের সাহায্যে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়েছে। আর এ-ও শোনে, তার আব্বা তার ওপর বলাৎকার করার জন্যই সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সব কিছু শুনে তার মাথায় খুন চেপে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। নিজের ওপরই সে বেশী ধিক্কার দেয়। তার ওপর নির্ভর করেই সে নিজের মুলুক ছেড়ে বাগদাদে এসেছিল। তার আব্বাকে তো সে ভালই চেনে। শয়তানটির হাতেই ফুলের মত তরতাজা লেড়কিটিকে ছেড়ে দিয়ে সে ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছিল কোন্ আক্কেলে! আব্বার ওপর তার মন অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে উঠল। প্রাসাদ তার কাছে এখন দোজকের তুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর নয়, এখানে আর একদিনও থাকতে সে নারাজ।

সারকান তার আব্বাকে বল্‌ল—'আমি এখানে আর থাকতে চাই না। আপনার বাদশাহীর যেকোন একটি সুবার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিন।'

—'দামাস্কাসে যাবে? আমার সুবাগুলির মধ্যে এর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। মন চাইলে সেখানকার সুবাদার হয়ে যেতে পার।'

—'রাজী। আমি দামাস্কাসেই যাব। আপনি আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।'

বাদশাহ উজির দানদানকে ডেকে বল্লেন—'সারকানকে দামস্কাসের সুবেদার করে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

সারকান দামাস্কাসের সুবেদারী নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে গেল।

বাদশাহ উমর এবার তার লেড়কি নুজাৎ আর লেড়কা দু-অল মাকান-এর খোঁজ নিলেন। তারা ভালই আছে। মক্তবে যাচ্ছে। নিয়মিত পড়শুনা করছে।

নুজাৎ-এর ওমর তখন চৌদ্দ আর দু-অল-মাকান-এর তেরো সাল। তাদের বিদ্যাবুদ্ধির কথা বাগদাদ নগরীর মানুষের মুখে মুখে।

কিশোর দু-অল-মাকান দেখল, বাগদাদ নগরের ভেতর দিয়ে একদল হজযাত্রী যাচ্ছে। ইরাক থেকে আসছে তারা। মক্কায় হজ করতে যাবে। তারপর মদিনা হয়ে পয়গম্বর মহম্মদের সমাধি ক্ষেত্রে গিয়ে নামাজ পড়বে। কিশোর দু-অল-মাকান তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না ধরে। তার আব্বা উমর অনেক করে বোঝান, সেখানে যারা তীর্থ করতে যায় প্রায় সবাই জীবনের শেষ সিঁড়িতে পা দিয়েছে। বালক, কিশোর বা যুবকদের সেখানে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না।'

দু-অল-মাকান নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে বাদশাহ তাঁকে মত দিতে বাধ্য হন। মাকান এবার তার বড় বহিন নুজাৎকে নিজের ইচ্ছার কথা জানায়। সে-ও মক্কায় যাবার জন্য গোপনে তৈরি হয়। পুরুষের পোশাক পরে সে যাবে মনস্থ করে। মাকান চুপি চুপি দুটো উট ভাড়া করে। বাদশাহ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকানকে মক্কায় যেতে দিতে রাজী হয়েছেন বটে। কিন্তু কিশোরী নুজাৎকে কিছুতেই যেতে দিতে চাইবেন না। তাই তারা রাত্রির অন্ধকারে, চুপি চুপি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে উটের পিঠে চেপে বসল।

বহু পথ ঘুরে, বহু মুলুক দেখতে দেখতে দুই কিশোর-কিশোরী একদিন মক্কায় উপস্থিত হ'ল। পবিত্র তীর্থক্ষেত্র আরাফৎ
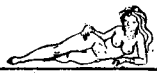
পর্বতশৃঙ্গ, মদিনার পবিত্র সমাধি ক্ষেত্রে প্রভৃতি একের পর এক তারা দর্শন করল।

মাকান সারাদিন সরাইখানায় একা কাটাল। ভাবল বিকেলের আগেই তার বহিন খানা নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু সন্ধ্যা হ'ল
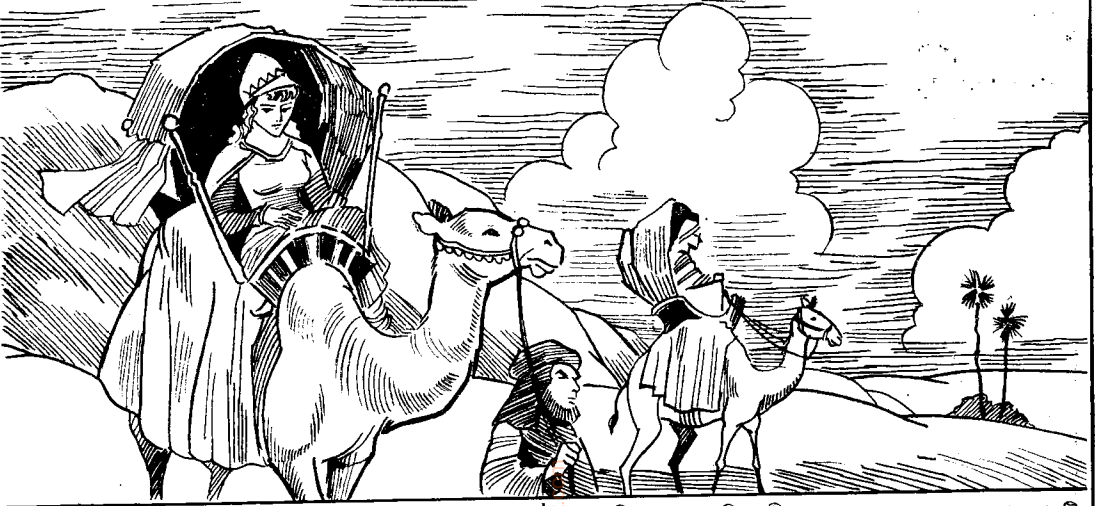
নুজাৎ এবং মাকান বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে এবার ফেরার পথে খ্রীস্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ভগবান যীশুর জন্মস্থান জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করল। দুর্গম পথ। কঠোর পথশ্রম সহ্য করতে না পেরে তারা উভয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ল। আসলে জন্মাবধি তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছে। হঠাৎ করে এমন কঠিন কঠোর পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? মাকানই বেশী কাবু হয়ে পড়ল। কোনরকমে তারা জেরুজালেমে পৌঁছল। মাকান-এর গা তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

নুজাৎ অসুস্থ ভাইয়াকে নিয়ে এক সরাইখানায় উঠল। হাতে দিনার যা ছিল তা-ও ফুরিয়ে এল। হেকিম ডেকে দাওয়াই দিল। কিন্তু বিমারি আরাম হ'ল না। নুজাৎ পড়ল মহাসমস্যায়। আল্লাহর কি মর্জি কে জানে। আরও ক'দিন হেকিমের দাওয়াই খেয়ে মাকান ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু এখন তারা একেবারে নিঃস্ব-রিক্ত। একটি কানাকড়িও হাতে নেই যা দিয়ে দুটো রুটি কিনে তারা পেটের জ্বালা নেভাতে পারে। বিদেশ-বিভুঁই, কে-ই বা তাদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝবে?

একটি দিন উপোষ করে কাটিয়ে পরদিন সকালে নুজাৎ ভাইয়াকে সরাইখানায় রেখে রোজগারের ধান্দায় পথে নামল। ভেবেছিল কোন আমীর টামীরের বাড়ি কাজ যোগাড় করে রোজগার পাতির চেষ্টা করবে। কিন্তু কোথায় কাজ? কে দেবে তাকে কাজ? একেবারেই অজানা-অচেনা জায়গা, কার কাছে গিয়ে হাত পাতবে?

নুজাৎ ফিরল না। রাত্রি গভীর হয়ে গেল তবু তার ফেরার নামটি নেই। একে খিদের জ্বালা তার ওপর বহিনের চিন্তা মাথায় নিয়ে মাকান সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় নিদারুণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটাল। দু' দুটো দিন কেটে গেল। তবু নুজাৎ-এর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

সরাইখানার এক যুবক কর্মীর সহায়তায় মাকান বাজারে গেল। যদি সেখানে কারো দয়া হয়, সামান্য কিছু খেতে দিয়ে তাঁর জান বাঁচায়। সরাই-কর্মীটি তাকে নিয়ে বাজারে পথের ধারে এক পোড়ো বাড়ির রোয়াকে বসিয়ে দিয়ে এল। একে বিমারিতে কাহিল তার ওপর দু' দিনের ওপর মুখে কুটোটিও কাটে নি। কথা বলার মত সামান্য ক্ষমতাও সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। তার শোচনীয় অবস্থা দেখে বাজারেরই কয়েকটি লেড়কার মায়া হ'ল। তারা দোকানদারদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে মাকানকে কিছু মিঠাই কিনে এনে দিল। আর একটি মাটির ঘটে করে জল দিল।

বাজারের লেড়কারা যে চাঁদা সংগ্রহ করেছিল তা থেকে ত্রিশ দিরহাম রয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবল তা দিয়ে একটি উট ভাড়া করে মাকানকে দামাসকাস-এর হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু দামাস্কাস বহু দূরের পথ। শেষ পর্যন্ত কেউ-ই যেতে উৎসাহী হ'ল না। বাদশাহ উমর-এর বেটা, সুবেদার সারকান-এর ভাই মাকান অনাহারে-অচিকিৎসায় পোড়ো বাড়িটির বারান্দায় পড়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চলেছে।

এবার রোগজীর্ণ মাকানকে দেখে এক প্রবীণের দিল কেঁদে

উঠল। সে তার মহল্লার কয়েক জনকে নিয়ে চাঁদা তুলে তাকে দামাস্কাসের হাসপাতালে নিয়ে রওনা হ'ল। কিছুদূর যাবার পর মাকান-এর অবস্থা আরও খারাপের দিকে। উটের পিঠে মাঁচার ওপর শুয়ে ধুকছে। সংজ্ঞাহীন। মনে হ'ল আর বেশীক্ষণ টিকবে না। ভাবল, এ মড়াটিকে আর শুধু শুধু এতখানি পথ টেনে নিয়ে গিয়ে কি লাভ! অবশ্য জান রক্ষার আশা থাকলে না হয় দেখা যেত। এরকম ভেবে তারা পথের ধারের এক হামামের বারান্দায় নামিয়ে রেখে তারা ঘরে ফিরে এল।

এক বুড়ো হামামেই থাকে। এখানে যারা নাইতে আসে তাদের জল জোগান দেয়। সক্কাল বেলা মৃতপ্রায় মাকানকে বারান্দায় পড়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। আপন মনে বলে ওঠে—'কী তাজ্জব ব্যাপার দেখ দেখি! মড়াটিকে এখানে কে ফেলে রেখে গেল!' কিন্তু কাছে গিয়ে বুঝল, মরেনি। এখনও গলার কাছে আত্মাটি ধুকপুক করছে। এখনও জিন্দা আছে। চেহারা ছবি দেখে বুঝল কোন খানদানি পরিবারের লেড়কা। তবে এখানে এরকম অরক্ষিত অবস্থায়ই বা ফেলে যাবে কেন? বুড়ো মৃতপ্রায় মাকানকে নিজের কামরায় নিয়ে গেল। সে আর তার বিবি তার সেবায় লেগে গেল। তার বিবি বল্ল—'সবই আল্লাহর মর্জি।' সে তাড়াতাড়ি চেলা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলে পানি গরম করে নিয়ে এল। ন্যাকড়া ভিজিয়ে গা মুছিয়ে দিল। বুড়োটি দৌড়ে গিয়ে হেকিমকে ধরে নিয়ে এল। হেকিম চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসে থেকে দাওয়াই দিল। শেষ চেষ্টা যাকে বলে। যদি আল্লাহ তাকে কাছে টানে তবে কার সাধ্য দুনিয়ায় ধরে রাখে। কয়েক দিনের মধ্যেই মাকান-এর বিমারি আরাম হয়ে গেল। কেবল উঠে বসাই নয়, দু'-চার কদম হাঁটচলাও এখন সে করতে পারে।

এমন সময় রাত পোহাল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বলা বন্ধ করলেন।

চুয়ান্নতম রজনী

অন্যান্য দিনের মত প্রায় মাঝ-রাতে বাদ্‌শাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগমের কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, হামামের সে বুড়ো-বুড়ির সেবা যত্ন ও ঐকান্তিক আগ্রহে-উৎসাহে মাকান ক্রমে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে পেল।

বুড়োর সামর্থ্য তেমন না থাকলেও মাকান-এর জন্য খুবই ভাবিত। তবে হ্যাঁ, এর জন্য তাকে কারো কাছে হাত পাততে হয় নি। সে হামামে জল জোগান দিয়ে রোজ পাঁচ দিরহাম করে কামায়। চার দিরহাম করে বুড়ো-বুড়ির খাবার দাবারের জন্য ব্যয় করে। আর রোজ এক দিরহাম করে বিপদ আপদের জন্য জমায়। তা দিয়েই মাকান-এর ইলাজ করিয়ে সুস্থ করে তুল্‌ল।

মাকান জেরুজালেমে বুড়ো-বুড়ির কাছেই আরও কিছুদিন রইল। সে এবার দামাস্কাসের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা ভাবল।

বুড়ো তাকে একা ছাড়তে রাজি নয়। একে বয়স কম, তার ওপর তবিয়ৎ এখনও ভালভাবে সারে নি। বিমারি আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। পথে বিপদে পড়লে দেখভাল কে করবে? মাকান কিন্তু দামাস্কাসে যাওয়ার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মাকানকে যখন কিছুতেই নিরস্ত করতে পারল না তখন বুড়ো বুড়ি বাধ্য হয়ে মনস্থ করল মাকান যদি যায়-ই তবে তারাও তার সঙ্গে যাবে। তারা বুড়ো-বুড়ি দুটি প্রাণী। দুটোমাত্র পেট। গুঁড়া-বাচ্চা নেই বলতে কেউ-ই নেই। যেখানে যাবে সেখানেই দুটো রুটির জোগাড় ঠিকই হয়ে যাবে।

বুড়ো তাদের খুব দরকারী কিছু বাসনপত্র রেখে বাকি সব নগদ পঞ্চাশ দিরহামে বেচে দিল।

সব ব্যবস্থা পাকা। এখন কেবল বেরিয়ে পড়লেই হয়।

এমন সময় প্রাসাদের বাইরে, বাগিচায় গাছে গাছে পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পঞ্চান্নতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সে বুড়ো-বুড়ি দু-অল-মকানকে নিয়ে দামাস্কাসে যাবার জন্য তৈরি হ'ল। বহুদূরের পথ। পথে খানাপিনা সারার জন্য কিছু শুকনো খানা পাকিয়ে এক ডিব্বায় ভরে নিল। মাকান-এর জন্য একটি খচ্চর ভাড়া করল।

এক সকালে মাকানকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে বুড়ো আর বুড়ি তার পিছন পিছন পয়দল হেঁটে রওনা হ'ল।

কয়েকদিন চলার পর বুড়ো তার বিবি আর মাকানকে নিয়ে দামাস্কাস নগরে পৌঁছে গেল। পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত। সবার আগে এক মুসাফিরখানায় উঠল। বুড়ো একটু জিরিয়ে নিয়ে খানাপিনা খরিদ করতে বাজারের খোঁজে বেরলো। কিছু সময় বাদে রুটি আর সব্জি নিয়ে ফিরল। সবাই এক সঙ্গে বসে খানাপিনা সারল।

সে রাত্রেই বুড়ির কাঁপিয়ে জ্বর এল। বেধুম জ্বর। একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ল। কিন্তু বুড়ো বা মাকান কেউ কল্পনাও করতে পারে নি বুড়িকে কালব্যাধিতে ধরেছে। পাঁচদিন বাদেই সে দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে খোদাতাল্লার দরবারে চলে গেল। বুড়িকে হারিয়ে মাকান গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। সে তো ভালই জানে, বুড়ির অকৃত্রিম সেবাযত্নের ফলেই তার জান রক্ষা পেয়েছিল।

দু'-চারদিন বুড়ো ও মাকান কামরা থেকে আর বেরোতে পারল না। বুড়ির আকস্মিক বিয়োগ-ব্যথা সামলে উঠতে তাদের খুবই

বেগ পেতে হ'ল।

এক সকালে মাকানকে নিয়ে বুড়ো পথে হাঁটাহাঁটি করছে। এমন সময় দেখে কোতোয়ালীর সামনে উট, ঘোড়া, খচ্চর আর গাধার পিঠে প্রচুর সমানপত্র চাপিয়ে ক'জন লোক যাত্রার উদ্যোগ নিচ্ছে। মাকান তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল, বাগদাদের বাদশা উমর অল-নুমানকে স্থানীয় শাসক বাৎসরিক ভেট পাঠাচ্ছেন। উমর অল-নুমান-এর নাম কানে যেতেই মাকান-এর চোখ দুটোতে পানি ভিড় করল। বুড়ো ভাবল, নিজের মুলুকের নাম শুনেই মন বিমিয়ে উঠেছে। আসলে বুড়ো তো জানে না, উমর তার কে হন। জন্মভূমির নামে চোখে পানি আসাই স্বাভাবিক। বুড়ো তাকে নানা কথার মাধ্যমে সান্ত্বনা দিল। কিন্তু কোন কথাতেই তার অস্থির মনকে শান্ত করতে পারল না।

বুড়ো শেষ পর্যন্ত মাকানকে নিয়ে বাগদাদে যাওয়া মনস্থ করল। এখন তার কাছে তো জেরুজালেম, দামাস্কাস আর বাগদাদ—সবই সমান। পিছুটান বলতে বুড়িটি ছিল, তা-ও খোদাতাল্লার দরবারে পাড়ি জমিয়েছে। এখন সে নীল আসমানের পাখির মতই স্বাধীন-মুক্ত।

বুড়ো দামাস্কাস থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে এবার মাকানকে নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশে পা-বাড়াল।'

বেগম শাহরাজাদ এ-পর্যন্ত বলার পর তাঁর কিস্‌সার মোড় ঘোরাতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমরা বরং এখন মাকান-এর রূপসী-কিশোরী বহিন নুজাৎ-এর খোঁজ করে দেখি, সে কোথায়, কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

নুজাৎ তার অসুস্থ ভাইয়া মাকানকে সরাইখানার রোয়াকে রেখে রোটি-রোজগারের ধান্দায় পথে নামল। সে কাম কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে নগরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথায় কাজ? কে-ই বা দেবে তাকে কাজ? অর্থোপার্জনের কোন ধান্দা তো সে করতে পারলই না। উপরন্তু এক বাদাবী সর্দারের খপ্পরে পড়ে গেল। তার সঙ্গে জনা পাঁচেক সাকরেদ রয়েছে। বাদাবীরা ওই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ডাকাত, মরু অঞ্চলের বাদাবী নামক স্থানে তাদের বসতি।

বাদাবী সর্দার গুটিগুটি নুজাৎ-এর কাছে গেল। তাকে বল্‌ল—'কি বেটি, তুমি কি কারো ঘরে কাজ করছ, নাকি কাম কাজ পেলে করবে? আমার ছ'টি লেড়কি ছিল। পাঁচ-পাঁচটি এরই মধ্যে খোদাতাল্লার দরবারে চলে গেছে। ঘরে এক গুঁড়া লেড়কি আছে। তাকে দেখ ভাল করার মত কেউ-ই নেই। তুমি যদি আমার ঘরে যাও। তাকে দেখ ভালের দায়িত্ব নাও তবে আমার সুবিধা হয়।'

নুজাৎ আমতা আমতা করে বল্‌ল—'কিন্তু হুজুর, আমি পরদেশী। আমার এক ভাইয়া সরাইখানায় রয়েছে। বিমারি। আপনার ঘরে নোকরি আমি করতে পারি, আন্ধার হওয়ার আগেই কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! আমি রোজ আন্ধার হওয়ার আগেই ঘরে ফিরব। তুমি তখন সরাইখানায় তোমার ভাইয়ার কাছে চলে যেয়ো।'

নুজাৎ যেন আসমানের চান্দ হাতে পেল। খোদাতাল্লাকে সুকরিয়া জানাল। খোদাতাল্লার দোয়া না হলে লোকটি উপযাচক হয়ে তাকে কাজ দিতে আসবে কেন?

বাদাবী দস্যুটি নুজাৎ'কে ধাপ্পা দিয়ে তার মনের বিশ্বাস সঞ্চার করতে সক্ষম হ'ল। তার ঘরে নোকরি, ছ'-ছ'টি লেড়কি, পাঁচটি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, একটি নাবালিকা, ঘরে একা থাকে সবই বানানো কিস্‌সা। তার ধাপ্পা ধরার মত বয়স, বুদ্ধি বা বাস্তব অভিজ্ঞতা সব কিছুরই নিতান্ত অভাব তার।

বাদাবী দস্যু এবার নুজাৎ'কে উটের পিঠে চাপিয়ে পালাতে লাগল। কিছুদূর যেতে না যেতেই নুজাৎ তার দুরভিসন্ধির কথা অনুমান করে কান্না জুড়ে দেয়। দস্যুটি তার মুখ চেপে ধরে। সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

বাদাবী দস্যুটি উপায়ান্তর না দেখে একটি সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলা তার গলায় চেপে ধরে। গর্জে ওঠে—'হতচ্ছাড়ি, আর একবার চেঁচাবি তো এ-চাক্কু তোর গলায় গেঁথে দেব, বলে রাখছি!'

নুজাৎ বুঝল, নির্জন-নিরালা মরু অঞ্চলে চিৎকার করে গলা ফাঁটালেও কেউ তার ইজ্জৎ রক্ষা করতে ছুটে আসা তো দূরের কথা কেউ সাড়াও দেবে না। অন ন্যোপায় হয়ে সে চুপ করল। কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

বাদাবী দস্যুটি এবার রাগে গস্ গস্ করতে করতে বল্‌ল—'শোন, যখন বুঝবি আমি খুবই গোস্‌সা করেছি তখন কোন ব্যাপারেই 'না' বলবি না, নইলে আমার শিরে হয়ত খুনই চেপে যাবে। ব্যস, তখন তোর গলায় চাকু বসিয়ে দিতেও দ্বিধা করব না। এবার সিধা কথা শোন, আমি তো ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, সত্যি বটে। এ-আমার ব্যবসা। ধোঁকা দিয়ে কাজ হাসিল করতেই হয়। আর এক বাত শুনে রাখ, আমি নিজে তোকে ভোগ করব না। ইজ্জৎ নেব না। অন্য একজনের ভোগের জন্যই তোকে নিয়ে চলেছি। তবে আমার লাভ কি, ভাবছিস তো? প্রচুর দিনার ইনাম পাব। এ-ই আমার লাভ।'

নুজাৎ তার কথা শুনে কান্নার বেগ আরও বাড়িয়ে দিল।'

বাদাবী দস্যু এবার জোরে এক ধমক দিয়ে বল্‌ল—'চুপ কর্ বলছি হারামজাদী! বলছি, যার কাছে তুই থাকবি তার চেয়ে সুখে রাখার মত হিম্মৎ তামাম বাগদাদ নগরে দ্বিতীয় কাউকে মিলবে না। বাদশাহ উমর অল-নুমান-এর দালালের হাতেই তোকে তুলে দেব। ব্যস, তারপরই সোজা গিয়ে উঠবি একেবারে বাদশাহের হারেমে।'

বাদশাহ উমর-অল-নুমান-এর কথা কানে যেতেই নুজাৎ-এর মুখের ভাবান্তর ঘটল। সে বুঝতে পারল না, দস্যুটি এ-ব্যাপারেও তাকে আবার ধাপ্পা দিচ্ছে কি না।

বার বার ধমক খেয়ে চরম ক্রোধে ছুরির ফলা নাচানো দেখে নুজাৎ আর কথা বাড়াল না, কান্নাকাটিও তেমন করল না। খোদাতাল্লার নাম নিয়ে দাঁতে দাঁত কামড়ে নসীব সম্বল করে এবার সে চুপ করে রইল।

বাদাবী ডাকাত সর্দার বলে চল্‌ল—'শোন, তোর দেহে নয়া যৌবনের জোয়ার। সুরৎও মন মজানোর পক্ষে যথেষ্ট। এমনই এক মনমৌজী বাগদাদের বাদশাহ উমর তল্লাস করছে। আমি কথা দিচ্ছি, বাদশাহের হারেমে তোর যাতে জায়গা হয় আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব। আর যদি কাঁদিস, মেলা খিটির খিটির করিস তবে এক বজ্জাত সওদাগর দেখে বেচে দেব—বুঝবি তখন মজা কাকে বলে।'

নুজাৎ লোকটিকে এরই মধ্যে চিনে নিয়েছে। হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। তাই মুখে কলুপ এঁটে নিজের নসীবের কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাস পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছাপ্পান্নতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ আবার তার কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বাদাবী সর্দার নুজাৎকে নিয়ে দামাস্কাসে পৌঁছল। এক মুসাফিরখানায় নিয়ে তুল্‌ল।

পরদিন নুজাৎকে বাঁদী হাটে নিয়ে যাওয়া হ'ল। দালালরা এগিয়ে এসে দরদস্তুর করতে লাগল।

বাদাবী ডাকাত সর্দার দালালদের উদ্দেশে বল্‌ল—'শোন, লেড়কির সুরৎ তো তোমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। আমি আর এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। তোমরা দেখেশুনে দর দস্তুর কর। যদি আমার পোষায় দিয়ে দেব, তবে একটি শর্ত আছে। এ-লেড়কির এক ছোট ভাইয়া আছে। জেরুজালেমের সরাইখানায় আছে। একে যে কিনবে তাকে কিন্তু ওই লেড়কার দায় দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। অতএব ভেবেচিন্তে দামদস্তুর কর।

এক সওদাগর নুজাৎ-এর কাছে এল। হ্যাঁ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করল। হ্যাঁ, জুঁতসই লেড়কিই বটে।

সওদাগর জিজ্ঞাসা করল—'এ লেড়কির ওমর কত?'

—'খুবই কম। বেশ ডাগর ডাগরই বটে। বয়স খুব বেশী হলেও পনের। কুমারী। দেখছ না এর উন্নত বক্ষ কেমন কামিজ ফেটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে? দেহ-মনে যৌবনের জোয়ার। এক নজর দেখলেই মনে কামোন্মদনা জাগিয়ে তোলে। তামাম বাগদাদ নগর ঢুঁড়ে এলেও এমন যৌবনের ঢেউ কোন কুমারীর দেহেই দেখতে পাবে না।'

নুজাৎ পিছন ফিরে সমানে চোখের পানি ফেলে চলেছে। ভাল-মন্দ কিছুই বল্‌ল না। বলবেই বা কি? নসীব সম্বল করে চোখের

পানি ফেলা ছাড়া তার কি-ই বা করণীয় আছে? নুজাৎ নাকাবের ফাঁক দিয়ে আঁড়চোখে তাকিয়ে দেখল, দালালটি বুড়ো। একেবারেই বুড়ো। তবু সে আল্লাতাল্লার হাতে নিজের নসীবের ভার সঁপে দিল। তার এখন সবচেয়ে বড় কর্তব্য ডাকাত সর্দারটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। তাতে যদি তাকে এ সওদাগরের দাসী হয়েও দিন গুজরান করতে হয় তাও শ্রেয়ঃ। তারপর কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় পরে ভাবা যাবে।'

সওদাগরটি তাকে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কে গো? কি পরিচয় তোমার? তোমার পরিচয় বল তো শুনি।'

—'আমার পরিচয়? কেবলমাত্র এতটুকু শুনে রাখুন, আমি আপনার শত্রু নই। আমার দ্বারা আপনার কোনই অহিত সাধিত হবে না। বরাতে যা আছে তা হবেই। আমার নসীবে যা আছে শত চেষ্টা করেও তা থেকে অব্যাহতি পাব না। আমাকে নিঃশঙ্কচিত্তে তা মেনে নিতে হবেই। আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনি আমার নসীবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, ভুল করবেন। আসলে আমি কিন্তু মনে করি, আপনি নিছকই উপলক্ষ।'

সওদাগর নুজাৎ-এর কথা শুনে নিঃসন্দেহ হ'ল, এ কোন না কোন আমীর ওমরাহের লেড়কি। একে যদি কোন রকমে একবার বাদশাহ উমর অল-নুমান-এর সামনে নিয়ে ফেলা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেবেন। বহুৎ ইনাম নিয়ে ঘরে ফেরা যাবে। এবার সর্দারকে লক্ষ্য করে বল্‌ল—ভাইজান, তোমার লেড়কিটি আমার বহুৎ মনপছন্দ্। এবার বল তো এর জন্য কি দাম প্রত্যাশা করছ?'

ডাকাত সর্দার কৃত্রিম গোস্‌সা প্রকাশ করে ব'লে উঠল—'তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই। মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তুমি অ আ ক খ-ও জান না। একে যদি ভাল বল তবে বদ লেড়কি কাকে তুমি বলবে, জানি না। আমি তো জানি এর প্রতিটি গাঁটে গাঁটে বদবুদ্ধি। যদি একে কিনে ঘরে নিয়ে যাও তবে দু' দিনে তোমার ভিঁটে-তে ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। যাও, ভাইজান পাতলা হও। তোমার সঙ্গে আমি কারবার করব না।'

সওদাগর ডাকাত সর্দারের কথায় ভড়কে গেল। কারো সামনে পাত্রের প্রশংসা করলে যে এমন হিতে বিপরীত হতে পারে তা তার আগে জানা ছিল না। এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল— 'আরে ভাইজান, গোস্‌সা করছ কেন? এমন চটাচটি করলে কি চলে? ঠিক আছে, লেড়কিটি খুবই বুড়া, খুবই দজ্জাল। আমি দজ্জাল লেড়কিই কিনতে চাইছি। এবার বল তো। এর জন্য তুমি কত দাম চাইছ?'

—'আমার মুখে না-ই বা শুনলে। সবই তো দেখলে? শুনলে আর বুঝলে, এবার তুমিই বল না, কি দাম দিতে চাইছ?'

—'এ কি রকম কথা হ'ল ভাইজান? তুমি বেচতে এসেছ, তুমিই তো দাম চাইবে। তাতে আমার যদি পোষায় ভাল নইলে অন্যত্র ধান্দা করব।'

ডাকাত সর্দার সত্যিই সমস্যায় পড়ল। লেড়কি কেনা-বেচা সে বহুৎ করেছে সত্য। এতকাল যাদের নিয়ে কারবার করেছে তাদের দাম হয়েছে কেবলমাত্র সুরতের দিক বিবেচনা করে। আজকের লেড়কিটি যে তাদের চেয়ে আশমান জমিন ফারাক, সুরতের সঙ্গে বহু গুণেরও একত্র সমাবেশ ঘটেছে। ফলে এর বিনিময়ে কি দাম চাওয়া যেতে পারে সে ধারণাও করতে পারছে না। আবার বাঁদী-রক্ষিতার মধ্যে গুণের বিকাশকে গুণ মনে না করে বাদশাহের কাছে দোষ বিবেচিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। অতএব কি দাম চাইবে সে কূল-কিনারা করতে পারছে না।

সওদাগর রেগেমেগে বল্‌ল—'ঠিক আছে ভাইজান। এক কাজ কর। দু' শ' দিনার নিয়ে লেড়কিটিকে আমার হাতে তুলে দাও।'

—'ভাইজান, আমার এ সওদা খরিদ করা তোমার কর্ম নয়। ঝুটমুট ঝামেলা না করে কেটে পড়। দু' শ' দিনারই যদি শেষমেষ দাম ওঠে তবে আর বেচব না। ঘরে নিয়ে গিয়ে ভুট্টার ক্ষেতে লাগিয়ে দেব, চাষ করবে।'

—'তুমি মিছেই চটাচটি করছ ভাইজান, বাদশাহের হারেমে বাঁদী হয়ে থাকবে। সেখানে তোমার ওইসব গুণ কি কাজে লাগবে, বল তো?'

—'গুণ না-ই বা কাজে লাগল। কিন্তু সুরৎ? এমন সুরৎ বাগদাদ নগরে ঢুঁড়ে এলেও মিলবে না। তার দামই বা দু' শ' দিনার কোন সাহসে তুমি হাঁকছ? ঠিক আছে ভাইজান, পাতলা হও। তোমার মুরোদ আমার বোঝা হয়ে গেছে।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে গেল। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বাদাবী ডাকাত সর্দার আর সওদাগরের মধ্যে দরকষাকষি চলতে লাগল।

সওদাগর নুজাৎ-এর গুণাবলীর চেয়ে রূপের কদরই বেশী মনে করে। সে এবার বল্‌ল—ঠিক আছে, বোরখার নাকাবটি আর একবার সরাতে বল, আমি এর মুখটি আর একবার দেখতে চাই।'

ডাকাত সর্দার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্‌ল—'আমি আর দেখাতে টেখাতে পারব না। তুমি যাও দেখে নাও গে।' সে আর এগোল না। দু' পা এগিয়ে গিয়ে উটের দানাপানি দেওয়ার কাজে মন দিল।

সওদাগর এবার নুজাৎ-এর কাছে যেতেই সে নিজেই নাকাবটি তুলে ধরল। কাঁদো কাঁদো স্বরে সওদাগরকে বল্‌ল—'হুজুর মেহেরবান, আমাকে এ-হিংস্র জানোয়ারটির হাত থেকে মুক্তি দিন,

আমি এর বেয়াদপি আর একটি দিনও বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি যদি আমাকে খরিদ না করেন তবে আমি নিজে হাতেই জান খতম করে ফেলব।'

সওদাগর নীরবে নুজাৎ-এর কাছ থেকে ফিরে এসে ডাকাত সর্দারকে এক লাফে পঞ্চাশ হাজার দিনার দিতে চাইল।

ডাকাত সর্দার ভাবল এ তো বেশ মজার ব্যাপার! দু' শ' দিনার থেকে এক লাফে একেবারে পঞ্চাশ হাজার! সে এবার বেঁকে বসল। বল্‌ল—'পঞ্চাশ হাজার দিনারেই যদি দেব তবে তো অনেক আগে কেনা-বেচা ছেড়ে ঘরে চলে যেতাম হে।'

—'ঠিক আছে, আরও দশ হাজার বাড়িয়ে দিচ্ছি, পুরোপুরি ষাট হাজারই পাবে।'

—'না ভাইজান, তোমার পক্ষে দেখছি আমার সওদা খরিদ করা হবে না। এর পিছনে আমার খরচ হবে নব্বই হাজার। আর তুমি পঞ্চাশ-ষাটে চক্কর খাচ্ছ! যাও, কিছু মনে কোরো না, পথ দেখ।'

—'ঠিক আছে, আরও দশ বাড়ালাম।'

—'ভাইজান, কেন মিছে নিজে বকছ, আমাকেও বকিয়ে মারছ? বল্‌লাম তো, তুমি আমার সওদা কিনতে পারবে না।'

এবার সওদাগর বেশ একটু রাগত স্বরেই বল্‌ল—'ঠিক আছে। পুরো এক লাখই দেব। যদি রাজী থাক, দিনার বুঝে নিয়ে লেড়কিটিকে আমার হাতে তুলে দাও।'

ডাকাত সর্দার আর কচলাকচলি করতে ভরসা পেল না। যদি সওদাগর ঘাড় বাঁকিয়ে কেটে পড়ে তখন সমস্যায় পড়তে হবে। সে বল্‌ল—'ভাইজান, তুমি তাড়াতাড়ি দিনারগুলো মিটিয়ে দিয়ে তোমার সওদা বুঝে নাও। আমাকে আবার জেরুজালেমে গিয়ে ওর ভাইয়ার খোঁজ নিতে হবে।'

সওদাগরের কাছ থেকে এক লাখ দিনার বুঝে পেয়ে সে জেরুজালেমে হাজির হ'ল। সে-সরাইখানায় গিয়ে নুজাৎ-এর ভাইয়া মাকান-এর তল্লাস করল। পাত্তা পেল না। সরাইখানার মালিক বল্‌ল—'সে ক'দিন আগে সেখান থেকে ভেগেছে। তামাম শহর চষে বেড়াল। কোথাও তার পাত্তা মিল্‌ল না। তাকে চোখেও দেখেনি কোনদিন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বল্‌লেও তো তাকে চিনতে পারবে না। তবু সে হাল ছাড়ল না।

ইতিমধ্যে পূর্ব-আকাশে রক্তিম ছোপ দেখা দিয়েছে। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সওদাগর এক লক্ষ দিনারের বিনিময়ে নুজাৎ'কে কিনে নিজে বাড়ি নিয়ে গেল। তার বিবি তাকে হামামে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে গোসল করাল। সওদাগর দোকান থেকে তার জন্য ভাল পোশাক ও কিছু গহনাপত্র খরিদ করে নিয়ে এল। তার বিবি নুজাৎ'কে সেগুলো পরিয়ে দিল। একে তার সুরৎ খুব, তার ওপর, ঝকমকে পোশাক ও গহনাপত্র পরালে তাকে জব্বর দেখাতে লাগল। সওদাগর তাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ভাবল, একবার শাহজাদা সারকান-এর সামনে নিয়ে ফেলতে পারলে আর দেখতে হবে না, বাজী মাৎ।
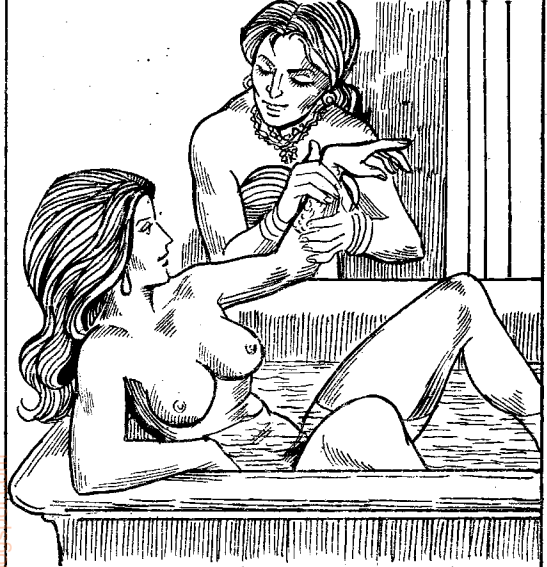
সওদাগর নুজাৎ'কে বল্‌ল—'শোন, তোমাকে আগেই বলে রাখছি, শাহজাদা সারকান যদি তোমাকে দর দামের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেন তবে কত দিয়ে আমি খরিদ করেছি ভুলেও যেন বলো না! আর এমন সব কথা বলবে যাতে সে বেশ ফলাও করে তার আব্বা বাদশাহ উমর-এর নিকট একটি চিঠি লিখে দেন। তারপর আমি সে চিঠি আর তোমাকে নিয়ে যাব বাগদাদে বাদশাহ উমর-এর দরবারে। ব্যস, একেবারে দাঁও মেরে দেব। মোটাঅঙ্কের দিনার দিয়ে বাদশাহ তোমাকে লুফে নেবেন।

বাগদাদ, শাহজাদা সারকান আর বাদশাহ উমর-এর নাম কানে যেতেই নুজাৎ-এর চোখ দিয়ে পানির ধারা নেমে এল।

ব্যাপারটি সওদাগরের নজর এড়াল না। এর আগে হাটে দরদামের সময়েও বাদশাহের কথা উঠতে তার মুখে কেমন বিষাদের ছায়া নেমে আসতে লক্ষ্য করেছিল। তখন পাত্তা দেয় নি। এখন ব্যাপারটি তার দিলে দাগ কাটল। অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে

বল্ল—'কি গো, বাদশাহ্ উমর-এর নাম করতেই তোমার চোখে পানি ভিড় করল, ব্যাপার কি? আমি তাজ্জব মানছি।'

—'বাদশাহ্ উমর অল-নুমান আমার পরিচিত তাই তার নামটি শোনার পরই আমার—'

—'বাদশাহ্ উমর তোমার পরিচিত!' সবিস্ময়ে সওদাগর ব'লে উঠল।

নুজাৎ বুদ্ধি খরচ করে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিল—'না, মানে বাদশাহের লেড়কি আমার সঙ্গে মক্তবে পড়ত। সে সুবাদে তাদের প্রাসাদে দু'-চারবার গিয়েছি। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। যদি বাদশাহের কাছ থেকে আপনার কোন কাজ উদ্ধার করার থাকে তবে কাগজ-কলম দিন আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। যদি চিঠি নিয়ে আপনি নিজে তার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে যান তবে তাঁকে বলবেন, নসীবের ফেরে আমি আজ এখানে ওখানে চক্কর খেয়ে দিন গুজরান করছি। আর বলবেন, বহু মুলুক ঘুরে, ভাসতে ভাসতে আমি তারই লেড়কা শাহ্জাদা সারকান-এর আশ্রয়ে অবস্থান করছি।'

নুজাৎ-এর কথায় সওদাগরের মন এবার ভিজে একেবারে পানি হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেরাজ খুলে কাগজ-কলম এনে নুজাৎ-এর হাতে দিল। সে খস্ খস্ করে কয়েক ছত্র লিখে চিঠিটি সওদাগরের হাতে দিয়ে বল্ল—'বাদশাহকে আমার সালাম জানাবেন।'

সওদাগর চিঠিটি ভাঁজ করে শারিয়ানের জেবে রাখতে রাখতে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্ল—'বেটি, খোদাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমার মধ্যে আরও গুণের সঞ্চার করেন। যেন তোমার ভালই করেন।'

এমন সময়ে রাত্রির অবসান হ'ল। বেগম শাহ্রাজাদ তাঁর কিস্সা বন্ধ করলেন।

উনষাটতম রজনী

বাদশাহ্ শারিয়ার তার কাজকর্ম মিটিয়ে প্রায় মাঝ-রাত্রে অন্দর মহলে বেগম শাহ্রাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাহাপনা, সওদাগর নুজাৎ-এর লেখা চিঠিটি জেবে রাখল।

এবার থেকে সওদাগর ও তার বিবির কাছে নুজাৎ-এর কদর অনেকগুণ বেড়ে গেল। তাকে যে কিভাবে সন্তুষ্ট করবে, ভেবে অস্থির হ'ল।

সওদাগরের বিবি নুজাৎ'কে খুব ভাল করে সাজিয়ে দিল। শাহ্জাদা সারকান-এর দরবারে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। শাহ্জাদা বলে কথা। তার নজরে যদি তাকে ধরাতে না পারে তবে সব ভেস্তে যাবে। ইতি মধ্যে এক লাখের ওপর দিনার এর পিছনে খরচ হয়ে গেছে। শাহ্জাদা যদি একবার তার সুরৎ দেখে মুখ বাঁকান তবে মুহূর্তে তার নসীবের চাকা ঘুরে একেবারে চোখের পানি বের করে ছাড়বে। আর যদি শাহ্জাদা খুশী হন—না, আর ভাবতে পারছে না! তার নসীব তাকে একেবারে আমীর বানিয়ে দেবে। এমন দাঁও মারবে যাতে জিন্দেগী ভর পায়ের ওপরে পা তুলে মৌজ করে কাটিয়ে দিতে পারবে।

সওদাগর খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে নুজাৎ'কে নিয়ে শাহ্জাদা সারকান-এর প্রাসাদে হাজির হ'ল।

শাহ্জাদা সারকান-এর সামনে নুজাৎকে দাঁড় করিয়ে তার বোরখার নাকাবটি সরিয়ে দিল।

শাহ্জাদা সারকান এর আগে কোনদিন তার বহিনকে চোখে দেখে নি। তাই সঙ্গত কারণেই তাকে চিনতে পারল না।

সওদাগর নুজাৎ-এর নাকাবটি সরিয়ে তার মুখটিকে দেখার সুযোগ করে দিল।

শাহ্জাদা সারকান এক ঝলক নুজাৎ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল—'শুভন আল্লাহ! এ কী এ দুনিয়ার কেউ নাকি বেহেস্ত থেকে নেমে আসা হুরী! এমন সুরৎ তো এর আগে কোনদিন চোখে পড়ে নি!'

নুজাৎকে দেখামাত্র শাহ্জাদা সারকান-এর শরীরের সব ক'টি স্নায়ু যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। এমন অনন্য সুরৎ আর যৌবনের ভরা জোয়ারের একত্র সমাবেশ ঘটলে কোন যুবক তো দূরের কথা যে কোন বৃদ্ধেরও দিমাক ঘুরে যাওয়ার কথা।
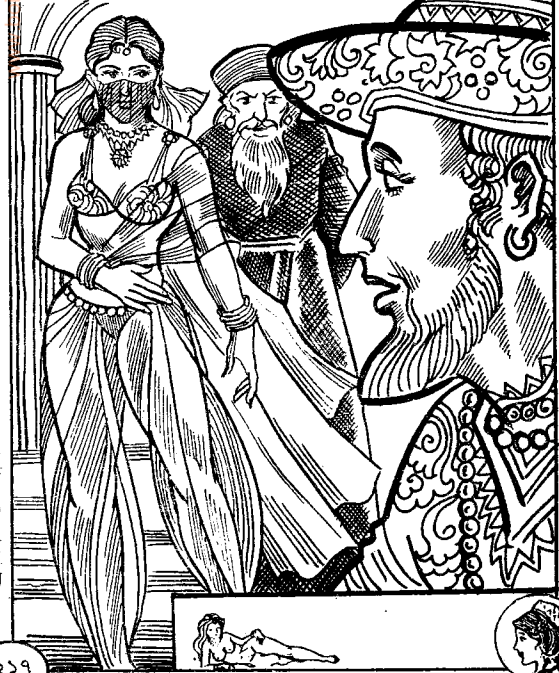
সওদাগর নিজ অভিজ্ঞতা সম্বল করে যুবক শাহজাদা সারকানের মানসিক পরিস্থিতির কথা সহজেই আঁচ করে নিতে পারল। এবার হাত কচলে হুজুরের কাছে পেশ করল—'এ লেড়কি কেবল সুরতের বিচারেই শ্রেষ্ঠা নয়। এর বহুমুখী গুণও যেকোন আদমির নজর কাড়বে। এমন কোন বিদ্যা নেই যাতে এর যথেষ্ট দখল নেই। হুজুর, মেহেরবানি করে একবারটি যাচাই করলেই বুঝতে পারবেন, আমি কেবলমাত্র ব্যবসার খাতিরে আমার সওদার সুখ্যাতি করছি না।'

—'না না, পরীক্ষা করার আর কি আছে। তোমার প্রথম কথা যখন মিলে গেছে তখন আর সব কথা আর কাজের মধ্যে কিছুমাত্রও ফারাক নেই বলে আমার বিশ্বাস। খাজাঞ্চিকে বলছি, তোমার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে।

—'হুজুর আমি কিন্তু অন্য চিন্তা করে লেড়কিকে আপনার দরবারে হাজির করেছি। বাদশাহ উমর-অল-নুমান-এর জন্য একে খরিদ করেছিলাম। তা হুজুর মেহেরবান, সওদাটি যদি আপনারই চোখে ধরে থাকে তবে রেখে দিতে পারেন। আমার তো ব্যবসা, আপনি রাখলেও যা আবার বাদশাহ নিলেও একই কথা। তবে আমার সওদা আপনার ভোগে লাগলেই আমি বেশী খুশী হ'ব।'

—'ঠিক আছে, এবার বল তো কি দামে তুমি একে খরিদ করেছ? আর আমার ইনামই বা কি আশা করছ?'

—'হুজুর ঝুট বলব না। একে খরিদ করেছি এক লক্ষ দিনারের বিনিময়ে। আর সাজ পোশাক আর গহনাপত্রের জন্য খরচ হয়েছে আর এক লক্ষ। আমার দালালীই বলেন ইনামই বলেন সে আপনার যা বিবেচনা হয় দেবেন।

শাহজাদা সারকান এবার খাজাঞ্চিকে ডেকে সওদাগরের সওদা বাবদ এক লক্ষ, সাজ পোশাক গহনাপত্রের জন্য এক লক্ষ আর ইনাম বিশ হাজার দিনার মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর সওদাগর এবার থেকে যখন, যা কিছু বাণিজ্য করবে তার কর যেন মকুব করে দেওয়া হয় এরকম হুকুম দিয়ে দিলেন।

সওদাগর হাত কচলে, ঠোঁটের কোণে যুদ্ধজয়ের হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'হুজুর মেহেরবান। আপনার মত দিল্ দরিয়া আদমি সচরাচর চোখে পড়ে না।'

সওদাগর তার প্রাপ্য বুঝে পেয়ে শাহজাদা সারকানকে সালাম জানিয়ে দরবারকক্ষ ত্যাগ করল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ষাটতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশটুকু শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সওদাগর নুজাৎ'কে শাহজাদা সারকান-এর হাতে তুলে দিয়ে নিজের প্রাপ্য দু' লাখ বিশ হাজার দিনার শেরিওয়ানের জেবে পুরে বিদায় নিল।

শাহজাদা সারকান-এর তলব পেয়ে নগরের চারজন প্রখ্যাত কাজী পড়ি কি মরি করে ছুটে দরবারে উপস্থিত হ'ল।

শাহজাদা সারকান কাজীদের লক্ষ্য করে বল্‌লেন—'শোনো, আমি এক সওদাগরের কাছ থেকে এ-লেড়কিকে খরিদ করেছি। আমি একে শাদী করতে চাই। শাদীর হলফনামা তৈরি কর। আর আমার শাদীর সাক্ষী হবে তোমরা।'

শাহজাদার হুকুমে কাজীরা ব্যস্ত-হাতে শাদীর হলফনামা তৈরি করে ফেল্‌ল।

শাহজাদা সে সওদাগরকেও তলব করল। তাকেও শাদীর সাক্ষী রাখতে চায়। শাহজাদার তলব পেয়ে সওদাগরও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

শাহজাদা সারকান বল্‌ল—'সওদাগরের মুখ থেকে আমি শুনেছি, এ-লেড়কি কেবলমাত্র সুরতের বিচারে অনন্যা নয়, অগাধ গুণাবলীও তার শ্রেষ্ঠত্বের আর এক দিক। এ যে নানা বিদ্যায় অসাধারণ বিদূষী তার প্রমাণ বাঁদী তোমাদের উপস্থিতিতে দেবে। তোমরা বিচার করে আমাকে বলবে, সওদাগরের বক্তব্য কতখানি সত্য।'

প্রাসাদেরই এক বিশালায়তন কক্ষে পর্দা ঘেরা স্থানে বাঁদী নুজাৎ'কে বসানো হ'ল। পর্দার এক ধারে নগরের আমীর-ওমরাহ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ঘরের জনানারা আর অন্য ধারে শাহজাদা সারকান, সওদাগর আর চার কাজী বসল।

শাহজাদা সারকান পর্দার বাইরে থেকে বল্‌ল—'সুন্দরী, তুমি তো জানই, সওদাগর পঞ্চমুখে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির তারিফ করেছে। আমরা তোমার মুখ থেকে কিছু নীতিকথা শুনতে উৎসাহী। এ ব্যাপারে তোমার জ্ঞান বুদ্ধি কতখানি গভীর তার পরিচয় দাও।'

নুজাৎ বল্‌ল—'শাহজাদা, আপনি বর্তমানে আমাকে যে হুকুম করেছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় রেখে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করছি।'

সবার আগে আমি প্রাথমিক আচরণ বিধির কথা ব্যক্ত করছি। মনুষ্য জীবনে প্রধান উৎসাহের সঞ্চার ঘটে আত্মবিশ্বাস থেকে। উৎসাহ উদ্দীপনা জাগে বাসনার অতৃপ্ত আগুনে দগ্ধ হতে, অন্যথায় কিছুতেই তার সঞ্চার ঘটা সম্ভব নয়। মনুষ্য জাতি কোন্ কোন্ বিষয়ে তার কুশলতা প্রদর্শন করতে উৎসাহিত হয়? এর উত্তর—সংসারধর্ম পালন, শিল্পকলা, রাজনীতি আর বাণিজ্য।

সবার আগে আমি রাজনীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখছি। দেশের শাসন ব্যবস্থা যে-নীতির দ্বারা সুদৃঢ় হতে পারে তা-ই রাজনীতির পর্যায়ে পড়ে। প্রজারা সুখে-শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করে, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় আর প্রজারা সরকারের প্রতি আস্থাভাজন হয়।

রাজনীতি সম্বন্ধে পারস্যের বাদশাহ তৃতীয় শাহ বলেছেন—'সরকার' এবং 'আস্থা' যমজ বোনের মত। সরকারকে 'রক্ষক' হিসেবে আর 'আস্থা'কে সম্পদ জ্ঞান করা যেতে পারে।

আমাদের পয়গম্বর যে উপদেশ দিয়েছেন তাতে বলা আছে দুনিয়াতে দুটো মাত্র বস্তু সর্বাধিক ক্ষমতাবান। তাদের একটি 'ন্যায়' আর দ্বিতীয়টি 'অন্যায়'। সবাই যখন ন্যায় ধর্মকে আশ্রয় করে তখন তামাম দুনিয়া সুন্দর হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আবার দুনিয়া বিষময় হয়ে ওঠে যখন অন্যায়-ই ধর্ম বলে বিবেচিত হয়।

এবার বাদশাহ আরদাশির-এর কথা বলছি শুনুন—তিনি তার সুলতানিয়তকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আর প্রতিটি সুবার প্রমাণস্বরূপ এক একটি মোহর আঁকা আংটি ধারণ করতেন। এভাবে সুষ্ঠু শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর শাসন-ব্যবস্থা ইসলামের শাসনকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

পারস্য সম্রাট কাসরা তার সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পুত্রকে একবার এক পত্র দিয়েছিলেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্সার এ পর্যন্ত বলে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। সেখানে ভোরের প্রস্তুতি চলছে লক্ষ্য করে কিস্সা বন্ধ করলেন।

একষট্টিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, পারস্যের বাদশাহ কাসরা পত্রটিতে লিখেছিলেন—আব্বাজান, একটি কথা স্মরণ রেখো, অযথা কারো প্রতি করুণা দেখাতে যেয়ো না। এর ফলে সরকার দুর্বল হতে বাধ্য।' তিনি পত্রটির আর এক জায়গায় এ-ও লিখেছিলেন—'কিন্তু যেখানে ক্ষমা প্রদর্শন প্রয়োজন সেখানে কখনই শক্ত হওয়া উচিত নয়। তারা এর ফলে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।'

একবার খলিফা আবদুল-অল-মানিক ইবন্-অল-মারবান মিশরে তার সেনাপতি, ভাইয়া আবদ্ অল আজিজ'কে এক পত্রে লিখেছিলেন—'তোমার পরামর্শদাতারা তোমাকে কিছুমাত্র শিক্ষাও দিতে সক্ষম হয় নি। তুমি শত্রুপক্ষের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছ। তারাই তোমাকে শিখিয়েছে কিভাবে সেনাবাহিনীকে অধিকতর মজবুত করা সম্ভব।'

আবার খলিফা উমর ইবন্ খাতাব তার সভায় যাদের উচ্চপদে

নিযুক্ত করতেন তাদের আগে হলফ করতে হ'ত—দুর্বল ও শক্তি-সামর্থ্য হীন পশুর পিঠে আরোহণ করব না। শত্রুর সমানপত্র আত্মসাৎ করব না, নামাজ পাঠের সময় বিলম্ব করব না আর সাহেবী পোশাক ব'লে যা চিহ্নিত তা পরিধান করব না।

উমর ইবন্ খাতাব আরও বলেছেন—তিন প্রকার রমণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। পতিকে মন-প্রাণে চায় যে মুসলমান নারী সে আদর্শ নারী হিসেবে চিহ্নিত। কেবলমাত্র সন্তানের মঙ্গলার্থে যে মুসলমান নারী স্বামীর সঙ্গ কামনা করে তাকেও ভাল বলা যেতে পারে। কিন্তু যে মুসলমান নারী পর পুরুষের প্রতি আসক্তা তাকে খারাপ বিবেচনা করে তার সঙ্গ এড়িয়ে চলবে।

উমর ইবন্ খাতাব আরও বলেছেন, দুনিয়ায় তিন প্রকার পুরুষের অস্তিত্ব রয়েছে। যারা চালাক চতুর ভাল কাজে হাত দেয় বিচার-বিবেচনা করে। যারা বুদ্ধিমান তারা সবার আগে বিচার-বিবেচনা করে, কাজ শুরু করার আগে অন্যের পরামর্শ নিয়ে নেয়। আর যারা বোকার হদ্দ তারা কারো বুদ্ধি-পরামর্শ তো নেয়-ই না উপরন্তু বিচার বিবেচনা না করেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত আলী-ইবন্ কালিব নারীর রঙ্গ-তামাশা সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন। তাদের সম্বন্ধে চোখ-কান খোলা রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। তাদের বুদ্ধি-পরামর্শ কখনই গ্রহণ করবে না। কিন্তু তাদের অসন্তোষের কারণ হলে ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। তারা চূড়ান্ত সর্বনাশের দিকে মতি দিতে পারে।

কাজীরা নুজাৎ-এর জ্ঞানের গভীরতার কথা বিবেচনা করে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা সোল্লাসে বল্‌লেন—এমন উপদেশামৃতের হদিস আমরাও তো ইতিপূর্বে পাই নি!

এবার নুজাৎ বল্‌ল—অন্য আর একদিন মানবতার তিনটি ধারা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আজ আমি বিচক্ষণতা ও আচার

আচরণের দ্বিতীয় ধাপ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখছি। আপনারা শুনে রাখুন, সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণতার ধাপে পৌঁছনো কিছুতেই সম্ভব নয়। জন্মলব্ধ গুণ ব্যতীত কারো পক্ষেই এখানে পৌঁছনো সম্ভব হয় না। আমি কেবলমাত্র দু'-একটি দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে প্রসঙ্গটি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে ব্রতী হ'ব।

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ দেখলেন ভোর হয়ে আসছে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

বাষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, নুজাৎ এবার বল্‌ল—একদিন খলিফা সুযারিয়াহ নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে চোখের সামনে ল্যাংড়া হাস্যরসিক আবু বাহব ইবন্ কাইসকে দেখতে পেলেন। সে পথে পথে ভিক্ষা মেঙে বেড়াচ্ছে। খলিফা তার কাছে এগিয়ে গেলেন। তাকে ডেকে বল্‌লেন—'উপদেশ কিছু দাও তো শুনি।'

ল্যাংড়া খলিফার আগ্রহের কথা বিবেচনা করে সোল্লাসে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনি রোজ মস্তক মুণ্ডন করবেন, গোঁফ ছাঁটবেন আর নখ কাটবেন। আর আপনার দাঁত-মুখ যাতে সাফ সুতরা থাকে সে-ব্যবস্থা করবেন। তবে যেন কিছুতেই জুম্মাবারে এসব কাজ করতে যাবেন না। এ-ই পবিত্র উপদেশ।

খলিফা মুচকি হেসে বল্‌লেন—'ওহে, আমাকে না হয় সৎ উপদেশ দিলে, কিন্তু তুমি নিজে? তুমি নিজে কোন উপদেশ পালন কর, বল তো?'

—'জাঁহাপনা, আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে আমি বলব, আমি একপা সামনে বাড়াবার আগে দুটো পায়ের অবস্থানই সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি।'

—'আর একটি কথা। বড়দের প্রতি তোমার আচরণ কেমন?'

—মাত্রাতিরিক্ত সম্মান না দিয়ে যোগ্যতা অনুসারে সম্মান দিয়ে থাকি। আবার তারাও প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করবেন, আশা রাখি।'

—'এবার বল তো তোমার বিবির সঙ্গে তুমি কেমন আচার ব্যবহার করে থাক?'

—'আমি মাফি মাঙছি জাঁহাপনা। সে-কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না।' সলজ্জমুখে ল্যাংড়া বল্‌ল। পরমুহূর্তেই ভাবল স্বয়ং খলিফা যখন শুনতে চাচ্ছেন তখন তো বলাই দরকার। —'জাঁহাপনা, আমার বিবি একেবারেই দুর্বল-কাবু। কুঁজোও বটে। চিৎ হয়ে শোয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

—'সে কী হে, তবে তো মহাসমস্যা দেখছি। যদি চিৎ হয়ে শুতেই না পারে তবে ছাদের তলার টিকটিকির খেলা, কড়ি কাঠ গোণা প্রভৃতি তার পক্ষে কি করে সম্ভব হয়, ভেবে পাচ্ছিনে।'

—'সে কিন্তু উপুর হয়ে শুয়ে ইঁদুরের ছুটোছুটি দাপাদাপি দেখতেই পছন্দ করে বেশী।'

ল্যাংড়ার উপস্থিত বুদ্ধি ও কথার মারপ্যাঁচ দেখে মুগ্ধ হলেন। মুচকি হেসে বল্‌লেন—'তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করতে চাই। বল, কি পেলে তুমি খুশী হবে?'

—'জাঁহাপনা, ন্যায় ও সত্য পথে থেকে প্রজাপালন করুন। ব্যস, এটাই আপনার কাছ থেকে আমার একমাত্র কাম্য। এর বেশী এক কণাও আমি প্রত্যাশা করি না।' খলিফার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ল্যাংড়া তার নিজস্ব ভঙ্গিতে হেঁটে এগিয়ে গেল।

ল্যাংড়া এগিয়ে গেলে খলিফা আপন মনে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—'তামাম ইরাকে যদি আর একজনও জ্ঞানী ব্যক্তি না থাকে তবু আমার আর কিছুমাত্র আক্ষেপ নেই। আবু বাহব একাই একশ' জনের অভাব পূরণ করছে।'

ইতিমধ্যে ভোরের আলো একটু একটু করে প্রকাশ পেতে লাগল। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তেষট্টিতম রজনী

মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদের কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, নুজাৎ এবার বল্‌ল খলিফা উমর ইবন্ অল-খাতাবের আমলে কোষাগারের দায়িত্বে ছিলেন বুড়ো মুয়াইকিব। ধর্মপ্রাণ। খলিফা একদিন তার ছোট লেড়কাটিকে নিয়ে

মুয়াইকিব-এর কাছে উপস্থিত হলেন। মুয়াইকিব শিশুটির হাতে একটি রুপোর দিরহাম দিলেন। এর ক'দিন বাদে খলিফা মুয়াইকিবকে ডেকে বল্‌লেন—'শুনছি, তুমি নাকি ধনাগারের অর্থ নয়-ছয় করছ?'

—'তোবা তোবা! এ কী কথা জাঁহাপনা! জিন্দেগীতে আমি কারো একটি কানাকড়িও আত্মসাৎ করি নি।'

—'তাই যদি হবে তবে তুমি আমার ছোট লেড়কাকে সেদিন রুপোর দিরহামটি কোত্থেকে দিয়েছিলে?'

বৃদ্ধ উঠে গিয়ে একটি খাতা নিয়ে এল। একটি পাতার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, নিজের চোখেই দেখুন, শাহজাদার নামে আমি এক দিরহাম হিসাবে উল্লেখ করেছি।'

—'ভাল কথা। কিন্তু কার দিরহাম, কাকে দিলে? তাকে তামাম ইসলাম ধর্মীদের কাছে ঋণী করলে মুয়াইকিব?'

বুড়ো মুয়াইকিব চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। সে এতদিন নিজেকেই সবচেয়ে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞান করত। কিন্তু আজ দেখছে তার চেয়েও সৎ লোক রয়েছে। সুলতানের সততার কাছে তার সততা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

খলিফা এক রাত্রে আবু জাইদকে নিয়ে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে দেখেন পথের ধারে এক জনানা কাঠ জ্বেলে হাড়িতে জল গরম করছে। রোগা হাড় জির জিরে দুটো শিশু তার পাশে।

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন—'বেটি, এতরাত্রে রাস্তার ওপর বসে করছ কি?'

—'পানি গরম করছি। গুঁড়া বাচ্ছা দুটোর পেটে সারাদিন দানাপানি পড়ে নি। একটু পানি গরম করে খাইয়ে দেব। আমার নসীবের কথা কাকেই বা জানাই। গুঁড়াবাচ্ছাদের এক মুঠো খানা জোটে না। খোদাতাল্লার কাছে খলিফাকে এর জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে।'

—'তুমি কি ভাবছ, তোমার তকলিফের কথা জেনেও খলিফা নিশ্চিন্তে বসে বসে রয়েছেন? বাগদাদ শহর তো আর এতটুকু নয়। এখানে কে, কোথায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, না জানালে তিনি কি করে জানবেন বল তো?'

—'প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের হদিসই যদি না রাখতে পারেন তবে খলিফা হওয়ার সাধ হয়েছে কেন?'

খলিফার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, কোন জবাবই দিতে পারলেন না। আবু জাইদকে নিয়ে সোজা প্রাসাদে ফিরলেন। ভাড়ার থেকে এক বস্তা আটা আর এক ঝারি চর্বি বের করলেন। জাইদকে বল্‌লেন, আটার বস্তাটি তার পিঠে তুলে দিতে।

—'জাঁহাপনা, আপনি নিজে কেন আটার বস্তা টানতে যাবেন? কোন নোকরকে ডাকছি, জনানাটিকে দিয়ে আসবে। নইলে আমাকে দিন। আমি পিঠে করে তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

—'না। আমাকেই পৌঁছে দিতে হবে। জাইদ, শেষ বিচারের দিন আল্লাতাল্লার দরবারে আমার পাপের বোঝা কি তুমি বইবে, বল?'

—'আটার বস্তা আর চর্বির ঝারিটি খলিফা নিজেই বয়ে নিয়ে গিয়ে জনানাটিকে পৌঁছে দিলেন। এবার কিছু আটা মেখে পরোটা বানাতে লেগে গেলেন। আর তা গুঁড়া বাচ্ছা দুটো আর আম্মাকে খাওয়ালেন। তারপর ঠাণ্ডা পরোটা নিজেও খেলেন। আর বাকী আটা আর চর্বি জনানাটিকে বুঝিয়ে দিয়ে খলিফা প্রাসাদে ফিরলেন। পথে জাইদকে বল্‌লেন—'বুঝলে, জনানাটির কথা আজ আমার আঁখি খুলে দিয়েছে। সামনের আন্ধার ঘুচে গেছে জাইদ।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চৌষট্টিতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, নুজাৎ নীতিকথা শুনিয়ে চলেছে—খলিফা উমর একদিন মেঠো পথ দিয়ে যাচ্ছেন। এক রাখালকে কতগুলো বকরি চরাতে দেখলেন।

তাকে বল্‌লেন—'আমার কাছে একটি বকরি বেচবে?'

—'বকরির মালিক তো আমি নই। নেহাৎই যদি খরিদ করতে চান তবে আমার মালিকের সঙ্গে বাতচিত করুন। আমি তো তার কেনা বান্দা মাত্র। আমি কি করে বকরি বেচব?'

'তার সততায় খলিফা মুগ্ধ হলেন। বল্‌লেন—'তোমার মালিকের কাছে আমাকে নিয়ে চল। আমি তোমাকেই খরিদ করে নিতে চাচ্ছি। সৎ আদমির বড়ই অভাব। তোমাকে খরিদ করে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক। আর গোলামী করতে হবে না তোমাকে। যে দিকে মন চায় চলে যাবে। দিল যা চাবে করবে।'

খলিফার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় খলিফার কাছে এল। নাম তার হাফসা। সে বল্‌ল—'মহাত্মা, আপনি বহুৎ ধনদৌলত নিয়ে নিজের মুলুকে ফিরছেন, শুনতে পেলাম। আমি তো আপনার এক ভাগীদার, আমার অংশ আমাকে মিটিয়ে দিন।'

—'আল্লাহ আমাকে শুধুমাত্র রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। ধনদৌলত যা কিছু আমার ভাবছ, সবই আমার মুসলমান প্রজাদের সম্পত্তি। একটি কপর্দকও আমার নিজের নয়। আবার প্রজা হিসেবে যদি কিছু আশা কর তবে তা-ও সম্ভব নয়। তুমি আমার সহোদর ভাই। যদি কিছু দেই তবে সবাই আমাকে স্বজন পোষণের দায়ে অভিযুক্ত করবে।'

আমি এবার তৃতীয় পর্বের কথা বলছি। এতে পুণ্যবানদেরই একমাত্র অধিকার।

হাসান অল বাসরি-র মতে আদমিরা তার অন্তিমকালে তিনটি কথা ভেবে শোক-তাপ পায়। তাদের প্রথমটি হচ্ছে—পাওয়া ধনকে অবজ্ঞা করা, দ্বিতীয়—অপূর্ণ কামনা-বাসনা, আর তৃতীয়—অপূর্ণ উচ্চাভিলাষ।

কয়েকজন একবার সুফিয়াকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমীর আদমিরা পুণ্যের অধিকারী হয়?'

তিনি বলেন—'পারে, অবশ্যই পারে। কখন পারে তাই না? তারা তাদের ধনদৌলত হারিয়ে যখন নিঃস্ব-রিক্ত হয় তখন। আর শ্রদ্ধাবনত হয়ে যখন দান ধ্যান করতে সক্ষম হয়।'

আবদাল্লাহ ইবন সাদ্দাদ অন্তিমকালে তাঁর লেড়কা মহম্মদকে ডেকে উপদেশ দান করেছিলেন—'সৎ পথে চলবে, ধর্মের প্রতি আস্থা রাখবে। আর আল্লাহ-র প্রতি ভক্তিতে অবিচল থাকবে। আর সর্বদা স্মরণ রাখবে, ধনদৌলত সুখ উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু আনন্দ লাভ করবে তা না।' ভোগে নয়, ত্যাগের মাধ্যমে পরম প্রাপ্তি ঘটে।

মহাধার্মিক প্রবর আবাদ অল-আজিজ যখন উমায়াদের অষ্টম খলিফার পদ লাভ করে মসনদে আরোহণ করেন তখন একদিন নগরের আমীর-ওমরাহদের তার দরবারে আহ্বান করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'তোমাদের অত্যাবশ্যকীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিজের অধীনে রেখে বাকী সব সরকারের হাতে তুলে দাও। এতে তারা খুবই রাগান্বিত হলেন। খলিফার বৃদ্ধা পিসির কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানালেন। তাঁর নাম ফতিমা। ফতিমা একদিন খলিফার শয়নকক্ষে এলেন। তাঁকে বল্‌লেন—'তুমি মহাধার্মিক খলিফা। আমি কেন এসেছি তা তুমি আশা করি অনুমান করতে পারছ।'

—'আল্লাহ তার পয়গম্বরকে দুনিয়ায় পাঠান জনগণের মাঝে খুসবু বইয়ে দিতে আর মানব ধর্মের বিস্তার ঘটাতে। নদ-নদী যেমন পানি দান করতে করতে এগিয়ে চলে ঠিক তেমনি পয়গম্বরের পবিত্র জীবনধারা নিজে কিছু গ্রহণ না করে দান করতে করতে অগ্রসর হন। তাকে অবলম্বন করে কত সব আদমি উদ্ধার হয় তার ইয়ত্তা নেই। সে-স্রোতধারা যাতে শুকিয়ে কাঠ হয়ে না যায় তা লক্ষ্য রাখাই আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

এমন সময় ভোর হয়ে আসায় বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পঁয়ষট্টিতম রজনী

গভীর রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদের কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, নুজাৎ নীতিকথা বলে চলেছে। আর শাহজাদা সারকান, সওদাগর ও চার কাজী অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে তা শুনছে।

ফতিমা এবার তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে বিদায় নিলেন। তিনি আমীর ওমরাহদের বল্‌লেন—'তোমাদের কয়েক জনের নসীবের জোরে তোমরা খলিফা আজিজ-এর মত সুলতানকে লাভ করেছ। তার কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে কাজ কর।'

উমর শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর লেড়কাদের উপদেশ দিয়ে গেছেন—দারিদ্র্য বাঞ্ছনীয় নয় কিন্তু দারিদ্র্যের স্বাদ পেতেই হয়। খোদাতাল্লার সাহচর্য লাভ করতে হলে দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে নিতেই হবে।

তাঁর অন্তিম সময়ে মসলামাহ ইবন্ আবদ অল-মালিক উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন—সবাই বলাবলি করছে, আপনি আপনার বিষয় সম্পত্তির একটি কানাকড়িও আপনার লেড়কাদের দান করে যাচ্ছেন না। আপনি চাইলেই কিন্তু তাদের আমীর বানিয়ে রেখে যেতে পারতেন।

খলিফা বিস্মিত হন। ক্ষুব্ধ স্বরে ব'লে উঠলেন—'বলছ কি হে, জিন্দেগী ভর ন্যায় পথ আঁকড়ে থেকে শেষনিঃশ্বাস ফেলার আগে এরকম একটি জঘন্য কাজ করে যাব! তবে জনম ভর যা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করেছি মুহূর্তে কর্পূরের মত সব উবে যাবে যে! আর আমার জন্য দোজকের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাল্যে আমার এক পূর্বসূরীর শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। জিন্দেগীভর বহুৎ কিছু

অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার করেছিলেন। তার মৃত্যুতে সবাই স্বস্তি পেয়েছিল। খোদাতাল্লার কাছে দু'হাত তুলে আর্জি জানিয়েছিল, দোজকই যেন তার একমাত্র আশ্রয় স্থল হয়। ব্যস, তখনই আমি হলফ করি, তার মত অসৎ আচরণে আমার মতি কোনদিনই যেন না হয়।

এ-মসলামাহ অল-মালিকও একবার বলেছিলেন, আমি এক বৃদ্ধের ইচ্ছামৃত শবদেহ গোর দিয়ে সবে শুয়েছি, তন্দ্রাভাব জেগেছিল—ব্যস, খোয়াব দেখলাম, এক বৃদ্ধ আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। সস্নেহে আমাকে বল্‌লেন—'জিন্দেগীতে এমন সব কাজ করবে যার জন্য পুরস্কার লাভের যোগ্য হও।'

একবার তিনি একটি কিস্‌সাও শুনিয়েছিলেন—উমর ইবন্ আব্দ অল-আজিজ-এর রাজত্বকালে এক নওজোয়ান তার এক দোস্তের সঙ্গে মোলাকাত করতে যায়। সে ছিল রাখাল। ভেড়া চরাত।

ভেড়ার পালের মাঝে এক জোড়া মোটাসোটা কুকুর দেখে সে বিস্মিত হয়। রাখালকে জিজ্ঞাসা করে—তোমার ভেড়ার পালে কুকুর দুটোকে রেখেছ কেন হে?'

তার রাখাল-দোস্তটি হেসে বলল—'কুকুর নয়। ও দুটো নেকড়ে. পোষা নেকড়ে।'

—'পোষা? সে কী হে তারা ভেড়া খেয়ে ফেলে না?'

—'মারের ভয় দেখিয়ে পোষ মানিয়েছি। থাবা দিতে গেলে পা ভেঙে দেব. ভয় আছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, কাল্লা মজবুত হলে দেহেও বল থাকে।'

বেগম শাহরাজাদ এমন সময় দেখলেন প্রভাত হয়ে আসছে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছেষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—জাঁহাপনা, নুজাৎ এবার বল্‌ল—খলিফা আবিদ অল-আজিজ একবার বলেছিলেন—আল্লাহ তো চিরজীবি করেন নি। যেকোন ধর্মাবতারের কাছে মৃত্যুই তাঁর সবচেয়ে বড় আশীর্বাদরূপে গণ্য হয়।

খলিফা হিসারাস একদিন তাঁর পারিষদদের নিয়ে বসে। তখন ইবন্ সফবান উপস্থিত হলেন। বল্‌লেন—'আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আপনাকে আজ এক উপদেশ মূলক কিস্‌সা শোনাব।'

তিনি কিস্‌সাটি শুরু করলেন—এক সুলতান একদিন তাঁর সভাসদদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'আমার মত মহাত্মা, উদারচেতা, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিত্তশালী আর কোন বাদশাহ কি তোমাদের চোখে পড়েছে?' তা শুনে এক প্রবীণ ধর্মাশ্রয়ী সভাসদ বল্‌লেন— 'জাঁহাপনা, অধমের গোস্‌তাকী মাফ করবেন, আপনার এ অগাধ ধনদৌলত চিরস্থায়ী হবে বলেই কি আপনার বিশ্বাস?'

—'ধনদৌলত কোনদিনই চিরস্থায়ী হতে পারে না।'

—'তাই যদি হয় তবে কেন এমন গর্বের সঙ্গে এরকম প্রশ্নের অবতারণা করছেন?'

—'তবে বল, আমার কর্তব্য কি?'

—'নিজের মনকে পবিত্র রাখুন। অহঙ্কার মন থেকে মুছে ফেলুন। পাপচিন্তা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ-তে নিজেকে সঁপে দিয়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপনে লিপ্ত থাকুন।'

তখন থেকেই খলিফা একটিমাত্র কম্বল সম্বল করে অতি দীনহীনের মত জীবন যাপন করতে লাগলেন।

নুজাৎ এবার বল্‌লেন—জীবনের এ পর্বের আরও অনেক জ্বলন্ত উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু আজ সে-সুযোগ নেই। ভবিষ্যতে চেষ্টা করব।

এমন সময় প্রভাতের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতষট্টিতম রজনী

গভীর রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, নুজাৎ-এর কথায় চার কাজী আবেগ-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর তারা শাহজাদা সারকান'কে যথোচিত পদ্ধতিতে কুর্নিশ জানিয়ে ফিরে গেল।

শাহজাদা সারকান এবার তার দাস-দাসীদের বল্‌ল—'আজ রাত্রেই আমি শাদী করব। তোমরা আড়ম্বরের সঙ্গে যাতে শাদী মিটতে পারে তার আয়োজন কর।'

প্রাসাদে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। আমীর ওমরাহরা নিমন্ত্রিত হয়ে এল। কব্জি ডুবিয়ে সবাই যাতে খানাপিনা করতে পারে তার ব্যবস্থা হ'ল। বাতির রোশনাই ঝলমলিয়ে উঠল। বহু আমির-ওমরাহ-সওদাগর এসে শাহজাদাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল।

কুমারী লেড়কিরা পাত্রী নুজাৎ'কে অপূর্ব সাজে সাজিয়ে তুল্‌ল। প্রথমে তাকে সাতবার বাসর কক্ষ প্রদক্ষিণ করাল। তারপর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাকে বিবস্ত্রা করা হ'ল। এক বৃদ্ধা তার শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল যে তার দেহ সহবাসের উপযোগী কিনা। এবার সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সুসজ্জিত সারকান বাসরঘরে প্রবেশ করল। নিজ দেহের শোরিওয়ান, পাৎলুন এবং অন্যান্য, গাত্রাবরণ যা কিছু সবই এক এক করে খুলে বিবস্ত্র হ'ল। এবার খুশী মনে সদ্য শাদী করা বিবির পাশে গিয়ে বসল। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না তার নিজের বহিনই বিবির আসন লাভ করেছে। আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বুকে টেনে নিল নুজাৎ-এর পনের বছরের যৌবনভরা ডগমগে দেহটিকে। শাদীর প্রথম রাত্রেই নুজাৎ গর্ভবতী হ'ল।

নুজাৎ-এর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর পেয়ে সারকান তার উজিরকে বল্‌ল বাগদাদে খলিফা উমর অল-নুমান'কে সংবাদটি পৌঁছে দিতে।

সারকান নিজেই খলিফা উমরকে লেখা চিঠিটির বয়ান ব'লে গেল। —এক বাঁদীকে কিনে শা[illegible]রেছি। সে কেবল খুবসুরৎই নয়। নানা গুণে গুণান্বিতাও ব[illegible]ঘ্রই বাগদাদে পাঠাব। সে তার দেবর দু অল-মকান এবং ননদ নুজাৎ-এর সঙ্গে মোলাকাৎ করে আসবে।

সারকান-এর লেখা চিঠি নিয়ে এক দ্রুতগামী অশ্বে চেপে দূত বাগদাদের পথে যাত্রা করল। যথা সময়ে বাগদাদের সংবাদ নিয়ে দূতটি ফিরে এল।

পূর্ব-আকাশে ভোরের প্রস্তুতি চলেছে। বেগম শাহ্‌রাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন। তিনি বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতান উমর অল-নুমান চিঠিতে তাঁর লেড়কাকে লিখলেন—'বেটা, তুমি বাগদাদ ছাড়ার পর থেকে বিভিন্ন উপায়ে নসীবের চাকা ঘুরেই চলেছে। শোক-জ্বালায় আমার হাড্ডি জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে গেছে। আমার জান দু অল-মাকান আর নুজাৎ প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে। আমি তখন বাগদাদের বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে শুনি তারা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ভিড়ে প্রাসাদ ছেড়ে মক্কায় গেছে। মাকান অবশ্য আমার কাছে আগে একবার মক্কায় যাবার আব্দার করেছিল। তার বয়সের কথা উল্লেখ করে আমি তখন বুঝিয়ে নিরস্ত করেছিলাম। কথা দিয়েছিলাম আমি নিজে তাকে সঙ্গে করে সামনের বছর নিয়ে যাব। তাতে মন ভরে নি। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে তার বড় বহিন নুজাৎকে নিয়ে গোপনে প্রাসাদ ছেড়ে যায়। মক্কায় লোক পাঠিয়ে তল্লাস করেছি। অন্য বহু জায়গায়ও পাত্তা লাগিয়েছি। পাত্তা মেলে নি। শেষে হতাশ হয়ে হাল ছাড়তেই হ'ল। আল্লাতাল্লা তোমার মঙ্গল করুন।'

এর কিছুদিন পর নুজাৎ আসন্ন প্রসবা জেনেও জরুরী কাজে সারকানকে বাগদাদে যাত্রা করতে হ'ল। কারণ তার আব্বা গুরুতর অসুস্থ।

বাগদাদ থেকে ফিরে এসে দেখে সাতদিন আগে নুজাৎ এক লেড়কি পয়দা করেছে। লেড়কির গলায় একটি সোনার হার। তার লকেটটির দিকে চোখ পড়তেই সারকান প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে—'নুজাৎ, এ হার তুমি কোথা পেয়েছ, বল? এ তো দৈবশক্তি সম্পন্ন পাথর তিনটির একটি। কোথায় পেলে? সত্যি করে বল। পাথরতিনটি তো নসীব বিড়ম্বিতা ইরবিজা আমার আব্বাকে দিয়েছিল। বাঁদী কাহাকার, বল কোথায় পেলে?'

বাঁদী শব্দটি কানে যেতেই নুজাৎ কালনাগিনীর মত ফোঁস করে ওঠে—'তুমি আমাকে 'বাঁদী' সম্বোধন করলে? আমি রীতিমত তোমার শাদী করা বিবি। 'বাঁদী' সম্বোধন করে আমাকে অপমান করার সাহস তোমাকে কে দিয়েছে! শুনে রাখ, আমি মোটেই ফেল্‌না নই। এতদিন আমি আমার প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখেছিলাম। আজ ফাঁস করতে বাধ্য হচ্ছি—তুমি যেমন শাহজাদা আমিও ঠিক তেমনি শাহজাদী। আমি বাগদাদের খলিফা উমর অল-নুমান-এর বেটি। আমার প্রকৃত নাম—নুজাৎ অল-জামান। অতএব তোমার চেয়ে আমি কমতি কিসে শুনি?'

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে এল বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

উনসত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদা সারকান তার বিবি নুজাৎ-এর কথা শুনে স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তার স্থিরদৃষ্টি বিবির মুখের ওপর নিবদ্ধ। চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ সুস্পষ্ট। আপন মনে ব'লে উঠলেন—'খোদাতাল্লার একী নিষ্ঠুর

পরিহাস! নিজের বহিনকে শয্যাসঙ্গিনী করেছি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ-শরমের বাত আমি কাকে বলব! আমি এমন কী গুনাহ করেছি যে এমন নির্মম-নিষ্ঠুর শাস্তি আমাকে দিলে?'

নুজাৎ-এর আঁখিতেও পানির ধারা নেমে এল।

এক সময় সারকান নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্ল—'শোন, জানতে যখন পেরেই গেছি তখন আর আমাদের মধ্যে এ-সম্পর্ক বজায় রাখা অবশ্যই সঙ্গত নয়। আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দরবারের উজিরের সঙ্গে তোমার শাদীর বন্দোবস্ত করব। ভুল আমাকে শোধরাতেই হবে।'

নুজাৎ সোল্লাসে সম্মতি দেয়। বলে—'যত তাড়াতাড়ি পার আমাদের এ-অসঙ্গত সম্পর্ক ছিন্ন করার বন্দোবস্ত কর।'

সারকান এক আমীরের সঙ্গে নুজাৎ-এর শাদী দিয়ে ছিল। এ-ঘটনার কয়েক দিন পর বাগদাদ থেকে বাদশাহ উমর-এর বার্তা নিয়ে দূত এল। তাঁর চিঠিতে বক্তব্য—আজ পর্যন্ত নুজাৎ আর মাকান-এর কোন পাত্তা মেলে নি। তাদের শোকে তিনি যার পর নাই কাতর। কনস্তানতিনোপল থেকে এক বুড়ি পাঁচ-পাঁচটি খুব সুরৎ লেড়কি নিয়ে প্রাসাদে এসেছে। কেবলমাত্র সুরতের বিচারেই নয় বিভিন্ন গুণের বিচারেও তারা অতুলনীয়া। বেচতে ইচ্ছুক। তবে তারা অর্থের বিনিময়ে নয়। বাহারী সমানপত্রের দিকেই তার আগ্রহ বেশী। অতএব সারকান যেন সেখানকার আকর্ষণীয় কিছু সমানপত্র পাঠিয়ে দেয়। সে সঙ্গে তার বিবিকেও যেন পাঠিয়ে দেয়। উমর শুনেছেন, সারকান-এর বিবি খুবই বিদুষী। এতএব তাকে দিয়ে লেড়কি পাঁচটির বিদ্যাও জ্ঞানের বহর যাচাই করে নিতে চাইছেন।

বাদশাহ উমর-এর চিঠি পড়ে মহা মুশকিলে পড়ল। উপায়ান্তর না দেখে নুজাৎ'কে ডেকে পাঠায়। সে বুদ্ধিমতী। নিশ্চয়ই পরামর্শ কিছু দিতেই পারবে। সব শুনে সে বল্ল—আমাকে বরং বাগদাদে পাঠিয়ে দাও। সবকিছু আব্বাকে গুছিয়ে বলতেই হবে। আর গোপন রাখা সঙ্গত নয়। এবার সারকান'কে বল্ল—'ভাইজান, তুমি চিঠি লিখে আব্বাকে জানাও, কি করে আমি বাদাবী ডাকাত-সর্দারের হাতে পড়লাম। তারপর সওদাগর মারফৎ কি করেই বা তোমার হাতে পড়ি। তুমি আমাকে চিনতে না পেরে শাদী করেছিলে তা-ও লিখবে। আমরা সহবাস করেছি, এ-কথাটি কেবল কৌশলে চেপে যাবে। তারপর আমার আসল পরিচয় জানতে পেরে তোমার দরবারের আমীরের সঙ্গে আমার যে আবার শাদী দিয়েছ একথা লিখতেও ভুল করবে না।'

সারকান এবার তার আব্বার ফরমাস অনুযায়ী অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য দামাস্কাসের বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে নুজাৎ-এর সঙ্গে বাগদাদে পাঠাবার উদ্যোগ নিল।

এমন সময় সে-বুড়োর সঙ্গে বহু মুলুক ঢুঁড়ে দু অল-মাকান দামাস্কাসে হাজির হ'ল। প্রাসাদের সদর-দরজার সামনে উটের পিঠে সমানপত্র দেখে দু-অল-মাকান জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারল এসব বাগদাদে যাচ্ছে। বাদশাহ উমর অল-নুমান'কে ভেট পাঠানো হচ্ছে। বাগদাদের নামটি কানে যেতেই তার দিল আনন্দে নেচে ওঠে। সে তখনই মনস্থ করে ফেলে তাদের পিছু পিছু বাগদাদে যাবে। বুড়োটি কিন্তু তাকে একা ছাড়তে নারাজ। সে-ও সঙ্গে যেতে চায়।

সারকান-এর ভেট নিয়ে উট বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করল। মাকান গাধার পিঠে চেপে তাদের পিছু নিল। বুড়োটি চল্ল পয়দল।

তিনদিন পথ চলার পর এক মুসাফিরখানার সামনে নুজাৎ-এর তাঁবু পড়ল। মাকানও গাধার পিঠ থেকে নামল। বুড়োকে নিয়ে মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিল।

এদিকে নুজাৎ তার স্বামীর সঙ্গে তাঁবুতে বাস করছে। রাত্রে নুজাৎ-এর ঘুম আসছে না। নিজের নসীবের কথা ভাবতে ভাবতে তার দিল উদাস-ব্যাকুল হয়ে যায়। সে গুটিগুটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে নরম ঘাসের বিছানার ওপর বসে পড়ল। মাথার ওপরে কুমড়ো ফালির মত চান্দ, তার ওপর মাঝ রাত্রের ফুরফুরে বাতাস। এমন সময় মুসাফিরখানার দিক থেকে বাতাসে গানের সুর ভেসে এল। নুজাৎ উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করল। হ্যাঁ, সে-গানটিই তো বটে! তার ভাইয়ার মন পছন্দ গানটিই তো কে যেন গাইছে।

নুজাৎ তার দেহরক্ষী খোজাকে হুকুম করে—'যা, দেখে আয় তো, কে গাইছে!'

খোজা বুড়োকে জিজ্ঞাসা করে কোন হদিস না পেয়ে হতাশ মনে ফিরে গেল, 'বুড়ো ব্যাপারটিতে খুবই ঘাবড়ে গেল।

মুসাফিরখানার ভেতরে গিয়ে মাকানকে বল্‌ল—'তোমার গান আমিরের বিবির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। রেগে একেবারে কাঁই। তাঁর খোজা দেহরক্ষী এসে খুব করে শাসিয়ে গেছে। বিদেশ বিভুঁই, একটু-আধটু সমঝে চল বেটা।'

মাকান তাঁর কথায় পাত্তা দিল না। আবার গুণগুণ করে গান ধরল। নুজাৎ উৎকর্ণ হয়ে গানটি লক্ষ্য করল। না, শোনার ভুল অবশ্যই নয়। তার ভাইয়ার সে-গানটিই তো বটে।

নুজাৎ আবার তার খোজা দেহরক্ষীকে তলব করল। ধমকের স্বরে বল্‌ল—'আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কে গান গাইছে! আর তুই এসে বল্‌লি, আমার শোনার ভুল। যা, ভাল ক'রে খুঁজে দেখ গে, কে গাইছে। তাকে আমার সামনে হাজির করবি।'

বুড়ো এবারও বল্‌ল—'তোমাদের শোনার ভুল। গভীর রাত্রে অনেক সময় এরকম ভুলচুক হয়েই থাকে। মরুভূমির মায়াও মনে করতে পার। মরুভূমিতে মাঝে মধ্যে কতসব অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে যা ভাবাই যায় না। কখনও মনে ধান্দা লাগবে, কেউ যেন গান গাইছে, কখনও মনে হবে গুঁড়াবাচ্চা কেউ কাঁদছে, আবার অনেক সময় বেহেস্ত থেকে হুরী পরী নেমে এসেও কতসব বিচিত্র কাণ্ড ঘটায়।'

খোজা ফিরে যায়। নুজাৎ'কে মরুভূমির মায়ার কথা উল্লেখ করে। দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে কেউ-ই গান গায় নি।

নুজাৎ এবার এক থলি সোনার মোহর খোজাটির হাতে দিয়ে বল্‌ল—'মোহরের লোভ দেখাবি। দেখবি, যে গান গাইছিল স্বীকার করবে এবং তোর সঙ্গে আসতেও রাজী হবে।'

খোজা এবার বুঝল, ঘুমের ব্যাঘাতের ব্যাপার স্যাপার নয়। অন্য কোন রহস্য এর পিছনে রয়েছে। আমীর আদমীদের মর্জি, সাধারণের বোধগম্য হবার নয়।

নিরুপায় হয়ে মোহরের থলিটি নিয়ে খোজা আবার ছুটল মুসাফিরখানার দিকে। বুড়োকে গিয়ে বলে,—'তুমিই গান গাইছিলে। আমার মালকিন-এর কাছে একবারটি চল। ভয় ডরের কিছুই নেই। তিনি শুধু তোমাকে এক নজর দেখতে চাইছেন। এই যে এতগুলো মোহর পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

এমন সময় প্রভাতের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সত্তরতম রজনী

গভীর রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বুড়োটি এবার মাকান'কে ডেকে খোজার সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়ে দিল। সব কিছু শুনে সে তো বিস্ময়ে একেবারে ভিমড়ি খাওয়ার জোগাড়। তার গান শুনে আমিরের বিবি তাকে তলব করেছেন, বিশ্বাস করতেও যে উৎসাহ পাচ্ছে না। আবার ঘুঁষ বা ইনাম যা-ই হোক না কেন এক থলি মোহরও তার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বুড়োর বারণ সত্ত্বেও মাকান খোজাটির পিছন পিছন তার মালকিনের তাঁবুর দিকে হাঁটতে লাগল।

তাঁবুর কাছে পৌঁছে মাকান'কে বাইরে দাঁড় করিয়ে খোজা ভেতরে গিয়ে গায়কের আগমন বার্তা জানাল।

নুজাৎ তাঁবুর ভেতরে থেকেই খোজাকে বল্‌ল—'তার নাম ধাম জিজ্ঞাসা কর। আর একটু আগে যে-গানটি গাইছিল সেটি তাকে আবার গাইতে বল।'

খোজার মুখে তার মালকিনের ফরমাস শুনে মাকান বল্‌ল—'গান শুনতে চান একবার কেন পাঁচবার শোনাব। কিন্তু নাম-ধাম বলতে পারব না। এখন পথই আমার ঠিকানা। মুসাফির হয়ে মুলুকে মুলুকে টুঁড়ে বেড়াচ্ছি। আর আমার নামও অনেক আগেই হারিয়ে গেছে।'

মাকান গান শুরু করল। কয়েক কলি গাইতে না গাইতেই নুজাৎ উন্মাদিনীর মত তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই—'মাকান! ভাইয়া আমার! ভাইয়া'—বলতে বলতে তাকে দু' হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল। ব্যাস, আর কিছুই বলা হয়ে উঠল না। দুম্ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌ল।

এমন সময় প্রভাত হয়ে আসছে বুঝতে পেরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একাত্তরতম রজনী।

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, নুজাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দু অল-মাকান এবার তার দিদি নুজাৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে টেনে তুল্‌ল। নুজাৎ-এর সংজ্ঞা ফিরে এল। বহিন আর ভাইয়া আনন্দে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কোন কথা নেই। কেবল নীরবে একে অন্যের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

নুজাৎ এবার তার ভাইয়া মাকান'কে পাশে বসিয়ে নিজের অতীত-কাহিনী বল্‌ল। মাকানও তার দুঃখের দিনগুলোর কথা দিদির কাছে ব্যক্ত করল। তবে একথা বলতে ভুল্‌ল না যে, তার সঙ্গের বুড়োটির জন্যই তার জান রক্ষা পেয়েছে।

এমন সময় নুজাৎ-এর স্বামীর নিদ টুটে গেল। গভীর রাত্রে তার বিবির পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবককে দেখে যার পর নাই বিস্মিত হয়।

নুজাৎ তার মানসিক পরিস্থিতির কথা অনুমান করতে পেরে ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমি ভরা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'কি গো ভালমানুষ, ভাবছ এত রাত্রে আমি কাকে পাশে বসিয়ে কথা বলছি, তাই না? ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। আমার সহোদর ভাইয়া দু-অল মাকান। বাদশাহ উমর অল-নুমান-এর ছোট লেড়কা।'

নুজাৎ এতদিন তার স্বামীর কাছে নিজের আসল পরিচয় দেয় নি। আজই প্রথম নিজের জীবনের দুঃখময় ঘটনাবলী সংক্ষেপে প্রকাশ করল। এবার সে জানতে পারল আরবের সর্বেসর্বা বাদশা উমর-এর জামাতা সে। সে বাদশাহের জামাতা আর বাদশাহ্ তার শ্বশুর। একী কম কথা! সে আপন মনে বলে উঠল—'হায় শুভন আল্লাহ! আমি বাদশাহের জামাতা!'

পাখির ডাকে সকাল হ'ল। নুজাৎ ও তার স্বামীর নির্দেশে খোজা এবার ছুটল মুসাফিরখানা থেকে সে-বুড়োটিকে নিয়ে আসতে।

বুড়ো তখন গাধাটিকে গাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াচ্ছে। খোজাকে দূর থেকে দেখেই তার কলিজাটি দড়কচা মেরে যাবার জোগাড় হ'ল। সে ধরেই নিল, আজ তার গর্দান যাবেই, কেউ-ই রুখতে পারবে না। লেড়কাটির জান নিয়েছে, এবার তাকেও খতম করতে এসেছে।

হ্যাঁ, সে যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তা-ই। খোজাটি কাছে এসেই বল্‌ল—'চল আমার সঙ্গে। তোমায় শূলে চড়ানো হবে। তুমি বার বার মিথ্যে কথা বলে আমাকে তাড়িয়েছ, কে গান গাইছিল তুমি জানতে না, তাই না? মিথ্যুক কাহাকার।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

বাহাত্তরতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, খোজাকে দেখে বুড়ো তো পৌনে মরা হয়ে গেল। বুড়ো যত মুষড়ে পড়ে খোজা ততই তড়পায়। সে এবার কোর্তার কলার নাচিয়ে বলে—'আমার সঙ্গে মস্করা করার মজা টের পাবে এবার। তোমাকে শূলে না চড়ালেও গর্দান তো নেওয়া হবেই। আর যদি নসীব খারাপ হয় তবে গর্দানও যাবে শূলেও চড়াবে। তবে কোনটি আগে হবে তা মালিক-মালকিনই ঠিক করবেন।'

বুড়ো তো কোরবাণির খাসির মত কাঁপতে কাঁপতে জান হাতে নিয়ে খোজাটির পিছন পিছন চল্‌ল।

কয়েক পা গিয়েই বুড়োটি কাঁপা কাঁপা গলায় বল্‌ল—'শোন গো ভাইজান, যে-ছোকরাটি গান গাইছিল সে আমার কুটুম সাক্ষাৎ কেউ-ই নয়। পথের পরিচয়। ব্যস, এর বেশী কিছু ভেবে কিন্তু আমার শাস্তির বরাদ্দ আবার বাড়িয়ে দিয়ো না। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, ছোকরাটি আমার কেউ-ই নয়।'

খোজাটি তামাশা দেখার জন্য এবার বল্‌ল—'এসব কথায় আর কাজ হবার নয়। সাফ কথা, তোমরা দু' জনে বিবি সাহেবার নিদ টুটিয়েছ। দু' জনকে সমান সাজা দেওয়া হবে।'

বুড়ো তাবুতে গিয়ে যেন ধড়ে জান ফিরে পেল। শুকিয়ে ওঠা কলিজাটি যেন পানির ছোঁয়া পেল। সাজা দেওয়া তো দূরের কথা তাকে বরং নুজাৎ মণ্ডা মিঠাই দিয়ে আপ্যায়ন করল।

নুজাৎ ও তার সঙ্গী-সাথীরা আবার পথে নামল। বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছোতে না পৌঁছতে তারা এক বিশাল অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হ'ল। তাদের সঙ্গে সুলতানের পতাকা।

নুজাৎ ও তার সহযাত্রীরা উট থামাল। অশ্বারোহী বাহিনীর পাঁচজন প্রধান ঘোড়ায় বসেই প্রশ্ন করল—'তোমরা কে? কোথা থেকে আসছ, চলেছই বা কোথায়?'

নুজাৎ-এর স্বামী তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বল্‌ল—'আমরা দামাসকাস থেকে আসছি।'

দামাসকাসের নাম শুনেই অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধানদের আগ্রহ বেড়ে গেল। তারা আবার অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল—'দামাসকাস? দামাসকাস থেকে আসছ? পরিচয় কি?'

—'আমি দামাসকাসের দরবারের সচিব। শাহজাদা সারকান-এর পক্ষ থেকে বাগদাদের বাদশাহ উমর অল-নুমান-এর কাছে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে বাদশাহের ভেট রয়েছে।'

—'আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বাদশাহ উমর অল-নুমান দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে চলে গেছেন।'

—'সে কী কথা। আকস্মিক মৃত্যু—কিভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটল?'

—'বিষক্রিয়ায়। মৃত বাদশাহের উজির দানদান আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। মেহেরবানি করে একবারটি চলুন তাঁর সঙ্গে বাতচিত করবেন। তার মুখ থেকে বাদশাহের মৃত্যুর কথা বিস্তারিতভাবে শুনতে পাবেন।'

উজির দানদান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'হ্যাঁ, বিষক্রিয়ায়ই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিভাবে, কাদের দ্বারা এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল পরে বলব। সবার আগে আমাদের কাজ বাগদাদের বাদশাহ নির্বাচন করা। আমি ইতিমধ্যেই সেখানকার চারজন কাজীর মতামত নিয়েছি। তাদের বক্তব্য শাহজাদা সারকানই মসনদের দাবীদার। তাই আমরা সদলবলে দামাসকাসে তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করতে চলেছি। তবে বাগদাদের জনসাধারণের মত দু-অল-মাকানকেই মসনদে বসানো হোক।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উজির এবার বল্‌লেন—'কিন্তু কোথায় পাব তাকে? সে যে আজ দু' বছরের ওপর বাগদাদ ছাড়া। তার বড় বহিন নুজাৎ'কে নিয়ে মক্কায় পাড়ি দিয়েছে। ব্যস, বহুৎ তল্লাসী চালিয়েও তাদের কোন পাত্তা মেলে নি।'

বাদশাহ উমর অল-নুমান-এর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত হলেও দু অল-মাকান-এর সিংহাসন প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা শুনে নুজাৎ-এর স্বামীর দিল খুশীতে নেচে ওঠে। কারণ সে মসনদে বসলে তার নসীব খুলে যাবে, সন্দেহ নেই। বাগদাদের ওপর তার প্রভাব ও প্রতিপত্তিও কম হবে না।

এমন সময় প্রভাতের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিয়াত্তরতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হলে বাদশাহ শারিয়ার কিস্‌সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, দু-অল-মাকান-এর বাগদাদের মসনদ প্রাপ্তির কথা শুনে নুজাৎ-এর স্বামীর দিল আনন্দে নেচে উঠল। কোনরকমে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বিষণ্ণ মুখে বল্‌ল—'আজকের এ নিদারুণ শোক তাপের মধ্যেও আপনাকে একটি খুশীর খবর দিচ্ছি—নুজাৎ অল-জামান আর তার ভাইয়া দু-অল-মাকান-এর হদিস মিলেছে। নুজাৎ আমার বেগম। তারা দু'জনই আমাদের সঙ্গে আছে।

উজির দানদান চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে নুজাৎ-এর স্বামীর মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। একেবারে স্তম্ভিত। মুখ দিয়ে রা সরছে না।

নুজাৎ-এর স্বামী এবার সংক্ষেপে নুজাৎ এবং মাকান-এর দু' বছরের বিড়ম্বনার কাহিনী তাঁর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল।

উজির দানদান অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে সব শুনলেন। এবার সোল্লাসে চেঁচিয়ে সেনাপতি ও আমীর-ওমরাহদের কাছে ডাকলেন। বল্‌লেন—'আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত শাহজাদা দু অল-মাকান-এর হদিস মিলেছে। এবার আপনারা ভাবুন, আলোচনার মাধ্যমে স্থির করুন, বাগদাদের মসনদে কাকে বসাবেন।

ছাউনি পড়ল। বিস্তীর্ণ ময়দানে সভা বসল। তারা সবাই যাচ্ছিল দামাস্কাসে শাহজাদা সারকান-এর সঙ্গে মোলাকাত করতে। তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাগদাদে নিয়ে মসনদে বসাতে। এখন দু-অল-মাকান-এর হদিস মেলায় পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। অতএব আলোচনার দরকার অবশ্যই রয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে তারা পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছল। মৃত বাদশাহ উমর-এর ছোট লেড়কা দু-অল-মাকানকে বাগদাদের মসনদে বসাবে। বাদশাহের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবে।

এদিকে নুজাৎ আব্বার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কেঁদে আকুল হয়। মাকানও ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

নুজাৎ ও মাকান পিতার শোক একটু সামলে নিলে নুজাৎ-এর স্বামী এবার মাকান'কে বল্‌ল—'উজির দানদান এবং সাম্রাজ্যের আমীর-ওমরাহরা একমত হয়েছেন, তোমাকেই বাগদাদের মসনদে বসাবেন। এবার বল, তোমার কি মত?'

মাকান কিন্তু এতবড় একটি খবর শুনেও উল্লসিত হতে পারল না। সে বেঁকে বসল। প্রবল আপত্তি তুলে সে বল্‌ল—'সে কী, আমি বাগদাদের মসনদে বসব কি! আমার বড় ভাইয়া বর্তমান থাকতে আমি বাগদাদের মসনদে! অসম্ভব, এ হয় না। হতে পারে না। তার দিলে দাগা দিয়ে আমি কিছু করতে উৎসাহী নই।'

দু-অল-মাকান-এর ভগ্নিপতি দেখল সব ভেস্তে যাচ্ছে। তাই

সে পরামর্শ দিল—'ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকবে, বড় ভাইয়ার দিলে দাগা তোমাকে দিতে হবে না। এক কাজ করা যাক, রাজ্যের গণ্যমান্য আদমিরা যখন চাইছেন তখন তোমার অভিষেক পর্ব এখানেই চুকিয়ে নেওয়া যাক। তুমিই বাদশাহের পদে অভিষিক্ত হও। পরে সুযোগ মাফিক সারকান'কে তলব করে, রাজ্যকে দু' ভাগ করে, এক অংশের শাসক তুমি হবে আর অন্যটির শাসনক্ষমতা সারকানকে দেওয়া যাবে। এতে তোমাদের মধ্যে পেয়ার মহব্বৎ অক্ষুণ্ণ থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

দু'-অল-মাকান এবার আর অমত করতে পারল না। বাদশাহী সাজ বাগদাদ থেকে সঙ্গে করেই আনা হয়েছিল। উজির দানদান-এর নির্দেশে দু-অল-মাকান'কে সাজগোছ করিয়ে একেবারে সাচ্চা বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হ'ল। তার হাতে তুলে দেওয়া হ'ল সোনার তরবারি। অভিষেককালে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে এটি লাভ করে আসছে।

দু-অল-মাকান সোনার তরবারিটি মাথায় ঠেকিয়ে হলফনামা পাঠ করল। হলফনামার মর্মার্থ—'আমি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে ব্রতী থাকব।'

এবার আমীর-ওমরাহরা নব অভিষিক্ত বাদশাহকে কুর্নিশ জানিয়ে হলফ করল—'আজ থেকে আপনাকে আমাদের মহামান্য বাদশাহ হিসাবে মান্য করতে কসুর করব না। আর আপনার হুকুম শিরোধার্য জ্ঞান করব।'

ইতিমধ্যে প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় পাখিদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চুয়াত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার আবার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এর পর কি হ'ল বলছি, শুনুন।'

অভিষেক পর্ব চুকে গেলে এক বাদশাহী ভোজসভার আয়োজন করা হ'ল।

ভোজসভায় খানাপিনা সারতে সারতে উজিরকে নুজাৎ বল্‌ল—'কিভাবে আব্বাজানের মৃত্যু হয়েছে মেহেরবানি করে সে কথা বল্‌বেন কি?'

উজির দানদান ম্লান হেসে বল্‌লেন—'বেটি, অবশ্যই বলব। আর তোমাদের তা বলা তো আমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। বলছি তবে শোন—তোমরা বাগদাদ ছেড়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করার পর তোমাদের বহুৎ তল্লাশ করা হ'ল। এ-মুলুক সে-মুলুকই কেবল নয় তামাম মক্কা-মদিনা ঢুঁড়ে বেড়ানো হ'ল। যাকে বলে একেবারে চিরুণী-তল্লাসী। কিন্তু কেউ-ই কোন হদিস দিতে পারল না। তোমাদের অদর্শন ও শোক-তাপে বাদশাহ মনমরা হয়ে হরবখত প্রাসাদেই কাটাতে লাগলেন। দরবারে তাঁর উপস্থিতিও অনিয়মিত হয়ে পড়ল। এমন সময় এক বুড়ি এল প্রাসাদে। তার সঙ্গে পাঁচ-পাঁচটি খুবসুরৎ লেড়কি যুবতী। তাদের প্রত্যেকের দেহেই যেন লেগেছে যৌবনের জোয়ার, আর বসেছে রূপের হাট, পরদেশিয়া। কনস্‌তানাতিনোপল থেকে এসেছে বুড়িটি। আমাকে বল্‌ল, বাদশাহের সঙ্গে ভেট করতে চায়। যুবতী পাঁচটিকে বাদশাহের হাতে তুলে দেয়ার জন্যই নাকি এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে তাদের নিয়ে এসেছে। বুড়ি দৃঢ়তার সঙ্গেই বল্‌ল—'কেবলমাত্র সুরৎ-এর বিচারেই নয়। তাদের মত সর্বগুণসম্পন্না লেড়কি নাকি তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও আর একটি মিলবে না।

বাদশাহের কাছে খবর পাঠালাম। তিনি বুড়িকে তলব করলেন। লেড়কি পাঁচটিকে চাক্ষুষ করলেন। তখনও তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায় নি বটে। তবে এমন সুরৎ অন্য কোন লেড়কির মধ্যে জিন্দেগীতে দেখি নি। বাদশাহও বহুভাবে তাদের সুরৎ-এর তারিফ করলেন।

বাদশাহ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'কি গো রূপসীরা, তোমাদের গুণের কথা বুড়ি যা কিছু বলছে, সত্যি কি?'

লেড়কিরা সমবেত ভাবে কুর্নিশ সেরে সমবেত কণ্ঠেই বল্‌ল—'বিলকুল ঠিক।'

—'বহুৎ আচ্ছা, কি কি বিদ্যা তোমরা রপ্ত করেছ দু'-একটি নমুনা দেখাও তো, দেখি।'

লেড়কিদের মধ্য থেকে একটি লেড়কি কুর্ণিশ করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, বলছি শুনুন—মানুষ জিন্দা থাকে কেন? তার কারণ সে নিজের ওপর প্রভুত্ব দেখাতে আগ্রহান্বিত। এ কোসিস করতে গিয়ে সে খোদাতাল্লার দোয়ায় জিন্দা থাকতে চায়। শির তুলে খাড়া হতে চায়। সবার সেরা হতে, নাম-খ্যাতির অধিকারী হতে আগ্রহান্বিত হয়।'

আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠান কেন? কারণ সে যাতে নিজেকে এবং অন্য দশজনকেও সুন্দর করে গড়ে তোলে। নবাব বাদশাই প্রথম পুরুষ। তাঁর পুণ্য বলেই প্রজারা হয় পুণ্যবান। তাঁর সুখেই প্রজাদের সুখ উৎপাদিত হয়, আর তাঁর দুঃখেই তারা হয় দুঃখিত-মর্মাহত। জ্ঞানী ও বোদ্ধারা মিতভাষী, বিনম্র, বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যনিষ্ঠ হন। প্রকৃত দোস্ত-জিগরী দোস্তকে বাছাই করে নিতে সক্ষম হন। শত্রুকে দূরে ঠেলে রাখেন। আর দোস্তের জন্য জান কবুল করতেও কুণ্ঠিত হন না। কারণ, তিনি তো ভালই জানেন, তামাম দুনিয়ায় জিগরী দোস্ত বিনা আর সবই সুলভ। দোস্তের সঙ্গে মেহবুবা, এমন কি বিবির তুলনা পর্যন্ত করা যায় না। এক মেহবুবাকে ছেড়ে অন্য জনকে পাকড়াও করা যায়, এক বিবিকে তালাক দিয়ে অন্য লেড়কিকে শাদী করে বিবি বানিয়ে ঘরে নিয়ে আসাও সম্ভব। কিন্তু দোস্তের সঙ্গে বিবাদ বাঁধলে, বিচ্ছেদ ঘটলে অন্য দোস্ত পাকড়াও করা অসম্ভব। দোস্তীতে যদি চিড় খায় তবে তা আর জোড়া দিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

পয়গম্বরের একটি বাণী বলছি শুনুন—'এক কাজী আমীর আর ভিখমাঙার মধ্যে কোনই ফারাক-জ্ঞান করতেন না। সবাইকেই তিনি সমজ্ঞান করতেন। বিচারের সময় নিরপেক্ষতার মুল্য দিতেন। যা ন্যায় ও সঙ্গত সে-রায়ই প্রদান করতেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেওয়ার দিকেই তার প্রধান নজর থাকত। যদি কোন ব্যাপারে তা সম্ভব না হ'ত তবে বিভিন্ন দিক থেকে সম্পূর্ণ ঘটনাটির বিচার-বিবেচনা করে দেখার চেষ্টা করতেন। আর সাক্ষী-প্রমাণের মারফৎ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তবেই রায় দান করতেন। সামান্যতম দ্বিধা থাকলেও রায় দানে ব্রতী হতেন না। নতুন ক'রে পুরো ব্যাপারটির পর্যালোচনা শুরু করতেন।

কাউকে ভয় ডর দেখিয়ে জুলুম চালিয়ে আর ভুখা রেখে তাকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া কোন বিচারকের উচিত বলে গণ্য হয় না। এর মাধ্যমে সত্য উদ্ধার করা, সুবিচার করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ পেটের জ্বালায়, জুলুমের ডরে ঝুটবাতকেই সাচবাত বলে স্বীকার না করে পারে না।

দিগ্বীজয়ী সম্রাট আলেকজান্দার মুলুক জয় করতে বেরিয়ে হরবখত তিনজনকে কাছে কাছে রাখতেন। তাঁদের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, একজন বিচক্ষণ-বিচারক আর একজন দক্ষ রসুইকর। তিনি বলতেন, অপরাধী সেনার বিচার নিজে করতে গেলে ক্রোধপরায়ণ হয়ে হয়ত নামমাত্র অপরাধের ক্ষেত্রে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিতে পারি। তাই একজন বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ বিচারক অত্যাবশ্যক।

আর শিক্ষকের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি বলতেন—যোগ্য শিক্ষক অপরিহার্য এই জন্য যে, লেড়কা লেড়কির পড়ালিখা বিনা দুনিয়ার সব কিছুই আন্ধার। উপযুক্ত শিক্ষক বিনা সুশিক্ষা দান কিছুতেই সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের ভিত মজবুত করতে হলে যোগ্য শিক্ষক তো চাই-ই চাই।

অভিজ্ঞ পাচকের প্রয়োজন সম্বন্ধে আলেকজান্দার-এর অভিমত এই যে, পাচক আমার তবিয়তের দিকে নজর রাখবে। আমার খানাপিনার ভার যদি আমারই ওপর বর্তায় তবে অধিকাংশ দিন ভুখাই থাকতে হবে।

লেড়কিটি এ পর্যন্ত বলে কুর্ণিশ জানিয়ে পিছু হঠে গেল।

এবার অন্য এক লেড়কি কুর্ণিশ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করে—জাঁহাপনা, এবার আমার কথা শুনুন। এক সময় লুকমান নামে এক দার্শনিক ছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন দুনিয়াতে তিন প্রধান সত্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনটি মোক্ষম কষ্টিপাথরের অস্তিত্ব বর্তমান। (ক) যে যথার্থ বীর তার পরিচয় লড়াইয়ের সময়ই মিলতে পারে। মুখে যে আদমি শের মারে তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার প্রয়োজন নেই। (খ) কোন আদমির কেবলমাত্র গোস্‌সার সময় তার সততা ও মহত্বের পরিচয় মিলতে পারে। গোস্‌সা মানুষের আসলী রূপ উন্মোচন করে দেয়। (গ) তোমার জিগরী দোস্ত কে তা বুঝতে পারবে তোমার তকলিফের
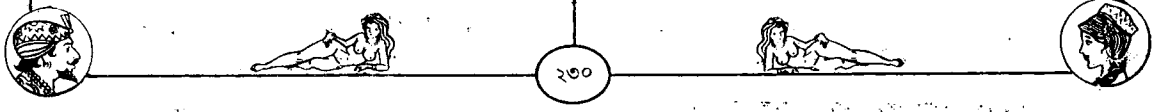
মুহূর্তে। যে দোস্ত পাশে দাঁড়িয়ে তোমার তকলিফ বিনাশ করতে তোমার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে চেষ্টা করে তাকেই জিগরী দোস্ত জ্ঞান করবে।

তোষামাদকারীদের তোষামদ সত্ত্বেও দাম্ভিক-অত্যাচারী শাসক তার উচিত শিক্ষা লাভ করে। লাঞ্ছিত-অত্যাচারিত ব্যক্তি একদিন না একদিন সুবিচার লাভ করবেই। সুশাসক তার প্রজার ওপর তার কর্ম অনুযায়ীই আচরণ করে থাকে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ কাজ করতে গিয়ে বিপদে জড়িয়ে পড়েছে সেদিকে নজর দিয়ে বিচারের রায় দান অবশ্যই উচিত নয়। তার আসল ধান্দার তল্লাস করা দরকার। হৃদয়ই হচ্ছে মনুষ্যদেহের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। কাউকে মন্দ বলে মনে করার অর্থই হচ্ছে তার হৃদয়টি খারাপ। আর এ জন্যই সে মনুষ্যদেহ ধারণ করলেও মানুষ বলে গণ্য হয় না।

কোন এক সময় ইজরায়েলে দুই ভাইয়া বাস করত। ভাইয়াদের মধ্যে একজন অন্য ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করল —'ভাইজান, আজ পর্যন্ত তুমি যা কিছু করেছ তাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমার মতে সবচেয়ে কঠিন কাজ মনে করেছ, বল তো?'

বড় ভাইয়া তার প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিল—'বলছি তবে শোন, একদিন আমি মুরগীর খামারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন একটি মুরগীকে দু' হাতে ধরে ফেলি। দেখলাম, সে তার মাথাটিকে চট করে চক্কর মেরে ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। পর মুহূর্তেই মাথাটিকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে ফিন মাথাটি সোজা অবস্থায় নিয়ে গেল। ব্যাপারটি আমার মধ্যে বিস্ময় উৎপাদন করল। ভাবতে লাগলাম, একটি মুরগী অনায়াসে যা ক'রে ফেল্‌ল আমি মানুষ হয়ে কি তা শতবার চেষ্টা করেও সম্পন্ন করতে পারব না? কোন্ কাজ তোমার কাছে কঠিন বোধ হয়েছে, এবার বল তো?

ছোট ভাইয়া নিজের কথা বল্‌ল—'আমি একদিন ভাবলাম, খোদাতাল্লার কাছে কিছু মাঙবো। নামাজ পড়ার সময় তাঁকে স্মরণ করলাম, কিন্তু হায়! আমার পক্ষে কিছুই প্রার্থনা করা সম্ভব হ'ল না। জিভ যেন আড়ষ্ট হয়ে এল।'

এ পর্যন্ত বলার পর দ্বিতীয় লেড়কিটি চুপ করল। অন্য একটি লেড়কি এবার উঠে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে বল্‌ল—জাঁহাপনা আমি কেবলমাত্র দুটো নীতির কথা আপনার দরবারে পেশ করছি—(ক) সুফিয়া বলেছেন—মানুষের মুখই তার দিল্-এর আয়না। আর (খ) মানুষের আত্মশুদ্ধি হলে তবেই সে বেহেস্তে যেতে সক্ষম হয়।'

এবার চতুর্থ লেড়কি এগিয়ে এসে দাঁড়ায়।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পঁচাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, চতুর্থ লেড়কি এবার তার বক্তব্য শুরু করল—

ইবরাহিম মিঞা একবার একটি কিস্‌সা বলেছিলেন—এক ভিখারী পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াত। একদিন সে হঠাৎ একটি তামার পয়সা হারিয়ে ফেল্‌ল। আমার দুঃখ হ'ল। তার দিকে আমি একটি রুপোর টাকা এগিয়ে দিলাম। সে কিছুতেই নিল না। সে সাফ জবাব দিল, আমি হারিয়েছি তামার পয়সা, রুপোর টাকা নিয়ে ফ্যাসাদে পড়বো নাকি হে? পয়সাটি আমি অনায়াসে খরচ করে ফেলতে পারবো। কিন্তু রুপোর টাকা? টাকা হাতে এলে সেটি ভাঙাতে দিল কিছুতেই চাবে না।

মনসুর ইবন একবার এক কিস্‌সা বলেছিলেন। কিস্‌সাটি মোটামুটি এরকম—একবার আমি মক্কায় হজ করতে যাচ্ছিলাম। আন্ধার রাত। কৃষ্ণ শহরের পথ দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ একটি লোকের তারস্বর কানে এল। লোকটি চেঁচিয়ে বল্‌লে—হা আল্লাহ আমি তোমার গোলাম! তোমার অভিপ্রেত অমান্য করার মত হিম্মৎ আমার নেই। কিন্তু নসীবের ফেরে আজ আমি পাপী। তোমার হুকুম আমি যথাযথ ভাবে পালন করব। তুমি আমার গুণাহ নাশ করে দাও।'

আল্লাহ-র কাছে এ-প্রার্থনা জানাবার পর মুহূর্তেই আচমকা ভয়ানক এক শব্দ হ'ল। কোন কিছু যেন নিচে পড়ে গেল। আন্ধার রাত। কোন কিছুই ঠাওর ক'রে উঠতে পারলাম না। বহুৎ চিল্লাচিল্লি হাঁকডাক করলাম। তবু কারও কণ্ঠই কানে এলো না। অনন্যোপায় হয়ে আমি আমার মাথাগোঁজার জায়গাটিতে চলে গেলাম।

পরদিন সকালে একটি শবদেহ গোরস্থানে নিয়ে যেতে দেখলাম। শবযাত্রীদের মধ্য থেকে শোকসন্তপ্ত এক অতিবৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, —'কে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে হে?'

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লোকটি বল্‌ল—'আমার লেড়কা গত কাল নামাজের পর উপস্থিত সম্মানীয় ব্যক্তিদের আল্লাহ-র বাণী শোনাচ্ছিল। তার বক্তব্যের মাঝে এক জায়গায় ছিল—তোমাদের মধ্যে যে বা যারা আমার কথায় আস্থাবান, তাদের প্রতি আমার নির্দেশ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয় উন্মুক্ত কর।' এ পর্যন্ত বলে সে চুপ করল।

এবার এক পথিক পবিত্র ধর্মগ্রন্থের এ-বাণী শোনামাত্র নিজের বুকে এক ছুরির ফলা আমূল গেঁথে দিয়ে কলিজাটি টেনে বের করে নিল।

শেষ লেড়কিটি এবার এগিয়ে এল। সে তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বল্‌ল—এক দার্শনিক সাফ বলেছেন, প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের খোঁজ যে রাখে না, তার পক্ষে খোদাতাল্লার করুণা প্রত্যাশা করাও উচিত নয়। একজন প্রতিবেশীর কাছে যে ঋণ সঞ্চিত রয়েছে সহোদর ভাইয়ার কাছে তা জমা হয় না।

ইবন্ আদহাম একবার মক্কা থেকে হজ সেরে ফিরে আসার সময় তাঁর এক দোস্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, —'কেমন জীবন যাপনে তুমি আগ্রহী?'

তার দোস্তটি জবাব দিয়েছিল—'আমি খুবই কম খানাপিনা করি। যেদিন কিছু হাতে পাই খাই, অন্যথায় আশা ক'রে থাকি যদি কিছু খানা জুটে যায় তবে খাব, আর যদি না-ই জোটে তবে উপোষ ক'রে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকব। কিছুই খাব না।'

ইবন্ আদহাম-এর মুখে কিছুই আটকায় না। যাকে যা বলার মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দেন। তাঁকে বলেছিলাম, বাঘ-এর কুকুরগুলোর স্বভাবও কি সেরকমই। আমার কথা বল, খোদাতাল্লা যেদিন জুটিয়ে দেন সেদিন নিজেকে ভাগ্যবান ভাবি, পঞ্চমুখে তাঁর গুণ গাই এবং যেদিন বিমুখ করেন সেদিন তাকে সুক্রিয়া জানাই।

এবার লেড়কিটি সরে দাঁড়ায়। এবার তাদের নেত্রী উঠে দাঁড়ায়। সে-বুড়িটির কথা বলছি। সে তার বক্তব্য শুরু করে—ইমাম অল-সাফি-র বক্তব্য হচ্ছে—একটি রাত্রিকে তিনটি যামে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যামে পাঠাভ্যাস, দ্বিতীয় যামে নিদ আর তৃতীয় যামে নামাজ-এর কথা ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য জীবনের শেষ ধাপে পুরো রাত্রিই তিনি বিনিদ্র কাটিয়েছেন।

ইমাম আর একবার বলেছেন—কিঞ্চিৎ মাত্র যবের রুটি খেয়ে আমি দশটি সাল গুজরান করেছি। অধিক আহার দেহকে ভারী করে তোলে। বুদ্ধি ভোঁতা হয়। অবসাদ আসে, শরীর ঘুমে নেতিয়ে পড়ে। কাজের প্রতি অনাগ্রহ দেখা দেয়।

একবার ইবন ফুয়াদ বলেন—আমি একদিন নামাজের আগে রুজু করার জন্য ব্যস্ত-পায়ে নদীর দিকে যাচ্ছি। এমন সময় এক বুড়ো, সাদা দাড়ি-গোঁফ মুখে, আমাকে লক্ষ করে বল্‌লেন—বেটা, এত হুড়োহুড়ি করছ কেন? নিষ্ঠার সঙ্গে রুজু কর। নিষ্ঠার অভাব থাকলে নামাজের ফল কিছুই পাবে না।

বুড়ো নদীতে নামলেন। যত্নের সঙ্গে হাত-মুখ ধুলেন। এবার ধীর-পায়ে মসজিদের দিকে হাঁটলেন। আমি তার পিছু নিলাম। এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বেটা, কিছু বলবে কি?

আমি হাত কচলে নিবেদন করলাম, মেহেরবানি করে যদি বলেন কিভাবে চললে আল্লাতাল্লাকে লাভ করতে পারব, বড়ই উপকার হয়।

—'সবার আগে নিজেকে জানতে-চিনতে কোসিস কর। যখন নিজেকে পুরোপুরি জানতে পারবে তখন নিজে থেকেই তাকে পেয়ে যাবে।'

খলিফা আবু জাফর অল-মনসুর আবু হানিফাকে তিনি বাৎসরিক দশ হাজার দিরহাম বেতন দিয়ে তার মুলুকের প্রধান বিচারপতির পদে বহাল করলেন। তার পরদিন সকালে প্রধান খাজাঞ্চিকে আবু হানিফার কাছে পাঠালেন। অতি সাধারণ পোশাক পরে আবু হানিফা ঘর থেকে বেরোলেন। প্রধান খাজাঞ্চি তাঁর সামনে দশ হাজার দিরহামের থলেটি রাখলেন। আর সুলতানের হুকুমনামা পেশ করলেন। আপনার এক সালের বেতন হিসাবে দশ হাজার দিরহাম অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর বলেছেন, এ অর্থ

কোনরকম অসৎ পথে অর্জিত নয়। তিনি যেন নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন।

হানিফা দিরহামের থলেটি ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন এ দিরহামগুলো সৎ পথে অর্জিত হতে পারে বটে। কিন্তু সুলতান তো নিজেই অসৎ, অত্যাচারী, দাম্ভিক ও অবিবেচক। এমন একজনের নোকরি করতে আমি উৎসাহী নই।'

বুড়িটি এবার বল্ল—অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। আজ এ পর্যন্তই থাক। সুলতান যদি সত্যিই আগ্রহী হন তবে পরে না হয় আবার শোনানো যাবে।

বাদশাহের উজির দানদান কিছু সময়ের জন্য বিরতি দিলেন। একটু দম নিয়ে এবং দু-অল-মাকান-এর অত্যুগ্র আগ্রহ লক্ষ্য করে এবার বল্লেন—'বুড়ি আর তার সঙ্গিনী পাঁচটি লেড়কির প্রশংসা বাদশাহ শতমুখে করতে লাগলেন। প্রাসাদের অন্দর মহলের যে কামরাগুলো ইরবিজা ভোগ করত সেখানে এদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য উজির দানদানকে হুকুম দিলেন।

এবার থেকে বাদশাহ রোজ নিজে এসে বুড়ি ও তার লেড়কি পাঁচটির খোঁজখবর নিয়ে যান। তাদের কোনরকম তকলিফ হচ্ছে কিনা নিজে চোখে দেখে যান।

বুড়িটি সারাদিন কিছুই খানাপিনা করত না। রাত্রে কেবল একটি যবের রুটি আর সরবৎ খেত। দিনভর আল্লাতাল্লার প্রার্থনায় ডুবে থকেত। বুড়ির কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাপার-স্যাপার বাদশাহকে আরো অভিভূত করে তুলল। তার প্রাসাদ যেন তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতা লাভ করেছে। তিনি যার-পরনাই উল্লসিত হলেন। দশ-দশটি দিন এভাবে কেটে গেল। বাদশাহ আমাকে বল্লেন—'এবার আসল বাতচিত হয়ে যাক। বুড়িকে জিজ্ঞেস কর, কি দাম সে প্রত্যাশা করে?'

বুড়ি আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্ল—'ধনদৌলত আমি কিছুই নেব না। কেবলমাত্র একটি শর্তেই এদের হস্তান্তর করতে পারি। শর্তটি হচ্ছে, এক মাস ধরে আপনি উপবাসের মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করবেন। আর একমাত্র আল্লাহ-র উপাসনাতেই নিজেকে লিপ্ত রাখবেন। কোনরকম কামনা বাসনাকেও মনে ঠাঁই দেবেন না। এর ফলে আপনার দেহ-মন পবিত্র হয়ে উঠবে। তারপর লেড়কিদের গ্রহণ করবেন। কোন ধনদৌলত নয়, আপনার মুলুকের যা বিখ্যাত জিনিস আছে তার কিছু আমাকে উপহারস্বরূপ দান করতে পারেন, গ্রহণ করব।'

বুড়ির এরকম অভাবনীয় প্রস্তাবে বাদশাহ আরও মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বল্লেন, 'আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছিয়াত্তরতম রজনী

প্রায় মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, বুড়ির কথায় বাদশাহ উমর সম্মত হলেন। বুড়ি এবার বল্ল—জাঁহাপনা একটি তামার পাত্র আনতে হুকুম করুন। আর বল্‌বেন তাতে করে যেন একটু পানিও নিয়ে আসে।

এক দাসী তামার পাত্রে পানি নিয়ে এল।

বুড়ি পাত্রটি হাতে নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করল। এবার সেটি বাদশাহের হাতে দিয়ে বল্ল—'উপবাসের দশদিন পর এ পাত্র থেকে জলপান করবেন। এতে শরীরের ক্ষয়পূরণ হয়ে দুর্বলতা দূর হবে। আজ যাচ্ছি। ঠিক এগার দিনের দিন ফিন মোলাকাৎ হবে।' বুড়ি এবার কুর্নিশ করে বিদায় নিল।

বাদশাহ পানির পাত্রটি সিন্দুকে তালাবন্ধ করে রেখে দিলেন।

বাদশাহ সেদিন থেকেই উপবাস শুরু করলেন। তাঁর একটি মাত্রই লক্ষ্য—দেহ-মন শুদ্ধ-পবিত্র করা। তবেই তিনি খুবসুরৎ লেড়কি পাঁচটিকে শয্যাসঙ্গিনী করতে পারবেন।

দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এগারো দিনের দিন বাদশাহ তামার পাত্রের মন্ত্র পড়া সবটুকু পানি এক দমে পান করে ফেল্লেন। দশদিন উপবাসে পেটের নাড়িভুড়ি পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিল। পানিটুকু সে জ্বালা নিভিয়ে যেন স্বস্তি দিল। অবসাদও অনেকাংশে লাঘব হয়ে গেল। বাদশাহ ভাবলেন, বুড়ির কথা পুরোপুরি ফলে গেছে। তবে তো তার পানিতে কোন দৈবশক্তি

প্রয়োগ করে গেছে যার ফলে এমন ভোজবাজির খেল্ সম্ভব হ'ল।

পানিটুকু পান করে হাতের তামার পাত্রটি রাখতে না রাখতেই দরওয়াজায় করাঘাতের শব্দ হ'ল। বাদশাহ্ নিজে হাতে দরওয়াজা খুলে দিলেন। কলার পাতার একটি পুটুলি হাতে নিয়ে বুড়ি কামরায় ঢুকে এল।

বুড়ি কলাপাতার পুটুলিটি বাদশাহের হাতে দিয়ে বল্ল —'জাঁহাপনা, আপনার উপবাসের একুশ দিনের মাথায় এ-পুটুলিটি খুলবেন। এর ভেতরে সামান্য আচার আছে। সেদিন এটুকু খাবেন।'

বাদশাহ শ্রদ্ধার সঙ্গে পুটুলিটি হাতে নিয়ে সিন্দুকের ভেতরে রেখে তালা বন্ধ করলেন।

একুশতম দিনে বাদশাহ্ সিন্দুক থেকে পুটুলিটি বের করলেন। একটু বাদেই বুড়িটি এসে দরজায় করাঘাত করল। দরজায় দাঁড়িয়েই বুড়ি মুচকি হেসে বল্ল—'আমার ভাইয়াদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে গিয়েছিলাম। কোন্ শর্তে তাদের লেড়কিদের আপনার হাতে সম্প্রদান করব তাদেরকে বলেছি। তারা খুবই খুশী হলেন। বাদশাহ যখন তাদের লাভ করার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হয়েছেন তখন তাঁর আগ্রহ আন্তরিক ও অত্যুগ্র বলেই তাঁরা ধরে নিয়েছেন। আর তাঁর আকাঙ্ক্ষায় কোনরকম ফাঁকি নেই। তাদের বিশ্বাস, লেড়কিরা আপনার কাছে সুখে-শান্তিতেই থাকবে। তবে জিন্দেগীর জন্য তাদের দূরে সরিয়ে দেবার আগে একটি বার দেখতে চান। আজ আপনার উপবাসের একুশ দিন চলেছে। আমি আজ লেড়কিদের নিয়ে যাব। ত্রিশ দিনের দিন আপনার এখানে ফিরিয়ে আনব। সেদিন আপনার উপবাসের দিন পূর্ণ হবে।

বাদশাহের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এল। বুড়ির একথা মেনে নিতে তিনি উৎসাহী নন। চোখ দুটো কপালে তুলে বল্লেন—'সে কী, যাদের জন্য এত সব কৃচ্ছ্রসাধন তারাই হাতের নাগালের বাইরে চলে গেলে চলবে কি করে?'

বুড়ি এবার ফোকলা দাঁতে হেসে বল্ল—'এতদিন আপনার সান্নিধ্যে কাটালাম তবু আমার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছেন না। আপনি তো লেড়কিদের ওপর জুলুম করে ধরে আনেন নি। আমিই উপযাচক হয়ে কথাটি পেড়েছি। তাই আপনার অমতের কারণ কিসের। তাদের সন্তান সারা জনমের জন্য তাদের অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছে। শেষ বারের মত একবারটি চোখে দেখার ইচ্ছা তো হতেই পারে।'

বাদশাহ এবার নরম হয়ে বল্লেন—'হ্যাঁ, ঠিক কথাই তো বটে। লেড়কা-লেড়কি আব্বাকে ছেড়ে গেলে কী যে মর্মান্তিক বেদনার সঞ্চার হয় তা আমি উপলব্ধি করছি। ঠিক আছে, লেড়কিদের নিয়ে যাও। তবে ত্রিশ দিনের দিন ফিন নিয়ে এসো, মনে থাকে যেন।'

—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন জাঁহাপনা। আমার জবান এক, হেরফের হবে না। তবে যদি আপনার মনে কোনরকম দ্বিধার সঞ্চার হয় তবে এক কাজ করুন। আপনার বিশ্বস্ত কোন আউরতকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিতে পারেন। তার হেফাজতেই পাঁচ লেড়কি থাকবে। আর তাদের আব্বাদেরও বাদশাহের হুকুমের কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে।'

—'বহুৎ আচ্ছা বাৎ! সে বুঝিয়ে বলতে পারবে দেরী করলে বাদশাহ গোঁসসা করবেন। আমার পেয়ারী বাঁদী সোফিয়া তোমাদের সঙ্গে যাবে। আমার দুটো সন্তানের গর্ভধারিণী। কনস্তানতিনোপলের সম্রাট আফ্রিদুন-এর বেটি। লিখাপড়াও আছে। জ্ঞান-বুদ্ধিও যথেষ্টই আছে। তোমার ভাইয়াদের পরিস্থিতিটি বুঝিয়ে বলতে পারবেই।'

—'বহুৎ আচ্ছা।'

—'কিন্তু ত্রিশদিনের দিন আমি কি খানাপিনা করব তার নির্দেশ দিয়ে যাবে তো।'

—'সে খেয়াল আমার মাথায় আছে। এক গ্লাস সরবৎ দিয়ে যাব আপনার জন্য। ত্রিশ দিনের দিন হামামে গিয়ে আচ্ছা করে গোস্ল করবেন। শরীরের ক্লেদ ও গ্লানি দূর হবে। তারপর নামাজ সেরে সরাবটুকু পান করবেন। ব্যস, তারপরই আপনি সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।

বুড়িটি এবার লেড়কি পাঁচটি এবং সোফিয়াকে নিয়ে প্রাসাদ থেকে যাত্রা করল।

ত্রিশ দিনের দিন ভোরে বাদশাহ গোস্ল সেরে এলেন। দেহের গ্লানি ও ক্লেদ কেটে গিয়ে শরীর দিল্ অনেকাংশে সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে এল। এবার নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ-র উদ্দেশে নামাজ পড়লেন। সিন্দুক থেকে সরবতের গ্লাসটি বের করে নিঃশেষে পান করে গ্লাসটিকে রেখে পালঙ্কে এসে বসলেন। নফর-নোকরদের ডেকে বল্লেন—'আমি এখন নিদ যাব। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

ক্রমে সারাটা দিন কেটে গেল। আমি বাদশাহের কামরার দরজায় কুরশি পেতে ঠায় বসে। কখন তাঁর নিদ ভাঙবে, কখন তলব করে বসবেন বলা তো যায় না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যের আন্ধার নেমে এল। প্রাসাদের ঘরে ঘরে মোমের বাতি জ্বালিয়ে দিল নফররা। তবু বাদশাহের নিদ আর টুটে না। তারপর ক্রমে রাত্রি গভীর হতে থাকে। বাদশাহ কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েই রইলেন। তখন কি আর বুঝেছিলাম, তার নিদ আর কোনদিনই টুটবে না?

সকাল হ'ল। তবু বাদশাহের ঘরের দরওয়াজা খুল্‌ল না। কলিজাটি কেমন মোচড় মেরে উঠল। শোচলাম কি, আর নয়, এবার ডাকতেই হয়। বহুৎ ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করলাম। ভেতর থেকে কোন আওয়াজই ভেসে এল না।

নফরদের দিয়ে দরওয়াজা ভাঙালাম। ভেতরে উঁকি দিতেই আমার চক্ষু স্থির। দেখলাম, বাদশাহের মৃতদেহ পালঙ্কের ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বিছানা অগোছাল। বুঝলাম, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে বহুৎ ধস্তাধস্তি করেছেন।'

কথা বলতে বলতে উজির দান্‌দান-এর চোখের কোল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। নুজাৎ আর দু-অল-মাকান ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। আমীর-ওমরাহ যারা ছিল সবার চোখেই পানি দেখা দিল। নুজাৎ-এর স্বামী নুজাৎ ও মাকানকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

চোখের পানি মুছতে মুছতে উজির দান্‌দান এবার বল্‌লেন—আমি হেকিম ডেকে সরবতের গ্লাসটি পরীক্ষা করালাম। তার বালিশের তলায় এক চিলতে কাগজ পাওয়া গেল। তাতে দু' ছত্র লেখা—'লম্পটের জন্য শোক-তাপের কিছু নেই। এ লেখা তোমরা যারা পড়বে—মনে রেখো ব্যভিচারের এ-ই উপযুক্ত শাস্তি। ভেবে দেখ তো এ-আদমি কত সুলতান-বাদশাহের আদরের লেড়কির জীবন বরবাদ করেছে। নৃশংস বল্গাহীন অত্যাচার চালিয়ে কত সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করেছে। এ লম্পটটি তার লেড়কা সারকান'কে সিসিরিয়ায় পাঠিয়েছিল। সে সম্রাট হারদুব-এর কলিজার সমান লেড়কি ইরবিজাকে ছলাকলার মাধ্যমে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। হিংস্র নেকড়ের মত আচরণ করেছিল তার ওপর। তারপর তাকে এক নিগ্রো শয়তানের হাতে তুলে দেয়। সে নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ করে তার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত হত্যা করে তার ধনদৌলত গায়েব করে। এক সময় চম্পট দেয়। সে লম্পট, অত্যাচারী, নারী খাদক বাদশাহ উমর অল-নুমানকে আমি আজ হত্যা করলাম। তাকে খতম করে তামাম আরব দুনিয়ায় শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হলাম। এ জন্য খোদাতাল্লা আমার ওপর করুণা করবেন।

এবার আমার পরিচয় তোমাদের দরবারে পেশ করছি। আমি হারদুব-এর বাঁদীদের সর্দারনী। সোফিয়াকে আমি তার আব্বাজান আফ্রিদুন-এর হাতে তুলে দিচ্ছি। তোমরা কিন্তু ভেবো না এখানেই ঘটনা প্রবাহ থেমে যাবে। আমরা এবার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাগদাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি। তার বহু গুনাহের সাক্ষী প্রাসাটিকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। বাদশাহের বংশ নির্মূল করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। বাগদাদের দুর্গের মাথায় খ্রীস্টধর্মের পতাকা উড়িয়ে দেওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য জ্ঞান করছি।

বাদশাহ উমর অল-নুমান দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে যাত্রা করেছেন। পুরো একটি মাস বাগদাদে শোক পালন করা হ'ল। প্রজারা জিগিরি তুলল, বাগদাদের মসনদে উত্তরাধিকারী বসানো

হোক। কাজীদের তলব করলাম। দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে বাতচিত হ'ল। সবার মুখেই এক বাত—শাহজাদা সারকানকে নিয়ে এসে মসনদে বসিয়ে রাজ্যের ভার অর্পণ করা হোক। দেশের প্রজারা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জিগির তুল্‌ল—দু-অল-মাকানকে মসনদ দেওয়া হোক, তিনিই আমাদের বাদশাহ। কিন্তু কোথায় সে? কোথায় পাওয়া যাবে তাকে। তামাম আরব দুনিয়া চষে ফেলা হ'ল। কোথাও তার হদিস মিল্‌ল না। তাজ্জব বনে গেলাম। তাই অনন্যোপায় হয়ে কাজীদের পরামর্শকেই আঁকড়ে ধরতে হ'ল। দামাস্কাসের দিকে সদলবলে যাত্রা করলাম। শাহজাদা সারকানকে সেখান থেকে বাদশাহের পদে অভিষিক্ত করে বাগদাদে নিয়ে আসব। তারপরই খোদাতাল্লার অপার মহিমা তাঁর মর্জিতেই শাহজাদা দু-অল-মাকান-এর সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেল।

দু'-অল-মাকান-এর অভিষেক-পর্ব সুসম্পন্ন হয়ে গেল। দু-অল-মাকান এবার বৃদ্ধ উজির দান্‌দানকে বল্‌লেন—'আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়সেও প্রবীণ। সবচেয়ে বড় কথা আপনি আমার আব্বাজীর উজির ছিলেন। অতএব আশা করব আমারও উজিরের পদে অভিষিক্ত থেকে পরামর্শ দান থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

উজির দান্‌দান মুচকি হেসে বাদশাহ মাকান-এর কথায় সম্মতি দিলেন। এবার শেরিওয়ানের জেব থেকে একটি লম্বা ফর্দ বের করে বাদশাহ মাকান-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'বাদশাহের মৃত্যুর পর তার বিষয় সম্পত্তি ধনদৌলতের একটি ফর্দ আমি আগেভাগেই তৈরি করে রেখেছি, নিন।'

তাঁবু গোটানো হ'ল। আর মিছে সময় নষ্ট নয় সোজা বাগদাদের উদ্দেশ্যে নব নিযুক্ত বাদশাহ মাকান তাঁর দলবল নিয়ে যাত্রা করলেন।

বাদশাহ দু-অল-মাকান কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বড় ভাইয়া সারকানকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে চিঠি লিখলেন। আর বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব বাগদাদে ফিরে এসে সিসিরিয়া সম্রাটের হুমকীর মোকাবেলা করেন।

চিঠিটি প্রবীণ ও বিচক্ষণ উজির দান্‌দান-এর হাতে দিয়ে বল্‌লেন—'আপনি বিচক্ষণ আদমি। আপনি নিজে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাগদাদে নিয়ে আসবেন। তিনি যদি চান, আমি মসনদ ছেড়ে তাঁর অধীনে দামাসকাস-এর সুবেদার হয়ে থাকব। আজ আমাদের মাথার ওপরে কালোমেঘ, আমাদের মিলে ঝুলে থাকতে হবে। শক্ত হাতে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। তারপর আপন আপন স্বার্থের কথা ভাবা যাবে।'

তরুণ বাদশাহ মাকান-এর বুদ্ধির তারিফ করে উজির দান্‌দান দামাসকাস-এর উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।

বৃদ্ধ উজির বিদায় নিলে মাকান এবার জেরুজালেম-এর সেই বুড়োকে তলব করলেন। তাঁর কাজের ইনামস্বরূপ তাকে একটি প্রাসাদ তৈরি করে দিলেন। আর ব্যবসা করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ অর্থও কিছু দিলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর ভোর হয়ে আসছে দেখে তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—জাঁহাপনা, বাগদাদে-এর তরুণ বাদশাহ মাকান-এর চিঠি নিয়ে বৃদ্ধ উজির দানদান দামাসকাস-এ সুবেদার সারকান-এর সঙ্গে ভেট করলেন। সব বৃত্তান্ত খুলে বল্‌লেন। তাঁকে নিয়ে ফিরে এলেন বাগদাদ-এ। সঙ্গে আনলেন বিশাল সেনাবাহিনী ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। দু' ভাইয়ার প্রথম মোলাকাত। এর আগে কেউ, কাউকে চোখেও দেখে নি।

শত্রুর মোকাবেলা করতে সারকান ও মাকান কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সুবিশাল সেনাবাহিনী ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জেরুজালেম-এর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, এ-লড়াই কেবলমাত্র বাগদাদ আর জেরুজালেম-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সমগ্র আরবের মুসলমান শাসিত দেশগুলি একজোট হয়ে খ্রীস্টান শাসিত জেরুজালেম-এর আক্রমণের মোকাবেলা করতে উদ্যোগী হল।'

এক মাস বাদে মুসলমান বাহিনী শত্রুর মুলুকের কাছে পৌঁছায়। সম্রাট আফ্রিদুন খবর পেয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ব্যস্ত হয়ে সিসিরিয়া-র খ্রীস্টান সম্রাট হারদুবকে খবর পাঠান।

এবার আফ্রিদুন ও হারবুদ-এর সেনাবাহিনী প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিসিরিয়ার সীমান্ত ঘিরে দাঁড়ায়।

এদিকে বুড়ি সে বাঁদী সর্দারনী খবর পেয়ে ছুটে আসে। হারদুবকে অভয় দেয়। গর্বের সঙ্গে হারদুবকে বলে, 'কুছ পরোয়া নেই। আমি আপনার সহায়। বাগদাদ-এর সম্রাটকে এমন শিক্ষা দেব যাতে জিন্দেগীতে আর লড়াইয়ের কথা উচ্চারণও না করে।'

বাঁদী সর্দারনী এবার কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল লড়াইয়ের ফাঁদ তৈরি করতে, কোন্ পথে, কখন এবং কিভাবে আক্রমণ করে সহজেই বাগদাদ-এর সৈন্যদের ঘায়েল করা যাবে।

বাঁদী সর্দারনী অনেক মাথা খাটিয়ে চমৎকার একটি মতলব বের করল। হারদুব আর আফ্রিদুনকে বল্‌ল—'এক কাজ করুন, যত শীঘ্র সম্ভব নৌকা বোঝাই করে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দিন। আর বাকী সবাই থাকবে এপারে। পাহাড়ের গায়ে মুসলমান সৈন্যরা অবস্থান করছে। ফলে দু' দিক থেকে

সাঁড়াশী আক্রমণ চালাতে পারলে মুসলমান সৈন্যদের অনায়াসে ঘায়েল করা যাবে।

বাঁদী সর্দারনীর ফন্দিকেই কাজে লাগানো হ'ল। মতলব মাফিক কাজ হচ্ছে দেখে বুড়ি বাঁদী সর্দারনী তো নিঃসন্দেহ আফ্রিদুন ও সম্রাট হারদুব-এর জয় সুনিশ্চিত। সে সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করার জন্য চমৎকার এক ভাষণ দিল। তার ভাষণের মূল বক্তব্য—যেন তেন প্রকারেণ সারকানকে ঘায়েল করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তার মত দুর্ধর্ষ বীর যোদ্ধাকে কুপোকাৎ করতে পারলে বাকী সবাইকে তো নস্যির মত উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

খ্রীস্টান দলের প্রধান সেনাপতিও কম বীরযোদ্ধা নয়। তাঁর মত দুর্ধর্ষ বীর তামাম ইওরোপ মহাদেশ ঢুঁড়ে বেড়ালেও দ্বিতীয় একজন মিলবে না। নাম তার লুকা। বহুৎ বড় বড় যুদ্ধে সে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বুড়ি বাঁদী সর্দারনী তাকে বল্‌ল—'যুদ্ধ জয়ের চিন্তা পরে করা যাবে। তোমার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকবে যে-কোন উপায়ে মুসলমান যোদ্ধা সারকানকে পরাজিত করা। তাকে খতম না করা পর্যন্ত তোমার বিরতি নেই।'

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটাত্তরতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সে-বুড়ি বাঁদী সর্দারনী খ্রীস্টান সেনাপতি লুকাকে সারকান-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুল্‌ল।

অকুতোভয় লুকা সম্রাট হারদুব'কে অভিবাদন সেরে তার বাহন জাঁদরেল ঘোড়াটির পিঠে চেপে বসল। বীরদর্পে সৈন্য সামন্ত নিয়ে এগিয়ে চল্‌ল সারকানকে টিট করার জন্য।

সারকান-এর ঘোড়া ধীর-পায়ে এগিয়ে আসে। হাতে তার সুতীক্ষ্ণ তরবারি। এমন সময় আচমকা লুকা পিছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দুই বীরযোদ্ধার তরবারির লড়াই। লুকা-র যতগুলো কায়দা-কৌশল জানা ছিল এক এক করে সবগুলি প্রয়োগ করেও সারকানকে কব্জা করতে পারল না।

সারকান এতক্ষণ নীরবে লুকা-র আক্রমণ প্রতিহত করেছে। এবার সে সক্রিয় হ'ল। অগ্রণী ভূমিকা নিতে লাগল। নিজের যতগুলি যুদ্ধকৌশল জানা রয়েছে সেগুলো এক এক করে লুকার ওপর প্রয়োগ করতে লাগল। বেশী তকলিফ তাকে করতে হ'ল না। সারকান সুযোগ বুঝে এক কোপে লুকার ধড় থেকে মুণ্ডুটি নামিয়ে দিল। ফিন্‌কি দিয়ে খুন বেরিয়ে এল। বীভৎস দৃশ্যটি দেখেই তার সৈন্যরা অস্ত্রপাতি ফেলে পিছন ফিরে লম্বা দিল।

সম্রাট হারদুব আর আফ্রিদুন-এর কানে বীরযোদ্ধা লুকার শোচনীয় পরিণতির কথা পৌঁছতে দেরী হ'ল না। তাদের তো

মাথায় বজ্রাঘাত হবার উপক্রম হ'ল। আফ্রিদুন কপাল চাপড়ে বল্‌ল—'আমার সাম্রাজ্যের ভিতই আজ নড়বড়ে হয়ে গেল।'

বুড়ী বাঁদী সর্দারনী এগিয়ে আসে। আফ্রিদুন ও হারদুব-এর ভিতরে সাহস সঞ্চার করতে গিয়ে বল্‌ল—'বিপদের সময় মনমরা হয়ে কপাল চাপড়ানো মূর্খের কাজ। আপনারা সাহস অবলম্বন করুন। আমি বিচার করে দেখলাম মুখোমুখি লড়াই করে আমরা সারকানকে জব্দ করতে পারব না। লুকাই যখন পারল না তখন সমগ্র খ্রীস্টান সাম্রাজ্যে এমন কোন বীর নেই যে সারকান-এর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে। তার গায়ে কাঁটার আঁচড় দেওয়াও কল্পনাতীত ব্যাপার।'

হারদুব অসহায় দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'তবে? কিভাবে আমরা সারকানকে পরাজিত করতে পারব বলে তুমি মনে করছ, বল তো খোলাখুলি।'

—'বুদ্ধি। কায়দা-কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। এ মুহূর্তে বুদ্ধি বলকেই আমাদের একমাত্র অবলম্বন মনে করতে হবে। ফাঁদ তৈরির সঠিক দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

—'কিন্তু কি সে ফাঁদ? কিভাবেই বা তুমি ফাঁদ পাততে চাইছ, শুনিই না।'

—'আমি আপনাদের সৈন্য দল থেকে গোটা পঞ্চাশেক বাছাই করা সৈন্য নেব। তবে তারা সবাই যেন আরবী ভাষায় কথা বলতে পারে।'

—'এ কোন সমস্যার ব্যাপারই নয়। আমার সৈন্যদলে খাস আরবের লোকই রয়েছে। কিন্তু তাদের কোন্ কাজে লাগাবে?'

—'আমি আরব সওদাগরের বেশ ধারণ করব। আর পঞ্চাশজন সৈন্যকে আরবীয় পোশাক পরিয়ে দেব। তারপর হাজির হ'ব সারকান-এর সামনে। আমি তার সামনে গিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেব —'কন্‌সতান্‌তিনোপলে আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করি। আরবের সওদা নিয়ে খ্রীস্টান-ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করি। খ্রীস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু করায় আমাদের বেদম প্রহার দিয়ে তাদের দেশ থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। দেশে ফেরার উপায় পর্যন্ত নেই। তাই আপনার সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। ব্যস, এতেই দেখবেন বাজীমাৎ করে দিয়েছি।'

বুড়ি এবার বল্‌ল—'মুসলমানরা খুবই স্বজাতিপ্রিয়। এদের এ দুর্বলতাটুকুকে কাজে লাগিয়ে আমি সদলবলে তাদের দলে ঢুকে পড়ব। তারপর কি করে তাকে খাঁচাকলে ফেলি দেখবেন। ইঁদুরের মত ফাঁদে ফেলা যাকে বলে।'

হারদুব ও আফ্রিদুন ভেবে দেখল, বুড়ি কৌশলটি মন্দ করে নি। ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে কাজ হাসিল হবেই। তাই তারা সোল্লাসে বুড়ির ফন্দিটির তারিফ করে পঞ্চাশ জন আরবীয় সৈন্য দিতে সম্মত হ'ল।

এ পর্যন্ত বলার পর বেগম শাহরাজাদ দেখলেন ভোর হয়ে এল ব'লে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

উনআশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ্ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় প্রবেশ করলেন। বেগম তার কিস্‌সার অকথিত অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক সকালে সারকান ও মাকান তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখে জনা পঞ্চাশেক আরবীয় সওদাগর সামনে দাঁড়িয়ে। কাঁদো কাঁদো মুখ। চোখে পানি না বেরলেও বেরোতে বেশী দেরীও নেই। গায়ের পাৎলুন, শেরওয়ানী প্রভৃতি ছেঁড়া ফাঁতা ফাঁতা। দু'-চার জায়গায় রক্তের ছোপ। চোখের তারায় বিষাদ. ভীতি ও হতাশার ছাপ।

সারকান এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কে গো তোমরা? এখানে যুদ্ধ-শিবিরে কি মনে করে?'

বুড়িটি মুসলমানী কায়দায় কুর্নিশ জানিয়ে বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌ল —'আমাদের মুলুক ইস্পাহান। বিশ সাল ধরে কন্‌সতানতিনোপলে বাণিজ্য করছি। আরব মুলুকের সমানপত্র সেখানে বেচি। তাদের দেশের পয়সা রোজগার করে দেশে গুঁড়া বাচ্চাদের খানাপিনা করিয়ে জিন্দা রেখেছি। কিন্তু এখন মহামুশকিলে পড়া গেল। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় তারা আমাদের ওপর চড়াও হয়। জুলুম করে, সমানপত্র কেড়ে নেয়। জেভ একেবারে ফাঁকা করে দেয়। তারপর শুরু করে মারধোর। আমাদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন, আমাদের কী হালৎ করে ছেড়েছে। একমাত্র মুসলমান বলেই খ্রীস্টানরা আমাদের ওপর হামলা হুজ্জতি চালায়। দেশে ফিরে খাওয়ার মত রেস্তও আমাদের নেই। তাই উপায়ান্তর না দেখে আপনাদের বিরক্ত করতেই হ'ল।'

সারকান সহানুভূতির দৃষ্টিতে বুড়ির দিকে তাকায়।

বুড়ি হরদম কেঁদেই চলেছে। এবার চোখ মুছতে মুছতে বল্‌ল —'হুজুর, মেহেরবানি করে আমাদের দেশে ফেরার মত একটি ফিকির করে দিন।'

সারকান এবার মুখ খুল্‌ল—'তোমরা আপাতত আমাদের মেহমান হয়ে তাঁবুতেই থেকে যাও। পরে ভেবে দেখব, ফিকির কিছু করা যায় কি না।'

সওদাগরের বেশধারিনী বুড়ি আর তার পঞ্চাশজন সৈন্য সারকান আর তার ভাইয়া মাকান-এর মেহমান হয়ে মুসলমানী তাঁবুতে মাথা গুঁজল। খানাপিনার কোন ত্রুটি রাখল না। সরাবও দেওয়া হ'ল বেশ কিছু বোতল। বুড়ি মনে মনে উল্লসিতা হ'ল। বুড়ি নিজে কিন্তু কিছুই মুখে দিল না। কেবল কোরাণ পাঠ আর নামাজ নিয়েই মেতে রইল।

বুড়ির নিরম্বু উপবাস এবং ঈশ্বরীয় কামকাজের কথা শুনে সারকান তার সঙ্গে ভেট করতে গেল। বুড়ির সঙ্গে কথা বলে বুঝল, বুড়ি তাদেরই হয়ে আল্লাতাল্লার কাছে যুদ্ধ জয়ের প্রার্থনায় লিপ্ত। এবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নিঃসন্দেহ হ'ল। বুড়িরও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে সারকান মুগ্ধ হ'ল।

সারকান বল্‌ল—'বুড়ী তুমি এরকম কৃচ্ছ্রসাধনে লিপ্ত হয়েছ কেন?'

—'সে কী গা! আপনারা এত কষ্ট করে মুসলমান শক্তি বৃদ্ধির জন্য লড়াই করে চলেছেন। আমি তো একে ধর্মযুদ্ধ বলেই জ্ঞান করি। এ যুদ্ধের মাধ্যমেই মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। তাই প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ-র কাছে দোয়া মাঙছিলাম যাতে মুসলমান সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতিই খ্রীস্টানরা করতে না পারে।'

সারকান আর মাকান-এর শির সওদাগরবেশী বুড়ির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নত হয়ে গেল। তারা ভাবল, মুসলমান দুনিয়ার এরকম সঙ্কট মুহূর্তে আল্লাহই বুড়িকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

বুড়ির সঙ্গী এক সৈন্য সারকানকে বল্‌ল—'হুজুর, এর ওপর মাঝে মাঝে আল্লাহ-র ভর হয়। তখন একে যা জিজ্ঞাসা করবেন ঠিক ঠিক জবাব পেয়ে যাবেন। আল্লাহ-ই এর মাধ্যমে কথা বলেন।'

সারকান ও মাকান সবিস্ময়ে সৈন্যটির কথা শুনল। তারা আরও নিঃসন্দেহ হ'ল যে, আল্লাহ নির্ঘাৎ মুসলমান দুনিয়াকে রক্ষার জন্য একে পাঠিয়েছেন। নইলে এমন অদ্ভুত যোগাযোগ হ'ল কি ক'রে?

পরদিন সকালে বুড়ি যখন আল্লাহ-র প্রার্থনায় লিপ্ত তখন তার

'চর' উঠল।

সারকান ও মাকান বুড়ির সামনে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বসল। ভাববিমুগ্ধ দিল নিয়ে সারকান বল্‌ল—'ধর্মযুদ্ধে কি আমাদের জয় হবে? আমরা কি খ্রীস্টানদের যুদ্ধে হারিয়ে আরব দুনিয়ায় মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব?'

—'পারবি —অবশ্যই পারবি। কিন্তু সবার আগে শত্রুপক্ষের গুপ্ত ঘাঁটির তল্লাশ করতে হবে। গুপ্তঘাঁটির খবর না মিল্‌লে লড়াইয়ে জেতা যায় না। আমার সঙ্গের সওদাগরদের এসব জায়গা নখদর্পণে। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আগুয়ান হলে অবশ্যই শত্রুকে কাবেল করতে পারবি।'

বুড়ির সঙ্গীদের একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'সাচ বাৎ। একেবারে হক্ বাৎ বলেছে। আমরা বিশ-পঁচিশ সাল এখানে সওদাগরী কারবার করছি। এখানকার রাস্তা ঘাট আমাদের ভাল চেনা জানা আছে। খ্রীস্টান দুনিয়ার কোথায় কি আছে কিছুই আমাদের অজানা নয়। তাদের গুপ্তঘাঁটির হদিস দেওয়া আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়।'

সারকান ও মাকান যেন আসমানের চাঁন্দ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল। খ্রীস্টান জাতটিকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করা তাদের কাছে আর কোন সমস্যাই নয়।

সারকান তাদের সৈন্যদের পঞ্চাশটি ভাগে বিভক্ত করল। ঠিক হ'ল বুড়ির পঞ্চাশজন সহযাত্রীদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটি দল অগ্রসর হবে। ভিন্ন ভিন্ন পথে তারা শত্রু পক্ষের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হবে। আর সওদাগররা গুপ্ত পথের নিশানা দেখিয়ে দেবে যাতে শীঘ্রই খ্রীস্টানদের সাবাড় করে দেওয়া সম্ভব হয়।

মাকান আর বৃদ্ধ উজীর ছাউনিতেই রয়ে গেল। আর সারকান রওনা বুড়ির সঙ্গে যাত্রা করল। বুড়ি বলেছে, তাকে একেবারে সিসিরিয়ার দুর্গে পৌঁছে দেবে। আর বুড়ি তাকে বলেছে, শত্রুসৈন্য এখন দুর্গের বাইরে। হারদুব-এর দুর্গ প্রায় শূন্য। বুড়ি এ-ও বলেছে, দুর্গটির দখল নিতে পারলে খ্রীস্টানদের সাবাড় করে দেওয়া কোন সমস্যাই নয়।

হায় নসীব! শয়তানের সাক্ষাৎ চর বাঁদী সর্দারনী বুড়ির পাতা ফাঁদে স্বেচ্ছায় শিরগলিয়ে দিয়ে সারকান-এর জান খতম হ'ল। বাদশাহী তাজ শিরে পরার অপূর্ণ সাধ নিয়েই সে দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তের পথে রওনা হ'ল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তার অসম্পূর্ণ কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বুড়ি সর্দারনীর পাতা ফাঁদে শির গলিয়ে দিয়ে সারকান জান হারাল। বুড়ি তাকে ধাপ্পা দিয়ে সিসিরিয়ার দুর্গে প্রবেশ করে দেখল সত্যিই দুর্গটি ফাঁকা। ভাবল বিনা লড়াইয়ে, এক ফোঁটাও খুন না ঝরিয়ে সে দুর্গের দখল নিয়ে নিল, এমন নসীব সচরাচর হয় না। উল্লসিত হয়ে সারকান যখন বুড়ির সঙ্গে নিজের সুপ্রসন্ন নসীবের কথা বলছে ঠিক সে মুহূর্তেই পিছন থেকে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে এক গুপ্তঘাতক অতর্কিতে সারকান-এর পিঠে হাতের ছুরিটি আমূল গেঁথে দিল। ঝট করে তরবারি খুলে সারকান পিছন ফিরে রুখে দাঁড়ালও বটে কিন্তু ক্ষতস্থান দিয়ে গল গল করে খুন ঝরতে লাগল। আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌ল। পরমুহূর্তেই সব খতম।

এদিকে বুড়ির পাতা ফাঁদের খেল পুরো দস্তুর শুরু হয়ে গেছে। রাত্রি যত গভীর হয় চারদিক থেকে দুঃসংবাদ আসতে লাগল। বুড়ি চারদিকে যে-ফাঁদ ছড়িয়ে রেখেছে তাতেই মুসলমান সৈন্যরা ঝাঁকে ঝাঁকে খতম হতে লাগল।

বৃদ্ধ উজির দানদান-এর পরামর্শে মাকান রাত্রির আন্ধারেই বাগদাদের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

মাকান বাগদাদে পৌঁছে তার ভাইজান সারকান-এর স্মৃতির উদ্দেশে এক শোক-মঞ্জিল বানাল। বাদশাহ, উজির, পারিষদবর্গ ও প্রজারা পরলোকগত সারকান-এর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে প্রার্থনা করল।
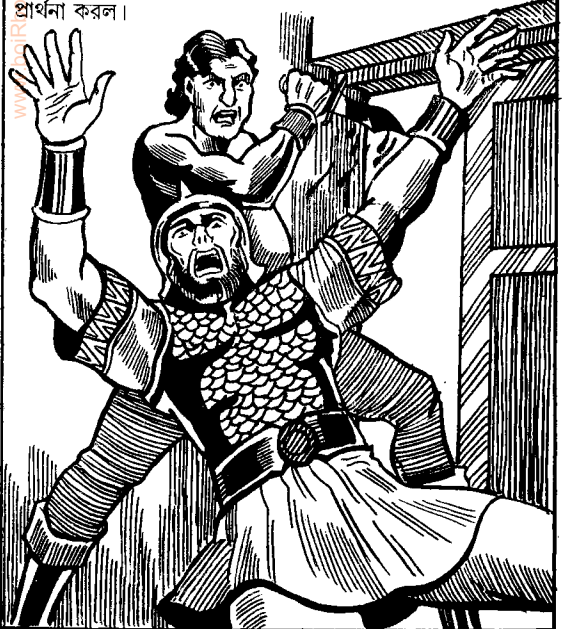
আজিজ, আজিজা ও তাজ অল-মুলুকের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ সারকান, মাকান ও নুজাৎ-এর কিস্‌সা শেষ করে কয়েক মুহূর্তের জন্য মৌন হলেন। এক সময় মুখ খুল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার শুরু করছি আজিজ, আজিজা ও শাহজাদা তাজ অল-মুলুক-এর কিস্‌সা।

পারস্যের ইস্পাহান পর্বতের পিছনে ছবির মত এক মুলুকের সুলতান সুলেমান শাহ। মহাধার্মিক। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি নামাজ কোরাণ আর ধর্মীয় আলাপ আলোচনা নিয়ে মগ্ন থাকেন। রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশ ধারণ করে তামাম সুলতানিয়তে ঢুঁড়ে বেড়ান। প্রজারা কিভাবে দিন গুজরান করছেন তা দেখার জন্যই তাঁর এরকম কর্ম তৎপরতা। তার চোখে আমীর-ভিখমাঙা সবাই সমান। সবাই যখন তাঁর প্রজা তখন তাদের মধ্যে ফারাক তো থাকতেই পারে না। এতকিছু সত্ত্বেও সুলতান সুলেমান শাহ-র একটিমাত্র সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। বেগম আর লেড়কা লেড়কির সাধ। জীবনের শেষ সিঁড়ির দিকে যতই ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকেন ততই তাঁর মধ্যে এ-বিশেষ না-পাওয়ার বেদনাটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। হাহাকার আর হাহুতাশ সম্বল করে তিনি দিন গুজরান করতে থাকেন। জিন্দেগী মরুভূমির মত শুখাই কাটল।

সুলতান সুলেমান শাহ একদিন তাঁর উজিরকে ডেকে বল্‌লেন—'শোন, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, দিন বুঝি ফুরিয়ে এল। এরকম ওমরে একেলা থাকা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। আর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও কেউ রইল না। তাছাড়া আমাদের পয়গম্বর তো বলেছেনই শাদী কর আর সংখ্যা বৃদ্ধি কর। তুমি এ ব্যাপারে কি পরামর্শ আমাকে দিচ্ছ, বল।'

বৃদ্ধ উজির বার কয়েক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বড়ই কঠিন প্রশ্ন আমার সামনে রেখেছেন। এক কথায় এর জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সাধ্যমত সংক্ষেপেই আপনার সওয়ালের জবাব দেয়ার কোশিস করছি। আমি বলব, যদি কোন একেবারেই অপরিচিত বাঁদীকে শাদী করে আপনি বেগমের মর্যাদা দেন তবে পরিণামে দুঃখই কিনে নেওয়া হবে। এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, যাকে শাদী করে প্রাসাদে তুলেছেন তার আব্বা একটি অসৎ, বজ্জাৎ আর সাক্ষাৎ শয়তান। আব্বার খুন তো লেড়কির দেহেও প্রবাহমান।

জাঁহাপনা, আপনার ঔরসে আর আপনার শাদী করা বেগমের গর্ভে যে সন্তান পয়দা হবে সে হয়ত কালে কালে বজ্জাত আর শয়তানই হয়ে উঠবে। আপনার কোন গুণই তার মধ্যে প্রকাশ পেল না, তখন? পরিতাপের সীমা থাকবে না। তখন না পারবেন গিলতে আর না পারবেন ওগরাতে। তাই জাঁহাপনার কাছে আমার একটি মাত্রই আর্জি, বান্দাকে যেন বাজার থেকে বাঁদী কিনে আনতে হুকুম করবেন না। দুনিয়ার সবসেরা সুরৎ-ও যদি তার থাকে তবু আমি তা করতে নারাজ। তবে হ্যাঁ, লেড়কা-লেড়কি পয়দা করাই যদি আপনার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে কোন সুলতান বাদশাহের লেড়কিকে শাদী করে প্রাসাদে নিয়ে আসুন। আপনি যদি হুকুম করেন তবে শাহ বংশেরও খুবসুরৎ লেড়কি জোগাড় করা সম্ভব।'

—'হ্যাঁ, আমি শাদী করব। তুমি শাহ বংশের পাত্রীর পাত্তা লাগাও। কেবলমাত্র সন্তান পয়দা করার উদ্দেশ্যেই আমি সাদী করতে উৎসাহী।'

—'জাঁহাপনা, পাত্রী আমার হাতের মুঠোতেই রয়েছে। আমার বিবির কাছে খবর আছে সফেদ নগরের সুলতান জহর শাহ-র এক খুবসুরৎ লেড়কি রয়েছে। এমন সুরৎ নাকি তামাম আরব দুনিয়ার কোন লেড়কির মধ্যে নাই।

ব্যস, আর দেরী নয়। বৃদ্ধ উজিরের পরামর্শে সুলতান এক প্রবীণ ও বিচক্ষণ আমীরকে সুলতান জহর শাহর দরবারের উদ্দেশে যাত্রা করতে বল্‌লেন। পর মুহূর্তেই ভাবলেন, যে-সে লোক দিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার নয়। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ উজিরকেই সুলতান জহর শাহ-র দরবারে ভেজলেন।

প্রচুর সোনাদানা, হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তা এবং হরকিসিমের সমানপত্র উট আর খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে বৃদ্ধ উজির সুলতান জহর শাহ-র দরবারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

সুলতান জহর শাহর দরবারে উজির উপস্থিত হয়ে তাঁকে কুর্নিশ করে নজরানা স্বরূপ দ্রব্য সামগ্রী তাঁর সামনে রাখলেন।

সুলতান মহা খুশী। আগন্তুক উজিরকে বল্‌লেন—'আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত। আগে খানাপিনা সেরে সুস্থ হোন। পরে ধীরে সুস্থে আপনার বক্তব্য শোনা যাবে।'

বিকালে উজির সুলতানের সঙ্গে ভেট করলেন। মসনদে সুলতান জহর শাহ উপবিষ্ট। তাঁরই সামনে সুদৃশ্য একটি কুরশিতে উজিরকে বসতে দেওয়া হল।

এমন সময় প্রভাত হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একাশিতম রজনী

প্রায় মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সুলতান জহর শাহ আগন্তুক সুলতান সুলেমান-এর বৃদ্ধ উজিরকে যথোচিত খাতির করে বসালেন।

সুলেমান-এর উজির দু'-চারটি সৌজন্যমূলক কথা সেরে নিজের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, আমার মহামান্য সুলতানের পক্ষ থেকে আপনার দরবারে দু'টো আর্জি পেশ করার জন্যই আমাকে ছুটে আসতে হ'ল।'

সুলতান জহর শাহ ঠোঁটের কোণে চমৎকার হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—'আপনার সুলতানের অভিপ্রায় কি, মেহেরবানি করে বলুন।'

—'আমার সুলতান, শাহজাদী—আপনার লেড়কির পাণিপ্রার্থী। আমার সুলতান যেসব উপঢৌকন পাঠিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তা গ্রহণ করে ধন্য করুন। আমাদের সুলতান—'

উজিরকে তার কথা শেষ করতে না দিয়েই সুলতান জহর শাহ অবিশ্বাস্য, একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক কাজ করে বসলেন। মসনদ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুক বৃদ্ধ উজিরকে কুর্নিশ জানালেন।

ব্যাপারটি দরবারে উপস্থিত সুলতান জহর শাহ-র উজির থেকে শুরু করে আমীর-ওমরাহ প্রভৃতির মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার করল। সামান্য এক উজিরকে সুলতান মসনদ ছেড়ে উঠে কুর্নিশ জানালে অবাক তো হতেই হয়।

সুলতান জহর শাহ শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদন করলেন—'আপনি প্রবীণ, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আপনি সুলতান সুলেমান-এর যে-প্রস্তাব আমার দরবারে পেশ করলেন তার জন্য আমি যারপর নাই খুশী। আপনি সুলতান সুলেমান-এর যে-অভিমত বহন করে নিয়ে এসেছেন তা আমার কাছে পরম আনন্দের ব্যাপার বলেই মনে করছি। নসীব নিতান্তই আচ্ছা না হলে আমার লেড়কির দিকে সুলতানের নজর অবশ্যই যেত না। আমার লেড়কি তার প্রাসাদে কেনা বাঁদী হয়ে তাঁর সেবায় নিজেকে লিপ্ত রাখবে।'

সুলতান জহর শাহ-র তলব পেয়ে কাজীরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। তারা সুলতানের লেড়কি ও সুলতান সুলেমান-এর শাদীর কবুলনামা তৈরি করল।

সুলতান জহর শাহ-র দিল্ খুশীতে টগবগিয়ে উঠল। তিনি লেড়কির সহচরী যারা যাবে, সব নফর-বাঁদীদের নিজে বাছাই করলেন। দশটি খচ্চরের পিঠে সাদীর দানসামগ্রী বোঝাই করা হ'ল।

সুলতান সুলেমান-এর উজির সুলতান জহর শাহ-র লেড়কিকে নিয়ে শুভমুহূর্তে নিজের মুলুকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

প্রাসাদ-দরজায় পৌঁছে এক নফরকে দিয়ে সুলতান সুলেমান-এর কাছে তাঁর ভাবী বেগমের আগমনবার্তা পাঠালেন।

খবর পেয়ে সুলতান আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে পড়ার জোগাড় হলেন।

বিরাশিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্সা শুরু করলেন—প্রজাদের মধ্যেও খবরটি কম সাড়া জাগাল না। সুলতান-এর এতদিন পর সুমতি হয়েছে, শাদী করে ঘর-সংসার পাতবেন, কম কথা! সমগ্র নগর জুড়ে শুরু হয়ে যায় আনন্দ-লহরী।

সে রাত্রেই সুলতান ও বেগম মধুযামিনী যাপন করলেন। আর প্রথম রাত্রেই বেগম অন্তঃসত্ত্বা হলেন। সুলতান-এর মধ্যে নতুন করে আনন্দের জোয়ার বয়ে চল্ল। তাঁর দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। তাঁর মসনদের উত্তরাধিকারী আসছে। তার মৃত্যুর পর সুলতানিয়তের কি গতি হবে, কে মসনদে বসে প্রজাপালন করবে এ ব্যাপারে যে অনিশ্চয়তা ছিল আজ তা ঘুচে যাওয়ার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে।

দশমাস গর্ভ ধারণ করে বেগম এক লেড়কা পয়দা করলেন। চাঁদের কলার মত ফুটফুটে টুকটুকে নবজাতকের নামকরণ করা হ'ল তাজ অল-মুলুক।

লেড়কার ওমর যখন সাত সাল তখন এক প্রবীণ ও বিচক্ষণ মৌলভীর ওপর তার বিদ্যা শিক্ষার ভার দেয়া হ'ল।

নওজোয়ান তাজ অল-মুলুক-এর ওমর যখন আঠার সাল তখন সে সব বিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠল। সে যেমন সুদর্শন নওজোয়ান তেমনি তার বিদ্যা-বুদ্ধি।
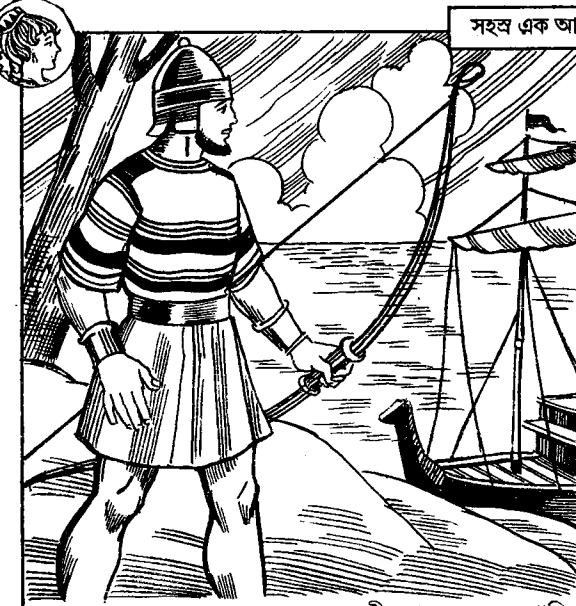
এক সকালে তাজ অল-মুলুক এক নদীর ধারের জঙ্গলে পাখি শিকার করতে বেরল। শিকারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে সে নদীর ধারে এসে পড়ল। দেখল, এক সওদাগর তার নৌকা নোঙর করে তাবু ফেলেছে। তার নির্দেশে এক নফর ছুটল সওদাগরের খবরাখবর নিতে।

সওদাগর তখন তাজ অল-মুলুক-এর জন্যেই ভেট পাঠাবার বন্দোবস্ত করছে।

এদিকে তাজ-এর প্রেরিত নফর ফিরে আসতে দেরী করায় তাজ নিজেই এক পা দু'পা করে সওদাগরের তাঁবুর উদ্দেশে এগোতে লাগল। পথেই উট ও খচ্চরের পিঠে উপহার সামগ্রী চাপিয়ে তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সওদাগরকে অগ্রসর হতে দেখে তাজ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সওদাগর তাজ'কে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে কুর্নিশ করে দ্রব্যসামগ্রী তার পায়ের কাছে রাখল। তাজ তাকে সমান-পত্রগুলির দাম জিজ্ঞাসা করল।

সওদাগর জিভকেটে বল্‌ল—'তোবা! তোবা! এমন কথা মুখেও আনবেন না হুজুর! আমরা আপনার নফরের নফর। এই তো ক'টি মাত্র সমানপত্র আপনাকে নজরানা স্বরূপ দিতে আসলাম। আপনার পছন্দ্ হলেই আমি খুশী। এর বিনিময়ে দাম!

তাজ সমানপত্র সব এক নফরের হাতে দিয়ে তাঁবুতে নিয়ে যেতে হুকুম করল। এবার সওদাগরকে সুকরিয়া জানিয়ে ঘোড়ার রেকাবিতে পা দিয়ে তাজ থমকে গেল। বিষাদক্লিষ্ট মুখে এক নওজোয়ানকে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কাছে এগিয়ে গেল। সমবেদনার স্বরে জিজ্ঞাসা করল—'ভাইয়া, তোমার চোখে পানি কেন? কে তুমি? কি নাম তোমার? থাকই বা কোথায়?'

—'আমার নাম আজিজ।' কথাটি কোনরকমে ছুঁড়ে দিয়েই ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

তিরাশিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদী আবার কিস্‌সা শুরু করলেন।

তাজ তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বল্‌ল—'দুঃখ বেদনা কম-বেশী সব আদমির জীবনেই তো আসে। তাই বলে দুঃখের হাতে নিজেকে সঁপে দিলে তো দুঃখ-দুর্দশার কাছে পরাজিত হওয়াই হয়। তুমি নির্দ্বিধায় আমার কাছে তোমার তকলিফের কথা বলতে পার। কথা দিচ্ছি, তোমার মুশকিল আসান করতে আমি চেষ্টার কসুর করব না।'

—'আমার দুঃখময় জীবনের কথা শুনে আপনার ফয়দা কি হবে?'

—'কৌসিস করব তোমার নসীবের ভাগ যাতে আমি নিতে পারি।'

—'বহুৎ আচ্ছা! তবে বলব, কথা দিচ্ছি। কিন্তু এখানে, এত লোকের মাঝে আমি বলতে পারব না।'

তাজ ম্লান হেসে বল্‌ল—'ঠিক আছে, আমার তাঁবুতে চল।'

নওজোয়ানটিকে নিয়ে তাজ তাঁবুতে ফিরে এল। খানাপিনার পর দু'জনে মুখোমুখি বসল।

নওজোয়ান আজিজ এবার তার দুঃখের কিস্‌সা বলতে শুরু করল—'আমি আমার আব্বাজীর একমাত্র লেড়কা। তাঁর কোন লেড়কি নেই। একেবারেই একলা আমি, আমার চাচা মারা যাবার সময় তার একমাত্র মা-মরা লেড়কিকে আমার আব্বার হাতে তুলে দেন। তাঁর পক্ষে দেখভাল করা সম্ভব নয় বলেই তাকে এপথ বেছে নিতে হয়। আমরা ভাইয়া আর বহিন মিলেঝুলে দিন গুজরান করি। লিখাপড়া, খানাপিনা, খেলকুদ সবই একসাথে করি। আমার নাম আজিজ আর আমার চাচাতো বহিনের নাম আজিজা। নামের মধ্যেও সুন্দর একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়, ঠিক কিনা?

দেখতে দেখতে আজিজা-র শাদীর ওমর হয়ে গেল। আমার আব্বা বল্‌লেন—'বেটা, আমার ভাইয়া গোরে যাবার আগে আমাকে বলে গিয়েছিল—আজিজ-এর সঙ্গে আজিজার শাদী দিও। তোমাকে তো তাকে শাদী করতে হবে।'

আব্বার বাৎ শুনে আমি তো আশমান থেকে পড়লাম। হঠাৎ শাদী! সে কী এখনই শাদী করব কী। সত্যি বলতে কি সেদিন পর্যন্ত আমার দিলে কোনদিন শাদীর কথা জাগে নি। ঘরেই পাত্রী রয়েছে, যখন তখন যাকে শাদী করা যায় তার দিকে তাকিয়েও কোনদিন শাদীর কথা ভাবি নি।

সত্যি বলছি, আজিজা আর আমার মধ্যে পেয়ার কম ছিল না, কেউ, কাউকে ছেড়ে একরাত্রিও কোথাও থাকতে দিল্ চাইত না। ভাল কিছু কাউকে খেতে দিলে অন্য জনকে না দিয়ে মুখে তুলতে পারতাম না। আবার আজিজার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের পেয়ারে তিলমাত্রও খাদ ছিল না। এমন মধুর একটি সম্পর্ক যে মহব্বতের রূপ নেবে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলবে তা আজিজা কোনদিন ভেবেছিল কিনা জানি না, আমি অন্ততঃ ভাবিনি।

আমি আব্বার কথার কোন জবাব না দিয়ে থালি থেকে খানা তুলে মুখে পুরতে লাগলাম। হ্যাঁ-না বা ভাল মন্দ কোন কথাই বল্‌লাম না। আব্বা বার বার আড়চোখে তাকিয়ে আমার মানসিক পরিবর্তনটুকু বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি নির্বিকার ভাবে খানা খতম করে উঠে পড়লাম। আব্বার মুখের ওপর প্রতিবাদ করার মত বুকের পাটা আমার ছিল না। তাই মুখে কুলুপ এঁটেই থাকতে হ'ল।

এক সন্ধ্যায় আব্বার ঘরে আমার তলব পড়ল। কাঁপতে কাঁপতে হাজির হলাম। ভাবলাম, আজ তিনি আমার ওপর কোন্ ফরমান জারি করবেন, কে জানে। আমি দরওজায় পা দিতেই তিনি গুরু-গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলেন—' কামরায় এসো।'

আমি গুটি গুটি এগিয়ে তাঁর মুখোমুখি অথচ মুখ নিচু করে দাঁড়ালাম।

তিনি পূর্বস্বর অনুকরণ করে বল্‌লেন—'আগামী জুম্মাবার তোমার শাদীর দিন ধার্য করেছি। আজিজা-র সঙ্গেই তোমার শাদী হবে। তোমার ইয়ার-দোস্তদের মধ্যে যাদের নিমন্ত্রণ করতে চাও তাড়াতাড়ি সেরে ফেল।'

এবারও মুখবুজে তার কথা শোনলাম। শাদীর জন্য দিলকে তৈরী ক'রে নিলাম।

চুরাশিতম রজনী

জুম্মাবারে নামাজ সারার পর হঠাৎ আজিজ-এর খেয়াল হ'ল, এক দোস্তকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি। শেরওয়ানিটি গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গরমির দিন। পথে যেন লু বইছে। গা দিয়ে সমানে পানি ঝরছে। ঘাম পড়ে চোখ দুটো পর্যন্ত জ্বালা করছে। অনন্যোপায় হয়ে সামনে ছোট্ট বাগিচা দেখে ঢুকে পড়ল। একটি ঝাঁকড়া গাছের তলায় বসে জিরোতে লাগল। ভাবল রোদের তেজ একটু কমলে হাঁটবে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে দিল।

আজিজ বলছে ফুরফুরে বাতাসে সবে আমার চোখ দু'টোতে একটু তন্দ্রাভাব এল। আচমকা খুট্ ক'রে এক আওয়াজ হ'ল। তন্দ্রা টুটে গেল। সোজা হয়ে বসে পড়লাম। চোখ ফেরাতেই একটি ছোট্ট পুটলি আমার সামনে পড়ে থাকতে দেখলাম। লাল একটি রুমালে কি যেন বাঁধা। আমার সামনে হঠাৎ পড়ল।

আমি কৌতূহলী দিল্ নিয়ে হাত বাড়িয়ে রুমালে বাঁধা বস্তুটি তুলে নিলাম। গিঁটি খুলেই অবাক হলাম। আপন মনে বলে ওঠলাম 'হায় খোদা ; সামান্য এক টুকরো পাথর এত যত্ন করে বাঁধা হয়েছো।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলাম। হঠাৎ একটি খোলা-জানালা নজরে পড়ল। দেখি, এক খুবসুরৎ লেড়কি দাঁড়িয়ে। ষোড়শী, কি অষ্টাদশী হবে বোধ হয়। বুঝতে দেরী হ'ল না এ তারই কাম। পাথরটিকে রুমালে বেঁধে নির্ঘাৎ সে-ই ছুঁড়ে দিয়েছে আমাকে লক্ষ্য করে।

আমার কলিজাটি সে-মুহূর্তে যে কেমন নেচে উঠল তা বলে বুঝাতে পারব না হুজুর। তবে ধরে নিতে পারেন কলিজাটি অকস্মাৎ অস্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আমি প্রথম অনুভব করলাম, একটি লেড়কি এক নওজোয়ানের ভেতরে কী অবর্ণনীয় চাঞ্চল্য জাগাতে পারে।

আউরৎ আমার শৈশবের সর্বক্ষণের সঙ্গী। বাল্য কৈশোর আর যৌবনের প্রারম্ভ জুড়ে থাকলেও আউরৎ কি জিনিস সেদিন, সে মুহূর্তেই প্রথম অনুভব করতে পারলাম। এই প্রথম আমার কলিজায় উন্মাদনা জাগিয়ে তুল্‌ল।

রুমালটির এক কোণে একটি গিঁট নজরে পড়ল। কৌতূহলাপন্ন হয়ে ব্যস্ত-হাতে গিঁটটি খুলতেই এক চিলতে কাগজ বেরিয়ে এল। তার গায়ে দু' ছত্র লেখা—'ওগো, পথিকবর, তুমি কি পথ হারাতে চাচ্ছ না? যে-পথ ধরে তুমি এগোবে মনস্থ করেছ তা ছাড়াও তো বহুৎ দুর্গম অজানা-অচেনা পথ রয়েছে। সেরকম পথ পাড়ি দেবার স্বাদ কোনদিন পেয়েছ কি? ভাব—ভেবে দেখ তো?'

ব্যস। আর দেরী নয়, তখনই অজানা-অচেনা খুবসুরৎ লেড়কিটির পেয়ার মহব্বতের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেল্‌লাম। সে-রাত্রেই যে আমার শাদী হবার কথা তা নিঃশেষে আমার দিল্‌ থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

আমি নিষ্পলক চোখে সে-লেড়কিটির দিকে চেয়ে রইলাম। চোখের পলক পড়ছে না। আমার পেয়ারী ইঙ্গিতে আমাকে কি যেন সব বুঝাতে চাইল। সবার আগে তর্জনীটি ঠোঁটের কাছে নিল। তারপর মুহূর্তেই হাত দুটো দিয়ে নিজের বুকটিকে চেপে ধরল। ফিক ক'রে নিঃশব্দে হাসল।

হায় খোদা! আমি তার ইশারা ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করতে পারলাম না।

ব্যস, খনিক বাদেই ধীরে ধীরে জানলাটি বন্ধ করে গেল। আমার কলিজা উথালি-পাথালি করতে লাগল। সাগরের ঢেউ বয়ে চল্‌ল আমার বুক জুড়ে, আনাচে কানাচে—সর্বত্র।

আমার পা দুটোকে যেন কোন্‌ দৈত্য তার অদৃশ্য হাত দিয়ে পেরেক গেঁথে দিল! নিশ্চল-নিথরভাবে সেখানে বসেই রইলাম। আমার দিল্‌ বল্‌ল—আবার জানালা খুলবে, আবারও আমার মেহবুবা কিছু বলবে। আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল বন্ধ জানালাটির দিকে। ক্রমে সূর্য পশ্চিম-আকাশের গায়ে হেলে পড়ল। আকাশের গায়ে শুরু হয়ে গেল রঙের খেলা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যার প্রস্তুতি শুরু হ'ল। তারপর প্রকৃতির কোলে শুরু হয়ে গেল আলো-আঁধারের খেলা। না আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত জানালাটি আর খুলল-ই না।

বুকভরা হতাশা আর হাহাকার নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পরে ঘরে ফিরে এলাম।

আমাকে দরওয়াজায় দেখেই আব্বা বাজখাঁই গলায় ব'লে উঠলেন—'তোমার জ্ঞান গম্যির বলিহারি! কাণ্ডজ্ঞান বলতে যদি কিছুমাত্রও থাকে! আজ যার শাদী সে কী করে রাত দুপুরে ঘরে ফেরে ভেবে পাচ্ছি নে! এমন যার কর্তব্যজ্ঞান তার হাতে একটি লেড়কিকে তুলে দেওয়া কেবলমাত্র বোকামিই নয়, অবিবেচকের কাজও বটে। এ শাদী আমি হতে দিচ্ছি না। তোমার আক্কেলই আমাকে এ শাদী বাতিল করতে বাধ্য করল। এ শাদী বাতিল।'

আমার আম্মা বহুৎ চোখের পানি ঝরালেন। তিনি তো ভালই জানেন, আব্বা একগুঁয়ে। একবার যখন 'না' ব'লে ফেলেছেন তখন তাঁকে দিয়ে 'হ্যাঁ' বলানো স্বয়ং খোদাতাল্লার পক্ষেও সম্ভব না।

পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আমার চাচাতো বহিন আজিজা পাশে এসে দাঁড়াল। আলতো করে আমার পিঠে হাত রেখে সে বল্‌ল—'ভাইজান। কি ব্যাপার, খুলে বল তো?'

আজিজা আমার শৈশবের সাথী। তার কাছে কোনদিন কোন কথা লুকোই নি। সেদিনও পারলাম না। খুবসুরৎ সে লেড়কির কথা তাকে বল্‌লাম। কিছুমাত্র গোপন না করে পুরো ঘটনাটি তার কাছে খোলাখুলি তুলে ধরলাম। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক সময় বল্‌লাম—'আজিজা, তুমি বিশ্বাস কর, তাকে এক নজর দেখার পর থেকেই আমার বুকের মধ্যে কালবৈশাখীর তুফান বইতে শুরু করেছে। কলিজাটি কেবলই উথালি পাথালি করে চলেছে। শত চেষ্টা করে তার মুখটাকে আমার দিল থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারছি না। কেন? কেন আমার এমনটা হ'ল, বল তো?'

পঁচাশিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন। জাঁহাপনা, আজিজা বিষণ্নমুখে বল্‌লো—'একেই বলে' পেয়ার, একেই বলে মহব্বৎ। তুমি যে ওকে পেয়ারের রশিতে বেঁধে ফেলেছ ভাইজান। তুমি ঘাবড়িও না। আমি তোমার পাশে পাশে থেকে তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করব। সে-লেড়কিটিকে পাকড়ে নাও, লটকে নাও, তাকে তোমার পেয়ার জানাও। তোমার মুখে এক টুকরো হাসি দেখার জন্য আমিবুক থেকে কলিজাটিকে উপড়ে নিয়ে আসতেও দ্বিধা করব না। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে সে আবার বলতে শুরু করল—ঠোঁটের কাছে তর্জনি নিয়ে গিয়ে সে তোমাকে চুম্বনের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। আর হাত দিয়ে নিজের বুকটি জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করার কথা, আর তোমাকে দিল্‌ অর্পণের কথা বুঝাতে চেয়েছিল। ঠিক আছে তোমাকে আমি আবার সে-বাগিচায় পাঠাব।' আজিজা আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সোহাগ জানাতে জানাতে কথাগুলি বল্‌ল।

দু'দিন বাদে আজিজা নিজে হাতে আমাকে ঝলমলে পোশাক

পরিয়ে দিল। খুব খুসবুওয়ালা আতর শেরওয়ানিতে ছিটিয়ে দিল। এবার মুচকি হেসে বল্‌ল—'যাও, এবার সে বাগিচায় গিয়ে বোসো। কাজ মিটে গেলেই ঘরে ফিরে আসা চাই। আমি তোমার পথ-চেয়ে বসে থাকব। কোথাও দাঁড়াবে না।'

আমি সোজা বাগিচায় গিয়ে সে-গাছটির ছায়ায় বসলাম। একটু বাদেই আমার বহুবাঞ্ছিত জানালাটি ধীরে ধীরে খুলে গেল। জানালাপথে ভেসে উঠল আমার বেহেস্তের সে-হুরী। বুকভরা হৈচৈ নিয়ে জানালাটির গরাদ ধরে দাঁড়াল। মুখে দুষ্টমিভরা হাসির ছোপ তার এক হাতে একটি রুমাল অন্য হাতে ছোট্ট একটি আয়না পরপর তিনবার হাতের রুমালটি ভাঁজ করল। তিনবারই ভাঁজ খুলে ফেল্‌ল। তারপর মুহূর্তেই রুমালটিকে ওপরে নিচে নাড়াতে থাকে। আয়নাটি দিয়ে পর পর তিনবার আমার মুখে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি ফেল্‌ল। আরপর আচমকা কামিজের হাতা গুটিয়ে তার ধবধবে হাত দুটোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবার নতুনতর এক ইঙ্গিতে মেতে উঠল। ডান-হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে তার বুকটিকে চেপে ধরল। ফিক্ করে হেসে জানালাটি বন্ধ করে দিল। ব্যস, সেদিনের মত খেল্ খতম।

আমি এবারেও হতভম্ব হয়ে গেলাম। তার ব্যাপার-স্যাপার কিছুতেই ধরতে পারলাম না। হতাশমন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আজিজা-র কাছে তার ইশারা-ইঙ্গিতগুলোর কথা বললাম।

আমার কথা শুনে সে মুহূর্তকাল নীরবে ভাবল। তারপর বল্‌ল' —'আরে ভাইজান, বুঝতে পারলে না? সে বলতে চাইছে পাঁচদিন পরে সে তার মনের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত করবে। তাদের বাড়ির লাগোয়া একটি কাপড় রঙ করার ঘাঁটি আছে, সেখানে তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে।'

ছিয়াশিতম রজনী

বেগম আবার কিস্‌সা শুরু করেন। আজিজ বল্‌ল—আজিজা-র ব্যাখ্যা শুনে আমার কলিজাটি তো আনন্দে লাফালাফি শুরু করে দিল আমি আবেগ-উচ্ছ্বাস একটু সামলে নিয়ে বল্‌লাম—'হ্যাঁ, কাপড় রঙ করার একটি ঘাঁটি আছে বটে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে—'

—'সমস্যা? কিসের সমস্যা?'

—'সমস্যা হচ্ছে, পাঁচ-পাঁচটি দিন তাকে না দেখে আমি থাকব কি করে, বলতো? আমার কলিজা তো শুকিয়ে আমসি হয়ে যাবে।'

—'মহব্বৎ বড় দায়। এমন উতলা হলে কি চলে? এমনও হয় একের পর এক সাল ধৈর্যে বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে হয়। তবে কি বাঞ্ছিতাকে পাওয়া যায়। আর তোমার তো মাত্র পাঁচটি দিন।

আমার গোসল আর খানাপিনা সব শিকেয় উঠল। সে খুবসুরৎ লেড়কি আমার দিল্ কেড়ে নিয়েছে। তার ধ্যান-জ্ঞান আমার সর্বক্ষণের সাধনা হয়ে দাঁড়াল। চোখের নিদ পর্যন্ত সে কেড়ে নিয়েছে।

আজিজা আমার কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। আমার প্রতি তার সহানুভূতির সে-ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারব না। এখন আর তার প্রশ্নই ওঠে না।

পাঁচ-পাঁচটি দুঃখের দিন, আমার ধৈর্য পরীক্ষার কাল অতিকষ্টে কেটে গেল।

আজিজা আমাকে আবার সাজিয়ে-গুছিয়ে আমার মেহবুবার কাছে পাঠাল শনিবার। কাপড় রঙ করার ঘাঁটি বন্ধ। আমি বন্ধ দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে সে-রূপসীর প্রতিক্ষায় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে লাগলাম। না, আমার বাঞ্ছিতার দেখা পেলাম না। ক্রমে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারপর রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। তবু আসার নামটি নেই! খুবই অবাক হলাম। কিন্তু হাল ছাড়লাম না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত্রি ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। ভাবলাম, আর নয়. এবার ঘরে ফেরা যাক। বিষণ্ণ মনে ঘরে গিয়ে আজিজাকে আমার হতাশার কথা বল্‌লাম।

রাত্রে কখন, কোথায় ঘুমিয়েছিলাম আমার হুঁসও ছিল না। সকালে চোখ মেলেই দেখি, আজিজা-র কোলে মাথা রেখে আমি শুয়ে।

আমি চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বল্‌লাম—'সে কী আজিজা, তুমি সারারাত্রি নির্ঘুম অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছ!'

—'কি করে নিদ যাই বলতো! সারাটি রাত তুমি যে কাণ্ড করেছ শুনলে তোমারই হাসি পাবে। বেহুঁস হয়ে পড়েছিলে। আর থেকে থেকে কি যেন প্রলাপ বকছিলে যার কোন মাথামুণ্ডু নেই। তোমাকে এ-অবস্থায় ফেলে কারো চোখ বন্ধ করতে দিল্ চায়, তুমিই বল?'

আমি হতাশ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম—'আজিজা, আমি ভেবে পাচ্ছি নে, কেন সে এল না।'

সে ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমিভরা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'পরীক্ষা। এ-ও এক পরীক্ষা। মহব্বতের পরীক্ষা। তোমার মহব্বতের গভীরতার পরিমাপ সে করতে চাইছে। সে সঙ্গে তোমার আগ্রহ ও ধৈর্যের পরীক্ষাও ক'রে দেখল।'

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে আজিজা বল্‌ল—'আজ বিকেলে আবার সে-বাগিচায় যাও। নতুন কোন ইশারা ইঙ্গিত সে দেবে।'

আজিজা-র কথামত আমি আবার বাগিচার সে-গাছটির তলায় গিয়ে বসলাম। বহু পরিচিত জানালাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম। বেশীক্ষণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হ'ল না। জানালাটি ধীরে ধীরে খুলে গেল। এবার তার হাতে একটি ছোট্ট আয়না আর বটুয়া। অন্যহাতে একটি ফুলদানী আর লণ্ঠন। তাজ্জব ব্যা ার মনে হ'ল।

সে আয়নাটিকে বটুয়ার মধ্যে ভরে নিল। এবার আয়না সমেত

বটুয়াটি হাত বাড়িয়ে পিছনের দিকে রাখল। এবার ফুলদানির ফুলের ঝাড়ের মধ্যে লণ্ঠনটিকে ভরে নিল। চুল এলোমেলো করে মুখ ঢাকল। ব্যস, আবার জানালাটি যথারীতি বন্ধ হয়ে গেল।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, আয়না, বটুয়া, ফুলদানি আর লণ্ঠনের মধ্যে সে কি বুঝাতে চাইছে?

আমি আমার মেহবুবার এবারের ইশারা-ইঙ্গিতের অর্থ উদ্ধারের ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে চালাতে ঘরে ফিরলাম।

আমি সদর-দরজা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অজিজা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে ছুটে এল। আমি তাকে এবারের ঘটনাটিও সবিস্তারে বল্লাম। সে এবার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বল্ল— 'বটুয়ার ভেতরে আয়নাটি পুরে পিছনে রেখে সে বুঝাতে চাইছে—যখন রাত্রি নেমে আসবে। চুল আলুথালু করে মুখ ঢেকে বুঝাতে চাইছে—অন্ধকারে যখন সূর্যের আলো চাপা পড়ে যাবে। ফুলের মাধ্যমে বুঝাচ্ছে, ফুল বাগিচায় তোমাকে থাকতে বলছে। আর লণ্ঠন? বুঝাতে চাইছে তখন একটি আলো দেখতে পাবে।'

সাতাশিতম রজনী

আজিজ বল্ল—এবার আর আমি আজিজা-র ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আসলে তার ব্যাখ্যার সত্যতা-যৌক্তিকতা নিয়ে আমার মনে সন্দেহের সঞ্চার ঘটেছিল।

আজিজা কিন্তু আমাকে সে বাগিচায় যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি গররাজি হওয়া সত্ত্বেও আজিজা-র কথামত যথা সময়ে বাগিচার সে গাছটির তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, এবার সত্যি তার সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল। হঠাৎ দেখলাম। একটি ঝোপের কাছে একটি লণ্ঠন জ্বলছে। আলোটি লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম। তাজ্জব ব্যাপার। আমার সঙ্গে সঙ্গে আলোটিও এগোতে লাগল। আলোটি অনুসরণ করে আমি এবার একটি সুবিশাল মহলে ঢুকলাম। দরজার রেশমী পর্দা ঠেলে কামরার মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিন্তু কামরার ভেতরে ঢুকে আরও তাজ্জব বনে গেলাম। কেউ-ই নেই। ঘর শূন্য। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন আদমি এতবড় মহলে আছে বলে আমার মনে হ'ল না। কৌতূহল মিশ্রিত ভয়ে ভয়ে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমার বিস্ময় কাটল না। আদমি তো দূরের কথা অন্য কোন প্রাণীও আমার চোখে পড়ল না। আর আশায় আশায় তিন-তিনটি ঘন্টা কাটিয়ে দিলাম। এঘর-ওঘর ঘুরে ঘুরে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার ওপর মনে জমাট বাঁধা হতাশা। আর পারলাম না হাঁটাহাঁটি করতে। কার্পেটের ওপর বসে পড়লাম। হঠাৎ চোখে পড়ল তাকের ওপর খাবারদাবার আর সরাবের বোতল রয়েছে। ঝট্ করে উঠে কয়েকটি পিস্তার বরফি টপাটপ মুখে পুরে দিলাম। বোতল থেকে সরাব ঢেলে ঢকঢক করে কয়েক পেয়ালা দিলাম সাবাড় করে। মুহূর্তে শরীরটি একটু চাঙা হয়ে উঠল। আবার গিয়ে কার্পেটের ওপর বসে দেয়ালের গায়ে হেলান দিলাম। সরাবের নেশা আমাকে পেয়ে বসল। কখন যে কার্পেটের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম, বলতে পারব না। তারপর সারা রাত্রি কিভাবে কাটল তা-ও আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

জানালা দিয়ে কখন যে রোদ এসে আমার মুখের ওপর পড়েছিল তা-ও আমি বলতে পারব না।

আচমকা চোখ মেলে তাকালাম। হঠাৎ অনুভব করলাম আমি যেন কাঁটার ওপর শুয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে মেঝের দিকে চোখ ফেরাতেই অবাক হয়ে গেলাম। দেখি, সারা মেঝেতে মোটা-দানার নিমক ছড়ানো। আর? আমার পেটের ওপরে কে যেন ডাঁই করে কয়লার গুঁড়ো রেখে গেছে। একলাফে উঠে বসলাম। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক তাকালাম। না, একই পরিস্থিতি। মানুষের নামগন্ধও নজরে পড়ল না। আবার নতুন করে তাজ্জব বনলাম। নিজের বোকামির জন্য নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগলাম।

সে মহল থেকে বেরিয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে আমি পথ পাড়ি দিতে লাগলাম। এক সময় আজিজার কাছে এসে ঢিব করে বসে পড়লাম।

আমার এরকম ভয়াবহ রূপ দেখে আজিজা আতঙ্কিত হ'ল। সে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই আমি বলতে লাগলাম—'ঘুম ভেঙে দেখি আমি নিমকের ওপর শুয়ে। আর গা ভর্তি কয়লার গুঁড়ো।'

আজিজা বল্‌ল— 'লেড়কিটি কি রল্‌ল? সে-ও কি এসবের কিছুই জানে না?'

—'আরে ধুৎ! লেড়কিটির সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হলে তো!'

আমার কথায় আজিজা তাজ্জব বনে গেল। চোখ দুটো কপালে তুলে সে সবিস্ময়ে বল্‌ল— 'সে কী! লেড়কিটির সঙ্গে তোমার আদপেই যদি দেখা না হয়ে থাকে তবে তার ঘরে গেলে, পিস্তার বরফি, সরাব খেলে কি করে? আবার রাতভর ঘুমিয়েছও বল্‌লে—কি করে সম্ভব হ'ল? বুঝছি না, তুমি কি খোয়াব দেখছ, নাকি গুলতাপ্পি দিচ্ছ?'

আমি তার কথার কি জবাব দেব বুঝে পেলাম না। তবে বাগিচায় ঝোপের আড়ালে লণ্ঠনের আলোটি দেখার পর থেকে সব ঘটনা, যেটুকু আজিজা-র কাছে বলা হয়ে ওঠে নি, খোল্‌সা করে বললাম।

আজিজা এবার গুম হয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর একসময় মুখ খুল্‌ল— 'আজিজ, তোমার কথায় আমার কলিজা শুকিয়ে আসছে। লেড়কিটির হাতে তোমার নসীবের বহুৎ তকলিফ আছে। লবণ ছিটিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে, তোমার দেহে যৌবন পুষ্টিলাভ করে নি। তাই তো উদ্ভিন্না যৌবনাকে সম্ভোগের মাধ্যমে তৃপ্তিলাভের চেয়ে খানাপিনা আর নিদ যাওয়ার ব্যাপার স্যাপারে তোমার আকর্ষণ বেশী। আর কয়লার গুঁড়ো? এর অর্থ হচ্ছে তোমাকে সে ঘৃণার চোখে দেখে। তোমার কাছে পেয়ার মহব্বতের মূল্য খুবই নগণ্য। এবার আমি বুঝছি, তোমার আর সে পথ না মাড়ানোই সঙ্গত। তার মোহ থেকে নিজেকে বিছিন্ন করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

আজিজা-র কথায় আমার কলিজাটি আচমকা মোচড় মেরে উঠল। বুক উজাড় করে, দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আপন মনে বলে উঠলাম— 'হায় খোদা! আমারই তো কসুর! আমি তো উপযাচক হয়েই আমার পেয়ার মহব্বতকে অপমান করার সুযোগ করে দিয়েছি। নিজের ভোগ-লালসার বশবর্তী হয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে দাগা খেলাম। বিলকুল কসুরই তো আমার।'

আমি নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। জবাই হওয়া খাসীর মত ছটফট করতে লাগলাম। নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসল। আজিজা-র দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বল্‌লাম— 'আজিজা, আমি তো তাকে ছাড়া জান রাখতে পারব না। জিন্দেগী বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। যা হোক কিছু একটি ফিকির তো বাৎলাও। সে যদি আমাকে পায়ে ঠেলে দেয় তবে আমি ডাঁহা মারা যাব।'

আজিজা-র মুখে বিষাদের কালো-ছায়া ফুটে উঠল। আর কেউ না জানুক, আমি তো ভালই জানি, জিন্দেগীতে আমি ছাড়া আর কেউ বল-ভরসা নেই। আমার দুঃখে সে এখন যেমন কাতর ঠিক তেমনি আমার সামান্য সুখে সে উদ্বেল হয়ে পড়েছে বহুবার। নইলে কোন লেড়কি তার মেহবুবকে অন্য কারো হাতে তুলে দিতে উৎসাহী হয়?

আজিজা-র বুকের ভেতরে তুষের আগুনের মত আগুন ধিক্‌ধিক্ করে জ্বলছে। কথাটি তো মিথ্যা নয়। তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল— আজিজ আমার হাত-পা ক্রমে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে, জান কি? আমার চাচা, তোমার আব্বা, আমার শাদীর পাত্র ঠিক করে ফেলেছেন। তাই এখন আমাকে আর বাড়ির বাইরে বেরোতে দেবেন না। যা কিছু করার তোমাকেই করতে হবে। আমার ফন্দি-ফিকির যদি তোমার পক্ষে গ্রহণীয় হয় তবে আজ আবার তার বাড়ি যাও। খানাপিনার লোভ সামলে নিজেকে শক্ত রাখবে। আমার বিশ্বাস, আজ তোমাদের মোলাকাৎ হবেই হবে। খোদাতাল্লার ওপর ভরসা রেখে এগিয়ে যাও। আখেরে ফল পেতেও পার।'

সন্ধ্যার কিছু আগে আজিজা আবার নিজেহাতে আমাকে সাজিয়ে দিল। আতর ছড়িয়ে দিল পোশাক-আশাকে। খুসবুতে ঘর ভরে গেল। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সে বল্‌ল—'সে যখন তোমার গালে টোকা দিয়ে সোহাগ জানাবে তখন তাকে যেন একটি প্রেমের গান শোনাতে ভুলো না।'

আমি তখন পেয়ার মহব্বতের খোয়াবে ডুবে রয়েছি। আজিজার কলিজার ব্যথা বুঝবার মত দিল্ আর সময় উভয়েরই অভাব ছিল আমার। তার চোখ দুটোতে পানি ভিড় করেছে। কেন এ-পানি, কিসের ব্যথা-বেদনায় তার কলিজাটি জর্জরিত হচ্ছে তার হদিস করার ফুরসৎ আমার ছিল না।

অষ্টাশিতম রজনী

আজিজ বল্‌ল— 'আমি আবার সে-বাড়ির ভিতরে গুটিগুটি ঢুকে গেলাম। একই দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। এতবড় মহলে জনপ্রাণীর চিহ্নও দেখলাম না। আজ তাকে দেখতে পাবই, মোলাকাৎ হবেই একরকম নিশ্চিন্ত বিশ্বাস নিয়ে একটি কুর্শিতে গা-এলিয়ে দিয়ে বসে রইলাম। রাত্রি ক্রমে গভীর হতে হতে দ্বিতীয় প্রহর পেরিয়ে তৃতীয় প্রহর শুরু হ'ল। আজিজা-র পরামর্শ ভুলে পেট পুরে খেয়ে নিলাম। সরাব গিললাম গলা পর্যন্ত। আর বসলাম না। যদি ঘুমিয়ে পড়ি এ ভয়ে রাতভর পায়চারি করে বেড়ালাম। শেষ রাত্রির দিকে কখন যে গালিচার ওপর বসে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম কিছুই বলতে পারব না। ঘুম যখন ভাঙল তখন জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ ঢুকে মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

চোখ মেলে এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরাতে চমকে উঠলাম। দেখি, আমি এক আস্তাবলে। তাজ্জব বনে গেলাম। আমি তো ছিলাম

মহলের বৈঠকখানায়, তবে আস্তাবলে কখন কি করে এলাম? আমি চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। বুকের ওপর কে যেন কতগুলি হাড়ের
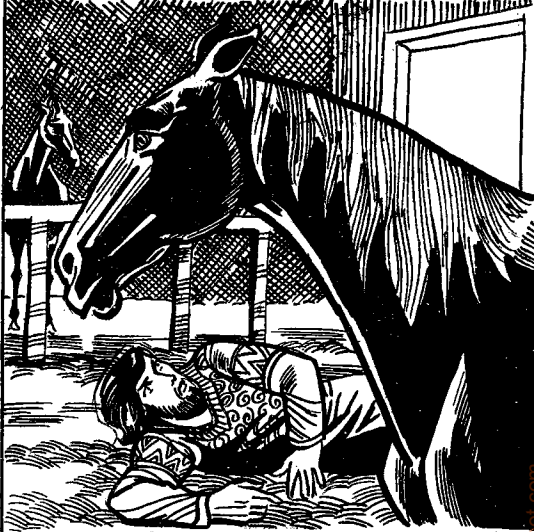
টুকরো আর একটি গোলাকার বল রেখে গিয়েছিল। আরও ছিল, কিছু সবজীর খোসা, শুকনো রুটির টুকরো কয়েকটি, একটি ছুরি আর দুটো দিরহাম রেখে গিয়েছিল।

আমি আর সেখানে এক মুহূর্তও থাকতে পারলাম না। ছুরিটি হাতে নিয়ে বদ্ধ পাগলের মত বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম।

আমার কাদা-গোবর মাখা পোশাক, উসকো খুসকো চুল আর, চোখ-মুখের আতঙ্কের ছাপ দেখে আজিজা ব'লে উঠল— 'কি ব্যাপার, আজও ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি? তোমাকে এত করে বলে দিলাম, ঘুমিয়ো না, সেই কালঘুমের হাতে নিজেকে সঁপে দিলে! তাজ্জব ব্যাপার-স্যাপার তোমার!'

আমি আজও তার কাছে কিছু গোপন করতে পারলাম না। গত রাত্রের ঘটনা সবই এক এক করে আজিজা-র কাছে বল্‌লাম। সে কপাল চাপড়ে বলে উঠল— 'হায় খোদা! তুমি আমার কথাটিকে পাত্তাই দিলে না। বলেছিল্যাম খানা খাবে না, সরাব খাবে না, ঘুমোবে না—

করলে ঠিক তার বিপরীত! তোমাকে নিয়ে আর পারার জো নেই দেখছি!

আমি উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম—'মিছে কপাল চাপড়ে হায় হায় করলে কি হবে? এখন কি করব, বল? যা হবার তো হয়েই গেছে। তাকে না পেলে আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে, বলেছিই তো।'

উননব্বইতম রজনী

বেগম আবার কিস্‌সা শুরু করলেন।

আজিজা এবার বল্‌ল—'যে বলটি তোমার বুকের ওপর রাখা ছিল তার অর্থ হচ্ছে—তুমি অন্তঃসারশূন্য। ফাঁপা বেলুনের মত তোমার ভেতরটি। কামনা-বাসনা কিছুই নেই তোমার মধ্যে। শুধুই হাওয়ায় ভরা তোমার বুক। আর ছুরিটি? এর অর্থ কিন্তু ভয়ঙ্কর। আর দিরহাম দুটোর মারফতে তার চোখের কথা বুঝাতে চাইছে। সব্‌জীর খোসাগুলির কথা বলা হয় নি। শোন, ওগুলো দিয়ে তোমাকে নিষ্কর্মা বলতে চাইছে। আর হাড়ের টুকরোগুলোর কথা ভেবে ভয়ে আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে সে আবার বলতে শুরু করল—'শোন, আজও আবার তোমাকে ওই মহলে যেতে হবে। দুপুরে সকাল সকাল খানাপিনা সেরে লম্বা ঘুম দেবে যাতে সারারাত্রি জেগে থাকতে পার। ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু কেলেঙ্কারী করে বসবে। সন্ধ্যার আগে গলা পর্যন্ত ঠেঁসে খানা খাবে। পেটভর্তি থাকলে রাত্রে খানাপিনার জন্য দিল ছটফট করবে না।'

সন্ধ্যার আগে আজিজা আমাকে পোশাক-আশাক পরিয়ে দিল। তারপর আতর ছিটিয়ে খুসবুর ব্যবস্থাও করল। আমি নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বল্‌লাম—'এ কী করলে আজিজা, এ পোশাক তো আমার আব্বা আমার শাদীর জন্য কিনে এনেছিলেন। আজ হঠাৎ এ পোশাকে আমাকে সাজালে কেন আজিজা?'

—'হ্যাঁ, শাদীর পোশাকই বটে। কিন্তু শাদী তো আর হ'ল না।'

—'হ'ল না ঠিকই। কিন্তু কোনদিন কি আমার শাদী হবে না?'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আজিজা বল্‌লে—'হবে, অবশ্যই হবে। কিন্তু সে-শাদী তো হবে শাহজাদী বাদশাহের লেড়কির সঙ্গে। তখন এ-পোশাক নয়, জরি দেওয়া ঝলমলে পোশাক তোমার গায়ে উঠবে।'

—'কেন আজিজা, তোমার সঙ্গে আমার শাদী হবে না?'

—'অন্য পাত্রের সঙ্গে তোমার আব্বা, আমার চাচাজী আমার শাদী ঠিক করেছেন। তুমি অমত করায় উপায়ান্তর না দেখে তিনি এপথই বেছে নিয়েছেন।'

শরমে আমার মাথা নীচু হয়ে গেল। কি বলব, চট করে গুছিয়ে উঠতে পারলাম না।

আজিজা চোখের পানি মুছতে মুছতে এবার বল্‌ল—'আজিজা, আমার শাদী যার সঙ্গে হোক, সুলতান-বাদশাহের লেড়কার সঙ্গে হলেও আমি আজ যেমন তোমার আছি ভবিষ্যতেও তোমারই থাকব। তুমি যাকে নিয়েই ঘর বাঁধ না কেন তার জন্য আমি বিন্দুমাত্রও পরোয়া করি না। এ দুনিয়ায় তোমাকে আমি কাছে না পেলেও শেষ-বিচারের দিন আমাদের মিলন তো হবেই হবে

আজিজ।' আজিজা কথা ক'টি আমার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

নব্বইতম রজনী

বেগম আবার তাঁর কিস্‌সা শুরু করলেন।

জাঁহাপনা, কয়েক মুহূর্ত পরে চোখের পানি মুছতে মুছতে আজিজা আবার মুখ খুল্‌ল—'আজিজ, আজ তোমার পরম লগ্নের দিন। তোমাকে আমি নিজের হাতে, মনের মত করে সাজিয়ে দেব না, বলছ কি! মন খারাপ কোরো না মেহবুব, তোমার এতদিনের সাধ আজ পূর্ণ হবে। আমি আল্লাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করছি, তোমরা যেন জিন্দেগী ভর একে অন্যের কাছাকাছি একাত্ম হয়ে থাকতে পার। মেহবুবার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সুখে শান্তিতে—ভাল কথা, যে গানা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি, তাকে শোনাতে ভুলো না যেন।'

আজিজার আচরণ আমাকে বিস্মিত করল। নিজের মেহবুবকে নিজের কলিজাকে নিজের হাতে সাজিয়ে তার মনের মানুষের কাছে পাঠাচ্ছে, কম কথা! এমন ত্যাগ, এমন আত্মসম্বরণ আর এমন আত্মপীড়ন সচরাচর দেখা যায় না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে না আসতেই আমি তার মহলের বৈঠকখানায় পৌঁছে গেলাম। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখলাম। কামরাটি শূন্য—ফাঁকা। খানা আর সরাবের বোতল আগের মতই সাজানো রয়েছে।

রাত্রির প্রথম প্রহর কেটে গিয়ে দ্বিতীয় প্রহরে পড়ল। আমি ঠায় বসে রইলাম। খানা বা সরাব কিছুই স্পর্শ করলাম না। ঘুমের তো প্রশ্নই ওঠে না।

বিনিদ্র অবস্থায়ই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরও আমি কাটিয়ে দিলাম। আমার মনের কোণে হতাশা আর হাহাকার গাঢ় হতে থাকে। তার আশা আজও ছেড়েই দিলাম।

এমন সময় একদল লেড়কির গলা আমার কানে এল। সচকিত হয়ে সোজা হয়ে বসলাম। উৎকর্ণ হয়ে লেড়কিদের গলার স্বর কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ, আমার ধারণা অভ্রান্ত। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একদল খুবসুরৎ লেড়কি পরিবেষ্টিত হয়ে আমার মনময়ূরী, আমার খোয়াবের হুরী-পরী, আমার কলিজা সে লেড়কিটি হাসিমাখা মুখে কামরায় ঢুকল। ভেতরে ঢুকেই ঠোঁটে হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই আমার পেয়ারী, আমার মেহবুবা বল্‌ল—'কি গো, আজকে এখনও জেগে রয়েছ, ঘুমোলে না?'

—'না, তুমি আসবে জানতে পেরে ঘুম আর এগোতে সাহস পায় নি রূপসী।'

একানব্বইতম রজনী

বেগম কিস্‌সা শুরু করলেন।

জাঁহাপনা, লেড়কিটি তার সঙ্গী সাথীদের কামরা ছেড়ে যেতে ইশারা করল। তারা এক এক করে কামরা ছেড়ে গেল। এবার এত বড় কামরাটিতে কেবল আমরা দু'জন রইলাম। আমি আর আমার ভাললাগা লেড়কিটি। সে ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমি ভরা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমার পাশে, একেবারে গা ঘেঁষে বসল। তার নিটোল তুলতুলে আর ধবধবে সাদা হাত দুটো দিয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আঃ কি শান্তি! কি স্বস্তি! আমি আমার ঠোঁট দুটোকে তার আপেল রাঙা ঠোঁট দুটোর কাছে নিয়ে গেলাম। চুম্বন করলাম। এক-দুই-তিন—পরপর কতবার যে তাকে চুম্বন করেছিলাম তার হিসাব রাখার মত অবস্থা তখন আমার ছিল না।

আর বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। কার্পেটের ওপর আমরা শুয়ে পড়লাম। সে আমাকে বাকি রাত্রিটুকু সোহাগে সোহাগে ভরিয়ে তুল্‌ল আমার এতদিনের হতাশা আর হাহাকারে আমার মনময়ূরী পানি ছিটিয়ে শান্ত করে দিল।

আমরা জড়াজড়ি করে কখন যে কার্পেটের ওপরেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম দু'জনের কেউ-ই বলতে পারব না।
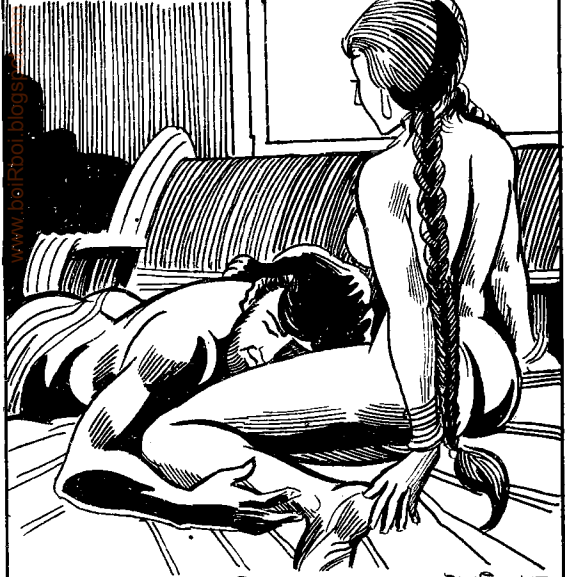
ঘরের মেঝেতে সোনালী রোদ এসে কখন যে লুটোপুটি খেতে শুরু করেছে বুঝতেই পারি নি। চোখের ওপরে রোদ এসে পড়ায় আমাদের সুখ-নিদ্রা টুটে গেল।

আমি তার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য তৈরী হলাম। আমি তাকে আমার নাম বল্‌লাম। সে তার নাম বল্‌ল—দুনিয়া। বিদায় মুহূর্তে সে তার নিজের হাতে তৈরী একটি রেশমী রুমাল আমাকে

উপহার দিল।

বাড়ি ফিরে আজিজা-র কামরায় যেতেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম সে খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমার উপস্থিতির কথা বুঝতে পেরে আজিজা উঠে বসল। ওড়না দিয়ে চোখের পানি মুছে বল্‌ল—'আমার জন্য ভেবো না আজিজ।' তারপর বলল তোমার মহব্বতের অগ্রগতি কতদূর কি হ'ল?'

আমি সারারাত্রির ঘটনাবলী তাকে বল্‌লাম। সব শেষে আমার মেহবুবার উপহৃত রুমালটি তার চোখের সামনে মেলে ধরলাম। সে মুখে বিষাদের ছাপ ফুটিয়ে তুল্‌ল না, আবার উল্লসিতও হ'ল না। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল— 'তুমি সুখী তো, তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমাদের ভবিষ্যৎ-জীবন উজ্জ্বলতম হয়ে উঠুক। আমি দূর থেকে তোমাদের সুখ শান্তি দেখে তৃপ্ত হ'ব।'

আমি সচকিত হয়ে বল্‌লাম—'এ কী কথা বলছ আজিজা! তুমি কোথায় যাবে? দূর থেকে মানে—'

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সে বলতে শুরু করল—'আমি যেখানে যাব তার হদিস তোমাদের পাওয়ার উপায় নেই, আজিজ। বহু দূরে, তোমাদের একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাব।'

আমার মন থেকে তখনও গত রাত্রের আবেগ-উচ্ছ্বাস মুছে যায় নি। তাই তার হেঁয়ালিপূর্ণ কথা ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তা নিয়ে ভাববার মত মানসিকতা আমার ছিলও না।

আজিজা এবার বল্‌ল— 'ভাল কথা, সে-গানাটি তোমার মেহবুবাকে শুনিয়েছিলে?'

আমি জিভ্ কেটে বল্‌লাম—'এই রে, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

—'তাকে দেখেই আবেগে অভিভূত হয়ে সব গুলিয়ে ফেলেছিলে বুঝি? যাক, যা হবার হয়ে গেছে। আজ কিন্তু শোনাতে ভুলবে না। মহব্বতের মন্ত্র দিয়ে গাঁথা গানাটির প্রতিটি শব্দ। আজ কিন্তু শোনাতে ভুলো না যেন।'

বিরানব্বইতম রজনী

বেগম আবার কিস্‌সা শুরু করলেন।

আজিজ বল্‌ল— 'আজিজা আমার ভুলের জন্য মর্মাহত হয়েছে, বুঝতে বাকি রইল না। এটাই তো স্বাভাবিক। যাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে সে দেউলিয়া সে যদি তার অনুরোধ উপেক্ষা করে তাতে তো মর্মাহত হবারই কথা। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লাম— 'কিছু মনে কোরো না। তোমার গানা আজ আমি তাকে তো শোনাবই—শোনাব।'

আবার গেলাম। আজিজা-র কথা মত, অবশ্য নিজের অত্যুগ্র আগ্রহ ছিল না একথা বল্‌লে মিথ্যাই বলা হবে। আমি ঠিক সন্ধ্যায় সে-বাগিচায় গিয়ে হাজির হলাম। বাগানে পা দিতেই বাঞ্ছিতা দুনিয়ার মুখোমুখি হলাম। সে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তার কামরায় বসাল। দু'-চারটি মামুলি কথার পর আমরা পাশাপাশি বসে খানাপিনা সারলাম। সে সরাবের বোতল নিয়ে এল, সে পেয়ালা ভরে ভরে নিজে সরাব পান করলো আমাকেও দিল।

দুনিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে কতভাবে যে সোহাগ করল তা বলে শেষ করা যাবে না। তার সর্বাঙ্গে যৌবনের ঢল নেমেছে। আমার যৌবনও উথালি-পাথালি করতে লাগল। যৌবনের উন্মাদনা যে কী জিনিস তা সেদিন রাত্রেই আমি প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম। যৌবনের বাঁধনহারা জোয়ারের তাণ্ডবে আমরা উভয়েই যেন ভেসে চল্‌লাম অজানা-অচেনা এক রূপকথার দেশে। সারা রাত্রি আমরা কেউ-ই দু'চোখের পাতা আর এক করতে পারলাম না। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা একে অন্যের যৌবনচিহ্নগুলো নিয়ে মেতে রইলাম।

সকাল হ'ল। এবার বিদায় নেবার পালা। অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে যেন আজিজার পানিভরা চোখ দুটো ভেসে উঠল। সে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেছিল—'আমার গানাটি তাকে শুনিও। এ-ই আমার স্মৃতি-উপহার। গানাটি আমার তাকে গেয়ে শোনাতে কিন্তু ভুলো না।'
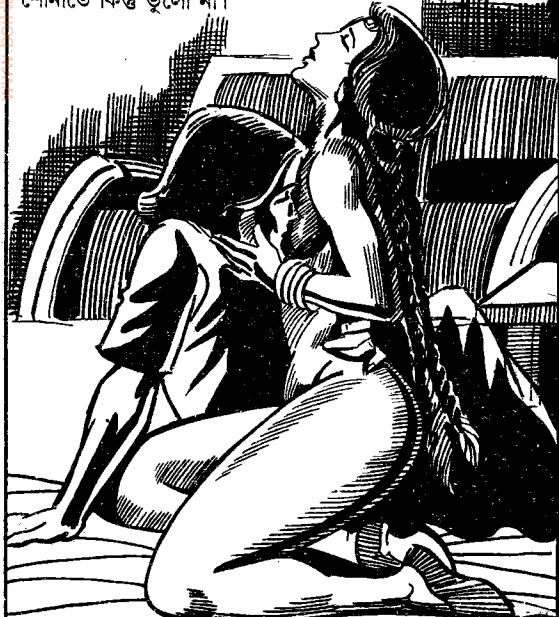
আমি দুনিয়া-র দরজায় দাঁড়িয়েই গুনগুন স্বরে গানটি গেয়ে তার অনুরোধ রক্ষা করলাম।

আমি গানা থামাতেই দুনিয়া অতর্কিতে বলে উঠল 'এ গানা তুমি কোথায় পেলে মেহবুব? কার কাছে শিখেছ? কে শিখিয়েছে, বল?'

তার রকম-সকম দেখে আমি যেন একেবারে আসমান থেকে পড়লাম। আমি যতদূর বুঝি, এটি নিছকই প্রেম-গীতি ছাড়া কিছু নয়। তবে এটি শোনামাত্র দুনিয়া কেন এমন করে ফুঁসছে?'

আমি বার কয়েক ঢোক গিলে কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলাম—'আমার চাচার লেড়কি আজিজা আমাকে শিখিয়েছে।'

—'তোমার চাচার লেড়কি? সে কি তোমাকে পেয়ার করে?'

আমি মৌন রইলাম। হ্যাঁ-না ভাল-মন্দ কিছুই বলতে পারলাম না।

তিরানব্বইতম রজনী

বেগম আবার কিস্সা শুরু করলেন। জাঁহাপনা, —'দুনিয়া গলা ছেড়ে ব'লে উঠল—'মুখবুজে থেকো না। আমার কথার জবাব দাও। তার সঙ্গে কি তোমার পেয়ার মহব্বত রয়েছে? বল, সে কি তোমাকে পেয়ার করে?'

আমি গোমড়া মুখেই জবাব দিলাম—'হ্যাঁ, সে আমাকে নিজের কলিজার চেয়েও বেশী পেয়ার করে।'

এবার গুলিখাওয়া বাঘিনীর মত সে গর্জে উঠল—'যদি তাই হয়, নিজের কলিজার চেয়ে বেশী তোমাকে পেয়ার করে থাকে তবে কেন এখানে নক্করবাজি করতে এসেছো! একটি লেড়কির জান নিয়ে খেলা করতে তোমার দিল্ এতটুকুও কাঁদল না!'

'আমি তোমাকে পেয়ার করি মেহবুবা। নিজের জানের চেয়েও বেশী পেয়ার করি।'

'সে-ও তো তোমাকে পেয়ার করে। তোমাকে দিল। দিয়ে দেউলিয়া হয়েছে। তার জান নিয়ে কেন এমন করে মহব্বতের খেলায় মেতেছ?'

—'বিশ্বাস কর মেহবুবা, আমি তোমাকে নিয়ে খেলা করতে আসি নি, তোমাকে আমি নিজের কলিজার চেয়েও বেশী পেয়ার করি।'

—'থাক, ঝুট মুট আর কতগুলি বুলি আওড়ে আমাকে প্রবোধ দেয়ার কোশিস কোরো না। এতক্ষণ সে হয়ত আর জিন্দা নেই।'

—'জিন্দা নেই! কে বলেছে তোমাকে আজিজা জিন্দা নেই?'

—'বলবে আবার কে? আমার দিল্ বলছে, সে আর জিন্দা নেই। তুমি কিছুই বোঝ না কি? তার যা কিছু বক্তব্য সবইতো গানার মধ্যে বলা আছে, বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবে। তোমাকে যে কি ব'লে তিরস্কার করব আজিজ আমি ভেবে পাচ্ছি নে। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক একটি লেড়কির মহব্বত তুমি পায়ে ঠেলে কি ক'রে যে আমার কাছে এলে ভেবে পাচ্ছি নে!' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে এবার বল্ল—'যার কাছে পেয়ার মহব্বৎ কোন মূল্যই পায় না তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই আমি রাখতে উৎসাহী নই। তার গোরে ফুল দিয়ে তোমার গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করগে। তাতে তোমার গুনাহ কিছুটা ম্লান হলে হতেও পারে।'

আমি বিষণ্ন মনে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই শুনি বাড়ির ভেতর থেকে বহু কণ্ঠের কান্নার রোল ভেসে আসছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তবে তো দুনিয়া-র কথাই ঠিক। আজিজা দুনিয়া ছেড়ে গেছে। জহর পান করে সে নিজেহাতে জান খতম করে দিয়েছে। কসুর—সব কসুর আমার।

পুরো একটি মাস আমি চোখের পানি ফেল্লাম। এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম মহব্বৎ কি জিনিস। আর এ-ও বুঝলাম, আমি আজিজা'কে পেয়ার করতাম। সে পেয়ার মহব্বতের আগুনের শিখা ছিল অন্তর্মুখী, বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

সে যতদিন জীবিত ছিল, আমার কাছাকাছি পাশাপাশি ছিল, ততদিন তো তার মহব্বতের খোঁজ আমি নেই নি। সামান্যতম চেষ্টাও কোনদিন করি নি। আর আজ? সে-আজিজা-র অভাবে দুনিয়া আমার কাছে মূল্যহীন, বিষ তুল্যবোধ হচ্ছে। আমার এ-ছারা জানটির কী-ই বা দাম, জিন্দা থেকেই বা লাভ কতটুকু? কেন জিন্দা থাকব, কার জন্যই বা থাকব!'

তবু জানটিকে টিকিয়ে রাখা দরকার। আর এর জন্য চাই অর্থ। অর্থোপার্জনের ধান্দায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। এ-মুলুক থেকে ও-মুলুক ঢুঁড়ে অর্থোপার্জনের ফিকির করলাম। ছোটোখাটো ব্যবসাপত্র শুরু করি। আয় যৎসামান্যই হয়। দিন গুজরান হয়ে যায় কোনরকমে। হরবকত একই চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। আজিজা, আজিজা-র চিন্তা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হ'য়ে দাঁড়াল।

তাজ অল-মুলুক আজিজা-র কিস্সা শোনার পর বল্ল—'আজিজ, দোস্ত আমার, তোমার বেহেস্তের হুরী খুবসুরৎ দুনিয়া'কে একবারটি নিজের চোখে দেখার জন্য অস্থির বোধ করছি। তুমি তো বল্লে লেড়কিটির সুরৎ যেমন অনন্য তেমনি চালাক চতুরও বটে, ঠিক কিনা?'

—'ঠিক, শতকরা একশ' ভাগই ঠিক।'

—'শোন, সবার আগে আমি একটি ব্যাপার সেরে ফেলতে চাইছি। ব্যাপারটি হচ্ছে, তোমার ব্যবহার ও কথাবার্তা আমার খুবই ভাল লেগেছে। তোমার সঙ্গে আমি দোস্তি পাতাতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার দোস্ত, জিগরী দোস্ত। আমার মহলে চল। আমার সঙ্গেই থাকতে হবে তোমাকে। কোন ওজর আপত্তি চলবে না।'

আজিজ তাজ-এর কথায় সম্মত হ'ল। তার সঙ্গে তার প্রাসাদে এল। এখানে সুসজ্জিত ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

এবার তাজ দোস্ত আজিজকে বল্‌ল—'দোস্ত, এবার দুনিয়া নামে লেড়কিটির হদিস কোথায়, কার কাছে পাওয়া যেতে পারে, আমি তা বের করবই।'

শাহজাদা তাজ অল-মুলুক এবার নিজের কামরায় গিয়ে দরওয়াজায় খিল দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। তার গোস্‌সা হলে এরকম আচরণ করে। গোসল, খানাপিনা—এমন কি কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।

পাত্তা লাগিয়ে সুলতান জানতে পারলেন, শাহজাদা তাজ এক পরদেশী সওদাগরের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছে। সে-ই তার ভেতরে পেয়ার মহব্বতের রোগ ধরিয়েছে। দুনিয়া নামে এক লেড়কির খোয়াব দেখছে। তাদের মুলুক প্রবাল দ্বীপে। কর্পূর নামক দ্বীপ তার রাজধানী। দুনিয়া-র আব্বাজী সেখানকার সুলতান। তার মত সুরৎ নাকি তামাম আরব দুনিয়ায় দোসরা কোন লেড়কির নেই।'

—'কেন? দূর দেশ থেকে পাত্রী না আসলে তার পছন্দ হবে না, কী রকম কথা! নিজের মুলুকে লেড়কির আকাল পড়ে গেছে নাকি?'

বৃদ্ধ উজির বল্‌ল—'জাঁহাপনা, সবই দিল্‌-এর ব্যাপার। কারো দিলে যদি কোন লেড়কি বাঁধা পড়ে যায় তবে যত খুবসুরৎ লেড়কির সঙ্গেই তার শাদী দেন না কেন তার পরিণতি ভাল হবে না, খেয়াল রাখবেন।'

চুরানব্বইতম রজনী

বেগম আবার কিস্‌সা শুরু করলেন।

জাঁহাপনা,—'সুলতান স্বয়ং তাজ-এর কামরার দরজায় গেলেন, বাইরে থেকে কত চেঁচিয়ে সহানুভূতির স্বরে বল্‌ল—'তাজ দরওয়াজা খোল, আমাদের সুলতানিয়তের লাগোয়া কোন সুলতানের লেড়কিকে শাদী করে সুখে ঘর সংসার কর।'

তাজ কিন্তু তার নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়ল না। দুনিয়া ছাড়া আর কোন লেড়কি তার পছন্দ নয়। অন্য কাউকে শাদী করে বিবির আসনে বসানো তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়—সব কথা তার আব্বাজানকে জানিয়ে দিল।

উপায়ান্তর না দেখে সুলতান তার একগুঁয়েমির মূল্য দিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'তা-ই কর বেটা, তুমি প্রবাল দ্বীপে গিয়ে তোমার পছন্দ মাফিক লেড়কিকে শাদী ক'রে ঘরে নিয়ে এসো। তবে একটি কথা। আমি সে মুলুকের সুলতানের কাছে দূত পাঠাচ্ছি। তিনি যদি আমার প্রস্তাবের মূল্য না দেন তবে কিন্তু তার সুলতানিয়ৎ আমি ধুলোয় মিশিয়ে দেব।'

কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। আজিজ সেখানে যাওয়ার পথ ঘাট জানে বলে বৃদ্ধ উজিরের সঙ্গে তাকেও পাঠালেন সেখানে। সঙ্গে দিলেন বহুমূল্য প্রচুর ইনাম। যথা সময়ে সুলতান শাহ-র দরবারে পৌঁছলেন। সুলতানকে যথোচিত পদ্ধতিতে কুর্নিশ সেরে সুলতাল সুলেমান প্রেরিত ইনামগুলি তার সামনে হাজির করল। সৌজন্য বশতঃ উভয়ে সংক্ষেপে কুশল বার্তাদি বিনিময় করলেন। তারপর বৃদ্ধ উজির সুলতান-এর অভিপ্রায়ের কথা সুলতান শাহ্‌র দরবারে পেশ করলেন।

জাঁহাপনা, সুলতান শাহ লেড়কির শাদীর প্রস্তাব শুনে অকস্মাৎ মৌন হয়ে রইলেন। আসলে কি বলবেন, কি জবাব দেবেন সহসা ভেবে পেলেন না। অন্য কোন সমস্যা হলে না হয় ভাল-মন্দ যা হোক কিছু জবাব দিতেন। কিন্তু তার লেড়কি দুনিয়ার শাদীর ব্যাপারে তিনি তেমন কোন জোরদার মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন না। কিন্তু দুনিয়া-র শাদীর কত পাত্র প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, দুনিয়া সবার প্রস্তাবকে সঙ্গে সঙ্গে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে সুলতান শাহ এক খোজাকে দিয়ে দুনিয়া'কে আনিয়ে সভার সামনে হাজির করার হুকুম দিলেন। দুনিয়া গোড়ার দিকে আসতে সম্মত হয়েছিল বটে কিন্তু যখন শুনল, তার শাদীর প্রস্তাব নিয়ে ভিনদেশ থেকে মেহমান এসেছে তখন বেঁকে বসল। ব্যস, সংবাদবাহক খোজাকে শাহজাদী রীতিমত তাড়া করল।

খোজাটি কাঁপতে কাঁপতে এসে সুলতানকে দুনিয়ার অপ্রত্যাশিত আচরণের কথা জানাল। হাত কচলে তাঁর দরবারে পেশ করল—'জাঁহাপনা শাহজাদী আমাকে যে কেবল ছুরি নিয়ে তাড়া করেছেন তা-ই নয়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লেন—'আব্বাজানকে বলবে, তিনি যদি ফিন আমার শাদীর জোগাড় করেন তবে আমি নিজের হাতে আমার জান খতম করে দেব।'

লেড়কির আব্বাজান সুলতান শাহ সুলতান সুলেমান-এর উজিরের উদ্দেশে বললেন—'সুলতান'কে আমার শুভাশিস জানাবেন। আর বল্‌বেন আমার লেড়কি দুনিয়ার শাদীর কোশিস আমি অন্যত্র করছি। তিনি যেন আমার ওপর গোস্‌সা না করেন।'

উজির আজিজ'কে নিয়ে নিজের মুলুকের দিকে যাত্রা করল। সুলতান সুলেমন-এর দরবারে পৌঁছে সুলতান শাহ-র মতামত ব্যক্ত করল। তবে এ-ও বলতে ভুল করল না, সুলতান তাদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করেছে। কিন্তু তার লেড়কি দুনিয়ার জন্যই সে তার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছে।

[একটু পরপর রজনীর অবসান এবং নতুন রজনীতে কিস্‌সা শুরুর উল্লেখ করলে মূল কাহিনীর রসহানি ঘটে। তাই এবার থেকে অনেকগুলো রজনী অতিক্রান্ত হওয়ার পর রজনী অতিক্রান্ত হওয়ার নাম উল্লেখ করছি]

এক শ ত্রিশতম রজনী

বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতান সুলেমান-এর উজীর প্রবাল দ্বীপের সুলতান শাহকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য প্রয়াসী হ'ল। আর সব দোষ এসে শাহজাদী দুনিয়া-র ওপর চাপাল। তার অমতের জন্যই সুলতান তার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

শাহজাদা তাজ তার আব্বাজান-এর অনুমতি নিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে উজির এবং আজিজ'কে নিয়ে প্রবাল দ্বীপে উপস্থিত হ'ল।

উজিরের পরামর্শে তাজ প্রবাল দ্বীপের সবুজ নগরে একটি বেশ বড়সড় দোকান খুলে বসল। রেশমী ও মখমল প্রভৃতি মূল্যবান সব কাপড়ের দোকান।

একদিন এক বুড়ি তাজ-এর দোকানে কাপড় কিনতে এল। কাপড় বাছাবাছি করতে করতে সে বল্‌ল—'কাপড়গুলো আবার শাহজাদী দুনিয়া-র মন মাফিক হবে কি না, কে জানে।'

শাহজাদী দুনিয়া-র নামটি শোনামাত্র সুলতান সুলেমান-এর লেড়কা-তাজ-এর কলিজাটি আনন্দে নেচে উঠল। তবে মনের ভাব গোপন রেখে বুড়িকে তার পছন্দ মাফিক কাপড় বেছে নিতে বল্‌ল—'আপনার যা পছন্দ হয় নিয়ে যান দামের জন্য ভাববেন না।'

বুড়িটি তাজকে জিজ্ঞাসা করল—'বেটা, তুমি বুঝি পরদেশী? কি নাম তোমার বলবে কি?'

—'কেন বলব না? কেউ নাম জানতে চাইলে বলা তো সৌজন্যের ব্যাপার। যে-কথা আপনি জানতে চাইছেন—সত্যি আমি পরদেশী। আর আমার নাম তাজ অল-মুলুক।'

তাজ-এর নির্দেশে আজিজ এবার বৃদ্ধার পছন্দ্‌ মাফিক কাপড়গুলো ভাল করে বেঁধে তার হাতে তুলে দিল।

বুড়ি কাপড়ের মোড়কটি প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে শাহজাদী দুনিয়ার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'বেটি, ভারী সুন্দর সব কাপড় নিয়ে এসেছি। তোর পছন্দ হতেই হবে। দোকানীর সুরৎ দেখনাই হলে তার কাপড়ও পছন্দ্‌ হওয়ার মতই হয়ে থাকে। তার বাতচিতও চমৎকার। কাপড়ের দামই নিল না। দাম দিতে গেলে নিল না। হেসে হেসে বল্‌ল—দামের জন্য পরোয়া কিছু নেই। শাহজাদী আমার দোকানের খরিদ্দার জানতে পারলে অন্য সবাই তো এখানে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ব্যস, তখন দ্বিগুণ মুনাফা তুলে নেব।'

শাহজাদী দুনিয়া কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বল্‌ল—'আমি-ই বা তার কাপড় মাগনা নিতে যাব কেন। তাকে বলবে, আমার আব্বাজীর সঙ্গে ভেট করে তার কাপড়ের দাম আর ইনাম যেন নিয়ে যায়।'

—'দেখ বেটি, দামের কথা বল্‌লে তাকে ছোটই করাই হবে।' তবু শাহজাদীর কথা তাজ'কে গিয়ে বল্‌ল—'বেটা, তোমাকে একবারটি আমাদের মহলে, সুলতানের দরবারে যেতে হবে যে। সুলতানের বেটি তোমার কথা তার আব্বাজানের কাছে বলে রাখবে। তুমি দরবারে গিয়ে তোমার সততার জন্য সুলতানের কাছ থেকে প্রাপ্য প্রচুর ইনাম নিয়ে আসবে।'

তাজ এবার শাহজাদী দুনিয়ার কাছে একটি চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা জানাল। চিঠিটি বৃদ্ধার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এটি শাহজাদীর হাতে তুলে দিও।' এবার একটি থলে বুড়ির হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এতে এক হাজার দিনার রয়েছে, তোমার কাজের ইনাম।' এতগুলো দিনার ইনাম পেয়ে বুড়ি মহানন্দে নাচতে নাচতে সুলতানের প্রাসাদে ফিরে এল। চিঠিটি দুনিয়া-র হাতে তুলে দিল। চিঠিটি নিয়ে দুনিয়া ব্যস্ত-হাতে ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল তার বক্তব্য—'আপনাকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখা হয় নি। কিন্তু আপনার গুণাবলীর পরিচয় আমি পেয়েছি। আপনার দৈহিক সৌন্দর্য আমার চোখ না দেখলেও, দিল্‌ ও কলিজার ওপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছে। আপনি আমার কল্পনার হুরী। কল্পনার মধ্যে দিয়ে যেন হাজার বছর ধরে আপনাকে চিনি। প্রস্ফুটিত পদ্মের কুঁড়ি আর রক্তগোলাপের পাঁপড়ির মধ্যে আপনার রূপ-সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছি। আসমানের চাঁদ আর উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রতরঙ্গে আপনাকে আমি দেখেছি। বসন্তে সুসজ্জিত দ্রাক্ষাকুঞ্জ আর বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভায় আপনাকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি।'

চিঠিটি পড়া শেষ হতে না হতেই দুনিয়া উত্তেজিত ভাবে চিঠির কাগজটিকে হাতের মুঠোয় দলামোচড়া করে শরীরের সর্বশক্তি দিয়েই পিষ্ট করতে লাগল। তীরবিদ্ধ হরিণীর মত ঘরময় বার কয়েক পায়চারি করে এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কালনাগিনীর মত ফুঁসতে থাকে—এত বড় ঔদ্ধত্য! এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। এমন এক চিঠির বাণ ছুঁড়ব, বাছাধন বুঝবে ভদ্রলোকের লেড়কিকে চিঠি লেখার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর।

ক্রোধোন্মত্তা দুনিয়া বুড়িকে দিয়ে কাগজ-কলম আনাল। এবার কাঁপা কাঁপা হাতে খস্‌ খস্‌ করে লিখতে শুরু করল—"মূর্খের দোষ সীমা-হীন। তারা নিজেকে পয়গম্বর জ্ঞান করে। নিজের মূল্য সম্বন্ধে তারা একেবারেই অজ্ঞ। বাঁদরকে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিলেও সে বাদরামি থেকে বিরত হয় না।

অসভ্য জঙ্গলীদের কি করে টিট করতে হয় সে-শিক্ষা আমার ভালই রপ্ত রয়েছে। একটি কথা শুধু জানিয়ে দিতে চাই —'আশমানের চাঁদ আশমানেই থাকবে। জমিনে কোনদিনই সে নেমে আসবে না। আগুনে হাত দিলে হাত অবশ্যই পুড়বে। ক্রুশে বিদ্ধ করে যাদের জীবনাবসান ঘটানো হয় তারা সবাই অবশ্যই

যীশুর মত নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক নয়—কথাটি স্মরণ রাখলে আনন্দিত হ'ব। আহাম্মককে অবশ্যই নিজের নির্বুদ্ধিতার খেসারত দিতেই হয়।"

চিঠিটি নিয়ে বুড়িটি আবার ছুটল। তাজ-এর দোকানে এসে তার হাতে সেটি তুলে দিল।

চিঠির ভাঁজ খুলে উর্ধ্বশ্বাসে তার বক্তব্য পড়ল। তারপর সেটি ভাঁজ করতে করতে চোখে মুখে বিষাদের ছাপ এঁকে আপন মনে ব'লে উঠল—'আমার ওপর খুব করে এক হাত নিয়েছে! খুব তড়পেছে। আমাকে নাকি ক্রুশবিদ্ধ করে পরপারে পাঠিয়ে ছাড়বে। যদি মারতে চায় মারুক না কেন, কে বাধা দিচ্ছে, মরতে আমি জানি। মৃত্যুভয়ে আমি ভীত নই, আমি বরং মরতেই চাই। এমন দুঃখের যন্ত্রণায় তিলে তিলে দগ্ধে মরার চেয়ে মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তো চিরশান্তি লাভ করা সম্ভব। হ্যাঁ, এ-চিঠির জবাবও আমি দেবই দেব। ফলে বরাতে যা জোটে জুটুক। ভবিষ্যতের ভাবনায় কুঁকড়ে থেকে বর্তমানে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরতে আমি রাজী নই।

শাহজাদা তাজ আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসল। লিখে চল্‌ল একের পর এক ছত্র। সে লিখল—"ওগো রূপসী, তুমি আমাকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে শাসিয়েছ। কিন্তু হায়! মৃত্যুভয় আমার মনকে দুর্বল করতে পারে না, জেনে রাখ। তুমি ভোগ-বিলাসের সাগরে সাঁতার কাটছ। তোমার কাছে জিন্দা থাকা আর জিন্দেগীকে উপভোগ করার মধ্যেই যত আনন্দ, যত সুখ। আর আমি? আমি ভয়-ভীতিহীন সদানন্দময় এক উচ্ছল যুবক। মৃত্যুকে কিছুমাত্রও পরোয়া আমি করি না। তুমি যদি আমাকে ক্রুশকাঠে গেঁথে মার তবু আমার দিল কেঁদে উঠবে না। আমি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরলেও যীশুর প্রভাব প্রতিপত্তির প্রত্যাশী নই। হাসতে হাসতে আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব। আমি মনে করব, প্রেম মানুষকে এক অনন্য আনন্দের জোয়ারে ভাসায়। কিন্তু আমার প্রেম না হয় মৃত্যুর রূপ ধরেই আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অতএব তুমি যে মৃত্যুভয় আমাকে দেখিয়েছ তা আমার কাছে নিতান্তই অবজ্ঞার বিষয়।"

চিঠিটি লেখা শেষ করে, বুড়ির হাতে দিয়ে তাজ বল্‌ল—'আমাকে এর শেষ কোথায় দেখতেই হবে। পরিণামে যদি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয় তবু আমি পিছু হঠতে নারাজ।'

চিঠিটি বুকের কাছে, কামিজের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বুড়ি শাহজাদী দুনিয়ার ঘরে ঢুকল।

বুড়িকে দেখেই দুনিয়া অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে ব'লে উঠল—'কিগো, তোমার অচিন দেশের রাজপুত্তর কি আমার চিঠি পড়ে মুষড়ে গেল নাকি?'

—'মুষড়ে গেল কি পুলকিত হ'ল তা আমি জানব কি করে? আমি পত্রবাহক মাত্র।' বলতে বলতে বুড়ি কামিজের ভেতর থেকে একটি চিঠি দুনিয়া-র হাতে দিয়ে বল্‌ল—' আপনার চিঠি পেয়ে তো খুবসুরৎ যুবকটির মুখ একেবার বিকালের পড়ন্ত সূর্যের মত লাল হয়ে উঠল। রাগে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে কয়েক ছত্র লিখে আমার হাতে এ-চিঠিটি দিয়ে বল্‌লে— 'যে মরার জন্য এক পায়ে খাড়া, তাঁকে মৃত্যুভয় দেখালে তো হাসির খোরাকই জোগানো হয়।'

শাহজাদী দুনিয়া বুড়ির কথার কতটুকু শুনল কে জানে? ব্যস্ত হাতে চিঠিটির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল। তার অ-দেখা, খোয়াবের অচিন দেশের রাজপুত্র তারপর ব্যস্ত হাতে লিখেছে—"ওগো রূপসী তন্বী, শরতের ঝলমলে রৌদ্র কিরণোজ্জ্বল আকাশের গায়ে এক ঝাঁক দুরন্ত কবুতর উড়ে চলেছে। তাদের সফেদ পাখার গায়ে সূর্যের কিরণে রূপালী বর্ণ ধারণ করে, তারাও পাখি। আবার শকুন? যারা ভাগাড়ে পঁচা গলা মৃতের স্তূপ ঘাটাঘাটি করে তারাও কিন্তু পাখির পর্যায়েই পড়ে। তাই বলছি কি, সব মানুষের দেহ-ই তো চামড়ায় মোড়া থাকে। কিন্তু সবাই কি মানুষ পদবাচ্য পাওয়ার যোগ্য, সবাই কি সমান?"

চিঠিটি লেখা শেষ করে দুনিয়া বুড়ির হাতে দিল।

বুড়ি আবার ছুটল শাহজাদা তাজ-এর দোকানের উদ্দেশে।

তাজ চিঠির নির্মম বক্তব্য পাঠ করে যারপর নাই মুষড়ে পড়ে। একেবারে সরাসরি আঘাত। মুষড়ে তো পড়বেই। সে সৌজন্য বজায় রেখে তার কি জবাব দেবে সহসা ভেবে পেল না।

তাজ-এর অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে আজিজ তার হয়ে চিঠিটির জবাব লিখল। সে চিঠিটি লেখা শেষ করে তাজ'কে বল্‌ল-পড়ছি শোন—'এমুহূর্তে আমি আল্লাতাল্লা-র ওপরেই আমার

সবকিছু সঁপে দিয়ে ভবিষ্যতের পথ চেয়ে বসে। তোমাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে যেভাবে দেউলিয়া হয়েছি তার পরিবর্তে আল্লাতাল্লা'কে যদি মনে-প্রাণে কামনা করতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে কোলে ঠাঁই দিতেন। কিন্তু তুমি এক অবোধ যুবতী মাত্র। আল্লাতাল্লা-র করুণা কি তোমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়, নাকি পাওয়া সম্ভব, আপনজনদের স্নেহডোর ছিন্ন ক'রে একদিন তোমার এখানে খোঁজে এসে আমার জীবনতরী নোঙর করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে নির্মমভাবে ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু এবার আমি যেখানে যাওয়া মনস্থ করেছি সেখানে কিন্তু তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না। জীবন সায়াহ্নে আজ না হোক কাল সবাইকেই সেখানে যেতে হয়। তিনি কিন্তু কাউকেই দাগা দিয়ে ফিরিয়ে দেন না। তাঁর দরাজ দিল্ কিনা, সবাকেই তিনি কোলে তুলে নেন।'

শাহজাদী দুনিয়া চিঠিটি পড়েই বুড়ির ওপর রেগে একেবারেই কাঁই হয়ে গেল। রাগে-দুঃখে-অপমানে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌ল—'কী নির্লজ্জ বেহায়ার পাল্লায়ই না পড়া গেল! যত্তসব নক্করবাজ ছোড়ার পাল্লায় আজ আমাকে পড়তে হয়েছে শুধুমাত্র তোমারই জন্য। যাও, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও!'

বুড়ি আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াল না। সে তো ভালই জানে, শাহজাদী ক্ষেপে গেলে তার মাথায় খুন চেপে যায়। সেই মুহূর্তে লাশ ফেলে দেওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

বুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে গোমড়ামুখে তাজ-এর দোকানে গিয়ে হাজির হল। তাজ ভাবল, সে এবারও তার মনময়ূরী, বেহেস্তের হুরীর চিঠি নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাকে নির্বিকার দেখে তাজ বলেই ফেল্‌ল—'কি গো, আজ বুঝি শূন্যহাতেই পাঠিয়ে দিয়েছে? চিঠি চাপাটি কিছু দেয় নি?'

বুড়ি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'আবারও চিঠি! এতেই আমার জান নিয়ে ছাড়ছিল। আল্লাতাল্লা-র দোয়ায় কোনরকমে আব্বাজানের দেওয়া জানটি নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছি।'

—'একটা কথা বলবে কি? আমি লক্ষ্য করছি পুরুষ মানুষের প্রতি তোমার শাহজাদী কেমন এক জ্বলন্ত ভীতি অন্তরে পোষণ করে, ঠিক বলিনি? কিন্তু কেন, বলতে পার?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন বটে। এক রাত্রে শাহজাদী কি যেন এক খোয়াব দেখেন। ব্যস, তার পর থেকেই পুরুষ মানুষের ওপর তাঁর মনে নিদারুণ ঘৃণা পয়দা হয়। কোন পুরুষকেই দু'চোখ পেতে দেখতে পারেন না।'

—'খোয়াব? কিসের খোয়াব? কি দেখেছিল, জান?' অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে তাজ বুড়ির দিকে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল।

—'জানি। আমাকে পরদিন সকালেই বলেছিল। খোয়াবের মধ্যে সে দেখেছিল, এক ব্যাধ বাগিচায় ঢুকে পাখিধরার জাল বিছিয়ে দিয়েছে। তার ওপর পাখির খানা, কিছু যবের দানা ছিটিয়ে দেয়। ব্যাধ এবার অদূরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। একটু বাদেই দুটো খুবসুরৎ কবুতর জালের ওপর বসে যবের দানা খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করে। পুরুষের যা চরিত্র—পুরুষ কবুতরটি লম্ফঝম্ফ দিতে দিতে এক সময় জালে ফেঁসে যায়। মেয়ে-কবুতরটি তাকে জাল থেকে ছাড়াবার জন্য বহুৎ কোশিস করতে থাকে। কিছুতেই যখন তার মেহাবুবকে জাল থেকে মুক্তি দিতে পারল না তখন সে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মাটিতে মাথা ঠুকতে থাকে। গাছের ডালে একদল কবুতর বসে এ-দৃশ্যটি দেখল। তারা ভাবল, এখানে থাকলে তাদেরও হয়ত ব্যাধের মরণফাঁদে আটকা পড়তে হবে। ভীত-সন্ত্রস্ত মনে তারা ডানা মেলে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু সে হতভাগিনী মেয়ে-কবুতরটি কিন্তু ঠায় সেখানে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ঠোঁট দিয়ে জালের দড়ি কাটতে থাকে। বহু চেষ্টার পর সে তার মেহবুব পুরুষ-কবুতরটিকে মুক্ত করে ফেলে। পুরুষ কবুতরটি জাল থেকে বেরিয়েই গাছের ডালে গিয়ে বসল। আল্লাহ-র মর্জি। জাল কাটতে গিয়ে মেয়ে কবুতরটির পা জলে জড়িয়ে যায়। সে জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে কোশিস করতে থাকে। কিন্তু এতে সে জাল থেকে ছাড়া তো পেলই না উপরন্তু দু'টি পা-ই জালে জড়িয়ে গেল। পুরুষ-কবুতরটি গাছের ডাল থেকে নেমে এসে তার সেই মেহবুবাকে জালের বাঁধন থেকে মুক্ত করার কোশিস করা তো দূরের কথা, সে গাছের ডালে বসে নির্বিকার টুল টুল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে ব্যাধটি এসে মেয়ে কবুতরটিকে জাল থেকে খুলে নিল। ইতিমধ্যেই পুরুষ-কবুতরটি নিজের জান বাঁচাতে উড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

খোয়াবের এ পর্যন্ত দেখার পরই শাহজাদী দুনিয়া-র নিদ টুটে যায়। তখন তিনি আমাকে তলব করলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে তাঁর কামরায় ছুটে যাই, কামরায় পা দিয়েই দেখি, তিনি ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখে পালঙ্কের ওপর বসে। আমাকে বসতে ব'লে তিনি তার সদ্যদেখা খোয়াবের কিস্‌সা আমাকেই বললেন। তারপর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আমাকে বললেন, পুরুষ জাতটি কী নির্মম-নিষ্ঠুর! পুরুষ-কবুতরটি যদি এমন নির্মম হতে পারে তবে পুরুষ-আদমিরা না জানি এর চেয়ে কত বেশী নির্মম মনোভাব পোষণ করে! কী সাঙ্ঘাতিক পুরুষ জাতিটি!

সেদিন থেকে পুরুষ জাতটির প্রতি শাহজাদী দুনিয়ার মনে আতঙ্ক আর বিদ্বেষ দানা বাঁধে। আজ পুরুষ আদমি দেখা তো দূরের কথা নাম শুনেই রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে যান।

তাজ অল-মুলুক ম্লান হেসে বল্‌ল—'কিন্তু সব পুরুষ আদমিই কি সমান? পুরুষ-কবুতরটির মত সব পুরুষ-আদমিরা স্বার্থপর

হওয়া কি সম্ভব? এক আদমির সঙ্গে অন্যের কিছু না কিছু ফারাক তো হতে বাধ্য। আবার লেড়কিদের মধ্যে সবাই ভাল এমন তো নয়। ভাল-মন্দ মিলেই তো দুনিয়াটি গড়ে উঠেছে। আজ গিয়ে সুযোগ বুঝে তুমি তাকে বলবে, সে জিন্দেগীতে কটি পুরুষ দেখেছে? ক'জনার চরিত্রের হদিসই বা সে রাখে?'

—'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু যার বোঝার চেয়ে না-বোঝার চেষ্টা বেশী তাকে কি করেই বা বুঝাই, বলুন তো?'

—'ওসব আমি বুঝি না। আমার একটিই অনুরোধ যে করেই হোক তার সঙ্গে একবারটি আমার মোলাকাৎ করিয়ে দিতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার দ্বারা আমার অভিলাষ পূর্ণ হবেই।'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বুড়ি বল্‌ল—'ঠিক আছে। কোশিস আমি অবশ্যই করব। এবার কি বলছি ধৈর্য ধরে শুনুন—প্রাসাদের বাইরে এক চিলতে বাগিচা আছে। সেখানে ছোট্ট একটি মঞ্জিল দেখা যাবে। শাহজাদী দুনিয়া হরমাহিনায় একবার করে সেখানে যান। ঠিক এক হপ্তা বাদে তার সে মঞ্জিলে যাবার কথা আছে। আপনাকে তখন তাঁর সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়ে দেব। তারপর আপনার কাজ। যদি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও কথা কৌশল দিয়ে তাঁর দিল্ জয় করতে পারেন তবে বুঝব আপনার কৃতিত্বের এবং আমার হতাযশের জন্যই আপনি অভিলাষ পূর্ণ করতে পেরেছেন। তবে এমনও হতে পারে, আপনাকে মুখোমুখি দেখলে আপনার সম্বন্ধে তাঁর মনের বদ্ধমূল ধারণা বদলে যেতেও পারে।'

তাজ অল-মুলুক এবার বল্‌ল—'ঠিক আছে, তোমার পরামর্শমত কাজ করব। এখন চল, তোমাকে একটি জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।'

তাজ আর আজিজ বুড়িকে নিয়ে তাদের বাড়ি এল। বৃদ্ধ উজির দাদান'কে সব বৃত্তান্ত খুলে বলে। উজির কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বল্‌ল—'আমার মাথায় চমৎকার একটি ফন্দি এসেছে। পরে বলব। আগে চল, বাগানে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসি গে। তারপর যা করণীয় তা ভেবেচিন্তে করা যাবে।'

বাগানে পৌছে উজির বুড়ো মালিকে কিছু দিরহাম হাতে গুঁজে দিয়ে বাগানে অবস্থানের অনুমতি আদায় করে নিল।

মালি দিরহামগুলি জেবে পুরতে পুরতে বলল—'এক সময় এ-বাগিচা আর মঞ্জিলটি আরও অনেক ভাল ছিল। শাহজাদীর এখন আর এদিকে আগের মত দিল্ নেই। শুনেছি, এখন কিছুদিন যাবৎ তিনি বিমারিতে ভুগছেন। দিল্ অশান্ত, সুখ-শান্তি কিছুই নেই।

উজির এবার মালির হতে দিরহামের একটি গোছা ধরিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'ভাইয়া, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। একজন ভাল চিত্রশিল্পী জোগাড় করতে হবে। তাকে দিয়ে এ-মঞ্জিলের দেয়ালে কিছু ছবি আঁকতে হবে। তোমার মালকিন তো দিন সাতেক পরে এখানে আসবে। তার আগেই কিন্তু কাজটি সেরে ফেলা চাই-ই চাই।'

—'চিত্রশিল্পী? দেয়ালে ছবি আঁকতে হবে? কিসের ছবি হুজুর?'

—'মন দিয়ে শুনে রাখ—বড় ঘরটি, যেখানে বসে শাহজাদী নাচা-গানা শোনেন তার দু'দেওয়ালে দুটো ছবি আঁকতে হবে। তাদের একটি ছবি—যেমন ধর, চমৎকার একটি বাগিচার ছবি। তাতে দেখাতে হবে ছোট-বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের বিচিত্র সমারোহ। বাগিচার একটি ঝাঁকড়া গাছের তলায় এক ব্যাধ জাল পেতে অদূরবর্তী একটি মোটাসোটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। জালে একটি মেয়ে-কবুতর আটকা পড়ে গেছে। নিজেকে মুক্তো করার জন্য বহুৎ কোশিস করছে। আর পুরুষ-কবুতরটি অস্থির হয়ে তার আশপাশ দিয়ে চক্কর মারছে। তার দিল অশান্ত, চোখে-মুখে হতাশার ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হবে, বুঝেছ?'
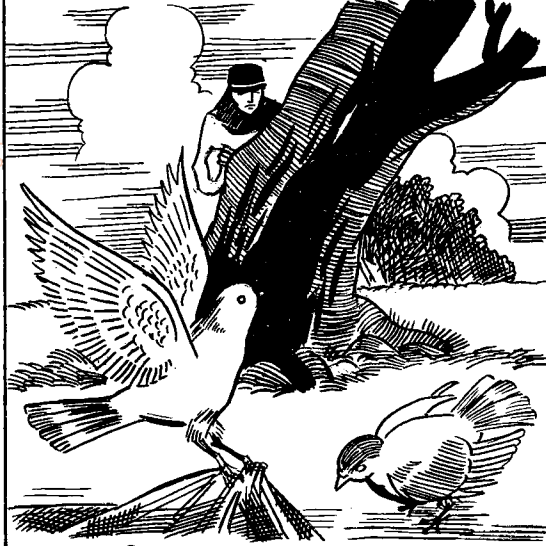
বুড়ো মালি ঘাড় কাৎ করে বোঝার ভাব দেখায়।

—'উজির দাদান ব'লে চল্‌ল, আর এক ধারের দেওয়ালে অন্য একটি ছবি আঁকতে হবে। সেখানে আঁকতে হবে পুরুষ-কবুতরটি দাঁত দিয়ে জাল কেটে মেয়ে-কবুতরটিকে মুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে কোশিস করছে। জাল কাটার পর মেয়ে-কবুতরটি উড়ে ভেগে যাচ্ছে। আর পুরুষ-কবুতরটি জালে আটকা পড়ে ছটফট করছে। এবার ব্যাধটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পুরুষ-কবুতরটিকে জাল থেকে বের করে খাঁচায় পুরছে, বুঝেছ? ব্যাস, এ-কটি ছবি আঁকাবে।'

তাজ অল-মুলুক কিন্তু উজিরের মতলবটির কথায় খুব বেশী আশান্বিত হতে পারল না। সামান্য দুটো ছবির মাধ্যমে শাহজাদীর নিদারুণ বিতৃষ্ণাকে ম্লান করে দিয়ে তার মনকে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে, ভাবা যায়!'

ছ'দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যেই বুড়ো মালি অভিজ্ঞ এক চিত্র-শিল্পীকে ধরে নিয়ে এসে উজির দাদান-এর ফরমাস অনুযায়ী দুটো বেশ বড় ছবি আঁকিয়ে নিল।

সাতদিন পর শাহজাদী দুনিয়া বুড়িটি এবং দাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বাগিচায় এল। বিকালের ফুরফুরে হাওয়ায় খোশ মেজাজে পায়চারী করতে লাগল।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ উজির দাদান তাজ অল-মুলুক এক আজিজ'কে নিয়ে বাগিচার এক ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করছে। বুড়ির এরকমই পরামর্শ ছিল, প্রয়োজনের সময় বুড়ি তাদের তলব করবে।

শাহজাদী দুনিয়া যখন বাগিচায় পায়চারি করছে তখন সুযোগ বুঝে বুড়ি বল্‌ল—'আপনাকে একটি কথা বলার ছিল। যদি আপনার মেজাজ মর্জি এখন শরিফ থাকে, যদি অভয় দেন তবে বলতে পারি।'

দুনিয়া পায়চারি করতে করতে মুচকি হেসে বল্‌ল—'বল, তুমি কি বলতে চাইছ, শুনি?'

বুড়ি বল্‌ল —'ঠিক আছে, একটু পরে বলছি। আপনি মঞ্জিলে গেলে বলব।' ইতিমধ্যে, বুড়ি দুনিয়াকে নিয়ে পায়চারি করতে করতে সে-ঝোপটির কাছে চলে যায়। তাজ এবার তার বাঞ্ছিতা রূপসীকে পরিষ্কার দেখতে পায়। বুড়ি তাকে নিয়ে দাঁড়াল না মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যায়।

মঞ্জিলে ঢুকে প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই দুনিয়া থমকে যায়। দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবি দুটো তার মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। নিষ্পলক চোখে ছবিগুলিকে নিরীক্ষণ করতে থাকে, এবার ঘাড় ঘুরিয়ে বুড়িকে বল্‌ল—'এ ছবি এখানে কি করে এল? কে-ই বা আঁকল? এযে আমার 'খোয়াবের মধ্যে' দেখা সেই বিশেষ দৃশ্য। অবিকল একই দৃশ্য। আশ্চর্য ব্যাপার তো? অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে আরও কয়েক মুহূর্ত ছবি দুটোকে নিরীক্ষণ করার পর দুনিয়া এবার বল্‌ল—'না' অবিকল এক দৃশ্য তো নয়। এখানে দেখছি মেয়ে-কবুতরটি ব্যাধের জালে আটকা না পড়ে আটকা পড়েছে পুরুষ-কবুতরটি। আর নিতান্ত স্বার্থপরের মত মেয়ে কবুতরটি উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একেবারে বিপরীত দৃশ্য। আমার খোয়াবের মধ্যে দেখা দৃশ্যের একেবারে বিপরীত দৃশ্য।'

—'খোয়াবের দেখা দৃশ্য কিন্তু সর্বদা পরবর্তীকালে নিদ টুটে যাওয়ার পর হুবহু মনে থাকে না। অনেক সময় গুলিয়ে যায়। আপনি হয়ত পুরুষ-কবুতরকে মেয়ে, আর মেয়ে-কবুতরকে পুরুষ ভেবে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। সবারই যখন এমনটি হয় আপনার হবে এতে আর আশ্চর্যের কি থকতে পারে শাহজাদী।'

শাহজাদী দুনিয়া-র মুখে অকস্মাৎ বিষাদের ছায়া নেমে এল। সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্‌ল—'কী ভুলযে আমি করেছি তা আর কারো কাছে বলার নয়। ইচ্ছা করছে নিজের মাথার চুল নিজে হতে টেনে ছিঁড়ি। ক'দিন আগেই আমি যে সুলতানের লেড়কাকে আশাহত করে ভাগিয়ে দিয়েছি। সামান্য ভুলের জন্য বিলকুল বরবাদ করে দিয়েছি। আব্বাজানকে আজই বলব, এক নওজোয়ান জোগাড় না করলে আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে।'

—'এতে উতালা হচ্ছেন কেন শাহজাদী। আপনার দিল্‌ যখন চাইছে অচিরেই তা পূরণ হবে।'

—'কিন্তু কি করে তা সম্ভব? আমি যা করে রেখেছি তা কি সামান্য মুখের কথাতেই শোধরানো সম্ভব? কোন্‌ নওজোয়ান এখন আমাকে বিশ্বাস করে শাদী করতে উৎসাহী হবে, বলতে পার? তুমি কি ভুলে গেছ, কিছুদিন আগেই আমি ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচার করেছিলাম, যে-নওজোয়ান আমাকে শাদী করবে আমি তাকে যেন-তেন প্রকারেণ গলাটিপে তাকে হত্যা করব। এরকম ভয়ঙ্কর একটি কথা শোনার পরও কেউ আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে উৎসাহী হবে বলে তুমি মনে কর? যদি আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেও প্রচার করি, এখন আমি শাদী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তবে সবাই ভাববে আমি নতুন এক ফিকির বের করেছি।'

বুড়ি শাহজাদী দুনিয়াকে নিয়ে আবার বাগিচায় যায়। বাগিচায় পায়চারি করতে করতে দুনিয়া এবার প্রধান ফটকের কাছে শাহজাদা তাজ অল-মুলুক'কে দেখতে পায়। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে নওজোয়ান সুপুরুষ তাজ-এর দিকে। তাজ কিন্তু এর কিছুই জানতে পারল না। সে তখন পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে গাছের ডালে খেলায় মত্ত পাখিদের দেখছে।

শাহজাদী দুনিয়া বিস্ময়ের ঘোরে কাটিয়ে এক সময় ব'লে ওঠে—'আহা! কী সুন্দর নওজোয়ান! যেমন তার মনলোভা মুখের আদল তেমনি খুবসুরৎ তার দৈহিক গঠন।'

দুনিয়া এবার বুড়িকে বল্‌ল—'তাড়াতাড়ি যাও, নইলে দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে আর তার হদিস পাবে না। এমন খবসুরৎ এক নওজোয়ান হাতের নাগালের বাইরে চলে গেলে আখেরে নিজের আঙুল কামড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।'

বুড়ি মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে থপ্‌ থপ্‌ ক'রে দৌড়োতে শুরু করল। শাহজাদা তাজ অল-মুলুক-এর কাছে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'শাহজাদী মহব্বতে হাবুডুবু খাচ্ছে। একেবারে বাজী মাৎ! কাল আপনার বাড়ি যাব। সঙ্গে ক'রে শাহজাদীর কছে নিয়ে যাব। তৈরী থাকবেন।'

কথা ক'টি বলেই বুড়ি পিছন ফিরে হাঁটতে থাকে। শাহজাদীর কাছে গিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বলে—'এত করে বল্‌লাম আপনার কথা, পাত্তাই দিলনা! কিছুতেই আসতে রাজী হ'ল না। দেমাক দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। কী আমার কাজের মানুষ রে! আমার মুখের ওপর বলে দিল, আমার জরুরী কাজ রয়েছে, নষ্ট করার মত ফুরসৎ নেই। তা ছাড়া কোন জনানার সঙ্গে দেখা করার মনও আমার নেই। কী আমার মরদ রে! আপনি ভাববেন না, কালই আমি ওর দিমাক বিগড়ে দেব। দেখবেন, সুড়সুড় করে কেমন আপনার প্রাসাদে গিয়ে হাজির হয়। আজ রাত্রিটি কোনরকমে দাঁতে দাঁত চেপে কাটিয়ে দিন। সকাল হলেই আমার খেল শুরু করে দেব। যদি নিতান্তই বেগড়বাই করে তবে দেখবেন গলায় দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে ছাড়ব আপনার মেহবুবকে।'

শাহজাদী দুনিয়া রীতিমত হায় হায় ক'রে ওঠে—'সে কী, গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে, বলছ কী! যদি তার দিল না-ই চায় তবে জোরাজুরি করে ফয়দা কিছু হবার নয়।'

—'ঠিক আছে, আপনি যখন নিতান্তই গররাজী তখন না হয় গলায় দড়ি টড়ি দেব না। তবে তার দেমাকের দৌড় আমি দেখে ছাড়ব, বলে দিলাম। কাল আপনার প্রাসাদে তাকে হাজির ক'রে তবে ছাড়ব।'

শাহজাদী দুনিয়া আর কথা না বাড়িয়ে বুড়ির সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে গেল।

সকাল হতে না হতেই বুড়িটি শাহজাদা তাজ-এর বাড়ি হাজির হ'ল। তার হাতে একটি পুটুলি। এক পরস্ত সালোয়ার কামিজ প্রভৃতি লেড়কিদের পোশাক। পুটুলিটি তাজ-এর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে লেড়কি সেজে নিন। নইলে দ্বাররক্ষী আপনাকে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে না।'

তাজ বুড়ির সাহায্যে পোশাক বদলে লেড়কি সেজে নিল। আয়না দিয়ে দেখল, বিলকুল লেড়কি বনে গেছে। বলে দিলেও কেউ সহজে বিশ্বাস করবে না যে, এ লেড়কি নয়।

বুড়ি এবার ছদ্মবেশী তাজ'কে নিয়ে প্রাসাদের দরজায় হাজির হ'ল। খোজা দ্বাররক্ষী পথ আগলে দাঁড়াল। বুড়ি বল্‌ল—'তুমি কি অন্ধা নাকি হে! দেখছনা, এক আমীরের বিবি। খুব ভাল সেলাই জানে। তাই সুলতান সে আমীরকে বলেছিলেন, তার বিবি যেন মাঝে-মধ্যে এসে শাহজাদীকে সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে দিয়ে যায়। তাই আমি একে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' বুড়ি কথা বলতে বলতে ছদ্মবেশী তাজ'কে নিয়ে সদর-দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়।

বুড়ি একের পর এক মহল পেরিয়ে তাজকে নিয়ে শাহজাদী দুনিয়া-র কামরার কাছাকাছি পৌঁছে থমকে যায়। তাজকে বল্‌ল—'আমি আর যাব না। আপনি ডানদিকের কামরায় ঢুকলেই শাহজাদীর দেখা পেয়ে যাবেন। তারপর যা কিছু করার বুদ্ধি খরচ করে আপনাকেই করতে হবে।'

তাজ এবার কয়েক পা এগিয়ে দরজার সামনে গেল। পর্দা সরিয়ে কামরার ভেতরে উঁকি দিতেই তার চোখে পড়ল পালঙ্কের ওপর শরীর এলিয়ে শাহজাদী দুনিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন। তার কামিজের সব ক'টি বোতাম খোলা। নিটোল স্তন দুটো ঘাসের ফাঁক দিয়ে উকি দেয়া আধ-ফোঁটা পদ্মের কুঁড়ির মত অংশ বিশেষ বেরিয়ে রয়েছে। সে দিকে এক ঝলক তাকাতেই তাজ-এর শরীরের সব ক'টি স্নায়ু যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। রক্তের গতি হ'ল দ্রুততর। আর বুকের ভেতর কলিজাটি তিরতির করে লাফাতে শুরু ক'রে দিল। ছোট ছোট অলকগুচ্ছ কপালের ওপর ভিড় করেছে। তারই কয়েকটি বাতাসের সঙ্গে দোল খাচ্ছে। আর শালোয়ারটি? শালোয়ারটি পায়ের অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। আঃ কী বাহার!'

তাজ নির্বাক-নিষ্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তার খোয়াবের মনময়ূরীকে দেখতে লাগল। ভাবল, তাকে জাগাবে, নাকি না জাগিয়ে দূর থেকে তার ঘুমন্ত পেয়ারীরর রূপ-সৌন্দর্য সুধা পান করে তৃপ্তি লাভ করবে? হাত বাড়ায়। হাত দিয়ে কপালে নেমে আসা চুলগুলি সরিয়ে দিতে চায়। পর মুহূর্তেই হাতটি সরিয়ে নেয়। আর কয়েক মুহূর্তে এমনি দ্বিধার মধ্যে কাটে। তারপর

অতিসন্তর্পণে তার পাশে বসে। যেন নিজের অজান্তে মুখটি নেমে যায় তার ঠোঁট দুটোর দিকে। নিজেকে সংযত রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। তার ঠোঁট দুটো দিয়ে দুনিয়া-র আপেল-রাঙা ঠোঁট দুটোকে আলতো ক'রে স্পর্শ করে। তাজ যেন ঘুমের ঘোরে খোয়াব দেখার মত নিজের হাত দুটো দিয়ে দুনিয়ার-এর গলা জড়িয়ে ধরে। তার ঠোঁট দুটো দিয়ে নিজের ঠোঁট আবারও স্পর্শ করায়।

শাহজাদী দুনিয়া বুঝতে পারে না, সে সত্যি জেগে, নাকি ঘুমের ঘোরে খোয়াব দেখেছে। আচমকা উঠে বসার কোসিস করল, পারল না। তাজ-এর পেশীবহুল সুদৃঢ় হাত দুটো তাকে জাপ্‌টে ধরে রেখেছে। চিৎকার করে কি যেন বলার চেষ্টা করে। তা-ও পারল না। ইতিমধ্যে আর দুটো ঠোঁট তার ঠোঁট দুটোকে আবদ্ধ করে দিয়েছে। তার বহু আকাঙ্ক্ষিত নওজোয়ানটির কাছে হার মানতেই হ'ল আত্মসমর্পণ করতে হ'ল সম্পূর্ণরূপে। কেবলমাত্র তাকেই না, দুনিয়ার সব লেড়কি জনানাকেই পুরুষের কাছে হার মানতে, আত্মসমর্পণ করতে হয় এমনি করেই।

শাহজাদী দুনিয়া তার আধ-ফোটা পদ্মের কুঁড়ির মত ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে তাকাল। খোয়াবের মধ্যে এতদিন যাকে দেখেছে, যার রূপ-সৌন্দর্য সুধা পান করে তৃপ্তিলাভের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে সেই মনের মানুষ আজ তার বুকে। বুকের যৌবনচিহ্ন দুটোকে নিজের প্রশস্ত বুকের চাপে পিষ্ট করে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রেখেছে। একী খোয়াব, নাকি বাস্তব? আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত দুনিয়া দু'হাত বাড়িয়ে জাপ্‌টে ধরে। একেবারে তার বুকের সঙ্গে তাজ লেগে রয়েছে তবু যেন পুরোপুরি তৃপ্তি পাচ্ছে না কাছে, আরও কাছে পাবার জন্য মন তার উতালা হয়ে ওঠে। তাজ-এর ডান-হাতটি পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম আভায় আলোকিত আকাশের মত গাল দুটোর ওপরে আলতো করে বোলাতে থাকে। দুনিয়ার দিল এক অকথিত পুলকে-উচ্ছ্বাসে বার বার শিহরিত হতে থাকে। হাতটি কিছুক্ষণ এগাল-ওগাল করে এক সময় অস্থিরভাবে নেমে আসে তার গলা ছাড়িয়ে নিচের দিকে। তারপর এক সময় তার বোতাম-খোলা কামিজের মধ্যে ঢুকে হারিয়ে যায়। কেবল বার বার অস্থিরভাবে নাড়া চাড়ার মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এবার? এবার তারা কামোন্মাদনার বন্যায় ভাসতে ভাসতে কোন অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল তার বিবরণ না-ই বা দিলাম।

তাজ প্রায় একটি মাস প্রাসাদের অনেকের বিশেষ করে সুলতানের অজান্তে দুনিয়া-র ঘরেই রয়ে গেল। রোজ রাত্রেই তারা পরস্পরের মাধ্যমে কাম-পিপাসা পরিতৃপ্ত করতে থাকে। মানুষের স্বভাবই তো এ-ই যত পায় ততই যেন না-পাওয়ার হতাশা তাকে পেয়ে বসে। কতখানি পেলে তার মন-প্রাণ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তা সে নিজেই জানে না। সবই মনে হয় সাময়িক তৃপ্তি। পরমুহূর্তেই আবার নতুন করে পাওয়ার জন্য বুকের ভেতরে অবর্ণনীয় চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়।

এদিকে উজির দাদান আর আজিজ চঞ্চল হয়ে উঠে। এ-ভাবে আর কতদিন অলসভাবে বসে থাকা সম্ভব। শাহজাদা তাজ সেই যে একমাস আগে সুলতানের প্রাসাদে গেছে আর তার ফেরার নাম নেই। সে-বুড়ির আর দেখা নেই। উজির ধরেই নিয়েছে, তাজ নির্ঘাৎ ধরা পড়েছে। সুলতান ক্ষেপে গিয়ে হয় তার গর্দান দিয়েছে, নয়ত নিদেনপক্ষে কয়েদখানায় পুরে দিয়েছে। যাই-হোক, কিছু না কিছু অঘটন যে ঘটেছে এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সংশয় তার রইল না। আজিজও ভেবে কোন কূল কিনারা করতে পারল না। অনেক ভেবে চিন্তে আজিজ বলল—'এবার বোধ হয়, আমরা শাহজাদাকে ফিরে পাব। নিদেনপক্ষে তার খবর তো পাবই। এক মাস হ'ল, শাহজাদী এবার বাগিচার মঞ্জিলে যাবে। এখন তাকে ধরা না পেলেও সে-বুড়িটিকে ঠিক হাতের নাগালের মধ্যে পাবই পাব। তখনই যা হোক হিল্লে একটি হয়ে যাবেই।'

উজির দাদান যার পার নাই শঙ্কিত হয়ে যায়। অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি করতে করতে এক সময় ব'লে উঠল—'না, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে অলসভাবে বসে থাকতে নারাজ। কিছু একটা হয়ে গেলে নিজের মুলুকে ফিরে সুলতানের কাছে মুখ দেখাব কি করে? আজ, এ-মুহূর্তেই আমি রওনা হচ্ছি। সুলতানের কাছে গিয়ে পুরো ব্যাপারটি খুলে বলে আগে তো আমার বুকের বোঝা হাল্কা করি। তারপর সুলতান যা ভাল বুঝবেন, করবেন।'

বৃদ্ধ উজির প্রাসাদে ফিরে সুলতানের কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল। সুলতান সবকিছু শুনে স্তম্ভিত, মর্মাহত হলেন।

গুলিবিদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠলেন—'কর্পূর দ্বীপের সুলতান আমার বেটাকে কোতল করেছে, নয় তো শূলে চড়িয়েছে! যা-ই করুক, তার বদলা আমাকে নিতেই হবে! এত স্পর্ধা তার! আমার বেটার গায়ে হাত তুলেছে! তামাম ইস্পাহান আমার ডরে কাঁপে। আর কর্পূর দ্বীপের সুলতান তো কোন্ ছার। তার ইমারত আমি ধূলায় মিশিয়ে দেব। ধ্বংস করব তার সুলতানিয়ৎ।'

উজির দাদান'কে দিয়ে সেনাপতিদের খবর পাঠানো হ'ল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কর্পূর দ্বীপ আক্রমণের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করে ফেলা হ'ল। অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল সেনাবাহিনী হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে বীরদর্পে এগিয়ে চল্‌ল কর্পূর দ্বীপের উদ্দেশে।

এদিকে শাহজাদা তাজ অল-মুলক আর শাহজাদী দুনিয়া মহব্বতের অথৈ সাগরে আত্মমগ্ন। এক রাত্রির দ্বিতীয় চতুর্থ যামে তাজ তার মেহবুবা দুনিয়া-র কোলে মাথা রেখে শুয়ে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল—'মেহবুবা আমার, তুমি আমাকে অ-নে-ক দিয়েছ, আমিও সাধ্যমত নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি তোমার কামতৃষ্ণা নিবারণ করতে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও আমাদের পেয়ার মহব্বতে সামান্য খুঁত রয়ে গেছে। আমি আজ পর্যন্ত তোমার কাছে আমার আসল পরিচয় দেই নি। আজ বলছি বেগম—আমি সুলতান সুলেমান শাহ-র লেড়কা। সবুজ নগর ও ইস্পাহান-এর অধিপতি তিনি। আর আমার নাম তাজ অল-মুলুক। তোমার কাছে আমি সওদাগরের পরিচয় দিয়েছি। ক'দিন ধরেই কথাটি বলব বলব ক'রে আর বলা হয়ে ওঠে নি।'

শাহজাদী দুনিয়া সচকিত হয়ে তাজ-এর মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকায়। তাজ-এর গালে হাত বুলাতে বুলাতে ব'লে—'সেকী! তুমি সুলতান সুলেমান-এর বেটা। তোমার আব্বার কাছ থেকেই আমাদের শাদীর প্রস্তাব নিয়ে তোমাদের উজির আমার আব্বাজীর সঙ্গে ভেট করতে এসেছিলেন, আমি তাঁকে হতাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।'

—'হ্যাঁ, সবই আমি জানি। তোমার আব্বাজী তাকে খুবই খাতির করেছিলেন। কিন্তু তুমিই তাঁর সে প্রস্তাব নির্মমভাবে খারিজ করে দিয়েছিলে। তুমি নাকি পুরুষদের নাম শোনামাত্র ক্ষেপে একেবারে টঙ্ হয়ে যেতে।' আজ মাসাধিক কাল হয়ে গেল আমি এখানে মৌজ করে দিন গুজরান করছি। কিন্তু ওদিকে উজির সাহেব আর আমার দোস্ত আজিজ যে কি করছে, কিছুই জানি না।'

—'বুড়িকে পাঠিয়েছিলাম আমি। তাদের কোন পাত্তা নেই। তোমার দোকান বন্ধ। কামরায়ও তালা ঝুলছে। আশপাশের কেউই কিছু বলতে পারল না। তারপর আর একদিন গিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভেট করে জানতে পারলাম তারা তাদের মুলুকে ফিরে গেছে।'

তাজ সচকিত হয়ে উঠে বসে পড়ল। মুখের হাসি মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে বলে উঠল—'মেহবুবা, কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হতে চলেছে! আমার দিল্ বলছে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। উজির সাহেব নির্ঘাৎ ধ'রে নিয়েছেন, তোমার আব্বা আমাকে যেকোন ভাবেই হোক কোতল করেছেন। তিনি আমাদের সুলতানিয়তে ফিরে গিয়ে আব্বাকে এ রকম কোন কিছুই বলেছেন।'

—'তবে? তবে উপায়?'

—'উপায় একটিই আছে। চল, আজই আমরা সবুজ নগরের উদ্দেশে যাত্রা করি। আমাদের দেখলেই আব্বাজী শান্ত হবেন।'

সকাল হ'ল। সুলতান সারিমান-এর দরবারে এক জহুরী এল। তার হাতে একটি বেশ বড়সড় গহনার বাক্স। সেটি সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে সে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, পারস্য থেকে এ গহনাগুলো নিয়ে এসেছি। আপনার পছন্দ্ হলে রাখতে পারেন।'

সুলতান খোজা-সরদারের হাতে গহনার বাক্সটি দিয়ে বললেন—'অন্দর মহলে দুনিয়া'কে দেখিয়ে আনো। এ যদি তার পছন্দ্ হয় তবেই রাখার প্রশ্ন।'

দরওয়াজা ঠেলে খোজা-সর্দার কাফুর ঘরে ঢুকতেই সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে যেন নিজের চোখ দুটোর ওপরেও আস্থা রাখতে পারছে না। একেবারেই অভাবনীয় ব্যাপার। শাহজাদী দুনিয়া একেবারে বিবস্ত্রা। এক খুবসুরৎ নওজোয়ানকে জড়িয়ে ধরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কাফুর ভাবল খোয়াব দেখছে। চোখ দুটো রগড়ে আবার তাকাল। না, খোয়াব টোয়াব তো নয়!

কাফুর-এর কাছে শাহজাদী দুনিয়া-র ব্যাপার-স্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। এ-নাগরটির জন্যই তো সে এতদিন শাদীর নাম শুনেই রেগে একেবারে রুদ্ররূপ ধারণ করত। সুলতানের হুকুম তামিল করতে এসে একদিন কী বিপদের মুখেই না পড়েছিল। ইয়া বড় এক ছুরি নিয়ে শাহজাদী তাকে তাড়া করেছিল। সে-কথা মনে হলে আজও তার হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে যেতে চায়। তার মনে প্রতিশোধ স্পৃহা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

কাফুর ব্যস্ত-পায়ে দরবারে ফিরে গিয়ে সুলতানকে ইশারায় বাইরে নিয়ে আসে। কোনরকম দ্বিধা-সঙ্কোচ না করেই বলে—'জাঁহাপনা, গহনা পছন্দ্ করাতে গিয়ে আমি কী অপ্রস্তুতেই না পড়েছি! মনে হ'ল আমি বুঝি দোজাকের দরজায় দাঁড়িয়ে। দেখি, শাহজাদী এক নওজোয়ানকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বিভোর হয়ে নিদ যাচ্ছেন। কারো গায়ে এক চিলতে কাপড়ও নেই। আমি শরমে এতটুকু হয়ে গেলাম।'

—'চুপ কর! বেতমিস কাহাকার যদি তোর কথা সত্যি না হয় তবে কিন্তু তোর গর্দান যাবে বলে রাখছি।'

সুলতান শারিমান হুঙ্কার দিতে দিতে অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন—কার গর্দানে কটি মাথা একবার আমি দেখব! আমার প্রাসাদের অন্দর মহলে ঢুকে নষ্টাচার করে বেরিয়ে যাবে ; এত বড় কলিজা কার আছে দেখতে চাই!'

ক্রোধোন্মত্ত সুলতান সারিমান গস্‌গস্‌ করতে করতে দুনিয়ার ঘরে দরওয়াজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, শরমে তার চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আপন মনে বলে উঠলেন—'খোজা-সর্দার কাফুর তো একবিন্দুও ঝুট বাত বলে নি।

গুলিবিদ্ধ শেরের মত গর্জে উঠলেন—'কে আছিস?'

সুলতানের হুঙ্কার শুনে এক নিগ্রো পরিচারক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

সুলতান হুকুম দিলেন—'শাহজাদী আর ওই শয়তানটিকে পিঠমোড়া করে বেঁধে দরবারে হাজির করো।'

নিগ্রো পরিচারকটি সুলতানের হুকুম তামিল করল। দরবার কক্ষ ফাঁকা। একমাত্র সুলতান সারিমান ছাড়া দ্বিতীয় কোন আদমি সেখানে নেই। নিগ্রোটি শাহজাদী আর তাজ'কে সুলতানের সামনে হাজির করল। ক্রোধোন্মত্ত সুলতান অতর্কিতে একটি বর্শা তাজ'কে লক্ষ করে ছুঁড়ে মারলেন। কাঁপা কাঁপা হাতের বর্শাটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। হাতে বাঁধা অবস্থাতেই শাহজাদী দুলিয়া ঝট্‌করে তাজ-এর সামনে গিয়ে তাকে আগলে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—'কোতল করতেই যদি হয় তার আগে আমাকেই কোতল করুন, আব্বাজী। এ নওজোয়ান নির্দোষ। আমিই তাকে অন্দরমহলে নিয়ে গেছি। আমার আস্কারা না পেলে কোন নওজোয়ান নির্বিবাদে আমার কামরায় রাত কাটাতে পারে, আপনিই বলুন?'

বিষধর সাপের মাথায় শিকড় ধরলে যেমন তার উগ্রতা নাশ হয় সুলতান অকস্মাৎ ঠিক তেমনি মিইয়ে গেলেন। তবু তিনি ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে লাগলেন। এবার তাজ-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি বল্‌লেন—'কে তুমি? তোমার পরিচয় কি, বল?'

তাজ নির্ভয়ে সুলতানের সওয়ালের জবাব দেয়—'আমার নাম তাজ অল-মুলুক। আমার আব্বার নাম সুলতান সুলেমান শাহ। সবুজ নগরে তার রাজধানী। সমগ্র ইস্পাহান তাঁর সুলতানিয়ৎ। এবার আপনার দিল যা চায় করুন। যদি আমাকে কোতল করতে চান, আপত্তি নেই। তবে আশা করি পরিণামে কি ঘটতে পারে আপনিও অনুমান করতে পারছেন। তাই আমাকে খতম করে নিজের পায়েই যেন আবার কুড়ুল মারবেন না।'

সুলতান সারিমান কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে আর স্থির থাকতে পারলেন না। মসনদ থেকে নেমে তাজকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সোল্লাসে বল্‌লেন—'বেটা, তোমার হাতে আমার কলিজার সমান দুনিয়া'কে তুলে দিতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব। না জেনে, না বুঝে তোমার ওপর অবিচার করেছি, কটু কথা বলেছি দিল থেকে ঝেড়ে মুছে ফেল।'

এমন সময় বৃদ্ধ উজির ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌ল—'জাহাপনা, সর্বনাশ ঘটতে চলেছে! আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে সুলতান সুলেমান-এর সেনাবাহিনী জোর কদমে অগ্রসর হচ্ছে। আগে ভাগে এর বিহিত করতে না পারলে আমাদের ইমারত থেকে শুরু করে সব কিছু ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। আমি আর এক মুহূর্তও দেরী করলে আমাদের অস্তিত্ব আর থাকবে না। আমি আমাদের সেনাপতিদের তৈরী হতে বলি গে।' কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ উজির দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন।

সেদিনই সুলতান সারিমান শাহজাদী দুনিয়া আর শাহজাদা তাজ'কে নিয়ে সবুজনগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁদের সঙ্গে বৃদ্ধ উজির আর নাজিরও চল্‌ল।

এদিকে সুলতান সুলেমান-এর সৈন্যদলের কাছে খবর যায় শাহজাদা তাজ সুস্থ। বহাল তবিয়তেই জিন্দা আছে। ফলে মারমুখী সৈন্যরা থমকে যায়।

শাহজাদা তাজ অল-মুলুক জিন্দা আছে খবরটি সুলতান সুলেমান-এর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এক দূত ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আবার এদিক থেকে সুলতান সারিমানও সুলতান সুলেমান এর কাছে দূত পাঠিয়ে দিলেন, সুলতান সারিমান স্বয়ং শাহজাদা তাজ এবং তার বিবিকে নিয়ে সবুজ নগরে যাচ্ছেন।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলার পর ভোর হয়ে এল। বেগম তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগমের ঘরে এলেন। বেগম তার কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশটুকু শুরু করতে গিয়ে এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদা তাজ যে তার বিবিকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরছে খবরটি সুলতান সুলেমান-এর কানে যথা সময়ে পৌঁছে গেল।

শাহজাদা তাজ অল-মুলুক প্রাসাদে পৌঁছল। সে সুলতান সুলেমান'কে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'আব্বাজান, আমি আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছি। আমার জন্য আপনাকে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনগুজরান করতে হয়েছে। আমার অপরাধের সীমা নেই। আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

সুলতান তাজ'কে বল্‌লেন—'বেটা, আল্লাহ-র ওপর আস্থা রাখবে। তিনি যখন, যেভাবে রাখেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তা নিয়ে আমার কোন আক্ষেপ বা দুশ্চিন্তা নেই। আজ যে তোমাকে আবার বুকে ফিরে পেয়েছি তার জন্য তাঁকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাই। তিনি তোমাদের ভবিষ্যৎ-জীবন মধুময় করে তুলুন।'

সুলতান সুলেমান তাঁর মেহমান সুলতান সারিমানকে সাদরে গ্রহণ করলেন। যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন।

সুলতান সুলেমান-এর দিল আজ আনন্দে ভরপুর। তার ভেতরে উত্তাল উদ্দাম সাগরের জোয়ার বইছে। তিনি উজির দাদান'কে দিয়ে তাঁর সুলতানিয়তের বড় বড় কাজীদের তলব করলেন।

সুলতান বললেন আমার বেটা শাহজাদা তাজ অল-মুলুক আর শাহজাদী দুনিয়া-র শাদী হবে। তোমরা তাদের শাদীর কবুলনামা তৈরি কর।'

ফুল, মালা আর রঙিন বাতি দিয়ে প্রাসাদটিকে সুন্দর করে সাজানো হ'ল। সুলতান নিজে হাতে জনে জনে নতুন পোশাক, ফুল-মালা গোলাপ ও আতর প্রভৃতি দান করলেন। প্রজারা এক মাস ধরে নাচা-গানা আর হৈ-হুল্লোড়ের মাধ্যমে আনন্দ করল। আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে তাজ আর দুনিয়া-র শাদী হয়ে গেল।

শাহজাদা তাজ কিন্তু এত আনন্দের মধ্যে আজিজ'কে ভুলে যায় নি। বহুমূল্য পোশাক পরিচ্ছদ, প্রচুর ধনরত্ন, নফর-বাঁদী উট ও খচ্চর প্রভৃতি দিয়ে আজিজকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল।

কিছুদিন পর সুলতান সুলেমান দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে যাত্রা করলেন। তাজ অল-মুলুক এবার সবুজ নগরের মসনদে বসল। আজিজ হ'ল তার প্রধান পরামর্শদাতা—উজির।

কানমাকানা আর নসিবার কিস্‌সা

শাহজাদা তাজ অল-মুলুক এবং শাহজাদী দুনিয়া-র কিস্‌সা শেষ করে বেগম শাহরাজাদ এবার দু-অল-মাকান-এর লেড়কা কানমাকানা আর নুজাৎ-এর লেড়কি নসিবার কিস্‌সা শুরু করেন। বাল্যকাল থেকেই এক সঙ্গে খেলাধূলা করে তারা বড় হতে থাকে। তাদের উভয়ের সুরৎই চোখে লাগার মত। এ যেন একজনের চেয়ে অন্যজনের সুরৎ অনেক—অনেক বেশী। নসিবা খুবই শান্ত। তার কথাবার্তা, চলাফেরা খুবই ধীরস্থির। কোনরকম ঝুটঝামেলা দেখলে নিজেকে সতর্কতার সঙ্গে দূরে রাখে। কিন্তু কানমাকানা? সে যেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটোছুটি তার নিত্যকার অভ্যাস। আর শিকারের নেশা যেন তার খুনের সঙ্গে মিশে রয়েছে। তেজী ঘোড়ার সওয়ার হয়ে তীর ধনুক নিয়ে বনে বনে হিংস্র জন্তুর মোকাবেলা করাতেই তার যেন আনন্দ। আর নিগ্রো বীরদের সঙ্গে তরবারি নিয়ে লড়াই এবং মল্লযুদ্ধের প্রতিও তার আকর্ষণ কম নয়।

নসিবার আব্বা নুজাৎ-এর স্বামী কানমাকান-এর সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আজ প্রবল শক্তিধর ও প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে। সৈন্যদের অনেককেই আজ সে বশীভূত করে নিয়েছে। তবে কেউ কেউ যে উজির দানদান-এর তাঁবে রয়েছে, মিথ্যা নয়। কিন্তু উজির দানদান-এর চেয়ে নসীবার আব্বাই দিন দিন অধিকতর প্রতাপশালী হয়ে উঠতে লাগল। তার প্রতাপ-প্রভাব সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত উজির দানদান উপায়ান্তর না দেখে বাগদাদ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হয়। অদূরবর্তী এক নগরে গিয়ে গোপনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। আল্লাহ যদি কোনদিন মুখ তুলে তাকান তখন ফিন নসীব যদি ফেরাতে পারে সে আশাতেই সে দিন গুজরান করতে লাগল। তার একমাত্র ইচ্ছা, কিশোর কানমাকানা কবে নওজোয়ান হয়ে উঠবে। কবে তাকে মসনদে বসিয়ে মনস্কামনা পূর্ণ করে নুজাৎ-এর স্বামীর হাত থেকে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে। এরকম সব আশায় বুক বেঁধে উজির দানদান ভবিষ্যতের পথ চেয়ে দিন গুজরান করছে।

এদিকে নুজাৎ-এর স্বামীর দৌরাত্ম্য দিন দিনই বেড়ে চলেছে। তার ভয়ে শের আর গাই এক ঘাটে পানি খায়। তার কথা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করবে এমন আদমি সে তল্লাটে কেউ-ই নেই। সে-ই তামাম মুলুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত হয়ে নিজের প্রতাপ খাটিয়ে চলেছে। তার কঠোর নির্দেশে কানমাকানা আর তার বুড়ি আম্মা গৃহে নজরবন্দী হয়ে দিন গুজরান করে চল্‌ছে। চোখের পানি তাদের এখন সম্বল। এর একটাই কারণ, কানমাকানা যাতে আর নসীবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা না করতে পারে। এ-অবস্থায় অসহায়ভাবে খোদাতাল্লা-র কাছে চোখের পানি ফেলে আর্জি জানানো ছাড়া আর কি-ইবা তাদের করার থাকতে পারে!

কানমাকানাকে কিন্তু তার আব্বা শত কোশিস করেও বশে

রাখতে পারে না। সে গোপনে যথারীতি তার মেহবুবা নসীবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু এভাবে তো আর দিনের পর দিন চলা সম্ভব নয়। চলতে পারলও না। নসীবার আব্বা তাকে এমন কড়া পাহারার মধ্যে রাখতে লাগল যার ফলে কানমাকানা কিছুতেই তার সঙ্গে আর মোলাকাত করার সুযোগ পায় না। কিন্তু তার দিল্ মানবে কেন? উপায়? উপায় একটি বের করল।

কানমাকানা তার মেহবুবা নসীবাকে একটি চিঠি লিখে নিজের মানসিক পরিস্থিতির কথা জানাল। সে লিখল—"মেহবুবা নসীবা, তুমি চোখের আড়াল হওয়ার পর থেকে আমার মন-প্রাণ যে কিরকম বিষিয়ে রয়েছে তা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। তোমার অদর্শনে আমার খানাপিনা আর চোখের নিদ ঘুচে গেছে। জানি না খোদাতাল্লা আবার কবে আমাদের মোলাকাত করাবেন। তোমাকে আমার পাশে না পেলে জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে। এ-মুলুক আজ আমার কাছে দোজাক-এর সমান হয়ে গেছে। নসিবা, মেহবুবা আমার, চল আমরা এ-মুলুক ছেড়ে এমন এক মুলুকে চলে যাই যেখানে কেউ আর আমাদের মধ্যে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করতে পারবে না।"

কানমাকানা তার কলিজার সমান চিঠিটি এক বিশ্বস্ত খোঁজা পরিচারকের হাতে দিয়ে বললে—'এটি নসীবার হাতে পৌঁছে দিবি। খবরদার কেউ যেন টের না পায়।'

চিঠিটি হাতে নিয়ে খোজা পরিচারকটি সালাম জানিয়ে বিদায় নিল। কিন্তু সে কথা রাখল না। চিঠিটি নসীবা-র হাতে না দিয়ে চুপিচুপি তার আব্বাজানের হাতে দিল। চিঠির বয়ান পড়ে তার আব্বাজান তো রেগে একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। কানমাকানাকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হ'ল।

শেষ পর্যন্ত নসীবা-র আব্বাজান অনেক ভেবে চিন্তে নিজেকে সংযত করে। ভাবল, মাথা গরম করে হঠাৎ কিছু করে বসলে আখেরে সব ভেস্তে যাবে। নিজেকে সামলে নিয়ে গুটিগুটি নুজাৎ-এর কাছে হাজির হ'ল। নুজাৎ চিঠিটি পড়ার পর যারপরনাই বিস্মিত হ'ল। একেবারে আশমান থেকে পড়ল যেন। গুম্ হয়ে বসে রইল। তার কীর্তিমান ভাইপো যে তলে তলে এতদূর অগ্রসর হয়ে পড়েছে এ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। তার স্বামী সব কিছু শুনে বল্ল—'শোন নুজাৎ, লেড়কির এখন দিনদিনই ওমর বাড়ছে, বয়স হচ্ছে। আর কানমাকানাও নওজোয়ান হয়ে উঠছে। তার দেহে যৌবনের কামনা-বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তাই বিবেচনা করে দেখ, এখন কি নসীবা আর কানমাকানার ঘন ঘন মোলাকাত হতে দেওয়া সঙ্গত? বল? তাই আমার পরামর্শ, আজ থেকে নসীবাকে সর্বদা হারেমে রাখার ব্যবস্থা কর। আর তার দিকে কড়া নজর রাখবে।'

বিবিকে পরামর্শ দিয়ে নুজাতের স্বামী নিজের কাজে চলে গেল। নুজাৎ চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ভাইপোকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে বল্ল—'শোন, নসীবার আব্বাজান তোমার ওপর তেলে বেগুনে জ্বলে রয়েছেন। একে রগচটা, তার ওপর এমন একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আখেরে যে কি ঘটবে তা ভেবে আমি অস্থির। তোমার লেখা চিঠিটি তাঁর হাতে পড়েছে। তাই আমার বদ্ধমূল ধারণা তিনি তোমার সর্বনাশ সাধন করতে পারেন। আমি জানি, তুমি নসীবাকে নিজের কলিজার সমান পেয়ার কর। নসীবা আমার লেড়কি। সবকিছু শোনার পর আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলেছে, তোমাকে ছাড়া তার কাছে দুনিয়া অস্তিত্বহীন। তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য সে নিজের কলিজা পর্যন্ত ছিঁড়ে দিতেও কুণ্ঠিত নয়। এ-ও সত্যি, তুমিই মসনদের একমাত্র দাবীদার। তবু তুমি এখনও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওনি। তাই তোমার প্রতি আমার একমাত্র পরামর্শ রইল—ধৈর্য ধর। দাঁতে দাঁত চেপে আরও কয়েক্ সাল কোনরকমে কাটিয়ে দাও। তারপর তোমার প্রাপ্য মসনদ তুমি লাভ করবে। ফিরে পাবে তোমার হকের সুলতানিয়ৎ। তখন তোমার বাঞ্ছা পূরণের আর কোনই প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কারণ, আমরা তো তখন তোমার হাতের মুঠোয় থেকে হুকুম তামিল করতে বাধ্য থাকব। তবে আমি কথা দিচ্ছি, তুমি মাঝে-মধ্যে যাতে নসীবা-র দেখা পাও সে চেষ্টা আমি করব।'

কানমাকানা নুজাৎ-এর কথায় তেমন ভরসা পেল না। এখানে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। এখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র গিয়ে

বাঁচতে চাই। মসনদের মোহ আমার নেই। সুলতানিয়াৎ-ও আমার কাছে নিতান্তই মূল্যহীন। আপনার লেড়কি নসীবা আমাকে পেয়ার মহব্বত করে। আমিও তাকে নিজের কলিজার চেয়েও বেশী পেয়ার করি। আমরা চাই কাছাকাছি পাশাপাশি থাকতে। অর্থের মোহ আমাদের কারোরই নেই। আমরা পথে পথে ভিখ মেঙ্গে দিন গুজরান করতেও কুণ্ঠিত হ'ব না। নসীবাকে না পেলে আমার, কেবলমাত্র আমারই বলি কেন, আমাদের দু'জনের জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে।'

নুজাৎ বল্‌ল—'মসনদের বা সুলতানিয়ৎ-এর মোহ তোমার না থাকলেও প্রজাদের কিন্তু তোমাকে চাই-ই চাই। তাদের বিশ্বাস, এ-মসনদ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে। তোমাকে মসনদে অধিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত ধর্মের নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। কারণ, তুমিই এ-মসনদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। অতএব বুঝতেই পারছ, তুমি মুলুক ছেড়ে চলে গেলে প্রজারা হতাশ হয়ে বিদ্রোহ করতেও দ্বিধা করবে না। তারা নিঃসন্দেহ হবে আমার স্বামী চক্রান্ত করে তোমাকে মুলুক ছাড়া করেছেন।'

কানমাকানা নুজাৎ-এর কোন উপদেশেই কান দিল না। সে এক রাত্রে কালান্দর ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করে সত্যি সত্যি গৃহত্যাগী হ'ল। কানমাকানা হারা উদ্দেশে পথ চলতে শুরু করে। এ গ্রাম সে গ্রাম পেরিয়ে, বহু মুলুক ঘুরে এক রাত্রে এক বনের ধারে একটি ঝাঁকড়া গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটাতে থাকে। রাত্রির প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে কার যেন মিষ্টি-মধুর গানা তার কানে যায়। নিদ টুটে গেল। তড়াক্ করে উঠে বসে পড়ে। উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করে। প্রথমে ভেবেছিল বুঝি বা খোয়াব দেখছে। এবার নিঃসন্দেহ হ'ল। খোয়াব নয়, পুরোপুরি বাস্তব। সত্যি অদূরবর্তী কোন স্থানে কে যেন তন্ময় হয়ে গানা গাইছে। সে এবার উঠে পড়ল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে এগিয়ে চলতে লাগল।

সামনে এক অনুচ্চ পাহাড়। কানমাকানা উদ্ভ্রান্তের মত পাহাড়টির উপর উঠতে লাগল। সামান্য উঠতেই আবছা অন্ধকারে কে একজন বসে তন্ময় হয়ে গানা গাইছে। কানমাকানাকে দেখে রহস্যময় আদমিটি গানা থামিয়ে বলে উঠল—'কে? কে গো তুমি? তুমি কি কোন আদমি, নাকি জিনিটিনি? শোন, যদি জিনি হয়ে থাক তবে এগিয়ে আসতে পার। আর যদি কোন আদমি হও তবে আর এক পা-ও এগোতে চেষ্টা কোরো না। আন্ধার। তার ওপর ঘন ঘন চড়াই উৎরাই। পা ফেলতে একটু ভুলচুক হয়ে গেলে একেবারে পাতাল পুরীতে পৌঁছে যাবে। জানে বাঁচার তো প্রশ্নই ওঠে না। চুপটি করে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আন্ধার কেটে আলো ফুটুক তখন আমাদের মোলাকাত আর চিন-পরিচয় হবে। বাতচিত যা কিছু তখনই সেরে নেওয়া যাবে।'

কানমাকানা উপায়ন্তর না দেখে আন্ধারে সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেয়।

একসময় আন্ধার কেটে পাহাড়ের মাথায় ভোরের আলো দেখা দেয়। প্রকৃতির কোলে নেমে আসে ঝলমলে সকাল। এমন সময় কানমাকানা একটি আদমিকে তার দিকে অগ্রসর হতে দেখল। তার গায়ে মরু অঞ্চলের বাদাবী দস্যুদের মত পোশাক। কোমরে ঝুলছে ইয়া বড় এক তরবারি। কাছাকাছি এসেই সে কানমাকানাকে প্রশ্ন করে—'কে তুমি? কোন্ মুলুকে ঘর? কোন্ জাত তোমার? কোন অস্ত্র না নিয়ে খালি হাতে এ-দুর্গম পাহাড়ে উঠেছ, তোমার সাহস তো কম নয় নওজোয়ান!'

কানমাকানা বাদাবী দস্যুটির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বল্‌ল—'আমার নানা ছিলেন শাহেনশাহ উমর অল-নুমান। তিনি ছিলেন বাগদাদের সুলতান। আর আব্বার নাম দুল-অল-মাকান তিনিও এক সময় বাগদাদের সুলতান ছিলেন। তিনিও বেহেস্তে গেছেন। আর আমার নাম কানমাকানা। আমার ফুফার লেড়কি নসীবার সঙ্গে আমার পেয়ার মহব্বত হয়। সে কারণেই আমাকে মুলুক ছেড়ে এখানে-ওখানে ঢুঁড়ে বেড়াতে হচ্ছে।'

—'গুলতাপ্পী দেওয়ার আর জায়গা পাওনি! তুমি শাহজাদা হলে গায়ে কালান্দার ফকিরের পোশাক কেন?'

—'বললামই তো আমি মুলুক ছেড়ে বিবাগী হয়েছি।'

—'তোমার সাহস তো কমতি নয় দেখছি! দেহরক্ষী না নিয়ে তুমি একা একা ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছ!'

—'যে বিবাগী হয়ে ফকিরের বেশে মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে তার আবার দেহরক্ষীর প্রয়োজন কি? তবে কোনদিন যদি নসীবে থাকে, সুলতান হয়ে মসনদে বসতে পারি তখন না হয় তোমাকেই আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করব।'

—'তোমার সাহস তো কম নয় হে? এটুকু এক পুঁচকে ছোকড়া বলে কিনা আমার মত এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে দেহরক্ষী রাখবে! জান, আমি চাইলে তোমাকে আমার নফর বানিয়ে রাখতে পারি?'

সহজ-সরল কিশোর কানমাকানার কথায় বাদাবী দস্যুটি কিন্তু খুবই মজা পেল। এক ঝটকায় তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। সামান্য নেমে বল্‌ল—'তোমাকে এখন পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কে ঠেকাবে, শুনি? ঐ নদীর জলে ফেলে দিলেই বা কে রক্ষা করবে?'

পাহাড় থেকে নেমে বাদাবী দস্যুটি কানমাকানাকে কাঁধ থেকে নামায়। তার সঙ্গে করমর্দন করে বলে—'আজ, এ-মুহূর্ত থেকে আমি তোমার বান্দা। শাহজাদা, আজ থেকে তোমাকে রক্ষা করাই আমার সবচেয়ে বড় কাজ। আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে বলছি, আমার জান থাকতে তোমার গায়ে কেউ ফুলের টোকাটিও দিতে

পারবে না।'

কানমাকানা বাদাবী দস্যুর কথায় যার পর নাই অবাক হয়। ভাবে বড় অদ্ভুত আদমি তো! কথাবার্তা কেমন খাপছাড়া। একটু আগে যাকে সে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল, নদীর পানিতে ছুঁড়ে ফেলবে বলেছিল এখন সে-ই কিনা বলছে তার নফর হয়ে জিন্দেগী কাটিয়ে দেবে। ইয়া আল্লাহ! এ আবার কেমন আদমি!

পাহাড় থেকে নেমে বাদাবী দস্যু কানমাকনাকে নিয়ে নদীর ধারে বসল। পোটলা খুলে শুকনো রুটি আর নিমক বের করল। নিজে কিছু খেল আর কিছু দিল কানমাকনাকে।

রোটি চিবোতে চিবোতে বাদাবী দস্যু বল্‌ল—'তুমি আমার নাম জানতে চাইলে না তো? আমার নাম সাব্বা ইবন্ রামাহ ইবন্ হুমাম। মরু অঞ্চলে আমার ঘর। আমরা জাতে তাইস। আমার ওমর যখন দু' সাল তখন আমার আব্বাজান বেহেস্তে চলে যান। চাচার ঘরে আমি মানুষ হতে থাকি। নাজমা নামে চাচাজীর এক লেড়কি ছিল। এক সময় আমাদের মধ্যে পেয়ার মহব্বত জন্মায়। আমাদের শাদীর ওমর হলে আমরা শাদী-নিকা করার মতামত ব্যক্ত করলাম। চাচীর মত পেলাম। কিন্তু চাচাজী একেবারেই গররাজী। তাঁর সাফ কথা, শাদী করে আমি বিবিকে রোটি কাপড়া দিতে পারব না। আমার দলের সর্দার এগিয়ে গেল। চাচাকে বল্‌ল—আমাদের শাদীর পর দলই আমাদের রোটি-কাপড়ার দায়িত্ব নেবে। কিন্তু তার কথাতেও চাচাজী নরম হলেন না। তখন এক নতুন পথ নিলেন। শাদী করতে হলে তাঁকে পঞ্চাশটি উট, পঞ্চাশটি ঘোড়া, দশটি নফর, পঞ্চাশ বস্তা ভুট্টা আর পঞ্চাশ বস্তা যব আমাদের বিয়ের যৌতুক হিসাবে দিতে হবে। আমার তো শিরে হাত পড়ল। তার এমন বিরাট ফর্দ অনুযায়ী চাহিদা পূরণ করা কি করে সম্ভব হবে? তারপর থেকে আমি সরাব পান করে সারা রাত জানোয়ারের মত মকানে মকানে ডাকাতি করে বেড়াই। আজ না হোক কাল আমার মেহবুবাকে যে পেতেই হবে। দিনার কামাতে হবে—প্রচুর দিনার।'

কানমাকানা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'আমাদের দু' জনের নসীবই দেখছি সমান।'

তারা যখন গল্পে মসগুল তখন দূরে একজন ঘোড়সওয়ার তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সাব্বা কোমর থেকে তরবারি বের করে শক্ত করে ধরে। না, ডাকাত বা সুলতানের সিপাই হবে হয়তো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাদের সামনে এসেই ঘোড়া থেকে নামল। আহত এক আরব মুসলমান। ডাকাত। ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে খুন ঝরছে।

কানমাকানা ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গিয়ে আহত মুসলমান ডাকাতটিকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাল। ঘাসের নরম বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে তারা উভয়ে মিলে তার সেবা শুশ্রূষা শুরু করে। সৈনিকটির কামিজাটি তাজা খুনে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। সে কামিজটি তুলে দেখাল, বিরাট একটি ক্ষত। চুঁইয়ে চুঁইয়ে খুন ঝরছে। সাব্বা বল্‌ল—'দোস্ত, তোমার এ-অবস্থা কে, কেন করেছে?'

—'এই যে ঘোড়াটি দেখছেন, এ-ই আমার কাল হ'ল। তামাম আরব দুনিয়ায় এর মত তেজী ঘোড়া দ্বিতীয় আর একটি মিলবে না। গায়ে গতরেও কেমন বড় দেখছেন তো? এক সময় কনস্তান্তিনোপলের সম্রাট আফ্রিদুন এর মালিক ছিলেন। আমি একে চুরি করে নিয়ে আসি। তামাম আরব দুনিয়ায় এর খ্যাতির কথা প্রচার হয়ে যায়। ব্যস, হয়ে গেল খেল শুরু। সবার নজর কেড়ে নেওয়া ঘোড়াটিকে অন্য দলের ডাকাত ছিনতাই করে নেওয়ার ফিকির খুঁজতে লাগল। সর্দার শোচলো কি, বেচে দিলে ঝামেলা চুকে যাবে। তাই আমাকে হুকুম করল আরব সীমানায় রক্ষী বাহিনীর কাছে বেচে দিয়ে আসতে।

সর্দারের হুকুম তামিল করতে আমি সেনাপতির সঙ্গে ভেট করলাম। তিনি এক তাজ্জব কথা শোনালেন—'তুমি ঘোড়ার যে সুখ্যাতি করছ তার প্রমাণ কি? এতগুলো দিনারের বিনিময়ে কিনে যদি আখেরে দেখি গাধার বাচ্চা, তখন?'

সেনাপতির বাৎ শুনে আমার খুন শিরে চেপে গেল। একটু বেশ রাগত স্বরেই বল্‌লাম—'বহুৎ আচ্ছা, তবে প্রমাণই দিচ্ছি। আপনার কাছে যত ঘোড়া আছে তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে তাগড়াই ঘোড়াটিকে নিয়ে আসুন। আমি ঘোড়া নিয়ে ছুটব। তাকে ডিঙিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। কেউ ছুঁতে পারলেও জান কবুল করে যাব, কথা দিলাম।'
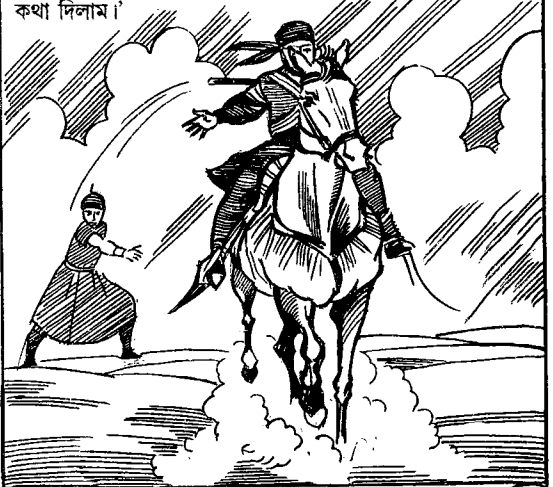
আমার পঙ্খীরাজ খেল দেখাল। সবাই তাজ্জব মানল। সৈন্যদের শিরায় শিরায় খুন টগবগিয়ে উঠল। তাদের সেনাবাহিনীতে যা দুর্লভ তা যদি এক ডাকাতের কাছে থাকে তবে খুন শিরে চাপবেই। তারা পাগলা হয়ে গেল। সমানে বর্শা ছুঁড়তে লাগল আমাকে লক্ষ্য করে। ব্যস, তাদেরই দু'-চারটে আমার গায়ে গেঁথে গেল। তবু আমার জান হয়ত টিকে যেত কিন্তু ঘোড়ার গতি বাগে আনতে পারলাম না। এক নাগাড়ে তিনদিন-তিনরাত্রি বাতাসের বেগে সে ছুটল। খোদাতাল্লার দোয়া না থাকলে এমনটি তো হতে পারে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাকাতটি এলিয়ে পড়ল। কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। জড়িয়ে জড়িয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করল— 'দোস্ত, আমার ডাক এসে গেছে। দুনিয়ার খেল খতম। দিল্ চাইছিল তোমার সর্দারের সঙ্গে একবার ভেট করি। সে আর হবার নয়। আমার দেহটা গোর দিতে ভুলো না যেন। আর আমার জান এ-ঘোড়াটিকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। একে আমি অল-কাতুল-অল মাজনুন নামে ডাকি। কথাটি শেষ করেই সে আদমি দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তের পথে যাত্রা করল। তারা দু'জনে মিলে মাটি খুঁড়ে তাকে গোর দিল।

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলতে না বলতে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

বাদশাহ শারিয়ার পরের রজনীতে অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার অবশিষ্টাংশ শুরু করলেন।

ডাকাতটির মৃতদেহ গোর দেওয়ার কাজ মিটল। এবার ডাকাত সাব্বা কানমাকানাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিজে ক্রীতদাসের মত তার পিছন পিছন পয়দল চল্‌ল। পাহাড়ের পাদদেশে ঘোড়া থামাল। খানাপিনা সারা দরকার। কিন্তু কোথায় খানা? উপায়ান্তর না দেখে বর্শা চালিয়ে একটি হরিণ শিকার করল। তার গোস্ত পুড়িয়ে উভয়ে পেটের জ্বালা নিভাল।

আবার তারা পথে নামল। পথে তিনজন সৈনিকের মুখোমুখি হতে হ'ল তাদের। বাধল লড়াই। কানমাকানা বল্‌ল—'তুমি দাঁড়িয়ে মজা দেখ। আমি একাই জানোয়ার তিনটিকে খতম করতে পারব। আমার গায়ে সুলতানের খুন বইছে। আমি সুলতান উমর অল-নুমান-এর নাতি।' কথা বলতে বলতে সে সৈনিক তিনজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনায়াসেই তাদের ঘায়েল করে সাব্বা-র কাছে ফিরে এল।

সাব্বা তার পিঠ চাপড়ে বল্‌ল—'সাবাস দোস্ত! শাহজাদার মত কাজই করেছ বটে! তোমার কব্জির জোর আমাকে অবাক করেছে।'

আবার ঘোড়া এগিয়ে চল্‌ল। আগের মতই ঘোড়ার পিঠে কানমাকানা আর পয়দল চলছে ডাকাত সাব্বা।

নিগ্রো লেড়কির কিস্‌সা

পথ চলতে চলতে এক নিগ্রো লেড়কির সঙ্গে কানমাকানা ও সাব্বার ভেট হয়। আলাপ পরিচয় হয়। সে মরু অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মরুবাসীদের কিস্‌সা শুনিয়ে পেট চালায়। এ-ই তার জান বাঁচাবার ফিকির। কানমাকানা বল্‌ল—'আজ রাত্রিটুকু আমাদের সঙ্গেই কাটাবে। আপত্তি আছে? তুমি কিস্‌সা বলবে, আমরা শুনব, রাজী তো?'

—'আমার তো এ-ই ধান্দা বাবু সাব। আপত্তির কি আর থাকতে পারে!'

একটি ঝাঁকড়া বাদাম গাছের তলায় সাব্বা তাঁবু খাটাল। হরিণের পোড়া গোস্ত দিয়ে খানাপিনা সারল তিনজনে। তাঁবুর সামনে নরম ঘাসের বিছানায় তিনজন বসল। কানমাকানা বল্‌ল—'কই গো, কিস্‌সা শুরু কর।'

নিগ্রো লেড়কিটি একটু নড়ে চড়ে জুঁত হয়ে বসে তার কিস্‌সা শুরু করল—'এক চরস খোরের কিস্‌সা শুরু করছি। এক ফেরেবাজ নওজোয়ান ছিল। তার নেশা একটিই—কুমারী লেড়কির দেহ সম্ভোগ করে বেড়ানো। তার খপ্পরে একবার পড়লে কোন কুমারীরই আর ইজ্জত বাঁচানো সম্ভব হ'ত না। আমীর বাদশাহের মত অর্থও ছিল তার। যাকে বলে একেবারে দিনারের পাহাড়ের মালিক। নিত্য-নতুন কুমারী লেড়কি জোগাড় করার হিম্মতও ছিল তার। দিনের পর দিন জনানার দেহ সম্ভোগের মধ্য দিয়ে একদিন তার মনে বিতৃষ্ণা দেখা দিল। ভাবল, দেহ আলাদা আলাদা বটে। কিন্তু জিনিস তো একই। কত আর রোচে! দিনের পর দিন দলন, পেষণ, চুম্বন আর সম্ভোগে বিতৃষ্ণা তো আসতেই পারে। কার্যতঃ হ'লও তা-ই। আবার এদিকে অর্থও ফুরিয়ে এল। নতুন ফিকির করবে কি দিয়ে?

লেড়কাটি নিঃস্ব হয়ে দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগল। কোর্তা-পাৎলুন জোগাড় করার মতও ফিকির নেই। পোশাক ফেঁসে গেছে। কিনবে কি দিয়ে? খানাপিনাও জোটে না। ভিখ মেঙ্গে দিন গুজরান করে। একদিন বাজারের পথে পথে ভিখ মেঙ্গে বেড়াবার সময় তার পায়ে এক পেরেক গেঁথে যায়। বহুৎ খুন ঝরল। বহুৎ কোশিস করল, খুন বন্ধ করতে পারল না।

কয়েক পা গিয়ে এক হামামে ঢুকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পা-টিকে আচ্ছা করে ধুয়ে নিল। তখন তার নজরে পড়ল এক আদমি অন্য এক পৈঠায় বসে মৌজ করে কি যেন চিবোচ্ছে। কৌতূহল হ'ল।

তাকে জিজ্ঞাসা করল—'কি খাচ্ছ গা?'

সে আদমি জবাব দিল—'হাসিস। খাবে? দিল চাইলে বল, দিতে পারি।'

—'দাও একটু, খাবো। খেয়ে দেখি তোমার হাসিস কেমন নেশা ধরাতে পারে।'

সে আদমিটি ফিক্ করে হেসে মুখ থেকে সামান্য হাসিস বের করে নওজোয়ানটির হাতে দিয়ে বল্‌ল—'চিবোও। দুনিয়াকে ভুলে থাকার এমন দাওয়াই আর হয় না।'

নওজোয়ানটি দ্বিধা না করে হাসিসটুকু মুখে ছুঁড়ে দিয়ে ঘন ঘন চিবোতে লাগল। অভ্যাস নেই। আগে কোনদিন হাসিস চোখেও দেখে নি। ফলে বার কয়েক চিবোতেই বেমালুম নেশার শিকার হয়ে পড়ল। ফিক্ ফিক্ করে হাসতে শুরু করল। হামামে যারা গোসল করতে এল তারা তাকে দেখে পাগল ঠাওরাল।

কিছুক্ষণ হাসাহাসির পর সে পাথরের মেঝের ওপর সটান শুয়ে পড়ল। এবার হাসি থেকে শুরু হ'ল প্রলাপ বকা। তার সে প্রলাপ থেকেই আজকের এ-কিস্‌সার সূত্রপাত।

এবার তাকে দুটো নিগ্রো জাপটে ধরল। উলঙ্গ করে ফেল্‌ল। পিঠমোড়া করে বেঁধে হামামের এক ধারে মেঝের ওপর ফেলে দিল। তারপর ইয়া বড় বড় খোসা আর সাজিমাটি দিয়ে ঘষে ঘষে তার গায়ের ময়লা তুল্‌ল। পানি ঢেলে ঢেলে গোসল করাল। একেবারে সাফসুতরা এক নওজোয়ান হয়ে গেল সে।

এমন সময় অন্য আর এক নিগ্রো এসে বল্‌ল—'জলদি কর, সময় হয়ে গেছে। এবার একে পাত্রীর ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

নওজোয়ানটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। চোখ দু'টি কপালে তুলে বল্‌ল—'পাত্রীর? কিসের পাত্রীর? কার পাত্রী? আমি তো আজ পর্যন্ত শাদীই করি নি।'

—'হুজুরকে কি কেউ হাসিস খাইয়ে দিয়েছে? নইলে এমন প্রলাপ বকছেন কেন? আর দেরী করা ঠিক হবে না, ওদিকে হয়ত অপেক্ষা করে করে আপনার পাত্রীর কলিজাটি দরকচা মেরে গেছে।'

এবার কালো বোরখা পরিয়ে তাকে বিশাল এক মকানের শোবার কামরায় নিয়ে গেল। সুসজ্জিত কামরা। তাকে কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে নিগ্রো দু' টি বিদায় নেয়। এবার মাঝ-বয়সী ইয়া লম্বা চওড়া নিগ্রো কামরায় এল। খানসামা। এক গ্লাস গুলাব পানির সরবৎ তার হাতে। বল্‌ল—'জাঁহাপনা, বান্দা হাজির। আপনার সরবৎ। আর কি হুকুম, বলুন?'

—'জাঁহাপনা'! কথাটি উচ্চারণ করেই নওজোয়ানটি ফিক্ করে হেসে দেয়। আপন মনে ব'লে উঠল—'এখানে সবাই দেখছি, হাসিস খেয়ে বুঁদ হয়ে রয়েছে। নইলে আমাকে 'জাঁহাপনা' সম্বোধন করতে যাবে কেন? যত্তসব নেশাখোরের দল! এক কাজ কর। তোমাদের গুলাব পানির সরবৎ আমার পেট সহ্য করতে পারবে না। তার চেয়ে বরং একটি ইয়া বড় তরমুজ কেটে আমার সামনে ফেল, দেখবে কেমন গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করি।'

খানসামাটি করলও তা-ই। ইয়া ঢাউস একটি তরমুজ এনে ধপ্ করে তার সামনে রাখল। ছুরির ফলা ঢুকিয়ে টুকরো টুকরো করল।

নওজোয়ানটি বল্‌ল—'ভাইয়া, তরমুজে রস তো দেখি পুরোদস্তুরই রয়েছে। এবার একটি ডাঁশা—মানে বেশ রসটস আছে এমন একটি লেড়কি জোগাড় করে নিয়ে এসো তো দেখি কেমন পার। লেড়কির রস আর তরমুজের রস মিশে যে সাগর সৃষ্টি করবে তাতে ডুব দেওয়ার যে কি শান্তি-তৃপ্তি তা ভাষায় বুঝানো যাবে না।'

ব্যস, খানসামা এবার তার হুকুম তামিল করতে ছুটল। এক উদ্ভিন্না যৌবনাকে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরল। খানসামা বিদায় নিল। নওজোয়ানটি লেড়কিটিকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে কোলের ওপর বসিয়ে নিল।

এমন সময় পিঠে ঠাণ্ডা মালুম হচ্ছে অনুমান করে সে পাথরের মেঝের ওপর উঠে বসল।

চোখ মেলে তাকিয়েই দেখতে পেল। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে এক দল আদমি। সবার চোখেই কৌতূহলের ছাপ। নওজোয়ান অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত চোখে-মুখে হতাশার ছাপ এঁকে বল্‌ল—'কোথায়? লেড়কিটিকে গায়েব করে তোমরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল?'

প্রায় শ' খানেক আদমি সমস্বরে হেসে ওঠে।

নওজোয়ানটি সবার হাসাহাসি দেখে ঘাবড়ে যায়। ভাবে, এ কী তাজ্জব ব্যাপার! সবাই হাসছে—হাসিস খেয়ে এরা বুঁদ হয়ে রয়েছে নাকি? নইলে এমন কোন হাসির ব্যাপার তো ঘটে নি।'

ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা আদমিগুলো বল্‌ল—'কি হে ডাঁশা লেড়কির মোহ তোমার এখনও কাটে নি দেখছি! বাদশা, উজির, নাদির সেজে খুব তো কচিকাচা লেড়কি নিয়ে মজা লুঠলে। শখ মেটেনি এখনও? খুব হয়েছে, এবার চুপ মার দেখি।'

নিগ্রো লেড়কিটির কিস্‌সা শুনে কানমাকানা তো হেসে দম বন্ধ হয়ে মরার জোগাড়। হাসি থামিয়ে এক সময় বল্‌ল—'ভারী মজার কিস্‌সা ফেঁদেছ তো!'

—'কিস্‌সা বলাই তো আমার কাজ গো। গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঢুঁড়ে কিস্‌সা বলে পেটের জোগাড় করি।'

—'তুমি আর একটি মজাদার কিস্‌সা শোনাও। তোমাকে খুশী করে দেব, কথা দিচ্ছি।'

নিগ্রো লেড়কিটি আর একটি কিস্‌সা শুরু করতে যাবে, অমনি তাদের সামনে এক ঘোড়সওয়ার এসে ঘোড়া দাঁড় করাল।

কানমাকানা ঝট করে কোমর থেকে তরবারি টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঘোড়সওয়ারটি বল্‌ল—'আমি বাগদাদ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে এসেছি। উজির দানদান সৈন্য-সংগ্রহ করে বাগদাদ আক্রমণ করেন। আমাদের ভাবী সুলতান কানমাকানার পিসাকে তিনি মসনদ থেকে বলপূর্বক নামিয়ে দেন। এখন বাগদাদের মসনদ তাঁর দখলে। আমাদের শাহজাদা কানমাকানা বিবাগী হয়ে মুলুক ছেড়ে এসেছে। উজির দানদান-এর হুকুম, যেভাবেই হোক, যেখান থেকে হোক তাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে। তাকে মসনদে বসিয়ে তিনি দায়িত্ব শেষ করতে চান। আমরা দলবেঁধে চারদিকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি, কেউ যদি তার খোঁজ দেয় মেহেরবানি করে জানালে আমরা উপকৃত হ'ব।'

কানমাকানা এবার সাব্বার কানে কানে বলে—'দোস্ত, বাগদাদ থেকে ডাক এসেছে। চল, যাত্রা করা যাক।'

কানমাকানা অনুচ্চ কণ্ঠে কথাটি বল্‌লেও কানমাকানার কথা শুনতে পায়। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না, সে এতক্ষণ তার বাঞ্ছিত কিশোর কানমাকানা-র সঙ্গেই কথা বলেছে।

কানমাকানা এবার দস্যু সাব্বা আর তার নিগ্রো লেড়কিটিকে নিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হ'ল। কান-মাকানা সে-পক্ষীরাজ কাতুল-এর পিঠে চেপে যাত্রা করল।

কানমাকানা প্রাসাদে ঢুকেই সবার আগে তার আম্মার কামরায় ছুটে যায়। চোখের পানি ফেলে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—'কতদিন পর তোমাকে দেখলাম। যখন, যেখানে ছিলাম কেবল তোমার কথা ভেবেছি। তোমার কানমাকানা আবার তোমার কাছেই ফিরে এসেছে।'

তার আম্মাও তাকে বহুভাবে আদর-সোহাগ করতে থাকে।

কানমাকানা এবার তার আম্মার সঙ্গে নুজাৎ-এর কামরায় আসে। বিষাদের প্রতিমূর্তির মত নসীবা ও তার আম্মা পালঙ্কের এক কোণে বসে হতাশ দৃষ্টি মেলে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। নিষ্পলক তাদের চাহনি।

নসীবা এবার তার বিশাদক্লিষ্ট মুখটিকে জানালার দিকে ফেরায়। বাইরের নীল আকাশের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

কানমাকানা আর দেরী করল না। সে রাত্রেই নসীবাকে শাদী করে কাছে টেনে নিল।

বাসর ঘরে কানমাকানা তার সদ্য শাদী করা বেগমকে বুকে টেনে নিয়ে সোহাগ করে বল্‌ল—'পেয়ারী, মেহবুবা, আমার অদর্শনে তোমার কলিজাটি ছটফট করে নি?'

—'কেন? তোমার কথা ভাবতে যাব কেন, শুনি? তুমি মুলুক ছেড়ে যাবার সময় আমার কথা একবারও কি ভেবেছিলে, নাকি দেখা করে গিয়েছিলে?' অভিমান ভরে নসীবা কথাটি ছুঁড়ে দেয়। এবার বল্‌ল—'বেশ তো এ মুলুক-সেমুলুক ঢুঁড়ে বেড়িয়ে এলে। আমার কথা ভেবে তোমার দিল্ কি এক মুহূর্তের জন্যও আকুল হয়েছিল?'

—'কি যে বল পেয়ারী! হায় খোদা! আমার সম্বন্ধে এরকম ধারণা তুমি করতে পারলে! ভাল কথা, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে সাব্বাকে জিজ্ঞাসা করলেই তোমার মনের ধন্দ দূর হয়ে যাবে।'

—'সাব্বা? কে সাব্বা? কোথায় থাকে?'

—'এক পরদেশী, আমার দোস্ত। সে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত।'

—'ডাকাত!' সচকিত হয়ে নসীবা কানমাকানা'কে জড়িয়ে ধরে। চোখ বড় বড় করে বলে—'ডাকাত? তুমি শেষ পর্যন্ত ডাকাতের দলে গিয়ে নাম লিখিয়েছিলে?'

—'দূর! ডাকাতের দলের কথা কে তোমাকে বলেছে? একজন মাত্র ডাকাত। বাদাবী ডাকাত। সে-ই তো আমার দুঃসময়ে নিজের জান কবুল করে আমার জান রক্ষা করে। আমার সঙ্গেই এখানে এসেছে। তাকে আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছি। আমার তামাম সুলতানিয়াতে খুঁজলে তার মত শক্তিশালী, নির্ভীক ও বিশ্বাসী একজনকেও মিলবে না।'

বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর প্রভাত হয়ে আসে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

জানোয়ার ও পক্ষীর কিস্‌সা

একশ' ছত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কক্ষে এলেন। বেগম শাহরাজাদ এবার জানোয়ার ও পক্ষীর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে এক ময়ূর দম্পতি এক সমুদ্রের ধারে, জঙ্গলে বাসা বেঁধে বাস করত। ময়ূরী খোসমেজাজে পাখা মেলে নেচে বেড়াত, আর ময়ূরটি নৃত্য পটিয়সী ময়ূরীর নৃত্য উপভোগ করে পুলক লাভ করত। তারা দিনের আলোয় জোড়বেঁধে খানার তল্লাশে এখানে-সেখানে টুঁড়ে বেড়াত। দিনের শেষে ফিরে আসত তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় স্থল এক গাছের কোটরে। এভাবে মহানন্দে তারা দিন গুজরান করছিল।

একদিন গাছের কোটরে বসে ময়ূর-ময়ূরী খোশ মেজাজে গল্প করছিল। গল্পের ফাঁকে ময়ূরটি ময়ূরীকে বল্‌ল—'ধুৎ, এভাবে দিনের পর দিন একই জায়গায় চক্কর মারতে আর দিল চায় না। তার চেয়ে বরং চল কোন দূরের মুলুক থেকে বেড়িয়ে আসি গে। নতুন নতুন বন, গাছগাছালি, পাহাড়, ঝরণা আর কত কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে—ভালই লাগবে।'

ময়ূরী সোল্লাসে বল্‌ল—'খুব ভাল প্রস্তাব। চল তবে শুভ দিন দেখে দু'জনে বেরিয়ে পড়ি।'

যে-কথা সেই কাজ। একটি দিনও নষ্ট করতে তারা নারাজ। সেদিনই বিকাল পড়তে না পড়তে ময়ূর-ময়ূরী আকাশে পাখা মেল্‌ল। তারা হারা উদ্দেশ্যে উড়তে উড়তে সমুদ্র পেরিয়ে এক ছোট্ট দ্বীপে হাজির হ'ল। কত জানা-অজানা গাছপালা, রঙ বে-রঙের কতসব ফুল আর ফলের বিচিত্র সমারোহ যা দেখে ময়ূর

দম্পতির দিল আনন্দে নাচানাচি শুরু ক'রে দিল। তারা সাধ মিটিয়ে গাছের সুমিষ্টফল খেল, ঝরণার পানি দিয়ে তৃষ্ণা মিটাল। নতুন পরিবেশ, নতুন নতুন ফলের অফুরান সমারোহ দেখে ময়ূরী তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড়, ময়ূরটির মধ্যেও কম আনন্দের সঞ্চার ঘটল না।

প্রথম দিনটি ময়ূর দম্পতি মহানন্দেই কাটাল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতেই এক রাজহাঁস অতর্কিতে তাদের সামনে উপস্থিত হ'ল। মুখে বিষাদের ছাপ, চোখ দুটো দিয়ে পানি ঝরছে। সে কাঁদতে কাঁদতে ময়ূর দম্পতিকে বল্‌ল—'বাঁচাও! আমার জান বাঁচাও!'

ময়ূরটি বল্‌ল—'ভাইয়া শান্ত হও। চোখের পানি মোছ। কোন ডর নেই। আমরা তো আছি। মাথা ঠাণ্ডা করে বল তো ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার?'

রাজহাঁসটি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্‌ল—'ভাইজান, আদমকিন।'

—'আল্লাহ তো ওপরে রয়েছেন রক্ষা করবেন। কিন্তু বুঝতে পারছি না। সমুদ্রের মধ্যে এমন একটি দ্বীপে আদমকিন কি করেই বা এল? তাজ্জব ব্যাপার দেখছি!'

—'হ্যাঁ, আদমকিনই বটে। আদমকিনের কবল থেকে আমাকে বাঁচাও।'

—'বলেছিই তো আমরা জান কবুল করে হলেও তোমার জান রক্ষা করব। কিন্তু এমন এক তাজ্জব ব্যাপার বিশ্বাস যে করতে উৎসাহ পাচ্ছি নে। আমি জানি আদমকিন আশমানে উড়তে পারে না, সাঁতারও কাটতে জানে না। তবে এমন এক দ্বীপে তার পক্ষে কি করে আসা সম্ভব হ'ল? ভাল কথা, তুমি এখানে কতদিন আছ, বল তো?'

—'এক্কেবারে শৈশব—যখন গুঁড়াবাচ্চা ছিলাম, তখন থেকে আমি এ দ্বীপে বাস করছি। কিন্তু এতদিন আদমকিন তো দূরের কথা কেউ-ই আমার দিলে আতঙ্কের সঞ্চার করতে পারে নি। গতরাত্রে আমি আস্তানায় নিদ যাচ্ছিলাম। মাঝ রাত্রে খোয়াব দেখলাম এক আদমকিন আমার শিয়রে বসে বলছে—'এই যে রাজহাঁসের পো, তোমাকে তো খুবই নাদুস নুদুসই দেখা যাচ্ছে! শরীরে গোস্তও আছে বহুৎ খুব। আর খিদেতে আমার পেটে দাউ দাউ করে আগ জ্বলছে! তার মূলোর মত ইয়া বড় বড় দাঁত, ভাঁটার দুটো চোখ দেখে আমার কলিজাটি শুকিয়ে এক্কেবারে কাঠ হয়ে গেল। তাদের গায়ে গতরে অসীম তাগত। হাতীর চেয়ে বেশী তাগতের অধিকারী। তারা বুনো হাতীর সঙ্গে লড়াই করে সহজেই তাদের কাবু করে দেয়।'

ব্যস, আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়তে শুরু করলাম। আদমকিন কিন্তু

থেমে গেল না। আমার পিছু নিল। এক পাহাড়ের গুহায় এসে কোনরকমে আব্বার দেওয়া জান বাঁচালাম। পেটে কিল মেরে গুহার মধ্যেই কাটাতে লাগলাম। খানাপানি জোটে না। বাইরে বেরিয়ে খানা ও পানির পাত্তা লাগাব এমন সাহস আমার নেই। এক সময় পানি বিনা তেষ্টায় আমার কলিজা শুকিয়ে গেল। আমি অস্থির ভাবে চোখের মণি দুটো বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে গুহার এক কোণে অতিকায় এক সিংহকে লেজ নাড়তে দেখলাম। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। তবে জিভ দিয়ে লালা গড়াচ্ছিল কিনা ঠিক দেখতে পাই নি। লক্ষ্য করার মত দিল্‌ও আমার ছিল না। আমি তো তাকে সবে দেখলাম। সে কিন্তু অনেক আগে থেকেই আমার ওপর নজর রেখে চলছিল।

পশুরাজকে দেখে তো আমার মধ্যে নতুন করে ভয়ের সঞ্চার হ'ল।

আমি হাঁটু দুটোকে যতই শক্ত করে সোজাভাবে দাঁড়াতেচেষ্টা করি ততই যেন কাঁপাকাঁপি শুরু করে দিল।

পশুরাজের মুখে মৃদু মৃদু হাসি। সে মিষ্টি-মধুর স্বরে আমাকে বল্‌ল—'বেটা, এমন বিষণ্ণ মুখে কেন? খুব ডর লেগেছে বুঝি? আয় বেটা, কাছে আয়। কি হয়েছে, কিসের ডর শুনি?'

তার আশ্বাস পেয়ে আমি কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে পেলাম। পায়ে পায়ে তার দিকে সামান্য এগিয়ে যাই।

পশুরাজ মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই এবার বল্‌ল—'বেটা, তোর নাম কি? কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত?'

—'রাজহাঁস। পক্ষি।'

—'বহুৎ আচ্ছা! এবার বল তো বেটা, তোর কিসের ডর? কেউ তোর পিছু নিয়েছে কি?'

আমি তাকে আমার খোয়াবের কথা বল্‌লাম।

—'তাজ্জব কি বাৎ! কয়েক দিন আগে আমিও ঠিক এরকমই এক খোয়াব দেখেছিলাম বটে। আমি পরে আব্বাজানকে বল্‌লাম। তিনি শুনে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লেন—'আদমকিনরা বহুৎ বদমায়েশ, শয়তান। তাদের মগজে চট করে শয়তানী বুদ্ধি বানিয়ে নিতে পারে। পিছন থেকে কখন, কিভাবে সে এসে জান নিয়ে নেবে ঠাহরও করতে পারবে না।'

পশুরাজের কথায় আমার কলিজায় যৎ-সামান্য যে জল ছিল তা নিঃশেষে উবে গেল। বার কয়েক ঢোক গিলে বল্‌লাম—'তবে জান বাঁচাবার ফিকির কি করা যাবে? এমন একটি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির জানোয়ার নিয়ে এ-বনে বসবাস কি করে সম্ভব?'

সিংহমশাই, তুমি তো এ-বনের রাজা। সর্বেসর্বা। সামান্য একটি আদমকিন তোমার ওপর দিয়ে হুমকী চালাবে আর তুমি কিনা তা বরদাস্ত করবে, মুখ বুজে হজম করবে! অন্য জানোয়াররা শুনলে যে তোমার অপযশ গাইবে। তোমার দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে পানি খায়। মেঘের মত একবারটি গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার ছাড় তো দেখবে আদমকিনের চৌদ্দ পুরুষ কেমন কাঁপাকাঁপি শুরু করে দেয়। আমরা তো তোমার প্রজা। আমাদের জান জিন্দা রাখার সার্বিক দায়িত্ব তোমার, অস্বীকার করতে পারবে না। অতএব কিভাবে আমাদের রক্ষা করা যায় কিছু একটি ফিকির তো বের কর।'

—'আলবাৎ! আমি কিছুতেই আদমকিনের বেয়াদপি বরদাস্ত করব না। আমার সঙ্গে একবারটি চল তো নচ্ছারটির দফা রফা করে দিয়ে আসি। আমার রাজত্বে এমন সব শয়তানের জায়গা নেই।'

এ কথা বলে পশুরাজ আমাকে নিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বীরদর্পে এগিয়ে চল্‌ল। সে রাগের চোটে লেজটিকে এত জোরে জোরে দোলাতে লাগল যে, তার পিছন পিছন চলা আমার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই সামনে ধুলোয় অন্ধকার এক জায়গার কাছাকাছি আমরা হাজির হলাম। ধুলোর ঝড়টি যেন আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। একটু বাদেই বুঝলাম, একটি গাধা উদ্ভ্রান্তের মত এগোচ্ছে। পশুরাজ তো তার রকম সকম দেখে রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা। গর্জে উঠল—'হেই ছোকরা, এমন বেয়াদপি করছিস কেন? কে তুই? কি নাম? কোন্ জাতের জানোয়ার বল তো?'

—'জাঁহাপনা, আমাকে গাধা বলেই সবাই জানে। আমি জাতেও গাধা। আদমকিন-এর ডরে আব্বার দেয়া জান বাঁচাবার তাগিদে এমন হন্যে হয়ে ছুটে পালাচ্ছি।'

—'নিলর্জ্জ কাঁহাকার! শরম লাগল না কথাটি কইতে? ইয়া তাগড়া চেহারা তোর। আর তুই কিনা সামান্য এক আদমকিনের ডরে জান নিয়ে ভাগছিস!'

বার দু'-তিন ঢোক গিলে গাধাটি ফ্যাকাসে-বিবর্ণমুখে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আদমকিনের সঙ্গে আপনার বোধ হয় জান পরিচয় নেই। নইলে এমন তাগদদার আর হিংস্র জানোয়ারটির কথা এমন হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন না। এমন ছলাকলা করে আপনাকে ফাঁদে ফেলবে আগে তিলমাত্র টের পাবেন না। জংপড়া একটি লোহার আঁকশি দিয়ে আমার জিভটিকে কেমন ফালাফালা করে দিয়েছে, দেখুন।'

সত্যি বেচারার জিভ দিয়ে তখন তিরতির করে খুন ঝরছে দেখলাম। গাধাটি কাঁদো কাঁদো স্বরে এবার বল্‌ল—'বিশ্বাস করবেন না জাঁহাপনা, সপাং সপাং করে এমন জোরে চাবুক হাঁকতে লাগল যা শুনেই আমার কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে আমি বলছি, আমি সাচ্চা গাধার লেড়কা। আমার

আব্বা আর আম্মার নাম ধরে এমন সব খিস্তি খেউড় করতে লাগল যা মুখে আপনার দরবারে পেশ করা খুবই কষ্টকর। আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। এক লাফে এক টিলা থেকে অন্য টিলায় যেতে গিয়ে আচমকা পিছনের পা দিয়ে শয়তানটিকে মারলাম এক চাঁড়। সে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল এক খাদে। ব্যস, সে মওকায় আমি লম্বা দিলাম।'

পশুরাজ সিংহ জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'ভাল কথা। কিন্তু এখন দৌড়বার কি আছে।'

চোখ দুটো কপালে তুলে গাধাটি এবার বল্‌ল—'বলছেন কী জাঁহাপনা! শয়তানটি বলছে আমাকে ভিস্তিওয়ালার কাছে বেচে দেবে। আমার পিঠে জলের বোঝা—আঃ! আর ভাবতে পারছি না! জান খতম করে দেবে। এ বুড়ো হাড় এত ধকল কি আর সইতে পারবে! আদমকিন-এর মত শয়তান তামাম দুনিয়া টুঁড়েও আর একটি মিলবে না। ধরতে পারলে নির্ঘাৎ জান খতম করে দেবে।'

গাধাকে পেয়ে আমি যেন আর একটু জোর পেলাম। করজোড়ে বল্‌লাম—'জাঁহাপনা, জানোয়ারটি কি সাঙ্ঘাতিক পাজি, আশা করি এবার মালুম হচ্ছে? গাধার মত জানোয়ার যদি এমন পৌনে মরা হয়ে যায় তবে তো আমাকে টুপ্ করে গিলেই ফেলবে।'

গাধাটি পালাবার উপক্রম করলে পশুরাজ থাবা বাড়িয়ে তার লেজটি ধরে ফেলে বল্‌ল—'কতদিন আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। তার চেয়ে আমার সঙ্গে চল, শয়তান আদমকিন-এর আস্তানাটি যদি খুঁজে পাই।'

আরে ব্ব্যাস, খোদাতাল্লার দোহাই জাঁহাপনা, আপনি আমাকে অন্ততঃ এরকম হুকুম করবেন না। শুনেই আমার কলিজাটি হরদম ডিগবাজি খাচ্ছে। আমি দৌড়ে কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আগে তো জান বাঁচাই তারপর অন্য—'

গাধাটির কথা শেষ হতে না হতেই অন্য একটি জানোয়ারকে আমাদের দিকে আসতে দেখা গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সে আমাদের কাছে এল। মুখ দিয়ে তার ফেনা ঝরছে।

পশুরাজের প্রশ্নের উত্তরে জানোয়ারটি তার নাম বল্‌ল—অশ্ব।

সে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আদমকিন-এর দৌরাত্মে অতিষ্ট হয়ে আমি জান নিয়ে ভাগছি।'

পশুরাজ সিংহ গর্জে ওঠে—'ভাগছ! জান নিয়ে ভাগছ! ইয়া তাগড়াই তোমার চেহারা। আর কী তোমার বিক্রম। আর তুমি কিনা সামান্য আদমকিন-এর ডরে ভাগছ! তোমার শরম হওয়া উচিত। তুমি পা দিয়ে একটি ঝাঁপটা দিলে পাহাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠতে পারে। আর আমার তো তোমার মত জাদরেল চেহারা না তা

সত্ত্বেও আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তার গোস্ত দিয়ে নাস্তা সারব বলে। তাকে খতম করে দুনিয়া থেকে সরাতে না পারলে প্রজাদের কাছে যে আমার ইজ্জৎ ঢিলা হয়ে যাবে। আর তারা আমার আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে।'

পথশ্রমে ক্লান্ত ঘোড়াটি ঘাসে মুখের ফেনা মুছে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, নক্করবাজ শয়তান আদমকিন-এর ফন্দি ফিকির ধরতে পারে এরকম জানোয়ার আপনার রাজ্যে কেউ-ই নেই। বেটা একেবারে হাড়ে হাড়ে বজ্জাৎ! একবার ছলাকলা করে আমার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে কি নাজেহালই না করেছিল! দড়ির বিপরীত দিকটি একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ইয়া বড় বড় দাঁতগুলো বের করে বিশ্রী কায়দায় ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে। একদিকে রাগে আমার গা পিত্তি জ্বলে যেতে লাগল। ভয়ে আমার কলিজা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। তারপর বাঁধন ফেলে তড়াক্ করে লাফিয়ে আমার পিঠে চাবুক কষাতে লাগল। অঙ্কুশ লাগানো চাবুক। ফলে পেট ও পিঠের বহু জায়গায় কেটে গিয়ে খুন ঝরতে লাগল। তবু চাবুক থামাল না। তারপর প্রায় আধমরা করে এক কলুর কাছে আমাকে বেচে দেয়। কলু আমাকে দিয়ে ঘানি টানিয়ে দাম উসুল করতে মেতে গেল। শেষ পর্যন্ত একদিন খোদাতাল্লার নাম নিয়ে নচ্ছার কলুটিকে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঃশেষে নিয়োগ করে ঝাড়লাম এক লাথি। জাঁহাপনা, আমার কথা মানুন, বজ্জাৎটির থেকে নিজেকে দূরে রেখে বাপের দেয়া জানটিকে রক্ষা করুন। মেহেরবানি করে পালান এখান থেকে।

পশুরাজ ঘোড়াটির কথায় বিতৃষ্ণায় দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে। যত্তসব ভীরু কাপুরুষের দল জুটেছে। তোমরা দেখে নিও

আদমকিনকে আমি খতম করবই করব। তোমরা শুধু আমার সঙ্গে গিয়ে তার ডেরাটি একবার দেখিয়ে দাও। তারপর কি করে তাকে টিট করি তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে।'

এবার বিরাট কুঁজ নাচিয়ে, গলা দুলিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে একটি উট এসে পশুরাজের সামনে দাঁড়াল। তার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপছে। সিংহ চোখে-মুখে বিদ্রূপের ছাপ এঁকে বল্‌ল—'কি হে, শয়তান আদমকিন-এর ডরে তোমাদেরও হাত-পা পেটে সিঁধিয়ে যাচ্ছে নাকি?'

—'জাঁহাপনা, আমার দুরবস্থার কথাটি একবারটি বিবেচনা করে দেখুন। নাকটির দিকে তাকিয়ে দেখুন হতচ্ছাড়া আদমকিন আমার নাক ফুঁটো করে মোটা একটি রশি বেঁধে দিয়েছে। আর পিঠে করে ইয়া পেল্লাই পাথরের চাঁই চাপিয়ে দিয়েছে। একটু বেগড়বাই করলেই পিঠে ঘন ঘন অঙ্কুশের ঘা মেরে মেরে আমার পিঠটিকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। তারপর বে-গতিক দেখে দিল আমাকে এক কষাইয়ের কাছে বেচে। আমার আব্বারই কেবল নয় চৌদ্দ পুরুষের নসীব ভাল যে, হতচ্ছাড়া কষাইটিকে লাথিগুতো মেরে কোনরকমে ভেগে আসতে পেরেছি।'

পশুরাজ এবার তড়পাতে লাগল—'শয়তান আদমকিন কোথায় আছে তোমরা একবারটি আমাকে দেখিয়ে দাও। আমি তার হাড্ডি আর গোস্ত আলাদা আলাদা করে ছাড়ব।'

—'জাঁহাপনা, তার দুরবস্থা নিজের চোখে দেখার কিছুমাত্র উৎসাহ-আগ্রহও আমার নেই। আমাকে ছেড়ে দিন, পালাই। জিন্দেগীভর আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব তবু শয়তান আদমকিন-এর ধারে কাছে আমাকে যেতে বল্‌বেন না। কথা বলতে বেচারি উটটি গোদা গোদা পায়ে থপ্‌থপ্ শব্দ করে পালাতে লাগল।'

পশুরাজ সিংহ হতাশ দৃষ্টিতে দাঁত কিড়মিড় করে উটটির ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় এক বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ লাঠি ভর দিয়ে কোনরকমে পশুরাজের সামনে এসে দাঁড়াল। করজোড়ে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আমি একজন ছুতোর মিস্ত্রী। বনে বনে কাঠ কেটে গুঁড়া বাচ্চা নিয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করি। আপনি বনের বাদশাহ। একচ্ছত্র অধিপতি। আজ আমার জিন্দেগী বরবাদ করে দিল এক শয়তান। সবাই হতচ্ছাড়াটিকে আদমকিন বলে জানে। আপনিও হয়ত বজ্জাতটির নাম শুনে থাকবেন।'

—'তোমার কি ধরনের অনিষ্ট সে করেছে, বল তো?'

—'আমাকে শয়তানটি ছলাকলার মাধ্যমে খপ্পরে ফেলে উদয়াস্ত কাঠ কাটিয়ে নিচ্ছে। বদলে খানাপিনা বা ইনাম—কিচ্ছু আমাকে দেয় না। আজ আমি সুযোগ বুঝে কোনরকমে জান নিয়ে তার খপ্পর থেকে ভেগেছি।' এবার নিজের পিঠটি দেখিয়ে বল্‌ল—'চেয়ে দেখুন, চাবুক মেরে মেরে আমার পিঠ কেমন ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে!'

—'কিন্তু এরকম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে চল্‌লে কোথায়? আমার কাছেই এসেছ, নাকি অন্য কোথাও—'

পশুরাজের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ছুতোরটি বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার দরবারে আমার অভিযোগ পেশ করলাম। এবার আপনার আব্বাজীর উজির চিতাবাঘের কাছেও যাব।'

—'উজিরের কাছে? আমি যদি তোমার মুশকিল আসান করতে না পারি তবে উজির কি—'

—'না জাঁহাপনা, উজিরের কাছে যাব তেনারই তলব পেয়ে। আদমকিন-এর দৌরাত্মে তিনি নাকি রাতের পর রাত নির্ঘুম অবস্থায় কাটাচ্ছেন। আমাকে তলব দিয়েছেন, তেনার থাকার জন্য মজবুত করে একটি কামরা বানিয়ে দিতে।'

ছুতোর মিস্ত্রীর কথায় সিংহ তেলে বেগুনে চটে যায়। দাঁত কিড়মিড় করে বলে—'কী এত বড় স্পর্ধা! চিতাবাঘ তো তিনি সামান্য উজির মাত্র। আর আমি বনের বাদশাহ। আমার কামরা না বানিয়ে তুমি চলেছ তার জন্য কামরা বানাতে। বলিহারি আব্দার তো! আগে আমার জন্য খুব মজবুত করে একটি কামরা বানিয়ে দিয়ে তবে অন্যের কথা বিবেচনা করবে।'

—'জাঁহাপনা, খোদা মেহেরবান, উজির আগে আমাকে তলব করেছেন। মেহেরবানি করে গোস্‌সা করবেন না। আগে তাঁর কামরাটি কোনরকমে বানিয়ে দিয়ে এসেই কোমর বেঁধে লেগে যাব আপনার জন্য খুব মজবুত একটি কামরা বানাবার কাজে।' কথাটি কোনরকমে ছুঁড়ে দিয়েই বুড়ো ছুতোর মিস্ত্রীটি ছুটতে চেষ্টা করল। সিংহটি লেজ ছাড়ল না। দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌ল—'মামদোবাজি পেয়েছ নাকি। আগে আমার কামরা বানিয়ে দিয়ে তবে অন্য কথা।'

ছুতোর মিস্ত্রী দেখল, আদমকিন-এর হাত থেকে কোনরকমে জান বাঁচলেও শেষ পর্যন্ত পশুরাজের হাতেই তা যেতে বসেছে। সে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সিংহের জন্য একটি কামরা বানিয়ে ফেল্‌ল। সিংহ দাঁত কিড়মিড় করে বল্‌ল—'কী এক দায়সারা কাজ করলে হে! এতটুকু কামরায় আমাকে যে সর্বদা কুকুরকুণ্ডলি পাকিয়ে শুতে হবে।'

ছুতোর মিস্ত্রী বলল —'মেহেরবান, গোস্‌সা করবেন না। আসলে কাঠ তো কেটেছিলাম উজির নেকড়ের মাপে কামরা তৈরির জন্য। সে কাঠে আপনার জন্য কামরা—ছোট তো হবেই।

এমন সময় বুড়ো মিস্ত্রীর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল ছোট্ট একটি জানোয়ার—আদমকিন। একেবারে কদাকার চেহারা। বেটে খাটো কিন্তু মোটাসোটা। মুখটি কদর্য, নাক খ্যাঁদা ; চোখ দুটো শরীরের

তুলনায় খুবই বড়। জ্বলজ্বল করছে। যেন দুটো বড়সড় কাচের গুলিতে সরাসরি সূর্যের কিরণ পড়েছে। কুচকুচে কালো লোমে সারা শরীর ঢাকা।

বিশ্রী স্বরে হেসে আদমকিন বল্‌ল—'কি গো। নিজের ইয়া দশাসই চেহারার জন্য খুবই গর্বিত, তাই না? আমাকে চিনতে পারছ? পারলে না তো? আমি তোমার মোউৎ। তোমাকে দুনিয়া থেকে তাড়িয়ে আমি জঙ্গলের নবাব-বাদশা হ'ব। তামাম জঙ্গল আর পাহাড় শাসন করব। অবশ্য বেহেস্তে বা দোজখে যেখানে তোমার দিল চায় যেতে পার, আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি একটিই তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। মানে মানে যদি কেটে পড় তবে তো কথাই নেই। নইলে তোমাকে টিট করার, তোমার নক্কারবাজি বন্ধ করার দাওয়াই আমার ভালই জানা আছে। কেশরগুলো ধরে এমন এক হেঁচকা টান দেব যে, আছাড় খেয়ে জান খতম হয়ে যাবে।'

পশুরাজ চোখের পানি ফেলে, হাউমাউ করে কেঁদে বল্‌ল—'খোদাতাল্লার কসম। অপঘাতে আমার জান—'

আদমকিন ফিক্ করে হেসে উঠল—'জিন্দেগীভর বহুৎ সুখই তো করেছ। আর কেন। এবার তোমাকে জাহান্নামে—'কথাটি শেষ না করেই আদমকিন তার ছোট্ট থাবা দুটো দিয়ে বেচারি পশুরাজের কেশর ধরে এমন এক হেঁচকা টান দিল যে, চার-পাঁচ হাত দূরে গিয়ে পড়ল। দারুণভাবে গোঙাতে লাগল। ব্যস, হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল। পশুরাজের সে কী করুণ আর্তনাদ! মাটিতে পড়ে বার কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করে পশুরাজ চিরদিনের মত দুনিয়া ছেড়ে গেল। ব্যস, সব খতম।

আদমকিন যখন পশুরাজকে নিয়ে ব্যস্ত সেই সুযোগে কাঠ

মিস্ত্রী সেখান থেকে গুটি গুটি কেটে পড়ল।

আদমকিন সিংহের লাশটি তার সদ্য তৈরি খুপরিতে ঢুকিয়ে দিল। এবার শুকনো লতাপাতা জোগাড় করে দিল আগ ধরিয়ে। ব্যস, একদম খতম।

এমন সময় এক সকালে একটি জাহাজ এসে দ্বীপটিতে নোঙর করল। একদল শিকারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হুড়মুড় করে জাহাজ থেকে নেমে এল। শিকারীদের দেখে ময়ূর-ময়ূরী থেকে শুরু করে চিতা, হাতী প্রভৃতি সবাই যে, যেদিকে পারল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কিন্তু সমস্যায় পড়ল রাজহাঁসটি, সে না পারে ভাল উড়তে আর না পারে ভাল ছুটতে। ফলে শিকারীরা অনায়াসে তাকে ধরে ফেল্‌ল, ছাল ছাড়িয়ে গোস্ত বের করল। রসুইখানায় নিয়ে গিয়ে তেল-মসলা দিয়ে আচ্ছা করে পাকিয়ে সবাই মিলে ভাগজোক করে খেয়ে নিল।

শাহরাজাদ কিস্‌সা থামিয়ে একটু দম নিতে লাগলেন। বাদশাহ শারিয়ার বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, তোমার কিস্‌সা আমার দিল্ কেড়ে নিয়েছে—'

বাদশাহকে কথাটি শেষ করতে না দিয়ে বেগম শাহরাজাদ মুচকি হেসে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এর চেয়েও বহুৎ আচ্ছা কিস্‌সা আমার জানা আছে।'

নওজোয়ান মেষপালক ও লেড়কির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক নওজোয়ান মেষপালক ও লেড়কির কিস্‌সা আপনার দরবারে পেশ করছি।

এক পর্বতমালার ধারে এক নওজোয়ান মেষপালক কুটীর বেঁধে বাস করত। সে ছিল যথার্থই সৎ, সত্যনিষ্ঠ, মহাধার্মিক ও পরোপকারী। তামাম মুলুকের আদমি তার গুণগান করে। এমন কি বনের পশু-পাখিরাও সকাল-বিকাল তার চারিত্রিক গুণাবলীর কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে।

আল্লাহের কাছেও মেষপালকটির চারিত্রিক গুণাবলীর কথা পৌঁছে গেল। বহুবার তার সম্বন্ধে বহু কথা শুনে আল্লাহ বললেন, —'ব্যাপার কী!'

একদিন আল্লাহ তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়ার জন্য তৎপর হলেন। তামাম মুলুকের আদমিরা যা বলে তার কতটুকু সত্যি যাচাই করবেন তিনি। তাই এক সকালে বেহেস্তের এক হুরীকে পাঠিয়ে দিলেন নওজোয়ান মেষপালকটির কাছে।

মেষপালক তার কুটীরে শুয়ে। উঠি উঠি করেও তখন পর্যন্ত ওঠা হয়ে ওঠেনি। চোখ দুটো বন্ধ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে।

এমন সময় নাকে উগ্র খুসবু যাওয়ায় সবিস্ময়ে চোখ মেলে তাকাল। দেখল, এক লেড়কি দরজায় মনলোভা এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে।

মেষপালকটির চোখে বিস্ময়ের ছাপ। সে ভাবছে, এ কী বাস্তব, নাকি খোয়াব দেখছে! চোখ দুটো রগড়ে আবার তাকাল। একই দৃশ্য। লেড়কিটি হরদম হেসেই চলেছে।

মেষ পালকটি নিঃসন্দেহ হ'ল, খোয়াব টোয়াব নয়। একেবারে সাক্ষাৎ এক খুবসুরৎ লেড়কিই বটে। সে চোখে-মুখে অনুরূপ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্ল—'তুমি কে গো সুন্দরী? এখানে, আমার কাছে তোমার কি দরকার? কই, আমি তো তোমাকে তলব করি'নি? তবে কেন কষ্ট করে এসে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

লেড়কিটি তেমনি হাসতে হাসতে গিয়ে নওজোয়ান মেষপালকটির পাশে একেবারে গা-ঘেঁষে বসল। অভিমানের সুরে বল্ল—'তুমি যেন কেমন পুরুষ মানুষ। আমার ষোল বছরের রূপ-যৌবনের ডালি সাজিয়ে তোমার কাছে ছুটে এলাম। আর তুমি কিনা নিতান্ত নিস্পৃহের মত বেগুনবেচা মুখ করে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলে! তোমার কি ইয়েটিয়ে নেই নাকি? আমি ছুটে এসেছি, আমার যৌবনসুধা তোমাকে নিঃশেষে দান করে তৃপ্ত হতে আর সে সঙ্গে তোমাকে তৃপ্তি দিতে। আমাকে দলন, পেষণ, চুম্বন প্রভৃতি সহকারে সম্ভোগ কর মেহবুবা। আমি আর যৌবনের ভার বৃথা বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারছি না। আমার কলিজাটি জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে। এসো—কাছে এসো। আমাকে জাপ্টে ধর। দলে পিষে একেবারে শেষ করে দাও মেহবুব আমার। সবাই বলে তোমার দিল্ নাকি দয়া-মায়ায় ভরপুর। দিলদরিয়া তুমি। সবার বাঞ্ছা পূরণে তুমি সদা তৎপর হও। তবে কেন আমাকে বাঞ্ছা পূরণে বিমুখ করবে?' কথা বলতে বলতে বেহেস্তের হুরীটি নওজোয়ান মেষপালকটিকে আলিঙ্গন করল।

ব্যস, আর যাবে কোথায়! মেষপালকটি এক ঝটকায় লেড়কিটির কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বল্ল—'নষ্টামি করার আর জায়গা পাও নি! বেরোও—দুশ্চরিত্রা, বে-শরম, বে-আব্রু লেড়কি কাঁহাকার! আর কোনদিন এ মুখো হলে জান খতম করে দেব। আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর দিকেই আমার দিল্ ঝুঁকবে না কোনদিন।'

লেড়কিটি কিন্তু ঘাবড়াল না। বরং সে ফিক্ করে হেসে মেষপালকটির দিকে সামান্য এগিয়ে বসল। চোখের বাণ মারল। কেন মিছে গোস্সা করছ? ঝুটমুট আমাকে তাড়িয়ে দেবার ধান্দা করছ! তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আমিই তোমার মধ্যে কামনার আগুন জ্বেলে দেব আর খুনে ধরার মাতন। দেখবে, সম্ভোগের বাসনা তোমার দিলে কেমন চড়চড় করে জেগে ওঠে। আমার আপেল-রাঙা টসটসে ঠোঁট দুটো দেখে তোমার দিলটিতে মোচড় মেরে উঠছে না? চুম্বন করার জন্য তোমার ভেতরটি আকুপাকু করছে না? ভরা যৌবনের জোয়ারলাগা আমার বুক আর থলথলে নিতম্ব দুটো কি তোমার কলিজাটিকে চঞ্চল করে তুলছে না? তবে কেন মিছে তোমার যৌবনকে জোর করে দাবিয়ে রাখছ?'

বিশ্বাস কর, আমি আর পারছি না! মেহেবুব আমার, বুকে টেনে নাও আমাকে। তোমার প্রশস্ত বুকের চাপে আমার বুক পিষ্ট হোক। এরই মধ্য দিয়েই চরম প্রাপ্তির সূচনা হোক। পুরুষের দৈহিক নির্যাতনেই নারীর সুখ-শান্তি উৎপাদিত হয়।'

নওজোয়ান মেষপালকটি তীরবিদ্ধ জানোয়ারের মত ফোঁস করে উঠল—'বেলেল্লাপনা করার আর জায়গা পাওনি শয়তানী! এখনও বলছি, ভালোয় ভালোয় আমার ডেঁরা থেকে বেরিয়ে যাও। নইলে এমন এক ঠুঁসা দেব জিন্দেগীর মত কামজ্বালা নিভে যাবে, বলে দিচ্ছি।'

লেড়কিটি নির্বিকার। যেন তার হম্বিতম্বি তার কানেই যায় নি। আচমকা লেড়কাটির গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বন করার চেষ্টা করে। মেষপালকটি বিতৃষ্ণায় মুখ সরিয়ে নেয়।

—'সত্যি এমন এক ভাব দেখাচ্ছ যেন ইয়েটিয়ে কিছুই নেই তোমার। এমন তরতাজা আপাপবিদ্ধ কুমারী, ডাঁসা পেয়ারার মত টসটসে আমার বুক—চেখে দেখ একবারটি। এক কুমারী তার অমূল্য সম্পদ কুমারীত্ব তোমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য উসখুস করছি আর তুমি কিনা ভাল আদমি সেজে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।' তার মুখটিতে হাত দিয়ে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এবার বল্ল—'শোন, এ রসের স্বাদ তো পাওনি কোনদিন, বুঝবে কি করে? জিন্দেগীভর 'আল্লাতাল্লা' আর 'খোদাতাল্লা' করেই নিজেকে বঞ্চিত করলে। একটিবার চেখে দেখ আমার ষোল বছরের যৌবন সুধা তখন দ্বিতীয়বারের জন্যে হন্যে হয়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি করে বেড়াতে হবে, বলে দিচ্ছি।'

মেষপালকটি পরম বিতৃষ্ণায় চোখ-মুখ বিকৃত করে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! শোভন আল্লাহ! আমার চোখ-কান, দেহ-দিল্ সবই অপবিত্র করে ছাড়ল দেখছি, বজ্জাত লেড়কি কাঁহিকার! ভাগ—ভাগ এখান থেকে। ভাগ—ভাগ বলছি।'

খুবসুরৎ লেড়কিটি এবার ঝট করে উঠে দাঁড়াল। মেষপালক ভাবল, আপদ বিদায় হচ্ছে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে সে তার কামিজ, চুরিদার সব—সবই এক এক করে খুলে একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে গেল।

উদ্ভিন্ন যৌবনা লেড়কিটির সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবন চিহ্নগুলো নওজোয়ান মেষপালককে কাছে ডাকতে লাগল।—অসহ্য— —অসম্ভব! কিছুতেই না। কিছুতেই সম্ভব নয়।'

আচমকা বিকট আর্তনাদ করে উঠল—'না....না...না!' দু' হাত দিয়ে চোখ দুটোকে ঢাকল। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল 'বে-শরম বে-ইজ্জৎ কুত্তী কাঁহিকার। ভাগ আমার চোখের সামনে থেকে।' কথা ক'টি লেড়কিটির দিকে ছুঁড়ে দিয়েই সে একটি গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে, পিছন ফিরে বসে রইল।

লেড়কিটি অনন্যোপায় হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে উঠল—'ওগো, ধার্মিকপ্রবর, তোমার ধর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতার কাছে আমার রূপ-যৌবন পদদলিত হ'ল। আমি পরাজয় স্বীকার করে বিদায় নিচ্ছি। তুমি আল্লাহ্-র প্রতি ভক্তি অবিচল রেখে জিন্দেগীকে সার্থক করে তোল।' কথা ক'টি বলে বেহেস্তের হুরী মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শেষ করলে বাদশাহ শারিয়ার ভাববিমুগ্ধ চিত্তে ব'লে উঠলেন—'বেগম সাহেবা, তোমার কিস্‌সা আমার দিলের দরওয়াজা একটু একটু করে খুলে দিচ্ছে। এরকম কিস্‌সা যদি তোমার আর জানা থাকে তবে তা শুনিয়ে আমাকে চিত্তশুদ্ধির সুযোগ দান কর।'

বক ও কচ্ছপের কিস্‌সা

এক শ' ছেচল্লিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—জাঁহাপনা, এবার আপনাকে বক ও কচ্ছপের কিস্‌সা শোনাচ্ছি।

কোন এক সমুদ্রের কূলে বসে এক বক উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের রূপ-সৌন্দর্য দেখছিল। এমন সময় সমুদ্রের কূল ঘেঁষে এক মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখল। লাসটি ফুলে-ফেঁপে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে লাসটি গিয়ে এক পাহাড়ের গায়ে আটকা পড়ে গেল।

বকটি লাসটিকে অনুসরণ করে পাহাড়টির গায়ে গিয়ে বসল। লাসটির দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দেখতে পেল, তার মুণ্ডুটি নেই। গায়ে সিপাহীর কোর্তা। বকটি বুঝতে পারল লড়াইয়ে পরাজিত হওয়ায় তার এ হালৎ করে লাসটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে।

বকটি ভাবল, সিপাহীটির নসীবে যা ছিল তা-তো অনেক আগেই ঘটে গেছে। এখন আমি-এর সদগতি করলে আমার গুনাহ তো কিছু হবার কথা নয়। এরকম ভেবে সে লাসটির গা থেকে গোস্ত দিয়ে জিভটিকে একটু ঝালাই করে নেবার মতলব করল।

বকটি যেই না ডানা মেলতে যাবে অমনি অতিকায় এক কচ্ছপকে দ্রুত লাসটির দিকে এগিয়ে আসতে দেখল।

কচ্ছপটি এগিয়ে এসে বল্‌ল—'ভাইয়া, এখানে বসে যে? কি দেখছ এমন করে?'

বকটি মুচকি হেসে বল্‌ল—'কিছুই না। একেলা বসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম ভাইজান। তুমি হঠাৎ কখন এসে তীরে উঠে পড়। বিপদের সম্মুখীন হও—এসবই ভাবছিলাম। আসলে ইদানিং এখানে খুব নেকড়ের আনাগোনা শুরু হয়েছে কিনা। হরদম ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। তাই ভাবছি, হতচ্ছাড়া এ-মুলুক ছেড়েই ভেগে যাব।'

—'ভাইয়া যদি নেহাৎই কোথাও ভাগার ফিকির কর তবে কিন্তু আমাকে সাথে নিতে ভুলো না যেন। আর এখানে কেউ খাতির টাতিরও তো করে না। ভিন্‌দেশে গেলে দেখবে সবাই আমাদের কেমন খাতির আত্তি করে। আজ থেকে তোমাকে আমার জিগরি দোস্ত করে নিলাম।

কচ্ছপের কথায় বকটির দিল গলে যায়। আহ্লাদে একেবারে গদগদ হয়ে গেল। 'ভাইজান, তুমি আমাকে তোমার দোস্ত—একেবারে জিগরি দোস্ত বানিয়ে নিলে, কম কথা! তোমার মত দিল দরিয়া প্রাণী দ্বিতীয় আর একটি আছে বলে আমি মনে করি না। স্বার্থগৃধ্ন এ দুনিয়ায় প্রকৃত দোস্ত পাওয়াই তো মুশকিল। আমার জাতের মধ্যে যারা আছে সবারই এক ধান্দা। ভাল ভাল মছলি পাকড়ে খাবে আর হরদম গুঁড়াবাচ্চা পয়দা করবে। নিজেকে, নিজের জননাকে নিয়েই সবাই মজে থাকে। ইয়ার দোস্ত তো দূরের কথা আল্লাহ্-র কথা পর্যন্ত ভুলেও ভাবে না।'

কচ্ছপ অপলক চোখে বকের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনল। এক সময় উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠল—'বাঃ কী চমৎকার কথা! কী সুন্দর তোমার ভাষাজ্ঞান। কথা শুনলে দিল জুড়িয়ে যায়! এক কাজ কর ভাইয়া। আমার কাছে এসো। আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ভাব বিনিময় করি, দোস্তিটিকে একটু

পাকা করে নেই।'

বক এবার কচ্ছপটির কাছে এগিয়ে এল। তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে কচ্ছপটি এবার বল্‌ল—'ভাইয়া তোমার জাত ভাইরা যখন নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক তখন আর বেকার ওদের কাছে থেকে দরকার নেই। চল, ভিন্‌ দেশে গিয়ে আমরা দুই দোস্ত পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতায় সুখে দিন গুজরান করি।'

বক হেসে বল্‌ল—'বেড়ে মতলব ফেঁদেছ দোস্ত। কিন্তু আমার বিবি আর লেড়কা-লেড়কিদের কি হালৎ হবে?'

—'কি আবার হবে। তাদেরও সঙ্গে নিয়ে নেবে।'

তারপর একদিন বক ও কচ্ছপ সপরিবারে অন্য মুলকের উদ্দেশে রওনা হ'ল।

ইতিমধ্যে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নেকড়ে ও খেঁকশিয়ালের কিস্‌সা

এক শ' উনপঞ্চাশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহ্‌রাজাদ-এর কক্ষে এলেন। আসন গ্রহণ করতে করতে বল্‌লেন—'মেহবুবা, তোমার কিস্‌সা আমাকে যার পর নাই মুগ্ধ করছে। এবার আমার অনুরোধ, তুমি কোন হিংস্র জানোয়ারের কিস্‌সা শোনাও।'

—'জাঁহাপনা, আপনার হুকুম তামিল করাই তো আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আপনার বাঞ্ছা পূরণ করতে আমি এখন হিংস্র জানোয়ার এক নেকড়ে এবং ধূর্ত খেঁকশিয়ালের কিস্‌সা শুরু করছি।

এক নেকড়ের একটি পোষা খেঁকশিয়াল ছিল। নেকড়েটি রোজ নানাভাবে খেঁকশিয়ালটির প্রতি দুর্ব্যবহার করে খেঁকশিয়ালটির প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত করে তোলে। সে প্রতিনিয়ত ফিকির খুঁজতে লাগে, কি করে শয়তান মালিক নেকড়েটির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

এক সকালে নেকড়েটি ঘুম থেকে উঠেই খেঁকশিয়ালটির চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল—'হারামী শয়তান, নচ্ছার কোথাকার! এতক্ষণ করছিলি কি? বজ্জাত শেয়ালের বাচ্চা কাঁহিকার!'

খেঁকশিয়ালটি নির্বাক। নেকড়ে যে তার গুষ্টি তুষ্টি করছে, সে সবের কিছুই যেন তার কানে যায় নি। সে উপরন্তু মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'হুজুর। আমার মাথায় চমৎকার একটি মতলব এসেছে! যাকে বলে একেবারে বেড়ে মতলব।'

তার মালিক নেকড়েটি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সজোরে এক ধমক দিয়ে উঠল—'রেখে দে তোর বেড়ে মতলব। উদ্ভট সব ভাবনা তোর মাথায় খেলে। ওসব ভেবে ভেবে মগজটিকে আর বরবাদ করিস নে। যা, নিজের কাজ কর গে, তবেই আমি কৃতার্থ। ফিন যদি এরকম মাতব্বরি করিস তো পিটিয়ে হাড্ডি গুঁড়া করে ছাড়ব, বলে রাখছি।'

খেঁকশিয়ালটি হকচকিয়ে উঠে করজোড়ে মিনতি করে—'হুজুর, আমি আপনার অনুগত নফর। যদি না বুঝে কোন গোস্তাকী করে থাকি মাফ করে দেবেন।'

খেঁকশিয়ালটির নম্রতা ও বিনয়ে হিংস্র নেকড়েটির মেজাজ কিছুটা শরিফ হয়। মুচকি হেসে এবার সে বল্‌ল—'এত করে যখন বলছিস তখন এবারের মত মাফ করেই দিলাম। তবে খেয়াল রাখবি ভবিষ্যতে যদি আর কোনদিন এরকম বে-আদপি করবি তো তোর কলিজাটি টেনে ছিঁড়ে দেব। যেটুকু দরকার তার এক রত্তিও বাড়তি বাৎ বলবি না।'

খেঁকশিয়ালটি এবার তেমনি করজোড়েই বল্‌ল—'একেবারে হক্‌ কথাই বলেছেন হুজুর। আমাদের পয়গম্বর তো বলেই গেছেন, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা কাউকে বলবে না, জিজ্ঞাসাও করবে না। আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে গায়ে পড়ে কাউকে কিছু শোনাতেও কোশিস করবে না, উপদেশ তো অবশ্যই নয়। নিজের কাজে লেগে থাকা ছাড়া অন্য কোন ধান্দা করবে না। অন্য কারো ব্যাপার- স্যাপার নিয়ে মিছে ভাবনা চিন্তা কোরো না।'

নেকড়েটি ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে—'হতচ্ছাড়া খেঁকশিয়াল একদিন কায়দামত তোকে বাগে পেলে তোর মাতব্বরির শোধ সুদে-আসলে তুলে ছাড়ব।'

খেঁকশিয়াল এবার বল্‌ল—'আপনার তো আর অজানা নয় যে, ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই পুণ্য সঞ্চয় হয়ে থাকে। আর ক্ষমার মাধ্যমে ঔদার্যগুণের প্রকাশ হয়। হুজুর, আপনি যখন আমাকে বাঁ-পায়ে সজোরে লাথি মারেন তখন কিন্তু আমার ভেতরের আন্ধার কেটে গিয়ে জায়গাটি আলোয় উদ্ভাসিতই হয়ে ওঠে।'

নেকড়েটি নিজের অজ্ঞতার জন্য অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকে। খেঁকশিয়ালটির পিঠ চাপড়ে এবার বল্‌ল—'ভাইয়া, তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। তোমার নিজের চৈতন্যোদয় হয়েছে বলেই তো এমন জ্ঞানগর্ভ সব বাৎ বাতলাতে পারছ। সত্যি বলতে কি তোমাকে সেদিন লাথি মেরে আমি স্বস্তি পাইনি। এবার থেকে একটু সামলে সুমলে চলবে যাতে এমন দুর্ব্যবহার আমাকে আর করতে না হয়।'

—'ভাইজান, আল্লাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করি তিনি আপনার ক্ষমতা ও প্রতাপ বৃদ্ধির সহায়ক হোন।'

—'তোমাকে তো আমি আগেই বুকে টেনে নিয়েছি ভাইয়া।

এখন থেকে তুমি আমার অভিন্ন হৃদয় বিশ্বাসভাজন অনুচর হলে। হরবখত চোখ-কান খোলা রাখবে। যদি নতুন কিছু দেখ সঙ্গে সঙ্গে এসে আমাকে খবর দেবে।'

খেঁকশিয়াল করজোড়ে নিবেদন করল—'আপনার হুকুম তামিল করাই তো বান্দার কাজ। আল্লাহ আপনার ভালই করুন।'

এবার খেঁকশিয়াল নেকড়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ছোট-বড় কয়েকটি ঝোঁপঝাড় অতিক্রম করে এক আঙুর বনে ঢুকল। জায়গাটি তার পরিচিত। এখানে মস্ত বড় এক নালা রয়েছে। তাই সে এ-পথে না এসে ঘুরে যাতায়াত করে। মহাজনরা তো উপদেশ দিয়েছেনই, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাফেরা করবে। অন্যথায় পতন ঘটতে বাধ্য।

খেঁকশিয়ালটি আপন মনে বলে উঠল—'শয়তান আদমকিনের ছলাকলা আর ছদ্মবেশের ব্যাপার-স্যাপার আমি ধরে ফেলেছি। যদি খেঁকশিয়ালের কোন নকল মূর্তি এখানে চোখে পড়ে তবে আর এখানে দাঁড়ানোর দরকার নেই। নির্ঘাৎ আদমকিন নতুন কোন ফাঁদ পেতে সর্বনাশ সাধনে ব্রতী হয়েছে। ব্যস, সোজা চম্পট দেব।' এরকম বলতে বলতে অতি সন্তপর্ণে পা ফেলে, মাটির গন্ধ শুঁকে, বাতাসের আঘ্রাণ নিয়ে, কান দুটো সজাগ রেখে সে বিপদ সীমা পেরিয়ে গেল। এবার এক গর্তের ধারে এসে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল কে যেন লতাপাতা দিয়ে গর্তের মুখটি বুজিয়ে দিয়ে গেছে। তার মনে পুলকের সঞ্চার হ'ল। কিন্তু কিসের পুলক, কেনই বা সে এমন পুলকিত হ'ল নিজেই জানে না।

খেঁকশিয়ালটি এবার এগোবার ধান্দা করল। ঠিক তখনই নেকড়ের সঙ্গে দেখা। মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে নেকড়েকে বল্‌ল—'হুজুর, মনে হচ্ছে আল্লাতাল্লা এবার আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। আমাদের নসীবের চাকা ঘুরে গেছে।'

নেকড়ে চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে ধমকের স্বরে বল্‌ল —'ধানাই পানাই রেখে সাফ সাফ বাতা, ব্যাপার কি।'

সোল্লাসে শিয়ালটি এবার বল্‌ল—'এ-জঙ্গলের মালিক দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। তাকে গোর দেওয়া হয়েছে। আমি নিজের চোখে তার গোরস্থান পর্যন্ত দেখে এলাম।'

—'তবে তো নসীব উল্টে দিয়েছ দেখছি! তবে আর আমড়া কাঠের ঢেঁকির মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন? সেখানে গিয়েই দাঁড়িয়ে থাক, পাহারা দাও।'

নেকড়ের কাছ থেকে আচ্ছা মত ধমক খেয়ে খেঁকশিয়াল গুটি গুটি এগিয়ে চলে। নেকড়ে তাকে অনুসরণ করে। সামান্য গিয়ে খেঁকশিয়াল বল্‌ল—'হুজুর, এখানে—জঙ্গলের মালিক-কে এখানেই গোর দেওয়া হয়েছে।'

আঙুরবন। থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে। এত আঙুর দেখে নেকড়ে আর লোভ সম্বরণ করতে পারল না। শরীরের সবটুকু তাগদ দিয়ে সে এক লাফ দিল আঙুরের একটি থোকা ধরার জন্য। পারল তো না-ই উপরন্তু আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল। ব্যস, একেবারে লতাপাতায় বন্ধ করা গর্তটির মুখে ধপাস করে আছড়ে পড়ল। এতো আর স্বাভাবিক গর্ত নয়, একটি ফাঁদ। নেকড়ে পড়ামাত্রই গর্তের মধ্যে সিঁধিয়ে গেল।

নেকড়ের দুরবস্থা দেখে খেঁকশিয়ালটি উল্লসিত হয়। সে সামনের পা দুটো তুলে আনন্দে লাফাতে লেগে যায়।

নেকড়ে ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য নানা ফিকির করতে লাগল। সব চেষ্টাই তার বিফলে গেল। কোন কৌশলই ফলপ্রসূ হ'ল না। পরিশ্রম বেকার হয়ে গেল।

খেঁকশিয়াল ধমক দিয়ে ওঠে—'এ কী দোস্ত, এমন চরমতম বিপদের সময় তুমি ঠ্যাঙ ছড়িয়ে কাঁদতে বসে গেলে! কান্না থামিয়ে দেখ, কোন ফন্দি ফিকির বের করতে পার কিনা যাতে আমি গাড্ডা থেকে উদ্ধার হতে পারি। স্বীকার করছি, এক সময় আমি তোমার ওপর একটু-আধটু নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলাম। আজ তার জন্য অনুশোচনায় কম দগ্ধ হইনি। সে সব এখন দিল্ থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে আমার জন্য কিছু কর। আমার লেড়কা লেড়কিদের খবর দেওয়ার চেষ্টা কর। আমার চরম বিপদের দৃশ্য নিজের চোখে তারা দেখুক। চোখের পানি মুছে আমাকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় সে ফিকির বের কর।'

খেঁকশিয়াল এবার নিজমূর্তি ধারণ করল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নেকড়ের কথার জবাব দিল—'কী আমার পিরিতের নাগর রে। তার জন্য আমি কেঁদে বুক ভাসাতে যাব। হতচ্ছাড়া, নচ্ছার, শয়তান কাঁহিকার। বলে কিনা একটু-আধটু নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। হারামি, তোর লাথির চোটে আমার কলিজাটি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এখনও আমার বুকটি ধুকপুক করে। তোর আজকের দুর্গতি আরও ক'বছর আগেই হওয়া উচিত ছিল। আল্লাতাল্লা তোর সহায় বলেই আজও তোর হাড্ডিগুলি আস্ত রয়েছে। তাই তো চোখের সামনে তুই একটু একটু করে মরবি আর আমি তা দেখে উল্লাস করব।'

—'আমি জানি দোস্ত, তুমি মুখে যা-ই বল না কেন আমার এরকম চরমতম দুঃসময়ে তুমি কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে না। তোমার দিল্ কত উদার তা আর কেউ না জানুক আমার তো অন্তত অজানা নয়। আমাকে এ-গাড্ডা থেকে উদ্ধার করার ফিকির তুমি বের করবেই।'

খেঁকশিয়াল গাড্ডার কাছে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক করে হাসতে থাকে। নেকড়েটি এবার প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্‌ল—'দোস্ত, একটু বড় রশিটশি জোগাড় করে নিয়ে এসো, নিদেনপক্ষে শক্ত দেখে লতা-পাক দিয়ে রশি বানিয়ে নাও। তার এক প্রান্ত গাছের সঙ্গে বেঁধে অন্য প্রান্তটি গাড্ডায় আমার দিকে নামিয়ে দাও। আমি রশি বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে আসতে পারব। দোস্ত, তোমার এ সহৃদয়তার কথা আমি জিন্দেগীতে ভুলব না।'

খেঁকশিয়ালটি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে হেসে বল্‌ল—'শয়তান কাঁহিকার! তোর এমন সুন্দর বাক্যি এতদিন কোথায় ছিল? তবে হ্যাঁ, তোর আত্মা গাড্ডা থেকে উঠে বেহেস্তে—ধুৎ বেহেস্তে নয়, দোজকে চলে যাবে। কিন্তু তোর নশ্বর দেহটি গাড্ডার ভেতরেই পচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। জিন্দেগীভর সবার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছিলি তার ফল তো ভোগ করতেই হবে।

নেকড়ের দু' চোখের কোল বেয়ে পানি গড়াতে লাগল।

খেঁকশিয়াল বলে চল্‌ল—'ওরে শয়তান, মরতে যখন হবেই তখন বৃথা চোখের পানি ফেল্‌লে ফয়দা কিছু হবে না। তার চেয়ে বরং বাজ পাখির কিস্‌সা বলছি, সবার আগে শুনে নে।'

বাজপাখির কিস্‌সা

খেঁকশিয়াল বল্‌ল, কিছুদিন আগের কথা। এক বিকালে আমি আঙুর বনে ঢুকে টসটসে আঙুরের থোকা পেড়ে উদরস্থ করছি। হঠাৎ আঙুর বনের ধারে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। একটি তিতির পাখি আছাড় খেয়ে পড়ল। ওপরের দিকে চোখ ফেরাতেই একটি বাজপাখিকে দেখতে পেলাম। বুঝতে অসুবিধা হ'ল না, নসীব বিড়ম্বিত তিতির পাখিটি বাজপাখিটির খপ্পরে পড়েছিল।

বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ তিতির পাখিটির দিকে মুখ তুলে তাকালেন। সে সামনে একটি গর্ত পেয়ে টুক্ করে তাতে ঢুকে গিয়ে আব্বার দেওয়া জানটিকে কোন রকমে রক্ষা করতে পারল।

বাজপাখিটি কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। ধরা শিকার হাতছাড়া হবার আক্ষেপ বুকে নিয়ে গর্তটির মুখে ঠায় বসে রইল। আজ না হোক কাল হলেও তাকে বাইরে আসতেই হবে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

গর্তের মুখে বসে, তিতিরটি শুনতে পায় এরকম উচ্চগ্রামে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—'ওরে ছোট্ট পাখি, আমার আদরের দুলাল, এত ভয় ডরের কি আছে বুঝছি না তো। কোন ডর নেই। আমি তো বুঝি, খিদেতে তোর পেটে জ্বালা ধরে গেছে। কেন ঝুটমুট নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিস, বল তো? আয়, বাইরে বেরিয়ে আয়। এসে দেখ, কী সুন্দর সব দানা তোর জন্য জোগাড় করেছি। পানিও আছে। তোকে আমি যে নিজের কলিজার চেয়েও ভালবাসি তা যদি জানতিস তবে আর গর্তে ঢুকতিস না। তুই কি বুঝিস নে, তোকে বুকে করে নিয়ে আমি তোর সুখের খোঁজেই যাচ্ছিলাম?'

বোকা হাঁদারাম তিতির পাখিটি শয়তান বাজপাখির মধুমাখা বাক্যি শুনে মজে গেল। সে বাইরে বেরিয়ে আসতেই বাজপাখিটি টুক করে তাকে দু' পায়ে আঁকড়ে ধরে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেল।

এবার সে এমন জোরে আঙুল দিয়ে চেপে ধরল যে, ছোট্ট তিতিরটির জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। রাগে ও যন্ত্রণায় সে রীতিমত কাৎরাতে লাগল—'আমার গোস্ত খেয়ে খুশি হবি ভেবেছিস, তাই না? সেটি কিছুতেই হতে দিচ্ছি না। আমি পেটে গিয়ে বিষ হয়ে তোর জান খতম করব। মরতেই যদি হয় তবে তোকে নিয়েই মরব।'

বাজপাখিটি তিতিরের কথায় কানও দিল না। সে তাকে মুখে পুরেই টুক করে গিলে ফেল্‌ল।

কী তাজ্জব ব্যাপার! ছোট্ট পাখি তিতিরটির করুণ প্রার্থনা বুঝি আল্লাতাল্লা শুনতে পেয়েছিলেন। তিতিরটিকে গেলামাত্রই বাজপাখিটি কেমন এলিয়ে পড়ল। বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ব্যস, সব খতম।

* * *

কিস্‌সা শেষ করে খেঁকশিয়াল এবার নেকড়েটিকে বল্‌ল—'কি রে শয়তান, কি বুঝলি? বাজপাখির মত তোর দশাও একই রকম হবে। অত্যাচার, অবিচার, শোষণ আর অধর্মের শেষ একদিন না একদিন হবেই। আর তার ফল অত্যাচারীকে ভোগ করতেই হবে। আল্লাতাল্লা তোর শেষ বিচারের ব্যবস্থা করেছেন।'

নেকড়ে কেঁদেকেটে বলে—'ভাইয়া, দোস্ত আমার, একটু সদয় হও। এমন ক'রে মুখ ফিরিয়ে থেকো না। একদিন দেখবে, আমিই তোমার সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী।'

খেঁকশিয়াল মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'হায় রে হতচ্ছাড়া নেকড়ে! তোর দেখছি কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই। কোন নীতি কথাই তোর জানা নেই! তাজ্জব ব্যাপার! মরার আগে যেটুকু পারিস শুনে নে। বিজ্ঞজনরা বলে গেছেন তোর মত কদাকারদের চেহারা আর চোখের শয়তানী দেখেই তার দিলের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে হবে। একটু আগেই তুই যেসব মিঠা প্রলেপ দেওয়া বাৎ আওড়েছিস তা খুবই উপাদেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তোর মুখে সারল্যের লেশমাত্র নেই। আর চোখের তারায় শয়তানীর সুস্পষ্ট ছাপ কেন? তুই আমাকে বিপদের সময় সৎ পরামর্শ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিস, কিন্তু তোর ঘটে যদি সত্যি ছিটোফোঁটা বুদ্ধিও থাকে তবে তো নিজে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার ফিকির নিজেই বের করে ফেলতে পারতিস। তুই ভাবিস তোর মত ধূর্ত দ্বিতীয় কেউ-ই নেই। কার্যতঃ আমি কিন্তু দেখছি, তোর মত মাথায় গোবর পোরা এক নিরেট মূর্খ অন্য কোন প্রাণীই নেই। নইলে আমার কথা ভাল-মন্দ বিবেচনা না করেই আঙুর বনে আসতেই বা গেলি কেন? আর না হয় এলি কিন্তু লাফালাফি করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে গেলিই বা কেন? সবশেষে বলছি, তোর নসীবই তোকে ব্যাপারটি নিয়ে তলিয়ে দেখার মত দিল্ দেয় নি। নইলে অবশ্যই একবার হলেও ভাবতিস, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করতিস, এখানে লতাপাতার নিচে কোন ফাঁদ পাতা আছে কিনা।'

বিশ্রী স্বরে হেসে খেঁকশিয়াল এবার বল্‌ল—'তোর নিজের ঘটেই বুদ্ধির লেশমাত্রও নেই আর তুই কিনা আমাকে আশ্বাস দিচ্ছিস, বিপদের সময় উপদেশ দিয়ে মুশকিল আসান করবি! আহাম্মক কাঁহিকার, তোর কথা শুনে এক হেকিমের কিস্‌সা আমার মনে পড়ে গেল, জান খতম হওয়ার আগে কিস্‌সাটি বরং শুনেই নে।

এক আদমির ডান-হাতে একটি আব হয়েছিল। যত দিন যায় ততই বড় হতে থাকে। সে সঙ্গে ব্যথা বেদনা তো আছেই। নগরের সব বড় ও নামকরা হেকিমকে তলব করা হ'ল। হেকিম তার দাওয়াইয়ের বাক্স নিয়ে ছুটে এল। হেকিমের চোখ ঢাকা, পট্টি বাঁধা।

রোগী জিজ্ঞাসা করল—'হেকিম সাহেব, আপনার চোখে পট্টি কেন? কি হয়েছে? কোন্ বিমারি—'

হেকিম বিমর্ষ মুখে বল্‌ল—'আর বলবেন না ভাইয়া, আমার চোখে একটি আব হয়েছে।'

হেকিমের বাৎ শুনে রোগী তো তাজ্জব বনে গেল। সে ভ্রূ-কুঁচকে বল্‌ল—'সে কী হেকিম সাহেব, আপনার চোখেই আব! ইলাজ করে আবটি সারাতে পারছেন না? এদিকে আপনি আবার আমার আবটির ইলাজ করতে এসেছেন? হাসালেন মশাই; বুঝেছি, এ আপনার কম্ম নয়। আপনার ক্ষ্যামতায় আমার ইলাজ কুলোবে না। আপনার দক্ষিণা দিচ্ছি নিয়ে বিদায় হোন।'

তাই বলছি কি আহাম্মক নেকড়ে, অন্যের বিমারি সারাবার আগে তোর নিজের গলতি কিছু থাকলে আগে দাওয়াই দিয়ে সারিয়ে নে। আগে নিজের জান বাঁচাবার ফিকির কর। তারপর আমাকে উপদেশ দেবার কথা ভাববি। আমি বলি কি, তোর মরণ যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন আর মিছে হ্যাঁচড় ফ্যাঁচড় করে লাভ কি। এখানেই চুপটি করে পড়ে থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে বরণ করে নে।'

খেঁকশিয়ালটির কথা শুনে নেকড়েটি গুঁড়া বাচ্চার মত বিলাপ পেড়ে কাঁদতে শুরু করল। দোস্ত, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও। নিদেনপক্ষে তোমার লেজটি নিচে ঝুলিয়ে দাও। আমি ওটি ধরেই না হয় ওপরে উঠে যাই। কোশিস তো করে দেখি, যদি জান বাঁচাতে পারি। তুমি আমার আগের সব গোস্তাকি মাফ করে দাও। আর আমার হিংস্রতা? আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমার মসৃণ দাঁত আর নখগুলি আজই পাথরে ঘষে ভোঁতা করে নেব। তবে তো আর বিবাদ বিসম্বাদের প্রশ্নই উঠবে না। এমন কি গোস্ত খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেব, কথা দিচ্ছি। কেবল ঝর্ণার পানি খেয়ে জিন্দেগী কাটিয়ে দেব। তখন তো আমি এক সাচ্চা ফকিরই বনে যাব। আল্লাহ্-র নাম জপ করেই আমি দিন গুজরান করব।'

খেঁকশিয়ালটির মুখে বিদ্রূপের হাসি লেগেই রইল। সে এবার বল্‌ল—'শয়তান কাঁহিকার, তোর মধুর বাৎ শুনে মজে যাব এতবড় আহাম্মক আমি নই। আর তোর মত এক ঝানু শয়তানের চরিত্র রাতারাতি বদলে গেছে এরকম কোন নজির অন্ততঃ আমার চোখের সামনে নেই। বোকা হাঁদা, আমাকে কি তোর মত আহাম্মক ঠাওরেছিস নাকি রে! আমি তোর বাৎ শুনেই সুড় সুড় করে লেজটি নামিয়ে দেব আর তোর সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব! তার চেয়ে তুই মৃত্যুর দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যা আর আমি এখানে বসে তোর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে উল্লাস করি, কেমন? পীর-পয়গম্বররা তো বলেই গেছেন,—"একমাত্র দুরাচারীদের নিধনের মাধ্যমেই দুনিয়ার বিলকল গুনাহের অবসান ঘটা সম্ভব।"

নেকড়ে বিলাপ পেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—'আমার জিগরী দোস্ত খেঁকশিয়াল, আমি তো জানিই আমীর-বাদশার ঘরে তুমি পয়দা হয়েছ। সমাজে তোমার একটি আলাদা খাতির আছে। তোমার পাণ্ডিত্যের কথা তামাম জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারদের কারোরই অজানা নেই। আর তোমার ঔদার্য্যগুণের কথা কে না জানে? তাই আমার এ উপকারটুকু করে তোমার চারিত্রিক গুণাবলী অক্ষুণ্ণ রাখ।'

খেঁকশিয়ালটি এবার ফিক্ করে হেসে উঠল। হাসি পাবারই তো কথা। নেকড়ে ফাঁদে পড়ে খেঁকশিয়ালকে কেমন তোষামোদ শুরু করেছে তাতে হাসি চাপা সত্যি দুষ্কর। হাসতে হাসতে বল্‌ল—'ওরে নেকড়ে, তুই বোকাহাঁদা আমি জানতাম, কিন্তু এত যে বোকা ঘুণাক্ষরেও ধারণা করতে পারি নি। তোকে একটি উপদেশ দিচ্ছি, মরার আগে শুনেই যা—হেকিমরা সব কিসিমের বিমারিই ইলাজ করতে পারে, সারাতেও পারে। লেকিন মৃতদের জান ফিরিয়ে দিতে পারে না। আর একমাত্র হীরাতেই ভেজাল মেশানো যায় না। একমাত্র নসীব ছাড়া আর যা কিছু আছে চেষ্টার মাধ্যমে সবকিছুকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। তুই বারবার বলছিস, তোর জান বাঁচলে তুই জিন্দেগীভর আমার জিগরী দোস্ত হয়ে কেনা গোলাম হয়ে থাকবি। চমৎকার বাৎ, শয়তান কাঁহিকার। শোন, তোর শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি। খল সাপের কিস্‌সা তোকে শোনাচ্ছি, যদি কিছু অন্ততঃ শিক্ষা তোর হয়। এক সাপুড়ের ঝুড়িতে এক সাপ থাকত। একদিন সাপুড়ের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সাপটি ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে যায়। রাস্তায় হরদম গড়াগড়ি খেতে থাকে। আসলে তার শরীরে তেমন তাগদ ছিল না। দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে সাপুড়ে তার তবিয়ত একেবারে ঢিলা করে দিয়েছিল। তাই বহুৎ কোশিস করল ভেগে যাবার জন্য। লেকিন পারল না। এক আদমি তাকে দেখে থমকে খাড়া হয়ে গেল। দিল্‌টি দুখাইল। তাকে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। দুধ আর কলা খাইয়ে খাইয়ে তার দেহে ফিন তাগদ ফিরিয়ে আনল। এবার সাপটির নিজের ওপর আস্থা ফিরে এল। সে নিঃসন্দেহ হ'ল—সে একাই এখন খুশীমত যেখানে খুশী চলে যেতে পারবে। যা খুশী করতেও পারবে। ব্যস, এবার সে নিজমূর্তি ধারণ করল। সে তার জান রক্ষাকর্তার শিরে ছোবল মেরে বসল। আর দেরী নয়। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। অচিরেই তার জান খতম হয়ে গেল।

তাই বলছি কি শয়তান নেকড়ে এবার আমি কেটে পড়ছি। তুই একাই বরং তোর মৃত্যুর দৃশ্যটি দেখ।'

খেঁকশিয়ালটি এবার কিছু দূরে একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে গলা ছেড়ে 'হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া' করে চেঁচাতে লাগল। তার গলা শুনে আঙুর খেতের মালিক লাঠি নিয়ে ছুটে এল।

ইতিমধ্যে খেঁকশিয়ালটি একটি ঝোপের আড়ালে চলে গিয়ে নেক্‌ড়ের গর্তটির দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগল।

এদিকে আঙুর খেতের মালিক লাঠি নিয়ে ছুটে গর্তটির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ঝট্ করে বেড়ে একটি মতলব তার মাথায় এল। ইয়া পেল্লাই সব পাথরের টুকরো এনে এনে নেকড়ের ওপরে ফেলতে লাগল। খেঁকশিয়ালটি ঝোপের আড়াল থেকে নেকড়ের বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে পেল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? অচিরেই পাথরের আঘাতে তার জান খতম হয়ে গেল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নেউল ও ইঁদুরের কিস্‌সা

পরের রজনীতে বাদশাহ শারিয়ার আবার অন্দরমহলে বেগমের কামরায় এলেন। বেগম বল্‌লেন—জাঁহাপনা, আশা করি নেকড়ে ও খেঁকশিয়ালের কিস্‌সাটি আপনার ভালই লেগেছে। এখন আপনাকে নেউল আর ইঁদুরের কিস্‌সা শোনাচ্ছি।

জাঁহাপনা, এক আউরত ক্ষীরার বীচির ডাল বানিয়ে বস্তিতে বস্তিতে ঢুঁড়ে বেচত।

এক সকালে আউরতটির কাছে এক নওজোয়ান এল ক্ষীরার বীচির ডালের ফরমাস দিতে। হেকিম নাকি তাকে ব্যবস্থা দিয়েছেন ক্ষীরার বীচি সেদ্ধ করে খেতে। সে একবারে পাঁচ সের ক্ষীরার বীচি বীচি কিনে নিয়ে গিয়ে ঘরে মজুদ করে রাখতে চাইছে।

আউরতটি বল্‌ল—'কাল এসে নিয়ে যেও। আমি বীচি থেকে ডাল বানিয়ে গোছগাছ করে রেখে দেব। তুমি এলেই পেয়ে যাবে।

সন্ধ্যার পর সে অনেকক্ষণ ধরে কোশিস করে ক্ষীরার বীজ থেকে ডাল বানিয়ে একটি ঝুড়িতে করে খাটিয়ার তলায় রেখে দিল।

একটি নেউল গভীর রাত্রে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে ঝুড়ি থেকে কিছু ক্ষীরার বীচির ডাল খেয়ে চম্পট দিল। সকালে নিদ ভাঙলে আউরতটি উঠে খাটিয়ার তলা থেকে ঝুড়িটি টেনে কাছে আনতেই দেখল, ক্ষীরার বীজের ডাল বেশ কম। সে রাগে ফুঁসতে লাগল—বজ্জাত ইঁদুরগুলোর জ্বালায় আর পারার জো নেই! একেবারে হাড্ডি পর্যন্ত জ্বালিয়ে খেল! বিড়ালটি গোরে যাওয়ার পর ইঁদুরগুলো যেন রীতিমত রাহাজানি শুরু করে দিয়েছে। অরাজকতায় পেয়ে বসেছে দেখছি! তোদের ব্যবস্থা আজ রাত্রেই করছি। কল পেতে এক একটি করে ধরব আর কচুকাটা করে ছাড়ব। কিন্তু আমি এখন খদ্দের নওজোয়ানটিকে বলি কি! একদিন আগে ফরমাস দিয়ে গেল আর আমি তাকে মাল জোগান দিতে পারলাম না! কথার খেলাপ করলাম।

নেউলটি তখন ঘরের পিছনে ঝোপের আড়ালে বসে। আউরতটির কথা বিলকুল শুনতে পেল। হাসল। বিলকুল গোস্সা ও ঝামেলা ইঁদুরটির ওপর দিয়েই তবে যাচ্ছে—উল্লসিত হয়ে সে ভাবল।

এবার থেকে আউরতটি রোজ রাত্রে ক্ষীরার বীজের ডাল বানিয়ে রাখে আর নেউলটি চুপিচুপি এসে ভুরিভোজন করে যায়।

রোজ সকালে নিদ টুটলে আউরতটি ঝুড়িটি টেনে কাছে নেয়! ব্যস, তারপরই ইঁদুরের আদ্য শ্রাদ্ধ শুরু করে দেয়। তার গোস্সা এমন পঞ্চমে চড়ে যায় যে, গস্ গস্ করতে করতে বলে—'আজ রাত্রেই তোর মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি। আজ রাত্রে আর নিদ যাবো না, জেগেই কাটিয়ে দেব। তারপর লাঠির ঘায়ে চৌদ্দপুরুষের নাম

ভুলিয়ে মারব।'

নেউলটি ঝোপের আড়াল থেকে সব শুনল। গোঁফের ফাঁক দিয়ে দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসল। তারপর গুটিগুটি ইঁদুরের কাছে গিয়ে বল্‌ল—'দোস্ত, তোমার মত হাঁদারাম আর দ্বিতীয়টি দেখি নি। তোমার ঘরের মালকিন ঝুড়ি বোঝাই করে ক্ষীরার বীজের ডাল রেখে দেয় আর তুমি কিনা উপোষ করে দিন কাটাচ্ছ! রাত্রে গা গতর একটু নাড়াচাড়া করলেই তো দানাপানি জোটাতে পার। যাক, আজকে খবর দিলাম। পেট পুরে খেয়ে নিও। আমি রোজই খাই, কোন ঝুটঝামেলাই নেই।

ইঁদুরটি দেখল, নেউলটি প্রকৃত দোস্তের কাজই করেছে। নইলে কে আগ বাড়িয়ে নিজের খানাপিনার ভাগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে? রাত্রি একটু গভীর হলেই হাঁদারাম ইঁদুরটি খাটিয়ার তলায় ঢুকে ঝুড়ি থেকে ক্ষীরার বীজের ডাল খেতে লেগে গেল। আউরতটি খট্ খট্ আওয়াজ শুনে লাঠি নিয়ে খুবই সন্তর্পণে খাটিয়া থেকে নামল। বেধড়ক লাঠি চালিয়ে ইঁদুরের দফারফা করে দিল।

জিগরী দোস্তের কিস্‌সা

ইঁদুরের চরম পরিণতি দেখে নেউলটি কামরার পিছনে লেজ খাড়া করে আনন্দে নাচানাচি জুড়ে দিল।

বেগম শাহরাজাদ ইঁদুর আর নেউলের কিস্‌সা শেষ করে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমার কিস্‌সা যদি সত্যি আপনাকে আনন্দ দিয়ে থাকে তবে আরও কিস্‌সা আমি শোনাতে পারি।'

বাদশাহ শারিয়ার বল্‌লেন—'পেয়ারি, একটি জিগরী দোস্তের কিস্‌সা শোনাও।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক দেশে এক সময় একটি কাউয়া আর কাঠবিড়ালির মধ্যে দোস্তি গড়ে উঠেছিল। সত্যি বলতে কি তারা ছিল যাকে বলে একেবারে জিগরী দোস্ত।

এক সকালে কাউয়া আর কাঠবিড়ালিটি এক মোটাসোটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে খোশ মেজাজে কথাবার্তা বলছিল। এমন সময় ইয়া তাগড়াই এক শের সেখানে হাজির হ'ল। শেরটি আচমকা এক হাঁক দিল। ব্যস, কাঠবিড়ালিটির কলিজা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

এদিকে শেরটির তর্জন গর্জন শুনে কাউয়াটি আচমকা উড়ে পাশের এক গাছের মগ ডালে গিয়ে বসল। কিন্তু কাঠবিড়ালিটি হঠাৎ করে কোন ফিকির বের করতে পারল না, কোথায় গিয়ে লুকিয়ে থেকে জান বাঁচাতে পারে!

কাঁদো কাঁদো স্বরে কাঠবিড়ালিটি কাউয়াটিকে বল্‌ল—'দোস্ত, এখন কি ফিকির করি বল তো? এমন কোন বুদ্ধি দাও যাতে আমার জান বাঁচতে পারে।'

কাউয়াটি মুখ কাচুমাচু করে বল্‌ল—'এতো মহা মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল দেখছি। কি করে যে তোমার মুশকিল আসান হতে পারে মাথায়ই আসছে না। শেরটি খুব কাছেই চলে এসেছে। এক্ষুণি হয়ত হুঙ্কার দিয়ে তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।'

কাউয়াটি তার দোস্ত কাঠবিড়ালিটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখতে পেল পাশের ময়দানে এক পাল ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। আর তাদের মধ্যে কয়েকটি শেরের মতই ইয়া তাগড়াই শিকারী কুকুরও রয়েছে। শেরের খপ্পর থেকে ভেড়াগুলোর জান বাঁচাবার জন্য ভেড়ার মালিক কুকুরগুলোকে রাখে।

ভেড়া আর কুকুরগুলোকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কাউয়াটি ডানা মেল্‌ল। উড়তে উড়তে গিয়ে ঠোকর মেরে মেরে শেরটির চোখ কানা করে দেবার জোগাড় করল। সে রাগে দাঁত কিড়মিড় করে তর্জন গর্জন করল বটে কিন্তু সুচতুর কাউয়াটিকে দমাতে পারল না। ঠোকর মেরেই সে পালিয়ে যায়। কুকুরগুলোও এবার রীতিমত ক্ষেপে গেল। তারা তাকে লক্ষ্য করে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তেড়ে যায় আর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে বাঘটির দিকে।

এদিকে এতগুলো কুকুরের তর্জন গর্জন শুনে শের বেচারার কলিজা শুকিয়ে গেল। ভাবল, কুকুরগুলি বুঝি তাকে লক্ষ্য করেই তেড়ে আসছে। ব্যস, আর দেরি না, লেজ তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গভীর বনের দিকে পালিয়ে গেল।

কাউয়াটি কাছে আসতেই কাঠবিড়ালিটি বল্‌ল—'দোস্ত, সত্যি তুমি আমার জিগরী দোস্ত।'

কিস্‌সা শেষ করে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কিছু কিছু দোস্ত দুনিয়ায় এমন আছে যারা তাদের দোস্তকে রক্ষা করতে জান পর্যন্ত কবুল করতে দ্বিধা করে না।

আলী ইবন বকর ও সামস অল-নাহারের কিস্‌সা

বাদশাহ শারিয়ার-এর অত্যুগ্র আগ্রহে বেগম শাহরাজাদ এবার আলী ইবন্ বকর ও সামস অল-নাহার-এর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক সময় বাগদাদ নগরে আবু অল-হাসান নামে এক বণিক বাস করত। খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর সময়ের কথা বলছি। আবু অল-হাসান ছিল এক পোশাক বিক্রেতা। বাদশাহ, সুলতান, উজির, নাজির ও আমীর-ওমরাহদের ব্যবহারের উপযোগী বহুমূল্য চকচকে ঝকঝকে পোশাক তার দোকানে সর্বদা মজুত থাকত। এ মুলুক-সে মুলুক ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে সে নিত্য নতুন কায়দা কলমের পোশাক সংগ্রহ করত। পোশাক আশাক ছাড়া হীরা জহরতের হরেক কিসিমের গহনাপত্রও তার দোকানে পাওয়া যেত। দোকানের এক ধারে খোজাদের পছন্দসই পোশাকও ঢেঁই করা থাকত।

বাদশাহের হারেমের খোঁজারা তো আবু অল-হাসান-এর নামে একেবারে অজ্ঞান। একটি সাধারণ টুপি খরিদ করতে গেলেও তারা তার দোকানে হাজির হয়। বাদশাহের ও তাঁর পরিবারের পোশাক আশাক খরিদের ব্যাপারে খোজাদের ভূমিকাও কম নয়। তাই দোকানি তাদের খাতিরও করে খুবই। গুলাব পানির সরবৎ, সুন্দর খুসবুওয়ালা মিঠা পান ও টুকিটাকি আরও কত কিছু দিয়ে যে তাদের দিল্‌কে খুশি করার কোশিস করত তার ইয়ত্তা নেই। আবার সামানপত্রের দামের ওপরও তাদের দস্তরি মিলত।

হাসানের ব্যবহার ছিল খুব অমায়িক। লঘু-গুরু বিচার করে বাৎচিৎ কি করে করতে হয় তা তার ভালই রপ্ত ছিল। তাই খলিফা হারুণ-অল-রসিদও মাঝে-মধ্যে হাসান-এর দোকানে হাজির হতেন। তাঁর খুবসুরৎ চেহারা ছবি এবং দিলখোলা ব্যবহার খলিফাকে আকৃষ্ট করেছিল।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ বণিক আবু হাসান'কে এতই স্নেহ করতেন যে, তার প্রাসাদে কোন উৎসব অনুষ্ঠান হলে তাকে নিমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না। তাছাড়াও খলিফার ঢালাও নির্দেশ ছিল, হাসানকে যেন যে কোন সময় প্রাসাদে ঢুকতে দেয়া হয়।

জাঁহাপনা এবার শুনুন, খুবসুরৎ নওজোয়ান হাসান-এর সঙ্গে আমীর-ওমরাহদের পরিবারের বিবি আর লেড়কিদের ব্যাপারের কথা। তারাও অবাধে তার দোকানে যাতায়াত করত। দীর্ঘ সময় ধরে পোশাক আশাক বাছাবাছি করত। পছন্দ মাফিক কেনাকাটা করে ঘরে ফিরত।

পারস্যের সুলতানের লেড়কার নাম ছিল শাহজাদা আলী ইবন বকর। বণিক হাসান-এর সঙ্গে তার খুব দোস্তী ছিল। ফলে তার দোকানে আলী ইবন বকর খুবই যাতায়াত করত।

এক বিকালে শাহজাদা আলী ইবন বকর তার দোস্ত হাসান-এর দোকানে বসে বাতচিত করছে, এমন সময় দোকানের দরওয়াজায় নয় দশটি খুবসুরৎ লেড়কি এসে দাঁড়াল। তাদের সঙ্গী একটি লেড়কি খচ্চরের পিঠে বসে। তার পোশাক আশাক খুব দামী। চকচকে ঝকঝকে। সুরৎও খুবই মনমৌজি। বোরখার নাকাবের জালের ফাঁক দিয়ে তার মুখের যে-অংশটুকু দেখা যায় তাতেই শাহজাদা আলী ইবন বকর-এর কলিজাটি নাচানাচি দাপাদাপি শুরু করে দিল।

খুবসুরৎ লেড়কিটি খচ্চরের পিঠ থেকে নামল। পদ্মের মত পা দুটো আলতো করে ফেলে ফেলে দোকানের দিকে এগোতে লাগল। হাসান ঝট করে জায়গা থেকে উঠে সাদর অভ্যর্থনা করে তাকে দোকানের ভেতর নিয়ে গেল। আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত

হয়ে বল্ল—'আপনার শুভ পদার্পণে আজ ধন্য হলাম।'

খুবসুরৎ লেড়কিটি ধীর-পায়ে এগিয়ে হাসান-এর নির্দেশিত মখমলের গদিতে গিয়ে বসল।

হাসান কর্মচারীর ওপর ভরসা করতে না পেরে একের পর এক চুড়িদার আর কামিজ প্রভৃতি তাকে দেখিয়ে সামনে ঢেঁই করে ফেল্ল। আর লেড়কি পছন্দ করায় এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, মুখের নাকাবটি কখন সরে গেছে সে হুঁসও ছিল না তার। সত্যি বলতে কি বণিক হাসান তার সুপরিচিত। তার সামনে লজ্জা শরমের তেমন কিছু নেই। কিন্তু অন্য এক নওজোয়ান যে রয়েছে। তার সামনে নাকাবটি খুলে পড়া বাস্তবিকই শরমের ব্যাপারই বটে। শাহাজাদা আলী ইবন বকর কিন্তু আকস্মিক এ সুযোগটিকে কাজে লাগাতে ভুল করল না। অপলক চোখে তার সুরৎটুকু নিরীক্ষণ করতে লাগল। আপন মনে ব'লে উঠল—'শোভন আল্লাহ! কী সুরৎ!'

সত্যি লেড়কিটির সুরৎ অতুলনীয়। একেবারেই অনন্যা। রূপের আভা চোখ দুটো ঝলসে দেয়। তামান দুনিয়ার সুরৎ যেন এককাট্টা করে লেড়কিটির গায়ে লেপে দেওয়া হয়েছে। শাহজাদা আলী ইবন বকর এক ঝলক লেড়কিটির মুখের দিকে তাকাতেই তার বুকের ভেতরে কলিজাটায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। শরীরের সব কটা স্নায়ু একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। তার মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায়। তার দিল্ এমন চঞ্চল হয়ে উঠল যে, এখান থেকে দৌড়ে পালাতে পারলে সে যেন স্বস্তি পায়। অসহ্য! একেবারেই অসহ্য! এত সুরৎ তার চোখ দুটো সইতে পারছে না।

লেড়কিটিও কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়। তার চোখ দুটোও চঞ্চল হয়ে উঠল। আড়চোখে নওজোয়ানটিকে বার কয়েক দেখে নিল। তার মধ্যে যে আকস্মিক অস্থিরতা ভর করেছে তা সে ভালই বুঝতে পারল।

শাহজাদা আলী ইবন বকর আস্তে আস্তে কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

শাহাজাদা আলী ইবন বকরকে উঠে যেতে দেখে খুবসুরৎ লেড়কিটি ঝট্ করে দাঁড়িয়ে বল্ল—'ছিঃ ছিঃ! আমার জন্য আপনার দোকানের একটি খদ্দের হাতছাড়া হবে তা কি করে সম্ভব! এক কাজ করি, আমিই বরং চলে যাচ্ছি। আমি গোস্সা করে একথা বলছি না। আমি না হয় অন্য এক সময়ে এসে—'

তাকে মুখের কথাটি শেষ করতে না দিয়েই শাহাজাদা আলী ইবন বকর ব'লে উঠল—'আল্লাতাল্লার নামে খসম খেয়ে বলছি আমি কিন্তু আপনার উপস্থিতির জন্য দোকান ছেড়ে যাচ্ছি না। তবে এ-ও সত্যি, আপনার মুখটি দেখার পর মুহূর্ত থেকে কলিজায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছি। যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন এ-যন্ত্রণা, কিসের যন্ত্রণা এবং কেমন যন্ত্রণা তবে কিন্তু আমাকে শরমে ফেলবেন। আমি নিজেই জানি না, আপনাকে কি করে তা বলব? অবর্ণনীয় ও অভাবনীয় সে-যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই আমি আপনার সংশ্রব থেকে দূরে চলে যেতে চাইছি। এতে যদি কোন গোস্তাকী হয়ে থাকে তবে মাফ করে দেবেন।'

আলী ইবন-এর সুন্দর সুন্দর কথাগুলো তার দিলে খুব ধরল, দাগ কাটল। আপন মনে বলে উঠল—'নওজোয়ানটির বাৎ বহুৎ আচ্ছা! চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খুবসুরৎ নওজোয়ানটির দিকে। হাসান-এর দিকে সামান্য ঝুঁকে অনুচ্চ কণ্ঠে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্ল—'এ-নওজোয়ানটি কে? কোথায় থাকে?'

—'আলী ইবন বকর তার নাম। খুব খানদানি বংশের লেড়কা। প্রাচীন পারস্য শাহদের বংশে জন্ম। এর সুরৎ যেমন চোখে লাগার মত তেমনি মনটিও খুবই উঁচু।'

—'হ্যাঁ, খুবসুরৎ নওজোয়ানই বটে।

লেড়কিটি যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। সে এবার হাসান-এর দিকে ফিরে অনুরোধের স্বরে বল্ল—'আমি চাই আপনারা একবারটি আমাদের প্রাসাদে যান। যদি বলেন, তবে আমি এক খোজাকে পাঠিয়ে দেব আপনাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য। আসলে আপনার দোস্তকে একবারটি দেখাতে চাচ্ছি, বাগদাদের সুলতানের হারেমে যে সব আউরত রয়েছে তারা পারস্যের সুলতানের হারেমের আউরতদের তুলনায় সুরতের বিচারে একেবারে ফেলনা নয়।'

হাসান সুচতুর। মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়ায়। সওদাগরি কারবার করে। বুদ্ধি-বিবেচনা খুবই পাকা। অতএব তার উদ্দেশ্য বুঝতে কোন অসুবিধাই হ'ল না। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'আপনার আদেশ শিরোধার্য। দেখবেন, সময় মত আমরা মানিক-জোড় আপনার প্রাসাদের দরজায় হাজির হ'ব।'

লেড়কিটি আলী ইবন বকর-এর দিকে আড়চোখে তাকাল মুহূর্তের জন্য। আচমকা চোখের বাণ মারল। ঝট্ করে নাকাবটি দিয়ে ভাল ভাবে মুখ ঢেকে ফেল্ল। এবার তার বেলনের মত নিটোল ধবধবে পা দুটোতে ছন্দ তুলে তুলে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে খচ্চরটির পিঠে চেপে বসল।

খুবসুরৎ লেকড়িটি বিদায় নিলে হাসান বল্ল—'কি দোস্ত, কেমন বুঝলে? প্রথম দর্শনেই নিমন্ত্রণ জুটে গেল। তোমার নসীব খুবই ভাল বলতে হবে!'

আলী ইবন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—'লেড়কিটি আমার কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দিল! কিন্তু দোস্ত, এর পরিচয় তো এখন পর্যন্ত জানতে পারলাম না।'

—'আরে দোস্ত, উনি হচ্ছেন খলিফা হারুণ-অল-রসিদের সবচেয়ে বড় পেয়ারের বিবি। তাঁর শিরোমণিও বলতে পার। খাস বেগমের ওপর টেক্কা দিয়ে চলেন। হবে না, স্বয়ং খলিফা থেকে শুরু করে বাঁদী-নফর সবার ওপরেই দাপটা খাটান। আর খলিফা তার ওপর বিশ্বাসও রাখেন যথেষ্ট। নইলে দেখলে না, তার সঙ্গে যারা ছিল সবাই লেড়কি। একটিও খোজা নফর ছিল না। হারেমেও তাঁর ওপর নজর রাখার জন্য কোন খোজাকে নিযুক্ত করা হয় নি। এত সতর্কতা, এমন কড়া পাহারার মধ্যেও হারেমের বেগমরা কামজ্বালা নেভানোর জন্য পরপুরুষের সঙ্গ লাভের জন্য উতলা হয়। দেহদান করে। সম্ভোগের মাধ্যমে কামজ্বালা নেভায়। তাই তো খোজা নফর বেগমদের ওপর কড়া নজরদারি করে। কিন্তু এইমাত্র যে হুরীর মত খুবসুরৎ লেড়কিকে দেখলে তামাম বাগদাদ নগরে তার মত খুবসুরৎ লেড়কি দ্বিতীয়টি মিল্‌ব না। কিন্তু তাজ্জব বাত, এর নামে কোন কেলেঙ্কারীর কথা নিয়ে প্রাসাদে বা নগরে কোনদিনই টি টি পড়ে নি। দোস্ত এত কিছু বল্লাম কিন্তু আসলি বাৎ-ই এখন বলা হ'ল না। তোমার খোয়াবের হুরীটির নাম সামস অল-নাহার।

দুই দোস্ত যখন বেহেস্তের হুরীর খুবসুরৎ সামস অল-নাহার-এর সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করছে ঠিক তখনই এক নিগ্রো নফর দোকানে ঢুকল, সালাম জানিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বল্ল—'বেগম সাহেবা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য। মেহেরবানি করে চলুন আপনারা।'

হাসান তার দোস্ত আলী ইবনকে নিয়ে খোজা নিগ্রোটির সঙ্গে খলিফার প্রাসাদের উদ্দেশ্যে পা-বাড়াল।

আলী ইবন পথে আসতে আসতে ভেবেছিল সামস অল-নাহারকে কয়েকটি কবিতা শুনিয়ে চমক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু প্রাসাদে পা দেওয়া মাত্র সামস অল-নাহার মেহমানদের নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, কবিতা শোনানোর মত ফুরসৎই পেল না।

হাসান আর আলী ইবন খানাপিনা সেরে সামান্য বিশ্রাম নিল। তারপর সামস অল-নাহার তাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রাসাদটি দেখাতে লাগল। সব শেষে সুসজ্জিত একটি কামরায় তাদের বসতে বলে কিছু সময়ের জন্য তাদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

এমন সময় দশ-দশটি খুবসুরৎ লেড়কি, কেউ ষোড়শী, কেউ বা অষ্টাদশী—ব্যস্ত পায়ে কামরায় ঢুকে মেহমানদের ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা উভয়েই বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের সুরৎ দেখতে লাগল।

এমন সময় প্রভাতের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' তিপান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার আবার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, দশটি খুবসুরৎ লেড়কি কামরায় ঢুকল। আলী ইবন আর আবুল হাসান সবিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের প্রত্যেকের হাতেই কোন না কোন তারের বাদ্যযন্ত্র। সবাই সুন্দর ভঙ্গিতে বসে করুণ সুর বাজাতে লাগল। দিল্ উতলা করা সুর। কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া বাদ্যযন্ত্রের সুর।

এমন সময় দশ-বারোটি ইয়া তাগড়াই নিগ্রো ক্রীতদাসী একটি রুপোর বেদী বয়ে নিয়ে এল। তার ওপরে উপবিষ্টা এক যুবতী। নাকাবের জালটি এতই মিহি যে, তার আপেলের মত রক্তাভ ও টসটসে গাল দুটো তো সামান্য ব্যাপার, এমন কি চোখের পাতাগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

নিগ্রো ক্রীতদাসীদের বক্ষ অনাবৃত। এক চিলতে কাপড় পর্যন্ত নেই। আর নিম্নাংশ? সেও অনাবৃতই বলা চলে। অতি মিহিসূতো দিয়ে বোনা এক চিলতে করে কাপড় কোমর থেকে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটুকু থাকা আর না থাকা দু-ই সমান।

রূপসী সামস অল-নাহার নাকাবের ফাঁক দিয়ে আলী ইবনকে চোখের বাণ মারল। পদ্মের পাঁপড়ির মত ঠোঁট দুটো মেলে মুচকি হাসল। আলী ইবনও অনুরূপ হাসির মাধ্যমে তার জবাব দিল।

আবুল হাসান সুযোগ বুঝে আলী ইবন এর দিকে সরে আসে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে—'কি দোস্ত, কেমন

বুঝছ?'

—'দোস্ত, সত্যি আমি ভাবতেও পারি নি, নাকাবের আড়ালে এমন যাদু থাকতে পারে! এ হুরী আমার দিল্ কেড়ে নিয়েছে, কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। আর বুকের ভেতর লক্‌লকে আগুনের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে পাগল করে দিল। জানি না, আমার নসীব আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে।'

এদিকে খুবসুরৎ লেড়কিরা গানের সুর বাজিয়েই চলেছে। বিরহের সুর। এমন সময় সামস অল-নাহার-এর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল।

আলী ইবন বকর-এর পক্ষেও চোখের পানি ধরে রাখা সম্ভব হ'ল না। কোন বাদ্যযন্ত্র আদমির দিলে এমন বিরহজ্বালা ধরিয়ে দিতে পারে তা আলী ইবন অন্ততঃ খোয়াবের মধ্যেও কোনদিন মুহূর্তের জন্য ভাবে নি।

সামস অল-নাহার এবার চোখের পানি মুছতে পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে একটু সামলে নেবার চেষ্টা করে। আলী ইবন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। লম্বা লম্বা পায়ে পর্দা ঠেলে তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়।

সামস অল-নাহার হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে আচমকা আলী ইবন এর বুকের ওপরে পড়ে গেল। হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার যৌবন ও পৌরুষভরা শরীরটিকে। ক্রমে তার হাত দুটো সুদৃঢ় হয়ে আসতে লাগল। দৃঢ়.... আরও.....আরও দৃঢ়ভাবে জাপ্‌টে ধরল

তাকে। নিটোল স্তন দুটোকে তার প্রশস্ত বুকের চাপে দলিত পিষ্ট করে ফেলতে চাইছে। তার দেহে যেন দৈত্যের শক্তি ভর করেছে। যৌবনজ্বালা তো এমন করে আগে কোনদিন তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দেয় নি। ইতিপূর্বে প্রৌঢ় খলিফাকে বহুবার দেহদান করেছে বটে। কিন্তু আজকের মত দিল দরিয়া হয়ে নিজেকে পুরোপুরি বিলিয়ে দিতে পারে নি। কিন্তু আজ-এ নওজোয়ান আলী ইবনকে দিল্ নিঃশেষে উজাড় করে দেওয়ার জন্য যেন সে উন্মাদিনীর প্রায় হয়ে উঠেছে।

পর মুহূর্তেই আলী ইবন নিজেকে মুক্ত করে নেয়। ঢুকে যায় কামরার ভেতরে। অনিশ্চিত আশংকা তার মন প্রাণ জুড়ে বসল। ভাবল, সদ্য যে ঘটনাটি ঘটে গেছে তা নির্ঘাৎ প্রাসাদের সবাই জেনে গেছে। এসব কথা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আবুল হাসান এতক্ষণ কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিল, কে জানে। সে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বল্‌ল—'তোমাকে তলব করেছে। যাও, ঘুরে এসো—'

আলী ইবন এবার আবুল হাসান-এর পিছন পিছন সুজ্জিত একটি কামরায় ঢুকল। রূপসী সামস অল-নাহার দরজার দিকে মুখ করে পালঙ্কের ওপরে মনলোভা ভঙ্গিতে বসে । আলী ইবন এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মুচকি হেসে অভ্যর্থনা জানাল।

সামস অল-নাহার এবার আবুল হাসান-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌ল—'তোমাকে সামান্য সুক্‌রিয়া জানিয়ে বা মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ছোট করার কোশিস আমি করব না। তবে একথা স্বীকার না করলে খোদাতাল্লার কাছে অপরাধী হতে হবে, একমাত্র তোমার জন্যই আমি এ-অমূল্য রতন লাভ করেছি। জিন্দেগীকে নতুন করে ভোগ করার পথের হদিস পেয়েছি। দেহদান-সম্ভোগ আর পেয়ার মহব্বতের মধ্যে যে আসমান-জমিন ফারাক আজই তা আমি প্রথম উপলব্ধি করার সুযোগ পেলাম। সবই কিন্তু তোমারই অবদান, আবুল হাসান শুধু এটুকু জেনে রাখ, আমি নিমকহারাম বেইমান নই। তোমার কথা আমার দিলে গাঁথা থাকবে।'

—'মালকিন, আপনি যে মুখে বল্‌লেন, আমার কথা স্মরণে রাখবেন তা শুনেই আমি ধন্য ও যারপরনাই খুশি।'

সামস অল-নাহার এবার আলী ইবনকে লক্ষ্য করে ভাব বিমুগ্ধ স্বরে বলল—'মেহবুব আমার! তোমার পেয়ার মহব্বৎ নিখাদ আমি বুঝেছি। আর তা বুঝেছি বলেই তোমাকে আমার বুকের সর্ব শীর্ষে স্থান করে দিয়েছি। লেড়কিরা অনেককে বুকে তুলে নিতে পারে বটে। কিন্তু এখানে? কেবলমাত্র একজনের জন্যই এটি খালি রেখে দেয়। কারো বা জিন্দেগীই কেটে যায়। কিন্তু এ স্থানটি ফাঁকাই

রয়ে যায়। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বল্‌ল—'মেহবুব, মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে তুমি আমার বুকের সে-বিশেষ স্থানটিতে স্থায়ী আসন লাভ করে ফেলেছ।'

আবার গানা-বাজনা শুরু হয়। এক নিগ্রো ক্রীতদাসী সরাবের বোতল ও পেয়ালা দিয়ে গেল। সামস অল-নাহার মেহমান আবুল হাসান এবং আলী ইবনকে নিজে হাতে সরাব পরিবেশন করল। সরাবের নেশা একটু একটু করে তাদের দেহে ভর করতে লাগল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' চুয়ান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোন রকম ভূমিকার অবতারণা না করেই তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশটুকু বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সামস অল-নাহার তার মেহমান আবুল হাসান এবং আলী ইবনকে নিজের হাতে সরাব পবিবেশন করল এবং নিজেও এক পেয়ালা গলায় ঢালল। এবার তার মেহবুবকে সুললিত কণ্ঠের গানা শোনাবার জন্য তৎপর হ'ল। কী মিষ্টি-মধুর তার গলা! আর গানার কথা ও সুরও দিল্‌কে আকুল করে দেয়।

আলী ইবন তন্ময় হয়ে তার মেহবুবার কিন্নরকণ্ঠের গানা শুনতে লাগল। তারা কতক্ষণ যে এমন বিভোর হয়ে সুরের সায়রে ডুবেছিল নিজেরাই তা জানে না। তারা এমন এক জগতে পৌঁছাল যেখানে শুধুই গানা আর গানা। মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেল তাদের দিনারের পাহাড়ের কথা, সওদাগরী কারবারের কথা আর উজির নাজির ও আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে তার হৃদ্যতার সম্পর্কের কথা। এমন কি সে যে এ-দুনিয়ারই একজন সেকথাও কোন্ অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

এক সময় মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আলী ইবন-এর দু'চোখের কোল বেয়ে নেমে আসে পানির ধারা। কান্নায় ভেঙে পড়ে। শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। উদ্‌ভ্রান্তের মত আবুল হাসান'কে আলিঙ্গন ক'রে বলতে লাগল—'দোস্ত এ কী করলে তুমি? কোথায় নিয়ে এসেছ আমাকে? কেন নিয়ে এসেছ? জীবনে যে এত গান আছে, সুর আছে আর আছে আনন্দ তা জানতাম না—সে-ই তো অনেক ভাল ছিল। আমার একটি মাত্রই ডর এক সময় না এক সময় এ-মধুরতম রাত্রি ফুরিয়ে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে সুমধুর সঙ্গীত লহরী—তখন, তখন কি নিয়ে বাঁচব দোস্ত?'

—'তোমাকে নিয়ে আর পারি না দোস্ত! ভবিষ্যতের কথা ভেবে তুমি বর্তমানের আনন্দমুখর রাত্রিটিকে অস্বীকার করবে? এমুহূর্তে যে-অমৃতের স্বাদ পেলে কাল যদি তার তিলমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে ; তাতেই কি আসে যায়। আজকের মজাটুকু আকণ্ঠ পান করে নাও, কালকের ভাবনা কালই আবার নতুন করে ভাবা যাবে।'

আবুল হাসান কথা বলতে বলতে দু'খানা বাঁশি হাতে তুলে নিল। একটি বাঁশি নিজের হাতে রাখল আর দ্বিতীয়টি আলী ইবন-এর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'দোস্ত, বাজাও। এসো আমরা রূপসী নাহার এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাই, নাচি—মজা লুঠি।

এমন করে সুরের সায়রে সবাই যখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত ঠিক তখনই প্রধান ফটক থেকে খবর এসেছে—মাসরুর হাজির। শুধুমাত্র সে-ই নয়, সঙ্গে আফিফ-ও রয়েছে। আর কয়েকজন খোজা রক্ষী।

সামস অল-নাহার এবার আলী ইবন এবং আবুল হাসানকে লক্ষ করে বল্‌ল—'মাসরুর প্রধান ফটকে অপেক্ষা করছে। তোমাদের সঙ্গে বাৎচিৎ করতে এসেছে।'

মাসরুর-এর নাম শুনেই আলী ইবন এবং আবুল হাসান যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। চোখ-মুখ মুহূর্তের মধ্যে চকের মত ফ্যাকাশে হয়ে এল।

সামস অল-নাহার পরিস্থিতি সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরে নিজে থেকেই বল্‌ল—'থাক, তোমাদের এ নিয়ে ভাবতে হবে না। যা করার আমিই করছি। আমি নিজেই যাচ্ছি মাসরুর-এর মোকাবেলা করতে।'

আলী ইবন আর আবুল হাসানকে কামরার ভেতরে রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা লটকে দেওয়া হ'ল। আর দাসদাসী নফরবাঁদী সবাই অনেক আগেই নীরবে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। সামস অল-নাহার সদর-দরজার দিকে এগিয়ে যায় মাসরুর মেজাজ ঠাণ্ডা করতে।

কামরার দরওয়াজা-জানালা সব বন্ধ। আলী ইবন গোমড়া মুখে বসে রইল। আবুল হাসান তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌ল—'দোস্ত, বিপদ যখন মাথার ওপর তখন ভেঙে পড়ার অর্থই হ'ল বিপদের হাতে আত্মসমর্পণ করা। দিল্‌কে শক্ত কর। সোজা হয়ে খাড়া হও। খোদাতাল্লার ওপর ভরসা রাখ।'

আলী ইবন ফোঁস করে উঠল—'খোদাতাল্লা! খোদাতাল্লা কি বলে দিয়েছেন, যাও হে লেড়কিদের নিয়ে মজা লুঠো?'

—'দোস্ত, মাথা ঠাণ্ডা কর। ধৈর্যে বুকবাঁধ। মহব্বতের পথ মোটেই মসৃণ নয়। বন্ধুর—একেবারেই বন্ধুর। সতর্কতার সঙ্গে ধীর পদক্ষেপের মাধ্যমে যে ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারে একমাত্র সেই মহব্বতের ফয়দা লুঠতে পারে।'

সামস অল-নাহার বাগিচায় গিয়ে এক শ্বেতপাথরের বেদীর ওপর বসল। এক বাঁদীকে বল্‌ল মাসরুরকে তার কাছে নিয়ে আসতে। খলিফার দেহরক্ষী। নিজে তার সঙ্গে ফটকে গিয়ে

মোলাকাৎ করা তার পক্ষে ইজ্জৎহানির ব্যাপার।

মাসরুর সামস অল-নাহার-এর তলব পেয়ে বাগিচায় তার সামনে হাজির হয়ে সালাম জানাল। কিন্তু এরকম নগ্নপ্রায় অবস্থায় তাকে দেখবে ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি। সে ধরতে গেলে ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বল্‌ল—'মালকিন, খলিফা আপনাকে স্মরণ করেছেন, খবরটি দিতে এসেছি। বহুৎ দিন আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ নেই। তাই তাঁর দিল্‌ উতলা। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, সে যদি নিজে আসে, বহুৎ আচ্ছা। সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আর যদি আমাকে যেতে বলে তবে আমি গিয়ে তার সঙ্গে মোলাকাৎ করব।'

সামস অল-নাহার আমতা আমতা করে বল্‌ল—'তাঁকে আমার নাম করে বলবে, তিনি যদি বাঁদীর কামরায় হাজির হন তবে আমি খুবই খুশী হ'ব।'

মাসরুর সালাম জানিয়ে বিদায় নিল।

এবার সামস অল-নাহার উন্মাদিনীর মত ছুটে গিয়ে ওই ঘরের ভেতর ঢুকল। আলী ইবন-এর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্নাভেজা কণ্ঠে বল্‌ল—'আলী, মেহবুব আমার। কেন তুমি আমার বুকে এমন করে আগুন ধরিয়ে দিলে? কেন এমন করে মহব্বতের বাতি জ্বালিয়ে দিলে? তোমার সঙ্গে কেনই বা আমার মোলাকাৎ হ'ল। নইলে গোরে যাওয়ার আগে পেয়ার মহব্বত কি বস্তু আমার মালুম ছিল না। শুধু জানতাম পুরুষকে খুশী করার জন্যই লেড়কিদের জন্ম। শুধুই দেয়া, কিছুই পাওয়ার নেই। আজ তুমি আমাকে প্রথম শিখালে দেয়ার মাধ্যমেই পাওয়াও যায়। কিন্তু নসীবের ফের তোমাকে আমি কাছে রাখতে পারব না। যাকে চাই তাকে পাব না। কিন্তু যাকে আমার দিল্‌ চায় না সে আমার এ-শরীরটিকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে—অসহ্য! চমৎকার খোদাতালার মর্জি।'

আলী ইবন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগ মধুর স্বরে বল্‌ল—'ফিন মিছে চোখের পানি ফেলছো! তোমার আলী তোমারই থাকবে। যখন, যেখানেই থাক না কেন, তোমার তসবির তার বুকে আঁকা থাকবে। দিলের আয়নায় তোমাকে সে দেখবে আর তোমার কথা ভাববে। মেহবুবা, আমি আজ যেমন তোমার তেমনি ভবিষ্যতেও তোমারই থাকব। খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমার জীবন-যৌবনে তুমিই একমাত্র নারী। পহেলা মহব্বতের মুহূর্তে আমি আমার সবটুকু পেয়ার-মহব্বত নিঃশেষে—উজাড় করে তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। অন্য কারো জন্য একতিলও সঞ্চয় করে রাখিনি।'

এমন সময় এক খোজা ছুটে এসে সামস অল-নাহারকে খবর দিল, খলিফা হারেমে আসছেন।
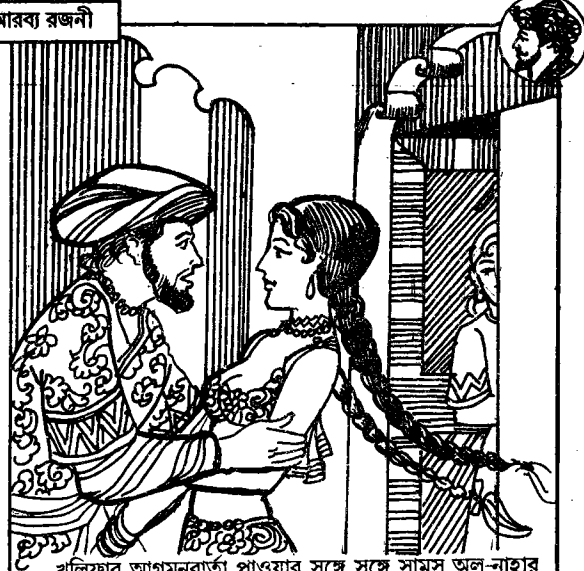
খলিফার আগমনবার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামস অল-নাহার শেষবারের মত তার মেহবুব আলী ইবনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এবার বাঁদীদের লক্ষ্য করে বল্‌ল—'প্রাসাদের ওদিকে ফটকটি খুলে খলিফাকে অভ্যর্থনা জানাও। আমি তৈরী হয়ে যাচ্ছি।'

এবার সামস অল-নাহার এর নির্দেশে এক ক্রীতদাসী আলী ইবন ও আবুল হাসানকে নিয়ে এমন একটি কামরায় ঢুকিয়ে দরওয়াজা বন্ধ করে দিল যেখান থেকে বাদশাহ যে ঘরে অবস্থান করছে সে-ঘরটি স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সে-ঘরের কেউ-ই বহু চেষ্টা করেও তাদের দেখতে পাবে না।

আলী ইবন ঘরে ঢুকেই আবুল হাসানকে বল্‌ল—'দোস্ত কামরাটি যে আন্ধার! চোখে কিছুই মালুম আসছে না।'

আবুল হাসান হাতড়ে একটি কুরশি পেয়ে বসতে বসতে বল্‌ল—'এখন জমাটবাঁধা আন্ধার বটে। কিন্তু একটু বাদেই চোখে সয়ে যাবে। তখন হয়ত সবই মালুম হবে।'

যে-ক্রীতদাসীটি তাদের ঘরে নিয়ে এসেছে সে গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্‌ল—'আপনাদের তকলিফ হবে ঠিকই কিন্তু বাত্তি জ্বালানো যাবে না। খলিফার নজরে পড়লে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধরুন।'

এ-ঘরে আন্ধার বটে। কিন্তু এরই মুখোমুখি খলিফার ঘরে বাত্তির মেলা বসেছে। বাত্তির রোশনাইয়ে হাসান ও আলী জানালার শার্সিতে চোখ রেখে খলিফার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল।

খলিফার ঘরের দরওয়াজায় পৌঁছে সামস অল-নাহার নতজানু হয়ে কুর্নিশ সেরে বল্‌ল—'খোদা আপনার ভালই করুন।'

সামস অল-নাহার খলিফার কাছে এগিয়ে গেল। খলিফা তাকে আলিঙ্গন করল। চুম্বন করতে গিয়েও মুখটি সরিয়ে নিয়ে

বল্‌ল—'চল, ছাদে গিয়ে খোলা আশমানের নিচে বসি।'

উন্মুক্ত ছাদ। একদিকে প্রমত্তা টাইগ্রিস নদী, অন্যদিকে ফুল ও ফলের বাগিচা। মাথার ওপরে অতন্দ্র প্রহরী শুক্লপক্ষের চাঁদ। বাতাসে জানা-অজানা ফুলের খুস্‌বু দিল্‌কে উদাস ব্যাকুল করে দেয়। তারই মাঝখানে রুপোর মসনদে খলিফা উপবেশন করল। পাশে রক্ষিত অন্য একটি আসন দখল করে সামস অল-নাহার। ছাদ জুড়ে নরম গালিচা বিছানো।

সামস অল-নাহার কণ্ঠস্বর সাধ্যমত মিষ্ট করে বল্‌ল—'খোদাতাল্লার অশেষ মেহেরবানী যে আজ আপনাকে কাছে পেলাম জাঁহাপনা। আপনার বিরহজ্বালায় আমি প্রতিনিয়ত দগ্ধ হই। মানুষ তো অনেক কিছুই চায় কিন্তু পায় কতটুকু? আর আপনাকে কাছে পেতে চাইলেই আমি পাব কেন? আর চাওয়াও তো সঙ্গত নয়।'

খলিফা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'সঙ্গত নয়! কেন? কেন সঙ্গত নয়?'

—'তাহলে নিতান্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দেওয়া হবে জাঁহাপনা।'

—'স্বার্থপরতা? কিসের স্বার্থপরতা? এর মধ্যে আবার স্বার্থপরতা বা আসে কোত্থেকে?'

—'জাঁহাপনা, আপনি তো আর আমার একার নন যে, চাইলেই পাব। নিজের খুশীমত, প্রাণভরে আপনাকে পাবার জন্য উদ্বেল হ'ব। আপনার হারেমে যে আমার মত রূপসীদের হাট বসিয়েছেন। তবু যে মাঝে-মধ্যে এ বাঁদীর কাছে ছুটে আসেন তার জন্য খোদাতাল্লাকে সুক্‌রিয়া জানাতেই হয়। তাঁর মেহেরবানি ছাড়া—'

—'নাহার, তোমার কাছ থেকে আমি পেয়েছি বহুৎ কিছু। কিন্তু বিনিময়ে কতটুকুই বা দিতে পেরেছি? আমি তোমার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন যদি ভেবে থাক তবে অবিচারই করা হবে। তোমার নিঃসঙ্গতার ব্যথা, মর্মবেদনা আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি। কিন্তু খলিফার কর্তব্যনিষ্ঠা আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শোন, আমার হারেমে হাজার বাঁদী-বিবি থাক না কেন আমার নাহার একজনই। আমি যে তোমার, শুধুই তোমার।'

ইতিমধ্যে একদল খুবসুরৎ লেড়কি ঘরে ঢুকল। তাদের সুরৎ যেমন আকর্ষণীয় তেমনি তাদের সোনার জরির কাজ করা ঝলমলে পোশাক। তবে তার পরিমাণ খুবই কম। দেহের খুব কম জায়গাই তারা আবৃত রেখেছে। যেটুকু ঢেকে ঢুকে না রাখলে ইজ্জৎ বাঁচে না, ব্যস সেটুকুর ওপরে মিহিজালের কাপড়ে তৈরী আচ্ছাদন চাপিয়ে দেওয়া রয়েছে।

সামস অল-নাহার এর নির্দেশে রূপসীরা গানা ধরল। বিরহ সঙ্গীত। প্রেমের সঙ্গীত গানার মধ্য দিয়ে বিরহজ্বালা যেন উপচে পড়ছে।

আলী ইবন ও আবুল হাসান'কে ক্রীতদাসীটি বল্‌ল—'হুজুর, বেগম সাহেবা লেড়কিদের এ-গানা গাইতে বল্‌ল্ব কেন, বলতে পারেন? তাঁর কলিজার জ্বালা। তাঁর দিলের দর্দ আপনার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। আপনি তার দিল্ কেড়ে দেউলিয়া করে দিয়েছেন। এখন আপনার বিরহে তার দিন গুজরান কি করে সম্ভব'?

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' পঞ্চান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সামস অল-নাহার গান শুনতে শুনতে এক সময় বিরহজ্বালা সহ্য করতে না পেরে এক লেড়কির কোলে ঢলে পড়লেন। মুহূর্তে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌ল।

সামস অল-নাহার-এর আকস্মিক ভাবান্তরটুকু আলী ইবন'কে বড়ই ভাবিয়ে তুল্‌ল। সে ফ্যাকাসে মুখে, চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে ক্রীতদাসীটিকে বল্‌ল—'আমার পেয়ারী, আমার মেহবুবার একি হালৎ হ'ল! হায় আল্লাহ! একি করলে!'

ক্রীতদাসীটি মুচকি হেসে তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌ল—'হুজুর, ঘাবড়াবেন না। বিরহজ্বালা সইতে না পেরে মাথা চক্কর মেরেছে, মূর্চ্ছা গেছেন। একটু বাদেই আবার গা-ঝাঁড়া দিয়ে উঠে পড়বেন, সামলে নেবেন নিজেকে।'

এদিকে আলী ইবন-এর মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তার মাথাও কেমন ঝিম ঝিম করছে। শরীর টলছে। গা গোলাচ্ছে। তার মধ্যেও বিরহজ্বালা প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আবুল হাসান ধরে না ফেল্‌লে হয়ত মেঝেতে পড়েই যেত।

আলী ইবন একটু স্বাভাবিকতা ফিরে পেলে ক্রীতদাসীটি তাদের প্রাসাদের খিড়কী দরওয়াজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। হাজির হ'ল টাইগ্রিস নদীর ধারে। একটি ডিঙ্গি নৌকা ঘাটেই বাঁধা ছিল। আলী ইবন ও আবুল হাসান নৌকায় উঠল। মাঝ-বয়সী মাঝি লগি মেরে মেরে ডিঙ্গিটিকে নদীর মাঝামাঝি নিয়ে গেল। এবার সেটি ভাঁটার টানে এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে ডিঙ্গিটি আবার পাড়ের দিকে এগিয়ে চলে। বিপরীত পাড়ে নিয়ে গিয়ে মাঝি ডিঙ্গি ভেড়ায়।

টাইগ্রিস নদীর এদিকটিতে দস্যু-তস্করের উপদ্রব খুব বেশী, অতর্কিতে পথচারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যথাসর্বস্ব লুটপাট করে ভেগে যায়। খুনখারাপিতেও তারা সিদ্ধহস্ত।

আবুল হাসান বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে আলী ইবন'কে নিয়ে তার এক দোস্তের বাড়ি গিয়ে উঠল। আবুল হাসানের দোস্তটি এত রাত্রে

তাদের দেখে বিস্মিত হ'ল। অভ্যর্থনা করে কামরায় নিয়ে গিয়ে বসাল। সাধ্যমত খানাপিনার বন্দোবস্ত করল। ঘরে সরাবও ছিল এক বোতল। এনে দিল। খানাপিনা সেরে আলী ইবন ও আবুল হাসান আলাদা একটি ঘরে চৌকির ওপর শুয়ে পড়ল। আবুল হাসান ক্লান্ত দেহে চৌকির ওপর শরীর এলিয়ে দিতেই নিদ এসে চোখে ভর করল। অচিরেই বেহুঁশ হয়ে সে নিদ যেতে লাগল। আলী ইবন কিন্তু কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। সামস অল-নাহার এর চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। কলিজাটিকে দরকচা মেরে দিয়েছে তার বিরহজ্বালা। এ কী মহা জ্বালায় পড়া গেল। শত কোশিস করেও দিল্ থেকে সরিয়ে নিজেকে হাল্কা করতে পারছে না। আলী ইবন সারাটি রাত্রি নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার মধ্যে বিনিদ্র অবস্থাতেই কাটাল।

সকাল হ'ল, দোস্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আলী ইবন আর আবুল হাসান আবার পথে নামল। কোনরকমে পয়দল হেঁটে আলী আবুল-এর বাড়ি পৌঁছোয়। একে বিনিদ্র রাত্রি যাপন তার ওপর পরিশ্রম তো রয়েছেই। ফলে আলী কামরায় ঢুকেই চৌকির ওপর গা এলিয়ে দিল। কখন যে তার দু'চোখের পাতা এক হয়ে গিয়েছিল বুঝতেই পারেনি।

সন্ধ্যার দিকে আবুল হাসান তার দোস্ত আলী ইবন-এর বিষাদক্লিষ্ট মনকে চাঙা করে তোলার জন্য গানা-বাজনার ব্যবস্থা করল।

আলী ইবন-এর কিছুতেই মেজাজ মর্জি শরিফ হ'ল না। সামস অল-নাহার-এর বিরহজ্বালা তার কলিজাটিকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে লাগল।

আবার নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। আবার সে-মেহবুবার চিন্তা, আবার বিরহ-যাতনা আর আবার চলতে লাগল বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ। অভিশপ্ত রাত্রি।

সকালে আবুল হাসান দোকান খুলে বসল। আলী ইবন তার কামরায়ই রয়ে গেল। একটু বেলা হলে, খানাপিনা সেরে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে, দু'দোস্ত এরকম পরিকল্পনা করার পর আবুল হাসান দোকানে গেছে।

আবুল হাসান দোকান খোলার কিছুক্ষণ বাদে সামস অল-নাহার-এর সে-ক্রীতদাসীটি হাজির হ'ল।

এদিকে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের প্রস্তুতি চলছে বুঝতে পেরে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্সা বন্ধ করলেন।

একশ' ছাপান্নতম রজনী

প্রায় মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার আবার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তার কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, ক্রীতদাসীটিকে দেখেই আবুল হাসান-এর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ঢিবঢিবানি শুরু হ'ল। সে ধরেই নিল, ক্রীতদাসীটি নির্ঘাৎ কোন না কোন ফরমান নিয়ে এসেছে। আর তা মোটেই আনন্দদায়ক নয়।'

ক্রীতদাসীটি প্রথম মুখ খুলল—'আমাকে মালকিন পাঠিয়েছেন, আলী সাহেব কেমন আছেন খোঁজ নিতে। তাঁর তবিয়ৎ আচ্ছা তো? আমার মালকিন তো খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছেন। একটু বাদে বাদে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। আর থেকে থেকে খোদা মেহেরবান......খোদা মেহেরবান করছেন।'

—'আলী উপযুক্ত বিশ্রামের পর এখন মোটামুটি সুস্থই আছে। আমরা তো দেখে এলাম, বেগম সাহেবা গানা শুনতে শুনতে এক লেড়কির ওপর আচমকা পড়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্লেন। তারপর?'

—'আপনাদের ডিঙ্গিতে তুলে দিয়ে প্রাসাদে ফিরে যাই। দেখি, বেগম সাহেবা তখনও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। আমরা যারপরনাই উদ্বিগ্ন। খলিফাও চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ এঁকে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে মুহূর্তের জন্য তিনি মুখ তুলে তাকালেন। খলিফা ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকলেন—'নাহার। মেহবুব আমার, তোমার, তোমার কি হয়েছে, বল তো? তোমার কি তকলিফ না বল্লে আমি বুঝব কি করে? বল, কি হয়েছে তোমার?'

সামস অল-নাহার তার ডান হাতটি আলতো করে খলিফার

হাতের ওপরে রাখল। কিছু বলার কোশিস করল। পারল না। কেবল তার ঠোঁট দুটো বার কয়েক তিরতির ক'রে কাঁপল। পর মুহূর্তেই আবার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

কেটে গেল, আরও কিছুটা সময়। ভোর হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সামস অল-নাহার আবার চোখ মেলে তাকাল।

অস্থিরচিত্ত খলিফা তার মাথায়-গালে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ল—'পেয়ারী, কি হয়েছে? তোমার দর্দ কোথায় আমাকে বল্‌। যদি তেমন কিছু হয় তবে না হয় হেকিমকে তলব দিচ্ছি। বল, কি তকলিফ তোমার।'

সামস অল-নাহার দম নিয়ে নিয়ে বলতে লাগল—'জাঁহাপনা কেন ঝুটমুট ভেবে আকুল হচ্ছেন? তেমন কিছুই আমার হয় নি। আসলে নতুন এক ফল খেয়েছিলাম। গরহজম হয়েছে। টাটকা ফল কিনা তাই সহ্য হয় নি।'

—'কী তাজ্জব কী বাত! ফল খেয়ে মূর্চ্ছা গেলে? হতেও পারে তৃপ্তিসহকারে খেতে পার নি হয়ত। বিদ্বেষ-ঘৃণা অশ্রদ্ধার সঙ্গে কিছু খেলে এমনটি হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয়।'

সামস অল-নাহার ম্লান হেসে বল্‌ল—'না। বরং তার বিপরীতই বলতে পারেন জাঁহাপনা। তৃপ্তির মাত্রা একটু বেশী ছিল বলেই হয়ত গরহজম হয়েছিল। আপনি ভাববেন না, ঠিক সামলে নিতে পারব।'

—'নাহার? মেহবুবা আমার, তোমার তবিয়ত সুস্থ না থাকলে আমার দিল্‌ তো সুস্থ থাকতে পারে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ তুমি নিজেকে সুস্থ রাখবে।'

সামস অল-নাহার ম্লান হাসল।

ভোর হ'ল। খলিফার তলব পেয়ে বৃদ্ধ হেকিম তার দাওয়াইয়ের বাক্স নিয়ে ছুটে এল। দাওয়াই দিল।

হেকিম সাহেবের ইলাজে সামস অল-নাহার অচিরেই স্বাভাবিকতা ফিরে পেল।

ভোর হ'ল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' সাতান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার আবার বেগম শাহরাজাদ এর কামরায় এলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সামস অল-নাহার হেকিম সাহেবের ইলাজে প্রায় স্বাভাবিকতা ফিরে পেলেন। তার বিমারি সেরে যাওয়ায় খলিফাও স্বস্তি পেলেন।'

ইতিমধ্যে আলী ইবন হাঁটতে হাঁটতে দোস্ত আবুল হাসান-এর দোকানে এল।

ক্রীতদাসীটির মুখে তার মেহবুবা সামস অল-নাহার-এর অসুস্থতার বাৎ শুনে বড়ই উৎকণ্ঠিত হ'ল।

আবুল হাসান দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলী ইবন'কে বল্‌ল—'দোস্ত আমিই যত অনিষ্টের মূল। আমারই জন্য তোমাদের দু-দুটো কলিজায় আগুন জ্বলছে। জ্বলেপুড়ে খাঁক হচ্ছে তোমাদের দিল্‌। আমিই তোমাদের পরিচয়ের যোগসূত্র। তোমাকে তার কামরায় নিয়ে যাই আমিই।'

তারপরদিন আলী ইবন-এর খবর নিতে সে-ক্রীতদাসীটি আবার এল। সালাম জানিয়ে বল্‌ল—'আমার মালকিন আজ কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন। শাহজাদা আলী ইবন-এর তবিয়ৎ কেমন আছে জেনে যেতে হুকুম করেছেন।' কথা বলতে বলতে সে কামিজের ভেতর থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করে আলী ইবন-এর হাতে তুলে দেয়। সামস অল-নাহার-এর চিঠি। মহব্বতের চিঠি।

আলী ইবন চিঠির বক্তব্য পাঠ করে কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটাল। এক সময় কাগজ-কলম নিয়ে চিঠির জবাব লিখতে শুরু করল।

ক্রীতদাসীটি আলী ইবন-এর চিঠিটি বুকের কাছে, কামিজের ভেতরে চালান করে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আলী ইবন কয়েক মিনিট পর আবুল হাসান-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবার নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। আবুল হাসান-ই একটি তাগড়াই খচ্চর ঠিক করে দিল।

আলী ইবন বিদায় নিল, আবুল হাসান এবার ভাবতে বসল। ব্যাপারটি যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে করে আখেরে ফল ভাল হবে না বলেই তার আশঙ্কা। ব্যাপারটি গোড়াতে যেমন সহজ-সরল ও স্বাভাবিক মনে হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে বরং তার বিপরীত। বড়ই জটিল। কোনক্রমে খলিফার কানে গেলে তাকে হয় কোতল করবে, নয় তো শূলে চড়াবে। আর যেভাবে চিঠি চাপাটি শুরু হয়েছে ব্যাপারটি আজ না হোক কাল ফাঁস হবে-ই হবে। শেষের কথা ভেবে ডরে আবুল হাসান-এর হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল।

পরদিন সকালে আবুল হাসান খচ্চরের পিঠে চেপে আলী ইবন-এর বাড়ি হাজির হ'ল। কোনরকম ভূমিকা না করেই সে তাকে সরাসরি বল্‌ল—'দোস্ত, আমার কিন্তু ব্যাপারটি সুবিধের মনে হচ্ছে না। ফালতু ঝুট ঝামেলা ছাড়ান দাও। আমি সংসারী আদমি, বাল বাচ্চা নিয়ে ঘর করি। আমার নিজের জন্য ভাবি না। খলিফার কোপে পড়ে আমার জান গেলে আমার বিবি আর বাল বাচ্চার কি গতি হবে ভাবলেই আমার হাত-পা কাঁপে। আর তোমারই বা এমন কি ওমর হ'ল। জান বাঁচলে এর চেয়ে অনেক খুবসুরৎ লেড়কি তোমার চারপাশে চক্কর মেরে বেড়াবে। তার চেয়ে যা হবার হয়ে গেছে। মনে কর ওটি একটি দুর্ঘটনা মাত্র। এবার

নিজেকে সামলে সুমলে নাও। ফালতু ধান্দা ছাড়।'

—'দোস্ত তোমার সৎ পরামর্শের জন্য বহুৎ সুক্‌রিয়া। কিন্তু সব কিছুর পরও আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমার মেহবুবা সামস অল-নাহারকে ছাড়া আমার জান জিন্দা থাকবে না। জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে। তাকে ছাড়া আমার জিন্দা থাকা সম্ভব নয়, থেকে লাভই বা কি?'

আবুল হাসান বুঝল আলী ইবন-এর দিল্ যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার কৌশিস বৃথা। আর উপদেশ বিলকুল ভস্মে ঘি ঢালার সামিল। সে মুখে কুলুপ এঁটে তার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। পরদিন সন্ধ্যার আগে আলী ইবন-এর অভিন্নহৃদয় দোস্ত আমিন ছুটতে ছুটতে এসে তাকে জানাল আবুল হাসান তার দোকান পাট বন্ধ করে সপরিবারে বসরাহতে পালিয়েছে। পরে এক সময় এসে দোকান বন্ধ করে বিলকুল ঝামেলা মিটিয়ে যাবে।' আমিন সমবেদনার স্বরে বলে—'দোস্ত ঘাবড়াও মাত। আমি তোমার পাশে আছি। আমার তো কোন পিছুটানই নেই। অতএব খলিফা বা সুলতান যদি আমাকে কোতলও করে তবু আমার জন্য শোক তাপ করার কেউ-ই থাকবে না। তাই খোদাতাল্লার মর্জিতে জিগরী দোস্তের জন্য কিছু করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।'

আলী ইবন ম্লান হাসল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'তুমি কোশিসের কসুর রাখবে না আমি জানি। তবু আবুল হাসান ছিল খলিফার পেয়ারের আদমি। তার পক্ষে যেটুকু সম্ভব তুমি শত কৌশিস করেও তা পারবে কেন, বল তো? তোমার পক্ষে তো খলিফার মহলে ঢোকাই সবচেয়ে বড় সমস্যা দোস্ত।'

—'ধ্যুৎ, এ আবার আমার কাছে সমস্যা নাকি। তোমার হয়ত মলুম নেই, আমি হীরা-জহরত-এর কারবার করি। হারেমের বেগমদের কাছে বহুবার হরকিসিমের পাথর বেচেছি। কখন খোজারা বেগম-বাঁদীদের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে ডেকে প্রাসাদে নিয়ে যায় আবার কখনও বা নতুন কোন পাথর আমদানি হলে আমি নিজেই খলিফার মহলে যাই। আর আমি তো প্রধান ফটকের রক্ষীর খুব পেয়ারের আদমি বনে গেছি।'

তার কথায় আলী ইবন-এর কলিজায় যেন পানি এল।

এমন সময় সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। দরজা খুলতেই এক লেড়কি কামরায় ঢুকে জানায় বেগম সামস অল-নাহার খুবই অসুস্থ। আলী-র দীর্ঘ অদর্শনে কাতর। তাকে একবারটি চোখের দেখা না দেখে তার পক্ষে জান রক্ষা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কোথায় তাদের মোলাকাৎ হতে পারে? খলিফার প্রাসাদে? অসম্ভব। তবে? আমিনই মুশকিল আসান করে দিল। তার ছোটখাট এক বাগান বাড়ি আছে। আলী চাইলে সে তাদের ব্যবহারের জন্য বাড়িটির চাবি দিতে পারে।

আলী যেন আশমানের চান্দ্ হাতে পেল। সে এবার সামস অল-নাহার-এর প্রেরিত লেড়কিটিকে সব বুঝিয়ে বল্‌ল এবং আমিন-এর বাগান বাড়ির ঠিকানা বাত্‌লে দিল।

পরদিন লেড়কিটি ফিন এল। মালকিন আমিন'কে তার প্রাসাদে নিয়ে যেতে বলেছে, বল্‌ল।

তার কথায় আমিন যেন আসমান থেকে পড়ল। ফুটা বেলুনের মত অকস্মাৎ চিপসে গেল। মুহূর্তে চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। বার কয়েক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বল্‌ল—'আমি? প্রাসাদে? আমি প্রাসাদে যাব? আমাকে দেখলেই তাঁর প্রহরায় নিযুক্ত খোঁজাদের সন্দেহ হবে। ব্যাপারটি খলিফার নজরে আনবে। তারপর আমার নসীবে কি জুটবে, তোমরা অনুমান করতে না পারলেও আমি তসবির দেখার মত স্পষ্ট দেখতে পচ্ছি। তার চেয়ে বরং তুমি গিয়ে তাকে আবারও সালাম জানিয়ে বল তিনি যেন আমার বাগান বাড়িতে এসে মেহবুব আলী ইবন-এর সঙ্গে মোকাবেলা করে।'

লেড়কিটি প্রাসাদে ফিরে বেগম সামস অল-নাহার'কে আমিন-এর অভিপ্রায়ের কথা জানাল।

সামস অল-নাহার সন্ধ্যার কিছু আগে গায়ে অতি সাধারণ একটি বোরখা চাপিয়ে বেরোল। যোগাযোগ রক্ষাকারিণী লেড়কিটির সঙ্গে আমিন-এর বাগান বাড়িতে হাজির হ'ল।

আমিন সদর-দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সামস অল-নাহারকে ভেতরে আসার জন্য অভ্যর্থনা জানাল।

সামস অল-নাহার এর নাকাবের ফাঁক দিয়ে তার মুচকি হাসির রেখাটুকু দেখতে অসুবিধা হ'ল না। সে সঙ্গে তার রূপের জৌলুসটুকুও তার নজর এড়াল না। নাকাব-এর মিহি জাল ভেদ করে তার দৃষ্টি সামস অল-নাহার-এর মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ হ'ল।

সামস অল-নাহার প্রথম মুখ খুলল—'আচ্ছা, আপনিই কি আমিন?'

—'হ্যাঁ, এ অধমের নামই আমিন।'

—'কিছু মনে করবেন না, একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। —আপনি কি শাদী করেছেন? কে কে আছেন আপনার?'

—'না শাদী করিনি। আর আমার আপনার বলতে তামাম দুনিয়ায় কেউ-ই নেই। আব্বা, আম্মা, ভাইয়া বা বহিন কেউ-ই নেই।'

আমিন এবার একটি সুসজ্জিত কামরায় সামস অল-নাহারকে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসতে দিল। তারপর বল্‌ল—'আমি আলী ইবন'কে নিয়ে এখনই ফিরে আসছি। যাব আর আসব।' কথা বলতে বলতে আমিন কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দু'-তিন বাদে আলী ইবন একা কামরায় ঢুকল। বেশ কিছুদিন বাদে উভয়ের মোলাকাৎ হ'ল। সামস অল-নাহার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। উন্মাদিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আলী ইবন-এর বুকের ওপর।

রাত্রি একটু গভীর হ'লে সামস অল-নাহার তার রক্ষী লেড়কিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিল।

খানাপিনার পাট চুকলে আমিন ও তার দোস্ত আলী ইবন আর সামস অল-নাহার-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসস্থানে ফিরে গেল।

আমিন-এর বাগান বাড়িটিতে রইল দুই মেহবুব আর মেহবুবা। আলী ইবন সাধ্যমত কম শব্দ করে দরওয়াজাটি বন্ধ করে দিল। নিঝুম-নিস্তব্ধ বাড়িটিতে দু'টি মাত্র প্রাণী মহব্বতের জোয়ারে ভেসে চল্‌ল যেন কোন্ অজানা-অচেনা-অদেখা মুলুকের উদ্দেশ্যে।

ভোর হ'ল। বাড়িটির সামনে পাড়া ও বে-পাড়ার আদমির ভিড় জমে গেল।

সবার মুখেই এক বাত। আমিন-এর খালি বাগান বাড়িতে কাল রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেছে।

এক মাঝবয়সী আদমি চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'কাল মাঝরাত্রে একদল ডাকু এসে বাড়ির সমানপত্র যা ছিল সব নিয়ে ভেগেছে। সে সঙ্গে আমিন-এর দু' মেহমান ছিল তাদেরও মুখ বেঁধে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

অভাবনীয় খবরটি পাওয়ামাত্র বাড়ির মালিক আমিন ছুটে এল। সব কিছু শুনে সে তো রীতিমত স্তম্ভিত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এক মাঝ-বয়সী লোক এগিয়ে এসে বল্‌ল—'তুমি কি তোমার মেহমানদের পাত্তা জানতে চাও? যদি আগ্রহী হও তবে আমার সঙ্গে এসো, বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

আমিন যেন তামাম আশমানটিকে হঠাৎ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে অজ্ঞাতপরিচয় আদমিটিকে অনুসরণ করল। সে আদমি তাকে নিয়ে টাইগ্রিস নদী পার হ'ল। এবার গলি- পথে হাঁটতে লাগল। এ-গলি ও-গলি ডিঙিয়ে এক বেশ বড়সড় মকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মকানটি ভাঙা চোরা। কেউ থাকে না এখানে।

প্রধান ফটকে আঙুলের সাহায্যে সঙ্কেত-ধ্বনি করতেই ফটক খুলে গেল। আমিনকে নিয়ে ষণ্ডামার্কা আদমিটি ভেতরে ঢুকল। তাকে নিয়ে সে একটি বড়সড় কামরায় গেল। দশ-বারোজন ইয়া দশাসই চেহারার আদমি গোল হয়ে বসে খানাপিনা করছে। আমিন-এর চোখের মণি দুটো চঞ্চল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সব কিছু দেখতে লাগল। দেয়ালে বিভিন্ন রকম অস্ত্রপাতি ঝুলছে। সবকিছু দেখে সে নিঃসন্দেহ হ'ল, ডাকুদের আড্ডায় এসে পড়েছে।'

যে গাট্টাগোট্টা আদমিটি আমিনকে এখানে এনে ফেলেছে সে ইয়া মোটা গোঁফ জোড়ার ফাঁক দিয়ে মৃদু হেসে বল্‌ল—'এবার নিশ্চয়ই তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, আমরাই তোমার মেহমানদের ছিন্‌তাই ক'রে নিয়ে এসেছি।'

আমিন চমকে উঠে বলে—'আমার মেহমানরা কি জিন্দা—'

—'হ্যাঁ, জিন্দাই আছে। জানে খতম করি নি। আমার কথায় ভরসা রাখতে পার। তারা খলিফার ইমারত থেকেও আচ্ছা—বহাল তবিয়তেই আছে।'

আমিন-এর চোখ থেকে আতঙ্কের ছাপটুকু তখনও মিলিয়ে যায় নি।

সে-ডাকুটি এবার বল্‌ল—'আমার দলের আদমিদের খানাপিনা মিটে যাক। তারপর তাদের সঙ্গে তোমার মোলাকাৎ করিয়ে দেব। কিন্তু ইয়াদ থাকে যেন, যা বলবে সাচ বাৎ বলবে, ঝুটা বাতের ধার-কাছ দিয়েও যাবে না। যদি ঝুটা কিছু বল তবে আখেরে খারাপ হবে।'

আমিন এবার ডাকুটির কাছে আলী ইবন এবং সামস অল-নাহার-এর বৃত্তান্ত খোলসা করে বল্‌ল। তিলমাত্রও গোপন করল না।

তার কথা শেষ হতে না হতেই সুলতানের কোতোয়াল সে-ঘরে ঢুকল। তার গায়ের পোশাক আশাকই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

কোতোয়াল বজ্রগম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল—'আমি এতক্ষণ

উৎকর্ণ হয়ে পাশের ঘরে অবস্থান করছিলাম। তোমার কথাবার্তা সবই শুনেছি।' মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে এবার বল্‌ল—'আশা করি এবার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, আমরা সুলতানের বেতনভোগী কর্মচারী। একটি বাৎ শুনে রাখ, আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব নয়।

আরও খেয়াল রাখবে, খলিফার সঙ্গে বেইমানী করে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায় নি, তোমার জিগরী দোস্তও নয়।

ঘটনার নিষ্পত্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে গেল। খলিফার নির্দেশে সামস অল-নাহারকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। আর তার মেহবুব আলী ইবন বকর? তার প্রাপ্যও তাকে চুকিয়ে দেওয়া হ'ল। ঘাতকের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল তাকে। এক কোপে তার ধড় থেকে গর্দানটি নামিয়ে দেওয়া হ'ল।

সব ঘটনা শেষ হয়েও যেন শেষ হতে চায় না। যেন শেষ থেকে আবার নতুনতর ঘটনার সূত্রপাত হয়।

সে-রাত্রেই খলিফা হারুণ-অল-রসিদ সামস অল-নাহার-এর কামরায় গেলেন। তাকে আদরে-সোহাগে অভিভূত ক'রে দিয়ে বল্‌লেন—'পেয়ারী, তুমি হয়ত আমার মহব্বতের ওপর ঠিক আস্থা রাখতে পারছ না। ভাব, আমার মহব্বতে আসলের চেয়ে খাদই বেশী। আসলে কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা তুমি পোষণ কর। তুমি আমার জান, আমার কলিজার চেয়েও বেশী।'

খলিফার কাছ থেকে আশাতীত আদর সোহাগ পেয়ে সামস অল-নাহার যেন আহ্লাদে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। তার কোলে নিজেকে সঁপে দিয়ে পরম শান্তিতে খলিফার কোলের ওপর এলিয়ে পড়ল। ক্রমে তার দেহে বিষক্রিয়া শুরু হ'ল। তার মুখ—সর্বাঙ্গ নীল হয়ে এল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি শেষ করতে না করতেই ভোর হয়ে এল। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' সত্তরতম রজনী

শাহরাজাদ কামার অল-জামান আর শাহজাদী বদরের মহব্বতের কিস্‌সা

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম এবার সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের এক কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, এবার শাহজাদা কামার অল-জামান আর শাহজাদী বদর-এর মহব্বতের কিস্‌সা শুরু করছি। শুনুন জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে শাহরিমান নামে এক বাদশাহ রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্যের নাম ছিল খালিদান। তাঁর সমসাময়িক কালে তাঁর মত প্রতাপশালী বাদশাহ তামাম আরব দুনিয়াতে কেউ-ই ছিলেন না। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিলাসব্যসনের প্রতিও যে তাঁর প্রবণতা ছিল না এরকম কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাঁর হারেম আলো করেছিল চার-চারটি বেগম আর সত্তরটি খুবসুরৎ রক্ষিতা। কামতৃষ্ণা নিবৃত্তির ঢালাও বন্দোবস্ত থাকলেও তার দিলে কিন্তু পুরোদস্তুর সুখ শান্তি ছিল না। তবু যেন শূন্যতা, হতাশা আর হাহাকার তাঁর বুক জুড়ে ছিল। কিসের এ-অভাব? কিসের এ-শূন্যতা? তার পরিতাপের একমাত্র কারণ, তার কোন বালবাচ্চা হয় নি। নিঃসন্তান। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবে এ ভাবনাতেই তাঁর দিল্ সর্বদা বিষিয়ে থাকে।

বিষাদের প্রতিমূর্তি সুলতান শাহরিমান একদিন তার প্রধান উজিরকে তলব করলেন। সুলতানের তলব পেয়ে বৃদ্ধ উজির হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

সুলতান চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'শোন, আমার খ্যাতি প্রতিপত্তি সবই আছে। কিন্তু দিলে সুখ-শান্তি নেই। আল্লাতাল্লা আমাকে কেন বালবাচ্চা থেকে বঞ্চিত করলেন, বলতে পার?'

—'জাঁহাপনা, ব্যাপারটি খুবই পরিতাপের, সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার সন্তানহীনতার দুঃখ তো কেবলমাত্র একা আপনাকে ব্যথিত মর্মাহত করছে না, তামাম সুলতানিয়তের অধিবাসীরা আল্লাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করছে, যাতে আপনি এক লেড়কা, মসনদের উত্তরাধিকারী লাভ করেন।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে বৃদ্ধ উজির বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ব্যাপারটি আমাদের কাছে যতই পরিতাপের হোক না কেন এর সুরাহা কিন্তু একমাত্র আল্লাতাল্লার পক্ষেই করা সম্ভব। অতএব তাঁকে মনে-প্রাণে স্মরণ করুন। তিনি অবশ্যই মুখ তুলে তাকাবেন, আপনাকে দোয়া করবেন।'

—'তোমার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে—'

সুলতানের মুখের বাৎ কেড়ে নিয়ে বৃদ্ধ এবার বল্লেন—'জাঁহাপনা আর একটি বাৎ খেয়াল রাখবেন—'আজ রাত্রে যখন হারেমে যাবেন তখন ভাল করে রুজু করে, সশ্রদ্ধ অন্তরে নামাজ পড়বেন। তারপর শান্ত-শুদ্ধ মন নিয়ে হারেমে ঢুকবেন। হারেমে ঢুকে বেগম সাহেবার সঙ্গে সহবাস করার পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহকে কাতর মিনতি জানাবেন—আজকের সহবাসের ফলস্বরূপ আপনি যেন একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন।'

বৃদ্ধ উজিরের পরামর্শটি সুলতান শাহরিমান-এর খুবই দিলে ধরল। তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—'চমৎকার! চমৎকার পরামর্শ দিয়েছ উজির!' তিনি পুরস্কারস্বরূপ উজিরকে মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ উপহার দিয়ে খুশী করলেন। সন্ধ্যার কিছু পরেই সুলতান হারেমে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সুলতান একজন মনের মত খুবসুরৎ রক্ষিতাকে নির্বাচন করলেন। খোঁজাকে দিয়ে খবর পাঠালেন, তার ঘরেই আজ তিনি রাত্রি যাপন করবেন।

বাদশাহ সহবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সংবাদ পেয়ে সৌভাগ্যবতী সে-রক্ষিতাটি মনমৌজী সাজগোজ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

সুলতান এবার বৃদ্ধ উজিরের পরামর্শ মাফিক নিজে ভাল করে রুজু সেরে শুদ্ধ পোশাক আশাক পরলেন। পবিত্র মন নিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজান্তে করজোড়ে আল্লাতাল্লার কাছে প্রার্থনা জানালেন, আজকের সহবাসের ফল স্বরূপ তিনি যেন এক পুত্র সন্তান লাভ করেন।

এবার পবিত্র দিল্ নিয়ে সুলতান পূর্ব-নির্ধারিত রক্ষিতার কামরায় প্রবেশ করলেন। দশ মাস পরে তাঁর এক খুবসুরৎ লেড়কা পয়দা হ'ল।

সুলতান শাহরিমানের-মুখে হাসি ফুটে উঠল। তাঁর সুলতানিয়তের প্রজারা একমাস ধরে বাজী পোড়াল, নাচা-গানা করল আরও বহুভাবে উল্লাস প্রকাশ করল।

সুলতান শাহরিমান লেড়কার নামকরণ করলেন কামার অল-জামান। আর তার দীর্ঘায়ু কামনা করে আল্লাহ-র কাছে মোনাজাত করলেন। তাঁর এতদিনের বাসনা আজ পূর্ণ হ'ল—কম কথা।

সুলতান শাহরিমান লেড়কাকে পেয়ে দুনিয়ার আর সব কিছু ভুলে গেলেন। তার দিনের একটি বড় ভগ্নাংশই কাটে শিশুকে নিয়ে।

দেখতে দেখতে কামার অল-জামান নওজোয়ান হয়ে উঠল। সুলতান শাহরিমান লেড়কার শাদীর কথা ভাবলেন। বৃদ্ধ উজিরকে ডেকে পরামর্শ করলেন।

সুলতান শাহরিমান এবার লেড়কাকে তলব করলেন।

কামার অল-জামান এসে আব্বাজীকে কুর্নিশ করে নতমুখে সামনে দাঁড়াল। মিষ্টি-মধুর স্বরে উচ্চারণ করল—'আব্বাজী, আমাকে তলব করেছেন? বলুন, আমার প্রতি আপনার কি নির্দেশ?'

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন, ভোর হতে আর দেরী নেই। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' একাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পড়তে না পড়তেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদা কামার অল-জামান তার আব্বাজানের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

সুলতান শাহরিমান বল্লেন—'বেটা, আমার ওমর ক্রমে বেড়েই চলেছে। আর বেশী দিন নেই। আল্লাতাল্লা কাছে টেনে নিলেন ব'লে। আমার দিল্ চাইছে, তোমাকে শাদী দিয়ে সংসারী করে দিয়ে যাই।'

শাহজাদা কামার অল-জামান সবিস্ময়ে সুলতানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'আব্বাজান, এখনই শাদী করতে আমার দিল্ চাইছে না। স্বীকার করছি, শাদীর প্রয়োজন আছে। জীবনে আউরতও চাই-ই। কিন্তু এখনও তো আমি আউরতের অভাব বোধ করছি না। তাদের সম্বন্ধে আমার কোনই আকর্ষণ নেই, কোনরকম কৌতূহলও আমার মধ্যে মুহূর্তের জন্য উঁকি দেয় নি।'

—'শাদী হলে বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে বেটা।'

—'না আব্বাজী। এ অবস্থায় শাদী করলে বিবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুর না-ও হতে পারে। অতএব আপনার দরবারে আমার একটিই আর্জি, শাদী করার আগে আমার দিল্‌কে বিলকুল তৈরি করে নেওয়ার সুযোগ দিন।'

সুলতান শাহরিমান এত সহজে দমবার পাত্র নন। তিনি লেড়কার দিলকে নরম করতে গিয়ে বল্লেন—'বেটা, তোমার লিখা পড়া সাঙ্গ হয়েছে। গায়ে গতরেও তুমি নওজোয়ান হয়ে উঠেছ। অতএব তোমার শাদীর ওমর হয়েছে বলেই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি একী তাজ্জব বাৎ শোনালে—লেড়কিদের সম্বন্ধে তোমার ভেতরে কোন আকর্ষণ বা কৌতূহল কিছুই পায়দা হয় নি? তবে কি—তবে কি তোমার শরীরে এমন কোন খুঁত রয়েছে—! সুলতান কথাটি আর শেষ করতে পারলেন না। শরমে বাধল। কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন সজোরে তার মুখ চেপে ধরল।

শাহজাদা তার আব্বার কথা বুঝতে পেরে মাথা নীচু করে নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

প্রবীণ-অভিজ্ঞ সুলতানের বুঝতে অসুবিধা হ'ল না, শাহজাদা কি যেন বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই তা মুখফুটে আব্বাজানের কাছে বলতে পারছে না। এক সময় জামান অনন্যোপায় হয়ে মুখ

খুলতে বাধ্য হ'ল। সে আমতা আমতা করে বলল—'আব্বাজান, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। কিন্তু ক'দিন ধরেই একটি বাৎ বলব বলব করে আপনাকে বলতে মুখে বাঁধছে। আমি নানা শাস্ত্র পাঠ করেছি। হরেক কিসিমের কিতাবেও লেড়কিদের বিশ্বাসঘাতকতার কিস্‌সা পড়েছি। তারা পুরুষদের সঙ্গে নানা ছল চাতুরির মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। যৌবনের জোয়ার লাগা দেহ, আর সুরতকে মুলধন করে তারা পুরুষের জিন্দেগী বরবাদ করে দেয়। তাই কোন লেড়কিকেই কেউ সুনজরে দেখে না। আর যদি কোন লেড়কি নষ্টামি করবে মন করে তবে তাকে খাঁচায় আটক করে রাখলেও পরপুরুষকে দেহদান করবেই।

আব্বাজান আমার কসুর নেবেন না। যে বাৎ আপনাকে বললাম তা কিন্তু আমি বানিয়ে বলছি না। আমাদের পীর-পয়গম্বরদের বাণীই আমার মুখ দিয়ে প্রকাশ করলাম। তাই আপনার দরবারে আমার একমাত্র আর্জি, শাদীর জন্য আমার ওপর জুলুম করবেন না। তারপরও যদি শাদীর নাম করে কোন লেড়কিকে আমার গলায় লটকে দেন তবে তার পরিণাম অবশ্যই বাঞ্ছনীয় হবে না। চিরদিনের জন্য আমাকে হারাতে হবে, মনে রাখবেন।'

লেড়কার বাৎ শুনে সুলতান শাহরিমান চমকে যান। —'ছিঃ ছিঃ! বেটা, এরকম কোন কিছু তো আমি করতে চাইছি না। তোমার যখন আপত্তি তখন আমি তো জুলুম করছি না। কেনই বা জুলুম করব? যাকে তুমি শাদী করবে সে তোমার জিন্দেগীভরের জন্য সঙ্গী হবে। তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবে। আর সেখানে যদি কারো বিশ্বাসে ফাঁক থাকে তবে তাতে মধু নিঃসরণ না ঘটে জহরই পয়দা হবে।'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে সুলতান শাহরিমান এবার বললেন—'বেটা, তুমি বহু কিতাবে পড়েছ লেড়কিরা বেইমান হয়। পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেহদান করতেও দ্বিধা করে না। সাচ্চা বাৎ। কিন্তু তুমি আরও কিতাব পাঠ কর, তল্লাশী চালাও দেখবে লেড়কিদের পক্ষেও বহু জ্ঞানী-গুণীজন আচ্ছা বাৎ বহুৎ বলেছেন। আর তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাণ্ড শূন্য। কিতাবের কালির অক্ষরই তোমার একমাত্র সম্বল। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখবে তোমার কিতাবের বাণীর সঙ্গে বাস্তবতার মিল যেমন আছে তেমনি অমিলও রয়েছে যথেষ্টই। চলার পথে যে জ্ঞান আহরণ করা যায় সে-ই প্রকৃত জ্ঞান। তোমার মধ্যে যতদিন না লেড়কিদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা জন্মায় ততদিন আমিও তোমাকে শাদী করতে মানা করছি ভবিষ্যতে যদি কোনদিন তোমার বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্তন ঘটে তবে নির্দ্বিধায় আমার কাছে ব্যক্ত করবে।'

দেখতে দেখতে আরও এক সাল কেটে গেল। সুলতান শাহরিমান মুখফুটে বেটাকে শাদীর প্রসঙ্গে কোন বাৎচিৎই করেন না। আর শাহজাদা কামার অল-জামানও আব্বাজানের কাছে এ ব্যাপারে আর মুখ খোলে না।

সুলতান শাহরিমান বড়ই মর্মবেদনার মধ্যে দিন গুজরান করতে লাগলেন। জীবনের শেষ সাধের চেয়েও পুত্রস্নেহ তাঁর কাছে অনেক অনেক গুণ বড়। প্রাসাদের একান্তে এক নিরালা কামরায় তিনি সর্বক্ষণ গোমড়ামুখে বসে থাকেন। তিনি মাঝে-মধ্যে ভাবেন, লেড়কাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, তার বিচার বিবেচনা ও জ্ঞানবুদ্ধি বদলেছে কি না। শাদী করে ঘর-সংসার করার দিকে তার মন ঝুঁকেছে কি না জিজ্ঞাসা করার মন হয়।

এক সকালে সুলতান শাহরিমান শাহজাদা জামান'কে নিজের কামরায় তলব করলেন।

শাহজাদা আব্বাজানকে কুর্ণিশ করে নিতান্ত অনুগত লেড়কার মত আদেশের অপেক্ষায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুলতান শাহরিমান জিজ্ঞাসা করলেন—'বেটা, তোমার সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন ঘটল কি? নাকি পূর্বের সে মতই এখনও আঁকড়ে ধরে রয়েছ?'

শাহজাদা জামান নিতান্ত অপরাধীর মত বিষণ্ণ ও বিবর্ণ মুখে আগের মতই মাথা নত করে আব্বাজীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। যে লেড়কা আব্বাজানের সামান্য একটি সাধ পূর্ণ করতে সক্ষম নয় তাকে অপরাধী তো বলতেই হয়।

এক সময় জামান মুখ খুলল—'আব্বাজী, আপনার পরামর্শ অনুযায়ী আমি বহুৎ কিতাব পাঠ করেছি। কিন্তু কোন কিতাবেই কোন

জ্ঞানী-গুণীজন লেড়কিদের পক্ষে বলেন নি। বরং সবার উক্তি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই—দুনিয়াতে এমন কোন খারাপ কাম, এমন কোন গুণাহই নেই যা লেড়কিরা করতে পিছপাও হয়।'

লেড়কার মেজাজ-মর্জি এখনও শোধরায় নি, সুলতান শাহরিমান বুঝতে পারলেন। অতএব আরও ধৈর্য ধরতে হবে। এ জোর জুলুমের কাজ নয়। ভাল করতে গিয়ে শেষে হয়ত দেখা যাবে পরিণাম ভয়ঙ্কর রূপ ধারণা করেছে।

উপায়ান্তর না দেখে সুলতান বৃদ্ধ উজিরকে তলব করলেন। উজির এসে কুর্ণিশ করে বলল—'জাঁহাপনা, আমাকে তলব করেছেন?'

—'হ্যাঁ। শোন উজির, তোমার পরামর্শেই আজ আমি আব্বা হতে পেরেছি। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত লেড়কা পয়দা করা-সম্ভব হয়েছে।'

—'সবই খোদার মর্জি। আমরা তো নামান্তর মাত্র জাঁহাপনা।'

—'তারপর কি বলছি শোন, দুনিয়ায় আদমিদের চাওয়ার শেষ নেই। একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে না হতেই অন্য একটি এসে মাথায় চড়ে।'

—'এ তো আদমিদের সহজাত প্রবৃত্তি জাঁহাপনা।'

—'আমার ক্ষেত্রেও একই বাৎ প্রযোজ্য। আমার লেড়কার অভাব ছিল, খোদাতাল্লা পূরণ করেছেন। এখন আবার নতুনতর বাসনা, গোরে যাওয়ার আগে নাতির মুখ দেখব। লেকিন লেড়কা আমার শাদীর নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। এখন যা হোক কিছু একটি ফিকির বের কর যাতে আমার সাধ পূর্ণ হতে পারে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে উজির মুখ খুলল—'জাঁহাপনা, এ-ব্যাপারে ঝটপট কিছু করা ঠিক হবে না। ধৈর্য ধরুন। আরও এক সাল ধৈর্য ধরতে হবে। তারপর একদিন হঠাৎ করে তাকে দরবারে ডেকে পাঠাবেন। পারিষদদের সামনে আচমকা প্রচার করে দেবেন যে, শাহজাদার শাদীর দিনক্ষণ সবই পাকা হয়ে গেছে।'

ম্লান হেসে সুলতান বললেন—'উজির, আমার লেড়কা যেমন একরোখা, তোমরা এ দাওয়াইয়ে কাজ তেমন হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

—'জাঁহাপনা, আপনার ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে-ই! মোক্ষম দাওয়াই। কারণ, আপনার বুদ্ধিমান লেড়কা দশজনের সামনে আপনার কথা খিলাপের কথা, আপনার অসম্মানের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত শাদীর পিঁড়িতে বসতে রাজী হবেই। গুরুজনের প্রতি এমন অটুট শ্রদ্ধা ভক্তি অন্য কোন লেড়কার মধ্যে দেখাই যায় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কামার অল-জামান শাদীর মত দেবেই দেবে।'

এমন সময় নিশি অবসানের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' বাহাত্তরতম রজনী

একটু গভীর নিশিতে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ বলতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, উজিরের কথা শুনে বাদশাহ শাহরিমানের মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল। তিনি সোল্লাসে বললেন—'উজির তোমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। তুমি একেবারে শতকরা এক শ' ভাগ সত্যি কথা বলেছ। আমার বেটা কামার অল-জামান-এর পিতৃভক্তি অতুলনীয়। সে অবশ্যই দরবারের সবার সামনে আমার ইজ্জৎহানিকর কোন কথা বা কাজে উৎসাহী হবে না।' কথা বলতে বলতে সুলতান নিজের গলার মুক্তার হার খুলে উজিরের হাতে দিয়ে বললেন—'উজির তোমার এ-উপদেশের মূল্য বিচার করা সম্ভব নয়। তবু আমি পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে এটি দিলাম। গ্রহণ কর।'

উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী সুলতান শাহরিমান আরও একটি বছর ধৈর্য ধরলেন।

এক সকালে দরবারকক্ষ যখন উজির নাজির এবং অন্যান্য পারিষদের দ্বারা পরিপূর্ণ ঠিক তখনই সুলতান তার বেটা কামার অল-জামান'কে তলব করলেন।

জামান দরবারে প্রবেশ করে সুলতানকে যথোচিত পদ্ধতিতে কুর্ণিশ সেরে হুকুমের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

সুলতান শাহরিমান সস্নেহে বললেন—'বেটা, আমি তোমার শাদীর পাক্কা বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। কবে যে হঠাৎ চোখ বুজবো তা আল্লাতাল্লা ছাড়া কেউ-ই জানেন না। তাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা তুমি শাদী করে ঘর বেঁধেছ নিজের চোখে দেখে যাই।'

সুলতানের কথা শেষ হলে শাহজাদা কামার অল-জামান লাঠির আঘাতে কোমরভাঙা সাপের মত ফোঁস করে উঠল, মুখে কিছু বলল না বটে। কিন্তু তার চোখের ভাষায় মনের খবর, প্রতিবাদ সবার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল।

সভায় উপস্থিত সবাই ম্লানমুখে মাথা নত করে বসে রইল।

এদিকে লজ্জা-ঘৃণা-অপমানে সুলতানের মুখ এতটুকু হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই গুলি খাওয়া শেরের মত গর্জে উঠলেন—'কী তোমার এতবড় স্পর্ধা! আমার মুখের ওপর প্রতিবাদ করার স্পর্ধা তোমার কী করে হ'ল? তাজ্জব বনছি!' এবার তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দরওয়াজার দিকে তাকিয়ে চিল্লিয়ে উঠলেন—'ওরে, কে আছিস, শাহজাদাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে পাশের মহলের কুঠুরীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখ।'

কামার অল-জামান দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ভাবতে লাগল —'এ-ই আমার পক্ষে মঙ্গল হয়েছে। আব্বাজীর হুকুম তামিল করলে আমার অপমৃত্যুই হ'ত। আব্বাজী এ কাজের মাধ্যমে নতুন এক নজীর সৃষ্টি করলেন, দুনিয়ায় যত কেলেঙ্কারী ঘটেছে সবার মূলেই রয়েছে আউরত।'

সুলতান শাহরিমান দরবার কক্ষ ছেড়ে নিজে বিশ্রাম করতে গেলেন। তার দু'চোখে পানির ধারা। একদিন যে লেড়কার প্রার্থনা করে চোখের পানির মাধ্যমে আল্লাহ-র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন আজ সে-লেড়কাকেই নিজে হাতে কঠোরতম শাস্তি দিয়েছেন।

ক'দিন এমনি ভাবেই কাটল। এক সকালে সুলতান শাহরিমান লেড়কার সব গুণাহ মাফ করে দেবেন স্থির করলেন। সে-আন্ধার কামরা থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। তিনি ভাবলেন—'বেটা কামার অল-জামান-এর তো এতে কোনই কসুর নেই। সে তো বহুবারই তার মতামত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যত ঝামেলা বাঁধিয়েছে বুড্ডা উজির। তার পরামর্শ শুনতে গিয়ে আজ যত ঝকমারিতে পড়তে হয়েছে। তারই জন্য আজ ইজ্জৎ ঢিলা হয়ে গেছে।

সুলতান শাহরিমান উজিরকে ডেকে খুব করে ধমকালেন। উজির মুখ বুজে সব শুনলেন। কোনরকম উষ্মা প্রকাশ না করে বরং সাধ্য মত শান্তস্বরে হাত কচলে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা তবু আমি বলব আরও পনেরটি দিন কোনরকমে ধৈর্য ধরুন।'

—'ইয়া আল্লাহ! প-নে-র দি-ন! আমার একমাত্র বেটা ওই আন্ধার কুঠুরিতে আরও পনের দিন পচবে? অসম্ভব! এ হতেই পারে না!'...

—'কি যে বলেন জাঁহাপনা, কেন পচবে? কষ্টই বা পাবে কেন? তার প্রয়োজনীয় সব বন্দোবস্তই আমি করে দিয়েছি। সে বহাল তবিয়তেই আছে, থাকবেও।'

কপালের চামড়ায় ভাজ এঁকে সুলতান ব'লে উঠলেন—'সব বন্দোবস্ত? কার হুকুমে তুমি বন্দোবস্ত করতে গেলে? আমি তোমাকে কোতল করব, শূলে চড়াব—না, গর্দান নিয়ে ছাড়ব।'

বৃদ্ধ উজির বিনম্র বিনয়ে এবার বলল—'জাঁহাপনা, আমার গর্দান, আমার জান তো যেদিন দরবারে প্রথম নোকরি নেই সেদিনই কবুল করে রেখেছি। এ-গর্দান এখন আর আমার নয়। চাই গর্দান রাখেন, চাই নামিয়ে দেন—আপনার মর্জি। তবে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ যে জাঁহাপনার সম্মানহানি হয় এমন কাজ কোনদিন করব আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবি নি। একটি বাৎ দিল্ দিয়ে বিবেচনা করবেন জাঁহাপনা, শাহজাদা কামার অল-জামান আপনার বেটা বটে। কিন্তু আমাদেরও কম পেয়ারের পাত্র নয়। সে-ই তো সুলতানিয়তের প্রতিটি আদমির ভবিষ্যতের বল-ভরসা। তাই বলছি কি, যদি কোন প্রহরী পেয়ারবশত শাহজাদার একটু সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করেই দিয়ে থাকে তবে কি আপনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না? সে তো এ গুণাহ কেবল আপনার বেটার জন্যই নয়, নিজের স্বার্থের তাগিদেই করছে।'

বৃদ্ধ উজিরের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সুলতান নতুন করে বিস্মিত হলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বললেন—'সবই বুঝলাম উজির। কিন্তু আরও পনেরদিন তাকে না দেখে কি করে আমার জান টিকিয়ে রাখব!'

—'অন্য কোন রাস্তা নেই জাঁহাপনা। পনেরটি দিন আপনাকে ধৈর্য ধরতেই হবে। তারপরই দেখবেন শাহজাদা বিলকুল বদলে গেছে। তখন আর শাদীর নামে সে চমকে উঠবে না। আপত্তিও করবে না।'

সুলতান এতকিছু শোনার পরেও দিল্‌কে শক্ত করে বাঁধতে পারলেন না। অস্থিরচিত্ত সুলতান রাতভর ওঠা-বসা-পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।

আবার আন্ধার সে কুঠুরিতে শাহজাদা কামার অল-জামান রাত্রে খানাপিনা চুকিয়ে বাত্তি জ্বেলে কিতাব খুলে বসল। কয়েক পাতা পড়ল। এবার আচ্ছা করে রুজু সেরে নিত্যকার অভ্যাসমত কোরাণের কয়েক পাতা পাঠ করল। কোরাণটি কপালে ছুঁইয়ে পাশের টেবিলে রাখল। এবার বিছানায় গেল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর প্রভাতের পূর্বাভাষ পেয়ে কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' ছিয়াত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার আবার অন্দর মহলে

এলেন। তিনি বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় প্রবেশ করলে বেগম তাকে মুচকি হেসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

বাদশাহ শারিয়ার তার মেহবুবা বেগম শাহরাজাদকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে বুকে টেনে নিলেন। বেগমসাহেবা বাদশাহের প্রশস্ত বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পরম তৃপ্তিটুকু নিঃশেষে উপভোগ করতে লাগলেন। পর মুহূর্তেই তার ছোট বহিন দুনিয়াজাদ-এর উপস্থিতির কথা মনে পড়ে গেল। বাদশাহের কণ্ঠলগ্না হয়েই তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন।

কিশোরী দুনিয়াজাদ তখন বালিশে মাথা রেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে তার চোখের মণি দুটো উঁকি মারতে লাগল।

শাহরাজাদ ধমক দিয়ে বললেন—'মুখপুড়ী, খুব টেঁপু হয়েছিস, না? পাশ ফিরে শো।'

দুনিয়াজাদ এক ঝটকায় পাশ ফিরল। সে চোক্ চোক্ আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল বাদশাহের ঠোঁট দুটো তার বহিনজীর ঠোঁটে আটকা পড়ে গেছে। পরস্পরের দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে পরম তৃপ্তিতে ভেসে চলেছে এক অজানা-অচেনা আনন্দ-সায়রে। সে ডান-হাতটি ধীরে ধীরে তুলে এনে নিজের বুকে রাখল। শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে টিপে ধরল। অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল। কলিজায় যেন আগুন জ্বলছে। এ-কিসের যন্ত্রণা, কিসের আগুন তা বুঝার মত বয়স তার অনেক আগেই হয়েছে। আবার তার পিছনের দিক থেকে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর আওয়াজ কানে এল। নিজের নিচের ঠোঁটটিকে দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরল। জোরে....আরও জোরে কামড় বসাল। কখন যে ঠোঁট কেটে তির তির করে খুন বেরোতে শুরু করেছে বুঝতেই পারে নি।

রাত্রি ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। বাদশাহ ও বেগম কামজ্বালা নিবারণের নতুন খেলায় মেতে ওঠেন।

কিশোরী দুনিয়াজাদ অনুমান করতে পারে তাঁরা কখন, কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছেন। তার রক্তে মাতন লাগে, শিরা-উপশিরায় রক্তের গতি বৃদ্ধি পায়। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না। বুকের তলায় কোল বালিশটি রেখে তার ওপর সজোরে চাপ প্রয়োগ করতে লাগল।

এমনি ক'রে উভয় পক্ষ আবছা আন্ধারে আরও কিছুটা সময় কাটিয়ে দিল। সাধ্যমত যে যতটুকু সম্ভব রাত্রিটিকে উপভোগ করল।

এক সময় বেগম শাহরাজাদ তার ছোট বহিন দুনিয়াজাদ-এর পিঠে ছোট্ট করে এক চাপড় মেরে বললেন—'নে এদিকে ফের, বুঝেছি। আর ঘাপটি মেরে, ঘুমের ভান করে শিটকে লেগে পড়ে থাকতে হবে না।'

দুনিয়াজাদ এক ঝটকায় পাশ ফিরে তার বহিনজীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল—'মাঝখান থেকে আজ বুঝি জাঁহাপনার কিস্সাই শোনা হবে না।'

—'কি করে হবে মুখপুড়ী? গাছের খাওয়া আবার তলেরও কুড়োনো—এক সঙ্গে তো চলতে পারে না।'

জাঁহাপনা। এবার কিস্সার পরের অংশটুকু বলছি শুনুন—শাহজাদা কামার অল-জামান'কে যে জরাজীর্ণ পড়ো বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল সেটি এক সময় ঝলমল করত। আদমিদের যাতায়াতে সর্বদা গমগম করত।

অতি-প্রাচীন কালের ব্যাপার। রোম নগরী তখন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নগরী। এখন ধ্বংসস্তূপের মত এ-মহলটি একসময় ছিল সমসাময়িক কালের বাদশাহের প্রাসাদ।

এ-ভাঙা প্রাসাদটি বহু সু ও কুকীর্তির সাক্ষী। এর প্রতিটি ইট, কাঠ আর পাথরের গায়ে বহু হাসি-কান্না-আনন্দের ধারা জড়িয়ে রয়েছে। এ-প্রাসাদটির ঠিক পিছনে একটি বিশাল ইঁদারা রয়েছে। সেটি এক জিনির নিশ্চিন্ত বাসস্থল। যুবতী জিনি মাইমুনাহ। ইবলিস-এর বংশধর। মাইমুনাহ-র আব্বাজী বাদশাহ জিন দিমিরিয়াৎ। সাবটেরা নিয়ান-এর বাদশাহ। তার বীরত্বের বহু অলৌকিক ঘটনার কিস্সা তামাম দুনিয়ার আদমির মধ্যে প্রচারিত।

জিনি মাইমুনাহ প্রতিরাত্রের দ্বিতীয় প্রহরে সে-ইঁদারা থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়ে যায়। উড়তে উড়তে মহাশূন্যে গিয়ে মনস্থির করে কোনদিকে সে ধাওয়া করবে।

নিত্যকার অভ্যাসমত জিনি সে-রাত্রেও ইঁদারা থেকে বেরিয়েই সচকিত হয়ে উঠল। সে দেখে পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ বাড়িটার জানালা দিয়ে আলো ভেসে আসছে। ইতিপূর্বে এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড আর কোনদিন তার চোখে পড়ে নি। তাজ্জব বনে যাওয়ার মত ব্যাপারই বটে। যে বাড়িতে কোনদিন কোন আদমির পায়ের ছাপ পড়ে না সেখানে আদমি এল কোত্থেকে? তার কৌতূহল হ'ল। ব্যাপারটি কি? কোন রহস্য এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাকে সে রহস্য ভেদ করতেই হবে, এরকম ভেবে জিনি গুটি গুটি পড়ো বাড়িটির ভেতরে ঢুকে গেল।

কামার অল-জামান তখন অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পালঙ্কের ওপর শুয়ে।

জিনি জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে নগ্নপ্রায় নওজোয়ানটির দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিষ্পলক তার চাহনি। তার দিলে এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ জাগে।

ধীর-পায়ে অতি সন্তর্পণে জিনি জামান-এর পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখ ও দিল ভরে তার যৌবনভরা দেহটির সুরৎ উপভোগ করল। তার চোখ দুটো পানিতে ছলছল করে উঠল। ভাবল, কোন্ পাষাণ হৃদয় তার বেটাকে এখানে নির্বাসনে

পাঠিয়েছে? তার কি মায়া-মমতার লেশমাত্রও নেই? সে হতচ্ছাড়া কি জানে না যে, এখানে শয়তান আফ্রিদি দৈত্যের বাস? তার নজরে পড়লে এর দেহটিকে টুকরো টুকরো করে ছাড়বে।

জিনি আপন মনে বলে চলে—'এ নওজোয়ান যে-ই হোক না কেন আমি এর জান বাঁচাব। এর জন্য যে কোন মূল্য দিতেও আমি রাজী। আল্লাতাল্লার আশীর্বাদলব্ধ এ-নওজোয়ানটির জান—'জিনি কথাটি শেষ করল না। কামার অল-জামান-এর মুখের কাছে নিজের ঠোঁট দুটো এগিয়ে নিল। নিঃশব্দে চুম্বন করল। এবার আগের মতই জানালা দিয়ে গলে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাতাসে ভর দিয়ে নীল আকাশের দিকে উড়ে চলল।

কয়েক মুহূর্ত কাটাতে না কাটাতেই এক অবাঞ্ছিত শব্দ তার কানে এল। অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। দেখল, এক অতিকায় আফ্রিদি দৈত্য তার দিকে ধেয়ে আসছে। এবার চিনতে পারল—আফ্রিদি দানাশ। হতচ্ছাড়া হাড়ে হাড়ে বদমায়েশ। সুলতান সুলেমান-এর বশ্যতার ধার সে ধারে না। এর আব্বার নাম সামহারিস। জিনদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী ব'লে সুনাম রয়েছে।

জিনি মাইমুনাহ-র দিলে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। যদি ওই ভাঙা কুঠুরিটির দিকে এর নজর যায় তবেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

আফ্রিদি দানাশ তার মনের কথা যেন বুঝতে পেরে গেছে। সে কাতর মিনতি করে—'জিনি, মাইমুনাহ আমাকে মেরো না। আমি সুলেমানের দাসানুদাস। সুলেমান তোমায় দোয়া করবেন, ভালই করবেন, দোহাই তোমার।'

মাইমুনাহ ম্লান হাসল। মনে মনে বলল—'এখন সুলেমানের ওপর তোমার খুব ভরসা দেখছি হে! গলায় ফাঁস আটকেছে তো তাই সুলেমান সুলেমান করছ। অন্য সময় তার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতেও ছাড়বে না। এবার আফ্রিদিকে লক্ষ্য করে বলল—'কথাটা ঠিকই বলেছ। একটিমাত্র শর্তে আমি তোমাকে রেহাই দিতে পারি। তুমি কোত্থেকে আসছ, বল? ঝুট বলার কোশিস করবে না। যদি ঝুট বলার কোশিস কর তবে জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব বলে দিচ্ছি।'

—'ছিঃ তুমি অমন কথা বলতে পারছ সুন্দরী। আমি কোনদিন তোমার কাছে ঝুট বলেছি নাকি বলতে পারি? আজ একটি তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে। আগে কথা দাও, আমার কিস্‌সা যদি তোমাকে খুশী করতে পারে তবে আমাকে খুশী মত যেখানে সেখানে ঢুঁড়ে বেড়াবার অনুমতি দেবে।'/

—'যেখানে খুশী চলে যাবে? যেখানে দিল চায় চলে যাবে? বহুৎ আচ্ছা। তোমাকে আমি অনুমতি দিলাম। এবার দিল ভরেছে তো? ব্যস, আর কোন কথা নয়, তোমার কিস্‌সা শুরু কর।'

মাইমুনাহ-র কাছাকাছি পাশাপাশি উড়ে বেড়াতে বেড়াতে বলল—'সুন্দরী, তবে সে-কিস্‌সা শুরু করছি—আমি এখন সম্রাট ঘায়ুর-এর সাম্রাজ্য থেকে আসছি। বহু দূরবর্তী অঞ্চল পশ্চিম চীন তার সাম্রাজ্য। প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ঘায়ুর। তার বীরত্বের কাছে কেবলমাত্র প্রতিবেশী ছোট ছোট রাজা-বাদশাহরাই নয় বহু খ্যাতিমান সম্রাট মাথা নত করে, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সম্রাট ঘায়ুর তার সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করেছেন। তবে তার এক একটি দল আমাদের মোট সেনাবাহিনীর চেয়ে ছোট তো নয়ই, বরং বড়ই বলা চলে।

আর সে দেশের লেড়কিরা এমনই সুন্দরী যে, দেখলে হুরী বলে ভ্রম হতে বাধ্য। গোসল করার পর তাদের গা থেকে মিষ্টি-মধুর খুসবু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। কারো গা থেকে এমন মিষ্টি খুসবু নির্গত হতে পারে এ যেন খোয়াবের মধ্যেও ভাবা যায় না।

প্রবল পরাক্রান্ত ঘায়ুর-এর কোন লেড়কা নেই, একটি মাত্র লেড়কি। বদর তার নাম। তার সুরৎ বাস্তবিকই বর্ণনার অতীত। আমার বিশ্বাস, বদর-এর তুল্য রূপসী তামাম দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর কেউ নেই। একমাত্র বেহেস্তের হুরীদের কারো কারো মধ্যে এরকম সুরতের সমাবেশ ঘটতে পারে। এক কথায় বলতে গেলে যেকোন নিরাসক্ত নওজোয়ানও যদি তাকে প্রত্যক্ষ করে তবে তার বুকে তুফান উঠবে, সাগরের উত্তাল-উদ্দাম ঢেউ বইতে বাধ্য।

উদ্ভিন্ন যৌবনা লেড়কি বদর সম্রাট ঘায়ুর-এর চোখের মণি। যত দিন যাচ্ছে, বয়স যত বাড়ছে ততই তার দেহে সুরতের হাট বসছে। সম্রাট কিছুদিন আগেও লেড়কির দিলে খুশী উৎপাদনের জন্য বস্তা বস্তা দিনার খরচ করে আজব এক প্রাসাদ গড়ে দিয়েছেন। সাতমহলা প্রাসাদ। তাদের একটি আগাগোড়া স্ফটিক দিয়ে বানানো হয়েছে।

তাদের একটি অ্যাসব্যাস্টার, একটি চীনামাটি, একটি বাহারি সব মার্বেল পাথর, একটি রুপো আর হীরা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সপ্তম মহলটি। এবার হিসাব করে দেখ, কী কাণ্ডটিই না সম্রাট ঘায়ুর তার বেটি বদর-এর জন্য করেছেন। দুনিয়ার সেরা কারিগরদের দিয়ে বানানো সাতমহলা প্রাসাদটির দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সম্রাটের ইচ্ছা, বদর প্রত্যেকটি মহলে একটি করে বছর বসবাস করবে। অর্থাৎ প্রতি সাত বছর বাদে একটি মহল ভোগ করবে।

সুন্দরী মাইমুনাহ, তোমাকে কি করে যে বিশ্বাস করাই, তাকে দেখার পর থেকে আমার দিমাক একেবারে বিগড়ে গেছে। কোন কিছুতেই আমার দিল্ ভরছে না।

সম্রাট ঘায়ুর লেড়কির শাদীর কথা ভাবল। তার শাদীর কথা চারিদিকের রাজ্যে প্রচার করা হ'ল। দেশ-বিদেশ থেকে সম্রাট-বাদশাহ-সুলতান, শাহজাদা আর আমীর-ওমরাহদের হাট বসে গেল ঘায়ুর-এর প্রাসাদে। লেড়কি একটি। কিন্তু পাণিপ্রার্থী হাজার। ঘায়ুর চাইল কি তার আদরের খুবসুরৎ লেড়কি তার পছন্দ মাফিক বর বেছে নিক।

রূপসী বদর'কে নিয়ে আসা হ'ল পাণিপ্রার্থী নওজোয়ানদের হাটে। কিন্তু কারো সঙ্গেই তার হাসি বিনিময় হ'ল না। তার কৃপা -দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য কোন নওজোয়ানেরই হ'ল না।

শাহজাদী বদর-এর এক কথা, কোন পুরুষের তাবে থেকে জীবন ধারণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর পদ্মের পাঁপড়ির মত তুলতুলে তার ওষ্ঠদ্বয় কি করে কোন পুরুষের কঠিন-কঠোর ওষ্ঠের নির্যাতন বরদাস্ত করবে। আর সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত তার নিটোল স্তনদ্বয় কোন পুরুষের কঠোর নির্মম হস্তের পেষণে পিষ্ট হবে এ যে তার কল্পনারও অতীত। ভাবলেই তার শরীরের সবক'টি স্নায়ু কেমন অবশ হয়ে আসতে চায়। আর...আর তার কুসুম কোমল নিতম্বদ্বয় কোন পুরুষের দেহভারে পিষ্ট হবে—অসহ্য। আর যা কিছু সম্পদ কুমারী উদ্ভিন্ন যৌবনা শাহজাদী বদর সযত্নে রক্ষা করে আসছে তা কোন পুরুষের নির্মমতার কাছে সঁপে দেয়ার কথা ভাবলেই তার মাথা ঝিম ঝিম করে। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসতে চায়। অসহ্য! অসম্ভব!

সম্রাট ঘায়ুর লেড়কির মতের বাইরে কিছু করতে চান না। সে যদি কোন পুরুষের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ হতে নাই চায়, আপত্তি করবেন না। তবে বহুভাবে তাকে যে বোঝাবার চেষ্টা তিনি করেন নি তা নয়।

একবার এক প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট প্রভূত হীরা জহরৎ ও অন্যান্য বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠিয়ে রূপসী তন্বী যুবতী বদর-এর পাণি প্রার্থনা করলেন।

সম্রাট ঘায়ুর তাঁর বেটি বদর-এর কাছে প্রস্তাবটি পাড়লেন। সাধ্যমত বুঝাতে চেষ্টা করলেন, এতবড় সম্রাটের বেগম হওয়া নসীবের ব্যাপার।

ঘায়ুর-এর পরিশ্রম-প্রয়াস পুরোপুরি বিফলে গেল। উপরন্তু তার বেটি গেল বিগড়ে। সে তার আব্বার মুখের ওপর বলে দিল—'আব্বা তুমি আমার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছ। তোমার নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ আমাকে আত্মঘাতী হওয়ার পথ বেছে নিতে বাধ্য করছে। এ জান খতম না করলে দেখছি তুমি আমাকে রেহাই দেবে না!'

সম্রাট ঘায়ুর দেখলেন, একী মহা সমস্যায় পড়া গেল! দেখা যাচ্ছে যা-ই করা হচ্ছে বিলকুল হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে বাধ্য হলেন, ভবিষ্যতে আর কোনদিনই তার শাদীর কথা মুখেও উচ্চারণ করবেন না।

বেগম শাহরাজাদ কিস্সার এ পর্যন্ত বলার পর ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে কিস্সা বন্ধ করলেন।

পরের রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার আবার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা সম্রাট ঘায়ুর তার লেড়কির শাদীর কোশিস আর করলেন না। তিনি দিল্ থেকে ব্যাপারটি মুছে ফেললেন।

আফ্রিদি দানাশ কিস্সার এ পর্যন্ত বলে জিন মাইমুনাহ-র দিকে আবেগ-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল—'মাইমুনাহ, সে বেহেস্তের পরীকে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। তোমার দিল্ চাইলে আমার সঙ্গে যেতে পার, দেখে চোখ দুটোকে সার্থক করে তুলবে।'

মাইমুনাহ তাচ্ছিল্যের স্বরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল—'কথাটি বলতে তোমার মুখে এতটুকুও বাঁধল না! সামান্য এক লেড়কির সুরৎ দেখেই তোমার দিমাক বিগড়ে গেছে। বলিহারি তোমার সুরতের বিচার! আসলে সুরৎ কাকে বলে তুমি বোঝই না।'

আফ্রিদি দৈত্য দানাশ বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। জিনি মাইমুনাহ ব'লে চলল—'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলেছি। খুব-সুরৎ কাকে বলে, তুমি জানই না। আমি যে নওজোয়ানকে পেয়ার মহব্বৎ দিয়েছি তাকে দেখলে তো তোমার শির ঘুরে যাবে। আর মুখে রা পর্যন্ত সরবে না।'

—'তাই বুঝি?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দৈত্য দানাশ বলল—'কে সে? কোথায় তার ঘর?'

—'এক শাহজাদা। বাদশাহের লেড়কা। আমি যে ইঁদারায় থাকি তারই লাগোয়া এক ভাঙাচোরা বাড়িতে তাকে দেখে এসেছি। বন্দী-জীবন যাপন করছে।'

—'তবে যাই, একবারটি দেখে আসি গে।' কথা বলতে বলতে দৈত্য দানাশ ঘোরার কোশিস করল। জিনি আচমকা তার হাত চেপে ধরে বলল—'সে কী, কোথায় চললে? খবরদার! তুমি একা যাবে

না সেখানে। যেতে চাও তো আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তোমাকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। ঈর্ষার বশে হয়ত তাকে খতমই করে দেবে। বহুৎ খুবসুরৎ নওজোয়ান দেখলেই তোমার হাত দুটো নিসপিস করতে থাকে। তার জান না নেয়া পর্যন্ত তোমার দিমাক ঠাণ্ডা হয় না।'

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আফ্রিদি দৈত্য দানাশ বলল—'তুমি কি যে বল সুন্দরী, বুঝে পাই না। তুমি যাকে পেয়ার মহব্বৎ কর তার অনিষ্ট আমি কখন করতে পারি? আমি আল্লাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, কোনদিন আমি একা একা তোমার মেহ-বুবের কাছে যাব না। চল, দূর থেকে এক ঝলক দেখেই চলে আসব।'

জিনি মাইমুনাহ এবার পিছন ফিরে আবার শূন্যে ভেসে চলল। আফ্রিদি দৈত্য দানাশ তাকে অনুসরণ করল।

চোখের পলকে তারা সে পড়ো বাড়ির চিলেকোঠার জানালার কাছে হাজির হ'ল। তারপর জানালা দিয়ে গলে গেল। কামরার ভেতরে ঢুকে জিনি মাইমুনাহ বলল—'খবরদার কোনরকম শব্দ কোরো না! এর ঘুম ভাঙলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে কিন্তু।'

আফ্রিদি দৈত্য দানাশ আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে ব'লে উঠল—'বাঃ চমৎকার! কোন পুরুষের মধ্যে এমন সুরতের মেলা বসতে পারে এ যেন কল্পনারও অতীত। এ যেন সদ্য বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে।' এবার মাইমুনাহ-র দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—'আমি আমার মেহবুবা যে শাহজাদীর সুরতের বর্ণনা তোমাকে দিয়েছিলাম সে তোমার মেহবুব এ-শাহজাদার সুরতের তুলনায় খুবই নগণ্য।'

জিনি মাইমুনাহ তার পাখা দিয়ে দানাশ-এর মুখে আচমকা এক ঝাপটা দিয়ে বলল—'খুব হয়েছে। এবার মানে মানে এখান থেকে কেটে পড়। এভাবেই তোমার মধ্যে ঈর্ষার উদ্ভব হয়। তারপরই তুমি তার জান খতম—ভাগ ভাগ বলছি। নইলে এমন এক আছাড় মারব যে তোমার দফা একেবারে রফা করে ছাড়ব। যাও, সোজা তোমার পেয়ারের বদর-এর কাছে চলে যাও।' এবার দু'পা এগিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল—'তোমার রূপসীকে আজ রাত্রেই এখানে নিয়ে আসা চাই। তাদের পাশাপাশি রেখে আমি যাচাই করে দেখতে চাই, কার সুরৎ সবচেয়ে বেশী, আমার মেহবুব, নাকি তোমার মেহবুবা ওই শাহজাদী বদর-এর। খেয়াল রেখো, আজ রাত্রেই আমি তাকে এখানে দেখতে চাই। নইলে এমন এক আছাড় মারব যে হাড্ডি একেবারে গুঁড়া হয়ে যাবে। যাও জলদি গিয়ে তাকে এনে এখানে হাজির কর।'

জিনি মাইমুনাহ-র ধমক খেয়ে আফ্রিদি দৈত্য দানাশ-এর কলিজা ডরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ভীত-সন্ত্রস্ত দিল্ নিয়ে ডরে জড়োসড়ো হয়ে সে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে ঘুমন্ত শাহজাদী বদরকে নিয়ে এল।

তাকে জানালায় দেখেই জিনি মাইমুনাহ ফোঁস করে উঠল—'কী ব্যাপার, এত দেরী হ'ল কেন? পশ্চিম চিনে যাতায়াতে এত সময় তোমার লেগে গেল! আমাকে শেখাচ্ছ! হতচ্ছাড়া শয়তান কাঁহিকার! বুঝেছি, পিঠের ওপর এমন যৌবনের জোয়ার লাগা কুমারী। ফিনফিনে একটি কামিজ ছাড়া গায়ে কিছুই নেই। তার ধবধবে শরীরের রোমগুলি পর্যন্ত কামিজ ভেদ করে নজরে পড়ছে। দেহের প্রতিটি ভাঁজ ফুলে ফেঁপে উঠছে। এত কিছু দেখে তোমার দিমাক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কলিজায় আগুন ধরে গিয়েছিল বুঝি। কামজ্বালায় দগ্ধ হতে হতে এক সময় শাহজাদী বদরকে পথের মাঝে নামিয়ে—'ছিঃ মুখ ফুটে বলা তো দূরের কথা ভাবতেও পারছিনে। তোমাকে আমি চিনি না? তোমার দিলে যদি একবার সম্ভোগের বাসনা জাগে তখন ভোগ না করা পর্যন্ত তোমার দিল ঠাণ্ডা হবার নয়।'

আফ্রিদি দৈত্য দানাশ মুখ গোমড়া করে, নিতান্ত অপরাধীর মত মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টু-শব্দটিও করল না।

জিনি মাইমুনাহ এবার শাহজাদী বদর-এর দিকে দৃষ্টি ফেরাল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার বিবস্ত্র প্রায় দেহপল্লবটিকে খুটিয়ে খুটিয়ে নিরীক্ষণ করে এক সময় আবেগভরে ব'লে উঠল—'বাঃ কী সুরৎ! চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়!' এবার আলতো করে তার গা থেকে কামিজটি খুলে নিল। আবার নিরীক্ষণে লিপ্ত হ'ল। আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে লাগল—'একমাত্র বেহেস্তের হুরীদের দেহেই এরকম সুরৎ দেখা যায়। দানাশ এর সুরতের যে বিবরণ দিয়েছিল তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী সুরতের সমাবেশ ঘটেছে এর দেহে।' এবার জিনি মাইমুনাহ শাহজাদার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। উভয়কে পাশাপাশি রেখে বিচার করল। একসময় মুখ খুলল—'দানাশ ঝুটবাৎ বলে নি।

আমার শাহজাদা থেকে তার শাহজাদীর সুরৎ কোন অংশে কমতি নয়।'

এবার আফ্রিদি দৈত্য দানাশ-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে জিনি মাইমুনাহ বলল—'শোন,তুমি যে বলেছিলে আমার শাহজাদার সুরৎ তোমার শাহজাদীর সুরতের চেয়ে ঢের—ঢের বেশী, তা কিন্তু ঠিক নয়। নওজোয়ানদের সুরতের বিচার হয় কি দিয়ে? দেখতে হবে তাদের দেহের কোথাও আদৌ মেয়েলী ছাপ আছে কিনা। অবশ্যই স্বীকার করবে আমার শাহজাদা একেবারেই নিখুঁত! আর লেড়কির সুরতের বিচার হয় তার শরীরের কামের ছাপের মাধ্যমে। তোমার শাহজাদী বদরকে আমি কেন খুবসুরৎ বলছি, জান? এর নিটোল স্তন যুগল, সরু কোমর, মেদহীন তলপেট আর তুলতুলে প্রশস্ত নিতম্ব যা কিছু পুরুষের মধ্যে কাম-পিপাসা জাগিয়ে তোলে সবই এর দেহে যথাযথ উপস্থিত। কিন্তু আমি ফিন বলব, আমার শাহজাদা কামার অল-জামানই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।'

—'কেন ঝুটমুট জাদা বাৎ বলছ? আমি তো মেনেই নিচ্ছি, তোমার শাহজাদা কামার অল-জামান-এর সুরৎই বেশী আকর্ষণীয়।'

জিনি মাইমুনাহ খেঁকিয়ে ওঠে—'শাহজাদা কামার অল-জামান-এর সুরৎ-ই বেশী আকর্ষণীয়—এতক্ষণ কোথায় ছিল তোমার এরকম মিঠা মিঠা বাৎ। গর্দানে এমন এক রদ্দা মারব, জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে।'

আফ্রিদি দানাশ ভীত-সন্ত্রস্ত মুখে, কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল—'সুন্দরী, আমার ওপর তোমার কেন যে এমন গোসস্য, বুঝছি না! আমি তো তোমার কাছে সেই তখন থেকে মাফি মাঙছি। আমি ফিন বলছি, তোমার শাহজাদার সুরৎ-ই বেশী। আর আমার শাহজাদীকে দ্বিতীয় স্থানে রাখছি। এবার একটু হাস তো দেখি। সেই কখন থেকে মুখ ব্যাজার ক'রে রেখেছ। দেখে আমার কলিজার ধুঁকপুকানি কিছুতেই থামছে না।'

এমন সময় প্রাসাদসংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের কিচির মিচির শুনে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' বিরাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, আফ্রিদি দৈত্য দানাশ করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেও জিনি মাইমুনাহ-র গোস্‌সা একেবারে কমল না। সে রাগে গস্ গস্ করতে করতে বলল—'তুমি কি সাধে এমন নরম হয়েছ? আসলে গর্দান বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছ।'

জিনি মাইমুনাহ ব্যাপারটিকে আর বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহী হ'ল না। কারণ, ধস্তাধস্তি তো দূরের কথা একটু গলা চড়িয়ে কথা বললেই তাদের নিদ টুটে যেতে পারে। জিনি মাইমুনাহ এবার অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলল—'দানাশ, এখন কি বলছি ধৈর্য ধরে শোন। আমরা কিন্তু কেউ-ই স্বেচ্ছায় নিজ নিজ জায়গা থেকে নড়তে রাজী নই। তাই আমাদের বিতর্কের মীমাংসা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের মতামত একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এর ফয়সালা করতে হলে অন্য কাউকে নিয়ে আসতে হবে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! তোমার দিল্ যাকে চায়, ডেকে নিয়ে এসো।' আফ্রিদি দৈত্য দানাশ-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই জিনি মাইমুনাহ উপুড় হয়ে তর্জনি দিয়ে মেঝেতে তিনবার টোকা দিতেই ভয়াল দর্শন এক দৈত্য আবির্ভূত হ'ল। এক পলকে তাকে একটু দেখামাত্রই কলিজা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যায়। তার দেহটি যেমন বিশাল তেমনি মাথায় ইয়া লম্বা লম্বা ছয়টি শিং। এক একটির দৈর্ঘ্য চার হাজার চারশ' আশি হাত। আর পিছনে গাঁইতির মত বাকানো একটি অঙ্গ। দেখলেই বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। শুধু কি এ-ই? তাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে তার পিঠের কুঁজটি। এত বড় ও কদর্য কুঁজ কারো থাকতে পারে বিশ্বাস করতেই উৎসাহ পাওয়া যায় না। একেবারে নিখুঁত বৃত্তাকার দুটো ইয়া বড় বড় চোখ। দু'চোখের নিচে যেখানে নাক থাকে সে জায়গাটি একেবারেই ল্যাপাপোছা। নাক ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আরও আছে। দৈত্যটিকে আরও বেশী করে কদাকার করে তুলেছে তার খোড়া, বাঁকাচোরা পা'টি। আর তার বাহুর দৈর্ঘ্যের পরিমাপ দিতে গিয়ে নিজেরই বুকে ধুকপুকানি শুরু হয়ে যায় জাঁহাপনা। একটি হাতের দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার পাঁচ শ' পঞ্চাশ হাত। আর দ্বিতীয়টি? বড় জোর এক বিঘৎ দীর্ঘ। কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যটির নাম কশ্‌কশ্ ইবন্-ফকরাশ ইবন্-আত্রাশ। আবু জানফাশ-এর বংশধর ব'লে তাকে সবাই জানে।

ইবন-আত্রাশ আবির্ভূত হতেই জিনি মাইমুনাহ মুচকি হেসে তার কুশলবার্তাদি নিল।

ইবন-আত্রাশ করজোড়ে বলল—'আমার প্রতি কি হুকুম মেহেরবানি ক'রে বলুন।'

—'শোন, ইবন-আত্রাশ, হতচ্ছাড়া দানাশ-এর সঙ্গে আমার বিবাদ দেখা দিয়েছে।। তোমাকে আমাদের বিবাদের মীমাংসা করার জন্য কষ্ট দিয়ে তলব করে নিয়ে এসেছি। তোমাকে বলতে হবে, ওই যে পালঙ্কের ওপর শাহজাদা আর শাহজাদী গভীর নিদে আচ্ছন্ন তাদের মধ্যে কার সুরৎ সবচেয়ে বেশী? এখন তোমার প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে, উভয়কে ভালভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, নিজের দিলের সঙ্গে বোঝাপড়া করা, তারপর তোমার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলবে এদের মধ্যে কার সুরৎ সবচেয়ে বেশী।'

দৈত্য কশ্‌কশ্ মহাফাঁপরে পড়ল। শ্যাম রাখে না কুল রাখে?

শাহজাদা কামার অল-জামান-এর সুরৎ সবচেয়ে বেশী যদি বলা যায় তবে দৈত্য দানাশ-এর গাল ফুলবে—ক্ষুব্ধ হবে। আর যদি শাহজাদী বদর-এর সুরৎ-ই বেশী বলা যায় তবে আর রক্ষা নেই। জিনি মাইমুনাহ কিলিয়ে মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছাড়বে।

কয়েক মুহূর্ত ইয়া ডাগর ডাগর চোখের মণি দুটো নাচিয়ে শাহজাদা ও শাহজাদীকে নিরীক্ষণ করে অসহায়ভাবে দৈত্য কশ্‌কশ্‌ এবার আমতা আমতা ক'রে বলল—'কী ঝকমারীতেই না আমাকে ফেললে! আমার চোখে তো দু'জনের সুরৎই সমান মনে হচ্ছে।'

—'এ কিন্তু তোমার পিঠ বাঁচাবার ফিকির বের করেছ কশ্‌কশ্‌। উভয়েই খুবসুরৎ, বহুৎ আচ্ছা বাৎ। কিন্তু উনিশ-বিশ তো হতেই হবে। আরও আচ্ছা ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে—'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়ে দৈত্য কশ্‌কশ্‌ বলল—'পেয়েছি! বহুৎ আচ্ছা এক ফিকির আমার মাথায় এসেছে। আমি শাহজাদী বদর-এর গুণগান করে একটি শায়ের শোনাতে চাচ্ছি।'

—'ধুৎ! ধানাইপানাই রাখ! তোমার শায়ের টায়ের শোনার মত সময় বা ধৈর্য কোনটিই আমার নেই। যা বলার ঝটপট সাফসাফ বল কশ্‌কশ্‌।'

—'তবে আর একটি ফন্দি বাৎলাচ্ছি। আমরা তিনজনই বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাই। ভোর হোক। এরা দু'জনই জেগে উঠুক। একে অন্যকে দেখুক। আমরা নজর রাখব, কে, কার সুরৎ দেখে বেশী মুগ্ধ হয়েছে। যদি দেখা যায় লেড়কিটি লেড়কার সুরৎ দেখে মুগ্ধ, পাগলের মত ছটফট করছে তবে বোঝা যাবে লেড়কার সুরৎ বেশী। আর যদি দেখা যায় লেড়কিটিকে দেখার পর থেকে লেড়কাটির মধ্যে অস্থিরতা ভর করেছে তখন কিন্তু স্বীকার না করে উপায় থাকবে না যে, লেড়কিটির সুরৎই সবচেয়ে বেশী। কী মতলবটি পছন্দ হচ্ছে?'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলার পর প্রাসাদ্‌সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের প্রস্তুতি চলতে দেখা গেল। শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

এক শ' তিরাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। বাদশাহ ধীরে ধীরে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় বেগমের ওষ্ঠদ্বয়ের কাছাকাছি নামিয়ে আনলেন। আচমকা দুনিয়াজাদ-এর চোখে চোখ পড়তেই নিজেকে সামলে নিলেন। বেগম বুঝলেন, দুনিয়াজাদই বাদশাহের এভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার কারণ! তিনি মৃদু ধমকের স্বরে বললেন—'মুখপুড়ী কিছুক্ষণ পিছন ফিরে শোয়া যায় না! কিস্‌সা বললে তো আর মনে মনে বলব না। তখন তো আমিই তোকে এদিকে ফিরতে বলব।'

শাহরাজাদ-এর বাৎ শেষ হবার আগেই কিশোরী দুনিয়াজাদ পিছন ফিরে শুয়ে জিভ দিয়ে বার বার চেটে শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটদুটোকে ভিজিয়ে নিতে লাগল।

বেগম শাহরাজাদ এদিকে বাদশাহ শারিয়ার-এর সুপ্রশস্ত বুকের নিচে একটু একটু করে হারিয়ে যেতে লাগলেন।

কিশোরী দুনিয়াজাদ পিছন ফিরে শুয়ে কেবল অস্ফুট স্বর, মৃদু কম্পন আর ঘন ঘন শ্বাসক্রিয়ার শব্দ প্রভৃতিকে জুড়ে জুড়ে পুরো ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ ধারণা করে নিল। তারপর কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক-নিস্তব্ধ। কেবল থেকে থেকে শ্বাসক্রিয়ার অস্পষ্ট শব্দ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতাকে ভঙ্গ করতে লাগল।

এক সময় বেগম শাহরাজাদ স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে গত রাত্রে কিস্‌সাটি যেখানে বন্ধ করেছিলেন তারপর থেকে শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, কশ্‌কশ্‌-এর বাৎ শুনে জিনি মাইমুনাহ উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠল—'বেড়ে মতলব! এতক্ষণ তবে ন্যাকাবোকার মত আমতা আমতা করছিলে কেন, বল তো?'

এবার কশ্‌কশ্‌-এর পরামর্শমত জিনি মাইমুনাহ, আফ্রিদি দৈত্য দানাশ এবং দৈত্য কশ্‌কশ্‌ স্বয়ং মাছির রূপ ধারণ করল। দানাশ পালঙ্কের অদূরে এক গোপন স্থানে ঘাপটি মেরে বসে রইল। আর অন্য দু'জন কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে শাহজাদা কামার অল-জামান ঘুমের ঘোরে ডান-হাতটি ঘাড়ের কাছে তুলে নিল। বার কয়েক ঘাড়ে আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে নিল। এবার সেটিকে পালঙ্কের ওপর ছড়িয়ে দিল। কিন্তু হাতটি বিছানার ওপরে পড়ার জো নেই। বিছানা তো আর শূন্য নয়। শাহজাদী বদর বিবস্ত্র হয়ে এলিয়ে পড়ে ঘুমে আচ্ছন্ন। যে-হাতটিকে কামার অল-জামান

বিছানার ওপর রাখতে চেষ্টা করল আদতে সেটি গিয়ে আশ্রয় নিল পূর্ণ যৌবনা বদর-এর কুসুম-কোমল দুই উরুর ফাঁকে। কেমন অস্বাভাবিক মনে হ'ল। নিদ চটে গেল। আচমকা চোখ মেলে তাকাল। আবছা অন্ধকারে ঘাড় ঘুরিয়েই বিবস্ত্রা ঘুমন্ত বদরকে দেখেই তার চোখ দুটো যেন যন্ত্রচালিতের মত বন্ধ হয়ে গেল। আপন মনে বলে উঠল—'শোভন আল্লাহ! একী তাজ্জব কী বাৎ! আমাকে এ কোন নরকে এনে ফেলেছে! একী বাস্তব, নাকি খোয়াব দেখছে সে! চোখ দুটো বন্ধ রেখেই সে আবার হাতটিকে আস্তে আস্তে সচল করল। এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। উদ্দেশ্য সত্যিই কেউ তার পাশে বিবস্ত্রা হয়ে শুয়ে রয়েছে কিনা। সামান্য এগোতেই আচমকা তার হাতটি থেমে গেল। নরম! অস্বাভাবিক নরম। কবোষ্ণও বটে। এটি বিবস্ত্রা লেড়কির দেহের কোন অংশ? হ্যাঁ, একটু আগে তো তার হাতটি এর কাছাকাছিই অবস্থান করছিল। কী তুল তুলে নরম! কী মোলায়েম! তবে কি এটি খুবসুরৎ লেড়কিটির উরুদেশই বটে! হ্যাঁ, ধারণা অভ্রান্ত। এবার নিজের নাকটিকে তারদিকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেল। লম্বা লম্বা শ্বাস টানল। আপন মনে বলে উঠল—'আর কী চমৎকার খুসবু! খুসবুতে বাতাস ম ম করছে।' শাহজাদা কামার অল-জামান আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। দেখল, তার পাশে, মাত্র হাত খানেক দূরে এক খুবসুরৎ বিবস্ত্রা লেড়কি ঘুমে বিভোর। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। সত্যি লেড়কিটির সুরৎ আকর্ষণীয়। তার মনমৌজী রূপ চোখ দুটোকে যেন শক্তিশালী চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে। কোন যুবতীর দেহে, সালোয়ার কামিজ আর বোরখার আড়ালে যে এমন রূপের অতলান্ত সাগর লুকিয়ে থাকতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি কোনদিন।

পরমুহূর্তেই কামার অল-জামান যেন আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেল। এক বিবস্ত্রা সুরতের আকরকে পাশে নিয়ে শোয়া তো দূরের কথা তার-দিকে তাকানোও যে রীতিমত গুণাহ। এ গুণাহের মাফ নেই। দোজকেও স্থান হবে না।

কিন্তু কামার অল-জামান কতক্ষণ নিজেকে সংযত রাখবে। কৌতূহল। কৌতূহলের শিকার হয়ে সে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেই আড় চোখে বিবস্ত্রা কুমারী বদরের যৌবনের জোয়ার লাগা সুরৎ নিরীক্ষণ করতে লাগল। আগুন! হ্যাঁ, সুরতের আগুনই বটে। আগুনের সংস্পর্শে ঘি তোর দূরের কথা লোহা পর্যন্ত গলে পানি হয়ে যায়। কামার অল-জামান-এর কৌতূহলী চোখের মণি দুটো বিবস্ত্রা সুরতের আকর কুমারী বদর-এর আধ-ফোটা পদ্মের মত মুখটিকে, আপেল-রাঙা গাল দুটোকে, পদ্মের পাঁপড়ির মত ওষ্ঠদ্বয়কে দীর্ঘ সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ক্রমেই তার চোখের মণি দুটো চঞ্চল হয়ে পড়তে লাগল। মুখাবয়ব থেকে এবার চোখের মণি দুটো নেমে এল চিবুক বেয়ে গলায়। এখানেও এক নতুনতর সৌন্দর্য তার চোখে ধরা পড়ল। তারপর? তারপর আরও সামান্য নেমে তার দৃষ্টি একেবারে স্থির হয়ে গেল। আচমকা এক অভাবনীয় ও অনাস্বাদিত শিহরণ তার শিরা উপশিরায় অনুভব করল। তামাম দুনিয়ায় যা কিছু খুবসুরৎ ব'লে বিবেচিত হয় তারা এর বুকের কাছে এসে ম্লান হয়ে যাবে। দুনিয়ার কোথাও এমন অবর্ণনীয় সুরৎ লুকিয়ে থাকতে পারে এর আগে সে খোয়াবের মধ্যেও কোনদিন ভাবতে পারে নি।

কামার অল-জামান কেমন এক অবর্ণনীয় উত্তেজনার জোয়ারে তলিয়ে যেতে লাগল। খুনের গতি ক্রমেই দ্রুততর হচ্ছে। বুকের মধ্যে কলিজাটি উথালি পাথালি শুরু করে দিয়েছে। আর মনে লেগেছে মাতন। এ কী মহা দায়! এ কী জ্বালা! এ কী অবর্ণনীয় অস্বস্তি! তার সর্বাঙ্গ ঘামে জবজবে হয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা ডানহাতটিকে সে ঘুমন্ত সুরতের আকর বদর-এর দিকে এগিয়ে দিল। রাখল তার গায়ে। এবার আপনা থেকেই সেটি চঞ্চল হয়ে উঠল। তার বিবস্ত্রা দেহের আনাচে কানাচে হাতটি বার বার চক্কর খেতে লাগল। কী যে এক অনাস্বাদিত আনন্দে পুলকে তার দিল্ চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর হয়ে পড়তে লাগল তা অপরকে বুঝিয়ে বলা যায় না। এ হচ্ছে পুরোপুরি উপলব্ধির ব্যাপার। আত্মমগ্ন হয়ে নিঃশব্দে উপভোগ করার ব্যাপার।

কামার অল-জামান এতদিন জৈবিক প্রবৃত্তিকে যৌবনের ক্ষুধাকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অস্বীকার করেছে। নিজেকে করেছে, পীড়িত মর্মাহত। আজ তার যৌবন-ক্ষুধা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সুতীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। আজ তাকে রোধ করবে তার সাধ্য কি?

কামার অল-জামান মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলে—আর ঝুটমুট আত্মপীড়ন নয়। শরীর আর দিল্ আজ এককাট্টা হয়ে গেছে। উভয়ের চাহিদা একই।

কামার অল-জামান-এর দিল্ তার হাত দুটোর ওপর থেকে কর্তৃত্ব উঠিয়ে নিল। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিল। ব্যস, হাত দুটো এবার যেন ক্ষুধার্ত শেরের থাবার মত রূপসী কুমারী বদরের স্তন দুটোকে আঁকড়ে ধরল। তারপর? তারপর নিজের অজান্তে সে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল—'ইয়া খোদা, এত শান্তি-সুখ তোমার সৃষ্ট লেড়কিদের দেহে রয়েছে আগে তো বুঝি নি! এত্ সুখ যে সহ্য করা যায় না! নিরবচ্ছিন্ন সুখ তার মধ্যে উন্মাদনার সঞ্চার করল। খুনে তার মাতন লাগে। তার নিটোল স্তন দুটোর ওপর নিজের বুকটিকে অস্থিরভাবে ঘষতে লাগল। মেদহীন তলপেটে অলস অবশ হাতটিকে বার বার বুলাতে লাগল। রোমাঞ্চ...শিহরণ...পুলকানন্দ!

কামার অল-জামান এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! কারো কারো ঘুম খুবই গাঢ় হতে পারে বটে। তাই বলে এরকমটি তো ভাবা যায় না। কারো বিবস্ত্রা দেহটিকে নিয়ে যদি এমন করে নাড়াচাড়া করা যায়, দলন ও পেষণ করা যায় তবে কতক্ষণ আর সে ঘুমের দাসত্ব করতে পারে? তবে? তবে কি দৈত্য দানাশ তার ওপর তুকতাক যাদুমন্ত্র করে দিয়ে গেছ? হ্যাঁ, এ-ই সত্য হতে পারে বটে।

শতচেষ্টা করেও কামার অল-জামান তার নিদ ভাঙাতে পারল না। নিজের কাজের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল। ছিঃ, এ আমি করছি কি? এক রূপসী যুবতীর সদ্য প্রস্ফুটিত কমলের খুসবু আমাকে তস্করের মত লুকিয়ে লুকিয়ে তার অজান্তে গ্রহণ করতে হ'ল। আল্লাহ, আমার গোস্তকি মাফ করে দাও। যৌবনের জ্বালা, কামের আগুনের তেজে যে এত প্রকট হতে পারে সে খোয়াবের মধ্যেও কোনদিন ভাবে নি।

এদিকে কামরার বাইরে, জানালার পৈঠায় মাছির রূপ ধরে বসে দৈত্য দানাশ এবং জিনি মাইমুনাহ-এর প্রতিটি মুহূর্তের কাজের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। আবার দৈত্য কশকশ তো ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছে তার ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন করতে। অনুসন্ধিৎসু তার দৃষ্টি।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে বুঝতে পেরে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্সা বন্ধ করলেন।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পরই বাদশাহ শারিয়ার কিস্সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই সরাসরি কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন। তিনি বললেন—'জাঁহাপনা,

শাহজাদী বদর বিবস্ত্রা অবস্থায় চিৎ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছিল।

কামার অল-জামান কামজ্বালা সইতে না পেরে বদরকে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে ফেরাতে যাবে ঠিক তখনই একটি কথা তার দিলের কোণে উঁকি মারল। থমকে গেল। যন্ত্রচালিতের মত হাতটিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেনে নিল বদর-এর দেহের ওপর থেকে।

কামার অল-জামান আপন মনে ব'লে উঠল—'হায় আল্লাহ! এখন আমার কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হ'ল। এসব আমার আব্বাজীর কারসাজি! তিনিই ফন্দি-ফিকির করে এ-খুবসুরৎ লেড়কিটিকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমার দিল্‌কে শাদীর দিকে ফেরাতে চান। শাদী করে আমি যাতে অন্য দশজনের মত ঘর সংসার করি এটি তার একান্ত ইচ্ছা। এ ফিকির একই উদ্দেশ্যে। আর তিনি নির্ঘাৎ দরজা বা দেয়ালের ছিদ্রে চোখ রেখে আমার মানসিক অবস্থার ক্রমঃপরিবর্তনটুকুর ওপর কড়া নজর রেখে চলেছেন। কাল সকালে যদি আমায় তিনি প্রশ্ন করেন, দোজকের কীট নিয়ে কে কামোন্মাদনায় লিপ্ত হয়েছিল? কে-ই বা তার যৌবনের জোয়ারলাগা দেহটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উপভোগ করেছিল? তখন? তখন তাঁর কথার কি জবাব দেব? জীবন, আদর্শ, নারীর ছলনাময়ী সুরৎ আর চোখ ধাঁধানো সুরতের আড়ালে তাদের কুৎসিৎ কদাকার দিল্‌ লুকিয়ে থাকে—এ সব বড় বড় বাৎ যে আগে ঝেড়ে রেখেছি, এখন তার কি জবাব দেব। আর কোনদিন আদর্শ, ন্যায়নীতি প্রভৃতির কথা মুখে আনতে পারব আমি? না, অসম্ভব। আমার আব্বাজী, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন তিনি আমাকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ভাববেন, আমি কল্পনাও করতে পারি না!

কামার অল-জামান যন্ত্রচালিতের মত এক লাফে পালঙ্ক থেকে নেমে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে হাঁপাতে লাগল। নির্বাক, নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে কামার অল-জামান দাঁতে দাঁত চেপে নিজের মনকে শক্ত করে বাঁধল। আপন মনে বলতে লাগল—'মাত্র আর কিছু সময়...বড়জোর দু' বা তিন ঘণ্টা আমাকে যৌবনের উন্মাদনাকে দাবিয়ে রাখতে হবে। যত কষ্টই হোক, রাখবও তা-ই। তারপরই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। তখন আব্বাকে সাফ সাফ বলে দেব, যদি এ-লেড়কির সঙ্গে আমার শাদীর বন্দোবস্ত কর, আমি রাজী।

বেটার মতিগতি পাল্টেছে দেখে আব্বাজী নির্ঘাৎ আহ্লাদে গদগদ হয়ে উঠবেন। উজির-নাজির আর আমীর-ওমরাহদের ডেকে শাদীর বন্দোবস্ত করবেন। কাজীর তলব পড়বে শাদীর কবুলনামা বানানোর জন্য।

কামার অল-জামান নিজের দিল্‌কে শক্ত করে বাঁধল। নিজের কামকাতর দিলকে কি করে বশীভূত করতে হয় তা তার ভালই জানা আছে। ধীর-পায়ে পালঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল। বিবস্ত্রা বদর-এর

দিকে পিছন ফিরে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

জিনি মাইমুনাহ ব্যাপার দেখে রাগে-দুঃখে-অপমানে আঘাতে পাওয়া কালনাগিনীর মত ফুঁসতে লাগল। বদর ঘাপটি মেরে পড়েই রইল সেই থেকে। চোখ পর্যন্ত খুলল না। তার মেহবুব কামার অল-জামান তার কাছে এমনই ফেলনা যে, চোখ মেলে তাকাল না পর্যন্ত! রাগে তার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। সে মাছির রূপ ধরেই বিদ্যুৎগতিতে কামরার ভেতরে ঢুকে গেল।

ভোঁ...ভোঁ...ভোঁ রব তুলে উড়তে উড়তে বদর-এর ধবধবে সাদা ও পদ্মের কোড়কের মত উরুতে আছাড় খেয়ে পড়ল। শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে দিল এক কামড় বসিয়ে। ঘুমের মধ্যেই বদর সামান্য নড়ে চড়ে আবার স্থির হ'ল। মাইমুনাহ এত সহজে পিছিয়ে যাবার পাত্রী নয়। শাহজাদী বদর-এর নাকে, পায়ের তালুতে, স্তন দুটোতে আর নাভি কুন্ডলি প্রভৃতি স্পর্শকাতর স্থানগুলিতে ঘন ঘন কামড় বসাতে লাগল। বিরক্তি ও অসহ্য যন্ত্রণায় বদর বার বার ছটফট করতে করতে এক সময় আধ-ফোঁটা পদ্মের মত চোখ দুটো মেলে তাকাল। পাশে ঘুমন্ত কামার অল-জামান'কে দেখেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে ভাবল, এ কী খোয়াব? খোয়াবের ঘোর? নাকি বাস্তব? নিজের চোখ দুটো বন্ধ করল, আবার খুলল। না এ তো তার খোয়াবের শাহজাদা নয়। প্রায় উলঙ্গ খুবসুরৎ যুবক কামার অল-জামান-এর দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল। যত দেখছে ততই সে বিস্মিত হচ্ছে।

শাহজাদী বদর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে কামার অল-জামান-এর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—কোন নওজোয়ানের দেহে এমন সুরতের বিচিত্র সমারোহ ঘটতে পারে আগে তো কোনদিন সে ভাবে নি। সে ধরেই নিল তার আব্বা কৌশলে নওজোয়ানকে তার বিছানায় এনে শুইয়ে দিয়েছে।

শাহজাদী বদর এবার উলঙ্গ প্রায় কামার অল-জামান-এর ওপর ধীরে ধীরে ঝুঁকতে লাগল। নিজের ওষ্ঠদ্বয়কে ঘুমন্ত অজ্ঞাত পরিচয় নওজোয়ানটির ওষ্ঠদ্বয়ের ওপর স্থাপন করল, আলতো ক'রে চুম্বন করল।

শাহজাদী বদর এবার আপন মনে বলতে লাগল—'কাল ভোরেই আমি আব্বাজানকে অবাক করে দিয়ে বলব, এ-নওজোয়ানের সঙ্গে যদি আমার শাদীর বন্দোবস্ত কর তবে আমি আর অমত করব না। কাল ভোরেই আমি উপযাচক হয়ে আমার সম্মতির কথা জানিয়ে দেব।

শাহজাদী বদর এবার ঘুমন্ত জামান-এর দিকে সামান্য এগিয়ে যায়। তার ডান-হাতটি দু'হাতে মুঠো করে ধরে। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে—'ওগো, অচেনা নওজোয়ান, আমার দিকে ক্ষণিকের জন্য ফের। চোখ মেলে তাকাও। আমি বদর। তাকাও...ওঠ....আমাকে সোহাগ কর।'

হায় খোদা! কামার অল-জামান-এর নিদ তো ভাঙার নয়। জিনি মাইমুনাহ তো যাদুমন্ত্রবলে তাকে নিদে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

শাহজাদী বদর তো এসবের কিছুই জানে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, নওজোয়ান কামার অল-জামান নির্ঘাৎ জেগে গেছে। এতকিছুর পরও কেউ যে নিদের ঘোরে থাকতে পারে কি করেই বা বিশ্বাস করবে? তাই সে উলঙ্গপ্রায় কামার অল-জামান-এর শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে কোন সাড়াই পেল না। বদর কিন্তু এত সহজে দমল না। আসলে নিজেকে সংযত রাখা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। সে কামার অল-জামান-এর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উন্মাদিনীর মত জাপটে ধরল তার যৌবনদীপ্ত দেহটিকে। তাকে চুম্বন করল। জোরে....আরো জোরে তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। দাঁতের আঘাতে তিরতির করে খুন ঝরতে থাকল। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই তার। থাকবেই বা কি ক'রে? তার বুকের মধ্যে উত্তাল-উদ্দাম সাগরেব ঢেউ, কালবৈশাখীর তুফান বইছে। ভাবাপ্লুতা বদর কামার অল-জামান-এর স্পর্শকাতর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৌতূহল বশতঃ বার বার হাতাতে লাগল। পুলক...সুখ...এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি অষ্টাদশী বদর-এর যৌবনজ্বালা আরও শতগুণ বাড়িয়ে দিল। অর্থের বিনিময়ে দুনিয়ার ঐশ্বর্যকে করায়ত্ত করা যায়। সুখ-ভোগের সামগ্রীকে একত্রে জড়ো করে পাহাড়ও বানিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এ-সুখ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। অর্থের বিনিময়ে লাভ করা যায় না। একমাত্র অনুভূতির মাধ্যমেই এ-সুখ উপলব্ধি সম্ভব।

শাহজাদী বদর আবার উন্মাদিনীর মত শাহজাদা কামার অল-জামান-এর ওপর ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করেদেয়। মহাসমস্যায় পড়ল সে। নিজের উন্মত্ত যৌবনজ্বালা সহ্য করা সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার শত কোশিস করেও কামার অল-জামান'কে সজাগ করতে পারছে না। তাকে জড়িয়ে ধরে সে শুয়ে পড়ল। একের পর এক চুম্বন করতে থাকে। তারপর? তারপরের কথা কিছুই তার জানা নেই। সে যেন এক মায়াময় খোয়াবের রাজ্যে তলিয়ে গেল। কেবলই অন্ধকার! সুখ! আনন্দ! সাগরের ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ। তুফান। বিক্ষুব্ধ ঢেউ আর উন্মত্ত তুফানের মাঝে পড়ে বদর করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে থাকে—'আমাকে ধর...বাঁচাও! ....এত হর্ষ-বিষাদ আমি সইতে পারছি না। আঃ কী আনন্দ!... অসহ্য....অসহ্য!'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর বুঝতে পারলেন ভোর হয়ে এল ব'লে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

এক শ' পঁচাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদীর কাণ্ডকারখানা আফ্রিদি দানাশ ও কশকশ আর জিনি মাইমুনাহ গোপন অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করতে লাগল। মাইমুনাহ-র মুখে হাসি ফুটে উঠল। উল্লাসে ব'লে উঠল কি গো, এবার তোমাদের থোঁতামুখ যে ভোঁতা হয়ে গেল। আমি তো বলেই ছিলাম, আমার শাহজাদার সুরৎ তোমার রাজকুমারীর তুলনায় একটু হলেও বেশী। এবার নিশ্চয়ই স্বীকার করতে দ্বিধা নেই?'

আফ্রিদি দানাশ ফ্যাকাশে মুখে বলল—'মাইমুনাহ, আমি তোমার কাছে পরাজিত হয়েছি, নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছি।' মাইমুনাহ এবার কশকশ'কে বহুভাবে সুক্রিয়া জানাতে লাগল। এ-তো খুবই সত্য যে, তারই কৌশল কাজে লাগিয়ে তাদের উদ্ভুত সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে।

এবার আফ্রিদি দানাশ পালঙ্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে নওজোয়ান কামার অল-জামান-এর প্রশস্ত বুকের ওপর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকা বদর'কে আলতো করে কাঁধে তুলে নিল। সম্রাট ঘায়ুর-এর প্রাসাদের নির্দিষ্ট কামরায় শুইয়ে দিয়ে আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে আকাশপথে উড়ে চলল।

এদিকে ঘুমন্ত শাহজাদা কামার অল-জামান-এর দিকে মাইমুনাহ এগিয়ে গেল তার তুলতুলে ঠোঁট দুটোতে আলতো করে চুম্বন করল। এদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেরী নেই অনুমান করে নিজের আশ্রয়স্থল ইঁদারাটিতে সে আশ্রয় নিল।

পাখীর ডাকে ভোর হ'ল। শাহজাদা কামার অল-জামান চোখ মেলে তাকাল। গত রাত্রের ঘটনা তার স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। তাই সে অস্থির হয়ে তার পাশে শুয়ে থাকা লেড়কিটিকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় তার বাঞ্ছিতা লেড়কি? সে তো অনেক আগেই ভোঁ - ভাঁ!

শাহজাদা কামার অল-জামান ভাবল, এর পিছনেও নির্ঘাৎ তার আব্বাজানের কোন কৌশল কাজ করছে। নইলে রাত্রির অন্ধকারে লেড়কিটি কি কর্পূরের মত উবে গেল।

কামার অল-জামান পালঙ্ক থেকে নামতে নামতে ভাবল, আর দেরী নয়। আজ—হ্যাঁ, আজই তার আব্বাজানকে বলবে, শাদীতে তার আপত্তি নেই।

শাহজাদা কামার অল-জামান কামরা থেকে বেরিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তার শয্যাসঙ্গিনী সে-খুবসুরৎ লেড়কিটিকে খুঁজতে লাগল।

এদিকে বেলা কিছুটা বাড়লে সাব্বাব নামে এক পরিচারক নাস্তা নিয়ে এল। অত্যুগ্র উৎসাহের সঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করল—'কি রে, সে—লেড়কিটি কোথায় গেল, জানিস কিছু?'

—'লেড়কি? কিসের লেড়কি? কার লেড়কি? কোথায় ছিল?' সাব্বাব তার প্রশ্নের উত্তর তো দিলই না উপরন্তু হাজার খানেক প্রশ্ন তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

সাব্বাব-এর তো কিছুমাত্র দোষ নেই। এতবড় বাড়িতে লেড়কির মুখ কোনদিন দেখেনি। সেখানে কেউ যদি আচমকা এরকম প্রশ্ন করে বসে তবে তো আকাশ থেকে পড়ারই কথা।

কামার অল-জামান ভাবল, সাব্বার সবকিছু জেনেও না জানার ভান করছে। তাই রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়ে বলল—'শোন, যা জানিস, যেটুকু জানিস সত্যি করে বল। নইলে তোর গর্দান নিয়ে ছাড়ব বলে রাখছি।'

কোরবানির খাসির মত কাঁপতে কাঁপতে সাব্বার বলল—'হুজুর, গর্দানই নেন, আর কোতলই করেন—আমি খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, কিসের লেড়কি, কার লেড়কি—কিচ্ছু আমি জানি না। আমি তো—'

সাব্বার'কে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই কামার অল-জামান তাকে একের পর এক কিল-চড়-লাথি মারতে লাগল।

সাব্বার শাহজাদা কামার অল-জামান-এর হাত থেকে কোনক্রমে নিজেকে মুক্ত করে উদভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে সুলতানের কাছে উপস্থিত হ'ল। ঠিক তখনই উজিরের সঙ্গে সুলতানের কথা হচ্ছিল। সুলতান বল্‌লেন—'উজির, আমার কলিজার সমান কামার অল-জামান-এর জন্য আমার খুব খারাপ লাগছিল। সারারাত্রি ঘুমোতে পারিনি। অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়িয়েছি। কেবল মনে হয়েছে, আমার জামান না জানি সে পড়ো

বাড়ির অন্ধকার কুঠরিতে কত কষ্টই না পাচ্ছে।'

উজির ম্লান হেসে বলল—'কেন ঝুটমুট শাহজাদার জন্য ভেবে কষ্ট পাচ্ছেন? সে আপনার প্রাসাদের চেয়ে কোন অংশে কম আরামে নেই।'

এমন সময় সাব্বাব দরবার কক্ষের দরজায় পৌঁছেই বলল—'জাঁহাপনা, মহা সর্বনাশ ঘটে গেছে! শাহাজাদার দিমাক খারাপ হয়ে গেছে। একদম পাগল বনে গেছেন।'

—'দিমাক খারাপ হয়ে গেছে? পাগল বনে গেছে? বুঝলি কি করে?'

—'জাহাপনা সকালে বিছানা থেকে নেমেই শাহাজাদা আমাকে বললেন—কাল রাত্রে যে লেড়কিটি আমার সঙ্গে রাত্রি কাটিয়ে গেল, সে কোথায়?' ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে সাব্বাব বলল—'আমি বার বার বলতে লাগলাম, হুজুর, এখানে লেড়কি কোত্থেকে আসবে? কেউ আসে নি, আসতে পারে না। ব্যস আমার ওপর চড়াও হলেন। আমি যেন সবকিছু জেনেও তাঁর কাছে গোপন করছি এরকম ভাব নিয়ে আমাকে বেদম মারধোর শুরু করে দিলেন। মেরে আমার হাড্ডি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে জাঁহাপনা।' এবার হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল—'এমন এলো পাথাড়ি ঘুষি চালাতে লাগল যে, এই দেখুন নাক ফেঁটে খুন ঝরছে, দু'দুটো দাঁত ভেঙে গেছে'।

সুলতান গুলিখাওয়া শেরের মত তর্জন-গর্জন শুরু করলেন—'উজির, তুমিই যত সর্বনাশের মূল! তোমার কুমতলব শুনতে গিয়েই আমি নিজে হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলাম। আমার সুস্থ-স্বাভাবিক বেটার দিমাক খারাপ করে দিলাম। তোমার গোরে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে উজির। তোমাকে উচিত শিক্ষা আমি দিয়ে ছাড়ব। যাও, গোরে যাবার আগে শেষ কাজটুকু করে যাও। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখ বেটার আমার কি হালৎ হ'ল।'

বৃদ্ধ উজির লম্বালম্বা পায়ে সে পড়ো বাড়ির চিলে কোঠায় হাজির হ'ল। দরজায় পৌঁছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হ'ল। দেখে শাহজাদা কামার অল-জামান কোরাণ পাঠ করছে। প্রশান্ত স্বাভাবিক তার দিল্ কোরাণ-এর শ্লোকের মধ্যে আত্মমগ্ন।

এমন সময় বেগম শাহারাজাদ বুঝলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। তিনি কিস্সা বন্ধ করলেন। বাদশাহ তাঁর কোলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলেন।

একশ' সাতাশিতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হলে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, উজির জামান-এর পাশে দাঁড়িয়ে তার মিষ্টি-মধুর কণ্ঠের কোরাণ পাঠ শুনতে লাগল। কোরাণ-এর প্রতি তার এ-মুহূর্তে অন্ততঃ আকর্ষণ নেই। যার গর্দান যেতে বসেছে তার কাছে কোরাণ পাঠ তো ভাল লাগার কথাও না।

কোরাণ থেকে মুখ তুলেই জামান উজিরকে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুচকি হেসে বলল—'কেমন আছেন উজির সাহেব? আপনার তবিয়ত আচ্ছাতো?'

—'শাহজাদা, তোমাকে দেখার পর আমার কলিজা ঠাণ্ডা হ'ল। এখন মালুম হচ্ছে, গর্দানটি এ-যাত্রা. বুঝি রক্ষা পাবে। সাব্বাব-এর মুখে তোমার কথা শুনে—'

—'সাব্বার? কেন, কি বলেছে সাব্বার?'

উজির হাত রুচলে বলল—'খুবই মন্দ কথা শাহজাদা। হতচ্ছাড়াটি বলে কিনা তোমার দিমাক বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে! তুমি নাকি বলেছ, তোমার কামরায় কাল রাত্রে কোন্ লেড়কি ছিল—'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই জামান বলল—'উজির সাহেব, শুধু আমার কামরায়ই নয়, আমার পালঙ্কে? আমার কাছাকাছি পাশাপাশি শুয়ে লেড়কিটি রাত্রি কাটাল। আর বলে কিনা, সাব্বাব কিছু জানে না? উজির সাহেব, আমার সাফ কথা শুনুন, যা সত্যি তাই বলবেন, বুজরুকির আশ্রয় নেবেন না। আপনিই কারসাজি করে আব্বাকে দিয়ে এখানে আমাকে কয়েদ করে রেখেছেন। তারপর আমার ঘুমের মধ্যে লেড়কিটিকে প্রায় উলঙ্গ করে আমার পাশে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দিয়েছিলেন। ভোর হবার আগেই তাকে আবার হাফিস করে দিয়েছেন। এত কিছুর পরও বলতে চান আপনারা আমার সঙ্গে মজাক করছেন না? আব্বাজানের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে আপনি এসব বুজরুকি করে চলেছেন। আব্বাজান আপনাকে শূলে না চড়ালেও আমি আপনাকে কোতল করব, বলে রাখছি। এখনও সময় আছে, সাফ সাফ বলুন। সে খুবসুরৎ লেড়কিটিকে কোথায় হাফিস করেছেন?'

জামান-এর বাত শুনে বৃদ্ধ উজিরের কলিজা তো শুকিয়ে একেবারে কাঠ। সে যেন একেবারে আসমান থেকে পড়ল—'খোদা মেহেরবান! শাহজাদা তুমি এসব কি বলছ! কি হয়েছে তোমার, খোলসা করে বল তো? কাল রাত্রে কি তোমার ভাল নিদ হয় নি? খোয়াব টোয়াব কিছু দেখেছিলে কি? তাজ্জব কোন খোয়াব দেখেছিলে? প্রহরীরা চারদিকে সর্বদা টহল দিচ্ছে। এর মধ্যে লেড়কি এলই বা কি করে, গেলই বা কোন্ কৌশলে? দিমাক ঠাণ্ডা কর। নইলে সবাই বলবে তোমার দিমাক গড়বড় হয়েছে, পাগল হয়ে গেছ।'

—'পাগল এখনও হইনি। তবে আপনাদের মত বেতমিসদের পাল্লায় পড়ে পাগল হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমার চোখ দুটো দিয়ে তাকে আমি স্পষ্ট দেখেছি, এ হাত দুটো দিয়ে তাকে স্পর্শ করেছি, তার শরীরের খুসবু আমি নাক দিয়ে স্পষ্ট অনুভব

করছি—আর বলছেন কিনা আমি খোয়াব দেখেছি! বেতমিস বে-আক্কেল শয়তান কাঁহিকার।'

কথা বলতে বলতে জামান বৃদ্ধ উজিরের মুখে আচমকা সজোরে এক ঘুষি লাগিয়ে দেয়। চোখের পলকে উজির মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণা ও আতঙ্কে কাৎরাতে লাগল। চোখ গোল গোল করে গর্জে উঠল—'শয়তান কাঁহিকার! সাফ সাফ বলুন, সে-লেড়কিকে কোথায় লুকিয়েছেন? নইলে আপনার জান খতম করে দেব।' এবার সজোরে মাথায় করাঘাত করল, নিজেহাতে নিজের চুল টেনে টানতে বল্‌ল—'শয়তানগুলো আমাকে পাগল করার মতলব এঁটেছে!'

বৃদ্ধ উজির মেঝেতে পড়ে কাতরাতে কাতরাতে বল্‌ল—শাহজাদা, গোস্‌সা করবে না। যা ঘটনা সাফ সাফ তোমাকে বলছি—'সুলতানের পরামর্শে আমাকে এ-কাজ করতেই হয়েছে। তিনি লেড়কিটিকে তোমার কাছে পাঠিয়ে বুঝার কোশিস করেছেন তার প্রতি তোমার আকর্ষণ কতখানি। যদি দেখা যায় তুমি তাকে পছন্দ্‌ করছ, তবে তার সঙ্গে তোমার শাদী—'

—'শাদী দেবেন? শাদীই যদি দেবেন তবে আর এত দেরী করছেন কেন? আব্বাজীর কাছে যান, পরামর্শ করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাদীর বন্দোবস্ত করুন।'

বৃদ্ধ উজিরের মুখে হাসি ফুটল। বুঝল, দাওয়াইয়ে কাজ হয়েছে। কৌশলটি প্রয়োগ না করলে এ যাত্রায় আর জান বাঁচাবার ফিকির ছিল না।

বৃদ্ধ উজির ছাড়া পেয়ে যেন ধড়ে জান ফিরে পেল। আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে কোনরকমে কাতরাতে কাতরাতে দরবারে ফিরে এল। এবার হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, সর্বনাশ হয়ে গেছে! আপনার লেড়কা জামান সত্যি সত্যি উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়েছে! এই দেখুন, বেধড়ক পিটিয়ে আমার হালৎ কি করে ছেড়েছে!'

—'কী সব আজেবাজে কথা বলছ উজির! পাগল.... উন্মাদ... আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! কী তাজ্জব কাণ্ড দেখ দেখি! আসল ব্যাপারটি আমাকে খোলসা করে বল তো শুনি!'

—'জাঁহাপনা, তার বক্তব্য হচ্ছে, গতরাত্রে আপনি আর আমি বন্দি করে তার পালঙ্কে বিবস্ত্রা প্রায় এক লেড়কিকে রেখে এসেছিলাম। রাতভর নাকি লেড়কিটি তার পাশাপাশি শুয়েছিল। ঘুম থেকে জেগে তাকে দেখতে না পেয়ে তার দিমাক খারাপ হয়ে মাথায় খুন চাপে। হাতের কাছে সাব্বাবকে পেয়ে চেপে ধরে, বেদম প্রহার করে। তারপর হাজির হলাম আমি। চোখ মেলে তাকিয়েই সামনে আমাকে দেখেই রেগেমেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। ব্যস্‌, শুরু করে এলোপাথাড়ি কিল-চড়-লাথি-ঘুষি।'

—'উজির এতেই তোমার কলিজা শুকিয়ে গেল? তোমার নসীবে যে শেষ পর্যন্ত কি আছে তা একমাত্র আমিই জানি। তোমাকে কোতল করব। না, একটু একটু করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারব তোমাকে। তোমার কু-পরামর্শেই আমার একমাত্র বেটার এ-হালৎ হয়েছে, অস্বীকার করতে পার? তুমি কিছুতেই আমার হাত থেকে ছাড়া পাচ্ছ না। এখন আমাকে নিয়ে সে পোড়ো বাড়িতে চল। নিজের চোখে আমার বেটার হালৎ একবারটি দেখে আসি।'

সুলতান কামরায় ঢুকেই বেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বার বার চুম্বন করে কিছুটা স্বস্তি লাভ করেন।

সুলতান এবার তাঁর আদরের দুলাল, চোখের মণি একমাত্র বেটা জামান'কে নিয়ে পালঙ্কে বসলেন। জামান প্রথমে আব্বাজানের পাশে বসতে একটু দ্বিধা করছিল বটে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

সুলতান বেটার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে নিয়ে রাগে গস্‌গস্‌ করতে করতে উজিরকে বল্‌লেন—'তোমার মত মিথ্যবাদী প্রবঞ্চক দ্বিতীয় আর একটি নেই। আমার সুস্থ-স্বাভাবিক বেটাকে তুমি বলছ কিনা—তোমাকে আমি রেহাই দিচ্ছি না।'

সুলতান এবার বেটা জামান-এর গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লেন—'বেটা, আজ কি বার, বল তো?'

—'আব্বাজান, আজ তো শনিবার।'

—'বহুৎ আচ্ছা। আজ শনিবার হলে কাল কি বার হবে বেটা?'

—'রবিবার।'

—'বহুৎ আচ্ছা!' সুলতান সবিনয়ে একবার বেটার মুখের দিকে পরমুহূর্তেই উজিরের দিকে তাকাতে লাগলেন।

এদিকে সুচতুর শাহাজাদা জামান তার আব্বাজানের আকস্মিক আচরণে বিস্মিত হয়। ভাবতে লাগল—আব্বাজান হঠাৎ এরকম

কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? অতি শৈশবে অবশ্য তাকে পাশে শুইয়ে তার আব্বাজান এরকম বহু প্রশ্নের মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নিতেন। এবার সে নিঃসন্দেহ হ'ল—বুড়োভাম উজিরটি নির্ঘাৎ তার আব্বাজানকে বলেছে, তার দিমাক গড়বড় হয়েছে, উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়েছে।

সুলতান এবার উজিরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালেন। চোখের ভাষায় তিনি বুঝাতে চাইছেন—'উজির, তোমার কথা যে কতবড় মিথ্যা এর পরও তোমাকে প্রমাণ দেবার কিছু আছে?

বেগম শাহরাজাদ ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' অষ্টাশীতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতান মোটামুটি নিঃসন্দেহ হলেন, উজির তাঁর বেটা জামান-এর সম্বন্ধে যা কিছু বলেছে, ডাঁহা ঝুট বাৎ। বেটার সঙ্গে তিনি যেটুকু বাৎচিৎ করেছেন তাতে তাকে অন্ততঃ পাগল মনে করার কোন কারণ নেই।

সুলতান আবার বেটার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সস্নেহে বল্‌লেন—'বেটা এ—কোন্ মাহিনা? আরবী হিসাবের—।

সুলতানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শাহজাদা জামান বল্‌ল—'জেলকদ্।'

—'এর পরের মাহিনা?'

—'এর পর জেলহিজ্জা।'

—'এর পর থেকে—'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই শাহজাদা জামান বলতে লাগল—'জেলহিজ্জা-র পরে 'মহরম', এর পর 'রবিয়াল আউয়াল' এরপর 'রবিয়াস্‌সানি', এরপর 'জামাদ আউয়াল', এরপর 'জামাদ স্বাসি', এরপর 'রজব', এরপর 'শ্বাবন', এরপর 'রমজান' এবং সব শেষে 'শ্বওয়াল'।

শাহজাদা জামাল-এর বাৎ শুনে সুলতান একেবারে খুশীতে ডগমগ হয়ে গেলেন। দাঁত কিড়মিড় করে বল্‌লেন—'উজির, আমি তো মনে করছি, তুমি নিজেই একটি পাগল। বয়স হয়েছে। তোমার দিমাক এখন কাম কাজ ঠিক ঠাক্ করছে না। দরবার ছেড়ে বরং মক্কা-মদিনায় গিয়ে আল্লাতাল্লার নাম আর কোরাণ পাঠ করে শেষ ক'টি দিন গুজরান করগে।'

সুলতান আবার বেটা জামান-এর দিকে তাকিয়ে, আগের মতই সস্নেহে গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লেন—'বেটা, এ-বুড়া উজির আর সাব্বাব তোমার নামে কি সব যাচ্ছেতাই কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। গতরাত্রে তোমার ঘরে নাকি এক খুবসুরৎ লেড়কি ঢুকেছিল। তোমার পালঙ্কে, তোমার পাশে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছে। সকাল হলে তাকে না দেখে তুমি নাকি অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিলে? এমন কি তুমি সাব্বাব আর উজিরকে দারুণ মারধোরও নাকি করেছিলে? যত্তসব মিথ্যাবাদীর দল জুটেছে আমার নসীবে। সব ক'টিকে আমি শূলে চড়াব, কোতল করে ছাড়ব।'

শাহজাদা জামান এবার ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌ল—'আব্বাজান, ব্যাপারটি নিয়ে অনেক জলই ঘোলা হয়েছে। এরকম রঙ্গ রসিকতায় আমার আর দিল নেই। সাফ কথা বলছি শুনুন—আপনি তো আমাকে এতদিন শাদীর জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আমি কিছুতেই মত দেই নি। লেড়কিদের সম্বন্ধে আমার মধ্যে যে ধারণা জন্মেছিল আজ বিলকুল বদলে গেছে। গত রাত্রে যে লেড়কিটিকে আপনি আমার কামরায়, আমার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন, তাকেই আমি শাদী করতে আগ্রহী। আপনি বন্দোবস্ত করুন। আমি আজই তাকে শাদী করব। তাকে দেখার পর থেকে আমার কলিজায় আগুন ধরে গেছে। তাকে দূরে রেখে একটি দিন গুজরানও আমার পক্ষে অসম্ভব। আজই শাদীর বন্দোবস্ত করে আমাকে রক্ষা করুন, বাঁচান।'

সুলতান তো বেটার মুখ থেকে এরকম অপ্রত্যাশিত কথা শুনে রীতিমত স্তম্ভিত। মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম। করুণ আর্তনাদ করে উঠলেন—'খোদা মেহেরবান! আমার এ কী সর্বনাশ করলে! আমার একমাত্র বেটার দিমাক সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে! এর একী হালৎ করলে খোদা! একে ছাড়া আমি কি করে জিন্দা থাকব! খোদা, এ কী করলে তুমি?'

সুলতান এবার লেড়কার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলতে লাগলেন—'বেটা ঘাবড়াও মাৎ। খোদার ওপর ভরসা রাখ। তাঁর দোয়া হলে তোমার উন্মাদ দশা নিশ্চয়ই কেটে যাবে। তোমার কাঁধে কোন শয়তান ভর না করলে এমনটি তো হবার নয়। রাত্রে নিশ্চয় গভীর নিদ হয় নি! নিদ গভীর না হলে অনেক সময় শিরে এসে হরেক কিসিমের চিন্তা ভাবনা ভর করে! এমনই সবাই খোয়াব টোয়াব দেখে থাকে। বেটা, আমি কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমি তোমাকে শাদীটাদীর কথা বলব না। কোন জোর জুলুমের তো প্রশ্নই ওঠে না। বেটা, তুমি দিমাক ঠাণ্ডা কর। সুস্থ-স্বাভাবিক দিল্ ফিরে পাও। ব্যস, খোদাতাল্লার কাছে আমার আর কিছু চাইবার নেই।'

শাহজাদা কামার অল-জামান-এর দু'চোখের কোল বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। সে ডুকরে ডুকরে কেঁদে বল্‌ল—'আব্বাজান, তামাম দুনিয়ায় যত আদমি আছে তাদের মধ্যে আমি

আপনাকে সবচেয়ে বেশী পেয়ার করি। শ্রদ্ধাও করি সবচেয়ে বেশীই। আপনি খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে একটিবার মাত্র বলুন, গতরাত্রে আমার কামরায়, আমার পালঙ্কে শুয়ে যে লেড়কিটি রাত কাটিয়েছিল—তার সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা নেই?'

সুলতান হতভম্বের মত বেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শাহজাদা জামান এবার বল্‌ল—'হ্যাঁ আব্বাজান, আপনি লেড়কিটির ব্যাপারে কিছুই জানেন না, একথাটিই শুধুমাত্র আমি শুনতে চাই। আপনার বাৎ শোনার পর আমি প্রমাণ দেব, কোন লেড়কি কাল আমার কামরায় রাত্রি কাটিয়েছিল কিনা।'

—'বেটা, খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, কোন লেড়কি বন্দোবস্ত করা তো দূরের কথা, এমন কি কিছু জানিও না।'

শাহজাদা জামান এবার নতমুখে, ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগল 'আব্বাজান, গতরাত্রে—চতুর্থ প্রহরে হঠাৎ আমার নিদ টুটে গেল। আধা নিদের অবস্থা। হঠাৎ মনে হ'ল আমার ওপরে উঠে কোন এক লেড়কি লাফালাফি দাপাদাপি করছে। তখন আমার হালৎ এমন ছিল না যে লেড়কিটিকে সরিয়ে দেই বা উঠে বসি। কখন যে আবার নিদ এসে গিয়েছিল আমি ঠাহরই করতে পারি নি। অনেক বেলায় আমার নিদ টুটল। লেড়কিটি বে-পাত্তা। এদিক - ওদিক তাকালাম, হদিস মিল্‌ল না। তখনই লক্ষ্য করলমা, আমার তলপেটে শুকনো খুন। অবাক মানলাম। তারপর হামামে গিয়ে ভাল করে গোসল করলাম। চলুন, হামামে গেলে এখনও তার চিহ্ন কিছু না কিছু দেখতে পাবেন।'

শাহজাদা জামান এবার ডান-হাতের তর্জনিটি সুলতানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—'আব্বাজান, আপনি কি আগে কোনদিন আমার হাতে এ - অঙ্গুরীয় দেখেছিলেন, বলুন? এটি কোন না কোন লেড়কির। আর আমার আঙুলে যে - হীরার অঙ্গুরীয় ছিল তা গায়েব হয়ে গেছে।'

সুলতান গম্ভীর মুখে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করলেন। এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'সবই তো বুঝলাম বেটা। কিন্তু তুমি যেসব প্রমাণ দাঁড় করিয়েছ তা-ও যথেষ্ট নয়। ব্যাপারটি নিয়ে ভাল করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।'

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে অনুমান করে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

এক শ' নব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ্ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন।

বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, লেড়কার বাৎ শুনে সুলতান যারপরনাই ভাবিত হলেন। ব্যস্ত পায়ে হামামে গেলেন। দেখলেন, জমাটবাঁধা খুন মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আর কিছু পানির সঙ্গে ধুয়ে গেছে।'

সুলতান ভেতরে ভেতর গর্জাতে লাগলেন—'শয়তান উজিরই এর মূলে। আর লেড়কিটি দেহে খুবই তাগদ ধরে।'

সুলতান লেড়কার কামরায় ফিরে গেলেন। গুম হয়ে বসে রইলেন কিছু সময়। তারপর এক সময় আহত শেরের মত গর্জে উঠলেন—'উজির, নির্ঘাৎ তোমারই শয়তানি এটি। তোমার জন্যই আমার বেটার এ - হালৎ হয়েছে। তুমিই গত রাত্রে শয়তানি করে কোন এক লেড়কিকে এ - কামরায় পাঠিয়েছিলে।'

বৃদ্ধ উজির সুলতানের পা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি এসবের বিন্দু বিসর্গও জানি না। কোরাণ ছুঁয়ে, খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে আমি বলতে পারি, লেড়কির ব্যাপার স্যাপার কিছুই আমার জানা নেই।'

সুলতান এবার সাব্বাব'কে তলব করলেন।

সাব্বাব খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে সাফ সাফ জবাব দিল—'জাঁহাপনা, লেড়কির ব্যাপার স্যাপার কিছুই আমি জানি না।'

সুলতান দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এতবড় একটি ব্যাপার ঘটে গেল, অথচ কেউ জানে না! রহস্য তবে! গভীর এক রহস্য এর পিছনে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কি করে এ - রহস্যের জট ছাড়ানো যেতে পারে, তিনি আপন মনে ভেবে চল্‌লেন।

শাহজাদা কামার অল-জামান এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'আব্বাজান, আমি কোন বাৎ শুনতে চাই না। ওই লেড়কিকে আমার চাই-ই চাই। ওকে আমি শাদী করব। ওকে ছাড়া

আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে।'

সুলতান লেড়কার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। কি করবেন। কি বলবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'বেটা, আল্লাহ্‌-র ওপর ভরসা রাখা ছাড়া কিছু তো করার দেখছিনে। ইয়া বড় দুনিয়ায় অজানা, অদেখা আর অচেনা এক লেড়কির পাত্তা কি ক'রে পাওয়া সম্ভব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

লেড়কাকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান প্রাসাদে ফিরে এলেন। নিজের কামরায় লেড়কার থাকার ব্যবস্থা করলেন। দিনের পর দিন বিষণ্ণমুখে লেড়কাকে সামনে নিয়ে আশমান-জমিন ভেবে চল্‌লেন। প্রজা, মসনদ, ধনদৌলত সব কিছু তাঁর কাছে বিষময় হয়ে উঠেছে।

দরিয়ার মাঝে এক ভাসমান পাহাড়ের গায়ে সুবিশাল এক ইমারত ছিল। সুলতান শখ করে এটি বানিয়েছিলেন। লেড়কাকে নিয়ে তিনি এবার সেখানেই চলে গেলেন। কিন্তু বাপ-বেটা কারো নসীবেই সুখ - শান্তি জুটল না। শাহজাদা জামান ক্রমে বিষাদের এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠল। কোন আবেগ নেই, নেই কোন উচ্ছ্বাস। সর্বদা নির্বাক-নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মত গালে হাত দিয়ে বসে ভেবেই চলেছেন।

এদিকে আফ্রিদি, কশকশ ও দানাশ রাজকুমারী বদর'কে তার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বিদায় নেয়।

সকাল হয়। জানালা দিয়ে সূর্যের কিরণ চুপিচুপি ঘরে ঢুকে বদর-এর চোখে - মুখে পড়ে। ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে সে তাকায়। তার দিল খুশীর আমেজে ভরপুর। গতরাত্রেই জিন্দেগীতে প্রথম সে সম্ভোগসুখ লাভ করেছে। সুখের রেশটুকু যেন এখনও তার দিল থেকে কাটে নি। এবার সে সম্বিৎ ফিরে পেল। উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক - ওদিক তাকাতে লাগল। চোখের মণি দুটোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁজতে লাগল তার প্রাণপুরুষকে। কই, সে তো নেই। ঘরের দরজা বন্ধ। আশ্চর্য এ - ঘরে সে এসেছিলই বা কি ক'রে? আবার বেরিয়ে যাওয়াই বা কি করে সম্ভব হয়? সে উন্মাদিনীর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

রাজকুমারী বদর-এর আর্তনাদ শুনে পরিচারিকারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। সবার চোখেই অজানা উৎকণ্ঠার ছাপ।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় পাখীদের আনাগোনা লক্ষ্য করে বুঝলেন, ভোর হয়ে এল বলে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

এক শ' একানব্বইতম রজনী

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার কিছু পরেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বদর-এর আর্তনাদ শুনে পরিচারিকারা ছুটে এল। বদর গর্জে উঠল—'কালরাত্রে যে-নওজোয়ান আমার সঙ্গে শুয়েছিল সে কোথায় গিয়েছে? নিদ যাওয়ার সময়ও ছিল, এখন নেই—হাপিস হয়ে গেল?'

পরিচারিকারা তো তার হম্বিতম্বি শুনে ডরে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে গেল। তারা সমস্বরে ব'লে উঠল—'নওজোয়ান? কালরাত্রে? শোভন আল্লা! আপনার সঙ্গে নওজোয়ান শুয়েছিল? আপনি বোধহয় সুস্থ নেই!'

—'ওসব বুজরুকি রাখ। কোথায় সে লেড়কা খুঁজে বের কর। নইলে এক এক করে আমি সবাইকে কোতল করব।'

বুড়ী বাঁদী সাহস করে বলে—'রাজকুমারী, মেহেরবানি করে চুপ করুন। এরকম অলক্ষুণে কথা মুখেও আনবেন না। খোদাতাল্লার এ কী বিচার! এ কী সর্বনাশ করলে তুমি! রাজকুমারী তো কোনদিন সামান্যতম গুনাহ্‌ও করেন নি। তবে কেন তার দিমাক এমন করে বরবাদ করে দিলে! এ কী বিচার তোমার! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একথা সম্রাট যদি শোনেন তবে কী কেলেঙ্কারীটাই না হবে! মেহেরবানি করে চুপ করুন শাহজাদী।'

—'আমি কোন কথাই শুনতে চাই না। কোথায় গেল আমার মেহেবুব, খুঁজে বের কর। যেখান থেকে পার তাকে বের করা চাই-ই। এতগুলো লোক থাকতে এক তরতাজা নওজোয়ান প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল, নজরেই পড়ল না কারো! তাকে ছাড়া আমি একদিনও বাঁচব না। আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে।' রাজকুমারী বদ্ধ পাগলের মত ঘরময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। দেয়াল থেকে তরবারি টেনে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। নসীব ভাল যে, কারো গায়ে লাগে নি।

রাজকুমারী বদর উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছে খবরটি দেখতে দেখতে প্রাসাদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সম্রাট ঘায়ুর-এর কানে যেতেও দেরী হ'ল না।

সম্রাট ঘায়ুর হারেমের দাসী-বাঁদী সবাইকে তাঁর কামরায় তলব করলেন। সবাই জান হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হ'ল সম্রাটের কামরার সামনে। সবাই যেন কোরবানির পশু।

সম্রাট দাসী-বাঁদীদের মুখ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। নিজের কানকেও যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। এতবড় একটি দুঃসংবাদ বিশ্বাস করতে উৎসাহও তো পাওয়ার না। মাত্র তো একটি রাত্রি। এরই মধ্যে এতবড় একটি অঘটন কি করে ঘটতে পারে ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ এঁকে বুড়ি বাঁদী সম্রাটের কাছে নিবেদন করল—'রাজকুমারী যে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছে তাতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।'

সম্রাট রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে, কার সঙ্গে কি কথা বলছ আশা করি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। আর তোমার মন্তব্য যদি মস্তিষ্কপ্রসূত হয়, সত্যতার লেশমাত্রও না থাকে তবে তোমার যে গর্দান যাবে আশাকরি তা-ও অনুমান করতে পারছ।'

সম্রাট মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বল্‌লেন—'ভাল করে ভেবে বল তো, এমন মারাত্মক একটি কাণ্ড কি করে ঘটল ব'লে তুমি মনে কর? আর রাজকুমারী বদর যা বলছে, তার সবটুকুই কি পাগলামি, না কি তার সঙ্গে অল্পবিস্তর—'

—'হুজুর, গোড়াতে অবশ্য আমারও সেরকমই মনে হয়েছিল। বাধ্য হয়ে পরে কিছুটা অন্যরকম ধারণা করতেই হ'ল।'

আহত শেরের মত বার কয়েক ঘরময় পায়চারি করে সম্রাট ঘায়ুর এক সময় বুড়ি বাঁদীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লেন—'তুমি দেখেছ? কি দেখেছ? তুমি কি ক'রে বুঝলে যে, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে?'

বুড়ি বাঁদী হাত কচলে নিবেদন করল—'হুজুর, রাজকুমারী নিদ থেকে জেগেই বিকট চীৎকার করে ওঠেন। আমি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে ছুটে যাই। তার গায়ে ছিল একটিমাত্র ফিনফিনে কামিজ। আর দেহের নিম্নাংশ একেবারেই নগ্ন থাকে। বিশ্বাস করুন হুজুর, তার উরুর দু'ধারে শুকনো খুন আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। তাঁর কাছ থেকে এরকম কোন ঘটনা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।' কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে কথাটি ছুঁড়ে দিয়েই বুড়ি বাঁদী মুখ নিচু করল। এবার কেটে কেটে ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌ল—'হুজুর, আপনি সম্রাট, এ-মুলুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনার কাছে মেয়েদের সব ব্যাপার স্যাপার কি খুলে বলা সম্ভব, বলুন? তবে এটুকু জানবেন, এ-ধরনের খুন ঝরার ব্যাপার স্বাভাবিক নয়। একমাত্র কোন পুরুষকে সঙ্গদান করলেই
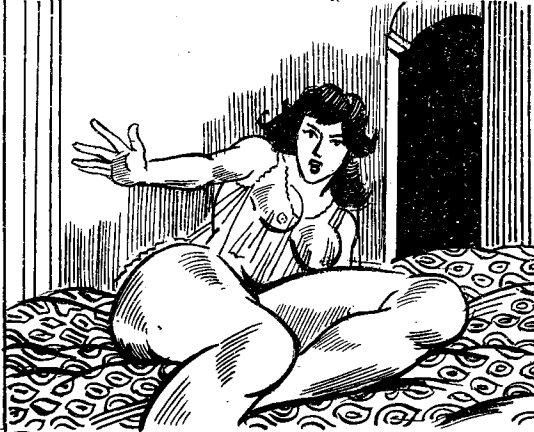
এরকমটি হতে পারে। আবার তা-ই বা বলি কি ক'রে? চারদিকে সতর্ক প্রহরী। একটি পিঁপড়েরও প্রবেশ সম্ভব নয়। অপরিচিত কোন নওজোয়ানের তো প্রশ্নই ওঠে না। কাণ্ডটি অবিশ্বাস্য তো বটেই।'

সম্রাট ঘায়ুর উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে অন্দর মহলে তার লেড়কি বদরের কামরায় গেলেন। লেড়কিকে আদর-সোহাগ করে বল্‌লেন—'বেটি, প্রাসাদের সবাই তোমাকে কেন্দ্র করে বহুৎ অপ্রীতিকর বাৎ রটিয়ে বেড়াচ্ছে।'

—'কি? কি বলছে সবাই?'

—'বলছে, কালরাত্রে তোমার ঘরে নাকি কোন্ নওজোয়ান রাত্রি কাটিয়েছে? তুমি নাকি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে সহবাস করেছ—এরকম আরও অনেক কিছু—আমি তাদের এক এক করে গর্দান নেব, নয় তো শূলে চড়াব। কাউকে ছেড়ে কথা বলব না!'

—'মিথ্যা? এক বর্ণও মিথ্যা নয়। আপনি তো জানেনই আমি গত কাল পর্যন্ত ভয়ানক পুরুষ - বিদ্বেষী ছিলাম। আজ কিন্তু আমার মন থেকে পুরুষের প্রতি বিদ্বেষটুকু নিঃশেষে মুছে গিয়ে তার পরিবর্তে আকর্ষণই সৃষ্টি হয়েছে। কালরাত্রে আমার মেহবুবকে আমার দেহ-দিল্ সর্বস্ব সমর্পণ করে দেউলিয়া হয়েছি। আমি এখন শাদী করতে রাজী। আপনি বন্দোবস্ত করুন। আমি একটি কথাই জানতে চাচ্ছি, তাকে যদি কালরাত্রে আমার কামরায় পাঠালেনই তবে আবার অন্ধকার কাটতে না কাটতেই কেন ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন?'

সম্রাট চোখে-মুখে অবিশ্বাস ও আতঙ্কের ছাপ এঁকে লেড়কির মুখের দিকে তাকালেন।

রাজকুমারী বদর ব'লে চল্‌ল—'সে নওজোয়ানও কিন্তু আমাকে দিল সঁপে দিয়েছে।' তর্জনি বাড়িয়ে ধ'রে এবার বল্‌লেন—'নইলে সে কিছুতেই নিজের হাতের অঙ্গুরীয় আমাকে পরিয়ে দিত না।'

সম্রাট চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বল্‌লেন—'সবই খোদার মর্জি। খোদা যা ভাল বুঝেছেন করেছেন। তবে সবাই ঠিকই বলেছে, দেখছি। আমি পিতা। আমাকে তো আর চুপ করে থাকলে চলবে না। বেটি, ওসব ব্যাপার আর মাথায় এনো না। আমি সুচিকিৎসক ডাকছি। ভাল হেকিম বদ্যি আর দাওয়াই পড়লে শীঘ্রই তুমি সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।'

পিতার কথায় বদর মুহূর্তে ক্ষেপে একেবারে কাঁই হয়ে যায়। নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফাঁতা ফাঁতা করতে থাকে, সমানে চুল ধরে টানতে থাকে। আর চোখ বড় বড় করে ঘরময় দাপিয়ে বেড়াতে থাকে।

সম্রাট ঘায়ুর আরও নিঃসন্দেহ হলেন, তাঁর আদরের দুলালী একেবারেই উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছে। মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে মানুষ

এরকমই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

সম্রাট ঘায়ুর এবার দরজার কাছে গিয়ে পরিচারিকাদের ডাকলেন। তাদের ওপর কড়া নির্দেশ দিলেন—'তাকে কোনক্রমেই ঘর থেকে বেরোতে দেবে না। জোর করে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে রাখবে। প্রয়োজনে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে।' এবার সম্রাট ঘায়ুর বিষণ্ণমুখে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর দিল থেকে শান্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল। সর্বদা একই ভাবনায় তলিয়ে থাকেন, কেন লেড়কির এমন হালৎ হ'ল? কি করেই বা তার রোগ নিরাময় হয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে পারে?

সম্রাট ঘায়ুরের নির্দেশে রাজ্যের বড় বড় বদ্যি, হেকিম ও গণৎকাররা ছুটে এলেন।

সম্রাট তাদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমার একমাত্র লেড়কির রোগ নিরাময় করে তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে পার তবে প্রয়োজনে তার হাতে আমার একমাত্র বেটিকে সম্প্রদান করতে রাজী আছি। আর কাজে হাত দিয়ে যদি ব্যর্থ হও তবে কিন্তু তার গর্দান নেব।'

হেকিম-বদ্যি ও গণৎকার যারা এসেছিল তারা সাহস করে আর কাজে হাত দিতে পারল না। কারণ, সিংহাসন লাভের চেয়ে গর্দান যাওয়ার আশঙ্কায় তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিল।

সম্রাট ঘায়ুর-এর নির্দেশের কথা এবার তার রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে দেওয়া হ'ল। ফলে নিজ দেশ ও অন্যান্য রাজ্য থেকে বহু হেকিম, বদ্যি ও গণৎকার সম্রাট ঘায়ুর-এর দরবারে ভিড় করতে লাগল। এক এক করে সবাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মুখ ব্যাজার করে পিছিয়ে গেল। বেশী লোভ করতে গিয়ে যেচে গর্দান দিতে কে যাবে? আবার কেউ বা সাহসে ভর করে কাজে হাত দিল। পরিণামে নসীবে যা জোটার জুটল।

বুড়ি বাঁদীর এক বেটা ছিল। রাজকুমারী বদর-এর প্রায় সমবয়সী। বাল্যের দুরন্ত দিনগুলিতে তারা এক সঙ্গে খেলাধূলাও করেছে। পরবর্তীকালে সে বহুদেশ ঘুরে ঘুরে বহু যাদুবিদ্যা রপ্ত করেছে। মিশরীয় তন্ত্রমন্ত্রের ওপর তার খুবই দখল। তার নাম সারজাবন। দুনিয়ার বহু দেশ ঘুরে সে স্বদেশে ফিরে এসেছে। নগরে ঢোকার মুখেই এক জায়গায় প্রায় চল্লিশটি নরমুণ্ডু দেখে সে থমকে যায়। বিস্ময় বোধ করে। একে-ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল—রাজকুমারী বদর-এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। যারা চিকিৎসা শুরু করেছিল তারা ব্যর্থ হয়ে শর্ত অনুযায়ী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কারো পক্ষেই তাঁর রোগ নিরাময় করা সম্ভব হয় নি।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে গেল। বেগম এবার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' চুরানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সারজাবন ঘরে ফিরে তার আম্মার কাছে বদরের খোঁজ নিল। পথচারী লোকটি নরমুণ্ডুগুলো সম্বন্ধে যা বলেছে তার আম্মাও একই কথা বল্‌ল।

সারজাবন রাজকন্যার চিকিৎসা করার চিন্তা করল। তার আম্মার কাছে নিজের ইচ্ছার কথা বলতেই তার বুড়ি আম্মা চমকে ওঠে বল্‌ল—'সে কী বেটা, যেচে গর্দান দিতে যাবে! ওসব চিন্তা ছাড়।'

সারজাবন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নসীবে যা আছে হবে। সে একবারটি কোশিস করে দেখবে। তার পীড়াপীড়িতে তার আম্মা তাকে লেড়কিদের পোশাকে সজ্জিত করে গোপনে অন্দরমহলে নিয়ে গেল।

সারজাবন হারেমে ঢুকে, বদর-এর সামনে গিয়ে গা থেকে বোরখা ফেলে দিল। বোরখার তলায় করে সে একটি মোমবাতি ও কয়েকটি যাদুবিদ্যার পুঁথি নিয়ে এসেছে।

সারজাবনকে দেখামাত্র রাজকুমারী বদর ছুটে এসে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আবেগ-মধুর স্বরে বলে ওঠে—'ভাইয়া, কতদিন পর তোমার দেখা পেলাম। ওরা সবাই আমাকে পাগল ভাবে। পাগলের চিকিৎসাও করাচ্ছে। তুমি কিন্তু আমার প্রতি সেরকম কোন আচরণ কোরো না।'

—'ছিঃ, তুমি আমাকে অন্য দশজনের সমান ভাবতে পারছ বহিন! আমি তোমার কোন চিকিৎসা করতেই আসি নি। সত্যি তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে কিনা নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য শুধু তোমার একটি কোষ্ঠী তৈরি করব।'

সারজাবন ও রাজকুমারী বদর পাশাপাশি বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। বদর সব বৃত্তান্ত বাল্যবন্ধু সারজাবন-এর কাছে খোলাখুলি বলল। এক সময় তার হাত দুটো চেপে ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'আজ আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে তাকে না পেলে আমার জান রাখাই দায় হয়ে পড়েছে। জিন্দেগী বরবাদ হতে চলেছে।'

সারজাবন ধৈর্য ধরে সব কিছু শুনে বল্‌ল—'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তোমার মনের মানুষকে কোথায় পাওয়া যাবে! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার মুশকিল আশান আমি করতে পারব। আমার পেশার তাগিদে বহু দেশে, বহু রাজা-বাদশার দরবারে আমার অবাধ যাতায়াত রয়েছে। তবে হীরার অঙ্গুরীয়টি দেখে মনে হচ্ছে তোমার

মনময়ূরটি যে-সে ঘরের লেড়কা নয়। আমি আগামী কালই আবার পথে নামছি। মুলুকে-মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়াব। তোমার বর্ণিত নওজোয়ানের পাত্তা লাগাব। রাজকুমারী বদর-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরল।

সারজাবন তারপরদিনই দেশ ছেড়ে ভিন্‌দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কয়েকটি মুলুক ঘুরে সে সমুদ্রের নিকটবর্তী 'তারার' নামে এক নগরে উপস্থিত হ'ল।

সারজাবন জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল সেখানকার আদমিরা রাজকুমারী বদর-এর প্রসঙ্গে কিছু জানে না। তবে সে মুলুকের সুলতানের একমাত্র বেটা কামার অল-জামান-এর অবিশ্বাস্য-দুরারোগ্য ব্যাধির কথা তারা জানে। কৌতূহলী মন নিয়ে সারজাবন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কামার অল-জামান-এর ব্যাধির ব্যাপার সব জেনে নিল।

সারজাবন এ-ও জেনে নিল, কামার অল-জামান-এর আব্বাজীর নাম সুলতান শাহরিমান। তার সুলতানিয়তের নাম খালিদান। পায়ে হেঁটে গেলে পুরো ছয় মাহিনা লাগে। আর সাগর পাড়ি দিয়ে গেলে এক মাহিনায়ই খালিদান-এ হাজির হওয়া সম্ভব। কামার অল-জামান ও বদর-এর কাহিনীর মধ্যে সে মিল খুঁজে পেল। সারজাবন একটি বড়সড় নৌকা নিয়ে খালিদানের উদ্দেশে যাত্রা করল। কিছু দূর যেতে না যেতেই প্রচণ্ড ঝড় উঠল। প্রথমে তার নৌকার পাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নৌকাটাও গেল গুঁড়ো হয়ে। সারজাবন এবার উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে সাঁতার কাটতে শুরু করল। খোদা মেহেরবান। একটি ভাসমান বয়া পেয়ে কোন রকমে সে জান বাঁচাল। নসীবের জোর না থাকলে এরকম যোগাযোগ হতে পারে না।

এক সময় বয়াটি সুলতান শাহরিমান-এর প্রাসাদের কাছাকাছি ঘাটে এসে ভিড়ল। বয়ার ওপর প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সারজাবনকে পড়ে থাকতে দেখে কয়েকজন ধরাধরি করে তাকে পাড়ে তুল্‌ল। তারা তাকে উজিরের কাছে নিয়ে গেল। উজির বুঝল, ভিন্‌দেশের মুসাফির। নির্ঘাৎ জাহাজ বা নৌকাডুবির ফলে এ-দুর্বিপাকে পড়েছে।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' ছিয়ানব্বইতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হলে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বৃদ্ধ উজির ভিন্‌দেশী মুসাফির মেহমান নওজোয়ানটির প্রতি সদয় হ'ল। হেকিম ডেকে তাঁর ইলাজ করাল। দু' দিনেই সে সুস্থ হয়ে উঠল।

এক সকালে মেহমান সারজাবন উজিরের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শাহজাদা কামার অল-জামান-এর খোঁজ করল। তার উন্মাদদশার কথা জিজ্ঞাসা করল।

বৃদ্ধ উজির সবিস্ময়ে বল্‌ল—'তুমি শাহজাদার কথা শুনেছ?'

—'হ্যাঁ। আমি তার ইলাজ করতে চাই। তবে দাওয়াই খাইয়ে নয়। ঝাড়ফুঁক তাবিজ-কবজই আমার দাওয়াই। আমার তারিকা।

উজির আশ্বাস পেল। বল্‌ল—'এর আগে কিন্তু অনেকেই শাহজাদা কামার অল-জামান-এর ইলাজ করতে এসে প্রাণ দিয়েছে, জান?'

—'তাও জানি। গোটা চল্লিশেক নরমুণ্ডু তো পথে দেখেই এসেছি।'

—'তবে তুমি সবই জান দেখছি। মনের দিক থেকে একেবারে তৈরি। আর তোমার কথায় আমারও বিশ্বাস, তুমিই পারবে শাহজাদার রোগ নিরাময় করতে।'

—'খোদা মেহেরবান। খোদার মর্জিতেই তোমার এখানে আসা সম্ভব হয়েছে বাপজান। নইলে সাগরের তুফান অগ্রাহ্য করে, প্রবল ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি ক'রে তুমি এখানে এলে বেটা?'

—'সে যা-ই হোক। আমাকে যে একবারটি শাহজাদা কামার অল-জামান-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

—'অবশ্যই। তুমি আগে সব বৃত্তান্ত শোন। আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, আমাদের একমাত্র বল ভরসা শাহজাদার তবিয়ৎ আচ্ছা হোক, আমাদের সবারই একমাত্র কাম্য।'

উজির এবার আগন্তুক নওজোয়ান সারজাবন'কে শাহজাদার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ সবিস্তারে বল্‌ল।

সারজাবন নিঃসন্দেহ হ'ল শাহজাদার সে-রাত্রের নায়িকা, শয্যা সঙ্গিনী রাজকুমারী বদর ছাড়া কেউ নয়। কিন্তু উজিরকে তার মনের কথা কিছুই বুঝতে দিল না।

উজির বল্‌ল—'বেটা, সব বৃত্তান্ত তো শুনলে। এবার তোমার দিল্ কি বলছে, তুমি ইলাজ করে শাহজাদাকে কি সুস্থ করে তুলতে পারবে ব'লে মনে কর?'

—'আমি খোদাতাল্লার ওপর ভরসা রাখি। তাঁর দোয়া হলে হয়তো আমার কোশিস বৃথা হবে না। আগে রোগীকে দেখি। তার বিমারির আস্থা বিবেচনা করি। তারপর আপনাকে বলব, আমার দ্বারা আপনাদের কোন উপকার হবে, কিনা। বলেছিই তো দাওয়াইয়ে আমার ভরসা নেই। তাবিজ কবজ ব্যবহারে আশা করি শাহজাদা পূর্বের হালৎ ফিরে পাবে।'

বৃদ্ধ উজির এবার সারজাবন'কে নিয়ে শাহজাদা কামার অল-জামান-এর কামরায় গেল। বাদশাহ শাহরিমানও সেখানে হাজির হলেন।

শাহজাদাকে এক পলক দেখেই সারজাবন বিস্মিত হ'ল। রাজকুমারী বদর-এর মুখে তার মেহবুবার চেহারার যে বিবরণ শুনেছে তার সঙ্গে এর চেহারার অবিকল মিল সে খুঁজে পাচ্ছে।

সারজাবন আশান্বিত হ'ল। শাহজাদা তাকে হেসে অভিনন্দন জানায়। নিজের পালঙ্ক দেখিয়ে বসতে বলে। সারজাবন এগিয়ে গিয়ে পালঙ্কে বসল।

সারজাবন বার কয়েক বাদশাহ ও উজিরের দিকে তাকাল। তারা বুঝল, সে হয়ত রোগীর সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করতে চাইছে। তারা এক এক করে ঘর ছেড়ে গেল।

সারজাবন এবার শাহজাদার দিকে এগিয়ে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'শাহজাদা, আর ডর নেই দোস্ত। খোদাতাল্লার মর্জিতেই আমি তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এখানে হাজির হয়েছি। আপনার মহব্বতের মেহবুবার পাত্তা আমার কাছে আছে।'

শাহজাদা কামার অল-জামান তাকে সন্দেহের চোখে দেখল। ভাবল, নির্ঘাৎ কোন না কোন বদ মতলব নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে।

সারজাবন তার মানসিক অবস্থার কথা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বল্‌ল—'শুনুন শাহজাদা, আমার ওপর, আমার ইলাজের ব্যবস্থার ওপর যদি ভরসা রাখতে পারেন তবেই আপনার রোগমুক্তি সম্ভব। আগে আমার বাৎ সব শুনুন, তারপর যদি ভরসা হয় আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

শাহজাদা কামার অল-জামান মুচকি হেসে বল্‌লেন—'ঠিক আছে, তোমার বক্তব্য আগে শুনি। তারপর না হয় আমার মতামত ব্যক্ত করব।'

সারজাবন এবার বল্‌ল—'আপনি যার চিন্তায় ব্যাকুল। যাকে নিয়ে ওই বিশেষ রাত্রে সহবাস করেছিলেন, তার নাম বদর। রাজকুমারী বদর। সম্রাট ঘায়ুর-এর লেড়কি বদর। ঘায়ুর খালিদানের সম্রাট। সে আমার বহিনের মত। বাল্যকাল থেকে আমরা এক সঙ্গে মানুষ হই। এখনও আমাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক অব্যাহত।

শাহজাদা কামার অল-জামান এবার আগন্তুক নওজোয়ান সারজাবনকে হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নেয়। দিল থেকে তাকে দোস্ত ব'লে স্বীকার করে নেয়।

সারজাবন বল্‌ল—'শাহজাদা, সব বৃত্তান্তই তো শুনলেন। এবার আমি যদি বলি আপনার এ-বিমারি শরীর বা দিমাকের বিমারি নয়— বিলকুল দিলের ব্যাপার। পেয়ার মহব্বতের বিমারি। এ বিমারি তো দাওয়াই বা তাবিজ-কবজে সারার নয়। এর একমাত্র ইলাজ হচ্ছে—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই শাহজাদা কামার অল-জামান বলে উঠল—'তুমি আজ থেকে আমার দোস্ত হ'লে। এবার বল, কি ক'রে আমি আমার মেহবুবার দেখা পাব? তার সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হতে পারে? তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।'

—'নিয়ে যাব। মোলাকাৎ করিয়ে দেবার কোশিস আমি অবশ্যই করব। কিন্তু দোস্ত, সে-মুলুক তো আর হাতের নাগালের মধ্যে নয়। বহুৎ দুর। দরিয়া পেরিয়ে তবে সম্রাট ঘায়ুর-এর মুলুকে যেতে হয়। তুমি সেখানে গেলে উভয়ে—তুমি নিজে এবং রাজকুমারী বদর-ও সুস্থ হয়ে উঠবে। দু' দুটো নওজোয়ানের জান রক্ষা হবে।'

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখীর কলরব শুনে বুঝলেন ভোর হতে আর দেরী নেই। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

একশ' নিরানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় প্রবেশ করলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, শাহজাদা কামার অল-জামান রাজকুমারী বদর-এর সান্নিধ্যলাভের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল।

এমন সময় সুলতান শাহরিমান আচমকা ঘরে ঢুকলেন। চৌকাঠ ডিঙিয়েই তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, তার লেড়কা হেসে হেসে আগন্তুক নওজোয়ানের সঙ্গে কথা বলছে। সুলতানের বুকে যেন অকস্মাৎ খুশীর তুফান বয়ে গেল। দীর্ঘদিন পর লেড়কার মুখে এরকম অনাবিল হাসি দেখলে তো খুশীতে ডগমগ হওয়ারই কথা।

এবার যেন নতুন করে সুলতান শাহরিমান দেহে জীবনীশক্তি ফিরে পেলেন। তার প্রাসাদে দরবার কক্ষে আবার আগেকার সেই হাসি-আনন্দের জোয়ার বয়ে চল্‌ল। তিনি মূল্যবান পোশাক-আশাক হীরা-জহরৎ প্রভৃতি উপহারদানে আগন্তুক নওজোয়ান সারজাবনকে পুরস্কৃত করলেন।

সুলতান বিদায় নিলে শাহজাদা কামার অল-জামান এবার সারজাবন-এর হাত দুটো চেপে ধরে আবেগের সঙ্গে বল্‌ল—'দোস্ত মেহবুবাকে না দেখে আমার পক্ষে আর একটি দিনও জান টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এখন বাৎলাও কি ক'রে আমি আমার কলিজার সমান মেহবুবা বদর'কে কাছে পেতে পারি?'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে ভেবে নিয়ে সারজাবন বল্‌ল—'দোস্ত, একটি ফিকির করলে তোমার বাসনা পূর্ণ হতে পারে। সুলতান'কে বল, আমরা দু'জন কয়েক দিনের জন্য শিকারে যাব। এতে অবশ্য তোমাকে একটু ঝুট বাৎ বলতে হবে। তবে এতবড় একটি কাজ হাসিলের জন্য ছোট খাটো ঝুট বাৎ বল্‌লে গুনাহ তেমন কিছু হবে না। ব্যস, তারপরই আমরা হাজির হ'ব তোমার জান, তোমার কলিজা, তোমার মেহবুবা রাজকুমারী বদর-এর দরবারে।'

ব্যবস্থাটি শাহজাদা কামার অল-জামান-এর খুবই দিলে ধরল। এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল।

শাহজাদা কামার অল্‌-জামান তার সদ্য পাতানো দোস্ত সারজাবন'কে নিয়ে শিকারে যাবার নাম ক'রে যাত্রা করল। বাদশাহ শাহরিমান সঙ্গে কয়েকজনও দিয়ে দিলেন।

দু'টি তাগড়াই ঘোড়ায় চেপে শাহজাদা কামার অল্‌-জামান ও সারজাবন যাত্রা করল। তাদের সঙ্গী সাথীরাও গোড়ার পিঠে চাপল।

সারাদিন ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে তারা হাজির হ'ল এক গভীর জঙ্গলে। সেখানে তাঁবু খাটানো হ'ল।

গভীর রাত্রে তাদের সঙ্গী সাথীরা যখন সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন সারজাবন ও শাহজাদা জামান ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা দু'জনে দুটো ঘোড়ায় চাপল। আর সঙ্গে অতিরিক্ত একটি ঘোড়া নিয়ে নিল। অতিরিক্ত ঘোড়াটির পিঠে একটি বাক্স। তার মধ্যে উভয়ের সাজ পোশাক ও সোনার মোহর। কিছু খানাপিনাও আছে।

কিছুদূর গিয়ে সারজাবন একটি গাছের তলায় শাহজাদা জামান'কে রেখে অতিরিক্ত ঘোড়াটি ও জামান-এর এক প্রস্ত পোশাক নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। জামান তার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে সারজাবন ফিরে এল। তার হাতে জামান-এর পোশাক। খুন লাগানো। খুনে একেবারে জবজবে। অতিরিক্ত যে ঘোড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সেটিকে জবাই করে তার খুন পোশাকে মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। এবার খুন মাখানো পোশাকগুলি এক চৌরাস্তার ধারে ফেলে রাখল। পরে কেউ শাহজাদা জামান'কে খুঁজতে এসে এগুলো দেখেই ধরে নেবে হয় তাকে কেউ খুন

করেছে, নতুবা কোন হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কবলে পড়ে জান খুইয়েছে।

এবার শাহজাদা জামান-এর কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হ'ল। সারজাবন-এর বুদ্ধির তারিফ করল বহুভাবে।

ব্যস। আর দেরী নয়, এবার তারা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পথ চলতে চলতে সারজাবন বল্‌ল—'দোস্ত, সকালে তোমার লোকজন ঘুম থেকে উঠে আমাদের খোঁজাখুঁজি করবে। তারপর পথের ধারে তোমার খুনমাখা পোশাক দেখতে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সুলতানের কাছে ছুটে গিয়ে দুঃসংবাদটি দেবে। তারপরই চারদিকে সৈন্য সামন্ত তোমার তল্লাসে বেরিয়ে পড়বে। তার আগেই আমাদের বহুদূরে, তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে হবে।' প্রায় এক মাস ঘোড়া ছুটিয়ে তারা সম্রাট ঘায়ুর-এর রাজধানীতে পা দিল।

সারজাবন শাহজাদা কামার অল-জামান-কে নিয়ে সম্রাট ঘায়ুর-এর দরবারে উপস্থিত হ'ল। সারজাবন তার পরিচয় দিল। এক বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী ব'লে। সে জোর দিয়েই বল্‌ল—'আগন্তুক এক জ্যোতিষী, তামাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী। বহুৎ দূরবর্তী মুলুক থেকে একে অনুরোধ করে আনানো হয়েছে। এর দৃঢ় বিশ্বাস, রাজকুমারী বদর-এর বিমারি ইলাজ করে সারিয়ে তুলতে পারবেই।'

সুদর্শন যুবক কামার অল-জামানকে সবাই বারণ করল এরকম এক দুঃসাহসিক কাজে যেন হাত না দেয়। বহু মুলুক থেকে হেকিম-বৈদ্য জ্যোতিষী এসেছিল, ইলাজ করল। কিন্তু তার রোগ নিরাময় করতে না পেরে সম্রাটের ঘাতকের হাতে জান দিয়েছে।'

কামার অল-জামান কিন্তু কোন বাধা নিষেধকেই পাত্তা দিল না।

সে সম্রাটের দরবারে হাজির হয়ে যথোচিত ভঙ্গিতে কুর্নিশ জানিয়ে জ্যোতিষী ব'লে নিজের পরিচয় দিল। আর দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌ল, রাজকুমারীর বিমারি সে সারাতে পারবেই।

সম্রাট ঘায়ুর আগন্তুক ভিনদেশীয় জ্যোতিষী নওজোয়ান কামার অল জামান-এর দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। এমন খুবসুরৎ যে কোন পুরুষ মানুষের হতে পারে তা যেন তার কল্পনারও অতীত। বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থায় পাথরের মূর্তির মত তাকিয়েই রইলেন।

এক সময় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে বললেন—'বেটা তোমার ওমর দেখছি খুবই কম। নওজোয়ান। প্রথম দর্শনেই তোমার ওপর আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। আমার বেটির যোগ্য পাত্রই বটে। কিন্তু আমার শর্তের কথা শুনেছ কি? যদি আমার বেটির তাজ্জব বিমারি সারাতে না পার তবে তোমার নসীব তোমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, ভেবে দেখেছ কি?'

কামার অল-জামান এবার স্মিতহাস্যে বলল—'আপনি আমার জন্য মিছে ঘাবড়াবেন না। আমি সবকিছু শুনে, নিজের দিলের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে তবেই আপনার দরবারে হাজির হয়েছি।'

সম্রাট ঘায়ুর এবার এক খোজা প্রহরীকে দিয়ে আগন্তুক জ্যোতিষী কামার অল-জামান'কে রাজকুমারী বদর-এর কামরায় পাঠিয়ে দিলেন।

কামার অল-জামান রাজকুমারী বদর-এর কামরার দরওয়াজায় এসে দাঁড়াল। জামান প্রথমেই কামরার ভেতরে গেল না। সঙ্গের যোদ্ধাকে দিয়ে একটি কুরশি আর কাগজ-কলম আনাল।

জামান এবার কুরশিতে বসল। কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ চারতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ আবার তাঁর কিসসা শুরু করলেন—'জাহপনা শাহজাদা কামার অল-জামান চিঠি লিখতে লাগল। তার চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এরকম—মান্যবর সম্রাট ঘায়ুর-এর লেড়কি বদর-এর উদ্দেশ্যে খালিদানের সুলতান শাহরিমান-এর লেড়কা কামার অল-জামান এর চিঠি।

মেহবুবা, তুমি তো বোঝ না, জানও না এক অব্যক্ত ব্যথা-বেদনা কিভাবে আমার কলিজাটিকে পীড়িত করছে। আমার কলিজা জ্বলেপুড়ে খাঁক হচ্ছে কেবলমাত্র তোমার অদর্শনে। আর এরই জন্য আমি উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছি। কলমের মাধ্যমে আমার দিলের ব্যথা-বেদনা তোমার কাছে প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। সে অত্যাশ্চর্য মিলনের শুভরাত্রির পর থেকে আমি হরবকত তোমার বিরহ-জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। সবাই বলে আমি নাকি উন্মাদ হয়েছি। কি করে তাদের বুঝাব, আমার দিলের কথা, কলিজায় ব্যথার কথা? তুমি আমার আঙ্গুলে এ-পান্নার অঙ্গুরীয়টি পরিয়ে দিয়েছিলে। চিঠির সঙ্গে পাঠালাম। দেখ তো, চিনতে পার কিনা! আমার দিল আজ দরিয়ার মত অস্থির হয়ে উঠেছে। কবে যে তোমার কমল বদন দু'চোখ ভরে দেখতে পাব, জানি না। মধুর চুম্বন রইল।

ইতি —

তোমার মেহবুব

কামার অল-জামান

সবশেষে আর একটি পংক্তি সংযোজন করল —আর শোন, নগরে ঢোকার মুখের মুসাফিরখানায় আমি মাথা গুঁজেছি।

চিঠি লেখা শেষ করে একটি খামে চিঠিও নিজের হাতের পান্নার অঙ্গুরীয়টি তাতে ভরে খোজা-প্রহরীটিকে দিয়ে কামরার ভেতরে রাজকুমারী বদর-এর কাছে পাঠিয়ে দিল।

খোজাটি কামরার ভেতরে ঢুকে পালঙ্কের ওপর বিমর্ষমুখে অর্দ্ধশায়িতা রাজকুমারী বদর-এর হাতে খামটি দিয়ে বলল—'এক জ্যোতিষী দরওয়াজার বাইরে অপেক্ষা করছেন। তিনি এ-চিঠিটি দিয়ে বললেন, আপনাকে না দেখেই নাকিআপনারবিমারি সারিয়ে তুলতে পারবেন। তিনিই এ-চিঠিটি আপনাকে দিলেন।'

বদর ব্যস্ত-হাতে খামের মুখটি ছিঁড়তেই তার ভেতর থেকে পান্নার অঙ্গুরীয়টি বেরিয়ে এল। এক পলকে অঙ্গুরীয়টি দেখেই চিনতে পারে। এটিই—হ্যাঁ, এটিই তিনি তার জান, তার কলিজার সমান মেহবুবাকে সে-বিশেষ রাত্রে, জীবনের প্রথম সম্ভোগের মুহূর্তে পরিয়ে দিয়েছিল।

রাজকুমারী বদর আর চিঠিটি পড়ারও প্রয়োজন বোধ করল না। এক লাফে দরওয়াজার বাইরে বেরিয়ে এসে শাহজাদা কামার অল-জামানকে জড়িয়ে ধরল। তার দু'চোখের কোল বেয়ে নেমে এল পানির ধারা।

কামার অল-জামান-এর দু'চোখেও পানি ভিড় করল। কারো মুখে কোন কথা নেই। কেবল অনুভবের মধ্য দিয়ে উভয়েই সুখে-শান্তি নিঙড়ে নিতে লাগল। সে সঙ্গে কামার অল-জামান তার মেহবুবা বদর'কে চুম্বনে চুম্বনে আকুল করে দিতে লাগল।

এদিকে কপোত-কপোতির প্রেম-মিলনের দৃশ্য চাক্ষুষ করে খোজা প্রহরীটি তো শরমে এতটুকু হয়ে গেল। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে দরবারে হাজির হ'ল। সম্রাটের কাছে সাধ্যমত লজ্জা-শরম বজায় রেখে আগন্তুক নওজোয়ান জ্যোতিষী এবং রাজকুমারীর ব্যাপার স্যাপার বর্ণনা করল।

সম্রাট ঘায়ুর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। মাথার মুকুট পড়ে রইল, জুতা পরতেও ভুলে গেলেন। পোশাক আশাকের দিকে খেয়াল নেই। ব্যস্ত-পায়ে হারেমের উদ্দেশে ছুটলেন।

দরওয়াজার সামনেই কপোত-কপোতির দেখা পেয়ে গেলেন। তার বুকে আশান্ত সাগরের ঢেউ বয়ে চলেছে। আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে তিনি কামার অল-জামান'কে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কামার অল-জামান-এর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল—'আমার নাম কামার অল-জামান। আমার আব্বা বাদশাহ শাহরিমান। খালিদানের বাদশাহ। এবার সে গোড়া থেকে সব কাহিনী বিস্তারিত ভাবে তাঁর কাছে ব্যক্ত করল।

শাহজাদা কামার অল-জামান মুসলমান। ইসলাম ধর্মাবিলম্বী। অতএব তার শাদী ইসলামের বিধান অনুযায়ীই হওয়া দরকার।

সম্রাট ঘায়ুর-এর নির্দেশে নগরের প্রধান কাজীকে তলব দিয়ে আনা হ'ল। মুসলমানদের শাদীর রীতি-নীতি অনুযায়ী শাদীর কবুল নামা তৈরী করা হ'ল।

সম্রাট ঘায়ুর জাকজমকের সঙ্গে রাজকুমারী বদর ও শাহজাদা কামার অল-জামান-এর শাদী দিলেন।

কামার অল-জামান ও বদর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নতুন ক'রে, মধুযামিনী যাপন করল। সম্ভোগসুখ উপভোগ করল। একে অন্যের কণ্ঠলগ্ন হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে, ভোর হওয়ার মুখে কামার অল-জামান তার আব্বাজান সুলতান শাহরিমানকে খোয়াবের মধ্যে দেখতে পেল। তিনি যেন তাদের পালঙ্কের পাশে, শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন। কেঁদে কেঁদে তার দু'চোখ অন্ধা হয়ে গেছে। ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কেঁদে তিনি বলছেন— 'বেটা, তোমার শোকে আমি আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছি। তুমি মাত্র একবারের জন্য এসে আমাকে দেখা দাও। গোরে যাওয়ার আগে আমাকে একবার চোখের দেখা দিয়ে যাও। আমার মসনদ, সুবিশাল প্রসাদ, বিশালায়তন সুলতানিয়ৎ—সবকিছু আজ আমার কাছে মূল্যহীন। এসব দিয়ে হবেই বা কি? সবই আছে, আমার কালিজা তুমিই কেবল নাই। সবকিছু থাকতেও আমার বুকটি আজ মরুভূমি হয়ে গেছে। এসো বেটা, শুধু একটিবার দেখা দিয়ে যাও।'

বিকট আর্তনাদ ক'রে কামার অল-জামান পালঙ্কে উঠে বসে পড়ে।

রাজকুমারী বদর-এর ঘুম ভেঙে যায়। সে স্বামীর আকস্মিক আচরণে বিচলিত হয়ে পড়ে। সে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, কোন ভয় সূচক স্বপ্ন দেখেছে, নাকি আকস্মিক কোন ব্যথা-বেদনার উদ্ভব হয়েছে?

এমন সময় রাত্রি অবসান হ'ল, বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ ছয়তম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার আবার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, বিবির পীড়াপীড়িতে কামার অল-জামান মুখ খুলল—'শোন, কালই আমরা যাত্রা করব। নিজের মুলুকে না যাওয়া পর্যন্ত আমার দিল্ শান্ত হবে না। এইমাত্র খুবই খারাপ এক খোয়াব দেখলাম। আমার আব্বাজী আমার শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। কালই আমরা যাত্রা করতে চাই। তুমি কি বলছ, মেহ্‌বুবা?'

—'তোমার আর আমার তো আলাদা মত হতে পারে না। আমরা যে এখন থেকে একই মত আর পথের পথিক। তোমার অবর্তমানে সুলতান শোকে অভিভূত হয়ে পড়বেন এ-তো খুবই স্বাভাবিক। আমি ঘুম থেকে উঠেই আব্বাকে তোমার খোয়াবের কথা বলব। তিনি সানন্দে আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা করে দেবেন।

বদর ঘুম থেকে উঠেই খোজা ভৃত্যটিকে সম্রাট ঘায়ুর-এর কাছে ভেজল। তাকে দেখেই সম্রাট আতঙ্কিত হলেন। ভাবলেন আবার কোন দুঃসংবাদ নয় তো!

খোজা বলল—'রাজকুমারী আপনার সঙ্গে খুবই জরুরী আলোচনা করতে ইচ্ছুক। আপনি মেহেরবানি করে যদি—'

সম্রাট ব্যস্ত পায়ে অন্দরমহলে বদর-এর কামরায় এলেন।

বদর পিতার কাছে স্বামীর ইচ্ছার কথা জানাল। আর সে সঙ্গে খোয়াবের কথাও বলতে ভুলল না।

কন্যার কথা শুনে সম্রাট ঘায়ুর-এর চোখে জল দেখা দিল। অগত্যা স্নেহ কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদের কথা শুনেই তার চোখ দুটো পানিতে ভারী হয়ে এল। যাকে একদিনের জন্যও চোখের আড়াল করেন নি তাকে আজ পরের ঘরে পাঠাতে হচ্ছে। চোখের পানি মুছতে মুছতে তিনি বললেন—'বেটি তোমার অদর্শনে আমার দিলের অবস্থা কি হবে আশা করি তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না। এক সাল বাদে আবার এসে আমাকে দেখে যেয়ো।'

রাজকুমারী বদর পিতাকে জড়িয়ে ধরে দু'গালে চুম্বন করে। তাঁর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে কান্নাভেজা চোখে বলে—'আব্বা, তোমার অদর্শনে আমিও কি কম ব্যথিত মর্মাহত হ'ব বল?'

—'বেটি, এ-ই যে আল্লাহ-র বিধান। সমাজের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। লেড়কিদের ভবিতব্য। লেড়কি হয়ে যখন জন্মেছিস তখন আজ না হোক কাল পরের ঘরে যে যেতেই হবে।'

দুপুরের কিছু পরে সম্রাট ঘায়ুর সাশ্রুনয়নে বেটি ও জামাতাকে বিদায় দিলেন।

নগরের পথ অতিক্রম করার সময় দু'পাশের কৌতূহলী প্রজারা দেখল রাজকুমারী আব্বার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর। চোখের পানি বাঁধন হারা বন্যার পানির মত অনবরত পড়েই চলেছে।

নগর ছাড়িয়ে তারা এবার প্রান্তরের পথে নামল। ইতিমধ্যেই রাজকুমারী চোখের পানির ভাঁটা পড়ে গেছে। ঠোঁটের কোনে দেখা দিয়েছে হাসির ছোপ। লেড়কিদের আবাল্যের চিন্তা সেজেগুজে স্বামীর বুকে মাথা রেখে শ্বশুরবাড়ির পথে পাড়ি জমানো। বদর-এর সে খোয়াব আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। একী কম কথা। কম আনন্দের।

এক নাগাড়ে ত্রিশদিন উটের পিঠে কাটিয়ে তারা একদিন এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের কাছে তাঁবু গাড়ল। সঙ্গে অনুচররা ব্যস্ত হাতে সব ব্যবস্থা করল। পাশেই একটি ছোট্ট নদী। পানির অভাব পূরণ করা যাবে।

উটের পিঠে সুন্দর হাওয়া থাকলেও ক্রমাগত বদর-এর পিঠে, কেবল পিঠেই নয়, সর্বাঙ্গে ব্যথা। এবার তাবুর নিচে একটু টান টান হয়ে শুতে পারায় যেন একটু স্বস্তি পেল।

সঙ্গী পরিচারকদের তাবুগুলো একটু দূরে খাটানোর ব্যবস্থা করা হ'ল। হৈ হট্টগোল রাজকুমারীর নিদের ব্যাঘাত যদি হয় এরকম ভেবেই এ-ব্যবস্থা।

তাঁবুর ভেতরে মখমলের চাদর পেতে বিছানা তৈরী করে রাজকুমারী বদর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কামার অল-জামান তাঁবুর ভেতরে ঢুকে দেখল, খুবই পাতলা একটি রেশমী সেমিজ আর কাঁচুলী পরিহিতা বদর ঘুমে বিভোর। জামান তার পাশে বসল। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকে বদর-এর গায়ের পাতলা ফিনফিনে সেমিজটির অনেকখানি উড়ে গিয়ে মাঝে মাঝে তার শরীরের অদৃশ্য অংশ দৃশ্য করে তুলছে। দীর্ঘ একমাস তারা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও সম্ভোগ-সুখ তো দূরের কথা, কেউ কাউকে চুম্বন বা আলিঙ্গন পর্যন্ত করতে পারে নি। ফলে জামান-এর মধ্যে কামতৃষ্ণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চিত্তে জাগে অদম্য চাঞ্চল্য। কিন্তু চারদিকে পরিচারকরা ঘোরাফেরা করছে। এর মধ্যে! ছিঃ! এযে বনের জন্তু-জানোয়ারের সামিল কাজ হবে। জামান অনন্যোপায় হয়ে ঘুমন্ত বিবির পাশে বসল। তার সর্বাঙ্গে হাত বুলাতে লাগল। স্পর্শ সুখ। একেবারে না পাওয়ার চেয়ে যতটুকু পাওয়া যায়।

ক্রমে জামান-এর দেহ-মন উত্তপ্ত হতে থাকে। বার বার হাত বোলাতে বোলাতে বদরের কোমরের কাছে শক্ত একটি বস্তু তার হাতে বাঁধল।

জামান সেমিজটি সামান্য ফাঁক করে শক্ত বস্তুটিকে দেখার চেষ্টা করল। একটি পাথর। নিশ্চয়ই মাহামূল্যবান কোন পাথর। নইলে রাজকুমারী এতযত্ন করে এটিকে কোমরে ধারণ করতেই বা যাবে কেন? খুব সম্ভবতঃ কোন দৈবশক্তি সম্পন্ন পাথরটাথরই হবে। নইলে শরীরের এত জায়গা থাকতে কোমরেই বা সে বাঁধতে যাবে কেন?

পাথরটির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে জামান ভাবল, বদর-এর পাতানো ভাই সারজাবন হয়ত পাথরটি তাকে ব্যবহার করতে বলেছে। কারণ, সে তো জোতিষী চর্চা করে। গাছের শিকড়বাকড় আর পাথর নিয়েই তার কারবার। পাথরের দ্রব্যগুণ তো থাকেই। বহুৎ বিপদ আপদের হাত থেকে পাথর মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে এরকম কথা সর্বযুগে তামাম দুনিয়ার আদমিরা জানে।

জামান এবার কৌতূহলীমন নিয়ে ঘুমন্ত বদর-এর কোমর থেকে পাথরটি খুলে নিল।

সূর্যের আলোয় ভালো করে পাথরটিকে দেখার জন্য তাবুর বাইরে এল। হাতে নিয়ে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। এমন সময় ঘটল এক অকল্পনীয় ব্যাপার। অতর্কিতে একটি পাখী ছোঁ মেরে পাথরটিকে নিয়ে উড়ে গেল, চোখের পলকে ব্যাপারটি ঘটে গেল। চোখের পলকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন। বাদশাহ শাহরিয়ার সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত বেগমের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলেন। বেগম আঙ্গুল দিয়ে তার চুলে বিনি কেটে দিতে লাগলেন। বাদশাহের চোখে তন্দ্রা ভাব এল।

দু'শ' সাততম রজনী

বেগম শাহ্‌রাজাদ আবার তাঁর কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কামার অল-জামান-এর হাত থেকে ছোঁ মেরে পাথরটি নিয়ে পাখিটি উড়তে উড়তে সুউচ্চ একটি গাছের ডালে গিয়ে বসল।

জামান দূর থেকে দেখতে পেল হতচ্ছাড়া পাখিটি গাছের ডালে বসে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পাথরটিকে হারিয়ে জামান-এর মন যার পর নাই বিষিয়ে উঠল। আতঙ্কিতও কম হ'ল না। এমন একটি অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটতে পারে সে কল্পনাও করতে পারে নি। এখন উপায়? রাজকুমারী ঘুম থেকে জেগে অবশ্যই পাথরটির খোঁজ করবে। না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠবে। কি বলে তাকে প্রবোধ দেবে। আর নিছক প্রবোধের ব্যাপার তো নয়। পাথরটি সে হয়ত নিজের কলিজার চেয়েও বেশী ভলবাসে।

জামান অনন্যোপায় হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত গাছটির দিকে ছুটে যায়। একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে পাখিটিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। কাজ যেটুকু হ'ল পাখিটি উড়ে গেল। পাথরটিকে ছাড়ল না। তবে আশার বিষয়, পাখিটি উড়ে বেশীদূরে গেল না। সামান্য দূরবর্তী অন্য একটি গাছের ডালে গিয়ে বসে বে-রসিকের মত লেজ নাড়তে লাগল। জামান আর একটি ঢিল তুলে নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। এবারও ঘায়েল করতে পারল না। পাখিটি উড়ে গিয়ে অন্য একটি ঘাছের ডালে বসল। পাখিটি যেন তার সঙ্গে রসিকতায় মেতেছে। জামান আর একটি পাথর ছুঁড়ে মারলে। সে এবার সে -গাছেরই ডাল পরিবর্তন করে অন্য এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

পাখিটি বার বার উড়ে গিয়ে যখন যে ডালেই বসুক না কেন, এমন ভঙ্গিতে বসছে জামান যেন পাথরটিকে স্পষ্ট দেখতে পায়। সে আশান্বিত হয়। পাখিটির পিছন যেন না ছাড়ে। প্রতিবারেই জামান-এর মনে হয় এবার নির্ঘাৎ সে পাখিটিকে ঘায়েল করতে পারবে। ব্যর্থ, বারবারই সে ব্যর্থ হতে লাগল। কিন্তু এতবার ব্যর্থ হয়েও প্রতিবারেই তার মধ্যে আশার সঞ্চার ঘটছে।

বার বার এগাছ-ওগাছ করে করে পাখিটি এক সময় অদূরবর্তী এক পাহাড়ের অনুচ্চ এক চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিল। জামান-এর শিরে তখন খুন চেপে গেছে। সে তরতর করে পাহাড়ের গা-বেয়ে ওপরে উঠে যায়। আবার শুরু করে পাথর ছোঁড়া। পাখিটি এখানেও রসিকতায় মাতল। জামান পাথর ছুঁড়তেই উড়ে গিয়ে আবার অন্য একটি চূড়ায় গিয়ে বসল।

পাখিটির পিছন পিছন ছুটে জামান একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার বহু আকাঙ্ক্ষিত পাথরটি কিন্তু হতচ্ছাড়া পাখিটির ঠোঁটেই রয়ে গেল।

দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। পাখির পিছনে ছুটতে গিয়ে কখন যে বিকেল গড়িয়ে প্রকৃতির কোলে আলো-আঁধারির খেলা শুরু হয়ে গেছে তা সে খেয়ালই করে নি। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। গা দিয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে। কিন্তু এ-অবস্থায় বদর-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কোনমুখে। তাকে বলবেই বা কি? পাথরটির শোকে সে হয়ত এরই মধ্যে কাতর হয়ে পড়েছে। এখন উপায়?

এদিকে অন্ধকার ক্রমে ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জমাটবাঁধা অন্ধকারে প্রান্তর, বনভূমি, পাহাড় সব তলিয়ে গিয়ে একাকার হয়ে এল। নিজের হাতটিকে পর্যন্ত ভালভাবে দেখা যায় না। এখন উপায়? এ-অবস্থায় ঘন ঘন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে নিচে নামতে গেলে যেকোন মুহূর্তে পা হড়কে প্রাণনাশ হওয়ার সম্ভাবনা। আর আল্লাহ-র দোয়ায় তা যদি না-ও হয় তবে পথ হারিয়ে সারারাত্রে দূরবর্তী কোন স্থানে পৌঁছে যাওয়া কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। এখন আর শত কোশিস করেও তাঁবুর খোঁজ পাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু উপায়ই বা কি? আর হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের খপ্পরে পড়লে তো আর কথাই নেই। এক মুহূর্তে সব খেল খতম।

এদিকে রসরাজ পাখিটি অন্ধকারে গাছের ডালে বসে পাখা ঝাপটাচ্ছে। তার মুখের পাথরটি সাপের মাথার মনির মত চকচক করছে। তার খুন টগবগিয়ে ওঠে। শিরা উপশিরাগুলি দপ দপ করতে থাকে। একটি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে পরম আক্রোশে পাখিটিকে তা লক্ষ্য করে জামান ছুড়ে মারল। পাখি বিকট এক আওয়াজ করে আবার অন্য একটি ডালে গিয়ে বসল। আরও বার

কয়েক ঢিল মারার পর জামান আর ভরসা পেলনা। অন্ধকারে যেকোন মুহূর্তে পা-হড়কে পড়ে যেতে পারে আশঙ্কায় একটি পাথরের ওপরে বসে হাঁপাতে লাগল। কখন যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারে নি।

ভোর হ'ল। জামান চোখ মেলে তাকাল। দেখল, একটি প্রশস্ত পাথরের ওপর সে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছে।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই জামান উঠে বসল। ওপরের দিকে মুখ তুলতেই দেখতে পেল পাখিটি গাছের ডালে বসে লেজ নাড়ছে। তার মুখের পাথরটি তখনও জ্বল জ্বল করছে। ভোরের রক্তিম সূর্যের আলো পড়ে সেটির চাকচিক্য যেন আরও বহুলাংশে বেড়ে গেছে।

জামান আবার একটি পাথর তুলে নিয়ে পাখিটিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। সে এখন রীতিমত মরিয়া হয়ে উঠেছে। একের পর এক ঢিল ছুঁড়ে চলল। আর পাখিটিও ডাল বদলে তার চোখের সামনে বসে লেজ নাড়তে থাকল।

এভাবে এগাছ-ওগাছ করতে করতে পাখিটি জামানকে প্রলোভন দেখাতে দূরে, বহুদূরে নিয়ে চলে যায়। দুপুরের আগে জামান একটি আপেল আর চেরীফলের গাছ দেখতে পেল। লাল টসটসে চেরীফল আর মনলোভা পাকা আপেল দেখে কয়েকটি ছিঁড়ে ক্ষিধে নেভাল। গণ্ডুষ ভরে ভরে ঝর্ণার পানি খেল, এমনি করে পাখিটির পিছনে ছুটে ছুটে দুটো দিন কেটে গেল।

চেরী গাছের নীচে শুয়ে জামান রাত্রি কাটাল। সকাল হ'ল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে হতচ্ছাড়া পাখিটি চেরী গাছের ডালে বসে লেজ নাড়ছে। জামান আবার পাথর নিয়ে পাখিটির পিছন-তাড়া করতেলেগে যায়। সে এবার আরও মরিয়া হয়ে লেগেছে। শিরে খুন চেপে গেছে। যা হোক একটি হিল্লা করে তবে ছাড়বে। তার পক্ষে সামান্য একটি পাখির কাছে হার মানা কি করেই বা সম্ভব? সুলতান শাহরিমান-এর লেড়কা হয়ে সামান্য একটি পাখির কাছে হার মানার কথা ভাবতেই পারে না। কিন্তু তাকে বাগে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব হ'ল না।

এদিকে পাখিটি জামান'কে প্রলুব্ধ করে করে একেবারে সমুদ্রের ধারে এনে ফেলল। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। শরীর আর চলে না। মাথা ঝিমঝিম করছে। নচ্ছার পাখিটি সমুদ্রের তীরবর্তী একটি আখরোট গাছের ডালে বসে মৃদু মৃদু লেজ নাড়াচ্ছে। তার কাণ্ড দেখে জামান-এর গা-পিত্তি জ্বলে গেল। একটি মাটির ডেলা তুলে নিয়ে শরীরের সর্ব শক্তি নিয়োগ করে পাখিটিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। পাখিটি এবার বার কয়েক পাখা ঝাপটেই ঊর্ধ্বাকাশের দিকে উড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এবার চোখের আড়ালে চলে গেল।

পাখিটি উড়ে যাওয়ায় কামার অল-জামান-এর সব আশায় ছাই পড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে সমুদ্রের ধারে মাটির ওপর বসে পড়ল। তার দু'চোখেরকোল বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। তার দীর্ঘ তিনদিনের প্রয়াস মুহূর্তে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল।

ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরে জামান কখন যে বসা থেকে শুয়ে পড়েছিল। আর কখন যে দু'চোখের পাতা এক হয়ে ঘুমের কোলে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল কিছুই তার খেয়াল নেই।

কামার অল-জামান এক সময় চোখ মেলে তাকাল। কিছু সময় ঘুমের মধ্যে কাটানোর ফলে অবসাদ কিছুটা কেটে যাওয়ায় একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল। জামান এবার যেন সম্বিৎ ফিরে ফেল। অজানা-অচেনা জায়গা। বিদেশ—বিভুঁই। এখন সে কোথায় আছে? তাঁবু থেকে কত দূরেই বা অবস্থান করছে—কিছুই অনুমান করতে পারল না।

জামান উঠে দাঁড়াল। হারা উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল। এক পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল অদূরে একটি প্রাচীন নগর রয়েছে।

নগরের কাছে পৌঁছে জামান মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে তার বিবি বদর-এর কথা ভাবে। আজ চারদিন—চাররাত্রি তার কাছ ছাড়া। তার অদর্শনে বেচারি না জানি কত চোখের পানিই ফেলে চলেছে।

জামান নগরের পথ ধরে এগোতে লাগল। এক সময় প্রাচীরে ঘেরা এক বাগিচায় প্রবেশ করল সে। একটু হাঁটাহাঁটি করেই এক বুড়ো মালীর দেখা পেয়ে গেল। একেবারে থুরথুরে বুড়ো। তাকে আদাব জানিয়ে জামান বলল—'মালিক, এ-নগরে পা দিতেই অদ্ভুত একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। পথচারীরা সবাই যেন কেমন গম্ভীর প্রকৃতির। নির্বাক কারো মুখেই রা নেই। ব্যাপার কি?'

বুড়ো বলল—'ইয়া আল্লা! আপনি তাদের সঙ্গে বাৎচিৎ বলার কোশিস করেন নি তো? জোর বাঁচা বেঁচে গেছেন মালিক। ওরা সবাই শত্রু পক্ষের লোক। তারা সব শয়তান কাফের। দরিয়ার ওপার থেকে এসে এখানে মুসলমানদের ওপরে হামলা হুজ্জুত করছে। আল্লাহ-র ওপর তাদের বিশ্বাস নেই। বহু মুসলমানের খুন ঝরিয়েছে। জানে খতম করেছে বহু মুসলমানকে। আর তাদের জনানারা বে-শরম, বে-আব্রু। বোরখা ব্যবহার করে না। নাকাবের ধার ধারে না। এমন বেহায়া জাত আর দেখি নি মালিক। একেবারে অশিক্ষিত জঙ্গলী ভূত। শয়তান তাদের একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ-র নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না। পচা গোস্ত আর চর্বি এদের কাছে সুখাদ্য বিবেচিত হয়। এ-নগরের সব আদমিকে নির্মমভাবে

... হয়েছে। কেবল আমাকেই খতম করেনি। কিন্তু কেন যে ... ওপর তাদের মেহেরবানি হ'ল বলতে পারব না মালিক।'

বুড়ো মালী কামার অল-জামান'কে তার ঘরে নিয়ে যায়। খানাপিনার ব্যবস্থা করে দেয়। এক বোতল শস্তা দামের সরাবও এনে তার সামনে রাখে।

জামান খানাপিনায় মন দেয়। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ীভুড়ি জ্বলে যাচ্ছে। আর চোখে ঘুম শরীর ক্লান্ত-অবসন্ন।

বুড়ো মালী তার সামনে মেঝেতে বসে আপ্যায়ণ করছে। বুড়ো কৌতূহল দমন করতে না পেরে একসময় বলল—'মালিক, আপনি হঠাৎ এ-সর্বনাশা দেশে কেন জান দিতে এলেন?'

এমন সময় রাত্রি অবসান হ'ল। বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ আটতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহ্‌রাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তখন পাৎলা ফিনফিনে একটি সেমিজ গায়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় পালঙ্কে বসে। মখমলের সেমিজটি এত পাৎলা যে, তাঁর নিটোল স্তন দুটোকে যেন অস্থিরভাবে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখা গেল। কাপড়ের আস্তরণের বাঁধা অগ্রাহ্য করে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এমন কি নাভিকুণ্ডলীটি পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা পড়ছে। আর চোখের মনি দুটো আবেগে জড়ানো। কামনার সুস্পষ্ট ছাপ। কাছে টানার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। বাদশাহ শারিয়ার কামরায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে নিশ্চল-নিথর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নামমাত্র আবরণে আবৃত, নগ্নপ্রায় পূর্ণ যৌবনা বেগমের কামতপ্ত দেহটির দিকে। তার কলিজাটি যেন মুহূর্তে কেমন অস্থির হয়ে পড়ল। শিরা-উপশিরায় খুন চন-মনিয়ে উঠল। মগজের ভেতরে একদল পোকা যেন হঠাৎ খাবলা খাবলি শুরু করে

দিল। বাদশাহ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ভুলে গেলেন কিস্‌সার কথা। এমন কি কিশোরী দুনিয়াজাদ-এর উপস্থিতির কথাও তার কিছুমাত্র খেয়াল নেই। আচমকা নগ্নপ্রায় বেগমের যৌবনের জোয়ার লাগা দেহটির ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। উন্মাদের মত তার তুলতুলে নরম শরীরটিকে নিয়ে দলন আর পেষণের খেলায় মেতে গেলেন।

দুনিয়াজাদ তখন কপালে হাত রেখে শুয়ে। হাতের ফাঁক দিয়ে তার কৌতূহলী চোখের মণি দুটো একবার তার বড় বহিন শাহ্‌রাজাদ-এর ওপর পর মুহূর্তেই যৌবনদীপ্ত বাদশাহ শারিয়ার-এর সুঠাম দেহের ওপর চক্কর মারতে লাগল।

বেগম শাহ্‌রাজাদ এক সময় দুনিয়াজাদ-এর গালে আলতো করে এক চাটি মেরে বলল—'মুখপুড়ী, ওদিকে ঘুরে শো। নইলে চোখ গেলে দেব বলে দিচ্ছি। খুব পাকা হয়ে গেছিস, তাই না?'

দুনিয়াজাদ উপায়ান্তর না দেখে ঝটকরে পিছন ফিরল। একটি তাকিয়া টেনে নিল। সেটিকে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল। এদিকে শুরু হয়ে গেল প্রবল ধস্তাধস্তি। বেগম শাহ্‌রাজাদ এক সময় চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন—আমি আর পারছি না! এত সুখ সহ্য করতে পারছি না! আমি মরে গেলাম। অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম----

তারপরই বাদশাহ শারিয়ার দীর্ঘ সময় পালঙ্কে গা এলিয়ে দিয়ে এলিয়ে পড়ে রইলেন। বেগম শাহ্‌রাজাদ-এর মুখেও আর কোন কথা নেই। নিঃশব্দে এলিয়ে পড়ে থেকে সম্ভোগ-সুখের শেষ রেশটুকু উপভোগ করতে লাগলেন।

এক সময় বেগম শাহ্‌রাজাদ উঠে বসলেন। এলোমেলো পোশাকটুকু গোছগাছ করে নিলেন।

বাদশাহ শারিয়ার বেগমের কোলে মাথা রেখে কিস্‌সা শোনার জন্য তৈরী হলেন।

বেগম তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশটুকু শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, কামার অল-জামান বুড়ো মালীর কাছে তার জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা খুলে বলল। চোখের পানিতে তার বুক ভেসে যেতে লাগল। বুড়ো তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করল। বুড়ো বলল—'বেটা' সবই খোদাতাল্লার মর্জি। তিনি আমাদের দিয়ে যা করান আমরা কাঠের পুতুলের মত তাই করি। যা বলান বলিও তা-ই। নসীবে যা লেখা আছে তাকে খণ্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নেই।

—'আমার বিবি বদর—'

—'বেটা' তোমার বিবি আর সেখানে আছে বলে আমার অন্তত বিশ্বাস হয় না। একদিন অপেক্ষা করার পর নির্ঘাৎ তারা খালিদানের

উদ্দেশে যাত্রা করেছে।'

—'কিন্তু আমি এখন করি কি?'

—'আমি তোমায় খালিদানে যাবার ব্যবস্থা করে দেব। ঘাবড়িয়ো না। এখানের বন্দরে মাঝে মধ্যেই খালিদানের মুলুকের জাহাজ আসে। সওদাগরী জাহাজ। তাতে তোমাকে তুলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।'

এদিকে রাজকুমারী বদর মাঝরাত্রে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে যায়। কোমরে হাত দিয়ে দেখে পাথরটি জায়গা মত নেই। ভাবল, তার স্বামী কৌতূহল বশতঃ পাথরটি খুলে নিয়ে ধারে-কাছে কোথাও গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে।

সকাল হ'ল। কিন্তু তবু কামার অল-জামান ফিরল না। ক্রমে সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। বদর এবার আর ধৈর্য ধরতে পারল না। তার পাতানো ভাই সারজাবন-এর ওপর রাগ হতে থাকে। ওটার জন্যই হয়ত তার স্বামীর এ-হাল হয়েছে।

এদিকে শাহজাদা কামার অল-জামান' কে তাঁবুতে নেই একথা বদর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে গোপন রাখল। সঙ্গী সাথীরা নিজেদের খানাপিনা নিয়েই ব্যস্ত থাকল। তাদের বিশ্বাস, শাহজাদা কামার অল-জামানই তাদের যাত্রার সময় হলে তৈরী হতে বলবেন। আর তিনি ওদিকে সদ্য বিবাহিতা বিবিকে নিয়ে মৌজ করছেন, অতএব তাদের কাছাকাছি গিয়ে বিরক্তির কারণ হওয়া উচিত নয়। এরকম মনে করেও তারা এদিকে নজর দেয় নি। মোদ্দা কথা জামান সে তাঁবুতে নেই কথাটি সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হ'ল।

রাজকুমারী বদর এবার জামান-এর পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিল। মাথায় পরল টুপি আর কোমরে তরবারি বেঁধে একেবারে জামান বনে গেল। আর নিজের পোশাক আশাক পরিয়ে দিল তার বাঁদীটিকে।

এবার তারা বেরিয়ে এল তাঁবুর বাইরে। দূর থেকে তাদের সঙ্গী সাথীরা ভাবল শাহজাদা জামান আর রাজকুমারী বদর ভ্রমণে বেরিয়েছে। বদর তাদের সবাইকে ডেকে বলল—'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে রওনা হ'ব। তাঁবু গুটিয়ে সবাই যত তাড়াতাড়ি পার তৈরী হও।'

উট এগিয়ে চলল দুলকি চালে। প্রায় এক ঘন্টা পথ চলার পর তারা সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেল।

একটি জাহাজ ভাড়া করা হ'ল। দরিয়া পাড়ি দিতে হবে।

এক নাগাড়ে দশদিন জাহাজ চলার পর এবনি দ্বীপে জাহাজ ভিড়ল। তাঁবু গড়া হ'ল। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেওয়া হ'ল, দ্বীপটির নাম এবনি। এখানকার সম্রাট আরমানুস। সম্রাটের একটিমাত্র খুবসুরৎ লেড়কি আছে। হায়াৎ অল-নাফুস তার নাম। যুবতী।

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের কলতান শুনে বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন প্রভাত হয়ে এল ব'লে। তিনি কিসসা বন্ধ করলেন।

দুশ' নয়তম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের কাছাকাছি বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম সরাবের বোতল ও পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বাদশাহকে আপ্যায়ণ করলেন। তারপর এক সময় কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, কামার অল-জামান-এর বেশে সজ্জিতা বদর এবনি দ্বীপের সম্রাটের কাছে একটি চিঠি পাঠাল। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখল, সে খলিদানের সুলতান শাহরিমান-এর লেড়কা। কামার অল-জামান তার নাম।

বদর তার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে এক প্রবীণের মুখে শুনেছিল সম্রাট আরমানুস-এর সঙ্গে সুলতান শাহরিমান-এর দোস্তি রয়েছে। মধুর সম্পর্ক তাই সে এ-পথ বেছে নিতে উৎসাহী হ'ল।

জিগরী দোস্ত শাহরিমান-এর একমাত্র বেটা কামার অল-জামান এসেছে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট পারিষদকে পাঠিয়ে দিলেন জাহাজ ঘাটে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য।

অতিথি কামার অল-জামান-এর সৌজন্যে সম্রাট বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সেখানে জামান-এর বেশে সজ্জিত বদর-এর সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হ'ল। সে সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হ'ল।

পুরো তিনটি দিন আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে কাটল। চতুর্থ দিন সকালে বদর হামামে গিয়ে আচ্ছাকরে গোসল সেরে এল। এবার সম্রাট আরমানুস-এর পাশের আসনে বসল।

সম্রাট আরমানুস কথা প্রসঙ্গে বললেন—'বেটা, এবার তুমি কি ভাবছ বল? কোনদিকে যাওয়ার দিল আছে কি?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু কবে, কোনদিকে যাব সেরকম কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।'

সম্রাট আমতা আমতা করে বললেন—'আমি দোস্তের মুখে তোমার কথা শুনেছিলাম। আবার এর-ওর কাছে শুনেছিলাম তুমি নাকি এক খুবসুরৎ নওজোয়ান। আজ চাক্ষুষ করার পর চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন সম্ভব হ'ল। আমি মনে করছি, আমার একমাত্র লেড়কি হায়াৎ অল-নাফুস-কে তোমার হাতে তুলে দেই। অবশ্য তোমার

যদি আপত্তি না থাকে।'

বদর নির্বাক। সম্রাটের কথার কি উত্তর দেবে হঠাৎ করে গুছিয়ে উঠতে না পারায়-ই তাকে মৌনব্রত ধারণ করতে হয়েছে।

সম্রাট আরমানুস বলে চললেন—'শোন বেটা, আমার একমাত্র বেটির নাম হায়াৎ অল-নাফুস। আমি তার আব্বা, নিজেমুখে লেড়কির সুরৎ আর গুণের কথা কি বলব। তুমি এক নজরে দেখলেই বুঝবে তার মত খুবসুরৎ লেড়কি বড় একটি মেলে না। আর গুণও তার বহুমুখী। তুমি যদি রাজী থাক তবে তোমার সাথে তার শাদী দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আর আমার ওমরও নেহাৎ কম হয় নি। রাজকার্য আর বিষয় সম্পত্তির কচকচানিতে আর দিল নেই। তাই ভাবছি, তোমাকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে আমি মক্কা মদিনায় গিয়ে আল্লাতাল্লার নামগান করে বাকী দিনগুলি গুজরান করে দেব। এখন বল বেটা, তোমার বক্তব্য কি?'

সম্রাটের কথায় রাজকুমারী বদর-এর কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে আসতে থাকে। এর কি-ই বা জবাব দেবে। তার স্নায়ুগুলো ক্রমে যেন শিথিল হয়ে আসতে লাগল। এখন তার সামনে রেহাই পাওয়ার মত একটি মাত্রই পথ খোলা—রাজকুমারী বদরকে মাত্র কয়েকদিন আগেই শাদী করেছি বলে কোনক্রমে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে প্রশ্ন জাগে—সম্রাট যদি বলে বসেন ইসলাম ধর্মে তো একাধিক শাদীর নির্দেশ রয়েছে—তখন? কেবলমাত্র একাধিক বললে ঠিক বলা হ'ল না—একজন পুরুষ একাধারে চার লেড়কিকে শাদী করে বিবির আসনে বসাতে পারে। আমার লেড়কি হায়াৎ অল-নাফুস না হয় তোমার দ্বিতীয় বেগমই হ'ল। আপত্তি কোথায়?

জামান-এর বেশধারী বদরকে নির্বাক দেখে সম্রাট আরমানুস বার বার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগলেন।

এদিকে বদর নীরবে ভেবে চলেছে—সে যদি কসুর স্বীকার করে, আসল ঘটনা ফাঁস করে দেয় যে, সে কামার অল-জামান নয়। পরিস্থিতির চাপে পড়ে জামান সাজতে হয়েছে। আসলে সে বদর। সম্রাট ঘায়ুর-এর লেড়কি। আর জামান-এর বিবি তখন সম্রাট আরমানুস হয়ত বা আসলি রূপ ধারণ করে বসবেন। সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বসবেন, তবে এক কাম কর, আমি তোমাকে শাদী করে পিয়ারের বেগম করে নিচ্ছি এখন। কামনা-বাসনার ব্যাপারকে এক রত্তিও বিশ্বাস করা যায় না। ইসলাম ধর্মে তো একাধিক বিবি রাখার নির্দেশ দেওয়াই আছে। আবার তার লেড়কিকে শাদী করার অক্ষমতা জানালেও হ্যাপা কম নয়। তখন হয়ত সম্রাট ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিতে উঠেপড়ে লেগে যাবে। এ তো মহাসঙ্কটে পড়া গেল। এদিকে গেলে শেরের পেটে যেতে হবে, ওদিকে গেলেও

শেরের লকলকে জিহ্বা! তবে জান বাঁচাবার ফিকির?

বদর নিজের দিলের সঙ্গে বহুৎ বোঝাপড়া করল। শেষ পর্যন্ত ফিকির একটি বের করল বটে। সাব্যস্ত করল—আপাতত জান বাঁচাবার জন্য তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাওয়া যাক। পরে আল্লাতাল্লা যে-পথে নিয়ে যান পরিস্থিতি অনুযায়ী চিন্তা করা যাবে। নসীবের ওপর নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া এমুহূর্তে গত্যন্তর নেই। বদর এবার সলজ্জ দৃষ্টিতে সম্রাটের দিকে তাকাল। ক্ষীণকণ্ঠে আমতা আমতা করে বলল—'জাঁহাপনা, আপনি আমার আব্বাজীর জিগরি দোস্ত। আপনার ইচ্ছাকে আমি আমার আব্বাজানের ইচ্ছা বলেই মনে করি। আপনার হুকুম তামিল করতে আমি রাজী। আপনি আমাদের শাদীর বন্দোবস্ত করুন।'

বদর-এর কথায় সম্রাট আরমানুস-এর দিল আনন্দে নেচে উঠল। তিনি সোল্লাসে বললেন—'এ-ই তো আমার দোস্ত শাহরিমান-এর বেটার মত বাৎ! বহুৎ আচ্ছা!'

সম্রাট আরমানুস দরবারে উপস্থিত উজির-নাজির ও অন্যান্য পারিষদ আমীর-ওমরাহদের মধ্যে সানন্দে ঘোষণা করে দিলেন, আমার লেড়কি হায়াৎ অল-নাফুস-এর সঙ্গে খালিদান-এর সুলতান শাহরিমান-এর একমাত্র লেড়কা কামার অল-জামান-এর শাদী আজ রাত্রেই সুসম্পন্ন হবে।

সম্রাট আরমানুস-এর নির্দেশে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় চার কাজীকে তলব করা হ'ল। তারা যথা সময়ে হাজির হয়ে শাদীর কবুলনামা বানিয়ে দিয়ে গেলেন।

উপস্থিত গণ্যমান্য আদমিদের সামনে শাদীর কবুলনামায় উভয় পক্ষের স্বাক্ষর নেওয়া হ'ল। সম্রাট আরমানুস সেখানেই সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য আদমিদের সামনে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা ক'রে

দিলেন—'আমি এ-ও সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার থেকে আমার মসনদের অধিকারী হবে আমার জামাতা কামার অল-জামান। আমি আশা রাখি আপনারা নবনিযুক্ত সম্রাটের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করে আমার এবং মসনদের মর্যাদা রক্ষা করবেন।'

সাম্রাজ্যের উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হাসি ও করতালির মাধ্যমে সম্রাটের প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানালেন। সে-সন্ধ্যাতেই কামার অল-জামান-এর ছদ্মবেশী রাজকুমারী বদর-এর সম্রাটনন্দিনী হায়াৎ অল-নাফুস-এর শাদী হ'ল।

এবার রাত্রি একটু গভীর হলে বৃদ্ধ সম্রাজ্ঞী নিজে বেটি হায়াৎ অল-নাফুস-এর হাত ধরে বদর-এর কামরায় পৌঁছে দিলেন।

বদর দরওয়াজায় এগিয়ে এসে পাত্রীকে হাত ধরে কামরার ভেতরে নিয়ে গেল, এ-ই এ-দেশের প্রচলিত প্রথা।

বদর এবার বিবির বেশে সজ্জিত হায়াৎ অল-নাফুস'কে পাশে বসাল। নিজেহাতে তার নাকাবটি তুলে শুভদৃষ্টি বিনিময়-পর্ব সম্পন্ন করল।

বদর নাকাবটি তুলে লেড়কিটির মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাতেই নজরে পড়ল তার চোখে-মুখে আনন্দের লেশমাত্রও নেই। খুশীর পরিবর্তে তার চোখের তারায় বিষাদের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সচকিত হয়ে বার বার তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্তই বটে। কিসের যেন এক অশান্তি, না পাওয়ার বেদনা তার ভেতরটি কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে।

বদর সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে 'কি গো সুন্দরী, তাকাও, মুখতুলে তাকাও আমার দিকে।'

হায়াৎ অল-নাফুস এবার মুখ তুলে তাকাল বদর-এর দিকে। এবার তার মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

বদর বুঝে নিল, হায়াৎ অল-নাফুস-এর মনে নির্ঘাৎ তার স্বামীর সুরৎ নিয়ে দ্বিধা ছিল। যদি তার স্বামী যথার্থই সুন্দর না হয়। যদি বুড়ো হয়। সাতলেড়কার বাপ হয় তবে তো জিন্দেগী একদম বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু বদর-এর মুখের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তার দ্বিধা কেটে গেল। স্বামীর সুরৎ দেখে মুগ্ধ হ'ল। প্রথম দর্শনেই তার দিল ভরে গেল। আর কিছুমাত্রও আশঙ্কা রইল না।

কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তার কিসসা বন্ধ করলেন।
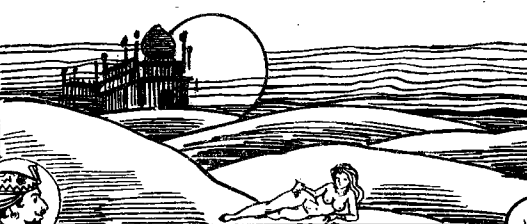
দু'শ দশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার কিস্‌সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে, ব্যস্ত পায়ে অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন।

বেগম শাহরাজাদ মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করেই কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সম্রাটনন্দিনী হায়াৎ অল-নাফুস এর দিল থেকে তার স্বামীর সুরতের ব্যাপারে দ্বিধা দূর হয়ে গেল।

এদিকে বদরও কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে বধূবেশে সজ্জিতা হায়াৎ অল-নাফুসকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এক সময় সে আপন মনে বলে উঠল—'খুবসুরৎ লেড়কি বটে। মুহূর্তের জন্য হলেও তার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হ'ল—অস্বীকার করার উপায় নেই।'

বদর সৌজন্য বশতঃ নববধূ হায়াৎ অল-নাফুস-এর একটি হাত নিজের কোলে তুলে নিয়ে নানাভাবে আদর-সোহাগ করতে লাগল।

হায়াৎ এতক্ষণ যেন ভীতা-সন্ত্রস্তা শম্বুকীর মত খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল। তার স্বামী তাকে দিল থেকে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা এতদিন এ-আশঙ্কাতেই সে জড়োসড়ো হয়েছিল। এবার তার কলিজায় যেন একটু পানি এল। বদর এবার হায়াৎ'কে কাছে টেনে নিয়ে সশব্দে একটি চুম্বন করল। হায়াৎ-এর দিল এতে ভরে যায়। সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে। শিরা-উপশিরায় বয়ে যায় এক অনাস্বাদিত শিহরণ, অভূতপূর্ব উত্তেজনা। কোন নওজোয়ানের সোহাগ চুম্বনের স্বাদ যে এমন মধুর হতে পারে এই প্রথম সে উপলব্ধি করল।

হায়াৎ-ও যে আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূতা হয়ে বদর'কে চুম্বন করতে উৎসাহী হয় নি, একটু-আধটু প্রয়াসী হয় নি তা নয়। কিন্তু দুরন্ত লজ্জা শরম এসে তার কণ্ঠ চেপে ধরল। বার বার বাধা দিল অগ্রসর হতে। পারল না। কিছুতেই শরম কাটিয়ে নিজের ঠোঁট দুটো-কে বদর-এর ঠোঁটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না।

বদর এবার হায়াৎ-এর হাত দুটো ধরে ছোট্ট ক'রে এক হেঁচকা টানে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। ঠোঁটে, গালে কপালে আর মাথায় বার বার চুম্বন করে তার মধ্যে একের পর এক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করল। গায়ের বিশেষ বিশেষ স্থানে হাত বোলাতে উদ্যোগী হ'ল। হায়াৎ শরমে মুখ ঢাকল। হাত বাড়িয়ে বদর-এর হাতটিকে সরিয়ে দেয়ার কোশিসও যে করেনি তা-ও নয়। কিন্তু বদর-এর আগ্রহের কাছে সে হার মানল। এমনি ক'রে দীর্ঘ সময় তার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে আসতে লাগল। আর হায়াৎ-এর দিল ও দেহে উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল। চোখ দুটোতে অবসাদ মিশ্রিত রোমাঞ্চ ভর করল। শরীর এলিয়ে

পড়ল। চোখ দুটোতে নিদ ভর করল। কখন যে সে গভীর নিদে ডুবে গেল নিজেই বুঝতে পারে নি।

পাখীর ডাকে ভোর হ'ল। হায়াৎ নিদ থেকে জেগে সলজ্জ দুরুদুরু বুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘুমন্ত বদর-এর দিকে ভালভাবে তাকাতেও পারল না। যদি সে জেগে থাকে। যদি চোখ দুটো মেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তবে? কী শরম কী বাৎ!

একটু বেলা হলে বদর-এর ঘুম ভাঙল। চোখে মুখে পানি দিয়ে এবার তৈরী হয়ে নিল। দরবারে গিয়ে বসতে হবে। তাকেই যে মসনদে বসানো হয়েছে। সাম্রাজ্যের শাসনভার যে তার হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ আদমির দণ্ডমুণ্ডের দায়িত্ব তার ওপর বর্তেছে।

উজির-নাজির, আমির-ওমরাহরা যথা সময়ে দরবারে উপস্থিত হয়ে নতুন সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষায় গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে। কারো মুখেই হাসি নেই! সবার দিলেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, একই ভাবনা—নতুন সম্রাটের মেজাজ মর্জি না জানি কেমন হবে।

বদর সম্রাটের পোশাকে সজ্জিত হয়ে, চোখে-মুখে সম্রাটের গাম্ভীর্যের ছাপ এঁকে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। উপস্থিত পারিষদরা নিজ নিজ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাল। বদর মসনদে উপবেশন করলে উপস্থিত সবাই এক এক করে আসন গ্রহণ করল।

বদর প্রথম দিনই কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার ঝটপট যথোচিত মীমাংসা করে দিয়ে প্রবীণ ও বিচক্ষণ সভাসদদের মুগ্ধ করল।

বদর সভাসদদের সবচেয়ে বেশী করে মুগ্ধ করল কিছু কিছু নতুন নতুন শাসন সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে। সে বৃদ্ধউজির ও অন্যান্য পারিষদদের লক্ষ্য করে সহজ-সরল ভাষায় বলল—'দেখুন, আমাদের সাম্রাজ্যে যাতে সুশাসনব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রবর্তিত হতে পারে সেদিকে আমাদের সবার আগে নজর দিতে হবে। সবার আগে আমি বলব বিচার পদ্ধতির সংস্কারের কথা। আমি মনে করি আপরাধীকে ধরে তার কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি দিলেই বিচারকের কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত হয়েছে মনে করে উল্লসিত হওয়ার বিন্দুমাত্রও কারণ নেই। আমাদের সবার আগে অনুসন্ধান করতে হবে মানুষ কেন অপরাধ করে। তারপর তার প্রতিকারের পথ আমাদের বের করতে হবে। অপরাধ করেছে বলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কঠোর শাস্তি দানের জন্য উল্লসিত হতে হবে। এ-পথ অবশ্যই সঙ্গত নয়। বিচার করে যে-রায় দান করা হয়েছে তাতে যদি কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না। পুনরায় গোড়া থেকে তার অপরাধের কথা খতিয়ে দেখতে হবে।

সম্রাটের নজরে দেশের ছোট-বড় প্রতিটি মানুষই সমান। অতএব সবাই তার কাছ থেকে সমান আচরণ পাবে এটাই বড় কথা। প্রজা যদি বিদ্রোহী হয়, সম্রাটের বিরুদ্ধাচারণে প্রবৃত্ত হয় তবে মনে করতে হবে সম্রাটের শাসনব্যবস্থাই-এর জন্য সর্বতোভাবে দায়ী।

বদর যখন দরবারে শাসনব্যবস্থা নিয়ে পারিষদদের সঙ্গে লিপ্ত তখন বৃদ্ধ-প্রাক্তন সম্রাট আরমানুস তাঁর বিবিকে নিয়ে লেড়কি হায়াৎ এর কামরায় গুটি গুটি প্রবেশ করলেন। বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী লেড়কিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—'বেটি বর তোর পছন্দ হয়েছে তো?'

হায়াৎ আব্বার সামনে শরমে মুখ তুলে তাকাতে পারল না। অবনত মস্তকে ম্লান হেসে ছোট্ট করে জবাব দিল—'বহুৎ আচ্ছা! বহু আদর সোহাগ করল। অনেক্ষণ ধরে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। এক সময় আমি নিদ যাই। বিভোর হয়ে পড়ি। কি করে যে ভোর হয়ে গেল সমঝে উঠতেই পারি নি মা।'

তার আম্মা সবিস্ময়ে বললেন—'সে কী রে! ব্যস, এটুকুই? আর?'—'কেন, বললাম আমাকে খুব আদর সোহাগ করেছে। সোহাগে সোহাগে দিল একেবারে ভরিয়ে দিয়েছে মা।'

আমতা আমতা করে তার আম্মা বললেন—'আমি এসব কথা বলছি না, বেটি। মানে —মানে আর কিছু কি—'।

—'আর কিছু বলতে কি বলতে চাইছ, মালুম হচ্ছে না ছাই।' বেশ একটু রাগত স্বরেই হায়াৎ তার আম্মার উদ্দেশ্যে কথাটি ছুঁড়ে দিল।

তার আম্মা এত সহজে ব্যাপারটি থেকে সরে যেতে রাজী নয়। মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে আবার বললেন—'বলছি কি, আদর-সোহাগ টোহাগ ছাড়া আর কিছু—মানে ইয়ে টিয়ে—নিদ যাওয়ার আগে তোকে—তোকে সে গ্রহণ করে নি বেটি?'

—'গ্রহণ? কিসের গ্রহণ? কিভাবেই বা গ্রহণ করবে? গ্রহণ বলতে কি-ই বা তুমি সমঝাতে চাইছ, বুঝছি না।'

তার আম্মা মহাফ্যাঁসাদে পড়লেন, অথচ লেড়কির কাছ থেকে ব্যাপারটি তার জানা একান্ত দরকার বোধ করছেন। কামিজের খুট নাড়াচাড়া করতে করতে এবার আরও খোলসা করে সমঝাতে গিয়ে তিনি বললেন—'বেটি, বলতে চাইছি, নিদ যাওয়ার আগে সে তোর সালোয়ার-কামিজ খুলেছিল কি?'

হায়াৎ সবিস্ময়ে আম্মার মুখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে ভূমির দিকে তাকাল। ডান-পায়ের বুড়ো আঙুলটি মেঝেতে ঘষতে ঘষতে এবার কেটে কেটে বলল—' সালোয়ার-কামিজ? এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছ? এসবের আবার জরুরৎ কি—'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই তার আম্মা এবার প্রসঙ্গটি চাপা দিতে গিয়ে বললেন—'থাক বেটি, ওসব কথা এখন ছাড়ান দেওয়া যাক। পরে সময়-সুযোগ মত—এখন বিশ্রাম কর। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। মালুম হচ্ছে, তোর মেজাজ এখন শরিফ নয়।'

বুড়ো-বুড়ি চোখের ভাষায় কি যেন সিদ্ধান্ত নিলেন, হায়াৎ ঠিক সমঝে উঠতে পারল না। বিষণ্ণ ও চিন্তিত মুখে তাঁরা কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আম্মার হেঁয়ালি-পূর্ণ কথাগুলি হায়াৎ-এর বুকের ভেতরে তোলপাড় করতে থাকে, 'গ্রহণ করা।' সালোয়ার-কামিজ খোলা প্রভৃতি টুকরো টুকরো কথাগুলো বারবার তার মাথায় চক্কর মারতে থাকে।

এমন সময় দরবারের কাজকর্ম মিটিয়ে বদর অন্দরমহলে হায়াৎ-এর কামরায় ঢুকল। তার গায়ে সম্রাটের পোশাক আশাক এখনও রয়েছে। কামরায় ঢুকে বদর মুচকি হসে বলল—সুন্দরী এমন নিবিষ্ট মনে কি ভাবছ, বল তো?'

আচমকা বদর-এর কণ্ঠস্বর শুনে হায়াৎ সচকিত হয়ে সোজা হয়ে বসল। সলজ্জমুখে বলল—'না, কিছুনা। এমনি একেলা বসে কিনা। তাই—'

—'কেন, তোমার আব্বা-আম্মা তোমার সাথে ভেট করতে আসেন নি? আমি তো ভাবলাম কি ওঁদের সাথে বাৎচিৎ করছ। তোমার কামরায় তাঁরা—।'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই হায়াৎ সামান্য ঘাড় কাৎ করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—'এসেছিলেন, একটু আগেই ওনারা গেলেন।'

—'কিছু পুছতাছ—কি বাৎচিৎ হ'ল?'

—'আম্মা আমাকে শুধালেন রাত্রে নিদ যাওয়ার আগে তুমি আমার সালোয়ার-কামিজ খুলেছিলে কিনা?'

বদর-এর মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল।

হায়াৎ অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বলল—'আচ্ছা, আমি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিনা আম্মা বারবার একথা শুধালেন কেন?'

বদর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে, মুখে জোর ক'রে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল—'হ্যাঁ, এটিই প্রচলিত প্রথা। শাদীর পর বাসর ঘরে পাত্র নিজেহাতে পাত্রীর সালোয়ার-কামিজ খুলে দেয়।'

হায়াৎ চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ একে বদর-এর মুখের দিকে তাকায়।

বদর মুখে হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই এবার বলল—'হ্যাঁ, পাত্রীর গা থেকে সব পোশাক আশাক খুলে নিয়ে তারা পাশা পাশি শোয়। কিন্তু কাল রাত্রে মন বলল কি তুমি বড়ই ক্লান্ত। তাছাড়া তুমি তো শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বন্ধ করলে, নিদ গেলে। তাই তোমাকে বিরক্ত করতে আমার দিল চাইল না। তার জন্য আপশোষের কি আছে। আজ তোমাকে সেভাবেই শুইয়ে দিচ্ছি। ব্যস, শোধবাদ, ঠিক কিনা?'

হায়াৎ-এর মুখ শরমে লাল হয়ে গেল। বদর তার শরমকে পাত্তা না দিয়ে নিজেহাতে প্রথমে তার গা থেকে কামিজ এবং সালোয়ার প্রভৃতি সব খুলে ফেলল। এবার তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কোলে তোলার ভঙ্গিতে তুলে নিয়ে ধপাস করে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দিল।

হায়াৎ আকস্মিক শরমটুকু সামলে উঠতে না পেরে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

বদর জোর করে তার হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে বার বার তার ঠোঁটে, গালে কপালে চুম্বন করতে লাগল।

হায়াৎ আবার হাত দুটো মুখের কাছে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। বদর হাত দিয়ে তার হাত দুটোকে সরিয়ে দিয়ে এবার জিজ্ঞাসা করল—'পেয়ারী, পুরুষ মানুষকে তোমার কেমন লাগছে? ভাল তো?'

হায়াৎ আগের চেয়ে কিছুটা জড়তা কাটিয়ে সামান্য স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল—'আমি জিন্দেগীতে পুরুষ বলতে আমার আব্বা আর হারেমের কয়েকজন খোজা নোকরকে দেখেছি। ব্যস, এর বেশী কাউকেই দেখি নি। আব্বার বাৎ তো প্রশ্নই ওঠে না। আর খোজাদের দেখে কি পুরুষ বলা যায়, নাকি ভাবাই সম্ভব, বল? এক

কথায় তারা তো পরিপূর্ণ মানুষই না। একজন পুরুষ জনানার যা কিছু থাকা দরকার তার কোনটিই তো তাদের মধ্যে উপস্থিত নেই।

বদর মুচকি হাসে।

হায়াৎ এবার সহজ-সরলভাবেই বদর-এর উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়—'আচ্ছা,তুমি বলতে পার, তাদের কেন আধা-মানুষ বলা হয়? তাদের মধ্যে এমন কি অনুপস্থিত যার ফলে তাদের পুরুষ বা জনানা কোন পর্যায়েই না ফেলে আধা মানুষ বলা হয়?'

—'ধ্যুৎ, তোমার মত বোকা লেড়কি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। আরে এ-তো সোজা বাৎ, তোমার যা নেই তাদেরও তা-ই নেই।'

—'আমার নেই? কি নেই? কি আমার নেই? হেই, বল না আমার মধ্যে কোন জিনিস অনুপস্থিত? এ আবার কী ধরনের কথা?'

বদর তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সামান্য কাছে টেনে নেয়। আবার তার ঠোঁটে, গালে ও কপালে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগল।

হায়াৎ প্রতিটি চুম্বনে শিহরিত হতে থাকে। তার দিল্ যেন একটু একটু করে রোমাঞ্চে ভরে উঠতে থাকে। কেমন যেন এক অনাস্বাদিত উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরে কম্পন অনুভব করে। শিরা-উপশিরায় খুনের গতি দ্রুততর হয়। বুকের ভেতরে কল্জিটি দলামোচড়া হয়ে যেতে থাকে।

বদর বুঝতে পারে হায়াৎ আর বেশীক্ষণ স্বাভাবিক থাকতে পারবে না। রোমাঞ্চে-শিহরণে-কম্পনে শরীর শীঘ্রই এলিয়ে পড়বে। এবার সে তার বিবস্ত্র দেহটিতে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার চোখ দুটো আবেশে জড়িয়ে আসতে থাকে। চোখ দুটো ছোট হতে হতে এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। সে নিদ যেতে থাকে। বদর ও তার পাশে শুয়ে চোখ বন্ধ করে।

বেগম শাহরাজাদ কিস্সার এ পর্যন্ত বলার পর ভোরের পূর্বাভাস পেয়ে কিস্সা বন্ধ করলেন।

দু'শ এগারতম রজনী

রত্রির দ্বিতীয় প্রহর পড়তে না পড়তেই বাদশাহ শারিয়ার আবার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, হায়াৎ নিদ গেলে বদর নিশ্চিত হ'ল। এবার সে-ও তার পাশে শুয়ে চোখ বন্ধ করল।

সকাল হ'ল। বদর পালঙ্ক থেকে নামল। হায়াৎ তখনও বেহুঁস হয়ে নিদ যাচ্ছে। সে বিবস্ত্র হায়াৎ-এর গায়ে একটি চাদর চাপা দিয়েছিল।

বদর এবার পোশাক আশাক বদলে দরবারের উদ্দেশে পা-বাড়াল।

বৃদ্ধ সম্রাট আরমানুস তার বিবিকে নিয়ে অন্দরমহলে তাঁর লেড়কির কামরায় এলেন।

বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী লেড়কির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন—'বেটি, গত রাত্রি কেমন কাটল, বল তো?'

—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা কেটেছে আম্মা!'

সম্রাট আরমানুস ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বলল—'বেটি, এখনও তুমি চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানা আঁকড়ে পড়ে। ব্যাপার কি? কাল রাত্রে বুঝি খুব পরিশ্রম—শরীরের ওপর দিয়ে খুবই ধকল গেছে?'

—'ধকল? ধকল আবার কিসের? সে আমাকে কত সোহাগ করেছে? গায়ে-মাথায় অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিয়েছে। আমার নিদ না আসা পর্যন্ত সে জেগেই ছিল। তারপর আরও কত কি করেছিল! আজ নিজেহাতে আমার সালোয়ার-কামিজ খুলে দিয়েছে। গালে, ঠোঁটে, কপালে চুম্বন করে করে কতই না আদর-সোহাগ করেছে। তখন আমার দিল কেমন করে যে বার বার নেচে উঠছিল সে তোমাকে বলে সমঝাতে পারব না আব্বা! তখন আমার কেমন লাগছিল—'

—'কেমন? কেমন লাগছিল বেটি?'

—'সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। চমকলাগা যাকে বলে। এর আগে কোনদিন এমন বোধ হয় নি, সত্যি বলতে কি আমি যেন একা মরায় শুয়েই বেহেস্তের স্বাদ পাচ্ছিলাম!'

সম্রাজ্ঞী এবার আর মুখবুজে থাকতে পারলেন না। লেড়কির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তিনি বললেন—'বেটি, তোমাকে যে তোয়ালেটি দেওয়া হয়েছিল, কোথায়? তাতে খুব খুনটুন লেগেছে বুঝি?'

—'তোয়ালে? কোথায়, তোয়ালে টোয়ালে তো এ- কামরায় আনি নি। সে-তো হামামে রেখে এসেছি। আর খুন? কিসের খুন?

খুনটুন আবার বেরোতে যাবে কেন আম্মা? এর মধ্যে আবার খুন খারাবি কারবার আসবে কেন? কি যে সব যা-তা বলছ—'

লেড়কিকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই তার আম্মা এবার বললেন—'খুনটুন মোটেই ঝরে নি বেটি?'

লেড়কির কথায় তার আম্মা-আব্বা উভয়েরই কপাল চাপড়াবার মত পরিস্থিতি হ'ল।

সম্রাজ্ঞী কপাল চাপড়ে ব'লে উঠলেন—'হায় বেটি, একী কাণ্ড! তোমার স্বামী তোমাকে কেন যে এভাবে ধোঁকা দিচ্ছে, মালুম হচ্ছে না!'

সম্রাট আরমানুস-এর মুখে বিষাদের ছাপ ফুটে ওঠে। তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—'ব্যাপার তো খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না বেগম সাহেবা। সে যদি এভাবে তার কর্তব্যে অবহেলা করতেই থাকে তবে তো আমাকে অন্য পথ নিতেই হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক যদি না-ই গড়ে ওঠে তবে অহেতুক শাদীর ঝামেলা করার দরকার কি ছিল?'

সম্রাজ্ঞী বললেন—'হ্যাঁ, আমিও তো তা-ই ভাবছি।'

—'কাল সকালেও যদি আমি শুনতে পাই আমার বেটির কুমারীত্ব বজায়ই রয়ে গেছে তবে যা-ই হোক একটি হিল্লে আমাকে করতেই হবে। আর এভাবে মুখবুজে থাকা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

—'হ্যাঁ, এ-বিয়ের ফয়দা কিছু তো আমি বুঝছি না।'

—'দেখি কোথাকার জল গড়িয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বেশী বেগড়বাই করলে আমি কামার অল-জামান-এর কাছ থেকে মসনদ ছিনিয়ে নিতে বাধ্য হব। আমার লেড়কি বঞ্চিত হবে, আর সে মৌজ করে মসনদ ভোগ করবে, অসম্ভব।'

সম্রাজ্ঞী বললেন—'করছ কী বল তো! এত দিমাক গরম করলে আখেরে পস্তাতে হবে। ভাব বিলকুল ব্যাপারটি ভেবে দেখ। তার কাছে থেকে মসনদ কেড়ে নিয়ে মুলুক থেকে ভাগিয়ে দিলে পরিণামে কি হতে পারে একবারটি ভেবে দেখা দরকার।'

—'কি আবার হবে। কিচ্ছু হবে না। আমি আমার বেটি হায়াতকে ফিন শাদী দেব। তাই বলে এমন একটি কচি লেড়কির জীবন তো আর বরবাদ করে দেওয়া যায় না।'

—'হায়াৎ-এর আব্বা সুলতান শাহরিমান গোস্সা করলে আমাদের আখেরে কোন তকলিফ—'

—'হোক। করুক গোসসা, আমি কাউকে ডরাই না। তাই বলে আমার বেটির জিন্দেগী বরবাদ তো আর করতে পারি না।'

দিন ভর দরবারের কাজে ডুবে থাকার পর সন্ধ্যার কিছু পরে বদর আবার হায়াৎ-এর কামরায় ফিরে এল। আদর-সোহাগ করতে করতে থমকে গিয়ে সবিস্ময়ে বলল—'কি ব্যাপার সুন্দরী, তোমার চোখে পানি—হয়েছে কি বল তো?' গায়ে-মাথায় হাত বুলতে বুলতে এবার বলল—বুঝেছি, আজ ফিরতে দেরী হয়েছে বলে তোমার গোস্সা হয়েছে, ঠিক কিনা?'

চোখ মুছতে মুছতে হায়াৎ বলল—'না, এসব কিছু নয়।'

—'তবে? তবে তোমার চোখে পানি কেন? হয়েছে কি, বলবে তো?'

—'আজ সকালে আব্বা এসেছিলেন আমার কামরায়। আম্মাও সাথে ছিলেন।'

—'এ তো খুবই স্বাভাবিক, বেটির খবরাখবর নিতে তাঁরা আসবেন এ-ই তো সঙ্গত কাজ।'

—'আব্বা তোমার ওপর খুব গোসসা করেছেন। তিনি যা বাতালেন তাতে মালুম হ'ল তোমার কাছ থেকে তিনি মসনদ ছিনিয়ে নিতে পারেন।'

আতঙ্কিত বদর জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল—'তা তিনি অবশ্যই পারেন বটে। কিন্তু আমি এমন কি গোস্তাকি করলাম যার জন্য তার গোসসা এতদূর গড়াতে পারে? কিছু বললেন নি?'

—'অবশ্যই বলেছেন। আমার শাদীর পর দু'রাত্রি চলে গেল কিন্তু তুমি নাকি আমাকে কুমারী করেই রেখে দিয়েছ? আব্বা সাফ বাৎ বলে গেছেন, আজ রাত্রে তুমি যদি আমার দেহ গ্রহণ না কর তবে মসনদ ছিনিয়ে নিয়েই তিনি ক্ষান্ত হবেন না, আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে দিতে পারেন। তোমার কোন ক্ষতি করলে যে আমি।'

—'কি? তুমি কি? আমার ক্ষতি করলে তুমি খুব ব্যথা পাবে, না? হায়াৎ, তুমি আমাকে বহুৎ পেয়ার কর, তাই না?'

বদরকে জড়িয়ে ধ'রে হায়াৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। এক সময় কান্না ভেজা গলায় বলতে থাকে, 'বা রে, আমি ব্যথা পাব না। দু'দিনেই আমি সমঝে গেছি, তুমি আদমি হিসাবে বহুৎ আচ্ছা। এবার বদর-এর গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল—'তুমি এক কাজ করলেই তো পার। আমার আব্বা ঠিক যেমনটি চাচ্ছেন তেমন তেমন করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। আমার কুমারীত্ব নাশ হলে যদি তারা খুশী হন তবে কেন আমি কুমারীত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকব। আর তুমিই বা কেন তা খুশী হয়ে ঘোচাবে না?'

—'তারা আর কিছু বলেছেন?'

—'হ্যাঁ। আরও বাৎ বলেছেন। আমার তোয়ালেতে খুনের চিহ্ন খুঁজছিলেন। কাল ভোরে যদি তাতে খুন না দেখাতে পারি তবে হয়ত খুনখারাবি কাণ্ডই বাঁধিয়ে দেবেন।' দু'হাত দিয়ে বদর-এর মুখটিকে সরাসরি নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে হায়াৎ এবার বলল—'শোন, ডরে আমার কলিজা কাঁপছে। তুমি যা ভাল বোঝ

কর, আমি আর ভাবতে পারছি না। তোমার পথ, তোমার নিশানাই আমার নিশানা, এর বেশী কিছু আমার মালুম নেই।'

—'হ্যাঁ, আমাদের দু'জনের পথ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মেহবুবা। বদর বুঝল এ-ই সুযোগ। একে কাজে লাগাতে হবে। এবার হায়াৎ-এর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—'আমি একটি বাৎ তোমাকে বলব বলব করে বলা হয়ে উঠছে না।'

—'কি বাৎ? আমার কাছে তোমার এত দ্বিধা কিসের, বলতো তুমি আর আমি কি আলাদা কিছু যে আমরা ছাপাতে যাব? বল, কি বাৎ তোমার দিলে জাগছে মেহবুব?'

—'তোমার আর আমার মধ্যে যদি কোন কামনা-বাসনার সম্পর্ক না থাকে তবে তোমার আপত্তি আছে? আমাদের পেয়ার মহব্বৎ যদি বেহেস্তের পেয়ার হয়, আপত্তি কি?'

—'বহুৎ আচ্ছা বাৎ!' সোল্লাসে হায়াৎ বলে—আপত্তির কিছুই নেই। কিন্তু আমার আব্বা আম্মা কেন যে রোজ ঘ্যানর ঘ্যানর করেন, আমার কিছুই মালুম হয় না। আমার পেয়ার মহব্বৎ বহুৎ আচ্ছ। একেবারেই খাঁটি, নিখাদ।'

—'যদি এমন হয় আমরা জিন্দেগী ভর ভাই আর বহিন হয়ে থাকব, ক্ষতি কি? তোমার দিল্-এর জন্য ব্যথিত-মর্মাহত হবে হায়াৎ?'

—'অবশ্যই না। আমরা খোশ মেজাজে চলব। আমি তোমার কাছে দিলের দরওয়াজা খুলে দেব। তুমিও আমার কাছে কিছু ছাপাবে না। ব্যস, খুশী। আমরা উভয়েই খুশী।'

বদর দেখল, দাওয়াইয়ে কাজ হচ্ছে। বিমারি একটু একটু করে সারছে। এবার ঝট করে সে আর একটু এগিয়ে গেল—'আর একটি কথা। খুব ভাল করে নিজের দিলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে জবাব দেবে। মনে কর, আমি তোমার ভাইয়া না হয়ে যদি বহিন হই,

তবে? ভেবে দেখ, তুমি কি তখনও আমাকে একই রকম ভাবে পেয়ার করতে পারবে হায়াৎ?

—'পারব। জরুর পারব। জাদা পেয়ার করতে পারব তোমাকে। তুমি হবে আমার সবচেয়ে বড় সহচরী। আমাদের পেয়ারে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আর কোনদিন আমরা কেউ কারো কাছ থেকে দূরে সরে যাব না। এক দিল, এক আত্মা হয়ে আমরা পাশাপাশি কাছাকাছি রইব।'

বদর এবার আচমকা হায়াৎকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ঘন ঘন চুম্বন করে বলল—'হায়াৎ, যদি কসম খাও কারো কাছে ফাঁস করবে না তবে তোমাকে বহুৎ আচ্ছা এক তামাশা দেখাতে পারি। আগে বল, কারো কাছেই ব্যাপারটি ফাঁস করবে না?'

—'খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, কারো কাছেই ফাঁস করব না। বল, কি বলতে চাইছ?' অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে হায়াৎ বলল।

বদর এবার হায়াৎ'কে পর পর দু'তিনটে চুম্বন সেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজের গা থেকে কোর্তা, শেরিওয়ানি, চোস্ত প্রভৃতি এক এক করে খুলে ফেলে। একেবারে উলঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর তার আঠার সালের যৌবনভরা দেহটিকে হায়াৎ-এর সামনে মেলে ধরে। নিজের সুডৌল নিখুঁত স্তন দুটোকে দু'হাতে মুঠো করে ধরে মুচকি হেসে বলল—'কি ভাবছ হায়াৎ আমি তোমাকে ধোকা দিয়েছি, জালিয়াতি করেছি তোমার আব্বার সঙ্গে। তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছি, এই তো?'

হায়াৎ সবিস্ময়ে বলল—'আমি আমার নিজের কথা কিছুই ভাবছি না। কিন্তু তোমার এরকম পুরুষের বেশ ধারণের কারণ কি, আমাকে খোলসা করে বলবে কি?'

বদর হেসে বলে—'জরুর বলব। আর সব খোলসা করেই বলব। আমরা যখন বহিন হয়েছি। একে অন্যকে পেয়ার করে ফেলেছি, কিছুই ছাপাব না তোমার কাছে। আমার দুঃখ-যন্ত্রণার কিসসা শুনলে তোমার চোখের পানি বন্ধ হবে না। তবু সবই তোমাকে বলব।

এবার হায়াৎ-এর কাঁধে হাত রেখে বদর কামার অল-জামান-এর সঙ্গে তার সে প্রথম রাত্রির পরিচয়, মিলন ও সম্ভোগ থেকে শুরু করে তার রহস্যজনক ভাবে হাফিস হয়ে যাওয়ার ঘটনা পর্যন্ত সব খোলসা করে বলল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'নসীব, সবই নসীব। কবে যে আমার নসীব ফিন ঘুরবে, তাকে আমার বুকে ফিরে পাব একমাত্র আল্লাতাল্লাই জানেন। এবার সস্নেহে হায়াৎ-এর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল—'বহিন, আমি মনে করি, জামান আজ না হোক কাল ফিরে আসবেই। তখন আমরা দু'বহিন

ভাগাভাগি করে তাকে ভোগ করব। তুমি হবে তার দ্বিতীয় বেগম।'

হায়াৎ সবিস্ময়ে বদর-এর মুখের দিকে তাকায়। বদর ব'লে চলল—'তুমি আমার জবানের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি তাকে তোমার হয়ে অনুরোধ করি, সে জরুর তা ফেলতে পারবে না।'

—'তাতেও যদি তিনি রাজী না হন?'

—'এতে যদির কোন সম্ভাবনাই নেই।'

হায়াৎ এবার ছোট্ট শিশুর মত বদর-এর বিবস্ত্র দেহটির দিকে মন দেয়। তার স্তন দুটোকে তাকাতে তাকাতে বলে বহিনজী তোমার দুটো কী বড়। আর আমার দুটো এই এত্তটুকু, কেন?'

—'সময় লাগবে। সবে তো গাছে ফল ধরেছে। বহিন, সময় হোক তোমার দুটোও দেখবে এমন সুডৌল হয়ে উঠবে।'

হায়াৎ বলে—'বহিনজী, আমি কতদিন বাঁদীদের কাছে জানতে চেয়েছি, আমার শরীরে এই যে এত সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আয়োজন। এর কোন্‌টি কোন্ কাজে লাগে?'

—'তারপর? তারা কি বলল?'

—'কি আবার কিচ্ছু না। একথা-সেকথা বলে বার বার কাটিয়ে গেছে। কী বজ্জাৎ তারা, ভেবে দেখ তো!'

একদিন এক তাজ্জব কাণ্ড করে বসেছিলাম আমি, এক বাঁদী আমার নগ্নদেহে সাবান মেখে দিচ্ছিল! আমি তাকে চেপে ধরলাম, তোমাকে আজ আর **ছাড়ছি**। আমার শরীরের এসব অঙ্গের কাজ কি? আমি যতবারই জিজ্ঞাসা করেছি ততদবারই সে ইঙ্গিতে, ভাসা ভাসা জবাব দিয়েছে।'

বদর **মুচকি** হেসে বলল—'তাই বুঝি?'

—'তবে আর বলছি কি? তোমাকে আজ আর ছাড়ছি না বহিনজী। তুমি আমাকে আজ বুঝিয়ে দাও।'

—'তারা কিছুই বলে নি?'

—'আমি একদিন এক বাঁদীকে চেপে ধরেছিলাম আচ্ছা করে। সে হতচ্ছাড়ি কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না। আমিও জুলুম শুরু করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন কিছুতেই খোলসা করে বলল না তখন আমি গলা ছেড়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম। ব্যস, আমার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আমার আম্মা ভীতা-সন্ত্রস্তা হয়ে হামামে ছুটে গেলেন। আমাকে বললেন—হয়েছি কি? এমন চেঁচামেচি কিসের?'

আমি চুপ। বাঁদীটিও মুখে কলুপ এঁটে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আম্মার পীড়াপীড়িতে মুখ খুলতে বাধ্য হ'ল। আমতা আমতা করে বলল—'শাহজাদী জানতে চাইছেন, শরীরের কোন্ অঙ্গ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হয়?'

বাঁদীটির বাৎ শুনে আমার আম্মার মুখও কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। টু-শব্দটি ও করলেন না। এক সময় রেগেমেগে আমার গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বললেন—'হতচ্ছাড়ি। ফিন যদি দাসী-বাঁদীদের সঙ্গে এসব ব্যাপার নিয়ে বাৎচিৎ করতে যাও তবে আর রক্ষে রাখব না, বলে দিচ্ছি!'

ব্যস। তার পর থেকে এ ব্যাপারে আমিও মুখে কলুপ এঁটে দিলাম, কারো সাথে আর এসব ব্যাপারে নিয়ে বাৎচিৎ হয় নি।

বদর হেসে বলল—'এখন তোমার বয়স হয়েছে। সবই বুঝতে পারবে। আমি এক এক করে সব তোমাকে শিখিয়ে দেব। কোন্ অঙ্গ কোন কাজে ব্যবহার করতে হয় সবই খোলসা করে বলব।'

এবার বদর তাকে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু প্রতিটি অঙ্গের ব্যবহার ও তাদের গুরুত্বের কথা খোলসা করে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

এমন সময় প্রাসাদের বাইরের আখরোট গাছের ডালে পাখীর ডানা ঝটপটানি শুরু হয়ে গেল। হায়াৎ বুঝতে পারল, ভোরের **পূর্বাভাষ**। হায়াৎ এবার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলল—'বহিনজী, তুমি দরবারে চলে গেলেই আমার আব্বা এ-কামরায় আসবেন। আম্মাও সঙ্গে থাকবেন। আমার তোয়ালেতে খুন দেখতে চাইবেন। তখন কি জবাব দেব?'

বদর বলল—'ঠিক আছে। তোমার মুশকিল আসান করে দিচ্ছি। এবার সে পাশের পাখির খাঁচা থেকে একটি পাখি ও তোয়ালে নিয়ে হামামে গেল। পাখিটিকে হত্যা করে তার দেহের কিছুটা খুন তোয়ালের গায়ে লাগাল। আর কিছুটা খুন হায়াৎ-এর দু'পায়ের ফাঁকে লাগিয়ে দিল। এবার তোয়ালেটি তার হাতে দিয়ে বলল—'দেখতে চাইলে এটি তাঁদের হাতে তুলে দিও। ব্যস, কাজ হাসিল।'

হায়াৎ বলল—'ঝুট মুট পাখিটিকে হত্যা করলে। তুমি মন করলেই আমার শরীরের খুনই বের করে তোয়ালেতে লাগিয়ে দিতে পারতে।'

—'তা অবশ্য পারতাম ঠিকই। কিন্তু এটি কামার অল-জামানের সম্পত্তি। আমি সেখানে হস্তক্ষেপ করতে উৎসাহী নই।'

ভোর হ'ল। বদর সাজগোছ করে দরবারে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই বৃদ্ধ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী অন্দরমহলে হায়াৎ-এর কামরায় এলেন।

হায়াৎ খুনমাখা তোয়ালেটি আম্মার দিকে এগিয়ে দিল। তিনি এবার তার উরুতে শুকানো খুনের দাগ দেখে উৎফুল্ল হলেন।

সম্রাট এবার খুশীতে ডগমগ হয়ে সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে হায়াৎ-এর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে বদর-এর শাসনকার্যে উজির-নাজির ও অন্যান্য পারিষদরা তো খুশী হয়েছেই এমন কি প্রজাদের মুখেও হাসির ঝিলিক দেখা দিল।

বদর-এর দিলে অন্য কোন দুঃখ নেই। একটি মাত্র দুঃখই তার ভেতরটি কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে—'কামার-অল জামান কবে ফিরে আসবে, তাকে বুকে টেনে নেবে।'

জাহাজ ছাড়া খালিদানে যাওয়া সম্ভব নয়। আর ইবনী দ্বীপ না ছুঁয়ে কোন জাহাজই যায় না, বন্দর কর্তৃপক্ষকে বদর কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছে, কোন জাহাজ খালিদানে গেলে অবশ্যই যেন ভাল করে তল্লাসী চালায়।

কামার অল-জামান বুড়ো মালীর কুঠরীতে বসে নসীবের সঙ্গে মিতালী করে দিন গুজরান করছে। কবে খালিদানের জাহাজ আসবে, তার নসীব ফেরাবে। তারপর সে তার মেহবুবা বদরকে বুকে ফিরে পাবে।

এদিকে খালিদানের সুলতান শাহরিমান মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চলেছেন। তিনি লেড়কাকে ফিরে পাবার ভরসা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি নিঃসন্দেহ তার লেড়কা কামার অল-জামান আর জিন্দা নেই। আরব দুনিয়ার প্রতিটি সুলতানিয়তে আদমি ভেজে খবর লাগিয়েছেন,পাত্তা মেলে নি। শেষ পর্যন্ত সুলতান শাহরিমান-এর নির্দেশে তার তামাম সুলতানিয়তে শোক দিবস পালন করা হয়। সুউচ্চ এক মিনার বানিয়ে লেড়কার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে মালী রোজ সকালে একবার করে বন্দরে যায়, খোঁজ নেয় খালিদানে কোন জাহাজ যাচ্ছে কিনা, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

এক বিকালে কামার অল-জামান জানালার ধারে বসে নিজের নসীবের কথা ভাবছে। এমন সময় বাগিচার গাছে কয়েকটি পাখির লড়াই বাঁধল। একটি পাখি লড়াইয়ে হেরে গিয়ে জান দিল।

কিছু সময় বাদে দুটো পাখি এল। তারা মৃত পাখিটির জন্য কিছু সময় কিচির-মিচির করে দাপাদাপি করল। শোক প্রকাশের পর ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়ে মৃত পাখিটিকে তারা গোর দিল।

কিছু সময় আবার চুপচাপ। তারপরই কয়েকটি পাখি খুনী পাখিটিকে তাড়া করে সেখানে নিয়ে এল। তার পেট চিরে দিল। তারপর তারা আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কামার অল জামান এবার বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল মৃত পাখিটির পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়েছে। তার পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে হঠাৎ তার নজরে পড়ল তার নাড়িভুঁড়ির দিকে। সে অবাক হ'ল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে বুঝতে পেরে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিসসা বন্ধ করলেন।

দু'শ ষোলতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিসসার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, কামার অল-জামান মৃত পাখিটির নাড়িভুড়ির মধ্যে চকচকে একটি বস্তু দেখতে পেল। চিনতে অসুবিধা হ'ল না যে, এই পাথরটিই তার বিবি বদর-এর কোমরে ছিল। গ্রহরত্ন। ব্যস্ত হাতে পাথরটি তুলে নিল। আর দেরী নয়, সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

কামার অল-জামান ফিরে পাওয়া অমূল্য নিধি পাথরটিকে বেশ শক্ত একটি সুতোদিয়ে নিজের গলায় পরে নিল।

কামার অল-জামান এবার আপন মনে বলে উঠল—'এবার আমার মন থেকে সব দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর হয়ে গেছে। আমি এবার নিঃসঙ্কোচে বদর-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব। সবই খোদাতাল্লার মর্জি। তিনি গ্রহরত্নটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার নসীবে দুঃখ-দুর্দশা দিয়েছেন। আবার তিনিই ফিরিয়ে দিয়ে দুর্দশা লাঘবের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার চোখের মণি, আমার খোয়াবের হুরী, আমার কলিজা বদর-এর সামনে যেতে এখন আর আমার কোন দ্বিধাই রইল না।

কামার অল-জামান ভাবল, পাথরটি গলায় ঝুলিয়ে রাখলে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্টই থেকে যায়। লোকের নজরে পড়তে পারে। কিন্তু উপায়? অনেক ভেবেচিন্তে চমৎকার একটি ফিকির মাথা থেকে বের করল। একটি রুমালের মধ্যে পাথরটিকে রেখে শক্ত করে গিট দিল। এবার সেটিকে হাতে তাগার মত করে বেঁধে নিল। ব্যস, নিশ্চিন্ত।

ভোরে নাস্তা সারতে সারতে বুড়ো মালী বলেছিল ঘরে খানা পাকাবার মত কাঠ নেই। বাগানে একটি শুকনো গাছ আছে বটে। কিন্তু সেটিকে চেলা করার সামর্থ্য তার নেই। বুড়ো হাড়ের কর্ম নয়। কিন্তু নগরের লোকজনও জানের মায়ায় পালিয়েছে। কামার তাদের পাবে কোথায়?

বুড়োর কথায় জামান বলেছিল—'আমি বাদশাহের লেড়কা

বটে। কাঠ কাটার অভ্যাস নেই সত্য, গায়ে তো তাগদ কম নয়। আমি ঠিক চেরাই করে ফেলব।'

জামান এবার একটি কুড়ুল নিয়ে বাগানে ঢুকল। বাগানে গিয়ে মরা গাছটির গায়ে কুড়ুল দিয়ে ঘা মারতে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটে গেল। গাছটির গা থেকে ঝনঝন আওয়াজ বেরিয়ে এল।

জামান-এর কৌতূহল হ'ল। গাছটির গোড়া থেকে সামান্য মাটি সরাতে না সরাতেই ব্রোঞ্জের একটি মোটা পাত্র তার চোখে পড়ল। অবিশ্বাস্য রহস্যজনক পাত্রটি সরাতেই তার চোখের সামনে একটি সিঁড়ি ভেসে উঠল। সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে।

জামান-এর কৌতূহল উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। সে সিঁড়িটি বেয়ে নিচে নামতে লাগল। রইল পড়ে তার গাছ কাটা। এবার জামান-এর চোখের সামনে একটি গুহা ভেসে উঠল। গুহার মুখে একটি প্রস্তর ফলকে লেখা আছে থামু ও আদ-দের নাম আর সাল তারিখ। আর সামান্য এগিয়ে দেখল ইয়া পেল্লাই পেল্লাই গোটা কুড়ি তামার জালা।

জামান জালাগুলির কাছে এগিয়ে গেল। একটির ঢাকনা খুলে দেখল গলা পর্যন্ত সোনার মোহরে ভর্তি। আর একটির ভেতরে সোনার তাল বোঝাই। এবার সে একের পর এক জালার ঢাকনা খুলল। দেখল তাদের দশটিতে সোনার তাল আর বাকি দশটিতে সোনার মোহর ঠাসা।

কামার অল-জামান ভাবল ইয়া আল্লা! এত ধন দৌলত মাটির তলায় পুঁতে রেখে এখানকার সুলতানরা বেহেস্তে পাড়ি জমিয়েছে। এখন বিদেশী কাফেররা পুরো শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। কোনক্রমে টের পেলে সব ধন দৌলত আত্মসাৎ করবে।

জামান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। ব্রোঞ্জের পাত্রটিকে আগের মতই গর্তের মুখে চাপা দিল। তারপর সতর্কতার সঙ্গে মাটি ও লতাপাতা চাপা দিয়ে দিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে বুড়ো মালী জাহাজঘাটা থেকে ফিরে এল। তার চোখ-মুখে খুশীর প্রলেপ। বলল—'হুজুর, আপনার নসীব ফিরতে চলেছে। আজ এইমাত্র এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বাৎচিৎ হ'ল। আপনাকে এবনি দ্বীপে নামিয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। এবনি যেতে পারলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না। সেখান থেকে হরদমই খালিদানের জাহাজ ছাড়ে। তখন আর আপনার মুলুক খালিদানে যাওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকবে না।

জামান নিজের দিলের উচ্ছ্বাস-আবেগ চেপে রাখতে না পেরে বলল—'চাচাজী, আপনার ওমর হয়েছে। দুনিয়ার ভোগ লালসা আপনার কাছে মূল্যহীন, খুবই সত্য। তবু বলছি—আমাদের নসীব খুব সহায়, আমার সঙ্গে চলুন। একটি তাজ্জব ব্যাপার দেখাচ্ছি। কথাটি বুড়ো মালির উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়েই জামান তাকে টানাটানি করে ধরতে গেল ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নিয়ে চলল পাতালপুরীর সে রত্নভাণ্ডারটির কাছে।

এমন সময় রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের পূর্বাভাষ দেখা দেয়। বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করেন।

দু'শ' উনিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, পাশাপাশি কুড়িটি জালা ভর্তি সোনার তাল আর সোনার মোহর দেখে বুড়ো মালীর তো দিমাক খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। সে রীতিমত আঁৎকে উঠে বলল—'শোভন আল্লাহ! এ কী বাস্তব, নাকি আমি খোয়াব দেখছি বেটা! এত ধন দৌলত আদমিদের কোন্ কাজে লাগে?'

—'জিন্দেগীকে ভোগ করে। এসব ধন দৌলত আপনার। যে কয়দিন দুনিয়ায় থাকবেন দু'হাতে খরচ করবেন।'

—'না বেটা। এসবে আমার জরুরৎ নেই। এসব আমার দিমাক খারাপ করে দেবে। আমি পাগল হয়ে যাব। এসব আপদ আমার সুখ-শান্তি ছিনিয়ে নেবে। কয়দিনই বা দুনিয়ায় থাকব। এই তো বেশ আছি। এসবে আমার কোন জরুরৎ নেই। বেটা, তোমার ওমর কম। বহুৎদিন দুনিয়ায় থাকবে। তুমি এসব নিয়ে নাও। তুমি যাবার আগে আমাকে সামান্য কিছু দিনার দিয়ে যেও। একটি কফিন কিনে রেখে দেব। গোর দেয়ার সময় যেন সেটি দিয়ে আমার লাশ ঢেকে দেয়। ব্যস, আর কিছু চাই না।'

—'কিন্তু আমিই বা একা নিতে যাব কেন। আধাআধি ভাগ করা হোক। আধা আপনার আর আধা আমার। আপনি না নিলে আমিও এগুলো ছোঁব না।'

বুড়ো মালী পড়ল মহাফাঁপরে। অসহায় দৃষ্টিতে জামান-এর দিকে তাকিয়ে এবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—'তবে বেটা, তুমি

যা ভাল বোঝ কর।'

জামান এবার কাঠ দিয়ে গোটা কুড়ি বাক্স বানিয়ে ফেলল। এবার হাতের গ্রহরত্নটির দিকে চোখ পড়তে ভাবল—'এমন একটি অমূল্য সম্পদ এভাবে সবার চোখের সামনে রেখে দেয়া মোটেই উচিত নয়। হাত থেকে পাথরটি খুলে একটি কাঠের বাক্সের ভেতরে সেটি রেখে দিল। এবার তার ওপর সোনার মোহর ঢেলে দিল। এবার বাক্সগুলির ওপরে কিছু কিছু কাঁচা জলপাই দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিল। গ্রহরত্নের বাক্সটির ওপরে এক টুকরো চামড়া [illegible] দিয়ে আটকে দিয়ে চিহ্ন করে রাখল।

খুব ভোরে বুড়ো মালী জাহাজঘাটা থেকে কয়েকজন কুলী ডেকে আনবে কথা হ'ল। কিন্তু মাঝ-রাত্রের আগেই তার দারুণ জ্বর এল। জামান'কে কিছু বলে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে চাইল না।

জ্বর গায়ে নিয়েই বুড়ো মালী ভোরে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল কুলীর খোঁজে। কুড়িজন কুলী নিয়ে এল।

কুলীরাও প্রত্যেকে এক একটি করে কাঠের বাক্স মাথায় নিয়ে জাহাজ ঘাটের উদ্দেশে রওনা হ'ল।

জামান কুলীদের বলে দিয়েছে বাক্সগুলো যেন একেবারে জাহাজে তুলে দেয়।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন ভোর হয়ে এলো বলে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' বাইশতম রজনী

রাত্রি গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, কুলীরা কুড়িটি কাঠের বাক্স নিয়ে জাহাজঘাটে হাজির হ'ল। এক এক করে সব ক'টি বাক্স জাহাজের ডেকে নিয়ে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল।

জামান কুলীদের বলে দিয়েছিল খুব ভোরে সে জাহাজে পৌঁছে যাবে। তার জন্য জাহাজ ছাড়ার বিলম্ব হবে না।

জামান রাত্রে সামান্য খানাপিনা সেরে নিল। বুড়ো মালী কিছুই মুখে দিল না। তার গায়ে অস্বাভাবিক জ্বর। জামান গায়ে হাত দিয়ে দেখে হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে। বুড়ো মালী জ্বরে একেবারে বে-হুঁশ।

জামান সারারাত্রি বুড়ো মালীর শিয়রে বসে কাটাল। নিজেই টোটকা ওষুধ দিল। কিছু জঙ্গলী পাতা বেঁটে রস করে তাকে খাইয়ে দিল। কোন কাজই হ'ল না। শেষ রাত্রের দিকে বুড়ো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

জামান একাই কোদাল দিয়ে বাগিচার একপ্রান্তে একটি গর্ত তৈরী করল। বুড়োকে গোর দিয়ে দিল।

জামান-এর কাজ মিটতে মিটতে অনেক বেলা হয়ে গেল। খুব ভোরে জাহাজ ছাড়ার কথা ছিল। তার জাহাজের কথা খেয়ালই ছিল না। যখন হুঁস হ'ল তখন সূর্য গুটিগুটি আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে। সে জাহাজ ঘাটের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

হায় নসীব! জামান জাহাজঘাটে গিয়ে দেখে জাহাজ ভাগলবা। নির্দিষ্ট সময়েই জাহাজ ছেড়ে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে জাহাজ প্রায় মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে গেছে। তার দু'চোখের কোল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

চোখের পানি মুছতে মুছতে জামান আবার বাগিচায় ফিরে এল। এক সময় শিশুর মত গলা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—'হায় আমার নসীব। আমি আর আমার মেহবুবা বদরকে ফিরে পাব না। আমি গ্রহরত্নটি হাতে পেয়েও নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য আবারও খোয়ালাম! একমাত্র খোদা মেহেরবানের দোয়া হলে তবেই আমি বদরকে ফিরে পাব। পাওয়া ধন হারালাম আমি।'

জামান আবার কুড়িটি কাঠের বাক্স বানিয়ে ফেলল। বুড়ো মালীর অংশের সোনার মোহর ও সোনার তালগুলো বাক্সে ভরল। এবার নতুন করে বাগিচার কাজে নিজেকে নিয়োগ করল।

এদিকে জাহাজ এবনি দ্বীপে নোঙর করল। বাক্সগুলির প্রত্যেকটির গায়ে কামার অল-জামান-এর নাম বড় বড় হরফে লেখা।

বদর বাক্সগুলো দেখে তো রীতিমত আনন্দে-আহ্লাদে ডগমগ। ভাবল, এতদিন পর জামান-এর দেখা পাওয়া গেল। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল, এ-জাহাজেই জামান-এর আসার কথা ছিল। কিন্তু জাহাজঘাটে সে পৌঁছোবার আগেই জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে, ফলে এতগুলো বাক্স মালিকহীন অবস্থায় জাহাজে পড়ে রয়েছে।

বদর মর্মাহত হ'ল। এতদিন পর স্বামীকে ফিরে পেয়েও হাতছাড়া হয়ে গেল।

বদর জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে কিছু জলপাই কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

বদর এক বাক্স জলপাই কিনতে চাইল। ক্যাপ্টেন বলল—'জাঁহাপনা, আমি তো জলপাই বিক্রি করতে পারব না। তবে জাঁহাপনা যদি নিতান্তই একটি বাক্স নিয়ে যেতে চান তবে নিজের দায়িত্বে নিয়ে যেতে হবে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, বদর ক্যাপ্টেনকে বলল—একটি নয়। আমি সবগুলি জলপাইয়ের বাক্সই কিনে নিতে চাই।'

ক্যাপ্টেন বলল—'জাহাজের সবক'টি বাক্স জলপাই যদি কেনেন তবে প্রতিটি বাক্সের জন্য এক হাজার করে দিরহাম মূল্য দিতে হবে।—কুড়িটি জলপাইয়ের বাক্সের জন্য মোট কুড়ি হাজার দিরহাম দাম দিতে হবে।'

বদর এবার বাক্সগুলি কুলির মাথায় চাপিয়ে প্রাসাদে নিয়ে এল। বাঁদীদের দিয়ে দুটো বড় বড় থালা আনাল। একটি বাক্স খুলে জলপাই বের করে থালায় রাখতে লাগল।

আশ্চর্য ব্যাপার! জলপাইগুলোর গায়ে সোনার গুঁড়ো মাখানো।

আর একটি বাক্স খুলে একই অবস্থা দেখতে পেল। বাঁদীদের বলল—'তাজ্জব ব্যাপার দেখছি! এক কাজ কর। সবগুলি বাক্স খুলে জলপাইগুলি মেঝেতে ঢেলে ফেল তো দেখি, ব্যাপার কি!'

এক এক করে বাক্সের মুখ খুলে জলপাই বের করতেই সবাই তাজ্জব বনে গেল। সামান্য ক'টি জলপাই ওপরে সাজানো। ব্যস, তারপরই সোনার মোহর আর সোনার তালে বাক্সগুলি ভর্তি। সবশেষে একটি বাক্স উপুড় করতেই তার হারানো গ্রহরত্নটি বেরিয়ে পড়ল।

পাথরটি হাতে নিয়ে বদর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। ভাবল, কী করে এটি সম্ভব হ'ল! এখানে এ-পাথরটি এল কি ক'রে! তার চিনতে ভুল হবার কথা নয়। বহুদিনের পরিচিত পাথর যে, চিনতে ভুল হবার তো কথা নয়।

হায়াৎ তখন বদর-এর পাশে দাঁড়িয়ে। হাতের পাথরটি তাকে দেখিয়ে বলল—'জান হায়াৎ, এ-পাথরটি মন্ত্রপূত। দৈব পাথর। যেদিন হারিয়েছি সেদিন আমার স্বামীকেও খোয়াতে হয়েছে। পাথরটি যখন ফিন হাতে পেয়েছি তখন তিনিও শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসবেন।'

বদর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তলব দিল।

সম্রাটের তলব পেয়ে মাঝ বয়সী ক্যাপ্টেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। বদর বলল—'এ-বাক্সগুলির মালিক কি আপনার পরিচিত? তার পেশা কি? সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী কি?'

—'জাঁহাপনা, জাহাজে তাঁরও আসার কথা ছিল। কিন্তু সময়মত তিনি পৌঁছাতে না পারায় প্রমাদ ঘটল। বাধ্য হয়ে তাকে ফেলেই জাহাজ ছাড়তে হ'ল।'

—'আপনি এক কাজ করুন, জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে যান। এর জন্য আপনার যে ক্ষতি হবে আমি তা পুষিয়ে দেব। তবে তাকে কিন্তু নিয়ে আসা চাই। তার এতগুলো জলপাই আমি ভোগ করব —এ কাজটি যেন ঠিক নয় বলেই আমার দিল্ বলছে।

আর শুনুন, যদি কাজ হাসিল করতে পারেন তবে বহুৎ ইনাম পাবেন।'

ক্যাপ্টেন ঘাড়কাৎ করে সম্মতি জানাতে গিয়ে বলল—'আমার কোশিসের কোন ঘাটতি থাকবে না হুজুর। আসলে ব্যাপারটি তো ওনার ওপর নির্ভর করছে।'

—'আমি কোন ধান্দার বাৎ শুনতে রাজী নই। যেমন করে হোক, তাকে আমার সামনে হাজির করতেই হবে। ফিরে এসে ধানাইপানাই শুরু করবেন, বহুৎ কোশিস করেছিলাম, উনি আসেন নি, শুনব না। তাই যদি হয় তবে কিন্তু আমার বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি আমার বাৎ অবজ্ঞা করে জাহাজ ভেড়ান তবে কিন্তু গর্দান যাবে, হুঁশ থাকে যেন। সে সঙ্গে আপনার জাহাজের খালাসীদেরও কোতল করব।'

এমন সময় প্রভাত হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' আটাশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন। তিনি বললেন—'জাঁহাপনা, জাহাজের ক্যাপ্টেন বদর-

এর হুকুম তামিল করতে জাহাজ নিয়ে ছুটল বিধর্মী অধিকৃত মুলুকটির উদ্দেশে।

কয়েকদিন এক নাগাড়ে জাহাজ চালিয়ে ক্যাপ্টেন এক সকালে বন্দরে জাহাজ ভেড়াল।

এদিকে কামার অল-জামান একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী বুড়ো মালির মৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েছে। সে বিমর্ষ মনে কোনরকমে দিন গুজরান করছে। আর থেকে থেকে মোহরের বাক্সগুলির দিকে নজর রেখে চলেছে।

ক্যাপ্টেন কয়েকজন খালাসিকে সঙ্গে নিয়ে খোঁজ করে করে কামার অল-জামান'কে খুঁজে বের করল। সে বলল—'আমার জাহাজে আপনার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপনার হদিস না পেয়ে জাহাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আপনার জলপাইয়ের বাক্সগুলি খালিদানের সম্রাটের প্রাসাদে রয়েছে। সম্রাটের হুকুমেই আপনার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার প্রতি কড়া হুকুম আপনাকে খালিদানের সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

—'বহুৎ আচ্ছা। চলুন, আমি অবশ্যই যাব। তবে আমার ঘরে আরও কুড়ি বাক্স জলপাই রয়েছে। আপনি মেহেরবানি করে আপনার খালাসিদের দিয়ে জাহাজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে বহুৎ খুশী হ'ব।'

ক্যাপ্টেনের জাহাজের খালাসিরা মোহরভর্তি বাক্সগুলিকে জাহাজে নিয়ে গেল। কামার অল-জামান'কে নিয়ে জাহাজ ছাড়ল।

জাহাজ খালিদানের অন্তর্গত এবনি বন্দরে নোঙর করল।

ক্যাপ্টেনের মেজাজ রীতিমত শরিফ। খালিদানের সম্রাটের হুকুম তামিল করতে পেরেছে। আর কিছু না হোক গর্দানটি বাঁচল।

ক্যাপ্টেন এবার কামার অল-জামান'কে নিয়ে সম্রাটের প্রাসাদে হাজির হ'ল।

কামার অল-জামানকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখামাত্র বদর তাকে চিনতে পারল—তার হৃদয় দেবতা।

জামান আচমকা বদর'কে দেখে চিনতে পারল না। চেনার কথাও তো নয়। সে যে সম্রাটের পোশাকে সজ্জিতা।

বদরের হৃদয় দেবতা, যার জন্য দিনের পর দিন রাতের পর রাত চোখের পানি ঝরিয়েছে তাকে দেখে কোনরকম উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করল না। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত রাখল। ক্যাপ্টেন বা অন্যান্যদের উপস্থিতিতে নিজেকে সংযত না রেখে উপায়ই বা কি?

বদর-এর হুকুমে তার পরিচারকরা জাহাজ থেকে জলপাই বোঝাই কুড়িটি বাক্স প্রাসাদে নিয়ে এল।

ক্যাপ্টেন তার প্রাপ্য এক হাজার সোনার দিনার ইনাম-স্বরূপ নিয়ে কুর্ণিশ সেরে বিদায় নিল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' ত্রিশতম রজনী

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্সার পরবর্তী অংশটুকু শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, কেবলমাত্র বদরই নয়, কামার অল-জামান'কে কাছে পেয়ে কেবল বদরই খুশী হ'ল তা নয়, হায়াৎ-ও কম খুশী হ'ল না। সে-ও খুশীতে ডগমগ। সে বদরকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল।

ক্যাপ্টেন বিদায় নিলে কামার অল-জামান বদর-এর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। বদর দু'জন পরিচারককে তলব করল। তারা এলে কামার অল-জামান'কে দেখিয়ে বদর বলল—'একে হামামে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে গোশল করাবে। তারপর দামী পোশাক পরিয়ে কাল সকালে আমার কামরায় নিয়ে আসবে। বদর-এর কামরায় এবার বৃদ্ধ উজিরের তলব পড়ল। বৃদ্ধ উজির হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সম্রাট বদরকে কুর্ণিশ সেরে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

বদর এবার জামানকে দেখিয়ে বলল—'এক কাজ করবে, এর জন্য খুব সুন্দর একটি প্রাসাদ বানাবার ব্যবস্থা কর। আর একশ'টি নফর নোকর নিযুক্ত কর। আর উজিরের সমান বেতনের ব্যবস্থা কর। আর উট, খচ্চর ও ঘোড়া যা কিছু দরকার বন্দোবস্ত করে দেবে।

পরদিন বদর আবার আগের মতই কামার অল-জামান-এর ছদ্মবেশ ধারণ করে দরবারে উপস্থিত হ'ল। আর পাশে রক্ষিত একটি বহুমূল্য আসনে জামান'কে বসতে দিল।

জামান যার পর নাই বিস্মিত হয়। ভাবে, ব্যাপার কি আমাকে সম্রাট এত খাতির করছে কেন? কোন বড়রকম মতলব না থাকলে তো এমনটি হবার কথা নয়। কিন্তু মতলবটি কি? কোন গোপন গূঢ় রহস্য না থাকলে অবশ্যই তাকে এত খাতির করার কথা নয়। আবার ক্যাপ্টেনকেও কড়া নির্দেশ দিয়েছিল যে-কোনভাবে আমাকে যেন এর সামনে হাজির করা হয়। কাজ হাসিল করে ক্যাপ্টেন এক হাজার সোনার দিনার নিয়ে গেছে। কম কথা! কিন্তু কেন আমার জন্য কম বয়সী সম্রাটের এত আগ্রহ?

জামান এবার ভাবে তবে কি আমার খুবসুরৎ সুঠাম দেহ দেখে যুবক সম্রাট মজে গেছে? আমার সঙ্গে দোস্তী করতে উৎসাহী? কিন্তু এসব ধান্দার মধ্যে আমি থাকতে রাজী নই। এর খেয়ালের খোরাক জোগাবার মত সময় বা দিল্ কোনটিই আমার নেই। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা, বিবি বদর'কে তল্লাস করে বের করা। ধন দৌলত আর ইনামের প্রত্যাশী আমি অন্ততঃ নই। একটু বেগড়বাই কিছু মালুম হলেই বসনে পদাঘাত করে এখান থেকে

কেটে পড়ব, সাফ কথা।

কৌতূহলের শিকার হয়ে একদিন জামান সম্রাট বদর'কে বলল—'জাঁহাপনা, আমি আপনার আচরণে তাজ্জব না হয়ে পারছি না। আপনি আমাকে যে খাতির যত্ন করছেন তাতে আমি কেবলমাত্র অবাকই হচ্ছিনা, বিব্রতও বোধ করছি। আর আমাকে যে আপনার মসনদের পাশে আসন দিয়েছেন তাতে তো কেবলমাত্র আপনার একান্ত প্রিয়জনদের প্রাপ্য।

জাঁহাপনা, আমাকে উজিরের সমান পদে বহাল করেছেন কিন্তু এ-কাজ তো কোন যুবকের অবশ্যই নয়। পাকা চুল দাড়িওয়ালা কোন আদমিরই এ-পদে বহাল হওয়ার কথা। কিছু মনে করবেন না, আপনার দিলে আমাকে নিয়ে যদি কোন মতলব থাকে তবে মেহেরবানি করে সাফ সাফ বাতিয়ে দিন।'

মুচকি হেসে বদর বলল—'খুবসুরৎ নওজোয়ান, তুমি যা কিছু বললে খুবই সাচ বাৎ বটে। আমার কাম কাজের পিছনে কারণ তো কিছু না কিছু আছেই। আসলে তোমার সুরৎ-ই আমার কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।'

—'আল্লাতাল্লা আপনার মঙ্গল করুন। আপনার দোহাই, আমাকে এ-বন্ধন থেকে মুক্তি দিন। আমার এক বিবি রয়েছে। আজ সে নিরুদ্দেশ। তাকে আমি নিজের কলিজার চেয়ে বেশী পেয়ার মহব্বৎ করি। তার বিরহে আমি জ্বলে পুড়ে খাঁক হচ্ছি. তাই মেহেরবানি করে আমাকে আপনার মহব্বতের বন্ধন থেকে মুক্তি দিন জাঁহাপনা। আপনি আমার সুখ-উৎপাদনের জন্য যা কিছু করেছেন তার জন্য আমি সর্বান্তকরণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।'

সম্রাট বদর হাত বাড়িয়ে উজিরের একটি হাত চেপে ধরে আবেগ-মধুর স্বরে বলে উঠল—'পরদেশী নওজোয়ান উজির, দিমাক ঠাণ্ডা করে বস। তোমার সুরৎ দেখে আমি মুগ্ধ। তাই তোমাকে কাছ ছাড়া করছিনা। তোমার পটলচেঁরা চোখ দুটো আমার কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তুমি যদি সত্যই নওজোয়ান হও তবে কেন মিছে নিজেকে শম্বুকের মত গুটিয়ে নিচ্ছ। আর একটি বাৎ নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, নসীবকে অস্বীকার করা যায় না।

জামান সচকিত হয়ে বলে—'এ কী তাজ্জব কথা বলছেন জাঁহাপনা। আপনি এক নওজোয়ান, আমিও তা-ই। আপনার হারেমে তো বহুৎ খুবসুরৎ আউরৎ রয়েছে। তাদের ছেড়ে আপনি আমার মত এক নওজোয়ানের মহব্বতে মজে গেছেন! ব্যাপারটি তো মোটেই স্বাভাবিক নয় জাঁহাপনা। আপনি তাদের সাথে মহব্বতের খেলায় মাততে পারেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা কিছু দিল্ চায় করতে পারেন, বাধা নেই। গোস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা। আমার কিছুতেই মালুম হচ্ছে না, কেন আপনি আমার মত এক

নওজোয়ানের ঘাড়ে চেপে বসলেন। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আমার নিজের ধান্দায় চলে যাই। এসব ঝুট ঝামেলায় আমার দিল্ উত্যক্ত হয়ে উঠছে।'

মুচকি হেসে বদর বলল—'হয়ত তুমি সাচ বাৎ-ই বলেছ নওজোয়ান। কিন্তু আলাদা আলাদা আদমির রুচিবোধও আলাদা হয়, স্বীকার করছ কি? রুচির সঙ্গে তাল রেখে তার প্রবৃত্তিও বদলে যায়।'

—'হায়, আল্লাহ!' জামান আপন মনে ব'লে উঠল। সে নিঃসন্দেহ হ'ল, সম্রাটের দিমাক কিছু গড়বড় হয়ে গেছে। এখন অন্ততঃ তাকে ভাল কিছু সমঝানো যাবে না। তাই অনন্যোপায় হয়েই তখনকার মত প্রসঙ্গটি ধামাচাপা দিল। সে-ও মনস্থির করল। পরিস্থিতির চাপে পড়ে যদি কিছু তাজ্জব কাণ্ডকারখানা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তা-ই হোক।

এমন সময় প্রভাত হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু' শ' চৌত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সম্রাট বদর-এর বাৎ শুনে কামার অল-জামান বলল—'জনাব, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিতে পারি, তবে একটি শর্ত আছে। আপনাকে কসম খেতে হবে, আমাকে নিয়ে আপনি যে কোনভাবে, যে কোন কৌতূহল চরিতার্থ করার খেলায় মাতামাতি করতে পারেন, আমি কিছুমাত্রও আপত্তি করব না। কিন্তু কেবলমাত্র একবারই তা করবেন, প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাতাল্লার মর্জি। তার মর্জি মাফিকই এসব হচ্ছে, জানি।'

বদর ম্লান হাসল।

সুন্দরী বদর জামানকে নিজের কামরায় তলব করল। 'জামান-এলে মুচকি হেসে বলল—'তুমি তো জবান দিয়েছ, আমাকে মর্জি

মালিক যে কোন কাজ করতে দেবে, ঠিক কিনা?'

জামান নির্বাক।

বদর এবার অতর্কিতে জামান-এর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'হাতে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে উন্মাদিনীর মত তার কপালে, ঠোঁটে ও গালে একের পর এক চুম্বন করতে লাগল।

জামান পরম বিতৃষ্ণায় বারবার মুখ বিকৃত করতে লাগল। এক নওজোয়ানের কাছে অন্য এক নওজোয়ানের চুম্বন অবশ্যই সুখদায়ক হওয়ার কথা নয়।

জামান ব্যাপারটির মধ্যে কেমন যেন এক রহস্যের গন্ধ পেল। বদর-এর শরীরটিকে নিয়ে তার মধ্যে গভীর রহস্যের সঞ্চার ঘটল। তার শরীরটিতে কেমন যেন গলতি আছে মালুম হ'ল। পুরুষের শরীর বিশেষ করে অংশ বিশেষ লেড়কিদের মত নরম হওয়ার তো বাত নয়। ভাবে, তবে কি এটি আসলে লেড়কার শরীরই নয়!

বদর আবার তাকে নিজের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলে—'মেহবুব আমার, তুমি কি এখনও আমাকে ঠাহর করতে পারছ না? আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া বদর। দু'দুটো—বিশেষ করে একটি রাতের স্মৃতি কি এত সহজে ভুলে গেলে? তোমার দিল্ থেকে আমাকে চিরদিনের মত মুছে ফেলেছ?'

জামান চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে নিষ্পলক চোখে বদর-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বদর এবার তার গা থেকে সম্রাটের ছদ্মবেশ এক এক করে খুলে ফেলল।

কামার অল-জামান-এর সামনে স্মিত হাস্যে দাঁড়াল তার বিবি, তার কলিজা, আর সম্রাট ঘায়ুর-এর লেড়কি বদর।

জামান আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বদর'কে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল—'পেয়ারী, আমার দীর্ঘদিনের খোয়াব আজ বাস্তবতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আল্লাতাল্লার দোয়ায় তোমাকে সত্যই আজ

বুকে ফিরে পেলাম।' সারারাত্রি তারা বিনিদ্র অবস্থায় কাটাল। জামান বলল তার বিচ্ছেদ-বেদনার কথা। আর বদর শোনাল নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। রাত্রি শেষ হয়ে যায় কিন্তু তাদের কথা ফুরোয় না।

ভোর হ'ল। বদর বিছানা থেকে নেমেই সোজা বৃদ্ধ সম্রাট আরমানুস-এর কামরায় গেল। সব বৃত্তান্ত তাঁর কাছে ব্যক্ত করল।

আরমানুস বদর-এর মুখ থেকে সব কিছু শুনে কয়েক মুহূর্ত বাজপড়া রোগীর মত নির্বাক-নিস্পন্দভাবে বসে রইলেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

বদর এবার হাত কচলে বৃদ্ধ সম্রাট আরমানুস-এর কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলল—'জাঁহাপনা, আপনার আদরের বেটি হায়াৎ-এর কুমারীত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আপনি তো কামার অল-জামান'কে জামাতা করতে চেয়েছিলেন। সে তো আপনার প্রাসাদেই এখন অবস্থান করছে। আপনার দিল্ চাইলে তাদের শাদীর বন্দোবস্ত করতে পারেন। আমার এতে তিলমাত্র আপত্তিও নেই।'

—'কিন্তু বেটি, তোমার জামান।'

—'হায়াৎ'কে আমি ছোট বহিনের মত পেয়ার করি। আমরা দুজনে একই সম্পত্তি জামান'কে ভাগাভাগি করে নেব। কসম খেয়েছিলাম, হায়াৎ হবে জামান-এর দ্বিতীয়া বিবি।'

বৃদ্ধ সম্রাট আরমানুস এবার কামার অল-জামান-এর কামরায় গিয়ে তার হাতদুটো চেপে ধরে আকুল আবেদন রাখলেন—'বেটা আমার বেটিকে তুমি গ্রহণ কর। সে সঙ্গে আমার মসনদ, আমার সাম্রাজ্য, আমার প্রাসাদ আর অগণিত প্রজার দায়িত্বও তোমাকে অর্পণ করতে চাচ্ছি।'

আপনাদের, বিশেষ করে বদর-এর মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ আমার নেই, সাধ্যও নেই। বদর-এরও যখন একই মর্জি তখন আমার আপত্তির কারণ নেই।

শুভ মুহূর্তে কামার অল-জামান ও হায়াৎ-এর শাদী হয়ে গেল। বদর তাকে নিজের বুকে টেনে নিল। এবার বলল—'বহিন, তুমি হলে জামান-এর খাস বেগম। আর আমি হলাম তার বাঁদী।'

বৃদ্ধ সম্রাট আরমানুস পারিষদদের মধ্যে প্রচার করে দিলেন—কামার অল-জামান-এর সঙ্গে তাঁর একমাত্র বেটি হায়াৎ-এর শাদী হবে আর সে-ই হবে এ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

সম্রাট আরমানুস-এর প্রাসাদে নতুন করে আলোর রোশনাই বয়ে গেল। ফুল-মালায় প্রাসাদটিকে চমৎকার করে সাজানো হ'ল। ঝাড়বাতি জ্বলল। সানাই বাজল। কামার অল-জামান-এর সঙ্গে নানা আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে হায়াৎ-এর শাদী হয়ে গেল। শাদীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা বদর নিজে হাতে করল। তার কলিজাটি

বার বার মোচড় মেরে উঠল বটে তবু তাকে মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হতে দেখা গেল না, সবাই তার ঔদার্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'ল।

এক সাল ঘুরতে না ঘুরতেই কামার অল-জামান এবং হায়াৎ-এর এক টুকটুকে লেড়কা পায়দা হ'ল। আবার বদর-এর গর্ভেও একটি অনিন্দ্যসুন্দর লেড়কা পায়দা হ'ল। তারা একই সঙ্গে সহোদর ভাইয়ার মত মানুষ হতে লাগল। জিন্দেগীভর তাদের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল।

বেগম শাহরাজাদ কামার অল-জামান ও বদর-এর কিস্সা শেষ হতে না হতেই দুনিয়াজাদ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল—'বহিনজী তোমার কিস্সা কী সুন্দর! কিস্সা শুনতে শুনতে মনে হয় আমি যেন সে অচিনদেশের নায়ক-নায়িকাদের কাছাকাছি পাশাপাশি বসে সব শুনছি, দেখছিও সব।'

বেগম শাহরাজাদ বললেন—'তোর একার দিল্ ভরলেই তো হ'ল না, আমার আর একজন শ্রোতাও যে রয়েছেন। আমার কিস্সা তাঁর দিলে কতখানি দাগ কাটছে তা-ও তো জানা দরকার।'

বাদশাহ্ শারিয়ার তার হাতে আলতো করে একটি চুমু খেয়ে বললেন—'পেয়ারি, তোমার মুখের কিস্সা শোনার জন্য আমি পাগলের মত তোমার কামরায় ছুটে আসি, তোমার কিছু মালুম হয় না?'

ইতিমধ্যে প্রভাতের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

খুশ বাহার ও খুশ নাহারের কিস্সা

দু'শ' সাঁইত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার নতুন কিস্সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন।

বেগম শাহরাজাদ বল্লেন—'জাঁহাপনা আজ শুরু করছি খুশ বাহার ও খুশ নাহার-এর কিস্সা।

প্রাচীনকালে কোন এক নগরে এক বণিক বাস করত। তার নাম ছিল—বাহার। সে ছিল এক নওজোয়ান।

বাহার পালতোলা নাও নিয়ে দুনিয়ার বহুদেশে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে সওদা করত। আর সে সমানপত্র অন্য এক দেশে বেচে বহুৎ সোনার দিনার কামাই করত।

নওজোয়ান যথা সময়ে এক খুবসুরৎ লেড়কিকে শাদী করল। এক সাল ঘুরতে না ঘুরতেই বাহার-এর বিবি এক লেড়কা পায়দা করল। তার নামকরণ করা হ'ল খুশ বাহার।

লেড়কা পয়দা হওয়ার সাতদিন বাদে বাহার বাঁদীর বাজারে হাজির হ'ল। তার বিবি লেড়কা নিয়ে কাম কাজ করতে পারে না, তাই একটি বাঁদী তার ঘরে না হলেই নয়। বিবির সেবা যত্ন করবে, বাচ্চা সামলাবে, খানা পাকাবে—এরকম কাম কাজের জন্য এক জনানা জরুরৎ হয়ে পড়েছে।

বাহার বাঁদীর বাজারে গিয়ে বহু খোঁজা খুঁজি করে এক মাঝ-বয়সী, মোটামুটি সুরৎ আছে এমন এক বাঁদীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার পিঠে কাপড়ের ঝোলায় একটি খুবসুরৎ লেড়কি বাঁধা। যে এ-বাঁদীকে কিনবে তাকে লেড়কিটিসহই কিনতে হবে।

বাহার বাঁদীটির দালালকে দাম জিজ্ঞাসা করল।

দালালটি বলল—বাঁদী আর বাচ্চা লেড়কির দাম পঞ্চাশ সোনার দিনার।'

বাহার আর দরাদরি না করে দালালের হাতে পঞ্চাশটি সোনার দিনার গুঁজে দিয়ে বাঁদী আর তার বাচ্চা লেড়কিটিকে ঘরে নিয়ে এল।

বাঁদী দেখে বাহার-এর বিবি খুশী হ'ল বটে তবে অহেতুক এতগুলো দিনার খরচা হওয়ায় তার কলিজাটি খচখচ করছিল।

বণিক বাহার বিবিকে সমঝাল—'শোন, ওই বাচ্চা লেড়কিটিকে দেখে আমার দিলে দর্দ হ'ল। কিনেই ফেললাম। ওর সুরৎ দেখেছ; কামরায় আলোর রোসনাই বয়ে যায়। বড় হলে ওর সুরৎ আরও বাড়বে। তোমার বেটার সঙ্গে শাদী দেব। কেমন আচ্ছা মানাবে বল?'

—'সবই তো সমঝালাম। কিন্তু এতগুলো আদমির খরচাপাতিও তো কম হবে না।'

—তুমি ঘাবড়িও না বিবি। আমি ঠিক সামাল দিয়ে নেব। আমার বাৎ মিলিয়ে নিও, লেড়কিটির বয়স হলে তামাম আরব, পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে সুরতের বিচারে সবচেয়ে সেরা হবে।'

বণিককে বিবি জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল বাঁদীটির নাম হাফিজা আর তার বাচ্চা লেড়কির নাম নসীবা।

—'বহুৎ আচ্ছা নাম তো! তোমার নাম হাফিজা আর বেটির নাম নসীবা—বহুৎ আচ্ছা!'

বণিকের বিবি এবার বণিককে বলল—'শোন, নিয়ম আছে, দাসী-বাঁদী খরিদ করে আনলে তাদের পুরনো নাম বাতিল করে নতুন নাম দিতে হয়। নামকরণের কথা কিছু ভেবেছ কি?'

বণিক বলল—'তোমার সেবা যত্ন করার জন্য বাঁদী খরিদ করে আনলাম, নামকরণ তো তোমার পছন্দ মাফিকই করতে হবে বিবি-জান। তুমিই যা হোক ভেবে চিন্তে দুটো নাম রেখে ফেল। এর মধ্যে আর আমাকে জড়িও না।'

বণিকের বিবি অনেক ভেবেচিন্তে চমৎকার এক নাম বের করল। বণিকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—'আচ্ছা, বাচ্চাটির নাম যদি খুশ নাহার রাখা হয় তবে কেমন হবে বল তো?'

—'খুশ নাহার? বেড়ে নাম! চমৎকার! আমাদের বেটার নাম খুশ বাহার, আর এর নাম খুশ নাহার—তাজ্জব কাণ্ড করেছ বিবিজান! চমৎকার মিল হয়েছে। এর চেয়ে সুন্দর নাম আর হয় না।'

আরও কয়েক সাল কেটে গেল। খুশ বাহার ও খুশ নাহার একটু বড় হ'ল। তারা ভাই-বহিনের মত বড় হতে লাগল। তারা জানেও সম্পর্কে তারা ভাই-বহিন।

খুশ বাহার-এর উমর যখন পাঁচ হ'ল তখন বণিক বহুৎ খরচাপাতি করে ঘটা করে বেটার ছুন্নত-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল। মেহমান আর দোস্তরা গলা পর্যন্ত ঠেসে খানাপিনা করল। দিনের শেষে সবুজ নিশান হাতে কুফা নগর পরিক্রমা করে শিশুর দীর্ঘায়ু কামনা করল।

খুশ বাহারকে ঝলমলে পোশাকে সাজিয়ে সুসজ্জিত একটি খচ্চরের পিঠে বসানো হয়। আর অন্য একটি খচ্চরের পিঠে চেপে খুশ নাহার তার পাশাপাশি ছিল। এ ভাবেই দোস্ত, মেহমান ও আত্মীয়স্বজন মিছিল করে নগর পরিক্রমা করে।

এমন সময় ভোর হয়ে ওল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' আটত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে এলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, এক সময় খুশ বাহার-এর উমর এগার পেরিয়ে বারোয় পড়ল।

এক সকালে বণিক খুশ বাহারকে বলল—'বেটা, এখন থেকে তুমি খুশ নাহারকে তোমার বহিনের দৃষ্টিতে দেখবে না। সে তোমার আম্মার পেটের লেড়কি, তোমার সহোদরা নয়। খুশ নাহার আমাদের বাঁদী হাফিজা-এর লেড়কি। তবে বাঁদীর লেড়কি হলেও তাকে তোমার সমান আদর যত্নে মানুষ করা হয়েছে। আর তার দেহে যৌবনের চিহ্ন ফুটে উঠতে শুরু করেছে।'

আব্বার কথা শুনে খুশ বাহার সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বণিক বলে চলল—'হ্যাঁ বেটা, আমরা সাব্যস্ত করেছি, উমর হলে তোমাদের শাদী দেব। তাই এবার থেকে তোমাদের সহজ-স্বাভাবিক মেলামেশা আর চলবে না। এবার থেকে খুশ নাহার বোরখা ব্যবহার করবে।'

বণিক বাহার ও তার বিবির একান্ত ইচ্ছায় খুশ বাহার আর খুশ নাহার সে-রাত্রেই এক সঙ্গে, এক বিছানায় শোয়। সহবাস করে।

দেখতে দেখতে 'আর পাঁচ-পাঁচটি সাল গুজরান হ'ল। খুশ নাহার পূর্ণ যৌবনা হয়ে ওঠে। তার দেহের যৌবন চিহ্নগুলো সুডৌল হয়ে উঠল। যৌবনের জোয়ার দেখা দিল তার দেহে। তামাম কুফা নগরে তার মত খুবসুরৎ লেড়কি দ্বিতীয় আর একজনও নেই।

খুশ নাহার কেবলমাত্র সুরতের বিচারেই নয় গৃহকর্মাদি থেকে শুরু করে শিল্পকর্ম, সাহিত্যচর্চা, কোরাণের ওপর দখল প্রভৃতি গুণাবলীর দিক থেকেও সে অনন্যা হয়ে উঠল।

খুশ বাহার ও খুশ নাহার হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করতে লাগল। তাদের এ রকম অনাবিল আনন্দ ও সুখ বুঝি খোদাতাল্লার সহ্য হ'ল না। অচিরেই তাদের দাম্পত্য সুখে ভাটা পড়ল।

কুফা নগরীর সুবেদারের নজর পড়ল রূপসী তন্বী যুবতী খুশ নাহার-এর ওপর। তার সুরতের সঙ্গে অসাধারণ সব গুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছে শুনে খুশীতে তার দিল্ ডগমগ হয়ে ওঠে। তোবা তোবা—নিজের সুখ-ভোগের জন্য অবশ্যই নয়। তবে? সে ভাবল, যদি লেড়কিটিকে বণিক বাহার-এর ঘর থেকে ভাগিয়ে নিয়ে আসতে পারে তবেই তার নসীব ফিরে যাবে।

খুবসুরৎ খুশ নাহারকে নিয়ে সে সোজা খলিফা আবদ-অল-মালিক ইবন সারবান-এর কাছে হাজির করবে। খলিফাকে ভেট দেবে তামাম আরব, পারস্য ও তুরস্কের সেরা সম্পদ। ব্যস, তার নসীবের চাকা এবার ভন্‌ভন্ করে ঘুরতে শুরু করবে।

সুবাদার তার মতলবকে বাস্তবায়িত করার জন্য এক বিকালে এক বুড়িকে খুশ নাহার-এর কাছে ভেজল। বুড়ির সঙ্গে তার শলা-

পরামর্শ হয়ে গেছে, যে কোন ভাবে সে নাহারকে পটিয়ে পাটিয়ে এনে সুবাদারের হাতে তুলে দেবে। তবে এর জন্য অবশ্যই বুড়িকে ইনাম দেবার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হ'ল।
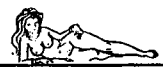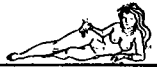
বুড়ি খুশ নাহার-এর কাছে যাবার সময় কিম্ভূতকিমাকার বেশে নিজেকে সাজিয়ে নিল। তার পোশাক পরিচ্ছদ যেমন বিদঘুটে তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যা কিছু সঙ্গে নিল তাও লক্ষণীয়ই বটে। বুড়ি গলায় পরে নিল একটি ইয়া বড় ও মোটা হাড়ের মালা। মাথার চুল উসকো খুসকো। হতে নিল একটি পেল্লাই চিমটা।

বণিক বাহার-এর বাড়ির সদর-দরজায় গিয়ে বুড়ি তারস্বরে চেঁচাতে লাগল—খোদা হাফেজ! খোদা মেহেরবান। খোদাতাল্লাই একমাত্র সাচ্চা আর বিলকুল ঝুটা। খোদা হাফেজ। দেখতে দেখতে বণিকের বাড়ির দরজায়, কিম্ভূতকিমাকার বুড়িকে ঘিরে পথচারী কৌতূহলী জনতা ভিড় করল।

বুড়ির কণ্ঠে বার বার—'খোদা হাফেজ। খোদা মেহেরবান' ধ্বনি শুনে বণিকের লেড়কা খুশ বাহার দরজা খুলেই ধর্মাত্মা বুড়িকে দেখতে পেল। সে বুড়ির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল।

বুড়ি মুচকি হেসে বলল—'বেটা, নামাজের সময় বয়ে যাচ্ছে। যদি আপত্তি না কর তবে তোমাদের ঘরে নামাজ সেরে নিতে চাচ্ছি।'

—'নামাজ সারবেন? বহুৎ আচ্ছা বাৎ! এ তো বড়ই খুশীর কথা। আল্লা তাল্লার নাম করবেন আমার ঘরে এতো অবশ্যই কাম্য। আসুন, ভেতরে আসুন।'

বুড়ি আরও জোরে গলা চড়িয়ে 'খোদা হাফেজ! খোদা মেহেরবান' ধ্বনি দিতে দিতে ঘরে ঢুকে গেল।

ভেতরে ঢুকে বুড়ি বদনার পানি দিয়ে রুজু সারল। তারপর মক্কার দিকে মুখ করে হতচ্ছাড়ি শয়তানী বুড়ি গলা ছেড়ে নামাজ পড়ল।

শয়তানী বুড়ি নামাজের অভিনয় সেরে উঠতে উঠতে বলল—'খোদা হাফেজ! খোদা মেহেরবান! খোদা তোমায় দোয়া করবেন বেটা।'

শয়তানী বুড়ি নামাজ সারল। কিছু সময় বিশ্রাম করল। কিন্তু বিদায় নেবার নামটি পর্যন্ত নেই।

খুশ বাহার ও খুশ নাহার শয়তানী ভণ্ড বুড়ির আচরণে ক্ষুব্ধ না হয়ে খুশীই হয়। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল—এমন এক ধর্মাত্মা বুড়ি যদি তাদের ঘরে দু'-চারদিন থাকেও তবু আপত্তি করবে না। নসীবে না থাকলে এমন ধর্মাত্মা মেহমান জোটে না।

বুড়ি রোয়াকে আসন পেতে বসল। আল্লাহ-র নামগান শুরু করল—'শোন বেটা, আল্লাহ-র দোয়া বিনা দুনিয়ার গতি নাই। তার

কাছে যে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে, পুরোপুরি বিলিয়ে দিতে পারে তাদের জন্য বেহেস্তের দরওয়াজা খোলাই থাকে। আর দুনিয়ায় যতদিন থাকে ততদিন বেহেস্তের আনন্দ এখানেই ভোগ করতে পারে।'

বুড়ি ধর্মকথার মাধ্যমে তাদের, বিশেষ করে খুশ নাহার-এর দিল্ জয় করে নিল। আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূতা হয়ে সে বুড়িকে বলল—'আমাদের মেহমান হয়ে আজ রাত্রিটুক যদি এখানে থেকে যান তবে—'

—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা বাৎ! আমি ফকিরের মত দিন গুজরান করছি। আমার কাছে এখান-ওখান বিলকুল সমান। তা তোমরা যদি খুশি হও তবে আজ রাত্রিটা তোমাদের মেহমান হয়েই থেকে যাই।'

খুশ নাহার এবার তার স্বামীর কামরায় গিয়ে বলল—'আমার দিল বলছে বুড়ি আল্লাহ-র পয়গম্বর হয়ে এসেছে। আমাদের নসীব ফিরে যাবে। আমরা কোশিস করে বুড়িকে এখানে রেখে দিতে পারলে—'

খুশ বাহার বলল—'তোমার দিল্ যখন চাচ্ছে, বুড়িরও যদি আপত্তি না থাকে তবে আর আমি মাঝখান থেকে আপত্তি করে বেহেস্তের পথে নিজেহাতে কাঁটা বিছাতে যাব কেন।'

—'বুড়ি রাজী হয়েছে। আজকের রাত্রিটা তো থাকুক তারপর কাল তার সঙ্গে বাৎচিৎ করে যা হয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

রাত্রে খানাপিনার সময় খুশ নাহার বুড়িকে কিছু খেতে বলল। বুড়ি আপত্তি জানাল। রোজার দোহাই দিয়ে কিছুই মুখে দিল না। বুড়ির ওপর খুশ বাহার ও খুশ নাহার-এর ভক্তি শ্রদ্ধা আরও অনেকগুণ বেড়ে গেল।

খুশ নাহার তাদের পাশের কামরায় বুড়ির থাকার বন্দোবস্ত

করে দিল। শয়তানী বুড়ি সেখানে রাতভর নামাজের ভণ্ডামি আর কোরাণ পাঠ করে কাটাল।

সকালে রুজু করে, নামাজ সেরে বুড়ি খুশ বাহার'কে বলল—'বেটা এবার আমি বিদায় নিচ্ছি, কি বল? খোদা তোমাদের দোয়া করবেন। তোমাদের ভালই করবেন।'

খুশ নাহার চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলল—'সে কী, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। আমরা তো আরও ভেবেছিলাম, এখানেই জীবনের শেষ ক'টা দিন গুজরান করবেন। মেহেরবানি করে এখানেই থেকে যান।'

—'বেটি, আল্লাহ-র দোয়া তোমরা পাবে। তোমরা প্রকৃত মুসলমানের গুণাবলী দিলে ধারণ করছ। তোমাদের দিল্ জুড়ে রয়েছে ধর্ম আর আল্লাতাল্লা। তোমরা তার দোয়া থেকে বঞ্চিত হবে না। তাই তো তোমাদের মেহমান হয়ে রাত্রিবাস করে গেলাম। আমি নিয়ৎ করেছি, সব দরগা আর মসজিদগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব। তাই আমাকে অনিচ্ছায় হলেও বিদায় নিতেই হচ্ছে। ভবিষ্যতে এদিকে এলে তোমাদের ঘরেই উঠব, কথা দিচ্ছি।'

বেকুব খুশ বাহার! বেকুব খুশ নাহার। শয়তানী বুড়ির ভণ্ডামী ধরতে পারার মত তাদের সে কূটবুদ্ধির একান্ত অভাব। তাদের তো তার দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সামান্য আঁচ পাওয়ারও কথা নয়। তাদের শান্তি-সুখে আগুন জ্বেলে দেবার জন্যই যে বুড়ির আবির্ভাব আর ভণ্ডামীর আশ্রয় নেয়া তার তিলমাত্র ধারণাও তারা করতে পারল না।

বুড়ি প্রাথমিক ভণ্ডামী সেরে এবার সুবাদারের কাছে হাজির হ'ল। সে আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূতা হয়ে ব'লে উঠল—'হুজুর, এমন সুরৎ যে দুনিয়ার কোন লেড়কির হতে পারে তা আমি খুশ নাহারকে দেখার আগে ধারণাই করতে পারিনি। বেহেস্তের হুরী ছাড়া এরকম সুরৎ আর নজরে পড়ে না। আমাদের তল্লাটে তো নয়ই তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও কোথায় মিলবে কিনা সন্দেহ। আর তার কণ্ঠ দিয়ে যেন সর্বদা মধু ঝরছে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! তা বুড়ি তোমার কাম কাজ কতদূর এগলো?'

—'হুজুর সবে তো কাজে হাত দিয়েছি। খুশ নাহার-এর মত খুবসুরৎ আর গুণবতী লেড়কিকে বশ করতে সময় তো একটু আধটু লাগবেই। আর কাজটি যদি এতই সোজা হ'ত তবে আপনিই কি আর আমাকে মোটা অর্থ ইনাম দিতে রাজী হতেন, বলুন?'

—'যে-কোন ভাবে তাকে আমার হাতে এনে দিতে হবে, খেয়াল থাকে যেন।'

—'হুজুর, আমার হাতযশের বলে কাজ আমি ঠিকই হাসিল করব। কিন্তু ঝট্ করে এরকম কঠিন এক কাজ হাসিল করা সম্ভব নয়। মাস খানেক সময় আমাকে দিতেই হবে।'

কয়েকদিন পর শয়তানী বুড়িটি আবার খুশ বাহার-এর বাড়ির দরওয়াজায় গিয়ে হাঁক দিল—'খোদা হাফেজ! খোদা মেহেরবান!'

খুশ বাহার এক গাল হেসে শয়তানী বুড়িকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল। আবার শুরু হ'ল তার ভণ্ডামী। নামাজ পড়া আর কোরাণ পাঠ শুরু হ'ল। আর সে সঙ্গে গুরুগম্ভীর ভাষণের মাধ্যমে উপদেশ তো আছেই। বুড়ি প্রায় একমাস ধরে মাঝে-মধ্যেই এখানে হাজির হয়। দু'একদিন করে থেকে ভড়ং ভাড়ং করে বিদায় নেয়।

একদিন শয়তানী বুড়ি তার কুমতলব সিদ্ধ করতে গিয়ে খুশ নাহার'কে একা পেয়ে বলল—'বেটি, কুফা নগরীর সুবাদারের কথা কিছু শুনেছ?'

খুশ নাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বুড়ি ব'লে চলল—'বেটি, একী কথা। তোমার মত ধর্মপ্রাণা লেড়কি কুফার সুবাদারের কথা কিছুই শোনে নি? আরে তিনি যে আল্লাহ-র পয়গম্বর! এমন পুণ্যাত্মা সজ্জন তামাম দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর একজন মিলবে না। আহা বড়ই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ। তাকে একবারটি চোখে দেখার জন্য কত মুলুক থেকে যে আদমিরা আসে তার ইয়ত্তা নেই। আর তোমরা কিনা তাঁর নামই শোন নি। তাজ্জব ব্যাপার তো!'

—'তাই নাকি! আমরা এমনই পাপাত্মা যে এত কাছে থেকেও তার দর্শন পেলাম না! বড়ই শরমের ব্যাপার!'

—'বেটি, তোমার দিল্ যদি চায় তবে আমি তাঁর সঙ্গে তোমার ভেট করিয়ে দিতে পারি। যদি দিল্ চায় তবে চল, আজই।—' শয়তানী বুড়ির মুখের কথা শেষ হবার আগেই খুশ নাহার বলল—'এমন সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়েও আমি কাজে লাগাতে পারছি না!'

—'কেন বেটি? তোমার দিল্ চাচ্ছে, অথচ যাবে না, কেন?'

—'আমার স্বামী এখন ঘরে নেই। তার মত বিনা তো—'

—'তাতে কি আছে বেটি, তোমার শাশুড়ীকে বলে আমার সঙ্গে চল। তোমার স্বামী ঘরে ফেরার আগেই আমরা ফিরে আসতে পারব। যাবে, তাকে দর্শন করে ফিরে আসবে। মামুলি ব্যাপার। কতক্ষণ আর লাগবে বেটি।'

খুশ নাহার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে তার অভিলাষ ব্যক্ত করল। তার শাশুড়ী আক্ষেপ করে বলল—'বেটি এমন অপূর্ব সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আমি তোমাকে পয়গম্বর দর্শনের অনুমতি দিতে পারছি না বলে কিছু মনে কোরো না। খুশ বাহার ঘরে নেই। তাকে না বলে গেলে সে শুধু গোস্‌সাই করবে না, দুঃখও পাবে। সে

ফিরলে তার অনুমতি নিয়ে গিয়ে পয়গম্বর দর্শন করে এসো। আর সে-ও যদি যেতে চায় তবে তো কথাই নেই।'

বুড়ি বলে—'সে কী, এমন সুযোগ সামান্য কারণে হাতছাড়া করবে। তোমার বেটা ঘরে ফেরার অনেক আগেই আমরা তো ফিরেই আসছি।'

খুশ নাহার-এর অত্যুগ্র আগ্রহ ও বুড়ির কথার ওপর বিশ্বাস করে তার শাশুড়ী মত না দিয়ে পারল না।

বুড়ি খুশ নাহার'কে সঙ্গে নিয়ে সুবাদারের বাগান-বাড়িতে হাজির হয়। সুবাদার খুশ নাহারকে দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে যায়। আপন মনে বলে ওঠে, বেহেস্তের হুরীই বটে। ইয়া আল্লা! এমন সুরৎ কোন জনানার হতে পারে কল্পনাও যে করা যায় না! খোদা মেহেরবান!

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' একচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, খুশ নাহার কদর্য চেহারার সুবাদার'কে দেখেই ব্যস্ত-হাতে নাকাবটি টেনে নিয়ে ভালভাবে মুখ ঢাকল।

খুশ নাহার অবাক হ'ল। বুড়িটি তার সঙ্গে নেই দেখেই তার বুকের ভেতর ধুঁকপুকানি শুরু হয়ে গেল। সে বুঝল হতচ্ছাড়ি বুড়িটি তাকে ধোঁকা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। দু'চোখ বেয়ে পানির ধারা নেমে এল।

শয়তান সুবাদার-এর কলিজা ইতিমধ্যেই খুশীতে নাচানাচি দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। চোখ দুটো হিংস্র শেরের মত জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল।

সুবাদার তাকে কিছু বলল না। কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে গেল। খস্‌খস্ ক'রে খলিফা আবদ-অল মালিক ইবন সারবান'কে কয়েক ছত্রের একটি চিঠি লিখে ফেলল।

সুবাদার এবার প্রহরীদের সর্দারকে ডেকে বলল—'আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। এই নাও। এ-জনানাকে দামাস্কাসে খলিফার কাছে নিয়ে যাও। তাকে আমার চিঠিটি দিয়ে বলবে আমি তাকে এ ভেট পাঠিয়েছি।'

খলিফার প্রধান উজিরের হাতে চিঠি ও খুশ নাহার'কে জমা দিয়ে প্রহরীদের সর্দার কুফায় ফিরে এল।

খুশ নাহারকে খলিফার প্রাসাদের হারেমে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল।

খুশ নাহার কপালে হাত দিয়ে বসে নিরবচ্ছিন্নভাবে চোখের পানি ফেলে চলল—

এক সময় খলিফা খোশ মেজাজে হারেমে এলেন। খলিফা আগে তার বহিন দাহিয়ার কাছে খুবসুরৎ লেড়কি খুশ নাহার সম্বন্ধে খবরাখবর নিলেন।

দাহিয়া খলিফাকে নিয়ে হারেমে খুশ নাহার-এর কামরায় এলেন। নাহার দেয়ালে হেলান দিয়ে হরদম চোখের পানি ফেলে চলেছে। দাহিয়া তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—'বহিন, কাঁদছ কেন? পথে বুঝি খুব ধকল গেছে? তবিয়ৎ খারাপ?'

খুশ নাহার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'তার তবিয়ৎ খারাপ নয়। নসীবের কথা ভেবেই তার চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে।'

—'নসীব? খুব খুশীতে মাঝে-মধ্যে চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। তোমারও কি তা-ই। এত খুশী সহ্য করতে পারছ না?'

—'না, তার ঠিক বিপরীত? আমার ঘর, আমার স্বামীর জন্য দুঃখে আমার কলিজা ফেঁটে যাচ্ছে।'

—'দুর পাগলী কাঁহিকার! কোথায় ছিলে আর এখন কোথায় এসেছ, জান? অবশ্যই জান না। জানলে বরং চোখের পানির পরিবর্তে খুশীতে ডগমগ হয়ে যেতে।'

খুশ নাহার এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চায়। সে বলল—'বহিনজী, এ-নগরের নাম কি, বলুন তো!'

—'সে কী হে, এর নামও জান না? এ জায়গাটির নাম দামাস্কাস। কেন হে, সওদাগর তোমাকে বলে দেয় নি, কোথায়, কার বাদী করে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? একী তাজ্জব কাণ্ড! তোমাকে তো কিনে আনা হয়েছে খলিফার ভোগ-বিলাসের জন্য, জান না? এখন তোমার প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে, কি করে খলিফার মুখে হাসি ফোটাতে পারবে তার কোশিস করা। ভাল কথা, তোমার নামটিই শোনা হ'ল না। কি নাম তোমার?'

—'খুশ নাহার।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই খলিফা অতর্কিতে ঘরে ঢোকেন। তাকে দেখেই নাহার ব্যস্ত হাতে নাকাবটি টেনে মুখ ঢাকল।

খলিফা সবিস্ময়ে বললেন —'সে কী, আমি এলাম তোমার খুবসুরৎ মুখটি দেখতে। আর তুমি কি না নাকাব টেনে মুখ ঢাকছ! একী তাজ্জব কাণ্ড?'

খুশ নাহার কিন্তু নাকাবটি সরাল না। উপরন্তু নাকাবটি টানাটানি করে সাধ্যমত আরও ভাল করে মুখ ঢাকল। শম্বুকের মত নিজেকে গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

খলিফা সরবে হেসে উঠলেন। দাহিয়া'কে বললেন—'তাজ্জব কাণ্ড দেখেছ দাহিয়া! এ তোমার হেফাজতে ক'দিন থাক। খুব করে তালিম দাও। কাজের যোগ্য করে তোল। এমন জড়োসড়ো হয়ে সওদাগরের পুঁটুলি হয়ে থাকলে কাম কাজ কি করে চলবে, বল তো?'

খলিফা আর একটিবার বোরখায় ঢাকা নাহার-এর দিকে তাকালেন। লোলুপ তার দৃষ্টি। কিন্তু ধবধবে সাদা ও বেলনের মত নিটোল কব্জি পর্যন্ত হাত দুটো ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

দাহিয়া হামামে গোসল করাতে নিয়ে নাহার-এর উলঙ্গ প্রায় দেহটি দেখে সচকিত হয়। আপন মনে বলে ওঠে—'শোভন আল্লাহ! এ যে কলিজা-কাপানো সুরৎ! আশমানের বিজলী যেন জমিনে নেমে এসেছে। বেহেস্তের হুরী বুঝি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। হায় আল্লা! কোন আদমির দেহে এমন সুরতের জৌলুষ থাকতে পারে চাক্ষুষ না করলে মালুম হবার নয়।'

হামাম থেকে ভাল করে গোসল করিয়ে সোনার জরি দেওয়া বহুমূল্য সাজ পোশাক নাহার'কে পরিয়ে দেওয়া হ'ল। আর মণি-মুক্তা খচিত গহনাপত্র পরানো হ'ল।

দাহিয়া যারপরনাই বিস্মিত হয়। একী তাজ্জব লেড়কি! এত দামী দামী গহনাপত্র পরেও মুখে হাসি ফুটল না। সেই আসার পর থেকে হাঁড়ির মত মুখ ব্যাজার করে বসে! নসীব ফিরলে সবাই খুশী হয়। মুখে হাসির ঝিলিক ফোটে। আর এ-লেড়কির কিনা সে বোধটুকুও নেই! হায় খোদা! একী আজব লেড়কিকে পাঠালে!

বহু মূল্য পোশাক ও অলঙ্কারাদি গায়ে চাপিয়ে খুশ নাহার ঘরের কোণে, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে বিড়ম্বিত নসীবের কথা ভাবতে থাকে। তার দিল্ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তার স্বামী খুশ বাহার'কে মুছে ফেলতে পারে না। সে খানাপিনাও বন্ধ করে দিল।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই খুশ নাহার-এর রূপ-যৌবন শুকিয়ে পোড়া কাঠ হয়ে গেল। হাড্ডি সার! এবার এল জ্বর। বেদম জ্বর। দামাস্কাস নগরের সেরা সেরা হেকিমদের তলব করা হ'ল। তারা দাওয়াই দিল। ইলাজ করল কিন্তু হায় বিমারি সারল না।

এদিকে খুশ বাহার সন্ধ্যার কিছু পরে কাম কাজ সেরে ঘরে ফিরে এল। নাহার'কে দেখতে না পেয়ে উতলা হ'ল। নাহার-এর নাম ধরে ডাকাডাকি করল। কিন্তু কোথাও পেল না।

শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে খুশ বাহার তার আম্মার কাছে যায়। সে ঘরের কোণে বসে হরদম চোখের পানি ফেলে চলেছে। বেটাকে দেখে সে গলা ছেড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—'বেটা, নাহার সে-বুড়ির সঙ্গে সুবাদার-এর কাছে গেছে। অনেক আগেই ফেরার কথা ছিল। কিন্তু এখনও ফিরছে না। বুড়ি ওয়াদা করে ছিল, তুই ঘরে ফেরার আগেই দিয়ে যাবে। কিন্তু এখনও ফিরছে না। তাজ্জব মানছি বেটা! যা, পাত্তা লাগা।'

খুশ বাহার উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে সুবাদারের মকানে হাজির হয়। তাকে সরাসরি প্রশ্ন করে—'আমার নাহার কোথায়, বলুন? এক বুড়ি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। কোথায় সে, জলদি বের করে দিন।'

সুবাদার যেন একেবারে আশমান থেকে পড়ল। চোখ দুটো কপালে তুলে বলল—'বুড়ি! নাহার? কে বুড়ি? কে-ই বা তোমার নাহার? তাদের এখানে আসার কি দরকার?'

—'ন্যাকামি ছাড়ুন মশাই। নাহার আমার বিবি। তাকে কোথায় রেখেছেন জলদি করে বলুন? আর বুড়িটিকে ভেবেছিলাম, ফকিরের ভাব নিয়ে আল্লাতাল্লার নাম করে দিন গুজরান করে। ইয়া মোটা কাপড়ের আলখাল্লা গায়ে, হাড্ডির মালা গলায় আর হাতে ইয়া পেল্লাই একটি চিমটা—সবদেখে আমরা মজে গিয়েছিলাম। শয়তানী বুড়ির ভণ্ডামী ধরতে না পারায় আমার নসীবে আগ লাগল। ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার বিবিকে নিয়ে এল।'

—'শোন বেটা, তোমার আব্বা আমার জিগরী দোস্ত। আমি

তোমার জন্য সাধ্যাতীত কোশিস করব, আমার ওপর আস্থা রাখতে পার। তোমার সঙ্গে ওই বুড়ির দেখা হলে আমার সামনে হাজির করবে, দেখবে কেমন আড়ং ধোলাই দেই। আর বেটা, তোমার বিবির জন্য ঘাবড়াবে না, আমি তাকে খুঁজে বের করার কোশিস অবশ্যই করব।'

খুশ বাহার সুবাদারের কাছ থেকে মিথ্যা আশ্বাস পেয়ে কোতোয়ালের কাছে যায়। তার কাছে নালিশ করে, এক ভণ্ড বুড়ি আমার বিবিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে।

কোতোয়াল গোঁফে তা দিতে দিতে বলল—' আচ্ছা পুরুষ মানুষ তো তুমি! তোমার স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে আর তুমি তার কিছু করতে পারলে না? আমার কাছে নাকে কাঁদতে এসেছ? ঠিক আছে, বল তো, কোন পথে নিয়ে গেছে!'

—'আমি ঘরে ছিলাম না। বুড়ি আমার আম্মাকে বলে গেছে সুবাদারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। এ ছাড়া নিশানা বলা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

—' বহুৎ আচ্ছা বাৎ! তুমি যদি না জান তবে আমিই বা কি করে জানব। যত্তসব! বাজে ঝামেলা কোরো না। আমার কাজ আছে পাতলা হও দেখি।'

খুশ বাহার আবার সুবাদারের কাছে ফিরে আসে। কোতোয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

সুবাদার কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করে খুব হম্বিতম্বি জুড়ে দিল। কোতোয়ালকে হাতের কাছে পেলে যেন এক্ষণি কোতল করবে, নয় তো শূলে চড়াবে। এক সিপাহীকে পাঠিয়ে কোতোয়ালকে তলব দিল।

কোতোয়াল এবার হন্তদন্ত হয়ে পড়ি কি মরি অবস্থায় সুবাদারের দরবারে হাজির হ'ল। কুর্নিশ সেরে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

সুবাদার বাজখাই গলায় গর্জে উঠল—'তুমি ভেবেছ কি হে! আমার এলাকায় চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি বা রাহাজানি যা-ই হোক না কেন সব দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তাবে। আর বেচারার বিবিকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে, তোমার কাছে নালিশ করতে গেছে। আর তুমি কিনা তাকে ভাগিয়ে দিলে! তাজ্জব ব্যাপার! যেখান থেকে পার, যেমন করে হোক এর বিবির তল্লাস করে বের করে দিতে হবে। আমার তল্লাটে এরকম শয়তানী বরদাস্ত করব না। তবে যদি ইতিমধ্যে নগর ছেড়ে চলে যায় তবে অবশ্য তোমার কোন কসুর হবে না। নইলে তোমার গর্দান যাবে, বলে রাখছি।'

সুবাদারের কথায় কোতোয়াল একেবারে আশমান থেকে পড়ল। ভ্রূ কুঁচকে, কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। এমন সময় সুবাদার তাকে চোখ মারল। তাকে বুঝাতে চাইল, বিচার প্রার্থীর সামনে একটু হম্বিতম্বি না করলে নিজেরও সম্মান থাকে না। আর বিচার প্রার্থীও আস্থা হারিয়ে ফেলে। কোতোয়ালের সঙ্গে সাঁট করেই তো সুবাদার বুড়ি আর খুশ নাহার'কে দামাস্কাসে চালান করেছে। আর তাকেই যদি শূলে চড়াতে যাওয়া হয় বিভ্রাটের সৃষ্টি তো হবেই।

কোতোয়াল এবার গা-ঝাড়া দিয়ে ব'লে—'হুজুর, আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। এর বিবি যদি এ তল্লাটে থাকে তবে খুঁজে তাকে বের করবই। আর যদি অন্য মুলুকে চালান হয়ে যায় তবে তো—'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই সুবাদার বলতে লাগল—'অন্য মুলুকে, আমাদের সীমানার বাইরে চলে গেলে তোমার কসুর মাফ করে দেয়া হবে।' এবার খুশ বাহার-এর উদ্দেশ্যে বলল—'বেটা, ঘরে যাও। আমরা দেখছি তোমার বিবিকে কি করে খুঁজে বের করা যায়। তোমার নসীব ভাল থাকলে বিবিকে ফিন তোমার বুকে পাবেই।'

এমন সময় রাত্রি অবসান হ'ল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' বিয়াল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন —'জাঁহাপনা, খুশ বাহার সুবাদার ও কোতোয়ালের কাছ থেকে মিথ্যা আশ্বাস পেয়ে নসীব সম্বল করে ঘরে ফিরে এল। কিছুতেই অশান্ত দিল্‌কে সে শান্ত করতে পারল না। বিষণ্ন মনে বিছানা আশ্রয় করল। দু'দিন বাদে তার জ্বর এল। হাড্ডি কাঁপানো জ্বর। হেকিম ডাকা হ'ল। দাওয়াই দিল বটে, কিন্তু হেকিম ফিরে যাবার সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে গেল—'এর বিবি ঘরে না ফিরলে বিমারি কিছুতেই সারবে না। কোন হেকিম-বদ্যি এর ইলাজ করে বিমারি সারাতে পারবে না।'

এক দিন এক পারসী-বুড়ো কুফা নগরে এল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ও রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শী। বণিক খবর পেয়ে লেড়কার ইলাজ করাতে তাকে নিয়ে এল। বণিক পারসী-বুড়োর হাত দুটো ধরে অনুরোধ করল ভাল ক'রে ইলাজ করে লেড়কাকে সারিয়ে তোলার জন্য। তাকে ইনাম দিয়ে খুশী করে দেবে আল্লাহ-র নামে কসম খেল। প্রয়োজনে তার বাড়িঘর—যথাসর্বস্ব তাকে দিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ পারসী-বুড়ো কিছুই বলল না। কেবল ঠোঁট টিপে হাসল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করল। জিভ দেখল, চোখ দেখে শরীরের খুনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করল। তারপর এক সময় ম্লান হেসে বলল—'সওদাগর সাহাব, এর বিমারি তো শরীরে নয়, বিমারি ধরেছে দিলে। বহুৎ আচ্ছা,

আমি গণনা করে জেনে নিচ্ছি এর আপনজন কোথায় আছে।'

পারসী-বুড়ো এবার মেঝেতে কিছু সাদা বালি ছড়িয়ে দিল। তার ওপর সাজিয়ে দিল পাঁচটি শ্বেত পাথরের নুড়ি, তিনটি কালো পাথরের নুড়ি, দু'খানি কাঠি আর মাঝখানে একটি শেরের মুণ্ডু। এবার বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াল। তারপর বলল—'শুনুন, সওদাগর সাহাব, আপনার লেড়কা যার শোকে কাতর তাকে দামাস্কাস-এ সুলতানের হারেমে মিলবে। তার হালৎ-ও ভাল নয়। দীর্ঘদিন বিমারিতে বিছানা নিয়েছে।

সওদাগর কান্নায় ভেঙে পড়ে। পারসী-বুড়োর হাতে-পায়ে ধরে বহুৎ চোখের পানি ঝরাল। পারসী-বুড়ো তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বলল—'ধৈর্য ধরতেই হবে। তবে আমি আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে বলছি, এদের মোলাকাৎ আমি করে দিতে পারবই। আপনাকে যথাসর্বস্ব দিতে হবে না। আমাকে এখন খরচ খরচা বাবদ মাত্র পাঁচ হাজার সোনার দিনার দিন। বিমারি সারলে আপনার বেটা বিবিকে ফিরে পেলে আপনার দিল্ যা চায় আমাকে ইনাম দেবেন।'

পারসী-বুড়ো বণিকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার সোনার দিনার বুঝে পেয়ে খুশ বাহার'কে বলল—'বেটা, তোমাকে যে আমার সঙ্গে দামাস্কাসে যেতে হচ্ছে। ক'দিন বাদে একেবারে তোমার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে।'

খুশ বাহার পারসী-বুড়োর দাওয়াই খেয়ে ক'দিনের মধ্যেই শরীরটিকে একটু চাঙা করে নিল।

পারসী-বুড়ো এবার খুশ বাহার'কে নিয়ে দামাস্কাসের পথে পা-বাড়াল।

দামাস্কাসে পৌঁছে পারসী-বুড়ো একটি ছোট কামরা ভাড়া করল। সেখানে একটি মনোহারী দোকান সাজাল। কামরার আর একদিকে কিছু হেকিমি দাওয়াইপত্রও রাখল।

পারসী-বুড়ো নিজেকে বিশেষ সাজে সাজিয়ে নিল। মাথায় অদ্ভব কায়দায় একটি পাগড়ীও বেঁধে নিল। আর খুশ বাহারকে পরাল নীল রেশমী কামিজ আর কাশ্মিরী কোর্তা। আর হাতে বেঁধে দিল গুনাবী জরির কাজ করা রেশমী রুমাল। হেকিমের সহকারীর মত পোশাকই বটে।

পারসী-বুড়ো বলল—'শোন, তুমি আমাকে আব্বা সম্বোধন করবে। আর আমি তোমাকে সবার কাছে আমার বেটা ব'লে পরিচয় দেব।'

কিছুদিনের মধ্যে তামাম দামাস্কাস নগরে তাদের হেকিমি ইলাজের কথা ছড়িয়ে পড়ল। আরও প্রচার হ'ল, পারসী হেকিম বুক, নাড়ী প্রভৃতি পরীক্ষা না করে কেবলমাত্র রোগীর থুথু পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় ও তার ইলাজ করতে পারে। অত্যাশ্চর্য হিম্মৎই বটে। এমন এক হেকিমের নাম-যশের কথা কেনই বা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে না?

এক সকালে পারসী-বুড়োর দোকানের সামনে এক খানদানি পরিবারের আউরত এক খচ্চরের পিঠ থেকে নামল। সুসজ্জিতা বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা দোকানে এলে খুশ বাহার তাড়াতাড়ি একটি কুরশি এগিয়ে দিয়ে তাকে বসতে বলে। বৃদ্ধা বসে।

আউরতটি এবার তার বোরখার ভেতর থেকে একটি জলের বোতল বের করল। পারসী-বুড়োর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে ওতে প্রস্রাব আছে। আবার মুহূর্তকাল তার মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে পারসী-বুড়োকে বলল —'আচ্ছা, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে। আপনি ইরাক ছেড়ে এসে এখানে ব্যবসা ফেঁদেছেন, তাই না?'

—'হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। আমি সেখানে আপনার নফর ছিলাম।'

—'ছিঃ! এমন কথা বলতে নেই। এ দুনিয়ার কেউ কারো নফর নোকর নয়। যাক গে, আমি যে-কাজে এসেছি। এতে খলিফার সদ্য কেনা বাঁদীর প্রস্রাব রয়েছে। দীর্ঘদিন জ্বর। বহুৎ হেকিম ইলাজ করেছে। সারে নি। শেষ ভরসা যখন আপনি তখন দেখুন তার বিমারি ইলাজ করে যদি আরাম দিতে পারেন। আপনার নাম-যশের বাৎ শুনে খলিফার বহিন দাহিয়া আমাকে আপনার দরবারে ভেজলেন।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে পারসী-বুড়ো বলল—'দেখুন, আমার ইলাজ একটু আলাদা কিসিমের। ইলাজ করতে হলে বিমারির ব্যাপার স্যাপার শোনার আগে রোগী বা রোগিণীর নাম জানা দরকার। কারণ দরকার হলে আমি ঝাড়ফুকও করি কিনা—'

—'রোগিণীর নাম খুশ নাহার।'

নামটি কানে যেতেই পারসী-বুড়ো মুহূর্তের জন্য একটু সচকিত হয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে এক চিলতে

কাগজ নিল। এবার কলম দিয়ে আঁচড় কেটে কেটে কতগুলো সংখ্যা লিখল। তাদের কতগুলি লালকালি আর কতগুলি লিখল সবুজ কালি দিয়ে। এবার লাল ও সবুজ সংখ্যাগুলি যোগ করল। তারপর আরও কিছু সংখ্যা তার সঙ্গে যোগ করল। এবার ক্রমান্বয়ে বিয়োগ গুণ, ভাগ প্রভৃতি অনেক কিছুই করল। সবই ঝটপট সেরে ফেলল।

আগন্তুক বৃদ্ধা সবিনয়ে তার কাণ্ড কারখানা দেখতে লাগল।

খুশ বাহার পারসী-বুড়োর পাশে চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ এঁকে বসে রইল।

পারসী-বুড়ো এবার মুখ খুলল—'দেখুন, বিমারি আমি ধরে ফেলেছি। জ্বর বা অন্য উপসর্গ যা কিছুই থাক না কেন, তার আসল বিমারি বুকে। বুকের—।'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই বৃদ্ধা বলল—'ঠিক বাৎ বটে। ওর বুকের মধ্যে নাকি সর্বদা ধড়ফড় করে। হরদম ধড়ফড় করে।'

পারসী-বুড়ো আবার গম্ভীর হয়। বিড়বিড় করে কি সব বলে, তারপর এক সময় আবার মুখ খোলে—'দেখুন, ইলাজ শুরু করার আগে আমাকে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যেমন ধরুন, সে কোন্ দেশের লেড়কি? কোত্থেকে এবং কিভাবে এখানে এসেছে? আর তার উমরই বা কত?

—'দেখুন হেকিম সাহেব, আমি যা কিছু বলব সবই খুশ নাহার-এর মুখ থেকে শোনা কথা। শুনেছি, কুফা নগরেই নাকি তার জন্ম আর উমর সম্বন্ধে শুনেছি ষোল সালের কাছাকাছি। যে সালে কুফা নগর আগুনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সে-সালেই নাকি সে পয়দা হয়েছিল। আর দামাস্কাস নগরে এসেছে মাত্র কয়েক হপ্তা আগে।'

খুশ বাহার সব কিছু শুনে ভিমরি খাওয়ার জোগাড়। তার সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়েছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম কপাল জুড়ে ভেসে উঠেছে।

পারসী-বুড়ো এবার খুশ বাহার-এর দিকে তাকিয়ে বলল—'বেটা, বোতল নাও। সাত নম্বর দাওয়াই বানাও। খুব হুশিয়ার, একটু হেরফের হলে ফেলে দিয়ে ফিন বানাবে।'

আগন্তুক বৃদ্ধা এবার পারসী-বুড়োর সঙ্গে একটু গল্প করে সময় কাটাবার ধান্দা করল। বলল—'এ লেড়কা খুবসুরৎ দেখছি! আপনার বেটা বুঝি? যার জন্য দাওয়াই নিচ্ছি সে-ও খুবসুরৎ।'

—'হ্যাঁ, আমার বেটা। আপনার নফর বটে।'

—'একদিন আপনার এ খুবসুরৎ বেটাও বড় হেকিম হয়ে উঠবে।'

খুশ বাহার দাওয়াইয়ের বোতল ভরল ও কয়েকটি পুরিয়া বানাল। সুযোগ বুঝে পুরিয়ার কাগজের গায়ে কুফা অঞ্চলের ভাষায় নিজের নাম, ঠিকানা প্রভৃতি লিখে দিল। দুর্বোধ্য হরফ। যারা এ-ভাষা বোঝে না তাদের চোখে কেবলমাত্র কয়েকটি কালির আঁচড় ছাড়া কিছু নয়। এবার দাওয়াইয়ের বোতল ও পুরিয়া বৃদ্ধার হাতে তুলে দিল।

বৃদ্ধা রুমাল থেকে দশটি সোনার দিনার পারসী-বুড়োর হাতে গুঁজে দিয়ে ব্যস্ত পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আবার খচ্চরের পিঠে উঠল।

বৃদ্ধা খুশ নাহার-এর কামরায় গিয়ে তার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলল—'চোখের পানি মোছ বেটি। এই দেখ, তোমার জন্য বড়িয়া দাওয়াই নিয়ে এসেছি। মোক্ষম দাওয়াই। যেমন খুবসুরৎ বুড়ো হেকিম তেমনি খুবসুরৎ তার নওজোয়ান বেটা। এক পুরিয়া খাবে তো বিমারি পালাতে পথ পাবে না।'

খুশ নাহার বৃদ্ধাকে সত্যিকারের আপনজন ভাবে। তামাম প্রাসাদে একমাত্র একেই একটু-আধটু বিশ্বাস করে। ভালও বাসে খুবই।

দাওয়াইয়ের একটি পুরিয়া খোলামাত্রই খুশ নাহারের চোখে মুখে খুশীর ছাপ ফুটে ওঠে। সে পুরিয়ার গায়ের লেখা বার বার পড়তে লাগল—'আমি খুশ বাহার। আমার আব্বা কুফার বণিক।' আচমকা তার মাথাটি চক্কর মেরে ওঠে। কোনরকমে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর গলা নামিয়ে বৃদ্ধাকে বলে—'আচ্ছা, হেকিমের লেড়কাটির সুরৎ কেমন? ওমর কত?'

—'খুবসুরৎ। আর ওমর সতের সালের কাছাকাছি।'

বৃদ্ধাটি একটু আগে তাকে যেমন দেখে এসেছে বিলকুল তাই বর্ণনা দিল। সে সঙ্গে বলল—'তার মুখের একটি কালো তিল তার সুরৎ-কে আরও অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।'

সবকিছু শুনে খুশ নাহার বৃদ্ধাকে আলিঙ্গন করে বলল—'তোমার দাওয়াই আমার অসুখ অনেক কমিয়ে দিয়েছে।' এবার পুরিয়ার গায়ে ছত্র কয়টি দেখাল।

খুশ নাহার সুস্থ, বিলকুল সুস্থ।

বৃদ্ধার মুখে খুশ নাহার-এর রোগ নিরাময়ের খবর শুনে খলিফা তো আহ্লাদে একেবারে গদগদ। সে সন্তুষ্ট হয়ে দাওয়াইয়ের দাম ছাড়াও ইনামস্বরূপ এক হাজার সোনার দিনার হেকিমকে পাঠিয়ে দিল।

বৃদ্ধা পারসী-হেকিমের কাছে যাওয়ার সময় খুশ নাহারও একটি পুরস্কার পাঠিয়ে দিল। একটি ছোট্ট কাগজের বাক্স তার হাতে দিয়ে বলল—'এক কাজ করবেন, এটা হেকিমের বেটার হাতে দেবেন। খবরদার অন্য কারো চোখে যেন এটি না পড়ে।'

বৃদ্ধা পারসী-বুড়োর দোকানে গিয়ে খুশ-বাহারের হাতে খুশ নাহার-এর বাক্সটি তুলে দিল।

খুশ বাহার চিঠি পড়ল। তাতে খুশ-নাহার লিখেছে, সে-শয়তানী ভণ্ড বুড়ি কিভাবে তাকে সুবাদারের হাতে তুলে দেয়। তারপর সুবাদার তাকে দামাস্কাসে খলিফার প্রাসাদে পাঠায়। খলিফার ইচ্ছার কথাও লিখতে সে ভুলল না। চিঠিটি পড়া শেষ হতে না হতেই খুশ বাহার চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

ব্যাপার দেখে বৃদ্ধা তাজ্জব বনে যায়। পারসী-বুড়োকে জিজ্ঞাসা করে—'আপনার বেটার চোখে পানি, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল— ব্যাপার কি?'

—'এ-ই তো স্বাভাবিক। যাকে আপনি খলিফার বাঁদী ভাবছেন, যার জন্য দাওয়াই নিয়ে গেলেন, তার আদৎ পরিচয় জানেন কি? সে-এ লেড়কার পিয়ারের বিবি। শাদীকরা বিবি। কুফার হতচ্ছাড়া পাজী সুবাদার ফন্দি করে বুড়িকে দিয়ে তার মকান থেকে ভাগিয়ে নিয়ে আসে। তারপর খলিফার ভোগের সামগ্রী হিসাবে দামাস্কাসে চালান করে দেয়। বিবির বিরহে লেড়কাটির হালৎ খুবই খারাপ দেখে আমি তাকে এখানে নিয়ে আসি। এ আমার বেটা তো নয়ই, এমন কি আত্মীয়ও নয়। আদতে এক বণিকের বেটা। কুফায় এর ঘর। আর নাম খুশ বাহার।'

বৃদ্ধা খুশ বাহার ও খুশ নাহার-এর মর্মান্তিক বৃত্তান্ত শুনে চোখে-মুখে বিষাদের ছাপ এঁকে গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

পারসী-বুড়ো বলে চলল—'সবই তো শুনলেন। এবার আপনার সাহায্য-সহযোগিতা পেলে এরপক্ষে পিয়ারের বিবিকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এবার জেব থেকে খলিফার দেওয়া ইনাম একহাজার সোনার মোহর বুড়ির হাতে দিয়ে সে বলল—'এগুলো আপনাকে ইনামস্বরূপ দিচ্ছি। যদি এ-লেড়কার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে আরও বহুৎ কিছু দিয়ে আপনাকে খুশী করে যাব। কোশিস করে দেখুন, যদি দু'-দুটো নওজোয়ানের জান বাঁচাতে পারেন।'

এমন সময় প্রভাতের সূচনা হচ্ছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' পঁয়তাল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ আবার তাঁর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, বৃদ্ধা মোহরের পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে বলে,—'হেকিম সাহেব, আমার কোশিসের ঘাটতি হবে না। কিন্তু কাজ হাসিল হওয়া বা না হওয়া তো নসীবের ব্যাপার।'

বৃদ্ধা আবার খচ্চরের পিঠে চেপে প্রাসাদে ফিরে আসে। খুশ নাহার-এর দিলে খুশীর ঝিলিক। মুখে হাসির রেখা। তার দিল্ বলছে সে আবার তার প্রাণপ্রতিম খুশ বাহার-এর কাছে ফিরে যেতে পারবেই।

বৃদ্ধা বলে—'বেটি, তুমি যদি আগে এসব কথা একটিবার আমার কাছে ফাঁস করতে তবে হয়ত এতদিনে তোমার তকলিফ দূর হয়ে যেত। আমার ওপর ভরসা রাখ। আমি এ-পরিস্থিতিতে নিজের বেটির জন্য যা করতাম, তোমার মুক্তির জন্যও একই ভাবে কোশিস করব। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, যত তকলিফই আমার হোক না কেন তোমাকে তোমার বাঞ্ছিতের কাছে পৌঁছে দেবই দেব।'

খুশ নাহার চোখের পানি মুছতে মুছতে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে। চোখের কোল বেয়ে আবার পানির ধারা নেমে আসে। আনন্দাশ্রু।

দু'দিন বাদে বৃদ্ধা ফিন পারসী-বুড়োর দোকানে আসে। খচ্চরের পিঠ থেকে একটি পুঁটুলি নামিয়ে আনে। এতে এক প্রস্থ আউরতের পোশাক। সালোয়ার, কামিজ, বোরখা প্রভৃতি।

বৃদ্ধা পুঁটুলিটি খুলে পোশাকগুলো খুশ বাহার'কে পরিয়ে আউরত সাজিয়ে নিল।

বৃদ্ধাটি এবার খুশ বাহার'কে নিয়ে পথে নামল। পথ চলতে চলতে এক সময় বলল—'বেটা, লেড়কিরা কিভাবে পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটে পরখ করে নাও। সেভাবে হাঁটার কোশিস কর।' এবার আগে আগে হাঁটছে এরকম একদল লেড়কিকে দেখিয়ে বলল—'ওই দেখ, ওরা হাঁটার সময় পাছাদুটো কেমন ক্রমান্বয়ে ওঠা-নামা করছে। কোশিস কর বিলকুল তাদের মত করে হাঁটতে।'

খুশ বাহার লেড়কিদের হাঁটার ঢঙ ঢাঙ কিছুটা রপ্ত করে নিল এবং নিজের হাঁটা চলার মধ্যে তা ফুটিয়ে তুলল।

এবার বৃদ্ধা খুশ বাহারকে নিয়ে খলিফার প্রাসাদে ঢুকল। আউরতদের হারেমে ঢোকার কোন বাঁধা নেই। ফলে-বৃদ্ধা খুশ বাহারকে নিয়ে অনায়াসে হারেমে ঢুকে গেল।

হারেমে ঢুকে বৃদ্ধা অঙ্গুলি-নির্দেশ করে খুশ বাহার'কে

বলল—'এক কাম কর, ওই যে দরওয়াজাটি দেখছ সেটি দিয়ে সোজা ঢুকে যাবে। তারপর একটি লম্বা রোয়াক চোখে পড়বে। রোয়াক শেষ করে বাঁ-দিকে ঘুরবে। তারপর সামান্য এগিয়ে দেখবে ডান-দিকে আর একটি রোয়াক। সামান্য যেতেই পাশাপাশি অনেকগুলো দরওয়াজা দেখতে পাবে। প্রথম পাঁচটি দরওয়াজা বাদে ষষ্ঠ দরওয়াজা ঠেলে কামরায় ঢুকে যাবে। একটু বাদেই আমি খুশ নাহার'কে পাঠিয়ে দেব।

ধৈর্য ধরতে হবে, আমি সুযোগের সন্ধানে থাকব। তারপর খোজা আর প্রহরীদের সাহায্যে তোমাদের দু'জনকে প্রাসাদ থেকে পাচার করার বন্দোবস্ত করব।

খুশ বাহার বৃদ্ধাকে সুক্রিয়া জানিয়ে ধীর-পায়ে, লেড়কিদের মত পাছা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে চলল। বৃদ্ধার নির্দেশ অনুযায়ী চলার পর পাশাপাশি দরওয়াজাগুলির কাছে এক সময় হাজির হ'ল। এবার পর পর পাঁচটি দরওয়াজা ছেড়ে ষষ্ঠ দরওয়াজায় সামান্য চাপ দিল। দরওয়াজা খুলে গেল। খুশ বাহার ভেতরে ঢুকে পালঙ্কের ওপর লেড়কিদের ঢঙে বসল।

এবার খুশ বাহার-এর ধৈর্য পরীক্ষা।

নীরব প্রতীক্ষা। কখন তার মনময়ূরী দরওয়াজা ঠেলে কামরায় ঢুকবে। তাকে আলিঙ্গন করে কলিজার জ্বালা নেভাবে।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের কিচির মিচির শুরু হয়ে গেল। ভোরের পূর্বাভাষ। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' ছেচল্লিশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, খুশ বাহার কামরায় ঢুকে পালঙ্কের ওপর বসল। এবার চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কামরাটিকে দেখতে লাগল। তার মনে খটকা লাগল। এত বড় কামরায়ই কি বৃদ্ধা তাকে ঢুকতে বলেছে? এমন বিশাল একটি কামরা তো কারো শোবার কামরা হতে পারে না। ভুল করে অন্য কামরায় ঢুকে কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে বসে নি তো?

তা ছাড়া এক ধারে একটি মসনদও রয়েছে। ডরে তার কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। সে ধরেই নিল—পিয়ারীকে পাওয়ার আগেই তার মোউৎ এসে হাজির হবে। হয় গর্দান যাবে, না হয় শূলে চড়িয়ে জান খতম করবে।

খুশ বাহার ব্যাপারটি নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করল। কিন্তু কোন পথ বের করতে না পেরে নসীব সম্বল করে পালঙ্কের ওপর বসেই রইল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই খেল শুরু হয়ে গেল। কার যেন পায়ের শব্দ তার কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার কোশিস করল। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত। পায়ের শব্দটি তার দিকেই এগোচ্ছে বটে। তার কলিজাটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। ডরে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লার নাম করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক বৃদ্ধা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। বৃদ্ধাটি-ই দাহিয়া—খলিফার বহিন।

দাহিয়া কামরায় ঢুকেই বোরখা পরা এক আউরত-কে পালঙ্কের ওপর বসে থাকতে দেখল। তাজ্জব বনে যায়। দু'পা এগিয়ে এসে বলল—'তুমি কে গা? আর হারেমের মধ্যে বোরখা চাপিয়ে বসে কেন? হারেমে বোরখার জরুরৎ তো নেই। কে তুমি? হারেমে পরপুরুষের যে প্রবেশাধিকার নেই তা-ও তোমার মালুম নেই বুঝি? বল তো, কে তুমি?'

খুশ বাহার-এর মুখ দিয়ে রা সরে না। থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যায়। বলবেই বা কি? আর কি করেই বা বলবে? সে যে দাহিয়ার কণ্ঠ শুনেই পৌনে মরা হয়ে গেছে।

পালঙ্কে বসা বোরখাপরা আউরত-টির কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে দাহিয়া আবার আগের মত স্বাভাবিক স্বরে বলে—'কি গা বেটি, কিছু কইছ না কেন? শরম লাগছে? ধুৎ শরমের কিছু নেই।' এবার হাত বাড়িয়ে নাকাবটি সরিয়ে বলল—'ইয়া আল্লা' কী সুরৎ তোমার! এমন এক মুখ বোরখা দিয়ে ঢেকে রাখছ!'

খুশ বাহার তবু নির্বাক। পাথরের মূর্তির মত বসে রইল।

দাহিয়া বলল—'তুমি খলিফার বাদী? তোমাকে খলিফা বরখাস্ত করেছেন? তোমার কসুর কি ছিল? ঠিক আছে, আমি খলিফাকে বলে কয়ে ফিন তোমাকে বহাল করে দেব। আমি খলিফার সহোদরা। আমার নাম দাহিয়া। কি তোমার তকলিফ আমার কাছে খোলসা করে বল।'

খুশ বাহার এবারও নির্বাক। মুখ নিচু করে, কাঁদো কাঁদো মুখ নিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দাহিয়া এবার আরও কাছাকাছি এগিয়ে যায়। সহানুভূতির স্বরে বলে—'খোল, বোরখা খুলে দাও।' এবার সে ধরতে গেলে জোর করেই তার গা থেকে বোরখা খোলার কোশিস করে। আর খুশ বাহার দু'হাতে মুঠো করে বোরখা ধরে থাকে। ব্যস, দাহিয়া জুলুম করতে লেগে যায়।

দাহিয়া হঠাৎ ভড়কে যায়। বোরখা খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দাহিয়া বুঝল খুশ বাহার-এর বুকটি লেড়কাদের মত সমান। এরকম উমরে লেড়কিদের বুক তো হৃষ্টপুষ্ট আপেলের মত হয়। আপেল তো দুরের কথা, একটি কুলের চিহ্নও নেই। সে তাজ্জব বনে গেল।

খুশ বাহার প্রমাদ গুণল। ভাবল দাহিয়া এবার খোজাদের ডেকে জোর করে বোরখা খুলে তার স্বরূপ আবিষ্কার করে ছাড়বে। উপায়ান্তর না দেখে সে ধপ করে পালঙ্ক থেকে নেমে দাহিয়া-র গোর দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লেগে যায়। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বলে—'আমি মাফি মাঙছি। আমি লেড়কি নই, লেড়কা। হারেমে ঢোকার সুবিধার জন্যই আমাকে এরকম চাতুরির আশ্রয় নিতে হয়েছে। গোস্তাকি মাফ করবেন। আমার বিবি, আমার কলিজা এ-হারেমে বন্দিনীর মত দিন গুজরান করছে।'

—'তাজ্জব ব্যাপার। তোমার বাৎ ঠিক সমঝে উঠতে পারছি না। খোলসা করে বল।'

—'আমার বিবি খুশ নাহার। আমার আব্বা বাঁদীর বাজার থেকে তাকে আর তার আম্মাকে খরিদ করে নিয়ে এসেছিল। আমি তখন সবে পয়দা হয়েছি। আর খুশ নাহার তার আম্মার কোলে। আমার উমর যখন বারো সাল তখন আমাদের শাদী হয়।

আমার বিবি নাহার-এর মত খুবসুরৎ লেড়কি অন্য কোথাও আছে কিনা মালুম নেই, তবে কুফা নগরে অবশ্যই ছিল না। তাই সে কুফার সুবাদারের নজরে পড়ে। সে ছল চাতুরীর মাধ্যমে আমার বিবিকে ভাগিয়ে এন খলিফার হারেমে চালান করে দেয়। খলিফার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাকে জানিয়েছে, বাঁদীর বাজার থেকে সে খুশ নাহার'কে খরিদ করেছে। আর নাহার কোন বাদশাহের লেড়কি এমন বাৎ-ও খলিফাকে সে জানিয়েছে।

এদিকে সে-বৃদ্ধা খুশ বাহার'কে হারেমে ঢুকিয়ে দিয়ে খুশ নাহার'কে তলব করল। সে এলে তাকে খুশ বাহার-এর কামরায় ভেজবে।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' সাতচল্লিশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হলেই বাদশাহ শারিয়ার কিস্সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় আসেন। বেগম কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, খুশ বাহার-এর দুঃখের কথা শুনে খলিফা-র বহিন দাহিয়া দিলে ব্যথা অনুভব করল। সে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল—'বেটা, কোন ডর নেই। আমার দেহে একবিন্দু খুন থাকতে কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। তোমার বিবিকে তুমি যাতে ফিন ফিরে পাও তার কোশিস আমি করব। আর তুমি তাকে ফিরে পাবেও। আমার ভাইজান মহা ধার্মিক। অন্যের বিবি জোর করে ছিনিয়ে এনে ভোগ করার পাত্র তিনি নন। আর এ-ও বলছি বেটা, যদি সুবাদারের কুকর্মের জন্য কুফায় তাঁর এতটুকুও সম্মান ও প্রতিপত্তি হানি হয়ে থাকে, তবে তিনি অবশ্যই তার প্রতিকার করবেন। এতবড় অন্যায়-অবিচার তিনি কিছুতেই হজম করবেন না।

এবার বৃদ্ধা খুশ নাহার'কে নিয়ে তার নির্দ্ধারিত কামরায় এল। কিন্তু হায় খোদা কামরা যে খালি। কোথায় গেল সে? তবে কি কামরা চিনতে না পেরে অন্য কোন কামরায় ঢুকে পড়ল? তবে যে কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে। খুশ নাহার'কে দাঁড় করিয়ে বুড়ি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করে তার খোঁজ করতে লাগল। এত বড় ইমারত। কানাগলির মত পথ। এখানে কোন কামরায় ঢুকে পড়লে তার হদিস পাওয়া সত্যি অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কোথাও খুশ বাহার-এর হদিস পাওয়া গেল না। অনন্যোপায় হয়ে খুশ নাহার চোখের পানি ফেলতে ফেলতে হতাশ জর্জরিত দিল্ নিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এল।

এক বাঁদী এসে খুশ নাহার'কে বলল—'দাহিয়া মালকিন আপনাকে তলব করেছেন।'

ডরে কাঁপতে কাঁপতে খুশ নাহার দাহিয়ার কামরায় গেল। তার ডর ছিল খুশ বাহার নির্ঘাৎ ধরা পড়েছে। এবার উভয়ের বিচার এক সঙ্গে হবে। তাই জরুরী তলব। তার কি হবে জানা নেই। তবে তার স্বামী খুশ বাহার-এর যে গর্দান যাবে এতে কিছুমাত্রও সন্দেহ তার নেই।

বাঁদীটির পিছন পিছন খুশ নাহার দাহিয়ার কামরায় ঢুকতেই দাহিয়া ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এবার পালঙ্কের দিকে তার মুখটি ফেরায়। মুচকি হেসে বলে—'কি গা বেটি, চিনতে পারছ? তোমরা এবার বিরহজ্বালা ভুলে গল্পগুজব কর। আমি আর মিছে তোমাদের পিয়ার মহব্বতের মধ্যে সং-এর মত দাঁড়িয়ে থেকে ঝুট ঝামেলার কারণ হ'ব না।' কথা বলতে বলতে দাহিয়া বাঁদীটিকে নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দাহিয়া বিদায় নিলে খুশ বাহার ও খুশ নাহার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হরদম চোখের পানি ফেলে চলল। আকস্মিক

আনন্দটুকু সামলে নিয়ে কোন কথাই কেউ বলতে পারল না।

এখন খুশ নাহার সুস্থ হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে খবর পেয়ে খলিফা হারেমে এলেন। তার বহিন দাহিয়া তাকে অভ্যর্থনা করল।

খুশ নাহার-এর কাছাকাছি পালঙ্কের ওপর বোরখা পরিহিত অন্য একজনকে দেখে খলিফা বিস্মিত হলেন। নাকাবের ফাঁক দিয়ে তার খুবসুরৎ মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতেই খলিফার দিমাক ঘুরে যাবার জোগাড়। তিনি দাহিয়াকে বললেন—'বহিন, এ খুবসুরৎ লেড়কি কে বটে?'

দাহিয়া নির্দ্বিধায় জবাব দিল—'খুশ নাহার-এর দোস্ত। জিগরী দোস্ত। কুফা থেকে এসেছে। একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাই উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছে।'

—'ইয়া আল্লাহ! শোভন আল্লাহ! একই সঙ্গে দু'-দুটো খুবসুরৎ লেড়কি! এক কাজ কর, এ-নতুন বাঁদীটিকে আমার রক্ষিতার স্থান দিলাম। আমার শাদী করা বেগম বনে সে থাকবে। খুবসুরৎ লেড়কি বটে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাহিয়া বলল—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা বন্দোবস্ত ভাইজান! এর যা সুরৎ তাতে এরকম মর্যাদাই প্রাপ্য। ভাইজান,তোমাকে একটি ছোট্ট কিস্‌সা শোনাচ্ছি। কিস্‌সাটি এক বড় লেখকের কিতাবে এক সময় পড়েছিলাম।'

—'শোনাও। শুনি তোমার কিস্‌সাটি কেমন।'

—'ভাইজান, কুফা নগরে এক নামজাদা বণিক বাস করত। বণিকের নাম বাহার। তার একমাত্র বেটা। নাম তার খুশ বাহার। বচপন থেকে সে তাদের বাড়ির এক বাঁদীর লেড়কির সঙ্গে মানুষ হতে থাকে। তারা তখন ভাইয়া-বহিন-এর মত ছিল। বাঁদীর সে লেড়কির নাম খুশ নাহার। দু'জনই খুবসুরৎ। খুশ বাহার-এর উমর যখন বারো তখন তার বাপজান বলল—'বেটা, তোমাদের দু'জনেরই উমর হয়েছে। এখন থেকে তোমরা আর ভাইয়া-বহিন সম্পর্ক বজায় রাখবে না। আর খুশ নাহার তোমার সহোদরা নয়। সেদিনই তারা প্রথম সহবাস করল। দেখতে দেখতে তাদের উমর বেড়ে গেল। খুশ নাহার সতেরতে পা দিল। তার দেহে তখন যৌবনের জোয়ার। তার সুরৎ আরও খোলতাই হ'ল। তার সুরতের কথা কুফা নগরের সুবাদারের কানে গেল। তার মাথায় কুমতলব ঢুকল। সে এক শয়তানী বুড়িকে প্রচুর সোনার দিনার ইনাম দিয়ে খুশ বাহার-এর বিবি খুশ নাহার'কে ভাগিয়ে নিয়ে এল। ধূর্ত সুবাদার এবার নিজের কাজ হাসিল করার জন্য নাহার'কে দামাস্কাসে খলিফার হারেমে পাঠিয়ে দিল। খলিফাকে ভেটস্বরূপ খুবসুরৎ নাহার'কে ভেজে দিল। সেই থেকে খুশ নাহার খলিফার হারেমে চোখের পানি ঝরাচ্ছে। আর পিয়ারী বিবিকে হারিয়ে খুশ বাহার চোখের পানি ঝরাচ্ছে কুফা নগরে।

তারপর একদিন খুশ বাহার এক হেকিম ও জ্যোতিষীর সঙ্গে বিবির খোঁজে দামাস্কাসে হাজির হয়। সে একদিন জানতে পারল তার কলিজার সমান বিবি খুশ নাহার খলিফার হারেমে বন্দিনী-জীবন গুজরান করছে। তার বিরহে তার বিবিও চোখের পানি ফেলে ফেলে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এবার সে নানা ফন্দি ফিকির করে জানের মায়া তুচ্ছ করে খলিফার হারেমে ঢুকে পড়ল। তার মেহবুবা, তার কলিজার সমান বিবির সঙ্গে মিলন হ'ল।

খবরটি খলিফার কানে গেল। তিনি গুলিখাওয়া শেরের মত ছুটে এলেন হারেমে। হাতে তাঁর কোষমুক্ত তরবারি। তিনি কোন বিচার না করে হাতের তরবারি দিয়ে দু'জনের গর্দান নিলেন। কোন যুক্তিই তিনি দিলেন না। ভাইজান, লেখক কিস্‌সাটি এখানে এভাবে শেষ করেছেন।

খলিফা কিস্‌সাটি শুনে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

দাহিয়া এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'ভাইজান, কিস্‌সার লেখক কিস্‌সাটি শেষ করে কোন মন্তব্যই করলেন না। ভাইজান, একটি বাৎ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাব?'

খলিফা যেন এতক্ষণ কিস্‌সাটির মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি ডুবিয়ে রেখেছিলেন। বহিনের কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে থতমত খেয়ে ব'লে উঠলেন —'কি—'কি? কোন্‌সা বাৎ বহিন?'

—'তুমি যদি খলিফা হতে, তোমার হারেমে যদি এরকম ব্যাপার ঘটতো তবে তুমি খুশ বাহার ও খুশ নাহার-এর বিচার কিভাবে করতে বল তো?'

খলিফা আবদ্‌-অল মালিক ইবন সারবান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'বহিন, আমি নির্দ্বিধায় বলছি, খলিফা অবশ্যই গলতি কাম করেছেন। কোন লোকের গর্দান নেবার আগে তাকে অবশ্যই কিছু না হলেও ব্যাপারটি নিয়ে এক শ'বার ভাবা উচিত ছিল। এমনও তো দেখা যায় জান নেবার আগে সহস্রবার ভাবনা চিন্তার পর তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর আমার কথা যদি জানতে চাও বহিন তবে আমি তরবারি ব্যবহার না করে ফুলের মালাই ব্যবহার করতাম। তাদের মহব্বতের ইনাম স্বরূপ ফুলমালা নিজে হাতে খুশ বাহার আর খুশ নাহার-এর গলায় পরিয়ে দিতাম।'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে খলিফা আবার বলতে শুরু করলেন—'দেখ, ব্যাপারটি এমনভাবে ভাবা যেতে পারে। পহেলা নম্বর তারা আশৈশব মহব্বতের জোরে বাঁধা হয়ে রয়েছে, দুসরা তারা তো তখন খলিফার প্রাসাদে মেহমান। মেহমানের জান খতম করা তো দূরের কথা তাকে মন্দ বাৎ বলাও গুণাহ। তিসরা খলিফাকে সর্বদাই ধীরস্থির ও ন্যায়ের পূজারী হতে হবে, বহিন। অতএব আমার বিচারে ঐ খলিফাকে আমি নির্বোধ, অবিবেচক ও

স্বপদার্থ ছাড়া কোন আখ্যাই দিতে পারি না।'

খলিফার কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর বহিন দাহিয়া তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বলল—'ভাইজান, তুমি না জেনেই তোমার নিজের বিচার করে ন্যায়ের পথকে আঁকড়ে ধরেছ। আমাদের ধর্মাশ্রয়ী পুণ্যাত্মা আব্বাজীর সুযোগ্য বেটা তুমি। তোমার মুখ থেকে আমি বিচারের এরকম রায়ই আশা করেছিলাম।'

খলিফা চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলতে লাগলেন—'আরে বহিন, তুমি এ-করছ কি? ব্যাপার কি? আমার তো কিছুই মালুম হচ্ছে না! তুমি নির্ভয়ে বল, ব্যাপার কি? তুমি তো জান বহিন কারো গুস্তাকিই আমি কোনদিন মাফ করি নি, করবোও না।'

দাহিয়া এবার বোরখায় ঢাকা খুশ বাহার'কে দেখিয়ে বলল—'ভাইজান এ-ই আমার কিস্‌সার নায়ক খুশ বাহার। ছদ্মবেশ ধারণ করে জানের মায়া তুচ্ছ করে তার কলিজার সমান বিবি খুশ নাহার-এর সঙ্গে মিলিত হতে ছুটে এসেছে। ধরা পড়লে জান খতম হবে জেনেও সে কোন পরোয়া না করে তোমার হারেমে ঢুকে পড়েছে। আর যে সুবাদার খুশ নাহার'কে ভাগিয়ে এনে তোমাকে ভেট পাঠিয়েছে সে হচ্ছে কুফা নগরীর বর্তমান সুবাদার শয়তান ইউসুফ অল- থাফাকী। ভাইজান, আশা করি তোমার ইয়াদ আছে, সে তোমাকে লিখেছিল, দশ হাজার সোনার দিনারের বিনিময়ে সে খুশ নাহার'কে এক সওদাগরের কাছ থেকে খরিদ করেছে, ঠিক কিনা? আশা করি তুমি তাকে উচিত শাস্তি দিয়ে ন্যায় বিচারের নয়া নজির স্থাপন করবে। আর এদের গোস্তাকি মাফ করে দেবে। এরা উভয়ে উভয়কে পিয়ার-মহব্বৎ করে, এ-ই এদের একমাত্র গোস্তাকি। আর এরা এখন তো তোমার প্রাসাদে মেহমান। আমার কথা বল্লাম। ভাইজান, এবার তোমার বিচার যা হয় কর।'

—'বহিন, আমার মতামত তো আমি অনেক আগেই ব্যক্ত করেছি।' খলিফা এবার হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে খুশ বাহার আর খুশ নাহার-এর দুটো হাত মিলিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বল্‌লেন—'তোমাদের পুনর্মিলন আমাকেই সবচেয়ে বেশী খুশী করেছে। খোদা-তাল্লা তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন মধুময় করে তুলুন।'

এবার খলিফা খুশ বাহার ও খুশ নাহার'কে সাতদিন নিজের প্রাসাদে মহা আদর যত্নে মেহমান করে রাখলেন।

সাতদিন বাদে বহুমূল্য ইনাম সঙ্গে দিয়ে তাদের কুফা নগরীতে ভেজলেন। আর কুফার সুবাদারকে? তাকে বরখাস্ত করলেন। তার পদে খুশ বাহার-এর আব্বা বাহার'কে নিযুক্ত করে ন্যায় বিচারের নতুন নজির গড়লেন।

কিস্‌সা শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

বাদশাহ শারিয়ার আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বললেন—'বেগম, তোমার কিস্‌সা আমার দিল্ কেড়ে নিয়েছে। রাতের পর রাত তোমার কিস্‌সা শোনার জন্য আমি তৈরী।'

বেগম শাহরাজাদ এবার বললেন—'জাঁহাপনা, এবার যে-কিস্‌সা বলব তা শুনলে আপনার দিল্ খুশীতে ভরে যাবে। কিন্তু আমার ডর লাগে, এভাবে রাতের পর রাত কিস্‌সা শুনলে যদি আপনার মধ্যে অনিদ্রা রোগ ভর করে? এতেই তো আপনার চোখ থেকে নিদ ঘুচে গেছে।'

—'তা হোক বেগম সাহেবা। আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। অনিদ্রা রোগের ডরে তো আর তোমার এরকম কিস্‌সা শোনার লোভ সম্বরণ করা সম্ভব নয়।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভোর হয়ে এল ব'লে। আজ আর নতুন কিস্‌সা শুরু করার সময় নেই। কাল রাত্রে আপনাকে আলা অল-দিন এবং আবু সামাত'-এর কিস্‌সা শোনানোর ইচ্ছা রাখছি।

আলা অল-দিন এবং আবু সামাতের কিস্‌সা

দু'শ' পঞ্চাশতম রজনী

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার কিস্‌সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম শাহরাজাদ নতুন কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, কায়রো নগরে কোন এক সময়ে এক লব্ধ প্রতিষ্ঠ বণিক বাস করত। তার নাম সামস্-অল-দিন তার সদাচারণের জন্য নগরের বণিক সম্প্রদায় থেকে শুরু করে প্রতিটি আদমি তাকে খুব খাতির করত।

বণিকটি এক জুম্মাবারে শাস্ত্রের বিধান অনুয়ায়ী নাপিত ডেকে

মাথা ন্যাড়া করল, গোঁফ চেঁছে ফেলল। সর্বদা সে এরকমভাবে শাস্ত্রের বিধান পালন করে চলত। নাপিতের কাজ শেষ হলে বণিক এবার তার কাছ থেকে আরশি নিয়ে মাথা ও গোঁফ দেখতে গিয়ে ইয়া লম্বা শনপাটের মত সাদা দাড়ি দেখে তার দিল্ মোচড় মেরে ওঠে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে ওঠে সত্যি তবে উমর হয়েছে! সন্ধ্যা না হলেও বিকেল তো অবশ্যই হয়ে গেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল—'হায় বেচারা সামস-অল-দিন, তোমার গোরে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। এবার জিন্দেগীর খেল খতম হয়ে যাবে। কিন্তু জিন্দেগীতে কি তুমি লাভ করলে? ধনদৌলত অনেকই তো কামিয়েছ কিন্তু এসবের কি গতি হবে? জিন্দেগী ভর যদি বালবাচ্চার মুখই না দেখলে তবে ধন-দৌলত কার জন্য রেখে যাচ্ছ? কার ভোগে লাগবে এসব? একদিন তোমার প্রদীপের তেল-ফুরিয়ে যাবে। বাতি যাবে নিভে। ব্যস, সব খেল খতম। তোমার নাম, তোমার স্মৃতি সবায়ের দিল্ থেকে মুছে যাবে। তোমার কোন চিহ্নও রইবে না।'

সামস্-অল-দিন তারপর বিষণ্ন মনে মসজিদে গিয়ে নামাজ সারল। বাড়ি ফিরলে তার বিবি বলল—'কিগা, আজ ফিরতে এত দেরী হ'ল যে?'

সামস-অল-দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'আর বেশী ব্যস্ততায় কি-ই বা লাভ, বল? আমার জিন্দেগীর খুশী-আনন্দের কি-ই বা আছে। যে কয়দিন দুনিয়ায় আছি কোনরকমে জানটাকে টিকিয়ে রাখা ছাড়া কিছু তো নয়।'

বণিকের বিবি স্বামীর এরকম হেঁয়ালীপূর্ণ ঔদাসীন্যে কেমন যেন অকস্মাৎ মিইয়ে গেল। দিল্‌টি বিষিয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে সোহাগ দেখিয়ে বলল—'আজ কি হয়েছে গা তোমার? কথার মধ্যে কেমন যেন হতাশার ছাপ। ব্যাপার কি খোল্‌সা করে বল তো?'

—'খোল্‌সা করে বলার আবার কি আছে?' বেশ একটু রাগত স্বরেই বণিক কথাটি ছুঁড়ে দিল—'আমার যত অশান্তির মূল তো তুমি। হ্যাঁ, একমাত্র তুমিই। রোজ বাজারে যাই। দেখি আমার সমবয়সী সওদাগররা তাদের বালবাচ্চাদের নিয়ে দোকানে আসে। আমার কলিজা মোচড় মেরে ওঠে। বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে যায়। তখন ভাবি, দুনিয়ায় আর থেকে কি-ই বা ফয়দা? এর চেয়ে গোরে গেলে হয়ত অনেক বেশী শান্তি পাওয়া যাবে।'

স্বামীর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তার বিবি বলল—'শোন, সবই খোদাতাল্লার মর্জি। তার মর্জির বিরুদ্ধে তো আমাদের কিছুই করার নেই।'

—'চুপ কর! খোদাতাল্লার দোহাই দিয়ে নিজের —থাক আমাকে একটু একেলা থাকতে দাও। ঝুটমুট আমাকে বিরক্ত করতে এসো না। নিজের কাম কাজ কর গে। চল্লিশ সাল আগে শাদী হয়েছে। আজ পর্যন্ত যে একটি লেড়কা বিয়াতে পারল না তার মুখে আর বড় বড় বাৎ সাজে না। তাদের তো খোদাতাল্লার ওপর দোষ চাপানো ছাড়া আর কোন হিম্মৎ নেই। আমি বহুবার আর একটি শাদী করে নতুন বিবি আনতে চেয়েছিলাম। তুমি বার বারই চোখের পানি ফেলে পথ আগলে দাঁড়িয়েছ। কি ফয়দা হ'ল? আমার জিন্দেগী বরবাদ হ'ল। ব্যস, খেল খতম। তোমার তো নিজে থেকেই বলা দরকার ছিল দেখ, আমার বাল বাচ্চা পয়দা করার হিম্মৎ নেই, তুমি বরং আর একটি শাদী করে শখ মেটাও। তুমি আটকুঁড়ি। তোমার হাতে খাওয়া, তোমার সঙ্গে সহবাস করা তো দূরের কথা তোমার মুখ পর্যন্ত দেখার মত উৎসাহ আমার নেই। তোমাকে ছুঁতে আমার গা ঘিনঘিন করে। তোমার মত বাজা জনানার মুখ দেখলেও অযাত্রা। গুনাহ হয়। তুমি আর আমার সামনে ও-পোড়া মুখ নিয়ে এসে কোনদিন দাঁড়িয়ো না।'

বণিকের বাৎ তার বিবির ইজ্জতে লাগল। সে এবার উগ্রমূর্তি ধারণ করল। রীতিমত রুখে দাঁড়াল—'দেখ, তখন থেকে যা নয় তাই বলে যাচ্ছ। মুখ সামলে বাৎচিৎ বলবে, হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। নিজের হিম্মৎ নেই, আর যত কসুর আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে খালাস হয়ে যাচ্ছে। তোমার শরম হয় না! এক রাত্রির জন্য কি তুমি আমাকে সম্ভোগের সুখ দিতে পেরেছ? আমাকে তুমি 'আটকুঁড়ি', 'বাজা' যা নয় তা-ই বলে গালমন্দ করছ। কিন্তু কেন? কেন আমি লেড়কা বিয়াতে পারছি না একবার চিৎ হয়ে শুয়ে ভেবে দেখ তো।'

বণিক নীরবে দাড়ি হাতাতে থাকে।

তার বিবি ব'লে চলল—'আমি আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি—তোমার হীনবীর্যতার জন্যই আমরা লেড়কা পয়দা করতে পারি নি। আমার কোন গলতি নেই। তোমার হিম্মৎ থাকলে আমি অবশ্যই লেড়কা পেটে ধরতে পারতাম।'

বণিক নীরব চাহনি মেলে বিবির তেজ দেখতে লাগল।

তার বিবি আজ মুখ একবার যখন খুলেছে তখন এর শেষ না দেখে ছাড়বে না। সে এবার বলল—'শোন, আমার বাৎ শোন। লম্বা-চাওড়া বাৎ রেখে ভাল কোন হেকিমের কাছে যাও। নিজের ইলাজ করাও। শুক্র বৃদ্ধির দাওয়াই খাও। যদি তোমার বীর্য বাড়ে তবে দেখবে আমি ঠিক লেড়কা পেটে ধরতে, বিয়াতে পারব।'

বিবির উচিত কথা শুনে বণিক এবার ফুটা বেলুনের মত একেবারে চিপসে গেল।

বার কয়েক ঢোক গিলে বণিক এবার বলল—'কথাটি হয়ত ঠিকই বলেছ বিবি। হয়ত আমার দোষেই আমরা নিঃসন্তান হয়েছি। আমার বীর্যের তেজই বোধ হয় নেই। তেজমরা বীর্যে তো লেড়কা

পয়দা হতে পারে না। তোমার কাছে কোন ঠিকানা আছে বিবি, যার দাওয়াই খেলে বীর্য গাঢ় হয়। শরীর ও দিল্ চাঙা হয়ে ওঠে? সম্ভোগের তৃষ্ণা জাগে?'

—'আমি কি করে বলব? আমি কি হেঁকিমি বিদ্যা জানি নাকি? কতসব বড় বড় হেকিম রয়েছে। তাদের কাছে যাও।'

—'কিন্তু কোথায়, কোন্ হেকিমের কাছে গেলে কাজ হবে—'

তাকে বাৎ শেষ করতে না দিয়েই তার বিবি বলল—'তোমার কত ইয়ার-দোস্ত রয়েছে, তাদের সঙ্গে বাৎচিৎ করলে ঠিক পাত্তা মিলে যাবে। ভাল হেকিমের কাছে পৌঁছতে পারলে—কাজ হাসিল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' একান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, বিবির কথা শুনে বণিকের টনক নড়ল। সে পরদিন দোকান খোলার আগেই এক হেকিমের দরওয়াজায় হাজির হ'ল। দাওয়াই নেয়ার জন্য হাতে করে একটি বাটিও নিয়ে গেছে। আজ যা হোক একটি হিল্লে করে তবে ঘরে ফিরবে।'

বুড়ো হেকিম তার চাঁদির চশমার ফাঁক দিয়ে নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে বণিকের দিকে তাকিয়ে বলল—'কি বিমারি? তকলিফ কি?'

বণিক হাত কচলে, আমতা আমতা করে বলল—'হেকিম সাহেব, এমন এক দাওয়াইয়ের বন্দোবস্ত করে দিন যা খেলে শরীরে তাগদ বাড়ে, শুক্র বৃদ্ধি হয়, বালবাচ্চা পয়দা করা যায়।'

বণিক সামস্-অল-দিন-এর মুখে এমন বাৎ শোনার জন্য বুড়ো হেকিম তৈরী ছিল না। তারমত একজন সদাশয় ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির মুখে এ রকম সব বাৎ শুনে বুড়ো ভাবল, বুঝি বুড়ো মানুষ পেয়ে একটু মজাক করতে এসেছে। তাই বুড়োও মজাক করার লোভ সামলাতে না পেরে ব'লে উঠল—'কী সর্বনেশে কাণ্ড! আর মাত্র একদিন, কালও যদি আসতেন বণিক সাহেব, পুরোটাই আপনাকে দিয়ে দিতে পারতাম। কাল একের পর এক রোগী এসে সবটুকু নিয়ে চলে গেছে। ইস্ কাল আসতে পারলেন না! আদতে ও দাওয়াইয়ের চাহিদা খুব বেশী কিনা। চাহিদা বেশী, কিন্তু যোগান কম হলে যা হয়, বুঝতেই তো পারছেন। খুব শরমের বাৎ। আপনি বরং পাশের হেকিম সাহেবের কাছে যান, হয়ত মিললেও মিলে যেতে পারে।'

বণিক এবার পর পর কয়জন হেকিমের ঘরে গেল। কিন্তু ফয়দা কিছুই হ'ল না। সবাই মুচকি হেসে একই বাৎ বলে তাকে বিদায় করল।

বণিক শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে নিজের দোকানে ফিরে এল। কিছুক্ষণ পর এক মাতাল তার দোকানে এল। দালালী কারবার করে। সামসাম তার নাম। আফিং, চরস থেকে শুরু করে গাঁজা, ভাঙ, সরাব কোন নেশাই তার বাদ নেই। আর ফাজিল কাজেরও শিরোমণি ব'লে পরিচিত মহলে সে চিহ্নিত। কিন্তু বণিক সামস্-অল-দিন'কে ধর্মাশ্রয়ী বলে খুবই সমীহ করে।

দোকানে পা দিয়েই দালাল সামসাম বণিক সামস্-অল-দিনকে মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখে বলল—'কি বণিক সাহেব, এমন মুখ ব্যাজার করে বসে যে, ব্যাপার কি?'

বণিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'সামসাম, আমার নজদিকে এসে বস। আমার দুঃখের কিস্‌সা তোমাকে শোনাচ্ছি।'

দালাল সামসাম এগিয়ে যতদূর সম্ভব বণিকের কাছাকাছি গিয়ে বসল।

বণিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগল—'সামসাম ভাইয়া, আজ থেকে চল্লিশ সাল আগে আমার শাদী হয়েছে। কিন্তু আমার নসীব এতই মন্দ যে, কোন বালবাচ্চার মুখ দেখতে পেলাম না। আমার বিবি বলল—আমার নাকি বীর্যের দোষ হয়েছে। শুক্রহীনতা। লেড়কা পয়দা করার হিম্মৎ নেই। আজ সকালে বাজারের সব ক'টি হেকিমের দরওয়াজায় ঢুঁড়ে বেরিয়েছি। কিন্তু কেউ-ই দাওয়াই দিতে পারল না। সবাই একই বাৎ শোনাল—'কাল ছিল, আজ ফুরিয়ে গেছে।''

বণিকের দুঃখর কথা শুনে সামসাম দুঃখ পেল না, আবার মন খুলে হেসে আনন্দও করতে পারল না। সে বলল—'আপনি এ নিয়ে দিল্ খারাপ করবেন না। এ বিমারির দাওয়াই আমার ভালই জানা আছে। বেশী নয়, একটিমাত্র দিনার আমাকে দিন। সমান পত্র খরিদ করে নিয়ে আসি। তারপর আমি নিজে হাতে দাওয়াই বানিয়ে আপনার ইলাজ শুরু করে দেব। নির্ঘাৎ ফল পেয়ে যাবেন।'

বণিক সোল্লাসে বলে উঠল—'শোভন আল্লাহ! শোন সামসাম, খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, তুমি যদি আমার বিমারি সারিয়ে লেড়কা পয়দা করার হিম্মৎ করে দিতে পার তবে আমি তোমাকে এমন ইনাম দেব যে, তোমার নসীব একেবারে ফিরে যাবে।'

দালাল সামসাম এবার একটির পরিবর্তে দুটো সোনার দিনার নিয়ে বিদায় নিল। কিছুক্ষণ বাদে কিছু সমানপত্র নিয়ে সে ফিরে এল। দাওয়াই বানাল। দাওয়াইয়ের বাটিটি বণিকের হাতে দিয়ে বলল—'রাত্রে নিদ যাওয়ার ঠিক দু'ঘণ্টা আগে এক দাগ খাবেন। তবে দাওয়াই খাওয়ার তিনদিন আগে রোজ একটি করে কবুতরের

দো-পিঁয়াজি খেতে হবে। আরও আছে। আর খাবেন ভেড়ার অণ্ডকোষ ভাজা আর পাকা রুই মছলির কালিয়া। —ব্যস, দেখবেন আপনার শরীরে একেবারে শেরের মত তাগদ আসবে। বালবাচ্চা পয়দা করার মত ক্ষমতা জন্মাবে। যদি আমার দাওয়াই কাজ না করে, ফয়দা না পান তবে আমার মুখে থুথু ছুঁড়ে দেবেন। তবে হ্যাঁ, যা-যা বললাম ঠিক ঠিক মত করবেন।

বণিক ভাবল, লোকটি নেশা-ভাঙ করে দিন গুজরান করে। আর আউরত নিয়ে পড়ে থাকে। এ সব ব্যাপারে তার জ্ঞান গম্যি কিছু থাকলে থাকতেও পারে।

দাওয়াইয়ের বাটি নিয়ে বণিক সামস-অল-দিন ঘরে ফিরল। এবার সামসাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করল।

রোজের খানাপিনার মধ্যে প্রাধান্য পেল কবুতরের দো-পিঁয়াজি, ভেড়ার অণ্ডকোষ ভাজা আর পাকা রুই মছলির কালিয়া।

তিনদিন নিয়ম মাফিক খানাপিনা করার পরই তার শরীর গরম হয়ে উঠল। সত্যি সে যেন শেরের তাগদ লাভ করেছে। এবার এক দাগ দাওয়াই খেয়ে বিবির সঙ্গে শুয়ে পড়ল। মনের সুখে সম্ভোগ করল। তার বিবি তো তার যৌবনশক্তির পরিচয় পেয়ে একেবারে তাজ্জব বনে গেল।

সে-রাত্রেই বণিকের বিবি সন্তানসম্ভবা হ'ল। মাস তিনেক গেলে তারা নিঃসংশয় হ'ল। তিন-তিন মাস তার মাসিক ধর্ম বন্ধ। অতএব বিবির পেটে বাচ্চা এসেছে।

দশ মাস বাদে বণিকের বিবি একটি লেড়কা প্রসব করল। লেড়কাটি খুব তাগড়াই হ'ল। সদ্যোজাত লেড়কাকে দেখলে মনে হয় এর উমর বুঝি এক সালের কম নয়।

লেড়কা জন্মাবার তিনদিন-তিনরাত্রি বাদে মহল্লার সবাই পেটপুরে মিঠাই খেয়ে গেল। সপ্তম দিনে কামরায় নিমক ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

লেড়কা দেখে বণিকের মনে খুশী যেন আর ধরে না। লেড়কাকে কোলে নিয়ে বণিক বলল—'লেড়কার আম্মা, লেড়কার নাম কি রাখবে, ভেবেছ কিছু?'

বণিকের বিবি বলল—'যদি লেড়কি হ'ত তবে আমি একটি জুতসই নাম রাখতাম। লেড়কা পয়দা হয়েছে। অতএব তুমিই এর নাম রাখ।'

লেড়কার বাঁ-উরুতে একটা তিল রয়েছে দেখে বণিক আনন্দে লাফাতে থাকে। অনেক ভেবে চিন্তে সে লেড়কার নাম রাখল—'আলা অল-দিন আবু সামাত। কিন্তু নামটি বড্ড বড়। তাই তার ডাক নাম হ'ল—'আবু সামাত'।

চার বছর বয়সেই আবু সামাত সিংহ শাবকের মত ইয়া মোটাসোটা হয়ে উঠল। পাড়ার লোক, বিশেষ করে বালবাচ্চারা তো তার বাড়িই ছাড়তে চায় না। বণিক তার বিবিকে বার বার বলে বাচ্চাকে একটু সামলে সুমলে রেখো আবু সামাত-এর মা। সবার মন তো আর সমান নয়। নজর লাগতে পারে। তখন কিন্তু আর কেঁদেও কূল কিনারা পাবে না।

বণিকের কথায় তার বিবির টনক নড়ল। এবার থেকে যখন তখন শিশু আবু সামাত'কে আর যার তার সামনে বের করা হয় না। অধিকাংশ সময়ে তাকে অন্দরমহলেই রাখা হয়। পাঁচ পাঁচটি বাঁদী নিযুক্ত করা হ'ল শিশুর পরিচর্যার জন্য। সুলতান-বাদশার হালে সে মানুষ হতে থাকে। বয়স একটু বাড়লে নামজাদা মৌলভীর হাতে আবু সামাত-এর পাঠাভ্যাসের দায়িত্ব দেয়া হ'ল। এখনও তাকে অন্ধকার ঘরে, সবার চোখের আড়ালে রাখা হ'ল।

এক সময় আবু সামাত বাল্যের দিনগুলো ডিঙিয়ে কৈশোরে পা দিল। তার উমর চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরয় পড়ল। গোঁফের রেখা উঁকি দিল। একদিন পরিচারক খানা সাজিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকলটি তুলে দিতে ভুলে গেল। আবু সামাত গুটি গুটি কামরার বাইরে চলে এল। তার দিল্ চায় সবার সঙ্গে বিশেষ করে সমবয়সীদের সঙ্গে একটু-আধটু মেলামেশা করতে। তাই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করল।

আবু সামাত হাঁটতে হাঁটতে তার আম্মার কামরায় চলে এল। তার আম্মা তখন মহল্লার কয়েকটি আউরত এবং লেড়কির সঙ্গে বাৎচিৎ করছে। আচমকা এক উঠতি বয়সের লেড়কাকে কামরায় ঢুকতে দেখে সবাই শশব্যস্ত হয়ে বোরখা টানাটানি করে ঢেকেঢুকে বসার জন্য ব্যস্ত হয় পড়ল।

একজন তো অনুচ্চ কণ্ঠে বলেই উঠল—'ইয়া খোদা, কী বে-আক্কেলে লেড়কারে বাবা! একেবারে বে-ইজ্জতের ব্যাপার! আচমকা জনানাদের কামরায় ঢুকে এল!'

আবু সামাত-এর আম্মা কথাটি যেন শুনতে পায় নি এরকম

ভাব দেখিয়ে, মুচকি হেসে বলল—'এর সঙ্গে বোধ হয় তোমাদের জান পরিচয় নেই। আমার লেড়কা। একমাত্র লেড়কা। এর সামনে শরমের কিছু নেই। দাস-দাসী ছাড়া বাইরের কোন লেড়কা-লেড়কিদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেই নি।'

—'তাই বুঝি? আমরা তো দেখিনি কোনদিন। আপনিও কোনদিন এর কথা বলেন নি।' কথা বলতে বলতে তারা মুচকি হেসে নাকাব সরিয়ে দেয়।

বণিকের বিবি উঠে গিয়ে লেড়কার কপালে ও গালে চুমু খেয়ে বলল—'বেটা এখানে থেকো না। তোমার নিজের কামরায় চলে যাও।'

তার উপস্থিতি সবার মধ্যে অস্বস্তির সঞ্চার করছে দেখে তার আম্মা আরও ব্যস্ত হয়ে তাকে নিজের কামরায় পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার আম্মা বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে ম্লান হেসে বলল—'মহল্লার লেড়কাদের সঙ্গে মিশলে খারাপ হয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় তাকে সর্বদা ঘরের মধ্যেই রাখা হয়। নাহানা, খানাপিনা, লিখাপড়া সবই ঘরের মধ্যে সারে। বড় হয়ে, নিজের ভাল-মন্দ বোঝার উমর না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তাকে মানুষ করা হবে। আবার কোন নষ্ট লেড়কির পাল্লায় পড়েও জিন্দেগী বরবাদ করে ফেলতে পারে। আজই প্রথম তাকে আমার কামরায় আসতে দেখলাম।'

আবু সামাত কামরা ছেড়ে গেলে সবাই বলল—'খুবসুরৎ লেড়কা। বহুৎ আচ্ছা লেড়কা তো হয়েছে আপনার। খোদাতাল্লা একে দীর্ঘায়ু দান করুন।'

এক মাস পরে আবু সামাত আবার তার আম্মার কামরায় এল। দুয়ারে এক নফর এক খচ্চরের জীন-লাগাম পরাচ্ছে দেখে আবু সামাত-এর কৌতূহল হয়। সে আম্মাকে বলে—'আচ্ছা, ঐ জানোয়ারটাকে এরকম করে বাঁধাছাঁদা করছে কেন?'

তার আম্মা বলে, তোমার আব্বার দোকান থেকে ফেরার সময় হয়ে গেছে। তাকে খচ্চরটি আনতে যাবে।

—'আব্বা কি করেন? তার কিসের কারবার? বাজার কোথায়?'

—'বেটা, তোমার আব্বা মস্তবড় এক বণিক, তামাম কায়রো নগরে তার খুবই সুখ্যাতি। পাইকারী কারবার। আর তোমার আব্বা বণিক সমিতির প্রধান। তার অনুমতি নিয়ে তবে বণিকদের কায়রোর বাইরে বাণিজ্য করতে যেতে হয়। তিনি খুবই রইস আদমী।'

—'ইয়া আল্লা! খোদা মেহেরবান, তিনি আমাকে রইস আদমি, সম্ভ্রান্ত বণিকের ঘরে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা আম্মা, আমাকে আর কতকাল এভাবে কামরায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে? কবে আমি আব্বার সঙ্গে দোকানের গদিতে গিয়ে বসতে পারব?'

—'বহুৎ আচ্ছা বাৎ! তোমার আব্বা দোকান থেকে ফিরলে তাঁর সাথে বাৎচিৎ করা যাবেখন। অস্থির হওয়ার কি আছে, বুঝছি না তো!'

সামস-অল-দিন সন্ধ্যার পর দোকান থেকে ফিরলে তার বিবি লেড়কার ইচ্ছার কথা তার কাছে পেশ করল।

সামস-অল-দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'শোন, আমারও মন চায় বেটা আমার সাথ সাথ থাকুক। কিন্তু বোঝ তো, সবাই চারদিকে শকুনের মত চোখ নিয়ে সব বসে। বেটা আমার যদি কারো কুনজরে পড়ে যায়, সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।'

—'তোমার বাৎ আমি মানছি। কিন্তু লেড়কাকে এভাবে ঘরে বন্দী করে রাখলে আখেরে কি ফল দাঁড়াবে তা-ও তো ভাবা দরকার।'

—'বিবিজান বাইরের কোন খোঁজ খবরই তো রাখ না। এই তো সেদিন, ওপাড়ার এক লেড়কার ওপর ডাইনীর নজর পড়েছিল। ব্যস, দু'দিনেই খতম। বালবাচ্চা যত গোরে যায় সবই প্রায় একই কারণে। এর পরও কি তুমি বলবে—।

—'মানছি। তাই বলে লেড়কাকে তুমি বাইরে বেরোতে না দিয়ে ঘরে আটক করে রাখবে? দুনিয়ায় আপন আপন নসীব নিয়ে সবাই পয়দা হয়। ঘরে আটক করে রাখা তো দূরের কথা পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখলেও নসীবের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জো নেই। তা নিয়ে ঝুটমুট ঝামেলা করলে ফয়দা তো হবার নয়। তাছাড়া তোমার উমর বাড়ছে। বুড্ডা হচ্ছ। একদিন না একদিন গোরে যেতেই হবে। তখন তোমার কারবারের মালিকানা তো তোমার বেটার ওপরই বর্তাবে। কায়রো নগরের কেউ আজ পর্যন্ত তোমার লেড়কার মুখ দেখে নি। হঠাৎ একদিন দোকানে গিয়ে বসলে অন্য কারবারীরা তাকে তোমার লেড়কা ব'লে মানবে কি? তোমার কর্মচারীরাও তাকে অস্বীকার করতে পারে, ঠিক কিনা? তারপর কারবারের হালৎ-হালচালও তো শেখা দরকার। আমি না হয় বললাম, এ আমার বেটা। সবাই যদি বলে—না, এ আবু সামাত সামস-অল-দিন-এর ঔরসজাত সন্তান নয়, তখন? তখন তো সরকারের ফৌজদার এসে তোমার দোকানে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে যাবে। তখন তোমার বেটা আর আমার তো তখন ছোবড়া চোষা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না, আবু সামাত-এর বাপ।'

বণিক গম্ভীর হ'ল। বিবির বাৎ শুনে তার কিছুটা হুঁশ হ'ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে—'হ্যাঁ, বাৎ সাচ্চা বটে। আমি তো এদিকটা কোনদিন ভেবে দেখি নি বিবিজান। সাচ্চাবাৎ বটে, আউরতদের বিষয় আশয়ের জ্ঞান খুব পাকা।' এবার আর একটু ভেবে নিয়ে বলল—'সাচ্চাবাৎ বটে। কালই আবু সামাত'কে কারবারে নিয়ে গিয়ে বসাব। সবার সঙ্গে কিছু জান পরিচয় হওয়া খুবই দরকার। কেনা-বেচার তারিকাগুলো সম্বন্ধে জ্ঞানগম্যি থাকা

দরকার। আমার যা তবিয়ৎ, কবে কি হয়ে যায়, কে জানে।'

সামস্-অল-দিন এবার লেড়কাকে ডেকে বলল—'বেটা কাল আমার সঙ্গে দোকানে গিয়ে কারবারের তারিকাগুলো আস্তে আস্তে শিখে নেবে। আমার বাৎ শুনে তোমার দিল্ হয়ত খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠছে। তবে হুশিয়ার। দুষ্ট লোকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবে। কে তোমার দোস্ত আর কে বেইমানী করতে পারে তা তোমার মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে শেখা বিদ্যা প্রয়োগ করে যাচাই করে নেবে।'

কিস্সার এ পর্যন্ত বলার পর ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' চুয়ান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শাহরিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় হাজির হলেন। বেগম কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—জাঁহাপনা, পরদিন ভোরে সামস্-অল-দিন তার লেড়কা আবু সামাত'কে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে বাজারে নিজের দোকানে নিয়ে গেল। দোকানের গদিতে নিজে সামনে বসে, আর লেড়কাকে বসায় পিছনে, আবডালে। দোকানের খরিদ্দার ও পথচারীরা আবু সামাত-এর দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। কেউ বা পঞ্চমুখে তার সুরতের প্রশংসা করে।

সেদিন সে-নেশাখোর লোকটি সামস-অল-দিন-এর দোকানে আসে। তার নেশা তখন একেবারে তুঙ্গে। আবু সামাত'কে দেখে সে চোখ দুটো কপালে তুলে বলে—'কি হে ব্যাপারী, এ কে? আশমানের চাঁদ যে জমিনে নেমে এসেছে। কে, চিনতে পারলাম না তো?'

লোকটি চরস টেনে একেবারে বুঁদ। সে-ই যে দাওয়াই বানিয়ে দিয়ে ব্যাপারীর লেড়কা পয়দা হওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল সে খেয়াল তার নেই। খেয়াল থাকার মত এখন অন্ততঃ তার অবস্থা নয়। সে মস্করা জুড়ে দেয় ব্যাপারীর চুল-দাড়ি সফেদ হলে কি হবে শরীরে এখনও হাতীর তাগদ ধরে নইলে এ-বয়সে এমন খেল দেখাতে পারে কখনও!

একে বলে চরসের নেশা। গাঁজা-চরসের নেশাই এমন পাজী। একবার কোন প্রসঙ্গ শুরু করলে আর তার মুখের লাগাম থাকে না। একই কথা তার জিভের ডগায় চক্কর মেরে বেড়ায়। শুধু নিজে বলেই ক্ষান্ত দিল্ না। পথচারী ও অন্যান্য দোকানীদের ডেকে বলতে লাগল—'এই দেখ, বুড়া হাড্ডির খেল দেখ! অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদের হাট বসিয়েছে ব্যাপারী সামস-অল-দিন।'

মাতালটি নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো রবে হাসতে থাকে। তবে কিছু কিছু দোকানীও তার সঙ্গে তাল যে দিল না তা-ও নয়।

এবার বাজারের দোকানীদের মাথায় ব্যাপারটি খেলতে থাকে। তারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আলোচনা করে, বুড়ো সামস-অল-দিন এ লেড়কাকে পেল কোথায়? লেড়কার এত উমর হ'ল, কেউ জানল না, শুনল না?

দোকানীদের সভায় সামস-অল-দীন-এর তলব পড়ল। মাতাল সামসাম ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল—'সভার মাঝখানে আমি ব্যাপারী সমিতির সভাপতি সামস-অল-দীন-এর ইজ্জৎ হানি করতে চাই না। কিন্তু আপনারা সবাই বিচক্ষণ ব্যক্তি। বিচার-বিবেচনা করে দেখুন—তিনি হঠাৎ চৌদ্দ পনের সাল উমরের লেড়কাকে কোথায় পেলেন? আমার মতে, এরকম এক অসৎ আদমিকে ব্যাপারী সমিতির সভাপতির পদে না রেখে অন্য কাউকে এ-পদে বহাল করা হোক।'

মাতাল হলেও সামসাম অকাট্য যুক্তি দাঁড় করিয়েছে। তাকে খণ্ডন করা কারো পক্ষেই সম্ভব হ'ল না।

ব্যাপারটি অনেক দূর গড়াল বটে। দোকানীরা এবার থেকে সামস-অল-দীন'কে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে লাগল। বাৎচিৎ, হাসি-মস্করা করা তো দূরের কথা কেউ তার দোকানের দিকে তাকায়ও না। একদিন যে নেশাখোর দালাল তার সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল সে-ও ঘাড় ঘুরিয়ে তার দোকানের সামনে দিয়ে চলে যায়।

সামস-অল-দীন অন্ততঃ নেশাখোর দালাল সামসাম-এর এরকম আচরণকে দিল্ থেকে মেনে নিতে পারল না। সেদিন বিকালেই সামসাম তার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় হাঁক দিল—'ও-সামসাম ভাইয়া, আদৎ ব্যাপার কি বল তো? আজ সকালে আমাকে সবাই ফতিয়াহ শুনিয়ে গেল। তোমরা কেউ আমার দোকানের ত্রিসীমানায়ও আসছ না। হয়েছে কি, খোলসা করে বল তো।'

বার কয়েক ক্ষয়কাশের রোগীর মত খুক খুক করে কেশে সামসাম বলল—'কি জানি ভাইয়া, আমি তো কিছু জানি না। কিন্তু

এমন তাজ্জব সব কথা বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে যা কান পেতে শোনা যায় না। শুনলে গা ঘিন ঘিন করে। আপনার মত এক ধর্মাশ্রয়ী এক বুড্ডা আদমির নামে এমন সব বাৎচিৎ শুনে আমারও উল্টি আসছিল।'

সামস-অল-দীন-এর মুখ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কলিজাটি মোচড় মেরে উঠল। নিজেকে একটু সামলে সুমলে নিয়ে এবার বলল—'কিন্তু আমার গুস্তাকী কি তা-তো জানা দরকার। এমন কি গুনাহ আমি করলাম যে, সবাই আমার দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাইছে?'

সামসাম এবার সামস-অল-দীন-এর দিকে ঝুঁকে, গলা নামিয়ে বলল—'দেখুন আমি আপনার জিগরী দোস্ত। আমার কাছে ছাপাবার কিছু নেই, মানছেন তো?'

—'হ্যাঁ, আমিও তোমাকে তামাম দুনিয়ায় আমার জিগরী দোস্ত, সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করি।'

—'তাই যদি হয় তবে মন খোলসা করে বলুন তো, এমন খুবসুরৎ লেড়কাটিকে কোন্ কাজে দোকানে এনে বসিয়েছেন? অন্য সবাই যেসব ঝুট বাৎ চাউর করে বেড়াচ্ছে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছি। সবাই আপনার বিরুদ্ধে পঞ্চমুখে কুৎসা রটাচ্ছিল। একমাত্র আমিই আপনার পক্ষে মোসাবিদা করি। আমি গলা চড়িয়ে বলেছি, বুড্ডাকালে ব্যাপারী সামস-অল-দীন যদি কোন খুবসুরৎ কচি লেড়কার প্রতি আসক্ত হয়েই থাকেন তবে সে খবর সবার আগে আমার কাছেই আসত। কারণ, কায়রো নগরে যেসব বুড়ো হাবরার এসব বিমারি রয়েছে তা আমার নখদর্পণে। আমি ছাড়া কে কচি ও খুবসুরৎ লেড়কাকে জোগান দেবে? ঘাবড়াবেন না সাহাব, আমি বলেছি, কচি লেড়কাটি নির্ঘাৎ তার বিবির কোন নিকট আত্মীয়। তবে আপনার রুচি জব্বর সাহাব। বেড়ে লেড়কা জোগাড় করেছেন। তামাম কায়রো নগর ঢুঁড়ে এলেও এমন খুবসুরৎ কচি লেড়কা দ্বিতীয় আর একটি মিলবে না।'

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' পঞ্চান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, এবার কি বলছি শুনুন—

মাতাল সামসাম-এর মুখ থেকে অপ্রীতিকর বাৎ শুনে সামস-অল-দীন তীব্র প্রতিবাদ করল—'তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, মুখ সামলে বাৎ করবে সামসাম! তুমি কি অতীতের সব বাৎ গুলে খেয়েছ? লেড়কা পয়দা করার দাওয়াই তুমিই না একদিন আমাকে বানিয়ে দিয়েছিলে, ভুলে গেছ?'

—'তা দিয়েছিলাম বটে সাহাব। কিন্তু লেড়কা কি চৌদ্দ-পনের সাল তার আম্মার পেটেই ছিল? কবে তিনি লেড়কা বিয়িয়েছেন, শুনি নি তো। আর এতদিন চোখেও তো দেখি নি।'

—'আমার বাৎ খেয়াল কর সামসাম। তোমার বানানো দাওয়াই খেয়ে আমার বিবি এ-লেড়কা পয়দা করে। তারপর থেকে চৌদ্দ-পনের সাল তাকে আমি কামরায় আটক রেখেছিলাম। শয়তান আদমির কুনজরে পড়ে এ ডরেই আমি তাকে কামরা থেকে বেরোতে দিতাম না। আজ এই প্রথম একে দোকানে এনে বসিয়েছি। কারবার, তারিকা সব জানা দরকার। আমি গোরে গেলে একেই তো কারবার দেখতে হবে। আমার বিষয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী তো এ-ই হবে। তোমাকে বলি বলি করেও এতকাল বাৎটি বলা হয়ে ওঠে নি। তুমিই তো আমার মুখে হাসি ফুটিয়েছ সামসাম, অস্বীকার করতে পারবে না। এই যে এক হাজার সোনার দিনার তোমাকে ইনাম স্বরূপ দিলাম। এই নাও—ধর।'

এবার মাতাল সামসাম-এর পুরো ব্যাপারটি মনে পড়ে। না, আর কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। এ-লেড়কা বুড্ডা সামস-অল-দীন-এরই বটে।

সে এবার দোকানে দোকানে ঘুরে সবাইকে ব্যাপারটি বলে নিজের ভুলের জন্য মাফ চায়। দোকানীরাও সামস-অল-দীন-এর কাছে এসে ত্রুটি স্বীকার করে মাফ চেয়ে যায়।

পরদিন সামস-অল-দীন বাজারের সব দোকানীকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল। তখন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সামস-অল-দীন-এর এক আমীর খদ্দেরও উপস্থিত ছিল। মাহমুদ তার নাম। অগাধ ধন-দৌলতের মালিক।

মাহমুদ মাঝ-বয়সী। অতি অমায়িক সজ্জন।

খানাপিনা সেরে বিশ্রাম করার সময় মামুদ কিশোর আবু সামাত'কে কাছে ডেকে বলে—'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে বেটা? আমরা এতক্ষণ কী সুন্দর এক কিস্‌সা শুনছিলাম! তুমি থাকলে শুনতে পেতে।'

—'কিস্‌সা? কিসের কিস্‌সা? কেমন কিস্‌সা হচ্ছিল?'

—'সে বহুৎ কিসিমের কিস্‌সা। বাগদাদ, দামাস্কাস আর আলেপ্পা প্রভৃতি মুলুকের চটকদার বহু কিস্‌সা। আচ্ছা তোমার আব্বা তো বহুৎ বড় বণিক। অবশ্যই তুমিও তার সঙ্গে বহুৎ মুলুক ঢুঁড়ে বেড়িয়েছ। সে সব মুলুকের কিস্‌সা কিছু বল না শুনি।'

—'আমি? আমি শোনাব কিস্‌সা! শোভন আল্লা! আপনারা হয় তো জানেন না, আমি পয়দা হওয়ার পর থেকে আমাকে কামরায় আটক করে রাখা হয়েছিল। কোন আদমির সঙ্গেই আমাকে মেলামেশা করতে দেয়া হয় নি। সবে দু'দিন আগে আমাকে কামরা থেকে বের হতে দেয়া হচ্ছে। আমার আম্মা জেদ

না ধরলে আব্বাজান আমাকে এখনও দোকানে নিয়ে যেতেন না।'

—'সে কী? হায় খোদা! খোদা হাফেজ! দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধ থেকে তিনি তোমাকে এতদিন বঞ্চিত রেখেছিল? ঘর ছেড়ে না বেরোলে দুনিয়াকে কি বোঝা যায় কখনও?'

—'আপনার বাৎ সাচ্চা, মানছি। কিন্তু ঘরের আকর্ষণ আবার আলাদা।'

—'বেচারা! তুমি বাছা কূপমণ্ডুক হয়েই রইলে। একমাত্র লেড়কিরাই চারদেয়ালে ঘেরা কামরায় আটকা পড়ে থাকে।'

মাহমুদ-এর কথায় আবু সামাত-এর পৌরুষে ঘা লাগে। আম্মার কাছে ছুটে এসে মাহমুদ-এর ব্যঙ্গোক্তির কথা বলে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে—'আমি আর বন্দী-জীবন যাপন করব না। তোমরা আমাকে বাঁধা দিলে একদিন বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মঘাতী হয়ে যাব বলে দিচ্ছি।'

তার আম্মার চোখে পানি দেখা দিল। লেড়কাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল—'আমি তোমার আব্বাজানের সঙ্গে পরামর্শ করব। তিনি যাতে তোমার বিদেশ যাত্রার বন্দোবস্ত করেন, তদ্বির করব। তিনি রাজী না হলে আমি আমার গহনাপত্র বিক্রি করে সওদাগরি সমানপত্র কিনে তোমার পরদেশে যাত্রার বন্দোবস্ত করে দেব, কথা দিচ্ছি।'

এবার আবু সামাত-এর মা বাড়ির নোকরকে ডেকে বলল—'গুদাম খুলে দেখ, কাপড় চোপড় কি আছে। সব বের কর।'

এদিকে মেহমানরা ভোজ খেয়ে বিদায় নিলে সামস-অল-দীন অন্দরমহলে এল।

সামস-অল-দীন দেখল নোকররা গুদাম থেকে কাপড় চোপড়ের গাঁটরি টানাটানি ক'রে বের করছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল, আবু সামাত-এর মায়ের নির্দেশেই তারা এসব করছে।

ব্যস্ত পায়ে সামস-অল-দীন অন্দরমহলে এল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' সাতান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা,—সামস্-অল-দিন বিবির কাছে এসে বেশ একটু রাগত স্বরেই বলল—'এসব হচ্ছে কি শুনি? গুদাম থেকে সব কাপড়ের গাঁটরা বের করা হচ্ছে যে বড়?'

আবু সামাত-এর আম্মা ঠাণ্ডা মাথাতেই জবাব দিল—'শোন তোমার বেটার উমর হয়েছে, সে বাণিজ্যে যেতে চায়, তাই সমানপত্র বের করে দিচ্ছি।'

—'বাণিজ্যে যাবে! সে কী কথা! কোথায় যেতে মন করেছে?'

—'বলছে তো দামাস্‌কাস, বাগদাদ আর আলেপ্পো প্রভৃতি মুলুকে যাবে।'

—'ইয়া আল্লা! বলছ কী বিবিজান! আমি কিছুতেই তাকে পরদেশে যেতে দিচ্ছি না।'

এবার সে আবু সামাত'কে ডেকে বলল—'বেটা, শুনলাম তোমার পরদেশে যেতে মন চাইছে? এসব বদখেয়াল শির থেকে নামাও। আমাদের পয়গম্বরের বাণী—যে নিজের মুলুকে থেকে সুখ-ভোগের সন্ধান করে সে-ই যথার্থ সুখ লাভ করে। নিজের মুলুক ছেড়ে তোমার অবশ্যই—'

আব্বার মুখের বাৎ ছিনিয়ে নিয়ে আবু সামাত বলল—'আব্বাজান, আপনি হয়ত আমাকে আপনার অবাধ্য লেড়কা মনে করবেন, কিন্তু আমি নাচার। যাবো যখন মন করেছি আমি যাব-ই যাব। এতে যদি আমাকে রিক্ত হাতে ঘর থেকে পা ফেলতে হয় তাতেও পিছুপা হ'ব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামস-অল-দিন বলল—'বহুৎ আচ্ছা, আমি পঞ্চাশ গাটরি কাপড়া সাথে দিয়ে দিচ্ছি। কোন্ নগরে, কোন্ কিসিমের কাপড়া বিকাবে সব বাৎলে দেব। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পথ পাড়ি দেবে। খোদাতাল্লা তোমার সহায় হোন। খেয়াল রাখবে, মরুভূমির ভয়ঙ্কর সব কুত্তা জীবন সংশয় করে তোলে। আর বাদাবী ডাক্কুরা যেন তোমার জান খতম আর সমানপত্র লুঠতরাজ না করে।'

ছয়টি উটের পিঠে সমানপত্র তোলা হ'ল। আবু সামাত-এর আম্মা চোখের পানি দিয়ে লেড়কাকে বিদায় জানাল। কামিজের তলা থেকে একটি ছোট্ট পুঁটুলি বের করে লেড়কার হাতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—'এতে এক হাজার সোনার দিনার আছে। বিপদ আপদে কাজে লাগিও। আর উট চালকদের সর্দার কামাল-এর বুদ্ধি পরামর্শ মত কাজ করবে।'

আব্বা আর আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবু সামাত উটের পিঠে উঠল। আবু সামাত বিকেলের দিকে কায়রো নগরের সীমানা পেরিয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

মাহমুদ লোক মারফৎ খবর পেয়েছে আবু সামাত সমানপত্র নিয়ে পরদেশে বাণিজ্য করতে চলেছে। সে তাকে অনুসরণ করল।

কায়রো নগর থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে আবু সামাত-এর সঙ্গে মাহমুদ-এর ভেট হয়। মাহমুদ-এর উট, ঘোড়া আর খচ্চরের এক বিশাল বাহিনী। পথ পাড়ি দিতে দিতে সে স্বগতোক্তি করছে—'মাহমুদ তুমি মরুপ্রান্তরে যথেচ্ছ আচরণ কর। কেউ দেখবে না, আড়িও পাতবে না কেউ। তোমার সঙ্গে এক নিরীহ-নম্র কিশোর। তাকে নিয়ে আনন্দ-সায়রে ডুবে থাক, বাধা দেবার কেউ-ই নেই। দেদার মজা লুঠে নাও।'

আবু সামাত এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাঁবু ফেলল। তার অদূরে তাঁবু ফেলল মাহমুদ। মাহমুদ আবু সামাত-এর উটের দলের সর্দার কামাল'কে ডেকে বলল—'তোমরা তো দলে মাত্র কয়েক জন। আলাদা খানা পাকাবার দরকার নেই। আমার বাবুর্চি যা খানা পাকাবে তা দিয়েই সবার চলে যাবে।'

সন্ধ্যার কিছু পর মাহমুদ কামাল'কে তলব করে বলল—'এক কাজ কর, তোমাদের মনিবকে একবারটি আমার তাঁবুতে আসতে বলবে কি?'

মাহমুদ-এর আমন্ত্রণে আবু সামাত তার তাঁবুতে এল। একা নয়, কামাল এল সঙ্গে। মাহমুদ সন্তুষ্ট হ'ল না। মুখ ব্যাজার করে মামুলি কিছু বাৎচিৎ করল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না।

আবু সামাত আবার তাঁবু তুলে যাত্রা করল। মাহমুদও সদলবলে তার পিছু নিল।

আবু সামাত দিনের শেষে আবার তাঁবু গাড়ল। তার কিছু দূরে মাহমুদ-এর তাঁবু পড়ল। মাহমুদ আবার আবু সামাত'কে তার তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানাল। আবু সামাত এল কিন্তু একা নয়। কামাল তার সঙ্গে এঁটুলির মত লেগে রইল। মহা মুশকিল। আবার মামুলি বাৎচিৎ সেরে মাহমুদ তাকে বিদায় দেয়। এরপর থেকে আবু সামাত যতবার তলব পেয়ে মাহমুদ-এর তাঁবুতে যায় ততবার কামাল ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করতে থাকে। মাহমুদ কিন্তু হতাশ হয়ে হাল ছাড়ল না।

এভাবে নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আবু সামাত দামাস্কাস নগরে উপস্থিত হ'ল। মাহমুদ রইস আদমি। অগাধ ধন দৌলতের মালিক। দামাস্কাস, কায়রো, বাগদাদ এবং আলেপ্পায় তার একটি করে প্রাসাদোপম মকান রয়েছে। ইয়ার দোস্তদের নিয়ে এসব মকানে এসে আনন্দ স্ফূর্তি করে যায়।'

দামাস্কাস নগরের মুখে আবু সামাত তাঁবু গাড়ল। আর মাহমুদ তার নিজের পাক্কা মকানে গিয়ে আশ্রয় নিল। সন্ধ্যার কিছু আগে এক নোকরকে ভেজল আবু সামাত-এর তাঁবুতে। সে আবু সামাত'কে বলল—'আমার মালিক আপনাকে তলব করেছেন। বলেছেন, আপনাকে একেলা যেতে। এক সাথে খানাপিনা সারবেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা। একটু অপেক্ষা কর। আমার উট চালকদের বুড়ো সর্দার কামাল'কে একবারটি জিজ্ঞেস করে আসি।' একটু বাদে ফিরে এসে বলল—'দুঃখিত। আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে একেলা ছাড়তে কামাল-এর মন নাই।'

দামাস্কাসের কারবার মিটিয়ে আবু সামাত আবার তাঁবু তোলে। মাহমুদও তাকে অনুসরণ করে।

এবার আলেপ্পা নগরীতে এসে আবু সামাত তাঁবু গাড়ল।

মাহমুদ এখানে এসেও নোকরকে পাঠিয়ে একই কায়দায় আবু সামাত'কে আমন্ত্রণ জানায়। কামাল-এর নির্দেশে আবু সামাত এবারও একই কারণে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে।

এভাবে বার বার আশাহত হওয়ায় মাহমুদ-এর দিলে জেদ চেপে যায়।

আলেপ্পা ছেড়ে যেখানে আবু সামাত প্রথম তাঁবু ফেলল সেখানে মাহমুদ নিজে হন্তদন্ত হয়ে তার তাঁবুতে আসে। একই কৌশলে তাকে নিজের তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানায়। বলল—'আজ আমার বাবুর্চি বহুৎ কিসিমের মুখরোচক খানা পাকাচ্ছে। দু'জনে এক সঙ্গে বসে খানাপিনা করব, আমার দিল্ চাইছে। আজ আর কোন ওজর আপত্তিই শুনছি না।'

তার মুখের ওপর না বলতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল। আমতা আমতা করে বলল—'ঠিক আছে, যাব।'

আবু সামাত চোস্ত-কোর্তা চাপিয়ে বেরোবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় কামাল এসে পথ রুখে দাঁড়ায়। বেশ চোখ গরম করেই বলে—'বেটা, তুমি দেখছি সাচ্চা বেকুব! তামাম কায়রোর আদমি তাকে 'সর্বভুক' বলে চেনে। একবার ভেবেও দেখলে না, আমি কেন বার বার নিষেধ করছি! আমি তোমাকে কিছুতেই মত দিতে নারাজ।'

—'কিন্তু আমি যে রাজী হয়েছি। সবাই যা-ই বলুক না কেন, সে তো আর আমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে না।'

—'ইতিপূর্বে অনেককে কিন্তু সে চিবিয়েই খেয়েছে বেটা। আমার বাৎ শোন। রুখ যাও।'

আবু সামাত কিছুতেই দমল না। 'জবান দিয়েছে', 'কথার খেলাপ হবে' এরকম সব যুক্তি দেখিয়ে জোর করে সে মাহমুদ-এর তাঁবুর উদ্দেশে ছুটল।

মাহমুদ আবু সামাত'কে নিয়ে একটি তাঁবুতে ঢোকে। টেবিলে হরেক কিসিমের খানা সাজানো। গলা পর্যন্ত ঠেঁসে উভয়ে খানা পিনা সারল। দামী সরাব গিলল পেয়ালার পর পেয়ালা। সরাবের নেশায় মাহমুদ টলতে লাগল। আচমকা মাহমুদ হাত বাড়িয়ে আবু সামাত-এর মুখটিকে নিজের মুখের কাছে নিয়ে আসে। চুমু খেতে চেষ্টা করে। নেশা ধরলেও জ্ঞান তার পুরোমাত্রায় রয়েছে। তার ওপর কামাল-এর কথাগুলো তো মাথায় চক্কর মারছে। সে মাহমুদ-এর মুখটিকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে গর্জে ওঠে—'এসব কি বে-আদবি! পিছিয়ে যান বলছি।'

মাহমুদ-এর মন তখন চাঙা। হিংস্র শেরের মত দু'হাতে আবু সামাত-এর গলাটি জড়িয়ে ধরে। সজোরে তার মুখটিকে কাছে আনতে প্রয়াসী হয়। আবু সামাত ততোধিক বল প্রয়োগ করে মুখ সরিয়ে নিয়ে গর্জে ওঠে—'আপনার মতলবটা কি শুনি? এসব বে-আদবির অর্থ কি? কি চাইছেন?' কথা বলতে বলতে শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে আবু সামাত মাহমুদ'কে এক ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিল। এবার এক ফাঁকে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে।

এদিকে কামাল তার তাবুর বাইরে নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে মাহমুদ-এর তাঁবুর দিক মুখ করে বসেছিল।

আবু সামাত উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ফিরে আসে। কামাল এগিয়ে যায়। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে—'বেটা, কি সমাচার। খোদার কসম, বল তো ব্যাপার কি?'

আবু সামাত কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা আনার চেষ্টা করে করে বলে—'ব্যাপার আবার কি হবেঁ? কিচ্ছু না। বহুৎ খানা পিনা হ'ল। ব্যস, আর কিছু না।'

কামাল তার নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আবু সামাত কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলল—'আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। যত শীঘ্র সম্ভব তাঁবু গুটিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক।'

—'বেটা তুমি মুখে বলছ বটে কিছু হয় নি, যাক গে, সমস্যা হচ্ছে এখন আর ওকে এখানে রেখে আমাদের একা পথ চলা নিরাপদ নয়। আর এ-মরুভূমির পথটিও সুবিধের নয়। বাদাবী ডাক্কুদের হামলা হুজ্জতি প্রায়ই হয়।'

বুড়ো কামাল-এর কথায় আবু সামাত মত পাল্টাল না। রাত্রেই তাঁবু গুটিয়ে তারা বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করল। বাগদাদের ক্রোশ ছয়েক দূরে সূর্য অস্ত গেল। আবু সামাত সেখানে তাঁবু গাড়তে চাইল। কামাল বাধা দিল। জায়গাটি ভাল নয়। সে রাত্রের মধ্যেই বাগদাদে পৌঁছে যাবার পরামর্শ দিল। কারণ, এখানে মরু-কুত্তার খুবই হামলা হয়। একবার তারা দলবেঁধে চড়াও হলে কামড়ে মাংস ছিঁড়ে খেয়ে নেয়। একটু জোর কদমে চললেই নগরের দরওয়াজা বন্ধ হওয়ার আগেই বাগদাদে পৌঁছে যাওয়া যাবে, কামাল বলল।

কামাল-এর যুক্তি আবু সামাত-এর মনঃপূত হ'ল না। সে বলল—'ইয়া আল্লা! মাঝরাত্রে বাগদাদ নগরে পৌঁছব—অসম্ভব। এত ব্যস্ততার কিছু নেই। সকালে সূর্য ওঠার সময় বাগদাদে পৌঁছলে তার শোভা দিল্ খুশ করবে, সন্দেহ নেই। তুমি তো জান চাচা, কেবল সওদা করার উদ্দেশ্যেই আমি মুলুক ছেড়ে বেরোয় নি। আরব-দুনিয়াকে দেখে দিল্ আর চোখকে ধন্য করতে চাই।'

আবু সামাত তো আদতে কামাল-এর মালিক। বেশী ওজর আপত্তি করা ঠিক নয় ভেবে সে মুখে কলুপ এঁটে দিল।

সেখানেই তাঁবু গাড়া হ'ল। রাত্রে খানাপিনার পর সবাই নিদ গেল। আবু সামাত একটি পাকা-বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে তাঁবুর
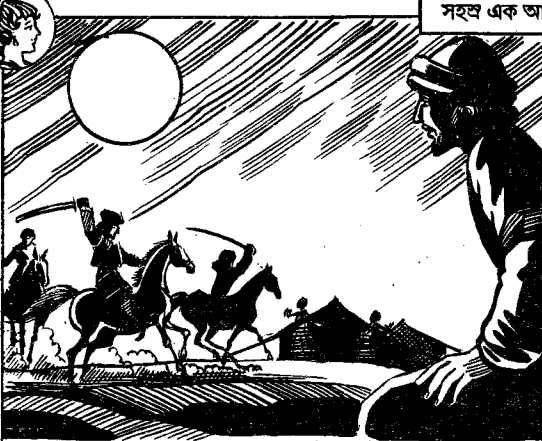
বাইরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। মরুভূমির ফুরফুরে বাতাস আর চাঁদনি রাত তার দিল্‌কে উতালা করে দিল। এক পা-দু'পা করে এগোতে লাগল। আচমকা ঘোড়া হাঁকিয়ে একদল বাদাবী ডাকু আবু সামাত-এর তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরবারির আঘাতে সবাইকে কচুকাটা করে সমানপত্র, খচ্চর ও উটগুলো নিয়ে তারা চম্পট দিল।

আবু সামাত দূরে দাঁড়িয়ে মর্মান্তিক দৃশ্যটি নীরবে প্রত্যক্ষ করল। তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। ভাবল, এখানে থাকা মোটেই আর নিরাপদ নয়। আবার কোন দল হুজ্জতি করতে এসে তাকেও সাবাড় করে দেবে। উপায়ান্তর না দেখে সে একাই রাতের আন্ধারে বাগদাদের পথে হাঁটতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে দামী পোশাক গা থেকে খুলে ফেলে একটি মাত্র কামিজ ও ইজের পরে সে আবার হাঁটা জুড়ল। কামিজে ধূলোবালি মেখে, চুল উসকোখুসকো করে ভিখারীর বেশে সে ভোরের কিছু আগে বাগদাদ নগরের সদর দরওয়াজায় পৌঁছল। সদর-দরওয়াজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এক বাগিচা দেখতে পেল। এক চবুতর পেয়ে গা এলিয়ে দেয়। ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ে।

এদিকে মাহমুদও চুপ করে বসে নেই। অন্য এক আড়াআড়ি পথ ধরে বাগদাদের দিকে এগোতে থাকে। পরদেশীরা এ-পথ জানে না। এ-মুলুকের সব পথই তার নখদর্পণে। আর বাদাবী ডাকুরা এদিকে আসে না। তারা তো ভালই জানে, পরদেশী সওদাগররা সমানপত্র নিয়ে এ-পথে বড় একটা যাতায়াত করে না। মাহমুদ বহাল তবিয়তে সদলবলে বাগদাদে পৌঁছে গেল। নগরে ঢোকার মুখে সবাই বাগিচায় ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে সাফসুতরা হয়ে নেয়। মাহমুদও ক্লান্ত দেহে সবাইকে নিয়ে বাগিচায় ঢুকল। উদ্দেশ্য হাত-মুখে পানি দিয়ে একটু জিরিয়ে নেবে। ফোয়ারার কাছাকাছি গিয়েই সে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিখারীর বেশে আবু সামাত'কে চবুতরের ওপর শুয়ে নিদ যেতে দেখে আঁৎকে ওঠে। এক রাত্রির মধ্যে তার এ-হাল হওয়া যে কল্পনাতীত ব্যাপারই বটে। খুশীতে তার কলিজাটি নাচানাচি শুরু করে দিল। ভাবল—হতচ্ছাড়া কামাল নির্ঘাৎ এখন আর তার সঙ্গে নেই। বাগদাদে তার নিজের মকানে একে নিয়ে তোলা এখন আর কোন সমস্যাই নয়। সব খুইয়ে এখন আর বেগড়বাই করাও এর পক্ষে সম্ভব নয়।

মাহমুদ যখন আপন ভাবনায় মসগুল তখন হঠাৎ আবু সামাত চোখ মেলে তাকায়। এতক্ষণ বিশ্রী একটি খোয়াব দেখছিল। আতঙ্কে নিদ চটে যায়। চোখে-মুখে শয়তানের হাসি ফুটিয়ে মাহমুদ বলল—' কি হে, তোমার এ-হালৎ হ'ল কি করে? এখানে একা শুয়ে যে, হয়েছে কি?'

আবু সামাত উঠে বসল। চোখের পানি ঝরিয়ে গত রাত্রের মর্মান্তিক ঘটনার কথা সবিস্তারে তার কাছে ব্যক্ত করল।

মাহমুদ চোখে-মুখে কৃত্রিম আক্ষেপের ছাপ ফুটিয়ে তুলে বলল—'নসীবে যা ছিল ঘটেছে। কি আর করবে। নসীবের সঙ্গে লড়াই করে জেতা যায় না। সমানপত্রের জন্য ঘাবড়িয়ো না। আমি তার চেয়ে ঢের বেশী সমানপত্র তোমাকে দিয়ে দেব'খন। কি আর করবে। এখানে, আমার এক মকান আছে, জানই তো। চল, নাস্তা সেরে বিশ্রাম করে চাঙা হয়ে নাও। তারপর যা হয় ভেবেচিন্তে স্থির কোরো।'

আবু সামাত আমতা আমতা করতে লাগল। মাহমুদ একরকম জোর করেই তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল।

মকানে নিয়ে গিয়ে মাহমুদ দোকান থেকে ভাল খানা খরিদ করিয়ে আনায়। তারপর আবু সামাত'কে নিয়ে এক সঙ্গে বসে নাস্তা সারে। দামী সরাব পান করতে দেয়। নিজেও কয়েক পেয়ালা গলায় ঢালে। মাহমুদ এবার ষাঁড়ের মত গলায় খিস্তি খেউড়ের গানা গাইতে থাকে। যত্তসব কাঁচা খিস্তি এক জায়গায় জড়ো করে গানের ভঙ্গিতে গাওয়া যাকে বলে। এ ধরনের কথাবার্তা সে কস্মিনকালেও শোনে নি। তার গা-পিত্তি জ্বলে যায়। সে এক লাফে কামরা থেকে বেরিয়ে সদর-রাস্তায় নেমে যায়। মাহমুদ বাধা দিতে চেষ্টা করে। সরাবের নেশা প্রতিবন্ধকতা করে। পা টলতে থাকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে চায়। দেয়াল ধরে কোনরকমে টাল সামলায়। ততক্ষণে আবু সামাত অনেক দূর চলে যায়। জনতার ভিড়ে মিশে লম্বা লম্বা পায়ে সে হাঁটতে থাকে।

আবু সামাত সারা দিনমান পথে পথে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে একটি মসজিদে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যে দু' আদমি তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তাদের এক জন অতি বৃদ্ধ। চুল-দাড়ি সব পাকা। হাতে একটি লণ্ঠন। নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে আবু সামাত-এর দিকে তাকিয়ে বলল—'বেটা, তুমি কি পরদেশী—মুসাফির?'
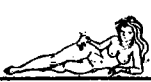
আবু সামাত হাত কচলে বলল—'হ্যাঁ। কায়রো মুলুকে আমার ঘর। আমার আব্বা সওদাগর। তাঁর নাম সামস-অল-দীন। কায়রোর ব্যাপারী সমিতির সভাপতি।'

বৃদ্ধ তার সঙ্গীটির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে এবার নীচু গলায় বলল—'আল্লাহ বোধ হয় আমাদের দিকে নজর দিয়েছেন। নইলে এত সহজে এক পরদেশী যুবককে পাব ভাবতেই পারি নি। ব্যাপারটি তাজ্জবই বটে।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু' শ' একষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, পাকা চুল-দাড়িওয়ালা বুড়োটি, আবু সামাত'কে নিয়ে মসজিদের মেঝেতে বসল। তারপর বলল—'বেটা, বোধ হয় আল্লাতাল্লা-র মর্জিতেই তুমি এখানে হাজির হয়েছ। তোমার কাছে আমার একটি আব্দার আছে বেটা। একটি কাজ তোমাকে করে দিতে হবে। তবে মাগনা করাব না। ইনাম পাবে। পাঁচ হাজার সোনার দিনার নগদ দেব। এক হাজার দিনারের সমানপত্র আর এক হাজার দিনার দামের একটি ঘোড়া পাবে।'

বৃদ্ধের বাৎ শুনে আবু সামাত অবাক মানে। ভাবে তাকে দিয়ে তারা এমন কোন কাজ হাসিল করতে চাইছে যার বিনিময়ে এত কিছু ইনাম দিতে ইচ্ছুক? সে আমতা আমতা করে বলে—'দেখুন, আমার হালৎ এখন ভিখ মাঙ্গার চেয়েও শোচনীয়। অর্থকড়ি আমার দরকার খুবই কিন্তু আমার তো কোন কাজেরই অভিজ্ঞতা নেই। অতএব আপনাদের কোন উপকারে আমি লাগতে পারব বলে মনে করি না।'

—'বেটা, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। তোমার চোখ-মুখ দেখেই আমার মালুম হয়েছে, তুমি পারবে।'

—'কিন্তু কাজটি কি তা-ও তো আমার জানা দরকার।'

—'বেটা ইসলাম ধর্মের নিয়ম কানুন হয়ত তোমার জানা আছে—বিবিকে পহেলা দফে তালাক দেওয়ার পর তিন মাস বাদে তাকে ঘরে তোলা যায়। দুস্‌রা দফে তালাক দিলেও একই নিয়মে তাকে ঘরে তোলা সম্ভব। কিন্তু তিন তালাক সারা হয়ে গেলে তাকে আর ঘরে তোলার বিধান শাস্ত্রে নেই। কিন্তু তার ব্যবস্থাও করে দেওয়া আছে। কারো সঙ্গে সে বিবিকে শাদী দিয়ে দিতে হয়। নতুন স্বামীর সঙ্গে একরাত্রি বাস করতে হবে। তারপর তার দ্বিতীয় স্বামী তিন তালাক দিয়ে দিলে তখন আর প্রথম স্বামীর সঙ্গে নিকা বসার কোন বাধা থাকে না।'

—'সে না হয় বুঝলাম কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, আগে শুনি।'

—'হ্যাঁ বেটা, যে-কথা বলতে চাইছি—কিছুদিন আগে আমার লেড়কির সহিত এর খুব বিবাদ হয়। এর সঙ্গে লেড়কির শাদী দিয়েছিলাম। রাগ সামলাতে না পেরে এ-লেড়কাটি আমার বেটিকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দেয়। ঝামেলা চুকে গেল। আমার লেড়কি বোরখা পরে ফেলল। তার স্বামী তার কাছে পরপুরুষ বনে গেল। লেড়কি আমার মকানে ঘুরে এল। কিন্তু তার তালাক দেওয়া এ-স্বামীটির দিমাক ঠাণ্ডা হলে কপাল চাপড়ে কাঁদতে বসল। চোখের পানি সেই থেকে ঝরিয়েই চলেছে। সব রাস্তা তো তিন তালাকে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ফিকির তল্লাস করে বেড়াচ্ছে। আমি তো জানি, দিমাক গরম করে হঠাৎ কাজটি করে বসেছে। আদতে তারা একে অন্যকে কলিজার চেয়েও পিয়ার মহব্বৎ করে। তা নইলে তিন তালাক দেয়া লেড়কিকে ফিরে পাওয়ার জন্য কেউ এমন উতলা হয়, তুমিই বল বেটা?'

—'সমঝালাম। তারপর?'

—'বেটা, তোমাকে একটু সদয় হতেই হবে। তবে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুবই দৈন্যদশা চলছে তোমার। এমন সময়ে যদি এতগুলো দিনারই কেবল নয়, এক রাত্রের জন্য হলেও খুবসুরৎ একটি লেড়কিকে ভোগ করার সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দাও তবে বোধ হয় তোমার পক্ষে ঠিক হবে না। বেটা রাজী হয়ে যাও। তোমারও অবস্থা ফিরুক আর এ-নওজোয়ানটিও তার কলিজার সমান বিবিকে বুকে ফিরে পাক।'

নিজের শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আবু সামাত অসম্মানজনক ও অপ্রীতিকর প্রস্তাব হলেও বৃদ্ধকে মত দিয়ে দিল।

বৃদ্ধের পাশে বসে থাকা নওজোয়ানটির মুখে হাসি ফুটল। সে আচমকা আবু সামাত-এর হাত দুটো চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠল—'খোদা মেহেরবান! আপনার দোয়ায় আজ আমাদের মস্তবড় এক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ধন দৌলত দিয়ে আপনার এ ঋণ শোধ হবার নয়। আদতে তখন আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। সামলাতে না পেরে ঝোঁকের মাথায় কাজটি করে ফেলি। তারপর দিমাক একটু ঠাণ্ডা হলে নিজেই নিজের হাত কামড়াতে থাকি। মুসলমানের লেড়কা। জবান তো আর পাল্টাতে পারি না। ব্যস, পড়ে গেলাম গাড্ডায়। এবার একটু আমতা আমতা করে নওজোয়ানটি বলল—'দেখুন বাৎচিৎ পাকা হয়ে গেল বটে। আপনার সঙ্গে শাদী মিটেও গেল, কিন্তু যদি রাতারাতি আপনার দিল্ বিগড়ে যায়? যদি আপনি আর তাকে তিন তালাক দিতে রাজী না হন, তখন? বিবির সুরৎ যদি আপনার দিল্ গলিয়ে দেয়! তাই যদি শাদীর আগে লিখিত চুক্তি করে নেয়া যায়

তবে আপনি গররাজী নন তো?'

—'চুক্তি? কেমন হবে সে-চুক্তি, শুনতে পারি কি?'

—'মনে করুন, শাদী হয়ে গেল। আপনি শাদীর পর তাকে আর তিন তালাক দিয়ে ছাড়লেন না। তাই যদি হয় তবে আপনাকে একটি জরিমানা দিতে হবে। স্বাক্ষর করে দেবেন শর্ত ভঙ্গ করলে দশ হাজার সোনার দিনার দিতে আপনি বাধ্য থাকবেন। আমি তখন সে পরিমাণ অর্থ আপনার কাছে দাবী করব। প্রয়োজনে আইনের সাহায্য নেব।'

—'তাই বলুন, এরকম শর্ত?' সরবে হেসে আবু সামাত ব'লে উঠল, আমি এতে এক পায়ে খাড়া। শর্ত ভঙ্গ করলে তবে তো জরিমানা দাবী বা শাস্তির ব্যাপার। পাগল, ও পথই আমি মাড়াচ্ছি না।'

বৃদ্ধ এবার তাদের দু'জনকে নিয়ে কাজীর দরবারে হাজির হ'ল। শাদীর কবুলনামা ও চুক্তিনামা বানানো হ'ল। স্বাক্ষরও হ'ল।

বৃদ্ধ এবার তার নতুন জামাতাকে নিয়ে ঘরে ফিরল। লেড়কিকে সব বৃত্তান্ত খোলসা করে বলল।

লেড়কির আম্মা আবু সামাত'কে বসিয়ে রেখে লেড়কিকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠাবার নাম করে চলে গেল।

এদিকে বেচারী নওজোয়ান পুরনো স্বামী তো হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাঁক হতে লাগল। এক রাত্রির জন্য হলেও তার বিবিকে অন্য এক নওজোয়ান সম্ভোগ করবে, কোন স্বামী সহ্য করতে পারে! উপায়ান্তর না দেখে সে এক ডাইনী বুড়িকে ধরে নিয়ে এল। কথা দিল, প্রচুর ইনাম দেবে। একটি মাত্র রাত্রি বাসর ঘরে থেকে সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর কামকাজ—দাপাদাপি বন্ধ করার জন্য।

এদিকে বাসর ঘরে আবু সামাত পালঙ্কের ওপর বসে স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছে। একটি মাত্র রাত্রির সুযোগ এরই মধ্যে যেটুকু মজা লুঠে নেওয়া যায়।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' বাষট্টিতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হ'লে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, আবু সামাত পালঙ্কের ওপরে বসে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছে।

এমন সময় লাঠি ভর দিয়ে ডাইনী বুড়ি সে কামরায় ঢুকল। আবু সামাত'কে জিজ্ঞাসা করল—'বেটা, যে-লেড়কিটিকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে তাকে কোন্ কামরায় মিলতে পারে বলতো? আর বোলোনা, দাওয়াই মালিশ করে কি আর কুষ্ঠরোগের আরাম করা যায়! কিন্তু তার আব্বা শুনবে না। আমাকে রোজ রোজ রাত্রে এসে দাওয়াই মালিশ করে যেতে হয়। তারা যখন বুঝবে না আমার আর কি—মালিশ করে মজুরি নিয়ে যাব।'

আবু সামাত সচকিত হয়ে বলে—'ইয়া আল্লাহ! কুষ্ঠরোগ।
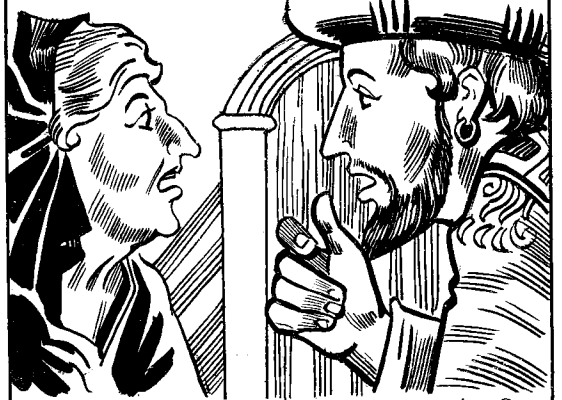
কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে আমাকে রাত্রিবাস করতে হবে? কুষ্ঠরোগীকে সম্ভোগ করতে হবে? খোদা হাফেজ! আমার যে শুনেই কলিজা শুকিয়ে আসছে।'

—'সে কী বেটা, রাত্রি বাস, সম্ভোগ এসব কি বাৎ বেটা? এর মধ্যে এসব আবার কোত্থেকে আসে?' বুড়ি যেন কিছুই জানে না এরকম ভান করে সওয়ালটি ছুঁড়ে দিল।

আবু সামাত বলল—'লেড়কিটির আগের স্বামীর সঙ্গে যে আমার এ-চুক্তিই হয়েছে গো? সে-তো তিন তালাক দিয়ে বিবিকে ছেড়ে দিয়েছে। আবার তাকে ঘরে নেয়ার জন্য পাগলা হয়ে গেছে। তাই একটিমাত্র রাতের জন্য আমি তাকে শাদী করেছি। তাকে নিয়ে রাত্রি কাটাতে হবে। সম্ভোগ টম্ভোগ যা কিছু এক রাত্রের মধ্যেই সেরে নিতে হবে। ব্যস, সকাল হলেই আবার তিন তালাক দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়ার চুক্তি হয়েছে।'

—'সে কী বেটা, কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে রাত্রিবাস, সম্ভোগ—সর্বনাশ, ভুলেও এসব কর্ম করতে যেয়ো না যেন। কুষ্ঠরোগ দারুণ ছোঁয়াচে, জান না? ছুলেই ব্যারামে ধরবে। আমি বুড়ো হয়েছি। গোরে যাবার সময় হয়ে গেছে। পেটের জ্বালা নেভাতে গিয়ে যদি কুষ্ঠরোগ হয়ই, হোক গে। কিন্তু তোমার এমন জোয়ান বয়স, এমন সুরৎ—একটিবার মাত্র সম্ভোগ সুখ লাভ করতে গিয়ে জেনে শুনে জিন্দেগী বরবাদ করে দেবে! বুড়ো মানুষের উপদেশ শোন, ভুলেও যেন তাকে ছুঁতে যেয়ো না।'

আবু সামাত ডাইনী বুড়ির কথা শুনে গোমড়া মুখে গালে হাত দিয়ে বসে রইল। বুড়ি বুঝল দাওয়াইয়ে কাজ হতে চলেছে।

ডাইনী বুড়ি এবার খুঁজেপেতে লেড়কিটিকে বের করল। দরওয়াজা থেকেই রীতিমত হায় হায় করতে করতে সে কামরায় ঢুকল। বলল—'হায়! হায়! হায়! এরকম কাজও কোন বাপ করতে পারে! এমন সুরৎ আর কাঁচা উমর যে-লেড়কির তাকে নাকি এমন দগদগে কুষ্ঠ রোগীর গলায় লটকে দিল! বুঝলাম, লেড়কি না হয় স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের গলার কাঁটা হয়ে বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাই বলে এমন এক আধ-মরার সঙ্গে—ছিঃ ছিঃ ভাবলেও গা-পিত্তি জ্বলে যায়।' এবার লেড়কিটির কাছে এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—'নসীব তোমার এত খারাপ জানতাম না বেটি! ভুলেও যেন ওই কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে রাত্রি কাটাতে যেয়ো না। ঘরে গেলেও তার ধারে কাছেও যেও না যেন। তার সঙ্গে জাপ্টাজাপ্টি করা তো দূরের কথা ভুলেও যেন তাকে ছুঁয়ো না। একটি বারের সম্ভোগ সুখের জন্য জিন্দেগী ভর ওই দুরারোগ্য বিমারি গায়ে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। আমি আরও আনন্দ করে তোমার নতুন স্বামীকে দেখতে এলাম কেমন সুরৎদার। ব্যস, ঘরে ঢুকেই চমকে উঠি। গা ঘিন ঘিন করতে থাকে।'

এদিকে আবু সামাত তার নিত্যকার অভ্যাসমত শুতে যাওয়ার আগে কোরাণের কয়েক পাতা পাঠ করল। এবার তার বিবির জন্য দরজার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। রাত্রি বেড়ে চলল। কিন্তু তার আসার নামটিও নেই।

আবার লেড়কিটি পাশের ঘর থেকে মুগ্ধ হয়ে আবু সামাত-এর সুরেলা কণ্ঠের কোরাণ পাঠ শুনতে লাগল। কোরাণ পাঠ শেষ হলে সে ভাবল, নসীবে যা আছে পরে বিবেচনা করা যাবে। এমন মিষ্টিমধুর যার কণ্ঠস্বর তাকে একবারটি চোখের দেখাও দেখব না! অসম্ভব! এমনও তো হতে পারে বুড়ি কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যা কথা বলে তাকে ভড়কে দিয়ে গেছে। তারপর কি ভেবে সে এবার একটি গানা ধরল।

সামাত পাশের ঘর থেকে মুগ্ধচিত্তে তার মধুঝরা কণ্ঠের গানা শুনতে লাগল। এক সময় সে আপন মনে ব'লে উঠল—'আহা কী মধুর গলা, কী সুন্দর সুর আর তালজ্ঞান। বেহেস্তের হুরীরাও বোধ হয় এমন মধুর গানা গাইতে পারে না। এমন যার গলা সে কি না কুষ্ঠরোগে মরণাপন্ন! বুড়িটি কি তবে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লেড়কিটির বিরুদ্ধে বানিয়ে বানিয়ে ওসব কথা বলে গেল?

লেড়কিটি গানা বন্ধ করলে আবু সামাত এবার একটি গানা ধরল। আড়খেমটা। সে দিল্ উজাড় করে দিল গানার মধ্যে।

এবার গাইতে গাইতে আবু সামাত শুনতে পেল লেড়কিটি তার গানার তালে তালে ঘুঙুর পায়ে নেচে চলেছে। পাশের ঘর থেকে সুর-ছন্দ মাফিক ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ হচ্ছে। আবু সামাত ভাবল, যার সারা অঙ্গে দগ্দগে্ কুষ্ঠরোগ সে কী করে এমন করে নাচছে। রোগে যার অঙ্গ জ্বরো জ্বরো তার দিলে নাচা-গানার ইচ্ছাই বা কি করে আসে? তাজ্জব ব্যাপার তো! হতচ্ছাড়ি বুড়িটি কি তবে তাকে সাচমুচ ধোকাই দিয়ে গেল?

এমন সময় দরওয়াজার পর্দাটি দুম করে সরে গেল। আবু সামাত-এর চোখের সামনে ভেসে উঠল খুবসুরৎ এক লেড়কির মুখ। মুখ নয়ত যেন আসমানের চাঁদ জমিনে নেমে এসেছে। নয় তো বেহেস্তের কোন হুরী এসে দাঁড়িয়েছে তার মুখোমুখি। এমন সুরৎ কোন লেড়কির থাকতে পারে এ যেন ভাবতেও সে উৎসাহ পাচ্ছে না। বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে নিষ্পলক চোখে সে পাথরের মূর্তির মত নীরবে তাকিয়ে রইল।

লেড়কিটি নীরবতা ভঙ্গ করে বলল—'কি গো ভাল মানুষ, অমন হাঁ করে কি দেখছ?' এবার লেড়কিটি চোখের বাণ মেরে বলল —'চল, শোবে চল।'

চোখের বাণ মেরে, মুচকি হেসে লেড়কিটি আবু সামাত'কে এমন ভঙ্গিতে ডাকল যে মুহূর্তে সে মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হ'ল। তার কলিজায় আগুন ধরে যাওয়ার জোগাড়। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'শুতে যাবো? কোথায়? চল, কোথায় নিয়ে যাবে, চল।'

লেড়কিটি এবার বিচিত্র ভঙ্গিতে পাছা দুলিয়ে আগে আগে যেতে লাগল। সামাত পথ চলতে গিয়ে সবিস্ময়ে সাগরের ঢেউয়ের মত তার পাছার নাচন দেখতে লাগল। তার মনে হ'ল, বুকের ভেতরে কলিজাটি যেন উথালি পাথালি করছে। যার পুরুষাঙ্গ নিতান্ত অক্ষম তার মধ্যেও যেন সম্ভোগের শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে।

লেড়কিটিকে দেখার পর আবু সামাত-এর দিল্ থেকে সন্দেহটুকু যেন মুহূর্তে নিঃশেষে উবে গেল। তবু সে চাইল সম্ভোগের আগে, যৌন-মিলনের পূর্ব মুহূর্তে একবারটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে নিলে হয়। আর কিছু নয়, আদতে বিমারিটি তো কুষ্ঠ। সবচেয়ে বেশী ছোঁয়াচে।

লেড়কিটি আবু সামাত-এর দ্বিধাটুকু দেখে তার দিলের কথা যেন বুঝতে পেরে গেছে। সে এবার মুচকি হেসে বলে—'হতচ্ছাড়ি বুড়ি বুঝি তোমার কামরায়ও এসেছিল? ভাল কথা। তোমায় সন্দেহ দূর করে দিচ্ছি, ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই।

লেড়কিটি কামরার দরওয়াজা বন্ধ করে আবু সামাত-এর দিকে গিয়ে দাঁড়াল। ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটিয়ে তুলল। চোখের বাণ মারল। এবার সে তার গা থেকে এক এক ক'রে পোশাক আশাক খুলে ফেলতে লাগল। এক সময় একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে আবু সামাত-এর দিকে ফিরে তাকাল।

আবু সামাত-এর অবস্থা একেবারে শশমিরা। কলিজার

লাফালাফি দাপাদাপি যেন আরও হাজারগুণ বেড়ে গেল। শিরা-উপশিরায় খুনের গতি গেল বেড়ে। হৃদস্পন্দনও সে সঙ্গে অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল। নিজের অজান্তে এক সময় সে বলে উঠল—'শোভন আল্লা! কী সুরৎ, ঢলঢলে ভরা যৌবন। এমন সুরৎ, এমন নিটোল দেহ সম্ভোগ করে গায়ে কুষ্ঠ বরণ করে নেয়া তো দূরের কথা, গোরে যেতে হলেও আক্ষেপ থাকবে না।

লেড়কিটি এবার আবু সামাত-এর সামনে নিজের শরীরটিকে এক চক্কর মেরে নিয়ে বলল—'কি গো, কি বুঝছ, আমার সারা গায়ে দগদগে কুষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ কি?' আবার তার যৌবনের জোয়ার লাগা শরীরটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে গিয়ে বল্‌ল—'কয়েকটি ছোট-বড় তিল ছাড়া আমার শরীরে আর কোন দাগই খুঁজে পাবে না।'

কুষ্ঠের ঘা বা দাগফাগ দেখার মত মানসিকতা আবু সামাত-এর নেই। তার সুপ্ত পৌরুষ অনেক আগেই মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গে কেউ যেন জলবিচুটি মাখিয়ে দিয়েছে। অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা। কিন্তু সে একেবারেই নবীশ—আনাড়ী। কি দিয়ে, কিভাবে কি করতে হয় কিছুই তার জানা নেই। অভিজ্ঞতার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি কোন ইয়ার দোস্তও তার কোনদিন ছিল না যার কাছ থেকে সম্ভোগ—যৌন-মিলনের ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মাতে পারত। পরক্ষণেই সে নিজেকে প্রবোধ দেয়। লেড়কিটি আর তার মত আনাড়ী নয়। সে সময়মত যখন, যা করতে হয় নির্ঘাৎ শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। কুছ পরোয়া নেই।

আবু সামাত দু'পা এগিয়ে আসে। লেড়কিটি অতর্কিতে পিছিয়ে যায়। চোখে-মুখে অভাবনীয় ভীতির ছাপ।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সে বল্‌ল—'না, আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার শরীরে যদি সাচমুচ কুষ্ঠ বিমারি থাকে। তবে? তবে আমার জিন্দেগী যে বরবাদ হয়ে যাবে। পঙ্গু হয়ে জিন্দেগী ভর দুঃখ সইতে হবে।

—'সে কী কথা। কিসের কুষ্ঠ? কে না কে বল্‌ল আমার শরীরে কুষ্ঠ আর অমনি আমার শরীরে দগ্‌দগে ঘা হয়ে যাবে?'

—'ঠিক আছে। আগে তোমার সব কাপড় চোপড় খোল। আমি যেমন দেখালাম সেরকম তোমার শরীরও আমাকে দেখাও।'

—'অবশ্যই, অবশ্যই দেখবে। যাকে দেহসুখ দেবে ও যার কাছ থেকে দেহসুখ লাভ করবে তার শরীরটি নিজের চোখে দেখবে না, তা তো হতে পারে না মেহবুবা।' কথা বলতে বলতে আবু সামাত তার পোশাক খুলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

লেড়কিটি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে স্বামীর যৌবনভরা দেহটিকে দেখতে লাগল। মুহূর্তে তার মধ্যে কামোন্মাদনার সঞ্চার হ'ল। শিরা উপশিরায় খুনে মাতন লাগল। সে উন্মাদিনীর মত ছুটে স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাহুডোরে বেঁধে ফেলল তার নগ্ন দেহটিকে। তার

ঠোঁটের কাছে নিজের ঠোঁট দুটোকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তার ঠোঁটে, গালে আর কপালে ঘন ঘন চুমু খেতে লাগে।

আবু সামাত ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে খাঁক হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে, কি করবে ঠাহর করতে পারছে না। কেবল দু'হাত দিয়ে সাঁড়াশীর মত বিবস্ত্রা লেড়কিটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তার যৌবনভরা আপেলের মত টসটসে বুকের স্পর্শ পেয়ে এক অকল্পনীয় অনুভূতি তার দিলে জেগে ওঠে। মাতন—উভয়ের খুনেই পুরোদমে মাতন লেগে গেছে। কেবলমাত্র দলন ও পেষণে লেড়কিটির দিল্ ভরবে কেন? কিভাবে আরও হাজারগুণ সুখ লাভ হতে পারে তা-তো তার আর অজানা নয়।

লেড়কিটি এবার আবু সামাত'কে জড়িয়ে ধরে রেখেই আচমকা এক আছাড় দিয়ে পালঙ্কের ওপর ফেলে দিল। স্বামীর উলঙ্গ দেহের ওপর এক লাফে উঠে গেল। তারপর তার শরীরের দু'পাশে-পা রেখে বসে পড়ল। এবার দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে ওঠা-বসা ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল। উপোষী ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। এতদিন পেয়েও সে যেন না পাওয়ার বেদনায় তার কলিজাটি জ্বলে পুড়ে খাঁক হচ্ছিল। আজই যেন আদৎ পুরুষ মানুষকে ভোগ করে সে দেহক্ষুধা মিটাতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তার হাঁফ ধরে যায়। ওই অবস্থাতেই স্বামীর ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে। জড়িয়ে ধরে। কি গো তুমি কেমন পুরুষ মানুষ! নিষ্ক্রিয়ই

থাকবে নাকি। সিংহের মত শরীর ও তেজ অথচ নিজেকে এমন করে গুটিয়ে রাখছ কেন? কথাটি বলে সে আবু সামাতকে জড়িয়ে নিয়ে আচমকা পাল্টি খেয়ে যায়। আবু সামাত তার ওপর উঠে পড়ল।

লেড়কিটি আবেশে জড়ানো আধ-বোজা চোখ দুটো মেলে স্বামীর দিকে তাকায়। হাঁটু দিয়ে এক গুঁতো দিয়ে প্রায় ধমকের সুরে ব'লে উঠল চুপ মেরে রইলে কেন? আমি যেমন করলাম অনবরত ঠিক সেরকমটি করে যাও। আমার জ্বালা নেভাও। আমি আর পারছি না। আমাকে ডলে-পিষে একদম শেষ করে দাও। এত সুখ তোমার মধ্যে! এত সুখ আমি আর সহ্য করতে পারছি না! আমাকে চেপেচুপে একদম শেষ করে দাও। তোমার আব্বা ঠিক যেমন করে তোমার মত সিংহশাবকের জন্ম দিয়েছিল ঠিক তেমনটিই কর। আজ আমার একেবারে শেষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।'

এক সময় লেড়কিটি পরম তৃপ্তিতে পালঙ্কের ওপর শরীর এলিয়ে দিল। এক অভূতপূর্ব সুখানুভূতিতে তার দিল্ আর দেহ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে রইল। চোখ দুটো বন্ধ করে তৃপ্তিটুকু পুরোপুরি অনুভব করতে লাগল। ক্লান্ত অবসন্ন লেড়কিটি এক সময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল।

আবু সামাত এবার বিবস্ত্রা লেড়কিটির নিস্তেজ শরীরটিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল। কখন দু'চোখের পাতায় ঘুম জড়িয়ে এসেছিল বুঝতেই পারেনি।

দম্পতির প্রথম আদৎ সুখের রাত্রির অবসান হ'ল। আবু সামাত এক সময় চোখ মেলে তাকাল। আবছা অন্ধকারে দেখল তার সদ্য বিবাহিতা বিবি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কয়েক ঘণ্টা আগে লাভ করা পরম তৃপ্তিটুকু তার চোখে-মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। রাত্রে কথা প্রসঙ্গে সে জেনে নিয়েছিল তার বিবির নাম জুবেদা। আবু সামাত তার বিবির গায়ে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে ডাকল—'জুবেদা, ভোর হয়ে গেছে—ওঠো। ওঠো জুবেদা। আমার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। এবার যে আমাকে বিদায় নিতে হবে।'

আবু সামাত-এর টুকরো টুকরো কথা কানে যেতেই জুবেদা হুড়মুড় করে উঠে বসল। আচমকা স্বামীর দিকে চোখ পড়তেই খুবই শরম লাগল। যন্ত্রচালিতের মত হাত দুটো বুকের ওপর তুলে আকস্মিক শরমটুকু সামলে নেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালাল।

আবু সামাত বল্‌ল—'মেহবুবা, এবার যে আমাকে চলে যেতে হবে। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও।'

আতঙ্ক-মিশ্রিত জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে জুবেদা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। আবু সামাত এবার বল্‌ল—'চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে ছেড়ে যেতেই হবে জুবেদা। আমি যে শর্তাবদ্ধ। না গিয়ে আমার উপায় নেই। তবে এ-ও সত্য পিয়ারী, একটি মাত্র রাত্রির গোটা দুই প্রহরেই আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে ছাড়া আমার জান বাঁচানো অসাধ্য। আমার জান—'

—'শর্ত? কিসের শর্ত? কার সঙ্গে শর্তাবদ্ধ মেহবুব? কিছুতেই তোমার আমাকে ছেড়ে যাওয়া চলবে না।' কথা বলতে বলতে জুবেদা তার স্বামীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—'না, আমি ছাড়বনা। কিছুতেই তোমাকে ছাড়তে পারব না মেহবুব আমার।'

আবু সামাত তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌ল—'মেহবুবা তোমার কি জানা নেই, কি শর্তে আমি তোমাকে লাভ করেছি? তোমাকে সম্ভোগের মাধ্যমে নিজে জীবনের প্রথম ও পরমতম সুখ লাভ করেছি, কোন্ শর্তে, জানা নেই কি? শোন, অবুঝ হয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবলমাত্র একটি রাত্রের জন্য। তোমার আগের স্বামীর সঙ্গে আমি চুক্তিবদ্ধ। সে তোমাকে তিন তালাকের মাধ্যমে হারিয়ে ফিন ফিরে পাবার জন্য উতলা হয়ে পড়েছে। আর তাকে তার অভিলাষ পূর্ণ করতে হলে তোমার আবার অন্যত্র শাদী হওয়ার একান্ত দরকার হয়ে পড়ে। তাই এক রাত্রির শর্তে তোমার আব্বা আমার সঙ্গে তোমার শাদী দিয়েছেন।'

বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে জুবেদা তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

আবু সামাত ব'লে চল্‌ল—'শোন জুবেদা, সব কিছু খোলাখুলি তোমার জানা দরকার রয়েছে। হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম, আমি এবার তোমাকে তিন তালাক দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, তোমার আগের স্বামী তোমাকে নিকা করে ঘরে নিয়ে যেতে পারবে এ-ই ইসলাম ধর্মের বিধান। আমি যাতে বেইমানী না করতে পারি সে জন্য তোমার আগের পক্ষের স্বামী আমাকে দিয়ে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। আর আমি যদি চুক্তি ভঙ্গ করি, তিন তালাক দিয়ে তোমাকে ত্যাগ না করি তবে সে আমার কাছ থেকে দশ হাজার সোনার দিনার দাবী করতে পারবে। আইনের সাহায্য নিয়ে আদায়ও করবে। দশটি দিরহামও যে বের করতে পারবে না সে দশ হাজার দিনারের চিন্তাই তো করতে পারে না। অতএব আমি তোমাকে তিন তালাক না দিলে তোমার আগের স্বামী আমার নামে মামলা রুজু করবে। তখন? মামলায় তো আমাকে অবশ্যই হারতে হবে। বোকামির মাশুল দিতে গিয়ে আমাকে জেলের গারদে ঢুকতে হবে। জেলের ঘানি টেনে বাকী দিনগুলো গুজরান করতে হবে।'

জুবেদার দু'চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। সে স্বামীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। ঠোঁটে, গালে ও কপালে চুমু খেল। তারপর ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—'মেহবুব, কলিজা আমার, তোমাকে ছাড়া আমার জান রাখার কথা ভাবতেই পারি না। একটি মাত্র রাত্রে তুমি আমাকে যে-সুখ দিয়েছ তা জিন্দেগীভর আমার বুকে স্মৃতি হয়ে রইবে। তোমাকে কিছুতেই আমার পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয়।'

—'তুমি বুঝনা পিয়ারী, আমি তোমার আগের স্বামীর সঙ্গে লিখিত শর্তে আবদ্ধ। নিজে হাতে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছি।'

—'তা হোক গে। আমি কথা দিচ্ছি, ফিকির কিছু একটি বের আমি করবই করব। সমস্যা যাতে দূর হতে পারে তার ফিকির—না,

তোমাকে ছাড়তে পারব না। তোমাকে ছাড়ার আগেই যেন আমি গোরে যাই।'

—'তাজ্জব ব্যাপার! এমন কোন্ ফিকির তুমি বের করবে যাতে আমার জান বাঁচতে পারে? আমি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছি, বল্‌লামই তো তোমাকে।'

—'এত সহজে ভেঙে পড়লে কখনও চলে, বল? একটু বাদে আমার আব্বা তোমাকে কাজীর দরবারে নিয়ে যাবে শাদীর কবুল নামা বাতিল করে তিন তালাকের দলিলে স্বাক্ষর করানোর জন্য। তুমি গো-বেচারার মত আমার আব্বার সঙ্গে কাজীর বাড়ি যাবে। তারপর কাজীকে সুযোগ মত বলে দেবে—আমি বিবিকে তালাক দিতে রাজী নই। তোমার বাৎ শুনেই কাজী চমকে উঠবেন। সবিস্ময়ে তোমার দিকে তাকিয়ে কাজী তখন বলবেন—'আহাম্মক কাঁহিকার। সামান্য একটি লেড়কির জন্য নগদ পাঁচ হাজার সোনার মোহর, এক হাজার সোনার দিনার দামের সমানপত্র আর একটি ঘোড়া যার দাম এক হাজার দিনার—সব ছেড়ে ছুঁড়ে দেবে! বেকুব বে-আক্কেল কাঁহিকার!' কাজীর কথায় একদম ঘাবড়াবে না। তার বাৎ খতম হওয়া মাত্র জবাব দেবে—'হুজুর, যাকে তালাক দিয়ে ছেড়ে দিতে বলছেন তার একগাছি চুলের দামই যে দশ হাজার দিনার।'

কাজী তোমার বাৎ শুনেই গম্ভীর হয়ে যাবেন। তারপর একটু-আধটু উষ্মা প্রকাশ করে বলবেন—'বহুৎ আচ্ছা, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। আমার বেগড়া দেবার কিছুমাত্রও কারণ নেই। তবে হ্যাঁ, কানুন তোমার পক্ষ নেবে। কারণ, শাদী করা বিবিকে আইন-সম্মতভাবে ভোগ-দখল করার পুরো অধিকার তোমার রয়েছে। কিন্তু অন্য দিক থেকে তোমাকে এরা গাড্ডায় ফেলতে কোশিস করবে। চুক্তি করেছ। চুক্তি ভঙ্গ করলে তুমি দশহাজার দিনার আক্কেল সেলামি দেবে, চুক্তি করেছ। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছ। চুক্তির অর্থ দিতে না পারলে সোজা গারদে পুরে দেবে।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবু সামাত বল্‌ল—'আরে, এ-কথাই তো আমি এতক্ষণ ধরে তোমাকে বোঝাতে চাইছি বিবিজান। তবে আর তুমি আমাকে কি ফিকির বাৎলালে?'

জুবেদা মুচকি হেসে বল্‌ল—'আরে ঘাবড়াও মাৎ। এবার কি বলছি শোন। কাজী আদতে আদমী হিসাবে বহুৎ আচ্ছা। শিক্ষা-দীক্ষাও বহুৎ নিয়েছে। জ্ঞান-গম্যিও যথেষ্টই। তবে তার একটিমাত্র রোগ রয়েছে—খুবসুরৎ লেড়কা দেখলে তার দিমাক খারাপ হয়ে যায়। কলিজা আছাড়ি পিছাড়ি করে।'

—'ওরে ব্বাস! এখানে এসেও কি 'সর্বভুক'-এর কবলে পড়তে হবে? ইয়া আল্লা! এ আবার কার খপ্পরে পড়তে চলেছি!' চমকে উঠে আবু সামাত অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল।

জুবেদা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'কি

গো, একেবারে চমকে উঠলে যে? পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছু আছে নাকি গো? কোথায়; কার খপ্পরে পড়েছিলে, বল তো।

—'নেই আবার! জিন্দেগী বরবাদ হতে চলেছে, নেই আবার। ইতিপূর্বে আমি ভয়ঙ্কর এক 'সর্বভুক'-এর খপ্পরে পড়েছিলাম। কোনরকমে পিছলে সটকে পড়েছিলাম। এখন ফিন আর এক 'সর্বভুক'-এর পাল্লায় পড়তে চলেছি। অসম্ভব! কভি নাহি হোগা। কিছুতেই আমি পারব না। এ ফিকির বাতিল করে অন্য কোন ধান্দা বাৎলাও। বুড়ো হাবড়া কাজীর লোচ্চামি কিছুতেই আমার দ্বারা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়।'

জুবেদা স্বামীকে আবার সশব্দে চুমু খেল। আঙুল দিয়ে চুলের বিলি কাটতে কাটতে বল্‌ল—'কেন এত সহজে ভেঙে পড়ছ, বল তো? তোমার দিল্‌কে শক্ত করার ওপর আমাদের দু'জনের শান্তি-সুখ নির্ভর করছে, বুঝছ না কেন! শোন, কাজী যখন আক্কেল সেলামীর দশহাজার দিনার দিয়ে দিতে বলবে তখন তুমি দু'পা সরে গিয়ে কাজীর গা-ঘেঁষে দাঁড়াবে। কাঁদো কাঁদো সুরে বলবে,—'হুজুর, মেহেরবানি করে আমাকে কিছু সময় দিন।' দেখবে, তোমার গায়ের ছোঁয়া পেয়ে কাজী গলে একেবারে জল হয়ে যাবে। আর দুম করে একেবারে আশাতীত সময় তোমাকে দিয়ে বসবে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে জুবেদা এবার বল্‌ল—'কিছু দিন সময় পেলে ধীরে সুস্থে যা হোক ফিকির একটি হয়েই যাবে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! বেড়ে ফিকির বাৎলেছ!'

এমন সময় এক নোকর এসে আবু সামাত'কে ডেকে নিয়ে গেল। জুবেদা-র আব্বা তাকে কাজীর কাছে নিয়ে গেল। কাজী অবিশ্বাস্য বন্দোবস্ত করে দিল। এক চোটে দশদিন সময় দিয়ে দিল। আরও বল্‌ল—'দশদিন পরও যদি আক্কেল সেলামির দশহাজার দিনার শোধ করতে না পার তবে ভেবো না, আমিই না হয় তা শোধ দিয়ে দেব।'

আবু সামাত কাজ হাসিল করে ফিরে এসেছে শুনে জুবেদা আনন্দে গদগদ হয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ জোরদার খানাপিনার বন্দোবস্ত করল।

রাত্রে নাচা-গানার বন্দোবস্তও হ'ল। নাচা-গানা যখন পুরোদমে চলছে তখন দরওয়াজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। সামাত দরওয়াজা খুলে দিতে পা-বাড়ায়।

খলিফা হারুণ অল-রসিদ এক পারসীক দরবেশের ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর উজির জাফর, সভাকবি আবুনাসাব এবং দেহরক্ষী মাসরুর'কে নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে বাগদাদের পথে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

জুবেদাদের বাড়ির দরওয়াজার কাছাকাছি এসে খলিফা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। উজির জাফরকে বল্লেন—'তোফা! তোফা! বহুৎ আচ্ছা গানা হচ্ছে! চল দেখি ব্যাপার কি।'

আবু সামাত দরওয়াজা খুলে দেখে চারজন পারসীক দরবেশ। দরবেশদের একজন বল্ল—'যদি মেহেরবানি করে একটু গানা শোনার বন্দোবস্ত করে দাও—দূর থেকে গান শুনে দিল্‌টি নেচে উঠল কিনা।'

—'তাতে কি আছে, আসুন ভেতরে আসুন।' তাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে আবু সামাত হাত কচলে বল্ল—'আমাদের গান আপনাদের দিল্‌কে স্পর্শ করেছে শুনেই আমরা খুশী। আদতে আমরা কেউ-ই পেশাদার গাইয়ে নই। আজ আমাদের খুশীর দিন কিনা, তাই দিল্ খুলে একটু গানা-বাজনা—' পারসী দরবেশদের সর্দার গোছের আদমি অর্থাৎ খলিফা বললেন—'খুশীর দিন? ঠিক মালুম হ'ল না তো। কিসের খুশী? কেন এমন দিল্‌জোড়া খুশী, বলতো বেটা!'

আবু সামাত এবার তার আপন মুলুক কায়রো নগর থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর থেকে শুরু করে কাজীর কাছে আক্কেল সেলামির দশ হাজার দিনার দেয়ার জন্য দশদিনের সময় পাওয়া পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সবিস্তারে বর্ণনা করল।'

আবু সামাত-এর চেহারা ছবি, কথা বলার কৌশল, সৌজন্য বোধ এবং নিরীহ নম্র ও সহজ সরল আচরণে পারসী দরবেশের পোশাকধারী খলিফা হারুণ-অল-রসিদ যারপরনাই মুগ্ধ হন। তিনি মুচকি হেসে বল্লেন—'বেটা দশ হাজার দিনারের জন্য ঘাবড়িয়ো না। আমরা সবাই কোশিস করে তোমার দেনা শোধ করে দেব।'

আবু সামাত হাত কচলে বল্ল—বহুৎ সুক্রিয়া, আপনাদের সহানুভূতির কথা জিন্দেগীভর স্মরণ রাখব।'

—'দেখ বেটা, রাত দুপুরে অর্থকড়ির ঘ্যান ঘ্যানানি আর ভাল লাগছে না। যার জন্য তোমাদের বিরক্ত করতে এসেছি। তোমার বিবিকে বল আচ্ছা দেখে দুটো গানা শুনাতে।'

জুবেদা তার কিন্নর কণ্ঠে একের পর এক মিষ্টি মধুর গানা গেয়ে চল্‌ল। কি করে যে রাত্রি কেটে গেল কেউ বুঝতেই পারল না। জানালার পাশের গাছের ডালে পাখিরা কিচির মিচির করে ভোরের পূর্বাভাষ ঘোষণা করল।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ কামরা ছেড়ে যাবার আগে একশ সোনার মোহরের একটি পুঁটুলি খাটের কোণায় চুপি চুপি রেখে পথে নামলেন।

ভোর হলে আবু সামাত সোনার মোহরের পুঁটুলিটি দেখতে পেল। এমন সময় দরওয়াজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সে এগিয়ে গিয়ে দরওয়াজা খুলতেই দেখে পঞ্চাশটি খচ্চর সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের পিঠেই সমানপত্র। আর একটি তাগড়াই খচ্চরের পিঠে বসে রয়েছে আবু সিনার বান্দা। খুবসুরৎ নওজোয়ান।

আবু সামাত'কে দেখেই নওজোয়ানটি খচ্চরের পিঠ থেকে এক লাফে নেমে নতজানু হয়ে তাকে আদাব জানিয়ে বল্ল—'আমি কায়রো থেকে আসছি। আপনার আব্বাজান আপনার বিবির জন্য পঞ্চাশ হাজার দিনারের উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। আর এ-চিঠিটি আপনার জন্য—' কথা বলতে বলতে সে আবু সামাত-এর হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিল।

আবু সামাত চিঠি খুলে পড়তে লাগল। চিঠির বক্তব্য—তার আব্বা লোকমুখে তার বিপদের কথা শুনে বড়ই ভাবিত। ডাকুদের হাতে সবকিছু খুইয়ে নিঃস্ব অবস্থায় পরদেশে কিভাবে দিন গুজরান করছে তা নিয়েই সে ভেবে অস্থির। তার বিবির জন্য পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যের উপঢৌকন পাঠিয়েছে। আর তার আম্মা পাঠিয়েছে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি।

তারা সবচেয়ে বেশী মর্মাহত হয়েছে সে অর্থাভাবে কোন এক তালাক দেওয়া লেড়কিকে শাদী করায়। শুধু তা-ই নয় তাকে তিন তালাক দিয়ে আবার তার আগের স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে বলে। রুচিশীল সম্ভ্রান্ত আদমীদের কাজ এ নয়। শাদী হয়ে যাওয়ার পর সে তো তার আইন সম্মত বিবি হয়ে যায়। অতএব সে নিজ ইচ্ছায় তাকে ত্যাগ না করলে কেউ-ই তাকে স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে তামাম দুনিয়ায় এমন কোন আইন নেই। বিবি যদি সত্যই তার পছন্দ মাফিক হয়ে থাকে তবে কিছুতেই যেন সে তাকে ত্যাগ না করে। আর সালিম-এর সঙ্গে যা কিছু পাঠিয়েছে তার অর্থমূল্য পঞ্চাশ হাজার দিনারেরও বেশী। যদি দরকার হয় এ থেকে শর্তের অর্থ মিটিয়ে দিয়ে বিবিকে যেন যথোচিত সম্মানের সঙ্গে ঘরে নিয়ে যায়।

চিঠিটি হাতে নিয়েই আবু সামাত এক দৌড়ে তার বিবির কাছে যায়। তাকে চিঠিটি দেখায়। আর বলে তার আগের স্বামীর দশ

হাজার দিনার এখন অনায়াসে শোধ দিতে পারবে।

জুবেদা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার কোশিস করে। ঠিক তখনই জুবেদা-র আব্বা তার আগের জামাতাকে নিয়ে কামরায় ঢোকে।

জুবেদা জিভ কেটে সসঙ্কোচে আবু সামাত'কে ছেড়ে দু'পা সরে দাঁড়ায়।

জুবেদা-র আব্বা বলে—'বেটা সামাত, তুমি আমার জামাতা বাবাজীর কথা কিছু ভাব। রাগের মাথায় সে না হয় আমার বেটিকে তিন তালাক দিয়েই দিয়েছিল। সবই তো তোমাকে বার বার বলা হয়েছে। এখন সে আমার বেটির বিরহে একেবারে মুষড়ে পড়েছে। তুমি তার বিবিকে ফিরিয়ে না দিলে তার পক্ষে এখন জান টিকিয়ে রাখাই সমস্যা। তুমি যদি ওর বাঞ্ছা পূরণ কর তবে সারা জিন্দেগী তোমার বান্দা হয়ে থাকবে। তুমি কি চাও ওর জিন্দেগী বরবাদ—'

তাকে কথাটি খতম করতে না দিয়েই আবু সামাত বলে উঠল—'দেখুন, এ কী তাজ্জব বাৎ বলছেন! কে, কার জিন্দেগী খতম করতে পারে? আর কে-ই বা জিন্দেগী ভর কারো বান্দা হয়ে থাকে, বলুন! এসব হচ্ছে গিয়ে মামুলি বাৎ। এবার কাজের কথা শুনুন, আল্লাহ্-র দোয়ায় এখন আমার আর অর্থাভাব নেই। তাই জুবেদা-র আগের পক্ষের স্বামীকে শর্তের চেয়ে অনেক বেশী অর্থ দিতে চাচ্ছি। পথে সমানপত্র নিয়ে পঞ্চাশটি খচ্চর দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখে আসুন। সবই আমি তাকে দিয়ে দিচ্ছি। সে সঙ্গে বান্দা সালিম'কেও উপরি পাওনা হিসাবে পেয়ে যাবে। আর একটি বাৎ, আপনারা জুবেদার সঙ্গে বাৎচিৎ করে দেখুন, সে কি চায়। সে যদি এর সঙ্গে ঘর করতে রাজী থাকে তবে আমি নিঃশর্তে তাকেও ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাব। আমি কোন কিছুতেই গররাজী নই।'

জুবেদার আব্বা আবু সামাত-এর বাৎ শুনে তাজ্জব বনে গেল। যেন একেবারে আশমান থেকে পড়ল। এবার দু'পা' এগিয়ে গিয়ে

জুবেদা-র কাছে গেল। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌ল—'বেটি, তোমার কি মত, খোলসা ক'রে বল। তুমি কার সঙ্গে ঘর করতে মন করেছ? তোমার বিরহে তোমার প্রথম পক্ষের স্বামী যে পাগলা হয়ে খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছে। তোমাকে ফিরে পাবার জন্য কবুল করেছে। আমার বাৎ শোন বেটি, গোস্‌সা হলে এমন কথা, এমন কাজ অনেক স্বামীই করে থাকে। দিমাক ঠাণ্ডা হলে পস্তায়। এর হালাৎ-ও হয়েছে ঠিক তা-ই। তুমি জিদ ছাড়। একে মাফ করে দাও। আবার নতুন করে তোমরা দু'জনে ঘর-সংসার শুরু কর।'

জুবেদা কামিজের কিনারায় আঙ্গুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বল্‌ল—'আব্বা, এখন আর আমি জিদটিদের কথা ভাবছি না। আসলে যাকে নিয়ে এতদিন ঘর করলাম সে একেবারেই বেকুব। বলতে পার কাণ্ডজ্ঞানরহিত। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, ও একটি দিনের জন্যও তোমার বেটির দিল্‌কে খুশী করতে পারেনি, পারেনি মুহূর্তের জন্যও মুখে হাসি ফোটাতে। তুমি আমার আব্বা, এর চেয়ে খোলাখুলি তোমাকে কি করে বোঝাই, দিমাকে আসছেনা, আর আমার নতুন স্বামী-সে সত্যিকারের মরদ। একটি লেড়কিকে খুশী করতে যা কিছু দরকার সবই তার মধ্যে রয়েছে। এতদিন আমি যে-যৌবনজ্বালা নিয়ে পলে পলে দগ্ধ হচ্ছিলাম একটিমাত্র রাত্রের দুটি প্রহরের মধ্যে ও আমার কলিজার জ্বালা-যন্ত্রণায় পানি ছিঁটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। আমি পরম তৃপ্তি লাভে দিল্ ভরিয়ে নিয়েছি। জিন্দেগীতে যে এত খুশী, এত আনন্দ আর এত পরিপূর্ণ তৃপ্তি আছে আগে জানতাম না। আমার আগের স্বামী নিতান্ত পঙ্গুর মত পথ চলতে গিয়ে মাঝ-পথেই পা হড়কে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত। সে না পেত আত্মতৃপ্তি, না পারত আমাকে তৃপ্তি দিতে। তারপর অতৃপ্তির জ্বালা কলিজায় নিয়ে উভয়ে রাতভর নিরবচ্ছিন্ন ছটফটানির মধ্যে দিয়ে কাটাতাম। সকাল হ'ত। আবার আসত রাত্রি। আবার শুরু হ'ত না পাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া। আকুল হয়ে তৃপ্তি চাইতাম। কিন্তু রাত্রি কাটত শূন্যতা আর হতাশার মধ্যে। আমি আজ নতুন ক'রে জীবনকে উপভোগ করার নিশানা পেয়েছি। তুমি আব্বা হয়ে বেটিকে কি সে পথ থেকে ফিরে এসে আবার হতাশার সাগরে ডুব দিতে বলছ? তার চেয়ে ওকে বরং অন্য জায়গায় ধান্দা করতে বল। আমাকে জিন্দেগীর সুখটুকু নিঙড়ে নিতে দাও।'

জুবেদা-র বাৎ চলাকালীনই তার আগের স্বামী কপাল চাপড়ে, হায়, আল্লা ব'লে মেঝেতে বসে পড়ল।

আবু সামাত তার মনমৌজী বিবিকে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল। প্রতিটি রাত্রি তাদের কাছে যেন নতুন ব'লে মনে হয়ে চলেছে। তাদের কারোরই চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সামান্যতম ফাঁক রইল না। নিরবচ্ছিন্ন খুশীতে তাদের জিন্দেগী তিলে তিলে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে চল্‌ল।

আবু সামাত আর জুবেদা-র শাদীর পর নয়দিন কেটে গেল। দশমদিন সকালে আবু সামাত বল্‌ল—'কী তাজ্জব ব্যাপার, দেখেছ বিবিজান! ওই চারজন দরবেশ, বিশেষ করে তাদের দলের সর্দারটি কী ধাপ্পাই না দিয়ে গেল। হতচ্ছাড়া বলে গেল, তোমার আক্কেল সেলামির দশ হাজার দিনার আমরা সবাই মিলে বন্দোবস্ত করে দেব। ব্যস, তারপর একেবারে বে-পাত্তা! তার ভরসায় থাকলে আমাকে গারদে ঢুকতে হ'ত।'

সন্ধ্যার আন্ধার নেমে আসার কিছু পরে আবু সামাত-এর ঘরে গানা বাজনার মজলিস বসল। পুরোদমে গানা চলেছে এমন সময় দরওয়াজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। আবু সামাত দরওয়াজা খুলেই দেখে সেই চারমূর্তিমান দরবেশ দাঁড়িয়ে। সে চোখে-মুখে বিদ্রূপের ছাপ ফুটিয়ে ব'লে উঠল—'ধাপ্পাবাজদের বাদশারা আসুন—আসুন। খোদাতাল্লার দোয়ায় আপনাদের সাহায্য ছাড়াই আমার মুশকিল আশান হয়ে গেছে। অর্থের সমস্যা ইতিমধ্যেই মিটিয়ে ফেলতে পেরেছি।' এবার মুহূর্তের জন্য ভেবে বল্‌ল—'আপনারা যতই ফেরেববাজ, ধাপ্পাবাজই হোন না কেন আমার গরীবখানার মেহমান তো বটে। আসুন, ভেতরে এসে বসুন আর দিল্ ভরে গানা-বাজনা শুনে যান।'

আবু সামাত এবার জুবেদার দিকে ফিরে বল্‌ল—'আমাদের সে-ফেরেববাজ মেহমানরা এসেছেন। আচ্ছা গানা কিছু গেয়ে শোনাও। আন্ধার রাতে তকলিফ করে এদের আসাটি যেন পুষিয়ে যায়।'

জুবেদা সাধ্যাতীত দরদ দিয়ে, দিল্ উজাড় করে গানা গাইল। তার গানা শুনে মেহমান দরবেশরা খুশীতে ডগমগ।

গানা থামালে খলিফার সভাকবি আবু নাসার এবার ঠাণ্ডা গলায় আবু সামাত'কে মুচকি হেসে বল্‌ল—'তুমি কি করে বুঝলে যে, তোমার আব্বা মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে কায়রো থেকে তোমার জন্য পঞ্চাশটি খচ্চর আর ঐসব সমানপত্র পাঠাতে পেরেছেন? তোমার কি মালুম নেই যে, যত সংক্ষিপ্ত পথ ধরে, যত শীঘ্র পথ পাড়ি দিয়েই আসা যাক না কেন পঁয়তাল্লিশ দিনের আগে কায়রো থেকে কিছুতেই বাগদাদে আসা সম্ভব নয়?'

—'হ্যাঁ, ঠিক বটে।' ঘাড় নেড়ে ফ্যাকাসে মুখে আবু সামাত জবাব দিল।

—'এবার বিবেচনা কর, মাত্র দিন দশেক আগে তুমি ডাকুদের হাতে তোমার আদমিদের ও সমানপত্র খুঁইয়েছ। এত কম সময়ে তার কাছে খবরটি কি ক'রে পৌঁছল, একবার ভেবেও দেখলে না? হিসাব জুড়লে দেখা যাবে এখান থেকে কায়রো যেতে দেড় মাহিনা লাগবে। আবার কায়রো থেকে ফিরতেও দেড় মাহিনার ব্যাপার। এবার হিসাব জোড় তো—তিন মাহিনা হয় কিনা?'

—'শোভন আল্লাহ! বহুৎ গলতি হয়ে গেছে হুজুর। এরকম ভাবনা তো আমার দিমাকে আসে নি! আদৎ কথা কি জানেন হুজুর? বিপদের মুখে এতসব সমানপত্র আর আব্বাজানের চিঠি হাতে পেয়ে আমার দিমাক ঘুরে গিয়েছিল। খুশীর মেজাজে আমার বুদ্ধি-বিবেচনা বিলকুল গাড্ডায় ঢুকে গিয়েছিল। এবার মেহেরবানি করে বলুন তো, এতসব সমানপত্র কে পাঠিয়েছিলেন?'

মুচকি হেসে হারুণ অল-রসিদ-এর সভাকবি এবার বল্‌ল—'শোন আবু সামাত, তোমার সুরতের সমান তোমার মগজ যদি থাকত তবে তুমি খলিফার উজিরের পদলাভ করে তাঁর পাশাপাশি অবস্থান করার যোগ্যতা লাভ করতে। যাকগে তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বলছি—'ইনি খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর উজির মান্যবর জাফর আলি বারসাকী, আমি তাঁরই সভাকবি আবু নাসার আর ঐ যে দেখছ, সে খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর। আর যিনি একটু আগে কামরা ছেড়ে গেছেন তিনি স্বয়ং মহামান্য খলিফা হারুণ-অল-রসিদ। এবার তোমার দিলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, খলিফা তোমার মধ্যে এমন কি দেখলেন যার জন্য দরাজ হাতে তোমাকে খয়রাতি দিতে গেলেন? এ সওয়ালের একটিই জবাব, তোমার খুবসুরৎ চেহারা, মিষ্টি-মধুর আচরণ আর অনন্য আদব কায়দাই খলিফার দিলে দাগ কেটেছে।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই খলিফা হারুণ অল-রসিদ আবার ঘরে ঢুকলেন।

আবু সামাত আনত মস্তকে খলিফাকে কুর্নিশ ক'রে করজোড়ে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, বান্দার গোস্তাফী মাফ করবেন। আমি অবিবেচকের মত বাৎ বলে আপনার ইজ্জতে ঘা দিয়েছি। আপনার মহানুভবতার যে পরিচয় পেয়েছি, চরম সঙ্কট থেকে আপনি যে আমার জান ও ইজ্জত রক্ষা করেছেন সে বাৎ জিন্দেগীভর আমার দিলে গাঁথা থাকবে।'

বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্তে আবু নাসার এগিয়ে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'আবু সামাত, ইয়াদ থাকে যেন—কাল ভোরে খলিফার সঙ্গে অবশ্য দরবারে দেখা করবে।'

সকাল হ'ল। জুবেদা স্বামীকে খলিফার দরবারে যাবার জন্য নিজে হাতে সাজ পোশাক পরিয়ে তৈরী করে দিল। খলিফা হারুণ-অল-রসিদ তাঁর পার্ষদদের নিয়ে দরবারে মসনদে বসে। আবু সামাত সেখানে হাজির হয়ে আনত মস্তকে খলিফাকে কুর্নিশ সেরে তার পায়ের কাছে ছোট্ট একটি বাক্স রাখল। তাতে খলিফার প্রেরিত খয়রাতি সামগ্রীর মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভাল নক্সাযুক্ত একটি উপহার আছে।

খলিফা উপস্থিত পার্ষদদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'আজ থেকে এ-কিশোর আবু সামাত'কে আমার সুলতানিয়তের সওদাগর সভার সভাপতির পদে অভিষিক্ত করছি।'

খলিফার হুকুমে তামাম বাগদাদ নগরে ঢোল পিটিয়ে সওদাগর সভার নবনিযুক্ত সভাপতি আবু সামাত-এর নাম ঘোষণা করা হ'ল।

আবু সামাত খলিফার বদান্যতা লাভ করে তাঁর কাছাকাছি পাশাপাশি থাকার সুযোগলাভে ধন্য হ'ল।

আবু সামাত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'হায় আবু সামাত, তোমার বাসনা পূরণ হ'ল না। তুমি চেয়েছিলে বাগদাদ বাজারে বড়সড় একটি দোকান খুলে বসবে। তোমার সে-বাসনা অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল। তুমি বনে গেলে একেবারে সওদাগর সভার সভাপতি!'

কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রাসাদের প্রধান সরাবজী দেহ রাখলেন; বেহেস্তে চলে গেলেন। খলিফা এবার আবু সামাতকে আর একটু পদোন্নতির সুযোগ দান করলেন। তাকে প্রধান সরাবজীর পদে বহাল করলেন।

একটি রাত্রিও ভালভাবে কাটতে পারল না। সকালে দরবারে এসে এক রাজকর্মচারী খলিফাকে কুর্নিশ করে খবর দিল—'জাঁহাপনা, প্রাসাদের প্রধান সচিবের দেহাবসান ঘটেছে।'

দরবারে আবু সামাত-এর তলব হ'ল। সে পড়ি কি মরি করে দরবারে হাজির হ'ল। খলিফা বললেন—'আবু সামাত, আজ থেকে তোমার ওপর প্রাসাদের প্রধান সচিবের দায়িত্বভার অর্পিত হ'ল। প্রাসাদের সার্বিক দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পিত হ'ল। এ সুবাদে আজ থেকে তোমার বেতনও দ্বিগুণ করা হ'ল।'

কিসসার এ-পর্যন্ত বলতে না বলতে ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' সাতষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার উপস্থিত হলে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন—' শুনুন জাঁহাপনা, আবু সামাত খলিফার প্রাসাদে সারাদিন থেকে প্রধান সচিবের দায়িত্ব পালন করতে লাগল। কেবলমাত্র রাত্রিটুকুর জন্য নিজের ঘরে বিবির কাছে ফিরে যায়।

একদিন খলিফা আবু সামাত'কে বললেন—'আজ প্রাসাদে নাচা-গানার মজলিশের আয়োজন কর।'

সন্ধ্যার কিছু পরে শুরু হ'ল নাচা-গানার মজলিশ। পর্দার আড়াল থেকে খলিফার এক বাঁদী সুরেলা কণ্ঠে গানা ধরল। গানার কথা ও সুরের মূর্চ্ছনায় সবাই মশগুল। আবু সামাত-ও একেবারে মাতোয়ারা। খলিফা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্‌লেন—'কি হে আবু সামাত, ব্যাপার তো সুবিধের বোধ হচ্ছে না। মালুম হচ্ছে, তুমি আমার বাঁদীর সুরৎ আর সুরের মূর্চ্ছনায় একেবারে মজে গেছ!'

আবু সামাত মুচকি হেসে জবাব দিল—'জাঁহাপনা যদি মজেন তবে তো নিয়ম মাফিক বান্দাও মজতে বাধ্য।'

'না, না দোস্ত, হাল্কা কথায় পাশ কাটিয়ে গেলে তো চলবে না। আমি খুশী হয়ে আজ থেকে এ-বাঁদীকে তোমার হাতে তুলে দিলাম।'

খলিফা এবার খোজাকে তলব করলেন। সে এলে হুকুম করলেন—'এক কাজ কর, দিল কা পেয়ার-এর ধন দৌলত আর সমানপত্র যা কিছু আছে সব এ হুজুরের ঘরে দিয়ে আয়। আর গানা শেষ হলে তাকেও চল্লিশজন দাসী-বাঁদীসহ তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবি।'

আবু সামাত প্রায় হাতে পায়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—'খোদা মেহেরবান, জাঁহাপনা এ-অধমের প্রতি এ-অবিচার ভুলেও করবেন না। জাঁহাপনার ভোগের সামগ্রী স্পর্শ করে আমি দোজাকের পথ সাফসুতরা করে রাখতে চাই না। এ যে আমার পক্ষে ভাবাই গুনাহ!'

খলিফা হেসে বললেন—'তোমার ডর কোথায় আমার বুঝতে বাকী নেই। তোমার বিবি আর একটি লেড়কিকে ঘরে তুল্‌লে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরবে, ঠিক কি না?'

—'না, জাঁহাপনা, সেরকম ডর আমার নাই।'

এবার খলিফা উজির জাফর'কে হুকুম করলেন, দশ হাজার দিনার দিয়ে বাঁদী-বাজার থেকে একটি খুবসুরৎ বাঁদী খরিদ করে নিয়ে আসার জন্য। বৃদ্ধ উজির জাফর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে খলিফার মুখের দিকে তাকাল।

খলিফা এবার বল্‌লেন—'আবু সামাত-এর কাজে খুশী হয়ে তোমার খরিদ করা বাঁদীকে ইনামস্বরূপ তাকে দেব।'

খলিফার হুকুম তামিল করতে উজির আবু সামাত'কে নিয়ে বাঁদী-বাজারে গেল। বাঁদীর মেলা দেখিয়ে সে বল্‌ল—'আবু সামাত, বাজার ঢুঁড়ে দেখ। তোমার পছন্দ্ মাফিক একটি বাঁদী খরিদ কর। দাম যা লাগে তার জন্য আমি আছি।'

সেদিন কোতোয়াল আমির খলিদ বাঁদী-বাজারে এসেছে তার

একমাত্র লেড়কার জন্য পছন্দ মাফিক খুবসুরৎ একটি বাঁদী খরিদ করতে। লেড়কাটি তার সঙ্গেই রয়েছে। বছর চৌদ্দ উমর। হুতুম পেঁচার মত থ্যাবড়া মুখ। হোঁদল কুতকুতের মত চেহারার আদল। তারা যে লেড়কির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে-ই নাক সিঁটকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাই উপায়ান্তর না দেখে বাঁদী-বাজারে হাজির হয়েছে। পেঁচামুখো লেড়কাটার নামও জব্বর—বড়ফট্টাই। কোতোয়ালের বিবিই জোর জুলুম করে তাকে বাঁদী-বাজারে পাঠিয়েছে।

বড়ফট্টাই-এর আম্মা নাকি গতরাত্রে আবিষ্কার করেছে লেড়কার শরীরের পুরুষত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। বিছানার চাদরে দাগ। স্বপ্নদোষ হয়েছে। তাই ঠেলেধাক্কে লেড়কাকে সঙ্গে দিয়ে কোতোয়ালকে বাঁদী-বাজারে পাঠিয়েছে।

এবার দালালরা একের পর এক বাঁদী এনে কোতোয়ালের লেড়কা ও আবু সামাত'কে দেখাতে লাগল। কিন্তু কোনটিকেই ডাঁশা-আনকোরা বলে কারো মনে হ'ল না।

কিছুক্ষণ বাদে দালালদের সর্দার এক লেড়কিকে নিয়ে এল। তাকে দেখামাত্রই বড়ফট্টাই-এর জিভ দিয়ে পানি গড়াবার উপক্রম হ'ল। তার আব্বাকে বল্‌ল—'এটিই একমাত্র ডাঁশা মাল। একেই আমি খরিদ করতে চাই।'

আবার বাঁদীটিকে আবু সামাত-এর কলিজায়ও নাড়া দেয়। সে উজিরকে বলে—'একে নেয়া যায়। জব্বর লেড়কি।'

উজির জাফর বাঁদীটির দাম জিজ্ঞাসা করলে দালালদের সর্দার বল্‌ল—'জী পাঁচ হাজার দিনার।'

বড়ফট্টাই সঙ্গে সঙ্গে ছয় হাজার দিনার হেঁকে বসল। আবু সামাত হাঁকল—আট হাজার দিনার।

এবার সাড়ে আট হাজার দিনার হেঁকে বসল বড়ফট্টাই।

আবু সামাত বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, নয় হাজার এক দিনার আমার দর রইল।'

এবার উজির জাফর মুখ খুল্‌ল—'আমি পুরোপুরি দশ হাজার দিনার।'

শেষ পর্যন্ত আর দর না ওঠায় দালালদের সর্দার দশ হাজার দিনার নগদ বুঝে পেয়ে বাঁদী যুঁই'কে বিক্রি ক'রে দিল।

ব্যাপারটি বড়ফট্টাই সহ্য করতে না পেরে বাজারময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

আবু সামাত বাঁদী যুঁইকে নিয়ে ঘরে ফিরল। জুবেদার-এর সঙ্গে সদ্য কেনা বাঁদী যুঁই-এর আলাপ করিয়ে দিল। স্বামীর পছন্দ মাফিক খরিদ ক'রে আনা বাঁদীকে অবজ্ঞা করতে না পেরে কাছে ডেকে গল্প করল, নাম-ধাম জিজ্ঞাসাবাদ করল।

সামাত জুবেদার-এর আচরণে মুগ্ধ হয়। বাঁদীকে দ্বিতীয় বিবি হিসাবে গণ্য করা হবে জুবেদা'কে সে বল্‌ল।

জুবেদা বাঁদী যুঁইকে নিজে হাতে সাজগোছ করে স্বামীর কামরায় পাঠাল। আবু সামাত-এর সঙ্গে সহবাস করায় প্রথম রাত্রেই যুঁই অন্তঃসত্ত্বা হয়।

এদিকে কোতোয়াল পড়ল মহাফাঁপরে। লেড়কা বড়ফট্টাইকে কিছুতেই সামালাতে পারছেনা। তার এক বাৎ—ঐ বাঁদীকে আমার চাই-ই-চাই। নইলে আমি নিজের হাতে জান খতম করব।'

লেড়কার কাণ্ডকারখানা দেখে তার আম্মা গলা ছেড়ে কাঁদতে বসে গেল। কাঁদবেই তো। একমাত্র লেড়কা আত্মহত্যা করলে সে কাকে নিয়ে থাকবে? জিন্দেগী যে বরবাদ হয়ে যাবে। তার কান্না শুনে মহল্লার অনেকেই ছুটোছুটি করে এল। সমবেদনা জানাল। বহুভাবে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কেউ আবার একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলল—'একজনের মুখের গ্রাস হতচ্ছাড়াটি কি করে যে কেড়ে নিল, তাজ্জব ব্যাপার!'

মহল্লার যারা দুঃখ প্রকাশ করতে ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে এক শয়তানী বুড়িও ছিল। তাকে সবাই সিঁধেল চোর আহমদ-এর আম্মা বলেই জানে। তার শয়তানী বুদ্ধি ও কাজকর্মের জন্য মহল্লার সবাই সমীহও করে খুবই। তবে ভক্তিতে অবশ্যই নয়, ডরে। বড়ফট্টাই-এর আম্মাকে শয়তানী বুড়িটি বল্‌ল—'বেটি ঘাবড়াও মাৎ। তোমার লেড়কার সাধ আমি পূরণ করে দেব। জানই তো, আমার বেটা আহমদ পহেলা নম্বরের সিধেঁল চোর। সে পারে না এমন কাজই নেই।'

বড়ফট্টাই-এর আম্মা বুড়ির হাত দুটো চেপে ধরে চোখের পানি ঝরিয়ে বল্‌ল—'তবে যে করেই হোক আমাকে কাজটি হাসিল করে দেয়ার কোশিস কর। তোমার বেটাকে দিয়ে বাঁদী যুঁই'কে চুরি করিয়ে আন। নইলে আমার লেড়কাকে আর জিন্দা রাখা যাবে না।'

—'কিন্তু বেটি, আমার ইচ্ছা থাকলেও নাচার। তোমার স্বামী যে আমার বেটাকে কয়েদখানায় আটকে রেখেছে। সে বাইরে থাকলে এ-কাজ তার কাছে একেবারে মামুলি।'

রাত্রে শোবার আগে কোতোয়ালের বিবি খুব ক'রে সাজগোছ করল। চোখে সুরমা টানল, দামী সালোয়ার-কামিজ চাপাল। আতর ছিঁটিয়ে দিল সারা গায়ে। বাতাস পর্যন্ত খুসবুতে ভরে গেল। সে স্বামীর কামরায় যাওয়া মাত্র তার স্বামী কোতোয়াল নওজোয়ানের মত অত্যুগ্র আগ্রহ সহকারে বিবিকে বুকে টেনে নিল। লাস্যময়ী জনানা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। স্বামীকে বলে—'তুমি কথা দাও আমার একটি অনুরোধ রাখবে।'

কোতোয়াল খালিদ-এর কলিজা তখন দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। আর খুনে লেগেছে মাতন। সে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল—'খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, তুমি যা বলবে আমি তা-ই করব। তোমার মর্জি অবশ্যই পূরণ করব।'

—'আহমদ-এর বুড়ি মা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চলেছে। লেড়কার শোকে সে আজ গোরে যেতে বসেছে। তাকে খালাস করে দিতে হবে, বল রাজী?'

প্রৌঢ় খালিদ-এর ক্লেদ ইতি মধ্যেই নির্গত হয়ে গেছে। তবু বল্‌ল—'জবাব যখন দিয়ে ফেলেছি, খেলাপ করতে পারব না আহমদ'কে কয়েদখানা থেকে খালাস করে দেব।'

পরদিন সকালে কোতোয়াল খালিদ কয়েদী আহমদ'কে নিয়ে খলিফার দরবারে হাজির হ'ল। খলিফা তার বৃত্তান্ত শুনে তার হাতকড়া খুলে দেয়ার আদেশ করলেন। আর কোতোয়াল'কে বল্‌ল—'এর বুদ্ধি বিবেচনা পাকা। আর চুরি, ডাকাতি আর রাহাজানি প্রভৃতি কাজের ফন্দিসন্দি ভাল জানে। অতএব একে আমি কোতোয়াল-প্রধানের পদে নিযুক্ত করলাম।

আহমদ অবনতমস্তকে খলিফা'কে কুর্নিশ করল। একেই বলে নসীব। কেবলমাত্র কয়েদখানা থেকে মুক্তিই নয় কোতোয়ালের চাকরি জুটে গেল।

আহমদ খুশীতে নাচতে নাচতে ঘরে ফিরল। তার আম্মা বল্‌ল—'বেটা, এবার একটি কাজ যে করতে হবে তোকে।'

বুড়ি এবার বড়ফট্টাইর ঘটনাটি লেড়কার কাছে বল্‌ল—'যুঁইকে যে করেই হোক চুরি করে বড়ফট্টাইর ঘরে তুলে দিতে হবে।'

আহমদ তার আম্মাকে আশ্বাস দিল। সামান্য কাজটি সে শীঘ্রই সেরে দেবে। সেদিন ছিল মাসের পয়লা তারিখ। সে তারিখে খলিফা তাঁর প্রধান বেগমের কামরায় যান। রাত্রিবাস করেন।

সন্ধ্যায় কিছু পরে খলিফা খোশ মেজাজে তাঁর প্রধানা বেগমের কামরায় গেলেন। কামরাটির পাশেই ছোট্ট একটি খালি কামরা। সে-কামরায় খলিফা তাঁর গলার রত্নহারটি খুলে রাখলেন। বহুমূল্য মণি মাণিক্য তাতে। আর এমন সব হীরা যা আন্ধারে চকচক করে। আর একটি অত্যাশ্চর্য বাতি কামরার আন্ধার কেটে যায়।'

খলিফা তাঁর রত্নহার খুলে বেগমের কামরায় গেলেন। এদিকে আহমদ প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢোকে। গুটিগুটি ছোট্ট কামরাটিতে ঢুকে রত্নহারটি নিয়ে চম্পট দিল।

রত্নহারটি নিয়ে আহমদ এবার সোজা আবু সামাত-এর মকানে হাজির হয়। ভেতরে ঢুকে যায়। কামরার পিছনের দেয়ালের একটি শ্বেত পাথরের টুকরো খুলে ফেল্‌ল। এবার রত্নহারটি সেখানে রেখে পাথরটিকে আবার আগের মতই বসিয়ে দিল। ব্যস। কাজ হাসিল করে চুপিচুপি সটকে পড়ে। এবার ইবরাহিম-এর দোকানে গিয়ে গলা পর্যন্ত সরাব গিল্‌ল।

সকাল হ'লে খলিফা প্রধান বেগমের কামরা থেকে বেরোলেন। ছোট্ট কামরাটিতে গিয়েই থমকে যান। রত্নহারটি নেই। যারপরনাই বিস্মিত হন। তাঁর ব্যবহারের জিনিসে হাত দেয় এতবড় দুঃসাহস! ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হলেন তিনি।

খলিফার রত্নহার খোয়া গেছে। প্রাসাদ তোলপাড় করা হতে লাগল। প্রাসাদের হারেমে চোর! অভাবনীয় কাণ্ড! তলব করা হ'ল সব খোজাদের, সবারই মুখ কালো। কেউ স্বীকার করল না। খলিফা গুলিবিদ্ধ শেরের মত গর্জে উঠলেন—'সবাইকে এক এক করে শূলে চড়াব—কোতল করব।'

খলিফা উজির জাফর'কে ডাকলেন। ব্যাপারটি তার কাছে বললেন, কোতোয়াল খালিদ তখনই নবনিযুক্ত কোতোয়াল আহমদকে নিয়ে সেখানে হাজির হয়।

খলিফা এখন রাগে গসগস করতে করতে খালিদ'কে বললেন—'শোন, কাল রাত্রে বেগমের কামরা থেকে আমার রত্নহার খোয়া গেছে। তোমরা এতগুলো লোক থাকতে বিশেষ ক'রে তোমার মত একজন জাঁদরেল কোতোয়াল থাকতে কি ক'রে এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে, বুঝতে পারছি না!'

—'জাঁহাপনা—'

খালিদ কোন কথা বলার আগেই খলিফা আবার বলতে লাগলেন—'শোন, যে-রত্নহারটি খোয়া গেছে তা আমার খুবই প্রিয়। মনে করতে পারো সেটি আমার কলিজার সমান। অতএব যেখানে থাক, পাতালের অতল গহ্বরে লুকিয়ে রাখলেও আমি সেটি চাই। যদি না পার তবে জেনো অবশ্যই তোমার গর্দান যাবে। আজকের দিনের মধ্যেই সে-চোরকে আমার সামনে হাজির করতে হবে, খেয়াল থাকে যেন। আর যদি ব্যর্থ হও তবে তোমার কাটামুণ্ডুটি প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।'

খলিফার ফতোয়া শুনে আমীর খালিদ-এর অবস্থা তখন কাপড়ে-চোপড়ে হওয়ার জোগাড়। হওয়ার কথাও বটে। এতবড় বাগদাদ নগরে চোর কোথায় ঘাপটি মেরে রয়েছে কে জানে। সে ধরেই নিল এ-যাত্রায় আর জান রাখা যাবে না। কোরবানির পশুর মত কাঁপতে কাঁপতে, বার কয়েক ঢোক গিলে সে এবার মুখ খুল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনি তো কাল আহমদ'কে প্রধান কোতোয়াল

নিযুক্ত করেছেন। অতএব সবদায়িত্ব তো তার ওপরই বর্তাচ্ছে। আমি তো তার অধীনস্থ কর্মচারী ছাড়া কিছু নই। তাই খোয়া যাওয়া রত্নহারটি যদি না-ই পাওয়া যায় তবে তো তারই শাস্তি হওয়া দরকার, বিবেচনা করে দেখুন।

আহমদ নির্দ্বিধায় বল্‌ল—'জাঁহাপনা, ব্যাপারটি আমার কাছে কোন সমস্যারই নয়। তবে জাঁহাপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা—

—'বল, কি বলতে চাইছ?'

—'আপনি আমাকে হুকুম দিন আমি যেন, নগরের যেকোন বাড়ি, গুদাম আর দোকানে ঢুকে তল্লাস চালাতে পারি। উজির জাফর থেকে শুরু করে কাজী বা আপনার একান্ত প্রিয়জন আবু সামাত-এর মকানে পর্যন্ত সব জায়গায় যেন তল্লাস চালাতে পারি।'

—'বহুৎ আচ্ছা। আমি এখনই তোমার হাতে এরকম ফরমান দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু খেয়াল থাকে যেন গর্দান আমার চাই-ই চাই। সে গর্দান তোমার নিজের বা রত্নহার যে চুরি করেছে তারই হোক। যদি চোরকে পাকড়াও করতে পার তবে তোমারটা বাঁচবে আর চোরের গর্দান যাবে। আর যদি তা না পার তোমার গর্দান যে যাবে, আশা করি তা আর স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।'

আহমদ কিছুমাত্র ঘাবড়ালো না। স্বাভাবিক কণ্ঠেই সে বল্‌ল—'ঠিক আছে, তাই হবে, আপনার বিচার মাথা পেতে নিয়ে চৌদ্দ পুরুষের নামে কসম খেয়ে বলছি জাঁহাপনা, চোরকে আমি অবশ্যই পাকড়াও করে আপনার দরবারে হাজির করবই। আমার আম্মা রত্নহারটি গায়েব করলেও নিস্তার পাবে না জাঁহাপনা।'

আহমদ এবার খলিফার ফরমান আর দু'জন কোতোয়ালের সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে, খলিফাকে কুর্নিশ করে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল।

আহমদ প্রথমেই হাজির হ'ল উজির জাফর-এর মকানে। লোক দেখানো তল্লাসী চালিয়ে সে তার মকান থেকে বেরিয়ে এল। কিছুই পেল না। পাওয়ার তো কথাও নয়।

আহমদ এবার কাজীর মকানে তল্লাসী চালাল। সেখানেও সে বাঞ্ছিত রত্নহারটি পাওয়া যাবে না তা-তো সে জানেই। এবার সে হাজির হ'ল কোতোয়ালের মকান তল্লাসী করতে। এখানেও লোক-দেখানো, দায়সারা গোছের তল্লাশ সেরে খালিহাতে বেরিয়ে এল।

আহমদ এবার তার দুই সহকারী সিপাহীকে নিয়ে হাজির হ'ল সুলতানের একান্ত প্রিয়জন আবু সামাত-এর মকানে। খলিফার ফরমান আবু সামাত'কে দেখিয়ে তার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করল। অতি বিনয়ের সঙ্গে সে তাকে বল্‌ল—'কর্তব্য বড় কঠিন দায়। আমি জানি আপনার মত সজ্জন সচরাচর মেলে না। তবু কর্তব্যের তাগিদে আপনার মকানটি একবার তল্লাসী করতেই হবে।'

আবু সামাত হেসে বল্‌ল—'তল্লাসী করবেন। বহুৎ আচ্ছা, যান। মকানের যেখানে খুশী তল্লাসী চালাতে পারেন, কিছুমাত্রও আপত্তি নেই। আমি কিছুই মনে করব না।'

আহমদ তার কামরায় ঢুকতে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌ল—'তল্লাসী করব তো কেবলমাত্র তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ম রক্ষা করতে। আদত ব্যাপার তো সেরেই রেখেছি।' লোকদেখানো তল্লাসী চালিয়ে আহমদ সিপাহীদের নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। এবার সিপাহীদের বল্‌ল—'শাবল দিয়ে কামরার বাইরের দেয়াল গুলো ভাল করে গুতিয়ে গাঁতিয়ে দেখ। আহমদ নিজেও তাদের সঙ্গে হাত লাগাল। কিছুক্ষণ এখানে-ওখানে শাবল ঠুঁকে সে এক জায়গায় এসে থমকে যায়। সিপাহীদের একজনকে বল্‌ল—'এ-জায়গাটি যেন কেমন মনে হচ্ছে। ভালকরে শাবল ঠোক তো দেখি।'

আবু সামাত বল্‌ল—'সন্দেহজনক মনে হলে পাথরটি খুলে ফেললেই তো হয়।'

আহমদ এবার শাবলের মাথা দিয়ে সামান্য গুঁতো দিতেই পাথরের টুকরোটি খসে পড়ে গেল। চোখের সামনে একটি গর্ত বেরিয়ে পড়ল। এবার সে গর্তটির ভেতরে ডান-হাত চালান দিয়ে দিল। ব্যস, হাতে ক'রে বের করে আনল খলিফার খোয়া যাওয়া রত্নহারটি।

ব্যাপার দেখে আবু সামাতের ভিমরি যাওয়ার জোগাড় হয়। মাথা চক্কর মেরে ওঠে। মাথায় হাত দিয়ে বসে আর্তনাদ করে উঠল — ইয়া আল্লা! একী তাজ্জব ব্যাপার!'

এক মুহূর্তও দেরী নয়, ঘটনার বিবরণ লিখে আবু সামাত এবার রত্নহারসহ সেটিকে পাঠিয়ে দিল কোতোয়ালের দরবারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খলিফা স্বয়ং কাজীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল আবু সামাত-এর মকানে এলেন। তিনি একেবারে আশমান থেকে পড়লেন। আবু সামাত-শেষ পর্যন্ত এমন বেইমানী করল, তিনি ভাবতেই উৎসাহ পাচ্ছেন না। বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। মাল যে তার মকান থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে।

খলিফা দীর্ঘ সময় বিষণ্ন মনে নীরবতার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে এক সময় গর্জে উঠলেন—'একে নিয়ে যাও, ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দাও। বুঝুক, বিশ্বাসহন্তার শাস্তি মৃত্যু।'

হাবিলদাররা তামাম বাগদাদ নগরে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে দিল, সন্ধ্যায় আবু সামাতকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে, তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ল। তার দুই বিবিকে সকাল থেকে পথে বের করে দেয়া হ'ল।

খালিদ বাঁদী যুঁই'কে নিজের মকানে নিয়ে গিয়ে লেড়কার হাতে তুলে দিল, আর জুবেদা? তাকে তার আব্বার কাছে ভেজা হ'ল।

হাবিলদারটি আবু সামাত'কে খুবই পিয়ার করে। তার সততার কথা হাবিলদার খুব ভালই জানে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, কিছুতেই এরকম একটি নক্কারজনক কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আদতে নির্ঘাৎ অন্য কোন রহস্য এর পিছনে রয়েছে। কি সে কারণ? কি সে ফন্দি? কিন্তু খলিফার হুকুম তামিল না করে নিস্তার নেই।

হাবিলদার এবার সোজা কয়েদখানার সচিবের কাছে হাজির হয়। তাকে বলে—'আপনার জিম্মায় জনা চল্লিশেক কয়েদী রয়েছে। আমি তাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

কয়েদখানার সচিব ফাটক খুলে দিল। হাবিলদার তল্লাসী চালিয়ে একজনকে পেয়ে গেল যার সঙ্গে আবু সামাত-এর আদলের অবিকল সাদৃশ্য রয়েছে। তাকে ফাটকের বাইরে আনা হ'ল। আবু সামাত-এর পরিবর্তে সে বেচারাকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেয়া হ'ল। স্বয়ং খলিফা থেকে শুরু করে প্রজারা সবাই জানল, আবু সামাত-এর জীবনাবসান হয়ে গেল।

রাত্রির প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে আসল আবু সামাত'কে হাবিলদার চুপি চুপি নিজের মকানে নিয়ে গেল।

হাবিলদারের প্রশ্নের উত্তরে আবু সামাত বল্‌ল-'খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি ঘুণাক্ষরেও এসবের কিছু জানি না। নির্ঘাৎ কোন এক নোংরা মতলব, গোপন অভিসন্ধি এর পিছনে কাজ করছে।'

—'বেটা, আমি বিশ্বাস করি তোমার মত একজন আদত মুসলমান এরকম একটি অপকর্ম কিছুতেই করতে পার না। অপরাধী আজ না হোক কাল ধরা পড়বেই, ভেবো না। তা কিন্তু এখনি প্রমাণ করা যাচ্ছে না। তাই তোমার নিরাপত্তার খাতিরে কিছু দিনের জন্য হলেও এ-নগর ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাক। চারদিকে শত্রুর গুপ্তচর চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে। তোমার খোঁজ পেলে তোমার আর আমার উভয়েরই জান খতম করে ছাড়বে। মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে তোমাকে এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। সাগরের ওপারে আলেকজান্দ্রিয়া নগর। সেখানে গিয়ে কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দাও। সময় সুযোগ বুঝে আমিই তোমাকে ডেকে নিয়ে আসব। তোমার বিবি জুবেদার জন্য কিছু ভেবো না। আমার বাড়িতে সযত্নেই থাকবে।'

—'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, রাস্তাঘাট আমার কিছুই জানা নেই। কোন রাস্তায়, কিভাবে যাব—।'

—'ঘাবড়াও মাৎ বেটা। আমি তোমাকে সঙ্গে করে আলেক-জান্দ্রিয়ার জাহাজে দিয়ে আসব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তবে তা-ই চলুন।'

আবু সামাত হাবিলদারের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পথে নেমে পড়ল। অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাগদাদ নগরী ছাড়িয়ে গেল। আগুনের মত গরম বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে আবু সামাত-এর মত জন্মসুখীর পক্ষে খুবই তকলিফ হতে লাগল।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে হাবিলদার দু'জন চসমখোর ইহুদীর দেখা পেল। সুদের কারবারী, তার কাছে আসতেই হাবিলদার বল্‌ল—'ঘোড়া থামাও, তোমাদের তল্লাসী করতে হবে।'

সুদখোর্ ইহুদী দুটো ঘোড়া থেকে নামতেই হাবিলদার আচমকা তরবারির কোপে তাদের গর্দান নামিয়ে দিল।

ইহুদী দুটোর অর্থকড়ি নিতে নিতে হাবিলদার বল্‌ল বেটা, এরা এখনি বাগদাদে গিয়ে আমাদের কারসাজির কথা খলিফার কানে দিত। আবু সামাত'কে নিয়ে এবার হাবিলদার নিহত ইহুদীদের ঘোড়ায় চেপে সেখান থেকে চম্পট দিল।

মরু-প্রায় অঞ্চলের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে হাবিলদার আবু সামাতকে নিয়ে হাজির হ'ল। এক মুসাফির খানায় ঘোড়া দুটোকে জিম্মা রাখল। ঘাটে গিয়ে দেখে আলেকজান্দ্রিয়াগামী বড় একটি পালতোলা নৌকা ছাড়ার উদ্যোগ করছে। হাবিলদার তাকে ইহুদীদের কাছ থেকে পাওয়া সোনাদানা ও মোহর প্রভৃতি যা পেয়েছিল সব আবু সামাত-এর হাতে তুলে দিল। তারপর তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌ল—'বেটা আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে আমার খবরের আশায় আশায় দিন গুজরান করবে। নসীব আজ না হোক কাল পাল্টাবেই। তখন আমি তোমাকে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করব।'

নৌকা ছাড়ল। হাবিলদার চোখের পানি মুছল।

হাবিলদার বাগদাদে ফিরে শুনল—নকল আবু সামাত'কে ফাঁসিকাঠে ঝুলানোর পর খলিফার মধ্যে অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে। নিদারুণ অশান্তির মধ্যে কাল কাটান। তিনি চোখের পাতা আর এক করতে পারেন নি। আবু সামাত এরকম এক জঘন্য কাজ করতে পারে কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।
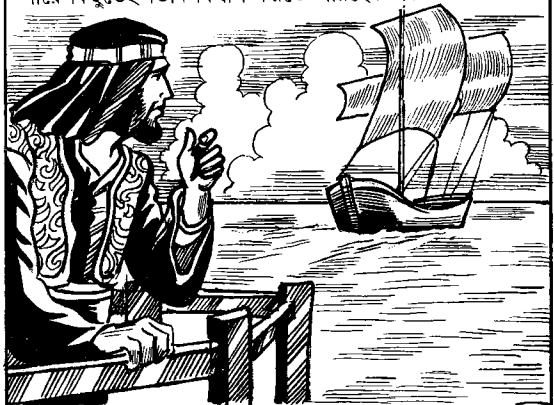
উজির জাফরকে বললেন—'শোন গতকালের ব্যাপারে আমি খুবই মুষড়ে পড়েছি। যার আচার-আচরণ এমন মোলায়েম তার ভেতর এমন যে শয়তান ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে মালুম হবে কি করে?'

—'**জাঁহাপনা**, ব্যাপারটি এখন রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে, রহস্যভেদ না হওয়া পর্যন্ত এরকম ঝাপসাই রয়ে যাবে। আদত কারণ উদ্ধার হলে তবেই—আবু সামাত এক উঁচু **বংশোদ্ভূত**। মিশরের এক সুপ্রতিষ্ঠিত বণিকের লেড়কা। আমিও ভাবছি এর পিছনে কোন গোপন চক্রান্ত কাজ করেছে।'

খলিফার দৃঢ় বিশ্বাস, অবশ্যই ফাঁসির দড়িতে এর নিষ্কলুষ নওজোয়ানের জান নেয়া হয়েছে, তা যদি হয় তবে তো খুবই গুনাহ হয়েছে।

আবু সামাত-এর লাশটি ভালভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য খলিফা ছদ্মবেশে উজির জাফরকে নিয়ে বধ্যভূমিতে হাজির হলেন। কফিনে মোড়া আবু সামাত-এর লাশটি তখনও ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে।

উজির জাফর তার মুখ থেকে কফিনের কাপড়টি সরাতেই খলিফা চমকে ওঠেন। তিনি কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বল্‌লেন—'জাফর, আবু সামাত তো আরও লম্বা ও মোটাসোটা ছিল।'

উজির জাফর বল্‌ল—'জাঁহাপনা, মরার পর দীর্ঘ সময় পরে মানুষের চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। লম্বা মানুষও অনেক সময় কিছুটা খর্ব—'

—'কিন্তু আবু সামাত-এর গালে বেশ উজ্জ্বল তিল ছিল। গেল কোথায়?'

—'অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে দেহ বিকৃত হয়ে অনেক কিছুই বদলে যায়। হয়ত এক্ষেত্রে সেরকমই কিছু ঘটেছে।'

—'কি জানি—আবার এদিকে তাকিয়ে দেখ, এর পায়ের তলায় উল্কি কাটা। স্পষ্টাক্ষরে দুটো নাম লেখা। এ চিহ্ন তো জাফর সিয়া সম্প্রদায়ের। আবু সামাত সুন্নি ছিল, আমি নিঃসন্দেহ।'

উজির জাফর-এর মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। মুহূর্ত কাল ভেবে নিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'খোদাতাল্লা ছাড়া কারো পক্ষে এ-রহস্যের কিনারা করা সম্ভব নয় জাঁহাপনা।'

বুকভরা হতাশা, দুশ্চিন্তা ও দ্বিধা নিয়ে খলিফা বধ্যভূমি ত্যাগ করে আসেন।

খলিফার নির্দেশে আবু সামাত-এর লাসটি গোর দিয়ে দেওয়া হ'ল। আবু সামাত-এর স্মৃতি খলিফার দিল্‌ থেকে তিলে তিলে দূরে সরে যেতে থাকে। আবু সামাত হারিয়ে যায়।

আমরা এবার দু'পা এগিয়ে গিয়ে দেখি আবু সামাত-এর দ্বিতীয়া বিবি যুঁই কি অবস্থায় দিন গুজরান করছে।

হাবিলদার আবু সামাত-এর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেই চুপ মেরে যায় নি। সে এবার যুঁইকে নিলামে তুল্‌ল। আর প্রথমা বিবি জুবেদা? তাকে নিজের মকানে নিয়ে গিয়ে তুল্‌ল। বড়ফট্টাই-এর আব্বা বাঁদী যুঁই'কে নিলামে খরিদ ক'রে নিয়ে গেল।

বড়ফট্টাই-এর আব্বা বাঁদী যুঁইকে নিয়ে গিয়ে লেড়কার কামরায়-দিল ভেজে। বড়ফট্টাই তাকে দেখেই কামাতুর চোখে তার দিকে তাকাতে লাগল। কলিজা ছটফটিয়ে ওঠে। জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কিনা বোঝা যায় নি অবশ্য। কামজ্বালায় জর্জরিত বড়ফট্টাই আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সজোরে জাপ্টে ধরে বুকের মধ্যে।

বড়ফট্টাই-এর আচরণে যুঁই যারপরনাই বিরক্ত হয়। তার গা-পিত্তি জ্বলে যায়। অধৈর্য হয়ে তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ছিটকে দূরে ফেলে দেয়। গাছের গুঁড়ির মত বড়ফট্টাই-এর দেহটি মেজেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। কোমর থেকে ছুরি বের করল। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে যুঁই'কে ডর দেখায়—'ফিন যদি এরকম করবি তো জান একে-বারে খতম ক'রে দেব, ইয়াদ থাকে যেন।'

বড়ফট্টাই-এর মা চিল্লাচিল্লি শুনে ছুটে এসে যুঁইকে শাসাতে লাগল।

যুঁই মুখবুঁজে হজম করার লেড়কি নয়। সে তম্বি করতে লাগল—'এ কি রকম মতলব। এক স্বামীর ঘর করতে এসে অন্য এক আদমির সঙ্গে কোন্‌ লেড়কি লদকালদকি করে, বল তো? আমি বে-ওয়ারিশ মাল নাকি? আমি আবু সামাত-এর শাদী করা বিবি, ইয়াদ নেই? তোমার বেটার কাজ হচ্ছে সিংহীর গুহায় কুত্তা ঢোকার মত।

বড়ফট্টাই-এর আম্মা গলা পঞ্চমে চড়িয়ে দিল—'তোমার মত বজ্জাত লেড়কিকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় সে-দাওয়াই আমার কাছে আছে।'

বড়ফট্টাই-এর আম্মা এবার যুঁই এর ঝলমলে পোশাক খুলে নোকরাণীর পোশাক পরিয়ে দিল। এবার হেঁশেলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল। খাটিয়ে খাটিয়ে গতর কয়লা করে দেবে।

যুঁই ম্লান হেসে বল্‌ল—'তোমার ওই হুতুমমুখো লেড়কার সঙ্গে সহবাস করার চেয়ে গতর খাটিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করা ঢের ইজ্জতের।'

ফুলের মত সুরৎ যার তাকে নোকরাণীদের সঙ্গে কাজ করতে দেয়ায় অন্যান্য নোকরাণীরা ব্যাপারটি সুনজরে দেখল না। মায়া হল। সবাই তাকে পিয়ার করে বুকে টেনে নিল। তাকে কোন কাম কাজ করতে দিল না। সবাই মিলে ভাগাভাগি করে তার কাজ ক'রে দিতে লাগল।

এদিকে আছাড় খেয়ে বড়ফাট্টাই-এর কোমরের হাড্ডি সরে গেল। বিছানা নিল। আর ওঠার ক্ষমতাই রইল না।

আগেই বলা হয়েছে বাঁদী যুঁই-এর গর্ভে আবু সামাত-এর ঔরসজাত সন্তান তিলে তিলে বাড়তে লাগল। দশমাস গর্ভ ধারণ করে সে একটি লেড়কা প্রসব করল। যুঁই সদ্যোজাত লেড়কার নামকরণ করল আসলান। নোকরাণীদের মহলে আসলান দিনে দিনে চাঁদের কলার মত বাড়তে লাগল। কেবলমাত্র আম্মার বুকের দুধ সম্বল করে সে গায়ে গতরে বাড়তে লাগল। সে দেখতে যেমন আবু সামাত-এর মত তেমনি গাট্টাগোট্টা হয়ে উঠল। যেন জঙ্গলের সিংহ শাবক কামরায় চলে এসেছে।

এক সকালে বাঁদী যুঁই জরুরী দরকারে ওপর তলায় যায়। এদিকে আসলান এক পা দু'পা ক'রে সোজা খালিদ-এর কামরায় গিয়ে ঢুকে পড়ল। চাঁদের মত ফুটফুটে লেড়কাটিকে দেখেই তার কলিজাটি মোচড় মেরে ওঠে। আবু সামাত-এর মুখটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। শিশু আসলান-এর হাত ধরে কাছে নিয়ে যায়। চুমু খায়। কোলে বসিয়ে আদর সোহাগ করতে থাকে।

যুঁই ফিরে দেখে কামরা ফাঁকা। আসলান নেই। তার বুকের মধ্যে ধুক্ পুকানি শুরু হয়ে যায়। কলিজা শুকিয়ে ওঠে। বড়ফট্টাই-এর মা ডাইনীর নজরে পড়লে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলাও তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। ব্যস্ত পায়ে খুঁজতে খুঁজতে খালিদ-এর বৈঠকখানায় গিয়ে লেড়কাকে দেখল। কলিজায় জল এল।

যুঁইকে দেখে খালিদ জিজ্ঞাসা করল—'তোমার লেড়কা?'

'হ্যাঁ, হুজুর?'

'এর আব্বা কে? আমার নোকরদের কেউ নিশ্চয়?'

যুঁই-এর দিল্ কেঁদে ওঠে। চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'আবু সামাত আমাকে শাদী ক'রে বিবির মর্যাদা দিয়েছিল, আপনার তো অজানা নয় হুজুর। আপনি যখন আমাকে নিলামে খরিদ ক'রে নিয়ে আসেন তখন এ-লেড়কা আমার পেটে ছিল।

—'হ্যাঁ, আবু সামাত-এর মতই লেড়কার সুরৎ হয়েছে বটে।'

যুঁই আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'আজ থেকে আসলান আপনারই বেটা। আপনি একে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে তৈরী ক'রে নিন হুজুর।'

যুঁই-এর বাৎ শুনে খালিদ-এর কলিজা নেচে ওঠে। মুখে দেখা দেয় খুশীর ঝিলিক। বহুৎ আচ্ছা, আজ থেকে আমি একে দত্তক নিলাম। একটি অনুরোধ, মেহেরবানি ক'রে কারো কাছে এর আদৎ পরিচয় যেন কোনদিন প্রকাশ কোরো না। ব্যস, আর কিছু নয়।'

যুঁই ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানাল।

খালিদ এবার থেকে আসলান'কে নিজের বিবির, নিজের ঔরসজাত লেড়কার মত করে লালন পালন করতে লাগল। লেখাপড়া, অস্ত্রশিক্ষা আর খেলকুদ তাকে শেখাতে লাগল। কোরাণ-এর পাঠ দান করার জন্য নগরের সবচেয়ে বড় মৌলভীকে নিয়োগ করল।

দেখতে দেখতে আসলান নওজোয়ান হয়ে উঠল। তার সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির কথা খলিফার কানে গেল। তিনি খুশী হয়ে তাকে আমীরের উপাধি দান করলেন।

নসীবের খেল। এক বিকালে সরাবের দোকানের সামনে আসলান-এর সঙ্গে আহমদ-এর দেখা হয়ে গেল। আহমদ তাকে অনুনয় বিনয় ক'রে সরাব খাওয়াল। গলা পর্যন্ত সরাব গিলে দু'জন ভাঁটিখানা থেকে বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে রাত্রি হয়ে গেছে। চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। আহমদ কোর্তার জেব থেকে ছোট্ট একটি চিরাগ বের করল। তার ঢাকনাটি খুলতেই বেরিয়ে এল এক টুকরো হীরার উজ্জ্বল দ্যুতি। তাজ্জব ব্যাপার তো! আসলান অবাক মানে। তাজ্জব বনার ব্যাপারই বটে। তেল, মোম কিচ্ছু নেই অথচ জ্বলছে। সে আহমদ-এর হাত থেকে নিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে চিরাগটিকে দেখতে লাগল।

আহমদ বল্‌ল—'এর জন্য একটি নিরীহ নিরপরাধ আদমিকে জান দিতে হয়েছে, জান?'

—'জান দিতে হয়েছে!' চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে আসলান আহমদ-এর গর্বোজ্জল চোখ দুটোর দিকে তাকায়।

—'জরুর।' আহমদ এবার সরাবের নেশার ঘোরে আবু সামাত-এর ফাঁসির কিস্‌সা তার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল।

সামান্য একটি স্বার্থের খাতিরে কেউ এরকম নীচ ও জঘন্যতম কাজ করতে পারে আসলান ভাবতেও উৎসাহ পাচ্ছে না।

আসলান ঘরে ফিরে তার আম্মার কাছে আহমদ-এর মুখ থেকে শোনা তার আব্বার কাহিনী ব্যক্ত করল।

লেড়কার মুখ থেকে স্বামীর নসীবের বাৎ শুনে যুঁই আর্তনাদ ক'রে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর ভোর হয়ে গেল। বেগম কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ উনসত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—জাঁহাপনা, সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে যুঁই লেড়কাকে আদর ক'রে বল্‌ল—'বেটা, তোমার বাৎ শুনে আমার দিল্ বলছে, খোদাতাল্লা বুঝি আমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছেন। সত্য আর গুনাহ কোনদিন গোপন থাকে না। আজ না হোক কাল তা প্রকাশ পাবেই। আর তোমাকে আর একটি বাৎ বলছি, খালিদ তোমার আসলি আব্বা নন। তার ঔরসজাত সন্তান নও তুমি। আমার কাছ থেকে তোমাকে দত্তক নিয়েছেন। তোমার আব্বা আবু সামাত। খলিফার রত্নহার গায়েব হওয়ার দায় তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ঝুটমুট তাকে অপরাধী করে ফাঁসির দড়িতে লটকে দেওয়া হয়েছিল। তোমার আব্বার জিগরী দোস্ত হাবিলদার। তার সাথে ভেট কর। সবকিছু খোলসা ক'রে তাকে বল। আর আল্লাতাল্লা-র নামে কসম খেয়ে তাকে সাফ সাফ বলে দেবে, আব্বার হত্যাকারীর ওপর বদলা তুমি নেবেই নেবে।

আসলান হাবিলদারের সাথে ভেট করল। তার মুখে সবকিছু শুনে সে গুলিবিদ্ধ শেরের মত গর্জে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বল্‌ল—'বেটা, সবই আল্লাতাল্লার মর্জি। তাঁর ওপর আস্থা রেখে এগিয়ে যাও। রহস্যভেদের প্রয়াস কর। তিনিই এর হিল্লা করে দেবেন।

পোলো খেলা হচ্ছে।

খোদা ভরসা। সেদিনই হিল্লা হয়ে গেল। আসলান খলিফার দলে খেলায় অংশ নিয়েছে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে প্রধান কোতোয়াল ও তার দলবল। খেলা চলাকালীন একটি বেকায়দা বল এসে খলিফার একটি চোখ প্রায় অন্ধ ক'রে দিচ্ছিল। অদ্ভুত কৌশলে আসলান বলটি রুখে দিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা থেকে খলিফাকে রক্ষা করল। তার ঠিক পরমুহূর্তেই আসলান শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এমন এক বল মারল যে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সে-খেলোয়াড়টির মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে গেল।

খলিফা সোল্লাসে চিল্লিয়ে ওঠেন—'সাবাস নওজোয়ান! সাবাস খালিদ-এর বেটা!'

খেলা সাঙ্গ হলে খলিফা তার গায়ে-মাথায় হাতবুলিয়ে বল্‌লেন—'বহুত আচ্ছা বেটা। তোমার খেলার কৌশল আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

আসলান মৌকা বুঝে দুম করে বলে উঠল—'জাঁহাপনা, আমার পিতৃহন্তার বিচার চাই। আপনার দরবারে আমি সুবিচার প্রার্থী। খালিদ আমার আব্বা নন। আমি তার দত্তক সন্তান। বিলকুল ঝুটমুট আপনি আমার আব্বাকে ফাঁসির দড়িতে লটকে দিয়েছেন।'

খলিফা সবিস্ময়ে আসলান-এর মুখের দিকে তাকালেন। আসলান এবার বল্‌ল—'জী জাঁহাপনা, আমার আব্বা আবু সামাত। আপনি মিথ্যা চুরির দায়ে তাকে ফাঁসি দিয়ে নিজের নামকে কলঙ্কিত করেছেন। আমার বাৎ বিশ্বাস না হলে আহমদ-এর কোর্তার জেব তল্লাসী করলেই বামাল মিলে যাবে।'

খলিফার হুকুমে এক সিপাহী আহমদ-এর কোর্তার জেব থেকে সে-চিরাগ বাতিটি বের করল।

চিরাগ বাতির ঢাকনাটি খুলতে খলিফার দীর্ঘদিনের সাথী হীরের টুকরোটি জ্বলজ্বল করে উঠল।

খলিফা ক্রোধে ফেঁটে পড়ার জোগাড় হলেন। গর্জে উঠলেন—'বেইমান কাঁহিকার! এ হীরা কোথায় পেলি, বল।'

—'জাঁহাপনা, আমি এ-হীরা দোকান থেকে খরিদ করেছিলাম।'

খলিফার ক্রোধ পঞ্চমে চড়ে গেল। অধিকতর ক্রোধে এবার গর্জে ওঠেন—'সিপাহী, চালাও চাবুক। চাবুকের ঘায়ে এর পিঠ থেকে খুন বের করে দাও। শয়তান বেইমান কাঁহিকার! দোকানে এ-হীরা বিক্রি হয়, তাই না? জোরসে চাবুক চালাও।'

চাবুকের ঘায়ে আহমদ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। কাৎরাতে কাৎরাতে সে স্বীকার করল, বেগমের পাশের কামরা থেকে সে-ই খলিফার ব্যবহৃত রত্নহার ও অন্যান্য হার চুরি করেছিল। আজব চিরাগবাতিটির লোভ সম্বরণ করতে না পেরে এটি ছাড়া বাকী সব আবু সামাত-এর মকানের দেয়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। আর এ-ও স্বীকার করল—তারই কসুরে নিরীহ-নিরপরাধ আবু সামাতকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয়েছে।

খলিফা এবার আসলান'কে বল্‌লেন—'তুমি নিজে হাতে একে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে পিতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।'

আসলান এবার হাবিলদারের সহায়তায় চোরের শিরোমণি আহমদ'কে সবার সামনে ফাঁসির দড়িতে লটকে দিল।

আসলান এবার চোখের পানি মুছতে মুছতে খলিফাকে বল্‌ল—'জাঁহাপনা দয়া করে আমার আব্বাকে ফিরিয়ে এনে দিন।

খলিফার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল।

আসলান বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি জানি, আমার আব্বা আবু সামাত এখনও জিন্দা—বহাল তবিয়তে আছেন।'

—'অসম্ভব! আবু সামাত জিন্দা আছে? বহাল তবিয়তে আছে? এ কভি নাহি হো সেক্‌তা—অসম্ভব। আমার হুকুমে তার ফাঁসি হয়ে গেছে। গোর দেয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ফাঁসির পরদিন আমি উজির জাফর'কে নিয়ে তার লাশ দেখে ভড়কে গিয়েছিলাম। কেমন সন্দেহ হয়েছিল, লাশটি যেন আবু সামাত-এর ব'লে মনে হচ্ছিল না। তবু বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। বুকের ভেতরে দ্বিধা

কিছু না কিছু রয়েই গেল।'

খলিফার চোখে পানি দেখে হাবিলদার সাহস পেল। এগিয়ে এসে সে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার গুস্তাকী মাফ করবেন, আমি সেদিন সজ্ঞানে আপনার হুকুম তামিল করি নি। সেদিন আবু সামাতকে সরিয়ে ফেলে অবিকল তারই মত দেখতে এক আসামীকে ফাঁসীর দড়িতে লটকে দিয়েছিলাম। তবে এটুকুই সান্ত্বনা, সে-আদমিটি ফাঁসির আসামীই ছিল বটে। তারপর আবু সামাত'কে আমি গোপনে আলেকজান্দ্রিয়ায় চালান করে দেই। সে এখন সেখানে এক দোকান খুলে বসেছে।

হাবিলদারের বাৎ শুনে খলিফা হারুণ অল-রসিদ খুশী হয়ে তাকে উপযুক্ত ইনাম দিয়ে সন্তুষ্ট করেন।

এদিকে আবু সামাত চৌদ্দ সালের মধ্যে তার দোকানটিকে রমরমা করে তোলে। দশগুণ পুঁজি হয়। তারপর তার দিল্ কারবারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রমে কারবার গুটিয়ে ফেলতে লাগল।

এক সকালে তার দোকানের সামনে জাহাজের এক ক্যাপ্টেন হাজির হয়। একটি পাথরের টুকরোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সেটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ক্যাপ্টেন নিজে থেকেই আশি হাজার দিনার দিতে সম্মত হ'ল।'

—'ইয়া খোদা!' আবু সামাত যেন একেবারে আশমান থেকে জমিনে পড়ল। হবার কথাই তো বটে। সামান্য একটি পাথরের টুকরোর দাম আশি হাজার দিতে চাইলে চোখ দুটো তো কপালে উঠবেই।'

আবু সামাত ক্যাপ্টেনকে নিজের ভেতরের বিস্ময়টুকু বুঝতে না দিয়ে দুম ক'রে বলে উঠল—'এত সস্তায় এ-পাথর খরিদ করতে পারবে না মিঞা। পানিও এর চেয়ে জাদা দামে বিক্রি হয়। আপনার দিমাক টিমাক খারাপ হয়েছে নাকি?'

—'কই বাৎ নেহি, আরও দশ হাজার বেশী নাও।'

আবু সামাত এবার বার কয়েক লোক দেখানো আমতা আমতা ক'রে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল।'

ক্যাপ্টেন বল্‌ল—'কিন্তু ভাইয়া, মেহেরবানি করে তোমাকে একবারটি আমার সঙ্গে জাহাজে যেতে হবে। এক হাতে পাথর নেব আর অন্য হাতে দাম চুকিয়ে দেব। মেহেরবানি করে—'

—'বহুৎ আচ্ছা, যাব। চলুন, পাথরটি নিয়ে আপনার সাথেই যাচ্ছি।'

জাহাজে পৌঁছে ক্যাপ্টেন আবু সামাত'কে একটি বেঞ্চে বসতে দিয়ে মোহর আনার অজুহাতে ভেতরে চলে গেল।

সময় এগিয়ে চলে। ক্যাপ্টেন গেছে তো গেছেই। ফেরার নামটিও করে না। আবু সামাত-এর দিল্‌টি মোচড় মেরে ওঠে। সে নিঃসন্দেহ হ'ল, নির্ঘাৎ জোচ্চরের পাল্লায় পড়েছে। ইতিমধ্যে জাহাজ মাঝ দরিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। পালিয়ে আসার পথও বন্ধ।

আবু সামাত জাহাজে বন্দী হ'ল।

দীর্ঘ সময় বাদে ক্যাপ্টেনের মুখ দেখা গেল।

ক্যাপ্টেন চোখে-মুখে বিদ্রূপের ছাপ এঁকে বল্‌ল—'আবু সামাত, চিনতে পারছ? থাক এখন না-ই বা ধরা দিলাম। সময় মত বিলকুল পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন শুধু জেনে রাখ, জাহাজ জেনেভায় চলেছে। তারপর তোমার নসীবই আমাকে কর্তব্য বলে দেবে। তোমারও মালুম হবে, নসীবে কি লেখা আছে।'

জেনেভা বন্দরে জাহাজ নোঙর করতেই এক বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে জাহাজে উঠে এল। তার সঙ্গে দু'জন তাগড়াই প্রহরী। আবু সামাত বৃদ্ধার হুকুমে জাহাজ থেকে নেমে এক গীর্জায় হাজির হ'ল। বৃদ্ধা বল্‌ল—'পাশে একটি মঠ আছে, নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছ? এবার থেকে তোমার কাজ হবে এ-গীর্জা ও মঠের নফরের কাজ করা। কাঠ কেটে আনা থেকে শুরু করে খানাপাকানো, বাসনকোসন মাজা আর মঠ ও গীর্জা সাফসুতরা করা তোমার দৈনন্দিন কাজ। তিনশ' সত্তর জন আদমি এখানে খানাপিনা করে। একা তোমাকে সব সামলাতে হবে। আর বিকালের আগে যখন একটু ফুরসৎ পাবে ফুলগাছে পানি দেবে।

বিকালেও কাজ আছে! ইয়া পেল্লাই একটি গদা তোমাকে দেয়া হবে। সেটি কাঁধে নিয়ে গীর্জার সামনের পথে দাঁড়িয়ে পথচারীদের প্রার্থনায় যোগদান করার জন্য অনুরোধ করবে। যদি কেউ ওজর আপত্তি করে তবে জোর জুলুম করতে হবে। বেশী বেগড়বাই করলে গদা দিয়ে দমাদম পিটতে শুরু করবে।'

আবু সামাত ভয়ডর মিশ্রিত জিজ্ঞাসার ছাপ চোখের তারায় এঁকে নীরবে রহস্যময়ী বৃদ্ধাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

বৃদ্ধাটি আবার মুখ খুল্‌ল—'কেন পিটতে যাবে, ভাবছ?

আদতে আমরা চাই না এখানে অ-খ্রীস্টান, মানে কোন বিধর্মী বসবাস করুক। এ নগরে বসবাস করতে হলে ধর্মযাজকদের আশীর্বাদ শিরে নিয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করতে হবে। যা কিছু বল্‌লাম প্রতিটি কথা দিলে গেঁথে রাখার কোশিস করতে খেয়াল রাখবে।

কথা ক'টি আবু সামাত-এর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বৃদ্ধা নিস্তেজ চোখ দুটো দরওয়াজার দিকে ফেরাল। এবার লাঠি ভর দিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবু সামাত ভাবল, আমার নসীব আমাকে এ-কোন্ কয়েদখানায় এনে ফেল্‌ল। কি ক'রে যে এ ফাটক থেকে খালাস পাব, আল্লাতাল্লাই জানেন।

আবু সামাত গীর্জার ভেতরে এক পাইন কাঠের চৌকির ওপর বসে চোখের পানি ফেলতে লাগল। এমন সময় অদৃশ্য এক নারীকণ্ঠের গানা তার কানে এল। দিল্ উজাড় ক'রে গাইছে।

দু' পা এগিয়ে গিয়ে আবু সামাত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আপন মনে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ যে সেই লেড়কিটি! আমি কি খোয়াব দেখছি!'

আবু সামাত অনুচ্চ কণ্ঠে কথাটি বল্‌লেও লেড়কিটি ঠিক শুনতে পেয়ে গেছে। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে লেড়কিটি বল্‌ল—'স্বপ্ন কেন দেখতে যাবে গো? তুমি তো জেগে, দিব্যি জেগে আছ গো। এ নগরটির নাম জেনেভা। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দিয়ে ফন্দি ফিকির করিয়ে আমিই তোমাকে এখানে আনিয়েছি। আমার বাবা এখানকার সম্রাট। আমি রাজকুমারী হুসন্ মরিয়াম। আমি যাদুবলে তোমার রূপ আর যৌবন দেখতে পাই। তখন থেকেই তোমার প্রেমে পড়ি। তোমার রক্ত-মাংসের শরীরটিকে চাক্ষুষ করার বড় শখ ছিল। কাছে আনিয়েছি। আমার গলার এ-পাথরটি দেখতে পাচ্ছ, দৈব পাথর এটি। আমার হুকুমেই জাহাজের ক্যাপ্টেন তোমার অগোচরে তোমারই দোকানে এটিকে লুকিয়ে রেখেছিল। শোন, তোমাকে যখন কাছে আনতেই পেরেছি, তুমি আমাকে বিয়ে কর। তারপর তুমি যা চাও তা-ই পাবে। তোমার সব ইচ্ছাই আমি পূরণ করব।'

—'আমার ইচ্ছা পূরণ করবে। আমি ফিন আলেকজান্দ্রিয়া নগরে ফিরে যেতে পারব, কথা দেবে?'

—'অবশ্যই ফিরে যেতে পারবে।'

—'তবে আমি তোমাকে শাদী করতে রাজী।'

পাদরীকে তলব দেয়া হ'ল। আবু সামাত আর রাজকুমারীর শাদী হয়ে গেল।

—'এবার বল, তুমি আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরতে চাও, বল?'

—'চাই। এখনি ফিরতে চাই।'

মরিয়াম এবার তার দৈব পাথরটি সূর্যের দিকে উঁচু করে ধরল। হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটিকে ঘষতে ঘষতে অনুচ্চকণ্ঠে মন্ত্র বলতে লাগল।

চোখের পলকে একটি উড়ন্ত শয্যা নেমে এল। তারা দু' জনে তাতে উঠল। রাজকুমারী আবার পাথরটি ঘষতে ঘষতে বল্‌ল—'আলেকজান্দ্রিয়া।'

উড়ন্ত শয্যা সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে শূন্যে ভাসল। বিদ্যুৎবেগে
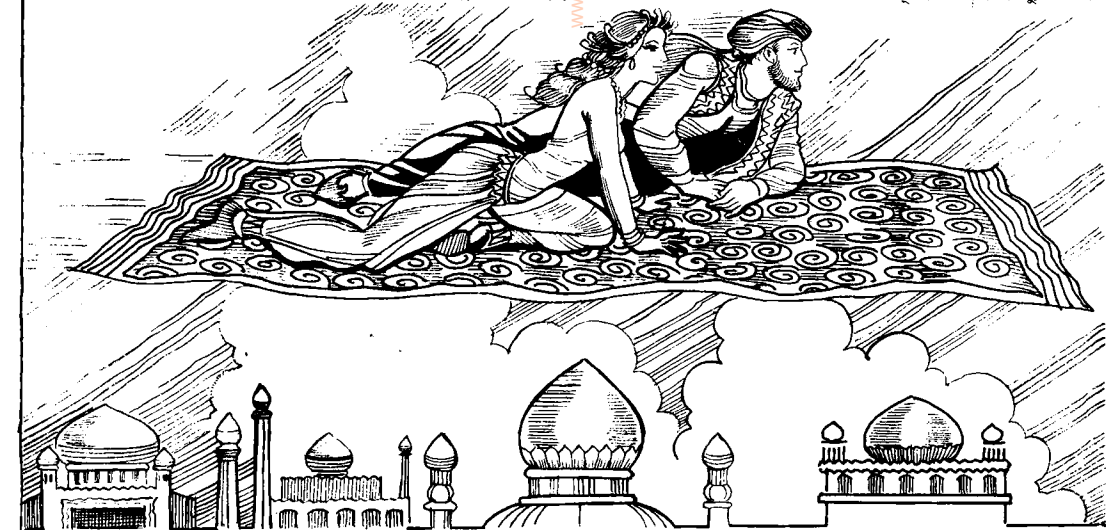
উড়ে চলে এল আলেকজান্দ্রিয়ায়।'

আবু সামাত উড়ন্ত শয্যা থেকে নেমেই সামনে বাগদাদের সে বৃদ্ধ হাবিলদারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল।

হাবিলদার তাকে আলিঙ্গন করে বল্‌ল—'বেটা, আসলি চোর ধরা পড়ে গেছে। বিচারে তার ফাঁসি হয়েছে।'

বৃদ্ধ হাবিলদার এবার তার কাছে এক এক ক'রে সব ঘটনা খোলসা ক'রে বল্‌ল।

রাজকুমারী এবার উড়ন্ত শয্যায় আবু সামাত এবং হাবিলদারকে তুলে দিল। উড়ন্ত শয্যাটি এবার তেমনি বিদ্যুতের বেগে উড়ে বসরা নগরে বণিক সামস অল-দিন-এর বাড়ির দরওয়াজায় গিয়ে নামল।

আবু সামাত-এর আম্মা দরওয়াজা খুলেই চমকে যায়। লেড়কাকে সামনে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে বুকে জড়িয়ে ধরে।

তিনদিন বিশ্রাম করে আবু সামাত তার আব্বা আর আম্মাকে নিয়ে মোট পাঁচজন উড়ন্ত শয্যায় উঠে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি বাগদাদে খলিফা-র প্রাসাদের সামনে এসে থামল।

আবু সামাতকে কাছে পেয়ে খলিফা যেন আশমানের চাঁদ হাতে পেলেন। খুশীতে একেবারে ডগমগ। তিনি সামস অল-দিন, আবু সামাত এবং তার বেটা আসলান'কে তার সুলতানিয়তের উচ্চ পদে নিযুক্ত করলেন। সবাই খুশী।

আবু সামাত পাত্তা লাগিয়ে জানতে পারল নসীবের পরিবর্তনের সবের মূলে মাহমুদ গোপনে কাজ করে চলেছে। সে তাকে কাছে ডেকে খলিফাকে বলে তাকেও উচ্চপদে নিযুক্ত করার বন্দোবস্ত করল।

আবু সামাত এবার থেকে তার তিন বিবি জুবেদা, যুঁই ও মরিয়ম এবং একমাত্র লেড়কা আসলান'কে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শেষ করে কিছু সময়ের জন্য নীরব হলেন।

দুনিয়াজাদ তার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'বহিনজী, এবার এরকমই আর একটি বহুৎ আচ্ছা কিস্‌সা শোনাও।'

বেগম শাহরাজাদ জানলা দিয়ে প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের দিকে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ফেরালেন। বুঝলেন ভোর হতে বেশি দেরী নেই। তিনি এবার তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকা বাদশাহ শারিয়ার-এর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভোর হয়ে এল ব'লে। আজ আর নতুন কিস্‌সা শুরু করার সময় নেই। কাল আপনাকে আবু নসাব-এর কিস্‌সা শোনাব। ভোর হ'ল।' বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহল ত্যাগ করলেন।

আবু নসাবের কিস্‌সা

দু'শ' সত্তরতম রজনী

গভীররাত্রে কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা এবার আপনাকে শোনাচ্ছি খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর সভাকবি আবু নসাব-এর কিস্‌সা। আর জাঁহাপনা আমি এখন যা কিছু বলব সবই তার অভিজ্ঞতার কিস্‌সা।

আবু নসাব খলিফার সভাকবি হিসেবে বহুৎ যশ অর্জন করেছিল। কিন্তু এ-গুণের পাশাপাশি তার চারিত্রিক দোষে তাকে অপযশও কম কুড়োতে হয় নি। আদতে সে ছিল একজন দুশ্চরিত্র শয়তান গোছের আদমি।

বাদশাহ শারিয়ার বেগমকে চুম্বন করে বল্‌লেন—কিস্‌সা শুরু করার আগেই যে আসর জমিয়ে দিলে! বহুৎ আচ্ছা! লেকিন বেগম-সাহেবা, আজ সকাল থেকেই দিল্‌টি কেমন ভারী ভারী লাগছে। দিল্ চাইছে কিছু উপদেশ ও জ্ঞানলাভ করা যায় এ কিসিমের কিস্‌সা শুনতে।

—'জাঁহাপনা, আমি এরকম কিস্‌সাই আজকের জন্য বেছে রেখেছি।'

—'বহুৎ আচ্ছা বেগম সাহেবা! বহুৎ আচ্ছা! তবে তোমার কিস্‌সা শুরু কর।'

বেগম শাহরাজাদ বাদশাহ শারিয়ার-এর চুলে আঙুল দিয়ে বিলিকাটা অব্যাহত রেখে এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কোন এক কালে বাগদাদ নগরে এক বণিক বাস করত। খুবই প্রতিষ্ঠিত, অগাধ ধনদৌলতের মালিক। তার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু এতকিছু থাকলেও তার দিলে এক তিলও শান্তি ছিল না। সব পেয়েও না পাওয়ার বেদনা তার কলিজাটিকে সর্বদা কুঁরে কুঁরে খেত। এত বিষয় সম্পত্তি থাকতেও কারো দিলে জমাটবাঁধা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-হতাশা থাকতে পারে এ যে একেবারেই অভাবনীয় ব্যাপার। তবু বণিকের দিলে যে শান্তি ছিল না, মিথ্যা নয়। তার অশান্তির একমাত্র কারণ সে ছিল নিঃসন্তান। বালবাচ্চা কিছু ছিল না। একটিমাত্র লেড়কার জন্য তার দিল্ হরবখত উদাস-ব্যাকুল থাকত।

বণিকের শির ক্রমে সফেদ হতে শুরু করেছে। দাঁতও দু'-একটি নড়বড়ে। সূর্য পাটে বসতে শুরু করেছে। কিন্তু হায়! আজও বালবাচ্চা কিছু হ'ল না। বণিক তার অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করতে কোশিসও কম করে নি। একের পর এক বিবি আমদানি করেছে। কিন্তু ফলাফল শূন্য।

একদিন বণিকের প্রায় তোবড়ানো মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। তার ছোট-বিবি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। যথা সময়ে সে টুকটুকে

একটি লেড়কা পয়দা করল। বণিক আল্লাতাল্লাকে দু' হাত তুলে সহস্র সুক্রিয়া জানাল।

বণিক আর তার ছোট-বিবি বহুৎ চিন্তা ভাবনা বাছাবাছির পর সদ্যোজাত লেড়কার নামকরণ করল আবু অল-হুসন।

বণিক লেড়কাকে সর্ববিদ্যায় বিশারদ করার জন্য নামকরা এক মৌলভী রেখে দিল। পড়ালিখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধনুর্বিদ্যায়ও তালিম দেওয়া হতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই সে বাগদাদ নগরের সেরা ধনুর্বিদরূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। একদম অব্যর্থ তার লক্ষ্য। কেবল গুণের বিচারেই নয়। সুরতের বিচারেও মহল্লায় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না।

বৃদ্ধ বণিক যেন নয়া জিন্দেগী ফিরে পেয়েছে। লেড়কাকে নিয়ে দিনভর খুশীতে মজে থাকে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই বৃদ্ধ বণিকের দিলে এক নতুনতর হতাশার সঞ্চার হ'ল। হরবখত গালে হাত দিয়ে বসে ভাবে, তার তো গোরে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু আছে সব কিছু বিলকুল ছেড়েছুঁড়ে বেহেস্তে চলে যেতে হবে।

বৃদ্ধ বণিক এক বিকালে লেড়কা আবু হুসন'কে তলব করল। পাশে বসাল। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌ল—'বেটা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন শুধুমাত্র আল্লাতাল্লার তলবের অপেক্ষায় আছি। তোমার জন্য বিষয় সম্পত্তি যা রেখে যাচ্ছি তা সাত পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে খেলেও ফুরবার নয়। এদিক থেকে আমার আপসোসের কিছু নেই। তবে তোমার কাছে আমার একটিমাত্র উপদেশ রইল—বে-হিসাবী হবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করবে না। তবে হ্যাঁ, নিজেকে তকলিফ দিয়ে ধনদৌলত জমাতে বলছি না। আল্লাতাল্লার ওপর ভরসা রেখে দিন গুজরান করবে। ইয়াদ রাখবে, তার দোয়াতেই জিন্দেগীতে সুখী হওয়া যায়।

অচিরেই বণিক দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তের পথে পা-বাড়াল।

আবু হুসন আব্বাকে হারিয়ে বহুৎ চোখের পানি ঝরাল। ইয়ার দোস্তরা হরবখত পাশাপাশি কাছাকাছি থেকে তাকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিল।

কিছুদিনের মধ্যেই আবু হুসন আব্বার শোক সামলে উঠতে পারল। তার ইয়ার-দোস্তরা তার মকানে স্থায়ী আস্তানা গাড়ল। খানাপিনার দেদার বন্দোবস্ত।

অচিরেই আবু হুসন-এর দিল্ থেকে আব্বার উপদেশাবলী ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। দু' হাতে দিনার ওড়াতে লাগল। ইয়ার দোস্তরা মজা লুঠতে লাগল। সুলতানী খানা, দামী সরাব আর নিত্য নতুন নাচনেওয়ালির আমদানি হতে লাগল তার মকানে। ঝাড়বাতি ঝুলাতেও ভুলল না। তার আব্বাজীর রেখে যাওয়া দিনারের পাহাড়ের শির নিচু হতে হতে এক সময় জমিনে এসে ঠেকল। ব্যস, বিলকুল ভোঁ ভাঁ হয়ে গেল। এক সময় কেবলমাত্র একটি বাঁদী তার সম্বল হ'ল।

তার খুবসুরৎ এক বাঁদী ছাড়া আবু হুসন-এর যা কিছু ছিল তার নসীব এক এক করে সব ছিনিয়ে নিল। বাঁদীটির নাম হাফিজা।

আবু হুসন-এর চোখে নিদ উধাও হয়ে গেল। নিরবচ্ছিন্ন হতাশা আর হাহাকার তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তবে বাঁদী হাফিজার সুরৎ তামাম বাগদাদ নগরে সবচেয়ে সেরা। অনন্যা।

হাফিজা এক সকালে হুসন'কে আদর সোহাগ করতে করতে বল্‌ল—' হরবখত গালে হাত দিয়ে মনমরা হয়ে ভেবে কি লাভ বল তো? যা করলে কাজের কাজ হতে পারে তার ফন্দি ফিকির কর। আমি কি বলছি শোন—আমাকে দিয়ে তোমার মুশকিল আশান হতে পারে। নসীব ফিরে যাবে।'

আবু হুসন সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

হাফিজা ব'লে চলে—'হ্যাঁ, যা বলছি শোন—আমাকে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর কাছে নিয়ে চল। তাকে বলবে, মাত্র দশ হাজার দিনার পেলেই তুমি আমাকে বেচে দিতে রাজী আছ। তাকে বলবে, বাঁদীর সুরতের তুলনায় দাম কমতিই আছে। বাঁদী-বাজারে গিয়ে নিলাম তুল্‌লে বহুৎ দিনার আমদানি হতে পারে বটে। কিন্তু কার কাছে, কোন মুলুকে চলে যাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। আপনার হারেমে থাকলে, কষ্ট পাবে না। আমার দিল্ ঠাণ্ডা থাকবে। এ বাৎ তো সাচ যে, আপনি ছাড়া বাঁদী হাফিজার গুণের কদর দেয়ার মত সমঝদার আদমি তামাম বাগদাদে দোসরা কেউ নেই। আপনার দিল্ চাইলে এর গুণ হাজারবার যাচাই করে নিতে পারেন। ব্যস, কাজ হাসিল।'

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বাঁদী হাফিজা এবার বল্‌ল—'লেকিন এক বাৎ খেয়াল রাখবে। খলিফা দর নিয়ে কচলাকচলি করলে তুমি একদম রাজী হবে না। গাঁট হয়ে বসে থাকবে—পাক্কা দশ হাজার

...দির।'

আবু হুসন পড়ল মহামুশকিলে। এক দিকে কলিজার সমান বাঁদী হাফিজা-র প্রতি পিয়ার মহব্বৎ আর অন্যদিকে আর্থিক অভাব অনটন। বহুৎ লড়ালড়ির পর সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেল্ল। খলিফার কাছে বাঁদী হাফিজা'কে বেচেই দেবে।

সন্ধ্যার কিছু আগে আবু হুসন বাঁদী হাফিজা'কে সাজিয়ে গুজিয়ে খলিফার কাছে হাজির হ'ল। সে হাফিজার শিখিয়ে দেয়া বুলি মুখস্থ বিদ্যার মত খলিফার কাছে আওড়ে গেল।

খলিফা আবু হুসন-এর মুখ থেকে বাঁদী হাফিজা-র গুণের ফিরিস্তি শুনে মুচকি হেসে বল্লেন—'হাফিজা, তোমার যে সব গুণের কথা শুনলাম তার দু'-চারটে নমুনা যে চাই।'

হাফিজা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'জাঁহাপনা, ফরমাশ করুন, কি জানতে উৎসাহী।'

—'তোমার পাণ্ডিত্য, কোন্ কোন্ বিষয়ে আগে বল।'

—'জাঁহাপনা, সঙ্গীত, ব্যাকরণ, কাব্য, গণিত, জ্যামিতি, আইন, সমাজবিদ্যা কলাবিদ্যা, সামরিকবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা—কোন্ বিষয়ে আপনি জানতে উৎসাহী মেহেরবানি ক'রে বলুন।'

—'সঙ্গীতে তোমার দখল কেমন, বল তো।'

—'জাঁহাপনা, সঙ্গীতের তো হরেক শাখা। তবে সবচেয়ে কঠিন যে কালোয়াতী তাতেও আমার দখল যথেষ্টই আছে। আর সেতার, পাখোয়াজ ও বীণা প্রভৃতি আমার হাতে পড়লে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আবার নাচেও আমার পারদর্শিতা রয়েছে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! তোমার বাগ্মীতায় আমি মুগ্ধ।'

খলিফা এবার বাঁদী হাফিজা-র বিভিন্ন বিষয়ের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সুলতানিয়তের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞকে তলব করলেন।

খলিফার বিশালায়তন এক কামরায় পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞগণ সমবেত হলেন। কারোরই মালুম নেই খলিফা কেন হঠাৎ তাঁদের তলব করেছেন।

এক সময় উজির জাফর'কে নিয়ে খলিফা সেখানে এলেন। তার পিছন পিছন আবু হুসন বাঁদী হাফিজা'কে নিয়ে সেখানে হাজির হ'ল। হাফিজা খলিফার দিকে এগিয়ে গিয়ে আনত মস্তকে সশ্রদ্ধ কুর্ণিশ করল।

খলিফা এবার উপস্থিত পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে বল্লেন—'আজ আপনাদের তকলিফ দিয়ে আমার প্রাসাদে নিয়ে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য, একটি জনানার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করা। আপনারা নিজ নিজ পছন্দ মাফিক প্রশ্ন তাকে করতে পারেন।'

উপস্থিত সবাই ঘাড় কাৎ করে খলিফার প্রশ্নের জবাব দিলেন। হাফিজা এবার উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বল্ল—'মহামান্য প্রাজ্ঞজন, আপনাদের মধ্যে যদি কেউ কোরাণ-বিশেষজ্ঞ থাকেন তবে মেহেরবানি করে আমাকে জানতে দিন।'

এক বৃদ্ধ হেকিম হাত তুলে হাফিজা-র জিজ্ঞাসা নিরসন করলেন।

—'তবে মেহেরবানি করে আপনিই আমাকে প্রথম যা কিছু জিজ্ঞাস্য বলুন।'

—'বহুৎ আচ্ছা! বেটি, বল তো পবিত্র কিতাব কোরাণ শরিফ মোট কয়টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত? আর তাতে কতগুলি বর্ণ এবং অক্ষরের উল্লেখ রয়েছে? এসব বাৎ না হয় পরে হবে। আগে বল তো বেটি, তোমার ইমাম কে? তোমার মালিক কে? আর তোমার পয়গম্বরই বা কে? কাদের তুমি ভ্রাতৃজ্ঞান কর? তোমার নীতি কি? তোমার নির্দিষ্ট পথ ও দিক কোন্‌টি?'

—'হুজুর, আমি এক এক করে আপনার বিলকুল সওয়ালের জবাব দিচ্ছি। পবিত্র কিতাব কোরাণ আমার ইমাম। কোরাণই আমার কানুন। আল্লাহকে আমি একমাত্র মালিক জ্ঞান করি। আর আমার পয়গম্বর মহম্মদ। মক্কার কাবাহ্ আমার দিক। আমার নীতি পয়গম্বরের উপদেশাবলী। আমার ধর্মে বিশ্বাসী আদমি মাত্রই আমার ভাই। আর সুন্নী সম্প্রদায়ের নির্দেশিত পথকেই আমি আমার পথ ব'লে জ্ঞান করি।'

খলিফা মুগ্ধ হয়ে সবিস্ময়ে হাফিজার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

হেকিম এবার নতুন একটি সওয়াল ছুঁড়ে দিলেন—'বেটি, এবার বাতাও তো কি করে সমঝাতে পার আল্লাহ আছেন?'

—'যুক্তির মারফৎ সমঝানো যায়। যুক্তি দো কিসিমকা। পহেলা যুক্তি পাই দিল্ থেকে আর দুসরা অর্জনের ব্যাপার। জ্ঞান-বুদ্ধিই এর সহায়ক।'

—'এবার বাতাও যুক্তি কোথা থেকে আসে?'

—'দিল্। দিল্ থেকে। তবে মস্তিষ্ক তাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগায়।'

—'ইসলাম ধর্মে কয়টি কর্তব্যের নির্দেশ রয়েছে ও কি কি?'

—'পাঁচটি কর্তব্য অবশ্য পালনীয়। পহেলা—ধর্মবিশ্বাস—আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়, দুসরা—মহম্মদ আল্লাহ-র পয়গম্বর। তিসরা—দান, চৌথা—প্রার্থনা আর পঞ্চম—রোজা। সে সঙ্গে মক্কায় তীর্থযাত্রার কথাও উল্লেখ রয়েছে।'

—'ধর্মের ব্যাপারে কোন্ কোন্ আচরণ প্রশংসনীয়, বাতাও।'

—'এতে ছয় আচরণের উল্লেখ মেলে। (ক) নামাজ, (খ) উপবাস, (গ) দান, (ঘ) নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি বর্জন, (ঙ) রিপু দমন এবং সব শেষে (চ) ধর্মযুদ্ধে যোগদান।'

—'নামাজ কেন অত্যাবশ্যক বাতাও তো।'

—'নামাজের উদ্দেশ্য আল্লাহ-র কাছে ধর্মের অর্ঘ্য নিবেদন করা। গুণ কীর্তনের মাধ্যমে তার মহিমা প্রচার করা। আর আত্মার শান্তির প্রয়াসী হওয়া।'

—'বেটি, এবার বাতাও তো বিশ্বাস কিভাবে দৃঢ় হয়?'

—'নামাজের মাধ্যমে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়।'

—'নামাজের মাধ্যমে কোন্ কোন্ কিসিমের লাভ হতে পারে ব'লে তুমি মনে কর?'

—'পার্থিব লাভ নামাজের মাধ্যমে হতে পারে না। নামাজের মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে, আদমি এবং আল্লাহ-র মধ্যে অপার্থিব যোগসূত্র স্থাপন করা। দশটি অলৌকিক লাভ নামাজের মাধ্যমে হয়—(ক) দিলে সহানুভূতির সঞ্চার করে, (খ) দিল্‌কে প্রস্ফুটিত করে, (গ) মুখাবয়বে প্রশস্তি আনয়ন করে, (ঘ) দিলে দয়া-মায়ার সঞ্চার ঘটে, (ঙ) শয়তানকে দূরে হটিয়ে দেয়, (চ) বিমারিকে বাধা দেয়, (ছ) অশুভকে বিনাশ করে, (জ) বোধশক্তিকে সুদৃঢ় করে, (ঝ) শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করে এবং (ঞ) আত্মা ও আল্লাহ-র ব্যবধান ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! এবার বাতাও তো নামাজের গোপন কথা কি?'

—'রুজু। রুজু করার আগে দিল্‌কে করুণা ও সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলা অত্যাবশ্যক।'

—'এবার বাতাও তো বেটি, কেউ যখন রুজু করতে প্রবৃত্ত হয় তখন জীন বা শয়তানরা কি ক'রে থাকে?'

—'কেউ যখন রুজু করতে প্রবৃত্ত হয় তখন শয়তান তার বা দিকে অবস্থান করে। আর জীন অবস্থান করে ডানদিকে। কিন্তু আল্লাহ-র নামে নামাজ শুরু হওয়ামাত্র শয়তান চট্ ক'রে কেটে পড়ে। কিন্তু জীন তার কাছে এগিয়ে আসে, চারদিক থেকে চারটি বাতি তার শিরে তুলে ধরে। আল্লাহ-র গুণকীর্তন করে আর আদমির গুনাহকে মার্জনা করার জন্য কোশিস করে। সে আদমি যদি রুজু করার সময় আল্লাহ-র নাম উচ্চারণ করতে ভুলে যায় তবে শয়তান তার ঘাড়ে চেপে বসে। আর সর্বশক্তি নিয়ে আত্মার নিপীড়ন শুরু করে। সন্দেহের ইঙ্গিত এবং চেতনা প্রশমিত করার উৎসাহ প্রদর্শন করে থাকে।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু' শ' তিয়াত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, হাফিজা তার বক্তব্য অব্যাহত রাখল।' সে এবার বলল—'রুজুর সময় পানি দিয়ে সর্বাঙ্গ ধৌত করে নেওয়া উচিত। মোদ্দা কথা, দৃশ্য ও অদৃশ্য যত চুল দেহে আছে সবই যেন

পানিতে ভেজে, এমন কি যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও যেন ভালভাবে পানি দিয়ে ধৌত হয়। এসব ধৌত হওয়ার পর তবে পা ধৌত করতে হয়।'

—'রোজা সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?'

—'রোজা পালন করা হয় রমজান মাসে। তখন হররোজ সূর্যাস্তের আগে আহারাদি, পান এবং মৈথুন করা নিষেধ। যতদিন নতুন চাঁদ দৃশ্য না হবে ততদিন এ-উপবাস পালন করার বিধান রয়েছে। একমাত্র কোরাণ পাঠ, অর্থাৎ কোরাণ ব্যতীত অন্য কোন কিতাব পাঠ থেকে বিরত থাকতে পারলে খুবই ভাল হয়।'

—'ইসলাম শাস্ত্র বলেছে কোন কোন বস্তু রোজাকে কলুষিত করে না—কি কি?'

—'শিরে তেল মালিশ, শুর্মা, কাজল প্রভৃতির ব্যবহার, রাস্তার ধূলোবালি, দিনে অথবা রাত্রে বীর্যপাত। থুথু গিলে ফেলা, খুনঝরা, সম্ভোগ এবং অমুসলমান জনানার প্রতি নজর দেয়া—এদের দ্বারা রোজা কলুষিত হয় না। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এতে রোজা কলুষিত হয়।'

—'পবিত্র তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে তোমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই বেটি।'

—'প্রত্যেক সাচ্চা মুসলমানকে তামাম জিন্দেগীতে অন্ততঃ একবার মক্কায় তীর্থ করতে যাওয়া উচিত। তবে তীর্থে যাওয়ার আগে কতগুলো নির্দেশ অবশ্য পালনীয়— (ক) মস্তক মুণ্ডন করা, (খ) দরবেশের পোশাকাদি পরিধান করা, (গ) নখ কাটা, (ঘ) জনানাদের সঙ্গে ব্যবহারিক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং (ঙ) মুখাবয়ব আবৃত রেখে চলাফেরা করা। তবে হ্যাঁ, এর সঙ্গে আরও কিছু বিধি নিষেধ সুন্নী সম্প্রদায় পালন করে থাকে।'

—'আত্মিক পলায়ন বিষয়ে কিছু বাতাতে পার?'

—'অবশ্যই। আত্মিক পলায়ন বলতে বুঝায় জনানা থেকে দূরে থাকা, উদবাসন আর মৌনব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন পবিত্র মসজিদে অবস্থান করা। তবে ধর্ম একথা স্বীকার করে না।'

—'বেটি, এবার বল তো পবিত্র ধর্মযুদ্ধ বলতে কি বুঝায়?'

—'ইসলাম যদি কোনভাবে বিধর্মীর দ্বারা বিপন্ন হয় তবে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ধর্মযুদ্ধে আক্রমণ করার নির্দেশ নেই। আত্মরক্ষাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সাচ্চা মুসলমান হবে সে অস্ত্রহাতে এগিয়ে যাবে, ভুলেও পলায়নের কোশিস করবে না।'

—'এবার বল তো 'রোজা'র আক্ষরিক অর্থ কি? আর দানের অর্থ?'

—'বিরত থাকা। দানের অর্থ হচ্ছে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলা।'

—'বহুৎ আচ্ছা, এবার বল তো যুদ্ধ বলতে কি বুঝায়?'

—'আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধে ব্রতী হওয়া।'

—'বেটি, 'রুজু' করার অর্থ কি, বল তো?'

—'ভেতরের ও বাইরের মলিনতাকে ধৌত করে নেয়া।'

—'বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ আচ্ছা।' এবার বৃদ্ধ হেকিম সোল্লাসে বল্ল —'জাঁহাপনা, এ-লেড়কির কোরাণ বিষয়ের জ্ঞান আমাকে সত্যিসত্যিই মুগ্ধ করে দিয়েছে। এর পাণ্ডিত্যের প্রতি আমি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি।'

হাফিজা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্ল—'আপনি তো আমাকে হরেক কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। এবার যদি অনুমতি দেন তবে একটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাচ্ছি।'

—'জরুর।—জরুর প্রশ্ন করতে পার বেটি।'

—'মেহেরবানি করে আমাকে সমঝায়ে দিন, ইসলামের বনিয়াদ বলতে আমরা কি সমঝাব?'

—'শোন বেটি, ইসলাম ধর্ম মূল চারটি বনিয়াদের ওপর খাড়া আছে! যেমন ধর —(ক) ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। আর এটি জ্ঞানগর্ভ যুক্তির মাধ্যমে প্রতিভাত হয়। (খ) কর্তব্যবোধ, বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতা। (গ) সাধুতা এবং (ঘ) যাবতীয় অঙ্গীকার পালন করা।

—'যদি অনুমতি করেন তবে আপনার কাছে আর একটি প্রশ্ন রাখার ইচ্ছা রয়েছে। আমি এখন যে-প্রশ্নটি উত্থাপন করব তার যথাযথ উত্তর দান যদি করতে না পারেন তবে আপনার শিরোপার অধিকারী কিন্তু আমাকে করতে হবে। রাজী তো? আমার এবারের প্রশ্নটি হচ্ছে—বলুন তো ইসলামধর্মের শাখা কয়টি?'

বৃদ্ধ কোরাণ বিশারদ প্রশ্নটি শোনার পরই আচমকা ফুটো বেলুনের মত একেবারে চিপসে গেল। ফ্যাকাশে মুখে অসহায়তার ছাপ ফুটিয়ে তুলে নীরবে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

খলিফা বৃদ্ধের অক্ষমতার কথা বুঝতে পেরে বল্লেন—'হে শাস্ত্রজ্ঞ নারী, তুমিই আমাদের ইসলাম ধর্মের এ নিগূঢ় তথ্যের কথা শোনাও। যদি আমাদের খোলসা করে সমঝায়ে দিতে পার তবে কোরাণ বিশারদের শিরোপার অধিকারী অবশ্যই তুমি হচ্ছ।'

হাফিজা এবার যথোচিত বিনম্র-বিনয়ের সঙ্গে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বল্ল—'জাঁহাপনা, বলছি, তবে ধৈর্য ধরে শুনুন—ইসলাম ধর্ম মোট কুড়িটি শাখায় বিভক্ত। মহামান্য খলিফা যদি প্রতিটি শাখার নাম ও বিশদ বিবরণ শুনতে আগ্রহী হন তবে আপনার সময়-সুযোগ মত আমি আলোচনা করব প্রতিশ্রুতি দান করছি।'

খলিফা উল্লসিত হয়ে বল্লেন—'বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ আচ্ছা!' এবার কোরাণ বিশারদকে তার শিরোপা খুলে হাফিজাকে দান করার হুকুম দিলেন।

কোরাণ বিশারদ নিজের প্রতিশ্রুতি ও খলিফার হুকুম তামিল করতে গিয়ে বিষণ্ণমুখে হলেও নিজের শিরোপা খুলে হাফিজার সামনে ধরল। এবার অবনত মস্তকে সভাকক্ষ ত্যাগ করল।

খলিফার হুকুম নিয়ে অন্য আর এক বিশারদ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। হাফিজা'কে লক্ষ্য করে বলে, 'আহার্য গ্রহণ করতে গিয়ে আমাদের কোন্ কোন্ নিয়মকানুন পালন করা উচিত?'

—'জী, খানাপিনা শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে পানি দিয়ে হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। খানাপিনা সারার সময় বাঁ-দিকে হেলে বসা চাই। খানাপিনা গ্রহণ করার সময় বাঁ-দিকে সামান্য কাৎ হয়ে বসা বিধেয়। আর কেবলমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুলি, মধ্যমা এবং তর্জনী ব্যবহার ক'রে খানা মুখে তুলতে হয়। খানা গ্রহণ করার সময় অন্য কারো দিকে দৃষ্টিপাত করতে নেই। কারণ, এতে মনে হতে পারে তার খানার ব্যাপারে হয়ত কেউ কিছু ভাবছে। ফলে ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

—'এবার বল তো 'অল্প একটু', 'অর্ধেক' এবং 'তুচ্ছাতি তুচ্ছ' বলতে কি বুঝায়?'

—'অল্প একটু বলতে 'ধর্মাত্মা', অর্ধেক বলতে 'ভণ্ড সাধক' আর তুচ্ছাতি তুচ্ছ বলতে 'বিধর্মীকে বুঝায়।'

—'বহুৎ আচ্ছা। কোথায় বিশ্বাসের সন্ধান মিলতে পারে, বল তো?'

—'বিশ্বাস মোট চারটি জায়গায় অবস্থান করে। জায়গা চারটি হচ্ছে—(ক) মস্তক, (খ) হৃদয়, (গ) জিহ্বা ও (ঘ) ধর্মানুসারী।'

—'এবার আমাকে সমঝায়ে দাও হৃদয় কয় প্রকার ও কি কি?'

—'অগণিত। তবে যারা সাচ্চা মুসলমান তাদের হৃদয় সর্বদা পবিত্রতা রক্ষা করে চলে আর বিধর্মীদের হৃদয় পবিত্রতা রক্ষার জন্য ভাবিত নয়।'

ইতিমধ্যে প্রভাতের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

দু' শ' ছিয়াত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলে বেগম কিস্সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বিশেষজ্ঞের প্রশ্নের সুচিন্তিত ও নির্ভুল জবাব দিয়ে হাফিজা তার হর্ষ উৎপাদন করতে লাগল। সে সোল্লাসে বলে উঠল—'বেটি, তোমার শাস্ত্র-বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি যথার্থই মুগ্ধ। এমন অমিত জ্ঞান আমি অন্ততঃ কারো মধ্যে আজ পর্যন্ত পাই নি।'

হাফিজা এবার বিনম্র-বিনয়ে শাস্ত্রজ্ঞকে বল্ল—'এবার আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে উৎসাহী, তবে শর্ত থাকবে আমার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে ও অক্ষম হলে আপনার শিরোপাও

আমার প্রাপ্য হবে। এবার বলুন তো, ধর্মীয় কোন্ কর্তব্য সর্বাগ্রে পালন করা বিধেয়?'

বিশেষজ্ঞ মুখ চুণ করে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। খলিফার নির্দেশে সে নিজের শিরোপা খুলে হাফিজা-র হাতে তুলে দিল।

হাফিজা এবার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে খলিফার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, সর্বাগ্রে যে-কর্তব্য পালন করতে হয় তা হচ্ছে—ধর্মীয় কর্তব্যগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে 'রুজু' কর্তব্য পালন করা বিধেয়। এর মাধ্যমে দেহ-মনে শুদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব।'

উপস্থিত সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার ক'রে নিল, হাফিজা-ই সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ।

এবার অন্য এক শাস্ত্রজ্ঞ সদন্তে হাফিজা-র কাছে প্রশ্ন রাখল—'বেটি, আমরা সবাই তো একবাক্যে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলাম। এবার কোরাণ সম্বন্ধে আমরা তোমার মুখ থেকে কিছু নিগূঢ় তথ্য শুনতে আগ্রহী।'

হাফিজা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। খলিফা ও উপস্থিত শাস্ত্রজ্ঞদের যথোচিত সম্ভাষণ ক'রে বল্‌ল—'কোরাণ সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে সর্বাগ্রে বলতে হয়—কোরাণ এক শ' চোদ্দটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাদের মধ্যে সত্তরটি রচিত হয়েছে মক্কায়। অবশিষ্ট চুয়াল্লিশটি রচিত হয়েছে মদিনায়। সত্তরটি অধ্যায় আবার দু' শ' একুশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এদের প্রত্যেক 'দশক' নামে চিহ্নিত। আর কোরাণে মোট ছ' হাজার দু' শ' ছত্রিশটি স্তবক বর্তমান। আর শব্দ সংখ্যা সর্বমোট ঊন-আশি হাজার চারশ' ঊনচল্লিশটি। অক্ষর সংখ্যা সর্বমোট তিন লক্ষ তেইশ হাজার দু' শ' সত্তরটি।'

শাস্ত্রজ্ঞ এবার হাফিজার কাছে পয়গম্বরদের সংখ্যা ও তাদের নাম জানতে চাইল।

তার জিজ্ঞাসা নিরসন করতে গিয়ে বল্‌ল—'শুনুন, আমাদের মোট পঁচিশজন পয়গম্বর ছিলেন। তাদের নামও কি শুনতে চাইছেন?'

—'জরুর। কি তাঁদের নাম, বলতো শুনি?'

—'পয়গম্বরদের মধ্যে সর্বাগ্রে আদম-এর নাম করতে হয়। তারপর যথাক্রমে নাম করতে হয়—নোয়াহ, ইসমাইল, আইজ্যাক, জ্যাকব, যোসেফ, ইলিসা, জোনাহ, লাভ, সালিহ, হুদ, সোয়াইব, ডেভিড, সলোমন, ধুল, কাফ্ল, ইদ্রিস, ইলিয়াস, ইয়াহিয়া, জ্যাকারিয়াস্, জোব, মোসেস, আরুন, জেসাস ও মহম্মদ।'

—'বহুৎ আচ্ছা! এবার বল তো পয়গম্বর বিধর্মীর বিচার কিভাবে ক'রে থাকেন?'

—'পয়গম্বর বলেছেন, ইহুদীদের বক্তব্য খ্রীস্টানরা ভ্রান্ত পথে গমন করে। আবার ইহুদীরা ভ্রান্ত মত পোষণ করেন খ্রীস্টানদের সম্বন্ধে। সত্য বলতে গেলে তাদের উভয়ের বক্তব্যই নির্ভুল।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু' শ' আটাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা হাফিজা এবার বল্‌ল—আমি এবার একটি প্রশ্ন মহাপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞের কাছে করতে চাইছি। মেহেরবানি করে বলুন তো কোরাণের কোন্ স্তবকে কাফ অক্ষরটি তেইশবার ব্যবহার করা হয়েছে, মিম ষোলবার এবং অন্য একটি অক্ষর চল্লিশবার ব্যবহার করা হয়েছে?'

এ-শাস্ত্রজ্ঞটিও অন্যান্যদের মতই আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। ফলে খলিফার নির্দেশে তাকেও শিরোপা খুলে হাফিজা-র হাতে তুলে দিতে হ'ল।

খলিফা এবার সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন—'আমার তামাম সুলতানিয়তে হাফিজা-ই সর্বশ্রেষ্ঠা শাস্ত্রজ্ঞা।'

খলিফা খুশী হয়ে হাফিজাকে ইনামস্বরূপ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করলেন।

এবার খলিফা হাফিজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মন খোলসা ক'রে বল তো হাফিজা, তুমি কি আমার হারেমে যেতে ইচ্ছুক? সেখানে বাদশাহী মর্যাদা পাবে। আর যদি দিল্ চায় তবে এ-যুবকের সঙ্গেও বাস করতে পার, ভেবে দেখ।'

—'খোদা মেহেরবান, আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই ফিন ফিরে যেতে আগ্রহী।'

—'বহুৎ আচ্ছা! আমি খুশী হয়ে আরও পাঁচ শ' সোনার দিনার ইনাম দিচ্ছি। আমি তোমার মহব্বতের মূল্যবোধে খুশী হয়েছি। আমার হারেমে সুখ বিলাসের চেয়েও তোমার কাছে মহব্বতের

মূল্য যে ঢের বেশী তা জেনে আমি যারপরনাই মুগ্ধ। তোমার [illegible] আবু অল-হুসন'কে আমি আমার দরবারে উচ্চ পদ দান করলাম।'

এবার হাফিজা সদ্যপ্রাপ্ত শিরোপা ও সোনার মোহরগুলো নিয়ে আবু হুসন-এর সঙ্গে সভাকক্ষ ছেড়ে গেল।

সভাস্থ সবাই একবাক্যে স্বীকার ক'রে নিল তামাম দুনিয়ায় আব্বাস-এর বংশধরের এ কাজ বাস্তবিকই অতুলনীয়।

বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর মুখ থেকে কিস্‌সার নর্তকী হাফিজা-র অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধির কথা শুনে সোল্লাসে বলে উঠলেন—'তোফা—তোফা! আবার খলিফার কীর্তিকথাও অনন্য, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।'

বেগম শাহরাজাদ এবার বল্লেন—'জাঁহাপনা, এবার আবু নসব-এর অনন্য কীর্তির কথা আপনার দরবারে পেশ করছি।'

আবু নসাবের অনন্য কীর্তিকথা

আবু নসাব-এর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্লেন—'জাঁহাপনা, একরাত্রে খলিফা বিনিদ্র রাত্রি গুজরান করছিলেন। রাত্রি গভীর থেকে ক্রমে গভীরতর হয়ে এল। কিন্তু ঘুম আসা তো দূরের কথা, কিছুতেই দু' চোখের পাতা এক করতে পারছিলেন না।

অনন্যোপায় হয়ে অস্থিরচিত্ত খলিফা পালঙ্ক থেকে নেমে পড়লেন। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। একাই হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদ ছেড়ে বাগিচার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

বাগিচায় পৌঁছে দেখলেন বাগিচার অদূরবর্তী তার হাবেলীর জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কৌতূহল হ'ল।

খলিফা কৌতূহলী মন নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। হাবেলীর দরওয়াজা খোলা। খোজা প্রহরী দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমে অচৈতন্য। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘুমন্ত খোজা প্রহরীটিকে ডিঙিয়ে তিনি কামরার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

কামরায় পা দিয়েই খলিফা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে পড়ল পালঙ্কের মাথার দিকে একটি ছোট্ট জলচৌকির ওপর সরাবের পাত্র। পাশে মনলোভা পেয়ালা।

খলিফার কৌতূহল চরমে উঠল। তিনি দু' পা এগিয়ে পালঙ্কের গা-ঘেঁষে দাঁড়ালেন। পালঙ্কের পর্দা তুলতেই সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গে এক অবাঞ্ছিত শিহরণ অনুভব করলেন। কি দেখলেন তিনি যার জন্য এমন ক'রে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি? দেখলেন—যেন এক বেহেস্তের হুরী পালঙ্কের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অনন্যা।

হারুণ-অল-রসিদ আগের মত সন্তর্পণেই পিছিয়ে এলেন। সরাবের পাত্র ও পেয়ালা হাতে তুলে নিলেন। সরাব ঢেলে পেয়ালা পূর্ণ করলেন। খুবসুরৎ লেড়কিটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি সরাবের পেয়ালাটি ঠোঁটের কাছে তুলে নিলেন। ধীরে ধীর সবটুকু সরাব গলায় ঢেলে দিলেন। একটিমাত্র ভাবনাই তার শিরে বার বার চক্কর মারতে লাগল—কে এ বেহস্তের হুরী—খুবসুরৎ লেড়কি? কে এখানে একে আনল? কোত্থেকেই বা আনল?

খলিফা কৌতূহলের শিকার হয়ে ফিন পালঙ্কের কাছে এগিয়ে গেলেন। আলতো ক'রে লেড়কিটির কপালে হাত রাখলেন। আধফোটা পদ্মের মত চোখ দুটো মেলে তাকাল। কেবল মুহূর্তের জন্য। প্রথম দর্শনেই খলিফাকে চিনতে পারল। হুড়মুড় ক'রে উঠে বসল। চোখে-মুখে তার জমাটবাঁধা আতঙ্কের ছাপ। ডরে তিরতির করে কাঁপতে লাগল। কোনরকমে পোশাক আশাক একটু সামলে নিয়ে বেনিয়ার পুঁটুলির মত ডরে জড়োসড়ো হয়ে পালঙ্কের একপাশে বসে রইল।

খলিফা কামরার কোণে দাঁড় করানো একটি তানপুরা দেখতে পেয়ে কৌতূহলাপন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি গানা গাইতে পার?'

—'পারি। পারি জাঁহাপনা।'

—'তোমার পরিচয় জানার জন্য আমার দিল্‌ কৌতূহলে ভরপুর হলেও এখন আর সে-কথা তুলে সময় নষ্ট করতে চাই না। এখন তোমার সুরেলা কণ্ঠের একটি গানা শোনাও সুন্দরী।।'

খুবসুরৎ লেড়কিটি গানা ধরল। গানা নয় তো যেন তার কণ্ঠ দিয়ে মধু ঝরতে লাগল। তন্ময় হয়ে খলিফা তার গানা শুনতে লাগল। একের পর এক একুশটি রাগরাগিনী গেয়ে শোনাল।

খলিফা যেন আনন্দ-সায়রে ভাসতে ভাসতে কোন্ অচিন মুলুকে চলে গেলেন।

গানা থামিয়ে লেড়কিটি বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আজ আমি নসীবের ফেরে এখানে, এ-জনমানবহীন মকানে নির্বাসিত-জীবন যাপন করছি।'

—'কিন্তু কেন? কেন তোমার নসীব তোমাকে এখানে এনে ফেলেছে, বলতে পার? কিসের দুঃখ তোমার? কেনই বা এ-নিরবচ্ছিন্ন হতাশা?'

—'জাঁহাপনা, আপনার লেড়কা অল-আমিন আমাকে দশ হাজার সোনার মোহরের বিনিময়ে বাঁদী-বাজার থেকে খরিদ করে নিয়ে এসেছেন। আমাকে বলা হয়েছিল আপনাকে ভেট দেয়ার জন্যই তিনি আমাকে খরিদ করেছেন। আমার নসীব বেগড়বাই করল। আপনার খাস বেগম ব্যাপারটিকে দিল্ থেকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নিগ্রো খোজাকে দিয়ে আমাকে এখানে চালান করে দেন। তারপর থেকেই এখানে বন্দী-জীবন গুজরান করছি।'

লেড়কিটির বাৎ খলিফা-র মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করে। তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'ঘাবড়াও মাৎ। তোমাকে আলাদা এক প্রাসাদ গড়ে দিচ্ছি। সেখানে থাকবে। দাসী-বাঁদীর ব্যবস্থাও থাকবে। আমার তরফ থেকে মোটা অর্থ পাবে মাসোহারা হিসাবে।'

এদিকে গানা শুরু হতেই খোজাটির ঘুম ভেঙে যায়। ডরে জড়োসড়ো হয়ে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

খলিফা খোজাকে হুকুম করলেন,—'ছুট্টে গিয়ে আবু নসাব'কে তলব দে।'

খলিফা-র মধ্যে যখনই কোন দুষ্টবুদ্ধি জাগে তখনই আবু নসাব'কে তলব করেন।

এদিকে খোজা গিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা আবু নসাব'কে খলিফা-র কথা বলতে সে বল্‌ল—'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু খলিফা-র দরবারে কি ক'রে যাই বল তো? আমার দেহটি যে এক লেড়কার কাছে বাঁধা দিয়ে রেখেছি। ও ছাড়লে তবেই না যেতে পারব।'

—'লেড়কা? বন্ধক? কই, লেড়কা টেড়কা কিছু তো দেখছি নে সাহাব! শুনেছি জমিন, মাকান আর সমানপত্র বাঁধা দেওয়া যায় বটে। কিন্তু দেহ—।'

কবিবর আবু নসাব সমঝাল, খোঁজা তার হেঁয়ালীটুকু ধরতে পারে নি। সে এবার মুচকি হেসে বল্‌ল—। 'বেটা, লেড়কাটির ওমর বহুৎ কম। গোঁফ-দাড়ি গজায় নি এখনও। দেখতে রোগা পটকা হলে কি হবে একেবারে লালটুস। তাকে এক হাজার দিরহাম দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাছে যে অর্থকড়ি কিচ্ছু নেই, আগে হুঁস ছিল না। তাই অর্থকড়ি না পেলে সে যে আমাকে ছাড়বে না খোজা সাহাব।'

—'ইন্‌সাল্লা! তখন থেকে লেড়কা লেড়কা করছেন কবি সাহাব, কিন্তু কোথায় সে লেড়কা?'

এমন সময় খুবসুরৎ এক লেড়কা এসে দরওয়াজায় দাঁড়াল। আবু নসাব চোখের ভাষায় তাকে দেখিয়ে বল্‌ল—'ওই দেখ।'

খোজা বাধ্য হয়ে একাই হাভেলীতে খলিফা-র কাছে ফিরে গেল। তাঁকে আবু নসাব-এর নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা আর লেড়কাটির এক হাজার দিরহামের সমাচার দিল।

ব্যাপারটি খলিফার মধ্যে কৌতূহলের উদ্রেক করল। তিনি হাজার দিরহাম খোজার হাতে দিয়ে বল্‌লেন—'যা, আবু নসাবকে খালাস করে নিয়ে আয় গে।'

আবু নসাব এবার নেশার ঘোরে টাল খেতে খেতে খলিফা-র কাছে হাজির হয়। খলিফা তো তার নেশার বহর দেখে রেগে একেবারে কাঁই।

আবু নসাব খলিফা-র বাৎ না শুনি না শুনি ক'রে বল্‌ল—'ইয়া আল্লা! খুবসুরৎ লেড়কি জোগাড় করেছেন দেখছি জাঁহাপনা।'

খলিফা মুচকি হেসে বল্‌লেন—'আবু নসাব, ভাবছি এবার তোমার উপযুক্ত একটি পদে তোমাকে বহাল করব। কবিতা টবিতা লেখা ছেড়ে ছুড়ে তুমি বাগদাদের জনানাদের দালালের সর্দারী করবে।'

ভয়-ডর কাকে বলে আবু নসাব-এর জানা নেই। অন্য সবাইকে তো দূরের কথা খলিফাকেও দিল্ যা চায় মুখের ওপর ফটাফট শুনিয়ে দেয়। সে খলিফা-র কথার জবাব দিতে গিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠল—' জী, দালালীর দস্তুরী আজ থেকেই পাব তো?'

খলিফা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলেন— 'কেন? আজ আবার দালালী কেন?'

'বাঃ তাজ্জব ব্যাপার তো! এমন খুবসুরৎ লেড়কিকে রাতভর ভোগ করলেন, আর আমার প্রাপ্য দালালী দেবেন না!'

খলিফা-র গোস্‌সা পঞ্চমে চড়ল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি খোজাকে হুকুম করলেন—'যা মাসরুর'কে তলব দে। আজ আমি এর গর্দান নিয়ে ছাড়ব। হতচ্ছাড়া বলে কী!'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ নব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, খলিফা-র জরুরী তলব পেয়ে তার দেহরক্ষী মাসরুর উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে কুর্নিশ করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

খলিফা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—'মাসরুর, ওই বজ্জাতটিকে উলঙ্গ করে ফেল। সে অবস্থায় গাধার জিনের সঙ্গে বেঁধে তামাম বাগদাদ নগর চক্কর মারাতে হবে। তারপর সবার চোখের সামনে ওর গর্দান নেব।'

মাসরুর খলিফা-র হুকুম তামিল করল। কবি আবু নসাব'কে এনে দাঁড় করাল প্রাসাদের সদর-দরজায়। নগরবাসী কৌতূহল বশতঃ সেখানে জড়ো হল।

উজির জাফর প্রাসাদের সদর-দরজায় আদমির মেলা বসেছে দেখে ছুটে এল। শুনল, খলিফা-র হুকুমে কবি আবু নসাব-এর গর্দান নেওয়া হবে। তাই কৌতূহলী আদমির ভিড়।

উজির ভিড় ঠেলে আবু নসাব-এর কাছে যায়। উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলে—'কি ব্যাপার কবি?'

আবু নসাব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দেয়—'আর বলবেন না উজির সাহাব—আমার কোন কসুর নেই। জব্বর এক কবিতা লিখে খলিফাকে এমন মাতিয়ে দিয়েছি যে তিনি একেবারে খুশিতে ডগমগ। ব্যস, আর দেরী নয়। তার গায়ের পোশাক আশাক খুলে আমাকে বকশিস দিয়ে দিলেন।' কথা বলতে বলতে নিজের বিবস্ত্র দেহটিকে দেখাল।

আবু নসাব-এর বাৎ শুনে খলিফা তো হেসে গড়াগড়ি যাবার জোগাড়। এবার খুশী হয়ে তাকে তিনি কেবল প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতিই দিলেন তা-ই নয়। সত্যি সত্যি নিজের গায়ের বহুমূল্য পোশাক খুলে তাকে উপহার দিলেন।

কিস্‌সা শেষ হতেই বেগম শাহরাজাদ-এর ছোট বহিন দুনিয়াজাদ তার গলা জড়িয়ে ধরে আব্দারের সুরে বল্‌ল—'বহিনজী, কী সুন্দর কিস্‌সা তোমার!'

বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বল্‌লেন—'সুন্দরী, এবার একটি রোমাঞ্চকর কিস্‌সা শোনার জন্য আমার দিল্ ছটফট করছে।'

বেগম শাহরাজাদ আঙুল দিয়ে বাদশাহের মাথায় বিলি কাটতে কাটতে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার সিন্দবাদ নাবিকের সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা বলছি, আশা করি এতে আপনার দিল্ কানায় কানায় ভরে উঠবে।'

সিন্দবাদ নাবিকের প্রথম সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নতুন কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, খলিফা হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে বাগদাদ নগরীতে এক কুলী বাস করত। সে খুবই দরিদ্র। বাজারে মোট বয়ে কোনরকমে সে দিন গুজরান করত। নাম তার সিন্দবাদ। কুলী সিন্দবাদ এক গ্রীষ্মের দুপুরে ইয়া বড় ও ভারী একটি গাট্টি নিয়ে পথ পাড়ি দিতে লাগল। মাথার ওপরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত সূর্যটি যেন তার সঙ্গে রেষারেষি ক'রে তাপ বিকিরণ করছে।

সিন্দবাদ ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এক বণিকের বাড়ির সদর-দরজায় হাজির হ'ল। গলা শুকিয়ে কাঠ। শরীর টলছে। পা দুটো যেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। মাথার গাট্টিটি নিয়ে তার পক্ষে আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'ল না। বাড়িটির রোয়াকে ধপাস ক'রে গাট্টিটি রেখে হাল্কা হ'ল।

সিন্দবাদ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রোয়াকের ওপর বসে সে অনবরত হাঁপাতে লাগল। কিছু সময় ছায়ায় বসে বিশ্রামের মাধ্যমে ক্লান্তি কিছুটা অপনোদন করে সামান্য স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। এক সময় সিন্দবাদ-এর নাকে গোলাপ পানির খুসবু বাতাসে ভেসে এসে লাগতে লাগল। ব্যাপার কি হঠাৎ করে বুঝতে পারল না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে খুসবুর উৎসস্থল নির্ণয়ের প্রয়াসী হ'ল। শেষ পর্যন্ত বুঝল, দুনিয়ার রূপ-রস-খুসবু তার জন্য নয়। গরীবের এসবের খোঁজ করার অর্থ পণ্ডশ্রম মাত্র। আমীর বাদশাহের মোটও তাকে বইতে হয়। কতই না খুবসুরৎ সামানপত্র তার মাথার গাট্টির মধ্যে। তাদের স্বাদ কি একটি দিনের জন্যও সে পেয়েছে? অবশ্যই না। তার নসীবে কেবল মজুরি স্বরূপ দু'-চারটে দিরহাম ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কলুর বলদের মত কত দামী দামী সব সামানপত্র সে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্বাদ পায় না। যারা সে সব ভোগ করে তারা ভিন্ন সমাজের, ভিন্ন গোত্রের আদমি। দুনিয়ার আচ্ছা আচ্ছা সব সামানপত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকার। আমীররা ভোগ করে, গরীবরা বয়ে নিয়ে তাদের মুখের সামনে তুলে ধরে।

আজ? আজও সিন্দবাদ মাথায় করে সেসব সামানপত্রের গাট্টি ঘেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বয়ে নিয়ে চলেছে তার মধ্যে নির্ঘাৎ

ধনীদের বিলাসের সামগ্রী রয়েছে। এসব ব্যবহারের মাধ্যমে কত সব আল্লাতাল্লার দোয়া লব্ধ ভাগ্যবানদের বিলাস ব্যসনের সামগ্রী রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

বুকের জমাটবাঁধা দুঃখ-হতাশাকে লাঘব করার জন্য কুলী সিন্দবাদ গানা ধরল।

ছায়ায় ঢাকা রোয়াকে ফুরফুরে বাতাস পেয়ে, খোশ মেজাজে কিছুক্ষণ গানা গাওয়ার পর সিন্দবাদ-এর ক্লান্তি অনেকাংশে লাঘব হ'ল। সে একটু চাঙা হয়ে উঠল এবার।

সিন্দবাদ ফিন গাট্রিটি তুলে নিয়ে আবার নতুন ক'রে যাত্রার উদ্যোগ নিতেই দরওয়াজা খুলে এক বান্দা বেরিয়ে এল।

সিন্দবাদ বান্দাটির দিকে বিস্ময়মাখানো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বান্দাটি বেশ একটু মোলায়েম স্বরেই বল্‌ল—'আমার মালিক তোমাকে তলব করেছেন। চল, ভেতরে চল।'

ব্যাপারটি সিন্দবাদ-এর মধ্যে কেবলমাত্র বিস্ময়ই নয়, যথেষ্ট ডরেরও সঞ্চার করে। সে ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যাওয়ার ধান্দায় ধানাই পানাই শুরু করে দেয়। —'ভাইয়া, তোমার মনিব তলব করেছেন সে-তো আমার পক্ষে রীতিমত নসীবের ব্যাপার। কিন্তু আমার সাধ অপরিমিত থাকলেও ভেতরে যাওয়া যে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না ভাইয়া। আদতে আমার গাট্রিটি রেখে ভেতরে যাওয়া কি ক'রে সম্ভব বল? পরের সামানপত্র কোথায় রেখে যাব, বল তো ভাইয়া?'

—'আরে ধ্যুৎ, বাহানা রাখ তো। তুমি ভেতরে গিয়ে আমার মালিকের সঙ্গে বাৎচিৎ সার। আমি তোমার সামানপত্র পাহারা দিচ্ছি।' কথা বলতে বলতে বান্দাটি ছোট্ট ক'রে এক ধাক্কা দিয়ে একরকম জোর করেই সিন্দবাদ'কে বাড়ির ভেতরে চালান দিয়ে দিল।

বান্দাটি এবার সদর-দরজার রক্ষীর জিম্মায় সিন্দবাদ-এর গাট্রিটি রেখে তার পিছন পিছন ভেতরে চলে গেল।

বাড়ির ভেতরটি ছবির মত সাজানো। একেবারে ঝকঝকে চকচকে। বান্দাটি সিন্দবাদকে বিশালায়তন সুদৃশ্য এক কামরায় নিয়ে গেল।

কামরার ভেতরে আদমির ভিড়। সিন্দবাদ একনজর দেখেই সমঝে নিল সবাই খানদানি পরিবারের আদমি। আমীর-ওমরাহটাহ হবে হয়ত।

গোলাপ পানির খুসবু এসে সিন্দবাদ-এর নাকে লাগতে লাগল। সুবিশাল টেবিলে ধবধবে সাদা মখমলের চাদর বিছানো। তার ওপরে সারি সারি রুপোর রেকাবি। প্রত্যেকটিতে খানা সাজানো। হরেক কিসিমের খানা। অজানা, অদেখা খানা। অনাস্বাদিত তো

বটেই। সে সঙ্গে কয়েকটি সরাবদানি ভর্তি দামী আঙুরের সরাব। রুপোর পেয়ালাও সাজানো রয়েছে।

কামরার একধারে হরেক কিসিমের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত বাঁদীরা বিচিত্র ভঙ্গিমায় বসে।

সিন্দবাদ চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে কামরার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সব কিছু দেখতে লাগল। সে আপন মনে ব'লে উঠল —'ইয়া আল্লাহ! এ কোথায় এসে পড়লাম! এ-ই কি বেহেস্ত, নাকি দুনিয়ারই কোন অংশ?'

সবচেয়ে প্রবীণ আদমিটি সিন্দবাদ'কে হাতের ইশারা ক'রে কাছে ডাকল। টেবিলে বসতে বল্‌ল। নোকরকে ডেকে তাকে খানা দিতে বল্‌ল।

এক মাঝ-বয়সী নফর খানাভর্তি রেকাবি এনে সিন্দবাদ-এর সামনে রাখল। প্রবীণ আদমিটি বল্‌ল—'তুমি আগে খানাপিনা সার। তারপর বাৎচিৎ হবে।

সিন্দবাদ গোগ্রাসে উপাদেয় খানাগুলিকে উদরস্থ করল।

প্রবীণ আদমিটি এবার বল্‌ল—'বেটা তোমার কি নাম? মকান কোথায়? পেশা কি?'

—'আমার নাম সিন্দবাদ। কুলী। মোট বয়ে রুটির বন্দোবস্ত করি।' প্রবীণ এবার শিশুর মত হো হো ক'রে হেসে বল্‌ল—'আরে ভাইয়া, কী তাজ্জব বাৎ! তোমার আর আমার নাম যে একই! আমার নামও তো সিন্দবাদ। তুমি সিন্দবাদ কুলী। আর আমি সিন্দবাদ নাবিক। ব্যস, ফারাক এটুকুই।'

সিন্দবাদ কুলী নীরবে ম্লান হাসল।

প্রবীণ আদমিটি বল্‌ল—'সিন্দবাদ ভাইয়া, আমাদের কিছু গানা শোনাতে হয় যে। নাও, ঝুটমুট দেরী কোরো না, শুরু ক'রে দাও।'

গানার কথায় সিন্দবাদ কুলী যেন সবে আসমান থেকে পড়ল। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'সাহাব, আমার গানা তো দুঃখ-শোকের। আপনাদের মত আমীরদের আমার মামুলি গানা পছন্দ হবে? মন পছন্দ না হলে

কিন্তু আমার ওপর ফিন গোস্সা করবেন না যেন।'

—'গোস্সা করার কি আছে ভাইয়া? তুমি তো আমার ছোট ভাইয়ের সামিল। একটু আগে দিল্ উজাড় করে গাইছিলে, সেটি ফিন গাও।'

সিন্দবাদ কুলী একটু আগে গাওয়া গানাগুলি এক এক ক'রে গেয়ে শোনাল।

গানা শুনে প্রবীণ সিন্দবাদ নাবিক তো খুশীতে একেবারে ডগমগ।

সিন্দবাদ নাবিক এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'ভাইয়া, আমার জিন্দেগীও বড়ই বিচিত্র। বার বার ওঠা-নামা আশা-হতাশার মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করে শেষমেষ এ-জায়গায় এসে পৌঁছেছি।'

একটু দম নিয়ে প্রবীণ সিন্দবাদ নাবিক এবার বল্‌ল—'শোন ভাইয়া, আমার এই যে অগাধ বিত্ত সম্পদ আর প্রাচুর্য দেখতে পাচ্ছ, সব আমারই নিরবচ্ছিন্ন কষ্টের মধ্য দিয়ে অর্জিত। জিন্দেগীভর আমি যেভাবে লড়াই করে এসব করেছি সবই তোমার কাছে বলব। কিছু গোপন না ক'রে। আমার জিন্দেগীতে যা কিছু ঘটেছে সবই তোমার কাছে ব্যক্ত করব।

ভাইয়া, গোড়াতেই বলে রাখছি, আমি সাত-সাতবার সমুদ্রযাত্রা করেছি। কত দুর্ভাগ্য আর দুঃসাহসিকতা যে আমার সমুদ্র যাত্রার কাহিনীর সাথে জড়িয়ে রয়েছে তা শুনলে কেবলমাত্র তুমিই নও, যে শুনবে তারই বুকে বিস্ময় দানা বাঁধবে।

ভাইয়া, আমার সমুদ্রযাত্রার সে সব বিস্ময়কর কাহিনীর কথা তোমাকে এক এক ক'রে সবই বলব।'

প্রবীণ সিন্দবাদ নাবিক এবার উপস্থিত মেহমানদের উদ্দেশ্যে বল্‌ল—'আমার আব্বা ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সওদাগর। দু'হাতে দিনার কামিয়েছেন। গরীবদের প্রতি তাঁর দরদ ছিল অতুলনীয়। তাদের জন্য গাঁটের কড়ি ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

আমার আব্বা গোরে যাবার সময় আমার জন্য দিনারের পাহাড় জমিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। বিরাট মকান, জমি জিরাত আর নগদ অর্থ মিলে তিনি আমার জন্য যা রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন তা চৌদ্দ পুরুষ ধরে পায়ের ওপর পা তুলে খেলেও শেষ হবার নয়।

আব্বার মৃত্যুকালে আমার উমর ছিল খুবই কম, নাবালক। আমাকে এবং আমার বিষয়-সম্পত্তি দেখভাল করার জন্য আমার এক আত্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এলেন। স্বেচ্ছায় আমার সার্বিক দায়িত্বভার ঘাড়ে তুলে নিলেন।

আমি সাবালক হলে আমার আব্বার রেখে যাওয়া বিষয় আশয় আমার নিজের হাতে তুলে দিলেন হিতাকাঙ্ক্ষী সে নিকট আত্মীয়টি। একে উমর কম। তারওপর অগাধ বিষয় আশয় হাতে পড়ায় আমার দিমাক খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল।

ব্যস, কাচা পয়সা হাতে পড়ামাত্র আমার বিলাস ব্যসন তরতর করে ঊর্ধ্বমুখী হতে লাগল। দামী সরাব আর খানাপিনার মাত্রা গেল বেড়ে। ইয়ার দোস্তদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। খানাপিনা আর দামী সরাবের ফোয়ারা ছুটল। সে সঙ্গে বাঈজীদের নাচা-গানার আসরও ঘন ঘন বসতে লাগল।

একদিন আবিষ্কার করলাম আমার বিষয় আশয় কেবলমাত্র সরাবের বোতলের তলানির মত অবশিষ্ট আছে। নামমাত্র অর্থকড়ি আমার হাতে রয়েছে। আতঙ্কে আমার কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল।

আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ইয়ার দোস্তরা ইতিমধ্যেই পিঠটান দিয়েছে।

সামনে আমার বিরাট জিন্দেগী পড়ে রয়েছে। কি ক'রে যে জীবনের বাকী দিনগুলো গুজরান করব সে-ভাবনা তখন আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার আব্বা পয়গম্বর সুলেমান ইবন দাউদ-এর একটি বাণী প্রায়ই বলতেন—'জন্মের মুহূর্তের চেয়ে অন্তিম মুহূর্ত অনেক বেশী শ্রেয়। জিন্দা কুত্তা মরা সিংহের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। দৈন্যদশার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়।' এ বাণী আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে চক্কর মেরে বেড়াতে লাগল।

না, আর দেরী নয়। নামমাত্র দামে আমার যা কিছু বিষয় আশয় ছিল সব বেচে সাফ সুতরা হয়ে গেলাম। মাত্র তিন হাজার দিনার সব কিছুর বিনিময়ে আমার কোর্তার জেবে উঠল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

দু' শ' বিরানব্বইতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তার কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, প্রবীণ সিন্দবাদ

নাবিক তার কিস্‌সা বলে চলেছে—মাত্র তিন হাজার দিরহাম সম্বল করে আমি ভিন্ দেশের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। ছোট খাটো একটি জাহাজ আমাকে নিয়ে সাগরে ভেসে চল্‌ল বসরাহর দিকে।

জাহাজ বসরাহ বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চল্‌ল। তারপর এক এক করে বেশ কয়েকটি দ্বীপ পিছনে ফেলে এগিয়ে চল্‌লাম। আমার জাহাজ প্রতি বন্দরেই ভেড়াতে লাগলাম। প্রতি বন্দর থেকে কিছু না কিছু সওদা কিনি। আবার বিক্রিও করি কিছু না কিছু।

এবার দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ এক নাগাড়ে জাহাজ চালিয়ে আমি একটি দ্বীপের দেখা পেলাম। সবুজ দ্বীপ, গাছগাছালিতে ভর্তি। ক্যাপ্টেন দ্বীপটিতে জাহাজ নোঙর করল।

জাহাজ দ্বীপে ভিড়তেই জাহাজের কর্মীরা হুড়মুড় করে দ্বীপটিতে নেমে পড়ল। আমরা, সব সওদাগর এক সঙ্গে দল বেঁধে দ্বীপটির মাটিতে পা দিলাম।

একটি গাছের নিচে খানা পাকানোর বন্দোবস্ত করা হ'ল। আমি প্রকৃতির শোভা দেখার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেলাম। খানাপিনার ব্যাপারে কিছুমাত্রও আগ্রহ আমার রইল না।

আমরা প্রত্যেকেই যখন কোন না কোন কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছি ঠিক তখনই আচমকা ভয়ঙ্কর এক শব্দ হল। পুরো দ্বীপটি থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। আমার কলিজাটি যেন আচমকা মোচড় খেয়ে গেল। কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল হদিস মিলল না। জাহাজের ক্যাপ্টেন গলা ফাটানো চিৎকার জুড়ে দিলেন—'যে যেখানে, যে অবস্থায় আছেন তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে আসুন। এটি আদৌ কোন দ্বীপ নয়। আদতে এটি একটি অতিকায় তিমি মাছের পিঠ। যুগ যুগান্ত ধরে এ সমুদ্রের মাঝখানে ঘুমোচ্ছে। তাই দিনের পর দিন পলি জমে জমে ডাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছে। আর সে পলি-মাটিতে লতা ও ঝোপঝাড় জন্মেছে। খানা পাকানোর জন্য আগুন জ্বালাবার ফলে উত্তাপ পেয়ে মোচড়া মুচড়ি দিচ্ছে। ব্যস, এবারই সে চলতে আরম্ভ করবে। আবার এমনও হতে পারে, সে আচমকা ডুব দেবে।'

ক্যাপ্টেনের সতর্কবাণী কানে যেতেই সবাই পড়ি কি মরি করে জাহাজে উঠে আসতে লাগল। জামা কাপড় আর খানাপিনা আর বাসন কোসন সব রইল ভাসমান তিমিটির পিঠে।

জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হ'ল। যারা পারল হুড়মুড় করে জাহাজের পাটাতনের ওপর ঝোলাঝুলি করতে করতে কোনরকমে উঠল। আর যেসব হতভাগা জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না তারা ওই অজ্ঞাতনামা দ্বীপটিতে নির্বাসিত হ'ল। কিন্তু সে-ও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। এক সময় সবাইকে নিয়েই অতিকায় তিমিটি সমুদ্রের অতল গহ্বরে ডুব দিল্। ব্যস, তারাও সবাই জিন্দেগীর জন্য দরিয়ার অতল গহ্বরে ডুব দিল।

ক্যাপ্টেনের চিৎকার শুনতে পেয়েও যারা জাহাজে আশ্রয় নিতে পারল না আমিও তাদের দলেই ছিলাম।

আল্লাতাল্লার অসীম দোয়া। তাঁর দোয়াতেই আমি দরিয়ার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলাম। এক ফাঁপা গুঁড়িকে দরিয়ার পানিতে ভেসে যেতে দেখলাম। মুহূর্তকাল সময় নষ্ট না করে বরাতগুণে পাওয়া কাঠের গুঁড়িটির ওপর চেপে বসলাম।

আমাকে নিয়ে গাছের গুঁড়িটি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চল্‌ল। কিন্তু বেশী দূর যাওয়া গেল নয়। আচমকা পর্বত সমান একটি ঢেউ আসায় আমাকে সহ গুঁড়িটি আচমকা পাল্টি খেয়ে গেল। আমার নসীব এখানেও কাজ করে চলেছে। আচমকা আর একটি ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আবার কাঠটির ওপর চেপে বসলাম।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে অন্ধকারে কারাগৃহের মত আমি যেন বন্দী হয়ে গেলাম। প্রাণদণ্ডের আসামীর মতই করুণ আমার অবস্থা। আমি ঢেউয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, একমাত্র খোদাতাল্লা ছাড়া কেউ আমার জান রক্ষা করতে পারবে না। আদমি তো কোন ছার। কাঠটির ওপর জেঁকে বসলাম। খোদা ভরসা।

ভোরের আলো দেখা দিল। এবার অস্পষ্ট হলেও নিজেকে দেখতে পেলাম। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ! আমি তবে মরিনি! পূর্ব-আকাশে রক্তিম সূর্য দেখা দিল। আমি করজোড়ে তার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানালাম। আমার চলা অব্যাহতই রইল।

আমি এবার পা দুটোকে দাঁড়ের মত বার বার আগু-পিছু চালাতে লাগলাম।

আমার করুণ আকুতি আল্লাহ-র কান পর্যন্ত নির্ঘাৎ পৌঁছেছে। নইলে বেলা একটু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর বেগ হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক বেড়ে যাবে কেন? আমার নিদানের সম্বল বাতাসের বেগে ঢেউয়ের তালে ভাসতে ভাসতে ধিক্‌ধিক্ এগিয়ে চল্‌ল তীরের দিকে।

খোদা ভরসা। শেষ পর্যন্ত তীর পাওয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ভুল ভেঙে গেল। তীর নয়। সমুদ্র দ্বীপ। এক দুর্লঙ্ঘ পর্বতের পাদদেশ। সাগরে ঘেরা, পাহাড় আর জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপটির দিকে আমি হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। হায় আমার নসীব! এমন কোন স্থান খুঁজে পেলাম না যেখান দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কোনরকমে দ্বীপটিতে উঠে যেতে পারি। ওপরে উঠতে গেলে কিছু তো একটি অবলম্বন চাই-ই চাই। একটি মোটাসোটা লতা পেলেও কোনরকমে নিজেকে দ্বীপটিতে তুলে নিয়ে যেতে পারতাম। কোন কায়দাই নেই।

এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত একটু আশার আলো

পেয়ে গেলাম। একটি পাহাড়ী বটগাছের ঝুরি জল পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে দেখলাম। ঝুরিটি আঁকড়ে ধরে বাঁদরের মত ঝুলতে ঝুলতে কোনরকমে গাছের ডালে ওঠা গেল।
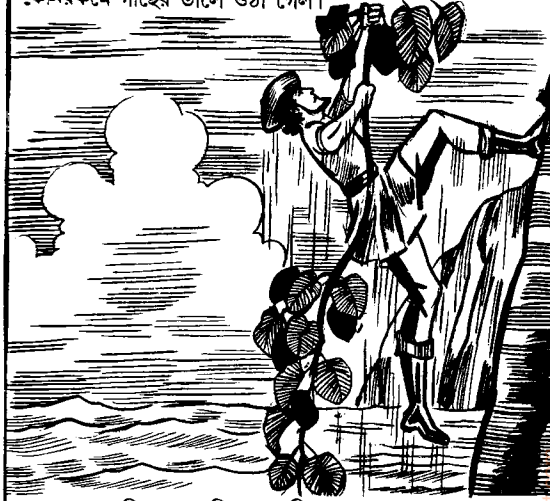
এবার কলিজায় পানি এল। দিলেও ভরসা এল। ভাবলাম, খোদাতাল্লা বোধ হয় আমার জান বাঁচাতেই চাইছেন। এবার নিজের কথা ভাববার মত সুযোগ এল। বুঝলাম, অনবরত পা চালানোর ফলে হাঁটু দুটো টন টন করছে। আর সামুদ্রিক মাছের দাঁতের ঘায়ে পা দুটো ক্ষত বিক্ষত।

গাছ থেকে নেমে প্রায়-সমতল এক টুকরো পাথর পেয়ে শরীর এলিয়ে দিলাম। কখন যে ক্লান্ত শরীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল কিছুই বুঝতে পারি নি।

মাথার ওপরে সূর্যটি হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে গিয়ে এক সময় এমন অবস্থায় দাঁড়াল যেখান থেকে আমার সঙ্গে চরম শত্রুতা করার সুযোগ পেল। বে-আক্কেলের মত আমার চোখে তার কিরণ বর্ষণ করতে লাগল। ঘুম ছুটে গেল। উঠে বসলাম। চারদিকে ঝলমলে রোদ।

উঠে বসলাম। দাঁড়ানোর কোশিস করলাম। পারলাম না। পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করল। পা সোজা করে কিছুতেই দাঁড়াতে পারলাম না। হাঁটু দুটো টন টন করছে। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে প্রায় বুকে হেঁটে সামনের সমতল ভূমির দিকে এগোতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে এক ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছলাম। মাথার ওপরে ফুল-ফলের বিচিত্র সমারোহ। চেনা-অচেনা ফলের মেলা। খোদাতাল্লাকে নতুন করে সুক্রিয়া জানাতেই হ'ল। আর কিছু না হোক ফল আর ঝর্ণার পানি খেয়ে জানটিকে তো কিছুদিন অন্ততঃ টিকিয়ে রাখা যাবে।

ঝর্ণার পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ, গাছের ফলে উদর পূর্তি আর পাথরের বিছানায় নিদ্রা—জব্বর বন্দোবস্ত। এক-দুই-তিন করে বেশ কয়েকটি দিন কেটে গেল। পায়ের ক্ষতগুলি প্রায় কমে এসেছে। হাঁটুতে একটু শক্তি পাচ্ছি। তবে এখন মাটিতে পা ফেলে কোনরকমে খাড়া হতে পারি বটে। কিন্তু হাঁটা চলা করতে গেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। একটি গাছের ডালে ভর দিয়ে তবে হাঁটাহাঁটি করতে পারি।

একদিন লাঠি ভর দিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে একটি পাথরের ওপর বসেছিলাম। হঠাৎ একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু নজরে পড়ল। ডরে আমার কলিজাটি বোধ হয় আচমকা দরকচা মেরে গেল। আমার তখনকার হালৎ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আদতে অতিকায় কালো বস্তুটি কি কোন সামুদ্রিক জানোয়ার নাকি জঙ্গলের বাসিন্দা ঠাহর করতে পারলাম না। বুকের ভেতরে কোন অদৃশ্য হাত যেন সমানে হাতুড়ি পিটতে লাগল। জোর ক'রে দিলে সাহস সঞ্চয় করলাম। এক পা দু' পা ক'রে বুকের টিবটিবানি নিয়ে এগোতে শুরু করলাম। সামান্য এগোতেই ব্যাপারটি ফয়সালা হয়ে গেল। মোটামুটি বুঝলাম, হিংস্র কোন জানোয়ার অবশ্যই নয়। আমাদের দেশের ঘোড়ার জাত ভাই হবে হয়ত। অনেকটা সেরকমই দেখতে। নিরীহ-নম্র আচরণ ভরসা, অন্ততঃ ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না।

অতিকায় জানোয়ারটি একটি গাছের সঙ্গে বাঁধা। কয়েক পা এগিয়ে তার কাছাকাছি গেলাম। হ্যাঁ, বাঁধাই বটে। প্রশ্ন জাগল নির্ঘাৎ ধারে কাছে কোন আদমি আছে। নইলে জানোয়ারটি বাঁধল কে?

আমি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে জানোয়ারটিকে দেখছি। ঠিক সে-মুহূর্তেই কার যেন বিকট চিৎকার কানে এল। হকচকিয়ে গেলাম। এক আদমি রীতিমত হুঙ্কার দিতে দিতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। গর্জে উঠল—'কে তুমি? এখানে কি করে এসেছ? এখানে আসার সাহসই বা কি ক'রে পেলে?'

আমি কোরবানির খাসির মত কাঁপতে কাঁপতে করজোড়ে নিবেদন করলাম—'হুজুর, গোস্সা করবেন না। আমার কসুর নেবেন না। আমি পরদেশী। জাহাজে ছিলাম। হঠাৎ বিপর্যয়ের মুখে পড়ায় জাহাজ আমাকে ফেলে ভেগে যায়। আমার মত বে-কায়দায় আমার অনেক সঙ্গী-সাথীও পড়েছিল। তারা যে নসীব সম্বল করে ভাসতে ভাসতে কোথায় গেছে আদৌ জিন্দা আছে কিনা তাও জানা নেই। খোদাতাল্লার দোয়ায় একটি কাঠের গুঁড়ির ওপর চেপে আমি ভাসতে ভাসতে এখানে এসেছি। বিশ্বাস করুন, নিজের ইচ্ছায় নয়। ঢেউ-ই ঠেলে ধাক্কে গুঁড়িটিকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

রহস্যজনক আদমিটি আচমকা আমার একটি হাত খপ্ করে ধরে ফেল্‌ল। আমি তো পৌনে মরা হয়ে গেলাম। সে তেমনি

কর্কশ স্বরে বল্‌ল—'চল আমার সঙ্গে।'

আমি ডরে শিটকে লেগে গেলাম। লাঠিটি ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে অনুসরণ ক'রে চল্‌লাম।

সে আমাকে একটি গুহায় নিয়ে গেল। আমাকে সমাদর করে বসাল, যেন আমন্ত্রিত মেহমান। পাতায় ফল সাজিয়ে আমার সামনে দিল। সে-ও অন্য একটি পাতায় নিজের জন্য খানা নিল। খেতে খেতে সে আমার নামধাম জিজ্ঞাসা করল। কোন উদ্দেশ্যে আমি সমুদ্রপথে পাড়ি দিতে গিয়েছিলাম, খোলসা করে বল্‌লাম।

আমি ইতিমধ্যে সাহস সঞ্চয় করে অনেকটা স্বাভাবিক হতে পেরেছি। তবু ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম—'হুজুর, আমি না হয় খোদাতাল্লার মর্জিতে এ-দ্বীপে হাজির হয়েছি। কিন্তু কেন, কিভাবে আপনি এ জনমানবহীন দ্বীপে এলেন? কেনই বা এ-গুহা সম্বল করে দিন গুজরান ক'রে চলেছেন? আর আপনার বাহন মাদী-ঘোড়াটিকেই বা কোথায় পেলেন? তাকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন। কি কাজে লাগে, মেহেরবানি ক'রে বল্‌বেন কি?'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির এ পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে এল। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ' তিরানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার আবার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম ফিন তার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, প্রবীণ সিন্দবাদ তার বৃত্তান্ত বলে চলেছে—সে আদমি আমার বাৎ শুনে মুচকি হেসে বল্‌ল—'এ দ্বীপে আমি একাই নয়, আমার মত আরও অনেকেই বাস করে। আমরা সুলতান মীরজান-এর অধীনে কাজ করি। দ্বীপের চারদিকে আমরা পাহারায় নিযুক্ত। প্রতি মাসে যেদিন প্রথম চাঁদ দেখা দেয় সেদিন আমরা দ্বীপের চারদিকে একটি করে মাদী ঘোড়া বেঁধে রাখি। তারপর নিজেরা লুকিয়ে থাকি গুহার ভেতরে। মাদি ঘোড়ার গায়ের গন্ধে সাগর থেকে সিন্ধু ঘোটক উঠে আসে। মাদী ঘোড়াকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। পারে না। পারবে কি করে? তারা সবাই যে বাঁধা। তারা চি হিঁ রবে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। আমরা সিন্দু ঘোটকদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে দৌড়ে যাই। সিন্ধু ঘোটকটিকে মেরে ভাগিয়ে দেই। মাদি ঘোড়াটিকে নিয়ে আসি। কিছুদিন বাদে সে বাচ্চা পয়দা করে। বাচ্চা বহুৎ তাগড়াই হয়। ব্যস, বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। আমাদের সুলতান এ কারবার করে আজ ধন দৌলতের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছেন।

আজ এ-মাসের প্রথম চাঁদ দেখা যাবে। সিন্ধুঘোটকও উঠে আসবে। কাজ মিটে গেলে তোমাকে আমাদের সুলতানের দরবারে নিয়ে যাব। খোদাতাল্লার দোয়ায় আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল। নইলে জনমভর পাহাড়ে মাথা খুঁড়লেও তুমি নিজের মুলুকে ফিরে যেতে পারতে না।

আমরা যখন গুহার মুখে বসে বাৎচিৎ করছি তখন ঘোড়ার চিঁহিঁ রব কানে এল। বুঝলাম, সিন্ধুঘোটক উঠে এসেছে। মাদী ঘোড়ার ওপর চড়াও হয়েছে। মাদী ঘোড়াটি মনের সুখে পাল খাচ্ছে। তার চরমতম আনন্দের মুহূর্তে আমরা কাছে গিয়ে ব্যাঘাত ঘটালাম না। কাজ মিটে গেল।

সিন্ধুঘোটকটি এবার মাদী ঘোড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। করবেই তো। সবে সে চরম সুখ পেয়েছে। তাকে কাছে রেখে হরবখত সম্ভোগ সুখ লাভের জন্য সে উতলা তো হবেই। আমার আশ্রয়দাতা তখন বিকট স্বরে চিল্লিয়ে তার সঙ্গী সাথীদের তলব করল। একদল আদমি লাঠিসোটা নিয়ে দৌড়ে এল। পিটিয়ে সিন্ধুঘোটকটিকে ভাগিয়ে দিল।

সিন্ধুঘোটকটিকে ভাগিয়ে দিয়ে মাদী ঘোড়াটিকে নিয়ে এসে ফিন গাছের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। আমার আশ্রয়দাতা এবার তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিল।

আমাকে পেয়ে দ্বীপের সবাই তো মহাখুশী। একটি তাগড়াই ঘোড়া এনে আমাকে বল্‌ল—'দোস্ত, ঘোড়ায় চাপ। আমাদের সুলতানের দরবারে তোমাকে নিয়ে যাব। আমাদের মেহমান তুমি। সুলতানও তোমাকে দেখলে বহুৎ খুশী হবেন।'

সুলতানের দরবারে আমাকে খুবই খাতির দেখানো হ'ল। সুলতান তো একেবারে তার মসনদের পাশে কুর্শি পেতে আমাকে বসতে দিলেন। তিনি ধৈর্যসহকারে আমার সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য এবং নসীবের বিড়ম্বনার কথা শুনলেন। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'বেটা, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। নসীবে যেটুকু দুঃখ-আনন্দ লেখা আছে ঘটবেই। আমাদের সাধ্য কি তাকে খণ্ডন করি। তিনি তোমার সহায় না থাকলে দরিয়া পাড়ি দিয়ে এখানে, এ-দ্বীপে হাজির হলে কি করে? তোমার ইন্তেকালও তোমার কপালে লিখে দিয়েছেন বলেই তো তুমি আজও জিন্দা আছ। ঘাবড়াও মাৎ বেটা। তিনিই তোমার তকলিফ দূর করে দেবেন।'

সুলতান যে আমার ওপর সদয় হয়েছেন তা বুঝলাম যখন দেখলাম, তিনি আমাকে বন্দরের প্রধান পরিদর্শকের পদে বহাল করেছেন।

তবে আমার চাকরিটি দায়িত্বপূর্ণ হলেও তেমন কিছু কঠিন নয়। মাঝে-মধ্যে জাহাজ আসে। তখন একটু ছুটোছুটি করতে হয়। ব্যস, তারপরই আমার কাজ সুলতানের দরবারে হাসি মস্করার মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করা।

সুলতান আমার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ফলে হালৎ এমন দাঁড়াল যে, তিনি আমার পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও

নড়েন না।

সুলতানের আদর যত্ন সত্ত্বেও আমার দিল্ কিছুতেই ওই সাগরে ঘেরা দ্বীপের মধ্যে আটকা পড়ে থাকতে চাইল না। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার যেন দম আটকে আসতে লাগল। অস্থির হয়ে পড়লাম। আপন মুলুকে ফেরার চিন্তা আমার সর্বক্ষণের সাথী হয়ে দাঁড়াল।

একদিন এক জাহাজ ভিড়ল। আমি ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটে গেলাম। তার সঙ্গে ভাব জমালাম। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম—'কাপ্তেন সাহাব, বাগদাদ কোন্ দিকে? এখান থেকে জাহাজে ক' দিন লাগে?'

ক্যাপ্টেন বিমর্ষমুখে বলে—'হ্যাঁ, শুনেছি বটে, বাগদাদ নামে এক মুলুক আছে। লেকিন আমি কোনদিন যাইনি। কোন্ দিকে, কত দূর তা-ও বলতে পারব না।'

আমি বিলকুল হতাশ মানি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি, আপন মুলুকে ফেরা বুঝি আমার নসীবে নেই। জাহাজের কর্মীরা তামাম দুনিয়া চষে বেড়ায়। তারাই যদি বলতে না পারে তবে কার ওপর আর ভরসা করা যাবে।

নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে, মৃতপ্রায় অবস্থায় সে দ্বীপে আমি দিন গুজরান করতে লাগলাম।

একদিন সুলতানের দরবারে হাজির হলাম। দেখি এক অপরিচিত আদমি সুলতানের সঙ্গে বাৎচিৎ করছে। সুলতান আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিতে গিয়ে বল্লেন—'বেটা, ইনি আমাদের মেহমান। হিন্দুস্তান থেকে এসেছেন। সে মুলুকেরই আদমি।'

আমি প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করলাম—'জী, হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা কোন্ ধর্মের উপাসক?'

—'হিন্দুধর্ম। হিন্দুরা বহুৎ বর্ণে বিভক্ত। তবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। ক্ষত্রিয়রা বীর। যোদ্ধা। যুদ্ধবিগ্রহই তাদের একমাত্র পেশা। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকেই তারা ধর্মের অঙ্গ জ্ঞান করে। আর ব্রাহ্মণরা? তারা পণ্ডিত। পূত পবিত্র জীবন যাপন তাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। পূজা পাঠ, শাস্ত্র আলোচনা, শাস্ত্র রচনা প্রভৃতির মাধ্যমে তারা দিন গুজরান করে। মদ্যকে তারা অপবিত্র জ্ঞান করে। মদ্য পান তো দূরের কথা স্পর্শও করে না। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় ছাড়া সেখানে আরও বাহাত্তরটি নিম্নবর্ণের মানুষের বাস। তাদের জীবন যাত্রার প্রণালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।'

হিন্দুস্তানী মেহমানটির বাৎ শুনে আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। যেন সদ্য আশমান থেকে জমিনে পড়েছি। একই মুলুকে, একই ধর্মে এত ভাগ যে কল্পনাও করা যায় না। আমি হিন্দুস্তানে কোনদিন যাই নি। তবে তার লাগোয়া মুলুক কাবুলে একবার গিয়ে কিছুদিন ছিলাম।

একদিন বন্দরে এক বিশালায়তন জাহাজ ভিড়ল। আমি কর্তব্যের তাগিদে এগিয়ে গেলাম। জাহাজের সামানপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম। তারপর ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ব্যস, আর কিছু নেই?'

—'আছে বটে। কিন্তু সে সব সামানপত্রের মালিক জাহাজে নেই। তাই আমার পক্ষে দেখানো বা বিক্রী করা সম্ভব নয়।'

—'মালিক সঙ্গে নেই? কেন? সে বা তারা কোথায়? তাজ্জব বাৎ। সামানপত্র আছে, মালিক নেই—এ কেমন—।'

—'তারা আসার পথে ডুবে গেছে। খোদাতাল্লাই জানেন তাদের কে জিন্দা আছে আর কে জিন্দা নেই। কথাটি বলেই ক্যাপ্টেন দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল। এবার বল্ল—'কি আর করা যাবে, বাগদাদে গিয়ে তাদের ওয়ারিশের কাছে সামানপত্র ফেরৎ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

ক্যাপ্টেনের বাৎ শুনে আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের চমক অনুভব করলাম। কলিজাটি নাচানাচি শুরু করে দিল। নিজেকে কোনরকমে সামলে সুমলে জিজ্ঞাসা করলাম—'তাদের কি নাম নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে?'

—'হ্যাঁ। একজনের নাম সিন্দবাদ—'

ক্যাপ্টেন তারপর আর কি কি বলেছিল কিছুই আমি শুনিনি। মাথাটি চক্কর মেরে উঠল। চোখে কেমন অন্ধকার দেখতে লাগলাম।

এক সময় নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বল্লাম—'আমাকে চিনতে পারছেন না? ভাল ক'রে লক্ষ্য করে দেখুন তো চিনতে পারছেন কিনা? আমিই সেই নসীব বিড়ম্বিত সিন্দবাদ। অতিকায় তিমি মাছের পিঠের ওপর হাঁটাচলা করছিলাম আমরা কয়েকজন। সে আগুনের ছোঁয়া পেয়ে মোচড়ামুচড়ি দিতেই কে যে কোথায় ছিটকে পড়লাম, হদিস মিলল না। কয়েকজন হুটোপাটা করে জাহাজে উঠল। আমি আর পেরে উঠলাম না।

এক সময় অতিকায় তিমিটি ভুঁস করে জলে তলিয়ে গেল। ব্যস, আমার হালৎ শোচনীয় হয়ে পড়ল। কোনরকমে একটি গাছের গুঁড়ি পেয়ে আঁকড়ে ধরলাম। চৌদ্দ পুরুষের নসীব ভাল যে, কোনরকমে জানে বেঁচে গেলাম।'

এবার আমি ক্যাপ্টেনের কাছে কাঠের গুঁড়িটি অবলম্বন করে কিভাবে এ-দ্বীপে এসে পৌঁছেছি তা হুবহু সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

ক্যাপ্টেন বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে নীরবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বলে চল্লাম—'এখানকার সুলতান মিরজান আমাকে

খুবই পেয়ার করেন।'

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু' শ' চুরানব্বইতম রজনী

গভীর রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ কুলী তার নসীবের কথা জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে ব্যক্ত করছে।

সে এবার বল্‌ল—আমার বাৎ শুনে ক্যাপ্টেন বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিমায় হেসে উঠল। এক সময় হাসতে হাসতেই বল্‌ল—'সাহাব জব্বর মতলব এঁটেছ দেখছি। তোমার মত মিথ্যাচারী জিন্দেগীতে দেখি নি। আমি তখন নিজের চোখে দেখেছিলাম, যারা জাহাজে উঠতে পারে নি তারা তিমিটির সঙ্গে সঙ্গে দরিয়ার পানিতে ডুবে গেছে। আর তুমি আমাকে আহাম্মক ভেবেছ নাকি হে? আমাকে বুঝাতে চাইছ, তুমি জিন্দা রয়ে গেছ! তাজ্জব বাৎ শোনালে সাহাব! কি করে যে তুমি আমাকে এমন বেকুব ঠাওরালে, অবাক মানছি!'

আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। আপন মনে ব'লে ওঠলাম—'হায় খোদা, তুমিই একমাত্র ভরসা।' এবার ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বল্‌লাম—'কিন্তু আমি আপনার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি।'

ক্যাপ্টেন কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসার ছাপ চোখে মুখে এঁকে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বল্‌লাম—'হ্যাঁ, আমি-ই যে সিন্দবাদ তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিতে পারি। জাহাজে আমার সহযাত্রী যারা ছিল তাদের অনেকেই তো জিন্দা আছে। তাদের তলব করে এখানে জড়ো করুন। ব্যস, তবেই দেখবেন, প্রমাণ হয়ে যাবে, আমি-ই সিন্দবাদ।'

ক্যাপ্টেনের তলব পেয়ে জাহাজের যাত্রী ও কর্মীরা ছুটে এল। তারা আমাকে দেখেই সোল্লাসে জড়িয়ে ধরল। রীতিমত নাচানাচি জুড়ে দিল।

আমিই যে সিন্দবাদ এ বিষয়ে ক্যাপ্টেনের আর কোনই দ্বিধা রইল না। সে-ও আমাকে সানন্দে জড়িয়ে ধরল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বল্‌ল—'তোমার কাহিনী শুনে মালুম হচ্ছে, তোমার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে।'

ক্যাপ্টেন এবার যাবতীয় সামানপত্র আমার হাতে তুলে দিল। ব্যস, আর দেরী নয়। গাট্টিগুলো নিয়ে বাজারে হাজির হলাম। চড়া দামে সব বিক্রি হয়ে গেল। আশাতীত মুনাফা হ'ল।

সুলতান মীরজান-এর আন্তরিকতার কথা ভুলিনি। আগেভাগেই সবচেয়ে ভাল কিছু সামানপত্র তাঁর জন্য বেছে রেখেছিলাম। দরবারে গিয়ে কুর্ণিশ সেরে সামানপত্র তার পায়ের কাছে রাখলাম।

সুলতান আমাকে কাছে টেনে নিলেন। আবেগ-মধুর স্বরে বলতে লাগলেন—'বেটা, পেয়ার-মহব্বৎ-ই আদৎ। পিয়ার-মহব্বৎ-ই একমাত্র জিন্দা থাকে। আবার এসব বহুৎ খারাপ চিজও বটে। এরা যেমন মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে তেমনি চোখের পানিও ঝরায়।'

আমি বুঝলাম, সুলতানের চোখের পাতা ভিজে উঠেছে, কণ্ঠস্বর ভারী। কথা বলতে বলতে তিনি নিজের গলার বহু মূল্য রত্নহারটি খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। চোখের পানি মুছে আমাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

সুলতানের মহব্বতের সাক্ষর রত্নহারটি আমি কোনদিন বিক্রি করতে পারি না। আমীর-ওমরাহ অনেকেই হাজার হাজার দিনার দাম দিতে চেয়েছে। তবু আমি দিল্ থেকে কিছুমাত্রও উৎসাহ পাই নি।

সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তারপর আমার প্রথম আশ্রয়দাতা সে-গুহাবাসী দোস্তের কাছে গেলাম। চোখের পানি ঝরিয়ে সে আমাকে বিদায় দিল।

আমাদের জাহাজ নোঙর তুল্‌ল।

একনাগাড়ে জাহাজ চালিয়ে, দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আমাদের জাহাজ বসরাহ বন্দরে ভিড়ল।

আমার দিল্ নেচে উঠল। বাগদাদের কাছাকাছি চলে এসেছি। এবার সহজেই বাগদাদে পৌঁছে যাব।

জাহাজ ছাড়ল। মাত্র দু'দিন জাহাজ চালিয়ে ক্যাপ্টেন বসরাহ বন্দরে নোঙর করল। সেখান থেকে বাগদাদ।

আমি আত্মীয়-দোস্তদের কাছে ফিরে গেলাম। সবাই আমাকে কাছে পেয়ে খুব খুশী হ'ল। আমি অর্থকড়ি খুইয়ে পথের ভিখারী হলে যে সব দোস্ত কেটে পড়েছিল তারাও এক এক ক'রে আবার

কাছে ঘেঁষতে লাগল। মধুর সন্ধান পেলে মৌমাছিরা তো কাছে ভিড়বেই। আমার জীবনে ফিন বসন্ত এল। খুশীতে মসগুল হয়ে পড়লাম।

সিন্দবাদ নাবিক এবার সিন্দবাদ কুলীকে লক্ষ্য ক'রে বল্ল—'এ-ই হ'ল আমার সমুদ্রযাত্রার প্রথম কিস্‌সা।'

সিন্দবাদ নাবিক এবার সিন্দবাদ কুলীর হাতে কিছু সোনার মোহর দিয়ে বল্ল—'এগুলো তোমার কাছে রাখ। কাল সুবহে জরুর আসবে, আমার সমুদ্রযাত্রার দ্বিতীয় কিস্‌সা তোমাকে শোনাব। তোমার ব্যবহার, বিশেষ ক'রে তোমার গানা আমার দিল্ জয় করে নিয়েছে। কাল সকালে আসা চাই, ভুলে যেয়ো না যেন।'

কোর্তার জেবে মোহরগুলো রাখতে রাখতে সিন্দবাদ কুলী বলল—'খোদা মেহেরবান। আপনার ওপর খোদার আশীর্বাদ রয়েছে। আপনার মহব্বতের দাম আমি মাথা পেতে নিলাম। কাল জরুর আসব।' সিন্দবাদ নাবিককে কুর্ণিশ করে সিন্দবাদ কুলী কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় গাছে গাছে পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন, ভোর হয়ে এল বলে। তিনি এবার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সিন্দবাদ নাবিকের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা

দু'শ' পঁচানব্বইতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় বাদশাহ শারিয়ার প্রবেশ করলেন। বেগম শাহরাজাদ বল্লেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ কুলী সকালে নিদ থেকে উঠে সিন্দবাদ নাবিকের মকানে হাজির হল। গৃহকর্তার বহুৎ ইয়ার-দোস্ত ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির হয়েছে।

নাস্তা সারতে সারতে সিন্দবাদ নাবিক তার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা শুরু করল—প্রথম সমুদ্রযাত্রা সেরে ঘরে ফিরে আনন্দ-ফূর্তির মধ্যেই দিন গুজরান করতে লাগলাম। কিন্তু একনাগাড়ে সুখ-আনন্দ—কোন কিছুই ভাল লাগে না। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে আমার দিল্ হাঁপিয়ে উঠল। আবার জাহাজে উঠে দরিয়া পাড়ি দেবার জন্য দিল্ ছটফট করতে লাগল।

বাঁধাছাঁদা ফিন শুরু করলাম। ইতিমধ্যেই বাজার থেকে বহুমূল্য সামানপত্র খরিদ ক'রে ঘর বোঝাই ক'রে ফেলেছিলাম। সবই ভিন্ দেশের বাজারের চাহিদার দিকে নজর দিয়ে খরিদ করা। দশ-বারোটি বড় বড় গাট্টি তৈরি হ'ল।

ঠিক তখনই আমার এক জিগরী দোস্ত সন্ধান নিয়ে এল, একটি জাহাজ বিক্রি আছে। পুরানো জাহাজ। কিন্তু তার হালৎ এখনও বহুৎ আচ্ছা। দেখলে-মালুম হয়, একেবারে আনকোরা। দরদস্তুর হয়ে গেল। দর একটু বেশীই হ'ল। তবু চোখ-কান বুজে খরিদ করে ফেললাম। এবার যেসব সওদাগরদের সঙ্গে আমার খাতির ও জানপহচান রয়েছে তাদের পাত্তা লাগালাম। বল্লাম, আমি জাহাজ নিয়ে ভিন্ দেশে বাণিজ্য করতে যাচ্ছি, ইচ্ছা করলে তোমরাও আমার সঙ্গে যেতে পার।

আমার ডাকে সওদাগররা সাড়া দিল। তারা সমানপত্র নিয়ে এসে জাহাজে উঠল।

জাহাজের নোঙর তুল্লাম। জাহাজ দরিয়ার ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে এগিয়ে চল্ল।

এক এক করে দ্বীপে জাহাজ ভেড়ালাম। জাহাজ ঘাটে আদমির মেলা বসে গেল। সওদা খরিদ করতে এসেছে। আমাদের চকচকে ঝকঝকে সমানপত্র দেখে সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। উতলা হবে না-ই বা কেন? এমন সওদা তাদের চৌদ্দপুরুষেও দেখেনি। এক একটি সওদা এমন চড়া দামে বিক্রি হতে লাগল যাতে আমাদের প্রত্যেকের জেবই মুনাফায় ভরে উঠতে লাগল।

জাহাজ আবার বন্দর ছাড়ল। দু'দিন-দু' রাত্রি বাদে সুন্দর একটি দ্বীপে জাহাজ ভেড়ালাম। পাহাড়ে ঘেরা সবুজে ঢাকা দ্বীপ। কী যে তার প্রাকৃতিক শোভা তা ভাষার মাধ্যমে কাউকে সমঝানো সম্ভব নয়।

আমি জাহাজ থেকে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে চল্লাম সবুজ দ্বীপটির এক-পেয়ে পথ ধরে। কিছুদূর যেতেই চমৎকার এক ঝর্ণা নজরে পড়ল। পাথরের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে তার পানি নিচে নেমে আসছে। এক নজর দেখলেই চোখ দুটো জুড়িয়ে যায়। আপন মনে বলে উঠলাম—'খোদাতাল্লার কী অপূর্ব সৃষ্টি! খোদাতাল্লার মর্জি কোথায় যে কি রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ভাবলে অবাক মানতে হয়।'

ঝর্ণার পাড় ধরে আমি গুটিগুটি আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। সামনে সারি সারি ফলের গাছ। কী তাদের গড়ন আর কী বিচিত্র রঙ! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটি শুকনো ডাল দিয়ে আঘাত ক'রে গোটা চারেক ফল পাড়লাম। কী যে তাদের স্বাদ বলে বুঝানো যাবে না। মনে হ'ল বেহেস্তের বাগিচার ফল মুখে দিয়েছি। তারপর নেমে গিয়ে গণ্ডুষ ভরে ঝর্ণার ঠাণ্ডা পানি খেলাম। দিল্ জুড়িয়ে গেল। এবার প্রায়-সমতল একটি পাথরের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে লাগলাম। ভাবলাম, একটু বাদে জাহাজে ফিরে যাব। ফুরফুরে বাতাসে কখন যে দু' চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মালুমই হয় নি।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি সূর্য পশ্চিম-আশমানের গায়ে হেলে পড়েছে। যন্ত্রচালিতের মত এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে লাগলাম জাহাজ ঘাটের দিকে।

জাহাজঘাটে পৌঁছেই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। দেখি ঘাট ফাঁকা। জাহাজ উধাও। হতাশ দৃষ্টিতে দরিয়ার দিকে তাকালাম। ভোঁ ভাঁ। জাহাজের চিহ্নও নজরে পড়ল না।

আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলাম—'হায় আল্লাহ! এ কী করলে! আমাকে নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত করে, আমারই জাহাজ নিয়ে আমার সওদাগর দোস্তরা উধাও হয়ে গেল।'

নির্জন-নিরালা দ্বীপে আমি নির্বাসিত হলাম। জেব ফাঁকা। একটি কানাকড়িও আমার সঙ্গে নেই। নামমাত্র অর্থকড়ি যা কিছু সম্বল সবই ওই জাহাজে। আমার সঙ্গী সাথীদের কি যে মতলব কিছুই আমার দিমাকে এল না। তাজ্জব মানতেই হ'ল।

আমার চোখ দুটো বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। আশমানের দিকে মুখ-তুলে আর্তনাদ করে উঠলাম—'খোদা মেহেরবান, কি তোমার মর্জি, তুমিই জান! কিন্তু এ কী কঠিন পরীক্ষায় ফেল্‌লে আমাকে! এ কী নসীবের ফেরে পড়লাম! প্রথম সমুদ্রযাত্রায় তোমার দোয়াতেই আমার জান রক্ষা পেয়েছিল। এবার ফিন তুমিই নিজে হাতে আমার জান নেয়ার মতলব করেছ!'

আমার চোখ দিয়ে অঝরে পানি গড়াতে লাগল। উন্মাদের মত গলা ছেড়ে বিলাপ জুড়ে দিলাম। কখনও বদ্ধ উন্মাদের মত মাথার চুল টানি, কখনও কপাল চাপড়াই আবার কখনও বা পাথরে মাথা ঠুকতে লাগলাম—'হায় খোদা, এ কী কাণ্ড তোমার!'

কান্নাকাটি থামিয়ে অনুসন্ধিৎসু চোখে দরিয়ার দিকে তাকালাম। চোখের মণি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার জাহাজটিকে দেখার কোশিস করলাম। ব্যর্থ প্রয়াস। সামনে কেবল নীল আর নীল। নীলের বিচিত্র সমারোহ।

আমার হালৎ, আমার অসহায়বোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আবার বিলাপ জুড়ে দিলাম—'হায় খোদা, আমার মধ্যে ফিন সমুদ্রযাত্রার দুর্মতি কেন ঢুকিয়ে দিয়েছিলে! ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে খোশ মেজাজেই তো ছিলাম। খানাপিনার অভাব ছিল না। সিন্দুকভরা ধনদৌলত। জিন্দেগীভর পায়ের ওপর পা তুলে খেলেও আমার অভাব হ'ত না। লালসা ....লালসার শিকার হয়েই আমি নিজের পায়ে কুড়ুল মারলাম। লালসাই আজ আমাকে এ-চরম সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এক সময় নিজের দিল্‌কে সমঝালাম, এভাবে হাপিত্যেশ করে কি-ই বা ফয়দা? রাতভর পাহাড়ে মাথা ঠুকলেও কোন সুরাহা হবার নয়। দিল্‌কে শক্ত করতে হবে। জান রাখার ফিকির আমাকেই বের করতে হবে। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যেই প্রকৃতির বুকে আলো-আঁধারীর খেলা শুরু হয়ে গেছে। দরিয়ার বুকে আধো আলো আধো আধো অন্ধকার বিরাজ করছে। একটু বাদেই অন্ধকারের বুকে বিলকুল হারিয়ে যাবে দ্বীপ-সাগর সব কিছু। তখন?

কোন ফিকির বের করতে না পেরে বেশ বড়সড় একটি গাছে উঠে গেলাম। অজানা-অচেনা দ্বীপ। বলা তো যায় না অন্ধকারে কখন কোন্ হিংস্র জানোয়ার ঘাড়ে চেপে বসে।

গাছের ডাল ধরে দুঃখের রাত্রি গুজরান করলাম। ভোরের আলো ফুটে উঠলে গাছ থেকে নেমে আসার আগে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাতে লাগলাম, যদি ধারে-কাছে কোন লোকালয় নজরে পড়ে। গাছপালা, ঝোপঝাড় আর অনুচ্চ পাহাড়টি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।

চোখের মণি দুটোকে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে এক জায়গায় আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। অদূরে সফেদ একটি বস্তু চোখের সামনে ভেসে উঠল। অবাক মানলাম। ভাবলাম, কি হতে পারে ওই সফেদ বস্তুটি?

গাছ থেকে নেমে এলাম। লম্বা লম্বা পায়ে রহস্যজনক ওই সফেদ বস্তুটির দিকে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার জমাটবাঁধা রহস্যের হিল্লা হয়ে গেল। রহস্যজনক সফেদ বস্তুটি একটি গম্বুজ। পেল্লাই গম্বুজ। পাথর কেটে কেটে তৈরি হবে হয়ত।

তাজ্জব ব্যাপার! গম্বুজটির চারিদিকে চক্কর মারতে লাগলাম। সত্যি তাজ্জব ব্যাপার। কোনদিকে দরওয়াজা বা জানলার চিহ্নমাত্রও

নজরে আমার পড়ল না। এমন কি ওপরে ওঠার কোন সিঁড়ি পর্যন্ত তল্লাশী করে পেলাম না।

ভাবলাম, গম্বুজটির মাথায় উঠলে কোন একটি ফিকির নির্ঘাৎ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু বহুৎ কায়দা কসরৎ করলাম। কিছুতেই উঠতে পারলাম না। তার গা এমন মসৃণ যে সামান্য ধরার জায়গা পর্যন্ত নেই। কোশিস যে করব তার ফিকির থাকা তো চাই। তাজ্জব মানলাম।

গম্বুজটির ওপরে ওঠার মতলব ছেড়ে এবার পায়ের সামনে পা রেখে রেখে তার চারদিক ঘুরে এলাম। এক শ' পঞ্চাশ পা।

কোন ফিকির বের করতে না পেরে হতাশ জর্জরিত হয়ে গম্বুজটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে চোখের পানি ঝরাতে লাগলাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে গেলাম।

সারাদিন কাটিয়ে দিলাম গম্বুজটির রহস্য উদ্ধার করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে গিয়ে।

কখন যে সূর্য পশ্চিম-আশমানের গায়ে হেলে পড়েছে টেরই পাই নি। উঠে পড়লাম। কোথায় যাই, কি করি ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দিলাম আরও কিছুটা অমূল্য সময়। ফিন আলো-আঁধারীর খেল্ শুরু হয়ে গেল। দিমাক খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। এখন যাই কোথায়, করি কি? একটু বাদেই ঘুটঘুটে অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরবে। জঙ্গল থেকে কোন হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ঘাড়ে চাপলে—উঃ আর ভাবতে পারছি না! আমার খুন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল।

আচমকা আশমানের দিকে চোখ ফেরাতেই আমার কলিজাটি মোচড় মেরে উঠল। আর্তনাদ করে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ! এ আবার কোন্ নতুন বিপদ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছ!'

গোড়াতে ভেবেছিলাম, এক খণ্ড কালো মেঘ বুঝি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে আশমানটিকে ঢেকে দেবার ধান্দায় মেতেছে। লেকিন তা-ই বা কি ক'রে সম্ভব! দারুণ গ্রীষ্ম! সারাদিন খটখটে রোদ ছিল। হঠাৎ এরকম জমাটবাঁধা মেঘের আবির্ভাব কি করে সম্ভব!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটির ফয়সালা হয়ে গেল। দেখলাম, অতিকায় একটি পাখি ডানা ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুত নিচের দিকে নেমে আসছে। কোন্ কিসিমের পাখি কে জানে। কোন পাখির আয়তন যে এমন বিশাল হতে পারে কোনদিন ভাবতেও পারি নি।

কিতাবের কিস্‌সা কাহিনীতে পড়েছিলাম, এক কিসিমের পাখি আছে যাদের আকৃতি ছোটখাট একটি পাহাড়ের মত। রকপাখি নাকি তার নাম। এবার ব্যাপারটির ফয়সালা হয়ে গেল। দিনভর আমি যাকে গম্বুজ ভেবে কতরকম চিন্তা ভাবনা করেছি, আদতে মোটেই সেরকম কিছু নয়। রকপাখির ডিম। হায় খোদা! এ কী ভ্রান্তি!
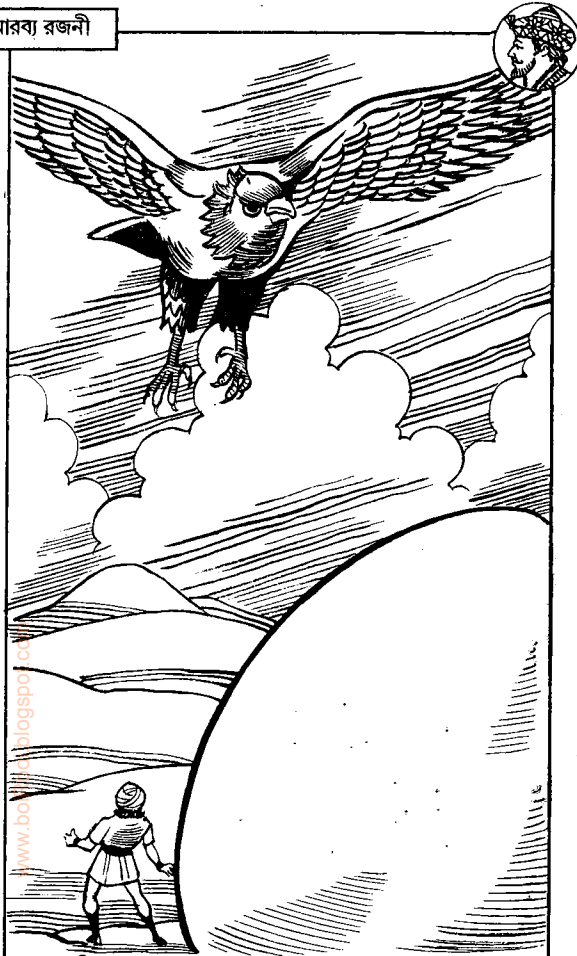
আমি লম্বা লম্বা পায়ে সামান্য সরে গেলাম। পাখিটা ডিমটির কাছে নেমে এল। ডানা ছড়িয়ে তার ওপর বসল। আমার দিলে তিলমাত্র সন্দেহও রইল না—গম্বুজের মত অতিকায় ডিমটি তারই গর্ভে ছিল।

কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে পাখিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক সময় মাথায় একটি ফন্দি খেল্‌ল। প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে আমি ডিমটির একেবারে কাছে চলে গেলাম।

অতিকায় পাখিটি ডানা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে ডিমে তা দিচ্ছে। নিশ্চল-নিথর। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। আমি মাথা থেকে পাগড়ীটি খুলে খুবই সতর্কতার সঙ্গে পাগড়ীর একটি প্রান্ত পাখিটির একটি পায়ের সঙ্গে বেঁধে ফেল্‌লাম।

আমার ধান্দা, সকালে পাখিটি যখন খাবারের সন্ধানে উড়ে যাবে তখন আমি পাগড়ীর বিপরীত প্রান্তটি ধরে থাকব খোদাতাল্লার

নাম নিয়ে। কিতাবে পড়েছি, রকপাখি একটি হাতীকে নিয়েও অনায়াসে আকাশপথে পাড়ি জমাতে পারে। আমি তো তার কাছে একটি ছারপোকার সামিল।

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু শ' ছিয়ানব্বইতম রজনী

মাঝরাত্রের কাছাকাছি বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক তাঁর দ্বিতীয় সমুদ্র যাত্রার কাহিনী বলে চলেছে—আমার হাতের কব্জিতে পাগড়ীর এক প্রান্ত বেঁধে নিলাম। এবার সারারাত্রি নীরব প্রতীক্ষা। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হ'ল। আমার বল-ভরসা পাখিটি তো ডিমের ওপর বসে গভীর নিদ্রায় ডুবে রয়েছে। আর আমি? ডিমটির গায়ে হেলান দিয়ে নীরবে অপেক্ষা করে চলেছি, কখন পাগড়ীতে টান পড়বে। সারাটি দিন হতাশা আর হাহাকারের মধ্যে কেটেছে। শরীর ও দিল্‌ দু'-ই ক্লান্ত-অবসন্ন। আমার আশা, রকপাখিটি নির্ঘাৎ উড়ে গিয়ে কোন না কোন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় খানার খোঁজে গিয়ে বসবে। ব্যস, আমি আগের মত সতর্কতার সঙ্গে পাগড়ীর বাঁধন খুলে নিজেকে মুক্ত করে নেব। তারপর নিজের মুলুকে ফেরার ফিকির কিছু না কিছু একটি বেরিয়েই যাবে।

পূর্ব-আশমানের গায়ে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। প্রকৃতি ক্রমে ফর্সা হয়ে দৃশ্যমান হতে লাগল।

রক পাখিটি এবার ডিমটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে শূন্যে ডানা মেল্‌ল। ক্রমে আশমানের দিকে উঠতে লাগল। সে কী তার ডানা চালানোর শব্দ। ওরে ব্বাস! আমি পাগড়ীটি শক্ত করে ধরে রইলাম। চোখ দুটো বন্ধ করে দিলাম। কারণ, জমিনের দিকে নজর পড়লে পায়ের তলায় কেমন যেন অবাঞ্ছিত সুড়সুড়ি অনুভূত হয়। কোনক্রমে হাত ফসকে গেলে আর দেখতে হবে না। মুহূর্তে একেবারে থেৎলে যাব, হাড্ডি গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে।

এক সময় আমার বাহক রকপাখিটি একটি পাহাড়ের ওপরে বসল।

এতক্ষণ পাখিটির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলাম। এবার সক্রিয় হয়ে উঠলাম। ব্যস্ত-হাতে পাগড়ীটি খুলে ফেললাম। বলা তো যায় না পাখিটির ফিন কি মর্জি হয়। হয়ত বা আবার উড়তে শুরু করে দেবে। কাজ হাসিল। তার সঙ্গে আমার আর কোনই সম্পর্ক রইল না।

হ্যাঁ, যা ভাবছিলাম ঠিক তা-ই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাখিটি ফিন শূন্যে ডানা মেল্‌ল।

ভুল—চরমতম ভুল করেছি আমি। পাখিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।

পাখিটি পাহাড় ছেড়ে যাবার সময় অতিকায় একটি ময়াল সাপকে ঠোঁটে চেপে ধরে দরিয়ার দিকে উড়ে গেল। সাপটিকে দেখেই সে পাহাড়ের ওপর এসে বসেছিল।

পাখিটির কাণ্ড দেখে আমার কলিজা শুকিয়ে গেল। ভাবলাম, একটি সাপ যখন চোখের সামনে দেখলাম তখন আরও হাজারটি থাকলেও তো তাজ্জব হওয়ার ব্যাপার নয়।

এবার সম্বিৎ ফিরে পেলাম। আমি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে। ন্যাড়া পাহাড়। গাছপালা, ঝর্ণা, নদী কোথাও কিছু নেই।

জিনিস হারিয়ে গেলে তার মূল্য শতগুণ বেড়ে যায়। আমার ক্ষেত্রেও বিলকুল তা-ই হয়েছিল। ভাবলাম, সে-দ্বীপে বরং এর চেয়ে ঢের নিরাপদেই ছিলাম। ঝর্ণা আর ফলমূলের গাছ প্রচুর ছিল। অন্ততঃ না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হ'ত না। এখানে এক ফোঁটা পানিও নেই যে শুকিয়ে ওঠা কলিজাটিকে ভিজিয়ে একটু তরতাজা করে নিতে পারি।

পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম—'এ আমি হঠাৎ ক'রে কোথায় এসে পড়লাম। বিষধর সাপের আড্ডা। কেবলমাত্র ময়ালই নয়। হাজার কিসিমের বিষধর সাপের আড্ডা। চোখের পলকে গিলে সোজা উদরে চালান ক'রে দিলে ঠেকাবার কেউ-ই নেই।

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলাম—এখানে খাব কি? কি দিয়ে উদর পূরণ করব? তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও এক ফোঁটা পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

—'হায় খোদা! এ আমায় কোথায় এনে ফেল্‌লে? এ যে কড়াই থেকে একেবারে জ্বলন্ত চুল্লিতে এনে ফেল্‌লে! এখন কে বাৎলে দেবে বাঁচার নিশানা?'

পাথর ধরে পা টিপে টিপে কোনরকমে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। কিছুটা পথ নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাজ্জব ব্যাপার। চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগছে। অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকালাম। মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'ইয়া খোদা! এ যে হীরার স্তূপ!'

হ্যাঁ, হীরাই বটে। যেদিকে তাকাই কেবল হীরা আর হীরা। রাশি রাশি বস্তা-বস্তা হীরা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আমি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টি মেলে ছোট-বড় হীরার টুকরোগুলোকে দেখতে লাগলাম। এমন সময় এক জায়গায় আমার দৃষ্টি থমকে গেল। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখলাম, অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে। ইয়া বড় বড় সাপ। দশাসই চেহারা। সবাই ব্যস্ত হয়ে গর্তে ঢুকছে। রকপাখির ভয়ে তারা দিনমানে বড় একটা বাইরে থাকে না। রাত্রে খাবারের খোঁজে বেরোয়। অজগর, ময়াল প্রভৃতি সাপের কথা কিতাবে পড়েছি। কিন্তু কোন সাপ যে এমন

বিশালদেহী হতে পারে কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

নসীবে কি আছে, খোদাতাল্লাই জানেন। পা ফেলতে গিয়ে কখন যে সাপের গর্তে পা সিঁধিয়ে দেব, কে জানে। নিজের প্রতি বার বার ধিক্কার দিতে লাগলাম। নিজের মুলুকে, নিজের প্রাসাদে সুখেই দিন গুজরান করছিলাম। কেন যে ফিন সওদাগরী কারবারের ভূত মাথায় চাপল ভেবে পাচ্ছিনে।

বহুৎ খোঁজাখুঁজি করেও মাথা গোঁজার মত একটি নিরাপদ আশ্রয় বের করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটি গুহা নজরে পড়ল। ভেতরে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে থাকা যেতে পারে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। উপায়ান্তর না দেখে গুহাটির মধ্যে নিজেকে সিঁধিয়ে দিলাম। তারপর গুহার মুখে একটি পাথরের চাঁই চাপা দিয়ে একটু স্বস্তি বোধ করলাম।

আমি গুহার মধ্যে একটু আয়েস করে বসার কোশিস করলাম। মুহূর্তে সামনের পাথরটি কেমন যেন একটু নড়েচড়ে উঠল। ইয়া আল্লা! এ আবার কি আজগুবি কাণ্ড!

দিনের আলোয় যাকে পাথরের টুকরো ভেবেছিলাম আসলে সেটি আদৌ পাথর টাথর নয়, পেল্লাই একটি সাপের পিঠ। বিড়ে পাকিয়ে নিশ্চিন্তে ডিমে তা দিচ্ছে। আমি ডরে শিটকে যাবার জোগাড়। সর্বাঙ্গ কেমন যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। মাথার স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে আসতে লাগল। ব্যস, তার পরের কথা কিছুই আমার দিমাকে নেই।

কখন যে ভোর হয়েছে হুঁশই ছিল না। এক সময় সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। নিদ ছুটল। পিছন ফিরে তাকাবার মত অবস্থা আমার ছিল না। পাথরটিকে কোনরকমে সরিয়ে দুরু দুরু বুকে বাইরে বেরিয়ে আসা সম্ভব হ'ল।

গত দিন ও রাত্রি উপোষ গেছে। তার ওপর স্নায়ুর ওপর অস্বাভাবিক চাপ। আমার শরীরের শক্তি যেন কোন্ অদৃশ্য দৈত্য কেড়ে নিয়েছে।

কোনরকমে দুর্বল শরীরটিকে তুলে দাঁড় করালাম। সোজা হয়ে দাঁড়াবার সাধ্য নেই। আর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। চোখ ফিরিয়ে দেখি আমার একেবারে গা-ঘেঁষে প্রকাণ্ড একটি গোস্তর টুকরো। ভাল ক'রে লক্ষ্য করে বুঝলাম, একটি ভেড়ার এক চতুর্থাংশ। ছাল চামড়া ছাড়ানো। তাজ্জব বনলাম। যে-ই কাজটি করুক না কেন এমন নিপুণভাবে ভেড়ার গা থেকে ছাল চামড়া ছাড়ালেই বা কি ক'রে?

কিতাবের কিস্‌সা পড়েছিলাম, জহুরীরা ওই হীরার পাহাড় থেকে হীরা সংগ্রহ করতে এসে ভেড়ার মাংস ছুঁড়ে ফেলে। কাঁচা মাংসের গায়ে হীরার ছোট-বড় বহু টুকরো গেঁথে যায়। তারপর বাজপাখি বা রকপাখি এসে ছোঁ মেরে গোস্তের টুকরোটিকে নিয়ে বাসায় চলে যায়। তখন কৌশলে পাখিটিকে খেদিয়ে দিয়ে হীরাগুলি নিয়ে নেয়।

আমার মাথায় একটি মতলব এল। চট করে কিছু বড় বড় হীরা কুড়িয়ে জড়ো করলাম। এবার কোর্তা, পাৎলুন সব খুলে হীরার টুকরোগুলি দিয়ে একটি পুঁটুলি বানালাম। সেটিকে কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিলাম। এবার পাগড়ীটি খুলে গোস্তের টুকরোটিকে ফাঁস দিয়ে বাঁধলাম। মাংসের অধিকাংশ অংশ বের ক'রে অনাবৃত রাখলাম। আর পাগড়ীটির অন্য প্রান্ত আমার হাতের কব্জির সঙ্গে বেঁধে নিলাম। ফিন শুরু হ'ল নীরব প্রতীক্ষা—ধৈর্যের পরীক্ষা। জান বাঁচাবার কোশিস তো করতে হবে!

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, একটি রক পাখি উল্কার বেগে নেমে এল। ছোঁ মেরে মাংসের টুকরোটিকে ঠোঁটে কামড়ে ধরে শূন্যে ডানা মেলল। আমিও আশমানে উঠতে লাগলাম। খোদাতাল্লা এবার নসীবে কি লিখে রেখেছে, কে জানে।

রক পাখিটি উড়তে উড়তে গিয়ে তার বাসায় নামল। আমি পাগড়ীর বাঁধন খুলে রক পাখিটির পিছনে চলে গেলাম। একটু বাদে এক বুড়ো জহুরী সেখানে এল। আমাকে দেখেই তাজ্জব বনে গেল। বড় বড় চোখ ক'রে তাকাল। আমি আদমির মুখ দেখে খুশীতে ডগমগ হয়ে গেলাম। সে কিন্তু খুশী না হয়ে কেমন ব্যাজার মুখ করেই আমার দিকে তাকাল। ভাঙা কাঁসরের মত গলায় সেঁক সেঁক করে উঠল—'চোর—শয়তান কাঁহিকার! হীরা চুরির মতলব নিয়ে এখানে হাজির হয়েছ, তাই না? খবরদার বলে দিচ্ছি। এটি আমাদের কয়েক পুরুষের ব্যবসা। আমাদের অধিকার। আমাদের পেটে কিল মারার ধান্দা করলে কিছুতেই বরদাস্ত করব না, বলে রাখছি। জবরদাস্ত কিছু করার মতলব করলে জান খতম করে

ছাড়ব।'

আমি তাকে অভয় দিতে গিয়ে ম্লান হেসে বল্‌লাম—'মিঞা সাহাব। এমন গোস্‌সা করছেন কেন? আপনার রুজি রোজগারের ভাগ নেয়ার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। একজন নিরীহ বণিক আমি। আমার নসীবের দৌলতে এখানে এসে পড়েছি। চুরি, ডাকাতি বা রাহাজানি কোন কুমতলবই আমার নেই।

কথা বলতে বলতে আমি **পুঁটুলি** থেকে হীরা বের করে কয়েকটি বুড়োর হাতে গুঁজে দিয়ে মুচকি হেসে বল্‌লাম—'কি, এবার খুশী তো?'

বুড়ো ড্যাবা ড্যাবা চোখ ক'রে হীরার টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় কাঁপা কাঁপা গলায় বল্‌ল—'শোভন আল্লাহ! এতবড় হীরা! এতো জিন্দেগীতে কোনদিন চোখেও দেখি নি! বেটা, এ তুমি কোথায় পেলে? কিভাবে পেলে?'

—'কোত্থেকে পেলাম, কিভাবে পেলাম পরে সব বলছি। আগে দিল্ খোলসা ক'রে বলুন, আপনার দিল্ ভরেছে নাকি আরও দু'-একটি চাই?'

—'ব্যস বেটা, এ-ই যথেষ্ট। এর একটি বেচলে কয়েক পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে দিব্যি জিন্দেগী কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আমার বালবাচ্চা কেউ-ই নাই। কে ভোগ করবে? তার চেয়ে বরং বাকী সব তোমার জিম্মাতেই থাক।'

—'খুব বেকায়দায় পড়েছি। আপনার কাছে থলেটলে কিছু আছে কি?'

—'আছে। জরুর আছে। নাও, কি করবে, কর।'

আমি থলেতে হীরাগুলি ভরে নিলাম। এবার কোর্তা পাৎলুন গায়ে চাপিয়ে সভ্যভব্য হয়ে উঠলাম।

আমি এবার বুড়োর কাছে আমার দ্বিতীয় সমুদ্র যাত্রার কাহিনীর কিছু অংশ বল্‌লাম। রকপাখির সাহায্যে পাহাড়ে ওঠার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত বলতে না বলতেই বুড়ো চোখ দুটো কপালে তুলে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লা! ওই দুর্গম হীরার পাহাড়ে তুমি উঠলে কি ক'রে? ভাবলেই যে আমার হাঁটু কাঁপতে শুরু করছে বেটা। এর আগে অনেকেই সেখানে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কেউ-ই জান নিয়ে ফিরতে পারেনি। তুমি—তাজ্জব কাণ্ড তো!'

আমি এবার পাগড়ী খুলে রকপাখির পায়ে ফাঁস পরানো থেকে শুরু করে পাগড়ীতে ভেড়ার মাংসপিণ্ড বেঁধে কৌশলে পাহাড় থেকে নেমে আসার ব্যাপারটি খোলসা করে সব বৃত্তান্ত বুড়োর কাছে ব্যক্ত করলাম। বুড়ো সব শুনে সেই যে হাঁ করল কয়েক মুহূর্ত আর চোয়াল বন্ধ করতে পারল না।

এক সময় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে বুড়ো আমার পিঠ চাপড়ে বল্‌ল—'সাবাস নওজোয়ান! তোমার সাহস আর হিম্মৎ আমাকে মুগ্ধ করেছে। খোদা তাল্লার দোয়া রয়েছে তোমার ওপর। নইলে এমন—'

তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম—'খিদেয় আমার পেটের নাড়িভুঁড়িতে আগুন জ্বলছে। কাল থেকে দানাপানি কিছু জোটে নি। কিছু খানার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?'

—'তাই তো, আমার যে আগেই ব্যাপারটি ভাবা দরকার ছিল। আমার তাঁবুতে চল। সব মিলে যাবে। বেশী দূরে নয়—বাঁক ঘুরেই।'

বুড়োর সঙ্গে তাঁবুতে এসে পেট পুরে খানাপিনা ক'রে বল শক্তি ফিরে পেলাম। তার তাঁবুতেই ওদিন কাটালাম। রাত্রিবাসও তাঁবুতেই করতে হ'ল।

সকালে দেখি বুড়ো একা নয়। তার সঙ্গী-সাথী আরও কয়েকজন রয়েছে। তারা আমাকে দরিয়ার ধারে নিয়ে গেল।

দুপুরের কাছাকাছি একটি জাহাজ ভিড়ল। বুড়ো ও তার সঙ্গী সাথীদের সুক্‌রিয়া জানিয়ে জাহাজে উঠলাম।

এক সময় আমাদের জাহাজটি কর্পূর দ্বীপে নোঙর করল। এখানে অতিকায় সব গাছের বিচিত্র সমারোহ। দুধের মত সাদা কষ বেরোয় এদের গা থেকে, তারপর এ কষ থেকেই কর্পূর তৈরী হয়।

কর্পূর দ্বীপে কারকাভন নামে ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রকৃতির এক বিশেষ আকৃতির জানোয়ার বাস করে। আমাদের মুলুকের গণ্ডারের মত অনেকটা আকৃতি। নাকের ডগায় ইয়া বড় একটি ক'রে শিং। কম করেও ছয় হাত লম্বা। গায়ে গতরেও খুব তাগদ। পেল্লাই সব হাতীকে অনায়াসে ঘায়েল করার হিম্মত রাখে। হাতী ঘায়েল করে এরা দূরে সরে গেলে রকপাখি শোঁ শোঁ শব্দে নেমে আসে। ছোঁ মেরে মরা হাতীটিকে ঠোঁটে আঁকড়ে ধরে উড়ে যায়। তারপর শুরু হয় মহাভোজ।

অনেক সোনার মোহর দরকার। জাহাজ ভাড়া থেকে শুরু করে অন্যান্য খরচের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কুছ পরোয়া নেই। দিলাম একটি হীরা বেচে।

তারপর ফিন আবার জাহাজে চাপলাম। শুরু হ'ল এ বন্দর থেকে অন্য এক বন্দরে নোঙর করা। সব শেষে হাজির হলাম বসরাহ বন্দরে ব্যস, দিল্ আমার নাচানাচি শুরু করে দিল। বাগদাদ আর মাত্র কয়েক ক্রোশ।

আমাকে কাছে পেয়ে আমার আত্মীয়জনরা খুশীতে ডগমগ হ'ল বাতাসে আমার আগমন বার্তা ইয়ার দোস্তদের কাছে পৌঁছে গেল। মধুর লোভে ফিন মৌমাছির হাট বসে গেল আমার বিশাল বৈঠকখানায়।

এবার থেকে বিলাস ব্যসনের মধ্যে আমি দিন গুজরান করতে লাগলাম। গোস্ত আর সরাবের সদ্ব্যবহার করতে লাগল আমার ইয়ার দোস্তরা। নাচা-গানার আয়োজনও হররোজ হতে লাগল। সে-ফাঁকে চলে আমার সমুদ্র-যাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা। মোদ্দা বাৎ রীতিমত অনাবিল আনন্দ-সুখেই আমার দিন গুজরান হতে থাকে।

আমার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা মোটামুটি এরকম।

দোস্ত আর মেহমানগণ আল্লাহ যদি সবার তবিয়ৎ আচ্ছা রাখেন তবে আমার তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা আপনাদের দরবারে পেশ করার ইচ্ছা রাখছি। আশা করি আগামীকালের কিস্‌সা আপনাদের কাছে অধিকতর রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় মনে হবে।

বেগম শাহরাজাদ সিন্দবাদ নাবিকের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা শেষ করতে না করতেই প্রাসাদের বাইরের বাগিচায় ভোরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। বেগম কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

দু'শ আটানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক তার কিস্‌সা শেষ ক'রে তাঁর দোস্ত মেহমানদের নিয়ে নাস্তা সারলেন।

নাস্তা শেষ হলে বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক এবার কোর্তার জেব থেকে একশ'টি সোনার মোহর বের ক'রে সিন্দবাদ কুলীর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'বেটা, এগুলো আমি খুশী হয়ে তোমাকে দিলাম। তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী খরচা করবে।'

সিন্দবাদ কুলী মোহরগুলো কোর্তার জেবে চালান করে দিয়ে নতজানু হয়ে বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিককে সালাম ক'রে বিদায় নিল।

সিন্দবাদ নাবিকের তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা

সিন্দবাদ কুলী পরদিন সুবহে বিছানা ছেড়ে রুজু ক'রে পবিত্র দিল্ নিয়ে নামাজাদি সারল। ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। সে ফিন লম্বা লম্বা পায়ে সিন্দবাদ নাবিকের মকানের উদ্দেশ্যে হাঁটা জুড়ল।

সিন্দবাদ কুলী সদর দরওয়াজা ডিঙিয়ে সিন্দবাদ নাবিকের বৈঠকখানায় পা দিয়ে দেখে তার মেহমান ও দোস্তরা ইতিমধ্যেই এক এক করে সেখানে জড়ো হয়েছেন। সবাই তার আসার অপেক্ষায় বসে।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক ফোকলা দাঁতে হেসে সিন্দবাদ কুলীকে আদর ক'রে পাশে বসাল।

অন্যদিনের মত সুবিশাল টেবিলে নাস্তা সাজানো রয়েছে। সরাবের বোতল আর পেয়ালারও ঘাটতি নেই।

খানাপিনা সারতে সারতে সিন্দবাদ নাবিক তার তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌ল—'আল্লাহ যে সর্বশক্তির আধার তা অবশ্যই আমাদের কারো অজানা নয়, ঠিক কিনা? আর একটু বাড়তি কিছু যদি ভাবা যায় তবে আমরা দেখব, আমাদের মত সাধারণ আদমিদের তুলনায় তাঁর বিচার-বিবেচনাবোধ হাজার গুণ বেশী। কেন এরকম বাৎ বলছি তাই না? ভেবে দেখুন তো, সওদাগরি কারবার করতে গিয়ে, দরিয়া পাড়ি দেওয়ার সময় আমার জান খতম হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। একবার নয়। পর পর দু'বার।

আমার তো ধন দৌলতের কোনই অভাব ছিল না। আল্লাহ আমাকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন। আমার চৌদ্দ পুরুষ দেদার দিনার খরচা করলেও তা খতম হবার নয়। তবে ফিন নতুন জান হাতের মুঠোয় নিয়ে জাহাজ নিয়ে ভিন্ দেশে পাড়ি জমানোর কোশিস করতে যাব কেন?

আমি বলব, আল্লাহ যথা সময়ে আমার দিল্ থেকে পূর্ববর্তী সমুদ্রযাত্রার প্রাণ সংশয়ের বাৎ বিলকুল মুছে দিয়েছিলেন। তিলমাত্র ভীতিও আমার মধ্যে ছিল না। তাই ফিন আমি জাহাজে চড়ার জন্য উৎসাহী হয়ে পড়েছিলাম।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক ফিন বলতে শুরু করল—'আদৎ ব্যাপার কি জানেন? প্রাসাদের চার দেয়ালে ঘেরা কামরায় বৈভবের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে আমার দিল্ হাঁপিয়ে উঠেছিল। বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য আমার দিল্ আনচান করতে লাগল। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

আমি ফিন সওদা খরিদ করতে মেতে গেলাম। পরদেশের

বাজারে চাহিদা আছে এমন সব সওদা খরিদ ক'রে কামরা বোঝাই করে ফেললাম। তবে হ্যাঁ, এবার আর ইয়া ভারী বড় আর ভারী সওদা একটি খরিদ করলাম না। আরবের আতর নির্যাস বাইরের মুলুকে বহুৎ দামে বিকায়। মুনাফাও দ্বিগুণ। আর বাগদাদের শিল্প সম্ভারও বহুৎ কদর পায়। এরকম বিবেচনা করে ছোট ছোট সামানপত্রই বেশী খরিদ করলাম।

বসরাহ বন্দরে হাজির হলাম। সেদিনই দুপুরের কিছু বাদে। বসরাহ বড় বন্দর, আশা করি আপনাদের অবশ্যই জানা আছে। এখান থেকে জাহাজে তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়ানো যায়।

বসরাহ বন্দরে গিয়ে একদল সাচ্চা মুসলমান বণিকের সঙ্গে জান পহ্ছান হ'ল। প্রথম আলাপেই তাদের সঙ্গে আমার দোস্তী হয়ে গেল। আমি তাদের জিগরী দোস্ত বনে গেলাম। পছন্দসই দোস্ত না মিললে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা কেমন রুঠা রুঠা বোধ হয়।

বসরাহ থেকে আমরা বড় জাহাজে উঠলাম। গুরু গম্ভীর ভোঁ দিতে দিতে ক্যাপ্টেন জাহাজ ছাড়ল। ধীর-মন্থর গতিতে আমাদের জাহাজ মাঝ-দরিয়ার দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

আমাদের জাহাজ একের পর এক বন্দরে নোঙর করতে লাগল। আমরা বন্দর থেকে বেরিয়ে নগরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সওদা ফেরি করে বেচতে লাগলাম।

আগেই তো বলেছি, আমার সঙ্গে যা কিছু সওদা ছিল বিলকুল বিলাস সামগ্রী। ভরসা একটিই যে, এ-কিসিমের সওদা অন্য কারো সঙ্গেই ছিল না। ফলে দেখা গেল আমার সওদার চাহিদা অন্য সবার সওদার তুলনায় ঢের বেশী। আমি মওকা নিতে ছাড়লাম না। এক একটি সওদার চড়া দাম হাঁকলাম। তাতেও ছাড়া নেই।

আমার সওদার ওপর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। সুযোগ বুঝে আমি দু'হাতে মুনাফা লুটতে মেতে গেলাম। খুশীতে আমার কলিজা নাচানাচি শুরু করে দেয়।

আমাদের জাহাজ একের পর এক বন্দর ছুঁয়ে এক সময় মুসলমান সুলতানদের সুলতানিয়ৎ এলাকা ডিঙিয়ে মাঝদরিয়া ধরে এগিয়ে চলতে লাগল।

আমাদের পায়ের তলায় অথৈ নীল পানি, মাথার ওপরে ওল্টানো গামলার মত সুবিশাল নীল আশমান। তার গায়ে ঝুলছে বিশাল জ্বলন্ত সূর্য। নীল আশমানের গা বেয়ে পেঁজা তুলার মত টুকরো টুকরো মেঘ অজানা মুলুকের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছে। তাদেরই টুকরো ছায়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করছে দরিয়ার নীল পানির ওপর। আমি তো কেবল মোহর রোজগারের ধান্দায় মুলুক ছাড়ি নি। দুনিয়ার বৈচিত্র্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার অদম্য বাসনাও আমার মধ্যে পুরোদস্তুর রয়েছে।

আমি ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে দরিয়ার পানিতে মেঘের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। এমন সময় ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর কানে এল—'ইয়া আল্লাহ! কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটে গেছে! আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। কোথায় কোন্‌দিকে আমাদের জাহাজ এগিয়ে চলেছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কথাটি কোনরকমে বলেই ক্যাপ্টেন বেমালুম কপাল চাপড়াতে বসে গেল। ডুকরে ডুকরে কেঁদে বার বার বলতে লাগল—'খোদা, একী হ'ল! একী করলে তুমি!' সে এবার হাউমাউ ক'রে কেঁদে উন্মাদের মত মাথার চুল টানতে লাগল। নিজের পোশাক পরিচ্ছদ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল।

আমরা ছুটে গিয়ে পরিস্থিতিটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করলাম—'আমরা এখন কোথায় আছি, কোনদিকে চলেছি কিছুই কি ঠাহর করতে পারছেন?'

আগের মতই ডুকরে ডুকরে কেঁদে ক্যাপ্টেন জবাব দিল—'পালের হাওয়া মোড় নিয়েছে। আমরা বিলকুল পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

—'সে তো বুঝলাম। আমরা এখন কোনদিকে চলেছি ঠাহর করতে পারছেন কিছু?'

—'জাহাজ এখন দ্রুত বাঁদর দ্বীপের দিকে ছুটে চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে সে দ্বীপে পৌঁছে যাব।'

—'তারপর? তারপর কোথায়—'

আমাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন ফিন কান্নাভেজা কণ্ঠে বলতে লাগল—'বাঁদর-দ্বীপ মরণ-দ্বীপ ব'লে পরিচিত। আজ পর্যন্ত কোন জাহাজ, এমন কি কোন আদমি পর্যন্ত সেখান থেকে জিন্দা ফিরতে পারে নি।' ফিন দু'হাতে কপাল চাপড়াতে শুরু করল।

আমরা দলবেঁধে চিল্লাতে লাগলাম—'কী সর্বনেশে কারবার করেছেন! যেভাবেই হোক জাহাজের গতি ফেরানোর কোশিস করুন। এতগুলো আদমির জান খতম করতে বসেছেন দেখছি!'

—'অসম্ভব! কোন কোশিসেই কাজ হবার নয়। কিছু সময় বাদেই জাহাজ বাঁদর দ্বীপে পৌঁছে যাবে। আর যদি জাহাজের ওপর জোর জুলুম খাটানোর কোশিস করি তবে জাহাজই গুঁড়িয়ে যাবে।'

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানতে পেরে আমরা, যাত্রীরা উন্মাদের মত ডেকের ওপর ছুটোছুটি দাপাদাপি জুড়ে দিলাম। মৌউত হাতছানি দিয়ে ডাকছে, দিমাক ঠিক রাখা কি আর সম্ভব?

জাহাজ আরও কিছুটা এগিয়ে বাঁদর-দ্বীপের কাছাকাছি যেতে খেল শুরু হয়ে গেল। পঙ্গপালের মত দলে দলে বানর আমাদের জাহাজটিকে আক্রমণ করল। তাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা তো

দূরের কথা মোটামুটি অনুমান করাও সম্ভব হ'ল না। দশ-বিশ হাজার তো নয়ই। পঞ্চাশ হাজার বললেও হয়ত কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না। বিশাল বানরসেনা। যুদ্ধোন্মাদ ক্রোধোন্মত্ত বানরসেনা। জাহাজের চারদিকে রীতিমত লাফালাফি দাপাদাপি শুরু করে দিল আমাদের সাক্ষাৎ মৌউত বানরের দল।

আমরা জান হাতে নিয়ে জাহাজের ডেকের ওপর বসে আল্লাতাল্লার নাম স্মরণ করে চলেছি।

জাহাজের চারদিক ঘিরে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ক'রে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ক্রোধোন্মত্ত জানোয়ারগুলো আমাদের রীতিমত শাসাতে লাগল। তাদের এমন রণং-দেহী ভাব যে, জাহাজ থেকে নিচে নামলেই আমাদের ছিঁড়ে ফেঁড়ে একাকার করে দেবে।

বানরের দলকে আক্রমণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তারা আক্রমণ করলে কিভাবে প্রতিরোধ করব তা ভেবেই আমরা কূলকিনারা করতে পারলাম না।

ভেবেছিলাম, বানরগুলো নিচে দাঁড়িয়েই হম্বিতম্বি করবে, জাহাজে ওঠার সাধ্যে কুলোবে না। কিন্তু আমাদের সব আশা-ভরসা বানচাল করে দিয়ে তারা দলে দলে কাতারে কাতারে জাহাজের ডেকের ওপর উঠে এল।

আমরা আল্লাতাল্লা-র ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলাম। বানরগুলো জাহাজে পুরোদমে খেল শুরু করে দিল। আমাদের সওদাপত্রের গাট্টি ছিঁড়ে তছনছ ক'রে দিতে লাগল। সে সঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচুনি আর কিচিরমিচির তো রয়েছেই।

কয়েকটি বানর তরতর ক'রে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠে গেল। পাল ছিঁড়ে দিল, পালের কাছি খুলে ফেল্‌ল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের আরও অবাক ক'রে দিল যখন দেখলাম হাল-দাঁড় অধিকার ক'রে জাহাজটি নিয়ে সমুদ্র সৈকতে হাজির করল।

আর কয়েকজন আমাদের ওপর চড়াও হ'ল। আমাদের এক এক ক'রে টেনে হিঁচড়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে তীরে নিয়ে গেল। ভয়ে আমাদের কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল। কলিজা শুকিয়ে কাঠ। বুঝতে পারছি মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি থাক আর না-ই থাক, মনোবল নিঃশেষে উবে গেছে।

আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে কোরবাণির পশুর মত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। চোখের সামনে আমাদের এত বড় সর্বনাশ ঘটতে দেখছি কিন্তু প্রতিরোধ করার মত দুঃসাহসের একান্ত অভাব। এবার তারা আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড করল। বৈঠা চালিয়ে দাঁড় বেয়ে জাহাজটিকে নিয়ে তারা মাঝদরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

আমরা নীরবে হতাশ দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার দু' চোখ বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। কয়েকজন তো গলা ছেড়ে মরাকান্না জুড়ে দিল। জানি বিপদের মুহূর্তে ভেঙে না পড়ে বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও ধৈর্যের সঙ্গে বিপদের মোকাবোলার কোশিস করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু অবুঝ দিল্‌কে বুঝাই কি দিয়ে?

আমাদের সওদাপত্র তো গেছেই এমন কি জাহাজটিকেও খোয়াতে হয়েছে। এখন জান বাঁচাবার ফিকির করতেই হয়। একার কাজ নয়। পাড়ে সবাই গোল হয়ে বসলাম। সবাই মিলিত হলাম। পরস্পরের ফন্দি ফিকির এক সাথে জুড়ে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হ'ল, সবার আগে পেটের জ্বালা নেভাতে হবে। পেটে আগুন নিয়ে ভাবতে বসলে উপযুক্ত পথ বের করা সম্ভব নয়। আর ইতিমধ্যে আতঙ্ক অনেকাংশে লাঘব হয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। দলবেঁধে দ্বীপের ফলফুলের খোঁজে ভেতরের দিকে অগ্রসর হতেই একটি সুবিশাল অট্টালিকা আমাদের নজরে পড়ল।

গাছ থেকে পাকা ফল কিছু পেড়ে আগে খানাপিনা সারলাম। এবার দলবেঁধে চল্‌লাম অট্টালিকাটি লক্ষ্য ক'রে। বাস্তবিকই বিশালায়তন এক প্রাসাদ। উঁচু প্রাচীর গেঁথে চারদিক ঘেরাও করা হয়েছে। প্রধান ফটকটিও দেখার মত।

প্রধান ফটকটি খোলাই রয়েছে দেখলাম। প্রাসাদের ভেতরে সুবিশাল এক কামরায় সারিবদ্ধভাবে রসুইখানার সরঞ্জামাদি রাখা আছে। কামরাময় হাড়ি ছড়ানো। তাদের কতকগুলিতে ঝোল-মশলা মাখানো।

ব্যাপার দেখে আমাদের সবার মাথা চক্কর মারতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এক এক করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লাম।

সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে আচমকা ভয়ঙ্কর বাজ পড়ার শব্দে আমাদের মূর্চ্ছা ভাব কেটে গেল।

চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পেলাম কুচকুচে কালো দশাসই চেহারার দৈত্যাকৃতি এক আদমি সিঁড়ি বেয়ে বীরদর্পে নিচে নামছে। তার উচ্চতা? প্রায় একটি তালগাছের মত। কদাকার আর কাকে বলে। মুখপোড়া হনুমানও বুঝি এর চেয়ে বেশী সুরতের অধিকারী। চোখ নয় তো যেন জ্বলন্ত দুটো চুল্লি। দাঁতগুলো গাঁইতির মত। আর মুখটি একটি কূঁয়ো বা ইঁদারার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। নিচের ঠোঁটটি বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়ায় তাকে আরও বেশী কদাকার দেখাচ্ছে। ইয়া লম্বা হাতের নখগুলোর দিকে চোখ পড়তেই আমার কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

ভয়াল দর্শন আদমিটিকে একটিবার দেখেই আমার চোখ দুটো অতর্কিতে বন্ধ হয়ে গেল। বাব্বা! এরকম দৃশ্য চোখে দেখা যায়। সে বীরদর্পে মেঝে কাঁপিয়ে এগিয়ে এসে পিছন থেকে আমার ঘাড়টি সাঁড়াশীর মত চেপে ধরল। ভাবলাম একে বলে নসীবের ফের। নইলে এত আদমি থাকতে বেছে বেছে আমাকেই পেয়ার মহব্বত জানাতে এল।

ইয়া আল্লাহ! হতচ্ছাড়াটি এবার ছোট্ট একটি পুতুলের মত আমাকে মাথার ওপর তুলে ভন্ ভন্ করে চক্কর মারতে লাগল। পর মুহূর্তেই তার মেজাজ মর্জি বদলে গেল। আমার রোগা পটকা চেহারাটি হয়ত তার পছন্দ মাফিক হ'ল না। দুম করে মেঝেতে ফেলে দিল। এবার অন্য একজনকে মাথার ওপর তুলে ভন্ ভন্ করে দু' চক্কর মারল। তাকেও মেঝেতে ফেলে দিল। এভাবে সবাইকে নিয়ে সে একই কাণ্ড করল।

আমার বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। হতচ্ছাড়াটি এভাবে আমাদের ওজন সম্বন্ধে ধারণা করে নিল। কার গতর থেকে কি পরিমাণ গোস্ত মিলতে পারে, ধান্দা।

আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেনের গায়ে গতরে গোস্ত সবচেয়ে বেশী। যেমন মোটাসোটা নাদুস নুদুস চেহারা তেমনি লম্বাও বটে। তাকে দেখে দৈত্যাকৃতি আদমিটি খুশীতে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠল। মুখের হাসি যেন আর মিলাতেই চায় না।

আমি দুরুদুরু বুকে আড়চোখে দৈত্যাকৃতি আদমিটির কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। এক সময় নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লাহ! এ কী পৈশাচিক কাণ্ড!' দেখলাম, ভয়ালদর্শন হতচ্ছাড়াটি ক্যাপ্টেনকে কাঠের পুতুলের মত দু' হাত দিয়ে আলতো ক'রে তুলে নিল। চোখে-মুখে ভয়ঙ্কর হিংস্রতার ছাপ ফুটিয়ে তুলে এক হাতে তার কোমর আর অন্য হাতে তার ঘাড়টি ধরে আচমকা এক মোচড় দিল। ব্যস, মুণ্ডুটি চোখের পলকে ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেনের মুণ্ডুহীন ধড়টিকে পেল্লাই এক কড়াইয়ের মধ্যে রেখে চুল্লীতে চাপিয়ে দিল। এবার চুল্লীতে আগুন জ্বাল্‌ল। ধড়টি আধ-সিদ্ধ করে কড়াই থেকে তুলে নিল। এবার লকলকে জিহ্বা আর গাঁইতির মত দাঁত বের করে গব্ গব্ করে খেতে শুরু করল। ছোট ছোট হাড্ডিগুলো সমেত গোস্তগুলো উদরে চালান দিয়ে দিল। আর বড় বড় হাড্ডিগুলো ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেল্‌ল। তার চোখে মুখে তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠল। বার কয়েক ঢেকুর তুলে তৃপ্তিটুকু পুরো পুরি অনুভব করল।

দৈত্যাকৃতি আদমিটি এবার পাশের শান বাঁধানো একটি বেদীর ওপর চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আহারের পর বিশ্রামের প্রয়াস। কিছুক্ষণের মধ্যেই গণ্ডারের মত ঘোৎ ঘোৎ করে নাক ডাকিয়ে নিদ যেতে লাগল।

আমাদের বিশেষ ক'রে আমার হালৎ তখন সঙ্গমিরা। জিন্দা আছি কিনা সে বিষয়েও যেন নিশ্চিত হতে পারছি না।

পরদিন সকালে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল। বিকট আওয়াজ ক'রে পেল্লাই হাত দুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে আড়মোড়া ভাঙল। দুম্ করে খাড়া হয়ে গেল। ফিন মেঝে কাঁপিয়ে বীর দর্পে পা ফেলে ফেলে সিঁড়িটি বেয়ে সে ওপরে নিঃশব্দে ও নির্বিকারভাবে উঠে গেল।

হতচ্ছাড়াটি বিদায় নিয়েছে বুঝতে পেরেই আমি উন্মাদের মত গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলাম। ডুকরে ডুকরে কেঁদে বল্লাম—'খোদা, এর চেয়ে সমুদ্রের পানিতে ডুবে মরাও ঢের ভাল ছিল। নইলে বানরগুলো যদি বুক ফেঁড়ে কলিজা ছিঁড়ে খুন চুষে চুষে খেত তবু সহ্য করা যেত। কিন্তু কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে ভাজা—আঃ আর ভাবতে পারছি না আমার সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

কেঁদে বুক ভাসালে ফয়দা কিছুই হবার নয়। নসীবের ফের কেউ খণ্ডাতে পারবে না। একমাত্র খোদাতাল্লা ভিন্ন কারো সাধ্য নেই জান রক্ষা করে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

এক সময় আমি উঠে দাঁড়ালাম। অভিশপ্ত প্রাসাদটি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আমার সহযাত্রীরা আমাকে অনুসরণ করল। যদিও জানি এ যাত্রায় আর জান নিয়ে মুলুকে ফিরে যেতে পারব না। তবু কিতাবে পড়েছি, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে তল্লাশী চালিয়ে এমন একটি গুহা বা অন্য কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না যেখানে মাথাগুঁজে দৈত্যাকৃতি শয়তানটির নজর থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারি। তামাম দ্বীপ হন্যে হয়ে ঢুঁড়ে অন্য কোন প্রাসাদ বা ছোটমোট মকানের হদিসও পেলাম না, যেখানে মাথাগোঁজা সম্ভব। কেবল গাছ আর গাছ। দ্বীপ জুড়ে শুধুই গাছের মেলা। এমন কি কোন পর্বত বা টিলা

পর্যন্ত নেই।

দ্বীপটির এখানে ওখানে ঢুঁড়ে আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল। বুঝলাম, যমপুরীর দক্ষিণ দুয়ার সেই প্রাসাদটিতে গিয়েই রাত্রে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। করলামও তা-ই।

দৈত্যাকৃতি আদমিটির মর্জি একবারে একজনকে ছাড়া দ্বিতীয় কারো গায়ে হাত দেয় না। নসীব সম্বল ক'রে শুয়ে বসে আমরা রাত্রি গুজরান করতে লাগলাম। আতঙ্কের রাত্রি যেন আর ফুরোতে চায় না। আমরা তো জানিই যার নসীবে মৃত্যু লেখা আছে দৈত্যের হাতে আজ রাত্রে তার প্রাণ যাবেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈত্যাকৃতি আদমিটি কলিজা-কাঁপানো তর্জন গর্জন করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে আগের রাত্রির মত বীরদর্পে নেমে এল। সে ফিন আগের মতই আমাদের এক এক করে মাথার ওপরে তুলে ওজন পরীক্ষা করল। তারপর একজনের ধড় থেকে মুণ্ডুটি বিচ্ছিন্ন করে কড়াইয়ে চাপিয়ে আধ-সিদ্ধ করল। পরম তৃপ্তিতে ভোজ সারল। ব্যস, ফিন গণ্ডারের মত নাক ডাকিয়ে সকাল পর্যন্ত বিভোর হয়ে নিদ দিল।

খুব ভোরে তার নিদ টুটে গেল। আড়মোড়া ভেঙে খাড়া হ'ল। ফিন সিঁড়ি বেয়ে উধাও হয়ে গেল।

প্রাসাদ তো নয় আমরা যেন একেবারে দোজাকের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছি। কলিজার ধুকপুকানি কিছুতেই কমছে না। আমরা পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম—দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে জান খতম করব তবু এ মৃত্যুপুরীতে আর এক মুহূর্তও নয়। আর যদি এখানে থাকতেই হয় তবে একজোট হয়ে শত্রুকে খতম করার কোশিস করব। নসীবে যা আছে পরে দেখা যাবে।

আমি খাড়া হলাম। উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লাম —'দোস্তরা, আমার বাৎ শুনুন। শয়তান দৈত্যটিকে যদি খতম করতে পারি বহুৎ আচ্ছা। আর যদি না পারি তবে একটি ফিকির করলে কেমন হয়, আপনারা বিবেচনা করে দেখুন—সমুদ্রের কিনারায় ইয়া পেল্লাই সব কাঠের গুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখেছি। তাদের কয়েকটি দিয়ে ভেলা বানিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে চেপে বসি। দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে যেদিকে হয় চলে যাব। আজ না হোক কাল জাহাজের দেখা পাবই। নইলে অন্য কোন দ্বীপে তো গিয়ে ভিড়তে পারব। পানিতে ডুবে দম বন্ধ হয়ে জান খতম হলেও এর চেয়ে ঢের ভাল।'

আমার মতলবটি দেখলাম অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হ'ল। তারা 'বহুৎ আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা মতলব' ব'লে তারিফও করল। আর করবে না-ই বা কেন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে তিলে তিলে ধুঁকে মরার চেয়ে দরিয়ায় ডুবে জান খতম যদি হয়-ই হোক।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিনশোতম রজনী

মাঝ রাত্রে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার অবশিষ্টাংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক তার দোস্ত ও সেই মেহমানদের কাছে কিস্‌সা ব'লে চলেছে—'হ্যাঁ, আমার মতলবটিকে সবাই স্বাগত জানাল। ব্যস, আর দেরী নয়, আমরা পা টিপে টিপে দোজাক-সদৃশ প্রাসাদটি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে এলাম। কাঠের গুঁড়ি জুড়ে জুড়ে বিশাল এক ভেলা বানিয়ে ফেল্‌লাম. জঙ্গল থেকে ফলমূল এনে তার ওপর জড়ো করলাম।

কাজ সেরে আমরা ফিন মৃত্যুপুরীতে ফিরে এলাম।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই কলিজা-কাঁপানো তর্জন গর্জন করতে করতে নিচে নেমে আমাদের একজনকে দিয়ে আগের দু'

রাত্রির কায়দায় ভোজ সারল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে নিদ যেতে লাগল।

আমরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৎপর হলাম। দুটো ইয়া লম্বা শিক জোগাড় করে চুল্লির আগুনে গরম ক'রে টকটকে লাল করে নিলাম। এবার সন্তর্পণে শয়তান দৈত্যটির দিকে সতর্কতার সঙ্গে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। আর একই সঙ্গে উত্তপ্ত শিক দুটো তার দু' চোখে দিলাম গেঁথে। বিকট আর্তনাদ করে এক ঝটকায় সে উঠে বসে পড়ল। সে কী তর্জন গর্জন! তামাম দ্বীপটি যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল প্রচণ্ড আক্রোশে। কী যে ভয়ঙ্কর রূপ সে ধারণ করল চোখে না দেখলে অনুমান করাও সম্ভব নয়।

শয়তান দৈত্যটি বিকট স্বরে তর্জন গর্জন করে হাতড়ে হাতড়ে

সিঁড়িটি ধরল। কাৎরাতে কাৎরাতে কোনরকমে ওপরে উঠে বেপাত্তা হয়ে গেল।

আমরা উৎকণ্ঠামুক্ত হলাম। দলবেঁধে চলে এলাম। সমুদ্রের ভেলায় উঠে বসলাম।

দৈত্যটিকে খতম করে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, শত্রুমুক্ত হয়েছি। কিন্তু ভেলায় উঠতে না উঠতে আমাদের ধারণা যে পুরোপুরি ভ্রান্ত, বুঝতে পারলাম। সবে ভেলাটি কিনারা থেকে কিছুদূর গেছে অমনি দেখি আহত দৈত্যটির হাত ধরে একটি অধিকতর কদাকার জনানা তর্জন গর্জন করতে করতে বিশাল একটি পাথর এনে তার হাতে তুলে দিল। সে অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমাদের ভেলাটির দিকে সেটি ছুঁড়ে মারল। তার কোশিস ব্যর্থ হয় নি। পাথরটি ভেলাটির কাছাকাছি পড়ায় সেটি আচমকা একদিকে কাৎ হয়ে গেল। বোধ হয় ভেলাটির কানায়ও লেগেছিল। আবার আর একটি পাথর আমাদের দিকে ধেয়ে এল। আরও একটি—পরপর কয়টি পাথর ছুঁড়ে মারল যন্ত্রণাকাতর ক্রোধোন্মত্ত দৈত্যটি। কিন্তু আমরা কোনরকমে লক্ষ্য এড়িয়ে ভেলাটিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। আমাদের চৌদ্দ পুরুষের নসীবের জোর ছিল বলেই আমাদের জান খতম হতে হতে কোনরকমে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, নসীব আমাদের জান রক্ষা করল। খোদাতাল্লা-র দোয়ায় আমরা কোনরকমে একটি দ্বীপে পৌঁছোতে পারলাম।

ফলমূল আমাদের ভেলাতেই ছিল। তা দিয়ে পেটের জ্বালা নিভিয়ে সবাই মিলে দুটো গাছের ডালে বসে রাত্রি কাটালাম।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি, দুটো গাছের প্রায় সব ক'টি ডালেই ইয়া লম্বা ও মোটা সোটা সাপ ঝুলছে। তাদের চোখগুলো চুল্লীর মত জ্বলছে। আমার কলিজাটি যেন আচমকা ডিগবাজি খেয়ে গেল। পাশের গাছটির দিকে চোখ পড়তেই আমার শরীরের সব ক'টি স্নায়ু যেন এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। দেখি, আমার এক সহযাত্রীকে ইয়া পেল্লাই এক সাপ একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। আতঙ্কে তার মুখ দিয়ে রা সরছে না। তারপর তাকে গিলতে শুরু করল রাক্ষুসে সাপটি।

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলাম—'হায় খোদা! এ আবার কোন্ মরণ দ্বীপে এনে ফেল্‌লে! কোনরকমে দৈত্যের খপ্পর এড়িয়ে এসে আর এক যমের কবলে পড়লাম যে! খোদা, তুমিই একমাত্র ভরসা।'

আমরা কাঁপা কাঁপা হাত-পায়ের ওপর নির্ভর করেই কোনরকমে গাছ থেকে জমিনে নেমে এলাম।

আমরা দলবেঁধে ফিন আশ্রয়ের খোঁজে বেরোলাম। হাঁটতে হাঁটতে বহু দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি আর একটি অধিকতর মোটাসোটা ও ঝাঁকড়া গাছকে আশ্রয় হিসাবে বেছে নিলাম। সবাই মিলে চারদিকে টুঁড়ে খুঁজে দেখলাম, যমদূত সাপ আছে কিনা। না, একটি বাচ্চা সাপও নজরে পড়ল না।

ফলমূল খেয়ে দিন গুজরান করলাম। ফিন রাত্রি দেখা দিল। সবাই মিলে গাছে উঠে পছন্দ মাফিক ডাল বেছে নিলাম। দিলে এটুকুই স্বস্তি যে, এ রাত্রিটি অন্ততঃ নির্বিঘ্নে কাটবে। কিন্তু এখানেও

যে নসীব আমাদের বিরোধিতা করে চলেছে, আমাদের চারদিকে সাপের ফোঁস ফোঁসানি কানে যেতে তা মালুম হ'ল।

বুঝলাম, দিনের বেলায় সাপগুলো এখানে-ওখানে ঢুঁড়ে খানার খোঁজ করে। রাত্রি গুজরান করে গাছের ডালে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাতটিও ভালভাবে দেখা যায় না। কোথায় কোথায় সাপ ঝুলছে দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার সহযাত্রীরাই বা কোথায়, কিভাবে আছে তা-ই বা কে জানে? এক সময় আমার ঠিক পাশের ডাল থেকে একটিমাত্র তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল। সে-ও মুহূর্তের জন্য। ব্যস, তারপরই সব নির্বাক-নিস্তব্ধ। চারদিক থেকে কেবল সাপের ফোঁস ফোঁসানি শোনা যেতে লাগল। আমার কোন এক সহযাত্রী সাপের পেটে যাবার আগে আর্তনাদের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম।

আমি জানের মায়া ত্যাগ করে কেবল মনে মনে আল্লাহ-র নাম জপ করে, বাকী রাত্রিটুকু গুজরান করলাম। কথা বলার মত সাহস বা শক্তি কোনটিই আমার ছিল না।

এবার আমি একা। একেবারেই একা।

ভোর হ'ল। গাছের ডালটি দু' হাতে শক্ত করে চেপে ধরে চারদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ভয়ে ভয়ে তাকালাম। না, সাপটি উদরপূর্তি করে ভোর হতেই চম্পট দিয়েছে।

আমি বুঝলাম, নিঃসন্দেহ হলাম, দিনের আলোয়, মৃত্যুভয় নেই। তবে সাপটি একবার যখন মানুষের মাংসের স্বাদ পেয়েছে তখন নির্ঘাৎ ফিন রাত্রির অন্ধকার নামতে নামতে তল্লাসী শুরু করবে। প্রয়োজনে সারারাত্রি ধরে পুরো দ্বীপটি চষে বেড়াবে। আর এবার তো আমারই পালা।

মৃত্যু অবধারিত জেনেও আমি বাঁচার ফিকির খুঁজতে লাগলাম। হাত-পা গুটিয়ে মোউতের হাতে নিজেকে সঁপে না দিয়ে বাঁচার কোশিস তো করতেই হবে।

আমি সমুদ্রের ধারে বসে আশমান-জমিন ভেবে চলেছি। হঠাৎ সামনে কিছু শুকনো কাঠ পড়ে থাকতে দেখে বেড়ে একটি মতলব মাথায় এসে গেল। কিন্তু মতলব তো বেরলো, তার বাস্তব প্রয়োগ কতখানি সার্থক হবে খোদাতাল্লাই জানেন। ভাবলাম, একবার মহড়া দিয়ে নেয়া যাক। বন থেকে মোটা সোটা লতা নিয়ে এলাম। এবার আমার পা দুটোর প্রত্যেকটিতে দুটো করে বড় বড় কাঠ শক্ত করে বেঁধে ফেল্লাম। তারপর শরীরের চারদিকে বাঁধলাম মোট চারটি কাঠ। তাতে মাথাটিও প্রায় ঢাকা পড়ে গেল। আমি যেন কাঠের খাঁচায় বন্দী হয়ে গেলাম। প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম—'আল্লাহ, সময় মত বেড়ে মতলব, জান রক্ষার চমৎকার ফিকির আমার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছ!' আল্লাতাল্লা যে সত্যি আছেন আমি নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

মহড়া সেরে আমার শরীর থেকে কাঠের টুকরোগুলো খুলে এক জায়গায় যত্ন করে রেখে দিলাম। লতাগুলি তার পাশেই রাখলাম। সময়মত যেন আর তল্লাসী চালাতে না হয়।

এবার বেরোলাম খানা জোগাড় করতে। পেটের নাড়িভুঁড়ি খিদেতে জ্বলছে। কিছু দিয়ে বুঝ না দিলে এ-জ্বালা কমার নয়।

সমুদ্র থেকে কিছু দূরে গিয়ে একটু তল্লাসী চালাতেই কিছু আধ-পাকা ফল পেয়ে গেলাম। শুকনো কাঠ ছুঁড়ে ছুঁড়ে কয়েকটি পাড়া গেল। সেগুলো গোগ্রাসে গিলে অবুঝ পেটকে বুঝ দিলাম।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করে নেমে আসতে শুরু করেছে।

কাঠগুলোর কাছে ফিরে এলাম। পূর্ব প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিজেকে কাঠের খাঁচার মধ্যে বন্দী করে নিলাম। রাত্রি একটু গভীর হতেই কলিজা-কাঁপানো ফোঁস ফোঁসানি শুরু হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার মোউত আমার তল্লাশী চালাচ্ছে। গত রাত্রে আজকের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমাকে রেখে গিয়েছিল। অতএব কোথাও না কোথাও আমাকে পাবেই। প্রয়োজনে তামাম দ্বীপটিই চষে বেড়াবে। না, বেশী ঢুঁড়তে হ'ল না। অল্পায়াসেই আমাকে পেয়ে গেল। ফোঁস ফোঁস শব্দটি ক্রমে এগিয়ে আসাতে আমি নিঃসন্দেহ হলাম। আর এ-ও বুঝলাম, এটি ময়াল সাপ।

এক সময় অতিকায় সাপটির উষ্ণ নিশ্বাস আমার গায়ে এসে লাগায় তার উপস্থিতি পুরোপুরি মালুম হ'ল। তার হিম-শীতল দেহের স্পর্শও মালুম হ'ল কয়েকবার। এক সময় সে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠল। কাঠের গায়ে বার বার কামড় মারছে তাও আমার পরিষ্কার মালুম হ'ল। কিন্তু ইয়া বড় বড় কাঠ সমেত আমাকে গিলে ফেলা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। মরিয়া হয়ে বহুৎ কোশিসই করল। কিন্তু তাকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতেই হ'ল।

ভোর হ'ল। আমার মোউত বিদায় নিয়েছে। বাঁধন খুলে কাঠের খাঁচা থেকে এবার নিজেকে মুক্ত করলাম।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' একতম রজনী

বাদশাহ্ শারিয়ার যথা সময়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক এবার বল্ল—কাঠের খাঁচার মধ্যে সারা রাত্রি আবদ্ধ থেকে এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আমার শরীরের স্নায়ুগুলো যেন কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল। মাথাও রীতিমত ঝিমঝিম করছিল। উপায়ান্তর না দেখে আমি ঘাসের ওপর শরীর এলিয়ে দিলাম। কখন যে চোখের

পাতা জুড়ে এসেছিল মালুমই হয় নি।

যখন আমার নিদ টুটল তখন সূর্য মাথার ওপরে অনেকটা উঠে এসেছে। আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসলাম। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে গেলাম।

উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে চোখের মণি দুটো চক্কর মারতে লাগল। এক সময় সচকিত হয়ে সোজাভাবে খাড়া হয়ে পড়লাম। সমুদ্রের একটি বিশেষ জায়গায় আমার চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেল। হ্যাঁ, মাস্তুলই তো বটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি জাহাজ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। খুশীতে বার কয়েক উন্মাদের মত লাফালাফি করলাম। হাত দু'টি সামনে নেড়ে চিৎকার ক'রে ডাকাডাকি করতে লাগলাম। মালুম হ'ল, কেউ আমাকে দেখতে পায় নি, ডাকও শুনতে পায় নি।

এবার যন্ত্রচালিতের মত মাথার পাগড়ীটি খুলে ফেল্‌লাম। উন্মাদের মত লাফিয়ে লাফিয়ে সেটি সমানে নাড়তে লাগলাম। হ্যাঁ, মালুম হ'ল এবার জাহাজের আদমিদের নজর কাড়তে পেরেছি বটে।

জাহাজের মুখ ঘুরল। ক্রমে সেটি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্যাপ্টেন জাহাজ ভিড়িয়ে আমাকে তুলে নিল। খোদাতাল্লাকে সুক্‌রিয়া জানাতেই হ'ল।

ক্যাপ্টেন আমাকে গোসল করে আসতে বল্‌ল। নয়া কোর্তা আর পাৎলুন পরতে দিল। খানাপিনা করিয়ে সুস্থ করে তুলল।

বিকেলে ক্যাপ্টেন আমাকে পাশে বসিয়ে আমার দুঃসাহসিক অভিযানের বৃত্তান্ত উৎসাহের সঙ্গে আদ্যোপান্ত শুনল। সব শেষে পিঠ চাপড়ে আমার সাহসিকতার জন্য বহুভাবে তারিফ করল।

ক' দিন মৌজ ক'রে খানাপিনা করে আর কিস্‌সা-কাহানী বলে খুশীতে দিন গুজরান করলাম।

এক সকালে আমার অপরিচিত সালাহিতা দ্বীপে জাহাজ ভিড়ল। জাহাজের সওদাগররা নিজ নিজ গাট্টি বোচকা নিয়ে কেনাবেচা সারতে চলে গেল।

আমি মুখ গোমড়া করে জাহাজের ডেকে বসে রয়েছি। জাহাজের ক্যাপ্টেনের কামরায় আমার তলব পড়ল। ছুটে গেলাম। সে আমাকে বল্‌ল—'নসীবের ফেরে তুমি সর্বস্ব খুইয়ে আজ ভিখ মাঙ্গার সামিল হয়ে গেছ। জাহাজের গুদামে বাগদাদের এক সওদাগরের কিছু সামানপত্র রয়েছে। পথে তাকে আমাদের খোয়াতে হয়েছে। চল, তার সামানপত্রের গাট্টিগুলো তোমাকে দিচ্ছি। সেগুলো বেচে যা মুনাফা হবে সবই তোমার। সম্ভব হলে এখান থেকে কিছু মালপত্র খরিদ করে নাও। ভিন্‌ মুলুকে বেচতে পারবে।

ক্যাপ্টেন আমাকে নিয়ে গুদামে গেল। গাট্টিগুলো দেখাল। আমার তো চক্ষু স্থির। সোল্লাসে ব'লে উঠলাম—'শোভন আল্লাহ! আল্লা মেহরবান!'

আমি গাট্টিগুলো দেখেই চিনতে পারলাম। এমন কি নিজে হাতে যেভাবে প্রতিটি গিঁট দিয়েছিলাম, হুবহু তেমনটিই রয়ে গেছে। আর প্রতিটি পেটরার গায়ে স্পষ্ট করে 'সিন্দবাদ নাবিক' নাম লেখাও রয়েছে।

আমি খুশীতে ডগমগ হয়ে সোল্লাসে বল্‌লাম—'আরে এসব তো আমারই। আগেরবার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে এগুলো খুইয়েছিলাম। এক দ্বীপে জাহাজ থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে ফেলে জাহাজ চলে এসেছিল। আমি দ্বীপে নির্বাসিত হই।

ক্যাপ্টেন আমার বাৎ শুনে দু' পা এগিয়ে আমার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। আচমকা আমাকে জড়িয়ে ধরে ব'লে উঠল—'হ্যাঁ, ঠিকই তো। তুমিই তো সে সওদাগর। দেখ দেখি কী অদ্ভুত কাণ্ড! খোদাতাল্লার মর্জি—যাও, তাড়াতাড়ি কেনাবেচা সেরে এসো।'

আমি গাট্টি বোচকা নিয়ে জাহাজ ছেড়ে নামলাম। সামান্য কোশিসেই আমার বিলকুল সমানপত্র খুবই চড়া দামে বেচতে পারলাম। আশাতীত মুনাফাও হ'ল।

মোহরের পোটলা নিয়ে নিজের মুলুকে ফিরে এলাম। আপনজনের সঙ্গে ফিন মিলিত হলাম। আমার আগমনবার্তা পেয়ে ইয়ার-দোস্তরা ছুটে এল। আমার এ-কামরা ফিন খানাপিনা আর নাচা-গানায় জমজমাট হয়ে উঠল।

কিস্‌সা শেষ করে বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক এক শ'টি সোনার

মোহর শেরওয়ানির জেব থেকে বের ক'রে সিন্দবাদ কুলীর হাতে দিতে দিতে বল্‌ল—'কাল সকালে ফিন এসো। কাল আমার চতুর্থ সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা শোনাব।'

সিন্দবাদ কুলি মোহরগুলো কোর্তার জেবে চালান দিয়ে দিল। এবার সিন্দবাদ নাবিককে সালাম জানাল। আগামী সকালে ফিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কামরা ছেড়ে পথে নামল।

সিন্দবাদ নাবিকের চতুর্থ সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা

সকাল হ'ল। সিন্দবাদ কুলী রুজু সেরে নিষ্ঠার সঙ্গে নামাজ পাঠ করল। তারপর গায়ে পাৎলুন-কোর্তা চাপিয়ে পথে নামল। সিন্দবাদ নাবিকের মাকানের সে-পরিচিত বিশালায়তন কামরাটির দরওয়াজায় পৌঁছে দেখে মেহমানরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক তাকে পাশে বসিয়ে তার চতুর্থ সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা শুরু করল—'আমি নিজের মুলুকে ফিরে এসে ফিন ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে খুশীর জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলাম। কিন্তু চার দেয়ালে ঘেরা কামরায় আমার দিল্‌ হাঁপিয়ে উঠল। দেশভ্রমণের পোকাগুলো আমার মগজে কিলবিলিয়ে উঠল। আর বিলাস-ব্যসন ফিন আমার কাছে বিষবৎ মনে হতে লাগল।

ব্যস, আমি সওদা করার কাজে মেতে গেলাম। ভিন দেশের আদমিদের কাছে কদর পেতে পারে এ রকম দামী দামী বিলাস সামগ্রী খরিদ করে কামরা বোঝাই করে ফেল্‌লাম। বাঁধা ছাঁদা সেরে শুভ মুহূর্তে বসরাহ বন্দরে হাজির হলাম। সেখান থেকে বড় বড় জাহাজ ছাড়ে। তামাম আরব দুনিয়ায় ঢুঁড়ে বেড়ায়।

বসরাহ বন্দরে আরও কয়েকজন সওদাগরের সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল। একই জাহাজে আমরা চাপলাম।

দিনের পর দিন জাহাজ নির্বিবাদেই সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছে। খুশীতেই আমরা দিন গুজরান করছি।

এমন সময় একদিন ক্যাপ্টেনের ব্যস্ততা লক্ষ্য করলাম। তিনি তামাম জাহাজ ঢুঁড়ে যাত্রীদের সতর্ক করে দিতে লাগলেন—কিছুক্ষণের মধ্যে তুফান উঠবে। আর এক কদমও যাওয়া যাবে না। মাঝ-সমুদ্রে নোঙর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

আমি ধরেই নিলাম, আমার—হ্যাঁ, আমার নসীবই জাহাজের বিপদ ডেকে আনছে। নইলে কোনবার নির্বিবাদে সফর চুকাতে পারলাম না। গত তিনবারের সমুদ্রযাত্রার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমার মধ্যে একে একে উদয় হতে লাগল। এবার নসীব আমাকে ঠেলে দিচ্ছে তুফানের মুখে।

তুফানের কথা কানে যেতেই আমার কলিজাটি যেন ফুটা বেলুনের মত মুহূর্তে চিপসে গেল। মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল—'হায় খোদা! এ আবার কোন্‌ ফেরে ফেলতে চলেছ! তুফান! সামুদ্রিক তুফান! যদি তুফানের মোকাবেলা করতে গিয়ে জাহাজ চুরমার হয়ে যায়—উফ্‌! আর ভাবতে পারছি না! মাথা ঝিমঝিম করছে। সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসতে চাইছে।

ক্যাপ্টেনের সতর্কবাণী শেষ হতে না হতেই বিকট আর্তনাদ করতে করতে কোন্‌ অদৃশ্য দৈত্য যেন তীব্র আক্রোশে আমার জাহাজটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। শুরু হ'ল প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস। ব্যস, বিলকুল খতম। ইয়া পেল্লাই জাহাজটি ভেঙে চূরে সমুদ্রের বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চোখের পলকে সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল।

জাহাজের ক্যাপ্টেন, তার কর্মচারীরা আর এতগুলো যাত্রী কোথায় যে তলিয়ে গেল মালুমই হ'ল না।

ইতিপূর্বে দেখেছি খোদাতাল্লা আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিলেও জান রক্ষার ফিকির একটি না একটি করেই দেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। জাহাজভাঙা একটি বড়সড় কাঠের পাটাতন হাতের নাগালের মধ্যেই পেয়ে গেলাম। কোনরকমে তার ওপর উঠে বসলাম।

কাঠের পাটাতনটি আমাকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে এক সমুদ্রের পাড়ে এসে ঠেকল।

পাটাতনটি থেকে নেমে আমি বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। দীর্ঘ সময় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় স্নায়ুর ওপর অস্বাভাবিক চাপ গেল। তাছাড়া শরীরের ওপর দিয়েও কম ধকল যায় নি। সারারাত্রি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃতের মত পড়ে রইলাম।

কিভাবে যে আমি সারাটি রাত্রি গুজরান করেছি বলতে পারব না। সকালে সূর্যের কিরণ চোখে পড়তে নিদ টুটে গেল। চোখ মেলে দেখি আমার অদূরে আমার আরও কয়েকজন সহযাত্রী বালির ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বুঝলাম, তাদের ওপরও আল্লাহ-র দোয়া বর্ষিত হয়েছে।

আমি বালির বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। সহযাত্রীদের ডেকেডুকে তুললাম। এবার দলবেঁধে মহল্লার দিকে হাঁটা জুড়লাম। কয়েক কদম এগিয়েই সাদা রঙের একটি মকান দেখলাম। বাড়িটির দিকে আরও সামান্য এগোতেই একদল গাট্টাগোট্টা ও কুচকুচে কালো আদমি আমাদের ঘেরাও ক'রে ফেল্‌ল। একেবারে উলঙ্গ। শরম ঢাকতে সামান্য পাতাটাতাও ব্যবহার করে নি।

আমরা তাদের হাতে বন্দী হয়ে বিস্ময়মাখানো নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইলাম। কালো আদমিগুলো আমাদের ইশারা করল মকানটির ভেতরে যাওয়ার জন্য। মুখে টু-শব্দটিও করল না।

বিশালায়তন এক কামরায় আমরা হাজির হলাম। কামরার কেন্দ্রস্থলে কাঠের মসনদে একজন চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ

এঁকে দরওয়াজার দিকে মুখ ক'রে বসে। বুঝতে অসুবিধা হ'ল না এ-আদমিটি অসভ্য জঙ্গলি আদমিগুলোর সম্রাট।

আমরা কামরার ভেতরে ঢুকতেই সম্রাট ইশারায় আমাদের বসতে নির্দেশ করলেন। একটু বাদেই বড় বড় থালাভর্তি বিশেষ কিসিমের খানা এল। বড় বড় গোস্তের তৈরি খানা। তাদের হালৎ দেখেই আমার ভক্তি চটকে গেল। ঠেলে বমি আসতে চাইল। আমার সহযাত্রীদের পেটেও চুল্লির আগুন জ্বলছে। অখাদ্য খাদ্যের সাহায্যেই হালুম হালুম করে তারা উদর পূর্তিতে মেতে গেল। দীর্ঘ সময় অনাহারে তো আমিও কাটিয়েছি। তবু এক টুকরো গোস্তও জিভে ঠেকাতে পারলাম না। এক-আধ বার কোশিস যে করি নি তা-ও নয়। ভেতর থেকে নাড়িভুড়ি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

আমার সহযাত্রীরা ভুড়ি বোঝাই ক'রে যখন ঘন ঘন তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে তখন উপবাসী আমি টুল টুল ক'রে তাকিয়ে তাদের তৃপ্তির পরিমাপ করতে লাগলাম।

আদতে খানাপিনার ব্যাপারে আমার বাছ বিচার বচপন থেকেই চলে আসছে। কিন্তু পরে বুঝলাম, আল্লাতাল্লা আমার জান রক্ষা করতেই আমার মধ্যে এরকম স্বভাব পয়দা ক'রে দিয়েছিলেন।

আমরা যে-অসভ্য জঙ্গলী আদমিগুলোর হাতে কয়েদ বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম তারা আদতে নরখাদক। আর যে-গোস্ত পাকিয়ে আমাদের খানাপিনা করতে দিয়েছিল তা-ও আমাদের মতই কোন-না কোন নসীববিড়ম্বিত আদমিরই গোস্ত। শোভন আল্লাহ! আবার কোন্ দোজখের দক্ষিণ দুয়ারে হাজির হলাম! আরও কয়েক দিন বাদে ব্যাপারটি আরও খোলসা হয়ে গেল। তারা আদমীদের বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে কোতল করে না। কিছুদিন নিজেদের জিম্মায় রেখে খাইয়ে দাইয়ে গায়ে গতরে গোস্ত বাড়িয়ে নেয়। বেশ নাদুস নুদুস করে নিয়ে তবেই কষাইখানায় নিয়ে যায়।

যে আদমিটি সবচেয়ে নাদুসনুদুস হয়ে ওঠে সে সম্রাটের ভোগে লাগে। আর একটু কমা মালগুলো তার চ্যালাচামুণ্ডাদের বরাতে জোটে। সম্রাটের খানাপিনা হয় রুচিমাফিক। কাঁচা গোস্ত কিছুতেই ছোঁবে না। ছাল চামড়া ছাড়িয়ে ভালভাবে আগুনে ঝলসে তবেই মুখে তুলবে।

সম্রাটের খানা পাকাবার সময় বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। আগুনে কাঠ জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেলেও তা ধিক্ ধিক্ ক'রে জ্বলতে থাকে। তখন জ্যান্ত একটি আদমির গায়ে তেল-মশল্লার গোলা মাখিয়ে দেয়া হয়। মরিচ, লবণ ও অন্যান্য মশলার ঝাঁঝে আদমিটি যখন কোরবানির মুহূর্তের খাসির মত নিদেন ডাক ছেড়ে ছটফট করতে করতে এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন তাকে ওই চুল্লীর জ্বলন্ত অঙ্গারে ছুঁড়ে দেয়া হয়। উল্টে পাল্টে পোড়ানো হয় তার পুরো শরীরটিকে। তেল-মশল্লা ছাল চামড়া ভেদ করে গোস্তের কোষে কোষে ঢুকে যায়। এবার টুকরো টুকরো করে সম্রাটের ভোগ দেয়া হয়।

সম্রাটের খানাপিনার ফিরিস্তি শোনার পর থেকে আমার খিদে-তেষ্টা শিকেয় উঠে গেছে। কেবল ঢকঢক ক'রে পানি দিয়ে উদর পূর্তি করতে লাগলাম। তখন আমার একমাত্র ধান্দা কি করে বেশী রোগা, একেবারে হাড্ডিসার হয়ে যাওয়া যায়। তবে সম্রাট তো দূরের কথা তার চ্যালাচামুণ্ডা অসভ্য জঙ্গলীগুলো পর্যন্ত চরম বিতৃষ্ণায় আমাকে অবশ্যই বাতিল ক'রে দেবে।

আমার সহযাত্রীরা রীতিমত তোয়াজের মধ্য দিয়ে গায়ে গতরে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। কড়া নজর। একজনও যদি কোনক্রমে ভেগে যায় তবে সম্রাট কোতল ক'রে ছাড়বে। এক জঙ্গলী আমাদের জিম্মাদার। সে রোজ আমাদের জঙ্গলে নিয়ে যায়। ফলমূল জোগাড় ক'রে এনে খেতে দেয়। আমি ভুলেও কিছু দাঁতে কাটি না। লোভ সম্বরণ ক'রে, খিদের জ্বালা অগ্রাহ্য করে আমাকে যে যেন তেন প্রকারেণ একেবারে লিকলিকে প্যাকাঠির মত হয়ে যেতে হবে।

এক সময় আমার চেহারার হালৎ দেখে নিজেরই মায়া হ'ল। গোস্তটোস্ত যে কোথায় উধাও হয়ে গেছে খোদাতাল্লাই জানেন। একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছি। পর মুহূর্তেই আমার শুকনো তোবড়ানো গালে মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে ওঠে। এতে জান তো রক্ষা পাবেই।

আমার মতলবটি সার্থক হয়েছে মালুম হ'ল। যখন দেখলাম আমাদের জিম্মাদার উলঙ্গ নরখাদকটি আমার প্রতি নিতান্ত ঔদাসিন্য প্রদর্শন করছে। তার একমাত্র নজর আমার সহযাত্রী দোস্তদের দিকে। হবে না, তারা যা পায় তাই উদরে পুরে এক একটি খোদার খাসি বনে গেছে।

আমি আমাদের জিম্মাদারের ঔদাসিন্যের সুযোগ নিতে গিয়ে একদিন জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার সময় পথের মাঝে দুম্ ক'রে পড়ে গেলাম। বিমারি হয়েছে বুঝাবার কোশিস করলাম।

কারো বিমারি হলে তার গোস্ত তারা ছোঁয়ও না। শেয়াল আর গিদ্দরের জন্য ফেলে দেয়।

আমি একে রোগা পটকা তার ওপর বিমারি ধরেছে। ছোঃ ছোঃ! এর গোস্ত আবার খাওয়া চলে নাকি!

আমার মতলবটি পুরোপুরি সার্থক হ'ল। আমাকে পথের ধারে ফেলে রেখে জিম্মাদারটি আমার সহযাত্রী দোস্তদের নিয়ে এগিয়ে গেল।

এমন অপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া করব এতবড় আহাম্মক অন্তত আমি নই। আমার জিম্মাদার সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলে আমি ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম। বিপরীত দিকের পথ ধরে কোনরকমে এগিয়ে চল্‌লাম।

সারাদিন ধরে দুর্বল শরীরে হাঁটাহাঁটি করলাম। রাত্রেও হাঁটার বিরাম নেই। জঙ্গলের ফলমূল আর ঝর্ণার পানি খেয়ে পুরো আটদিন হেঁটে এক নয়া মুলুকে হাজির হলাম।

সে-মুলুকের আদমিরা আমাদের মাফিক কোর্তা-কামিজ পরে। সভ্যভব্য। পথের ধারে জমিতে কাজ করছে এরকম একদল আদমির দেখা পেলাম। আমাকে ভিন্ দেশীয় আন্দাজ করে কৌতূহলী দিল্ নিয়ে এগিয়ে এল। আমার ভাষাতেই তারা কথা বলছে দেখে কলিজায় জল এল।

আমি তাদের কাছে আমার নসীবের বিড়ম্বনার ঘটনা আদ্যোপান্ত বল্‌লাম। একটি বর্ণও ছাপলাম না।

আমার চেহারার হালৎ দেখে তারা বহুভাবে দুঃখ প্রকাশ করল। এ যে আমার ইচ্ছাকৃত ব্যাপার, বহুৎ কোশিস, বহুৎ কষ্ট স্বীকার করে তবে এরকম হালৎ করতে হয়েছে। নইলে আমার গোস্তে নরখাদকদের উদর পূর্তি হ'ত তা-ও বলতে বাদ দিলাম না।

তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমি জাহাজে চেপে সমুদ্রের পারে একটি দ্বীপে হাজির হতে পেরেছিলাম। দ্বীপ-শহর। এখানেই তাদের সুলতানের প্রাসাদ। তারা আমাকে দরবারে সুলতানের সামনে হাজির করল।

আমি নতজানু হয়ে সুলতানকে কুর্ণিশ করলাম।

সুলতান আমাকে বসতে বল্‌লেন।

আমি কথায় কথায় সুলতানকে বল্‌লাম—'আপনার মুলুকে একটি ব্যাপার আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এখানকার সবাই দেখছি জিন-লাগাম ছাড়াই ঘোড়ায় চড়ছে। জীন-লাগাম কি কেবল আরামের জন্যই ব্যবহৃত হয়, নাকি দেখতেও খুবসুরৎ, জাঁহাপনা?'

সুলতান চোখ দুটো কপালে তুলে ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে বল্‌লেন—'কি বল্‌লে! জীন-লাগাম? সে আবার কি জিনিস হে? এসব নাম তো কস্মিন কালেও শুনিনি!'

—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি করে হুকুম করলে দেখাতে পারি জীন-লাগাম সুখদায়ক তো বটেই। আবার অবশ্যই শখও পূরণ করে।'

—'বহুৎ আচ্ছা। তুমি যদি আমার মধ্যে খুশীর সঞ্চার করতে সক্ষম হও তবে আমি তোমাকেও খুশী করতে কসুর করব না।'

আমার অনুরোধে সুলতান একজন দক্ষ ছুতোর মিস্ত্রী দিলেন। সে আমার ফরমাশ অনুযায়ী চমৎকার একটি কাঠের জীন বানিয়ে দিল। এবার এক ধুনুরী তার ওপর তুলো বিছিয়ে বেশ পুরু ক'রে একটি গদী বানাল। কাঠের জীনের গায়ে সোনার জরির নকসাযুক্ত কাপড় গদীর ওপর সেঁটে দিলাম। এবার কামারকে দিয়ে এক জোড়া রেকাবি বানিয়ে নিলাম। লাগাম বানালাম নিজের হাতেই।

পছন্দ মাফিক প্রয়োজনীয় সবকিছু তৈরি হয়ে গেলে সুলতানের ঘোড়াশাল থেকে বাছাই করে সবচেয়ে মোটাসোটা একটি ঘোড়া বের ক'রে আনলাম। ঘোড়াটির গায়ে এবার যথাস্থানে জীন, রেকাবি ও লাগাম প্রভৃতি পরিয়ে দিলাম।

ঘোড়াটিকে পছন্দ মাফিক সাজিয়ে সুলতানের সামনে হাজির করলাম। ঘোড়ার এরকম সাজ দেখে সুলতান তো একেবারে থ বনে গেলেন।

ব্যস, আর দেরী নয়। সুলতান তড়াক্ করে লাফিয়ে ঘোড়াটির পিঠে চেপে বসলেন। এক চক্কর মেরে ফিন আমার কাছে এলেন।

আমার কাজের তারিফ করতে গিয়ে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা বন্দোবস্ত! যেমন দেখনাই তেমনি আরামদায়ক তোমার জীন-লাগাম!' সুলতান আমাকে ইনাম স্বরূপ বহুৎ সোনার মোহর দিলেন।

বৃদ্ধ উজির তা দেখে লোভ সামলাতে না পেরে তার নিজের ঘোড়ার জন্যও আমাকে দিয়ে জীন-লাগাম বানিয়ে নিলেন। তবে
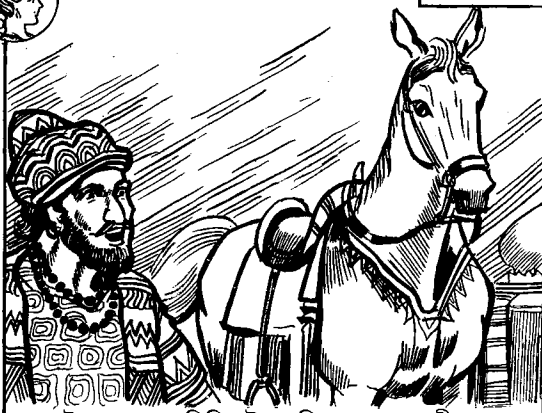
অবশ্যই মাগনা নয়। তিনিও ইনাম দিয়ে আমাকে খুশী করলেন।

কিছুদিনের মধ্যে আমি সুলতানের সবচেয়ে পেয়ারের পাত্র বনে গেলাম।

একদিন সুলতান আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে সস্নেহে বল্লেন—' সিন্দবাদ, আমি তোমাকে কেমন পেয়ার করি, আশা করি তোমার জরুর মালুম আছে। তোমাকে ছাড়া আমার জান রাখাই দায়। তাই তোমাকে আমি আরও কাছে টেনে নিতে চাচ্ছি। আমার প্রাসাদের একটি লেড়কিকে তোমার সঙ্গে শাদী দিয়ে স্থায়ীভাবে তোমাকে আমার কাছে রেখে দেব স্থির করেছি।'

—'শাদী? জাঁহাপনা আমি পথের ভিখমাঙ্গা ছিলাম। আপনার মেহেরবানি লাভ করে আজ দরবারে ঠাই পেয়েছি। আজ আর আমার নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই জাঁহাপনা। আপনার মর্জি মাফিকই কাজ হবে।'

ব্যস, আর দেরী নয়। সুলতানের প্রাসাদে শাদীর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

শাহবংশীয়া এক খুবসুরৎ লেড়কীর সঙ্গে আমার শাদী হয়ে গেল। সে সর্ব বিদ্যায় পারদর্শিনীও বটে।

শাদী ক'রে আমার নসীব ফিরে গেল। আমার বিবি যে কেবলমাত্র খুবসুরৎ এবং বিদূষী তা-ই নয়। সে তার মৃত পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী। সুবিশাল প্রাসাদ, জমি জিরাত, বহুমূল্য হীরা-জহরৎ আর অগাধ নগদ অর্থের মালিক সে নিজে।

আবার সুলতানের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ যা কিছু মিলেছে তা-ও কমতি নয়।

শাদী সত্যি আমার নসীব ফিরিয়ে দিল। জীবনের মূল্য নতুন ক'রে জানতে, বুঝতে শিখলাম। এমন অন্তহীন খুশীর স্বাদ তো আগে কোনদিন বরাতে জোটে নি। আদর পেয়ার মহব্বত কি জিনিস তা-ই এই প্রথম বুঝলাম। সে সঙ্গে বুঝলাম যৌবনের কদর। যৌবনকে ভোগ করার পাকাপাকি বন্দোবস্ত, কম কথা।

আমি বিবিকে নিয়ে সুলতানের সান্নিধ্যে বেশ কয়েকটি সাল গুজরান করে দিলাম। সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার কাছাকাছি পাশাপাশি থাকব, খুবই সত্য বটে। তবু গোপন ইচ্ছা পোষণ করে চলেছি, একদিন বিবিকে নিয়ে আমার নিজের মুলুক বাগদাদে পাড়ি জমাব।

সবই খোদাতাল্লার মর্জি। তাঁর মর্জি-মাফিকই সব কাজ সম্পন্ন হয়। আমরা যতই প্রয়াসী হই, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করি না কেন তাঁর মর্জির বাইরে এক কদমও যাবার উপায় নেই।

এক সকালে আমার এক দোস্তের বিবি মারা গেল। দোস্তটি কেঁদে বুক ভাসাতে লাগল। বহুভাবে তাকে সান্ত্বনা দেবার কোশিস করলাম। কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হ'ল।

আমি দোস্তটির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্লাম—'ঝুটমুট কেন কেঁদে নিজের জান খতম করছ? বিবি মারা গেছে এতে তো আর কারো হাত নেই। ফিন খুবসুরৎ এক লেড়কিকে শাদী ক'রে ঘর-সংসার পাতবে। চোখের পানি—!

আমাকে থামিয়ে দিয়ে দোস্তটি ডুকরে কেঁদে বলতে লাগল—'শাদী? খোয়াব দেখছ নাকি? এক ঘণ্টা বাদে যাকে সহমরণে জান দিতে হচ্ছে তাকে তুমি দেবে শাদি। তাজ্জব বাৎ শোনাচ্ছ দোস্ত!'

তার বাৎ কিছুই আমার দিমাকে এল না। সবিস্ময়ে বল্লাম—'দোস্ত এসব কী বলছ! কিসের সহমরণ! কেন তোমাকে এক ঘণ্টা বাদে সহমরণে জান দিতে হবে—কী সব যা তা বলছ?'

—'সে কী দোস্ত! আমাদের মুলুকের প্রচলিত প্রথা তোমার জানা নেই? এখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আগে মরবে অন্য জনকে সহমরণে জান দিতে হয়। এমন কি সুলতানকেও এ-প্রথা মেনে চলতে হয়। মোদ্দা কথা, কেউ-ই এর হাত থেকে রেহাই পায় না।'

দোস্তটির বাৎ শুনে আমার কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। কী সর্বনাশ বাৎ শোনাচ্ছে! এমন ভয়ঙ্কর প্রথার কথা ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম কে শাদী করতে যেত! ইয়া আল্লাহ! আমার বিবি কোনক্রমে মারা গেলে আমাকেও যে তবে ধরে বেঁধে—উফ্ আর ভাবতে পারছি না। শরীর শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

আমি বার কয়েক ঢোকগিলে জিজ্ঞাসা করলাম—'দোস্ত, আমি তো এখানে পরদেশী। তবে কি আমার বেলাতেও এ-প্রথা খাটবে, নাকি—'

সে আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গেই বল্ল—'জরুর। আলবৎ খাটবে। পরদেশী হলেও এখন তো এদেশেরই বাসিন্দা। স্থানীয় এবং পরদেশী সবার ক্ষেত্রেই এ-প্রথা সমানভাবে প্রযোজ্য, কারো মাফ নেই।'

ব্যাপারটি এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বিবির মৃত্যু-শোকের চেয়ে নিজের মৃত্যুভয়-ই তার এরকম বিলাপ পেড়ে

কাঁদার কারণ। আতঙ্কেই সে পৌনে মরা হয়ে গেছে, বিবির জন্য শোক করার অবকাশ কোথায়?'

প্রতিবেশীরা এসে মৃতার বাড়িতে জড়ো হ'ল। মৃতদেহ বাঁধাছাঁদা হ'ল। মৃতদেহ নিয়ে শোক-মিছিল এগিয়ে চল্‌ল। তার পিছন পিছন আমার দোস্তটি বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে চলল। তার পাশে আমি চোখের পানি মুছতে মুছতে পথ পাড়ি দিচ্ছি।

মহল্লা ছাড়িয়ে পাহাড়ের ধারে একটি বিশাল কুয়ো। তার মধ্যে মৃতদেহটিকে নামিয়ে দেয়া হ'ল। তারপর আমার দোস্তটি, যাকে সহমরণে জান দিতে হবে তার পিঠে এক কলসী পানি, সাতটি রুটি বেঁধে দেয়া হ'ল। এবার তার একটি হাত শক্ত দড়ি বেঁধে তরতর করে কুয়োটির মধ্যে নামানো হ'ল। তার পা মাটিতে গিয়ে ঠেকলে, দড়ির টান বন্ধ হলে ওপর থেকে চিল্লিয়ে বলা হ'ল—'দড়ির বাঁধন খুলে দাও।' দড়ির বাঁধন আলগা হতেই সেটি টেনে তুলে নিল। রুটি সাতটি খেয়ে হতভাগাটি যে কয়দিন জিন্দা থাকে থাকবে। তারপর না খেয়ে, ডরে শিটকে লেগে এক সময় তার জান খতম হয়ে যাবে।

আমি প্রাসাদে ফিরে সোজা সুলতানের সঙ্গে ভেট করলাম। সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আচ্ছা, আমার আগে যদি আমার বিবি মারা যায় তবে কি আমাকে সহমরণে জান দিতে হবে?'

—'জরুর। জরুর জান দিতে হবে। হঠাৎ তোমার মুখে একথা ব্যাপার কি?'

—'না, ব্যাপার কিছুই নয়। সেরকম কিছু ঘটে নি। কিন্তু ঘটাও তো একেবারে অসম্ভব নয়। মরণ-বাঁচনের কথা কে বলতে পারে? একটি বাৎ—'

আমার মুখের বাৎ কেড়ে নিয়ে সুলতান ম্লান হেসে বলে উঠলেন—'কি বলতে চাইছ, খোলসা ক'রে বলেই ফেল।'

—'আমি তো ভিন্ দেশীয়। আমার মুলুকে বিবি আর বালবাচ্চা সবই তো রয়েছে। তবে আমাকে আপনার সুলতানিয়তের প্রথা কেন মানতে হবে? আমার ক্ষেত্রে তো—'

—'তোমার ক্ষেত্রে একই আইন কানুন প্রযোজ্য। তুমি তো কেবল এ মুলুকের বাসিন্দাই নও। এখানকার লেড়কীকে শাদী করেছ আর এখানকার প্রথা মানবে না। জরুর মানতে হবে।'

সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি উর্ধ্বশ্বাসে আমার প্রাসাদের দিকে ছুটতে লাগলাম। আমার বুক ভরা আতঙ্ক। যদি গিয়ে দেখি আমার বিবি এরই মধ্যে মারা গেছে তবে তো আমার শিরে বাজ পড়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে। সুলতান, উজির, আমীর, ওমরাহ আর সুলতানিয়তের বহু খানদানি পরিবারের আদমি শবযাত্রায় সামিল হবে। এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার পক্ষে চুপিচুপি সটকে পড়া বাস্তবিকই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। হাতে দড়ি বেঁধে কুয়োর মধ্যে—উফ্, তার আগেই শিটকে লেগে যাবে। আর ভাবতে পারছি না। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

প্রাসাদে ফিরে রোয়াকে বিবিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কলিজায় পানি এল। দিব্যি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু নসীবের ফের এড়ানো যাবে কি ক'রে। খোদাতাল্লা যাকে মারে, রুখবে কে?

দু' দিন বাদেই আমার বিবির বিমারি হ'ল। কঠিন বিমারি, বিছানা নিল। বিমারি তো হতেই পারে। দেহ থাকলে বিমারি একেবারেই হবে না, তা-ও কি হয়? নিজেকে বহুভাবে প্রবোধ দিতে লাগলাম। কে, কাকে প্রবোধ দেয়? কলিজা যে এদিকে শুকিয়ে একেবারে খটখটে। বার বার একই আতঙ্ক নীরবে তার মধ্যে ক্রিয়া করে চলেছে।

যা ভেবেছিলাম বিলকুল তা-ই ঘটতে চলেছে। দীর্ঘদিন বিমারিতে ভোগার পর আমার পেয়ারি আমার মেহবুবা আর বিছানা ছেড়ে উঠল না। আমাকে চরমতম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সত্যি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। আমি তো পৌনে মরা হয়ে গেলাম। বিবির জন্য শোক করব নাকি নিজের জন্য গলা ছেড়ে কাঁদব, সহসা ভেবে উঠতে পারলাম না।

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছোটে। সুলতান দুঃসংবাদটি পেয়ে লম্বা লম্বা পায়ে আমাদের প্রাসাদে এলেন। আমাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'বেটা, খোদাতাল্লার মর্জি আমরা যে এড়াতে পারি না। নসীবে যা লেখা আছে ঠিক সময় মাফিক ঘটে যাবে। আমাদের শাস্ত্রের বিধান। বিবির সঙ্গে বেহস্তে যাবার জন্য নিজেকে তৈরি কর।'

সুলতানের বাৎগুলো আমার কাছে বিষবৎ মনে হতে লাগল। আপন মনে বলতে লাগলাম—'কী ভয়ঙ্কর বিধান! নইলে নিজের মুলুকে বিবি ও বালবাচ্চা থাকতে পরদেশে এসে নিঃশব্দে জান দিতে হচ্ছে'। এমন ভয়ঙ্কর প্রথা এদেশে চালু জানলে কে শাদী করতে যেত? নিজের মুলুকে বিবি-বালবাচ্চার কাছে ফিরে যেতাম। সুলতানের সোহাগের প্রলেপ দেয়া বাৎগুলি এখন এক এক ক'রে মনে হতে লাগল—'তোমাকে আমি কেন পেয়ার করি তা অবশ্যই তোমার মালুম আছে। শাদী করে সুখে ঘর-সংসার কর।' এরকম আরও কত কি-ই না তখন বলে আমার দিল্‌টিকে উতালা করে দিয়েছিলেন। আর এখন সেই সুলতানই ফিন আমাকে মরার জন্য নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন! জ্যান্ত গোর দেয়ার ফিকির ক'রে নিলেন।

কয়েক জন আমার বিবির শব দেহটি বাঁধাছাঁদা মেরে কাঁধে তুলে নিল। আমি আতঙ্কে শিটকে লেগে যাবার জোগাড় হলাম।

সুলতান, উজির, আমীর, ওমরাহ ও সুলতানিয়তের গণ্যমান্য আদমিরা শবযাত্রার সামিল হয়েছেন। আমি তাদের পিছন পিছন ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে পথ পাড়ি দিতে লাগলাম।

পর্বতের পাদদেশের সে-কুয়োটির ধারে এসে শব-মিছিল থামল। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠান সেরে আমার বিবির মৃতদেহটিকে কুয়োর ভেতরে নামিয়ে দেয়া হ'ল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে কোরবানির খাসীর মত কাঁপতে কাঁপতে সবকিছু দেখছি।

সবাই এবার আমার দিকে নজর দিল। প্রথা অনুযায়ী এক কলসী পানি ও সাতটি রুটি আমার পিঠে বেঁধে জোর জুলুম করে ইয়া লম্বা দড়ির সাহায্যে আমাকে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দেয়া হ'ল। কুয়োটির তলদেশের মাটিতে এক সময় আমার পা ঠেকল। ওপর থেকে চিৎকার ভেসে এল—'দড়ির বাঁধন খুলে দাও। ফাঁস খুলে দড়িটি ছেড়ে দাও।'

আমি নির্বিকার। মনস্থ করলাম, দড়ির বাঁধন খুলব না। খুললামও না। মুখে কুলুপ এঁটে ঘাপটি মেরে রইলাম। ওপর থেকে জোর চিল্লাচিল্লি ভেসে আসতে লাগল—'দড়ির ফাঁস খুলে দাও। করছ কি? এত দেরী করছ কেন?'

তবু আমি নির্বিকার। বাঁধন খুল্‌লাম না। হ্যাঁ বা না কিছু বল্‌লামও না।

ওপরের কণ্ঠস্বরকে অধিকতর অধৈর্য মালুম হ'ল—'আরে করছ কি হে! বাঁধন খুলে দড়িটি ছেড়ে দাও! কেন ঝুটমুট দেরী করছ? দড়ি না নিয়ে আমরা ফিরতে পারছি না। ঝটপট বাঁধন খুলে দড়ি ছেড়ে দাও।'

কে কার বাঁধন খোলে আর কে-ই বা দড়ি ছাড়ে। আমি অন্ধকার গহ্বরে ঘাপ্‌টি মেরে নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েই রইলাম।

ওপরের আদমিগুলো অধৈর্য হয়ে উঠল। বার কয়েক বাঁধন খোলার জন্য চেঁচামেচি করে এক সময় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে দড়ির আশা ছেড়ে কুয়োর মুখে পাথর চাপা দিয়ে সবাই বিদায় নিল।

অন্ধকার পাতালপুরীতে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। কেঁদে কেঁদে কাহিল হয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ঘুমিয়ে রইলাম। সারাদিন সারারাত্রি ঘুমে বিভোর হয়ে রইলাম। পরদিন সকালে চোখ মেলে তাকালাম। কুয়োর মুখের পাথরটির ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসা আলো দেখে বুঝলাম সকাল হয়েছে।

খুব ক্ষিদে পেয়েছে। নাড়িভুঁড়িতে জ্বালা ধরে গেছে। দুটো রুটি আর পানি দিয়ে পেটের জ্বালা নেভালাম।

ওপর থেকে ছিটকে আসা সামান্য আলোতে যেটুকু দেখা গেল তাতে বুঝলাম, আমার চারদিকে নরকঙ্কাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আর মাংস-পচা উৎকট গন্ধ তো রয়েছেই। হবেই তো। কতগুলো মৃতদেহের গায়ে তখনও পচা মাংস জড়িয়ে। ঠেলে বমি আসতে চায়, জোর করে চেপে রাখি। অন্য ফিকির তো যে নেই। আমার তখন ভাবনা, মূলধন তো মাত্র সাতটি রুটি। তাও আবার ইতিমধ্যে দু'টি খরচা হয়ে গেছে। তারপর? আতঙ্কে বার বার শিউরে উঠতে থাকলাম। রুটি ক'টি ফুরালে পাতালপুরীতে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই, এই তো আমার নসীব—আমার বরাত।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন'শ চারতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার কামরায় এলে বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশটুকু শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক তার কিস্‌সা বলে চলেছে। ভিন্ মুলুকে না হয় বরাতগুণে এসে পড়েছি। কিন্তু শাদীর ঝামেলায় কেন ঝুটমুট জড়াতে গেলাম! নিজের মুলুকে বিবি-বালবাচ্চা সবাই আছে। কোনরকমে ঘরে ফিরে যেতে পারলেই তাদের নিয়ে ঘর-সংসার করাই তো ঢের, ঢের সুখের ছিল। আমার দুর্মতিই অপমৃত্যুর পথ সাফসুতরা করে দিয়েছে। এখন মালুম হচ্ছে হীরক পাহাড়ে সাপের পেটে গেলে বা নরখাদকরা যদি তেল-মশল্লা মাখিয়ে আগুনে ঝলসে খেত এর চেয়ে বেশী কি হ'ত! সে-মৃত্যুর চেয়ে এভাবে তিলে তিলে মরা ঢের কষ্টদায়ক। আরও ভাল হ'ত ঝড়ের দাপটে জাহাজটি টুকরো টুকরো হওয়ার সময় দরিয়ার পানিতে তলিয়ে গেলে। অন্তত তাতে দীর্ঘ সময় ধরে আতঙ্কে পৌনে মরা হয়ে এমন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত না।

আমি উন্মাদের মত আর্তনাদ করতে লাগলাম, 'দু'হাতে নিজের চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলাম আর বার বার কুয়োর দেওয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করলাম।

রুটি প্রায় শেষ। পানিও কলসির তলায় গিয়ে ঠেকেছে। হবেই তো। পাতাল পুরীতে সাতটি দিন যে গুজরান করেছি। ক্ষিদে, রাক্ষুসে ক্ষিদে আমাকে পেয়ে বসল। নাড়িভুঁড়িতে যেন আগুন জ্বলেই চলেছে। তবু শেষ রুটির টুকরোটি মুখে দিতে পারলাম না। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সেটিকে মুখের কাছে নিয়ে বার বার ফিরিয়ে এনেছি।

আমার মোউত, মৃত্যু আমার ঠিক মাথার ওপরে। শুধুমাত্র সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আতঙ্কে চোখ দুটো বারবার বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ-র নাম স্মরণ করাই একমাত্র শান্তি—একমাত্র স্বস্তি। বিড় বিড় করে তাঁর স্মরণ করতে লাগলাম।

খোদা মেহেরবান। আচমকা এক ঝলক আলো কুয়োটির অন্ধকার অনেকাংশে দূর করে দিয়ে আমার চারদিকের সব কিছু স্পষ্ট দৃশ্য ক'রে তুলল। যন্ত্রচালিতের মত ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম কুয়োর মুখের পাথরটি সরে গেছে।

এক বৃদ্ধের শবদেহ ক্রমে আমার দিকে নেমে যেতে লাগল। তারপরই তার বিবি করুণ আর্তনাদ করতে করতে দড়ি বেয়ে নিচে নামল। তার পিঠেও এক কলসি পানি আর সাতখানা রুটি বাঁধা।

আমি হাত বাড়িয়ে কঙ্কালের একটি পা তুলে নিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে বুড়িটির মাথায় আঘাত করলাম। মুহূর্তে সব খতম।

কেবলমাত্র এক কলসি পানি আর সাতটি রুটির জন্য পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড করতে কিছুমাত্রও দ্বিধা করলাম না। যে করেই 'হোক আমাকে জিন্দা থাকতেই হবে। এভাবে যে ক'দিন জানটিকে টিকিয়ে রাখা যায় তখন আমার একমাত্র ধান্দা। উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায় আর ধর্ম-অধর্মবোধ আমার মধ্য থেকে লোপ পেয়ে গেছে। সদ্যলব্ধ এক কলসি পানি আর সাতটি রুটি মূলধন ক'রে আমি ফিন পাতালপুরীতে দিন গুজরান করতে লাগলাম।

আলোকচ্ছটা। অখণ্ডিত পাথরটি ফিন সরে গেছে। এবার এক বিবির মৃতদেহ আমার দিকে নেমে গেল। তার পিছন পিছন নেমে আসতে লাগল তার জ্যান্ত স্বামী। বহু আকাঙ্ক্ষিত রুটি আর পানির কলসিটির দিকে আমি লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কাছে যেতেই পূর্বপদ্ধতি অনুসরণ করে এরও জান খতম করলাম। ফিন এক কলসি পানি আর সাতটি রুটি আমার করায়ত্ব হ'ল। আল্লাহ-র করুণায় আরও ক'দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হলাম।

আমি এভাবে একের পর এক খুন ক'রে নিজের জানটিকে টিকিয়ে রাখতে লাগলাম।

আমি হাড্ডির বিছানায় শুয়ে একদিন নিদে আচ্ছন্ন ছিলাম। আচমকা বিকট ও রহস্যজনক এক শব্দে হুড়মুড় ক'রে উঠে বসে পড়লাম। যন্ত্রচালিতের মত হাড্ডির টুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরলাম। স্পষ্ট মালুম হ'ল। বেশ বড়সড় কি যেন একটি আমার পায় গা-ঘেঁষে চলে গেল।

জমাটবাঁধা অন্ধকার। কিছুই মালুম হচ্ছে না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হাড্ডির স্তূপের ওপর দিয়ে এগোতে থাকি। রহস্যভেদ করতেই হবে। পা টিপে টিপে এগোতেই থাকি।

এক সময় এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল। আচমকা এক টুকরো আলো এসে আমার মুখে পড়ল। আলোটির উৎসস্থলের খোঁজে আরও এগোতে থাকি। আলো ক্রমে বেড়ে চলল। আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। একী অকল্পনীয় ব্যাপার—ভাবতে লাগলাম। সেটা যে আমার মুক্তির পথ ভাবতেই পারিনি বরং ভাবলাম, এ বুঝি নতুনতর এক মৃত্যুফাঁদ।

আমি কৌতূহলী দিল্ নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। হাড্ডির টুকরোটি হাতেই রয়েছে। এমন সময় আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে একটি জানোয়ারের মত কি যেন ছুটে পালিয়ে গেল। গোস্তের লোভে এখানে হাজির হয়েছিল। আচমকা আমার দিল্ খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, হিংস্র জানোয়ারের কাজই বটে। মড়া আদমির সুস্বাদু গোস্তের লোভে কুয়ো পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। রাত্রে গুটিগুটি এসে লাশ টেনে নিয়ে যায়। খোদাতাল্লার ওপর আমার আস্থা অনেকাংশে বেড়ে গেল। আশায় বুক বেঁধে আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে রহস্যটি আমার কাছে আরও অনেকখানি খোলসা হয়ে গেল। মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে হিংস্র জানোয়াররা মৃত্যুকূপের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে।

আমি খোদাতাল্লার নাম স্মরণ করতে করতে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একেবারে খোলা আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াই। কতদিন পর যে এতবড় আকাশটিকে দেখতে পেলাম খোদাতাল্লাই জানেন।

আমি কৌতূহলী দৃষ্টিমেলে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। আমার একদিকে সমুদ্র, বিপরীতদিকে সুউচ্চ পর্বত আর মাথার ওপরে নীল আকাশ।

পর্বতের বিপরীত দিকে নগর। পাহাড় ডিঙিয়ে নগরে যাওয়া-আসা সম্ভব নয়। অতএব একমাত্র সমুদ্রই ভরসা। সমুদ্রপথেই আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে।

এবার ক্ষিদে অনুভব করতে লাগলাম। এতক্ষণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ক্ষিদে তেষ্টা শিকেয় উঠে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় খানা। উপায়ান্তর না দেখে ফিন মরণকূপে ফিরে গেলাম। অধীর

প্রতীক্ষায় রইলাম কবে নতুন শব নামবে।

খোদাতাল্লা সহায়। শবদেহের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। শবদেহ নামল। একই উপায়ে রুটি আর পানি সংগ্রহ করলাম। ফিরে গেলাম সমুদ্রের ধারে। জাহাজের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার মাথায় বহুৎ আচ্ছা একটি মতলব খেলে গেল। কেন কেবল রুটি আর পানি নিয়েই সন্তুষ্ট হচ্ছি। মরণকূপ তো অতুল ধন-দৌলতের আকরও বটে। হাজার হাজার আদমির সমাধি এখানে হচ্ছে। তাদের মধ্যে জনানার সংখ্যা অর্ধেক না হলেও কাছাকাছি তো হবেই। আর তারা সবাই কম-বেশী অলঙ্কারাদি নিয়েই তো কুয়োয় নামে। সেগুলোর কিছু সংগ্রহ করতে পারলেই তো আমি আমীর-বাদশাহ বনে যেতে পারি।

আমি সোনাদানা হীরা-জহরতের তল্লাসে মেতে গেলাম। হাড্ডি-খুলি সরিয়ে বহুৎ কিসিমের অলঙ্কার সংগ্রহ করে পাহাড় করে ফেললাম।

এবার সমস্যা হ'ল এতসব অলঙ্কার পত্র নেব কেমন করে? তার হিল্লে করতেও দেরী হ'ল না। শবাচ্ছাদনের দু'-একটি কাপড় খুলে নিলেই তো মুশকিল আশান হতে পারে। করলামও তা-ই। পুঁটুলিটি বেশ বড়সড়ই হ'ল।

এবার গোটা কয়েক রুটি, এক কলসি পানি আর অলঙ্কারাদির পুঁটুলিটি নিয়ে ফিন সমুদ্রের ধারে চলে এলাম।

একটি জাহাজ অদূরবর্তী অঞ্চল দিয়ে চলেছে দেখে মাথার পাগড়ীটি খুলে দোলাতে থাকি।

খোদা জান রাখলে মারে কে? জাহাজের ক্যাপ্টেন আমার সঙ্কেত বুঝতে পেরে মেহেরবানি করে একটি ডিঙি নৌকো পাঠিয়ে দিল।

আমি পানির কলসিটি ফেলে দিয়ে রুটি আর অলঙ্কারের পুঁটুলিটি নিয়ে ডিঙিতে উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে পৌঁছে গেলাম।

ক্যাপ্টেন কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একসময় বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বল্‌ল—'কে তুমি? তোমার মুলুক কোথায়? হিংস্র জানোয়ারের এলাকায় কি করে এলে? জিন্দাই বা রইলে কি করে? পাহাড় ডিঙিয়ে তো কোন আদমি ওখানে আসতে পারে না। আমি এ তল্লাটে বহুৎ চক্কর মেরেছি। আজ অবধি কোন আদমির চিহ্নও তো কোনদিন—সত্যি তাজ্জব করলে।'

আমি ক্যাপ্টেনের কাছে আমার নসীবের ব্যাপার স্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। তবে শেষের দিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লাগাম টেনে ধরতেই হয়েছিল। অলঙ্কারের ব্যাপার স্যাপারের কথা বেমালুম মিথ্যা করে বানিয়ে বল্‌লাম। তাকে বল্‌লাম, আমার যথাসর্বস্ব খোয়া গেলেও সোনাদানা হীরা-জহরতের পুঁটুলিটি বুকে আঁকড়ে রেখেছিলাম।

আমার কাহিনী শেষ করে পুঁটুলিটি খুলে একটি জড়োয়ার অলঙ্কার ক্যাপ্টেনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বল্‌লাম—'এটি আমার জান রক্ষার ইনাম। আপনার দোয়াতেই আমার জান রক্ষা হয়েছে। মানি সামান্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা জহরতের অলঙ্কারটি দিয়ে আপনার ঋণ শোধ হবার নয়। তবু মেহেরবানি করে এটি নিয়ে আমাকে খুশী করুন।'

ক্যাপ্টেন মুচকি হাসলেন। গহনাটি ফিরিয়ে দিলেন। মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বল্‌লেন—'বেটা, এটি আমি নিতে পারব না। খোদাতাল্লা যে তোমার জান রক্ষা করেছেন, যথেষ্ট। তুমি বিপদে পড়ে আমার স্মরণাপন্ন হয়েছ। খোদার মর্জিতেই তোমাকে আমি হিংস্র জানোয়ারদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি। একে আমার কর্তব্য বলেই মনে করি। অতীতে বহুৎ আদমিকে এরকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। তাদের কাছ থেকে একটি কানাকড়িও কোনদিন হাত পেতে নেই নি। উপরন্তু জেব থেকে রাহা খরচও অনেককে দিতে হয়েছে। বেটা, ইয়াদ রাখবে, দুনিয়াটি একটি সরাইখানা ছাড়া কিছু নয়। খোদাতাল্লার মর্জিতেই দু'দিনের জন্য আসা। ফিন তারই মর্জিতে একদিন বিদায় নিতে হয়। চলার পথে এর-ওর সঙ্গে জান পরিচয় হয়। ব্যস, স্মৃতিটুকুই টিকে থাকে। এরই ফাঁকে কারো জন্য কিছু করতে পারলে তো নিজেকে ধন্য জ্ঞান করা উচিত।'

ক্যাপ্টেনের বাৎ শুনে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার দিল্ ভরে উঠল। সুক্‌রিয়া জানাতেই হ'ল।

জাহাজ একের পর এক দ্বীপ, বন্দর আর নগর অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চল্‌ল।

খোদাতাল্লা-র দোয়ায় এক সকালে আমাদের জাহাজ বসরাহ বন্দরে নোঙর করল। খুশীতে আমার দিল্ ডগমগ হয়ে উঠল। এবার নির্ঘাৎ নিজের মুলুক বাগদাদে পৌঁছাতে পারব সন্দেহ রইল না।

আমার আত্মীয়জনরা আমাকে কাছে পেয়ে খুশী হ'ল।

কিস্‌সা শেষ ক'রে সিন্দবাদ নাবিক এবার বল্‌ল—আগামীকাল যে কিস্‌সা তোমাদের কাছে পেশ করব তা বাস্তবিকই অতুলনীয়।

সিন্দবাদ নাবিক সেদিনও সিন্দবাদ কুলীকে একশটি সোনার মোহর দিয়ে বল্‌ল—'এগুলো তোমার কাছে রাখ কাজে আসবে। কাল সকালে ফিন আসবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

খানাপিনা সেরে দোস্ত-মেহমানরা সিন্দবাদ নাবিককে সুক্‌রিয়া জানিয়ে বিদায় নিল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সিন্দবাদ নাবিকের পঞ্চম সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা

তিনশ' ছয়তম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার প্রায় মাঝ রাত্রে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, পরদিন সকালে সিন্দবাদ নাবিকের ইয়ার-দোস্তরা এক এক ক'রে তার কামরায় এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিন্দবাদ কুলী কামরায় ঢুকে সিন্দবাদ নাবিককে সালাম জানাল।

সিন্দবাদ নাবিক তার পঞ্চম সমুদ্র যাত্রার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌ল—'দোস্ত ও মেহমান, চতুর্থ সমুদ্রযাত্রা সেরে মুলুকে ফিরে আসার পর দীর্ঘদিন আমি বিবি বালবাচ্চা আর ইয়ার দোস্তদের নিয়ে আনন্দ স্ফূর্তির মধ্য দিয়েই দিন গুজরান করলাম। কিন্তু সে আর ক'দিন? আমার দিল্ ফিন বহির্মুখী হয়ে উঠল। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পরদেশে যাবার জন্য দিল্ উতলা হয়ে উঠল। যার খুনের সঙ্গে দেশদেখার নেশা জড়িয়ে রয়েছে তার দিল্ চার দেওয়ালে ঘেরা ছোট্ট কাম্‌রায় বন্দী হয়ে থাকতে চাইবে কেন!

আমি ফিন সওদা করার কাজে মেতে গেলাম। আগের বারের মতই ভিন্ দেশের বাজারে চাহিদা আছে ওরকম সামানপত্রে কামরা বোঝাই ক'রে ফেল্‌লাম। তারপর বাঁধাছাঁদা করে তৈরী হয়ে গেলাম। এমন সময় এক দোস্ত খবর নিয়ে এল, বহুৎ আচ্ছা একটি জাহাজ সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। ব্যস, আর দেরী নয়, দামদস্তর করে জাহাজটি খরিদ করে ফেল্‌লাম। একটু বেশী বেতন দিয়ে এক অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনকে নিযুক্ত করলাম। কিন্তু একা একটি জাহাজ নিয়ে বেরোলে খরচা পোষাবেনা ভেবে বাগদাদ নগরীর সওদাগর দোস্তদের আমার সমুদ্রযাত্রার কথা জানালাম। অনেকেই তাদের সামানপত্র নিয়ে জাহাজে এল।

শুভমুহূর্তে আমরা বসরাহ বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়লাম। পথে বহুৎ বন্দর, নগর আর দ্বীপ পড়ল। কোথাও জাহাজ ভেড়ালাম। কোথাও আবার অপ্রয়োজন বোধে কোন কোন বন্দর-নগর এড়িয়ে গেলাম।

আমরা বন্দরে বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে সওদাপত্র কেনাবেচা করতে করতে এগিয়ে চললাম। আমার সামানপত্র চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেল। মুনাফাও কম হ'ল না।

একদিন চলার পথে একটি দ্বীপের চিহ্ন দেখতে পেলাম। দূর থেকে দেখেই সমঝে গেলাম সেখানে আদমির বাস নেই। দ্বীপটি জুড়ে কেবল বিচিত্র সব গাছের মেলা। দ্বীপটি সম্বন্ধে আমার মধ্যে কৌতূহল দানা বাঁধল। নিজেই মাস্তুল বেয়ে তরতর ক'রে ওপরে উঠে গেলাম। গোলাকৃতি গম্বুজের মত দুইটি সাদা বস্তুর দিকে আমার নজর আকৃষ্ট হ'ল।

মাস্তুল থেকে নেমে ক্যাপ্টেনের কাছে হাজির হলাম। দ্বীপটিতে জাহাজ ভেড়াতে বললাম।

ক্যাপ্টেন জাহাজ ভেড়াতেই সবাই হৈ হৈ ক'রে নেমে গেল। মহাউল্লাসে আমার অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে ছুটে গেল। আমি তো মাস্তুলের ওপরে উঠে মোটামুটি দেখেই নিয়েছি। তাই আর জাহাজ থেকে নামলাম না।

আমার সঙ্গী সওদাগররা একটু বাদেই ফিরে এল। তারা রহস্যজনক সাদা বস্তু দুটো সম্বন্ধে যে-বর্ণনা দিল তা শুনে আমার কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল।

সাদা বস্তু দুটো গম্বুজ টম্বুজ মোটেই নয়। আদতে দুটো পেল্লাই ডিম। সবাই মিলে ঠেলে ধাক্কে ডিমদুটোকে সরানো তো দূরের কথা সামান্য গড়াতেও পারে নি। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। শেষে রেগেমেগে দুটো পাথরের চাঁই ছুড়ে মারল। বেশ কিছু পরিমাণ পিচ্ছিল তরল পদার্থ তাদের ভেতর থেকে নির্গত হ'ল। সব শেষে ইয়া বড় বড় দুটো বাচ্চা বেরিয়ে এসে ছটফটানি শুরু ক'রে দেয়।

আমি তাদের মুখে সবকিছু শুনে চমকে উঠে বললাম সেকি! কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছেন যে! তাদের আব্বা আম্মা ফিরে এসে এদৃশ্য দেখলে সবার জান খতম করে ছাড়বে, রকপাখি খুব বদরাগী। গায়ে পড়ে মানুষের কোন ক্ষতিই করে না। কিন্তু চটে গেলে জান খতম না করা পর্যন্ত ছাড়ান দেয় না।

আমি কাঁপতে কাঁপতে ক্যাপ্টেনকে জাহাজ ছাড়তে বললাম। ব্যস্ত-হাতে নোঙর তুলে জাহাজটিকে কোনরকমে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে আসা হ'ল। ভাবলাম, এ-যাত্রায় কোনরকমে বিপদ কাটিয়ে

ওঠা গেছে। কিন্তু খোদার মর্জি আদতে তা নয়।

হঠাৎ আকাশের গায়ে দু'টুকরো কালো মেঘ উঁকি দিল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভাবলাম, এক্ষণি তুফান উঠল ব'লে। না, ভুল—একেবারেই ভুল ধারণা। দু'দুটি রকপাখি কলিজা কাঁপানো শোঁ শোঁ শব্দ করে উঁচু-আকাশ থেকে উল্কার বেগে নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। তাদের উভয়ের পায়ের নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরা রয়েছে বিশাল দুটো পাথরের চাঁই। তাদের এক একটি আকৃতিই আমাদের জাহাজটির চেয়ে বড় না হোক ছোট তো অবশ্যই নয়।

ব্যাপার দেখে আমাদের স্নায়ু শিথিল হয়ে আসতে লাগল। হাত পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের জাহাজটিকে লক্ষ্য করে একটি পাথর ছেড়ে দিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন খুবই অভিজ্ঞ। আচমকা জাহাজটিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিপদ সামাল দিয়ে দিল।

আমরা দুরু দুরু বুকে আকাশের দিকে মুখ করে তাকিয়ে। কারণ আর এক যমদূত যে আর একটি পাথরের চাই বয়ে নিয়ে আমাদের জাহাজের চারদিকে চক্কর মেরে চলেছে। মাথার ওপরে খড়্গ ঝুলছে। আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে।

রক পাখিটি পায়ের আঙুলের বন্ধন শিথিল করতেই ক্যাপ্টেন ক্ষিপ্রগতিতে হাল ধরে মোচড় মারতে থাকে। আর একটু—আর একটু। না, শেষ রক্ষা করতে পারল না। বিপদসীমা অতিক্রম প্রায় করেই ফেলেছিল। কিন্তু সামান্য একটুর জন্য কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত ঘটে গেল। বিশালাকৃতি পাথরটি জাহাজের সামনের দিকটি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আছাড় খেয়ে জলে পড়ে গেল। চোখের পলকে হুড়মুড় করে জল ঢুকে জাহাজটিকে তলিয়ে দিল।
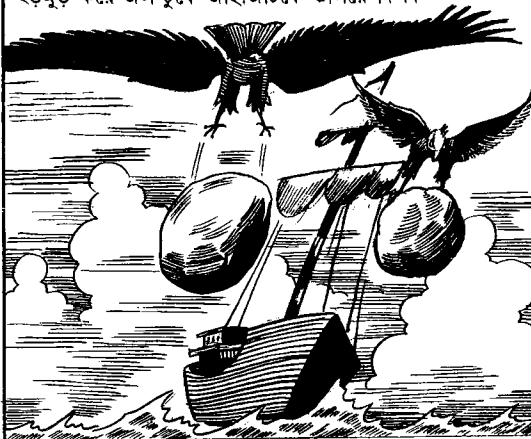
খোদাতাল্লা আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। নইলে জাহাজভাঙা এতবড় কাঠের টুকরোটি ঠিক সে মুহূর্তেই বা আমার নাগালের মধ্যে চলে এল কি করে? যাই হোক বরাতগুণে পাওয়া কাঠটির ওপরে কষ্টে উঠে বসলাম। কত ঢেউয়ের তালে তালে ওঠা নামা করতে করতে বাধন হারা উদ্দেশ্যে ভেসে চল্‌লাম।

সারাদিন সারারাত্রি ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঢেউয়ের সঙ্গে মোকাবেলা ক'রে ক'রে এক সময় এক দ্বীপের গায়ে এসে আমার বাহক কাঠটি আটকে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা বালির বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কিছুটা ক্লান্তি অপনোদন ক'রে নিলাম। এবার দ্বীপটির ভেতরে ঢুকতে লাগলাম।

দ্বীপের গাছগাছড়ার ফাঁক দিয়ে এগোতে এগোতে এক সময় চমৎকার একটি বাগিচায় হাজির হলাম। গাছে গাছে পাকা ফল ঝুলছে। পাশেই দেখলাম কুল কুল রবে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে একটি ঝর্ণা। ফল আর ঝর্ণার পানি দিয়ে দু'দিনের উপবাস ভঙ্গ করলাম। মনে হ'ল শরীরে হৃতশক্তির কিছুটা অন্তত ফিরে পেয়েছি।

এমন সময় রাত্রির অবসান হ'ল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সাততম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক দোস্ত ও মেহমানদের কাছে কিস্‌সা বলছে—আমি পেটপুরে পাকা ফল ও ঝর্ণার পানি খেয়ে কিছুক্ষণ ঘাসের ওপর শুয়ে রইলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। এবার সত্যি সত্যি নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হতে লাগল। অজানা-অচেনা দ্বীপ, এর নামও শুনিনি কারো মুখে।

নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে সারা রাত্রি ঠায় বসে কাটালাম। ডর লাগছিল। চোখ বন্ধ করলে যদি আচমকা কোন বিপদ এসে ঘাড়ে চেপে বসে।

গাছে গাছে পাখির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। বুঝলাম, ভোরের পূর্বাভাষ।

কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বীপটির বুকে নেমে এলো সকালের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা। দিল্ কিছুটা শান্তি পেল।

এবার দ্বীপটিকে ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য কৌতূহল হ'ল। পায়ে পায়ে এগিয়ে চল্‌লাম দ্বীপের কেন্দ্রস্থলের দিকে। কিছুদূর যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম একটি ঝর্ণা। তার ওপরে একটি সাঁকো তৈরী করে দুই পাড়ের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করা হয়েছে।

সাঁকোটির মুখে এক বুড়ো বসে একা। উলঙ্গ, তবে একটি গাছের পাতা লতার সাহায্যে বেঁধে শরম ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে।

আমাকে দেখার পরও বুড়োটির মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না। নীরব চাহনি মেলে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

আমি ভাবলাম, এ-বুড়োটিও নির্ঘাৎ আমারই মত নসীবের ফেরে পড়েছে। জাহাজডুবির ফলে সর্বস্ব খুইয়ে ফলটল খেয়ে কোনরকমে জান টিকিয়ে রেখেছে।

আমি দু'পা এগিয়ে গিয়ে সহানুভূতির স্বরে বল্লাম—'জী, কে আপনি? এ-দশাই বা আপনার কি ক'রে হ'ল? কোন্ মুলুকের আদমি আপনি?'

আমি এক নাগাড়ে এতগুলো প্রশ্ন বুড়োটির দিকে ছুঁড়ে দিলাম। সে কিন্তু কোন জবাবই দিল না। হাত নেড়ে আর চোখের ভাষায় কি যেন বুঝাতে চেষ্টা করল। আমি জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে অনুমান করলাম, চলার সামর্থ তার নেই। ঝর্ণার পানি একটু পেলে কলিজাটিকে ভিজিয়ে নিতে পারে।

আমি বুড়োটিকে কাঁধের ওপর তুলে নিলাম। সে আমার বুকের দু'পাশ দিয়ে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে গলাটি জড়িয়ে ধরল। ক্রমে কাঠির মত হাত দুটো দিয়ে সাঁড়াশির মত আমার গলাটিকে এমন আঁকড়ে ধরল যেন আর কিছুক্ষণ এভাবে চল্‌লে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

আমি শরীরের সবটুক শক্তি-প্রয়োগ করে তার বাহুর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার কোশিস করলাম। কিন্তু হায়! পেশী-হীন, হাড্ডি সম্বল হাত দুটো দিয়ে আমার গলাটিকে আরও শক্ত করে ধরল। ছাড়াতে পারলাম না। বুড়োর অপ্রত্যাশিত আচরণে আমার মধ্যে মৃত্যুভয় দেখা দিল। আতঙ্কে আমার বুকের মধ্যে ঢিবঢিবানি শুরু হয়ে গেল। আপন মনে ব'লে উঠলাম, 'হায় খোদা! পরোপকার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে জানই খোয়াতে হচ্ছে।

ক্রমে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তার ওপর অবধারিত মৃত্যুর আতঙ্ক সবমিলিয়ে আমার স্নায়ুগুলো ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে লাগল। আর খাড়া থাকতে পারলাম না। তাকে নিয়েই দুম করে মাটিতে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সংজ্ঞাও লোপ পেয়ে গেল। কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলাম বলতে পারব না। সংজ্ঞা ফেরার পর দেখলাম বে-রসিক বুড়োটির হাত দুটো তেমনি সাঁড়াশির মত আমার গলা আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মোউত বুড়োটির মুখের দিকে তাকালাম। সে চোখের ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দিল ফলের গাছগুলোর কাছে নিয়ে যেতে।

আমি নাচার। বুড়োটির নির্দেশ অমান্য করার মত মনোবল আমার নেই। তাকে ক্ষ্যাপালে চলবে না। তাকে সন্তুষ্ট করে, কোনরকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে জান খতম করে দেবে। হাড্ডিসার চেহারা হলে কি হবে ; গায়ে যেন অসুরের শক্তি ধরে। তাকে প্রতিরোধ করার কোশিস করা নিতান্তই বোকামি।

আমি বুড়োটিকে কাঁধে নিয়ে একটি গাছতলায় এসে দাঁড়ালাম। ডালে ডালে পাকা ফল ঝুলছে। বুড়ো এক হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেই অন্য হাতে গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল। এবার ঝর্ণার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। উপায় নেই। নিজের জান রাখার তাগিদেই তাকে কাঁধে বয়ে ঝর্ণার ধারে হাজির হলাম।

সারাদিন বুড়োটিকে বয়ে নিয়ে বেড়ালাম। ভেবেছিলাম, রাত্রে অন্তত ঘুমোবার জন্য কাঁধ থেকে নামবে। তখন আপদটিকে ফেলে রেখে সোজা চম্পট দেব।

হায় খোদা! আমার গলায় জড়িয়ে থেকেই সে দিব্যি ঘুমোতে লাগল। তার কবল থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব হ'ল না।

একী পৈশাচিক কাণ্ড! শয়তান বুড়োটির পাল্লায় পড়ে আমার জান কয়লা হয়ে যেতে লাগল। রীতিমত অত্যাচার। অত্যাচারে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুল্‌ল দেখছি! শয়তানটিকে খোদাতাল্লা কবে যে আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে অব্যাহতি দেবেন তা একমাত্র তিনিই জানেন।

এবার আমার মাথায় চমৎকার একটি মতলব এল। মাত্র কয়েক হাত দূরে একটি লাউগাছ দেখতে পেলাম। একটি পাকা লাউ ছিঁড়ে আনলাম। তার ভেতর থেকে বীচিগুলো বের করে ফেললাম। এবার তার ভেতরে কিছু টসটসে পাকা আঙুর ঢুকিয়ে দিলাম। মাটি খুঁড়ে একটি গর্ত তৈরী করে লাউটিকে পুঁতে রাখলাম। দু'তিনদিনের মধ্যেই আঙুর পচে গাজলা কাটতে লাগল। এবার লাউটিকে তুলে দেখি চমৎকার সরাব তৈরী হয়ে গেছে। এক চুমুক গাজলা সমেত অর্ধেক সরাব উদরে ঢুকিয়ে দিলাম। ব্যস। কিছুক্ষণের মধ্যেই সরাবের নেশা শুরু হয়ে গেল। এবার আমার শরীরটিকে তুলোর মত হাল্কা মনে হতে লাগল। ঘাড়ের ওপরের বোঝাটিও যেন খুবই হাল্কা মনে হতে লাগল। খুশীতে আমার দিল্ নেচে উঠল। ব্যস, আমি এবার উন্মাদের মত নাচানাচি লাফালাফি শুরু করে দিলাম।

আমার কাণ্ড দেখে আমার কাঁধের বুড়োটি এবার যেন থমকে গেল। আমার গায়ের অসুরের বল বুড়োকে আতঙ্কিত করল। সে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। এবার সে পা দুটো দিয়ে আমার বুকে অনবরত গুঁতো মারতে লাগল। বুঝলাম, দাওয়াইয়ে কাজ হয়েছে।

ইশারায় আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, লাউয়ের সরাব সে-ও খাবে।

আমি আমার ভুক্তাবশিষ্ট সরাবটুকু বুড়োকে দিলাম। সে চোঁ চোঁ শব্দ করে সবটুকু সরাব গলায় ঢেলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সরাবের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। এবার ক্রমে পায়ের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়তে লাগল। হাতেরও সে দৃঢ়তা আর নেই। আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আচমকা সজোরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে হতচ্ছাড়া বুড়োটিকে কাঁধ থেকে দিলাম ফেলে। সে সঙ্গে সঙ্গে হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে কোশিস করল। সরাবের নেশায় শরীর টলছে। দুম ক'রে আছড়ে ফিন মাটিতে পড়ে গেল।

এবার আমার মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা চাঙা হয়ে উঠল। শয়তান বুড়োটি ক'দিন ধরে আমার জানটাকে একেবারে কয়লা করে দিয়েছে। আর আমি তাকে এত সহজে রেহাই দেব? অসম্ভব। পাস থেকে একটি পাথরের চাই তুলে নিয়ে উন্মাদের মত অনবরত তার মাথায় আঘাত হানতে লাগলাম। তার মাথার খুলিটি গুঁড়িয়ে গেল।

এভাবে আমি অনেক কায়দা কৌশল ও কসরৎ ক'রে আমার সাক্ষাৎ মোউত বুড়োটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এমন সময়ে ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' আটতম রজনী

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক তার কিস্‌সা ব'লে চল্‌ল—দোস্ত ও মেহমানগণ, বিশ্বাস করুন, আমার সাক্ষাৎ মোউৎ বুড়োটিকে খতম করার পর আমার মনোবল দশগুণ বেড়ে গেল। আমি তো তার কব্জায় পড়ে জানের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।
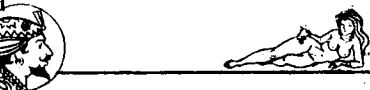
এবার আমি খুশী হয়ে সমুদ্র সৈকতের দিকে হাঁটতে লাগলাম। সমুদ্রের কাছাকাছি যেতেই একটি বিশালায়তন জাহাজ নজরে পড়ল। ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গেলাম।

জাহাজের যাত্রী ও লস্করর| তখন জাহাজ থেকে নামছে। জাহাজের ক্যাপ্টেনও তাদের সঙ্গে রয়েছে।

আমাকে দেখেই জাহাজের ক্যাপ্টেন সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি বল্‌লাম—'আপনারা এ-দ্বীপে নোঙর করলেন কেন? এমন হন্তদন্ত হয়ে চল্‌লেনই বা কোথায়? জনবসতি তো এখানে নেই।'

ক্যাপ্টেন বল্‌ল—'বসতি নেই জানি। একটু এগিয়ে গেলে একটি ঝর্ণা রয়েছে। পানি খুব মিষ্টি। সুমিষ্টি ফলও রয়েছে প্রচুর। আমরা পানি ও ফল আনতে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি কে? কি ক'রে এখানে এলে? আর কেনই বা এলে?'

ক্যাপ্টেনের কাছে আমি আমার নসীবের ফেরের কিস্‌সা সংক্ষেপে বল্‌লাম। এমন কি শয়তান বুড়োর কাণ্ডকারখানাও বাদ দিলাম না।

ক্যাপ্টেন আঁৎকে উঠে বল্‌ল—'কী সর্বনেশে কাণ্ড! তুমি ওই হতচ্ছাড়া বুড়োটির কবলে পড়েছিলে? সাক্ষাৎ শয়তানই বটে। অতীতে যেসব নাবিক তার কবলে পড়েছিল—জান নিয়ে ফিরতে পারে নি। তার হাড্ডিসার দাবনা আর হাতে এতই তাগদ যে, চেপেই জান খতম করে দিতে পারে। বেটা, তোমার জোয়ান বয়স আর ফন্দি ফিকিরের জন্যই তার খপ্পর থেকে জান বাঁচাতে পেরেছ। ওই হতচ্ছাড়া বুড়োটিকে সবাই সমুদ্রের আতঙ্ক ব'লে জানে। তার নাম শুনলেই চমকে ওঠে। খোদাতাল্লা তোমার সহায়। তাকে খতম করে তুমি বহুৎ নাবিকের জান বাঁচিয়েছ।'

আমার নসীবের বাৎ শুনে ক্যাপ্টেনের মায়া হ'ল। আদর ক'রে জাহাজে নিয়ে গেল। কোর্তা-পাৎলুন দিল। খানাও দিল হরেক কিসিমের।

জাহাজ নোঙর তুল্‌ল। বেশ কিছুদিন অনবরত জাহাজ চালিয়ে খুবসুরৎ এক বন্দরে আমাদের জাহাজ ভিড়ল। জাহাজ ঘাটেই কিছু স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল। তাদের মুখে শুনলাম, এর নাম বানর-নগর। এর এরকম নামকরণের কারণ, বন্দরের গাছে গাছে অদ্ভুত দর্শন হাজার হাজার বানর বাস করে।

জাহাজে এক প্রৌঢ় সওদাগরের সঙ্গে আমার খুব ভাব, একেবারে দোস্তী হয়ে গিয়েছিল। বড় অমায়িক আদমি। আমি তার সঙ্গে বন্দরের ধারে পায়চারি করছিলাম। সে আমাকে একটি চমৎকার ফন্দি বাৎলে দিল। একটি কাপড়ের থলিতে পাথরের নুড়ি দিয়ে বল্‌ল—দোস্ত। এটি নিয়ে নগরের ফটকে চল। দেখবে

তোমার মত অনেকে পাথরের নুড়ির থলি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের অনুসরণ করবে। তারপর তারা যা-যা করবে তুমিও অবিকল তা-ই করবে। দেখবে বহুৎ মুনাফা পিটে জাহাজে ফিরতে পারবে।'

আমি হিতাকাঙ্ক্ষী সওদাগরের পরামর্শ অনুযায়ী পাথরের নুড়িবোঝাই থলিটি নিয়ে নগরের প্রবেশ-দ্বারে হাজির হলাম। সওদাগর ঠিক বাৎই বলেছে। আমার মত অনেককেই পাথরের থলি কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তারা পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগল। আমি তাদের পিছু নিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেখানে অসংখ্য লম্বা লম্বা নারকেল গাছ। মাথায় বানরের আড্ডা।

আমার সঙ্গী সাথীরা এবার থলে থেকে পাথর নিয়ে বানরগুলোকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। উদ্দেশ্য তাদের উত্তেজিত করা। হ্যাঁ, কৌশলটি প্রয়োগ ক'রে হাতেনাতে ফল পাওয়া গেল। বানরগুলো ক্ষেপে গিয়ে নারকেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। আমিও থলে থেকে পাথর নিয়ে অনবরত ছুঁড়তে লাগলাম।

আমি এবার অন্য সব আদমিদের সঙ্গে আমার সংগৃহীত নারকেলগুলি নিয়ে বাজারে হাজির হলাম। ভাল দামে বিক্রি হ'ল। এ এমনই একটি কারবার যে, বিনা পুঁজিতে মুনাফা লোটা।

জাহাজ কয়েকদিন সে বন্দরে রইল। আমি রোজই নারকেলের কারবার করে পুঁজি বাড়াতে লাগলাম। আমার দোস্তটি অর্থোপার্জনের চমৎকার ফিকির শিখিয়ে দিয়েছে।

সবশেষে কিছু নারকেল জাহাজে এনে তুললাম। অন্য বন্দরে চড়া দামে বিক্রি করার প্রত্যাশায় আমার মত অনেকে নারকেল সংগ্রহ ক'রে জাহাজ একেবারে বোঝাই করে ফেল্‌ল।

জাহাজ নোঙর তুল্‌ল। এবার জাহাজ এমন এক বন্দরে নোঙর করল যেখানের সমুদ্রে মুক্তো মেলে। মুক্তো ঝিনুকের মধ্যে থাকে। এক বিশেষ কিসিমের ঝিনুক। তা-ও আবার সবার পেটে মুক্তোর দেখা মেলেনা। পাওয়া বাস্তবিকই নসীবের ব্যাপার। সবার বরাতে জোটে না।

আল্লাতাল্লা এখানেও আমাকে সহায়তা করলেন। নইলে আমি যে-ক'টি ঝিনুক খুলি, দেখি মুক্তো চকচকে করছে। খুশীতে দিল্ ডগমগিয়ে উঠল। আশমানের দিকে মুখ তুলে আমাকে বলতেই হল—'খোদা মেহেরবান। অসীম দোয়া তোমার।'

আমার মুনাফা দিনদিন বেড়ে বহুৎ মোহর জমে গেল।

নিজের মুলুকের জন্য দিল্ ছটফট করতে লাগল। আর নয়। বহুৎ-ই তো হ'ল। এবার ঘরে ফেরা যাক। বিবি আর বালবাচ্চার সঙ্গে মিলিত হওয়া দরকার।

আমি আর জাহাজের অপেক্ষায় রইলাম না। জাহাজ এখনও বহুৎ মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়াবে। তার অপেক্ষায় থাকলে কবে মুলুকে ফিরতে পারব ঠিক ঠিকানা নেই। বাধ্য হয়ে বড়সড় একটি নৌকা ভাড়া করে বসরাহ্ বন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। তারপর বসরাহ বন্দরে নৌকা থেকে নেমে বাগদাদে হাজির হলাম।

ঘরে ফিরে আত্মীয়-বান্ধবদের বুকে পেয়ে দিল্ শান্ত হ'ল। এই হ'ল আমার পঞ্চম সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা।

কিস্‌সা শেষ করে সিন্দবাদ নাবিক এবার শেরওয়ানির জেব থেকে এক শ'টি সোনার মোহর বের ক'রে সিন্দবাদ কুলীর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'কাল সকালে ফিন এসো। আল্লাতাল্লা যদি সবাইকে বহাল তবিয়তে রাখেন তবে আমার ষষ্ঠ সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা শোনাব।

সিন্দবাদ কুলী কোর্তার জেবে মোহরগুলি রাখতে রাখতে সিন্দবাদ নাবিককে বহুৎ সুক্‌রিয়া জানিয়ে বিদায় নিল।

পরের সকালে সিন্দবাদ কুলী বিছানা ছেড়ে উঠল। পানি দিয়ে ভালভাবে রুজু ক'রে পবিত্র হয়ে নামাজ সারল। এবার কোর্তা-পাৎলুন গায়ে চাপিয়ে সিন্দবাদ নাবিকের মকানের উদ্দেশ্যে পা-বাড়াল।

সিন্দবাদ নাবিকের ষষ্ঠ সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা

সিন্দবাদ নাবিক তার সুবিশাল কামরায় ইয়ার দোস্তদের নিয়ে নাস্তা সারতে সারতে কিস্‌সা শুরু করল।

এক রাত্রে আমি ইয়ার দোস্তদের নিয়ে হরেক কিসিমের খানা আর দামী সরাব দিয়ে খানাপিনা সারছিলাম। জানালা দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম, কয়েকজন সওদাগর পয়দল পাড়ি দিচ্ছে। আমি ছুটে বাইরে গেলাম। ডাকলাম তাদের। অভ্যর্থনা করে কামরার ভেতরে নিয়ে এলাম।

সওদাগরদের সঙ্গে বাৎচিৎ ক'রে জানতে পারলাম, তারা বাণিজ্য করতে ভিনদেশে চলেছে। তাদের মুখে বাণিজ্যের বাৎ শুনেই আমার দিল্ নেচে উঠল। বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য রীতিমত ছটফট করতে লাগলাম।

কথা প্রসঙ্গে সওদাগরদের একজন বল্‌ল—'জী, আমরা এখানে দু'দিন থেকে সওদা খরিদ করব। তারপর বসরাহ্ বন্দর থেকে জাহাজে উঠব।'

আমি সে-মুহূর্তেই সমুদ্রযাত্রার পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। সকাল হতে না হতেই বাজারে বেরিয়ে পড়লাম সওদা খরিদ করতে। ভিন দেশের বাজার ও সেখানকার আদমিদের রুচি-মর্জি তো আমার ভালই জানা আছে। সেদিকে নজর রেখে হরেক কিসিমের বিলাস সামগ্রী জড়ো করে কামরা বোঝাই করে ফেললাম। এবার খরিদ করা সামানপত্র দিয়ে বড় বড় কয়েকটি

গাঁটরি পেটরায় বাঁধাছাঁদা করে নিলাম।

সদ্য পরিচিত সওদাগর-দোস্তদের সঙ্গে শুভ মুহূর্তে বসরাহ বন্দরে হাজির হলাম। একটি সওদাগরী জাহাজ ঘাটেই দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আল্লাহ-র নাম স্মরণ ক'রে আমি গাঁটরি-পেটরা নিয়ে জাহাজে উঠলাম।

জাহাজ নোঙর তুল্‌ল। তরতর ক'রে এগিয়ে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে। চারদিকে কেবল পানি। নীল পানি। আর সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন গর্জন।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' নয়তম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। কিছুটা সময় বেগমকে আদর-সোহাগ ক'রে নিজে তৃপ্তি লাভ করলেন। বেগমের যৌবনের জোয়ার লাগা দেহ আর দিল্‌কেও তৃপ্তি দিলেন।

বেগম শাহরাজাদ এবার তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক তার ইয়ার দোস্ত আর সিন্দবাদ কুলীর কাছে তার সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা ব'লে চলেছে—আমাদের সুবিশাল জাহাজটি পালে হাওয়া পেয়ে তরতর ক'রে এগিয়ে চল্‌ল। তারপর শুরু করল এ-বন্দর থেকে সে-বন্দর নোঙর করা। প্রতি বন্দরেই আমরা সওদা বিক্রি করি। প্রয়োজনে সেখান থেকে অন্য বন্দরের আদমিদের পছন্দ মাফিক সামানপত্র খরিদ ক'রে ফিন জাহাজ বোঝাই করি। আমার সওদা চড়া দামে বিক্রি হতে থাকে। ফলে দু'হাতে মুনাফা পিটতে লাগলাম।

এক গভীর রাত্রে আমরা একেবারে নিদে বিভোর হয়ে নাক ডাকাচ্ছিলাম। আচমকা ক্যাপ্টেনের চিল্লাচিল্লিতে নিদ টুটে গেল। হুড়মুড় ক'রে উঠে বসে পড়লাম।

শোনলাম ক্যাপ্টেন চিল্লিয়ে বলছে—'সবাই শোন, আমাদের জাহাজ এক অজানা দ্বীপে এসে পড়েছে।'

আমি আড়মোড়া ভেঙে একটু চাঙা হয়ে নেয়ার কোশিস করছিলাম। ক্যাপ্টেনের বাৎ শুনে সচকিত হয়ে নিদ-জড়ানো চোখ দুটো অতর্কিতে কপালে তুলে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

ক্যাপ্টেন ব'লে চলেছে—'হ্যাঁ, একেবারেই অজানা-অচেনা এক দ্বীপে আমরা হাজির হয়েছি। আমি এ-পথে আগে কোনদিন আসিনি। নিতান্তই অচেনা। নসীবে কি আছে কিছু বলতে পারি না। খোদাতাল্লার নাম স্মরণ করা ভিন্ন গতি নেই। তিনি যদি জান রাখেন তবেই এখান থেকে জিন্দা ফিরতে পারব।'

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল। আমি দুরু দুরু বুকে উঠে দাঁড়ালাম। ডেকের দিকে দু'পা যেতেই দেখি, ক্যাপ্টেন মাস্তুলের ওপর উঠে গেছে। পালের কাছি কেটে দিল।

বিপদ নয়া রাস্তা ধরে এল। মুহূর্তে তুফান উঠল। ভীষণ তুফান। তুফানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজটি কিছুক্ষণ টিকে ছিল। ব্যস, তার পরই দিয়াশলাইয়ের খোলের মত জাহাজটি তীরবেগে ছুটতে ছুটতে এক পাহাড়ের সঙ্গে দুম্ ক'রে ধাক্কা মারল। ব্যস, খতম। জাহাজ ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল। আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম। ভাবলাম, হাড়গোড় বুঝি গুঁড়িয়ে গেছে। বরাত ভাল যে, সেখানে কিছু ডালপালা লতা-পাতা তুফানে এনে জড়ো ক'রে রেখেছিল।। জানি না তুফান, নাকি আল্লা-তাল্লা-র এ-কাজ।

আমি মোক্ষম আছাড়টি খেয়ে একটু-আধটু জখম হলাম বটে। তবে অচিরেই আল্লাহ-র দোয়ায় সামলে উঠতে পেরেছিলাম।

জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের কি হালৎ হয়েছে কিছুই মালুম হ'ল না। একে ঘুটঘুটে অন্ধকার তার ওপর প্রবল তুফান। কে, কার হদিস করে।

আমি ওই শুকনো গাছপালার স্তূপের মধ্যে চিৎ হ'য়ে পড়ে থেকে সারারাত্রি আল্লাতাল্লা-র নাম করে কাটিয়ে দিলাম। ক্যাপ্টেন, সওদাগর দোস্ত বা জাহাজের খালাসীদের কে, কোথায় এবং কিভাবে আছে কিছুই আমার জানা নেই।

সকাল হ'ল। লতাপাতার স্তূপের ওপর বসে থেকেই আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। সামনেই অনুচ্চ এক পাহাড়। বুঝলাম পাহাড়টি থাকাতেই তুফান আমাকে সমেত শুকনো লতাপাতাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রের বুকে ফেলতে পারেনি।

আল্লাহ-র নাম নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এবার আর যা দেখলাম তাতে আমার কলিজাটি আচমকা কেঁপে উঠল। আমাদের জাহাজের ভাঙা অসংখ্য ছোট-বড় টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আর? তার মাঝখানে দু'জন হতভাগ্য খালাসীর মৃতদেহ।

আমি এক পা দু'পা করে দ্বীপের ভেতরের দিকে এগোতে লাগলাম। সামান্য এগোতেই ছোট্ট একটি পার্বত্য নদী নজরে পড়ল। পাহাড় ছেড়ে দ্বীপের মধ্যে কিছুটা ঘোরাফেরা ক'রে নদীটি পাহাড়ের একটি গুহার ভেতরে ঢুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত যে কি হয়েছে, চুপি চুপি সাগরে গিয়ে পড়েছে, নাকি গুহার ভেতরেই কোন কায়দা কৌশলের মাধ্যমে থাকার জায়গা ক'রে নিয়েছে মালুম হ'ল না।

নদীর পাড় ধরে কিছুপথ হাঁটা চলা করে নদীর তীরভূমির আদৎ চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি আঁচ করতে পারলাম।

নদীর পাড়ে কোটি কোটি ছোট-বড়-মাঝারি নুড়ি ছড়ানো। কোন কোনটি অত্যুজ্জ্বল। শ্যাওলাও তাদের আদৎরূপ চাপা দিতে

পারে নি। কি এগুলো? কোন্ কিসিমের পাথরের নুড়ি?

কৌতূহলের শিকার হয়ে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে একটি নুড়ি হাতে তুলেই সরবে ব'লে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ! শোভন আল্লাহ! আল্লা তুমি আমাকে এ কোথায় এনে ফেল্‌লে। তামাম দুনিয়ার ধন দৌলত যে এখানে এনে জড়ো করা হয়েছে। আমি প্রায় উন্মাদের মত কথা ক'টি ছুড়ে দিয়ে হাতের ইয়া বড় চুনী-র টুকরোটির দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

কেবল কি চুনী-ই না, হরেক কিসিমের সব অমূল্য পাথর নদীটির দু'পাড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কতরকম অমূল্য গ্রহরত্নের যে বিচিত্র সমাবেশ এখানে ঘটেছে তার হদিস একমাত্র অভিজ্ঞ জহুরীর পক্ষেই দেয়া সম্ভব।

আমি কৌতূহলের শিকার হয়ে নদীর পাড় ধরে পায়ে পায়ে এগোতে থাকলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই একটি ঝর্ণার মুখোমুখি হলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে নিচে নেমে এসেছে। কি নামছে? পানি? অবশ্যই না। তবে? আলকাতরার মত কুচকুচে কালো এক কিসিমের তরল পদার্থ। ঝর্ণাটি অনুসরণ ক'রে হাঁটতে গিয়ে দেখলাম সেটি সরাসরি সমুদ্রে গিয়ে মিলেছে।

সমুদ্রের এক কিসিমের মছলির খুবই প্রিয় খাদ্য এই কালো তরল পদার্থটি। তারা এগুলো সাগ্রহে গিলে নিয়ে কিছুসময় উদরে জমা করে রাখে। তার পর এক সময় ফিন উগরে দেয়। ওগরান তরল পদার্থগুলো মোমের মত সাগরের বুকে ভেসে বেড়ায়। তাদের খুসবুতে সাগর বাহিত বাতাস দিল্‌কে চাঙা করে তোলে।

হায় আল্লাহ! একী তোমার বিচিত্র খেয়াল! এত সব অমূল্য সম্পদ এখানে, এ নির্জন দ্বীপে স্তূপাকার ক'রে রেখেছ যার এক কণাও দুনিয়ার কোন কাজেই লাগছে না! জাহাজ পথভুলে এখানে এসে পড়লেও বিধ্বস্ত হতে বাধ্য। সমুদ্রের অতল গহ্বরে হতভাগ্যর দল অসহায় ভাবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তাই এ-দ্বীপের অমূল্য সম্পদ দুনিয়ার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

আমার হাতের নাগালের মধ্যে অতুল বৈভব। কিন্তু পেটের জ্বালা নেভানোর মত এক তিল খানাও খুঁজে পেলাম না। গাছপালা ঝোপঝাড় আছে বটে। কিন্তু সারা দ্বীপ চুঁড়ে চুঁড়েও এমন কোন ফলমূল পেলাম না যা দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করতে পারি। চোখ দুটো বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। নিশ্চিত মৃত্যু বুঝতে পেরে চোখের পানি আটকে রাখা সম্ভব, নাকি আটকা থাকে?

নিরম্বু উপবাসের মধ্য দিয়ে এক-দুই-তিন ক'রে পর পর কয়েকটি দিন কোনরকমে গুজরান করলাম। না, আর পারলাম না। অনাহারক্লিষ্ট দেহটি এক সময় বালির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। ক্ষুধার জ্বালা যে কী দুর্বিষহ রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে তা বুঝিয়ে বলার মত ভাব ও ভাষা নেই। খিদে-তেষ্টায় বালির ওপর পড়ে কাৎরাতে থাকি। নিজের হাতে চুল ছিঁড়ি, বুক চাপড়াই আর ক্ষীণকণ্ঠে 'হায় খোদা' 'হায় খোদা' করি! এক সময় দুর্বল হাত দুটো দিয়ে বালি সরিয়ে সরিয়ে নিজের কবর নিজেই খুঁড়তে শুরু করলাম।

নিজের কাছে নিজেই অবাক মানলাম। বালি সরিয়ে সরিয়ে এতবড় একটি গর্ত, মোটামুটি একটি কবর এরকম শরীর নিয়ে খুঁড়তে পারব ভাবতেই পারি নি।

কবরটির ভেতরে দলামোচড়া পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর কোন চিন্তা নেই। বাতাস বাহিত বালি এসে আজ না হোক কাল আমাকে ঢেকে দেবে। ব্যস, জিন্দেগীর খেল খতম।

কবরের ভেতরে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর নিজের ওপর দারুণ গোস্‌সা হ'ল। একী তাজ্জব কাণ্ডে আমি মেতেছি। অতীতে তো এর চেয়েও চরম দুর্গতি সহ্য করেছি। দাঁতে দাঁত চেপে বিরুদ্ধ প্রকৃতির মোকাবেলা করেছি। আজ তবে এমন দুর্বুদ্ধি আমার ঘাড়ে চাপল কেন?

হাত দুটোতে ভর দিয়ে কোনরকমে উঠে বসে পড়লাম। গালে হাত দিয়ে বসে কিছুক্ষণ ভাবলাম। মাথায় এল—নদীটির উৎপত্তিস্থল তো আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছি। কিন্তু কোথায়, কিভাবে এর শেষ হয়েছে তা তো দেখা হ'ল না। পাহাড়ের গুহায় তো সে ঢুকল—তারপর? তার পরেরটুকু?

আমার মাথায় এল—নদীটি নির্ঘাৎ পাহাড়ের ওই গুহাটির মধ্যে গিয়ে খতম হয়ে যায় নি। অন্য কোন না কোন মুলুক অবধি ধাওয়া করেছে।

আমি আপন মনে বলে উঠলাম— 'নদীটির শেষ আমাকে দেখতেই হবে। আমার মোউত কাঁধে চেপেছেই। না নিয়ে ছাড়বে না। তবু শেষ বারের মত কোশিস করেই দেখা যাক। মৃত্যু এভাবে না হয় অন্য কোনভাবে হবে এর বেশী তো কিছু নয়।

গুহাটির ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পাক্কা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। পানির তোড়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকি, দেখাই যাক না। যদি গুহার মধ্যে ঢুকে আর বেরিয়ে আসতে না-ই পারি তবে বড় জোর বালির সমাধির পরিবর্তে পানির সমাধি হবে—এই তো?

এবার গর্তটি থেকে উঠে এসে জাহাজভাঙ্গা একটি পাটাতন খুঁজে বের করে টেনেহিঁচড়ে নদীর ধারে নিয়ে এলাম। আরও কিছু কাঠ সংগ্রহ করে চমৎকার একটি ভেলা তৈরী করে ফেললাম। এবার চিন্তা হ'ল, মরি আর জিন্দাই থাকি এখানে ফিন আর আসার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বীপের অতুল ঐশ্বর্যের মায়া হেলায় কাটিয়ে ফেলা হয়ত ঠিক হবে না। এমনও হতে পারে খালি হাতে বিদায় নিলে পরে এর জন্য হাত কামড়াতে হবে।

ছেঁড়া পাল থেকে কয়েক হাত লম্বা একটি টুকরো নিয়ে এলাম। নদীর পাড় থেকে বেছে বেছে অত্যুজ্জ্বল দেখে বেশ কিছু পাথর কুড়িয়ে ইয়া পেল্লাই একটি পুঁটুলি বানিয়ে ফেললাম। এবার সেটিকে ভেলার ওপর চাপিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলাম। আল্লাহার নাম নিয়ে ভেলাটিকে দিলাম জলে ভাসিয়ে। তার ওপরে চেপে বসলাম। শরীর এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুরু হ'ল আমার ভেলা-অভিযান। আমার খিদে-তেষ্টায় কাতর দেহটি কখন যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল, বলতে পারব না।

এক সময় আমার সংজ্ঞা ফিরে এল। চোখ মেলে তাকালাম। চমকে গেলাম। দুর্বল শরীরেও যন্ত্রচালিতের মত তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে বসে পড়তে পারলাম। দেখি শ'খানেক মুখ চারদিক থেকে কৌতূহল মিশ্রিত উৎসাহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। তাদের সুরৎ আর পোশাক আশাক দেখে মালুম হ'ল আমি হিন্দুস্থানে পৌঁছে গেছি। এরা হিন্দুস্থানী।

কৌতূহলী লোকগুলো আমাকে টুকরো টুকরো বহুৎ বাৎ জিজ্ঞাসা করল। আমি তাদের কথার একটি বর্ণও উদ্ধার করতে পারলাম না। জবাব দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আমিও তাদের একের পর এক প্রশ্ন করলাম। সব কোশিসই বৃথা গেল। কেউ, কারো বাৎ সমঝে উঠতে না পারায় আমার বা উপস্থিত কৌতূহলী আদমিদের—কারো পক্ষে কৌতূহল দমন করা সম্ভব হ'ল না।

বাৎচিৎ-এর আশা ছেড়ে দিয়ে আমি তাদের ইঙ্গিতে মনোভাব বুঝবার কোশিস করলাম। পেটে হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, বড্ড খিদে পেয়েছে।

বুঝলাম, আমার কোশিসটি ফলপ্রসু হয়েছে। দু-চার আদমি পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করল। কিছু সময় বাদেই তারা ফিন ঘুরে এল। হাতে তাদের খানার থালা আর লোটা ভর্তি পানি। আমি গোগ্রাসে খেতে লেগে গেলাম। খানা শেষ করে ঢক্‌ঢক্ করে লোটার পুরো পানিটুকু গলায় ঢেলে দিলাম।

খানাপিনা সেরে পাশের দিকে ঘাড় ঘোরাতেই আমার এক জাতভাইকে দেখতে পেলাম। তারাই খুঁজেপেতে তাকে নিয়ে এসেছে। সে পরিষ্কার আরবী ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল—'তোমার নাম কি হে? মুলুক কোথায়? এখানে কেন, কিভাবেই বা হাজির হয়েছ?'

তার কাছে আমার বিড়ম্বিত নসীবের বাৎ সবিস্তারে বাতালাম।

আমার জাতভাইটি এবার অন্যান্যদের হিন্দুস্থানী ভাষায় বুঝিয়ে দিল। সবকিছু শুনে তাদের চোখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। বারবার আঁৎকে আঁৎকে উঠল।

আমি বল্‌লাম— 'তাজ্জব বলার কিচ্ছু নেই। এরকম দুঃসাহসিক ব্যাপার স্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার নেশা আমার খুনের সঙ্গে মিশে গেছে। কেবলমাত্র এবারই নয়। আরও পাঁচ-পাঁচবার আমার জান খতম হবার জোগাড় হয়েছিল। খোদাতাল্লা প্রতিবারেই আমাকে নানা বেকায়দার মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত জানটি টিকিয়ে দিয়েছেন। এবারও বোধ হয় জিন্দেগী বরবাদ হতে গিয়ে রক্ষা পেয়ে গেল।' আমার জাতভাইটির মুখে শুনলাম, জায়গাটির নাম 'সারণদ্বীপ'। এবার তারা আমাকে মিছিল ক'রে সে দেশের সম্রাটের দরবারে নিয়ে গেল।

সম্রাট আমার মুখ থেকে সমুদ্র যাত্রার বিবরণ ও সঙ্কটের কাহিনী শুনে বল্‌লেন— 'বাছা, ঈশ্বর তোমার সহায়। তার অকৃপণ কৃপা না থাকলে কেউ এরকম চরমতম সঙ্কট কাটিয়ে সুস্থ-সবল দেহে ফিরে আসতে পারে না।'

আমি পুঁটুলিটি খুলে একটি বহুমূল্য পাথর বের ক'রে সম্রাটের পায়ের কাছে রাখলাম। নজরানা দিলাম।

সম্রাট আমার ওপর খুশী হলেন। গল্পচ্ছলে তিনি বল্‌লেন—'আমার সাম্রাজ্য এ-সারণ দ্বীপটি চব্বিশটি পরগণায় বিভক্ত। এর উত্তরে গেলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশিখরের মুখোমুখি হবে। পর্বতটিতে বহু গ্রহরত্ন মেলে।'

সম্রাট আমাকে খুশী হয়ে কয়েকটি গ্রহরত্ন উপঢৌকন দিয়ে পেয়ার জানালেন।

সারণ দ্বীপের আর একটি মূল্যবান সম্পদ অসংখ্য নারকেল গাছ। এক সকালে আমি সম্রাটের দরবারে, তাঁর পাশাপাশি বসে বাৎচিৎ করছি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আমাকে বল্‌লেন— 'সিন্দবাদ, তোমারে বাগদাদের রাজ্য শাসন ব্যবস্থা কেমন, বল তো। জনপ্রিয়তার দিক থেকে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ কতখানি সার্থক, বল তো।'

আমি বল্‌লাম— 'আমার মুলুকের সুলতান যথার্থই একজন

পহেলা নম্বরের ধর্মাত্মা। তাঁর সুলতানিয়তে অন্যায়-অত্যাচার চলে না। প্রজারাও খলিফার জন্য জান কবুল করতে কসুর করে না। প্রজাদের হিতসাধন খলিফার রাত্রি-দিন সর্বক্ষণের চিন্তা। তাঁর কসুরের ত্রুটি নেই।'

সারণ দ্বীপের সম্রাট খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর অনন্য গুণের বাৎ শুনে যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। এবার বল্লেন— 'বাছা আমি যদি খলিফার জন্য সামান্য কিছু উপহার তোমার হাতে দেই তবে কি তুমি তার হাতে পৌঁছে দিতে রাজী আছ? একে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস মনে করতে পার।'

প্রচুর সংখ্যক গ্রহরত্ন, সাপের চামড়ার সুদৃশ্য একটি গালিচা, দু'শর কাছাকাছি কর্পূরের ঢেলা, আট হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হাতীর দাঁত আর দ্বীপের এক খুবসুরৎ লেড়কিও সঙ্গে দিলেন খলিফার সেবার জন্যে।

সম্রাট খলিফার নামে তাঁর সখ্যতা কামনা করে একটি পত্র লিখে দিলেন।

এক বিকালে বাগিচায় পায়চারি করতে করতে সম্রাট আমাকে বল্লেন— 'সিন্দবাদ তুমি আমার দেশে অতিথি হয়ে এসেছ। তুমি ইচ্ছে করলে এখানে বসবাস করতে পার। আমি খলিফার কাছে দূত পাঠিয়ে তোমার আত্মজনদের খবরাখবর আনার ব্যবস্থা করছি।'

আমি ভাব বিমুগ্ধ কণ্ঠে বল্লাম— 'মহামান্য সম্রাট, আপনার মহানুভবতা ও আন্তরিকতার বাৎ জিন্দেগীভর আমার দিলে গাঁথা হয়ে থাকবে। লেকিন, আমি আমার মুলুকে ফিরে যেতে আগ্রহী। আপনার আচরণ ও দেশ আমার দিল্ কেড়ে নিয়েছে। বিবি, বালবাচ্চা আর ইয়ার দোস্তের আকর্ষণেই আমি আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলাম না। আমাকে নিজগুণে মাফ করবেন।'

এক কর্মচারীকে বন্দরে পাঠিয়ে সম্রাট খবর সংগ্রহ করলেন, দু'-একদিনের মধ্যেই বসরাহ-র দিকে একটি জাহাজ ছাড়বে।

সম্রাট আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন— 'বাছা সিন্দবাদ, তোমার মন বাগদাদে চলে গেছে। যাও, আমি বাধা দেব না। তোমার জন্য আমার প্রাসাদের দরজা সর্বদা খোলাই থাকবে। যখনই মন চাইবে, নির্দ্বিধায় চলে এসো।'

সম্রাট এবার জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তলব করে দরবারে নিয়ে এলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তাকে বললেন— 'এর নাম সিন্দবাদ। সিন্দবাদ নাবিক। অসীম সাহস, অটুট মনোবল এবং অনন্য উপস্থিত বুদ্ধির ধারক। বহুবার মৃত্যুর মুখ থেকে কৌশলে ফিরে এসে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। পথে যেতে যেতে এর মুখ থেকে বিভিন্ন সমুদ্রযাত্রার কথা শুনতে পারবে। একে বাগদাদে, এর দেশে পৌঁছে দিও, যা ভাড়া আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে।'

সারণ দ্বীপের সম্রাটকে সুক্রিয়া জানিয়ে আমি জাহাজে উঠলাম।

বাগদাদে পৌঁছে আমি সবার আগে খলিফা হারুণ-অল-রসিদের-এর দরবারে পৌঁছলাম। খলিফাকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ জানালাম। সারণ দ্বীপের সম্রাটের দেয়া উপঢৌকনগুলি এবং হাতচিঠিটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

খলিফা খুবই খুশী হলেন।

আমি খলিফার কাছে পঞ্চমুখে সম্রাটের গুণগান করলাম।

খলিফা খুশী হয়ে একপ্রস্থ মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ ইনামস্বরূপ দিলেন।

কিস্সা শেষ করে সিন্দবাদ নাবিক এবার বল্ল— 'আমার সম্মানিত মেহমান দোস্তরা, এ-ই হ'ল আমার ষষ্ঠ সমুদ্রযাত্রার মোটামুটি বিবরণ। কাল সকালে আপনাদের কাছে আমার সপ্তম সমুদ্রযাত্রার কিস্সা পেশ করার ইচ্ছা রাখছি।'

সিন্দবাদ নাবিক এবার একটি সোনার মোহরের থলি সিন্দবাদ কুলীর হাতে দিয়ে বল্ল— 'এগুলো তোমার জেবে রাখ, কাজে লাগবে। কাল সকালে আসা চাই, ইয়াদ থাকে যেন।'

সিন্দবাদ কুলী মোহরের থলিটি কোর্তার জেবে চালান দিয়ে দিল সিন্দবাদ নাবিককে সালাম জানাল। এবার আগামী সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল।

সিন্দবাদ নাবিকের সপ্তম সমুদ্রযাত্রার কিস্সা

পরদিন সকালে সিন্দবাদ নাবিকের মকানে মেহমানরা এক এক করে আসতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিন্দবাদ কুলীও তার প্রশস্ত কামরায় হাজির হ'ল।

টেবিলে নাস্তা সাজানো হ'ল।

সিন্দবাদ নাবিক কুলীকে পাশে বসিয়ে, অন্যান্য মেহমান দোস্তদের নিয়ে নাস্তা সারতে সারতে বল্ল—আমার ছয় ছয়টি সমুদ্রযাত্রার ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতা লাভ করে আমি পাক্কা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, যথেষ্ট হয়েছে, আর সমুদ্রে যাচ্ছিনে। দিল্ থেকে সমুদ্রকে ধুয়ে মুছে একেবারে সাফসুতরা ক'রে ফেল্লাম। এবার থেকে বিবি, বালবাচ্চা আর ইয়ার দোস্তরাই আমার জিন্দেগীর একমাত্র সম্বল। তাদের নিয়েই সুখে-দুঃখে বাকী দিনগুলি গুজরান ক'রে দেব। ওরে ব্বাস! একের পর এক যেসব মরণফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলাম, দোজাখের দক্ষিণ দুয়ারে হাজির হয়েছিলাম তা ভাবলে এখনও আমার কলিজা শুকিয়ে আসে। হাঁটু কাঁপে আর

শরীরের শিরা-উপশিরা শিথিল হয়ে আসতে চায়। তার ওপর উমর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। চুল সফেদ হচ্ছে, দাঁত নড়ছে, শরীরের কলকব্জা এক এক ক'রে ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া যাওয়ার দরকারই বা কি। জিন্দেগীভর তামাম আরব দুনিয়ায় ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে মোহরও তো কম কামাই করি নি। খোদাতাল্লা-র দোয়ায় আমি বাগদাদে সবচেয়ে শরীফ আদমি। আমার চৌদ্দপুরুষ পায়ে পা তুলে ভোগ বিলাস করলেও আমার মোহরের পাহাড় ক্ষয় হয়ে সমতল হ'বে না।

তামাম বাগদাদে আমার খাতিরও কম নয়। এমন কি খলিফাও আমাকে খাতির সমীহ করেন। মাঝে মধ্যেই তলব পাঠান। পাশে বসিয়ে আমার সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা শোনেন। অবাক মানেন। অতএব আর ভুলেও সমুদ্রে যাচ্ছি না।

একটি বাৎ বহুৎ সাচ্চা—কোন আদমির ইচ্ছাই শেষ বাৎ নয়। তার ওপর একজন রয়েছেন যিনি আড়ালে বসে কলকাঠি নাড়ান।

আমি একদিন খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর দরবারে হাজির। তার পাশে বসে সমুদ্রযাত্রার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কিস্‌সা বলছি। খলিফা মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার কিস্‌সা শুনছেন।

আমি কিস্‌সা শেষ করলে খলিফা আমাকে বললেন— 'সিন্দবাদ, আমার দিল্ চাইছে সারণ দ্বীপের সম্রাটকে কিছু উপঢৌকন আর শুভেচ্ছা পাঠাব।'

আমি সোল্লাসে বল্‌লাম— 'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! এ তো খুশীর বাৎ জাঁহাপনা!'

—'সে তো বুঝলাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে।'

—'সমস্যা? কিসের সমস্যা জাঁহাপনা?'

—'সমস্যা একটিই, এমন কোন পছন্দ মাফিক দূত মিলছে না যাকে দিয়ে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।'

আমি গম্ভীর মুখে বসে রইলাম। টু-শব্দটিও করলাম না। খলিফার দিল্ কি চাইছে তা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হ'ল না।

আমাকে নীরব দেখে খলিফা আমতা আমতা ক'রে বল্‌লেন—'সিন্দবাদ, বিবেচনা করে দেখলাম, তুমিই একমাত্র আদমি যার ওপর ভরসা রাখা চলে। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার উপঢৌকন ও শুভেচ্ছা সারণ দ্বীপের সম্রাটের দরবারে পৌঁছে দাও। এতে লাভ কিন্তু দু'দিক থেকে—'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম— 'লাভ? কিসের লাভ? দু'দিক থেকে লাভ বলতে আপনি কি সমঝাতে চাইছেন জাঁহাপনা?'

—'মানে—মানে বলতে চাইছি তোমাকে কাছে পেলে সম্রাট বহুৎ খুশী হবেন। আর আমার কাজটি মিটে যাবে। কি বল?'

আমার বুঝতে বাকী রইল না, খলিফা ইচ্ছাক্রমে আদেশের দিকে মোড় নিচ্ছেন। অধিকতর মোলায়েম স্বরে এবার বল্‌লাম— 'জাঁহাপনা, আপনার ইচ্ছাই কার্যকর হবে। বলুন, 'কবে আমাকে রওনা হতে হবে?'

খলিফা আমার সম্মতি পেয়ে উপঢৌকনের জন্য বাগদাদের সেরা সেরা সামানপত্র সংগ্রহ করাতে মেতে গেলেন। সবকিছু গোছগাছ ক'রে বাহারী একটি পেটরাতে বোঝাই করলেন।

আমার বাৎ তোমরা বিলকুল বিশ্বাস করতে পার, মুলুক ছেড়ে সমুদ্রে আসার একদম ইচ্ছা আমার ছিল না। কেবলমাত্র খলিফাকে খুশী করার জন্য আমাকে সেবার জাহাজে উঠতেই হ'ল।

খলিফা রাহাখরচ বাবদ দশহাজার দিনার আমার হাতে তুলে দিলেন। আর দিলেন সারণ দ্বীপের সম্রাটের নামে লেখা একটি পত্র। উপঢৌকনের পেটরাটির মধ্যে দিলেন—বহুমূল্য ও মনলোভা লাল আভাযুক্ত মখমলের শয্যা। তার দাম সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র ধারণাও করতে পারলাম না। আমার অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সেরকম বিলাস শয্যা চোখে দেখার নসীব জিন্দেগীতে আমার হয় নি।

মখমলের বিলাস শয্যাটির মতই আর দু'রঙের দু'দুটো শয্যা পেটরাটিতে দিয়ে দিলেন। আর? কুফার সেরা দর্জির তৈরী বহুমূল্য একশ' প্রস্ত দিলবাহার পোশাক। বাগদাদের সূচীকর্ম সম্বলিত কিছু চমৎকার পোশাক, আলেকজান্দ্রিয়ার মনমৌজি রেশমী কাপড়, কারুকার্য সম্বলিত সোনার ফুলদানি একটি। তার গায়ে একটি সিংহকে বিদ্ধ করার জন্য এক শিকারী তীর-ধনুক নিয়ে তাক করছে—একটি ছবি খোদাই করা। এক প্রখ্যাত শিল্পী অনন্য এ-শিল্পকর্মটিকে ফুলদানিটির গায়ে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন, এছাড়া প্রায় দু'হাজার অন্যান্য সামানপত্র দিয়ে বিশালায়তন পেটরাটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

সিন্দবাদ নাবিককে খলিফা সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন।

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলতে না বলতেই প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে ভোরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিনশ' বারোতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়র বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় উপস্থিত হলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন— 'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক মেহমান ও দোস্তদের কাছে তার নিজের সপ্তম ও সর্বশেষ সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা বলে চলেছে। সিন্দবাদ এবার বল্‌ল— 'শুনুন মেহমান ও দোস্তরা, আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খলিফার চিঠি ও পেটরা নিয়ে একদিন বসরাহ বন্দর থেকে জাহাজে উঠলাম।

নিরবচ্ছিন্নভাবে দু'-দু'টি মাস জাহাজে কাটিয়ে নির্বিবাদে সারণ

দ্বীপে হাজির হলাম।

সম্রাট আমাকে কাছে পেয়ে যারপরনাই খুশী হলেন। এ যেন তাঁর কাছে একেবারেই অকল্পনীয় এক ব্যাপার।

একে পূর্বপরিচিত। পরদেশী মেহমান। সবচেয়ে বড় কথা এবার আমি খোদ খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর দূত হয়ে তার সভায় উপস্থিত হয়েছি। অতএব খাতিরের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হবে, সন্দেহ কি!

আমি যথোচিত সম্ভাষণ ও প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সম্রাটের হাতে খলিফাপ্রদত্ত শুভেচ্ছাপত্রটি দিলাম। আর উপঢৌকনের পেটরাটি দেখিয়ে বল্‌লাম—আমাদের মহামান্য খলিফার প্রেরিত সামান্য উপঢৌকন গ্রহণ ক'রে আনন্দদান করুন।

সম্রাটের প্রাসাদে মেহমান হয়ে কয়েকটি দিন বহুৎ খুশীতে গুজরান করলাম।

সম্রাট আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চান না। আমি অন্ততঃ আরও কয়েকটি দিন গুজরান না করলে নাকি তাঁর মন ভরছে না।

আমি সসম্মানে বল্‌লাম— 'মহামান্য সম্রাট, আমি নিজের ইচ্ছাতে, ভ্রমণের ইচ্ছা নিয়ে এবার আপনার দরবারে মেহমান হয়ে আসিনি। সুলতানের হুকুম তালিম করতেই আমাকে আসতে হয়েছে। বাগদাদে ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাতে হবে, আমি তাঁর হুকুম যথাযথভাবে তামিল করেছি। নসীবে যদি থাকে, ভবিষ্যতে যদি ফিন আসতে পারি তখন অবশ্যই আপনার অভিলাষ পূর্ণ করার কোশিস করব।

আর কয়েকদিন সম্রাটের প্রাসাদে অতিথি হিসাবে অবস্থান করলাম। তারপর এক সকালে সম্রাটের কাছ থেকে খুশীভরা দিল্ নিয়ে জাহাজে উঠলাম।

এবার আর অন্য কোনদিকে যাওয়ার ধান্দা নেই। সারণ দ্বীপ থেকে সোজা বসরাহ বন্দর। তারপর সেখান থেকে বাগদাদ। ব্যস, খেল খতম।

আমাদের জাহাজ পালে দমকা বাতাস পেয়ে তর্‌তর্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল গভীর সমুদ্রের দিকে।

এবারের মত নির্বিবাদে কোনবারই সমুদ্রযাত্রা করা আমার নসীবে সম্ভব হয় নি।

প্রায় এক সপ্তাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে জাহাজ চালিয়ে ক্যাপ্টেন সিন দ্বীপে জাহাজ ভেড়াল। সওদাগররা কেনবেচা করার জন্য নামল। এ বন্দরটি সওদাগরদের বহুৎ পছন্দ।

সিন দ্বীপ থেকে জাহাজ ছাড়ল। তর তর ক'রে জাহাজ এগিয়ে চল্‌ল মাঝ সমুদ্রের দিকে।

ক্যাপ্টেন পথের নিশানা ঠিক করতে গিয়ে থমকে গেল। নিজের কাছে মন ও চোখ নিবদ্ধ রেখেই সে এবার স্বগতোক্তি করল—

'কী তাজ্জব ব্যাপার! কোথায় এসে পড়েছি, ঠিক মালুম হচ্ছে না তো!'

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন ব্যস্ত-পায়ে মাস্তুলের কাছে গেল। মাস্তুল বেয়ে তর্‌তর্ ক'রে ওপরে উঠে গেল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিমেলে চারদিকে তাকাতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে তার ফ্যাকাসে মুখ একেবারে চকের মত সাদা হয়ে গেল।

আমরা একদল যাত্রী আশমানের দিকে মুখ তুলে ক্যাপ্টেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কলিজা ইতিমধ্যে ধিক্‌ধিক্ ক'রে নাচতে শুরু ক'রে দিয়েছে। সবার মধ্যেই একই আতঙ্ক, ক্যাপ্টেন নেমে এসে কি খবর দেবে!

ক্যাপ্টেন মুখ চুণ ক'রে ফিরে এল। জানাল আমাদের জাহাজ মরণ ফাঁদ দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এখান থেকে আজ পর্যন্ত কেউ-ই জান নিয়ে ফিরতে পারে নি। নাবিকের এরকমই বক্তব্য।

আমি সবে মুখ খুলতে যাব। হ'ল না। ক্যাপ্টেন আমার আগেই ব লতে শুরু করল—ব্যস, সব খতম। আল্লাতাল্লার নাম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জান রক্ষা পাওয়ার আর কোনই ভরসা নেই।

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'লে উঠলাম— 'হায় আল্লাহ! এ যাত্রায় তবে জান রক্ষার কথা ভাবতে হচ্ছে!'

ক্যাপ্টেন ঈশান কোণের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বল্‌ল— 'ওই দেখ এবার এখানেই আমাদের ইন্তেকালের বন্দোবস্ত হচ্ছে। ওই যে কুচকুচে কালো মেঘের টুকরোটি দেখা যাচ্ছে—মুহূর্তে আশমান ছেয়ে ফেলবে। তার ওপর প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়ের সঙ্কেত পাচ্ছি। আমাদের মত একশ' জাহাজকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া তার পক্ষে কিছুমাত্র সমস্যা নয়। তার চক্করে পড়ে—।

—'কিন্তু কোন দ্বীপ ধারে কাছে—।'

আমাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন বল্‌ল— 'হ্যাঁ, আছে। খুব কাছেই একটি দ্বীপ আছে বটে। তীরে নোঙর করতে

পারলে জাহাজ রক্ষা পাবে।'

—'তবে মেহেরবানি করে তাই করুন সাহাব।'

ম্লান হেসে ক্যাপ্টেন বল্‌ল—ফয়দা কিছুই হবে না। জান রক্ষার কোন ফিকিরই করা যাবে না। লাভের মধ্যে হবে, সিংহের থাবা এড়িয়ে নেক্‌ড়ের মুখের সামনে হাজির হাওয়া, ওই দ্বীপের চারদিকে হাজার হাজার ময়াল সাপের আড্ডা। বড় বড় গাছের গুঁড়ি তো সামান্য বাৎ পাহাড়ের মত তাদের আকৃতি বল্‌লে হয়ত বাড়িয়ে বলা হবে না। আমাদের এক এক আদমিকে তো বিনা মেহনতে হেকিমের দাওয়াইয়ের বড়ির মত গিলে ফেলবে।

আমি সামনে ভূত দেখার মত চমকে উঠে বল্‌লাম— 'ইয়া আল্লাহ!' ক্যাপ্টেনের দিকে বল্‌লাম— 'আর যেচে ময়ালটয়ালের খপ্পরে গিয়ে পড়ার দরকার নেই, তুফানে ছিটকে গিয়ে সাগরের পানিতে ডুবে জান দিতে হয় তা-ও আচ্ছা।'

ক্যাপ্টেন লম্বালম্বা পায়ে নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল। আমরা কয়েকজন কাঁপা কাঁপা পায়ে তার পিছু নিলাম। ক্যাপ্টেন একটি তোরঙ্গ চৌকির তলা থেকে টেনে বের করল। তালা খুল্‌ল। ভেতর থেকে সাদামত কিসের যেন গুঁড়া আর এক টুকরো ন্যাকড়া বের করে আনল। গুঁড়ো গুলোকে সামান্য পানি দিয়ে ময়দা মাখার মত করে শক্ত ক'রে মেখে ছোট ছোট দুটো মার্বেলের মত তৈরী করল। দুটোকে দু'নাকের ছিদ্রে ঠেলে ঠেলে ঢুকিয়ে নিল।

ক্যাপ্টেন আমাদের তাজ্জব বনিয়ে দিয়ে ছোট্ট একটি কিতাব বের করে সুর করে পাঠ করতে লাগল।

আমি জমাটবাধা দুঃখের মধ্যেও ফিক্ করে হেসে ফেল্‌লাম।

ক্যাপ্টেন চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে মুহূর্তের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমার মুখের হাসিটুকু চেপে রেখে বল্‌লাম— 'সাহাব, এ কী করছেন আপনি। জাহাজ এমন চরম সঙ্কটের মুখে, যাত্রীরা জান হাতে নিয়ে আল্লাতাল্লার নাম করছে। আর আপনি কিনা, কিতাব খুলে বসলেন!'

—'জেনে রাখ, ওই যে ঝড় আসছে সেটি পয়গম্বর সুলেমান-এর সেনাবাহিনী। আর ওই দ্বীপে রয়েছে সুলেমান-এর সমাধি। তামাম দুনিয়ার কেউ-ই আজ পর্যন্ত সে-সমাধি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে নি। এর কাছাকাছি এলেই প্রবল তুফানের মুখে পড়ে জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তারপরও যদি কেউ কোন ক্রমে হাজির হতে পারে তবে ইয়া পেল্লাই সব ময়াল সাপের মুখ গহ্বরে তাকে যেতেই হবে।'

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন আবার কিতাবের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

এক সময় চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে ক্যাপ্টেন ব'লে উঠল—'ধ্যুৎ, হ'ল না!'

—'কি? কি হ'ল না সাহাব? কিছুই মালুম হ'ল না। কিসের বাৎ বলছেন—কি হ'ল না?'

—'দুর্যোগের ব্যাপার। দুর্যোগ কাটাবার কোন ফিকিরই দেখছি না। যা বুঝলাম, আরও প্রবল রূপ নিয়ে দেখা দেবে। ভাইসব, আমি সাফ বাৎ ব'লে দিচ্ছি, নিজের নিজের পথ খুঁজে নাও।'

ঝড় তখনও শুরু হয় নি। বৃষ্টি পুরোদমে চলছে। বৃষ্টির পানিতে জাহাজের পাটাতনে পানি থৈ থৈ করছে। আমরা কাপড়ের গাঁটরির চিন্তা করছি। ক্যাপ্টেন বল্‌ল— 'ধ্যুৎ, এসব ধান্দা ছেড়ে জান রাখার ফিকির কিছু করতে পার কিনা, দেখ। ঘূর্ণিঝড় উঠল বলে। জান রাখার ধান্দা কর। আমি বল্‌লাম, জিন্দা থাকলে ফিন দেখা হবে।'

সে-মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের চোখ-মুখের সে আতঙ্কের ছাপটুকু যে দেখেছিলাম, আজও আমার চোখের সামনে তা স্পষ্ট ভেসে ওঠে। আমি জানি না, সেদিনই ক্যাপ্টেন সাগরের পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল কিনা। জিন্দা থাকলেও তার সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা হয় নি।

ক্যাপ্টেন বিদায় নিতে না নিতেই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিল ঝড়। মুহূর্তে আমাদের এতবড় জাহাজটিকে শোলার মত উড়িয়ে প্রায় একশ' হাত ওপরে তুলে দুম্ ক'রে আছাড় মারল। আমরা কে, কোথায় ছিটকে পড়লাম ঠিক ঠিকানা নেই।

সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমি কোনরকমে জাহাজের একটি ভাঙা পাটাতন দেখে কোনরকমে সেটিকে আঁকড়ে ধরলাম। কাৎরাতে কাৎরাতে একসময় পাটাতনটির ওপর উঠতে পারলাম। ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত একটি দ্বীপের ধারে গিয়ে আমার পাটাতনটি আটকা পড়ে গেল।

আমি কোন রকমে হাতড়ে পাড়ে উঠে গেলাম। দুর্বল পা দুটো খুবই মেহনৎ ক'রে আমাকে দ্বীপের ভেতরের দিকে নিয়ে চল্‌ল। কিছুদূর যেতেই একটি নদী দেখতে পেলাম। ঠিক করলাম নদীর পানিতে আমার নিদানের সম্বল কাঠের পাটাতনটিকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দ্বীপটিকে দেখব। করলামও তা-ই।

স্রোতের টানে আমাকে নিয়ে পাটাতনটি তর্‌তর্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল। এক সময় পাটাতনটি গাছের সঙ্গে বেঁধে নদীর পাড়ের গাছ থেকে প্রচুর পাকা ফল পাড়লাম। গলা পর্যন্ত ঠেসে ফল খেলাম। তারপর ঢক্‌ঢক্ করে নদীর পানিও কিছু উদরে ঢুকিয়ে নিলাম। শরীর ও দিল্ দু'-ই কিছুটা চাঙা হয়ে উঠল। আরও কিছুটা এগিয়ে একটি বাঁক ঘুরতেই পড়লাম ভয়ঙ্কর এক বিস্ময়ের মুখে। নদীর স্রোত হঠাৎ অস্বাভাবিক বেড়ে গেল। দুর্বার গতিতে আমার পাটাতনটি এগিয়ে চল্‌ল। টাল সামলাতে না পেরে আমি অকস্মাৎ উল্টে পানিতে পড়ে গেলাম। পাটাতনটি আর আমার সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল। আমি স্রোতের টানে এগিয়ে চল্‌লাম। ধরেই নিলাম, এতদিন, এত দরিয়ার পানির সঙ্গে মোকাবেলা করেও জানটিকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু এ যাত্রায় আর রক্ষা নাই, জলের তোড়ে শক্ত পাড়ে আছাড় খেয়েই জানটি খোয়াতে হবে।

খোদা মেহেরবান। একদল জেলে মছলি ধরছিল। তাদের জালে আমি এবং আমার সাধের পাটাতনটি আটকা পড়ে গেলাম।

জেলেরা ব্যস্ত হয়ে জাল গোটাতে শুরু করল। ইয়া পেল্লাই এক মছলির মত তারা টানাটানি ক'রে আমাকে পারে তুলে নিল।

খোদাতাল্লা এবারও আমার জান রক্ষা করলেন। এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিনশ' তেরোতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন— 'জাঁহাপনা, মেহমান আর দোস্তদের কাছে সিন্দবাদ নাবিক তার সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা বলে চলেছে। সে এবার বল্‌ল— 'জেলেরা আমাকে পাড়ে তুলে নিল। দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানিতে থাকার ফলে আমার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। এক বুড়ো জেলে আমার গায়ে চর্বি জাতীয় এক ধরনের তরল পদার্থ মাখিয়ে দিতে লাগল। কাঁপুনি ধীরে ধীরে কমে এল। তারপর এক মকানে নিয়ে গিয়ে গরম পানি দিয়ে আচ্ছা করে গোসল করাল। এবার মোটামুটি স্বাভাবিকতা ফিরে পেলাম।

আমাকে তারা সাধ্যাতীত তোয়াজ খাতির করল। আচ্ছা সব খানাপিনা দিল।

তিনদিন কেটে গেল জেলেদের মহল্লায়।

চতুর্থদিন ভোরে সে বুড়োটি এল। চাটাই বিছিয়ে আমার মুখোমুখি বসল। সস্নেহে বল্‌ল— 'বেটা, আল্লাহ-র দোয়ায় এ-যাত্রায় জব্বর ফাড়া কাটিয়ে উঠলে। আমরা তো তোমার আসা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

আমি নীরব চাহনি মেলে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে ম্লান হাসলাম।

বুড়ো এবার বল্‌ল— 'বেটা, এবার বল তো, কে তুমি? তোমার মকান কোথায়? কোথায় গিয়েছিলে? যাচ্ছিলেই বা কোথায়?'

—'আমার নাম সিন্দবাদ। সওদাগরী কারবার করি।' এবং বিপর্যয়ের মুখে পড়ার পর থেকে মোউতের সঙ্গে মোকাবেলা ক'রে কিভাবে জান টিকিয়ে রেখেছি বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম।

বুড়ো আমার দিকে তার নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে কয়েক মুহূর্ত নীরবে আমার আপাদমস্তক বার কয়েক দেখল।

এক সময় বুড়োটি বল্‌ল— 'বেটা, তোমার সামানপত্র কিছুই খোয়া যায় নি। সবই আমার জিম্মায় রেখে দিয়েছি। সেগুলো নিয়ে তোমার মুলুকে ফিরে যাওয়ার ধান্দা কর।'

—'সামানপত্র? কিসের সামানপত্র? কিছুই তো আমার দিমাকে আসছে না।'

—'বেটা, যে কাঠের পাটাতনের ওপর বসে তুমি নদী পাড়ি দিচ্ছিলে সেটি চন্দনকাঠের। বহুৎ দামী চিজ। আমার সঙ্গে বাজারে গেলে আমি তোমাকে উপযুক্ত দাম পাইয়ে দিতে পারি।'

—'আপনি সমঝদার আদমি। পরোপকারী ও মহা ধার্মিক, আপনি সেটি নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়ে আসুন। আমাকে যেটুকু অর্থ দেবেন তাতেই আমি খুশী থাকব।'

তবু বাজার দেখাবার নাম ক'রে বুড়োটি এক রকম জোর করেই আমাকে বাজারে নিয়ে গেল।

আমার চন্দন কাঠের পাটাতনটি নিলামে উঠল। এক হাজার দিনার থেকে শুরু করে দর বাড়তে বাড়তে দশ হাজার দিনার পর্যন্ত উঠে গেল।

ব্যাপার দেখে আমি তো অবাক।

আমাকে ততোধিক অবাক করে দিয়ে বুড়ো এবার বল্‌ল— 'ও-বেটা বাজার বহুৎ মন্দা। নইলে এর দাম আরও উঠত।'

আমি মুচকি হেসে বল্‌লাম—'কি করা যাবে, বলুন। দশ হাজার দিনারেই দিয়ে দিন।'

—'ঠিক আছে আমি আরও এক শ' দিনার বেশী দিয়ে দেব। আমাকেই দিয়ে দাও!'

আমি সবিস্ময়ে বল্‌লাম—'আপনিই নেবেন? তা-ই যদি হয় তবে আর এত দূরে, বাজার পর্যন্ত পাটাতনটিকে বয়ে আনার জরুরৎ কি ছিল, বুঝছি না তো? আর আপনি আমার জান রক্ষা করেছেন। তার দাম কি দিনার-দিরহাম দিয়ে শোধ করার মত?'

বুড়োর এক নোকর পাটাতনটি তার গুদামে নিয়ে গেল। সকালে ফিরে বুড়ো দশ হাজার এক শ' দিনার জোর ক'রে আমার কোর্তার জেবে পুরে দিল।

দুপুরে খানাপিনা সারতে সারতে বুড়ো আমাকে বল্‌ল—'বেটা, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।'

আমি সচকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

বুড়ো ব'লে চল্‌ল—'আমার একটি বেটি আছে। খুবসুরৎ এক মাত্র বেটি। আমি গোরে গেলে আমার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র মালিক তো সে-ই হবে। তুমি তাকে শাদী করে আমার আপনজন বনে যাও।'

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। হ্যাঁ-না ভাল-মন্দ কিছুই বল্‌লাম না।

বুড়ো বুঝল শাদীর ব্যাপারে মৌন থাকার অর্থই হচ্ছে, সম্মতি আছে! বুড়ো এবার খপ ক'রে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বল্‌ল—'বেটা, তোমার কাছে আমার দাবী একটিই—'শাদী করার পর আমি যে কয়দিন জিন্দা থাকব, আমাকে একা ফেলে বিবিকে নিয়ে নিজের মুলুকে চলে যেয়ো না। আমি গোরে চলে গেলে চাই এখানে থাক আর নিজের মুলুকে চলে যাও আমি তো আর দেখতে আসছি না।'

—'দেখুন, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনার দোয়াতেই যখন আমার জান রক্ষা হয়েছে তখন তো আমার ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে না। আদতে আমি তো দ্বিতীয় জীবন লাভ করেছি।'

বুড়ো সোল্লাসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—'জিন্দা রহ বেটা।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' চৌদ্দতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ প্রায় মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সিন্দবাদ নাবিক তার দোস্ত ও মেহমানদের কাছে তার সপ্তম ও শেষ সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা ব'লে চলেছে। সে বল্‌ল—বুড়োটি আমার কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে কাজীকে তলব করলেন। শাদীর কবুলনামা বানানো হ'ল।

তারপর আত্মীয় মেহমানদের উপস্থিতিতে মহা ধূমধাম ক'রে তাঁর একমাত্র বেটিকে আমার হাতে তুলে দিলেন।

আমি বুড়োর মকানে এতদিন মেহমান হয়ে দিন গুজরান করছি কিন্তু আগে তার মুখ দেখা তো দূরের কথা তার সালোয়ার কামিজের অংশও দেখতে পাইনি কোনদিন। সে তখন যে আমার বিবির আসন লাভ করেছিল আজও বহাল তবিয়তে আমার ঘর করে চলেছে।

শাদীর রাত্রে সে নাকাবে মুখ ঢেকে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথম দর্শনেই তার সুরৎ আমাকে মুগ্ধ করে। আমার কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দেয় আর খুনে জাগায় মাতন। বহুৎ দিন বাদে এক খুবসুরৎ যুবতীর কবোষ্ণ বক্ষ আমার মধ্যে কামোন্মাদনা জাগিয়ে তুল্‌ল। দিল্ ভরে তাকে সম্ভোগের মাধ্যমে নিজে তৃপ্তি

পেলাম আর তাকেও তৃপ্তির সাগরে ভাসিয়ে দিলাম।

নতুন শাদী করা বিবিকে নিয়ে আমি খুশীতে দিন গুজরান করতে লাগলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার নতুন শ্বশুর বেহেস্তে চলে গেলেন। মহাধূমধামের সঙ্গে মহল্লার বহুৎ আদমির উপস্থিতিতে তাকে গোর দেয়া হল।

বসন্তকালে সে-মুলুকের আদমিরা উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে।

বসন্তোৎসবে এখানকার আদমীরা আশমানে ওড়ে। আমারও শখ হ'ল আশমানে উড়ব। তারপর এখানকার আদমীদের মত আমিও নিচে নেমে আসব।

কিন্তু সমস্যা হ'ল, আমার আশমানে ওড়ার শখের ব্যাপারটিকে আমার বিবি তো নয়-ই এমন কি মহল্লারও কেউ পাত্তা দিল না। এমন কি আশমানে ওড়ার কায়দাও কেউ আমাকে শিখিয়ে দিল না। এ তো মহা সমস্যায় পড়া গেল।

শেষ পর্যন্ত খুব ক'রে ধরার পর একজন বহুৎ কসরৎ ক'রে আমাকে আশমানে ওড়ার কৌশল শিখিয়ে দিল।

বসন্তোৎসবের দিন আমি অন্যান্যদের সঙ্গে আশমানে উড়ে চল্‌লাম। উঁচু-উঁচু-আরও উঁচুতে উঠে গেলাম। অনবরত নকল ডানা নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমি বাতাসে ভর দিয়ে বহুৎ উঁচুতে উঠে

গেলাম। ব্যস, আমি ডানা ভেঙে নিচে পড়তে লাগলাম।

আমার পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। নসীবের জোরে অল্পের জন্য আমার জান টিকে গেল।

আমি পাহাড়ের এক চূড়ার কাছাকাছি প্রায় সমতল এক জায়গায় গালে হাত দিয়ে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম।

হঠাৎ দু'দু'টি সুদর্শন লেড়কা আমার সামনে এসে দাঁড়াল, কোন লেড়কার সুরৎ যে এমন অনন্য হতে পারে আমার অন্তত জানা ছিল না।

আমি সবিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম—'বেটা, তোমরা কে? এখানেই বা কি করতে এসেছ?'

—'আমরা আল্লাহ-র বরপুত্র।' কথা বলতে বলতে তাদের একজন আমাকে একটি সোনার লাঠি দিয়ে বল্‌ল—'এ-পথ ধরে চলে যাও। ডর নেই। যাও, এগিয়ে যাও।' আমি লাঠিটি হাতে নিয়ে তাদের নির্দেশিত পথ ধ'রে এগোতে লাগলাম। আর অনবরত মুখে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে থাকলাম।

পথ পাড়ি দিতে দিতে ভাবছি, ব্যাপার কি! লেড়কা দুটো কারা! তারা এখানেই বা কিভাবে এবং কেন এল! আরও সামান্য এগোতেই এক বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখি, সামনে এক বিষধর সাপ আমার দিকে মুখ ক'রে। তার মুখে এক হতভাগ্য। তার দেহের প্রায় তিনভাগই সাপটির মুখের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

কী বীভৎস দৃশ্য! আমি উপায়ান্তর না দেখে হাতের লাঠিটি ছুঁড়ে মারলাম শাপটিকে লক্ষ করে।

আমি আরও অবাক মানলাম, যখন দেখলাম ছোট্ট এক লাঠির আঘাতেই সাপটি এলিয়ে পড়ে গেল। আর খতমও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

আমি উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে হতভাগ্যটিকে বিষধর সাপটির মুখগহ্বর থেকে ছুটে বের ক'রে ফেল্‌লাম।

হতভাগ্যটি বল্‌ল—'আমি আদমিটাদমি কিছু নই। আমি—' তাকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই আমি সবিস্ময়ে বলে ওঠলাম—'তুমি আদমি নও! তবে? তবে কি তুমি!'

—'জিন। এ-পথে উড়ে যাচ্ছিলাম। তোমার মুখে আল্লাতাল্লার নাম শুনে আমি হঠাৎ কক্ষচ্যুত হয়ে যাই। পাথরের ওপর পড়তেই সাপটি আমাকে টপ্ ক'রে মুখে পুরে নেয়।' তারপর বল্‌ল—'তুমি আমার জান বাঁচিয়েছ। তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব। বল, তোমার কোন্ কাজে আমি লাগতে পারি।

—'বহুৎ আচ্ছা! তবে এক কাজ কর। আমাকে আমার বিবির কাছে দিয়ে এসো।'

মুচকি হেসে সে আমাকে এক ঝটকায় পিঠে তুলে নিল। বায়ুর বেগে উড়তে উড়তে চোখের পলকে আমার মকানের দরওয়াজায় নামিয়ে দিল।

আমার বিবি তখন হাপুস নয়নে কান্নাকাটি করছে। এরই মধ্যে কয়েক বদনা চোখের পানি ফেলেছে। সে নিঃসন্দেহ আমার কম্মফতে হয়ে গেছে। আমাকে পেয়ে বলল—'এ-শয়তানের মুলুকে আর নয়। চল, জমি জিরাত আর মকান প্রভৃতি যা আছে বিলকুল বিক্রিটিক্রি ক'রে আমরা এখান থেকে চম্পট দেই।'

—'তারপর? যাবে কোথায়?'

—'কেন, বাগদাদে। তোমার নিজের মুলুকে। আমার আব্বাজীরও তো সেরকমই মত ছিল—তিনি গোরে যাবার পর আমি যেন তোমার সাথে বাগদাদে চলে যাই। আমার আব্বাজী অগাধ সম্পত্তি রেখে গেছেন। বিলকুল বেচে সাফসুতরা হয়ে যাও। তারপর একটি সওদাগরী জাহাজ খরিদ ক'রে সামানপত্র নিয়ে এখান থেকে চল চম্পট দেই।'

—'হ্যাঁ, বহুৎ আচ্ছা মতলব! বিবিজান, তবে তা-ই করা যাক।'

অত্যাবশ্যক কিছু সামানপত্র রেখে বাকী সব দিলাম নিলামে চড়িয়ে। প্রচুর দিনার আমদানি হয়ে গেল। একটি জাহাজ খরিদ ক'রে ফেললাম। তারপর বিবিকে নিয়ে জাহাজে উঠলাম। ব্যস, বসরাহ বন্দর হয়ে আমরা সোজা বাগদাদে পৌঁছে গেলাম।

আমার নয়া বিবিকে দেখে আত্মীয়-দোস্তরা তো মহাসুখী।

সুদীর্ঘ সাতাশ সাল বাদ আমি মুলুকে ফিরে এসেছি। আমার আত্মীয়-দোস্তরা বল্‌ল—'সিন্দবাদ, জনমভর তো সাগরে ভেসে বেড়ালে আর পরদেশে ঢুঁড়ে বেড়ালে। এখন বুড়ো হয়েছ। হাড্ডির জোর কমে গেছে, এবার ঘরে থিতু হও। যে ক'দিন দুনিয়ায় থাক বিবি-বালবাচ্চা নিয়ে কাটিয়ে দাও।'

আমিও সেরকমই ভাবলাম। আমার অগাধ ধন দৌলত। বাগদাদের সেরা ধনী। বিবি আর বালবাচ্চা নিয়ে ঘর সংসারে লিপ্ত থাকব। আর অবসর বিনোদনের জন্য ইয়ার দোস্তরা তো রয়েছেই। তারপর থেকে বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করে সুখে দিন গুজরান করছি।'

সিন্দবাদ নাবিক এবার সিন্দবাদ কুলির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বল্‌ল—'দোস্ত, এবার ভেবে দেখ তো তোমার বয়সে আমার জীবন যাত্রার সঙ্গে তোমার কী আশমান-জমিন ফারাক। আমি প্রায়ই এমন পরিস্থিতিতে পড়তাম। জিন্দেগীতে আর কোনদিন বিবি আর বালবাচ্চার কাছে ফিরতে পারব কিনা একমাত্র আল্লাতাল্লাই জানতেন। আর তুমি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে দিনভর মোট বয়ে বেড়াও। কিন্তু তোমার তো এক ভরসা থাকে দিনের শেষে ফিন ঘরে ফিরে বিবি আর বালবাচ্চার মুখ দেখতে পাবেই।'

সিন্দবাদ কুলী এবার বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিকের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে অনুতাপের স্বরে ব'লে উঠল—'জী, আমাকে মাফ করে দেবেন। আমার সেদিনের দুঃখের গানা শুনে আপনি নির্ঘাৎ গোস্‌সা করেছেন। এবার আমি আদৎ বাৎ সমঝেছি—যে আদমি যেরকম কর্ম করে ফলভোগও সেরকমই করে।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শেষ করে এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা কিস্‌সা খতম হ'ল বটে। তবু বলছি। সিন্দবাদ নাবিক আর সিন্দবাদ কুলীর মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক কিন্তু জিন্দেগীভর অক্ষুণ্ণ ছিল। সিন্দবাদ কুলী দিনভর কাজকর্মে লিপ্ত থেকে দিনের শেষে দোস্ত সিন্দবাদ নাবিকের মকানে হাজির হয়। খানাপিনা, নাচা-গানা আনন্দ-স্ফূর্তি চলে প্রায় সারা-রাত্রি অবধি । তারপর ফিরে আসে বিবি আর বালবাচ্চার কাছে।'

বেগম শাহরাজাদ সিন্দবাদ নাবিকের সর্বশেষ সমুদ্রযাত্রার কিস্‌সা শেষ ক'রে চুপ করলেন।

ইতিমধ্যে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচার পাখিদের কিচিমিচি শুরু হয়ে গেছে। ভোরের পূর্বাভাষ।

বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। নানাভাবে তাঁকে আদর সোহাগ করতে থাকেন।

এমন সময় উজিরের ছোট লেড়কি দুনিয়াজাদ তার দিদির গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠল—'বহিনজী, তোমার কিস্‌সা কী সুন্দর! কিস্‌সা শুনলে—'

বেগম শাহরাজাদ অধৈর্য ভরে তাকে ধমক দিয়ে ওঠে—'চুপ কর মুখপুড়ী! সময়-অসময় বোঝে না! ওদিকে যা। পাশ ফিরে শুয়ে থাক। কিশোরী দুনিয়াজাদ পাশ ফিরে শোয়ামাত্র তারা উভয়েই সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বাদশাহ ধীরে ধীরে নিজের ঠোঁট দুটোকে বেগমের ঠোঁটের কাছে নিয়ে যান। তারপর চুম্বনের মাধ্যমে নিজে তৃপ্তিলাভ করেন আর উদ্ভিন্না যৌবনা বেগমকে তৃপ্তিতে তৃপ্তিতে ভরিয়ে তোলেন। তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব—দলন, পেষণ ও সম্ভোগের মাধ্যমে পরমতম তৃপ্তি লাভের পর্ব।

এক সময় বাদশাহ শারিয়ার বেগমের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মৃদু হাঁপাতে লাগলেন।

বেগম শাহরাজাদও বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তৃপ্তির রেশটুকুর পুরোপুরি উপলব্ধি করতে লাগলেন।

দুনিয়াজাদ এবার পরিস্থিতি অনুকূলে এসেছে অনুমান ক'রে পাশ ফিরল। শাহরাজাদের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল—'বহিনজী, তোমার কিস্‌সা কী সুন্দর! সিন্দবাদ নাবিকের কিস্‌সা তো দিল্‌কে একদম উতলা ক'রে দেয়, রোমাঞ্চ জাগায়।'

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'বহিন এ তো নিছক কিস্‌সাই নয়। সিন্দবাদ নাবিকের দুঃসাহসিক নৌ-অভিযানের ঐতিহাসিক সত্যতাও রয়েছে। এ মিথ্যে নয়, মনগড়া কিস্‌সাও নয়।'

বাদশাহ শারিয়ার ভাবলেন, লেড়কিটির রূপ-যৌবন যেমন শরীর ও দিলকে তৃপ্তি দেয় তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ দান করে তার কিস্‌সাগুলি। এর মধ্যে না জানি রোমাঞ্চকর কত কিস্‌সাই না রয়েছে। আমার চোখের নিদ কেড়ে নিয়েছে। একে কোতল করলে তার দিল-পাগল করা কিস্‌সা থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হবে। না, এর কিস্‌সা শেষ না হওয়া অবধি একে টিকিয়ে রাখতেই হবে।'

বাদশাহ শারিয়ার যখন নিজের কর্তব্য নির্দ্ধারণে ব্যস্ত তখন বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'বহিন, আল্লাতাল্লা যদি জান টিকিয়ে রাখেন তবে কাল তোমাদের আলী শার ও জুমুর্‌রুদ'-এর কিস্‌সা শোনাব।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বল্‌লেন—'দেখি, আল্লাতাল্লা-র কি মর্জি।'

বাদশাহ শারিয়ার আর কিছু না বলে বেগমের কোলে মাথা রেখে চোখদুটো বন্ধ করলেন।

আলী শার ও জুমুর্‌রুদ-এর কিস্‌সা

তিন শ' ষোলতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর আসতে না আসতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে খোরাশান নগরে এক বণিক বাস করত। সে ছিল খুবই ধনী। তার নাম ছিল গ্লোরি।

বণিক গ্লোরি-র এক খুবসুরৎ লেড়কা ছিল। তার নাম আলী শার। গ্লোরি ছিল বৃদ্ধ। অতিবৃদ্ধ। শরীরের তাগদ শেষ সীমায় এসে পড়েছে। কোনরকমে চলাফেরা করতে পারে, ব্যস এটুকুই। ব্যবসাপত্র দেখভাল করার ক্ষমতা সে প্রায় হারিয়েই ফেলেছে।

বৃদ্ধ গ্লোরি একদিন তার লেড়কাকে কাছে ডাকল। তার গায়ে-

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্ল—'বেটা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এবার যে আমাকে খোদাতাল্লার কাছে যেতেই হচ্ছে।' আলী শার আব্বার মুখের দিকে বিষণ্ন মুখে, নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। কি বলবে, এ পরিস্থিতিতে কি বলা উচিত সে সহসা গুছিয়ে উঠতে পারল না।

বৃদ্ধ গ্লোরি ব'লে চল্ল—'হ্যাঁ বেটা, আমাকে এবার যে যেতেই হবে। যাবার আগে তোকে কয়েকটি বাৎ বলে যেতে চাইছি।'

—'আব্বাজান, কি? কি বাৎ?'

—'বেটা, আমার বাৎ ইয়াদ রাখবি। এ-দুনিয়ার সাথে নিজেকে কোনদিন, কোন অবস্থাতেই জড়িয়ে ফেলবি না।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বল্ল—'তামাম দুনিয়াটিই এক পেল্লাই কামারশালা। তোকে হয় আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁক করবে, নয়ত টকটকে লাল আগুনের টুকরায় তোর চোখ দুটোকে অকেজো ক'রে দেবে। আর তা নইলে নিদেন পক্ষে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোর দম বন্ধ ক'রে ছাড়বে। দুনিয়ার কাছ থেকে এমন কিছু পাবি না যার মাধ্যমে ফয়দা কিছু লুঠতে পারবি।'

—'আব্বাজান, আপনার উপদেশ আমি জরুর ইয়াদ রাখব। আমার প্রতি আপনার আর কোন উপদেশ থাকলে বলুন।'

—'যদি পারিস তবে কারো উপকার করবি। কিন্তু ইয়াদ রাখবি বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করবি না। তবে এ-ও ইয়াদ রাখবি, পরোপকার বা আচ্ছা কোন কাজ করার সুযোগ কিন্তু হরবখত আসে না। তাই আচ্ছা কোন কাজ হাতের কাছে—'

বণিক গ্লোরি-র কথা শেষ হবার আগেই আলী শার ব'লে উঠল—'আব্বাজান আপনার এ বাৎ-ও আমি জরুর ইয়াদ রাখব।'

—'আমি তোর জন্য প্রচুর ধনদৌলত রেখে গেলাম। খবরদার কিছুই নষ্ট করবি না। অকারণে-অবহেলায় ফুঁকে দিস নে যেন। আর এক বাৎ ইয়াদ রাখবি, দুনিয়ায় যার অর্থকড়ি আছে আদমিরা তাকেই খাতির করে, আদমি ব'লে জ্ঞান করে।'

—'জরুর ইয়াদ রাখব আব্বাজান।'

—'আর একটি বাৎ, দিন গুজরান করতে গিয়ে যার অভিজ্ঞতা তোর থেকে বেশী তাকে কখনও অগ্রাহ্য করবি না। বরং তার সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা যতটুকু পারিস নিয়ে নিবি। আর পরদেশে যেতে গেলে সবার আগে পাকা মাথাওয়ালা আদমির পরামর্শ নিয়ে তবে পাড়ি জমাবার ধান্দা করবি। অবশ্যই তার আগে নয়।'

—'এ-ও জরুর ইয়াদ থাকবে আব্বাজান।'

—'এবার তোকে আমার শেষ বাৎ শোনাতে চাইছি।'

—'বলুন আব্বাজান, কি সে বাৎ।'

—'দুনিয়ায় যতদিন থাকবি, ভুলেও কোনদিন সরাব স্পর্শ করবি না। ইয়াদ রাখবি, জ্ঞানী-গুণীদের মতে, সরাব হচ্ছে দোজাখের দক্ষিণ দুয়ার।'

—'জরুর ইয়াদ রাখব আব্বাজান।

—'সরাব পেটে গেলে কৌন্ কাম আচ্ছা আর কোন্ কাম বুরা সে-জ্ঞান দিল্ থেকেই লোপ পেয়ে যায়। বেটা, আমার বাৎ ইয়াদ রাখবি, আমি দিল থেকে তোকে দোয়া করছি। এ-দোয়া তোকে সর্বদা ঘিরে থাকবে, বিপদ আপদের মুহূর্তে রক্ষাকবচের মত কাজ করবে।'

—'এ-ও আমি জরুর ইয়াদ রাখব আব্বাজান।'

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বাৎচিৎ করায় বৃদ্ধ বণিক হাঁপাতে লাগল। পর মুহূর্তেই একটু স্বস্তি লাভের প্রত্যাশায় চোখ বুজল।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে বিশ্রাম নেবার পর বৃদ্ধ ফিন চোখ মেলে তাকাল। তারপর এক সময় হাতদুটো ওপরে তুলে, ঠোঁট দুটো তিরতির ক'রে কাঁপিয়ে অস্পষ্টস্বরে কি যেন বলতে শুরু ক'রে। বলতে পারল না। শেষবারের মত হয়ত আল্লাহ-র প্রার্থনা সেরে নিল।

এক সময় বৃদ্ধ বণিকের চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এল। দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে আল্লাহ-র দরবারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল।

আব্বার মৃত্যুর পর আলী শার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কারবার দেখা শোনা করার কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করল।

বিদায় মুহূর্তে তার আব্বাজী যেসব উপদেশামৃত দান ক'রে গেছে তা পালন করার কিছুমাত্র যৌক্তিকতা আছে বলে জ্ঞান করল না। সে গোড়া থেকেই হিতাকাঙ্ক্ষীদের এড়িয়ে চলতেই বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ল।

কিছুদিনের মধ্যেই আলী শার-এর কিছু নয়া নয়া দোস্ত জুটে গেল। সুযোগ সন্ধানী দোস্ত। দোস্তীর অছিলায় নিজের আখের গোছাবার ধান্দা এরকম কিছু নওজোয়ান তার চারদিকে মৌমাছির মত ঘুর ঘুর করতে লাগল। সে তাদের কাছে যেন মাথা বিকিয়ে দিয়েছে এরকম ভাব নিয়ে চলাফেরা করতে লাগল।

আলী শার-এর নয়া দোস্ত যারা এল তাদের অধিকাংশের আম্মা আর বহিনরা দেহ বিক্রি ক'রে রুটির বন্দোবস্ত করে। সে নিজের মনে বলে—'আব্বাজান যে অপরিমিত ধন দৌলত রেখে গেছেন তা যদি আমি নিজে না ভোগ করি তবে ফয়দা যা হবে তা হচ্ছে, অন্যের ভোগের জন্য রেখে দেয়া। সেটি হতে দিচ্ছিনে। আমি নিজেই ভোগ ক'রে দুনিয়ার যা কিছু সুখ সাচ্ছন্দ্য উপভোগ ক'রে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

আলী শার ভোগ-লালসা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য উঠে পড়ে মেতে গেল। ভোগের সঙ্গে দুর্ভোগের নিকট-সম্বন্ধ।

ভোগের পরেই আসে দুর্ভোগ। আলী শার-এর ক্ষেত্রেও এর সত্যতা লক্ষিত হ'ল। অর্থকড়ি যা কিছু ছিল ফুরোতে ফুরোতে এক সময় একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। শেষে হালৎ এমন হ'ল—বসতবাটী, আসবাবপত্র, বাসনকোসন যা কিছু ছিল সবই খোয়াতে হ'ল তাকে।

এক সময় আলী শার একেবারে ভিখমাঙ্গাতে পরিণত হয়ে গেল। সব কিছু খুঁইয়ে সে এবার অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারল, আব্বাজান তাকে যে উপদেশবাণী দিয়ে গিয়েছিল তা তার রেখে যাওয়া বিত্তসম্পদের চেয়েও ঢের ঢের মূল্যবান।

যেসব ইয়ার দোস্তরা এতদিন মৌমাছির মত আলী শার-এর চারদিকে ঘুর ঘুর করত তারা মৌচাক মধুহীন হয়ে পড়ায় নানা অছিলায় এক এক ক'রে কেটে পড়তে লাগল।

আলী শার-এর পরিস্থিতি এবার এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে রুটির জোগাড় করাই তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। অনন্যোপায় হয়ে তাকে ভিক্ষার বাটি হাতে তুলে নিতেই হ'ল।

একদিন ভিক্ষার বাটি হাতে ভিক্ষা করতে করতে আলী শার বাজারের কাছে এসে হাজির হ'ল। বাজারে ঢোকার মুখে হঠাৎ সে দেখতে পেল, এক জায়গায় কিছু আদমি জড়ো হয়ে কি যেন করছে। তার কৌতূহল হ'ল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখে খুবসুরৎ এক লেড়কি। তাকে ঘিরেই এ-জটলা।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সতেরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আলী শার ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা আদমিদের পুছতাছ ক'রে জানতে পারল, লেড়কিটিকে বিক্রি করার জন্য বাজারে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। আলী শার বিস্ময়মাখানো দৃষ্টিতে লেড়কিটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল। বাস্তবিকই খুবসুরৎ লেড়কিই বটে। যেন বেহেস্তের হুরী। গুলাবের পাঁপড়ির মত তার ঠোঁট দুটো। মুখ নয় তো যেন গোটা একটি পান বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আর গায়ের রঙ, দুধে-আলতায়। সূর্যের অত্যুজ্জ্বল কিরণ পড়ায় লেড়কিটির শরীরের দৃশ্য স্থানগুলো যেন চিকচিক করছে।

লেড়কিটির বুকের ওপরে দৃষ্টি পড়তেই চোখের মণি দুটো থমকে গেল। দৃষ্টি আটকা পড়ে গেল। বাস্তবিকই বুক দুটোর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো দায়। হবে না-ই-বা কেন? পূর্ণ যৌবনা লেড়কিটির নিটোল স্তন দুটোর ভারে সে যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইছে। আর তার নিতম্বটিও যেন সালোয়ার-কামিজের বাধা অগ্রাহ্য করে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর কোমরটিকে যেন হাতের মুঠোয় ধরে ফেলা সম্ভব। সব মিলিয়ে লেড়কিটিকে

বেহেস্তের হুরী মনে করলেও ভুল হবে না।

আলী শার বার কয়েক খুবসুরৎ লেড়কিটিকে নিরীক্ষণ ক'রে এক সময় স্বগতোক্তি করল—'শোভন আল্লা! বেহেস্তের হুরী যে জমিনে নেমে এসেছে!'

আলী শার লেড়কিটির রূপের সায়রে তলিয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। নিষ্পলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল-নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লেড়কিটির চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা আদমিগুলোর মধ্যে কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগল—'এমন বেহেস্তের হুরীকে খরিদ করার সামর্থ্য একমাত্র গ্লোরি-র বেটা আলী শার-এরই রয়েছে।' আসলে তারা তো জানে না আলী শার যে ইতিমধ্যেই স্ফূর্তি ক'রে পৈত্রিক সম্পত্তির কানাকড়ি পর্যন্ত ফুঁকে দিয়ে আজ ভিক্ষার বাটি সম্বল করেছে।

এবার যে-দালালটি লেড়কিটিকে বেচার জন্য বাজারে নিয়ে এসেছে সে অভিজ্ঞ চোখ দুটোকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা আদমিদের ওপর বার কয়েক বুলিয়ে নিয়ে চিল্লাতে শুরু করল—এ-মরুভূমি অঞ্চলের আমীর-ওমরাহরা শুনুন—বেহেস্তের হুরীর মত এ-লেড়কিটির নাম জুমুর্‌রদ। একেবারে একশ ভাগই আনকোরা। কোন মরদ আজ পর্যন্ত একে ছুঁতেও পারে নি। রাতের আন্ধারে বহুৎ লেড়কিকে নিয়ে সম্ভোগ করা যেতে পারে বটে। কিন্তু এর সমান আরাম-আনন্দ কোন লেড়কির কাছ থেকেই মিলবে না। এ যেন এক গুলাবের তোড়া—খুসবুতে নেশা লাগাবে, দিল্‌কে মাতোয়ারা ক'রে দেবে। দর হাঁকুন, নিলাম ডাকুন, রাতো কী বেগম জুমুর্‌রদ আপনার জিন্দেগীকে ভরপুর ক'রে তোলার জন্য হাজির। ডাকুন—দর হাঁকুন।'

এক ব্যাপারী সবার আগে পাঁচ শ' দিনার দর হাঁকল।
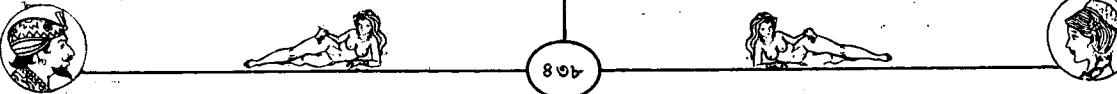
সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে অন্য এক ব্যাপারী ব'লে উঠল পাঁচ শ' দশ দিনার।

রসিদ আল-দিন নামে এক মাঝ-বয়সী কদাকার আদমী ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ঠোঁটের কোণ বেয়ে তার পানের পিক গড়াচ্ছে, চোখের কোণে ডেলা পাকানো পিচুটি। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় হাঁকল —'আমার দর ছয় শ' দিনার।'

পাশ থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল—'ছয় শ' দশ দিনার।'

মাঝ বয়সী কদাকার আদমিটির ইজ্জতে লাগল, সে কোমরের লুঙ্গিটিকে গোছগাছ করতে করতে হেঁকে বল্ল—'বহুৎ আচ্ছা, আমার দর তবে পুরো এক হাজার দিনার রইল।' ব্যস আর কেউ সাহস ক'রে এগিয়ে এল না। নিলাম এখানেই খতম হয়ে গেল।

দালালটি এবার ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লেড়কিটির মালিককে বলল—'জী, এক হাজারের বেশী দর যে উঠছে না। কি করবেন? মাল খালাস ক'রে দেবেন, নাকি—'

—'হ্যাঁ, এক হাজারেই ছেড়ে দেব। লেকিন তার আগে এক কাম করতে হবে, সে লেড়কিটিকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, ওর পছন্দ মাফিক আদমির কাছেই ওকে বেচব। তুমি একবার ওর মতামত জেনে নাও তো।'

জুমুর‍্যদ একবার রসিদ অল-দিন-এর দিকে চোখ ফিরিয়েই আঁৎকে উঠে বলে—'এ কোন হতচ্ছাড়া বাঁদরমুখোর হাতে আমাকে তুলে দিতে চাইছ? দোজখের কীটও বুঝি এর চেয়ে সাফ সুতরা! আমার মুখের দিকে লালসা-মাখানো দৃষ্টিতে ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে কেমন তাকিয়ে রয়েছে একবারটি চেয়ে দেখ। এর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে রাত্রি কাটাতে হবে ভাবলেই আমার গা ঘিন ঘিন করছে! রক্ষে কর ওটি আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

দালালটি ফিন সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভিড়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে এবার হাঁক দিল—'এক হাজার দিনারের বিনিময়ে বেহেস্তের এ হুরীটি'কে আর কে খরিদ করতে রাজী আছেন, বলুন?'

এবার অন্য আর এক মাঝ-বয়সী চিল্লিয়ে উঠল—'আমি, আমি খরিদ করতে চাই। আমি দেব এক হাজার দিনার।'

জুমুর‍্যদ এবার তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, এ-আদমিও মাঝ-বয়সী বটে। তবে রসিদ আল-দিন-এর মত এতটা কদাকার নয়। ঠোঁটের কোণে পানের পিক বা চোখের ধারে পিচুটির চিহ্ন মাত্রও নেই। তবে মোটামুটি বুড়ো। কিন্তু আদৎ বয়সকে লুকোবার ধান্দা করেছে। চুল আর দাড়িতে আচ্ছা ক'রে কলপ মেখে জোয়ান মরদ সাজার কোশিস করেছে।

আদমিটির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে জুমুর‍্যদ নাক শিঁটকে, মুখ বাঁকিয়ে বলে ওঠে—'ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এর সঙ্গে! কী শরমের ব্যাপার! ছোড়া সাজার কোশিস করেছে বটে! কিন্তু আদতে তো বুড়োই বটে।'—

জুমুর‍্যদ চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে দ্বিতীয় জনকেও বাতিল ক'রে দিল। পরিস্থিতি অনুকূল বুঝে অন্য একজন এগিয়ে এসে গম্ভীর স্বরে বলল—'আমি—আমি দিচ্ছি এক হাজার দিনার। এই নিন দিনারের থলি আর আমার মাল আমাকে বুঝিয়ে দিন।'

জুমুর‍্যদ এবার নতুন আদমিটির দিকে তাকিয়েই ফিক ক'রে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে ওঠে।

এবারের আদমিটি কানা। একটি চোখ খোয়া গেছে। জুমুর‍্যদ হাসি থামিয়ে এবার বলল—'তোমরা কি আর খরিদ্দার পেলে না, শেষ পর্যন্ত যতসব কানা-খোড়া ধরে নিয়ে আসছ। জানা নেই, কানারা মিথ্যাবাদী হয়। ফিন মিথ্যাবাদীরাও কানা হয়। কানা আর মিথ্যাবাদীর মধ্যে ফারাক কিছু নেই।

কানা খদ্দেরটি বাতিল হয়ে যাবার পর আর একজন এগিয়ে এল। বেটেখাটো, রীতিমত গাট্টাগোট্টা। গায়ে গোস্তর পরিমাণ একটু বেশীই বটে। সংক্ষেপে বললে, বাতাবী লেবুর মত গোলগাল চেহারা। মুখে ইয়া লম্বা এক গোছা দাড়ি। নামতে নামতে একেবারে তলপেট পর্যন্ত চলে গেছে।

জুমুর‍্যদ নতুন নাগরটিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলল—'কী আমার নাগর বাছাই করেছে রে! গায়ে একগাদা লোম। যেন জঙ্গল থেকে বেরিয়েই সোজা বাজারে হাজির হয়েছে।'

জুমুর‍্যদ এক এক ক'রে চারজনকেই বাতিল ক'রে দিয়েছে।

ব্যাপারটি দালালের মোটেই মনঃপুত হ'ল না। সে রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। লেড়কির মালিককে বলল—'আমি হার মানছি ভাইজান! মালুম হচ্ছে আমার দ্বারা এ কম্ম হবার নয়।' এবার জুমুর‍্যদ'কে লক্ষ্য ক'রে বলল তোমার মরদ তুমি বেছেটেছে নাও। আমার দ্বারা হবার নয়। তুমি এদের মধ্য থেকে তোমার পছন্দমাফিক—সবাই নগরের গণ্যমান্য ব্যাপারী, বেছে নাও।'

লেড়কিটি এবার সক্রিয় হ'ল। ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগল। চঞ্চল তার দৃষ্টি। চোখের তারায় হতাশার ছাপ।

চোখের মণি দুটোকে এর-ওর মুখের ওপর থেকে তুলে নিয়ে এসে লেড়কিটি এক জায়গায় এনে স্থির করল। আলী শার-এর মুখের ওপর তার দৃষ্টি আটকে গেল। বিভিন্ন উমরের যত আদমি দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে আলী শার বাস্তবিকই অনন্য। কী তার সুরৎ! কী মনমৌজী চোখ-মুখ।'

জুমুর‍্যদ এবার মুখ খুলল। দালাল'কে লক্ষ্য ক'রে বলল—'আমি একেই এতক্ষণ তাল্লাশ করছিলাম। এবার মিলল। আমি এর সঙ্গেই যেতে চাই, এর সঙ্গেই ঘর করতে উৎসাহী। এ-ই আমাকে খরিদ ক'রে নিক। এর সুরৎ আমার কলিজায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

আর আমার চোখে ধরেছে রঙ। কী সুরৎ! কী তার মুখ-চোখ-নাক! সাচ্চা নওজোয়ান। নিটোল তার দেহের গড়ন। ফিন শক্তিমত্তার পরিচায়কও বটে। একে এক ঝলক দেখেই আমার দিল্ উতলা হয়ে উঠেছে মাত্র একটিবার আলিঙ্গন করার জন্য। আমার খুনে মাতন লাগছে। একে চাই-ই চাই। কথাটি বলেই সে ভাবে বিভোর হয়ে কবিতা আওড়াতে লাগল।

লেড়কিটির ব্যাপার স্যাপার দেখে দালালটি রীতিমত তাজ্জব বনে গেল। তাজ্জব বলার মতই তো বাৎ। বাজারে যে লেড়কিকে বেচার জন্য আনা হয়েছে সে যদি কথায় কথায় এমন কবিতা আওড়ায় তবে তাজ্জব না বনে পারা যায়?

দালালটি এবার লেড়কিটির মালিকের দিকে ঝুঁকে, চোখ দুটো কপালে তুলে বলল—'জী, এ কেমন লেড়কিকে বাজারে বেচতে নিয়ে এলেন? কবিতা টবিতা ছাড়া কোন বাৎ-ই এর জানা নেই?'

'আরে ভাইয়া, লেড়কিটির কারবার দেখে তোমার তাজ্জব বনাই স্বাভাবিক বটে। এর সুরৎ তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। এ খালি কবিতা বলেই না, কবিতা লেখেও। নামজাদা কবি। এক সঙ্গে সাতটি কলম চালিয়ে সাতটি কবিতা লিখে ফেলতে পারে। ফিন রেশমী কাপড়ে মনলোভা নক্সা বানাতে পারে। আর পারে চমকদার কার্পেট বানাতে যার দাম পঞ্চাশ দিনার হবেই। আমি কবুল করতে পারি, একে যে আদমি খরিদ করে নিয়ে যাবে সে কয়েক মাসের মধ্যে দিনার বুঝে পেয়ে যাবে।'

দালালটি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টি মেলে একবারটি জুমুর্‌রদ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে দু'পা এগিয়ে আলী শার-এর মুখোমুখি দাঁড়াল। মুচকি হেসে বলল—'নওজোয়ান, নসীবে না থাকলে এরকম ধন ঘরে নেয়া যায় না।' আলী শার-এর হাত টেনে নিয়ে চুম্বন ক'রে বলল—'দেখবেন সাহাব; বিবিকে সর্বদা চোখে চোখে রাখবেন। এরকম ধন ঘরে রাখাও বড্ড ঝকমারি।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির এপর্যন্ত বলার পরই ভোর হয়ে এল। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' উনিশতম রজনী

রাত্রি গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, দালালটি আলী শার'কে বলে চলল—'সাহাব, তোমার নসীবের কথা ভেবে আমার হিংসা হচ্ছে। নিজের চোখেই তো দেখলে, বেহেস্তের হুরীটিকে কত আদমিই তো খরিদ করার কোশিস করল—পাগল হ'ল, পেল কি? সুরৎ ছাড়াও এর মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে তাকে সামান্য দিনারের বিনিময়ে খরিদ করা সম্ভব নয়। লেড়কি যখন তোমাকে তার নাগর হিসাবে বেছে নিয়েছে তখন তোমার বরাত খুলে গেছে ধরে নিতে পার। তার মালিক অবশ্যই তোমার হাতে ডাঁশা মালটি তুলে দিচ্ছে। একে খরিদ করে, ঘরে নিয়ে যাও সাহাব, এ তোমায় সুখ-শান্তি আর অর্থ দুই দেবে।'

ব্যাপার দেখে আলী শার-এর গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। সে খুবই বিব্রত বোধ করে, অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সে ভাবে তাকে নিয়ে লেড়কিটি, লেড়কির দালাল প্রভৃতি রঙ্গ তামাশায় মেতেছে। হায় আল্লাহ! এ কী দায়ে ফেললে আমাকে। সামান্য রুটির দাম জানতে চাওয়ার হিম্মত যার নেই সে কিনা এরকম খুবসুরৎ একটি লেড়কির দাম জিজ্ঞাসা করবে! তারা তো ধরেই নিয়েছে লেড়কিটিকে খরিদ করার মত যথেষ্ট অর্থ আমার সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে। নইলে লেড়কি কেনা-বেচার সময় হাজির হতে যাবই বা কেন? আগু পিছু বিবেচনা করে আমার মুখে কলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আগ বাড়িয়ে ইজ্জত খোয়াতে না যাওয়াই উচিত। আলী শার দালালটির কথার জবাব দিল না।

জুমুর্‌রদ কিন্তু আপন সিদ্ধান্তে অটল। সে তার পেয়ারের নাগর আলী শার'কে আচমকা চোখের বাণ মেরে বসল। তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

জুমুর্‌রদ এবার দালালটির কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল—'আমাকে একবারটি ওর কাছে নিয়ে চল। আমি তাকে অনুরোধ করব যে করেই হোক আমাকে যেন সে খরিদ ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। সে, যা-ই বলুক, আমি ওর সঙ্গেই যাচ্ছি। তুমি আমাকে ওর সামনে হাজির কর, সব ফয়সালা হয়ে যাবে।'

উপায়ান্তর না দেখে দালাল এবার জুমুর্‌রদ'কে নিয়ে আলী শার-এর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

উপস্থিত সবাই দেখল, আলী শার-এর সামনে গিয়ে বেহেস্তের হুরী দাঁড়িয়েছে। জুমুর্‌রদ আলী শার-এর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলতে লাগল—'ওগো আমার মেহবুব, আমার দিল্, তোমাকে দেখেই যে আমার কলিজায় জ্বালা ধরে গেছে। শিরায় শিরায় খুনে মাতন লেগেছে! তুমি কি বুঝছ না, তোমাকে একটিবার আমার যৌবনভরা বুকে পাবার জন্য কেমন উতলা হয়ে উঠেছি? কেন তুমি এমন বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে রয়েছ? তুমি কি ভাবছ, যে-দর আমার উঠেছে আমি তার চেয়ে বেশী দরে খরিদ হওয়ার যোগ্য। বহুৎ আচ্ছা! তুমি না হয় যে-দর ন্যায্য মনে করছ সে-দরই হাঁক। আর যদি ভাব দর বেশী বোধ হচ্ছে, তবে তোমার যা খুশী তা-ই বল না কেন। এতে শরমের কি আছে, বুঝছি না তো? মেহবুব আমার, মুখ খোল। কিছু তো বল। তবে আমার বাৎ শুনে রাখ, আমি তোমার সঙ্গে যাব যখন মন করেছি—যাবও তোমার সঙ্গে।'

আলী শার-এর চোখ দুটো ছল ছল করতে থাকে।

জুমুর্‌রদ বলল—'হাজার দিনার কি তোমার কাছে বেশী মনে হচ্ছে? তা-ই যদি হয় বলেই ফেল না। ঠিক আছে তুমি আটশ' দিনার

দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেল।

আলী শার ঘাড় ঝাঁকায়।

জুমুর‍্যদ মুচকি হেসে বলে—তবে সাতশ' দাও। তাতে রাজী নও? যাক আর দাম দস্তুরের দরকার নেই। তুমি একশ' দিনার গুণে দিয়ে আমাকে তোমার মকানে নিয়ে চল। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার বুকের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। দেরী করছ কেন, বের কর একশ' দিনার।'

—'আমার সঙ্গে একশ' দিনারও নেই। আমার জেব একেবারেই খালি।'

—'নেই? একশ' নেই? কত কম পড়ছে, বলই না। শরম কিসের?' কথা বলতে বলতে জুমুর‍্যদ খিল খিল ক'রে হেসে আলী শার-এর গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে। এমন এক ভাব দেখায়, দেরী করলে যেন বাজারে, একগাদা আদমীর সামনেই সে তাকে জড়িয়ে ধরবে। শরম টরমের তোয়াক্কা সে করে না।

ব্যাপার দেখে আলী শার শক্ত কাঠ হয়ে যায়। তার অক্ষমতা তো কেবলমাত্র অর্থকড়ির দিক থেকে। যৌবন আর পৌরুষত্বের তো আর ঘাটতি নেই। তাই উদ্ভিন্ন যৌবনা খুবসুরৎ এক লেড়কির কামদীপ্ত দেহের ছোঁয়া পেয়ে তার কলিজা লাফালাফি দাপাদাপি শুরু করে দেয়। অতি কষ্টে সে নিজেকে সংযত রেখে শুষ্ক কণ্ঠে কোনরকমে উচ্চারণ করল—'বিলকুল ভুল জায়গায় হাত বাড়িয়েছ সুন্দরী। একশ' দিনারের ব্যাপার তো আমি চিন্তাও করতে পারি না। আমার জেবে একটি দিনারও খুঁজে পাবে না। খামকা সময় ও ধৈর্য নষ্ট না করে তুমি বরং অন্য জায়গায় ধান্দা কর। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার কোনই ফয়দা হবে না।'

জুমুর‍্যদ মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে যায়। তবে এটুকু বুঝতে তার বাকী নেই, এর কাছে একটি কানাকড়িও নেই।

জুমুর‍্যদ এবার চট ক'রে একটি মতলব এঁটে ফেলল। প্রায় ফিসফিসিয়ে আলী শার'কে বলল—'বহুৎ আচ্ছা, তোমাকে দিনারও দিতে হবে না। ফিকির আমিই করে দিচ্ছি। আমি যা-যা বলছি কর, তবেই হিল্লে হয়ে যাবে। তুমি আমাকে এ-কামিজটি পরিয়ে দাও, আর দ্বিতীয় হাত দিয়ে আমার কোমরটি ধর। ব্যস, দেখবে সমস্যা মিটে গেছে।'

আলী শার তার কথা মত কাজ করতে গিয়ে দেখল, হঠাৎ তার কোমরের কাছে ধরে রাখা হাতটিতে একটি থলি এসে পড়ল।

জুমুর‍্যদ বলল—'এতে এক হাজার দিনার আছে, দালালের হাতে নয়শ' দিয়ে আমার দাম চুকিয়ে দাও। বাকী এক শ' নিজের জেবে রেখে দাও। আখেরে কাজ দেবে।'

আলী শার থলিটি থেকে নয় শ' দিনার দালালের হাতে গুঁজে দিয়ে জুমুর‍্যদ'কে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

আলী শার লেড়কিটিকে তার ভাঙাচোরা ঘরে নিয়ে আসতে খুবই সঙ্কোচ বোধ করছিল। জুমুর‍্যদ কিন্তু তার ঘরদোরের দৈন্যদশা দেখে বিস্মিত বা বিমর্ষ কিছুই হ'ল না।

একটি ছেঁড়া মাদুর ছাড়া আলী শার-এর বিছানা বলতে কিছুই নেই। কোথায় বা নবাগতাকে বসতে দেবে তা-ই তার কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

জুমুর‍্যদ তার কামিজের তলা থেকে একটি থলি বের করে তা থেকে এক হাজার দিনার আলী শার-এর হাতে দিয়ে বলল—'ছুটে বাজারে যাও। আচ্ছা কিছু খানা, একটি কার্পেট আর আসবাবপত্র যা-যা দরকার খরিদ ক'রে জলদি নিয়ে এসো।'

আলী শার বাজার থেকে সওদা সেরে সমানপত্রের গাঁটারি নিয়ে ঘরে ফিরল।

জুমুর‍্যদ নিজে হাতে কার্পেট বিছাল। বিছানা গোছগাছ করল। বালিশ-তাকিয়া জায়গামত রাখল। দরজায় ঝুলিয়ে দিল বাহারী এক পর্দা।

কামরা গোছগাছ ক'রে দু'জনে খানাপিনা সারতে বসল। সরাব খেল পেয়ালা ভরে ভরে। সরাবের নেশা দু'জনকেই একটু-একটু ক'রে ধরতে শুরু করেছে। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে পড়তে চাইছে।

নতুন কামরা, নতুন বিছানায় জুমুর‍্যদ নিজেকে তার বহু বাঞ্ছিতের হাতে তুলে দিল। তার জীবনের প্রথম পুরুষ। দেহসুখ কি জিনিস সে এই প্রথম অনুভব করল। একে, অন্যের কাছে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিল। সারারাত্রি ধরে তারা সম্ভোগের মাধ্যমে কামজ্বালা নিবৃত্ত করল। তৃপ্ত করল দিল্‌কে আর অশান্ত কলিজাকে করল শান্ত। তারপর? উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে অবশ-অলস ভাবে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটিয়ে দিল।

জিন্দেগীর প্রথম সুখের রাত্রির অবসান হ'ল পাখির ডাকের মধ্য দিয়ে।

জানালা দিয়ে এক টুকরো রোদ চুপি-চুপি এসে জুমুর্‌রাদ-এর কামতৃপ্ত চোখের ওপর পড়ল। সে বিছানা ছেড়ে নেমে এল। রাত্রের তৃপ্তিটুকু এখনও তার চোখের তারায় জড়িয়ে রয়েছে। বুকে প্রথম বসন্তের খুশীর জোয়ার।

জুমুর্‌রাদ সকাল হতে না হতেই কাজে লেগে গেল। শুরু করল জীবন-সংগ্রাম। দামাদম সিল্কের গায়ে চমৎকার নকসাযুক্ত একটি মনলোভা পর্দা বানিয়ে ফেলল। মাত্র আট দিনের মধ্যে এমন দিলবাহার নকসা বানানো যায় এ যেন আলী শার-এর কাছে খোয়াব দেখার সামিল। সে কেবল ভূয়সী প্রশংসাই নয়, বহুভাবে জুমুর্‌রাদ'কে কৃতজ্ঞতা জানাল।

পর্দাটি তৈরী হয়ে গেলে জুমুর্‌রাদ সেটিকে আলী শার-এর হাতে দিয়ে বলল—বাজারে গিয়ে বেচে এসো। ইয়াদ রেখো পঞ্চাশ দিনারের কমে কিছুতেই বেচবে না, ফিন বেশীও নেবে না।

—'কিন্তু একেবারে পঞ্চাশ দিনার—কম বা বেশী নয় কেন?' আলী শার সবিস্ময়ে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল।

—'হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ দিনারেই বেচতে হবে। ইয়াদ রেখো, কম বা বেশীতে বেচলে কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।' আর এ-ও ভুলো না, আমাদের শত্রু চারদিকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। তাই পর্দাটি অজানা অচেনা কোন খরিদ্দারের কাছে বেচো না যেন।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' কুড়িতম রজনী

প্রায় মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগমের কোলে মাথা রেখে পালঙ্কের ওপর শরীর এলিয়ে কিস্‌সা শোনার জন্য তৈরী হলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তি অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আলী শার তার বিবি জুমুর্‌রাদ-এর বাৎ ইয়াদ করতে করতে পর্দাটি নিয়ে বাজারে গেল। ঠিক পঞ্চাশ দিনারের বিনিময়েই পর্দাটি বেচে দিল। এবার প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে সিল্কের কাপড় আর সোনালি আর রূপালী সূতো সওদা করে ঘরে ফিরল।

জুমুর্‌রাদ অহেতুক সময় নষ্ট না করে ফিন পর্দা ও কার্পেট বানানোর কাজে মেতে গেল। আট দিনে বাহারী একটি কার্পেট বানিয়ে ফেলল। আলী শার এটিও পঞ্চাশ দিনারে বেচে এল।

একদিকে পর্দা-কার্পেট বানানো ও বিক্রি আর অন্য দিকে সম্ভোগ সুখ পুরোদমে উপভোগ করে পুলকানন্দে তারা ভেসে চলল।

একদিন আলী শার কার্পেটের ছোট্ট একটি গাঁটরি নিয়ে বাজারে গেল। বাজারে ঢোকার মুখেই নচ্ছার এক খ্রীষ্টান ক্রেতার মুখোমুখি হয়ে গেল। এক রকম জোর করেই তার কার্পেট দেখল। নিজে থেকেই সে ষাট দিনার দাম দিতে চাইল।

ঠিক সে-মুহূর্তেই জুমুর্‌রাদ-এর সতর্কবাণী আলী শার-এর ইয়াদে এল। আবার ক্রেতাটিও একেবারেই অপরিচিত। খ্রীষ্টান, তাই সে তার কাছে কার্পেট বেচতে সরাসরি অস্বীকার করল।

এদিকে খ্রীষ্টানটিও নাছোড়বান্দা। কার্পেট তাকে দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। ষাট দিনার থেকে এক লাফে এক শ' দিনারে উঠে গেল।

আলী শার যাতে তার কাছে কার্পেটটি বিক্রি করে তার জন্য খ্রীষ্টান ক্রেতাটি এক দালালকে দুশ দিনার ঘুষ দিয়ে হাত ক'রে রেখেছিল।

আলী শার যখন খ্রীষ্টান খরিদ্দারটির কাছে কিছুতেই কার্পেটটি বেচতে চাইল না তখন বে-কায়দা দেখে দালালটি এগিয়ে এল। সে আলী শার-এর খুবই পরিচিত। মুচকি হেসে সে আলী শার-এর কাঁধে আলতো ক'রে একটি ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—'আরে দোস্ত, তুমি করছ কী? ষাট দিনার থেকে এক লাফে একেবারে এক শ'তে পৌঁছে গেছে, ভাবতে পারছ! সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। পরে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি।'

খ্রীষ্টান ও দালালটি এমন পীড়াপীড়ি শুরু ক'রে দিল যে, শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টান খরিদ্দারটির কাছে বেচতে বাধ্য হ'ল।

ঘরে ফেরার পথে কিছু দূর এসে আলী শার আচমকা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, খ্রীষ্টান খরিদ্দারটি তার পিছু নিয়েছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। খ্রীষ্টানটি কাছে আসতেই সে বলল—'কি হে, চললে
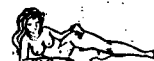
কোথায়? কই, এর আগে তো তোমাকে এ-পথে দেখিনি।'

—'জী, মাফ করবেন। রাস্তার বাঁকের কাছে এক জরুরী কাজ রয়েছে কিনা তাই ব্যস্ত পায়ে চলেছি।'

কাজ আছে। কাজ তো থাকতেই পারে। অতএব বলার তো কিছুই থাকতে পারে না। বাধ্য হয়ে সে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। কয়েক পা গিয়ে ফিন সে ঘাড় ঘোরায়। এবারও দেখল, খ্রীষ্টানটি তার পিছন পিছনই আসছে। খুবই গোস্‌সা হ'ল তার। রীতিমত খেঁকিয়ে উঠে বলল—'কি হে, হতচ্ছাড়া পাজী কোথাকার, ফিন আমার পিছু নিয়েছ।'

—'বিশ্বাস করুন, একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই আমাকে এ-পথে আসতে হয়েছে হুজুর। এখন আমাকে একটু জল দিতে পারেন? তেষ্টায় গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ।'

আলী শার ভাবল, হতচ্ছাড়া খ্রীষ্টানটি যতই খারাপ আদমি হোক না কেন, পানি চেয়েছে। তৃষ্ণার্ত। কোন মুসলমান পিপাসিতকে পানি না দিলে আল্লাতাল্লা তাকে কিছুতেই মাফ করবেন না।

আলী শার খ্রীষ্টানটিকে ঘরে নিয়ে গেল। বাইরের দিককার রোয়াকে বসতে দিয়ে পানি আনতে কামরার ভেতরে ঢুকে গেল, কামরার ভেতরে ঢুকতেই জুমুর‍্যাদ-এর সঙ্গে মুখোমুখি হতে হ'ল।

জুমুর‍্যাদ বলল—'কার্পেটটি বেচলে? কত দিনার দাম নিয়েছ? কার কাছে বেচলে?'

আলী শার বার কয়েক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বলল—'আমার খুব চেনাশুনা এক খরিদ্দারের কাছেই বেচেছি।'

জুমুর‍্যাদ বিমর্ষ মুখে বলল—'আজ আমার দিল্ কেমন আনচান করছে। স্বস্তি পাচ্ছিনা কিছুতেই। কিন্তু তুমি পানির বদনা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

—'আমার এক দালাল তেষ্টায় বড্ড কাতর হয়ে পড়েছে। থাকতে না পেরে আমার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।'

জুমুর‍্যাদ-এর ফ্যাকাসে মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে গেল। নিজের অজান্তে ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আলী শার পানির বদনা নিয়ে কামরা ছেড়ে রোয়াকের দিকে পা-বাড়াল। ভেতরের রোয়াকে পা দিয়েই সে দেখল, খ্রীষ্টানটি এরই মধ্যে বাইরের রোয়াক থেকে একেবারে তার শোবার ঘরের রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে খ্রীষ্টানটিকে লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে উঠল—'হারামী কাঁহাকার! হতচ্ছাড়া কুত্তার বাচ্চা! তোর সাহস তো কম নয়! আমার অনুমতি না নিয়েই তুই বাইরের রোয়াক থেকে একেবারে আমারই শোবার ঘরের রোয়াকে চলে এসেছিস!'

খ্রীষ্টান খরিদ্দারটি নিতান্ত অপরাধীর মত মুখ কাচুমাচু করে বলল—'অপরাধ নেবেন না হুজুর। হেঁটে হেঁটে পায়ের শিরায় টান ধরেছিল। তাই আর একটু হাঁটাহাঁটির মাধ্যমে ব্যাপারটিকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছিলাম। তা ছাড়া আপনার বাইরের রোয়াক আর শোবার ঘরের রোয়াকের মধ্যে ফারাকও তো বেশী নয়। পানি খেয়ে, এখানে বসেই একটু জিরিয়ে নিয়ে বিদায় নেব।'

খ্রীষ্টান খরিদ্দারটি কথা বলতে বলতে আলী শার-এর হাত থেকে পানি ভর্তি বদনাটি নিয়ে গলায় ঢেলে দিল। খালি বদনাটি ফিরিয়ে দিল।

আলী শার কিন্তু সেখান থেকে এক চুলও নড়ল না। শয়তান খ্রীষ্টানটি বিদায় না নেয়া পর্যন্ত পিছন ফিরতে দিল্ সরল না।

এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। খ্রীষ্টানটি তবু ওঠার নামটি করে না। উপায়ান্তর না দেখে আলী শার চিল্লিয়ে উঠল—'তোর ধান্দা কি, শুনি? নিজে থেকে বাড়ি ছেড়ে যাবি, নাকি আমাকেই বন্দোবস্ত করতে হবে?'

—'হুজুর দুনিয়ায় এমন কিছু লোক রয়েছে যারা ভাল কাজ করে সবার প্রিয় পাত্র হতে চায়। লোকের মনে চিরকাল জীবিত থাকতে চায়। আপনি দেখছি ঈশ্বরের খাতায় নিজের নামটি লেখাতে একেবারেই অনাগ্রহী। জল দিয়ে আমার তেষ্টা মিটিয়েছেন। খুব ভাল কাজই করেছেন। এখন খিদের জ্বালায় আমি কষ্ট পাচ্ছি। যদি ঘরে একটু-আধটু খাবার টাবার থাকে তাই দিয়ে আমার খিদে মেটাবার ব্যবস্থা করে দিলে বড়ই আনন্দিত হই। একটু বাসি-পোড়া রুটি আর পিঁয়াজ হলেও আমার দিব্যি চলে যাবে।'

তার বাৎ শুনে আলী শার-এর শিরে খুন চাপার জোগাড় হ'ল। সে বাজখাই গলায় চিল্লিয়ে উঠল—'না, এখানে আর কোন ধান্দাই চলবে না। বেরো এখান থেকে! নইলে তোর জান নিয়ে ছাড়ব, বলে দিচ্ছি!'

খ্রীষ্টানটি একেবারেই নাছোড়বান্দা। এক পা তো নড়লই না। এমন কি তার মধ্যে কোন ভাবান্তরই লক্ষিত হ'ল না। নির্বিকার ভাবেই এবার বলল—'ভাল কথা, ঘরে কিছু না-ও থাকতে পারে। তবে কার্পেট বিক্রি করে তো অনেক দিনারই পেয়েছেন। বাজার থেকে কিছু খাবার টাবার এনে দিন। আমি সেটুকু খেয়ে একটু সুস্থ হলেই বিদায় নেব। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।'

আলী শার দেখল, হতচ্ছাড়াটি নেহাৎ-ই পাগল। কুকুর লেলিয়ে না দিলে কিছুতেই কাঁধ থেকে নামবে না।'

আলী শার এবার একটি লাঠি বের করা মাত্র খ্রীষ্টানটি ব'লে উঠল—'এ করছেন কী মশাই! আমি আপনার কাছে এক টুকরো রুটি, সামান্য নুন আর একটি পিঁয়াজ ছাড়া তো কিছুই চাই নি। তার বদলে আপনি এরকম আচরণ করছেন।'

আলী শার দেখল শয়তানটি একবার যখন ঘাড়ে চেপেছে তখন কিছু অন্ততঃ না খেয়ে নামবে না। উপায়ান্তর না দেখে সে যার-পর নাই বিরক্ত হয়ে খাবার কেনার জন্য গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে

করতে বাজারের দিকে হাঁটা জুড়ল। বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে তাকে বলে গেল, যেন এক পা-ও নড়াচড়া না করে। তারপরও বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে কামরায় ইয়া পেল্লাই এক তালা লটকে দিয়ে গেল।

আলী শার হন হন ক'রে বাজারে গেল। তাড়াতাড়ি কিছু খানা কিনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ফিরে এল।

উঠোনে পা দিয়েই দেখে হতচ্ছাড়া খ্রীষ্টানটি দিব্যি রোয়াকে বসে রয়েছে। সে খানার ঠোঙ্গাটি দুম্ করে তার সামনে রেখে বলল—'নাও গেল! তারপর আমাকে রেহাই দাও। এমন শয়তান কুত্তা দ্বিতীয় আর একটি আছে ব'লে মনে হয় না।'

খ্রীষ্টানটি কিন্তু তার এত অশ্রদ্ধা, যাচ্ছেতাই ভাষায় এত গালাগালি—ভ্রূক্ষেপই করল না। মুখ দেখে মালুমই হ'ল না, এসব বাৎ তার কানে গেছে। উপরন্তু স্বাভাবিক স্বরেই বলল—'আমি

একাই খাব? এ কি ক'রে হয়? আপনিও বসুন—'

—'যাক, খুব হয়েছে। তুমি একাই গেল। আমি শুধু চাই তুমি মেহেরবানি ক'রে আমার কাঁধ থেকে নাম।'

খ্রীষ্টানটি একেবারেই বেহায়ার চূড়ান্ত। এবার সে মুচকি হেসে বলল—'তা-ও কি কখনও হয়? পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথা রয়েছে, অতিথির সঙ্গে গৃহস্বামীকেও আহার করতে হয়। যে এর অন্যথা করে সে নাকি বেজন্মা। তাই বলছি কি, বসুন আমার সঙ্গে। যা হোক কিছু মুখে দিন।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' একুশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আলী শার নাছোড়বান্দা খ্রীষ্টানটিকে কিছুতেই কব্জা করে উঠতে পারছে না। বাধ্য হয়ে তার পাশে ধপ্ ক'রে বসে পড়ল। বাজার থেকে কিনে আনা খানার ভাগ নিতেই হ'ল।

আলী শার নিজের কৃতকর্মের বাৎ ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে গেল। খ্রীষ্টানটি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না। সে একটি কলার খোসা ছাড়িয়ে তাকে দু'খণ্ড ক'রে ফেলল। একটি টুকরোর মধ্যে আফিঙে সিদ্ধ করা একটি ভাঙের গুলি পুরে দিল। ভাঙের গুলিটির তেজ এমনই উগ্র যে, একটি গোদা হাতিকে খাইয়ে দিলে এক সালের মধ্যে তার নিদ টুটবে না। কলার টুকরাটি এবার আলী শার-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল 'হুজুর, কলার আধা আপনি খান। আর বাকীটুকু আমি খাচ্ছি।'

আলী শার ব্যাপারটি নিয়ে তিলমাত্রও ভাবনা চিন্তা করল না। কলার টুকরাটি নিয়ে সোজা মুখে চালান করে দিল। তারপর কপ্ ক'রে গিলে ফেলল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আফিং আর ভাঙের খেল শুরু হয়ে গেল। আলী শার দুম ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। ব্যস শয়তান খ্রীষ্টানটি এবার নিজমূর্তি ধারণ করল। নেকড়ের মত তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে পড়ল। পা টিপে টিপে সদর-দরজার বাইরে চলে গেল। সেখানে তার কয়েকজন সাকরেদ খচ্চর নিয়ে অপেক্ষা করছে। আর? সেই বাঁদরমুখো কদাকার রসিদ অল-দিন তাদের সঙ্গেই রয়েছে। জুমুর্‌রদ যাকে নাক শিঁটকে, মুখ বাঁকিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

খ্রীষ্টানটিকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখেই রসিদ অল-দিন-এর কলিজা খুশীতে নাচানাচি শুরু ক'রে দিল। তার জিদ ছিল, যে কোন মূল্য দিয়েই হোক জুমুর্‌রদ'কে তার চাই-ই চাই। সে আদতে খ্রীষ্টান। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বাড়তি কিছু সুবিধা ভোগ করার জন্য মুসলমানের নাম ও পোশাক আশাক ধারণ করেছে। আর এ-খ্রীষ্টানটি রসিদ-এরই সহোদর। তার নাম বরনুম।

আলী শার'কে পরিকল্পনা মাফিক অচৈতন্য ক'রে এসেছে শুনে রসিদ খুশীতে ডগমগ হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। সাকরেদদের নিয়ে জোর জবরদস্তি করে জুমুর্‌রদ'কে ধরে ফেলল। তার মুখে কাপড় বেঁধে দিল। এবার হাত-পা রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে তাকে নিয়ে তুলল শয়তানের সাক্ষাৎ চর রসিদ অল-দিন-এর মকানে।

জুমুর্‌রদ'কে সোজা রসিদ অল-দিন-এর শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। হাত-পায়ের রশি খুলে দিল। মুখের বাঁধনও আলগা ক'রে দিল। জুমুর্‌রদ গুলিবিদ্ধ বাঘিনীর মত এক হেঁচকা টানে মুখের

কাপড়টিকে খুলে ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল। ঠিক তখনই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে হতচ্ছাড়া শয়তান বাঁদরমুখো রসিদ দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের ক'রে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। লালসায় তার চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করছে।

রসিদ চোখের কোণের পিঁচুটির ডেলা আঙুল দিয়ে মুছতে মুছতে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় ব'লে উঠল—'মেহবুবা, তুমি এখন আমার হাতে বন্দী। ঝুটমুট বেগড়বাই ক'রে ফয়দা কিছুই হবে না। তুমি আমাকে ঘেন্না কর, জানি। দিল্ থেকে মহব্বত তুমি আমাকে দেবে না, দিতে পারবেনা তা-ও বিলকুল বুঝি। তাই তোমাকে জবরদস্তি ভোগ করে আমাকে লালসা মেটাবার ফিকির বের করতে হয়েছে। তোমাকে আমি বুকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছি। তোমার যৌবন-সুধা পান করার জন্য আমার কলিজা অস্থির। তুমি আমাকে পেয়ার কর চাই না কর, তোমার শরীরটি'কে আমার চাই-ই। আমার বাৎ যদি না শোন, যদি বেগড়বাই কর তবে তোমার ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতে আমি বাধ্য হ'ব।'

জুমুর‍্যদ ফোঁস করে ওঠে—'শয়তান কাঁহিকার! আমাকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেল্‌লেও আমার ধর্ম থেকে আমি এক পা-ও নড়ছি না। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমার ওপর যত অত্যাচারই করিস না কেন আমার দিলের নাগাল কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও মিলবে না। তুই যদি বোকা পাঁঠার মত জবরদস্তি আমার ঘাড়ে চেপে বসিস তবু আমার দিল্ তোর কাজে সায় দেবে না।'

—'কি বল্‌লি হতচ্ছাড়ি! আমাকে তুই এখনও ঘেন্না করিস!'

—'করি। ভবিষ্যতেও করব। আমার সাফ কথা শুনে রাখ শয়তান, তোর পাপ মুহূর্তের জন্যও আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর এ-ও শুনে রাখ তুই কোনদিনই খোদাতাল্লার ক্ষমা পাবি না। কৃতকর্মের জন্য তোকে তিলে তিলে দগ্ধে মরতে হবে।'

—'খোদাতাল্লা-র ডর দেখাচ্ছিস আমাকে! বহুৎ আচ্ছা, দেখি তোর খোদাতাল্লা কি ক'রে রক্ষা করে, ইজ্জৎ বাঁচায়!'

রসিদ এবার ক্রোধোন্মত্ত শেরের মত গর্জে উঠল। দুই ক্রীতদাসীকে তলব করল। তারা ছুটে এলে বলল—'হারামজাদীকে পিঠমোড়া করে বেঁধে উপুড় করে শুইয়ে দে।

ক্রীতদাসীরা এবার রশি নিয়ে এসে জুমুর‍্যদ'কে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে মেঝেতে ফেলে দিল।

রসিদ এবার তার ওপর উন্মাদের মত চাবুক চালাতে শুরু করল। জুমুর‍্যদ আল্লাহ-র নাম স্মরণ করতে লাগল। আর থেকে থেকে যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে ঘরময় চক্কর মারতে থাকল।

জুমুর‍্যদ চাবুকের ঘা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

রসিদ এবার ক্রীতদাসীদের বলল—'একে রসুইখানায় নিয়ে যা। সেখানে তোদের সঙ্গে থাকবে। রাস্তার ওপর শুয়ে রাত্রি কাটাবে। খবরদার কিছুতেই খানা আর সরাব দিবি না শয়তানীর বাচ্চাকে।

জুমুর‍্যদ ক্রীতদাসীদের সঙ্গে রসুইখানায় দিন গুজরান করতে লাগল। এদিকে নসীববিড়ম্বিত বেচারা আলী শার পরের দিন পর্যন্ত বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল। রাত্রির দিকে তার নেশা টুটল। উঠে দাঁড়াল। বিবি জুমুর‍্যদ'কে খুঁজল পাতিপাতি ক'রে। কোথাও তার দেখা পেল না। দু'চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। তার বিবি কোথায় গেছে, কি হয়েছে, কে তাকে জবাব দেবে? সবই ঠিকঠাক রয়েছে; কেবল তার দিল্, তার কলিজা জুমুর‍্যদ-ই নেই।

আলী শার রোয়াকে বসে চোখের পানি ঝরিয়ে ভাবতে লাগল। এবার এক এক করে তার সব মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল, শয়তান খ্রীষ্টানটির কাণ্ডকারখানা। তার বুঝতে বাকী রইল না শয়তানটি-ই তার বিবিকে গায়েব করেছে। সে এবার বিলাপ পেড়ে কাঁদতে কাঁদতে উন্মাদের মত মাথা ঠুকতে লাগল, নিজের চুল ছিঁড়তে লাগল; ফিন মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল।

আলী শার কিছুই বুঝতে পারছে না, কোন্‌দিকে যাবে, কার কাছে যাবে, কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে তার মেহবুবা জুমুর‍্যদ-এর কথা। কে তাকে দেবে তার প্রাণপ্রতিমা, তার কলিজার হদিস?

আলী শার কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে। সে উন্মাদের মত বিলাপ পেড়ে পেড়ে পথ দিয়ে ছুটতে লাগল। কিছু দূর যেতেই এক বুড়ির মুখোমুখি হ'ল। তার হালৎ দেখে বুড়িটির মায়া হ'ল। বুড়ি বলল—'বেটা, খোদাতাল্লা তোমার সহায় হোন। তোমার এ-হালৎ কেন? কি হয়েছে, আমাকে বাতাও।'

আলী শার চোখের পানি মুছতে মুছতে নিজের নসীবের

বিড়ম্বনার ঘটনা বুড়িকে সবিস্তারে বলল।

বুড়ি তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ ক'রে বলল—'বেটা ঘাবড়াও মাৎ! সবঠিক হয়ে যাবে। খোদা-র ওপর ভরসা রাখ।'

বুড়ি বুঝল নওজোয়ানটি বিরহ-জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে। আমার বাৎ মান। তুমি এখনি বাজারে যাও। ঝটপট ফেরি করার একটি ঝুড়ি খরিদ করে নিয়ে এসো। আর কিছু কাচের চুড়ি, সস্তা দামের কানের দুল আর কিছু পুঁতির মালাও খরিদ করবে। তোমার এসব সামানপত্র নিয়ে আমি বাড়ি-বাড়ি ফেরি করে বেড়াব। তোমার বিবি জুমুর্‌রদ-এর হদিস না পাওয়া পর্যন্ত আমি হররোজ ফেরি ক'রে বেড়াব। খোদাতাল্লার মর্জিতে আজ না হোক কাল সে তোমার ডেরাতেই ফিন ফিরে আসবে। আমার বাৎ মিলিয়ে নিও বেটা। কান্না থামাও, ভাবনা ছাড়। যা বললাম সব নিয়ে জলদি ফিরে আসবে।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' বাইশতম রজনী

মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বুড়ির পরামর্শ অনুযায়ী আলী শার বাজারে টুঁড়ে টুঁড়ে একটি ফেরি করার ঝুড়ি আর সামানপত্র খরিদ ক'রে নিয়ে এল।

বুড়িটি এবার মাথায় ফেরির ঝুড়ি চাপিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে শহরের বাড়ি বাড়ি টুঁড়ে বেড়াতে লাগল।

বুড়ি এ-বাড়ি সে-বাড়ি টুঁড়তে টুঁড়তে একদিন শয়তান রসিদ-এর বাড়ির দরজায় এসে হাঁক দিল—'চুড়ি, মালা, দুল নেবে গো? চুড়ি, মালা, দুল নেবে?'

বুড়ি যখন তার সওদা নিয়ে রসিদ অল-দিন-এর মকানের দরওয়াজায় এসে হাঁক দিল ঠিক তখনই আধমরা জুমুর্‌রদ'কে কয়েক জন দাসী রসুইখানায় ক্রীতদাসীদের আড্ডায় নিয়ে এল। দীর্ঘসময় ধরে তার ওপর জানোয়ারের মাফিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। কপাল ফেটে খুন গড়াচ্ছে।

সওদার ঝুড়ি মাথায় ক'রে বুড়ি মকানের কড়া নাড়ল। এক ক্রীতদাসী দরওয়াজা খুলে দিলে বুড়ি তার সামানের বিবরণ দিল। তারপর বলল এসব সামানপত্র খরিদ করতে পারে তোমাদের এমন কেউ আছে কি?'

—'আছে। এসো, ভেতরে এসো,' ক্রীতদাসীটি বলল।

বুড়িকে নিয়ে রসুইখানার কামরার দরওয়াজায় বসতে দিল। ব্যাস, ক্রীতদাসীরা তাকে ঘিরে ধরল। সবাই কিছু না কিছু কিনতে আগ্রহী। উৎসাহের সঙ্গে সবকিছু দেখতে লাগল।

বুড়ির চোখ এদিক-ওদিকে চক্কর মারতে লাগল। এক সময় দেখল, রসুই খানার মেঝেতে পড়ে এক আউরৎ কাৎরাচ্ছে। ব্যাপারটি বুঝতে তার বাকী রইল না।

ক্রীতদাসীরা যখন সামানপত্র নিয়ে মেতে রয়েছে তখন বুড়ি গুটি গুটি রসুইখানার ভেতরে ঢুকে বলল—'বেটি, আল্লাহ'কে ডাক। তিনিই তোমার তকলিফ দূর করবেন, তাঁর নির্দেশেই আমি তোমাকে উদ্ধার করার জন্য এখানে হাজির হয়েছি। তুমিই তো আলী শার-এর বিবি ক্রীতদাসী জুমুর্‌রদ, তাই না?'

বুড়ি এবার সমানপত্র ফেরী করার অছিলায় কিভাবে এখানে হাজির হয়েছে সে বৃত্তান্ত তার কাছে সংক্ষেপে ব্যক্ত করল।

বুড়ি বার কয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে ক্রীতদাসীদের অবস্থা দেখে নিয়ে অপেক্ষাকৃত গলা নামিয়ে বলল—'কাল সন্ধ্যাবেলা তৈরী থেকো, আমি তোমাকে পালাবার ফিকির ক'রে এখান থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাব। আর একটি বাৎ, এখান থেকে জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা থেকে শিসের আওয়াজ পেলে তুমি শিস দিয়ে জানান দিও।'

জুমুর্‌রদ ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল।

বুড়ি ব'লে চলল—'শিস শুনতে পাওয়া মাত্র তুমি প্রাচীর টপকে নিচে নেমে যাবে, মনে থাকবে? আলী শার তোমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করবে।'

বুড়ির বাৎ শোনামাত্র জুমুর্‌রদ খুশীতে চিক্‌চিক্ করতে লাগল। আনন্দে ডগমগ হয়ে বুড়ির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানাল।

বুড়ি এবার রসিদ-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে আলী শার-এর মকানে গেল। জুমুর্‌রদ-এর সঙ্গে যে-পরামর্শ হয়েছে তার কাছে সবিস্তারে ব্যক্ত করল।

আলী শার বুড়িকে বহুভাবে ধন্যবাদ দিল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন

স্বরূপ কিছু উপহারও তাকে দিতে চাইল। বুড়ি কিছুতেই কোন পুরস্কার নিতে সম্মত হ'ল না। সে বলল—'আল্লাহ্-র নির্দেশেই সে এ-কাজ করেছে। পুরস্কার নেয়ার অধিকার তো তার নেই।

বুড়ি আলী শার-এর কাছ থেকে ফিরে নিজের ডেরায় এল। রুজু স্বরে আল্লাহ-র কাছে প্রার্থনা জানাল, আলী শার যেন আগামী কাল তার বিবিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

বুড়ি বিদায় নিলে অফুরন্ত খুশীর মুহূর্তেও আলী শার-এর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার মধ্যে এখন আতঙ্ক দেখা দিল জুমুর্‌র্যদ ফিরে এলে সে কোন্ মুখে তার সামনে দাঁড়াবে? সে তাকে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী করে সতর্ক ক'রে দিয়েছিল—পঞ্চাশ দিনারের একটি কানাকড়ির বেশী দামে কার্পেট বিক্রি করবে না। ভুলেও যেন অচেনা কোন ফেরীওয়ালার কাছে কার্পেট বিক্রি কোরো না। কিন্তু তার কোন নির্দেশই তো সে পালন করে নি। আর এরই জন্য এ প্রমাদ ঘটল।

আলী শার পরের দিন যথা সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তার বিবি জুমুর্‌র্যদ-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রি ক্রমেই গভীর হতে থাকে। কিন্তু তার বাঞ্ছিতার দেখা নেই। সময় ক্রমে এগিয়ে চলে। চোখ দুটোতে নিদ জড়িয়ে আসে। নিদ কখন টুটল যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। তখন নিজের হাত-পায়ের দিকে তাকিয়ে থমকে যায়। হাত-পা বাঁধা। হায় আল্লাহ! এ-হালৎ কে, কখন করল?'

নসীব। বিলকুল নসীবের খেল। কোশিস যতই করা যাক না কেন, নসীব এড়াবার সাধ্য কারো নেই। নইলে সে-রাত্রেই রসিদ-এর বাড়ি ডাকুরা কেনই বা ঘিরতে যাবে?

ডাকুরা রসিদ-এর বাড়ি ঘেরাও করতে গিয়ে আলী শার'কে প্রাচীরে হেলান দিয়ে গভীর নিদে আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। তার গায়ে বহুমূল্য পোশাক আশাক ছিল। ডাকাতরা তার গা থেকে সেগুলো খুলে নিল।

ডাকুরা হঠাৎ দেখল রসিদ-এর বাড়ির ওপরতলার একটি জানালা খুলে গেল। ঝটপট তারা এক ধারে সরে গিয়ে আত্মগোপন করে রইল।

কিছুক্ষণ বাদেই ডাকাত-সর্দার শুনতে পেল খোলা জানালা দিয়ে এক লেড়কি শিস দিয়ে যেন কাকে তলব করছে। ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ ক'রে তার কৌতূহল হ'ল। লোভও গেল বেড়ে। সে-ও আচমকা একটি শিস দিল। পরমুহূর্তেই সে অবাক হ'ল। দেখতে পেল, একটি লেড়কি জানালা দিয়ে, ঝুলন্ত দড়ি বেয়ে বেয়ে প্রাচীরের এপাশে চলে আসছে। লেড়কিটি মাটিতে পা দেবার আগেই ডাকাত-সর্দার তাকে পড়ন্ত পাকা ফলের মত লুফে নিল।

ডাকু লেড়কিটিকে হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়ামাত্র তাকে পিঠের ওপর নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। তার গায়ে অসুরের

তাগদ। জুমুর্‌র্যদ'কে নিয়ে ছুটে পালাতে তাকে কিছুমাত্রও বেগ পেতে হ'ল না।

আলী শার তখনও সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই প্রাচীরে হেলান দিয়ে শুয়ে তার বিবিকে উদ্ধার করার ফিকির বের করার খোয়াব দেখে চলেছে।

এদিকে অসুরের মত প্রবল বিক্রমে ডাকাতটি জুমুর্‌র্যদ'কে নিয়ে দৌড়োবার সময়েও জুমুর্‌র্যদ এতটুকু বুঝতে পারে নি সে আলী-শার-এর পিঠে নয়, অন্য কারো পিঠে অবস্থান ক'রে পথ পাড়ি দিচ্ছে। তবে দৌড়োনোর গতি দেখে সে বিস্মিত হয়। সে এক সময় বলল—'কি গো, তবে যে বুড়িটি বলল, তুমি আমার শোকে একেবারে কাবু হয়ে গেছ। কিন্তু কার্যত তো তোমার চেয়ে দ্রুত দৌড়োতে দেখছি! বুড়িটি বানিয়ে বানিয়ে বেমালুম এমন ঝুট বাৎ বলে গেল!'

ডাকুটি মুখে কলুপ এঁটে রইল। কোন উত্তর দেয়া দূরের কথা টু-শব্দটিও করল না।

জুমুর্‌র্যদ-এর কৌতূহল হ'ল। শক্ত ক'রে তার চুলের মুঠি ধরে ঘাড় কাৎ করল। তার মুখটি দেখার কোশিস করল। ডাকাতটির চুল মুঠো ক'রে সামান্য কাৎ হয়ে ঝুঁকতেই তার কলিজা ছ্যাৎ করে উঠল। ভাবল, আলী শার-এর চুল তো এমন পাটের মত নয়। হাত দুটো আরও নামিয়ে তার গালের ওপর বার কয়েক ঘষল। এবার সে নিঃসন্দেহ হ'ল, নির্ঘাৎ অন্য কেউ তাকে ছল করে নিয়ে চলেছে। চিল্লিয়ে উঠল—'কে? কে তুই? তুই কে, কথা বল।'

ইতিমধ্যে ডাকুটির তেজী ঘোড়া তাদের নিয়ে নগর ছাড়িয়ে

প্রায় ফাঁকা এক জায়গায় হাজির হয়ে গেছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চিল্লিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না। কোশিস অবশ্য করল। ফয়দা কিছু হ'ল না।

ডাকু সর্দার বলল—'সুন্দরী, কোন ফয়দা হবে না। কেউ শুনবে না তোমার গলা। শোন, আমি এক ডাকু। জনাফ আমার নাম। আহমদ অল-দানাব আমার সর্দার। তার দলে আমার মত চল্লিশজন ডাকু আছে। সবাই আমার মত গায়ে গতরে এমন বিশাল। তবে দুঃসাহস বলতে যা কিছু আমারই সবচেয়ে বেশী। আবার বদমাই-শিতেও আমি সেরা। আমার সাফ বাৎ শোন সুন্দরী। আজ রাত্রিতে তোমার যৌবনের জোয়ার লাগা এ তুলতুলে নরম শরীরটিকে আমি আগে দলন, পেষণ আর সম্ভোগের মাধ্যমে সাধ মিটিয়ে ভোগ করব। তারপর ছিবড়েটুকু ছুঁড়ে দেব আমার সাঙ্গাৎ ডাকুদের দিকে। তারাও একে একে তোমাকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে খুবলে খুবলে খাবে। দেখবে, জিন্দেগীতে এত সুখ কোন মরদ তোমাকে দিতে পারে নি। অনেকেই হয়ত তোমার ওপর চেপেছে। লদকালদকি করেছে। নিজেরা সুখ কতটুকু পেয়েছে, জানি না। কিন্তু তোমাকে নির্ঘাৎ আমার মত এত সুখ দিতে পারে নি। তোমার ওপরে আমি চেপে যখন তলপেটে সুড়সুড়ি দেব তখন তোমার দিল্ বলবে, আমাকে দলাইমলাই ক'রে শেষ ক'রে দাও। জান একদম খতম করে দাও—এত সুখ আমি আর সইতে পারছি না! ঠিক তখনই তোমার কামোন্মাদ শরীরের দুই উরুর মাঝখানে আমি ডুবে যাব। তারপর? আমরা উভয়ে পরম তৃপ্তির অতল অন্ধকারে একটু একটু ক'রে ডুবে যাব, হারিয়ে যাব। তারপরই তোমার চাওয়ার চেয়ে অনেক অনেক বেশী পাওয়ার মধ্য দিয়ে শরীর এলিয়ে পড়ে থাকবে। এবার একই ভাবে আমরা চল্লিশজন জোয়ান মরদ একে একে তোমার শরীরটি নিয়ে নাড়াচাড়া করব। ছিবড়ে চুষে চুষে রস নিঙড়ে নেয়ার কোশিসে মেতে উঠব।

—উফ! খোদা মেহেরবান! কী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে আমাকে ঠেলে দিলে! এমন কি গুণাহ করেছি আমি যার জন্য আমাকে এমন চরম পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিলে! আমাকে এনে ফেললে একেবারে বিশ জোড়া হিংস্র জানোয়ারের হাতে!

জুমুর‍্যদ চিল্লিয়ে কাঁদতে চেষ্টা করল। চি চি শব্দ ছাড়া আর কিছুই তার গলা দিয়ে বেরলো না। কারণ, ইতিমধ্যেই ডাকুটি তার মুখ চেপে ধরেছে। বিপদের মোকাবেলা করার জন্য সে খোদাতাল্লার কাছে শক্তি, সাহস ও ধৈর্য প্রার্থনা করতে লাগল।

জুমুর‍্যদ ভাবল, খোদাতাল্লার মর্জিতেই দুনিয়ার সব কাজ হয়। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একচুলও এদিক ওদিক হবার জো নেই। নসীবকে মুখ বুজে সহ্য করতেই হবে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' তেইশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, দুর্ধর্ষ সে ডাকুটি জুমুর‍্যদ'কে ফিন পিঠে তুলে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। এক সময় এক পাহাড়ের গুহায় হাজির হ'ল। চল্লিশটি ডাকুর ডেরা। তারা দিন গুজরান করে এখানে। সারারাত্রি নিজেদের ধান্দায় টুঁড়ে বেড়ায়। নিশাচররা যা করে থাকে।

ডাকুদের ডেরায় এক বুড়িও থাকে। সে এ-ডাকুটির আম্মা। গুহার মুখে গিয়েই ডাকুটি তার বুড়ি আম্মাকে ডাকল। জুমুর‍্যদ'কে বুড়ির হাতে সঁপে দিয়ে সে বলল—'আমি ফিন ফিরে না আসা পর্যন্ত হুরীটি তোমার জিম্মায় রইল। একটু তোয়াজ টোয়াজ ক'রে ওর দিল্‌কে তৈরী কর। আমি দোস্তদের সঙ্গে এক জায়গায় হামলা চালাতে যাচ্ছি। এতগুলো জোয়ান মরদের মহব্বত সহ্য করতে হলে দিল্‌কে শক্ত করতে হবে তো।' কথা বলতে বলতে ডাকুটি ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ডাকুটি বিদায় নিলে বুড়ি জুমুর‍্যদকে পাশে বসাল। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—'বেটি, চোখের পানি মোছ। আনন্দ কর। ভাবতে পার, চল্লিশটি জোয়ান মরদ এক এক ক'রে তোমার তুলতুলে দেহটিকে নিয়ে যখন লদকালদকি করবে তখন কী সুখই না পাবে! সুখে-তৃপ্তিতে তোমার দিল্ নেচে নেচে উঠবে। একা চল্লিশজন জোয়ান মরদকে পাড় করার নসীব কয়জনের হয়, বল?'

জুমুর‍্যদ বুড়ির সব বাৎ নিঃশব্দে শুনল। টু-শব্দটিও করল না। বোরখাটি খুলে মাথার তলায় দিয়ে শুয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে

চোখের পানি ঝরাতে লাগল। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। ভোরে গুহার মুখ দিয়ে সূর্যের আলো উঁকি দিল। সে গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে আপন মনে বলতে লাগল—'শয়তানের নজর পড়েছে আমার ওপর। একটি নয়, চল্লিশটি শয়তান আমার দিকে জুল্ জুল্ করে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবে। তারপর? আমার দেহটিকে নিয়ে সবাই হিংস্র জানোয়ারের মত—উফ! আর ভাবতে পারছি না! ইয়া আল্লাহ! একী কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেললে আমাকে! এ কয়েদখানা থেকে ভেগে যাওয়ার চিন্তা পাগলের প্রলাপ। ফিন নিশ্চেষ্ট হয়ে এখানে বসে থাকাও সম্ভব নয়। কিন্তু কি ক'রে আমি আত্মরক্ষা করব! ফিকির আমাকে করতেই হবে। আমার আত্মা, আমার ইজ্জৎ আর আমার সতীত্বকে রক্ষা আমি করবই করব। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমার দেহটিকে কিছুতেই আমি গুনাহের অতল-গহ্বরে ডুবিয়ে দিতে পারব না।'

জুমুর্‌র্যদ নিজের দিলের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে উঠে দাঁড়াল। ওড়না দিয়ে চোখের পানি মুছল। এবার গুটিগুটি বুড়ির কাছে এল। জোর করে কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা এনে বলল—'তোমার আদর যত্নে আমার দিল্ আর দেহ দু'-ই চাঙা হয়ে উঠেছে। চল্লিশটি জোয়ান মরদের লদকালদকি সহ্য করতে কোন তকলিফই হবে না। কিন্তু সবে তো সকাল হ'ল। কাম কাজ তো শুরু হবে সেই রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে, ইয়া পেল্লাই দিন। এতক্ষণ একা একা মুখ বন্ধ করে বসে থাকলে কামজ্বালা আমাকে পেয়ে বসবে। কলিজাটিকে কুঁরে কুঁরে খাবে।'

বুড়ি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চোখের নিস্তেজ মণি দুটোকে মেলে জুমুর্‌র্যদ-এর মুখের দিকে তাকাল। তার তোবড়ানো মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি।

জুমুর্‌র্যদ ব'লে চলল—'চুপটি ক'রে বসে না থেকে বরং চলুন গুহার বাইরে গিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে আপনার মাথার উকুন বেছে দেই।' তার বাৎ শুনে বুড়ি তো খুশীতে একেবারে ডগমগ। হাত বাড়িয়ে তার গালে চুমু খেয়ে বলল—'তুমি পারবে বেটি, চল্লিশটি জোয়ান মরদ-কে পাড় করতে! তোমার ওপর খোদাতাল্লার দয়া আছে।'

—'হ্যাঁ, আমারও এরকমই বিশ্বাস।'

—'তা বেটি, আমার উকুনের ব্যাপারেই যখন বললে, শোন তবে—কেনই বা উকুনের ঝাঁক সরাইখানার মত আমার মাথা আশ্রয় করবে না। এখানে আসা অবধি এক বদনা পানিও মাথায় ঢালার সুযোগ হয় নি। তাই-তো তামাম দুনিয়ার উকুন এসে আমার মাথায় জমায়েত হয়েছে। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, তুমি আমার মাথায় উকুনগুলোকে যদি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিতে পার তবে তোমার ভাল-মন্দের চিন্তা আমার রইল।'

বুড়ি খুশীতে ডগমগ হয়ে জুমুর্‌র্যদকে সঙ্গে নিয়ে গুহার বাইরে এল। প্রায় সমতল একখণ্ড পাথরের ওপর রোদে পিঠ দিয়ে বসল।

জুমুর্‌র্যদ বুড়ির মাথার উকুন বাছতে বাছতে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাতে লাগল। উদ্দেশ্য, পালাবার ধান্দা বের করা। মিহি চিরুণি দিয়ে বুড়ির মাথা আঁচড়াতে লাগল। একে শীতের সকালে রোদের আমেজ তারপর উকুন বাছার সুখে অল্প সময়ের মধ্যেই বুড়ি পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে নিদ গেল। গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

জুমুর্‌র্যদ এবার সন্তর্পণে পা টিপে টিপে উঠে দাঁড়াল। পাশেই ডাকুদের একটি ঘোড়াকে ঘাস খেতে দেখল। তার কাছে গেল। একলাফে তার পিঠে চেপে বসল। ব্যস, দিল জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে।

কিন্তু কোনদিকে যেতে হবে, কোথায় তার মেহবুব আলী শার -এর মকান জানা নেই। শয়তান ডাকুটি রাতের অন্ধকারে তাকে গুহায় নিয়ে গিয়েছিল। তাই সে অনন্যোপায় হয়ে হারা উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

জুমুর্‌র্যদ দিনভর উন্মাদিনীর মত ঘোড়া ছুটাল। এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। ঘোড়া থামিয়ে এক ঝাঁকড়া গাছের তলায় ঘোড়া দাঁড় করাল। শক্ত ক'রে ঘোড়াটিকে বাঁধল। তারপর গাছটির গায়ে হেলান দিয়ে আধো নিদ আধো জাগরণের মধ্য দিয়ে রাত্রি গুজরান করল।

ভোরের আলো ফুটে উঠল। জুমুর্‌র্যদ ফিন ঘোড়ার পিঠে চাপল।

জুমুর্‌র্যদ এগার দিন ঘোড়া ছুটিয়ে মরুভূমি পেরিয়ে এক মনোরম ঘাসের দেশে এসে পৌঁছাল। সেখানে ইয়া বড় বড় সবুজ ঘাসের

বিচিত্র সমারোহ। পাশেই পানিও রয়েছে। সে ঘোড়া থেকে নামল। একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঘোড়াটি বেঁধে দিল ঘাস খেয়ে একটু শক্ত সাবুদ করে নেয়ার জন্য। এবার সে এক-পা-দু' পা করে এগিয়ে গেল। দেখল, গাছে গাছে পাকা ফল ঝুলছে। একটি শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে কিছু পাকাফল পাড়ল। পেটপুরে খেল। তলাও-এর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে কলিজাটিকে শান্ত করল।

জুমুর্‌রাদ ফিন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সামান্য এগোতেই সে এক জঙ্গলে ঢুকে গেল। গভীর জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সরু একটি পথ। সে-পথ ধরে দুর্বার গতিতে ঘোড়া ছুটে চলল। জঙ্গল পেরিয়ে ঘোড়া এবার এক নগরে ঢুকল। দূর থেকে সুউচ্চ একটি চূড়া দেখেই সে অনুমান করেছিল যে নির্ঘাৎ গম্বুজের চূড়া। এখন কাছে আসায় নিঃসন্দেহ হ'ল।

নগরে ঢুকেই জুমুর্‌রাদ দেখল, পথের ধারে কয়েকজন জটলা করছে। জটলা ঠিক নয়, বিজয়োল্লাস। সে ঘোড়া নিয়ে কাছে যেতেই ইনামদার, আমীর, ওমরাহ আর নেতৃস্থানীয় কিছু আদমী ছুটে এসে তাকে কুর্ণিশ করে এমন কায়দায় দাঁড়াল যেন তার আদেশ পালন করতে পারলে নিজেদের জীবন ধন্য জ্ঞান করবে।

এতগুলো গণ্যমান্য আদমীর কাণ্ডকারখানা দেখে জুমুর্‌রাদ রীতিমত অবাক মানল। এমনতর উষ্ণ সম্বর্ধনার কথা তো ভাবতেই পারে না।

সমবেত আদমীরা সোল্লাসে ব'লে উঠল—'আল্লাতাল্লা আপনার মঙ্গল করুন! আমাদের সুলতানকে দীর্ঘজীবি করুন। হে মহামান্য সুলতান, আপনার সুমহান ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে সুলতানিয়ৎ সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আর প্রজাদের সুখ উৎপাদিত হোক!'

তাদের বাৎ শেষ হতে না হতেই হাজার হাজার সশস্ত্র সৈন্য সারিবদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে এগিয়ে এল।

সবার আগে ঘোড়ার পিঠে অবস্থানরত ঘোষক গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে সুলতানের শুভাগমন ঘোষণা করতে লাগল।

এখানকার আদমিদের কাণ্ডকারখানা দেখে ছদ্মবেশী জুমুর্‌রাদ-এর তো চক্ষুস্থির। এসবের কারণ কিছুই সমঝে উঠতে পারল না।

নগরের প্রধান তার ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জুমুর্‌রাদ তাকে জিজ্ঞাসা করল—'আদৎ মতলব কি, বলুন তো?'

রাজপ্রাসাদের রক্ষীর কানে তার প্রশ্নটি গেল। সে এগিয়ে এসে কুর্ণিশ ক'রে বলল—'জাঁহাপনা, আল্লাহ-র কী মর্জি! কী অসীম দোয়া। তাই তো তিনি আপনাকে আমাদের মুলুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

—'তার মানে? কি বুঝাতে চাইছেন, খোলসা করে বলুন।'

—'জাঁহাপনা, আল্লাহ-ই এ-সুলতানিয়তের মুকুট আপনার শিরে পরিয়ে দিয়ে মসনদে বসিয়ে দিয়েছেন। আমরা আপনার মত
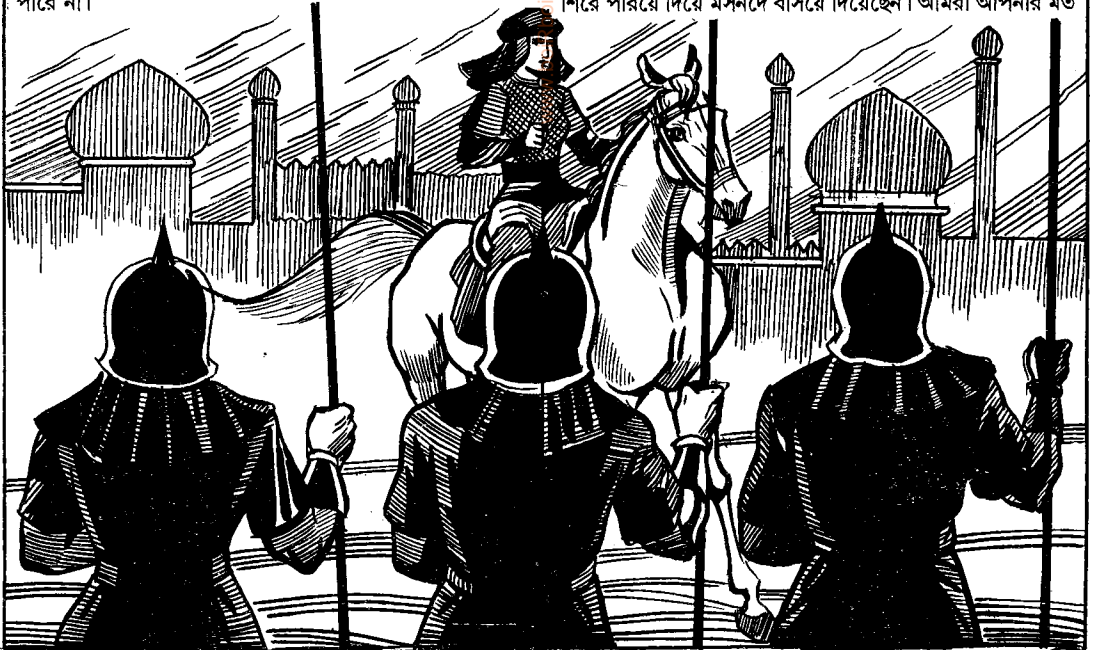
এক খুবসুরৎ নওজোয়ানকে আমাদের অভিভাবকরূপে পেলাম। আল্লাহ'কে সুকৃরিয়া জানাতেই হয়। তিনি চাইলে তো আপনাকে না পাঠিয়ে অন্য কোন আদমি, কোন ভিখমাঙ্গাকেও পাঠিয়ে দিতে পারতেন। তা না ক'রে আপনাকে পাঠানোর জন্য হাজার সুকৃরিয়া তাঁকে জানাতেই হয়।'

জুমুর্‌রদ আরও তাজ্জব বনল।

রাজপ্রাসাদের রক্ষী ব'লে চলল—'হ্যাঁ খোদাতাল্লাকে জরুর সুকৃরিয়া জানাতে হয়। নইলে আপনার বদলে কোন ভিখমাঙ্গা এসে হাজির হলেও আমরা তাকে সুলতানের মসনদে বসাতাম। এরকম সম্মান-খাতির, এরকম সম্বর্ধনা তাকেও আমরা জানাতে বাধ্য থাকতাম।

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলার পর প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের কিচির-মিচিরের মাধ্যমে ভোরের পূর্বাভাষ ঘোষিত হ'ল। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' চব্বিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু না হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, নগরবাসীদের উষ্ণ সম্বর্ধনায় জুমুর্‌রদ যারপরনাই তাজ্জব বনে গেল।'

জুমুর্‌রদ রাজপ্রাসাদের রক্ষীটির বক্তব্যের ফাঁকে চোখ দুটো কপালে তুলে ব'লে উঠল—'একজন ভিখমাঙ্গা এলেও—'

তার মুখের বাৎ ছিনিয়ে নিয়ে রক্ষীটি এবার বলল—'আলবাৎ! জাঁহাপনা আমাদের মুলুকের প্রচলিত রীতি হয়ত আপনার জানা নেই, ঠিক কিনা?'

—'কী? কি সে রীতি?'

—'আমাদের মুলুকের সুলতান যদি অপুত্রক অবস্থায় বেহেস্তে চলে যান তবে আমরা উৎসুক দৃষ্টি মেলে পথের দিকে চেয়ে থাকি খোদাতাল্লা কবে আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবেন, নতুন সুলতানকে পাঠিয়ে দেবেন। সুলতান গোরে যাবার পর যে-পরদেশীই আমাদের মুলুকে আসবেন তাকেই আমরা মসনদে বসিয়ে সুলতান হিসাবে বরণ করে নেই, এ রীতি আবহমান কাল থেকে এ-সুলতানিয়তে চলে আসছে। আল্লাহ'কে হাজার কুর্নিশ করি তিনি মেহেরবানি করে খুবসুরৎ এক সুলতানকেই আমাদের মুলুকে পাঠিয়েছেন।'

রাজপ্রাসাদের রক্ষীর বাৎ শুনে জুমুর্‌রদ-এর মাথায় নানা মতলব এসে ভিড় করতে লাগল। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, চট জলদি সে এমন কোন কাজই করবে না যার ফলে তার আদৎ রূপ তাদের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে চোখে-মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটিয়ে তুলে অনুচরদের উদ্দেশ্যে বলল—'আমার বাৎ শোন। আমি তুর্কী ঠিকই। লেকিন সামান্য বংশে আমি পয়দা হইনি। খানদানি বংশ আমার। মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে আল্লাতাল্লার অপূর্ব সৃষ্টি দেখব বলেই আমি ঘোড়ার পিঠে উঠেছি। তবে হ্যাঁ, মহল্লা ছাড়ার আগে আত্মীয় ও দোস্তদের সঙ্গে বিবাদ একটু-আধটু হয়েছিল। সেখানে ফিন ফিরে যাব না এরকম বাৎ-ও বলেছিলাম। আল্লাতাল্লা যেমন তোমাদের আমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন তেমনি আমিও অপ্রত্যাশিত সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়েছি। এমন সুযোগ হাতছাড়া ক'রে বোকামির পরিচয় দিতে আমি মোটেই রাজী নই। আল্লাতাল্লা-র নামে কসম খেয়ে আমি বলছি, তোমাদের দেওয়া মুকুট শিরে ধারণ করে মসনদে বসব।'

মিছিল এক সময় সুলতানের প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল।

রাজপ্রাসাদ রক্ষী, উজির, আমীর ওমরাহরা ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এসে যথোচিত অভ্যর্থনাসহ ছদ্মবেশী জুমুর্‌রদ'কে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাল।

প্রাসাদেরই বিশালায়তন এক সুসজ্জিত কামরায় পারিষদরা নতুন সুলতানকে সম্বর্ধনা জানানোর প্রস্তুতি নিতে মেতে গেল। তার গায়ে চাপাল সোনার জরির কাজ করা অত্যুজ্জ্বল রেশমী পোশাক। শিরে পরিয়ে দিল সুলতানের মুকুট। হাতে দিল সুলতানিয়তের প্রতীক রাজদণ্ড। এবার জয়ধ্বনি সহকারে তাকে মসনদে বসিয়ে দিল।
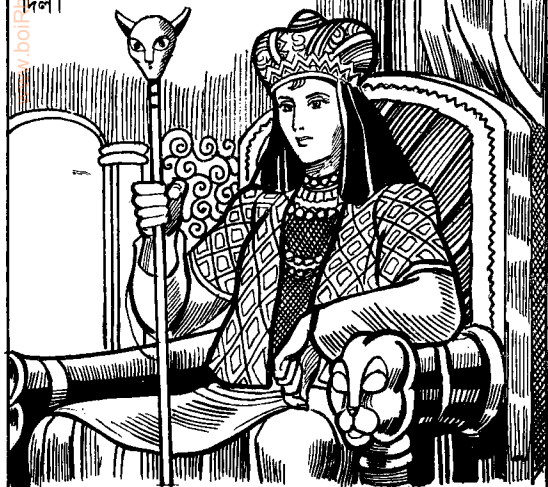
বৃদ্ধ উজীর, নাজীর, আমীর ওমরাহ থেকে শুরু করে সাধারণ পার্ষদ পর্যন্ত সবাই আভূমিলুণ্ঠিত হয়ে যথোচিত সম্মান জ্ঞাপন করল।

সদ্য অভিষিক্ত সুলতান শপথবাক্য পাঠ করল।

সভাসদরাও আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে সম্বর্ধনা-সভার কাজ সাঙ্গ করল।

জুমুর্‌রাদ সুলতানের পদে অভিষিক্ত হয়ে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে নিজেকে লিপ্ত করল।

মসনদে বসেই জুমুর্‌রাদ কোষাগার থেকে অপরিমিত অর্থ দুস্থ প্রজাদের মধ্যে বিলি করল। প্রজারা তো আল্লাদে একেবারে গদগদ। এমন দিল্ দরিয়া, এমন গরীবের দোস্ত ইতিপূর্বে কোন সুলতানই নাকি তারা জিন্দেগীতে দেখে নি।

জুমুর্‌রাদ এবার আর এক অভাবনীয় পদক্ষেপ নিল—গরীব গুবরা প্রজাদের বকেয়া কর মকুব করাই শুধু নয় তাদের জন্য খয়রাতির বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে হাজার হাজার প্রজার চোখের মণিতে পরিণত হ'ল। আর? কয়েদখানার ফটক খুলে দিয়ে কয়েদীদের মুক্তি দিল। যাবতীয় মামলা মোকদ্দমার নিকেষ ক'রে দিল।

নতুন সুলতানকে পেয়ে প্রজারা যেন আশমানের চাঁদকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল। আরও আছে। তার গুণাবলীর শেষ নেই। নওজোয়ান হয়েও হারেমের দিকে ঘেঁষে না। কী অনন্য সংযম! কী ত্যাগ! কী অতুলনীয় বৈরাগ্য! সবাই ভাবল, এক পয়গম্বর। আল্লাতাল্লা প্রজাদের সুখ উৎপাদনের জন্যই তাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

সবাই সুখী। সবাই খুশী। পারিষদ থেকে শুরু ক'রে সুলতানিয়তের সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সবাই খুশীতে ডগমগ। কিন্তু সুখ নেই কেবলমাত্র একজনের দিলে। কে সে! জুমুর্‌রাদ স্বয়ং। তার বুকে তিলমাত্র খুশীও নেই। দিনভর হরকিসিমের কাজের মধ্যে ডুবে থাকে বটে। কিন্তু বুকের মধ্যে বারবার উঁকি মারে তার বাঞ্ছীত আলী শার-এর মুখ। কেউ জানে না তার জ্বালা কোথায়? কোথায় পরিপূর্ণতার মাঝেও তার অপূর্ণতার ব্যথা-বেদনা। বুকের জ্বালা তুষের আগুনের মত গোপনে পুষে রেখে সে তলে তলে আলী শার-এর খোঁজ করতে থাকে। সে যে সাচ্চা মুসলমান। সাচ্চা সতী। পতি অন্তঃপ্রাণা। তার মেহবুবাকে আজ না হোক কাল খুঁজে সে পাবেই। তাকে ফিরে পেতেই হবে।

এক মাহিনা—দু'মাহিনা ক'রে পুরো এক সাল কেটে গেল। জুমুর্‌রাদ গোপনে আলী শার-এর বহুৎ তালাশী করল। কিন্তু কোন পাত্তাই মিলল না।

জুমুর্‌রাদ এবার একটি মতলব ভাঁজল। দারুণ এক ফন্দি। ফন্দিটি যাতে সে শীঘ্র প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য সে তার সুলতানিয়তের উজির, নাজির আর আমীর-ওমরাহদের তলব করল। তাদের হুকুম দিল, আনুমানিক সোয়া তিন মাইল জায়গা ভাল ক'রে ঘেরাও করার বন্দোবস্ত করুন। তার কেন্দ্রস্থলে একটি গম্বুজাকৃতি মহল বানাবেন। প্রাসাদে একটি সুদৃশ্য মসনদ রাখবেন। আর মহলের পুরো মেঝে পারস্যের লাল গালিচা দিয়ে মুড়ে দেবেন। সেখানে সুলতানিয়তের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসবেন। সুলতান জুমুর্‌রাদ-এর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করা হ'ল।

সুলতানিয়তের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হ'ল। বাদশাহী খানাপিনার বন্দোবস্ত করা হ'ল। সরাবের বন্যা ছুটল। নিমন্ত্রিতরা মহা খুশী হয়ে বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা ব'লে সুলতানের জয়ধ্বনি দিল।

খানাপিনা আর চলল নাচা-গানা। এরই ফাঁকে জুমুর্‌রাদ উপস্থিত মেহমানদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখল—প্রতি মাহিনার গোড়াতে আমি এখানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাব। আমার সুলতানিয়তের প্রজারাও ভোজে যোগদান করবে। আমার হুকুম যে অমান্য করবে তার গর্দান নেব।'

পরের মাসের গোড়ার দিকে সুলতানের হুকুমে ঘোষক ঢ্যাড়া পিটিয়ে প্রচার ক'রে দিল, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সুলতানের নয়া মহলে ভোজ-সভায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় গর্দান যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে মসনদে সুলতান বসলেন। আর তামাম সুলতানিয়তে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই মিছিল ক'রে হাজির হ'ল পূর্ব ঘোষিত সুলতানের নতুন মহলে। খানাপিনা সারতে সারতে সবাই একে অন্যের সঙ্গে বাৎচিৎ করতে লাগল—এমন প্রজাহিতৈষী সুলতান তামাম দুনিয়াটি ঢুঁড়ে এলেও দ্বিতীয় আর একটি মিলবে না।

সুলতান জুমুর্‌রাদ গোপনে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত। সে চঞ্চল চোখের মণি দুটো উপস্থিত সবার মুখের ওপর ঘুরপাক খাওয়াতে লাগল। সে তাজ্জব বনল দিল্ যাকে চায় তাকে তো পায় না। কোথায় মিলবে তাকে?

সুলতানের মানসিক অস্থিরতা ও চোখের মণি দুটোর চাঞ্চল্যটুকু প্রজাদের কারো কারো নজর এড়াল না। একজন তো সচকিত হয়ে পাশের আদমিকে বলেই ফেলল—'গতিক তো বড় সুবিধের মালুম হচ্ছে না। খোদাতাল্লার কসম! আমার ডর লাগছে। সুলতান যেন বার বার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন।'

উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক উদরসর্বস্ব মাঝ-বয়সী আদমী খানাপিনা সারছে। সে একের পর এক রেকাবির খানা উদরে চালান দিতে লাগল। তার চৌদ্দ পুরুষেও যেন এ রকম খানা খায় নি। কে এ-আদমিটি? এ-আদমিই খ্রীষ্টান বরসুম। এর দৌলতেই জুমুর্‌রাদ আর আলী শার-এর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। উভয়ের জিন্দেগীতে নেমে এসেছে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ, দুর্দশা আর হতাশা। তারই সহায়তায় তার বড় ভাইয়া রসিদ অল-দিন আলী শার'কে নেশার ঘোরে মৃত প্রায় ক'রে রেখে জুমুর্‌রাদ'কে নিয়ে চম্পট দিয়েছিল।

সুলতান জুমুর্‌রাদ অপলক চোখে তার প্রতিটি মুহূর্তের

কার্যকলাপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' পঁচিশতম রজনী

পরের রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কোনরকম ভূমিকা না ক'রে কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন। বেগম বললেন—'জাঁহাপনা, নিমন্ত্রিত মেহমানরা যখন খানার রেকাবি খালি করার জন্য ব্যস্ত তখন সুলতান খ্রীষ্টান বরসুম রেকাবির পর রেকাবি খানা উদরে চালান দিতে প্রাণান্ত কোশিস চালিয়ে যাচ্ছে আর মাঝে-মধ্যে সুলতানের চোখ দুটোর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখে চলেছেন।'

বরসুম-এর পাশের লোকটি তার খাওয়ার বহর দেখে বলল—'করছ কি হে! এমন গোগ্রাসে খানা চালান দিচ্ছ, গরহজম হয়ে মরবে নাকি। এবার রেহাই দাও।' বরসুম পাত্তা দিল না, পাশের অর একজনের পাত থেকে একটি গোস্তর টুকরা তুলে নিল।

বরসুম যখন ইয়া বড় একটুকরো গোস্ত দাঁতের সাহায্যে বাগে আনার জন্য প্রাণান্ত কসরৎ চালাচ্ছে ঠিক তখনই চারজন সিপাহী অতর্কিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিনা কৈফিয়তেই পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

শয়তান খ্রীষ্টান বরসুম তো চিল্লাচিল্লি ক'রে, হাত-পা ছুঁড়ে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল।

জুমুর‍্যদ গোড়া থেকেই তার চালচলনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলছিল। তাই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছে।

সিপাহীরা বরসুম'কে বেঁধে সুলতানের সামনে হাজির করল। ব্যাপার দেখে উপস্থিত সবাই তো তাজ্জব বনে গেল।
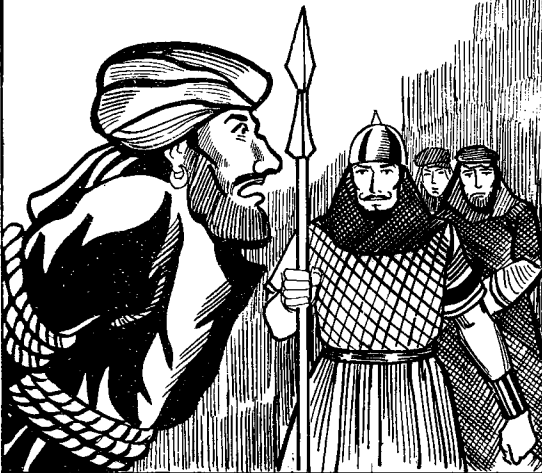
একজন পাশ থেকে ব'লে উঠল—'উচিত শাস্তিই হয়েছে। যত পার খাও। খানার তো আর ঘাটতি নেই! তাই বলে একজনের পাত থেকে খানা ছিনিয়ে নেবে নাকি! গুনাহ—অন্যের খানা ছিনিয়ে খাওয়া ঘোরতর গুনাহ।'

জুমুর‍্যদ-এর চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোতে চাচ্ছে। ক্রোধের আগুন।

জুমুর‍্যদ অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল—'তুমি কে হে? তোমার চোখের তারা দুটো নীল দেখছি। এরকম চোখ গুনাহের কারণ। কি নাম তোমার? পেশা কি? তুমি তো এ-মুলুকের কেউ নও। এখানে এসেছ কেন, বল তো?'

বন্দী বরসুম-এর শিরে মুসলমানদের মাফিক একটি সাদা পাগড়ী বাঁধা। সাদা পাগড়ী জড়ালেই নিস্তার পাওয়া যায় না।

সুলতানের প্রশ্নের জবাবে বন্দীটি বলল—'জাঁহাপনা, আমি এক ফেরীওয়ালা। ফিতে, চুড়ি প্রভৃতি হরেক সাজসজ্জার সামগ্রী ফেরী ক'রে কোনরকমে দিন গুজরান করি।

জুমুর‍্যদ এবার এক খোজাকে বলল—'আমার কামরায় আল্লাতাল্লার দোয়া দেয়া বালি রাখা আছে, নিয়ে আয়। আর কলমটিও খেয়াল ক'রে আনবি।'

খোজাটি এক ছুটে সুলতানের আদিষ্ট দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে এল।

জুমুর‍্যদ এবার বালিগুলোকে একটি পাটাতনের ওপর বিছিয়ে দিল। কলম বুলিয়ে বুলিয়ে আঁক কেটে কেটে একটি বানর আঁকল; আর তারই পাশে কয়েকটি সোজা সোজা দাগ। এগুলো কেন এঁকেছে কিছুই মালুম হ'ল না।

জুমুর‍্যদ নিজের আঁকা ছবিটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কি যেন বলল। এক সময় গর্জে উঠল—'উল্লু কাঁহিকার! ঝুট! ঝুট বাৎ বলছিস জানোয়ার কাঁহিকার। তোর স্পর্ধা তো কম নয়! সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে বেমালুম ঝুট বাৎ বললি! তুই মুসলমানের ভেক ধরলেও নিজেকে ছাপাতে পারিস নি। তুই খ্রীষ্টান। তোর নাম বরসুম, ঠিক কিনা? একটি ক্রীতদাসীর খোঁজে এদেশে চুপিচুপি এসেছিলি। লেড়কিটিকে তুই গায়েব করেছিলি, ঠিক তো? কসুর কবুল কর। এ মন্ত্রপূত বালির সামনে দাঁড়িয়ে ঝুট বললে রেহাই পাবার জো নেই, যদি নিজের ভাল চাস, কসুর স্বীকার কর।'

সুলতানের বাৎ শুনে শয়তান বরসুম-এর কলিজা শুকিয়ে গেল। ডরে কাঁপতে কাঁপতে আচমকা আর্তনাদ ক'রে উঠল—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি ক'রে আমার গুস্তাকি মাফ ক'রে দিন।'

চোখের পানি মুছতে মুছতে বরসুম এবার বলল—'কসুর কবুল করছি। আর ঝুট বলব না। কোন কিছুই আপনাকে ছাপাব না। সাচ্চা বাৎ বটে। আমি খ্রীষ্টান। আমার ঘর থেকে এক ক্রীতদাসী ভেগে

গিয়েছিল। তারই তাল্লাশী চালাতে গিয়ে টুঁড়তে টুঁড়তে আমি আপনার সুলতানিয়তে একদিন এসে পড়েছিলাম। তারপর এক খুব-সুরৎ ক্রীতদাসীকে চুরি করে ভেগে যাই। তার ওপর জুলুমও বহুৎ-ই করা হয়েছে। আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে বলছি, ভবিষ্যতে আর এরকম কাম কাজে মতি হবে না।'

নিমন্ত্রিতরা ফিসফিসিয়ে বলাবলি করতে লাগল—'ইয়া আল্লা! দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও এরকম আর একজন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী সুলতানের দেখা মিলবে না। খ্রীষ্টানটির পেট থেকে কেমন টেনে হিঁচড়ে সমাচার বের ক'রে নিলেন।'

জুমুর্‌দ এবার জল্লাদকে বলল—'খ্রীষ্টান কুত্তাটিকে নিয়ে যাও। নগরের বাইরে নিয়ে গিয়ে এর গা থেকে ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেবে। তারপর ছালটিকে নগরের প্রবেশ-দ্বারের সঙ্গে সেঁটে দেবে। আর ধড়টি আধ-পোড়া ক'রে নালায় ফেলে দেবে।'

জল্লাদ সুলতানের হুকুম তামিল করল।

বরসুম-এর প্রতিবেশীরা মহল্লায় ফিরে গিয়ে ব্যাপার নিয়ে বাৎচিৎ করল।

পরের মাহিনায় ফিন সুলতান খানা পিনার বন্দোবস্ত করল। এবার সবাই সতর্ক। নিজের রেকাবি ছাড়া অন্য কোনদিকে কেউ ভুলেও তাকাল না।

সুলতানের নিমন্ত্রিতরা যখন খানার রেকাবি নিয়ে মেতে রয়েছে ঠিক তখনই ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। দামড়ার মত দশাসই চেহারার এক আদমি খানাপিনার আসরে এল। বিরিয়ানির রেকাবি নিয়ে হালুম হালুম ক'রে খেতে লেগে গেল।

কদাকার ষণ্ডামার্কা লোকটিকে এক নজরে দেখেই জুমুর্‌দ সনাক্ত ক'রে ফেলল। এ-ই সেই ডাকু। চল্লিশ ডাকুর মধ্যে একজন। আহমদ অল-জানাফ। ছিনতাই করা লেড়কিটিকে নিয়ে একটু ইয়ে টিয়ে করবে ব'লে সাকরেদদের নিয়ে দুপুরের পরেই গুহায় ফিরেছিল। ব্যস, গুহার মুখে বুড়িটির মুখে শোনে, চিড়িয়া ভাগ গই, চিড়িয়া পালিয়েছে। ব্যস, তার খুন শিরে চেপে গেল। তখনই কসম খায়, লেড়কিটি যেখানে থাক, পাতালের ভেতর লুকিয়ে থাকলেও খুঁজে তাকে বের করবেই। এমুলুক-সেমুলুক টুঁড়তে টুঁড়তে সে এখানে হাজির হয়েছে।

নসীবের খেল। নসীব কে খণ্ডন করবে? অল-জানাফ-এর নসীবই তাকে এখানে হাজির করেছে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' ছাব্বিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার কিস্‌সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম বাদশাহকে যথোচিত সম্ভাষণ সেরে কিস্‌সা শুরু করলেন —'জাঁহাপনা, ডাকুটি খানাপিনার মজলিশে ঢুকেই একটি বিরিয়ানির রেকাবি টেনে নিয়ে তা থেকে গোগ্রাসে বিরিয়ানি গিলতে লাগল। তার কাণ্ড দেখে উপস্থিত সবার কলিজা মোচড় মেরে উঠল। হায় হায় ক'রে উঠল সবাই। ওই খানায় গুনাহ জড়িয়ে রয়েছে। ওটা রেখে দাও। সুলতান তোমার ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেবেন। জ্যান্ত পুঁতে দেবেন! তোমার গোস্ত কুত্তা দিয়ে খাওয়াবেন।'

ডাকু জানাফ-এর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও নেই। একই ভাবে হালুম হালুম ক'রে বিরিয়ানি খেয়ে মুহূর্তে রেকাবিটি খালি ক'রে দিল। শয়তানটির হাত দুটো কুচকুচে কালো। তার ওপর অস্বাভাবিক লোমশ। কাকের পায়ের মত অনেকটা দেখতে। খানা তুলে মুখে পোরার সময় আরও বেশী কদাকার দেখাচ্ছিল। একটি উট যেন অনবরত পা চালাচ্ছে। ইয়া পেল্লাই বলের মত বিরিয়ানির ডেলা পাকিয়ে মুখে পুরে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে ভেতরে চালান দিয়ে দিচ্ছে। দৈত্যটির কাণ্ডকারখানা দেখেই অনেকের গা-পাকাচ্ছিল। রাক্ষসরাও বুঝি এর থেকে ধীরে ধীরে সমঝে টমঝে খানা খায়। সে একের পর এক বিরিয়ানির থালা সাবাড় ক'রে চলল।

ডাকু জানাফ-এর ওপর আগের সেই চার সিপাহী ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে হাজির করল সুলতান জুমুর্‌দ-এর সামনে।

জুমুর্‌দ জিজ্ঞাসা করল—'কি নাম তোমার? তোমার পেশা কি? আমাদের নগরে আসার কারণ কি?'

—'জাঁহাপনা, অ্যাটমাম আমার নাম। বাগিচার কাজ করি —মালী। নিজের মুলুকে রুটির ধান্দা হ'ল না। যদি কাম কাজ কিছু মেলে তাই টুঁড়তে টুঁড়তে এখানে হাজির হয়েছি।'

জুমুর্‌দ-এর হুকুমে ফিন সেই মন্ত্রসিদ্ধ বালি এল। কলমও আনা হ'ল একটি। ফিন শুরু হ'ল আঁক কষাকষি। বিড়বিড় ক'রে আগের মতই কি সব পাঠ। তারপর চলল হিসাব জোড়া।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কি যেন ভেবে নিয়ে জুমুর্‌দ এক সময় চিল্লিয়ে উঠল—'ঝুট! বিলকুল ঝুট। শয়তান কাঁহিকার! সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুট বাৎ বলছিস, ডর নেই তোর! তোর নসীব তোকে জাহান্নামের দরওয়াজায় পৌঁছে দিয়েছে। আমার গণনার ফল হচ্ছে, তোর নাম জানাফ। ডাকু জানাফ। ডাকাতি, রাহাজানি আর হামলা—'হুজ্জতি তোর পেশা। কুত্তা কাঁহিকার! জল্লাদ ডেকে তোর জান খমত করে ছাড়ব! গর্দান নিয়ে ছাড়ব।'

ডাকু জানাফ এবার হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠে বলল —'জাঁহাপনা, খোদার কসম, আর ভুলেও ঝুট বাৎ বলব না। আপনার বাৎ-ই সাচ্চা বটে, খোদার নামে ফিন কসম খেয়ে বলছি, আমি এ-মুহূর্তেই এ-নগর ছেড়ে চলে যাব। জিন্দেগীতে আর

আপনার মুলুকের নামও করব না। মেহেরবানি ক'রে এবারের মত দোয়া করুন, মাফ ক'রে দিন।

—'তুই এক সাচ্চা শয়তান! তোকে জিন্দা রাখলে আমার গুনাহ হবে। তোকে যত জলদি সম্ভব দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে।'

কথা বলতে বলতে জুমুর্‌রুদ জল্লাদকে ডেকে একই রকমভাবে ডাকু জানাফ-এর ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নগরীর প্রবেশ-দ্বারে টাঙিয়ে রাখার নির্দেশ দিল। আর ছালচামড়াহীন ধড়টিকে আধ-পোড়া করে নালায় ফেলে দেয়ার হুকুমও দিল।

জল্লাদ সুলতানের হুকুম তামিল করল।

পাখির ডাকে ভোর হ'ল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সাতাশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পড়তে না পড়তেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতান ছদ্মবেশী জুমুর্‌রুদ আগের মতই ঢেঁড়া পিটিয়ে তৃতীয় খানাপিনার মজলিসের বন্দোবস্ত করল। উজির, নাজির, আমীর, ওমরাহ থেকে শুরু ক'রে তার সুলতানিয়তের সাধারণ প্রজারাও যথাসময়ে হাজির হ'ল।

খানাপিনা শুরু হ'ল। বাদশাহী খানা আর সরাবের ঢালাও বন্দোবস্ত। সবার সামনে অন্যান্য খানার সামনে বিরিয়ানির রেকাবিও একটি ক'রে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিরিয়ানির রেকাবি কেউ ভুলেও ছুঁলো না। খাওয়া তো দূরের কথা, সেদিকে তাকাতেও কারো সাহসে কুললো না। ওরে ব্বাস! বিরিয়ানি খেয়ে দু'দুটো জান খতম হয়ে গেল! কোন—সাহসে আবার কেউ এদিকে হাত বাড়াব?

খানাপিনা যখন পুরোদমে চলছে তখন হঠাৎ এক বুড়ো আসরে হাজির হ'ল। তার চুল-দাড়ি সব শন পাটের মত সফেদ।

জুমুর্‌রুদ আগন্তুক বুড়োটিকে সহজেই চিনতে পারল। হতচ্ছাড়া শয়তান রসিদ অল-দিন। সে-ই সাকরেদদের নিয়ে তাকে জোর ক'রে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল। শয়তানটিকে দেখেই জুমুর্‌রুদ-এর শিরে খুন চেপে গেল। পারলে ধরে এনে সে এখনই তাকে জ্যান্ত গিলে খায়।

জুমুর্‌রুদ ভ্রূকুঁচকে রসিদ-এর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, সে এখানে কি ক'রে হাজির হ'ল? তার ভাই বরসুম তো এক মাস আগেই এখানে এসেছিল। এক মাস পেরিয়ে গেল। তবুও সে না ফেরায় উৎকণ্ঠিত হয়ে নিজেই ঘর ছেড়ে বেরোয়। এখানে-ওখানে টুঁড়ে ভাইয়ার তল্লাশী ক'রে সব শেষে এখানে হাজির হয়েছে।

নসীব। হ্যাঁ, নসীবই রসিদ'কে এখানে, ভোজের মজলিসে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে। ফিন নসীবই তার হাতে বিরিয়ানির রেকাবিও তুলে দিয়েছে।/

জুমুর্‌রুদ আপন মনে হেসে ভাবতে লাগল—'আল্লাহ-এর মর্জি বোঝার সাধ্য কি। নইলে বেছে বেছে শয়তান, দোজাকের কীটগুলো একে একে এখানে হাজির হতে যাবে কেন! আর এতসব খানা থাকতে বিরিয়ানির রেকাবি-ই বা কেন হাতে তুলতে যাবে? কিন্তু এ তো ঠিক বাৎ নয়। প্রজারা কেন তাদের প্রিয় খানা বিরিয়ানি খাবে না? খানা সামনে রেখে আত্মাকে কষ্ট দেবে কেন? অসম্ভব! এ হতে পারে না। আমি হুকুম জারি করব, যে বিরিয়ানি না খাবে তাকে ফাঁসির দড়িতে লটকে দেব।'

সুলতান জুমুর্‌রুদ এবার ক্রোধোম্মত্তা হয়ে উঠল। চিল্লিয়ে হুকুম দিল, বিরিয়ানির রেকাবি নিয়ে যে সফেদ চুল-দাড়িওয়ালা বুড়োটি বসে তাকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে আমার সামনে হাজির কর।'

সিপাহীরা রসিদকে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে সুলতানের সামনে হাজির করল।

সুলতান তাকে জিজ্ঞাসা করল—"তোর নাম কি? পেশা কি? আর এ-মুলুকেই বা এসেছিস কোন্ মতলবে?'

—'আমার নাম রুস্তম, জাঁহাপনা। পেশা বলতে নির্দিষ্ট কোন কিছু আমার নেই। তবে একটি নেশা আছে বটে। মুলুকে মুলুকে টুঁড়ে বেড়ানোই আমার কাজ। আমি দরবেশ কিনা তাই—'

—'চুপ কর শয়তান কাঁহিকার!'

সুলতানের হুকুমে ফিন মন্ত্রপূত বালি এল। সঙ্গে একটি পেন্সিলও আনা হ'ল।

আগের মতই পাটাতনের ওপর বালি বিছিয়ে আঁক কাটা শুরু হ'ল। আঁক কাটা হয়ে গেলে সুলতান জুমুর্‌রুদ বিড় বিড় ক'রে কী সব মন্ত্র আওড়াল। ব্যস, এবার বাজখাই গলায় গর্জে উঠল—'শয়তান কুত্তা কাঁহিকার। সুলতানের সামনে ঝুটবাৎ বলতে তোর মুখে এতটুকু আটকাল না। আমার গণনা তো হিসাব দিচ্ছে, তুই দরবেশ টরবেশ কিছুই না, সাক্ষাৎ শয়তান। তোর নাম রসিদ অল-দিন, ঠিক তো? লেড়কি আর অন্যের বিবির ওপর অত্যাচার, ইজ্জৎ হানি করাই তোর একমাত্র ধান্দা, মুসলমানের ভেক ধরে তুই টুঁড়ে বেড়াস। আদতে তুই খ্রীষ্টান। তা-ও ফিন ধর্মচ্যুত। এখনও বাতাচ্ছি, তোর গুণাহ মেনে নে। আমার উজির নাজির আর প্রজাদের সামনে তোর সাচ্চা পরিচয় রাখ। নইলে এখানে, এমুহূর্তেই তোর ধড় থেকে শিরটি আলাদা হয়ে যাবে।'

শয়তান রসিদ জান রাখার তাগিদে বিলকুল কসুর স্বীকার করে নিল। আর বার বার গুস্তাকীর জন্য মাফি মাঙ্গতে লাগল। বদনা বদনা চোখের পানিও ঝরাল।

সুলতান জুমুর্‌রুদ জল্লাদকে তলব করল। জল্লাদ এলে তাকে হুকুম করল, উলটি পায়ে দড়িবেঁধে শির নিচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখবি। পাছায় হাজার ঘা জুতো মেরে শরীর থেকে ছাল চামড়া

খিঁচে নিবি। তারপর চামড়াটি নিয়ে আগের কুত্তাগুলির চামড়ার পাশে সেঁটে রাখবি। নিয়ে যা, জলদি সব সেরে ফেল।'

জল্লাদ এবার রসিদ'কে সদর-রাস্তায় নিয়ে গেল। সুলতানের হুকুম বিলকুল তামিল করল। সবশেষে রসিদ-এর চামড়াটি নিয়ে নগরের প্রবেশ দ্বারে সেঁটে দিল।

জুমুর‍্যদ এক এক ক'রে তার শত্রুদের প্রাপ্য শাস্তি বিধান করল বটে। কিন্তু সে কোথায়? কোথায় তার মেহবুব? বহুৎ কায়দা কৌশল ক'রে, বহুৎ তাল্লাশী চালিয়েও তার জান, তার কলিজা আলী শার-এর পাত্তা তো কিছুতেই মিলছে না। তার দিল্ থেকে শান্তি-সুখ নির্বাসিত।

জুমুর‍্যদ সবার অলক্ষে চোখে পানি ঝরিয়ে বলে—'খোদা, আমাকে নিয়ে একী তাজ্জব খেলায় মেতেছ। খোদা, আমাকে বদলা নেয়ার ক্ষমতা দান করেছ বলে তোমাকে হাজার সুক্রিয়া জানাচ্ছি। আমার আলী শার'কে আমার বুকে ফিরিয়ে দাও। তাকে না পেলে আমার জিন্দেগী যে একদম বরবাদ হয়ে যাবে, তুমি কি তা জান না, বোঝ না?'

জুমুর‍্যদ দিনভর দরবারে কাজের মধ্যে ডুবে থাকে আর রাতভর আলী শার-এর জন্য চোখের পানি ঝরায়।

দিন যায়, মাহিনা যায়—জুমুর‍্যদ ফিন পরের মাহিনার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকে।

সুলতান জুমুর‍্যদ-'এর খানাপিনার আসর ফিন জমজমাট হয়ে ওঠে। পারিষদ ও প্রজারা কব্জি ডুবিয়ে খানা সারে। সরাবের বন্যা বয়ে যায়।

চোখের পানি ফেলে জুমুর‍্যদ করুণ মিনতি জানায়—'খোদা মেহেরবান, যোশেফ'কে তো তুমিই তাঁর আব্বার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে। তবে আমার বেলায় কেন মুখ ফিরিয়ে রাখলে? আমার দিকে মুখ তুলে তাকাও। আলী শার-'কে আমার বুকে এনে দাও। যারা পথ ভুল করে তুমিই তো মেহেরবানি ক'রে তাদের সাচ্চা পথের নিশানা বাৎলে দাও।'

এদিকে নিমন্ত্রিতরা খানাপিনা সারছে আর নসীববিড়ম্বিতা জুমুর‍্যদ চোখের পানি ঝরিয়ে ভিড়ের মাঝে তার বাঞ্ছিতের মুখটির তাল্লাশী চালাচ্ছে। ঠিক তখনই এক সুদর্শন নওজোয়ান খানাপিনার আসরে ধীর পায়ে হাজির হ'ল। তার চোখে-মুখে খানদানি পরিবারের ছাপ সুস্পষ্ট। আসরে বিরিয়ানির রেকাবির জায়গা বাদে তিল ধারণের জায়গা পর্যন্ত নেই। তাই উপায়ান্তর না দেখে আগন্তুক নওজোয়ানটি সেখানেই বসে পড়ল। উপস্থিত সবাই চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে তার দিকে তাকাল।

আগন্তুক নওজোয়ানটির মুখের দিকে তাকিয়েই জুমুর‍্যদ চিনতে পারল। সচকিত হয়ে সোজাভাবে বসল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিমেলে বার বার তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

জুমুর‍্যদ আচমকা চিল্লিয়ে উঠতে চেয়েও নিজেকে গুটিয়ে নিল। জোর ক'রে উচ্ছ্বাস-আবেগকে দমন ক'রে রাখল। আর তার কলিজাটি বার বার মোচড় মেরে উঠতে লাগল। শিরা-উপশিরায় খুনের গতি দ্রুত থেকে ক্রমে দ্রুততর হতে লাগল।

জুমুর‍্যদ কাঁপা কাঁপা ঠোঁট দুটো সামান্য নাড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে, প্রায় স্বগতোক্তি করল—'হ্যাঁ, আলী শার। আমার জান, আমার কলিজা আলী শার-ই বটে।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' আটাশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, চলুন আমরা আলী শার-এর খোঁজ করি। আলী শার বুড়ির সক্রিয় সহযোগিতায় তার মনময়ূরী জুমুর‍্যদ-এর হদিস পেয়ে শয়তান রসিদ-এর মকান-এর কাছে এল। তারপর নিদ গেল। তার নিদ যখন টুটল তখন ভোরের আলো উঁকি দিতে শুরু করেছে। দোকানিরা দোকানপাট খুলছে। তখন সে চোখ মেলে তাকাল। সে রীতিমত অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। এ কী কারবার, সে পথের ধারে শুয়ে কেন? মাথার পাগড়ী হাপিস হয়ে গেছে। গায়ের দামী কোর্তাটি পর্যন্ত গায়েব হয়েছে। এবার আর তাজ্জব বনল না। এক এক ক'রে বিলকুল ঘটনা তার দিমাকে ভেসে উঠতে লাগল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। সুযোগ পেয়েও বরাতগুণে তার সদ্ব্যবহার করতে পারল না। চোখ দুটো পানিতে ছল ছল ক'রে উঠল। বিষণ্ণ মুখে সে নিজের ঘরের দিকে পা-বাড়াল।

বুড়িটির কাছে নিজের নসীবের ব্যাপার খোলসা ক'রে বলল। কিছুই ছাপাল না।

বুড়ি ফিন তার ফেরী করার ঝুড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হাজির হ'ল শয়তান রসিদ-এর মকানে। সাধ্যমত কোশিস ক'রে বুড়ি ফিন আলী শার-এর মকানে গেল। সববৃত্তান্ত তার কাছে রাখল। সব শেষে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ি বলল—'বেটা, তোমার বিবি তো রসিদ-এর মকানে নেই। তার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাম কাজে মন দাও। তোমার ভুলের জন্যই তাকে পেলে না। আমি ধান্দায় থাকছি। যদি কোন ফিকির বের করতে পারি তবে জরুর তোমাকে বাতিয়ে দেব। খোদার নাম কর। তিনি যদি মেহেরবানি ক'রে তোমার বিবির হদিস দেন তবেই তুমি তাকে বুকে ফিরে পাবে। একমাত্র তিনিই তোমার বল ভরসা।'

আলী শার বুঝল, নিজের সামান্য গলতির জন্যই তার মেহবুবাকে পেয়েও হারাতে হয়েছে। এ দুঃখ কোথায় রাখবে। তার চোখের সামনে বিলকুল ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। তার হতাশা আর হাহাকার প্রবল থেকে প্রবলতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে এক সময় তার বিছানা সম্বল হ'ল। খানাপিনা উঠে গেছে। চোখের নিদ উধাও আর দিল্ থেকে সুখ-শান্তি চির নির্বাসিত। এমনি করেই একদিন হয়ত তাকে গোরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

বুড়িটি আলী শার-এর সর্বক্ষণের সাথী হয়ে দাঁড়াল। সেবা যত্ন বা সান্ত্বনা সবই তাকেই দিতে হয়।

আলী শার-এর পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগল। বুড়ি একদিন তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল—'বেটা, নিজেকে শক্ত কর। এমন ক'রে যদি দিন দিন ভেঙে পড়, দিল্‌কে দুর্বল ক'রে ফেল তবে তোমার মেহবুবাকে ফিরে পাবে কি ক'রে?' বুড়ি প্রায়ই একথা-সেকথার মাধ্যমে তাকে বহুভাবে সাহস ও উৎসাহ দিতে লাগল।

আলী শার একদিন সত্যি সত্যি নিজের দিল্‌কে শক্ত ক'রে বাঁধল। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত একদিন বুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জুমুর্‌র‍্যাদ-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। বহুৎ মুলুক ঢুঁড়ে, বহুৎ সুলতানিয়তে চক্কর মেরে তবে বিরিয়ানির রেকাবির সামনে এসে বসেছে।

ক্ষিদেতে আলী শার-এর পেট চোঁ চোঁ করছে। তাই সে ব্যস্ত-হাতে রেকাবি থেকে বিরিয়ানি তুলে গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

আশে পাশের নিমন্ত্রিতরা আলী শার'কে বিরিয়ানি খেতে বারণ করল। শুনল না। যার পেটের ভেতরে আগুন জ্বলছে তার পক্ষে কোন হুঁসিয়ারী তো কার্যকর হওয়ার কথা নয়।

আলী শার-এর হালৎ দেখে এক আদমি তো বলেই ফেলল—'আরে ইয়ার করছ কী! তোমার নসীবে যে ফাঁসির দড়ি লেখা রয়েছে দেখছি! নয়ত গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তোমার দোস্তদের চামড়ার সঙ্গে সেঁটে দেবে। হুঁশিয়ার।'

—'দোস্ত, আমি যেভাবে দিন গুজরান ক'রে চলেছি তার চেয়ে ফাঁসির দড়িতে লটকে পড়া হাজার গুণ কাম্য। আর বিরিয়ানি খেলেই যদি মরা যায় তবে তো আমি অবশ্যই খাব।'

জুমুর্‌র‍্যাদ আলী শার-এর প্রতিটি মুহূর্তের ওপর নজর রেখে চলেছে। ভাবল, খিদের সময় খানার রেকাবি হাতে নিয়ে বসেছে এ-সময়ে তাকে ডেকে বিরক্ত করা মোটেই সঙ্গত নয়।

আলী শার খানা সেরে খালি রেকাবিটি এক ধারে সরিয়ে রেখে এক বদনা পানি ঢক ঢক ক'রে গলায় ঢেলে দিল। এবার যেন তার কলিজা একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

এক সিপাহী এসে আলী শার'কে সসম্মানে সুলতান জুমুর্‌র‍্যাদ-এর কাছে নিয়ে গেল।

আসরে যারা খানাপিনা নিয়ে ব্যস্ত তাদের মধ্যে এক প্রজা তার পাশের একজনকে বলল 'কি দোস্ত, ব্যাপারটিকে কিন্তু খুব সোজা করার কোনই কারণ নেই। অন্যান্যদের পিঠ মোড়া ক'রে বেঁধে, চ্যাংদোলা ক'রে সুলতানের সামনে হাজির করেছিল। কিন্তু এ-নওজোয়ানটির বেলায় যে একেবারে আলাদা বন্দোবস্ত। রীতিমত তোয়াজ ক'রে নিয়ে গিয়ে সুলতানের সামনে হাজির করা হ'ল। কসুর এক-ই, শাস্তি আলাদা। সুলতানের মর্জি কি, তিনি নিজেই জানেন। সিপাহী রীতিমত তোয়াজ করতে করতে তাকে কিন্তু সুলতানের সামনে হাজির করল।

আলী শার সুলতানের সামনে গিয়ে অবনত হয়ে কুর্নিশ করল। জুমুর্‌র‍্যাদ এবার যেন বিলকুল মাটির পুতুল বনে গেল। তার সুলতানোচিত আচরণ যেন নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

জুমুর্‌র‍্যাদ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল—'নওজোয়ান, তোমার নাম কি? কোন পেশায় নিযুক্ত? তোমার এখানে আসার কারণই বা কি?'

আলী শার জবাব দিল—'জাঁহাপনা, আমার নাম আলী শার। আমি কোন পেশায় লিপ্ত নই। আমার আব্বা ছিলেন একজন বড় কারবারী। অগাধ অর্থ আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। আর আমার নসীবই আমাকে এখানে হাজির করেছে।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' উনত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই সরাসরি কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা আলী শার সুলতান জুমুর্‌র‍্যাদ-এর প্রশ্নের জবাব

দিতে গিয়ে বলল—'আমার নসীব-ই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। আমি বিবিকে হারিয়ে উন্মাদের মত এমুলুক সেমুলুক টুঁড়ে বেড়াচ্ছি। হন্যে হয়ে তার তল্লাশী চালাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত হাজির হয়েছি আপনার সুলতানিয়তে। ডাকুরা তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। আজ আমি উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়ে তার তল্লাশী চালাচ্ছি। জানি না, খোদাতাল্লা মেহেরবানি করে আমার বিবি, আমার কলিজা জুমুর্‌র্যদ'কে আমার বুকে আদৌ কোনদিন ফিরিয়ে দেবেন, কিনা।'

জুমুর্‌র্যদ ফিন বালি আর কলম আনাল। আগের মতই বালি বিছিয়ে আঁক কেটে চলল। তারপর শুরু হ'ল বিড় বিড় ক'রে মন্ত্রপাঠ। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে মুখ খুলল—'হ্যাঁ, তোমার নাম আলী শার। গ্লোরি-র বেটাই বটে তুমি। আর আদতে তুমি যে এক সাচ্চা আদমি তা আমি গণনার মাধ্যমে স্পষ্ট জানতে পারছি। তোমার বাৎ বিলকুল সাচ্চা। আমি তোমাকে বলছি নওজোয়ান, তোমার মেহবুবাকে শীঘ্রই তুমি খুঁজে পাবে। ঘাবড়াও মাৎ।'

খানাপিনা শেষ হলে জুমুর্‌র্যদ রাজকীয় পোশাকে আলী শার'কে সাজাল। এবার এক নফরকে হুকুম করল, আস্তাবল থেকে সবচেয়ে ভাল ঘোড়া বের ক'রে আনতে। তার পিঠে চাপিয়ে প্রাসাদে হাজির করতে।

সুলতান জুমুর্‌র্যদ-এর ব্যাপার স্যাপার প্রজাদের মধ্যে কৌতূহল সঞ্চার করল। করার কথাই তো বটে কারণ, এর আগে যাদের খানাপিনার আসর থেকে পাকড়াও ক'রে আনা হয়েছে তাদের সবার ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে নগরের প্রবেশদ্বারে লটকে দেয়া হয়েছে। আর এর প্রতি একেবারে বিপরীত আচরণ করছে। তাজ্জব! বলার মতই কাণ্ডই তো বটে। কেউ কেউ এরকম মন্তব্যও ক'রে বলল, খুবসুরৎ নওজোয়ান পেয়েই আমাদের সুলতানের দিমাক বিলকুল ঘুরে গেছে।

আবার কেউ কেউ এর মধ্যে এর চেয়ে বেশী রহস্যের গন্ধ খুঁজতে লেগে গেল। এ-মুহূর্তে সুলতান জুমুর্‌র্যদ-এর একমাত্র চিন্তা কখন রাত্রির আন্ধার নেমে আসবে। তার হৃদয় দেবতাকে কাছে পাবে। বুকে জড়িয়ে ধরবে। চুম্বনের পর চুম্বন দিয়ে নিজে তৃপ্তি পাবে, তৃপ্তিতে ভরপুর ক'রে তুলবে আলী শার-এর দিল্। উফ! কতকাল তার মধুর সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে ভাবলে দিল ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে। আজ না পাওয়ার সবজ্বালা মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে। আলী শার শান্তিবারির মাধ্যমে তার কলিজার জ্বালা জুড়িয়ে বিলকুল হিমশীতল ক'রে দেবে। উঃ সে যে কী আনন্দ ভাবলেই তার দিল-জান মাদকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এক সময় প্রাসাদের বুকে আন্ধার নেমে এল। জুমুর্‌র্যদ-এর যেন আর সবুর সইছে না।

অস্থিরমতি জুমুর্‌র্যদ সন্ধ্যার কিছু পরেই পোশাক বদলে রাত্রের পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিল। সামান্য একটি অতি মিহি সেমিজ ছাড়া গায়ে আর কিছুই রাখল না।

রাত্রি আরও একটু গভীর হলে জুমুর্‌র্যদ এক খোজাকে হুকুম দিল আলী শার'কে তার কামরায় হাজির করার জন্য।

এদিকে উজির নাজির ও অন্যান্য অমাত্যরাও সুলতানের এরকম অদ্ভুত আচরণে কম বিস্মিত নয়। তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল সুলতান নির্ঘাৎ দরবেশটির প্রেমে মজে গেছেন। তবু রক্ষা, লেড়কি টেড়কি নয়। আজ রাত্রে তারা হয়ত একই কামরায় শোবেন। একই পালঙ্কে যে শোবেন এরকম ভাবাও পাগলের প্রলাপ নয়।

পারিষদদের মধ্য থেকে একজন এরকম মন্তব্যও করতে ছাড়ল না—'সুলতান শীঘ্রই দরবেশটিকে তার ভেক খুলিয়ে মন্ত্রী বা প্রধান সেনাপতি গোছের কোন একটি পদে বহাল ক'রে দেবেন।'

সুলতানের হুকুম তামিল করল খোজা ভৃত্যটি। সে আলী শার'কে সুলতানের কামরায় পৌঁছে দিয়ে বাইরে থেকে দরওয়াজা টেনে দিল।

আলী শার কামরায় ঢুকে সুলতান জুমুর্‌র্যদ'কে কুর্নিশ ক'রে হুকুমের অপেক্ষায় মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

জুমুর্‌র্যদ ভাবল, গোড়াতেই যদি নিজের পরিচয় দিয়ে দেই তবে হয়ত আকস্মিক আবেগে-উচ্ছ্বাসে সে মূর্ছাই যাবে। তাই নিজেকে সংযত রেখে তার দিকে পিছন ফিরে বলল—'ওহে নওজোয়ান, কাছে এসো। আমার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াও।'

আলী শার দু'পা এগিয়ে কি ভেবে ফিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

জুমুর্‌র্যদ এবার বলল—'তোমার খিদেটিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। ওই দেখ, টেবিলে খানা সাজানো রয়েছে। খানাপিনা সেরে নাও।'

আলী শার খানা সারলে জুমুর্‌র্যদ এবার বলল—'নেশাটেশা একটু-আধটু নিশ্চয়ই কর? পাশের টেবিলে হরেক কিসিমের সরাব রয়েছে। মর্জি মাফিক বোতল ও পেয়ালা টেনে নাও।'

আলী শার-এর খানাপিনা সারা হ'লে জুমুর্‌র্যদ এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে পালঙ্কে এনে বসাল। তার হাত দুটো ধরে এবার বলল—'নওজোয়ান তোমাকে কাছে পেয়ে, তোমার আচরণে আমি বহুৎ খুশী হয়েছি। তোমার মত খুবসুরৎ মুখ এর আগে আমার চোখে পড়েনি।' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বলল—'নওজোয়ান, আমার পায়ে ব্যথা হচ্ছে, একটু আধটু টিপে দেবে? দাও না—একটু টিপে দাও।'

আলী শার উপায়ান্তর না দেখে সুলতানের পা টিপতে লেগে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই সুলতান বলল—'কেবল পা নিয়েই পড়ে রইলে যে হে! আর একটু ওপরে ওঠ—উরু পর্যন্ত আচ্ছা করে টিপে দাও। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।'

আলী শার সুলতানের পায়ের কাপড় সরিয়ে কিছুটা তাজ্জব বনেছিল, পায়ে লোমের লেশমাত্রও নেই। এবার উরু পর্যন্ত কাপড় তুলে টিপতে গিয়ে আরও তাজ্জব বনল। আর পা আর উরু কী তুলতুলে, একেবারে যেন পেঁজা তুলোর বস্তা। সে আপন মনে ব'লে উঠল—'হায় আল্লাহ! পুরুষের পা এমন তুলতুলে ক'রে গড়ে দিয়েছ!'

সুলতান এবার আরও এক ধাপ এগোতে গিয়ে বলল—'নওজোয়ান, তুমি তো বহুৎ আচ্ছা পা টিপতে পার! ওঠো, আর একটু ওপরে উঠে যাও। বেশ ক'রে দলাই মালাই কর। একেবারে কোমরের কাছাকাছি উঠে যাও। উঃ তুমি কী যে আরাম দিচ্ছ ভাষায় বুঝাতে পারব না।'

আলী শার হাত দুটো আরও সামান্য ওপরে তুলে নিল। ঝট ক'রে নামিয়ে এনে বলল—'জাঁহাপনা, আমি মাফি মাঙ্গছি।'

—'কেন? অসুবিধে কিসের?'

—'উরুর ওপরে কি ক'রে টিপে দেব আমার দিমাকে আসছে না।'

—'সে কী হে! উরু পর্যন্ত যেভাবে টিপেছ—'

—'যেটুকু বুঝেছি তা-তো দিলামই। এর বেশী উঁচুতে কি হাত তোলা যায়, নাকি তোলা উচিত, আপনিই বলুন?'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' ত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগমের কোলে মাথা রেখে পালঙ্কে শরীর এলিয়ে দিয়ে কিস্‌সা শোনার প্রস্তুতি নিলেন। বেগম তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, সুলতান আলী শার-এর কথা শুনে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে বলল—'কী বললে, এত স্পর্ধা তোমার। ধানাই পানাই রেখে যা বলছি, কর। যদি একমুহূর্তও দেরী কর তবে তোমার গর্দান নেয়া হবে। আমার হুকুম তামিল ক'রে আমাকে তৃপ্তিতে ভরিয়ে দাও। বিনিময়ে তুমি আমার স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে জীবন ধন্য করতে পারবে। নাও,দেরী কোরো না, কোমর পর্যন্ত ভাল ক'রে টিপে দাও।'

—'জাঁহাপনা সবই তো মালুম হ'ল, কিন্তু আপনার মর্জি যে ঠিক কি তা-ই তো আমার দিমাকে আসছে না। যদি মালুমই না হয় তবে হুকুম তামিল কি ক'রে করা যাবে ভাবছি।'

—'এক কাজ কর। তোমার পাৎলুনটি খুলে ফেল। তারপর আমার পাশে, একেবারে আমার গা-ঘেঁষে উপুড় হয়ে শোও। তারপর যা করতে হবে আমিই সব বলে দেব।'

—'জাঁহাপনা, গোস্‌সা করবেন না। জিন্দেগীতে এ ধরনের কাজ কোনদিনই আমি করি নি। আর আমি ইচ্ছুকও নই। তবে আপনি যদি এ সব কাজের জন্য আমার ওপর বল প্রয়োগ করেন তবে খোদাতাল্লার কাছে আপনাকে এর জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে।'

সুলতান বড়বড় চোখে তার দিকে তাকাল।

আলী শার ব'লে চলল—'আপনি মেহেরবানি করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কসম খাচ্ছি, আপনার মুলুক ছেড়ে চলে যাব।'

—'আমি কোন অনুরোধই মানতে রাজী নই। আমার হুকুম, পাৎলুন খুলে আমার পাশে শুয়ে পড়। উপুড় হয়ে শোও। অন্যথায় এখন, এখানেই তোমার গর্দান যাবে। কী খুবসুরৎ তুমি। উলঙ্গ হয়ে আমার পাশে শোবে। এরজন্য তোমার তো অনুতাপের কোন ব্যাপার নেই।

আলী শার নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সুলতানের হুকুম তামিল করতে গিয়ে পাৎলুনটি খুলে ফেলল। এবার তার পাশে উপুড় হয়ে, অনেকটা কেন্নোর মত জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ল।

পরমুহূর্তেই সুলতান ঝট ক'রে তার পিঠের ওপর উঠে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। আবেগের সঙ্গে আলী শার'কে দু'হাতে জাপ্টে ধরল। তৃপ্তিতে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইল।

ব্যাপার দেখে আলী শার ধরেই নিল এবার আমার কম্মফতে। তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আলী শার আচমকা শিহরিত হয়ে উঠল। তার শিরা-উপশিরায় যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। সে পিঠে যেন নরম ও গোলাকার দু'টো বস্তুর চাপ অনুভব করল। সুলতানের নিশ্বাস উষ্ণ। আর শরীরও যেন ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠছে স্পষ্ট বুঝতে পারল।

পরমুহূর্তেই বিন্দু বিন্দু ঘাম তার সারা গায়ে ফুটে উঠতে লাগল। আপন মনে বলল—'এবার আমার কম্ম ফতে হবে।'

আলী শার সচকিত হয়ে স্বগতোক্তি করল—'ইয়া আল্লাহ! এ কী তাজ্জব কাণ্ড! কোন পুরুষ মানুষের শরীর যে এমন নরম রোমাঞ্চকর হয় কস্মিনকালেও দেখিনি।'

আলী শার উপায়ান্তর না দেখে মড়ার মত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল। শেষ পর্যন্ত সুলতান কোন পথ অবলম্বন করে ধৈর্য ধরে নজর রেখে চলা ছাড়া তার করারও তো কিছু নাই।

সুলতান উপুড় হয়ে নিশ্চল নিথর ভাবে আলী শার-এর পিঠের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে রইল। তারপরই ধীরে ধীরে তার পিঠ থেকে নেমে এল।

আলী শার এবার আরও তাজ্জব বনল। সে ভাবল সুলতানের যদি ওসব কোন ধান্দাই থাকত তবে এতক্ষণ এমন নির্জীবের মত তো শুয়ে থাকতে পারত না। কামোন্মাদনা অবশ্যই তার মধ্যে জাগত। তবে? তবে কি সুলতান পুরুষাঙ্গহীন? নাকি—না, আলী শার আর ভাবতে পারছে না।

আলী শার-এর পিঠ থেকে নামার পর সুলতান-এর মতিগতি পরিবর্তিত হতে দেখা গেল। এবার সে আলী শার'কে নিজের পিঠে তুলে নেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল।

আলী শার-এর পরিস্থিতি তখন একেবারেই সঙ্গীন হয়ে পড়ল। চরম অবস্থা বলা যেতে পারে। এমন চরমতম সঙ্কটেও কেউ পড়ে। তার নসীবেও এ-ও ছিল! সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—'ইয়া আল্লা, এর পরিণতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তুমিই জান!' তার গা দিয়েও এবার ঘাম ঝরতে লাগল। ডরে তার কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

সুলতান এবার আলী শার-এর ডান-হাতটিকে নিজের দু'হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে মৃদু চাপ দিতে লাগল। আলী শার ফিন নতুন ক'রে বিস্মিত হ'ল। আবার সেই 'নরম' আর 'শক্ত'-র ভাবনা তাকে পেয়ে বসল।

আলী শার নিজের হাতটিকে সুলতানের হাতের বন্ধন থেকে ছিনিয়ে আনতে গিয়েও পারল না। আদতে তার সাহসেই কুলালো না। জানের মায়া সবচেয়ে বড় মায়া।

সুলতান এবার আলী শার-এর হাতটিকে আচমকা যেখানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করল তাতে তার সর্বাঙ্গে কেমন এক অবর্ণনীয় অনুভূতির উদয় হ'ল।

আলী শার চমকে উঠে স্বগতোক্তি করল—'এ কী! এ তো পুরুষ নয়। কিছুতেই পুরুষ হতে পারে না। অন্ধকার আকাশে আচমকা বিদ্যুতের ঝিলিকের মত তার কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেল। সুলতান পুরুষ নয়—কিছুতেই পুরুষ নয়। তার পুরুষাঙ্গের খোঁজ করতে যাওয়া নিষ্ফল প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়।

মুহূর্তে কিভাবে, কি ক'রে যে কি হয়ে গেল আলী শার কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কেমন যেন উগ্র কামনা তাকে পুরোপুরি গ্রাস ক'রে ফেলল। নিজেকে হারিয়ে ফেলল। নিজেকে বশীভূত রাখার ক্ষমতা তার মধ্য থেকে নিঃশেষে উবে গেল।

সুলতানের ছদ্মবেশ জুমুর‍্যাদ-এর ওপর থেকে যেন দমকা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল। আলী শার-এর কাছে এবার সে তার মেহবুব জুমুর‍্যাদ হয়ে ধরা দিতে গিয়ে সশব্দে হেসে উঠল। ঠিক এরকমই এক পরিস্থিতির জন্য সে এতক্ষণ কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত হয়েছিল। সে এবার হো হো করে হাসতে হাসতে আলী শার'কে জড়িয়ে ধরল। হাসি থামিয়ে এবার বলল—'কি গো, তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না! আমিই যে তোমার প্রাণেশ্বরী জুমুর‍্যাদ, এত কিছুর পরও বোঝ নি! হায় আমার নসীব! আমি তবে এতদিন কার বিরহে হরবখত চোখের পানি ঝরিয়েছি।'

আলী শার জুমুর‍্যাদ-এর কথাটি শোনামাত্রই আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ব'লে উঠল—'তোমার নসীবের চেয়েও আমার নসীবই বেশী মন্দ জুমুর‍্যাদ। নইলে তুমি আমাকে প্রথম দর্শনেই চিনে ফেলতে পেরেছ। আর আমি? আমি তোমাকে চিনতে পারলাম এইমাত্র, এত কিছু ঘটে যাওয়ার পর। কিন্তু পিয়ারী, আমি অবাক হচ্ছি কি করে এতক্ষণ নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলে! কথা বলতে বলতে সে তার মনময়ূরীকে বার বার চুম্বন করতে লাগল। আলী শার এবার চুম্বনে-সোহাগে জুমুর‍্যাদ-এর দিল ভরিয়ে দিল।

জুমুর‍্যাদ তার আবেশে জড়ানো ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে আলী শার-এর গালে নিজের গাল উন্মাদের মত বুলাতে বুলাতে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল— 'কি হে নওজোয়ান, কই, এবার তো

আর আড়ষ্ট হচ্ছ না, সঙ্কোচে অনবরত না-না বলে পিছিয়ে যাচ্ছ না।'

আলী শার যেন এখন আর নিজের মধ্যে নেই, সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সে একেবারে কামোন্মাদ নেকড়ের মত জুমুর‍্যাদ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ঝটকায় নগ্নপ্রায় জুমুর‍্যাদ'কে কোলে তুলে নিল। এবার? এবার তার দেহটিকে নিয়ে সে যে কি করবে, কি করলে অধিকতর আনন্দ পাবে বুঝে উঠতে পারল না।

এদিকে জুমুর‍্যাদ-এর অবস্থাও সঙ্গীন। কামোন্মাদিনী। কামজ্বালা তার ভেতরটিকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আলী শার-এর হাতে সঁপে দিল। সে তার শরীরটিকে যদি ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দেয় দিক। তাকে একেবারে শেষ করে দিক। সে আর পারছে না। কলিজার জ্বালা নিভতে পারে একমাত্র আলী শার-এর পেশীবহুল কঠিন হাত দুটোর নিষ্পেষণের মাধ্যমেই। হাল্কা আদরে-সোহাগে নয়, পুরুষের নির্মম নিষ্পেষণই আউরতের একান্ত কাম্য। এরই জন্য যৌবনের জোয়ারলাগা দেহটি নিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় তারা প্রহরের পর প্রহর কাটায়।

আলী শার এবার কামজ্বালায় জর্জরিতা উলঙ্গ প্রায় জুমুর‍্যাদকে পালঙ্কের ওপর দুম ক'রে শুইয়ে দিল। তারপর? তারপর অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তারা দলন, পেষণ আর সম্ভোগের মাধ্যমে কলিজার জ্বালা নেভানোর প্রয়াসে লিপ্ত রইল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' একত্রিশতম রজনী

গভীর রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলে, বেগম তার কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশটুকু শুরু করলেন —'জাঁহাপনা, আলী শার এবং জুমুর‍্যাদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ঘুম রাত্রি যাপন করতে লাগল।

এদিকে সুলতানের কামরায় নওজোয়ান আলী শার প্রবেশ করার পর থেকে দুই খোজা ভৃত্য খুবই কৌতূহলাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তারা কৌতূহলের শিকার হয়ে সুলতানের কামরার দরজা থেকে সরতে পারল না। তারপর এক সময় বন্ধ-দরওয়াজার ফাঁক ফোকর দিয়ে বিচিত্র সব শব্দ ভেসে আসায় তাদের কৌতূহল আরও অনেকাংশে বেড়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—"উভয়েই তো মরদ। নওজোয়ান। তবে কামরার ভেতর থেকে এরকম রহস্যজনক শব্দ ভেসে আসছে কেন? তারা খোঁজাখুঁজি ক'রে দরজার গায়ে সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র আবিষ্কার করল! তাতে একজন চোখ লাগিয়েই চমকে উঠে ঝট করে এক পা সরে এল। কাঁপা কাঁপা গলায় স্বগতোক্তি করল—'শোভন আল্লাহ! এ কী কাণ্ড সুলতান নওজোয়ানটি দেখছি কুস্তি শুরু করেছে। একজন অন্যজনকে জব্বর এক কুস্তির প্যাঁচ কষে একেবারে পটকান দিয়ে দিয়েছে। এবার বুকের ওপর চেপে বসেছে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তাকে কব্জা করার জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছে। ফিন মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনছে সে। গালে কামড়ে দেবে নাকি! এ যে কুস্তীর রীতি বহির্ভূত কাজ। খোদা মেহেরবান! আমাদের সুলতান কি তবে নওজোয়ানটির কাছে হেরে যাচ্ছেন? তলে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন, অসহায়ভাবে তার লম্ফঝম্ফ বরদাস্ত ক'রে চলেছেন। খোদা মেহেরবান। আমাদের সুলতানকে এবার নওজোয়ানটির ওপরে তুলে দাও, জিতিয়ে দাও। তার এভাবে নওজোয়ানটির তলে পড়ে মার খাওয়া মানে তো আমাদের, তামাম সুলতানিয়তের আদমিদের মুখে চুণ-কালি মাখানোর সামিল।"

তবে ব্যাপারটি তারা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখল। আদতে তারা নিজেরাই রহস্যভেদ করবে, পরিকল্পনা করল।

ভোর হ'ল। জুমুর‍্যাদ অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী বেলা করেই শয্যা ত্যাগ করল। দরওয়াজা খোলার আগে সে নিজেকে আবার সুলতানের ছদ্মবেশে সজ্জিত ক'রে নিল।

সুলতানের সভাসদরা যথা সময়ে এক এক ক'রে উপস্থিত হ'ল। সুলতান জুমুর‍্যাদ উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌ল —'আপনাদের সঙ্গে আমার একটি জরুরী আলোচনা রয়েছে। আমি যে-পথে এসেছিলাম সে-পথেই এখান থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি। আপনাদের কাছ থেকে আমি এতদিন যে আন্তরিকতা ও সহানুভূতি পেয়েছি তার জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রে আপনাদের ছোট করার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। হ্যাঁ, যে-কথা বলতে চাচ্ছি, আপনারা অন্য কাউকে মসনদে বসিয়ে সুলতানিয়তের শাসন ভার অর্পণ করুন।'

উপস্থিত সভাসদরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। সবার মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

সুলতান জুমুর‍্যাদ ব'লে চল্‌ল—'হ্যাঁ, আমি বিদায় নিচ্ছি। আগন্তুক নওজোয়ান দরবেশের সঙ্গেই আমি এ-সুলতানিয়ৎ ছেড়ে চলে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। যেতে যে আমাকে হবেই।'

জুমুর‍্যাদ যখন বিদায় নেবার জন্য উন্মুখ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে তখন শত অনুরোধেও তাকে আটকে রাখা সম্ভব নয়। পরদেশী যদি নিজের মুলুকে যেতে চায় তাকে আটকে রাখার কোশিস করলেই বা সে শুনবে কেন?

কয়েকজন খোজা ভৃত্য উটকে সাজিয়ে প্রাসাদের প্রধান ফটকে এনে দাঁড় করাল। দু'জন খোজা সুলতানের সঙ্গে যাবে। তারা তৈরী হয়ে এল।

ছদ্মবেশী সুলতান জুমুর্‌রদ এবং দরবেশের ভেকধারী আলী শার এবার সভাসদ ও অন্যান্য রাজকর্মচারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুসজ্জিত উটের পিঠে চাপল। আর খোজা ভৃত্য দু'জন দুটো গাধার পিঠে চেপে জুমুর্‌রদ ও আলী শার-এর পিছন পিছন চল্‌ল।

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে, কঠোর তকলিফ সহ্য করে আলী শার তার বিবি জুমুর্‌রদ'কে নিয়ে খোরামান নগরে নিজের মকানে পৌঁছে গেল।

আলী শার ফিরে আসার আগেই সে-বুড়িটি বেহেস্তে চলে গেছে। সে কিন্তু নিজের জানের চেয়েও তাকে বেশী পিয়ার মহব্বৎ করত।

আলী শার বুড়ির জন্য শোক করল। কান্নাকাটি ক'রে বহুৎ চোখের পানি ঝরাল। তার গোরস্থানে চমৎকার একটি স্মৃতিসৌধ বানিয়ে দিল।

আলী শার তারপর বহুৎ সাল তার বিবি জুমুর্‌রদকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে ঘর করল। কিছুদিনের মধ্যে তাদের একটি লেড়কাও পয়দা হয়েছিল। তাদের সংসার আনন্দ ও সুখময় হয়ে উঠেছিল। তাদের একজন চিরবিদায় গ্রহণ করলে তাদের সুখ ও আনন্দ ভেঙে গেল।

বেগম শাহরাজাদ এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এই হ'ল আলী শার ও তার বিবি জুমুর্‌রদ-এর কিস্‌সা। এবার আপনার দরবারে যে-কিস্‌সা পরিবেশন করব তা এর চেয়ে কম জমজমাট ও চিত্তাকর্ষক নয়। বিচিত্র চরিত্রের ছয়টি লেড়কিকে ঘিরে সে-কিস্‌সাটি গড়ে উঠেছে। তাদের চরিত্র, তাদের চলাফেরা আর মতিগতি বাস্তবিকই বৈচিত্র্যে ভরপুর। তারা এক একজন অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী। আমি হলফ করে বলতে পারি, এমন অনন্য কবিত্বশক্তির পরিচয় আপনি অন্য কারো কাছ থেকেই পান নি।'

দুনিয়াজাদ তার বহিনজীর গলা জড়িয়ে ধরে আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—'বহিনজী, তোমার কিস্‌সা বাস্তবিকই অসাধারণত্বের দাবী রাখে। আর দিলে অভাবনীয় দোলা দেয়। তোমার মুখ থেকে ছয় লেড়কির কিস্‌সা শোনার জন্য আমার দিল্ ছটফট করছে। কিস্‌সা শুরু কর।'

বাদশাহ শারিয়ারও এবার নয়া কিস্‌সা শোনার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ছয় লেড়কির কিস্‌সা

বাদশাহ শারিয়ার এবং বহিন দুনিয়াজাদ-এর অত্যুগ্র আগ্রহে বেগম শাহরাজাদ বিচিত্র চরিত্রের ছয় লেড়কির কিস্‌সাটি শুরু করলেন —'জাঁহাপনা বাদশাহ আল-মাসুন-এর কথা আপনার ভাল জানা না থাকলেও তার নামটি হয়ত শুনে থাকবেন। আমি যে মহা ধার্মিক মাসুন-এর বাৎ বলতে চাইছি আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন।

বাদশাহ মাসুন একদিন তার পারিষদবর্গকে নিয়ে দরবারে বসে ছিলেন। পারিষদবর্গের মধ্যে উজির, নাজির, আমীর, ওমরাহরা সবাই তখন দরবারে হাজির। কিছুক্ষণের মধ্যেই সভাকবি বসোরার মহম্মদও হাজির হ'ল। এবার ষোল-কলা পূর্ণ হ'ল। মহম্মদ বাদশাহের খুবই প্রিয়পাত্র, কাছের মানুষ। বাদশাহের কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে তাঁকে খুশীতে ভরপুর ক'রে রাখা মহম্মদ-এর কাজ।

সভাকবি মহম্মদ দরবারে হাজির হলে সুলতান তাকে একটি কিস্‌সা বলার ফরমাশ দিলেন। মহম্মদ মুচকি হেসে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, কিস্‌সা শোনাতে হবে? বহুৎ আচ্ছা। আপনার দরবারে এখন যে-কিস্‌সা পেশ করব তা অবশ্যই কারো মুখ থেকে শোনা নয়। মনগড়া কিস্‌সাও নয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি এমন এক ঘটনা আপনার দরবারে পেশ করছি।'

বাদশাহ বল্‌লেন—'তা-তো আমার দেখার দরকার নেই। আমি শুধু চাই, কিস্‌সাটি যেন আমার শোনা না থাকে। তার ঘটনা যেন আমার দিলে দাগ কাটতে পারে আর সবাই শুনে তারিফ করে।'

কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে মহম্মদ বল্‌ল—'জাঁহাপনা, অল-ইয়াম নামক নগরে এক ধনী আদমি বাস করত। তার নাম ছিল আলী। লোকটি আমার সুপরিচিত ছিল। সে নিজের মুলুক অল-ইয়াম ছেড়ে এক সময় বাগদাদে এসে বাস করতে থাকে। জিন্দেগীকে পুরোপুরি উপভোগ করার যা কিছু বন্দোবস্ত থাকা দরকার কোন কিছুরই ত্রুটি সে রাখেনি।

আলী বাগদাদে জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে আশা ক'রে অল-ইয়াম নগরের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেচে দিয়ে সে বাগদাদে এসে স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলল।

আলী-র হারেমে ছয়টি খুবসুরৎ বাঁদী ছিল। বাঁদী ছয়টি ছিল বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাদের যে কেবল মনলোভা সুরৎই ছিল তা নয়, গুণের দিক থেকে তারা প্রত্যেকে অসাধারণত্বের দাবী রাখত। সবচেয়ে বড় কথা, তারা প্রত্যেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। একের সঙ্গে অন্যের চারিত্রিক মিলের চেয়ে অমিলই ছিল পুরো-দস্তুর। ফিন লেড়কি ছয়জনের সুরতের কথায় ফিরে আসা যাক। সত্য বলতে কি ছয়জনই যেন ছয়টি বেহেস্তের হুরী। খোদাতাল্লার মর্জিতে বেহেস্ত ছেড়ে জমিনে এসে যেন তারা হাজির হয়েছে। ফিন তাদের মধ্যে কে যে সবচেয়ে সুরতের দাবীদার তা নির্বাচন করা ছিল বাস্তবিকই কঠিন সমস্যা। লেড়কিদের মধ্যে প্রথমটি ছিল খুবই ফর্সা। দুধে-আলতায় তার গায়ের রঙ। দ্বিতীয়টির রঙ

বাদামী। মনপছন্দ। তৃতীয়টি সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। একহারা চেহারা ছিল চতুর্থ লেড়কির। পঞ্চমজনের রঙ সোনালী। পীতাভও বলা চলে। আর আবলুস্ কাঠের মত কুচকুচে কালো রঙ ছিল ষষ্ঠ লেড়কিটির। ছয়জনকে পাশাপাশি দাঁড় করালে কে যে সবচেয়ে
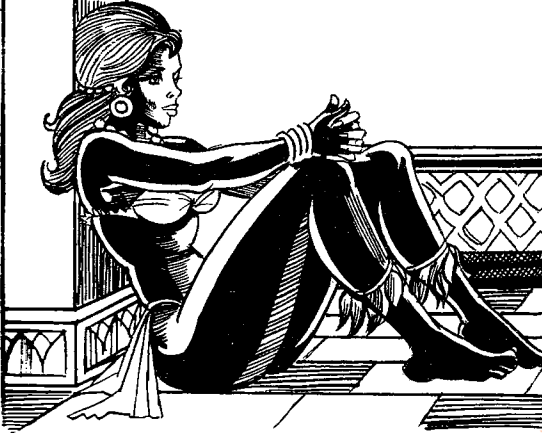
সুরতের অধিকারিণী বাছাই করা বাস্তবিকই বহুৎ মুশকিলের ব্যাপার।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' বত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অসমাপ্ত কিস্সাটির পরবর্তী অংশ শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় হাজির হলেন। বেগমের কোলে শির রেখে আধ-শোয়া অবস্থায় পালঙ্কে শরীর এলিয়ে দিয়ে বাদশাহ কিস্সা শোনার জন্য তৈরি হলেন। বেগম আঙুল দিয়ে আলতোভাবে বাদশাহের চুলে বিলি কাটতে কাটতে কিস্সা বলতে লাগলেন—'জাঁহাপনা, আলী-র হারেমের বাঁদী ছয়জন যে কেবলমাত্র তাদের গায়ে রূপের ছটাই বসিয়েছিল তা নয়, গুণের বিচারেও তারা দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা লেড়কির সঙ্গে টেক্কা দিতে পারত। সাহিত্য-শিল্পকলা, সঙ্গীত-নৃত্যশিল্প, অসাধারণ বিদ্যা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ছিল তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ।

আলী ছয়টি লেড়কিকেই বহুৎ আদর সোহাগ করত। সে তাদের আদর করে ছয়টি আলাদা আলাদা নামে সম্বোধন করত।

আলী ফর্সা লেড়কিটিকে বদরুন্নেসা ব'লে সম্বোধন করত। শেহেলা নামে সম্বোধন করত বাদামী রঙের লেড়কিটিকে। যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী সে-লেড়কিটিকে বদর-এ কামিল বলে সম্বোধন করত, একহারা চেহারার লেড়কিটির নাম দিয়েছিল বেহেস্তের হুরী। সোনালী যার গায়ের রঙ তার নাম মেহেরুন্নিসা আর কাজল সম্বোধন করত কুচকুচে কালো লেড়কিটিকে।

আলী বাগদাদে এসে স্থায়ী জীবনযাপনে উৎসাহী হ'ল। জায়গাটি তার পছন্দ মাফিকই হ'ল বটে। পছন্দ হওয়ার মত জায়গাই বটে। কারণ, তামাম দুনিয়ার আদমির মুখে মুখে তখন বাগদাদের নাম ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। সেখানকার বাতাস থেকে শুরু ক'রে খানাপিনা পর্যন্ত সব কিছুতে আলাদা এক বৈশিষ্ট্য সবার নজর কাড়ত। দিল্‌কে উতলা ক'রে দিত।

এক সকালে আলী তার ছয় বাঁদীকে কাছে ডাকল। উদ্দেশ্য তাদের নিয়ে এক সঙ্গে খানাপিনা গানা-বাজনা আর রঙ্গতামাশা ক'রে দিল্‌টিকে একটু চাঙা ক'রে নেবে।

আলী-র তলব পেয়ে বাঁদীরা ছুটে এল। তার হুকুম তামিল করতে গিয়ে হাসি-মস্করা আর রঙ্গ-তামাশা শুরু করল সবাই মিলে। আলী তাদের রঙ্গরসে মজে গেল।

এক সময় আলী সরাবের পেয়ালা হাতে নিয়ে বদরুন্নেসার কাছে এসে বলল—'পিয়ারী, তোমার কণ্ঠের মধুঝরা গানা শোনার জন্য আমার দিল্ বিলকুল অস্থির হয়ে উঠেছে। মনমৌজী এক গানা শুরু কর যাতে আমাদের দিল্ সরাবের নেশার চেয়ে মশগুল হয়ে ওঠে।'

বদরুন্নেসা মুচকি হেসে বল্‌ল—'জাঁহাপনার যো হুকুম।' কথা বলতে বলতে সে বীণাটি হাতে তুলে নিল।

খুবসুরৎ লেড়কি বদরুন্নেসা-র মিষ্টি মধুর কণ্ঠ আর চমৎকার গানায় আলী-র মেজাজ শরিফ হয়ে উঠল।

গানা শেষ ক'রে বদরুন্নেসা নতজানু হয়ে আলীকে কুর্ণিশ করল।

আলী বাস্তবিকই মহাখুশী হ'ল। মেজাজ রীতিমত শরিফ। গানা শেষ হলেও গানার কথা ও সুর তার কানের মধ্যে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হতে লাগল। এ যেন অকথিত এক অনুভূতি। বোঝা যায় বটে, বোঝানো যায় না কাউকে।

আলী সরাবের পেয়ালাটিতে ছোট্ট ক'রে একটি চুমুক দিল। তারপর সেটিকে লেড়কিটির দিকে এগিয়ে দিল।

লেড়কিটি তার হাত থেকে পেয়ালাটি নিল। এক চুমুকে সরাবটুকু সাবাড় ক'রে দিয়ে খালি পেয়ালাটি ফিন তার হাতে ফিরিয়ে দিল। তারপর নতজানু হয়ে কুর্ণিশ ক'রে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

আলী ফিন সরাবের বোতল হাতে তুলে নিল। পেয়ালা ভরে সরাব নিল।

সরাবের পেয়ালাটি নিয়ে আলী এবার বাদামী রঙের লেড়কি

শোলা-র কাছে গেল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্‌ল। মুখে হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বল্‌ল—'মেহবুবা শোলা, তোমার গানা তো বহুৎ আচ্ছা। গলার কাজ ও সুরজ্ঞানও তোমার আচ্ছাই। আর উচ্চারণ বিলকুল নিখুঁত। তোমার গানা দিল্‌ থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর ক'রে দেয়। তোমার মন পছন্দ গানা একটি শোনাও মেহবুবা।

শোলা নতজানু হয়ে কুর্ণিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার দিলে রঙ ধরানোই তো আমার কাজ। আপনাকে খুশী করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ—শুরু কর সুন্দরী। বড়িয়া এক গানা লাগাও যাতে আমার দিল্‌ খুশীতে ভরে ওঠে।'

শোলা মুচকি হেসে আলীকে কুর্ণিশ করল। মুখের হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বীণাটি হাতে তুলে নিল। ভাবাবেগে আপ্লুতা হয়ে এবার কিন্নর কণ্ঠে গানা শুরু করল। কী সুর! কী মধুমাখা তার কণ্ঠ। হঠাৎ ক'রে শুনলে মনে হবে বেহেস্তের কোন হুরী বুঝি তন্ময় হয়ে সুর সাধনা ক'রে চলেছে।

আলী চোখ দুটো বন্ধ ক'রে ভাবের সাগরে ডুবে গেল। সে যেন খোয়াবে দেখা এক গানার মজলিসে সামিল হয়েছে। শোভন আল্লা! সুরের কী মধুর আলাপ! আলী-র মনে হ'ল সে যেন এ দুনিয়ার কেউ নয়। বেহেস্তের গানের মজলিসে বসে সুর-তাল-ছন্দের মাধ্যমে দিল্‌কে চাঙা ক'রে নেয়ার জন্য উন্মনা।

আলী ভাববিমুগ্ধ দিল্‌ নিয়ে সরাবের পেয়ালাটিকে ধীরে ধীরে ঠোঁটের কাছে তুলে নিল। আনমনা ভাবে পেয়ালায় চুমুক দিল। তারপর পেয়ালাটি শোলা-র দিকে বাড়িয়ে দিল।

শোলা ফিন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্‌ল। নতজানু হয়ে আলীকে কুর্ণিশ করল। ধীরে ধীরে পেয়ালাটিকে ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল, এক চুমুকে পেয়ালাটি খালি ক'রে আলী-র হাতে তুলে দিল।

আলী শূন্য পেয়ালাটি নিয়ে দু' কদম এগিয়ে গিয়ে বোতল থেকে সরাব ঢেলে পেয়ালাটি পূর্ণ ক'রে নিল।

এবার পিছন ফিরে এগিয়ে গেল বদর-এ-কামিল-এর কাছে। মুচকি হেসে তাকে বল্‌ল—'পিয়ারী, তোমার বপুটি সাধারণের তুলনায় একটু বেশী রকমই স্থূলকায়। তা হোক গে। সুরতের ঘাটতি একটু-আধটু কম থাকলে তাকে গুণ দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে। গুণের বিচারে তুমি তো অনন্যা। এখন একটি গানা গেয়ে আমার দিল্‌কে খুশী করার কোশিস কর।

আলী-র ফরমাশ অনুযায়ী গানা গাওয়ার জন্য বদর-এ-কামিল নিজেকে তৈরি ক'রে নিতে লাগল। ফিন ছোট্ট ক'রে হাসল। হাতে বীণাটি তুলে নিল। অভিজ্ঞ-নরম আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে নির্জীব তারগুলো যেন মুহূর্তে সজীব হয়ে উঠল।

সুরের মূর্চ্ছনায় আলীর দিল্‌ অকস্মাৎ চাঙা হয়ে উঠল। ক্রমে ভাবের সাগরে তলিয়ে যেতে লাগল। হাজির হ'ল এক স্বপ্নাচ্ছন্ন জগতে। সেখানে কেবলই যেন খুশী আর আনন্দের এক নয়া দুনিয়া।

বদর-এ-কামিল-এর সুর-তাল-ছন্দ যেন পাথরের বুকেও ভাবের বন্যা বইয়ে দিতে পারে।

আলী দীর্ঘ সময় যেন মায়াময় এক নয়া দুনিয়ার বাসিন্দা হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইল।

বদর-এ-কামিল গানা থামাল।

আলী ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে পেল। সরাবের পেয়ালাটি ঠোঁটের কাছে তুলে আলতো ক'রে এক চুমুক দিল। পেয়ালার সরাবে গলাটি ভিজিয়ে নিল। এবার অবশিষ্ট সরাব সমেত পেয়ালাটি বদর-এ-কামিল-এর দিকে এগিয়ে দিল। সে নতজানু হয়ে আলীকে ফিন কুর্ণিশ করল। তারপর অপূর্ব এক ভঙ্গিতে পেয়ালাটি ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে এক মুহূর্তে বিলকুল সরাব পান ক'রে নিল।

বদর-এ-কামিল-এর চোখের তারায়ও খুশীর প্রলেপ।

আলী ফিন সরাবের বোতলটি থেকে এক পেয়ালা সরাব ঢেলে নিল। ধীর কদমে এগিয়ে গেল বেহেস্তের হুরীর দিকে। হাত দু'-তিন দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার মৃদু হেসে তাকে ফরমাশ করল—'পিয়ারী, তোমার কণ্ঠে আছে মিঠা সুরের বাহার। তোমার মিষ্টি-মধুর গানা পাথরের বুকেও ফুল ফোটাতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, তোমার নামই তো তোমার যথার্থ পরিচয় বহন করছে। আমার দিলে সাগরের ঢেউ বইয়ে দিতে পারে এমন এক গানা তোমার কাছ থেকে আমি প্রত্যাশা করি। আশা করি তুমি আমার বাঞ্ছাপূরণ করতে সক্ষম হবে।'

বেহেস্তের হুরী মুচকি হাসল। নতজানু হয়ে আলীকে কুর্ণিশ করল। তার কিন্নর কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল যেন, এক অনাস্বাদিত সঙ্গীতলহরী। সে সঙ্গে বীণার তার ঝনঝনিয়ে উঠল গানের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে। গানা তো নয় যেন পাহাড়ের বুক থেকে কুলকুলরবে নেমে আসছে চঞ্চল ঝর্ণা।

আলী-র বুকে খুশীর জোয়ার। বারবার বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! ব'লে আলী গানার তারিফ করতে লাগল।

আলী ফিন সরাবের পেয়ালাটি ঠোঁটের কাছে তুলে নিল। ছোট্ট ক'রে একটি চুমুক দিয়ে কিছু সরাব গলায় পুরে নিল। পরম তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

আলী এবার অবশিষ্ট সরাবটুকু সমেত পেয়ালাটি বেহেস্তের হুরীর দিকে এগিয়ে দিল।

বেহেস্তের হুরী সরাবের পেয়ালাটি এক নিঃশ্বাসে সাবাড় ক'রে দিল। ফিন নতজানু হয়ে আলীকে কুর্ণিশ করল। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে তার হাতে পেয়ালাটি ফিরিয়ে দিল।

আলী ফিন বোতল থেকে সরাব ঢেলে নিল। এবার ধীর-পায়ে এগিয়ে গেল সোনালী লেড়কিটির দিকে। তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসতে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' বত্রিশতম রজনী

রাত্রি গভীর হতে না হতেই বাদশাহ্ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আলী সরাব ভর্তি পেয়ালাটি হাতে নিয়ে সোনালী লেড়কিটির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। মেহেরুন্নেসা তার নাম। আলী বল্‌ল—সুন্দরী মেহেরুন্নেসা তোমার কী সুরৎ। গায়ের রঙ কাচা সোনার মত—যেন ফুটন্ত এক চাঁপা ফুল। আমার দিল্ একটি মহব্বতের গানা শোনার জন্য বড়ই উতলা হচ্ছে। তুমি একটি মহব্বতের গানা গেয়ে আমার অশান্ত দিল্‌কে শান্ত কর। এমন এক গানা শোনাও যাতে দুনিয়াকে আমার কাছে অসার জ্ঞান হয়। আর যেন মহব্বতকেই একমাত্র সার ব'লে মনে হয়। এমন এক মহব্বতের গানায় তুমি দিল্ উজাড় ক'রে ঢেলে দাও সুন্দরী।

মেহেরুন্নেসা আলী-র হুকুম তামিল করতে বীণাটি হাতে তুলে নিল। তুল্‌ল সুরের ঝঙ্কার। তারপর বেহাগের সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়। কোটিদেশ দুলিয়ে, পৃষ্ঠ নাচিয়ে একের পর এক গানার কলি গেয়ে চল্‌ল।

আলী-র দিল্‌টি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় কেমন যেন উদাস-ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার দিলের দরওয়াজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। তার মধ্যে সে জাগিয়ে তুল্‌ল অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য আর অবর্ণনীয় উচ্ছ্বাস-আবেগ।

আলী সরাবের পাত্রটি ঠোঁটে তুলে নিল। মৃদু এক চুমুক দিল। তারপর দু' পা এগিয়ে গিয়ে সেটিকে মেহেরুন্নেসা-র হাতে তুলে দেয়। ভাবাপ্লুতা মেহেরুন্নেসা এক চুমুকে পূর্ণ পেয়ালাটি শূন্য ক'রে ফিন আলীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

আলী পেয়ালাটি ফিন পূর্ণ ক'রে এবার ধীর-পায়ে এগিয়ে গেল কৃষ্ণকায়ার কাছে।

আলী তাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌ল—'পিয়ারী, তোমার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণভ্রমরের মত হলে কি হবে তোমার দিল্‌টি যে তুষারশুভ্র। তুমি যেন এ দুনিয়ার দুঃখ, বেদনা ও হতাশার প্রতীক। কিন্তু চোখের তারায় মায়া-কাজল মাখানো। কাছে টানার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। তোমার মুখের দিকে তাকালে দুনিয়ার অস্তিত্বের কথা আমার দিল্ থেকে উবে যায়। তোমার কণ্ঠের মন-মাতানো একটি গানা শোনার জন্য আমার দিল্ যারপর নাই চঞ্চল হয়ে পড়েছে। একটি দিল্‌বাহার গানা শোনাও সুন্দরী।

কৃষ্ণকায়া এবার আলী-র হুকুম তামিল করতে গিয়ে আলতো ক'রে বীণাটি হাতে তুলে নিল। শুরু করল বেদনাঘন এক করুণ গানা। গানাটির দু'-এক কলি শোনার পরই তার ভেতরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ জাগাল। দুঃখের মধ্যেও যে, এমন এক অবর্ণনীয় মাদকতা থাকতে পারে আলী-র অন্তত তা আগে জানা ছিল না।

ভাবাচ্ছন্ন আলী এবার সরাবের পেয়ালাটি ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে ছোট্ট ক'রে একটি চুমুক দিল। তারপর সেটি তুলে দিল কৃষ্ণকায়ার হাতে।

কৃষ্ণকায়া লেড়কিটি সরাবের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে নতজানু হয়ে আলীকে কুর্ণিশ করল। এবার এক চুমুকে সরাবের পেয়ালাটি নিঃশেষ ক'রে খালি পাত্রটি ফিন আলীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

ছয়টি খুবসুরৎ লেড়কিই এবার এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। আলীকে কুর্ণিশ করল। সবার মুখেই হাসির ঝিলিক। খুশীর ফোয়ারা। আলী-র দিল্‌ও কম আনন্দিত নয়। সোল্লাসে সে বল্‌ল—'তোমাদের সবার গানাই আচ্ছা হয়েছে। সবার গানাই আমার দিলে খুশীর আমেজ এনে দিয়েছে।'

বাঁদী লেড়কিরা সমস্বরে বল্‌ল—'তা-ও কি হয়? সবার গানা আচ্ছা হতে পারে? লেকিন কিছু না কিছু হেরফের তো হতেই হবে। আপনি দিল্ খোলসা ক'রে বলুন, কার গানা, কার বীণার ঝঙ্কার সবচেয়ে আচ্ছা হয়েছে!'

আলী এবার বাস্তবিকই মহাফাঁপরে পড়ল। কঠিন সমস্যা। এ-সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কি? কূল রাখি না, রাই রাখি? কাকে ছেড়ে কাকে ধরি—সমস্যাই বটে। বাস্তবিকই সবারই বীণার ঝঙ্কার,

গানার ছন্দ আর সুর সমান। কণ্ঠের বিচারেও কেউ কারো থেকে কমতি নয়।

তবু আলী ভাবল, সমস্যার উদ্ভব যখন হয়েছে তখন তা থেকে নিজেকে মুক্তো তো হতেই হবে। ফিন অবিচারও কোন বাঁদীর ওপর করা ঠিক হবে না। আলী এবার ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে বসল। চোখ দুটো বন্ধ ক'রে প্রত্যেকের গানা আলাদা আলাদা ক'রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করার কাজে লিপ্ত হ'ল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে প্রতিটি গানার বিচার বিশ্লেষণ করল।

এক সময় হতাশদৃষ্টিতে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব। তোমাদের কাউকেই আমি বেশী খুশী করতে অপারগ। আমার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে তোমরা সবাই আমার গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়াও। আমাকে আদর সোহাগ কর।' বাঁদী লেড়কিরা এগিয়ে এসে আলীকে নানাভাবে আদর সোহাগ করতে লাগল। ঠিক যেন এক সোহাগের তীব্র প্রতিযোগিতা।

আলী এক সময় অসহায়ভাবে বল্‌ল—'খোদাতাল্লা'কে অশেষ সুক্‌রিয়া যে, তোমাদের মত সর্বগুণান্বিতা লেড়কিদের আমি কাছে পেয়েছি। তোমাদের পেয়ে আমি বাস্তবিকই গর্বিত, মহাখুশী। লেকিন কোন একজনকে বেছে নিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দেয়া সম্ভব নয়। তাই সে বিচারের ভার তোমাদের ওপরই আমি অর্পণ করছি। তোমরা প্রত্যেকেই তো কোরাণ ও অন্যান্য কিতাব পাঠ ক'রে জ্ঞানার্জন করেছ। পুরানো কিস্‌সা কাহিনীও বহুৎ জান। এবার আমি তোমাদের দু'জন-দু'জন ক'রে ভাগ ক'রে দেব। তাদের একজন নিজের সুরতের বর্ণনা দেবে আর দ্বিতীয়জন নিজের গুণাবলী আমাদের সবার সামনে ব্যক্ত করবে অর্থাৎ তোমরা পরস্পর প্রতিপক্ষের বাদী। উপযুক্ত যুক্তির অবতারণা ক'রে তোমার যুক্তি খণ্ডন করবে।'

বাঁদী লেড়কিরা এবার যেন কেমন বিস্মিত হ'ল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আলী-র মুখের দিকে তাকাল। শেষের কথাটি খোলসা ক'রে বলার জন্য অনুরোধ করল।

আলী হেসে বল্‌ল—'আমি বলতে চাইছি কি, একজন কোন একটি ব্যাপারকে আচ্ছা বল্‌লে প্রতিপক্ষ তার প্রতিবাদ করবে। তার বক্তব্যকে খণ্ডন ক'রে নিজের বিরুদ্ধ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে। অর্থাৎ কেউ কোন কিছুকে নিকৃষ্ট বল্‌লে অন্য জনকে তাকেই উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করতে হবে। তবে হ্যাঁ, সবাই ইয়াদ রাখবে, কোন অশালীন আচরণ বা উক্তি প্রয়োগ করা চলবে না। আর প্রয়োজনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তোমার বক্তব্যকে জোরদার করতে পারবে। বাধা নেই।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' চৌত্রিশতম রজনী

রাত্রি গভীর হতে না হতেই বাদশাহ বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আলী-র প্রস্তাবে সবাই সম্মতি দিল।

ফর্সা আর কৃষ্ণকায়ার জুড়ি সবার আগে বলতে উঠল।

বদরুন্নেসা কৃষ্ণকায়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য শুরু করল—'শোন কৃষ্ণকায়া, ফর্সা বা উজ্জ্বল রঙের ব্যাপারে কবিদের মতামত হচ্ছে—আলো ফর্সা, চাঁদের কিরণ ফর্সা আর বীর্যবানপুরুষেরা ফর্সা হয়ে থাকে। আর নসীব যদি আচ্ছা হয় তবে ফর্সা আদমির কপাল দিয়ে যেন আলোর ঝলকানি ফুটে বেরোয়। তাই তো প্রখ্যাত এক কবি তাঁর এক কবিতার মাধ্যমে মতামত ব্যক্ত করেছেন—'খোদাতাল্লা পয়দা করার সময় লেড়কিটিকে মুক্তার ফেনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। তারপর তার অপরূপ দেহটিকে মেদিগাছ ভিজিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। সফেদ গোলাপও কিছু সঙ্গে নিয়েছিলেন। সবশেষে তিনি এক অত্যুজ্জ্বল আর পাণ্ডুপাদপও তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন।

এবার বলছি সফেদের প্রসঙ্গে কোরাণের বক্তব্য—মুশার হাতে একবার কুষ্ঠরোগ আক্রমণ করেছিল। আল্লাহ তাঁকে বল্‌লেন—মুশা, তোমার ব্যাধিগ্রস্ত হাতটি জেবের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। দেখবে, হাতটি মুহূর্তে সফেদ হয়ে যাবে। পবিত্র হয়ে উঠবে। যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল ফিন ভরে যাবে।'

আমাদের ধর্মগ্রন্থে সফেদের ব্যাপারে বলা হয়েছে—মুখাবয়ব যাদের সফেদ আল্লাহ কেবল তাদের প্রতিই করুণা প্রদর্শন ক'রে থাকেন।'

আরও আছে—কমলাফুল। দিনের আলো ও ভোরের আশমানের শুকতারাও তো বিলকুল সফেদই বটে।

মোদ্দা কথা হ'ল আমার গায়ের রঙই সব রঙের সেরা। আমার এরকম চোখ ধাঁধানো সুরৎ তো গায়ের রঙের জন্যই লাভ করেছি।

আমার মত যাদের গায়ের রঙ তারা যেকোন পোশাক পরলেই সমানভাবে সুরতের প্রকাশ ঘটে।

বেহেস্তের যে তুষার দুনিয়ার জমিনে নেমে এসেছে তার রঙ-ও তো সফেদই বটে। ধর্মাশ্রয়ী আদমীরা শিরে যে-ফেজ ব্যবহার করেন তার রঙ তো সফেদ, ঠিক কিনা?'

আমার নিজের গুণগান আর করতে চাই না।

আমি এবার তোর কালো রূপের কথা কিছু বলছি—কালো? গোরস্থানের কাকের গায়ের রঙ কালো! লেখার কাজে যে-কালি ব্যবহার করা হয় তার রঙও তো কালোই বটে, কামরায় কামরায় যে ঝুল পড়ে তার রঙ? সে-ও তো কালোই হয়ে থাকে, ঠিক

কিনা? কাক কালো। কিন্তু সে কি আচ্ছা গানা গাইতে সক্ষম, বল?

এক কবি সফেদ আর কালোকে পাশাপাশি রেখে বহুৎ আচ্ছা এক কবিতা লিখেছেন যার বিষয়বস্তু হ'ল—বাদশাহের অর্থ দিয়ে একটি মুক্তা খরিদ করা সম্ভব কিন্তু এক শিলিঙ দামে এক বস্তা কয়লা বিক্রি হয়ে যায়। সফেদ মুখ আর সফেদ পাখা দিয়ে বেহেস্তটাকে চিনে নাও, তা যদি না হ'ত তবে তো স্বর্গের অস্তিত্ব কিছুই থাকত না। বাস্তবে নয়, কেবলমাত্র নামের মধ্যেই বেহেস্ত চাপা পড়ে থাকত। তোমরা যদি আমাকে বলতে বল তবে আমি একটিমাত্র কথার মাধ্যমেই আমার বক্তব্যকে পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারি—যাকে আমরা দোজখ সম্বোধন করি সে তো কেবলমাত্র কালোই বটে।

মহাধার্মিক নোওয়া-র একটি কিস্‌সা শোনাচ্ছি—নোওয়া-র দুই লেড়কা। তাদের একজনের নাম—হাম আর দ্বিতীয়জনের নাম সাম।

নোওয়া একদিন লেড়কা দুটোকে শিয়রে বসিয়ে নিদ যাচ্ছিলেন।

নোওয়া যখন নিদে পুরোদমে বিভোর তখন আচমকা ঝোড়ো বাতাস বইল। বাতাসে তার কাপড় উঠে গেল।

বাতাসে কাপড় উঠে যাওয়ায় নোওয়ার পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে পড়ে। হাম এ দৃশ্য দেখে বেদম হাসাহাসি শুরু ক'রে দিল। সে কী হাসি! দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

ইতিহাস বলে নোওয়া দুনিয়ার দ্বিতীয় পুরুষ। তাঁর জিন্দেগীর বিচিত্র সব কিস্‌সা তো আর কারো অজানা নয়। কাপড় উড়ে গিয়ে তার পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ ক'রে সাম কিন্তু একদম হাসাহাসি করল না।

সাম তার আব্বার ধর্মবোধ এবং সুখ্যাতির বিবরণ কিছু কিছু জ্ঞাত ছিল। তাই সে নিঃশব্দে তাঁর কাপড় গোছগাছ ক'রে পুরুষাঙ্গটি ঢেকে দিল। এর মধ্যেই তাঁর নিদ গেল টুটে।

নোওয়া চোখ মেলে তাকিয়েই হামকে হাসাহাসি করতে দেখলেন। তিনি তাকে অভিসম্পাত দিলেন। আর সাম-এর মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ দেখে তিনি প্রীত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

আব্বার মুখ থেকে অভিসম্পাত-বাক্য নির্গত হওয়ায় হাম-এর মুখ একেবারে চূণ হয়ে গেল। আর সাম-এর মুখ অধিকতর সফেদ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরবর্তীকালে সাম-এর বংশধররা হলেন মহাযোগী, ধর্মযাজক, ধর্মপ্রচারক এবং রাজা।

আর অভিসম্পাত লাভ ক'রে হাম পড়ল মহাফাঁপরে। সে তার কালো মুখটিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার উদ্দেশ্যে ঘর-সংসার ফেলে ভেগে গেল। তার বংশে পয়দা হ'ল কালো ও বীভৎস নিগ্রোরা। তার বংশে কোন যোগী, ধর্মগুরু বা দেবদূত পয়দা হয় নি। এসব বাৎ কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই নয় ছোট-বড় সব আদমিরই জানা আছে।

আলীর নির্দেশে বদরুন্নেসা মৌন হ'ল। কৃষ্ণকায়া লেড়কিটি উঠে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করতে লাগল। সে স্বাভাবিক স্বরেই বক্তব্য শুরু করল—'বদরুন্নেসা, তুই কিছু জানিস না। কিছু না জানলে বলবিই বা কি ক'রে, ঠিকই তো।

তোকে কোরাণের বক্তব্য আগে শোনাচ্ছি—আল্লাতাল্লা গভীর রাত্রে শপথ নিতেন। তবে এরকম কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, তিনি দুপুরে মোটেই শপথ নিতেন না। মাঝ-রাত্রিটিকে তিনি সবচেয়ে বেশী পছন্দ্ করতেন কেন, জানিস কি? কারণ, মাঝ-রাত্রিটি যে কালো নয় রে, সফেদ।'

কালো চুল সম্বন্ধে কিছু বলছি শোন—'কালো চুল কার প্রতীক, বল তো? জেনে রাখ, যৌবনের প্রতীক তো কালো ছাড়া কিছু নয় রে। আর সফেদ? সফেদ চুল? সফেদ চুল বার্ধক্যের প্রতীক। বার্ধক্যে ভোগ আর কামনা-বাসনা খতম হয়ে যায়। তখন যবনিকা পতনের অপেক্ষা।

কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' পঁয়ত্রিশতম রজনী

রাত্রি গভীর হওয়ার আগেই বাদশাহ শারিয়ার কিস্‌সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কৃষ্ণকায়া লেড়কিটি ব'লে চল্‌ল—শোন ভাই, কালো যদি রঙের মধ্যে সেরা নাই হবে তবে আল্লাতাল্লা কেন আমাদের কলিজা ও চোখের মণির

ওপরে কালো রঙের প্রলেপ দিয়ে দিয়েছেন?

কালো রঙের পক্ষ অবলম্বন ক'রে এক প্রখ্যাত কবি বহুৎ আচ্ছা বক্তব্যের অবতারণা করেছেন—কালো দেহের ভেতরে আগুন জ্বেলে রাখা আছে। আর তাদের শিরা-উপশিরায় ভোগ-বাসনা বিদ্যমান। কালো দেহে যৌবনের চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। আর সফেদ? সে-তো ডিমের খোলারই সামিল। আল্লাহ, এরকম দেহ নিয়ে দুনিয়ায় জিন্দা থাকার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। খোলাটিকে পেয়ার করাই তো কঠিন সমস্যার ব্যাপার। যদি তা-ই হ'ত তবে আমি জানটিকে টিকিয়েই রাখতে পারতাম না। মৃতের ঢাকনার সফেদ কাপড় দেখলেই আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়। সফেদ চুলওয়ালার মহব্বৎ তো কবরখানার বিলাপ ছাড়া কিছু নয়।

আরও বলছি শোন্—কখন অভিন্নহৃদয় বন্ধুরা এক জায়গায় মিলিত হয়, জানিস? রাত্রে।

মেহবুব আর মেহবুবা কার খোঁজ ক'রে বলতে পারিস? ছায়াকে। কিন্তু কেন ছায়াকে খুঁজে বেড়ায়, জানিস কি? আরে, ছায়ার রঙ যে কালো। তাদের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে যাতে দিনের আলো মাথা ঘামাতে না পারে সেজন্যই তো রাত্রির অন্ধকার তাদের আড়াল ক'রে রাখে। নিরাপদ আশ্রয় সৃষ্টি ক'রে তাদের পেয়ার মহব্বতের সুযোগ ক'রে দেয়। দিনের আলোয়, এসব করতে গেলে তো তুই-ই পঞ্চমুখে কুৎসা প্রচারের কাজে মেতে যাবি।

আরে, একটি ব্যাপার তো খুবই সাধারণ—ফুলশয্যার রাত্রি শেষ হয়ে গেলে নবদম্পতি কি ব'লে অনুতাপ জ্বালা প্রকাশ ক'রে তা-ও কি জানা নেই? বলে—হায়রে আমার নসীব! এত তাড়াতাড়ি রাত্রি ফুরিয়ে ভোর হয়ে গেল! আচ্ছা বল তো, কেন এরকম ব'লে আক্ষেপ করে? রাত্রিকে বহুৎ পছন্দ করে বলেই না তাদের মুখ দিয়ে এরকম মন্তব্য বেরোয়।

না, বেশী বলার ইচ্ছা নেই। জ্ঞানীরা তো বলেনেই—বেশী বাক্য ব্যয় না ক'রে অল্প কথাতেই বেশী যুক্তি খাড়া করা যায়।

ওরে, এবার কি বলছি, ধৈর্য ধরে শোন। কালোর প্রশংসা আর বেশী করতে চাই না। তবে জেনে রাখ, যত রঙ আছে তাদের মধ্যে কালোই একমাত্র খাঁটি রঙ। আর যা কিছু সবই মেকী।

এবার কালোর সুখ্যাতি রেখে তোর কথা শুরু করা যাক। আমি কালো রঙ নিয়ে পুরুষের দৃষ্টি যত আকর্ষণ করতে পারি তার এক অংশও তোর পক্ষে সম্ভব হয় না।

তোর সফেদ রঙের কথা যদি বলতেই হয় তবে বলছি—শোন, তোর সফেদ রঙটি তো কুষ্ঠের মতই দুরারোগ্য একটি ব্যাধি। কী উৎকট গন্ধ—কারই বা অজানা, বল তো।

আরে, একটু আগে তুই নিজেকে তুষারের সঙ্গে তুলনা করছিলি। ঠিক কিনা?

মেহবুব-মেহবুবা তাই তো তুষারটিকে বরবাদ ক'রে দিয়েছে দোজখেতে। কিভাবে? দোজখের নাম শুনিস নি? নিশ্চয় শুনেছিস, তাই না?

দোজখে পাপিষ্ঠাদের শাস্তি দেয়ার জন্য তুষার জমিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। কী যে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা সে আর বলার নয়। হাড়মাস ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাওয়ার উপক্রম। আমরা আগুনকে ভয়ঙ্কর ব'লে থাকি। কিন্তু দোজখের ঠাণ্ডা আগুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আর তার রঙ? বরফেরই মত সফেদ। তাইতেই তো মেহবুব-মেহবুবারা ঠাণ্ডাটিকে একেবারে বরবাদ ক'রে দিয়েছে।

বদরুন্নেসা, তুই তো আমাকে লেখার কালির সঙ্গে তুলনা করলি, তাই তো? বহুৎ আচ্ছা, আমার একটি বাতের জবাব দে তো? আল্লাহ-র যত বাৎ কি দিয়ে লেখা হয়েছে, বল তো শুনি? কেবলমাত্র আমি কেন? দুনিয়ার সব্বাই স্বীকার করবে, কালো কালি দিয়েই।

তোকে আরও বলি—কস্তুরি, মৃগ নাভি কাকে বলে? তার গুণ তোর জরুর জানা আছে? আর রঙটি কি? তামাম দুনিয়ার আদমি এর জবাবে একই বাৎ বলবে—কালো।

কালোর গুণকীর্তন করতে গিয়ে এক নামজাদা কবি যে মন্তব্য করেছেন তা হ'ল—যে মৃগনাভি সর্বোৎকৃষ্ট ব'লে গণ্য হয় তা কিন্তু কালো। আর পচা নাসপাতির রঙ? সে-তো সাদা। যে চোখের মণির সাহায্যে দুনিয়ার জৌলুস তুমি দেখতে পাও, তার রঙ? সে-ও তো কালোই বটে। ফিন অন্ধদের চোখ তো ধবধবে সাদা। কালোর অনুপস্থিতির জন্য তাদের চোখের সামনে থেকে সবকিছু বেপাত্তা হয়ে যায়।

আলী সোল্লাসে ব'লে উঠল—বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ বড়িয়া সব যুক্তির অবতারণা ক'রে তোমরা নিজ নিজ বক্তব্যকে জোরদার করে তুলেছ। আর এরই ফলে তোমাদের বাক্‌যুদ্ধ সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তোমাদের বহুৎ, বহুৎ তারিফ না ক'রে আমি পারছি না।

আলী-র নির্দেশে দ্বিতীয় দল এবার সামনে এসে দাঁড়াল। এবার মুখোমুখি হ'ল ধুমসো মোটা বদর-এ-কামিল আর পেকাঠির মাফিক লিকলিকে লেড়কিটি।

আলী-র হুকুমে মোটাসোটা বদর-এ-কামিল তার বক্তব্য শুরু করার জন্য তৈরি হ'ল। শুরু করার মুখেই সে এক বিশ্রী কাণ্ড করল। দুম ক'রে সালোয়ার, কামিজ বিলকুল খুলে একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে গেল।

বিবস্ত্রা বদর এ-কামিল এবার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তার সব অঙ্গগুলি দেখাল। সবার আগে দেখাল গোড়ালি ও কব্জি। তারপর

ইয়া পেল্লাই মোটা, হাতির পায়ের মত উরু ও পায়ের গোছার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবেগে সমোদ্যত থলথলে স্তনযুগলের নিচে খুবসুরৎ তার উদরটিকে দেখাল। এবার সমোদ্যত, পরিসরমর্দন স্তনযুগলের প্রতি সবার নজর ফেলার প্রয়াস চালাল। এর ফল কি হ'ল? লেড়কিটি বিবস্ত্রা হয়ে মৃদু মৃদু তরঙ্গের সৃষ্টি করে সে আলীকে কামলোভাতুর ক'রে তুল্ল। তার কামনার আগুনে মুঠো মুঠো ধুলো ছিটিয়ে উত্তেজনায় ভরপুর ক'রে তুল্ল তাকে।

এবার বিবস্ত্র অবস্থাতেই ধুমসো লেড়কিটি লিকলিকে লেড়কিটির মুখোমুখি গিয়ে খাড়া হ'ল। কটাক্ষ করল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' ছত্রিশতম রজনী

সে-রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়া অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন।

বেগম বাদশাহকে যথোচিত সম্ভাষণ ক'রে পালঙ্কে বসালেন। তিনি বেগমের কোলে শির রেখে কিস্‌সা শোনার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। বেগম আঙুল দিয়ে তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, ইয়া পেল্লাই মোটা বদর-এ-কামিল লিকলিকে বেহেস্তের হুরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মেদবহুল শরীরটির সমর্থনে বক্তব্য শুরু করল—শোন গো বেহেস্তের হুরী, খোদাতাল্লার মেহেরবানিতে পাহাড়, পর্বত, টিলা আর গুহা যা কিছু দেখছ সর্বত্রই স্থূলত্বের ছড়াছড়ি। আর তাদের গায়ে যেন তুলতুলে নরম ঘাস আর লতা-পাতার গালিচা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। খোদাতাল্লার নরম জিনিসের প্রতিই সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ।

আর আমার শরীরে যে মেদের বিচিত্র সমারোহ দেখতে পাচ্ছ তা কিন্তু আল্লাহ তার পছন্দ মাফিকই আমার হাড়-মাসে লেপে দিয়েছেন। আর তারই অপার করুণায় আমার শরীরে পদ্মের সুমিষ্ট খুসবু আর মধুর মনলোভা বাসনা নির্গত হয়।

আমার গায়ে যে মাংসপিণ্ডের সমারোহ দেখতে পাচ্ছ তা-ও তাঁরই একান্ত ইচ্ছার ফসল। আর আমার শরীরের তাগদ? সে-ও তো তারই দোয়াতেই লাভ করেছি। এক থাপ্পড়ে শত্রুকে ধরাশায়ী করার হিম্মৎ আমার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে।

ওগো আমার পেকাঠি সুন্দরী, জ্ঞানীগুণী আদমিরা এ সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন, জান কি? তাদের মতে জিন্দেগীতে তিনটি উপায়ে প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা যেতে পারে, যেমন—গোস্তর ওপর চড়ে সুখভোগ কর, গোস্ত নিয়ে খেলায় মাত আর গোস্ত খেয়ে তাগদ বাড়াও।

বিলকুল সাচ্চা বাৎ। নাদুসনুদুস লেড়কিদের দেখলে কার দিলটি না চনমনিয়ে ওঠে, বল তো? তুমিই বল তো ঘন ঘন চড়াই-উৎরাই দেখলে কেউ কি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, নাকি মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারে?

জান কি, আল্লাহ তুলতুলে নরম জিনিস কত পছন্দ করেন? তাই তো তিনি নির্দেশ দিয়েছেন মেদবহুল মোটাসোটা মেষ শাবক আর বাছুরকে কোরবানি দেয়ার জন্য, জানিস তো?

সালোয়ার কামিজ খুলে বিবস্ত্রা হয়ে, আল্লাতাল্লার দেয়া পোশাকে আমি তোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, চেয়ে দেখ। ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে স্বীকার করতে বাধ্য হবি, আমার শরীরটি যেন হুবহু এক বাগিচা। প্রকৃতির বাগিচা। বুকের দিকে নজর দে, কেমন নিটোল দুটো ডালিম শোভা পাচ্ছে। গাল দুটোতে যেন দুটো রক্তাভ পীচফল শোভা পাচ্ছে। আর আমার কোমরের নিচের দিকটায় নজর দে, দেখ, কী সুন্দর এক তরমুজ যেন ফলে রয়েছে।

জানিস কি, তিতির পাখি ইজরাইলের পাট চুকিয়ে মিশরে পাড়ি জমিয়েছে। তার ফলে ইজরাইলের লেড়কা-লেড়কিরা পরম উপাদেয় তিতিরের গোস্তের স্বাদ থেকে বঞ্চিত। কী মর্মান্তিক ব্যাপার ভেবে দেখ তো। ওগো বেহেস্তের হুরী, একটি তিতির থেকে কতখানি গোস্ত মেলে, জানা আছে কি? আর তার স্বাদ? তার স্বাদের ব্যাপারে কিছুমাত্র ধারণাও কি তোর রয়েছে? তার গা থেকে এত বেশী গোস্ত মেলে বলেই না সবাই তার সমাদর করে, ঠিক বাৎলাই নি?

কষাইখানায় গিয়ে গোস্তর দাম দিয়ে কেউ কি শুধু এক ঝোলা হাড্ডি খরিদ করে কখনও ফিরে আসে? এমন এক তাজ্জব ব্যাপার তুই দেখেছিস, নাকি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিস? কসাই তার
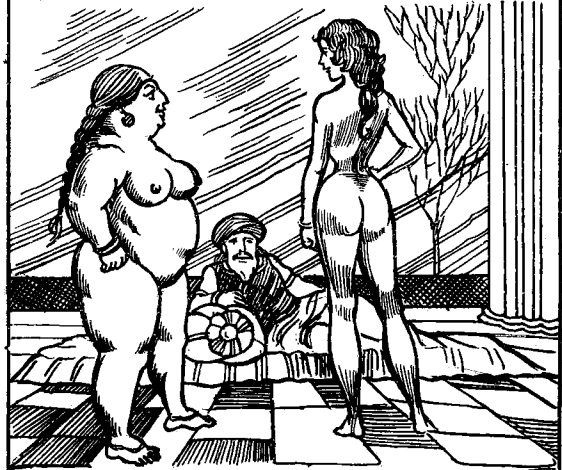
পেয়ারের খদ্দেরদের জন্য গোস্তওয়ালা টুকরোগুলো আগেভাগে লুকিয়ে রাখে।

ওরে বেহেস্তের হুরী, কেবলমাত্র আমিই নই, বহুৎ সব কবিও আমার মত সুদেহী, মেদবতী লেড়কিদের গুণকীর্তন করতে গিয়ে যা বলেছেন তা হ'ল—তার হাঁটুর গড়ন, হাঁটুর লাবণ্য একবারটি চেয়ে দেখ! তার সুডৌল নিতম্বদ্বয়ের ভারে ভূমিতে কম্পন অনুভূত হচ্ছে। স্থূলকায়ারা কামনা-বাসনার রাণী। তার জঙঘাদ্বয়ের কম্পনে জমিনে মৃদু মৃদু কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে। এরূপ প্রত্যক্ষ ক'রে আমার দিল্ ভরে উঠল, খুশী উপচে পড়ছে। আর এরই মাধ্যমে আমার জিন্দেগী সার্থকতায় পরিপূর্ণ ব'লে জ্ঞান করছি।

আমি না-ই বা বলতে গেলাম। তুই নিজেই তোর হাড্ডিসার তুলতুলে চেহারার দিকে একবারটি চোখ ফেরা। যেন এক দাঁড়কাক ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে। তোর মুখের দিকে তাকালে কার মধ্যে খুশীর সঞ্চার হয়, বল তো? তোর বুকের দিকে তাকালে কার কার মধ্যে পুলকের সঞ্চার হয়, বলতে পারিস? তোর শরীরের হাড্ডিগুলো কী শক্ত! কোন মরদ যদি ভুল ক'রে তোকে আলিঙ্গন ক'রে বসে তবে তার কী দশা হবে, ভেবে দেখ তো। খোদা-র নামে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে-বেকুফ নির্ঘাৎ জখম হয়ে চিল্লিয়ে উঠবে।

বেহেস্তের হুরী, তোর মত লেড়কিকে দেখে এক বিখ্যাত কবি বলেছেন—খোদা মেহেরবান কখনও যেন হাড্ডিসার রোগার ওপর চড়তে না হয়। রোগা লেড়কিরা বড়ই আনাড়ী। তাই তাদের ডর লাগে, তাদের বুকে তিলমাত্র আরামও যদি পাই তবে সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে আমার শিরা-উপশিরাগুলি খুণহীন হয়ে পড়েছে। ইয়া আল্লাহ! রক্ষা কর।'

আলী এগিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা! অনেক বলেছ, আর নয়। এবার তুমি নিজের জায়গায় যাও।'

বেহেস্তের হুরী এবার মুখর হ'ল। তার উমর অন্য পাঁচজনের মধ্যে সবার চেয়ে কম। সে নাদুসনুদুস লেড়কিটির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে তার বক্তব্য শুরু করল—আমার দিকে তাকা। আমার এ-দেহটি কার অপার করুণার ফসল, বলতে পার? আল্লাহ্-ই আমাকে তাঁর নিজের রুচি ও মর্জি মাফিক তৈরি করেছে। তাকে হাজার কুর্নিশ জানাই।

আকাশচুম্বী ইয়েলো গাছ যখন বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দোল খায় সে দৃশ্য কি চোখের সামনে কোনদিন দেখেছ? তা বাস্তবিকই দিল্‌কে দোলা দেয়।

ডাঁটার মাথায় পানির ওপরে যে পদ্মফুল ফুটে থাকে তখন তার যে সুরৎ চোখে পড়ে তার চেয়ে আচ্ছা কিছু দুনিয়ায় আছে কি?

আর যে-বাঁশী যুবতী লেড়কির দিলে দোলা লাগায়, মাতোয়ারা করে তোলে, শুনেছ কি?

মাতোয়ারা করা বাঁশী, ইয়েলো গাছে শাখা-প্রশাখা আর পদ্মের ডাঁটা সবই তো সরু, হালকা আর কম ওজন বিশিষ্ট, ঠিক কিনা?

আমি রোগা, হালকা। তাই তো আমি লম্বা-লম্বা পায়ে হনহনিয়ে চলতে সক্ষম। ব্যাপারটি কী আরামদায়ক, ভাবতে পার? জমিনের ওপর সোজাভাবে আমি হাঁটি। কোনরকম জড়তা প্রকাশ পায় না। কচ্ছপের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলাফেরা আমার ধাতে সয় না, পারিও না। তাই তো মেদবহুল মোটাসোটা আদমিদের দেখলে আমার শরীর ঘুলায়, মাথা ঝিমঝিম করে।

আর একটি বাৎ বিবেচনা ক'রে দেখ তো—কোন লেড়কি তার মেহবুবকে পেয়ার মহব্বৎ করতে গিয়ে কি বলে—মেহবুব আমার, কলিজা আমার, হাতির মত ইয়া তাগড়াই তোমার শরীরটার সুরৎ কী অস্বাভাবিক! নইলে, তোমার শরীরে পর্বতপ্রমাণ মেদের স্তূপ আমার দিল্‌কে কেড়ে নিয়েছে। আমি তোমার সুরতের সাগরে সাঁতার কাটতে পেরে ধন্য, জিন্দেগীকে ধন্য জ্ঞান করছি—কোন মরদকে কখনও এরকম সব বাৎ বলতে শুনেছিস, বল তো?

তারা কিন্তু এ কিসিমের বাৎ কখনই বলে না। উপরন্তু তারা আবেগভরে বলে—আহা, তোমার কোমর কী সরু! তোমাকে একেবারে হাতের মুঠোয় ধ'রে নেয়া সম্ভব। ঠিক যেন সিংহীর মত কোমর তোমার। আর পেঁজা তুলোর মত নরম তোমার দেহপল্লবটি। পাখি যেমন ডানা মেলে হাল্কা ভাবে উড়ে বেড়ায় তুমিও ঠিক তেমনি অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়াতে পার। আর সামান্য খানা পেলেই তোমার উদর পূরণ হয়ে যায়। তোমার রাঙা গাল দু'টিতে চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য হলে বেহেস্তবাসের সুযোগকেও সহজেই আমি ত্যাগ করতে পারি। আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বলে—মেহবুবা, তোমার হাল্কা বাহুলতা দুটো দিয়ে তুমি যখন আমাকে আলিঙ্গন কর এক অনাস্বাদিত আবেশে আমার দিল্ তখন ভরপুর হয়ে ওঠে। তোমার হাসি? তোমার মতই তোমার হাসিও হাল্কা। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি শোলার মত হাল্কা বলেই না তোমাকে আমার বুকের ওপর তুলে নিতে কিছুমাত্র তকলিফও হয় না। আমার মেহবুবা, আমার অনাবৃত হাঁটুর ওপরে তোমার শরীরটিকে পশমী চাদরের মতই মনে হয়। আহা মরি মরি! কী যে সুখ তোমার মধ্যে কী দিয়ে বুঝাবো, বল তো?

ওগো, নাদুসনুদুস বাঁদরমুখী, তোর এমন হতকুৎসিৎ মুখ কি কোনদিন কোন পুরুষের কলিজায় আগুন জ্বেলে দিতে পেরেছে? না, পারে নি, পারবেও না। একমাত্র মেদহীন ছিপছিপে লেড়কিরাই পুরুষদের দিমাক খারাপ ক'রে দিতে পারে। আর তাদের নিজেদের পায়ে লুটিয়ে দিতে পারে। আঙুরলতা যেমন কোন অবলম্বনকে জড়িয়ে ওপরে উঠে যায় তেমনি মরদরাও আমাকে জড়িয়ে বিকশিত হতে উৎসাহী হয়ে পড়ে, আমাকে চুম্বন করতে করতে

মাতোয়ারা হতে থাকে। আর হুজুর কি এমনিতেই আমাকে বেহেস্তের হুরী ব'লে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর-সোহাগে আমার দিল্ ভরিয়ে তোলেন'?'

এমন সময় পূর্ব-আকাশের রক্তিম ছোপ প্রভাত ঘোষণা করল। বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সাঁইত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন —'জাঁহাপনা, বেহেস্তের হুরী তার বক্তব্যের রশি টেনে ধরে বল্‌ল—'আমার প্রসঙ্গ আর নয়। তার চেয়ে বরং তোর নাদুসনুদুস শরীরটি সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলি। ওরে মেদের ভাণ্ড, সাচ্চা বাৎ বলবি। তুই যখন থপ্ থপ্ ক'রে পথ পাড়ি দিস তখন তুই কি নিজের মেদ থলথলে আর গোস্তর পুঁটুলিটিকে নিজের চোখে দেখতে পাস? অবশ্যই না। আমরা কিন্তু পাই, তোর হালৎ দেখে আমাদের মায়া হয়, শোকে ভেঙে পড়ি। তোর হাঁটার কী বাহার! নিতম্বের থলথলে গোস্ত যেন জমিনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায়। হাঁসের মত বিশ্রী কায়দায় নিতম্ব হেলিয়ে দুলিয়ে পথ চলিস। কিন্তু দেমাক পুরোদস্তুর। হাতীর মত ঝুড়ি ঝুড়ি খানা লাগে। তুই যতই চিল্লিয়ে মাৎ করিস না কেন সম্ভোগের সময় মরদকে কি এতটুকুও তৃপ্তি দিতে পারিস? থাম্বার মত দুই উরু, আর গামলার মত ভুড়ি। এই তিনের ফাঁকে গুহার খোঁজ করতে করতেই মরদের কম্ম ফতে হয়ে যায়। ইয়েটিয়ে করার আর সুযোগ পায় না, পাবেই বা কি ক'রে? পুরুষাঙ্গ যে দিশেহারা হয়ে আদৎ জায়গার হদিস পায় না। আর গুহার খোঁজ পেলেও তো কাজ কিছু হবার নয়। তোর ভুড়ির গুঁতো খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। কোন্ সুখের লোভে মরদরা তোর কাছে আসতে উৎসাহী হবে, বল তো?

আদতে বাজারে বিকোবার মত কোন গুণই তোর মধ্যে নেই, তবে একমাত্র হ্যাঁ, কষাইদের কাছে, গোস্ত বিক্রেতাদের কাছে তোর কদর একটু-আধটু হতে পারে বটে। খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে যখন হাসিস তখন কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার জোগাড় হয়। আর তোবা তোবা! তোর ফুলো ফুলো গালে চুমু? অসম্ভব। কোন মরদই চুমু খাওয়ার জন্য ঠোঁট এগিয়ে নিতে উৎসাহী হবে না।

তোর হাতে মরদ দেবে ধরা? ছ্যাঁ-ছ্যাঁ! থাম্বার মত তোর ওই হাত দুটোতে ধরা দিতে কেউ-ই উৎসাহী হবে না। দমকা বাতাসের মত তোর নিঃশ্বাস বয়। তার ধাক্কা সামাল দেবার মরদ কে আছে, বলতে পারিস? আর ঝর্ণার মত সর্বদা তোর শরীর থেকে ঘাম ঝরেই চলেছে। কী দুর্গন্ধ! ঠেলে বমি বেরিয়ে আসতে চায়।

যখন নিদ যাস তখন ভোস্ ভোস্ ক'রে তোর নাক ডাকে। কলিজায় কাঁপন ধরিয়ে দেয়। একটু নড়াচড়া করলেই কামারের
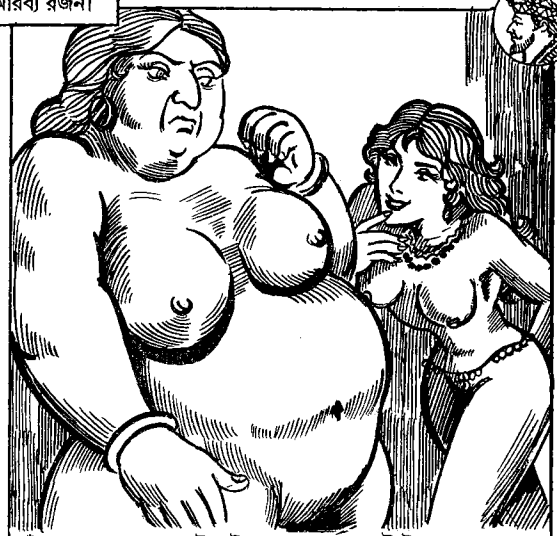
হাঁপরের মত তোর হাইফাই শুরু হয়ে যায়। উটের মত থপ্ থপ্ ক'রে যখন পথ চলিস তখন আচমকা তোর পায়ের তলায় কেউ পড়ে গেলে জান খতম হয়ে যাবে।

ওরে গোস্তর পুঁটুলি, তোর গায়ে সর্বদা উৎকট গন্ধ লেগেই থাকে। আর কেনই বা থাকবে না? আদতে গোসল করার সময় শরীরের সব ক'টি অংশে তোর হাত যে পৌঁছোতেই পারে না। উৎকট গন্ধের আর দোষ কি, বল?'

মোদ্দা কথা সামনের দিক থেকে তোকে দেখলে মনে হয় একটি হাতি বুঝি দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশ থেকে দেখলে উট ব'লে ভ্রম হয় আর পিছন থেকে ঠিক যেন এক ভিস্তি।

বেহেস্তের হুরীর বাৎ শুনে আলী সরবে হেসে উঠে বল্‌ল—'শোভন আল্লাহ! কী মারাত্মক ব্যাপার! বহুৎ আচ্ছা মন্তব্য করেছ তোমরা। যাও, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় চলে যাও।'

আলী-র নির্দেশে এবার সোনালী লেড়কি মেহেরুন্নেসা আর বাদামী রঙ বিশিষ্টা শোলা এগিয়ে এল।

প্রসঙ্গ শুরু করতে গিয়ে আগে সোনালী লেড়কিটি বল্‌ল—আমার গায়ে দিনের-আলোকে ধরে রেখেছি। কোরাণে বহুৎ জায়গাতেই আমার রঙের উল্লেখ দেখা যায়। আল্লাহ-ও বলেছেন, সোনালি হলুদ রঙ আমার বহুৎ পছন্দ। আল্লাহ-র দোয়ায় আমার গায়ের রঙ উজ্জ্বল—ঝলমলে রোদের মত। আমার রঙ ভেল্কী জানে। সোনালি হচ্ছে রঙের মধ্যে একেবারেই সেরা। সূর্য-চাঁদ-তারা আমার রঙ নিয়েই মনলোভা হয়ে উঠেছে। সোনালি পীচ আর আপেল কার না দিলে দাগ কাটতে পারে? দুনিয়ার যত দামী পাথর সবাই আমার গায়ের রঙ নিয়েই মনমৌজী হয়ে উঠেছে। শস্য পাকলে আমার গায়ের রঙই তো ধারণ করে।

সোনালি ফসলে ক্ষেতে ক্ষেতে রূপের হাট বসে যায়। তাই তো শরৎকাল সবার দিল্ জয় করতে পারে। কেন? আমার গায়ের রঙে চারদিক ছেয়ে যায় বলেই তো। সূর্যের উত্তাপ গাছের পাতাগুলোকে সোনালি বর্ণ দান করে।

আমার বাৎ না হয় ছাড়ানই দিলাম। তোর কথা, তোর বাদামি রঙের ব্যাপারে এবার কিছু ব'লে নিচ্ছি যেকোন বাদামি সামগ্রীর দাম অপেক্ষাকৃত কম। রঙই তার জন্য দায়ী। ছ্যাঃ ছ্যাঃ কী বিদঘুটে তোর রঙ। কেউ-ই এ-রঙটিকে আদর ক'রে কাছে টেনে নেয় না।

এমন কোন আচ্ছা গোস্ত হয় কি যার রঙ তোর গায়ের মত বাদামি? কী বিতিকিচ্ছিরি রঙ তোর। আদতে তুই ফর্সা নস, আবার কুচকুচে কালোও নয়। দুনিয়ার আদমিরা এদের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ! প্রশংসার ছিঁটেফোঁটাও তোর নসীবে জোটে না।

সোনালী লেড়কি মেহেরুন্নেসাকে আলী থামিয়ে দিয়ে শোলাকে তার মতামত ব্যক্ত করার নির্দেশ দিল।

শোলা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্ল। সে হাসলে যেন মুক্তো ছিটকে ছিটকে বেরোতে লাগল। ঘাড় মধুর মত, বাদামী তার গায়ের রঙ। চেহারাও বড়ই চমৎকার। তার শরীরের সব ক'টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাতাল্লা যেন নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছেন। তার কোমরের গড়ন সাগরের ঢেউয়ের মত। যেন হরদম দুলতেই থাকে। কালো মেঘের মত এক গোছা কোঁকড়ানো চুল মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুহূর্তের জন্য মৌন থেকে তারপর বল্ল—'খোদাতাল্লাকে বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া যে, তিনি আমাকে এক বস্তা গোস্ত দিয়ে থলথলে করে, পেকাঠির মত লিকলিকে বা প্রতিবন্ধী ক'রে দুনিয়ায় পাঠান নি। শ্বেতী রোগীর মত ফ্যাকাশে সফেদ বা কামলা রোগীর মত হলদে বা কয়লার মত কুচকুচে কালো রঙের প্রলেপ গায়ে দিয়ে দুনিয়ায় পাঠান নি। বিভিন্ন রঙ মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি আমার গায়ের রঙ বানিয়েছেন যা যে কোন রঙকেই টেক্কা দেয়ার হিম্মৎ রাখে। তিনি যে কত বড় কারিগর এর মাধ্যমেই মালুম হয়।

দুনিয়ার তাবড় তাবড় কবিরা আমার মত লেড়কির দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকেন। আমার রঙের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁরা হাজার হাজার বন্দনাগীতি লিখেছেন। ভাষা ও ছন্দের বুলি উজাড় ক'রে দিয়েছেন সেসব কবিতার প্রতিটি ছত্রে।'

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিরা ভোরের পূর্বাভাষ ঘোষণা করল। বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' আটত্রিশতম রজনী

প্রায় মাঝ রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, সোনালী লেড়কি শোলা ব'লে চল্ল—শোন, তোর গায়ের রঙকে রঙ বলে মেনে নেয়ার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়। ওটিকে তো আমি কোন রঙ বলেই মনে করি না। তোর হলদে রঙ আদতে মৃত্যুর প্রতীক। সবুজ পাতার পরিণতি হলুদ রঙ ধারণ করার অর্থই হচ্ছে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া। তাই বলতেই হয় হলুদ মৃত্যুর প্রতীক।

হরিতাল আর গেরিমাটি উভয়ের রঙই হলুদ। এরা দাওয়াই তৈরির কাজে লাগে। আর তা দিয়ে যে দাওয়াই হয় তা গায়ে মাখলে রোম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবুজ ঘাস তো খুবই নরম, তাই নয়? কিন্তু শুকিয়ে গেলে গরু-ছাগল বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে রাখে।

দোজখের হলুদ রঙের জাকুম গাছের নাম শুনেছ তো? তাতে ডাকু, খুনী আর শয়তানদের শির ঝুলিয়ে রাখে। তাতে এক কিসিমের তামাটে ফল হয় যা বিলকুল তোর মুখের মত। কবিরা তোর মত লেড়কিদের মুখের কথা ভেবেই সখেদে বলেছেন, 'খোদাতাল্লার দোয়ায় আমি একটি বিবি পেয়েছিলাম। তার রঙটি হলদে ছিল। তখন থেকেই আমি শিরের দরদ নিয়ে ভুগে ভুগে সারা হচ্ছি। একবার আমি তাকে বলেছিলাম, খুব হয়েছে, এবার আমরা যে-যার রাস্তা খুঁজে নেই। ব্যস, ঝগড়ার সূত্রপাত। আর তাতেই আমাকে দাঁতগুলি খোয়াতে হয়েছে। ওরে ব্বাস! ভাবলে এখনও আমার খুন ঠাণ্ডা হয়ে আসে।'

আলী তার বাৎ শুনে তো হেসে জমিনে একদম গড়াগড়ি যাবার উপক্রম হ'ল। বাকি চার লেড়কিকেও কাছে ডাকেন, প্রত্যেককে সমান দামের পোশাক ও অলঙ্কারাদি উপহার দিয়ে খুশী করে।

বসোরার মহম্মদ কিস্সা শেষ ক'রে এবার বল্ল—'জাঁহাপনা এ-ই হচ্ছে ছয় লেড়কির কিস্সা।'

কিস্সা শুনে আল সামনের বাদশা খুশী হলেন। মামুদ'কে আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বল্লেন—ওই ছয় লেড়কির ঠিকানা তোমার জানা আছে?'

এক কাজ কর, ওই ছয় লেড়কির পাত্তা লাগাও। তাদের মালিকের মকানে যাও। তাকে জিজ্ঞেস ক'রে এসো, আমার কাছে তাদের বেচবে কিনা?'

মহম্মদ বল্ল—'জাঁহাপনা, হয়ত আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কারণ, আলী ওই লেড়কি ছয়টিকে নিজের জানের চেয়েও বেশী পেয়ার মহব্বৎ করে।'

—'তবু তুমি যাও। প্রতি লেড়কি পিছু দশ হাজার—মোট ষাট হাজার দিনার নিয়ে যাও। আলীকে গিয়ে বোলো যে, আমি ওই লেড়কি ছয়টিকে খরিদ করতে আগ্রহী।'

বাদশাহকে কুর্ণিশ ক'রে বসোরার মহম্মদ ষাট হাজার দিনার কোর্তার জেবে পুরে আলী-র মকানে হাজির হ'ল। বাদশাহের অভিপ্রায়ের সমাচার দিয়ে সে আলী-র হাতে ষাট হাজার দিনারের

পুঁটুলিটি তুলে দিল। একে স্বয়ং বাদশাহের অভিপ্রায়। তার ওপর নগদ ষাট হাজার—প্রতি লেড়কি পিছু দশ হাজার দিনার। তার কলিজাটি নাচানাচি শুরু ক'রে দিল। আর চোখের মণি দুটো চক চক করতে লাগল। কিন্তু লেড়কিগুলিকে সে বড়ই পেয়ার করে। পেয়ার আর লোভ এই দুয়ের দ্বন্দ্বে কিছুক্ষণ ভোগার পর অর্থলোভই জয়ী হ'ল। শেষ পর্যন্ত দিনারের পুঁটুলিটি জেবে পুরে তার কলিজার সমান লেড়কি ছয়টিকে বসোরার মহম্মদের হাতে তুলেই দিল।

বসোরার মহম্মদ লেড়কি ছয়টিকে বাদশাহের সামনে হাজির করলে তিনি তো তাদের গায়ের রঙ দেখে রীতিমত ভিমরি খাবার জোগাড়। তাদের দৈহিক লাবণ্য ও রঙের মধ্যে সাদৃশ্য তো নেই-ই বরং বৈসাদৃশ্য পুরো দস্তুর। আবার প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ঢঙের আধার। বাদশাহ তাঁর বাঞ্ছিতা লেড়কিদের পেয়ে খুশীতে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠলেন।

লেড়কিগুলোও নাচা-গানা দেখিয়ে, কবিতা শুনিয়ে আর কিস্‌সা ব'লে বাদশাহকে খুশীর সায়রে ডুবিয়ে রাখল। রঙ-তামাশায়ও তার মনকে কম ভরিয়ে তুল্‌ল না।

এদিকে হতভাগ্য আলী লেড়কি ছয়টিকে হাতছাড়া ক'রে বিমর্ষভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে লাগল। অনুশোচনার জ্বালায় জর্জরিত হ'ল। তারা যে তাকে অফুরন্ত আনন্দ দান করত সে তুলনায় ষাট হাজার দিনার তো খুবই নগণ্য। সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। এক সময় তার হালৎ এমন হ'ল যে, জান ধরে রাখাই তার পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়াল।

এক সকালে আলী কাগজ-কলম নিয়ে বসল। নিজের মর্ম বেদনার কথা উল্লেখ ক'রে একটি চিঠি লিখে ফেল্‌ল। চিঠির বক্তব্য—আমার বিমর্ষ হৃদয় ওই ছয়টি পদ্মের পাঁপড়ির মত লাবণ্যময়ীকে চুম্বন করার জন্য ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়। তারা যে আমার তৃষ্ণার ঠাণ্ডা পানি, আমার বাঁচার রসদ, আর আমার দৃষ্টিশক্তির আধার, আমার জান—আমার সর্বস্ব। সেই উপহারের বিনিময়ে আমি আমার চোখ দুটোকে মুদ্রিত ক'রে দিতে কুণ্ঠিত হ'ব না। আমার এ-চোখ দুটো দিয়ে সেই লেড়কি ছয়টিকে দেখতে অত্যুগ্র আগ্রহী। তারাই যে আমার প্রাণ-প্রদীপের তেল, কামনার অবলম্বন আর আমার জানকে টিকিয়ে রাখার উষ্ণতা জোগাতে পারে। কিন্তু প্রদীপে যার তেল নেই, সেখানে তো বাতি জ্বলতে পারে না।

বাদশাহ অল মামুন-এর হাতে পত্রটি পৌঁছলো। বাদশাহ যথার্থই উদার হৃদয়। আলী-র মর্মবেদনায় তিনি ব্যথিত হলেন। ছয়টি লেড়কীকে তলব করলেন। তাদের প্রত্যেককে প্রচুর উপহার সামগ্রী ও নগদ দশ হাজার দিনার দিয়ে আলী-র মকানে পাঠিয়ে দিলেন। আলী হারানো রত্নদের ফিরে পাওয়ার খুশীতে তার দিল্‌ নেচে উঠল। তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে কলিজা ঠাণ্ডা করল।

বাদশাহ লেড়কিদের হাতে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে ষাট হাজার দিনার দিয়ে তিনি তাদের খরিদ করেছিলেন তা মকুব ক'রে দিয়েছেন। আলী বাদশাহের উদারতায় মুগ্ধ হ'ল। খুশীতে তার দিল্‌ উঠল ভরে। জিন্দেগীর শেষ দিন পর্যন্ত সে তার ছয় রূপসীদের নিয়ে আনন্দে মেতে ছিল।

বেগম শাহরাজাদ এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ছয়টি লেড়কির কিস্‌সা তো শুনলেন। এর পর আপনাকে আজব তামার জালার কিস্‌সা শোনাব। আপনার দরবারে আজ পর্যন্ত যত কিস্‌সা পেশ করেছি তাদের মধ্যে এ-কিস্‌সাটি সবচেয়ে সেরা বলেই আমার বিশ্বাস।

দুনিয়াজাদ তার বহিনজীর গলা জড়িয়ে ধরে আবেগ ভরে ব'লে উঠল—'বহিনজী তাড়াতাড়ি তোমার কিস্‌সা শুরু কর।'

—'আজ নয় বহিন। যদি কাল পর্যন্ত জান টিঁকে থাকে—'

বাদশাহ শারিয়ার বেগমের রক্তিম গালে আলতো ক'রে একটি টোকা দিয়ে বল্‌লেন—'কাল পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে বলছ কি! ভোর হতে এখনও অনেক দেরী। কাল নয়, আজই শুরু কর।'

দুনিয়াজাদ আব্দার করল—'হ্যাঁ—হ্যাঁ, বহিনজী, আজই—যতটা হয় বল। বাকীটুকু—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বেগম মুচকি হেসে বল্‌ল—'ঠিক আছে, তোদের উভয়ের অত্যুগ্র আগ্রহকে চাপা দিয়ে কাল পর্যন্ত কিস্‌সাটি ঝুলিয়ে রাখব না। ধৈর্য ধরে শুনুন জাঁহাপনা বলছি।'

আজব তামার জালার কিস্‌সা

জাঁহাপনা, এ কথা তো আমরা সবাই মানি আল্লাহ-ই সব বাদশাহের বাদশাহ। আর সব সুলতানের সুলতান। তার ওপরে কেউ নেই। তার মর্জিতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য পরিচালিত হয়।

কোন এক সময়ে এক মুলুকে এক খলিফা রাজত্ব করতেন, সেই মুলুকের নাম—

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' ঊনচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ্ শারিয়ার কিস্‌সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহের শিকার হয়ে ব্যস্ত-পায়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না ক'রে সরাসরি কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন।

বেগম বললেন—'জাঁহাপনা, ওমিয়াদ বংশের খলিফারা কোন এক সময়ে দামাস্কাসের শাসক ছিলেন।

আবু আল-মালিক বিন সারবান ছিলেন ওমিয়াদ বংশের খলিফাদের মধ্যে একজন। জ্ঞানী-গুণীদের তিনি যারপরনাই শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন। স্বদেশ ও ভিন দেশের বিচিত্র সব কিস্‌সা কাহিনী শোনার জন্য তিনি ছিলেন খুবই আগ্রহান্বিত। পর্যটক ও জ্ঞানী-গুণীরা তাকে কিস্‌সা শুনিয়ে খুশী করতেন। তবে ডেভিডের লেড়কা সুলেমান-এর কিস্‌সা শোনার জন্যই তিনি বেশী উৎসাহী ছিলেন।

সুলেমান-এর অতুলনীয় গুণাবলী আর তাঁর বিচক্ষণতার কিস্‌সা শুনতে পেলে তিনি রাতভর নির্ঘুম অবস্থায় বসে থাকতে পারতেন। আরও আছে। মরু-অঞ্চলের বল্গাহীন অত্যাচার তিনি যেভাবে দমন ক'রে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন আর জলে-স্থলে-আকাশপথে যেসব আফ্রিদি ও জিন উপদ্রব চালায় তাদের কী অসীম ধৈর্য, কৌশল ও শক্তি দিয়ে তিনি কব্জা করেছিলেন সেসব কিস্‌সা বার বার শুনেও যেন তার দিল্ ভরত না।

এক সকালে খলিফা আবু আল-মালিক-এর দরবারে এক প্রখ্যাত ভূ-পর্যটক হাজির হলেন। তার নাম—তালিব-বিন-সাল। তিনি কিস্‌সাপ্রিয় খলিফাকে রোজ কিস্‌সা শুনিয়ে খুশী করতেন। সেগুলোর সঙ্গে তিনি আজব তামার জালার কিস্‌সাটিও শুনিয়েছিলেন।

আজব তামার জালার কিস্‌সাটি এমনই অত্যাশ্চর্যে ভরপুর যে, খলিফা তাঁর কাহিনীটি বিশ্বাস করতে উৎসাহী হলেন না। কিন্তু কেন তার মনে অবিশ্বাস দানা বাঁধল? কালো ধোঁয়ায় পূর্ণ ছিল কিস্‌সার তামার জালাটি। আদতে এ ধোঁয়া নাকি আদৌ ধোঁয়াই নয়। এগুলো দৈত্যদের গায়ের রোয়া। তাজ্জব বাৎ! এমন ব্যাপার স্যাপার বিশ্বাস করা সম্ভব?

খলিফার চোখের অবিশ্বাসের ছাপটুকু প্রত্যক্ষ ক'রে তার দিলে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তালিব-বিন-সাল প্রসঙ্গক্রমে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আপনি ধর্মাত্মা। আপনার দরবারে ঝুট কিছু পেশ করা আমার পক্ষে অন্ততঃ সম্ভব নয়। ঝুট কিছু ব'লে আপনাকে ধোঁকা দেওয়ার সাহস ও ইচ্ছা কোনটিই আমার নেই। যা বল্‌লাম, এর বিলকুল সাচ্চা।

বহুৎ দিন আগের বাৎ। জিন একবার সুলেমান-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। তাই তিনি ওই তামার জালাটিতে তাকে আটক করে শাস্তি দিয়েছিলেন। তারপর পশ্চিম-আফ্রিকার মঘরিব-এর বাইরে বিলাপ সাগরের পানিতে তাকে সমেত জালাটিকে ফেলে দিয়েছিলেন।

জালাটিকে পানিতে ফেলার আগে কিছু ধোঁয়া তা থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। সে ধোঁয়াই আফ্রিদি দৈত্যের আত্মা। তা বাতাসের সঙ্গে মিশে সে ফিন নিজের অবয়ব ফিরে পায়।

এ বাৎ শুনে খলিফা তাজ্জব বনে গেলেন। এ-ও কি কখনও হতে পারে! ব্যাপারটিকে তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা দরকার। তিনি চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপটুকু অক্ষুণ্ন রেখেই বল্‌লেন—'শুধু কথায়ই হবে না, আমি আফ্রিদির ধোঁয়ায় ভরা কয়েকটা জালা দেখতে চাই। এরকমটা কি কখনও হতে পারে? এ ব্যাপারে তোমার কি মত, বল। সম্ভব হলে আমাকে সঙ্গে ক'রে তুমি চল। আমি নিজের চোখে ব্যাপারটি দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসি।

—'জাঁহাপনা, আপনি মিছে তকলিফ করতে যাবেন কেন? আপনার হুকুম তামিল করতে ব্যাপারটিকে এখানেই দেখানোর বন্দোবস্ত করা হবে। এ কোন সমস্যাই নয়। তবে এর জন্য আপনাকে কেবলমাত্র একটু তকলিফ করে একটি চিঠি লিখতে হবে। ব্যস, তারপর যা করার আমিই সব করব। চিঠিটি লিখবেন আপনারই অধীনস্থ মঘরিব অঞ্চলের শাসনকর্তা আমীর মুশা-র নামে। চিঠিতে লিখবেন—পাহাড় যেখানে শেষ হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে তার লাগোয়া ছোট্ট একটি সমতল ভূমি রয়েছে। তারই গায়ে সাগরের বুকে তামার জালাগুলোকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। মুশা যেন সেগুলোকে পানি থেকে তুলে আপনার দরবারে পাঠিয়ে দেন। ব্যস, এটুকু লিখলেই চলবে।

খলিফা সুলেমান মঘরিব-এর শাসনকর্তা আমীর মুশা'কে একটি চিঠি লিখে তামার জালাগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

খলিফার চিঠি কোর্তার জেবে পুরে ভূ-পর্যটক তালিব-বিন-

সদল আমীর মুশা-র কাছে ছুটলেন।

আমীর মুশা তালিব-বিন-সালকে যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন প্রদর্শন করলেন। চিঠির বক্তব্য পড়ে বললেন—খলিফার হুকুম যখন হয়েছে তখন আমাকে অবশ্যই তা তামিল করতে হবে।

আমীর মুশা তার সেনাপতি আব্দ-অল-সামাদকে তলব করলেন। তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়িয়ে বহুৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

সেনাপতি আব্দ-অল-সামাদ আমীর মুশা-র তলব পেয়ে ছুটে এলেন।

আমীর মুশা তাকে বললেন—'মহামান্য খলিফা জিনের আত্মা ভর্তি কয়েকটি তামার জালা চেয়ে জরুরী চিঠি পাঠিয়েছেন। ডেভিড-এর লেড়কা সুলেমান তামার জালাগুলোতে কয়েকটি জিনের আত্মা ভর্তি ক'রে রেখেছিলেন। তারা সেখানে বন্দী হয়ে রয়েছে। সাগরের বুকে জালাগুলো রয়েছে। তোমার ওপরে সেগুলোকে তুলে আনার দায়িত্ব দিচ্ছি। সাগর আর পাহাড় যেখানে মিশেছে সেখানে সাগরের পানিতে নাকি ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। আমি তো এ-অঞ্চল বহুৎ দিন শাসন করছি, কিন্তু এরকম বাৎ এর আগে কারো মুখে শুনিনি। কিন্তু আমাদের মেহমান তালিব-বিন-সাল সাগরের যে-অংশের উল্লেখ করছেন আমি এরকম কিছুও কোনদিন শুনেছি বলেও মনে হচ্ছে না। ফিন কোনপথে সেখানে যাওয়া যাবে তা-ও আমার কিছুই জানা নেই। আপনাকে কষ্ট দিয়ে নিয়ে আসার অর্থ হচ্ছে, আপনি তো তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়িয়েছেন। তালিব-অল-বিন যে পাহাড়ের ব্যাপারে বলছেন তা আশা করি আপনার অবশ্যই জানা আছে, ঠিক কিনা?'

—'হ্যাঁ জাঁহাপনা, পাহাড় যেখানে সাগরে মিশেছে আমি এক দমে সেখানে গিয়েছিলাম বটে। লেকিন এ বুড়া হাড্ডি নিয়ে একা সেখানে যেতে আমার আর সাহসে কুলোচ্ছে না। সাধ থাকলেও সাধ্য আমার নেই। বিশ্বাস করুন, পথ খুবই দুর্গম, এমন কি প্রচণ্ড তেষ্টায় গলা ভেজাবার মত পানিটুকু পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, সেখানে যেতেই দু'সাল কয়েক মাহিনা সময় লেগে যাবে। ফিরে আসতে আরও বেশী সময় লাগবে। ফিন ফিরে আসা যাবে কিনা সে ব্যাপারেও কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। বরং সম্ভাবনা কম বলেই ধরে নিতে হবে।

জাঁহাপনা, সে-মুলুকে জীবন্ত আদমির নামগন্ধও নেই। পাখি যেমন ডালের গায়ে ঝুলে থাকে ঠিক তেমনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে আদমি ঝুলে থাকে। আজ পর্যন্ত ভিন মুলুকের কেউ-ই সে দেশে যেতে পারে নি। সে নগরটির নাম "তাম্র নগরী"। তাজ্জব এক নগর বটে!'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে নিয়ে বুড়ো সেনাপতি সামাদ ফিন
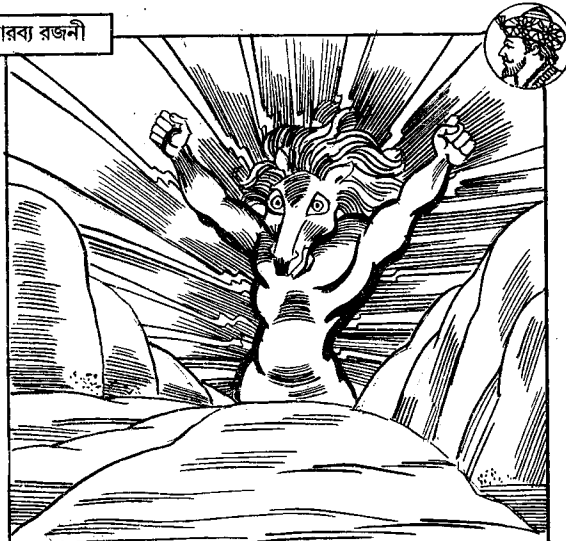
মুখ খুলল—'জাঁহাপনা, আজ পর্যন্ত আপনার কাছে আমি কিছু ছিপাই নি। আজও ছিপাব না। এইমাত্র আমি সে-পথকে দুর্গম বলেছি। তবে কেবলমাত্র দুর্গম বললেই যথার্থ বলা হবে না, মারাত্মক ভয়াবহ, অস্বাভাবিক বিপদ পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে। সেখানে যেতে গিয়ে মাঝ-পথে একটি বিশাল মরুভূমি রয়েছে। আফ্রিদি দৈত্য আর জিন রাত্রি-দিন চব্বিশ ঘণ্টা সে পথ পাহারা দিচ্ছে।

আর জনবসতি? আজ পর্যন্ত কোন আদমি সে-অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলতে পারে নি।

বুড়ো সেনাপতি সামাদ এবার মেহমান ভূ-পর্যটক তালিব-বিন-সালকে লক্ষ্য ক'রে বলল—'সামাদ সাহাব, আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তটি আদমিদের কাছে যে নিষিদ্ধ তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে? আজ অবধি কেবলমাত্র দু'আদমি সেখানে যেতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ডেভিড-এর লেড়কা সুলেমান। আর দুসরা জোড়া সিঙ্গের আলেকজান্দার। জায়গাটি একেবারেই নীরবতার রাজত্ব। চারদিকে কেবল বালি আর বালি। বিস্তীর্ণ মরুভূমি। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে মালুম হবে বুঝি আপনি নীরব-নিস্তব্ধ গোরস্তানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

আমীর মুশা এবার মুখ খুললেন—'সামাদ সাহাব, বিলকুল সাচ্চা বাৎ। মাথার ওপরে ঘোরতর বিপদ। তবু সব কিছুকে উপেক্ষা করে সেখানে যেতেই হবে। এখন কথা হচ্ছে, আপনি যদি নিতান্তই যেতে আপত্তি করেন তবে আমাকেই রওনা হতে হবে। খলিফার হুকুম তামিল না ক'রে উপায় নেই। এখন বিবেচনা ক'রে দেখুন—'

—'কিন্তু যেতে হলে আমাকেই যেতে হবে। অন্য কারো পক্ষে এ-কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। আর পথ কেবলমাত্র আমারই জানা।

আমীর মুশা, দু'হাজার উট সঙ্গে নিয়ে নিল। এক হাজার খানা আর অন্য এক হাজার পানি বহন করবে। সে-মুলুকে জ্যান্ত আদমি টাদমি নেই বলে সৈন্য সামন্ত বেশী নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যারা আছে তারা প্রেতলোকের বাসিন্দা। ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তাদের গায়েই লাগবে না। আর যদি ক্ষেপেই যায় তবে সৈন্য বা অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়াস বৃথা। তাছাড়া ফালতু লটবহরের ঝামেলা দেখলে তারা ভীষণ ক্ষেপে যেতে পারে। সব বন্দোবস্ত ক'রে দিন। আল্লাহ্-র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

এমন সময় প্রভাত হয়ে আসায় বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' চল্লিশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বুড়ো সেনাপতি সামাদ বিদায় নিলে আমীর মুশা-র মুখ ডরে একেবারে চূণ হয়ে গেল। একদম ঘাবড়ে গেলেন, আল্লাহ ভরসা। তবু তার চাহিদা অনুযায়ী সব কিছুর বন্দোবস্ত করে দিলেন।

আমীর মুশা এবার সেনা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং বিভিন্ন বিভাগের সেনাপতিদের তলব করলেন। সবার উপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছার বাৎ ব্যক্ত করে লেড়কা হারুণ'কে মসনদে অভিষিক্ত করলেন। ক'রে দায়িত্বমুক্ত হলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে হারুণ-এর ওপরই রাজ্যের সার্বিক দায়িত্বভার অর্পিত হ'ল।

আমীর মুশা এবার সামাদ-এর চাহিদা অনুযায়ী সামানপত্র গোছগাছ করার কাজে মেতে গেলেন।

যাবতীয় ব্যবস্থাদি পাকা হয়ে গেলে আল্লাহ-র নাম নিয়ে শুভমুহূর্তে তারা পথে নামলেন।

দু'হাজার উট। বিশাল বাহিনী। দিনের পর দিন পথ পাড়ি দিতে লাগল। একের পর এক মাহিনা ক্রমেই পেরোতে লাগল। কয়েক মাহিনা চলার পর তাঁরা মরুভূমির বালির রাজত্বে প্রবেশ করলেন।

এবার বিশাল বাহিনী মরুভূমির ওপর দিয়ে চলতে লাগল। নীরব-নিস্তব্ধ মরুভুমি। ঠিক যেন গোরস্তানের ওপর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। প্রাণীর চিহ্ন মাত্রও নেই।

এক বিকালে দিগন্ত জুড়ে এক টুকরো ঘন কালো মেঘের মত কি যেন দেখা গেল। কি? মেঘ? নাকি অন্য কিছু?

তারা উটের মুখ ওই কালো দিকটির দিকে ঘুরিয়ে দিল। অফুরন্ত জিজ্ঞাসা আর আতঙ্ক নিয়ে তারা এগিয়ে চল্‌ল। কিছুদূর যেতেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেল। ওই কালো বস্তুটি মোটেই মেঘ বা অন্য কিছু নয়। আকাশচুম্বী সুবিশাল এক মকান। ইস্পাতের দেয়ালে ঘেরা মকানটি। তার পরিধি কম করেও হাজার দশেক ফুট তো হবেই। তার গম্বুজটি সিসের তৈরী। তার চারদিকে সুবিশাল কার্নিশ। হাজার হাজার কাক যাতে ভালভাবে বসতে পারে তার জন্যই এরকম ব্যবস্থা। আর ইয়া পেল্লাই চারটি থামের ওপর বিশালায়তন বাড়িটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে সে এক তাজ্জব ব্যাপার।

কুচকুচে কাকই সেখানকার একমাত্র বাসিন্দা। কাক ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর চিহ্নমাত্রও দেখা যায় নি।

মকানটির প্রধান ফটকের সামনে অতিকায় একটি কালো পাথরের ফলক। তার গায়ে রোমান হরফে খোদাই করা কয়েকটি ছত্র লেখা। সামাদ-ই কেবল রোমান হরফ পড়তে পারেন। তিনি পাথরের গায়ের লেখাটি পড়ে মুশা'কে তার অর্থ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন।

কালো পাথরটির গায়ের লেখাটির বক্তব্য হ'ল—যাও, ভেতরে ঢুকে যাও। তবেই রাজাদের কিস্‌সা কাহিনী জানতে পারবে। তারা আমার এ গম্বুজের ছায়ায় কিছু সময় বিশ্রাম করেই বাতাসে মিলিয়ে গেছে। খড়কুটোর মত মৃত্যুর ঝড়ের সঙ্গে উড়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মুশা বাণীটির অর্থ উপলব্ধি করার পর বহুৎ মর্মাহত হলেন। মুখ দিয়ে অস্পষ্ট স্বর বেরিয়ে এলে—'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ভগবান নেই। আল্লাহ এক ও অভিন্ন।'

মুশা কয়েক মুহূর্ত কালো পাথরের সামনে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এবার সদলবলে মকানটির ভেতরে ঢুকে গেলেন। ভেতরে ঢুকতেই কালো গ্রানাইট পাথরের সুউচ্চ একটি মিনার তাদের সামনে পড়ল। তার চারদিকে কুচকুচে কালো কাকের মেলা বসেছে যেন।

মিনারটির চারদিকে অসংখ্য সমাধি স্তম্ভ। পেল্লাই একটি স্তম্ভের গায়ে রোমান হরফে লেখা। যার মর্মার্থ হ'ল—

বিকারের রোগীর মত যৌবনের উন্মত্ততা অতিবাহিত হয়েছে। তবু বহুৎ কিছুই আমি দেখেছি। যৌবনের বল-বীর্যের কথা কি কখনও মন থেকে মোছা যায়? যদিও আমি নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছি, আজকে আমি ধুলোতে মিশে একাকার হয়ে গেছি। আজও আমি যেন যৌবনের উন্মত্ততার উচ্ছলতার ধ্বনি স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি। প্রবল বিক্রমে বিশাল শহরকে বার বার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি। ভীত-সন্ত্রস্ত নারী পুরুষরা ভয়ে বিষাদের শ্বাস ফেলে প্রতি মুহূর্তে। আমার রথের চাকায় রাজারাজড়াদের প্রাণনাশ করেছি। কোনরকম ক্ষমা কাউকেই কোনদিন করিনি। কিন্তু আজ? যৌবনের সে উন্মাদনা যেন খোয়াবের মত চোখের সামনে ভাসছে। আর বালির মৃত যাদুঘরে ফেনার অক্ষরের মত বালির চরের ওপর ভেসে

বেড়াচ্ছে। আমার সৈন্যসামন্ত ও যাবতীয় কৌশলকে ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যু আমাকে বন্দী করে নিয়েছে। ওগো পথিকবর শোন, কান পেতে শোন আমার মৃত্যু বাণী। আত্মার অপচয় কোরো না। এ মাটি হয়ত কালই বলবে আমি তাকে আমার জঠরে আশ্রয় দিয়েছি।

বুড়ো সামাদ কবিতার বক্তব্য তর্জমা ক'রে ক'রে মুশা আর তার সঙ্গী সাথীদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। মুশা-র চোখে পানির ধারা নেমে এল। আর ভাবতে লাগলেন—'খোদাতাল্লার অভিসম্পাতে হতভাগ্যটিকে কী অন্তহীন কষ্টই না স্বীকার করতে হয়েছে।'

ব্যথিত মর্মাহত মুশা এবার এগিয়ে গিয়ে মিনারটির কাছে দাঁড়ালেন। সামাদ তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঠের দরওয়াজার গায়ে সোনার পাতে রোমান হরফে লেখা আর একটি কবিতা পাঠ করতে লাগলেন।

কবিতাটি পাঠ শেষ ক'রে সামাদ এবার সেটি তর্জমা ক'রে মুশাকে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌লেন—

আমি সর্বশক্তিমান পরম পিতার নামে বলছি—তোমরা, যারা এখানে হাজির তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, ভুলেও যেন কেউ আরশির দিকে তাকিয়ো না। তোমাদের একটি নিঃশ্বাসই তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মায়া, হ্যাঁ, মায়ার ফাঁদ পেতেই তো আদমিদের পা মচকে দেয়। আমার শক্তি সামর্থ্যের বাৎ কিছু বলছি শোন, দশ হাজার ঘোড়া আমার ছিল। বন্দী রাজারা ছিল তাদের সহিস। হারেমে সহস্রাধিক অনূঢ়া রাজকন্যা আমাকে খুশী করার জন্য সর্বদা চনমন করত। তামাম দুনিয়া থেকে আমি তাদের যোগাড় করেছিলাম। তাদের কুচগুলি ছিল মনলোভা। সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক। পূর্ব আর পশ্চিম আমার পদানত হয়েছিল। আমি নিজেকে সর্বশক্তিমান ভেবেছিলাম। কিন্তু অচিরেই যিনি আদৎ সর্বশক্তিধর তার কাছ থেকে আমার তলব এল।

ওপরওয়ালার তলব পেয়ে আমি আমার কোষাগারের দরওয়াজা খুলে দিয়ে আমার অধীনস্থ সুলতানদের ডেকে বল্‌লাম, তোমরা ধনদৌলত যা কিছু আছে নিয়ে যাও আর বিনিময়ে আমাকে মাত্র একটি দিন আমার জানটিকে টিঁকিয়ে রাখ। তারা নীরবে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল। মোউৎ এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আর দখল করল আমার মসনদ।

সামাদ কবিতাটির তর্জমা করা শেষ করলে সবাই ডুকরে ডুকরে কেঁদে বুক ভাসাতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটির পর চোখের পানি মুছতে মুছতে একে একে সবাই ভেতরে ঢুকে গেল। অতিকায় সব হলঘর। আসবাবপত্র সবই সাজানো গোছানো। কিন্তু সবই ফাঁকা।

পর পর কয়েকটি কামরা ডিঙিয়ে তারা আরও বড় একটি কামরায় ঢুকে গেল। পেল্লাই একটি চন্দন কাঠের টেবিল। টেবিলটির কেন্দ্রস্থলে ছোট্ট একটি কবিতা খোঁদাই করা।

সামাদ কবিতাটি পাঠ করলেন। তারপর সেটিকে তর্জমা ক'রে মুশা ও অন্যান্যদের বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌লেন—

কবিতাটির মমার্থ হচ্ছে—'কত সব কুচক্রী রাজারাজড়াই না এ টেবিলের চারদিকে ঘিরে বসে থাকত। আর তাদের সঙ্গে কানা রাজারাও বসত। এখন? এখন তারা সবাই আন্ধারে শায়িত। এখন আর কারো ওঠার ক্ষমতা নেই। আর দেখতে পায় না কেউ।'

মুশা স্তম্ভিত হয়ে যান। কবিতার অর্থ কিছুই তার বোধগম্য হয় না। কি এর অর্থ? উদ্দেশ্যই বা কি? শেরওয়ানীর জেব থেকে এক টুকরো চামড়া বের করে তিনি তাতে কবিতাটি লিখে নিলেন।

মুশা এবার সহযাত্রীদের নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। ফিন তাম্র নগরীর উদ্দেশে পা-বাড়ালেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' একচল্লিশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, মুশা তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে এক নাগাড়ে প্রায় তিনদিন পথ চলার পর তৃতীয় দিন সন্ধ্যার কিছু আগে অত্যাশ্চর্য এক বস্তুর মুখোমুখি হ'ল। ঘোড়সওয়াররাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হ'ল। সেটি একটি অতিকায় মূর্তি। ঘোড়সওয়ারের মূর্তি।

ঘোড়সওয়ারটির ডান হাতে সুদীর্ঘ একটি লোহার তরবারি। তরবারি সমেত হাতটি কোর্তার ওপরে তুলে দেয়া রয়েছে।

বিকালের বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভার কিছুটা তরবারিটির ওপর পড়ায় সেটিকে রক্তবর্ণ দেখাচ্ছে।

এক পা-দু' পা ক'রে তারা মূর্তিটির একেবারে গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। লোহার তরবারিটি ছাড়া বেদী, ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার সবই তামার পাতে মোড়া।

মূর্তিটির বেদীর গায়ে একটি কবিতা উৎকীর্ণ করা রয়েছে। লেখার ঢঙঢাঙ দেখলেই কলিজাটি মোচড় মেরে ওঠে।

সামাদ অনুচ্চকণ্ঠে কবিতাটি পাঠ করলেন। তারপর মুশা ও অন্যান্যদের কাছে তা তর্জমা ক'রে শোনাতে গিয়ে বল্‌লেন—'এর মর্মার্থ হচ্ছে 'হে পথিকবর, এ-নিষিদ্ধ মুলুকে এসে যদি তুমি পথভ্রষ্ট হয়ে পড় তবে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে আমার গায়ে ধাক্কা মার। ধাক্কার ফলে আমার মুখটি যেদিকে ঘুরবে সেদিকই হবে তোমার পথ।'

কবিতার নির্দেশ অনুযায়ী মুশা সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে রহস্যময়
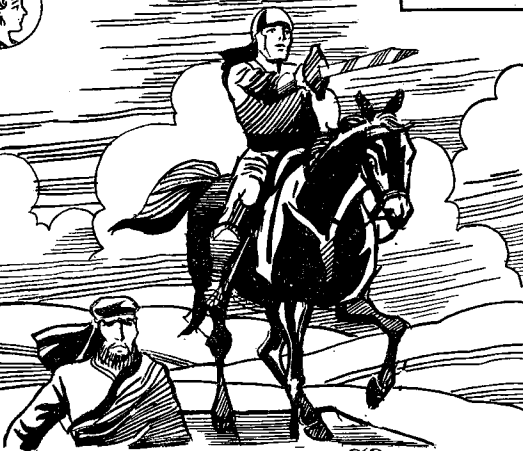
মূর্তিটির গায়ে এক ধাক্কা দিলেন। ব্যস, মূর্তিটি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল। তারা যে-পথ ধরে যাচ্ছিল তার ঠিক বিপরীত দিকে মুখ ক'রে সেটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামাদ এবার বুঝলেন, তিনি ভুল পথ ধরে চলছিলেন। এবার মূর্তিটির নির্দেশিত পথে তাঁরা এবার পা-বাড়ালেন।

মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত তারা এক নাগাড়ে পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে। পথের দু' ধারে কেবল বালি আর বালি। জীবজন্তুপ্রাণী, গাছপালা, ঝোপঝাড় তো দূরের কথা এক টুকরো সবুজ ঘাসও তাদের নজরে পড়ল না।

এক মাহিনা কেটে গেল। তবু তাদের পথ চলার বিরাম নেই। একদিন এক কুচকুচে কালো পাথরের এক পাহাড়ের সামনে এসে তারা থামলেন।

কৌতূহলী চোখ মেলে তাঁরা অদ্ভুতদর্শন পাহাড়টিকে দেখতে লাগলেন। এক জায়গায় এসে তাঁদের দৃষ্টি থমকে গেল। দেখলেন, পাহাড়ের গায়ে অদ্ভুত এক প্রাণী। শেকল দিয়ে বাঁধা। এরকম কোন প্রাণী তারা জিন্দেগীতে দেখেন নি। তা-ও আবার শেকল দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা।

বাস্তবিকই তাজ্জব ব্যাপারই বটে। প্রাণীটির অর্দ্ধেক মাটির তলায় পোঁতা, বাকিটুকু ওপরে—দৃশ্য। কে যে অদ্ভুত এ প্রাণীটিকে এখানে, এ-অবস্থায় রেখে গেছে তার হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। তবে মনে হ'ল একে শাস্তি দেয়ার জন্যই এভাবে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছে। কারণ প্রাণীটির ও পরের দৃশ্য অংশটুকু দৈত্যাকৃতি। কলিজা শুকিয়ে যাবার মতই ভয়ঙ্কর তার রূপ। তার ওপর কালো দুটো ডানাও বীভৎসতাকে আরও বেশী ক'রে ফুটিয়ে তুলেছে। আর হাত চারটি। সিংহের মত নখরযুক্ত ইয়া পেল্লাই সব থাবা। মুখের সম্মুখ ভাগ, না পুরো মাথাটিই গাধার মত। ইয়া লম্বা ও কোঁকড়ানো চুলগুলো বাতাসে অনবরত উড়ছে। চৌবাচ্চার মত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। কপালেও ইয়া বড় একটি চোখ। আরও আছে। মাথার দু' পাশের ইয়া লম্বা শিং দুটোর দিকে চোখ পড়লেই বুকের মধ্যে থরহরি কম্প শুরু হয়ে যায়। চিতাবাঘের মত তার চাহনিতে সুস্পষ্ট হিংস্রতার ছাপ। কুচকুচে কালো জীবটির শরীরটি সব মিলিয়ে যেমন অতিকায় তেমনি ভয়ঙ্করও বটে।

মুশা তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে অদ্ভুত জীবটির কাছাকাছি যেতেই সে এমন তর্জন গর্জন শুরু করে দিল যে, মনে হ'ল—এই বুঝি শেকল ছিঁড়ে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেকলটিকে ছেঁড়ার জন্য সে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগল। খোদা ভরসা। কালো পাথরের গায়ে সাক্ষাৎ মোউৎটিকে বেঁধে না রাখলে নসীবে যে কি ছিল তা একমাত্র খোদাতাল্লাই জানেন।

কোনক্রমে শিকলটি ছিঁড়তে পারলে আর দেখতে হতো না। শিং দিয়ে গুঁতিয়েই সবার দফা রফা করে দিত। কিন্তু শেকলটি ছিঁড়তে না পেরে আশমান-জমিন কাঁপিয়ে তর্জন গর্জন শুরু করে দিল।

ভয়ঙ্কর সে-জন্তুটির আস্ফালন দেখে ভয়ে মুশার সঙ্গী সাথীদের গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

মুশা চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে সামাদ'কে জিজ্ঞাসা করলেন—'দৈত্যটির ব্যাপার কিছু আপনার জানা আছে?'

—'না। তবে তাকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত সে নিজেই বলতে পারে। ঠিক আছে। আমিই জিজ্ঞেস করছি।' দু' পা এগিয়ে গলা ছেড়ে বলতে লাগলেন—'আল্লাতাল্লা দুনিয়ার যাবতীয় দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আর তোমাকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাতাল্লা-র নামে তোমাকে আমার ক'টি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য বলছি। মেহেরবানি ক'রে জবাব দাও। তুমি কে? এখানে কেন ও কতদিন ধরে এরকম শাস্তি ভোগ করছ?'

সামাদ-এর প্রশ্নগুলি শুনেই দৈত্যটি কুত্তার মত চিল্লিয়ে উঠল। তারপর বিচিত্র এক স্বরে বলতে লাগল—'আমার নাম দাহিশ বিন আল-আমাশ। ইব্রিস-এর এক ইফ্রিত আমি। জিনের আব্বা। আর আমি এখানে কেন! অদৃশ্য এক শক্তি বলে আমাকে এখানে বেঁধে এ-হালৎ ক'রে দিয়েছে। আবহমান কাল ধরে আমাকে এরকম কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

কোন এক সময়ে সাগরের রাজা এ-মুলুকের শাসনকর্তা ছিলেন। লাল পাথরের তৈরি একটি মূর্তি তাম্র-নগরীর পাহারায় নিযুক্ত ছিল। তার দেখভালের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছিল। আমার বাসস্থলও তারই ভেতরে ছিল। আমার দৈববাণী শোনার বাসনা নিয়ে দুনিয়ার বহুৎ মুলুক থেকে আদমি এখানে জড়ো হ'ত।

সমুদ্রের রাজার এক সামন্তরাজ ছিলাম আমি। একবার ডেভিড-

এর লেড়কা সুলেমান-এর এক ফরমানের বিরুদ্ধে বহুৎ দিন জেহাদ ঘোষণা করেছিল। জিনদের সর্দার ছিলেন সমুদ্রের ওই রাজা। আদতে তিনি জিনদের সর্দার আদৌ ছিলেন না। একদিন তাদের মালিকের সঙ্গে সমুদ্রের রাজার যুদ্ধ বেঁধে যায়। রাজা আমাকে প্রধান সেনাপতি ক'রে যুদ্ধে পাঠান।

যুদ্ধটি কিন্তু অহেতুক বাঁধে নি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক কারণকে কেন্দ্র করেই উভয় পক্ষ যুদ্ধে সামিল হয়েছিল। আমি সংক্ষেপে সে-কারণটি তোমাদের কাছে পেশ করছি—

সমুদ্রের রাজার এক খুবসুরৎ লেড়কি ছিল। দুনিয়ার তামাম মুলুকে তার সুরতের খ্যাতির প্রচার হয়ে যায়। সুলেমানও তা শুনলেন। সুলেমান-এর হারেমে বহুৎ বিবি ছিল। ফিন আর একটি বিবির সংখ্যা বাড়াবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

সমুদ্রের রাজার খুবসুরৎ লেড়কিটিকে শাদী করার জন্য প্রস্তাব দিয়ে সুলেমান দূত পাঠালেন। শাদীর প্রস্তাব ছাড়াও তিনি দূতকে দিয়ে আরও দুটো প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি হ'ল লাল পাথরের মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলার জন্য অনুরোধ। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ এক এবং অভিন্ন। আর সুলেমানই হলেন আল্লাহ-র প্রেরিত একমাত্র ধর্মপ্রচারক। প্রস্তাব দুটো তাঁকে মেনে নিতে হবে।

সুলেমান-এর প্রস্তাব পাওয়ার পরই সমুদ্রের রাজা তাঁর উজির-নাজির ও অন্যান্য পারিষদদের তলব করলেন। আমাকেও সেখানে হাজির হতে হয়।

সমুদ্রের রাজা আমাদের উদ্দেশ্যে তাকালেন—'সুলেমান-এর চিঠিতে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তিনি প্রকারান্তরে আমাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। শাসিয়েছেন। তার প্রথম বক্তব্য তার সঙ্গে আমার লেড়কির শাদী দিতে হবে। আর দ্বিতীয় প্রস্তাব জিনদের সৈন্যাধ্যক্ষ দাহিশ বিন আল-আমাশ যে লাল পাথরের মূর্তির ভেতরে অবস্থান করে সেটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আপনাদের পরামর্শ চাচ্ছি, এ-প্রস্তাব কি আমি মেনে নেব?'

বৃদ্ধ উজির তাঁর মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে গিয়ে বল্লেন—'সুলেমানকে ডরাবার কিছুমাত্রও কারণ নেই।' এবার আমাকে দেখিয়ে বল্লেন—'আমাদের সৈন্যরা ওর মত সাহসী ও শক্তিশালী।'

আমি গর্জে উঠলাম—'জাঁহাপনা একটিবারমাত্র হুকুম দিন, আমি দূতটিকে আচ্ছা ক'রে ঘা কতক দিয়ে তার মুলুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এতে সুলেমান তাঁর চিঠির জবাব পেয়ে যাবেন।

রাজা এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। ব্যস, আর দেরী নয়। হতচ্ছাড়া দূত মশাইকে আচ্ছা ক'রে দাওয়াই দিয়ে দিলাম। দূত বেচারা মারধোর খেয়ে, অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে ল্যাংচাতে

ল্যাংচাতে তার প্রভু সুলেমান-এর কাছে ফিরে গেল।

সুলেমান দূতের মুখে আমাদের আপ্যায়নের বহরের বাৎ শুনে রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। সেনাধ্যক্ষকে তলব দিলেন। চারদিকে সাজসাজ রব পড়ে গেল। সৈন্যদের মধ্যে জ্যান্ত আদমি, জিন আর পশু-পাখিও ছিল বেশ কিছু সংখ্যক। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ তিনটি দলে সৈন্যরা ভাগ হয়ে গেল।

পশুরাও চারটি সারিতে ভাগ হয়ে গেল। মাথার ওপরে চক্কর মারতে লাগল পেল্লাই পেল্লাই সব পাখি। তারা শ্যেন দৃষ্টিতে আমাদের সৈন্যদের ওপর নজর রেখে চল্‌ল। কেউ কেউ গুপ্তচরের কাজে লিপ্ত রইল।

পাখিরাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তারা আচমকা তীরবেগে নেমে এসে আমাদের সৈন্যদের কামড়ে-আঁচড়ে নাস্তানাবুদ ক'রে দিতে লাগল। আরও আছে। বহু সৈন্যের চোখের মণি গেলে দিল। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

সুলেমান? তিনি ডানদিকে উজির আসাব বিন বারখিয়া'কে এবং বাঁ-দিকে ইফ্রিতদের অধিপতি দিমিব্যাত'কে নিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলা করতে চললেন। চারটি ইয়া বড় হাতি তাঁর সোনার রথটিকে বিকট আওয়াজ তুলে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল।

বিদ্রোহী জিনদের পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছিল। আমার হুকুম পেয়ে জিনরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে চল্‌ল। তারা আমাদের প্রতিপক্ষ জিনদের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে আক্রমণ চালাতে লাগল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' বিয়াল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পড়তে না পড়তেই বাদশাহ্ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে তখন আমার ইচ্ছা ছিল, নিজে হাতে সুলেমান'কে খতম করি।

আমি লম্ফ ঝম্ফ করতে করতে কাছাকাছি এগোতেই সুলেমান আগ্নেয় পর্বতের মত ইয়া বড় হাঁ ক'রে আগুনের গোলা ছুঁড়তে শুরু করে দিল।

আমি আচমকা সুলেমান-এর ওপর লাফিয়ে পড়ার ধান্দায় উর্ধ্বাকাশে উঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু আগুনের গোলাটি আমাকে সুড়সুড় করে নিচে নামিয়ে আনল। আগুনে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। আর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

এরকম পরিস্থিতিতে কতক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় তোমরাই বল? আমি তবু দমে যাই নি। কিন্তু আমাদের সৈন্যর চেয়ে সুলেমান-এর সৈন্য সংখ্যা এতই বেশী ছিল যে, পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর রইল না। অনন্যোপায় হয়ে আমি সৈন্যদের পিছু হঠার হুকুম দিলাম।

আমার হালৎও ইতিমধ্যেই কাহিল হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে পালিয়ে জান বাঁচাবার ফিকির খুঁজতে লাগলাম। না, হ'ল না। পালাতে পারলাম না। জ্যান্ত আদমি, জিন আর পশু-পাখি দিয়ে সুলেমান আমাকে পাকড়াও ক'রে ফেল্‌ল। অনেকে জান দিল, কেউ কেউ পশুর পায়ের তলায় পড়ে অসহায়ভাবে পিষ্ট হ'ল। সবচেয়ে আতঙ্কের কারণ হ'ল ইয়া বড় বড় পাখিরা। তারা আমাদের সৈন্যদের চোখ গেলে দিতে লাগল। এরকম সব সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই ক'রে কাঁহাতক টিঁকে থাকা সম্ভব, বল?

আমি প্রায় তিন মাহিনা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালাম। কিন্তু আর শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। ধরা দিতেই হ'ল, এ কালো পাহাড়টির গায়ে বেঁধে রেখে আমাকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করল।

আর আমার সৈন্যদের? তাদের ধোঁয়ায় রূপান্তরিত ক'রে ইয়া পেল্লাই সব জালায় বন্দী ক'রে রাখল।

ধোঁয়া ভর্তি জালাগুলোকে সুলেমান-এর নির্দেশে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হ'ল। সেগুলো ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় তাম্র নগরীর প্রাচীরের গায়ে এসে আটকা পড়ে যায়। সেই থেকে সেগুলো সেখানেই সাগরের তলায় ডুবে রইল।

আমাদের যুদ্ধ-বন্দী অন্য সৈন্যদের কি যে হালৎ হয়েছে তা আমার জানা নেই। কারণ, আমি তো নসীবের ফেরে এখানে এরকম চরম দুর্গতির মধ্যে দিন গুজরান ক'রে চলেছি।

তোমরা যদি তাম্র নগরীতে প্রবেশ কর তবে কারো না কারো
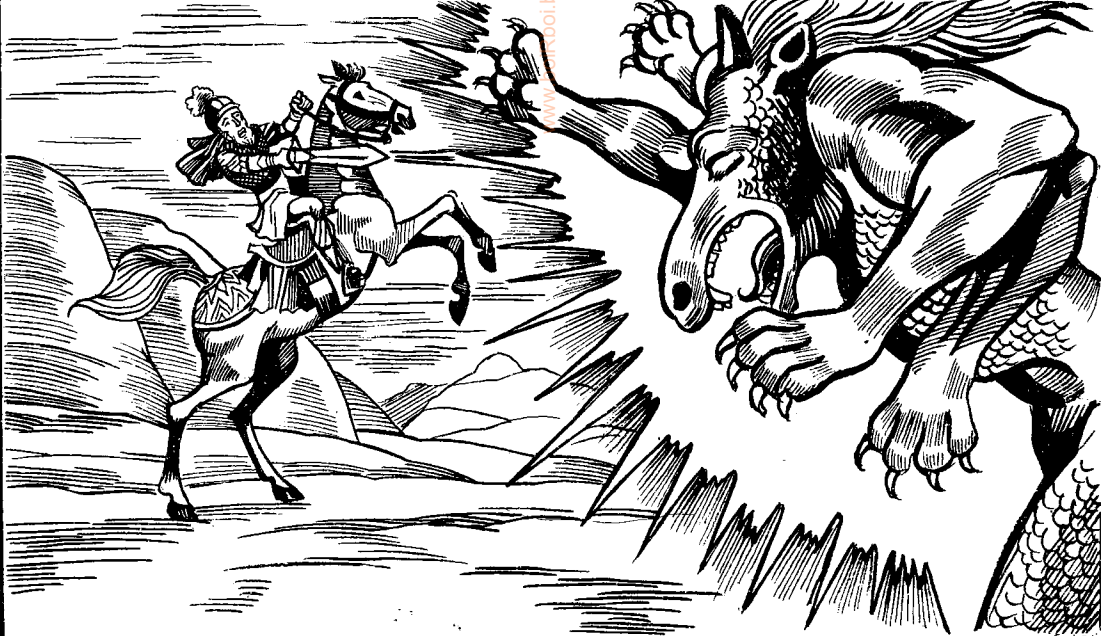
সঙ্গে মোলাকাৎ হবেই। তবে তারা নির্ঘাৎ আমার মতই বন্দী-জীবন যাপন করছে আর অনবরত চোখের পানি ঝরিয়ে চলেছে।'

কিস্‌সা শেষ ক'রে ভয়ঙ্কর সে-দৈত্যটি আচমকা গা-ঝাড়া দিয়ে এমন বিকট স্বর ক'রে চিল্লিয়ে উঠল যে, পাহাড় সমেত পুরো অঞ্চলটি যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

দৈত্যটির মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে মুশা-র বোধ হয় দিল্‌টি একটু-আধটু নরমও হয়েছিল। কিন্তু আচমকা এরকম বর্বরের মত আচরণ করায় তার দয়া-মায়া নিঃশেষে উবে গেল।

মুশা তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে তাম্র-নগরীর উদ্দেশে পা-বাড়ালেন।

এক সময় তাম্র নগরী চোখের সামনে ফুটে উঠল। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অন্ধকারের বুকে সব কিছু বিলকুল চাপা পড়ে গেল।

মুশা সহযাত্রীদের সঙ্গে শলা পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন ভোরের আলো ফুটে উঠলে তবেই তাম্র নগরীর প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করবেন।

সবাই পথশ্রমে ক্লান্ত। শরীর টলছে। পথের ধারেই সবাই সারিবদ্ধভাবে শুয়ে পড়ল। ব্যস, কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই একদম বিভোর হয়ে নিদ যেতে লাগল।

পূর্ব-আকাশের গায়ে রক্তিম ছোপ দেখা দিতেই মুশা সবাইকে ডাকাডাকি ক'রে তুলে দিলেন।

শুরু হ'ল ফিন হাঁটা। কিছু পথ যেতেই তাঁরা তাম্র-নগরীর প্রবেশ দ্বারের খোঁজ করতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। কোথায় প্রবেশ-দ্বার? সব যে ভোঁ-ভাঁ! দ্বার তো দূরের কথা এমন কোন ফাঁক ফোকরও চোখে পড়ল না যেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে কোনরকমে ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন। তাজ্জব বনে গেলেন। এতবড় একটি নগরী। অথচ কোন প্রাণীর চিহ্নও ধারে-কাছে কোথাও দেখতে পেলেন না। জীবন্ত প্রাণী ভেতরে থাকলে একটু-আধটু শব্দটব্দ হ'ত—তা-ও শোনা গেল না।

মুশা এত সহজে দমবার পাত্র নন। দলবল নিয়ে সারাদিন প্রাচীরের চারদিকে দিয়ে হাঁটা হাঁটি করলেন। বৃথা চেষ্টা।

বিকাল হ'ল। সূর্য পশ্চিম-আকাশের গায়ে একটু একটু ক'রে আত্মগোপন করতে লাগল। শুরু হ'ল আলো-আঁধারীর খেল্‌। ক্রমে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। একটু বাদেই জমাটবাঁধা আন্ধার নেমে এল প্রকৃতির বুকে।

তাঁবু খাটানো হ'ল। তারপর সবাই বিভোর হয়ে নিদ্‌ যেতে লাগল। একমাত্র মুশা জেগে রইলেন।

মুশা তাঁবুর সামনে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন, এ পরিস্থিতিতে কি করা কর্তব্য। অসুবিধা যতই হোক না কেন ভেতরে ঢোকার ফিকির কিছু না কিছু তো বের করতেই হবে।

সকাল হওয়ার অনেক আগেই মুশা তালিব বিন আর সামাদ'কে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য পা-বাড়ালেন। সৈন্যদের ওপর তাঁবু ও সামানপত্রের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন।

কিস্‌সাটির এ-পর্যন্ত বলা হতে না হতেই প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের কিচির মিচির শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' তেতাল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, তাঁবু থেকে বেরিয়ে মুশা তাঁর সহযাত্রী দু' জনকে নিয়ে নসীব সম্বল করে পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন।

চারিদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে পাহাড়টি মৌউতের মত নিশ্চল-নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ায় অনেকখানি জায়গা ধীরে ধীরে দৃশ্য হয়ে উঠল।

চাঁদের আলোয় তাম্রনগরীর অনেকখানি অংশও আলোকিত হয়ে উঠেছে। মুশা ও তাঁর সঙ্গীরা নগরীর ভেতরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কি দেখতে পেলেন তারা? এক স্বপ্নময় জগৎ যেন তাদের চোখের সামনে আচমকা এসে হাজির হ'ল।

চাঁদের আলোয় তাঁরা নগরের অভ্যন্তরের বড় বড় মকান দেখতে পেল। সুবৃহৎ ইমারত বল্‌লেও এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। আর তাদের গম্বুজগুলোও কম মনলোভা ব'লে মনে হ'ল না। কী সুন্দর যে তাদের গঠনভঙ্গী তা ভাষায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। নগরের কেন্দ্রস্থল দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে একটি খাল। তার দু' ধারে ছোট-বড় পাকা মকান আর গাছ।

নগরটিকে ঘিরে রেখেছে যে তামার উঁচু ও মজবুত প্রাচীর তা সাগর পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

নগরীর এক পাশে বিস্তীর্ণ গোরস্থান। রাত্রির নিস্তব্ধতা আর চাঁদের হাল্কা আলোয় সেটিকে মৃতের স্তূপের মতই মালুম হচ্ছে। আদমি বা জানোয়ারের চিহ্নও নেই। এমন কি কোন রাতজাগা পাখিও ধারে-কাছে কোথাও আছে বলে মুশা-র মালুম হ'ল না।

ইয়া পেল্লাই সব ইমারত, পাকা মকান, খাল, প্রাচীর, সমুদ্র আর গোরস্তান—কোথাও কোন আদমির চিহ্নও মুশা বা তাঁর সহযাত্রীদের নজরে পড়ল না। এমন কি পেঁচা, বাঁদুর বা অন্য কোন কিসিমের রাতজাগা পাখিও এর মৃত্যুপুরী তাম্র নগরীতে বেঁচে আছে বলে মুশা-র মালুম হ'ল না।

অভিশপ্ত তাম্র নগরীর অন্তহীন নীরবতার কথা ভাবতে ভাবতে

মুশা তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলেন।

প্রাচীরের গায়ে এসেই মুশা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যেই ভোরের আলো একটু একটু ক'রে ফুটতে শুরু করেছে। তিনি দেখলেন, প্রাচীরের গায়ে একটি কবিতা উৎকীর্ণ রয়েছে। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিমেলে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পেলেন, একটি নয় চার চারটি কবিতা প্রাচীরের গায়ে চিত্রের মত উৎকীর্ণ করে রাখা হয়েছে।

মুশা সামাদ-এর দিকে ঘাড়-ঘুরিয়ে তাকাতে না তাকাতেই তিনি এক এক ক'রে কবিতা পাঠ করতে লাগলেন।

সামাদ প্রথম কবিতাটি পাঠ ক'রে সেটি তর্জমা ক'রে বুঝাতে গিয়ে বল্লেন—ওহে, তোমরা কেবল ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ ক'রে অস্থির হচ্ছ। কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু আর শূন্যতার হাহাকার তোমাদের বিলকুল সঞ্চয়কে বরবাদ ক'রে দিচ্ছে। মালুম আছে কি? সবার ওপরে এক মালিক বসে রয়েছেন। তিনিই সেনা বাহিনীকে টিঁকিয়ে রেখেছেন। বাদশাহের জন্য ছোট্ট একটি অন্ধকার কুঠুরী নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন।

—'উফ্! ইয়া আল্লাহ!' মুশা, বুকের বেদনা, কলিজার জ্বালা চেপে রাখতে পারলেন না। কী নির্মম-নিষ্ঠুর! আত্মা অবিনশ্বর! আল্লাতাল্লা-র চোখে দুনিয়ার সবকিছুই সমান। আত্মাকে তো নিদের ঘোরে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আজ বা কাল—যেদিনই হোক তার ঘুম ভাঙবেই—জাগবেই।'

সামাদ বিশ্বাস কব, কবিতাটির প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ আমার বুকের ভেতরে গাঁথা হয়ে গেল!

সামাদ এবার দ্বিতীয় কবিতাটি পাঠ ক'রে তার বিষয়বস্তু মুশা'কে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বল্লেন—'ওহে, তোমরা হাত দিয়ে চোখ দুটোকে চাপা দাও কেন? তুমি এ-পথে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কেন খেলা কর? তোমাকে তো এমনই আর একটি ঠিকানায় পৌঁছে দেবে। সে বাদশারা আজ কোথায় গেল? জোয়ান মরদগুলিই বা আজ কোথায়? আজ ইরাকের হুজুর আর ইস্পাহানের সম্রাটই বা কোথায় গেল?'

সামাদ এ-কবিতাটি তর্জমা ক'রে বুঝিয়ে দিলে মুশা আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন—'শোভন আল্লাহ! বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!'

সামাদ এবার তৃতীয় কবিতাটির ওপর চোখ বুলাতে লাগলেন। পড়া শেষ হলে এটিকেও তিনি তর্জমা ক'রে মুশা'কে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বল্লেন—'ওহে, আন্ধার পথে এক অপরিচিত আদমিকে তুমি দেখছ, তাকে তুমি ডাকলে, সে মোটেই দাঁড়াল না। তোমার জিন্দেগীও ঠিক একই রকম। সে এখন ভারত ও চীনের সম্রাটের সঙ্গে ভেট করার জন্য ছুটে চলেছে। নুবিয়া ও সিন্হার সম্রাটের সঙ্গে তার ভেট করা খুবই জরুরী। তারা তো তোমার মতই কোন দম্কা বাতাসে পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ছে।'

সামাদ কবিতাটির তর্জমা শেষ করতে না করতেই মুশা বিকট স্বরে চিল্লিয়ে উঠলেন—'কোথায়? কোথায় গেলেন সিনহা আর নুবিয়ার সম্রাট? বিলকুল খতম। বিলকুল খতম হয়ে গেছে। প্রবল ঝড়ের বেগে নিচে গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

সামাদ এবার চতুর্থ বা শেষ কবিতাটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কৌতূহলী চোখের মণি দুটোকে কবিতার ছত্রগুলির ওপর সোৎসাহে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর কবিতাটিকে তর্জমা করে দিতে গিয়ে বল্লেন—'ওহে, মোউৎ তোমার কাঁধের ওপর চেপে বসেছে। তোমার সরাবের পেয়ালা আর তোমার মেহবুবার স্তনদ্বয়ের দিকে ততোধিক উৎসাহের সঙ্গে তাকিয়ে রয়েছে। তুমি দুনিয়ার চালাক-চতুরদের ফেলা জালে আটক হয়েছ। আর মাকড়সারূপী শূন্যতা তোমার পিছনে ওৎপেতে রয়েছে। যাদের আকাঙক্ষা পাহাড়ের চূড়ার মত উঁচু ছিল আজ তারা কোথায়? যারা একদিন প্যাঁচার মত গোরস্তানের বাসিন্দা ছিল আজ তারা ইমারতে সুখী জীবন যাপন করছে।'

সামাদ কবিতাটি তর্জমা ক'রে মুশা'কে বুঝিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যেই মুশার কলিজা গলে পানি হয়ে চোখ দুটোর কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। চোখের পানি মুছতে মুছতে তিনি আপন মনে বলতে লাগলেন—'ওগো, জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা, আজ না হোক কাল যখন জান নেবেই তবে আর ঝুটমুট আদমির জন্ম দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালে কেন? আমাদের আদৎ ঠিকানা তো একমাত্র আল্লাতাল্লাই জানেন। এ প্রশ্নের জবাব একমাত্র তাঁরই জানা আছে। আমাদের একমাত্র কাজ কেবল তাঁর হুকুম তামিল করা আর তার

নামগান করা।'

মুশা এবার সঙ্গীদের নিয়ে ব্যথিত-মর্মাহত দিল্ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই সৈন্যদের দুটো বহুৎ লম্বা মই বানাতে হুকুম দিলেন। তাদের বল্‌লেন—'মই বানিয়ে আমরা তামার প্রাচীরে উঠব। আর দ্বিতীয় মইটি প্রাচীরের ভেতরে নামিয়ে দিয়ে নগরে নেমে যাব।

মুশা-র নির্দেশে সৈন্যরা মই তৈরির তোড়জোর শুরু ক'রে দিল। জঙ্গল থেকে গাছের ডাল কেটে নিয়ে এল। সেগুলোকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে পাঁজা করল। কাপড় লম্বালম্বা ক'রে ফালা করল। এবার কাপড়ের ফালা আর কোমর বন্ধনী এক সঙ্গে ক'রে পাকিয়ে ইয়া লম্বা লম্বা দড়ি তৈরি ক'রে ফেল্‌ল। উটের কিছু লাগামও এ কাজে ব্যবহার করল। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মুশা-র আদিষ্ট দুটো মই। সদ্য তৈরি মই দুটো নিয়ে যাওয়া হ'ল তামার প্রাচীরের কাছে। বহুৎ কসরৎ করে প্রাচীরের গায়ে একটি মই ঝুলিয়ে দেয়া হ'ল। জবরদস্ত বন্দোবস্ত। আল্লাহ-র নাম নিয়ে মুশা সবার আগে দড়ির মই বেয়ে তামার প্রাচীরের ওপর উঠে গেলেন। তারপর সামাদ ও অন্যান্যরা এক এক ক'রে মই বেয়ে উঠে প্রাচীরের ওপর গিয়ে বসল।

কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' চুয়াল্লিশতম রজনী

পরের রাত্রে বাদশাহ্ শারিয়ার যথা সময়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, তাম্র নগরীর প্রাচীরে ওঠার আগে মুশা কয়েকজন সৈন্যকে তাঁবু ও অন্যান্য সামানপত্র দেখভাল করার জন্য তাঁবুতে রেখে গিয়েছিলেন।

মুশা সহযাত্রীদের নিয়ে প্রাচীরের ওপর দিয়ে হেঁটে দুটো বুরুজের কাছে গিয়ে থামলেন। দুটো তামার দরওয়াজা দিয়ে বুরুজ দুটোকে আটকে দেয়া হয়েছে।

দরওয়াজার পাল্লার ওপরে একটি মূর্তি—অশ্বারোহীর মূর্তি। নিরস্ত্র অশ্বারোহী।

মূর্তিটির বেদীর গায়ে রোমান হরফে খোদাই করা রয়েছে দুটিমাত্র ছত্র। সামাদ ছত্র দু'টি পড়ে মুশাকে তর্জমা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন—'আমার নাভির গায়ে একটি পেরেক আছে, দেখ। তার মাথায় আলতো ক'রে বারো বার চাপ দাও।'

মুশা ব্যস্ত-পায়ে মূর্তিটির কাছে এগিয়ে গিয়ে পর পর বারো বার পেরেকটির মাথায় চাপ দিলেন। ব্যস, ঠিক যেন ভোজবাজির

খেল্। চোখের পলকে দরজার পাল্লা দুটো দু' ধারে সরে গিয়ে ফাঁক হয়ে গেল।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকাতেই মুশার চোখের সামনে লাল গ্রানাইট পাথরের একটি সিঁড়ি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সিঁড়িটি সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে।

মুশা সদলবলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে সুবিশাল একটি কামরায় হাজির হলেন। কামরাটির দরওয়াজার সামনে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী দেখে তাদের মালুম হ'ল বুঝি পাহারা দিচ্ছে। আর অস্ত্র? তাদের একহাতে চকচকে তরবারি আর অন্য হাতে একটি ক'রে ধনুক।

মুশা এগিয়ে গিয়ে প্রহরীদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'আমরা তোমাদের মালিকের সঙ্গে বাৎচিৎ করতে চাই। আশা করি তোমরা আমাদের পথরোধ করবে না।

তাজ্জব ব্যাপার! তার কথার জবাব দেয়া তো দূরের কথা প্রহরীরা সামান্য নড়াচড়াও করল না। এমনকি চোখের মণি পর্যন্ত অচঞ্চল রয়ে গেল।

মুশা ভাবলেন—'ব্যাপার কি? এরা কি তবে আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ? তাই আমার বক্তব্য বুঝতে না পেরে নিশ্চল নিথর ভাবেই নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

মুশা মুখে হতাশার ছাপ এঁকে সামাদ'কে বল্‌লেন—'আমি হেরে গেছি। এবার আপনি কোশিস ক'রে দেখুন যদি কোন হিল্লা করতে পারেন। দুনিয়ার যত ভাষা আপনার রপ্ত রয়েছে এক এক ক'রে সব ক'টি ভাষা ব্যবহার করে দেখুন। যদি এদের মুখ থেকে বুলি ফোটাতে পারেন।'

সামাদ প্রথমে গ্রীক ভাষায়, তারপর ক্রমান্বয়ে হিব্রু, হিন্দু, ইথিওপিয়ান, সুদানিজ এবং সব শেষে পারশিয়ান ভাষায় তাদের

সঙ্গে বাৎচিৎ করার কোশিস করলেন। ব্যর্থ প্রয়াস। কেউ-ই মুখ খুল্‌ল না।

মুশা-র নির্দেশে সামাদ এবার দুনিয়ায় যত কায়দায় অভিবাদন প্রচলিত রয়েছে এক এক ক'রে সব ক'টি মৌনী প্রহরীদের সামনে প্রয়োগ করলেন। উদ্দেশ্য তাদের পছন্দ মাফিক কোন অভিবাদন করা হলে তখন তার অবশ্যই পাল্টা অভিবাদন ক'রে সৌজন্যবোধের পরিচয় দেবে। কিন্তু এতেও কোনই ফয়দা হ'ল না।

ফালতু নষ্ট করার মত সময় তাদের নেই। তাই প্রহরীদের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মুশা তাঁর দলবল নিয়ে ফিন হাঁটা জুড়লেন। তিনি কয়েক পা এগিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, প্রহরীরা নির্বিকার। এমন কি তাদের চোখ-মুখেরও কোন পরিবর্তন হয় নি।

পথ পাড়ি দিতে দিতে সামাদ বল্‌লেন—'দেখুন, জিন্দেগীতে আমি বহুৎ মুলুকে চুঁড়ে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোথাও এমন তাজ্জব ব্যাপারের মুখোমুখি আমি হইনি, বিশ্বাস করুন। আমাদের এতগুলো আদমিকে একেবারে বেকুব বানিয়ে দিল! আল্লাহ ভরসা।'

কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি ক'রে মুশা ও তার সহযাত্রীরা বাজারে হাজির হলেন। দোকান সব হাঁ ক'রে খোলা। সামানপত্রও সাজানো রয়েছে দোকানে দোকানে। সওদা করার জন্য খরিদ্দারও রাস্তায় বহুৎ। কিন্তু এখানেও ওই তাজ্জব ব্যাপার। সবাই নির্বাক। নিশ্চল-নিথরভাবে দোকানে ও পথের এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে।

মুশা-র কাছে ব্যাপারটি এমন মালুম হ'ল যে, তাদের পরদেশী ভেবে স্থানীয় লোকগুলো থমকে গেছে। তারা চলে গেলেই ফিন স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, হাঁটা চলা করবে। কেনাকাটাও শুরু করবে। অথবা তাদের আকস্মিক অনধিকার আগমনের বিরুদ্ধে মৌনব্রতের মাধ্যমে তাম্র নগরীর আদমিরা এভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ধ্যুৎ ছাই—মুশা আর ভাবতে পারছেন না। তাঁর মাথা ঝিম ঝিম করছে।

মুশা ফিন পথে নামলেন। তাঁর সহযাত্রীরা তাঁকে অনুসরণ ক'রে চল্‌লেন। পথের দু' ধারে মকানগুলির দশাও একইরকম। উভয় দিকে সারিবদ্ধভাবে ছোট বড় মকান আর ইমারতগুলো দাঁড়িয়ে। কতগুলো তো মনমৌজী কারুকার্যমণ্ডিত। চোখ ফেরানোই দায়। পথেও আদমির মেলা। কেউ যাচ্ছে, কেউ বা বিপরীত দিক থেকে ফিরছে এরকম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটি এমন যে কেউ যেন যাদুমন্ত্রবলে তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এমন কি বাক্‌শক্তিও কেড়ে নিয়েছে।

মুশা যে তার দলবল নিয়ে পথ চলেছেন তাতে যেন পথচারীদের কিছুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই। আহ্বানও নেই, বিসর্জনও নেই। তাদের আগমনে কেউ খুশী নয়, বিরাগভাজনও নয়। পথের দু' ধারে দোকানীরা নিজ নিজ পসরা সাজিয়ে বসে। সবই আছে। কিন্তু কারো কোনরকম চাঞ্চল্য নেই, একের সঙ্গে অন্যের বাক্যালাপও বন্ধ।

বাজারের শেষ প্রান্তে এক জায়গায় এসে মুশা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার সামনে অতিকায় একটি তামার চাদর। তার গায়ে সূর্যের কিরণ পড়ে ঝিকমিক করছে পুরো বাজারের চত্বরটি। তারই অদূরে একটি বিশালায়তন ইমারৎ। শ্বেতপাথরে মোড়া। ইমারতটির দু' ধারে দুটো অতিকায় কেল্লা সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। তামা দিয়ে তৈরি। তার উচ্চতা এত বেশী যে, তার শীর্ষদেশ দেখতে গেলে কাঁধে মাথা ঠেকে যায়। কেল্লাটির গায়ে পাখাওয়ালা বিচিত্রসব পশুর ছবি উৎকীর্ণ করা। ইমারৎটির সদর-দরওয়াজায় সশস্ত্র প্রহরী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। কালো হাতে বিচিত্র ঢঙের তরবারি, কালো ইয়া লম্বা হাতলযুক্ত বর্শা।

মুশা কৌতূহলের শিকার হয়ে আল্লাতাল্লা-র নাম নিয়ে তার দল বল নিয়ে ইমারতটির সদর-দরওয়াজা দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ভেতরে ঢুকেই তারা বিশাল একটি চাতাল দেখতে পেলেন। তার কেন্দ্রস্থলে বহুবর্ণ পাথর দিয়ে তৈরী একটি চত্বর দেখলেন। চাতালটিকে একটি দুর্গের অংশ বিশেষ বলেই মালুম হ'ল। তার দেয়ালের গায়ে হরেক কিসিমের অস্ত্রপাতি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

চাতালটির ওপর অসংখ্য আদমি বসে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখছে। সবার চোখেই আগ্রহ। কিন্তু চোখের মণি নিশ্চল।

তাজ্জব ব্যাপার। মুশার সঙ্গী সশস্ত্র সৈন্যদের দেখে কুচকাওয়াজরত সৈন্যদের মধ্যে সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও লক্ষিত হ'ল না। কেউ তাদের পথরোধ করল না। এমন কি কেউ ডেকে জিজ্ঞেসও করল না—'তোমরা কারা। পরদেশী। কোন্ মুলুকে তোমাদের ঘর?'

মুশা তাজ্জব বনে গেলেন। কি বল্‌বেন, কি করবেন সহসা কিছুই ভেবে উঠতে পারলেন না।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' পঁয়তাল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম বাদশাহকে যথোচিত সম্ভাষণ সেরে কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সুবিস্তীর্ণ চাতালটির গায়ে রোমান হরফে একটি কবিতা উৎকীর্ণ করা রয়েছে।

মুশা কবিতাটির দিকে সামাদ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সামাদ সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—শোভন আল্লাহ! এ-মুলুকে যে

দেখছি কবিতার ছড়াছড়ি!

সামাদ এগিয়ে গিয়ে রোমান হরফে লেখা পাঠোদ্ধার করলেন। মুশাও অন্যান্যদের কাছে তার বিষয়বস্তু বল্লেন—'ওহে, শীঘ্র পিছন ফিরে দাঁড়াও। দেখতে পাবে, তোমার মোউৎ তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে। নিমরড, আদম আর পারস্যের সুলতান তাকে দেখতে পেয়েছিল। আর? আর দেখেছিল বিশ্বজয়ী বীর আলেকজান্দার। তাছাড়া কারুম, সাদাত এবং হামাম-ও তাকে দেখেছিল। তাদের ওপর কঠোর নির্দেশ হয়েছিল দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। আর তাদের কাছে একটি প্রশ্নও করা হয়েছিল যা এ-দুনিয়ার কেউ-ই তাদের করতে পারে নি। ওহে, তোমরা শোন, আদমিদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারে একমাত্র মৃত্যুভয়। জিন্দেগীভর যা কিছু আচ্ছা কাম কাজ তুমি করবে এ-রক্তাক্ত জিন্দেগীতে তা-ই ফুল হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।'

মুশা জেব থেকে এক চিলতে পাতলা চামড়া বের ক'রে কবিতাটির আদ্যোপান্ত লিখে রাখলেন।

মুশা এবার তাঁর দলবল নিয়ে চাতালটির পাশ দিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে একটি সুবিশাল কামরায় ঢুকে গেলেন। কামরাটির ভেতরের একটি ফোয়ারা দিয়ে ডাবের পানির মত স্বচ্ছ পানি হরদম বেরিয়ে আসছে। কামরার মেঝেতে আঁকাবাঁকা চারটি নালা দিয়ে ফোয়ারার পানি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা চারটির তল আলাদা আলাদা রঙ বিশিষ্ট। একটি পোখরাজের, একটি রক্তাভ পাথরের, একটি নীলকান্ত মণি আর সর্বশেষটি পান্নার মত সবুজ পাথর দিয়ে তৈরি। ফলে পানির রঙেও বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আর তাদের ছায়া পড়েছে শ্বেত পাথরের দেয়ালের গায়ে। সাগরের বুকে বিকালের বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভা পড়লে সাগরের পানি যেমন মনলোভা রঙ ধারণ করে কামরাটির দেয়ালগুলি৺ যেন একই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কামরাটির ভেতরে দাঁড়িয়ে মুশা ও তাঁর সহযাত্রীদের মালুম হতে লাগল তারা যেন বেহেস্তে পৌঁছে গেছে।

দ্বিতীয় দরওয়াজা দিয়ে ঢুকেই মুশা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লাহ! এখানে যে তামাম দুনিয়ার ধন দৌলত জড়ো করা হয়েছে।' বাস্তবিকই চোখ ট্যাড়া হয়ে যাবার মত ব্যাপারই বটে। সে-কামরায় রাখা আছে সাবেক আমলের সোনা-রূপার মুদ্রা। আর ঢাই করা রয়েছে মণি-মুক্তো, হীরা-জহরৎ। তাজ্জব ব্যাপার! এমন দামী দামী পাথর ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, ভাবতেও উৎসাহ পাওয়া যায় না।

কামরাটির ভেতরের একটি দরওয়াজা দিয়ে পাশের আর একটি কামরায় গিয়ে তারা দাঁড়ালেন। এখানে যেন পোশাক আশাকের দোকান সাজানো হয়েছে। লেড়কা-লেড়কিদের পোশাক থেকে শুরু করে বয়স্কদের হরেক কিসিমের বহুমূল্য পোশাকের বিচিত্র সমাবেশ। পোশাক ছাড়া সোনা-রূপার তৈরি বাসন কোসনও কামরার মেঝেতে পাহাড় ক'রে রাখা হয়েছে।

মুশা চতুর্থ কামরাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন—এ যে দেখছি, বেহেস্তের ধন দৌলত এখানে, কামরাগুলিতে জড়ো করা হয়েছে। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লালসায় দিল্ রীতিমত চনমনিয়ে ওঠে।

মুশা-র হঠাৎ খেয়াল হ'ল, আর নয়, এবার ফেরা দরকার। তাঁবু ছেড়ে অনেকক্ষণ বাইরে কাটিয়েছেন।

মুশা ও তাঁর সহযাত্রীরা পিছন ফিরলেন, যে-পথে তাম্র নগরীতে প্রবেশ করেছেন সে-পথেই ফিরতে হবে।

কয়েক পা এগোতেই মুশা ফিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রথম কামরাটিতে ফিরে আসার পরই দেখলেন, সোনার জরির কাজ করা বহুমূল্য সিল্কের পর্দা দিয়ে একটি দেয়াল সতর্কতার সঙ্গে ঢেকে দেয়া হয়েছে। কৌতূহলের শিকার হয়ে পর্দাটি উঁচু করতেই একটি দরওয়াজা নজরে পড়ল। ইয়া পেল্লাই একটি রুপোর তালা দরওয়াজাটির গায়ে ঝুলছে।

মুশা এবং সামাদ—উভয়েই কঠোর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তালাটি খোলা দরকার। কিন্তু কি ক'রে সম্ভব? চাবি? চাবি কোথায়? সামাদ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। না, কোন ফিকিরই করতে পারলেন না। তালাটা নাড়ানাড়ি ক'রে তিনি তার গায়ে ছোট্ট একটি স্প্রিং দেখতে পেলেন। কৌতূহল হ'ল। সেটার গায়ে চাপ দিলেন। ব্যস, ছোট্ট একটি শব্দ করে তালাটি গেল খুলে।

তালাটি খুলতেই সবাই হুড়মুড় ক'রে ভেতরে ঢুকে গেলেন। সামনেই একটি মার্বেল পাথরের গম্বুজ দেখা গেল। তার গায়ে বহু রং বিশিষ্ট পাথর বসানো রয়েছে। বাইরের আলো তাদের গায়ে পড়ায় পুরো গম্বুজটি ঝলমল করছে। ঠিক যেন বেহেস্তের সুরৎ।

কামরার মেঝেতে সোনার জরির কাজ করা কার্পেট বিছানো। তার ওপরের ঠোটে দুটো রুবি বসানো। একটি দর্শন পাখি। তার পাখার পালকগুলো পান্নার তৈরি।

কামরাটির কেন্দ্রস্থলে সুদৃশ্য একটি বেদী। বেশ উঁচু। মুশা কয়েকজনকে নিয়ে তার ওপরে উঠে দাঁড়ালেন। মণি মুক্তোর কাজ করা এক চাঁদোয়ার তলায় একটি লেড়কি শুয়ে। পদ্মের পাপড়ির মত তার চোখ দুটো বোজা। নিদ যাচ্ছে। তার মাথায় মণি-মুক্তো, হীরা-জহরৎ বসানো সুন্দর একটি মুকুট শোভা পাচ্ছে। মুক্তোর হারটি একেবারে তার কণ্ঠলগ্ন। খুবসুরৎ লেড়কিটির শিয়রে দুটো ক্রীতদাসী অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসে। তাদের এক জনের হাতে চকচকে বর্শা আর দ্বিতীয় জনের হাতে একটি সুমসৃণ কৃপাণ।

লেড়কিটির পায়ের কাছে একটি শ্বেতপাথরের ফলক। তার গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে—তদমুর আমার নাম। আমি তামালকাইৎসের রাজকন্যা। এ-নগর আমার। এখানে যত ধন দৌলত রয়েছে সব তোমরা ইচ্ছা মত নিয়ে যেতে পার। যে এখানে আসবে বিলকুল ধন দৌলত তারই প্রাপ্য। কিন্তু খবরদার। আমার সুরতে মজে গিয়ে ভুলেও যেন আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমাকে স্পর্শ করলে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে, ইয়াদ রেখো।

নিদে অভিভূতা লেড়কিটিকে এক পলক দেখেই মুশা-র মধ্যে কেমন যেন এক অবর্ণনীয় ভাবান্তর ভর করেছিল। কিন্তু সাবধান বাণীটি পড়ামাত্র তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

মুশা এবার সামাদ-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। বল্‌লেন—'এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে। দুনিয়ার যা কিছু বিস্ময়কর বস্তু সবই তো এক এক ক'রে চাক্ষুষ করলাম। এ-দৃশ্য জিন্দেগীতে ভুলবার নয়।'

এবার আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য সমুদ্রের ধারে গিয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জালাগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে।

মুশা এবার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'তোমরা খুশী মাফিক ধন দৌলত দিয়ে কোর্তার জেব ভরে নিতে পার। কিন্তু খুবসুরৎ ওই লেড়কিটিকে ভুলেও যেন কেউ স্পর্শ কোরো না।'

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' ছেচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহ্‌রাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, মুশা সবাইকে লেড়কিটির ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন।

মুশা-র বাৎ শুনে তালিব বিন-সাল এবার মুখ খুললেন—'হুজুর, এ-খুবসুরৎ লেড়কিটিকে দামাস্কাসে নিয়ে গিয়ে খলিফাকে ভেট দিতে না পারলে আমার কলিজা ঠাণ্ডা হবে না। আমার দিল্ বলছে ইফ্রিরে জালার বদলে এ-লেড়কিটিকে নিয়ে গিয়ে খলিফাকে ভেট দিতে পারলে তিনি হাজার গুণ খুশী হবেন। আর আপনি বলছেন কিনা—'

—'না! লেড়কিটিকে কিছুতেই স্পর্শ করা যাবে না। ভুলেও যেন সে-কোশিস কোরো না।'

—'হুজুর, স্পর্শ করলে রাজকন্যা বরং খুশীই হবেন। এটুকুর জন্য তাঁর আবার মনে করার কি আছে, মালুম হচ্ছে না তো।'

কথা বলতে বলতে তালিব এক ঝটকায় রাজকন্যাকে কোলে তুলে নিলেন। ব্যাস, মুহূর্তে এক কৃতদাসীর কৃপাণের আঘাতে তাঁর মুণ্ডুটি মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। ধড় থেকে ফিন্‌কি

দিয়ে খুন বেরিয়ে এল।

কারবারটি এত দ্রুত ঘটে গেল যে, কেউ কিছু মালুমই করতে পারল না। মুশা-র মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লাহ্! খুন!' ব্যস এক লাফে তিনি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সামাদ ও অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করলেন।

মুশা সহযাত্রীদের নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে সমুদ্রের ধারে ক্রমে থামলেন। কয়েকটি জেলেকে জাল নিয়ে কসরৎ করতে দেখলেন।

তামাম তাম্র নগরী ঢুঁড়ে এখানে এসে মুশা যেন এবার স্বস্তি পেলেন। এরা—হ্যাঁ, এরাই প্রথম কথা বল্‌ল।

মুশা জেলেদের বুড়ো সর্দারকে তলব করলেন। নেংটি পরা বুড়োটি এগিয়ে এসে তাকে সালাম জানাল।

মুশা বল্‌লেন—'শোন, আমাদের খলিফা আব্দ-অল-মালিক-এর হুকুম তামিল করতে আমাকে তোমাদের মুলুকে ছুটে আসতে হয়েছে। ধর্মপ্রচারক সুলেমান-এর আমলে কয়েকটি আফ্রিদি দৈত্যকে তামার জালার মধ্যে পুরে সাগরের পানিতে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল। সেগুলোকে উদ্ধার করতে আমরা হন্যে হয়ে ছুটে এসেছি। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সাহায্যপ্রার্থী।' মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে তিনি এবার বল্‌লেন—'আর এক বাৎ, আমরা এখানে এসে তাজ্জব বনে গেছি। তামাম তাম্র নগরীর আদমিরা মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে, কেউ টু-শব্দটিও করছে না। ব্যাপার কি বল তো?'

—'হুজুর, সাগর পাড়ের জেলেরা আল্লাতাল্লার নির্দেশেই এখানে রয়েছে। আর আল্লাহ-র ধর্মপ্রচারকদের হুকুমও আমরা শিরে রাখি। তাম্র নগরীর আদমিদের এ-হালৎ বহুৎ দিনই চলে আসছে। চলবেও শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত।'

—'ইফ্রিদি দৈত্যর জালার ব্যাপারটা?'

—'জালা! ইফ্রিদি দৈত্যের জালা পেতেও আপনাদের তকলিফ হবে না। বহুৎ ইফ্রিদি এখানে জালার মধ্যে রয়েছে। আমরা তো মাঝে-মধ্যেই জালা থেকে ইফ্রিদি বের করে রসুইখানায় খানা পাকিয়ে খাই। যত ইফ্রিদি চান, দিয়ে দেব। কিন্তু খবরদার। খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে। ঢাকনা খোলার সময় হাত দিয়ে জালার মুখটি আচ্ছা করে চেপে ধরে রাখবেন।

হুজুর জালা থেকে তাদের বের করার আগে কসম খাইয়ে নেবেন—ধর্ম-প্রচারক মহম্মদের নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব। ডেভিডের লেড়কা সুলেমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব, কসম খাচ্ছি।'

বুড়ো জেলে একটু দম নিয়ে এবার বল্ল—'হুজুর, খলিফা আব্দ-অল-মালিক'কে আমরা দুটো খুবসুরৎ লেড়কি উপহার দেব যাদের তুল্য লেড়কি তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও মিলবে না।'

বুড়ো জেলে এবার ঝপ্ ক'রে সাগরের পানিতে লাফিয়ে পড়ল। মুহূর্তে বারোটি তামার জালা তুলে এনে মুশা'কে বুঝিয়ে দিল। সবগুলোর গায়ে সুলেমানের মোহর অঙ্কিত।

বুড়ো ফিন ডুব দিল। পর মুহূর্তেই দুটো খুবসুরৎ লেড়কিকে নিয়ে ভুস্ ক'রে ভেসে উঠল।

বাস্তবিকই লেড়কি দুটোর সুরতের তুলনা চলে না। মুখ তো নয় যেন আশমান থেকে চাঁদ এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। বুক সমুন্নত। দেহের নিম্নাঙ্গের দিকে চোখ ফেরালে বুকের ভেতর কলিজার নাচানাচি শুরু হয়ে যায়। উরু নয় তো যেন নিটোল কদলীকাণ্ড। আর নিতম্বের গড়নও বড়ই মনলোভা। আধ-ফোটা দুটো পদ্মের কুড়ি যেন চোখ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। চলার ভঙ্গি অনেকটা মছলির মাফিক। হেলে দুলে নেচে নেচে পথ পাড়ি দেয়। একটিবার হাসলেই যেন রাশি রাশি মুক্তো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর কোকিলের স্বরকেও হার মানায়। তার হাসি আর কণ্ঠস্বর কানে গেলে নেশা লেগে যায়। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোয় ঠিকই, কোন ভাষাতেই তারা বাৎচিৎ করতে পারে না।

মুশা বুড়ো জেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বল্ল—'তোমার আচরণে আমি মুগ্ধ। তুমি যেভাবে আমাকে স্যাহায্য করেছ তার ঋণ কেবলমাত্র সুক্রিয়া জানিয়েই শোধ করা যাবে না। সে কোশিসও আমি করব না।'

বুড়ো জেলেটি মুচকি হাসল। হাত কচলে নিবেদন করল—'হুজুর, আপনারা আমাদের মুলুকে মেহমান। আপনাদের খুশী করা তো আমাদের অবশ্য কর্তব্য।'

—'আমি তোমার কাছে একটি আব্দার রাখছি, তোমরা আমাদের মুলুক দামাস্কাসে চল। আমাদের মেহমান হয়ে কিছুদিন থেকে আসবে। আশা করি, দামাস্কাসের রূপ-সৌন্দর্য তোমার দিল্‌কে খুশীতে ভরিয়ে তুলতে পারবে। যাবে?'

বুড়ো জেলে মুহূর্তে তার সহকর্মীদের সঙ্গে চোখের ভাষায় পরামর্শ সেরে নিয়ে মুশা-র আমন্ত্রণ রক্ষা করার সম্মতি জানাল।

কাজ হাসিল। তামার জালা হাতে পাওয়া গেছে।

মুশা এবার তাঁর দলবল আর জেলেদের নিয়ে দামাস্কাসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

ফেরার পথে শেষবারের মত সবাই ফিন তাম্র নগরীতে প্রবেশ করল। মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরৎ যে, যত পারল জেব বোঝাই ক'রে নিয়ে নিল।

বেচারা তালিব বিন-মাল! কামজ্বালায় জানটি খোয়াল। নিষ্প্রাণ তাম্র নগরীর বুকে তার প্রাণহীন ছিন্ন দেহটি পড়ে রইল।

মুশা সদলবলে দামাস্কাসে ফিরে এলেন। বহু আকাঙ্ক্ষিত তামার জালাগুলিকে মুশা খলিফার সামনে হাজির করলেন। আর খলিফাকে দেয়া জেলেদের খুবসুরৎ লেড়কি দুটোকেও তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

খলিফা একটি তামার জালা কাছে টেনে নিলেন। একটি হাত দিয়ে জালার মুখটি চাপা দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে তার ঢাকানাটি খুলে ফেল্‌লেন।

চোখের পলকে জালার মুখ দিয়ে জমাট বাঁধা একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তা থেকে অতিকায় ইফ্রিদি দৈত্য আবির্ভূত হ'ল। দৈত্যটি ভয়াল দর্শন হলেও তার চোখে-মুখে ভীতির ছাপ সুস্পষ্ট। সে করজোড়ে খলিফাকে নিবেদন করল—'হুজুর, মহাত্মা সুলেমান-এর বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ ঘোষণা করেছিলাম। কৃত অপরাধের জন্য আপনার কাছে আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি। মেহেরবানি করে আপনি আমার জান রক্ষা করুন।'

মুহূর্তে কামরার ঘুলঘুলি দিয়ে ইফ্রিদি দৈত্যটি বেরিয়ে গেল। এভাবে একের পর এক ইফ্রিদি দৈত্য খলিফার কাছে কসম খেয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

খলিফা এবার সাগরের লেড়কি দুটির দিকে চোখ ফেরালেন। এক ঝলক দেখেই তাঁর চোখ দু'টি ঝলসে যাবার জোগাড় হ'ল। সচকিত হয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাদের রূপ-যৌবনে খলিফা যারপরনাই মুগ্ধ বেজায় খুশী। তারা কিন্তু বেশীদিন এ-দুনিয়ায় থাকল না। কিছুদিনের মধ্যেই বেহেস্তে চলে গেল।

খলিফাকে খুশী ক'রে মুশা জেরুজালেমের পথে পা-বাড়ালেন। সেখানেই একদিন ধ্যান করতে করতে দেহ রাখলেন।

কিস্‌সা শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

বাদশাহ শারিয়ার উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—'সত্যি তোমার কিস্‌সা অতুলনীয়! এমন সব কিস্‌সা জিন্দেগীতে শুনতে পাব ব'লে কোনদিন ভাবিনি।

বেগম বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এখনও এক প্রহর রাত্রি রয়েছে। আমার দিল্ চাইছে 'ইবন্ আল-মনসুর'-এর কিস্‌সা আপনার দরবারে পেশ করি। তাঁর জীবনে বহুৎ তাজ্জব ও দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছিল যা শুনলে আপনার দিল্ ভরে উঠবে।

দুঃসাহসিক ইবন্ আল-মনসুরের কিস্‌সা

বাদশাহ শারিয়ার বেগমের কোলে মাথা রেখে কিস্‌সা শোনার প্রস্তুতি নিলেন।

বেগম কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, খলিফা হারুণ-অল-রশিদ-এর মহানুভবতার কিস্‌সা আপনার দরবারে পেশ করেছিলাম, আশা করি ইয়াদ আছে? প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় ব্রত। কি ক'রে প্রজাদের হিতসাধন করা যায় এ-চিন্তায় রাত্রে তাঁর চোখে নিদ আসত না।

এক রাত্রে খলিফা পালঙ্কে শুয়ে অস্থিরভাবে সময় গুজরান করছিলেন। কিছুতেই চোখের পাতা দু'টি এক করতে পারছেন না। তখন অনন্যোপায় হয়ে এক ঝটকায় পালঙ্কের ওপর বসে পড়লেন।

কামরার বাইরে তাঁর দেহরক্ষী মসরুর তরবারি হাতে পায়চারি করছে।

খলিফা দেহরক্ষী মসরুর'কে তলব করলেন। মসরুর দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে কুর্ণিশ ক'রে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

খলিফা অসহায় দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'মসরুর, কিছুতেই যে নিদ আসছে না। কি করি বল তো?'

—'জাঁহাপনা, হয়ত কোন ভাবনা চিন্তায় দিমাক গরম হয়ে গেছে। দিমাক ঠাণ্ডা না থাকলে নিদ আসবে কি ক'রে?'

—'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এখন উপায় কি করি, বল?'

—'জাঁহাপনা, বাইরে বহুৎ ঠাণ্ডা বাতাস, একটু পায়চারি করলে স্বস্তি আসতে পারে। দিমাকও ঠাণ্ডা হবে। তবেই দেখবেন দু' চোখের পাতা এক হয়ে আসবে। বাগিচায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে খুসবুর মেলা বসে গেছে। ফুরফুরে বাতাস। মাথার ওপরে আশমানে তারার খেলা। আর ইয়া বড় চাঁদ আশমান-দুনিয়া সব কিছু পাহারা দিচ্ছে। চলুন জাঁহাপনা, বাগিচায় একটু পায়চারি ক'রে আসবেন, কলিজা ঠাণ্ডা হবে।'

—'ধ্যুৎ! এসবে আজ আর দিল্ নেই মসরুর।'

—'ছাড়ান দিন তবে। এক কাজ করা যাক জাঁহাপনা, আমি প্রাসাদের হারেমে যেসব খুবসুরৎ বাঁদী রয়েছে তাদের খবর দিচ্ছি, তৈরি থাকতে। আপনি তাদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে নিয়ে রাত্রিটুকু কাটিয়ে দিন।'

—'না, এসবেও আজ আমার রুচি নেই মসরুর।'

—'তবে আপনার দরবারে যেসব জ্ঞানী-গুণী আদমি রয়েছেন তাদের কাউকে আপনার নাম ক'রে তলব করছি।'

—'না, না মসরুর তাতেও আজ আমার রুচি নেই, দিল্ টানছে না।'

—'জাঁহাপনা, প্রাসাদের ভাঁড়ারে দুনিয়ার সবচেয়ে আচ্ছা আচ্ছা সরাব জড়ো করা রয়েছে। হুকুম হলে আমি দৌড়ে গিয়ে—'

—'সরাব? অসম্ভব! সরাবে আমার দিল্ ঠাণ্ডা হবার নয়। অন্য কোন ফিকির তোমার জানা থাকলে চলতে পারে।'

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচার গাছে গাছে পাখির কিচির মিচির শুরু হয়ে গেল। ভোরের পূর্বাভাষ। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সাতচল্লিশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগমের কামরায় এলেন্। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, মাসরুর কোন যুক্তি দিয়েই যখন খলিফা হারুণ অল-রসিদকে তুষ্ট করতে পারল না তখন বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—জাঁহাপনা, কিছুতেই যখন আপনার দিল্ নেই তবে আমার গর্দান নামিয়ে নেবেন? তবে হয়ত আপনার দিল্ শান্ত হবে, স্বস্তি পাবেন।'

মসরুর-এর বাৎ শুনে খলিফা সরবে হেসে উঠলেন। তারপর এক সময় হাসি থামিয়ে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা বাৎ বলেছ মসরুর! বলা যায় না, একদিন হয়ত তোমার গর্দান নামানোর জরুরৎ হতেও পারে।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে খলিফা এবার বল্‌লেন—'মসরুর, তোমার গর্দান নেবার ব্যাপারটি এখন চাপা থাক। তুমি বরং এক কাজ কর। একটু ঘুরে এস। যার সান্নিধ্য আমার দিল্‌কে আনন্দ দান করতে পারে এরকম কোন আদমির দেখা পেলে তাকে আমার কামরায় নিয়ে এসো।'

খলিফার হুকুম তামিল করতে দেহরক্ষী মসরুর তাঁর দিল্ খুশী করার মত লোক খুঁজতে গিয়ে প্রাসাদ তোলপাড় করল। শেষ পর্যন্ত মুখ ব্যাজার ক'রে খলিফার কামরার দরওয়াজায় এসে ফিন দাঁড়াল! তাঁকে নিজের ব্যর্থতার কথা জানাল।

খলিফা সক্রোধে বল্‌লেন—'তাজ্জব ব্যাপার দেখছি! এমন কাউকেই মিল্‌ল না যে আমার অস্থির দিল্‌কে ঠাণ্ডা করতে পারে!

—'জাঁহাপনা, তামাম প্রাসাদ চুঁড়ে বুড়ো হতচ্ছাড়াটিকে ছাড়া আর তেমন কারোরই দেখা মিল্‌ল না।'

—'বুড়ো হতচ্ছাড়া! কে? সে কে বল তো।'

—'জাঁহাপনা, ইবন্ আল-মনসুর।'

—'ইবন্ আল? কোন্ ইবন্ আল, বল তো। দামাস্কাসের ইবন্ আল-মনসুর?'

—'জী জাঁহাপনা। হতচ্ছাড়া সে-শয়তানটির হদিসই পেলাম।'

—'মসরুর, দেরী কোরো না, নিয়ে এসো। বুড়ো ইবন্ আল'কে আমার তলব দাও।'

খলিফার হুকুম তামিল করতে মসরুর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ইবন্ আল'কে তাঁর সামনে হাজির করল।

খলিফা বল্‌লেন—'ইবন্ আল সাহাব, আপনার মুখ থেকে দুঃসাহসিক কোন কাহিনী শোনার জন্য আমার দিলে চাঞ্চল্য বোধ করছি।'

বুড়ো ইবন্ আল নতজানু হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ ক'রে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আপনার হুকুম আমি অবশ্যই তামিল করব। লেকিন একটি বাৎ, কোন্ কিসিমের কিস্‌সা আপনি শুনতে চাইছেন?'

তাঁর কথার তাৎপর্যটুকু বুঝতে না পেরে খলিফা নীরব চাহনি মেলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।'

ইবন্ আল বিচক্ষণ আদমি। তিনি খলিফার মানসিক হালতের বাৎ বিবেচনা করে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমি জানতে চাইছি, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি এরকম কোন বাস্তব ঘটনা, নাকি অন্য কারো মুখ থেকে শোনা কিস্‌সা শুনতে আপনি বেশী উৎসাহী?'

—'কানে শোনা কিস্‌সা নয়, নিজের চোখে দেখেছেন এরকম কোন কিস্‌সাই আপনি মেহেরবানি ক'রে আমাকে শোনান। চোখে দেখা ঘটনা দিলের ওপর বহুৎ দাগ কাটে।'

—'তবে শুনুন জাঁহাপনা। আমার অনুরোধ কিস্‌সা শোনার সময় মেহেরবানি ক'রে দিল্-কান-চোখ বিলকুল সজাগ রাখবেন।

জাঁহাপনা, আমি আপনার দোয়ায় প্রাসাদে ঠাঁই পেয়েছি বটে। এখানেই দিন গুজরান করে চলেছি। তবে এ-ও অবশ্যই শুনে থাকবেন, আমি হর সালই দিন কয়েকের জন্য বসোরাহ-তে যাই। আপনার নায়েব মহম্মদ আল-হামানী সেখানে বসবাস করেন। আদতে তাঁরই সঙ্গলাভের প্রত্যাশায় বসোরাহ-তে ছুটে যাই।

আমি এক সাল তার প্রাসাদে গেলাম। প্রাসাদের সদর-দরওয়াজার কাছে পৌঁছে দেখি আল-হামামী সাহাব ঘোড়ার পিঠে বসে। পুছতাছ ক'রে জানতে পারলাম, শিকারে যাচ্ছেন।

আমাকে দেখেই আল-হামামী উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ব'লে উঠলেন—'এসো—চলে এসো ইবন্-আল।'

আমি মুখ কাচুমাচু ক'রে জবাব দিলাম—'মাফ করবেন। ঘোড়ার পিঠে আমি চাপছি না। ঘোড়ার পিঠে চাপলেই আমার গা ঘুলায়, শির টলতে থাকে। আমি গাধার পিঠে চেপে যেতে পারি, রাজী?'

গাধার পিঠে চেপে শিকারে যাবার কথা শুনে আল-হামামী তো হাসতে হাসতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবার জোগাড় হয়েছিলেন। হাসি থামিয়ে এক সময় বল্‌লেন—'মালুম হ'ল, শিকারে যাবার মন নেই তোমার। তবে প্রাসাদেই থেকে যাও। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে কিন্তু, ইয়াদ থাকে যেন।'

আল-হামামী আমাকে প্রাসাদে রেখে শিকারে চলে গেলেন। আমি আল-হামামী'র অনুপস্থিতিতে তাঁর মেহমান হয়ে প্রাসাদে বাস করতে লাগলাম। একদিন ভাবলাম, যতবার এখানে এসেছি প্রতিবারই প্রাসাদেই দিন গুজরান করি। বড় জোর প্রাসাদের লাগোয়া বাগিচায় কয়েক চক্কর মারি। কিন্তু বসোরাহ শহরটিকে ঘুরে ঘুরে দেখা হয়ে ওঠেনি। এখন আমি একা, অপূর্ব সুযোগ। ঘুরে ঘুরে সব কিছু না দেখলে শেখা যায় না।

আমি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে হারা উদ্দেশ্যে বসোরাহ নগরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। খুশিতে আমার দিল্ চাঙা হয়ে উঠতে লাগল।

জাঁহাপনা, প্রায় সত্তরটি বড় রাস্তা তামাম বসোরাহ শহরকে ঘিরে রেখেছে। সবগুলোই লম্বায় প্রায় আড়াই শ' মাইল।

একবার আমি একদম একা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ব্যস, এক সময় যেন দারুন চক্করের মধ্যে পড়ে গেলাম। রাস্তা হারিয়ে ফেল্‌লাম। পথচারীরা আমাকে বোকা হাঁদা ঠাওরায় সেজন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও শরমে বাঁধল। আমি অস্থির হয়ে হাঁটছি তো হাঁটছি। মাথার ওপরে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সূর্যও যেন আমার সঙ্গে রেষারেষি ক'রে তাপ বিকিরণ ক'রে চলেছে। ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেলাম। কোর্তা-চোস্ত বিলকুল ভিজে
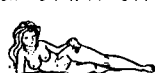
জবজবে। কিন্তু গলা শুকিয়ে একদম কাঠ। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম।

পানির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক সময় এক গলি দিয়ে চলতে গিয়ে প্রাসাদোপম একটি মকান নজরে পড়ল। পেল্লাই মকান। তার গায়ে এক চিলতে বাগিচাও রয়েছে দেখলাম।

আমি এক পা-দু'পা ক'রে বাগিচার মধ্যে ঢুকে গেলাম। বাগিচার চারদিকে মার্বেল পাথরের বেদী। বসার বন্দোবস্ত। আমি এগিয়ে গিয়ে একটি বেদীর ওপরে বসে পড়লাম। গাছের হিমেল বাতাস পেয়ে সবে বেদীটির ওপর শরীর এলিয়ে দিয়েছি অমনি মালুম হ'ল কে যেন গানা গাইছে। লেড়কির কণ্ঠ। বহুৎ বড়িয়া গানা—একদম মন-মৌজী। দিলকে পাগলা ক'রে দেবার মত গানাই বটে। তার সে-গানার বক্তব্যটুকু আমার এখনও স্পষ্ট ইয়াদ আছে জাঁহাপনা—'আমার দিল্ থেকে চঞ্চল হরিণটি যখন বিদায় নিল তখন তার স্থান দখল ক'রে বসল দুঃখ আর হতাশা। কেন সে আমাকে ত্যাগ করল? কুমারী লেড়কিরা যাতে আমাকে পেয়ার মহব্বত করে সেরকম ছলনার আশ্রয় তো আমি কোনদিনই নেই নি, তবে?'

সে গানার বক্তব্যে আমার দিল্ রহস্যের গন্ধ খুঁজে পেল। ফিন ভাবলাম লেড়কিটির সুমিষ্ট কণ্ঠের মাফিক তার সুরৎ-ও যদি মনলোভা হয় তবে তামাম দুনিয়ায় এ-ই হবে অনন্যা।

আমি শ্বেত পাথরের বেদী ছেড়ে উঠে পড়লাম। প্রাসাদোপম মকানটির দরওয়াজায় হাজির হলাম। বহুমূল্য রেশমী কাপড়ের পর্দাটি সামান্য ফাঁক ক'রে দেখার কোশিস করলাম। বৃথা কোশিস। কিছুই নজরে পড়ল না।

আচমকা পিছন ফিরতেই বাগিচার ঠিক কেন্দ্রস্থলে দু'টি লেড়কিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সুরৎ দেখে মালুম হ'ল তাদের মধ্যে একজন নির্ঘাৎ বাঁদী। আর দ্বিতীয় লেড়কিটিই গানা গেয়েছিল। দিমাক খারাপ ক'রে দেওয়ার মত সুরৎ-ই বটে।

লেড়কি দু'টিকে দেখে একটি কবিতা আমার দিলে ভেসে উঠল, যার মমার্থ হচ্ছে—'লেড়কিটির চোখের কোণে ব্যাবিলনের আগুন জ্বলছে। তার ঘাড়ের ওপরে যুঁই ফুলের মত সফেদ একটি বাতি। তার সে-সুরৎ-কে রাত্রির আন্ধার অভিনন্দন জানায়। তার উন্নত স্তন দু'টি কী নরম, তুলতুলে। আহা মরি মরি! স্তন দু'টিকে বুঝি পরম স্নেহে নিটোল ক'রে গড়ে তোলা হয়েছে। ফিন এমনও হতে পারে, স্তন দু'টি পরম স্নেহের ছোয়ায় দলা পাকানো সফেদ গোস্তর পিণ্ড।'

জাঁহাপনা, বিশ্বাস করুন, তার সে-সুরৎ চোখের সামনে দেখে আমার পক্ষে আর নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হ'ল না। আমি তখন নিজেকে হারিয়ে, উন্মাদের মত চিল্লিয়ে উঠেছিলাম—'শোভন আল্লাহ! যদি পারতাম তবে আমি তাকে আমার চোখ দু'টি দিয়ে গিলে ফেলতাম। ইয়া আল্লাহ, এত সুরৎও তোমার দুনিয়ায় আছে?'

আমার কণ্ঠ শুনে লেড়কিটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। আচমকা পরপুরুষের মুখোমুখি হওয়ায় ঝট ক'রে নাকাবটি টেনে মুখটিকে আড়াল ক'রে দিল।

আমার এরকম বে-শরম আচরণ দেখে লেড়কিটি ক্ষেপে একেবারে লাল হয়ে গেল। বাঁদীটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল।

বাঁদীটি হিংস্র বাঘিনীর মাফিক আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম হ'ল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ব'লে উঠল—'বে-শরম বেতমিস কাঁহিকার, শুনি তোমার মতলবটি কি? অচেনা-অজানা আদমির মকানের অন্দর মহলে ঢুকতে তোমার শরম লাগল না? অচেনা লেড়কির দিকে নজর বুলাতে চোখ দুটো কাঁপল না? চুল-দাড়ি তো পেকে একেবারে সফেদ হয়ে গেছে। দু'দিন বাদে গোরে যাবে। বে-আক্কেল কাঁহিকার! লেড়কিদের সুরৎ দেখার যদি এতই লালচ তবে আগে কোথায় ছিলে নাগর আমার? এখন বুড়া হাড্ডি নিয়ে সুরৎ—'

রূপসীটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমিও বেশ চড়া স্বরেই জবাব দিলাম—'হ্যাঁ,—হ্যাঁ, বুড়া তো হতেই চলেছি। উমর লুকোবার তো আর কোন ফিকির নেই যে, কমিয়ে টমিয়ে যা হোক কিছু একটা বলে দেব। আর লালচ আর শরম টরমের ব্যাপার বল তবে সেটা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে।'

—'আঃ কী আমার রসের নাগর রে! বে-শরম কাঁহিকার! লাজ নেই তোর?'

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' আটচল্লিশতম রজনী

সে রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার একটু আগেই অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। কিস্‌সার পরবর্তী অংশটুকু শোনার জন্য তাঁর দিল্ খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল বলে আর তর সইছিল না। বেগম মুচকি হেসে কুশল বার্তাদি সেরেই কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, মনসুর বল্ল—আমার মেজাজ দেখে লেড়কিটি দু'কদম এগিয়ে এসে আমার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। তেমনি খেঁক খেঁক ক'রে বল্ল—'তোমার ওই সফেদ চুলের চেয়ে বেশী শরমের কী-ই বা থাকতে পারে? চুল সফেদ হয়েছে, শরমও তোমার দিল্ থেকে একদম খতম হয়ে গেছে। তা না হলে শরম টরমের মাথা খেয়ে অচেনা আদমির প্রাসাদের হারেমে ঢুকতে দিল্ নেচে ওঠে?'

—'খোদার কসম। আর যা-ই বল আমার পাকা দাড়ির কথা বলে বার বার খোটা দিয়ো না বলে রাখছি। আর এখানে ঢুকে পড়ার ব্যাপারটির সঙ্গে লজ্জা শরমের কি সম্পর্ক থাকতে পারে, তা-ও তো বুঝছি না।'

—'তবে এখানে কেন এলে, সাচ্চা বলবে?'

—'তেষ্টা পেয়েছে। তেষ্টায় ছাতি পর্যন্ত ফেটে যেতে চাইছে। এক বদনা পানি পেলে—'

আমাকে বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই লেড়কিটি এবার বল্ল—'তুমি যখন পানির জন্য তকলিফ ভোগ করছ, পানি দিচ্ছি।'

এক পরিচারিকাকে ডেকে এক গ্লাস সরবৎ আনাল। আমার হাতে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে গ্লাস উপুর করে সবটুকু পানি গলায় চালান দিয়ে দিলাম। চমৎকার খুসবু বেরলো সরবতের গ্লাস থেকে।

আমি সরবতের গ্লাসটি বাঁদীর হাতে দিতে গিয়ে খুবসুরৎ লেড়কিটির দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগলাম। ব্যাপার তো আদতে একই! সরবৎ আর সুরতের সুধা। কিছুমাত্রও ফারাক আছে বলে সে-মুহূর্তে অন্ততঃ মনে করি নি।

বাঁদীসুন্দরী এবার একটি তোয়ালে আমার হাতে তুলে দিল মুখ মোছার জন্য। আল্লাহ'কে সুক্‌রিয়া জানাতেই হ'ল। কারণ আরও কিছুটা সময় কাটানোর ফিকির হ'ল।

আমি তোয়ালেটি দিয়ে ধীরে সুস্থে মুখ মুছি আর আড়চোখে আমার দিল্ কা পঙ্ক্তিটির সুরৎ দেখি। মুখ থেকে তোয়ালেটিকে নামিয়ে আনলাম গলায়। সেখানে তোয়ালেটি বুলিয়ে আরও কিছুটা সময় গুজরান ক'রে দিলাম। তারপর তোয়ালে চলে গেল ঘাড়ে। কিছু সময় সেখানেও তোয়ালে বুলালাম। সব শেষে হাত মোছার বাহানা করলাম। এবার? উপায়ান্তর না দেখে তোয়ালেটিকে ফিরিয়ে দিতেই হ'ল।

তেষ্টার পানি পেয়ে গেছি। তোয়ালের ব্যাপারও মিটে গেছে। এবার কামরা ছাড়তেই হয়। নইলে আমার ছালই হয়ত ছাড়াবার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। সব কিছু বুঝেও কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলাম না। একই জায়গায় মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখ বন্ধ বটে, আমার চোখ দুটো কিন্তু খোলা, শরম টরমের মাথা খেয়ে বার বার খুবসুরৎ লেড়কিটির দিকে তাকানোর কাজ অব্যাহতই রাখলাম।

আমি নসীব সম্বল ক'রে কামরা ছেড়ে বেরোলাম না। ব্যাপার বেগতিক দেখে খুবসুরৎ লেড়কিটি এগিয়ে এসে বল্ল—'কি মিঞা, কাজ তো মিটল এবার পথ দেখতে হয় যে।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বল্‌লাম—'হ্যাঁ, যেতে তো হয়-ই। আর আমার হাতেও বহুৎ জরুরী কাজ রয়েছে।'

—'তবে আর দেরী কেন, এবার—'

—'কিন্তু একটি চিন্তা আমার কলিজাটিকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে। তাই তো এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছিনে।'

—'চিন্তা? কলিজা খুবলে খুবলে খাচ্ছে? কিসের চিন্তা? কার জন্য চিন্তা?'

—'দেখুন, আমরা যদি প্রতিটি ব্যাপারকে উল্টো দিক থেকে বিচার করতে বসি তবে আখেরে কি দাঁড়াবে? বিচ্ছিন্ন সব ঘটনাকে এক সঙ্গে জুড়ে দিলেই বা তার পরিণাম কি হতে পারে, ভেবে পাচ্ছি নে!'

—'দেখুন মিঞা, সরবৎ গলায় ঢেলে বুঝি এখন বড় বড় ব্যাপার মাথায় উঁকি দিতে শুরু করেছে? নোংরামি আর গুণাহের ফল আমাদের ভোগ করতেই হয়, কিন্তু এমন কি হালৎ হ'ল যে, আমার কামরায় বসেই তার ফয়সালা করতে হবে। নিজের মুশকিল আসান করতে গিয়ে আমাকে কেন ঝুটমুট ভোগাচ্ছেন, বলুন তো?'

—'না, মানে—মানে এ মকানের মালিক আমার খুব পরিচিত ছিল। বয়সের পার্থক্য একটু-আধটু যা ছিল আমরা আমল দিতাম না। এক জিগরী দোস্তের মকানে বসে বাৎচিৎ করতে করতে তিনি আমাকে বোধহয় এ মকানটির বিবরণই দিচ্ছিলেন।' কামরাটির সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিন বলতে শুরু করলাম—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ-বাড়িটির বাৎ-ই আমাকে সেদিন তিনি বলছিলেন বটে। খোদার কসম, তিনি আমার জিগরী দোস্ত ছিলেন।'

—'জিগরী দোস্ত? বহুৎ আচ্ছা বাৎ! এবার বলুন তো মিঞা এ মাকানের মালিকের নাম কি ছিল?'

—'মালিকের নাম? তার নাম আলি বিন মহম্মদ। খুব বড় জহুরী। বাসোরাহ শহরের সবচেয়ে নামজাদা জহুরী। বহুৎ খাতির ছিল তার। বহুৎ সাল মোলাকাৎ নেই। মালুম হচ্ছে তিনি আর এ-

দুনিয়ায় নেই। আচ্ছা, তার কোন লেড়কা বা লেড়কি নেই?'

লেড়কির চোখ দুটোর কোণায় এবার পানির বিন্দু দেখা দিল। চোখ মুছতে মুছতে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সে বল্‌ল—'আপনার খেয়াল যখন পুরোদস্তুর আছে, আপনি যখন তাঁর জিগরী দোস্ত তখন আর আপনার কাছে বলতে বাধা নেই। তাঁর একটি লেড়কি আছে। বুদুর তার নাম। সে-ই তাঁর স্থাবর-অস্থাবর বিলকুল সম্পত্তির মালিক।'

তার মুখের ওপর চোখের মণি দুটোকে বার কয়েক বুলিয়ে নিয়ে এবার নসীব ঠুকে প্রশ্নটি দিলাম ছুঁড়ে—'বু-দু-র? তবে কি তুমিই সে-বুদুর?'

—'হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। আমিই বুদুর।

—'তাই তো আমি এতক্ষণ বে-শরমের মত নাকাবের ফাঁক দিয়ে তোমার মুখটিকে বার বার দেখার কোশিস করছিলাম। মালুম হচ্ছিল, তুমি বিরক্ত হচ্ছ, তবু না তাকিয়ে পারছিলাম না। তোমার কলিজা জুড়ে কী যে দুঃখ! কিন্তু প্রাসাদতুল্য এ-মকান, অগাধ ধন দৌলত তো বিলকুল তুমি একাই ভোগ করছ। তোমার দুঃখ কোথায়, আমার কাছে খোলসা ক'রে বল তো। আল্লাতাল্লা-র বোধহয় এটিই মর্জি। সেজন্য তিনি হয়ত আমাকে এখানে টেনে এনেছেন। তোমার দুঃখ-যন্ত্রণা আমি লাঘব ক'রে দেব, বল কি সমস্যা তোমার?'

—'আপনি যতই আপনজন হন না কেন, আমার গোপন ব্যাপার কেন আপনার কাছে ফাঁস করতে যাব? আপনাকে আমি চিনি না। নাম-ধাম বিলকুল অজানা। কোন কিসিমের আদমি আপনি তা-ও আমার জানা নেই।'

—'নাম? আমার নাম? ইবন্ আল-মনসুর। দামাস্কাসে আমার ঘর। খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর আমি বহুৎ পিয়ারের আদমি। দোস্তী দিয়ে তিনি আমার কলিজা খরিদ ক'রে নিয়েছেন।'

আমি থামতে না থামতেই বুদুর সোল্লাসে ব'লে উঠল—'থামুন! থামুন! আর দরকার নেই। আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।' কুর্শি এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'বসুন, এখানে বসুন।'

তারপর আরও দু'-চারটে মামুলি বাৎচিৎ হ'ল। তারপর বুদুর আমাকে নিয়ে অন্দর মহলের একটি কামরায় গেল।

কামরাটির জানালা খুললেই চমৎকার বাগিচাটি।

খানাপিনা সারতে সারতে বুদুর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—আমার মুখে তকলিফের ছাপই আপনাকে আমার ব্যাপারে ভাবিয়ে তুলেছে, এবার মালুম হ'ল। বলব, আপনার কাছে কিছু ছিপাব না। তবে খোদার কসম, একটি শর্ত কিন্তু মানতে হবে। আমি যা কিছু আপনাকে বলব, কারো কাছে ভুলেও ফাঁস করতে পারবেন না, রাজী?'

আমি ঘাড় কাৎ ক'রে তার কথায় সম্মতি জানালাম।

—'তবে বলছি, শুনুন আমার নসীবের বিপর্যয়ের কাহিনী—'

তার কাহিনী শুরু হওয়ার মুখে বাঁদী আমার থালায় কয়টি গোলাপ জাম দিল।

আমি তার মুখে যে কাহিনী শুনলাম তার সারাংশ আদতে আমার জীবনেরই কিস্‌সা—যখন মহব্বতের জালে জড়িয়ে পড়লাম তখন আমার কলিজা, আমার মেহবুব কাছ থেকে বহুৎ, বহুৎ দূরে চলে গেছে।

বুদুর এটুকু বলেই থেমে গেল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল। ওড়না দিয়ে চোখ মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—'তোমার সুরৎ অতুলনীয়। যার সঙ্গে তোমার মহব্বৎ হয়েছিল তার সুরৎ-ও অবশ্যই আকর্ষণীয়ই ছিল। তার কি নাম, বল তো?'

—'আপনার অনুমান অভ্রান্তই বটে। তার সুরৎ খুবই আকর্ষণীয় ছিল। আর তার নাম জুবাইর বিন উমাইর। একজন সম্ভ্রান্ত আমীর। তামাম বসোরাহ বা ইরাকে তার মত খুবসুরৎ নওজোয়ান আর দ্বিতীয়টি নেই।'

—'তোমার মহব্বতের কথা কিছু বলবে কি?'

—'মহব্বতের কথা? সে তো বহুৎ, বহুৎ কথা। আমরা ক্রমে একে অন্যের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে একেবারেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর খুবই সামান্য একটি কারণে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। মাত্র ছোট্ট একটি সন্দেহ-ই এর জন্য দায়ী।'

—'শোভন আল্লাহ! হায় আল্লা এ কী শুনছি! তোমার মত লেড়কীকে সন্দেহ—ধুৎ! আচমকা দমকা বাতাসে পদ্মফুল কাদায় গড়াগড়ি খেতে পারে, তাই বলে তাকে সন্দেহ করা চলে? যত্তসব— আর যদি সন্দেহের মধ্যে কিছু সত্যতা থেকেও থাকে তবু তো তোমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই সব সন্দেহ ধুয়ে মুছে যাবার কথা।'

—'তা-ও ফিন কোন পুরুষের টুরুষের ব্যাপার হলেও না হয় হ'ত। নিছকই একটি লেড়কিকে দিয়ে তার সন্দেহ।'

—'তাজ্জব ব্যাপার! লেড়কিকে নিয়ে সন্দেহ!'

—'আলবাৎ। এই যে লেড়কিটিকে দেখছেন, স্রেফ একে নিয়ে তার ছিল সন্দেহ।'

—'খোদাতাল্লা-র করুণা তোমার ওপর বর্ষিত হোক। কোন আদমি টাদমি নয়-ই, শয়তানও এরকম বাৎ বিশ্বাস করতে উৎসাহী হবে না। বিতিগিচ্ছিরি কাণ্ড তো। এক লেড়কির সাথে দুসরা এক লেড়কির মহব্বৎ—ধ্যুৎ। বল তো, এরকম অদ্ভুত একটি সন্দেহ তার ভেতরে দানা বাঁধল কি করে?'

—'লেড়কিটি গোসল করার সময় আমার গায়ে সাবান মাখিয়ে দেয়। গোসল হয়ে গেলে চুল বেঁধে দেয়। সালোয়ার কামিজ হাতে তুলে দেয়। মোদ্দা কথা, তখন সে আমার গায়ে গায়ে থাকে। একদিন গোসলের শেষে সে আমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। আমার গা তখন একটিমাত্র তোয়ালে দিয়ে ঢাকা ছিল। গরমের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সে হঠাৎ আমার গা থেকে তোয়ালেটি সরিয়ে ফেলে। চুলবাঁধা সেরে আমাকে বেমালুম জড়িয়ে ধরল। দু'গালে চুমু খেল। তারপর বল্‌ল—'আমি মরদ হলে দেখিয়ে দিতাম মহব্বৎ কি ক'রে করতে হয়।'

—'তারপর? তারপর কি হ'ল?'

—'তারপর সে আমাকে ফিন জড়িয়ে ধরল। নানা কৌশলে আমাকে চটকা-চটকি করতে লেগে গেল। উমর কমতি তো, কতটুকু কায়দা কৌশলই বা তার জানা আছে। যা-ই হোক, সে যখন আমার শরীরটিকে নিয়ে পুরোদস্তুর মজে রয়েছে ঠিক তখনই আমার মেহবুব আমীর দরওয়াজা ঠেলে কামরায় ঢুকল। আমাদের দু'জনকে জাপ্টাজাপ্টি করতে দেখে সে নিঃশব্দে কামরা ছেড়ে চলে গেল। এক টুকরো কাগজ পেলাম। তাতে লেখা যে মহব্বৎ কাউকে হাতে তুলে দেওয়া যায় না, সেই মহব্বৎ আমাদের উভয়কে খুশী করতে পারে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে সালোয়ার-কামিজ গায়ে চাপিয়ে কামরার বাইরে এলাম। ততক্ষণে সে ভোঁ ভাঁ—পালিয়েছে। ব্যস, সেই দেখাই আমাদের শেষ দেখা।

—'এক বাৎ, তোমাদের শাদী হয়েছিল কি?'

—'শাদী বলতে যা বোঝায় তা আমাদের অবশ্যই হয় নি।' মহব্বৎ-ই ছিল আমাদের দু' জনের বন্ধনের মূল সূত্র। একই সঙ্গে এক বিছানায় আমরা রাত্রি গুজরান করতাম।'

—'আমি কি একবার কোশিস ক'রে দেখতে পারি? দেখাই যাক না যদি তোমাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে পারি, কি বল?'

আমার বাৎ শুনে বদর-এর দু' চোখের কোণে পানি দেখা দিল। চোখ মুছতে মুছতে বল্‌ল—'আপনি কোশিস করতে চাইলে আমি আপত্তি করব না। তবে খেয়াল রাখবেন, আমাদের দু' জনের পথ এখন আলাদা আলাদা দিকে বয়ে গেছে। ইয়াদ রাখবেন, যে-আদমির দিল্ পাষাণ সেরকম এক আদমির উপকার করতে আপনি প্রয়াসী হচ্ছেন। আমি একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি, মেহেরবানি করে আপনি সেটি আমার মেহবুবা জুবাইর-এর হাতে তুলে দেবেন। আর আপনার ইচ্ছাকে কার্যকরী করার কোশিস করবেন। ব্যস, আর কি-ই বা আমার বলার থাকতে পারে, বলুন?'

বুদুর এবার খস্ খস্ ক'রে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিল। চিঠির বক্তব্য—'মেহবুব আমার, বিরহ-জ্বালা আর কতদিন আমাকে সইতে হবে, বল তো? তোমার অনুপস্থিতির বেদনা আমার রাতের নিদ কেড়ে নিয়েছে। বহুৎ দিন আগে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছ। স্বপ্নে তোমাকে দেখলেও আজ চেনা সম্ভব নয়।

আমাকে ফেলে দরওয়াজা খুলে তুমি ভেগে গেছ। মহল্লার আদমিরা কত কিছুই না সুযোগ বুঝে বলাবলি করে। আমার গায়ে কালি দেয়। তোমার কাছে আমি কী যে কসুর করেছি, এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। দিল্ থেকে তোমার দ্বিধা ঝেড়ে মুছে ফেল। তখন দেখবে, আমাদের পুনর্মিলনের ব্যাপারটি ভাবতে কেমন উৎসাহ জাগে। আমরা দুই-ই মিলে ফিন এক হয়ে গেলে খোদাতাল্লা আমাদের দোয়াই করবেন। তাঁর মর্জিও তা-ই। আর দূরে সরে থেকো না। —ইতি-তোমার মেহবুবা বুদুর।'

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলা হতে না হতেই ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' উনপঞ্চাশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির জের টানতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বুদুর তার মেহবুব জুবাইর-এর চিঠিটি শেষ ক'রে সেটি এবং এক হাজার দিনার আমার কুর্তার জেবে পুরে দিল। আমি ওজর আপত্তি জানালাম। ধোপে টিকল না। সব শেষে এমনও বল্‌লাম, তার পরলোকগত পিতার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে কাজটি করে দেয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। এতে খরচাপাতির প্রশ্নই ওঠে না।'

আমি এবার জুবাইর বিন উমাইর-এর মকানে হাজির হলাম। তার আব্বার সাথে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আজ সে মৃত। জুবাইর তখন শিকার করতে বনে বনে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। অপেক্ষা করতেই হ'ল।

জুবাইর ফিরে এলে আমি আমার নাম, ধাম ও অন্যান্য পরিচয় দিতেই সে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার অনুপস্থিতিতে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ব'লে বহুভাবে অনুশোচনা প্রকাশ করতে লাগল। আর তার মাকানে কম-সে-কম এক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য একদম ঝোলাঝুলি করতে লাগল।

জাঁহাপনা, নওজোয়ানটিকে আগুনের টুকরা বল্‌লে হয়তো ঠিক বলা হবে না, দাবানল বলাই সঙ্গত। লেড়কিটি কেন মর্ম বেদনায় ভুগছে তা এবার বিলকুল মালুম হ'ল। অপলক চোখে তাকে দেখতে লাগলাম।

জুবাইর আমাকে এক রকম জোর করেই তার মকানে সেদিন রেখে দিল। দুপুরে খানাপিনা সারতে গিয়ে তাজ্জব বনে গেলাম। হাজার কিসিমের খানার বন্দোবস্ত। গলা পর্যন্ত ঠেঁসে খানা সারলাম। আর সরাব? কী যে তার স্বাদ আর খুসবু আপনাকে বলে বুঝাতে পারব না।

জাঁহাপনা, মেহেরবানি করে আমার প্রতি অবিচার করবেন না। আপনি হয়তো ভাবছেন খানাপিনা আর জুবাইর-এর আদর আপ্যায়নে মজে গিয়ে আমি আদৎ ব্যাপারটিই ভুলে গিয়েছিলাম। তা কিন্তু মোটেই না।

খানার টেবিলে বসে, খানা সামনে রেখে আমি জুবাইর'কে বল্‌লাম—'খানা শুরু করার আগে আমি খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনার কাছে একটি প্রার্থনা রাখব। আপনি যতক্ষণ না সেটি মঞ্জুর করেন ততক্ষণ আপনার আয়োজিত চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় খানা আমি ছুঁয়েও দেখব না।'

—'মঞ্জুরের প্রশ্ন তো আগে নয়। সবার আগে তো আপনার প্রার্থনার কথা আমার জানা দরকার। তবে এটুকু অন্ততঃ জানবেন, আপনি আমার মেহমান, আপনাকে খানা ফেলে উঠে যেতে দিচ্ছি না। অতএব আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে বলেই ধরে নিতে পারেন।'

আমি তার কাছ থেকে অভয় পেয়ে কোর্তার ভেতরের জেব থেকে বুদুর-এর দেয়া চিঠিটি বের করে তার হাতে গুঁজে দিলাম।

চিঠির ভাঁজ খুলে চোখের সামনে ধরতেই জুবাইর-এর মুখে ক্রমে লাল ছোপ ফুটে উঠতে লাগল।

মুহূর্তের মধ্যে জুবাইর-এর চোখ-মুখ হিংস্র চিতার মাফিক হয়ে উঠল। চিঠিটি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে পা দিয়ে সেটিকে মেঝেতে ঘষতে ঘষতে দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌ল—'মান্যবর ইবন্ আল-মনসুর, আপনি আমাকে যা হুকুম করবেন আমি হাসিমুখে মেনে নেব। কিন্তু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মেহেরবানি ক'রে এ-চিঠিটির ব্যাপারে কিছু বলে আমাকে উত্যক্ত করবেন না। আমি চিঠির জবাব দিচ্ছি না। আপনাকেও কিছু বলার ইচ্ছে নেই।'

আমি তার বাৎ শুনে খানার টেবিল ছেড়ে উঠে আসতে যাব অমনি সে আমার হাত চেপে ধরল। অনুরোধের স্বরে বল্‌ল —'আপনি আমার মেহমান—' বক্তব্য শেষ না ক'রে সে মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে বিষণ্ণকণ্ঠে বল্‌ল—'কেন যে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছি তা শুনে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে, নিজেকে আমার জায়গায় দাঁড় করালে দেখবেন, আমাকে জোর করার ইচ্ছা আপনার মধ্য থেকে উবে গেছে। ফিন যদি এ-ও ভেবে থাকেন যে, আপনিই প্রথম তার চিঠি ও অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়েছেন, তবে অবশ্যই ভুল করবেন। আপনাকে আগে কিছু বলতে হবে না। সে আমাকে কি বলতে চেয়েছে আমি সবই আপনাকে বলে দেব। এবার সে তার বক্তব্য পেশ করতে লাগল।

জাঁহাপনা, আমি তাজ্জব বনে গেলাম। নওজোয়ান জুবাইর বিলকুল ঘটনা আমাকে ব'লে দিল।

আমি তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম। জুবাইর এবার আচমকা আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'আপনি কেন যে ফালতু এর মধ্যে নিজেকে টেনে আনতে উৎসাহী হচ্ছেন, বুঝছি না! মেহেববানি ক'রে নিজেকে গুটিয়ে নিন। আমার মেহমান হয়ে যতদিন দিল্ চায় থেকে যান। আপনার সেবাযত্ন ক'রে যাতে নিজেকে ধন্য করতে পারি তা-ই করুন।'

জাঁহাপনা, বিশ্বাস করুন, জুবাইর-এর আচরণে আমি যেন ক্রমেই কেমন বদলে যেতে লাগলাম। তার আতিথ্য গ্রহণ না ক'রে আমার পক্ষে কিছুতেই চলে আসা সম্ভব হ'ল না।

জুবাইর আমাকে রীতিমত তোয়াজ টোয়াজ করেই তার মকানে রাখতে লাগল। আমিও তার আপ্যায়নে যারপরনাই খুশী। একদিন খানাপিনার টেবিলে বসে বলব কি বলব না ভাবতে ভাবতে কথাটি বলে ফেল্‌লাম—'আপনি এত সব বন্দোবস্তের মাধ্যমে আমাকে খুশী করতে প্রাণান্ত প্রয়াস চালাচ্ছেন। কিন্তু একদিনও নাচা-গানার আয়োজন তো করলেন না।'

আমার বাৎ শোনামাত্র তার মুখটি অকস্মাৎ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'দেখুন, ওসব বহুৎ দিন আগেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তবে আপনি আমার মেহমান, আপনি উৎসাহী হলে বন্দোবস্ত করতেই হয়।'

আমি মতামত ব্যক্ত করার আগেই সে এক ক্রীতদাসীকে গানা

গাইতে ফরমাশ দিল।

ক্রীতদাসীটির গাওয়া গানটির মর্মার্থ হ'ল—'সরাবের বোতল আর পেয়ালা তো সঙ্গেই রয়েছে। তুমি কি এখনও সে-সুধা পান করনি? যে-যাতনা আমাদের খুশী ক'রে, যে চুম্বন আমাদের কলিজাকে ঠাণ্ডা ক'রে, যে চুম্বন আমাদের নিঃস্ব-রিক্ত ক'রে দেয়, যে-চুম্বন আমাদের বিরক্তির উদ্রেক করে তার স্বাদ কি তুমি পাও নি? যে গুলাব আন্ধারে পুড়ে খাঁক হয়ে যায় তার খুসবু তুমি কি আজও পাও নি?'

গানা খতম হতে না হতেই জুবাইর আচমকা কুর্শি থেকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। সংজ্ঞা লোপ পেল।

গাইয়ে ক্রীতদাসীটি বিষণ্ণমুখে জুবাইর-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমার প্রতি অভিযোগ করল—'হুজুর, এর জন্য আপনিই পুরোপুরি দায়ী। আমি বহুৎ দিন ওঁকে গানা গেয়ে শোনাই নি। বিষাদের গানা শুনলেই ওঁর কলিজায় আগুন জ্বলে যায়। ব্যস, তারপরই ওঁর সংজ্ঞা লোপ পায়।'
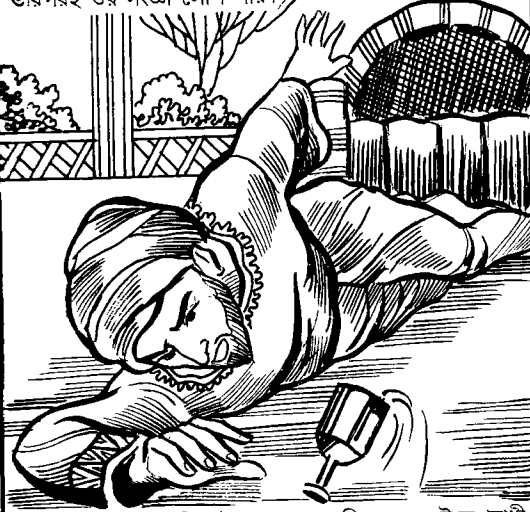
আমি বাস্তবিকই বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। নিজেকে বড়ই অপরাধী বোধ হতে লাগল। ক্রীতদাসীটি তাকে বিরক্ত করতে বারণ করল। তারপর আমাকে সঙ্গে ক'রে আমার থাকার কামরায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

সকাল হ'ল। আমি বিদায় নেবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। এক নফর আমার কামরার দরওয়াজায় এসে দাঁড়াল। সালাম জানিয়ে একটি চিঠি আর এক হাজার দিনারের একটি পুঁটুলি আমার হাতে গুঁজে দিল। জুবাইর চিঠিতে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আর গতরাত্রে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলায় আমি যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম তার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেছে।

আমি জুবাইর-এর মকান থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম।

যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে আমি এত দূর এসেছিলাম তার ফয়দা কিছুই হ'ল না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বুদুর-এর প্রাসাদে হাজির হলাম। দেখি, সে আমারই পথ চেয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে।

আমি প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই বুদুর কয়েক কদম এগিয়ে এসে মুচকি হেসে ব'লে উঠল—'ইবন্ সাহাব, ফয়দা কিছুই হ'ল না। ঠিক কিনা? বেকার হয়রান হবেন, আমি তো জানতামই।'

বুদুর-এর বাৎ শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম।

সব শেষে বুদুর আমাকে তাজ্জব ক'রে দিল, যখন সে আমার ও জুবাইর-এর মধ্যে যেসব বাৎচিৎ হয়েছে সবই অবিকল বলতে লাগল।

তার ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি যেন একেবারে আশমান থেকে পড়লাম। মনে মনে বল্লাম—'লেড়কিটি কি গণৎকার, নাকি যাদুমন্ত্র কিছু জানে? তা যদি না-ও হয় তবে সে আমার পিছনে নির্ঘাৎ গোয়েন্দা টোয়েন্দা কিছু লেলিয়ে দিয়েছিল।

আমি বল্লাম—'ব্যাপার কি, এত সব তুমি জানলে কি ক'রে? কাছে পিঠে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিলে নাকি?'

ম্লান হেসে সে আমার প্রশ্নের জবাব দিল—'লুকিয়ে শোনার দরকার পড়ে না ইবন্ সাহাব। সাচ্চা মেহবুবার কাছে কোন কিছুই লুকানো যায় না। আপনার কোন কসুরই নেই। সবই আমার নসীব।'

এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশমানের দিকে তাকিয়ে ফিন বলতে শুরু করল—'মহব্বতের দেবতা, আত্মার দেবতা—আল্লাহ, আমার দিল্‌কে শক্ত ক'রে বাঁধার শক্তি দাও! আমার জুবাইর যদি কোনদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমার দরওয়াজায় হাজির হয় তবে আমি মুখ ঘুরিয়ে থাকব।' বুদুর আমার মেহনতের জন্য সুক্রিয়া জানিয়ে আমাকে বিদায় দিল।

আমীর মহম্মদ-এর সাথে ভেট করলাম। তার মকানে দু' রাত্রি কাটিয়ে ফিন বাগদাদে ফিরে এলাম।

পরের সালে আমি ফিন বসোরায় নগরে গেলাম।

জাঁহাপনা, কিস্‌সা বলার মাঝে আপনাকে বলা হয় নি, আমীর মহম্মদ একবার আমার কাছ থেকে বহুৎ দিনার হাওলাৎ নিয়েছিল। ফি বছর একবার ক'রে বসোরায় গিয়ে তার কিস্তির দিনার নিয়ে আসতাম। সে সালে বসোরায় গিয়ে মনে করলাম কি, একবারটি বুদুর-এর প্রাসাদে গিয়ে মেহবুব মেহবুবার খবর নিয়ে আসি।

বুদুর-এর প্রাসাদের দরওয়াজায় পা দিতেই কলিজাটি আচমকা মোচড় মেরে উঠল। প্রাসাদের দরওয়াজা-জানলা সব বন্ধ। দরওয়াজার জাফরি ফাঁক ক'রে সচকিত হয়ে ঝট করে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল নতুন একটি

স্মৃতিসৌধ। কবরের গায়ে কি সব লেখা। ছোট ছোট হরফ। দূর থেকে পাঠোদ্ধার করতে পারলাম না।

আমি চাপা আর্তনাদ ক'রে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ! লেড়কিটি শেষ পর্যন্ত বেহেস্তেই চলে গেল। অভিশপ্ত যৌবন! যৌবনের ভোগ-বাসনা অপূর্ণ রেখেই দুনিয়া ছেড়ে বুদুর চলে গেল! একটি তাজা ফুল অকালে ঝরে গেল!

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' পঞ্চাশতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আমি বিষণ্ণ দিল্ নিয়ে জুবাইর-এর মকানে ফিরলাম।

তার মকানের কাছাকাছি আসতেই আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। এখানে আর এক তাজ্জব ব্যাপারের মুখোমুখি হলাম। দেখি উমাইর-এর মকান ভেঙেচুরে জমিনের সঙ্গে মিশে গেছে। সব ফাঁকা। চমৎকার বাগিচাটি—উধাও হয়ে গেছে। ধারে কাছে এমন কোন আদমি নেই যাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আদৎ ব্যাপারটি জেনে নিতে পারি। ইয়া আল্লাহ! এ কী কারবার। শেষ পর্যন্ত কি নওজোয়ানটিও গোরে চলে গেল। একটি কবিতা মনে পড়ে গেল। যার মর্মার্থ হ'ল—

'দরওয়াজার গোবরাট দেখেই আমার চোখে পানির ধারা নেমে এল। সে-আতিথেয়তার শাহজাদা আজ কোথায় উধাও হয়ে গেল? আমার পাশাপাশি যারা বসত সে সব মেহমানরা কোথায় গেল? মাকড়সা প্রশ্ন করছে, আর তার জবাব দিচ্ছে বাতাস।'

আমি দুঃখ সহ্য করতে না পেরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আচমকা আমার পিছনদিক থেকে এক বুড়ো বিকট স্বরে গর্জে উঠল —'চুপ কর বেকুব কাঁহিকার!' তাজ্জব বনলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, এক নিগ্রো ক্রীতদাস।

আমি চোখ মুছতে মুছতে বল্লাম—'গোস্‌সা করছ কেন ভাইজান? আমার এক দোস্ত দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। তারই নাম ক'রে একটু চোখের পানি ফেলছি।'

—'দোস্ত? কে তোমার দোস্ত হে?'

—'জুবাইর বিন উমাইর।'

—'ধ্যুৎ, যত্তসব অলক্ষুণে কথা! তিনি মরতে যাবেন কেন হে? খোদার দোয়ায় তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন।'

—'বহাল তবিয়তে—তবে মকান, বাগিচা সব গেল কোথায়?'

—'মহব্বতের জন্য—'

—'ম-হ-ব্ব-ৎ? মহব্বতের জন্য?'

—'জী হ্যাঁ, মহব্বতের জন্য। জুবাইর জিন্দা আছেন বটে। তবে গোরে যেতে আর খুব বেশী দেরী নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ নেই। বোধশক্তি মাঝে-মধ্যে ফিরে এলেও মুখফুটে খানা চাইতে পারেন না। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও পানি চাওয়ার হিম্মৎটুকুও আজ আর তার নেই।'

—'তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জুবাইর'কে গিয়ে বল মনসুর সাহাব দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে।'

ক্রীতদাসটি চট্ ক'রে ভেতর থেকে ঘুরে এসে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল।

আমি কামরার ভেতরে ঢুকেই জুবাইর-এর মুখোমুখি হলাম। দেখি সে পালঙ্কের ওপরে আধ-শোয়া অবস্থায়। হাড্ডি ক'টি সার। কঙ্কালের মত নিশ্চল-নিথর। দরওয়াজার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। শরীরে এক ছিঁটে খুন আছে বলেও মালুম হ'ল না।

আমি দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে জুবাইর'কে সালাম জানালাম। কুশলবার্তা জানতে চাইলাম। তার দিক থেকে কোন সাড়াই পেলাম না।

নিগ্রো ক্রীতদাসটি আমার কানের কাছে মুখ এনে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌ল—'কবিতা ছাড়া তিনি এখন কিছুই শুনতে পান না।'

তার কথাটি কানে যেতেই চমকে উঠলাম। ধরতে গেলে খুবই ঘাবড়ে গেলাম। মুহূর্তে নিজের অসহায় অবস্থা কাটিয়ে একটু স্বাভাবিক হতে পারলাম। একটি কবিতা আওড়াতে লাগলাম। কবিতাটির বিষয়বস্তু—

'বুদুর এখনও তোমার খুবলে খুবলে ক্ষতবিক্ষত আত্মাকে শিক্ষা দিয়ে চলেছে। অথবা তুমি তার নির্দেশ এখনও অনুভব করছ না? অথবা এখনও সে নির্ঘুম রাত্রি যাপন ক'রে চলেছে। তুমি এক মূর্খ, নির্বোধ, নির্বোধ-প্রেমিক।'

আমি নড়েচড়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, কাজ হয়েছে। কবিতাতে কাজ হয়েছে। জুবাইর-এর নিশ্চল চোখের মণি দুটো সচল হ'ল। খুবই অনুচ্চ কণ্ঠে কোনরকমে উচ্চারণ করল—'ইবন্ বিন-মনসুর। সালাম। আমার হালৎ তো চোখের সামনেই দেখছেন। যা কিছু বিলকুল বিলিয়ে দিয়ে আজ আমি ভিখমাঙ্গা বনে গেছি।'

আমি একই রকম অনুচ্চকণ্ঠেই জবাব দিলাম—'আমি কি আপনার কোন উপকারে লাগতে পারি?'

—'ইবন্ সাহাব, একমাত্র আপনার পক্ষেই আমার জানটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব।' মেহেরবানি ক'রে আমার একটি চিঠি যদি বুদুর-এর কাছে পৌঁছে দেন, আমার কথা তাকে বলেন তবে ধন্য হ'ব। একমাত্র আপনার পক্ষেই এ-কাজ সম্ভব ব'লে আমি মনে করি।'

—'আপনার হুকুম তামিল করব আল্লাহ-র নামে কসম খাচ্ছি।'

তাজ্জব বনে গেলাম। আমার বাৎ তার কানে যেতে না যেতেই যন্ত্রচালিতের মাফিক তড়াক্ ক'রে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে পাশ থেকে এক চিলতে কাগজ ও কলম টেনে নিয়ে লিখতে লাগল।

মেহবুব বুদুর,

মালুম হবে আমি হয়ত পাগল বনে গেছি। আমার দিমাক বিলকুল খতম। চোখের তারায় সুস্পষ্ট হতাশার ছাপ। জর্জরিত—দিশেহারা। একসময় মালুম হয়েছিল মহব্বৎ বোকামি ছাড়া কিছু নয়। ধারণা ছিল, এর মত সহজ-সরল-হাল্কা আর কিছুই নেই। কিন্তু তোমার অদৃশ্য জবরদস্ত মহব্বতের জোয়ারে ক্রমে বিপর্যস্ত হতে হতে আজ আমার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। মহব্বৎকে একদিন খড় কুটোর মত তুচ্ছ জ্ঞান করে দু পায়ে ঠেলে দিয়েছিলাম। আজ কিন্তু স্পষ্ট মালুম হচ্ছে মহব্বৎ সাগরের মত অতল এবং অনন্ত তার বিস্তৃতি। আমার কলিজা আজ টুকরো টুকরো। তোমার সান্নিধ্য ছাড়া তো আমার কলিজা স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে না। আমাকে তোমার বুকে টেনে নাও। অতীতে তোমার মহব্বতকে অবমাননা ও তাচ্ছিল্য জ্ঞান করার জন্য আমি আভূমি-লুণ্ঠিত হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করছি। মেহেরবানি ক'রে আমার কসুর মাফ ক'রে দাও।

বুদুর আমার, একবারটি ভেবে দেখ তো একদিন আমাদের উভয়ের মধ্যে মহব্বতের কী দুর্নিবার আকর্ষণই না ছিল! তোমার বিরহ আমাকে গোরে যাবার জন্য প্রেরণা জোগাচ্ছে। আমার জান খতম হয়ে এল ব'লে। তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার না, পারবে না আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস—ইতি—'

আমি আমীর জুবাইর-এর চিঠি জেবে নিয়ে পথে নামলাম। বুদুর কোথায়, কি তার বর্তমান হালৎ কিছুই আমার মালুম নেই।

বুদুর-এর মকানে ঢুকে সোজা তার বৈঠকখানার দরওয়াজায় হাজির হলাম। ভেতরে উঁকি দিতেই আমার কলিজা তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠল। দেখি, বুদুর দশটি বাঁদী পরিবেষ্টিতা হয়ে কামরার মেঝেতে বসে। তার তবিয়ৎ, মেজাজ মর্জি আগের চেয়ে ঢের, ঢের শরিফ। তার চোখে-মুখে-বুকে যৌবনের জোয়ার। হেসে হেসে বাঁদীদের সঙ্গে মজলিশে মেতেছে নাকি? ভাবতে লাগলাম—তবে সেদিন কার কবর দেখেছিলাম?

আমাকে দরওয়াজায় দেখেই একগাল হেসে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বুদুর বল্ল—'কী নসীব আমার! আসুন—ভেতরে আসুন। দ্বিধা-সঙ্কোচের কোনই কারণ নেই।'

—'খোদাতাল্লার দোয়া তোমার ওপর বর্ষিত হোক।'

—'কি ব্যাপার, সকালে বৈঠকখানায় চুপচাপ বসে—'

আমার মুখের বাৎ কেড়ে নিয়ে বুদুর বল্ল—'সেই যে সেই লেড়কিটি, মারা গেছে। বাগিচায় তার গোর দেয়া হয়েছে। তার দু'
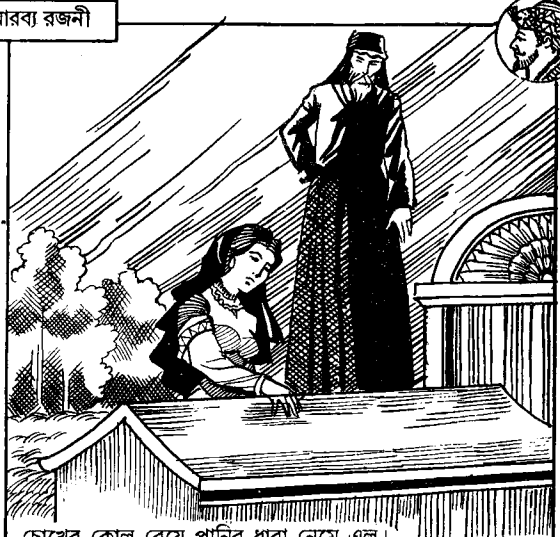
চোখের কোল বেয়ে পানির ধারা নেমে এল।

—'সবই খোদাতাল্লা-র মর্জি। পরম করুণাময় তার আত্মার মঙ্গল করুন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বল্লাম—'লেড়কিটি তোমাকে বহুৎ পিয়ার করত, তুমিও তাকে পিয়ার ঢেলে দিয়েছিলে। তার জন্য তোমার চোখের পানি তো ঝরবেই।'

—'হ্যাঁ, লেড়কিটিকে আমি বহুৎ পিয়ার করতাম, ঠিকই।'

পরিস্থিতিটি একটু সামাল দিয়ে নিয়ে আমি জেব থেকে আমীর জুবাইর-এর চিঠিটি বুদুর-এর হাতে তুলে দিয়ে বল্লাম—'শোন, তোমার বিরহে তার হালৎ আজ একেবারেই শোচনীয়। মৌউতের সাথে পাঞ্জা লড়ে চলেছে। তোমার মতামত শোনার জন্য এখনও জানটিকে টিকিয়ে রেখেছে।'

চিঠিটির ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিল। ম্লান হাসল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই সে বল্ল—'সে তো গত সালেরই ব্যাপার তাই না, আমার চিঠিটি পড়ে সে পরম বিতৃষ্ণায় ছিঁড়ে ফেলেছিল? এরই মধ্যে আমার বিরহে একেবারে গোরে যাবার মত হালৎ হয়ে গেল! যাক গে, আমার উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয়েছে। আমার নীরবতায় সে হতাশায় জর্জরিত হয়েছে। তাকে কাছে ফিরে পাবার জন্য আমি সব রকম কোশিস করেছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই সে বিতৃষ্ণায় আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তবুও হাল ধরে রেখেছিলাম।

এ পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' একান্নতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ পরের রজনীতে কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, ইবন্ বিন্ মনসুর খলিফা হারুণ-অল-রসিদ'কে কিস্‌সা শোনাচ্ছে। সে এবার বল্ল—তুমি

ঠিকই করেছ। সে যে জঘন্য কসুর করেছে তাকে হাল্কা চোখে বিচার ক'রে অল্পেতে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তবে এ-ও সাচ্চা বাৎ ক্ষমা আদমির চরিত্রের এক মহৎ গুণ। আমি এ-ও বলছি, এমন এক প্রাসাদোপম বিশাল মকানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থেকে তোমার কি-ই বা ফয়দা? আর তার জান যদি খতমই হয়ে যায় তবে কি আর তুমি শান্তি পাবে, বল? তুমি কি জিন্দেগীভর অনুশোচনায় দগ্ধে মরবে না?'

বুদুর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'হ্যাঁ, আপনার বাৎ-ই সাচ্চা। আমি তার চিঠির জবাব জরুর দেব।

বুদুর কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল।

জাঁহাপনা, তার সে-চিঠির ব্যাপারে আপনাকে কি যে বলব, মালুমই হচ্ছে না। কী চমৎকার তার লেখার ভঙ্গি, কী চমৎকার তার ভাব, কী চমৎকার যে তার ভাষা আপনাকে ব'লে বুঝাতে পারব না। যাকে বলে ভাব—ভাষা আর আবেগে একেবারে মাখামাখি অবস্থা। আপনার দরবারের সবচেয়ে বড় কবি বা লেখকও হয়ত এমন একটি চিঠি দাঁড় করাতে পারবেন না। আর আমার পক্ষে তো চিঠির বক্তব্য হুবহু বলা সম্ভবই নয়। তাই বাধ্য হয়ে তার বক্তব্য আর আমার ভাষা মিলিয়ে ঝুলিয়ে আপনার দরবারে পেশ করছি—

মেহবুব,

আমাদের উভয়ের মধ্যে যে কেন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তা সাধ্যাতীত কোশিস করেও আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি। অতীতে এমন কোন কসুর হয়ত হয়েছিল যার ফলে আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। তবে ভরসা এটুকুই যে, সে-অতীতের আজ মৃত্যু ঘটেছে।

মেহবুব আমার, তুমি আমার বুকে কবে ফিরে আসবে তারই প্রতীক্ষায় আমি পথ চেয়ে বসে থাকব। তোমার খুবসুরৎ গালে আমার চোখ দুটো ডুবিয়ে দিয়ে আমি পরম শান্তিতে নিদ যাব। আমার চোখ থেকে সেই কবে নিদ উধাও হয়েছে, তুমি কি জান? এবার আমি সুখে নিদ যেতে পারব শুনেই আমার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে, খুশীতে দিল্‌ ডগমগিয়ে উঠছে।

জিন্দেগীর যাবতীয় তেষ্টা যে-পানীয় মেটাতে পারে তুমি এলে উভয়ে একত্রে তা পান করব। কি গো, রাজী তো? আর পান ক'রে ক'রে যদি বেহেড মাতালও হয়ে পড়ি তবু কেউ কিছু বলবে না, বলার কেউ নেই।

এ-মুহূর্ত থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে থাকাই আমার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল।

ইতি—

আমি বুদুর-এর হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে কোর্তার জেবে গুঁজতে গুঁজতে বল্‌লাম—'তোমার চিঠি অবশ্যই জীবনীশক্তি ফিরিয়ে এনে চাঙা ক'রে তুলবে। আর দুঃখ-যাতনা দিল্‌ থেকে বিলীন করে দেবে।'

আমি চৌকাঠ ডিঙতে যাব অমনি বুদুর আমার কোর্তার কোণা ধরে হাল্কা টান দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম।

বুদুর কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'ইবন্‌ সাহাব, মেহেরবানি ক'রে এমন বন্দোবস্ত করবেন যাতে আজই আমরা বেহেস্তের রাত বানিয়ে ফেলতে পারি—তাকে বলবেন।'

আমি হাঁফাতে হাঁফাতে আমীর জুবাইর-এর দরওয়াজায় হাজির হলাম। দেখি সে দরওয়াজা খুলে, কুর্শি পেতে বসে অপলক চোখে পথের দিকে তাকিয়ে।

চিঠিটি পড়ামাত্রই তার চোখ দুটো চিকমিকিয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই চোখের কোল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। খুশীর অশ্রু। আবেগে-উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মালুম হ'ল কি যে বলবে, আর কি-ই বা করবে ভেবে ওঠাই তার পক্ষে মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পারল না। এক সঙ্গে জোয়ারের পানির মত আনন্দের কাছে নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। কুর্শি থেকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। ব্যস, সংজ্ঞা হারিয়ে একেবারে শক্ত কাঠ হয়ে গেল।

ক্রীতদাসীরা পানির বদনা নিয়ে ছুটে এল। চোখে-মুখে ঘন ঘন পানির ছিটা পড়তে লাগল।

চোখ মেলে তাকাল এক সময়। আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এতবড় কামরাটি বিলকুল নীরব নিস্তব্ধ। এক সময় সে-ই নীরবতা ভঙ্গ করল—'ইবন সাহাব, চিঠিটি কি তার নিজের হাতেই লেখা?'

—'হাতে ছাড়া আর কিসে লিখবে?' ইচ্ছা করেই আমি এমন একটি খাপ ছাড়া উত্তর তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

আমার মুখের বাৎ ফুরাতে না ফুরাতেই পর্দার আড়ালে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। মালুম হ'ল কেউ যেন পায়ে মল পরে হাঁটছে।

আমার ধারণা বিলকুল ঠিক। মুহূর্তের মধ্যে বুদুর পর্দা ঠেলে আমাদের কামরায় ঢুকে পড়ল। জাঁহাপনা, সে যেন এক বেহেস্তের দৃশ্য। আপনাকে আমি বলে বুঝাতে পারব না।

আমীর জুবাইর যন্ত্রচালিতের মত তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই কপোত-কপোতী বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে পড়ল। আমার উপস্থিতির কথা আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোয়ারে তাদের মন থেকে মুছে গেল। শরম টরম তাদের দিল্‌ থেকে সে-মুহূর্তের জন্য অন্ততঃ উবে গিয়েছিল।

আমি পিছন ফিরলাম।

বুঝলাম তাদের কারোরই টু-শব্দটিও করার উপায় নেই।

অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে মালুম হ'ল, তাদের একজনের ওষ্ঠদ্বয় অন্যজনের ওষ্ঠদ্বয়ের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে।

আমি চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিলাম। পারলাম না। থমকে যেতেই হ'ল।

বুদুর-এর কণ্ঠস্বর কানে এল—'ওঃ হো, আমি বসছি না। আগে আমাদের মধ্যে চুক্তি হবে তারপর বসাবসি।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। দেখি, বুদুর তার মেহবুবের কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলছে।'

জুবাইর বল্‌ল—'বুঝেছি। অবশ্যই সেটি আজই সেরে ফেলতে হবে। ব্যবস্থা করছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদর-দরওয়াজা দিয়ে কাজীকে ঢুকতে দেখলাম। সঙ্গে ক'রে একজন সাক্ষীকেও নিয়ে এসেছে।

কাজী ব্যস্ত-হাতে সাদীর কবুলনামা লিখে ফেল্‌ল। দু' জনকে হলফনামা পাঠ করানো হ'ল।

কাজী ও সাক্ষী বুদুর-এর কাছ থেকে এক হাজার ক'রে দিনার বুঝে পেয়ে খুশী হয়ে বিদায় নিল।

কাজী বিদায় নিলে আমিও তৈরি হতে লাগলাম। হঠাৎ পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে আমীর জুবাইর আমার হাত থেকে কোর্তাটি ছিনিয়ে নিয়ে বল্‌ল—'দুঃখের দিনে পাশে থেকে চোখের পানি মুছিয়ে দিলেন আর সুখের দিনে দূরে সরে যাবেন সে কি হয় ইবন্ সাহাব?'

আমি আর জোরাজুরি করলাম না জাঁহাপনা, আপনিই বলুন, কব্জী ডুবিয়ে শাদীর খানা কে-ই বা দু' পায়ে ঠেলে দিতে উৎসাহী হয়?'

পরের সকালে আমার বিদায় নেবার কথা। প্রস্তুতিও নেয়া শুরু ক'রে দিয়েছি। আমীর জুবাইরকে বল্‌লাম—'হঠাৎ একটি কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।'

—'কৌতূহল? কিসের কৌতূহল, বলুন তো ইবন্ সাহাব?'

—'প্রথম দিন আপনার দরওয়াজায় পা দিয়েই দেখি, আপনি রেগে একেবারে কাঁই হয়ে রয়েছেন। কেন?'

জুবাইর গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল।

আমি ব'লে চল্‌লাম—'আর এক প্রশ্ন—আপনাদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পিছনে কারণ কি ছিল? বুদুর-এর মতামত অবশ্য আমি আগেই জেনেছি। তার মুখে শুনেছিলাম, আপনি হঠাৎ-ই তার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে আমার কলিজাটি ছটফট করছে। সামান্য যে ঘটনাটিই আপনার চলে আসার প্রধান ও একমাত্র কারণ, নাকি অন্য কোন কারণ এর পিছনে ছিল? আমার বিশ্বাস, অন্য কোন কারণ নির্ঘাৎ এর পিছনে ছিল, বলুন?'

সে ম্লান হেসে বল্‌ল—'আপনি প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। বুদুর-এর সে-লেড়কিটি আজ গোরে গেছে। আমার গোস্‌সাটুকুও সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে। আর আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কি ক'রে হ'ল তা আপনাকে বলতে আজ আর আমার কোন দ্বিধা নেই।'

—'তবে বলুনই না, শুনি।'

—'খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার। আমি একবার বুদুর'কে নিয়ে নৌকো ক'রে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তার আর সেই লেড়কিটির কিছু কাম কাজ দেখে নৌকার বুড়ো মাঝি আমাকে বল্‌ল—'হুজুর, গুস্তাকি মাফ করবেন। একটি বাৎ আপনাকে বলছি, যে বিবি তার স্বামীর চেয়ে বাঁদীকে বেশী পিয়ার ক'রে, তাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে রঙ্গ তামাশা করে, সে-বিবিকে কোন স্বামীর পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব, বলুন? তারা একদিন আমার নৌকার গলুইয়ে জাপ্টাজাপ্টি ক'রে বসে মহব্বতের গানায় একেবারে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছিল। কী সব কথা যে সে গানায় ছিল শুনলে আপনার গা ঘিন ঘিন ক'রে উঠবে। আমারই গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল হুজুর।'

—'কি গানা, কি কথা, বল তো শুনি?'

—'গানার মাধ্যমে বলা হয়েছিল—আমার কলিজায় যতটুকু উষ্ণতা ছিল সবই ক্রমে শীতল হয়ে গেছে। কারণ, আমার মেহবুব যে আর আগের মত নেই। তাই তার মহব্বৎ এখন গরল হয়ে দেখা দিয়েছে। সম্প্রতিকালে আমি মহব্বতের যা কিছু কায়দা কলম দেখাই না কেন তার অনেক অনেকই পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার দিল্‌টি এখন কেমন ভোঁতা ভোঁতা হয়ে গেছে, আর যা কিছু সবই বিলকুল কাদার মত তুলতুলে।'
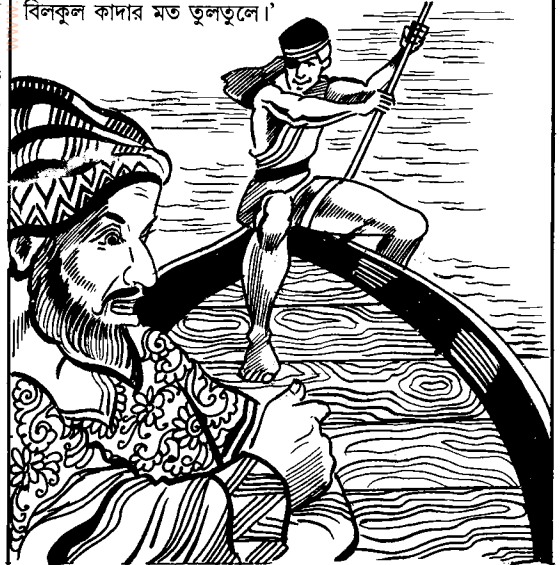
মাঝির মুখ থেকে তাদের কাণ্ডকারখানার বিবরণ শুনে আমার দিমাক খারাপ হয়ে গেল। শিরা-উপশিরায় খুন টগবগিয়ে উঠল। চোখে আন্ধার দেখতে লাগলাম। আপন মনে ব'লে উঠলাম—'সাচ্চা বাৎ। এ-তো বরদাস্ত করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়।'

হন্তদন্ত হয়ে বুদুর-এর মকানে গেলাম। তারপর? তারপর যে-দৃশ্য চোখের সামনে দেখেছি তা-তো আপনিই আমাকে বলেছেন।

আমার শিরে খুন চেপে গেল। অনুচ্চ কণ্ঠে বল্লাম—'যা শুনেছি তা তবে ঝুটা নয়। মাঝির সন্দেহ মোটেই অমূলক নয়।

থাক গে ইবন্ সাহাব, সে সব তো এখন ইতিহাসের পাতায় উঠে গেছে। সেখান থেকে আর আমাদের দু' জনের মধ্যে টেনে আনার ইচ্ছে নেই, উচিতও নয়। আমরা উভয়েই সে সব আজ দিল্ থেকে মুছে ফেলব।'

এ পর্যন্ত বলার পরই ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' বাহান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, ইবন্ আল-মনসুর খলিফাকে বল্লেন— আমীর জুবাইর তারপর আমার হাতে একটি দিনারের থলি গুঁজে দিয়ে বল্ল—'আমাদের জন্য আপনি যা কিছু করেছেন তার মূল্য সামান্য অর্থ বা কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মাধ্যমে পরিশোধ হবার নয়। তবু আপনি এটি ধরুন। আমাদের মাঝখানে আপনি এসে না পড়লে আমাদের উভয়েরই জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যেত। এতে মাত্র তিন হাজার দিনার আছে গ্রহণ ক'রে আমাদের ধন্য করুন।'

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। থলিটি হাতে নিয়ে, তাদের আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নিলাম।

—'ওরে ব্বাস! বিকট আওয়াজ যে! কিসের আওয়াজ?' ইবন্ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে খলিফা আরাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে নাক ডাকিয়ে নিদে বিভোর। হায় খোদা! খলিফা নিদ যাচ্ছেন আর ইবন্ তাঁকে কিস্‌সা শুনিয়ে চলেছেন।

ইবন্ কামরা ছেড়ে নিজের জায়গায় গিয়ে আগের মতই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল।

কিস্‌সাটি শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

মুহূর্তকাল পরে বেগম ফিন মুখ খুল্লেন—'কী তাজ্জব বাৎ জাঁহাপনা, যে-কিস্‌সা শুনে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ নাক ডাকিয়ে নিদে বিভোর হয়ে পড়েছিলেন সে-কিস্‌সা আপনার চোখে নিদ আনতে পারল না!'

—'আমি যে ঠিক তার বিপরীত কোশিস চালিয়ে যাচ্ছি। আমার চোখে যাতে নিদ না আসে সে-কোশিসের বাৎ সমঝাতে চাইছি।' বাদশাহ শারিয়ার সরবে হেসে উঠলেন।

বেগম শাহরাজাদও তাঁর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। হাসি থামিয়ে বাদশাহ শারিয়ার বল্লেন—'এবার তোমার মুখ থেকে আমরা একটি শিক্ষামূলক কিস্‌সা শুনতে চাচ্ছি, কি বল দুনিয়াজাদ!'

দুনিয়াজাদ হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! বহিনজী এখনই শুরু ক'রে দাও। এখনও তো রাত্রি অনেকই আছে। এর মধ্যে যতটুকু হয় বল।'

বাদশাহ শারিয়ার এবার বল্লেন—'এমন এক কিস্‌সা বল যে সব লেড়কী স্বামীর দিলে কেবলমাত্র নারীদেহ ভোগের কামনা জাগিয়ে তোলে আর তাকে সুখ-ভোগের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে গোরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পরিণামে তাদের কি শাস্তি হতে পারে তা-ও যেন কিস্‌সার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

উজিরের লেড়কি ও কসাই ওয়াঁর্দার কিস্‌সা

জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে কায়রো নগরে ওয়াঁর্দা নামে এক নওজোয়ান বাস করত। তার একটি কসাইখানা ছিল। গোস্তর কারবারী। কায়রো নগরেই ছিল তার গোস্তর দোকানটি।

একটি লেড়কি রোজ ওয়াঁর্দার দোকানে মাংস খরিদ করতে আসত। তার কেবলমাত্র মুখটিই নয়, পা থেকে মুখ অবধি রঙ ছিল বিবর্ণ, চকের মত ফ্যাকাসে। চোখ দুটোর দিকে তাকালেও তাকে বড়ই ক্লান্ত বোধ হত। কেমন যেন বিষণ্ণ, মনমরা।

লেড়কিটি যখন গোস্ত খরিদ করতে আসত তখন ঝাঁকা নিয়ে কুলি তার পিছনে থাকত। সে দোকানে এলেই ভেড়ার সবচেয়ে মাংসল অংশ ও এক জোড়া রাং খরিদ করত। একটি ক'রে সোনার ছোট মোহর দিয়ে রোজ দাম মেটাত। গোস্ত থাকত কুলিটির ঝুড়ির ভেতরে। তারপর সে ঘুরে ঘুরে বাজার থেকে হরেক কিসিমের সওদা খরিদ করত।

লেড়কিটির বাইরের স্বভাবও ছিল তার চেহারার মত ম্যাড়ম্যাড়ে। প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে দাঁড়িয়ে বাৎচিৎ করা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ।

লেড়কিটির দীর্ঘদিন ধরে একই রকমভাবে চলাফেরা, গোস্ত খরিদ করা আর সওদাপাতি কুলির মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া—সব কিছু দেখে ওয়াঁর্দা-র মধ্যে কৌতূহলের উদ্রেক ঘটল। কিন্তু লেড়কিটি নির্বাক। কৌতূহল নিবৃত্ত করার উপায় কি? বাধ্য হয়ে ওয়াঁর্দাকে ধৈর্য ধরতেই হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যে ওয়াঁর্দা অপূর্ব এক সুযোগ পেয়ে গেল। এক

বিকালে লেড়কিটির সে-কুলিকে তার দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখল। হাঁক দিল। সে এগিয়ে এলে ওয়াঁর্দা তার হাতে একটি বড়সড় ভেড়ার মাথা দিয়ে বল্‌ল—'আমি ছাল ছাড়িয়ে একদম ঠিকঠাক ক'রে দিয়েছি। রসুইকরকে বলবে, মাথাটি যেন গোটাই পাক করে। কুঁচিকুঁচি করলে স্বাদ থাকবে না।'

কুলিটি ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানাল।

ওয়াঁর্দা একটু আমতা আমতা ক'রে এবার আদৎ প্রসঙ্গটি পাড়ল—'ওহে মিঞা, তুমি রোজ যে-লেড়কিটির সঙ্গে বাজারে আস সে কে, বল তো?' লেড়কিটি রোজ গোস্তর সঙ্গে একটি ক'রে ভেড়ার অণ্ডকোষ নেয় কেন, বল তো? আর একটি বাৎ, তাকে সব সময় যেন কেমন বিমর্ষ দেখায়।'

—'জানার জন্য আপনার কলিজাটি খুবই ছটফট করছে, তাই না? তবে আমি তেমন কিছু জানি না। আপনি যখন গরীবকে ডেকে একটি ভেড়ার গোস্ত বকশিস দিলেন তখন যেটুকু জানি না বল্‌লে গুনাহ হবে। যা জানি বলছি—আমার মালকিন একদিন সওদাপাতি খরিদ করার পর ওই কোণার দিককার খ্রীষ্টানের দোকান থেকে খাওয়ার জন্য সরাব খরিদ করলেন। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে উজির সাহেবের বাগান-বাড়িতে গেলেন। এক চিলতে কাপড় দিয়ে আমার চোখ দু'টি বেঁধে দিলেন। আমাকে হাত ধরে টেনে একটি সিঁড়ির কাছে হাজির করলেন। আমাকে নিয়ে নিচে নেমে যেতে লাগলেন। কিছুটা নামতেই কে একজন আমার মাথা থেকে সওদার ঝুড়িটি তুলে নিয়ে একটি দিনার আমাকে দিল। আর চোখ বাঁধা অবস্থায় ফিন সিঁড়ি ভেঙে আমাকে ওপরে উঠিয়ে আনা হ'ল। আমি ঝুড়ি ফেলেই ফিরে আসি।'

—'আচ্ছা, এতগুলো গোস্ত, মোমবাতি ও বাদাম প্রভৃতি রোজ তার কি কাজে লাগে?'

—'সে খবর আপনাকে দিতে পারব না হুজুর।'

—'ব্যস, এ-পর্যন্তই তোমার দৌড়? কিন্তু মিঞা, আমার কৌতূহল দমন করা তো দূরের কথা এ যে দেখছি আরও হাজার গুণ বাড়িয়ে দিলে।'

কুলিটি ওয়াঁর্দাকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিল। লেড়কিটির ব্যাপার নিয়ে ওয়াঁর্দা ভাবতে বসল। এমন কি রাতভর একই ভাবনায় ডুবে রইল।

পরের দিনও একই ঘটনা ঘটল। লেড়কিটি গোস্ত খরিদ করল। দাম মিটিয়ে দিয়ে কুলিটিকে নিয়ে চলে গেল।

ওয়াঁর্দা জেদ ধরল—যে করেই হোক ব্যাপারটির একটি হিল্লে সে করবেই। আর তা আজই ক'রে ফেলবে। সে নজর রাখল কখন সে বাজার ছেড়ে যায়।

এক সময় সওদা সেরে লেড়কিটি বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে

লাগল। ওয়াঁর্দা ভেড়া জবাইয়ের একটি বড়সড় ভোজালি হাতে নিয়ে তার পিছু নিল। লেড়কিটি যাতে তাকে দেখতে না পায় এমন কায়দায় ও দূরত্ব বজায় রেখে রেখে সে গোপনে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। উজিরের বাগিচার সামনে হাজির হ'ল লেড়কিটি। ওয়াঁর্দা একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে বড় একটি রুমাল দিয়ে বেশ ক'রে কষে কুলিটির চোখ দুটো বেঁধে দিল। তাকে নিয়ে কিছু দূর এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছু সময় বাদে কুলিটি বেরিয়ে এল। তার চোখ খোলা।

ওয়াঁর্দা খুবই সতর্কতার সঙ্গে লেড়কিটিকে অনুসরণ করতে লাগল। লেড়কিটি এগোতে এগোতে অতিকায় একটি পাথরের চাঁইয়ের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। না, ধারে-কাছে কেউ-ই নেই।

লেড়কিটি এবার নিচের দিকে ঝুঁকল। পাথরের একটি বিশেষ জায়গায় হাত দিয়ে চাপ প্রয়োগ করল। ব্যস, মুহূর্তে একটি গর্ত বেরিয়ে গেল। গর্তটির মুখেই একটি পাথরের সিঁড়ি। লেড়কিটি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। একেবারে ভোঁ ভাঁ।

ওয়াঁর্দা এবার পা টিপে টিপে সে গর্তটির কাছে গেল। পাথরটির গায়ে চাপ দিল। তারপরই সিঁড়ি।

এবার কসাইয়ের জবানীতেই কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শোনা যাক। কসাই ওয়াঁর্দা বল্‌ল—গর্তের মুখে পাথরচাপা দিয়ে দেওয়া ভেতরে জমাটবাঁধা অন্ধকার দেখা দিল। নিজের হাতটিকে পর্যন্ত ভালভাবে দেখা যায় না। কোন্ দিকে যাব, কি করব চট ক'রে ভেবে উঠতে পারলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম মৃদু আলোর রেখা। হাল্কা আলোটুকু সম্বল ক'রে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম। বুকের ভেতরে অনবরত হাতুড়ির ব্যস্ততা।

সামান্য এগোতেই সামনে একটি দরওয়াজা পড়ল। তাতে কান ঠেসে ধরলাম। ভেতর থেকে হাসির রোল ভেসে এল।

দরওয়াজার গায়ে ছোট একটি ছিদ্র ছিল। সে-ছিদ্রপথে আলো বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

আমি কৌতূহলের শিকার হয়ে ছিদ্রটিতে চোখ লাগিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলাম। অতর্কিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হ্যাঁ, অবিকল সে-লেড়কিটির মতই বটে। ফিন ছিদ্রটিতে চোখ লাগালাম। নিঃসন্দেহ হলাম, সে-লেড়কিটিই তো বটে।

আমার বুকের উত্তেজনা অনেকাংশে বেড়ে গেল।

আমি আবার ছিদ্রটিতে চোখ রাখলাম। তাজ্জব বনে গেলাম। দেখলাম, লেড়কিটি একেবারেই বিবস্ত্রা। চিৎ হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে সে শুয়ে। আর একটি ইয়া গোদা বানর তার ওপরে উঠে কি যেন করছে। দলাইমালাই। একেবারে লদকালদকি করার মত ভাব।
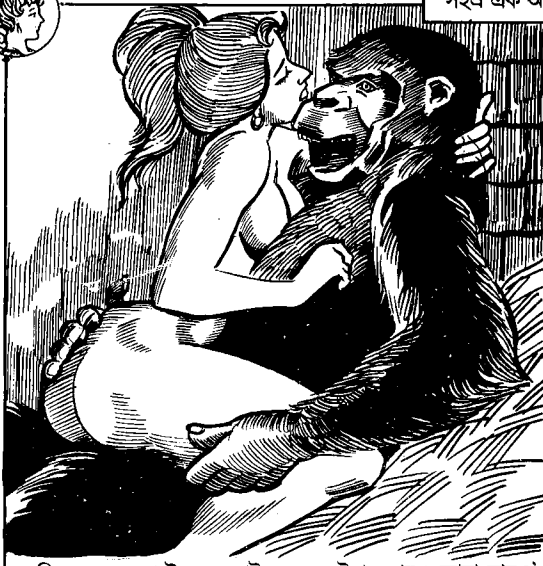
নাকি করছেও তা-ই? ধুৎ ছাই, এমন ঘটনা কখনও ভাবা যায়?'

বানরটির মুখ কিন্তু অনেকটা মানুষের মুখের মত।

বানরটি এবার নিজের মুখটি নামিয়ে লেড়কিটির মুখের কাছে নিয়ে গেল। লেড়কিটি উত্তেজনায় তার ঠোঁট দুটোকে নিজের ঠোঁটের ওপর ঠেসে ধরল। তারপর মাথাটি বার বার এদিক-ওদিক কাৎ করে চারটি ঠোঁটকে হরদম ঘষাঘষি করতে লাগল।

বানরটি এবার যেন হিংস্র নেকড়ের মাফিক ক্ষেপে গেল। এক লাফে লেড়কিটির ওপরে চেপে গেল। তারপর উভয়ে উভয়কে শরীরের সবটুকু তাগদ নিঙড়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল। বানরটি এবার তার লোমশ শরীরটি দিয়ে লেড়কিটিকে প্রায় ঢেকে ফেল্‌ল।

বানরটি এবার যেন অধিকতর উন্মাদদশা প্রাপ্ত হ'ল। লেড়কিটির ওপর বার বার লাফালাফি দাপাদাপি শুরু করে দিল। আর লেড়কিটি? সে তলে পড়ে তৃপ্তিতে-আবেগে-উচ্ছ্বাসে বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ অবর্ণনীয় উত্তেজনায় জাপ্টাজাপ্টি, লাফালাফি, দাপাদাপি ক'রে হাঁপাতে লাগল।

একবার নয়। পর পর তিনবার বানরটি লেড়কিটির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাফালাফি দাপাদাপি করল আর কিছুক্ষণ ধরে বিশ্রাম করল।

আমি ভাবলাম তিনবারেই বানরটির কম্ম ফতে হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। অন্ততঃ দশবার তো হবেই। ইয়া আল্লা! তাজ্জব ব্যাপার! বানরটি না হয় জানোয়ার—সবই সম্ভব। কিন্তু লেড়কিটি? এক রাত্রে পর পর দশবার সে যে কি ক'রে বানরটির ধস্তাধস্তি বরদাস্ত করল আমার দিমাকে এল না।

কাম কাজ সেরে তারা জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে নিদ যেতে লাগল। বানরটির ব্যাপার ঠিক মালুম হ'ল না। লেড়কিটির মুখে রীতিমত খুশীর আমেজ, পরম পাওয়ার ছাপটুকু আমার নজর এড়ায় নি।

কিস্‌সাটির এ পর্যন্ত বলা হতেই বাগিচায় পাখিদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। ভোরের পূর্বাভাষ। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' তিপ্পান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার কিস্‌সা শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কসাই ওয়াঁর্দা তার অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে এবার বল্‌ল—তখন আমার হালৎ কি যে হতে পারে আশা করি আপনাদের সমঝাতে হবে না। আমার কণ্ঠটি কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন সজোরে চেপে ধরল। টু-শব্দটিও গলা দিয়ে বেরলো না। আপন মনে বলতে লাগলাম—'ইয়া আল্লাহ! এমন রুচিও কোন লেড়কির হতে পারে!'

বানরটি অকাতরে নিদ যাচ্ছে। লেড়কিটিও গভীর নিদে আচ্ছন্ন। এমন সুযোগ আর মিলবে না ভেবে আমি খুবই সন্তর্পণে, একেবারে আলতো ক'রে দরওয়াজার পাল্লায় চাপ দিলাম।

পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে গেলাম। হাতে আমার জবাই করার ভোজালি। চকচক করছে। আদমিদের বিশ্বাস, এটি গোস্ত কাটার আগেই হাড়ে গিয়ে আঘাত করে। বুঝতেই পারছেন তার ধার কী পরিমাণ থাকে?

এক কোপে বানরটির মুণ্ডুটি ধড় থেকে আলাদা করে দিলাম। ফিন্‌কি দিয়ে খুন বেরিয়ে এল। জবাইকরা পাঁঠার মাফিক বার কয়েক লাফালাফি করেই মুণ্ডহীন ধড়টি স্থির হ'ল।

লেড়কিটি উদোম গায়ে গরম খুন লাগায় তার নিদ টুটে গেল। চোখ মেলে ভোজালি হাতে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিকট স্বরে আর্তনাদ জুড়ে দিল। মুহূর্তে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বহুৎ কোশিস চালিয়ে লেড়কিটির সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলাম। এবার সে আমাকে চিনতে পারল।'

বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটিয়ে লেড়কিটি এবার কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল—'তুমি সে ওয়াঁর্দা না? তোমার এক আচ্ছা খদ্দেরকে এ-ই ইনাম দিলে? এটিই কি আমার প্রাপ্য ইনাম?'

—'হ্যাঁ, ইনাম তো বটেই। জানোয়ারটির হাত থেকে তোমাকে রেহাই দিলাম। আচ্ছা, তোমাকে আনন্দ দেয়া, তোমার তৃষ্ণা মেটাবার মত কোন মরদই কি দুনিয়ায় নেই? এমন একটি জানোয়ারের সঙ্গে তুমি—'

তুমি এত সহজে আমার যন্ত্রণার কথা বুঝতে পারবে না। বিলকুল খুলে বলা দরকার। আমার কিস্‌সা শুনলে তবে হয়ত কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে।

আমার আব্বা এক উজির। অগাধ ধন দৌলতের মালিক। আমি তাঁর একমাত্র লেড়কি। আমার উমর যখন পনের তখন পর্যন্ত আমি আমার আব্বার প্রাসাদেই ছিলাম। ভালই দিন গুজরান করছিলাম।

আমাদের প্রাসাদে একটি গাট্টাগোট্টা নিগ্রো ক্রীতদাস ছিল। এক দুপুরে প্রাসাদে একটু নিরালা হলে আমি তার খপ্পরে পড়ে গেলাম।

ওয়াঁর্দা, তোমার হয়ত মালুম আছে, লেড়কিদের ভেতর কামোন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে তাদের সমান আর কেউ নেই। কিশোরীদের তো তারা একদম চোখের মণি। আর আমার চেহারাটিও এমন ছিল যে, যে কোন উমরে আমাকে বাইশ-তেইশ সালের লেড়কির মত দেখতে ছিলাম। আমাদের প্রাসাদের সে-নিগ্রোটিই প্রথম আমাকে যৌবনের, কামপিপাসা নিবৃত্ত করার স্বাদ পেলাম। দিল্ চনমনে হয়ে গেল। যৌনপিপাসাও এমন বেড়ে গেল যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিগ্রোটির সঙ্গে সহবাস না করলে পিপাসা মিটত না, কলিজা ঠাণ্ডা হ'ত না।

আমাদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্য দিয়ে দিন ভালই গুজরান হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন নসীব বাদ সাধল। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় আমার সুখের নাগর নিগ্রোটি মারা গেল।

তুমিই বল ওয়াঁর্দা, যে একবার পুরুষের স্বাদ পেয়েছে সে কি আর সহবাস ছাড়া থাকতে পারে? কিন্তু পুরুষের জন্য আমার কলিজা ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়তে লাগল।

কামজ্বালায় দগ্ধ হতে হতে একদিন আমাদের বাড়ির এক বুড়ির কাছে আমার ঘটনা খোলসা ক'রে বল্‌লাম।

সব কিছু শুনে বুড়ি বল্‌ল—'এ কাজে নিগ্রোদের চেয়ে উপযুক্ত আর কোন আদমিই নেই। যদি কোন নিগ্রোকে কব্জা করতে না-ই পার তবে গরিলার মত বড় সড় একটি বানর জোগার কর। লেড়কিদের জ্বালা নেভাতে বানররাও কম ওস্তাদ নয়।'

ব্যস, বানর খোঁজা শুরু করলাম। একদিন দেখি, আমাদের প্রাসাদের পাশের সদর রাস্তা দিয়ে একজন কয়েকটি বানরের গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।

তাজ্জব ব্যাপার! আমি লালচ মাখানো দৃষ্টিতে বানরগুলোর দিকে তাকাতেই দেখলাম, ইয়া গোদা একটি বানর ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখতে দেখতে পথ চলেছে। কেন, সে-ই জানে। আচমকা এক লাফ দিয়ে সে তার মালিকের হাত থেকে শেকলটি খসিয়ে ফেল্‌ল। ব্যস, এক লাফে পথের ওধারে চলে গেল। তারপরই একেবারে বে-পাত্তা।

বানরটির মালিক বহুৎ কোশিস করল। পাত্তা মিল্‌ল না। শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে হাল ছেড়ে দিল।

সন্ধ্যার কিছু বাদে সে আমার কামরায় ঢুকে গেল। আচমকা আমাকে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরল।

আমি ঘাড় ঘুরিয়েই কঁকিয়ে ওঠলাম। সে আমার তলপেটে পর পর কয়েকটি চুমু খেয়ে অভয় দেবার কোশিস করল।

সাচ্চা বাৎ, গোড়ার দিকে সে আমাকে জাপ্টে ধরলে আমার গা ঘিন ঘিন করত। আমি তো নিজে থেকে তাকে ধরতে সাহসই পেতাম না। ক্রমে ব্যাপারটি গা-সহা হয়ে যায়। এখন তো রীতিমত আরাম পাই। সাচ্চা বাৎ ইয়ে টিয়ে করার সময় মালুম হয় আমি বুঝি বেহেস্তে চলেছি।'

একদিন আমার আব্বা আমাদের সহবাসের দৃশ্য নিজের চোখে দেখে ফেল্‌লেন। আর যাবে কোথায়? আমাকে বেদম মারধোর করলেন।

কিন্তু আমি তো একেবারেই নাচার। ওকে ছাড়লে আমার জিন্দেগীই যে বরবাদ হয়ে যাবে।

এখন উপায়। চিন্তা ভাবনা ক'রে ফিকির একটি বের ক'রে ফেল্‌লাম। আমার নাগর সে-বানরটিকে এখানে এনে লুকিয়ে রাখলাম। এ বন্দোবস্তে সে-ও বাঁচল। আমিও দিনের পর দিন কামপিপাসা নিবৃত্ত করতে লাগলাম। একদম বেড়ে বন্দোবস্ত।

আমি রোজ তার জন্য খাবার আর সরাব নিয়ে আসি। এবার চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে লেড়কিটি আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এখন কে আমার জান টিঁকিয়ে রাখবে! আমি-ই বা কি নিয়ে বাঁচব!'

আমি তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌লাম—'কেঁদো না। চোখের পানি মোছ। দিমাক ঠাণ্ডা কর। ঝুটমুট কেঁদে কি-ই বা ফয়দা বল?'

—'ঝুটমুট? তুমি একে ঝুটমুট বলছ ওয়াঁর্দা! আমার জিন্দেগী বরবাদ হতে যাচ্ছে, আর তুমি কিনা একে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি ব'লে উঠলাম—'শোন, কান্না থামাও। তোমার তো কামকাজ চলা নিয়ে কথা, ঠিক কিনা?'

সে অতর্কিতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বুকে সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে এবার আমার বক্তব্যটিকে তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম—'হ্যাঁ, তোমার কাজ চল্‌লেই তো হ'ল, নাকি? বানরের বদলে আমি যদি তোমাকে—চলবে না? পরীক্ষার মাধ্যমেই বুঝতে পারবে হতচ্ছাড়া ওই বানরটির চেয়ে আমার তাগদ কিছু কমতি নয়।'

—অ্যাঁ! তুমি? তুমি বানরের পরিবর্তে—'

—'বল্‌লামই তো ফলেন পরিচয়তে। আমি ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই। আমার ইয়ার দোস্তরা তো বলেই, কেবল ঘোড়াতেই নয় কারো ওপরে চড়তে পেলে দুনিয়ার

আর কিছুই আমি চাই না।'

লেড়কিটি আর কথা বাড়িয়ে দেরী করতে রাজী হ'ল না। এক লাফে আমার এ-চওড়া বুকটির ওপর এসে পড়ল। আমাকে জাপ্টে ধরল। আমিও লোহার মত শক্ত পাঁঠা জবাই করা হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরে তাকে আমার বুকের সাথে মিশিয়ে নিলাম। তারপর? তারপর কি ঘটতে পারে, কি ঘটেছিল আশা করি আর খোলসা করে বলতে হবে না।

কেবলমাত্র সেদিনই নয়। আমাদের সময় ঠিক করাই ছিল। রোজ যথা সময়ে আমরা সেখানে হাজির হতাম। আমি নিজে আনন্দ পেতাম, তার দিল্ও আনন্দে ভরপুর ক'রে তুলতাম।

একদিন চরম আনন্দের মুহূর্তে সে তো স্বীকারই করে ফেল্ল, একাজে বানরের চেয়ে আমার কায়দা আর তাগদ দু'-ই বেশী। ব্যস, আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে।

দেহসুখ লাভ হয়, দিল্ খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে। কিন্তু এসব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। লোভের শিকার হয়ে কাম কাজ পুরোদমে শুরু করেছিলাম বটে। কিন্তু কয়েক মাহিনা বাদেই আমার তাগদ কমে গেল। আমি কমজোরী হয়ে পড়লাম। তার অত্যুগ্র কামজ্বালা নেভাতে গিয়ে আমি যেন অথৈ সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম।

আমি নেতিয়ে পড়ছি বটে। কিন্তু লেড়কির কামাগ্নিতে ঘি পড়ার দ্বিগুণ শিখা ছড়িয়ে পড়ল। দুর্বার তার গতি। লড়াইয়ে সে আমাকে ছাড়িয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে লাগল। আমাকে সে পিছিয়ে পড়তে দেবে, কিছুতেই না। তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য আমার কোথায়? হায় খোদা! এমন গাড্ডার মধ্যেও কোন মরদ পড়ে! এখন যে আমি ফকিরের বেশ ধরে পালাতে পারলে বাঁচি!

আমার হালৎ এক্কেবারে সসমিরা। পুরোদস্তুর মাজা ভাঙা বিষধরের মাফিক বনে গেছি। অনন্যোপায় হয়ে একদিন গোপনে এক বুড়ির সঙ্গে পরামর্শ করলাম। বুড়ি নাকি ঝাঁড়ফুঁকের কারবার করে। জবরদস্ত লেড়কিটির কামজ্বালা নেভাতে গিয়ে আমি কেমন নাস্তানাবুদ হচ্ছি, খোলসা করে তাকে বল্লাম। জব্বর একটি দাওয়াই চাইলাম।'

বুড়ি ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্ল—'দাওয়াই? কিন্তু বিমারি যে সোজা নয় মিঞা।'

—'দেখ অনেকের মুখেই তোমার দাওয়াইয়ের ব্যাপার শুনেছি। তোমার হিম্মৎ আছে সবাই বলে। ধান্দা ছেড়ে বাৎলাও কি ক'রে আমি ওই দস্যি লেড়কিটির হাত থেকে আমার জান মাল বাঁচাতে পারি?'

—'তা মিঞা, এত ক'রে যখন ধরেছ তখন ফিকির বের করার কোশিস তো করতেই হবে।'

বুড়ি এবার একটি মাটির কলসি নিল। মিশরীয় নুপিনের কিছু বীজ তার ভেতরে রাখল, দু' ছটাক হপ্ গাছের বাকল, আধা বদনা ভিনিগার আরও হরেক কিসিমের গাছের বাকল। তারপর আধা কলসি পানি ভরে নিল। এবার সেটিকে চুল্লীতে চাপিয়ে দিল। আগুন জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে। টগবগ করে পানি ফুটতে লাগল। কলসির পানি শুকিয়ে আধা হয়ে গেলে সেটি চুল্লি থেকে নামিয়ে নিল।'

বুড়ি এবার কলসিটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্ল—'মিঞা তোমার দাওয়াই বুঝে নাও।'

—'সে তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তোমার দাওয়াই তাকে খাওয়াব, নাকি মালিশ করব? ধ্যুৎ ছাই, এ আমার কম্ম নয়। আমার সঙ্গে চল, যা হোক একটি হিল্লে ক'রে দিয়ে এসো।'

বুড়ি আপত্তি করল না। আমি তাকে মাটির তলার গুপ্ত কামরাটিতে নিয়ে গেলাম।'

কাজ শুরু করার আগে বুড়ি আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বল্ল—'মিঞা, তুমি অন্যদিনের মত পুরোদমে কারবার চালিয়ে যাবে। সে যেন বুঝতে না পারে, তুমি কোন মতলব পাকড়েছ। কাজ মিটে গেলে সে যখন এলিয়ে পড়ে গভীর নিদে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডাকবে, বুঝলে?'

আমার জান বাঁচাবার তাগিদ। তাই বুড়ির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চল্লাম। সেদিন লেড়কিটিকে অন্যদিনের চেয়ে বেশী খুশী করার জন্য ক্ষেপে গেলাম। আমার গায়ে যেন হাতির তাগদ জন্মে গেল।

এক-দুই-তিন ক'রে দশবার সে আমাকে তার ওপর তুল্ল আমিও লড়ে গেলাম নসীব ঠুকে। দশবারের বার চরম সুখটুকু আর সামলাতে পারল না। সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্ল।

একলাফে কামরা থেকে বেরিয়ে ইশারায় বুড়িকে ডেকে নিয়ে এলাম। বুড়ি দাওয়াই নিয়ে এল। সামান্য গরম কিছু দাওয়াই নিয়ে বুড়ি লেড়কিটির উরু দুটো ফাঁক ক'রে দিল ঢেলে।

অত্যাশ্চর্য রঙিন এক কিসিমের ধোঁয়া লেড়কিটির নিম্নাঙ্গ ঢেকে ফেল্ল। আর ধোঁয়াটুকু ক্রমে তার শরীরের ভেতরে যে ঢুকছে তা স্পষ্ট মালুম হ'ল।

এক সময় লেড়কিটির উরু দুটির ফাঁক দিয়ে পোকার মত কি যেন বেরিয়ে এল। বড়সড় কেঁচোর মত পোকা। তাদের একটির রং হলদে আর অন্যটির রঙ কালচে।

এমন সময় বাগিচা থেকে পাখির কিচির মিচির ভেসে আসতে লাগল। ভোরের পূর্বাভাষ। বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ চুয়ান্নতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন —'জাঁহাপনা, কেঁচোর মত জীবন্ত দু'টি পোকাকে কিলবিল করতে দেখে বুড়ি গলাছেড়ে চিল্লিয়ে উঠল—'কাজ হয়েছে!—দাওয়াইয়ে কাজ হয়েছে!'

বুড়ি এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল —'খোদাতাল্লাকে সুক্‌রিয়া জানাও—সুক্‌রিয়া! এ-পোকা দুটোই লেড়কিটির মধ্যে অফুরন্ত কামতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলত। পোকার কামড়ে সে ছটফট করত। এই কালচে পোকা পয়দা হয়েছে নিগ্রোটির সঙ্গে যৌন মিলনের ফলে। আর বানরের সঙ্গে যৌনমিলনে পয়দা হয়েছে হলদে পোকাটি। এবার থেকে দেখবে, লেড়কিটির মধ্য থেকে আর খাই-খাই, কি খাই—কি খাই ভাব উধাও হয়ে গেছে।

বুড়ির বাৎ বিলকুল সাচ্চা। ব্যাপারটি মালুম হ'ল পরদিন যখন আমি তার কাছে গেলাম। সে আমাকে অন্য দশটি লেড়কির মত স্বাভাবিক ভাবেই নিল। কামাগ্নি তার মধ্য থেকে হ্রাস পেয়েছে। সহবাসের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। আমার দিল্ খুশীতে ভরে উঠল। তার চোখে-মুখেও ফুটে উঠল খুশীর প্রলেপ।

আমি তাকে শাদীর প্রস্তাব দিলাম। সে মুচকি হাসল। আপত্তি করল না। দিনের পর দিন আমার সঙ্গে সে সহবাস করেছে। আপত্তি করবে কোন্ সুখে। বুড়িকে তলব করলাম। আমাদের শাদীর বাৎ শুনে সে খুবই খুশী হ'ল। আমাদের শাদী হয়ে গেল।

বুড়ি আমাদের দু' জনকেই জিন্দেগী বরবাদ হওয়ার সুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। সে খুশী হয়ে আমাদের এবার এমন একটি দাওয়াই দিল যা আমাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন যাপনের সহায়ক হয়েছে।

কিস্‌সা শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, যে-সব লেড়কিরা কামজ্বালায় সর্বদা কি খাই—কি খাই করে তাঁদের বিমারির ইলাজ কি ক'রে করতে হয় তা তো শুনলেনই।

বাদশাহ শারিয়ার বল্‌ল—'এ-বিমারি আর দাওয়াইটির সম্বন্ধে আমি গত সালেই শুনেছিলাম। আর এ-কিস্‌সাটিও গত সালেরই। কামজ্বালায় জর্জরিতা লেড়কিটিকে দাওয়াইয়ের ধোঁয়া দিয়ে বিমারির ইলাজ করার ব্যাপারটিও আমি এক সাল আগেই শুনেছি। আদৎ বাৎ হচ্ছে, লেড়কিটিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বাদশাহ এবার বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, এখন এমন কিস্‌সা বল যাতে আমার কলিজা উত্তেজনায় লাফাতে শুরু করে।

হাসিব এবং সর্পকন্যা যমলিকার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, অতি প্রাচীনকালে গ্রীসে এক পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল ড্যানিয়েল। তিনি গৃহী হলেও সাধুসন্তের মত ছিল তার দিল্। জীবনযাত্রাও ছিল প্রায় তাদেরই মত।

ড্যানিয়েলেরও শিষ্য অনুগামী ছিল অনেক। রোজ সকালে তার বাড়িতে শিষ্য সামন্তদের ভিড় জমত। তারা তাঁর কাছে অধ্যয়ন করত। ধর্ম বিষয়ে পাঠও নিত কেউ কেউ।

শিষ্যদের নিয়ে পণ্ডিত ড্যানিয়েল-এর দিন বেশ সুখেই কাটছিল। কিন্তু তাঁর মনে দুঃখ ছিল একটিই। সন্তানহীনতার দুঃখ। তার অবর্তমানে, পরলোকগমনের পর তাঁর শিক্ষা ও বহুমূল্য প্রাচীন পুঁথিপত্র উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ পাবে না এ ভেবেই তিনি মনমরা হয়ে পড়তেন। কষ্ট পেতেন খুবই।

সন্তান লাভের অত্যুগ্র বাসনা নিয়ে তিনি সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে আকুল আবেদন জানালেন। একনিষ্ঠ মন নিয়ে প্রার্থনা করলেন।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের প্রাসাদের সদর-দরজায় হয়ত কোন দ্বাররক্ষী নেই। তাই হয়ত তাঁর প্রার্থনা ঈশ্বরের দরবারে বিনা বাধায়, নির্বিবাদে পৌঁছে যেতে পেরেছিল।

ঈশ্বর খুশী হয়ে ড্যানিয়েল-এর বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। তাঁর সহধর্মিণী সন্তানসম্ভবা হলেন। তিনি প্রথমে মাস ও পরে দিন গুনতে লাগলেন।

ড্যানিয়েল এক সকালে তাঁর সহধর্মিণীকে কাছে ডাকলেন। তিনি কাছে এলে বল্‌লেন—'দেখছ তো আমি অনেক বুড়ো হয়ে পড়েছি। আর বেশী দিন নেই। যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে। এদিকে তোমার গর্ভজাত সন্তান অচিরেই ভূমিষ্ঠ হবে।'

ড্যানিয়েল-এর সহধর্মিণী নীরব চাহনি মেলে স্বামীর মুখের

দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ড্যানিয়েল ব'লে চল্‌লেন—'যা বলছি ধৈর্য ধরে শোন—আমার মৃত্যুর পর আমার যাবতীয় পুঁথিপত্র ও পাণ্ডুলিপি যথাস্থানে থাকবে ব'লে মনে হচ্ছে না। প্রয়োজনের সময় তোমার গর্ভের সন্তান হয়ত সেগুলো হাতের কাছে পাবে না।'

ড্যানিয়েল কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। সারা জীবনে যা কিছু শিখেছেন, চলার পথে যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সবই সংক্ষেপে লিখে গোছগাছ ক'রে যাবেন, ঐকান্তিক ইচ্ছা। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই তার অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করে যেতে চান।

বড়ই কঠিন কাজ। সারা জীবনে অর্জিত তার অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের মূলকথা এবং পাঁচ হাজার পাণ্ডুলিপির সার সংক্ষেপ প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি পাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা কি যে-সে কাজ নাকি? কাজটি অসম্ভব, অসাধ্য হলেও সম্ভব করলেন। লেখা শেষ হয়ে গেলে বার বার পড়ে দেখলেন, এর চেয়েও সংক্ষিপ্ত করা যাবে কিনা। না, আর সম্ভব নয়। আর সংক্ষিপ্ত করার কোন রাস্তাই নেই। সব মিলিয়ে লেখা দাঁড়াল পাঁচ পাতা।

না, পাঁচ পাতাতেও ড্যানিয়েল সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। আবার প্রয়াস শুরু করলেন। মাত্র পাঁচটি পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন পুরো একটি বছর। হ্যাঁ, পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়েছে। একটিমাত্র পাতার মধ্যে তাঁর বক্তব্যকে তিনি লিখে ফেল্‌লেন।

ড্যানিয়েল বুঝতে পারলেন, ক্রমেই হাতছানি দিয়ে তার দিকে মৃত্যু এগিয়ে আসছে।

মৃত্যু শিয়রে বুঝতে পেরে ড্যানিয়েল তাঁর যাবতীয় পাণ্ডুলিপি বস্তাবন্দী করে সাগরের জলে ফেলে দিয়ে এলেন। তার এরকম কাজের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, কেউ যাতে সেগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম না হয়।

সবই তো বস্তাবন্দী করে সাগরের জলে বিসর্জন দিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য কি রাখলেন? হ্যাঁ, রেখেছেন তো বটেই। কি? কি সেটি? ওই একটি কাগজ।

ড্যানিয়েল-এর সহধর্মিণী পূর্ণ-গর্ভবতী হলেন। চলাফেরা করা তো দূরের কথা ওঠা-বসা করাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

ড্যানিয়েল সহধর্মিণীর কাছে গেলেন। তাঁকে বল্‌লেন, শোন—আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। পরমেশ্বর আমাকে সন্তান দিয়েছেন। কিন্তু আমার বরাতে হয়ত আর তার মুখ দেখা হ'ল না। পরম করুণাময়ের সে অভিপ্রায় থাকলে এমনটি হবে কেন? আমি পূর্বপুরুষ হিসেবে তার জন্য, আমার উত্তরসূরীর জন্য কেবলমাত্র একটি কাগজ রেখে গেলাম।

তোমার গর্ভের সন্তান বড় হয়ে যখন সবকিছু বুঝতে শিখবে, পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করবে তখন তুমি আমার হয়ে তার হাতে এ কাগজটি দিও।

তোমার গর্ভের সন্তানটি যদি এ কাগজের লেখা পড়ে এর মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারে তবে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। সে তার সময়ের সবচেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি ব'লে পরিচিত হতে পারবে।'

ড্যানিয়েল-এর প্রৌঢ়া সহধর্মিণী ছলছল চোখ দুটো মেলে ঘাড় কাৎ করল। ড্যানিয়েল এবার বল্‌ল—'আর একটি কথা মনে রেখো। তোমার গর্ভজাত সন্তানের নামকরণ কোরো হাসিব।'

কথা ক'টি কোনরকমে শেষ করেই ড্যানিয়েল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর অবিনশ্বর আত্মা অনন্ত সুন্দরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ড্যানিয়েল-এর শেষকৃত্যে বহু জ্ঞানী-গুণী, নগরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও শিষ্য-শিষ্যারা চোখের জল ফেলে শেষবারের মত তাঁকে বিদায় জানিয়ে গেলেন।

ড্যানিয়েল দেহ রাখার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই তার সহধর্মিণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। ফুটফুটে দেবশিশুর মত রূপ-সৌন্দর্যের আকর হয়ে জন্মগ্রহণ করল নবজাতকটি।

পরলোকগত পিতার শেষ ইচ্ছানুযায়ী শিশুর নামকরণ করা হ'ল 'হাসিব'।

জ্যোতিষী এলেন। বিচিত্র সব আঁকজোঁক কেটে শিশুর ভাগ্য গণনা করা হ'ল। বিচারের ফলাফল জানাতে গিয়ে জ্যোতিষী বল্‌লেন—সন্তান দীর্ঘজীবি হবে বটে। কিন্তু তার একটি ফাঁড়া আছে। তার বিদ্যা বুদ্ধি হবে, জ্ঞান অর্জন করবে। নাম যশ লাভ করবে প্রচুর। কিন্তু যদি ফাঁড়াটি কেটে যায়।' শিশু হাসিব-এর ভাগ্যগণনা ক'রে বৃদ্ধ জ্যোতিষ তার পুঁথিপত্র বোগলে নিয়ে বিদায় নিলেন।

হাসিব দিন দিন বাড়তে লাগল। পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যালয়ে পাঠান হ'ল। শত চেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়া শেখানো গেল না। বইপত্র রেখে পেশাগত ব্যবসায় লাগিয়ে দেয়া হ'ল। কিন্তু হাসিব সবকিছু ছেড়ে ছন্নছাড়ার মত ওখানে-ওখানে ঘুরে দিন কাটাতে লাগল। ছেলে না শিখল লেখা-পড়া, না করে কাজকর্ম। বিধবা মা ছেলের মতিগতি দেখে কেঁদে আকুল হন।

প্রতিবেশী হিতাকাঙ্ক্ষীরা হাসিব-এর মাকে পরামর্শ দিল, ছেলেকে বিয়ে থা দিয়ে ঘরে টুকটুকে একটি বৌ এনে দিলে তার সংসারে মন বসবে।

হাসিব-এর মা সবার পরামর্শ অনুযায়ী ছেলের বিয়ে দিলেন। টুকটুকে একটি বৌ ঘরে এল। কিন্তু কার্যত ফলাফল শূন্য। হাসিব যা ছিল তা-ই রয়ে গেল।

হাসিবদের পাড়ায় কিছু কাঠুরে থাকে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি ক'রে সংসার চালায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাসিব-এর মাকে পরামর্শ দিল, একটি কুড়ুল, কিছু দড়ি আর একটি গাধা কিনে ছেলেকে তাদের সঙ্গে জঙ্গলে কাঠ কাটতে পাঠাবার জন্য।

হাসিব-এর মা প্রতিবেশী কাঠুরেদের পরামর্শ অনুযায়ী সব কিছু জোগাড় ক'রে দিল। মায়ের কথায় হাসিব রাজী হয়ে গেল। কাঠুরেদের সঙ্গে কুড়ুল কাঁধে নিয়ে, গাধার পিঠে চেপে হাসিব জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল।

গভীর জঙ্গলে পাহাড়, ঝর্ণা আর বিচিত্র সব গাছগাছালি দেখে হাসিব-এর মন মজে গেল। সে কাঠকাটার কাজে লেগে রইল। রোজই জঙ্গলে যায়। কাঠ কেটে গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। রোজগার হতে লাগল।

এক দুপুরে হাসিব সহকর্মীদের সঙ্গে জঙ্গলে কাঠ কাটছে। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হল। ভীষণ বৃষ্টি। সে সঙ্গে-ঝড় আর বজ্রপাত তো রয়েছেই। সবাই একটি গুহায় গিয়ে মাথা গুজল।

গুহার ভেতরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তারা আগুন জ্বেলে ঠাণ্ডার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার ব্যবস্থা করল। হাসিব-এর ওপর দায়িত্ব পড়ল আগুনে কাঠ যোগান দেয়া।

হাসিব গুহার মুখে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেরাই করতে গেলে তার হাত থেকে হঠাৎ কুড়ুলটি ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে পড়ে। গম্ভীর একটি আওয়াজ হ'ল। অস্বাভাবিক আওয়াজটি হাসিব-এর মনে কৌতূহলের সঞ্চার করল। তার মনে হল জায়গাটি যেন ফাঁকা।

হাসিব অন্য একটি কুড়ুল নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। কিছুটা খোঁড়াখুঁড়ির পরই একটি পাথরের চাঁই তার চোখে পড়ল। ব্যস্ত হাতে পাথরটি তুলে ফেল্‌ল। তার ঠিক তলায় একটি তামার ঝুড়ি দেখতে পেল। ঝুড়িটি বেশ বড়সড়ই।

কিস্‌সার এ পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' পঞ্চান্নতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, হাসিব কৌতূহলী মন নিয়ে সহকর্মীদের কাছে গেল। রহস্যজনক আওয়াজটির কথা বল্‌ল। সবাই দৌড়ে গেল। তামার ঝুড়িটি তুলতেই চোখের সামনে একটি গর্ত দেখা দিল। একটি সুড়ঙ্গ।

হাসিব মাটিতে শুয়ে পড়ে গর্তটিতে মাথা ঢুকিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই তার চক্ষু স্থির হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। দেখল, পাশাপাশি কয়েকটি জালা সাজানো রয়েছে।

কোন সিঁড়ি নেই। জালাগুলোকে ওপরে তুলে আনতে হলে গলায় দড়ি বেঁধে তুলতে হবে।

হাসিব-এর আর তর সইছে না। দড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। কুড়ুল দিয়ে একটি হাড়ির গায়ে আঘাত করতেই ভেঙে গেল। জালার ভেতর থেকে গল গল ক'রে মধু বেরোতে লাগল।

কাঠুরেরা মধু বা এরকম কোন কিছুর কথা ভাবে নি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই সোনার মোহরটোহর জালাগুলোর মধ্যে রয়েছে।

একটি জালায় তো মধু পাওয়া গেল। কাঠুরেদের হতাশ করল। বাকীগুলোতে কি আছে দেখা দরকার। গলায় দড়ি বেঁধে এক এক করে সব ক'টি জালা ওপরে তুলে আনা হ'ল।

এদিকে কাঠুরেদের মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল। তারা হাসিব'কে আর গর্ত থেকে তুল্‌ল না। সে থাকলে জালার ভেতর থেকে যা-ই উদ্ধার করা হোক না কেন তাকে ভাগ দিতে হবে। অহেতুক তাকে গর্ত থেকে তুলে এনে মালের ভাগীদার বাড়াবার দরকারও তো নেই। হাসিব গর্তের ভেতরে মরে পড়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি?

কাঠুরেরা বাজারের কাছাকাছি এসে এক যুবককে হাসিব-এর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল। সে গিয়ে তাঁকে বল্‌ল—'হাসিব যখন জঙ্গলে কাঠ কাটছিল তখন তার গাধাটি হঠাৎ কোথায় চলে যায়। হাসিব হন্যে হয়ে গাধার খোঁজে জঙ্গলে ছুটোছুটি করতে লাগল। ঠিক তখনই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। আমরা দৌড়ে গিয়ে হাতের কাছে একটি গুহা পেয়ে তাতে ঢুকে পড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি একটি ইয়া তাগড়াই বাঘ এসে তোমার ছেলে হাসিব আর তার গাধাটিকে মেরে ফেল্‌ল; আমরা কুড়োল নিয়ে কাছে যাওয়ার আগেই বাঘটি হাসিব-এর টুঁটি চেপে ধরে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল।

সদ্য পুত্রহারা বিধবা হাসিব-এর মা সবকিছু শুনে বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করল। পুত্রহারা বিধবার কান্না আল্লাতাল্লা-র কানে পৌঁছবে কিনা, কে জানে?

এদিকে কাঠুরেরা জালাগুলোকে বাজারে নিয়ে গেল। সব ক'টিতেই মধু ভর্তি। বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা পিটল। সবাই বাজারে একটি ক'রে দোকান খুলে চুটিয়ে ব্যবসা করতে লাগল।

এদিকে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত হাসিব গুহার মধ্যে পড়ে মৃত্যুর জন্য অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল। অনেক কেঁদেছে। চেঁচিয়ে গলা ফাঁটিয়েছে। কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। সে অনন্যোপায় হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগল। মনস্থ করল আত্মহত্যা করে এ যন্ত্রণা ও হতাশার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবে।

হাসিব হঠাৎ দেখতে পেল ইয়া বড় একটি কাঁকড়া বিছে তার দিকে ধেয়ে আসছে। সে কুড়োলটি দিয়ে তাকে দু' টুকরো করে দিল।

হাসিব এবার কাঁকড়া বিছেটি যেদিক থেকে এল সেদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। ক্ষীণ একটি আলোর রেখা তার নজরে পড়ল।

হাসিব দৌড়ে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে সজোরে ঘা মারল। ব্যস, দরজাটি একটু ফাঁক হয়ে গেল। বার কয়েক জোরে জোরে ঘা মারতে দরজাটি ভেঙে গেল।

হাসিব এক লাফে ভেতরে ঢুকে গেল। দেখল, একটি বিশালায়তন চাতাল। ওধারে একটি আলো জ্বলছে। সামান্য এগোতেই ইস্পাতের একটি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় ঝুলছে ইয়া বড় একটি রূপোর তালা। পাশেই একটি সোনার চাবি।

হাসিব চাবি ঘুরিয়ে তালা খুল্‌ল। দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিতেই তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। চমৎকার একটি সরোবর। মাথার ওপরে খোলা আকাশ। পায়ের তলায় পান্নার পাহাড়।

সরোবরের চারদিকে বারো হাজার শ্বেতপাথরের আসন। আর এক ধারে মনলোভা কারুকার্য মণ্ডিত একটি সিংহাসন।

এমন সময় হাসিব দেখতে পেল পান্নার পাহাড়ের গা-বেয়ে একটি শোভাযাত্রা আসছে। কেউ হেঁটে আসছে না। বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে সবাই শূন্যে ভেসে তার দিকে এগোচ্ছে। একদল মহিলা সবাই পরমা সুন্দরী।

মিছিল আরও কিছুটা এগোতেই হাসিব আরও আশ্চর্য হ'ল। মিছিলকারী মহিলাদের কারো পা নেই। কোমরের নিম্নাংশ সরীসৃপের মত লম্বাটে। তাই বাধ্য হয়ে সরীসৃপের মত পথ চলে। এরা সর্পকন্যা। গ্রীক ভাষায় গান গাইছে সবাই। রানীর গুণকীর্তন। চমৎকার তাদের গলা। চমৎকার গানটির সুর।

চারজন সর্পকন্যা উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু রানীর এখনও দেখা মেলে নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হ'ল। সর্পকন্যাদের মাথায় একটি গামলা রয়েছে। তার মধ্যে বসে তাদের রানী।

সর্পকন্যারা রানীকে এসে সিংহাসনে বসাল। হাসিব ইতিমধ্যেই আড়ালে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে দিয়েছে।

এবার মিছিল ক'রে অন্যান্য সর্পকন্যারা এল। শ্বেতপাথরের বেদীর ওপর সবাই বসল।

হাসিব রানীর নজর এড়াতে পারে নি। রানী তাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকল। সে বলীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে রানীর সামনে হাজির হল। রানী মুচকি হেসে তাকে পাশে বসালেন।

মৃদু হেসে, সুরেলা কণ্ঠে রানী এবার বল্‌লেন—'আগন্তুক যুবক, তুমি আমাদের অতিথি। মন থেকে ভয়-দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দাও। আমার নাম যমলিকা। তোমার নাম কি? তুমি কিভাবে এ-সরোবরের তীরে এলে? আমার বাস মাউন্ট কাফে। প্রতি শীতে আমি প্রজাদের নিয়ে এখানে কাটাই। কয়েক মাস বাস করি।

হাসিব রানীর কাছ থেকে অভয় পেয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সে এবার রানী যমলিকা-র প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'আমার নাম হাসিব। পরলোকগত ঋষিতুল্য পণ্ডিত ড্যানিয়েল-এর পুত্র। আমার জন্মের আগেই আমার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমি আমার পিতার মত জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত হয়ে উঠতে পারতাম। আর কিছু না হোক একজন বণিক বা ব্যবসায়ী

তো হতে পারতাম। বাল্য ও কৈশোরে পড়াশুনা না ক'রে বন্ধুদের সঙ্গে খেলে বেড়িয়েছি। অদৃষ্টগুণে একজন কাঠুরে হয়ে উঠলাম।

চার দেয়ালে বন্দী থাকা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আমার ইচ্ছা, আমার মৃত্যুর পর যেন আমার কবরের ওপর কেউ স্মৃতিসৌধ গড়ে না দেয়।

রানী হাসিব-এর জীবনকাহিনী শুনে খুবই খুশী হ'ল। সে এক সর্পকন্যাকে কিছু খাবার দাবার এনে হাসিব'কে দিতে বল্‌লেন।

সর্পকন্যাটি সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপাদেয় খাবার এনে হাসিব'কে দিল। রানী বল্‌লেন—'হাসিব, তুমি আমাদের অতিথি। দীর্ঘসময় সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী ছিলে। নিশ্চয়ই খিদে-তেষ্টা পেয়েছে। এগুলো দিয়ে আগে ক্ষুধা নিবৃত্ত ক'রে সুস্থ হয়ে নাও।

হাসিব গোগ্রাসে খাবারগুলো খেতে লাগল।

রানী এবার বল্‌লেন—'তুমি যতদিন খুশী আমাদের অতিথি হয়ে এখানে থাকতে পার। তোমার কোন অনিষ্টই কেউ করবে না। অন্তত এক সপ্তাহ এখানে থাক। আমি তোমাকে গল্প শুনিয়ে খুশী করব! আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তোমার মন-প্রাণ ভরিয়ে দেব। তুমি মানব-দেশে ফিরে যাবার পর গল্পগুলো তোমার উপকারে লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

বুলুকিয়ার কিস্‌সা

রানী যমলিকা গল্প বলবেন। গল্প শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে রানীর প্রজারা নিজ নিজ আসনে তৈরি হয়ে বসল। তাদের অতিথি হাসিব-এর মুখেও উৎসাহের ছাপ।

রানী গল্প শুরু করলেন—শোন, পুরাকালে কোন এক দেশে বানু-ইসরায়েল নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম ছিল, বুলুকিয়া।

একদিন বৃদ্ধ রাজা বুলুকিয়া'কে ডেকে বল্‌লেন—'আমার মৃত্যুর পর তুমিই সিংহাসনে বসবে। কারণ, তুমিই সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সিংহাসনে বসে প্রথমেই তোমাকে একটি কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। কাজটি হচ্ছে, রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সম্পত্তির একটি ক'রে আলাদা আলাদা ফর্দ তৈরি করবে। আর একটি নির্দেশ রইল—ভালভাবে পরীক্ষা না করে প্রাসাদের কোন জিনিস বাইরে যেতে দেবে না।

রাজার মৃত্যু হ'ল। রাজপুত্র বুলুকিয়া সিংহাসনে বসলেন। বুলুকিয়া সিংহাসনে বসার পর পরলোকগত পিতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে চল্‌লেন। রাজা প্রাসাদের যাবতীয় জিনিসপত্র বিশালায়তন একটি ঘরে জড়ো করল। প্রত্যেকটি জিনিসের আলাদা আলাদা ফর্দ তৈরি করার ব্যবস্থা করা হ'ল।

তখনও কোন কোন ঘরে কিছু জিনিস রয়ে গেছে। এক এক করে নিয়ে আসা হচ্ছে। রাজকর্মচারীরা একটি ঘরে দুটো পাথরের থামের ওপর একটি সিন্দুক দেখতে পেল। আবলুশ কাঠের তৈরি। সিন্দুকের ডালা উঁচু করতেই একটি সোনার বাক্স তাদের নজরে পড়ল।

রাজকর্মচারীদের মনে সিন্দুকের সোনার বাক্সটির ব্যাপারে কৌতূহল হ'ল। তারা রাজাকে খবর দিল।

রাজা বুলুকিয়া খবর পেয়ে সে-ঘরে ছুটে এলেন। রাজার নির্দেশে সোনার বাক্সটির ঢাকনা খোলা হ'ল। বাক্সের ভেতরে চোখ বুলাতেই একটি সোনার পুঁথি নজরে পড়ল।

রাজা কৌতূহল বশতঃ পুঁথিটি বের করলেন। পাতা ওল্টাতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল গ্রীক ভাষায় লেখা কয়েকটি ছত্র।

তাতে লেখা ছিল—যে জন মানুষ, জিন, পশু, পাখির রাজা ও প্রভু হতে চান তাকে একটি আঙটি পরতে হবে। ধর্মপ্রচারক সুলেমান এ-আঙ্‌টি পরেছিলেন। এখন তিনি সাত-সাগরের তীর সমাধিস্থ। তার আঙুলে আঙ্‌টিটি এখনও রয়েছে।

এ-দৈব আঙ্‌টিটি আদি পুরুষ আদম বেহেস্তে পরতেন। বেহেস্ত থেকে তাঁর পতন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এটি ব্যবহার করেছেন।

আদম-এর কাছ থেকে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল এটি পেয়েছিলেন। তারপর তিনি এটি মহাধার্মিক সুলেমানকে দিয়েছিলেন।

সাত সমুদ্রের পার থেকে নির্দিষ্ট দ্বীপে যাওয়ার ক্ষমতা কোন নৌকোরই নেই। এক রকম যাদু-বৃক্ষরস আছে যা পায়ে মাখলে অনায়াসে সমুদ্র পার হওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৃক্ষরসটি সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। পাতালপুরীতে রানী যমলিকা রাজত্ব করেন। তাঁর সাম্রাজ্যে এরকম গাছ জন্মায়। রানী ছাড়া অন্য কেউ এ-কথা জানেন না।

রানী যমলিকা গাছ, লতা প্রভৃতির ভাষা বুঝতে পারেন। অতএব যে-ব্যক্তি এ-দৈবজ্ঞ আঙ্‌টিটি সংগ্রহ করতে আগ্রহী তাকে পাতালপুরী রানী যমলিকা-র রাজ্যে যেতে হবে।

এ-আঙ্‌টি যে জন হস্তগত করতে পারবেন তিনি কেবলমাত্র মানব জাতিরই নয় পশু-পাখির ওপরও প্রভুত্ব করবেন। তারপর যবনিকা প্রদেশে উপস্থিত হয়ে অমৃত পান করতে পারবেন। অমৃতপানে কেবলমাত্র যে অমরত্ব লাভ করা যায় তা-ই নয়, রূপ-যৌবনও তার দেহে স্থায়ী আসন গ্রহণ করবেন।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' ছাপ্পান্নতম রজনী

রাত্রি গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, পুঁথির বক্তব্য পাঠ ক'রে রাজা বুলুকিয়া তার

রাজ্যের বড়-বড় পণ্ডিত, মৌলভী, দরবেশ আর জাদুকরদের ডেকে পাঠান।

রাজ দরবারে জরুরী সভা বসল।

রাজা পুঁথির বক্তব্যের কথা গোপন রেখে উপস্থিত জ্ঞানী-গুণীজনদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন কি যিনি আমাকে পাতালপুরীতে রানী যমলিকা-র রাজ্যে পৌঁছে দিতে পারেন?

রাজার বাসনার কথা শুনে উপস্থিত সবাই মহাপণ্ডিত অ্যাফান-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। যাদুবিদ্যাও তাঁর রপ্ত রয়েছে। জ্যামিতি ও মহাকাশ বিজ্ঞানেও তাঁর যথেষ্ট দখল।

রাজার অনুরোধে মহাপণ্ডিত অ্যাফান সম্মত হলেন, তাকে রানী যমলিকার প্রাসাদে পৌঁছে দেবেন।

রাজা বুলুকিয়া পরিব্রাজকের পোশাকে নিজেকে সজ্জিত ক'রে তুললেন। রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব বর্তাল বৃদ্ধ উজিরের উপর।

অ্যাফান রাজাকে নিয়ে পথ পাড়ি দিতে দিতে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। তিনি বল্‌লেন—'এবার আমাদের যাদুবিদ্যার সাহায্যে বাঞ্ছিত পথ খুঁজে নিতে হবে।

বৃদ্ধ পণ্ডিত অ্যাফান এবার নিজের চারদিকে একটি গণ্ডি আঁকলেন। ঠোঁট কাঁপিয়ে, অনুচ্চকণ্ঠে কি সব মন্ত্র আওড়ালেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হতে না হতেই একটি পাতালে যাওয়ার পথ বেরিয়ে গেল।

অ্যাফান এবার বল্‌লেন—'মহারাজ, এ-পথে দু' জন তো এক সাথে যেতে পারে না। চেষ্টা করে দেখি, পথটিকে যদি প্রশস্ত করা যায়।

বৃদ্ধ পণ্ডিত এবার পাতালপুরীর পথটির চারদিকে গণ্ডী কেটে আবার মন্ত্র আওড়ানো শুরু করলেন। অবিশ্বাস্য তাঁর মন্ত্রের গুণ। মুহূর্তে পথটি বেশ প্রশস্ত হয়ে গেল।

বৃদ্ধ পণ্ডিত এবার রাজাকে নিয়ে পাতাল পুরীতে হাজির হলেন। হাঁটতে হাঁটতে এ-সরোবরটির ধারে গিয়ে উভয়ে দাঁড়ালেন।

আমি মহাপণ্ডিত অ্যাফান এবং রাজা বুলুকিয়া'কে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম।

তাঁরা তাদের আমার সাম্রাজ্যে আসার উদ্দেশ্যের কথা আমাকে জানালেন। হাসিব তুমি তো একটু আগে নিজের চোখেই দেখেছ, চারটি সর্পকন্যা একটি অতিকায় গামলায় আমাকে বহন করে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি তাদের সেদিন এভাবেই পান্না পাহাড়ে এনেছিলাম। পথের ধারের গাছগাছালি তাদের সঙ্গে কত কথাই না বলেছিল।

আমরা একটি ঝোপের ধার দিয়ে যাবার সময় থোকা থোকা লাল ফুল নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, আমাদের রস কী চমৎকার! এ রস পায়ে মেখে মানুষ অনায়াসে সাগর পাড়ি দিতে পারে।

আমি মুচকি হেসে অতিথিদের বল্‌লাম—'এটিই আপনাদের বাঞ্ছিত গাছ। প্রয়োজনমত এর রস সংগ্রহ ক'রে নিন।'

মহাপণ্ডিত অ্যাফান ব্যস্ত-হাতে সে-গাছের রস নিঙরে একটি পাত্র ভর্তি করলেন।'

আমি বল্‌লাম—'মহাজ্ঞানী অ্যাফান, দয়া করে বলবেন কি, এ-রস আপনাদের কোন্ মহৎ কাজে লাগবে?'

অ্যাফান বল্‌লেন—'মহামান্যা রানী সাত সমুদ্রের ধারে একটি দ্বীপ রয়েছে। সেখানে মহাধার্মিক সুলেমান-এর কবর। তাঁর হাতে একটি আঙ্‌টি রয়েছে যেটি আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। সে দৈব আঙ্‌টিটির অবিশ্বাস্য ক্ষমতা বলেই তিনি সমস্ত জীবজগতের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমি চোখ দুটি কপালে তুলে সবিস্ময়ে ব'লে উঠলাম—অসম্ভব। সুলেমান-এর আঙ্‌টি আজ পর্যন্ত কেউ পরতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। আপনারা এরকম বাঞ্ছা মন থেকে মুছে ফেলুন।'

পণ্ডিত অ্যাফান নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রানী এবার বুলুকিয়া-র দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বল্‌লেন—'তুমি এ কী পাগলের খেলায় মেতেছ? তোমার এই তো বয়স। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, মন থেকে এরকম অসম্ভব পরিকল্পনা মুছে ফেল।'

রানীর কথায় রাজা বুলুকিয়া-র মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল।

রানী তাঁকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বললেন—হ্যাঁ, তুমি মন থেকে এরকম অসম্ভব পরিকল্পনা মুছে ফেল। আমি বরং তোমাকে একটি গাছ দেখিয়ে দিচ্ছি যার পাতার রস তোমাকে অনন্ত যৌবন দান করবে।

আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে তারা বাঞ্ছিত পাতার রস নিয়ে চলে গেল।

রানী এবার বললেন—'শোন হাসিব, সাগরের ওপর দিয়ে তাঁরা কিভাবে দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা তোমায় ব্যক্ত করছি, শোন—

মহাপণ্ডিত অ্যাফান রাজা বুলুকিয়া'কে নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন। তারপর সে-ফুল ও পাতার রসের পাত্রটি হাতে নিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন। সে-রস আচ্ছা করে পায়ে মাখলেন। এবার সাগর পাড়ি দেবার জন্য জলে নামলেন। হাঁটা শুরু করলেন। মহানন্দ। হবে না-ই বা কেন? অথৈ সমুদ্রের বুক দিয়ে দিব্যি পায়ে-হেঁটে যেতে পারলে কার না খুশীতে মনে দোলা লাগে? এক সময় সাশ্রয় করার জন্য তারা দৌড় লাগালেন। তিন দিন আর তিন রাত্রি মহানন্দে কাটিয়ে তাঁরা একটি চমৎকার দ্বীপে হাজির হলেন।

রাজা বুলুকিয়া কৌতূহলী চোখ মেলে চারদিকে মনলোভা দৃশ্য দেখতে দেখতে বললেন—'এ-ই নিশ্চয়ই বেহেস্ত। আমরা এখন বেহেস্তেই অবস্থান করছি।'

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সাতান্নতম রজনী

সারাদিন রাজকার্যের মধ্যে লিপ্ত থাকার পর রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, প্রকৃতিদেবী যেন দ্বীপটিকে নিজের মনের মত ক'রে গড়ে তুলেছেন? রূপ, রস আর গন্ধ উজাড় করে তিনি দ্বীপটিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কোথাও কোনরকম কার্পণ্য করেন নি।

পণ্ডিত অ্যাফান আর রাজা বুলুকিয়া দ্বীপটির এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলেন।

এক সময় সূর্যদেব পশ্চিম-আকাশের গায়ে আশ্রয় নিল। আকাশের গায়ে রক্তিম ছোপ। তারই আভা দ্বীপটির ওপরে পড়ায় মনে হ'ল বাস্তবিকই তারা যেন স্বর্গরাজ্যেই বিচরণ করছেন।

এক সময় দ্বীপের বুকে শুরু হয়ে গেল আলো-আঁধারীর খেলা। তারপরই নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার।

এবার পণ্ডিত অ্যাফান যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। অজানা-অচেনা দ্বীপ। কোথায় কোন বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে, কে বলতে পারে।

উপায়ান্তর না দেখে বৃদ্ধ পণ্ডিত অ্যাফান রাজা বুলুকিয়া'কে নিয়ে একটি উঁচু গাছে উঠে পড়লেন।

গাছের মোটা ডালের সঙ্গে উভয়ের দেহ শক্ত লতা দিয়ে জড়িয়ে নিলেন। নইলে ঝিমিয়ে পড়ে গেলে কম্ম একেবারে ফতে হয়ে যাবে।

রাত্রি একটু গভীর হতে না হতেই ক্লান্তিতে তাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল। এমন সময় আচমকা বিকট একটি আওয়াজ কানে যেতেই তারা সচকিত হয়ে উঠলেন।

গাছের গোড়া থেকে বিকট আওয়াজটি ভেসে আসছে। এবার তারা বুঝতে পারল দ্বীপটির নিচ থেকে কে প্রচণ্ড জোরে পুরো দ্বীপটিকেই বার বার ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সমুদ্রের বুক থেকে বুঝি বিশাল দেহী কোন দৈত্য উঠে আসছে। অতিকায় একটি পাথর তার মুখে। অগ্নিপিণ্ড। দাউ দাউ হাউ হাউ ক'রে জ্বলছে। তারই আলোকচ্ছটায় সম্পূর্ণ দ্বীপটিতে আলো ছড়িয়ে পড়ল। একেবারে আলোয় আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে।

না, একটি দৈত্য নয়। তার পিছন পিছন আরও কয়েকটি দৈত্য একই রকম জ্বলন্ত পাথর মুখে নিয়ে ওপরে উঠে এল।

দৈত্যরা দ্বীপে উঠে আসতে না আসতে অগণিত হাতী, সিংহ, বাঘ, নেকড়ে আর হায়না প্রভৃতি পশু তাদের কাছে আনন্দে ছুটে এল। সারা রাত্রি দৈত্য ও পশুরা মিলে দ্বীপটি তোলপাড় করে আনন্দ করল। সকাল হতে না হতেই প্রথমে দৈত্যরা চলে গেল তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল সমুদ্রের অতল গহ্বরে। আর পশুরা গভীর বনের দিকে পা-বাড়াল।

এরকম একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে অ্যাফান আর বুলুকিয়া-র পিলে চমকে উঠল। তারা সুড় সুড় ক'রে গাছ থেকে নেমে ব্যস্ত-হাতে সে-ফুলের রস পায়ে মাখতে লাগলেন। ওরে ব্বাস! যমের দক্ষিণ দুয়ারে আর এক মুহূর্তও নয়।

তাঁরা আবার সমুদ্রে নামলেন। দ্রুতপায়ে হেঁটে দ্বিতীয় সমুদ্র অতিক্রম করতে লাগলেন।

হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা সুউচ্চ পর্বতের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ছোট বড় নুড়ি পাথরে পূর্ণ একটি উপত্যকা তাঁদের নজরে পড়ল। পাথরগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের।

উপত্যকায় শুঁটকি মাছের ছড়াছড়ি। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলের সঙ্গে মাছ ভেসে এসে আর ফিরে যেতে পারে নি। তারা শুঁটকি মাছ খেয়ে দিন কাটালেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হ'ল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল উপত্যকা জুড়ে। অ্যাফান আর বুলুকিয়া পাশাপাশি দুটো প্রায় সমতল পাথরের চাঁই বেছে নিলেন। ইচ্ছা, এঁদের ওপরে শুয়ে বসে

কোনরকমে রাত্রি কাটিয়ে দেবেন।

তারা পাথরের চাঁই দুটোতে বসতে না বসতেই অকস্মাৎ এক বিকট গর্জন তাঁদের কানে এল। সে কী গর্জন পিলে চমকে দিল। তারা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন, অতিকায় একটি বাঘ গর্জন করতে করতে তাঁদের দিকে এগোচ্ছে।

দৌড়ে পালাবার জো নেই। উপায়ান্তর না দেখে পায়ের তলায় ফুলের রস বুলিয়ে উভয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এরকম একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বাঘ বাবাজীর তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। সে ভাবল, এ আবার কেমন ভূতুড়ে কাণ্ড রে বাবা! তার বুকের ভেতরে ফুসফুস নাচানাচি শুরু করে দিল। আর দেরী নয়। সে পিছন ফিরে, লেজ গুটিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

অ্যাফান ও বুলুকিয়া এবার তৃতীয় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছে। এক সময় ঈশান কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। পর মুহূর্তেই উঠল ভীষণ ঝড়। ঝড়ের সে কী বেগ! তাদের বুঝি উড়িয়ে নিয়ে গিয়েই ফেলবে। সমুদ্র পাগলা হাতির মত ক্ষেপে উঠল। অতিকষ্টে তারা সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে পথ পাড়ি দিতে লাগল। তীব্র ঝড় আর সমুদ্রের অনবরত আস্ফালনকে অগ্রাহ্য করে কতক্ষণ পথ চলা সম্ভব।

বহু কষ্টে পথ পাড়ি দিয়ে শেষ রাত্রে তারা এসে পৌঁছল সুন্দর একটি দ্বীপে। পাড়ে পৌঁছে সমুদ্রের ধারের একটি ঝাঁকড়া গাছের তলায় তারা শুয়ে পড়ল। ফুরফুরে বাতাসে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। সূর্য গুটিগুটি আকাশের গা-বেয়ে অনেক ওপরেই উঠে গেছে।

তারা ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে বনের দিকে গেল। গাছে গাছে রঙ-বে-রঙের পাকা ফল ঝুলছে। শুকনো একটি ডাল দিয়ে আঘাত ক'রে কিছু পাকা ফল পেড়ে তারা গলা পর্যন্ত ঠেঁসে খেয়ে নিল। ফলগুলি খুবই মিষ্ট ও সুস্বাদু।

ফলগুলি সত্যি অদ্ভুত চরিত্রের। চিনির আধিক্যের জন্য তাদের প্রত্যেকটির বাইরে মিছরির মত শর্করা জমাট বেঁধে রয়েছে।

রাজা বুলুকিয়া এমন অদ্ভুত চরিত্রের ফলগুলি দেখে আনন্দে নাচানাচি শুরু ক'রে দিলেন। তিনি অ্যাফান'কে বল্লেন—'এমন বিচিত্র আকৃতি ও রঙ বিশিষ্ট ফলের রাজ্য ছেড়ে যেতে মন সরছে না। এখানে আর ক'দিন থেকে গেলে কেমন হয়, বলুন তো?'

ফলের লোভের ফাঁদে পড়ে রাজা বুলুকিয়া হাবুডুবু খাচ্ছেন দেখে অ্যাফান হেসে ফেল্লেন। হাসতে হাসতেই বল্লেন—'বেশ তো দিন দশেক থেকে প্রত্যেকটি ফলের স্বাদ গ্রহণ ক'রে তবেই না হয় এ-দ্বীপ ছেড়ে যাত্রা করা যাবে। তারা সেখানে রয়েই গেল।

দশম দিন সকালে তাঁরা আবার পায়ে ফুলের রস মাখতে শুরু করল।

এবার তাঁরা চতুর্থ সাগরে নামলেন। আবার শুরু হ'ল অবিশ্রান্ত হাঁটা।

এক নাগাড়ে চারদিন চাররাত্রি পর তারা ছোট একটি দ্বীপে এসে থামলেন। পুরো দ্বীপটি জুড়ে কেবলই সাদা বালি। চারদিক শুধুই বালি আর বালি। বিভিন্ন জাতের সরীসৃপের আড্ডা এখানে। তারা বালির নিচে বাসা করে থাকে।
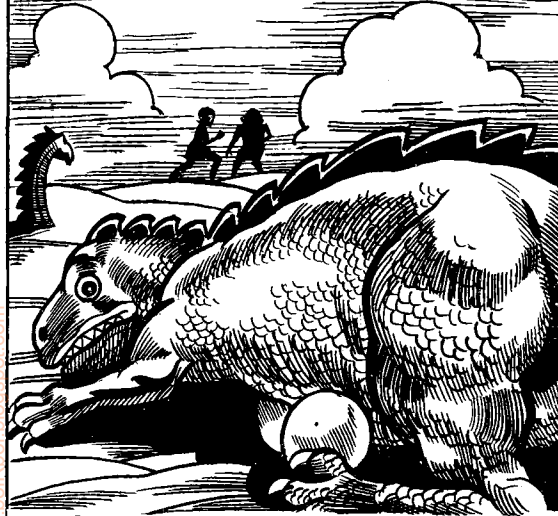
সরীসৃপগুলো ডিম পাড়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসে। সূর্যের আলোয় ডিম পাড়ে। তারা ডিমে তা দিতে দিতে রোদ পোহায়। গাছের চিহ্নমাত্রও নেই। একে থাকা-খাওয়ার সুখ আদৌ নেই। তার ওপর সরীসৃপের কামড়ে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা। বাধ্য হয়ে তারা পায়ে ফুলের রস মাখতে লেগে গেলেন। সমুদ্র পেরিয়ে ডাঙায় পা দিলেই রসের গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

তাঁরা আবার সমুদ্রে নামলেন, এবার তাঁরা এগিয়ে চলেছেন পঞ্চম সমুদ্রের ওপর দিয়ে। মাত্র একদিন-এক রাত্রে তাঁরা পঞ্চম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফেল্‌লেন।

সকালে সূর্য ওঠার আগেই তাঁরা অদ্ভুত একটি দ্বীপে উঠলেন। এখানে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়গুলোর মাথায় জমাট বাঁধা সোনা। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। পাহাড়ের পাদদেশে অসংখ্য গাছ। প্রায় প্রতিটি গাছে হলুদ রঙের ফুল। খুবই উজ্জ্বল তাদের রঙ। তারার মত অনবরত জ্বলে আর নেভে। পাহাড় আর অদ্ভুত চরিত্রের গাছগুলি দ্বীপটিকে যেন এক স্বপ্ন রাজ্যে পরিণত করেছে। এমন অকল্পনীয় সৌন্দর্য ইতিপূর্বে চোখে দেখা তো দূরের কথা দেখতে পাবে বলে তারা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেন নি।

অ্যাফান বল্লেন—'এর নাম সোনালি ফুলের দ্বীপ। অতি প্রাচীনকালে নাকি সূর্যের একটি টুকরো খসে এ-দ্বীপে পড়েছিল। সে টুকরোই হচ্ছে এ-দ্বীপটি।'

দিনের মতই সারারাত্রি চলে এখানে আলোর রোশনাই। তারা আলোর খেলা দেখে দেখে সারাটি রাত্রি দিব্যি কাটিয়ে দিলেন।

সকাল হ'ল। আবার তাঁরা পায়ে রস মাখার উদ্যোগ নিলেন। প্রফুল্লচিত্তে তাঁরা আবার সমুদ্রে নামলেন। এ-ই সমুদ্র। তারা আবার অনবরত হেঁটে চল্লেন। হাঁটাহাঁটিতে ক্লান্তি আসে সত্য। কিন্তু মনের অদম্য উৎসাহের কাছে তা নস্যাৎ হয়ে যায়।

এমন সময় ভোর হয়ে আসায় বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' আটান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, মহাপণ্ডিত অ্যাফান ও বুলুকিয়া ষষ্ঠ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছেন। দীর্ঘ সময় হাঁটাহাঁটির পর তাঁরা এক মনলোভা বেলাভূমিতে পৌঁছলেন। দ্বীপটি জুড়ে ঝোপ ঝাড় আর জানা-অজানা সব গাছের বিচিত্র সমারোহ।

সমুদ্রের পাড়ে একটি পাথরের ওপর বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর তাঁরা দ্বীপের ভেতরের দিকে পা-বাড়ালেন।

এতক্ষণ বেশ হাসিখুশী মন নিয়েই তারা চলছিলেন। কিন্তু এবার আনন্দ আতঙ্কের রূপ নিল। আরে ব্বাস! গাছে গাছে এসব কি ঝুলছে? ফল তো নয়। তবে? মানুষের মাথা। অগণিত মানুষের মুণ্ডু। তাদের মুখের অভিব্যক্তি আবার ভিন্নতর। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। কেউ মুখ গোমড়া ক'রে রয়েছে, কেউ খিলখিল ক'রে হাসছে, কারো মুখে মিটিমিটি হাসি, আবার কেউ বা অঝোরে কেঁদে চলেছে।

গাছ থেকে কিছু কিছু মুণ্ডু পাকা ফলের মত খসে পড়ছে। তাতেও অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষিত হচ্ছে। মাটিতে পড়ামাত্র সেগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে।

আজব ফল তো? অ্যাফান ও বুলুকিয়া আজব ফলগুলির ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পেলেন না।

উপায়ান্তর না দেখে তারা বন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি পাহাড়ের আড়ালে প্রায় সমতল বেলাভূমিতে মুখ গোমড়া ক'রে বসে রইলেন।

ক্লান্তিতে তাঁদের চোখের পাতা জুড়ে আসছে। চোখ বন্ধ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটাতে লাগলেন। এক সময় রোমাঞ্চকর এক শব্দ কানে যেতেই সচকিত হয়ে চোখ মেলে তাকালেন। দেখেন, সাগরের বুক থেকে পরমা সুন্দরী এক কন্যা উঠে ছন্দময় ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসছে। তার পায়ের মল জোড়া অদ্ভুত স্বরের সৃষ্টি ক'রে চলেছে।

না, একটি নয় আরও একটি অপরূপা উঠে এল সমুদ্র ছেড়ে বেলাভূমিতে। তার পায়েও মল।

এভাবে একের পর এক অপরূপার আবির্ভাব ঘটতে ঘটতে মোট বারোটি সাগরকন্যা বেলাভূমি বেয়ে উঠে বেলাভূমি ধরে এগিয়ে আসছে। তাদের রূপের জৌলুসে পুরো দ্বীপটিই যেন মুহূর্তে ঝলমলিয়ে উঠল। কাকে ছেড়ে কাকে ধরি? প্রত্যেকের রূপই সমান। চোখ ফেরানো দায়। রূপের আভায় চোখ ঝলসে দেয়।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তারা বেলাভূমিতে হাসাহাসি করল, গান গাইল, নাচল—আরও কত কী যে ছলাকলা করলে বলে বুঝানো যাবে না।

ঘণ্টা খানেক পরে তারা আবার বিচিত্র ভঙ্গিতে হেঁটে সমুদ্রে নামল, শুরু হ'ল জলকেলি। সে-ও এক মনোরম দৃশ্য।

বনের দিকে চোখ ফেরাতেই আর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। বনের গাছগুলি যেন প্রতি মুহূর্তেই লাফিয়ে লাফিয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। অচিরেই তারা চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। চাঁদকে ঢেকে ফেলবে।

এক সময় গাছের ছায়া তাদের গায়ে এসে পড়ায় তাঁরা সচকিত হয়ে সোজা ভাবে, একেবারে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে পড়ল। এতক্ষণ সাগর কন্যাদের নাচের মধ্যে ডুবে ছিলেন। এদিকে কিছুমাত্রও খেয়াল ছিল না। আবার কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির

মুখোমুখি হতে হবে আশঙ্কায় তাঁরা আবার পায়ে ফুলের রস মেখে নিলেন।

এবার অ্যাফান ও রাজা বুলুকিয়া সপ্তম সমুদ্রে নামলেন।

সপ্তম সমুদ্রেই তাঁদের বেশী সময় লেগে গেল। পায়ের তলায় ফুলের রস। অতএব শোয়া বা বসার প্রশ্নই ওঠে না। এক নাগাড়ে দু' মাস হাঁটাহাঁটি ক'রে তাঁরা শেষ পর্যন্ত একটি দ্বীপে এসে পৌঁছলেন।

মহাপণ্ডিত অ্যাফান ও রাজা বুলুকিয়া তাদের বহু বাঞ্ছিত দ্বীপের মাটিতে পা রাখলেন। দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি তাঁদের মুখ থেকে মুহূর্তে মুছে গিয়ে ফুটে উঠল হাসির ঝিলিক।

নথিটিতে দ্বীপটির যে-বর্ণনা দেয়া আছে দ্বীপটি অবিকল সে রকমই বটে। এ-ই সপ্ত সমুদ্রের দ্বীপ। এখানকার পবিত্র ভূমিতে মহাধার্মিক সুলেমান-এর দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে। চির শান্তিতে তিনি শায়িত। আর তাঁর আঙুলে রয়েছে সে বহু আকাঙ্ক্ষিত আঙটিটি।

দ্বীপের পবিত্র মাটিতে তাঁরা পদস্পর্শ করলেন। ভারী সুন্দর দ্বীপটির শোভা। দ্বীপ জুড়ে ফুল আর ফলের গাছ। গাছে গাছে অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে। ফলগুলিও দেখতে খুবই মনলোভা। চোখ জুড়িয়ে যায়।

বনের গায়েই ছোট্ট একটি পাহাড়। পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে এসেছে চমৎকার একটি ঝর্ণা।

দীর্ঘ ছ' মাস সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কাঁচা মাছের সাহায্যে উদর পূর্তি করেছেন। ফলে হাতের কাছে এমন স্বচ্ছ মিষ্টি জল আর গাছে গাছে ঝুলে থাকা পাকা ফল দেখে তাঁদের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা সম্ভব হল না।

বুলুকিয়া হাত বাড়িয়ে একটি পাকা আপেল ছিঁড়তে গেলেন। ব্যস, মুহূর্তে ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। বিশালাকৃতি এক দৈত্য অতর্কিতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার গাছে হাত দিলে দু' টুকরো ক'রে ফেলব।'

বুলুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে নিবেদন করলেন—'প্রভু দৈত্যরাজ, আমার প্রতি মুখ তুলে তাকান। আমরা দু'টি প্রাণী ক্ষিদে-তেষ্টায় মরণাপন্ন। আপনি আমাদের এ-আপেল খেতে বারণ করছেন কেন?'

—'শোন তোমরা যদি ভুলে গিয়ে থাক তবে আমার কি-ই বা করার আছে, বল? তোমরা মানব সন্তান। তোমাদের আদি পিতা আদম আল্লাহ-র নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে আপেল খেয়েছিল, মনে নেই তোমাদের? তোমরা তো আবার আল্লাহ'কে মান না। তাঁর বিরুদ্ধে যখন তখন বিদ্রোহে সোচ্চার হয়ে ওঠ। তাই আমি সর্বক্ষণ এ-গাছটিকে আগলে রাখি। আমি একে কর্তব্য বলেই মনে করি। এ গাছের ফলে কেউ হাত দিলে আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে দু' টুকরো ক'রে ফেলি।'

—'অপরাধ নেবেন না দৈত্যরাজ। আমাদের খিদে মেটাবার উপায় কিছু তো বলে দিন।'

—'এখান থেকে পালাও। এতবড় দ্বীপ, খুঁজে দেখ গে—খাবারের অভাব হবে না। কিন্তু এ-গাছের ফল অবশ্যই পাবে না।'

অ্যাফান আর বুলুকিয়া দৈত্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে দ্বীপের ভেতরের দিকে এগোতে লাগলেন। পথের ধারে বহু ফলগাছ। পেট পুরে ফল খেলেন। পাকা ফল আর ঝর্ণার জল দিয়ে শরীরকে একটু চাঙা ক'রে আবার হাঁটা জুড়লেন।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তাঁরা একটি গুহার সামনে হাজির হলেন। মহাধার্মিক সুলেমান-এর কবর এখানেই রয়েছে। তারা গুটি গুটি গুহাটির মধ্যে ঢুকে গেলেন। তারা যতই এগোচ্ছেন গুহাটির জ্যোতি ততই বাড়ছে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাঁরা হেঁটেই চলেছেন। এ কী ব্যাপার, গুহাটির কি শেষ ব'লে কিছু নেই!

আরও কিছুটা পথ হেঁটে তারা বিশালায়তন একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। পুরো ঘরটিই যেন কেবলমাত্র হীরা দিয়ে তৈরি। হীরা কেটে কেটে ব্যবহার করা হয়েছে। দেয়াল, ছাদ ও মেঝে সব দিক থেকেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি বেরোচ্ছে।

তাঁরা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার। তাদের মনে কোনরকম বোধ নেই, কোন অনুভূতিও নেই।

ঘরটির কেন্দ্রস্থলে সুদৃশ্য একটি সোনার পালঙ্কে ডেভিড-এর

পুত্র সুলেমান শায়িত। তার গায়ে সবুজ মুক্তার জামা। তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে এক অভাবনীয় অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি বেরোচ্ছে। দিব্য জ্যোতি।

চিরনিদ্রায় শায়িত সুলেমান-এর ডান হাতের তর্জনিতে রাজা বুলুকিয়া-র বহু আকাঙ্ক্ষিত সে-যাদু আঙ্‌টির দ্যুতি।

সুলেমান-এর আঙ্‌টি পরা হাতটি তার বুকের ওপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে রাখা আছে। আর বাঁ-হাতটি সামান্য প্রসারিত। হাতে শোভা পাচ্ছে রাজদণ্ড। তার মাথায় একটি চুনি জ্বলজ্বল করছে।

অ্যাফান আর বুলুকিয়া বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থায় বহু সময় ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিশ্চল-নিথর তাঁদের দেহ, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। কতক্ষণ যে তাঁরা এখানে, এভাবে দাঁড়িয়ে, তাঁরাই জানেন না। হয়ত পর পর কয়েকটি দিন-রাত্রিই পেরিয়ে গেছে। অ্যাফান এগোতে সাহস পেলেন না।

বুলুকিয়া এক সময় অ্যাফান-এর কানের কাছে মুখ দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন—'অনেক ঝড় ঝাপ্টা সহ্য করে, অনেক বিপদ তুচ্ছ ক'রে, হাজারো ফাঁড়া কাটিয়ে আমরা এখানে আসতে পেরেছি। এত কাছে এসে, একটুর জন্য ফিরে যাব? অসম্ভব।'

অ্যাফান জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। বুলুকিয়া ব'লে চল্‌লেন—'মুখের আতঙ্কের ছাপটুকু দেখেই আমি আপনার মনের অবস্থা সম্বন্ধে অনুমান ক'রে নিতে পারছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি একাই এগিয়ে যাচ্ছি। আপনাকে যে মোহিনী মন্ত্রটি শিখিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে তো?' অ্যাফান নীরবে ঘাড় কাৎ ক'রে প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

বুলুকিয়া এবার বল্‌লেন—'আমি যখন আঙ্‌টিটি খুলতে শুরু করব তখন আপনি সে-মোহিনী মন্ত্রটি অনুচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করবেন। খবরদার, উচ্চারণ যেন মোটেই ভুল না হয় মনে থাকবে তো?'

অ্যাফান এবারও মৌন থেকেই ঘাড় কাৎ করলেন। বুলুকিয়া এবার সিংহাসনের দিকে এগোবার জন্য পা-বাড়াতে যাবেন অমনি অ্যাফান তাঁর হাত চেপে ধরলেন। বল্‌লেন—'আমি যাচ্ছি, আপনি বরং মোহিনী মন্ত্রটি পাঠ করুন।'

অ্যাফান এবার মহাপুরুষের সিংহাসনটির দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে চল্‌লেন, এদিকে বুলুকিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে হলেও স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে ক'রে মোহিনী মন্ত্রটি পাঠ করতে লাগলেন।

সিংহাসনটির একেবারে গা-ঘেঁষে তিনি দাঁড়ালেন। বুকের মধ্যে কে যেন অনবরত হাতুড়ি পিটে চলেছে। এবার কাঁপা-কাঁপা হাত দুটো বাড়িয়ে মহাপুরুষ সুলেমান-এর আঙুলটি ছুঁলেন। ধীরে ধীরে চাপ প্রয়োগ করলেন। আঙ্‌টিটি খোলার জন্য বার বার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদিকে রাজা বুলুকিয়া আতঙ্কে রীতিমত কাঁপতে লাগলেন, অভাবনীয় এক আতঙ্ক তাঁর মধ্যে ভর করেছে। আতঙ্কে মোহিনী মন্ত্র পাঠ করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেল্‌লেন, একেবারেই উল্টো পাল্টা হয়ে গেল। আগে শক্তমন্ত্র এবং পরে আহ্বান মন্ত্র বলার কথা। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে তিনি আহ্বানমন্ত্র বলে ফেল্‌লেন আগে। এ ভুল মারাত্মক। এ ভুল ভয়ঙ্কর, সঙ্গে সঙ্গে ভুলের ফলও পাওয়া গেল। এরই ফলে ঘরটির ছাদ থেকে এক ফোঁটা তরল হীরা বৃদ্ধ অ্যাফান-এর ঠিক ব্রহ্মতালুতে পড়ল। ব্যস, তার সর্বাঙ্গ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। সে কী আগুন! মুহূর্তে তার শরীরটি ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। ছাইটুকু মহাত্মা সুলেমান-এর পায়ের কাছে পড়ে রইল।

বুলুকিয়া হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করতে লাগলেন—'ছিঃ ছিঃ এ কী পাপ কাজ করতে এসেছি আমি! লোভের বশীভূত হয়ে আমি শেষ পর্যন্ত দেবতার ঘরে ডাকাতি করতে এসেছি! এ পাপ আমি কোথায় রাখব!'

নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য বুলুকিয়া পিছন ফিরলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বৃদ্ধ অ্যাফান-এর ভস্মরাশির দিকে মুহূর্তের জন্য তাকালেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এবার উন্মাদের মত দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বুলুকিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু এখন উপায়! সে দৈব রস কোথায় পাবেন? রসভর্তি পাত্রটি তো অ্যাফান-এর হাতে ছিল। সে তো সেটি নিয়েই মহাত্মা সুলেমান-এর পালঙ্কের কাছে গিয়েছিলেন। তার নশ্বর দেহের সঙ্গে রসের ভাণ্ডটিও তো ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তিনি দিগন্ত বিস্তৃত উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আতঙ্ক ও হতাশায় উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলেন—'হায়! আমার বরাতে এ-ও ছিল!'

এমন সময় ভোর হয়ে এল, বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' উনষাটতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, রাজা বুলুকিয়া সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মত আর্তনাদ করতে লাগলেন। দুঃখে ও হতাশায় নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন।'

রাণী যমলিকা কিস্‌সা বলতে গিয়ে এবার বল্লেন—'আমি তাকে অনেক ক'রে বারণ করেছিলাম এমন দুঃসাহসিক অভিযানের পথে পা না বাড়াতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবেই। সে যে যাবেই। তাকে যে যেতেই হবে।

বুলুকিয়া-র বিপদের কথা আর বলার নয়। তিনি একা, একেবারেই নিঃসঙ্গ। চোখের জল ফেলে ফেলে একা নির্জন-নিরালা দ্বীপে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। লোভে পাপের সঞ্চার হয়, আর পাপই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। বুলুকিয়া-র পরিস্থিতি এখন এরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক সময় ধূলোর ঝড় উঠল। ধূলোয় সমস্ত দ্বীপটিই যেন মুহূর্তে ঢাকা পড়ে গেল। বুলুকিয়া ঝড়ের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ঝড়ের শোঁ-শোঁ শব্দের সঙ্গে কোলাহল শোনা গেল। বজ্রপাত হলেও বুঝি এত জোরে শব্দ হয় না। বর্শা, তরবারি, ঢাল প্রভৃতির শব্দ আর্তনাদের মত তার কানে ভেসে এল। আতঙ্কে সে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল।

ধূলোর ঝড় থেমে গেল। হঠাৎ অগণিত আফ্রিদি দৈত্য, জিন ও প্রেতাত্মারা মাটি ফুঁড়ে উঠতে লাগল। বিকট আর্তনাদ শুরু ক'রে দিল সবাই মিলে। ঠিক যেন নরকপুরীতে বুলুকিয়া দাঁড়িয়ে। তিনি দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁর পা দুটোকে মাটির সঙ্গে শক্ত ক'রে আটকে দিয়েছে। ঠিক সে মুহূর্তেই বিকট দর্শন কে একজন এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। অপার্থিবদের দলের পাণ্ডা। সে জিজ্ঞাসা করল—'তুই কে? আমরা বছরে একবার ক'রে মহাত্মা ডেভিড-এর পুত্র সুলেমান-এর সমাধিক্ষেত্র দেখতে আসি। কিন্তু তুই কে? কি করেই বা এখানে এলি?

ভীত সন্ত্রস্ত বুলুকিয়া বার কয়েক ঢোক গিলে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন—'অপার্থিব দলের প্রধান, আমার নাম বুলুকিয়া। বানু ইজরায়েলের শাসক আমি। সমুদ্রযাত্রা করতে গিয়ে পথ ভুল ক'রে এখানে হাজির হয়েছি।'

—'হুম্! তাই বুঝি? পথ ভুল ক'রে এখানে এসে পড়েছিস?'

—'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। কিন্তু আপনি কে? আপনার সঙ্গে অন্যান্যরাই বা কারা?'

—'আমরা? আমরা নিজেদের জান বিন জান-এর উত্তরসূরি ব'লে মনে করি, সাঘ্‌র আমাদের রাজা। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা তিনি। তার রাজ্য থেকে এখানে এসেছি। সাঘ্‌র শ্বেতভূমির রাজা, কোন এক সময় আদ্-এর ছেলে সাদ্দাদ সে-দেশ শাসন করতেন।

—'সাঘ্‌র-এর শ্বেতভূমি কোথায়, কোন দিকে দয়া করে বলবেন কি?'

—'সে রাজ্যটা কাফ্ পাহাড়ের পিছনে অবস্থিত। এখান থেকে পঁচাত্তর মাস ধরে এক নাগাড়ে হেঁটে তবে কোন মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে। আর আমরা? চোখের পলকে সেখানে পৌঁছে যেতে পারি।'

—'তাই বুঝি? আমার মত মানুষের পঁচাত্তর মাস—'

—'হ্যাঁ। তবে তোমার কথা স্বতন্ত্র। তুমি একজন রাজার ছেলে রাজা। তুমি যদি যেতে চাও তবে তোমাকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি।'

—'কিন্তু আমি তো আপনাদের মত বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে পথ পাড়ি দিতে পারব না। তবে কি ক'রে আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

—'কেন? আমাদের কেউ তোমাকে পিঠে ক'রে বইবে। আগে তুমি মনস্থির কর আমাদের সঙ্গে যেতে আগ্রহী কি না?'

বুলুকিয়া তো এক পায়ে খাড়া। এমন সুযোগ কোন পাগলেও তো হাতছাড়া করবে না। দৈত্যরাজকে বল্লাম—'আপনি দয়া ক'রে ব্যবস্থা ক'রে দিলে আমি অবশ্যই আপনাদের রাজাকে দেখতে যাব।'

দৈত্যরাজ আর কথা বাড়াল না।

রাজা বুলুকিয়া এক জিনের কাঁধে চেপে আকাশ পথে দিব্যি চোখের পলকে রাজা সাঘ্‌র-এর রাজ্যে পৌঁছে গেলেন।

জিনটি বুলকিয়া'কে এক সমতলভূমিতে নামাল। স্থানটি জাঁকজমকপূর্ণ। সেখানকার নালাগুলি পর্যন্ত সোনা ও রুপো দিয়ে বাঁধানো। নালাগুলির গায়ে সারিবদ্ধ ভাবে কৃত্রিম গাছ দাঁড় করানো। গাছগুলির পাতা পান্নার আর ফলগুলি চুনি দিয়ে তৈরি। আর সম্পূর্ণ সমতলক্ষেত্রটি সুদৃশ্য সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া।

মখমলের একটি তাঁবুর ভেতর সোনার সিংহাসনের ওপরে সুন্দর ভঙ্গিতে রাজা সাঘ্‌র অবস্থান করছেন।

রাজা সাঘ্‌র-এর ডানদিকে সোনার আসনে সামন্ত রাজারা বসে আছেন, তাঁর বাঁ-দিকে বসেছেন উজির, নাজির, সেনাপতি আর জ্ঞানী-গুণীরা।

রাজা বুলুকিয়া আভূমিলুণ্ঠিত হয়ে রাজাকে অভিবাদন জানালেন। ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে রাজার প্রশস্তি গাইলেন।

রাজা সাঘ্‌র ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বুলুকিয়া'কে সাদর অভ্যর্থনা ক'রে তাঁর পাশের একটি সুদৃশ্য সোনার সিংহাসনে বসালেন।

বুলুকিয়া এবার নিজের কথা, ফুলের রস সংগ্রহ ক'রে তা পায়ে মেখে সমুদ্র পাড়ি দেবার কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। কিছুই গোপন করলেন না। তার কথা শুনে তো রাজা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন।

এবার তাঁবুর বাইরে মখমলের মেঝের ওপর একটি বিরাট কাপড় বিছিয়ে দেয়া হ'ল। ভোজনের প্রস্তুতি চলেছে। কাপড় বিছানো হয়ে গেলে একটি চীনামাটির অতিকায় গামলায় পঞ্চাশটি সিদ্ধ উটের মাংস। অন্য আর একটি অতিকায় গামলায় পঞ্চাশটি ভেড়ার মাথা আর অন্য আর একটি গামলায় পঞ্চাশটি ঝলসানো উটের মাংস এনে মাঝখানে রাখা হ'ল। সবই গরম। ধোঁয়া উঠছে তখনও। তাছাড়া ফলের ব্যবস্থা তো পাহাড় প্রমাণ। জিন আর অতিথি সবাইকে সোনার থালায় ক'রে খাবার পরিবেশন করা হ'ল। সবাই পেট পুরে খেল।

ভোজপর্ব সম্পন্ন হয়ে গেলে রাজা সাঘ্‌র বুলুকিয়া'কে নিয়ে গল্প করতে বসলেন। মনখুলে গল্প বলা যাকে বলে। রাজা সাঘ্‌র বল্‌লেন—'আমাদের কাহিনী নিশ্চয়ই আপনি এখনও শোনেন নি। আমি সংক্ষেপে আপনাকে বলছি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ রাখতে চাইছি।

রাজা বুলুকিয়া বল্‌লেন—'অনুরোধ? কি সে অনুরোধ? আপনি বলুন, যদি আমার পক্ষে তা রক্ষা করা একান্ত অসম্ভব না হয় তবে নিশ্চয়—'

—'তেমন কিছুই না। আপনি মানব সমাজে ফিরে গিয়ে সাধ্যমত আমাদের কথা প্রচার করবেন। আমাদের কথা কারো যেন অজানা না থাকে। ব্যস, আর কিছুই নয়।'

—'অবশ্যই প্রচার করব। আমার চেষ্টার কোনই ত্রুটি হবে না, কথা দিচ্ছি।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিনশ' ষাটতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, রাজা সাঘ্‌র তাঁদের কাহিনী বুলুকিয়া-র কাছে বলতে শুরু করলেন—আল্লাহ আদিতে আগুন সৃষ্টি করেন। কিন্তু তামাম দুনিয়ার সাতটি জায়গা থেকে আগুনকে দূরে রাখলেন। কয়েক হাজার সাল অবধি তিনি এ কাজটি করেছিলেন।

সবার আগে যে-জায়গাটিতে আগুন জমা রেখেছিলেন, তার নাম জাহান্নাম। ধর্মবিদ্রোহীদের মধ্যে যারা কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ জ্বালায় জর্জরিত হবে না তাদের জন্যই এখানকার আগুন রক্ষিত।

আগুন রক্ষিত দ্বিতীয় অঞ্চলটির নামকরণ করা হয়েছে 'লাজা'। এখানে উপসাগরের মত সুবিশাল গর্ত খুঁড়ে আগুন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ধর্ম প্রচারক মহাত্মা মহম্মদ-এর উত্তরসুরীরা এ-আগুন ব্যবহার করবে। তাদের দোষ-ত্রুটিগুলোকে অন্ধকারে লুকিয়ে রাখার জন্যই এরকম ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কারণ তাঁরা নিজেদের

দোষ-ত্রুটি মেনে নিতে চাইবেন না।

'জাহিন' নামকরণ করা হয়েছে আগুন রক্ষিত তৃতীয় অঞ্চলটির। সম্পূর্ণ অঞ্চলটি একটি ফুটন্ত কড়াইয়ের মধ্যে অনবরত জ্বলছে। 'ম্যাগগ' আর 'গগ'-দের জন্য এটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

চতুর্থ অঞ্চলটি 'সইর' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে আগুন সঞ্চিত রাখা হয়েছে এবলিস-এর জন্য। যে সব দেবদূত বিদ্রোহে লিপ্ত তিনি তাদের নেতা। তিনি তাদের সৈন্যাধ্যক্ষ 'আদম'-এর কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। এ-অস্বীকৃতির মাধ্যমেই তিনি সর্বশক্তিমানের নির্দেশ পালন করেন নি।

পঞ্চম স্থানটির নামকরণ করেছিলেন 'সাখুর'। এ-অঞ্চলটি নির্ধারিত করা হয় ধর্ম বিদ্বেষী, অধার্মিক, মিথ্যাশ্রয়ী এবং আত্মম্ভরীদের জন্য।

ষষ্ঠ স্থানটির নামকরণ করা হ'ল 'হিৎসৎ'। এখানে মড়ক সৃষ্টি করা হ'ল। গুমোট পরিবেশ এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আর 'হাওয়াই' নামে চিহ্নিত করা হ'ল সপ্তম স্থানটিকে। এটিকে বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হ'ল। আল্লাহ-র ওপর যাদের বিশ্বাস থাকবে তাদের জন্য এস্থানটিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হ'ল। আবার ইহুদী আর খ্রীস্টান বেশী হয়ে গেলে এখানে রাখা হতে লাগল।

প্রথম অঞ্চল, যাকে জাহান্নাম আখ্যা দেয়া হয়েছে তার সত্তর হাজার আগ্নেয় পাহাড় রয়েছে। আর তাদের প্রত্যেকটির সত্তর হাজার ক'রে উপত্যকা বিদ্যমান। আবার প্রত্যেক উপত্যকায় সত্তর হাজার নগর। প্রতিটি নগরে রয়েছে সত্তর হাজার বুরুজ। প্রত্যেক বুরুজে রয়েছে সত্তর হাজার বসতবাটী। আবার প্রত্যেক বাড়িতে সত্তর হাজার ক'রে বেঞ্চ রক্ষিত। প্রতিটি বেঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক অপরাধের পৃথক পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আপনিও ইচ্ছা করলে নিজে গুণে দেখতে পারেন। কোনই অসুবিধা নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে শাস্তি ও নিপীড়ন কত প্রকার? এর উত্তর একমাত্র আল্লাহ-ই দিতে পারেন।

যে-সাতটি অঞ্চলের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক অঞ্চল হচ্ছে প্রথম অঞ্চল অর্থাৎ 'জাহান্নাম'। তবে হ্যাঁ, জাহান্নাম অঞ্চলটির অসহনীয় কষ্ট, নিপীড়ন প্রভৃতির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে বাকী ছয়টি অঞ্চলের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ক'রে নিতে সক্ষম হবেন।

আগুন সম্বন্ধে আমি এত উৎসাহ নিয়ে আপনাকে বিষদ বিবরণ কেন দিলাম, বলতে পারেন? কারণ, আমরা জিনেরা যে অগ্নিসন্তান।

আর যা কিছু বল্লাম তা থেকে ও নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন যে, আমরা অগ্নিসন্তান।

এবার যা বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন—'সৃষ্টিকর্তা আল্লা সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করলেন দু'টি মাত্র জীব। তারা উভয়েই যে জিন আশা করি আর বলার দরকার নেই। তাদের একজনের নাম খালিত আর অন্যজনের নাম খলিত। আল্লাহ তাদের নিজের রক্ষী হিসাবে বহাল করলেন। তাদের মধ্যে খালিত সিংহের মত রূপ আর অন্যজনের অর্থাৎ খলিত-এর রূপ নেকড়ে বাঘের মত। সিংহ পুরুষ আর স্ত্রীলোক হ'ল নেকড়ে। খালিত নামে সিংহের পুরুষাঙ্গটির দৈর্ঘ্য কুড়ি গজ। আর খলিত অর্থাৎ নেকড়ের যৌনাঙ্গটির বিস্তৃতি একটি কচ্ছপের মত। আসলে তার যৌনাঙ্গটি যাতে খালিত-এর পুরুষাঙ্গ টিকে ধারণ করতে পারে সে-পরিমাণ মাপ বিশিষ্ট করেই আল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন।

খলিত আর খালিত-এর মধ্যে একজনের গায়ের রঙ সাদা-কালোর ছোপযুক্ত আর অন্যজনের সাদা-গোলাপী রঙ্ বিশিষ্ট।

আল্লাহ খলিত আর খালিত-এর মিলন ঘটিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাদের যৌন মিলনের মাধ্যমে পয়দা হ'ল হাজার হাজার সন্তান সন্ততি। তাদের মধ্যে ড্রাগন, কুমীর, বিভিন্ন প্রকার বিছা আর কুমীর ও সাপ সমেত যত সরীসৃপ। আর সে সঙ্গে হল এরকম আরও কয়েক কিসিমের জীব। এবার এসব জীবকে পাপীতাপীদের শাস্তি দেয়ার জন্য সাতটি অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া হ'ল। তারা দিব্যি নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে লাগল।

আল্লাহ কিন্তু এতেই থেমে গেলেন না। খলিত আর খালিত'কে নির্দেশ দিলেন দ্বিতীয় বার সঙ্গমে লিপ্ত হতে। এবার পয়দা হ'ল সাতটি পুরুষ আর সাতটি নারী। তাদের একজনকে আল্লাহ বেছে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

তারপর খলিত আর খালিত-এর একের পর এক মিলনের ফলে অগণিত প্রজন্ম পয়দা হ'ল। তাদের নেতাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যের অধিকারী তার নাম এবিলিস। পরবর্তীকলে তার নসীবের চরম দুরবস্থা লক্ষিত হয়েছিল। তার অঞ্চলের প্রত্যেকেই আল্লাহ-র বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। জেহাদের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তার নসীবেও তা-ই ঘটল। এবিলিস ও তার অনুগামীদের ঠাঁই হ'ল দোজখে।

আর অন্য ছয়জন নওজোয়ান এবং অন্যান্য লেড়কিরা জেহাদের খাতায় নাম তো লেখালই না বরং আল্লাহ-র নিতান্ত অনুগতের মত তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে লাগল। আমরা তাদের উত্তরসূরী।

আমাদের বংশের যাবতীয় তথ্য সংক্ষেপে আপনার কাছে তুলে ধরলাম।

আমরা খানাপিনা খুবই বেশী পরিমাণে ব্যবহার করি। তাই এখন খাদ্যদ্রব্য এমন ঢিবি ক'রে জড়ো করা হয়েছে। আঁৎকে উঠতে

পারেন বটে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন খাদ্যের বরাদ্দের কথা শুনলে হয়ত আর বিস্ময়টুকু থাকবে না।

তবে বলেই ফেলি, কি বলেন? আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন দশটি উট, কুড়িটি ভেড়া দিয়ে খানা সারি। আর সে সঙ্গে বড় ডাবু-হাতে চল্লিশ হাতা করে ঝোলও উদরস্থ করি। ডাবু-হাতাটি পেল্লাই একটি গামলার মত।

আপনাকে আমাদের সম্বন্ধে অনেক খবরই দিলাম। এর ফলে মানব-সমাজে গিয়ে পরিচিত মহলের কাছে আমাদের সম্বন্ধে কিছুটা অন্ততঃ ধারণা তো দিতে পারবেন। ফিন আপনার অপরিসীম উপকারও সাধন করতে পারবেন।

এবার কি বলছি ধৈর্য ধরে শুনুন। কাফে পর্বতের চূড়া থেকে এখানকার বরফ নেমে আসে। এ-বরফের অস্তিত্ব যদি না থাকত তবে সূর্যের প্রখর উত্তাপে জীব-জগৎ গাছপালা বিলকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ত।

তামাম দুনিয়ার ভূ-ত্বকের সাতটি স্তর বর্তমান। এদের প্রত্যেকটি স্তরকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক একজন পালোয়ান জিনি। একটি পাহাড়ের ওপর জিনি দাঁড়িয়ে। আবার পাহাড়টি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ষাঁড়ের ঘাড়ের ওপর। আর অতিকায় একটি মাছের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ষাঁড়টি। ষাঁড়টিকে ঘাড়ে নিয়ে মাছটি হরদম সাঁতার কাটছে।

এবার কি বলছি শুনুন—অন্তঃহীন সমুদ্রের তলদেশ হচ্ছে দোজখের ছাদ। অতিকায় একটি সাপ দোজখের সাতটি ছাদকে
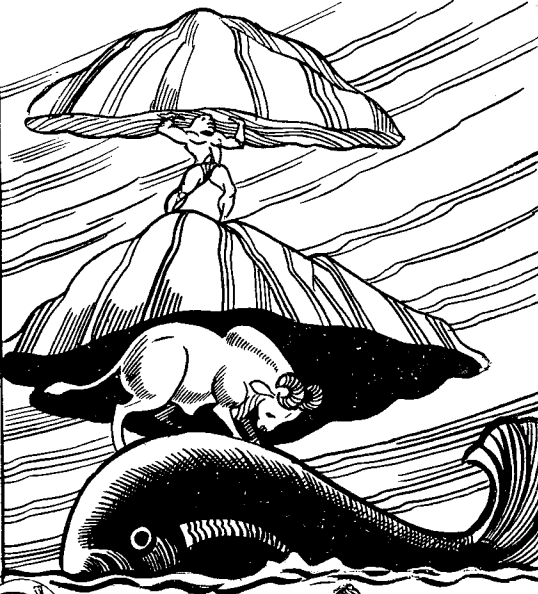
মুখে আটকে রেখেছে। এভাবেই সে আটকে রাখবে অন্তিম বিচারের দিন পর্যন্ত। সেদিন সে দোজখ আর তার অধিবাসীদের আল্লাহর সামনে উগরে দেবে। তারপর শুরু হবে অন্তিম বিচার। বিচারান্তে আল্লাহ রায় দেবেন। তার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলবে।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' একষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমাদের এবং দুনিয়া পয়দা হওয়ার কাহিনী এরকম।

আমাদের সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য আপনার দরবারে পেশ করছি। আমাদের বয়স যেমন কমে না তেমনি বাড়েও না। আমরা কোনদিনই বার্ধক্য প্রাপ্ত হই না। জরার মত ব্যাধিও আমাদের থেকে তফাতে থাকে। দুনিয়ার তামাম আদমি পশু-পাখি ও কীট পতঙ্গ দ্রুত বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা? অনন্ত যৌবনের রূপ ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছি। আদতে অমৃত ফোয়ারার অমৃত যে আমরা পান ক'রে চলেছি। খিচর সে ছায়ালোকে হরবখত পাহারা দিয়ে চলেছেন। খিচর তামাম ঋতুর পার্থক্য দূর করে একটি ঋতুতে পরিণত করে দিয়েছেন।

খিচর অন্তঃহীন হিম্মতের অধিকারী। তিনি নদীগুলিকে বাঁধ ভাঙার গতিদান করেছেন। গাছগাছালিকে সবুজ ক'রে রেখেছেন। আর সূর্য অস্ত গেলে প্রকৃতির কোলে নিজেই গোধূলির আলো নিজের হাতেই গড়ে তুলেছেন। গোধূলি—রূপালি গোধূলি!

জিনি এবার বল্‌ল—'বুলুকিয়া, আপনি ধৈর্য ধরে আমার সব কথা শুনেছেন ব'লে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করতে চাইছি। আমাদেরই এক জিন আপনাকে কাঁধে ক'রে আপনার দেশে দিয়ে আসবে, রাজী তো?'

—'রাজী বলতে রাজী! এমন সুযোগ পাগলেও তো হাতছাড়া করবে না।

এবার জিনদের বহুভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বুলুকিয়া বিদায় নিলেন। তারপর এক পালোয়ান-জিন তাঁকে কাঁধে নিয়ে শূন্যে ভাসল। মুহূর্তে তাঁকে তাঁর রাজ্যে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল।

বুলুকিয়া তাঁর রাজ্যে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু যেতে হবে রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদে। এক সমাধিক্ষেত্রের ধার দিয়ে যাবার সময় তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, এক নওজোয়ান এক সমাধির সামনে বসে বিলাপ ক'রে কেঁদে চলেছে। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তিনি চারদিকে তাকালেন। আর কাউকেই ধারে কাছে দেখতে পেলেন না। কৌতূহলের শিকার হয়ে এক পা দু'পা ক'রে

নওজোয়ানটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'বেটা, কি ব্যাপার তোমার, বল তো? দুটো কবরের মাঝখানে বসে অনবরত কেঁদেই চলেছ, ব্যাপার কি বল তো? আমার কাছে তোমার ব্যথা-বেদনার কথা বল। আমি তোমার দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার কোশিস করব।

নওজোয়ানটি চোখ মুছতে মুছতে বল্‌ল—'আপনি ঝুটমুট কেন আমার জন্য তকলিফ করতে যাবেন?'

—'তুমি বলই না, কি তোমার সমস্যা?'

—'না, থাক। আপনি ব্যস্ত হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। ঝুটমুট আপনার দেরী করিয়ে দিতে চাই না। আমার দুর্ভাগ্যের বোঝা আমি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন চলে যান।'

—'একটা কথা তো আগে বল, দুই কবরের মাঝখানে এভাবে বসে কাঁদছ কেন্?'

—'নীরবতা, গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য। আমার কান্নার শব্দ যাতে বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে অন্যের শান্তি ভঙ্গ না করে। আপনি নিজের কাজে চলে যান। আমি কোশিস ক'রে দেখি চোখের পানিতে দুঃখের পাথরকে ভেজাতে পারি কি না।'

—'নসীব বড়ই মন্দ দেখছি! তোমার বিড়ম্বিত নসীবের ব্যাপার তো আমাকে শুনতেই হবে। তোমার দুঃখ-দুর্দশা, শোক তাপের কাহিনী নির্দ্বিধায় আমার কাছে ব্যক্ত কর।'

কথা বলতে বলতে বুলুকিয়া ক্রন্দনরত যুবকটির পাশে পাথরের ওপর বসলেন।

নওজোয়ানটির একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের কোলের ওপর রাখলেন। তারপর নিজের জিন্দেগীর বিড়ম্বিত কাহিনী এক এক ক'রে আদ্যোপান্ত তার কাছে বললেন। এবার বল্‌লেন—'আমার নসীবের বিড়ম্বনার কিস্‌সা তো শুনলে। এবার তোমার দুঃখ-দুর্দশার কথা আমাকে বল। তোমার ব্যথা-বেদনা আশা-হতাশা অবশ্যই আমার মনে দাগ কাটবে।'

নওজোয়ানটি এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল—'ভাইয়া, আমিও এক রাজপুত্র, আমার বিড়ম্বিত জীবনের কিস্‌সা আরও অত্যাশ্চর্য। আর তা শুনলে বেদনায় আপনার দিল্ ভরে উঠবে।'

যুবকটি এবার তার কোর্তা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্‌ল—'আমার জন্মভূমি কাবুল। সে দেশের সুলতান টিগমাস বানু-সালানো-র ঘরে আমি পয়দা হয়েছি। আমার আব্বাজী আফগানিস্থানেরও শাসনকর্তা ছিলেন। তার রাজ্যে এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল। সবাই তাকে চোখের মণির মতই পিয়ার করে।

আমার আব্বাজীর অধীনে সাতজন সামন্ত রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁদের প্রত্যেকের রাজ্যে এক শ'টি শহর ছিল। আর দুর্গ ছিল এক শ'টি ক'রে।

আমার আব্বাজীর অধীনে ছিল এক শ' জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আর এক শ' অসম সাহসী ঘোড়সওয়ার।

খোরাসানের সুলতান বাহরোয়ান-এর আদরের বেটি ছিলেন আমার আম্মা।'

—'সবই তো বল্‌লে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমার নিজের নামটি তো বল্‌লে না?'

ম্লান হেসে যুবকটি বল্‌ল—'আমার নাম জানশাহ্। আমার আব্বার আগ্রহ-উৎসাহে আমার মধ্যে শৈশব ও বাল্যের দুরন্তপনার দিনগুলো থেকেই বিদ্যার্জনের প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখা গেছে। তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া আর অস্ত্র চালনাতেও তামাম সুলতানিয়তে আমার তুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই ছিলেন না। ঘোড়ার পিঠে চেপে দূর দূরান্তে পাড়ি জমানো আর শিকারে যাওয়াও ছিল আমার একটি বিশেষ ঝোঁক।

আমার আব্বাজী একদিন আমাকে এবং তাঁর অনুচরবর্গকে নিয়ে শিকার করতে গেলেন। বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আমি তিনদিন ধরে তাজ্জব সব খেল্ দেখছিলাম।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা তাঁবুতে বসে যখন বিশ্রাম করছি তখন একটি হরিণ শাবক তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাতে লাফাতে আমার সামনে হাজির হ'ল। ব্যস, তারপরই সে ছুট দিল। আমি মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে সাতজন সৈন্য নিয়ে তার পিছু নিলাম। তাকে অনুসরণ ক'রে এক নদীর তীরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম এবার তাকে ঘিরে ফেলা সম্ভব হবে।

হরিণটি কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমাদের দিকে তাকিয়েই ঝুপ্ ক'রে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঊর্ধ্বশ্বাসে সাঁতরে ওপারে যাবার কোশিস করতে লাগল।

আমাদের ঝোঁক আরও বেড়ে গেল। হরিণটির পিছন পিছন পানিতে ঝাঁপ দিতে যাব অমনি একটি নৌকো দেখতে পেয়ে তাতে চাপলাম। একজন সৈন্যের ওপর আমাদের সাতটি ঘোড়ার দায়িত্ব দেয়া ছিল।

নদীতে স্রোত ছিল যথেষ্টই। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নৌকা তরতর ক'রে ছুটে মাঝ-নদীতে এসে পড়ল।

অনেক আগেই সন্ধ্যা হয়েছে। রাত্রির আন্ধার তখন প্রকৃতিকে ঢেকে ফেলেছে। ঘুটঘুটে আন্ধারে আমাদের নৌকা যে কোথায়, কোন্‌দিকে ছুটে চলেছে আমাদের জানা ছিল না। নদীর স্রোতের মধ্যে পড়ে সারা রাত আমরা হারা উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলছিলাম।

খোদা ভরসা, আমরা কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়লাম না। নইলে

পাহাড়ের গায়ে নৌকা আচমকা ধাক্কা খেলে নির্ঘাৎ আমাদের সাতজনেরই সলিল সমাধি হয়ে যেত।

স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমাদের নৌকা ভোরের আগে আগে এক জায়গায় গিয়ে ভিড়ল। হাতের কাছে ডাঙা পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে নৌকা থেকে নেমে এলাম। আল্লাহ্-র মেহেরবানি না থাকলে সে যাত্রায় আমাদের জান কিছুতেই রক্ষা পেত না।

এদিকে ঘটে গেল আর এক কাণ্ড। যে-সৈন্যটির কাছে আমাদের ঘোড়াগুলো জিম্মা রেখে এসেছিলাম সে আমাদের ফিরতে দেরী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। রাত্রিও পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে সে ব্যাপারটি আমার আব্বাজীর কানে তুল্‌ল।

আব্বাজী তো নিঃসন্দেহ, নির্ঘাৎ আমাদের সলিল সমাধি হয়ে গেছে। হতাশা আর শোকে মুহ্যমান হয়ে তিনি মাথা থেকে রাজমুকুট নিজে হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বুকফাঁটা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

আব্বাজী সেনাপতিকে তলব করলেন। আমার তল্লাশী করতে চারদিকে দূত ছুটল।

যথাসময়ে আমার আম্মার কাছেও খবর গেল। তিনি উন্মাদিনীর মাফিক বুক চাপড়ে কাঁদতে লেগে গেলেন। মুখ আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত ক'রে দিলেন। দু'হাতে চুল ছিঁড়তে লেগে গেলেন, টেনে হিঁচড়ে পোশাক আশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল্‌লেন। সব শেষে শোকবস্ত্র পরিধান করলেন। অতএব আমার আব্বা আর আম্মা উভয়েই নিঃসন্দেহ, আমি আর ইহলোকে নেই।

আদতে আমরা তো আর ইহলোক ত্যাগ করিনি। বরং বহাল তবিয়তেই রয়েছি। নৌকো থেকে নেমে ভেতরের দিকে এগোতে লাগলাম। সামনে পড়ল ছোট একটি নদী। খুবই মনলোভা তার দু' তীরের সৌন্দর্য। নদীটির পাড় ধরে হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে হঠাৎ তাজ্জব এক ব্যাপার চোখে পড়ল। দেখি, এক আদমি তীরে বসে নদীর পানিতে পা দুটো ডুবিয়ে রেখেছে। আপন খেয়ালে পা দুটোকে থেকে থেকে দোলাচ্ছে। আমরা গুটি গুটি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সালাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মেহেরবানি ক'রে বল্‌বেন কি আমরা এখন কোথায় আছি?

সত্যি বিচিত্র চরিত্রের আদমিই বটে। আমাদের অভিবাদনের জবাব তো দিলই না এমন কি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালও না। আগের মতই নির্বিকার উদাসীনভাবে বসে পা দুলিয়েই চল্‌ল।

আমরা এবার বল্‌লাম—'এ-জায়গাটির নাম মেহেরবানি ক'রে বলবেন কি?'

মরা জন্তু-জানোয়ারের ওপরে হামলা চালাবার পূর্ব মুহূর্তে শকুন যেমন বিকট স্বর করে সে ঠিক তেমনি স্বর ক'রে চিল্লিয়ে উঠল।

তার এরকম অভাবনীয় আচরণে আমার কলিজাটি আতঙ্কে অকস্মাৎ যেন ডিগবাজী খেয়ে গেল। আর আমার মুখটি ফুটা বেলুনের মত চিপ্‌সে গেল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' বাষট্টিতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, রহস্যজনক আদমিটি বিকট স্বরে চিল্লিয়ে তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আদমিটির দিকে চোখ পড়তেই আমার বুকের মধ্যে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। শিরা-উপশিরায় খুন ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। কোন আদমির শরীরটি দু'ভাগ। কোমর থেকে কারো শরীর একেবারে দু' টুকরো দেখলেও ঠিক থাকতে পারে এমন শক্ত কলিজা ক'জনের থাকে?

রহস্যজনক আদমিটির শরীরের ওপরের অংশটি আমার দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। আর নিচের অংশটি ছুটে চল্‌ল বিপরীত দিকে। আরও ঘাবড়ে গেলাম। যেন দেখলাম তার মতই আরও অসংখ্য আদমি ঝর্ণার ধার দিয়ে আমার দিকেই তেড়ে আসছে।

চোখের পলকে রহস্যজনক আদমিটি আমার তিনজন সঙ্গীকে সাঁড়াশীর মত দু' হাতে আঁকড়ে ধ'রে ফেল্‌ল। ব্যস, শুরু করে দিল পৈশাচিক কাণ্ড। গোগ্রাসে তাদের কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল।

তার কারবার দেখে আমার হালৎ এমন হয়ে গেল যে, আমি যেন আর আমার মধ্যে নেই।

আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে এক লাফে নৌকাটির ওপরে গিয়ে পড়লাম। পর মুহূর্তেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার জীবন্ত তিন সহযাত্রী।

পানিতে ডুবে দম বন্ধ হয়ে জান দিতে রাজী আছি। কিন্তু রাক্ষসদের হাতে? ও ব্বাস! ভাবলেই শরীর একেবারে অবশ হয়ে আসতে লাগল।

নৌকাটিকে সামান্য ঠেলে ভেতরের দিকে দিতেই স্রোতের টানে তরতর ক'রে এগিয়ে চল্‌ল। যে কোন উপায়ে রাক্ষসগুলোর হাত থেকে আমাদের জান বাঁচাতেই হবে।

সামান্য এগিয়েই মালুম হ'ল আমরা বুঝি দোজখের ওপর দিয়ে চলেছি। তাকিয়ে দেখি, নদীর তীর ধ'রে বাতাসের বেগে ছুটে আসছে হাজার হাজার উরু আর ঠ্যাঙের মিছিল। আমাদের ধরার চেষ্টাতেই তাদের এরকম ছুটোছুটি। আশমানের দিকে তাকিয়ে আমি আকুল আর্তনাদ ক'রে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ্! এ কী বিপর্যয়ের 'মুখে আমাদের ঠেলে দিলে!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি ঠ্যাঙ্ আর উরুগুলি আমাদের দিকে ছুটে আসছে আর দেহগুলি আমার সঙ্গীদের দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করতে ব্যস্ত।

আল্লাহ-ই যেন মেহেরবানি ক'রে আমাদের জান রক্ষার ফিকির ক'রে দিয়েছেন। নইলে স্রোতের বেগ এমন প্রবল কি করেই বা হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাটি আমাদের নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দিল। এবার যেন কলিজায় জল এল।

এবার উদ্ভূত ব্যাপারটি নিয়ে ভাববার মত মানসিকতা ফিরে পেলাম। ভাবলাম, রাক্ষসগুলোর তো পুরো পেট নেই। পেটের মাঝখান থেকে কাটা। তবে তারা আমাদের সঙ্গীদের খেয়ে রাখছে কোথায়? ভেবে কূল কিনারা পেলাম না। তবে আমাদের তিনজন হতভাগাকে যে হারাতে হয়েছে এ বিষয়ে তো সন্দেহের কিছুমাত্রও অবকাশ নেই। আমরা সবাই আশমানের দিকে দু' হাত তুলে তাদের জন্য শোক প্রকাশ করলাম। আল্লাতাল্লার কাছে চোখের পানি ফেলে ফেলে তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করতে লাগলাম। পুরো ব্যাপারটি একেবারে যেন চোখের পলকে ঘটে গেল। সে বীভৎস নারকীয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে কাউকে বলে বা কিতাবে লিখে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

রাত্রি কাটল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে নৌকার ওপরেই। পরদিন একটু বেলা হতেই আল্লাহ-ই যেন নদীর এক বাঁকের মুখে আমাদের নৌকাটির দাঁড়াবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। আল্লাহ-কে সুক্রিয়া জানাতেই হ'ল।

আমরা নৌকা থেকে নামলাম। ক্ষিদেতে পেটের ভেতরে নাড়িভুঁড়িগুলো যেন দাউদাউ হাউ হাউ ক'রে জ্বলছে। যা হোক কিছু দিয়ে জ্বালা নেভাতেই হবে। পথশ্রমে ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ক্লান্ত-অবসন্ন পায়ে নদীর তীর ছেড়ে আমরা এগোতে লাগলাম। বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হ'ল না। হাতের নাগালের মধ্যেই বাহারী ও সুমিষ্ট ফলের গাছ পেয়ে গেলাম। রাক্ষসগুলোর মতই আমরা গোগ্রাসে ফল খেয়ে উদর পূর্তি ক'রে নিলাম। তারপর গণ্ডূষভরে নদীর ঠাণ্ডা পানি পান করলাম। ব্যস, দিল ও জান যেন ফিন পুরো দস্তুর মত তরতাজা হয়ে উঠল।

নদীর তীর থেকে কিছুদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গী সাথীরা হাঁটাহাঁটি করে এল। সন্দেহজনক কোন কিছুই তাদের নজরে পড়ল না। তবে মার্বেল পাথরের এক বিশালায়তন প্রাসাদ নাকি দেখে এসেছে। তার চারদিক ঘিরে বাগিচা। বাগিচার এক ধারে একটি সায়র। তারা প্রাসাদটির ভেতরেও ঢুকেছিল। একটি বিশাল কামরায় সুদৃশ্য একটি শূন্য মসনদ আর তার দু' পাশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো কতগুলো আসন।

তাজ্জব ব্যাপার। বাগিচায় তো দূরের কথা প্রাসাদটিতে পর্যন্ত জীবিত বা মৃত কোন প্রাণীর চিহ্ন মাত্রও নজরে পড়ল না। আমার সঙ্গী সাথীরা প্রাসাদটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল, একটি টিকটিকি বা পিঁপড়ে পর্যন্ত চোখে পড়ল না।

প্রাসাদ থেকে সবাই ফিরে এলে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাসাদটিতে গিয়ে মাথা গোঁজলাম। বিশালায়তন কামরাটিতে ঢুকেই আমি মসনদে বসে পড়লাম। আমার সঙ্গীরা বসল আমার ঠিক সামনের আসনে। প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল। আমি

মসনদে বসে, আমি যেন একদম বাদশাহ বনে গেলাম।

তাজ্জব ব্যাপার তো, মসনদটিতে বসামাত্র আমার আব্বা, আম্মা আর ভাই-বহিনের বাৎ স্মৃতির পটে এক এক করে ভেসে উঠতে লাগল। আমার দু' চোখের কোল বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। আমার সহযাত্রীরাও ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

আমরা যখন মনমরা হয়ে কোনরকমে সময় গুজরান করছি, ঠিক তখনই একেবারেই অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল। কামরার বাইরে ভীষণ তর্জন গর্জন শুরু হয়ে গেল। সমুদ্র ক্ষেপে গেলে যেমন বুকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী গর্জনের উদ্ভব হয়, অবিকল সেরকম গর্জন শুনতে পেলাম। মালুম হ'ল অবাঞ্ছিত আওয়াজটি ক্রমেই কামরাটির দিকেই এগিয়ে আসছে। আতঙ্কে আমাদের মুখ শুকিয়ে উঠল।

আমার সঙ্গীদের একজন সাহসে ভর করে উঠে গিয়ে ব্যাপারটি দেখার জন্য সবে আসন ছেড়ে উঠেছে অমনি একদল বিভিন্ন উমরের বাঁদর হৈ-হট্টগোল করতে করতে কামরায় উঠে এল। উজির, নাজির, পাত্রমিত্র প্রভৃতি। বুড়ো মত একটি বানর সবার আগে আগে ছিল। তার চলাফেরা আদব কায়দা দেখে মনে হ'ল সে-ই উজির।

আমি তো ধরতে গেলে পৌনে মরা হয়ে গেলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। কলিজা ঠাণ্ডা। ভাবলাম, রাক্ষসদের হাত থেকে আব্বার দেয়া জানটি রক্ষা পেলেও এবার নির্ঘাৎ খতম হয়ে যাব। বানর হলে কি হবে রীতিমত দৈত্যাকার সবার চেহারা। কারো চেয়ে কেউ কমতি নয়। আর কিছুরই দরকার পড়বে না, ইয়া পেল্লাই পেল্লাই নখগুলি দিয়ে একটি আঁচড় বসালেই জিন্দেগী একদম বরবাদ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

উজির বানরটি কিন্তু ঘরে ঢুকেই আমাকে অবাক ক'রে দিল। নতজানু হয়ে আমাকে কুর্নিশ ক'রে মানুষের মত দিব্যি কথা বল্‌ল—'আল্লাহ-র অশেষ কৃপা বলে আপনাকে আমরা কাছে পেয়েছি। আমি ও আমার সহকর্মীরা একমত হয়ে আপনাকে আমাদের সুলতান ব'লে মেনে নিচ্ছি।'

আমি তো তখন বিস্ময়ের সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। তার কথায় হাসব, নাকি কাঁদব ভেবে পাচ্ছিনে।

উজির-বানরটি এবার বল্‌ল—'আর আপনার সঙ্গী তিনজন আমাদের সেনাবাহিনীর তিন প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে আমরা ধন্য হ'ব।'

আমরা তার কথা নির্বিবাদে মেনে নিলাম।

আমাদের সম্মতি পেয়ে তাদের সে কী আনন্দ হ'ল তা ভাষায় বুঝানো সম্ভব নয়। তারা কচি হরিণের মাংস দিয়ে আমাদের খানা পিনার বন্দোবস্ত করল। সে কী আপ্যায়ন, একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

খানাপিনার পাট মেটানোর পর উজির সবিনয় নিবেদন রাখল—'জাঁহাপনা, আমাদের সেনাবাহিনী আপনাদের অভিবাদন জানানোর জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। মেহেরবানি ক'রে একবারটি বাইরে গেলে তারা বড়ই খুশী হবে।'

আমি এবং আমার তিন সঙ্গী সাথী উজিরের সঙ্গে প্রাসাদের বাইরে গিয়ে সেনাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করার জন্য এগোতে লাগলাম। পথে উজির আমাকে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত। তৈরি হয়ে আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।'

আমি মুখ খুললাম—'যুদ্ধ? কিসের যুদ্ধ? কাদের সঙ্গেই বা যুদ্ধ?'

—'আমাদের পুরনো শত্রু প্রেতের রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ।'

আমরা যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে বানর-সৈন্যদের অভিবাদনের ব্যাপারটি সেরে ফিরে এলাম। আমাদের বিশ্রাম করার সুযোগ দিয়ে উজির ও অন্যান্য সবাই বিদায় নিল।

বিশ্রাম? আমাদের বিশ্রাম তো শিকেয় উঠে গেছে। এখন কিভাবে বানরদের এ-ফাঁদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় সে চিন্তাতেই দিমাক খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। আমরা একান্তে নিজেদের পরিস্থিতি নিয়ে গোপন আলোচনায় বসলাম। কি ক'রে এ-মুলুক ছেড়ে পালানো যাবে তা-ই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। পালানোই যে আমাদের একমাত্র বাঁচার রাস্তা সে-বিষয়ে আমরা একমত।

প্রাসাদের পিছনের দিকে একটি খিড়কি দরওয়াজার খোঁজ পাওয়া গেল। আমরা সেটির সদ্ব্যবহার করলাম। গুটি গুটি বেরিয়ে লম্বা পায়ে নদীর তীরে চলে এলাম। হতাশ হতে হ'ল। আমাদের একমাত্র সম্বল নৌকাটি যথাস্থানে নেই। নির্ঘাৎ কেউ সরিয়ে ফেলেছে। ফুসফুস নিঙড়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—'খোদাতাল্লা তোমার এ কী মর্জি!'

আমরা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় নৌকোটির খোঁজ করলাম। না, নৌকোর চিহ্নও কোথাও নেই। অনন্যোপায় হয়ে কারাগার স্বরূপ প্রাসাদটিতেই ফিরে এলাম।

শরীর ও দিল্ উভয়ই ক্লান্ত। আর জেগে থাকা সম্ভব হ'ল না। গভীর নিদে ডুবে গেলাম।

সকালে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি বৃদ্ধ উজির-বানরটি দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই কুর্নিশ ক'রে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, সৈন্যরা প্রস্তুত। যুদ্ধের যাবতীয় বন্দোবস্ত পাকা। এখন শুধুমাত্র জাঁহাপনার হুকুম হলেই প্রেতদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে।'

তার বাৎ চুকতে না চুকতেই দেখলাম, কয়েকজন অতিকায়

চারটি কুকুর ধরে নিয়ে আসছে।

প্রাসাদের সদর-দরওয়াজায় তাদের নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের বাহক। কুকুরের পিঠে চেপে আমাদের যেতে হবে। এতক্ষণ কলিজায় ছিঁটেফোঁটা পানি যা-ও ছিল এবার সেটুকুও উবে গেল।

আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দামই নেই। কুকুর তৈরি। অতএব কুকুরের পিঠেই চাপতে হ'ল।

আমাদের পিঠে নিয়ে কুকুরগুলো আগে আগে চল্‌ল। কারণ, আমাদের তো সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে হবে। আমাদের ঠিক পিছনেই উজির। বানর-সৈন্যের দলপতি। আর তার পিছনে কিচির মিচির, ঘ্যাঁৎ ঘোঁৎ বিচিত্র সব আওয়াজ করতে করতে চলছে লক্ষাধিক সশস্ত্র বানর সৈন্য।

পুরো একটি দিন আর রাত্রি আমরা চলেছি কুচকাওয়াজ করতে করতে। চলার যেন আর বিরাম নেই। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে অবশ্যই নয়। কেন চলেছি তা তো জানাই আছে। কোথায়? কোন দিকে আর কি রূপ নিয়ে আমাদের শত্রু পক্ষ রয়েছে তা আমাদের মালুম না থাকলেও বুড়ো উজির অবশ্যই জানে।

এক সময় আমরা সুবিশাল একটি কালো পাহাড়ের কাছে এসে থামলাম।

বুড়ো উজির বল্‌ল—'জাঁহাপনা, হতচ্ছাড়া প্রেতগুলো পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে। আমাদের দেখেই তারা কিলবিল ক'রে বেরিয়ে এল। ইয়া আল্লাহ! কী বিতিকিচ্ছিরি চেহারা। দেখলেই গা ঘিনঘিন করে। আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। তামাম দুনিয়ায় এমন ভয়ঙ্কর দর্শন কোন কিছু থাকতে পারে ব'লে আমার অন্তত জানা ছিল না। কারো ষাঁড়ের মত মাথাটিকে উটের মত ধড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কারো ধড়ে হায়নার মাথা, কারো বা কেবল মাথাটি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, ধড় বলতে কিছুই নেই, জিন্দেগীতে যেসব সুরৎ দেখব ব'লে কল্পনাও করতে পারি নি তা-ই চোখের সামনে দেখতে হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে বল্‌লে ঠিক বলা হবে না। দেখতে আমাদের বাধ্য করছে।

আমাদের সাজোয়া বাহিনী দেখে শত্রু সৈন্যরা কিল্‌ বিল্‌ ক'রে পাহাড় ছেড়ে নেমে এল। ব্যস, শুরু করে দিল পাথর-বৃষ্টি। লাখ লাখ বল্‌লে ঠিক বলা হবে না, কোটি কোটি বলেও যথার্থ বর্ণনা হবে না—অগণিত পাথর উড়ে এসে আমাদের ওপর পড়তে লাগল। আমাদের সৈন্যদের হিম্মৎ মালুম হ'ল যখন দেখলাম তাদের পাথর কুড়িয়ে তাদের লক্ষ্য ক'রে হরদম পাথর ছুঁড়ছে।

আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ উভয়ই এক সময় রীতিমত জোরদার হয়ে উঠল। যুদ্ধ ছড়াতে ছড়াতে এক সময় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। আমি এবং আমার তিন সঙ্গী পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে অনবরত তীর ছুঁড়তে লেগে গেলাম। কাজ হচ্ছে। বেশ কয়েকটি শত্রুসৈন্যকে ঘায়েল ক'রে ফেল্‌লাম। আমাদের যুদ্ধ কৌশল ও তৎপরতায় একের পর এক শত্রু সৈন্য কুপোকাৎ হয়ে পড়ছে দেখে আমাদের সৈন্যদের সে কী উল্লাস!

একদল তো দু' বাহু তুলে ধেই ধেই ক'রে নাচতে শুরু করে দিল। সে সঙ্গে তাদের নিজস্ব স্বর ও কায়দায় চিল্লাচিল্লি তো রয়েছেই। খোদা মেহেরবান। আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করলাম। পরাজিত সৈন্যরা চাচা আপন জান বাঁচা ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। আমরা বিজয়ী। এত সহজে তাদের রেহাই দেয়া হবে না। আমরা তাদের তাড়া করলাম।

সবার আগে আগে আমরা চারজন কুকুরের পিঠে চেপে চলেছি। কুকুরগুলোর সে কী দৌড়। দুনিয়ার কোন কুকুর যে এত তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে তা আমার অন্ততঃ ধারণা বহির্ভূত। দৌড়—দৌড়, আর দৌড়! দৌড়তে দৌড়তে কুকুরগুলোর জিভ বেরিয়ে লালা ঝরতে লাগল।

কুকুরগুলো দৌড়ে দৌড়ে কাহিল হয়ে পড়েছে। তাদের কিছু সময় অন্ততঃ বিশ্রাম দেয়া দরকার। নামলাম। সামনে মুখ তুলতেই দেখি, সুউচ্চ এক পাহাড়।

আমাদের সৈন্যরা ও উজির যখন যুদ্ধ জয়ের আনন্দে লাফালাফি মাতামাতি করতে ব্যস্ত ঠিক তখনই আমরা চারজন শত্রু সৈন্যকে ধাওয়া করার অছিলায় কুকুরের পিঠে চেপে পালাতে শুরু করেছিলাম। ফলে আমাদের দিকে কারো নজরই ছিল না।

আমরা পাহাড়টির পাদদেশে কুকুরের পিঠ থেকে নামলাম। গাছের সঙ্গে লাগাম দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে বিশ্রাম করতে দিলাম। এবার নিজেদের হালৎ নিয়ে ভাববার সুযোগ পেলাম। পিছন ফিরে ব্যাপারটি সম্বন্ধে আঁচ ক'রে নিতে চাইলাম, বানর বা প্রেত কারোরই নজর আমাদের দিকে ছিল না। ফলে কারো টিকির দেখাও পাওয়া গেল না। ব্যস, বিলকুল নিশ্চিন্ত।

লক্ষ লক্ষ বানর সৈন্য আর প্রেতের চোখের সামনে দিয়ে আমরা দিব্যি বে-পাত্তা হয়ে গেলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

পাহাড়টির গা ধরে সামান্য হাঁটাহাঁটি করতেই পাহাড়ের গায়ে কয়েক ছত্র লেখা নজরে পড়ল। তার বক্তব্য হ'ল—

'ওহে কয়েদী, নসীব তোমাকে বানরদের রাজা বানিয়ে দিয়েছিল। তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে গিয়ে তুমি যদি উদভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করে থাক তবে তোমাকে মুক্তির পথ বাৎলে দিচ্ছি।

'শোন, তোমার সামনে দুটো পথ খোলা। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পথটি তোমার ডান-দিকে এগিয়ে গেছে। সমুদ্রের উপকূলে গিয়ে সেটি থেমেছে। মরুভূমির ভেতর দিয়ে পথটি এগিয়ে গেছে। রাক্ষস, দৈত্য-দানো আর জিনে মরুভূমিটি ছেয়ে আছে।

'আর অন্যপথটি চলে গেছে বাঁ-দিক দিয়ে। এ-টি অপেক্ষাকৃত লম্বা। চারমাস এক নাগাড়ে পাড়ি দিলে তবে পথটি পেরোতে পারবে। একটি উপত্যকার ভেতর দিয়ে পথটি এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে। উপত্যকাটি পিঁপড়ের উপত্যকা নামে চিহ্নিত। দ্বিতীয় পথটি ধরে হেঁটে যদি কোনরকমে পিঁপড়ের সংস্রব এড়াতে পার তবে তোমার নসীবকে এড়াতে পারবে। আর এভাবেই তুমি অগ্নি পর্বতের পাদদেশে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে। সে অঞ্চলটিতে ইহুদীদের একাধিপত্য।

আমি ডেভিড-এর লেড়কা সুলেমান। আমি তোমার মুক্তির ফিকির বাৎলে দিলাম।'

আমরা বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে কুকুর বাহনদের পিঠে চেপে পথ পাড়ি দিতে লাগলাম। এ-রাস্তা ধরে হাঁটলেই ইহুদীদের রাজ্যে পৌঁছতে হবে। আর পথে পড়বে পিঁপড়ের উপত্যকা।

পুরো একটি দিনও আমরা পথ চলি নি। ব্যস, আমাদের বুকের ভেতর ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। পিছন থেকে তুমুল কোলাহল কানে ভেসে আসতে লাগল। মাটি পর্যন্ত যেন থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা-ই। হাজার হাজার বানর সৈন্য আমাদের ধাওয়া ক'রে এগোচ্ছে। সবার আগে সেই বুড়ো গোদা উজির। ইয়া আল্লাহ! এ যে সর্বনেশে কাণ্ড ঘটতে শুরু করেছে। পালাবার আর কোন ফিকির খুঁজে বের করতে পারলাম না। আমরা বানরসৈন্যদের হাতে অসহায়ভাবে বন্দীত্ব বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হলাম। সবার সে কী বিশ্রী স্বরে চিৎকার চেঁচামেচি! কলিজা শুকিয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

উজির-বানর এগিয়ে এল। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য নতজানু হয়ে আমাদের কুর্নিশ করল। বহুভাবে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

দীর্ঘদিন পর বানররা প্রেতদের সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়লাভ করতে পেরেছে। যুদ্ধজয়ের আনন্দ, আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রভৃতি উল্লেখ ক'রে উজির ছোট্ট একটি ভাষণই দিয়ে দিল।

আমাদের ঘিরে রীতিমত সভা শুরু হয়ে গেল। যদিও প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে তবু আমাদের মধ্যে যারপরনাই বিরক্তির সঞ্চারই শুধু নয় গোস্সায় গা পিত্তি রীতিমত জ্বলতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে সব বে-আদপি নির্বিবাদে হজম করতে লাগলাম।

যা ভেবেছিলাম কার্যতও হ'ল ঠিক তাই। আমাদের ঘেরাও করে ফিন প্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত হ'ল। তারা চিল্লিয়ে চারদিক কাঁপাতে কাঁপাতে আমাদের প্রাসাদে নিয়ে যেতে লাগল। উজির বল্‌ল—'রাজ্যে নিয়ে গিয়ে আমরা তোমাদের অভিষেকের বন্দোবস্ত করব। প্রজারা খুশীতে মাতবে। খুশীর ফোয়ারা ছুটবে তামাম রাজ্য জুড়ে।'

আমরা কয়েক পা যেতে না যেতেই ঘটে গেল একদম অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড। আচমকা তামাম উপত্যকাটি আড়াআড়ি এক

বিশাল ফাঁটলের সৃষ্টি হ'ল। ইয়া আল্লাহ! এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! পিঁপড়ে! কাতারে কাতারে ইয়া বড় বড় পিঁপড়ে সে-ফাঁটল দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। ব্যস, চোখের পলকে বানর সৈন্য আর পিঁপড়ের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল। উফ্ সে যে কী ভয়ঙ্কর বিতিকিচ্ছিরি লড়াই, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। পিঁপড়েগুলোর পা গুলো এক একটি গাঁইতির মত। আর দাঁত তো নয় যেন এক একটি সাঁড়াশি আটকে দেয়া হয়েছে। তারা দুটো পা দিয়ে এক একটি বানরকে আঁকড়ে ধরে দাঁত দিয়ে পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের ক'রে দিতে লাগল।

বানররাও নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত-পা গুটিয়ে পিঁপড়েদের হাতে মার খেতে রাজী নয়। তারা দল বেঁধে এক একটি পিঁপড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পাগুলো ধরে টেনে দু' টুকরো ক'রে দিতে লাগল। তুমুল লড়াই। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হয়ে গেল তুলকালাম কাণ্ড। জিন্দেগীতে এমন ভয়ঙ্কর লড়াই দেখি নি। ব্যাপার দেখে আমাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবার জোগাড়।

আমাদের মধ্যে ফিন পালাবার ধান্দা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠল। আমাদের বাহন কুকুর চারটি তৈরি। তারা যুদ্ধে মেতে থাকতে থাকতে আমরা বহুৎ দূরে চলে যেতে পারব।

শত কোশিস করেও আমাদের চারজনের পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। তাদের এখানে ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা যখন পালাবার ফিকির খুঁজছি ঠিক তখনই চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ল আমার সঙ্গী তিনজন। ইয়া বড় বড় পিঁপড়ে তাদের জেঁকে ধরল। টেনে হিঁচড়ে খাবলে খুবলে তাদের একেবারে দফারফা করে দিল। তাজা খুনে জবজবে হয়ে গেল তাদের শরীর।

এবার আমি একা, একেবারেই একা। এতদিন প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা-পরামর্শের মাধ্যমে ফন্দি-ফিকির ক'রে জান রক্ষার উপায় বের করতে পেরেছি। এখন আর শলাপরামর্শ করার মত আমার পাশে আর কেউ-ই রইল না। যা কিছু করার আমাকে একাই করতে হবে।

আমার সঙ্গীদের আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা ক'রে আমি বিষণ্নমনে চুপিচুপি কুকুরের পিঠে চেপে বসলাম।

আমার বিশ্বস্ত বাহন কুকুরটি আমাকে পিঠে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চল্ল। ছুটতে ছুটতে সে আমাকে নিয়ে একটি নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল। এবার নদী পেরোবার পালা। কুকুর এ-কাজে অচল। বাধ্য হয়ে আমি এবার কুকুরটির গায়ে বার কয়েক হাত বুলিয়ে আদর করে দিলাম ছেড়ে। এবার আমি একেবারেই একা, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম।

কুকুরটিকে বিদায় দিয়ে আমি নদীতে নামলাম। সাঁতরে নদী পার হলাম। এবার আর আমার দিলে তিলমাত্রও আতঙ্ক নেই। বানর বা পিঁপড়ে কারো ডরেই কুঁকড়ে থাকতে হবে না।

এবার আমি পয়দলে পথ পাড়ি দিতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমি পর্বতের গায়ে লেখা সুলেমান-এর বর্ণিত ইহুদীদের রাজ্যে হাজির হলাম। একটি ব্যাপার সে শিলালিপিতে উল্লেখ করা নেই যা পরবর্তীকালে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ব্যাপারটি হচ্ছে, একটি নদী খালি পায়ে হেঁটে পেরোতে হয়। কই, এর কথা তো লিপিতে উল্লেখ ছিল না। পুরো একটি সপ্তাহ আমাকে নদীটির পাড়ে গালে হাত দিয়ে বসে অলসভাবে কাটাতে হয়েছে। বিশেষ একটি দিনে সেটি পার হওয়া সম্ভব হয়েছিল। পরে লোকমুখে শুনেছি, প্রতি শনিবার নদীটিতে পানি থাকে না। সেদিন ইহুদিদের খানাপিনার আসর বসে। নদীতে পানি থাকলে যাতায়াতের তকলিফ হয়।

নদীর ধার থেকেই নগরের সীমানা শুরু। আমি শহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে নগরবাসী কাউকে দেখলাম না। রাস্তার ধারে সারিসারি ছোট বড় মকান। প্রথম যে-বাড়িটি পেলাম সেটিতেই বরাত ঠুকে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে ঢুকতেই বিশালায়তন একটি কামরায় কয়েকজনকে গোল হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। ভাবলাম, নসীবের ফের কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

আমি ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে গোল হয়ে বসে থাকা লোকগুলোর কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে সালাম জানালাম। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বল্লাম—'আমার নাম জানশাহ্। সুলতান টিগমাস আমার আব্বা। তিনি বানু সালাম এবং কাবুলের সুলতান। বহুৎ ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে, বহুৎ হামলা-হুজ্জতি পুহিয়ে আমি এখানে আসতে পেরেছি। আমি ক্ষুধায় বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছি। মেহেরবানি করে কিছু খানা দিয়ে আমার জান বাঁচান। আর একটি বাৎ, আমার আব্বার সুলতানিয়ৎ কোন্‌দিকে তা-ও আমাকে বলে দিন।'

আমার কথার জবাব কেউ-ই দিল না। আমার মুখের দিকে সবাই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে নীরবে তাকিয়ে রইল। শেষমেশ একজন ইঙ্গিতে আমাকে বুঝিয়ে দিল—'আগে খানাপিনা সার, পরে তোমার সমাচার শোনা যাবে। এখন কোন কথাই বোলো না।' এবার তর্জনীর সাহায্যে একটি খানার থালা দেখিয়ে দিল।

আমি মুহূর্তমাত্র দেরী না ক'রে থালাটি হাতে তুলে নিলাম। গোস্ত। খুবই উপাদেয় ক'রে পাক করা গোস্ত। এমন সুস্বাদু গোস্ত জিন্দেগীতে জিভে ঠেকানো সম্ভব হয় নি। পাশেই দামী সরাবের বোতল আর পেয়ালা। পেয়ালায় সরাব ঢালতেই খুসবুতে কামরা ভরে গেল। গোস্ত আর সরাব দিয়ে গলা পর্যন্ত ঠেসে নিলাম।

আমার খানাপিনা মিটলে সে-দলপতি গোছের আদমিটি আমার কাছে এগিয়ে এল। এতবড় একটি কামরায় নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করছে। দলপতি এবারও মুখ খুল্ল না। ইঙ্গিতে ইশারায় আমাকে

বল্‌ল—'কে? কখন? আর কোথায়?'

আমিও ইঙ্গিতে তার কাছ থেকে জেনে নিলাম—'আমি কি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব?'

লোকটি আগের মত ইঙ্গিতেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল—পার। কিন্তু কেবলমাত্র তিনটি কথার মাধ্যমে উত্তর দিতে হবে।'

আমিও ইঙ্গিতে জবাব দিলাম—'কারবারীর দল, কাবুল, কখন?'

দলপতি ইঙ্গিতেই জবাব দিল—'জানি না।'

এবার আমাকে আগের মতই ইঙ্গিতে বল্‌ল—'খানাপিনা হয়েই গেছে। যাও, এবার মানে মানে সরে পড়।'

আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে উৎসাহ পেলাম না। সালাম জানিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লাম।

আমি কামরা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। এ কী ঝকমারিতে পড়া গেল! দেখি সবাই ইশারায় ব্যস্ত। সবাই সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চোখের মণি দুটো তাদের প্রত্যেকের ওপর একবারটি বুলিয়ে নিয়ে দেখতে লাগলাম, সাহায্য করার মত চেহারার অধিকারী কে। মুখ দেখলেই আদমির হিম্মৎ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেয়া যেতে পারে। এমন সময় আচমকা কে যেন চিল্লিয়ে উঠল।

—'এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা রোজগার করার ইচ্ছা থাকলে আমার সাথে এসে পড়। স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে ফাউ স্বরূপ একটি ক্রীতদাসীও পাবে। কেবলমাত্র এক প্রহর কাজ করে দিলেই পেতে পার।'

এদিক-ওদিক চক্কর মেরে কোন ফয়দা হবে বলে বোধ হচ্ছে না। তাই যে-আদমিটি চিল্লাচিল্লি করছিল সোজা তার কাছে চলে গেলাম। কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই বল্‌লাম—'কি কাজ করতে হবে, বলুন? আমি আপনার কাজ করে দিয়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর লেড়কিটিকে পেতে চাচ্ছি।'

সে আর টু-শব্দটিও করল না। আমার হাত ধরে পাশের একটি মাকানে গিয়ে ঢুকল। আমীর আদমির মকান, এক নজরে দেখেই ঠাহর ক'রে নিলাম। দেখি, এক বুড়ো সামনে বসে। বুড়োটিকে কুর্নিশ সেরে লোকটি বল্‌ল—'একজনকে পাওয়া গেছে, নিয়ে এসেছি। মালুম হচ্ছে পরদেশী গায়ে তাগদ আছে। পরিশ্রমী। এক নাগাড়ে তিন মাস খাটা এর পক্ষে কোন সমস্যাই নয়। আমার চিল্লাচিল্লিতে একমাত্র এ-ই সাড়া দিয়েছে।'

বুড়ো তার নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মুহূর্তের জন্য আমার ওপর বুলিয়ে নিয়ে পাশে বসাল। বহুৎ আচ্ছা সব খানা খেতে দিল। সরাবও দিল এক বোতল।

আমার খানাপিনা মিটে গেলে বুড়ো কোর্তার জেব থেকে বেশ বড়সড় একটি থালা টেনে বের করল। গুনে গুনে এক হাজার দিনার আমার হাতে তুলে দিল। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ ক'রে নিলাম। জাল নয়।

বুড়োর কাণ্ডকারখানা দেখে আমার কাণ্ড তাজ্জবই মনে হচ্ছিল।

সে এবার এক নফরকে কাছে ডাকল। তাকে দিয়ে আমার জন্য এক পরস্ত নতুন পোশাক আনাল। তার নির্দেশে সেগুলো গায়ে চাপিয়ে নিলাম।

এবার যে-লেড়কিটি আমার প্রাপ্য হবে তাকেও সামনে আনিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল। আমার কোনরকম ধন্দ যেন না থাকে।

আমি তাজ্জব বনে গেলাম। আমাকে কি কাজ করতে হবে তা বলার নাম নেই। কিন্তু আমার প্রাপ্যটুকু সে আগেভাগেই বুঝিয়ে দিল।

আমি বুড়োটিকে দেখছি আর তাজ্জব হয়ে তার কাণ্ডকারখানার ওপর নজর রাখছি।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' তেষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বুড়োটি আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে, গায়ে গুলাবের আতর ছিঁটিয়ে লেড়কিটির কামরায় পাঠিয়ে দিল।

দেখলাম, লেড়কিটি পালঙ্কের ওপর মনলোভা ভঙ্গিতে আমার অপেক্ষায় বসে। ব্যাপার দেখে আমি যেন একদম আশমান থেকে জমিনে পড়ে গেলাম। ইয়া আল্লাহ! এ যে বেহেস্তের হুরী!

বুড়ো আমাকে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিল, লেড়কিটি একদম আনকোরা, কুমারী। কোন মরদ একে স্পর্শ করতে পারে নি। সহবাসের মাধ্যমে বুঝলাম, বুড়োর বাৎ একদম সাচ্চা। তিনদিন-তিনরাত্রি কামরার মধ্যেই আমরা কাটিয়ে দিলাম। ফলে খানাপিনা যা কিছু বিলকুল লেড়কিটির সঙ্গেই আমাকে সারতে হ'ল।

চতুর্থ দিন ভোরে বুড়ো আমাকে তলব করল।

আমি কাছে গিয়ে বুড়োকে সালাম জানালাম।

বুড়ো তার অনুজ্জ্বল চোখ দুটো মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'তোমার পাওনাগণ্ডা আগামই পেয়ে গেছ, কি বল?'

আমি ঘাড় কাৎ ক'রে বল্‌লাম—'জী হুজুর।'

—'যাক, এখন তবে কাজ করতে পারবে, কি বল?'

—'কিন্তু কি কাজ তার বিন্দু বিসর্গও তো আমার জানা নেই। তবু কাজ না ক'রে তো রেহাই নেই। কি কাজ আমাকে করতে হবে, মেহেরবানি ক'রে বলুন।'

বুড়ো ইশারায় দু' জন ক্রীতদাসকে তলব করল। তারা আমাকে নিয়ে দুটো খচ্চরের কাছে হাজির হ'ল। লাগাম বাঁধা খচ্চর। তাদের একটির পিঠে একজন আগেভাগেই বসে। আদমিটি আমাকে অন্য খচ্চরটির ওপর বসতে নির্দেশ দিল। গুছিয়ে গাছিয়ে বসতে না বসতেই হতচ্ছাড়া খচ্চর দুটো লেজ তুলে ছুটতে শুরু করে দিল। একেবারে জোর কদমে ছোটা যাকে বলে। লাগাম ধরে কোনক্রমে নিজেকে সামলাতে পারলাম। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক নাগাড়ে ছুটেই চল্‌লাম। এক সময় এমন বেখাপ্পা জায়গায় পৌঁছলাম যে-জায়গাটি একেবারেই খাড়াই। মানুষই কেবল নয়, কোন জন্তুর পক্ষেও এরকম একটি পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

অনন্যোপায় হয়ে খচ্চরের পিঠ থেকে নামতেই হ'ল। আমার সঙ্গীটি আমার দিকে একটি ছুরি এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এটি দিয়ে তোমার খচ্চরটির ভুড়ি ফাঁসিয়ে দাও। কাজ শুরু করে দাও। এরই মাধ্যমে তোমাকে কাজ শুরু করতে হবে।'

আমি কোনরকম প্রশ্ন না করেই কাজে লেগে গেলাম। ছুরি দিয়ে ভুড়ি ফাঁসিয়ে দিতে না দিতেই খচ্চরটি ইহলোক ত্যাগ করল।

আমার সঙ্গীটির দ্বিতীয় নির্দেশ—'খচ্চরটির লাশ থেকে ছাল ছাড়িয়ে নাও।'

আমি এবারও কোন প্রশ্নের অবতারণা না করেই তার হুকুম তামিল ক'রে ফেল্‌লাম।

সে এবার বল্‌ল—'চামড়াটি পেতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। তারপর আমি চামড়াটির চারদিকে সেলাই ক'রে দিচ্ছি।'

আমি এবারেও নিঃশব্দে তার হুকুম তামিল করলাম। চামড়াটি পাথরের ওপর বিছিয়ে চটপট শুয়ে পড়লাম। চিৎ হয়ে শুলাম।

সে এবার আমার গায়ে সূঁচ না ফোটে এরকম কৌশলে হাত চালিয়ে সেলাই করতে লেগে গেল। সেলাই করার কাজ অব্যাহত রেখেই সে বল্‌ল—'যা বলছি, শোন—এখনই একটি অতিকায় বাজ পাখি এসে চামড়া সমেত তোমাকে নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে তার বাসায় নিয়ে যাবে। ওই যে দুর্গম পাহাড় দেখতে পাচ্ছ তার মাথায় তার বাসা।'

আমি স্থবিরের মত নিশ্চল-নিথর ভাবে তার বক্তব্য শুনতে লাগলাম। আমার প্রাণপাখি বুঝি বাজপাখির ছোঁয়া পাওয়ার আগেই খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে।

সে এবার বল্‌ল—'ইয়াদ রেখো, আকাশে ওড়ার সময় একদম নড়াচড়া করবে না। যদি আমার বাৎ না মেনে নড়াচড়া কর তবে বাজ পাখিটি ভয় পেয়ে নখের বাঁধন আলগা ক'রে দেবে ছেড়ে। আশমান থেকে ধপাস্ ক'রে পড়বে একেবারে জমিনে। ফলে কি হবে আশা করি বুঝতেই পারছ?

আমি ঘাড় কাৎ করে তার কথার জবাব দিলাম।

সে ব'লে চল্‌ল—'বাজপাখিটি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে তোমাকে ছেড়ে দেয়া মাত্র এ-ছুরিটি দিয়ে চামড়া কেটে বাইরে বেরিয়ে আসবে। পাখিটি আচমকা তোমাকে দেখতে পেয়ে ডরে তফাতে ভেগে যাবে। এবারই তোমাকে আসলি কাজটি সেরে ফেলতে হবে। কাজটি হচ্ছে, পাহাড়ের ওপরে দেখবে মূল্যবান সব পাথরের ছড়াছড়ি। তুমি সে সব পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে নিচে ফেলতে থাকবে। পাথর ফেলে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসবে। আমার বাৎ তোমাকে সমঝাতে পেরেছি কি?'

আমি আগের মতই ঘাড় কাৎ করলাম।

সে সবশেষে মুচকি হেসে বল্‌ল—'নিচে নেমে আসার পরই তোমার ছুটি। আমরা ফিন খচ্চরের পিঠে চেপে এখান থেকে ফিরে যাব। ঠিক আছে তো?'

ইহুদীটি সেলাই ফোড়াই সেরে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে আবডালে দাঁড়িয়ে রইল।

সেলাই শেষ হতে না হতেই হেঁচকা একটি টান অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম, বাজপাখি নখে চেপে ধরে আমাকে শূন্যে তুলে নিয়েছে। অনুভব করলাম, আমি আকাশ পথে উড়ে চলেছি। আমি মড়ার মত শিটকে লেগে পড়ে রইলাম। মালুম হ'ল আমাকে শক্ত কিছুর ওপর নামিয়ে দিয়েছে। আশমান থেকে ছেড়ে দেয় নি। আছাড় খেয়ে পড়লে হালৎ অন্য রকম হ'ত। শক্ত পাথরের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। খোদাতাল্লাকে সুক্রিয়া জানাতেই হ'ল। এবার ইহুদীটির নির্দেশ অনুযায়ী ছুরি চালিয়ে চামড়াটি কাটার
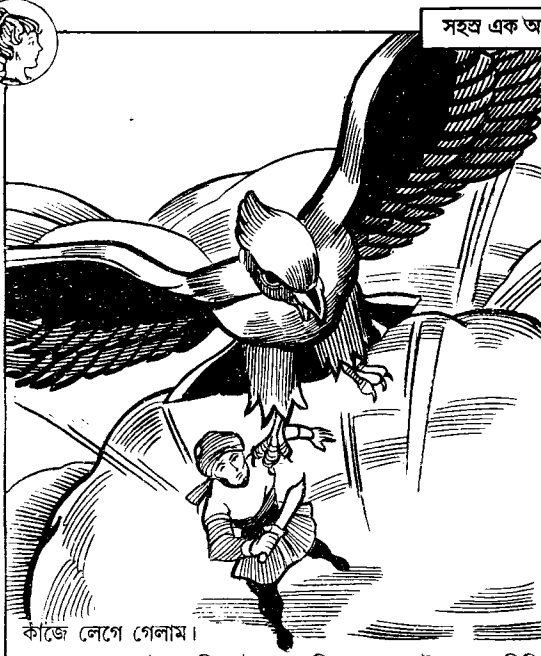
কাজে লেগে গেলাম।

চামড়া কেটে আমি বাইরে বেরিয়ে আসতেই বাজপাখিটি আচমকা বিকট স্বরে চিল্লিয়ে তফাতে চলে গেল।

আমি এবার সে-আসলি কাজে লেগে গেলাম। পান্না, চুনি আর হরেক কিসিমের বহুমূল্য সব পাথর ব্যস্ত-হাতে জড়ো করতে লেগে গেলাম। এবার ঠেলে ধাক্কে পাথরের স্তূপটি গড়িয়ে নীচে ফেলতে শুরু করলাম। সে সব ইহুদীটির কাছে চালান হয়ে গেল।

তাদের কাজ তো মিটল। এবার আমি পাহাড় থেকে নিচে নামব, তারপর মজুরির অর্থ নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াব।

ব্যাপারটি খুবই সহজভাবে বলা গেল বটে। কিন্তু পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে বুঝলাম, কী কঠিন সমস্যার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে। নিচের দিকে তাকাতেই আমার কলিজাটি যেন আচমকা একটি ডিগবাজী খেয়ে গেল। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ।

কী ক'রে নামা যাবে? চূড়ার পরেই বিশাল কার্নিশ। কার্নিশের পর থেকে একদম খাড়াই। চারদিকে একবার চক্কর মারলাম। না, নামবার কোন ফিকিরই বের করতে পারলাম না।

একটি পাথরের চাঁই আঁকড়ে ধরে নীচের দিকে উঁকি দিয়ে যা দেখলাম তাতেই পুরো ব্যাপারটি আমার মালুম হ'ল। দেখি ইহুদীটি আমার জোগান দেয়া পাথরগুলো বস্তা বোঝাই ক'রে খচ্চরটির পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে। এবার নিজেও চাপল তার ওপর। ব্যস, লম্বা লম্বা পায়ে খচ্চরটি এগিয়ে চল্ল শহরের দিকে। আমি আর্তনাদ ক'রে ওঠলাম—'ইয়া আল্লাহ! আমি কি তবে এ-নির্জন-নিরালা পাহাড়ের বুকে নির্বাসিত হলাম!'

আমি চূড়ার একটি পাথরের টুকরোর ওপর বসে আতঙ্ক ও হতাশায় আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম।

এক সময় খোদাতাল্লার নাম নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনকে শক্ত ক'রে বাঁধলাম। নসীবে যা আছে তা তো হবেই। এবার হাঁটা জুড়লাম। কোশিস করে দেখি যদি নিচে নামার কোন ধান্দা বের করতে পারি।

না, আমি পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে যায় নি। খোদাতাল্লার দোয়ায় জব্বর রক্ষা পেয়ে গেছি। এক নাগাড়ে দু' মাহিনা ধরে আমি পর্বতটির চূড়ায় চক্কর মেরে বেড়ালাম।

সবশেষে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হ'ল। দেখি, সামনে একটি নদী পাহাড়ের গা বেয়ে কুল কুল রবে নিচে নেমে গেছে। বয়ে চলেছে উপত্যকার ওপর দিয়ে। খোদাতাল্লা যেন অকৃপণ হাতে এ-জায়গাটিকে গড়ে তুলেছেন। নদীর তীর ধরে হরেক কিসিমের ফুল আর ফলের গাছ। গাছে গাছে পাকা ফলের বাহার। খিদেতে পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে। ব্যস্ত হাতে কয়েকটি ফল ছিঁড়ে হালুম হালুম ক'রে উদরে ঢুকিয়ে দিলাম। গণ্ডুষ ভরে নদীর ঠাণ্ডা পানি তুলে গলা ভেজালাম।

আমি এবার কিছুটা সতেজ হতে পারলাম। নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চল্‌লাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন আমার পা দুটোকে পাথরের সঙ্গে শক্ত ক'রে আটকে দিয়েছে। এমন অভাবনীয় একটি ব্যাপার আচমকা চোখের সামনে দেখলে তাজ্জব না বনে তো উপায় নেই। পাহাড়ের গায়ে একটি সুবিশাল মকান প্রাসাদ। সামনেই প্রাসাদের সদর-দরওয়াজা। সেখানে একটি পাথরের বেদীর ওপরে এক বুড়ো বসে ঝিমোচ্ছে। আমার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যন্ত্রচালিতের মত উঠে সে আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন। প্রথমে ভেবেছিলাম দ্বাররক্ষীটক্ষী কেউ হবে। তার হাতের চুনির তৈরি রাজদণ্ডটি আমার ভুল ভাঙিয়ে দিল। তিনি নির্ঘাৎ রাজা।

আমি নতজানু হয়ে কুর্নিশ জানালাম। রাজার মুখে হাসির ছোপ ফুটে উঠল। আমাকে সস্নেহে পাশে বসালেন।

আমি তাঁর আসনের মুখোমুখি অন্য একটি পাথরের আসনে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়লাম।

রাজা বল্‌লেন—'বেটা, এখানে কখন এসেছ? কোত্থেকেই বা এসেছ? কই, তোমার আগে তো এখানে কোন আদমি আসে নি। কোথায় যাওয়ার দিল্ আছে, বল তো?'

এমন মধুর আচরণ, এমন সহৃদয়তা এমন অন্তরঙ্গ বাৎচিৎ বহুকাল শুনতে পাই নি। আমার ভেতরে দুঃখ-দুর্দশা-হতাশা যা কিছু রয়েছে বিলকুল বুড়ো রাজার কাছে ঢেলে দেবার জন্য বড়ই

উৎসুক হয়ে পড়লাম।

বুড়োর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি শিশুর মত কান্না জুড়ে দিলাম। বুকের জমাটবাঁধা দুঃখ-হতাশা আর কথার চাপে আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম। শেষে আমার হালৎ এমন হয়ে পড়ল যে, আর কিছু বলার মত ক্ষমতাই আমার রইল না। কেবলই ফোঁপাতে লাগলাম।

বুড়ো অধিকতর সহানুভূতির স্বরে বল্‌ল—'বেটা, ঝুটমুট কেঁদে কি-ই বা ফয়দা হবে? তোমার দুঃখ-বেদনায় আমার বুকের পাঁজর ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চাইছে।

বুড়ো আমাকে নিয়ে সুসজ্জিত একটি কামরায় গেলেন। একটি সুদৃশ্য বহুমূল্য আসনে নিজে উপবেশন করলেন। পাশের একটি আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে বসতে বল্‌লেন।

আমি আসন গ্রহণ করে আমার করুণতম কাহিনী আদ্যোপান্ত বল্‌লাম।

আমি নিজের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী বুড়োর কাছে উজাড় করে ঢেলে দিলাম। তারপর আচমকা প্রশ্ন ক'রে বসলাম—'আচ্ছা, এ-প্রাসাদ, অগাধ ধন দৌলত—এসব কার? এসবের মালিক কে, মেহেরবানি করে বলবেন কি?'

—'এসব বাৎ জানার জন্য তোমার বুঝি খুব কৌতূহল হচ্ছে? বলছি তবে শোন,—বহুৎ দিন আগে সুলতান সুলেমান এ-ইমারত তৈরি করেছিলেন। তাঁরই হুকুমে আমি পাখিদের অধিনায়কত্ব করে চলেছি। তামাম দুনিয়ার পাখি তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য জিন্দেগীতে একবার না একবার আসবেই। তুমি কি তোমার মুলুকে ফিরে যেতে চাও?'

—'আপনার সাথে মোলাকাৎ যখন হয়েই গেছে তখন আর মুলুকে ফেরার জন্য আমি মোটেই ভাবিত নই।'

—'সাচ্চা বাৎ। তুমি যদি নিজের মুলুকে ফিরতে চাও তবে আমাকে বোলো, কোন একটি পাখিকে বলে দিলেই যেখানে, যতদূরেই হোক তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর শোন, এ-ইমারতকে নিজের বলেই জ্ঞান করবে। তোমার খুশী মাফিক যেকোন কামরায় প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু কেবলমাত্র একখানা কামরায় ভুলেও যেন ঢোকার কোশিস কোরো না।' এবার এক গোছা চাবি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—এর মধ্যে একটি সোনার চাবি আছে, সেটি দিয়ে সে-বিশেষ কামরাটি খোলে।'

চাবির গোছাটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে পাখিদের অধিনায়ক বুড়োটি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি কৌতূহল বশতঃ সোনার চাবি দিয়ে যে কামরাটি খোলে তার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কৌতূহল যথেষ্টই রয়েছে বটে। কিন্তু কামরাটিকে স্পর্শ করতেই দিল্ চাইল না।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' চৌষট্টিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ পরের রজনীতে কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশটুকু শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, পাখিদের অধিনায়ক বুড়ো জানশাহ্‌কে যে কামরায় যেতে নিষেধ ক'রে দিয়েছে সে-কামরার প্রসঙ্গে সে রাজা বুলুকিয়া'কে বলছে—কামরাটির দরওয়াজায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার কৌতূহল ক্রমেই অদম্য হয়ে উঠতে লাগল। শেষে একসময় কৌতূহল এতই মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যে, তাকে দাবিয়ে রাখা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। বুড়োর নিষেধ আর আমার যুক্তি মুহূর্তে নস্যাৎ হয়ে গেল। আমি হেরে গেলাম। এক সময় তালাটির গায়ে সোনার চাবিটি লাগিয়ে আল্লাতাল্লার নাম স্মরণ ক'রে চাবিতে মোচড় মেরে বসলাম।

দরওয়াজা খুলে অজ্ঞাত নিষিদ্ধ বস্তুর দুর্নিবার আকর্ষণে এক লাফে কামরার ভেতর ঢুকে গেলাম।

কামরার ভেতরে আমি তো একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। কয়েক কিসিমের চমৎকার কিছু সামগ্রী ছাড়া ডর-ভয়ের মত কিছুই নজরে পড়ল না।

কামরাটির কেন্দ্রস্থলে অতিকায় একটি রুপোর গামলা। তাতে একটি ফোয়ারা। গামলার চারদিকে কতগুলি সোনার পাখি বসানো। সুবিশাল একটি চুনি কেটে কেটে একটি সিংহাসন বানিয়ে গামলাটির গায়ে রক্ষিত হয়েছে। এমন সব মজাদার দৃশ্য দেখে খুশীতে আমার দিল্ ভরে উঠল।

আমি খুশীতে ডগমগ দিল্ নিয়ে সিংহাসনটিতে বসে পড়লাম। তার মাথার ওপরে একটি লাল সিল্কের চাঁদোয়া টাঙানো। মৌজ ক'রে সিংহাসনটিতে বসলাম। চোখ বন্ধ ক'রে খুশীটুকু পুরোপুরি উপভোগ করার কোশিস করতে লাগলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে চোখ মেলে তাকিয়েই আমি একদম তাজ্জব বনে গেলাম। ভাবলাম, আমি কি জেগে, নাকি খোয়াব দেখছি? বুলুকিয়া ভাইয়া, তুমি বিশ্বাস করবে না। দেখলাম গামলার পানিতে তিনটি খুবসুরৎ লেড়কি গোসল করছে। বিলকুল বেহেস্তের হুরীর মাফিক দেখতে।'

আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। এক লাফে সিংহাসনটি থেকে নেমে একেবারে গামলাটির গা-ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালাম। আচমকা চিল্লিয়ে উঠলাম—'ওগো, আমার বেহেস্তের হুরীরা! খুবসুরৎ লেড়কিরা—'

ব্যস, লেড়কিরা আমাকে দেখামাত্র পালকের সাহায্যে নিজ নিজ গোপন স্থানগুলোকে ঢেকে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে লাগল। তারা এবার আড় চোখে আমার মুখের দিকে তাকাতে শুরু

করল। তারা যেন আমাকে বিদ্রূপ করছে এরকম তাদের চোখের চাহনি।

আমি তখন বিলকুল কৌতূহলের শিকার হয়ে পড়েছি। শরম টরম ভুলে গিয়ে লেড়কি তিনটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তোমরা কারা গো রূপসীরা? বেগমের মত সুরৎ তোমাদের। বল না গো, তোমাদের পরিচয় কি? আমার নাম জানশাহ্। সুলতান টিগমাস-এর বেটা আমি। তিনি বানু-শাহলান এবং কাবুলের অধিপতি।'

তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম উমর এবং সুরৎ যার বেশী সে লেড়কিটি আমার প্রশ্নের জবাব দিল—'আমরা তিন বহিন। বাদশাহ নস্র-এর বেটি। হীরার প্রাসাদে তিনি বাস করেন। খুশী মাফিক গোসল করার জন্য আমরা রোজ এখানে আসি। আজও একই উদ্দেশ্যে এসেছি।'

—'আমাকে কি তোমাদের মোটেই পছন্দ হচ্ছে না? জরুর পছন্দ্ হয়েছে, তাই না? তবে এসো না আমার সঙ্গে দিল্ খোলসা ক'রে আনন্দ স্ফূর্তি করবে। কি গো, রাজী?'

—'কি যে বল জানশাহ্, যুবতী লেড়কি কখনো নওজোয়ানের সহিত খেল্ কুদ করতে, আনন্দ স্ফূর্তি করতে পারে? আমাদের সম্বন্ধে আরও ভালভাবে জানতে উৎসাহী হলে আমাদের প্রাসাদে চল। আব্বাজীর সাথে বাৎচিৎ করবে। যাবে কি?'

ব্যস, আমার কলিজায় দাগা দিয়ে লেড়কিটি তার দু' বহিনকে নিয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল।

তারা তো আমার প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টি হেনে হাসতে হাসতে ডগমগিয়ে চলে গেল। বুলুকিয়া ভাইয়া, আমার তখন যে কী হালৎ বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার কলিজায় কে যেন আচমকা গরম লোহার সেঁকা দিয়ে দিল। আমার সব কিছু বিলকুল জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যেতে লাগল। জানা ছিল না, দুনিয়ায় এমন কোন্ ঠাণ্ডা পানি আছে যা দিয়ে আমার বুকের জ্বালা নেভাতে পারি। আকস্মিক মনোকষ্ট আর হতাশায় আমি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম। ব্যস, সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেল।

যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, পাখিদের অধিনায়ক বুড়োটি আমার শিয়রে বসে চোখে-মুখে গুলাবের পানি ছিঁটিয়ে দিচ্ছে।

বুড়ো ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্ল—'কি গো। এ-বুড়োটির নিষেধ না শোনার ফল তো হাতেনাতেই পেয়ে গেলে, কি বল? তোমাকে তো এ-নিষিদ্ধ কামরায় প্রবেশ করতে বার বার বারণ করেছিলাম, পাত্তা দাও নি। এখন ঠেলা সামলাও।'

আমার মুখে যেন কে কুলুপ এঁটে দিয়েছে। টু-শব্দটিও করতে পারলাম না। কেবল হরদম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

—'তোমার এ হালৎ কেন হয়েছে এবার আমার মালুম হ'ল। কবুতরের সাজে লেড়কিরা কামরায় এসেছিল, তাই না? তারা কখন সখন গোসল করতে এখানে হাজির হয়।'

আমি চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্লাম—'আপনার অনুমান অভ্রান্ত। হ্যাঁ, তিনটি খুবসুরৎ লেড়কি কামরায় ঢুকে গোসল সারছিল। মেহেরবানি ক'রে আমাকে বলুন, কোথায় আছে হীরার প্রাসাদ? কোথায়, কোন্দিকে গেলে তার দেখা পাব। আর লেড়কি তিনটির আব্বা নস্র-এর সাথে মোলাকাৎ হতে পারে কিভাবে, আমাকে ব'লে দিন।'

—'ইয়া খোদা! বলছ কি তুমি নওজোয়ান! খবরদার ভুলেও সেখানে যাওয়ার কোশিস কোরো না!'

—'কিন্তু আমি যে—'

—'তুমি বাদশাহ্ নসর-এর সম্বন্ধে বিলকুল আন্ধারে আছ। সে জিনদের বাদশাহ। প্রবল পরাক্রমশালী। তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? তুমি ভেবেছ, তোমার সঙ্গে সে তার লেড়কির শাদী দেবে? না, কখনই দেবে না। ইয়া পেল্লাই সব পাখি এখানে আসবে। আমি ব'লে দেব তোমাকে যেন তোমার নিজের মুলুকে পৌঁছে দিয়ে আসে। ঝুটমুট কেঁদো না। চোখ মোছ, দিলকে শক্ত কর।'

—'কিন্তু ওই খুবসুরৎ লেড়কিদের বাৎ বিনা আমি যে আর ভাবতেও উৎসাহ পাচ্ছি না। আপনি বিশ্বাস করুন। তাদের না পেলে আমার জান খতম হয়ে যাবে। জিন্দেগী একদম বরবাদ হবে। আপনি আমার জন্য বহুৎ করেছেন। আর একটিমাত্র অনুরোধ রক্ষা করলে জিন্দেগীভর আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আমি নিজের মুলুকে ফিরতে নারাজ। আমার আপনজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাও আমার কিছুমাত্র নেই। একবার, মাত্র একবার

তাদের দু'চোখ ভরে দেখতে চাই। আপনি মেহেরবানি ক'রে বন্দোবস্ত করে দিন।'

ব্যস, আর দেরী নয়, বুড়োর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম। তার পায়ে শির ঠেকিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে থাকলাম।

লেড়কিটি রজনীগন্ধার মাফিক সফেদ। দেখতেও আধফোটা রজনীগন্ধার মাফিকই বটে। তার সুরৎ দেখে চোখের পিপাসা কিছু মিটলেও তার খুসবু তো পরখ করা হ'ল না। তার ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত জুটল না। না পেলে আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে।' অভিমান মিশ্রিত আব্দারে বুড়োর দিল্‌কে নরম করার কোশিস করতে লাগলাম।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে পাখিদের ডানা ঝটপটানি শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ তাঁর কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' আটষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বেগম বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, জানশাহ বুলুকিয়া'কে কিস্‌সা শোনাতে গিয়ে এবার বল্‌ল—'বুলুকিয়া ভাইয়া, তোমাকে আর কি বলব, আমি বুড়োর পায়ে পড়ে আকুল হয়ে কেঁদেকেটে বারবার আমার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলাম।'

—'বহুৎ আচ্ছা, লেড়কিটিকে তুমি আলবৎ পাবে। তোমার কলিজার আগুন যখন তাকে ছাড়া নিভবে না তখন যা-যা বলি শোন। আর যদি আমার পরামর্শ অনুযায়ী চল তবে তুমি তাকে লাভ করতে পারবে। ওই কামরার দরওয়াজার আড়ালে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা গোসল সারতে ফিন আসবে। ডানা খুলে পানিতে নামবে। তুমি চুপি চুপি তাদের ডানগুলো লুকিয়ে ফেলবে। গোসল সেরে তোমার কাছে ডানাগুলো ফিরিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাবে। তখন বিবস্ত্রা হয়ে আদর সোহাগের মাধ্যমে তোমাকে খুশী করার কোশিস করবে, তুমি কিছুতেই সেগুলো দেবে না। তুমি সাফ কথা জানিয়ে দেবে, আগে মিঞা ফিরে আসুক তারপর ফেরতের ব্যাপারে ভেবে দেখা যাবে। খবরদার, কোনক্রমে তোমার দিল্‌কে দুর্বল করে দিয়ে যদি ডানাগুলি হাত করতে পারে তবে আর ভুলেও এমুখো হবে না। আমি ফিরে তোমার বাসনা পূরণের যা কিছু বন্দোবস্ত করতে হয় করব।'

পাখিদের অধিনায়ক বুড়োটি বিদায় নিলে আমি দরওয়াজার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

তাদের হাসাহাসি আর বাৎচিৎ আমার কানে গেল। মালুম হ'ল তারা আসছে। তারা উড়তে উড়তে এসে জলাশয়ের পাশে বসল।

যে-লেড়কিটি সেদিন আমার সঙ্গে দু'-চারটি বাৎচিৎ করেছিল সে তার বহিনদের বল্‌ল—'বহিনজী, ধারে কাছে কেউ গা-ঢাকা দিয়ে নেই তো? সেদিন যে লেড়কাটি এখানে এসে পড়েছিল, সে কোথায়, কি হ'ল, বলতে পারিস?'

—'তার জন্য তোকে ভাবতে হবে না সান্‌সা। ঝুটমুট দেরী করিস নে। এখন আয় পানিতে নেমে মৌজ ক'রে কেলি করা যাক।'

তারা নিজ নিজ ডানা খুলে পানিতে নেমে গেল। আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছি ; কখন তারা গোসল করতে করতে অতিকায় গামলাটির মাঝখানে চলে যায়। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। একটু বাদেই তারা কেলি করতে করতে গামলাটির মাঝখানে চলে গেল। ব্যস, আমি একলাফে এগিয়ে গিয়ে ছোট লেড়কিটির সালোয়ার-কামিজ নিয়ে নিলাম। সে-তো আমার কারবার দেখে চিল্লিয়ে গলা ফাঁটাতে লেগে গেল। জলের ওপর কেবলমাত্র মুখটি ভাসিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাতর মিনতি জুড়ে দিল। বিবস্ত্রা খুবসুরৎ লেড়কিটি শরমে একেবারে এতটুকু হয়ে যাবার জোগাড়। চোখে-মুখে কাতর মিনতির ছাপ ফুটিয়ে তুল্‌ল।

না, এত সহজে আমিও গলবার পাত্র নই। নিজের দিল্‌কে শক্ত ক'রে বাঁধলাম। একদম নরম হওয়া চলবে না।

তারপর আমি তার ডানা দুটো শিরের ওপরে তুলে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ক'রে ধেই ধেই ক'রে নাচতে লেগে গেলাম।

ছোট লেড়কিটি আমার গুণগান গেয়ে মন গলাবার কোশিস করতে গিয়ে বল্‌ল—'তুমি এক নওজোয়ান। গণ্যমান্য আদমিও বটে। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি সাগরের সমান। কিন্তু অন্যের সামানপত্রে কি করে যে হাত দিলে, তাজ্জব হচ্ছি।'

—'ওখান থেকে নয়। আগে পানি থেকে উঠে এসো তারপর আমার সঙ্গে বাৎচিৎ বল।'

—'জরুর তোমার সঙ্গে বাৎচিৎ বলব। কিন্তু বিবস্ত্রা অবস্থায় তো আর ওঠা সম্ভব নয়, বিবেচনা কর। আগে আমার সালোয়ার-কামিজ তো দেবে। ওগুলো গায়ে চাপিয়ে তবে তো পানি ছেড়ে উঠব। তারপর মৌজ ক'রে তোমার সঙ্গে বাৎচিৎ করব। তুমি আমাকে তখন খুশীমত সোহাগ কোরো।'

—'তুমি আমার কলিজা, আমার দিল। তুমি দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের মধ্যে অন্যতমা—অনন্যা। তোমাকে না পেলে আমার জান টিকিয়ে রাখা দায়। তাই তোমার পোশাকগুলো দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তা করলে তো ব্যাপারটি নিজের হাতে নিজের বুকে ছোরা বসানোর সামিল কাজ হবে। সুন্দরী, আমার দোস্ত পাখিদের অধিনায়ক ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার সালোয়ার-কামিজ ফিরে পাবে না।

এবার লেড়কিটি তার বহিনজীর দিকে ফিরে অনুচ্চ কণ্ঠে প্রায় ফিসফিসিয়ে কি যেন বল্‌ল। তারপর আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌ল—'তোমার হাতে তো কেবলমাত্র আমার সালোয়ার-কামিজই

রয়েছে। তবে তুমি একটু অন্যদিকে চোখ ফেরাও যাতে আমার বহিনজীরা তাদের পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিতে পারে। তারপর তাদের পোশাক থেকে কয়েকটি পালক ছিঁড়ে আমাকে দেবে। তা দিয়ে আমি শরীরের গোপন স্থানগুলিকে আড়াল করে পানি থেকে উঠব। মেহেরবানি করে—'

আমি মুচকি হেসে বল্লাম—'এ কাজ অবশ্য করা যেতে পারে। এই নাও আমি আবডালে চলে যাচ্ছি।' বলতে বলতে আমি মসনদটির আড়ালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইলাম।

এবার বড় বহিন দুটো পানি থেকে উঠে নিজেদের পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিল। তারপর তাদের পোশাক থেকে কয়েকটি পালক ছিঁড়ে ছোট বহিনটিকে দিল। সে শরীরের গোপন স্থানগুলো কোনরকমে ঢেকে ঢুকে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌ল—'হ্যাঁ, এবার বাইরে বেরিয়ে এসো।'

আমি একলাফে মসনদটির আড়াল থেকে বেরিয়ে ছোট লেড়কিটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তার গালে, ঠোঁটে—সর্বাঙ্গে হরদম চুমু খেতে লাগলাম। তবে পোশাকটিকে তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখে দিয়েছি। সে আমাকে বহুৎ আদর সোহাগ জানাতে লাগল। আমার ভূয়সী প্রশংসা ক'রে পোশাকটি হাতাবার ধান্দা করে। জব্বর খোসামোদ।

না, আমি কিছুতেই নরম হচ্ছি না। মিঠা বাৎ ব'লে আমার দিল্‌কে ভেজাতে পারবে না। এক ঝটকায় তাকে কোলে নিয়ে মসনদটির ওপর বসে পড়লাম। তার পক্ষে ধান্দা করা মোটেই সম্ভব হ'ল না।

আমার বাহুবন্ধন থেকে পালাবার জো নেই। আন্দাজ করে নিল। সানসা এবার আমার কামনায় সাড়া দিল। হাত দুটো দিয়ে আমার গলা ধরে ঝুলে পড়ার জোগাড় হ'ল। আদরে সোহাগে আমার কলিজাটি একেবারে ভিজিয়ে দিল। আমার গালে হরদম চুমু খেতে লাগল। নিজের ঠোঁট দুটোকে আমার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে বারবার ঘষতে লাগল। নিবিড় হতে হতে এক সময় যেন উভয়ে মিলেমিশে এক হয়ে গেলাম।

কিছু সময় বাদে পাখিদের অধিনায়ক বুড়ো ফিরলেন। তাকে দেখেই আমরা ঝট্‌ ক'রে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

আমি মসনদ থেকে উঠে তার কাছে গেলাম। বুড়ো বল্‌লেন—'বেটি, এ-লেড়কাটি কি তোমার পছন্দ? এ কিন্তু তোমার মহব্বতে একেবারে মাতোয়ারা। আমি খুশীই হয়েছি। জানশাহ্‌ বংশ মর্যাদায় খুবই উঁচু। তার বাৎ শুনে তোমার আব্বা বাদশাহ নস্‌র খুশীই হবেন। মালুম হচ্ছে, তোমাদের শাদীতে তিনি প্রতিবন্ধকতা করবেন না। এর আব্বা আফগানিস্তানের সুলতান, টিগমাস তাঁর নাম। তোমার আব্বার কাছে এর কথা বলবে। তাকে রাজী করানোর দায়িত্ব তোমার। আমি বিশ্বাস করি, তুমি বুঝিয়ে বল্‌লে তিনি অমত করবেন না।'

—'আপনার হুকুম আমি শিরে তুলে নিলাম।'

—'আমার সামনে কসম খাও যে, তুমি তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নেবে। আর জিন্দেগীভর তার কণ্ঠলগ্না হয়ে কাছাকাছি পাশাপাশি থাকবে।'

বুড়ো এবার আমার মেহবুবার শিরে হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন—'পরম পিতা করুণাময় খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানাই। তারই অভিপ্রায়বশতঃ তোমাদের মিলন ঘটল। তোমরা সুখে জিন্দেগী কাটাও। তোমাদের মধ্যের বাঁধার প্রাচীর দুর ক'রে দিয়ে উভয়ে উভয়কে মহব্বতের জালে জড়িয়ে নাও।'

সানসা ঘাড় কাৎ ক'রে বুড়োর পরামর্শ মানার সম্মতি জানাল। বুড়ো এবার বল্‌লেন—জানশাহ্‌, তার সালোয়ার কামিজ প্রভৃতি যা কিছু পোশাক আছে ফিরিয়ে দাও। এ কথা দিয়েছে কখনও তোমার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবে না।

সানসা-র বহিনরা তাদের আব্বার কানে ব্যাপারটিকে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল।

বুড়ো এবার আমাদের নিয়ে সুসজ্জিত একটি কামরায় হাজির হলেন।

বহিনরা চলে গেলে সানসা এবার ফলমূল কেটে আমাদের খানাপিনার বন্দোবস্ত করল। তার শিষ্টতা ও সৌজন্যবোধ আমাকে মুগ্ধ করল। একটি রাজকন্যার যেমন আচরণ হওয়া দরকার তাদের কোনটিরই ঘাটতি তার মধ্যে লক্ষিত হয় নি।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' উনসত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পড়তে না পড়তেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, জানশাহ রাজা বুলুকিয়ার কাছে তার কিস্‌সা বলছে—বুলুকিয়া ভাইয়া, রাত্রির আন্ধার নেমে আসার কিছু বাদেই আমি সানসা'কে নিয়ে একটি কামরায় চলে গেলাম। আমরা উভয়ে উভয়কে নিভৃতে পেয়ে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলাম। অনাবিল আনন্দ-খুশীতে ভরে উঠল আমাদের দিল্‌। কি ক'রে যে আমরা এতবড় একটি রাত্রি গুজরান করে দিলাম মালুমই হ'ল না। সুখের রাত্রি তো, পলকে ফুরিয়ে যায়।

ভোরে সানসা-র ডাকে চোখ মেলে তাকালাম। আমার চোখ দুটো থেকে নিদ কাটানোর জন্য কপালে ছোট্ট ক'রে দুটো চুমু খেল। তারপর বল্‌ল—'কি গো, আমার আব্বাজীর কাছে যেতে

হবে, খেয়াল নেই? ওঠ, তৈরী হয়ে নাও। আমাদের বিদায় জানাতে পাখিদের অধিনায়ক-বুড়ো সদর-দরওয়াজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। আমি এবং সানসা তাকে সালাম ও বহুভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

সানসা আমাকে তার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে দিব্যি বাতাসের বেগে উড়ে চল্‌ল। চোখের পলকে আমরা হীরা প্রাসাদে পৌঁছে গেলাম।

সদর-দরওয়াজার সামনে ক'টি জিন অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। আমাদের আগমনবার্তা প্রাসাদে পৌঁছে দেবার জন্যই তারা কষ্ট করে এখানে দাঁড়িয়ে।

রাজা নস্‌র সানসা-র আব্বা। জিনরা তাঁকে নেতা ব'লে মান্য করে। আমাকে দেখে, পরিচয় পেয়ে মহাখুশী হলেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। একটি হীরের মুকুট নিজে হাতে আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। আমার মত পাত্রকে লেড়কি পছন্দ করায় তার আম্মা তো একেবারে খুশীতে ডগমগ। তিনি তো লেড়কিকে কতগুলো হীরেই উপহার দিয়ে বসলেন।

আমার শ্বশুরালয়ের দিনগুলি বেশ খোশ মেজাজেই কাটতে লাগল। নিজের মুলুকের জন্য এক সময় দিল্ বড়ই ছটফট করতে লাগল। আমার শ্বশুর রাজা নস্‌র-এর কাছে প্রস্তাব দিলাম, এবার বিবিকে নিয়ে আমি নিজের মুলুকে ফিরে যেতে চাই। আমার আব্বা আর আম্মাকে তো তাদের বেটার বউ দেখাতে হবে। রাজা ও রানী উভয়েই হাসিমুখে আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তবে কথার ফাঁকে আমার কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি তাঁরা আদায় করে নিলেন—বছরে একবার ক'রে তাদের লেড়কিকে নিয়ে তাদের হীরা প্রাসাদে কাটিয়ে যেতে হবে।

আমাদের বিদায় মুহূর্ত উপস্থিত। রাজা নস্‌র-এর নির্দেশে ইয়া তাগড়াই পুরুষ-জিন আমাদের কাঁধে নিয়ে শূন্যে উড়ে চল্‌ল। আমাদের পরিচর্যার জন্য সঙ্গে চল্‌ল কয়েকটি মেয়ে-জিন। তারা বাতাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে উড়ে দু'সালের পথ মাত্র দু'দিনে পাড়ি দিয়ে আমাকে কাবুলে নিয়ে হাজির হ'ল।

আমার আব্বা ও আম্মা বেটার বউ সানসাকে দেখে মহাখুশী হলেন। আমাদের শাদী হয়েছে শুনে তো আনন্দে-উচ্ছ্বাসে-আবেগে তারা কেঁদেই ফেললেন। শুধু কি এ-ই? আমার আম্মা তো অপ্রত্যাশিত অনাবিল আনন্দ সইতে না পেরে সংজ্ঞাই হারিয়ে ফেল্‌লেন। তার হালৎ দেখে সানসা একদম হকচকিয়ে গেল। সে উৎকণ্ঠিতা হয়ে তার চোখে-মুখে হরদম গুলাব পানি ছিঁটাতে লাগল। তার পরিচর্যা সার্থক হয়েছে, আম্মা সংজ্ঞা ফিরে পেলেন।

কেবলমাত্র আমার আব্বা আর আম্মাই নন, উজির নাজির থেকে শুরু ক'রে অন্যান্য সভাসদরা তো আমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। এমন কি প্রজারা পর্যন্ত নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছিল, আমার মৃত্যু হয়েছে। এ-পরিস্থিতিতে আমার আগমন, তার ওপরে একেবারে বিবিকে সঙ্গে করে সুলতানিয়তে হাজির হওয়ায় রাজ্যের সর্বত্র খুশীর জোয়ার বয়ে চল্‌ল। তামাম সুলতানিয়তের প্রজারা কয়েকদিন ভরে কব্জি ডুবিয়ে খানাপিনা সারল। গুলাব পানি আর সরাবের বন্যা বয়ে গেল। আর নাচা-গানা আনন্দ-স্ফূর্তি তো রয়েছেই।

আমার আব্বা সানসা-র ইচ্ছাতে উপহারস্বরূপ চমৎকার একটি বাগিচা গড়ে দিলেন। বাগিচার কেন্দ্রস্থলে চমৎকার একটি মকান বানিয়ে দিলেন আমাদের বসবাসের জন্য। সেখানে মহা খুশীতে আমরা দিন গুজরান করতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে এক সাল ঘুরে এল। সানসা-র আব্বার কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম তা পালন করার জন্য জিন-এর কাঁধে চেপে আমরা হীরা প্রাসাদের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। কে জানত এ-যাত্রাটি আমাদের দুষ্টগ্রহের মাফিক কাজ করবে।

আমরা যাত্রা পথে দিনভর জিনের কাঁধে চেপে শূন্যে পথ পাড়ি দিতাম। আর রাত্রি কাটাতাম গাছের নিচে বিশ্রামের মাধ্যমে। এক সন্ধ্যায় আমরা এক নদীর ধারে নামলাম।

নদীর টলটলে পানি দেখে সানসা গোসল করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি বহুভাবে তাকে বারণ করলাম। একেবারে হীরা-প্রাসাদে গিয়ে গোসল করার পরামর্শ দিলাম, সে পাত্তাই দিল না। তার এত জিদ যে, আর বলার নয়। আমার নিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সে নদীতে গোসল সারতে গেল। কেবলমাত্র সে-ই নয়।
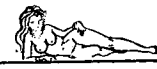
অন্যান্য জিনরাও তার দেখাদেখি নদীর পাড়ে পোশাক আশাক খুলে রেখে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা পানি তোলপাড় করে গোসল সারছিল। এমন সময় সানসা বিকট স্বরে চিল্লিয়ে উঠল। তাকে পাজাকোলে ক'রে পানি থেকে পাড়ে তোলা হ'ল। আমি উন্মাদের মত তার নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম। ধাক্কা দিলাম ঘন ঘন। তাজ্জব বনে গেলাম। তার দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া তো দূরের কথা সে সামান্য নড়ল চড়লও না। একদম খতম। বিষাক্ত সাপের কামড়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে।

আমি শোকে-দুঃখে একদম ভেঙ্গে পড়লাম। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লাম। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বেশ কয়েকদিন গুজরান করলাম। আমি জিন্দা থেকেও যেন মরে গেছি। কিন্তু মৃত্যু আমার হ'ল না। তখন কেন যে বেঁচে গিয়েছিলাম, পরে আফশোষ হতে লাগল। আদতে আমার নসীবের ফেরেই টিকে গিয়েছিলাম। নসীব আমার বিরোধিতা করেছিল।

সানসা-র শোককে সামলাতে আমি তার গোরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ বানালাম। আর আমার জন্য অন্য একটি। এখন পথ চেয়ে দিন গুজরান করছি, কবে মোউত এসে আমাকে নিয়ে যাবে। তার পাশেই আমি চিরনিদ্রায় শায়িত হ'ব। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি আমার মেহবুবা কবে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে, কাছে টেনে নেবে। নিজের মুলুক থেকে বহুদূরে নির্জন-নিরালা গোরস্তানে আমি দুঃখের দিনগুলি গুজরান করছি। আমার নসীবই আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

কিস্‌সা বলতে বলতে নওজোয়ান জানশাহ আচমকা আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢাকল—'বুলুকিয়া ভাইয়া।'

বুলুকিয়া চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'জানশাহ ভাইয়া, আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমার কিস্‌সা আমার দুঃসাহসিক কাহিনীগুলো থেকে ঢের তাজ্জব ও আশ্চর্যজনক। আমার কিস্‌সা তোমার কিস্‌সাকে টেক্কা দেবে।' এবার আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বুলুকিয়া বল্‌ল—'ভাইয়া খোদাই একমাত্র ভরসা। তাঁর নামগান কর, মনেপ্রাণে স্মরণ কর। একমাত্র তিনিই পারবেন তোমার অশান্ত দিল্‌কে শান্ত করতে। তাকে দিল্‌ থেকে মুছে ফেলা ছাড়া শান্তির আর কোন পথ নেই। ওঠ—উঠে দাঁড়াও। দিল্‌কে শক্ত ক'রে বাঁধ।

এমন সময় পূব-আকাশে ভোরের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বুলুকিয়া পত্নীহারা জানশাহ'কে নানাভাবে

প্রবোধ দিতে লাগলেন। বহুভাবে কত কোশিস করলেন তাকে নিজের সুলতানিয়তে নিয়ে যাবার জন্য। ব্যর্থ প্রয়াস। সে কিছুতেই গোরস্তান ছেড়ে অন্যত্র যেতে নারাজ। এত জেদ! তার জেদ এতই প্রবল যে, তাকে চোখে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে হুবহু তার বর্ণনা দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বুলুকিয়া নিজের সুলতানিয়তের দিকে পা-বাড়ালেন।

ব্যস, বুলুকিয়া-র আর পাত্তা মেলে নি। তুমি এখানে হাজির হয়েছ, তার কথা আর ইয়াদ নেই। তবু ক্ষীণ আশা, সে ফিরে এলেও আসতে পারে। তুমি কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে চলে যেয়ো না। কয়েক সাল এখানে থাক। তোমার সঙ্গলাভ ক'রে জিন্দেগীকে খুশীতে ভরিয়ে নেই। বহুৎ কিস্‌সা আমার জানা আছে বটে। বুলুকিয়া-র দুঃখ-যন্ত্রণার কিস্‌সা যাদের মাঝে নিতান্তই জোলো ব'লে মালুম হবে। তোমার মত আচ্ছা শ্রোতা পেয়ে আমি সাচমুচ খুশী।

পাতালপুরীর রানী কিস্‌সা শোনাল। খানাপিনা সারা হ'ল। নাগিনীকন্যারা বহুৎ আচ্ছা নাচা-গানা করল। কম হ'ল না।

সবাই এবার রানীর গ্রীষ্মকালীন নিবাসের উদ্দেশে যাত্রা করবে। পূর্ণ-উদ্যমে সামানপত্র গোছগাছ করা হতে লাগল।

ব্যাপার দেখে হাসিব-এর কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। ইয়া আল্লাহ এদের সঙ্গে যেতে হবে! সে আম্মা আর বিবিকে বহুৎ পিয়ার মহব্বৎ করে। তাদের সংস্রব ছেড়ে আর কতদিন কাটাবে?

বুকে জোর ক'রে সাহস সঞ্চয় করে সে বল্‌ল—'রানী আমি একজন কাঠুরিয়া। আপনি মেহেরবানি ক'রে আমাকে সঙ্গদান ক'রে আমার জিন্দেগীকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছেন। আমার আম্মা, বিবি সবই বর্তমান। তাদের কাছে ফিরে যেতে না পারলে ভেবে ভেবে তাঁরা হয়ত জানই খতম করে দেবেন। তাছাড়া এভাবে টিকে থাকা আমার পক্ষেই বা কি ক'রে সম্ভব, মালুম হচ্ছে না। আমার শোকে-তাপে তাঁদের জান খতম হওয়ার আগে আমি ঘরে ফিরে যেতে চাচ্ছি। খোদার দোহাই, আমাকে এবার যেতে দিন। তবে আমার জিন্দেগীভর আফশোষ থাকবেই, আপনার মনমৌজী কিস্‌সাগুলো শোনার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করতে হ'ল।'

হাসিব বিদায় নেয়ার জন্য উন্মুখ, রানী বুঝতে পারলেন। আর এ-ও বুঝলেন, সে ঠিকই বলেছে।

রানী অনন্যোপায় হয়ে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা, তোমার বিবি আর আম্মার কাছে তুমি ফিরেই যাও, আমি বাধা দেব না। তবে তোমার মত এমন এক একনিষ্ঠ শ্রোতা বিদায় নিচ্ছে ভেবে আমি মর্মাহত। কিন্তু তুমি যদি আমাকে কথা না দাও যে, জিন্দেগীতে

কোনদিন হামামে গোসল করবে না, তবে তোমাকে আমি ছাড়ব না। যদি কোনদিন প্রতিশ্রুতি ভুলে হামামে গোসল কর তবে কিন্তু সেদিনই তোমার জান খতম হয়ে যাবে।

এরকম একটি অত্যাশ্চর্য প্রতিশ্রুতির কথা শুনে হাসিব তাজ্জব বনে যায়। তবু সে প্রতিশ্রুতি দিল।

রানী হাসিব'কে বিদায় জানালেন। সবে ভোরের আলো একটু একটু করে উঁকি দিতে শুরু করেছে।

হাসিব তার বাড়ির দরওয়াজায় করাঘাত করল। দরওয়াজা খুলে তাকে সামনে দেখেই তার আম্মা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অভিভূতা হয়ে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। কান্না শুনে তার বিবি ছুটে এল। এতদিন পর স্বামীকে কাছে পেয়ে আদর সোহাগ করতে লাগল। তাদের বাড়িতে খুশীর বন্যা বয়ে গেল।

হাসিব-এর সঙ্গে যেসব প্রতিবেশী জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিল তারা তাকে মধুর গর্তে ফেলে পালিয়ে এসেছিল। ফিরে এসে তার আম্মা আর বিবিকে বলেছিল, হাসিব বাঘের পেটে গেছে। তারা চোখের পলকে এক একজন আমীর বনে গেছে। কেউ বাজারে দোকান খুলে বসেছে, কেউ বা সওদাগরী কারবার করে দিনারের পাহাড় গড়ে তুলেছে।

হাসিব চুপটি ক'রে কিছুক্ষণ ভাবল। এক সময় মুখ খুল্‌ল। বল্‌ল—'আম্মা, কাল সকালে তুমি একবারটি বাজারে যাবে।'

তার আম্মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। হাসিব বল্‌ল—'হ্যাঁ, বাজারে গিয়ে তুমি প্রচার ক'রে দেবে, আমি ফিরে এসেছি।'

তার আম্মা করলও তাই। বাজারে গিয়ে চাউর করে দিল, হাসিব ফিরে এসেছে।

সে সব কাঠুরেগণ ব্যাপার সুবিধার নয় অনুমান করে পরিস্থিতিটিকে সামাল দেবার জন্য বল্‌ল—'হাসিব ফিরে আসার খবর পেয়ে আমরা খুবই খুশী হয়েছি। আমরা যাব, তার এতদিনের যা কিছু ঘটনা শুনব।'

তারা হাসিব-এর মায়ের হাতে তার জন্য বহুমূল্য রেশমী কাপড়, আর বুটিদার কিংখাব নিজেদের দোকান থেকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দিল।

হাসিব-এর সাথে ভেট করতে যেতে হবে। দোকানীরা দোকান বন্ধ ক'রে তার মকানে যাবার আগে এক সাথে মিলিত হ'ল। ছোটখাট এক বৈঠকের মাধ্যমে স্থির করল তারা প্রত্যেকে মধুবিক্রির অর্থ থেকে কিছু অংশ তো হাসিব'কে দেবে সে সঙ্গে বাঁদী আর বাড়ির অংশও তাকে দেবে।

হাসিব-এর মকানে পৌঁছে দোকানীরা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার হাতে চুম্বন ক'রে অনুশোচনার স্বরে বল্‌ল—'ভাই হাসিব, কাজটি গলতিই হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মাফ ক'রে দাও। তোমার জন্য কিছু উপহার এনেছি, নিতেই হবে। তার অংশ তো তোমারও প্রাপ্য। যদি না নাও তবে বুঝব, তুমি আমাদের ক্ষমা করতে পার নি।'

হাসিব ভাবল, মিছে ক্ষোভ জমিয়ে রেখে ফয়দাই বা কি? এতে প্রতিবেশীদের সাথে তিক্ততা বৃদ্ধি ছাড়া ফয়দা কিছুই হবার নয়। তাদের উপহার গ্রহণ ক'রে বল্‌ল—'সাচ্চা বাৎ, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। দেয়ালে হাজার মাথা ঠুকলেও তা তো আর ফেরার নয়।'

দোকানীরা আনন্দ করতে করতে বাড়ি ফিরল। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে লাভের বখরা পেয়ে হাসিব একটি বড়সড় দোকান খুলে বসল। শহরে একটি চমৎকার মকানও বানাল।

হাসিব একদিন এক হামামের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। হামামের মালিক তাকে সালাম জানিয়ে একবারটি তার হামামে পদার্পণ করার জন্য বার বার অনুরোধ জানাতে লাগল। সুন্দর সব আরামদায়ক ব্যবস্থাদির উল্লেখ ক'রে একবারটি পরীক্ষা করার জন্য তাকে বিশেষ অনুরোধ করতে লাগল।

হাসিব বল্‌ল—'আমাকে মাফ করবেন। আমি এক জনের কাছে কসম খেয়েছি, কোনদিন হামামে ঢুকব না।'

হামামের মালিকটি নাছোড়বান্দা। তবু তাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' একাত্তরতম রজনী

পরদিন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার জের টেনে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, হাসিব কসম খেয়েছে সে কোনদিনই হামামে ঢুকবে না এমন তাজ্জব বাৎ এমন অদ্ভুত কসমের ব্যাপার হামামের মালিক বিশ্বাসই করতে পারল না। বিশ্বাস করার মাফিক ব্যাপারও তো নয়।

হামামের মালিক বেশ একটু অভিমানের স্বরেই বল্‌ল—'বুঝেছি, কসম টসম কিচ্ছু নয়। আদতে আমাকে এড়িয়ে যাবার একটি ফিকিরমাত্র। মেহেরবানি ক'রে বলবেন কি, আমি আপনার কাছে এমন কি কসুর করলাম যার ফলে আপনি আমার অনুরোধ সরাসরি উপেক্ষা ক'রে অপমান করলেন?'

—'সে কী তাজ্জব বাৎ ভাইয়া! আমি তো বলছি কসম—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে হামামের মালিক এবার বল্‌ল—'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল বুঝেছেন, করলেন। আমিও খোদাতাল্লা-র নামে কসম খাচ্ছি, আমার হামামে আপনাকে যদি ঢোকাতে না পারি তবে আমি ঘরে যে তিনটি বিবি পুষছি তাদের তালাক দিয়ে দেবো।'

হাসিব প্রমাদ গুণল। বল্‌ল—'এ কী ফেরে পড়া গেল! সে

এবার বল্‌ল—'কেন ঝুটমুট গোস্‌সা করছ ভাইয়া? আমি খোদাতাল্লা-র নামে কস্‌ম খেয়ে বলছি, তোমাকে যা বলেছি তার একটি অর্থও ঝুটা নয়।'

হাসিব ভাবল, হামামের মালিক কসম খেলে, তার তিন বিবিকে তালাক দিলেও তার কিছুই করার নেই। মুশকিল যতই হোক না কেন তার পক্ষে হামামে গোসল করা বা হাত-পা ধোয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। অনন্যোপায় হয়ে সে তার নিজের পথে পা-বাড়াল।

ব্যস, আর দেরী নয়। হামামের মালিক আচমকা এক লাফে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। হাত চেপে ধরে বল্‌ল—'আপনি ফিরে গেলে আমাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে, তিন-তিনটি বিবিকে তালাক দিয়ে একদম ফকির বনে যেতে হবে। আমি কসম খেয়ে বলছি, হামামে গোসল করার জন্য আপনাকে কোন তকলিফ ভোগ করতে হলে আমি তার জন্য দায়ী হ'ব। তবু আপনি একবারটি হামামে ঢুকুন।'

তাদের ধস্তাধস্তিতে রাজপথে পথচারীদের ভিড় জমে গেল। তারা ব্যাপার শুনে হাসিবকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে একবারটি হামামে ঢুকে মালিককে কসম রক্ষার সুযোগ দেবার জন্য।

হাসিব কিছুতেই রাজী হ'ল না। তার জেদ দেখে পথচারীদের কয়েকজন নওজোয়ান রেগে গেল। তারা জোর ক'রে হাসিব-এর কোর্তা-পাৎলুন খুলে নিয়ে রীতিমত টানতে টানতে হামামে ঢুকিয়ে দিল। জোর ক'রে চেপে ধরে বদনায় ক'রে পানি তুলে তাকে গোসল করিয়ে দিল।

হামামের মালিক শপথ রক্ষা হওয়ায় বেজায় খুশী হ'ল। উৎসাহী পথচারী নওজোয়ানরা হাসিব'কে গোসল করিয়ে ফিন কোর্তা-পাৎলুন পরিয়ে দিল।

হাসিব হামাম থেকে বিষণ্ণমুখে বেরিয়ে পথে নামার উদ্যোগ নেয়। পারল না, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তার হালৎ ক্রমে সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ। ক্রমে কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে আসতে লাগল। ঘাড় থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে হিমেল স্রোত বার বার মাজা পর্যন্ত নেমে যেতে লাগল। অভাবনীয় ব্যাপার। এক সময় গলা দিয়ে রা-পর্যন্ত করতে পারছে না, এমন হালৎ হয়ে গেল। এক সময় হালৎ এমন শোচনীয় হয়ে পড়ল যে, কি করণীয় কিছুই তার মালুম হচ্ছে না।

হাসিব কি যেন বলার কোশিস করল। পারল না। ঠোঁট দুটো কেবল তিরতির করে কাঁপতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। রাজার সশস্ত্র সিপাহীরা হামামটি ঘিরে ফেল্‌ল। তারা হাসিব-এর কোর্তার কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে চল্‌ল। ব্যাপার দেখে হাসিব তো একেবারে আশমান থেকে জমিনে পড়ল।

রাজপ্রাসাদে এনে সিপাহীরা হাসিব'কে বৃদ্ধ উজিরের সামনে হাজির করল। উজির তারই জন্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। উজির দু'হাত বাড়িয়ে হাসিবকে পা থেকে তুলতে তুলতে সিপাহীদের ধমকে উঠলেন—'তোদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই। বল্‌লাম, সসম্মানে নিয়ে আসবি। আর তোরা কিনা—তোবা তোবা!' উজির হাসিব'কে কুর্ণিশ করলেন। অনুতাপের স্বরে অনুরোধ করলেন—'হুজুর মেহেরবানি ক'রে আপনাকে যে একবারটি সুলতানের দরবারে যেতে হবে।'

হাসিব ভাবল, নসীবে যা আছে তা তো আর খণ্ডন করা যাবে না। বাধ্য হয়ে উজিরের সঙ্গে সুলতানের দরবারের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

হাসিব উজিরের পিছন পিছন প্রাসাদের বিশালায়তন এক কামরায় প্রবেশ করলেন। সেখানে সুদৃশ্য এক পালঙ্কে সুলতান শায়িত। রেশমী কাপড় দিয়ে তাঁর মুখ ঢাকা।

সুলতানের পালঙ্ক থেকে অদূরে নাজির ও অন্যান্য সভাসদরা দাঁড়িয়ে। আর রয়েছে উন্মুক্ত তরবারি হাতে কয়েকজন গাট্টাগোট্টা ভয়ালদর্শন জহ্লাদ।

কামরাটির চারদিকে একবারটি চোখ বুলাতেই হাসিব-এর দিমাক ঘুরে গেল। ডরে কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড়। সে ভাবল, মোউৎ আর বেশী দূরে নেই। প্রতিশ্রুতি ভাঙার ফল এবার তাকে হাতেনাতে পেতে হবে।

হাসিব এবার পালঙ্কের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে বিলাপ পেড়ে

কাঁদতে লাগল—'আমি কিছুই জানি না। আমার কোন কসুরই নেই। আমাকে জোর ক'রে ধরে—'

উজির তাকে আর বলতে দিলেন না। ভব্যসভ্যভাবে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'হুজুর, আপনি ড্যানিয়েল-এর বেটা। আমাদের সুলতানকে আপনি রক্ষা করবেন ব'লে আমরা অধীর অপেক্ষায় রয়েছি। সুলতান কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত, কুষ্ঠ তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে। আমরা নিশ্চিন্ত জানি, আপনি ড্যানিয়েল-এর বেটা বলেই তার রোগ নিরাময় করতে পারবেন।'

—'একমাত্র আপনার দ্বারাই সুলতান কারজাদানে-র জান রক্ষা পেতে পারে।' নাজির, সভাসদ ও জল্লাদরা সমস্বরে ব'লে উঠল।

ব্যাপার দেখে তো আতঙ্কে হাসিব-এর জান খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়। ক্ষীণ এবং কাঁপা কাঁপা গলায় বল্‌ল—'আপনারা এসব কী বলছেন! আমি বাস্তবিকই কোন কেউকেটা নই। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি—আমি খুবই সামান্য এক আদমি। সিপাহীরা ভুল ক'রে আমাকে এখানে হাজির করেছে।'

সে এবার উজির-এর দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বল্‌ল 'আমার আব্বার নাম ড্যানিয়েল, অবশ্য সত্য। কিন্তু আমি এক অকাট মূর্খ। পেটে কালির অক্ষর নেই বলতে, কিছুই নেই। আমার আম্মা বহুৎ কোশিস করেছিলেন আমাকে পণ্ডিত ক'রে তুলবেন। আখেরে ফয়দা কিছুই হয় নি। বাধ্য হয়ে একটি খচ্চর, কুড়ুল আর কিছু দড়ি খরিদ ক'রে জঙ্গলে কাঠ কাটতে পাঠান। আমি কাঠুরে বনে গেলাম।'

বৃদ্ধ উজির বাধা দিয়ে বল্‌লেন—'কেন ঝুটমুট নিজের ক্ষমতা ছিপাতে চাইছেন মালিক। তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও আপনার মত দ্বিতীয় একটি হেকিম মিলবে না।'

হাসিব এবার কেঁদেকেটে বল্‌ল—'উজির সাহাব, আমাকে এ কী বিপাকে ফেল্‌লেন? বিমারি ইলাজ এবং নিদান সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞানও যে আমার নেই। সুলতানের বিমারির ইলাজ ক'রে আমি কিভাবে তাঁকে সারিয়ে তুলব, বলুন তো।'

—'ঝুটমুট বাজে ধান্দা ক'রে কোন ফয়দা হবে না। আমরা জানি, সুলতানের বিমারি সারার ফন্দি ফিকির আপনার ভালই কব্জা করা আছে। ঝটপট কাম কাজ শুরু ক'রে দিন।'

—'কী আছে আমার হাতে, জানিই বা কি? মেহেরবানি ক'রে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বড় কোন একজন হেকিমকে তলব করুন।'

—'কেন যে ঝুটমুট ঝামেলা বাড়াচ্ছেন আমার দিমাকে আসছে না। আপনি বিমারির ইলাজ করতে পারেন, নিদান দিতেও পারেন। কারণ, পাতালপুরীর রানীর সাথে আপনার পরিচয় ও খাতির আছে।

হাসিব নির্বাক। এর কি জবাব দেবে, হঠাৎ ক'রে সে গুছিয়ে উঠতে পারল না।

উজির এবার বল্‌লেন—'পাতালপুরীর রানীর কুমারী দুগ্ধ পান করলে অথবা মলমের মত ক্ষতস্থানে মাখলে যেকোন কঠিন বিমারী সেরে যেতে পারে।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' বাহাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, হাসিব-এর এবার মালুম হ'ল ; প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে হামামে ঢোকার ফলেই তার নসীব এমন করে বিগড়ে গেছে।

হাসিব এবার উন্মাদের মত চিল্লিয়ে ওঠে—'কি বল্‌লেন আমার মালুম হচ্ছে না! ওরকম কুমারী লেড়কির দুধ আমি জিন্দেগীতে কোনদিন দেখি নি। আর পাতালপুরীর রানীর সাথে পরিচয় থাকা তো দূরের কথা আমি তার নামও কোনদিন শুনিনি।' উজিরের কণ্ঠস্বরে এবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন—'দেখুন, আপনার বাৎ যে কতখানি অসত্য তা আমি এখনই প্রমাণ ক'রে দিতে পারি। আপনি পাতালপুরীর রানীর কাছে কিছুদিন যে ছিলেন তা আমি ভালই জানি।'

হাসিব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

—'কি ক'রে বুঝলাম, তাই না? প্রাচীনকাল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত যারাই রানীর কাছাকাছি অবস্থান করেছেন তাদের সবার পেটের চামড়া বিলকুল কালো বনে গেছে। রানীর হামামে গোসল না করলে পরে কারো পেটের চামড়া এমন কালো হতে পারে না। একটি কিতাব পড়ে এসব ব্যাপার আমি শিখেছি। আপনাকে যে-হামাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে আমার গুপ্তচর হরবখত পাহারা দিচ্ছে। যারাই গোসল করে তাদের পেটের চামড়ার ওপর নজর রাখাই তাদের কাজ। আপনার পেটের চামড়া কালো দেখতে পেয়ে তারা খবর দেয়। সিপাহী পাঠিয়ে আমি আপনাকে এখানে নিয়ে আসি। ধান্দা ছেড়ে কাজে লাগুন।'

—'হতে পারে আপনার বাৎ বিলকুল সাচ্চা, তবুও আমি বলছি, আমি রানীর হামামে গোসল করা তো দূরের কথা চোখেও কোনদিন তাকে দেখি নি।'

উজির এবার আচমকা এক হেঁচকা টানে হাসিব-এর পরণের তোয়ালেটি খুলে দিল। ব্যস, কুচকুচে কালো পেটটি দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

হাসিব কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্‌ল—'বিশ্বাস করুন, আমার পেটের এরকম রঙ নিয়েই আমি পয়দা হয়েছি। কোন হামামে গোসল করার ফলে এমনটা হয় নি।'

হাসিব রানীর কাছে শপথ করেছিল, রানী কোথায় থাকেন ভুলেও কারো কাছে ফাঁস করবে না। তাই বার বার দৃঢ়তার সঙ্গে এমন কসম খেয়ে বলতে লাগল, রানীর সান্নিধ্যে যায় নি, দেখেও নি।

উজিরের নির্দেশে দু'জন জল্লাদ হাসিব'কে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে ফেলে। তার পায়ের তলায় হরদম আঘাত করতে থাকে। ভাবল, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে হামামে গোসল করার জন্যই এবার তাকে জান খোয়াতে হবে। বেদম প্রহার। অসহ্য যন্ত্রণা। বাধ্য হয়ে বল্‌ল সব কথা সে কবুল করবে।

প্রহার বন্ধ করা হ'ল। দামী পোশাক পরিয়ে দেয়া হ'ল। তাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে, নিজে অন্য একটি ঘোড়ায় চেপে উজির হাসিব'কে নিয়ে চল্‌লেন। সঙ্গে তার সশস্ত্র সৈন্য। ঘোড়া ছুটিয়ে তারা সে ভাঙা বাড়িটির সামনে হাজির হলেন। রানী যমলিকা-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসিব এ-বাড়িটি থেকেই যাত্রা করেছিল।

উজির কিতাব পড়ে কিছু কিছু যাদুবিদ্যা রপ্ত করেছিলেন। তার কিছু এবার ব্যবহার করল। ধূপের মত কি যেন পোড়ালেন। অনুচ্চ কণ্ঠে কেবলমাত্র ঠোঁট দুটো নাড়িয়ে কি সব মন্ত্র আওড়ালেন। আর হাসিবকে দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলেন যাতে রানী একমাত্র তাকেই দেখা দেন। মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হ'ল। বাড়িঘর, সামানপত্র বিলকুল কেঁপে উঠল। যে-যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল। চারটি সর্পকন্যার—ন্যায় কাঁধে চেপে, গামলার মধ্যে বসে রানী এসে দেখা দিলেন।

রানীর নিশ্বাসে আগুন ছিটকে ছিটকে বেরোচ্ছে। রানীর চোখ দুটোতেও আগুনের হল্কা। গম্ভীর মুখে বল্‌লেন—'তুমি আমার কাছে কসম খেয়েছিলে, ইয়াদ নেই?'

—'মহারানী মেহেরবানি করে আমার কসুর নেবেন না। আমার কোন কসুর নেই।' এবার উজিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বল্‌ল—'যা কিছু বিলকুল ও-ই করেছে।'

—'জানি, কিছুই আমার অজানা নয়। তাই তোমাকে কোনরকম শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা আমার নেই। যা কিছু সবই তোমাকে দিয়ে জোর ক'রে করিয়েছে। তবে সুলতানের দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হওয়াও দরকার। তুমি আমার কাছ থেকে দুধ নিতে এসেছ, দেব। সুলতানের বিমারির ইলাজ করবে, সেরে যাবেন।'

হাসিব সবিস্ময়ে রানীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রানী ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। কানে কানে বল্‌লেন—'দুধ আমি দেব। কি ক'রে ব্যবহার করবে, বিলকুল কানে কানে বলে দিচ্ছি। আমি একটি দুধের পাত্রে লাল চিহ্ন এঁকে দিচ্ছি, এতে সুলতানের বিমারি সারবে। আর দ্বিতীয়টি দিচ্ছি উজিরের জন্য। তোমাকে বেদম প্রহার করেছে, তাই না?'

হাসিব ঘাড় কাৎ করল। রানী বলে চল্‌লেন—'সুলতানের বিমারি সেরে গেছে দেখে উজির আমার দুধ পান করার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে। তার যাতে বিমারি না হয় সে জন্যই এত আগ্রহান্বিত হবে। তখন দ্বিতীয় পাত্রের দুধটুকু তাকে পান করতে দিও।'

দুধের পাত্র দুটো হাসিব'কে বুঝিয়ে দিয়ে রানী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে হাসিব রানীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করল। প্রথম পাত্রটির দুধ সুলতানকে পান করাল। ব্যস, তাঁর দেহের ক্ষতগুলি যাদুমন্ত্রের মাফিক মিলিয়ে যেতে লাগল। পুরানো খসখসে চামড়ার পরিবর্তে নতুন চামড়া গজাতে শুরু করে। ব্যাপার দেখে উজিরের দিল্ একদম চনমনিয়ে উঠল। সে-ও দুধপান করতে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন। নিজে হাতেই দ্বিতীয় পাত্রটিকে গলায় ঢেলে দিলেন। বিলকুল দুধ পান করলেন।

দুধ পেটে যাওয়া মাত্র উজিরের পেট ফুলতে ফুলতে ঢাক হয়ে যেতে লাগল। একটু বাদেই দুম্ ক'রে বিকট এক আওয়াজ তুলে তার পেট ফেটে গেল।

উজিরের জান খতম হয়ে গেল। হাসিব-এর ওপর অত্যাচারের পরিণামে তাকে জান খোয়াতে হ'ল।

সুলতান বিমারিমুক্ত হয়ে ফিন রাজ্যশাসনে মন দিলেন। হাসিব-এর জন্যই সুলতানের পক্ষে রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজের মসনদের পাশে অন্য একটি আসনে তার বসার বন্দোবস্ত করলেন।

সুলতান-এর বৃদ্ধ উজির মারা গেছেন। উজিরের শূন্যপদ পূরণ করা দরকার। সুলতান প্রসন্ন হয়ে হাসিব'কে সে-পদে বহাল করলেন।

সুলতানের নির্দেশে হাসিব-এর উজিরের পদে নিযুক্তির ব্যাপারটি ঢেঁড়া পিটিয়ে সর্বত্র জানিয়ে দেয়া হ'ল।

পারিষদদের স্পষ্ট ভাষায় সুলতান জানিয়ে দিলেন 'তোমরা আমাকে যে-সম্মান প্রদর্শন করবে নতুন উজির হাসিব'কেও সেরকম সম্মানই প্রদর্শন করবে। তার কিছুমাত্র অসম্মান কেউ করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' তিয়াত্তরতম রজনী

শাহরাজাদ বল্‌লেন—হাসিব-এর মায়ের কাছে এক টুকরো কাগজ পেল। তাতে লেখা ছিল—'সব শিক্ষাই মূল্যহীন। কারণ সময়মত আল্লাহই মানুষকে যাবতীয় শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে দেবেন।' বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শেষ করে এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এই হ'ল ড্যানিয়েল-এর পুত্র হাসিব ও পাতালের রানী যমলিকা-র কিস্‌সা।

বেগম কিস্‌সা শেষ করতে না করতেই বাদশাহ শারিয়ার আচমকা চিল্লিয়ে উঠলেন—'আমার ক্লান্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আমার মানসিক পরিস্থিতি যদি এভাবে উত্তরোত্তর বেড়েই চলে তবে কিন্তু তার পরিণাম ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দেবে। তখন তোমার ধড়, মুণ্ডু এক সঙ্গে থাকবে না, ইয়াদ রেখো।

বাদশাহের কথায় দুনিয়াজাদ-এর বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন ধড়াস করে উঠল। মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল।

বেগম শাহরাজাদ-এর চোখে-মুখেও উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজের মনকে শক্ত করে বেঁধে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বল্‌ল—'যা-ই হোক জাঁহাপনা, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটিয়ে দেবার কথা চিন্তা ক'রে এবার আপনাকে কয়েকটি মজাদার কিস্‌সা শোনাচ্ছি।'

হাসি মস্করাপ্রিয় হারুণ-অল-রসিদ

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, খলিফা হারুণ-অল-রসিদ এক রাত্রে বাগদাদের পথে ঘুরছিলেন। তাঁকে সঙ্গদান করছিলেন তাঁর উজির বারমাকী, প্রিয় গায়ক ওস্তাদ আবু ইশাক এবং কবি নবাস প্রভৃতি।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় নগরের এক প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। বসরাহ বন্দর থেকে একটি পথ বাগদাদ নগরীতে এসে মিশেছে।

খলিফা এক সময় লক্ষ্য করলেন, এক বুড়ো গাধার পিঠে চেপে নগরের দিকে আসছে।

খলিফা উজির জাফর'কে বল্‌লেন—'জাফর এক কাজ কর তো, লোকটি কেন গাধার পিঠে চেপেছে জিজ্ঞেস ক'রে এসো তো।'

জাফর তখন বুঝতেই পারল না খলিফা লোকটির ব্যাপারে এত উৎসাহী কেন? নইলে লোকটি গাধার পিঠে চেপে কোথায় চলেছে তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা তো থাকার কথা নয়। খলিফার আদেশ পালন করতেই হয়। তাই সে সামান্য এগিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'ওহে মিঞা, কোথায় চলেছো? আসছই বা কোথা থেকে?'

—'আসছি বসরাহ থেকে, আর বাগদাদ নগরেই চলেছি।'

—'তোমার এ-ই বয়স। বুড়ো হয়েছ! এমন দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে বাগদাদে যাবার কারণ কি?'

—'এর-ওর মুখে শুনেছি, বাগদাদ নগরীতে নাকি অনেক বড় বড় হেকিম রয়েছে। এরকম কারো খোঁজেই আমার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আসা।'

—'তোমার কোন্ বিমারি, বল তো?'

—'চোখের বিমারি। বহুৎ তকলিফ হচ্ছে। কোশিস ক'রে দেখি যদি কারো কাছ থেকে আচ্ছা সুরমা জোগাড় করতে পারি। দেখা যাক, কি হয়।'

—'বিমারির আরাম হবে কি না তা তো আল্লাতাল্লার হাত। তবে আমি তোমাকে এমন জব্বর এক সুরমা বানিয়ে দিতে পারি যা চোখে লাগালে এক রাত্রের মধ্যে তোমার চোখের বিলকুল বিমারির আরাম হয়ে যাবে। আর এর ফলে তোমার অর্থেরও বহুৎ সাশ্রয় হবে।

—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ বড়িয়া বাৎ! আল্লাহ ছাড়া এর ইনাম আর কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়।' বুড়ো স্বগতোক্তি করল।

বুড়ো কথাটি অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌লেও জাফর-এর কানে ঠিকই গেল। খলিফার কাছে এগিয়ে গিয়ে ইঙ্গিতে ব্যাপারটি ব'লে এসে ফিন বুড়োর দিকে এগিয়ে এলেন। বুড়োকে লক্ষ্য ক'রে এবার বল্‌লেন—'শোন মিঞা, তোমার বাৎচিৎ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই যেচে তোমার উপকার করতে চাইছি। তবে শোন, তোমাকে আমার দাওয়াই বাৎলে দিচ্ছি। এক কাজ করবে—তিন ছটাক নাকের প্রশ্বাস নেবে, সূর্যের রশ্মি তিন ছটাক তাতে মেশাবে, চাঁদের কিরণ তিন ছটাক ও তিন ছটাক চিরাগের আলো মিশিয়ে নেবে। তারপর সে মিশ্রণ একটি তলাহীন হামাম দিস্তায় ভাল ক'রে ঘেঁটে ঘুঁটে মিশিয়ে ফেলবে। তারপর মিশ্রণটি মুক্ত বাতাসে কিছুক্ষণ রেখে দেবে। একনাগাড়ে তিনমাস সেগুলোকে হাওয়া খাওয়াবে। তিন মাস বাদে সে মেশানো মশলাগুলোকে আচ্ছা ক'রে দলাই মালাই করবে। ব্যস, এবার সেগুলোকে একটি পিরিচে ভরে রেখে

দেবে। তারপর মশলা সমেত পিরিচটিকে আরও তিন মাস ধরে কড়া রোদে শুকোবে। তবেই দেখবে তোমার দাওয়াই তৈরী হয়ে গেছে।

এবার কি বলছি শোন মিঞা—পিরিচে যে সুরমা তৈরী করা হ'ল তাকে এক রাত্রে তিন শ' বার চোখে লাগাবে। খোদাতাল্লার যদি তোমার ওপর দোয়া থাকে তবে দেখবে, এক রাত্রেই তোমার যাবতীয় বিমারির আরাম হয়ে গেছে।'

জাফর-এর বাৎ শুনে বুড়ো তো কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলে গেল। সে গাধার পিঠে বসেই জাফর'কে সালাম জানাতে লাগল। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বার বার বলতে লাগল—'জী, আপনার মত হেকিম দ্বিতীয়টি আর নেই। আপনার দাওয়াইয়ের দাম কিভাবে শোধ করব, ভেবে পাচ্ছিনে।'

—'ঠিক আছে, সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে। যে সব সামানপত্রের কথা বল্‌লাম তা আগে জোগাড় করার কাজে লেগে যাওয়া দরকার।'

—'তবে হুজুর মেহেরবানি ক'রে আমার দাওয়াই বানাবার বন্দোবস্ত করুন। একটু হাত চালিয়ে করবেন। নইলে হয়ত উধাও হয়ে যাবে। আমি খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, নিজের মুলুকে ফিরে গিয়ে আপনার জন্য খুবসুরৎ একটি বাঁদী পাঠিয়ে দেব। কী সুরৎ তার, দেখলে দিমাক খারাপ হয়ে যাবে। আর কিছু না হোক, তার লালচে তুলতুলে নিতম্ব দেখলেই আপনি মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় হবেন। আর লেড়কিটি এমন সুন্দর সুর করে কাঁদতে পারে, দেখবেন আপনার ওই ফ্যাকাশে মুখটিকে থুথুতে একেবারে মাখামাখি ক'রে দেবে, আর উলুখাগড়ার বনের মত দাঁড়িগুলোকে ভিজিয়ে একদম জবজবে ক'রে দেবে।'

কথা ক'টি বলতে বলতে বুড়ো তার গাধার লাগামে টান দিল। গাধাটি তাকে নিয়ে থপ থপ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল তার গন্তব্যস্থলের দিকে।

ব্যাপার দেখে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ তো হেসে গড়াগড়ি যাবার জোগাড়।

জাফর-এর হালৎ তখন সঙ্গীন। কোন কথা বলার মত অবস্থা-ই তার নয়। রীতিমত অপ্রস্তুতে পড়ল। তাঁর মুখ দিয়ে রা পর্যন্ত বেরল না। লজ্জায় একেবারে এতটুকু হয়ে গেল।

কবিবর আবু নবাস কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাব দেখাল। সে এগিয়ে গেল জাফর-এর দিকে। বিজ্ঞের মত জাফর'কে বারবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে লাগল।

ছোট্ট এ-কাহিনীটি শুনে বাদশাহ শারিয়ার-এর মুখে খুশীর ঝিলিক ফুটে উঠল।

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কিস্‌সাটি ছোট হলেও আশাকরি আপনার দিলে খুশীর আমেজ আনতে পেরেছে, কি

বলেন?'

বাদশাহ বল্‌লেন—'সে আর বলতে! এরকমই আর একটি কিস্‌সা শোনার জন্য আমার দিল্ আনচান করছে। আশাকরি আর একটি চটকদার কিস্‌সা বলে তুমি আমাকে খুশী করবে।'

দুনিয়াজাদ তার বহিন শাহরাজাদ-এর গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'বহিনজী, তোমার কিস্‌সা কী সুন্দর! আর তোমার বলার কায়দাও খুবই চমৎকার। এখনও রাত্রি অনেকই আছে। আর একটি কিস্‌সা শুরু কর।'

শিক্ষক ও ছাত্রের কিস্‌সা

কিছুক্ষণ বিরতির মাধ্যমে একটু দম নিয়ে বেগম শাহরাজাদ আবার বলতে শুরু করলেন—উজির বদর অল্-দিন ছিলেন ইয়েমানের সুবেদার। তাঁর এক খুবসুরৎ ছোট ভাই ছিল। তার রূপের জেল্লায় সবার চোখে ধাঁধা লেগে যেত।

বদর-অল-দিন তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে খুবই ভাবিত ছিলেন, তাঁর মনে সর্বদা আশঙ্কা হ'ত এই বুঝি কেউ তাঁর ভাইয়ের দিকে কু-নজরে তাকাচ্ছে, নজর দিচ্ছে।

আবার সঙ্গদোষের ব্যাপারেও বদর-অল-দিন-এর কম খুঁতখুঁতানি ছিল না। বলা তো যায় না কোন্ কু-সংসর্গে পড়ে ভাইটি

তাঁর গোল্লায় যাবে। এরকম সব ভাবনার বশীভূত হয়ে তিনি তাঁর খুবসুরৎ ভাইটিকে প্রতি মুহূর্তে চোখে চোখে রাখতেন। কোনক্রমে চোখের আড়াল হলেও তাকে মনের আড়াল করতেন না মুহূর্তের জন্যও।

বদর অল-দিন তাঁর ছোট ভাইটিকে কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে দেয়া তো দূরের কথা এমন কি পাঠাভ্যাস করতে মক্তবে মৌলভী সাহেবের কাছে পর্যন্ত পাঠাতেন না। তাই বলে তাকে অকাট মূর্খ করেও রাখেন নি। এক সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত মৌলভীকে তার গৃহ-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

বদর অল-দিন-এর খুঁতখুতানি চরম পর্যায়ে পৌঁছল যখন দেখা গেল তিনি এক নিভৃত কক্ষে মৌলভীর কাছে ছোট ভাইয়ের বিদ্যানুশীলনের বন্দোবস্ত করলেন। সে-কক্ষে কারো প্রবেশাধিকার তো ছিলই না এমন কি তিনি নিজেও সচরাচর যেতেন না।

নসীবের খেল্ কে রোধ করতে পারে? নসীবের চাকা সময় মত ঠিক ঘুরে গেল। কিছুদিন যেতে না যেতেই বুড়ো মৌলভী সাহেব খুবসুরৎ কিশোরটির মহব্বতে পড়ে গেল। তার বুড়ো হাড়ে যৌবনের শক্তি ফিরে এল। শুরু হয়ে গেল ভেল্কী। তার কলিজা চনমনিয়ে উঠল। দিল্ জুড়ে শুরু হ'ল বসন্তের হিল্লোল।

মৌলভী নিজের দিলকে শান্ত রাখতে বহুৎ কোশিস করেছিল। কিন্তু খোদতাল্লা-র মর্জি ; এ যে হতেই হবে।

মৌলভী নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে একদিন কিতাব সরিয়ে রেখে ব'লে উঠল—'শোন, মহব্বত কখন যে কার মধ্যে পয়দা হয় তা খোদাতাল্লাও বোধকরি জানেন না। নইলে তোমাকে দেখার পর থেকে আমার দিল্ এমন চন্‌মনিয়ে উঠবে কেন? কোন লেড়কার সুরৎ বুড়ো হাড়ে এমন মহব্বতের জোয়ার বইয়ে দিতে পারে এ যে কল্পনারও অতীত।'

বদর অল-দিন-এর কিশোর ভাইটি চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

বুড়ো মৌলভী ব'লে চল্‌ল—'তোমাকে দেখার পর থেকে আমার কলিজার জ্বালা শুরু হয়ে গেলো। তোমাকে কাছে না পেলে আমার জিন্দেগী বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। তোমাকে আমার চাই-ই চাই।'

বুড়ো মৌলভীর বাৎ শুনে বদর অল-দিন-এর কিশোর ভাই বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে পড়ল।

মৌলভী বল্‌ল—'চুপ ক'রে থেকো না, কিছু তো বল। আমি তো বল্‌লামই, তোমাকে ছাড়া আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে।'

—'কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব, মালুম হচ্ছে না। আমার ভাইজান হরবখত আমাকে চোখে চোখে রাখেন। তাঁর চোখে ধূলো দিয়ে আমি কি ক'রে যে আপনাকে খুশী করব, দিমাকে আসছে না মৌলভী সাহাব।'

—'কই পরোয়া নাহি। ফিকির আমি ভেবেই রেখেছি।'

—'ফিকির? কি সে ফিকির?'

—'রাত্রে তোমার ভাইজান যখন গভীর নিদে আচ্ছন্ন থাকবে তখন তুমি চুপিসারে ওদিককার ছাদে চলে আসবে। আমি তোমার অপেক্ষায় দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে থাকব। তোমার গলা শুনতে পেলেই আমি দেওয়ালের ওপর উঠে পড়ব। তারপর তোমার হাত ধরে দেওয়াল টপকে—'

বুড়ো মৌলভীর মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে বদর অল-দিন-এর ভাই সবিস্ময়ে বলে উঠল—'দেওয়াল টপকে? ওরে ব্বাস!'

—'তা নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি-ই তোমাকে নিয়ে দেওয়াল টপকে ওধারে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করব। কাক-পক্ষীও টের পাবে না।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' পঁচাত্তরতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, মৌলভীর প্রস্তাবে লেড়কাটি সম্মতি জানাতে গিয়ে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, আপনার মতলব অনুযায়ীই কাজ হবে।'

পরদিন সন্ধ্যার আন্ধার নামতে না নামতেই লেড়কাটি ঘুমের বাহানা ক'রে শুয়ে রইল। চোখ বন্ধ ক'রে শিট্‌কে লেগে পড়ে রইল।

সন্ধ্যার কিছু বাদে তার বড়ভাই বদর অল-দিন কাম কাজ মিটিয়ে ঘরে ফিরল। ছোট ভাইয়ের কামরায় দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল, সে ঘুমোচ্ছে। ডাকাডাকি না ক'রে নিজের কামরায় চলে গেল।

লেড়কাটির সাধ্যমত যতখানি সম্ভব কম শব্দ করে বিছানায় উঠে বসল। ধীরে ধীরে চৌকি থেকে নামল। পা টিপে টিপে কামরা থেকে বেরিয়ে ছাদের একধারে এসে দাঁড়াল। মুখে ছোট্ট ক'রে সঙ্কেত দিল।

বুড়ো মৌলভী আগেভাগেই প্রাচীরের ধারে অপেক্ষা করছে, নচ্ছারটি তাকে নিয়ে প্রাচীর টপকে ওধারে নিয়ে গেল। ব্যস, হাত ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে তার নিজের কামরায় হাজির হ'ল।

মৌলভী হরেক কিসিমের ফলমূল আর দামী ও সুন্দর খুসবুওয়ালা সরাব কামরায় সাজিয়ে রেখেছিল। আর আনন্দ-স্ফূর্তির যাবতীয় উপকরণও জড়ো করা ছিল।

মৌলভী কামরার মেঝেতে একটি মাদুর বিছিয়ে লেড়কাটিকে নিয়ে বসল। জানালা দিয়ে চাঁদের কিরণ মাদুরটির ওপর লুটোপুটি

খাচ্ছে।

তারা হাসি-আনন্দের মধ্যে প্রথমে ফলমূল খেতে লাগল। তারপর সরাবের বোতলের মুখ খুলে মৌলভী লেড়কাটিকে দিল আর নিজেও খেল গলা পর্যন্ত। মৌলভী এবার খেউর গোছের মহব্বতের গান ধরল। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস বইছে, চাঁদের কিরণ তাদের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। আর সে সঙ্গে সরাবের মদিরতা তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে তারা যেন এক মায়াময় স্বপ্নাচ্ছন্ন লোকে বিচরণ করতে লাগল।

মিষ্টি-মধুর আবেশের জোয়ারে মৌলভী আর লেড়কাটি ভাসতে ভাসতে যেন এক স্বপ্নাচ্ছন্ন লোকের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ কাটল। আরও বহুক্ষণই হয়ত এভাবেই তারা কাটিয়ে দিত। কিন্তু একটি আকস্মিক ঘটনায় তাদের মহব্বতের সাগরে ভাঁটা দেখা দিল।

ব্যাপারটি হ'ল—বদর অল-দিন নিজের কামরায় আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ তার দিল্ চাইল ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কিছু বাৎচিৎ করবে।

তার কামরার দরওয়াজায় এসে ভেতরে উঁকি দিতেই তার শির যেন আচমকা ঘুরে গেল। কামরা ফাঁকা। খালি বিছানা পড়ে রয়েছে। সে প্রথমে তার নাম ধরে ডাকাডাকি করল। কোনই সাড়া পেল না। সব কামরা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজল। কোন হদিসই মিল্‌ল না। আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি ক'রে পাত্তা না পেয়ে হতাশ হ'ল।

বদর অল-দিন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে খুঁজতে খুঁজতে ছাদে এল। হাঁটতে হাঁটতে ছাদের সে-জায়গাটিতে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল প্রাচীরের ওধারে এক কামরায় তার ভাই সরাবের পেয়ালা হাতে মৌলভীর সঙ্গে হাসাহাসি ঢলাঢলিতে মেতে রয়েছে। মহব্বতের জোয়ারে উভয়েই ভেসে চলেছে।

এমন সময় হঠাৎ মৌলভীর ছাদের দিকে নজর যায়। ইয়া আল্লাহ! এ যে স্বয়ং উজির বদর অল-দিন! তাদের দিকেই মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে। তার মাথায় যেন আশমান ভেঙে পড়ার জোগাড় হ'ল।

মৌলভী সচকিত হয়ে মহব্বতের গানার সুরের বদলে এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর ভাজতে শুরু করল।

উজির বদর অল-দিন যেন মুহূর্তের মধ্যে গানার মধ্যে ডুবে গেল। তন্ময় হয়ে গানার তালে তালে মাথা নাড়াতে লাগল। আর বার বার 'তোফা তোফা' ব'লে বাহবা দিতে লাগল।

উজির তার ভাইকে মৌলভীর কামরায় সরাবের পেয়ালা হাতে দেখেও খারাপ কিছু ভাবার অবকাশ পেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বার বার 'তোফা তোফা' আর 'বহুৎ আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা' ব'লে সেখান থেকে বিদায় নিল। সে মনে মনে বল্‌ল—'ভাইকে এমন সুন্দর গানার তালিম দেয়ার বন্দোবস্ত করে মৌলভী ভালই করেছে। এমন শিক্ষাগুরু হাজারে একজন মেলে কিনা সন্দেহ।'

উজির বিদায় নিলে মৌলভী ফিন নিজমূর্তি ধারণ করল। কিশোরটিকে নিয়ে মহব্বতের খেলায় মেতে উঠল।

আজব বটুয়ার কিস্‌সা

মৌলভী ও খুবসুরৎ লেড়কার কিস্‌সা শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে আজব বটুয়ার কিস্‌সা শোনাচ্ছি।

একরাত্রে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ নির্জন রাত্রি গুজরান করছিলেন। শত কোশিস করেও কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারছিলেন না।

এক নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে প্রায় মাঝরাত্রি পর্যন্ত গুজরান করে এক সময় উজির জাফর'কে তলব করলেন।

খলিফার তলব পেয়ে উজির জাফর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। খলিফা চোখে-মুখে হতাশার ছাপ এঁকে বল্‌লেন—'জাফর, কি করি বল তো, কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারছি না! অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাতে ভালভাবে গুজরান করতে পারি তার বন্দোবস্ত কর।

জাফর হাত কচলে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আলী নামে আমার এক জিগরী দোস্ত রয়েছে। সে বহুৎ মজাদার কিস্‌সা জানে যা শুনলে আপনার দিল্ চাঙা হয়ে উঠবে।'

—'তবে তাকে এখনই তলব দাও। তার কিস্‌সা শোনার জন্য আমি অত্যুগ্র আগ্রহী।'

খলিফার নির্দেশে উজির সে কিস্‌সা কথককে তাঁর সামনে হাজির করলেন।

খলিফা বল্‌লেন—'জাফর-এর মুখে শুনলাম, তুমি নাকি বহুৎ আচ্ছা কিস্‌সা বলতে পার। আর তোমার কিস্‌সা শুনলে নাকি চোখে নিদ জড়িয়ে আসে। সত্য কি? তাই তোমাকে গভীর রাত্রে ডেকে এনে তকলিফ দিতেই হ'ল। এমন এক কিস্‌সা ফাঁদ যা শুনলে আমার চোখে নিদ আসতে পারে।'

—'জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য। হুকুম করুন, কোন্ কিসিমের কিস্‌সা আপনি শুনতে আগ্রহী? আপনি কি কোন মনগড়া কিস্‌সা, নাকি আমি নিজের চোখে দেখেছি এরকম কোন ঘটনা শুনতে চাইছেন?'

—'শোন, যে-ঘটনার সঙ্গে তোমার নিজের যোগসাজস রয়েছে এরকম কোন কিস্‌সা শুরু কর।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর নির্দেশে আলী কিস্‌সা শুরু

করল—'জাঁহাপনা, আমার একটি দোকান রয়েছে। এক সকালে আমি দোকানে বসে, এক গাট্টাগোট্টা কালো নিগ্রো দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়েই সে দোকানের সামানপত্র দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে সেই নিগ্রোটি দোকানে ঢুকে হরেক কিসিমের সামানপত্রের দরদস্তুর করতে লাগল। কথার ফাঁকে টুক ক'রে একটি বটুয়া তুলে নিল। ব্যাপারটি আমার নজর এড়াল না। সে ভাবল, আমি বুঝি তার কাণ্ডটি মোটেই লক্ষ্য করি নি।

এক সময় নিগ্রোটি ঝট ক'রে দোকান থেকে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটা জুড়ল। এমন এক বাহানা করল, ব্যাপার যেন কিছুই নয়।

আমার পক্ষে আর হাত-পা গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। এক লাফে দোকান থেকে বেরিয়ে তার কোর্তার কলার চেপে ধরে বল্‌লাম—'হতচ্ছাড়া কাঁহিকার, আমার বটুয়া নিয়ে পালাচ্ছিস যে বড়। দিয়ে যা—আমার বটুয়া দিয়ে যা।'

সে জাত সাপের মত একেবারে ফোঁস ক'রে উঠল—'বটুয়া? এ তো আমারই বটুয়া। এর ভেতরে তো আমারই সামানপত্র রয়েছে।

এরকম একটি বাৎ শুনলে কার দিমাক ঠিক থাকতে পারে, বলুন জাঁহাপনা? আমি গর্জে উঠলাম—'এখনও বলছি, ভাল চাস তো আমার বটুয়া দিয়ে দে। নইলে চিল্লিয়ে লোক জড়ো করব বলে দিচ্ছি। বাধ্য হয়ে করলামও তা-ই। সবাইকে ডেকে

বল্‌লাম—'মুসলমান ভাইসব, তোমরা শোন—এ বিধর্মীটি আমার দোকান থেকে বটুয়াটি চুরি ক'রে নিয়ে ভেগে যাচ্ছে।'

আমার বাৎ শুনে ব্যবসায়ীরা বল্‌ল, তাকে কাজীর কাছে নিয়ে গিয়ে বিচারের বন্দোবস্ত করতে।

আমি কয়েকজন দোকানীর সাহায্যে হতচ্ছাড়া নিগ্রোটিকে টেনে হিচঁড়ে কাজীর কাছে নিয়ে গেলাম।

আমি কিছু বলার আগেই কাজীকে সে সালাম জানিয়ে বলতে লাগল—'হুজুর খোদাতাল্লা-র দোয়ায় আপনি দয়ার পূজারী, ন্যায়-পরায়ণ ধর্মাবতার। আপনার দরবারে আমি নিবেদন রাখছি, এ বটুয়াটি আমার। আর এর ভেতরে যেসব সামানপত্র রয়েছে তা-ও আমার। ক'দিন আগে বটুয়াটি এক জায়গায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ হদিস পেয়ে আমি আমার বটুয়াটি দোকান থেকে নিয়ে নিয়েছি।'

—'তোমার বটুয়া হারিয়ে গিয়েছিল?' কাজী প্রশ্ন করলেন।

—'গতকাল হারিয়ে গিয়েছিল হুজুর। বটুয়াটির চিন্তায় আমি গতরাত্রে দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি।'

—'বহুৎ আচ্ছা। এক কাম কর, বটুয়াটি আমার সামনে রাখ। তারপর এর ভেতরে কোন্ কোন্ সামানপত্র রয়েছে তার ফর্দ বানিয়ে আমার কাছে জমা দাও।' কাজী হুকুম দিলেন।

নিগ্রোটি এক নিশ্বাসে ব'লে চল্‌ল—'হুজুর, বটুয়াটির ভেতরে দুটো স্ফটিকের কাজললতা রয়েছে। কাজল পরানোর দুটো কাঁটা, দুটো চমৎকার সরবতের গ্লাস, একটি রেশমি রুমাল, দুটো চিরাগবাতি, দুটো কুর্শির কুশান আর রয়েছে দুটো বড় বড় চামচ, দুটো পানির বোতল, দুটো গালিচা, একটি থালা, মুখ ধোবার গামলা দুটো, রসুইখানার শিক একটি, পানি রাখার কলসি দুটো, দুটো মদের পাত্র, দুটো মাদী কুত্তা, দুটো অন্তঃসত্ত্বা বিল্লি, দুটো গাধা, চালরাখার পাত্র একটি, জেনানাদের শোবার ঘরের সামানপত্র কিছু, দুটো গাই, দুটো বাছুর, দুটো ষাঁড়, দুটো দৌড়বাজ মোষ, দুটো সিংহ, একটা সিংহী, দুটো খেঁকশিয়াল, একটা বড়সড় উট, দুটো ভেড়া, উটের বাচ্চা দুটো, আরাম কেদারা দুটো, মাদী ভালুক একটি আর রয়েছে একটি সুবিশাল প্রাসাদ।'

কাজী ইয়া বড় বড় চোখ ক'রে বিচারপ্রার্থী নিগ্রোটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ।

নিগ্রোটি ব'লে চল্‌ল—'হুজুর, প্রাসাদটির ভেতরে রয়েছে পেল্লাই দুটো দরবার কক্ষ, দুটো সামিয়ানা, দুটো সবুজ তাঁবু, দুটো দরওয়াজাওয়ালা রসুইখানা আর রয়েছে কুর্দ নিগ্রোদের একটি দল।

হুজুর, বটুয়াটির ভেতরে যেসব সামানপত্র রয়েছে বলে দাবী করছি, সবকিছুরই মালিক একমাত্র আমি।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা

বন্ধ করলেন।

তিন শ' ছিয়াত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ গল্পের অবশিষ্টাংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আলী এবার বল্‌ল—কাজী আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন—'এবার বল, তোমার অভিযোগ কি?'

আমি কি বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। কারো মুখ থেকে এমন সব তাজ্জব বাৎ শুনলে দিমাক ঠিক থাকতে পারে, আপনিই বলুন জাঁহাপনা?

কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমি কাজীকে বল্‌লাম—'হুজুর, খোদাতাল্লার দোয়ায় আপনার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দেবেন। হুজুর, আমার বটুয়াটিতে একটি সভাকক্ষের ভাঙাচোরা সামানপত্র রয়েছে, আর বিশালয়াতন একটি প্রাসাদও রয়েছে। কিন্তু রসুইখানা বা তার কোন ভাঙাচোরা অংশ নেই। আর একটি বড়সড় কুত্তার খোঁয়াড়, আর বালবাচ্চার লিখাপড়া করার মাদ্রাসা রয়েছে একটি। একদল দাবাড়ু, একদল পল্টন, ডাকাতদের ঘাঁটি একটি, একটি জাদরেল সেনাপতি, পুরো বাগদাদ আর বসরাহনগর, আদের বেটা আমির সাদ্দাস-এর এক প্রাচীন ইমারত, পাঁচটি খুবসুরৎ লেড়কা, বারোটি কুমারী লেড়কী, এক হাজার মরু-সর্দার, আর একটি কামারশালা রয়েছে আমার এ-বটুয়াটির মধ্যে। আপনি পরীক্ষার মাধ্যমে আমার বক্তব্যের সত্যতা যাচাই ক'রে দেখতে পারেন। আমি হুজুরের কাছে বটুয়াটি দাবী করছি।

আমার বক্তব্য শেষ হতে না হতেই হতচ্ছাড়া নিগ্রোটি কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল। সে কান্নার ফাঁকে বল্‌ল—'হুজুর, বটুয়াটি যে আমার তা অনেকে-ই জানে। আর একটি বাৎ, একটু আগে আমি যে সামানপত্রের ফর্দা হুজুরের দরবারে পেশ করেছি সেগুলো ছাড়াও কিছু সামানপত্র বটুয়াটির মধ্যে রয়েছে। সেগুলো হ'ল—দশটি অতিকায় গম্বুজ, দুটো বে-দখল নগর, চারজন দাবাড়ু, বাচ্চা ঘোড়া দুটো, একটি মাদী ঘোড়া, দুটো বড়সড় রসায়নাগার, টাট্টুঘোড়া দুটো, পাল খাওয়া ঘোড়া একটা, উচ্ছন্নে যাওয়া ছোড়া দুটো, দুটো খরগোস, বাঁদীদের দালাল দুটো, একজন ল্যাংড়া, একজন জ্যোতিষী, একজন অন্ধ, অসাড় লোক দু' জন, ফকির দু'জন, নাবিকভর্তি এক জাহাজ, একজন জাহাজের ক্যাপ্টেন, পাঠান ধর্মযাজক একজন, একজন কাজী আর সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা একজন প্রভৃতি। আর দু' জন সাক্ষীও রয়েছে যারা সাক্ষ্যদান করবে আমিই বটুয়াটির মালিক।

কাজী ফিন আমার দিকে তাকালেন। বল্‌লেন—'শোন, এর জবাবের বিরুদ্ধে তোমার কোন বক্তব্য থাকলে বলতে পার।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-কে লক্ষ্য ক'রে আলী এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, নচ্ছার নিগ্রোটির বাৎ শুনে আমার দিমাক গরম হয়ে গেল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে কাজীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বল্‌লাম—'আল্লাতাল্লা আমাদের কাজীকে আরও নিরপেক্ষ বিচারের বুদ্ধি জোগান। হুজুর, আমি আগে যেসব সামানপত্রের কথা বলেছি, যা আমার বটুয়াটির ভেতরে রয়েছে ব'লে দাবী করেছি সেগুলো ছাড়াও কিছু সামানপত্র তাতে রয়েছে। সে সব সামানপত্রের কথা এক এক ক'রে বলছি। ধৈর্য ধরে শুনুন ধর্মাবতার—বটুয়াটির ভেতরে রয়েছে পুরো একটি সেনাবাহিনীর পোশাক আশাক, এক সহস্র লড়াকু ঘোড়া, কিছু মাথাব্যথার দাওয়াই, লেড়কি প্রিয় আদমি একদল, একটা হরিণের খোয়াড়, একদল সুসজ্জিত ছোড়া, আঙুর ক্ষেত, ডুমুর ও আপেলের বাগিচা, ফুল ও ফলের গাছের বাগিচা একটা, নবদম্পতি, বেশ কিছু সংখ্যক ভীরু আদমি, একদল কর্মরত আদমিসহ বিশাল একটি শস্যক্ষেত্র। হামাম থেকে বেরিয়ে আসা খুসবুযুক্ত বাতাস, দুর্গন্ধময় বাতকর্ম, বেশ কিছু সংখ্যক নিশান, বিশজন সুগায়িকা, বিশটা নাচনেওয়ালী, একটা বড়সড় মসজিদ, কতগুলি হামাম, এক শ' বণিক, পঞ্চাশটা ভাঁড়ার, বংশীবাদক নিগ্রো একটা আর দামিয়েটো, গাজা ও শাবন নগর তিনটা আর পুরো কুফা নগরটা, ইস্পাহানের মাঝামাঝি অংশের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড, সুলেমান-এর সুমুফীজ আমুশিরবান প্রাসাদের কক্ষ প্রভৃতি।

জাঁহাপনা, সামানপত্রের ফিরিস্তি দিয়ে আমি বল্‌লাম—'খোদাতাল্লা কাজী সাহাবকে দীর্ঘজীবী করুন। এইমাত্র যেসব সামানপত্রের বাৎ আমি বল্‌লাম তা ছাড়া আমার এ-বটুয়াটির ভেতরে দাড়ি কামাবার ক্ষুর, একটি শবাধার এবং শবাচ্ছাদনের বস্ত্রও বটুয়াটির মধ্যে রয়েছে। আমি ফিন বলছি ধর্মাবতার, বটুয়াটি আমার, একদম আমার নিজস্ব।'

আমার বাৎ শেষ হলে কাজী একবার আমার মুখের দিকে পরমুহূর্তে নচ্ছার নিগ্রোটির দিকে তাকালেন। এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে উঠলেন—'ইয়া আল্লাহ! তোমরা উভয়েই মিথ্যাবাদী শয়তান। আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এখানে মস্করা করতে এসেছ। আর তা যদি না হয় তবে এ-বটুয়াটি কোন এক অলৌকিক সামগ্রী।

জাঁহাপনা, হতচ্ছাড়া নিগ্রোটি এবং আমি—উভয়েই নীরব চাহনি মেলে কাজীর দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম।

কাজী এবার হাত বাড়িয়ে বটুয়াটি তুলে নিলেন। তার মুখ খুল্‌লেন, তার ভেতর থেকে কতগুলো জলপাইয়ের বিচি আর কমলা রঙ বিশিষ্ট একটি বড়ি বের ক'রে আনলেন।

ব্যাপার দেখে কাজী তো একদম ঘাবড়ে গেলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে ব'লে ফেল্‌লাম—'ধর্মাবতার, এ-বটুয়া আমার

নয়। নির্ঘাৎ এ-নিগ্রোরই বটুয়া। আপনি একেই বটুয়াটি দিয়ে দিন। এর ওপর আমার কোন দাবী নেই। আমি এর মালিকানার দাবী তুলে নিচ্ছি।' কথা বলতে বলতে আমি কাজীর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

আলী-র কিস্‌সাটি শুনে খলিফা হারুণ অল রসিদ তো হেসে লুটোপুটি খাওয়ার জোগাড়।

খুশী হয়ে খলিফা আলীকে হরেক কিসিমের ইনাম দিয়ে বিদায় দিলেন।

কিস্‌সা শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এর চেয়েও বহুৎ মজাদার কিস্‌সা আমার জানা আছে। আপনার হুকুম হলে আমি এবার খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মহব্বতের কিস্‌সা শুরু করতে পারি।

বাদশাহ শারিয়ার অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, এখন রাত্রি অনেকই আছে। তুমি কিস্‌সা শুরু কর।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মহব্বতের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, খলিফা হারুণ-অল-রসিদ এক রাত্রে তাঁর দুই খুবসুরৎ যুবতী মেহবুবাকে দুইপাশে শুইয়ে সুখে রাত্রি গুজরান করছেন। যুবতীদের একটি কুফার আর অন্যটি মদিনার লেড়কি। উভয় জনানাকেই খলিফা খুবই পিয়ার করতেন।

দুই জনানাকে নিয়ে খলিফা তো সে-রাত্রে শুলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল তিনি কাকে সম্ভোগ করবেন। কারণ এক সঙ্গে দু'জনকে তো আর খুশী করা সম্ভব নয়। একজনকে খুশী করার কোশিস করলে অন্যজনের মুখ ভার হবে, এতে তাজ্জব হওয়ার কিছু নেই।

বহু চিন্তা ভাবনা ক'রে খলিফা মনস্থির করলেন, যে-লেড়কি তাঁকে খুশী করতে পারবে তিনি তাকেই সে-রাত্রিটি পুরস্কার দেবেন।

খলিফার অভিমত জানতে পেরে মদিনার লেড়কিটি খলিফার হাত টিপতে শুরু করে দিল।

এদিকে কুফার লেড়কিটিও চুপ করে বসে রইল না। সে খলিফার পা টেপার কাজে মেতে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সে-ই বেশী সুযোগ লাভ করল।

কুফার লেড়কিটি খলিফার পায়ের পাতা টিপতে টিপতে হাত হাঁটু পর্যন্ত তুলে আনল। তারপর? হাত দুটো ক্রমেই ওপরের দিকে তুলতে লাগল, ওপরে—আরও ওপরে তুলতে তুলতে হাতদুটোকে একেবারে নিষিদ্ধ অঞ্চলে চালান দিয়ে দিল।

জব্বর কৌশল, এ-কৌশলকে কাজে লাগিয়েই সে মদিনার

লেড়কিটিকে টেক্কা দিয়ে দিল।

কুফার লেড়কিটি খলিফার কলিজায় আগুন জ্বেলে দেয়, আর খুনে জাগিয়ে তোলে মাতন। সে যেন আশমানের চাঁদকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল।

কুফার লেড়কিটির সাফল্য দেখে মদিনার লেড়কিটি চমকে উঠে বলে—'এ কী তাজ্জব কাণ্ড করলে তুমি। তুমিই যে বাজী মাৎ ক'রে দিলে!'

কথা বলতে বলতে মদিনার লেড়কিটি কুফার লেড়কিটিকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে পালঙ্ক থেকে নিচে নামিয়ে দেয়।

কুফার লেড়কি ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে যায়। সে মর্মাহত হয়ে বলে কাজটি কিন্তু ঠিক করলে না। এরকম জবরদস্তি ক'রে তুমি গলতিই করেছ। আমার প্রাপ্য ধন তুমি ছিনিয়ে নিলে, মুখের গ্রাস জবরদখল করার কোশিস করছ!

এবার কুফার লেড়কিটি মদিনার লেড়কিটির ওপর সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল! ব্যস, শুরু হয়ে গেল রীতিমত ধস্তাধস্তি।

কেউ-ই কমতি নয়। একবার মদিনার লেড়কিটি কুফার লেড়কির বুকের ওপরে চেপে সমানে কিল-চড় মারতে থাকে। পর মুহূর্তেই কুফার লেড়কিটি এক ঝটকায় মদিনার লেড়কির ওপরে উঠে যায়।

মদিনার লেড়কিটি তলে পড়ে সমানে তর্জন গর্জন করতে

থাকে—আমার জিনিস আমি কিছুতেই ছাড়তে নারাজ। তুমি আরম্ভ করতে পার বটে, কিন্তু আমি একেবারে নিকেষ করে ছাড়ব, বলে দিচ্ছি।

এদিকে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ নীরবে তাদের ধস্তাধস্তি ও বাক্‌যুদ্ধ দেখছিলেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে রীতিমত উপভোগ্যই হয়ে উঠেছিল। এবার তিনি মনস্থির করলেন, তাদের উভয়কেই তিনি খুশী করবেন। কারো সাধ অপূর্ণ রাখবেন না।

কিস্‌সাটি শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে এর চেয়ে চমকপদ ও অপেক্ষাকৃত বড় একটি কিস্‌সা শোনাব।

নওজোয়ান ও মাঝ বয়সী মরদের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে দুই জনানার মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছিল। একদম তুমুল ঝগড়া।

তাদের ঝগড়ার বিষয়—মহব্বতের ব্যাপারে নওজোয়ান, নাকি মাঝ-বয়সী মরদ বেশী আকর্ষণীয়।

আবু অল-আইনা এক সময় কিস্‌সাটি বলেছিল—'এক গোধূলি বেলায় আমি গুটি গুটি ছাদের ওপর উঠে গিয়েছিলাম। একটু মুক্ত বাতাস খাওয়াই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমি অন্যমনস্ক ভাবে ছাদের ওপর পায়চারি করতে করতে হঠাৎ শুনতে পেলাম পাশের বাড়ির ছাদের দিক থেকে দুই জনানার কণ্ঠের ঝগড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। তাদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই চড়তে লাগল।

জনানা দুটো আমার মহল্লারই, দুই প্রতিবেশীর বিবি। তাদের স্বামী থাকা সত্ত্বেও উভয়েরই একজন ক'রে মেহবুব রয়েছে। এরকম হওয়ার পিছনে যুক্তি এই যে, তাদের যৌবন এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু তাদের স্বামী রত্ন দুটিই বুড়ো হয়ে পড়েছে। কর্মক্ষমতা বলতে যা বুঝায় তা তিলমাত্রও তাদের আর অবশিষ্ট নেই।

জনানা দুটোর মধ্যে একজনের মেহবুব নওজোয়ান। একদম তরতাজা। আর অন্যজনের মেহবুবটি মাঝ-বয়সি মরদ। তবে শক্ত-সামর্থ্য। কামকাজের ক্ষমতা, এখনও পুরোমাত্রায় রয়েছে। তারা এমন তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা জুড়ে দিয়েছে যে, কেউ তাদের বাৎচিৎ শুনছে কিনা সে হুঁসও হারিয়ে ফেলেছে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সাতাত্তরতম রজনী

রাত্রি একটু গভীর হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু

করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আবু অল-আইনা এবার বল্‌ল—কোন্দলরতা জনানা দুটোর মধ্যে একজন চিল্লিয়ে বলতে লাগল, আচ্ছা বহিনজী, তোমার মেহবুবের মুখে তো ইয়া বড় বড় দাড়ি, মুখ একেবারে ভরতি। এরকম বিশ্রী একটি ব্যাপারকে তুমি কি ক'রে বরদাস্ত কর, বল তো? এমন কোন মরদকে চোখের সামনে দেখলে কারো দিলে মহব্বতের জোয়ার বইতে পারে? ইয়া আল্লা, বিদঘুটে চেহারার আদমিটির গোঁফের চুল যখন তোমার ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়, তখন? আর সে তোমাকে আদর-সোহাগ করতে করতে হঠাৎ যখন তোমাকে চুম্বন ক'রে বসে তখন তোমার গাল দুটোতে চিড় ধরে না? তাজ্জব ব্যাপার বহিনজী। কি করে যে তুমি এসব বে-আদবি বরদাস্ত কর। ভেবে পাই না।'

ভাল চাও তো এখনও সময় আছে, আমার বাৎ শোন—তোমার মেহবুবটিকে পাল্টাও। আমার মেহবুব কেমন খুবসুরৎ নওজোয়ান দেখছ না? গায়ে তাগদও খুব। তুমিও এমনই একটি লেড়কাকে পাকড়াও কর। তার রক্তাভ তুলতুলে গালে চুমু খেলে খুশীতে দিল্ ভরে যাবে। তার নরম নরম ঠোঁট দুটোকে মুখে পুরে নিয়ে রাতভর চুষলেও সাধ মিটবে না। তোমার মেহবুবের তোবড়ানো গাল দেখবে তখন আর মোটেই রুচবে না। আরও হরেক কিসিমের মনলোভা বস্তু তার মধ্যে খুঁজে পাবে যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সে মহব্বতের সুখ কি ছোবড়ার মত দাড়ি মুখো আদমিটি তোমাকে দিতে পারবে? অবশ্যই না।'

দ্বিতীয় জনানাটি এবার কলকল ক'রে উঠল—'তোমার মত বোকা-হাঁদী দ্বিতীয়টি আর নেই। তোমার দিমাকে বুদ্ধি-বিবেচনার লেশমাত্রও নেই। আর রুচি কি জিনিস তা তো জানই না। একটি গাছ কখন চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে? যখন সে শাখা-প্রশাখা আর পাতায় ভরে ওঠে তখনই তাকে মনলোভা বোধ হয়। শসার স্বাদ কখন বাড়ে? যখন তার খোসা দড় হয়। দাড়িহীন টেকো আদমির চেয়ে কদাকার আদমি আর কেউ হতে পারে না। দাড়ি-গোঁফ তো মরদদের শোভা বৃদ্ধি করে যেমন জনানার শোভা বৃদ্ধি করে কোমর ছাড়িয়ে নেমে আসা চুলের গোছা। এত কিছু শোনার পরও তুমি কি বলবে, দাড়ি বা গোঁফের রেখা দেখা দেয় নি এমন কোন কচি কাচাকে আমার মরদ হিসাবে পাকড়াও করতে? তুমি এমন কিছু বাৎলাচ্ছ, কচি এক লেড়কার বুকের তলায় শুতে না শুতেই আমার কামজ্বালায় পানি ঢেলে দিতে? ধ্যুৎ, তাদের আবার হিম্মৎ আছে নাকি? ওপরে উঠতে না উঠতে নামার জন্য ছটফটানি শুরু করে দেয়। ব্যস, খেল্ খতম। বিলকুল এলিয়ে পড়ে। আমার বাৎ শোন, নিজেকে বঞ্চিত কোরো না। তোমার মেহবুবকে ছেড়ে অন্য কাউকে ধরা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তার মত তাগদ আর

দম কচিকাচারা পাবে কোত্থেকে? একবার ওপরে উঠলে আর তাকে নামায় সাধ্য কার? আর কলা কৌশল? আলাদা, একদমই আলাদা। তার আলিঙ্গন, তার চুম্বন, তার সম্ভোগ-কৌশল, সবই যেন বেহেস্ত থেকে কুড়িয়ে আনা। আর আরাম? ওরে ব্বাস, কলিজা বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে যায়! দিল্ চনমনিয়ে ওঠে!'

এসব বাৎ শুনে তো নওজোয়ানের মেহবুবটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবার জোগাড়। সে চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'তাই বুঝি? আমি স্বীকার করছি, আজ তোমার কাছ থেকে এক নতুন শিক্ষা লাভ করলাম।'

শসা ও শাহজাদার কিস্‌সা

নওজোয়ান ও মাঝ-বয়সী মেহবুব-এর কিস্‌সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ এবার 'শসা ও শাহজাদা' নামে আর একটি কিস্‌সা শুরু করেলেন—'জাঁহাপনা মুইন ইবন জাইদ নামে এক আমীর ছিল। একদিন সে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে শিকারে বেরল।

নিজের মাকান ছেড়ে বহুৎ পথ পাড়ি দিয়ে সে মরুপ্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এমন সময় দেখতে পেল গাধার পিঠে চড়ে এক আরব তার দিকেই আসছে।

আরবটি তার কাছাকাছি আসতেই মইন বল্‌ল—'সালাম আরব ভাইয়া, তারপর কোথায় চলেছেন এমন ব্যস্ত হয়ে? আপনার দেখছি, কি যেন একটি সামান কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন। কি? ওটি কি, বলুন তো?'

—'আমার জমিনে আচ্ছা শসা ফলেছে। আমীরের কাছে চলেছি। তাকে কিছু শসা দিয়ে আসব ভেবেছি।'

—'তাই বুঝি?'

—'জী হুজুর। জমিনের প্রথম ফসল আমির মুইনকে নিবেদন করে তবে নিজে ও পরিবারের সবাই মুখে তুলব।'

আরবটি এর আগে কোনদিন নিজের চোখে আমীর মুইনকে দেখেনি। ফলে তাকে চিনতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। সে এবার বল্‌ল —'তামাম সুলতানিয়তে তাঁর মত মহানুভব আদমি আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই আমার বিশ্বাস, তাঁকে শসাগুলি ভেট দিলে খুশী হয়ে প্রচুর দিনার বকশিস দেবেন।'

—'তাই বুঝি? তুমি এর বিনিময়ে কত দাম পাবে ভাবছ?'

—'তোবা-তোবা! দাম বলছেন কি সাহাব, ইনাম-বকশিস বলুন।'

—'তা-ই হবে। কত ইনাম আশা করছ, বল তো?'

—'অন্তত হাজার সোনার দিনার তো বটেই।'

—'এক হাজার কিন্তু খুবই বেশী হয়ে যাচ্ছে।'

—'তা-ই যদি বলেন, আমি তখন বলব, অন্তত পাঁচশ তো দিন।'

—'বহুৎ আচ্ছা বাৎ। কিন্তু তিনি যদি পাঁচশ দিনারও বেশী বলে মনে করেন, তখন?'

—'কই বাৎ নেহি, তিনশ তো দেবেন?'

—'এটিকেও যদি বেশী ভাবেন, তবে?'

—'তবে একশ দিনার —'

—'যদি এর দাম একশ' দিনারও বেশী ভাবেন, তখন?'

—'বহুৎ আচ্ছা— পঞ্চাশ দিনার প্রার্থনা করব।'

—'এতেও যদি বলে এর দাম পঞ্চাশ দিনার হলে বেশীই হয়ে যাবে ।'

—'ব্যস, আমি ত্রিশ দিনার চেয়ে নেব।'

—'ত্রিশ দিনারের বাৎ শুনেও তিনি যদি বলেন দামটি আমার ঠিক পছন্দ্ হচ্ছে না, তখন কি করবে?'

আরবটি এবার চোখে-মুখে এমন এক ভাব ফুটিয়ে তুল্‌ল যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে আচমকা বলে উঠল, ত্রিশ দিনারেও যদি তিনি আপত্তি তোলেন তবে আমি আমার গাধাটিকে সোজা তার হারেমে চালান দিয়ে দেব।

আরবটির বাৎ শুনে আমীর মুইন তো হেসে গড়াগড়ি যাবার জোগাড়। সে কী হাসি। বিলকুল হো হো রবে হাসি জুড়ল।

আমীর মুইন-এর আর শিকারে যাওয়া হ'ল না। অতর্কিতে

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিজের প্রাসাদের দিকে যাত্রা করল।

সে প্রাসাদে ফিরেই দেওয়ানকে তলব করল। আমীর-মুইন এর তলব পেয়ে বুড়ো দেওয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে হুকুমের অপেক্ষায় সামনে দাঁড়াল।

মুইন বল্‌ল—'দেওয়ানজী, একটু বাদে এক বুড়ো আরব গাধার পিঠে চেপে প্রাসাদের দরওয়াজায় হাজির হবে। তার গাধার পিছনে পোটলা বাঁধা কিছু শসা দেখতে পাবে। সে আদমি এলেই তাকে সোজা প্রাসাদে নিয়ে আসবে। তোয়াজ টোয়াজ করে আমার কাছে হাজির করবে।'

বুড়ো দেওয়ান 'জী হুজুর' বলে সালাম জানিয়ে বিদায় নিল।

একটু বাদেই সে আরবটি গাধা নিয়ে সদর-দরওয়াজার সামনে দাঁড়াল।

দেওয়ান আরবটিকে সদর-দরওয়াজায় দেখতে পেয়েই ব্যস্ত পায়ে ছুটে গিয়ে তাকে মাত্রাতিরিক্ত আদর আপ্যায়নসহ মুইন সাহাবের সামনে হাজির করল।

দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে আমীর মুইন তার আসনে বসে। তার গায়ে সে-শিকারের পোশাক আশাকও নেই। চকমকে পোশাক ও বহুৎ কিসিমের চাকচিক্যের মধ্যে সে মুইনকে একদম চিনতে পারল না। এ-ই যে সেই আদমি তা চেনাও সম্ভব নয়।

আমীর ইবন গম্ভীর মুখে আরবটিকে জিজ্ঞাসা করল—' কি হে, বস্তাটিতে আমার জন্য কি ভেট নিয়ে এসেছ?'

আগন্তুক আরবটি উত্তর দিল—'জী হুজুর, আমার জমিনের প্রথম ফসল কিছু শসা নিয়ে এসেছি।' কথা বলতে বলতে বস্তাটির মুখ খুল্‌ল।

—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! তুমি এর বিনিময়ে আমার কাছ থেকে ইনাম প্রত্যাশা করছ?'

—'এক হাজার সোনার দিনার।'

—'এ-ক হা-জা-র? এ বেশীই আশা করছ আরব ভাইয়া।'

—'তবে না হয় পাঁচশ দিনারই মঞ্জুর করুন।'

—'না, তা-ও বেশী হচ্ছে।'

—'তবে বরং এক কাজ করুন, একশ' দিনার দিয়ে দিন।'

—'না হে, একশ' দিনার হলেও বেশীই হয়।'

—'তবে পঞ্চাশ দিনার?'

—'তবু বেশী হচ্ছে।'

—'আর কিছু না হোক ত্রিশটি দিনার তো মঞ্জুর করবেন?'

—'না হে, ত্রিশ দিনারও বেশীই হচ্ছে।'

আগন্তুক আরবটি এবার চিল্লিয়ে উঠল —'হুজুর ,মাথার উপরে আল্লাতাল্লা রয়েছে। আদতে আমার নসীবই খারাপ দেখছি। মরুপথে ইয়া দশাসই এক আদমির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তখনই মালুম হয়েছিল, আমার কপালে আগ লাগল। কিন্তু হুজুর, ত্রিশ দিনারের কম দামে আমি কিছুতেই এতগুলো শসা ছাড়তে পারব না।'

আরবটির বাৎ শুনে আমীর মুখে কিছুই বল্‌ল না। কেবল নীরবে ঠোঁট টিপে টিপে হাসল। আরবটি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আমীর মুইন-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর আপন মনে বলে উঠল —'ইয়া আল্লা! কী তাজ্জব ব্যাপার। এ আদমিটিকেই তো আমি মরুপথে দেখেছিলাম, মালুম হচ্ছে।' আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে লক্ষ্য ক'রে নিঃসন্দেহ হ'ল।

আমীর মুইন এতক্ষণ নিজেকে কোন রকমে সামলে সুমলে রেখেছিল। আর সম্ভব হ'ল না। আচমকা সরবে হেসে একদম লুটোপুটি খেতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে নায়েবকে বল্‌ল—'এ-আরবটিকে তহবিল থেকে এক হাজার সোনার দিনার ইনাম স্বরূপ দিয়ে দাও।'

আমীর মুইন-এর হুকুম তামিল করার জন্য সবে দরওয়াজার চৌকাঠ ডিঙিয়েছে অমনি মুইন তাকে ডেকে বল্‌ল —'এক কাম করবে, সবার আগে এক হাজার সোনার দিনার দেবে। তারপর দেবে পাঁচশ',তারপর তিনশ' দেবে, তারপর দেবে একশ', তারপর পঞ্চাশ আর সবশেষে দেবে ত্রিশ দিনার।'

—'জী হুজুর। আপনার হুকুম মতই—'

—'আর আগন্তুক আরবটিকে বুঝিয়ে দেবে, আমি এক হাজার নয়শ' আশি দিনার তাকে ইনামস্বরূপ দিচ্ছি। সে যেন কিছুতেই না ভাবে, দিনারগুলো আমি তাকে শসার দাম হিসাবে দিচ্ছি।'

—'জী হুজুর আপনার হুকুম মতই—'

—'আর এক কাম করবে, তাকে গোসল করিয়ে, আচ্ছা করে খানাপিনা করিয়ে তবে বিদায় দেবে। ইয়াদ রাখবে, এক আরব আমাকে বেকুব বানিয়ে আধ বস্তা শসার বিনিময়ে যে এতগুলো সোনার দিনার নিয়ে যাচ্ছেনা এটা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে কিন্তু। সে যেন বোঝে আমীরের মহানুভবতার জন্যই সে এতগুলো দিনার পেয়েছে।'

কিস্‌সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। বাদশাহ শারিয়ার অত্যুগ্র আগ্রহে এবং ছোট বহিন দুনিয়াজাদ-এর অনুরোধে তিনি আর একটি কিস্‌সা শুরু করলেন—

শাদী ও তালাকের কিস্‌সা

বৃদ্ধ উজির জাফর এক সন্ধ্যায় খলিফা হারুণ-অল-রসিদ'কে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। তার বহুৎ দিনের বাসনা আজ পূর্ণ হয়েছে।

খলিফাকে তৃপ্ত করার জন্য উজির জাফর তার বাবুর্চিকে দিয়ে হরেক কিসিমের খানার বন্দোবস্ত করালেন।

যথা সময়ে খলিফা উজির-এর মাকান-এর সদর দরওয়াজায় ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন। জাফর হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে খলিফাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

খলিফা টেবিলে বসে খানাপিনা সারছেন এমন সময় এক বাঁদীর দিকে তাঁর চোখ পড়ল।

খানা সমেত হাতটিকে নামিয়ে এনে খলিফা বল্লেন—'কি হে জাফর, তোমার মাকানে খুবসুরৎ এক বাঁদী রেখেছ দেখছি!' তো উজির জাফর হাত কচলে নিবেদন করলেন—'জাঁহাপনা, সবই

তো আপনারই মেহেরবানির ফলে সম্ভব হয়েছে।'

—'শোন জাফর, আমি বাঁদীটিকে তোমার কাছ থেকে খরিদ ক'রে আমার প্রাসাদে নিয়ে যাব।'

—'কিন্তু জাঁহাপনা একে বেচার আমার মন নাই।'

—'যদি না-ই বেচ তবে এমনিতেই দিয়ে দাও।'

—'জাঁহাপনা, আমি একে বিক্রিও করব না আবার এমনিতেও দিতে রাজী নই।'

উজির জাফর-এর বাৎ শুনে খলিফা এবার রাগান্বিত হলেন। শোন জাফর, আমি খোদাতাল্লা-র নামে তিন কসম খেয়ে বলছি, আমার ইচ্ছা যদি তুমি পূরণ না কর, উচিত দাম নিয়ে বিক্রি না কর বা এমনিতে বাঁদীটিকে আমার হাতে তুলে না দাও তবে আমি আজই আমার প্রধানা বেগমকে তালাক দিয়ে দেব, শুনে রাখ।'

—'জাঁহাপনা, কসম আমিও খেতে জানি। আমি তিন তিনবার কসম খেয়ে বলছি, আপনার হুকুম যদি আমাকে তামিল করতেই হয় তবে আমার বিবিকে আমি তালাক দেব।' গলা চড়িয়েই উজির বলে উঠলেন।

আদতে সরাবের নেশা উভয়কেই পেয়ে বসেছে। নেশার ঝোঁকে তারা এরকম কঠিন কসম খেয়ে বসেছে। কিন্তু একটু বাদেই যখন নেশার ঝোঁক একটু কমে এল তখন উভয়েই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তখন ভাবলেন, কাজটি মোটেই সঙ্গত হয় নি।

এবার সমস্যা দেখা দিল কিভাবে এ কঠিন সমস্যার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। উভয়েই গালে হাত দিয়ে বসে ফিকির খুঁজতে লাগলেন।

দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা ভাবনা করে খলিফার মাথায় বহুৎ আচ্ছা একটি মতলব এল।

খলিফার মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। তিনি বল্লেন—'জাফর এক কাজ করা যাক। চল আমরা কাজী ইউসুফ-এর কাছে যাই, তাকে বলি সমস্যাটির একটি সমাধান বের করে দিতে। তিনি প্রধান আইনজ্ঞও। চিন্তা ভাবনা করে তিনি অবশ্যই একটি আচ্ছা ফন্দি ফিকির বাৎলে দিতে পারবেন। পারবেন আমাদের মুশকিল আশান করে দিতে। জাফর আশান্বিত হয়ে বল্ল—'জাঁহাপনা, মতলবটি মন্দ বের করেন নি বটে।'

খলিফার নির্দেশে এক দূত ছুটল কাজীকে তলব করতে। কাজী তখন গভীর নিদে আচ্ছন্ন। দরওয়াজার কড়া নাড়ার শব্দে কাজী হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। দূতের মুখে খলিফার তলবের সমাচার শুনলেন।

এত রাত্রে খলিফার প্রাসাদে তার ডাক পড়েছে শুনেই তাঁর মুখ চূণ হয়ে গেল। ভাবলেন, ব্যাপার নির্ঘাৎ বে-গতিক। নিশ্চয়ই এমন কোন কারণ ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে যাতে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রধান কাজী ব্যাপারটিতে খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। একটি বাক্স কামরা থেকে বের করে এনে দূতের হাতে দিয়ে বল্লেন—'তুমি এটিকে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে খলিফার প্রাসাদের দিকে রওনা হয়ে যাও। আমি এক্ষুণি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ছি।'

কাজী ইউসুফ খলিফার প্রাসাদে হাজির হলেন।

খলিফা এবং জাফর এতক্ষণ তাঁরই অপেক্ষায় অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন। কাজীকে প্রাসাদের দরবার কক্ষের দিকে অগ্রসর হতে দেখেই খলিফা ও জাফর উভয়েই ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে

গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

খলিফা তামাম সুলতানিয়তে একমাত্র ধর্মাবতার কাজীকেই সম্মান প্রদর্শন ক'রে থাকেন। তাই এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করে দরবারে নিয়ে এসে আসন দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন।

খলিফা বল্লেন—'কাজী সাহাব, কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, নিতান্ত উপায়ান্তর না দেখে আপনাকে এতরাত্রে বিরক্ত করতেই হ'ল।'

—'হ্যাঁ, সমস্যা যে কঠিন তা আমারও মালুম হয়েছে। এখন বলুন তো শুনি উদ্ভুত সমস্যাটি কি?'

খলিফা এবার কাজীর কাছে উজির জাফর-এর সঙ্গে তাঁর বিবাদের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

কাজী সবকিছু শুনে বল্লেন—'জাঁহাপনা, ব্যাপারটি তো খুবই সাধারণ। কোন সমস্যাই আছে বলে আমি মনে করি না।'

—'সাধারণ? কোন সমস্যাই নেই।' খলিফা বল্লেন।

—'না, কোন সমস্যা তো নেই-ই, বরং পানির মাফিক সহজ-সরল।'

—'কাজী সাহেব আপনি বলছেন, ব্যাপারটি কিছুমাত্রও জটিল নয়?'

—'না। আমি এর মধ্যে কোন জটিলতাই দেখছি না।'

—'আমাদের উদ্ভুত সমস্যার সমাধান আপনি কিভাবে করতে চাইছেন?'

—'জাঁহাপনা, শুনুন তবে বলছি—

—'খলিফা ও উজির জাফর অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—'বলুন, আমরা উভয়েই আপনার বিচারের রায় শোনার জন্য উদ্বিগ্ন।'

কাজী এবার উজির জাফর-এর দিকে ফিরে বল্লেন—'শুনুন, খলিফা দু' ভাবে খুবসুরৎ এ-বাঁদীটিকে আপনার কাছ থেকে পেতে আগ্রহী। তিনি একবার বলছেন বাঁদীটিকে খরিদ ক'রে নেবেন ফিন পরমুহূর্তেই বল্ছেন, বিনামূল্যে—অর্থাৎ দান করতে, ঠিক কি না?'

উজির জাফর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'ঠিক, বিলকুল ঠিক!'

—'তা-ই যদি হয় তবে আপনি ধর্মাবতারের কাছে বাঁদীটির অর্ধেকটা বেচে দেবেন আর অবশিষ্ট অর্ধেক দান করবেন।'

কাজীর বিচারের রায় শুনে খলিফা তো রীতিমত উল্লসিত হয়ে পড়লেন। খুশীতে একদম ডগমগ। এর ফলে তিনি বিরাট একটি সমস্যা থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। সে সঙ্গে উপরি মুনাফা স্বরূপ খুবসুরৎ বাঁদীটিকে পাওয়ার পথও সাফ হয়ে গেল।

কাজী আঁড়চোখে একটিবার খলিফার মানসিক অবস্থাটি সম্বন্ধে সামান্য আঁচ করে নিলেন।

খলিফা বল্লেন—'কাজী সাহাব, এ ব্যাপারে আইনের যা কিছু নির্দেশ ঝটপট সেরে ফেলুন। আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে পারছি নে। বাঁদীটিকে যাতে আমি চিরদিনের মত লাভ করতে পারি তার বন্দোবস্ত ক'রে দিন। আমি যাতে তাকে নিয়ে শীঘ্র প্রাসাদে ফিরতে পারি সে ব্যবস্থা করুন।'

কাজী খলিফার কথার কোন জবাব দিলেন না। উজির জাফরকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—'বাঁদীটিকে আমার সামনে হাজির করুন।'

জাফর-এর নির্দেশে বাঁদীটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে কাজীর সামনে হাজির হ'ল। সে-তো এসবের কিছুই জানে না। ফলে কাজীর সামনে হাজির করার ফলে দুরু দুরু বুকে উপস্থিত সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

কাজী এবার যেকোন ক্রীতদাসকে তলব করতে বল্লেন। জাফর-এর নির্দেশে এক নিগ্রো ক্রীতদাস ছুটে এসে কুর্নিশ করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াল।

কাজী ইউসুফ এবার বল্‌লেন—'আমি এ-ক্রীতদাসটির সঙ্গে বাঁদীটির শাদী দিয়ে দেব।'

কাজীর বাৎ শুনে খলিফা ও উজির উভয়েরই মুখ শুকিয়ে গেল।

কাজী তাদের মানসিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরে বলে উঠলেন—'এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। শাদীর পর পরই ক্রীতদাসটি তার বিবিকে বয়ান তালাক দিতে পারবে। তবে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে দেন মোহর দেয়ার নিয়ম চালু রয়েছে। এক হাজার দেন মোহর দিয়ে সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে। তারপর খলিফা তাকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী রক্ষিতা ক'রে প্রাসাদে নিয়ে তুলতে পারবেন।

কাজী এবার ক্রীতদাসটিকে বল্‌লেন—'যা বলব সাফ সাফ জবাব দেবে। আগে আমার বাৎ মন দিয়ে শোন। তারপর জবাব দেবে। এর মধ্যে মিথ্যা বা ছলচাতুরীর সামান্য উল্লেখ পেলে কিন্তু কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এবার বল, তোমার দিল্ কি বাঁদীটিকে শাদী করতে চাইছে?'

ক্রীতদাসটি ঘাড় কাৎ ক'রে জানাল শাদীতে তার মত আছে।

—'তবে এ-মুহূর্তে বাঁদীটিকে শাদী ক'রে তুমি বিবি হিসাবে লাভ করলে।' কাজী এবার একটি মোহরের থলি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এতে এক হাজার সোনার মোহর রয়েছে। নাও, ধর—তোমার দেন মোহর। তোমার সদ্য শাদী করা বিবির হাতে দিনারের থলিটি দিয়ে বল—তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক, বয়ান তালাক দিলাম। এতে তোমার ক্ষতিপূরণের দেন মোহর রয়েছে।'

ক্রীতদাসটি চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বল্‌ল—'সে কী কাজী সাহাব! এ কেমন বাৎ হ'ল! সবে তো আপনি এ-বাঁদীটির সঙ্গে আমার শাদী দিলেন। এখন তো এ আমার আইন মাফিক বিবি বনে গেছে। তবে কেন ঝুটমুট তালাক দিতে যাব কিছুই দিমাকে আসছে না!'

—'এ কী বাৎ শোনাচ্ছ হে!'

—'ঠিক বাৎ-ই বলছি কাজী সাহাব। আমার শাদী করা বিবিকে আমি ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। আমি বিবিকে নিয়ে নিজের মাকানে ফিরে যাব। ঘর-সংসার পাতব। সুখে ঘর করব।'

ক্রীতদাসটির সাহস ও অবাধ্যতায় খলিফা তো রেগে একদম ফেটে পড়ার জোগাড় হলেন। পারলে সে-মুহূর্তেই তার গর্দান নেন। রাগে-অপমানে কাঁপতে কাঁপতে তিনি কাজীকে বল্‌লেন—'দেখলেন ক্রীতদাসটির ঔদ্ধত্য?'

কাজী ধৈর্য হারালেন না। তিনি খলিফাকে বল্‌লেন—'ধৈর্য ধরুন। দিমাক গরম করলে বিলকুল ব্যাপারটি ভেস্তে যাবে। আমি সব সমস্যার সমাধান করার ফিকির বের করছি। ক্রীতদাসটি আমার প্রস্তাব মানতে অস্বীকার ক'রে কিছুমাত্রও কসুর করে নি।'

খলিফা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে কাজীর দিকে অপলক চোখে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

কাজী ইউসুফ ব'লে চল্‌লেন—'হ্যাঁ, কোন কসুরই সে করে নি। কারণ, বাঁদীটি তো তার শাদী করা বিবি। সে তালাক দিতে গররাজি হলে কিছুই করার নেই।'

—'তবে এর প্রতিকার?'

—'হ্যাঁ, ইসলাম ধর্মে এর প্রতিকারের বিধানও রয়েছে। আপনি ধৈর্য ধরুন, আমি সব বন্দোবস্ত করছি। আপনাকে এখন একটি মাত্র কাজ করতে হবে।'

—'বলুন, কি করতে হবে আমাকে?'

—'কিছুক্ষণের জন্য ক্রীতদাসটিকে আমাকে দান করে দিতে হবে। ব্যস, আমি তবেই মুহূর্তে বিলকুল সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলতে পারব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আমি তবে একে আপনার হাতে তুলে দিলাম।'

কাজী এবার বাঁদীটিকে উদ্দেশ্য ক'রে বল্‌লেন—'শোন, আমি এ-ক্রীতদাসটিকে তোমাকে দান করতে চাইছি, রাজী আছ?'

বাঁদীটি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল—'জী হুজুর, আমি রাজী।'

কাজী এবার লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে বল্‌লেন—'ব্যস, কাজ হাসিল! আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ। এতেই তোমাদের শাদী বাতিল হয়ে গেল।'

—'তবে? ব্যাপার কি হ'ল? এর ফয়সালা কি হ'ল হুজুর?'

—'এবার থেকে তুমি আর এর শাদী করা বিবি রইলে না। সে তোমার নফর বনে গেল। ইসলামে এরকমই বিধান দেয়া আছে।'

কাজী ইউসুফ এবার খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর দিকে ফিরে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমার বিচার সেরে ফেলেছি। এবার আপনি অনায়াসে বাঁদীটিকে রক্ষিতা করে প্রাসাদে নিয়ে যেতে পারেন।'

কাজীর উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচারের বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! আপনার মত বিচক্ষণ বিচারক কেবলমাত্র আমার সুলতানিয়াতেই নয়, তামাম দুনিয়ায় আর একটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

খলিফা থলিভর্তি সোনার দিনার দিয়ে কাজী ইউসুফ'কে পুরস্কৃত করলেন।

কাজী ইউসুফ ও খলিফার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে বল্‌ল—'আপনার ওপর খোদাতাল্লা-র দোয়া বর্ষিত হোক। আপনি পরমায়ু লাভ করুন। ধর্ম, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আস্থা রেখে সুখে প্রজা পালন করুন।'

কাজীর নির্দেশে এক নফর তাঁর বাক্সটি এনে সামনে রাখল। কাজী পুরস্কার স্বরূপ লব্ধ মোহরগুলো বাক্সটির মধ্যে পুরে ডালা বন্ধ ক'রে দিলেন। এবার সেটি নিয়ে তিনি গাধার পিঠে উঠলেন। ফিরে গেলেন নিজের মাকানে।

কিস্‌সা শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ছোট্ট এ-কিস্‌সাটির মাধ্যমে আইনের এক জটিল সমস্যার সমাধানের ফিকির জানতে পারা গেল।'

আবু নবাস ও জুবেদার গোসলের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, শাদী আর তালাকের কিস্‌সা তো শুনলেন। এবার আবু নবাস ও জুবেদার গোসলের কিস্‌সা বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন—খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর চাচার বেটির নাম ছিল জুবেদা। খলিফা যুবতী জুবেদা'কে বহুৎ পিয়ার করতেন। তাঁকে খুশী করার জন্য একটি মনলোভা বাগিচা গড়ে দিয়েছিলেন। বাগিচার কেন্দ্রস্থলে বানিয়ে দিয়েছিলেন সুদৃশ্য একটি ছোট্ট প্রাসাদ। তারই পাশে ছিল চমৎকার একটি ফোয়ারা। আর একটি সায়রও ছিল বাগিচাটিতে। স্বচ্ছ নীল তার পানি।

রোজ বিকালে বেগম জুবেদা সামান্যমাত্র পোশাকে লজ্জা নিবারণ ক'রে গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ান সায়রে সাঁতার কাটেন দিলভরা খুশী নিয়ে আর গোসল করেন এক অনাস্বাদিত খোশ মেজাজে।

বাগিচাটিকে প্রাচীর দিয়ে এমন ভাবে ঘেরাও করা যে, বাইরে থেকে আচমকা ভেতরে ঢুকে যাওয়া তো দূরের কথা কেউ উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখতে পর্যন্ত পায় না।

এক দুপুরের কিছু আগে বেগম জুবেদা বাগিচায় হাজির হলেন। বাইরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। তামাম দুনিয়াটি যেন জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে।

বেগম জুবেদা বাগিচায় ঢুকে সায়রটির কাছে গেলেন। ওড়না, সালোয়ার ও কামিজ যা কিছু পরনে ছিল বিলকুল খুলে ফেল্‌লেন।

বেগম এবার বিবস্ত্রা হয়ে সায়রের পানিতে নামলেন। হাঁটু সমান পানিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। আদতে আর গভীরে যেতে তার ডর লাগল। কারণ, সাঁতারে তিনি তেমন পটু নন। তাই অনন্যোপায় হয়ে কোমরের কাছাকাছি পানিতে দাঁড়িয়ে বদনা ভরে পানি নিয়ে গায়ে-মাথায় ঢালতে লাগলেন।

এদিকে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ ইতিমধ্যে অতি সন্তর্পণে গুটিগুটি এসে পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গোসলরতা বেগম জুবেদার বিবস্ত্র শরীরটিকে দেখার লোভ তিনি সম্বরণ করতে পারেন নি। তিনি ছোট্ট একটি গাছের ডাল ধরে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ও দিল্‌কে তৃপ্ত করতে ব্যস্ত। আচমকা গাছের সে-ডালটি

মড়াৎ ক'রে গেল ভেঙে। খলিফা যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখির আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' উনআশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির অবশিষ্টাংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আচমকা শব্দটি কানে যাওয়ামাত্র বেগম জুবেদা আতঙ্কিত হয়ে যন্ত্রচালিতের মাফিক ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন। ব্যস্ত-হাতে শরীরের নিম্নাঙ্গ ঢেকে আকস্মিক লজ্জা নিবারণের কোশিস করতে থাকেন। আর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিমেলে অদৃশ্য লোভাতুর চোখের খোঁজ করতে লাগেন।

কিন্তু দুটো মাত্র হাত দিয়ে নিম্নাঙ্গ ও বক্ষ—উভয়কে এক সঙ্গে তো আর চাপা দেয়া সম্ভব নয়। ফলে খলিফার চোখের সামনে সবই ধরা পড়ে যায়।

খলিফার দৃষ্টিতে লালসা মাখানো রয়েছে পুরোদস্তুর। তার পক্ষে ইতিপূর্বে কোনোদিন বেগম জুবেদার এরকম বিলকুল বিবস্ত্র শরীর দেখা সম্ভব হয় নি। আজ তাঁর সে বাঞ্ছা পূরণ হ'ল। আজই প্রথম তার বিবস্ত্র শরীর দেখে তিনি চোখ ও দিল্‌কে তৃপ্ত করতে পারলেন।

খলিফা বিস্ময় ও বিমূঢ় অবস্থায় গাছের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় আগের মতই সন্তর্পণে বাগিচা থেকে বেরিয়ে এলেন

খলিফা চোখ ও দিল্‌কে তৃপ্ত করে বাগিচা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বটে, কিন্তু তাঁর কলিজার কামজ্বালা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠল। তাঁর শান্ত দিল্ ক্রমেই আনচান করতে লাগল।

খলিফা কামজ্বালা ভুলে থাকার জন্যে গুন্‌গুন্ করে গানা গাইতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা কোশিস। অব্যক্ত যন্ত্রণা তাঁর কলিজাকে কুঁরে কুঁরে খেতে লাগল।

অশান্ত দিল্ নিয়ে তিনি নিজের কামরায় ফিরে এলেন। গুন্‌গুন্ করে গানা ধরলেন—

'সাগরের পানিতে আমি হেরিলাম যারে।'

ব্যস, এ-পর্যন্তই। আর অগ্রসর হতে পারলেন না। গানাটির পরবর্তী কলি রচনা করার জন্য তিনি প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা কোশিস। কিছুতেই পরবর্তী কলিটি বানাতে না পেরে তিনি এক নফরকে পাঠিয়ে তাঁর সভাকবি আবু নসাব'কে তলব করলেন।

খলিফার তলব পেয়ে কবিবর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

কবির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বল্‌লেন—'আবু, এ যে মহা সমস্যায় পড়া গেল দেখছি!'

আবু নসাব ভাবলেন, খলিফা কি না জানি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লেন— 'সমস্যাটি আমাকে খোলসা ক'রে বলুন। আমি কোশিস করে দেখি যদি কিছু করতে পারি।'

—'আমি একটি গানার প্রথম ছত্র রচনা করেছি। কিন্তু আর অগ্রসর হত পারছি না। আর দু'-একটি ছত্র তার সঙ্গে যোগ না করলে যে সেটি অসমাপ্ত রয়ে যায়।'

—'ছত্রটি কি, বলুন তো শুনি।'

—'সাগরের পানিতে আমি হেরিলাম যারে।'

—'জাঁহাপনা দেখুন তো, গানাটির পরবর্তী ছত্রটি এভাবে দাঁড় করালে আপনার দিল্ খুশীতে নেচে ওঠে কিনা?'

—'বল, বল আবু, কি সে ছত্রটি?'

—"সাগরের পানিতে আমি হেরিলাম যারে।
আঁকিনু ছবিটি তার হৃদয়-মাঝারে।।"

খলিফা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা আবু! আমি এতভাবে কোশিস করেও যাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি নি তুমি এক মুহূর্তে তাকে ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুল্‌লে? আমি ঠিক এরকম কথাই ভাবছিলাম।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ কবি আবু নসাব'কে ইনাম দিয়ে খুশী করলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি শেষ ক'রে চুপ করলেন।

বেগমের ছোট বহিন দুনিয়াজাদ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল—'বহিনজী, কী সুন্দর তোমার কিস্‌সা! এসব কিস্‌সা ছোট হলেও কী সুন্দর! দিলে দাগ কাটার মতই প্রতিটি ঘটনা। এবার একটি জন্তু-জানোয়ারের কিস্‌সা বল।'

আজব গাধার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ তাঁর বহিনের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে 'আজব গাধার কিস্‌সা'-টি শুরু করলেন।

এক সকালে এক রসিক আদমি একটি গাধার গলায় দড়ি পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে বাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

গাধাটি একদম নাদুসনুদুস। একটি ধূর্ত চোর গাধাটিকে দেখে লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। সে তখনই মনস্থির করে ফেল্‌ল যে-কোন ভাবেই হোক গাধাটিকে সে চুরি করবেই। কিন্তু কিভাবে সে মতলবটিকে বাস্তবায়িত করবে?

সাকরেদটি বল্‌ল—'এ আবার এমন কি কঠিন কাজ, গুরু? ভাববার মত ব্যাপরাই নয় এটি। তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাক। আর যা কিছু বিলকুল আমিই করব। দেখবে, গাধাটিকে আমি এমন এক ফন্দি ক'রে গায়েব ক'রে ফেলব যে, গাধার মালিক তো দূরের কথা তুমিও কিছুই মালুম করতে পারবে না।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিনশ' আশিতম রজনী

বাদশাহ শাহরিয়ার যথা সময়ে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির অবশিষ্টাংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—জাঁহাপনা, সে-চোর আর তার সাকরেদটি গাধাটির পিছন পিছন গুটি গুটি হাঁটতে লাগল। কারোর বাপের সাধ্যি ধরতে পারবে যে, তারা গাধাটিকে হাফিস করার কুমতলবে তার পিছু নিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে এক সময় চোরের সাকরেদটি গাধার গলা থেকে রশির ফাঁসটি খুলে ফেলে ঝট ক'রে নিজের গলায় পরে নিল। আর চোরটি গাধাটিকে নিয়ে বে-পাত্তা হয়ে গেল।

চোরের সাকরেদটি গাধার গলার রশির ফাঁসটি নিজের গলায় পরে নিয়ে এমন কায়দায় চলতে থাকল যে, গাধার মালিক ব্যাপারটির তিলমাত্রও বুঝতে পারল না। সে আগের মতই রশির প্রান্তটি ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভেবে চলেছে—গাধাটিকে কত দামে বেচলে তার মুনাফা কত হবে। আর গাধাটির কোন্ কোন্ গুণের কথা ব'লে তার প্রতি খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোশিস করবে। একে বেচে অন্য একটি গাধা সে খরিদ করবে। চোরের সাকরেদটি যতই সতর্কতার সঙ্গে গাধার মালিকের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার কোশিস করুক না কেন, বার বার রশিটিতে টান

পড়তে লাগল। ফলে গাধার মালিক পথ চলতে চলতে, পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগল— 'শয়তান গাধাটি এক্কেবারে কুড়ের বাদশা! বসে বসে খেয়ে গতরটিকে এমন বানিয়েছে যে, আর নড়তে চড়তে চায় না! ঘা কতক পিঠে দিলে তবে হতচ্ছাড়াটি পা-চালিয়ে চলে।'

কিছু সময় বাদে চোরের সাকরেদটি দেখল, চোরটি গাধাটিকে নিয়ে চোখের আড়ালে, একদম বে-পাত্তা হয়ে গেছে। তখন সে ঘাড় বাঁকিয়ে একদম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছের গুঁড়ির মাফিক একদম নিশ্চল-নিথর।

গাধাটির মালিক সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই রশিটির প্রান্ত ধরে সজোরে টানতে লাগল। আর ভাবল, এমন বে-আজব গাধা তো আমার চৌদ্দপুরুষেও দেখি নি।

রশি ধরে টানাটানি ক'রে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বহুৎ কোশিস সে করল। কিন্তু এক চুলও নড়াতে পারল না। তখন রাগে গস্‌গস্ করতে করতে আচমকা পিছন ফিরে তাকাল। ব্যস, তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার যোগাড়। এতই অবাক হয়ে পড়ে যেন মুখ দিয়ে তার রা-ও সরতে চাইছে না।

গাধাটির মালিক কোনরকমে একটু ধাতস্থ হয়ে বলল—'গা-ধা! ইয়া আল্লাহ! এ যে আদ্‌মি! এ কী তাজ্জব ব্যাপার!'

সে তার নিজের চোখ দুটোর ওপরও যেন আস্থা হারিয়ে ফেল্‌ল। অবিকল আদমির মাফিক হাত, পা, চোখ, কান মুখ—আদমি না হয়ে পারেই না। তবে? তবে কি নিদের ঘোরে সে খোয়াব দেখছে? তা-ই বা হবে কি ক'রে? সে যে রশি হাতে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে। এত বড় একটি জলজ্যান্ত ঘটনা কি আর মিথ্যা, খোয়াব হতে পারে! অন্য সব পথচারীদের মাফিক এরও তো সব কিছু রয়েছে। তবে? গাধা গেল কোথায়? গাধাটি পথ চলতে চলতে কি করে অবিকল আদমি বনে গেল?

গাধার মালিক হতভম্ভের মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে চোরের সাকরেদটিকে প্রশ্ন করল—'তুমি কি? তুমি কি আদমি?'

—'হুজুর, আমি আদমি-টাদমি নই। আপনার গাধা আমি। সে কী হুজুর আপনি আমাকে একদম চিনতে পারেন নি?'

ব্যাপার দেখে গাধার মালিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তার চোখ দুটো মুহূর্তে ছানাবড়া হয়ে গেল। অনুচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠল—'এ কী ভুতুড়ে কাণ্ড! গাধা কথা বলছে! আদমির মাফিক কথা বলছে গাধাটি!'

চোরের সাকরেদটি করজোড়ে নিবেদন করল—'হুজুর, আমি পয়দা হওয়ার সময় গাধা ছিলাম না। আমি আদমির গর্ভে, আদমির বাচ্চা হয়েই পয়দা হয়েছিলাম। আমার নসীবই আমাকে গাধা বানিয়েছে। নসীবের ফেরেই আমি গলায় রশি পরেছি।'

—'সে কী হে! এ কী তাজ্জব বাৎ শোনাচ্ছ?'

—'ঠিকই বলছি হুজুর। আমি যখন গুঁড়াবাচ্চা ছিলাম তখন বহুৎ নটখট লেড়কা ছিলাম। মহল্লার সবাই আমার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। ব্যস, বাধ্য হয়ে আমার আম্মা আমাকে অভিশাপ দিয়ে গাধা বানিয়ে দিল। সেই থেকেই আমি গাধা রয়ে গেলাম। এ আমার নসীবের ফের ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে?

আমি একদিন রশি ছিঁড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। তাতেও রেহাই পেলাম না। এক আদমি আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে দিল। তারপর আপনি এক সময় আমাকে খরিদ করে নিলেন। ব্যস, আপনার ঘরে আটক হয়ে পড়লাম। মোট বয়ে দিন গুজরান করছি। এতদিন আমার মুখে ভাষা ছিল না। ফলে আমার দুঃখ-দুর্দশা আপনাকে জানানো সম্ভব হয় নি। এখন ভাষা ফিরে পেয়েছি। আপনার কাছে আমার আজ একটি প্রার্থনা, মেহেরবানি ক'রে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খালাস পেয়ে আমার আম্মার কাছে ফিরে গেলেই সবকিছুর সুরাহা হয়ে যাবে। আমার আম্মার গোস্‌সা নির্ঘাৎ লোপ পেয়েছে। তিনি খুশী হয়ে আমাকে ফিন আদমির শরীর ফিরিয়ে দেবেন। বিলকুল আগের শরীর ফিরে পাব।'

চোরের সাকরেদটির বাৎ শুনে গাধার মালিক তো একদম মাথায় হাত দিয়ে পথের মাঝে বসে পড়ল। গলা ছেড়ে বিলাপ জুড়ে দিল—'ইয়া খোদা! একী গুনাহ করলাম আমি! আমার যে দোজখেও জায়গা হবে না! না, আর এক মুহূর্তও তোমার গলায় আমি রশি রাখতে চাই না। এখনই ছেড়ে দিচ্ছি। আজই তুমি তোমার মকানে, তোমার আম্মার কাছে ফিরে যাও বেটা। এতেই যে গুস্তাকী হয়েছে খোদাতাল্লা তা মাফ করবেন কিনা জানি না। বেটা, তোমার গলার রশি খুলে দিচ্ছি।'

গাধার মালিক এভাবে হা পিত্যেশ করতে করতে চোরের সাকরেদটির গলা থেকে রশিটি খুলে দিল। নিজের কাজের জন্য ধিক্কার দিতে দিতে ঘরে ফিরে গেল।

চোরের সাকরেদটি ছাড়া পেয়ে সোজা তার ওস্তাদের কাছে ফিরে গেল।

এ-ঘটনার কয়েকদিন বাদে গাধার মালিক বাজারে গেল অন্য একটি গাধা খরিদ করার জন্য। গাধাটি হাতছাড়া হওয়ায় তার কাম কাজ একদম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে।

গাধার মালিকটি বাজারে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে হঠাৎ একটি গাধার দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকাল। সে প্রায় চিল্লিয়ে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ যে আমার সেই গাধাটিই বটে! বেচার জন্য বাজারে হাজির করা হয়েছে। হ্যাঁ, অবিকল সে-গাধাটিই বটে!

গাধার মালিকটি সে-গাধাটির দিকে তাকিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল—'হতচ্ছাড়া নচ্ছারটি নির্ঘাৎ তার মাকে জ্বালাতন ক'রে

মেরেছে। বাধ্য হয়ে তার আম্মা তাকে ফিন গোস্‌সা করে গাধা বানিয়ে দিয়েছে। অসম্ভব। এমন শয়তানকে ফিন কিছুতেই খরিদ করে ঘরে নিয়ে যাব না।'

রাগে-দুঃখে-বিতৃষ্ণায় গাধাটিকে লক্ষ্য ক'রে বার কয়েক থুক্ ফেলে সে অন্য একটি গাধার দিকে এগিয়ে গেল। দরদস্তুর করে সেটিকে খরিদ ক'রে ঘরে ফিরল।

কিস্‌সা শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

কিছু সময় বাদে বাদশাহ শারিয়ার-এর অত্যুগ্র আগ্রহে আর একটি কিস্‌সা শুরু করার জন্য তৈরী হলেন।

জুবেদার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—জাঁহাপনা, এবার আপনাকে 'জুবেদার কিস্‌সা' শোনাচ্ছি। জুবেদা ছিলেন খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর খাস বেগম।

এক দুপুরে খলিফা আচমকা বেগম জুবেদা-র কামরায় হাজির হলেন।

খলিফা বেগমের পালঙ্কের কাছে যেতেই বিছানার চাদরের গায়ে একটি অবাঞ্ছিত দাগের দিকে তার নজরে পড়ল। টাটকা অথচ ফ্যাকাসে দাগ। সেদিকে নজর পড়তেই খলিফার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। সামান্য একটি দাগ তার মেজাজ মর্জি একদম বিগড়ে দিল।

ব্যাপারটি দেখে খলিফার শিরে যেন মুহূর্তে খুন চেপে গেল। তিনি বেশ রাগত স্বরেই ব'লে উঠলেন—'এ কি জুবেদা! ব্যাপার কি? চাদরে এ কিসের দাগ?'

জুবেদা খলিফার অঙ্গুলি নির্দেশিত দাগটির দিকে তাকিয়েই আঁৎকে উঠলেন। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অবাঞ্ছিত সে-দাগটি পরীক্ষা করতে লাগলেন। কোন সুরাহা করতে না পেরে নাকটিকে নামিয়ে নিয়ে তার গন্ধ শুঁকলেন। তারপর ফ্যাকাসে মুখ বললেন—'জাঁহাপনা, গন্ধ শুঁকে মালুম হচ্ছে, পুরুষের বীর্যের দাগ।'

খলিফা গুলিখাওয়া শেরের মত গর্জে উঠলেন—'পুরুষের বীর্য! একী আজব কারবার! আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিনা বেগম, দুপুরে তোমার বিছানায় তাজা বীর্য কি করে পড়তে পারে!'

বেগম জুবেদা অবাঞ্ছিত দাগটির দিকে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

খলিফা ব'লে চললেন—'তোমার বিছানায় তাজা বীর্যের দাগ আমাকে যারপরনাই বিচলিত করছে জুবেদা। প্রায় এক সপ্তাহ বাদে আমি তোমার কামরায় এলাম। তবে তাজা বীর্য কি করে এল?'

—'জাঁহাপনা, আপনি কি আমাকে অন্যরকম সন্দেহ করছেন? আপনিই বলুন, আপনার অবিশ্বাসের পাত্রী হওয়ার মত কাজ আমি কোনদিন করেছি, নাকি করা সম্ভব? আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার মত প্রবৃত্তি আমার কোনদিনই ছিল না, আজও নেই।'

—'কিন্তু...তবে একি ক'রে সম্ভব হ'ল?'

—'আপনি কি ভাবছেন, আমি পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলাম? আপনার চোখে ধুলো দিয়ে আমি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছি?'

—'কি জানি জুবেদা, কিছু ভাবতে পারছি না আমি!'

—'আপনি তবে আমাকে সন্দেহ করছেন?'

আমিও তা-ই ভাবছি। আমার দিমাক ঠিক কাজ করছে না। কাজী ইউসুফ'কে তলব করছি। তিনি বিচক্ষণ আদমি। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বিচারক হিসাবে তার যথেষ্ট নাম ডাক রয়েছে। অবাঞ্ছিত দাগটি সম্বন্ধে তিনি কি মন্তব্য করেন আমাকে অবশ্যই জানতে হবে।

জুবেদা নীরব চাহনি মেলে খলিফার দিকে তাকিয়ে রইলেন। খলিফা বলে চললেন—'শোন জুবেদা, তুমি আমার চাচার লেড়কি। আমার শাদী করা বেগমের মর্যাদা তুমি লাভ করেছ। আমার বংশের নামযশ রক্ষায় তোমার ভূমিকাও কম নয়। কাজী বিচার করে যদি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন তবে তোমার গুস্তাকির শাস্তি তোমাকে আমি দিতে বাধ্য হব।'

খলিফার তলব পেয়ে কাজী ইউসুফ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। খলিফার মুখে সবকিছু শুনে তিনি একলাফে তড়াক্ করে বিছানায় উঠে গেলেন।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দাগটির দিকে তাকিয়ে কাজী তার ঠিক কেন্দ্রস্থলে তর্জনি স্থাপন করলেন। মুহূর্তকাল বাদে তর্জনিটি চোখের সামনে নিয়ে গেলেন। বার কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। না, ফয়সালা করতে পারলেন না। এবার তর্জনিটিকে নাকের একদম গা-ঘেঁষে নিয়ে গেলেন। গন্ধ শুকলেন বার বার। সবশেষে রায় দিতে গিয়ে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করলেন—'জাঁহাপনা, আমি নিঃসন্দেহ, এ-নির্ঘাৎ আদমির বীর্যের দাগ।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' একাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, কাজী নির্দ্বিধায়ই বললেন, আদমির বীর্যই বটে। আর একদম তাজা। আদমির দেহ থেকে সদ্যই বেরিয়েছে জাঁহাপনা।'

—'আদমির বীর্য? তাজা? সদ্য বেরিয়েছে? কিন্তু কি করে এমন এক অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হ'ল আমার দিমাকে আসছে না তো। আমি সাতদিন বাদে বেগমের এ-কামরায় এসেছি। দাগটি আমার চোখে

পড়েছে আমি বিছানা স্পর্শ করার আগেই।'

কাজী ইউসুফ বিচক্ষণ ও পাকা বুদ্ধির ধারক। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, এতে বেগম সাহেবা তাঁর ওপর বিলকুল চটে যাবেন। দাগ যারই হোক না কেন, বেগমের চক্ষুশূল হলে পরিণাম কি যে হবে তা তার অনুমান করতে অসুবিধা হ'ল না। তিনি বেগমকে বাঁচাবার ফিকির বের করে নিজের মঙ্গল বিধানের কাজে মন দিলেন। অন্যথায় বেগমের ক্রোধ জিন্দেগী বরবাদ ক'রে দিলেও তাজ্জব বনার কিছু নয়।

কাজী ইউসুফ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিমেলে এবার কামরাটির ছাদের ওপর চোখ বুলাতে লাগলেন। ছাদের গায়ে একটি বাদুড়কে ঝুলে থাকতে দেখে খুশীতে তার দিল্ ভরে উঠল। মুখে দেখা দিল হাসির ঝিলিক। এবার খলিফার দিকে তাকিয়ে বল্লেন-জাঁহাপনা। একটি তরবারির বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?'

খলিফা মুহূর্তের জন্য কাজীর মুখের দিকে তাকালেন। ব্যাপার অনুমান করতে না পেরে এক নফরকে একটি তরবারি নিয়ে আসতে হুকুম করলেন।

কাজী তরবারি দিয়ে এক কোপে বাদুড়টিকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে ফেল্লেন।

রক্তাপ্লুত মড়া বাদুরটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে কাজী এবার বল্লেন— 'জাঁহাপনা, বিছানার চাদরের গায়ের ওই বীর্যের দাগ এরই বীর্য থেকে পয়দা হয়েছে। বাদুড়ের বীর্য অবিকল আদমির বীর্যের মাফিক।'

খলিফা বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে কাজীর মুখের দিকে তাকোলেন।

কাজী এবার বল্লেন—'জাঁহাপনা, আমাদের হেকিমি বিদ্যার কিতাবে লেখা আছে—'বাদুড়ের বীর্য আর আদমির বীর্যের বিলকুল মিল খুঁজে পাওয়া যায়।'

—'কিন্তু অহেতুক বীর্যপাত—'

খলিফার মুখের বাৎ মিলিয়ে নিয়ে কাজী বল্লেন—'অহেতুক হতে যাবে কেন জাঁহাপনা, আমার বিশ্বাস, বেগম সাহেবা একটু আগে যখন গভীর নিদে আচ্ছন্ন ছিলেন তখন তাঁর অজান্তে বাদুড়টি তার ওপর চড়াও হয়েছিল, ব্যস, তারই প্রমাণ রয়ে গেছে বিছানার চাদরের গায়ে। আমি এর জান নিয়ে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়েছি।'

কাজী ইউসুফ-এর বাৎ শুনে খলিফা নিঃসন্দেহ হলেন, জুবেদা নির্দোষ, নিরপরাধিনী। যে-ব্যাপারে তাঁর অজান্তে ঘটে গেছে তার জন্য তার প্রতি দোষারোপ করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

খলিফার মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। তাঁর চেয়ে বেশী খুশী হলেন বেগম সাহেবা জুবেদা।

কাজীর বিচক্ষণতার পুরস্কার স্বরূপ খলিফা বহুমূল্যের ইনাম দিলেন। তার চেয়ে ঢের, ঢের বেশী মূল্যের রত্নালঙ্কারে কাজী সাহাবকে তুষ্ট করলেন। আর হরেক কিসিমের খানা আর দামী সরাব দিয়ে নৈশ ভোজ সেরে তবে নিজের মকানে ফিরে যাবার উদ্যোগ নিলেন।

বেগম শাহরাজাদ কয়েকটি ফল নিজে হাতে কেটে কাজীকে খেতে দিলেন। কাজীর খাওয়া হলে জিজ্ঞাসা করলেন—'এদের মধ্যে কোন্ ফলটি সবচেয়ে আচ্ছা, বলুন তো কাজী সাহাব?'

কাজী আমতা আমতা করে বল্লেন—'বেগম সাহেবা, আপনার এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে বড়ই সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, সব কিসিমের ফলই তো এখন আমার উদরে অবস্থান করছে। একটির গুণগান করলে বাকীরা ব্যাজার হবে। বিদ্রোহ করবে। ব্যস, গর হজমের যন্ত্রণা আমাকে পোহাতে হবে।

কাজীর মন্তব্য শুনে খলিফা ও বেগম উভয়েই সরবে হেসে উঠলেন।

বাদশাহ শারিয়ার স্বীকার করলেন, খলিফা অল্প সময়ের জন্য হলেও বেগম জুবেদাকে সন্দেহ করেন। আর তাঁর এ-কাজ অবশ্যই উচিত হয়নি।

জেলের কিস্সা

বেগম শাহরাজাদ জুবেদার কিস্সাটি শেষ করে অন্য আর একটি কিস্সা শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—জাঁহাপনা, এবার আপনাকে জেলে সিরিনের কিস্সা শোনাচ্ছি। লোকমুখে শোনা যায় পারস্যের সুলতান খুসরাও খুবই মছলি প্রিয় ছিলেন।

সুলতান খুসরাও এক সকালে তাঁর খুবসুরৎ বেগমকে নিয়ে প্রাসাদের ছাদের ওপর বসে খোশ মেজাজে বাৎচিৎ করছিলেন। এমন সময় এক বুড়ো জেলে কিছু মছলি নিয়ে প্রাসাদের সদর দরওয়াজায় হাজির হ'ল।

জেলেকে দেখতে পেয়ে সুলতান ছাদ থেকে নেমে এলেন। বুড়ো জেলেটি একটি বেশ বড়সড় মছলি সুলতানকে দেখাল। উজিরকে, চার হাজার দিরহাম দাম মিটিয়ে দিয়ে মছলিটি খরিদ করে নেবার হুকুম দিলেন।

এক মছলির দাম চার হাজার দিরহাম—সুলতানের এ-রকম উদারতায় বেগম মোটেই খুশী হতে পারলেন না। তিনি সুলতানকে একটি মাত্র মছলির জন্য এত ইনাম দিতে বার বার নিষেধ করলেন। যুক্তি দেখালেন, ভবিষ্যতে যে কেউ কিছু বেচতে আসবে সে-ই এরকম আশমান ছোঁয়া ইনাম আশা করবে।

—'কিন্তু বেগম সাহেবা, আমি একবার যা স্বেচ্ছায় দান করে ফেলেছি তা কি আর ফিরিয়ে নেওয়া যায়? নাকি উচিত। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মেজাজ খারাপ করা ঠিক নয়।'

বেগম সিরিন প্রবল আপত্তি তুলে বলেন তোমার ইজ্জতে বাঁধছে? বহুৎ আচ্ছা, আমিই বন্দোবস্ত করছি।'

—'বন্দোবস্ত? কি বন্দোবস্ত—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বেগম বললেন —'এমন বন্দোবস্ত করব যাতে একূল ওকূল দু'কূলই রক্ষা হতে পারে। জেলের কাছ থেকে দিরহামগুলো ফেরৎ নেব, আবার আপনার ইজ্জতও খোয়া যাবে না।'

—'কিন্তু কিভাবে, বলবে কি?'

—'একটি চমৎকার মতলব আমার মাথায় এসেছে। তুমি জেলেটিকে শুধাও, তার মছলিটি মরদানা নাকি জনানা। সে জবাব দেবে হয় পুরুষ নয়তো জনানা—এই তো? যদি বলে পুরুষ তবে সঙ্গে সঙ্গে বলবে, তোমার মছলি নিয়ে যাও। পুরুষ মছলি আমি খাইনা। আর যদি বলে জনানা তবু বলবে নিয়ে যাও, কারণ দর্শাবে, আমি জনানা মছলি খাইনা। এতেই তোমার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়ে যাবে।'

বেগম সাহেবাকে খুশী করার জন্য সুলতান উপায়ান্তর না দেখে জেলেকে তলব করলেন।

জেলে এগিয়ে এলে সুলতান বল্‌লেন—'ওহে, মছলি তো তোমার কাছ থেকে রাখলাম, কিন্তু মছলিটি কি পুরুষ, নাকি জনানা, বল তো?'

সুলতানের প্রশ্নটি কানে যেতেই জেলেটি প্রথমে খুবই হকচকিয়ে গেল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার মছলিটি পুরুষও নয়, জনানাও নয়।'

সুলতান চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লেন—'এ কী অদ্ভুত বাৎ শোনালে হে! পুরুষ নয়, জনানাও নয় তাজ্জব বাৎ নয় কি?'

—'জাঁহাপনা, বাৎটিকে সাচ্চা জ্ঞান করবেন। আমার মছলিটি আদতে একটি ক্লীব।'

—'ক্লীব!' জেলের বাৎ শুনে খলিফা তো খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে পড়লেন। পুরুষও নয়, জনানাও নয় এমন অত্যাশ্চর্য একটি মছলি খরিদ করতে পেরেছেন দেখে তিনি তো আত্মহারা হয়ে পড়ার জোগাড় হলেন।

ব্যস, আর দেরী নয়। সুলতান উজিরকে হুকুম দিলেন, জেলেকে চার হাজারের বিনিময়ে আট হাজার দিনার দিয়ে দেওয়া হোক।

বুড়ো জেলে চার হাজার দিরহামের মছলি আট হাজার দিরহাম দাম বুঝে পেয়ে নিজের মকানের দিকে পা বাড়াল।

প্রাসাদের সদর দরওয়াজা পেরোবার আগেই দিরহামের থলিটির মুখ আল্‌গা হয়ে দিনার মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। সে হামাগুড়ি দিয়ে একটি একটি ক'রে দিরহাম কুড়িয়ে থলিতে ভরতে লাগল। কিন্তু শেষ দিরহামটি হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। সুলতান খুসরাও এবং তার বেগম সিরিন ছাদের ওপর বসে ব্যাপারটি দেখে সোল্লাসে প্রায় নাচানাচি জুড়ে দিলেন।

এমন সময়ে পূব-আকাশে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।
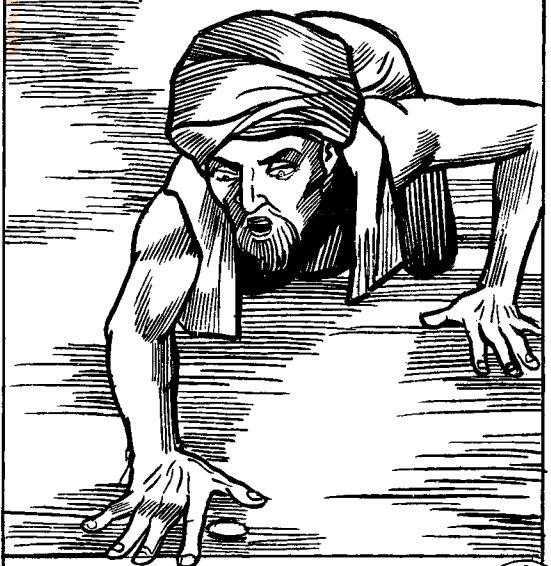
তিন শ' বিরাশিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, ব্যাপারটি লক্ষ্য করুন, লোকটি ধরতে গেলে চার হাজার দিরহাম ফোকটাই-ই পেয়ে গেল। কিন্তু একটি মাত্র দিরহাম খুঁজে না পেয়ে কেমন উন্মাদের মত ছুটাছুটি করছে, একবারটি দেখুন।'

সুলতান বললেন—'একদম সাচ্চা বাৎ। বুড়ো জেলেটি কিপ্‌টের একশেষ! ঠিক আছে, আমি তাঁকে তলব করছি।'

সুলতানের তলব পেয়ে জেলেটি ফিরল।

সুলতান বললেন—'কি হে, তুমি এমন কঞ্জুস কেন বল তো? একটি মাত্র দিরহামের মায়াও ছাড়তে পারলে না। তোমার দিল্ যেন আদমির নয়, চিড়িয়ার। মাত্র তো একটি দিরহাম। খুঁজে যদি না-ই মেলে তবে তোমার এমন কি লোকসান হ'ত বল তো? তোমার প্রাপ্যের চেয়ে ঢের বেশী দিরহামই তো পেয়েছ। একটি দিরহাম কোন গরীব ভিখমাঙ্গই না হয় কুড়িয়ে পেত। তাতে এমন কি ক্ষতি তোমার হ'ত?'

বুড়ো জেলে কুর্নিশ সেরে বল্‌ল—'খোদা মেহেরবান। জাঁহাপনা, একটি মাত্র দিরহাম খোয়া গেলে আমার যে বহুৎ লোকসান হ'ত তা নয়, সাচ্চা বাৎ। মাত্র একটি দিরহামের জন্য এত সময় ও ধৈর্য নষ্ট করা সঙ্গত নয় তা আমারও অজানা নয়। আদতে অন্য এক কারণে আমি এমন হন্যে হয়ে দিরহামটি তল্লাসী করছিলাম। এ যে সুলতানের কাছ থেকে পাওয়া ইনাম। এর বিচার অর্থের মাপকাঠি দিয়ে করা সম্ভব নয়। এর এক একটি দিরহাম আমার কাছে এক লাখ সোনার মোহরের চেয়েও বেশী।'

বুড়ো জেলের বাৎ শুনে সুলতান তো খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে গেলেন। এ-আদমি দানের মর্যাদা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এরকম জ্ঞানী আদমি লাখে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। তিনি খাজাঞ্চিকে ডেকে হুকুম দিলেন—'জেলেকে আরও বার হাজার দিরহাম ইনাম দিয়ে দাও। আর প্রাসাদে ও প্রাসাদের বাইরে সর্বত্র ঘোষণা ক'রে দাও—জনানার বাৎ শুনে কেউ যেন আর কোন কাজ করতে উৎসাহী না হয়। তাদের পরামর্শে চল্‌লে যে কোন লোকসান সাধারণ লোকসানের থেকে চারগুণ হতে বাধ্য।'

ইবন অল কবিবীর কিস্‌সা

জেলের কিস্‌সা শেষ করে বেগম শাহরাজাদ এবার 'ইবন অল কবিবীর কিসসা' শুরু করলেন। বেগম বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক মাঝরাত্রে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ নির্জন অবস্থায় সময় কাটাচ্ছিলেন। বহুৎ কোশিস করলেন তবু কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অস্থিরচিত্ত খলিফা এক সময় তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে বিছানায় বসে পড়লেন। গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠলেন—'মাসরুর! মাসরুর!'

খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কুর্নিশ ক'রে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হো-হো ক'রে হাসতে লাগল।

খলিফা তো মাসরুর-এর কাণ্ড দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। প্রায় ধমকের সুরে বল্‌লেন—' ব্যাপার কি? হঠাৎ তোমার এমন হাসির উদ্রেক হ'ল কিসে? তোমার কি দিমাক টিমাক খারাপ হয়েগেছে? নইলে এমন ক'রে হাসার অর্থ কি?'

খলিফার ধমক খেয়ে মাসরুর হাসি থামিয়ে অপ্রতিভ হয়ে নিতান্ত অপরাধীর মাফিক বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

সে করজোড়ে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আমার কসুর হয়েছে, মাফ করবেন। আদতে আপনার কোন ব্যাপারে আমি এমন ক'রে হাসাহাসি করি নি। অন্য একটি ঘটনা হঠাৎ ইয়াদে আসায় আমি হাসি দমিয়ে রাখতে পারি নি।'

—'ঘটনাটি কি, বল তো।'

—'আমি গতকাল বিকালে টাইগ্রীস নদীর ধারে ঢুঁড়তে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি বেশ কিছু আদমি ইবন অল কবিবীর নামে এক ভাঁড়কে ঘিরে হাসি তামাশা দেখছে আর সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।'

—'তাই বুঝি? তবে তো তার হাসির কিস্‌সা শুনতেই হয় মাসরুর। এক কাম কর, সে রসিকটিকে আমার সামনে হাজির কর। তার হাসির ঝোলা থেকে কিছু পেলে আমার দিল্ একটু আধটু হালকা হতে পারে। এমন কি চোখের পাতায় নিদ চলে আসাও অসম্ভব নয়।'

খলিফার হুকুম তামিল করতে তাঁর দেহরক্ষী মাসরুর ছুটল ভাঁড় ইবন কবিবীর-এর খোঁজে।

মাসরুর তাকে বহুত তাল্লাসী চালিয়ে বের করল। তাকে খলিফার কামরার সামনে হাজির করল। কামরার দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে সে কবিকে দিয়ে হলফ করিয়ে নিতে গিয়ে বল্‌ল—' শোন, আমার জন্যই আজ তুমি খলিফার প্রাসাদে আসতে পারলে। তোমার বরাত খুলে গেল। এক কাম কিন্তু তোমাকে করতে হবে। সব কিস্‌সা শুনিয়ে খলিফার কাছ থেকে যে-বকশিস পাবে তার বখরা কিন্তু আমাকে দিতে হবে। মোট চার ভাগ হবে। তিন ভাগ আমার প্রাপ্য আর এক ভাগ তুমি নেবে, রাজী?' ভাঁড় কবিবীর চোখের মণি দুটোকে প্রায় কপাল পর্যন্ত তুলে নিয়ে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লা! তিন ভাগ তুমি নেবে? আমার এক ভাগ মাত্র। বকশিসের অর্থ আধাআধি ভাগ হবে। মাসরুর দেখল বেশী কচলাকচলি করতে গেলে দেরী হয়ে যাবে, খলিফা গোস্‌সা হবেন। আধাআধি ভাগেই সে রাজী হয়ে গেল।

মাসরুর ভাঁড় কবিবীরকে খলিফার সামনে হাজির করল। খলিফা তাকে দেখে বলল—'কি হে, তুমি খুব হাসি-মস্করার মাধ্যমে হাসাতে পার। বহুৎ আচ্ছা সব হাসির কিস্‌সা জান। আমাকে কিছু হাসির কিস্‌সা শুনিয়ে দিল্ খুস ক'রে দাও দেখি। ইয়াদ রেখো, তোমার কিস্‌সা যদি আমার দিল্‌কে খুশী করতে না পারে, হাসির উদ্রেক ঘটাতে না পারে তবে কিন্তু তোমার বরাতে ইনাম জুটবে চাবুকের ঘা।'

খলিফার বাৎ শুনে ভাঁড়ের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। তার মাথায় যত কিস্‌সা ছিল, লেকিন এখন সব ভোজবাজীর মত, বিলকুল উধাও হয়ে গেল। বহুৎ কোশিস করল। কিন্তু কিছুই ইয়াদে আনতে পারল না। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে, জট বেঁধে যেতে লাগল। তার বুকের ভেতরে কামারের হাঁফর চলতে থাকে। কোর্তা-পাৎলুন ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে ওঠে। গলা দিয়ে ঘাম পর্যন্ত বেরোতে চায় না।

ভাঁড় কবিবীরের কারবার দেখে খলিফা চটে যান। চিল্লিয়ে ওঠেন, কোই হ্যায়? এ আদমীকে এক শ' ঘা চাবুক লাগাও! চাবুকের ঘা খেয়ে এর মগজ সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।'

এক ঘাতক খলিফার হাঁক ডাক শুনে চাবুক হাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

খলিফা গর্জে উঠলেন—'একে চাবুক মার। গুণে গুণে ঠিক এক শ' ঘা চাবুক চালাবে।'

ঘাতক ভাঁড় কবিবীরকে এক ঝটকায় মেঝেতে ফেলে দিয়ে একের পর এক চাবুক মারতে লাগল। ত্রিশ ঘা চাবুক খেতেই ভাঁড়টি করজোড়ে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আমার প্রাপ্যটুকু বুঝে পেয়েছি। এর পরেরটুকু আপনার দেহরক্ষী মাসরুর-এর প্রাপ্য।'

—'তার মানে? মাসরুর-এর প্রাপ্য হতে যাবে কেন?'

—জাঁহাপনা, কামরায় ঢোকার আগে আমাদের মধ্যে কড়ার হয়েছিল, আপনি যে বকশিস দেবেন তার দু'ভাগ নেবে মাসরুর, আর মাত্র একভাগ আমার প্রাপ্য।'

—'বহুৎ আচ্ছা! মাসরুর'কে তলব কর।'

মাসরুর'কে হাজির করা হ'ল। খলিফার নির্দেশে এবার তার পিঠে চাবুকের ঘা পড়তে লাগল।

চাবুক চলাকালীন এক সময় খোঁজাসর্দার এগিয়ে এসে বল্ল, জাঁহাপনা, ওকে আর নয়। এবার আমার পিঠে চাবুক মারা হোক। বাকী চাবুকের ঘা আমার প্রাপ্য।

ব্যাপার স্যাপার দেখে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ তো হাসতে হাসতে একদম লুটোপুটি খাবার জোগাড় হলেন। হর-দম হেসেই চল্‌লেন। হাসতে হাসতে তার দিলে যা কিছু বিষাদ ছিল ধুয়ে-মুছে বিলকুল সাফ হয়ে গেল।

খলিফার কামরায় উজির জাফরের ডাক পড়ল। জাফর এলে খলিফা হাসতে হাসতে বল্‌লেন—'এদের তিনজনকে বকশিস স্বরূপ এক হাজার দিনার করে দিয়ে দাও।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শেষ করে চুপ করলেন।

মৌলভী ও এক জেনানার কিস্‌সা

বাদশাহ শারিয়ার-এর বিশেষ আগ্রহে বেগম শাহরাজাদ এবার 'মৌলভী ও এক জেনানার কিস্‌সা' শুরু করলেন—এক ছন্নছাড়া নওজোয়ান ছিল। তার বহুৎ দিনের ধান্দা অন্যের ওপর দিয়ে নিজের খাওয়া পরা চালিয়ে নেয়া। তার মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার গন্ধও ছিল না। এক সময় তার মাথায় ফন্দি এল কিছু রোজগারপাতি করা দরকার। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে দিন গুজরান করা কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিল। অনেক ভেবেচিন্তে ফন্দি আঁটল—সে একটি মাদ্রাসা খুলে বসবে। এতে অর্থোপার্জন তো হবেই, উপরি লাভ সমাজে খাতির প্রতিপত্তি। এ কাজে তার সবচেয়ে বড় সহায়ক হ'ল তার বড় বড় বাৎচিৎ আর ভারিক্কি চালচলন। এ দুটো গুণকেই তো মূলধন করে সে এতদিন বহাল তবিয়তে সমাজের বুকে দাপটের সঙ্গে টিঁকে রয়েছে।

নওজোয়ানটি একদিন সত্যি সত্যি একটি মাদ্রাসা খুলে একদা মৌলভী সেজে বসে গেল।

মৌলভীর ভারিক্কী চালচলন আর বাৎচিতে লেড়কাদের আব্বা-আম্মারা সহজেই মজে গেল। তারা তাদের লেড়কাদের নির্দ্বিধায় মৌলভীর মাদ্রাসায় পাঠাতে লাগল।

মৌলভী তো বিলকুল নিরক্ষর। পেটে কালির অক্ষর বলতে কিছুই নেই। তাই একটি পাকা বেতই তার শিক্ষাদানের একমাত্র উপকরণ অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল।'

মৌলভীর মাদ্রাসায় পড়াশোনার পাঠ একদমই নেই। ছাত্ররা কিতাব শ্লেট প্রভৃতি বাড়ি থেকে নিয়ে মাদ্রাসায় আসে। নিজেরা যা পারে চিল্লাচিল্লী করে পড়ে। ছুটি হলে ফিন কিতাবটিতাব গোছগাছ করে বাড়ি ফিরে যায়।

মৌলভী সাহাব একটি টুল পেতে গ্যাঁট হয়ে কামরার মাঝখানে স্রেফ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। লেড়কারা কিছু জানতে চাইলে এমন চোখ বড় ক'রে তাকায় যে ডরে তাদের কাপড়ে চোপড়ে হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ব্যস, এ পর্যন্ত। এর পরেও জানতে চাওয়ার উৎপাত আর কোন্ লেড়কার থাকতে পারে?'

কিছুদিনের মধ্যেই মাদ্রাসা একদম জমজমাট হয়ে উঠল। ফলে মৌলভীর অর্থাগমের পরিমাণও চড়চড় করে বেড়ে যেতে লাগল।

একদিন ঘটল এক মজার ঘটনা।

গ্রামেরই এক জেনানা একটি চিঠি নিয়ে মৌলভীর কাছে এল। জেনানাটি লেখাপড়া জানে না। মৌলভীকে দিয়ে চিঠিটি পড়িয়ে নেয়ার আশায়ই তার মাদ্রাসায় আসা।

চিঠিটি হাতে নিয়ে মৌলভী যেন একদম অথৈ পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে লেগে গেল। এখন কোন্ ফন্দি করে ব্যাপারটিকে এড়ানো যায় সে ভাবতে লাগল। কোন ফিকিরই বের করতে পারল না। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। কোর্তা-পাৎলুন ভিজে জবজবে হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।'

মৌলভী উপায়ান্তর না দেখে নানা বাহানা ক'রে মাদ্রাসা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ধান্দা করল। কিন্তু পারল না। পারবেই বা কি করে? জেনানাটি যে ছিনে জোঁকের মত তার গায়ে গায়ে আঁকড়ে রয়েছে।

জেনানাটি হাতের চিঠিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—' খোদাতাল্লা, আপনার মঙ্গল করবেন। আমার স্বামী পাঁচ মাস পরদেশে কাটাচ্ছে। এতদিন পর সে এই প্রথম আমাকে চিঠি লিখেছে। আপনি মেহেরবানি ক'রে চিঠিটি পড়ে দিন মৌলভী সাহাব।'

—'শোন, চিঠিটি পড়ে দেব এ আর বেশী কথা কি? কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমার হাতে একদম সময় নেই। গত কাল আসতে পার নি?'

—'চিঠিটি যে আজকেই এসেছে মৌলভী সাহাব, গত কাল আসব কি ক'রে, আপনিই বলুন?'

মৌলভী খেঁকিয়ে উঠে বল্‌ল—'আজকেই এসেছে মৌলভী সাহাব। তার আরও আগে আসতে কি হয়েছিল? যাক গে, তুমি চিঠিটি নিয়ে পরে এক সময় এসো, কথা দিচ্ছি পড়ে দেব। এখন একদম সময় নেই। দুপুরে নামাজের সময়। কাউকে এখন বিরক্ত করতে আসা কি উচিত? এখনই মসজিদে যেতে হবে। তুমি বরং পরেই এসো।'

জেনানাটি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে এবার বল্‌ল—'আমি আর আমার দিল্‌কে ঠাণ্ডা রাখতে পারছি না।'

—'বল্‌লাম তো পরে এসো। এখন আমার একদম সময় নেই।'

—'মেহেরবানি ক'রে আপনি চিঠিটি পড়ে শুধু বলুন—আমার মরদ, আমার স্বামীর তবিয়ৎ আচ্ছা আছে তো? এখন কোথায় আছে, কি করছে, বলে দিন। আমি ফিরে যাব। আপনাকে আর মোটেই বিরক্ত করব না।'

কথা বলতে বলতে জেনানাটি হাতের চিঠিটি একরকম জোর করেই মৌলভীর হাতে গুঁজে দিল।

মৌলভী একদম জালে আটকা পড়ে গেল। উপায় নেই। যা হোক একটি ফন্দি ক'রে জেনানাটির ফাঁদ থেকে বেরোতেই হবে।

মৌলভী চিঠিটির ভাঁজ খুল্‌ল। উল্টো ক'রে চিঠিটি হাতে ধরল। এবার শুরু করল তার ফন্দি অনুযায়ী কাজ। এবার মুহূর্তকাল ধরে ঠোঁট দুটো বার বার নাড়িয়ে চিঠির বক্তব্য পড়ার বাহানা করল। এবার চিঠির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই পড়ার বাহানার সঙ্গে চোখ, মুখ ও হাতের বিচিত্র সব ভঙ্গি করতে লাগল। আর? কখনও চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য কপালে তুলে নেয়। চোখে-মুখে বিষাদের ছাপ ফুটিয়ে তোলে, কপালে করাঘাত করে, টুপি খুলে হাতে নেয়, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কখনও মৃদু স্বরে ইয়া আল্লাহ ব'লে ওঠে।'

মৌলভীর ভাবগতিক দেখে চিঠির মালিক লেড়কিটির তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হয়ে ওঠে। সে ধরেই নিল ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়। তার স্বামী হয়ত আর দুনিয়ায় নেই, গোরে আশ্রয় নিয়েছে।

জেনানাটি এবার ডুকরে কেঁদে উঠে বলে—'মৌলভী সাহাব, আমার কপালে আগুন লেগেছে, তাই না? যা ঘটেছে সাচ্চা বলুন। আমার কাছে কিছু ছিপাবেন না। আল্লাহ-র কসম, যা ঘটেছে আমাকে বলুন।'

মৌলভী চিঠিটি হাতে নিয়ে নীরব চাহনি মেলে জেনানাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

জেনানাটির কান্নার বেগ আরও অনেকাংশে বেড়ে গেল। সে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এবার বল্‌ল—'মৌলভী সাহাব, মুখে এভাবে যদি 'কুলুপ এঁটে থাকবেন, আমি তবে আমার পোশাক আশাক ছিঁড়ে ফেলব?'

—'ফেল। ছিঁড়েই ফেল।'

—'আমি কি তবে কপালে করাঘাত করব?'

—'কর। জোরসে করাঘাত কর।'

—'আমি কি গলা ছেড়ে বিলাপ জুড়ে দেব? গলা ছেড়ে

কাঁদব?'

—'দাও। কাঁদো।'

—'ইয়া খোদা! আমার নসীবে এ-ও ছিল?' জেনানাটি গলা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে মৌলভীর কাছ থেকে বেরিয়ে গেল। উন্মাদিনীর মাফিক সালোয়ার-কামিজ ছিঁড়তে লাগল। পোশাক আশাক ছিঁড়তে ছিঁড়তে, চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে জেনানাটি ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল।

জেনানাটি বাড়ির উঠানে গিয়েই ধড়াস্ ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। কেঁদে কেঁদে উঠোনে লুটোপুটি খেতে লাগল। মহল্লার জেনানা-পুরুষ বালবাচ্চা সবাই ছুটোছুটি ক'রে এল ব্যাপার জানার জন্য।

জেনানাটির কান্নার মাধ্যমেই সবাই বুঝতে পারে, তার কপালে আগুন লেগেছে। নসীব বিরোধিতা করেছে। তার স্বামী দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেছে।

সবাই সাধ্যমত প্রবোধ বাক্যে তাকে ঠাণ্ডা করার কোশিস করল। বৃথা চেষ্টা। স্বামীহারা অভাগিনীকে প্রবোধবাক্যে শান্ত করা যায় না।

ভিড়ের মধ্যে মহাল্লারই একজন শিক্ষিত আদমি উপস্থিত হয়েছে। সে ক্রন্দনরতা জেনানাটির হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে চোখের সামনে ধরল। দু'ছত্র পড়েই তো তার চক্ষুস্থির। সে বল্‌ল—'তোমার স্বামী মারা গেছে এমন বাৎ কে বল্‌ল তোমাকে?'

জেনানাটি তখন কেঁদে উঠোনে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সে-আদমিটি এবার প্রায় ধমকের স্বরে বল্‌ল—'কে এমন বাৎ তোমাকে বলেছে, বল তো? কাকে দিয়ে চিঠিটি পড়িয়েছিলে? কই, কারো ইন্তেকাল ঘটেছে এমন কোন বাৎ-ই তো চিঠিতে নেই।

আমি চিঠির বক্তব্য পড়ে শোনাচ্ছি। শোন, শেষ পর্যন্ত শুনে যদি তোমার কান্নাকাটি করতেই হয় তখনই কোরো। শোনো, পড়ছি—

"ওগো, চাচার লেড়কি, তোমাকে আমার মহব্বৎ জানাই। আমি এখানে বহুৎ আচ্ছা আছি। হপ্তা দু'-এর মধ্যেই মুলুকে ফিরছি। কতদিন হয়ে গেল তুমি আর আমি মিলিত হই নি। লেফাফাটির ভেতরে একখণ্ড শনের বহুৎ আচ্ছা কাপড়া তোমাকে ইনাম পাঠালাম। খোদাতাল্লা তোমার ভালই করুন।"

চিঠিটি পড়া শেষ হলে জেনানাটি সে-আদমির হাত থেকে চিঠিটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সে ফিন মাদ্রাসার দিকে ছুটতে লাগল।

জেনানাটি মাদ্রাসার দরওয়াজা দিয়ে ঢুকেই একেবারে মৌলভীর মুখোমুখি হয়ে গেল।

জেনানাটিকে দেখেই তো মৌলভীর মুখ একদম চুন। সে মৌলভীকে সরাসরি প্রশ্ন করে—'আমি আপনার কোন্ পাকাধানে মই দিয়েছি যে, আপনি আমাকে এমন এক ধোঁকা দিলেন? আমার স্বামী তো বহাল তবিয়তেই আছে। সে আমাকে এক খণ্ড কাপড়া ইনাম পাঠিয়েছে। আর আপনি বল্‌লেন কি না তার ইন্তেকাল ঘটে গেছে।'

মৌলভী মুখ কাচুমাচু করে বল্‌ল—'কিছু মনে কোরো না। তখন আমি ব্যস্ত ছিলাম, জানই তো। দিমাক আমার ঠাণ্ডা ছিল না। চিঠির পাতায় কি পড়েছি, কি তোমাকে শুনিয়েছি কিছুই আমার ইয়াদ নেই। তোমার খবর শুভ তিনি মুলুকে ফিরছেন জানতে পেরে আমিও কম খুশী হইনি। বহুৎ—বহুৎ খুশী হয়েছি খুশীতে আমার দিল বিলকুল ভরে উঠেছে।'

কিস্‌সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

বাক্সবন্দী খলিফার কিস্‌সা

মৌলভী ও জেনানার কিস্‌সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ বুঝতে পারলেন রাত্রি শেষ হতে এখন অনেক দেরী।

বেগম 'বাক্সবন্দী খলিফার কিস্‌সা' নামে অন্য একটি শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, এখন যে কিস্‌সাটি আপনার দরবারে পেশ করছি সেটি প্রখ্যাত কালোয়াতি গায়ক ইশাকের মুখ থেকে কোন এক সময় শুনেছিলাম। ইশাক কিস্‌সাটি এভাবে বলেছিলেন—এক রাত্রে আমি একদম মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলাম। গলা পর্যন্ত সরাব পান করেছিলাম।

পথে খুব প্রস্রাবের বেগ দিচ্ছিল। পুরো তলপেট জুড়ে ব্যথা লাগছিল। রাস্তার ধারের এক প্রাচীরের পাশে বসে পড়তে বাধ্য হলাম। দীর্ঘ সময় ধরে শরীর থেকে পানি বের হওয়ায় নিজেকে খুবই হাল্কা বোধ হতে লাগল।

প্রস্রাব সেরে উঠতে যাব অমনি ওপর থেকে কি যেন এক কঠিন বস্তুর আঘাত লাগল মাথায়। চোখে আন্ধার দেখতে লাগলাম। সচকিত হয়ে ঝট করে সামান্য সরে গেলাম।

একটু বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে ওপরের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি প্রাসাদের ওপর থেকে কে যেন একটি কাঠের বাক্স রশি দিয়ে বেঁধে ওপরের তলা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। সুদৃশ্য একটি বাক্স। বাক্সের ডালা নেই, খোলা। বাক্সটির ভেতরে চমৎকার নক্সা-যুক্ত সুগন্ধী একটি আসন বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

সেদিন সরাব একটু বেশীই গলায় ঢেলেছিলাম। নেশাও বেশ জাঁকিয়ে ধরেছিল। নেশার ঝোঁকে ঝোঁকে আমি কাঠের সে-বাক্সটির ভেতরে বসে পড়লাম। আদতে আমার কাছে ব্যাপারটি খুবই মজাদার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্যস, আমি বাক্সটির ভেতরে বসতে না বসতেই রশিতে টান পড়ল। বাক্সটি টানের চোটে ক্রমশ উপরে উঠে যেতে লাগল। আমি নির্বিকারভাবে বসেই রইলাম।

এক সময় বাক্সটি প্রাসাদটির বারান্দায় উঠে গেল। দাসী গোছের কয়েকটি লেড়কি আমাকে কুর্নিশ করল। কামরায় নিয়ে গিয়ে সুদৃশ্য আসনে বসতে দিল। আমি নিতান্ত বাধ্য লেড়কার মাফিক বাক্স থেকে বেরিয়ে সুরসুর করে কুর্শিটিতে বসলাম। লেড়কিগুলো আমাকে বসিয়ে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। বে-পাত্তা।

কিছু সময় আমি এক খালি-কামরায় বসে রইলাম। তারপর চমৎকার পোশাক আশাকে সজ্জিতা একটি লেড়কি এসে আমাকে কামরা থেকে বের করে নিয়ে চল্‌ল। কোথায় বা কেন আমি কিছুই জানি না। নীরবে তার পিছন পিছন চল্‌লাম।

লেড়কিটি লম্বা বারান্দা দিয়ে সোজা এগিয়ে আমাকে নিয়ে সুসজ্জিত একটি কামরায় বসতে দিল।

আমার সরাবের নেশা ইতিমধ্যে একটু কমে এসেছে। আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে কামরার সবকিছু দেখতে লাগলাম। যা কিছুই দেখি তাতে যেন মুষড়ে পড়তে লাগলাম।

এক সময় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—ইয়া আল্লাহ। আমাকে এরা কোথায় নিয়ে এল! তামাম দুনিয়ার দামী সব সামানপত্র যে এখানে জড়ো করা হয়েছে! এ তো সাধারণ কোন আদমির মকান নয়। মালুম হচ্ছে, কোন আমীর-বাদশাহর বাসস্থল হবে। আমি কি সরাবের নেশায় বেহেড মাতাল হয়ে কোন আমীর ওমরাহের মকানে ঢুকে পড়েছি? ব্যাপারটি কি করে যে ঘটে গেল আমার দিমাকে আসছে না ছাই।'

একটু বাদেই দরওয়াজা ঠেলে প্রায় দশটি খুবসুরৎ লেড়কি কামরায় ঢুকল। সবার পরনেই বহুমূল্য ঝলমলে পোশাক পরিচ্ছদ। তার গায়ের আতরের খুসবুতে কামরা ভরে উঠল।

খুবসুরৎ লেড়কিরা কামরায় ঢুকতেই আমি কুর্শি ছেড়ে যন্ত্রচালিতের মাফিক তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে সালাম জানালাম।

সবচেয়ে বেশী সুরৎ যে লেড়কিটির, দলের নেতৃস্থানীয়া ব'লে যাকে মালুম হ'ল সে আমার সামনে এগিয়ে এল। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি মধুর হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'আমার নসীবের জোরেই আপনার মত একজনকে আমার কামরায় পেলাম। আপনি মুসাফির। আমার মেহমান। কিন্তু মালুম হচ্ছে যুগযুগান্তর ধরে আপনার সাথে আমার পরিচয়। কী তাজ্জব ব্যাপার। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। মেহেরবানি করে আসন গ্রহণ করুন।'

আমি আসন গ্রহণ করলাম। সে-ও আমার পাশে প্রায় গা-ঘেষে বসল।

খুবসুরৎ লেড়কিটি মধুঝরা কণ্ঠে বল্‌ল—এত রাত্রে, এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন কোথায়?'

আমি তার প্রশ্নের কি জবাব দেব ভাবছিলাম।

কিন্তু আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে আবার বল্‌ল—'এপথে কোথায় যাচ্ছিলেন? ওই কাঠের বাক্সটিতেই বা বসতে গেলেন কেন, বলুন তো? আমিই যে বাক্সটি দড়ি দিয়ে পথে নামিয়ে দিয়েছিলাম, আপনার জানা ছিল কি?'

—'দেখুন আমি পথ দিয়ে যাবার সময় খুব জোর প্রস্রাব পায়। যাকে বলে হালৎ একদম বেসামাল হয়ে পড়েছিল।

লেড়কিটি নির্বাক। নীরব চাহনি মেলে আমার বাৎ শুনতে লাগল।

আমি ব'লে চল্‌লাম—প্রস্রাব সারার জন্য একটু আবডাল খুঁজতে গিয়ে আপনার প্রাচীরটি নজরে পড়ল। ব্যস বসে পড়লাম প্রস্রাব সারতে। ঠিক তখনই আপনার দোতলা থেকে দড়ি বাঁধা কাঠের বাক্সটি নেমে গেল। আমি তখন সরাবের নেশায় টলছি। বাক্সটি দেখে আমার মধ্যে বদমতলব চেপে গেল। গ্যাঁট হয়ে তার মধ্যে বসে পড়লাম। তখনই রশিতে টান পড়ল। আমি ওপরে উঠে এলাম। খোদার কসম, এতে ভাল কি মন্দ হবে আমি কিছুই বিবেচনা করি নি। বিলকুল নেশার ঝোঁকে, মজা করার জন্যই আমার মধ্যে এ রকম দুর্বুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আপনি গোস্‌সা যদি করেনই সরাবের ওপর গোস্‌সা করতে পারেন, আমার ওপর নয়। আমার কোনই কসুর নেই।'

—'ছিঃ কসুর—গোস্‌সা এসব বলছেন কেন? আপনি আসাতে আমি বরং খুশীই হয়েছি। খুশীতে আমার দিল ডগমগ।'

মালুম হচ্ছে আমি খোয়াব দেখছি। আপনারই জন্য আমি যুগযুগান্তর ধরে যেন পথ চেয়ে বসেছিলাম।

আমি যেন একটু স্বস্তি পেলাম। ভাবলাম, খোদা ভরসা। খুশী হোক আর না হোক অন্ততঃ গোস্‌সা করে নি।

খুবসুরৎ লেড়কিটি এবার বল্‌ল—'আপনার পেশা জানতে পারি কি?'

আমি এবার যেন আচমকা একটি ধাক্কা খেলাম। তার এ-প্রশ্নের জবাব কিভাবে দেব, দিমাকে আসছিল না। আমি যে খলিফা অল মামুনের এর সভার গায়ক তা কি ক'রে তার কাছে প্রকাশ করব, ভাবছিলাম। যদি কোনক্রমে বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, আমার পরিচয় জানতে পারে তবে সকাল হতে না হতেই তামাম শহরে হৈ চৈ পড়ে যাবে। তামাম আরব মুলুকে যে-গায়ক ইশাক-এর খ্যাতি সে এক লেড়কির কামরায় চোরের মত প্রবেশ করেছে—ইয়া খোদা—একদম কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

আমাকে নীরব দেখে লেড়কিটি আবার প্রশ্ন করল। 'আপনার পেশা কি—।'

তার মুখের বাৎ খতম হওয়ার আগেই আমি ব'লে উঠলাম, তাঁতী। তাঁত বুনে দিন গুজরান করি।'

—'আপনার বাৎচিৎ তো বহুৎ আচ্ছা। তাঁত বোনেন? আপনার আচরণ ও বাৎচিৎ শুনে কিন্তু আমার মালুম হয়েছিল, নির্ঘাৎ কোন বড় কবি। নইলে এরকমই কোন গুণী আদমি হবেন আপনি। বুনলেনই তাঁত, কবিতা টবিতা নিয়ে একটু আধটু মাথা নিশ্চয়ই ঘামান, কি বলেন? নামজাদা কোন কবির দু-চার ছত্র কবিতা নিশ্চয়ই জানা আছে, কি বলেন?'

—'তা অবশ্য কিছু জানি! তবে একেবারেই সামান্য—'

—'হোক গে, কিছু তো অন্ততঃ জানেন। মেহেরবানি করে দু'চার ছত্র যদি বলেন—' আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে ব'লে উঠলাম— 'না, তেমন কিছু জানা নেই। বড়ই শরমে ফেললেন। কাউকে শুনিয়ে খুশী করার মত সায়ের আমার জানা নেই। আমি কাজের ফাঁকে দু'-চার ছত্র পড়াশোনা করি মাত্র। তবে আপনি যদি মেহেরবানি করে দু'-একটি সায়ের শোনান—।'

আমার মুখের বাৎ কেড়ে নিয়ে সে এবার মুচকি হেসে বলল—'শোনাব। জরুর শোনাব। আপনি আমার মেহমান। আমি যা কিছু জানি বিলকুল আপনাকে শোনাব।'

এবার সে আমাকে নামজাদা কবিদের লেখা কতগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল। সেগুলোর কয়েকটি প্রাচীন কবি জুহাইর, অল কাইস, আন্তার, ইমরু, তারাফা, কলুতুম এবং আমীর ইবন প্রভৃতির এবং সম্প্রতি কালের অল বাক্কাশী, আবু মুশার এবং আবু নবীশ-এর কবিতা। তার কবিতা আবৃত্তি করার ভঙ্গি ও কিন্নর কণ্ঠস্বর আজও আমার যেন কানে বাজে।

আমি বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা বলে পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করতে লাগলাম।

লেড়কিটি এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল— 'আমি যা জানি তা তো আপনাকে শোনালামই। বোধ করি এবার আপনার দ্বিধা-সঙ্কোচ কেটে গেছে? আশা করি এবার আপনার কণ্ঠের দু-চারটে কবিতা শুনতে পাব।'

আমি জোর মিনতি জানাতে লাগলাম। কোনরকমে তার হাত থেকে এ ব্যাপারে রেহাই পাবার যত কৌশল জানা আছে কোনটিই প্রয়োগ করতে কসুর করলাম না। মুখ কাচুমাচু করে বল্‌লাম—'শরম, জড়তা বা দ্বিধার ব্যাপার স্যাপার জরুর নয়। আদতে আমার তেমন কিছু জানাই নেই যা শুনিয়ে আপনার মত শ্রোতাকে খুশী করতে পারি। তবে আপনার যখন কিছু শুনতে দিল্ চাইছে তখন কিছু বলছি। ভুলচুক কিছু হয়ে গেলে অনুগ্রহ করে শুধরে নেবেন।

এবার আমার কবিতার ঝোলা থেকে দুটো কবিতা বেছে ফেল্‌লাম। সাধ্যমত শ্রুতিমধুর ও নির্ভুল উচ্চারণ যাতে না হয় সে রকম কোশিস করেই সে দুটো পাঠ করলাম।

কিন্তু আমার মতলবটি কার্যকরী হ'ল না। কবিতা পাঠ শেষ হতে না হতেই খুবসুরৎ লেড়কিটি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠল—'আরে ব্বাস! কী কণ্ঠ আপনার! কবিতা বলার কী চমৎকার ভঙ্গি! আর কী যে মাত্রাজ্ঞান তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! আপনি যে তাঁতীদের শিরোমণি, সন্দেহ নেই। আস্তাকুড়েও যে এমন সম্পদ থাকতে পারে আপনাকে না দেখলে বিশ্বাসই হ'ত না!'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' পঁচাশিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন —'জাঁহাপনা, গায়ক ইশাক তাঁর কিস্‌সার পরবর্তী অংশ বলছেন—খুবসুরৎ লেড়কিটি এবার বহুৎ কিসিমের খানা আর দামী সরাব দিয়ে আমার আপ্যায়ন করল।

সরাবের পাত্রটি হাতে তুলে দিয়ে বল্‌ল—এবার আপনার মুখ থেকে এ-বাঁদি দু'একটি কিস্‌সা শুনতে আগ্রহী। আশা করি আমার এ সাধ অপূর্ণ রাখবেন না।'

—'বহুৎ আচ্ছা, বলছি তবে শুনুন। আমি সরাব পান করতে করতে কয়েকটি হরেক কিসিমের কিস্‌সা শোনালাম। কিস্‌সা শুনে সে কখনও খুশীতে হাসল, কখনও আতঙ্কে শিহরিত হ'ল আবার কখনও বা বিমর্ষমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি তাকে যে সব কিস্‌সা শোনালাম বিলকুল সুলতান

বাদশাহের দরবারের ঘটনা। সে তাজ্জব বনল। সামান্য এক তাঁতী হয়েও আমি কি করে খলিফার দরবারের এতসব ঘটনা জানতে পারলাম এমন অসম্ভব কাজ কি ক'রে আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল।

আমি তার জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্য বল্‌লাম—' তাজ্জব বনার [illegible] কথাই বটে। কিন্তু আমি বরাতগুণে খলিফার দরবারের এক কর্মীকে দোস্ত হিসাবে পেয়েছিলাম। তাই তো সামান্য এক তাঁতী হয়েও আমার পক্ষে খলিফার দরবারের এতসব ভেতরের সমাচার জানা সম্ভব হয়েছে।'

খুবসুরৎ লেড়কিটি আচমকা চোখের বাণ মেরে আমার কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দিল।

লেড়কিটি মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই এবার বলল—আপনাকে বহুৎ তকলিফ দিলাম। আর একটি মাত্র অনুরোধ রাখতে বলছি। আমার সঙ্গে যদি একটি গানা গান তবে বহুৎ খুশী হ'ব। আমার দিল্ চাইছে আপনার কণ্ঠের একটি গানা শুনি। আশা করি আমাকে হতাশ করবেন না।'

গানা গাওয়াই তো আমার পেশা। কিন্তু এমন আনন্দঘন পরিবেশে গানা গাওয়ার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না। তাই বিষণ্ণমুখে বল্‌লাম—'গানা জানা থাকলে অবশ্যই আপনাকে খুশী করার কোশিস করতাম। আদতে গানা শেখার সখ এক সময় আমার খুবই হয়েছিল। কিন্তু যখন বুঝলাম, গাধা ছাড়া আমার গানার সমঝদার আর কেউ-ই নেই তখন সে শখের জলাঞ্জলি দিয়ে দিলাম। গানার দুনিয়া থেকে সরে দাঁড়াবার জন্য মহল্লার সবাই ও ইয়ার দোস্তরাও আমাকে কম মিনতি জানায় নি। অনন্যোপায় হয়ে গানার সঙ্গে বিলকুল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম, ব্যস। গানার সঙ্গে জিন্দেগীর মত আমার আড়ি হয়ে গেল।

আমার বাৎ শুনে খুবসুরৎ লেড়কিটি তো হেসে একদম খুন হবার উপক্রম হ'ল। ইয়া খোদা! কী চমৎকার আদমি আপনি! কী মজার মজার যে বাৎচিৎ আপনি করতে পারেন যত ভাবছি ততই তাজ্জব বনছি!

—'মেহেরবানি করে আমার বাৎ বিশ্বাস করুন, গানা আমার গলায় একদম আসে না। নইলে আপনার মাফিক এমন এক খুবসুরৎ লেড়কি অনুরোধ করার বহুৎ আগেই দু'-চারটে গানা গেয়ে ফেলতাম। তার চেয়ে বরং আপনিই একটি গানা শোনান। আপনার গলা বলে দিচ্ছে, আপনি এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। আপনার গানার মধ্য দিয়ে আজকের রাত্রিটি অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠুক। শুরু করুন সুন্দরী, আর দেরী সইছে না।'

বিশ্বাস করুন, আমার ধারণা ছিল অন্য দশটি লেড়কিরা যেমন সাধারণ গানা গায় সে-ও ঠিক তেমনিই দু'-একটি মামুলি গানা গাইবে। কিন্তু তার কিন্নর কণ্ঠের গানা শুনে আমার দিমাক গড়বড় হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। মুলুকের জব্বর সব গায়করাও তার গানা শুনে চমকে উঠবে।

লেড়কিটি আমাকে বিস্মিত হতে দেখে খুশী হ'ল।

গানা শেষ করে সে আমাকে বল্‌ল—'বলুন তো গানটির রচয়িতা কে?'

আমি বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কিছু না বোঝার বাহানা করে বল্‌লাম—'না, আমার ঠিক জানা নেই।'

—'এ কেমন বাৎ শোনালেন সাহাব! এ গানার রচয়িতার নাম তো তামাম দুনিয়ার ছেলে বুড়া কারোরেই অজানা নয়। এর রচয়িতা কবি আবু নসাব, আর গেয়েছেন বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ ইশাক।'

আমি মুখের সে-কাচুমাচু ভাবটুকু বজায় রেখেই বল্‌লাম—'হ্যাঁ, ওস্তাদ ইশাকের গানা আমি শুনেছি বটে। কিন্তু তিনি আপনার কাছাকাছি যেতে পারবেন না। এমন কিন্নর কণ্ঠ তিনি কোথায় পাবেন, বলুন তো?'

—'খুব হয়েছে। আমাকে আর মিথ্যা স্তোকবাক্যে খুশী করতে হবে না। এতে গুণী আদমির মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও ওস্তাদ ইশাক-এর সমকক্ষ কাউকেই মিলবে না। আমি না বলে পারছি না আপনি ওস্তাদ ইশাকের গানা কোনদিনই শোনেন নি। নইলে এরকম বাৎ আপনার মুখ দিয়ে কোনদিনই বেরোত না।

কথাটি বলেই সে ফিন আর একটি গানা ধরল। আর গানা থামিয়ে মাঝে মধ্যে ওস্তাদ ইশাকের প্রতিভা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে আমাকে সমঝিয়ে দিতে লাগল। তার কিন্নর কণ্ঠের দিল দরিয়া গানা

আমার দিল ভরিয়ে দিল। সুখের রাত্রি, তাড়াতাড়ি গুজরান হয়ে যায়। তাই আমাদের সে রাত্রিটিও যেন চোখের পলকেই খতম হয়ে গিয়েছিল।

এক ক্রীতদাসী জানাল, ভোর হয়ে এল বলে। এবার কেটে পড়তে হবে। নইলে পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ভীষণ বেকায়দায় পড়তে হবে আমাকে।

অজ্ঞাত পরিচয় খুবসুরৎ লেড়কিটির সহজ সরল ও মিষ্টি মধুর আচরণ আমার বুকে স্থায়ী আস্তানা গাড়ল। যেন কতকালের আত্মিক সম্বন্ধ রয়েছে আমাদের মধ্যে। নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছি আমরা। তাই তাকে ছেড়ে আসতে আমার বহুৎ তকলিফ হচ্ছিল। সে-ও আমাকে সুকরিয়া জানাতে গিয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না।

আমি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বল্‌লাম—'আমি আপনাকে কতটুকু দিতে পেরেছি বলতে পারব না। কিন্তু বুক ভরে যেটুকু নিয়ে গেলাম তা বিলকুল অতুলনীয়।'

আরও বহুৎ কিছু বলার ছিল, শোনাবারও ছিল বহুৎ-ই। কিন্তু দিনের আলো বেগড়া বাঁধাল। ফর্সা হয়ে আসায় আমি লম্বালম্বা পায়ে তার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

নিজের মকানে ফিরে ভোরের নামাজ সেরে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। তামাম দিন ঘুমিয়ে কাটালাম। সন্ধ্যায় বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

সাফ সুতরা পোশাক গায়ে চাপিয়ে প্রাসাদে হাজির হলাম। প্রাসাদের প্রধান রক্ষীর মুখে শুনলাম, খলিফা ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগলাম। ফিন সে প্রাসাদের সামনে হাজির হলাম। অব্যক্ত এক নেশা আমার কাঁধে ভর করেছে। নইলে সে খুবসুরৎ লেড়কির প্রাসাদে যাওয়ার কোন্ দরকার ছিল?

আগের দিনের সে বাক্সটি ফিন রশির কাঁধে ভর করে নেমে এল। আমি মোহমুগ্ধের মত বসে পড়লাম।

সে-খুবসুরৎ লেড়কিটি আমাকে দেখেই আচমকা সরবে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে এক সময় বল্‌ল—'কি গো সাহাব, এখানেই পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার ইচ্ছা নাকি?'

আমি আমতা আমতা ক'রে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম—'তা হলেও খারাপ হয় না। আমি তো আপনার মেহমান, মেহমানকে তিন দিন সেবাযত্ন করার বিধান রয়েছে। আজ তো সবে দ্বিতীয় দিন। তৃতীয় দিন গুজরান হয়ে যাওয়ার পরও যদি হাজির হই তখন অবশ্যই দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারেন।'

আমরা তামাম রাত্রি গানা, কবিতা ও কিস্‌সা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে গুজরান করে দিলাম।

ভোরে আমি খুবসুরৎ লেড়কিটির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। ভাবলাম, আমার অনুপস্থিতির গুস্তাকী খলিফা নির্ঘাৎ মাফ করবেন না। কিন্তু খুবসুরৎ অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন লেড়কিটির ব্যাপারে বল্‌লে হয়ত এদফা কোনরকমে ব্যাপারটিকে সামাল দেয়া যাবে।

আমি লম্বা লম্বা পায়ে ফিন লেড়কিটির কামরায় ফিরে গেলাম।

আমাকে ফিরতে দেখে লেড়কিটি চোখ দুটো কপালে তুলে ব'লে উঠল—'কি সাহাব, ঘুরে এলে যে?'

আপনি তো আমার কণ্ঠের গানা শোনার জন্য বহুৎ উৎসাহ প্রকাশ করছিলেন। আপনার সাধ আমি পূর্ণ করতে পারি নি। হঠাৎ আমার এক ভাইয়ার কথা মনে পড়ে গেল। সে বহুৎ আচ্ছা গানা গাইতে পারে। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আজ রাত্রে তাকে নিয়ে আসতে পারি।'

লেড়কিটি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি এবার বল্‌লাম—'আজকেই শেষ। ভবিষ্যতে আর কোনদিনই আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না।'

এমন সময়ে ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিনশ' ছিয়াশিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, গায়ক ইশাক কিস্‌সা বলে চলেছেন—'আপনার দিমাক খারাপ হয়ে গেছে নাকি? আপনার ভাইয়াকে নিয়ে আসতে চাইছেন সে তো খুশীর কথা। এতে আপত্তির তো কিছুই থাকতে পারে না। নিয়ে আসবেন। তার গানা শুনে দিল্ ভরপুর করে নেয়া যাবে।'

আমি লেড়কিটির সম্মতি পেয়ে কাঠের বাক্সটিতে বসলাম।

আমার মকানে ফিরে দেখি, খলিফার দূত দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে। খলিফার জরুরী তলব।

দরবারে হাজির হতেই খলিফার বিষাদপূর্ণ মুখ নজরে পড়ল। বাজখাই গলায় গর্জে উঠলেন—'জানোয়ার কাঁহিকার। তোমার এত বড় বুকের পাটা! আমার হুকুম অগ্রাহ্য কর কোন্ সাহসে!'

—'জাঁহাপনা, গুস্তাকী মাফ করবেন। মেহেরবানি করে আগে আমার সব বাৎ শুনুন। তারপর যদি আমাকে কোতলও করেন, আপত্তি করব না।'

—'বাৎ? কি সে বাৎ? বল শুনি, কি বলতে চাও তুমি।'

—'জাঁহাপনা, দরবারে, সবার সামনে বলার মত ব্যাপার নয়। একটু আড়ালে আবডালে বলতে চাই।'

খলিফার নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে দরবার কক্ষ খালি হয়ে গেল। আমি দু'রাত্রের ঘটনা সবই খোলসা করে তাঁকে বল্‌লাম। আজ রাত্রে সে যে আমাদের পথ চেয়ে বসে থাকবে তা-ও বলতে

ভুললাম না।

খলিফার মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল। আমি শুধু বেকসুর খালাসই পেলাম না, তিনি নানাভাবে আমার কাজের তারিফ করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার আন্ধার নামতে না নামতেই আমি খলিফার প্রাসাদে হাজির হলাম। দেখি, তিনি এক বণিকের ছদ্মবেশে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে আমার অপেক্ষায় বসে।

আমরা প্রাসাদ ছেড়ে বেরোলাম। পথে যেতে যেতে বল্‌লাম, 'জাঁহাপনা, সেখানে গিয়ে লেড়কিটির কাছে কিন্তু ভুলেও আমার পরিচয় দেবেন না। তবে কিন্তু আমার ইজ্জৎ একদমঢিলা হয়ে যাবে।'

—'বহুৎ আচ্ছা। তোমার খুশী মাফিকই কাজ হবে।'

আমরা প্রাসাদটির সে প্রাচীরের কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই কাঠের বাক্সটি নেমে এল। হাজির হলাম খুবসুরৎ সে লেড়কিটির কামরায়।

খলিফা বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে লেড়কিটির সুরতের সুধা পান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিষ্পলক তাঁর চাহনি। ব্যাপারটি আমার নজর এড়াল না।

খুবসুরৎ লেড়কিটি যখন তার কিন্নর কণ্ঠে গানা ধরল তখন তো খলিফার হালৎ একদম বে-সামাল হয়ে পড়ল। তিনি যেন দরিয়ায় পড়ে গেছেন। আমার অনুরোধ ভুলে গিয়ে অকস্মাৎ ব'লে উঠলেন, 'করছ কী ইশাক। এমন সুন্দর চাঁদনী রাত, এমন মনলোভা পরিবেশ—বিলকুল বরবাদ করে দিচ্ছ ইশাক! গানা ধর, এমন মধুঝরা রাত কী বার বার আসবে!'

আমার সব কৌশল ফাঁস হয়ে গেল। লেড়কিটির কাছে আমি প্রবঞ্চক বনে গেলাম।

উপায় নেই। খলিফার নির্দেশে গানা ধরতেই হ'ল।

লেড়কিটি এক সময় তার চোখের মণি দুটোকে বার বার খলিফা ও আমার মুখের ওপর চক্কর মারাল। ব্যস, পরমুহূর্তেই ঝট্ ক'রে পর্দার আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করল। তার চোখ মুখের ভীতি ও আতঙ্কটুকু আমার নজর এড়াল না।

লেড়কিটির চোখ মুখের ভাষা ব'লে দিল সে ধরতে পেরে গেছে, স্বয়ং খলিফাই বণিকের ছদ্মবেশে হাজির হয়েছেন। আমার পরিচয় তো আবেগের বশে খলিফাই দিয়ে দিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ ইশাক খলিফা ছাড়া আর কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে না। আর খলিফার সামনে বে-আব্রু? অসম্ভব। তাই পর্দার আড়ালে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

খলিফা ব্যাপারটির অন্য রকম অর্থ করলেন। তিনি ক্ষোভের সঙ্গেই বলে উঠলেন—'ইশাক, লেড়কিটির কি আমাকে পছন্দ্ হয় নি? নইলে এমন ঝট্ ক'রে চলে গেল যে বড়। এক কাজ কর, এর খোঁজ নাও কার মকান এটি। লেড়কিটির অভিভাবকই বা কে? আর লুকোচুরি করে ফয়দা নেই। চিনেই যখন ফেলেছে তখন এ-মকানের মালিককে তলব কর।'

পাত্তা লাগিয়ে জানা গেল, খলিফারই দরবারের উজির শাহাল্ মকানটির মালিক। আর খুবসুরৎ লেড়কিটি তাঁরই।'

খলিফার তলব পেয়ে উজির হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। কুর্নিশ ক'রে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উজির বল্‌লেন—'এ-লেড়কি আমারই বটে। কাদীজা এর নাম।'

—'তোমার লেড়কির শাদী-নিকা কিছু হয়েছে কি?'

—'না, জাঁহাপনা। এখনও শাদী দেয়া হয় নি।'

—'তোমার লেড়কিকে আমি শাস্ত্রমতে শাদী করে বেগমের মর্যাদা দিতে চাই। তোমার কোন আপত্তি—'

—'জাঁহাপনা, আমি তো আপনার গোলাম। আপনার মতই আমার মত, আমার লেড়কির মতও বটে।'

আমি তোমার লেড়কিকে এক লাখ দেন মোহর দেব। তুমি লেড়কিকে বুঝিয়ে রাজী করাও। আর সে সঙ্গে তোমার লেড়কির আত্মীয় পারিজনদের জন্য এক হাজার গ্রাম আর এক হাজার খামার যৌতুকস্বরূপ দান করব।'

খলিফা আসন ত্যাগ করলেন। এবার আর তাঁর বাক্সের মধ্যে

বসে মকানটি থেকে বেরোবার দরকার নেই। সদর-দরওয়াজা দিয়েই বেরিয়ে বাদশাহের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

খলিফা পথ চলতে চলতে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্লেন—'ইশাক, এ-ব্যাপারটি ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে ফাঁস কোরো না। কাদীজা-র জীবদ্দশায় কারো কাছেই মুখফুটে কারো কাছেই বলিও নি।'

আমার এত উমর হ'ল কিন্তু কাদীজা-র মাফিক রূপ সৌন্দর্যর আকর দুনিয়ার কোন লেড়কিকেই দেখিনি। বেহেস্তের হুরী ছাড়া খোদাতাল্লা তামাম দুনিয়ায় আর কারো শরীরে এমন রূপ ঢেলে দিয়েছেন কিনা আমার অন্ততঃ জানা নেই।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটি শেষ করে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চুপ করলেন।

সূচী-অসূচীর কিস্সা

বেগম শাহরাজাদ অন্য আর একটি কিস্সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বছরের এক পবিত্র তিথিতে মক্কায় বহু ধর্মভীরু আদমিদের ভিড় জমে। পুণ্যার্থীরা কাবাহ মসজিদকে প্রদক্ষিণের মাধ্যমে আল্লাহ-র কৃপা ভিক্ষা করে।

এক সকালে একদল পুণ্যার্থী কাবা মসজিদকে প্রদক্ষিণ করে প্রত্যেকে আল্লাহ-র কাছে নিজ নিজ কামনার কথা নিবেদন করছিল। তাদের একজনের মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক বাসনার কথা প্রকাশ পায়। তা শুনে অন্যান্যরা তো ক্ষেপে একদম লাল হয়ে গেল।

আদমিটি অনুচ্চ কণ্ঠে বল্লেও অনেকেই শুনতে পেল, সে বল্ছে—'খোদা মেহেরবান, লেড়কিটি যেন তার স্বামীকে ঘৃণা করে। তবে আমার নসীব ফিরবে। আমি জিন্দেগীভর তাকে নিয়ে শুতে পারব।'

তীর্থক্ষেত্রে এরকম বাৎ কারো মুখ দিয়ে বেরোলে কার না শিরে খুন চেপে যায়! এমন জঘন্য এক কাজ কার সহ্য হয়? তাই সবাই ক্ষেপে গিয়ে তাকে ঘা কতক দিয়ে দিল। কাবাহ আমিরের সামনে হাজির করল। তিনি সুলতানেরও সুলতান। মুলুকের সর্বময় কর্তা। স্বয়ং সুলতানও তাঁর কথায় ওঠেন-বসেন।

কাবাহ-আমির সবকিছু শুনে হুকুম দিলেন—'একে ফাঁসির দড়িতে লটকে দেয়া হোক।'

এমন সময়ে ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সাতাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, কাবা-আমিরের মুখে ফাঁসির হুকুমের বাৎ শুনে সে-বে-শরম আদমিটি তড়াক্ ক'রে তার পায়ের ওপর পড়ে গিয়ে কেঁদে কেটে বল্ল—'হুজুর, আপনি ধর্মের রক্ষক, আপনিই আল্লাহ-র পয়গম্বর। আপনি মেহেরবানি করে আমার জান রক্ষা করুন।'

—'জাঁহাপনা, আমার সব বাৎ আগে শুনুন। দু'টি কাজ-এ আমি নিযুক্ত। পয়েলা নম্বর—রাস্তার ময়লা আবর্জনা সাফাই করা আর দুসরা—কশাইখানা থেকে ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি কুড়িয়ে কাড়িয়ে সাফ সুতরা করে সেগুলো বেচা।

জাঁহাপনা, এক সকালে আমি কসাইখানা থেকে এরকম নাড়িভুঁড়ি কুড়িয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একদল আদমি ছুটতে ছুটতে আমার দিকে আসছে। সবার মুখেই ভীতি ও আতঙ্কের ছাপ। তাদেরই পিছন পিছন একদল ক্রীতদাস লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে আসছে।

ব্যাপার দেখে আমি তো বিলকুল হতভম্ভ। একজনকে পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—'ব্যাপার কি হে?'

আদমিটি ছুটতে ছুটতেই বল্ল—'হারেমের জেনানা'রা এ-পথ দিয়ে যাবে। তাই রাস্তা সাফ করছি। কোন আদমিই থাকবে না।'

ইয়া আল্লাহ! তার বাৎ শুনেই আমার তো কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। এখন উপায়? লুকাই কোথায়?

উপায়ান্তর না দেখে গাধাটিকে একধারে দাঁড় করিয়ে নিজে একটি মকানের দিকে মুখ ক'র পাথরের মাফিক দাঁড়িয়ে পড়লাম। রেহাই নেই। দু'জন মস্তান গোছের আদমী আমাকে আচমকা পিছন দিকে থেকে জাপটে ধরে ফেল্ল। আর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, একটি ইয়া তাগড়াই নিগ্রো আমার গাধাটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

অন্য দিকে ঘাড় ঘোরাতেই নজরে পড়ল প্রায় ত্রিশটি লেড়কি আমার দিকে ইয়া বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে। অপলক তাদের চাহনি। চোখের তারায় বিস্ময়। তাদের মধ্যে একটি তো খুবসুরৎ। একদম বেহেস্তের হুরী। এমন সুরৎ কোন লেড়কির থাকতে পারে আমার অন্ততঃ জানা ছিল না।

নিগ্রো দুটো আমাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চল্ল। আমি বার বার বল্লাম, আমি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে খাড়া ছিলাম। পাত্তাই দিল না।

আমার পক্ষ নিয়ে কয়েকজন পথচারী নিগ্রো দুটোর দিকে তেড়ে এল—'একী তাজ্জব ব্যাপার! এ-আদমীর কসুর কি এ কী জুলুম! এর নোকরিই তো পথ সাফ সুতরা করা! পথ ছেড়ে যাবেই বা কোথায়? আর দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকায় হারেমের কোন জেনানার দিকেই তো নজর দিতে পারে নি। এমন নির্দোষ আদমির ওপর জুলুম চালালে খোদাতাল্লা ক্ষমা করবেন না।'

নিগ্রো দুটো তাদের বাৎ কানেই তুল্ল না। আমাকে নিয়ে

চল্‌ল।

আমি ভাবলাম আমার গাধার পিঠে রাখা নাড়িভূঁড়ির গন্ধে হয়ত কোন জেনানার উল্টি এসে থাকবে। সে কসুরের কারণেই হয়ত আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খোদাতাল্লাই আমার উদ্ধারের একমাত্র ভরসা।

আমাদের সামনে পথ চলেছে হারেমের জেনানার দল। কিছুটা পথ আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে সুবিশাল এক প্রাসাদের আদালত কক্ষে দাঁড় করাল। আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি নিঃসন্দেহ, হয় গর্দান যাবে নয়তো শূলে চড়াবে। জান আমার খতম হচ্ছেই। আমার পরিবারের কেউ আমার হালৎ জানতেও পারবে না। তাজা আদমিটি মকান থেকে কাজে গেল, আর ফিরল না। ব্যস, এটুকুই। আমার লাশের হদিশও কেউ পাবে না।

আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলাম।

কিছু সময় বাদে এক আদমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে হারেমে ঢুকল। আমাকে দেখেই তিনটি জেনানা বল্‌ল—'তোমার ওই জব্বর বাদশাহী সাজপোশাক খুলে ফেল হে।'

আমি তো হতভম্ব। যন্ত্রচালিতের মাফিক আমার কোর্তা পাৎলুন খুলে একদম উলঙ্গ হয়ে গেলাম। তারা আমাকে হামামে নিয়ে গিয়ে গরম পানি ছোবড়া দিয়ে রগড়ে আমার সাধের ময়লার আস্তরণ তুলতে গেলো। আচ্ছা ক'রে গোসল করিয়ে এক দম সাফসুতরা করে ফেল্‌ল। এবার খুসবুওয়ালা পানিতে আমাকে চুবিয়ে নিল।

গোসল করিয়ে জেনানা তিনটি আমাকে পাশের কামরায় নিয়ে গিয়ে সোনার জরিয়ের নয়া কোর্তা-পাৎলুন পরিয়ে দিয়ে একদম নবাব বাদশাহ-বানিয়ে দিল। এমন দুঃখের মধ্যেও মুহূর্তের জন্যে হলেও চিকনাই পোশাকের দিকে তাকিয়ে খুশীতে আমার দিল্ নেচে উঠল। পথে ঝাড়ু চালিয়ে যে-আদমি জঞ্জাল সাফা করে বেড়ায় আর ভেড়ার নাড়িভূঁড়ি ঘাটাঘাটি করে তার গায়ে এমন বাহারের পোশাক চাপলে খুশী হওয়াই তো স্বাভাবিক।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় শালিকের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল। ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' অষ্টআশিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ঝাড়ুদার ও ভেড়ার নাড়িভূঁড়ির কারবারী তার কিস্‌সা ব'লে চলেছে—আমাকে তো দামী ও চিকনাই সাজ পোশাক পরিয়ে বিলকুল আমীর-বাদশাহ বানিয়ে দেয়া হ'ল।

সাজগোছ করিয়ে আমাকে শাদীর পাত্রের মাফিক তোয়াজ করতে করতে নিয়ে গিয়ে সুসজ্জিত একটি কামরায় নিয়ে গেল, মখমলের চাদর বিছানো পালঙ্কের ওপর বসিয়ে দিল।

রাস্তায় লেড়কিদের ভিড়ের মধ্যে যাকে বেহেস্তের হুরী বলে মালুম হয়েছিল সেই পালঙ্কের এক পাশে আধ-শোয়া অবস্থায় রয়েছে দেখলাম। কেবলমাত্র অতি মিহি, একদম ফিনফিনে একটি সেমিজ তার গায়ে।

খুবসুরৎ লেড়কিটি আমার দিকে আচমকা চোখের বাণ মারল। কারবার দেখে আমি যেন আশমান থেকে জমিনে পড়লাম।

আমি স্থবিরের মাফিক বসে রইলাম। কি করব, কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। লেড়কিটি এবার চোখে ইশারা করে আমাকে তার কাছে এগিয়ে, গা-ঘেঁষে বসতে বল্‌ল।

বাঁদীরা খানাপিনা সাজিয়ে দিয়ে গেল। খিদেয় আমার পেটের মধ্যে আগ্নেয়গিরির দাপাদাপি চলছে। লেড়কিটি মাত্র একবার বলাতেই আমি থালা থেকে খানা তুলে গিয়ে ঝটপট উদরে চালান দিতে মেতে গেলাম। ভাবলাম, আগে পেটের জ্বালা তো নেভাই নসীবে যা আছে তা-তো হবেই।

হরেক কিসিমের সরাবের বোতল সাজানো। পেয়ালা ভরে সরাব গলায় ঢালতে লাগলাম। সরাবের এমন খুসবু জিন্দেগীতে পাই নি। লেড়কিটিও গলা পর্যন্ত সরাব গিল্‌ল।

আমাদের উভয়ের চোখের তারায় গোলাবী নেশার ছোপ ফুটে উঠল।

লেড়কিটি আচমকা এক হেঁচকা টানে আমাকে একদম তার বুকের ওপর তুলে নিল। আমি বিলকুল মিশে গেলাম তার তুলতুলে

দেহের সঙ্গে, আমার প্রশস্ত বুকের চাপে তার সমুন্নত নিটোল স্তন দুটো নিষ্পেষিত হতে লাগল। আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুচ্চ কণ্ঠে ব'লে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ! লেড়কিদের স্তনের ছোঁয়া এত আরামদায়ক আগে তো মালুম হয় নি! আমি তখন যেন নিজেকে বিলকুল হারিয়ে হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়ে গেছি—।

তারপর যা কিছু ঘটল সেসব ঘটনার কথা আপনার সামনে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমি মুখফুটে না বল্‌লেও, অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন।

জাঁহাপনা, আমার খেটে খাওয়া পেশীবহুল শরীরে তাগত তো কম নয়। একটি লেড়কিকে তৃপ্তি দিয়ে তার কামজ্বালা নির্বাপিত করার মত শক্তি সামর্থ্য আমার যে আছে তা আশা করি অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন। মোদ্দা বাৎ, সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করল। তার যৌবনের জোয়ার লাগা দেহটি এক সময় অসার হয়ে বিলকুল এলিয়ে পড়ল। নিজের পুরুষত্বের জন্য মুহূর্তের জন্য হলেও গর্ব অনুভব করলাম।

লেড়কিটি তামাম রাত্রি লতার মত আমাকে জড়িয়ে পড়ে রইল। আমার হালৎ এমন হ'ল—আমি বুঝি খোয়াব টোয়াব দেখছি।

বাগিচায় পাখির ব্যস্ততা শুরু হ'ল। লেড়কিটি এবার বিমর্ষমুখে বল্‌ল—'ভোর হয়ে এল ব'লে। এবার আমাকে ছেড়ে যেতেই হবে। ওঠ, তৈরী হয়ে নাও।'

আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পালঙ্কের ওপর উঠে বসলাম। লেড়কিটির মুখের দিকে চোখ মেলে তাকালাম। তাজ্জব ব্যাপার। তার মধ্যে কামনার লেশ মাত্র নেই।

আমি কামরা ছেড়ে বেরোবার উদ্যোগ নিলাম। লেড়কিটি একটি নক্সা করা রেশমী রুমাল আমার হাতে গুঁজে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'এ রুমালটি সঙ্গে সঙ্গে রেখো, আমার কথা ইয়াদ থাকবে।'

রুমালটির এক কোণে একটি গিঁট দেয়া। কি যেন বাঁধা আর অন্য কোণটিতে লেখা—গাধাটিকে খানা খরিদ করে দিও।'

আমি বিষণ্নমুখে দরওয়াজার দিকে পা-বাড়ালাম।

লেড়কিটি আমার একটি হাত জড়িয়ে ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল—'মাঝে-মধ্যে তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে। নফরকে দিয়ে খবর দেব, এসো কিন্তু।'

আমি মুচকি হেসে বল্‌লাম—'আলবৎ আসব। খবর পেলেই বান্দা হাজির হবে শাহজাদী।'

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গাধাটিকে নিয়ে নাড়িভুঁড়ির দোকানে গিয়ে মালগুলো বেচে দিলাম। এবার নিজেকে একটু হাল্কা বোধ হ'ল।

রুমালের গিঁটের দিকে এবার নজর দেয়ার ফুরসৎ পেলাম। ধারণা ছিল, লেড়কিটি এক আধটি দিনার টিনার বেঁধে দিয়েছিল। রুমালের গিঁটটি খুলতেই আমি ভিমরি খাবার জোগাড় হলাম। দেখি পঞ্চাশটি সোনার দিনার। এতগুলো মুদ্রা একসঙ্গে দেখা এর আগে কোনদিন নসীবে কুলোয় নি।

এতগুলো সোনার দিনার সঙ্গে নিয়ে ঘোরা মোটেই নিরাপদ নয় ভেবে নিরিবিলি একটি জায়গা খুঁজে মাটির তলায় পুঁতে রাখলাম। আখেরে কাজ দেবে।

আমি এবার দোকানের রোয়াকে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। মাথার ভেতরে হাজার খানেক চিন্তা, বিশেষ ক'রে গত রাত্রের প্রতিটি মুহূর্তের মধুময় স্মৃতি ভিড় করতে লাগল। তামাম দিন গালে হাত দিয়ে কিভাবে যে গুজরান করে দিলাম, আমার মালুমই হয় নি।

চারদিকে সন্ধ্যার আন্ধার নেমে এসেছে। আমি তখনও দোকানের রোয়াকে গালে হাত দিয়ে বসে তন্ময় হয়ে ভেবে চলেছি।

হঠাৎ এক মাঝ-বয়সী আদমি এসে বল্‌ল—'মেম সাহাব, চলুন।'

আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললাম—'যেতে হবে? কোথায় যেতে হবে?'

—'চলুনই না, গেলেই তো জানতে পারবেন। উঠুন—চলুন।'

আমি আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সময় নষ্ট করলাম না। নীরবে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

মোহমুগ্ধের মত হাঁটতে হাঁটতে ফিন সে-প্রাসাদের হারেমে হাজির হলাম।

কামরায় ঢুকে দেখি, খুবসুরৎ লেড়কিটি পালঙ্কের ওপর আগের মত পাতলা একদম ফিনফিনে একটি মাত্র সেমিজ গায়ে চড়িয়ে মনলোভা ভঙ্গিতে বসে। তার একটি পায়ের অনেকাংশ উন্মুক্ত। সেমিজটিকে ইচ্ছা ক'রে তুলে নেয়া হয়েছে নাকি তার অন্যমনস্কতার সুযোগে উঠে গেছে মালুম হ'ল না। আমার চোখ দুটো তার ধবধবে সফেদ ও নিটোল থাইয়ের ওপরে স্থির হয়ে গেল। আমার কলিজায় দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। শিরায় শিরায় খুনের গতি গেল বেড়ে। খুনে আমার মাতন লেগে গেল।

আমি তাকে কুর্নিশ জানাতে ভুলে গেলাম। সে আমার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল—'কি গো মিঞা, কি দেখছ এমন ক'রে?'

তার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই আমি যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। আচমকা তাকে কুর্নিশ ক'রে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লেড়কিটি আচমকা আমার একটি হাত ধরে এমন জোরে এক হেঁচকা টান দিল যে আমি টাল সামলাতে না পেরে একদম তার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মুহূর্তে দু'বাহুর বন্ধনে আমাকে আবদ্ধ ক'রে ব'লে উঠল—'দূর থেকে তুমি না হয় চোখ দুটোকে তৃপ্তি করছ কিন্তু আমার হালতের ব্যাপার একবারটি ভেবে দেখেছ? এদিকে আমি যে একটু একটু করে গলতে শুরু করেছি মেহবুব। বুকের ধন দূরে থাকলে দিল্ বরদাস্ত করবে কেন?'

জাঁহাপনা, আগের রাত্রের সে-নেশায় আমি মেতে গেলাম। কি ক'রে যে এতবড় রাত্রিটি গুজরান হয়ে গেল মালুমই হ'ল না। ভোর হতেই লেড়কিটি আমাকে তুলে দিল।

আমি লেড়কিটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরওয়াজার কাছাকাছি যেতেই সে গতদিনের মাফিক একটি রুমাল আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বল্‌ল—'এটি নিয়ে যাও, আখেরে কাজে লাগতে পারে।'

আমি সোনার দিনারগুলো আগের দিনের জায়গাটিতেই গর্ত খুঁড়ে পুতে রাখলাম।

আমি পর পর আটরাত্রি সম্ভোগসুখ লাভ ও পঞ্চাশটি করে সোনার দিনার উপার্জন করলাম। আর সে-সঙ্গে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যাপার তো ছিলই।

একদিন সে খুবসুরৎ লেড়কির কামরায় হরেক কিসিমের উপাদেয় খানা ও দামী সরাব দিয়ে খানাপিনা সারলাম। তারপর গায়ের কোর্তাটি খুল্‌লাম। পাৎলুনটি যেই খুলতে যাব অমনি এক বাঁদী ব্যস্ত পায়ে কামরায় ঢুকল। লেড়কিটির কানে কানে প্রায় ফিসফিসিয়ে কি যেন বল্‌ল। মুহূর্তেই লম্বা লম্বা পায়ে ফিন কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। লেড়কিটি এক লাফে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ল।

আমি লেড়কিটির মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকালাম। আমি কিছু বোঝার আগেই সে আমার হাত ধরে টানতে টানতে ছাদের সিঁড়ির একটি কামরায় হাজির করল। বিলকুল গুমটির মাফিক ছোট কামরাটি। আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে সে চুপিসারে চলে গেল।

আমি ঘুলঘুলি দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। হঠাৎ নজরে পড়ল কয়েকটি আদমি ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে সদর-দরওয়াজায় নামল। সুঠামদেহী এক নওজোয়ান তাদের সঙ্গে রয়েছে। সে ঘোড়া থেকে নেমেই এক দৌড়ে খুবসুরৎ লেড়কিটির কামরায় ঢুকে পড়ল।

আমি এবার সরে এসে অন্য একটি ঘুলঘুলিতে চোখ রাখলাম। সেটি দিয়ে কামরাটির ভেতরের বেশ কিছু অংশ ভালই নজরে পড়ে।

দেখলাম, নওজোয়ানটি কামরায় ঢুকেই চোখের পলকে কোর্তা পাৎলুন খুলে একদম উলঙ্গ হয়ে পড়ল। মালুম হ'ল সে এক বীর যোদ্ধা। নির্ঘাৎ সেনাপতি গোছের কিছু হবে।

কোর্তা-পাৎলুন খুলেই সুঠামদেহী নওজোয়ানটি এক লাফে লেড়কিটির ওপর চেপে বসল।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই কামোত্তেজনার ফোঁসফোসানি আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আর লেড়কিটি থেকে থেকে তৃপ্তি আহাঃ! উফ! ইস্-ইস্ প্রভৃতি বিচিত্র অস্ফুট আওয়াজ তুলতে লাগল। সে একের পর এক শীৎকারের মাধ্যমে তৃপ্তিটুকু নিঙড়ে নিঙড়ে উপভোগ করছে মালুম হ'ল। এরকম দৈত্যের মাফিক পৌরুষ না থাকলে লেড়কিদের কামজ্বালা নির্বাপিত হয় না। আমি রাতভর তাদের রতিরঙ্গ দেখে অব্যক্ত যন্ত্রণায় দগ্ধে মরতে লাগলাম অন্ধকার খুপরটির মধ্যে। নিজেকে বড়ই ছোট মনে হতে লাগল। নিজের দৈন্যদশা সে-মুহূর্তে অন্ততঃ আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। এমন আসুরিক পৌরুষ আমি কোথায় পাব? আমার গায়ে কি সে তাগদ আছে? আমি কি তাকে এরকম তৃপ্তি দিতে পেরেছি? অবশ্যই না।

এমন সময় পূব-আকাশে রক্তিম ছোপ ফুটে ওঠায় বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ উননব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী

অংশটুকু বলতে শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আন্ধার খুপরীটির ভেতর দাঁড়িয়ে সে-আদমি ভাবছে এ-নওজোয়ানটি নির্ঘাৎ লেড়কিটির স্বামী। ভোর হওয়ার আগেই নওজোয়ানটি কোর্তা-পাৎলুন গায়ে চাপিয়ে ব্যস্ত-পায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে লেড়কিটি এসে খুপরীর শেকল খুলে আমাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিল।

সে আবেগ-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বল্‌ল—'আমার স্বামীকে দেখেছ?' আমি ফ্যাকাসে মুখে বল্‌লাম—'দেখছি। কিন্তু একটি বাৎ, তিনি তো একদম নওজোয়ান। শরীর-স্বাস্থ্যও বহুৎ আচ্ছা। গায়ে তাগদও মাত্রাতিরিক্তই আছে বলে মালুম হচ্ছে। কিছুমাত্র ঘাটতিও তাঁর আছে বলে মালুম হচ্ছে না। তাজ্জব ব্যাপার! এতকিছু সত্ত্বেও তিনি তোমার কামজ্বালায় শান্তি বারি ছিঁটিয়ে তোমাকে ঠাণ্ডা করতে পারে না?'

—'হ্যাঁ, একদম সাচ্চা বাৎ বলেছ। আমার স্বামীর মাফিক তাগদ খুব কম আদমিরই আছে। আর এ-ই তো আমার বড় সমস্যা। এরকম পুরুষত্ব যার তাকে কি কোন লেড়কি হরবখত তৃপ্তি দিতে পারে? আমিও পারি না। এতে আমার স্বামী গোস্‌সায় একদম লাল হয়ে যায়।'

তোমার কাছে বলতে দ্বিধা নেই। একদিনের ঘটনা তোমাকে বলছি—সেদিন সন্ধ্যায় আমি আর আমার স্বামী বাগিচার এক বেঞ্চে পাশাপাশি, একদম গা-ঘেঁষাঘেষি ক'রে বাৎচিৎ করছি। আচমকা সে উঠে চলে গেল। কেন, কি ব্যাপার আমি কিছুই ঠাহর পেলাম না। আমি পা টিপে টিপে তাকে অনুসরণ করলাম। কামরার ভেতরে উঁকি দিয়ে যা দেখলাম তাতেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এক প্রৌঢ়া ঝিকে জড়িয়ে শুয়ে রয়েছে। ইয়া আল্লাহ! কোন আদমির রুচি এমনও হতে পারে, ভাবতেই গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে সে-মুহূর্তেই আল্লাহর নামে কসম খেলাম, এর সমুচিত জবাব আমি দেবই দেব। আর আমি পথের নোংরা মেথরকে দিয়ে কামপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি করব। তারপরই আমার বাঞ্ছিত আদমির তল্লাশী লাগালাম। পাঁচ পাঁচটি দিন তল্লাশী চালিয়ে তোমাকে পেয়ে গেলাম। তারপর তোমাকে দিয়ে আমার কামজ্বালা নিবিয়েছি। তার কাজের যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছি। ব্যাপারটি সে বুঝতে পেরে গেছে। তাই কালরাত্রে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। রাতভর আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হ'ল। তারপর একটি ফয়সালাও হয়ে গেল। আমার কাছে কসম খেয়েছে, ওরকম নোংরা কাজ ভুলেও আর কোনদিন করবেনা। পুরুষদের কসমটসমের ওপর আমার আস্থা নেই। শোন, ভবিষ্যতে ফের সে যদি ওরকম কোন নোংরা কাজে প্রবৃত্ত হয় তবে আমি ফিন তোমাকে তলব করব। এখনকার মত তুমি বিদায় নিতে পার।

সেদিন আমি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় লেড়কিটি এক সঙ্গে চার শ' সোনার দিনার ইনাম হিসাবে আমার হাতে গুঁজে দিল।

ব্যস, তার পরদিন থেকেই আমি অপেক্ষা করছি কবে তার স্বামী ফিন সেরকম কোন নোংরা কাজে লিপ্ত হবে। ফিন নোংরা কোন লেড়কি বা জেনানার কাছে যাবে। একদিন দু'দিন করে পুরো একটি বছর হয়ে গেল, আমার মেহবুবার কাছ থেকে ফিন ডাক এল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বহুৎ তকলিফ করে, পয়দল এ-মক্কায় হাজির হয়েছি। আল্লাতাল্লার কাছে আমার বাসনা জানিয়েছি। কাবাহ প্রদক্ষিণ করার সময় আমি বার বার বলেছি আমার বাঞ্ছিতাকে পাওয়ার ফিকির করে দিতে। আপনি বলুন হুজুর, আমি এতে কোন্ কসুর করেছি?

আমির আদমিটির কসুর মাফ করে দিলাম। তেমন কোন বড় রকম কসুর তো তিনি করেন নি।

আবু ইসার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ জানালা দিয়ে বাগিচার দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, এখনও ঢের রাত্রি রয়েছে। তিনি নয়া একটি কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, আপনাকে এবার আবু ইসার কিস্‌সা শোনাচ্ছি।

আবু ইসা ছিলেন হারুণ-অল-রসিদ-এর লেড়কা। তিনি একবার তাঁর ফুফার লেড়কা আলী বন হিমাস-এর মকানে মেহমান হয়ে কিছুদিন ছিলেন। আলী বহুৎ ধনী। তার আছে দিনারের পাহাড়। একদম দিনারের কুমির।'

সুরমা নামে আলীর খুবসুরৎ এক বাঁদী ছিল। পূর্ণ যৌবন আবু ইসা আলী-র মকানে যাওয়ার পর সুরমা'কে দেখেই তার মহব্বতে পড়ে যান। যাকে বলে একদম মহব্বতের সাগরে হাবুডুবু খাওয়ার হালৎ।

আবু ইসা বুকভরা দুঃখ হতাশা নিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে আসেন। বাঁদীটির মহব্বতে পড়ে তিনি যে অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছেন সে-বাৎ কারো কাছে মুখফুটে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

দিন যায়। মাহিনাও ক্রমে গুজরান হয়। কিন্তু আবু-র দিলের বিরহ-যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। বাঁদীটির চিন্তা দিল্ থেকে ঝেড়ে ফেলার প্রয়াস চালিয়েও কোনই ফয়দা হয় না। তাকে ভুলে থাকা বিষম দায় হয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে এক সকালে আবু ফিন আলী-র মকানে হাজির হল। মহব্বতের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে শেষ

পর্যন্ত সে শরম-ইজ্জৎ খুইয়ে দিলের সে-গোপন ইচ্ছা আলী-র কাছে প্রকাশ করেই ফেলেন।

বার কয়েক আমতা আমতা করে আবু বল্‌লেন—'ভাইয়া, তোমার ওই বাঁদীটি আমার বহুৎ পছন্দ্। তুমি ওকে বেচতে রাজী থাকলে আমি উচিত দাম দিয়ে খরিদ করে নিতে চাই।'

—'ইয়া আল্লাহ! সুরমা আমার হারেমের প্রধানা বাঁদী। ওর সুরৎ-ও সবচেয়ে বেশী। তামাম আরব দুনিয়া ঢুঁড়ে এলে ওর মাফিক সুরৎ খুব কম লেড়কির মধ্যেই দেখা মিলবে। কেনা-বেচার কারবার করতে তো আর আমি ওকে দশ হাজার দিনার দিয়ে খরিদ করি নি ভাইয়া।' মোদ্দা বাৎ, আলী বিলকুল গররাজি।

আলী উচিত দামের বিনিময়েও যদি বাঁদীটিকে বেচতে রাজী না হয় তবে তো তার ওপর জোর জুলুম চলে না। উপায়ান্তর না দেখে আবু ব্যাজার মুখে নিজের প্রাসাদে ফিরলেন।

প্রাসাদে ফিরে আবু ফিন কোশিস করতে থাকেন বাঁদীটিকে দিল্ থেকে একদম ঝেড়েমুছে ফেলে দিতে। এবারও তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়। বরং তার বিরহ-বেদনা তাঁকে অক্টোপাসের মাফিক আঁকড়ে ধরে। নিরুপায় হয়ে আবু তাঁর ভাইজান খলিফা অল-মামুনকে বিলকুল ঘটনা খোলসা ক'রে বললেন। বাঁদীটিকে নিজের করে পাবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

খলিফা অল-মাসুন সমঝাল। বাঁদটিকে না পেলে তাঁর ভাইয়ার জিন্দেগী একদম বরবাদ হয়ে যাবে। দু'ভাইয়া ঘোড়ার পিঠে চাপলেন। ঘোড়া ছুটে চল্‌ল আলী-র মকান-এর উদ্দেশে। খলিফা স্বয়ং হাজির। আলী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মেহমান খলিফার সেবা যত্ন করার জন্য।

হরেক কিসিমের খানার বন্দোবস্ত করলেন। দামী গুলাবী সরাব তো রয়েছেই।

খানাপিনা মিটলে আলী মেহমানদের খুশী করার জন্য নাচা-গানার বন্দোবস্ত করলেন। দশটি লেড়কি হরেক কিসিমের বাদ্যযন্ত্র হাতে কামরায় হাজির হ'ল। সবার গায়ে কালো রেশমী কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ। সবার সুরৎ-ই চোখে লাগার মত। গায়ের রঙ তো যাকে বলে বিলকুল দুধে-আলতায় মেশানো।

শুরু হ'ল সুরের মূর্চ্ছনা। একটি লেড়কি কিন্নর কণ্ঠে গানা ধরল। মালুম হ'ল—এ যেন বেহেস্তে গানার জলসা বসেছে।

গানা-বাজনা থামলে দশজনের মধ্যে যে-লেড়কিটির সুরৎ মনলোভা তার দিকে খলিফা আল মামুন অত্যুগ্র আগ্রহে ও কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

এক সময় প্রশ্ন করলেন—'তোমার নাম কি?'

খুবসুরৎ লেড়কিটি মিষ্টি-মধুর স্বরে জবাব দিল—'লহরা। জাঁহাপনা, লহরা নামে সবাই আমাকে ডাকে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা নাম তো! তোমার গানা শুনতে আমার দিল্ আকুল। তুমি একদম একা গাইবে?'

লহরা গানা ধরল।

তার গানার সারমর্ম—আমার এই যে কোমলতা আর চপল চাপল চাহনি, আমার এই ক্ষীণ কটিদেশ, যারা এসবের জন্য লুব্ধ হয়ে ছুটে আসে আমি তাদের একদম বিশ্বাস করিনা। তিলমাত্র বিশ্বাসও আমি তাদের করি না। কিন্তু মহব্বত যদি বিদায় নেয় তবে যে আমি মোমের মাফিক গলে যাব। ধূপ-ধুনার খুসবুতে দিল্‌কে মাৎ করে দেব। আমি শুকতারার মাফিক, আশমানের শুকতারার মাফিক জ্বলব। মহব্বতে দিল্ ভরপুর করে দেব। আর কেবলমাত্র মহব্বতের গানাই গাইব।

গানা শেষ হলে খলিফা অল-মামুন উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা তোমার কণ্ঠের কাজ। একটি বাৎ তোমাকে জিজ্ঞেস করছি লহরা—'

—'বলুন, কি আপনার জিজ্ঞাস্য? আমি সাধ্যমত আপনার প্রশ্নের জবাব দেব জাঁহাপনা।'

—'যে-গানাটি তুমি এই মাত্র গাইলে সেটি কার লেখা, বল তো?

—'গানাটি অমর ইবন্ মাদি করিব অল-জুবাইদীর। আর গানাটির সুর দিয়েছেন বিখ্যাত গায়ক মাবিদ।'

লেড়কিটি এবার যথোচিত ভঙ্গিতে খলিফাকে কুর্নিশ ক'রে কামরা ছেড়ে চলে যায়।

খলিফা এবার ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য একটি লেড়কির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তার সুরৎ সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। এক নজর দেখলেই দিল্ কেড়ে নেয়। খলিফার আগ্রহে সে-ও একটি গানা গাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে বসল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' নব্বইতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—জাঁহাপনা খলিফা অল-মামুন-এর হুকুমে লেড়কিটি গানা শুরু করল। তার গানার মর্মার্থ হ'ল—আমি নির্ভীক, উত্তাল, উদ্দাম, উচ্ছল মক্কার বনবালা। কোন শিকারীই আমাকে তীরবিদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। যারা আমাকে পাবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ছুটে আসে, বিফলকাম হয়, তারাই আমার কসুর খোঁজায় লিপ্ত হয়। কিন্তু তারা মুখে যা-ই বলুক না কেন, মনে মনে অবশ্যই স্বীকার করে নেয় আমার মাফিক কে-ই বা কালো আর চপল চোখের অধিকারী?'

কণ্ঠস্বরে অত্যুগ্র আগ্রহ আর কৌতূহল প্রকাশ ক'রে খলিফা লেড়কিটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বল তো গানাটির রচয়িতা কে? আর সুরই বা কে দিয়েছেন?'

—'গানাটির রচয়িতা জাবির। আর এতে সুরারোপ করেছেন বিখ্যাত গায়ক সুরেজ।'

—'বহুৎ আচ্ছা!'

লেড়কিরা নতজানু হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ ক'রে বিদায় নিল।

এবার আরও দশটি খুবসুরৎ লেড়কি নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র হাতে কামরায় প্রবেশ করল। তাদের প্রত্যেকের পরনে গাঢ় লাল মখমলের-কামিজ।

খলিফা তাদের মধ্যে যার সুরৎ সবচেয়ে বেশী চোখে ধরার মাফিক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার কি নাম বল তো?'

—'জাঁহাপনা, আমার নাম রসজানি।'

—তোমার কণ্ঠের একটি গানা শুনতে আমার দিল্ চাইছে।'

লেড়কিটি সুললিতকণ্ঠে গানা ধরল। তার কণ্ঠ আর গানার সুর দিল্‌কে একদম পাগলা ক'রে দেবার মতই বটে।

লেড়কিটির গানার মর্মার্থ হ'ল—'আভরণের রঙে কি আসে যায়? তার রঙ লাল, নীল, সাদা বা হলুদ যা-ই হোক না কেন তা দিয়ে মাথা ঘামাবার জরুরতই বা কি? সব লেড়কি তাদের সমান দাম দিয়ে থাকে। হর রাত্রির শেষে বিছানার ধারে যদি সে এমন কিছু পড়ে থাকতে দেখে তবে তো তার কাছে এর চেয়ে বেশী ক'রে চাওয়ার আর কিছুই থাকে না।

খলিফা অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—কে গানাটি রচনা করেছেন, জান? সুরই বা কে দিয়েছেন, বল তো?

—'গানাটির রচয়িতা আদি ইবন্ জাইদ। আর সুরকার? সুপ্রাচীন গানা। সুরকারের নাম জানা সম্ভব হয় নি।'

খলিফার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লেড়কির দল কামরা ছেড়ে গেল।

এবার ফিন আর একদল লেড়কি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কামরায় হাজির হ'ল। এদের সবার সোনালী মখমলের সালোয়ার—কামিজ গায়ে। আর সবার সুরৎও একদম বুকে ধাক্কা মারে। চোখ দুটিকে বিলকুল চঞ্চল ক'রে তোলে।

এবারের দলের মধ্যে সবচেয়ে সুরৎ যার বেশী সে লেড়কিকে উদ্দেশ্য ক'রে খলিফা বললেন—'তোমার কণ্ঠের একটি গানা শুনতে চাই। গাও তো শুনি, তোমার গানা আমার দিলে কেমন দাগ কাটতে পারে?'

লেড়কিটি যে গানাটি গাইল তার মর্মার্থ হ'ল—'রক্তিম গুলাবের সরাব আমি। নির্লিপ্ত নেশার ঘোরে আমি বেহুশ হয়ে পড়ে থাকি। এতে কী যে সুখানুভূতি কি দিয়ে আমি বুঝাব? আমি মহব্বতের ভিখমাঙ্গা। উদাস-ব্যাকুল দিল্ নিয়ে আমি হরদম সাথে সাথে ঢুঁড়ে বেড়াই।'

লেড়কিটি গান শেষ করলে খলিফা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে ওঠেন—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! এবার লেড়কিটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'লে উঠলেন—এবার বল তো গানাটির রচয়িতা কে? কে ই বা এতে সুরারোপ করেছেন, জান নিশ্চয়?'

—'জী জাঁহাপনা, গানাটি রচনা করেছেন কবিবর আবুনবাস। আর এতে সুরারোপ করেছেন ওস্তাদ ইশাক।'

খলিফার নির্দেশে লেড়কিরা কুর্নিশ সেরে বিদায় নিল। খলিফা এবার গৃহকর্তা আলী'কে তলব ক'রে বল্‌লেন—'আলী'এবার যে আমাকে বিদায় নিতেই হয়। তোমার এখানে এসে এমন আচ্ছা একটি সন্ধ্যায় দিল্‌কে গানার সাগরে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বহুৎ দিন এমন সুযোগ আসে না।

খলিফা এবার সরাবের পেয়ালাটি হাত থেকে নামিয়ে রেখে ওঠার উদ্যোগ নিলেন।

আলী এগিয়ে এসে বল্‌লেন—'সে কী জাঁহাপনা, এখনই উঠেছেন আর একটি লেড়কিকে আপনার সামনে হাজির না করলে আমার দিল্ ভরবে না, দুঃখ থেকে যাবে। আমার মকানের বাঁদীদের মধ্যে তার সুরৎ-ই যে সবচেয়ে বেশী। সুশিক্ষিতা, মার্জিত স্বভাবও বটে। নগদ দশ হাজার সোনার মোহর দিয়ে তাকে খরিদ

করেছিলাম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তার সুরৎ আপনার দিল্‌কে নাড়া দেবে। যদি আমার বাৎ সাচ্চা না হয় তবে আমি তাকে আমার মকান থেকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব।'

খলিফা গাত্রোত্থান করতে গিয়েও ফিন বসে পড়লেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা তবে তাকে হাজির কর, এক নজর দেখেই যাই।'

গৃহকর্তার ইঙ্গিত পেয়ে চাঁদের টুকরা পূর্ণ উদ্ভিন্ন যৌবনা লেড়কি কামরায় প্রবেশ করল। তার সুরতের জৌলুসে আচমকা যেন কামরাটি অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় ঝলমলিয়ে উঠল।

লেড়কিটি কামরায় পা দেয়ামাত্র খলিফার চোখ দুটো যেন হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। লেড়কিটির মুখ থেকে চোখের মণি দুটোকে যেন সরানোই তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল।

খলিফার ভাইয়া আবু ইসা-র আকস্মিক চাঞ্চল্যটুকু তাঁর নজর এড়াল না। তিনি সরাবের পেয়ালায় ঘন ঘন চুমুক দিয়ে চলেছেন। আর তার শ্বাসক্রিয়া ঘনতর হয়ে উঠেছে, কপালে দেখা দিয়েছে স্বেদবিন্দু। দেহের খুন বুঝি নিঃশেষে মুখে এসে জমা হয়েছে। তাঁর হালৎ দেখে খলিফার মধ্যে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। তিনি ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন—'কি? কি হয়েছে আবু?'

আবু ইসা-র গলা দিয়ে রা সরছে না, কোন্ অদৃশ্য হাত যেন সজোরে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। আর চোখ দুটো? লেড়কিটির সুরতের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে।

খলিফা সবিস্ময়ে বল্‌লেন,—'কি ব্যাপার আবু, লেড়কিটির সঙ্গে কি তোমার আগেই জান পরিচয়—আলাপ টালাপ ছিল?'

আবু আমতা আমতা ক'রে জবাব দেয়—'না, আলাপ ছিল না। কিন্তু আশমানের চাঁদ কার না চেনা জাঁহাপনা!'

খলিফা এবার খুবসুরৎ লেড়কিটির দিকে চোখ ফেরালেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম তোমার, বল তো?'

—'জাঁহাপনা, আমার নাম সুরমা।' কুর্নিশ ক'রে লেড়কিটি জবাব দিল।

—'তোমার একটি গানা শোনার জন্য আমার দিল্ চঞ্চল। একটি গানা গাও তো সুরমা।'

খলিফার নির্দেশে সুরমা গানা ধরল। তার গানার মর্মার্থ হ'ল—'ওগো আমার দিলের মালিক, ওগো আমার মেহবুব, তুমি কী নির্মম নিষ্ঠুর! তোমার কলিজাটি কি পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে? লেকিন আমি ভালই জানি, তোমার দিল প্রস্ফুটিত কুসুমের মাফিক খুসবুতে ভরপুর।

গানা শেষ হলে খলিফা করতালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! এবার বলতো গানাটির রচয়িতা কে? কে-ই বা এতে সুরারোপ করেছেন?'

জাঁহাপনা গানাটির রচয়িতা খুজাই। আর সুরদান করেছেন বিখ্যাত গায়ক জুরজুর।

আলি গোড়া থেকেই আবু-র মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাঁর ব্যাপার স্যাপার লক্ষ্য করছিল। সে সুরমা'কে দেখা ইস্তক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে চলেছে।

খলিফা নীরব হলে আলী বলল—'ভাইয়া আবু, তুমি আজ আমার সামনে মেহমান হয়ে এসেছ। তুমি খুশী না হলে আমার গুনাহ হবে, সন্দেহ নেই। সুরমা-র জন্য তুমি মর্মপীড়া বোধ করছ, আমার মালুম হচ্ছে। আমি সুরমা'কে তোমাকেই অর্পণ করছি। আশা করি, একে নিয়ে ঘরবেঁধে তুমি খুশী-আনন্দে ভবিষ্যৎ জীবন গুজরান করতে পারবে। তুমি একে গ্রহণ কর ভাইজান।'—

খলিফা মামুনও সানন্দে অনুমতি দিলেন।

আবু তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত খুবসুরৎ লেড়কিটিকে নিয়ে খুশীতে ডগমগ হয়ে প্রাসাদে ফিরলেন।

কিস্সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ খলিফার আজব কীর্তি নামক আর একটি কিস্সা শুরু করলেন।

নকল ও আজব খলিফার কিস্সা

বেগম শাহরাজাদ বললেন—'জাঁহাপনা, এক রাত্রে খলিফা হারুণ অল রসিদ নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে রাত্রি গুজরান করছিলেন। নিদ আসা তো দূরের কথা কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারছিলেন না।

প্রায় মাঝ রাত্রি পর্যন্ত পালঙ্কে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে অস্থিরচিত্ত খলিফা এক সময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। উজির জাফর'কে নিয়ে রাস্তায় পায়চারি করে সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

খলিফার পরনে সওদাগরের ছদ্মবেশ। আর বৃদ্ধ উজিরও বণিকের ছদ্মবেশে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছেন।

উজির জাফর খলিফাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টাইগ্রীস নদীর তীরে হাজির হলেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' বিরানব্বইতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন, 'জাঁহাপনা, খলিফা হারুণ-অল-রসিদ জাফর'কে নিয়ে নদীর ঘাটে এসে দেখেন ঘাটে একটি ছোট্ট নৌকা বাঁধা।

নৌকার বুড়ো মাঝি খানাপিনা সেরে বিছানা গোছগাছ করছে। খলিফা ডাকা-ডাকি হাঁকাহাঁকি করে মাঝিকে তুললেন। নৌকায় করে নদীতে একটু হাওয়া খাইয়ে আনার জন্য অনুরোধ করলেন।

বুড়ো মাঝি ঘাড় কাৎ করে খলিফার দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে বলল, —'এ কী তাজ্জব শখ হয়েছে আপনার! বেছে বেছে আজ রাত্রেই টাইগ্রীসে হাওয়া খেতে দিল্ চাইছে হুজুর!'

—'কেন? কোন অসুবিধা আছে?'

—অসুবিধা নেই আবার! আপনি কি কিচ্ছু জানেন না, আজ রাত্রে স্বয়ং খলিফা হারুণ-অল-রসিদ নৌকা বিহারে বেরিয়েছেন? কার গর্দানে কয়টি মাথা আছে যে, আজ রাত্রে টাইগ্রীসে নৌকা ভাসাবে।'

খলিফা হারু-অল-রসিদ বললেন—'খলিফা এখন নৌকা বিহার করছেন, তুমি নিশ্চিত জান কি?'

—'তামাম বাগদাদ নগরের কে না জানে সাহাব, খলিফা নৌকা বিহার করছেন? তাঁর সঙ্গে রয়েছে উজির জাফর, দেহরক্ষী মাসরুর আর দাসী-বাঁদী। গাইয়ে বাজিয়েরাও সঙ্গে রয়েছেন। ওই শুনুন সাহাব, খলিফার সহসচিব ফরমান জারি করছেন, কেউ যেন নদীতে নৌকা না ভাসায়। যে হুকুম অমান্য করবে তাকেই নৌকার মাস্তলে বেঁধে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে।'—

মাঝির বাৎ শুনেই খলিফা চোখ দুটো কপালে তুলে বল্লেন—'জাফর, এ কেমন তাজ্জব বাৎ শুনছি! এরকম কোন ফরমান তো আমি আদৌ জারি করিনি। আর গত এক মাসের মধ্যে ভুলেও আমি কোনদিন নৌকা বিহারে বেরোয় নি। এ তো তাজ্জব ব্যাপার দেখছি!

বৃদ্ধ উজির জাফরও এরকম তাজ্জব ব্যাপারটি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়েন। তাজ্জব বলার মাফিক ব্যাপারই বটে। মাঝির হাতে দশটি দিনার দিয়ে বল্লেন, নৌকা খোল। ঝামেলা যদি হয় আমি দায়ী থাকব। নৌকাটি এমন এক আবডালে নিয়ে চল যেখানে থেকে তামাম নদীটি নজরে আসে লেকিন আমরা কারো নজরে পড়ব না।'

বুড়ো মাঝি দিনার দশটি ট্যাঁকে গুঁজে নৌকা ছাড়ল। তীর বেগে নৌকা চালিয়ে এক আবডালে নিয়ে নৌকাটি দাঁড় করাল।

এমন সময় বিশালায়তন একটি বজরা খলিফার নৌকার কাছে চলে এল। বজরাটির ভেতরে যেন হাজার বাতির রোশনাই।—

খলিফা ও জাফর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারলেন, দাসী, বাঁদী ও নফর পরিবেষ্টিত হয়ে এক খুবসুরৎ নওজোয়ান সিংহাসনে বসে। পোশাক পরিচ্ছদ ও আদব কায়দা বিলকুল খলিফারই মাফিক। আর তাঁর পাশে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মরদটির সঙ্গে মাসরুর এর হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর মধ্যে উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি চাপা অথচ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন—'জাফর, আমার দিল্ বলছে, আমাদের খানদানেরই কোন নওজোয়ান। সম্ভবত হয় আল-মামুন নতুবা অল-আমিন—নির্ঘাৎ দুজনের একজন। আর পাশের আদমিটি কিন্তু বিলকুল তোমার মতই দেখতে। আর ওই যে বর্শা হাতে আদমিটি ঠিক যেন আমার দেহরক্ষী মাসরুর। তাজ্জব ব্যাপার তো!'

বৃদ্ধ উজির বার বার এদিক ওদিক কাৎ হয়ে ব্যাপারটি ভাল ভাবে দেখে নিয়ে সবিনয়ে বলে উঠলেন—'ইয়া খোদা! এযে বিলকুল একই রকম দেখতে! কোন ফারাকই তো আমার নজরে পড়ছে না জাঁহাপনা।'

আলোর রোশনাই নিয়ে ইয়া পেল্লাই বজরাটি ধীরে ধীরে খলিফার নৌকাটিকে পিছে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। বুড়ো মাঝি যেন এবার ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। খোদা ভরসা, কেউ যে দেখতে পায়নি।

খলিফার হুকুমে মাঝি নৌকাটিকে ফিন ঘাটে নিয়ে দাঁড় করাল। খলিফা তীরে দাঁড়িয়ে বুড়ো মাঝিকে বল্লেন—'ওহে, এরকম দৃশ্য কি তোমরা রোজ দেখতে পাও? খলিফা কি রোজ রাত্রেই এদিকে নৌকা বিহার করতে আসেন, বল তো?'

—'জী হুজুর। আপনার ধারণা বিলকুল সাচ্চা। খলিফা রোজরাত্রেই টাইগ্রীসে হাওয়া খেতে আসেন। তাই টাইগ্রীসের বুকে এরাত্রে নৌকা চালানো বন্ধ! খলিফার ফরমান গত এক মাস যাবৎ জারি হচ্ছে।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' চুরানব্বইতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, খলিফা এবার বুড়ো মাঝিকে বল্লেন—আমরা ভিনদেশী মুসাফির। এসব ব্যাপার তো মালুম ছিল না। তোমার কল্যাণে এ এক নয়া দৃশ্য দেখা বরাতে জুটল। আমরা কাল ফিন আসব। দশ দিনার বকশিস পাবে। আজকের মত একটু তকলিফ করে ব্যাপারটি দেখবে কি?'

—'হুজুর, কাল ঘাটে নৌকা থাকবে। সময় মত চলে আসবেন।'

খলিফা প্রাসাদে ফিরে গিয়ে অজ্ঞাত নকল খলিফার তাজ্জব ব্যাপারটি নিয়ে বাৎচিতের মাধ্যমে বাকি রাত্রিটুকু গুজরান করে দিলেন।

পরের রাত্রে খলিফা বৃদ্ধ উজির জাফর এবং দেহরক্ষী মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে টাইগ্রীসের সে-ঘাটে আগের দিনের মত হাজির হলেন। বুড়ো মাঝি পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ঘাটে নৌকা বেঁধে তীরে প্রতীক্ষায় বসে।

খলিফা উজির ও দেহরক্ষীকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন। মাঝি বাতাসের বেগে নৌকা চালিয়ে আগের রাত্রের সে-নিরালা

আবডালে হাজির হ'ল। লগি পুতে নৌকাটি বেঁধে দিল। এবার চলল বাঞ্ছিত সে-বজরাটির জন্য অধীর প্রতীক্ষা।

আবছা অন্ধকারে, ফুরফুরে বাতাস বাহিত মিষ্টি মধুর সঙ্গীত লহরী আর নুপুরের রিনিঝিনি আওয়াজ তাদের কানে এল। দিল্‌কে একদম উদাস-ব্যাকুল করে তুলল। অল্প সময় বাদেই নদীর একটি বিশাল ভগ্নাংশ আলোকরশ্মিতে ঝলমলিয়ে উঠল। বজরাটির হালৎ গত রাত্রের মতই। দাসী-বাঁদী পরিবেষ্টিত হয়ে তখ্‌তে বসে সুসজ্জিত এক খুবসুরৎ নওজোয়ান। গানা-বাজনার মজলিস বসেছে।

খলিফা চোখ দুটোকে কপালে তুলে বল্‌লেন—'জাফর, এমন তাজ্জব দৃশ্য আমি নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। এমন কি নিজের চোখ দুটোর ওপরও যেন পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছি না।'

খলিফা এবার নীরবে উঠে গিয়ে বুড়ো মাঝির হাতে আচমকা দশটি দিনার গুঁজে দিলেন।

বুড়ো মাঝি সবিনয়ে খলিফার মুখের দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে জিজ্ঞাসার ছাপ।

খলিফা বললেন—'মাঝি, দিনারগুলো তোমাকে বকশিস স্বরূপ দিলাম। বিনিময়ে নৌকাটিকে ওই বজরাটির কাছাকাছি নিয়ে চল। তোমার কোন ভয় নেই। আমাদের নৌকা তো অন্ধকারে রয়েছে। বজরার অত্যুজ্জ্বল আলোয় বসে কেউ আমাদের দেখতেই পাবে না। আরও কাছ থেকে ব্যাপারটি চাক্ষুষ করতে দিল্ চাইছে।'

বুড়ো মাঝি নৌকা নিয়ে বজরার কাছাকাছি যেতে আপত্তিই করল। কিন্তু হাতের দিনারগুলো তার দিলে উৎসাহের সঞ্চার করল। আন্ধারের বুক চিরে সাধ্যমত কম আওয়াজ করে নৌকাটিকে বজরার কাছাকাছি নিয়ে গেল। তারপর নিরাপদ দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

কিছু সময় ধরে বজরাটি উত্তাল উদ্দাম টাইগ্রীসের বুক চিরে এগিয়ে গিয়ে বাগিচার ধারের ঘাটে নিয়ে ভিড়ল।

অজ্ঞাত পরিচয় খলিফা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বজরা থেকে নামলেন। এদিকে বুড়ো মাঝিও খলিফার নির্দেশে নৌকা থেকে কিছুদূরে আন্ধারে দাঁড় করিয়ে দেহরক্ষী মাসরুর-এর হাত ধরে অতি সন্তর্পণে খলিফা নৌকা থেকে নেমে এলেন।

এদিকে বজরাটি ঝলমলে আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত করে এগিয়ে চলল বাগিচার দিকে।

খলিফাও তাঁর সঙ্গী উজি জাফর ও দেহরক্ষী মাসরুর'কে সঙ্গে নিয়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন।

এমন সময় পিছন দিক থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল—'হেই, খাড়া হো যাও।'

খলিফা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন কয়েকজন সিপাহী।

সিপাহীরা খলিফা ও তাঁর সঙ্গীদের বন্দী করে আজব নকল খলিফার সামনে হাজির করল।

তখতে উপবিষ্ট সুবেশী খুবসুরৎ নওজোয়ান নকল খলিফা তাদের জিজ্ঞাসা করল—'কে তোমরা? এত রাত্রে এখানে কি করছিলে?'

বৃদ্ধ উজির জাফর জবাব দিলেন—'জাঁহাপনা, আমরা পরদেশী, সওদাগরী কারবার করি। এমুলুকে সবে এসেছি। এখানকার আদব কায়দা অজানা। রাস্তা ঘাটও ঠিক মালুম নেই। তাই খালি খালি চক্কর মেরে বেড়াচ্ছি। মালুম ছিল না, এ-বাগিচায় সবার প্রবেশাধিকার নেই। তাই তো আপনার সিপাহীদের হাতে হয়রান হতে হয়েছে। এখন আপনার হাতে পড়েছি, নসীবে আরও কি আছে, কে জানে?'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে আজব, নকল খলিফা বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা, তোমরা যখন পরদেশী তখন তোমাদের কোন ডর নেই। তা নইলে তোমাদের ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে ছাড়তাম।'

আজব খলিফার নির্দেশে সিপাহীরা খলিফা ও তাঁর সঙ্গীদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। আজব খলিফা বললেন—'তোমরা পরদেশী। আমাদের মেহমান। আজ তোমরা আমাদের সাথে খানাপিনা সারবে। নাচা-গানার মধ্যে দিয়ে আনন্দ-স্ফুর্তিও করা যাবে, কি বল?'

খলিফা ও তার সঙ্গীরা আজব খলিফা ও তাঁর দলবলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাগিচাটির কেন্দ্রস্থলস্থ প্রাসাদে উঠে এলেন।

প্রাসাদটির সদর দরওয়াজায় একটি সায়ের খোদাই করা। যার মর্মার্থ হ'ল—একসময় এ-প্রাসাদ কারুকার্য আর রঙের জৌলুসে চকচক করত। আজ এর রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়েছে। তবু এর খানদান কিন্তু আজও এতটুকুও ম্লান হয়নি। মালিক আর মেহমান বিলকুল সমান, কোনই ফারাক নেই।'

প্রাসাদটির সুবিশাল একটি কামরার কেন্দ্রস্থলে একটি কারুকার্য শোভিত দৃষ্টিনন্দন মসনদ। আজব ও নকল খলিফা প্রাসাদে বসলেন। অন্যান্যরা তাকে ঘিরে উচ্চাসনে বসল।

খানাপিনার আসর বসল। ঝকঝকে রেকাবিতে সবার হাতে হাতে হরেক কিসিমের খানা পরিবেশন করা হ'ল। খুসবুওয়ালা দামী গুলাবী সরাবের বন্যা বইয়ে দেওয়া হ'ল।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ খানা তো দূরের কথা সরাবও স্পর্শ করলেন না।

ব্যাপারটি আজব ও নকল খলিফা সবিনয়ে উজির জাফরকে বল্‌লেন—'তাজ্জব ব্যাপার! আপনার সওদাগর দোস্ত সরাবের পেয়ালা নিলেন না কেন?'

—'ওনার এখন এ সবে আর আসক্তি নেই। একদম ছেড়ে দিয়েছেন'।

—'তবে অন্য কোন কিসিমের খানা—ফলমূল কিছু খেতে পারেন'।

নকল খলিফার নির্দেশে এক বাঁদী রূপার গ্লাসে পিস্তার সরবৎ নিয়ে এল। খলিফা আর আপত্তি না ক'রে গ্লাসটি ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেলেন।

খানাপিনার ব্যাপার মিটল। নকল খলিফা এবার তাঁর হাতের সোনার ছড়িটিকে মেঝেতে তিনবার ঠুকলেন। ব্যস, মুহূর্তে দেয়ালের একটি গোপন দরওয়াজা খুলে গেল।

দু'জন গাট্টাগোট্টা নিগ্রো দেয়াল-আলমারিটি থেকে দু'টি হাতির দাঁতের ছোট্ট একটি মসনদ বের করে আনল। সেটিকে এনে নকল মসনদটির পাশে স্থাপন করল। তাতে বসল এক খুব সুরৎ বাঁদী। তার সুরৎ যেন উপচে পড়ছে। শ্বেতাঙ্গিনী।

নকল খলিফার চোখের ইঙ্গিতে সে একটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র হাতে তুলে নিল। তারের বাদ্যযন্ত্র।

শ্বেতাঙ্গিনী বাঁদীটি গানা ধরল যার মর্মার্থ—'মেহবুব আমার, আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ে তুমি কি করে যে শান্ত ছিলে, ভেবে পাইনা। তোমার বিহনে কি করে জান রাখব, বল? মাঝে-মধ্যে সঙ্গ-সুধা দান করে আমার জান টিকিয়ে রেখো। আমার আতর দানি আজ ফাঁকা, বাগিচায় ফুল গেছে শুকিয়ে। আমার মহব্বতের বাঁশি আজ গায়েব হয়ে গেছে। তাই আমি আজ কূল কিনারা পাচ্ছি না।'

গানাটি শেষ হতে না হতেই এক অবিশ্বাস্য তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল। নকল খলিফা নওজোয়ানটি উন্মাদের মাফিক তর্জন গর্জন করতে করতে নিজের বহুমূল্য কোর্তা-কামিজ যা কিছু গায়ে ছিল ছিঁড়ে কুচিকুচি করতে লেগে গেলেন। ছুঁড়ে ফেল্‌লেন শরীরের বিলকুল আভরণাদি। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। ব্যস, সংজ্ঞা হারিয়ে একদম এলিয়ে পড়লেন। প্রহরীদের একজন ব্যস্ত-হাতে নিজের কোর্তা খুলে তাঁর বিবস্ত্র দেহটিকে ঢেকে দেয়।

আকস্মিক কাণ্ডটিতে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ ও উজির জাফর হতভম্ব হয়ে পড়েন।

খলিফা এবার তাঁর নগ্ন প্রায় দেহটির ওপর দৃষ্টি বোলাতে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌লেন—'জাফর, মালুম হচ্ছে পলাতক দাগী আসামী। নইলে তার সারা গায়ে এমন কালশিটে পড়া চাবুকের দাগ কেন? তাজ্জব ব্যাপার তো!'

ইতিমধ্যে নফররা এক প্রস্ত নয়া ঝলমলে বাদশাহী পোশাক এনে নকল খলিফাকে পরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার সংজ্ঞাও ফিরে এল। মসনদে জাঁকিয়ে বসলেন।

খলিফা ও তাঁর সঙ্গী দু'জন সাধ্যমত গলা নামিয়ে কি যেন সব

বাতচিৎ করতে লাগলেন।

নকল খলিফা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'কি গো সওদাগর সাহাবরা, ফিসফিসিয়ে কি সব বাতচিৎ হচ্ছে, বলতো? গোপন কিছু?'

উজির জাফর মুচকি হেসে বললেন— 'আমার দোস্ত বলছেন, সওদাগরী কারবারের দৌলতে আপনি বহুৎ মুলুকে ঢুঁড়ে বেরিয়েছেন লেকিন এমন সৌখীন বাদশাহ কোথাও দেখেন নি। আপনি মুহূর্তে যে পোশাক পরিচ্ছদ ছিড়ে ফাতাফাতা করলেন তার দাম কম হলেও দশ হাজার দিনার তো হবেই। লেকিন এতবড় ক্ষতিতেও আপনার মধ্যে এতটুকুও ভাবান্তর ঘটে নি।'

ব্যস, কাজ হাসিল। দাওয়াই ধরেছে সামান্য তোষামদে। নওজোয়ানটি গলে একদম পানি হয়ে গেলেন। বহুমূল্য এক প্রস্ত বাদশাহী সাজসজ্জা এবং নগদ এক হাজার সোনার মোহর জাফর'কে বকশিস দেয়ার জন্য হুকুম দিয়ে দিলেন।

ফিন গানা-বাজনার মজলিস শুরু হ'ল।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ ও তার সঙ্গীরা গানের জোয়ারে ভেসে চললেন, যেন এক অচিন মুলুকের উদ্দেশে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' ছিয়ানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির অবশিষ্টাংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, নওজোয়ানটির সর্বাঙ্গের সে-চাবুকের কালশিটে পড়া দাগগুলির ব্যাপার খলিফা কিছুতেই

...থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে উজিরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—'জাফর, তাকে কালশিটে পড়া দাগগুলোর ব্যাপারে পুছতাছ করে দেখ না, কি বলে? সেগুলো কিসের স্বাক্ষর বহন করছে, জানতে বড্ড ইচ্ছা করছে।'

—'জাঁহাপনা, এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। সবুর করুন। দেখাই যাক না এর শেষ কোথায় গিয়ে ঠেকে।'

খলিফা গোসসায় একদম অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন—'শোন জাফর, তুমি যদি তাকে ওই দাগগুলির ব্যাপারে জিজ্ঞেস না কর তবে আমি আমার শির আর আব্বাস-এর তাজিয়ার নামে কসম খেয়ে বলছি, তার প্রাসাদে ফেরার পর তোমার 'ধড়ে আর শির রাখব না। ভাল চাও তো—' আজব ও নকল খলিফা চোখে-মুখে কৌতূহলের ছাপ এঁকে বল্‌লেন—'সওদাগর সাহাব, খোদাতাল্লা-র কসম, বলুন তো আপনারা এমন ফিসফিসিয়ে কি বাৎচিৎ করছেন?'

উজির জাফর নিরুপায়। বাধ্য হয়ে বল্‌লেন—'আমার এ সওদাগর দোস্তটি জানতে চাইছেন, আপনার তামাম শরীর জুড়ে কালশিটে পড়া দাগগুলো কিসের? তার বিশ্বাস, কোন বাজে ধান্দায় পড়ে আপনি—'

উজির জাফর এর মুখের বাৎ কেড়ে নিয়ে আজব ও নকল খলিফা নওজোয়ানটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বল্‌লেন—'এই সমাচার' দেখুন, আপনারা পরদেশী মেহমান। আপনাদের খুশী করা আমার কর্তব্য। ধর্মও বটে। আমার সে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কিসস্য বলছি—

আমার আব্বা এক সাচ্চা আমীর আদমি ছিলেন। তিনি বেহেস্তে যাবার সময় আমার জন্য বহুৎ ধন দৌলত রেখে যান। সোনা, হীরা, মণি, মুক্তা, চুণী, পান্না সিন্দুক বোঝাই করা ছিল। আর রূপা যে কী পরিমাণ ছিল তার হিসাবই ছিল না।

নগদ অর্থ আর ধন দৌলত ছাড়া প্রাসাদ, ইমারত, বাগিচা, জমি-জায়গা, দীঘি ও তলাও—বহুৎ কিছুই আমার আব্বা রেখে গিয়েছিলেন আমার কোন ভাগীদার না থাকায় বিলকুল বিষয় আশয়ের মালিক একা আমিই হলাম।

আমার আব্বার একটি চালু কারবারও ছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট এক দোকান।

এক সকালে আমি দোকানে বসে। বেচা-কেনা তখনও জমে ওঠে নি। হঠাৎ দেখি এক খুবসুরৎ লেড়কি খচ্চরের পিঠে চেপে আমার দোকানের দরওয়াজায় এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে কয়েকজন দাসী-বাঁদীও রয়েছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে লেড়কিটিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালাম। সে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে আমার দোকানে ঢুকল। আমি কুর্শি দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করলাম। ঠোঁটের কোণে মনলোভা হাসির রেখা টেনে সে কুর্শিটি টেনে বসল।

লেড়কিটি সুরেলা কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—'আমি কি জহুরী মহম্মদ আলির সঙ্গে বাৎচিৎ করছি?'

আমি বিনয়ে একদম গদ গদ হয়ে জবাব দিলাম—'আমি কেবলমাত্র মহম্মদ আলীই নই, আপনার গোলামেরও গোলাম।'

—'আপনার কাছে কি চেখনাই কোন বালা আছে? হীরা বসানো বালা—'

আমি তাকে নামিয়ে দিয়ে বল্লাম—'আমার কাছে যত কিসিমের বালা রয়েছে এক এক করে আপনাকে দেখাচ্ছি। পচ্ছন্দ মাফিক বেছে নিন। আপনি পছন্দ করে যা হোক কিছু নিলে আমি বহুৎখুশী হ'ব। আর যদি হতাশ হয়ে ফিরে যান তবে আপনার চেয়ে বেশী খুশী হ'ব আমি।'

আদতে তখন আমার দোকানে বহু মন পছন্দ গহনাপত্র হরবখত মজুদ থাকত। আমি এক এক করে হরেক কিসিমের বালা বের করে তার সামনে রাখতে লাগলাম। দীর্ঘসময় নেড়ে চেড়ে দেখে এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'ঠিক পছন্দ মাফিক হচ্ছে না। আদতে আমি এর চেয়ে আচ্ছা কিছুর তল্লাস করছি। এসব চলার মত নয়।'

হঠাৎ আমার ইয়াদে এল, আমার আব্বা এক সময় হীরা বসানো বহুৎ বাহারী এক জোড়া বালা বানিয়ে ছিলেন। আলমারীর এক কোণে রেখে দিয়েছিলেন। ঝট্ করে উঠে সে দুটো বের ক'রে তার চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

সে এক লহমায় দেখেই ব'লে উঠল—'এর দাম কত লাগবে?'

—'এক লাখ দিনারের বিনিময়ে আমার আব্বা এটি খরিদ করেছিলেন। আপনার পছন্দ হলেই যথেষ্ট। এর জন্য দাম লাগবে না।'

আমার বাৎ কানে যেতেই লেড়কিটি সচকিত হয়ে বন হরিণীর মাফিক ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে আমার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাল। মুচকি হেসে বলল—'দাম লাগবে না কেন? আমি উচিত দাম দিয়েই খরিদ করতে চাই। বরং আপনার কেনা দামের চেয়ে পাঁচ হাজার বেশিই দেব। আপনি আপনার অর্থের সুদ বা সামানটির লাভ যা খুশী মনে করতে পারেন।

আমি ভাববিমুগ্ধ দিল্ নিয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করলাম—'এ গহনাটি এবং এর বিক্রেতা দু'ই আজ থেকে আপনার বান্দা বনে গেল।'

—'আমি তো দাম বলেই দিয়েছি। এর বাইরে কিছু করতে গেলে আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে যাব। তাতে আমার দিল্ সায়

দেবে না।'

এরকম বাৎচিৎ করতে করতে লেড়কিটি দোকান থেকে বেরিয়ে খচ্চরটির পিঠে চেপে বসল। যাওয়ার আগে বলে

গেল—'গহনাটি নিয়ে আমার প্রাসাদে আসুন। দাম মিটিয়ে এটি নিয়ে নেব। আপনার জন্য আজ আমার এতদিনের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। দেরী করবেন না, চলে আসুন।'

আমি কি বলব, ভেবে পেলাম না। এক কর্মচারীকে বললাম, লেড়কিটির পিছু নাও, তার প্রাসাদটি চিনে আসো।'

আমি তার ফেলে যাওয়া পথের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলাম।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' সাতানব্বইতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন —'জাঁহাপনা, সে-নওজোয়ান নকল খলিফা তার জীবনের কিস্‌সা ব'লে চলেছে—'পরদিন আমি ঠিকানা তল্লাশ ক'রে লেড়কিটির প্রাসাদে হাজির হলাম। এক লেড়কি সে-গহনাটি আমার হাত থেকে নিল। আমাকে বৈঠক খানায় বসিয়ে রেখে অন্দর মহলে চলে গেল।

একটু বাদে এক লেড়কি এসে আমাকে ভেতরের কামরায় নিয়ে গেল, একটি টুলে বসতে দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর একটু বাদে অন্য একটি লেড়কি এল। সবিনয়ে বলল—'জীহুজুর, মেহেরবানি করে আমার সঙ্গে পাশের কামরায় চলুন। একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করুন। ইতিমধ্যেই আপনার প্রাপ্য অর্থ তৈরী হয়ে যাবে।'

আমি কামরায় ঢুকতে না ঢুকতেই সে-খুবসুরৎ লেড়কিটি আমার গহনাটি পরে কামরায় এল। সোনার একটি মসনদে বসল। পরনে বোরখা নেই। এই প্রথম তাকে বোরখাহীন অবস্থায় দেখলাম। আমার কলিজাটি আচমকা মোচড় মেরে উঠল। ইয়া আল্লাহ! ভাবলাম, আমি না জানি পাগলের মাফিক চিল্লিয়ে উঠি। গুটি সুটি মেরে বসে রইলাম।

খুবসুরৎ লেড়কিটি উঠে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। সে সুরেলা কণ্ঠে বলে উঠল—'তোমার মাফিক খুবসুরৎ নওজোয়ান আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি। প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে দিল্‌ জান অর্পণ করে দেউলিয়া হয়ে গেছি। আর তুমি কিনা আমাকে পাষাণের মাফিক দূরে ঠেলে রাখতে চাইছ, মেহবুব?'

আমি বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটিয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করলাম সুন্দরী, দুনিয়ার সব সুরৎই তো তোমার দেহে আটকা পড়ে গেছে, কী ধনে যে তুমি ধনী তা নিজেই জান না। এমন সুরতের জৌলুস আমি জিন্দেগীতে দেখিনি।'

সে আচমকা আমার একটি হাত চেপে ধরে বলল—'মহম্মদ আলি, প্রথম দর্শনেই আমি তোমার মহব্বতে বাঁধা পড়ে গেছি। তোমার দোকানে যা বলেছি, কেবলমাত্র আমার প্রাসাদে তোমাকে কৌশলে নিয়ে আসার জন্য। বিলকুল ছলনা ছাড়া কিচ্ছু না।'

সে এক ঝটকায় আমাকে তার সমুন্নত বুকে টেনে নেয়। আমি যেন এরকমই কোন মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিলাম।

আমি তার বুকের সঙ্গে একদম লেপ্টে গিয়ে ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে মোহমুগ্ধের মাফিক পড়ে রইলাম।

আমি পেশীবহুল হাত দুটো দিয়ে তাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলাম।

ইতিমধ্যেই তার বুকে কামারের হাঁপর চলতে শুরু করেছে। আমি তার গাল, ঠোঁট ও চিবুকে ঘন ঘন চুম্বন করতে লাগলাম। তার চোখের তারার আকস্মিক পরিবর্তনটুকু আমার নজর এড়াল না। কাছে, আমার আরও কাছে আসতে চায় সে। নিটোল ও উন্নত স্তন দুটোকে আমার বুকের সঙ্গে সাধ্যমত চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিষ্পেষিত করতে চায়।

কারো মুখে রা নেই। কেবল দলন আর নিষ্পেষণের মাধ্যমে সুখটুকু নিঃশেষে কুড়িয়ে নেয়ার প্রয়াস।

আমার হালৎ দেখে তার হালৎ সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন নয়। তার কলিজার দাপাদাপি আমার কানে হাতুড়ির মাফিক হরদম
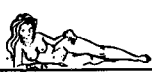
আঘাত হেনে চলেছে। তার সম্ভোগ তৃষ্ণা অনুভব করতে পারলাম। ধমনীতে আমার খুনের মাতনের মাধ্যমে। তার মুখে আমি ভাষা খুঁজে পেলাম। সে যেন বলছে—'আমি তোমার, একান্ত ভাবেই তোমার। দলন, পেষণ আর সম্ভোগে সম্ভোগে আমাকে একদম খতম করে ফেল। আমি আর পারছি না। আমার যা আছে বিলকুল নিয়ে ফেল। আমি আর পারছি না। আমার যা কিছু সম্পদ আছে আমাকে দিয়ে কলিজার জ্বালা জুড়াও। আমার যা কিছু সম্পদ বিলকুল তোমারই জন্য এত কাল আগলে আগলে রেখেছি। আজ সবই তোমাক দিয়ে বিলকুল দিবানা হতে চাই। তুমি কি জানো, কিছু বোঝ না মেহবুব আমার?'

আমি ভাবলাম, তার বুকের ভেতরে উত্তাল-উদ্দাম সাগরের ঢেউ বয়ে চলেছে। দেহ আর দিল্ সম্ভোগের কামনায় আকুল। এ অবস্থায় নিজেকে সংযত রাখার অর্থই হচ্ছে তাকেও নির্মম ভাবে বঞ্চিত করা। এ কাজ মোটেই সঙ্গত নয়।

কামজ্বালায় জর্জরিতা লেড়কিটিকে আমি এক ঝটকায় পালঙ্কের ওপর ফেলে দিলাম। আমরা উন্মাদের মাফিক ধস্তাধস্তি করতে করতে ক্রমে যেন এক অন্ধকার স্বপ্নাচ্ছন্ন লোকে তলিয়ে গেলাম। ব্যস, বিলকুল খতম। লেড়কিটি চার হাত-পা ছড়িয়ে পালঙ্কের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রইল। আমার মধ্যেও কেমন অবসন্ন ভাব ক্রিয়া করতে শুরু করল।

কারো মুখেই রা নেই। কামরার মধ্যে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে লাগল, আর উভয়ের ফুসফুস নিঙড়ে বেরিয়ে আসা হাঁসফাঁসানি থেকে থেকে নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগল।

সকাল হ'ল। চোখ মেলে তাকালাম। আমরা উভয়েই বিবস্ত্র। লেড়কি লতার মাফিক আমাকে জড়িয়ে, একদম লেপ্টে রয়েছে। তার চোখে মুখে রাত্রের সে-কাম তৃষ্ণা অন্তর্হিত। সে-জায়গা দখল করেছে অনাবিল প্রশান্তি আর পরিপূর্ণ তৃপ্তির ছাপ।

লেড়কিটি তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে তাকাল।

সে আমাকে চুম্বন ক'রে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে ব'লে উঠল—'মহম্মদ আলী, তোমার শরীরে তাগদ আছে বটে! রাতভর লদকালদকি ক'রে আমার গায়ে গতরে বিষের মাফিক ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছ, মালুম হচ্ছে, শরীরের হাড়গোড় গুঁড়াগুঁড়া হয়ে গেছে!'

আমি তাকে ফিন জড়িয়ে ধরলাম।

সে এবার আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগল—'মেহেবুব আমার, আমার কুমারীত্ব আজ তোমাকে সঁপে দিয়ে সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইতি পূর্বে আমি ভুলেও কোন পুরুষের সংস্রবে যাই নি। তুমি আমার জিন্দেগীর প্রথম মেহেবুব, প্রথম মহব্বৎ।'

—'আমার জিন্দেগীরও তুমিই প্রথম লেড়কী, প্রথম মেহেবুবা। তোমার কাছেই আমি মহব্বতের প্রথম পাঠ নিলাম।'

—'লেকিন আমি কে? আমার পরিচয়ই বা কি, কিছুই তো জানতে চাওনি? আমাকে কি তুমি ভেবে নিয়েছ, বাজারের এক বোরখাপরা গণিকা? হাত বাড়ালেই আমাকে মিলতে পারে? দিনার ঢাললেই বুকে পাওয়া যায়? নইলে পর্দার আড়ালে যে সব বিবি তার মরদের অনুপস্থিতির সুযোগে জোয়ান মরদকে দিয়ে কামজ্বালা নেভায়—তাদেরই কোন জেনানা? আল্লাহ-র কসম, আমাকে সেরকম কিছু ভাবলে কিন্তু আমার প্রতি অবিচারই করা হবে। স্বেচ্ছায় তোমাকে কামরায়, পালঙ্কে ডেকে আনলাম ব'লে কিন্তু আমাকে ছোট ক'রে দেখো না মেহেবুব। আমার আব্বার নাম ইয়াহিয়া ইবন খলিদ আল-বারসাকী। খলিফার উজির জাফর এর ছোটা বহিন আমি। কোন দিক থেকেই আমি ফেলনা নই।'

লেড়কিটির পরিচয় পাওয়া মাত্র আমার কলিজা শুকিয়ে আসতে থাকে। বুকের ভেতরে কামারের হাঁফরের দাপাদাপি শুরু হয়ে যায়। সদ্যকৃত কর্মের জন্য অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকি।

আমার ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—'ইয়া খোদা! এ কী ভয়ঙ্কর কাজে আমাকে লিপ্ত করলে! তার ডাকে কেন এমন হন্যে হয়ে ছুটে আসতে গেলাম! এক লহমায় আমি এমন খানদানি পরিবারের ইজ্জৎ ধুলিস্যাৎ করে দিলাম! এ গুস্তাকীর কি মাফ আছে? এ-গুনাহ কোথায় রাখি! আমাকে দিয়ে তুমি এ কী করালে খোদা!'

আমি উন্মাদের মাফিক চিল্লিয়ে উঠলাম—'তুমি কেন আমাকে এখানে আসার জন্য প্রলোভন দেখালে? কেন আমাকে ডেকে আনলে? আমি তো নিজে থেকে আসতে চাই নি। আমার তো কোন দোষ নেই—কোনই গলতি নেই। তুমিই আমাকে এ-পথে নিয়ে এসেছ। তোমার ইচ্ছাতেই—'

লেড়কিটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল—'কই, আমি তো তোমাকে দোষারোপ করছি না। আমি তোমাকে পেয়ার করি। তোমাকে শাদী করব—সাফ বাৎ। এবার তুমি বরং বল, আমাকে শাদী ক'রে ঘরে তুলতে তোমার আপত্তি আছে?

আমি যেন একদম আসমান থেকে জমিনে পড়লাম। ছানাবড়া হয়ে যাওয়া চোখ দুটো মেলে তার দিকে তাকিয়ে বললাম—'শাদী? তোমাকে শাদী—না, আপত্তি থাকবে কেন? লেকিন তুমি কি নিজে তোমার শাদীর বন্দোবস্ত করতে পার?'

—'আলবাৎ পারি। আমিই আমার মালিক। শুধু তুমি বল, আমাকে শাদী করতে রাজী কি, না?'

—'আমি তো বললামই-রাজী। আলবৎ রাজী।'

সব বন্দোবস্ত পাকা। কাজী হাজির হ'ল। শাদীর কবুলনামা তৈরী হয়ে গেল। সাক্ষীরা দস্তখৎ করল। আমাদের শাদীর পাট

ঢুকে গেল। আমরা সেদিন সে-কামরায় আশ্রয় নিলাম। দলন, পেষণ, চুম্বন ও সম্ভোগ পুরোদমে চলতে লাগল। আমার চোখের সামনে দুনিয়াটি হরেক কিসিমের বাহারী ফুলে ভরে উঠল।

আমরা বাসর-শয্যা দিল্ ভরে উপভোগ করতে লাগলাম।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে পাখিদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' আটানব্বইতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন, জাঁহাপনা, নকল খলিফা মহম্মদ আলী তার কিস্‌সা ব'লে চলেছে—সে-রাত্রির স্মৃতি আজও আমার চোখের সামনে যেন পটে আঁকা তসবীরের মাফিক ভাসছে।

শাদীর পর আমরা এক সঙ্গে খুশী-আনন্দে পুরো একটি মাস গুজরান করে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমরা উভয়ে উভয়কে চোখের আড়াল করতে পারি নি। কেবল রাত্রেই নয়, দিনেও আমরা পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতাম।

আমার দোকানপাট বিলকুল শিকেয় উঠেছে। খদ্দের পত্র আর মহাজনের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললাম। আমার একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়াল আমার বিবি, শাদী করা বিবি।

এক সকালে, আমার বিবি আমাকে বলল—'আমি হামামে যাচ্ছি। গোসল করতে দিল্ চাইছে। লেকিন মেহেবুব, এতক্ষণ তো তোমাকে চোখের আড়ালে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি তাকে চুম্বন করে বললাম—'আমার হালৎ-ও একই রকম, তুমি হামামে যাবে আর আসবে। একদম দেরী করবে না। আমি তোমার অধীর প্রতীক্ষায় থাকব।'

আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল—'মেহেবুব, আমি যাব আর আসব। হামাম থেকে ফিরে এসে তোমাকে যেন ঠিক এখানটিতেই দেখতে পাই।'

আমি ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানালাম।

আমার বিবি গোসল করতে হামামে চলে গেল। পরমুহূর্তেই এক বুড়ি কামরায় ঢুকে এল।

বুড়ি আমাকে সালাম জানিয়ে বলল—'হুজুর, খলিফার প্রধানা বেগম জুবেদা আপনাকে তলব করেছেন। জরুরী তলব। আপনি এখনই আমার সঙ্গে চলুন।'

—'আমার বিবি হামামে গেছে। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার এক পাও এখান থেকে নড়ার উপায় নেই।'

বুড়ি চোখ দুটো কপালে তুলে ব'লে উঠল—'সে কী হুজুর, আপনি তবে যাচ্ছেন না! কী ভয়ঙ্কর বাৎ! বেগম জুবেদার কানে এ-বাৎ উঠলে আপনার গর্দান যাবে, জানেন?'

—'জানি। কেবল আমিই নই, তামাম দুনিয়ার সবাই জুবেদার জেদের খবর রাখে। একবার জবান দিয়ে কোন বাৎ উচ্চারণ করলে তা তিনি পালন ক'রে তবে ছাড়বেন। লেকিন, আমি আমার বিবির কাছে কসম খেয়েছি, সে হামাম থেকে ফিরে না আশা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।'

—'হুজুর, নিজের বিবির দিমাক যে করেই হোক ঠাণ্ডা করতে পারবেন। লেকিন বেগম জুবেদা ক্ষুব্ধ হলে জিন্দেগী বরবাদ করে ছাড়বেন। আমার যা বলার, বললাম, এবার আপনার মর্জি মাফিক কাম করুন। আপনি গেলে সঙ্গে ক'রে প্রাসাদে নিয়ে যাব। নইলে একা ফিরে গিয়ে আপনার মতামত বেগমের কাছে পেশ করব।'

বুড়ির বাৎ শুনে আমার কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। হাঁটু কাঁপতে লাগল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—ঠিক আছে, তবে যাওয়াই যাক।'

বুড়ি আমাকে নিয়ে খলিফার প্রাসাদের অন্দর মহলে গেল। বেগম জুবেদা আমাকে মুচকি হেসে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। কুর্শি দেখিয়ে বসতে বল্‌লেন।

আমি কাঠের পুতুলের মাফিক জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলাম।

বেগম জুবেদার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই সচকিত হয়ে তাকালাম। তিনি বল্‌লেন—'কি গো ভালমানুষ, তুমিই তো উজিরের বহিনের পিয়ারের আদমি, ঠিক কিনা?'

—'আমি আপনার গোলামের গোলাম বেগম সাহেবা।'

—'বহুৎ আচ্ছা! ওরা তবে তোমার ব্যাপারে যা সাচ্চা তা-ই বলেছে, যেমন তোমার সুরৎ তেমনি মধুর কণ্ঠস্বর। চলাফেরা কথা বলার ঢঙ ঢাঙ্-ও তো মনলোভাই দেখছি। তোমাকে দেখে, বাৎচিৎ বলে বহুৎ খুব খুশী হয়েছি। একটি গানা শোনালে আমি আরও খুশী হ'ব।'

বেগম সাহেবার হুকুম। গানা সেরকমই জানি, গাইতেই হ'ল। গর্দানটি বাঁচাতে হবে তো।

বেগম জুবেদা আমার সুরৎ, আদব কায়দা ও গানার বহুৎ তারিফ করলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন—'যাও, এবার তোমার ছুটি। তোমার জান, তোমার কলিজার সমান বিবি হয়ত হামাম থেকে ফিরে তোমাকে না দেখে বেহুঁস হয়ে পড়েছে। হয়ত ভাবছে, আমি তার নাগরকে ছিনিয়ে এনেছি।'

আমি প্রাসাদে ফিরে দেখি, আমার বিবি মুখ ভার করে বসে। আমার ডাকেও সাড়া দিল না। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে আদর সোহাগ করার কোশিস করলাম।

সে তড়াক্ ক'রে এমন এক লাথি মারল যে, আমি ছিটকে গিয়ে দেয়ালে আছাড় খেয়ে পড়লাম।

সে গর্জে ওঠে—'বেহায়া, বেশরম, বেতমিস কাঁহিকার! তুমি প্রবঞ্চক! মহব্বৎ তোমার জন্য নয়। মহব্বতের মর্যাদা তোমার বিলকুল জানা নেই। তুমি আমার কসম ভুলে জুবেদার কলিজা

ঠাণ্ডা করতে গিয়েছিলে, তাই না? খোদার কসম তোমার মাফিক বেইমানের সঙ্গে আমি আর ঘর করতে নারাজ। জুবেদাকে গিয়ে খুব ক'রে শুনিয়ে দিয়ে আসব, অন্য জেনানার নাগরের দিকে তার এত নজর কেন!'

কথা বলতে বলতে সে করতালি দেয়। ব্যস, চোখের পলকে উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিগ্রো সাবাব কামরায় এল। আমার বিবি গর্জে উঠল—'এই বেইমানের গর্দান চাই। যাও, হুকুম তামিল কর।'

নিগ্রো সাবাব এগিয়ে এসে ঝট ক'রে আমাকে ধরে ফেলল। কালো কাপড় দিয়ে আমার চোখ বেঁধে দিল।

আমি তখন কি করব। কি-ই বা বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

এমন সময় পুব আকাশে রক্তিম ছোপ প্রকাশ পেল। ভোরের পূর্বাভাষ, বেগম কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

তিন শ' নিরানব্বইতম রজনী

খুবসুরৎ নওজোয়ান নকল খলিফা তাঁর কিস্‌সা বলে চলেছেন—আমার বিবির হুকুমের ব্যাপারটি প্রাসাদের সর্বত্র বাতাসে চাউর হয়ে গেল। ব্যস, প্রাসাদের যত দাস দাসী, নোকর নোকরাণী যত ছিল সবাই এসে আমার বিবির পায়ে পড়ে আমার জান রক্ষার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কারণ, গত এক মাহিনায় তারা সবাই আমার আচরণে মুগ্ধ হয়েছিল।'

—'আমার বিবির দিল্ কিছুটা গল্‌ল। বল্‌ল—'তোমাদের অনুরোধে একে জানে খতম করব না। লেকিন এমন শাস্তি দেব যাতে জিন্দেগীতে ভুলতে না পারে। জুবেদার ডাকে যেন আর নেড়ি কুত্তার মাফিক ছুটে না যায় সে বন্দোবস্ত করে দেব।'

আমার বিবির হুকুম তামিল করতে নিগ্রো-সাবাব তরবারি ফেলে চাবুক তুলে নেয়। সপাংসপাং শব্দে আমার ওপর চাবুকের ঘা পড়তে লাগল। কম-সে-কম পাঁচ শ' চাবুকের ঘা পড়ল আমার গায়ে। চামড়া কেটে খুন ঝরল বহুৎ জায়গায়।

এবার আমাকে কাঁধে তুলে পথের ধারের জঞ্জালের চৌবাচ্চায় ছুড়ে ফেলে দিল।

রাতভর সেখানে পচা গন্ধার মধ্যে পড়ে কাৎরালাম। ভোরের আগে, পথে আদমি চলাচল শুরু হবার আগে কাৎরাতে কাৎরাতে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা বুকে হেঁটে আমার নিজের প্রাসাদে ফিরে এলাম।

ক'দিন বেহুঁস হয়ে খোদার ওপর ভরসা করে পড়ে রইলাম বিছানা আঁকড়ে। কোন রকমে জান রক্ষা পেল। একমাত্র তাঁরই দোয়াতে কোনরকমে টিকে গেলাম।

আমি ফিন দোকানে গিয়ে বসলাম। লেকিন আমার বিবির ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটিকে দিল্ থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না। হরবখত একই চিন্তা আমার মাথার চারদিকে চক্কর মারতে লাগল। ব্যাপারটিকে দিল্ থেকে মুছে ফেলার ফিকির খুঁজতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত দোকান বেচে দিয়ে চারশ' নফর-নোকর খরিদ করে ফেললাম, তাদের নিয়ে হররাত্রে টাইগ্রীসে নৌকা বিহার করতে লাগলাম। দিল্ হাল্কা হ'ল। আর নকল খলিফা সেজে এ-প্রাসাদে আসর জমিয়ে নিজেকে চাঙা করতে লাগলাম। আমার বিবির সে-আচরণ দিল্ থেকে বিলকুল উধাও হয়ে গেল।

আজ রাত্রে আপনারা সঙ্গদান করায় নতুন খুশীতে দিল্ চাঙা হয়ে উঠেছে।

নকল খলিফার কিস্‌সা শুনে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'খোদাতাল্লাই একমাত্র ভরসা। তাঁর মর্জি মাফিকই আদমির নসিব নিৰ্দ্ধারিত হয়। আমাদের কার নসিবে যে কি লেখা আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন।'

খলিফা এবার উজির জাফর আর দেহরক্ষী মাসরুর'কে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পথে আসতে খলিফা বল্‌লেন—'জাফর, ওই নওজোয়ানের নসিবের ফেরের জন্য কোন্ জেনানাটি দায়ী, বল তো?'

—জাঁহাপনা, আমার কাহিনীই এর জন্য একমাত্র দায়ী। তার ভুল বোঝার জন্যই নওজোয়ানটির জিন্দেগী বরবাদ হতে চলেছে। উজীর জাফর বল্‌লেন।

সকাল হ'ল। খলিফা দরবারে হাজির হলেন। জাফর'কে তিনি বল্‌লেন—'কাল রাত্রের সে-নওজোয়ানটিকে দরবারে হাজির কর।

নওজোয়ান নকল খলিফা দরবারে এলেন।

খলিফা নিজের তখ্‌তের পাশের এক কুর্শিতে তাঁকে বসালেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাকে কেন তলব করেছি, শুনেছ বা অনুমান করতে পারছ? গত রাত্রে তিনজন ভিনদেশী সওদাগরকে তোমার জিন্দেগীর করুণতম কিস্‌সা নাকি শুনিয়েছিলে, ইয়াদ আছে তো? আজ আমি তোমার মুখ থেকে সে-করুণতম কাহিনী শুনতে চাই, নাও, শুরু কর।'

নওজোয়ানটি আমতা আমতা করে বললেন—'জাঁহাপনা, আমি কিস্‌সাটি বলার আগে আপনার কাছ থেকে অভয় প্রার্থনা করছি।'

খলিফা তাঁর দিকে একটি অভয়-রুমাল ছুঁড়ে দিলেন, এবার তিনি গত রাত্রের কিস্‌সাটি সবিস্তারে তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন।

কিস্‌সা শেষ হলে খলিফা বল্‌লেন—'সাচ্চা বাৎ বলবে, তোমার বিবির জন্য এখনও কি তুমি আগ্রহী? তাকে ফিরে পেতে তোমার দিল্‌ চায়? সে তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তাকে দিল্‌ থেকে মুছে ফেলে ফিন কাছে টেনে নিতে পারবে?'

—'জাঁহাপনা, এ ব্যাপারে আপনি যে বন্দোবস্ত করবেন তাই আমি সানন্দে মেনে নেব।'

খলিফার নির্দেশে জাফর তাঁর বহিনকে হাজির করলেন।

খলিফা তাকে বল্‌লেন—'আমার সম্মানীয় আমীর ইয়াহিয়া-র লেড়কি তুমি, এ-নওজোয়ানকে চেন কি?'

লেড়কিটি এক নজরে নওজোয়ানটিকে দেখে শরমে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

খলিফা বল্‌লেন—'শোন, ভুলচুক যা ঘটে গেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না। আমার ইচ্ছা তোমরা ফিন ঘর বাঁধ। আমি ঘটা করে তোমাদের শাদী দেব। তুমি রাজী তো?'

—'জাঁহাপনা, আপনার হুকুম শিরোধার্য। আপনার বিচার অনুযায়ী কাজ হবে।'

কাজী এলেন। শাদীর কবুলনামা বানানো হ'ল। সাক্ষীরা দস্তখৎ করল। শাদীর পর্ব মিটে গেল।

খলিফা নওজোয়ান মহম্মদ আলীকে নিজের আমীরের পদে বহাল করলেন।

কিস্‌সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

রোশন আর গুলাবীর কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নতুন একটি কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, ভোর হতে এখনও ঢের দেরী। আমি এবার আপনাকে 'রোশন আর গুলাবীর কিস্‌সা' নামে আর একটি ছোট্ট অথচ চটকদার কিস্‌সা শোনাচ্ছি—

কোন এক সময়ে এক দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাদশাহ রাজত্ব করতেন। তার ইব্রাহিম নামে এক উজির ছিল।

উজির ইব্রাহিম-এর একটি খুবসুরৎ যুবতী লেড়কি ছিল। তার নাম ছিল গুলাবী। সে কেবল সুরতের দিক থেকেই অনন্যা ছিল না। তার গুণও ছিল বহুৎ। প্রচুর বিদ্যাশিক্ষা সে গ্রহণ করেছিল। সে নিজে কবিতা লিখতে পারত। আবার প্রচুর সংখ্যক শায়েরও তার কণ্ঠস্থ ছিল। আর বয়েৎ-ও কম জানত না।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ'তম রজনী

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বাদশাহের প্রাসাদে যখনই কোন উৎসব-অনুষ্ঠান হ'ত তখন গুলাবী-র ডাক পড়ত-ই। গুলাবীর রসবোধও ছিল প্রচুর। তাই বাদশাহ তাকে নিজের পাশাপাশি কাছাকাছি রাখতে উৎসাহী হতেন।

এক বিকালে বাদশাহের কিছু মেহমান প্রাসাদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বল খেলছেন। গুলাবী জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখতে লাগল। আদতে নজর তার এক সুদেহী নওজোয়ানের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলাবী-র মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাকে যত দেখছে, ততই যেন দেখার ইচ্ছা প্রবলতর হয়ে উঠছে।

নওজোয়ানটিকে আরও কাছে পাওয়ার জন্য তার দিল্‌ চনমনিয়ে উঠতে লাগল।

গুলাবী আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। বুড়ি ধাইমাকে তলব করল।

বুড়ি ধাই তলব পেয়ে ছুটে এল। গুলাবী তাকে বলল—'ধাইমা, ওই যে নওজোয়ানটিকে দেখছ, চেন ওকে? ওর নাম ধাম কিছু জানা আছে?'

বুড়ি ধাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে গুলাবী-র দিকে তাকায়। আদতে সবাই নওজোয়ান। সবাই খুবসুরৎ। তার মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেওয়া ওর নিস্তেজ চোখের মণি দুটোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

গুলাবী এবার বলল—'আচ্ছা, আমি তোমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

গুলাবী এবার জানালা দিয়ে একটি আপেল ছুঁড়ে দিল। নওজোয়াটির গায়ে গিয়ে সেটি আঘাত হানল, সে ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল।

গুলাবী এবার বুড়ি ধাইকে জিজ্ঞাসা করল—'কি গো ধাইমা, এবার বুঝতে পেরেছ কি? ওর কি নাম, ধাম?'

—'তা আবার জানব না কেন বাছা। ওর নাম তো রোশন।'

—'রোশন? হ্যাঁ, ধাইমা রোশনই বটে। যথার্থ নাম! সার্থক নামা নওজোয়ান!'

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে ঠোঁট দুটো নাড়িয়ে কি যেন বলতে

লাগল। এক সময় ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলল—'ধাইমা, একটি কাগজ-কলম নিয়ে এসো তো।'

বুড়ি ধাই ছুটে গিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে এল।

গুলাবী এবার একটি কবিতা লিখল, যার সমার্থ হ'ল—

'তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ আব্বার আদরের লেড়কা। তিনি তোমার নামকরণ করেছেন, রোশন। রোশন অর্থাৎ দুনিয়ার আলো। নামটি সার্থকই বটে। তোমার সুরতের রোশনাইয়ে তামাম দুনিয়া আলোতে ঝলসিয়ে ওঠে। তোমার আলোকচ্ছটা পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতই স্নিগ্ধ, বড়ই কোমল। তোমার আলোকরশ্মি আমার ভেতরের অন্ধার বিলকুল কেড়ে নিয়েছে। তোমাকে প্রথম দর্শনের মুহূর্ত থেকেই আমি বাতাসে তোমার নিশ্বাস আঘ্রাণ করছি, যাতে তোমার দেহের খুসবু মিশে রয়েছে। তুমি এসো, আমার কাছে এসো।'

গুলাবী কাগজটিকে সুন্দর একটি বটুয়ায় ভরে বালিশের তলায় রেখে দিল।

গুলাবীর কাণ্ড কারখানা বুড়ি ধাই আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করল। গুলাবী ঘুমিয়ে পড়লে বুড়ি বালিশের তলা থেকে সন্তর্পণে বটুয়াটি বের করে নিল।

বুড়ি ধাই কবিতাটি পাঠ করে বুঝতে পারল তার গুলাবীর দিল্ মহব্বতে হাবুডুবু খাচ্ছে। চিঠিটি মুখখোলা অবস্থাতেই ফিন বটুয়াটির মধ্যে রেখে সেটি বালিশের তলায় গুঁজে দিল।

সকালে ঘুম ভাঙার পর বুড়ি ধাই এসে গুলাবী-র শিয়রে বসল, তার গালে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল—'বেটি, জন্মের পর থেকেই আমি তোমাকে কোলে পিঠে করে এত বড় ক'রে তুলেছি, এখন তোমার শরীরে যৌবন ভিড়তে শুরু করেছে। এ অবস্থায় যা স্বাভাবিক তা-ই তোমার মধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।'

গুলাবী নীরবে ধাইমার বাৎ শুনতে লাগল।

বুড়ি ধাই ব'লে চলল—'যৌবনের উন্মাদনার আগুন কেউ সহ্য করতে না পেরে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর কেউ বা নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়। কেউ আচমকা তলিয়ে যায়। আবার কেউ আগুনে পুড়ে পুড়ে সোনার মাফিক খাঁটি হয়ে ওঠে। প্রেমের চিন্তা বিষময়। আবার প্রতিনিয়ত প্রেম প্রার্থীকে দগ্ধে মারে। তবে এর হাত থেকে কিছুটা অন্ততঃ রেহাই পাওয়া যায় যদি প্রেমের চিন্তা-ভাগ অন্য কাউকে দেয়।

গুলাবী আশান্বিতা হয়। বলে—'ধাইমা, মহব্বতের জ্বালায় কোন্ দাওয়াইয়ের প্রলেপ দিলে শান্তি পাওয়া যায়, বলতে পার?'

—'পারি। সে-দাওয়াইয়ের খোঁজ আমার কাছে আছে'।

—'আছে? দাওয়াই তোমার জানা আছে? বলতো, কোন্ দাওয়াই আমার কলিজার জ্বালা নেভাতে পারে?'

—'এক কাজ কর বেটি' একটি চিঠি লিখে তোমার দিলের খবর, তোমার প্রেমের আকুলতার কথা তাকে জানাও। দেখবে, সে তোমাকে মহব্বতে মহব্বতে বিলকুল মাতোয়ারা করে দেবে।

খবরদার , তার কাছে কিছুই গোপন রাখবে না। তবেই দেখবে সে-ও তোমার কাছে তার দিলের দরওয়াজা খুলে দেবে। লেকিন এতে কোন ফাঁক ফোকর, কোন ছল চাতুরির আশ্রয় নিলে আখেরে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য।

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ দেখলেন ভোর হয়ে এল বলে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' একতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বুড়ি ধাইয়ের পরামর্শ গুলাবীর দিলে খুব ধরল। লেকিন গুলাবী কিছুতেই নিজের দিলের কথা, সে যে নওজোয়ানটির মহব্বতে একদম হাবুডুবু খাচ্ছে সে-বিবরণ তার মেহেবুব নওজোয়ানটির কাছে খোলসা ক'রে বলতে তার বাঁধল।

গুলাবী মনস্থ করল নওজোয়ানটির কাছ থেকে আগে তার দিলের খবর জানতে হবে। সে যদি বুঝে নওজোয়ানটি তাকে পিয়ার করে তবেই সে ধীরে ধীরে তার কাছে নিজেকে মেলে ধরবে।

গুলাবী-র দিলের ধান্দা বুড়ি অনুমান করে নিয়ে বুড়ি বলে—'বেটি, গত রাত্রে আমি এক বিচিত্র খোয়াব দেখেছি। এক

খুবসুরৎ লেড়কা এসে আমাকে বলল—'তোমার মালকিন গুলাবী আর খুবসুরৎ নওজোয়ান রোশন মহব্বতের জালে জড়িয়ে পড়েছে। তুমি শীঘ্র গুলাবী-র মহব্বতের চিঠি রোশন-এর কাছে পৌঁছে দাও। লেকিন রোশনের জবাব তোমাকেই গুলাবী-র কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি এমন এক পবিত্রকর্ম থেকে দূরে সরে থাকলে তোমার সর্বনাশ হবে।'

বেটি আমার স্বপ্নের ব্যাপার তোমাকে বাতালাম। এখন তুমি যা ভাল বোঝ কর।'

গুলাবী উল্লাসিতা হয়ে বালিশের তলা থেকে বটুয়াটি বের করে আগে ভাগে লিখে রাখা মহব্বতের চিঠিটা বুড়ি ধাইয়ের হাতে দিয়ে বলল—'তবে এক কাজ কর ধাইমা, এ-চিঠিটি আমার মেহেবুবের হাতে পৌঁছে দাও! সে যে জবাব দেবে আমাকে পৌঁছে দেবে। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, যাও, শীঘ্র যাও।'

বুড়ি ধাই দৌড়ে গিয়ে গুলাবী-র চিঠিটি রোশন-এর হাতে পৌঁছে দিল। রোশন ব্যস্ত হাতে লিফাফাটির চিঠিটি পাঠ করল। ব্যস, তার বুকে খুশীর জোয়ার বয়ে চলল।

রোশন এবার কাগজ-কলম নিয়ে খস্‌খস্‌ করে লিখে ফেলল গুলাবীর মহব্বতের জবাব। সে লিখল—

'আমার দিল্‌ আজ পাখি হয়ে সুদূর নীল আশমানের গায়ে ডানা মেলে হারিয়ে যেতে উন্মুখ। আমি তাকে কি করে বাঁধা দেব, সে যে আজ খাঁচা ছাড়া? তার মুখে আজ কেবল মুক্তির গানা। ওগো আমার মেহবুবা, আজ আমি নতুন সাজে নিজেকে সাজিয়ে দিলের দরওয়াজা খুলে দিয়েছি। এসো, তুমি এসো!

চিঠি লেখা শেষ করে রোশন সেটি বুড়ি ধাইয়ের হাতে তুলে দেয়। বুড়ি ধাই মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে চিঠি নিয়ে গুলাবীর কাছে ছুটে আসে।

উৎকণ্ঠিতা গুলাবী চিঠিটি হাতে পেয়ে যারপরনাই উল্লসিতা হয়ে পড়ে। মেহেবুবার চিঠিটি পরম তৃপ্তিতে বার বার চুম্বন করে, বুকে জড়িয়ে ধরে এক অনাস্বাদিত অনাবিল আনন্দ অনুভব করে।

গুলাবী মেহেবুব রোশন-এর চিঠির জবাবে লিখল—'ওগো, আমার দিল্‌, আমার জান, আমার কলিজা মেহেবুব, ধৈর্যে বুক বাঁধ। আমরা উভয়ে একই জালে জড়িয়ে পড়েছি, সাচ্চা বটে। লেকিন তবু কি ক'রে মালুম হবে আমারই মাফিক তোমার দিল্‌ও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমার দৃষ্টিপথ থেকে রাত্রির কালো ছায়া তোমাকে আড়াল ক'রে রেখেছে। আমাদের উভয়ের বুকেই যে তুষের আগুন ধিক্‌ ধিক্‌ ক'রে জ্বলছে তা সে আমার ভালই জানা আছে। তোমার ইয়ার দোস্তদের সামনে আমার নাকাব না-ই বা খুলে ফেলা হোল। তবু ওগো আমার মেহেবুব, তবু আমি যে তোমার, একান্ত ভাবে তোমারই।'

গুলাবী চিঠি লেখা শেষ করে সেটিকে একটি লিফাফার মধ্যে রেখে তার মুখ বন্ধ করল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' দুইতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন —'জাঁহাপনা, গুলাবী তার মেহবুবার মহব্বতের চিঠিটির জবাব লিখে বুড়ি ধাইটির হাতে দিয়ে বলল—'শীঘ্র এটি আমার মেহেবুবার কাছে পৌঁছে দাও। আমার আর তর সইছে না। জবাব নিয়ে যত শীঘ্র পার ফিন আমার কাছে ফিরে আসবে।

নসীব মন্দ। রোশন-এর দেখা মিলল না। ফিরে আসতে গিয়েই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত ঘটে গেল। সে একদম উজিরের প্রধান সচিবের খপ্পরে পড়ে গেল।

উজিরের প্রধান সচিব বাজখাই গলায় ব'লে উঠলেন—'এই যে বুড়ি, এত রাত্রে এখানে কেন? কাকে চাই? কোথায় যাচ্ছ?'

বুড়ি আমতা আমতা ক'রে জবাব দিল—'হামামে। হামামে যাচ্ছি হুজুর।'

তার জবাব দিতে দিতেই বুড়ি ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে যায়। হঠাৎ পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। অগোছাল কাপড় চোপড় সামলাতে গিয়ে কামিজের ভেতর থেকে চিঠিটি বেরিয়ে পড়ে। এক খোজা সেটি কুড়িয়ে নেয়।

খোজাটি কুড়িয়ে পাওয়া চিঠিটি উজিরের হাতে তুলে দিল। লিফাফাটি খুলে চিঠিটি চোখের সামনে ধরেই উজির চমকে ওঠেন। আর্তনাদ ক'রে ওঠেন—'ইয়া আল্লাহ! এ যে আমারই লেড়কি গুলাবীর হাতের লেখা!'

উজীরের আর্তনাদ শুনে তাঁর বেগম পড়ি কি মরি ক'রে ছুটে এলেন। উজির তার দিকে চিঠিটি এগিয়ে দিলেন।

উজিরের বেগম চিঠিটির দিকে এক নজরে তাকিয়েই চমকে ওঠেন—'ইয়া আল্লাহঃ এ যে আমার বেটি গুলাবী-র হাতের লেখা।'

উজিরের বেগম স্বামীর দিকে এগিয়ে গেলেন। বল্‌লেন-'এ দিমাক গরম করার কাজ নয়। দিমাক ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হবে, কি করে এ-সমস্যা থেকে উৎড়ানো সম্ভব। লোক জানাজানি হলে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত। সমাজে মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়বে।

উজির বল্‌লেন—'বিবিজান, লেড়কির ব্যাপারে আমার বহুৎ ডর লাগছে, বাৎ সাচ্চা বটে। বাদশাহ তাকে কত পেয়ার করে তোমার তো আর অজানা নয়। দু'দিক থেকে আমার ডর লাগছে। সে বাদশাহের খুবই পেয়ারের পাত্র। তারওপর সে আমার লেড়কা। এতে তুমি কি ভাবছ?'

—তাই তো। কি বলি ভেবে পাচ্ছি না। সবার আগে আল্লাতাল্লা-র কাছে প্রার্থনা করে নিচ্ছি। তারপর আমার মতামত ব্যক্ত করব।'

বেগম প্রার্থনা সেরে বল্লেন—'শোন, বাহার অল কুনুজ সমুদ্রে একটি পর্বত রয়েছে। সেখানে সচরাচর কারো যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে একটি মঞ্জিল তৈরী করে লেড়কিকে বাস করা বন্দোবস্ত করে দিন। এতে বাদশাহের ক্রোধ আর লেড়কির ইজ্জৎ উভয়ই রক্ষিত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

উজির বেগমের মতলবটিকে বাস্তবায়িত করতে সে-পাহাড়ের গায়ে একটি বহুৎ আচ্ছা মঞ্জিল বানিয়ে ফেল্লেন।

এবার উজির এক মাঝ-রাত্রে লেড়কি গুলাবীকে নিয়ে বজরায় চেপে পাহাড়-মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

উজির এতদিন যা কিছু বন্দোবস্ত করেছেন সবই খুবই গোপনে ও সন্তর্পণে যাতে কাক পক্ষীও টের না পায়। এমন কি গুলাবীকেও কিছু জানতে দেন নি।

গুলাবী যখন বুঝল, তার আব্বা তাকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার ধান্দা করছে তখন সে আসন্ন বিরহের সম্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়ল।

গুলাবী নির্বাসন-জীবনের পথে পা-বাড়াবার আগে নিজের কামরার দরওয়াজার গায়ে একটি কবিতা লিখে রেখে গেল যার মর্মার্থ—'মেহেবুব আমার, তোমার জন্য আমার দিল্ পাগল করা চুম্বন রয়ে গেল। আমি কোথায় যাচ্ছি কিছুই জানি না। পাখিরা গাছের ডালে বসে চোখের পানি ফেলে চলেছে। লেকিন আমার নসীব তো আমাকে রেহাই দেবে না।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' চারতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, গুলাবী আঁখির পানি দিয়ে সুর্মা গুলে দরওয়াজার গায়ে নিজের বিরহ-জ্বালার স্বাক্ষর রেখে আব্বার সঙ্গে প্রাসাদ ছাড়ল।

একের পর এক গ্রাম-গঞ্জ, নগর, পাহাড়-পর্বত আর বন-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে উজির তাঁর লেড়কি গুলাবীকে নিয়ে এগিয়ে চল্লেন গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে।

এক সময় উজির তার লেড়কিকে নিয়ে কুনুজ সাগরের পাড়ে হাজির হলেন।

একটি বড়সড় বজরা বানিয়ে তাতে দাসী ও নকর প্রভৃতি সহ উজির লেড়কি গুলাবীকে রওনা করিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। সঙ্গে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীও দিয়ে দিলেন।

বজরা ছাড়ার আগে প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন, পাহাড়-মঞ্জিলে গুলাবীকে পৌঁছে দিয়ে তারা যেন ফিরে আসে।

বজরা ছাড়ল। পালে হাওয়া পেয়ে বজরাটি তরতর করে এগিয়ে চলল।

রোশন ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে নামাজ সারল। নাস্তা সেরে ঘোড়ার পিঠে চাপল। উজিরের প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা হ'ল।

উজিরের প্রাসাদের সদর-দরওয়াজায় রোশন ঘোড়া থেকে নামল। প্রাসাদ ফাঁকা। কারো কোন সাড়া শব্দ নেই। সে একদম তাজ্জব বনল।

রোশন এবার গুটিগুটি প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে গেল। গুলাবীর কামরার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরওয়াজার গায়ের লেখাটির দিকে চোখ পড়ল।

দরওয়াজার লেখাটি পড়ে সে বুঝতে পারল, তার মেহেবুব, তার চোখের মণি গুলাবী প্রাসাদ ছেড়ে গেছে। স্বেচ্ছায় সে মোটেই যায় নি। তাকে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। তার মাথা হঠাৎ যেন কেমন চক্কর মেরে উঠল। বিলকুল আন্ধার দেখতে লাগল।

রোশন গুলাবীর বিরহ-যন্ত্রণা সামলে উঠতে পারল না. চাপা আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! একী করলে তুমি! কপালে হাত দিয়ে সে গুলাবীর কামরার দরওয়াজার সামনেই বসে পড়ল।

রোশন কতক্ষণ গুলাবী-র কামরার সামনে হতাশা আর হাহাকার সম্বল ক'রে বসেছিল তার মালুম নেই। এক সময় উঠে বুকভরা যন্ত্রণা নিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

রোশন কোথায় যাবে, কার কাছে গেলে গুলাবী-র পাত্তা জানতে পারবে, কিছুই তার জানা নেই।

গুলাবী-র বিরহ-ব্যথায় রোশন পাগলের মাফিক হয়ে গেল। এক সকালে অস্থিরচিত্ত রোশন এক কাপড়ায় মকান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পাগলের মাফিক পথে পথে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল।

রোশন বিলকুল হারা উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে মরুভূমিতে পৌঁছে গেল। তবু তার হাঁটার বিরাম নেই। এক সময় মরুভূমিও সে পেরিয়ে যায়। এবার এক নদীর পাড়ে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। গণ্ডুষ ভরে পানি তুলে কলিজাটিকে একটু ভিজিয়ে নিল। নদীর পানিতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে চমকে ওঠে। ইয়া আল্লা! কী চেহারা হয়েছে। সে একদম হাড্ডি সার হয়ে গেছে।

রোশন নিজের দিলকে প্রবোধ দেয়। মেহেবুবা গুলাবীই যদি পাশে না রইল তবে কি হবে ছাই সুরৎ দিয়ে?

রোশন ফিন পথ চলা শুরু করল। গ্রাম-গঞ্জ ও পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে চলেছে তো চলেছেই। কোথায় চলেছে, জানা নেই। সে শুধু জানে তাকে চলতে হবে। যে ভাবেই হোক রোশন'কে পেতেই

হবে তাকে।

দিনের পর দিন অজানা-অচেনা পথ পাড়ি দিয়ে রোশন একদিন এসে হাজির হ'ল এক সমুদ্রের পাড়ে। ক'দিন পেটে দানাপানি পড়ে নি। দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটে নি। আর সে চলতে পারছে না। পা দুটো যেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। বাধ্য হয়ে সমুদ্রের পাড়ের বালির ওপর শুয়ে পড়ল।

রোশন বালির ওপর প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এমন সময় এক ফকির সে-পথ দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রোশন'কে দেখে ভাবল, এভাবে এখানে পড়ে থাকলে নওজোয়ানটির জান খতম হয়ে যাবে। ইন্তেকাল হয়ে যাবে।

রোশন'কে দেখে ফকিরের মায়া হ'ল। তাকে ধরে তুল্‌ল। কোন রকমে নিজের গুহায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

ফকির ফলমূল দিয়ে খানা সাজিয়ে রোশন'কে খেতে দিল। লোটা ভরে ঝর্ণার পানি দিল।

খানাপিনা সেরে রোশন গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে অপলক চোখে ফকিরকে দেখতে লাগল।

রোশন ফকিরকে জিজ্ঞাসা করল—ফকির সাহাব, আমি এখন কোথায় আছি?'

—'এটা আমার দরগা। তোমার কোন ডর নেই বেটা। তুমি নিশ্চিন্তে এখানে থাকতে পার।

—'আমাকে এখানে, এ-গুহায় কেন নিয়ে এসেছেন ফকির সাহাব?'

—'আমি তোমাকে না আনলে সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে তোমার জান খতম হয়ে যেত। এরই মধ্যে তোমার ইন্তেকাল হয়ে যেত বেটা। জন্তু জানোয়ার তোমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। তাই বাধ্য হয়ে তোমাকে আমার দরগায় নিয়ে এসেছি।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে ফকির এবার প্রশ্ন করল—'বেটা, এবার তোমার ব্যাপার কিছু জানার জন্য আমার দিল উতলা হচ্ছে।'

—'বলুন, কি জানতে চাইছেন আমার কাছে?'

—'তুমি কোথায় যেতে চাইছ? আর কেনই বা এত কষ্ট স্বীকার করে পথ পাড়ি দিচ্ছ?'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' পাঁচতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিসসা ব'লে চলেছেন—'জাঁহাপনা, ফকির এবার জিজ্ঞাসা করল, বেটা তোমার নামটি তো শোনা হ'ল না। কি নাম তোমার?'

—'রোশন'।

—'রোশন, তুমি কোথায় চলেছ, কেন চলেছ, বললে না তো?'

রোশন এবার তার মহব্বতের কাহিনী ফকির সাহেবের কাছে এক এক ক'রে বিলকুল ব্যক্ত করল।

ফকির সাহেব ধৈর্য ধরে সবকিছু শুনল। তারপর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'বেটা, সবই নসীবের ফের। আল্লাতাল্লা-র মর্জিতেই দুনিয়ার বিলকুল কাম কাজ চলে। বিশ সাল হয়ে গেল আমি এ গুহায় বসতি গেড়েছি। আল্লাতাল্লার-র নাম করে দিন গুজরান করি। আদমিটাদমির মুখ এখানে দেখাই যায় না। তবে ক'দিন আগে একদল পুরুষ ও জেনানাকে এপথে যেতে দেখেছিলাম।'

ফকিরের বাৎ কানে যেতেই রোশন অকস্মাৎ সোজা হয়ে বসে পড়ল। কৌতুহলী দৃষ্টিমেলে ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফকির বলে চলল—'পুরুষ ও জেনানার সে-দলটি সমুদ্রের ধারে বিশ্রাম করল পুরো একটি বেলা। তারপর একটি বজরা চেপে এক মাঝ-বয়সী আদমী বাদে সবাই বিশাল এক বজরা চেপে চলে গেল সমুদ্রের বুক ছিঁড়ে খাড়া হয়ে থাকা ওই পাহাড়টির দিকে।

ফকিরের মুখের বাৎ শুনে রোশন-এর বুকে আশার সঞ্চার হ'ল।

ফকির এবার বলল—'বেটা, আমি গুহায় বসে তাদের কাণ্ড কারখানা বিলকুল দেখতে পেলাম। আমার মধ্যে একটি ব্যাপারে কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। বজরা ছেড়ে যাবার সময় একটি লেড়কি

গলা ছেড়ে বিলাপ করে কাঁদছিল, ইয়াদ আছে।'

বজরাটি সমুদ্রের বুক ছিঁড়ে এগিয়ে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ভিড়ল। আর একটি ব্যাপারে আমার বুকে কৌতূহলের সঞ্চার করল। বজরার যাত্রীরা বজরা থেকে নেমে সেটির গায়ে আগুন জ্বেলে দিল। তাজ্জব ব্যাপার!

বেটা, আমি বহুৎ কোশিস করেছি, বজরার আগুন দেয়ার ব্যাপারটির কিনারা করতে। লেকিন কোন মতলবই বের করতে পারি নি। ব্যাপারটি বিলকুল রহস্যজনকই রয়ে গেল।

ফকির এবার রোশন-এর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ফকির সহানুভূতির স্বরে বলল—'বেটা, আমার দিল বলছে, তারা তোমার মেহেবুবাকে ওই পাহাড়ের গুহায় বন্দী করে রেখেছে।'

তারপর শোন বেটা, বজরাটি আগুনে পুড়িয়ে একদম ছাই ক'রে দিয়ে আদমিগুলো মরুভূমির দিকে চলে গেল। ব্যস, এ-পর্যন্ত। রোশন-এর দুচোখ বেয়ে পানির ধারা নেমে এল।

রোশন-এর হালৎ দেখে ফকিরের দিল করুণায় ভরে গেল। সে বলল—'বেটা, আজরাত্রে আমি তোমার হয়ে আল্লাতাল্লার কাছে তোমার নামে প্রার্থনা করব। তাঁর যা আর্জি হবে। তিনি যেভাবে নির্দেশ দেবেন তুমি তা-ই করবে।'

এদিকে গুলাবী পাহাড়ের গায়ে সে-মঞ্জিলে বাস করতে লাগল। তার চোখের পানি আর শুকায় না। মঞ্জিলের ভেতরে বিলাস-ব্যসনের ঘাটতি নেই। আর দাসী, বাদী, চাকর-বাকর সবই রয়েছে। হুকুম হওয়ামাত্র তা তাঁর হাতের সামনে হাজির হয়। ভোগের এমন এলাহী ব্যাপার স্যাপার পেয়েও গুলাবী-র বুকে শান্তি নেই।

এদিকে রোশন ফকির সাহেবের মেহমান হয়ে দিনগুজরান করে চলেছে।

পরদিন সকালে ফকির রোশনকে কাছে তলব করে বল্‌ল—'বেটা কাল রাতভর আমি তোমার জন্য আল্লাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি। বেটা, তোমাকে এবার এক কাম করতে হবে। সামনে কয়েক লহমা গেলে কিছু মড়া খেজুর গাছ দেখতে পাবে। যত তকলিফই হোক না কেন কয়েকটি খেজুর গাছের গুঁড়ি জোড়া দিয়ে দিয়ে ছোট্ট একটি নৌকা বানিয়ে দেব।

ফকির সাহেবের বানানো নৌকাটি চেপে রোশন পাহাড়টির দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

তাজ্জব ব্যাপার তো! সাগর এতক্ষণ ছিল তলাও-এর মাফিক সৌম্য ঢেউ বলতে কিছুই ছিল না। লেকিন রোশন নৌকা নিয়ে সামান্য এগোতে না এগোতেই সাগর উত্তাল-উদ্দাম রূপ ধারণ করল। মালুম হচ্ছে, সাগর যেন বিলকুল ক্ষেপে গেছে।

আচমকা মাথাসমান উঁচু ঢেউয়ের তাণ্ডবে পড়ে রোশন বিলকুল কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। একদম বে-সামাল হয়ে পড়ল। তার নৌকাটি বার বার আছাড় খেতে খেতে উল্কার বেগে ধেয়ে চলল।

রোশন সংজ্ঞা হারিয়ে নৌকার ওপর পড়ল। যখন তার হুঁস হ'ল তখন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে এক পাহাড়ের পাদদেশে এলিয়ে পড়ে রয়েছে, উঠে দাঁড়াবার হিম্মৎ পর্যন্ত নেই।

এমন সময় এক খোজা এসে রোশনের-এর মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে খোজাটি বল্‌ল—'হুজুর, কে আপনি? এখানে এলেনই বা কিভাবে?'

রোশন ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'আমি এক বণিক। সমুদ্রের তাণ্ডবে আমার বজরা গেছে। ইস্পাহানের বণিক আমি।'

রোশন-এর নসীবের বাৎ শুনে খোজাটির চোখে পানির ধারা নেমে এল। সে চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'হুজুর, খোদাতাল্লার দোয়াতেই আপনার জান রক্ষা পেয়েছে। আমার মুলুকও ইস্পাহান। আমার মহব্বৎ, আমার চাচার লেড়কির সাথে আমার মহব্বৎ। বহুৎ পেয়ার করে আমাকে। আমার জাতভাইরা একসময় আমাকে চুরি করে নিয়ে ভেগে যায়। তখন আমার উমর কম ছিল।

আমার জাতভাইরা চুরি করে নিয়ে গিয়ে আমার অণ্ডকোষ দুটো কেটে ফেলে খোজা বানিয়ে দেয়। তারপর বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে দিল। খোজা বান্দার দর বেশী। তাই আমাকে খোজা বানিয়ে বেচে বহুৎ দিনার তারা হাতিয়ে নিল।

খোজাটি আমাকে নিয়ে পাহাড়ের ধারে এক বিশাল ইমারতে নিয়ে যায়। বাইরের মহলে তার থাকার বন্দোবস্ত। সদর-দরওয়াজা আগলানো তার কাজ, ব্যস, আর কিছুই করতে হয় না।

খোজাটি বল্‌ল—'ধরতে গেলে আমার কোন কাজই নেই। সদর-দরওয়াজা আগলানো—তাও এক সালে একবার মাত্র এটি খুলতে হয়। এক সালে 'একবার' শব্দটি শুনে যেতেই রোশন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

তার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বল্‌ল—'শোন, তামাম সাল ভর যা কি ব্যবহার করা হয় বিলকুল সামানপত্র প্রাসাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এক সাল বাদ ফিন বজরা বোঝাই করে সামানপত্র নিয়ে আসা হয়। দরওয়াজা খুলে সামানপাত্র ভেতরে ঢুকিয়ে খিল বন্ধ করা হয়। ব্যস, পুরো একটি সালের জন্য নিশ্চিন্ত।

এমন সময় অন্দরমহল থেকে কার যেন কান্নার শব্দ রোশন-এর কানে এসে লাগল। জেনানার কান্নার স্বর।

কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে রোশন খোজাটির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'কার কান্নার স্বর? কে কাঁদে, বল তো?'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ

করলেন।

চারশ' সাততম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, রোশন উৎকর্ণ হয়ে কান্নার স্বরটি লক্ষ্য করতে লাগল।

রোশন-এর জিজ্ঞাসা নিরসন করতে গিয়ে খোঁজাটি বল্‌ল—'হুজুর, এ-মহলটি উজিরের বেটির নির্বাসন জীবন যাপনের জন্য বানানো হয়েছে। কিছুদিন আগে তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তারপর থেকেই হারেমে বসে তার মেহবুবের বিরহে কেঁদে কেঁদে আকুল হচ্ছেন। কতদিন যে তাকে এভাবে চোখের পানি ঝরাতে হবে তাঁর জানা নেই।

খোজা প্রহরীটির বাৎ শুনে রোশন-এর কলিজাটি বিলকুল নেচে ওঠে। আশায় তার বুক ভরে যায়। চোখের পলকে তার পথশ্রমে ক্লান্তি অবসাদ কেটে গিয়ে একদম তরতাজা হয়ে ওঠে।

খোজাটি বলে চলল—'হুজুর, গুলাবীকে যে কতকাল এভাবে চোখের পানিতে বুক ভাসাতে হবে আল্লাহ ভিন্ন কেউ জানে না।

নসীববিড়ম্বিতা গুলাবী মাঝে মাঝে ভাবে মহলটির ছাদের ওপর থেকে পালিয়ে পড়ে জান খতম করে দেবে। অবসান ঘটবে যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণার। মুক্তি পাবে এ-বন্দীদশা থেকে। মহব্বতের বিরহ-যন্ত্রণা আর কতকাল বরদাস্ত করা যায়।

পাহাড়-মন্দিরটির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে যন্ত্রণাদগ্ধ দিল্‌ নিয়ে গুলাবী আশমান-জমিন ভেবে চলেছে হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি গাছের ডাল একদম ছাদ পর্যন্ত নেমে এসেছে। এটিকে সম্বল করে কোনক্রমে নিচে নেমে যেতে পারবে। তবে ছাদের একদম ধারে গিয়ে ডালটিকে ধরার কোশিস করতে হবে। হাতফসকে গেলে একদম পাতালে চালান হয়ে যাবে। লেকিন জানের মায়া তো তার নেই। এ-জান যত তাড়াতাড়ি খতম হয় তত তাড়াতাড়ি শান্তি।

শেষ পর্যন্ত বহুৎ কসরত করে হাত বাড়িয়ে ডালটিকে ধরতে পারল। খোদাতাল্লা-র নাম ক'রে পড়ল ঝুলে।

গুলাবী এবার এ ডাল সে ডাল পাকড়ে কোন রকমে নিচে নেমে আসতে পারল।

গাছ থেকে সে নামল বটে। লেকিন সমতল ভূমিতে যেতে গেলে এমন বহুৎ কসরৎ করতে হবে। ঘন ঘন খাড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে সে সমুদ্র তটে পৌঁছতে পারল।

গুলাবী-র পরনে সোনার জরির নকসা করা কামিজ। আর গায়ে হীরা-জহরতের গহনা।

উজির লেড়কিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে বটে, লেকিন ভিখারী

সাজে তো আর পাঠান নি, সম্ভবও নয়। অপত্য স্নেহ তো তাই বলে দিল্‌ থেকে মুছে ফেলেন নি।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' নয়তম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, গুলাবী সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখল, জেলেরা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে মছলি ধরছে।

জাল ফেলার ফাঁকে জেলেদের একজন গুলাবীকে দেখতে পায়। নির্জন নিরালা সমুদ্রের পাড়ে এক খুবসুরৎ লেড়কিকে দেখলে তাজ্জব বনার ব্যাপারই বটে। লেকিন এ-লেড়কি কে? এলই বা কি করে?

জেলেটি তার নৌকাটিকে সাধ্যমত ব্যস্ত-হাতে দাঁড় বেয়ে তীরে এনে ঠেকাল।

জেলেটি নৌকা থেকে নামতে নামতে বলল—'আমাকে ডর করার কোন কারণ নেই। আমি দৈত্য বা জিন-পরীটরী কিছু নই। কিংবা সাগরের পানির তলায় আমার বসতি নয়। আদমি—বিলকুল আদমি। আমার দিলেও মহব্বৎ ছিল। এক লেড়কিকে পেয়ার করতাম।

গুলাবী বলল—'আমার কাছ থেকেও তোমার কোন ডর নেই।

আমিও জিন-পরী নই। এক লেড়কি। আমি এক নওজোয়ানকে পেয়ার করতাম। আমাদের মহব্বৎ গড়ে উঠেছিল। খোদাতাল্লা-র মর্জিতে আমরা একে-অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি। আজ আমি নির্বাসিতা। আমার সব থেকেও আজ কেউ-ই নেই।

ছেলেটি সবিনয়ে গুলাবীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

গুলাবী এবার ছেলেটির কাছে কাতর মিনতি রাখে—'মেহেরবানি করে তোমার নৌকায় আমাকে একটু ঠাই দেবে? তোমাকে আমি খুশী ক'রে দেব। তোমাকে সোনা, হীরা, মুক্তা ইনাম দেব। সাগরের পানির তলায় ঝিনুকে যে মুক্তা থাকে সেই মুক্তা দেব।

ছেলেটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নীরব চাহনি মেলে গুলাবীর দিকে তাকিয়ে রইল।

গুলাবী এবার বলল—'মেহেরবানি করে আমাকে একটু ঠাঁই দাও। দেরী কোরো না। তোমার নৌকাটিকে কাছে নিয়ে এসো, ঝট করে উঠে পড়ি। দেরী করলে ওরা আমাকে পাকড়াও করে ফের কয়েদখানায় পুরে দেবে। খোদার কসম, দেরী কোরো না। নৌকাটি এগিয়ে পাড়ের সঙ্গে লাগাও।'

গুলাবী-র চোখের পানিতে জেলেটির দিল্ গলে একদম পানি হয়ে গেল। তার ইয়াদ হ'ল—সে যখন নওজোয়ান ছিল তখন সে-ও মহব্বতের জালে জড়িয়ে পড়ে বিরহ জ্বালা কম সহ্য করে নি। তিলে তিলে দগ্ধ হতে হয়েছে। এরকম পুরনো স্মৃতি তার দিলের কোণে ভেসে উঠতে লাগল।

জেলেটি এবার তার নৌকাটি পাড়ে নিয়ে গিয়ে বলল—'এসো নৌকায় উঠে এসো কোথায় যাবে বল, আমি পৌঁছে দেব।'

গুলাবী সন্তর্পণে নৌকায় উঠে গেল। অভিজ্ঞ মাঝি চোখের পলকে নৌকাটিকে পাড় থেকে বহুৎ দূরে নিয়ে চলে গেল।

নসীব মন্দ। আচমকা তুফান উঠল। সমুদ্র গেল ক্ষেপে। উত্তাল-উদ্দাম রূপ ধারণ করল মুহূর্তের মধ্যে। একদম প্রলয়ঙ্করী রূপ। পাকা মাঝি শক্ত হাতে হাল ধরল। নৌকা বাঁচাতে সাধ্যাতীত কোশিস করল। লেকিন তার মেহনত বৃথা গেল। নৌকাটিকে বাঁচাতে পারল না। পর্বত সমান ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকাটি তলিয়ে কোথায় যে হদিস হারা হয়ে গেল ঠাহরই করা গেল না।

সেদিন বিকালে সে-মুলুকের সুলতান তার কয়েক জন সভাসদকে সঙ্গে করে সমুদ্রের মুক্ত বায়ু সেবন করতে বেরোলেন।

সুলতান সদলবলে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন এক নৌকার গলুইয়ের ওপর এক খুবসুরৎ লেড়কি শুয়ে। লেড়কিটি সংজ্ঞাহীন। কাপড় চোপড় অগোছাল। প্রায় বিবস্ত্রা।

সুলতান লেড়কিটির দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন—'এ নির্ঘাৎ মানবী নয়, সাগর-কন্যা। কোন মানবীর শরীরে এমন সুরতের হাট তো বসতে পারে না। সাগর কন্যা না হলে নির্ঘাৎ বেহেস্ত থেকে নেমে আসা কোন পরীটরী হবে।

সুলতান বার-কয়েক ডাকাডাকি করার পর লেড়কিটি চোখ মেলে তাকাল। আধো খোলা, আধো বন্ধ চোখে সে সুলতানের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুলতান এবার বল্লেন—'কে গো তুমি? কোন মুলুকে তোমার ঘর? এখানে, নির্জন-নিরালা এ-সমুদ্রতটে এলেই বা কি করে?'

গুলাবী এবার ক্ষীণকণ্ঠে কোন রকমে নিজের নাম বলল। তারপর পরপর দম নিয়ে নিজের পরিচয় দিল। কোন কিছুই ছুপাল না। তার মহব্বৎ, বিচ্ছেদ, বিরহ জ্বালা বিলকুল খুলে বলল। সব শেষে তার করুণতম নির্বাসিত জীবন, জেলের মেহেরবানি সম্বল করে পালাবার ধান্দা, সাগরের তুফান বিলকুল ঘটনা এক এক করে বলল।

তুফানে পড়ে নৌকা সাগরের ঢেউয়ে নাজেহাল হতে থাকে। ব্যস, তারপর যে কি হ'ল কি ক'রে এখানে সমুদ্রতটে এসে পড়ল এটুকু তার পক্ষে আর বলা সম্ভব হ'ল না। আদতে নৌকাটি বেপাত্তা হওয়ার আগেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল।

এমন সময় পূর্ব-আকাশ ফর্সা হয়ে আসতে থাকে। বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' দশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার অবশিষ্ট অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সুলতান গুলাবী-র মহব্বৎ, বিরহ-যন্ত্রণা ও পর্বত-মঞ্জিল থেকে ভেগে আসার কাহিনী শুনে মর্মাহত হন। তিনি সহানুভূতির স্বরে বল্লেন—'নসীবে যা ছিল ঘটেছে। তোমার আর কোন ডর নেই। আমার ওপর ভরসা রাখতে পার। তোমার মেহবুবকে তোমার কাছে এনে দিতে পারব। তুমি নির্দ্বিধায় আমার প্রাসাদে যেতে পার। সেখানে থাকবে। আমি চারদিকে দূত পাঠিয়ে তোমার মেহবুবের তাল্লাশী চালাব। চল, কোন ডর নেই।'

গুলাবী সুলতানের সঙ্গে তার প্রাসাদে গেল।

সুলতান এবার তাঁর উজির'কে বাদশাহ সামিখ-এর দরবারে পাঠাল। তাঁর হাতে একটি চিঠি দিয়ে দিলেন বাদশাহের নামে। তাতে অনুরোধ জানালেন, বাদশাহ যেন মেহেরবানি করে রোশন'কে পাঠিয়ে দেন। অন্যথায় গোলাবী-র জান বাঁচবে না।

বাদশাহ লিফাফা খুলে সুলতানের চিঠিটি পাঠ করলেন। চিঠিটি পাঠ করে বাদশাহ হতাশার দৃষ্টিতে উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন—'সুলতানের অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। দুঃখিত। আদতে রোশন এ-মুলুকেই নেই।'

—'নেই? রোশন নেই?'

—'না। সে বর্তমানে কোথায়। কোন মুলুকে আছে তা-ও আমার জানা নেই। সে বে-পাত্তা। তার সন্ধান করেও হদিস মেলেনি। সে আজ জিন্দা আছে কিনা তা-ও আমার জানা নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উজির বলল—'জাঁহাপনা, খালি হাতে সুলতানের সামনে গিয়ে আমার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আমি ব্যর্থ হলে আমাকে উজিরের পদ থেকে নামিয়ে দেবেন, সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

বাদশাহ আরও গম্ভীর হলেন। নীরবে কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন। মুহূর্তে কর্তব্য নির্ধারণ করে ফেললেন। নিজের উজির ইব্রাহিম'কে সৈন্য সামন্ত দিয়ে রোশন-এর খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন। বিশেষ ক'রে নির্দেশ দিলেন—'একের পর এক মুলুকে যাবে। রোশন এর পাত্তা লাগাবে। তাকে বের করা চাই-ই চাই।'

উজির ইব্রাহিম একদল সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে রোশন -এর তাল্লাশ করতে বেরোবার উদ্যোগ নিলেন।

ইব্রাহিম বাদশাহকে কুর্ণিশ করে রোশন-এর তাল্লাশ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

উজির সদলবলে বহুৎ মুলুক ঢুঁড়ে রোশন-এর তাল্লাশ চালাতে লাগলেন। বহুৎ তল্লাশী চালিয়েও রোশন-এর পাত্তা মিলল না, এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' এগারতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা ব'লে চল্‌লেন—'জাঁহাপনা, উজির ইব্রাহিম হতাশায় জর্জরিত দিল নিয়ে বাদশাহ সামিখ-এর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন, এখন উপায়? তার মাথায় আশমান ভেঙ্গে পড়ার জোগাড় হল। খালি হাতে সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

উজির ইব্রাহিম এবার নগরের পথে পথে ঢুঁড়ে রোশন-এর তাল্লাশ করতে লাগলেন।

উজির গোলাবী-র মুখ থেকে রোশন-এর চেহারার যে-বিবরণ শুনে এসেছেন তার উল্লেখ ক'রে পথচারীদের কাছে তার হদিস জানতে চাইলেন। লেকিন তার সব কোশিস বিফল হ'ল। কেউ-ই রোশন নামে কোন নওজোয়ানের হদিস দিতে পারল না।

গ্রাম-গঞ্জ, পাহাড়-জঙ্গল আর মরুপ্রান্তর ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে রোশন-এর তাল্লাশ চালাতে চালাতে উজির এক সময় সদলবলে সমুদ্রের ধারে হাজির হলেন।

সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে উজির সমুদ্রের মধ্যবর্তী ওই পাহাড়, যেখানে গুলাবী বন্দিনী ছিলেন সেটিকে দেখে সুলতান দিরবাস-এর উজির ইব্রাহিম'কে জিজ্ঞাসা করলেন—ওই পাহাড়টির নাম কি বলুন তো?

ইব্রাহিম'কে বলল—সবাই 'নির্বাসিত আম্মা' পাহাড় নামে জানে।

—'কেন? এরকম নাম হ'ল কেন, বলতে পারেন?'

—'এর নামকরণের ব্যাপারে একটি চটকদার কাহিনী রয়েছে। কোন এক সময়ে চীন দেশে এক জিনিয়াহ থাকত।

জিনিয়াহটি ঘটনাচক্রে একবার এক মানব সন্তান নওজোয়ানের মহব্বতের ডোরে আটকা পড়ে যায়। তাদের মহব্বত ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে।

নওজোয়ানটির ওপর জিন ক্ষুব্ধ হয়, মুখের খানা ছিনিয়ে নিলে গোস্‌সা তো হবেই।

জিনটির ক্ষোভের হাত থেকে নওজোয়ানটির জান বাঁচাবার জন্য জিনিয়াহ তার মেহেবুবকে নিয়ে চলে আসে সাগরে ঘেরা পাহাড়টিতে। এখানে তাকে লুকিয়ে রেখে জান বাঁচাবার বন্দোবস্ত করে।

নওজোয়ানটি পাহাড়টির এক গুহায় মাথা গুঁজে কোনরকমে দিন গুজরান করতে থাকে।

এদিকে জিনিয়াহ গোপনে আশমানে উড়ে তার মেহেবুবের সঙ্গে দেখা করে, কিছু সময় আনন্দ-স্ফূর্তির মাধ্যমে কাটিয়ে যায়।

সে-নওজোয়ান ও জিনিয়াহ-এর মিলনের ফলে জিনিয়াহ পরপর কয়েকবার গর্ভবতী হয়।

জিনিয়াহ এ-পাহাড়েই কয়েকটি লেড়কা-লেড়কি প্রসব করে, তাদের বাল বাচ্চা পাহাড়েই থাকত।

জাহাজ নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সময় নাবিকরা তাদের বালবাচ্চার কান্নাকাটি চিল্লাচিল্লি বহুবার শুনেছে। তারা এতে তাজ্জব বনেছে।

নাবিকরা কিন্তু এর রহস্য উদ্ধার করার জন্য কৌতূহলী হয়েছে সত্য। লেকিন সাহস করে কেউ-ই এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটি সম্বন্ধে তল্লাশী চালাতে সাহসী হয় নি। সে-সময় থেকেই এ পাহাড়টির নামকরণ করা হয়েছে 'নির্বাসিতের আম্মা'।

সুলতান দিরবাস-এর উজিরকে নিয়ে উজির ইব্রাহিম নৌকা বেয়ে পাহাড়টির দিকে এগোতে লাগলেন।

উত্তাল-উদ্দাম সাগরে অতি কষ্টে নৌকা চালিয়ে তারা পাহাড়ের পাদদেশে এসে নৌকা থেকে নামলেন। সামনেই সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশচুম্বী পাহাড়।

পাহাড়ের গায়ে ঝুলছে সে-মঞ্জিল। গুলাবী-র উৎপীড়ন ও নিপীড়নের কারণ সে--মঞ্জিলটি।

ইব্রাহিম দূরে দাঁড়িয়ে মঞ্জিলটির সদর-দরওয়াজার ওপর কড়া নজর রাখতে লাগলেন।

দীর্ঘ অধীর প্রতীক্ষার পর ইব্রাহিম এক ছন্নছাড়া গোছের এক নওজোয়ানকে দেখতে পায়। তার পোশাক পরিচ্ছদ পাগলের মাফিক। মাথার চুল রুক্ষ রুষ্ট, তাকে উন্মাদের মাফিক মনে হলেও তিনি ঠিক চিনে ফেল্লেন—রোশন! হ্যাঁ, ইনিই গুলাবী-র মেহেবুবা রোশন।

ইব্রাহিম আশান্বিত হয়ে সদর-দরওয়াজার দিকে এগিয়ে গেলেন, খোজা প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করল---'তোমাকে একটি বাৎ জিজ্ঞাসা করছি, বল তো, এ-মুসাফির নওজোয়ানটি কে? কোন্ মুলুকে ঘর? তার পরিচয়ই বা কি?'

—'হুজুর, নওজোয়ানটি এক বণিক, সাগরের তুফানে তার জাহাজ ডুবে যাওয়ায় এখানে আশ্রয় নিয়েছে।' একদম ফকিরের হালচাল। বহুৎ আচ্ছা আদমি, খানাপিনা বা গোসল টোসলের দিকেও একদম খেয়াল নেই।'

উজির ইব্রাহিম আর কথা না বাড়িয়ে সোজা মঞ্জিলটির ভেতরে ঢুকে গেলেন, গুলাবী-র তল্লাশ করলেন। তাকে না পেয়ে এক পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার লেড়কি কোথায়? আমার গুলাবী?'

—'হুজুর, আমরা তাজ্জব বনেছি, দুর্গের মাফিক এ-মঞ্জিলটি থেকে তিনি কী ক'রে যে ভেগে গেলেন আমাদের দিমাকেই আসছে না।'

পরিচারিকাদের বাৎ শুনে ইব্রাহিম-এর চোখে পানির ধারা নেমে এল। উন্মাদের মাফিক এদিক-ওদিক ঢুঁড়লেন। লেকিন কোথাও তার পাত্তা মিলল না। কী তাজ্জব বাৎ, এত দাসী-বাঁদী, নফর-নোকর থাকতে একটি লেড়কি কর্পূরের মাফিক হাফিস হয়ে গেল।

উজির ইব্রাহিম এবার ব্যস্ত পায়ে ছাদে উঠে গেলেন। ছাদের ওপর ঝুলে পড়া গাছের ডালটি দেখে নিঃসন্দেহ হলেন, এটিকে অবলম্বন করেই গুলাবী মঞ্জিল ছেড়ে ভেগে গেছে।

পাহারাদাররা পাহাড়ের প্রতিটি গুহা ও প্রতিটি আনাচে কানাচে ছুটোছুটি করে তাল্লাশ করল। লেকিন গুলাবী-র হদিস মিলল না, সবাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল, গুলাবী বেহেস্তে চলে গেছে। তার ইন্তেকাল না হলে গেলই বা কোথায়?

প্রহরীরা হতাশ হয়ে মঞ্জিলে ফিরে গিয়ে খবরটি দিলে রোশন কাঁদতে লাগল। 'আমার মেহেবুবা, আমার গুলাবী বলে উন্মাদের মাফিক কাঁদতে লাগল।

উজির ইব্রাহিম তো বেটির শোকে বিলকুল ভেঙে পড়লেন। তিনি বুক চাপড়ে বেটির শোকে বহুৎ কান্নাকাটি করলেন, চোখের পানি ঝরালেন বহুৎ।

সুলতান দিরবাসের উজির ভাবলেন, এ ভাবে দিশেহারা হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মাফিক ছুটোছুটি ক'রে কোন ফায়দা হবে না। হতাশ হয়ে তাঁর একাই নিজের মুলুকে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এদিকে উজির ইব্রাহিম-এর হালৎ ভোলার নয়। বেটির শোকে বিলকুল ভেঙে পড়েছেন।

সুলতান দিরবাস-এর উজির ইব্রাহিম'কে বল্লেন —'বেটির শোকে আপনি একদম ভেঙে পড়েছেন, আমি বুঝতে পারছি। আমাকে শূন্য হাতেই নিজের মুলুকে ফিরে যেতে হচ্ছে, আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ—এ-মঞ্জিলে যে ভবঘুরে নওজোয়ানটি রয়েছে আমি তাকে নিজের মুলুকে নিয়ে যেতে চাইছি। এর খুবসুরৎ চেহারা ও সহজ-সরল আচরণে মুগ্ধ হয়ে সুলতান আমার ওপর তেমন ক্ষোভ প্রকাশ না-ও করতে পারেন।'

—'লেকিন।'

—'মেহেরবানি করে এতে আর আপত্তি করবেন না। আমি হলফ ক'রে বলছি, কিছুদিন বাদে এ-নওজোয়ানটিকে আপনার মুলুকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

উজির ইব্রাহিম আর আপত্তি করলেন না।

পাহাড়-মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে উজির ইব্রাহিম ও সুলতান দিরবাস-এর উজির নিজ নিজ রাস্তা ধরলেন।

সুলতান দিরবাস-এর উজির সংজ্ঞাহীন রোশন'কে একটি

খচ্চরের পিঠে চাপালেন। নিজেও চাপলেন অন্য একটি খচ্চরের পিঠে। তিনদিন তিনরাত্রি খচ্চরটির পিঠে কাটানোর পর রোশন এর সংজ্ঞা ফিরে এল।

শহরে ঢুকেই উজির সুলতানের কাছে এক দূতকে দিয়ে নিজের আগমনবার্তা পাঠিয়ে দিলেন। একটু বাদে দূতটি ফিরে এসে জানাল, সুলতান তাঁর শূন্য হাতে ফিরে আসার সংবাদ পাওয়া মাত্র ক্ষেপে একদম লাল। মাথায় খুন চাপার উপক্রম হয়েছে। তিনি কড়া হুকুম দিয়েছেন, উজির যেন শহরে না ঢোকেন।

সুলতান দিরবাস কুপিত জানতে পেয়ে উজিরের কলিজা শুকিয়ে একদম কাঠ। কোন ফিকির করতে না পেরে সঙ্গী নওজোয়ানটির কাছে পরামর্শ চাইলেন।

সব শুনে রোশন বলল—'হুজুর, সুলতান আপনাকে কোন দায়িত্ব দিয়ে পরদেশে পাঠিয়ে ছিলেন যা হাসিল করতে না পারায় আপনাকে শহর ছেড়ে যেতে হুকুম জারি করেছেন?'

উজির এবার ঘটনাটি খোলসা ক'রে রোশন-এর কাছে ব্যক্ত করলেন। রোশন সব শুনে তাজ্জব বনল। লেকিন মুখে তেমন কিছু প্রকাশ করল না। ক্ষীণকণ্ঠে বলল—'হুজুর, রোশন-এর পাত্তা আমার আছে। আপনি আমাকে নিয়ে সুলতানের সামনে হাজির হোন। আমি তাকে বলব, রোশন-এর পাত্তা আমার কাছে আছে। তার পরের ব্যাপার সামাল দেবার দায়িত্ব বিলকুল আমার ওপর ছেড়ে দেবেন। উজির আর মুহূর্ত মাত্রও সময় নষ্ট না করে নওজোয়ান রোশন-এর হাত ধরে টানতে টানতে উদ্‌ভ্রান্তের মাফিক সুলতানের সামনে হাজির হলেন।

সুলতান গর্জে উঠলেন—'কি ব্যাপার, খালি হাতে কেন! রোশন-এর কোন পাত্তা মিলেছে? কোথায় সে?'

উজির মুখ খোলার আগেই রোশন এগিয়ে এসে বলল—'জাঁহাপনা রোশন-এর খবর আমার কাছে। সে কোথায় লুকিয়ে আছে আমি জানি।'

—'নওজোয়ান, তুমি জান! রোশন কোথায়?'

—'কোথায়? কতদূরে সে এখন অবস্থান করছে?'

—'একদম কাছে। আপনার নাগালের মধ্যেই হুজুর।'

—'এত কাছে, অথচ আমার কর্মচারীরা, অপদার্থ উজির তার পাত্তাই লাগাতে পারছে'না!'

—'জাঁহাপনা, রোশন-এর পাত্তা আমি-ই আপনাকে দেব। লেকিন তাকে দিয়ে আপনার কি জরুরৎ যে, এমন হন্যে হয়ে আপনি তার তাল্লাশ করছেন?'

—'নওজোয়ান, ব্যাপারটি তোমার কাছে ব্যক্ত করতে আমার কিছুমাত্রও অমত নেই।'

—'তবে মেহেরবানি করে বলুন, রোশন'কে আপনার এমন কি জরুরৎ?'

—'কথা দিচ্ছি, তোমাকে সবই বলব। লেকিন দরবারে এখন ভিড়ভাট্টার মধ্যে বলতে বাঁধছে। বিলকুল ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই গোপনে একমাত্র তোমার কাছে বলতে চাইছি।'

সুলতান এবার রোশন'কে নিয়ে দরবারের পার্শ্বস্থ এক গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

রোশন এবার সুলতানের কাছ থেকে জরির কাজ করা ঝলমলে একপ্রস্ত পোশাক চেয়ে নিল।

রোশন পোশাকগুলো নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল সেগুলো গায়ে চাপিয়ে হঠাৎ সুলতানের সামনে হাজির হ'ল। বলল—'জাঁহাপনা, রোশন আপনার সামনে হাজির।'

সুলতান বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাঁকিয়ে রইলেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' তেরোতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগমের কোলে শির রেখে আধ-শোয়া অবস্থায়

কিস্‌সা শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন —'জাঁহাপনা, রোশন'কে চোখের সামনে খাড়া দেখে সুলতান তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবার জোগাড় হলেন।

রোশন এবার নিভৃতে তার বিরহ-যন্ত্রণার বিলকুল কাহিনী এক এক করে সুলতানের কাছে ব্যক্ত করল।

সুলতান রোশন-এর মুখে তার মহব্বতের কাহিনী শুনে বল্‌লেন 'বেটা, সাচ্চা মহব্বতের মৃত্যু নেই। তোমরা উভয়ে মহব্বৎ-কে যে আকুলতা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছ তার নজীর নেই। আশমানের বুকে যতদিন চাঁদ-সূর্য অবস্থান করবে ততদিন তোমাদের মহব্বতের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কাহিনী অত্যুজ্জ্বল থাকবে।'

রোশন দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে আমতা আমতা ক'রে বলল —'জাঁহাপনা, গুলাবী কোথায়?'

—'তোমার গুলাবী এখন আমার প্রাসাদেই আছে।'

সুলতান তাঁর কলিজার গুলাবীকে রোশনের হাতে তুলে দেয়ার মনস্থ করলেন। সুলতানের হুকুম পেয়ে কাজী ছুটে এলেন, শাদীর কবুলনামা বানানো হ'ল। গণ্যমান্য সাক্ষীরা কবুল নামায় স্বাক্ষর করলেন।

আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে রোশন ও গুলাবী-র শাদী হয়ে গেল। সুলতান দূত পাঠিয়ে বাদশাহ সামিম'কে রোশন ও গুলাবী-র শাদীর খবর জানালেন।

বাদশাহ সামিম লেড়কার শাদীর খবর পেয়ে খুবই খুশী হলেন। সুলতান দিরবাস জোরদার খানাপিনা ও উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। সাতদিন ধরে প্রাসাদে চলল নানা আনন্দ-অনুষ্ঠান।

তারপর সুলতান দিরবাস প্রচুর দান সামগ্রী ও বহুমূল্য উপহার সামগ্রী ও দাস-দাসী সহ কন্যা গুলাবী ও জামাতা রোশন'কে বাদশাহ সামিম-এর রাজধানী ইস্পাহানে পাঠালেন।

রোশন ও গুলাবী সুখে বিবাহিত জীবন ভোগ করতে লাগলেন।

আজব ঘোড়ার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ জানালা দিয়ে বাইরের বাগিচার দিকে এক নজরে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, রাত্রি শেষ হতে এখনও দেরী আছে। এ সুযোগে আপনাকে 'আজব ঘোড়ার কিস্‌সা' নামে নতুন একটি কিস্‌সা শোনাচ্ছি। জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে পারস্যে এক দোর্দণ্ড প্রতাপ বাদশাহ রাজত্ব করতেন। বাদশাহের নাম ছিল সাবুর।

বাদশাহ সাবুর-এর নাম-যশ সমসাময়িক কালে তামাম আরব দুনিয়ায় অগাধ প্রসার লাভ করেছিল। কেবল মাত্র ধন-দৌলতের দিক থেকেই নয়, বিদ্যা শিক্ষাতে তাঁর সমকক্ষ বাদশাহ কেউ-ই ছিলেন না, বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্যও তিনি তামাম আরব দুনিয়ায় বিশেষ খ্যাত ছিলেন।

বাদশাহ সাবুর কারো, এমন কি তাঁর দরবারের কোন পার্ষদও কোন বে-আদপি করলে তাকে ক্ষমা করতেন না। অত্যাচারী কোন আদমি আর বিদ্রোহীকে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না। এর জন্য নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

বাদশাহ সাবুর-এর রাজ্যে যেমন শান্তি শৃঙ্খলা বাঁধা পড়ে থাকত। তার খুবসুরৎ তিনটি লেড়কি ছিল। তাদের সুরতের মাফিক গুণ ছিল অন্তহীন।

কামার-অল আকমর নামে বাদশাহ সাবুর-এর একটি লেড়কা ছিল।

বাদশাহ সাবুর হরসাল দু'বার প্রাসাদে উৎসব অনুষ্ঠান করতেন। শরৎকালে 'মীরগান' নামে উৎসব আর বসন্ত কালে বহুৎ জাঁকজমকের সঙ্গে করতেন নওরোজ উৎসব।

কেবলমাত্র স্বদেশের প্রজারাই নয় বহু পরদেশী মেহমানও বাদশাহের আয়োজিত উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করত। উৎসব উপলক্ষ্যে বাদশাহ খুশী হয়ে কোন কয়েদীকে মুক্তি দিয়ে দিতেন, কারো বা মেয়াদ কমিয়ে দিতেন, আবার কোন কোন জ্ঞানী গুণীকে খেতাব দানের মাধ্যমে সম্মানিত করতেন। কর্মচারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি বা ইনাম দান করতেন। প্রজারাও বাদশাহকে নানা উপহার প্রদান করে নজরানা দিয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

বসন্তকালে আয়োজিত 'নওরোজ' উৎসব ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এতে কেবল মাত্র জ্ঞানী-গুণীজনের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হ'ত। এতে রাজ্যের কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদদের সমাবেশ ঘটত। পক্ষকাল ধরে চলত বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সবশেষে খেতাবদানের মাধ্যমে বাদশাহ তাঁদের বিশেষ বিশেষ সম্মানে ভুষিত করতেন। একবার বাদশাহ অন্যান্য সালের মাফিক বসন্তকালে নওরোজ উৎসবের আয়োজন করলেন।

বাদশাহ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হলে অন্যান্য বহুৎ পরদেশী জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে তিনজন বিশেষজ্ঞ হাজির হয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকেই অলৌকিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা দেশের অধিবাসী। তাদের একজন পারসিক , একজন রোমান আর অন্যজন হিন্দুস্থানী।

উৎসবের শুরুতে হিন্দুস্থানী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি নতজানু হয়ে বাদশাহ সাবুর'কে কুর্নিশ করে আজব একটি সামগ্রী নজরানা স্বরূপ

দান করলেন। বস্তুটি একটি মনুষ্য মূর্তি। সোনার তৈরী। হীরা ও মণি-মুক্তা খচিত। আর তার হাতে সোনার একটি ছোট্ট শিঙা শোভা পাচ্ছে।

মূর্তিটি বাদশাহের সামনে রেখে সে বলল—'জাঁহাপনা, মূর্তিটি অলৌকিক গুণের অধিকারী। একে আপনার প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারে স্থাপন করে দিলে নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার নগর পাহারা দিয়ে সুরক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারবে। কোন বহির্শত্রুর হিম্মত হবেনা আপনার নগর আক্রমণ করে বা দূর থেকে কোন শত্রুকে অগ্রসর হতে দেখলেই তার শিঙাধ্বনির মাধ্যমে শিঙা বাজিয়ে নগরবাসীকে সতর্ক করে দেবে। ফলে আপনার সৈন্যেরা তৈরী হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করে নগরটি রক্ষা করতে পারবে।

বাদশাহ সবিস্ময়ে হিন্দুস্তানী পণ্ডিতের বাৎ শুনতে লাগলেন। পণ্ডিত প্রবর বলতে লাগলেন—'জাঁহাপনা, আমার মুখের বাৎ বিশ্বাস করার দরকার কি? যথা সময়ে পরীক্ষার মাধ্যমেই আমার মূর্তির অলৌকিক গুণের প্রমাণ মিলতে পারে। আপনার জ্ঞাতার্থে আরও নিবেদন করছি যে, আমার এ-অলৌকিক দৈবগুণের অধিকারী মূর্তিটির শিঙার ধ্বনি কানে যেতেই শত্রু সৈন্যের কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সবাই পালিয়ে জান বাঁচাবার ধান্দা করবে। লেকিন পালাতে কেউ-ই পারবে না। শত্রু সৈন্যের কেউ কেউ আকস্মিক ভয় ডরে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে, আবার কেউ বা সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকবে দিনভর।

হিন্দুস্থানী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির বাৎ শেষ হতে না হতেই বাদশাহ সাবুর উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! আপনি যে আজব মূর্তি আমাকে উপহার দিলেন তার বিনিময়ে আমি আপনার কোন আশাই অপূর্ণ রাখব না। আপনাকে উপযুক্ত ইনাম দিয়ে আমি সম্মানিত করব।'

পারস্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি এবার এগিয়ে এসে যথোচিত ভঙ্গিতে বাদশাহ সাবুর'কে কুর্নিশ করল। দু' পা এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটি ঘোড়ার মূর্তি তাঁর সামনে রেখে বল্লেন—'জাঁহাপনা, আমি এ আজব ঘোড়াটি আপনাকে নজরানা দেবার জন্য নিয়ে এসেছি।

বাদশাহ কৌতূহল মিশ্রিত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে পারস্য-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির উপহৃত ঘোড়াটিকে দেখতে লাগলেন।

পারস্য-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি ব'লে চল্লেন—'জাঁহাপনা, আমার এ আজব ঘোড়াটি কোন ধাতুর তৈরি নয়, সম্পূর্ণ কাঠের। সাচ্চা আবলুশ কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছে। এটি অলৌকিক শক্তির আধার।

বাদশাহ সাবুর ঘোড়াটির দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আবলুশ কাঠের ওপরে হীরা ও মণি-মুক্তাগুলি রীতিমত ঝিল্লা দিচ্ছে।

বাদশাহ ঘোড়াটির ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে পারস্য-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির দিকে তাকালেন।
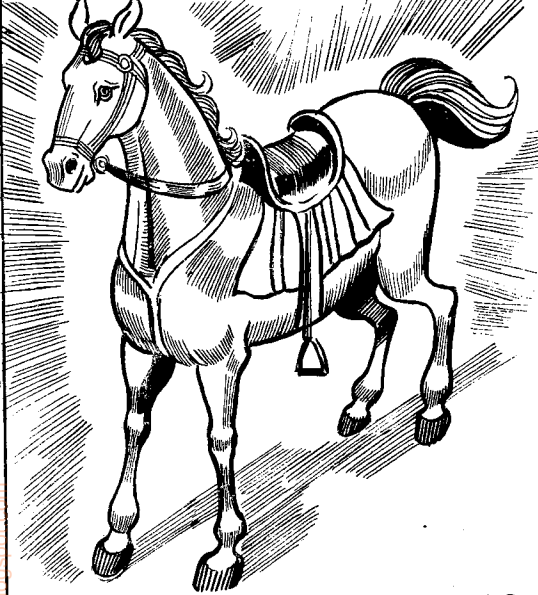
তিনি এবার বল্লেন—'জাঁহাপনা, আমার ঘোড়ার অলৌকিক শক্তির ব্যাপারে দু'-চার কথায় কিছু বলছি। ধৈর্য ধরে শুনুন—এর ওপর বসামাত্র সওয়ারকে নিয়ে সোজা শূন্যে উঠে যেতে পারে। জ্যান্ত কোন ঘোড়া এক সালে যে পথ পাড়ি দেয় সে-পথ এ-অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক মুহূর্তে অতিক্রম ক'রে ফেলে।

জাঁহাপনা, ঘোড়াটির পিঠে চাপলে আপনি আমার মুখের বাৎ মিলিয়ে নিতে পারবেন।

বাদশাহ আবার ছোট্ট ঘোড়াটির দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

এবার রোমান প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি এগিয়ে এসে বাদশাহকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করলেন। তারপর একটি খুব সুরৎ ময়ূরের মূর্তি বাদশাহের সামনে রেখে সশ্রদ্ধ নিবেদন করলেন—'জাঁহাপনা, আমার এ ময়ূরটি অলৌকিক শক্তির অধিকারী। পাত্রটির কেন্দ্রস্থলে বড় যে মূর্তিটি দেখছেন এটি ময়ূর। আর চারদিক থেকে তাকে যারা পরিবেষ্টন করে রেখেছে সেগুলো ময়ূরী। পাত্রটি রূপোর তৈরি। আর ময়ূর ও ময়ূরীগুলো খাঁটি সোনা দিয়ে বানানো।

বাদশাহ সাবুর কৌতূহলাপন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার মূর্তিটি কোন্ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, বলবেন কি?'

—হুজুর : ময়ূরটি দিন ও রাত্রের চব্বিশ ঘণ্টা ধরে প্রতি এক ঘণ্টা বাদে এক একটি ময়ূরীর সঙ্গে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়। এক একটির সঙ্গে এক ঘণ্টা করে চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশটি ময়ূরীর সঙ্গে সে কামক্রীড়ায় লিপ্ত থাকে।

বাদশাহ সাবুর তিনটি অত্যাশ্চার্য বস্তুকে পাশাপাশি রেখে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি একদম তাজ্জব বনে গেলেন। মুখ দিয়ে যেন তাঁর রা সরছে না।

বাদশাহ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন। এক সময় তিনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'দেখুন আপনারা নিজ নিজ বস্তু সম্বন্ধে যা বাৎলালেন তাতে আমি বিলকুল তাজ্জব বনে গেছি।

বাদশাহ এবার পরদেশী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বল্‌লেন—'শুনুন, আপনারা নিজ নিজ বস্তু সম্বন্ধে যা কিছু বাতালেন তা যদি বিলকুল সাচ্চা হয় তবে আপনারা যে, যা আশা করছেন তা অবশ্যই পাবেন।'

বাদশাহ এবার রোজ একটি ক'রে তিন দিনে তিনটি বস্তুর সত্যতা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে দেখলেন।

একদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাদশাহ সাবুর দেখলেন, সোনার ময়ূর প্রতি ঘণ্টায় একটি করে ময়ূরীর সঙ্গে রতি-রঙ্গ ক'রে সময় নির্দেশ করছে।

পরদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সোনার মূর্তিটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। সেটি শিঙা ফুঁকে নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিল।

সবশেষের দিন হীরা মণি-মাণিক্য খচিত আবলুশ কাঠের ঘোড়াটি পারস্য-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটিকে নিয়ে আশমানের দিকে উঠে গিয়ে বাদশাহ সাবুর'কে তাক লাগিয়ে দিল। সে কী তার শব্দ! সে কী তার গতিবেগ—সামলানোই যেন দায়।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' তেরোতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হতে না হতেই বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন'জাঁহাপনা, তিন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বস্তু তিনটির অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বাদশাহ সাবুর একদম তাজ্জব বনে গেলেন। তিনি যেন বিলকুল হতবাক হয়ে পড়েছেন। খুশীতে তার দিল্ ডগমগ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে বাদশাহ নিজেকে একটু সামলে নিয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'আপনাদের উপহৃত বস্তুগুলির অলৌকিক ক্ষমতা চাক্ষুষ করে আমি মুগ্ধ। আপনারা সবাই দিল্ খোলসা করে বলুন, আমার কাছ থেকে কে, কি প্রত্যাশা করেন।'

তিন মেহমান সমস্বরে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমরা তিনজনই একই বস্তু প্রত্যাশা করছি। আপনার তিনটি লেড়কি বর্তমান। আমরা তিনজন আপনার তিন লেড়কিকে শাদী ক'রে বিবির মর্যাদা দিতে চাইছি। আপনার কাছে আমাদের এ-ই প্রার্থনা।'

বাদশাহ সাবুর প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিদের বাঞ্ছা শুনে যার পর নাই খুশী হলেন।

বাদশাহের প্রাসাদে কাজীকে তলব করা হ'ল।

বাদশাহের তলব পেয়ে কাজী তার পুঁথিপত্র নিয়ে ছুটে এলেন। শাদীর কবুলনামা তৈরি হয়ে গেল। সাক্ষীরাও সোৎসাহে স্বাক্ষর করলেন।

সবচেয়ে ছোট লেড়কির নসীবে জুটল এক বুড্ডা। তার উমর যে কত তা হয়ত তিনি নিজেই ওয়াকিবহাল নন। তাঁর উমর খুব কম হলেও এক শ' সাল তো হবেই। মাথায় ইয়া পেল্লাই টাক। বেলমুণ্ডাও বলা চলে। ঘাড়ের কাছে পাটের ফেসোর মত দু'-চারগাছি রোম বাতাসে দোল খেয়ে খেয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। আর ভ্রূ-জোড়া বিলকুল ন্যাপাপোছা। মাথার দু' ধারে গাধার মাফিক ইয়া লম্বা দুটো কান ঝুলছে। লেকিন বুড্ডা হলে কি হবে শখ রয়েছে পুরোদস্তুর। আচ্ছা ক'রে কলপ বুলিয়ে সফেদ দাড়ি গোঁফকে কালো বানানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে ছাড়ে নি। বিড়ালের মাফিক ঘোলা চোখে ছানি পড়ে তাদের কর্মক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস করে দিয়েছে। আর দাঁত দুটোকে যেন শূয়োরের মুখ থেকে খুলে এনে এর মুখে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। উটের অণ্ডকোষের মাফিক তাঁর নিচের ঠোঁটটি বিশ্রী ভাবে ঝুলে পড়েছে। আচমকা এ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটিকে এক পলকে দেখলেই ডরে কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে যায়।

লেকিন ছোট লেড়কিটির সুরৎ? অনন্যা। এর মাফিক খুবসুরৎ লেড়কি এক শ' সালের মধ্যে তামাম আরব দুনিয়ায় কেউ-ই পয়দা হয় নি। চপল হরিণীর মাফিক ডাগর ডাগর চোখ দু'টি তার সুরৎ অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের শাখা-প্রশাখা তাকে আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হতে চায়। আশমানের চাঁদ সালাম জানিয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে। বাগিচার ফুল তার মাথায় স্থান পেয়ে দুনিয়ায় নিজেদের পয়দা হওয়া সার্থক জ্ঞান করে।

ছোট লেড়কিটি তার জীবন সঙ্গীর সুরৎ দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। এক নজরে দেখেই ছুটে গিয়ে পালঙ্কে আছাড় খেয়ে পড়ল। ডুকরে কান্না জুড়ে দিল।

বহিনের কান্না শুনে তার ভাইয়া কামার অল আকমর কাছে এগিয়ে এল। সমবেদনার স্বরে বল্‌ল—'বহিন, কি সমাচার? কি হয়েছে তোর? বল তো, কেন এমন ক'রে কাঁদছিস, বল তো?'

—'ভাইজান, তুমি কি কিছুই জান না কি হয়ে যাচ্ছে?'

—'বহিন, বিশ্বাস কর, আমি কিছুই জানি না। মাত্র তো একটি

দিনের জন্য শিকারে গিয়েছিলাম। এরই মধ্যে এমন কি ঘটে গেল যে, তোকে এমন আকুল হয়ে কাঁদতে হচ্ছে, তোর চোখে পানির ধারা ঝরছে। কি ব্যাপার আমাকে খোলসা করে বল বহিন।'

—'ভাইজান, তোমার কাছে ছিপবার কিছু নেই। বলব, সবই বলব। তবে সাফ বাৎ বলছি, এতবড় একটি জুলুম আমি কিছুতেই বরদাস্ত করে নিতে পারব না। আমার আচরণে নির্ঘাৎ আব্বাজী চরম গোস্‌সা করবেন। লেকিন ভাইয়া, এভাবে আমার জিন্দেগী তো হাসিমুখে বরদাস্ত করতে পারব না। অসম্ভব, কিছুতেই আমি তা হতে দিতে পারি না। আমি প্রাসাদ ছেড়ে গোপনে ভেগে যাব। একদম খালি হাতে, কোন ধনসম্পদ সঙ্গে নেব না, তোমাকে বলে রাখছি।' সবার অলক্ষ্যে আমি প্রাসাদ ছেড়ে ভেগে যাব।'

—'কী ঝকমারিতেই না পড়া গেল! ব্যাপার কি তা তো বলবি? আগে আমার কাছে সব কিছু খোলসা ক'রে বল।' কামার অল আকমর ধমকের স্বরে বল্‌ল।

ছোট বহিন ডুকরে ডুকরে কেঁদে এবার বল্‌ল—'তুমি আমার একমাত্র ভাই—ভাইজান। তোমার কাছে কিছু ছিপাব না। সব বলছি, পারসিক-প্রাজ্ঞটি আব্বাজীকে যাদুমন্ত্রে বশীভূত করে ফেলেছে। কালো একটি আবলুস কাঠের ঘোড়া দিয়ে আব্বাজীকে বলেছে, এ-ঘোড়ার পিঠে বসলে সওয়ারকে নিয়ে আশমানে উঠে যাবে। হাজার মাইল পথ মুহূর্তে পাড়ি দিয়ে দেবে।

তার বাৎ শুনে আব্বাজী কসম খেয়েছিলেন। পারসিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বাৎ সাচ্চা হলে তবে সে যা মাঙ্গবে তিনি তা-ই দেবেন। তিনি তাজ্জব করে দিলেন। ঘোড়াটি তাকে পিঠে নিয়ে দিব্যি শূন্যে উঠে গেল। বিশাল এলাকা নিয়ে কয়েক চক্কর মেরে ঘোড়াটি ফিন নেমে এল জমিনে।

আব্বাজী খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কোন্ ইনাম আশা করছ?'

পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নির্দ্বিধায় আমাকে শাদী করার বাঞ্ছা প্রকাশ ক'রে বসলেন।

আব্বাজী জবান ঠিক রাখতে গিয়ে রাজী হয়ে গেলেন। ভাইজান, আদমিটি কী যে কদাকার দেখতে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাও না, স্বচক্ষে চাক্ষুষ ক'রে এসো। তবে আমি যে সাচ্চা বলছি মালুম হয়ে যাবে।'

—'কোই বাৎ নেহি বহিনজী। আমি এখনই গিয়ে আব্বাজীর সঙ্গে আলোচনা করছি।'

ভাইয়ার বাৎ শুনে ছোট বহিন যেন আশার আলো দেখতে পেল।

কামার অল ব্যস্ত পায়ে দরবারে তার আব্বাজীর সঙ্গে ভেট করল। তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল—'আব্বাজী, কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি নাকি যাদুকরের মায়া জালের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন? সে-বুড্ডা আদমিটির সাথে নাকি বহিনের শাদী দেয়ার মতলব করেছেন, সাচ্চা কি? আপনি জেনেশুনে তার জিন্দেগী বরবাদ করে দিতে উঠে পড়ে লেগে গেছেন? এরকম কাণ্ড তো হতে দেয়া যায় না।'

পারসিক-প্রাজ্ঞটি পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনে রেগে একদম কাঁই হয়ে গেলেন।

বাদশাহ সাবুর মুখ খুল্‌লেন—'কামার অল আকমর, তুমি যদি অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ঘোড়াটির কেরামতি তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে তবে বুঝতে পারতে সে কী অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। আর কী অমূল্য দ্রব্য তিনি আমাকে ইনাম দিয়েছেন। বিনিময়ে তিনি আমার একটি লেড়কিকে শাদী করতে চেয়েছেন।

—'লেড়কিকে শাদী করতে চেয়েছেন!'

—'হ্যাঁ বেটা, তিনি তো খুব সামান্যই আশা করেছেন।'

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' পনেরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, লেড়কার দিলে আস্থা আনার জন্য বাদশাহ সাবুর তাকে নিয়ে প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এলেন।

এক ক্রীতদাস বাদশাহের হুকুমে আবলুশ কাঠের কালো ঘোড়াটিকে নিয়ে এল। সেটিকে এক নজর দেখেই শাহজাদা বিস্ময় বিমূঢ় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শাহজাদা কামার অল এক দুঃসাহসী ও কৃতী ঘোড়সওয়ার। সে এক লাফে অলৌকিক যাদুশক্তি সম্পন্ন কাঠের ঘোড়াটির পিঠে চেপে বসল। লেকিন তাজ্জব ব্যাপার, ঘোড়াটি শূন্যে ওঠা তো দূরের কথা সে বস্তু সামান্য নড়ল চড়লও না। পুতুলের মাফিক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

বাদশাহ ভ্রূ-কুঁচকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—কি ব্যাপার বলুন তো, ঘোড়া যে ঠায় দাঁড়িয়ে! আমার লেড়কার দিলের দ্বিধা দূর করুন। নইলে যে আমি মিথ্যার দায়ে জড়িয়ে পড়ব। যা হোক, বন্দোবস্ত তো কিছু করুন।'

পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি এগিয়ে এসে বল্‌লেন—শাহজাদা, ঘোড়ার গায়ে এই যে বোতামটি দেখছেন, এর গায়ে সামান্য চাপ দিলেই ঘোড়াটি আশমানে উঠে যাবে। দেখবেন, উল্কার বেগে ধেয়ে চলবে।

শাহজাদা কামার অল বোতামের গায়ে চাপ দিতে ঘোড়াটি শোঁ

শাঁ করে আশমানের দিকে উঠতে লাগল। এক সময় এত ওপরে উঠে গেল যে, তাকে ছোট্ট একটি বিন্দু ছাড়া অন্য কিছু মালুম হ'ল না।

এক এক করে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। লেকিন ঘোড়া আর নামে না শূন্যে হরদম চক্কর খেতে থাকে।

বাদশাহ চিল্লিয়ে উঠলেন—'আমার বেটা নামছে না কেন? আপনি তাকে নামিয়ে আনার ফিকির করুন।' চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ এঁকে তিনি ব'লে উঠলেন।

পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি বললেন—'জাঁহাপনা মূর্তিটির গায়ে বাঁ-দিকে একটি সোনার বোতাম লাগানো রয়েছে। সেটিতে টিপ দিলে নিচে নামা যায়। লেকিন আপনার বেটা তো আমার সব বাৎ না শুনেই বোতাম টিপে ঘোড়াকে ওপরে নিয়ে চলে গেল। আমার কসুর কোথায়, আপনিই বলুন জাঁহাপনা?'

ক্রোধোন্মত্ত বাদশাহ সাবুর এবার এক নিগ্রো ক্রীতদাসকে ডেকে পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটিকে কয়েদখানায় পুরে দিলেন।

এবার বাদশাহ উন্মাদের মাফিক ছুটতে ছুটতে নিজের কামরায় ঢুকে দরওয়াজা বন্ধ করে দিলেন। কোর্তা-পাৎলুন ছিঁড়তে লাগলেন। দাড়ি-গোঁফ ছেড়া শুরু করলেন। মেঝেতে শুয়ে রীতিমত দাবড়াদাবড়ি করতে লেগে গেলেন।

এদিকে শাহজাদার ব্যাপারটির খবর বেগম সাহেবার কাছেও পৌঁছে গেল। তিনিও উন্মাদদশা প্রাপ্ত হলেন। বাদশাহের দরবারের আমির-ওমরাহ, উজির-নাজির নফর-বাঁদী, দাস-দাসী সবাই কেঁদে আকুল হতে লাগল। প্রজারাও জটলা করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তামাম রাজ্য শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আজব ঘোড়াটি শূন্যে চক্কর মারতে মারতে আশমানের দিকে উঠতে উঠতে একদম সূর্যের কাছাকাছি চলে গেল।

ঘোড়াটির কারবার দেখে কামার অল বুঝতে পারে অল্প সময়ের মধ্যেই জ্বলন্ত সূর্যের অগ্নিদাহে ঘোড়াটিসহ সে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিছুতেই জান বাঁচানো যাবে না। সে ভাবল, পারসিক-প্রাজ্ঞ তার ওপর বদলা নিতে পেরেছে বটে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় আমি প্রতিবন্ধকতা করেছিলাম। বিনিময়ে যোগ্য বদলাই সে নিল। বিলকুল ভুল তো আমিই করেছি। তার যাদু-ঘোড়ায় চাপা আমার ঠিক হয়নি। এখন সে-কথা ভাবতে বসা নিরর্থক। আমার এ-চরমতম সঙ্কট থেকে একমাত্র খোদাতাল্লা ছাড়া কেউ-ই উদ্ধার করতে পারবে না।

শাহজাদা কামার অল-এর দিলে আচমকা একটি বাৎ বার বার খোঁচা মারতে লাগল—'বোতাম টিপে আমি যেমন ঘোড়া নিয়ে শূন্যে উঠেছি, পারসিক-প্রজ্ঞাটিও তো একই উপায়ে উঠে এসেছিলেন। লেকিন তিনি ফিন নেমে জমিনে ফিরে গেলেন কি করে। এরকম ভাবতে ভাবতে শাহজাদা ঘোড়াটির গায়ে হাত বোলাতে লাগল। আচমকা বাঁ-দিকে এক জায়গায় উঁচু মাফিক কি যেন হাতে ঠেকল। আঙুল দিয়ে সেটির গায়ে চেপে ধরল। ব্যস, কাজ হাসিল। ঘোড়াটি এবার জমিনের দিকে নামতে লাগল। উল্কার বেগে নেমে এক সময় জমিনে এসে দাঁড়াল।
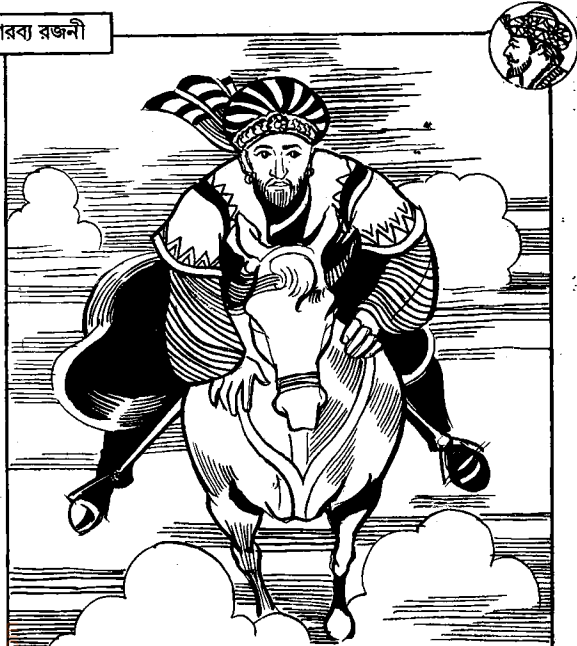
কামার অল এবার খোদাতাল্লা'কে সুক্রিয়া জানাল। সে ঘোড়াটির ওঠা-নামার কায়দা কৌশল রপ্ত করে নিয়েছে। তাল্লাশী চালিয়ে সে ঘোড়াটির ডান বা বাঁ দিকে ঘোরার কৌশলও আয়ত্ব করতে পারল। এবার কামার অল অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন যাদু ঘোড়াটিকে নিয়ে এমুলুক সে-মুলুক ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল। কত সব নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও মরু প্রান্তর পেরিয়ে তামাম দুনিয়া ঢুঁড়তে লাগল।

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ প্রাসাদের জানলা দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বুঝলেন, ভোর হয়ে এল বলে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' আঠারতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদা কামার অল অলৌকিক শক্তির আধার ঘোড়াটির পিঠে চেপে তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল।

শাহজাদা এক সময় পায়ের তলায় খুবসুরৎ এক নগর দেখে সেখানে থেকে ঘুরে ফিরে দেখার লোভ হ'ল। ঘোড়ার বোতাম

টিপে নামল।

গোধূলি বিদায়ী সূর্য পশ্চিম-আশমানে শেষ রক্তিম আভাটুকু নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার জন্য উন্মুখ।

সাজানো গোছানো নগর। বিলকুল ছবির মাফিক। কামার অল আকমর ঘুরে নগরটি দেখতে লাগল। দিল্ ভরে গেল খুশীতে। ভাবল, নিজের মুলুকে গিয়ে চমৎকার এ-নগরটির সৌন্দর্যের বর্ণনা আব্বা, আম্মা ও বহিনের কাছে ফলাও ক'রে বলবে।

কামার অল ফিন ঘোড়ার পিঠে উঠল। পর মুহূর্তেই একটি বিশালায়তন মঞ্জিল দেখে থমকে গেল। নিচের দিক এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখল, মঞ্জিলটি নগরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তার ছাদে চল্লিশ জন নিগ্রো পাহারা দিচ্ছে। সবাই সশস্ত্র। তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম আর তরবারি হাতে।

কামার অল ছাদের এক প্রান্তে ঘোড়া নামিয়ে চুপটি ক'রে বসে রইল। উদ্দেশ্য, পরিস্থিতিটি সম্বন্ধে সামান্য আঁচ নিয়ে নেবে।

রাত্রি ক্রমে গভীর হ'ল। চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়ে এল। সবাই নিশ্চিন্তে নিদে বিভোর হয়ে পড়ল। এবার ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ছাদে দু'-চার কদম হাঁটাহাঁটি করল। খিদে পেয়েছে খুবই। নিদেনপক্ষে সামান্য পানি হলেও পেটের জ্বালা কিছুটা কমানো যেত।

শেষ পর্যন্ত সে নিরুপায় হয়ে সিঁড়ি বেয়ে এক পা দু' পা করে নিচে নামতে লাগল। সে বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। এতবড় একটি মঞ্জিল। লেকিন কোন আদমি টাদমির দেখা নেই। বহুৎ তাল্লাশ করল। কারোরই দেখা মিল্‌ল না।

কামার অল ফিন সিড়ির দিকে পা-বাড়াল। তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হ'ল। মৃদু এক আলোকরশ্মি তার চোখে পড়ল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। তার মালুম হ'ল মঞ্জিলটির একদম শেষের দিক থেকে আলোটি আসছে। আলোকরশ্মির নিশানা ধরে সে গুটি গুটি এগোতে লাগল। এক সময় অন্দরমহলে, হারেমের দিকে এগোতে থাকে।

হারেমের দরওয়াজা একটি চৌপায়ায় এক নিগ্রো খোজা বেহুঁস হয়ে শুয়ে নিদ যাচ্ছে। তার শিয়রে একটি বাতি জ্বলছে।

নিগ্রো খোজাটি একদম দরওয়াজা আগলে শুয়ে। তাকে ডিঙিয়ে হারেমে ঢোকা বিলকুল অসম্ভব ব্যাপার। পাশে একটি পেল্লাই তরবারি। মাথার কাছে দেয়ালে একখানা পোটলা ঝুলছে।

আফ্রিদি দৈত্যের মাফিক লম্বা-চওড়া নিগ্রোটির লাশ। তাকে এক নজর দেখেই ডরে কামার অল আকমর-এর কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল—'ইয়া খোদা, এ আমাকে কোথায় এনে ফেল্‌লে? তুমি মেহেরবানি করে এক দফে আমাকে মৌউতের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে। লেকিন এবার দোজখের এ দূতের হাতেই জান খতম হবে।

আমার পেটে আগুন জ্বলছে। যা কিছু দিয়ে আগে সে আগুন চাপা দেয়া দরকার। দেয়ালে সিকেয় বাঁধা খানা তো কাজে লাগাব। তারপর জান থাকে থাকবে আর যায় যাবে।

সে খুবই সাবধানে এগিয়ে খানার পোটলাটি শিকে থেকে নামিয়ে নিয়ে সটকে পড়ে। হরেক কিসিমে আচ্ছা আচ্ছা খানা। পোটলায় বাঁধা। আর দেরী নয় একদম গোগ্রাসে খানাগুলি গিলতে লাগল।

অদূরে একটি ফোয়ারা দেখে এগিয়ে যায়। ফোয়ারা থেকে গণ্ডুষ ভরে পানি নিয়ে সে পান করল।

কামার অল ফিন নিগ্রো খোজাটির কাছে ফিরে এল। তার পাশ থেকে তরবারিটি তুলে নিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। না, কাউকেই নজরে পড়ল না। ফিন নিঃশব্দে সরে এল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' উনিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা ব'লে চল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কামার অল হাঁটতে হাঁটতে এক সময় অন্য একটি দরওয়াজার সামনে এসে খাড়া হয়ে পড়ল। তাতে একটি পর্দা। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। শয্যাকক্ষ সুবিশাল। দৃষ্টিনন্দন একটি হাতির দাঁতের পালঙ্ক।

ঘরের মেঝেতে চারটি যুবতী শুয়ে নিদ যাচ্ছে। সবাই খুবসুরৎ লেড়কি। সুরৎ যেন উপচে পড়ছে। কামার অল আকমর-এর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ভাবল বেহেস্তের হুরীরাও হয়ত এমন নয়নাভিরাম নয়।

এক ঝলক দেখেই তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে নসীব সম্বল করে একটি লেড়কির ঠোঁটে ছোট্ট করে একটি চুম্বন করল।

লেড়কিটির নিদ টুটে গেল। চপল চাপল হরিণীর মাফিক চোখ দুটি মেলে সবিস্ময়ে চাইল।

কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে লেড়কিটি বল্‌ল—'কে? কে তুমি? কেন এখানে এসেছ? কি করেই বা এসেছ?'

—'ইয়া খোদা! এক সঙ্গে এতগুলোর প্রশ্নের জবাব কি ক'রে দেব?'

—'এখানে কে তোমাকে নিয়ে এসেছে?'

—'নসীব। আমার নসীবই আমাকে এখানে টেনে এনেছে।'

—'আমার নাম সামস অল নাহার। তুমি কি হিন্দুস্থানের কোন বাদশাহের লেড়কা—শাহজাদা?'

কামার অল কি বলবে ভাবছে। সে কিছু বলার আগেই লেড়কিটি ফিন প্রশ্ন করল—'সে গতকাল আমার আব্বার কাছে

আমাকে শাদী করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। লেকিন আমার আব্বা রাজী হননি।

—'রাজী হন নি? কেন রাজী হন নি, বলবে কি?'

—'তার সুরৎ নাকি খুবই খারাপ। লেকিন তোমাকে তো খুবসুরৎ-ই দেখা যাচ্ছে। আমি তো তোমাকে এক ঝলক দেখেই বিলকুল মুগ্ধ হয়েছি।'

কামার অল নিজের সুরতের প্রশংসা শুনে আহ্লাদে একদম গদগদ হয়ে যায়।

খুবসুরৎ লেড়কিটি তাকে এক ঝটকায় বুকে টেনে নিল। ব্যস, উভয়ে লতার মত জড়াজড়ি ক'রে দীর্ঘ সময় পড়ে রইল।

রাত্রি ক্রমে বাড়তে লাগল। তাদের দেহে কামনার দাবদাহ শুরু হয়ে যায়। কলিজা বার বার নেচে নেচে ওঠে। শ্বাসক্রিয়া দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। শিরা উপশিরায় খুনের মাতন লাগে। একে অপরকে আদরে সোহাগে অভিভূত করে দিতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঝেতে শুয়ে পড়ে থাকা বাঁদীদের একজনের আচমকা নিদ টুটে গেল।

বাঁদীটি অজ্ঞাত পরিচয় এক নওজোয়ানকে দেখে আঁৎকে উঠে বলে—'শাহজাদী, আপনার পালঙ্কে ও কে শুয়ে?'

—'আমি চিনি না। নিদ টুটলে দেখি পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে। আমার মালুম হয়েছিল, কাল আব্বাজী এক নওজোয়ানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হয়ত সে-ই হাজির হয়েছে। লেকিন এর সঙ্গে বাৎচিৎ করে মালুম হ'ল, আমারই ভুল। সে নয়।'

—'সে-তো নয়-ই। সে তো বিলকুল কুৎসিৎ দেখতে। আমি নিজের চোখে তার সুরৎ দেখেছি। দেখলেই উল্টি আসে। আর এ-তো চাঁদের টুকরো। নির্ঘাৎ কোন সুলতান-বাদশার লেড়কা। কাল যে এসেছিল সে-তো নফর নোকর হওয়ার যোগ্যতাও তার নেই।

বাঁদীটি এক লাফ খোঁজাটির কাছে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে তার নিদ টুটিয়ে দিল। বাজখাই গলায় চিল্লিয়ে উঠল—'বহুৎ আচ্ছা! তুমি হারেমের নজরদার হয়ে নাক ডাকিয়ে নিদ যাচ্ছে। আর এ-সুযোগে এক শাহজাদা তোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শাহজাদীর কামরায় ঢুকে কম্ম ফতে করে দিল। জান কিছু?'

—'কী এতবড় সাহস! শাহজাদীর কামরায় নওজোয়ান? পরপুরুষ!' হাত বাড়িয়ে তরবারি ধরতে যায়। পেল না। ডরে আঁৎকে ওঠে। এক দৌড়ে শাহজাদীর কামরায় দরওয়াজার পাশে গিয়ে দেখে তারা মহব্বতের বাৎচিৎ করছে। বিলকুল জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে।

এরই মধ্যে তাদের মহব্বৎ গড়ে উঠেছে দেখে নিগ্রো খোজাটির তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে রা সরল না। তারপর আতঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'হুজুর, আপনি কি আদমি, না কি জীন 'বা' আফ্রিদি দৈত্যদৈত্য?'

তার বাৎ শুনে কামার অল তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল—'এত বড় স্পর্ধা তোর! আমার আব্বা বাদশাহ সাবুর। আর আমাকে বলছিস কিনা জিন নাকি আফ্রিদি দৈত্য!'

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে বল্‌ল—'আমি তোর মালিক সুলতানের জামাতা।' বলেই হাতের তরবারিটি বার দুই ঘোরাল। তোর এ-মালকিনের সঙ্গে আজ রাত্রে আমার শাদী হয়েছে। তাই তাকে নিয়ে বাসর-শয্যায়—'

নিগ্রো খোজাটি এবার থমকে গিয়ে বার কয়েক ঢোক গিল্‌ল। তারপর নিজেকে একটু সামলে সুমলে বল্‌ল—'হুজুর, আপনি যদি সাচমুচ শাহজাদা হয়েই থাকেন তবে বলব জরুর শাহজাদীর উপযুক্ত বরই হয়েছেন। মানিয়েছেও বহুৎ। বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!'

নিগ্রো খোজাটি এবার সুলতানের কামরায় গিয়ে উন্মাদের মাফিক কপাল চাপড়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'জাঁহাপনা, সর্বনাশ হয়ে গেছে, কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে।'

সুলতান একদম তাজ্জব বনে যান। আতঙ্কিত হয়ে বলতে থাকেন—'কী সর্বনাশ হয়েছে! কেলেঙ্কারী—খোলসা করে বল! ঝটপট বল কি হয়েছে? আমার কলিজা অস্থির হয়ে উঠেছে। কি হয়েছে সংক্ষেপে বল!

—'জাঁহাপনা, এক নওজোয়ান—একদম সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের কিচির মিচির শুরু

হয়ে গেছে। বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন, ভোর হয়ে এল ব'লে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' কুড়িতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, নিগ্রো খোজাটি গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে ওঠে, জাঁহাপনা, আর এক মুহূর্তও দেরী করবেন না। আপনার লেড়কির কামরায় ঝটপট চলুন। এক আফ্রিদি জিন শাহজাদার সুরৎ ধারণ করে শাহজাদীর সঙ্গে শুয়ে—আমি আর বলতে পারছি না। জলদি চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন।'

সুলতান রেগে একদম অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন—'তোর এত বড় বুকের পাটা! আমার লেড়কির কামরায় নজর রাখতে গাফিলতি করিস! পাহারা না দিয়ে নিদে বিভোর হয়ে থাকিস। তোর গর্দান নিয়ে ছাড়ব শয়তান বেতমিস কাঁহিকার!'

সুলতান তড়পাতে তড়পাতে গিয়ে শাহজাদীর কামরার দরওয়াজার সামনে গিয়ে থমকে খাড়া হয়ে পড়লেন।

বাঁদীদের একজন গলা নামিয়ে ভয়ে ডরে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমরা নিদে বিভোর হয়েছিলাম। আচমকা নিদ টুটে গেল। চোখ মেলে দেখি শাহজাদীর পালঙ্কে এক খুবসুরৎ নওজোয়ান শাহজাদীর সঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়ে। জব্বর এক শাহজাদা!'

সুলতানের চোখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। বাঁদীটি ব'লে চল্‌ল—'জাঁহাপনা, তবে ধন্দ কিছু হয়-ই। সাচ্চা শাহজাদা, নাকি জিন বা আফ্রিদি দৈত্য! এ-ও একদম সাচ্চা তাঁর সুরৎ দেখলে দিল্ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

বাঁদীটির বাৎ শুনে সুলতানের ক্রোধ কিছুটা ঠাণ্ডা হ'ল। তিনি পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন। দেখলেন, এক অকল্পনীয় খুবসুরৎ লেড়কা তাঁর বেটির পাশে, জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে। নিদে বিভোর।

সুলতান চোখে-মুখ বিস্ময়ের ছাপ এঁকে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখলেন, শাহজাদী ঘুমের ঘোরেই নওজোয়ানটিকে আদর সোহাগ করছে। গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়। ব্যাপার দেখে সুলতানের মাথায় ক্রোধে খুন চড়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। হাতের তরবারিটি শক্ত ক'রে বাগিয়ে ধরে এক লাফে কামরার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

সুলতানের পদচারণায় উভয়েরই নিদ টুটে গেল। কামার অল আকমর সবিস্ময়ে শাহজাদীকে জিজ্ঞাসা করল—'কে? তোমার আব্বা?'

শাহজাদী সামস অল বল্‌ল—'হ্যাঁ, আমার আব্বাজী।'

সামস অল-এর বাৎ কানে যেতেই কামার অল আকসার তরবারিটি মুঠো ক'রে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ল।

নওজোয়ানটি আত্মরক্ষার প্রয়াসের মাধ্যমেই সুলতান সমঝে গেলেন তার পৌরুষ আছে বটে। হাতের তরবারিটি নামিয়ে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌লেন—'বেটা, তুমি আদমি, নাকি জিন বা আফ্রিদি দৈত্যটৈত্য কিছু ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। কি তুমি?'

—'ইয়া খোদা! জাঁহাপনা, আপনি শাহজাদীর আব্বা না হলে আমি তরবারির এক কোপে আপনার ধড় থেকে শিরটি নামিয়ে ফেলতাম। আমি পারস্য সম্রাটের লেড়কা। আর আপনি কিনা আমাকে জিন বা আফ্রিদি দৈত্য ঠাওরেছেন! আপনার হাত ধরে মসনদ থেকে টেনে আমি নামিয়ে দিতে পারি। মালুম আছে? আপনার মঞ্জিল, আপনার ইজ্জত মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দেয়ার হিম্মত আমি রাখি।'

শাহজাদার বাৎ শুনে সুলতান নিঃসন্দেহ হলেন, এ-নওজোয়ান নির্ঘাৎ জিন বা আফ্রিদি দৈত্যটৈত্য কেউ নয়, সাচ্চা শাহজাদাই বটে।

সুলতান এবার বুকে সাহস সঞ্চার করে বললেন—'মানছি, তুমি শাহজাদাই বটে। লেকিন তোমার সাহস দেখে আমি তাজ্জব বনছি। এক শাহজাদা হয়ে তুমি কি করে এক শাহজাদীর ইজ্জৎ হানি করছ! তোমার কি মালুম আছে, আমার এ-লেড়কির জন্য আমি কত সুলতান, বাদশাহ আর শাহজাদার জান নিয়েছি। তারা আমার লেড়কিকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। আর তুই কি না তস্করের মাফিক তার কামরায় ঢুকে—দুঃসাহস তোর। গোপনে তাকে শাদী

করেছিস! তার ইজ্জৎ হানি করেছিস! আমি যদি এখন তোর গর্দান—'

—'আমার গর্দান গেলে আপনার গর্দানেও মাথা থাকবে না। জাঁহাপনা। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আমার চেয়ে খুবসুরৎ শাহজাদা কোন্ মুলুকে পাবেন, যার হাতে আপনার আদরের দুলালীকে তুলে দেবেন?'

—'এ বাৎ বিলকুল সাচ্চা বটে। আমার বেটির পাত্র হিসাবে তুমি খুবই যোগ্য। লেকিন তোমরা নিজেরা নিজেরা গোপনে যে-শাদী চুকিয়ে নিয়েছ আমি তা দিল্ থেকে মেনে নিতে পারছি না। কাজীকে তলব করে নিয়ম মাফিক শাদীর বন্দোবস্ত করতে হবে। নইলে আমি সিপাহী তলব করব।'

—'আপনার পরামর্শ আমি মেনে নিচ্ছি। এখন দিমাক গরম করে সিপাহী টিপাহী ডেকে জবরদস্তি কোন কাজ করে ফেল্লে আখেরে কিন্তু আপনাকেই পস্তাতে হবে। আপনার মসনদের মান ইজ্জৎ আছে। এযে বিলকুল ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।' বিষধর সাপের মাথায় তাবিজ রাখলে যেমন কাজ হয় ঠিক তেমনি কামার অল-এর আকমর-এর যুক্তিতে কাজ হ'ল। মালুম হ'ল, সুলতান কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছেন।

কামার অল ব'লে চল্ল—'জাঁহাপনা, দিমাক গরম করে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিছু না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম কিস্সা বন্ধ করলেন।

চার শ' একুশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটি ব'লে চল্লেন—'জাঁহাপনা, কামার অল আকসর-এর বাৎ শুনে সুলতান হঠাৎ কেমন থমকে গেলেন।

কামার অল থামল না। সে তার বক্তব্য অব্যাহত রাখল—'জাঁহাপনা, আমি দেখছি, দুটো পথ আপনার সামনে এখন খোলা।'

—'দুটো পথ? কোন্ পথের ইঙ্গিত তুমি করতে চাইছ?'

—'পহেলা পথ হচ্ছে, আমার সঙ্গে অসি-যুদ্ধে নামা। আর দুসরা পথ—আমি যেমন আপনার লেড়কির সঙ্গে সহবাস করছি তাতে গররাজী না হয়ে চেপে যাওয়া। আমি সকাল পর্যন্ত এ-কামরাতেই আপনার বেটির সঙ্গে কাটাই, আপত্তি করবেন না।'

চমকে উঠে সুলতান ব'লে উঠলেন—'অ্যাঃ! ক্যা বাৎ!'

—'হ্যাঁ, ভোর হলে আপনার অধীনে যত সৈন্য আছে তাদের আমার সঙ্গে যুদ্ধে ভিড়িয়ে দেবেন। আপনার সৈন্য সংখ্যা কত?'

—'চল্লিশ হাজার তো বটেই। অবশ্য আমার নফর-নোকর, ক্রীতদাস প্রভৃতিকে বাদ দেয়া হয়েছে।'

—'বহুৎ আচ্ছা, ভোর হতেই তাদের আমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভিড়িয়ে দিন। তারা আমাকে লড়াইয়ে হারাতে পারলে তবেই আপনার মান ইজ্জৎ রক্ষা পেতে পারে।'

—'আর যদি তুমি লড়াইয়ে হেরে যাও?'

—'লেকিন জিতে গেলেই বা আপনি কোন্ বন্দোবস্ত করবেন? আমি কিন্তু আপনাকে তখন বলব, আমার সঙ্গে আপনার লেড়কির শাদী দিতে। আপনার কোন ধানাইপানাই শুনতে রাজী থাকব না।'

কামার অল-এর বাৎ শুনে সুলতান ফন্দি আঁটতে থাকেন, নওজোয়ানটির যুক্তি মানাই বুদ্ধিমানের কাজ। অসি-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে বে-আক্কেলের কাজই হবে। আমার তাগদ এখন পশ্চিম-আশমানের গায়ে বিলকুল ঝুঁকে পড়েছে। এরকম এক নওজোয়ানের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের নাক নিজের হাতে কাটা। আগ বাড়িয়ে ইজ্জৎ খোয়ান।

কামার অল নীরব চাহনি মেলে সুলতানের মুখের ভাব ভঙ্গির প্রতিটি মুহূর্তের পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করতে লাগল।

সুলতান ভেবে চল্লেন—'লেকিন, নওজোয়ানটি কি বিলকুল পাগল হয়ে গেছে! নইলে বলছে কি, সে আমার তামাম সৈন্যের সঙ্গে একলা লড়াই করবে! যাক গে, আমার কি আর করার আছে। যে মোউতের জন্য মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে তার জান কে বাঁচাতে পারে? ভোরেই এ একদম খতম হয়ে যাবে। এর গর্দান থেকে শির নেমে পথের ধূলায়।'

আমার মান-ইজ্জৎ খোয়া যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, ভোরে তাঁর তামাম সৈন্যদলকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেবেন।

কামার অল বল্ল—'জাঁহাপনা, তবে কোন্ পথ ধরেছেন, বলুন?'

—'বহুৎ আচ্ছা, তুমি আমার বেটির সঙ্গে যেমন রাত্রি কাটাচ্ছ তেমনি বাকি রাত্রিটুকু কাটাও। লেকিন ভোরে তোমার মোউৎ অবশ্যম্ভাবী জেনে রাখো।'

সুলতান কামরাটির দরওয়াজা থেকে গটমট ক'রে চলে এলেন। নিগ্রো খোজাকে দিয়ে বৃদ্ধ উজিরকে তলব ক'রে পাঠালেন।

বৃদ্ধ উজির হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

সুলতান তাঁর কাছে ঘটনাটির আগাগোড়া খুলে বল্লেন। শাহজাদাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। ভোর হতে না হতেই তুমুল যুদ্ধ শুরু করতে হবে।

উজির সুলতানকে প্রবোধ দিলেন, নওজোয়ান শাহজাদাকে সেনাবাহিনীর জাদরেল সেনাপতি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে।

সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উজির ব্যস্ত-পায়ে ফৌজী

ছাউনিতে হাজির হলেন। সেনাপতিদের কড়া হুকুম দিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব গোটা সৈন্যদলকে তৈরী করে নিতে।

এদিকে অস্থির সুলতান বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলেন, নওজোয়ানটির সুরৎ-ই কেবল আকর্ষণীয় নয় তার দেহও পেশীবহুল—সুঠাম। বীরযোদ্ধাদের দেহ ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, আর বাচনভঙ্গীও দিল্ কেড়ে নেবার মাফিকই বটে। এমন চাঁদের টুকরা নওজোয়ানকে জামাতা ক'রে নিতে পারলে দেখনাই হ'ত। তার লেড়কির সঙ্গে মানাতও চমৎকার। একেই বলে বরাত। ধন হাতে পেয়েও হারাতে হচ্ছে। ভোর হলেই সৈন্যদের তরবারির ঘায়ে ওর জান খতম হয়ে যাবে।

সুলতান বার বার এপাশ ওপাশ করতে করতে ভেবে চল্‌লেন—নওজোয়ানটি ওই একটি মাত্র দোষের জন্য জান খোয়াচ্ছে। একরোখা, একদম একরোখা। আমার কাছে মাত্র একটিবার মাফ চেয়ে নিলেই বিলকুল ল্যাটা চুকে যেত। লেকিন কি করেই বা সে মাফ চাইবে? সে যে বাদশাহের লেড়কা। ক্ষমা কি করে চাইতে হয় সে কায়দা কানুন তো তার জানা থাকা সম্ভবও নয়।

ভোর হতে না হতেই এমনএক লেড়কার জান খতম, ইন্তেকাল হয়ে যাবে ভেবে সুলতানের কলিজাটি মোচড় মেরে উঠল। তিনি ফিন নওজোয়ানটির কাছে গিয়ে শেষবারের মত কোশিস করার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েন। ভাবলেন, সে মাথা নোয়ালে নোয়াতেও পারে।

পরমুহূর্তেই তিনি ভাবলেন, এতে তাঁর নিজের মাথাই বিলকুল নুয়ে যাবে। জোর ক'রে নিজেকে সংযত রাখলেন।

পাখির ডাকে ভোর হ'ল। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সুলতানের সৈন্যদল তৈরী।

সুলতান কামার অল আকমর-এর জন্য একটি তেজী ঘোড়া এনে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

কামার অল আকমর ঘোড়া প্রত্যাখ্যান ক'রে বল্‌ল—'আমার জন্য ঘোড়ার বন্দোবস্ত করার দরকার নাই। ঘোড়া আমি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি। তাতে চেপেই তো আমি আপনার প্রাসাদে এসেছি জাঁহাপনা। আমার ঘোড়া ছাদের ওপর রেখে দিয়েছি।'

ছাদের ওপর ঘোড়া রক্ষিত আছে কথাটি শোনামাত্র কামরার সবার চোখ বিলকুল ট্যারা হয়ে যাবার জোগাড়। মুখে কারো রা সরল না। নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। নওজোয়ানটি বলে কি! তবে কি ওর দিমাক বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে! সুলতান ভাবলেন, তবে কি একটি বিকৃত মস্তিষ্ককে হত্যা করে গুনাহ করতে যাব! তবে যে দোজখেও স্থান হবে না।

সুলতান এবার নওজোয়ানটিকে নিয়ে এলেন প্রাসাদ-সংলগ্ন পোলো খেলার ময়দানে যেখানে হাজার হাজার সশস্ত্র সৈন্য যুদ্ধের সাজে তৈরী। সুলতান বল্‌লেন—'তবে কি তুমি একলাই এদের সঙ্গে লড়াই করবে মনস্থ করেছ? তোমার আত্মম্ভরিতা দেখে তাজ্জব বনছি। যাক গে, লড়াই যখন করবেই তখন তৈরী হয়ে নাও।'

সুলতান এবার সৈন্যাধ্যক্ষকে ডেকে বল্‌লেন—'এ নওজোয়ান আমার বেটিকে শাদী করতে চায়। সবদিক থেকে যোগ্য পাত্রই বটে। লেকিন কিছুতেই এ আমার কাছে নত হতে রাজী নয়। ফিন বলে কিনা স্বেচ্ছায় না দিলে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেবে। এর বিশ্বাস, আমার বিশাল সুদক্ষ সেনাবাহিনীকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারবে। অতএব লড়াই অবশ্যম্ভাবী। খেয়াল রাখবে, তোমাদের লক্ষ্য থাকবে জব্দ করা, বন্দী করা, লেকিন হত্যা কোরো না যেন।'

সুলতান এবার কামার অল আকমর-এর কাছে ফিরে এসে বল্‌লেন—'বেটা, মনকে দৃঢ় কর। লড়াইয়ে তোমার জিৎ অবশ্যম্ভাবী। একদম ঘাবড়াবে না। তুমি জিতলে সবচেয়ে আনন্দিত হব আমি, ইয়াদ রেখো।'

সুলতানের হুকুমে সৈন্যাধ্যক্ষরা দৌড়ে ছাদে গেল কামার অল-এর বক্তব্য অনুযায়ী তার ঘোড়াটিকে দেখতে। লেকিন পুচকে এক কাঠের ঘোড়া দেখে তারা সমস্বরে হেসে উঠল। নেহাৎই পাগল না হলে এরকম এক মতলব ভাঁজে!'

সৈন্যাধ্যক্ষদের একজন তো বলেই ফেল্‌ল—'পাগল, বদ্ধ উন্মাদ! নইলে এমন বাৎ কারো কাছে বলা তো দূরের কথা ভাবতে পারে কখনও।'
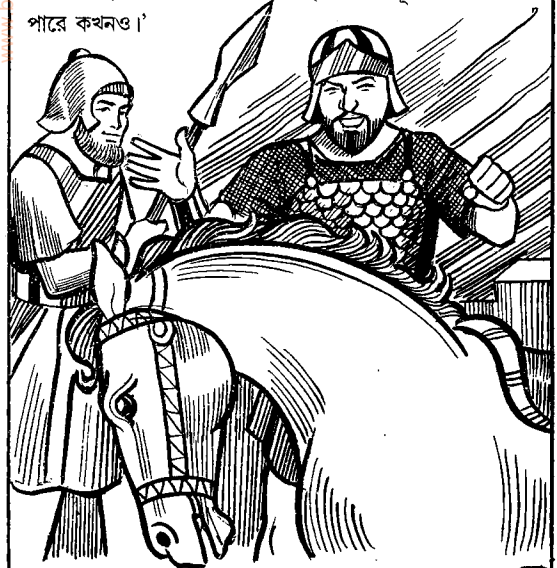
সৈন্যাধ্যক্ষরা ঘোড়াটিকে কাঁধে নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে এসে সুলতানের সামনে হাজির করল।

সুলতান সবিস্ময়ে ঘোড়াটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' বাইশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সৈন্যাধ্যক্ষদের একজন বল্‌লেন, আমার দিল্ বলছে এ-নওজোয়ানটি কোন বাদশাহ বা সুলতানের লেড়কা। যে কোন কারণেই হোক দিমাক গড়বড় হয়ে গেছে। তা নইলে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করার মতলব ভাঁজতে পারত না। আমার সুদক্ষ সৈন্যরা এক ঝটকায় একে কুপোকাৎ করে ফেলবে। উক্তিটি ছুঁড়ে দিয়েই সে সরবে হেসে উঠল।

—'দেখ, এত বড়াই করা ভাল না। শত্রুকে দুর্বল ভাবা উচিত নয়।' এবার কাঠের খেলনা-ঘোড়াটির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বল্‌লেন—'এ কী আজব বাৎ! তুমি এর পিঠে চড়ে আমার বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করতে চাইছ?'

—'হ্যাঁ, জাঁহাপনা, আজব ঘোড়াই বটে। এর হিম্মৎ দেখলে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন, মূর্চ্ছাও যেতে পারেন। বহুৎ আচ্ছা, কিছু নমুনা দেখাচ্ছি।'

কামার অল ঘোড়াটির কান পাকড়ে কাছে নিয়ে এল। এক ঝটকায় তার পিঠে চেপে বসল।

স্বয়ং সুলতান, কয়েক হাজার সশস্ত্র সৈন্য, প্রাসাদের নফর - নোকর, দাসী-বাঁদী প্রভৃতি হাঁ ক'রে নওজোয়ানটির কারবার দেখতে লাগল। সবার মধ্যেই একই কৌতূহল কাঠের ঘোড়া কি ক'রে প্রাণবন্ত হয়ে লড়াই করে দেখবে।

সৈন্যরা যে যার হাতের তরাবারি, বর্শা, বল্লম, তীর-ধনুক দৃঢ়ভাবে পাকড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেহাৎ যদি সে ঘোড়া নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে যাতে মুহূর্তে তাকে হত্যা না করে অন্ততঃ আত্মরক্ষা তো করতে পারবে।'

লেকিন কেউ কেউ বিরুদ্ধ মন্তব্যও করল—ব্যাপারটি এমন পানির মাফিক সহজ-সরল না-ও হতে পারে। যাকে আমরা উন্মাদ ঠাহরাচ্ছি, তার কায়দা কৌশল দেখে তেমন কিছু মালুম হচ্ছে না। কিছু একটি ভরসা না থাকলে আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে যাবেই বা কেন? এত সহজে তাকে ঘায়েল করে আমরা জিততে পারব ব'লে বিশ্বাস হয় না। তবু মান-ইজ্জৎ রক্ষা করতে দাঁতে দাঁত চেপে লড়তে হবেই।

এদিকে নওজোয়ান কামার অল তার কাঠের ঘোড়ার ভেল্কি দেখাতে লেগে গেল। তড়াক্ করে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেই সে আচমকা ঘোড়াটির ডানদিকের বোতামে হাল্কা চাপ দিল। ব্যস, সেটি মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে উল্কার বেগে আশমানের দিকে উঠে যেতে লাগল। সুলতান উজির, নাজির সহ হাজার হাজার সৈন্য হাঁ ক'রে তাজ্জব ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করতে লাগল। অনেকেই বিলকুল সংজ্ঞা হারিয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়ল।

সুলতান সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে উন্মাদের মাফিক চিল্লিয়ে উঠল—'ভেগে গেল! ওই যে ভাগছে! পাকড়াও——পাকড়াও।'

আশমানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সৈন্যাধ্যক্ষ বল্‌ল—'এ কী করে সম্ভব! নিজের চোখেই তো দেখছেন, মুহূর্তে কেমন চোঁ-চোঁ ছুট দিয়ে আশমানেই সেই কোথায় উঠে গেল।

চোখের পলকে ঘোড়াটি এসেই ঊর্ধ্বাকাশে উঠতে উঠতে একদম বে-পাত্তা হয়ে গেল।

উজির মুখ কাচুমাচু করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এতো আর নিছকই কোন কাঠের ঘোড়া নয়। যাদুটাদুর ব্যাপার আছে। আর এ নওজোয়ানটিও আমাদের মাফিক আদমিটাদমি নয়। নির্ঘাৎ কোন না কোন জিন বা আফ্রিদি দৈত্যটৈত্যই হবে। খোদাতাল্লার দোয়ায় যখন সে ভেগে গেছে তখন অন্ততঃ বেঘোরে জান দিতে হচ্ছে না।'

সুলতান বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটিয়ে প্রাসাদের অন্দরমহলে গেলেন। লেড়কি সামস অল নাহার'কে বুঝালেন—'বেটি, নওজোয়ান কামার অল আকসর আদতে কোন মানব সন্তান নয়। সে হয় জিন বা আফ্রিদি দৈত্য; নয়ত কোন যাদুকর। নইলে এমন আজব কাণ্ড করতে পারে কখনও?'

সামস অল নাহার আব্বাজীর বাৎ বিশ্বাস করতে পারল না। সে ডুকরে ডুকরে কেঁদে চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

সুলতান তাঁকে বহুভাবে বুঝাতে লাগলেন। খোদাতাল্লার ওপর ভরসা রাখ বেটি। তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সুক্‌রিয়া জানাও। তিনি আমাদের ভয়ঙ্কর এক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। লেড়কাটি জব্বর ধাপ্পাবাজ। চোখের পলকে হয়ত আমাদের বিশাল ও সুদক্ষ সেনাবাহিনীকে বিলকুল খতম করে দিত।'

সামস অল আব্বাজীর বাৎ শুনে ঠাণ্ডা তো হলই না উপরন্তু কান্নার বেগ অনেকাংশে বাড়িয়ে দিল।

এক সময় সে চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'আব্বাজী, সে যদি আর না ফেরে তবে আমি খানাপিনা ছেড়ে দেব। ফিরে এসে আমাকে বুকে টেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমি খানা পিনা না খেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাব। জিন্দেগী খতম করে ছাড়ব।'

সুলতান প্রমাদ গণলেন। বুঝলেন, একে প্রবোধবাক্যে শান্ত করার কোশিস বৃথা। হতাশা আর হাহাকারে জর্জরিত হতে

লাগলেন। কেবল ঠোঁট দুটো নেড়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব বলতে বলতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' তেইশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদী সামস অল তার মেহেবুব কামার অল আকমর-এর বিরহে গোসল ও খানাপিনা একদম ছেড়ে দিল।

এদিকে কামার অল আকমর শূন্যে উঠে নিজের মুলুকের দিকে ধেয়ে চল্‌ল।

পথ পাড়ি দিতে দিতে সে ভাবল, তার মেহবুবা তো তার আব্বার প্রাসাদে রয়ে গেছে। তাকে যেভাবেই হোক উদ্ধার করতেই হবে। সে জেনে নিয়েছে তার মেহেবুবার নাম সামস অল নাহার। তার আব্বার সুলতানিয়তের নাম ইয়ামান। রাজধানী-শহরটির নাম সানা।

ঘোড়াটি উল্কার বেগে ধেয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শাহজাদা কামার অল-এর প্রাসাদের ছাদের ওপর নামল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল।

কামার অল প্রাসাদে ঢুকেই তাজ্জব বনে গেল। সারা প্রাসাদটি যেন মৃত্যুপুরী বনে গেছে। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে। ব্যাপার কিছুই তার মালুম হ'ল না। সামান্যতম সাড়া শব্দও হচ্ছে না। লম্বা লম্বা পায়ে তার আব্বার কামরায় ঢুকে যেন ধড়ে জান ফিরে পেল। তার আব্বা জীবিত। শোক তাপে পাথর বনে গেছে। কামরারই অন্য দিকে তার আম্মা ও বহিন শোকে মুহ্যমান। উভয়েরই দু' চোখে পানির ধারা। চোখে মুখে অবিশ্বাস মাখানো বিস্ময়ের ছাপ। নির্বাক-নিস্তব্ধ। নিষ্পলক চোখে লেড়কার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন—সত্যিই কি তার বেটা জিন্দা আছে, নাকি—না, আর ভাবতে পারছেন না। মাথা ঝিম ঝিম করছে। তিনি কি জেগে, নাকি নিজের মাঝে খোয়াব দেখছেন?

কামার অল তাঁদের দিলের হালৎ আন্দাজ করে বলে উঠল—'আব্বাজী, আম্মা, আমি তোমাদের বেটা কামার ; আমি ফিরে এসেছি। আমি তোমাদের কোলে ফিরে এসেছি। আমার দিকে নজর দিয়ে দেখ, এই যে, আমি কামার।'

বাদশাহ সাবুর যেন বেটার বাৎ শুনে আচমকা সচকিত হয়ে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

কামার অল-এর আম্মা ও বহিনও নিজেদের সংযত রাখতে না পেরে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অধিকতর রব করে কাঁদতে লাগল। তার আম্মা উন্মাদিনীর মাফিক তার গালে, চিবুকে ও কপালে ঘন ঘন চুম্বন করতে লাগলেন।

একমাত্র লেড়কাকে বুকে ফিরে পেয়ে বাদশাহ সাবুর খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে উঠলেন।

ঢেরা পিটিয়ে রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে দেয়া হ'ল শাহজাদা ফিরে আসার আনন্দে বাদশাহের প্রাসাদে জোর খানাপিনার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সর্বশ্রেণীর প্রজাদের নিমন্ত্রণ।

প্রজারা প্রাসাদে এসে কব্জী ডুবিয়ে হরেক কিসিমের খানা খেল, সরাব পান করল। সাতদিন ভরে নাচা-গানা দেখে খুশী হয়ে নিজ নিজ মাকানে ফিরল।

উৎসব-আনন্দের জোয়ার স্তিমিত হলে শাহজাদা কামার অল

বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করল—'আব্বাজী, সে-পারসিয়ান প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি কোথায় গেলেন, দেখছি না যে? আপনাকে যে আদমি ঘোড়াটি ইনাম দিয়েছিলেন তার বাৎ বলছি।'

পারসিয়ান প্রাজ্ঞটির প্রসঙ্গ উঠতেই বাদশাহ সাবুর একদম চটে ব্যোম হয়ে গেলেন।

কামার অল তার আব্বার ক্ষোভ দেখে যার পর নাই বিস্মিত হয়।

বাদশাহ সাবুর পরম বিতৃষ্ণায় বলতে লাগলেন আর বোলো না। হারামজাদা একটি সাক্ষাৎ বদমায়েশ। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে ঘাড় ধরে প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়েছি। কয়েদখানায় পুরে দিয়েছি। তার ধাপ্পায় না মজলে আমাকে এমন দুঃখ দুর্দশায় ভুগতে হ'ত না।'

—'আব্বাজী, আমি তো তোমার বুকে ফিরেই এসেছি। আর তার দোষই বা কি? তাকে পুরো দোষ না দিয়ে আমার দোষও তো দেখতে হবে। ঘোড়াটিকে চালাবার কায়দা শিখেই আমি আশমানে উড়ে ছিলাম। নেমে আসার কায়দা মোটেই শিখে যাই নি। দোষ তো বিলকুল আমারই ছিল। আমার অনুরোধ, সে-আদমিটিকে যেন জানে খতম করবেন না।'

বাদশাহ লেড়কার ঐকান্তিক আগ্রহে পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটিকে জানে খতম না করে সসম্মানে কারাগার থেকে বের করে এনে মুক্তি দিলেন। আর প্রচুর নগদ অর্থ ও পোশাক পরিচ্ছদ ইনাম দিয়ে সম্মানিত করলেন। তার নিজের মুলুকে ফেরার রাহা খরচও দিয়ে দিলেন।

বাদশাহ সাবুর তাঁর ছোট লেড়কির সঙ্গে পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তির শাদীর ব্যাপারে কিছুই বল্‌লেন না। পারসিক-প্রাজ্ঞটিও আর কিছু বলে নতুনতর বিপদ ঘাড়ে তুলে নিলেন না। বাদশাহ মনস্থ করেই রেখেছিলেন—কিছুতেই তার হাতে লেড়কিকে তুলে দেবেন না। এতে তার কথার খেলাপ যদি হয়ই, হবে।

শাহজাদা কামার অল আকমর যতই বলুক, পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির কোন কসুরই নেই, বিলকুল কসুর তার নিজের। আশমান থেকে নেমে আসার উপায় না জেনেই সে আশমানে উড়ে গিয়েছিল। বাদশাহ নিঃসন্দেহ, তাঁর লেড়কাকে মেরে ফেলার জন্যই শয়তানটি তাকে নেমে আসার বোতামটির হদিস দেন নি। কারণ, শাহজাদা তার সঙ্গে বহিনের শাদী দেয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা করেছিল। সে রাগে, বদলা নেবার জন্যই সে এ-ধান্দা করে। একমাত্র খোদাতাল্লার দোয়ায় সে আশমান থেকে জমিনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। সে কায়দা ক'রে ঘোড়ার গায়ের বোতামটি বের করে না ফেল্‌লে জ্বলন্ত সূর্যের মধ্যে ঢুকে পুড়ে একদম ছাই হয়ে যেত। ইয়া খোদা, এমন সাক্ষাৎ মোউতের হাতে লেড়কিকে তুলে দেবেন বাদশাহ সাবুর! অসম্ভব!'

বাদশাহ এবার ঘোড়াটির দিকে নজর দিলেন। এর গতি কি করা যায়? কোন মতলবই বের করতে পারলেন না। অনন্যোপায় হয়ে লেড়কাকে তলব করলেন।

কামার অল আকমর এলে বাদশাহ বল্‌লেন—'বেটা, এক কাজ করা যাক, অলুক্ষণে ঘোড়াটিকে ভেঙেচুরে একদম খতম করে দেয়া যাক।

শাহজাদা কামার অল আকমর প্রতিবাদ করল। সে তখন শাহজাদী সামস অল নাহার-এর সঙ্গে তার মহব্বৎ ও এক রাত্রের সহবাসের কাহিনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করল। সবশেষে ক্রোধোন্মত্ত ছোট্ট-কালো ঘোড়াটির দৌলতে কি করে জান নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে বিলকুল খুলে বল্‌ল।

সব কিছু শুনে বাদশাহ মুহূর্তকাল গম্ভীর মুখে ভেবে বল্‌লেন—'সবই তো মালুম হ'ল বেটা। লেকিন এক বাৎ, ঘোড়াটির সব কায়দা কৌশল এখনও তোমার ভালভাবে রপ্ত হয় নি। তাই এটি একদম নিরাপদ নয়। আর কোনদিন চড়বে না।'

এদিকে কামার অল শাহজাদী সামস অল নাহার'কে কিছুতেই মন থেকে ঠেলে ফেলতে পারল না। হবেই তো। হাজার রাত্রের স্বাদ যে সে এক রাত্রের সহবাসের মাধ্যমেই উপভোগ করে ফেলেছে। তাকে ছেড়ে জিন্দা থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। জিন্দেগী একদম বরবাদ হয়ে যাবে। ঝামেলা ঝকমারি করেও তাকে বুকে ফিরে পেতেই হবে। লেকিন কি করে তা সম্ভব হবে? তার আব্বা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সে যেন কিছুতেই ওই কালো ঘোড়াটির পিঠে না চাপে। তবে কি করে সে ওই প্রাসাদে তার মেহেবুবার কাছে যাবে। তাকে বুকে পেতে হলে যে করেই হোক তাকে সবার অলক্ষ্যে চুরি করে আনতে হবে। একে তার আব্বা সুলতান। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তার ওপর সৈন্যসামন্ত থেকে শুরু করে প্রতিটি নগরবাসী তার ওপর চটে রয়েছে। হাতের নাগালের মধ্যে কোনক্রমে পেলে ধড় থেকে মুণ্ড নামিয়ে ছাড়বে।

বাদশাহ সাবুর এক সন্ধ্যায় প্রাসাদে নাচা-গানার মজলিস বসালেন।

নগরের নামজাদা সব গায়িকা ও নাচনেওয়ালি এসেছে মজলিসে। তখন এক বিরহ-সঙ্গীত শুনে কামার অল-এর দিলে যেন আগুন ধরে গেল। বহুৎ কোশিস করল দিল্‌কে ঠাণ্ডা করতে। লেকিন সব কোশিস তার ব্যর্থ হ'ল।

উপায়ান্তর না দেখে কামার অল গোপনে কালো ঘোড়াটির পিঠে চেপে বসল।

ঘোড়াটির ডানদিকের বোতামে টিপ দিতেই এক লহমায় ঘোড়া আশমানের দিকে উড়ে চল্‌ল। নামল সানা নগরে বাদশাহের প্রাসাদের ছাদে।

রাত্রি তখন গভীর। কাম কাজ সব মিটে গেলে প্রাসাদের সবাই খানাপিনা সেরে গভীর নিদে তলিয়ে রয়েছে।

কামার অল ছাদ থেকে নেমে সন্তর্পণে নিগ্রো খোজাটির পাশে এল। সে নিদে আচ্ছন্ন। তার শিয়রে শিকেয় ঝুলছে খানার পোটলাটি আর ইয়া পেল্লাই একটি তরবারি। এবার আর খানার দরকার নেই তার। এক ঝটকায় তরবারিটি হাতে নিয়ে নিল।

কামার অল পর্দা সরিয়ে তার মেহেবুবা সামস অল নাহার-এর কামরায় ঢুকল।

দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে কামার অল দেখল, কয়েকজন দাসী-বাঁদী সামস অল নাহার'কে তার কলিজার বিরহ-জ্বালা নেভাতে সান্ত্বনা দিচ্ছে—এভাবে খানাপিনা ছেড়ে, রাত্রি জেগে জেগে শরীর তো কাহিল হয়ে পড়বে। তার মেহেবুব একবার তার দেহসুখ যখন লাভ করেছে আজ না হোক কাল ফিরে আসবেই। মহব্বতের জন্যই তাকে জিন্দা থাকতে হবে। এভাবে নানা প্রবোধবাক্যে তারা তাকে বিছানা থেকে তুলে খানাপিনা করাবার কোশিস করে চলেছে। আর ওড়না দিয়ে চোখের পানির ধারা বার বার মুছিয়ে দিচ্ছে।

কামার অল আকমর দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে অভূতপূর্ব সে-দৃশ্যটি উপভোগ করতে লাগল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' চব্বিশতম রজনী

বাদশাহ শারিয়ার এলে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, দাসী-বাঁদীরা সামস অল নাহার'কে বহুভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে উঠিয়ে খানাখাওয়ানোর কোশিস করতে লাগল। লেকিন শাহজাদী দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইল। কুটোটিও দাঁতে কাটল না।

শাহজাদী সামস অল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বল্‌ল—'তোরা আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছিস। আমার মেহবুব, আমার কলিজা কিছুতেই ফিরবে না।'

এদিকে ভোর হতে না হতেই বাদশাহ সাবুর-এর প্রাসাদে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সাবুর খবর পান শাহজাদা কামার অল প্রাসাদে নেই। তার কামরা ফাঁকা। খাঁচা ছেড়ে পাখি ভেগেছে। চারদিকে তল্লাশীর ধুম পড়ে গেল।

বাদশাহ সাবুর-এর হঠাৎ কালো-ঘোড়াটির বাৎ স্মরণে এল। এক ছুটে ছাদে উঠে এলেন। এ-ও বিলকুল ভোঁ ভোঁ। ঘোড়া নেই। বাদশাহের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শাহজাদা ফিন ঘোড়ায় চেপে উধাও হয়েছে। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন তিনি। শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে উঠল।

বাদশাহ সাবুর নিঃসন্দেহ, শাহজাদা নির্ঘাৎ সানা নগরে সুলতানের প্রাসাদে তার মেহেবুবার সাথে মোলাকাৎ করতে গেছে। বিপদাশঙ্কায় তাঁর কলিজায় ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। সেখানকার সুলতান তার ওপর এমনিতেই চটে রয়েছেন। কোনরকমে ঘোড়ায় চেপে তার খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ফিন তিনি তাকে হাতের নাগালের মধ্যে পেলে একদম খুন না করে ছাড়বেন না।

ক্রোধোন্মত্ত বাদশাহ সাবুর প্রতিজ্ঞা করলেন। সর্বনাশের মূল কালো ঘোড়াটিকে এবার হাতে পেলে বিলকুল গুঁড়ো করে ছাড়বেন। নইলে লেড়কাকে জিন্দা রাখা যাবে না। তার গায়ের ঝালও মিটবে না।

এদিকে শাহজাদা কামার অল দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে দাসী-বাঁদীদের প্রবোধবাক্যগুলো শুনতে লাগল।

তাদের মিথ্যা প্রবোধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শাহজাদী কান্নার ফাঁকে বলতে লাগল—'ঝুটমুট আমাকে জ্বালাতন করিস নে তোরা। ভাগ এখান থেকে। আমাকে একটু একেলা থাকতে দে। তোরা যা-ই বলে আমাকে প্রবোধ দিস না কেন। আমার আব্বা একবার তাকে কব্জা করতে পারলে একদম জিন্দা কবর দিয়ে ছাড়বে।'

ইতিমধ্যে কামার অল অতি সন্তর্পণে সবার অলক্ষ্যে পা টিপে টিপে তার মেহেবুবার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

সে পিছন থেকে তার মেহেবুবার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে ব'লে উঠল—'মেহেবুবা, আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি। এদিকে তাকিয়ে দেখ—তোমার আব্বার ডরে আমি ফিন আসব না ভেবেছিলে?'

মেহেবুবা আমার, আমার কলিজা আসলি মহব্বৎ কোন কিছুর, এমন কি ইন্তেকালেরও পরোয়া করে না। মৌউতের ডরে কি কেউ কুঁকড়ে গিয়ে লড়াই না করে হাত-পা গুটিয়ে কামরার কোণে বসে থাকে, তুমিই বল। দুনিয়ায় পয়দা হলে ইন্তেকাল তো একদিন হবেই। আমার কাছে এটাও তো লড়াই-ই। মহব্বতের লড়াই,

তোমাকে বুকে পাবার লড়াই।

শাহজাদী সামস অল মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তার মেহেবুবার দিকে তাকায়। সে যেন জেগে খোয়াব দেখছে।

দাসী-বাঁদীরা হুড়মুড় করে কামরা ছেড়ে ভেগে গেল।

শাহজাদী সামস অল নাহার বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। এমনটি তো হওয়াই স্বাভাবিক। তার আব্বার মরণফাঁদ থেকে একবার সে সবার চোখে ধুলো দিয়ে ভেগেছে সে-ই ফিন স্বেচ্ছায় হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দেবে এ যে খোয়াবের মধ্যেও ভাবা যায় না।

সামস অল তার মেহেবুবের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। চোখের পানি ঝরিয়ে বুকের বোঝা হাল্কা করার কোশিস করে।

কামার অল আকমর বলতে লাগল—'তোমার বিরহে আমি যে কী দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ফিন কাটিয়েছি, আমার কলিজায় আগুন সারাক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলেছে সেসব তোমাকে আমি বুঝাতে পারব না মেহেবুবা। আজ তোমাকে ফিরে পাওয়ামাত্র আমার বুকে যেন বরফ বুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কলিজা বিলকুল ঠাণ্ডা বনে গেছে।

শাহজাদী সামস অল আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত। মাত্রাতিরিক্ত খুশীতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে উন্মাদিনীর মাফিক তার মেহেবুবের ঠোঁটে, গালে ও কপালে হরদম চুমু খেতে লাগল।

সে মেহেবুবের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলতে লাগল—'মেহেবুব আমার, তোমার অদর্শনে আমার হালৎ কি হয়েছিল, বুঝতে পারছ না? আর কিছুদিন তুমি চোখের আড়ালে থাকলে তোমার মেহেবুবাকে আর দেখতে পেতে না। সে জমিনে, গোরে আশ্রয় নিত। তোমাকে ছাড়া আমি জিন্দা থাকতে চাই না, পারবও না। মহব্বতকে যদি জিন্দাই রাখতে না পারলাম তবে আর নিজেকে জিন্দা রেখে ফয়দা কি? আমি নিয়ত করেছিলাম, তোমাকে নেহাৎ-ই যদি বুকে ফিরে না পাই তবে বিষ খেয়ে এ-জান খতম করে দেব।'

মেহেবুবার বাৎ শুনে কামার অল আতঙ্কিত হয়ে তার মুখ চেপে ধরে ব'লে উঠল—'এ সব অলুক্ষণে ভাবনা বিলকুল দিল্ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও মেহেবুবা। আমি দূরে থাকি, যেখানেই থাকি না কেন তোমার হয়েই থাকব। আমাদের মহব্বতে কোনদিনই ভাঁটা পড়বে না। আজ যেমন তুমি আমার, ভবিষ্যতেও বিলকুল আমারই থাকবে।'

শাহজাদীর হুকুমে দু'জন দাসী খানা আর সরাব দিয়ে গেল। সামস অল দু'টি রেকাবিতে হরেক কিসিমের খানা সাজিয়ে একটি কামার অল আকমর'কে দিল এবং নিজে নিল একটি রেকাবি। সরাব দিল পেয়ালা ভরে।

খানাপিনা সেরে তারা ফিন মহব্বতের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিল। উভয়ের দিল্ খুশীতে ডগমগ।

প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে কামার অল আকমর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—'মেহেবুবা, খুশীর রাত কেমন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় দেখ! এর মধ্যে পাখিরা আমাদের হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছে, ভোর হয়ে এল ব'লে।

—'তবে কি তুমি—'

—'হ্যাঁ মেহেবুবা, এবার আমাকে বিদায় নিতেই হবে। তোমার আব্বা কেমন বদ মেজাজ মর্জির লোক তা-তো তুমি জানই। হতচ্ছাড়া খোজাটির নিদ টুটে গেলে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আমি তোমার কাছে কসম খাচ্ছি প্রতি হপ্তায় একবার ক'রে এসে তোমার সাথে মিলিত হ'ব।'

সামস অল নাহার তাকে দু' হাতে লতার মাফিক বুকে জাপ্টে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল—'অসম্ভব! বিলকুল অসম্ভব! তোমাকে বিনা আমি জানই রাখতে পারব না। এক হপ্তা তো দূরের কথা, একদিন—এক মুহূর্তও তোমাকে চোখের আড়ালে করতে পারব না মেহবুব আমার। তুমি এখানেই থাকবে।'

কামার অল সচকিত হয়ে ওঠে। এক লহমায় তার কলিজার বিলকুল পানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। সামস অল-এর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে কোনরকমে উচ্চারণ করে—'মেহেবুবা, তোমার আব্বাকে তো চেনই কেমন জেদী। আমাকে তোমার কামরায় দেখলে একদম গর্দান নিয়ে ছাড়বেন।'

—'জানি মেহেবুব, আমার কামরায় তোমাকে রাখলে জিন্দেগীর জন্য তোমাকে হারাতে হবে। ভুলেও আমি এরকম প্রস্তাব দেব না। লেকিন তোমাকে দূরে রেখে আমার জান রাখাও কঠিন সমস্যা।'

—'তবে? তবে এমন কোন্ ফন্দি-ফিকিরের—'

তার মুখের বাৎ ছিনিয়ে নিয়ে সামস অল বল্ল—'ফিকির একটিই করা যেতে পারে—আমাকে তোমার সঙ্গে ক'রে—'

—'আমার সঙ্গে?'

—'হ্যাঁ, তোমার আব্বা পারস্যের মহামান্য বাদশাহ। তার মান ইজ্জৎ আমি পথের ধুলায় লুটিয়ে দিতে উৎসাহী নই। তিনি যদি আমাকে তোমার সঙ্গে শাদী দিয়ে প্রাসাদে তুলতে আপত্তি করেন তবে অন্য কোথাও আমাকে রেখে দেবে। তোমার মুখ চেয়ে, মহব্বতের খাতিরে দুনিয়ার বিলকুল তকলিফ হাসিমুখে বরদাস্ত করে নেব।'

উচ্ছ্বসিত আবেগে কামার অল লাফিয়ে উঠল। সোল্লাসে বল্ল—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ বড়িয়া মতলব। তোমার আব্বার এমন

ধন দৌলত, এত সুখ-সুবিধা বিলকুল ছেড়ে আমার সহগামিনী হতে পারবে?'

—'পারব। জরুর পারব। মেহবুব তোমাকে বুকে পাবার জন্য দুনিয়ার বিলকুল তকলিফ সহ্য করতে পারব।'

—'তবে আর দেরী কোরো না। ভোর হয়ে এল ব'লে। নিগ্রো-খোঁজাটির নিদ টুটে গেলে ঝকমারিতে পড়তে হবে। এ-মুহূর্তেই আমাদের খোদাতাল্লা-র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।'

কামার অল তার মেহেবুবা সামস অল'কে নিয়ে ব্যস্ত পায়ে ছাদে উঠে এল। তার হাতে সামস অল-এর কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ আর বহুমূল্য গহনাপত্র।

সামস অল'কে ঘোড়াটির পিঠে বসিয়ে দিয়ে নিজে তার পিছনে বসল। হাতের পোটলাটি ঘোড়ার জিনের সঙ্গে লটকে দিল।

ঘোড়াটির গায়ের ডানদিকের চাবিটিতে মোচড় দেয়ামাত্র সে তার কেরামতি শুরু করে দিল। শোঁ শোঁ শব্দে আশমানের দিকে উঠতে লাগল। যাদু-ঘোড়া উল্কার বেগে ধেয়ে চল্‌ল বাদশাহ সাবুর-এর রাজ্য পারস্যের দিকে।

এদিকে নিগ্রো-খোজা বিছানা ছেড়ে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে পড়ল। তার আতঙ্কের কারণ তরবারিটি জায়গা মাফিক নেই। মেঝেতে পড়ে। সে ভাবল, নির্ঘাৎ সে-নওজোয়ানটি শাহজাদীর কামরায় হামলা চালিয়েছে।

দরওয়াজার সামনে গিয়েই সে দেখল, কামরা ফাঁকা। শাহজাদী উধাও। ভয়ে-ডরে সে আঁৎকে উঠে চিল্লাতে লাগল।

নিগ্রো-খোঁজাটির চিল্লাচিল্লি শুনে সুলতান পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে শাহজাদীর কামরায় এলেন। কামরা খালি।

সুলতান ব্যস্ত পায়ে ছাদে উঠে দেখেন, বহুৎ দূরে কালো মাফিক একটি বিন্দু যেন ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হ'ল না ব্যাপার কি।

সুলতান যেন মুহূর্তে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হলেন। চিল্লিয়ে বলতে লাগলেন—'কামার অল, খোদার কসম, আমার একমাত্র বেটি সামস অল'কে ফিরিয়ে দিয়ে যাও। তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেয়ো না। আমার জান, আমার কলিজা সামস অল'কে ফিরিয়ে দিয়ে যাও।' সুলতান উন্মাদের মাফিক দু' হাতে বুক চাপড়াতে লাগলেন।

লেকিন হায়, সুলতানের ডাকে কেউ-ই সাড়া দিল না। আদতে তার কণ্ঠস্বর তাদের কানে পৌঁছনোর তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি ধারে কাছেও যায় নি।

তবু সুলতান সাধ্যাতীত গলা চড়িয়ে ফিন চিল্লাচিল্লি করতে লাগলেন—'সামস অল, ফিরে আয়! আমার বুকে ফিরে আয় বেটি! আমি খোদার নামে কসম খাচ্ছি, তোর মর্জি মাফিকই কাজ হবে। যা চাস, যাকে চাস পাবি।'

ব্যর্থ প্রয়াস। কেউ-ই ফিরল না।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' পঁচিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, জাদু-ঘোড়াটি বাদশাহ সাবুর-এর প্রাসাদে নামল। কামার অল বল্‌ল—'মেহবুবা, আমাদের প্রাসাদ এটি। আব্বার সামনে তোমাকে নিয়ে যেতে ডর লাগছে, যদি গোস্‌সা ক'রে তোমাকে কিছু ব'লে ফেলেন সে আমার বা তোমার কারোই কাম্য নয়। তোমাকে এখন কোথায় যে রাখি ভেবে পাচ্ছি না।'

—'দেখ ভেবে কি করা যায়। লেকিন একটি বাৎ, তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে কোথাও থাকা সম্ভব নয়।'

তার তুলতুলে রক্তিম গালে আলতো ক'রে একটি টোকা দিয়ে বল্‌ল—'কি যে বল মেহেবুবা, তোমাকে দূরে রেখে আমার পক্ষেই কি আর থাকা সম্ভব, বল? তার চেয়ে বরং চল আমরা বাগিচা-প্রাসাদে গিয়েই মাথা গুঁজি।'

কামার অল ফিন যাদু-ঘোড়ার পিঠে চেপে বাগিচা-প্রাসাদে গিয়ে হাজির হ'ল।

খুবসুরৎ জায়গা বটে। চারদিকে ফুল আর ফলের গাছ। তারই কেন্দ্রস্থলে ছোট একটি পটে আঁকা ছবির মাফিক প্রাসাদ। তারই এক পাশে নীল-পানির ফোয়ারা।

কামার অল তার মেহেবুবার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌ল—'এমন নিরিবিলি এক প্রাসাদে থাকতে তোমার একটু-আধটু অসুবিধা হতে পারে ঠিকই। লেকিন দু'-চারদিনের মামলা। ব্যস, তারপরই মওকা বুঝে আব্বার কাছে তোমার প্রসঙ্গ পাড়ব। আমি তার একমাত্র লেড়কা। তার বহুৎ আশা ছিল জাঁক করে আমার শাদী দেবেন। তামাম আরব দুনিয়া থেকে নিমন্ত্রিত মেহমানরা আসবেন। তুমি এখানেই থাক আমি আব্বার সঙ্গে ভেট করে আসছি। কাল রাত্রে আমি একদম চুপিচুপি প্রাসাদ ছেড়েছি। ভাবছেন।'

ঘোড়াটি সামস অল-এর জিম্মায় রেখে কামার অল তার আব্বার সঙ্গে ভেট করতে চলে গেল।

লেড়কাকে ফিরে পেয়ে বাদশাহ সাবুর যেন নয়া জনম লাভ করলেন। খুশিতে তাঁর দিল্‌ ভরে উঠল। লেড়কাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বহুৎ আদর সোহাগ করলেন।

কামার অল বল্‌ল—'আব্বা, আপনার জন্য বহুৎ বড়িয়া এক ভেট নিয়ে এসেছি। সানার সুলতানের লেড়কি। খুবসুরৎ। তামাম আরব দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও এমন সুরৎ দ্বিতীয় কোন লেড়কির মধ্যে মিলবে না।'

—'সুলতানের লেড়কি! সানার সুলতানের লেড়কি? সানার সুলতান ভেট পাঠিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ, আব্বা। সে আপনার একমাত্র লেড়কার বিবি হবে।

বাদশাহ সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠলেন—'আমার লেড়কার বিবি হবে? কোথায় সে? কোথায় তাকে রেখে এসেছ বেটা?'

—'আপনার বাগিচা-প্রাসাদে।'

—'আমার লেড়কার বিবি যে হবে তাকে বাগিচা-প্রাসাদে—কেন প্রাসাদে এনে তুল্‌লে না? এ কী তাজ্জব বাৎ।'

—'আব্বা, আপনি তাকে বাজি পুড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে, বাতির বন্যা বইয়ে জাঁক করে প্রাসাদে নিয়ে আসবেন। তাই সরাসরি প্রাসাদে না তুলে বাগিচা-প্রাসাদে রেখেছি।'

বাদশাহ খুশীতে ডগমগ হয়ে উজিরকে তলব করলেন। বৃদ্ধ উজির পড়ি কি মরি ক'রে এসে হাজির হলেন। কুর্নিশ সেরে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাদশাহ হুকুম জারি করলেন—'দাস-দাসী, নফর-নোকরদের বলুন প্রাসাদ সাজাতে। কামরায় কামরায় ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে দিতে। ঢেঁড়া পিটিয়ে নগরবাসীদের খবর দিন তৈরি হতে। আমার বেটার বিবিকে জাঁকজমকের সঙ্গে বাগিচা প্রাসাদ থেকে এ-প্রাসাদে নিয়ে আসতে হবে। বাতি জ্বালুন, বাজি পোড়ান—খুশীর বন্যা বইয়ে দিন তামাম মুলুকে।'

বাদশাহ ব্যস্ত হয়ে ধনাগারে প্রবেশ করলেন। ইয়া পেল্লাই সিন্দুক প্রাসাদের বহু মূল্য অলঙ্কারাদি রক্ষিত আছে। সবচেয়ে মূল্যবান পাথর ব্যবহৃত অলঙ্কার তিনি নিজে পসন্দ্‌ করে বের করলেন। লেড়কার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'আমার খানদানের সেরা অলঙ্কার। বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যাও বেটা, তুমি নিজে হাতে তাকে পরিয়ে সাজিয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসবে।

বৃদ্ধ উজিরের নেতৃত্বে বিশাল শোভাযাত্রা বাগিচা প্রাসাদের সদর-দরওয়াজায় এসে থামল।

উজির বাগিচা-প্রাসাদের অর্ন্দর মহলের কাছাকাছি পৌঁছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠল আতঙ্ক মিশ্রিত বিস্ময়। পাথরের মূর্তির মাফিক নিশ্চল নিথর ভাবে, অপলক চোখে তিনি শাহজাদা কামার অল-এর দিকে তাকিয়ে।

এদিকে কামার অল বাগিচা-প্রাসাদে সামস অল-এর জন্য সোনার জরির কাজ করা ঝলমলে বিবির পোশাকও রত্নাভরণ নিয়ে পৌঁছেই বিলকুল তাজ্জব বনে যায়। কামরা শূন্য, সামস অল নেই। যাদু-ঘোড়াটিও বে-পাত্তা। তবে? তবে কি—না, আর ভাববার শক্তি তার নেই। মাথা চক্কর মারতে থাকে। হাতের পোশাক ও অলঙ্কারাদি পড়ে যায়। নিজেও আছাড় খেয়ে পড়ে কামরার মেঝেতে। ব্যস। বিলকুল বেহুঁস।

বৃদ্ধ উজির কামার অলকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে সবিস্ময়ে আর্তনাদ করে ওঠেন—'ইয়া আল্লা! শাহজাদার এ কী হালৎ হয়েছে?

উজির কামরায় ঢুকে পেয়ালা ভরে পানি নিয়ে সামস অল-এর চোখে-মুখে হরদম ছিঁটা দিতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সংজ্ঞা ফিরে এল।

কামার অল ভাবতেই পারছে না সামস অল যাদু-ঘোড়ায় চড়ে বেমালুম উধাও হয়ে যেতে পারে। এ তো সাচমুচ যাদু-ঘোড়া তো কলকব্জার ব্যাপার। প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা চাবির বন্দোবস্ত। এর আঁট ঘাট না জানলে সামস অল-এর পক্ষে কি ক'রে উধাও হওয়া সম্ভব হতে পারে?

পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া ঘোড়াটির নাড়ি নক্ষত্রের হদিস তো অন্য কারো জানা নেই। বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করে কামার অল এর সামান্যই জানতে পেরেছে। ব্যস, আর কেউ-ই তো ঘোড়াটির ব্যাপারে অভিজ্ঞ নয়। তবে কি এটি সে-পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই কাজ?

কামার অল উদ্‌ভ্রান্তের মাফিক ছুটতে ছুটতে বাগিচার মালীর কাছে হাজির হ'ল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' ছাব্বিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কামার অল বাগিচার মালীর কাছে গিয়ে বল্‌লেন—'যা বলছি, সাচ্চা জবাব দেবে। কোন আদমি বাগিচায় ঢুকেছিল?'

কোরবানির ফাঁসির মাফিক কাঁপতে কাঁপতে বেচারা বাগিচার বুড়ো মালী বল্‌ল—'হুজুর, আপনি ছাড়া তো বাগিচায় কেউ-ই ঢোকে নি, বেরিয়ে যেতে দেখি নি কাউকেই। তবে হ্যাঁ, ইয়াদ হয়েছে, সে পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি এক দফে বাগিচায় ঢুকেছিল বটে। ভেতরেই রয়েছে তাকে বেরোতে দেখিনি।'

কামার অল-এর দ্বিধা-সংশয় কেটে যায়। নিঃসন্দেহ হ'ল, তাঁরই এ-কাজ। তিনিই গোপনে সামস অল'কে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে চম্পট দিয়েছেন।

মিছিলের সঙ্গে বাদশাহ স্বয়ং উপস্থিত। কামার অল ছুটে গিয়ে তাঁকে বল্‌ল—'আব্বাজী, আপনি মিছিল নিয়ে ফিরে যান। আমি তার তাল্লাসে যাচ্ছি। পাত্তা না মেলা পর্যন্ত আমি ফিরছি না।

বাদশাহ তাকে বাধা দেবার কোশিস করলেন। লেকিন তাঁকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়াটি বাতাসের বেগে ধেয়ে চল্‌ল।

পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাগিচায় ফুল সংগ্রহ করতে ঢুকে তাঁর সে অমূল্য সম্পদ যাদু-ঘোড়াটির হদিস পেয়ে যান। আর প্রাসাদ ঢুঁড়ে দেখতে গিয়ে পালঙ্কের ওপর এক খুব সুরৎ যুবতীকে নিদে বিভোর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খুশিতে তাঁর দিল্ ডগমগিয়ে ওঠে। কলিজা নাচানাচি শুরু করে দেয়। তিনি কামরার ভেতরে ঢুকে যান। তাঁর পায়ের শব্দে সামস অল-এর নিদ টুটে যায়।

পারসিক-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি ঝট করে তাকে কুর্নিশ করে বলে ওঠে—'শাহজাদী, আমি শাহজাদা কামার অল-এর বান্দা। তিনি এ-নগরেই বিশাল এক প্রাসাদে আপনার থাকার বন্দোবস্ত করেছেন। আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

একেই বলে নসীব। নসীবে যা লেখা আছে তা সে ঘটবেই, সামস অল তবু বল্‌ল—'লেকিন তিনি নিজে এলেন না কেন?'

—'ইয়া আল্লা। আপনি বুঝি জানেন না? তাঁর আম্মার তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ।'

—'আম্মার তবিয়ৎ খারাপ, বিমারি—আগে কিছু বলেন নি তো? কালই তো তিনি প্রাসাদ ছেড়ে আমাদের মুলুক সানায় গেছেন। এরই মধ্যে—'

—'আর বলবেন না। লেড়কা কাউকে কিছু না বলে প্রাসাদ ছেড়ে গেছেন। তাঁর পাত্তা না পেয়ে ডরে তিনি সেই যে বেহুঁশ হয়েছেন, আজও আর সুস্থ হন নি। দেরী করবেন না শাহজাদী। চলুন, ঘোড়ার পিঠে চাপুন আমি আপনাকে সে-প্রাসাদে পৌঁছে দিচ্ছি।'

—'লেকিন—'

তার মুখের বাৎ কেড়ে নিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন—'আমাকে দিয়ে আপনার কোন ডর নেই। নির্দ্বিধায় আমার সঙ্গে যেতে পারেন। প্রাসাদে তো আর নোকর-নফরের অভাব নেই। লেকিন আমার ওপর শাহজাদার পুরো ভরসা আছে বলেই না এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন। আমার চুল সফেদ হয়েছে, চোখের জ্যোতি গেছে, হাড্ডি বুড়া হয়েছে, এমন একজনের দিকে কোন লেড়কি লালসা নিয়ে তাকাবে না ভেবেই তো তিনি বেছে বেছে আমাকে বের করে কাজটি করতে হুকুম করেছেন। চলুন, তিনি আমাদের পথ চেয়ে বসে থাকবেন।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদা কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' সাতাশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, যাদুকর সহজ-সরল আদমির মাফিক এমন চোখ-মুখ করে শাহজাদী সামস অল-এর কাছে বক্তব্য পেশ করলেন যে, তার মনে আর তিলমাত্র দ্বিধাও রইল না।

শাহজাদী সামস অল'কে যাদু ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে যাদুকর নিজে তার পিছনে বসলেন।

ঘোড়ার গায়ের ডান-দিকের বোতামে মৃদু চাপ দিতেই সেটি ছোট্ট করে একটি ঝাঁকুনি দিয়ে শূন্যে উঠতে শুরু করল।

যাদুকর সামস অল'কে জাপটে ধরে বল্‌লেন—'ঘাবড়াবেন না শাহজাদী। আমি আপনাকে ধরে রাখছি। আমরা চোখের পলকে সে-নয়া প্রাসাদে পৌঁছে যাব।'

যাদু-ঘোড়াটি সশব্দে বাতাস কাটিয়ে উল্কার বেগে ধেয়ে চল্‌ল আশমানের দিকে। এবার যাদুকর অন্য আর একটি বোতাম টিপে ধরলেন। এবার ঘোড়াটি সোজা অগ্রসর হতে লাগল। একের পর এক মুলুক পেরিয়ে সেটি কেবলই সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

সামস অল তাজ্জব বনে যায়। নগরেরই অন্য প্রান্তে যদি সে-প্রাসাদটি হয়ে থাকে তবে এ যাদু-ঘোড়াটির পক্ষে তো এত দেরী হবার নয়। তবে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

ঘোড়াটি এবার মরুভূমির ওপর দিয়ে উল্কার বেগে ধেয়ে চলেছে। নিচের দিকে চোখ পড়তেই সামস অল বিকট আর্তনাদ ক'রে উঠল—আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন? আপনার মতলবটি কি, বলুন তো?'

—'কোথায় আবার, শাহজাদা যে-প্রাসাদের ঠিকানা—'

তার মুখের বাৎ ছিনিয়ে নিয়ে সামস অল ফিন চিল্লিয়ে উঠল। আপনি তো বললেন, সে নগরেই প্রাসাদ। লেকিন আমরা যে নদী, পাহাড়, মরুভূমি ডিঙিয়ে চলেছি—'ব্যাপার কিছু আমার দিমাকে আসছে না।'

—'কেন মিছে ঘাবড়াচ্ছেন। এই তো এসে গেলাম বলে।' লেকিন ঘোড়া উল্কার বেগে ধেয়ে চলেছে তো চলেছেই।

সামস অল ফিন চিল্লিয়ে ওঠে—'শয়তান, বেতমিস কাঁহিকার! এ কেমন ধান্দা আপনার! এই কি শাহজাদার বিশ্বাসী নফরের কাজ!'

—'নফর! নফর!' হো হো রবে যাদুকর হেসে উঠলেন। এক সময় হাসি থামিয়ে বল্‌লেন—'সুন্দরী, আমি নফরই বটে। আজ থেকে আমি তোমার নফরেরও নফর। আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় এখনও পাই নি। তবু তোমাকে আমি বিবি করে পাকাপাকি তোমার নফর হয়ে যাব।'

যাদুকর একটি নদীর ধারে ঘোড়া নামালেন।' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বল্‌লেন—'সুন্দরী, নেমে এসো। বড্ড পিয়াস পেয়েছে। একটু পানি দিয়ে গলাটি ভিজিয়ে না নিলে আর চলছে না।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সামস অল ঘাসের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ডুকরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—'তুমি দোজখের কীট। শয়তান। আমাকে আমার মেহেবুবের কাছে নিয়ে যাবার ছল করে এখানে নিয়ে এসেছ। আমাকে দিয়ে তুমি অসৎ উদ্দেশ্য, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাচ্ছ। জেনে রাখ শয়তান। আমার জান-থাকতে তুমি সে সুযোগ কিছুতেই পাচ্ছ না।'

—'দেখ সুন্দরী, পেয়ার মহব্বতের ব্যাপারে গোড়ায় একটু চটাচটি হয়-ই বটে। এখন দিমাক ঠাণ্ডা কর। আমি কসম খেয়ে বলছি, কামার অল থেকে তোমাকে আমি বহুৎ বহুৎ সুখ দেব।

আমি যাদু জানি। যাদু বলে তাজ্জব সব কাণ্ড করতে পারি। আমি যাদু বলে এমন এক প্রাসাদ বানিয়েছি, তোমার চোখ ট্যাঁড়া হয়ে যাবে। বাদশাহ্ সাবুর এমন প্রাসাদের চিন্তাও করতে পারে না। মন্ত্র প্রয়োগ ক'রে দ্বিতীয় বেহেস্ত বানিয়েছি।'

তোমার সেবা যত্ন করার জন্য দাসী-বাঁদীরা সর্বদা ব্যস্ত থাকবে। মুখ ফুটে না চাইতেই সব পেয়ে যাবে।
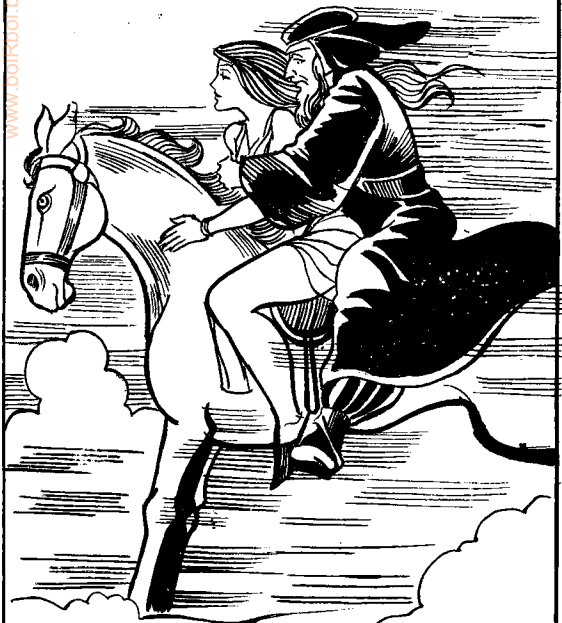
সুন্দরী, আমার কাছে এমন অমৃত রয়েছে যা পান করলে যেকোন আদমি অমরত্ব লাভ করবে। আমার কাছে এমন দাওয়াই আছে যা সেবনে চির যৌবন লাভ করবে। কামার অল পারবে এমন অমূল্য সম্পদ দিতে? বিলকুল যাদু বলে আমি এসব সংগ্রহ করেছি। বাজারে দিনার দিয়ে খরিদ করতে পারা যায় না।

সুন্দরী, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। বলতে পারবে, আমার উমর কত? ভাবছ নওজোয়ান। লেকিন আদতে আমি একশ' সাল উৎরে গেছি। হাজার পালোয়ানও পাঞ্জা লড়ে আমাকে ঘায়েল করতে পারবে না।'

বিশ্রী স্বরে হেসে এবার বল্লেন—'এক শ' সাল উমর হয়েছে শুনে ভাবছ, আমি বুড্ডা বনে গেছি। তাগত গেছে, পুরুষত্ব লোপ পেয়েছে কিনা? লেকিন সুন্দরী, আদতে আমি তোমার মাফিক হাজার সুন্দরীকে এক সাথে দেহ ও দিলের সুখ দিতে পারি, ইয়াদ রাখবে। তাই বলি কি, চোখের পানি মুছে ফেল।

সুন্দরী, লেড়কিরা দুটো বস্তু পুরুষের কাছ থেকে চায়। পয়েলা কাম-সুখ দোসরা বিলাস ব্যসন। আমার কাছ থেকে দুটোই অফুরন্ত মিলবে। কামার অল তোমার কোন কামনা বাসনাই মেটাতে পারবে না।

আর একটি বাৎ ইয়াদ রাখবে, আমার সাহায্য নিয়েই সে তোমাকে খুঁজে পেয়েছে। এ যাদু-ঘোড়া আমার। এতে চেপেই সে তোমাদের প্রাসাদে গিয়ে তোমাকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে। তাই বলছি কি—'

সামস অল উন্মাদিনীর মাফিক চিল্লিয়ে ওঠে—'শয়তান, বেতমিস, ধান্দাবাজ কাঁহিকার! জানের মায়া থাকে তো এখন বলছি, আমার সামনে থেকে সরে যাও। তোমার নসীবে অশেষ দুঃখ—'

যাদুকর হেসে গড়িয়ে পড়েন। সুন্দরী, খোদাতাল্লা আমার কপালে দুঃখের ব্যাপারটি লিখতে বিলকুল ভুলে গেছেন। আর দুঃখ-দুর্দশা কাকে বলে তুমিও একদম ভুলে যাবে।'

সামস অল-এর কান্না শুনে আচমকা ইয়া দশাসই চেহারার দু'-দু'জন সশস্ত্র সেনাপতি যাদুকরের পিছনে এসে দাঁড়ায়। তাঁর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যাদুকর পারস্যের রুম মুলুকের সীমানায় ঘোড়া নামিয়েছিলেন। ভেবেছিল, সুন্দর নদী। একটু পানি পান করবেন। তারপর নিজের মুলুকে যাবেন।

রুমের বাদশাহের নগর নদী থেকে খুবই কাছে। বাদশাহ রোজ বিকালে নদীর ধারে হাওয়া খেতে আসেন। অন্যদিনের মাফিক সেদিনও উজির, সেনাপতি বেষ্টিত হয়ে নদীর ধারে হাজির হয়েছেন। হঠাৎ নারীর আর্তস্বর কানে যেতেই উদ্‌ভ্রান্তের মাফিক চারদিকে তাকান। দেখেন, এক নারী। এক বুড়ো মরদের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত। ভাবলেন, এ শয়তান ডাকুটি লেড়কিটিকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে ইজ্জৎ নষ্ট করতে চাইছে। তাই সেনাপতিদের পাঠিয়ে দিলেন লেড়কিটিকে উদ্ধার করতে।

সেনাপতি দু'জন কদাকার বুড়ো যাদুকরকে বন্দী করে বাদশাহের সামনে হাজির করল।

বাদশাহ ব্যাপার জানতে চাইলে যাদুকর বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আল্লাতাল্লা-র কসম খেয়ে বলছি, এ আমার চাচার লেড়কি। আমার শাদী করা বিবি।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সামস অল ব'লে উঠল—'ঝুট, বিলকুল ঝুট বাৎ। জাঁহাপনা, আমাকে জোর করে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ শয়তান ডাকুটি। এর সঙ্গে আমার জান পরিচয়ও কোনদিন ছিল না। আমার স্বামী শাহজাদা। তার কাছ থেকে শয়তানটি আমাকে ভাওতা দিয়ে নিয়ে এসেছে।'

বাদশাহের হুকুমে সেনাপতিরা যাদুকরকে আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দিল। লেকিন তবু যাদুকর তার কসুর কবুল করল না।

বাদশাহের হুকুমে সেনাপতিরা তাকে পিটাতে পিটাতে কয়েদ খানায় ঢুকিয়ে দিল।

সামস অল যাদুকরের যাদু-ঘোড়াটিকে নিয়ে বাদশাহের প্রাসাদে এল। তাঁর মেহমান হয়ে বাস করতে লাগল।

বাদশাহ সামস অল-এর মুখ থেকে সব কিছু শুনে তাজ্জব বনে যান। কাঠের ঘোড়াটিতে চেপে তারা কি ক'রে ভেগে এল? তাজ্জব কাণ্ডই বটে।

এদিকে শাহজাদা কামার অল ঘোড়া নিয়ে বিলকুল উন্মাদের মাফিক বন-জঙ্গল, মরু প্রান্তর ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তার মেহেবুবার খোঁজে ছুটতেই থাকে।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' আটাশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন —'জাঁহাপনা, কামার অল তার মেহেবুবার তাল্লাসে দিনের পর দিন ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটোছুটি করতে থাকে। কতজনকে যে যাদুকর আর তার মেহেবুবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। লেকিন কেউ কোন পাত্তাই দিতে পারল না।

দিনের পর দিন ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটতে ছুটতে কামার অল এক সকালে সানা নগরে হাজির হয়। লেকিন প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। কেবল জানতে পারল, লেড়কির শোকে বাদশাহ শয্যা নিয়েছেন।

কামার অল নসীব সম্বল করে ফিন ঘোড়ার পিঠে চাপল। শুরু হ'ল নতুন করে পথ চলা।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে কামার অল একদিন হাজির হ'ল রুম মুলুকে। একে-ওকে জিজ্ঞাসা করল। না, এখানেও তার মেহেবুবার পাত্তা মিল্‌ল না। অনন্যোপায় হয়ে হতাশায় জর্জরিত দিল্ নিয়ে এক সরাইখানায় গিয়ে সে মাথা গুজল।

সেখানে কয়েকজন পরদেশী সওদাগর খানাপিনা সেরে গোল হয়ে বসে বাৎচিৎ করছে। কামার অল তাদের কাছে দাঁড়াল।

একজন বল্‌ল—'আমি রুমের নগরে সওদা ফেরি করতে গিয়ে এক আজব খবর শুনে এসেছি।'

শ্রোতারা অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে সমস্বরে বলে উঠল—'আজব খবর? কি তোমার আজব-খবর, বল তো শুনি ভাইয়া?'

—'বাদশাহ নদীর ধারে হাওয়া খেতে গিয়ে এক বুড্ডা আর এক খুবসুরৎ লেড়কিকে ধরে নিয়ে এসেছেন। বুড্ডাকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

সওদাগরদের মধ্য থেকে একজন মুখ বাঁকিয়ে ব'লে উঠল—'এ আবার এমন কি আজব খবর। এক আদমি এক আদমিকে নিয়ে ভেগেছে।'

—'আরে ভাইয়া, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আদৎ বাৎ তো এখনও চেপেই রেখেছি। আদমিটি নাকি একটি কাঠের ঘোড়ায় চেপে আশমান দিয়ে উড়ে এসেছিল। বাদশাহের প্রাসাদে ঘোড়াটি এখন রয়েছে। সে বুড্ডা এখন কয়েদখানায় ঝিমোচ্ছে।

কামার অল চুপ করে দাঁড়িয়ে সওদাগরদের বাৎচিৎ শুনে আশান্বিত হ'ল। যার তল্লাশ করতে গিয়ে সে তামাম দুনিয়া হন্যে হয়ে টুঁড়ে বেড়াচ্ছে তার হদিস এমন হঠাৎ করে মিলে গেলে খুশীতে দিল্ ভরে তো উঠবেই।

সওদাগরটি কিস্‌সা বন্ধ ক'রে চুপ করলে কামার অল বল্‌ল—'গোস্‌সা করবেন না। আপনাদের বাৎচিতে নাক গলাচ্ছি। মেহেরবানি করে বলবেন কি, কোন্ নগরে কোন্ বাদশাহের প্রাসাদে লেড়কিটিকে রাখা আছে?'

সওদাগরটি তাকে প্রাসাদের ঠিকানা বাৎলে দিল।

কামার অল ঘোড়া ছুটিয়ে রুম নগরের প্রবেশ-দ্বারে হাজির হয়। প্রহরী পথ আগলে দাঁড়াল। বল্‌ল—এ-নগরে ঢুকতে হলে দরবার থেকে বাদশাহের হুকুমনামা আনতে হবে।'

এদিকে রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। বাদশাহের দরবারে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

খুবসুরৎ নওজোয়ান কামার অল'কে দেখে প্রহরীটির মায়া হ'ল। সারা রাত্রি কোথায় পথে পথে টুঁড়ে বেড়াবে, তকলিফ হবে ভেবে নিজের ডেরায় রাত্রিটুকুর জন্য আশ্রয় দিল।

রাত্রে খানাপিনা সারতে সারতে প্রহরী কামার অলকে জিজ্ঞাসা করল—'ভাইয়া, তোমার মুলুক কোথায়?'

—'পারস্য।'

—'গোস্‌সা কোরো না ভাইয়া, শুনেছি তোমার দেশে নাকি চোর, জোচ্চর, বদমায়েশ আর শয়তানের সংখ্যাই বেশী। আমাদের কয়েদখানায় তো এখনও এক বুড্ডা রয়েছে। বুড্ডা হরদম ঝুট বাৎ বলে।'

—'ঝুট বাৎ? কি বলেছে?'

—'গলা পর্যন্ত তার অহঙ্কার। এমন বড়াই করে শুনলে মালুম হবে শয়তানটি বুঝি এক পয়গম্বর। হেকিমি বিদ্যাও নাকি জানে। তার সামনে হেকিম তামাম দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ নেই। শয়তান বুড্ডার সঙ্গে একটি আজব কাঠের ঘোড়া ছিল। সেটায় চেপে এক খুবসুরৎ লেড়কিকে নিয়ে ভাগছিল। নদীর ধারে বাদশাহের সেনাপতিরা তাকে পাকড়াও করে। কলের ঘোড়া, বোতাম টিপলে নাকি ঘোড়াটি আশমানে উঠতে পারে।'

—'ভাইয়া, বুড্ডাকে তো বাদশাহের হুকুমে কয়েদখানায় ঠেলে দেয়া হয়েছে। লেকিন সে-লেড়কিটি এখন কোথায়?'

—'লেড়কিটি? তার নসীব খুলে গেছে। বাদশাহ নাকি শাদী করে তাকে প্রধানা বেগমের মর্যাদা দেবেন। লেকিন সমস্যা—'

—'সমস্যা? কিসের সমস্যা?'

—'লেড়কিটির নাকি দিমাক গড়বড় হয়ে গেছে। হরদম ঠোঁট নেড়ে কি সব বলে। গুম্ মেরে বসে থাকে। কারো সঙ্গে বাৎচিৎ করে না। কিছু পুছতাছ করলে জবাব কোন জবাবই দেয় না।

—'তারপর? তারপর?' কামার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ব'লে উঠল।

—'তারপর আর কি? উন্মাদিনীকে তো আর শাদী-নিকা করা যায় না। তাই বাদশাহ তার দিমাক সারিয়ে তোলার জন্য দু' হাতে দিনার খরচ করছেন। নামজাদা হেকিম দিয়ে ইলাজ করাচ্ছেন।'

কয়েদখানায় বসে বুড্ডা হাত-পা ছোড়ে। বলে, 'আমাকে লেড়কিটির সামনে হাজির কর তার বিলকুল বিমারি মুহূর্তে সারিয়ে তুলব। নচ্ছারটি নাকি রাত্রেও নিদ যায় না। আজব আদমি বটে!'

খানাপিনা সারতে সারতে কামার অল ভাবল, হদিস তো মিল্‌ল বটে। পাক্কা খবর। লেকিন কোন্ পথে এগোলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে?

এমন সময় প্রহরীটি বল্‌ল—'ভাইয়া, তোমাকে যে কয়েদখানায় রাত্রিটুকু গুজরান করতে হবে। এ মুলুকের নিয়ম—পরদেশীকে কয়েদখানায় রাত্রি গুজরান করতে হয়। ভোর হলে ফিন খালাস পেয়ে যাবেন।'

খানাপিনা সারা হলে প্রহরীটি কামার অল'কে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিল।

কয়েদখানার দরওয়াজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই কামার অল কার যেন চাপা গোঙানি শুনতে পেল। দুরু দুরু বুকে কাছে এগিয়ে গেল। দেখল, এক বুড্ডা পাশ ফিরে শুয়ে অস্পষ্ট স্বরে হরদম কি যেন বলে চলেছে।

হ্যাঁ, শয়তান যাদুকরটি-ই বটে। কামার অল উৎকর্ণ হয়ে তার মুখের বাৎ শোনার কোশিস করল। সে বলছে—'হায় খোদা, কেন যে নদীটির ধারে ঘোড়া নামালাম। নইলে তো আমাকে এরকম এক হতচ্ছাড়া বাদশাহের কবলে পড়তে হ'ত না। এমন একটি টসটসে পূর্ণ যৌবনা লেড়কিকে দিল্ ভরে উপভোগ করার লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করে নিয়ে ভেগেছিলাম। লেকিন আশ মিটল না। নচ্ছার বাদশাহের, শকুনের নজর পড়ল আমার খাবারের ওপর। ছিনিয়ে নিল। ইয়া খোদা! চালে একটু ভুল করলাম আর বিলকুল গড়বড় হয়ে গেল!'

কামার অল বুড়োটির কিস্সা শুনতে শুনতে রাত্রি গুজরান করে দিল।

জানলা দিয়ে ভোরের আলো উঁকি দিতেই কামার অল-এর দিলে আশার সঞ্চার হ'ল। এবার কয়েদখানা থেকে খালাস পেয়ে বাদশাহের দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি পাবে।

একটু বাদে কয়েদখানার রক্ষী কামার অল'কে কয়েদখানা থেকে বের করে দরবারে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

চারশ' উনত্রিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, কয়েদখানার রক্ষী কামার অল'কে কয়েদখানা থেকে বের করে বাদশাহের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য এক প্রহরীকে সঙ্গে দিল।

কামার অল বাদশাহের দরবারে পৌঁছে নতজানু হয়ে কুর্ণিশ করল।

বাদশাহ প্রশ্ন করলেন—'কে তুমি? কি নাম তোমার? কোন্ মুলুক থেকে আসছ? আমার মুলুকেই বা তোমার কোন্ দরকার?'

সামস অল বাদশাহকে ফিন কুর্ণিশ করে বল্ল—'জাঁহাপনা, আমার নাম হরজা। পারস্য আমার নিজের মুলুক। হেকিমী ক'রে দিন গুজরান করি। কঠিন বিমারির ইলাজ করি। কারো দিমাক গড়বড় হয়ে গেলে ইলাজ করে সারিয়ে তুলতে পারি। সবাই বলে, আমার ওপর নাকি খোদাতাল্লার দোয়া রয়েছে।'

—'তুমি কঠিন বিমারি, দিমাক গড়বড় হয়ে গেলে ইলাজ করে সারিয়ে তুলতে পার?'

—'জাঁহাপনা, আমার হাতে বিমারি সারে নি এরকম কোন ঘটনা আজ অবধি ঘটে নি। তবে তামাম আরব দুনিয়ার সুলতান বাদশাহরা আমার গুণের পরিচয় পেয়ে যেসব পদক-তকমা দান করেছেন তা যদি গলায় ঝুলিয়ে চলাফেরা করার কোশিস করি তবে বিলকুল অসম্ভব হয়ে উঠবে।

তাছাড়া নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির জাহির করতে ঢাক-ঢোল পিটানোকে আমি ঘৃণা করি।'

—'তুমি কি কোন দাওয়াই দিয়ে, নাকি ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বিমারির ইলাজ কর?'

—'নিয়মিত দাওয়াই দিয়েই আমি বিমারি সারাই। ঝাড় ফুঁকের কারবার আমার কাছে নেই। রোগী দেখব, তার তকলিফের ব্যাপারে পুছতাছ করব, রোগের পরিমাণ বিচার করব। ব্যস, এবার দরকার মাফিক দাওয়াই ব্যবহার করব।'

—'লেকিন তোমার দাওয়াই যদি রোগ সারাতে না পারে তবে?'

—'আপনার দরবারে সবার সামনে নাকে খৎ দিয়ে ফিরে যাব। একটি কানাকড়িও দাবী করব না।'

—'বহুৎ আচ্ছা! তোমার বাৎ শুনে আমি বহুৎ খুশী হয়েছি।' বাদশাহ এবার নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে সামস অল এবং বুড্ডা ফেরেফবাজ যাদুকরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে দরবারে কামার অল-এর উপস্থিতি পর্যন্ত বিলকুল ঘটনা কিছুমাত্রও গোপন না করে এক এক ক'রে ব্যক্ত করলেন।

—'জাঁহাপনা, আমি নিঃসন্দেহ, আপনার রোগীর বিমারি আমার দাওয়াই সারিয়ে তুলতে পারবেই।'

—'তুমি যদি সাচমুচ লেড়কিটিকে সারিয়ে তুলতে সমর্থ হও তবে আমি তোমার কোন আশাই অপূর্ণ রাখব না। শোন নওজোয়ান, আমার দিল্ বলছে, কোন আফ্রিদি বা জিন পরীটরী লেড়কিটির কাঁধে ভর করেছে। তুমি অবশ্য আমার চেয়ে ভাল বুঝবে।'

—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি করে রোগের লক্ষণগুলো এক এক করে বলুন তো শুনি? কোন্ কোন্ উপসর্গের জন্য তার দিমাক এরকম ঘটেছে বলে আপনি ধারণা করছেন?

—'আমি যেদিন থেকে তাকে প্রাসাদে নিয়ে এসেছি, বুড্ডাটিকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছি আর আবলুশ কাঠের ঘোড়াটিকে আটক করেছি সেদিন থেকেই তার দিমাক কেমন যেন বিগড়ে যায়।

কামার অল মনস্থ করল, কাজ শুরু করার আগে নিজের চোখে তার প্রিয় যাদু-ঘোড়াটিকে একবারটি দেখে নেবে। হতচ্ছাড়া বুড্ডাটিকে দিয়ে ভরসা নেই, কলকব্জা বিগড়ে রাখতে পারে। বিলকুল ঠিক ঠাক থাকলে অনায়াসে কাজ হাসিল করে ফেলতে পারবে। তারপর সামস অল'কে এখান থেকে নিয়ে কেটে পড়ার

ফিকির বের করতে হবে।

কামার অল বাদশাহকে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার দিল্ বলছে, ওই ঘোড়াটিই যত নষ্টের মূল। ওটার মধ্যেই রোগ জীবাণু ছিল। আমি একবার ঘোড়াটিকে দেখতে চাই। অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

—'এতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে? চল, আমি নিজেই তোমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি।'

কামার অল এবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ঘোড়াটিকে উল্টেপাল্টে দেখে নিল। না, গড়বড় কিছুই নেই। কলকব্জা ও চাবি প্রভৃতি বিলকুল ঠিকঠাকই রয়েছে।

কামার অল এবার বাদশাহের দিকে ফিরে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার ধারণাই ঠিক। মালুম হচ্ছে, রোগীর বিমারি সম্বন্ধে আমি ধারণা করতে পেরেছি। ঘোড়াটিই বিমারির কারণ।'

—'তবে উপায়? বিমারির ইলাজ—'

—'বিমারির ইলাজের ব্যাপারেও আমি অনেকখানিই এগিয়ে গেছি। আমি নিজে হাতেই দাওয়াই বানাব।'

—'বহুৎ আচ্ছা! তবে তুমি কাজে লেগে যাও।'

—'জাঁহাপনা, এবার আমাকে যেতে হবে রোগীর কাছে। তার হালৎ নিজের চোখে দেখতে হবে। তার তকলিফের ব্যাপারে পুছতাছ করা দরকার। আর এক বাৎ, পরে হয়ত ইলাজের ব্যাপারে এ-ঘোড়াটিরও রোগীর কামরায় নিয়ে যাওয়ার দরকার হতে পারে।'

বাদশাহ এবার কামার অল'কে সঙ্গে নিয়ে সামস অল-এর কামরায় গেলেন।

সামস অল এক লহমায় কামার অল'কে দেখেই চিনতে পারল। সে বাদশাহকে দেখেই নিজের কামিজ ছিঁড়তে শুরু করল। বার বার মাথা ঝাঁকিয়ে মাথার উসকো খুসকো চুলগুলোকে আরও আলুথালু করে নিল। ইয়া বড় বড় চোখ করে একবার বাদশাহের দিকে, পরমুহূর্তেই ফিন কামার অল-এর দিকে তাকাতে লাগল। কে বলবে, বদ্ধ পাগল নয়।

কামার অল কিন্তু বুঝে নিল এসবই তার বাহানা। বাদশাহের সামনে নিজেকে উন্মাদিনী প্রতিপন্ন করার প্রয়াসমাত্র। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়ার ফিকির।

কামার অল এবার ধীর-পায়ে সামস অল-এর দিকে এগিয়ে গেল। বেশ গলা চড়িয়েই বল্‌ল—'আপনার ওপর খোদাতাল্লা-র দোয়া বর্ষিত হোক! তাঁর কৃপায় আপনি সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠুন! তারই দোয়ায় আপনার বিমারি সেরে যাবে। ফিরে পাবেন আগের সে-স্বাভাবিক জীবন।

সামস অল-এর বুকে তখন খুশীর জোয়ার বয়ে চলেছে। সাগরের ঢেউ যেন আছড়ে পড়ছে। কিন্তু অফুরন্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস মুখ ফুটে প্রকাশ করতে না পেরে বিকট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। সংজ্ঞা একদম লোপ পেয়ে গেল।

কামার অল দৌড়ে গিয়ে তাকে তুলে বসাবার কোশিস করে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে—'সামস, মেহেবুবা আমার, ওঠ, চোখ মেলে তাকাও। ধৈর্য ধর। খুবই কৌশলে ও সতর্কতার সঙ্গে আমাদের ধাপে ধাপে এগোতে হবে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ফিকির খুঁজতে হবে।'

বাদশাহ ভাবলেন, নওজোয়ান হেকিমটি কাজ শুরু করে দিয়েছে। দাওয়াইয়ের সঙ্গে কিছু ঝাড়ফুঁকও তার চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। তারই কাজ চলেছে।

কামার অল বলে চলে—'মেহেবুবা, খুবই হুঁশিয়ার হয়ে আমাদের প্রতিটি পা ফেলতে হবে। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে, ইয়াদ রেখো। তবে কিন্তু বাদশাহ আমার জান খতম করে দেবেন। নারী-খাদক বাদশাহের দিলে একবার বিশ্বাস আনতে পারলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার ব্যাপারে ভাবনা অনেক কমে যাবে। তোমার সক্রিয় সাহায্য ছাড়া আমি কিন্তু কাজ হাসিল করতে পারব না মেহেবুবা।'

এবার কামার অল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল, বাদশাহ কামরা ছেড়ে চলে গেছেন।

সে ফিন একই রকম অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল—'শোন সামস অল, বাদশাহ কামরা ছেড়ে গেছেন। আমি তাঁকে বলব, তোমার

কাঁধে জিন ভর করেছে। তাই তোমার এরকম পাগলীর মাফিক হালৎ হয়েছে। আমি তাঁকে ভরসা দেব, আমি ইলাজ করলে তুমি বিলকুল সেরে উঠবে। ফিন স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। তোমার কাজ হবে, ধীরে ধীরে সাধারণ আদমির মাফিক বাৎচিৎ করা। তবেই আমার ইলাজের ওপর তাঁর ভরোসা হবে।

সামস অল মুচকি হাসল। তারপর ঠিক তেমনি ফিসফিসিয়ে বল্‌ল—'আমার ওপর, আমার অভিনয়ের ওপর ভরসা রাখতে পার। এতদিন যে পাগলীর অভিনয় করেছি, কেউ বুঝল কিছু? এবারও ঠিক তোমার মতলব মাফিক কাজ করে যাব। ঘাবড়িয়ো না।'

কামার অল এবার বাদশাহের কাছে ফিরে এল। তাঁকে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার রোগীর বিমারি ধরা পড়েছে। তার কাঁধে জিন ভর করেছে। আপনার ওপর খোদাতাল্লা-র অশেষ দোয়া তাই তো তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর ক'দিন এভাবে কাটলে আর দেখতে হ'ত না, রোগীর জান নিয়ে নিত। নয়ত বিলকুল পাগল বনে যেত। লেকিন এখন আর কোন ডর নেই। আমি তো আছিই।'

—'দেখ, কোশিস করো। আমি চাই সে একদম সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠুক।'

—'আমি ইতিমধ্যেই একটি দাওয়াই দিয়ে দিয়েছি। কিছুটা ফল হচ্ছে তা শীঘ্রই মালুম হবে। এখনই যান, কিছু অন্ততঃ ধারণা করতে পারবেন।'

—'সে কী হ্যাঁ! সবে দাওয়াই দিয়ে এলে এরই মধ্যে—এত জোরদার দাওয়াই তোমার!'

বাদশাহ কৌতূহলী দিল নিয়ে ব্যস্ত-পায়ে সামস অল-এর কামরায় দরওয়াজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

সামস অল মুচকি হেসে তাকে কুর্নিশ করল। সামস অল বল্‌ল—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি করে যে বাঁদীকে স্মরণ করেছেন তাতে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।'

বাদশাহের মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। ভোরের পূর্বাভাষ। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' ত্রিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন —'জাঁহাপনা, সামস অল-এর মধ্যে আশাতীত পরিবর্তন ঘটেছে দেখে বাদশাহের দিল্ খুশীতে নেচে উঠল।

প্রথম পদক্ষেপেই কামার অল এতখানি সাফল্যলাভ করবে এ যেন বাদশাহ খোয়াবের মধ্যে কোনদিন ভাবতে পারেন নি।

বাদশাহ প্রাসাদের দাসীদের হুকুম দিলেন—'সামস অল'কে হামামে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা ক'রে ঘষে মেজে গোসল করিয়ে জড়িদার ঝলমলে পোশাক পরিয়ে দাও। আর মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কারাদি দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে এসো।'

দাসীরা সামস অল'কে নিয়ে গিয়ে বাদশাহের হুকুম মাফিক সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে এল।

বাদশাহ হেকিমকে বল্‌লেন—'তোমাকে সুক্‌রিয়া জানাবার ভাষা আমার নেই। তোমার ইলাজের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আমি বাস্তবিকই তাজ্জব বনছি। তোমার অলৌকিক ক্ষমতার তুলনা একমাত্র পয়গম্বরের সঙ্গেই চলতে পারে। খোদাতাল্লা তোমাকে চিরজীবি করুন। তোমার দৌলতেই আজ আমার চোখে-মুখে হাসির ছোপ দেখা দিয়েছে।'

—'জাঁহাপনা, শাহজাদীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে হলে কোন এক স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য নিয়ে যাওয়া দরকার। আজই তাঁকে নিয়ে চলুন, চিকিৎসার পরবর্তী ধাপ সেখানেই শুরু করব। তবে হ্যাঁ, ঘোড়াটিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ঘোড়াটি কাঠের হলেও রোগটির জন্মদাতা, এটি ভুল্‌লে চলবে না।'

বাদশাহ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কামার অল-এর দিকে তাকান। কামার অল বলে চলে—'হ্যাঁ জাঁহাপনা, কাঠের ঘোড়াটিই জিনের বাহন। প্রাসাদে জিনকে তাড়াতে গেলে সাময়িকভাবে হয়ত সে শাহজাদীর ঘাড় থেকে নেমে প্রাসাদেরই কোন আনাচে কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। আমি প্রাসাদ ছেড়ে যাওয়ামাত্রই ফিন তাঁর কাঁধে চেপে বসবে। তাই ঘোড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছি। আমি শাহজাদীর কাঁধ থেকে হতচ্ছাড়ি জিনকে নামিয়ে বিশালায়তন এক কামরায় পুরে ফেলব। ব্য স, জালা সমেত তাকে দরিয়ার পানিতে ফেলে দেব। এর আগে পর্যন্ত আমাদের উল্লসিত হবার কিছু নেই।

কামার অল-এর পরামর্শে কাজ হ'ল। বাদশাহ শাহজাদী সামস অল, কাঠের ঘোড়াটি এবং কামার অলকে নিয়ে হৈ হৈ ক'রে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আর দাসী-বাঁদী, নোকর-নফরও কম যায় নি।

নগর থেকে দূরবর্তী এক পাহাড়ের পাদদেশে বাদশাহের হুকুমে তাঁবু ফেলা হ'ল।

বাদশাহ তাঁবুর সামনে আরাম-কেদারা পেতে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় কামার অল তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কুর্নিশ করে বলে—'জাঁহাপনা, কাল ভোরে আমি শাহজাদীকে নিয়ে ঘোড়াটিতে চাপতে চাইছি। তখনই জীনের সঙ্গে আমার আদৎ মোলাকাৎ, বোঝাপড়া। সে অবশ্য আমাকে জব্দ করার কোশিস করবে। কিন্তু বহু কোশিস করেও খতম করতে সক্ষম হবে না। আমি তাকে একদম জাপ্টে ধরে ফেলব। ভাগতে পারবে না।'

বাদশাহ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে কামার অল-এর

বক্তব্য শুনতে লাগল।

কামার অল ব'লে চল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমার অনুরোধ, মেহেরবানি করে আপনি বা আপনার সেনাপতিরা জীনের নজরের ধারে-কাছে ঘেঁষবেন না। সে সুযোগ পেলে শাহজাদীর হয়ত ঘাড় থেকে নেমে আপনাদের কারো ঘাড়ে চেপে বসবে। আমি তাকে বিলকুল বাগে ফেলে তবে আপনাদের তলব করব। এর আগে পর্যন্ত আপনারা দূরে দূরেই থাকবেন। খবরদার কৌতূহলের শিকার হয়ে এগোবার কোশিস করবেন না।'

বাদশাহ বল্‌লেন—'তুমিই বলে দিও আমরা কোথায়, কতদূরে থাকব।'

ভোর হতে না হতেই কামার অল রোগীর বিমারির ইলাজ শুরু করে দিল। বাদশাহের দূরবর্তী একটি জায়গা দেখিয়ে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে অপেক্ষা করতে বল্‌ল। বল্‌ল—'খবরদার কেউ জীনটির নজরবন্দীর আওতায় থাকলে শাহজাদীকে দেখে সে অস্থির হয়ে উঠে তার দিকেই ধাওয়া করবে। যা করার আমিই করব। বোঝাপড়া করে ঠিক কব্জা করে নেব।'

কামার অল-এর বাৎ শুনে বাদশাহের কলিজা শুকিয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। বলা তো যায় না, শয়তান জীনটি যদি ক্ষেপে গিয়ে হেকিমকে ছেড়ে ধাওয়া করে, অন্য কারো ঘাড়ে চাপে তবেই জান খতম করে ছাড়বে। তবে ভরসা, হেকিম জবরদস্ত। তার সঙ্গে জীনটি ফেরেফবাজী করে সুবিধা করতে পারবে না। সে তাকে খতম করে ছাড়বে। বাপের বেটা না হলে, পুরোদস্তুর হিম্মৎ না থাকলে কেউ এমন ভয়ঙ্কর একটি কাজে হাত দেয়।

কামার অল এবার সামস অল'কে নিয়ে কালো যাদু-ঘোড়াটিতে চেপে বসল। ডান দিকের বোতাম টিপতেই ঘোড়াটি এক ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

বাদশাহ ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা দূর থেকে ধন্বন্তরী হেকিম কামার অল-এর অত্যাশ্চর্য ইলাজের পদ্ধতি দেখতে লাগলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ঘোড়াটি দ্রুত আশমানের দিকে উঠে যাচ্ছে।

বাদশাহ ভাবলেন, হয়ত জীনের সঙ্গে হেকিমের জোর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। হেকিম জীনটিকে কায়দা কসরৎ করতে লেগে গেছে। হেকিম নির্ঘাৎ অচিরেই তাকে কব্জা করে আশমান থেকে জমিনে আছাড় মেরে ফেলবে। জব্বর হেকিম। অসীম তার হিম্মৎ বটে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। সেনাপতি ও সৈন্যদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভর করল। সেনাপতি ফ্যাকাশে মুখে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, তাজ্জব ব্যাপার তো। হেকিমের তো ফেরার কোন ভাবই মালুম হচ্ছে না।'

হেকিমের ওপর বাদশাহের অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিরক্তি প্রকাশ

করে বল্‌লেন—'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বল তো? একটি জীনকে ঘায়েল করা কি সামান্য ব্যাপার নাকি! সময় তো কিছু লাগবেই। ধৈর্য ধর জীনের দুর্গতি চোখের সামনেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। ওই জালায় তাকে কয়েদ করে দরিয়ার পানিতে চালান দেয়া হবে।'

ক্রমে দুপুর হ'ল। ঘোড়া ফিরল না। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হ'ল, তবু ঘোড়াটির ফেরার নাম নেই। ক্রমে সন্ধ্যার আন্ধার নেমে আসতে লাগল। এবার বাদশাহের মুখে একটু একটু করে হতাশার ছাপ প্রকাশ পেতে লাগল।

বাদশাহ ফ্যাকাশে বিবর্ণমুখে বল্‌ল—'সেনাপতি, হেকিমের ধান্দা তো সুবিধের মালুম হচ্ছে না। এখন উপায়?'

—'জাঁহাপনা, পঞ্ছী পিঞ্জর ভেঙ্গে ভেগেছে। এখন বুক চাপড়ে হা পিত্যেশ করা ছাড়া উপায় নেই।'

বাদশাহের শরীরের বিলকুল খুন শিরে চেপে গেল। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন—'এখন মালুম হচ্ছে, সবই বুড়োটির ফন্দি ফিকির। কয়েদখানায় বসে সে কলকাঠি নাড়ছে। ফেরেফবাজকে আমার সামনে হাজির কর। শয়তানটিকে সবার আগে টিট করতে হবে।' রাগে গস্‌গস্ করতে করতে বাদশাহ ঘোড়ার পিঠে চেপে প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন।

বুড়ো যাদুকরকে রশি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে বাদশাহের সামনে হাজির করা হ'ল।

বাদশাহ বাজখাই গলায় গর্জে উঠলেন—'বদমায়েস, শয়তান, ফেরেফবাজ কাঁহিকার। কালো ঘোড়াটি যে আদতে একটি জীন তা আমার কাছে ছিপালি কেন? তোর গর্দান নেব আমি! নিজের হিম্মতে হেকিমটি শাহজাদীর বিমারির ইলাজ করে সারিয়ে তুল্ল আর তোর ঘোড়ার দৌলতে তাকে খোয়াতে হ'ল। আমার নসীবের ফেরে—'তোর জন্য মণি মাণিক্য খচিত গহনাগুলোও হাতছাড়া হয়ে গেল!

বেতমিস কাঁহিকার, তোর গর্দান নিয়ে আমার গায়ের ঝাল মিটাব।

এদিকে কামার অল ঘোড়াটির ডানদিকের বোতামে সামান্য চাপ দিতে ঘোড়া তার কাজ শুরু করে দিল। শোঁ শোঁ শব্দে আশমানের দিকে ধেয়ে চল্‌ল।

ঘোড়াটি পারস্যে পৌঁছে বাদশাহের প্রাসাদের ছাদের ওপর নামল। বাদশাহ সাবুর লেড়কাকে ফিরে পেয়ে সোল্লাসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বার বার গালে মাথায় চুম্বন করতে লাগলেন।

বাদশাহ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সৈন্য তলব করে আবলুস কাঠের কালো যাদু-ঘোড়াটিকে গুঁড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলেন। নইলে ভবিষ্যতে হয়ত ফিন লেড়কাকে খোয়াতে হবে।

যাদু-ঘোড়াটির ভাঙা অংশগুলিকে একদম দরিয়ায় ফেলে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দেয়া হ'ল।

বাদশাহ সোল্লাসে পুত্রবধূ সামস অল নাহার'কে সাড়ম্বরে বেটার বিবি হিসাবে বরণ করে নিলেন।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' বত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বাদশাহ সাবুর তাঁর বেটার বিবিকে সযত্নে প্রাসাদে রাখলেন।

এবার কামার অল জামান এক চিঠিতে সানার সুলতানকে তার অসীম সাহসের ব্যাপার স্যাপার জানাল। সে সঙ্গে এ-ও জানাল, তাঁর একমাত্র লেড়কি সামস অল নাহার'কে শাদী ক'রে সসম্মানে প্রাসাদে রেখেছে। চিঠির সঙ্গে বহুমূল্য উপহার সামগ্রীও পাঠাল।

কামার অল-এর চিঠিতে লেড়কির খবর পেয়ে সানার সুলতান উৎকণ্ঠামুক্ত হলেন। খুশী হয়ে তিনিও হীরা-জহরৎ খচিত অলঙ্কারাদি ও বহুৎ মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে দিলেন। এতে প্রমাণ হ'ল তিনি জামাতাকে সানন্দে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

তারপর থেকে যতদিন জীবিত ছিলেন সানার সুলতান লেড়কি ও জামাতাকে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাতেন।

বাদশাহ সাবুর একদিন দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে যাত্রা করলেন। এবার পারস্যের তখতে বসল কামার অল আকমর। সে হ'ল তামাম পারস্য মুলুকের বাদশাহ।

তারপর থেকে কামার অল প্রজা হিতৈষী বাদশাহ হিসাবে দেশ শাসন করে একদিন দুনিয়া ছেড়ে গেল। একদিন তার প্রিয়তমা বেগম সামস অলও চিরবিদায় নিল। তাকে কামার অল-এর পাশেই গোর দেয়া হ'ল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি শেষ করে থামলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, রাত্রি এমন ঢের বাকি। এবার আর একটি চিত্তাকর্ষক কিস্‌সা আপনাকে শোনাচ্ছি।

ডিলাইলাহ আর ঠগ জাইনাবের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদের সময়ে হাসান এবং আহমদ নামে দুই মহাধূর্ত চোর বাস করত। তাদের বসতি ছিল বাগদাদ নগরের কেন্দ্রস্থলে। আজব কায়দা কসরৎ করে তারা চুরি করত।

হাসান ও আহমদ চুরি করার আজব সব ফন্দি ফিকির আবিষ্কার করতে সিদ্ধহস্ত ছিল।

চোর দুটোকে নিয়ে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ খুবই ভাবিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাদের হিম্মৎ দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। এত সব অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কোতোয়াল ও সৈন্য সামন্ত থাকতেও তাঁরা মহাদাপটের সঙ্গে নিত্য নতুন পথে নগরবাসীদের মকানে চুরি করে চলেছে। আইন সম্বন্ধেও তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ফলে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, ফাঁক ফোকর দিয়ে সময় মাফিক তারা ঠিক পিছলে যায়।

শেষ পর্যন্ত খলিফা এক মতলব আঁটলেন। তিনি হাসান ও আহমদ'কে কোতোয়ালের দুই প্রধানের পদে বহাল করে দিলেন। চোর দিয়ে চোরকে শায়েস্তা করার ফন্দি ফিকির যাকে বলে।

খলিফার কাণ্ড দেখে প্রজারা তো স্তম্ভিত। দুই চোর-সম্রাটের ওপর নগর রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হলে তাজ্জব হবার ব্যাপারই বটে।

হাসান ও আহমদ-এর প্রত্যেকের সাহায্যকারী রূপে চল্লিশজন ঘোড়সওয়ার সিপাই নিযুক্ত করা হ'ল। আর বরাদ্দ করা হ'ল তাদের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামানপত্র। আর প্রতি মাসে এক হাজার সোনার মোহর বেতন হিসাবে নির্ধারণ করা হ'ল।

হাসান ও আহমদ চাকুরি গ্রহণ করে প্রথম রাত্রেই কোতোয়াল খালিদকে নিয়ে বাগদাদ নগরে টহল দিতে বেরল। তাদের পিছন

পিছন কুচকাওয়াজ করতে করতে চল্লিশজন ক'রে আশিজন সশস্ত্র সিপাই চল্‌ল নগর কাঁপিয়ে। কোতোয়াল ঘোষণা করল—আজ থেকে হাসানকে জল ও আহমদকে স্থল বিভাগের কোতোয়ালের প্রধানের পদে বহাল করা হ'ল। এরা আপনাদের জান এবং ধন সম্পদ রক্ষার জন্য জান দিতেও রাজী থাকবে। নগরবাসীদের কোন দরকার হলে তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করে জানাতে পারবেন।

বাগদাদ নগরে এক মহাধড়িবাজ বুড়ি ডিলাইলাহ আর জাইনাব নামে তার এক ফেরেফবাজ লেড়কি বাস করে।

বুড়ি ডিলাইলাহ-র দুই লেড়কি। বড়টির শাদী হয়েছে। লেকিন ছোটটির শাদী-নিকা হয় নি। নানা ফিকির ক'রে আদমির সঙ্গে প্রতারণা করাই তার একমাত্র কাজ। ফলে তাদের দু'জনের সুখ্যাতি নগরবাসীর মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।

ডিলাইলাহ-র স্বামী তামাম বাগদাদে চিড়িয়া সরবরাহ করত। আজ সে বেহেস্তে। খলিফা হারুণ অল রসিদ চিড়িয়া প্রিয়। তাই ডিলাইলাহ-র স্বামী যতদিন জীবিত ছিল খলিফা তাকে বড়ই পেয়ার করতেন। সে গোরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সুখ্যাতি নগরবাসীর দিল্ থেকে মুছে যেতে থাকে।

আজ ডিলাইলাহ-র বিবি ও লেড়কি আদমিদের সঙ্গে জালজোচ্চরি ও প্রতারণা করে বহাল তবিয়তে দিন গুজরান করছে। তারা যার পিছনে লাগে নানা কায়দা কসরৎ করে তার খুন-মাস পর্যন্ত খেয়ে ছাড়ে।

এদিকে কোতোয়াল যখন মহল্লায় মহল্লায় ঢুঁড়ে খলিফার নির্দেশ জারি করতে ব্যস্ত তখন বুড়ি ডিলাইলাহ আর তার লেড়কি নিজ নিজ কামরার জানলা দিয়ে সে-দৃশ্য চাক্ষুষ করতে লাগল।

লেড়কিটি তার আম্মার কামরায় গিয়ে বল্‌ল—'আম্মা আহমদ কে, জান? জাদরেল এক চোর। দাগী আসামী ভিন মুলুক থেকে পালিয়ে বাগদাদ নগরে এসে গা-ঢাকা দিয়ে জান বাঁচাচ্ছে। মিশর তার নিজের মুলুক। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে সেখানকার কোতোয়াল পথে পথে তার তল্লাসী চালাচ্ছে। এখানে পা দিয়ে সে যেভাবে জাল জুয়াচ্চুরি ও ঠগবাজি শুরু করেছিল তা দেখে খলিফাও কম সমস্যায় পড়েন নি। কিছুতেই তাদের কুকীর্তি বন্ধ করতে না পেরে, অনন্যোপায় হয়ে চুরি ডাকাতি ও জুয়াচ্চরি বন্ধ করার দায়িত্ব চোরের ওপরই দিয়ে দিলেন। এখন তারা খলিফার বিশেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চল্লিশজন করে সাহায্যকারী তাদের পিছন পিছন ঘোরে।

হাসান ও আহমদ হাজার দিনার করে প্রত্যেকে মাসোহারা পায়। আর বকশিস ও উপঢৌকনের তো রীতিমত ছড়াছড়ি।

জাইনাব এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'আম্মা, আমরা কী দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেই না দিন গুজরান করছি! আমাদের ব্যাপারে খলিফা নিতান্তই নির্মম-নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছেন। কোন হুঁসই তাঁর নেই!'

—'হ্যাঁ, তাইতো দেখছি বেটি। আমাদের ব্যাপারে তিনি বিলকুল উদাসীন।'

—'তাজ্জব ব্যাপার। আজব এ-দুনিয়া।'

—'বেটি, মাথার ওপরে আল্লাতাল্লা রয়েছেন। কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না। সবই দেখছেন। সবই বুঝছেন তিনি। দুনিয়াতে কৃতজ্ঞ লোকের চেয়ে অকৃতজ্ঞ আদমিই বেশী। এসব দিল থেকে মুছে ফেল। নইলে দিল্ সর্বদা ভারাক্রান্তই হয়ে থাকবে।'

—'সহ্য আর কত করা যায়। তার তো একটি সীমা-পরিসীমা আছে? আম্মা, তুমি একটি বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেই সব এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিতে পার। তোমার প্রবঞ্চনা আর ঠগবাজীর কায়দা কৌশল প্রয়োগ করলে অনায়াসেই উচিত শিক্ষা দিতে পারবে। তখন ঠেলায় পড়ে আল্লাহ-র নাম স্মরণ করতে বাধ্য হবেন। উপায়ান্তর না দেখে খলিফা তোমাকে দরবারে নোকরি দিয়ে জান বাঁচাতে পথ পাবেন না। আমি বলছি, তুমি একবারটি জেগে ওঠ, সক্রিয় হও।'

—'জরুর! একদম সাচ্চা বাৎ বলেছিস জাইনাব।' বুড়ি ডিলাইলাহ দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করে বলে উঠল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' তেত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, জাইনাব তার আম্মাকে ক্ষেপিয়ে দিল। আর তার আম্মা ডিলাইলাহ ও লেড়কির বাৎ শুনে রেগেমেগে একদম কাঁই হয়ে গেল। সে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বল্‌ল—'ঠিক, একদম ঠিক বাৎ বলেছিস জাইনাব। আমি এর বদলা নেবই নেব। কসম খেয়ে বলছি, এমন প্রতারণা ঠকবাজি শুরু করে দেব যাতে খলিফার নাভিশ্বাস উঠে যায়। এক চালেই কেল্লা ফতে। হাসান আর আহমদ চোখে একদম সর্ষে ফুল দেখবে।'

ব্যস, আর দেরী নয়। বুড়ি ডিলাইলাহ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। কাজ শুরু করে দিল। ফকিরের মাফিক ইয়া লম্বা এক আল্লাখাল্লা পড়ল। একটি বোরখা চাপিয়ে সেটিকে দিল্ ঢেকে। হরেক রঙের পুঁতির মালা গলায় ঝুলিয়ে দিল। জলভর্তি একটি বদনা গলায় ঝুলিয়ে নিল। হরেক কিসিমের বস্তু দিয়ে কিছু চাকতি তৈরী করে, মড়ার খুলি জোগাড় করে আজব একটি মালা সে বানিয়ে নিল। সেটি গলায় পরে যখন সে দাঁড়াল দেখলে গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। তার ওপর লাল-হলুদ একটি নিশান হাতে নিয়ে

নিল।

গায়ে কাঁপুনি ধরানো এরকম বিদঘুটে পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে ডিলাইলাহ পথে বেরলো।

সে থপ্ থপ্ করে পথ চলতে চলতে একটু বাদ বাদ 'ইয়া আল্লাহ! শোভন আল্লাহ!' প্রভৃতি চিল্লিয়ে বলতে লাগল। আর মাঝে মধ্যে হরেক কিসিমের প্রার্থনার বুলি আওড়ানো আছেই।

চলাফেরা ও চিল্লাচিল্লি করে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে তুল্‌ল যা কলিজা শুকিয়ে দেয়। গায়ের খুন হিম হয়ে যায়। তাকে দেখা মাত্রই শরীরের সব ক'টি স্নায়ু এক সঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে।

এভাবে তামাম নগর চক্কর মেরে মেরে বুড়ি ডিলাইলাহ এক সময় এক গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গলির ঠিক মোড়ের ওপর এক পেল্লাই মঞ্জিল। আগাগোড়া শ্বেতপাথর দিয়ে মোড়া। তার সদর দরওয়াজায় এক দশাসই চেহারার এর পুর-রক্ষী।

মঞ্জিলটির মালিক মুস্তাফা। খলিফার দেহরক্ষী। এ আদমি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। তামাম বাগদাদবাসী এর ডরে কাঁপে।

মুস্তাফা এক খুব সুরৎ লেড়কিকে শাদী করে সুখে দিন গুজরান করছে। সৎচরিত্র। নিজের বিবি ছাড়া অন্য কোন লেড়কির দিকে ভুলেও নজর দেয় না।

আল্লাহ কিন্তু মুস্তাফা-র ওপর একদম বিমুখ। ঘরে একটিও বালবাচ্চা নেই। আজ পর্যন্ত তার বিবি একটিও লেড়কা পয়দা করতে পারল না। একেই বলে নসীব। একটি লেড়কার অভাবে তার দিল্ সর্বক্ষণ বিষিয়ে থাকে।

মুস্তাফার উমর বেড়েই চলেছে। চুল সফেদ হচ্ছে। দাঁত এক এক করে বিদায় নিচ্ছে। চোখের জ্যোতিও বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু তবু সন্তানহীনতার দুঃখ তার দিল্ থেকে ঘুচল না।

একদিন যে-বিবি তার চোখের মণি ছিল আজ সে-ই তার সবচেয়ে অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'চোখ পেতে দেখতে পারে না। সামনে এসে দাঁড়ালেই তার মাথায় যেন খুন চেপে যায়। বাঁজা জেনানার মুখ দেখলেও নাকি গুনাহ।

মুস্তাফা-র নিশ্চিত বিশ্বাস তার বিবির জন্যই সে সন্তানহীন। তাকে দেখলে, তার মুখের বাৎ শুনলেই সে রীতিমত খেঁকিয়ে ওঠে। চিল্লিয়ে একদম বাড়ি মাৎ করে দেয়। অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গালমন্দ করতেও ছাড়ে না।

স্বামীর দ্বারা বার বার নির্যাতিত জেনানাটি প্রতিবাদ করে ওঠে—'আমার কসুর কি? কেন মিছে আমাকে দেখলেই তুমি খেঁকিয়ে ওঠ?'—'উঠব না? হাজারবার খেঁকিয়ে উঠব। আলবৎ বিলকুল কসুর তোর। তোর জন্যই বুড়ো বয়সে আমাকে নিজের হাত কামড়াতে হচ্ছে, নিজের চুল ছিঁড়তে হচ্ছে আর দিনভর বুক চাপড়াতে হচ্ছে। কসুর, সব কসুর তোরই।'

—'বলবে তো, আমার এমন কোন্ কসুর দেখলে যার জন্য আমাকে এমন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছ।'

—'ইয়াদ নেই, শাদীর রাতেই আমাকে দিয়ে কসম খাইয়ে নিয়েছিলি আমি যেন অন্য কোন জেনানাকে ঘরে না আনি? আমি করলামও তা-ই। লেকিন ফয়দা কি হ'ল? বুড়া হতে তো চল্‌লি একটি বাচ্চা বিয়োবার হিম্মৎ হ'ল, বল? দরবারের সবার ঘর বালবাচ্চায় ঝলমল করে। আর আমার ঘর চির আন্ধার। আমার বংশ রক্ষার ফিকির পর্যন্ত হ'ল না। ইয়ার-দোস্তরা অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে আমার দিকে তাকায়। এক বাঁজা জেনানাকে নিয়ে জিন্দেগী কাটালাম। বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল। জিন্দেগীভর যত বীর্য ঢাললাম, বিলকুল বিফলে গেল। কোন ফয়দাই—'

—'চুপ যাও! আমার কসুর খুঁজে না বেরিয়ে নিজের বীর্যের বিচার কর। নিজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাও, বিলকুল ফয়সাল হয়ে যাবে। আদতে তোমার বীর্য পানির মাফিক পাতলা। বালবাচ্চা পয়দা করার উপাদানের নিতান্তই অভাব।'

মুস্তাফা গর্জে উঠল—'কী, এতবড় বাৎ! আমার বীর্য পাতলা। লেড়কা পয়দা করার হিম্মৎ আমার নেই! আমার কসুরেই

বালবাচ্চা পয়দা করতে পারছ না।' শরীরের সব খুন তার মাথায় গিয়ে আশ্রয় নিল—দুঃখ, হতাশা, অপমান আর গোস্‌সায় থরথরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এবার বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, আমার বীর্যের দোষেই যদি তোমার গর্ভে বালবাচ্চা পয়দা না হয়ে থাকে তবে বিলকুল কসুর আমি মেনে নেব। তবে প্রমাণ চাই।'

—'প্রমাণ?'

—'হ্যাঁ, প্রমাণ, প্রমাণ আমিই দেব। হাতে নাতে তোকে প্রমাণ দেব আমার বীর্যের জন্য নয়, তোরই বালবাচ্চা বিয়োবার শক্তিহীনতার জন্য তুই বাঁজা হয়ে আছিস। আমি ফিন এক যুবতী লেড়কিকে শাদী করে লেড়কা পয়দা করে প্রমাণ দেব, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব, আমার বীর্য কত জোরদার।'

মুস্তাফা-র বিবি খেঁকিয়ে ওঠে—'ভয় দেখাচ্ছিস নাকি? নসীবে যদি বুড়া বয়সে সতীনের ঘর করার ব্যাপার লেখা থাকে তবে তা-ই করতে হবে।' কাপড়ে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে কামরা ছেড়ে গেল।

মুস্তাফা যেন এবার সম্বিৎ ফিরে পেল। সে ভাবল, এমন কড়া কড়া বাৎ তাকে না শুনালেই ভাল হ'ত। একে সন্তানহীনতার জ্বালা তার ওপর এসব বাৎ তার কলিজাটি বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

বুড়ি ডিলাইলাহ সে মঞ্জিলটির সামনে দাঁড়িয়ে তার বসবাসকারীদের সুখ-দুঃখের কিসসা তো শোনা গেল। এবার তাদের বাইরের আচার আচরণের ব্যাপারে কিছু বলা যাক. আর সে সঙ্গে ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহ-র কিছু শয়তানীর চালও জানা যাবে।

বুড়ি ডিলাইলাহ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বার কয়েক 'ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!' বলে লম্ফঝম্ফ করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে মুস্তাফা-র মকানের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল্। দেখল, তার বিবি গালে হাত দিয়ে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে।

খুশীতে বুড়ির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুকের ভেতরে কলিজাটি নাচানাচি শুরু করে দিল্। বুড়ি আবেগ ভরে স্বগতোক্তি করল এবার আমার খেল শুরু হবে। শয়তানী কাকে বলে দেখিয়ে ছাড়ব। খলিফার দেহরক্ষী মুস্তাফা-র বিবির দিলে কোন না কোন হতাশা দানা বেঁধেছে। এ-ই মওকা। একেই বিলকুল কাজে লাগাতে হবে। এর গায়ের বহুমূল্য সাজ পোশাক আর সোনা ও মণিমুক্তার আভরণাদি খুলে নিয়ে নিজের ঝোলায় পুরতেই হবে।

জানালা থেকে সরে এসে ডিলাইলাহ গলা ছেড়ে চিল্লাতে থাকে—'ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!'

ব্যস, পথের দু'ধারের মকানগুলোর জানালা এক এক করে খুলে গেল। সবাই দেখল, এক বুড়ো ফকির দরবেশ হাজির হয়েছে।

দরওয়াজা খুলে অনেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ফকিররূপী বুড়ির দোয়া মাঙতে লাগল।

মুস্তাফা-র বিবি ভাবল, আল্লাহ, সত্যই সর্বশক্তিমান। সর্বজ্ঞ। দুনিয়ার কিছুই তাঁর অজানা নয়। তাই তো তিনি দোয়া ক'রে ফকির সাহাবকে ঠিক সময় মাফিক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চোখ মুছতে মুছতে মুস্তাফা-র বিবি উঠে এসে এক দাসীকে সদর-দরওয়াজার প্রহরীর কাছে পাঠাল, হাতে-পায়ে ধরে পীর সাহাবকে যেন তার কাছে নিয়ে আসে।

প্রহরী আবু আলী বুড়ির কাছে গিয়ে তার পায়ে ধরে অনুরোধ জানাতে যাবে অমনি বুড়ি ছ্যাঁৎ করে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! খবরদার আমাকে স্পর্শ করবি না! সরে যা! সরে যা! রুজু-নামাজ কিছু করার নাম নেই—সরে যা! আমাকে ছুঁবি না।'

বুড়ি কৃত্রিম গোস্‌সা করে খেঁকিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই নিজেকে যেন একটু সামলে নিয়ে বল্‌ল—'আবু আলী। আল্লাহ-র কাছে তোর হয়ে দোয়া মাঙছি, গোলামি থেকে তোকে যেন রেহাই দেন। পরের গোলামি ক'রে তোকে যেন আর দিন গুজরান করতে না হয়। নসীবের জোরেই তোকে এমন জঘন্য কাজ করতে হচ্ছে। তোর দিলে শান্তি আসবে হরদম আল্লাহ-র নাম কর দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে, শান্তি আসবে।' বুড়ি তার প্যাঁচ পয়জার কাজে লাগাতে শুরু করে দিল্।

আবু আলী পথের ওপর সটান হয়ে শুয়ে বুড়ির দোয়া মাঙ্‌ল। আবেগমিশ্রিত স্বরে বল্‌ল—'পীর সাহাব, দোয়া করুন, আমার দিকে মুখ তুলে তাকান। আপনার ওই বদনাটি থেকে একটু পবিত্র পানি দিন।'

বুড়ি বহুৎ আচ্ছা ব'লে বদনাটি কাৎ করতেই সোনার দিনার তিনটি হঠাৎ পথের ওপর পড়ে যায়।

আবু আলী ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেল। আল্লাহ-র দোয়া না থাকলে তো তাঁর আশীর্বাদ তো এমন হাতে নাতে পাওয়া সম্ভব নয়। আবু আলী ব্যস্ত-হাতে দিনারগুলো কুড়োতে কুড়োতে ভাবল, এতো সামান্য পীর নয়, সাক্ষাৎ পয়গম্বর পীর সাহাবের বেশ ধরে তাকে দর্শন দিয়েছেন। অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্ষমতার ব্যাপার।

আবু আলী সোনার দিনার তিনটি বুড়ির দিকে বাড়িয়ে দিল্। বুড়ি চোখ-মুখ বিকৃত করে চরম বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'দিনার-দিরহামে আমার কোন আকর্ষণই নেই। সোনার দিনার আর মাটির ঢেলা—দু'-ই সমান, আমার কাছে বিলকুল তুচ্ছ। পার্থিব ধনদৌলতে মন নেই বেটা। আল্লাহ-র মহব্বৎ-ই আমার একমাত্র কাম্য। আর যা কিছু বিলকুল মূল্যহীন, তুচ্ছ।'

বুড়ির বাৎচিৎ শুনে আবু আলীর দিমাক কেমন যেন ঘুলিয়ে যায়। হকচকিয়ে ওঠে।

আবু আলী বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে, নীরব চাহনি মেলে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

বাঁদীটি এগিয়ে এসে বুড়িকে নিয়ে ভেতরে নিয়ে যায়। বুড়ি ভেতরে ঢুকে গলা ছেড়ে বার দু'-তিন —'ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!' ব'লে চিল্লিয়ে উঠল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' চৌত্রিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, পীর পয়গম্বরের পোশাকে সজ্জিতা বুড়ি মকানটির ভেতরে ঢুকে বজ্রগম্ভীর স্বরে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল।'

বাঁদীটি বুড়িকে নিয়ে কামরার ভেতরে গেল। চোখের পানি মুছতে মুছতে মুস্তাফা-র বিবি খাতুন বুড়ির পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—'দোয়া করুন! দোয়া করুন। আমার দিকে মুখ তুলে তাকান।'

বুড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে তুলতে তুলতে বল্‌ল—'বেটি, ওঠো। আল্লাহ-র নির্দেশেই আমি তোমার কাছে এসেছি। তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে কিছু বলবে বেটি?'

খাতুন ব্যস্ত হয়ে বুড়ির জন্য ফল ও পিস্তার সরবৎ নিয়ে এল। বুড়ি পরম বিতৃষ্ণায় ব'লে উঠল—'খানাপিনা বা ধনদৌলত কোন কিছুতে আমার মতি নেই বেটি। তা ছাড়া আমার রোজা চলছে। সালভরই আমার রোজা চলে। মাত্র পাঁচ দিন আমি খানা গ্রহণ করি। এখন বল বেটি, তোমার কি তকলিফ?'

খাতুন বুড়ি পায়ের কাছে বসে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'পীর সাহাব, শাদীর রাতেই আমি স্বামীকে দিয়ে কসম খাইয়েছিলাম, জিন্দেগীতে সে আর শাদী করবে না। সে কথার খেলাপ করে নি। আমার সঙ্গে প্রতিরাত্রে সহবাস করেছে। আমাদের কামপিপাসা নিবৃত্ত হচ্ছে। লেকিন আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে রইলেন। আজও আমাদের বালবাচ্চা পয়দা হ'ল না। আমার স্বামীর দিলে বহুৎ দুঃখ। এখন তার উমর হয়েছে। গোরে যাওয়ার দেরী নেই। এখন সে শাদী ক'রে নয়া বিবির গর্ভে সন্তান পয়দা করার জন্য একদম ক্ষেপে গেছে।

বুড়ি জুলজুল ক'রে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে হাসতে লাগল। খাতুন বলে চল্‌ল—'হ্যাঁ, আজ সে আমাকে সাফ বাৎ জানিয়ে দিয়েছে, শাদী সে করবেই। লেকিন আমার কি কসুর, বলুন? এ-বয়সে সতীন নিয়ে ঘর করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর চেয়ে নিজের জান খতম করে দেয়া ঢের ভাল।'

বুড়ি গম্ভীর স্বরে ব'লে ওঠে—'হ্যাঁ বেটি। এসবই আমার মালুম আছে।'

—'শুধু কি এ-ই? আমার স্বামী ঘর ছাড়ার আগে আমাকে শাসিয়ে গেছে, আজই শাদী করে নয়া বিবিকে নিয়ে তবে ফিরবে। আমার স্বামী বলে আমার কসুরেই বালবাচ্চা হয় নি। আমি বাঁজা। বীর্যধারণ করে বালবাচ্চা পয়দা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলব, গলতি যদি থাকে তবে তা আমার নয়। তারই বীর্যের গলতি। তার বীর্য কমজোরী। একদম তেজ নাই। লেকিন সে বাৎ সে মানতেই রাজী নয়। তাই জেদ ধরেছে, শাদী করে নয়া বিবির গর্ভে লেড়কা পয়দা করে আমাকে দেখিয়ে দেবে। মেহেরবানি করে আপনি এমন এক ফন্দি ফিকির বাৎলে দিন যাতে আমরা এ-বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ি বল্‌ল—'বেটি, ঘাবড়াও মাৎ! আমি কে, কি-ই বা হিম্মৎ আমার আছে আমি নিজে কিছুই জানি না। লেকিন, আমি যে আল্লাহ-র দূত এতে কোনই দ্বিধার কারণ নেই। তাঁরই নির্দেশে আমি তোমার কাছে হাজির হয়েছি। আমি তোমার মুশকিল আশান করে দেব। তবে হ্যাঁ, আমার বাৎ শুনতে হবে, যা বলব, করতে হবে, রাজী?'

—'রাজী। বলুন, আমার প্রতি আপনার হুকুম—'

—'বেটি, এ-নগরেই একপ্রান্তে একটি পীরের দরগা আছে, জান তো। আমার সঙ্গে সেখানে যাবে। তোমার কামনা-বাসনা সেখানে জানাবে। তবেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

—'পীর সাহাব, সমস্যা হচ্ছে, শাদীর দিন আমি যে সদর-দরওয়াজা দিয়ে এ-মকানে এসেছি তারপর আর কোনদিন মকানের বাইরে যাইনি। বহু কড়াকড়ি। জেনানাদের মকানের বাইরে যাবার হুকুম নেই।'

—'লেকিন কম সে কম একটিবারের জন্য তোমাকে সে-পীরের দরগায় যেতেই হবে বেটি। পীরের কাছে তোমাকেই যেতে হবে, পীর তোমার দুয়ারে আসবেন না। ঘাবড়াও মাৎ। যাবে আর আসবে। কাক পক্ষীও টের পাবে না।'

—'লেকিন আমার স্বামী।'

—'এর মধ্যে আর লেকিন টেকিনের ব্যাপার নেই। আর এক বাৎ, এসব ব্যাপার বাড়ির পুরুষদের অলক্ষ্যেই সারতে হয়, ইয়াদ রেখো। সেখানে গিয়ে শুদ্ধ-পবিত্র দিল্ নিয়ে তুমি লেড়কা বা লেড়কি যা চাইবে তা-ই পাবে।'

উল্লসিত হয়ে খাতুন ব'লে উঠল—'যা চাইব তা-ই পাব? লেড়কা চাইলে লেড়কাই পাব?'

—'হ্যাঁ বেটি, লেড়কা চাইলে জরুর লেড়কা পাবে। তবে স্বামীর সঙ্গে মিলনের সময় যে-বাচ্চা তোমার কোলে আসবে তার আদল তোমাকে মনে মনে কল্পনা করতে হবে। ব্যস, কাজ হাসিল।'

খাতুন খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে উঠল। বাক্স-পেটরা খুঁজে সবচেয়ে আচ্ছা সালোয়ার-কামিজ বের করে পরে তৈরী হয়ে নিল।

আবু আলী সদর-দরওয়াজায় টুল পেতে বসে। সে জিজ্ঞাসা করল—'মালকিন, কোথায় যাচ্ছেন?'

—'পীরের দরগায়। তাঁর দোয়ায় বাঁজা-জেনানার কোলে বালবাচ্চা লাভ করে।' বুড়িকে দেখিয়ে বল্ল—'ইনি মেহেরবানি করে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন।'

আবু সোল্লাসে বল্ল—'বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! ওনার সঙ্গে নির্দ্বিধায় যেতে পারেন। আল্লাহ-র দূত ইনি। আদমির আদল নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হয়েছেন। আপনার বাঞ্ছা পূরণের জন্যই ওনার আসা। আমার ওপর আল্লাহ-র অসীম দোয়া। এ সোনার তিনটে দিনার আমাকে দিয়েছেন।'

পথে যেতে যেতে বুড়ি বল্ল—'পীরের মহিমা এমনই যে, তুমি কেবলমাত্র লেড়কাই লাভ করবে না, স্বামীর সঙ্গেও সম্পর্ক দৃঢ় হবে। স্বামী তোমাকে চোখের আড়ালই করতে চাইবে না। তার মাথার মণি হয়ে থাকবে।'

ধূর্ত বুড়ি ভাবে। পথে বের করে তো এনেছি, লেকিন এর গহনাপত্র হাতানোর ফিকির কি করা যাবে? পথে আদমির মেলা। গিস্‌গিস্ করছে। এর মধ্যে সম্ভব নয়, উপায়?

বুড়ি ভেবে চলেছে, অন্য কোন ফন্দি ফিকির খুঁজতে হবে। সামান্য এগিয়ে বুড়ি বল্ল—'বেটি, তুমি আমার থেকে বেশ তফাতে হাঁট। নইলে পথচারীরা দেখলে কোনরকম সন্দেহ করতে পারে।'

কয়েক লহমা পরে তারা বাজারে এল। পথে সওদাগর সিদি মুসিন খাতুন'কে দেখে মুগ্ধ হয়। সে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে—'ইয়া আল্লাহ, কী সুরৎ! বেহেস্তের হুরী-পরীদের যে হার মানায়!

সওদাগরের মন্তব্য বুড়ির কানে পৌঁছায়। বুড়ি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সওদাগর সিদি-র দিকে তাকায়। এবার খাতুন'কে বল্ল—'বেটি, একটু অপেক্ষা কর। আমি আসছি। এখানে আমার এক শিষ্য রয়েছে। তার সঙ্গে একটু জরুরী বাৎ সেরে আসি।'

বুড়ি এগিয়ে গিয়ে বলে—'বেটা, তুমিই তো সওদাগর সিদি মুসিন, ঠিক কিনা?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বটে। লেকিন আপনি কি করে আমার নাম জানলেন? আমি তো আপনাকে ঠিক—'

—'ঠিক ইয়াদ করতে পারছ না, তাই না?'

—'সাচ্চা বাৎ বটে। আপনি কে, বলুন তো?'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' পঁয়ত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, বুড়ি তখন সওদাগর সিদি

মুসিন'কে বল্‌ল—'বেটা, তোমার পরিচিত এক সওদাগর আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।' আড়চোখে খাতুনকে দেখিয়ে বল্‌ল—'ওই যে দেখছ খুবসুরৎ জেনানাটিকে দেখছ, আমার লেড়কি। ওর আব্বা বহুৎ দিন হ'ল বেহেস্তে চলে গেছেন। আমার সাজ পোশাক দেখে নির্ঘাৎ তোমার মালুম হচ্ছে, আমি মায়ামোহ কাটিয়ে আল্লাহ-র নামে জান কবুল করেছি। এখন এ-লেড়কিটিই আমার বোঝা, পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাদীর উমরও পেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার মাফিক কোন যোগ্য পাত্র পেলে আমি বর্তে যাই।'

সওদাগর সিদি মুসিন খাতুন-এর দিকে তাকায়। স্থির তার দৃষ্টি, দৃষ্টিতে লালসা মাখানো পুরোদস্তুর।

বুড়ি আশান্বিতা হয়। এবার মোক্ষম অস্ত্রটি ছুঁড়ে দিল—'হ্যাঁ বেটা, আমি তোমাকেই খোঁজ করছি। আল্লাহ-র দরবারে আমার বাঞ্ছা নিবেদন করেছিলাম। তিনি আমাকে তোমার নামধাম বাৎলে দিলেন। ধনদৌলত কোন কিছুরই ঘাটতি নেই আমার। আমি তো তাঁরই চরণ আঁকড়ে পড়ে থাকব। বিলকুল সম্পত্তি তো তুমিই ভোগ করবে বেটা। এক নওজোয়ান কি চায়? ধনদৌলত, সুখ, বিবি আর শান্তি। আমার বেটিকে শাদী করলে তুমি এক সঙ্গে সবকিছুরই অধিকারী হবে।'

—'দেখুন, ধনদৌলত আর আরামের কোন অভাব আমারও নেই। শাদী-নিকা করি নি। তাই বিবি কি জিনিস জানি না। বিবির সঙ্গে শান্তিলাভ হয় কিনা তাও আমার জানা নেই। আমার আম্মা অবশ্য গোরে যাবার আগে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, সাদী করে সংসার কোরো, সুখে-শান্তিতে দিন গুজরান কোরো বেটা।'

—'হ্যাঁ বেটা, তা-ই কর।'

—'আম্মা গোরে যাবার সময় তো আমার দিমাকে কেবল পয়সা বাড়াবার ধান্দা। শাদীর ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার ফুরসৎ কোথায়? তাই আম্মার সাধ অপূর্ণই রয়ে গেছে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! আল্লাহ-র দোয়ায় আজ সে-সুযোগ পেয়ে গেলে বেটা। রাজী হয়ে যাও। জলদি কাজ মিটিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। আল্লাহ-র কাজে নিজেকে—এক কাজ কর বেটা, আমাদের সাথেই চল। তোমার ভাবী বিবির পিছন পিছন হাঁট, নজর ঢাল। তার চলাফেরার কোন খুঁত আছে কিনা, যাচাই করে নাও।

সওদাগর সিদি মুসিন-এর মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে ওঠে। সে সোল্লাসে বলে উঠল—'বহুৎ আচ্ছা! তা-ই হোক।'

—'লেকিন এক কাজ করবে কিন্তু বেটা। আমাদের থেকে একটু তফাতে থেকো। পথচারীদের যাতে মালুম না হয়, তুমি আমাদের সঙ্গেই চলেছ, ইয়াদ থাকবে?'

বুড়ির মতলব অনুযায়ী তারা পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে।

কিছুদূর যেতে এক দোকানের দিকে বুড়ির নজর গেল।

দোকানিকে বুড়ি ভালই চেনে। দোকানি কিন্তু বুড়িকে আদৌ চেনে না। বুড়ি এ-সুযোগটিকে কাজে লাগাবার ধান্দায় আছে। তার নাম হজ মহম্মদ। লেড়কি-জেনানার রোগ আছে এর। যে কোন উমরের লেড়কি হলেই হ'ল। নিত্য নতুন লেড়কি চাই। এতে দিনারও গোছা গোছা ওড়ায়? জেনানা দেখলে তার জিভ রসিয়ে ওঠে। লালা গড়ায়।

বুড়ি এগিয়ে গিয়ে দোকানটির সামনে দাঁড়াল। মুচকি হেসে বল্‌ল—'আপনার নাম তো হজ মহম্মদ?'

দোকানি নড়ে চড়ে বসে বল্‌ল—'জী হাঁ। লেকিন আপনি? আপনাকে তো চিনতে পারছি না। কে, কোথায় থাকেন?' ভ্রূ কুঁচকে হজ মহম্মদ বল্‌ল।

—'বাছা, আমাকে না চেনারই বাৎ বটে। এ-নগর থেকে দূরে আমাদের মকান। আমার বড় বিপদ। ওই যে নওজোয়ান আর লেড়কিটি দেখছেন—আমার বেটা আর বেটি। আমার শ্বশুরের ভিটায় যে বাড়ি রয়েছে তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। এখনই মেরামত না করলে শীঘ্রই হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়বে। মিস্ত্রি লাগিয়েছি। মেরামতি কাজ চলছে। কিছুদিনের জন্য এদের আশ্রয় দিলে বড়ই উপকার হয়।'

বুড়ির প্রার্থনা শুনে হজ মহম্মদের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। শয়তানের হাসি। জেনানা ভোগের লালসার হাসি। উল্লাস গোপন রেখে বল্‌ল—'বিপদ তো জিন্দেগীতে আসতেই পারে। আদমিই আদমির বিপদ থেকে উদ্ধার করে। তবে কারো জন্য কিছু করতে গেলে অসুবিধা তো কিছুটা ভোগ করতেই হবে। আল্লাহ সব মুশকিলেরই আশান করে দেন। লেকিন আমার ওপর তলায় যে-কামরা রয়েছে তাতে তো গ্রামের ব্যবসায়ীরা আসে, রাত্রে থাকে। সওদা করে পরের দিন নিজের মকানে ফেরে।

—'তুমিই তো বল্‌লে বাছা কারো উপকার করতে হলে নিজের মুশকিল কিছু না কিছু হয়-ই। আমার তো মাত্র মাস খানেকের মামলা। ওপরের কামরাটিকে বেড়া দিয়ে দু'ভাগ করে এক ভাগ আমাদের—'চাষীদের মাফিক আমরাও তো তোমার মেহমান বাছা।'

হজ মহম্মদ লোলুপ দৃষ্টিতে ফিন খাতুনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বল্‌ল—'ঠিক আছে, তা-ই হবে। বিপদ তো কারো চিরদিন থাকে না।'

বুড়ি তো ভালই জানে এমন খুবসুরৎ জেনানা দেখার পর হজ মহম্মদ-এর পক্ষে নারাজ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

হজ মহম্মদ বুড়ির হাতে কামরাটির চাবি তুলে দিল্‌।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' ছত্রিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কামরাটির চাবি হাতে পাওয়ায় বুঝল এ-পর্যন্ত তার প্যাঁচ-পয়জার অনুযায়ীই কাজ হয়েছে। পরবর্তী অংশটুকুও ঠিকই বাস্তবায়িত করতে পারবে।

বুড়ি এবার খাতুনকে নিয়ে সিঁড়ি-বেয়ে ওপরের কামরায় গেল। নওজোয়ান সওদাগরটি রয়ে গেল বাইরে। কামরায় ঢুকে খাতুন'কে বল্‌ল—'বেটি, পীর সাহেব নামাজ পড়ছেন, একটু বাদে আসবেন। তিনি এলে ফিন শরম টরম কিছু কোরো না যেন। তিনি যা-যা করতে বলবেন নির্দ্বিধায় তা-ই করবে। ইয়াদ রাখবে, তোমার একমাত্র লক্ষ্য লেড়কা পয়দা করা, সংসারের সুখ বজায় রাখা। আমি গিয়ে পীর সাহাবকে নিয়ে আসছি।'

বুড়ি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল।

খাতুন বোরখা খুলে একটু হাল্কা হয়ে বসল। গায়ে হাওয়া বাতাস একটু লাগানো দরকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়ি নওজোয়ান সওদাগর সিদি মুসিনকে নিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল। বুড়ি বল্‌ল—'বেটি, ইনি এসে গেছেন, এবার তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। পাশের কামরায় রয়েছেন লেকিন এক বাৎ, এসব জাঁকজমক—পোশাক আশাক বরদাস্ত করতে পারেন না।'

খাতুন একটু নড়ে চড়ে বসল।

বুড়ি ব'লে চল্‌ল—'হ্যাঁ, সাজ পোশাক, বিশেষ করে ধনদৌলত, অলঙ্কারাদি বরদাস্ত করতে পারেন না। ওসব বরং খুলে আমার কাছে দিয়ে দাও। পরে ফেরৎ পাবে।'

খাতুন-এর দিলে তখন রঙ লেগেছে। লেড়কা পয়দা হওয়ার আনন্দে দিল্ ভরপুর। দিল্ উপচে পড়ছে। তিলমাত্র দ্বিধা না করে গায়ে হীরা-জহরতের যত আভরণাদি আছে বিলকুল খুলে বুড়ির জিম্মায় রেখে দিল্।

খাতুন এবার গায়ের যত পোশাক রয়েছে এক এক করে খুলে বুড়ির হাতে দিয়ে দিল্। তার গায়ে কেবলমাত্র একটি একদম পাতলা সেমিজ রয়ে গেল। প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে বুড়ির সামনে খাড়া হ'ল।

বুড়ি গহনাপত্র ওড়না দিয়ে একটি পুঁটুলি বেঁধে নিজের কামিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল।

এবার পাশের কামরায় গিয়ে মুখ কাচুমাচু করে সওদাগর মুসিন'কে বল্‌ল—'বেটা, তুমি বিলকুল গড়বড় করে দিয়েছ। তোমাকে তো বলেইছিলাম, আমাদের থেকে একটু তফাতে তফাতে থাকবে। লেকিন তুমি তা পার নি। মহল্লার লেড়কারা টের পেয়ে গেছে। আমি তোমাদের শাদীর বাৎ বল্‌লাম। শাদীর বাৎ

শুনে তারা খুশীই হ'ল। লেকিন তারা বল্‌ল—যে নওজোয়ানের সঙ্গে তোমার লেড়কির শাদী দিচ্ছ, তার গায়ে দগদগে কুষ্ঠ ব্যাধি, জান? সাচ্চা বাৎ কি জান বেটা, কুষ্ঠ ব্যাধির ব্যাপারটি আমার বেটির দিল্ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমি অবশ্য তাকে প্রবোধ দিয়েছি, মহল্লার লেড়কারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। তাই ঝুটমুট—'

বুড়ির মুখের বাৎ শেষ হবার আগেই সিদি মুসিন ঝটপট কোর্তা-পাৎলুন খুলতে লেগে যায়। মুহূর্তে বিলকুল উলঙ্গ হয়ে পড়ে।

বুড়ি বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! এভাবেই আমার বেটির সামনে প্রমাণ দেবে, তোমার গায়ে একদম কুষ্ঠ ব্যাধি নেই। এ ভাবেই তার সামনে গিয়ে খাড়া হবে। তার ভুল এতে বিলকুল ভেঙে যাবে।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বুড়ি বল্‌ল—'বেটা, বন্দোবস্ত পাকা। লেকিন এক কাজ বাকী থেকে যাচ্ছে। তোমার পোশাক আশাক এখানে ফেলে চলে যাওয়া ঠিক নয়। আমি বরং আগে এগুলোর বন্দোবস্ত করে আসি। যাব আর ঝটপট ফিরে আসব।

বুড়ি সওদাগর সিদি মুসিন-এর কোর্তা-পাৎলুন ও খাতুনের যাবতীয় সাজ পোশাক বগলে নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে সোজা হজ মহম্মদ-এর দোকানে গিয়ে বল্‌ল—'বেটা, আমার লেড়কা আর লেড়কিকে কামরায় বসিয়ে দিয়ে এলাম।'

হজ মহম্মদ বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা। লেকিন আপনি এমন হন্তদন্ত হয়ে চল্‌লেন কোথায়?'

—'আমাদের সামানপত্র কিছুটা তো আনা হয় নি। দেখি একটি

গাধার ব্যবস্থা করি।' কথা বলতে কয়েকটি দিনার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এগুলো দিয়ে রুটি-মাংস খরিদ করে তুমিও খেয়ো আর ওদেরও দিয়ো। দুপুরে ওদের খাওয়া জোটে নি।'

হজ মহম্মদ বল্‌ল—'লেকিন আমার দোকানে তো আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ-ই নেই। দোকান ফেলে কি ক'রে যাই, বলুন তো?'

—'ঠিক আছে, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি-ই না হয় তোমার দোকান পাহারা দিচ্ছি। তুমি ওদের নিয়ে খানাপিনা সেরে ঝটপট ফিরে আসবে।'

খুবসুরৎ জেনানা খাতুনকে একবারটি কাছ থেকে ভালভাবে দেখার জন্য হজ মহম্মদ-এর কলিজা সেই তখন থেকে ছটফট করছিল। ভাবল, ভালই হ'ল, বুড়িই মওকা করে দিয়েছে। সে আর এক লহমাও দেরী করল না। বুড়িকে দোকানে বসিয়ে লম্বা-লম্বা পায়ে রেস্তোরার দিকে হাঁটতে লাগল।

বুড়িও মওকার সদ্ব্যবহারে মেতে গেল। দোকানের দামী দামী সামানপত্র হাত চালিয়ে একটি বস্তায় পুরে একদম মুখ বেঁধে ফেল্‌ল।

এমন সময় এক ছোকরাকে খালি গাধা নিয়ে হজ মহম্মদ-এর দোকানের সামনের পথ দিয়ে যেতে দেখে বুড়ি তাকে দাঁড় করাল।

বুড়ি বল্‌ল—'এ-দোকানের মালিক হজ মহম্মদকে চেন?'

গাধার মালিক ছোকরাটি হেসে বল্‌ল—'সে কী, এ-পথে রোজ যাতায়াত করি। রঙের কারবার তাঁর। খুব ভালই চিনি। লেকিন এসব বাৎ কেন বলছেন? হজ সাহাব কোথায়?'

বুড়ি কপাল চাপড়ে বল্‌ল—'দুঃখের কিস্‌সা আর কি বলব বেটা! হজ আমার বেটা। দেনার দায়ে তার দোকান নিলামে উঠতে চলেছে। বেটা তো আমার শোকে-তাপে বিছানা নিয়েছে। তাই আমি দামী সামানপত্র আগেভাগেই সরিয়ে ফেলছি।'

—'হ্যাঁ, ঠিকই করছেন বটে।'

—'কোতোয়ালের ষণ্ডামার্কা আদমিরা এসে সামানপত্র নিয়ে যাবে। তা বেটা, তোমার গায়ে তো তাগত আছে। আমি জোর হারিয়ে ফেলেছি তুমি এক কাজ করতে পার—মজুরি পাবে।'

—'কি? কি কাজ? এ কাঠটি দিয়ে রঙের জালাগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। সব জালা—একদম গুঁড়া গুঁড়া করে দেবে। আমার বেটার মুখের গ্রাস কোতোয়ালের সাকরেদদের ভোগ করতে দেয়ার দিল্ নাই। এই নাও আগাম পাঁচ দিনার, পরে আরও পাবে।

গাধার মালিক ছোকরাটি দেখল, বুড়ির কথায় যুক্তি আছে বটে। মুখের গ্রাস কোতোয়ালের সিপাহীরা ভোগ করবে, সহ্য না হবারই বাৎ বটে।

গাধার মালিক ছোকরাটি একটি কাঠের টুকরো দিয়ে দমাদম আঘাত করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল।

বুড়ি ছোকরাটিকে বল্‌ল—'তুমি নিশ্চিন্তে কাজ কর বেটা। আমি তোমার গাধার পিঠে বস্তাটি চাপিয়ে একটু তফাতে, নিরাপদ স্থানে রেখে আসি গে।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' সাঁইত্রিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, বুড়ি গাধার পিঠে হজ মহম্মদ-এর দোকানের সামানপত্রের বস্তাটি চাপিয়ে সোজা চম্পট দিল।

গাধার মালিক ছোকরাটি পাঁচ দিনার নগদ পেয়ে এবং পরে আরও মজুরি পাবার প্রত্যাশায় কাঠের আঘাতে রঙের জালাগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। দোকান জুড়ে রঙের ছড়াছড়ি।

এমন সময় হজ মহম্মদ দোকানে ফিরে এল। সে তো ছোকরাটির কারবার দেখেএকদম হতভম্ব হয়ে গেল। কি বলবে, কি করবে হঠাৎ করে কিছুই সে বুঝে উঠতে পারল না।

ছোকরাটি রঙের জালা ভাঙার কাজ অব্যাহত রেখেই বল্‌ল—'আপনি একদম ভাববেন না হুজুর। আমি একাই পারব। আপনি দূরে খাড়া হয়ে দেখুন, আমি সব কাজ ঠিকঠাক করছি কিনা।'

হজ মহম্মদ উন্মাদের মাফিক গর্জে উঠল—'বেকুব, বেতমিস, শয়তান কাঁহিকার! কার হুকুমে আমার দোকানে ঢুকে পাগলামি শুরু করেছিস, শুনি। তোকে আমি কোতোয়ালের হাতে দেব, গর্দান নেবার বন্দোবস্ত করব!'একলাফে দোকানে ঢুকে সে ছোকরাটির হাত থেকে কাঠের টুকরোটি ছিনিয়ে নিয়ে তার মাথায় আঘাত হানার জন্য উদ্যত হ'ল।

ছোকরাটি তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—'হুজুর, মেহেরবানি করে আমাকে মার ঢালবেন না। আমার কি কসুর বলুন?'

—'বেতমিস কাঁহিকার! আমার দোকানের সামানপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলি, সর্বনাশ করে দিলি ফিন বলছিস, কি কসুর করেছিস?'

—'হ্যাঁ,আমার কি কসুর? আপনার আম্মা রীতিমত মজুরি দিয়ে আমাকে—'

—'আম্মা? আমার আম্মা? মারব এক ডাণ্ডা! আমার আম্মার গোরে ঘাস গজিয়ে গেছে। আর তিনি তোকে মজুরি দিয়ে আমার দোকান ছাড়খাড় করতে লাগিয়ে গেছেন, তাই না। এক ডাণ্ডা মেরে জান একদম খতম করে দেব।'

—'লেকিন তিনি যে আমাকে কাজে লাগিয়ে আমার গাধার পিঠে দোকানের সামানপত্র চাপিয়ে বলে গেল ঝটপট ফিরে আসবেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা কাজ করেছ। হাঁ করে তাকিয়ে থাক পথের দিকে চেয়ে। ইয়া আল্লা! আমাকেও একদম পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে দেখছি!' দোকানের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে হজ মহম্মদ এবার বুঝল, তার দোকানের দামী দামী সামানপত্র গায়েব করে বুড়ি চম্পট দিয়েছে।

হজ মহম্মদ-এর চিৎকার চেঁচামেচিতে পথচারীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিক থেকে নানা কিসিমের প্রশ্ন ভেসে আসতে লাগল। হজ মহম্মদ সাধ্য মত এর-ওর প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোশিস করল।

ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন বলে উঠল—'বুড়ির লেড়কা আর লেড়কি যখন আপনার ঘরভাড়া নিয়েছে। আর তারা ওপরের কামরাতেই এখনও আছে তবে আর সমস্যার কি আছে, বুঝছি না তো।

—'হ্যাঁ, তারা ওপরের কামরা ভাড়া নিয়েছে। আমি তাদের জন্যই রেস্তোরায় খানা আনতে গিয়েছিলাম।' খানার ঠোঙাটি দেখাল।

হজ মহম্মদ-এর বাৎ চিৎ আর বুক চাপড়ানো দেখে ছোকরাটি নিঃসন্দেহ হ'ল, তার কপাল পুড়েছে। নসীবের ফের। গাধাটি ফেরৎ পাবার তিলমাত্র সম্ভাবনাও নেই। সে কান্নায় বিলকুল ভেঙে পড়ল।

ছোকরাটি কাঁদতে কাঁদতে হজ মহম্মদকে বল্‌ল—'আপনার জন্যই আমাকে গাধাটি খোয়াতে হয়েছে।'

হজ মহম্মদ তাকে ধমক দিয়ে ওঠে—'শয়তান কাঁহিকার! ফেরেফবাজ, ধান্দাবাজি করার আর জায়গা পাওনি! আমার জন্য তোকে গাধা খোয়াতে হয়েছে—মারব এক ডাণ্ডা —মাথা একদম চৌচিড়—'

—'আপনার জন্য নয়, বলতে চান? আপনার দোকানের বুড়িই তো আমার গাধা নিয়ে ভেগেছে। আপনার ভাড়াটে—আপনার দোকানের আদমি—ফেরৎ দিন আমার গাধা।'

—'শয়তান কাঁহিকার! চুপ কর! ডাণ্ডা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে ছাড়ব! আমার দোকানের সর্বনাশ করে ব'লে কিনা গাধা ফেরৎ দিন! ভাগ এখান থেকে।'

ব্যস, দু'জনে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ছোকরাটি বলে,আমার গাধা ফেরৎ দিন আর হজ মহম্মদ বলে, আমার দোকানে ঢুকে কেন সব কিছু ভেঙে একসার করলি?

হজ মহম্মদ ছোকরাটিকে ঘা কতক দিয়ে বসে—'তোকে আমি কোতোয়ালের সামনে হাজির করব। কয়েদ খাটিয়ে ছাড়ব। আমার দোকানের সর্বনাশ করে এত সহজে রেহাই পাবি ভেবেছিস?'

ছোকরাটি তবু বলে—'আমার গাধা ফেরৎ দাও। বাজে ধান্দা ছাড়। আমার গাধা ফেরৎ না দিলে তোমাকে আমি কাজীর দরবারে হাজির করে বিচার চাইব। তোমার গর্দান নেয়ার বন্দোবস্ত করব, বলে দিচ্ছি।'

পথচারীরা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে মজা লুটছিল। এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না। ভিড়ের মধ্য থেকে এক প্রবীণ বল্‌ল—'হজ মহম্মদ, তুমি তো বললে, বুড়িটি তোমার ভাড়াটে, ঠিক কিনা?'

—'হ্যাঁ, আজই তার কাছে এক মহিলার জন্য একটি কামরা ভাড়া দিয়েছি।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তোমার ভাড়াটে ছোকরাটির গাধা নিয়ে ভেগেছে তখন তার গাধা তোমাকেই ফেরৎ দিতে হবে। তুমি কিছুতেই দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।'

এমন সময় পুব আকাশে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' আটত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ আবার কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, হজ মহম্মদ আর গাধার মালিক ছোকরাটি তো জোর বিবাদ জুড়ে দিল্‌। কেউ কমতি নয়। এদিকে সে-নওজোয়ান সওদাগর সিদি মুসিন আর খুবসুরৎ খাতুন পাশাপাশি দু' কামরায় বুড়ির ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে।'

সওদাগর সিদি মুসিন বিলকুল উলঙ্গ। বুড়ি বলি গেছে, ঝটপট ফিরে আসবে। লেকিন ফিরল না। ধৈর্যচ্যুত হয়ে সে এক পা দু'পা করে বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হ'ল।

আর খাতুন? সে-ও তো ধরতে গেলে বিবস্ত্রাই। একদম ফিনফিনে একটি সেমিজ গায়ে চাপিয়ে সে দীর্ঘ সময় বুড়ির পথ চেয়ে বসে। আর কতক্ষণই বা ধৈর্য ধরতে পারে। বুড়ি তাকে ভাওতা দিয়ে তার রত্নালঙ্কারাদি ও পোশাক আশাক সব নিয়ে চম্পট দিয়েছে। আর ধৈর্য ধরতে না পেরে সে কামরা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

খাতুন বাইরে বেরিয়েই সিদি মুসিন-এর মুখোমুখি হয়ে যায়। বিলকুল উলঙ্গ। সে ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকায়।

সিদি মুসিন বাজখাই গলায় বলে ওঠে—শরম টরম পরে দেখাবে। আগে বল, তোমার আম্মা কোথায়? তাকে তলব কর। আমি আর দেরী করতে নারাজ। এ-মুহূর্তেই আমাদের শাদীর বন্দোবস্ত করতে বল। কোথায় সে? তলব কর, আমার সামনে হাজির কর। শাদীর বন্দোবস্ত করুক।'

খাতুন চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'সে কী! কে আমার আম্মা? আমার আম্মা তো কবেই বেহেস্তে গেছেন। তুমি কে? পীর সাহাবের চেলা তুমি?'

—'এ কোন্ কিসিমের বাৎ বলছ মেহেবুবা! তোমাকে শাদী করার জন্য আমার এ-হালৎ হয়েছে আর আমাকে কিনা পীরসাহাবের চেলা বানিয়ে ছাড়লে! তোমাদের ব্যাপার স্যাপার কি, কিছুই তো আমার মালুম হচ্ছে না!'

—'সেই তখন থেকে পাগলের মাফিক 'শাদী-শাদী' করছ ব্যাপার কি বল তো? আমার দিমাকে কিছুই আসছে না!' খাতুন যেন বিলকুল আন্ধার দেখতে লাগল। সে বিলাপ পেড়ে কান্না জুড়ে দিল।

সিদি মুসিন এবার ঠাওরাল কারবার তো সুবিধার নয়। এ পরিস্থিতিতে কি করবে, কি করা উচিত হঠাৎ করে সমঝে উঠতে পারল না।'

খাতুন-এর শিরে যেন আচমকা আশমান ভেঙে পড়ল। আতঙ্কে তার কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সে যে প্রায় উলঙ্গ সে- হুঁসও তার নেই। হুঁস থাকলেও কিছুই করার নেই। উন্মাদিনীর মাফিক চিল্লাতে চিল্লাতে সে সিঁড়ি-বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নামতে লাগল। তার বিশ্বাস, নিচে নামলেই বুড়ির দেখা পেয়ে যাবে।

সিদি মুসিনও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ল। উলঙ্গ অবস্থাতেই 'দাঁড়াও-দাঁড়াও, যেয়ো না', বলতে বলতে খাতুনকে অনুসরণ করল।

এদিকে সে-গাধার মালিক ছোকরা ও হজ মহম্মদের কাজিয়া চরম রূপ নিল। তারা বুড়িকে না পেয়ে তার লেড়কা-লেড়কির কাজিয়ার ফয়সালা করার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল।

সিঁড়ির কাছাকাছি এসেই হজ মহম্মদ রীতিমত ভড়কে যায়। দেখে, লেড়কা- লেড়কি উভয়েই উলঙ্গ। লেড়কিটির গায়ে নামমাত্র সেমিজ একটি থাকলেও লেড়কাটি বিলকুল উলঙ্গ। সে নিজের অজান্তেই আর্তনাদ করে ওঠে—'ইয়া আল্লাহ!শোভন আল্লাহ!'

হজ মহম্মদ ও তার পিছনে পথচারী জনতাকে দেখে খাতুন হকচকিয়ে যায়। বাতাসে হাঁটুর ওপর উঠে আসা সেমিজটিকে টানাটানি করে নামানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে থাকে।

সওদাগর সিদি মুসিন পড়ে আরও বেশী বেকায়দায়। সে- বেচারা দু' হাত দিয়ে কোনরকমে শরম ঢাকার কোশিস করতে লাগল।

হজ মহম্মদ তড়পাতে লাগল—'বেশ্যার বেটি বেশ্যা কাঁহিকার! শরম টরম সিকেয় তুলে রেখে আগে বল, তোর বেশ্যা আম্মা কোথায়? তাকে একবারটি পেলে দু' ঠ্যাং ধরে টেনে একদম ফেড়ে ফেলে দেব। বল, হারামজাদী নচ্ছার বেশ্যা মাগী কোথায় গেছে?'

খাতুন ডুকরে ডুকরে কেঁদে বল্‌ল—'সে আমার আম্মা নয়। আমার আম্মা বহুৎ দিন হ'ল বেহেস্তে গেছেন। সে এখানকার পীর সাহাবের শিষ্যা। পীরের দরগায় নিয়ে যাওয়ার ভাঁওতা দিয়ে আমাকে মকান থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। দেখছেনই তো আপনারা, কী হালৎ করে বুড়ি ভেগেছে।'

খাতুন-এর বাৎ শুনে সত্যই আদৎ ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছু কিছু আঁচ করতে পারল। গাধার মালিক ছোকরাটি গাধার শোক ভুলে সরবে হেসে উঠল। হজ মহম্মদও তার দোকান বরবাদ হওয়ার জ্বালা ভুলে না হেসে পারল না।

উপস্থিত পথচারীরাও বুঝল, তারা চার আদমিই শয়তানী বুড়ির পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হচ্ছে।

এবার সওদাগর সিদি মুসিন, হজ মহম্মদ আর ছোকরাটি ব্যাপারটি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করতে শুরু করল। যে করেই হোক তল্লাশী চালিয়ে বুড়িকে বের করতেই হবে। কড়া শাস্তি দিতে হবে তাকে।

ইতিমধ্যে পথচারীদের মধ্য থেকে একজন ছুটে গিয়ে সালোয়ার কামিজ খরিদ করে এনে খাতুন'কে দিল্। সে পোশাক গায়ে চাপিয়ে আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজের মকানের দিকে ছুটতে লাগল। নসীবের খেল তো এখনও শেষ হয় নি। এর পরেও যে তার বরাতে কি জুটবে, আল্লাহ-ই জানেন।

এদিকে হজ মহম্মদ পুরানো কোর্তা পাৎলুন জোগাড় করে

সিদি মুসিনকে আগে শরম নিবারণের বন্দোবস্ত করে দিল।

এবার সে সিদি মুসিন ও ছোকরাটিকে নিয়ে সোজা কোতোয়াল খালিদ-এর দরবারে এজাহার দিতে চল্‌ল।

পর পর তিন আদমির অভিযোগ শুনে কোতোয়াল খালিদের চোখ একদম ছানাবড়া হয়ে গেল। মুহূর্ত কাল গুম্ হয়ে ভাবল, এক সময় মুখ খুল্‌ল —'এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার দেখছি! খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, এমন তাজ্জব ব্যাপার আমার জিন্দেগীতে অন্ততঃ শুনি নি।

অভিযোগকারী তিন আদমিই নিজ নিজ ক্ষয়ক্ষতির উল্লেখ করে সমানে কপাল ও বুক চাপড়াতে লাগল।

কোতোয়াল ধমক দিয়ে উঠল—'উন্মাদের মাফিক বুক চাপড়ে কোনই ফয়দা হবে না। আমার বাৎ শোন, হতচ্ছাড়ি বুড়িটিকে যদি পাকড়াও করে আমার সামনে হাজির করতে পার তবে সাজা কাকে বলে আমি দেখিয়ে দেব। তাকে নাগালের মধ্যে না পেলে আমি বিলকুল অসহায়।'

কোতোয়ালের বাৎ শুনে তারা তিনজনই তখনকার মত কান্না থামায়। দিমাক ঠাণ্ডা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—'যে করেই হোক শয়তানী বুড়িটির পাত্তা লাগাতেই হবে। পাতালের ভেতরে লুকিয়ে থাকলেও তাকে তাল্লাশী চালিয়ে বের করা চাই-ই চাই।'

এদিকে নচ্ছার বুড়ি ডিলাইলাহ গাধার পিঠে বস্তাটি চাপিয়ে এক লহমায় বে-পাত্তা হয়ে গেল। নির্বিবাদে নিজের মকানে হাজির হয়।

বুড়ির লেড়কি জাইনাব খোলা-জানালায় দাঁড়িয়ে তার আম্মার পথে চেয়ে সময় গুজরান করছে। গাধা ও সামানপত্র নিয়ে তাকে মকানে ঢুকতে দেখে সে চিল্লিয়ে উঠল—'আম্মা, তোমার হিম্মৎ আছে বটে।'

—'হিম্মৎ থাকবে না তো কোতোয়ালের হাতে ধরা পড়ব নাকি রে? ওরকম দশটি কোতোয়ালকে আমি নাকানি চোবানি খাওয়াবার হিম্মৎ রাখি, জানিস? খলিফা আমার সঙ্গে যে-বেইমানী করল তার বদলা সবে তো শুরু করলাম। তার খলিফাগিরি ছুটিয়ে ছাড়তে না পারলে আমার নাম ডিলাইলাহ-ই নয়, শুনে রাখ।'

বুড়ি একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করল—' বিলকুল বাজী মাৎ করেছি। এক নওজোয়ান সওদাগর আর আসিফের বিবিকে বিলকুল উলঙ্গ করে ছেড়েছি। তাদের সাজ পোশাক, গহনাপত্র ও নগদ দিনার গাট্টি বেঁধে চম্পট দিয়েছি। উপরি মুনাফা এক দোকানের সামানপত্র আর একটি গাধা। বেটি, এবার মানছিস তো আমার কায়দা কসরৎ কেমন কাজ হাসিল করতে পারে?'

—'লেকিন, আম্মা আজ না হোক কাল তাদের কেউ যদি তোমাকে পাকড়াও করে ফেলে তখন? যদি কোতোয়ালের কাছে হাজির করে?'

—'আমাকে ধরবে এমন আব্বার বেটা এখনও পয়দা হয় নি। আর কোতোয়াল? ধ্যুৎ, রেখে দে তোর কোতোয়াল। তার হিম্মৎ কি আমার পিছনে লাগে। তবে হ্যাঁ, ওই গাধার মালিক ছোকরাটিকে নিয়ে একটু ডর আছে বটে। আমাকে চিনে রেখেছে। তার ওপর পথে পথে ঢুঁড়ে সামানপত্র বয়ে বেড়ায়। একটু-আধটু নজর রেখে চল্‌লেই সামাল দেয়া যাবে। আমি কারোরই পরোয়া করি না। এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেব।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিসসা বন্ধ করলেন।

চারশ' উনচল্লিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে কিস্‌সার পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহ এবার দরবেশের সাজ খুলে ফেলে আমীর আদমির হারেমের আয়ার পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিল।

বুড়ি ফিন বাগদাদের পথে পথে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে মতলব ভাঁজতে লাগল, এবার কাকে কব্জা করে কিছু ধন দৌলত কামিয়ে নেবে।

বুড়ি হাঁটতে হাঁটতে বাজারে হাজির হ'ল। পথের দু' ধারে হরেক কিসিম সামগ্রীর দোকান।

ডিলাইলাহ পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, এক আমীর আদমির দামী খুবসুরৎ একটি লেড়কা কোলে নিয়ে পথ চলেছে। যেমন তার সুরৎ, তেমনি সাজ পোশাক। এক লহমায় তাকিয়েই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, খানদানি পরিবারের লেড়কাই বটে। গলায় হীরা-মুক্তা খচিত বহুমূল্য একছড়া হার।

বুড়ি একটু আগেই দাসীটিকে ইয়া বড় প্রাসাদোপম এক মাকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। সওদাগর সমিতির সভাপতির মকান। বাগদাদের এমন কোন আদমি নাই যে, বাড়িটিকে চেনে না। আর লেড়কাটি যে সওদাগর সমিতির সভাপতির এরকম ধারণা করা অমূলক নয়।

দাসীটি লেড়কাটির সঙ্গে যেসব বাৎচিৎ করছে তাতে মালুম হচ্ছে, সওদাগর-মকানে আজ কোন উৎসব-অনুষ্ঠান রয়েছে। মেহমানে বাড়ি জমজমাট। লেড়কাটি যাতে হৈ-হুজ্জুতি করে মেহমানদের বিরক্তির সঞ্চার না করে তারই জন্য দাসীটির জিম্মায় দিয়ে একটু-আধটু ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম করা হয়েছে।

লেড়কাটিকে এক লহমায় দেখেই ডিলাইলাহ-র কলিজা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। সে বিড়বিড় করে ব'লে উঠল—'যে করেই হোক লেড়কাটিকে হাতাতে হবে। চুরি করে একদম উধাও হয়ে যেতে হবে।

এক পা দু'পা করে ডিলাইলাহ দাসীটির দিকে এগিয়ে গিয়ে ব'লে উঠল—' আর বোলো না বেটি, আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে।'

দাসীটি ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক তাকাল। না, ধারে-কাছে তো সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই! তবে? বুড়িটি তবে কার সঙ্গে বাৎচিৎ করছে? কিছুই ঠাহর করতে পারল না। হতাশ দৃষ্টিতে বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বুড়ি দাসীটির দিকে একটি দিনার এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এক কাজ কর, তোমার মালকিনকে গিয়ে বল, তার পুরনো আয়া উম অল খায়ের তার সঙ্গে ভেট করতে এসেছে। দাসীটি অচল দিনারটি হাতে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বুড়ি আবেগের সঙ্গে বলে উঠল—'আরে, তোমার মালকিনকে খবর দাও তবেই যথেষ্ট। আমি যে লেড়কিটিকে নিজের বেটির মাফিক কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আজ তার শাদীর পাকা দেখা, আমার আনন্দ! তাই তো আমার দোয়া জানাতে ছুটে আসতেই হ'ল।'

দাসীটি ফ্যাকাসে মুখে বল্‌ল—'আপনি যে মেহেরবানি করে ছুটে এসেছেন এ তো খুশীর ব্যাপারই বটে। লেকিন, এ-লেড়কাকে নিয়ে কি করে মকানের ভেতরে যাই বলুন তো। যা নটঘটে লেড়কা। এতক্ষণ তাফাল করছিল, তার আম্মা এখন খানদানি পোশাকে সেজেগুজে মেহমানদের সঙ্গে বসে। তার কাছে লেড়কাকে নিয়ে হাজির হলে তার সাজ বিলকুল বরবাদ করে দেবে।'

—'আরে ধ্যুৎ, আমার কোলে দাও তো দেখি কেমন তোমার নটঘটে লেড়কা। তোমরা বালবাচ্চা রাখার কায়দা কৌশল জান না বলেই না হয়রান হও।'

দাসীটি তিলমাত্র অবিশ্বাস ও দ্বিধা না করে লেড়কাটিকে বুড়ির কোলে দিয়ে মাকানের ভেতরে চলে গেল।

ব্যস, বুড়ি সহজেই মওকা পেয়ে গেল। সে লেড়কাটিকে নিয়ে এক দৌড়ে অদূরবর্তী এক অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

বুড়ি এবার হাত চালিয়ে লেড়কাটির গা থেকে হীরা-জহরৎ খচিত যত অলঙ্কারাদি ছিল বিলকুল খুলে নিল। আর লেড়কাটি? না, তাকেও হাতছাড়া করল না। তাকে দিয়ে কিছু রোজগার করার লোভ সামলাতে পারল না।

বুড়ি লেড়কাটিকে নিয়ে বাজারের এক জহুরীর দোকানে গেল। ইহুদী খুবই ধনী। দিনারের কুমীর। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার তেমন বনিবনা নেই।

স্থানীয় সওদাগর সমিতির সভাপতির সঙ্গে ইহুদী জহুরীটির একদম আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। বুড়ি ডিলাইলাহ ব্যাপারটি অনেক আগেই শুনেছিল।

বুড়ি ডিলাইলাহকে দোকানের সামনে সওদাগর সমিতির সভাপতির লেড়কাটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়াতে দেখে বুড়ো জহুরী তার দিকে পিটপিট করে তাকায়। মধুঝরা কণ্ঠে বুড়িকে বল্‌ল—'বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

—'আপনিই তো জহুরী আজারিয়াহ, তাই না?' বুড়ো ইহুদী হেসে বল্‌ল—'হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। আমিই ইহুদী জহুরী আজারিয়াহ।' বুড়ি হাত কচলে বল্‌ল—'এ-বাচ্চাটির বাড়িতে বহিনজীর শাদীর পাকা কথার উৎসব হচ্ছে। আরে, আমি কোন্ বাড়ি থেকে এসেছি, কোন্ বাড়ির বাচ্চা তা-ই বলি নি।'

—'তার আর দরকার হবে না। লেড়কাটিকে দেখেই আমি ধরে ফেলেছি। এবার বলুন তো আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'

—'এর আম্মার ইচ্ছা একজন শাহজাদার মাফিক একে সাজাবেন, তাই তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আপনার দোকানের হীরা-জহরৎ দিয়ে আচ্ছা করে সাজিয়ে দিন।

বুড়ো ইহুদী জহুরী বল্‌ল—'এ তো কোন সমস্যাই নয়, আমি এক্ষুণি একে একদম শাহজাদা সাজিয়ে দিচ্ছি।' জহুরী এবার আলমারি খুলে একটি হীরা বসানো চমৎকার মালা, তাগা, এক জোড়া মুক্তোবসানো কানের পল, এক জোড়া হীরা-জহরৎ বসানো হাতের বালা, সোনা ও মুক্তোর কোমরের বিছা, কয়েকটি ছোট ছোট হীরা বসানো আংটি আর মুক্তা বসানো কোর্তার বোতাম প্রভৃতি দিয়ে লেড়কাটিকে মনপছন্দ ক'রে সাজিয়ে দিল, বুড়ো ইহুদী জহুরী এবার সুসজ্জিত অবস্থায় লেড়কাটিকে সামনে দাঁড়

করিয়ে দেখতে দেখতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বল্‌ল—'কী বাহার! খুবসুরৎ, বহুৎ আচ্ছা!'

বুড়ির মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। সে বল্‌ল—'আপনি গহনার দাম কষে দিন। আমি মালকিনের কাছ থেকে দিনার নিয়ে এসে মিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

বুড়ো মুচকি হেসে বল্‌ল—'দামের জন্য ভাবতে হবে না। ওই পরিবারের দাম আজ না হোক কাল পাবই। তবু তুমি যখন জানতে চাইছ তখন শুনেই যাও মোটামুটি এক হাজার দিনার।'

—'বহুৎ আচ্ছা, মেহেরবানি করে লেড়কাটিকে একটু ধরুন। আমি এক দৌড়ে দাম নিয়ে আসছি।' বুড়ি গহনাগুলোকে পোটলা বেঁধে, লেড়কাটিকে জহুরীর কোলে বসিয়ে দিয়েই ব্যস্ত-পায়ে দোকান ছেড়ে যাবার উপক্রম করল।'

বুড়ো ইহুদী বল্‌ল—'আমি বুঝতে পারছি, আপনি গহনাগুলো নিয়ে যেতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন, তাই লেড়কাটিকে জামিন স্বরূপ রেখে যেতে চাইছেন। ছিঃ ছিঃ এমন কিছু ভাবলেন কি ক'রে! আপনি একে সঙ্গে নিয়েই যান। আর যদি মনে করেন লেড়কাটিকে রেখে গেলে আপনার যাতায়াতের অসুবিধা হবে তবে আলাদা ব্যাপার। আমি কোলে নিয়ে বসে আদর-সোহাগ করছি।'

বুড়ি ডিলাইলাহ লেড়কাটিকে বুড়ো ইহুদীর দোকানের গদিতে বসিয়ে লম্বা-লম্বা পায়ে রাস্তায় নামল।

বুড়ি ডিলাইলাহ সোজা নিজের মকানে ফিরে গেল। তাকে সকাল সকাল ফিরতে দেখে তার লেড়কি জাইনাব বল্‌ল—'আম্মা, কাকে পথে বসিয়ে এলে, বল তো? চোখ-মুখ দেখে মালুম হচ্ছে, জব্বর দাঁও মেরে এসেছ।'

বুড়ি মুচকি হেসে বল্‌ল—'কামাই কিছু হ'ল বটে, তবে তেমন বড় রকমের কিছু নয়। শাহবানদের ছোট লেড়কাটির গায়ের কিছু হীরা-জহরতের গহনাপত্র, আর তাকে ইহুদী জহুরীর দোকানে জিম্মা রেখে তার কিছু দামী পাথরবসানো গহনা, ব্যস।'

জাইনাব-এর চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে ওঠে। সে বলে আম্মা, তুমি যে এরকম বেপরোয়াভাবে ছিনতাই রাহাজানি চালাচ্ছ, একদিন হয়ত নগরের পথে তোমার বেরনোই দায় হয়ে উঠবে। একটু সমঝে টমঝে কাম কাজ করবে তো।'

—'ধ্যুৎ, চুপ কর তো, আমার গায়ে হাত তুলবে এমন বেটা এখনও দুনিয়ায় পয়দা হয় নি।'

বেগম শাহরাজাদ এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার চলুন, আমরা একটু পিছিয়ে গিয়ে সওদাগর-সমিতির সভাপতির বাড়ি থেকে চক্কর মেরে আসি। সে-দাসীটি লেড়কাটিকে বুড়ি ডিলাইলাহ-র জিম্মায় রেখে প্রাসাদে ঢুকে গেল।

খানাপিনা পুরোদমে চালু হয়ে গেছে। সওদাগর ও তার বিবি ঘুরে ঘুরে মেহমানদের সঙ্গে বাৎচিৎ করছে, কুশলবার্তাদি নিচ্ছে।

দাসীটি ধীর পায়ে সওদাগরের বিবির কানে কানে বল্‌ল—'মালকিন, আপনার বহু পুরনো আয়া উম অল খুইর সদর-দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে। আজ পাকা দেখার খবর পেয়ে লেড়কিকে দোয়া জানাতে ছুটে এসেছে।'

দাসীটির বাৎ শোনামাত্র সওদাগরের বিবি রীতিমত আর্তনাদ করে ওঠে—'লেড়কা? আমার লেড়কা? আমার লেড়কাকে কোথায় রেখে এসেছিস?'

দাসী বল্‌ল—'কেন? সে-বুড়ি আয়ার জিম্মায়, পথে, সদর-দরওয়াজার কাছে। লেড়কা আপনাকে দেখে কাঁদবে, কোলে যেতে চাইবে, আপনার সাজ পোশাক বরবাদ করে দেবে তাই অন্দরে আনিনি, এবার বুড়ির দেওয়া দিনারটি দেখিয়ে বল্‌ল—'আয়াটি এ দিনারটি আমাকে ইনাম দিয়েছে।'

দিনারটির দিকে এক লহমায় তাকিয়েই বুঝে নিল, মেকী, পিতলের। ব্যস, চিল্লিয়ে উঠলেন— 'বে আক্কেল বেতমিস কাঁহিকার! যা, আমার লেড়কা কোথায়, শিগ্‌গির নিয়ে আয়।'

দাসীটি দৌড়ে বাইরে এসে দেখে, ভোঁ-ভাঁ, কোথায় আয়া, কোথায়ই বা লেড়কা? সওদাগর-সমিতির সভাপতি ও তাঁর বিবি বুক চাপড়াতে চাপড়াতে রাস্তায় নেমে এলেন।

সওদাগর-সমিতির সভাপতির নির্দেশে চারদিকে সবাই ছুটোছুটি করে লেড়কার খোঁজ করতে লাগল। ব্যর্থ প্রয়াস। বুড়ি লেড়কাটিকে নিয়ে একদম বে-পাত্তা হয়ে গেছে। কোন হদিসই কেউ করতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত গহনাপত্রের দোকানগুলোতে তাল্লাসী করতে করতে লেড়কার হদিস মিল্‌ল। তার গায়ে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্রও নেই।

ক্রোধোন্মত্ত সওদাগর-সমিতির সভাপতি শাহবান্দার ইহুদী জহুরী আজারিয়াহকে আক্রমণ করে বসলেন। রাগে গস্‌গস্ করতে করতে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালমন্দ করে তার কাছে লেড়কার গায়ের হীরা-জহরতের গহনা-পত্র দাবী করতে লাগল।

শাহবান্দার প্রতাপশালী আদমি। তাঁর হিম্মৎ বহুৎ। তিনি চাইলে ইহুদী জহুরী আজারিয়াহ'কে একদম মুলুক ছাড়া করে দেয়ার হিম্মৎ রাখেন। ফলে আজারিয়াহ নিজের এক হাজার দিনার গায়েব হওয়ার শোক ভুলে আত্মরক্ষার চিন্তায় অধীর হয়ে পড়ল।

ইহুদী জহুরী আজারিয়াহ বার বার বলতে লাগল—'আমি সাচমুচ লেড়কা চুরির ব্যাপার স্যাপার কিছুই জানি না। এক ধূর্ত ধাপ্পাবাজ বুড়ি আয়া কোলে করে নিয়ে এসেছিল আমার দোকানে। আজ আপনার লেড়কির শাদীর পাকা কথা। আপনার বিবির হুকুমে লেড়কাটির জন্য এক হাজার দিনারের গহনাপত্র তাকে পছন্দ

'করাতে নিয়ে গেল। আর বাচ্চাটিকে রেখে গেল আমার জিম্মায়। আমি লেড়কাকে জামানত রাখতে আপত্তি করেছিলাম। জোর করে রেখে আপনার প্রাসাদে যাওয়ার নাম করে হাঁটা জুড়ল।'

—'শয়তান ইহুদী কাঁহিকার! বাজে ধান্দা রাখ। আমার লেড়কার হীরা-জহরৎ কোথায় রেখেছিস, বল? নইলে তোকে ফাটকে আটক করব।'

শাহবান্দার আর আজারিয়াহ-র বিবাদ যখন তুঙ্গে উঠেছে ঠিক তখনই গাধার মালিক ছোকরা ও হজ মহম্মদ সেখানে হাজির হ'ল। তারাও তাদের কিস্‌সা তাদের শোনাল। এবার শাহবান্দার বুঝলেন, ইহুদী আজারিয়াহ-র কোন কসুর নেই। অজ্ঞাত সে-শয়তানী বুড়িই এতগুলো আদমির সর্বনাশ সাধন করে নির্বিবাদে গায়ে বাতাস লাগিয়ে নগরের বুকে টুঁড়ে বেড়াচ্ছে।

শাহবান্দার তর্জন গর্জন করতে থাকেন, বুড়িকে ফাটকে দেবেন, শূলে চড়াবার বন্দোবস্ত করবেন, কোতোয়ালকে দিয়ে তার গর্দান নেবেন।

রাগে, অপমানে আর গহনা গায়েব হবার জ্বালায় তর্জন গর্জন করতে করতে শাহবান্দার লেড়কাকে কোলে নিয়ে প্রাসাদের দিকে হাঁটা জুড়লেন।

শাহবান্দার বিদায় নিলে ইহুদী জহুরী আজারিয়াহ এবার গাধার মালিক ছোকরা ও সওদাগর সিদি মুসিন এবং হজ মহম্মদ'কে লক্ষ্য করে বল্‌ল—'শয়তানী প্রতারক বুড়িকে শাস্তিদানের ব্যাপারে আপনারা কি চিন্তা করছেন?'

তারা সমস্বরে বল্‌ল—'আমরা তো কোতোয়াল খালিদ-এর দরবার থেকে এলাম। বুড়িটির নামে এজাহার দিতেই গিয়েছিলাম। তেমন কোন ফয়দা হবে ব'লে মালুম হ'ল না।'

ইহুদী আজারিয়াহ সবিনয়ে বল্‌ল—'কেন? কোতোয়াল কি বল্‌লেন?'

—'বললেন, দোষী বুড়িটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার হাতে তুলে দিলে তিনি কড়া সাজার বন্দোবস্ত করবেন।'

—'তবে তো আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল। চলুন, আমরা নগরের পথে পথে টুঁড়ে ধূর্ত বুড়িটির তাল্লাশ করি।'

সওদাগর সিদি মুসিন বল্‌ল—'চমৎকার ধান্দা! আমরা কাম কাজ ছেড়ে দিয়ে বুড়িটির তাল্লাসে লেগে যাই, তাই না? আর কোতোয়াল মৌজ ক'রে দাড়ি হাতাবেন আর আমাদের ধরে দেওয়া আসামীর বিচার করবেন! এমন বন্দোবস্ত আর হয় না।'

ইহুদী জহুরী বল্‌ল—'এক বাৎ, আপনাদের মধ্যে কেউ কি এর আগে এ ফেরেফবাজ বুড়িটিকে চিনতেন?'

গাধার মালিক ছোকরাটি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, —'আমি—আমি একে আগে থেকেই চিনতাম।'

তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চারজন চারদিকে বুড়িটির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। আর ঠিক করল, পথে যত জেনানা চোখে পড়বে সবাইকে কড়া নজরে দেখবে। তবে খুবই সতর্কতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে। কেউ বুঝতে পারলে তার যে কি হালৎ করবে তা-তো অনুমানই করা যাচ্ছে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' একচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, তারা চারজন নগরের চারদিকে বুড়ির তাল্লাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গাধার মালিক ছোকরাটিই প্রথম বুড়ি ডিলাইলাহ-র হদিস করতে পারল।

বুড়ি সেদিন অন্য এক বেশভুষা গায়ে চড়িয়ে পথ চলেছে। গাধার মালিক ছোকরাটি তার পথ আগলে চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিল।

বুড়ি বে-গতিক দেখে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌ল—'কি গো, এমন ষাঁড়ের মাফিক চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিয়েছ যে, ব্যাপার কি হে?'

—'ধান্দাবাজী ছাড়! আমার গাধা কোথায়? ভাল চাও তো ফিরিয়ে দাও আমার গাধাটিকে।'

—'গাধা? বহুৎ আচ্ছা, পাবে গাধা। বেটা তোমার গাধাটি ফেরৎ পেলেই কি ব্যাপারটির ফয়সালা হয়ে যাবে?'

—'আমার গাধা আমাকে ফেরৎ দাও। ব্যস, আমার মামলা খতম হয়ে যাবে। তারপর অন্য সবার সামানপত্রের জন্য আমার মাথাব্যথা নেই। আমার গাধা কোথায়, জলদি ফেরৎ দাও।'

—'বেটা, তুমি গরীব। আমীর-ওমরাহ নও। তোমার কিছু মারার ধান্দা আমার নেই। গাধা ফেরৎ দিয়ে দেব। আমীর-বাদশাহদের ধন-সম্পত্তি গায়েব করার ফিকিরই আমি করে থাকি। যাও ওই নাপিতের দোকানের ধারে গাছের সঙ্গে তোমার গাধাটি বাঁধা আছে, নিয়ে যাও। এ নিয়ে অন্য কারো সঙ্গে কোন বাৎচিৎ কোরো না যেন। এখানেই অপেক্ষা কর। আমি গাধাটিকে নিয়ে এখনই ফিরছি। তুমি যেন আবার ফিরে যেয়ো না।

গাধার মালিক ছোকরাটিকে দাঁড় করিয়ে সে নাপিতের দোকানে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—'আমার লেড়কা গাধাটির জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছে। সে এটিকে ভাড়া খাটিয়ে রোজগার পাতি করত। এক সময় দারুন খরার জন্য তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। হেকিম ডেকে বহুৎ ইলাজ করিয়েছি। কোনই ফল হয় নি। এখন দিন দিনই তার পাগলামি বেড়েই চলেছে। কেবল হাত-পা ছোড়ে, আর চিল্লিয়ে বলে আমার গাধা ফেরৎ দাও। গাধা না পেলে আমি খুন করে ফেলব। মারধোরও করতে আসে। শহরের সব চেয়ে বড় হেকিমের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।

নাপিত হজ মাসুদ বল্‌ল—'দাওয়াই কিছু দিয়েছেন?'

—'জব্বর এক দাওয়াই বাৎলে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ওর দু'পাশের শ্বদন্ত দুটো তুলে ফেলতে পারলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।'

—'তারপর?'

—'তারপর সেখানে দু'টো লোহার গজাল পুঁতে দিতে হবে।'

মাসুদ দুটো গজাল চুল্লিতে গরম করতে দিয়ে বুড়িকে বল্‌ল—'এক কাজ কর, তোমার লেড়কাকে এখানে হাজির কর। ঠিক আছে, আমিই ডাকছি।' দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নাপিত লেড়কাটিকে ডাকল—'কই হে, তোমার গাধা নিয়ে যাও।'

লেড়কাটি দোকানে ঢুকতেই নাপিত মাসুদ হঠাৎ তার তলপেটে মোক্ষম এক ঘুষি মেরে তাকে মেঝেতে ফেলে দিল। মাসুদ তার বুকের ওপর গেঁট হয়ে বসে গলা টিপে ধরে। লেড়কাটির জান খতম হয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। এবার একটি সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরে তার শ্বদন্ত দুটো পট্‌ পট্‌ করে উপড়ে ফেল্‌ল। যমদূতের মাফিক নির্মম হাতে টকটকে লাল গজাল দুটো শ্বদন্ত দুটোর জায়গায় দিল গেঁথে। নাপিত এবার তার দুই সহকারীর জিম্মায় ছোকরাটিকে রেখে বুড়িকে ডাকতে গেল।

দরওয়াজা দিয়ে এগিয়ে দেখে বুড়ি নেই। একদম উধাও। চিল্লাচিল্লি করে বুড়িকে ডাকল। না। বুড়ি একদম বে-পাত্তা। নাপিত এবার তার দোকানের দিকে তাকিয়েই আর্তনাদ করে উঠল। তার দোকানের ক্ষুর, কাঁচি, গামলা, বদনা যা কিছু ছিল সব নিয়ে বুড়ি ভেগেছে।

নাপিত এবার গাধার মালিক ছোকরাটির কাছে ফিরে এসে তাকে চেপে ধরল—'কুত্তার বাচ্চা, তোর আম্মা কোথায় বল? তোকে একদম খুন করে ফেলব। বল, তোর আম্মা কোথায়?'

ছোকরাটি একে দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগছে তার ওপর বেদম প্রহার খেয়ে তার জান খতম হয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল।

ছোকরাটিকে নাপিত যখন মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে চলেছে ঠিক তখনই সওদাগর সিদি মুসিন, জহুরী ইহুদী বুড়ো আর হজ মহম্মদ পথে পথে বুড়িটির তাল্লাসী চালাতে চালাতে সেখানে হাজির হ'ল। লেড়কাটির মুখ থেকে তখন গল গল করে খুন ঝরছে। সে সঙ্গে নাপিত দুমদাম করে তাকে পিটে চলেছে।

গাধার মালিক ছোকরাটি কেঁদে কেটে তাদের বলতে লাগল—'শয়তান নাপিতটি আমার জান খতম করে দিচ্ছে! আপনারা আমার জান বাঁচান।

তারা নাপিত হজ মাসুদ-এর ওপর চড়াও হ'ল। হজ মাসুদ তখন তাদের কাছে ঘটনাটির আদ্যোপান্ত বল্‌ল।

সব শুনে তারা বুঝল। নির্ঘাৎ সে বুড়িটির কাজ।

নাপিত হজ মাসুদ সহ সবাই ফিন কসম খেল, যে করেই হোক বুড়িটিকে শায়েস্তা করবেই। নইলে সে এভাবে তামাম বাগদাদ নগর জুড়ে শয়তানী চালিয়ে যাবে।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' বিয়াল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, প্রতারিত আদমিরা হলফ করল, বুড়িকে তারা শায়েস্তা করবেই।

তারা বুড়ি ডিলাইলাহ-র তাল্লাশী চালাতে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বাগদাদ নগর চষে ফেলতে লাগল। বুড়িকে বের করার জন্য যে কসম খেয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

বহুৎ কায়দা কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত বুড়িকে কব্জা করতে পারল। তাদের কোশিস সার্থক হ'ল।

বুড়িকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে প্রতারিত আদমিরা মিছিল করে

বুড়িকে নিয়ে কোতোয়াল আমির খালিদ-এর দরবারে হাজির হ'ল।

কোতোয়াল তখন অন্দর মহলে বিশ্রামরত। এক খোজা প্রহরী কোতোয়াল খালিদ-এর নির্দেশে বুড়িকে নিয়ে অন্দরমহলে তাঁর সামনে হাজির করলেন।

প্রতারিত পাঁচ আদমি কোতোয়ালের বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে খোজা প্রহরী বুড়িটিকে নিয়ে কোতোয়ালের কামরায় যাবার সময় তার বিবির মুখোমুখি হ'ল।

কোতোয়ালের বিবি বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল—'তোমার আবার কিসের মামলা? এত উমর হ'ল তবু মামলার শখ মিটল না?'

বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় জবাব দিল—'মামলা? কই, মামলার ব্যাপার স্যাপার তো নয়। কোতোয়াল সাহাবের সঙ্গে আমার বাৎচিৎ সব মিটে গেছে। আমার স্বামী আদতে বান্দা কেনা বেচার কারবার করে। কোতোয়াল সাহাব খুবসুরৎ এক বান্দা খরিদ করতে চেয়েছেন।'

কোতোয়াল খালিদ-এর বিবি সচকিত হয়ে, ভ্রূ কুঁচকে বললেন—'কি, কি বল্‌লে? বান্দা খরিদ করতে চেয়েছেন?'

—'তবে আর বলছি কি? আমার স্বামী ভিন দেশে বান্দা তাল্লাস করতে যাওয়ার সময় ঘরে পাঁচটি বান্দা রেখে গেছেন, আমাকে বলে গেছেন, আমার ফিরে আসতে দেরী হলে এদের বেচে সংসার চালিয়ো। পাঁচ-পাঁচটিই খুব কাজের, আমি কোতোয়াল সাহাবকে বান্দা পাঁচটির ব্যাপারে বলতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পাঁচটিকে খরিদ করতে চেয়েছেন।'

কোতোয়ালের বিবি বল্‌লেন—'পাঁচ-পাঁচটি বান্দাই খরিদ করতে চেয়েছেন?'

—'তবে আর বলছি কি। বান্দা পাঁচটিকেই আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনার বৈঠকখানায় আছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে উঁকি দিলেই দেখতে পাবেন।'

কোতোয়ালের বিবি উঁকি দিয়ে দেখল—'পাঁচটিই বেশ সভ্যভব্য।'

—'দামও খুব কম। মাত্র বারো শ দিনারে পাঁচ-পাঁচটি বান্দা—একদম সস্তা, পানির দামে বান্দা মিলছে।'

কোতোয়ালের বিবি দেখলেন, বুড়ি একদম সাচ্চা বলেছে। এত কম দামে পাঁচ-পাঁচটি বান্দা—অসম্ভব। তিনি বল্‌লেন—'কোতোয়াল সাহাব তো এখন বিশ্রাম করছেন। সন্ধ্যার আগে কামরা ছেড়ে বেরোবেন না। সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক দেরী। তুমি যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পার তবে তো বহুৎ আচ্ছা। নইলে আমি তোমার প্রাপ্য বারো শ' দিনার দিয়ে বান্দা পাঁচটিকে খরিদ করে নিতে পারি। লেকিন বটুয়া খুঁজে এক হাজার দিনার পেলেন। বুড়িকে বল্‌লেন—'এখন এক হাজার দিনার নিয়ে যাও। পরে এক সময় দু'শ নিয়ে যেয়ো। আপত্তি আছে?'

বুড়ি যেন এরকম প্রস্তাবে একদম হাতের মুঠোয় পুরো বেহেস্তটিকে পেয়ে গেল। আর দেরী নয়। কোতোয়ালের বিবির কাছ থেকে এক হাজার দিনার বুঝে পেয়ে সোজা পথে নামার উদ্যোগ নিল। কিন্তু উপায়? তাদের সামনে দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই মুখ কাচু মাচু করে বল্‌ল—'এক সমস্যা, তাদের সামনে দিয়ে যেতে আমার কলিজা ফেঁটে যাবে। আদতে দীর্ঘদিন আমার মকানে ছিল। মায়া পড়ে গেছে। আপনি আমাকে খিড়কি দরওয়াজা দিয়ে বের করে দিলে—'

—'তাতে কি আছে, চল আমার সঙ্গে।' কোতোয়ালের বিবি বুড়িকে খিড়কি দরওয়াজা দিয়ে পথে বের করে দিয়ে এলেন।

ধূর্ত বুড়ি এক হাজার দিনারের পুঁটুলিটি কামিজের ভেতরে নিয়ে নিজের মকানে ফিরে গেল।

বুড়িকে দরওয়াজা দিয়ে ঢুকতে দেখেই তার লেড়কি জাইনাব ছুটে এসে বল্‌ল—'আম্মা, আজ কাকে মুরগী বানিয়ে এলে? কামাই বা করলে কত?'

—'আজ একদম কিস্তি মাৎ করে এসেছি। জব্বর কাজ। রঙের কারবারী হজ মহম্মদ, ইহুদী জহুরী, নওজোয়ান সওদাগর সিদি মুসিন, গাধার মালিক ছোকরাটি আর নাপিতকে কোতোয়ালের বিবির কাছে এক হাজার দিনারে বেচে দিয়ে এলাম।'

—'বেচে দিয়ে এসেছ? এক হাজার দিনারের বিনিময়ে? তাও আবার একদম কোতোয়ালের বিবির কাছে?'

—'তবে আর বলছি কি, বেটি। আমাকে ধরে কোতোয়ালের দরবারে হাজির করেছিল। ভেবেছিল, কোতোয়ালকে দিয়ে আমাকে কঠিন সাজার বন্দোবস্ত করবে। উল্টে আমি কোতোয়ালের বিবিকে ঘোল খাইয়ে এক হাজার দিনার কামাই করে ভেগে এলাম।'

—'লেকিন কোতোয়াল ঘুম থেকে উঠে তোমার ব্যাপারে বিলকুল শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। তখনই তার যত রাগ গিয়ে পড়বে নিজের বিবি আর ওই পাঁচ-পাঁচটি কুত্তার বাচ্চার ওপর।

জাইনাব বল্‌ল—'আম্মা, ঢের করেছ। এবার রেহাই দাও। নইলে ধরা পড়লে বে-ইজ্জতি তো হবেই উপরন্তু জান খতম হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কোতোয়ালের বিবির সঙ্গে ফেরেফবাজী—গর্দান যাবে তোমার।'

জাইনাব তার আম্মাকে নানা ভাবে নিরস্ত করার কোশিস করতে থাকে।

এদিকে কোতোয়াল দিবা-নিদ্রা সেরে কামরা থেকে বেরিয়ে

এলেন। বিবির মুখে বান্দা খরিদের ব্যাপার শুনে যেন একদম আশমান থেকে জমিনে পড়লেন। চোখ দুটো কপালে তুলে বল্লেন—'বান্দা? কিসের বান্দা? কে বান্দা খরিদ করতে চেয়েছিল?'

এক হাজার দিনার খোয়া যাওয়ার চেয়ে ইজ্জতের ব্যাপারটিই কোতোয়ালের কাছে এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। খোদ কোতোয়ালের বিবির কাছ থেকে এক বুড়ি এক হাজার দিনার ফেরেফবাজী করে নিয়ে গেছে খবরটি চাউর হয়ে গেলে কোতোয়াল মুখ দেখাতে পারবে?

কোতোয়াল উন্মাদের মাফিক ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বৈঠকখানায় এলেন। সেখানে পাঁচটি প্রতারিত বেচারা ছাড়া আর কাউকেই চোখে পড়ল না।

কোতোয়াল খোজা প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করল—'শয়তানী ধূর্ত বুড়িটি কোথায়?'

খোজাটি হাত কচলে জবাব দিল—'জী হুজুর, আমি তো তাকে ওপর তলায় মালকিনের হাতে জিম্মা রেখে এসেছিলাম। ব্যস, আর তো কিছুই জানি না।'

—'তোর মালকিন এক হাজার দিনার দিয়ে যে পাঁচ-পাঁচটি বান্দা কিনেছে, কোথায় তারা?'

খোজাটি সবিস্ময়ে বল্ল—'বান্দা? মালকিন খরিদ করেছেন? কই, আমি তো এসব কিছুই জানি না।'

কোতোয়াল গর্জে উঠলেন—'জানিস না? কেন জানবি না? পাঁচ-পাঁচটি আদমি তোর চোখে ধূলো দিয়ে কর্পূরের মাফিক একদম উড়ে গেল। তাই যদি হয় তবে আর তোকে পাহারায় রেখেছি কেন হতচ্ছাড়া নচ্ছাড় কাঁহিকার।'

কোতোয়াল এবার বসে থাকা পাঁচ প্রতারিত বেচারাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লেন—'তোমাদের সঙ্গে কি কোন বুড়ি ছিল?'

তারা সমস্বরে জবাব দিল—'জী হুজুর।'

—'তবে আর সুলতান-বাদশার মাফিক চেয়ারে বসে পা-নাচাচ্ছ কেন? তোমরাই তবে আমার বিবির খরিদ করা বান্দা? যাও, কাজে লেগে পড়গে।'

বেচারা প্রতারিতরা কেঁদেকেটে বল্ল—'এ কী বাৎ বলছেন হুজুর! আমরা বান্দা হতে যাব কেন। আমরা খলিফার একান্ত অনুগত প্রজা।'

—'বাতেলা রেখে কাজে লেগে পড়। রীতিমত এক হাজার দিনার দিয়ে খরিদ করা হয়েছে। নক্কারবাজি রেখে যা বলছি কর। নইলে বান্দাকে দিয়ে কিভাবে কাজ করাতে হয় সে কায়দা কসরৎ আমার ভালই জানা আছে।'

—'আপনি এসব কি বলছেন, মালুম হচ্ছে না। আমরা এসেছি আপনার কাছে বিচার—'

—'ধানাই পানাই রেখে কাজে লেগে যাও, এখনও বলছি।'

—'আমরা নিয়ম মাফিক খলিফাকে কর দেই, তাঁর আইন কানুন মেনে চলি, আমাদের ওপর এরকম জুলুম চালালে আমরা খলিফার দরবারে আপনার নামে আর্জি জানাতে বাধ্য হ'ব। খলিফার দরবারে চলুন, তিনিই আমাদের বিচার করবেন।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিসসা বন্ধ করলেন।

চারশ' তেতাল্লিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, প্রতারিত পাঁচ বেচারার বাৎ শুনে কোতোয়াল খালিদ রীতিমত তড়পাতে লাগলেন। তোমরা বান্দা না হলে নির্ঘাৎ ফেরেফবাজ। আমার বিবিকে ধোঁকা দিতে এসেছ। আমার বিশ্রামের মওকা বুঝে বুড়ির সঙ্গে জোট বেঁধে আমার বিবির কাছ থেকে এক হাজার দিনার চোট করে নিয়েছ।'

—'এ কী তাজ্জব ব্যাপার শুরু করলেন। আপনার বাৎ আমাদের ইজ্জৎ হানি করছে কোতোয়াল সাহাব।'

—'ধোঁকাবাজ, ফেরেফবাজ শয়তানদের ইজ্জৎ! ধান্দা ছাড়। বেশী বেগড়বাই করলে পরদেশী বান্দা-কারবারীদের কাছে তোমাদের বেচে দেব, বলে রাখছি।'

কোতোয়াল যখন পাঁচ প্রতারিতকে নিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন ঠিক তখনই খলিফার দেহরক্ষী মুস্তাফা সেখানে হাজির হ'ল।

মুস্তাফা দু'দিন আগে সে বুড়ির দ্বারা তার বিবি খাতুন-এর প্রতারিত হওয়ার বিবরণ দিয়ে আর্জি জানিয়ে গিয়েছিল। বুড়িকে ধরতে পেরেছেন কিনা, খোঁজ নিতে এসেছেন।

মুস্তাফা-র বিবি এখন তাকেই দোষারোপ করছে, সে শাদী করে নয়া বিবি ঘরে আনার ডর দেখিয়েছে বলেই তো ঠগবাজ শয়তানী বুড়ির শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিল। তাকে নির্মম ভাবে আঘাত না করলে জরুর বুড়িটির খপ্পরে পড়ত না, কেলেঙ্কারীর ফাঁদে পা দিত না।

খলিফার দেহরক্ষী খালিদ কোতোয়ালকে দেখেই গর্জে উঠল—'তুমি একটি অপদার্থ কোতোয়াল। কোতোয়াল হওয়ার কোন মুরোদই তোমার নেই। তোমার অপদার্থতার জন্যই আজ তামাম বাগদাদ নগর চোর-ডাকাত আর ফেরেফবাজে ছেয়ে গেছে। দিনে দুপুরে খলিফার দেহরক্ষীর বাড়ি ঢুকে তার বিবিকে বের করে নিয়ে যায়—অরাজকতা—!'

তার মুখের বাৎ শেষ হবার আগেই পাঁচ প্রতারিত বেচারা সমস্বরে বলে উঠল—'মুস্তাফা ভাইয়া, আমাদের হালৎ-ও আপনার মাফিকই। ধাপ্পাবাজ সে-বুড়িটির খপ্পরে পড়ে আমরাও নাজেহাল হয়ে কোতোয়াল সাহাবের শরণাপন্ন হয়েছিলাম।'

এবার পাঁচজন নসীব-বিড়ম্বিত প্রতারক তাদের নিজ নিজ নাজেহালের বিবরণ দিল।

মুস্তাফা সবকিছু শুনে মুহূর্তকাল গুম্ হয়ে রইল। এক সময় সে মুখ খুল্‌ল—'হ্যাঁ, আমার বাৎ-ই দেখছি সাচ্চা। কোতোয়ালের অকর্মণ্যতার জন্যই আমরা, এতগুলো আদমিকে নাজেহাল হতে হয়েছে, লোকসানের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।'

কোতোয়াল খালিদ বললেন—'মুস্তাফা, তোমার বিবির কাছে তোমাকে খাটো হতে হচ্ছে, আমার মালুম আছে। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। হতচ্ছাড়ি বুড়িকে আমি পাকড়াও করবই করব।'

—'খুব হয়েছে। আপনার মুরোদ আমার জানা হয়ে গেছে।' মুস্তাফা এবার পাঁচ প্রতারিতের দিকে গিয়ে বল্‌ল—'তোমরা কি ঠগী বুড়িটিকে দেখলে সনাক্ত করতে পারবে?'

গাধার মালিক ছোকরাটি বল্‌ল—'আমরা সবাই পারব। আর আমি তো হাজারটি বুড়ির মাঝখান থেকে তাকে ঠিক বের করে ফেলতে পারব। আমার সঙ্গে দশটি সিপাহী দিলে তাকে পাকড়াও করে আপনার সামনে হাজির করতে পারব।'

গাধার মালিক ছোকরাটি মুস্তাফা-র কাছ থেকে দশটি সিপাহীকে সাহায্যকারী হিসাবে নিয়ে পথে পথে ঢুঁড়ে, তাল্লাশী চালিয়ে বুড়িকে ধরে ফেল্‌ল। তাকে বেঁধে হাজির করল কোতোয়ালের এজলাসে।

কোতোয়াল পাঁচ প্রতারকের জিম্মায় বুড়িকে রেখে দিলেন। সকালে আদালতে হাজির করা হবে। বিচার হবে। শাস্তি দেয়া হবে।

বুড়ি মুখ কাচুমাচু করে বাৎ বলল— 'কী তাজ্জব ব্যাপার! আমার তো কিছুই মালুম হচ্ছে না। জিন্দেগীতে কারো সামানপত্র গায়েব করা তো দূরের ব্যাপার কারো একটি কানাকড়িও গায়েব করিনি। আর আমাকে ধরেই কি নাজেহাল না করা হচ্ছে!'

বুড়ির ন্যাকামিতে কেউ কান দিল না।

পাঁচ প্রতারকের জিম্মায় বুড়িকে রাখা হ'ল। তারা নগরের সীমানায় একটি প্রাচীরের ধারে ইয়া মোটা একটি খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে বুড়িটিকে আচ্ছা করে বেঁধে ফেল্‌ল। তারপর তারা তাকে ঘিরে পাহারায় নিযুক্ত রইল।

রাত্রি গভীর হলে পাঁচ প্রতারক বুড়িকে ঘিরে নিদ দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদে একদম বিভোর হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে বুড়ি দেখল, দু'জন ঘোড়সওয়ার সেখানে হাজির হয়েছে।

তারা বুড়ির কাছাকাছি এসে কি যেন ভেবে ঘোড়া দাঁড় করাল। একজন তার সঙ্গীকে বল্‌ল—'ভাইয়া, বাগদাদ নগরে সবচেয়ে মজার কাজ কি করেছ, বলতে পার?'

—'মজার কাজ?'

—'হ্যাঁ ভাইয়া, কোন্ কিসিমের মজার কাজ করেছ?'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' চুয়াল্লিশতম রজনী

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিসসার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ঘোড়সওয়ারটি তার সঙ্গীর জবাবে বল্‌ল—'খোদাতাল্লা-র মর্জিতে আমার সবচেয়ে মজার খানা গলা পর্যন্ত ঠেসে খেয়েছি।'

—'কোন্ কিসিমের খানা তুমি সবচেয়ে বেশী পছন্দ কর?'

—'খাঁটি মধু মাখিয়ে মাখিয়ে পিঠে খেতে আমি সবচেয়ে পছন্দ করি।'

বাৎচিৎ করতে করতে হঠাৎ ঘাড় ঘোরাতেই এক ঘোড়-সওয়ার বুড়িকে দেখতে পেল। ব্যস্ত-পায়ে তার কাছে গেল।

বুড়ি সিপাহীদের দেখেই কেঁদে কেটে বল্‌ল—'বাছা, আমার জান বাঁচাও। মেহেরবানি ক'রে এ-জল্লাদদের কবল থেকে আমাকে রক্ষা কর।'

ঘোড়সওয়ারদের একজন বল্‌ল—'কে তুমি? তোমার এ-দশা কেন করল? তাজ্জব ব্যাপার, এক জেনানাকে পাষণ্ডরা এমন করে বেঁধে রেখেছে! তোমার কসুর কি ছিল যার জন্য এ-হালৎ করেছে?'

বুড়ি বল্‌ল—'আমার দুঃখের কিস্‌সা বল্‌লে তোমাদেরও চোখের পানি ঝরবে বেটা। আমার এক দুশমন আছে। সে বহুৎ আচ্ছা পিঠা বানাতে পারে। মধু মাখিয়ে খেতে খুব স্বোয়াদ লাগে। তামাম বাগদাদ নগরে তার পিঠের বহুৎ নাম। সে-আদমি একদিন আমাকে বিনা কারণে বেদম মারধোর করল। তাই আমি তার ওপর ঈর্ষায় জর্জরিত হচ্ছি। একদিন আমি গোস্‌সা ক'রে তার পিঠার থালায় থু থু ছিঁটিয়ে দিয়েছিলাম। আমার নামে সে-আদমি কোতোয়ালের কাছে নালিশ করল। ব্যস, তারপরই আমাকে এখানে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে রেখে যায়।

কোতোয়াল আমাকে বল্‌ল—'তোমাকে খালাস দিতে পারি, লেকিন তোমাকে এক থালা পিঠা মধু মাখিয়ে মাখিয়ে খেতে হবে। যতদিন আমি তার আদেশ মাফিক এক থালা পিঠা খেতে না পারব ততদিন আমাকে এখানে বন্দী থাকতে হবে। আদতে আমি পিঠা, মিঠাই খেতেই পারি না। উল্টি আসে। কাল ভোরেই দশ-থালা পিঠা আর মধু নিয়ে হাজির হবে। খাওয়ার জন্য আমার ওপরে জুলুম করবে। সে-দৃশ্যের ব্যাপার ভাবলেই আমার কলিজা শুকিয়ে যায়।'

দস্যুরা বুড়ির সমাচার শুনে বুড়ির জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। তারপর তারা বল্‌ল—'দেখ বুড়ি, আমরা দু'জনই পিঠা-মধু বহুৎ পছন্দ করি। তুমি চাইলে আমরা তোমার জন্য বরাদ্দ পিঠা-মধু খেয়ে সাহায্য করতে পারি।'

—'সে যে এমনিতে হবার নয়। এ-খুঁটিতে বাঁধা না থাকলে পিঠা-মধু দেবে কেন? কারণ, হুকুম আছে, যে আদমি খুঁটিতে বাঁধা তাকে দশ-থালা পিঠা-মধু খাওয়াতে হবে।'

দস্যুদের একজন অন্যজনকে বল্‌ল—'ভাইয়া, আমি তো গলা পর্যন্ত ঠেসে পিঠা-মধু খেয়েই এসেছি, পেট একদম ভর্তি। তুমি বরং থেকে যাও। ভোরে পিঠা-মধু সাধ মিটিয়ে খেয়ে নিও। সে ঘোড়া হাঁকিয়ে বিদায় নিল।

এবার অন্য দস্যুটি বুড়ির বাঁধন খুলে খালাস করে দিল। বুড়ির পোশাক আশাক নিজে পরে নিল। আর নিজের পোশাক দিল বুড়িকে। বুড়ি তাকে খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। কে বলবে বুড়িটিই খুঁটির সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় নেই।

বুড়ি এবার মোওকা বুঝে একলাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়া তাকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চল্‌ল।

ভোর হ'ল। পাঁচ প্রতারিতের নিদ টুটল।

ঘোড়সওয়ারটি বল্‌ল—'কি হে, পিঠা-মধু কোথায়?' গাধার মালিক ছোকরাটি তার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করল। এ যে পুরুষের কণ্ঠস্বর!

সে বল্‌ল—'তুমি কে হে? তুমি এখানে কি ক'রে এলে? বুড়িটি কোথায়?'
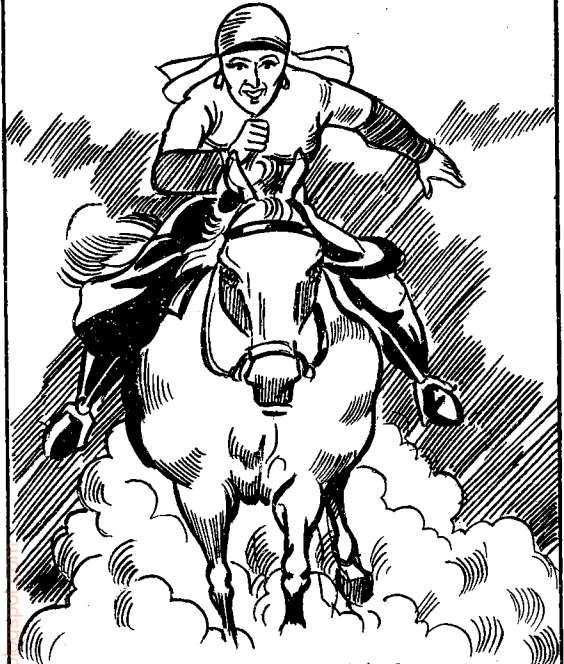
—'ও সব বাৎ ছাড় ইয়ার, জলদি পিঠা নিয়ে এসো।'

—'কিসের পিঠা? পাগলের মাফিক কি সব বকছ! আগে জবাব দাও বুড়িটি গেল কোথায়?'

—'বুড়ি ভেগেছে। আমার ঘোড়া নিয়ে ভেগেছে। সে তো আর পিঠা-মধু খেতে পারবে না। তাকে বেঁধে রেখে তবে আর ফয়দা কি? তাই খালাস ক'রে ভাগিয়ে দিয়েছি।'

প্রতারিত সমঝাল, বুড়ি কায়দা কসরৎ ক'রে ঘোড়সওয়ার ডাকাতটির সঙ্গে প্রতারণা করে, নিজের জায়গায় তাকে বেঁধে ভেগে গেছে।

একটু বেলা হতে কোতোয়াল ঘোড়ায় চেপে সেখানে হাজির হলেন। খুঁটিতে বাঁধা ডাকাতটি কোতোয়ালকে দেখে চিল্লিয়ে ওঠে—'খালি হাতে এলে কেন? আমার পিঠা-মধু, দশ-থালা পিঠা-মধু কোথায়?'

কোতোয়াল তো একদম আশমান থেকে পড়লেন। চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লে—'এ কী তাজ্জব ব্যাপার! বুড়ি কোথায়? এ যে দেখছি এক খোদার ষাঁড়। বুড়িটি গেল কোথায়?'

পাঁচ প্রতারিত আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'জী হুজুর, একেই তো বলে নসীব। নইলে দুপুর রাত্রে হতচ্ছাড়াটি কেন বুড়িকে খালাস করে দিয়ে নিজে খুঁটিতে বাঁধা পড়বে? আপনার দোষেই

বুড়ি ভাগল।'

কোতোয়াল সবিস্ময়ে বল্‌ল—'এ কী তাজ্জব বাৎ! তোমরা বুড়িকে পাহারা না দিয়ে পাঁচ-পাঁচ জনই নাক ডাকিয়ে নিদ দিলে। বুড়ি গেল ভেগে। এদিকে কসুর হ'ল আমার, তাই না?'

—'কসুর আপনার নয়, বলতে চান? আমরা জনা দশেক সিপাহী চেয়েছিলাম, দিলেন না। তবে কসুর আপনার হ'ল না?'

—'তোমরা রয়েছিলে কি করতে?'

—'আমরা কি আপনার নোকরি করি, নাকি কেনা গোলাম যে রাত্রি জেগে বুড়িকে পাহারা দেব। আপনার বিবিরও তো এক হাজার দিনার বুড়ি হাতিয়েছে। আপনার জ্বালা নেই?'

কোতোয়াল খালিদ এবার দস্যুটির কাছে তার বাঁধা পড়ার কাহিনী জানতে চাইলেন।

দস্যুটি বল্‌ল—'হুজুর, বুড়ি আমাকে বল্‌ল, এ-খুঁটিতে বাঁধা থাকলে ভোর হতে না হতেই দশ-থালা পিঠা-মধু মিলবে। লেকিন আপনি এলেন খালি হাতে। এতবেলা হয়ে গেল, কেউ পিঠা-মধু নিয়ে এল না। কারবার তো কিছু মালুম হচ্ছে না। জলদি আমার পিঠা-মধুর বন্দোবস্ত করুন।'

দস্যুটির বাৎ শুনে কাজী খালিদসহ পাঁচ প্রতারিত এত দুঃখের মধ্যেও হো হো করে হেসে উঠল।

দস্যুটি গোস্‌সায় গস্‌গস্ করতে করতে বল্‌ল—'আচ্ছা ধান্দায় পড়া গেল তো! পিঠা-মধু আনার কোশিস না করে দাঁত বের করে হাসছে! দেখুন, আপনারা কে আমি জানি না বটে। লেকিন বুড়িটির সঙ্গে আপনাদের সাঁট আছে, সাচ্চা বাৎ। ফেরেফবাজি করলে আমি নগরে গিয়ে কোতোয়ালের কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে আর্জি জানাব, ইয়াদ রাখবেন।'

দস্যুটি এবার বুঝতে পারল, পিঠা-মধুর ব্যাপার স্যাপার বিলকুল ঝুটা। বুড়িটি তাকে ধোঁকা দিয়ে সটকে পড়েছে।

এদিকে কোতোয়াল দেখল, মামলা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হতে চলেছে ধোঁকাবাজ বুড়িটি দুঃসাহসের সঙ্গে একের পর এক আদমিকে মুরগী বানিয়ে নির্বিবাদে সটকে পড়েছে।

কোতোয়ালের কোন কায়দা কসরৎ-ই বুড়ির কাছে পাত্তা পাচ্ছে না দেখে অনন্যোপায় হয়ে কোতোয়াল প্রতারিতদের নিয়ে খলিফার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলেন।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' পঁয়তাল্লিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ প্রায় মাঝ-রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোতোয়াল প্রতারিতদের নিয়ে খলিফাব দরবারে উপস্থিত হলেন। খলিফাকে যথোচিত ভঙ্গীতে কুর্ণিশ করে অবনত শিরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খলিফা প্রতারিতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। খলিফার প্রশ্নের উত্তরে গাধার মালিক ছোকরাটি প্রথমে তার গাধা খোয়া যাওয়ার কিস্‌সা শোনাল। তারপর এক এক করে সবাই নিজ নিজ দুর্দশার ব্যাপার খলিফার দরবারে পেশ করল। সব শেষে কোতোয়াল তার বিবির এক হাজার দিনার খোয়াবার কিস্‌সা শোনাল।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ বুড়িটির ব্যাপার স্যাপারে একদম তাজ্জব বনে গেলেন। তার মুখ দিয়ে যেন রা সরছে না। দরবারে অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। সবার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

এক সময় খলিফাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন—'এতো দেখছি, তাজ্জব ব্যাপার। এক জেনানা এতগুলো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ আদমিকে বিলকুল ভেড়া বানিয়ে ছাড়ল!'

খলিফা তাঁর সুলতানিয়তে এরকম তাজ্জব কাণ্ড ঘটার জন্য যারপরনাই মর্মাহত হলেন। তিনি মেনে নিলেন, তার শাসন ব্যবস্থায় গলতি থাকার জন্যই বুড়ির পক্ষে এমন দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল। প্রতারিতদের যার যা খোয়া গেছে রাজকোষ থেকে অর্থের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন আর ডাকাতটিকে দশ থালা পিঠা-মধু খাইয়ে তৃপ্ত করবেন, এও সাফ সাফ জানালেন।

লেকিন খলিফা বল্‌লেন—'সবার আগে আমার হুকুম, যে-ধূর্ত বুড়িটিকে আমার সামনে দেখতে চাই। যেখানে, যতদূরে, পাতালের ভেতরে লুকিয়ে থাকলেও তাকে আমার সামনে হাজির করতে হবে।'

খলিফা এবার তার দেহরক্ষী মুস্তাফা এবং কোতোয়াল খালিদকে লক্ষ্য করে বললেন—'ধূর্ত বুড়িটির তাল্লাস চালাও। খবরদার শুধুহাতে যেন ফিরে এসো না। যাও, আমার হুকুম তামিল কর।'

খলিফার হুকুম শুনে কোতোয়াল খালিদ-এর মাথায় যেন আশমান ভেঙ্গে পড়ার জোগাড় হ'ল। খলিফার হুকুমের অর্থ তো তাঁর জানাই আছে। তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি করে আমাকে ছাড়ান দিন। বুড়ি যে কখন, কোন্ রূপ ধরে আক্রমণ চালায় তার হদিস পাওয়া আমার হিম্মতে কুলোবে না। আপনি বরং অন্য কাউকে—'

খলিফা সরবে হেসে বললেন—'তবে কোতোয়ালের পদটিও অন্য কাউকেই দিয়ে দেয়া যাক, তোমার কি মত?'

—'জাঁহাপনা, যদি তা-ই হয় তবে আপনার সিপাহী আহমদ-এর ওপরই এ-পদের দায়িত্ব দিন। বুড়ি তার চোখে ধূলো দিতে

পারবে না। এতেই তার হিম্মৎ বুঝতে পারা যাবে।'

খলিফা উল্লসিত হয়ে আহমদ-এর ওপর ধূর্ত বুড়িটিকে পাকড়াও করার দায়িত্ব দিলেন।

আহমদ খলিফার হুকুম মাথায় নিয়ে চল্লিশজন অশ্বারোহী সিপাহী নিয়ে বাগদাদের পথে পথে বুড়ির তাল্লাশ চালাতে লাগল। আহমদ এক সময় নিজেই চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল। সে ছিল পাণ্ডা।

বাগদাদের পথে পথে বুড়ির তাল্লাশ করতে গিয়ে কয়েক চক্কর মারার পর আহমদ-এর প্রধান সাকরেদটি বল্ল—'হুজুর, বুড়িটি মহা ধড়িবাজ, আদমির সঙ্গে দিনের পর দিন প্রতারণা করে তার বুদ্ধি-কায়দা বিলকুল পাকা হয়ে গেছে। এক কাজ করুন, আপনি বরং বুড়িকে পাকড়াও করার দায়িত্ব হাসান-এর ওপর দিন। তিনি এর একটি হিল্লা করতে পারবেন, আমার বিশ্বাস।'

আহমদ সাকরেদটির বাৎ শুনে রীতিমত খেঁকিয়ে ওঠে—'ধ্যুৎ, তুমি একটি আস্ত আহাম্মক। নাম-যশ কেনার এতবড় একটি সুযোগ আমি স্বেচ্ছায় হতচ্ছাড়া হাসান'কে ছেড়ে দেব!'

আহমদ কখন যে হাসান-এর বাড়ির সামনের রাস্তায় এসে পড়েছে তার মালুমই ছিল না।

আহমদ হাসান বাড়ির দরওয়াজার কাছাকাছি ঘোড়া দাঁড় করিয়ে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে তার সাকরেদকে বলতে লাগল—'তোমার কি দিমাক খারাপ হয়ে গেছে! বুড়িটি যতই ধূর্ত হোক না কেন তাকে পাকড়াও করা এমন কি কঠিন সমস্যা! আর আমি যদি
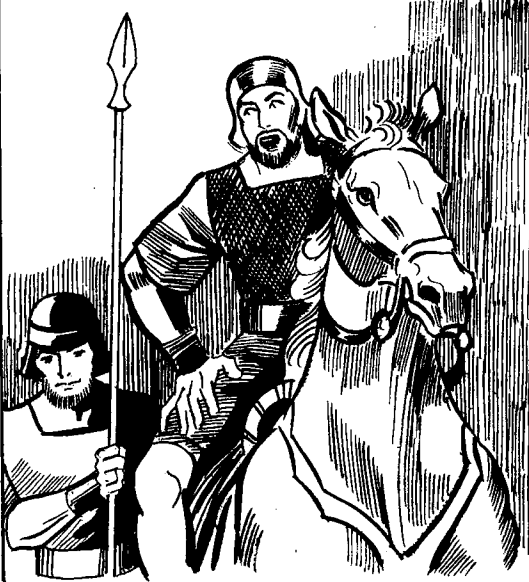
না-ই পারি তবে তার দায়িত্ব হাসান'কে দিয়ে নিজে আঙুল চুষব নাকি! বুড়িকে খলিফার সামনে হাজির করতে পারলে আমার ওপর খলিফার আস্থা একদম তুঙ্গে উঠে যাবে, ভেবেছ। আর ইজ্জতও কম বাড়বে না। আর তুমি বলছ কি না হাসান'কে স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দেব, তোমার দিমাকে কিচ্ছু নেই দেখছি!'

হাসান তার মকানের জানালায় দাঁড়িয়ে আহমদ-এর বিলকুল বাৎ শুনল, সে দাঁতে দাঁত চেপে বল্ল—'বহুৎ আচ্ছা! দেখা যাবে কার হিম্মৎ বেশী। আমার নাম হাসান। তোমার হিম্মৎ আমি দেখে ছাড়ব।'

আহমদ তার সিপাহীদের বল্ল—'তোমরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়। মকানে মকানে জোর তল্লাশী চালাও। একদম চিরুণী তাল্লাশি চালাবে। সবাই গিয়ে মুস্তাফা-র মকানের সামনে আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করবে। এদিকে মকানে মকানে ঢুকে তাল্লাশী চালাবার খবরটি বাতাসের কাঁধে ভর করে তামাম বাগদাদ নগরে ছড়িয়ে পড়ল। খবরটি ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহ এবং তার লেড়কি জাইনাব-এর কানে যেতেও দেরী হ'ল না।

ধূর্ত বুড়ি আহমদ-এর বুদ্ধি ও কায়দা-কসরৎ-এর দৌড় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছে। তাকে বাগে পায়, ও আহমদ-এর কম্ম নয়। তবে হাসান খুবই পারদর্শী। তার উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতার ওপর বুড়ির ভয়-ডর যথেষ্ট। তাই বুড়ি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরেই রয়ে গেল। বুড়ি তার লেড়কি জাইনাব'কে বল্ল—'বেটি, আজ আমার তবিয়ৎ আচ্ছা নেই। আজ আর হিম্মৎ দেখাতে পথে নামব না। আজকের দিনটি তোর ওপর ছেড়ে দিলাম। যা, এক চক্কর মেরে আয়। তোর কায়দা-কসরৎ-ও যে আমার চেয়ে কোন অংশে কমতি নয় তা আহমদ আর তার উল্লু চল্লিশটি সিপাহীকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়ে আয় তো।'

জাইনাব মুচকি হেসে বল্ল—'আম্মা, তোমার দোয়া থাকলে আমাকে রুখবে কার সাধ্য? আমি এক তুড়ি দিয়ে বাজী মাৎ করে তোমার কোলে ফিরে আসব।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

চার শ' ছেচল্লিশতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, ধূর্ত বুড়ির লেড়কি জাইনাব অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগল। জাইনাব খুবসুরৎ লেড়কি। তাকে এক লহমায় দেখলেই যে কোন নওজোয়ানের দিলে কামনার সঞ্চার হতে বাধ্য। সে পূর্ণ যৌবনা। বক্ষ সমুন্নত। নিতম্ব সুপ্রশস্ত। আর কোমর? হাতের মুঠোয় ধরা যায়। আর ডাগর ডাগর চোখ দুটোর দিকে তাকালে যে কোন নওজোয়ানের

কলিজার নাচানাচি শুরু হয়ে যায়।

জাইনাব তার আম্মাকে বল্ল—'আমি আমার কুমারীত্বের নামে কসম খেয়ে বলছি, চল্লিশ সিপাহীকে আমি আজ নাস্তানাবুদ করবোই করবো। জাইনাব আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামল। মুস্তাফা-র মকানের গায়ে হজ করিম-এর সরাবের দোকানে হাজির হ'ল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের বাণ ছুঁড়ল।

ব্যস করিম সঙ্গে সঙ্গে একদম কাৎ। জাইনাব আচমকা করিম-এর দিকে পাঁচটি দিনার এগিয়ে ধরে বল্ল—'আমার একটি ঘরের খুব দরকার। মাত্র একটি দিনের জন্য আমাকে একটি ঘর ভাড়া দিতেই হবে। আমার কিছু ইয়ার-দোস্ত আসবে একটু-আধটু মজা করতে।'

করিম এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। ঘরের পাকা বন্দোবস্ত করে জাইনাব ফিন নিজের মকানে ফিরে এলো। কারণ, সে-গাধা ও ঘোড়াটি তাদের মকানে বাঁধা রয়েছে। গালিচা ও বিছানাপত্র গাট্টি বেঁধে তাদের পিঠে চাপিয়ে করিম-এর সরাবখানায় ফিরে এল।

জাইনাব এবার বহুৎ কায়দা কসরৎ করে সরাবখানার কামরাটিকে সাজিয়ে ফেলে। হঠাৎ ক'রে দেখলে মালুম হবে এটি নির্ঘাৎ কোন আমীর-বাদশাহের কামরা।

জাইনাব সবে কামরাটি সাজানোর কাজ মিটিয়েছে ঠিক তখনই আহমদ-এর প্রধান সহকারী আলীর নেতৃত্বে নয়জন অশ্বারোহী সিপাহী সেখানে হাজির হ'ল।

আলী জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কে? এখানে কি করছ, বল তো?' জাইনাব তার দিকে ফিরে আচমকা চোখের বাণ ছুঁড়ে দিল। ব্যস, খেল্ শুরু। তার কলিজাটি এক লহমায় যেন দরকচা মেরে গেল।

জাইনাব জিজ্ঞাসা করল—'আপনিই কি সেনাপতি আহমদ?'

—'ইয়া আল্লা! আমি সেনাপতি আহমদ হতে যাব কেন? আমি তাঁরই অধীনস্থ কর্মচারী। আলী আমার নাম। আহমদ'কে তোমার কোন্ দরকার? যদি কিছু বলার থাকে আমাকেও বলতে পার। তিনি যা পারবেন তা হয়ত আমিও পেরে যেতে পারি।'

জাইনাব ফিন চোখের বাণ মেরে ফিক্ ক'রে হেসে বল্ল—'পারবেন, জরুর পারবেন। ইস্, আপনাকে খাড়া করিয়ে রেখে চলুন, কামরার ভেতরে চলুন।'

জাইনাব এবার এক সিপাহীকে দিয়ে বিরাট একটি সরাবের জালা আনাল। তাতে আগে ভাগেই আফিং মিশিয়ে রেখেছিল।

সরাব পাওয়ামাত্র সিপাহীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গলা পর্যন্ত গিল্ল। ব্যস, সরাব এবং আফিং একযোগে কাজ শুরু ক'রে দিল। দেখতে দেখতে তারা নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। জাইনাব এবার এক এক ক'রে সব ক'টিকে পায়ে ধরে টানতে টানতে সরাবখানার পিছনে জঙ্গলে রেখে এল।

কাজ সেরে জাইনাব ফিন কামরাটিতে গোছগাছ করে ফেল্ল। এবার সে তাদের সর্দার আহমদ-এর জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রইল। সে নিঃসন্দেহ, যখনই হোক আসতে তাকে হবেই।

জাইনাব-এর ধারণা অভ্রান্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়া হাঁকিয়ে আহমদ সরাবখানায় দরওয়াজায় হাজির হ'ল। সেখানে ঢোকার মুখেই জাইনাব'কে দেখেই থমকে গেল। হাড় গিলা পাখির মাফিক লোলুপ দৃষ্টিতে তার সুরৎ নিরীক্ষণ করতে লাগল।

জাইনাব সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। আচমকা চোখের বাণ ছুঁড়ে দিল আহমদ-এর দিকে। অব্যর্থ তার বাণ। এতে জাঁদরেল সেনাপতি আহমদ বিলকুল কুপোকাৎ হয়ে গেল।

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে জাইনাব বল্ল—আপনি যে আসবেন আমি আগেই জানতাম। তাই তো নিজে বাহারী সাজ গায়ে চাপিয়েছি। কামরাটিকেও সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি।'

আহমদ তার বাৎ শুনে একদম তাজ্জব বনে গেল। 'আমি যে আসব, জানতে? আমি নিজেই তো জানতাম না, লেকিন তুমি—'

—'কেন, আপনার সহকারী আলী সাহাব একটু আগেই তো বলে গেছেন, আপনি এখানে বিশ্রাম করবেন।'

'বিশ্রাম' শব্দটি কানে যেতেই আহমদ-এর কলিজাটি নতুন ক'রে দাপাদাপি জুড়ে দেয়। লালসা মাখানো নজরে জাইনাব-এর যৌবনের জোয়ারলাগা শরীরটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার সমুন্নত স্তনদ্বয় থেকে যেন তার চোখ ফেরানোই দায় হয়ে পড়েছে. তার ওপর নিতম্বের নাচানাচি তো রইলই।

জাইনাব বল্ল—'হুজুর, আলী সাহাব যাবার সময় আমাকে বার বার বলে গেছেন ডিলাইলাহ নামে বুড়িটির জন্য আপনি যেন একদম চিন্তা না করেন। তার হদিস মোটামুটি পেয়েই গেছেন। যে করেই হোক তাকে আপনার সামনে হাজির করবেনই।'

জাইনাব আচমকা আহমদ-এর একটি হাত ধরে ছোট্ট করে একটি টিপস্ দিয়ে বল্ল—'কী শরমের ব্যাপার বলুন তো! আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে—চলুন, ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করবেন।'

জাইনাব-এর হাতের ছোঁয়া পাওয়ামাত্র জাদরেল সেনাপতি আহমদ-এর দিমাক বিলকুল গড়বড় হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। শরীরের সব ক'টি স্নায়ু যেন এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। খুনে লেগে গেল মাতন। ব্যস, কম্ম ফতে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মাফিক জাইনাব-এর পিছন পিছন কামরার ভেতরে ঢুকে গেল।'

জাইনাব আহমদ'কে বসতে দিয়ে আফিং মিশ্রিত সরাব এগিয়ে দিল। আহমদ ঢকঢক্ ক'রে গলা পর্যন্ত সরাব গিলে ফেল্ল। ব্যস, এক লহমার মধ্যেই সরাবের কাজ শুরু হয়ে গেল। চোখ বন্ধ হয়ে

আসতে লাগল।

আহমদ টলতে টলতে জাইনাব-এর দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ধরার কোশিস করল।

জাইনাব সতর্কতার সঙ্গে সামান্য সরে গেল। আহমদ গিয়ে পড়ল দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে। বিকট আর্তনাদ ক'রে সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

কয়েক লহমার মধ্যেই আহমদ বেচারা বিলকুল বেহুঁস হয়ে এলিয়ে পড়ল।

জাইনাব-এর মুখে শয়তানীর হাসি ফুটে উঠল। সে এবার ব্যস্ত হাতে আহমদ-এর গা থেকে হীরা-জহরতের বোতাম, তাগা, অঙ্গুঠি ও গলার মুক্তার হার প্রভৃতি খুলে নিল। এমন কি একটিমাত্র খাটো জাঙ্গিয়া রেখে তার বিলকুল পোশাকও খুলে নিল। জাইনাব এবার তার পায়ে ধরে টানতে টানতে দোকানের পিছনে তার সংজ্ঞাহীন সহকর্মীদের ওপর ফেলে দিয়ে এল।

ভোর হবার আগেই জাইনাব নিজের মকান থেকে নিয়ে আসা সামানপত্র গাধা আর ঘোড়াটির পিঠে চাপিয়ে আম্মার কাছে ফিরে গেল।

লেড়কীর মুখে তার এক রাত্রির কাণ্ডকারখানার বাৎ শুনে বুড়ি ডিলাইলাহ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আবেগের সঙ্গে বল্ল—'বহুৎ আচ্ছা! আমার বেটির মাফিক কাজই করেছিস বটে।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' সাতচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, জাইনাব তো কাজ হাসিল করে নিজের মকানে ফিরে গেল। এদিকে আহমদ ও তার চেলাচামুণ্ডারা বেহুঁস হয়ে দু'দিন-দু'রাত্রি সরাবের দোকানের পিছনে ঝোপের মধ্যে পড়ে রইল।

তৃতীয় দিন সকাল থেকে তারা এক এক করে চোখ খুলতে লাগল। চারদিকে ঝোপঝাড় দেখে তারা মালুমই করতে পারল না কোথায় পড়ে রয়েছে। কেন, কিভাবেই বা এখানে এল। আর তাদের পোশাক আশাক খুলে কে-ই বা প্রায় উলঙ্গ করে এখানে ফেলে রেখে গেছে।

সে-মুহূর্তে তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা হয়ে দাঁড়াল প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় কি ক'রে লোকালয়ে বেরোবে?

কোন ফন্দিফিকির করতে না পেরে আহমদ সে-অবস্থায় সদলবলে জঙ্গল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পথে নামল।

একেই বলে নসীবের ফের। পথে পা দিতে না দিতেই তারা এখানে একদম হাসানের মুখোমুখি হয়ে গেল।

হাসান সুচতুর ও বিচক্ষণ আদমি। এক লহমাতেই সে ব্যাপারটি সম্বন্ধে মোটামুটি আঁচ করে নিল। হাসান চোখে-মুখে কৃত্রিম বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ব'লে উঠল—'এ কী তাজ্জব ব্যাপার আহমদ সাহাব! আপনাদের এরকম হালৎ কে করল? আপনার নসীবে এ-ও ছিল? এরকম দৃশ্য দেখব খোয়াবের মধ্যেও আমি কিন্তু কোনদিন ভাবিনি।'

আহমদ শরম ভুলে গিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্ল—'হাসান ভাইয়া, সামান্য একটি লেড়কি যে এমন ফেরেফবাজী করতে পারে তা আমার সহকর্মীরা তো কোন্ ছার আমিও ভাবতে পারি নি। এতগুলো আদমিকে লেড়কিটি একদম বেকুব, মুরগী বানিয়ে ছাড়ল!'

—কে সে-লেড়কি আমি ধরতে পেরেছি আহমদ ভায়া।

—'কে? কে সে, চেন?'

—'চিনি। আলবৎ চিনি, তাকে চিনি। এমনকি তার বুড়ি আম্মাটিকেও চিনি। তাদের তোমার সামনে হাজিরও করতে পারি।'

—'তাদের একদম হাজিরও করতে পার?'

—'জরুর পারি। আলবৎ পারি। তবে তোমাকে একটি শর্ত মানতে হবে। শর্তটি হচ্ছে, খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে স্বীকার করতে হবে তোমার মুরোদে কুলায় নি। আর বলবে,

জাঁহাপনা, এ-গুরুদায়িত্বটি হাসান'কে দিন।'

আহম্মদ ইঁদুরের মাফিক খাঁচাকলে আটক হয়ে গেছে। সে ঘাড় কাৎ ক'রে বল্‌ল—'বলব, জরুর বলব।'

হাসান এবার আহমদ'কে কোর্তা-পাৎলুন পরিয়ে খলিফার সামনে হাজির করল।

আহমদ খলিফাকে কুর্নিশ করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার কসুর নেবেন না। বুড়িকে টিট করা আমার কম্ম নয়, মেহেরবানি করে হাসান-এর ওপর ধূর্ত বুড়িটিকে পাকড়াও করার দায়িত্ব দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে কাজটি হাসিল করতে পারবেই। কেবলমাত্র শয়তানী বুড়িকেই নয়, তামাম বাগদাদ নগরে যত ফেরেফবাজ আছে সবাইকে ঠাণ্ডা করার হিম্মৎ তার আছে।'

খলিফা হাসান'কে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন—'পারবে ধূর্ত বুড়িটিকে টিট করতে?'

হাসান ঘাড় কাৎ ক'রে খলিফার প্রশ্নের জবাব দিল। —'বহুৎ আচ্ছা! এক বাৎ, বুড়িটি কি কেবলমাত্র আমার নজর কাড়ার জন্যই এরকম সব তাজ্জব কাণ্ড করে তামাম বাগদাদে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে?'

—'জাঁহাপনা, আপনি বিচক্ষণ আদমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। আপনার নজর কাড়াই ধূর্ত বুড়িটির একমাত্র লক্ষ্য।'

—'হাসান, তোমার বাৎ যদি সাচ্চা হয়, আর যদি অন্য কোন ধান্দা না থাকে, প্রবঞ্চনা করে যার কাছ থেকে যা কিছু সে হাতিয়েছে বিলকুল ফেরৎ দিয়ে দিলে বুড়ির কসুর আমি মাফ করে দেব। আল্লাহ্-র নামে এ-কসম খাচ্ছি হাসান।'

খলিফা এবার একটি রুমাল হাসান-এর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌ল—'আমার জবান যে সাচ্চা তার প্রমাণস্বরূপ আমি এটি তোমাকে দিলাম।'

হাসান খলিফাকে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিল। সে এবার সোজা সে-ধূর্ত বুড়ির মকানে হাজির হ'ল।

হাসান জাইনাব'কে বল্‌ল—'তোমার আম্মাকে গিয়ে বল, সে আজ পর্যন্ত যার কাছ থেকে, যা কিছু হাতিয়েছে তা যদি স্বেচ্ছায় ফেরৎ দিয়ে দেয় তবে খলিফা তার বিলকুল কসুর মাফ করে দেবেন। অপূর্ব সুযোগ। এমন সুযোগ জিন্দেগীতে আর মিলবে না। তা যদি না কর তবে আমি আইন অনুযায়ী তোমাকে ফাটকে নিয়ে না ঢুকিয়ে পারব না। এখন তুমি বল, কোন্ পথ ধরবে?'

বুড়ি নীরবে কামরার মধ্যে ঢুকে গেল। এবার সে যা কিছু সামানপত্র হাতিয়েছে বিলকুল হাসান-এর সামনে হাজির করল।

হাসান এক লহমায় সামানপত্র দেখে নিয়ে বল্‌ল—'লেকিন আহমদ আর তার সৈন্যদের সাজ পোশাক ও আহমদ-এর হীরা-জহরৎ?'

—'হুজুর, সেসবের হদিস তো আমার জানা নেই। তাদের কিছুই আমি গায়েব করি নি।'

—'হ্যাঁ, এবার মালুম হচ্ছে, তোমার বেটি জাইনাব হয়ত আহমদ ও তার সিপাহীদের সামানপত্র গায়েব করেছে। আচ্ছা, ওসব নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই।'

হাসান এবার খলিফার দেয়া রুমালটি বুড়ি ডিলাইলাহ্-র দিকে বাড়িয়ে দিল। সেটি গলায় বেঁধে সে হাসান-এর সঙ্গে খলিফার দরবারের উদ্দেশে যাত্রা করল।

হাসান খলিফার দরবারে হাজির হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলল—'জাঁহাপনা, আপনার বাঞ্ছিতা বুড়ি আপনার সামনে হাজির।'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' আটচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, হাসান সে-ধূর্ত ফেরেফবাজ বুড়িকে খলিফার সামনে হাজির ক'রে তাঁকে তার পরিচয় দিল। খলিফা রীতিমত রাগত স্বরেই ব'লে উঠলেন—'তুমিই তবে সে-ফেরেফবাজ বুড়ি? তোমার বুকের পাটা তো কম চওড়া নয়। আমার মুলুকে বাস করে ফেরেফবাজী চালাচ্ছ। তোমার জান নিয়ে ছাড়ব আমি।'

বুড়ি হাসান-এর দিকে ফিরে মুখ কাচুমাচু করে ব'লে উঠল—'একী তাজ্জব ব্যাপার হাসান সাহাব। আপনি তো আমাকে এ-রুমালটি দিয়ে বলেছিলেন, জাঁহাপনা এটি দিয়ে কসম খেয়ে অভয় দিয়েছেন।'

হাসান খলিফাকে তাঁর কসমের ব্যাপারে ইয়াদ করিয়ে দেয়। খলিফা ডিলাইলাহ্-র নাম শোনার পর কসমের ব্যাপারে তার ইয়াদে আসে। তিনি তাকে মাফ করে দিলেন।

খলিফা বল্‌লেন—'আমি তোমাকে মাফ করে দেব কসম যখন খেয়েছি মাফ করে দিলাম। লেকিন সাচ্চাবাৎ বলবে। তুমি কতদিন ধরে তামাম বাগদাদ নগরে এরকম আতঙ্ক ছড়িয়ে চলেছ? কেনই বা তুমি এপথ বেছে নিয়েছিলে?'

ডিলাইলাহ খলিফার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এপথে নামিনি। আমীর বাদশাহ বনার লোভ আমার কোনদিনই ছিল না। তবে মান ইজ্জতের লালচ আমার বহুদিনের। আমার স্বামী একদিন আপনার দরবারে উঁচু পদে বহাল ছিলেন। ইজ্জত খ্যাতিও তার যথেষ্টই ছিল। তিনি বেহেস্তে যাবার পর আপনি আর আমাদের দিকে ফিরে তাকানোরও জরুরৎ মনে করলেন না। আমি শুধুমাত্র

একটু বাদশাহী স্বীকৃতি প্রত্যাশী। আপনার দরবারে আমাকে একটু স্থান দিলেই জিন্দেগী সার্থক জ্ঞান করব।'

এবার ডাকাত থেকে শুরু করে গাধার মালিক ছোকরাটি পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিজ নিজ দুর্ভোগ ও খোয়া-যাওয়া সম্পত্তির ব্যাপার খলিফার গোচরে আনল।

খলিফা অভিযোক্তাদের বক্তব্য শোনার পর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যার যা কিছু খোয়া গেছে প্রত্যেককে সে ক্ষতিপূরণ দিয়ে খুশী করলেন। সে সঙ্গে প্রত্যেককে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী ইনামও দিলেন।

অভিযোক্তারা খলিফাকে সুক্রিয়া জানিয়ে নিজ নিজ মকানে ফিরে গেল।

খলিফা এবার ডিলাইলাহ'কে লক্ষ্য করে বল্লেন—'এবার তুমি বল। আমার কাছ থেকে কি পেলে তুমিও খুশী হয়ে নিজের মকানে ফিরে যাবে?'

ডিলাইলাহ নতজানু হয়ে বল্ল—'জাঁহাপনা, আপনি যদি আমাকে খুশীই করতে চান তবে মেহেরবানি করে আমাকে আমার স্বামীর পদে বহাল করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার স্বামী যেমন তাঁর কৃতজ্ঞতা ও সেবার মাধ্যমে খুশী করেছিলেন তেমনি আমার সেবাও আপনার দিলে খুশী উৎপাদন করতে পারব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তবে আজ, এ-মুহূর্ত থেকেই তোমাকে আমি তোমার বাঞ্ছিত পদে বহাল করলাম।'

—'জাঁহাপনা, আমার আর একটি আর্জি রয়েছে।'

—'আর্জি? বল, কি সে আর্জি?'

—'আমার লেড়কি জাইনাব'কে আমার সহকারীরূপে নিতে চাই। মেহেরবানি ক'রে আপনি আমার এ-অনুরোধটিও রক্ষা করুন।'

—'বহুৎ আচ্ছা! তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য তোমার লেড়কিকেও দরবারের কাজে নিযুক্ত করলাম।'

বুড়ি খলিফাকে সুক্রিয়া জানিয়ে, নতজানু হয়ে কুর্ণিশ ক'রে দরবার ত্যাগ করল।

ডিলাইলাহ চাকুরিতে বহাল হবার পর তার মর্জি মাফিক খলিফার চিড়িয়াখানাটিকে সাজিয়ে তুল্ল। তার লেড়কি জাইনাব সর্বক্ষণ তার পাশাপাশি কাছাকাছি থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য করল।

এক সময়ে যে-ডিলাইলাহ সমাজে ধূর্ত ও ঠগী ব'লে চিহ্নিত হয়েছিল আজ সে-ই নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বহু যশ-খ্যাতি অর্জন করল। আর সে সঙ্গে খলিফার কাছ থেকে আশাতীত ইনামও লাভ করল।

কিস্সাটি শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ ক্ষণিকের জন্য চুপ করলেন।

কয়েক লহমা নীরবতার মাধ্যমে কাটিয়ে বেগম শাহরাজাদই নীরবতা ভঙ্গ করে বল্লেন—'জাঁহাপনা, ধূর্ত ডিলাইলাহ আর তার ছলনাময়ী ও লাস্যময়ী লেড়কি জাইনাব-এর কাণ্ডকারখানার কিস্সা তো শুনলেন। এবার আপনাকে ইহুদী জহুরী মছলি ব্যবসায়ী জুরেম ও যাদুকর আজারিয়াহ-র কিস্সা শোনাচ্ছি।

জুরেম আজারিয়াহ ও ইহুদী জহুরীর কিস্সা

বাদশাহ শারিয়ার ভাবলেন, তাজ্জব ব্যাপার তো! আমি যতবারই লেড়কিটিকে খুন করার কোশিস করছি ততবারই সে এক একটি মজাদার কিস্সা বলে আমার দিল্ কেড়ে নিচ্ছে!'

বেগম শাহরাজাদ বল্লেন—'জাঁহাপনা, আপনার অনুমতি পেলে আমি নতুন কিস্সাটি শুরু করি।'

বাদশাহ শারিয়ার উল্লসিত হয়ে বল্লেন—'তোমার কিস্সা সাচমুচ আমার দিল্ কেড়ে নিয়েছে। এমন সব কিস্সা তুমি একের পর এক বলে চলেছ যা শুনলে নয়া কোন কিস্সা শুনতে চাই না এরকম বাৎ আমার পক্ষে কিছুতেই বলা সম্ভব নয়। তুমি নয়া কিস্সাটি শুরু কর।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটি শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আহমদ যখন বাগদাদ নগরে একের পর এক বিস্ময়কর চুরির মাধ্যমে তামাম বাগদাদ নগরে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তখন সে-নগরেই আর এক চোর দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে তার পেশা চালিয়ে যাচ্ছিল। তার নাম ছিল আলী—আলীচাঁদ। তার নিজের মুলুক ছিল কায়রো নগর।

আলী চাঁদ বাগদাদে ঘাঁটি গাড়ার আগে কায়রো নগরে সে প্রবল প্রতাপশালী চোর ছিল।

আলী চাঁদ কেন বাগদাদে এসে মাথা গুজল সে কিস্সাই আপনার দরবারে এখন পেশ করছি।'

এক রাত্রের ব্যাপার। আলীচাঁদ ইয়ার দোস্তদের নিয়ে বসেছিল। তার দিল্ ছিল বড়ই বিষণ্ণ। সে গুম্ হয়ে বসে আশমান-জমিন ভাবছিল। তার ইয়ার দোস্তরা হরেক কিসিমের ফিরিস্তি দিয়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে বাৎচিতে ব্যস্ত। আলী চাঁদ-এর সেদিকে হুঁস ছিল না। সে যেন তখন দুসরা কোন দুনিয়ায় বাস করছে।

আলীচাঁদ-এর এক সাকরেদ প্রস্তাব দিল, বাগদাদের বাজারে গিয়ে ধান্দা করলে দু'-চার দিনার কামিয়ে নেয়া সম্ভব।

আলী ইয়ার দোস্তদের বসিয়ে রেখে একাই চলে গেল। আলী হাঁটতে হাঁটতে একটি সরাবখানার সামনে হাজির হ'ল। এক

ভিস্তিওয়ালার সঙ্গে তার দেখা হ'ল। তার কাঁধে পানিভর্তি ভিস্তি। হাতে দু'টি তামার পেয়ালা। নগরের পথে পথে ঢুঁড়ে পানি বেচা তার কাজ।

সে অন্যদিনের মাফিকই পেয়ালা দু'টি ঠুকে বাজনা বাজিয়ে হরেক কিসিমের গান্না গেয়ে গেয়ে পানি বেচছিল।

আলীচাঁদ এক পেয়ালা পানি কিনে হাতে নিল। কি ভেবে পানিটুকু পান না করে পথের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার কাজে ভিস্তিওয়ালা তাজ্জব বনে যায়। বল্‌ল—'সাহাব এমন বড়িয়া পানি ফেলে দিলেন?'

আলীচাঁদ বল্‌ল—'ঠিক আছে, আর এক পেয়ালা লাগাও।'

ভিস্তিওয়ালা তা-ই করল। এবারও পেয়ালার পানির একই হালৎ করল। তার কাজ দেখে ভিস্তিওয়ালা বল্‌ল—'সাহাব পানি যদি না-ই খান, পিয়াস যদি না-ই লাগে তবে বেকার পানি খরিদ করে কেন ফেলে দিচ্ছেন।'

আলীচাঁদ তার বক্তব্যে কান না দিয়ে বল্‌ল—'আর এক পেয়ালা ভরে দাও।' ভিস্তিওয়ালা ভরা পেয়ালাটি হাতে দিলে আলী এবার তা পথে না ফেলে সোজা গলায় ঢেলে দিল। তার হাতে একটি সোনার দিনার গুজে দিল।

আলীর বিশ্বাস ছিল সোনার দিনারটি পেয়েই ভিস্তিওয়ালা ফিন-গানার সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের ধান্দায় এগিয়ে যাবে। আদতে সে কিন্তু এক কদমও নড়ল না।

ভিস্তিওয়ালা এক লহমায় আলীচাঁদ'কে দেখে নিয়ে বল্‌ল—'সাহাব খানদান একদম দুসরা চিজ। দিনার-দিরহাম ছিঁটালেই খানদানি মেজাজকে তুলে ধরা যায় না।'

আলীচাঁদ গোস্‌সায় একদম কাঁই হয়ে যায়। চিল্লিয়ে ওঠে—'হারামী কাঁহিকার। তিন পেয়ালা পানির দাম তিন দিরহামও হবে না। আমি তোকে একটি সোনার দিনার দিলাম। বিনিময়ে এসব বাৎ আমাকে শোনাচ্ছিস শয়তান ফেরেফবাজ বুড্ডা কাঁহিকার। মেরে একদম তক্তা বানিয়ে দেব। চিনিস আমাকে হারামী?'

আলীচাঁদ-এর মেজাজ হঠাৎ বিগড়ে গেল। দুম্ করে এক ঘুষি বুড্ডাটির চোয়ালে বসিয়ে দিল। সে সঙ্গে চৌদ্দপুরুষের উল্লেখ করে হাজারখানা কাঁচা খিস্তি খেউর তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

ভিস্তিওয়ালা ঘুঁষির ঘায়ে দেয়ালে আছাড় খেয়ে পড়ল। মুখে হাত দিয়ে দেখল, খুন ঝরছে কিনা। না, অল্পের ওপর দিয়েই গেছে। খোদা ভরসা।

আলী এবার দিমাক ঠাণ্ডা করে বল্‌ল—'তুমি খানদানের প্রশ্ন তুলে আমার ইজ্জতে ঘা দেবার তোমার দরকার কি ছিল?'

ভিস্তিওয়ালা বল্‌ল—'সাহাব। খোদাতাল্লার নামে কসম খেয়ে

বলছি, আমি এমন এক দিলদরিয়া আদমি দেখেছি তামাম দুনিয়ায় যার জুড়ি মিলবে না।'

আলীচাঁদ তার বাৎ শুনে তাজ্জব বনে গেল। অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বল্‌ল—'কে? কে সে? কোথায় থাকে?'

ভিস্তিওয়ালা এবার বল্‌ল—'সাহাব, আপনি দিমাক ঠাণ্ডা করে যদি একটু নিরালায় গিয়ে বসেন তবে আমি সে-কিস্‌সা আপনাকে শোনাতে পারি। যাবেন সাহাব?'

আলীচাঁদ মুচকি হাসল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' পঞ্চাশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, ভিস্তিওয়ালা এবং আলী বাগিচায় গিয়ে ফোয়ারার ধারে একটি পাথরের ওপর বসল।

ভিস্তিওয়ালা তার কিস্‌সা শুরু করল—'হুজুর, আমার আব্বা ছিলেন ভিস্তিওয়ালাদের দলপতি। কেউ নগরের মকানে মকানে পানি দিত, কেউ বা আমার মাফিক পথে পথে পানি ফেরি করত। আমার আব্বা সবারই দলপতি ছিলেন। তিনি বেহেস্তে গেলে আমি তার মকান, একটি বড় ও চালু দোকান, পাঁচটি উট, একটি খচ্চর

অল্প কিছু জমির মালিক বনে গেলাম। আমার মাফিক আদমির পক্ষে এ-ই বহুৎ জাদা, গরীব তো কোনদিনই বিলকুল খুশী হতে পারে না। খুশী হলেও ভোগ-দখল করতে সক্ষম হয় না। খুশীতেই বাকরুদ্ধ হয়ে যায়।

আমি আবার দোকানটিকে আরও বড় করে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলাম। মত বদলে ফেল্‌লাম। ভাবলাম, মক্কায় হজে গিয়ে আমার উটগুলি আর খচ্চরটিকে ভাড়া খাটিয়ে একদম আমীর বনে যাব।

লেকিন একটু আগে বল্‌লামই গরীবের নসীবে খুশী লেখা থাকে না। বেশী অর্থকড়ি দেখার বরাত তার হয় না। হলেও ভোগে আসে না। তার আগেই মোউৎ এসে হাজির হয়।

সে সালে আমার নসীব একদম খারাপ ছিল। আমি মক্কায় যাবার পরিকল্পনা করার আগে হজযাত্রীরা রওনা হয়ে গিয়েছিল।

আমি পরিকল্পনা থেকে তবু সরে গেলাম না। একাই উটগুলি আর খচ্চরটি নিয়ে মক্কার পথে বেরিয়ে পড়লাম। এক পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মরু ডাকু আমার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে বিলকুল নিঃস্ব করে দিল।

মক্কার উদ্দেশ্যে পা-বাড়াবার আগে বেশ কিছু দিনার কর্জ নিয়েছিলাম। পাওনাদারের দেনা শোধ করতেই হবে। অনন্যোপায় হয়ে উটগুলি ও খচ্চরটিকে দিলাম বেচে। নইলে তারা আমাকে কারাগারে ঢুকিয়ে দিত। পাওনাদার আরও কিছু রয়েই গেল। উট আর খচ্চর বিক্রির অর্থে সবার দেনা শোধ হ'ল না।

ভাবলাম, খালি হাতে মুলুকে ফিরলে পাওনাদাররা আমাকে ছেড়ে দেবে না। নির্ঘাত কারাগারে ঢুকিয়ে দেবে। পথে সিরিয়ার এক হজযাত্রী দলের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে গেল। বরাত ঠুকে গেলাম তাদের সঙ্গে মিশে। তারপর যথাক্রমে দামাস্কাস, আলেপ্পো নগর পেরিয়ে হাজির হলাম বাগদাদ নগরে।

পথে পথে ঢুঁড়ে বাগদাদের ভিস্তিওয়ালা সমিতির সভাপতির সঙ্গে ভেট করলাম। আমার হালতের বাৎ তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তাকে খুশী করার জন্য কোরাণ পাঠ ক'রে শোনালাম। ব্যস, শেখ সাহাবের দিল্ গলে গেল। তিনি মেহেরবানি করে নিজের জেবের দিনার ব্যয় করে আমাকে একটি বড়সড় ভিস্তি, আর দুটো পেয়ালা খরিদ করে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন—'পানি বেচে রোজগার করতে লেগে যাও। অনায়াসে পেটের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।'

নসীব। সবই নসীবের খেল। তামাম নগরে ঢুঁড়ে ঢুঁড়েও দুটো রুটির ধান্দা হ'ল না। ব্যাপারটি আমার কাছে খোলসা হ'ল। বাগদাদের আদমিরা আমাদের কায়রো নগরের আদমির মাফিক পানি খরিদ ক'রে পান করতে উৎসাহী নয়। পথের ধারের কোন মকানে বা দোকানে ঢুকে পানি চাইলেই মিলে যায়। তবে আর দিনার-দিরহাম খরচা করে খরিদ করবেই বা কেন? তাদের মতে একমাত্র কাফেররাই পয়সা দিয়ে পানি দেয়। তাই পানির ব্যবসা বাগদাদে তেমন চালু নয়।

পানি বেচতে চাইলে পথচারীরা বেশ ক'রে দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে উপদেশ দেয়, পানিটানির কারবার ছেড়ে রোজগারের অন্য কোন ফিকির খোঁজ। এ-ধান্দা এখানে অচল।

আবার কেউ বা গোস্‌সা ক'রে চিল্লিয়ে ওঠে—'বেকুব কাঁহিকার আমাকে কি তুমি খানাটানা খাইয়েছ যে, পানি দিচ্ছ? খানা খাওয়াও তারপর না হয় পানির ধান্দা কোরো।'

কেউ বা গুনাহের প্রসঙ্গ পেড়ে বলল—'বে-আক্কেল কাঁহিকার! পানি তো খোদ খোদাতাল্লা বানিয়েছেন। তার পানি তুমি বেচার ধান্দা করছ!' দোজখে যাবে, ইয়াদ রেখো।

তবু, আমি দমলাম না। পথে পথে ভিস্তি কাঁধে ঢুঁড়তে লাগলাম। কেউ-ই আমার পানি খরিদ করল না।

দুপুর পর্যন্ত বেকার ঢুঁড়ে বেড়ালাম। বিকাল হ'ল। তবু দুটো রুটির জোগাড় হ'ল না।

সারাদিন রুটি জোগাড়ের ধান্দায় পথে পথে কাটালাম। আমার কোশিস ব্যর্থ হ'ল। একটি কানাকড়িও রোজগার করতে পারলাম না। দিনভর দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটি নি। পেটের ভেতরে আগুন জ্বলতে লাগল। পথের ধারের এক আমীর আদমির বারান্দায় বসে নিজের নসীবের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ভাবতে লাগলাম। খোদাতাল্লার ওপর যাবতীয় কসুর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে হাল্কা করার কোশিস করতে লাগলাম।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাজারের দিক থেকে কেমন একটি চাপা গুঞ্জন ভেসে আসছে। আদমিরাও বড়ই অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে। সামনের বাঁকটির কাছেই আদমির ভিড় সবচেয়ে বেশী।

আমি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। পানির ভিস্তিটি কাঁধে নিয়েই ব্যস্ত-পায়ে বাঁকের দিকে এগোতে লাগলাম।

মিছিল। মিছিল চলেছে দেখলাম। পোশাক আশাকে সজ্জিত হয়ে, কোমরে তরবারি ঝুলছে। সবার হাতেই একটি ক'রে পাকা বাঁশের লাঠি। তারা রাস্তার এক ধার ধরে সারিবদ্ধভাবে মিছিল করে চলেছে।

মিছিলের আগে আগে চলেছে সিপাহীদের সেনাপতি। খুবসুরৎ। ইয়া দশাসই চেহারা। মালুম হ'ল গায়ে-গতরে শক্তিও ধরে যথেষ্টই।

পথের ধারে শহরবাসীরা দাঁড়িয়ে সেনাপতি গোছের আদমিটিকে নতজানু হয়ে সালাম জানিয়ে খুশী করার কোশিস করছে।

আমি কৌতূহল দমন করতে না পেরে ভিড়ের মধ্যে থেকে

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ভাইজান, ব্যাপার কি? কিসের মিছিল? আর ওই বিশালদেহী আদমিটিই বা কে, বলুন তো?'

আদমিটি কৌতূহলী চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলে সে বল্‌ল—'আরে ইয়ার, মিছিল দেখতে এসেছ, আর ওই লোকটি কে জান না?' পরমুহূর্তেই বেটা আদমিটি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্‌ল—'ওহো, তুমি তো পরদেশী! দু'-চারদিনের জন্য এসেছ। তবে আর তোমার দোষই বা কি?'

ওই যে, ইয়া দশাসই চেহারার আদমিটিকে বীরবিক্রমে পথ চলতে দেখছ, তাঁর নাম আহমদ। সিপাহীদের সেনাপতি। খলিফার বহুৎ পেয়ারের আদমি। তামাম বাগদাদ নগরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তাঁর ওপরে বর্তেছে।

হাসান নামে খলিফার আর এক সেনাপতি রয়েছেন। তিনিও খলিফার পেয়ারের আদমি। এঁরা উভয়েই হাজার দিনার ক'রে বেতন পান। আর এক শ' দিনার বরাদ্দ প্রত্যেক সিপাহীর জন্য।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'ত এমন জমকালো মিছিল করে সবাই চলেছে কোথায়?!

—'পথে পথে ঢুঁড়ে নগরের হালচাল দেখতে বেরিয়েছে।'

আমি তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে রোয়াক থেকে পথে নেমে পড়লাম। পেয়ালা দুটো বাজিয়ে হাঁকতে লাগলাম—'পানি চাই। পানি নেবে গো?'

আমার কণ্ঠস্বর শুনে সিপাহী-সেনাপতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক পা-দু' পা ক'রে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। কোনরকম ভূমিকা না করেই এক পেয়ালা পানি মাঙলেন।

আমি মুচকি হেসে তাঁর দিকে পেয়ালা ভরে পানি এগিয়ে দিলাম। পর পর তিন পেয়ালা পান করল।

তাজ্জব ব্যাপার! আপনি যেমন পর পর দু'বার পানি পথে ছুঁড়ে ফেল্‌লেন তিনিও তা-ই করলেন। শেষ পেয়ালার পানি গলায় ঢেলে দিলেন। খালি-পেয়ালাটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'আমার কায়রো ভাইয়ারা দীর্ঘায়ু লাভ করুক।'

আমি সবিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

তিনি এবার আমার দিকে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন—'নিজের মুলুক ছেড়ে এখানে বাগদাদ নগরে হঠাৎ পানি বেচতে এলে কেন। বল তো? এখানকার আদমিরা এ-কারবারটিকে সুনজরে দেখে না। আর এতে কামাই করাও সম্ভব নয়।'

আমি অল্প কথায় আমার নসীবের ব্যাপার বল্‌লাম। তিনি দোয়া ক'রে পাঁচটি সোনার মোহর আমাকে ইনাম স্বরূপ দিয়ে দিলেন।

সিপাহী-সেনাপতি এবার সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'এ ভিস্তিওয়ালা আমার দেশওয়ালি ভাই। বিপদে পড়ে বাগদাদ

নগরের পথে পথে পানি নিয়ে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। তোমরা সাধ্য মত একে একটু-আধটু সাহায্য কর।'

সিপাহীরা একে তার নির্দেশ জ্ঞান ক'রে এক-এক পেয়ালা পানি খরিদ করল। বিনিময়ে একটি ক'রে দিনার আমার হাতে গুঁজে দিল। এক লহমায় আমার জেবে এক শ'-রও বেশী দিনার জমে গেল।

বিদায়-মুহূর্তে সিপাহী-সেনাপতি আমাকে বল্‌লেন—'শোন ভাইয়া, এ সময়ে রোজই এখান দিয়ে যাই। তুমি এখানে পানি নিয়ে খাড়া থাকলে বহুৎ দিনার কামাই করতে পারবে। আমরা সবাই তোমার পানি খরিদ করব। এক সময় নিজের মুলুকে ফিরে গিয়ে তোমার দেনা যা কিছু আছে শোধ করতে পারবে। এখন চলি, কাল ফিন দেখা হবে।'

সেনাপতির নির্দেশে সিপাহীরা ফিন হাঁটা জুড়ল।

পানি বেচে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আমি এক হাজারেরও বেশী দিনার কামিয়ে ফেল্‌লাম। এবার নিজের মুলুকে ফিরে গিয়ে দেনা শোধ ক'রে দেয়ার পরিকল্পনা করলাম।

একদিন নিজের মুলুকের দিকে পা-বাড়ালাম।

কিস্‌সাটির এ পর্যন্ত বলতে না বলতেই ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' একান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভিস্তিওয়ালা আলী-র কাছে তার কিস্‌সা বলে চলেছে—'আমি পথে নামলাম। কায়রোর

পথে কিছুদূর যেতেই কায়রোগামী একদল যাত্রীর সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে গেল, আমি তাদের পিছু নিলাম।

আপনাকে বলা হয়ে ওঠে নি। আমি কায়রো ফিরব শুনে সিপাহী-সেনাপতি আহমদ আমাকে একটি খচ্চর বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। আর একশ' মোহর আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন—'ভাইসাব, একটি জরুরী ও একদম গোপন কাজ তোমাকে ক'রে দিতে হবে। খবরদার কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে। এক বাৎ, কায়রো নগরের বহুৎ আদমির সঙ্গে কি তোমার জান পহচান আছে?'

—'জী হুজুর। আমীর-ওমরাহ আর শেরিফ আদমিদের সঙ্গে—'

—'এতেই হবে। এ চিঠিটি কায়রো নগরের চাঁদ আলী-র হাতে পৌঁছে দিও। আমার জিগরী দোস্ত ছিল এক সময়। তার হাতে চিঠিটি দিয়ে বোলো তোমাদের ওস্তাদ এখন বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর বড়ই প্রিয়পাত্র বনে গেছে, সুখেই দিন গুজরান করছে। সে যেন চিঠি পাওয়ামাত্র বাগদাদ নগরে চলে আসে।'

আমি তার হাত থেকে লিফাফাটি নিয়ে কায়রোগামী আদমিদের দলে ভিড়ে গিয়ে নিজের মুলুকের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

বাগদাদ থেকে কায়রো পুরো পাঁচ দিনের পথ। পাঁচদিন এক এক ভাবে পয়দল হাঁটাহাঁটি করে কায়রো পৌঁছানো গেল।

নিজের মুলুকে ফিরে সবার আগে দেনাদারদের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিলাম। সিপাহী-সেনাপতি আহমদ-এর উদ্দেশ্যে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হ'ল। তাঁরই দৌলতেই তো নিজের মুলুকে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছে।

দেনা শোধের পর নিশ্চিন্ত হয়ে ফিন ভিস্তি কাঁধে তুলে নিলাম। শুরু করলাম জাত ব্যবসা। পথে পথে টুঁড়ে পেয়ালায় ঠুন্ ঠুন আওয়াজ তুলে পানি বেচা শুরু করে দিলাম।

আমার জেবে সিপাহী-সেনাপতি আহমদ-এর চিঠিটি সর্বদা আমার পকেটেই থাকে। চাঁদ আলী-র হাতে সেটি তুলে দেয়া আমার একান্ত কর্তব্য।

আমি চাঁদ আলী-র খোঁজে তামাম বাগদাদ নগর চষে ফেল্‌লাম। লেকিন তার পাত্তা লাগাতে পারলাম না। আমার সব কোশিস ব্যর্থ হ'ল। আজও তার সঙ্গে ভেট করতে পারলাম না।

ভিস্তিওয়ালা কিস্‌সাটির এ পর্যন্ত ব'লে চুপ করল।

এদিকে চাঁদ আলী আচমকা ভিস্তিওয়ালাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল। আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌ল—'ভাই আমিই তোমার সে-চাঁদ আলী। কোথায় আমার চিঠি? তাড়াতাড়ি আমার হাতে দাও। দেখি, তোমার ওস্তাদ আহমদ কি লিখেছে।'

চাঁদ আলীর এরকম আকস্মিক বাৎ শুনে ভিস্তিওয়ালা তাজ্জব বনে যায়। পর মুহূর্তেই মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এবার কোর্তার জেব-এর পকেটে হাত গলিয়ে আহমদ-এর চিঠিটি বের করে এনে তার হাতে দেয়।

চাঁদ আলী চিঠিটি হাতে নিতে নিতে বল্‌ল—'ভাইয়া, তোমার সঙ্গে একটু-আধটু রূঢ় আচরণ করে ফেলেছি। গোস্‌সা কোরো না। আহমদ সাহাবকে ওস্তাদ ব'লে মানতাম। তার সাকরেদদের মধ্যে আমাকে বহুৎ পেয়ার করতেন।'

চাঁদ আলী লিফাফার ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের ক'রে চোখের সামনে ধরল। তাতে লেখা রয়েছে—সুপ্রিয় চাঁদ, তুমি আমার লেড়কার সমান পেয়ারের পাত্র। তোমার প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল। আমার দিলের সমাচার যে তোমাকে দেব সে-হিম্মৎ আমার নেই। খোদাতাল্লা যে আমাকে দুটো ডানার বন্দোবস্ত করে দেন নি।

আমার আশমানের চাঁদ, তুমি হয়ত শুনে খুশীই হবে, আমি এখানে চল্লিশটি শয়তানের মাথায় ওপরে চেপে, তাদের শিরোমণি সেজে মৌজ ক'রে দিন গুজরান করছি। আমার অধীনস্থ সিপাহীরা সবাই এক-একটি পুরনো দাগী আসামী। এক সময় এরা সবাই হাজার কিসিমের চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানি প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। আর আজ? খলিফার দোয়ায় সবাই শাহী তকমা লাভ ক'রে বহাল তবিয়তে রয়েছে। খলিফা আমাকে নগর রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাকে খলিফা হাজার দিনার বেতন দেন। তার ওপর উপরি রোজগার, ইনাম, বকশিস তো রয়েছেই।

চাঁদ, আমার লেড়কার সমান চাঁদ, যদি ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেবার ধান্দা করতে চাও তবে চিঠিটি পাওয়ামাত্র সোজা আমার কাছে চলে এসো। তোমার মাথায় যে-সব দুর্বুদ্ধি গিজগিজ করছে এখানে এসে সেসব কাজে লাগালে একদম চমক লাগিয়ে দিতে সক্ষম হবে। একদম বাজী মাৎ। বাগদাদের বাতাসে অর্থকড়ি অনবরত উড়ছে। তোমার মাফিক সর্বগুণের আধার এক লেড়কা আমার পাশে থাকলে আমি কেল্লা ফতে ক'রে দিতে সক্ষম হ'ব। তুমি আমার পছন্দ্ মাফিক চেলা। আমি যেসব কায়দা কসরৎ তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে ফেলেছি তার ছোট খাটো দু'-একটি যদি ছাড় তবে সবাই তাজ্জব বনে যাবে। আর খলিফা? তোমার সবকিছু দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে পরম যত্নে-আনন্দে তোমাকে মাথায় তুলে রাখবেন। আমি আজই খলিফার কাছে তোমার তদ্বির তদারকি আগেই ক'রে রাখব। এর ফলে তিনি তোমাকে দরবারের এক উঁচু পদে নিযুক্ত করবেন।

সবশেষে ফিন বলছি, জলদি চলে এসো, দেরী কোরো না। আমি তোমার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকলাম। খোদাতাল্লা তোমার ভালই করুন।—ইতি, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী আহমদ।

আহমদ-এর চিঠিটি পড়ার পর চাঁদ আলী যেন খুশীতে বিলকুল আত্মহারা হয়ে পড়ে। আনন্দ সামলাতে না পেরে ধেই ধেই করে নাচতে লেগে গেল।

ভিস্তিওয়ালা ওঠার উদ্যোগ নেয়।

চাঁদ নাচতে নাচতে তার গলা জড়িয়ে ধরে। কোর্তার জেব থেকে এক মুঠো দিনার ও দিরহাম বের করে তার হাতে গুঁজে দিল। এবার লাফাতে লাফাতে গুন্ গুন্ করে গানা গাইতে গাইতে তার ভূগর্ভস্থ গোপন আস্তানায় ঢুকে যায়।

আস্তানায় তার সহকর্মীরা বিশ্রাম নিচ্ছে। সবাইকে ডেকে খুশীতে ডগমগ হয়ে বল্‌ল—'ভাইয়া, ওস্তাদ আহমদ-এর তলব এসেছে। আমি বাগদাদে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে তোমাদের বক্তব্য কি?'

চোর-ডাকুরা বেঁকে বসল—'এ কী ধান্দা, ওস্তাদ? আমাদের সবার জেব বিলকুল ফাঁকা। আর তুমি কিনা সটকে পড়ার ধান্দা করছ!'

—'আমার কোন কসুর নেই। নসীব আমাকে টানছে। পুরনো ওস্তাদের তলব এসেছে। আমাকে যে যেতেই হবে।' সহকর্মীরা বিলকুল বেঁকে বসল। তাকে কিছুতেই ছাড়তে নারাজ।

সবশেষে চাঁদ আলী তাদের সান্ত্বনা দিল—'তোমাদের একদম পথে বসিয়ে কেটে পড়ার ধান্দা আমার আদপেই নেই। পথে দামাস্কাস পড়বে। সেখানে ক'দিন থেকে কিছু কামাইয়ের ধান্দা করে তোমাদের জন্য পাঠিয়ে দেব।'

চাঁদ আলী মুসাফিরের পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিল। কোমরের দু' ধারে দুটো ছুরি কোর্তার তলায় নিয়ে নিল। হাতে একটি পাকা বাঁশের লাঠি। আর মাথায় চাপাল একটি অদ্ভুত টুপি।

সাজ পোশাক পরে তেজী ঘোড়ায় চেপে সহকর্মীদের কাঁদিয়ে চাঁদ আলী বাগদাদের পথে রওনা হ'ল।

কায়রো থেকে কিছুদূর যেতেই দামাস্কাসের পথে একদল হজযাত্রীদের সঙ্গে চাঁদ আলী-র মোলাকাৎ হ'ল। দলের মাতব্বর দামাস্কাসের সওদাগর-সমিতির শাহবান্দর। বহুৎ শেরিফ আদমি। মক্কা থেকে হজ সেরে নিজের মুলুকে ফিরছে।

চাঁদ আলী খুবসুরৎ এক নওজোয়ান। শক্ত সাবুদ চেহারা। দাড়ি গোঁফ পর্যন্ত গজায় নি। এরকম এক নওজোয়ানকে পেয়ে শাহবান্দার-এর নজরে ধরে গেল। সে সহজেই দলের সবার দিল্ জয় করে নিল। তবে এর পিছনে কারণও ছিল যথেষ্টই। দামাস্কাসে যাবার পথ খুবই বন্ধুর, বিপদ সঙ্কুল। প্রায়ই ডাকাতি ছিনতাই হয়। বাদাবী ডাকাতদের একচেটিয়া দখলে এ-পথ। তীর্থ যাত্রীদের সর্বস্ব কেড়ে বিলকুল উলঙ্গ করে ছাড়ে। আর জঙ্গলী জন্তু-জানোয়ারের ডরও কম নেই। একবার এক পেল্লাই বড় সিংহের আক্রমণ

ঠেকিয়ে তাকে একদম জব্দ করে দেয়। এসবের জন্য চাঁদ আলী শাহবান্দার-এর বড়ই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

হাজী শাহবান্দার দামাস্কাসে হাজির হওয়ার পর চাঁদ আলী'কে এক হাজার সোনার দিনার বকশিস দিল। আর দলের অন্যান্যদের সবাইকে দিল পাঁচ-পাঁচ দিনার।

চাঁদ পথ খরচা বাবদ সামান্য কিছু রেখে বাকী সবটুকু কায়রোয় দলের সহকর্মীদের জন্য পাঠিয়ে দিল।

তীর্থযাত্রীদের দলের সঙ্গে চাঁদআলী দামাস্কাসে পৌঁছে আহমদ -এর তল্লাস করল। তার ঠিকানা বল্‌ল বহুৎ আদমীকে। লেকিন ভিন্‌দেশী ভেবে বা অন্য কোন কারণে কেউ তাকে তার ওস্তাদ আহমদ-এর পাত্তা ব'লে সাহায্য করল না।

ওস্তাদ আহমদ-এর তাল্লাস করতে করতে এক ফাঁকা মাঠের ধারে হাজির হ'ল। সেখানে কয়েকজন গুণ্ডা-বদমায়েশের সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল। তাদের ওস্তাদ জাইনাব-এর বোনের লেড়কা মহম্মদ। একদম বাচ্চা। উমর খুবই কম।

চাঁদ আলীকে দেখে মহম্মদ গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল। অদূরে একটি মিঠাইয়ের দোকান। সেটি দেখিয়ে আলী মহম্মদকে বল্‌ল —'তোমরা মিঠাই খাবে?'

ওস্তাদ মহম্মদ উঠে দাঁড়ায়। নীরবে দোকানের দিকে এগোতে থাকে। তার অনুগামীরা তাকে অনুসরণ করল।

মিঠাই মণ্ডা খাইয়ে চাঁদ আলী ওস্তাদ মহম্মদ-এর হাতে একটি সোনার দিনার গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—'ভাইয়া, আমাকে একটি বাড়ির নিশানা বাৎলে দিলে বড়ই উপকার হয়। দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি পরদেশী। রাস্তা ঘাট কিছুই চিনি না।'

মহম্মদ বলে—'কার মকানে যাবে? কার মকানের নিশানা তাল্লাস করছ, বল তো?'

—'খলিফার সিপাহী-সেনাপতি আহমদ সাহাবের মকান।'

—'বহুৎ আচ্ছা। আমার সাথে এসো, পাত্তা লাগিয়ে দিচ্ছি।'

কয়েক পা গিয়ে পথ থেকে একটি ঢিল কুড়িয়ে নিল। দুম ক'রে সামনের একটি মকানের দেয়ালে ছুঁড়ে মেরে বল্‌ল—'ওই যে, ওই মকান।'

আওয়াজ শুনে আহমদ দরওয়াজা খুলে বেরিয়ে এল। গোস্‌সায় রীতিমত কাঁপছে।

লেকিন দরওয়াজা খোলার আগেই ওস্তাদ মহম্মদ এক দৌড়ে পথের বাঁক ঘুরে একদম বে-পাত্তা হয়ে গেল। আহমদ তার হদিস পেল না।

পথে চাঁদ আলী'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আহমদ ব'লে উঠল—'চাঁদ আলী যে! আরে এসো—এসো।' ঢিল মারার ব্যাপারটি চাপা পড়ে গেল।

কামরার ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে চাঁদ আলী বল্‌ল—'কী ঝকমারিতেই না পড়েছিলাম ওস্তাদ। একদম হয়রানের চূড়ান্ত। যে হতচ্ছাড়াকেই তোমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করি সে-ই মুখ কালো করে বলে—মালুম নেই। কি ব্যাপার ওস্তাদ?'

—'কি আবার, ডরে। বিলকুল ডরে কেউ আমার নাম করে না, মকানের নিশানা বলা তো বহুৎ দূরের ব্যাপার। বলা তো যায় না যদি কারো মুখ ফসকে কিছু বেরিয়ে পড়ে। গর্দান যাবে। তার চেয়ে মালুম নেই বলাই একদম নিরাপদ, ঠিক না?'

দরওয়াজা দিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকতে গিয়েও আহমদ থমকে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌ল—'চাঁদ ভাইয়া, আগে তোমাকে আমার মকানটি ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে নিচ্ছি, কি বল?'

—'বহুৎ আচ্ছা। তোমার মকান তো দেখছি একদম খোলাই। আমীর-বাদশার প্রাসাদও এমন খুবসুরৎ হয় না।'

সিপাহী-সেনাপতি ম্লান হেসে বল্‌ল—'হ্যাঁ, মকানটি একটু বড়ই বটে। তবে আমার সঙ্গে আমার চল্লিশজন সিপাহী-সাকরেদও থাকে কিনা তাই মকানটি একটু বড়সড় না হলে কুলোবে কেন?'

আহমদ টুঁড়ে টুঁড়ে চাঁদ আলীকে মকানটি দেখাল। চাঁদ আলী পঞ্চমুখে তার তারিফ করল।

আহমদ এবার চাঁদ আলীকে তার সিপাহীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌ল—'এ সবে আমার মুলুক কায়রো থেকে এসেছে। আমার পুরনো সাকরেদ। তার সমান মস্তান ও সাহসী ধান্দাবাজ তামাম কায়রোতে দ্বিতীয়টি নেই।'

আহমদ এবার তাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেল। নিজের পোশাক পরিচ্ছদ দেখিয়ে বল্‌ল—'খলিফা যেদিন আমাকে সিপাহী-সেনাপতির পদে বহাল করল সেদিন এগুলো ইনাম স্বরূপ দিয়েছেন।' এবার চাঁদ আলীর কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বল্‌ল—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তোমার সঙ্গে আমার ফিন মোলাকাৎ হবেই।'

খলিফা আমাকে বহুৎ পেয়ার করেন। আমার হুকুমে চল্লিশজন সিপাহী জান কবুল করতেও পিছপাও নয়। বহাল তবিয়তেই আছি ভাইয়া। আহমদ সন্ধ্যায় দেশওয়ালি পুরনো সাকরেদ চাঁদ আলী-র খাতিরে এক ভোজ-সভার আয়োজন করল। চল্লিশজন সিপাহীও কব্জি ডুবিয়ে এক সঙ্গে খানাপিনা করল। দিল্ খুলে নাচা-গানা করল। চাঁদ আলী বহুৎ আনন্দ পেল নয়া পরিবেশে এসে।

আহমদ পরদিন ভোরে খলিফার দরবারে যাওয়ার সময় চাঁদ আলীকে বলে গেল—'একদম মকানের বাইরে যাবে না। কারো সঙ্গে বাৎচিৎ করবে না। নয়া মুলুক। রাস্তাঘাট অজানা। একা কোথাও গেলে ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পার। কামরায় বিশ্রাম কর। দু'-চারদিন অপেক্ষা কর। তারপর সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আমার শত্রুরা চারদিকে ঘুরঘুর করছে। মওকা পেলেই গাড্ডায় ফেলে দেবে। তুমি নতুন। তোমাকে হাতের কাছে পেলেই তারা ধান্দায় মেতে উঠবে। হুঁশিয়ার, ইয়াদ রাখবে কায়রো আর বাগদাদের মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক। খলিফার গুপ্তচর মশা-মাছির মাফিক ঘুরঘুর করছে চারদিকে। আবার চোর, জোচ্চোর, গুণ্ডা, মস্তান ছারপোকার মাফিক নগরের পথে ঘাটে পিল্ পিল্ করছে।'

আহমদ-এর পরামর্শ চাঁদ আলী-র মনঃপুত হ'ল না। ভেতরে ভেতরে গোমড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটু-আধটু গোস্‌সা প্রকাশ করেই বল্‌ল— এ কেমন হুকুম ওস্তাদ। কামরার দরওয়াজা বন্ধ করে বসে থাকা তো বোরখা পরে থাকারই সামিল। আমি কি এরই জন্য মুলুক ছেড়ে বাগদাদে এসেছি?'

আহমদ চাঁদ আলী-র পিঠ চাপড়ে, মুচকি হেসে বল্‌ল—'গোস্‌সা করছ কেন ভাইয়া? দু'-চারটে দিন একটু ঝিম মেরে এখানকার হাওয়া সমঝে নাও। তারপর যেখানে দিল্ চায় টুঁড়ে বেড়াবে। আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে এক-এক করে সব ঘাঁটি চিনিয়ে দেব। তখন তো তুমি বিলকুল শের বনে যাবে।'

চাঁদ আলী গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আহমদ আর দেরী না ক'রে মকান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' তিপ্পান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, চাঁদ আলী'কে কামরায় রেখে আহমদ খলিফার দরবারে চলে গেল। চাঁদ আলী পুরো তিনটি দিন কামরা বন্দী হয়ে রইল। দিনভর সে টুঁড়ে টুঁড়ে দিন গুজরান করত তার পক্ষে এ হালৎ তো দম বন্ধ হয়ে আসার ফিকির।

চতুর্থ দিন ভোরে আহমদ মকান ছেড়ে যাবার সময় চাঁদ আলী মুখ কাচুমাচু করে বল্‌ল—'ওস্তাদ এ যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। কলিজা ছটফট করছে। এবার হুকুম দাও এমন এক কেরামতি দেখাই যাতে স্বয়ং খলিফাও চোখে সর্ষেফুল দেখেন।'

—'সবুর কর ভাইয়া। আর দু'-চারদিন নিজেকে সামলে সুমলে রাখ। এত ব্যস্ত হলে সবকিছু ভেস্তে যাবে। তোমার ব্যাপারটি নিয়ে আমাকেই ভাবতে দাও তো। দিমাক ঠাণ্ডা করে তুমি মুখে কুলুপ এঁটে কামরার মধ্যে বসে থাক।'

বুঝছ না কেন? ঝোপ বুঝে তো কোপ মারতে হবে। খলিফার মেজাজ মর্জি বুঝে তোমার প্রসঙ্গ তার কাছে পাড়ব। যাতে এক কথাতেই তোমাকে দরবারের কাজে বহাল করে নেন। হবেও তা-ই, সেদিন আহমদ দরবারে চলে গেলে চাঁদ আলী কয়েদখানার সামিল কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। নসীব ঠুকে, খোদাতাল্লার নাম নিয়ে একদম পথে হাজির হ'ল।

চাঁদ আলী এপথ-ওপথ পেরিয়ে একটি রেস্তোরার সামনে হাজির হ'ল। লম্বা-লম্বা পায়ে ভেতরে গিয়ে কয়েক কিসিমের খানা নিয়ে গলা পর্যন্ত ঠেসে খেল।

রেস্তোরা থেকে বেরোবার সময় দেখল, কুচকুচে কালো পোশাক গায়ে দিয়ে কয়েকটি নিগ্রো নওজোয়ান যাচ্ছে। তাদের মাথায় টুপি, কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধ, হাতে চকচকে খড়্গ। তাদের সঙ্গে এক জেনানা। কোন হারেমের বৃদ্ধা। আরও চারজন সশস্ত্র নিগ্রো বীরদর্পে চলেছে। বৃদ্ধা জেনানাটির মাথায় একটি তাজ। সোনার তাজ। তাজটির মাথায় একটি রূপোর কবুতর শোভা পাচ্ছে।

এ-বৃদ্ধাটি সে-শয়তানী ডিলাইলাহ। খলিফার চিড়িয়াখানার কাজকর্ম সেরে ফিরছে। তার সঙ্গে তার লেড়কি জাইনাবও রয়েছে।

বৃদ্ধা ডিলাইলাহ চাঁদ আলীর দিকে এক ঝলক তাকাল। সে তাকে চেনে না। দেখেও নি কোনদিন। এমন খুবসুরৎ নওজোয়ান দেখে তার কলিজাটি নড়েচড়ে ওঠে।

ডিলাইলাহ অনুচ্চ কণ্ঠে এক নিগ্রোকে বল্‌ল—'নওজোয়ানটি কে হে? চেন? ডাক তো একবারটি। থাক, রেস্তোরার মালিককে জিজ্ঞাসা কর।'

নিগ্রোটি রেস্তোরা থেকে ফিরে বিষণ্নমুখে বল্‌ল—'রেস্তোরার মালিক বল্‌ল, সে-ও চেনে না। আজই প্রথম দেখছে। মালুম হচ্ছে ভিন্ দেশী কেউ হবে।'

ডিলাইলাহ এবার এক নিগ্রোকে দিয়ে এক মুঠো বালি আনাল। উদ্দেশ্য, মন্ত্র পড়ে চাঁদ আলী-র পরিচয় জেনে নেবে। আমার দিল্ বলছে, এর ধান্দা সুবিধের নয়। কোন না কোন বাজে কাজ হাসিল করতেই একে এখানে আনা হয়েছে।

নিগ্রোটি বালি নিয়ে এল। জাইনাব তার হাতে যাদুসেজ তুলে দিল। বুড়ি আঁকা বাঁকা কিছু আঁক কষে বিড়বিড় করে কি যেন সব মন্ত্র আওড়াল।

এক সময় ডিলাইলাহ লেড়কির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'নওজোয়ানটির নাম চাঁদ আলী। কায়রো তার মুলুক। সিপাহী-সেনাপতি আহমদ-এর জিগরী দোস্ত। সাকরেদ।'

জাইনাব স্তম্ভিত হয়। সবিস্ময়ে বলে, সেই যে সেই আহমদ, যার কোর্তা-কামিজ খুলে প্রায় বিবস্ত্র করে ছেড়েছিলাম!'

—'বিলকুল সাচ্চা বাৎ। আমাদের টিট করার জন্য সে এবার কায়রো থেকে এ-শয়তানটিকে আমদানি করেছে। কায়রোর সেরা মস্তান, পাক্কা ধড়িবাজ।'

—'আম্মা তুমি ঝুটমুট ভেবে মরছ। এতো একদম বাচ্চা! ভাল ক'রে গোঁফ-দাড়িও গজায় নি। এর দ্বারা আমাদের কি-ই বা
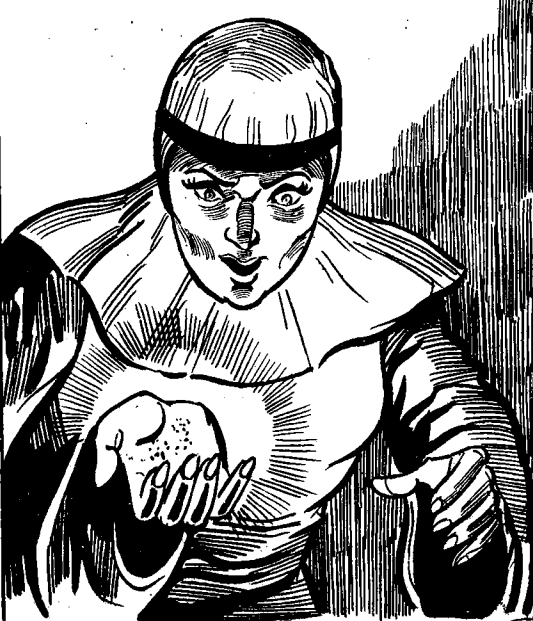
সর্বনাশ—'

—'আহমদ নিজের মকানে একে তুলেছে, বুঝছিস না ধান্দা আছে কিনা? ফিকির খুঁজছে।'

—'আম্মা, তুমি দিমাক ঠাণ্ডা কর। আমি ওর সঙ্গে ভেট ক'রে আদৎ ব্যাপারটি সম্বন্ধে আঁচ নিয়ে আসছি।'

জাইনাব তার উন্নত স্তন দুটো নাচিয়ে, নিতম্ব দুলিয়ে দুলিয়ে চাঁদ আলী-র দিকে এগিয়ে গেল। তার আম্মাকে মকানে পাঠিয়ে দিল।

জাইনাব কাছে গিয়ে চাঁদ আলীর আপাদমস্তক এক লহমায় নিরীক্ষণ করে নিল। দেখল, তার মায়ের দেয়া বিবরণের সঙ্গে চাঁদ আলী-র চেহারা বিলকুল মিলে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে চাঁদ আলী রেস্তোরা ছেড়ে পথে নেমে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লেগে গেছে। জাইনাব তাকে অনুসরণ করে। সামান্য গিয়েই তাকে আচমকা এক ধাক্কা মারে।

চাঁদ আলী থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় ঘুরিয়ে জাইনাব-এর দিকে তাকায়। জাইনাব চোখের বাণ মেরে বসল। একে খুবসুরৎ এক লেড়কির তুল তুলে হাতের ধাক্কা তার ওপর চোখের বাণ মারায় চাঁদ আলী একদম ভড়কে গেল। তার কলিজা নাচানাচি দাপাদাপি জুড়ে দিল। শিরায় শিরায় খুনের গতি গেল বেড়ে। চাঁদ আলী বিলকুল কুপোকাৎ। আচমকা ব'লে উঠল—'কী সুরৎ তোমার!

অনন্যা কে তুমি? কি তোমার পরিচয় বলবে কি?'

জাইনাব খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।

চাঁদ আলী এবার বল্‌ল—'বল না, কে তুমি? পথে পথে টুঁড়ে কার তাল্লাস করছ?'

—'যদি বলি তোমার মাফিক এক নওজোয়ানেরই তাল্লাস করছি, নওজোয়ান।' বলেই ফিন সরবে হেসে উঠল।

তার বাৎ শুনে আলী-র মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই বল্‌ল—'শাদী-নিকা হয় নি?'

—'হয়েছে। স্থানীয় এক সওদাগরের বেটি। আমার স্বামীও এক সওদাগর। কারবারের তাগিদে তিনি প্রায়ই ভিন্ দেশে টুঁড়ে বেড়ান। এখন ভিন দেশে আছেন। তাই তোমার মাফিক এক শক্ত সাবুত নওজোয়ানের খোঁজে বাইরে বেরিয়েছি। দিল্ ভরে এক সঙ্গে খানাপিনা সারব। তারপর দু' জনে—'

জাইনাব-এর বাৎ শুনে আলী-র কলিজা নাচানাচি শুরু করে দিল। শিরা-উপশিরার খুনে গতি গেল বেড়ে। কান দুটো দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোতে লাগল।

জাইনাব আচমকা চোখের বাণ মেরে বল্‌ল—'তোমার মাফিক এক শক্ত সাবুত নওজোয়ানকে নিয়ে রাত্রি কাটাতে পারব ভেবে খুশীতে আমার কলিজা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মকান থেকে বেরিয়ে পথে আসার সময় লেড়কারা পিছনে লাগে, উস্কানি দেয়, পাত্তা দেই নি। আদতে কাউকেই দিল্ থেকে মেনে নিতে পারি নি। তোমাকে এক লহমায় দেখেই দিল্ নেচে ওঠে, কলিজা অস্থির হয়ে পড়ে। তুমি যদি আজকের রাত্রিটি আমাকে সঙ্গ দান কর তবে আমি খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠতে পারব। যাবে তো? চল, পা-বাড়াও।'

চাঁদ আলী এর কি জবাব দেবে সহসা ভেবে উঠতে পারল না।

জাইনাব তার একটি হাত খপ ক'রে চেপে ধরতে গিয়েও থমকে গেল। আহ্লাদে গদগদ হয়ে বল্‌ল—'তুমি কেমন নাগর হে? লেড়কিদের চেয়েও শরম—চল, পা-বাড়াও।'

চাঁদ আলীর মাথাটি যেন আচমকা চক্কর মেরে উঠল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল—'তোমার মাফিক খুবসুরৎ উদ্ভিন্ন যৌবনার সাদর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারব তেমন শক্ত কলিজা আমার নয়। চল, কোথায় নিয়ে যাবে, যাচ্ছি।'

চাঁদ আলী জাইনাবকে অনুসরণ করে চল্‌ল। পথ পাড়ি দিতে দিতে সে ভাবল—এ-নগরে আমি একদমই নবাগত। এখানকার আদমি বা পথ কিছুর সঙ্গেই আমার জান পরিচয় নেই। কথা নেই বার্তা নেই আচমকা এক খুবসুরৎ লেড়কির ডাকে হাঁটা দেয়া কি উচিত হচ্ছে? তার ওপর অন্যের বিবি। এ-মুহূর্তে সে মকানে না-ও থাকতে পারে। লেকিন যে কোন সময় ফিরে আসতে পারে। ফিরে এসে যদি দেখে আমি তার বিবিকে জড়িয়ে পড়ে রয়েছি।

এক লহমায় তার মাথায় খুন চেপে যাবে। আর এ-ই স্বাভাবিক। তখন তার মোউত কেউ ঠেকাতে পারবে না। জ্ঞানীরা তো বলেই গেছেন পরদেশে অচেনা জেনানার সাথে অবৈধ মিলন এড়িয়ে চলবে।'

চাঁদ আলী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে আর যেতে নারাজ। ভাবল, অজানা-অচেনা এ-লেড়কি তাকে কোন্ চক্করে নিয়ে ফেলবে, কে বলতে পারে। আলী দু' পা এগিয়ে জাইনাব'কে আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'শুনছ, আজকের দিনটির জন্য আমাকে রেহাই দাও। তামাম বাগদাদ নগরে খুবসুরৎ নওজোয়ান ঢের মিলবে। তুমি অন্য কাউকে পাকড়াও করে নিয়ে যাও। আমি এখানে বিলকুল নবাগত। একজনের মেহমান হয়ে দিন গুজরান করছি। তার অজান্তে বাইরে রাত্রি কাটানো কিছুতেই সঙ্গত নয়। কসম খাচ্ছি, পরে একদিন তোমার সাধ মেটাব, শুধুমাত্র আজকের রাত্রিটি—'

জাইনাব আহ্লাদে অভিমানে-আবেগে গদগদ হয়ে বল্‌ল—'সে কী! না, সেটি হচ্ছে না। তোমাকে দেখেই আমার কলিজা নাচানাচি করছে, খুনে মাতন লেগেছে। ওঃ হুঃ সেটি হচ্ছে না। আজই—এখনই তোমাকে পেতে চাই। একবার তোমাকে বুকে ঠাঁই দিয়ে ফেলেছি—না, সেটি হচ্ছে না। আমার জান তবে একদম বরবাদ হয়ে যাবে।'

আবার চাঁদ আলীর কলিজাটি ভিজে একদম জবজবে হয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মাফিক তাকে অনুসরণ ক'রে চল্‌ল।

জাইনাব মকানে পৌঁছে কামিজের পকেট হাতাতে থাকে। চাবি বে-পাত্তা। বল্‌ল—'চাবি বে-পাত্তা। হারিয়েছি বোধ হয়।' এবার চাঁদ আলী-র দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'কি গো, একদম চুপ মেরে গেলে যে, চাবি হারিয়ে গেছে। কামরায় ঢোকার কৌশিস তো কিছু করতে হবে? তালাটি ভাঙা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তালা ভেঙে ফেল।

চাঁদ আলী বল্‌ল—'তালা ভাঙা গুনাহ। আমি তা করতে নারাজ।'

জাইনাব এবার নাকাবটি সামান্য সরিয়ে তার দিকে আচমকা চোখের বাণ মেরে বল্‌ল—'গুনাহ বলে কি কামরার ভেতরে যাব না? রাতভর এখানে কাটাব?'

চোখের এক বাণেই আলী মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়। মোহমুগ্ধের মত প্রায় তালাটি দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে শরীরের সবটুকু তাগদ নিঙড়ে দিয়ে মোচড় মারতে শুরু করে। তার যৌবনের উন্মাদনা তালাটি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না। দুম্ ক'রে খুলে গেল।

জাইনাব কামরার ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌ল—'এসো, ভেতরে এসো।'

জাইনাব খানাপিনার বন্দোবস্ত করল। চাঁদ আলীকে দামী সরাব দিল পেয়ালা ভরে। হেসে হেসে বাৎচিৎ করল। লেকিন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার হাতের নাগাল থেকে নিজেকে দূরে দূরে রাখতে লাগল।

চাঁদ আলী অস্থির হয়ে পড়ে। সে নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে আচমকা জাইনাব'কে ধরার জন্য হাত বাড়ায়। জাইনাব ঝট করে দু' পা সরে গিয়ে বলে—'কেন এমন অস্থির হচ্ছ? সবুর কর। রাত্রি একটু গভীর হোক। মহল্লার মকানগুলির বাত্তি নিভতে দাও। তারপর শুরু হবে আমার খেল। তাজ্জব বনে যাবে। তোমার দিল্ একদম ভরিয়ে দেব। কলিজা বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

খানাপিনা সেরে জাইনাব চাঁদ আলীকে নিয়ে ইঁদারার ধারে গেল। জল তোলার বালতিটি সামান্য নামিয়েই সে আচমকা আর্তনাদ করে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! আমার নসীব পুড়ল। একদম সর্বনাশ—'

চাঁদ আলী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বল্‌ল—'কি? কি হয়েছে মেহেবুবা? হয়েছে কি?'

—'কি আবার হবে—নসীবের ফের। অমন সুন্দর হীরার আঙ্‌টিটি খসে পড়ল।'

চাঁদ আলী চমকে গিয়ে ব'লে উঠল—'খসে পড়ল। খসে পড়ল মানে? একদম কুয়োর মধ্যে?'

—'তা নইলে সর্বনাশ হতে যাবে কেন? ইয়া আল্লাহ। নসীবে এ-ও ছিল! মেহবুব, এখন উপায়? গতকাল ভিনদেশে যাবার আগে আমার স্বামী খরিদ করে দিয়ে যায়। পাঁচ শ' দিনার দাম।'

—'তাই তো, এমন দামী জিনিস—'

—'কুয়োর পানি তেমন নেই। নেমে গিয়ে একটু হাতাহাতি করলেই মিলে যাবে। লেকিন কে নামবে। এত রাত্রে কাকে মিলবে। এক কাজ করি সালোয়ার কামিজ খুলে উলঙ্গ হয়ে আমিই নেমে যাই, কি বল? তুমি এক কাজ কর, দেয়ালের দিকে ফিরে থাক। খবরদার এদিকে ফিরবে না কিন্তু। আমি সাজ গোজ খুলে উলঙ্গ হচ্ছি।' কথা বলতে বলতে জাইনাব কামিজের বোতাম খোলার বাহানা করল।

চাঁদ আলীর পনের-ষোল সালের চনমনে পৌরুষে ঘা লাগল। সে বাধা দিয়ে বল্‌ল—'আরে করছ কি! করছ কি! তুমি জেনানা হয়ে কুয়োয় নামবে আর আমি জোয়ান মরদ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, হয় নাকি? তুমি এখানে থাক। আমি নেমে আঙ্‌টিটি তাল্লাশ করে নিয়ে আসছি।'

জাইনাব'কে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়েই চাঁদ আলী তার কোর্তা পাৎলুন খুলে ফেল্‌ল। এবার রশিটির এক প্রান্ত বেঁধে ফেল্‌ল একটি গাছের সঙ্গে। তারপর রশি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল

কুয়োর মধ্যে। এক লহমায় পানির নীচে তলিয়ে গেল।

জাইনাব এবার ঝট ক'রে রশিটি তুলে নিল। ব্যস, চোখের পলকে চাঁদ আলী-র পোশাক নিয়ে একদম বে-পাত্তা হয়ে গেল।

প্রাসাদটি খলিফার দরবারের এক আমীরের। জাইনাব জানত, প্রাসাদে কেউ নেই। তালা দিয়ে কোথায় যেন গেছে। সে এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। তার কুয়োতে চাঁদ আলীকে জিম্মা রেখে জাইনাব হাফিস হয়ে গেল।

ভোরে আমীর তার প্রাসাদে ফিরে এল। সদর-দরওয়াজা দিয়ে প্রসাদের ভেতরে পা দিয়েই আমীর ভড়কে যায়। দরওয়াজা খোলা। ব্যস্ত-পায়ে তামাম প্রাসাদটি ঘুরে ঘুরে দেখল। না। একটি কামরায় খানাপিনা করা ছাড়া আর কোন ক্ষতি করে নি। আল্লাহ-র অপার মেহেরবানি।

আমীর এক সময় পানি তুলতে কুয়োর ধারে এল। দড়ি-বালতি কুয়োর ভেতরে নামিয়ে দিল। বালতি তুলতে গিয়ে তাজ্জব বনে যায়। নিচে তাকিয়ে দেখে কালো কি যেন নজরে পড়ছে। আমীর বিলকুল ভড়কে গেল। চিল্লিয়ে ওঠে। আমীরের চিল্লাচিল্লি শুনে জোয়ান নোকর দৌড়ে এল।

আমীর বল্‌ল—'দেখ, কী তাজ্জব ব্যাপার! কুয়োর মধ্যে কালো মাফিক কি যেন একটি দেখা যাচ্ছে।'

নোকরটি বল্‌ল—'হুজুর, মালুম হচ্ছে, জঙ্গলী জানোয়ার, শুয়োর টুয়োর কিছু হবে।'

—'ইয়া আল্লাহ! তোবা! তোবা! জাত মান সব গেল দেখছি! শিগ্‌গির মৌলভীকে তলব দে। কোরাণ পাঠ করিয়ে পবিত্র করতে হবে। তোবা! তোবা! কী গুনাহ!'

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' পঞ্চান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিসসার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমিরের নির্দেশে নোকরটি ছুটল মৌলভীর কাছে। মৌলভীর পরামর্শে সে চারজন কোরাণ পাঠককে নিয়ে প্রাসাদে ফিরল।

কুয়োর ধারে চাঁদোয়া টাঙিয়ে শুরু হ'ল পুরোদমে কোরাণ পাঠ।

কয়েকজন জোয়ান মরদ টানাটানি করে বালতিটি ওপরে তুলে আনল। ওপরে এসে চাঁদ আলী তড়াক্ করে লাফিয়ে খাড়া হয়ে পড়ল।

আমীর কপাল চাপড়ে বলল—'ইয়া আল্লাহ! এ যে শুয়োর নয়, আদমী। এবার ডর ভয় কেটে গেল। হাত মাথার ওপরে তুলে চিল্লিয়ে উঠল—'হতচ্ছাড়া শয়তান কাঁহিকার! খালি-বাড়ি পেয়ে চুরি করতে ঢুকেছিলি? মেরে একদম জান খতম ক'রে ছাড়ব।'

—'খোদার কসম! আমি চোর-ডাকু নই। মেহেরবানি করে মারধোর করবেন না। এক গরীব ছেলে। টাইগ্রীসে মছলি পাকড়াও করে দিন গুজরান করি। দিনভর খেটেখুটে নদীর ধারে শুয়েছিলাম। নিদে বিভোর হয়ে পড়ি। নিদ টুটলে দেখি কুয়োর কাদা আর পানির মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছি। মেহেরবানি করে আপনি জান বাঁচিয়েছেন। খোদাতাল্লা আপনার ভালোই করবেন।'

আমীর ভাবল এ-আদমি স্রেফ নসীবের ফেরে রাতভর কাদা আর পানির মধ্যে তকলিফ ভোগ করেছে। তার ওপর বিলকুল উলঙ্গ নাকরকে দিয়ে পাৎলুন আনিয়ে পরতে দিল।

আমীর ব্যাপারটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সিপাহী সেনাপতি আহমদ-এর দরবারে পাঠিয়ে দিল। এদিকে আহমদ সন্ধ্যায় মকানে ফিরে তার পুরানো সাকরেদ চাঁদ আলী'কে না দেখে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়ে। চল্লিশজন সিপাহীকে নিয়ে রাতভর হন্যে হয়ে তামাম বাগদাদ নগর চষে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে মকানে ফিরে আসে। এবার আমিরের নোকররা নিয়ে এলে তার কলিজায় যেন পানির ছিঁটা পড়ল।

চাঁদ আলী মকান থেকে বেরনোর পর থেকে যা-যা ঘটেছে সবিস্তারে আহমদ-এর কাছে ব্যক্ত করল।
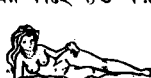
আহমদ সবকিছু শুনে নিঃসন্দেহ হ'ল, এ-কাজ নির্ঘাৎ জাইনাব-এর। সে এবার তার কাছে জাইনাব-এর হিম্মৎ ও কাণ্ডকারখানার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল। সবশেষে বল্‌ল—'যার দৌরাত্ম্যে তামাম বাগদাদের মরদরা জুজু হয়ে থাকে তুমি তারই খপ্পরে পড়েছিলে। খোদাতাল্লা-র দোয়ায় জান নিয়ে ফিরতে পেরেছ।

ইতিমধ্যে হাসানও সেখানে হাজির হয়েছে। আহমদ থামলে হাসান মুখ খুল্‌ল—'চাঁদ আলী, সবই তো শুনলে, এবার তুমি কি করতে চাও, বল?'

—'আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না। তাকে শাদী করতে চাই। আপনি পরামর্শ দিন। কোশিস করুন। শাদীর বন্দোবস্ত করুন।'

—'হ্যাঁ, বন্দোবস্ত আমি করে দেব। শাদী তোমাদের হবেই। লেকিন তোমাকে কসম খেতে হবে, আমার পরামর্শ ছাড়া অন্য কারো বাৎ শুনবে না। রাজী।'

—'রাজী। আজ থেকে আপনাকে আমি ওস্তাদ মানলাম। এবার হুকুম করুন—'

—'হুকুম? হ্যাঁ, কোর্তা-পাৎলুন খুলে একদম উলঙ্গ হয়ে যাও। লাজ শরম টরম শিকেয় তুলে রাখ।'

নিতান্ত বাধ্য লেড়কার মাফিক চাঁদ আলী কোর্তা-পাৎলুন খুলে হাসান-এর সামনে একদম উদোম হয়ে খাড়া হ'ল।

হাসান এবার ভুঁসো কালি এনে তার সারা গায়ে লেপে দিল। খুবসুরৎ চাঁদ আলী এবার বিলকুল এক নিগ্রো নওজোয়ান বনে

গেল। নিগ্রো নোকর। আসলি নিগ্রো।

হাসান এবার তাকে এক চিলতে কাপড় পরিয়ে লজ্জা নিবারণের বন্দোবস্ত করে দিল।

এবার চাঁদ আলী'কে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহ-র মকানে। রসুইখানার পাচকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার আশ্রয়ে থাকার জন্য।

হাসান জানে, পাচকটি কেবলমাত্র ডিলাইলাহ আর জাইনাব-এর জন্য খানা পাকায় না। চল্লিশজন চৌকিদার ও শিকারী কুকুরগুলোর খানার বন্দোবস্তও তাকেই করতে হয়।

হাসান চাঁদ আলী'কে বলে দিয়েছিল, সে যেন ডিলাইলাহ-র পাচককে বলে, একদিন ভেড়ার গোস্তর কাবাব বানাবে। তাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। তার রসুইখানায় এসে মৌজ করে কাবাব খেয়ে যায় যেন, সে তখন বলবে তার মালকিন কিছুতেই তাকে বাইরে যেতে দেবে না। সে-ই কাবাব বানাবে। আর চাঁদ আলী যেন পেটপুরে খেয়ে যায়। হাসান বার বার বলে দিয়েছে, চাঁদ আলী যেন কিছুতেই তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করে। এতেই নাকি কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

চাঁদ আলী তার বাৎ শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছিল—কাজ তো হাসিল হবে। লেকিন কিভাবে তা সম্ভব হবে?

হাসান ব্যাপারটি খোলসা করে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিল—চাঁদ আলী যেন কৌশলে ভেড়ার গোস্তর কাবাব নিজে কম খায়, ডিলাইলাহ-র পাচককে বেশী খেতে দেয়। এতে তার মেজাজ মর্জি পঞ্চমে চড়ে যাবে। তখন দিল্ খোলসা করে বাৎচিৎ করবে। তখন চাঁদ আলী যেন কৌশলে তার পেট থেকে যা কিছু জানার সব তথ্য টেনে বের করে নেয়। সবার আগে যেন জেনে নেয় ডিলাইলাহ ও জাইনাব কোন্ কিসিমের খানা পছন্দ করে। রসুইখানার চাবি কোথায় থাকে।

খানাপিনা শেষ হলে ডিলাইলাহ-র পাচক সরাব নিয়ে আসবে। চাঁদ আলি যেন তার সরাবের পেয়ালায় একগুলি আফিঙ ফেলে দেয়। সে-সরাব গলায় ঢাললেই সে নেশায় বুঁদ হয়ে যাবে। বেহুঁশ হয়ে এলিয়ে পড়বে। ব্যস, তখন ব্যস্ত হাতে তার কোর্তা পাৎলুন খুলে চাঁদ আলী যেন নিজের গায়ে চাপিয়ে নেয়। আর উলঙ্গ পাচককে নিয়ে কাঠকুটোর কামরায় তালা বন্ধ করে ফেলে রাখে।

এবার তার কাজ রাত্রের খানা পাকানো। খানার সঙ্গে যেন আফিঙ মিশিয়ে দেয়। ফলে সবাই খানাপিনার সারতে না সারতেই সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়বে। ব্যস, চাঁদ আলী এবার যেন খেল শুরু করে দেয়। ডিলাইলাহ, জাইনাব এবং চল্লিশজন চৌকিদার—সবার গা থেকে পোশাক আশাক খুলে একদম উলঙ্গ করে দেয়। গহনাপত্র যা কিছু থাকবে যেন বিলকুল খুলে নেয়। ব্যস, এবার সবকিছু গাট্টি
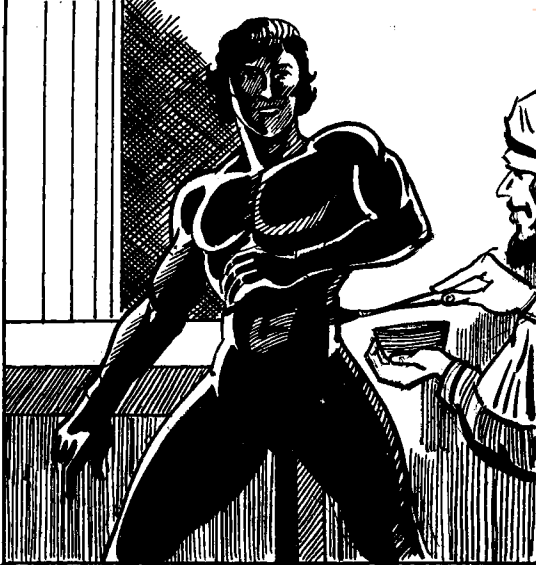
বেঁধে সোজা হাসান-এর কাছে চলে আসে যেন।

হাসান-এর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়। হাসান সবশেষে চাঁদ আলী'কে বলে দিয়েছিল, সে যেন ফেরার সময় চিড়িয়াখানা থেকে সবচেয়ে সেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চল্লিশটি কবুতর আনতে না ভোলে।

ডিলাইলাহ-র রসুইখানায় তার পাচকের সঙ্গে চাঁদ আলী-র ভেট হ'ল না। শুনল, বাজারে গেছে। চাঁদ আলী ব্যস্ত পায়ে বাজারের দিকেই ধাওয়া করল।

সব্জীর দোকানে মোলাকাৎ হ'ল। বাৎচিৎ সারল। তারপর চাঁদ আলী পূর্ব পরিকল্পনামাফিক নিজের রসুইখানায় তাকে নিমন্ত্রণ করল। সে যেতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। মালকিন জানতে পারলে নাকি জান নিয়ে নেবে।

ডিলাইলাহ-র পাচকটি বল্‌ল—'ভাইয়া, তারচেয়ে বরং তুমিই চলে আস না। মৌজ করে খানাপিনা করা যাবে। আমার মালকিনের ওপর দিয়েই খরচপাতি চালিয়ে নেব।

চাঁদ আলী সম্মত হয়ে নিগ্রো পাচকটির সঙ্গে ডিলাইলাহ-র বাড়ি চলে এল। হাসান-এর পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হ'ল। সে পাচকের সরাবের সঙ্গে আফিঙ মিশিয়ে তাকে নেশায় বুঁদ ক'রে ফেল্‌ল। তারপর তার পেট থেকে এক এক করে কথা বের ক'রে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নেশার ঘোরে এলিয়ে পড়ল। চাঁদ আলী পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক তার কোর্তা-পাৎলুন খুলে নিজে পরে নিল। এবার তাকে উলঙ্গ অবস্থায় টানতে টানতে পাশের ছোট্ট একটা কামরায় ঢুকিয়ে দরওয়াজায় তালা বন্ধ করে দেয়া হ'ল।

চাঁদ আলী এবার নিগ্রো পাচকটির কাছ থেকে শুনে রাখা খানাগুলি পাকাল। চৌকিদারদের শিকারী কুকুরগুলোর জন্যও খানা পাকাল। সবার খাবারের সঙ্গে দিল আফিঙ মিশিয়ে।

ডিলাইলাহ ও তার লেড়কি জাইনাব খানা খেয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চৌকিদার ও কুকুরগুলোও এলিয়ে পড়ল। চাঁদ আলী এবার ব্যস্ত-হাতে সবার পোশাক পরিচ্ছদ খুলে পোটলা বেঁধে ফেল্‌ল। উলঙ্গ, বৃদ্ধা ডিলাইলাহ ও তার যুবতী লেড়কি জাইনাব থেকে শুরু করে চৌকিদাররা পর্যন্ত সবাই বিলকুল উলঙ্গ হয়ে বেহুঁস অবস্থায় এলিয়ে পড়ে রইল।

জাইনাব উলঙ্গ হয়ে পড়ে রয়েছে। তার যৌবনচিহ্নগুলো চাঁদ আলী-র চোখের সামনে ভেসে উঠল। পেঁজা তুলতুলে তার শরীর। স্তনদুটো একদম নিটোল। সমুন্নত। চাঁদ আলী-র দিল্‌কে পাগলা ক'রে দিতে লাগল। তার কলিজায় কামনার আগুন জ্বলে উঠল। শিরা-উপশিরায় খুনের গতি মুহূর্তে শতগুণ বেড়ে গেল। খুনে লাগল মাতন। তার তলপেটটির দিকে চোখ পড়তেই শরীরের সব ক'টি স্নায়ু যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। তলপেটটি পর্বতের ঢালের মাফিক ক্রমশ ঢালু হতে হতে একটি বিশেষ জায়গায় গিয়ে মিশেছে। কী বাহার! ওঃ কী তার বাহার! তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লাহ! কী বাহার!' মুহূর্তে তার কলিজাটি মোচড় মেরে ওঠে। দিল্ চাইল নসীব সম্বল ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে দু'পা সরে যায়। সে দু'দিন বাদে যাকে বিবি বানাবে, তামাম জিন্দেগীর জন্য আপন ক'রে পাবে, কাছে কাছে রাখতে পারবে তার কুমারীত্ব তস্করের মাফিক হরণ করতে সে রাজী নয়।

চাঁদ আলী লালচ সংযত রাখলেও জাইনাব-এর যৌবনভরা, দিল্ পাগলকরা দেহটিকে ফেলে সরে যেতে পারল না। তার পাশে বসল তার উলঙ্গ, বিলকুল উলঙ্গ দেহটির যৌবনচিহ্নগুলোকে বার বার দলন, পেষণ ও চুম্বন করতে লাগল। জিন্দেগীতে সে এত সুখ আছে সে আজই প্রথম অনুভব করল।

চাঁদ আলী-র মাথায় খেয়াল চাপল, সংজ্ঞাহীন জাইনাব-এর পায়ের তালুতে সুড়সুড়ি দিয়ে দেখবে, প্রতিক্রিয়া কি হয়। করলও তা-ই। ব্যস, মুহূর্তে জাইনাব দিল্ আচমকা পা'টি ছুড়ে। একদম তার মুখে আঘাত লাগল।

আচমকা লাথি খেয়ে চাঁদ আলী একদম বেকুব বনে গেল।

চাঁদ আলী-র এখনও বহুৎ কাম কাজ বাকী। সবাই বে-হুঁস অবস্থায় থাকতে থাকতেই তাকে কাজ মিটিয়ে এখান থেকে চম্পট দিতে হবে। তার হুঁস হ'ল—হাসান বার বার বলে দিয়েছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কবুতরগুলিকে যেন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এবার ব্যস্ত হাতে সবগুলি কবুতরকে একটি খাঁচায় পুরে ফেল্‌ল।

গোছগাছ যা কিছু করার চাঁদ আলী ইতিমধ্যেই মিটিয়ে ফেলেছে।

ডিলাইলাহ ও জাইনাব-এর গায়ের যাবতীয় গহনাপত্রের পোটলাটি চাঁদ আলী কোর্তার জেবে চালান দিয়ে দিল। পোশাক আশাকের পোটলাটি নিল এক কাঁধে। আর অন্য কাঁধে কবুতরের খাঁচাটি তুলে নিয়ে সে পথে নামল। লম্বা লম্বা পায়ে হন হন ক'রে এগিয়ে চল্‌ল হাসান-এর মকানের উদ্দেশ্যে।

হাসান পিঠ চাপড়ে সোল্লাসে বল্‌ল—'সাবাস বাহাদুর নওজোয়ান। তুমি যে একদম কামাল ক'রে দিয়েছ! ঘাবড়াও মাৎ বেটা, জাইনাব-এর সঙ্গে তোমার শাদীর বন্দোবস্ত আমি করবই, দেখে নিও।'

এদিকে ভোর অনেক আগেই হয়ে গেছে। তবু ডিলাইলাহ-র মকানের কারোরই নিদ টুটল না। তবে সবার আগে চোখ মেলে তাকাল ডিলাইলাহ-ই। বুঝতে পারল সে বিলকুল উলঙ্গ। তাজ্জব বনল। এদিক-ওদিক তাকাল। লেড়কি জাইনাব-এর দিকে তাকাতেই তার চোখ কপালে উঠে গেল। মাথা ভারী। ঝিমঝিম

করছে। নিঃসন্দেহ হ'ল। গত রাত্রে নির্ঘাৎ কেউ না কেউ খানা বা সরাবের সঙ্গে বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল।

চটজল্‌দি বিছানা ছেড়ে উঠে সালোয়ার-কামিজ পরে নিল। এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খলিফার সংবাদবাহী কবুতরগুলো কে যেন হাফিস করে দিয়েছে। খলিফা জানতে পারলে জান খতম করে দেবেন। এখন উপায়? কোন ফন্দি ফিকিরই মাথা দিয়ে বেরলো না।

ডিলাইলাহ এবার দৌড়ে নিচে গেল। দেখল কুকুরগুলো এক একটি এখানে-ওখানে পা ছাড়িয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে।

ডিলাইলাহ-র দিমাক খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। উন্মাদিনীর মাফিক নিগ্রো চৌকিদারদের ওখানে গেল। এদেরও একই হালৎ। কারোরই হুঁস নাই।

ডিলাইলাহ এবার তার একমাত্র লেড়কির ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে লাগল। তবে কি- - -তবে কি জাইনাব-এর কুমারীত্ব নষ্ট করার জন্যই কোন শয়তান লোচ্চার এ-পথ অবলম্বন করেছে?

সে এবার বিবস্ত্রা বেহুঁস জাইনাব-এর পাশে এসে বসল। তার নিম্নাঙ্গ ভালভাবে পরীক্ষা করল। খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল সব কিছু। না, তার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই রয়েছে মালুম হচ্ছে। তবে তার সমুন্নত স্তন দুটোর গায়ে কেমন যেন লালচে ছোপ, দীর্ঘ সময় ধরে দলাই মলাই করলে ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে। আর? ঠোঁট দুটোতে যেন খুন জমে গেছে। ব্যস্ততার সঙ্গে চুম্বন করতে গিয়ে এক জায়গায় সামান্য কাটা। দাঁতের দাগ। তবে সর্বনাশ বলতে যা বুঝায় তেমন কিছু করে নি। খোদা ভরসা। এমন সুযোগ পেয়েও এর মাফিক খুবসুরৎ এক উদ্ভিন্ন যৌবনা লেড়কির ইজ্জৎ না নিয়েই শয়তানটি কেন যে বিদায় নিয়েছে বহু ভাবনা চিন্তা করেও ডিলাইলাহ তার কিনারা করতে পারল না। খোদাতাল্লা-র মেহেরবানি না থাকলে এমনটি কিছুতেই হতে পারে না।

ডিলাইলাহ যখন তার লেড়কির বিবস্ত্র দেহের কাছে বসে আশমান-জমিন ভেবে চলছিল তখন তার হঠাৎ নজরে পড়ে তার মাথার কাছে রক্ষিত এক চিলতে কাগজ। তাতে কয়েক ছত্র লেখা —"কায়রোর চাঁদ আলী আমি। তামাম কায়রো ঢুঁড়লেও আমার সমান সাহসী ও যোদ্ধা দ্বিতীয় একটি মিলবে না। এমন কি বাগদাদেও না পাওয়ারই কথা। এমন অসীম শক্তি-সাহসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সবাই আমাকে সভ্য ভব্য বলেই জ্ঞান করে। তুমিও নিশ্চয়ই তা দিল্ থেকে মেনে নেবে যখন বুঝবে তোমাকে বিলকুল হাতের মুঠোয় পেয়েও আমি তোমার কুমারীত্ব হরণ করি নি। আমার দিল্-কলিজাই আমাকে এরকমটি করার নির্দেশ দিয়েছে।"

ডিলাইলাহ চিঠিটি পড়ে এত দুঃখের মধ্যেও ভেতরে ভেতরে যার পর নাই খুশী হ'ল।

এক সময় জাইনাব-এর নিদ টুটল।

ডিলাইলাহ লেড়কি'কে সব খোলসা ক'রে বল্‌ল।

লেড়কির সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে বাৎচিৎ করতে করতে এক সময় সে বল্‌ল—'বেটি, লেড়কাটি ইমানদার বটে। তোর ইজ্জৎ নেয় নি। তুই যখন নিদে বেহুঁস হয়েছিলি তখন আমি তোর সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। আমাদের সব কিছু চুরি করেছে বটে। লেকিন তোর ইজ্জৎ চুরি করে নি। কেবলমাত্র এটুকুর জন্যই আমাদের উচিত তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা। খলিফা আমার বিচার করবেন, আমার অজানা নয়। তবু তাকে ঠগ জোচ্চর জ্ঞান করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দিল্ উদার। সে সাচমুচ মহৎ। নইলে কামতৃষ্ণাকে এমন করে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

তার লেড়কি জাইনাব গম্ভীর মুখে সালোয়ার-কামিজ পরতে লাগল।

ডিলাইলাহ মকান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল চাঁদ আলী-র তাল্লাশে। হাজির হ'ল হাসান-এর মকানে। দরওয়াজার কড়া নাড়তেই চাঁদ আলী শিটকিনি খুলে সামনে দাঁড়াল।

ডিলাইলাহ এক লহমায় চাঁদ আলী-র মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে মুচকি হাসল।

হাসান কুরশীতে বসে নাস্তা সারতে ব্যস্ত ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে ডিলাইলাহ'কে দেখেই হেসে স্বাগত জানাল। কুরশী দেখিয়ে বল্‌ল—'মেহেরবানি ক'রে বসুন। আমরা কবুতরের গোস্ত দিয়ে নাস্তা—'

ডিলাইলাহ সচকিত হয়ে, চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—কবুতরের গোস্ত! আপনাদের বিবেকে এতটুকুও বাঁধল না খলিফার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংবাদবাহী কবুতরগুলোকে চুরি ক'রে এনে—।

হাসান যেন একদম আশমান থেকে জমিনে পড়ল। চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'কবুতর! খলিফার কবুতর। আপনার চিড়িয়াখানা থেকে খলিফার কবুতরকে চুরি করেছে? কি যা-তা বকছেন, বলুন তো?'

ডিলাইলাহ মুখ বিকৃত করে ব'লে উঠল—'ন্যাকামি করছেন, মালুম হচ্ছে। যেন কিছুই জানেন না, কে, কবে চুরি করেছে? চাঁদ আলী—কায়রোর গুণ্ডা চুরি করে ভেগেছে।'

—'ইয়া আল্লাহ! এ কী বাৎ শোনালেন? খলিফার সংবাদবাহী কবুতর! আমি তো জানতাম সাধারণ, জঙ্গলী কবুতর। এতগুলো কবুতর কেটে রসুইখানায়—।'

—'বাজে ধান্দা ছাড়ুন! আমার কবুতর আমাকে ফিরিয়ে দিন। নইলে খলিফা আমার গর্দান নিয়ে ছাড়বেন। জান একদম খতম ক'রে দেবেন।'

হাসান এবার মোওকা বুঝে আদত মতলবটি ডিলাইলাহ-র কাছে তুলে ধরল—'শুনুন, কবুতর আমি ফিরিয়ে দিতে পারি। লেকিন আপনাকে তার বিনিময়ে আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ রাখতে হবে। একে শর্তও বলতে পারেন।'

—'অনুরোধ? কি সে-অনুরোধ? কি সে-শর্ত?'

—'চাঁদ আলী-র সঙ্গে আপনার লেড়কির শাদী দিতে হবে, বলুন রাজী?'

বৃদ্ধা ডিলাইলাহ সোল্লাসে ব'লে উঠল—'আরে এ যে আমারই ইচ্ছা আপনার মুখ দিয়ে প্রকাশ পেল। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা প্রস্তাব। লেকিন—।'

তার মুখের বাৎ ছিনিয়ে নিয়ে হাসান বল্‌ল—'এতে লেকিন টেকিনের সুযোগ নেই। বলুন, রাজী কি না?'

—'ওই যে বল্‌লাম, আমি তো এক পায়ে খাড়া। লেকিন লেড়কির আমার বয়স হয়েছে। তার নিজেরও তো মতামত থাকতে পারে। সে রাজী হলে আমি অবশ্যই খুশী হ'ব। লেকিন এতেও সমস্যা থেকে যায়। আমার বড়-ভাইয়া জুরেক-এর মতামতেরও দাম দিতে হয়। তবে আমি অবশ্যই আমার বেটি ও বড়-ভাইয়াকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনার সাধ্যাতীত কোশিসই করব।'

হাসান এবার আশ্বস্ত হয়ে তার কবুতরের পিঞ্জরটি ফিরিয়ে দিল।

ডিলাইলাহ কবুতর নিয়ে নিজের মকানে ফিরল। জাইনাব'কে তলব করল। সে এলে সোল্লাসে বল্‌ল—'বেটি, তোর জন্য বহুৎ বড়িয়া এক খবর নিয়ে এসেছি।'

জাইনাব ভ্রূ কুঁচকে বল্‌ল—'বড়িয়া খবর? কি সে-খবর আম্মা?'

—'চাঁদ আলী খুবসুরৎ লেড়কা। হাজারো গুণ তার। সে

তোকে শাদী করতে চায়। আমি বলছি তাকে পেলে তোর নসীব খুলে যাবে।'

—'তোমার যখন দিলে ধরে গেছে তখন আমার আর কি বলার থাকতে পারে। আমার জিন্দেগী নিয়ে তোমার চেয়ে ভাল কে আর বুঝবে?'

লেড়কির মত পেয়ে ডিলাইলাহ এবার ছুটল তার বড়-ভাইয়ার কাছে।

আলী হাসানও চাঁদ আলীর ব্যাপারটি নিয়ে কম ভাবিত নয়। সে তৎপরতার সঙ্গে একের পর এক ধাপ এগিয়ে চল্‌ল।

ডিলাইলাহ-র বড় ভাইয়া শুঁটকিমাছের কারবারী। এক সময় শরীরে যখন তাকত ছিল, খুনের জোর ছিল তখন সে তামাম বাগদাদ নগরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই আর খুন জখমের ব্যাপারে তার সমান কেউ ছিল না। এখন শুঁটকিমাছ সামনে নিয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকে। গুণ্ডা মস্তানরা বে-কায়দায় পড়লে তার কাছে ছুটে আসে। শলাপরামর্শ করে। কাজ হাসিলের কায়দা কসরৎ জেনে যায়।

আলী হাসান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—চাঁদ আলী, জুরেক আজ বুড়ো হয়েছে সত্য। চলাফেরা দৌড় ঝাঁপের হিম্মৎ আজ আর তার নেই। লেকিন বুড়ো হাড়েও সে আজ ভেল্কী দেখাতে পারে। আমরা আজও তার নাম শুনলে থমকে যাই। তার কাছে জাইনাব'কে শাদী করার প্রস্তাব দিয়ে কোন ফয়দা হবে ব'লে আমার অন্ততঃ বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার এই তো বয়স চাঁদ আলী। তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু ঐ লেড়কির তোয়াক্কাই করতাম না। জাইনাব সাচ্চা আগুনের হল্কা। এক লহমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দেবে। তার চেয়ে বরং তুমি এসব ধান্দা দিল্ থেকে মুছে ফেল। ভবিষ্যতে জাইনাব-এর চেয়ে খুবসুরৎ লেড়কি ঠিক জুটে যাবে। দিল্ থেকে তাকে একদম মুছে ফেল।'

—'না, ওস্তাদ। সে যে হবার নয়। তার খুবসুরৎ মুখাবয়ব, তার হরিণের মাফিক চপল চাপল চাহনি যে আমার পক্ষে দিল্ থেকে মুছে ফেলা কিছুতেই সম্ভব নয়। শত কোশিস করলেও পারব না। তাকে বুকে না পেলে আমার জিন্দেগী একদম বরবাদ হয়ে যাবে।'

—'ছায়ার পিছনে মিছে ছুটে কি ফয়দা হবে?'

—'আমি এর যা হোক হিল্লে করে ছাড়বই। জুরেক-এর দোকানে আমি যাবই। দেখাই যাক না তার মতিগতি কি? আমি বল্‌লাম।' চাঁদ আলী কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' আটান্নতম রজনী

চাঁদ আলী হন্তদন্ত হয়ে বাজারে ঢুকল। তাল্লাশী চালিয়ে জুরেক'কে বের করল। হাড্ডিসার এক বুড়ো। শুঁটকি মাছের পাহাড়ের মাঝে বসে।

চাঁদ আলী দোকানের সামনে দাঁড়াতেই বুড়ো নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে তাকাল। ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌ল—'মতলব কি হে?'

—'আপনার ভাগ্নীকে আমি শাদী করতে চাই। তার মত হয়তো পাওয়া যাবে। আপনি রাজী হয়ে যান। আমাদের শাদী-নিকার বন্দোবস্ত করে দিন।'

—'আমার ভাগ্নী—জাইনাব? বহুৎ আচ্ছা। লেকিন মিঞার পেশা কি?'

—'বড়িয়া ধান্দার কারবারী। আপনি তো এ-ধান্দার শিরোমণি ছিলেন এক সময়। আপনার পুরনো বিষয় সমাচার আমি জানি। আপনার বহিন ও ভাগ্নীও এখন আপনার সে-কারবারে হাত পাকিয়েছেন। ছলচাতুরী ও জোচ্চোরিতে তারা বাগদাদ নগরের মধ্যে সেরা। আর আমার হিম্মতের নমুনা খুব কমই আমি তাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। তবে আমার নিজের মুলুক কায়রোর আদমি আমার হিম্মতের পরিচয় বহুবারই পেয়েছে। আর তাতে আয়-আমদানিও কম হয় না।'

বুড়ো আড়চোখে তাকায়। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে—'হ্যাঁ, বহুৎ আচ্ছা। লেকিন তোমার হিম্মতের পরিচয় যে কিছু আমি পেতে চাই মিঞা সাব।'

—'পরিচয়। জরুর দেখাব। লেকিন কিভাবে আমার হিম্মতের পরিচয় দেব? কিভাবে আপনাকে আমি খুশী করতে পারি খোলসা করে বলুন?'

—'অর্থ কড়ির ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে বলছি। শাদী করলে দেনমোহর মেটাতে হবে তো?'

—'জরুর দেব। কিভাবে তা পেতে চান?'

—'শোন বেটা, এ-নগরে এক ইহুদী জহুরী বাস করে। যাদু বিদ্যায় পারদর্শী। আজারিয়াহ তার নাম। তার একটিমাত্র লেড়কি। তার এক প্রস্ত সোনার পোশাক, এক জোড়া সোনার জুতা, একটি সোনার তাজ আর কিছু হীরা-জহরতের গহনাপত্র রয়েছে। আমার ভাগ্নীকে শাদী করতে হলে ওইসব দেনমোহর হিসাবে দিতে হবে। হিম্মত যদি থাকে রাজী হয়ে যাও।'

—'জরুর পারব। আমার কাছে এ কোন ব্যাপারই নয়।'

—'ইহুদী জহুরী যাদু জানে বল্‌লামই তো। সোনা আর রুপা দিয়ে তৈরি ইয়া পেল্লাই এক মঞ্জিলে সে থাকে। নগর থেকে দূরবর্তী এক মাঠে সে-মঞ্জিল। ধারে কাছে কোন বসতি নেই। তাজ্জব ব্যাপার কি শোন, দিনের আলো তার মঞ্জিলটির হদিস আজ পর্যন্ত কেউ-ই পায় নি। যাদু মন্ত্রের সাহায্যে মঞ্জিলটিকে অদৃশ্য করে দিয়ে তবে সে সকালে দোকানে আসে। ফলে চোর, ডাকাত বা গুণ্ডারা মঞ্জিল থেকে সামানপত্র গায়েব করতে পারে না। বুঝছ না মঞ্জিলটির হদিস পেলে তবে তো চুরি-ডাকাতি বা লুটপাটের প্রশ্ন আসে। কি, পারবে আমার চাহিদা পূরণ করতে?'

—'ধ্যুৎ! এ আবার আমার কাছে কোন সমস্যা নাকি। ঘাবড়াবেন না। দেখবেন, আমি ঠিক কাজ হাসিল করে সবকিছু এনে হাজির করব।'

বুড়ো জুল্ জুল্ ক'রে তাকিয়ে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা! যদি হিম্মতে কুলোয় তবে আমি তোমাকে কায়রোর সাচ্চা লালু ব'লে মেনে নেব।'

বুড়ো জুরেক-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চাঁদ আলী জহুরী-বাজারে হাজির হ'ল। তার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এক লহমায় দেখেই যাদুকর জহুরীকে সনাক্ত ক'রে ফেলে। ভয়ঙ্কর রকমের কুদর্শন। প্রথম দর্শনেই গা-ঝাঁড়া দিয়ে ওঠে। পুরোদমে গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে। গিদ্দরের মত তার চাহনি। হাড় গিলা পাখির মাফিক ভঙ্গিমায় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করছে।

একটি নাদুসনুদুস খচ্চর দাঁড়িয়ে। বুড়ো যাদুকর জহুরীটি তার পিঠে এক-এক ক'রে সোনার বস্তা চাপাচ্ছে। কাজ সেরে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করল। যাদুমন্ত্র দিয়ে খচ্চরটিকে অদৃশ্য করে দিল। ব্যাস, এবার দোকান বন্ধ ক'রে কুঁজো হয়ে হাঁটা জুড়ল। এমন ভাব যেন অদৃশ্য খচ্চরটিকে সে অনুসরণ ক'রে চলেছে।

চাঁদ আলী বুড়ো যাদুকর জহুরীর পিছু নিল। তাজ্জব ব্যাপার। তারা হাঁটছে তো হাঁটছেই। ধারে কাছে কোন লোকালয়ই নজরে পড়ছে না। তামাম বাগদাদ যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। যেদিকে তার নজর যায় কেবল ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠ।
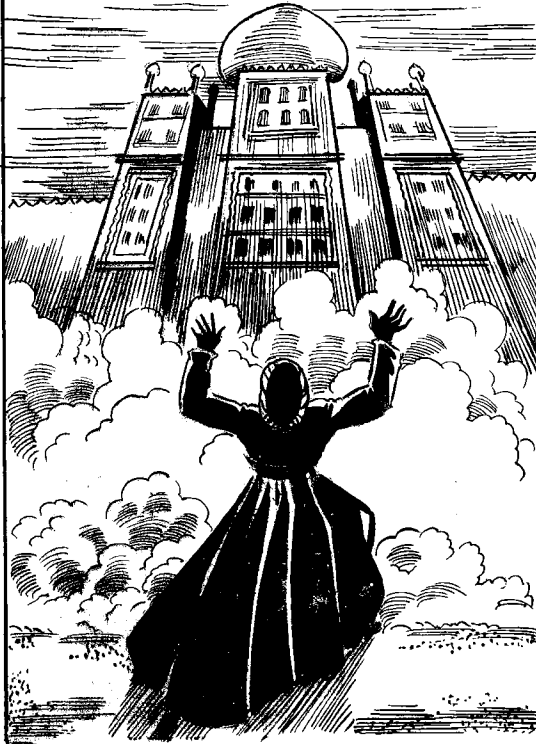
চাঁদ আলী হাঁটতে হাঁটতে হয়রান হয়ে পড়ে। বিরক্ত হয়। ভাবে হতচ্ছাড়া বুড়ো কি আর থামবে না!

হ্যাঁ, বুড়ো যাদুকর জহুরী এক সময় থমকে দাঁড়াল। ঠোঁট নেড়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কি যেন মন্ত্রতন্ত্র আওড়াল। তাজ্জব ব্যাপার। উন্মুক্ত প্রান্তরে সুবিশাল এক মঞ্জিল গড়ে উঠল।

শুঁটকি মাছের কারবারী বুড়ো জুরেক-এর বাৎ বিলকুল সাচ্চা। মঞ্জিলটি সোনা আর রুপা দিয়ে তৈরি।

এবার আরও তাজ্জব ব্যাপার ঘটল। বুড়ো জহুরী-খচ্চরটির পিঠে চাপল। চোখের পলকে খচ্চরটি সমেত সে বিলকুল হাফিস হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত বাদে বুড়ো জহুরীটি ফিন দৃশ্যমান হ'ল। এক জানলায় দাঁড়িয়ে। একটি বড়সড় থালায় এক লেড়কির সোনার সালোয়ার কামিজ—বিলকুল সাজগোছ, এক জোড়া সোনার জুতা, মাথায় হীরা-জহরৎ খচিত সোনার তাজ।

তাজ্জব ব্যাপার। হাড়গিলা পাখির মাফিক গলা বাড়িয়ে নচ্ছার জহুরী চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'শোন কায়রোর লালু। তোমার ডরে নাকি তামাম আরব, ইরাক, ইরান আর পারস্যের আদমি জুজু হয়ে থাকে? তোমার তাকত একবারটি দেখতে চাই। যদি পার আমার লেড়কির এসব সামানপত্র নিয়ে যাও তো দেখি। যদি পার তবে আমার বিলকুল সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে দেব। আর আমার লেড়কিকে তোমার সাথে শাদী দেব।'

চাঁদ আলী বিবেচনা করে দেখল, জুরেক-এর সঙ্গে তার যে সন্ধি হয়েছে সে-কথা তাকে জানানো দরকার।

চাঁদ আলী জোর ক'রে দিল্‌কে শক্ত করল। বুড়ো জহুরীর কামরায় গেল।

বুড়ো শুধাল—'কি নাম তোমার? এখানে কোন্ মতলবে এসেছ, বল তো?'

—'আমার নাম চাঁদ আলী। শুঁটকি মাছের কারবারী বুড়ো জুরেক-এর এক ভাগ্নী আছে।'

—'হ্যাঁ, সাচ্চা বাৎ বটে।'

—'তার নাম জাইনাব। আমি তাকে শাদী করতে আগ্রহী।'

বুড়ো যাদুকর জহুরী নীরবে তার বক্তব্য শুনতে লাগল।

চাঁদ আলী এবার বল্‌ল—'লেকিন সে-বুড়ো শাদীর দেনমোহর হিসাবে আমার কাছে আজব সব সামানপত্র দাবী করেছে।'

—'আজব সামানপত্র? কি? কি সে সামানপত্র?'

—'আপনার লেড়কির ব্যবহারের সোনার সালোয়ার-কামিজ ও অন্যান্য সোনার পোশাক, সোনার জুতো আর হীরা-জহরৎ খচিত মাথার সোনার তাজ। এসব জোগাড় না করলেই নয়, আশা করি বুঝতে পারছেন।

—'তোমার কি এ-ই বিশ্বাস যে চাইলেই আমি দিয়ে দেব? দান খয়রাৎ করার জন্য আমি তৈরি হয়ে বসে নাকি হে?'

—'এমন বহুমূল্য সামানপত্র যে কেউ কাউকে এমনিতে দিয়ে দেয় না তা কি আমি বুঝি না। কিভাবে সেগুলো আমার হাতে আসতে পারে সে-মতলব এঁটে তবেই আমি পা-বাড়িয়েছি।'

—'মতলব এঁটেই এসেছ? এ কিরকম বাৎ হ'ল, মালুম হচ্ছে না তো। তবে কি তুমি হাফিস ক'রে দেয়ার ধান্দায় আছ নাকি হে?'

—'হ্যাঁ, চুরি-ডাকাতি যা হোক কিছু তো করতেই হবে।'

—'জানের মায়া যদি না কর তবে অবশ্য গোরে যাওয়ার মতলব থাকলে কোশিস করে দেখতে পার। শোন, এসব সর্বনেশে ধান্দা ছেড়ে কাম কাজের ধান্দা কর গে। এর আগে অনেকেই এ-ধান্দা করতে এসে বেঘোরে জান দিয়েছে। তোমারও বিলকুল একই গতি হবে। ইয়াদ রেখো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য যাদুকর বুড়ো জহুরী নীরব হ'ল। তার পর ফিন মুখ খুলল—'একটু থাম বেটা, আমি গুণে দেখছি। যদি গণনার ফল দেখা যায় তোমার জান আমারই হাতে যাবে লেখা আছে তবে তোমার দেহ আর মুণ্ডু আলাদা করে ছাড়ব, ইয়াদ রেখো।'

বুড়ো আঁক জোক কেটে গণনা করল। তারপর সে যেন বিলকুল বদলে গেল। এমন ভাব দেখাতে লাগল সে যেন চাঁদ আলী-র নিতান্ত অনুগত নোকর। চাঁদ আলীর বাঞ্ছা পূরণ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল। আদতে এ তার বাহানা মাত্র। কয়েক লহমা পেরোতে না পেরোতেই বুড়ো যাদুকর একদম খেঁকিয়ে উঠল।

তুমি আমার ওপরে যে-হাত তুলেছ সে-হাতটি পাথর বনে যাক। বিলকুল পাথর বনে যাক।

ব্যস, এক লহমায় চাঁদ আলী-র হাত থেকে তরবারিটি টপ্ ক'রে খসে পড়ল। হাতটি কেমন নিঃসার হতে লাগল। সে চোখের পলকে বাঁ-হাতে তরবারিটি তুলে নিল। বুড়ো যাদুকর এবার বল্‌ল—তোমার ডান-হাতের মত বাঁ-হাতটিও পাথর বনে যাক।'

ব্যস, তার বাঁ-হাতের তরবারিটিও খসে পড়ল। চাঁদ আলী রাগে বিলকুল ফেঁটে পড়ার জোগাড় হ'ল। আচমকা সে বুড়ো ইহুদী যাদুকরের তলপেটে সজোরে এক লাথি মারল। বুড়ো লুটিয়ে পড়ল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার বল্‌ল—'তোমার ডান-পাটিও পাথর বনে যাক। চাঁদ আলীর ডান পা পাথর বনে যাওয়ায় সে একমাত্র বাঁ-পায়ের ওপর নির্ভর ক'রে খাড়া হয়ে রইল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' বায়ট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার উপস্থিত হলে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—

'জাঁহাপনা, যাদুকর বুড়োর যাদুবিদ্যার বলে চাঁদ আলী তার দুটো হাত এবং ডান-পা হারাল। সে বিলকুল পাথর বনে যাওয়া অঙ্গ গুলিতে বল ফিরে পাওয়ার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাল। ব্যর্থ প্রয়াস।

বুড়ো যাদুকর বিশ্রী সুরে হেসে বল্‌ল—'কি বুঝলে? এবার কি করবে। এখনও কি আমার লেড়কির সামানপত্র হাফিস করার মতলব আছে?' কথা ক'টি ব'লে তামাটে দাঁতগুলো বের ক'রে বুড়ো ফিন ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসতে লাগল।

আলী অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে করুণ স্বরে বল্‌ল—'আমি এখন বে-কায়দায় পড়ে নাজেহাল হচ্ছি বটে। বিলকুল অসহায়। লেকিন আমার মতলব থেকে এক তিলও সরছি না। ফিকির কিছু না কিছু বের করতেই হবে। জাইনাব আমার চোখের মণি। আমার বর্তমান-ভবিষ্যৎ—সবকিছু। তাকে আমার বুকে পেতেই হবে। জান কবুল করেও তাকে পেতেই হবে। তাই আপনার লেড়কির সামানপত্র যে করেই হোক আমাকে হাতাতেই হবে।

যাদুকর বুড়োর মুখে আবার বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। ব্যঙ্গের স্বরে বল্‌ল—'সে না হয় আমার লেড়কির সামানপত্র গায়েব করলে। আমি ভাবছি অন্য কথা। তুমি কায়রোর শের। এমন মান ইজ্জৎ যার সে কি এতগুলো সামানপত্র নিজে কাঁধে ক'রে বইবে নাকি! ইজ্জৎ বিলকুল পথে লুটাবে যে! তার চেয়ে বরং তোমাকে একটি খচ্চর বানিয়ে দিচ্ছি। তখন পিঠে সামানপত্র বইলে কেউ আর মস্করা করবে না। কথা বলতে বলতে বুড়ো এক গণ্ডুষ পানি নিল। বিড়বিড় ক'রে কি সব মন্ত্র আওড়ে তা চাঁদ আলীর ওপর দিল ছিঁটিয়ে। ব্যস, সে বিলকুল এক খচ্চর বনে গেল।

যাদুকর বুড়ো ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে এবার খচ্চররূপী চাঁদ আলী-র দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা! খুবসুরৎ এক খচ্চর বনে গেছে! বিলকুল আদৎ খচ্চর! তোমার সুরৎ নিজে যদি দেখতে পারতে একদম তাজ্জব বনে যেতে।'

চাঁদ আলী ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল। গাধা বনার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখের ভাষাও হারিয়ে ফেল্‌ল। তার কলিজার জ্বালা, তার আশা-হতাশা—কিছুই প্রকাশ করতে পারল না।

যাদুকর এবার এক টুকরো কয়লা দিয়ে চাঁদ আলীর চার দিকে একটি বৃত্ত এঁকে তাকে বন্দী ক'রে ফেল্‌ল। দিল্ চাইলেও যাতে দৌড়ে পালাবার ধান্দা করতে না পারে।

চাঁদ আলী তামাম রাত্রি ফাঁকা জায়গায় অসহায়ভাবে খাড়া হয়েই গুজরান ক'রে দিল। থেকে থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া সে কিছুই করতে পারল না।

সকাল হ'ল। যাদুকর বুড়ো নিচে নেমে এল। তার পরনে বাইরে বেরোবার সাজ পোশাক। খচ্চররূপী চাঁদ আলী-র পিঠে চেপে

বসল। এবার তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল। পথে যেতে যেতে বল্‌ল—'একটু-আধটু ফয়দা তো হ'ল। আমার বুড়ো খচ্চরটি একটি দিনের জন্য বিলকুল রেহাই পেল। পা ছড়িয়ে শুয়ে আরাম করতে পারল। আর তোমাকে হাটে বেচে কিছু আয় উপার্জনের ফিকির ক'রে নিতে পারব।

খচ্চররূপী চাঁদ আলীর মুখে ভাষা নেই। সে দীর্ঘশ্বাস আর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বুড়ো যাদুকরকে পিঠে বয়ে নিয়ে বাজারের পথে নীরবে হাঁটতে লাগল। মুহূর্তে একদম হাফিস হয়ে গেল।

বৃদ্ধ যাদুকর জহুরী অন্যদিন যে-জায়গায় তার খচ্চরটিকে বেঁধে রাখত *আজ সে-জায়গাতেই চাঁদ আলীকে বাঁধল। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মাফিক টকটকে লাল সূর্যটিকে মাথার ওপরে নিয়ে দিনভর সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে একবার একটি গামলায় কিছু শুকনো ছোলা দিয়ে গেল। ব্যস, খানাপিনা বলতে এটুকুই।

খচ্চররূপী চাঁদ আলী টুলটুল ক'রে তাকিয়ে দেখল, বুড়ো জহুরী দিনভর নিক্তিতে সোনা ওজন ক'রে ক'রে বস্তা বোঝাই করল।

চাঁদ আলীর থেকে থেকে বিকট স্বরে চিৎকার ক'রে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। দিনের শেষে ধৈর্য ধরতে না পেরে গামলা থেকে পানি মুখে ক'রে নিয়ে বৃদ্ধ জহুরীর গায়ে বার-কয়েক ছিঁটিয়ে দিল।

বৃদ্ধ জহুরী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল—'শয়তান বেতমিস কাঁহিকার! দাঁড়াও তোমার মস্করা বের করছি।

বিকালের দিকে এক ইহুদী লেড়কা জহুরী আজারিয়াহ্‌-র দোকানে ঢুকল। বল্‌ল—'জহুরী সাহাব, বড় মুশকিলে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এলাম। আমার ব্যবসা বিলকুল লাটে উঠে গেছে। বালবাচ্চা নিয়ে উপোষ যাবার ফিকির হয়েছে। আমার বিবির এক জোড়া বাজু নিয়ে এসেছি। বেচে দেব, হিসাব কষে যা হয় দিন। তা দিয়ে একটি গাধা আর ভিস্তি কিনব। ভেবেছি মহল্লার আদমীদের দুয়ারে দুয়ারে ঢুঁড়ে পানি বেচে বালবাচ্চাকে টিকিয়ে রাখব।

বৃদ্ধ জহুরী তার দিকে এক লহমায় তাকিয়ে নিয়ে বল্‌ল—'বেটা, তোমাকে একদম পানির দামে এ-খচ্চরটি দিতে পারি। লেকিন এক শর্তে—এর পিঠে বড় বড় বোঝা চাপিয়ে কাজ করাতে হবে। একদম নটখট খচ্চর। গোঁত্তা মারলেও নড়তে চড়তে চায় না। হরদম চাবুক চালাতে হবে, রাজী? যদি কসম খাও হরবখত ওকে দিয়ে মাল বওয়াবে আর পিটবে তবে মাগনাও আমি দিয়ে দিতে রাজী।'

—'আমি কসম খাচ্ছি জহুরী সাহাব, এমন বেধড়ক চাবুক চালাব যে, একদম চৌদ্দপুরুষের নাম ভুলে যাবে।'

বিনা পয়সায় নাদুস নুদুস একটি খচ্চরের মালিকানা লাভ ক'রে ইহুদী লেড়কাটি যেন আশমানের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল। খচ্চররূপী চাঁদ আলী-র পিঠে চেপে খুশীতে নাচতে নাচতে সে নিজের মকানে ফিরে গেল।

ইহুদী লেড়কা চাঁদ আলীকে তার মকানে নিয়ে গেলে তার বিবি আদর ক'রে ছোলা খাওয়াতে গেল। খচ্চরের যা কাজ চাঁদ আলী তা-ই ক'রে বসল। মারল সজোরে এক লাথি। সে ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। বিলকুল চিৎ। ওঠার হিম্মৎ রইল না। এবার নিজের বুকের নিচে জেনানাটিকে বিলকুল চেপে ধরে জিভ দিয়ে তার তুলতুলে নরম গাল দুটো পরম তৃপ্তিতে চাটতে লাগল।

আচমকা আছাড় খেয়ে পড়ায় জেনানাটির কাপড় একদম জায়গা মাফিক রইল না। অর্ধ উলঙ্গ হয়ে পড়ল। খচ্চরটির কামোদনাটুকু তার অভিজ্ঞ চোখে সহজেই ধরা পড়ল। আঁৎকে উঠল। ডরে সরে যাওয়ার কোশিস করল। লেকিন খচ্চরটি সামনের পা দুটো দিয়ে তার কোমরের কাছে সাঁড়াশীর মাফিক এমন আঁকড়ে ধরল যে, তার আর নড়াচড়ার ফিকিরটুকুও রইল না।
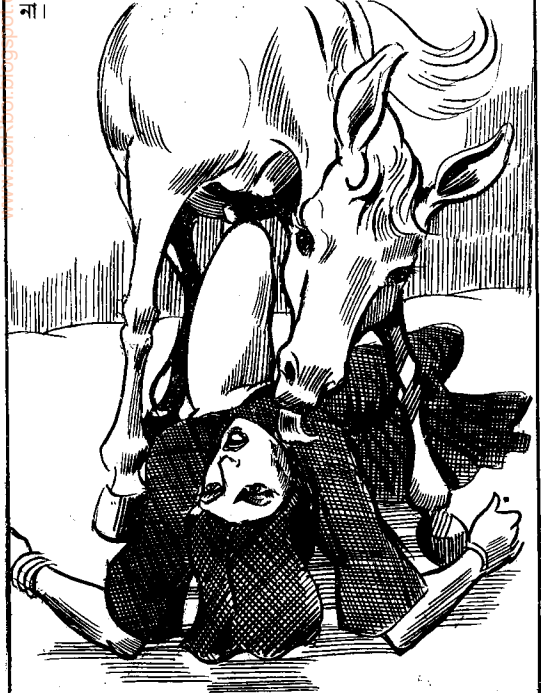
জেনানাটি বিকট চিল্লাচল্লি শুরু করে দিল। মহল্লায় কয়েকজন নওজোয়ান ছুটে এসে ইহুদী লেড়কিটিকে সাহায্য করল। সবাই মিলে বেধড়ক পিটে কামোন্মাদ খচ্চরটির কবল থেকে তাকে উদ্ধার করল।

একটু সুস্থ হয়ে জেনানাটি তার স্বামীর ওপর চটে একদম ব্যোম হয়ে গেল। সে-গোস্সায় কাঁপতে কাঁপতে বল্ল—'তোমার মাফিক ভীতু স্বামীর ঘর করার আর দরকার নেই আমার। একটি খচ্চরের কবল থেকে যে বিবিকে উদ্ধার করতে পারে না, ইজ্জত বাঁচাতে পারে না এরকম মরদে আমার কাজ নেই। মহল্লার নওজোয়ানরা লাঠিসোঠা নিয়ে না এলে জানোয়ারটির লালচ থেকে আমাকে রক্ষা করার হিম্মৎ তোমার ছিল! কামজ্বালা মেটাতে গিয়ে সে আমাকে বিলকুল ছিঁড়ে-ফাঁটিয়ে দিত।

জহুরী লেড়কাটি বিবির হালৎ দেখে ডরে কাঁপতে লাগল। জেনানাটি এবার বল্ল—'আমাকে রাখতে হলে একটিমাত্র পথই তোমার সামনে খোলা রয়েছে। খচ্চরটিকে মকান থেকে তাড়িয়ে দিতেই হবে। নইলে আমি তিন তালাক দিয়ে তোমার কাছ থেকে একদম দূরে সরে যাব। তোমার সংসার আর করছি না।'

ইহুদী লেড়কাটি এবার খচ্চরটিকে নিয়ে সোজা ইহুদী জহুরী আজারিয়াহ-র দোকানে হাজির হ'ল। উদ্ভুত সমস্যার কাহিনী তার কাছে ব্যক্ত ক'রে খচ্চরটিকে ফেরৎ দিয়ে ফিরে গেল।

বৃদ্ধ ইহুদী এবার খচ্চররূপী চাঁদ আলী-র পিঠে সোনার বস্তা চাপিয়ে বেধড়ক চাবুক চালাতে চালাতে নিজের মকানে ফিরে গেল।

তাকে মকানে নিয়ে এসেই বৃদ্ধ জহুরী একটি পাচন দিয়ে বেধড়ক পিটতে শুরু করল। তারপর মন্ত্রঃপূত পানি ছিটিয়ে ফিন পূর্বের দেহ দান করল।

চাঁদ আলী ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল।

বৃদ্ধ জহুরী বল্ল—'এবার বল, তোমার মতিগতির কোন পরিবর্তন হয়েছে কি?' চাঁদ আলী ফোঁস করে ওঠে—'আমার জান থাকতে মত পাল্টাচ্ছি না। যা একবার স্থির করেছি তা আমি করবই করব।' তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েই সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলব করল।

বৃদ্ধ তার মতলব ঠাহর করতে পেরে মন্ত্রঃপূত পানি ছিটিয়ে তাকে একটি ভল্লুকে পরিণত ক'রে দিল। ইয়া মোটা একটি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখল। সকালে দোকানে নিয়ে গেল। একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে দোকানদারী করতে লাগল।

বাজারের ক্রেতাদের একজন বৃদ্ধ জহুরীর কাছে ভল্লুকটিকে কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। বৃদ্ধ জহুরীকে বলল—'আমার বিবির কঠিন বিমারি হয়েছে। হেকিম দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন, ভল্লুকের মাংস খাওয়ালে আর ভল্লুকের চর্বি দু' বেলা গায়ে মাখালে নাকি বিমারি সেরে যাবে।'

বৃদ্ধ জহুরী তাকে বেচতে রাজী হ'ল একটি মাত্র শর্তে, আজই তাকে জবাই করতে হবে।

আগ্রহী ক্রেতাটি এক বাক্যে তার শর্ত মেনে নিল।

শেষে আর দাম দস্তুরের দরকার হ'ল না। বৃদ্ধ জহুরী মাগনাই তাকে ভল্লুকটি দিয়ে দিল। সে আদমি খুশীতে নাচতে নাচতে ভল্লুকটি নিয়ে নিজের মকানে ফিরল। এবার সে জবাইয়ের প্রস্তুতি নিতে লাগল। এ তো আর বকরি টকরি নয় যে যে কোন একটি ছুরি দিয়েই জবাইয়ের কাজ সেরে ফেলা যাবে। সে মহল্লারই এক দোস্তের ঘর থেকে বেশ বড়সড় ছুরি ধার করে এনে শান দিতে গিয়ে বিবির কাছে মন্তব্য করল—'কী তাগড়াই ভল্লুকটি। গোস্তও হবে বহুৎ। তোমার বিমারির ইলাজ ভালভাবেই হয়ে যাবে।'

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে কোন জানোয়ারের গায়ে হাতীর বল আসে। চাঁদ আলীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। সে এক ঝটকায় আদমিটিকে ফেলে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। সোজা বৃদ্ধ জহুরীর মকানে ফিরে এল।

বৃদ্ধতো চাঁদ আলীর কাণ্ড দেখে তাজ্জব বনে গেল। সে বল্ল—'তুমি যখন জান নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছ তখন আমি তোমাকে আর একটি সুযোগ দেব। লেকিন তুমি যদি আগের মাফিকই গোঁ ধরে বসে থাক তবে আমি অসহায়।'

বৃদ্ধ এবার মন্ত্রঃপূত পানি ছিটিয়ে তাকে ফিন আদমির রূপ দান করল। তারপর তার লেড়কি কামরকে তলব করে বল্ল—'এ নওজোয়ানের সঙ্গে বাৎচিৎ কর।'

আলী উদ্ভিন্ন যৌবনা বৃদ্ধ জহুরীর লেড়কি কামর-এর সুরৎ দেখে ভিমরি খাওয়ার জোগাড় হ'ল। তার দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে। এমন যৌবনের চিহ্নযুক্ত কোন লেড়কিকে সে জিন্দেগীতে দেখে নি।

বৃদ্ধ যাদুকর জহুরীর লেড়কিও চাঁদ আলী-র সুরৎ দেখে মুগ্ধ হয়। এমন লম্বা-চওড়া নওজোয়ান, এমন সুঠাম দেহ আর এমন তাগৎ কোন পুরুষের দেহে যে থাকতে পারে আগে তার জানা ছিল না।

খুবসুরৎ লেড়কি কামর মুখে কলিজা-নাচানো হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—'সাহাব, এক সাচ্চা বাৎ তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। তুমি কি কেবলমাত্র আমার গহনাপত্র আর সাজপোশাক পেলেই খুশী, আমাকে পাবার লোভ নেই?'

—'তোমার গহনাপত্র আর সাজ পোশাকই আমার একমাত্র কাম্য। এগুলোর বিনিময়ে আমি আমার চোখের মণি জাইনাব'কে আপন ক'রে পেতে চাই। এগুলো হাজির না করতে পারলে আমার

পক্ষে তাকে শাদী করা হয়ে উঠছে না।'

বৃদ্ধ যাদুকর ফোঁস ক'রে ওঠে—'এখনও দেমাক কমে নি! এত কিছুর পরও তোমার শিক্ষা হয় নি! তাজ্জব বনে গেলাম!' কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ যাদুকর ফিন তার গায়ে মন্ত্রঃপূত পানি ছিটিয়ে এক কুকুর বানিয়ে দিল। তার গায়ে বিতৃষ্ণায় থুথু ছিটিয়ে, সজোরে এক লাথি মেরে একদম মকান থেকে বের করে একদম রাস্তায় দিয়ে এল।

চাঁদ আলী কুকুরের দেহ ধারণ ক'রে বাগদাদের পথে পথে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল। যে মহল্লায় সে যায় সেখানকার নেড়ী কুত্তারাই তাকে তাড়া ক'রে। নতুন কোন ভাগীদারকে তারা বরদাস্ত করতে নারাজ। ফলে খানার অভাবে সে কষ্ট পেতে লাগল।

একদিন চাঁদ আলী এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষিদে তেষ্টায় ধুঁকতে থাকে। তার হালৎ দেখে দোকানির মায়া হয়। তাকে সঙ্গে ক'রে নিজের মকানে নিয়ে এল। তাকে তাড়াতাড়ি কিছু খানা ও পানি দিয়ে জান বাঁচাবার ফিকির করে দিল।

এমন সময়ে ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' চৌষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, দোকানি কুকুররূপী চাঁদ আলীকে নিজের মকানে এনে খানা-পানি দিয়ে কিছুটা সুস্থ ক'রে তুল্‌ল।

পরদিন ভোরে দোকানির নওজোয়ান লেড়কি কুকুররূপী চাঁদ আলী-র মুখোমুখি হ'ল। ব্যস, তার মধ্যে অকস্মাৎ ভাবান্তর লক্ষিত হ'ল। ঝট ক'রে নাকাবটি টেনে শরম বাঁচাল।

লেড়কির কাণ্ড দেখে দোকানি তাজ্জব বনে গেল।

দোকানির জিজ্ঞাসা নিবারণ করতে গিয়ে তার লেড়কি বল্‌ল—'আব্বাজান তোমার কি আক্কেল বলতে কিচ্ছু নেই? কাকে তুমি ঘরে নিয়ে এলে! যাকে কুকুরজ্ঞানে ঘরে নিয়ে এসেছ আদতে সে কুকুর নয়, আদমি। এক নওজোয়ান। এর নাম চাঁদ আলী। কায়রো তার মুলুক। নসীবই একে কুকুররূপ দান করেছে। যাদুকর জহুরী আজারিয়াহ যাদুবলে একে কুকুররূপ দান করেছে।'

চাঁদ আলী বাৎচিৎ করতে অক্ষম। লেকিন বিলকুল সমঝাতে পারে। তাই দোকানির লেড়কির বাৎ শুনে চাঁদ আলী ঘাড় কাৎ করে তার উক্তির সমর্থন জানায়।

দোকানি কপাল চাপড়ে বলতে লাগল—'ইয়া খোদা! এ কী তাজ্জব ব্যাপার!' এবার লেড়কির দিকে ফিরে বল্‌ল—'বেটি, এর জন্য কি আমাদের কিছুই করার নেই? একে ফিন মনুষ্যদেহ ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়?'

—'আব্বাজান, জরুর সম্ভব। লেকিন এক শর্তে, সে যদি আমাকে শাদী করতে সম্মত থাকে।'

—'বেটি, সে সব বাৎ পরে বিবেচনা করা যাবে। আগে এর দুঃখ কষ্ট লাঘব করার ধান্দা কর। কোশিস ক'রে দেখ, যদি তার মনুষ্যরূপ ফিরিয়ে দিতে পার। এর দিলে সুখ দেখা দিলে তখন না হয় আমিই এর কাছে তোর শাদীর প্রস্তাব দেব।'

আব্বাজীর নির্দেশে দোকানির লেড়কি এক গণ্ডুষ পানি নিয়ে বিড়বিড় ক'রে কি সব মন্ত্র আওড়াল। তারপর সে পানি কুকুররূপী চাঁদ আলী-র গায়ে ছিটিয়ে দিল। ব্যস, এক লহমার মধ্যেই তার দেহ ক্রমে কুকুরের দেহ থেকে বিলকুল আদমির দেহ লাভ করতে লাগল।

বৃদ্ধ দোকানি চাঁদ আলী-র যৌবনপ্রাপ্ত চেহারা দেখে তাজ্জব বনে গেল। এমন খুবসুরৎ যার চেহারা সে যদি নেড়ি কুত্তা হয়ে পথে পথে চক্কর মেরে বেড়ায় তবে ব্যাপারটি তো তাজ্জব বনারই বটে।

চাঁদ আলী আদমির দেহলাভ করার অব্যবহিত কাল পরেই বৃদ্ধ যাদুকর জহুরীর লেড়কি কামর সেখানে হাজির হ'ল। তার হাতে এক প্রস্থ নিজের পোশাক ও রত্নালঙ্কার। আর সোনার এক জোড়া জুতা। সে সামানপত্র তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এই নাও তোমার শাদীর দেনমোহর। জাইনাব'কে শাদী ক'রে সুখী হও। তোমার মহব্বৎ এক নয়া নজীর সৃষ্টি করল।'

চাঁদ আলী বিষণ্ণমুখে বল্‌ল—'তোমার মহানুভবতা আমাকে কেবল সুখীই করল না। কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করল। কি ব'লে যে তোমাকে সুকরিয়া জানাব, ভেবে পাচ্ছি না। তোমার দিলের খবর আমি রাখি। প্রথম দর্শনেই তুমি যে আমাকে মহব্বৎ দান

করেছ তাও আমার অজানা নয়।'

এদিকে দোকানির এক নিগ্রো ক্রীতদাসী ব্যাপারটিকে সুনজরে দেখতে পারল না। সে কিছুদিন বৃদ্ধ যাদুকর জহুরী আজারিয়াহ-র মকানে ক্রীতদাসী হিসাবে ছিল। তখন সে যাদুকরের অসাক্ষাতে তার যাদুবিদ্যার কিতাবপত্র লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে যাদুবিদ্যা অল্প-বিস্তর শিখে নিয়েছিল। তারপর বৃদ্ধ দোকানির মকানে সে ক্রীতদাসী হয়ে আসে।

সে ছুটে এসে দোকানির লেড়কিকে বল্‌ল—'মালকিন, আপনার একী কাণ্ড! একদিন দোকানির লেড়কি এবং নিগ্রো ক্রীতদাসীটি পরস্পরের কাছে কসম খেয়েছিল, তারা কেউ-ই কাউকে ছেড়ে থাকবে না।'

চাঁদ আলী সবকিছু শুনে এবং জহুরীর লেড়কির সাজ-পোশাক দেখে তাজ্জব বনে গেল। তার ত্যাগ ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে চাঁদ বল্‌ল—'আমি তোমাকে শাদী ক'রে তোমার মহব্বতের মূল্য দিতে চাই। তুমি হবে আমার প্রথমা বিবি। আর এরা হবে যথাক্রমে দ্বিতীয়া আর তৃতীয়া বিবি। আর জাইনাব? সে পাবে আমার সর্বকনিষ্ঠা বিবির মর্যাদা। এবার আমাকে দু'-চারদিনের জন্য ছুটি দাও, সাজপোশাক আর অলঙ্কারাদি দেখিয়ে জাইনাবকে এখানে নিয়ে আসি।'

চাঁদ আলী তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামল। পথ চলতে চলতে ভাবল, জাইনাব-এর জন্য বাগদাদের সেরা মিঠাই কিছু হালুয়া খরিদ করে নিয়ে যাবে। এক বুড়ো পথে পথে হালুয়া ফেরি করে বেড়াচ্ছে। তার কাছ থেকে কিছু হালুয়া খরিদ করতে এগিয়ে গেল। ফেরিওয়ালা তাকে নমুনা স্বরূপ একটু হালুয়া খেতে দিল। তা মুখে দেয়ার মুহূর্তকালের মধ্যেই তার গা-ঘুলাতে লাগল। শুরু হ'ল মাথা ঝিমঝিমানি। ব্যস, পথে লুটিয়ে পড়ল সে। সংজ্ঞা লোপ পেল। ফেরিওয়ালা তার হাতের সাজপোশাক ও গহনার পুঁটুলিটি নিয়ে পালাবার কোশিস করল। নসীব ভাল। ঠিক তখনই সে-পথ দিয়ে যেতে গিয়ে হাসান সেখানে হাজির হয়। সে চিনতে পারে, মস্তান মহম্মদ ফেরিওয়ালা সেজে চাঁদ আলীর সর্বনাশ করতে চাইছে। আফিঙ-এর হালুয়া খাইয়ে তার সর্বস্ব লুঠ করার জন্য ফাঁদ পেতেছে। হাসান তাকে পাকড়াও ক'রে ফেল্‌ল।

হাসান এবার আফিঙ-এর নেশা কাটানোর দাওয়াই খাইয়ে ক্রমে চাঁদ আলী-র সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল। তার পুঁটুলিটি ফিরিয়ে দিল। চাঁদ আলী এবার তার এতদিনের ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে হাসান-এর কাছে ব্যক্ত করল।

চাঁদ আলী বৃদ্ধ জহুরীর লেড়কি কামার'কে শাদী করতে চলেছে শুনে হাসান তাকে বহুৎ সাধুবাদ জানাল। তার আব্বার অবর্তমানে সে-ই জহুরী আজারিয়াহ-র দিনারের পাহাড়, প্রাসাদোপম অট্টালিকা ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির মালিক হবে এরকম বহুৎ বাৎ বলে তাকে বাহাদুর নওজোয়ান ব'লে পিঠ চাপড়াতে লাগল।

আলী হাসল। নিজের কৃতিত্বের ব্যাপার স্যাপার কারো মুখ থেকে শুনলে খুশীতে নেচে ওঠাই স্বাভাবিক।

হাসান এবার জাইনাব-এর শয়তান মামা বেতমিস বৃদ্ধ শুটকি মাছের কারবারী জুরেক-এর কাছে খবর পাঠিয়ে দিল—আপনার আদিষ্ট সাজ পোশাক ও গহনাপত্র নিয়ে চাঁদ আলী বৃদ্ধা ডিলাইলাহ ও তার লেড়কি জাইনাব-এর কাছে যাচ্ছে। তিনি যেন সেখানে উপস্থিত থেকে তাদের শাদীর বন্দোবস্ত করে নিজের জবান ঠিক রাখেন।

হাসান এবার সাজপোশাক ও গহনাপত্রসহ চাঁদ আলী'কে নিয়ে বৃদ্ধা ডিলাইলাহ-র মকানে হাজির হ'ল। বৃদ্ধ জুরেক তার মকানেই হাজির।

হাসান সাজপোশাক ও গহনাপত্রের পুঁটুলিটি জুরেক-এর সামনে রেখে বল্‌ল—'আপনার হুকুম মাফিক সব জোগাড় করা হয়েছে। আশা করি এবার আপনি জরুর জবান রাখতে উৎসাহী হবেন।

বৃদ্ধ জুরেক তোবড়ানো গালে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'দেখ বেটা, আমার জবান এক। জাইনাবও শাদীতে গররাজি নয়।

চাঁদ আলী পরদিন ভোরে বৃদ্ধ জহুরী আজারিয়াহ-এর মকানে হাজির হ'ল। আহম্মদ তার চল্লিশজন সহকারীকে সঙ্গে করে হাজির হ'ল। কাজী এলেন। শাদীর কবুলনামা বানানো হ'ল। একটি নয়, চার-চারটি শাদীর কবুলনামা বানানো হয়ে গেল। চাঁদ আলী বৃদ্ধ আজারিয়াহ-র লেড়কি কামর, বৃদ্ধা ডিলাইলাহ-র লেড়কি জাইনাব, দোকানির লেড়কি এবং তার নিগ্রো ক্রীতদাসীটিকে পর পর শাদী ক'রে বিবির মর্যাদা দিল।

এবার বাসর শয্যার বন্দোবস্ত। চাঁদ আলী প্রথম রাত্রে জাইনাব'কে শয্যা সঙ্গিনী করল। চাঁদ আলী নিজের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ ক'রে নিঃসন্দেহ হ'ল সে এতদিন সাচ্চা কুমারী ছিল। তার পরের রাত্রি থেকে সে এক একজন বিবিকে নিয়ে মধুযামিনী যাপন করল।

চাঁদ আলী আর তার চার বিবি সবার দিলেই খুশীর জোয়ার।

মহল্লার আদমি ও ইয়ার-দোস্তরা এক মাহিনা ভর শাদীর খানাপিনা সারল। দামী সরাবের বন্যা বইল। চারদিকে কেবল খুশী আর খুশী।

এদিকে হাসান মওকা মাফিক চাঁদ আলীর হিম্মতের ব্যাপারে খলিফাকে অনেক কিস্‌সা কাহিনী শোনাল। কায়রোতে থাকা-কালীন সে হাজারো বার বহুৎ হিম্মতের পরিচয় দিয়েছে এরকম বাৎ বলতেও ভুল্‌ল না। খলিফা খুশী হয়ে তাকে দরবারে হাজির

করার হুকুম দিলেন।

এক সকালে হাসান চাঁদ আলী'কে সাজিয়ে গুজিয়ে দরবারে খলিফার সামনে হাজির করল।

চাঁদ আলী খলিফাকে কুর্ণিশ ক'রে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াল। খলিফা তার দীর্ঘ ও সুস্থ-সবল দেহ আর খুবসুরৎ মুখাবয়ব দেখে যার পর নাই মুগ্ধ হলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রহরী রুমালে জড়ানো একটি ছিন্নমুণ্ড এনে খলিফার সামনে দাঁড়াল।

খলিফা চাঁদ আলী'কে জিজ্ঞাসা করলেন—'রুমাল সরিয়ে দেখ তো, কর্তিত মুণ্ডটি তোমার পরিচিত কিনা?'

রুমাল সরাতেই চাঁদ আলী চমকে ওঠে। এক লহমায় নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল—'হ্যাঁ, জাঁহাপনা, পরিচিত। বৃদ্ধ যাদুকর ও জহুরী আজারিয়াহ-র মুণ্ডু।

খলিফা দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লেন—'এক সময় এ-বৃদ্ধ শয়তান বাগদাদে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। হাজারো নিরীহ-নিরপরাধ আদমি এর হাতে জান খুইয়েছিল। আজ তার কৃতকর্মের যোগ্য পুরস্কার দেয়া সম্ভব হ'ল।'

—'জী জাঁহাপনা, যোগ্য পুরস্কারই বটে। নইলে তার দলের শয়তানগুলো তামাম বাগদাদ নগরে আগুন জ্বালিয়ে দিত।'

চাঁদ আলী এবার তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কিস্‌সা কাহিনী সবিস্তারে খলিফার কাছে ব্যক্ত করল।

তার বীরত্ব ও হিম্মতের পরিচয় পেয়ে খলিফা মুগ্ধ হলেন। বহুভাবে তার তারিফ করলেন। চাঁদ আলীর অনন্য সাহস, ধৈর্য ও ফন্দি ফিকিরের পরিচয় পেয়ে খলিফা তাকে আহমদ হাসান-এর সমান মর্যাদা সম্পন্ন পদে বহাল ক'রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন।

কিস্‌সাটি শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ কয়েক মুহূর্তের জন্য থামলেন।

একটু দম নিয়ে বেগম ফিন মুখ খুললেন—'জাঁহাপনা এখনও রাত্রি শেষ হতে দেরী আছে। আপনার হুকুম মিল্‌লে এমন 'আজব যাদু থলির কিস্‌সা'টি শুরু করতে পারি।'

আজব যাদু থলির কিস্‌সা

বাদশাহ শারিয়ার-এর সম্মতি পেয়ে বেগম শাহরাজাদ এবার এক সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের আজব যাদু থলির কিস্‌সাটি শুরু করলেন। বেগম বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক সময় এক বণিক বাস করত। তার নাম ছিল উমর। তার ছিল তিন লেড়কা। বড় লেড়কার নাম সালিম, মেজো সলিম আর যুদর ছিল ছোটটির নাম।

সালিম ও সলিম ছোট ভাইয়া যুদর-এর ওপর হরদম জুলুম চালাত। দু' চোখ পেতে তাকে দেখতে পারত না। বণিক নিঃসন্দেহ হ'ল। সে বেহেস্তে গেলে বড় লেড়কা দুটো যুদর-এর ওপর হরদম অন্যায় জুলুম চালাবে।

বণিক উপায়ান্তর না দেখে কাজী ও মহল্লার কিছু শরিফ আদমিকে সাক্ষী রেখে তাঁর বিলকুল সম্পত্তি ও অর্থ কড়ি যা ছিল তিন লেড়কার মধ্যে সমান ভাগ বাটোয়ারা ক'রে দিল। মোট চারটি ভাগ হ'ল। তিন লেড়কা এক এক ভাগ ক'রে পেল। আর এক ভাগ নিজের জন্য রাখল। নিজের ভাগটিকে আবার কাজীকে সাক্ষী রেখে তার বিবির নামে উইল ক'রে দিল। উইলের শর্ত রইল, তার মৌউৎ হলে সে সম্পত্তির মালিকানা বিবির ওপর বর্তাবে।

বণিকের কাজ দেখে আত্মীয় স্বজন ও ইয়ার দোস্তরা সোল্লাসে বল্‌ল—'সালিম-এর বাপ বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ বড়িয়া কাম করেছে। এতে কারোরই কোন আক্ষেপ থাকা উচিত নয়।'

বণিক তো কামটি আচ্ছাই করেছে বটে, লেকিন তার মৌউৎ হ'লে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ব্যাপারটি পুরোপুরি উল্টো হয়ে গেল। ধান্দা-ফিকির করে তার বড় লেড়কারা ছোট লেড়কা যুদর-এর সঙ্গে ছল চাতুরি জুড়ে দিল। দলিল জাল করে তার স্থাবর-অস্থাবর বিলকুল সম্পত্তি তার বড় ভাইয়ারা হাতিয়ে নিল।

যুদর চোখের পানি ফেলে মহল্লার আমীর আদমিদের

দরওয়াজায় ধর্ণা দিল। তারা সালিসীতে বসল। ফয়দা কিছুই হলো না। তারা কাউকেই পাত্তা দিল না।

যুদর একদম পথের ভিখারী বনে গেল। কোন কায়দা কসরৎ-ই কার্যকরী হ'ল না তখন সে অনন্যোপায় হয়ে কাজীর দরবারে মামলা রুজু করল। আদতে কাজী, আদালত, মামলা-মোকদ্দমা করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের ঘরের অর্থ হাসিমুখে কাজী সাহেবের কোর্তার জেবে ঢুকিয়ে দেয়া। বণিকের লেড়কাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। তারা সর্বস্ব খুইয়ে বিলকুল ভিখমাঙ্গাতে পরিণত হয়ে গেল। বণিকের তিন লেড়কার হালৎ-ই একই রকম হয়ে গেল।

তাদের হালৎ এমনই শোচনীয় হয়ে পড়ল যে, দিনভর ধান্দা করেও দু'-একটা রুটি ও পিঁয়াজের বন্দোবস্ত করতে পারে না, নিজেই বা কি দিয়ে পেটের জ্বালা নেভায় আর বিবি ও বালবাচ্চাদের মুখেই বা কি দেবে।

বহুৎ কোশিস ক'রে বড় দু' ভাইয়া জান রক্ষার এক ফিকির বের করল। তারা আম্মার ভাগের ধন দৌলত যা ছিল বিলকুল ছিনিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল।

বুড়ি চোখের পানি ফেলে ছোট লেড়কার কাছে এসে রুটির জন্য হাত পাতে। বড় লেড়কা দুটোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে অভিশাপ দিতে থাকে।

ছোট লেড়কাটি তার আম্মাকে বুঝায়—'তারাও তো তোমার পেটের লেড়কা বটে, তাদের কিছু একটা হয়ে গেলে কি আর তোমার কলিজা পোড়াবে না? আম্মার অভিশাপ বৃথা যায় না। এমন ক'রে অভিশাপ দিও না! দিমাক ঠাণ্ডা কর। সমঝে কাম কর। খোদাতাল্লা-র ওপর বিচারের ভার সঁপে দাও। তিনিই যা হোক হিল্লা ক'রে দেবেন।'

—'লেকিন বেটা —'

—'এতে আর কোন লেকিন টেকিন নয় আম্মা। ইয়াদ রাখবে, আমার বালবাচ্চার মুখে যদি খানা তুলে দিতে পারি তবে তুমিও জরুর উপোষ করবে না। তোমার বিলকুল দায়িত্ব আমি হাসিমুখে মাথায় তুলে নিলাম। ফিন বিধবা আম্মার সম্পত্তি বেমালুম হজম ক'রে দেবে এ-ও আমি মুখ বুজে হজম করব না। ভাইজানদের নামে কাজীর আদালতে মামলা রুজু করব। তাদের এ রকম বেশরমের মাফিক জুলুম জবরদস্তি আমি একদম হজম করব না।

তার বিধবা আম্মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্ল—'বেটা, মামলার বাৎ মুখেও আনবি না। মামলা করতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে কেমন নাজেহাল হতে হচ্ছে, ইয়াদ নেই। আমার বাৎ শোন, মামলার পোকা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দে। নসীবে যা ছিল, হয়েছে। সবই আল্লাহ-র মর্জি, দিল্ থেকে মেনে নে। শেষ বিচারের দিন কেউ-ই রেহাই পায় না। আমার স্বার্থগৃধ্ন ভাইজানরাও পাবে না, মিলিয়ে নিয়ো।

যুদর এক মতলব আঁটল। হাট থেকে একটি মছলি পাকড়াও করার জাল খরিদ ক'রে নিয়ে এল। ব্যস, দিনভর নীলনদের পানিতে মছলি পাকড়ে আম্মাকে নিয়ে দিন গুজরান করতে লাগল।

এদিকে আম্মার বিলকুল ধন দৌলত আত্মসাৎ করেও সালিম আর সলিম কিছুই ধরে রাখতে পারল না। ফুর্তি ক'রে কানাকড়ি একদম উড়িয়ে দিল। ফিন ভিক্ষার থালি হাতে তুলে নিল।

আম্মার কাছে সন্তান অন্যায় করলেও সহজেই মাফ প্রার্থনা ক'রে হতাশ হয় না। সালিম ও সলিম-এর ক্ষেত্রেও একই বাৎ প্রযোজ্য হতে বাধ্য। যুদর-এর অসাক্ষাতে সে বড় লেড়কা দুটিকে জানালা দিয়ে রুটি-পিঁয়াজ যোগান দিয়ে তাদের জান রক্ষা করতে লাগল।

রোজ সন্ধ্যায় আন্ধার নেমে আসার কিছু পরে দু' ভাইয়া মাটির সান্‌কি হাতে জানালার কাছে দাঁড়ায়। আর তাদের বুড়ি আম্মা রুটি-পিঁয়াজ বা মছলির রসা সরবরাহ করে।

ব্যাপারটি বেশীদিন আর আন্ধারে চাপা পড়ে রইল না। যুদর এক সন্ধ্যায় নীলনদ থেকে একটু আগে আগেই ফিরল। সে মকানে ঢোকার আগেই জানালার ধারে দুটো আবছা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। সহজেই সনাক্ত ক'রে ফেল্‌ল। নিঃসন্দেহ হ'ল, এরা তার দুই ভাইয়া ছাড়া কেউ-ই নয়।

গোপন ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তার আম্মা বিলকুল ভেঙে পড়লেন। নীরবে দু'চোখের পানি ঝরাতে লাগলেন। শরমে যুদর-এর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারল না।

এদিকে যুদর কিন্তু এক আজব কাজ করে বসল। সে এক দৌড়ে জানালার ধারে চলে গেল। বড় ভাইয়া সালিম-এর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বল্ল—'ভাইজান, তোমরা কেন মকানের বাইরে, আন্ধারে দাঁড়িয়ে? চল, ভেতরে চল, তিন ভাইয়া এক সাথে খানাপিনা সারব।'

যুদর বড় ভাইয়াদের নিয়ে কামরায় ঢুকল।

সালিম আর সলিম তো শরমে মাটির সঙ্গে মিশে যাবার জোগাড় হ'ল।

সালিম ছোট ভাইয়া যুদর'কে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বল্ল—'ভাইয়া, আমরা কোন মুখে তোমার সামনে এসে দাঁড়াই, বল তো? আমরা যে কসুর করেছি, দোজখেও যে আমাদের ঠাঁই হবে না। শয়তানের চক্করে পড়ে আমাদের দিমাক গড়বড় হয়ে গিয়েছিল। নইলে তোমার আর বিধবা আম্মার ধন দৌলত আমরা কি কখনও আত্মসাৎ করতে পারি, তুমিই বল?

সলিম বল্ল—'তামাম দুনিয়ায় তুমি আর আম্মা ছাড়া আমাদের আর আপনজন বলতে কেউ নেই। আজ মালুম হ'ল কি, দুনিয়াটি ফাঁকা-ফাঁপা। আজ আমরা আমাদের ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছি। বড় ভাইয়ার হয়ে তোমার কাছে মাফ চাইছি যুদর, আমাদের তুমি—'

—'ভাইজান, আজ এসব বাৎ ব'লে আমার কলিজায় কেন ঝুটমুট দাগা দিচ্ছ! আমারও জরুর উচিত ছিল তোমাদের পাত্তা লাগানো। কোথায়, কেমন আছ তাল্লাস করা। মাফ তোমরা চাইবে কেন? মাফ চাওয়া উচিত তো আমারও ছিল।'

যুদর-এর উদার দিল্ সে-সন্ধ্যায় আল্লাহ মেহেরবানি করে তিন ভাইয়া আর বিধবা আম্মাকে ফিন মিলিয়ে দিলেন।

যুদর ভাইয়াদের নিয়ে রাত্রে খানাপিনা সারল। ভোর হ'ল। প্রকৃতির বুকে আলো-আঁধারীর খেল চলছে। যুদর জাল কাঁধে বেরিয়ে পড়ল নীলনদে জাল ফেলে মছলি পাকড়াতে।

সন্ধ্যার কিছু আগে মছলি বিক্রি করে সংসারের অত্যাবশ্যক যাবতীয় সমানপত্র খরিদ ক'রে ঘরে ফিরল।

রোজ সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মছলি পাকড়াও ক'রে সংসারের বিলকুল সামানপত্র খরিদ ক'রে বাড়ি ফেরে। আর এদিকে সালিম আর সলিম ঠাঙের ওপর ঠাং তুলে ভাইয়ার রোজগারের ওপর নির্ভর ক'রে দিন গুজরান করতে লাগল। আর তাদের সুখ যেন উপছে পড়তে থাকে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদা কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' সাতষট্টিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, একদিন যুদর দিনভর নীলনদে জাল ফেল্‌ল। লেকিন একটি মছলিও তার জালে আটকা পড়ল না। মুখ ব্যাজার ক'রে ফিরল। পরদিন ঘটল তা-ই। পরদিন জায়গা বদলে নয়া এক জায়গায় জাল ফেল্‌ল। লেকিন নসীব বদলাল না। হতাশা জর্জরিত দিল্ নিয়ে ঘরে ফিরতে হ'ল।

যুদর তাজ্জব বনে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করল—'ইয়া আল্লা, একী হালৎ হ'ল! তবে কি নদীর মছলি একদম খতম হয়ে গেছে!'

যুদর-এর ঘরে দিনার-দিরহাম যা কিছু জমা ছিল ক্রমে বিলকুল খতম হয়ে গেল। সে হতাশ হয়ে ভাবতে লাগল, আম্মা আর দু'ভাইয়ার মুখে কি তুলে দেবে? তাদের কি তবে ভুখা রাখতে হবে? এ-ই কি খোদাতাল্লা-র মর্জি?

জাল কাঁধে নিয়ে আশমান-জমিন ভাবতে ভাবতে যুদর পথ পাড়ি দিতে লাগল। এমন সময় এক রুটির দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রোজ এখান থেকে রুটি খরিদ ক'রে বাড়ি নিয়ে যায়। আজ তার কোর্তার জেব একদম ফাঁকা। রুটি খরিদ করবে কি দিয়ে? সে রুটির গামলাটির দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

যুদর-এর ব্যাপারটি দোকানির নজর এড়াল না। কেন যে সে এরকম নীরব-হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেবে কিনারা করতে পারল না।

দোকানি গদি ছেড়ে উঠে এসে বলে— ভাইয়া, মালুম হচ্ছে আজ কিছু গড়বড় হয়ে গেছে। জালে মছলি ধরা পড়ে নি বুঝি? হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বল্‌ল —'এত লাজ শরমের কি আছে ভাইয়া? সব দিন তো আর সমান যায় না। ক'টি রুটি লাগবে নিয়ে যাও। আর উপার্জন হলে দাম দিয়ে গেলেই চলবে।'

দোকানি তাকে আর মুখ খোলার সুযোগ না দিয়ে কয়েকটি রুটি ও সব্জী পুঁটুলি বেঁধে জোর ক'রে হাতে গুঁজে দিল। যুদর দোকানির কাছে তার কাঁধের জালটি জিম্মা রাখতে চাইল। দোকানি হেসে তাকে বিদায় দিল। বল্‌ল—'ভাইয়া, রুটির দাম যেদিন জোগাড় করতে পারবে দিয়ে যেয়ো। এর জন্য একদম ভাববে না।'

যুদর খুশী হয়ে জাল ও রুটি সব্জী নিয়ে ঘরে ফিরল। কাকডাকা ভোরে সে ফিন জাল নিয়ে নীলনদে হাজির হ'ল। দিনভর ব্যর্থ প্রয়াস চালাল। এমন কি কোন গুঁড়া মছলিও তার জালে ধরা দিল না। হতাশ হয়ে নদী থেকে উঠে এল। রুটির দোকানি সেদিনও

জোর করে রুটি-সব্জীর পোটলা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—'দামের জন্য শরমটরমের কিছু নাই। বরাত ফিরলে এক সাথে দাম চুকিয়ে দিয়ো। তার পরদিন নসীব তার সহায় হ'ল না। সে-দোকানের কাছাকাছি আসতেই তার দিল্‌ বিলকুল বিষিয়ে উঠল। দোকানি ফিন জোর ক'রে রুটি-সব্জীর পোটলা গছিয়ে দিতে পারে আশঙ্কায় সে ঘুরে অন্য পথ ধরল। ব্যাপারটি সে-দোকানির নজর এড়াল না। সে ভাবল, যুদর ধার শোধ করতে হবে ভয়ে অন্য পথে পালাবার ফিকির করছে। সে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেল্‌ল, দোকানে নিয়ে এল। জোর ক'রে রুটি-সব্জীর পোটলা হাতে গুঁজে দিল।

কর্জ করে করে রুটির দোকানির খাতার পাতা ভরে গেল। লেকিন তবু যুদর-এর নসীব ফিরল না। রোজ সকালে বহুৎ আশা-ভরসা নিয়ে নীলনদের পানিতে নামে। লেকিন সন্ধ্যার আগে তাকে শূন্য হাতে উঠে আসতে হয়। একের পর এক জায়গা বদলায়, তবু মছলির দেখা মেলে না।

যুদর এবার কারুণ হ্রদে জাল ফেলতে গেল। নীল নদ আজকাল বহুৎ কঞ্জুস হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে তাকে স্থান পরিবর্তন করতেই হ'ল।

যুদর জাল ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় এক মুরকে খচ্চরের পিঠে চেপে তার দিকে আসতে দেখল। হাজী সাহাব।

হাজী সাহাব তাকে কাছে তলব করল। সে জাল রেখে এলে তিনি কোরাণ শরীফ থেকে কয়েকটি বয়েৎ আওড়ালেন। তারপর খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে একটি ঝোলা হাতড়ে এক গাছি রেশমি রশি বের ক'রে বল্‌লেন—'বেটা, এক কাম কর। রেশমি রশিটি দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেল। তারপর এক ধাক্কায় একদম ঠাণ্ডা পানির মধ্যে ফেলে দাও।

যদি দেখ, সবার আগে আমার হাত পানির ওপর ভেসে উঠেছে তবে জাল ফেলে আমাকে তাড়াতাড়ি পানি থেকে তুলে আনবে। আর যদি পা দুটোকে ভেসে উঠতে দেখ তবে নিঃসন্দেহ হবে, আমার জান একদম খতম হয়ে গেছে। পানিই আমার একমাত্র আশা-ভরসা।

যুদর চোখ দুটো কপালে তুলে বুড়োটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

বুড়ো বলে চল্‌ল—'যদি সাচমুচ আমার জান খতম হয়ে যায়, তবে আমার খচ্চরটিকে নিয়ে সোজা ঠিকানা বরাবর আমার দোকানে হাজির হবে। বৃদ্ধ ইহুদী সামাইয়াহ-র কাছে এক শ' দিনারের বিনিময়ে ঘোড়াটিকে তার কাছে বেচে দেবে। আর এ-পোটলাটি তোমার-জিম্মায় রেখে দিও। খবরদার কাকপক্ষীও যেন টের না পায়।'

বৃদ্ধ মুরের বাৎ শুনে যুদর রেশমী রশিটি দিয়ে তাকে পিঠ মোড়া করে বেঁধে দিল। তারপর সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল নীলনদের পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে মোউৎ এসে তাকে বেহেস্তে নিয়ে গেল। বিলকুল খতম।
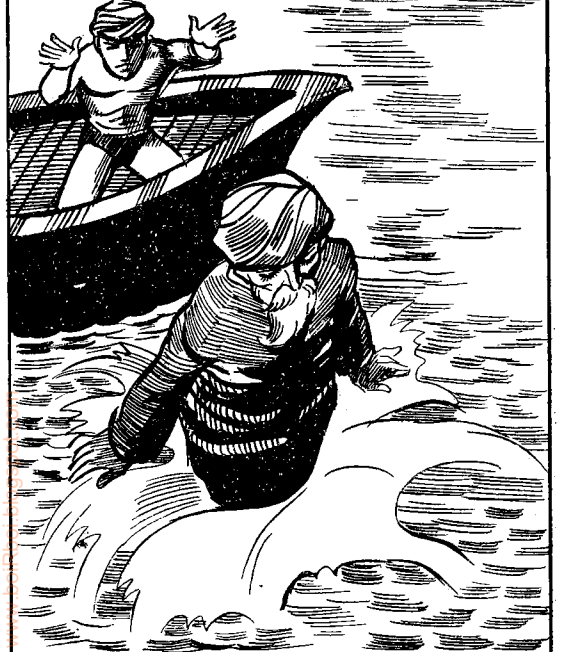
যুদর এবার হন্তদন্ত হয়ে বাজারে এসে ইহুদী সামাইয়াহ'কে তাল্লাশ ক'রে বের করল। ইহুদী বণিক তাকে খচ্চরটির দাম বাবদ একশ' দিনার দিল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বল্‌ল—'ঘটনাটি যেন ফাঁস না হয়। একদম গোপন রাখবে। ভুলেও কারও কাছে মুখ খুলো না যেন।'

যুদর এবার ছুটল রুটিওয়ালার কাছে। রুটির বাকী দাম বাবদ একটি দিনার দিয়ে তার দেনা শোধ করল। কসাই আর সব্জী বিক্রেতার দেনাও শোধ করে দিল। তারপর খানা নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরল।

সকাল হ'ল। যুদর ফিন কারুণ হ্রদে হাজির হ'ল। কাঁধে তার জাল। জাল নিয়ে সে পানিতে নামতে যাবে অমনি আর এক খুব তাগড়াই এক খচ্চরের পিঠে চেপে সেখানে হাজির হ'ল।

মুরটি বল্‌ল—'উমরের বেটা, গতকাল কি আমার মত অন্য এক ইহুদী সাহাব তোমার কাছে এসেছিল?'

যুদর ভাবল—মুর সাহাব তো বার বার তাকে বারণ ক'রে

গেছে। ব্যাপারটি যেন গোপন রাখে, তাই এ আদমী কায়দা কসরৎ ক'রে তার পেট থেকে গোপন সমাচার টেনে বের করতে চাইছে। তাই সে জোর ক'রে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে জবাব দিল—সাহাব? সাহাব? মুর সাহাব? কই কেউ তো আমার কাছে আসে নি।'

—'বেটা, কেন ঝুটমুট সাচ্চা বাৎ এড়িয়ে যাচ্ছ। আমি নিঃসন্দেহ সে আলবৎ এখানে এসেছিল। তারই হুকুমে তাকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে তুমি তাকে নীলনদের পানিতে ফেলে দিয়েছ। তারপর তার ঠ্যাং দুটো ভেসে উঠল। তুমি নিঃসন্দেহ হ'লে তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তারপর বাজারে গিয়ে ইহুদী বণিক সামাইয়াহ-র কাছে খচ্চরটিকে এক শ দিনারে বেচে দিয়েছ। ঝুটমুট কেন সাচ্চা বাৎ আমার কাছে ছিপাচ্ছ?'

—'তবে আর আমাকে ঝুটমুট বিরক্ত করতে এলেন কেন?'

—'শোন বেটা, আমিও একই কারণে তোমার কাছে এসেছি। আমার ভাইজানের মাফিক আমাকেও পিঠমোড়া ক'রে নীলনদের পানিতে ফেলে দাও। যদি দেখ, আমার পা দুটো ভেসে উঠেছে, বুঝবে আমারও ইন্তেকাল হয়ে গেছে। খতম হয়ে গেছি। ব্যস, আমার খচ্চরটিকেও ইহুদী বণিক সামাইয়াহ-র কাছে বেচে দিয়ে দাম নিয়ে নেবে।

যুদর একই পদ্ধতিতে নবাগত মুরটিরও হাত-পা পিঠ মোড়া করে বেঁধে দিল! ধাক্কা দিয়ে নীল নদের পানিতে তাকে ফেলে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার পা দুটো পানি ভেদ করে উপরে উঠে এল, যুদর নিঃসন্দেহ হ'ল, এরও ইন্তেকাল হয়ে গেছে।

ব্যস, আর দেরী নয়। যুদর খচ্চরটির পিঠে চেপে বাজারে গেল। ইহুদী বণিক সামাইয়াহ-র কাছ থেকে এক শ' দিনার বুঝে নিয়ে খচ্চরটি তার হাতে তাকে বুঝিয়ে দিল।

যুদর বিদায় নেবার সময় বণিক সামাইয়াহ আক্ষেপ সূচক শব্দ উচ্চারণ করে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! আর এক মুরকে খতম করল। লোভ আদমিকে দোজখের পথে টেনে নিয়ে যায়!

যুদর এবার পুরো এক শ' দিনার ঘরে নিয়ে তার আম্মার কাছে জিম্মা রাখল। সুযোগ বুঝে আম্মার দরবারে পুরো ব্যাপারটি খোলসা ক'রে পেশ করল।

বিলকুল ব্যাপারটি শুনে তার আম্মার চোখ দুটোতে পানি দেখা দিল। আতঙ্কিত কণ্ঠে বল্‌ল—'বেটা, কারুণ সরোবরে আর গিয়ে দরকার নেই। ডরে আমার কলিজাটি শুকিয়ে যাচ্ছে। মুররা আচ্ছা আদমী নয়। তোকে যে কোন সময় বেকায়দায় ফেলে দিয়ে জান খতম করে দেবে।'

যুদর প্রতিবাদ করে—'আমার কসুর কোথায়? কেউ যদি স্বেচ্ছায় এসে বলে আমাকে খুন করে দিনার কামিয়ে নাও, নেব না? রোজ সকালে নগদ নগদ এক শ' দিনার কামাইয়ের ধান্দা, হেলায় ছেড়ে দেব? এমন বেকুব তামাম দুনিয়ায় কেউ আছে? আমি নাচার। এখন অল্প মেহনতে এতগুলো দিনার কামাইয়ের ধান্দা থেকে আমাকে সরে আসতে বলো না। আমি কিছুতেই এ কাজ বন্ধ করতে পারব না। কভি নেহী।'

ভোর হতে না হতেই যুদর ফিন জাল কাঁধে কারুণ সরোবরের ধারে হাজিরা দিল।

যুদর পানির দিকে এগোতেই খচ্চরের পিঠে চেপে এক বৃদ্ধ মুর খচ্চরের পিঠে চেপে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। হাঁক দিল উমরের বেটা, সমাচার কি?

যুদর পিছন ফিরে তাকে দেখল। এবার এক বৃদ্ধ মুর। খচ্চরের পিঠে চেপে দাঁত বের করে হাসছে।

বৃদ্ধ মুরটি বল্‌ল—'উমরের বেটা, আমার আগে কোন মুর তোমার কাছে এসেছিল? সাচ্চা বাতাও বেটা—এসেছিল?'

—'জী হ্যাঁ, দু'জন। আমি তাদের উভয়কেই পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে সরোবরের পানিতে ফেলে দিয়েছি। তাদের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আমার দিল্ বলছে, আপনি ওপথেই জান দিতে চাইছেন। তবে আর দেরী না ক'রে ঝটপট চলে আসুন। আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।'

—'ভাইয়া, প্রত্যেক আদমির ইন্তেকাল তার নসীব অনুযায়ী হয়, তোমার মালুম নেই?'

—'জী, দু'-দুজনকে খতম ক'রে আমি হাত পাকিয়ে নিয়েছি। আপনার হাত-পা পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে, নিখুঁত বন্দোবস্ত ক'রে আপনাকে সোজাসুজি বেহেস্তে চালান দিয়ে দেব। আপনি তৈয়ার হয়ে যান।' যুদর বল্‌ল।

—'বহুৎ আচ্ছা নওজোয়ান! উমর-এর বেটার মাফিক বাৎ-ই বটে।

বৃদ্ধ মুর রাজী হয়ে যায়। যুদর তার হাত-পা আগের দু'জনের মতই পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে সরোবরের পানিতে ঝপাৎ ক'রে ফেলে দিল। বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। ঠ্যাং দুটোর বদলে এবার দুটো হাত পানির ওপরে উঠে এল। মুরটি চিল্লাতে লাগল—'বাঁচাও! বাঁচাও! সাঁতার জানি না! জলদি কর—জান খতম হয়ে যাবে।

যুদর ব্যস্ত হয়ে পানিতে জালটি ছড়িয়ে দিল। আদমিটিকে টেনে হিঁচড়ে পানি থেকে তুলে আনল। তার হাতের দিকে চোখ পড়তেই বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। খুনের মাফিক টকটকে লাল দুটো জ্যান্ত মছলি। ছটফট করছে।'

বৃদ্ধটি হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌ল—'বেটা, তুমি সাহায্য না করলে মছলি দুটো কিছুতেই আমার পক্ষে পানি থেকে তোলা সম্ভব হ'ত না।'

—'জী যদি স্বীকার করেন আমি আপনার এতটুকুও উপকার সাধন করেছি তবে এসবের মতলব কি, খোলসা ক'রে বলুন। একেই আমার কাজের বকশিস জ্ঞান করব। বলুন, কেন আপনি এবং আপনার ভাইরা এমন ধান্দায় মেতেছেন, বলুন।'

—'যুদর, তোমার অনুমান অভ্রান্ত যে-দু' আদমি গত দু' দিন তোমার সক্রিয় সহায়তায় এ-সরোবরের পানিতে জান দিয়েছে তারা আমার সহোদর ভাই। আর বাজারের যে-ইহুদী বণিক তোমার কাছ থেকে খচ্চর দুটো খরিদ ক'রে এক শ' করে দিনার দিয়েছে, সে-ও আমার সহোদর চতুর্থ ভাই। আবদ্-অল-রহিম তার নাম। আমাদের আব্বাজী ছিলেন এক জবরদস্ত যাদুকর। তাঁর নাম ছিল আবদ্-অল-ওয়াদুদ। আদৎ মুসলমান। তাঁর হাতেই আমরা চার ভাই যাদুবিদ্যা শিখেছিলাম। এমন কি গুপ্তধন আবিষ্কারের ব্যাপার স্যাপারও আমরা আব্বাজীর কাছে শিখি। মানে গুপ্তধন আবিষ্কারের সূত্রের ব্যাপার বলতে চাইছি। আমাদের হিম্মতের পরিচয় পেয়ে জিন পরী এবং আফ্রিদিরাও ডরে কুঁকড়ে থাকে।

আমাদের আব্বাজী অগাধ সম্পত্তি, জমি জিরাত ও নগদ ধন দৌলত রেখে বেহেস্তে যাত্রা করেন।

এরকম অগাধ সম্পত্তি আমাদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে গিয়ে যা ঘটা স্বাভাবিক, ঘটলও তা-ই। বিবাদ দেখা দিল আমাদের মধ্যে। শেষে অবশ্য আপোষেই রফা হয়ে গেল। লেকিন, আদৎ ঝামেলা দেখা দিল আব্বাজীর বহুমূল্য কিছু কিতাবের ভাগ বাঁটোয়ারা করতে গিয়ে। তার কিতাবগুলির মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান ছিল 'এ্যাল্ড' নামক কিতাবটি। সেটির ভাগাভাগি করতে গিয়েই আমরা কঠিনতম সমস্যার মুখোমুখি হলাম।

ঠিক তখনই এক সহৃদয় বৃদ্ধ, আমার ওস্তাদ আমাদের মকানে হাজির হলেন। আমাদের আব্বাজীর ওস্তাদও তিনিই ছিলেন। তাঁর নাম ছিল অল-কাহিন্ অল-অবতান্। তিনি অমূল্য কিতাব 'এ্যাল্ড' হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আমাদের উদ্দেশ্যে বল্লেন—'শোন, তোমরা আমার জানের চেয়েও বড়। আমার লেড়কার সমান শিষ্যের প্রিয় লেড়কা তোমরা। তাই তোমরা সবাই আমার চোখে বিলকুল সমান। তাই তোমাদের প্রতি আমার হুকুম রইল যে অল শমরদল-এর গুপ্তধন উদ্ধার করে সেখান থেকে অলৌকিক গোলক, সীলমোহর চিহ্নিত আঙ্গুঠি, তরবারি আর কাজলদানি এনে আমার হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবে সে-ই এ-কিতাবটির মালিকানা স্বত্বলাভের অধিকারী হবে, ইয়াদ থাকবে? উক্ত সামানপত্রের যাদুগুণ রয়েছে। বজ্রদৈত্য নামে এক জিনের জিম্মায় সীলমোহর চিহ্নিত আঙ্গুটি রয়েছে। যার হাতে এটি থাকবে সে নবাব-বাদশা না হলেও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আল্লাতাল্লা-র সমান ক্ষমতার অধিকারী হবে, সন্দেহ নেই। তামাম দুনিয়া তার হুকুমে চলবে।

আর অলৌকিক তরবারিটি যার হাতে থাকবে সে দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করবে না। এক তরবারির ওপর ভরসা করে বিশাল সেনাবাহিনীকে সে অনায়াসে পদানত করার হিম্মত রাখবে।

আর অলৌকিক গোলকটি? সেটি যার দখলে থাকবে সে এক লহমায় তামাম দুনিয়াটি চক্কর মেরে আসতে পারবে। সংক্ষেপে দুনিয়াটি চক্কর মেরে আসতে পারবে। দুনিয়াটি থাকবে তার একদম হাতের মুঠোয়। দুনিয়ার কোথাও গুনাহে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তাকে চোখের পলকে ভস্মীভূত করে দেয়ার হিম্মৎ তার থাকবে।

আর অলৌকিক কাজলদানির ক্ষমতা? তার কাজল সুরমার মাফিক চোখে লাগালে তার চোখের সামনে দুনিয়ার বিলকুল গুপ্তধন ছবির মাফিক ভেসে উঠবে। তাই বলছি কি, এ্যাল্ড নামে এ-কিতাবটি লাভ করতে হলে তোমরা অলৌকিক সামানপত্র তাল্লাশ করে নিয়ে এসো।

আমরা চারভাই সমস্বরে বলে উঠলাম—'ওস্তাদজী,আমরা আপনার প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী কাজ করতে রাজী।

আমাদের এক ভাই বল্ল—'লেকিন ওস্তাদজী, আমরা তো শমরদল-এর ধন ভাণ্ডারের পাত্তা জানি না। কোথায়, কিভাবে গেলে তার হদিস মিলতে পারে কিছু আভাস তো অন্ততঃ দিন।'

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

চারশ' সত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, আবদ-অল-ওয়াদুদ-এর লেড়কাদের অনুরোধে বৃদ্ধ ওস্তাদজী বল্লেন—'তোমরা শমরদল-এর নিশানা জানতে চাইছ? শোন তবে বলছি—শমরদল বাদশাহ লালশাহ-র দুই লেড়কার দখলে রয়েছে। তাদের যুদ্ধে হারাতে না পারলে শমরদল-এর দখল পাওয়া বিলকুল অসম্ভব। বাদশাহের লেড়কা দুটোকে বশীভূত করতে তোমাদের আব্বা কায়দা কসরৎ কম করেন নি। লেকিন তার বিলকুল কসরৎ ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হয়ে গেল। জলদি বাদশাহের লেড়কা দুটো তার মতলব সম্বন্ধে টের পেয়ে সরোবরের পানিতে দুটো লাল মছলীর রূপ ধারণ করে তারা আত্মগোপন ক'রে রইল। আমার আব্বাজী ব্যাপার বেগতিক দেখে হাল ছেড়ে দিলেন। আমি যাদুমন্ত্রবলে জানতে পারলাম, শমরদলের বিপুল ঐশ্বর্য আবিষ্কার করার হিম্মৎ আমাদের আব্বার নেই। এমন কি আমাদের চার ভাইয়ের হিম্মতেও কুলোবে না। তবে কায়রোর বণিক উমর-এর লেড়কা যুদর-এর সক্রিয় সহযোগিতায় তার হদিস পাওয়া ও উদ্ধার করা সম্ভব। সে বণিকের লেড়কা বটে, লেকিন সে ব্যবসাপত্র গুটিয়ে জাল নিয়ে নদীতে নদীতে ঢুঁড়ে মছলি পাকড়াও করার কাজে লিপ্ত হবে। বহু নদী ঘুরে একদিন সে কারুণ-এর সরোবরে মছলির লোভে হাজির হবেই। যুদর'কে দিয়ে হাত-পা পিঠমোড়া করে বাধিয়ে কারুণ-এর পানিতে ঝাঁপ দিতে হবে। পানিতে ডোবামাত্র অলৌকিক শক্তিবলে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে যাবে। হাত বাড়িয়ে লাল মছলিরূপী বাদশাহের সে লেড়কা দুটোকে ধরে ফেলতে হবে। আর যে লেড়কা দুটো পাকড়াও করতে পারবেনা তার জান পানিতেই খতম হয়ে যাবে।'

ওস্তাদজীর বাৎ শুনে আমরা, বড় তিন ভাই রাজী হয়ে গেলাম। লাল মছলীরূপী বাদশাহের লেড়কা দুটো পাকড়াও করে ওপরে তুলে আনার কোশিস করতে চাই, বল্লাম।

লেকিন আমাদের সবচেয়ে ছোট ভাই আবদ্-অল-রহিম ডরে কুঁকড়ে গেল। সে সরোবরের পানিতে ডুব দিতে অস্বীকার করল।

আমরা কসম খেয়েছিলাম, আমাদের মধ্যে যে-ই সরোবরের পানিতে জান দেব তার খচ্চর ও থলিটি নিয়ে বাজারে আবদ-অল-রহিম-এর দোকানে হাজির হবে। সে দুটো বুঝে নিয়ে সে যুদর'কে একশ' দিনার ক'রে দিয়ে দেবে। তার কোন ভাই মোউত-এর হাতে পড়েছে, ইন্তেকাল হয়ে গেছে।

যুদর আমার বড় দু'ভাই লাল মছলি পাকড়াও করতে গিয়ে সরোবরের পানিতে জান দিল। শেষে আমি সক্ষম হলাম। দেখতেই তো পাচ্ছ। আগেই বলেছি, বাদশাহের লেড়কা দুটো অসীম শক্তিধর। তারা দুই আফ্রিদি দানব। তাদের ধরতে পেরে শমরদলের ধনভাণ্ডারের মাত্র প্রথম ধাপ অতিক্রম করতে পেরেছি। এখনও তিন-তিনটি ধাপ আমাকে পেরোতে হবে। যুদর, সে ওস্তাদজীর নির্দেশ অনুযায়ী আমার কাছে তোমার জরুরৎ বহুৎ। আমার বর্তমান বাঞ্ছিতস্থল মারঘ্রিব। মিকনাস আরফেজ-এর অদূরবর্তী সে-জায়গাটি। তোমার সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা পেলে আমি তার নিশানা বের করতে পারবই। তুমি কি আমাকে সঙ্গদান করতে রাজী আছ যুদর? বিনিময়ে তুমি আমার দোস্তী লাভ করবে। আর যা কিছু আশা করবে, দেব কসম খাচ্ছি। কাজ মিটে গেলে তুমি ফিন তোমার প্রিয়জনের কাছে ফিরে যাবে। বল, তুমি কি রাজী?

—'সাহাব, আমিই আমার দু'ভাই ও আম্মার রুটির জোগাড় করি। একমাত্র ভরসা। তাদের অনুমতি পেলে তবে আমার পক্ষে তোমার পিছু নেয়া সম্ভব।'

—'যুদর, আমি বলব, এটি তোমার বাহানা ছাড়া কিছুই নয়। অর্থকড়ির ব্যাপারটিই যদি মুখ্য হয়ে থাকে তবে আমি তোমাকে হাজার খানেক দিনার দিচ্ছি। তাদের দিয়ে বলবে, মাস চারেক বাদে ঘরে ফিরবে।'

এক হাজার দিনারের কথায় যুদর তাজ্জব বনে যায়। নিজেকে একটু সামলে সুমলে বল্ল—'বহুৎ আচ্ছা, দিনারগুলো মায়ের হাতে দিয়ে আমি চারমাসের সময় নিয়ে আসি গে।

বৃদ্ধ মুরের কাছ থেকে এক হাজার দিনার বুঝে পেয়ে যুদর হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের মকানে ফিরল। দিনারের থলিটি আম্মার হাতে দিয়ে চারমাসের ছুটির বন্দোবস্ত ক'রে ফেল্ল। তার আম্মা যদিও গোড়ায় একটু-আধটু চোখের পানি ঝরাল। শেষে যুদর বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে শান্ত করল। আম্মার দোয়া মাথায় নিয়ে সে বৃদ্ধ মুরের সঙ্গে ভেট করল।

বৃদ্ধ মুর এবার তার খচ্চরটিতে নিজে চাপল। যুদর'কে বসাল তার পিছনে। যাদুমন্ত্রবলে তাকে এবার শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চল্ল।

দিনভর তারা উড়ে চল্ল। যুদর খিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়ল। বৃদ্ধ যাদুবলে হাজারো কিসিমের মুখরোচক খানার বন্দোবস্ত করল। এত সব খানা দেখে যুদর তো একদম ভিমরি খাবার জোগাড় হ'ল। যেমন তাদের সোয়াদ, খুসবুও ঠিক তেমনই মনমৌজী। আদতে খচ্চরের পিঠের সঙ্গে ঝুলন্ত একটি থলি যাদুমন্ত্রসমৃদ্ধ। তার কাছে হাত পেতে যা চাওয়া যায় তাই মেলে।

খচ্চরের পিঠে চেপে আকাশপথে চলতে চলতেই তারা খানাপিনা সেরে নিল।

সরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বৃদ্ধ মুর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্ল—'যুদর, আমরা এরই মধ্যে এক মাহিনার পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি।'

বৃদ্ধ মুরের বাৎ শুনে যুদর-এর চোখ দুটো কপালে উঠে যায়।

বৃদ্ধ মুর এবার বল্‌ল—'আমরা দিনভর চলতে থাকলে এক সালের পথ পাড়ি দিয়ে ফেলতে পারব।'

বৃদ্ধ মুর নওজোয়ান যুদর'কে নিয়ে দিনের পর দিন খচ্চর বাহনটিকে সম্বল ক'রে আকাশপথে উড়ে চলতে লাগল। খচ্চরের পিঠেই তাদের খানাপিনার বন্দোবস্ত হয়।

তারা একনাগাড়ে পাঁচদিন-পাঁচরাত্রি আকাশপথে উড়ে এক সময় মারঘ্রিবে হাজির হ'ল। তারপর পৌঁছোয় মিকনাস নগরে। এবার খচ্চরটি ধীরে ধীরে নেমে জমিনে পা রাখল।

বৃদ্ধ মুরটি যুদর'কে নিয়ে প্রাসাদোপম এক মকানে এসে খচ্চরটিকে নামাল।

এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি তাদের স্বাগত জানায়। নাম তার রহমা, সারা দেহে তার যৌবনের জোয়ার লেগেছে। এক লহমায় তার সুরৎ দেখেই যুদর-এর কলিজাটি যেন আচমকা ডিগবাজী খেয়ে ফিন একটু-একটু ক'রে সোজা হ'ল। তার সুরৎ যে কোন পুরুষের দিল্‌কে বিলকুল পাগল ক'রে দেবার হিম্মৎ রাখে। দরিয়ার ঢেউয়ের মাফিক তার নিতম্বের নাচন দেখলে যে কোন নওজোয়ান তো দূরের ব্যাপার বৃদ্ধের মধ্যেও যৌবনের উন্মাদনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর সবেগে সমুন্নত নিটোল স্তন দুটো হরদম কাছে ডাকে।

বৃদ্ধ মুরটি খচ্চরের পিঠ থেকে থলেটি নামিয়ে নিয়ে তাকে বল্‌ল—'তুমি এখন যেখানে দিল্ চায় যেতে পার। ফিন যখন তলব করব, হাজির থেকো। সঙ্গে সঙ্গে জমিন দু'ভাগ হয়ে গেল। খচ্চরটি তার ভেতরে ঢুকে গেল।

বৃদ্ধ মুরটির কাণ্ড দেখে যুদর তো রীতিমত থ বনে গেল। বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হেসে বল্‌ল—'তোমাকে তো বলেছিই, এটি কোন আদৎ খচ্চর নয়। জিনিয়াহ, তাই তো অনায়াসে আশমানে উড়তে পারে।

এদিকে নওজোয়ান লেড়কিটি এক প্রস্থ কোর্তা-পাৎলুন এনে আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'আপনার ময়লা সাজপোশাক বদলে নিন।

বৃদ্ধ মুরটিও থেমে নেই। তার যাদু-থলিটি থেকে হরেক কিসিমের খানা বের করে সাজিয়ে ফেল্‌ল। আমি সাজপোশাক বদলে নিলে মুরটি আমাকে নিয়ে খানাপিনা সারতে বসল।

বিশ-বিশটি দিন বৃদ্ধ মুরটির মেহমান হয়ে যুদর দিব্যি কাটিয়ে দিল।

এক সকালে বৃদ্ধ যুদর'কে নিয়ে শমরদলের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের তাল্লাশে বেরল। তারা হাঁটতে হাঁটতে নগরের সীমানার প্রাচীরের ধারে এসে থমকে দাঁড়াল। দুটো খচ্চর নিয়ে দু'জন নিগ্রো ক্রীতদাস তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বৃদ্ধ মুর যুদর'কে নিয়ে খচ্চরের পিঠে চেপে এগিয়ে চল্‌লো। নিগ্রো ক্রীতদাস দুটো চল্‌ল তাদের পিছু পিছু। পয়দল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হ্‌লে তারা একটি নদীর ধারে পৌঁছল। খচ্চর থেকে নামল। বৃদ্ধ ইশারা করামাত্র নিগ্রো ক্রীতদাস দুটো খচ্চর দুটোকে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেল। কিছু সময় বাদে তারা ফিন ফিরে এল। সঙ্গে তাদের তাঁবু ও বাঁশ-খুটি নিয়ে। এক লহমার মধ্যেই তাঁবু খাটিয়ে ফেল্‌ল। কাঁচের কলসীতে মছলি দুটো কাঁচের জারের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। সেটিকে একধারে রেখে দিল। নিগ্রো দুটো ফিন বে-পাত্তা হয়ে গেল।

বৃদ্ধ মুর এবার কাচের মছলির জার দুটোকে সামনে রেখে বিড় বিড় ক'রে কি সব মন্ত্র আওড়াল। আজব কাণ্ড ঘটে গেল। মছলি দুটো কাঁদো কাঁদো স্বরে ব'লে উঠল—'যাদুকর, আমরা তো কোন নটঘট কাম করিনি। দোহাই আপনারা আমাদের হত্যা করবেন না। আমরা আপনার গোলামেরও গোলাম। মেহেরবানি ক'রে আমাদের জানে বাঁচিয়ে রাখুন।

বৃদ্ধ কিন্তু মন্ত্র পাঠ বন্ধ করল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাঁচের জার দুটো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আর মছলি দুটো বাদশাহের লেড়কার রূপ ধারণ করে বৃদ্ধের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেঁদেকেটে বার বার বলতে লাগল—'খোদা মেহেরবান! দোহা

আমাদের জানে খতম করবেন না। আপনি যা বলবেন তা-ই করব আমরা। বলুন, আমাদের ওপর আপনার কি হুকুম?' ডরে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল।

—'বহুৎ আচ্ছা, শমরদলের পথের নিশানা বাৎলাও।'

—'যাদুসম্রাট, পথ আমরা বাৎলে দিতে পারি। লেকিন আপনার পক্ষে তো শমরদলের শয়নকক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। তবে হ্যাঁ, কেবলমাত্র যুদর নামে এক নওজোয়ানের পক্ষেই সেখানে যাওয়া সম্ভব। একমাত্র কায়রোর যুদর-ই একাজ করতে সক্ষম হবে।'

—'হ্যাঁ, কায়রোর যুদরই যাবে। সে আমার সঙ্গেই রয়েছে। ওই দেখ, কায়রোর উমর-এর বেটা যুদর তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে।'

—'ইয়া আল্লাহ! আপনি তো একদম কামাল ক'রে দিয়েছেন যাদুসম্রাট!' তারা এবার শমরদলের নিশানা বাৎলে দিল।

বৃদ্ধ যাদু-সম্রাট তাদের মুক্তি দিল। মুহূর্তের মধ্যেই বাদশাহের লেড়কা দুটো নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বে-পাত্তা হয়ে গেল।

বৃদ্ধ মুর যাদুকর এবার ধূপদানিতে ধূপ জ্বেলে দিল। তারদুটো রক্তরাগ মণি রাখল। জোরে জোরে বাতাস দিয়ে আচ্ছা করে আগুন জ্বেলে দিল। এবার এক মুঠো ধূনোর গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতেই গল গল ক'রে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ মুর যাদুকর বল্‌ল—'যুদর, আমি এবার ধ্যানে বসব। তার আগে তোমাকে কিছু সতর্ক বাণী শোনাতে চাইছি। কাজের সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলে বিলকুল বরবাদ তো হবেই এমন কি জানও খতম হয়ে যেতে পারে। যা বলছি, ধ্যায়ান কর—আমি যখন চোখ দুটো বন্ধ করে মন্ত্রপাঠ করতে থাকব তখন দেখবে, নদীটির পানি তিরতির ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছে। একদম ঘাবড়াবে না। অল্প সময়ের মধ্যে পানি বিলকুল শুকিয়ে যাবে। তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি সিঁড়ি।

মুহূর্তকাল দেরী না করে তুমি ঝটপট সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাবে। নিচে গিয়ে সুদৃশ্য ও পেল্লাই একটি সদর-দরওয়াজা দেখতে পাবে। তার পাল্লা দুটোতে দেখবে দুটো সোনার বালা কড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। কড়া নাড়বে। কেউ দরওয়াজা খুলবে না। ফিন কড়া নাড়বে। এবারও খুলবে না। তিসরাবার কড়া নাড়তেই দরওয়াজাটি খুলবে। একদম ডরাবে না। বিশালদেহী—একদম জল্লাদের মাফিক দেখতে এক রক্ষীকে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে।

রক্ষীটি বাজখাই গলায় গর্জে উঠবে—'তুমি যদি আদৎ যুদর হও তবে আমার সামনে গর্দান বাড়িয়ে দিয়ে খাড়া হয়ে যাও। আমি তোমার গর্দান নেব।'

—'যুদর, খবরদার! একদম ডরাবে না। নিজের দিলকে শক্ত ক'রে রাখবে। একদম পাথর বানিয়ে ফেলবে। তবে কোনরকম কায়দা-কসরৎ দেখাবার কোশিস কোরো না। তার হুকুম অনুযায়ী গর্দান বাড়িয়ে দেবে। সে তোমার গর্দান তরবারির আঘাত হানতে যাবে, সাচ্চা বাৎ। লেকিন পারবে না। সে হাউমাউ করে কেঁদে তোমার পায়ে পড়ে যাবে। মুহূর্তে খতম হয়ে যাবে। মৌউৎ এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। লেকিন তুমি তার সঙ্গে লড়তে গেলে তার বদলে তোমারই ইন্তেকাল হয়ে যাবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

তারপর সামান্য এগিয়ে চতুর্থ দরওয়াজায় যাওয়ামাত্র ভয়ালদর্শন এক সিংহের মুখোমুখি হবে। সে ধীর-পায়ে তোমার দিকে এগোবে। খবরদার! একদম ডরাবে না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বিশাল হাঁ করবে। ভয় ডর না করে তুমি ডান-হাতটি বেমালুম তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। ব্যস, তবেই তোমার পায়ে জানোয়ারটি ধপাস্ ক'রে পড়ে যাবে।

তারপর আবার এগিয়ে হাজির হবে পঞ্চম দরওয়াজায়। এবার এক লাফে বীর বিক্রমে এক আদমি এসে তোমার মুখোমুখি দাঁড়াবে। বিশালদেহী, ভয়ঙ্কর এক নিগ্রো। সে তর্জন গর্জন শুরু ক'রে দেবে। কলিজা চমকানো স্বরে চিল্লিয়ে উঠবে—'কে? কে তুমি? কোন্ মতলবে এখানে হামলা চালাতে এসেছ?' একদম ঘাবড়াবে না। স্বাভাবিক স্বরে জবাব দেবে—'আমার নাম যুদর। মেদুয়া যুদর। আমার আব্বা কায়রোর প্রখ্যাত এক বণিক ছিলেন।

উমর ছিল তাঁর নাম।'

তোমার জবাব শুনে ভয়ঙ্কর নিগ্রোটি এবার বলবে—'বহুৎ আচ্ছা! তোমার বাৎ যদি সাচ্চা হয়, যদি যুদর-ই তুমি হয়ে থাক তবে এগিয়ে গিয়ে ষষ্ঠ দরওয়াজার সামনে হাজির হও।'

আমার দিল্ বলছে দরওয়াজার সামনে হাজির হয়ে তুমি নিজেকে আর সামাল দিতে পারবে না। তখন আল্লাহ্-র নাম জপ করাই হবে তোমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। কেন, তাই না? দরওয়াজাটি খোলামাত্রই তোমার সামনে কলিজা কাঁপিয়ে দু'-দুটো ড্রাগন সুবিশাল গ্রীবা বিস্তার ক'রে জ্বলজ্বলে চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। লক্‌লকে জিভ নাড়িয়ে তোমার কলিজাকে অবশ ক'রে দিতে চাইবে। তারপর গুটিগুটি তোমার দিকে এগোবার কোশিস করবে। সে-মুহূর্তে তোমার প্রথম ও প্রধান কাজ হবে ঘাবড়ে না গিয়ে তার সামনের পা দুটোকে একদম চেপে ধরা। ইয়াদ রাখবে, কাজ যা কিছু করার বিলকুল আমার মন্ত্রই করবে। তুমি কেবল পুতুল-নাচের পুতুলের মাফিক অভিনয় চালিয়ে যাবে।

তারপর শোন, ড্রাগন দুটো বিকট স্বরে চিল্লাচিল্লি ক'রে মুহূর্তে এলিয়ে পড়ে যাবে। ব্যস, খেল্ খতম।

না। এতেও তোমার রেহাই নেই। আরও কাজ বাকি। তারপর তোমাকে হাজির হতে হবে সপ্তম দরওয়াজায়। সেখানে তোমাকে এক জেনানার মোকাবেলা করতে হবে। বৃদ্ধা, একদম বৃদ্ধা। ছলনাময়ী জেনানা। নানা ছলাকলা তার রপ্ত আছে। সে নিজেকে তোমার আম্মা বলে পরিচয় দেবে। কাছে ডাকবে। আদর-সোহাগ দেখাতে চাইবে। হুঁশিয়ার, তার বাৎ শুনে মজে যেয়ো না যেন। তবে কিন্তু সে দুনিয়া থেকে তোমাকে সোজা বেহেস্তে চালান ক'রে দেবে।

তুমি তাকে দেখে একদম ঘাবড়াবে না। কলিজা শক্ত ক'রে রুখে দাঁড়াবে। তুমি বলবে, তোমার সালোয়ার-কামিজ যা কিছু আছে খুলে ফেলে আমার সামনে বিলকুল উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াও। তা যদি না কর তবে তোমার জান একদম খতম করে দেব।'

সে ওজর আপত্তি চালাবে। কিছুতেই সাজপোশাক খুলতে রাজী হবে না। নানা বাহানা জুড়ে দেবে। তুমি ঝট ক'রে পাশের দেয়াল থেকে একটি তরবারি নিয়ে গর্জে উঠবে—'যদি জানে বাঁচার সাধ থাকে তবে সাজ পোশাক খুলে একদম উলঙ্গ হয়ে আমার সামনে দাঁড়াও। তখন সে আমতা আমতা ক'রে এক-একটি ক'রে পোশাক খুলতে থাকবে। লেকিন আধা পোশাক খুলেই থেমে গিয়ে তোমার মেহেরবানি প্রার্থনা করতে থাকবে। আকুতি মিনতি করবে, চোখের পানি ঝরাবে। তুমি তরবারি তুলে গর্জে উঠবে—'জলদি কর। নইলে একদম দু'টুকরো আলাদা করে ফেলব।' সে তখন সর্বশেষ পোশাকটিও গা থেকে ফেলে দেবে। তারপরই শয়তানি বুড়ি কর্পূরের মাফিক বাতাসে মিলিয়ে যাবে। একদম বে-পাত্তা হয়ে যাবে।

ব্যস, এবার বিলকুল বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে তুমি ধন দৌলতের ভাণ্ডারে পৌঁছে যাবে। তুমি একদম সোনা-রূপা, হীরা-জহরৎ আর মণি-মুক্তার পাহাড়ের মুখোমুখি হয়ে যাবে। কামরা একদম ঠাসা। তুমি এসবের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এগিয়ে গিয়ে হাজির হবে পরবর্তী কামরায়। সেখানে দেখবে এক খুবসুরৎ আদমি সোনার সিংহাসনে গা এলিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় রয়েছে। তার মাথার তাজে চকচক করবে একটি অত্যুজ্জ্বল মণি। সাতরাজার ধন দৌলতের সমান তার দাম। এ-ই যাদুকর শমরদল। সে তখন গভীর নিদে আচ্ছন্ন থাকবে। হ্যাঁ, যা বলতে চাইছি—শমরদল-এর মাথার তাজে যে মানিককে জ্বলজ্বল করতে দেখতে পাবে সেটিই সে আজব গোলক। আর যে তরবারির ব্যাপারে বলা হয়েছে সেটিকেও পাবে শমরদলের দেহেই। তার কোমরে ঝুলবে বাঞ্ছিত সে তরবারিটি। এবার বাকী রইল কাজললতা আর অঙ্গুঠিটি, ঠিক কিনা? শমরদল-এর গলায় সোনার শেকলে কাজললতাটিকে ঝুলতে দেখবে। আর তার আঙুলে শোভা পেতে দেখবে অঙ্গুঠিটি। ইয়াদ থাকে যেন, যে-চারটি অত্যাশ্চর্য সম্পদের জন্য এত ঝুট ঝামেলা ক'রে সেখানে হাজির হবে তা তোমাকে সংগ্রহ ক'রে

তবেই ফিরতে হবে।'

যুদর এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক নিশ্চল-নিথর ভাবে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ যাদুকর মুরের বক্তব্য শুনল। তার চোখের তারায় হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। এবার তার ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌ল—'আপনার বাৎ জরুর ইয়াদ থাকবে। লেকিন, এমন সব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবেলা ক'রে কাজ হাসিল করা কি কোন আদমির দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে?'

বৃদ্ধ যাদুকর মুর এবার যুদর-এর পিঠ চাপড়ে তার কলিজায় সাহস সঞ্চার করতে গিয়ে বল্‌ল—'বেটা ঘাবড়াও মাৎ। আমি তো বলছি, কোনই ডর নেই। দিমাক ঠাণ্ডা রেখে একের পর এক ধাপ এগিয়ে যাবে। আল্লাহ্-র ওপর ভরসা রাখবে। যাদের নিয়ে তুমি ভেবে মরছ আদতে তো তারা সবাই জিন আর আফ্রিদি দৈত্য। তাদের কব্জায় রাখার দায়িত্ব তো বিলকুল আমার ওপরই রইল।'

—'বহুৎ আচ্ছা! খোদা ভরসা। আপনার মর্জি মাফিকই কাজ হবে।'

বৃদ্ধ যাদুকর মুর এবার চোখ দুটো বন্ধ করে ধ্যানে বসল। তার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চরচর ক'রে নদীর পানি শুকিয়ে গেল। বিলকুল শুকনো জমিনে পরিণত হ'ল পানিতে থৈ থৈ নদীটি।

যুদর সাহসে ভর করে এগোতেই সামনে এক সিঁড়ি দেখতে পেল। ব্যস্ত-পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই সিংহ দুয়ারে হাজির হ'ল। তিন-তিন বার সোনার কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে গম্ভীর স্বর ভেসে এল—'কে? কে তুমি?'

—'যুদর। আমি যুদর। কায়রোর বণিক উমর-এর লেড়কা আমি।'

দরওয়াজার পাল্লা দুটো ফাঁক হ'ল। জল্লাদের মাফিক দশাসই চেহারার এক আদমি তার সামনে হাজির হ'ল। সে গর্জে উঠল—'আমি তোমার গর্দান নেব! তোমার জান খতম করব!'

যুদর একদম ঘাবড়ালো না। নিঃশব্দে গলাটি বাড়িয়ে দিয়ে গর্দান দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। সে তরবারি দিয়ে আঘাত তো করতেই পারল না উপরন্তু কাঁপতে কাঁপতে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। এবার দ্বিতীয় দরওয়াজায় হাজির হয়ে যুদর ঘোড়সওয়ারকে খতম করল। বৃদ্ধের পরামর্শ মাফিক দিমাক ঠাণ্ডা রেখে একের পর এক দরজায় নির্বিবাদে ডিঙিয়ে সপ্তম দরজাটিতে হাজির হ'ল। সপ্তম দরওয়াজা খুলে এক বুড়ি যুদর-এর সামনে এসে বিশ্রী স্বর ক'রে হেসে উঠল। কলিজা-কাঁপানো সে-হাসি। বুড়িটি অবিকল যুদর-এর আম্মার অবয়ব ধারণ করেছে। তার আম্মার পরিচয়ও দিল। বৃদ্ধ যাদুকর মুর তো তাকে আগেই এসব বিষয়ে আঁচ দিয়ে দিয়েছিল। ফলে সে বুড়ির কোন ছলাকলাতেই ভুল্‌ল না। সে বরং বজ্র-গম্ভীর স্বরেই তাকে সালোয়ার-কামিজ খুলে উলঙ্গ হয়ে তার সামনে খাড়া হবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। সবশেষে তরবারি দিয়ে তাকে দু' টুকরো করে ফেলার জন্য উদ্যত হতেই বুড়ি জান বাঁচাবার তাগিদে আধা-উলঙ্গ হয়ে তার সামনে দাঁড়াল। যুদর এবার বাকী সাজপোশাক খোলার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। বুড়ি ডাইনি এমন কাতর স্বরে আকুলি বিকুলি শুরু করলে যার ফলে যুদর-এর কলিজা ভিজে গেল। বৃদ্ধ যাদুকর মুরের কড়া হুকুম বেমালুম ভুলে গিয়ে সে কেমন যেন বে-সামাল হয়ে গেল। অনন্যোপায় হয়ে ব'লে উঠল—'আমার সামনে, বিলকুল উলঙ্গ হতে তোমার ইজ্জতে যখন এতই বাঁধছে তবে থাক। আর সাজ পোশাক খুলে কাজ নেই।'

ব্যস, বুড়ি ডাইনি তাকে পেয়ে বসল। নিজমূর্তি ধারণ করল। গর্জে উঠল—'কে আছিস, আয় তো। ডাণ্ডা নিয়ে আয়। শয়তান বেতমিসটাকে মেরে একদম হাড্ডি গুঁড়া ক'রে এখান থেকে একদম ভাগিয়ে দে।'

ব্যস, খেল্ শুরু হয়ে গেল। আচমকা যুদর-এর ওপর বেধড়ক ডাণ্ডা পড়তে লাগল। আর সে সঙ্গে কিল-চড়-লাথি তো রয়েছেই। যুদর তাজ্জব, বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। কে যে ডাণ্ডা চালাচ্ছে আর কে-ই বা কিল-চড়-লাথি মারছে কিছুই সে মালুম করতে পারল না। তার মুখ দিয়ে কেবল বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লাহ! আল্লাহ মেহেরবান।'

যুদর এবার পিছোতে পিছোতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একদম সে-নদীটির পাড়ে এসে পড়ল।

যুদর ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধ যাদুকর মুরটির সামনে দাঁড়িয়ে হতাশার স্বরে বল্ল—'হেরে গেলাম। বিলকুল হেরে গেলাম। পারলাম না। আমাকে মাফ করবেন।'

বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি তার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ হানে।

যুদর ব'লে চলে—'আম্মার সকরুণ মিনতি অগ্রাহ্য ক'রে সর্বশেষ কামিজটি খোলার জন্য তার ওপর জুলুম চালাতে পারলাম না। আমাকে মাফ করবেন। আমার কলিজাটি হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, 'তোমার ইজ্জতে যখন এতই বাঁধছে তবে থাক। আর সাজপোশাক খুলে কাজ নেই।' আমি নিশ্চিত যে, সে আমার আম্মা নয়—শয়তানি। তা সত্ত্বেও আমি জুলুম করতে পারলাম না। তার শেষ আবরণটুকু খুলে উলঙ্গ হওয়ার জন্য জুলুম চালাতে পারলাম না। আমার কসুর হচ্ছে বুঝেও তার ওপর সদয় হতেই হ'ল। ব্যস, এতেই আমি তালগোল পাকিয়ে বিলকুল ব্যাপারটিকে বরবাদ করে দিলাম। নসীব আমার খারাপ। নইলে তার মুখে আমার আম্মার মুখের আদল কেনই বা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে? মেহেরবানি ক'রে আমার গোস্তাকি মাফ করে দিন। আমার জন্য—হ্যাঁ, একমাত্র আমার দুর্বলচিত্তের জন্য আপনার পরিকল্পনা বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল। দোয়া করুন। আমাকে মাফ করে দিন।' বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি যুদর'কে প্রবোধ দিতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—'শোন, নসীবে যা ছিল ঘটে গেছে। ঝুটমুট কপাল চাপড়ে ফয়দা কিছুই হবে না। এখন পুরো একটি সাল আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। ঠিক এক সাল বাদে, আজকের তিথি নক্ষত্রে ফিন আমরা এখানে এসে কাজ হাসিল করার জন্য কোশিস করব। ইয়াদ থাকে যেন, ঠিক এক সাল বাদে।'

এবার বৃদ্ধের ইঙ্গিত পেয়ে খচ্চর দুটো হাজির হ'ল। বৃদ্ধ যুদর'কে নিয়ে হাজির হ'ল ফেজ নগরের বিশালায়তন সে-মকানে। তার সঙ্গে খোস মেজাজে যুদর পুরো একটি সাল সেখানে গুজরান করে দিল।

এক সাল বাদে ফিন সে-তিথি নক্ষত্র হাজির হ'ল।

বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি ফিন যাদু-খচ্চরের পিঠে চেপে যুদর'কে নিয়ে সে নগর-প্রাচীরটির ধারে এসে থামল। তারপর এল সে-নদীটির ধারে।

তার নির্দেশে খচ্চর দুটো বে-পাত্তা হয়ে গেল।

নিগ্রো দুটো তাঁবু ও বাঁশ-খুঁটি হাজির করল। তাঁবু খাটিয়ে ফেল্‌ল মুহূর্তের মধ্যেই। তারপর তারাও বৃদ্ধের ইঙ্গিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৃদ্ধ মুরটি এবার ধূনো জ্বাল্‌ল। মুঠো মুঠো ধূপ ছড়িয়ে দিল। কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগল।

বৃদ্ধটি এবার যুদর-এর দিকে চোখ তুলে তাকাল। স্বাভাবিক স্বরেই উচ্চারণ করল—'ইয়াদ আছে তো। আগের সালে গলতি করেছিল এবার জরুর সেরকম করবে না। কি বল?'

—'না, এবার কলিজা শক্ত ক'রে কাজ করব। কসুর-গলতি যা কিছু একবারই করেছি, আর নয়।'

—'তবু বলছি, যা-ই ঘটুক না কেন কিছুতেই সে-শয়তানটির মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে ভুলেও ভাববে না যে, সে তোমার আম্মা। মোদ্দা বাৎ, ডাইনিটির কোন ছল চাতুরির ফাঁদে পা দেবে না। ইয়াদ রাখবে, আগেরবারের মত গলতি কিছু ক'রে ফেল্‌লে কিন্তু জান নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। বুড়ি ডাইনী একদম জান খতম ক'রে দেবে।'

যুদর বল্‌ল—'আমি তো বল্‌লামই, এবার আর বুড়ির ছলনায় কান দেব না। আর যদি সে রকম কোন ভুলচুক করে আপনার পরিকল্পনাটি ভেস্তে দেই তবে আমার জান একদম খতম ক'রে দেবেন।'

বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি এবার চোখ দুটো বন্ধ ক'রে মন্ত্র আওড়ে যেতে লাগল। নদীর পানি শুকিয়ে গেল। যুদর এগিয়ে চল্‌ল সিঁড়িটির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে সে তরতর ক'রে নেমে যেতে লাগল।

তিনবার বন্ধ দরওয়াজায় কড়া নাড়ল। দরওয়াজাটি খুলে গেল। প্রহরী তরবারি উঁচিয়ে ধরে বল্‌ল—'গর্দান বাড়িয়ে দাও।' যুদর নিঃশব্দে ও নির্দ্বিধায় গর্দান বাড়িয়ে দিল। চোখের পলকে নিগ্রোটি হাউমাউ ক'রে কেঁদে তার পায়ের ওপর পড়ে গেল। পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রে।

যুদর এবার সাহসিকতার সঙ্গে একের পর এক দরওয়াজা অতিক্রম ক'রে একদম সপ্তম দরওয়াজাটিতে হাজির হ'ল। দরওয়াজাটি খুলে গেল। শয়তানি বুড়ি এগিয়ে আসে। ছল কলার মাধ্যমে সে যুদর'কে আগের মাফিক ভুলিয়ে ভালিয়ে বশীভূত করার কোশিস করতে থাকে। যুদর কিন্তু কিছুতেই বুড়িটির ছলাকলায় ভুলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে আর রাজী নয়। বুড়ি সালোয়ার-কামিজ খুলতে খুলতে সর্বশেষ ছোট্ট কামিজটি গায়ে রেখে থেমে যায়। যুদর গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে ওঠে—'শয়তানি ডাইনী কাঁহিকার! তাড়াতাড়ি শেষ সম্বলটুকু গা থেকে নামিয়ে ফেল। দেরী করলে তরবারিটি সোজা গেঁথে দেব, বলে দিচ্ছি!'

শয়তানি বুড়িটি উপায়ান্তর না দেখে বাতাসে মিলিয়ে গিয়ে শরম ও জান দু'-ই বাঁচাল।

প্রায় বারো আনা কাজ হাসিল। যুদর এবার অধিকতর সাহস নিয়ে অতিকায় কামরাটিতে ঢুকে গেল। কামরাটি সোনা-রূপা আর

মণি মাণিক্যে একদম ঠাঁসা। তামাম দুনিয়ার ঐশ্বর্য যেন কামরাটিতে টাঁই ক'রে রাখা হয়েছে। যুদর-এর তো ধন দৌলতের দিকে মন নেই। তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সে চারটি বস্তুর দিকেই যত আকর্ষণ।

যুদর এবার তড়াক্ ক'রে পাশের কামরাটিতে ঢুকে গেল, সেখানে একটি সুদৃশ্য সোনার মসনদ। তাতে চিৎ হয়ে শুয়ে যাদুকর অল-শমরদল গভীর নিদে আচ্ছন্ন। তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে মণি মাণিক্য খচিত বহুমূল্য তাজ। তার গায়ে জ্বলজ্বলে একটি অত্যুজ্জ্বল মণি। আজব গোলক। মসনদের কাছাকাছি দেওয়ালে একটি পেল্লাই তরবারি। চকচক করছে। তার গলায় সোনার হারের সঙ্গে ঝুলছে বাঞ্ছিত কাজললতাটি। সে ব্যস্ত হাতে তার তরবারিটি খুলে শক্ত ক'রে নিজের কোমরে বেঁধে নিল। তারপর কাজললতাটি অতীব সন্তর্পণে সম্রাটের গলা থেকে খুলে নিজের গলায় ঝুলিয়ে নিল। আর তাঁর আঙুল থেকে অঙ্গুঠিটি খুলে নিজের ডান-হাতের আঙুলে লাগিয়ে নিল। সবশেষে তাঁর মাথার কাছ থেকে ইয়া বড় মণিটি, যাকে আজবগোলক নামকরণ করা হয়েছে, সেটি নিয়ে নিল। সম্রাট শমরদল আগের মতই গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল।

যুদর কাজ হাসিল ক'রে ব্যস্ত-পায়ে কামরাটি থেকে বেরিয়ে গেল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল নদীটির নির্দিষ্ট স্থলে। মিলিত হ'ল বৃদ্ধ যাদুকর মুরটির সঙ্গে।

বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি তার হাতে বাঞ্ছিত দ্রব্যগুলি দেখে সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠল—'যুদর, এতদিন যাদের খোয়াব দেখেছি আজ তুমি তাকে বাস্তবায়িত করলে! বাঞ্ছিত অমূল্য সম্পদগুলি আজ আমি হাতের মুঠোয় পেলাম! ইয়া আল্লাহ! আমার খোয়াব দেখা আজ সার্থক হ'ল!' খুশীতে ডগমগ হয়ে বৃদ্ধ এবার যুদরকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার দু'চোখের কোল বেয়ে নেমে এল আনন্দাশ্রুর ধারা।

খচ্চরের পিঠে চেপে বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি যুদরকে নিয়ে খচ্চরের পিঠে চেপে প্রাসাদে ফিরল।

রাত্রে খানাপিনা সারতে সারতে বৃদ্ধ যাদুকর বল্‌ল—'যুদর, তোমার জন্যই আমার এতদিনের খোয়াব দেখা সার্থক হ'ল। তুমি নির্দ্বিধায় বল, কি চাও আমার কাছ থেকে? তোমার কোন সাধই অপূর্ণ রাখব না বেটা। আজ আমি ত্রিভুবন বিজয় করার মত হিম্মৎ রাখি। তুমি যা চাইবে তা-ই তোমাকে দু'হাত ভরে দিতে পারব।'

যুদর খানা সমেত হাতটিকে মুখের কাছ থেকে নামিয়ে এনে বল্‌ল—'মেহেরবানি করে যদি আপনার ওই যাদু-থলেটি আমাকে দান করেন তবে বহুৎ খুশী হই। বহুৎ দিন যাবৎ ওটির দিকে আমার নজর পড়েছে।'

—'ব্যস, এতেই তুমি খুশী? আর কিছুই আমার কাছ থেকে তুমি প্রত্যাশা কর না? সামান্য একটি যাদু-থলি—'

—'সামান্য? কাকে সামান্য বলছেন? যা চাওয়া যাবে তা-ই যে দিতে পারে তাকে আপনি সামান্য ব'লে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করছেন। দামী খানা পেলে আমার আর কিছুরই জরুরৎ নেই।'

বৃদ্ধ যাদুকর খুশী হয়ে যাদু-থলেটি এবং মণি-মুক্ত, হীরা-জহরৎ ভর্তি আর একটি থলি দিয়ে যুদর'কে পুরস্কৃত করল। তারপর বল্‌ল—'বেটা, তোমাকে যা দিলাম জিন্দেগীভর দু'হাতে খরচ খরচা করলেও ফুরোবে না। তবু বলছি, কায়রোতে গিয়ে একটি দোকান খুলে বস। দেখবে অচিরেই নগরের সেরা বণিক বনে যাবে। আর এ যাদু-থলিটির কাছে যা কিছু খানাপিনা মাঙ্গবে, পাবে। সোনার থালা ভর্তি খানার সদ্ব্যবহার করে ফিন থালাগুলো খেয়াল করে থলিটির মধ্যে ভরে দিও। ব্যস, ফিন যখন ফরমাশ করবে, মিলে যাবে।'

খানাপিনা সারা হলে বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি ইশারা করতেই একটি খচ্চর এসে সামনে দাঁড়াল। আর এল এক বিশালদেহী নিগ্রো। বৃদ্ধ বল্‌ল—'এ-খচ্চরটি আদতে একটি জিন। তোমাকে নিয়ে আশমান দিয়ে উড়ে যাবে। ব্যাপার স্যাপার তো জানই। বহুবার তো চেপেছ। যাদু-থলি আর মোহরভর্তি থলিটি সঙ্গে দিলাম। আর এক বাৎ, এ-নিগ্রো ক্রীতদাসটিকে কায়রোতে পৌঁছে হাতের কাছে মিলবে। এর হাত দিয়ে খচ্চরটিকে ফেরৎ দিও।

খচ্চরটি পাঁচদিন-পাঁচরাত্রি এক নাগাড়ে আশমান পথে উড়ে

যুদর'কে নিয়ে কায়রোতে হাজির হ'ল।

নিজের দরওয়াজায় পৌঁছেই যুদর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, তার আম্মা সামনে খাড়া। একটি ময়লা কালচিটে পড়া ন্যাকড়া দিয়ে কোনরকমে সে লজ্জা নিবারণ করেছে। দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন অনাহার ও অর্দ্ধাহারে চেহারা একদম হাড্ডিসার হয়ে গেছে।

যুদর তার আম্মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'এ কী সুরৎ হয়েছে তোমার? মালুম হচ্ছে, কতকাল খানাপিনা জোটেনি তোমার! একদম হাড্ডিসার হয়ে গেছ! পানি ঝরে ঝরে চোখের কোণে কালসিটে পড়েছে! ব্যাপার কি? আমি তো দু'বারে এক হাজার দু'শ দিনার দিয়ে গেলাম খরচ খরচা বাবদ। একটু নজর দিয়ে চালালে বহুৎ দিন চলে যাওয়া উচিত ছিল। ব্যাপার কি?'

—'সাচ্চা বাৎ বটে। তবু আমাকে থালা হাতে মহল্লার দুয়ারে দুয়ারে ঢুঁড়তে হয়েছে বেটা। নসীব তো আর খণ্ডাবার নয়। তোর দু'ভাইয়া আমার কাছ থেকে দিনারগুলো কেড়ে নিয়ে দেদার খরচ করতে লেগে গেল। ব্যস, দু'দিনেই বিলকুল উড়িয়ে দিল। সব খুইয়ে ফিন আমার ঘাড়েই চাপল। মহল্লার দুয়ারে দুয়ারে ভিখ মেঙে তাদের মুখে দানাপানি তুলে দিয়েছি। আর নিজে একদম পানি খেয়ে একের পর এক দিন গুজরান করেছি।'

যুদর থলি দুটো দেখিয়ে সোল্লাসে বল্‌ল—'আম্মা, তোমার দুঃখের দিন ঘুচে গেছে। আজ আমি একদম আমীর বনে গিয়েছি। দু'হাতে খরচাপাতি করলেও আমার অর্থ ফুরোবে না। একবার শুধু মুখ ফুটে বল, তোমার দিল্ কি খেতে চাইছে?'

—'পাগল বেটা! একদম বাজে খরচের ধান্দা করবি না। হিসাব ক'রে খরচ না করলে নসীব ফিন বিগড়ে যাবে। বাজার থেকে স্রেফ রুটি-সব্জি খরিদ ক'রে নিয়ে আয় তাতেই চলে যাবে।'

—'স্রেফ রুটি-সব্জী! বিরিয়ানি, কাবাব, কোপ্তা, মোরগ মসাল্লম, বাদশাহী হালুয়া, পেস্তার মিঠাই হরেক কিসিমের মিঠাই—কি খাবে বল?'

লেড়কার মুখে দুষ্প্রাপ্য সব খানার নাম শুনে তার আম্মার চোখ একদম কপালে উঠে গেল। ভাবল, লেড়কা বহুৎ দিন বাদে আম্মাকে কাছে পেয়ে একটু মস্করা ক'রে নিচ্ছে। খুশীতে তার মেজাজ মর্জি বিলকুল শরিফ। লেড়কাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বুড়ি বল্‌ল—'পাগল কাঁহিকার! বাদশাহী মেজাজ রেখে বাজার থেকে রুটি-সব্জী নিয়ে আয় গে, সবাই মিলে ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে পেট ভরে খেয়ে নেব।'

যুদর আর বাৎচিতের দিকে গেল না। সোজা যাদু-থলিটির ভেতরে হাত চালান ক'রে দিয়ে ফর্দ মাফিক খানা বের ক'রে ক'রে সোনার থালাগুলো বোঝাই করতে লেগে গেল। লেড়কার কাণ্ডকারখানা দেখে তার আম্মার দু'চোখ বিলকুল ছানাবড়া হয়ে গেল। নাক আর ভ্রূ কুঁচকে খানাগুলোর খুসবু নিতে লাগল। এমন অলৌকিক কাণ্ড চোখের সামনে দেখলে কে না তাজ্জব বনবে?'

যুদর বল্‌ল—'আম্মা, হরেক কিসিমের খানা, যখন, যা চাওয়া যাবে তা-ই এ থলিটি জোগান দেবে। কেবল খানার নাম বলে ভেতরে হাত চালিয়ে দিতে হবে। ব্যস, তা-ই মিলে যাবে।

যুদর তার আম্মাকে নিয়ে মৌজ করে খানাপিনা সারল।

খানা চিবোতে চিবোতে যুদর বল্‌ল—'আম্মা, আমাদের আর খানাপিনার অভাব রইল না। যত খানা চাইবে, ততই মিলবে। লেকিন আম্মা এ যাদু-থলিটির ব্যাপার কারো কাছে ভুলেও ফাঁস কোরো না যেন।'

—'পাগল কাঁহিকার! এমন এক সম্পদের ব্যাপারে কারো কাছে মুখ খুলতে যাব, আমার দিমাক খারাপ হয়েছে নাকি বেটা?'

দুপুর গড়াতে না গড়াতে যুদর-এর দু'ভাইয়া সালিম আর সলিম মকানে হাজির হ'ল। কামরায় পা দিয়েই তারা বিলকুল নাক টানতে লেগে গেল। হবে না-ই বা কেন? খুসবুতে কামরা যে ভরে রয়েছে। ব্যাপার দেখে তারা বিলকুল তাজ্জব বনে গেল।

সালিম আর সলিম মকানে হাজির হতে না হতেই আম্মা বাদশাহী খানার রেকাবি তাদের সামনে হাজির করল। রেকাবি দুটোর দিকে নজর পড়তেই সালিম-এর মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লা!' আমরা যে বিলকুল বাদশাহ বনে গিয়েছি! ছোট ভাইয়া এসেছে, তাই না?' তারা বাদশাহী খানা দিয়ে ভোজ সারল বটে। লেকিন ছোট ভাইয়ার নসীবের ব্যাপার চিন্তা ক'রে ভেতরে ভেতরে ঈর্ষায় বিলকুল জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল।

ঈর্ষা চাপতে না পেরে সালিম তার ভাইয়া সলিম-এর কানে কানে বলেই ফেল্‌ল—'কি রে, কেমন মালুম হচ্ছে? যুদর বিস্তর মাল কামিয়ে নিয়ে এসেছে। লেকিন তার দিল্ কতদিন সফেদ থাকবে খোদাই জানেন।' ক'দিন বাদে এক ভোরে যুদর কোন্ জরুরী কাজে বাইরে গেছে। এ সুযোগে সালিম আর সলিম তাদের আম্মাকে চেপে ধরল—'কি ব্যাপার বল তো? আমরা যখন যা খেতে চাই যুদর অনায়াসেই ফিন যোগাড় ক'রে ফেলে। তুমিই বা কখন হরেক কিসিমের খানা পাকাও? শিখলেই বা কোথায়?'

—'ইয়া খোদা! খানা পাকাতে যাব কোন্ দুঃখে! জানিস না যুদর দু'দুটো থলি নিয়ে এসেছে পরদেশ থেকে। একটি হীরা-জহরৎ ঠাসা। আর একটি খানা জোগায়। এটি যাদু-থলি। আজব ব্যাপার, যা মাঙ্গবি, পেয়ে যাবি থলি থেকে।'

সালিম আর সলিম এবার গোপনে মতলব ভাঁজতে লাগল,

আম্মার কাছ থেকে থলি দুটো হাফিস করে দেবে। তারপর সুয়েজ বন্দরে হাজির হবে। সেখানকার এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সলিম-এর জানা পরিচয় রয়েছে। তার কাছে খানার থলিটি বেচে দিয়ে বিস্তর দিনার কামিয়ে নেবে। তাকে একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে। তার সঙ্গে দু'জন মস্তান খালাসি থাকবে। তারাই বন্দোবস্ত যা করার করে নেবে।'

সালিম বল্‌ল—'তোর দিমাক বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে। খানার থলি বেচে আর ক'দিন চলবে। তার চেয়ে বরং ক্যাপ্টেনকে পটিয়ে পটিয়ে জাহাজে খালাসি ক'রে নিয়ে যাওয়ার ফন্দি ফিকির বের কর। একবার তাকেই জাহাজে তুলে চম্পট দিলে কিছু দিনের জন্য একদম নিশ্চিন্ত। এরই মধ্যে আমরা এদিকে থলি দুটোর সদ্ব্যবহার করে ফেলতে পারব।' শেষ পর্যন্ত তার মতলব অনুযায়ীই কাজ হ'ল। দু'ভাইয়া ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ভেট করল। নিজেদের মতলবের ব্যাপারে জানাল। একজন খালাসি পাওয়া যাবে শুনে ক্যাপ্টেনের দিল্‌ খুশীতে নেচে উঠল। ক'জন খালাসী তার দরকার। খালাসীর অভাবে জাহাজ ছাড়তে পারছে না। অতএব ক্যাপ্টেন সহজেই সালিম ও সলিম-এর ফন্দি মাফিক কাজ করতে রাজী হয়ে গেল।

সালিম ও সলিম খুশীভরা দিল্‌ নিয়ে মকানে ফিরে এল। মকানে ফিরে সালিম যুদর-এর কামরায় গিয়ে বল্‌ল—'ভাইয়া, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই আমরা এক কাজ করে ফেলেছি। সলিম-এর এক দোস্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন। কাল ভোরেই তার জাহাজ ছাড়বে। তাই তাকে আমরা আজ রাত্রে আমাদের এখানে ভোজ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি কিন্তু গোস্‌সা—'

তাকে শেষ করতে না দিয়েই যুদর বল্‌ল—'সে কী! তোমরা যা বুঝেছ করেছ। আমারও তাতে জরুর মত আছে। থাকাও উচিত। এতে কসুর হয়েছে ভেবে কেন ঝুটমুট নিজেদের কষ্ট দিচ্ছ ভাইজান?'

সন্ধ্যার কিছু বাদে দুই গাট্টাগোট্টা নিগ্রো মস্তানকে সঙ্গে ক'রে ক্যাপ্টেন সালিমদের মকানে হাজির হ'ল। তিন ভাইয়া এগিয়ে গিয়ে মেহমানদের অভ্যর্থনা করে কামরায় এনে বসাল।

একটু বেশী রাত্রেই খানাপিনার আসর বসল। মেহমানদের সঙ্গে সালিম তার দু'ভাইয়াকে নিয়ে ভোজ মেটাতে বসে গেল। খানার পাট চুকল। এবার সবাই দামী সরাবের বোতল খুলে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদর-এর সারা শরীর টলতে লাগল। চোখে আন্ধার দেখল। কুরশির ওপরেই এলিয়ে পড়ে গেল।

দু'ভাইয়া এবার একটি কাপড়ের থলিতে যুদরকে পুরে ক্যাপ্টেনের সঙ্গী মস্তান দু'জনের হাতে তুলে দিল।

নিগ্রো মস্তান দুটো যুদরকে কাঁধে ক'রে নদীর ঘাটে হাজির
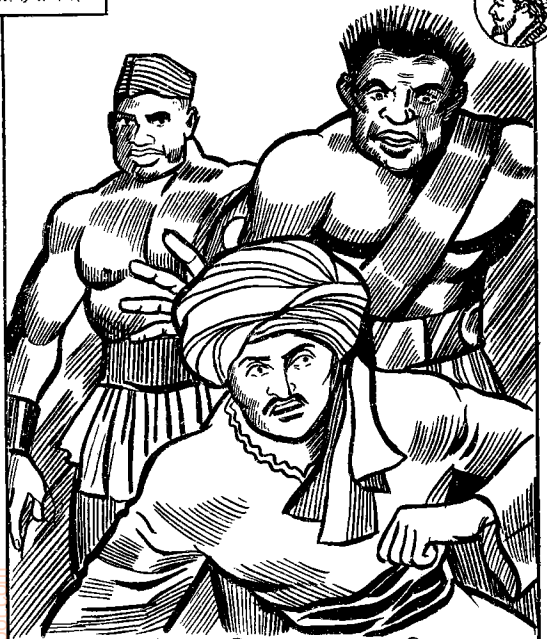
করে। তারপর নৌকায় চাপিয়ে সোজা সুয়েজে নিয়ে যায়।

জাহাজ ছাড়ল। যুদর-এর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেয়া হ'ল। তার কাজ জাহাজের দাঁড় টানা। নসীবের ফেরে যুদর আজ একদম ক্রীতদাস বনে গেল।

এদিকে খুব ভোরে সালিম আর সলিম তাদের আম্মার কামরায় যায়। তার কাছে বলে, যুদরকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রে খানাপিনা সেরে নিজের কামরায় ঘুমোতে চলে যায়। লেকিন এখন সে কামরায় নেই।

তাদের বাৎচিৎ শুনে তাদের আম্মার কলিজা বিলকুল শুকিয়ে যায়।

সালিম বলে—'কাল রাত্রে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মতলব এঁটে ভেগে যায় নি তো? ওর তো পরদেশ সম্বন্ধে বিস্তর আগ্রহ।'

—'তা বেটা হতেও পারে। তোমরা বা আমি জেনে গেলে যদি বেগড়া দেই। সেই ডরেই হয় তো ব্যাপারটি বিলকুল চেপে গেছে।' বলেই বুড়ি মুখে কাপড়চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে বল্‌ল—'তোমরা দু'-দু'টি ভাই খোদার খাসির মাফিক ঠ্যাঙের ওপরে ঠ্যাঙ তুলে দিব্যি ছোট ভাইয়ার ঘাড়ে চেপে দিন গুজরান করছ! আর যুদর রোজগারপাতির ধান্দায় পরদেশ ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে! তোমাদের কি শরম টরম নেই। বেটা আমার এতদিন বাদে ঘরে ফিরল। কই, দু'-চারদিন বসে আরাম করে খাবে। তা না করে ফিন রোজগারের ধান্দায় জাহাজে চাপল।'

আম্মার বাৎ শুনে সালিম আর সলিম-এর ইজ্জতে লাগল। তারা বেধড়ক প্রহার করল। সলিম কামরা থেকে যুদর-এর থলি দুটো বের করে নিয়ে এল্। গস্ গস্ করতে করতে বল্ল—'এসবই আমাদের আব্বাজীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি। তুমি ছোটো লেড়কাকে বেশী পেয়ার কর। তাই তার জন্য গোপনে লুকিয়ে রেখেছ।'

—'না। না, সলিম। যুদর পরদেশ থেকে রোজগার করে নিয়ে এসেছে। এ সবের একটি কানাকড়িও তোদের আব্বাজানের নয়! খোদার কসম, বিলকুল ধনদৌলত যুদর-এর।'

সালিম আর সলিম আম্মার কোন বাৎ-ই শুনল না। যা কিছু বিষয় সম্পত্তি বিলকুল নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করার ধান্দায় মেতে গেল। লেকিন গোল বাঁধল যাদু-থলিটির ভাগ নিয়ে কেউ এর দাবী ছাড়তে নারাজ। সালিম বলে, আমিই মতলব এঁটে যুদর'কে মুলুক ছাড়া করেছি। অতএব থলির মালিক কেন আমি হ'ব না, জানতে চাই।'

সলিম নাছোড়বান্দা। সে-ও থলির দাবী কিছুতেই ছাড়তে নারাজ। ফলে জোর চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল।

সালিম একটি ইয়া মোটা ডাণ্ডা নিয়ে সলিম-এর ওপর তেড়ে যায়। বে-গতিক দেখে সলিম দুটো থলিই দু'হাতে নিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় মারে।

সালিম ডাণ্ডা-হাতে তার পিছু নেয়।

পথে মহল্লার আদমিরা জমায়েৎ হতে থাকে। পথচারীরা জটলা করতে থাকে। লেকিন কেউ এগিয়ে গিয়ে ঝামেলায় জড়াতে রাজী নয়। ঠিক তখনই কোতোয়াল কয়েকজন সিপাহীকে নিয়ে সে-পথে সুলতানের দরবারে যাচ্ছিল। ব্যাপারটি নজরে পড়ায় সিপাহীদের হুকুম করলেন—'দু'জনকেই বন্দী করে আমার সামনে হাজির কর।'

সিপাহীরা দু'ভাইয়াকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে কোতোয়ালের সামনে এনে ফেল্ল।

কোতোয়াল তাদের দু'জনকেই নিয়ে চল্ল সুলতান সামস-অল দুলহারের দরবারে। আজব থলি এবং হীরা-জহরৎ ভর্তি থলি দেখে সুলতানের তো চক্ষুস্থির। এত ধন দৌলত যে তার কোষাগারেও আছে কিনা সন্দেহ। ভাবলেন, নির্ঘাৎ এরা কোন না কোন বাদশাহের কোষাগার লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছে।

সালিম আর সলিম বার বার কাকুতি মিনতি জানাল—এসবের কিছুই তারা জানে না। তাদের ছোটা ভাইয়া যুদর পরদেশ থেকে নিয়ে এসেছিল।

সুলতান যুদর'কে দরবারে হাজির করতে বল্লেন। লেকিন তা কি ক'রে সম্ভব? যুদর তো জাহাজে চেপে দরিয়ার চক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে সুলতান দু'ভাইয়াকে ফাটকে আটক করলেন। যুদর ফিরলে বিচার হবে। আর তাদের বুড়ি আম্মার জন্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিয়ে তখনকার মত ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখলেন।

সুলতানের হুকুমে উজির ফি মাহিনা যুদর-এর আম্মাকে মাসোহারা পাঠাতে লাগলেন।

এদিকে সুয়েজ বন্দরের ক্যাপ্টেন যুদর-এর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিনভর জাহাজের হাল টানিয়ে হালৎ একদম সঙ্গীন করে ছাড়ছে। নসীব। বিলকুল নসীবের ফের।

জাহাজ দরিয়ার ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দিনের পর দিন নয়া নয়া বন্দরে ভিড়তে লাগল। শেষে একদিন কুয়াশার ফাঁদে

পড়ে এক পাহাড়ের গায়ে জাহাজটি আছাড় খেয়ে পড়ল। ব্যস, এক লহমায় ভেঙেচুরে একসার হয়ে গেল।

জাহাজের ক্যাপ্টেন-খালাসীরা কে কোথায় ছিটকে পড়ল হদিস মিল্‌ল না। যুদর জাহাজে এক টুকরো কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে এক পাহাড়ের খাঁজে আটকা পড়ল। জানে বেঁচে গেল।

অনবরত দরিয়ার ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে শরীর অবশ। প্রায় সমতল এক চিলতে পাথরের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে কিছু সময় থেকে একটু দম নিয়ে নিল। তারপর পাথরের গা-বেয়ে এগোতে এগোতে এক সময় সে পাহাড় ছেড়ে সমভূমিতে হাজির হ'ল। হাঁটা জুড়ল। হাজির হ'ল এক তীর্থযাত্রীদের তাঁবুতে।

তীর্থযাত্রীদের দলপতি এক বণিক। মাঝ-বয়সী। যুদর'কে দেখে তার দয়া হ'ল। জিজ্ঞাসা করল—'আমাদের সঙ্গে যাবে কি? আমরা হজ করতে চলেছি। যদি দিল্ চায় আমাদের সঙ্গে যেতে পার। হজ সেরে আমরা ফিন আমাদের মুলুক জিদ্দায় ফিরব।'

যুদর যেন আশমানের চাঁদ হাতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' আশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিসসার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, জিদ্দার তীর্থযাত্রীদের পিছন ধরে যুদর মক্কায় হাজির হ'ল। যুদর ভাবল, নসীব—বিলকুল নসীবের ব্যাপার। নসীবে না থাকলে পুণ্যভূমি মক্কার পবিত্র মাটিতে পদার্পণ করা যায় না।

এদিকে কাবাহ প্রদক্ষিণ করার সময় বিলকুল এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। সে বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি আবাদ-অল-সামাদ-এর সঙ্গে যুদর-এর ভেট হয়ে গেল। যুদর চোখের পানি ঝরিয়ে তার কাছে নিজের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করল।

বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি তাঁকে সঙ্গে করে নিজের আস্তানায় নিয়ে গেল। সে বল্‌ল—'যুদর, তোমার নসীবে যা কিছু দুঃখ-দুর্দশা ছিল ফুরিয়ে এসেছে। এবার শুধুই সুখ—নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্য দিয়ে জিন্দেগীর বাকী দিনগুলি তুমি গুজরান করবে। আমি তোমার নসীব বিচার ক'রে বুঝলাম। আর এ-ও জেনেছি, তোমার ভাইয়াদের জন্যই আজ তোমার এ-হাল হয়েছে। তোমার থলি দুটো নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার সময় কোতোয়ালের মুখোমুখি পড়ে যায়। সুলতান তাদের বিচার করেন। এখন তারা ফাটকে আটক আছে।'

—'আর আমার আম্মা? তার হালৎ—'

—'সুলতান মাসোহারার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন। তা দিয়েই দুঃখে-কষ্টে তিনি দিন গুজরান করছেন। যা হবার হয়ে গেছে। এখন মক্কায় এসেছ, ধর্মকর্ম কর। আর কোনদিন এমুখো হওয়া নসীবে না-ও থাকতে পারে। আমি তোমাকে আমার মুলুকে নিয়ে যাব। সেখান থেকে তুমি যাতে কায়রোয় যেতে পার তার বন্দোবস্ত আমিই করে দেব।'

যুদর বৃদ্ধ যাদুকর মুরটির অনুমতি নিয়ে তার মণিব সে-বণিকটির সঙ্গে মোলাকাৎ করতে গেল। ভাবল, আমাকে যে ঠাঁই দিয়েছিল তাকে না বলে অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত করলে নির্ঘাৎ তার সঙ্গে বেইমানি করা হবে। নিজের মুলুকে ফিরে যাওয়ার কোশিস করলেও তাকে অবশ্যই জানানো উচিত।

যুদর এবার জিদ্দার সওদাগরটির সঙ্গে ভেট ক'রে বহুভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। সে সঙ্গে বৃদ্ধ যাদুকর মুরটির ব্যাপার স্যাপার ও বিস্তারিতভাবে তার কাছে ব্যক্ত করল।

তার মুখে বিলকুল কাহিনী-কিস্‌সা শুনে জিদ্দার বণিকটি খুশি হয়ে তাকে কুড়িটি দিনার জোর ক'রে গছিয়ে দিল।

মণিব-বণিকটির কাছ থেকে ফেরার সময় যুদর সেই-কুড়ি দিনার পথের ভিখারীদের দান করে দিল।

বৃদ্ধ যাদুকর মুরটি যুদর-এর আঙুলে যাদু-অঙ্গুঠিটি পরিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এবার থেকে তুমিই এ-অলৌকিক অঙ্গুঠির মালিক হলে। এর দৌলতে তুমি চাইলে তামাম দুনিয়াটিকে জয় করে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারবে। এর পাথরটিতে হাত রেখে ঘষা দিলেই এক জিন এসে তোমাকে কুর্নিশ জানাবে। বজ্রদানব তার নাম। তাকে যা হুকুম করবে সঙ্গে সঙ্গে সে তা তামিল করবে। ভাঙ্গা বা গড়া—এমন কোন কাজই নেই যা তার হিম্মতে কুলোবে না।

কিছু সময় বাদে যুদর অঙ্গুঠির গায়ে হাত রেখে মাত্র তিনবার ঘষামাত্র এক দানব তার সামনে হাজির হয়ে কুর্নিশ করল। যুদর তাকে হুকুম করল—'আমার মুলুকে আমার মকানে আমাকে পৌঁছে দাও।'

ব্যস, দানবটি তাকে কাঁধে নিয়ে শূন্যে উড়ে চল্‌ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে তাকে কায়রোয় পৌঁছে দিল।

আম্মার সঙ্গে তার মোলাকাৎ হ'ল। তার অবর্তমানে যা কিছু ঘটেছে বিলকুল শুনল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল।

এবার যুদর-এর হুকুমে দানবটি কয়েদখানা থেকে যুদর-এর দু'ভাইয়াকে খালাস ক'রে নিয়ে এল।

যুদর-এর সামনে এসে তারা ডর ও শরমে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, এমন সদাশয় ভাইয়ার সঙ্গে তারা একের পর এক বেইমানি করেছে। এ শরম, এ গুনাহ ঢাকার উপায় খুঁজে

না পেয়ে অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকে। চোখ দিয়ে অনর্গল পানির ধারা নামতে লাগল।

যুদর তাদের নানাভাবে প্রবোধ দিল। এবার জিজ্ঞাসা করল—'ভাইয়া, তোমরা বল তো সুলতান তোমাদের ওপর কিরকম দুর্ব্যবহার করেছেন?'

তারা সবিস্তারে বল্‌ল, সুলতান কিভাবে তাদের অমানুষিকভাবে প্রহার করেছেন, মোহরের থলি এবং যাদু-থলি কেড়ে নিয়েছে আর কয়েদখানায় সুলতানের সিপাহিরা তাদের ওপর দিনের পর দিন বল্গাহীন অত্যাচার চালিয়েছে। আর কিভাবে হাজারো কিসিমের জুলুম করেছে।

যুদর-এর হুকুমে দানবটি এবার সুলতানের প্রাসাদ থেকে থলি দুটো গায়েব করে নিয়ে এল। যুদর এবার যাদু-থলিটি আর হাতছাড়া করল না। নিজের জিম্মায় রেখে দিল। আর হীরা জহরতের থলিটি আর অন্যান্য হীরা জহরৎ যা কিছু ছিল সবই তার আম্মার জিম্মায় রাখল।

এবার একটি দেখনাই প্রাসাদ দরকার। দানবকে হুকুম করতেই সে আগাগোড়া সোনার একটি প্রাসাদ বানিয়ে ফেল্‌ল। এক লহমায় দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। দানবটি বল্‌ল—'হুজুর, তামাম দুনিয়ায় এর সমান প্রাসাদ আর একটিও মিলবে না।'

যুদর এবার দানবটিকে ছুটি দিয়ে দিল। সে যাবার আগে বার বার কুর্নিশ ক'রে ব'লে গেল—'হুজুর, কোন চক্করে পড়ে গেলে, মুশকিল দেখা দিলে তলব করবেন, সঙ্গে সঙ্গে গোলাম হাজির হয়ে যাবে।'

যুদর তার আম্মা আর ভাইয়াদের নিয়ে নয়া প্রাসাদে হাজির হ'ল। কেবল যুদরই নয়, তার আম্মা আর ভাইয়া সবাই প্রাসাদ দেখে তো বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। এমন এক প্রাসাদে বসবাস করা তো দূরের কথা কোনদিন তারা চোখে দেখতে পারবে এমন চিন্তা খোয়াবের মধ্যেও জাগে নি কোনদিন।

প্রাসাদে সামানপত্র নিয়ে হাজির হয়ে যুদরকে এক নতুনতর সমস্যার মোকাবেলা করতে হ'ল। এতবড় প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণ, সাফ খুতরা রাখা, খানা পাকানো, ইয়ার-দোস্ত ও মেহমানদের তদ্বির তদারক করা তো আর তার বুড়ি আম্মার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দানবটিকে ফিন স্মরণ করতেই হ'ল। সে যুদর-এর হুকুমে আশি জনের এক দল নফর-বাঁদী হাজির করল। সবাই নিগ্রো।

এদিকে সুলতানের প্রাসাদে হায় হায় রব উঠে গেল। সকালে জরুরী কাজের তাগিদে কোষাগারের তালা খুলেই সুলতানের খাজাঞ্চী একদম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কেলেঙ্কারী কারবার ঘটে গেছে। সোনাদানা আর হীরা-জহরৎ তো দূরের কথা একটা কানাকড়িও সে কোষাগারে নেই।

কোরবানির পশুর মাফিক একদম কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধ খাজাঞ্চী সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কুর্নিশ সেরে সর্বনেশে খবরটি দিল।

খাজাঞ্চীর মুখে দুঃসংবাদটি শোনামাত্র সুলতান গোস্‌সায় ফেটে পড়লেন। অভিজ্ঞ খাজাঞ্চী, একদল সশস্ত্র প্রহরী সর্বক্ষণ টহল দিচ্ছে—এরপরও কোষাগারে চোর ঢুকলে গোস্‌সা তো হবারই ব্যাপার।

খাজাঞ্চী ফিন কুর্নিশ ক'রে জানায় তালা ভাঙে নি। এমন কি সিঁদও কাটে নি। কোন ফুটো-ফাটাও নেই। আজব ফন্দি ফিকির ক'রে কাজটি সারা হয়েছে।

সুলতানের যত ক্রোধ গিয়ে পড়ল বৃদ্ধ খাজাঞ্চীর ওপরে। তার ওপর যখন তিনি শুনলেন, হীরা-জহরতের থলিটি তো দূরের ব্যাপার এমন কি যাদু-থলিটি পর্যন্ত হাফিস হয়ে গেছে তখন সুলতানের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। ক্রোধোন্মত্ত সুলতান নিজে চললেন সরজমিনে ব্যাপারটি তদন্ত করতে। কার গর্দানে দুটো মাথা যে, এতবড় একটি দুঃসাহসিক কাজে মাথা গলিয়েছে। দরবার কক্ষ যেন গোরস্তানের মাফিক বিলকুল নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেল। উজির-নাজির থেকে শুরু ক'রে আমীর-ওমরাহ পর্যন্ত যারা উপস্থিত কারো মুখেই টু-শব্দটি নেই।

সুলতান গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে করতে কোষাগারে হাজির হলেন। বহুভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। লেকিন কোন কিনারাই করতে পারলেন না। তাঁর কোশিস বিলকুল ব্যর্থ হ'ল। কেবল গোস্‌সায় ফুঁসতে লাগলেন।

এমন সময় কয়েদখানার রক্ষী কাঁপতে কাঁপতে এসে জানাল—সালিম আর সলিম-এর পাত্তা মিলছে না। কয়েদখানার দরওয়াজার তালাগুলি অক্ষুণ্ণ। কোথাও এতটুকু ভাঙাচোরা নেই। রাতভর কড়া পাহারা চলেছে—লেকিন দু' দু'জন কয়েদি উধাও। আজব কাণ্ড।

এমন সময় এক প্রহরী এসে কুর্নিশ ক'রে সুলতানকে জানাল, কাল বিকালেও প্রাসাদের অদূরবর্তী ময়দানটি বিলকুল ফাঁকা ছিল, সকালে সেখানে সুবিশাল এক প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। আগাগোড়া সোনা দিয়ে বানানো। তার ওপর সকালের রোদ পড়ে ঝিল্লা দিচ্ছে।

সুলতান একের পর এক আজব কাণ্ডের খবর পেয়ে বিলকুল দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একদম স্তম্ভিত। মাথায় বাজ পড়লেও আদমির হালৎ হয়ত এরকম হয় না। সুলতান তর্জন গর্জন জুড়ে দিলেন—'শূলে চড়াব! গর্দান নেব! সবক'টি শয়তানের জান খতম করব। কাড়ি কাড়ি দিনার বেতন দিয়ে আমি খোদার খাসি পুষছি! সব শয়তান! সব নিমকহারাম!'

সুলতান বৃদ্ধ উজিরের ওপর দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন সদ্য গড়ে

ওঠা প্রাসাদটির সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করতে। সঙ্গে দিলেন একদল সশস্ত্র সিপাহী।

বৃদ্ধ উজির ফিরে এসে জানাল—যা শোনা গিয়েছিল ব্যাপারটি হুবহু তা-ই। এমন সুবিশাল ও কারুকার্য মণ্ডিত সোনার প্রাসাদ গড়ে তোলা কোন আদমির কাণ্ড নয়। বিলকুল অলৌকিক ব্যাপার।

শেষ পর্যন্ত সবার মতামত এককাট্টা ক'রে সিদ্ধান্ত নেয়া হ'ল—যা কিছু কাণ্ড ঘটেছে সবার মধ্যে বিলকুল যোগ সাজোস রয়েছে। নইলে এক রাত্রের মধ্যেই তিন-তিনটি এমন আজব কাণ্ড কি ক'রে ঘটে?

উজির জানালেন, উমর-এর বেটা যুদর পরদেশ থেকে ফিরে এসেছে। এসব তারই কারবার হওয়া কিছুমাত্রও অবিশ্বাস্য নয়।

উজিরের মুখে এসব তথ্য শুনে সুলতান গোস্সায় একদম ফেঁটে পড়ার জোগার হ'লেন। সিপাহী পাঠিয়ে যুদর'কে বন্দী ক'রে আনার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

বৃদ্ধ-অভিজ্ঞ উজির তাকে বুঝালেন—জাঁহাপনা, দিমাক গরম ক'রে কিছু করতে গেলে বিলকুল ব্যাপার ভেস্তে যাবে। ফয়সালা কিছুই হবে না। ব্যাপারটি তলিয়ে দেখার জরুরৎ রয়েছে। যুদর নির্ঘাৎ কোন অলৌকিক শক্তি রপ্ত করেছে। কিছুদিন তার ওপর কড়া নজর রাখা দরকার।

সুলতান কারো কোন পরামর্শই নিতে নারাজ। যুদর'কে বন্দী ক'রে নিয়ে এসে হয় শূলে চড়াতে নয়তো গর্দান নেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হ'লেন।

উজির তবুও হাল ছাড়লেন না। তিনি বল্লেন—'জাঁহাপনা, শত্রু ছোট বা বড় যা-ই হোক না কেন সবার আগে তার হিম্মৎ কতখানি তা পরীক্ষা করা দরকার। তা না করলে হঠকারিতাই করা হবে। ফলে আখেরে নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনা হবে।'

সুলতান গর্জে উঠলেন—'মানছি। লেকিন আমার কোন প্রজা যতই হিম্মৎ ধরুক না কেন সে তো কিছুতেই আমার সমকক্ষ হতে পারে না।'

—'জাঁহাপনা, তবু আমি বলব, একটু সমঝে চলুন। ধৈর্য ধরুন। নীরবে পাত্তা লাগান। যুদর'কে আপনার অন্য প্রজাদের সমান না ভেবে একটু আলাদা দৃষ্টিতে দেখার কোশিস করুন। কোন মতলব বের করা যাক যাতে তাকে কৌশলে খতম করে দেয়া যায়। যে কোন অজুহাতে তাকে প্রাসাদে ভোজসভায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান। সেখানেই কৌশলে তাকে খতম ক'রে দিন। দুনিয়া থেকে একদম সরিয়ে দিন।'

সুলতান এবার থমকে গেলেন। পাকা মাথা উজিরের মতলবটি তার দিল্‌কে নাড়া দিল।

যুদর'কে নিমন্ত্রণ ক'রে প্রাসাদে নিয়ে আসার জন্য সুলতান

অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আমির উসমান'কে পাঠালেন। তার সঙ্গে দিলেন কয়েকজন সশস্ত্র সিপাহী।

আমির উলমান সুলতানের হুকুম তামিল করার জন্য ছুটলেন যুদর-এর নব নির্মিত প্রাসাদের দিকে।

যুদর-এর প্রাসাদের প্রহরী উলমান-এর পথ রুখে দাঁড়াল। স্বয়ং দানবটি তার প্রাসাদ আগলাচ্ছে। তার কাছে কারো জারিজুরি খাটবে না। তার চোখে ধুলো দিয়ে একটি মশা-মাছিও প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে পারে না।

দানব-প্রহরীটি বাধা সৃষ্টি করলে উলমান-এর সঙ্গী সিপাহীরা ক্ষেপে লাল হয়ে গেল। সুলতানের সিপাহীদের অগ্রাহ্য করবে এতবড় বুকের পাটা কার। ফলে প্রহরী-দানবটির সঙ্গে তাদের হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। দানবটি অলৌকিক শক্তিবলে সুলতানের সিপাহীদের মুহূর্তের মধ্যেই ধরাশায়ী করে দিল।

দুঃসংবাদটি সুলতানের কানে গেল। তিনি ক্ষেপে গিয়ে এক শ' সশস্ত্র সিপাহী পাঠিয়ে দিলেন যুদর-এর প্রহরীটিকে শায়েস্তা করার জন্য। কড়া হুকুম দিয়ে দিলেন, তাকে যেন পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে তাঁর সামনে হাজির করা হয়।

লেকিন দানব-প্রহরীটি চোখের পলকে সুলতানের এক শ' সশস্ত্র সিপাহীর দলটিকে কুপোকাৎ করে দিল। তারপর সুলতানের হুকুমে আরও দু'শ সিপাহী ছুটল। তারাও মুহূর্তে খতম হয়ে গেল যুদর-এর প্রহরী দানবটির হাতে।

সুলতান গুলি খাওয়া শেরের মাফিক গর্জে উঠলেন—'উজির সাহাব, আপনি নিজে যান সৈন্যদল নিয়ে। তার প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দেয়া চাই, ইয়াদ থাকে' যেন।'

উজির সৈন্য সামন্ত না নিয়ে, অস্ত্র রেখে বিলকুল খালি হাতে যুদর-এর প্রাসাদে গেলেন। কারণ, তিনি তো ভালই জানেন, চোখ রাঙিয়ে, অস্ত্রশস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দানবটিকে কব্জা করা যাবে না।

তিনি যুদর-এর প্রাসাদে গিয়ে বিলকুল নরম সুরে দানবটির কাছে প্রাসাদের ভেতরে গিয়ে যুদর-এর ভেট করার অনুমতি চাইলেন।

প্রহরী দানবটি উজিরকে বসতে দিয়ে এক নফর মারফৎ তার মালিককে খবর পাঠাল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চার শ' চুরাশিতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, নফরটি যুদর-এর হুকুমে বৃদ্ধ উজির'কে প্রাসাদের অন্দরে নিয়ে গেল। এক সুসজ্জিত কামরায় মণি মাণিক্য খচিত মসনদের সমান এক আসনে আয়েশ ক'রে যুদর বসে। উজিরকে দেখেই যথোচিত সম্ভাষণসহ বসতে দিল। কথা প্রসঙ্গে সে জানাল, সুলতান তার সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে বিবাদ করছেন। যদিও তার প্রহরী দানবটি একাই সুলতানের প্রেরিত একাধিক সেনাদলকে ঘায়েল করে দিয়েছে।

উজির তবুও বিলকুল নরম সুরেই বল্‌ল—'সুলতান আপনার সঙ্গে একবারটি ভেট করতে আগ্রহী। তাই আপনার ইজ্জতের খাতিরে এক খানাপিনার আসরের বন্দোবস্ত করছেন। আমি সুলতানের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে। এটুকু অন্ততঃ ইয়াদ রাখবেন সুলতান আপনাকে তাঁর জিগরী দোস্ত ব'লে মানেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা! সুলতান যখন আমাকে দোস্ত ব'লে মেনে নিয়েছেন তখন এতে তো আর কোন ওজর আপত্তিই চলে না। আপনি মেহেরবানি ক'রে যদি আমার হয়ে একটি কাজ করেন তবে বহুৎ খুশী হ'ব। সুলতানকে গিয়ে বলবেন, আজ রাত্রে আমি খানাপিনার বন্দোবস্ত করছি আমার প্রাসাদে তিনি মেহেরবানি ক'রে পায়ের ধুলো দিলে খুশীই হ'ব। যুদর-এর হুকুমে দানবটি সোনা-রূপার জরির নকসা করা এক প্রস্ত পোশাক এনে উজিরের হাতে দিল। যুদর সেগুলো তাকে পরতে অনুরোধ করল। উজির তার অনুরোধ রক্ষা না করে পারলেন না। গায়ে চাপিয়ে যুদর-এর সামনে দাঁড়ালেন।

যুদর বল্‌ল—'আপনি আমার প্রাসাদ ও প্রাসাদের অন্যান্য সামানপত্র যা কিছু দেখে গেলেন সুলতানকে গিয়ে বলবেন।

উজির ফিরে এসে যুদর-এর প্রাসাদ ও তার ধন-দৌলত যা কিছু দেখেছেন হুবহু তারই ছবি সুলতানের কাছে তুলে ধরলেন। সব শেষে ভোজ সভায় যোগদানের নিমন্ত্রণের কথা জানালেন।

সুলতান যুদর-এর আয়োজিত ভোজসভায় যোগদানে সম্মত হলেন।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সুলতান একদল সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে যুদর-এর প্রাসাদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

এদিকে সুলতান ভোজসভায় যোগদান করতে আসছেন খবর পেয়ে প্রহরী দানবটি যুদর-এর নির্দেশে তাঁর কয়েক শ' ভয়াল দর্শন বীর যোদ্ধাকে প্রাসাদের সদর-দরওয়াজার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাল। উদ্দেশ্য, সুলতান যাতে প্রাসাদে ঢোকার মুখেই একটি বড় রকমের ধাক্কা খান। তার ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছুটা অন্ততঃ আঁচ করতে পারেন।

যথা সময়ে সুলতান তাঁর রক্ষী-সৈন্যদের নিয়ে যুদর-এর প্রাসাদের সদর-দরওয়াজায় হাজির হলেন।

একজন নফর তাঁকে তেমন সম্মানসূচক সম্বোধন না করেই অন্দরমহলে তার মালিক যুদর-এর কামরার দিকে নিয়ে চল্‌ল। ব্যাপারটি যেন নেহাৎই মামুলি। যেন একদম নগণ্য কোন আদমি তার মালিকের সঙ্গে ভেট করতে এসেছে। সুলতান এতে যারপরনাই মর্মাহত হলেন। মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না বটে। তবে ভেতরে ভেতরে গর্জাতে লাগলেন।

যুদর-এর কামরায় ঢুকে সুলতান একদম ভড়কে গেলেন। যুদর আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে অন্যমনস্কতার বাহানা করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। সুলতানকে পাত্তাই দিল না। এমন কি কুরশি দেখিয়ে বসতে পর্যন্ত বল্‌ল না।

সুলতান একদম অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। সেখানে থাকবেন, নাকি নিজের প্রাসাদে ফিরে যাবেন, স্থির করতে পারলেন না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে যুদরই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বল্‌ল—'দুটো যুবককে আপনার কয়েদখানায় আটক রেখে আপনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কি কসুর ছিল তাদের, বলতে পারেন? অন্যের ধন দৌলত দিয়ে কোষাগার পূর্ণ করাকেই কি আপনি সঙ্গত মনে করেছিলেন?'

বেগতিক বুঝে সুলতান নিজ কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। যুদর এবার কুরশি এগিয়ে দিয়ে সুলতানের বসার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

যুদর-এর দু'ভাইয়া সালিম ও সলিম যাদু-থলির সাহায্যে বাদশাহী খানার বন্দোবস্ত করল। সুলতান খানাপিনা সেরে খুশিভরা দিল্ নিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

এবার থেকে সুলতান ফিরোজ যুদর-এর প্রাসাদে আসতে লাগলেন। যুদর যাদু-থলির সাহায্যে নিত্য নতুন মুখরোচক খানা দিয়ে মেহমান সুলতানকে আপ্যায়ন করল।

সুলতান যুদর-এর প্রাসাদে যতবারই যাচ্ছেন ততবারই দেখেন, নিত্যনতুন বহুমূল্য আসবাবপত্রে আগাগোড়া প্রাসাদটি সাজানো। আজব ব্যাপার তো! কী অপরিমিত ধন দৌলত থাকলে কারো পক্ষে এমন আজব কাণ্ড ঘটানো সম্ভব তা নিজের চোখে পরখ না করলে ধারণা করা বিলকুল অসম্ভব।

সুলতান যুদর-এর দিলখোলা আচরণে মুগ্ধ হন। লেকিন তাঁর মধ্যে ধারণা জন্মায়, কোনদিন হয়ত যুদর তাকে হত্যা ক'রে মসনদে বসে প'ড়বে।

সুলতানের আশঙ্কার ব্যাপারে উজির জানতে পেরে বল্‌লেন—'যুদর কোন্ লোভে আপনাকে হত্যা করবে? আপনার ধন দৌলতের তোয়াক্কা সে করে না। তার নিজের যা কিছু আছে তা আপনি খোয়াবে ভাবতে পারেন নি কোনদিন। তামাম দুনিয়ায়ও তার সমান ধন দৌলত নেই। দুনিয়াটিকে সে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেওয়ার হিম্মৎ রাখে।

সুলতানের মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে ওঠে। বৃদ্ধ অভিজ্ঞ উজির এবার বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভয়-ডর দেখিয়ে বা কব্জির জোরে যুদর'কে ঘায়েল করার আশা একদম ছেড়ে দিন। যদি পারেন ফাঁদ পেতে তাকে বাঁধার কোশিস করুন। আপনার লেড়কিকে ভিড়িয়ে দিন। যুদর-এর সঙ্গে তার শাদীর বন্দোবস্ত করুন। যুদর যদি রাজী থাকে, নসীব ঠুকে তার গলায় আপনার লেড়কিকে লটকে দিন।'

সুলতান খুশীতে বিলকুল ডগমগ হয়ে ব'লে উঠলেন—'বহুৎ বড়িয়া মতলব ভেজেছেন উজির সাহাব! যুদর রাজী হ'লে একদম কিস্তীমাৎ—এক ঢিলে দুই পাখি।'

উজির ব'লে চল্‌লেন—'জাঁহাপনা, তবে দেরী না করে আজ রাত্রেই যুদর'কে ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করুন। আর খানাপিনা চলাকালীন আপনার খুবসুরৎ লেড়কি আসিয়াহ'কে জরুর হাজির রাখবেন।'

সুলতানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যুদর তাঁর প্রাসাদে হাজির হ'ল। তার একমাত্র সবচেয়ে বড় অবলম্বন, তার ডান-হাত প্রহরী দানবটিকে সে সঙ্গে আনতে ভুল্‌ল না।

যুদর ভোজসভায় উদ্ভিন্ন যৌবনা খুবসুরৎ আসিয়াহ'কে দেখে মুগ্ধ হ'ল। তার সুরৎ দেখতে দেখতে একদম তন্ময় হয়ে গেল। নিজেই উজিরের কাছে প্রস্তাব দিল—সুলতান রাজী থাকলে সে তার লেড়কি আসিয়াহকে শাদী করবে।

সুলতান যুদর-এর মুখ থেকে শাদীর প্রস্তাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠিয়ে কাজীকে তলব করলেন।

সুলতানের তলব পেয়ে কাজী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। শাদীর কবুল নামা তৈরী করলেন। সাক্ষীরা কবুল নামায় সাক্ষর করলেন। আসিয়াহ আর যুদর-এর শাদী হয়ে গেল।

তাদের শাদীর কিছুদিন বাদে সুলতান দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে যাত্রা করলেন।

উজির-নাজির ও আমীর-ওমরাহদের সনির্বন্ধ অনুরোধে যুদর সুলতানের মসনদে বসল। তার দুই ভাইয়া সেলিম ও সলিম দরবারে দুই উজিরের পদে নিযুক্ত হ'ল।

একটি সাল নির্বিবাদেই কাটল। তারপরই শুরু হ'ল যুদর-এর দু'ভাইয়ার কুপরামর্শ। তারা ছোট ভাইয়ার কাছে থেকে নোকরি করতে নারাজ। মতলব আঁটতে লাগল কি ক'রে যুদর'কে ফাঁদে ফেলে, গোপনে হত্যা করে মসনদটি হাতানো যাবে। তারা ফন্দি বের করল। যুদর-এর খানার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করবে।

সে রাত্রেই সুযোগসন্ধানী বেইমান সলিম ছোট ভাইয়া যুদর'কে হত্যা করল। তার হাতের যাদু-অঙ্গুঠিটি হাতিয়ে নিল। অঙ্গুঠিটির ব্যবহার ইতিমধ্যেই সে জেনে নিয়েছে। এবার তার ওপরে বার-কয়েক আঙুল দিয়ে ঘষল। ব্যস, দানবটি তৎক্ষণাৎ তার সামনে হাজির হয়ে কুর্নিশ ক'রে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

সলিম হুকুম করল—'সালিম'কে হত্যা কর।' দানবটি এক লহমার মধ্যেই সালিম'কে গলা টিপে হত্যা করল। সলিম এবার

মসনদ দখল করে সুলতান বনে গেল। এক রাত্রির মধ্যে এতসব আজব কাণ্ড ঘটে গেল। ব্যাপার দেখে উজির-নাজির থেকে শুরু ক'রে প্রধান সেনাপতি পর্য্যন্ত সবাই বিলকুল তাজ্জব বনে গেলেন।

সলিম এবার যুদর-এর খুবসুরৎ যুবতী বিবি আসিয়াহ্'কে শাদী ক'রে শয্যাসঙ্গিনী করল।

তন্বী যুবতী বিধবা আসিয়াহ্ ফিন সধবা হ'ল। বাসরঘরে শাদীর সাজপোশাক পরে সে সলিমকে আদর সোহাগ করে পাশে বসায়। সলিম-এর যেন আর তর সইছে না। সদ্য শাদী করা, বহু দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিতা বিবিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করার জন্য বিলকুল ছটফট করতে থাকে। চুম্বন করার জন্য নিজের মুখটিকে বার বার আসিয়াহ্-র ঠোঁটের কাছে নিয়ে যায়।

আসিয়াহ্ আবেগ-মধুর স্বরে বলে—এত অস্থির হওয়ার কি আছে। আমাদের শাদী তো মিটেই গেছে। আমি তো তোমার হয়েই জিন্দেগীভর তোমার কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকব। এসো, পালঙ্কের ওপর বোসো। সরাব পান ক'রে দিল্ আর কলিজাকে আগে চাঙা ক'রে নাও। নইলে রাতভর লড়বে কি ক'রে?

সলিম ভাবল, আসিয়াহ্ তো বিলকুল সাচ্চা বাৎ-ই বলেছে। সে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে সরাবের পেয়ালা হাতে তুলে নিল। এক লহমার মধ্যে সেটি শূন্য ক'রে শূন্য পেয়ালাটি ফিন পূর্ণ ক'রে দেয়ার জন্য বিবির হাতে তুলে দিল। দ্বিতীয় পেয়ালাটি ঠোঁটের কাছে নিতে না নিতেই সে ঢলে পড়ল। তার শরীর ও মুখ ক্রমে নীল হতে লাগল।

আসিয়াহ্ এবার দরওয়াজা খুলে বাইরে গেল। উজির-নাজির, আমীর-ওমরাহ এবং সেনাপতিদের তলব ক'রে সবার চোখের সামনে যাদু-অঙ্গুঠিটি হাতুড়ির আঘাতে বিলকুল গুঁড়ো ক'রে দিল। আর যাদু-থলিটিকে কেটে কুঁচি কুঁচি করে দিল।

আসিয়াহ্ এবার বল্ল—'আমাদের সুলতানিয়তে যারা অশান্তি আর দুঃখ-দুর্দশার কারণ ছিল আজ আমি নিজ হাতে বিলকুল খতম ক'রে দিলাম। আপনারা নতুন সুলতানকে বসিয়ে সুলতানিয়তের শান্তি ফিরিয়ে আনুন।'

কিস্‌সাটি শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

বাদশাহ শারিয়ার এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক নিশ্চল-নিথরভাবে বসে কিস্‌সাটি শুনছিলেন। এবার উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে কিস্‌সাটির ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

দুনিয়াজাদ উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে তার বহিনজীর গলা জড়িয়ে ধরে বারবার চুমু খেতে লাগল।

রজক ও পরামাণিকের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্লেন—'জাঁহাপনা, রাত্রি এখনও ঢের বাকী। এবার আপনাকে 'রজক ও পরামাণিকের কিস্‌সা' শোনাচ্ছি।

আলেকজান্দ্রিয়া নগরে কোন এক সময়ে আবু কাইর নামে এক রজক আর আবু শাইর নামে এক পরামাণিক বাস করত। উভয়েই তাদের জাত ব্যবসার মাধ্যমে দিন গুজরান করত।

মহল্লার আদমিরা আবু কাইর'কে পহেলা নম্বরের শয়তান বেতমিস ব'লে জানত। তার দিমাকে হরবখত যত সব শয়তানী ফন্দি-ফিকির চক্কর মারত। তার ধান্দাই ছিল ছলাকলার মাধ্যমে লোকের সর্বনাশ করা। কোন খদ্দের তার কাছে কোর্তা-কামিজ ধোলাই ও রঙ করতে এলে আগাম বহুৎ অর্থ আদায় ক'রে নিত। লেকিন কোর্তা-কামিজ বেমালুম হজম করে ফেলত। কোন খদ্দেরই তার নিজের জিনিস আর ফেরৎ পেত না। তার ছল চাতুরির অভাব ছিল না। ফলে খদ্দেরদের দিনের পর দিন তার পিছন পিছন ঢুঁড়ে হয়রান হয়ে কপাল চাপড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকত না।

এক খদ্দের একবার তার ভাটিখানায় এসে কোর্তা-কামিজের জন্য খুব হম্বিতম্বি জুড়ে দেয়। রীতিমত হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয়। আবু কাইর কেঁদেকেটে দু'চারদিনের সময় নেয়। এমন বুঝিয়ে দেয় যে, ভাটিখানায় সে যখন কাজে ব্যস্ত ছিল তখন নাকি সব কাপড় গায়েব হয়ে গেছে। এখন তাকেই আক্কেল সেলামি দিতে হবে। তার নয়া কাপড়াটি রঙ ক'রে শুকোতে দিয়েছিল। সন্ধ্যায় মকানে ফেরার পর সেটি আর পায় নি। বেমালুম চুরি হয়ে গেছে।

কাপড়ার মালিক তার বাৎ শুনে রেগে একদম কাই হয়ে গেল। আবু কাইর এবার বল্ল—'হুজুর আপনি হয়ত জানেন না, প্রতিবেশী এক চোর দিন দিনই আমার সর্বনাশ ক'রে চলেছে। দু'-চারদিন বাদে বাদেই সে আমার কাপড়ার ওপর হামলা চালায়। বেমালুম চুরি ক'রে নিয়ে ভেগে যায়। এখন আমি একদম বেসামাল হয়ে পড়েছি হুজুর!'

—'চোর? কে? কোথাকার চোর?'

—'আমার প্রতিবেশী' আমার ঘরের কোণে থেকে হরদম চুরি করে চলেছে। কি আর বলব হুজুর, ওই যে পরামাণিক— ঝুপড়ি বানিয়ে বসে চুল-দাড়ি কামানোর বাহানা করে, তার কথা বলছি। তার ধান্ধা চুরি করা, আপনি দেখে নেবেন হুজুর, একবার বামালসহ হতচ্ছাড়া পরামাণিককে ধরতে পারলে জিন্দেগীর মত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। তখন বুঝবে, কার সঙ্গে নক্কড়বাজি করতে এসেছে!

খদ্দেরটি রজক আবু কাইর-এর চোখের পানি দেখে গলে গেল। নিজের কোর্তা-কামিজের আশা ছেড়ে দিয়ে উল্টে তাকেই সান্ত্বনা দিতে হ'ল। আপশোষ কোরো না ভাইয়া। গুনাহ করলে আল্লাতাল্লাই তার বিচার করবেন। তোমার যা কিছু লোকসান হয়েছে আজ না হোক কাল তিনি তোমাকে পুষিয়ে দেবেনই।'

রজক আবু কাইর-এর ধান্ধাবাজী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। ধীরে ধীরে তার কারবার শিকেয় উঠল। কোর্তা-কামিজ নিয়ে কেউ ভুলেও আর তার দরওয়াজায় আসে না।

আবু কাইর বেকায়দায় পড়ল। কারবার একদম বন্ধ। পেটের জোগাড় করাও তার সম্ভব হচ্ছে না। বেমালুম উপোষ করে কাটাচ্ছে।

আবু কাইর-এর দুঃখ দুর্দশা দেখে তার প্রতিবেশী পরামাণিক আবু শাইর-এর দিল্‌ কেঁদে উঠল।

আবু শাইর একদিন আমতা আমতা ক'রে আবু কাইর'কে বলল—'ভাইজান, বলতে আমার মুখে বাঁধে, এভাবে কতদিন আর ভুখা কাটাবে। এক কাজ কর, আজ থেকে আমার সঙ্গেই খানাপিনা কর। আগে জান তো বাঁচাও পরে যা হয় কোরো।'

অনন্যোপায় হয়ে আবু কাইর পরামাণিক আবু শাইর-এর সঙ্গে খানাপিনা সারতে লাগল। এভাবে কোনরকমে তার জান রক্ষা পেল।

এদিকে আবু শাইর দিন দিনই বুড়ো হচ্ছে। আগের মত খাটাখাটুনি করতে পারে না। তাঁর উপার্জন ক্রমেই কমতে থাকে। শেষে হালৎ এমন হয়ে দাঁড়াল যে, নিজের পেটের জোগার করাই সমস্যা। তার ওপর বাড়তি ঝামেলা রজক আবু কাইর-এর সংসারের বোঝা যোগ হ'ল।

আবু শাইর-এর হালৎ বিলকুল বে-সামাল দেখে আবু কাইর তাকে পরদেশে গিয়ে উপার্জনের ফন্দি ফিকির করার মতলব দিল। নয়া কোন নগরে গিয়ে কারবার ফেঁদে বসলে রোজগার জরুর হবে। এভাবে অন্ততঃ ভুখা মরতে হবে না।

আবু শাইর আবু কাইর-এর মতলব অনুযায়ী কাজ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। দোকানের ঝুপড়িটি বেচে দিল।

আবু কাইর কোরাণ শরিফ হাতে নিয়ে হলফ করল—'আবু শাইর, আমি হলফ করছি, আজ থেকে তোমাকে আমি ভাইয়া ব'লে মানব। আমরা পরদেশে গিয়ে যা কিছু আয় উপার্জন করব সমান ভাগভাগি ক'রে নেব।'

আবু শাইর সোল্লাসে বলল—'বহুৎ আচ্ছা' বড়িয়া প্রস্তাব। আমিও হলফ করছি আজ থেকে তুমি আমার ভাইয়া বনে গেলে।'

উভয়ের দিল্‌ই খুশীতে একদম ডগমগ। খুশী হবারই তো ব্যাপার বটে। যারা পেটে কিল মেরে দিনগুজরান করছিল আজ তারাই বাঁচার নিশানা খুঁজে পেয়েছে। গোরে না গিয়ে দুনিয়াকে ভোগ করার নিশানা পেল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' অষ্টআশিতম রজনী।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা,' আবু কাইর ও আবু শাইর নামে দোস্ত দু'টি জাহাজে উঠল। দিনার-দিরহাম তো দূরের ব্যাপার সামান্যতম খানাটানাও সঙ্গে নিতে পারে নি। দোকান ও তার সামানপত্র বেচে যা কিছু তাদের হাতে এসেছিল বিলকুল বিবি আর বালবাচ্চাদের জন্য ঘরে রেখে এসেছে। আর যা ছিল তা দিয়ে দু'জনের জাহাজভাড়া মিটিয়েছে।

বরাতে থাকলে সবই সম্ভব। জাহাজে পরামাণিক বলতে একজনই—আবু শাইর। ফলে জাহাজের ক্যাপ্টেন আর খালাসীদের চুল-দাড়ি কামানোর কাজে লেগে পড়ায় পরামাণিক আবু শাইর-এর উপার্জন মন্দ হ'ল না।

যাত্রীরা নিজেদের শুকনো খানা আবু কাইর ও আবু শাইর'কে দিয়ে তাদের জান বাঁচিয়ে রাখল। আবু শাইর অচিরেই জাহাজের যাত্রীদের বড় স্নেহ-ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়ে গেল। অচিরেই

জাহাজের ক্যাপ্টেনেরও সুনজরে পড়ে গেল আবু শাইর। তিনি খুশী হয়ে নিজের কামরায় তার খানাপিনার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তার ওপর জাহাজের যাত্রীদের পেয়ার মহব্বতের ব্যাপার তো রয়েছেই। সুখেই তার দিন গুজরান হতে লাগল।

আবু শাইর খানাপিনা জমিয়ে রাখতে লাগল। বলা তো যায় না, জাহাজের ক্যাপ্টেন বা যাত্রীদের মহব্বৎ যদি দীর্ঘস্থায়ী না-ই হয় তখন দু' দু'টো প্রাণী পেটের জ্বালা নেভাবে কি দিয়ে?

এদিকে আবু শাইর খানার পোটলা রেখে ক্যাপ্টেনের কামরায় ভোজ সারতে গেলে আবু কাইর পোটলা খুলে বিলকুল খানা লোপাট ক'রে দেয়।

আবু কাইর ক্যাপ্টেনের কামরায় খানা খেতে যায় না। তার কেবল ধান্দা বসে বসে খানার পোটলা সাবাড় করা।

ক্যাপ্টেন হরেক কিসিমের মুখরোচক খানার বন্দোবস্ত করেছেন। আবু শাইর গলা পর্যন্ত ঠেসে খানা খেল। ক্যাপ্টেন আবু কাইর-এর জন্য পোটলা বেঁধে খানা দিয়ে দিল।

এদিকে আবু শাইর পোটলা থেকে চুরি করে খানা খেয়েছে। ফলে ক্যাপ্টেনের পাঠানো খানার দিকে তার তেমন ঝোঁক নেই। লেকিন আবু শাইর-এর মুখে ক্যাপ্টেনের খানার সুখ্যাতি শুনে খিদে না থাকা সত্ত্বেও জোর ক'রে তার পাঠানো খানা সাবাড় করার জন্য বেহুঁস হয়ে লেগে গেল।

আবু শাইর ভোর হতে না হতেই ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে যাত্রীদের কাছে হাজির হয়। চুল-দাড়ি কামিয়ে উপার্জন করতে থাকে।

প্রায় তিন হপ্তা বাদে জাহাজ এক অজানা বন্দরে নোঙর করল। আবু কাইর এবং আবু শাইর জাহাজ ছেড়ে তীরে নামল। তারা এক সরাইখানায় আশ্রয় নিল। আবু কাইর অসুস্থ। সাগর বিমারির দ্বারা আক্রান্ত।

আবু শাইর নগরের কেন্দ্রস্থলের এক পথের ধারের এক গাছের তলায় ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে বসে পড়ল। রোজগারপাতি না করলে অসুস্থ আবু কাইর-এর ইলাজ করাবে কি দিয়ে? সে হাতের কাজ দেখিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই কারবার জমিয়ে মোটা রোজগার করতে থাকে। সরাইখানায় ফেরার পথে দোকান থেকে খানা নিয়ে যায়। রোগগ্রস্ত আবু কাইরকে দেয়, নিজেও পেটের জ্বালা নেভায়।

আবু কাইর বিছানা ছেড়ে আর ওঠে না, দিনভর নাক ডাকিয়ে নিদ যায়। আর আবু শাইর উদয়াস্ত গাছতলায় বসে চুল-দাড়ি কামিয়ে রোজগার করে। আবু কাইর-এর এতদিন না হয় বিমারি ছিল, এখন তো সুস্থ বটে। তবু কামরায় শুয়ে শুয়ে দিন গুজরান করে। আবু শাইর -এর রোজগারের পয়সায় মৌজ করে খানাপিনা সারে। কিছু বললেই মুখ বিকৃত করে বলে—'সারা গায়ে দর্দ! বিমারি! একদম মাথা তুলতে পারি না। কাম-কাজ করতে তাগদ চাই তো।'

আবু শাইর রোজগার পাতি ক'রে পুরো চল্লিশটি দিন উভয়ের খরচ খরচা চালিয়ে দিল। দিনের পর দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সে বিমারিতে পড়ল। আবু কাইর-এর বাহানা তবু কাটল না। সে কুড়েমি করে কামরার মধ্যেই শুয়ে-বসে কাটাতে লাগল। রোজগারের ধান্ধা একদম তার দিমাকে নেই।

আবু শাইর-এর রোজগার পাতি বিলকুল বন্ধ। একদম শয্যাশায়ী। উপায়ান্তর না দেখে সে সরাইখানার বৃদ্ধ মালিককে ডেকে বলল—'ভাইজান, আমাকে বিমারিতে ধরেছে; রোজগারের ধান্ধায় বেরোতে পারছি না। দু'-চারটে দিন আমার ভাইয়ার খানা পিনার বন্দোবস্ত করে দিলে উপকার হয়। আমি কাজে বেরোতে পারলেই আপনার দেনা শোধ করে দেব।'

আবু শাইর-এর অনুরোধে সরাইখানার বৃদ্ধমালিক পর পর চার দিন খানা পাঠিয়ে দিল। লেকিন এর মধ্যেও আবু শাইর-এর বিমারি সারল না। বরং ক্রমে বেড়েই চলল।

সরাইখানার মালিক এবার খানা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আবু কাইর খানাবিনা ছটফট করতে লাগল। বাধ্য হয়ে কামরার ভেতরের সামনাপত্র খুঁজতে খুঁজতে একটি ডিব্বার মধ্যে কিছু দিরহাম পেল। আবু শাইর দু'-একটি ক'রে দিনার বাঁচিয়ে জমিয়েছিল। আবু কাইর সেগুলো কোর্তার জেবে নিয়ে চুপি চুপি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

মোড়ের কাছে গিয়ে আবু কাইর এক মিঠাইওয়ালার দোকান থেকে কিছু পিস্তার হালুয়া কিনে খেল। ঢকঢক ক'রে পানি গলায় ঢালল। এবার হাঁটতে লাগল বাজারের দিকে।

বাজারে গিয়ে আবু কাইর একটি কোর্তা খরিদ করল। পথে টুঁড়তে টুঁড়তে যত আদমির গায়ে কোর্তা সে দেখেছে, সবার কোর্তার রঙই একরকম। সফেদ আর নীল। অন্য কোন কিসিমের রঙ এখানে পুরুষ বা জেনানা কারো কোর্তা-কামিজে সে দেখতে পেলো না। তাজ্জব বনল।

এক রঙওয়ালাকে আবু কাইর জিজ্ঞাসা করে এখানে কেবলমাত্র দু'টি রঙের ব্যবহারের কারণ জানতে পারল। আদতে তারা অন্য কোন কিসিমের রঙের ব্যবহারই জানে না। আবু কাইর এক রঙের দোকানিকে বলল—'ভাইয়া, আমার ঘর আলেকজান্দ্রিয়াতে। রোজগার পাতির ধান্ধায় আমি নিজের মুলুক ছেড়ে এখানে হাজির হয়েছি। আমিও আপনার মতই রঙের কারিগর। চল্লিশ কিসিমের রঙের কাজ আমি জানি। মেহেরবানি করে যদি আমাকে আপনার ভাগীদার হিসেবে কারবারে লাগান তবে কাজ দেখিয়ে আমি জরুর আপনাকে খুশী করতে পারব। এমন বাহারী মনমৌজী রঙ কোর্তা কামিজে লাগিয়ে দেব যে, এখানকার চল্লিশ ঘর রঙের কারবারীর চোখ বিলকুল ট্যাড়া হয়ে যাবে। ফলে আপনার কারবার দু'দিনে ফুলে ফেঁপে উঠবে।'

দোকানি আড়চোখে আবু কাইর-এর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল—'ভাইসাহাব, আমি এসব ঝুটঝামেলার মধ্যে যেতে নারাজ। একাই কাজ সামল দেই। যা রোজগার হয় তাতেই বেশ চলে যায়।'

—'বহুৎ আচ্ছা! ভাগীদার হিসেবে না-ই বা রাখলেন, কর্মচারী হিসাবে রাখুন। কাজ করব, মাহিনা দেবেন। কিছুদিনের মধ্যেই

আপনি নিজেই কাজ শিখে দিব্যি কারবার চালিয়ে নিতে পারবেন।'

—'আমার ইচ্ছা থাকলেই আপনাকে আমার কারবারের কাজে লাগাতে পারব না। কারণ দোকানে ভিনদেশী কর্মচারী নিতে হলে রজক-সভার অনুমতি চাই।'

উপায়ান্তর না দেখে আবু কাইর দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল। এবার একের পর এক ক'রে বেশ কয়েকটি রঙের দোকানে ঢুঁ মারল। সবার মুখেই এক অজুহাত, ভিনদেশী বলেই তাকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সাহস অবলম্বন করে আবু কাইর সে-মুলুকের সুলতানের শরণাপন্ন হ'ল। নিজের পরিচয় দিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় রঙের কারবারে তার খুবই পসার ছিল এরকম বলতেও ছাড়ল না। আমি এখানকার রঙের কারবারগুলিতে গিয়েছি। ভিন্‌দেশী বলে আমাকে তারা কাজে বহাল করতে পারে নি। একবার সুযোগ পেলে আমি নির্ঘাৎ কামাল করে দিতে পারতাম।

সুলতান চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন—'তুমি কামাল ক'রে দিতে পারতে? কিভাবে, বলতে পার?'

—'জাঁহাপনা, আমি হরেক কিসিমের রঙের ব্যবহার জানি। এমন সব কোর্তা-কামিজ রাঙিয়ে দেব, তাকিয়ে দেখতে হবে, সাচ্চা বাৎ!

নীল ছাড়া অন্য কোন রঙ কোর্তা, কামিজ ও পাৎলুন প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় এমন ধারণা সুলতানেরও নেই। তাই হরেক কিসিমের রঙের বাৎ শুনে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। তিনি বল্‌লেন—'তুমি যদি রঙের কাজ দেখিয়ে আমার দিলে খুশীর সঞ্চার করতে পার তবে আমি জরুর তোমার ব্যাপারে ভাববো। লেকিন যদি ঝুটা প্রমাণিত হয় তবে তোমার গর্দান যাবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

—'আমি যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারলে আপনার সামনে নিজেই গর্দান বাড়িয়ে দেব জাঁহাপনা।'

সুলতান খুশী হয়ে নগরের চৌরাস্তার ধারে আবু কাইর'কে বেশ বড়সড় একটি দোকানের বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। আর কাজ শুরু করার জন্য এক হাজার দিনার তার হাতে দিলেন। দোকান সাজানো হ'ল। এবার রঙ ও অন্যান্য সামানপত্র খরিদ করার জন্য মূলধন হিসাবে সুলতান আরও এক হাজার দিনার তার হাতে দিলেন।

সুলতান আবু কাইর-এর দোকানে পাঁচশ'গজ কাপড়া পাঠিয়ে দিলেন দিলবাহার রঙ করে দেয়ার জন্য।

আবু কাইর কাপড়াগুলোকে ঝলমলে বাহারে রঙে রাঙিয়ে দোকানের সামনে টাঙিয়ে দিল। ব্যস, মুহূর্তে পথচারীর ভিড় জমে গেল তার দোকানের সামনে। কাপড়া দেখে বিলকুল তাজ্জব বনে গেল।

নগরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কিন্তু ব্যাপারটিকে সুনজরে দেখতে পারল না, তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল—শেষ বিচারের দিন আগত প্রায়। দুনিয়া এবার একদম ধ্বংস হয়ে যাবে। নইলে দুনিয়ায় এমন আজব কাণ্ডকারখানা শুরু হয়। দুনিয়া একদম জাহান্নামে যেতে বসেছে!

এদিকে কিন্তু নিজের কাজের জন্য সুলতানের বুক রীতিমত ফুলে গেছে। এমন এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড তো তাঁরই উৎসাহ-উদ্দীপনায় সম্ভব হয়ে উঠেছে। তিনি বুক ফুলিয়ে উজির-নাজির আর আমীর-ওমরাহদের বলতে লাগলেন—'মুলুকে কেমন বাহারী সাজ পোশাকের আমদানি করলাম। আমার সুলতানিয়তের আদমিরা তামাম জিন্দেগীতে যা খোয়াবের মধ্যেও ভাবতে পারেনি আমি তারই বাস্তব রূপদান করলাম।'

আবু কাইর-এর রঙের ভেল্কির ব্যাপারে বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে নগরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কাপড়া রঙ করাবার ধান্ধায় তার দোকানে খদ্দেরের ভিড় উপচে পড়তে লাগল।

খদ্দেরের মুখে আবু কাইর-এর রঙের ভেল্কির ব্যাপার শুনে রজক সমিতির সভাপতি নিজে উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে বাৎচিৎ করতে এল। নানাভাবে কসুর স্বীকার করে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তার গুণের কথা বিশ্বাস কথা তো দূরের ব্যাপার আন্দাজও করতে পারে নি। স্বীকার ক'রে নিলেন।

নগরের রজকদের তো শিরে সংক্রান্তি, কারবার লাটে ওঠার জোগাড়। তারা কেউ কেউ জান বাঁচাবার তাগিদে আবু কাইর-এর কারবারে নোকরি করতে চাইল। আবু কাইর মুখ ঘুরিয়ে রইল। কাউকেই পাত্তা দিল না।

এদিকে আবু শাইর একটু সুস্থ হয়ে তার দিনারের ডিব্বাটির তল্লাশ করল। পেল না। পাবেই বা কি ক'রে। সে যখন বিমারিতে বেহুস ছিল তখন আবু কাইর যে সেটি চুরি ক'রে ভেগেছে। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সঙ্গীকে না দেখে সে অস্থির হয়ে পড়েছিল। তার ওপর দিনারের ডিব্বার ব্যাপারটি তাকে আরও ভাবিয়ে তুলল। তার দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগল। পরদেশে কে তাকে সাহায্য করবে।

সরাইখানার বৃদ্ধ মালিক তাকে সান্ত্বনা দিল। খানা পিনা দিয়ে সাহায্য করল।

পুরো দু'মাহিনা সরাইখানার মালিক আবু শাইর'কে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ ক'রে তুলল। আবু শাইর কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বলল—'আল্লাহ যদি কোন দিন মুখ তুলে তাকান আপনার সহৃদয়তার বিনিময়ে আমি জরুর চিন্তা ভাবনা করব। আজ আমি স্বীকার করছি দুনিয়ায় সবাই ঠগ জোচ্চর হলে দুনিয়া বহুৎ আগেই

বিলকুল ধ্বংস হয়ে যেত। দু'-চার জন মহাপ্রাণ আছে বলেই দুনিয়াটি আজও চলছে, চন্দ্র-সূর্য উঠেছে।

আবু শাইর ফিন তার ক্ষুর-কাঁচির বাক্সটি নিয়ে পথে নামল। পথে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে এক জায়গায় বহুৎ আদমির ভিড় দেখে কৌতূহলবশতঃ এগিয়ে যায়। এর-ওর কাছে পুছতাছ ক'রে জানতে পারল, কোন পরদেশী এখানে রঙের যাদু দেখিয়ে তামাম নগর তোলপাড় করে দিচ্ছে। আর এখানকার সব রজককে বিলকুল পথে বসিয়ে দিয়েচে। আলেক জান্দ্রিয়া মুলুকে তার ঘর। আবু কাইর নাম।

আবু শাইর লম্বা লম্বা পায়ে আবু কাইর-এর রঙের দোকানে হাজির হয়। তাকে দেখেই আবু কাইর গোসসায় একদম ফেঁটে পড়ার জোগাড় হয়। চোখ লাল করে বলে ওঠে—'শয়তান বেতমিস কাহিকার! এখানে হামলা করতে এসেছ কেন? ভাগ আমার নজরের সামনে থেকে!'

আবু শাইর তার ব্যাপার স্যাপার দেখে তাজ্জব বনে যায়। একদম আশমান থেকে পড়ল যেন। হতভম্বের মাফিক নীরবে তাকিয়ে রইল।

আবু কাইর এবার উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলল—'এ হতচ্ছাড়া মহাধুরন্ধর! পাক্কা চোর। ধর একে। পাকড়াও করে সুলতানের সামনে হাজির কর।'

আবু কাইর-এর মুখের বাৎ শেষ হবার আগেই পথচারী হাবসীরা আবু শাইর-এর ওপর জোর আক্রমণ চালায়। কিল-চড়-লাথি মেরে মেরে একদম পথে শুইয়ে দিল। আর একটু হলেই একদম খতম করেই দিত, পথে পড়ে সে অসহায় ভাবে গোঙাতে লাগল। সংজ্ঞা হারিয়ে এলিয়ে পড়ল। আবু কাইর একটি চকচকে ছুরি নিয়ে তেড়ে এসেছিল। লেকিন তার আগে শত্রুর সংজ্ঞা লোপ পাওয়ায় ফিন ছুরি হাতেই দোকানে ঢুকে যায়। আবু কাইর রাতভর পথের মাঝে পড়ে গোঙাল। সংজ্ঞা ফিরে পেল অনেক বেলায়।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আবু শাইর এক পথচারী হাবসীর কাছে হামামের পাত্তা জানতে চায়। পথচারীটি জানায় এখানে হামামের বন্দোবস্ত নেই, নাহাতে হলে দরিয়ায় যেতে হবে।

আবু শাইর শেষ পর্যন্ত সুলতানের দরবারে হাজির হ'ল। পরদেশী কোন নওজোয়ান ভেট করতে এসেছে শুনে সুলতান তাকে দরবারে তলব করলেন।

দরবারে হাজির হয়ে আবু শাইর নতজানু হয়ে সুলতানকে কুর্নিশ করে নিজের পরিচয় দিল। তারপর তার আগমনের হেতু বলতে গিয়ে আর্জি পেশ করল—'জাঁহাপনা, আমি একজন পরদেশী পরামাণিক, আলেকজান্দ্রিয়া আমার মুলুক, আমি হামামের যাবতীয় কাজে বিশেষ পারদর্শী।'

'হামাম' শব্দটি শুনে সুলতান ভ্রূ কোঁচকালেন, উজির-আমীর-ওমরাহ প্রভৃতি যারা দরবারে উপস্থিত ছিল সবাই তাজ্জব বনে গেলেন।

আবু শাইর ব'লে চলল—জাঁহাপনা, আমার মালুম আছে, হামামের সুখ-সুবিধার ব্যাপারে আপনাদের তিলমাত্র অভিজ্ঞতাও নেই, হামাম হচ্ছে গোসল করার আরামদায়ক এক জায়গা। পথের ধারে ধারে হামাম থাকলে ক্লান্ত পথচারীরা একটু-আধটু জিরিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করার সুযোগ পায়, তারপর গা-হাত-পা ঘষে মেজে সাফ সুতরী করে গোসল ক'রে শরীর ও দিলকে চাঙা ক'রে তোলার সুযোগ পায়। আমাদের আলেকজান্দ্রিয়া নগরের অধিবাসীরা হামামের মর্ম বোঝে। হামাম ছাড়া তাদের একটি দিনও চলে না। সাচ্চা বলতে কি বর্তমান দুনিয়ায় হামামের বন্দোবস্তের সাধ্য সেই সে- মুলুকের আদমির রুচিবোধের পরিচয় মেলে। আর দুনিয়ায় বসে বেহেস্তের সুখ একমাত্র হামামের মাধ্যমেই মিলতে পারে।'
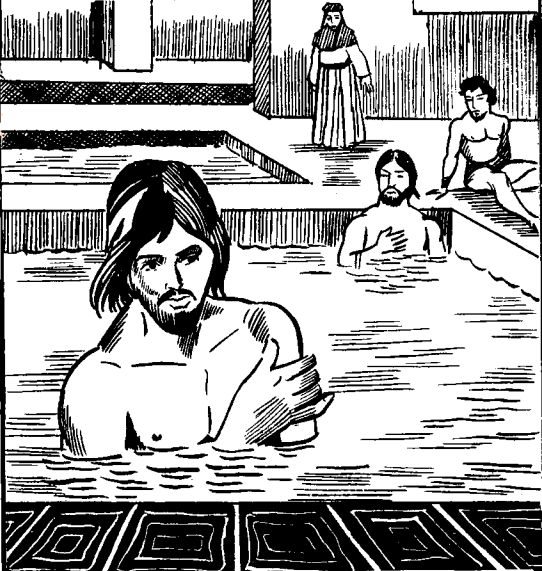
সুলতান কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটি ভাজ ক'রে বল্লেন— 'নওজোয়ান, হামাম এমন এক ব্যাপার যে সেখানে নাহালে বিলকুল বেহেস্তের সুখ মিলতে পারে।' মুহূর্ত কাল নীরবে ভেবে নিয়ে বল্লেন—'বহুৎ আচ্ছা নওজোয়ান। আমি যদি দিনার ব্যয় করতে রাজী হই তবে তুমি কি নিজে তত্ত্বাবধান ক'রে হামাম বানিয়ে তার দেখভাল করতে পারবে?'

—'জরুর পারব জাঁহাপনা। আপনার রাজমিস্ত্রিকে আমার সঙ্গে

ভেট করিয়ে দিন। হামামের ইমারত বানাবার কায়দা কসরৎ তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর যা কিছু বন্দোবস্ত করতে হয় আমি একাই করে ফেলতে পারব।'

সুলতানের তলব পেয়ে সুলতানিয়তের সবচেয়ে অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রি ছুটে এল।

আবু শাইর-এর পরিকল্পনা মাফিক বহুৎ কায়দা কসরৎ করে সে একটি খুবসুরৎ ইমারৎ গড়ে তুলল। রাজপথের ধারে সদ্য গড়ে ওঠা ইমারতটিকে আবু শাইর নিজের পছন্দ মাফিক একটি হামামে পরিণত করল। সাজগোছের কাজ সারা হয়ে গেলে সে সুলতানের দরবারে হাজির হয়ে কুর্ণিশ করল। সুলতানকে সদ্য তৈরী হামামটিতে গোসল ক'রে উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ জানাল।

সুলতান হামাম পরিদর্শন করতে এলেন। তাঁকে সঙ্গদান করলেন তাঁর দরবারের উজির নাজির আর যত আমীর ওমরাহগণ। সুলতান অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে তামাম জায়গাটির বিলকুল বন্দোবস্ত দেখবেন। খুশীতে তাঁর দিল্ নেচে উঠল। বহুভাবে আবু শাইর-এর রুচির তারিফ করলেন। তার সঙ্গী সাথীরাও খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে উঠলেন।

সুলতান এবং আবু শাইর-এর ফরমাশ অনুযায়ী বিশজন ইয়া তাগড়াই হাবসী কর্মচারীকে হামামের কাজে নিযুক্ত করলেন।

আবু শাইর এবার সুগন্ধী তেল, সুগন্ধী আতর, গুলাব পানি, দামী সাবান আর কিছু গামছা ও তোয়ালের একটি ফর্দ বানিয়ে সুলতানের খাজাঞ্চীর কাছে পৌঁছে দিল। যথা সময়ে রাজকোষের অর্থে তার বাঞ্ছিত সামানপত্র সরবরাহ করা হ'ল।

আবু শাইর তো হামাম উদ্বোধনের ব্যাপার আগেই সুলতানের সঙ্গে বাৎচিৎ সেরেই রেখেছিল।

শুভদিনে, শুভ মুহূর্তে সুলতান প্রথম গোসল করে হামামটির উদ্বোধন করলেন।

তামাম নগর ঢুঁড়ে লেড়কা-বুড়া সবার মুখেই এক বাৎ এক পরদেশী পথের ধারে হামাম নামে এক আজব হামাম বানিয়েছে!

এদিকে সুলতান গোসল সেরে গুলাবপানি আর পিস্তার সরবৎ পান করলেন, তার শরীর ও দিল্ বিলকুল চাঙা হয়ে উঠলেন।

দিলদরিয়া মেজাজে সুলতান এবার আবু শাইর'কে জিজ্ঞাসা করলেন—'আবু, তোমার গোসলখানায় যারা গোসল ক'রে তৃপ্তি লাভ করবে তার বিনিময়ে তুমি তাদের কাছ থেকে কত দিনার ক'রে নেবে ভেবেছ?'

—'জাঁহাপনা, পথচারীরা ক্লান্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে আসবে একটু শান্তির প্রত্যাশায়। শান্তি-স্বস্তিদানের বিনিময়ে কারো কাছ থেকে জোর জুলুম ক'রে কিছু আদায় করা কি উচিত কাজ হবে, আপনিই বলুন?'

সুলতান আবু শাইর-এর উত্তর শুনে মুগ্ধ হন। ভাবেন, এমন মহানুভব সচরাচর মেলে না।

আবু শাইর মুচকি হেসে বলল—'জাঁহাপনা, কাল আপনি নিজে এসে পরীক্ষা করলেই মালুম হবেন, আমার বাৎ সাচ্চা কি ঝুটা।

উদ্বোধনের পর তিনদিন হামামের দরওয়াজা খোলা রাখা হ'ল বিনামূল্যে যাতে সবাই গোসল করতে পারে। এ-বন্দোবস্ত বিলকুল প্রচারের জন্য। সবাই আসবে, দেখবে, গোসল করবে আর নিজ নিজ মহল্লায় গিয়ে পঞ্চমুখে এর প্রশংসা করবে। এটি আবু শাইর-এর এক জব্বর চাল বটে!

আবু শাইর হামাম-এর জন্য বাঁধাধরা কোন মূল্য না থাকায় ইনাম-বক্শিস হিসাবে বরং আমদানি বেশীই হতে লাগল। তার এ-কায়দাটিও তার কটুবুদ্ধির ফসল।

হামাম থেকে আবু শাইর-এর অর্থাগম এতই হতে লাগল যে কিছুদিনের মধ্যেই সে নগরের বিত্তশালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হিসাবে বিবেচিত হতে লাগল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ' ছিয়ানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সুলতানের দরবারে উজির, নাজির, আমীর-ওমরাহরা যে যখন গোসল করতে আবু শাইর-এর হামামে আসেন তারা খুসীভরা দিল্ নিয়ে ফিরে যাবার সময় তাকে একশ'সোনার দিনার, একটি নিগ্রো বান্দা ও একটি বাঁদী ইনাম স্বরূপ দিয়ে যান। আবার একটি ক'রে সফেদ বান্দাও কেউ দিয়ে যান।

সুলতানও তাকে এক হাজার সোনার দিনার আশীটি বান্দা দশটি খুবসুরৎ বাঁদী আর বিশটি লেড়কা পাঠিয়ে দেন।

বান্দা আর বাঁদীর মেলা বসে গেল আবু শাইর-এর প্রাসাদে। লেকিন এত সব বান্দা আর বাঁদী কোথায় রাখবে, কোন কাজেই বা লাগবে। সে ব্যাপারটি সুলতানের কানে তুলল। শেষে বলল—'আমি ঝুটমুট এতগুলো আদমিকে খাওয়াতে পরাতে যাব কেন? আর আমি তো সেনাদল গড়ে লড়াইও করতে যাচ্ছি না। আপনি 'বরং' এদের ফেরৎ নিয়ে আমার কাঁধ থেকে ঝামেলা সরিয়ে দিন জাঁহাপনা।'

সুলতান বল্‌লেন—'আরে আবু, বান্দা-বাঁদীর সংখ্যা যত বেশী থাকবে সবাই তোমাকে ততবেশী আমীর আদমি ঠাওরাবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোনদিন নিজের মুলুকে ফিরে যাওয়ার দিল্ করে তবে আমি এদের খরিদ ক'রে নেব। এসব ব্যাপার নিয়ে একদম দিমাক্

গরম করবে না।'

আবু শাইর তবু বিলকুল পীড়াপীড়ি শুরু ক'রে দিল — 'আপনি মেহেরবানি করে আমার প্রাসাদ থেকে বান্দা আর বাঁদীর হাট উঠিয়ে আমাকে রেহাই দিন জাঁহাপনা। দাম নিয়ে আমি ভাবচি না।'

বাদশাহ অনন্যোপায় হয়ে প্রতিটি বান্দা আর বাঁদীর জন্য একশ' ক'রে সোনার দিনার মিটিয়ে দিয়ে তাদের খরিদ ক'রে নিলেন।

আবু শাইর-এর কামরাগুলোতে আর দিনার-দিরহামের বস্তা রাখার মত জায়গাই নেই। রোজ এমন কাড়ি কাড়ি অর্থাগম হলে আর জায়গার সংকুলান করা যায়? ফলে আবু শাইর ব্যাপারটি নিয়ে মহাফ্যাঁসাদে পড়ল। অল্পাধিক দান ধ্যানও করে মাঝে-মধ্যে। তবু দিনারের পাহাড় যেন একদম কমতেই চায় না। সুলতানের দেওয়া খেতাব বা অর্থ কোনটিতে তার কোন মোহ নেই। এখানে, এ মুলুকে আসার আগে তার দিল্ যেমন উদার ছিল এখনও বিলকুল তা-ই রয়ে গেছে।

এদিকে আবু কাইর-এর এক দোস্ত একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে আবু শাইর-এর গোসলখানায় কোনদিন গোসল করেছে কিনা। সে নানা বাহানা ক'রে ব্যাপারটিকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু বেশী দিন বাহানা চলল না। একদিন উপায়ন্তর না দেখে দোস্তদের কাছে ইজ্জৎ বাঁচাতে খচ্চরের পিঠে এল হামামে। ঝলমলে কোর্তা-পাৎলুন তার গায়ে। তাতে দামী আতরের খুসবু। একদল বান্দা তাকে আদর যত্ন করতে করতে হামামে নিয়ে এসেছে।

আবু কাইর হামামের এক কামরায় উঁকি গিয়ে দেখে আবু শাইর আরামে কুর্শিতে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছে। আবু কাইর কৃত্রিম উচ্ছ্বাসের বাহানা করে ব'লে — 'আরে দোস্ত শাইর! তুমি এখনও জিন্দা আছ? আর আমি জিন্দা আছি, কি বেহেস্তে চলে গেছি খোঁজও নিলে না একবারটি? তামাম নগরের অধিবাসিরা আমার নাম জানে, জান পহচান রয়েচে—কাউকে পুছতাছ করলেই আয়াসে আমার পাত্তা মিলত। এমন কি সুলতান অবধি আমাকে খাতির করেন। আশমান ছোয়া ইজ্জৎ। আর তুমি আমার এক সময়ের জিগরী দোস্ত—আজব দুনিয়া, আজব হালচাল!

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বলল—'আমার নসীব যখন ফিরল তখন আমি বার বার তোমার ব্যাপারে ভেবেছি। চারদিকে আদমি ভেজলাম তোমার তাল্লাশ করতে। লেকিন কেউ-ই তোমার হদিস দিতে পারল না।

ঠোঁটের কোণেবিদ্রূপের হাসির রেখা ফুটিয়ে আবু শাইর 'ইয়াদ আছে, আমি তোমার দোকানে ভেট করতে গিয়েছিলাম, তুমি আর তোমার ইয়ার-দোস্তরা সেদিন যে আদর যত্ন করেছিলে তা আজও আমার হাড্ডিতে মালুম হয়।'

—'দোস্ত, তোমার কি দিমাক টিমাক খারাপ হ'ল! কবে তুমি আমার দোকানে গিয়েছিলে আমার তো ইয়াদ আসছে না!'

—'তোমার ইয়াদে না এলেও আমার ঠিকই ইয়াদ আছে। সেদিন সরাইখানার মালিক দেখভাল না করলে আজ আমাকে তাল্লাশ করতে হত গোরস্থানে, জমিনের তলায়।'

আবু শাইর তবু যে সে তার দোকানে গিয়েছিল, এবং তার আদমিরা বেধড়ক পিটিয়ে তার হালৎ একদম সঙ্গীন করে ছেড়ে ছিল বিলকুল চেপে যাওয়ার কোসিশ করতে লাগল। সে এবার বলল—'আদৎ ব্যাপার কি জান দোস্ত, আমার দোকানে প্রায়ই চুরি হয়। তাই লোকজনকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া আছে ভিখমাঙ্গা গোছের কোন আদমিকে দেখলেই যেন ঘা কতক দিয়ে ভাগিয়ে দেয়। আমার অজান্তে এরকম কোন ঘটনা ঘটলে ঘটতেও পারে। আমার বাৎ শোন দোস্ত, যদি বেশী কোন ভুলচুক কসুর টসুর করেই থাকি তবে তুমি নিজেই শুধরে নেবে, আমি কি তোমার কাছ থেকে এটুকু আসা করতে পারি না?'

আবু শাইর দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌ল—'ভুলচুক? অসম্ভব!'

বিলকুল অসম্ভব! যা কিছু করেছ একদম ঠাণ্ডা দিমাকে, জেনে শুনে করেছ। এবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে বল্‌ল—'যাকগে, ছাড়ান দাও। ওসব বাজে ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আমার আর ভাববার ফুরসৎ নেই। গোসল করার দিল নিয়ে এসেছ তো? চল—'

আবু শাইর দোস্ত আবু কাইরকে নিয়ে পাশের কামরায় গেল। তাকে একদম একেলা পেয়ে আবু কাইর এবার জিজ্ঞাসা করল—'দোস্ত, তুমি কি ভাবে তোমার নসীব, তোমার হালৎ বদলে ফেল্‌লে, বল তো?'

—'আল্লাহ-র কখন কার ওপর দোয়া হয় কেউ কি আগাম খবর পায় দোস্ত? এবার সে সরাইখানায় বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকার ব্যাপার থেকে শুরু ক'রে সুলতানকে দিয়ে হামামটি উদ্বোধন করানোর ব্যাপার স্যাপার পর্যন্ত বিলকুল খোলসা করে তার কাছে পেশ করল, সব শেষে বল্‌ল, আল্লাহ-ই আমার একমাত্র ভরসা দোস্ত। তিনি দু'হাত ভরে আমাকে দিয়েছেন, লেকিন কেড়ে নিতে হলে তিনিই নেবেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় কারো হাত নেই।'

আবু কাইর এবার দোস্ত আবু শাইর'কে গোসলে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে গোসল করিয়ে দিল!

গোসল সেরে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে আবু কাইর বল্‌ল—'দোস্ত, তোমার হামামের বিলকুল বন্দোবস্ত বহুৎ বড়িয়া। লেকিন একটি ব্যাপারে একটু-আধটু তকলিফ হয়। দাড়ি কামাবার বন্দোবস্ত। দাড়ি কামাবার সময় যদি একটু মলম গোছের বস্তু মাখিয়ে নেও তবে তকলিফ কম হবে।

—'হ্যাঁ দোস্ত, ব্যাপারটি আমার মাথায়ও আছে। লেকিন

এখানে ওসব বিলাস সামগ্রী মেলে না।'

—'ধুৎ! তুমিও যেমন দোস্ত! কারো ভরসা না ক'রে নিজেই তো তা বানিয়ে নিতে পার। আমি কায়দা কৌশল বাৎলে দিচ্ছি—সামান্য কড়া চুন, পিলা রঙের বিষ কিছু পরিমাণ ও নারিকেলতেল এক ছটাক নিয়ে এক সঙ্গে মিশিয়ে নেবে। তাতে সামান্য দামী আতর মিশিয়ে মিলে চমৎকার খুসবু বেরোবে। তবে এক বাৎ ইয়াদ রাখবে, এত দামী বস্তু সবাইকে দেওয়া যাবে না। কেবল সুলতান কখনও গোসল করতে এলে বের করবে। আচ্ছা করে সারা মুখে মাখিয়ে দাড়ি কামিয়ে দেবে। দেখবে খুশীতে তাঁর দিল্ বিলকুল ভরে উঠবে।'

আবু কাইর হামাম থেকে বেরিয়ে সোজা সুলতানের প্রাসাদে হাজির হ'ল। সুলতানের সঙ্গে ভেট ক'রে গোপনে তাকে বল্‌ল—'জাহাঁপনা, আবু শাইর আপনাকে গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে, খবর পেলাম। আমার খবরের ওপর বিলকুল ভরোসা রাখতে পারেন। সে আপনার দেহে সেঁকো বিষ ঢুকিয়ে দেবার মতলব এটেছে। আপনার দাড়ি কামাবার জন্য এক ধরনের মলম বানিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আপনি হামামে গোসল করতে গেলে তা আপনার মুখে মাখিয়ে দাড়ি কামাবার বাহানা করবে।'

—'সে কী আজব বাৎ শোনাচ্ছ আবু কাইর! কেন সে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে যাবে, আমার দিমাকে আসছে না!'

—'জাঁহাপনা, আপনার মালুম নেই বলেই এমন বাৎ—আদতে সে খ্রীষ্টান সম্রাটের গুপ্তচর বৃত্তি নিয়ে আপনার সুলতানিয়াতে অবস্থান করছে। আপনাকে হত্যা করতে পারলে ইনামস্বরূপ হাজার হাজার দিনার পাবে, সে কম ব্যাপার! বিসোয়াস করুন জাঁহাপনা, এ-দুঃসংবাদটি শোনার পর থেকে আমার খানাপিনা উঠে গেছে। কলিজা শুকিয়ে একদম কাঠ। আপনি আজ হামামে গেলে বামালসহ তাকে ধরে ফেলতে পারবেন।'

সুলতান এবার উজিরকে নিয়ে হামামে হাজির হলেন, আবু শাইর সোল্লাসে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার দাড়ি কামাবার জন্য বহুৎ বড়িয়া এক মলম বানিয়েছি। ক্ষুর-কাঁচির দরকার হবে না। সামান্য মলম আঙুলে নিয়ে দাড়িতে মাখিয়ে শুখনো ন্যাকড়া দিয়ে ডলা দিলেই বিলকুল সাফ সুতরা হয়ে যাবে।'

—'তাই বুঝি? এক কাম কর তো, সামান্য মলম উজিরের তল পেটে লাগিয়ে দাও তো, দেখি তোমার মলমের কেরামতি কেমন।'

সুলতানের হুকুমে আবু শাইর আঙুলে সামান্য মলম তুলে উজিরের তল পেটে মালিশ করে দিল। ব্যস, এক লহমার মধ্যে মলমের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। উজির যন্ত্রণায় গড়াগড়ি যেতে লাগলেন।

সুলতান গর্জে উঠলেন—'আবু কাইর তবে ঝুটা বলেনি।

ভয়ঙ্কর বিষই এতে ব্যবহার করা হয়েছে।'

সুলতানের হুকুমে আবু শাইরকে রশি দিয়ে আচ্ছা ক'রে বেঁধে দরবারে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

এবার সুলতানের দরবারে জাহাজের এক ক্যাপ্টেনের তলব পড়ল। ক্যাপ্টেন এলে গোসসায় উন্মত্ত সুলতান তাকে হুকুম দিলেন—'শয়তানটিকে নিমকের বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দেবে। নিয়ে যাও। আজই কাজ হাসিল করা চাই, ইয়াদ থাকে যেন।'

জাহাজের ক্যাপ্টেন সুলতানকে নতজানু হয়ে কুর্ণিশ ক'রে বন্দী আবু শাইরকে নিয়ে দরবার থেকে বিদায় নিল।

আবু শাইর একদিন এ-ক্যাপ্টেনটিকে তার হামামে গোসল করিয়েছিল। তার পকেটে তখন একটি কানাকড়িও ছিল না। তবু সে ক্যাপ্টেনকে যত্ন করে নিজে হাতে গোসল করিয়ে দিয়েছিল। আবু শাইর'কে দেখে ক্যাপ্টেনের সে-ঘটনা ইয়াদ আছে।

ক্যাপ্টেন এক নির্জন দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়ে বলল,—'মিএগ সাহাব, এ দ্বীপে কিছুদিন থেকে জান বাঁচাও। পরে সুযোগ মাফিক বন্দোবস্ত যা করার আমিই করব। ক্যাপ্টেন এবার বলল—'এক কাম কর, কিছুদিন নির্জন নিরালা এ দ্বীপে থাক।'

ক্যাপ্টেন আবু শাইর'কে সে-নির্জন দ্বীপে রেখে জাহাজ নিয়ে ফিরে এল।

এবার একটি বস্তায় ইট-পাথর ভরে তার মুখটি আচ্ছা ক'রে বেঁধে দিল। এবার ডিঙিতে সেটি চাপিয়ে প্রাসাদ সংলগ্ন নদীর পানিতে নিয়ে গিয়ে ঝুপ্ ক'রে ফেলে দিল। সুলতান প্রাসাদের জানালায় বসে পুরো ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন। তিনি শত্রু নিধন হওয়ায় নিশ্চিন্ত হলেন।

এদিকে হঠাৎ সুলতানের খেয়াল হ'ল তাঁর হাতের বহুমূল্য আঙ্গুটিটি নেই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস গোসল করতে গিয়ে কোন অসতর্ক মুহূর্তে পানিতে পড়ে গেছে। হীরার-জহরৎ বসানো আঙ্গুঠিটি হারিয়ে সুলতান বিলকুল ভেঙ্গে পড়লেন। সেটি হাতে না থাকলে তাঁর সুলতানিয়তে বিদ্রোহ দেখা দেবে, প্রজারা তাঁকে আগের মাফিক সমীহ করবে না। মসনদ দখল করাও বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়। তাই আকস্মিক এ ঘটনাটি কেউ কারো কাছেই ফাঁস করলেন না।

এদিকে মনুষ্যবাসহীন নির্জন-নিরালা দ্বীপে আবু শাইর বাস করতে লাগল। ফলমূল খেয়ে দিন গুজরান করতে লাগল। আর মাঝে মধ্যে জাল পেলে মছলি ধরে।

একদিন সে জাল ফেলল। বিরাট এক মছলি উঠল জালে। ছুরি দিয়ে তার পেট চিরতেই একদম তাজ্জব বনে গেল। হীরা-জহরৎ বসানো একটি আঙ্গুঠি মছলিটির পেট থেকে বেরলো। আঙুলে পরে নিল সেটি।

কিছুক্ষণ বাদে দুটো লেড়কা ডিঙি নিয়ে দ্বীপে হাজির হ'ল। আবু শাইর-এর কাছে ক্যাপ্টেনের খবর জানতে চাইল। তারা রোজ সুলতানের প্রাসাদে মছলি দেয়। লেকিন আজ জাল ফেলে ফেলে হয়রান হয়েছে। একটিও মছলি পায় নি। ক্যাপ্টেনই তাদের মছলি ধরতে বলে গেছে। এখন উপায় কি হবে, সুলতানের প্রাসাদে কি ক'রে মছলি পাঠাবে তা ভেবে তারা অস্থির।

আবু শাইর ডান হাত উঠিয়ে লেড়কা দুটোর সঙ্গে বাৎচিৎ করছিল। তারা তার হাতে আঙ্গুঠিটির দিকে নজর দিতেই এক আজব কাণ্ড ঘটে গেল। তাদের ধড় থেকে মুণ্ডু দুটো আশমানের দিকে উঠে গেল। ধড় দুটো জমিনে লুটিয়ে পড়ল।

কাণ্ড দেখে আবু শাইর-এর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। মাথা চক্কর মারতে লাগল। তারপর আর নিজেকে সামাল দিতে পারল না। আছাড় খেয়ে একদম জমিনে পড়ে গেল। ব্যস, একদম বেহুঁস হয়ে গেল। আর কিছুই তার মালুম নেই।

ক্যাপ্টেন দুপুরের পর তার খালাসীদের নিয়ে দ্বীপে এল। পানির ধারে, জমিনে লেড়কা দুটোর মুণ্ডুহীন ধড় দুটোকে পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল। দু'পা এগিয়েই দেখে আবু শাইর সংজ্ঞাহীন দেহটি নিশ্চল-নিথর ভাবে জমিনে পড়ে। তার শরীরের সব ক'টি স্নায়ু এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল, কলিজা শুকিয়ে আসতে লাগল।

আচমকা আবু শাইর-এর হাতের অত্যুজ্জ্বল আঙ্গুঠিটির দিকে ক্যাপ্টেনের নজর পড়ল, সে চিনতে পারল, সুলতানের হাতের আঙ্গুঠি এটি, অলৌকিক গুণের জন্যই লেড়কা দুটোর জান খতম হয়ে গেছে, তার মালুম হ'ল। তার এখন ডর একটিই। আবু শাইর যদি কোনক্রমে তার দিকে আঙ্গুঠির হাতটি বাড়িয়ে দেয় তবে তারও লেড়কা দুটোর মতো হালৎ হবে। সে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিল্লিয়ে ওঠে—আবু শাইর, তুমি ভুলেও যেন আমার দিকে তোমার ডান-হাতটি বাড়িওনা। যদি বাড়াও তবে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

ক্যাপ্টেন এবার বল্‌ল—'আবু শাইর, আঙ্গুঠিটি স্বয়ং সুলতানের। পানিতে খোয়া গিয়েছিল। লেকিন তুমি এটি পেলে কোথায়, বলতো। এটি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক যাদু আঙ্গুঠি। আজ সুলতানের হিম্মৎ তোমার মধ্যে জন্মেছে, একমাত্র যাদু আঙ্গুঠিটি আঙ্গুলে পরার জন্য। তুমি চাইলে ছোট বড় সবাইকে তোমার, গোলাম-বান্দা বানিয়ে দিতে পার। স্বয়ং সুলতানকেও তুমি বিলকুল বশে রাখার হিম্মৎদার বনে গেছ। আর তো সুলতানকে ডরাবার কোন দরকার নেই। আঙ্গুঠিটি পাওয়া মাত্র সুলতান তোমার বিলকুল কসুর মাপ করে দেবেন, কত সব ইনাম বকশিশে তোমার দিলকে খুশী করিয়ে দেবেন।

ক্যাপ্টেন আবু শাইরকে নিয়ে দরবারে ঢোকামাত্রই সুলতান ও তাঁর পারিষদগণ সচকিত হয়ে সোজা হ'য়ে বসেন। সবার চোখেই আতঙ্কের ছাপ। যাকে বস্তাবন্দী করে পানিতে ফেলে

দেওয়া হয়েছিল। যার মোউৎ অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাওয়ার ব্যাপার সে আচমকা দরবারে কি ক'রে আসে?

ব্যাপার দেখে সুলতান তীব্র আর্তনাদ করে ওঠেন—'ক্যাপ্টেন, তুমি আমার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।'

—'গুস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা, যে-আঙ্গুঠির বলে আপনি দৈবশক্তির অধিকারী ছিলেন আজ তা আবু শাইর-এর হাতে শোভা পাচ্ছে, জানেন কি? ওই দেখুন, আচ্ছা ক'রে নজর দিয়ে দেখুন'।

সুলতান আবু শাইর-এর হাতের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলেন। সাচ্চা বটে, তার হাতের আঙ্গুঠি আবু শাইর-এর আঙ্গুলে শোভা পাচ্ছে। সুলতান ভাবেন, তবে কি তার মোউৎ সামনে খাড়া? মুহূর্তেই তার মুণ্ডুটি উড়ে যেতে পারে। আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে করুণ স্বরে বলতে লাগলেন—আবু শাইর, তোমার সঙ্গে আমি যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছি তুমি কি তারই প্রতিশোধ নিতে আজ বদ্ধপরিকর? সাচ্চাই কি তুমি আমার মোউৎ হয়ে এসেছ? হাসিমুখে মসনদ থেকে নেমে যাচ্ছি। তোমাকে এর দখল দিচ্ছি।' সুলতানের দু'চোখ বেয়ে অনবরত পানির ধারা ঝরতে লাগল।

আবু নীরবে দু'পা এগিয়ে সুলতানের মুখোমুখি দাঁড়াল। উপস্থিত সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে নিজের আঙুল থেকে আঙ্গুঠিটি খুলে সুলতানের আঙুলে পরিয়ে দিল। জেব থেকে রুমাল বের করে তার চোখের পানি মুছিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, মসনদের জরুরৎ আমার নেই। আমি সাদাসিধে আদমি হয়েই থাকতে চাই। এক মছলির পেট থেকে আপনার আঙ্গুঠিটি পেয়েছিলাম। এটি আপনার ক্যাপ্টেনের মুখে শুনে দৌড়ে এলাম। আমার একটিই প্রার্থনা, ক্যাপ্টেন আপনার হুকুম তামিল না করে আমাকে জানে বাঁচিয়ে রেখে যে কসুর করেছেন তার জন্য তাকে কোন সাজা দেবেন না। আর এক অনুরোধ। আদৎ অপরাধীকে খুঁজে বের করুন। মেহেরবানি করে আমার সব বাৎ শুনলে আপনার দ্বিধা কেটে যাবে। বিলকুল সাফা হয়ে আপনার চোখের সামনে ফুটে উঠবে।'

সুলতান চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে আবু শাইর'কে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন—'আবু শাইর, বিলকুল ব্যাপার আমার কাছে সাফা হয়ে গেল। কোন দুর্মতি তোমার পিছনে লেগে তোমাকে দিয়ে ওসব কাজ করিয়ে নিয়েছিল। আদৎ কসুর তো আমারই। আমি তোমার দিলের খবর নেইনি। আমার কাজের জন্য আমি অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধে মরছি। এখন খোলসা করে বল তো কার প্ররোচনায় তুমি সে বিষাক্ত মলম বানিয়েছিলে?'

—'সে আমার নিজের মুলুকের আদমি। আমার দোস্ত আবু কাইর-ই আমার সহজ-সরল দিলের সুযোগ নিয়ে আমাকে দিয়ে তার মতলবকে কার্যকরী করেছিল। সে মলম দিয়ে যে আদমী খুন করা সম্ভব আদৌ মালুম ছিল না।'

—'এখন আমার ইয়াদ হচ্ছে, সে আমার কানে দিয়েছিল, তুমি নাকি খ্রীস্টানদের গুপ্তচর। আমাকে বেহেস্তে পাঠাবার জন্যই নাকি খ্রীস্টান সম্রাট তোমাকে আমার মোউৎ রূপে নিযুক্ত করেছে। ঐশ্বর্য এমনই বস্তু যা সবার আগে আত্মীয়-দোস্তদেরই কাবু করে।'

আবু শাইর আর্তনাদ করে ওঠে—'ইয়া আল্লাহ! আবু কাইর এমন ঝুট বলতে পারে, এত বড় শয়তান, দোজখের কীট আগে মালুম ছিল না! আমি তো ভুলেও খ্রীস্টানদের মুলুকের সীমানায় পা দেইনি। আর আমাকেই বানাল তাদের গুপ্তচর! জাঁহাপনা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি, হতচ্ছাড়াটি যখন খানাপিনা অভাবে গোরে যাবার জোগাড় হয়েছিল তখন দিনের পর দিন আমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে জান বাঁচিয়েছি। আর এখন সে-ই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। আমার মোউৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এবার আবু কাইর-এর ব্যবসা লাটে ওঠার পর থেকে জাহাজে চেপে এ-মুলুকে আসা, সরাইখানায় আশ্রয় নেওয়া, জ্বরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে ফেলে আবু কাইর-এর পলায়ন, তার দোকানে গেলে তাকে মারধোর করে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পথে ফেলে রাখা প্রভৃতি ব্যাপার স্যাপার আবু শাইর বিলকুল খোলসা করে সুলতানের কাছে ব্যক্ত করল।

সুলতানের হুকুমে সরাইখানার মালিককে তাঁর সামনে হাজির করা হ'ল। সব শুনে সরাইখানার বুড়ো মালিক বলল—'জাঁহাপনা, আবু শাইর-এর বাৎ বিলকুল সাচ্চা। সে আরও বল্‌ল—'আবু শাইর যখন বিমারিতে বিভোর হয়ে পড়ে তখন কাফের আবু কাইর তার পয়সা কড়ি হাফিস করে ভেগে যায়।'

সুলতানের হুকুমে এবার কাফের রজক আবু কাইর'কে রশি দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে দরবারে হাজির করা হ'ল। আবু শাইর আর সরাইখানার মালিককে দেখেই তার কলিজা শুকিয়ে গেল। বুঝল, এবার তার জান খতম হতে চলেছে।

সুলতান বাজখাই গলায় চিল্লিয়ে উঠলেন—'কাফের আবু কাইর, তুমি কপট চক্রান্তে তোমার দোস্তকে ফাঁসির কয়েদি বানিয়ে দিয়েছিলে। তোমার ছলচাতুরির সাজা তোমাকে জরুর পেতে হবে।'

সুলতান এবার কয়েকজন সৈন্যকে হুকুম দিলেন, আবু কাইর'কে পিঠ মোড়া ক'রে বেঁধে তামাম নগর ঘুরিয়ে আনার জন্য। সৈন্যরা তার হুকুম তামিল করল। এবার তার হুকুম হ'ল—'শয়তানটিকে চুনের বস্তায় পুরে, আচ্ছা ক'রে মুখ বেঁধে দরিয়ার লবণগোলা পানিতে ফেলে দাও। যাও, নিয়ে যাও। জলদি হুকুম তামিল কর।'

আবু শাইর এবার সুলতানের কাছে করুণ মিনতি জানায়—'জাঁহাপনা, আমি এখনও আবু কাইর'কে আমার দোস্ত বলে মানি। মেহেবানি ক'রে ওর জান খতম করবেন না।'

সুলতান আবু কাইর-এর আচরণে তাজ্জব বনে যান। চোখ দুটো বিলকুল কপালে তুলে ব'লে ওঠেন—'একী আজব অনুরোধ করছ আবু শাইর! সে কেবলমাত্র তোমারই নয়, আমাদের সঙ্গেও জাল-জোচ্চরি করেছে। জান খতম ক'রে দেবার মতলব এঁটেছিল। একে রেহাই দিলে খোদতাল্লা তোমাকে বা আমাকে—কাউকেই ক্ষমা করবেন না।'

আবু কাইর-এর নসীব তাকে মোউতের হাতে তুলে দিল। আবু শাইর সুলতানের যুক্তিপূর্ণ বিচারের বিরুদ্ধে টু-শব্দটিও করতে পারল না। চূনের বস্তায় বন্দী হয়ে দরিয়ার পানিতে তাকে জান দিতেই হ'ল।

আবু কাইর এবার সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের মুলুকে ফেরার প্রস্তুতি নিল। সুলতান স্বয়ং জাহাজ থেকে শুরু করে তার যাত্রার বিলকুল বন্দোবস্ত করে দিলেন। সে সঙ্গে সুলতানের তরফ থেকে উপহার স্বরূপ প্রচুর সামানপত্র জাহাজ বোঝাই ক'রে দেওয়া হ'ল।

জাহাজ আবু শাইর'কে নিয়ে বন্দর ছেড়ে মাঝ-দরিয়ার দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

কিস্‌সা শেষ করে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে দুই আবদাল্লার কিস্‌সা শোনচ্ছি।

দুই আবদাল্লার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ এবার নয়া কিস্‌সাটি শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন, বাদশাহ শারিয়ারও একটু নড়েচড়ে আয়েশ ক'রে বসলেন।

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বললেন—'কোন এক সময়ে এক দেশে আবদাল্লা নামে এক মেছুয়া ছিল। নদীর পানিতে জাল ফেলে ফেলে মছলি পাকড়ানোই ছিল তার একমাত্র কাজ।

মেছুয়া আবদাল্লা-র বালবাচ্চা ছিল নয়টি। সে একদম গরীব ছিল। মছলি পাকড়ে কোনরকমে দিন গুজরান করত।

মেছুয়া আবদাল্লা ছিল একদম একরোখা। কোন কিছুই সে গ্রাহ্য করত না। অর্থকড়ি রেখে ঢেকে কি করে চলতে হয় তা আদৌ সে জানত না। যা রোজগার করত তার একটি কানাকড়িও থাকা পর্যন্ত সে যেন স্বস্তি পেত না।

আবদাল্লা-র কাম কাজে তার বিবি খুশী ছিল না, তার মতলব হচ্ছে, অসময়ের জন্য দু'-চার দিনার তো ঘরে জমা রাখতে হয়। কার নসীবে কখন কি ঘটে, কে বলতে পারে? তার ওপর এতগুলো বালবাচ্চার ভবিষ্যৎ তো রয়েছেই।

খোদাতাল্লা-র বিচার নাই। নইলে আবদাল্লা-র বিবি ফিন আর এক লেড়কা, দশম সন্তান পয়দা করবে কেন? তার দশটি

বালবাচ্চার মধ্যে দশটিই লেড়কা।

একদিন ঘরে তিলমাত্র খানাও ছিল না। আবদাল্লা-র বিবি ব্যাজার মুখে বল্‌ল—'তুমি কেমন মরদ গো! লেড়কা পয়দা হ'ল, এর মুখে দু'ফোটা মধু তো দেওয়া দরকার। বন্দোবস্ত কর। যাও, জালটি নিয়ে সাগরে গিয়ে দেখনা যদি ছোটখাটো মছলি টছলি পাকড়াতে পার।'

বিবির বাৎ শুনে আবদাল্লা জাল কাঁধে তুলে নিল। ব্যস্ত পায়ে হেঁটে সাগরের দিকে চল্‌ল।

আবদাল্লা নৌকায় দাঁড়িয়ে আল্লাহ-র নাম স্মরণ করে ঝপ করে হাতের জালটি দিল পানিতে ছড়িয়ে। কিছু সময় বাদে টানাটানি ক'রে তুলল। লেকিন একটি কুঁচো মছলিও জালে উঠল না।

আবদাল্লা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশমানের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! একী তোমার বিচার। সদ্য পয়দা হওয়া লেড়কাকে কি তবে আমি ভুখাই রাখবে। এর জন্যই কি তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছ? এই কি তোমার বিচার?'

বুকভরা আশা ভরসা নিয়ে আবদাল্লা ফিন জালটিকে সাগরের পানিতে ছড়িয়ে দিল। এবার জালটি বহুৎ ভারী মালুম হ'ল, সে ভাবল, নির্ঘাৎ কোন বড়সড় মছলি জালে বেঁধেছে। ঝটপট জাল গুটিয়ে চল্‌ল। আচমকা সে লাফিয়ে দু'পা সরে গেল। ইয়া আল্লাহ! এ যে এক মরাগাধা! তার গা ঘুলাতে লাগল। হতছাড়া গাধাটিকে জাল থেকে ছাড়িয়ে নিল। এবার হাল ছেড়ে দিল। জালটিকে ভাল করে ধুয়ে গুটিয়ে নিল। এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জাল নিয়ে হাঁটা জুড়ল। এবার দরিয়ার অন্য একদিকে গিয়ে জাল ফেলল। প্রতিবারই কিছু না কিছু আবর্জনা উঠতে লাগল।

আবদাল্লা বিবির ওপর গোসসায় একদম কাঁই হয়ে গেল। তার নসীবের জন্যই আজ তার হালৎ এরকম শোচনীয় হয়েছে। বহুৎ দিন আগেই সে বিবিকে বলেছিল দরিয়ায় জাল নিয়ে টুঁড়ে টুঁড়ে ফয়দা তো কিছুই হচ্ছে না, তার চেয়ে বরং অন্য কোন কারবার শুরু করা যাক। লেকিন হতচ্ছাড়ির জন্যই সে আজও জাল ছাড়তে পারে না।

সূর্য পশ্চিম-আকাশে হেলে পড়েছে। জাল ফেলে ফেলে আবদাল্লা-র শরীর ও দিল্ দু'ই-ই দুর্বল। গা দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে অনবরত। শেষ বার। হ্যাঁ, শেষ বারের মত সে পানিতে জাল ছুঁড়ে মারল। তারপর আশমানের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বলল—'আল্লাহ, তুমি একবার চোখ তুলে তাকালেই আমার আর বিবির ইচ্ছা পূরণ, লেড়কার মুখে দু'ফোটা মধু দেবার ফিকির ক'রে দাও।'

আবদাল্লা এবার ধীরে ধীরে জাল টেনে গুটাতে লাগল। হায়। এবার জালটিকে সে আরও অনেক বেশী ভারী মনে হতে লাগল। জাল তুলেই সে চমকে ওঠে। ইয়া আল্লাহ, এযে এক আদমি!

আদমিই বটে! সে ভয়ে ডরে একসার হয়ে আদমিটির দিকে তাকাল। একদম তাজ্জব বনে গেল। এতো সাধারণ আদমি নয়। এর হাত, মুখ, মাথা বড় বিলকুল আদমির মাফিক। লেকিন পা অনুপস্থিত। নিম্নাংগটি একদম মছলির মাফিক। আজব তার সুরৎ।'

ভয়-ডরে আবদাল্লা-র কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। সে জাল ফেলে সোজা চোঁ-চোঁ দৌড় লাগায়।'

আজব আদমিটি চিল্লিয়ে বলল—'ওরে, ও মেছুয়া, ঝুটমুট ভাগছিস কেন? শোন—কোন ডর নেই। আমি তোর কোন ক্ষতি করব না।'

আবদাল্লা থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় ঘুরিয়ে আতঙ্কিত চোখে তাকায়।

মছলিরূপী আজব আদমিটি এবার বল্‌ল —'মেছুয়া ভাইয়া' আমি আফ্রিদি বা জীন পরী নই। আদমি। তোমার মাফিকই অবিকল এক আদমি। শোন, কাছে এসো। কোন ডর নেই, এসো।' আদতে আমি যদি আফ্রিদিই হতাম তবে সামান্য পানির সাধ্য কি আমাকে আটক রাখে। আর তোমার ঘাড় মটকাবার ফিকির করতাম।'

আবদাল্লা ভাবল—'আদমিটি তো সাচ্চা বাৎ-ই বলছে। এ যদি আফ্রিদিই হ'ত তো আমার গর্দানে মাথা থাকা সম্ভব ছিল না।

আবদাল্লা ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে পিছিয়ে গিয়ে মছলিরূপী আজব আদমিটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—'সাচ্চা বটে, তুমি আফ্রিদি দৈত্য নও?'

মছলিরূপী আজব আদমিটি নীরবে ঘাড় নাড়ল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' সাততম রজনী

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করল—'জাঁহাপনা, মেছুয়া আবদাল্লা ডরে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌ল—তুমি যদি আফ্রিদি দৈত্য না-ই হও তবে কে? কে তুমি?'

—'দেখইনা আমার চোখ, মুখ, নাক, পেট ও বুক সবই আছে—আমি আফ্রিদি দৈত্য কি করে হলাম, বলতে পার? তুমি পা দিয়ে হাঁট, আর আমি হাঁটি লেজের ওপর ভর দিয়ে। আমার ওপর জুলুম করে কেউ পানিতে ডুবিয়ে দেয় নি। আমি পানিতেই বাস করি। পানিই আমার মকান, কামরা—সর্বস্ব। আমার মাফিক হাজার হাজার লেড়কা-লেড়কি আছে যারা পানিতে পয়দা হয়েছে, পানিতেই জিন্দেগী কাটায়, খতমও তারা পানিতেই হয়ে যায়। আমার সুরৎ দেখে তোমার কি মালুম হচ্ছে না, তোমার দেহে যেমন খুন-গোস্ত আছে তেমনি আমারও আছে, তবে ফারাক

এটুকুই—তুমি জমিনের আদমি আর আমি পানির, আমার ওপর বিশোয়াস রেখে আমাকে জাল থেকে বের কর। তোমার সাথে দোস্তি গড়ে তুলতে চাই।'

মেছুয়া আবদাল্লা এবার পানি-লেড়কাকে জালের বাইরে বের করল।

জালের বাইরে এসে সে সোল্লাসে বল্‌ল—'খোদা মেহেরবান। দোস্ত, তুমি যেমন আদৎ মুসলমান, ইসলাম ধর্মামিশ্রিত। আমিও বিলকুল তা-ই। তবে আর ফারাক কোথায়?'

—'বহুৎ আচ্ছা! আমিও তোমার দোস্তি মেনে নিলাম।'

—'বহুৎ সুক্‌রিয়া! তবে আজ থেকে তুমি আমার জন্য জমিনের ফলমূল কিছু কিছু নিয়ে এসো, আর আমি দরিয়ার তলদেশ থেকে হীরা, মুক্তা, পান্না ও চুনী প্রভৃতি বহুৎ ঝিল্লাদার পাথর এনে তোমাকে ইনাম দেব, রাজী।'

পানি-লেড়কার বাৎ শুনে মেছুয়া আবদাল্লা তো খুশীতে তিন লাফ দিল। একদম ডগমগ। দোস্ত, আমি কসম খাচ্ছি, এ বন্দোবস্তের খেলাফ আমার দ্বারা অন্ততঃ হবে না।

—'আমিও কসম খাচ্ছি, আমিও খেলাফ করব না।'

মেছুয়া আবদাল্লা এবার বলল—'দোস্ত আদৎ কাজই তো বাকী রয়ে গেল। আমার নাম আবদাল্লা। তোমার কি নাম দোস্ত?'

—'আমার নামও আবদাল্লা-ই বটে। বহুৎ আচ্ছা—দুই দোস্ত, লেকিন নাম অবিকল এক।' এক লহমায় ভেবে নিয়ে পানি-লেড়কা আবদাল্লা বলল—'দোস্ত, দু'-চার লহমা অপেক্ষা কর। আমি দরিয়ার নিচ থেকে তোমার জন্য কিছু মণি, মুক্তা ও চুনী নিয়ে আসছি।'

মেছুয়া আবদাল্লাকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়েই পানি-লেড়কা আবদাল্লা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুপ করে একদম বে-পাত্তা হয়ে গেল।

কিছু সময় বাদে পানি-লেড়কা আবদাল্লা এক ঝুড়ি মণি, মুক্তা ও চুণী নিয়ে ঝুপ ক'রে পানির ওপরে ভেসে উঠল। টুকড়িটি মেছুয়া আবদাল্লা-র হাতে দিয়ে আব্দারের স্বরে বল্‌ল—দোস্ত, কাল এক টুকড়ি হরেক কিসিমের ফল আনতে ভুলো না যেন। দিনভর বহুৎ মেহনৎ করেছ। একদম হয়রান হয়ে গেছ। যাও দোস্ত, বিবি আর বালবাচ্চার কাছে ফিরে যাও।

আগামী কাল এসময়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেছুয়া আবদাল্লা খুশীভরা দিল নিয়ে দোস্তটির কাছ থেকে বিদায় নিল।

মেছুয়া আবদাল্লা মহল্লায় যাওয়ার আগে বাজার হয়ে গেল। রুটিওয়ালা তার কাছে কয়েকটি দিনার পায়, সে কিছু রুটি ও গোস্ত নিয়ে দোকানির হাতে একটি মুক্তা দিয়ে বলল—'ভাইয়া, এর আর কিছু ফেরৎ দিতে হবে না। দাম বাদ দিয়ে যা থাকবে তোমার

কর্মচারীদের আমার হয়ে মেঠাই মণ্ডা খাইয়ে দিও। আমার এক লেড়কা পয়দা হয়েছে। খুশী হয়ে আমি—

—'আর ভাই আবদাল্লা! এযে সাচ্চা মুক্তা বটে। তোমার লেড়কাটি পয়দা হতে না হতেই যে নসীব খুলে গেল! আরে দোস্ত রোটি গোস্তের এতঝুড়ি পুঁটুলটি তুমি মাথায় করে ঝুটমুট বইতে যাবে কেন? চল, আমি খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তোমার মকানে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এক রাত্রির ব্যবধানে মেছুয়া আবদাল্লা-র দাম যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। নইলে যে রুটিওয়ালা ধারে রুটি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সে-ই আজ নিজে তার রুটির পুঁটুলি বয়ে দিচ্ছে।'

পথে যেতে যেতে রুটিওয়ালা আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে ব'লে উঠল—'আবদাল্লা ভাইয়া, যা-ই বল না কেন তোমার লেড়কাটি নসীব নিয়ে জন্মেছে বটে। বিলকুল সুলতান-বাদশাহের নসীব। সাচ্চা বটে। একদম কামাল করেছ। নজরে নজরে রেখো,

ইয়াদ থাকে যেন।'

নিজের মকানে গিয়ে মেছুয়া আবদাল্লা তার বিবিকে আড়ালে ডেকে বল্‌ল—'মণি-মুক্তার টুকড়িটি সাবধানে রেখো। কারো কাছে ফাঁস কোরো না যেন। আমার রুটিওয়ালা দোস্ত ছাড়া আর কাউকেই আমি নিজে এ ব্যাপারে বলিনি। হুঁসিয়ার, ভুলেও মুখ খুলো না যেন।

সকাল হতে না হতেই মেছুয়া আবদাল্লা ফলের টুকরি নিয়ে ফিন দরিয়ার ধারে এল। চিল্লিয়ে ডাকাডাকি করল—'দোস্ত! দোস্ত!'

একটু বাদে সাগর-লেড়কা আবদাল্লা ভুস ক'রে পানির ওপরে ভেসে উঠল, মুখে হাসির ছোপ এঁকে বল্‌ল—'আরে দোস্ত, টুকরি বোঝাই ফল—বিলকুল আমার?'

—'এখানে তোমার সঙ্গে ছাড়া তো আর কারো সঙ্গে দোস্তি গড়ে ওঠে নি যে, ফলের ভাগ দিতে হবে। সাচ্চা, বিলকুল ফল তোমার, একদম একেলা তোমারই বটে।'

—'বহুৎ সুক্‌রিয়া! তোফা ফল আমদানি করেছ। বহুৎ আচ্ছা!' এ-পর্যন্ত শোনা গেল। কারণ, এর পরই সেও ঝুপ্ ক'রে পানির ভিতর তলিয়ে গেল। কয়েক লহমার মধ্যেই সে ফিন পানির ওপর ভাসল। এক টুকরি মণি-মুক্তা তার হাতে।

সেদিন এ পর্যন্তই। দোস্তদের মধ্যে আর বাৎচিৎ তেমন হ'ল না। মেছুয়া আবদাল্লা খুশীভরা দিল্ নিয়ে নিজের মহল্লার দিকে হাঁটা জুড়ল আর সাগর-লেড়কা আবদাল্লা ডুব দিয়ে চলে গেল পানির তলায়।

মেছুয়া আবদাল্লা হাঁটতে হাঁটতে হাজির হ'ল সে রুটিওয়ালার দোকানে। কাঁধে তার মণি-মুক্তার টুকরি।

তাকে দেখেই রুটিওয়ালা এক লাফে গদি থেকে নেমে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। জুল্‌জুল ক'রে তার কাঁধের টুকরিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। অপলক তার চাহনি।

এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রুটিওয়ালা বলল—'দোস্ত, আজ আমি আগেই কাজ মিটিয়ে রেখেছি। কিসমিস, বাদাম আর মধু প্রভৃতি দিয়ে মুখোরোচক পিঠা বানিয়ে দুপুরের আগেই তোমার বিবির হাতে দিয়ে এসেছি। মুখে দিলেই দিল্ বিলকুল ভরে উঠবে।'

মেছুয়া আবদাল্লা তিনটি ইয়া বড় বড় মুক্তা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—রেখে দাও পুরোটাই তোমার।'

মুক্তা তিনটি হাতে নিয়ে সে স্থবিরের মাফিক দাঁড়িয়ে রইল। চক্ষু পর্যন্ত স্থির। যেন অবিকল পাথরের মূর্তি। মুখ দিয়ে রা সরল না।

—'কি দোস্ত, একদম বোবা হয়ে গেলে দেখছি! আমি খুশী হয়ে দিলাম। রেখে দাও। রেখে দাও।' মেছুয়া আবদাল্লা বলল। 'কিছু মনে কোরো না দোস্ত, আমাকে একবারটি জহুরীর দোকান হয়ে যেতে হবে।'

সে এবার বাজারের এক বড়সড় জহুরীর দোকানে ঢুকে এক মুঠো মণি, মুক্তা ও পান্না দেখিয়ে দাম জানতে চাইল।

জহুরী ব্যাপার দেখে একদম আশমান থেকে পড়ল যেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক লহমা। সে একবার তার সুরৎ পরমুহূর্তেই হাতের মণি-মুক্তাগুলির দিকে তাকাতে লাগল। বার কয়েক এমনি করার পর সে ঢোক গিলে কোন রকমে উচ্চারণ করল—'এরকম জহরৎ তোমার কাছে কতগুলো আছে?'

—'বহুৎ। পুরো দু'টুকরি।'

—'তোমার মকান কোথায়, বল তো?'

—'মকান? আদতে মকান টকান বলতে যা বুঝায় তা আমার আদৌ নেই সাহাব।'

—'সে কি! থাক কোথায়? একটি ঠিকানা তো জরুর আছে?'

—'সাহাব, মছলির বাজারের গায়ে এক ঝুপড়ি বানিয়ে বিবি আর বালবাচ্চা নিয়ে কোন রকমে দিন গুজরান করি।'

জহুরীর চোখ দুটো অকস্মাৎ কুঁচকে গেল। কপালের চামড়ায় ভাঁজ একে মেছুয়া আবদাল্লার সুরৎ নিরীক্ষণ ক'রে চিল্লিয়ে উঠল, 'কোই হ্যায়? এ আদমিটিকে পাকড়াও কর। রশি দিয়ে বাঁধ। দরবারে চালান দিতে হবে। চোরাই মাল বেচতে এসেছে।'

ব্যস, চোখের পলকে দুই জোয়ান মরদ ছুটে এসে মেছুয়া আবদাল্লা'কে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল্‌ল।

দেখতে দেখতে জহুরীর দোকানের সামনে কৌতূহলী পথচারীর মেলা বসে গেল। সবার মুখেই একই সুর। বেটা পাকা চোর! হাসান সাহাবের মকানের চুরির ব্যাপারে নির্ঘাৎ এ-ও জড়িত ছিল। কেউ বা বল্‌ল —'এবার মালুম হ'ল, এত সব চুরি ছিনতাই হচ্ছে, মাল যাচ্ছে কোথায়!' আর সে সঙ্গে 'মার ঢাল,' খতম ক'রে দে, 'হাড্ডি একদম গুঁড়া গুঁড়া ক'রে দে'—আরও কত সব মন্তব্য চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল।

মেছুয়া আবদাল্লা একটি বাৎ-ও বল্‌ল না। মুখে কলুপ এঁটে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

জহুরী তাকে নিয়ে সুলতানের দরবারে হাজির হ'ল। সে নালিশ জানাতে গিয়ে যে সব অভিযোগ খাড়া করাল তার সঙ্গে বেগম সাহেবার হীরা জহরতের গহনাপত্র খোয়া যাওয়ার দায়ও বিলকুল তার ওপর চাপিয়ে দিল।

বাজারের অন্য সব জহুরীরাও দৌড়ঝাঁপ ক'রে দরবারে হাজির হতে লাগল। একজন তো বেমালুম বলেই ফেল্‌ল—'জাঁহাপনা

এর জেবে যেসব জহরৎ মিলেছে তার মধ্যে বেগম সাহেবার গহনার জহরৎ-ই বেশী। গহনা থেকে খুলে বেচতে নিয়ে এসেছে। ন্যাকা ন্যাকা ভাব করলে কি হবে, পাক্কা চোর। মহা-ধুরন্দর!'

সুলতান এবার মণি-মুক্তাগুলো এক খোজা নফরকে দিয়ে অন্দর-মহলে বেগম সাহেবার কাছে সনাক্তকরণের জন্য পাঠালেন।

মণি-মুক্তাগুলো এক লহমায় দেখে নিয়ে বিলকুল চিল্লিয়ে উঠলেন—'ইয়া আল্লাহ! কোথায় পেলি? কার কাছে পেলি এগুলো? আমার নয়, বহুৎ আচ্ছা। লেকিন জাঁহাপনাকে গিয়ে বল, আমার লেড়কার জন্য যেন এগুলো খরিদ ক'রে নেন। আমার বিলকুল পছন্দ্ মাফিক জহরৎ-ই বটে।'

খোজা নফরটি গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এগুলো বেগম সাহেবার খোয়া যাওয়া জহরৎ নয়। লেকিন তার বিলকুল এগুলো পছন্দ্ মাফিক জহরৎ। শাদীর জন্য খরিদ করে নিতে হুকুম পাঠিয়েছেন।'

খোজার বাৎ শুনে সুলতান গোস্‌সায় একদম লাল হয়ে গেলেন। জহুরীদের বল্‌লেন—'তোমরা একী আজব কাণ্ড করছ। নিরীহ সোজা-সরল পেয়ে আদমিটিকে ঝুটমুট হয়রান করছ! তোমাদের গোস্তাকী খোদাতাল্লার দরবারে মাফ হবে না।'

জহুরীটি এত সহজে হাল ছাড়তে নারাজ। সে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি করে আদৎ ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখার কোশিস করুন। এ বেটা জেলে, মছলি পাকড়ে কোনরকমে দিন গুজরান করে। এর কাছে এতগুলো জহরৎ কি ক'রে আসতে পারে। এর চৌদ্দপুরুষেও তো এসব চোখে দেখে নি।'

সুলতান গোস্‌সায় একদম কাঁই হয়ে গেলেন। গর্জে উঠলেন—'কেন চোখে দেখবে না, আমার দিমাকে আসছে না। আল্লাতাল্লা-র মর্জির কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে! কাকে, কখন, কি অমূল্য সম্পদ দান করেন, কেউ বলতে পারে না। সাচ্চা আদ্‌মির দিকে তার নজর, এক রাত্রির মধ্যে পথের ভিখমাঙ্গাকে তিনি আমীর বাদশাহ বানিয়ে দিতে পারেন, ফিন বাদশাকে খালি হাতে দিয়ে ভিখমাঙ্গাও বানিয়ে দেয়া কোন আজব ব্যাপার নয়। আদতে অন্যের ধন দৌলত দেখে তোমাদের চোখ টাটাচ্ছে। তোমাদের সমান কারবারী কেউ হয়ে উঠুক তোমরা তা বরদাস্ত করতে চাইছ না। আমার বাৎ শোন, তোমাদের এসব ধান্দাবাজী আল্লাতাল্লা-র কাছে টিকবে না, ইয়াদ থাকে যেন।'

সুলতানের কাছ থেকে অভয় পেয়ে মেছুয়া আবদাল্লা এবার মুখ খুল্‌ল—'জাঁহাপনা, এ-ই শেষ নয়, আমার কাছে আরও দু'টুকরি মণি-মুক্তা রয়েছে।'

সুলতান এবার বল্‌লেন—'মেছুয়া আবদাল্লা, এবার বল তো, এত সব জহরৎ তুমি কোথায় পেলে? সাচ্চা বল।'

মেছুয়া আবদুল্লা এবার সাগর লেড়কা আবদুল্লা-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সবই হু বহু সুলতানের কাছে খোলসা ক'রে পেশ করল।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' দশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতান মেছুয়া আবদাল্লা-র কিস্‌সা শোনার পর বিস্ময়ে চোখ দুটো বিলকুল কপালে তুলে বল্‌লেন—'এসব বাৎ বিলকুল সাচ্চা আবদাল্লা?'

—'হ্যাঁ জাঁহাপনা, বিলকুল সাচ্চা। আমরা উভয়ে কোরাণ শরীফ এর নামে কসম খেয়ে বলেছি, আমি রোজ সকালে তাকে এক টুকরি ফল দেব আর সে আমাকে এক এক টুকরি জহরৎ দেবে।'

—'শোন আবদাল্লা, বিলকুল আল্লাতাল্লা-র মর্জি। তাঁর প্রতি তোমার মধ্যে নিখাদ ভক্তি-নিষ্ঠা রয়েছে, তারই ইনাম হচ্ছে এত সব জহরৎ। লেকিন এক বাৎ, ধনদৌলত কামাই করা আর তা রক্ষণাবেক্ষণ করার মধ্যে বিস্তর ফারাক। আমি তোমার সম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিলাম। তবে এসব তোমার বেহেস্তে যাবার পর কে পাবে, তা বলা আমার এক্তিয়ার বহির্ভূত। তুমি রাজী থাকলে আমার বেটিকে তোমার হাতে তুলে দিতে আমার অমত নেই। যদি রাজী থাক, আমার লেড়কিকে শাদী কর ,তবে আমার অবর্তমানে তুমিই আমার তখতের দাবীদার হবে। সুলতান হয়ে এ- সুলতানিয়ৎ শাসন করবে। আর এখন তোমাকে উজিরের পদে বহাল করতে চাই।'

আবদাল্লা আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনি পিতৃতুল্য। আপনি যে মত করবেন আমারও একই বাৎ।'

সুলতান এবার কাজীকে তলব করলেন। কাজী তাঁর ইয়া পেল্লাই কিতাবটি নিয়ে সুলতানের প্রাসাদে হাজির হলেন। শাদীর কবুলনামা লিখে ফেল্‌লেন। সাক্ষীরা স্বাক্ষর দিলেন, মেছুয়া আবদাল্লা-র সঙ্গে শাহজাদীর শাদীর পাট চুকে গেল।

শাদীর পর মেছুয়া আবদাল্লা ও তার সদ্য শাদী করা বিবি এক কামরায়, এক বিছানায় শাদীর রাত্রি উপভোগ করল।

অন্যদিনের মতই সুলতান খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে খোলা জানালার ধারে বসে মুক্ত বায়ু সেবন ও আল্লাতাল্লা-র নামগানে মগ্ন রয়েছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল তাঁর জামাতা মেছুয়া আবদাল্লা একটি ফলের টুকরি কাঁধে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত পায়ে দরিয়ার দিকে যাচ্ছে।

সুলতান জানালায় বসে থেকে গলা চড়িয়ে ডাকলেন

—'আবদাল্লা, আবদাল্লা, কোথায় যাচ্ছ? কাঁধে ওটা কি?'

—'দরিয়ার ধারে যাচ্ছি। টুকরিতে ফল রয়েছে। সাগর-লেড়কা, আমার দোস্তের জন্য ফল নিয়ে যাচ্ছি।

—'বহুৎ আচ্ছা! লেকিন টুকরিটি তুমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছ! আমার জামাতা তুমি। নফর নোকররা রয়েছে, কাউকে নিয়ে গেলেই তো পারতে। এভাবে নিজে টুকরি বইলে ইজ্জৎ হানি হয়, মালুম নেই?'

—তার সঙ্গে যে আমার এরকমই শর্ত হয়েছিল। শর্ত ভঙ্গ ক'রে দোজখে যাব নাকি? আর তারই দৌলতে আজ আমি আপনার প্রাসাদে, আপনার লেড়কির কামড়ায়—আমার দৌলত, মান ইজ্জৎ লাভ করেছি।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ জবুর! জবুর, শর্তভঙ্গ করলে গুণাহ হয়। যাও, তোমার দেরী হয়ে গেলে তোমার দোস্তটি গোস্‌সা করবে।'

আবদাল্লা আবার লম্বা লম্বা পায়ে দরিয়ার দিকে এগিয়ে চলল। ফলের টুকরি তার কাঁধেই রয়েছে।

মেছুয়া আবদাল্লা এক সময় দরিয়ার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সে অন্য দিনের মতই চিল্লিয়ে 'দোস্ত দোস্ত' ব'লে ডাকাডাকি জুড়ে দিল।

পানি ভেদ করে ওপরে উঠে এল সাগর লেড়কা আবদাল্লা। সে ফলের টুকরিটি নিয়ে পানিতে তলিয়ে গেল। কিছু সময় বাদে মণি-মুক্তা, চুনী ও পান্নার টুকরি নিয়ে ফিন ভুস্ ক'রে ভেসে উঠল।

মেছুয়া আবদাল্লা জহরৎ এর টুকরি নিয়ে বাদশাহের প্রাসাদের দিকে হাটতে লাগল, বাজারের কাছে গিয়েই দেখে রুটিওয়ালার দোকান বন্ধ। শুনল তার বিমারি হয়েছে। একদম শয্যা নিয়েছে। ডাকাডাকি হাঁকাহাকি ক'রে আবদাল্লা তাকে তুলল। তাকে বল্‌ল—'আমি এখন সুলতানের জামাতা হয়ে প্রাসাদে রয়েছি, তার লেড়কির সঙ্গে আমার শাদী হয়ে গেছে দোস্ত।'

রুটিওয়ালা আবদাল্লা-র নসীব ফিরে গেছে শুনে বহুৎ খুশী হ'ল।

আবদাল্লা বল্‌ল—'দোস্ত, আমার তো নসীব একদম বদলে গেছে। এখন আর ধন-দৌলতের দরকার নেই। তুমি বরং এ মণি-মাণিক্যের টুকরিটি রেখে দাও।

তার মতলব শুনে রুটিওয়ালা তো বিলকুল থ বনে গেল। মুখ দিয়ে রা পর্যন্ত বেরলো না। ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মণি-মাণিক্যগুলি রুটিওয়ালাকে দান করে খালি টুকরিটি নিয়ে মেছুয়া আবদাল্লা প্রাসাদে ফিরল। সুলতান বল্‌লেন—'কি হে, তোমার সাগর লেড়কা, তোমার জিগরী দোস্ত বুঝি তোমাকে আজ বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে?'

—'তা কেন হবে? আজ বরং কালের চেয়ে বড়িয়া জহরৎ দিয়েছে। রুটিওয়ালাকে দিয়ে এলাম। বহুৎ আচ্ছা আদমি। আমাকে বহুৎ পেয়ার করে। আমার দুঃসময়ে, আমি যখন খানা বিনা ভুখায় মরতাম তখন সে-ই রুটি দিয়ে আমার বিবি আর বালবাচ্চাদের জান টিকিয়ে রেখেছিল।'

সুলতান সবিস্ময়ে বললেন—'তবে তো বহুৎ আচ্ছা আদমি! তোমার দোস্তটির নাম কি বল তো?'

—'রুটিওয়ালা আবদাল্লা।'

—'আজব ব্যাপার তো! তোমাদের দোস্তগুলোর নামের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল রয়েছে দেখছি! তোমার নাম মেছুয়া আবদাল্লা, তোমার এক দোস্তের নাম রুটিওয়ালা আবদাল্লা, আর এক দোস্তের নাম সাগর আবদাল্লা। বেটা আমার নাম মালুম হ্যায়? আমার নাম সুলতান আবদাল্লা।' বলেই সুলতান হো হো রবে হেসে বল্‌লেন—'আল্লা তাল্লা-র কারসাজী—সব আবদাল্লা কে একাট্টা করে দিয়েছেন। তার সঙ্গে আমার মোলাকাৎ করিয়ে দেবে? আমি তাকেও আমার দরবারে নিয়ে আসতে চাই। উজির বানিয়ে দেব তাকে।'

মেছুয়া আবদাল্লা সেদিনই রুটিওয়ালা আবদাল্লা'কে সুলতানের সামনে হাজির করল। সুলতান খুশী হয়ে তাকে তাঁর বাঁ পাশের উজিরের পদ দান করল।

মেছুয়া আবদাল্লা আজ নসীবের বলে সুলতানের জামাতা। উজির। দরবারে তার বহুৎ আদর-খাতির। লেকিন সে একদিনের জন্যও দোস্ত সাগর আবদাল্লা-র সঙ্গে ভেট করতে ভোলে না।

এক সাল গড়িয়ে গেল।

এক সকালে ফলমূল আর মণি-মাণিক্য বিনিময় পর্ব মিটিয়ে দুই দোস্ত দরিয়ার কিনারায় এক পাথরের ওপর মুখোমুখি ব'সে বাৎচিৎ করতে লাগল। তখন মেছুয়া আবদাল্লা-র উৎসাহ-আগ্রহ দেখে সাগর আবদাল্লা বল্‌ল, আমার মুলুক বহুৎ বড়িয়া। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে দোস্ত?'

—'তা কি ক'রে সম্ভব? পানির মুলুকে আমি তোমার মাফিক শ্বাস নিতে পারব কেন? দম বন্ধ হয়ে আসবে না'?

ব্যাজার মুখে সাগর-আবদাল্লা বল্‌ল, হ্যাঁ, সাচ্চা বটে। তকলিফ তো হবেই। আমি যেমন বেশী সময় ডাঙায় থাকলে বাতাসে গা শুকিয়ে যায়। বিড়বিড় করতে থাকে। দমকা বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। একদম বে-সামাল হয়ে পড়ি।'

—'আমারও একই ব্যাপার দোস্ত। পানিতে বাতাস একদম কম। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বেশী সময় থাকলে গায়ে ঠাণ্ডা লাগে। জোর জুলুম করলে জান খতম হয়ে যেতে পারে। মোদ্দা বাৎ যে, যে পরিবেশে পয়দা হয়েছে, জিন্দেগী কাটাচ্ছে তার অদল বদল কিছু হলেই তকলিফ হয়, সাচ্চা কিনা?'

—'সাচ্চা, বিলকুল সাচ্চা।'

—'দোস্ত, তোমার দিল্ চায় তো আমি তোমার সারা গায়ে এমন এক মলম মাখিয়ে দেব যাতে তুমি পানির তলায় দিব্যি চলাফেরা করতে পারবে। দিল্ চাইলে জিন্দেগীও কাটিয়ে দিতে পারবে, একদম তকলিফ হবে না।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তবে মলম লাগিয়েই দাও দোস্ত। কোশিস করে দেখি যদি তোমার মাফিক পানিতে টুঁড়ে বেড়াতে পারি।'

সাগর আবদাল্লা একটি পাত্রে কিছু কাঁইয়ের মত পদার্থ নিয়ে এল। বল্ল—'দোস্ত, এ মলম দানদান মছলির চর্বি থেকে বানানো হয়েছে। দানদান মছলির নাম শোন নি? ইয়া পোল্লাই, প্রায় হাতির সমান ওজন। আমরা, দরিয়ার প্রাণীরা দানদানকে দরিয়ার সুলতান বলি।'

মেছুয়া আবদাল্লা চোখ বড় বড় করে ফ্যাকাসে মুখে বল্ল —'দোস্ত তোমার মহল্লায় বহুৎ দানদান মছলি হরদম চক্কর মেরে বেড়ায় বুঝি? তবে আমার যাওয়ার দিল্ নেই। ওরে ব্বাস, গিলে ফেলবে সে।'

—'ধ্যুৎ, ঝুটমুট তুমি ডরে কাঁপছ দোস্ত! তারা দূর থেকে আদমির গায়ের খুসবু পেয়ে ভেগে যায়। কোন ডর নেই দোস্ত, আমি তো তোমার পাশে পাশেই থাকব।'

মেছুয়া আবদাল্লা এবার কিছুটা ধাতস্থ হতে পারল। কোর্তা পাৎলুন আর যা কিছু পোশাক গায়ে রয়েছে বিলকুল খুলে ফেল্ল। ছোট্ট একটি পোটলা বানিয়ে পাথরচাপা দিয়ে দিল। কেউ নিয়ে গেলে যে একদম উলঙ্গ হয়ে প্রাসাদে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের পাখির আনা গোণা লক্ষ্য ক'রে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' তেরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্সার জের টেনে বল্লেন—'জাঁহাপনা, মেছুয়া আবদাল্লা সাজ পোশাক খুলে বিলকুল উলঙ্গ হয়ে সাগর আবদাল্লা-র সামনে দাঁড়াল। সে এবার তার সারা গায়ে আচ্ছা করে মলম মাখিয়ে দিল।

এবার উভয়ে সাগরের পানিতে ডুব দিল। কিছু সময় বাদে এক গুহার ধারে পৌঁছে সাগর আবদাল্লা বল্ল—'দোস্ত, এ-ই আমার আস্তানা।'

মেছুয়া আবদাল্লা বিস্ময় মাখানো নজর মেলে চারদিকের পাহাড়, গাছ-গাছলা ও লতাপাতার ঝোপঝাড় দেখতে লাগল। সে সবিস্ময়ে স্বগতোক্তি ক'রে উঠল— 'ইয়া আল্লা। এযে দেখছি এক নতুন দুনিয়া! পানির তলায় এমন এক আজব কাণ্ড আল্লাহ ক'রে রেখেছেন! এ কি খোয়াব দেখছি, নাকি আমি চেতন রয়েছি।' ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে খুবসুরৎ প্রবাল, রক্তমুখী প্রবাল আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গুনাবী আর সফেদ প্রবাল তার সুরৎ আরও হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অদূরে এক হীরার পাহাড় তার দিল্ একদম কেড়ে নিল। আর রয়েছে পদ্মরাগমণির বিচিত্র সমারোহ। তার ধার কাছ দিয়ে রঙ বেরঙের হাজারো কিসিমের মছলি খুশীতে ডগমগ হয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। এমন কয়েক কিসিমের মছলিকে অদূরে টুঁড়ে বেড়াতে দেখা গেল যারা বিলকুল জন্তু-জানোয়ারের মাফিক। আর কেউ আদমির অবয়বধারী। তবে সাগর আবদাল্লা-র মাফিক শরীরের নিম্নাংশ অবিকল মছলির মাফিক। আজব এক দুনিয়া আল্লাতাল্লা সাগরের পানির তলায় গড়ে তুলেছেন যা মেছুয়া আবদাল্লা এখানে আসার আগে কল্পনাও করতে পারে নি।

মেছুয়া আবদাল্লা তার দোস্তের হাত ধরে এগিয়ে চলতে লাগল। যত দেখছে ততই তাজ্জব বনছে। আরও এগিয়ে মুখোমুখি হ'ল চুনী, পান্নার । সে ভাবল দুনিয়ার ধন দৌলত একাট্টা করলেও

যে এদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে না।

মেছুয়া আবদাল্লা এবার এক আজব মহল্লায় হাজির হ'ল। পান্নার পাহাড় কেটে কেটে ছোট ছোট অসংখ্য গুহা বানানো হয়েছে। সবগুলি গুহার মুখেই খাড়া রয়েছে একটি ক'রে ষোড়শী বা অষ্টাদশী লেড়কি, খুব সুরৎ। এক নজরে দেখলেই দিল্ উদাস হয়ে যায়। শুরু হয় কলিজার ছটপটানি। সবাই কুমারী। সাগর লেড়কি ব'লে পরিচিতা। গুহাগুলিই তাদের বাসস্থল।

সাগর আবদাল্লা বল্‌ল—'এরা সবাই কুমারী। দোস্ত তাল্লাস করছে। কারো সঙ্গে পেয়ার মহব্বৎ গড়ে উঠলে এখানকার কামরা ছেড়ে ওর সঙ্গে ঘর করতে চলে যায়। তার আগে পর্যন্ত এখানে খাড়া থেকে মহব্বতের পাত্রের তাল্লাশ করে। মহল্লার দেখা মিলবে পাহাড়টির বিপরীত প্রান্তে। বিবি আর বালবাচ্চা নিয়ে আদমিরা সেখানে বসবাস করে। লেড়কিদের শাদীর উমর হলে এখানে পাঠিয়ে দেয় মরদ বাছাই করার তাগিদে। শাদীর যোগ্য লেড়কারা এখানে ঘুরঘুর করে, বিবি পছন্দ করার জন্য ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। টুঁড়ে টুঁড়ে এক লেড়কিকে পছন্দ করে নিয়ে যায় মহল্লায়।

মেছুয়া আবদাল্লা এবার তার দোস্তের হাত ধরে হাজির হয় মহল্লায়, যেখানে হাজার গুহায় বিচিত্র সমাবেশ। রক্তরাগ মণির পাহাড়ের গায়ে গুহাগুলির সুরৎ দিল্ কেড়ে নেয়। এখানে সাগর আদমিরা বিবি আর বাল বাচ্চা নিয়ে সুখে ঘর করছে। লক্ষ লক্ষ চুনো মাছ ঝাঁক বেঁধে টুঁড়ে বেড়ায় পানির দুনিয়ায়। এগুলোকেই খানা হিসাবে ব্যবহার করে এ-মহল্লার আদমিরা। তাই এদের দিনার দিরহামের জরুরৎ হয় না। দোকান-হাট বাজারেরও তল্লাশ করার দরকার পড়ে না।

মেছুয়া আবদাল্লা ক্ষণিক ইতঃস্ততের পর বল্‌ল—'দোস্ত, যদি
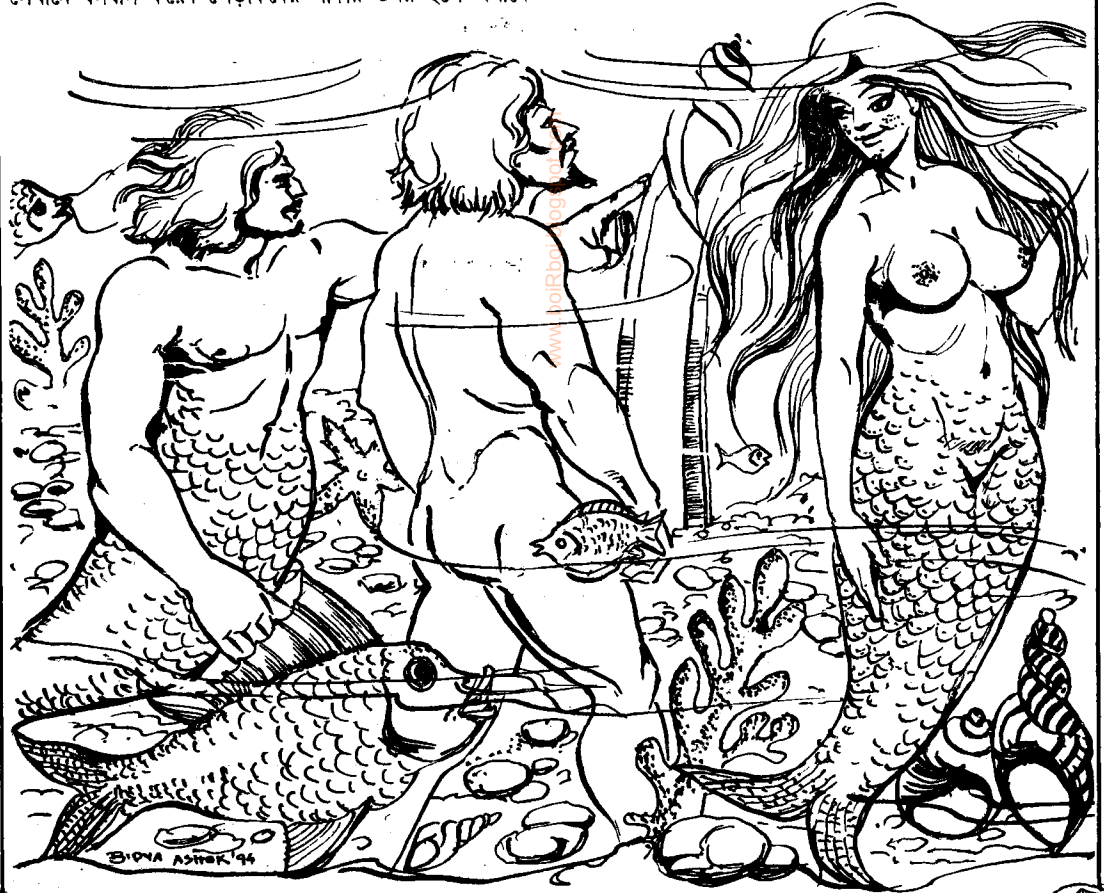
গোস্‌সা না কর তবে একটি ব্যাপারে পুছতাছ করি।'

সাগর আবদাল্লা মুচকি হেসে বল্‌ল—'কি জানতে চাও, বলেই ফেল দোস্ত, এত দ্বিধা-সঙ্কোচের কি আছে, বুঝছি না তো!'

—'ব্যাপারটি হচ্ছে, তোমরা কোর্তা-কামিজ-পাৎলুন ব্যবহার না করে লেড়কা-লেড়কি সবাই বিলকুল উলঙ্গ হয়ে ঢুঁড়ে বেড়াও কেন। তোমাদের কি লাজ শরম নেই?'

—'লাজ শরম? সে আবার কি দোস্ত? শরমটরম আমাদের জাতভাইরা বোঝে না। ঝুটমুট পোশাক গায়ে চাপিয়ে চলাফেরার অসুবিধা বাড়ানো ছাড়া ফয়দা তো কিছু নেই।'

—আর একটি ব্যাপার জানার জন্য আমার দিল্‌ ছটফট করছে দোস্ত। তোমাদের শাদী-নিকার নিয়ম-কানুন কিছু কিছু আছে কি?—'শাদী-নিকা যখন হয় তখন নিয়ম-কানুন তো কিছু জরুর মানতে হয়। এখানে মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী, পার্শী, হরেক ধর্মাবলম্বী বসত করে। একমাত্র মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ-ই শাদী-নিকার ধার ধারে না। পছন্দ মাফিক এক লেড়কিকে নিয়ে বেমালুম ঘর করতে শুরু করে। বাল-বাচ্চা হয়। কিছুদিন ঘর করার পর লেড়কা বা লেড়কি যদি আর সহবাস করতে আগ্রহী না হয় তবে অন্য কারো সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারে। আমরা, সাচ্চা মুসলমানরা এসব ধান্ধাকে ঘৃণা করি। আমরা কোরাণে বর্ণিত নিয়ম কানুন মেনে শাদী-নিকা করি।"

মেছুয়া আবদাল্লা এবার তার দোস্তের হাত ধরে বহুৎ বড়সড় এক মহল্লায় হাজির হ'ল। পাহাড়, গুহা, বন আর পানি সব মিলিয়ে বিলকুল দেয়ালে টাঙানো তসবীরের মাফিক মালুম হতে লাগল নয়া এ মহল্লাটিকে।

ছোট ছোট গুহায় বিবি আর বালবাচ্চা নিয়ে ঘর করে। আরও কিছুটা এগিয়ে সাগর আবদাল্লা একটি বড় সড় গুহার দরওয়াজায় পৌঁছে বল্‌ল—'দোস্ত, এ-ই আমার আস্তানা।'

দু'জনের এগিয়ে আসার শব্দ পেয়ে খুবসুরৎ এক জেনানা এগিয়ে এসে দরওয়াজা আগলে দাঁড়াল। গুলাবী তার রঙ। পানির ধাক্কা খাওয়ায় তার গায়ের রঙকে খোল তাই মালুম হয়। কুচকুচে কালো—কোঁকড়ানো এক গোছা চুল একদম কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। উন্নত বক্ষ। নিটোল স্তন দুটোর দিকে এক লহমায় নজর পড়লে কলিজার ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। দিল্‌ আকুল হয়ে ওঠে। হরিণীর মাফিক ডাগর ডাগর চোখ দুটোর দিকে নজর পড়লেই দিল্‌ অশান্ত হয়ে পড়ে। স্তন দুটোর পরই উদর। থলথলে গোস্ত গুলাবী চামড়ায় মোড়া। তারপর? তলপেট। তারপর? না তার পর যা রয়েছে এক লহমায় নজর দিলেই ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আল্লাতাল্লা বড়ই বেরসিক। বড়ই নিষ্ঠুর। তলপেটের মাঝামাঝি জায়গা থেকে একদম লেজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিম্নাঙ্গ জুড়ে রয়েছে মছলির আঁশ আর পাখনা। সুগঠিত ভারী নিতম্ব যা লেড়কিদের সৌন্দর্যের একটি বিরাট অংশ বলে দাবী করতে পারে সেই মাংসল, থলথলে নিতম্ব এর দেহে অনুপস্থিত।

সাগর আবদাল্লা ফলের টুকরিটি গুহার মুখে নামিয়ে রাখতে রাখতে আমার সঙ্গে খুব সুরৎ জেনানাটির পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌ল— 'আমার দোস্ত, জমিনে থাকে। এ-ই রোজ আমাকে এক এক টুকরি ক'রে ফল দেয়। আজও সে দিয়েছে এই দেখ। একদম সাচ্চা মুসলমান। আচ্ছা দিল-ও বটে।'

জেনানাটি ডরে জড়সড় হয়ে খাড়া হয়ে রইল। মালুম হ'ল সে আমাকে তার মোউৎ ভেবে এমন আতঙ্কিত হয়েছে।

সাগর আবদাল্লা তাকে লক্ষ্য করে বল্‌ল— 'একে দেখে এমন ডরের কিছু নেই। এ আমার দোস্ত, জিগরী দোস্ত। পানির ওপরে মিট্টির মুলুকে থাকে। আমাদের মেহমান হয়ে এসেছে, দু'-চার রোজ থাকবে।'

লেড়কিটি এবার স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। তার টক-টকে লাল ঠোঁট দুটোতে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'আসুন, ভেতরে আসুন।'

সাগর আবদাল্লা তাকে নিয়ে তার গুহা-কামরায় ঢোকার উদ্যোগ নিল। এমন সময় এক জেনানা কোলে বাচ্চা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হ'ল। সাগর আবদাল্লা পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে আমাকে বল্‌ল— 'এ হচ্ছে, সাগর বিবি। সে কোলের বাচ্চা দুটো নামিয়ে রেখে এক লহমায় আমাকে দেখে নিল। তারপর সরবে হেসে বল্‌ল—'কী তাজ্জব ব্যাপার! এযে দেখছি লেজবিহীন। এর লেজ কি ছিলই না, নাকি খসেটসে গেছে?'

সাগর আবদাল্লা অপ্রতিভ হয়ে বল্‌ল—'দোস্ত-এর বাৎ শুনে গোস্‌সা কোরো না। আদতে এরা তো লেজবিহীন আদমি এর আগে কোনদিনই দেখে নি। তাই একটু আধটু তাজ্জব তো বনবেই।

এমন সময় দশটি ইয়া লম্বা ও গাট্টাগোট্টা আদমি আমাদের কাছে এল। আমাকে ঘিরে খাড়া হয়ে পড়ল। তাদের মধ্য থেকে একজন গম্ভীর স্বরে সাগর আবদাল্লাকে বল্‌ল— 'সুলতান জানতে পেরেছেন, তুমি নাকি লেজবিহীন এক তাজ্জব আদমিকে তোমার কামরায় নিয়ে এসেছ? সুলতানের হুকুম তোমার মেহমানটিকে নিয়ে দরবারে হাজির হতে হবে। আদৎ বাৎ সুলতান পরীক্ষা করে দেখবেন একি আমাদেরই মাফিক খুন, গোস্ত আর হাড্ডি দিয়ে তৈরী নাকি অন্য কোন কিসিমের বস্তু দিয়ে এর শরীরটিকে গড়ে তোলা হয়েছে? চট জলদি নিয়ে চল্‌। সুলতান জরুরী তলব পাঠিয়েছেন।'

সাগর আবদাল্লা এবার নিতান্ত অপরাধীর ভঙ্গিতে মেছুয়া আবদাল্লাকে বল্‌ল— 'দোস্ত, সুলতানের কড়া হুকুম। অগ্রাহ্য করার

টপ্পর নেই। তবে তোমার কোন ডর নেই, বলতে পারি। আর যা কিছু বলার আমিই সুলতানকে বলব। আর নেহাৎ যদি কোন ঝামেলায় তোমাকে জড়িয়ে দেয়ার কোশিস করেন, আমি মোকাবেলা করব।'

আমি সাগর আবদাল্লা-র পিছন পিছন সুলতানের দরবারে হাজির হলাম।

সুলতানের কারবার দেখে মেছুয়া আবদাল্লা বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। সে দরবারে হাজির হওয়ামাত্র সুলতান এক লহমায় তার আপাদমস্তক দেখে নিয়েই বিকট স্বরে হাসাহাসি শুরু করে দিলেন। একজন পরদেশীকে নিয়ে এমন হাসি মস্করা করা যে সৌজন্যবিরুদ্ধ আবেগ-উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্যের জন্য তা-ও বিলকুল ভুলে গেছেন।

সুলতান এক সময় হাসি থামিয়ে তার দিকে তর্জনি-নির্দেশ ক'রে ব'লে উঠলেন— 'ইয়া আল্লাহ! এযে সাচ্চা-ই লেজবিহীন এক তাজ্জব আদমি।' এবার মেছুয়া আবদাল্লা'কে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন— 'কি হে, তুমি এমন তাজ্জব শরীর কি ক'রে পেলে? তোমার লেজ নেই যে—ব্যাপার কি? তোমার চলাফেরা করতে তকলিফ হয় না?'

—'লেজ থাকলে সুবিধা কতখানি পাওয়া যেত মালুম থাকলে না হয় আন্দাজ করতে পারতাম লেজ না থাকায় কতখানি তকলিফ ভোগ করছি।'

—'বহুৎ আচ্ছা! আর এক ব্যাপার, তোমার পিছনে ওই উঁচু ও ভারী বস্তুটি কি, বলতো?'

মেছুয়া আবদাল্লা নিজের নিতম্বের দিকে এক লহমায় তাকিয়ে নিয়ে বল্ল— 'এইটি? একে কেউ বলে নিতম্ব, কেউ বা পাছা বলে।' বসার কাজে এর দরকার হয়। আর খুবসুরৎ লেড়কিদের নিতম্ব উঁচু ও ভারী হয়ে থাকে। এ কিসিমের নিতম্ব যেসব লেড়কিদের থাকবে তাদের লেড়কারা বেশী কদর দেয়।'

এবার সুলতান তর্জনি-নির্দেশ ক'রে বল্লেন— আর এক তাজ্জব বস্তু তোমার দেহে দেখতে পাচ্ছি। কি ওটি?'

—'জাঁহাপনা, এটি আমাদের কাছে বহুৎ শরমের ব্যাপার। তাই আমার মুলুকে সবাই এটিকে কাপড়া দিয়ে বিলকুল ঢেকে রাখি। একে আমরা বলি লিঙ্গ—পুরুষাঙ্গ। আমরা এটিকে হরেক কিসিমের কাজে ব্যবহার করি। আপনি এ-মুলুকের সুলতান, মানী আদমি, আপনার কাছে বিলকুল খোলসা ক'রে বলতে শরম লাগছে। তাই সংক্ষেপে বলছি— এটির মারফৎ আমরা বংশবৃদ্ধি করি, লেড়কা-লেড়কি পয়দা করি। এর বেশী কিছু শুধালে আমার পক্ষে জবাব দেয়া বিলকুল অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।'

মেছুয়া আবদাল্লার বাৎ শুনে সুলতান ও তার উজির নাজির আমীর ওমরাহগণ কি বুঝল মালুম নেই। লেকিন সবাই হেসে একদম গড়াগড়ি যাবার জোগাড় হ'ল।

সুলতান এবার মেছুয়া আবদাল্লা-র নিতম্ব দেখে খুশী হয়ে তাকে বহুৎ হীরা জহরৎ দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

সাগর আবদাল্লা এবার তার মেহমান ও দোস্ত মেছুয়া আবদাল্লা'কে নিয়ে পানির ওপরে উঠে এল। তার সাধ ছিল দোস্তকে মেহমান ক'রে দু'চারদিন নিজের গুহায় রেখে দেবে। লেকিন তার খানাপিনা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। সে যে তাদের মত কাঁচা মছলি খেয়ে পেট ভরাতে পারে না। দিন ভর উপোষ ক'রে দিন গুজরান ক'রে দিয়েছে। তাই অনন্যোপায় হয়ে তাকে তার মুলুকে, মিট্টির মুলুকে পৌঁছে দিয়ে যেতেই হ'ল। হীরা জহরতের টুকরিটি তার হাতে তুলে দিয়ে সাগর আবদাল্লা বিদায় নিল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচশ' ষোলতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন— 'জাঁহাপনা, মেছুয়া আবদাল্লা'কে মিট্টির মুলুকে পৌঁছে দিয়ে তার দোস্ত সাগর আবদাল্লা পানিতে ডুব দিল।

এদিকে সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর পেরিয়ে বিকেল তারপর বিকেল পেরিয়ে এক সময় প্রকৃতির কোলে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। লেকিন সুলতানের জামাতা, মেছুয়া আবদাল্লা-র ফেরার নাম গন্ধও নেই দেখে তিনি বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সুলতান তার নব নিযুক্ত উজির রুটিওয়ালা আবদাল্লা'কে তলব ক'রে ব্যাপারটি তার নজরে আনল। সে এবার কিছু সংখ্যক নফর নিয়ে সাগরের দিকে ছুটল। বেশীদূর যেতে হ'ল না তাকে। পথেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নফরের মাথায় জহরতের টুকরিটি চাপিয়ে দিয়ে মেছুয়া আবদাল্লা বল্ল— 'আরে ভাই, আজ এক তাজ্জব মুলুকে ঢুঁড়ে এলাম।'

—'আজব মুলুক? কোথায়, কোনদিকে তোমার সে আজব মুলুক দোস্ত?' রুটিওয়ালা আবদাল্লা বল্ল।

—'পানির মুলুক। আমার সাগর দোস্ত জোর ক'রে আমাকে নিয়ে গেল তার নিজের মুলুক দেখাতে।'

সুলতান তাঁর জামাতা মেছুয়া আবদাল্লা-র মুখে আজব মুলুকের কিস্‌সা শুনে এক দম তাজ্জব বনে গেলেন। তারপর দু-এক লহমা নীরবে ভেবে বল্লেন —'বেটা, তুমি যা-ই বল না কেন, কাজটি কিন্তু মোটেই ভাল কর নি। পানির মুলুক আমাদের পক্ষে একদম নিরাপদ নয়। সেখানে পায়ে পায়ে বিপদ ছড়িয়ে থাকে। আমি চাই, তুমি যেন ভবিষ্যতে আর কোনদিন এরকম দুঃসাহস না কর। ধন

দৌলতের চেয়ে জানের দাম বেশী, ইয়াদ রাখবে। আর ইজ্জতের ব্যাপারটিও তোমাকে জরুর ভাবতে হবে। তুমি আমার জামাতা। সব জায়গায় পয়দল যাতায়াত করলে ইজ্জত থাকে না। দরবারের সবাই, এমন কি প্রজারাও তোমাকে নিয়ে কানাকানি করছে, তামাশা দেখছে। তাই বলছি কি, যখন-তখন সমুদ্রের ধারে ছুটে যেয়ো না।'

সুলতানের হুকুম অমান্য করতে পারল না মেছুয়া আবদাল্লা। সে আর কোনদিন ভুলেও সমুদ্রের ধারে দোস্ত সাগর আবদাল্লা-র সাথে মোলাকাৎ করতে গেল না।

এদিকে সাগর আবদাল্লা রোজ সকালে হীরা-জহরতের টুকরি নিয়ে পানির ওপরে উঠে আসে। দোস্তের জন্য দীর্ঘ সময় অধীর প্রতীক্ষায় থাকে। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে। মিট্টির দুনিয়ার বিলকুল আদমিই বুঝি এরকম করে কসম খেয়ে তা অনায়াসে ভঙ্গ ক'রে থাকে।

কিস্‌সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। বাদশাহ শারিয়ার কিস্‌সা শুনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। সে সঙ্গে বহুৎ তারিফও করলেন।

দুনিয়াজাদ বেগমের গলা জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে গলা জড়িয়ে ধরে ব'লে উঠল— 'বহিনজী, তোমার কিস্‌সা শুনলে চোখের নিদ বিলকুল উবে যায়। আর একটি বড়িয়া কিস্‌সা শুরু কর। রাত তো এখনও ঢের বাকি রয়েছে।'

সফেদ নওজোয়ানের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা এবার 'নওজোয়ান পীতাম্বরের কিস্‌সা' নামে এক বড়িয়া কিস্‌সা আপনার দরবারে পেশ করছি। বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ এক গভীর রাত্রে তাঁর উজির অল ফজল, উজির জাফর, কবিবর আবু নবাস, আবু ইশাক, তার রক্ষী মাসরুর আর হাবিলদার আহমদ'কে সঙ্গে নিয়ে নগর পরিদর্শনে বেরোলেন। তার পরনে সওদাগরের ছদ্মবেশ।

প্রধান উজির জাফর-এর পরামর্শে এক সময় টাইগ্রিস নদীর ধার দিয়ে হাঁটাচলা ক'রে শরীর ও দিল একটু চাঙা করার আশা নিয়ে সেদিকেই সদলবলে এগিয়ে চল্‌লেন।

টাইগ্রিসের ধারে পৌঁছে খলিফা একটি নৌকা ভাড়া করে পানির বাতাস খাওয়ার জন্য সদলবলে তাতে চেপে বসলেন।

বুড়ো-মাঝি চাঁদনি রাতে ঝিরঝিরে বাতাসের মধ্যদিয়ে উদাস-ব্যাকুল সুরে গানা গাইতে গাইতে নৌকোটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

নদীর তীর ঘেঁষে নৌকাটি চলছে। এক সময় চাঁদের আলোয় এক বিশাল ইমারৎ বাদশাহের চোখের ওপর ঝলমলিয়ে উঠল। ইমারতটির খোলা জানালা দিয়ে গানার মিষ্টি মধুর সুর বেরিয়ে বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে খলিফার কানে এসে বাজতে লাগল। খলিফা আচমকা সোজা হয়ে বসে পড়লেন। দু'-এক লহমা উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সে সুরলহরী।

এক সময় খলিফা উজির জাফরকে বল্‌লেন— 'মাঝিকে বল নৌকো থামাতে। ওই ইমারতে যাওয়ার জন্য আমার দিল্ বড়ই চঞ্চল হচ্ছে।'

খলিফা সদলবলে ইমারতটির সদর-দরওয়াজায় হাজির হলেন। এক খোজা প্রহরী পথ আগলে দাঁড়াল।

জাফর এগিয়ে গিয়ে বল্‌লেন— 'আমরা পরদেশী। মুসাফির একটিমাত্র রাত্রের জন্য আশ্রয়প্রার্থী।'

তাদের দরওয়াজায় অপেক্ষা করতে বলে খোজা প্রহরীটি ভেতরে চলে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ইমারতটির মালিক এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ছদ্মবেশী খলিফা ও তাঁর দলবলকে উষ্ণ অভ্যর্থনাসহ ভেতরে নিয়ে গেল।

এক সুসজ্জিত কামরায় তাদের নিয়ে গিয়ে বসতে দিল।

মেহমানরা আসন গ্রহণ করলে ইমারতের মালিকটি বল্‌লেন —'জনাব, আপনাদের মধ্যে কার কি পরিচয়, কার কতখানি মান মর্যাদা আমার জানা নেই। তাই আমার চোখে আপনাদের সমান ইজ্জৎ-খাতির। মেহেরবানি করে আপনারা আসন গ্রহণ করুন। আর ফরমান দিন, কিভাবে সেবা করে আমি আপনাদের খুশী করতে পারি।

খলিফা কামরাটির চারদিকে কৌতূহলী চোখের মণি দুটো বুলাতে গিয়ে এক জায়গায় গিয়ে থমকে গেলেন। দেখলেন, একশ'টি খুবসুরৎ লেড়কি সারিবদ্ধভাবে কুরশিতে বসে। সবাই নওজোয়ান। ইমারতের মালিক ইঙ্গিত করতেই তারা কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ইমারতের মালিকটি এবার ইঙ্গিত করামাত্র কয়েকটি নফর রূপার রেকাবিতে হরেক কিসিমের মুখরোচক খানা নিয়ে কামরায় ঢুকল। মেহমানরা আহার সারলেন।

খানাপিনার পাট চুকে গেলে ইমারতের মালিক করজোড়ে বল্‌লেন— 'আপনারা আমার মেহমান। ফরমান করুন আমি কিভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি?'

জাফর বললেন— 'জী, আমরা যখন নৌকায় বসে তখন মনমৌজী গানার লহরী কানে যাচ্ছিল। যদি আপত্তি না থাকে তবে মেহেরবানি করে একবার সে গানা শোনানোর বন্দোবস্ত করুন।'

ঘরে একটি পর্দা ঝুলছিল। এক নফর সেটি সরিয়ে দিতেই ইমারতের মালিকের খুবসুরৎ বিবি দৃশ্যমান হ'ল। সে এক মনলোভা ভঙ্গিতে বসে গানা ধরল। কী অপূর্ব তার গানার সুর,

তাল, ছন্দ! আর কী সুরেলা তার কণ্ঠ যা শোনামাত্র খলিফার কলিজা উথালি পাথালি করতে লাগল। তিনি আবেগের সঙ্গে আবু ইশাক-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে 'এমন বড়িয়া গানা জিন্দেগীতে কোনদিন শুনিনি! ইয়া খোদা! কী বড়িয়া এর কণ্ঠ। খলিফা এবার ইমারতের মালিকটির দিকে ফিরে আবেগের সঙ্গে বল্লেন— 'মালুম হচ্ছে, গায়িকা তার মেহবুবের বিরহে বিলকুল কাতর হয়ে পড়েছেন। তারই করুণ আর্তনাদ গানার কথা আর সুরের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।'

—'জী, আপনার অনুমান ভ্রান্ত। তবে এ-বাৎ জরুর ঠিক তার আম্মা আর আব্বার বিরহে এ কাতরা। যখনই তাদের স্মৃতি তার দিলের ওপর ক্রিয়া করে তখনই সে এমন বিরহের গানায় দিল্ উজাড় করে ঢেলে দেয়।

খলিফা ইতিপূর্বে ইমারতের মালিকটির দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকান। এবার লক্ষ্য করলেন সে নওজোয়ান। খুবসুরৎ। লেকিন মুখে তার তিলমাত্রও হাসির ছোপ নেই। মুখ ফ্যাকাসে। চকের মাফিক সফেদ।

খলিফা আমতা আমতা ক'রে বল্লেন—'যদি মেহেরবানি ক'রে কসুর না মানেন তবে একটি বাৎ জিজ্ঞেস করছি—আপনার মুখের ওই সফেদ দাগ কি জন্মগত, না কি অন্য কোন কারণ এর পিছনে জড়িত রয়েছে?'

—'আপনারা আমার মেহমান। আপনাদের যেকোন কৌতূহল নিবৃত্ত করা আমার কর্তব্যের আওতায় পড়ে। আর বলতে কিছুমাত্র আপত্তিও আমার দিক থেকে নেই।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে নওজোয়ানটি ফিন মুখ খুল্লেন— 'জী, আমার মুখ এমন সফেদ হওয়ার কাহিনী বড়ই আজব। সে কাহিনী আপনাকে বিলকুল খোলসা করে বলছি—আমি পয়দা হয়েছিলাম উমান মুলুকে। আমার আব্বাজী উমান নগরের এক প্রখ্যাত বণিক ছিলেন। জাহাজের কারবারী। ত্রিশ-ত্রিশটি জাহাজের মালিক। হর সাল ত্রিশ হাজার দিনার তার আমদানি ছিল। তিনি লিখাপড়াও ভালই জানতেন। তাই আমাকেও নিজের মনের মত শিক্ষিত ক'রে তুলেছিলেন।

একদিন কিছু মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমার আব্বাজী দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে চলে গেলেন।

সাচ্চা বলতে কি, আমার আব্বাজী আমার জন্য ধন দৌলতের পাহাড় রেখে গিয়েছিলেন।

একদিন আমি ইয়ার দোস্তদের নিয়ে একটু ফূর্তিফার্তা করছিলাম। এমন সময়ে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন সেখানে হাজির হলেন। তার সঙ্গে এক ঝুড়ি ফল। ফলগুলো দেখে আমার দিল একদম নেচে উঠল। আমি তাকে পুরো এক শ' দিনার বকসিস

দিলাম।

আমি কথা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ক্যাপ্টেন সাহাব, এতো দেখছি বিলকুল অসময়ের ফল। এখন আমাদের মুলুকে এসব ফল তো মেলে না। কোত্থেকে আমদানি করেছেন?'

—'বসরাহ ও বাগদাদের হাট থেকে খরিদ করে নিয়ে এলাম।'

আমার এক দোস্ত বসরাহ আর বাগদাদের নাম শোনামাত্র সে-মুলুকের প্রশংসায় একদম পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। তার কথা শুনে বসরাহ ও বাগদাদ মুলুকটিকে একটিবার চাক্ষুষ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়লাম।

ব্যস, আর দেরী নয়। বাগদাদ নগরীতে পাড়ি দেবার জন্য আমি তৈরী হতে লাগলাম। আমার যা কিছু সম্পত্তি ছিল বিলকুল একদম পানির সাথে বেচেছিলাম। এখন নফর বাঁদী যা ছিল বিলকুল বেচে একদম খালি হাত-পা হয়ে গেলাম। তবে হ্যাঁ একটিমাত্র জাহাজ নিজের দরকারের জন্য রেখে দিতেই হ'ল। আর মণি মুক্তা ও সোনাদানা রেখে দিলাম।

আমার জাহাজ নোঙর তুল্ল। পৌঁছলাম বসরাহ বন্দরে। সেখান থেকে ডিঙি নৌকো নিয়ে হাজির হলাম বাগদাদের ঘাটে।

বাগদাদের কারম্ অঞ্চলে একটি ইমারত ভাড়া করলাম। এখানে বাগদাদের আমীর-ওমরাহ ও ধনী আদমিরা বাস করেন।

সেদিন ছিল জুম্মাবার। আমি এখানে একদম নয়া এসেছি। তাই কৌতূহলী দিল্ নিয়ে পথে পথে ঢুঁড়ে সমৃদ্ধ নগরটিকে দেখতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় টাইগ্রিস নদীর ধারে হাজির হলাম। দেখলাম এক ইমারতের বারান্দায় এক বুড্ডা কতগুলো বালবাচ্চা নিয়ে বসে। একদম বুড্ডা। চুল-দাড়ি বিলকুল সফেদ। পরে জানতে পেরেছিলাম তাঁর নাম তাহির ইবন অল আলা, তিনি তাকে ঘিরে বসা বালবাচ্চাদের কিস্সা শোনাচ্ছেন। গুঁড়া বাচ্চাদের তিনি বহুৎ পেয়ার করেন। তারা তাঁকে 'কিস্সা বুড্ডা'। ব'লে সম্বোধন করে।

আমি কৌতূহলের শিকার হয়ে এক পা দু'পা করে বুড্ডার দিকে এগিয়ে অদূরে খাড়া হয়ে তার কিস্সা শুনতে লাগলাম। তার কিস্সা শুনে আমি স্বগতোক্তি করলাম— 'নসীবের জোরেই এমন কিস্সা শোনা সম্ভব হ'ল। বাগদাদে আসা বিলকুল সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

বুড্ডা কিস্সা শেষ ক'রে আমাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। আসন পেতে বসতে দিলেন। আমি তাকে সালাম জানিয়ে আসন গ্রহণ করলাম। বল্লাম—জী, আজ রাত্রিটুকু আপনার এখানে থেকে আলাপ পরিচয় করতে চাই। যদি মেহেরবানি করে—'

—'বহুৎ আচ্ছা বেটা। বহুৎ আচ্ছা বাৎ! খানাপিনা সেরে এখানেই রাত্রি গুজরান কর। আমার জিম্মায় খুবসুরৎ বহুৎ বাঁদী আছে। এমন কি এক শ' দিনারের লেড়কি চান, তা-ও মিলবে।'

—'বহুৎ সুক্রিয়া। আমাকে একটি দশ দিনার দামের বাঁদী দেবেন। ব্যস, তাতেই চলে যাবে। তিনশ' দিনার বুড্ডাটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লাম—'এক মাহিনার দাম আগাম দিচ্ছি, রেখে দিন।'

বুড্ডা এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফোকলা মুখে হেসে বল্ল—'ভাই সাহাব, আমার সঙ্গে চল।' সে আমাকে সঙ্গে ক'রে একটি কামরায় নিয়ে গেল।

দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে কামরায় উঁকি দিয়ে দেখি পালঙ্কের ওপর এক খুবসুরৎ লেড়কি বিচিত্র ভঙ্গিতে বসে। বুড্ডাটি আমাকে দেখিয়ে বল্ল—'তোমার নয়া নাগর, কাছে ডেকে নাও।'

খুবসুরৎ লেড়কিটি পালঙ্ক থেকে নেমে আমায় দিকে এগিয়ে এল। ঠোঁটের কোণে কলিজা অস্থিরকরা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসাল। নিজে বসল আমার একদম গা-ঘেঁষে।

লেড়কিটি শরাবের পেয়ালা ভরে আমার মুখের সামনে ধরল। আমি পেয়ালাটিতে ঠোঁট লাগালাম।

লেড়কিটি পরনে কামিজ বলতে ছিল একদম পাৎলা কাপড়ার তৈরী একটিমাত্র সেমিজ। আদতে সেটি থাকা আর না থাকা দু'-ই সমান। ব্যস, আর কিছুই নয়। আমি শরাবের খালি পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিয়ে তার তুলতুলে রক্তিম গালে আঙুল দিয়ে ছোট্ট ক'রে একটি টোকা দিলাম। সে আবেগে উচ্ছ্বাসে খিল খিল ক'রে হেসে আমার কোলে লুটিয়ে পড়ল, আমি দু'বাহুর বেষ্টনে তাকে বন্দী করে ফেল্লাম। রাতভর খুসবুওয়ালা গুলাবী শরাব আর তন্বী যুবতীর দেহ সুধা পান করলাম। ভোরে খুশীর জোয়ারে দোল খেতে খেতে পালঙ্ক থেকে নামলাম।

কেবল মাত্র একটি রাত্রিই নয়। এক দুই-তিন ক'রে পরপর ত্রিশটি রাত্রি সে খুবসুরৎ তন্বী নিজেকে উজাড় করে আমাকে দেহসুধা দান ক'রে বিলকুল তৃপ্ত করল, পরিপূর্ণ ক'রে তুল্ল আমার দিল্। লেকিন আমার মালুম হ'ল, আমি বুঝি কেবলমাত্র একটি রাত্রিই তার সঙ্গসুখ লাভ করেছি। আমি ত্রিশটি রাত্রি সে লেড়কিটির সঙ্গসুখ লাভ করার পরই এক নফর আমাকে নিয়ে সে বুড্ডার সামনে হাজির করল।

আমি খুশীতে ডগমগ হয়ে বল্লাম—'জী, লেড়কিটি বহুৎ আরাম-সুখ দিয়েছে। এবার মেহেরবানি ক'রে বিশ দিনারের একটি লেড়কির বন্দোবস্ত করে দিন।' আমি কোর্তায় জেব থেকে ছ'শ' দিনার বের ক'রে বুড্ডার হাতে দিলাম।

বুড্ডার নির্দেশে এক লেড়কা আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে একটি কামরার দরওয়াজায় ছেড়ে দিল।

কামরার ঠিক কেন্দ্রস্থলে বহুমূল্য মখমলের চাদর বিছানো একটি পালঙ্ক। পালঙ্কের চার কোণে চারটি বাঁদী খাড়া রয়েছে। আমাকে দেখেই তারা ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এল। অভ্যর্থনা করে কামরার ভেতরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কটির ওপর বসতে দিল। ব্যস, পরমুহূর্তেই তারা কামরা ছেড়ে চলে গেল।

কয়েক লহমার মধ্যেই এক খুবসুরৎ খ্রীস্টান লেড়কি এসে আমার মুখোমুখি খাড়া হ'ল। রক্তিম ঠোঁট দুটোর কোণে হাসির ছোপ। আগের সে লেড়কিটি থেকে এর সুরৎ অনেকাংশে লোভনীয় অস্বীকার করার জো নেই।

আমি তাকে দেখেই পালঙ্ক থেকে তড়াক ক'রে লাফিয়ে মেঝের ওপর খুবসুরৎ লেড়কিটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লাম। সে আলতো ক'রে আমার একটি হাত ধরল। বিলকুল অকল্পনীয় ভঙ্গিতে হেসে বল্ল— 'মিঞা, এমন সুরৎ তোমার, ভাড়া করা লেড়কির দরওয়াজায় আসতে হ'ল যে।' সে আমাকে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসাল। আমি নির্নিমেষ নজরে তার মুখের দিকে

চেয়ে রইলাম। সে শরাবের পেয়ালা আমার হাতে তুলে দিল। আমি এক চুমুকে শরাবটুকু গলায় চালান ক'রে দিয়ে ফিন তার মুখের ওপর রাখলাম। আমার কলিজা ইতিমধ্যেই নাচানাচি দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। আর খুনে বিলকুল মতন লেগে গেছে।

আমি খুবসুরৎ সে-খ্রীস্টান লেড়কিটিকে নিয়ে শুয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই যেন বেহেস্তে পাড়ি জামালাম।

আমার দিল্ বিলকুল ভরে গেল। হ্যাঁ, সুখ কানায় কানায় ভরে গিয়ে একদম উপচে পড়তে লাগল। এক সময় আমার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল-'ইয়া আল্লা! তোমার দুনিয়ায় এত সুখ আছে আগে জানা ছিল না। আদতে আমার সুখের শতকরা একশ' ভাগের জন্যই তার কৃতিত্ব। কি করলে মরদদের ভাল লাগে তা এর চেয়ে ভাল বোধ করি অন্য কোন লেড়কিরই জানা নেই।

পুরো একটি মাস যে কি করে কেটে গেল, মালুমই হ'ল না। এক বাঁদী আমাকে নিয়ে সে বুড্ডার সামনে দাঁড় করাল। আমি আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে তাকে বল্লাম—'জী, আরাম পেলাম বটে! মন চাইছে কি, জিন্দেগীর বাকী দিনগুলো তাকে জড়িয়েই পড়ে থাকি। আহা। বহুৎ আরাম! বহুৎ সুখ পেলাম।'

—'এতো বহুৎ খুশীর ব্যাপার। এক বাৎ, আজ রাত্রে এ-প্রাসাদে এক উৎসবের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আপনি হাজির থাকুন, খুশী হবেন।'

একটি পর্দা ঝুলিয়ে ছাদটিকে দু'ভাগ করে নেয়া হয়েছে। পর্দার বিপরীত দিকে দেখলাম এক নওজোয়ান আর এক তন্বী লেড়কি একদম আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে শুয়ে। আপন ভাবে বিভোর। দুনিয়ার কোনদিকে কিছুমাত্রও খেয়াল নেই কারোরই। আদতে পর্দাটি জালের মতই পাৎলা ছিল ব'লে ওধারের সবকিছু বিলকুল নজরে এল। কোন লেড়কির এমন অতুলনীয় সুরৎ হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। আমার শরীরের সবক'টি স্নায়ু এক সঙ্গে ঝন ঝনিয়ে উঠল। মাথার ভেতরে ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। তার খুনে লেগে গেল মাতন। আমার মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল। ব্যস্ত পায়ে যে লেড়কিটির কামরায় এক মাহিনা কাটিয়েছিলাম তার কামরায় হাজির হলাম। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম তাকে, পর্দার ওধারে যাকে দেখলাম কে সে?'

লেড়কিটি ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্ল—'কি গো, খুবই চোখে লেগে গেছে বুঝি? আমাদের শিরোমণি। কতসব সুলতান, বাদশাহ আর শাহজাদা তার সুরতের আগুনে জ্বলে পুড়ে সাঁফ হয়ে গেছে। তোমারও কি জাহান্নামে যাওয়ার শখ হয়েছে বুঝি?'

—'তাকে বুকে পেলে জাহান্নামে যেতেও রাজী আছি।'

—'তার এক রাত্রের দাম পুরো পাঁচ শ' দিনার, ইয়াদ রেখো।'

—'ধুৎ! পাঁচ শ' দিনার আবার এমন কি ব্যাপার!'

ঠোঁট বাঁকিয়ে লেড়কিটি বল্ল—'মালুম হচ্ছে, ওর সুরৎ দেখে দিমাক বিলকুল ঘুরে গেছে সাহাব। বহুৎ আচ্ছা, কাল সন্ধ্যায় পাঁচ শ' দিনার নিয়ে তৈরী থেকো, সে তোমার অঙ্কশায়িনী হবে।'

পরদিন সন্ধ্যায় আমি ঝলমলে কোর্তা-পাৎলুম গায়ে চাপিয়ে বিলকুল শাহজাদাদের মেজাজ নিয়ে বুড্ডার সামনে হাজির হলাম। ঝপ্ করে একটি দিনারের থলি তার সামনে রেখে বল্লাম, পাক্কা পনের হাজার আছে। এক মাহিনার ভাড়া আগাম দিয়ে দিলাম।

বুড্ডাটি আড়চোখে পিটপিট করে আমার মুখের দিকে এক লহমায় তাকিয়ে নিয়ে দিনারের থলিটিকে হাতে তুলে ওজন সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেয়ার কোশিস করল।

দু'জন বাঁদী আমাকে সঙ্গে ক'রে একটি কামরার দরওয়াজায় হাজির হ'ল। পর্দা সরিয়ে আমাকে কামরার ভেতরে নিয়ে গেল।

কামরার একধারে মখমলের চাঁদর বিছানো সোনার পালঙ্কের ওপর মনলোভা এক ভঙ্গিতে সে বসেছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি স্থবিরের মাফিক দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের পলক ফেলতেও ভরসা হচ্ছিল না, যদি দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে যায়।

বেহেস্তের হুরী-পরীদের সৃষ্টি করে অবশিষ্ট সুরৎটুকু নিয়ে এসে যেন লেড়কিটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। লেড়কিটির সুরৎ এমন হতে পারে আমার অন্ততঃ জানাই ছিল না।

লেড়কির বাৎ কানে যেতে আমি যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। সে অনন্য এক হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে এঁকে বলল—'হুজুর, আসুন, এগিয়ে এসে পালঙ্কের ওপরে বসুন। আমি যে আপনার প্রতীক্ষায়ই প্রহর গুণে চলেছি।' হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক গুটি গুটি তার দিকে এগিয়ে গেলাম, ধপাস্ ক'রে পালঙ্কের ওপর বসে পড়লাম।

সে কিন্নর কণ্ঠে গানা ধরল। বেহেস্তের হুরীরা ছাড়া এরকম মিঠা সুরে গানা গাইতে পারে ব'লে মালুম ছিল না আমার।

শিরা-উপশিরায় গানা সে-সুর বলে চল্‌ল। কলিজায় গাঁথা হয়ে গেল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে বুঝতে পেরে বেগম শাহারাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' একুশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সফেদ নওজোয়ানটি তার কিস্‌সা ব'লে চলেছে—জী, এক মাহিনা যে কি ক'রে কেটে গেল মালুমই হ'ল না। আচ্ছা খুসবুওয়ালা গুলাবী শরাব, নাকি খুব সুরৎ সে-লেড়কির নেশায় ডুবে থেকে আমি পুরো একটি মাহিনা গুজরান ক'রে দিয়েছিলাম আজ আর তা আপনাকে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না।

এক সকালে এক নফর আমাকে বুড্ডাটির সামনে হাজির করল। বুড্ডাটি বল্‌ল—'মিঞা, এক মাহিনা আজ পুরো হয়ে গেল।'

তার বাৎ শুনে আমার মাথায় আশমান ভেঙে পড়ার জোগাড় হ'ল। একদম সাচ্চা বাৎ, যেন একদম আশমান থেকে পড়লাম। আর্তনাদ ক'রে উঠলাম—সে কি সাহাব, আমার যে তার কাছ থেকে এখনও সব কিছু পাওয়া হয় নি! যেটুকু পেয়েছি তাতে একদম দিল্ ভরে নি।'

বুড্ডাটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি ব'লে চল্‌লাম—'জী, মেহেরবানি করে আরও কিছুদিন তার সঙ্গে কাটানোর বন্দোবস্ত করে দিন। নইলে আমার কলিজা একদম ঠাণ্ডা হবে না।'

বুড্ডাটি তোবড়ানো গালে হাসি ফুটিয়ে বল্‌ল—'এ তো বহুৎ আচ্ছা বাৎ। লেকিন, মিঞা, তার দাম যে আগাম দিতে হবে।'

—'জরুর। আমি মকানে গিয়ে আপনার হিসাব মাফিক দিনার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বুড্ডাটি নীরবে হাসল।

আমি আরও পনের হাজার দিনার এনে তার হাতে জমা দিলাম।

ঠিক এক মাহিনা বাদে নফরটি ফিন আমাকে বুড্ডাটির সামনে হাজির করল।

আমি আরও পনের হাজার দিনারের থলে এনে তার হাতে জমা দিলাম। আগামী এক মাহিনার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। এ ছাড়া আমার একদম উপায় ছিল না। আদতে আমার খুনে তখন বিলকুল মাতন লেগে গেছে। তার সুরতের নেশায় একদম মাতোয়ারা।

একের পর এক মাহিনা আমি কাটিয়ে দিতে লাগলাম সে-লেড়কিটিকে বুকে জড়িয়ে রেখে।

এবার পড়লাম বিপাকে। উমান থেকে সম্পত্তি বেচে যা কিছু নিয়ে এসেছিলাম বিলকুল খতম হয়ে গেল। এবার আমার চোখের পানি ঝরানো ছাড়া উপায় রইল না।

আমার হালৎ দেখে লেড়কিটি কৌতূহলাপন্না হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'মিঞা, তোমার হয়েছে কি? মুখের হাসি নির্বাসিত। চোখে পানি, ব্যাপার কি, বল তো?'

আমি আর নিজেকে সামাল দিতে পারলাম না, দু'হাতে মুখ ঢেকে গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠলাম—'আমার জেব একদম ফাঁকা। আজ আমি পথের ভিখমাঙ্গার সমান হয়ে গেছি। আমি যে সর্বস্ব খুইয়েছি তার জন্য দুঃখ নাই। লেকিন আপশোষ একটিই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। তোমাকে না দেখে আমার জান রাখা যে দায় হয়ে দাঁড়াবে সুন্দরী।'

লেড়কিটি আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সমবেদনার স্বরে বল্‌ল—'শোন, এর আগেও তোমার মাফিকই এক খদ্দেরের জেব একদম ফাঁকা হয়ে যায়। আমার জন্য তার বিলকুল সম্পত্তি খতম হয়ে গিয়েছিল। আমার আব্বার দিল্ উদার। তাকে বাড়তি তিন দিন আমাকে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমার ব্যাপারেও জরুর বিবেচনা করবেন। এক বাৎ, মেহবুব, তুমি যেমন আমাকে দূরে রাখতে পারবে না তেমনি আমার পক্ষেও তোমাকে না দেখে একদম থাকা সম্ভব নয়।'

চরমতম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও আমার বুকে খুশীর জোয়ার খেলে গেল।

সে এবার বল্‌ল—'আমি ভেবে দেখি কোন একটি কায়দা-কৌশল যদি বের করতে পারি। তুমি এ নিয়ে দিমাক গরম কোরো না। জরুরৎ হলে আমার জিন্দেগীর বন্দোবস্ত আমি নিজের হাতেই তুলে নেব। আমার উমর হয়েছে। নিজের আচ্ছা-বুড়া বিলকুল বিবেচনা করার জ্ঞান-বুদ্ধিও হয়েছে। আমার ইচ্ছায় বাধা দেয়ার হিম্মৎ কারো নেই।'

লেড়কিটি এবার কামিজের ভেতর থেকে পাঁচ শ' দিনারের

ছোট্ট একটি পুঁটুলি বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এগুলো আমার আব্বাজানের হাতে দিয়ে তাকে জানাও আজ থেকে রোজ একদিনার ক'রে ভাড়া মিটিয়ে দেব। আজ তুমি তার হাতে জমা দেবে। পরদিন সে দিনারগুলোই ফিন আমার হাতে জমা দেবে। পরদিন সে দিনারগুলিই ফিন তার হাতে জমা দেবে। এভাবে দেয়া-নেয়া চল্‌লে আব্বাজীর হিম্মৎ কি আদৎ ব্যাপার ধরতে পারেন।

লেড়কিটির বহুৎ বড়িয়া এ-মতলবটিকে কাজে লাগিয়ে পুরো একটি মাস আমি বুড়াকে ধোঁকা দিয়ে কাটিয়ে দিলাম।

নসীব। হ্যাঁ। নসীব সর্বত্র কাফির হয়। আমার নসীবও এক সময় বিলকুল বিগড়ে গেল। লেড়কিটি এক বাঁদীকে একদিন এক চড় মেরে বসল। ব্যস, তাতেই আমার কপাল পুড়ে গেল। সে গোস্‌সায় ফুঁসতে ফুঁসতে বুড্ডোর কাছে গিয়ে আমাদের ফন্দি-ফিকিরের ব্যাপারটি ফাঁস করে দিল।

বুড্ডাটি তো আমার ওপর গোস্‌সায় একদম ফেটে পড়ার জোগাড়। ঠগ, জোচ্চর, ধাপ্পাবাজ—আরও হরেক কিসিমের বাছা বাছা শব্দ ব্যবহার করে আমাকে আপ্যায়ন করল। গোস্‌সায় কাঁপতে কাঁপতে বল্‌ল—'কোন খদ্দেরের জেব ফাঁকা হয়ে গেলে আমি তাকে মাগনা তিন দিন আমার বেটির সঙ্গে কাটাতে দিয়ে থাকি। আর আপনি কি না ধাপ্পা দিয়ে পুরো একটি সাল গুজরান করে দিলেন। এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ। এক্ষুণি এখান থেকে সটকে পড়ুন। না, কেবল এখান থেকেই নয়, একদম বাগদাদের সীমানার বাইরে চলে যেতে হবে। আমার বাৎ না মানলে কাল ভোরেই আপনার লাস শেয়াল, কুত্তা নয়তো গিধ্বরে ছিঁড়েফেঁড়ে খাবে, ইয়াদ রাখবেন, বুড্ডাটি কথা বলতে বলতে জেব থেকে দশটি দিরহাম বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

উমানের নামকরা বণিকের লেড়কা আমি। দিনারের পাহাড়ে একদিন বসে থাকতাম। আজ একদম পথের ভিখমাঙ্গা বনে গেছি। কি ক'রে খানাপিনার বন্দোবস্ত করব, কোথায় রাত্রি গুজরান করব কোন ঠিকঠিকানাই রইল না।

এক দুপুরে পেটে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে বসরাহের বাজারে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছিলাম। ধান্দা একটি-ই, যদি কেউ মেরেহবানি ক'রে একটু-আধটু খানা দিয়ে আমার জান বাঁচায়।

আচমকা পিছন থেকে আমার কোর্তায় টান লাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, উমানের এক বণিক। আমার আব্বার অধীনে নোকরি করত। এখন সওদাগরী কারবারে দিনারের পাহাড় গড়ে তুলেছে। নিজেই এখন কারবার করে। বহুৎ কর্মচারী খাটায়।

আমি প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেই আমার সুখ-দুঃখের কিস্‌সা বিলকুল খোলসা ক'রে তার কাছে পেশ করলাম।

আমার বিশ-ত্রিশটি জাহাজ ও বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করা অর্থ বিলকুল বুড্ডাটির হাতে তুলে দিয়ে আমি যে আজ ভিখমাঙ্গাতে পরিণত হয়েছি—কিছুই তার কাছে ছিপালাম না।

সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'জনাব, চোখের পানি ঝরিয়ে কোনই ফয়দা হবে না। কর্মফল। কর্মফল ভোগ তো করতেই হবে। পিছনের দিকে তাকানো বিলকুল বোকামি। সামনে পা বাড়াতে হবে। বুকভরা সাহস আর ধৈর্য নিয়ে দুঃখ দুর্দশার মোকাবেলা করতে হবে। ধান্দা করতে হবে জান টিকিয়ে রাখার। যদি কিছু মনে না করেন তবে এক ফিকির বাতাতে পারি। যতদিন না নতুন কোন ফিকির বের করতে পারেন ততদিন আমার গদিতে বসুন। খানাপিনা ছাড়াও নগদ কিছু কিছু জরুর দেব। একে মাহিনা মনে করে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমার কারবার দেখভাল করবেন, আপনার ইজ্জতের সাধ্যমত আমি কিছু দেব।'

খুশিভরা দিল্ নিয়ে তার কাছ থেকে ফিরলাম। আমার-মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—'খোদা মেহেরবান। দুনিয়ায় এখনও তবে দু'-চারজন আচ্ছা আদমি আছে যারা কৃতজ্ঞতা জানাতে ছুটে আসে।

আমি বসরাহ বাজারে একটি সাল গুজরান ক'রে দিলাম। আমার জেবে এক শ' দিনার জমা হয়েছে। মতলব আটলাম, তা দিয়ে এবার নিজে একটি কারবার ফাঁদব।

ব্যস, আর দেরী নয়। বাগদাদের জাহাজে উঠলাম। আমি আমার অতীত ও বর্তমানের ভাবনায় ডুবে রইলাম। এক সময় চিল্লা-চিল্লি শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। দেখি, একদল বণিক এক বণিকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কৌতূহল হ'ল। ঝট ক'রে উঠে সেখানে যেতেই আমার চক্ষু একদম স্থির। দেখলাম বণিকটির সামনে একটি পোটলা খোলা তাতে কিছু মণি মুক্তা। জহরতের কারবারী। বন্দরে বন্দরে ঢুঁড়ে হীরা-জহরৎ বিক্রি করে ফিরছে। একটি আর বিক্রি ক'রে উঠতে পারে নি। খুব সস্তায় এগুলো বেচে দেবে। অন্য বণিকরা বুঝছে, জহরতের কারবারী বে-কায়দায় পড়েছে। একটু চাপাচাপি করতে পারলে একদম পানির জলে মিলে যেতে পারবে। তাই তারা ভাবে-ভঙ্গিতে কৃত্রিম অনাগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। তাদের ফন্দিই হয়ত বাস্তব রূপ নিত।

হীরা-জহরতের মালিক আচমকা ঘাড় ঘোরাতেই আমার দিকে নজর গেল। সোল্লাসে ব'লে উঠল—'জী, আপনার আব্বাজী উমানের বণিক ছিলেন, ঠিক কিনা? তিনি বহুৎ বড়া কারবারী ছিলেন। তার কাছে বহুৎ হীরা-জহরৎ বেচেছি। জী, আপনার এসব জহরৎ পছন্দ্?'

আমি মুখ ব্যাজার ক'রে জবাব দিলাম—'পছন্দ্ হলেও তো আমি কিনতে পারছি না। আমার জেবে মাত্র এক শ'টি দিনার আছে সম্বল বা মূলধন যা-ই বলুন না কেন আজ এটুকুই আছে।'

সে আমার দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌ল—'সে কী, আপনার এতবড় কারবার, কি ক'রে বরবাদ হ'ল!

—'সে কিস্‌সা বহুৎ বড়া। এক জাহাজ আদমির সামনে বলা সম্ভব নয়। ফয়দাই বা কি, বলুন?'

—'জী, এক সময় আপনার আব্বাজীর পয়সা আমার জেবেও কম আসে নি। যদি কিছু মনে না করেন তবে এসব হীরা-জহরৎ আপনার কাছেই রাখুন। নসীবে থাকলে এ দিয়েই কিছু কামাই ক'রে নিতে পারবেন।'

আমি প্রবল আপত্তি করলাম—'দাম না দিয়ে আমার পক্ষে এগুলো নেয়া সম্ভব নয়। আবার দামও আমার কাছে নেই।'

—'আমি যদি এক শত দিনারের বিনিময়ে এগুলো বেচি তবে তো আর আপত্তির কোন কারণই থাকতে পারে না, কি বলেন।'

আমার ভেতরে একটি ব্যাপার খচ খচ করতে লাগল, বণিকটি আমাকে দোয়া করছেন। লেকিন আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে জোর ক'রে হীরা জহরতের পুটুলিটি আমার হাতে গুঁজে দিল।

আমি অনন্যোপায় হয়েই সেগুলো কোর্তার জেবে চালান ক'রে দিলাম।

এবার থেকে আমার নসীবের চাকা ঘুরে চল্‌ল। বাগদাদে পৌঁছে হীরা-জহরতগুলির কয়েকটি বেচে বেশ কিছু দিনার কমিয়ে নিতে পারলাম।

পুঁটুলিটির ভেতরে আজব একটি বস্তু ছিল। দরিয়ার কোন কোন ছোটখাটো প্রাণী হবে হয়ত। একদম টকটকে লাল। দুটো পা, দুটো চোখও আছে। বাজারে অনেককেই খুলে দেখালাম। কেউ কেনার আগ্রহ দেখাল না। বস্তুটি যে কি তা-ও কেউ বলতে পারল না। বাধ্য হয়ে দোকানের আলমারির কোণায় ফেলে রাখলাম।

একদিন এক ভিনদেশী বণিক আমার দোকানে এল। বাৎচিতের ফাঁকে আলমারির বস্তুটির দিকে নজর যেতেই সে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে চিল্লিয়ে উঠল—'খোদা ভরোসা, এতদিন বাদে তবে হদিস মিল্‌ল!

সে বস্তুটিকে হাতে নিয়ে বার কয়েক ফু দিয়ে বস্তুটির ওপরের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বল্‌ল—'জী, এর দাম কত নেবেন, ঠিক ক'রে বলুন?'

—'আপনিই বলুন কেন, কত দাম দিতে চাইছেন?'

—'পুরো বিশ দিনার দিচ্ছি, কি খুশী তো?'

বিশ দিনারের বাৎ শুনে গোস্‌সায় আমার বুকে জ্বালা ধরে গেল। ভাবলাম, সক্কাল বেলা ঝুটমট রসিকতায় লিপ্ত হয়েছে। বিরক্ত হয়ে বল্‌লাম—'খুব হয়েছে জী! গোস্‌সা করবেন না। আপনি বিদায় হতে পারেন। আমি এটা বেচতে চাই না।'

সে-আদমি ভাবল, আমি বোধ হয় দর বাড়াবার ধান্দায় তাকে পাত্তা দিলাম না।

সে এবার একলাফে একদম পঞ্চাশ দিনারে উঠে গেল।

সে যে আমার সঙ্গে মস্করায় লিপ্ত হয়েছে তা শুনে আমার আর কোন সন্দেহই রইল না। লেকিন গোস্‌সার বশে হয়ত অসঙ্গত কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই মুখে কলুপ এঁটে চুপচাপ অন্য-মনস্কভাবে বসে রইলাম।

সে পরদেশী বণিকটি এবার ঝপাং ক'রে হেঁকে দিল—'পুরো এক হাজার দিনার দিচ্ছি, খুশী তো?'

আমি পুরোদমে গোস্‌সা প্রকাশ ক'রে বল্‌লাম—'কেন ঝুটমুট ঝামেলা করছেন মিঞা। এ কি মস্করা করার সময়?'

সে আদমি একদম নাছোড়বান্দা। এঁটুলির মাফিক আমার পিছনে লেগে রইল। মুখ কাচুমাচু ক'রে এবার বল্‌ল—

'আপনিও তো ঝেড়ে কাশছেন না সাহাব। কত দাম পেলে মালটি ছাড়বেন, মুখফুটে বলবেন তো? কত বলুন, এক দু'হাজার, তিন হাজার, নাকি চার হাজার?'

আমি বিরক্তিতে একদম ছটফট করতে লাগলাম। আর কিছু বলার মত ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। তাই মুখে কলুপ এঁটে গুম্ হয়ে বসে রইলাম। দশ-পনের-বিশ হাজার দিনার হেঁকেই চল্‌ল। কাঁহাতক আর বরদাস্ত করা যায়!

সে আদমি এবার চিল্লিয়ে উঠল—'সাহাব, দিল খোলসা ক'রে বলুন তো, কোন্ ধান্দায় আছেন? আদতে বেচার দিল্ আছে, কিনা?'

চিল্লাচিল্লিতে আশেপাশের দোকানি ও বাজারের খরিদ্দাররা আমার দোকানের সামনে একদম মেলা বসিয়ে দিল।

সে আদমি সবাইকে সাক্ষী মেনে বলল—'দেখুন, আমি মালটি খরিদ করতে চাই। তিনিও বেচবেন স্বীকার করলেন। আদতে মুশকিল হ'ল—তিনি মুখফুটে দর বলছেন না। ফিন আমি দর হাঁকছি তাতেও কিছুই বলছেন না। খালি ঝুটমুট গোস্‌সা করছেন। আদৎ মতলব কিছুই বুঝছি না। কী আজব ব্যাপার আপনারাই বলুন?'

আমি আর তিষ্ঠোতে না পেরে মুখ খুল্‌লাম—'মিঞা, আপনি কি আদতেই এটি খরিদ করতে আগ্রহী, নাকি এভাবে মস্করাই করে যাবেন? আমি তো বেচার জন্যই দোকানে সাজিয়ে রেখেছি।'

—'তা-ই যদি হয় তবে আমার শেষ দর শুনুন—পুরো-পুরি ত্রিশ হাজার দিনার নগদ পাবেন।'

আমি সবাইকে লক্ষ্য ক'রে চিল্লিয়ে ওঠলাম—'আপনারা সাক্ষী রইলেন, ইনি ত্রিশ হাজার দিনার দিতে চেয়েছেন। আমি কিন্তু এতেই রাজী হয়ে যাব। পরে কিন্তু কোন ওজর আপত্তিই শুনব না, ইয়াদ থাকে যেন।'

আমি মুখ বন্ধ করতে না করতেই সে-আদমি একটি থলি টেনেহিঁচড়ে আমার সামনে হাজির করল। দাম বুঝে পেয়ে আমি আজব বস্তুটি তার হাতে তুলে দিলাম। উপস্থিত সবাই নিজের নিজের ধান্ধায় চলে গেল। সে আদমিটি ঠায় খাড়া রইল।

ভিড় পাৎলা হলে আমার পাশে এসে বসল। একদম মোলায়েম স্বরে বল্‌ল—'জী, এক বাৎ—আপনি জহুরীর কারবার করছেন বটে। লেকিন আদৎ জহরৎ চেনেন না। নইলে এমন একটি জহরৎ একদম পানির দামে বেচে দিলেন। সাত বাদশার ধন আপনার কাছে এসেছিল। হেলায় হারালেন। আদতে ত্রিশ হাজার তো সামান্য ব্যাপার ত্রিশ-লক্ষ দিনারের বিনিময়ে এটি খরিদ করা যায় না।

আমার মাথায় বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। আমি প্রতারিত হয়েছি ভাবতে গিয়েই এক লহমার মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। যখন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ খুল্‌লাম, দেখি আমার মুখের খুন নিঃশেষে শরীরের অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মুখ একদম সফেদ হয়ে গেছে। ব্যস, সেই থেকে আমার মুখে আর খুনের লেশমাত্রও রইল না। বিলকুল সফেদ হয়ে রইল।

আমি স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে সে-আদমিটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'মিঞা সাহাব, খোলসা করে বলুন তো, বস্তুটি আদতে কি? কোন মহৎ কাজই বা এটি দিয়ে সিদ্ধ হতে পারে বলে আপনি—'

—'শুনুন, ভারতেশ্বরের এক খুবসুরৎ লেড়কি রয়েছে। তামাম দুনিয়া জুড়ে তার সুরতের কথা জানে। সবার বিশ্বাস, তার সমান রূপসী তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও দ্বিতীয় আর একটি মিলবে না। সে দুরারোগ্য এক মাথার বিমারিতে দীর্ঘকাল ভুগছে। দুনিয়ার বহুৎ হেকিম-বৈদ্যকে দিয়ে তার ইলাজ করানো হয়েছে। লেকিন তার বিমারির আরাম হয় নি।

আমি ভারতেশ্বরের দরবারের এক পারিষদ। একরোজ আমি তাকে বল্‌লাম—'জাঁহাপনা, আপনার লেড়কির বিমারির ইলাজ করে আরাম এনে দিতে পারে এমন এক হেকিমের ব্যাপারে আমি জেনেছি। সাদ আলী তার নাম। তবে তাঁর ইলাজ বহুৎ ব্যয়সাপেক্ষ।'

সম্রাট বল্‌লেন—'তা হোক, আমার লেড়কির বিমারির আরাম হলে অর্থের জন্য পরোয়া কোরো না। যাও, তার তাল্লাশ কর। রাজকোষ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে যাও।'

ব্যস, ব্যাবিলনে আমি ধন্বন্তরী সাদ আলী-র সঙ্গে ভেট করলাম। তা শুনে তিনি বল্‌লেন,—'সম্রাটের লেড়কির বিমারি ও তার ইলাজের ব্যাপারে আমি সাত মাস ধরে চিন্তা-ভাবনা করব। তারপর দাওয়াইয়ের বন্দোবস্ত করব।'

আমি সাত মাস বাদে ফিন তার সঙ্গে ভেট করলাম। তিনি বিধান দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'দরিয়ার এক বিশেষ ঝিনুক জাতীয় প্রাণী এ বিমারির দাওয়াই। একটি ডিব্বা খুলে টকটকে লাল একটি বস্তু বের করে আমার চোখের সামনে ধরে বল্‌লেন—এ বস্তু তামাম দুনিয়ায় মাত্র কয়েকটি রয়েছে। ধন সম্পদ দিয়ে এর দাম শোধ করা চলে না। তবু বলছি, এক কোটি দিনারের বন্দোবস্ত ক'রে দাও, ইলাজ শুরু করি। সিদ্ধযোগী ধন্বন্তরীর মুখে বস্তুটির দাম শুনে আমি যেন একদম আশমান থেকে ধপাস ক'রে জমিনে পড়লাম। লেকিন সম্রাট তো হুকুম দিয়েই রেখেছেন অর্থের জন্য পরোয়া নেই, বিমারি সারলেই হ'ল।

ধন্বন্তরীর বিধান অনুযায়ী ঝিনুক জাতীয় বস্তুটিকে শাহজাদীর গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। আজব ব্যাপার। ভোজবাজীর মাফিক তার বিমারি সেরে গেল। যাকে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে রাখতে হ'ত সে দিব্যি হাসি-মস্করা, গানা-বাজনা নিয়ে মেতে গেল। ভারতেশ্বরের মুখে হাসি ফুটল। প্রজারাও সম্রাটের মুখের হাসি দেখে খুশী হ'ল।

লেকিন এক রোজ শাহজাদী তার সহচরীদের নিয়ে নৌকা

বিহারে বেরিয়ে নাচা-গানা করছিলেন। ব্যস, কখন যে সে অমূল্য সম্পদ দাওয়াইটি নদীর পানিতে পড়ে গেল তার মালুমই হয় নি। লেকিন সে-মুহূর্তে মাথার ঝিমঝিমানি শুরু হয়ে গেল। গলায় হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। ইয়া আল্লাহ, রক্ষা কর এটি! ব্যস, শাহজাদী ফিন বিমারিতে উন্মাদিনীর মাফিক বনে গেলেন। দিনারের পুঁটুলি নিয়ে ব্যবিলনে সে-ধন্বন্তরীর কাছে ছুটলাম। নসীব মন্দ, সাদ আলী ইতিমধ্যে বেহেস্তে পাড়ি দিয়েছেন। শুনে সম্রাটের মাথায় আশমান ভেঙে পড়ার জোগাড়। ঢালাও হুকুম দিলেন, দিনারের পুঁটুলি দিয়ে তামাম দুনিয়ায় আদমি পাঠাও, সে রক্ষাকবচ আমার চাই-ই চাই।

সম্রাটের দরবারের দশ পারিষদ দশদিকে দিনারের থলি নিয়ে ঢুঁড়তে লেগে গেলাম। আপনার দোকানে এসে আমি এটি আবিষ্কার করলাম। এ-পর্যন্ত বলে সে বিদায় নিল।

আমি সখেদে ব'লে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ!' আমি দোকানে পড়ে অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতে লাগালাম।

কারবারের ওপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। কারবার বিক্রিবাট্টা করে ফিন আমার মেহবুবার দরওয়াজায় হাজির হলাম। হালৎ দেখে আমার চক্ষু স্থির। তার সে সুরৎ একদম হাওয়া হয়ে গেছে। ইমারৎ-ও ভাঙতে শুরু করেছে। পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে। জানালা ভাঙা। কবুতর। চামচিকে আর ইঁদুর-ছুচোর আড্ডা হয়েছে প্রাসাদোপম ইমারতটির।

আমাকে দেখেই এক লেড়কা এসে সামনে দাঁড়াল। আমি ইমারতটির মালিক ও তার লেড়কিদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। সে জবাব দিতে গিয়ে বল্‌ল—'জী, উমান নামে এক বণিকের লেড়কা, তার নাম আবু হাসান। আমার বুড্ডা মালিকের লেড়কির তার সঙ্গে মহব্বৎ হয়েছিল। বুড্ডা তাদের মহব্বতের ব্যাপারে জানার পর হাসান মিঞাকে এখান থেকে ভাগিয়ে দিলেন। এ অবিচার খোদাতাল্লা বরদাস্ত করলেন না। হাসান মিঞা তার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি-বাট্টা করে এক লাখ দিনার নিয়ে এখানে এসেছিলেন। বুড্ডা তার বিলকুল দিনার ট্যাঁকে গুঁজে তাকে হটিয়ে দিলেন। ব্যস, বুড্ডার নসীবের চাকা দ্রুত ঘুরতে শুরু করল। সে লেড়কিটি বুড্ডার বিছানা আশ্রয় করলেন। এখানে যত লেড়কি কারবার চালিয়ে অর্থোপার্জন করত সবার কারবার বুড্ডা বন্ধ করে দিলেন। বুড্ডার সে-লেড়কি নাহানা আর খানাপিনা একদম পোড়াকাঠ হয়ে গেল। হাড্ডি-সার। বুড্ডা আব্বা বহুৎ বোঝালেন, লেড়কি পাত্তা দিল না। দরওয়াজা বন্ধ ক'রে কামরায় পড়ে রইলেন। বুড্ডার লেড়কিদের মধ্যে তাঁর সুরৎ-ই ছিল সবচেয়ে বড়িয়া। তাঁর সমান সুরৎ তামাম বাগদাদ নগরীতে কারোরই ছিল না। বাদশাহ, সুলতান, আমীর আর ওমরাহরা যখন জানতে পারল তিনি আর কামরায় কোন খদ্দেরকে নিচ্ছেন না তখন তারাও আর এ মুখো হওয়া বন্ধ করে দিল।

লেড়কির হালাৎ দেখে বুড্ডা কাহের সাহাব বিলকুল ভেঙে পড়লেন। চারদিকে আদমি পাঠিয়ে হাসান মিঞার তাল্লাশ চালালেন। বিলকুল বেকার হয়ে গেল। তাঁর পাত্তা মিল্‌ল না। তিনি কোথায় অভাবে পড়ে গোঙাচ্ছেন, কে বলতে পারে?

বুড্ডা কারবার বিলকুল বন্ধ করে দেন। এখন তিনি এ নগরেরই এক ধারে এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করছেন। আল্লাতাল্লা কবে কাছে টেনে নেবেন তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন।

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—'এক কাজ কর, তোমার মালিককে গিয়ে বল, হাসান সাহেব এসেছেন, তাঁর তাল্লাশ করছেন।

লেড়কাটি আমার বাৎ শুনে এক লহমায় আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে নিল। তারপর সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠল—'আপনি—আপনি সাহাব এসেছেন!' ব্যস ছুটতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ বাদে লেড়কাটি বুড্ডাটিকে এনে আমার সামনে হাজির করল। সাচ্চা বাৎ-ই বটে। বুড্ডার চেহারা একদম হাড্ডিসার। গায়ের চামড়া কুচকে পড়েছে। চোখের কোণে কালির ছোপ, মাথার চুল রুক্ষ-রুক্ষ। বুড্ডা আমাকে জড়িয়ে গলা ছেড়ে বিলাপ জুড়ে দিল।

তারপর কামরার ভেতরে গিয়ে একটি বস্তা টানাটানি করে আমার সামনে রেখে বলল—'সাহাব, তুমি যত দিনার দিয়েছিলে

বিলকুল এর মধ্যে জমা আছে। তোমার সম্পত্তি ফেরৎ নিয়ে আমাকে রেহাই দাও।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বলল—'পুরো দু'সাল আমার লেড়কি খানাপিনা ছেড়ে দেয়েছে। বেটা, তুমি তার জান বাঁচাও। আমি করজোড়ে তোমার মেহেরবানি প্রার্থনা করছি!'

আমাকে চোখের সামনে দেখেই আমার মেহেবুবা মাত্রাতিরিক্ত খুশী সইতে না পেরে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। দু'চোখের কোল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। আনন্দাশ্রু—বিলকুল খুশীর স্বাক্ষর।

আর দেরী করলাম না। সে রাত্রেই কাজীকে তলব করা হ'ল। শাদীনামা বানানো হয়ে গেল। সাক্ষী সাবুদ তাতে স্বাক্ষরও করলেন। আমাদের শাদী চুকে গেল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে বুঝতে পেরে বেগাম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' ছাব্বিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সফেদ নওজোয়ানটি তার কিস্সা ব'লে চলল—হ্যাঁ, মহাধুমধামের মধ্যে আমাদের শাদীর পাট চুকল, সে-বুড্ডা তাহির মিঞার লেড়কি আমার বিবি, আমার জিন্দেগীর এক মাত্র সাক্ষী বনে গেল। তাকে নিয়ে খুশীতে ঘর করছি। আমাদের মহব্বতের ফসল স্বরূপ এক লেড়কা পয়দা হ'ল। আমাদের খুশী উপছে পড়তে লাগল।

তার কিস্সা বলতে বলতে এবার পাশের ঘরে গিয়ে দশ সাল উমরের এক লেড়কাকে এনে খলিফার সামনে হাজির ক'রে বলল—'জী, এ-ই আমার একমাত্র বেটা। আমার বংশধর।'

খলিফা লেড়কাটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন। এবার তিনি সঙ্গীদের নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

পরদিন দরবারে হাজির হয়েই খলিফা তাঁর উজির জাফর'কে হুকুম করলেন—আবু অল হাসানকে আমার সামনে হাজির কর। আর সাল ভর বসরাহ, বাগদাদ আর খুরামন থেকে যত কিছু মণি-মুক্তা, হীর-জহরৎ ভেট এসেছে বিলকুল আমার সামনে হাজির কর।

খলিফার হুকুমে উজির খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর'কে দিয়ে জহরতগুলি পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ছুটলেন হাসান'কে দরবারে হাজির করতে।

মাসরুর হীরা-জহরতগুলো দরবারে এনে একটি মসলিনের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল।

কিছু সময় বাদে উজির জাফর হাসান'কে নিয়ে দরবারে হাজির করলেন। হাসান নতজানু হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ করে নত মুখে তাঁর সামনে খাড়া হয়ে রইল।

খলিফা বল্লেন—'হাসান, কালরাত্রে তোমার প্রাসাদে যে কজন মেহমান রাত্রি গুজরান করেছিলেন, চেন তাদের?'

হাসান ঘাড় ঝাঁকিয়ে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, মেহমানদের পরিচয় জানার অধিকার তো গৃহকর্তার থাকে না।'

—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!' এবার খলিফার নির্দেশে মাসরুর মসলিনের কাপড়াটি তুলে ফেলল। খলিফা বল্লেন—'এবার তাকিয়ে দেখ তো, যে সব ধন দৌলত এখানে জড়ো করা হয়েছে তার দাম তোমার সে-ধন্বন্তরীর দৈব বস্তুটির সমান হবে কিনা?'

হাসান যেন এক লহমায় আশমান থেকে —একদম জমিনে পড়ল। ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে তাকিয়ে বল্ল—'জাঁহাপনা, আপনি—আপনি—'

—'আমিই। আমিই গতরাত্রে উজির জাফর ও অন্যান্য পরিচারকদের নিয়ে তোমার মেহমান হয়ে রাত্রি গুজরান করেছিলাম। দৈব বস্তুটি বিক্রি করায় তোমার যে-অগাধ ক্ষতি হয়েছে তা শুনে আমি মর্মাহত হয়েছি। তোমার ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত আমি এসব ধনদৌলত এখানে জড়ো করেছি।'

—'জাঁহাপনা, এদের দাম বরং তার চেয়ে বেশী হবে।'

—'সবই তোমার।'

হাসান একদম তাজ্জব বনে গেল। কেউ, কাউকে দান খয়রাত করতে পারে তার অন্ততঃ মালুম ছিল না। হাসান সংজ্ঞা হারিয়ে দরবারের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। দীর্ঘ সময় ধরে সেবা যত্নের পর তার সংজ্ঞা ফিরে এল।

খলিফা এবং তার পারিষদরা বিলকুল তাজ্জব বনে গেলেন। দেখলেন সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পরই তার মুখের সফেদ ভাব ভোজবাজীর মাফিক মিলিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক রঙ ফিরে এল। মাত্রাতিরিক্ত খুশীতে তার দেহে শিরা-উপশিরা যন্ত্রতন্ত্রে আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল।

মুখের দুর্বল শিরা-উপশিরা সবল হ'ল। ধমনী লাভ ফিরে পেল হৃত খুন বহনের ক্ষমতা।

খলিফা হারুণ অল রসিদ সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠলেন—'হাসান, সবই আল্লাহ-র দোয়া। তাঁর অপার মহিমার বলেই তুমি দেহের হৃত সৌন্দর্য ফিরে পেলে। আল্লা-র ওপর ভরসা রেখে সুখে ঘর সংসার কর।'

বেগম শাহরাজাদ 'সফেদ নওজোয়ানের কিস্সা' শেষ ক'রে চুপ করলেন।

বাদশাহ শারিয়ার কিস্সাটি শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক বসে রইলেন।

দুনিয়াজাদ বেগম সাহেবার গলা জড়িয়ে ধরে সোল্লাসে বল্ল—'বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা কিস্সা। মন দিল্ পাগল করা

কিস্‌সা বহুৎদিন শুনিনি। বহিন জী, এখনও তো ভোর হতে দেরী আছে। আর একটি বহুৎ বড়িয়া কিস্‌সা শুরু কর।'

আনারকলির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সফেদ নওজোয়ানের কিস্‌সা তো শুনলেন। 'এবার আনারকলির কিস্‌সা' নামে বহুৎ বড়িয়া একটি কিস্‌সা শুরু করছি। আশা করি খুশীতে আপনার দিল্ বিলকুল ভরে উঠবে।

কোন এক সময়ে শাহরিমান নামে এক বাদশাহ ছিলেন। তাঁর প্রাসাদ ছিল আজম মুলুকের খুরাসন নামক নগরে।

বাদশাহ শাহরিমাম-এর শতাধিক বাঁদী ছিল। লেকিন কারো গর্ভেই বালবাচ্চা পয়দা হ'ল না।

বালবাচ্চার অভাব বাদশাহ শাহরিমানকে হরবখত অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধে মারত। এমন বড় রাজ্য, এমন জৌলুষপূর্ণ প্রাসাদ। আর রাজকোষ ভর্তি ধনদৌলত তাঁর বেহেস্তে গমনের পর কে ভোগ করবে? কেই বা তাঁর তখ্‌তের উত্তরাধিকার পাবে? এমন হাজারো দুশ্চিন্তা তাঁর দিলকে সর্বদা বিষিয়ে রাখত। ফলে জ্ঞানী-গুণী আদমিদের নিয়ে শাস্ত্র-আলোচনায় ডুবে থাকার কোসিশ করতেন নসীব বিড়ম্বিত বাদশাহ শাহরিমান।

এক সকালে এক খুবসুরৎ লেড়কি সঙ্গে নিয়ে এক পরদেশী বঁণিক তার দরবারে হাজির হ'ল।

বাদশাহ এক লহমায় লেড়কিটিকে দেখেই বিলকুল চমকে উঠলেন। তার সুরতে যেন তামাম দরবার কক্ষ আলোর রোশনাইয়ে ছেয়ে ফেল্‌ল। পূর্ণ যৌবনা। তার সঙ্গে অনন্য সুরৎ মিলিত হয়ে তাকে যেন একদম বেহেস্তের হুরী বানিয়ে তুলেছে।

বাদশাহ তাকে দেখামাত্রই ব'লে উঠলেন—'কারবারী, এর দাম কত আশা করছ?'

—'জাঁহাপনা, এ-সুন্দরী আজও পুরোপুরি কুমারী। কোন পুরুষ আজ অবধি একে স্পর্শও করতে পারে নি। এর পালকের কাছ থেকে তিন হাজার দিনারের বিনিময়ে আমি একে খরিদ করেছিলাম। জাঁহাপনা খুশী হয়ে একে গ্রহণ করলেই আমিও খুশী হ'ব। বিনিময়ে ইনাম-বকশিস কিছুই আমি আশা করি না।

বাদশাহ দশহাজার দিনার দিয়ে খুবসুরৎ লেড়কিটিকে খরিদ করে নিলেন। সে সঙ্গে বহুমূল্য পোশাকও খুশী হয়ে বণিকটিকে দান করলেন।

বাদশাহের হুকুমে খোজা-সর্দার তাকে হারেমে নিয়ে গেল।

দরবারের কাজকর্ম সেরে রাত্রে বাদশাহ নিজের কামরায় হাজির হলেন। সন্ধ্যার কিছু বাদেই বাঁদীরা খুবসুরৎ লেড়কিটিকে বহুমূল্য ঝলমলে পোশাক পরিয়ে বাদশাহের কামরায়, পালঙ্কের ওপর রেখে গিয়েছিল।

বাদশাহ কামরায় ঢুকে নিজের সাজপোশাক খুলতে খুলতে বল্‌লেন—'সুন্দরী একবারটি এদিকে এসো তো। নাকাব ওঠাও, দেখি তোমার সুরৎ কেমন মনমৌজী।'

আজব ব্যাপার। যার হুকুমে তামাম সুলতানিয়তের জেনানা-পুরুষ থরথরিয়ে কাঁপে তাঁর হুকুম তামিল করার কোন আগ্রহই লেড়কিটির মধ্যে লক্ষিত হ'ল না। কুর্নিশ টুর্নিশ করা তো দূরের ব্যাপার, পালঙ্ক থেকে নামলও না।

বাদশাহ গর্জে উঠলেন—'বে-আদপ, বেতামিস কাঁহিকার। পর মুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলেন—'কি নাম তোমার?'

লেড়কিটি এবারও নির্বাক-নিস্তব্ধ পাথরের মূর্তির মাফিক ঠায় বসে রইল।

বাদশাহ ভাবলেন পরদেশী বণিক কি তবে তাঁকে এক বোবা লেড়কি গছিয়ে দিয়ে দশ হাজার দিনার নিয়ে হাফিস হয়ে গেছে?

এবার নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার নাকাবটি সরিয়ে দিয়ে মুখটিকে পুরোপুরি দেখার সুযোগ করে নিলেন। লেকিন তার চোখ-মুখের দিকে নজর পড়তেই তিনি দ্বিতীয় বার হোঁচট খেলেন। তার চোখ মুখে তিলমাত্র ভাবান্তরও তাঁর নজরে পড়ল না। চোখের তারা দুটো একদম স্বাভাবিক।

বাদশাহ আবার বল্লেন—'তোমার নাম কি? কে তুমি? কি ব্যাপার, মুখে কলুপ এঁটে—'

কোন জবাব দিল না সে। বাদশাহ যেন একদম আশমান থেকে পড়লেন। জিন্দেগীতে বহুৎ লেড়কিকে বুকে নিয়েছেন। লেকিন কোন লেড়কিকে—ভাবতে ভাবতে লেড়কিটির হাত ধরে আচমকা এক হেঁচকা টানে একদম নিজের বুকে নিয়ে নিলেন। দু'বাহুর চাপে তাকে পিষ্ট করতে লাগলেন। তার দেহে কামতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলার কোশিস করলেন। ব্যর্থ হলেন। বিলকুল ব্যর্থ হলেন। সরীসৃপের মাফিক তার শরীর একদম ঠাণ্ডা। নিজের দেহের উষ্ণ স্পর্শ তার মধ্যে তিলমাত্র তাপের সঞ্চারও করতে পারলেন না।

গোসসায় বাদশাহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলতে লাগল। লেকিন তার খুবসুরৎ কাম-কাজল পরানো ডাগর চোখ দুটোর দিকে নজর পড়তেই তার গোস্‌সা বিলকুল পানি হয়ে গেল। বাদশাহ সেদিন এ পর্যন্ত কোসিশ করেই তাকে ছেড়ে দিলেন।

পরের সন্ধ্যায় প্রাসাদে উৎসব-অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত হয়। লেড়কিটি কিন্তু একদম নির্বিকার। কামরার মধ্যে, পালঙ্কের উপরে ঠায় বসে রইল।

মেহমানরা বিদায় নিলে লেড়কিটিকে ফিন বাদশাহের হুকুমে তাঁর কামরায় আনা হ'ল। বাদশাহ তাকে ঝট করে কোলে তুলে নিয়ে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দিলেন। এবার নিজে হাতে তার গায়ের সালোয়ার, কামিজ প্রভৃতি বিলকুল সাজ পোশাক এক এক করে খুলে ফেলতে লাগলেন। লেড়কিটি একদম নির্বিকার। পোশাক খুলতে খুলতে কেবল জালের মাফিক ফিনফিনে পাৎলা একটি সেমিজ তার গায়ে রইল। বাদশাহ বিস্ময় মাখানো নজর মেলে তার দেহ পল্লবটির নিখুঁৎ সুরৎ চাক্ষুষ করতে লাগলেন। তার শিরা-উপশিরা বার বার ঝনঝনিয়ে উঠতে লাগল। খুনে জাগল মাতন। তার যেন আর তর সইছে না। শুরু হয়ে গেল। লেকিন হায়! কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন! কাকে সম্ভোগ করার জন্য তার দিল চঞ্চল হয়ে উঠেছে! লেড়কিটি যে বিলকুল নির্বিকার। কামতৃষ্ণার তিলমাত্রও যে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি। সে একদম নির্বাক-নিষ্পন্দ হয়ে এলিয়ে পড়ে রইল। তার দিমাকে যেন খুন চড়ে গেল। লেকিন তার খুবসুরৎ মুখের দিকে নজর যেতেই বাদশাহের ক্ষোভ কর্পূরের মাফিক উবে গেল।

একের পর এক রাত্রি বাদশাহ এমনই আশা-হতাশার মধ্য দিয়ে লেড়কিটিকে নিয়ে কাটাতে লাগলেন। ফলে হারেমের অন্য লেড়কিদের উপস্থিতির কথা তাঁর মাথা থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এভাবে আশা-হতাশার মধ্যে পুরো একটি সাল গুজরান হয়ে যায়। বাদশাহ নিঃসন্দেহ হতে পারছেন না, আদৌ লেড়কিটির দ্বারা তার কামতৃষ্ণা নিবৃত হয় বটে, লেকিন সে মৌন থেকে যায়। আর এ-ও তার মালুম নেই একের পর এক রাত্রি আদর-সোহাগ পেয়েও লেড়কিটি কেন এমন নির্বিকার, টু-শব্দটিও করে না।

মুখে একদম কলুপ এঁটে দিয়ে অসার হয়ে পড়ে থাকে।

বাদশাহ বহুবার বলেছেন—'তোমার দেহ সুধা আমার কলিজাকে তৃপ্ত করেছে, নিবৃত্ত করেচে কামজ্বালা। লেকিন আপশোষ একটি-ই—তুমি আমার ব্যাপারে একদম নির্বিকার। আজ পর্যন্ত আমাকে সম্বোধন করে একটি কথাও বলনি। মুখে রা পর্যন্ত করনি। কি ব্যাপার কিছুই মালুম হচ্ছে না।

তবু লেড়কিটি উদাস-ব্যাকুল দিল্ নিয়ে একই রকম নির্বিকার ভাবে বসে থাকে।

সুলতান এবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ঠোঁটে-গালে-কপালে চুম্বন ক'রে বল্লেন—'সুন্দরী বহুৎ আচ্ছা, কথা না-ই বা বল্লে, তুমি আমাকে একটি লেড়কা ইনাম স্বরূপ দান কর। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে যাতে বেহেস্তে যেতে পারি তোমার গর্ভের সন্তান আমার তখত আলো ক'রে সুলতানিয়ত শাসন করবে।'

আচমকা লেড়কিটি মুখ তুলে তাকাল। এই প্রথম সে বাদশাহের কথায় সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুতি নিল।

লেড়কিটি ঠোঁটের কোণে মিঠা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল—'জাঁহাপনা, আপনার আশা আল্লাহ ইতিমধ্যেই পূরণ করেছেন। আমার গর্ভে আপনার ঔরসে সন্তান এসেছে। আমি কসম খেয়েছিলাম যতদিন আপনার সন্তান গর্ভে ধারণ করতে সক্ষম না হ'ব ততদিন একদম মুখ খুলব না।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচশ' ত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, বাদশাহ, খুবসুরৎ লেড়কিটির বাৎ শুনে খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে পড়লেন। তাকে এক ঝটকায় বুকে টেনে নিয়ে আদরে-সোহাগে অভিভূত ক'রে দিতে লাগলেন। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বল্লেন—'তোমার বাৎ আমার কলিজায় বিলকুল নাচন ধরিয়ে দিয়েছে সুন্দরী। আজ আমার খুশীর দিন! আমার তখতের উত্তরাধিকারী পয়দা হতে

চলেছে। সে তা আগমনবার্তা পৌঁছে দিয়েছে।'

বাদশাহ শুভ সংবাদটি উপস্থিত পারিষদদের মধ্যে সোল্লাসে ঘোষণা করলেন। উজির-নজির আমীর-ওমরাহ—সবাই খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে পড়লেন।

রাত্রির আন্ধার ঘনিয়ে এলে বাদশাহ দরবারের কাজ চুকিয়ে নিজের কামরায় হাজির হলেন।

বাদশাহ তার জান, তার কলিজার সমান খুবসুরৎ লেড়কিটিকে বুকে টেনে নিয়ে আবেগ-মধুর স্বরে বললেন—'সুন্দরী, তোমার নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা আমার কলিজায় যে ব্যথা-বেদানার সঞ্চার করেছিল তা কি তুমি তিলমাত্রও অনুধাবন করতে পার নি?'

—'জাঁহাপনা আপনার আশ্রয়ে ঠাঁই পাওয়ার সময়ই আমার মালুম হয়েছিল, আপনাকে যদি আমি লেড়কা উপহার দিতে না পারি তবে আমার গতি হবে আপনার অন্য এক শ' বাঁদীরই মাফিক। তাই আমি শামুকের মাফিক নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম। আমার নসিবের ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম না। যেদিন আমি দ্বিধামুক্ত হলাম যে, আপনার সাধ আমি পূর্ণ করতে চলেছি সেদিনই আমি নিজেকে খোলসের মধ্য থেকে বের করে আপনার সামনে তুলে ধরেছি'।

সুলতান বললেন—'সুন্দরী, তোমার উল্লিখিত কারণ বিশ্বাসযোগ্য বটে, লেকিন তোমার নীরবতা, তোমার বিমর্ষতার পিছনে অন্য কোন কারণ আছে কি?'

—'জাঁহাপনা, আমার নসীবের ব্যাপার কি আর আপনাকে বলি! আজ চার সাল আমার আম্মা আর ভাইয়ার সাথে মোলাকাৎ হয় না। আমার জন্মভূমি ছেড়ে দরিয়ার এপার। বহুৎ দূরে আমি চলে এসেছি।

—'কেন ঝুটমুট নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ সুন্দরী, তারা যত দূরেই থাকুন না কেন তাদের এখানে নিয়ে আসা আমার পক্ষে কিছুমাত্রও সমস্যাই নয়। পেয়ারী, এতদিন তুমি আমার বুকে রয়েছ, তোমার নাম পর্যন্ত জানা নসীবে ঘটে নি। কি নাম তোমার?'

'গুলনার। আমার মুলুকে একে আনারকলি বলে। আমার আব্বাজী দরিয়ার বাদশাহ। দরিয়ায় দরিয়ায় ঢুঁড়ে বেড়াতেন। আমার আম্মাও থাকতেন তাঁর সঙ্গে। ফলে আমি দরিয়ার বুকেই পয়দা হয়েছিলাম। আমার নাম লোকান্ত। আর আমার ভাইয়ার নাম সালির।

শৈশব থেকে আমার সাধ ছিল দরিয়ার জীবন ছেড়ে মিট্টির দুনিয়ায় বাস করব। একটু বয়স বাড়লে ঠিক তা-ই একদিন সবার চোখে ধূলো দিয়ে সাঁতরে জমিনে এসে উঠলাম। রাত্রভর পানির সঙ্গে লড়াই করে করে শরীর বিলকুল এলিয়ে পড়ল। একসময় দরিয়ার পাড়ের বালির ওপর শুয়ে গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

ভোর হতেই আমার নিদ টুটে গেল। চোখ মেলে তাকিয়েই দেখতে পেলাম, এক কদাকার আদমি আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। বিলকুল আফ্রিদি দৈত্যের মাফিক তার সুরৎ। আমি তড়াক ক'রে বসে পড়লাম। এক লহমার মধ্যে আমাকে তার লোমে ঢাকা হাত দুটো দিয়ে জাপ্টে ধরে কাঁধে তুলে নিল। দৌড়ে দরিয়ার অদূরবর্তী এক জঙ্গলে ঢুকে গেল। এক লতা-পাতার কুড়েঘরের সামনে আমাকে নামাল। তারপর আমাকে দুয়ারে শুইয়ে দিয়ে কামজ্বালা নেভানোর কোশিস করল। খোদাতাল্লা-র নাম নিয়ে আমি তার মুখে সজোরে এক লাথি বসিয়ে দিলাম। শয়তানটি কয়েক হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। ব্যস, আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম। সে পিছু নিল বটে লেকিন আর ধরতে পারল না।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এক বণিকের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। সে আমাকে হাজির করল বাঁদী হাটে। আমি তিন হাজার দিনারে বিক্রি হয়ে গেলাম। জাঁহাপনা, আপনি তার কাছ থেকেই আমাকে খরিদ করেছেন। তবে সে আদমিটি সাচ্চা মুসলমান ছিল। সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও ধর্মাশ্রয় তার জিন্দেগীর লক্ষ্য না হলে

পুরো তিনটি সাল আমি নৌজোয়ান হয়েও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতাম, আপনিই বলুন জাঁহাপনা?'

খুবসুরৎ লেড়কি আনারকলি তার অতীত-জীবনের কিস্‌সা বলে চুপ করল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মাধ্যমে কাটিয়ে আনারকলি ফিন মুখ তুলল—'জাঁহাপনা, আপনার ঔরসজাত সন্তান গর্ভে ধারণ করার পর আমি নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পেরেছি। আপনি আপনার হারেমের বাঁদীদের চেয়ে আমাকে বেশী পেয়ার করবেন। আর সে-পেয়ার আমার ওপর জিন্দেগীভর বর্ষিত হবে।'

আনারকলি তার কিস্‌সা শেষ করে বাদশাহের কোলে মাথা রেখে শরীর এলিয়ে দিল।

বাদশাহ বল্‌লেন—'আনারকলি, মেহেবুবা আমার। তোমাকে নিয়ে দেখছি আমাকে প্রতিটি পল ডরে ডরে কাটাতে হবে। তুমি একটু আগে বল্‌লে, দরিয়ার পানির তলার মুলুকে তুমি পয়দা হয়েছিলে। আমার চোখে ধূলা দিয়ে ফিন কবে দরিয়ার পানিতে ডুব দেবে, কে বলতে পারে? তুমি ইয়াদ রেখো সুন্দরী, তোমার অবর্তমানে আমার জিন্দেগী একদম বরবাদ হয়ে যাবে।

এবার আবেগ-উচ্ছ্বাস কিছুটা চেপে রেখে বাদশাহ বললেন—'আনারকলি, পানির তলায় আদমির বাস, এ যে কল্পনাও করা যায় না। কিস্‌সা-কাহিনীতে এরকম ব্যাপার স্যাপার চালু আছে। সাচ্চা বটে। লেকিন আদতে তা কি ক'রে সম্ভব মালুম হচ্ছে না, তোমার মুখে শোনার পর আর অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। ব্যাপারটি খোলসা ক'রে বলে তুমি কি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করবে মেহেবুবা?'

—'জাঁহাপনা, আমি যা কিছু জানি জরুর আপনার দরবারে পেশ করব। সুলেমান ইবন দাউদ-এর অশেষ কৃপা বলেই পানির তলার বসবাস করার ক্ষমতা আদমি লাভ করে। আমার পূর্বপুরুষও তার কৃপা লাভে ধন্য হয়েছিলেন। আপনারা যেমন মিট্টির দুনিয়ায় মকান বানিয়ে বসবাস করেন। আপনারা যেমন শ্বাস নেবার কাজে বাতাস ব্যবহার করেন, নাক দিয়ে অনবরত বুকের ভেতরে নেন, ফিন বের করে দেন। আমরা তেমনি বাতাসের বদলে পানি মুখ দিয়ে টানি আর বের ক'রে দেই।

জাঁহাপনা, আমাদের পোশাক আশাক এমন এক কিসিমের বস্তু দিয়ে তৈরী যা ভিজে না বা পচে-গলেও যায় না। আর পানির তলায় আমরা কিভাবে দেখতে পাই, তাই না? আমাদের চোখের মণি পানির ছোঁয়া পাওয়া মাত্র হরদম জ্বলতে থাকে। দুনিয়ার তামাম মিট্টির মুলক এক সাথে জুড়লে যা হবে তা আমাদের পানির মুলকের চার ভাগের এক ভাগের সমান হবে। আশা করি জাঁহাপনা অনুমান করতে পারছেন আমাদের পানির দুনিয়া কেমন বিশাল। আমাদের মুলুক সাত-সাতটি দরিয়ায় বিভক্ত। তাদের কোন কোনটি প্রায় তোমাদের দুনিয়ার আধখানার সমান। এদের তলায় যে সমুদ্র ছড়িয়ে আছে তার দাম তোমাদের মিট্টির দুনিয়ার সে সম্পদ রয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী।

জাঁহাপনা, আমি তো আপনার জিন্দেগীর সঙ্গিনী। আপনার কাছাকাছি পাশাপাশিই থাকব। পরে ফিন আমাদের পানির দুনিয়ার খবর আপনার দরবারে পেশ করব।

মুহূর্তকাল বাদে আনারকলি ফিন মুখ খুলল—'জাঁহাপনা, আদৎ কথাই আপনাকে বলা হয়ে ওঠেনি। আমাদের পানির দুনিয়ায় প্রসুতির প্রসব করাবার যে কায়দা কৌশল চালু আছে তা আপনাদের মিট্টির দুনিয়া থেকে একদম আলাদা। তাই ডর হয় আপনাদের ধাই আমার লেড়কা পয়দা হওয়ার সময় কোন ভুলচুক করে না ফেলে। তাই আপনি মেহেরবানি করে আমার আম্মার কাছে আদমি পাঠিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করুন। প্রসবের কায়দা-কসরৎ তার বিলকুল জানা আছে।'

—'লেকিন তোমার আম্মাকে এখানে কি ক'রে নিয়ে আসা যেতে পারে তার ফিকির তো বল। আমার নফর-নোকররা পানির তলার মুলুকে যেতে পারবে কেন?'

—'জাঁহাপনা, আপনাকে নফর-নোকর পাঠাতে হবে না। যদি হুকুম দেন তবে আমি নিজে আমার আম্মা আর ভাইয়াকে এখানে আনার বন্দোবস্ত করতে পারি। আপনি পাশের কামরায় চলে যান। জানালা দিয়ে দরিয়ার দিকে নজর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখতে পাবেন কি ক'রে আমি তাদের পানির মুলুক থেকে এখানে নিয়ে আসছি।

বাদশাহের কৌতূহল হ'ল। তিনি পাশের কামরায় গিয়ে দরিয়ার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এদিকে আনারকলি তার কামিজের ভেতর থেকে এক টুকরো চন্দন কাঠ বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। তা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া নির্গত হতে লাগল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দরিয়ার পানি ফুলে ফেঁপে উঠল। আর দরিয়ার ওপরে প্রবল তুফান। ঠিক যেন এক প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। তার ভেতর থেকে উঠে এল এক বৃদ্ধা। বাদশাহের বুঝতে দেরী হ'ল না, এ বৃদ্ধাই আনারকলির আম্মা। তার পিছন পিছন উঠল এক কিশোর আনারকলির ভাইয়া।

আনারকলি ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গিয়ে তাদের প্রাসাদে নিয়ে এল। বৃদ্ধা লেড়কিকে জড়িয়ে ধ'রে বহুৎ কাঁদলেন, চোখের পানি ঝরালেন।

আনারকলি তার আম্মার চোখের পানি মুছিয়ে দিতে দিতে বলল—'হ্যাঁ আম্মা, আমার কসুর হয়ে গেছে। তোমাদের কিছু না ব'লে এভাবেই চুপিচুপি পানির দুনিয়া ছেড়ে আসা আমার জরুর

কসুর হয়েছে। তুমি আমায় দোয়া করে দাও, আদতে মিট্টির দুনিয়ার আকর্ষণেই আমি এ-কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আম্মার চোখের পানি মুছিয়ে ফিরে আনারকলি এবার বল্‌ল—'আম্মা, আমি এখন বাদশাহ শাহরিমান-এর প্রধানা বেগম। তিনি আমায় পেয়ার মহব্বৎ করেন।

এমন সময় ভোরের সঙ্কেত পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' বত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আনারকলি তার আম্মাকে এবার বলল—আম্মা, এতদিন বাদে তোমার সাথে মোলাকাৎ হ'ল, একটি বহুৎ বড়িয়া খবর তোমাকে দিচ্ছি। বাদশাহের ঔরসে আমার গর্ভে সন্তান পয়দা হয়েছে। আমাদের পানির দুনিয়ার প্রসবের কায়দা-কসরৎ তো মিট্টির দুনিয়ার ধাইদের জানা নেই। তাই তোমাকেই সে ব্যাপারটি সামাল দিতে হবে।'

এতক্ষণ পাশের কামরা থেকে বাদশাহ তাদের বাৎচিৎ শুনছিলেন। এবার এক পা দু'পা ক'রে তাদের কামরায় এলেন। আনারকলি বাদশাহের সঙ্গে তার আম্মার আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিল।

আনারকলির আম্মা বাদশাহকে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমার বেটিকে যে আপনি মেহেরবানি করে বুকে ঠাই দিয়েছেন, আপনার বেগমের সম্মান খাতির দান করেছেন তার জন্য আপনাকে হাজারো সুক্‌রিয়া জানাচ্ছি।

এক সকালে আনারকলি খুবসুরৎ এক লেড়কা প্রসব করল। সুলতান শাহ্‌রিমান লেড়কাকে দেখে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলেন। সাতদিন বাদে আচার অনুষ্ঠান সারা হলে আনারকলি লেড়কাকে বাদশাহের কোলে তুলে দিল। বাদশাহ শাহ্‌রিমান তাঁর তখতের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। তার মুখের হাসি যেন আর মিলাতে চায় না। লেড়কা পয়দা হওয়ার সপ্তম দিনের উৎসব-অনুষ্ঠানেই তার নামকরণ করা হ'ল বদর বাসিম।

বদর বাসিম শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চাঁদের কলার মাফিক দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

একদিন দুপুরের আগে আনারকলি-র ভাইয়া সালিহ শিশুটিকে নিয়ে আদর-সোহাগ করতে দরিয়ার দিকে এগিয়ে যায়। এক সময় সুযোগ বুঝে তাকে নিয়েই ঝুপ্ ক'রে দরিয়ার পানিতে ঝাঁপ দিল। ব্যস, একলহমার মধ্যেই পানিতে তলিয়ে গিয়ে একদম বে-পাত্তা হয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে বাদশাহ কপাল চাপড়ে হায় হায় শুরু করে দিলেন। তাঁর চোখের তারায় হতাশার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

আনারকলি তাকে নানা ভাবে প্রবোধ দিতে লাগল।

আনারকলির বাৎ-ই সাচ্চা হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সালিহ পানির ওপর ভেসে উঠল। তার কাঁধে পরম আনন্দে শিশু বদর বাসিম খিল্‌খিল্ করে হাসছে। আজব ব্যাপার তার মাথা একদম শুকনো ; গায়ে এক বিন্দু পানিও লাগেনি। পানির মুলুকের লেড়কা সালিহ কামাল করল।

বাদশাহের চোখ-মুখের বিমর্ষ ভাবটুকু লক্ষ্য ক'রে সালিহ সরবে হেসে ব'লে উঠল—'জাঁহাপনা, আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আপনি লেড়কার জন্য অস্থির হয়ে পড়বেন। আদতে আপনার সঙ্গে একটু মস্করা করার জন্যই আমি এ-কাজে উৎসাহী হয়েছিলাম। জাঁহাপনা, আপনি কেন মানছেন না, বদর বাসিম-এর দেহের খুনের অর্দ্ধেক আপনার আর অর্দ্ধেক আমার বহিনজীর। তাই পানির মুলুকে তার তো কোনই অনিষ্ট হবার কথা নয়।'

লেড়কাকে বাদশাহের কোলে তুলে দিয়ে সে এবার কোমর থেকে একটি থলি বের ক'রে বাদশাহের হাতে দিল। মুচকি হেসে বলল—'জাঁহাপনা, এতে কিছু হীরা-জহরৎ আছে, এগুলো আমার দিক থেকে ভাগ্নেকে উপহার দিলাম—মুখ দেখার নজরানা। থলির মুখ খুলেই বাদশাহ চমকে উঠে বল্‌লেন-ইয়া আল্লাহ! এ যে পেল্লাই সব হীরা জহরৎ!'

হীরা জহরতের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় কামরাটি বিলকুল আলোকিত হয়ে উঠল।

বাদশাহ সালিহ'কে আলিঙ্গন ক'রে বল্‌লেন—'তো আমার প্রাসাদে মেহমান হয়ে আরও কিছুদিন—কমসে কম চল্লিশদিন থাক। আশা করি আমার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবে না। সালিহ আর তার আম্মা বাদশাহের অনুরোধ রক্ষার্থে আরও চল্লিশদিন তাঁর মেহমান হয়ে প্রাসাদে রয়ে গেল।

বিদায় মুহূর্তে বাদশাহ সালিহ'কে বল্‌লেন—আমি তোমাদের কিছু উপহার দিলে আপত্তি করবে না তো?'

—'জাঁহাপনা, জানেনই তো আমরা পানির মুলুকে বাস করি। ধন দৌলত বা অন্য যেকোন কিসিমের সামগ্রীই সেখানকার জীবন যাত্রায় মূল্যহীন। আমরা একমাত্র মূল্য দিয়ে থাকি পেয়ার মহব্বতের। তা-তো আপনি দিল্ উজাড় করেই দিয়েছেন। আপনার আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা বাস্তবিকই আতুলনীয়। আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি তাতে দিল্ একদম উপছে পড়েছে। এখন হুকুম দিন, বিদায় নেই। সুযোগ-সুবিধা মাফিক ফিন আসব।'

বাদশাহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সালিহ ও তার আম্মা দরিয়ার পানিতে ডুব দিল।

আনারকলি প্রাসাদের খোলা-জানালায় দাঁড়িয়ে লেড়কা বাসিম'কে কোলে নিয়ে আম্মা ও ভাইয়াকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের আনাগোনা লক্ষ্য ক'রে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' চৌত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ্ শারিয়ার -এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আনারকলির বেটা বাসিম-এর ব্যাপারে ধাইদের ওপর কিছুমাত্রও আস্থা রাখতে পারছে না। তাদের হাতের মুঠোয় তাকে ছেড়ে না দিয়ে অধিকাংশ সময় তাকে নিজের কাছেই রাখতে লাগল।

দেখতে দেখতে বদর বাসিম-এর উমর চার সাল হয়ে গেল। সে দিন দিনই দামাল হয়ে উঠতে লাগল। তাকে সামলানোই দায় হয়ে উঠল। ক্রমে আর কয়েক সাল কেটে গেল। সে পনের সালে পা দিল। তার সুরৎ দেখে সবার তাক লেগে যায়। সে পড়ালিখা, খেলকুদ, শিষ্টাচার বিলকুল বিষয়ে সমবয়সীদের টেক্কা দিতে লাগল।

এদিকে বাদশাহ ক্রমে বার্ধক্যে পা দিলেন। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলছেন, চোখের নজরও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছেন, তাঁর বেহেস্তে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। উজির-নজির, আমীর-ওমরাহ্‌দের সাক্ষী রেখে নওজোয়ান বদর বাসিম'কে তখতে বসিয়ে নিজেকে হাল্কা ক'রে নিলেন।

তখতে বসেই বাদশাহ বাসিম-এর প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল দুর্বলকে সবলের কব্জি থেকে অব্যাহতি দেওয়া এবং ধনীদের শোষণের হাত থেকে দরিদ্রদের রক্ষা করা। বাসিম-এর ধৈর্য, নিষ্ঠা, অধ্যাবসায় এবং প্রজাহিতৈষী মনোভাব তার রাজকার্য পরিচালনার সহায়ক হিসেবে কাজ করতে লাগল। সাচ্চা বলতে কি প্রজারা তার আমলে সব চেয়ে সুখে দিনাতিপাত করতে লাগল।

এক সাল বাদে বাদশাহ শাহরিমান লেড়কা ও বিবিকে চোখের পানিতে ভাসিয়ে আল্লাহ-র নাম করতে করতে দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে যাত্রা করলেন।

বাদশাহের বেহেস্তে যাত্রার খবর পেয়ে সালিহ দরিয়ার তল থেকে ছুটে এল।

বাদশাহ বদর বাসিম ও আনারকলি এক মাহিনা কালা পোশাক পরে শোক পালন করল। সালিহও বহুৎ চোখের পানি ঝরিয়ে শোক প্রকাশ করল। ভাগ্নে বাসিম'কে নানা ভাবে প্রবোধ দিল।

সালিহ ভাগ্নে বাসিম-এর শাদীর ব্যাপারে তৎপর হ'ল। সে এ-ব্যাপারে বহিনজীর সঙ্গে আলোচনা করল।

সালিহ বল্‌ল—'বহিনজী, আমি বলি কি পানির দুনিয়ার শাহাজাদীর সঙ্গে বাসিম-এর শাদীর বন্দোবস্ত কর।' আনারকলি তার মতে সায় দিল।

সালিহ বহুৎ বিচার-বিবেচনা ক'রে বল্‌ল—'বহিনজী, সুলতান সামানদাল-এর বাৎ তোমার ইয়াদ আছে তো? তার একটি খুবসুরৎ লেড়কি আছে। তার নাম জানারা। এক লহমায় দেখলে মালুম হবে বুঝি বেহেস্ত থেকে কোন পরী বুঝি পানির মুলুকে নেমে এসেছে। তার আচার ব্যবহারও সুলতান বাদশাহের বিবি হবার মতই।'

—'হ্যাঁ, ভাইয়া, আমারও তা-ই মত। শাহাজাদী জানারা-ই আমার লেড়কা বাসিম-এর বিবি হবার যোগ্যা।

বাদশাহ বাসিম বিছানায় ঘুমের বাহানা ক'রে পড়েছিল এতক্ষণ

শাহজাদী জানারা-র সুরৎ ও গুণাবলীর বাৎ শুনেই সে নিজের দিলের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিয়েছে। শাহজাদী জানারাকেই সে শাদী করবে, পাক্কা সিদ্ধান্ত।

বাসিম রাতভর চোখের পাতা জুড়তে পারল না। সে কল্পনায় নিজের দিলে সে শাহজাদী জানারা-র তসবির এঁকে চলল।

নির্ঘুম অবস্থায় রাত্রি গুজরান ক'রে বাসিম কাক ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিদারুণ অস্থিরতায় তার কলিজা বিলকুল ছটফট করতে লাগল। তার মামার কামরায় গিয়ে তাকে ডেকে তুলল। তাকে নিয়ে দরিয়ার পাড়ে মুক্ত বাতাস খেতে গেল। আদতে হাওয়া খাওয়া টাওয়া তার বাহানা। দরিয়ার পাড়ে পৌঁছেই আদৎ ব্যাপারটি ফাঁস ক'রে দিয়ে বল্‌ল—'মামাজী, শাহজাদী জানারা'কে একবারটি চাক্ষুষ করার জন্য আমার কলিজা ছটফট করছে। জলদি বন্দোবস্ত কর।'

—'লেকিন তাকে পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়।'

বাসিম-এর অত্যুগ্র আগ্রহে সালিহ পানির মুলুকে গিয়ে শাহজাদী জানারকে চাক্ষুষ করাবার জন্য উভয়ে দরিয়ার পানিতে ঝাঁপ দিল। ব্যস, চোখের পলকে তারা পানির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সালিহ তার ভাগ্নে বাসিম কে নিয়ে যাবার আগে তাদের মাকানে তার আম্মার কাছে হাজির হ'ল। দিদা ও নাতির মোলাকাৎ হ'ল। তার বুড়ি আম্মা তার ডাগর ডোগর নাতিকে দেখে তাজ্জব বনে যায়। এরই মধ্যে তার দৈহিক পরিবর্তন এত হতে পারে তার একদম ধারণা ছিল না। দিদা-নাতি শুভেচ্ছা বিনিময় করল।

সালিহ বল্‌ল—'আম্মা, তোমার জোয়ান মরদ নাতি এখন শাদী করতে চাইছে। সামানদাল-এর বেটি শাহজাদী জানার'কে শাদী করার জন্য তোমার শরণাপন্ন হয়েছে। বন্দোবস্ত করে দাও।'

লেড়কার বাৎ শুনে বুড়ি চটে যায়। 'বলে—ইয়া আল্লাহ! কে যারে সুলতান সামানদাল-এর মুখের সামনে দাঁড়াতে। ও ব্বাস! যা ঠোঁট কাটা! হয় তো মুখের ওপরই দু'-চার বাৎ শুনিয়ে দেবে। তখন ইজ্জৎ কমবে বৈ বাড়বে না।'

লেকিন আম্মা আমার ভাগ্নেও তো কোন অংশে কমতি যায় না। সে-ও তো মিট্টির দুনিয়ার এক বাদশাহ বটে!'

এভাবে বহুৎ যুক্তি তক্কের পরে বুড়ি শেষমেশ বল্‌ল—'বেটা, যদি নেহাৎ-ই পারি তুই একা গিয়ে ব্যাপারটির ফয়সালা ক'রে আয়। বাসিম-এর আগ বাড়িয়ে যাওয়া বিলকুল ইজ্জতের ব্যাপার।'

সাহিল একা যাওয়াই সাব্যস্ত করল। উপহার সামগ্রী দিয়ে পুরো দুটো বস্তা সাজাল। এবার সে বস্তা দুটো পানিতে টানতে টানতে নিয়ে চলল সুলতান সামানদাল-এর প্রাসাদের দিকে।

সালিহ সুলতানের প্রাসাদে হাজির হ'ল। এক প্রহরী তাকে সুলতানের কামরায় পৌঁছে দিয়ে এমন এক প্রস্তাব আপনার দরবারে রাখতে চাইছি, যা পূরণ করা একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব।'

তার বাৎ শুনে সুলতানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি ব'লে উঠলেন, বাহানা রেখে তোমার বক্তব্য খোলসা ক'রে বল।'

—'জাঁহাপনা আপনার লেড়কির সঙ্গে আমার ভাগ্নের শাদীর ব্যাপারে বাৎচিৎ করতে এসেছি। সে মিট্টির মুলুকের বাদশাহ। তামাম মুলুকে তার বহুৎ নাম ডাক।'

সুলতান চিল্লিয়ে ওঠেন—'আমার ধারণা ছিল তোমার দিমাক বিলকুল আচ্ছা। নইলে এমন একটি প্রস্তাব তুমি আমার সামনে রাখতে সাহস করছ! নিতান্তই অসঙ্গত একটি প্রস্তাব নিয়ে নাচতে নাচতে এসে আমার সামনে হাজির করতে পারলে?

—'আপনি বৃথাই গোস্‌সা করছেন মেহেরবান। আমার ভাগ্নেকে আপনার লেড়কির পাশে খাড়া হবার অনুপযুক্ত ভাবছেন কোন্ বিচারে? আপনার লেড়কি খুবসুরৎ অস্বীকার করছি না। লেকিন আমার ভাগ্নের সুরৎ-ও তো কোন অংশে কমতি নয়। সে বর্তমানে খুরাসন ও পারস্যের বাদশাহ।

সুলতান সামানদাল তার বাৎ শুনে সরবে হেসে উঠলেন। সালিহ চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে বল্‌ল—'আপনি এধরনের আচরণ করবেন আমি খোয়াবেও—'

সুলতান সামানদাল গোস্‌সায় ফেটে পড়ার জোগাড় হলেন —তোমার ব্যাপারটি কি হে! এত বড় স্পর্ধা তোমার। আমার প্রাসাদে, আমারই নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান—' কথা বলতে বলতে তিনি তিনবার করতালি বাজালেন। ব্যস, চোখের পলকে একদল ইয়া তাগড়াই রক্ষী হাজির হ'ল। পরিস্থিতি সঙ্গীন বুঝে নওজোয়ান সালিহ অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে তাদের পাশ কাটিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে এসেই সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। দেখে তারই সৈন্যদল প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছে। তার বিপদ হতে পারে আশঙ্কায় তার আম্মা সশস্ত্র সৈন্যদল পাঠিয়েছে। তারা সালিহ-র মুখে সুলতানের অশিষ্ট আচরণের ব্যাপার জানতে পেরে হৈ হল্লা করতে করতে বেমালুম প্রসাদের ভেতরে ঢুকে গেল।

সুলতান সামানদাল একদম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাঁর সৈন্যদের হুকুম দিলেন—'ঝাঁপিয়ে পড়! হানাদারদের সমুচিত শিক্ষা দেয়া চাই।'

সুলতান সামানদাল-এর হুকুম পাওয়ামাত্র তার সৈন্যরা তীব্র আক্রোশে সাহিল-র ওপর চড়াও হ'ল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে অনুমান ক'রে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' চল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ

শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতান সামানদাল-এর হুকুম পেলে তাঁর সৈন্যদল হানাদার সালিহ-র সৈন্যদলের ওপর তীব্র আক্রমণ চালাতে লাগল। দীর্ঘসময় ধরে ক্ষিপ্রতার লড়াই চালিয়ে সালিহ-র সৈন্যরা সুলতান সামানদাল-এর সৈন্যদলকে প্রায় সাবাড় করে দিল। সামানদাল ব্যাপার দেখে প্রমাদ গুণলেন। বিলকুল ভড়কে গেলেন। তাঁর কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। এবার বুঝি তাঁকেই জানে খতম ক'রে দেবে। বে-গতিক দেখে পালিয়ে জান বাঁচাবার কোশিস করলেন। পারলেন না। সালিহ-র সৈন্যরা তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। অনন্যোপায় হয়ে তাদের সামনে হাত তুলে দাঁড়িয়ে বিলকুল কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন — 'আমাকে জানে খতম কোরো না!'

সালিহ-র সৈন্যরা সুলতান সামানদাল'কে রশি দিয়ে একটি থাম্বার সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধে ফেল্‌ল।

এদিকে সুলতানের নওজোয়ান লেড়কি জানারা আতঙ্কিত হয়ে একদল বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে খিড়কি দরওয়াজা দিয়ে ভেগে গেল। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে হারা উদ্দেশ্যে সে ছুটে চল্‌ল। লেকিন কোথায় যাবে। কার কাছে গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে কিছুই তার দিমাকে নেই।

শাহজাদী জানারা তার দলবল নিয়ে এক গভীর বনে প্রবেশ করল। ঝাঁকড়া একটি গাছের উপর উঠে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে লাগল। লেকিন নসীব যেখানে বিরুদ্ধে সেখানে আদমির বিলকুল কায়দা কসরৎ এক লহমায় নস্যাৎ হয়ে যায়।

এদিকে সালিহ-র কাছ থেকে দু'জন সৈন্য ছুটে এসে তার আম্মা লোকস্ত'কে সংবাদ দিল সালিহ'কে সুলতান সামানদাল অপমান করায় সেখানে ঘোরতর লড়াই শুরু হয়ে গেছে, আর এ-ও বলতে ভুল্‌ল না, নসীব তাদের। লড়াইয়ের দেবতা সালিহ'র গলায়ই জয়মাল্য পরিয়ে দেবে।

দূতের মুখে লড়াইয়ের খবর পেয়ে বদর নাসিম আতঙ্কিত হয়ে সসৈন্যে সুলতান সামানদাল-এর প্রাসাদের দিকে যাত্রা শুরু করল।

বদর নাসিম তো জানত না, যার জন্য এত কাণ্ড, যাকে পাওয়ার জন্য এত রক্তক্ষয় সে নসীবের ফেরে তারই কাছাকাছি এগিয়ে এসে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

বদর নাসিম সৈন্যদের প্রদর্শিত পথ ধরে জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করল। এটিই সুলতান সামানদাল-এর প্রাসাদে যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম পথ। নসীবই তাকে জঙ্গলের সে-ঝাঁকড়া গাছের তলায় টেনে আনল। পথ চলতে চলতে গাছটির অনুচ্চ ডালটির দিকে নজর পড়তেই সে যেন আচমকা এক হোঁচট খেল। দেখে গাছের ডালে বসে এক খুবসুরৎ লেড়কি আতঙ্কিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে। কোন লেড়কির গায়ে এমন চোখ ধাঁধানো সুরৎ আশ্রয় করতে পারে একে দেখার আগে তার তিলমাত্র ধারণাও ছিল না।

আতঙ্কে জড়োসড়ো লেড়কিটিকে দেখে বদর নাসিম বল্‌ল—'সুন্দরী, তুমি কে গো? এখানে, এভাবে জঙ্গলে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে আতঙ্কিতা লেড়িকিটি বল্‌ল— 'আমার নাম জানারা। সুলতান সামানদাল-এর একমাত্র লেড়কি। সালিহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমাদের প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। আমাদের বিলকুল সৈন্য খতম করে সে আমার আব্বাকে বন্দী করেছে। তার সৈন্যরা আমার তাল্লাশে প্রাসাদ তছনছ করছে। মাথার ওপরে বিপদ বুঝে আমি এসেছি।'

বদর নাসিম কৌতূহলী নজরে খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি জানারা-র দিকে তাকিয়ে রইল। নিষ্পলক তার চাহনি। তার খুবসুরৎ সৌন্দর্যসুধা পান করতে লাগল। তার পরিচয় নিয়ে নিজের পরিচয়ই যে তাকে দেয়া দরকার বিলকুল ভুলে গেল, একসময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বল্‌ল — 'আমি বদর নাসিম। সালিহ-র একমাত্র ভাগ্নে আমি। খুরাসণ ও পারস্যের বাদশাহ। আমার আম্মা আনারকলি বেগমসাহেবা লোকস্তের লেড়কি।'

বদর নাসিম—সালিহ-র ভাগ্নে কথাটি কানে যেতেই জানারা সচকিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। এবার বুঝি তার মালুম হ'ল—এরই জন্য সালিহ তার আব্বার কাছে দরবার করতে গিয়ে ছিল। আর এরই ফলে আজকের এ অস্থির পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আব্বার ওপর জানারার দিল্ অকস্মাৎ বিষিয়ে উঠল। এক খুবসুরৎ নওজোয়ান। তার ওপর এক নামজাদা সুলতান, সে তার লেড়কিকে শাদী করতে চেয়েছে, কসুর কোথায়? সসঙ্কোচে ব্যক্ত করল —'আপনি আমার আব্বার ওপর গোস্‌সা করবেন না। আদতে আমার আব্বা একদম রগচটা, জেদী আদমি। জেদ চাপলে আচ্ছা-বুড়া ক্রোধ বিলকুল হারিয়ে ফেলেন। নইলে আপনার মাফিক সবদিক থেকে যোগ্য এক নওজোয়ানকে পছন্দ্ হয় না! আদতে ব্যাপারটিকে ঠাণ্ডা দিমাকে বুঝার কোশিসই করে নি।' কথা বলতে বলতে জানারা ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল।

বদর বাসিম-এর সৈন্যদল ছুটল সুলতান সামানদাল-এর প্রাসাদের উদ্দেশ্যে। যার জন্য এত লড়াই, এত খুনোখুনি হানাহানি আর যার জন্য এত খুন ঝরছে সে তো তাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। অতএব লড়াইয়ের তো বিলকুল আর দরকার নাই।

এদিকে শাহজাদী জানারা গাছের ডাল থেকে নেমে বাদশাহ বদর বাসিম-এর কাছাকাছি পাশাপাশি খাড়া হয়ে বল্‌ল— 'আপনার মামা সালিহ-র হাতে আমার আব্বা আজ বন্দী। একমাত্র আপনিই পারেন তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে। এখন পুরো ব্যাপারটি নির্ভর করছে আপনার আর আপনার মামার ওপর।' বদর নাসিম মুচকি হেসে বল্‌ল—'সুন্দরী একদম উল্টো ব্যাপার। আমি কিন্তু বলব, পুরো ব্যাপারটিই নির্ভর করছে একমাত্র তোমার মর্জির

ওপর। তুমি চাইলে এখনই লড়াইটড়াই মিটে গিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে বিষাদ-বিতৃষ্ণার বদলে মধুর আত্মীয় সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে।'

ঠোঁটের কোণে বেহেস্তের হুরীদের হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে জানারা এবার বল্‌ল— 'সব বাৎ কি মুখফুটে বলা যায়? আমার চোখ দেখে দিলের সমাচার পাচ্ছেন না?'

বদর বাসিম মুচকি হেসে তার হাত ধরে বুকে নিয়ে এল। আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে তার ঠোঁটে, গালে ও কপালে চুম্বন করতে লাগল। আবেগ-মধুর স্বরে, আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বল্‌ল—'মেহবুবা, আমি যে এতদিন তোমারই ধ্যানে আত্মমগ্ন ছিলাম, তোমাকে না পেলে যে আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে। তুমি কি বোঝ না, একমাত্র তোমাকে বুকে পাবার জন্যই আমি মিট্টির দুনিয়া ছেড়ে তোমাদের এ-পানির দুনিয়ায় ছুটে এসেছি।

জানারা-র মুখাবয়ব মুহূর্তে অধিকতর আরক্তিম হয়ে উঠল। আকস্মিক শরমটুকু সামাল দিতে সে বদর বাসিম-এর প্রশস্ত বুকে মুখ লুকাল।

বদর বাসিম তার বলিষ্ঠ হাত দুটো দিয়ে জানারা-র তুলতুলে শরীরটিকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার ক'রে দিতে চায়। তার সুডৌল স্তন দুটোর নরম ও উষ্ণ উপস্থিতি তার কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দেয়। শিরার গতি হয়ে ওঠে দ্রুততর, ধমনীতে খুনের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। খুনে বিলকুল মাতন লেগে যায়। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। সে নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে হাত বাড়িয়ে জানারা-র কটিদেশের বন্ধন আল্‌গা করার কোশিস করে। ব্যর্থ হ'ল।

জানারা আচমকা অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ক'রে বসল। শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে বদর বাসিম'কে দূরে সরিয়ে দিল। সুতীব্র আক্রোশে ফুঁসতে লাগল। তার গায়ে-মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল—'তোমার সুরৎ দেখে ভেতরের ছবির হদিস নিতে পারি নি। বে- শরম, বেতমিস, জানোয়ার কাঁহিকার। জঘন্য কামনার কীট তুমি! এ-ই তোমার পেয়ার মহব্বৎ! তোমার শিরা-উপশিরায় বইছে লেড়কির গোস্তের পাশবিক ক্ষুধা। তোমার মহব্বৎ ঝুটা! বিলকুল ঝুটা! তুমি আমাকে পেয়ার কর, মহব্বতের ডুড়িতে বাঁধতে চাও—ঝুঁটা! বিলকুল ঝুটা!'

বদর বাসিম তার আচরণে একদম স্তম্ভিত। সে যেন আশমান থেকে পড়ল। কি করবে, তার আকস্মিক উষ্মার কি-ই বা জবাব দেবে গুছিয়ে উঠতে না পেরে নীরবে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

জানারা তড়পে চলেছে — ইতর গিধ্‌ধর কাঁহিকার। তোমার কামজ্বালা কি ক'রে জিন্দেগীর মাফিক ঠাণ্ডা করে দিতে হয় তা আমার ভালই জানা আছে। তোমার পাশবিক আচরণের বদলা স্বরূপ আমি তোমাকে পশু ও পাখির মিলিত আকৃতি বিশিষ্ট এর জানোয়ারে পরিণত ক'রে দিচ্ছি।' এবার জানারা বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

ব্যস, এক লহমার মধ্যেই বদর বাসিম এক অতিকায় জানোয়ারের রূপ পরিগ্রহ করল। ঠোঁট বাঁকিয়ে বিশ্রী এক ভঙ্গিতে সে এবার বল্‌ল —'তোমার উপযুক্ত সাজাই তোমাকে দিয়েছি। জানোয়ারের দলে তোমার ঠাঁই হবে না। আবার ডানা থাকলেও পাখিরা তোমাকে আশ্রয় দেবে না। ফলে বাধ্য হয়ে দুর্বিষহ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে তোমাকে।

জানারা এবার এক বাঁদীকে হুকুম দিল হতচ্ছাড়া জানোয়ারটিকে মরুভূমির মুলুকে নিয়ে বেঁধে রেখে আয়। খানাপানি বিনা শুকিয়ে কুঁকড়ে এর জান খতম হোক। মজা টের পাক, জেনানার গোস্ত খুবলে খাওয়ার কোশিস করলে কী ভয়ঙ্কর সাজা পেতে হয়। তিলে তিলে মালুম হোক মিট্টির দুনিয়া থেকে এসে পানির দুনিয়ায় হামলা চালালে নসীবে কি জোটে।'

বাঁদীর পিছু পিছু নসীব বিড়ম্বিত বদর-বাসিম বিষণ্নমুখে মরুভূমির দিকে চলতে লাগল। বাঁদীটি কিছুদূর গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল—'হারামী শয়তান কাঁহিকার! এমন ধপ ধপ করে গদাই লস্করী চালে চলছিস কেন? পা চালা বে-শরম, বেতমিস মরুভূমির মুলুকে গিয়ে মজা কাকে বলে বিলকুল মালুম হবে। পানির দুনিয়ায় দিল্লাগী করতে এসেছিলি!

মুখ ব্যাজার ক'রে বদর বাসিম নীরবে বাঁদীটিকে অনুসরণ করতে লাগল। এক সময় তারা হাজির হ'ল মরুভূমির মুলুকে। চারিদিকে কেবল উত্তপ্ত বালি আর বালি। চারদিক ধূ-ধূ। এবার পথ চলতে আরও বেশী তকলিফ হতে লাগল। বাদশাহের একমাত্র আদরের নন্দন। হাঁটাহাঁটি করতে পারবে কেন। তারওপর মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে হাঁটা তার পক্ষে বিলকুল অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তকলিফ হলেই বা তাকে ছাড়ে কে। বাঁদীটির হাতের ডাণ্ডা দমাদম তার পিঠে পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে সে পথ পাড়ি দিতে লাগল।

জেনানার দিল্‌ কলিজা বড়ই দুর্বল। বাঁদীটি বেশীক্ষণ নিজের নির্মম নিষ্ঠুর আচরণকে ধরে রাখতে পারল না। বদর বাসিম-এর ওপর তিলে তিলে মায়া-মমতা পয়দা হতে লাগল। নির্জন-নিরালা মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে তাকে বেঁধে রেখে যেতে তার দিল সরল না। তাজ্জব কাণ্ড। একটু আগেও সে যার ওপর ডাণ্ডা চালিয়েছে এখন তারই জন্য কলিজায় মর্মবেদনা অনুভব করছে। ফিন সে এরকমও ভাবল, শাহজাদী জানারা-র গোস্‌সা কমে গেলে, দিমাক ঠাণ্ডা হলে নিজের নিষ্ঠুর আচরণের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ

হবে। তখন তার ওপরই হয়ত গোস্সা করবে। খেঁকিয়ে বলবে—'হারামজাদী' আমার না হয় এমন দিমাকটিমাক গরম হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামাল দিতে না পারায় উদ্ভট এক শাস্তি বাদশাহকে দিয়েছিলাম। তুই কি কায়দা-কসরৎ ক'রে ব্যাপারটিকে সামাল দিতে পারিস নি? তোর ঘটে বুদ্ধি তিলমাত্র বুদ্ধি-বিবেচনা থাকত তবে আর বাঁদীগিরি করবি কেন? এরকম হাজারো বাৎ বলে পুরো ব্যাপারটি বেমালুম তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।

বাঁদীটি বাস্তবিকই বহুৎ আচ্ছা মতলব আঁটল। সে বদর বাসিম'কে তাড়াতে তাড়াতে এক শস্য শ্যামল প্রান্তরে হাজির করল। কাছেই একটি ছোট্টনদী কুলকুল ক'রে বয়ে চলেছে। গাছে গাছে পাকা ফলের বিচিত্র সমারোহ। বাঁদীটি ভাবল, পাকা ফল আর নদীর পানি খেয়ে দিব্যি উঠপাখি রূপী বদর বাসিম অনায়াসে জান টিকিয়ে রাখতে পারবে। সে তাকে বেঁধে না রেখে গলার রশি খুলে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছেড়ে দিল।

এদিকে ক্রোধোন্মত্ত সালিহ সুলতান সামানদাল'কে বন্দী করে প্রাসাদের সর্বত্র, একদম আনাচে কানাচে পর্যন্ত শাহজাদী জানারা-র তাল্লাশ চালাতে লাগল। লেকিন কোথাও তাকে পেল না। এতগুলো আদমির চোখে ধূলা দিয়ে এক লেড়কি একদম বে-পাত্তা হয়ে গেছে দেখে সে বিলকুল তাজ্জব বনে গেল।

সালিহ সুযোগ বুঝে সুলতান সামানদাল-এর তখত দখল ক'রে নিজেকে সুলতান ব'লে ঘোষণা ক'রে দিল।

সবই তো হ'ল। লেকিন আদৎ ব্যাপারটির ফয়সালা তো হ'ল না। ভাগ্নের শাদী দেবে কার সঙ্গে। যার জন্য এত হামলা-হুজ্জতি সে শাহজাদি জানারা-র হদিসই তো এখনও মিল্‌ল না।

সালিহ ব্যস্ত হয়ে তার মুলুকে ফিরে গেল। সেখানে পা দিয়েই সে নতুনতর এক দুঃসংবাদ পেল। তার আম্মার মুখে শুনল, ভাগ্নে বদর বাসিম বে-পাত্তা। চারদিকে তাল্লাশী চালিয়েও হদিস মিলে নি। সালিহও সৈন্য সামন্ত নিয়ে তার তাল্লাশ করতে গিয়ে তামাম পানির দুনিয়া তোলপাড় করল। লেকিন হতাশ হতে হ'ল।

শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে মিট্টির দুনিয়ায় তার বহিনজী আনারকলির কাছে দূত পাঠাল। দূতের মুখে লেড়কার সমাচার শুনে তার দু'চোখ বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। বিলাপ পেড়ে আশমান-জমিন কাঁপিয়ে তুল্‌ল।

এদিকে মরুভূমির অদূরবর্তী সবুজ-জঙ্গলে উটপাখিরূপী বাদশাহ বদর বাসিম জঙ্গল, নদী আর পাহাড়ময় প্রান্তরে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল। বিশাল এক দেহ নিয়ে বেশী চলাফেরা করতে পারে না। পাখা আছে বটে। লেকিন সে দুটো এতই ছোট যে, একদমই উড়তে পারে না। তাল্লাশ ক'রে ক'রে ইয়া পেল্লাই মোটা এক গাছের কোটর খুঁজে পেল। কাৎড়ে কাৎড়ে কোনরকমে কোটরটির ভেতরে নিজেকে গুঁজে দিল। দেখল এখানে কোনরকমে আশ্রয় নিয়ে বিরুদ্ধ নসীবের সঙ্গে মোকাবেলা করা যাবে।

ক্রমে সূর্য অস্ত গেল। প্রকৃতির বুকে শুরু হ'ল আলো-আঁধারীর খেল। কিছুক্ষণ বাদে গাঢ় অন্ধকার চারদিক ছেয়ে গেল। বদর বাসিম কোটরের ভেতরে গুটিশুটি মেরে শুয়ে দিন গুজরান করতে লাগল। তার নসীব এতেও বাদ সাধল। সকালে কোটর থেকে বেরিয়ে সবে একটা পাকা ফল ঠোঁটে তুলেছে। অমনি তার মালুম হ'ল পায়ে কি যেন জড়িয়ে গেছে। একটি রশির ফাঁস কে যেন গোপন অন্তরাল থেকে রশিটি ধরে টানছে। কয়েক মুহূর্তে মধ্যেই

ব্যাপারটি তাঁর কাছে খোলসা হয়ে গেল। শিকারীর ফাঁদে আটক হয়েছে সে।

ইয়া তাগড়াই, একদম আফ্রিদি দৈত্যের মাফিক এক আদমি রশি টেনে তার কাছে এল। মুখে তার জল্লাদের হাসি। সে বদর বাসিম-এর পায়ে ফাঁস খুলে এক ঝটকায় তাকে কাঁধে তুলে নিল। মুখে তার সুলতানিয়ৎ বিজয়ের হাসি। হবে না-ই বা কেন? সক্কালে ফাঁদ পাততে না পাততেই যদি ইয়া বড়া উটপাখি দাঁও মারা যায় তবে কার না মুখে হাসি ফুটে ওঠে? বাজারে এর গোস্ত বেচে কি পরিমাণ মুনাফা লুটতে পারবে ভেবেই তার দিমাক খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল।

পথ চলতে চলতে শিকারীটি ভাবল, হাটে এর গোস্ত বিক্রিবাটা করে যে দাম মিলবে তার চেয়ে ঢের দাম মিলতে পারে যদি সুলতান বাদশার দরবারে হাজির করা যায়। এরকম তাগড়াই উটপাখি দেখামাত্রই একদম লুফে নেবে, দামের ব্যাপারে চিন্তা করবে না।

শিকারী উটপাখিরূপী বদর বাসিম'কে কাঁধে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বাদশাহের দরবারে হাজির হ'ল। ইয়া দশাসই চেহারার পাখি দেখে বাদশাহের লোভ হ'ল। প্রচুর ইনাম বকশিষ দিয়ে তিনি পাখিটিকে খরিদ ক'রে ইয়া পেল্লাই এক খাঁচার ভেতরে বন্দী ক'রে রাখল। আর পাখিটার চোখ, মুখ ও ঠোঁটের আকৃতির অদ্ভুতত্ব তাঁকে মুগ্ধ করল।

বাদশাহ এক খোজা নফরকে দিয়ে অন্দরমহলে বেগম সাহেবাকে খবর পাঠালেন, অত্যাশ্চর্য পাখিটিকে একবারটি দেখে যাওয়ার জন্য।

বাদশাহের তলব পেয়ে বেগম সাহেবা ছুটে এলেন। পাখিটির কাছাকাছি এসেই থমকে গেলেন। ব্যস্ত হাতে নাকাবটি টেনেটুনে মুখ ঢাকার কোশিস করতে লাগলেন।

বেগম সাহেবার কাণ্ড দেখে বিলকুল ভড়কে গেলেন। ভাবলেন, আজব কাণ্ড তো! সামান্য একটি পাখি দেখে বেগম সাহেবার মধ্যে এমন ভাবান্তর ঘটল কেন? ব্যাপারটি এমন যে, শরমে বিলকুল কুঁকড়ে যাবার জোগার!

বেগম সাহেবা বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এটি সত্যিই আদৎ উটপাখি নয়। উটপাখিরূপী এক নওজোয়ান বাদশাহ। এর নাম বদর বাসিম। সুলতান শাহরিমান-এর লেড়কা। তার আম্মার নাম আনারকলি। শাহজাদী জানারা একে অভিশাপ দিয়ে উটপাখি বানিয়ে রেখেছে।

বাদশাহ বিস্ময় মাখানো বদর বাসিম-এর দিকে তাকাতে লাগল। এক সময় চিল্লিয়ে উঠলেন—'আল্লাহ, শয়তানী শাহজাদী জানার'কে সমুচিত সাজা দাও!'

সুলতানের বেগম যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী। তিনি নিজ লব্ধ বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে বিলকুল ঘটনা যেন চোখের সামনে এক এক ক'রে দেখতে পেলেন। তিনি খুবসুরৎ লেড়কি জানারা'কে আপন ক'রে পাবার জন্যে বদর নাসিম-এর পানির মুলুকে যাবার পর থেকে শুরু ক'রে শিকারীটির সঙ্গে সুলতানের দরবারে আসা পর্যন্ত ঘটনা হুবহু সুলতানের দরবারে পেশ করলেন।

সুলতান এবার বদর বাসিম-এর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার, বেগম সাহেবা যা কিছু বল্‌লেন সব সাচ্চা?'

উটপাখিরূপী বদর বাসিম ঘাড় কাৎ করে জানাল, বিলকুল সাচ্চা বটে।'

বদর বাসিম-এর দুঃখে সুলতানের কলিজা কঁকিয়ে ওঠে। তিনি যার পর নাই মর্মাহত হলেন। বেগমকে বললেন—'বেগম সাহেবা, তুমি লব্ধ যাদুবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে নসীববিড়ম্বিত বাদশাহকে ফিন মনুষ্যরূপ দান কর।'

বেগম গণ্ডুষ ভরে পানি নিয়ে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়ালেন। তারপর সে-মন্ত্রঃপূত পানি উট পাখিরূপী বদর বাসিম-এর গায়ে ছিটিয়ে দেয়ামাত্র সে আগেকার সে-খুবসুরৎ শরীর ফিরে পেল।

বাদশাহ এবার তাকে পাশে বসিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার অতীত-জীবনের বিলকুল ঘটনা শুনলেন।

বদর বাসিম বাদশাহের কাছে নিজের মুলুকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। বাদশাহ খুবসুরৎ একটি নৌকার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন, সে সঙ্গে নিজের মুলুকের এমন কিছু সামগ্রী দিয়ে নৌকা বোঝাই করে দিলেন যা অন্য কোন মুলুকে, বিশেষ করে বদর বাসিম-এর মুলুকে একদম মেলে না।

আল্লাহ-র নাম নিয়ে মাঝিরা নৌকা ছাড়ল। পালে বাতাস পেয়ে নৌকাটি তরতর ক'রে এগিয়ে চলল মাঝ দরিয়ার দিকে।

পাঁচ-পাঁচটি দিন বদর বাসিম-করে নির্বিবাদেই কাটল। ষষ্ঠ দিন দুপুর গড়াতে না গড়াতেই দরিয়ার বুকে প্রবল তুফান দেখা দিল। পানি ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ব্যস, নৌকাটি ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোচার খোলার মাফিক বার-কয়েক ওঠা নামা করতে করতে এক সময় তলিয়ে গেল। ব্যস, উত্তাল-উদ্দাম দরিয়ার বুকে পড়ে কে যে কোথায় তলিয়ে গেল হদিস পাওয়া গেল না। বাসিম নৌকার এক ভাঙা টুকরো আঁকড়ে ধরে নসীব সম্বল ক'রে ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলল।

বাসিম কতক্ষণ যে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পেরেছিল কিছুই তার ইয়াদ নেই। আর কখন যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল তা-ও বলতে পারবে না।

যখন বাসিম-এর সংজ্ঞা ফিরে এল তখন চোখ মেলে তাকাতেই

দেখল কাদা মাখামাখি হয়ে দরিয়ার কিনারে বালির ওপর সে শুয়ে রয়েছে। তার গায়েই অনুচ্চ এক পাহাড়। সে কোনরকমে উঠে বসল। গায়ে গতরে অসহ্য ব্যথা। সারারাত্রি যে শরীরের ওপর দিয়ে অমানুষিক ধকল গেছে এ তারই ফল।

কিছু সময় গালে হাত দিয়ে বসে বদর বাসিম ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে লাগল। এমন সময় দেখা গেল ঘোড়া, গরু, খচ্চর আর গাধার একটি দল তার দিকে এগোচ্ছে। ডরে তার কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। ভাবল, এতগুলো জানোয়ার যদি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে এক লহমাতেই আব্বার দেয়া জানটি বিলকুল খতম হয়ে যাবে।

ডরে কাঁপতে কাঁপতে সে হারা উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল। এক সময় হাজির হ'ল অজানা-অচেনা এক হাটে। হাটের শুরুতেই এক বুড্ডা হেকিমের দাওয়াখানা দেখল। জানের মায়ায় সে সেখানেই ঢুকে গেল।

তার হালৎ দেখে বুড্ডা হেকিমের মায়া হ'ল। দুপুরে সে তাকে সঙ্গে ক'রে নিজে মকানে নিয়ে গেল। এক নফর খানা দিয়ে গেল। খানাপিনা সারতে সারতে বুড্ডা হেকিম বল্‌ল—'বেটা, এ-নগরের নাম যাদুনগরী। এখানকার শাসকের নাম বেগম আল সানখ। তিনি নিজেও এক প্রখ্যাত যাদুকরী। তাঁর যাদু বিদ্যার খ্যাতি তামাম দুনিয়া জুড়ে। আদতে তিনি এক দানবী। যাদুবিদ্যার বলে মনুষ্য-নারী রূপ পরিগ্রহ ক'রে তখত আগলে রেখেছে। তাঁর একটিই দোষ। অসাধারণ কামুক প্রকৃতির। কামজ্বালায় তাঁর কলিজা যেন হরদম ছটফট করতে থাকে।

দুনিয়ায় এমন কোন মরদ নেই যে, তার কাম-ক্ষুধা মিটিয়ে তৃপ্ত করতে পারে। তার সবচেয়ে বড় কাজ, এ-দ্বীপে যারা পা দেয় তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে তাগড়াই নওজোয়ানকে বন্দী ক'রে নিয়ে এসে প্রাসাদের ফাটকে আটক ক'রে রাখে। দিনের পরদিন তাকে দিয়ে নিজের কাম-জ্বালা নেভায়। সে আদমি যখন বিলকুল কমজোরী হয়ে পড়ে তখন তাকে যাদুবলে জানোয়ার বানিয়ে দেয়। নিজেও সে জাতের মাদী জানোয়ারের রূপ ধারণ করে। ফিন চলতে থাকে সম্ভোগের খেল। একদিন জানোয়ারটিও কাহিল হয়ে পড়ে। তখন জানোয়ারটিকে ভাগিয়ে দেয়। সে জানোয়ারই থেকে যায়। আর নিজে মনুষ্য মূর্তিতে ফিরে আসে।

একটু দম নিয়ে বুড্ডা হেকিম ফিন বলতে লাগল—'তুমি যে-জানোয়ারদের ডরে কুঁকড়ে গিয়েছিলে তারা কিন্তু আদৎ জানোয়ার নয়, বেগম সাহেবার যাদুমন্ত্রের ফসল। তারা কোশিস করছিল তুমি যাতে এ-নগরে ঢুকে তাদের মাফিক যাদুকরী বেগমের খপ্পরে না পড়। তোমার নসীব যে তোমাকে এখানে টেনে আনবেই বেটা। তুমি জোয়ান মরদ। মোটামুটি তাগড়াইও বটে। আর চেহারা ছবি তো জরুর খুব সুরৎ। তোমাকে দেখামাত্রই মরদখেকো কামজ্বালায় জর্জরিতা যাদুকরীর কলিজার ছটফটানি শুরু হতে বাধ্য।'

বাসিম-এর শুকনো পাণ্ডুর মুখের দিকে এক লহমায় তাকিয়ে নিয়ে বুড্ডা হেকিম এবার বলল—'ঘাবড়াও মাৎ বেটা। আমিও যাদুবিদ্যা রপ্ত করেছি। যাদুর এমন সব মার প্যাচ রপ্ত করা আছে যা ঝেড়ে দিলে বেগম আলমানখ একদম কুপোকাৎ হয়ে যাবে। তবে সচরাচর আমি এ-বিদ্যা প্রয়োগ করি না। আদৎ ব্যাপার, আমি একজন সাচ্চা মুসলমান। রোজা, নামাজ আর কোরাণ শরিফ

প্রভৃতি নিয়েই পড়ে থাকি। কোরাণের নির্দেশ, বিশেষ বিদ্যা যেন কেউ আদৎ কাজে ব্যবহার না করে। নইলে—'

বুড্ডা হেকিমের বক্তব্য শেষ হবার আগেই প্রায় এক সহস্র লেড়কির একদল তার মকানের সদর-দরওয়াজায় হাজির হ'ল। তারা মুহূর্তের মধ্যে দু'দলে বিভক্ত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দরওয়াজার দু'ধারে খাড়া হয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই ঝলমলে বাদশাহী পোশাকে সুসজ্জিতা বেগম আলমানখ ঘোড়ার পিঠে চেপে সেখানে হাজির হলেন।

মকানে ঢুকে তিনি গটমট ক'রে এগিয়ে গিয়ে বুড্ডা হেকিম ও বদর বাসিম-এর কামরায় হাজির হলেন। লোলুপ দৃষ্টিতে বাসিম'কে দেখতে লাগলেন। বাসিম চোখ তুলে তাকানো মাত্র তাকে আচমকা চোখের বাণ মেরে বসল।

বেগম সাহেবা এবার বুড্ডা হেকিমকে জিজ্ঞাসা করল —'আবদ-অল রহমান সাহাব, এ খুবসুরৎ নওজোয়ানটির ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। এ কে, বলুন তো?'

বুড্ডা হেকিম নির্দ্বিধায় জবাব দিল—'আমার ভাইপো। আমার মুলুক থেকে ভেট করতে এসেছে। জরুরী কিছু বাৎচিৎ আছে তাই—'

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' পঁয়তাল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, বুড্ডার বাৎ শুনে বেগম মরদখেকো বেগম আলমানখ-এর কলিজাটি আচমকা যেন কেমন দড়কচা মেরে গেল। পরমুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে এবার বল্‌লেন—'লেড়কাটিকে আমার বহুৎ পছন্দ। যদি কসুর না করেন তবে মাত্র একটি রাত্রের জন্য আমি একে আমার প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, কোন রকম ফাজিল কাজ ওকে দিয়ে করাব না।'

—'তবে? তবে একে কি জরুরৎ বলবেন তো?'

—'বিশোয়াস করুন রহমান সাহাব, নওজোয়নটিকে সামনে বসিয়ে রাতভর তার সুরৎ নিরীক্ষণ করব। পাশাপাশি বসে বাৎচিৎ করব আর গানা-বাজনা করব। আর কিছুই করব না, কসম খাচ্ছি। আপনি নির্দ্বিধায় মাত্র একটি রাত্রের জন্য একে আমার জিম্মায় রাখতে পারেন। আদৎ ব্যাপার, এক দেখেই আমার কলিজা দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

বুড্ডা হেকিম জুলজুল ক'রে তাকিয়ে বল্‌ল—'দেখুন বেগম সাহেবা, একে আপনার জিম্মায় এক রাত্রির জন্য দিতে আমার আদৌ অমত নেই। তবে ইয়াদ রাখবেন, ভুলেও যেন এর ওপর যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করার কোশিস করবেন না। যদি জবানের হেরফের হয় তবে কিন্তু ফল জরুর আচ্ছা হবে না। কারণ, আপনার চরিত্র যে আমি হাড়ে হাড়ে জানি।'

—'ছিঃ ছিঃ! কি যে বলেন রহমান সাহাব! কসম যখন খেলাম তখন নিঃসন্দেহ হতে পারেন, খারাপ কিছুই করব না।'

এবার তার হাতে এক হাজার দিনারের থলি গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—'আপনার সেলামী।'

এবার বাসিম'কে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বেগম নিজের প্রাসাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

বাসিম প্রাসাদের ভেতরে পা দিয়েই বিলকুল থ বনে গেল।

কামরায় ঢুকেই বেগম তাকে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দিল। তবে হ্যাঁ, কোন দানবিক কায়দা-কসরৎ করার কোশিস সে আদৌ করল না। আদরে-সোহাগে অভিভূত ক'রে তার ভেতরে কামতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলার কোশিস করতে লাগল। বাসিম নিজের সত্তা তিলে তিলে হারিয়ে ফেলে তার হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়তে লাগল। সোহাগ-শৃঙ্গারের যাদুতে সে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ ক'রে ফেল্‌ল। দিনের পর দিন কামকলা প্রয়োগ করে করে সে নিজেকে বিলকুল পাকিয়ে ফেলেছে।

বাসিম বুড্ডা হেকিমের মুখে তার চরিত্রের এ-বিশেষ দিকটির ব্যাপারে আগেই সব জেনে নিয়েছিল। তাই নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখার সাধ্যাতীত প্রয়াস সে চালিয়েছিল। লেকিন পুরুষের কলিজায় কামতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলার রতিরঙ্গ এবং কায়দা-কসরৎ প্রয়োগের কাছে তার মানসিক দৃঢ়তা মুহূর্তে একদম নস্যাৎ হয়ে গেল।

আজব ব্যাপার! সে আনন্দ লাভ করতে যেমন ওস্তাদ তেমনি আনন্দ দান করে পুরুষকে মাতোয়ারা করে তুলতেও সমান দক্ষ। তার কায়দা-কসরৎ-এর কাছে যেকোন বীর্যহীন পুরুষও তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠবে। সম্ভোগসুখ লাভের জন্য ছটফট করতে থাকবে। রাতভর রতিসঙ্গ লাভ করেও বাসিম-এর মনে হতে লাগল, কিছুই যেন পাওয়া হ'ল না। আরও বহুৎ, বহুৎ পাওয়ার রয়ে গেছে।

সকাল হ'ল। বাসিম নড়তেই চাইল না। তার পরদিনও সে নারীটির থলথলে গোস্তের পিণ্ডটি নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে রইল। তবে সে দুষ্টুমি ক'রে বলেছিল—'কি গো, বিলকুল মজে গেলে যে! রাতভর তো আমার দেহের মধু নিঙড়ে নিঙড়ে ছিবড়ে করে ছাড়লে, পিয়াস মেটে নি? ওদিকে তোমার চাচাজী যে তোমার জন্য হা পিত্যেশ জুড়ে দিয়েছেন। এবার আমাকে ছেড়ে বিদেয় হবার জন্য তৈরী হও।

বাসিম আরও দৃঢ়ভাবে দু'হাতে নিজের প্রশস্ত বুকের মধ্যে তাকে চেপে ধরে। তার থলথলে স্তন দুটো পিষ্ট হতে হতে তার
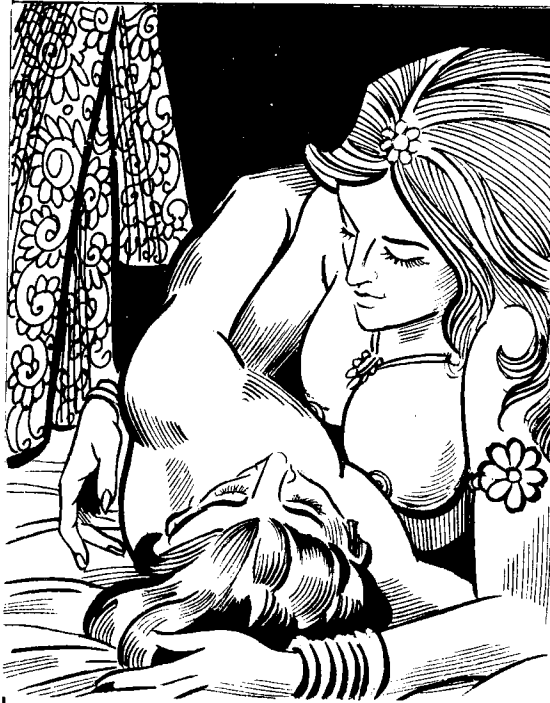
বুকের সঙ্গে একদম লেপ্টে যায়। মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে—'চাচাজীর ভাবনা চাচাজী ভাবুন গে। আমার কাজ আমি করে যাই।' বলতে বলতে আলমান্‌খ-এর রক্তিম ঠোঁটে চুম্বন করল। তার নিচের ঠোঁটটি নিজের মুখের ভেতরে পুরে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে চুষতে লাগল। খানিকবাদে মুখ সরিয়ে নিয়ে আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌ল—'কি যে বল সুন্দরী, এ-তৃপ্তি ছেড়ে দিয়ে চাচাজীর অনুগত ভাতিজা সাজতে আমি মোটেই রাজী নই। চাচাজী যা-ই বলুন, তুমি আমাকে যা-ই ভাব না কেন, এ সুখ ছেড়ে এক পা-ও আমি নড়ছি না। জিন্দেগীভর তোমাকে এভাবে জড়িয়ে পড়ে থাকব।'

—'জিন্দেগীভর!' আলমান্‌খ খিল খিল করে হেসে ওঠে।

—'হ্যাঁ, আলবাৎ জিন্দেগীভর। যে মধুর রসের স্বাদ তুমি আমাকে দিয়েছ তা ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় সুন্দরী।'

লেড়কিটি ফিন পুরোদমে রঙ্গরসে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। এক-দুই-তিন ক'রে পুরো চল্লিশটি রাত্রি রতিরঙ্গের মধ্যে বাসিম গুজরান করে দিল।

বাসিম-এর মধ্যে একদিন একটু-আধটু মস্করা করার লিপ্সা

জাগল। সে সন্ধ্যার আন্ধার নামতে না নামতেই পালঙ্কের ওপর ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে রইল। আলমান্‌খ অন্যরাত্রির মত কেবলমাত্র একটি ফিনফিনে সেমিজ পরে তার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। আদর-সোহাগের মাধ্যমে তার মধ্যে শৃঙ্গারের লিপ্সা জাগিয়ে তোলার কোশিস করতে লাগল।

বাসিম চোখে-মুখে কৃত্রিম বিরক্তির ছাপ এঁকে বল্‌ল—'আজ আমার তবিয়ৎ আচ্ছা নেই। আজকের রাতটা ওসব ছাড়ান দাও। তৃপ্তি ক'রে একটু নিদ যাওয়া যাক।'

অলৌকিক হাসির মাফিক খিল খিল ক'রে হেসে লেড়কিটি বল্‌ল—'তবিয়ৎ আর কতই বা আচ্ছা থাকবে। আদমির শরীর তো বটে। রাতের পর রাত এক নাগাড়ে ধস্তাধস্তি চালাচ্ছ। ধকল আর কত সইবে? বহুৎ আচ্ছা, আজ তোমার আরামের রাত। ঘুমাও।'

বাসিম আধ-বোজা চোখে ঝিম মেরে পড়ে রইল। মাঝরাতে লেড়কিটি পালঙ্ক থেকে নেমে সামান্য বার্লি নিয়ে পানি দিয়ে গুলে সরবৎ বানাল। তারপর তার সঙ্গে কি যেন গুঁড়ো সামান্য মেশায়। কাজ সেরে পাত্রটি রেখে দিয়ে বাসিম-এর পাশে আলতোভাবে শুয়ে পড়ে।

কাকডাকা ভোরে বাসিম শয্যা ত্যাগ করল। হাজির হ'ল বুড্ডা হেকিমের মকানে। তার কাছে পুরো ব্যাপার খোলসা ক'রে বল্‌ল। সব শুনে বুড্ডা গোস্‌সায় একদম জ্বলে উঠল। সে ফোঁস ক'রে উঠল—'রাক্ষসী! শয়তানের বাচ্চা কাঁহিকার! আমার সঙ্গে বেইমানি করলি!' এবার বাসিম-এর হাতে একটি পিঠে দিয়ে বল্‌ল—'এটা নিয়ে যাও। তার কামরায় গিয়ে দেখবে শয়তানের বাচ্চাটি নাস্তা সাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। রেকাবি দুটোতে হরেক কিসিমেরই একটি ক'রে পিঠে রয়েছে, দেখবে। তুমি কিছুতেই পিঠে মুখে তুলবে না, তাতে মন্ত্রঃপূত মধু মেশানো রয়েছে। ইয়াদ থাকে যেন, মুখে দিলেই তুমি গাধা বনে যাবে। তুমি কৌশলে তার রেকাবি থেকে পিঠেটি সরিয়ে তোমার রেকাবিতে রাখবে, আর তোমারটি দেবে তাকে। প্রয়োজনে তুমি এ-পিঠেটি খাবে। কোর্তার জেবে ক'রে এ-পিঠেটি নিয়ে যাও। ইয়াদ রাখবে, কায়দা-কসরৎ ক'রে কোনরকমে কাজ হাসিল করতে পারলে তোমার বদলে সে নিজেই গাধা বনে যাবে। ব্যস, তারপর তার পিঠে চেপে সোজা আমার কাছে চলে আসবে। তারপরের বন্দোবস্ত যা করার আমিই সারব। যাও, হুঁশিয়ার হয়ে কাজ সারবে।'

বাসিম আলমান্‌খ-এর প্রাসাদে হাজির হতেই সে তার হাতে নাস্তা তুলে দেয়। প্রথমে একটি পিঠে দিল। বাসিম সেটি ভেঙে একটি টুকরো মুখে ফেলার ভঙ্গি ক'রে কোর্তার জেবে ফেলে দেয়। সুযোগ বুঝে রেকাবির পিঠে বদলাবদলি ক'রে ফেল্‌ল। আলমান্‌খ টেরও পেল না কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল। এদিকে বাসিম পরম

নিশ্চিন্তে পিঠে চিবোতে লাগল। আলমান্‌খ পিঠে চিবোতে চিবোতে আগের রাত্রে বানিয়ে রাখা বার্লির সরবৎ থেকে খানিকটা হাতে নিয়ে আচমকা বাসিম-এর গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'তুই গাধা বনে যা!'

আজব ব্যাপার। আলমান্‌খ বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। বাসিম পিঠেটি খেল, মন্ত্রঃপূত বার্লির সরবৎ তার গায়ে ছিটিয়ে দেয়াও হ'ল, লেকিন তার অবয়বের কিছুমাত্রও পরিবর্তন তো হ'ল না।

বাসিম চিল্লিয়ে ওঠে শয়তানীর বাচ্চা! আমাকে গাধা বানিয়ে মজা লুটবি, তাই না? দাঁড়া তোর দাওয়াই দিয়ে তোরই ইলাজের বন্দোবস্ত করছি।' কথা বলতে বলতে হাতে মন্ত্রঃপূত বার্লির সরবৎ নিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'তুই গাধা বনে যা।'

ব্যস, মন্ত্রঃপূত বার্লির সরবৎ আর পিঠার কাজ শুরু হয়ে গেল। আলমান্‌খ ধীরে ধীরে গাধার অবয়ব ধারণ করল। বিলকুল সাচ্চা এক গাধা।

বাসিম এবার গাধাটির পিঠে চেপে বুড্ডা হেকিম শেখ আবদ অল রহমান-এর দাওয়াখানায় হাজির হ'ল।

গাধার পিঠে বাসিম'কে দোকানের সামনে দেখেই বুড্ডা হেকিম গোস্‌সায় কাঁপতে কাঁপতে একলাফে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেই সজোরে গাধাটির মুখে এক লাথি বসিয়ে দিল। গাধারূপিণী আলমান্‌খ যন্ত্রণায় নিদেন ডাক ছাড়ল।

বুড্ডা হেকিম গর্জে উঠল—'শয়তানীর বাচ্চা কাঁহিকার! আমার সঙ্গে বেইমানি করার সাধ তোর জিন্দেগীর মত মিটিয়ে ছাড়ব। বুড্ডা এবার বাসিম'কে বল্‌ল—'বেটা, তোমার আম্মা তোমার অদর্শনে বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছেন। আগে তোমাকে তোমার মুলুকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করি। তারপর এক এক ক'রে নসীব বিড়ম্বিত ভিনদেশী নওজোয়ানদের ফিন আদমির অবয়ব ফিরিয়ে দেব।

বুড্ডা এবার অনুচ্চ কণ্ঠে কি যেন সব বল্‌ল। এক অতিকায় আফ্রিদি দৈত্য তার সামনে এসে করজোড়ে খাড়া হ'ল। তাকে হুকুম দিল—'এ-বাদশাহকে তার মুলুক শ্বেতশহরের প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে এসো। ইয়াদ থাকে যেন, এর কোন তকলিফ হলে জান একদম খতম করে দেব।'

আফ্রিদি দৈত্য বাসিম'কে পিঠে চাপিয়ে পরম যত্নে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শ্বেতশহরে তার প্রাসাদে পৌঁছে দিল।

একমাত্র লেড়কা বাসিম'কে ফিরে পেয়ে তার আম্মা আনারকলি-র মুখে হাসির ছোপ ফুটে উঠল। লেড়কাকে বুকে নিয়ে আদরে-সোহাগে অভিভূত ক'রে তুল্‌ল। দু'চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল আনন্দাশ্রুর ধারা।

দু'দিন বাদে বাসিম-এর মামা সালিহ তাদের প্রাসাদে এল। বাসিম তার দীর্ঘদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা সবার কাছে ব্যক্ত করল। সব শেষে বল্‌ল—'মামাজী, আমি কিন্তু জানারা'কে শাদী করার ইচ্ছা এখনও দিল্‌ থেকে মুছে ফেলতে পারি নি। তুমি আমাদের শাদীর বন্দোবস্ত কর।'

—'আজ আর জানারা'কে পাওয়া কোন সমস্যাই নয়। তার আব্বা সুলতান সামানদাল আমার ফাটকে আটক রয়েছেন। বহুৎ আচ্ছা, তাকে এখানে হাজির করার বন্দোবস্ত করছি।'

সালিহ-র হুকুমে এক প্রহরী পানির মুলুক থেকে কয়েদী সামানদাল'কে বাসিম-এর প্রাসাদে হাজির করল।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সালিহ সামানদাল'কে বল্‌ল—'শাহেন-শাহ, আমার একমাত্র খুবসুরৎ নওজোয়ান ভাগ্নে আপনার লেড়কি জানারা'কে শাদী করতে আগ্রহী। আশা করি আপনি হাসিমুখে এর হাতে আপনার লেড়কিকে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করবেন।'

সামানদাল উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠল—'বহুৎ আচ্ছা! বদর বাসিম'কে জামাতা করতে পারলে আমি যারপরনাই খুশী হ'ব। আমি এক পায়ে খাড়া। তুমি বন্দোবস্ত কর।'

সুলতান সামানদাল-এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি পেয়ে সালিহ এবার এক প্রহরীকে পাঠাল শাহজাদী জানার-এর তাল্লাশ ক'রে
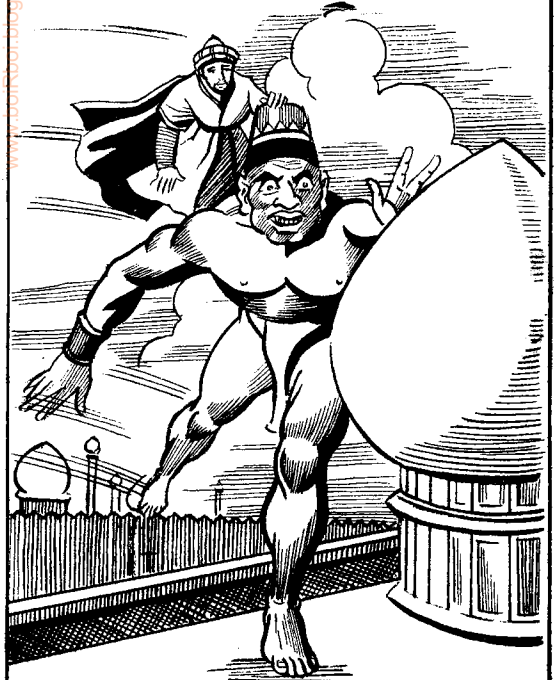
প্রাসাদে হাজির করতে।

প্রহরী শাহজাদী জানার'কে নিয়ে হাজির হ'ল। সালিহ আনারকলি-র সঙ্গে জানার-এর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সোল্লাসে বল্‌ল—'বহিনজী, এই তোমার বেটার বৌ হতে চলেছে। ভাল ক'রে দেখে নাও, তোমার বেটার পছন্দ কেমন।'

সুলতান সামানদাল বল্‌লেন—'বেটি, আমি এদের জবান দিয়েছি। আশাকরি আমার জবান খেলাফ হয় এমন কোন কাজ তুমি অবশ্যই করবে না। তবে আমি এটুকু তোমাকে জোর দিয়েই বলতে পারি, বদর বাসিম তোমার যোগ্য পাত্র।'

আব্বাজীর বাৎ শুনে জানারা সলজ্জ ভঙ্গিতে মুখ অবনত করল। তার চোখের মুখের ভাষা বুঝিয়ে দিল, বাসিম-এর কণ্ঠে বরমাল্য পরিয়ে দিয়ে তাকে স্বামীত্বে বরণ ক'রে নিতে, তামাম জিন্দেগীর জন্য তাকে সঙ্গী ক'রে নেয়ার তার কিছুমাত্রও আপত্তি নেই।

শাহজাদী জানারা-র সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদে খুশীর জোয়ার বইতে শুরু করল।

সন্ধ্যার আন্ধার নেমে আসতে না আসতেই নগরের সবচেয়ে বড় কাজী হাজির হলেন। শাদীর কবুলনামা বানালেন। সাক্ষীসাবুদরা কবুলনামায় দস্তখত করলেন। বাসিম আর জানারার শাদী-পর্ব বিলকুল হাসি-আনন্দের মধ্যে মিটল।

কিস্‌সা শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। বাদশাহ শারিয়ার-এর অনুরোধে বেগম শাহরাজাদ 'সুবাদার আমির মহম্মদের কিস্‌সা' নামে এক শয়তান লম্পটের কিস্‌সা শুরু করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিলেন।

সুবাদার আমির মহম্মদের কিস্‌সা

কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কাইরোর সুবাদার আমির মহম্মদ একদিন আমার কাছে কিস্‌সাটি পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর জবানী অনুযায়ীই কিস্‌সাটি আপনার দরবারে পেশ করছি।

কায়রোর সুবাদার আমীর মহম্মদ তখন মিশরের উত্তরাংশে ভ্রমণ করছিলেন। এক রাত্রে তিনি সেই-মুলুকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষক ফাল্লা-র মেহমান হয়ে তার মকানে রাত্রিবাস করেছিলেন। ফাল্লা ছিলেন একদম বুড্ডা। তার গায়ের রঙ ছিল তামাটে। একটি ব্যাপার সুবাদার সাহাব লক্ষ্য করলেন, তার গায়ের রঙ তামাটে হলে কি হবে, তার বালবাচ্চারা সবাই সফেদ। একদম সফেদ।

সুবাদার সাহাব আমতা আমতা ক'রে বল্‌লেন—'ফাল্লাজী, যদি কসুর না মানেন তবে একটি প্রশ্ন করি।'

বুড্ডা ফাল্লা ফোকলা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'এত ইতঃস্ততের কি আছে? কি আপনার জিজ্ঞাস্য নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।'

—'একটি ব্যাপার আমার কাছে আজব মালুম হচ্ছে, আপনার গায়ের রঙ গাঢ় তামাটে। লেকিন আপনার বালবাচ্চারা এমন মাত্রাতিরিক্ত সফেদ হ'ল কি ক'রে?'

—'ও এই ব্যাপার? শুনুন তবে বলছি সাহাব এদের আম্মা ফ্রাঙ্ক জাতির লেড়কি। আমি তাকে খুবই অল্প দামে খরিদ করেছিলাম। মাত্র দশ দিনারের বিনিময়ে, সে ছিল আদতে এক লড়াইয়ের বন্দিনী। হিতিন-এর লড়াইয়ে খ্রীষ্টানদের সালা অল দিন পরাজিত করে বহুৎ পুরুষ ও জেনানাকে বন্দী করেছিলেন। তাদেরই একটি আমার বরাতে জুটেছিল ধরে নিতে পারেন সাহাব। আর খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমার সে দুঃসাহসিক ও অত্যাশ্চর্য অভিযানের কিস্‌সা আপনার সামনে তুলে ধরছি, তবেই বিলকুল ব্যাপারটি খোলসা হয়ে যাবে।'

সাহাব, আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি একজন কৃষক। সাচ্চা কৃষক। শন চাষ ক'রে দিন গুজরান করি। আমার পূর্বপুরুষরাও একই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।

বহুৎ দিন আগে আমার জমিনে এক সালে বহুৎ আচ্ছা শন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। কাড়ি কাড়ি দিনার মুনাফা হবে আশা ছিল। লেকিন বিক্রিবাট্টা করতে গিয়ে একদম তাজ্জব বনে গেলাম। ব্যাপারী এমন দাম হাঁকল যাতে মুনাফা তো দূরের ব্যাপার প্রচুর দিনার লোকসানের বোঝা ঘাড়ে চেপে যাওয়ার জোগাড়।

দু'চারজন ইয়ার-দোস্ত আমাকে পরামর্শ দিল, এক কাম কর, সিরিয়ার একর নগরে তোমার শন নিয়ে যাও, প্রচুর মুনাফা পিটতে পারবে। আমি করলামও তা-ই।

তখন একর নগর ছিল ফ্রাঙ্কদের অধিকারে। তবে সেখানে আমার শন টেনে নিতে তকলিফ হ'ল ঠিকই। লেকিন মুনাফা হ'ল আশাতীত। তবে আধাআধি মাল এক দালালকে দু' মাসের জন্য ধারে দিতে হ'ল।

এক সকালে এক নওজোয়ান ফ্রাঙ্ক লেড়কি আমার দোকানের দরওয়াজায় এসে দাঁড়াল। তার সাজপোশাকের হালৎ দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। সামান্য ছেঁড়াফাঁটা পোশাকে কোনরকমে শরম সামলিয়েছে। ব্যস, আর যা কিছু একদম উদোম। লেড়কিটির সুরৎ দিলে ধরার মত বটে। গায়ের রঙ সফেদ, একদম ধবধবে সফেদ। সে যত সময় আমার সামনে ছিল প্রায় সব সময়ই কামকাজের ফাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে তার ছেঁড়া-ফাঁটা পোশাকের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়া যৌবনচিহ্নগুলোকে সাধ্যমত দেখে ফয়দা লোটার কোশিস করছিলাম। সে যে কয়েক আঁটি শন আমার কাছ থেকে খরিদ করেছিল আমি বাজার দরের চেয়ে একদম কম দামই নিয়েছিলাম। মাল বুঝে নিয়ে সে ফিক্ ক'রে হাসল। ব্যস, আমার

কলিজায় জ্বালা ধরে গেল।

ক'দিন যেতে না যেতেই ফ্রাঙ্ক লেড়কিটি ফিন আমার দোকানে এল শন খরিদ করতে। আমি যে তার সুরৎ দেখে মজে গেছি তা সে ঠাহর করতে পেরেছে। দেখলাম, এক বুড্ডিকে সঙ্গে নিয়ে এবার সে হাজির হয়েছে।

আমি লক্ষ্য করলাম বুড্ডিটি আমার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে। বিলকুল অর্থপূর্ণ তার দৃষ্টি। লেকিন মুখে কিছুই প্রকাশ করল না।

লেড়কিটি তারপর আরও বেশ কয়েকবার আমার দোকানে আসে। তার লোক দেখানো উদ্দেশ্য শন খরিদ করা। আমার কলিজা বারবার মোচড় মেরে উঠতে থাকে। খুনে লেগে যায় মাতন।

এক সকালে লেড়কিটি সে-বুড্ডিকে নিয়ে আমার দোকানে হাজির হ'ল। বুড্ডিটি এক আবডালে দাঁড়িয়েছিল। সুযোগ বুঝে তার দিকে গুটি গুটি এগিয়ে এলাম। প্রায় ফিস ফিসিয়ে বল্‌লাম—'লেড়কিটির সঙ্গে একটু আলাপটালাপের বন্দোবস্ত ক'রে দাও না গো। কসম খাচ্ছি, এর জন্য তুমি কিছু চাইলে জরুর পাবে।

বুড্ডি রাজী হ'ল। তবে একটি শর্তে—ব্যাপারটি একদম তোমাদের দু' জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তৃতীয় কোন আদমির কানে যেন না যায়, রাজী?'

—'কসম খাচ্ছি, আমি অন্তত কারো কাছে ফাঁস করব না। অর্থকড়ির পরোয়া আমি করি না। আমি তার পেয়ার মহব্বতের কাঙাল। তুমি বন্দোবস্ত ক'রে শুধু আমাকে দিন, সময় আর জায়গার কথা জানিয়ে দেবে। ব্যস, আমি ঠিক হাজির থাকব।' কথা বলতে বলতে আমি তার হাতে পঞ্চাশটি দিনার ধরতে গেলে উপযাচক হয়েই তুলে দিলাম। সে অধিকতর গলা নামিয়ে বল্‌ল—'ঠিক আছে, দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে এখনই যদি বলে দিতে পারি।'

একটু বাদে ফিরে এসে বুড্ডি বল্‌ল—'না গো, ওর তেমন কোন জানাশোনা জায়গা নেই। এক কাজ কর না, তোমার কামরায়ই বন্দোবস্ত কর। সন্ধ্যার পর আমিই পৌঁছে দিয়ে যাব। ফিন খুব ভোরে, লোকজন ওঠার আগে নিয়ে চলে যাব, কি বল?'

—'তাতে অসুবিধার কিছু নাই। আমি একলাই থাকি। ঝামেলা বা কারো জানাজানির সম্ভাবনা নেই।'

সেদিন সময় মতই বুড্ডিটি তাকে আমার কামরায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। আমি তাকে নিয়ে সোজা ছাদের ওপর চলে গেলাম। সতরঞ্চি পেতে পাশাপাশি বসলাম। খানাপিনা সারলাম এক সঙ্গে। পেয়ালা পেয়ালা সরাব সাবাড় করলাম।

সেটি ছিল চাঁদনী রাত। দরিয়ার ফুরফুরে বাতাস রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলছিল। হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মালুম হ'ল। ভাবলাম আমি এক সাচ্চা মুসলমান হয়ে আল্লাহ-র বাণী ভুলে গিয়ে এক খ্রীষ্টান লেড়কিকে নিয়ে রাত্রি কাটানোর লালসার শিকার হচ্ছি! ইয়া আল্লাহ! কী শরমের ব্যাপার!

রাত্রি একটু গভীর হতেই আমরা পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। সতর্কতার সঙ্গে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখলাম। আমি নিজেকে অতি কষ্টে হলেও সামলে সুমলে রাখলাম বটে। লেকিন তার মধ্যে নারী সত্তা ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। তার কলিজার জ্বালা তার মধ্যে অস্থিরতা জাগিয়ে তুলছে, ভালই বুঝতে পারলাম। প্রথমে আমার গায়ে একটি হাত রাখল। তারপর মাথায় হাত রেখে চুল নিয়ে খেলা জুড়ে দিল। আরও আছে, নিজের মুখটিকে আমার মুখের ওপর নামিয়ে এনে ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট ছোঁয়ানোর কোশিস করতে লাগল।

আমি আলতো ভাবে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লাম—'আজ নয়। অন্য দিন হবে খন। আজ বরং চাঁদের আলোয় তোমার মুখটি দেখেই রাত্রি গুজরান ক'রে দেই।'

সে-রাত্রে কেউ কাউকে না ছুঁয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

কাকডাকা ভোরে সে-বুড্ডিটি এসে তাকে নিয়ে গেল।

সেদিন দুপুরে লেড়কিটি আমার দোকানের সামনে দিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গেল। তাকে খুবই ক্ষুব্ধ মালুম হ'ল। গোস্‌সায় একদম ফেঁটে পড়ছে। অতৃপ্ত কামনাই তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। তাকে একবারটি বুকে পাওয়ার জন্য আমার কলিজায় লাফালাফি দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। গত রাত্রে যে আমি এত ঔদার্য-মহত্ত্ব দেখিয়েছি সেই আমারই কলিজা এখন অশান্ত হয়ে ওঠায় নিজেই তাজ্জব বনলাম। ভোগ-লালসার মধ্যে যার জিন্দেগী কেটেছে সে হঠাৎ সন্ত-ফকির বনে গেল, আজব কাণ্ড! নওজোয়ান। কাম-তৃষ্ণার দাস। প্রাসাদের খোজাটোজা তো নই। কেন ঝুটমুঠ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে নিজেকে ঠকাতে যাব?

এক ছুট্টে বাইরে বেরিয়ে বুড্ডিটিকে ধরলাম। বল্‌লাম—'আর একটি রাত যাতে ওর সঙ্গে কাটাতে পারি তার বন্দোবস্ত তোমাকে করে দিতেই হবে।'

বুড্ডি তোবড়ানো গালে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, আজ সন্ধ্যার পর পরই পৌঁছে দেব।'

বুড্ডিটি কিন্তু জবান ঠিক রাখল। লেড়কিটিকে সময় মাফিকই হাজির করল। লেকিন সে রাত্রেও আমার মধ্যে আল্লাহ-র বাণী খচ খচিয়ে উঠল। কিছুতেই তাকে সম্ভোগ করতে পেরে উঠলাম না। সে রাত্রিও উপোষ করেই গুজরান করতে হ'ল।
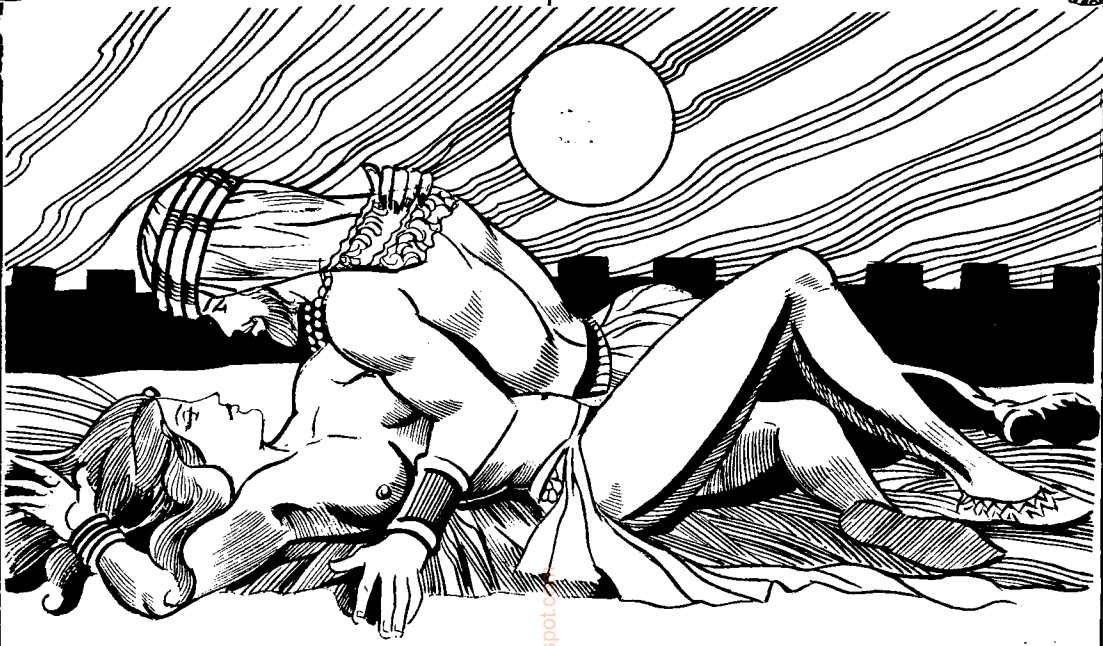
লেড়কিটির মুখ আর চোখের ভাষায় বুঝতে পারলাম, সে আমার ওপর রেগে একদম কাঁই হয়ে আছে। মুখে কুলুপ এঁটে খুব ভোরে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

পরদিন দুপুরে সে ফিন আমার দোকানের সামনে দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আমার বুকের ভেতরে কলিজার উপস্থিতি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে লাগলাম। সে রোষদীপ্ত চোখ দুটো মেলে আমার দিকে তাকিয়ে ফোঁস ক'রে উঠল—'ভগবান যীশুর নামে বলছি, ওহে মুসলমানের বাচ্চা, তোমাদের ধর্ম কি এ-ই শিক্ষা দিয়েছে? এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কিকে পাশে শুইয়ে আল্লাহ-র নাম জপ কর। ভুলেও ভেবো না আর কোনদিন আমাকে কাছে পাবে, ইয়াদ রেখো।'

অনন্যোপায় হয়ে আমি বুড়িডিটিকে ধরে বসলাম। সে-ও দাঁও বসাবার কোশিস করল—'পুরো পাঁচশ' দিনার লাগবে। এক দিনার কম বল্‌লেও হবার জো নাই।'

আমার কলিজায় তখন কামারের হাতুড়ি অনবরত আঘাত হেনে চলেছে। যে কোন মূল্যেই হোক ওকে সম্ভোগ করা চাই-ই চাই। পাঁচশ' দিনার আমার মাফিক আদমির কাছে পাঁচ হাজারের সমান। তবু খুঁজে পেতে হাতিয়ে টাতিয়ে পাঁচশ' দিনার জড়ো ক'রে থলির মধ্যে পুরে বুড়িডিটির কাছে ছুটে যাবার উদ্যোগ নিলাম।

ঠিক সে-মুহূর্তেই তার কানে এল সুলতানের আমির গলা ছেড়ে সনদ ঘোষণা করছেন—মুসলমান ভাইসব শোন, আমাদের নগরে যারা কারবার করছ তাদের যত শীঘ্র সম্ভব কারবার গুটিয়ে নগর ছেড়ে যেতে হবে। এর জন্য মাত্র এক হপ্তার সময় দেয়া হচ্ছে।'

এমন সময় ভোর হয়ে আসায় বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচশ' বাহান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কায়রোর সুবাদার তাঁর কিস্‌সা বলে চলেছেন—সুলতানের আমিরের মুখে সনদের বক্তব্য শুনে আমার তো কলিজা শুকিয়ে ওঠার জোগাড় হ'ল। ব্যস, খ্রীষ্টান লেড়কিটিকে সম্ভোগের চিন্তা আমার শিকেয় উঠল। ব্যস্ত হয়ে কিছু সামানপত্র খরিদ করলাম যা আমার দেশে নিয়ে বেচলে দু'-দশ দিনার মুনাফা হতে পারে। যার কাছে, যা কিছু পাওনাগণ্ডা ছিল তাগাদা চালিয়ে আদায় করার ধান্দা করলাম।

খ্রীষ্টান লেড়কিটির সঙ্গে আমার আর সহবাস করা বরাতে জুটল না। কারণ, সাতদিনের দিন আমাকে সে-জায়গা ছেড়ে দেশের দিকে যাত্রা করতে হ'ল।

আমি প্রথমে দামাস্কাসে এসে আল্লার দোয়ায় সামানপত্র বেচে প্রচুর মুনাফা অর্জন করলাম।

তখন বড়িয়া এক কারবারে লেগে পড়লাম। তাতে বহুৎ মুনাফা। সরকার যুদ্ধ বন্দীদের নিলামে বিক্রি করে দিত। আমি তাদের সস্তা দামে কিনে নিয়ে টুঁড়ে টুঁড়ে চড়া দামে বেচে দু' হাতে মুনাফা পিটতে লাগলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমি একদম দিনারের কুমীর বনে গেলাম। আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় কারবারটি আমার একচেটিয়ায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই মুনাফার কোন মা-বাপ ছিল না। পুরো তিনটি সাল বেপরোয়াভাবে মুনাফা পিটেছি। সাচ্চা ব্যাপার কি, কারবারে আমি এমনই মেতে উঠেছিলাম যে, তখন খ্রীষ্টান লেড়কিটির তসবির আমার দিল্ থেকে অনেকাংশে মুছে গিয়েছিল।

এক বিকালে আজব এক কাণ্ড ঘটল। একটি খুবসুরৎ বাদী নিয়ে সুলতানকে ভেট দিলাম। সুলতান খুশী হয়ে আমাকে একশ' দিনার ইনাম দিতে চাইলেন। খাজাঞ্চী গুণেগেঁথে জানাল, রাজকোষে মাত্র নব্বই দিনার আছে। যুদ্ধের এলাহী কারবার ঠেকাতে রোজ প্রচুর দিনার ব্যয় হচ্ছে। সঞ্চিত দিনার থাকবে কোথা থেকে? সুলতান বাধ্য হয়ে নগদ নব্বইটি দিনার দিয়ে আমাকে বললেন, বাকী দশটি দিনারের বিনিময়ে যুদ্ধ বন্দীদের কাউকে গিয়ে পছন্দ্ মাফিক একটি বন্দী নিয়ে নিতে।

আমাকে লেড়কিদের ফাটকে হাজির করা হ'ল। হাজার খানেক বন্দিনীদের মধ্যে থেকে একটি খুবসুরৎ বন্দিনীকে বাছাই করতে লেগে গেলাম। সেখানে টুঁড়তে টুঁড়তে হঠাৎ এক জায়গায় আমার নজর আটকে পড়ল। আমার পুরনো ক্ষতটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

লেড়কিটির নাম ড্যামজেল। তাকে নিয়ে আমি ফাটক থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমি লেড়কিটিকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি গো সুন্দরী, চিনতে পারছ আমাকে?'

ড্যামজেল ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল—'না, চিনতে পারলাম না তো।'

—'সে কি আমার দোকানে মাল খরিদ করতে যেতে, ইয়াদ নেই? এক বুড্ডিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে। দরিয়ার ধারে এক মকানে কামরা ভাড়া করে আমি বাস করতাম। সে মকানের ছাদে পর পর দু' রাত্রি তুমি আমার সঙ্গে গুজরান করেছিলে। ইয়াদ নেই? হাতের মুঠোয় পেয়েও তোমার ইজ্জৎ, তোমার কুমারীত্ব নষ্ট করি নি, তা-ও কি ইয়াদ নেই? আমার ইচ্ছা ছিল, তৃতীয় রাত্রে তোমাকে ঠিক সম্ভোগ করব, একদম সাচ্চা বাৎ। তোমার বুড্ডির সঙ্গে বাৎচিৎ মিটে গিয়েছিল। পাঁচশ' দিনার দিয়েই তোমাকে নিয়ে গিয়ে রাতভর তোমাকে সম্ভোগ করব। লেকিন সুলতান বিদেশী কারবারীদের সে-মুলুক ছাড়ার সনদ ঘোষণা করায় সাধ পূরণ করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নসীবে না থাকলে যা হয়। আজ মাত্র দশ দিনারে তোমাকে জিন্দেগীর মত লাভ করেছি। ড্যামজেল আজ থেকে তুমি আমার, বিলকুল আমার, মালুম হ'ল?'

—'শোন, সেদিন আমি তোমার দিলের নাগাল পাই নি। তোমার ওপরে বহুৎ গোস্‌সা হয়েছিল, সাচ্চা বটে। কাড়ি কাড়ি দিনার খরচা করে আমাকে নিয়ে গিয়ে নিজে রাতভর উপোষ করে কাটিয়েছ, আর আমার কলিজায়ও জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছ। গোস্‌সা হওয়া কি কোন কসুর? লেকিন কেন, কিছুই আমি মালুম করতে পারি নি। কিছুদিন বাদে অবশ্য ব্যাপারটি আমার কাছে বিলকুল খোলসা হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মের বিধান মানতে গিয়েই তুমি নিজেকে বঞ্চিত করেছিলে আর আমাকে করেছিলে বিলকুল হতাশ। তখনই ইসলাম ধর্মের ওপরে আমার দিলের ধন্দ ঘুচে গেছে। তারপরই আল্লাহ-র কাছে আমি আত্মসমর্পণ করেছি।

আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে বলছি, সে-রাত্রেও আমি তাকে সম্ভোগ করতে পারলাম না। আদতে সে-তো তখনও আমার খরিদ করা বাদী। আগে তাকে মুক্ত করা আমার কর্তব্য। তারপর কাজী ডেকে শাদীর কবুলনামা বানিয়ে শাদী সম্পন্ন করার পর ইয়ে টিয়ে যা কিছু করতে হবে।

একদিন কাজী তলব করে শাদী চুকিয়ে নিলাম। তারপর দামাস্কাসে আমাদের নয়া সংসার পাতলাম।

সে গর্ভবতী হ'ল। পয়দা হ'ল আমাদের শাদীর প্রথম ফসল এক লেড়কা।

এক সময়, লড়াই মিটে গেল। উভয় পক্ষের সন্ধি হ'ল যুদ্ধ-বন্দী বিনিময় হবে।

সুলতানের দরবারে এক ফ্রাঙ্ক দূত এল। সুলতানের সেনাপতি তার হাতে যুদ্ধ-বন্দীদের এক তালিকা তুলে দিল। সে নামগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল কই, এতে তো আমাদের এক সেনাপতির বিবির নাম দেখছি না?'

সুলতানের হুকুমে সৈন্যরা চারদিকে তাল্লাশী জুড়ে দিল। বিলকুল চিরুণি তাল্লাশী শুরু করে দিল। শেষ-মেষ আমার কামরায় এসে তার হদিস পেল।

আমার বিবি ব্যাপারটি শুনে বল্ল—'বহুৎ আচ্ছা, তুমি নিজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে হাজির হও। যা করার আমিই করব। তোমাকে কিছুই করতে হবে না।'

আমি আমার বিবিকে নিয়ে দরবারে সুলতান ও ফ্রাঙ্ক-দূতের সামনে তাকে হাজির করলাম। স্বয়ং সুলতান ও দূত পর পর একই প্রশ্ন তাকে করলেন—'তুমি কি তোমার নিজের মুলুকে, আগের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী, নাকি যার সঙ্গে ঘর করছ তাকে নিয়েই থাকতে চাও, খোলসা করে বল।'

—'জাঁহাপনা, আমি আমার বর্তমান স্বামীর ঘর করতেই আগ্রহী। কারণ, তার ঔরসজাত সন্তান আমার গর্ভে অবস্থান করছে।

আর আমি এখন ইসলাম ধর্মাশ্রিত।'

সুলতান মুচকি হেসে দূতটির উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'আপনি নিজের কানেই তো তার অভিপ্রায় শুনলেন। এবার আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করুন।'

দূতটি খেঁকিয়ে উঠলেন—'আর কি-ই বা জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে।' এবার আমার বিবির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌লেন—'খুব হয়েছে। তুমি এবার বিদায় নিতে পার। আমার আর কিছুই শোনার নেই।'

আমি দরবার কক্ষ থেকে বেরোবার সময় দূতটি আমাকে ডেকে একটি ছোট থলি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌লেন—'একর নগরে তোমার বিবির সঙ্গে যে-বুড়িটি তোমার কাছে যেত সে এটি তোমার হাতে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। নাও, ধর।'

থলিটা হাতে নিয়ে খুলে দেখি, তাতে রয়েছে ড্যামজেল-এর পুরনো সালোয়ার-কামিজ আর একটি রুমালের এক ধারে এক হাজার দিনার ও অন্যধারে পঞ্চাশ দিনার সযত্নে গিঁট মারা। বুঝলাম, আমার দিনারগুলিই ফেরৎ দিয়েছে। ব্যাপারটি খোলসা হয়ে গেল, এক সময় তার লেড়কির যে-ইজ্জৎ আমি রক্ষা করেছিলাম, তার ইনাম এ-দিনারগুলো।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি শেষ ক'রে মৌন হলেন।

দুনিয়াজাদ বেগম সাহেবার গলা জড়িয়ে ধরে আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বল্‌ল—'বহিনজী, তোমার কিস্‌সা শুনলে দিল্‌ বিলকুল জুড়িয়ে যায়। ভোর হতে এখন ঢের দেরী আছে। বড়িয়া দেখে আর একটি কিস্‌সা শুরু কর।

খলিফা ও দরিয়ার বানরের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ একটু নড়েচড়ে আয়েশ ক'রে বসতে বসতে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার 'খলিফা ও দরিয়ার বানরের কিস্‌সা' নামে এক চটকদার কিস্‌সা শোনাচ্ছি। জাঁহাপনা, 'খলিফা' বলতে এখানে কিন্তু আদৎ খলিফা বা সুলতান-বাদশাহের ব্যাপার নয়। এক মেছুয়াকে সবাই খলিফা সম্বোধন করত। যা-ই হোক খলিফা নামে মেছুয়াটি কোন এক সময়ে বাগদাদ নগরীতে বাস করত।

মেছুয়া খলিফা ছিল খুবই গরীব। সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার মত তার হালৎ ছিল না। তাই তার শাদী করার সাহসে কুলিয়ে ওঠে নি। আদতে তার রুজি রোজগার ছিল মহল্লার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

সে ফি রোজ কাকডাকা ভোরে জাল নিয়ে নদীতে নামে। সবার চেয়ে বেশী সময় সে পানিতে কাটায়। লেকিন তাজ্জব ব্যাপার মছলি তোলে সবার চেয়ে কম। একেই বলে নসীব।

এক ভোরে নদীতে পর পর দশবার জাল ফেল্‌ল। লেকিন একটি গুঁড়া মছলিও জালে পড়ল না। ফলে কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়েই সে হাপিত্যেশ করতে লাগল। বহুক্ষণ কপাল চাপড়ানোর পর সে ফিন হাতের জালটি পানিতে ছড়িয়ে দিল। জালে টান দিতেই সে একদম তাজ্জব বনে গেল। বিড়বিড় ক'রে বল্‌ল—'কি ব্যাপার, জাল এত ভারী ঠেকছে কেন? ভাবল, খোদাতাল্লা বুঝি বা এবার সদয় হয়েছেন। ঘেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে জালটিকে টেনে ওপরে তুলে আনল। তাজ্জব ব্যাপার। জালে উঠে এসেছে একটি অষ্টাবক্র বানর। তা-ও আবার তার একটি চোখ কানা। আশমানের দিকে হাত দুটো তুলে সে সখেদে ব'লে উঠল—'খোদা, এ-ই কি তোমার মতলব ছিল। একটি টেঁড়া বাঁকা বানর পাঠিয়ে দিলে। খলিফা ভাবল, বরাতগুণে যা মিলেছে তাকে ছাড়া ঠিক হবে না। এক টুকরো রশি বানরটির গলায় বেঁধে তার অন্য প্রান্তটি একটি সরু গাছের সঙ্গে বেঁধে বেদম প্রহার শুরু করল। বানরটি কঁকিয়ে উঠল—'আমাকে মেরে ফেলো না। দোহাই তোমার। আর মেরো না। খোদাতাল্লা তোমার আজকের খানাপিনার জরুর জোগাড় ক'রে দেবেন। খলিফা বানরটির পরামর্শে ফিন জালটি পানিতে ছড়িয়ে দিল। এবার তার কাছে সেটি আরও অনেক বেশী ভারী মালুম হ'ল। জাল টেনে তুলে তাজ্জব বনে গেল। খুবসুরৎ এক বানর উঠল। এবারের বানরটি কিন্তু আগেরটির মাফিক কানাখোড়া নয়। তার গায়ে একটি কোর্তা। সাদা আর লালের ডোরা। দু' কানে দুল, পায়ে দুটো মল সোনার। আর দুটো সোনার বালা ছিল হাতে।

খলিফা কপাল চাপড়ে সখেদে ব'লে উঠল—'খোদা এই কি তোমার মর্জি। নদীর সব মছলিকে আজ বানর বানিয়ে দিয়েছ?'

খলিফা ফিন আগের বানরটির ওপরও চড়াও হ'ল। ডাণ্ডা, নিয়ে তেড়ে গেল। শয়তান কাঁহিকার। তোর যুক্তি শুনে এই তো ফল হ'ল।'

প্রথম বানরটি মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌ল—'কেন ঝুটমুট আমার ওপর গোস্‌সা করছ! এবার যে উঠে এসেছে তাকে পুছতাছ করলেই তো বিলকুল ব্যাপার সাফা হয়ে যেতে পারে।'

দ্বিতীয় বানরটির কাছে খলিফা যেতেই সে খিল খিল করে হেসে উঠল—'খলিফা, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?'

—'না। আমার চেনার কোন জরুরৎ-ই নেই।'

গোস্‌সা ঝেড়ে ফেলে, দিমাক ঠাণ্ডা ক'রে আমার পাশে বস, আমার ব্যাপার তোমাকে খোলসা করে বলছি।'

গোস্‌সায় গস্‌গস্‌ করতে করতে খলিফা তার পাশে ধপ্‌ ক'রে বসে পড়ে বল্‌ল—'কি বলতে চাইছ, বল?'

—'বলছি শোন—তোমার কাছে আসার আগে আমি ইহুদীদের কাছে বাস করছিলাম। সুদের কারবারী। আমি যতদিন তার কাছে

ছিলাম তার কারবার ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। সে দোকান খোলা ও বন্ধকরা কোনটিই আমার মুখ না দেখে করত না। আদমিদের ধারণা বানরের মুখ দেখলে অযাত্রা। কোন কাজই হাসিল হয় না। লেকিন আমার মনিবের কারবারে তা রমরমাই হয়ে উঠেছিল। বহুৎ আচ্ছা, আমার মুখ দেখে একবার পানিতে জালটি ফেলে দেখ, তোমার নসীব পাল্টায় কিনা। কি ওঠে, কোশিস করে দেখই না খলিফা।'

খলিফার চোখে অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠল।

বানরটি এবার বল্‌ল—'এক কাজ কর। আমাকে জালে জড়িয়ে একবারটি পানিতে ফেলেই দেখ না, কি উঠে আসে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও খলিফা দ্বিতীয় বানরটিকে জাল দিয়ে জড়িয়ে পানিতে ছুঁড়ে মারল। খলিফার বরাতে এবার ভাল রকমই জুটল। পেল্লাই এক মছলি জালে বেঁধে উঠে এল। রুপোলি মছলি। সোনার মোহরের মাফিক্ চোখের মণি দুটো মেলে জুল্ জুল্ ক'রে সে তাকিয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় বানরটি বল্‌ল—'এবার যাওয়ার সময় পথে যদি কেউ মছলিটি খরিদ করতে চায়, দর জিজ্ঞাসা করে তবে কোন জবাব দিও না। সোজা স্যাকরার দোকানে গিয়ে উঠবে। সেখানে স্যাকরা সদা-র দোকান পাবে। তাকে বলবে—'আপনার নাম ইয়াদ করে পানিতে জাল ছড়িয়ে ছিলাম।' সে মছলিটি দেখে বলবে,—'আমার আগে আর কাউকে এটি দেখিয়েছ?'

স্যাকরার প্রশ্নের জবাবে বলবে—'আল্লাহ-র কসম, কাউকেই দেখাই নি।' তারপর সে থলি থেকে একটি দিনার বের ক'রে দাম দিতে চাইবে। নেরে না। আপত্তি জানাবে। মছলিটির দর বাড়াতে বাড়াতে যখন বলবে—'বহুৎ আচ্ছা, মছলিটির সম ওজনের সোনা তোমাকে দিচ্ছি।' তুমি গররাজি হবে। বলবে, দরের বদলে, একটি কথার বদলে মছলিটি আপনার হাতে তুলে দিতে আগ্রহী। আপনি স্রেফ একবার বলুন, আপনারা সাক্ষী রইলেন—'এ-মেছুয়া খলিফা-র সঙ্গে আমার বানরটি বদলি ক'রে নিলাম। ব্যস, এটুকুই।'

এ-ই তোমার মছলির উপযুক্ত দাম পাওনা হয়ে যাবে। এর পরই আমি বিলকুল তোমার বনে যাব। আর আমাকে দিয়েই তোমার নসীব বদলে যাবে। ফি দিন তুমি মছলি ধরে একশ' দিনার আয় করতে পারবে। ব্যস, তারপর থেকে ক্রমে তোমার দিনারের পাহাড় উঁচু হতে থাকবে। আর ইহুদীটি? সে ক্রমেই দৈন্যদশা লাভ করতে থাকবে। অচিরেই তুমি এ-তল্লাটের সবচেয়ে বড়া সওদাগর বনে যাবে। আর ইহুদীটি সব খুইয়ে ভিখ মাঙ্গাতে পরিণত হবে।'

মেছুয়া এবার দু' দুটো বানরের গলা থেকে রশির বাঁধন খুলে দিল। তারা উভয়েই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক লহমার মধ্যেই পানিতে তলিয়ে গেল।

স্যাকরাটি তার দোকানে নফর-নোকরদের নিয়ে তাকিয়া হেলান দিয়ে মৌজ ক'রে বসে। গায়ে দামী ও ঝলমলে কোর্তা, পাৎলুন আর কোট। আর তাদের গায়ে আতরের খুসবু।

মেছুয়া খলিফাকে দেখেই ইহুদী স্যাকরা হৈ হৈ ক'রে উঠল—'আরে খলিফা! কাল রাত্রে খোয়াব দেখেছি। ইয়া পেল্লাই এক মছলি ধরে দোকানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

খলিফা এক গাল হেসে বল্‌ল—'হুজুর, আজ আপনার নাম ইয়াদ ক'রে নদীতে জাল ফেলেছিলাম। এ-পেল্লাই মছলিটি জালে উঠেছে।' এই বলে সে ডালা থেকে রূপালি মছলিটি তুলে তার চোখের সামনে ধরল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচশ' সাতান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, মেছুয়া ইহুদী স্যাকরাকে মছলিটি দেখানোমাত্র 'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ বড়িয়া মছলি!' এরকম বহুৎ কিসিমের কথার মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে তার দিকে তার দাম স্বরূপ একটি দিনার বাড়িয়ে দিল। তারপর তিন দিনার দিল। খলিফা প্রবল আপত্তি জানাল।

ইহুদী স্যাকরা এবার বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ আচ্ছা! বেশ তো সোনা চাপিয়ে মছলিটি ওজন করিয়ে দিচ্ছি। তবে তো খুশী হবে?'

তাতেও খলিফা একই আপত্তি তুল্‌ল। সে বল্‌ল—'আদৎ ব্যাপার শুনুন, সোনা-চাঁদি বা দিনারের বিনিময়ে মছলিটি দিতে পারব না। আপনার ওই বানরটির বিনিময়ে মছলিটি নিতে পারেন।'

—'এ তো বড়া আজব প্রস্তাব হে! বহুৎ আচ্ছা, তা-ই কর। বানরটি নিয়ে তোমার মছলিটি আমাকে দিয়ে দাও।'

—'আর একটু তকলিফ আপনাকে করতে হবে হুজুর। আপনার নফর-নোকরদের সামনে আপনাকে হলফ করতে হবে তোমার মছলিটির সঙ্গে আমার বানরটি বদলা বদলি ক'রে নিলাম।" —ব্যস, এটুকুই।'

ইহুদী স্যাকরাটি তা-ই করল।

মেছুয়া খলিফা এবার ডালা থেকে মছলিটি তার হাতে তুলে দিয়ে বানরটির রশির বাঁধন আলগা করল। এবার সে লম্বা লম্বা পায়ে নদীর কূলে ফিরে এল।

খলিফা ভাবল, বানরটিকে ব্যাপারটি খোলসা ক'রে বলা দরকার। এরকম ভেবে সে নদীর পানিতে জাল ফেল্‌ল। টানাটানি ক'রে তুলে দেখল, বাঞ্ছিত বানরটি না উঠে হরেক কিসিমের বড়া পেল্লাই পেল্লাই মছলি।

ঠিক তখনই নদীর তীর দিয়ে এক লেড়কিকে খলিফা যেতে দেখে তার সামনে দাঁড়াল। এক দিনার দাম চুকিয়ে দিয়ে একটি মছলি খরিদ ক'রে নিল। তারপর আরও কয়েকজন এসে একটি একটি ক'রে মছলি খরিদ ক'রে নিল। সব মিলে একশ' দিনার তার আয় হ'ল।

দিনারগুলো পিরানের জেবে পুরে খলিফা খুশী হয়ে ঘরে ফিরে এল।

তারপর থেকে ফি দিন জাল ফেলে সে এক শ'টি ক'রে দিনার রোজগার করতে লাগল। খুশী তার উপচে পড়তে লাগল। সে তখন ভাবতে লাগল, একদিন আমার দিনারের পাহাড় গড়ে উঠবে। অভাবের তাড়নায় কত আদমিই না আমার দুয়ারে এসে ধর্ণা দেবে। কাউকে সে ফিরাবে না।

মেছুয়া খলিফা-র ভাবনা দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। সে এবার ভাবল—একদিন হয়ত খলিফা হারুণ-অল-রসিদ নিজে এসে তার কাছে দিনারের জন্য হাত পাতবে। মাত্র একশ'টি দিনার কর্জ নেয়ার জন্য।'

সে তখন বলবে—'জাঁহাপনা, এত দিনার কোথায় পাব? কোন রকমে নিত্যভিক্ষা দ্বারা তনুরক্ষা করি। আমার কাছে ধার দেয়ার মত অর্থ আছে এতবড় মিথ্যে কথাটি কে বলেছে, বলুন তো?'

খলিফা নির্ঘাৎ তার কথা বিশ্বাস করতে না পেরে জবরদস্ত হাবিলদারকে হুকুম দিয়ে বসবেন—তাকে গ্রেপ্তার করতে। সে গ্রেপ্তার করে পিরান পাৎলুন খুলে উলঙ্গ ক'রে বেদম প্রহার শুরু ক'রে দেবে। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে তার বাঞ্ছিত দিনার বের করে দিতেই হবে।

মেছুয়া খলিফা ভাবতে লাগল—'কারো সন্দেহ হয় এমন কাজ সে আদৌ করবে না। খানাপিনা, কোর্তা পিরান ও পাৎলুন বদলাবে না। তার যে নসীব ফিরেছে কাউকে তিলমাত্রও বুঝতে দেবে না।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে এরকম সব ব্যাপার স্যাপারের কথা ভাবতে লাগল। ঝট ক'রে সে বেড়ে একটি মতলব বের করল। এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। পিরান-পাৎলুন খুলে একদম উলঙ্গ হয়ে পড়ল। দেয়ালে টাঙানো চাবুকটি হাত বাড়িয়ে নিল। এবার নিজের গায়ে নিজেই বেধড়ক চাবুক চালাতে লাগল। আর গলা ছেড়ে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল—'আর মারবেন না জাঁহাপনা? আর মারবেন না। দোহাই আপনার। মেহেরবানি ক'রে আমাকে আর মারবেন না! জান খতম হয়ে যাবে। আপনার ঠ্যাং পাকড়াচ্ছি, আর মারবেন না!'

মেছুয়া খলিফা-র চিল্লাচিল্লি শুনে মহল্লার আদমিদের নিদ টুটে গেল। তারা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে আসতে আসতে বলতে লাগল—'চোর-ডাকাত লুঠপাট করার আর জায়গা পেল না! শেষ পর্যন্ত ভিখমাঙ্গা খলিফার বাড়ি হামলা চালাচ্ছে। যার খানাপিনা জোটে না। পিরান খরিদ করার সঙ্গতি নেই তার মাকানেই চোর-ডাকাতের হামলা।'

এদিকে মেছুয়া খলিফা নিজের গায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চাবুক চালাতে চালাতে বেদম চিল্লিয়েই চলেছে—'দোহাই হুজুর! আর মারবেন না। ঠ্যাং পাকড়াচ্ছি, আর মারবেন না!'

কামরায় ঢুকে সবাই তাজ্জব বনে যায়। কামরায় তো মেছুয়া খলিফা ছাড়া দ্বিতীয় কোন আদমিই নেই। তাজ্জব ব্যাপার বটে! সে নিজের গায়েই সপাং সপাং শব্দে বেধড়ক চাবুক চালিয়ে চলেছে।

দুয়ারে আদমির মেলা দেখে উল্টে খলিফাই তড়পাতে থাকে, তোমাদের কি ব্যাপার, বল তো? দুপুর রাত্রে এক জনের বাড়ি ভিড় জমিয়েছ! আমার নিজের কামরার, নিজের শরীরটির ওপরও কি দখল নেই? একশ' বার হাজারবার আমি আমার নিজের শরীরে চাবুক চালাব চিল্লাচিল্লি করব। এই বলেই সে ফিন সপাং সপাং শব্দে চাবুক চালাতে লাগল।

মহল্লার আদমিরা হেসে পাগলের কাণ্ড ভেবে, যে যার মকানে ফিরে গেল।

রাতভর মেছুয়া খলিফা চাবুক চালালে আর চিল্লাচিল্লি করল। ভোর হ'ল। ভাবল, এবার জাল নিয়ে নদীতে যাওয়া দরকার। আদৎ সমস্যা, দিনারগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখে যাবে? কামরার মধ্যে রেখে গেলে মহল্লার আদমিরা বিলকুল গায়েব করে দেবে। কোমরের খুঁটে গিঁট মেরে রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। টের পেলে পথে গুণ্ডা-মস্তানরা ছিনিয়ে নেবে। এবার বেড়ে এক ফন্দি ফিকির বের করল। পুরাণ এক ছেঁড়া পিরান দিয়ে একটি থলি বানিয়ে দিনারগুলো ভরে নিল। থলিটি ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। ব্যস, নিশ্চিন্ত হয়ে এবার জাল নিয়ে নদীতে গেল।

নদীর কূলে গিয়ে খলিফা পিরান, কোর্তা ও দিনারের থলিটি নদীর তীরে রেখে জাল নিয়ে পানিতে নামল।

কিছুক্ষণ বাদে তীরের দিকে নজর পড়তেই তার শরীরের সব ক'টি স্নায়ু এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। কোর্তা, পিরান এবং দিনারের থলি কিছুই নেই। কে যেন তার অন্যমনস্কতার সুযোগে সবকিছু গায়েব করে দিয়েছে। সে আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া খোদা! শয়তান চোর আমার ছেঁড়াফাঁটা কোর্তা পিরানের লোভও সামলাতে পারল না। তোমার এ-ই কি রকম বিচার! তোমার কি চোখের পর্দাও নেই!'

মেছুয়া খলিফা উপায়ান্তর না দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মছলির ডালাটি মাথায় চাপিয়ে নদীর তীর ধরে হাঁটতে লাগল।

এবার আমরা খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর দরবারে গিয়ে দেখি, তিনি কিভাবে দিন গুজরান করছেন! এ কিস্‌সার সঙ্গে তিনিও যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে।

তখন ইবন অল-কিরনাস নামে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ জহুরী বাস করত। খলিফা হারুণ-অল-রসিদের প্রাসাদ ও দরবারে তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল। খলিফার দরবারে তার খাতির প্রভাব ছিল আকাশছোঁয়া।

এক সকালে ইবন অল-কিরনাস-এর দোকানে একজন বাঁদীকে নিয়ে এক ব্যাপারী হাজির হ'ল। খুবসুরৎ কুমারী। সুরতের এমন জৌলুস তামাম আরব দুনিয়ার কারো শরীরে লক্ষিত হয় নি। তার ওপর সে হরেক গুণের অধিকারী।

জহুরী কিরনাস দরদস্তুর না করে পুরো পাঁচ হাজার দিনার দাম চুকিয়ে বাঁদীটিকে খরিদ ক'রে নিল।

হাজার খানেক দিনার দামের সালোয়ার, কামিজ, ওড়না প্রভৃতি পোশাক পরিচ্ছদে বাঁদীটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করল খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর দরবারে। সে রাত্রে লেড়কিটি খলিফার বিছানায়ই রইল। খলিফা তার সুরৎ ছাড়া অন্যান্য গুণাবলীরও পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন।

বাঁদীটির নাম মেরিজান। আরব মুলুকের লেড়কি।

খলিফা ভোর হতেই খুশী হয়ে লেড়কিটির দাম বাবদ দশ হাজার দিনার দিয়ে দিলেন।

খলিফা এবার হারেমের অন্য বাঁদীদের কথা ভুলে বাদী মেরিজানকে নিয়েই মজে রইলেন। এমন কি তার চাচার লেড়কি, তাঁর প্রধানা বেগম জুবেদা'কে পর্যন্ত দিল্ থেকে সরিয়ে দিলেন।

খলিফার কাণ্ড দেখে উজির-নাজির ও আমীর-ওমরাহরা তো বিলকুল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। খলিফা দরবারের কাজ কাম ছেড়ে দিয়ে এক লেড়কিকে নিয়ে মজে থাকলে সুলতানিয়ৎ যে রসাতলে যাবে।

সুলতানিয়তের বিশিষ্ট আদমিরা এককাট্টা হয়ে উজির জাফর'কে এর উপযুক্ত বিহিত করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

জাফর তাদের আশ্বাস দিলেন, ফন্দি-ফিকির একটি বের ক'রে খলিফার মতিগতি পাল্টাবেনই। তিনি আগামী শুক্রবারের প্রতীক্ষায় রইলেন।

বাঞ্ছিত সে-শুক্রবার এল। খলিফা নামাজ সেরে বেরিয়ে আসামাত্র বৃদ্ধ উজির জাফর তাঁকে ধরলেন—'সুলতানিয়তের ব্যাপার স্যাপার বিলকুল ভুলে গিয়ে এক বাঁদীকে নিয়ে যদি এভাবে ফিন রোজ পড়ে থাকেন তবে সুলতানিয়ৎ একদম জাহান্নামে যাবে, জাঁহাপনা। মহব্বতের মোহে পড়ে এমন তসবিরের মাফিক সুন্দর একটি সুলতানিয়ৎ যে বিলকুল ধ্বংস হয়ে যাবে!'

—'জাফর, আমি সব বুঝেও অন্ধা হয়ে গেছি। তার মহব্বতের দরিয়ায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

—'জাঁহাপনা, একটি মতলব আপনাকে দিচ্ছি। মেরিজান তো আপনার খরিদ করা বিবি। তার কণ্ঠলগ্না হয়ে তামাম দিন পড়ে না

থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নাচা-গানা শুনুন, শিকারে যান, নদীতে মছলি পাকড়ে দিলকে চাঙা ক'রে তুলুন—দিল্ ফিন তাজা চনমনে হয়ে উঠবে।'

উজিরের পরামর্শে খলিফা একদিন সিপাহীদের নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। জঙ্গলের কাছাকাছি যেতেই তারা হঠাৎ সিপাহীদের থেকে বিলকুল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।

আরও কিছুদূর যেতেই খলিফা দুর থেকে এক শস্য ক্ষেত দেখে ভাবলেন নির্ঘাৎ ধারে-কাছে পানির বন্দোবস্ত আছে। একটু গলাটি ভিজিয়ে নিতে পারলে জান রক্ষা পাবে। জাফর-এর খচ্চরটির চেয়ে নিজেরটি দ্রুতগতিসম্পন্ন বলে একাই খচ্চরটিকে তাড়িয়ে নিয়ে চল্লেন পানির সন্ধানে। পাহাড়ের ধারে, শসা ক্ষেতের কাছে পৌঁছোতেই দেখতে পেলেন মেছুয়া খলিফা কোর্তা, পিরান, পাৎলুন খুলে বিলকুল উলঙ্গ হয়ে দু' হাত তুলে লাফালাফি ক'রে নেচে চলেছে। আজব তার নাচের বাহার। এক লহমায় দেখলে মালুম হয় নির্ঘাৎ কোন দৈত্য অনবরত লাফালাফি ক'রে চলেছে।

হারুণ-অল-রসিদ মেছুয়ার কাছে গিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলেন।

মেছুয়া খলিফা নাচ থামিয়ে জোর চিল্লিয়ে উঠল—'তুমি কি একদম অন্ধা আছ নাকি? পাহাড়ের গায়ে নদী বয়ে চলেছে, মালুম হচ্ছে না। যাও, এগিয়ে গিয়ে দেখ।'

হারুণ অল-রসিদ এগিয়ে গিয়ে গণ্ডুষ ভরে ভরে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে পান করলেন।

ফিরে এসে মেছুয়া খলিফাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে হে? তোমার নাম কি? মাকান কোথায়? পেশা কি? এখানে করছই বা কি, বল তো?'

—'তুমি দেখছি অন্ধাই বটে। আমার সঙ্গে টুকরি আর জাল দেখেও বুঝতে পারছ না, পেশা কি?'

—'বহুৎ আচ্ছা। তুমি জেলে মালুম হ'ল। লেকিন তোমার সাজপোশাক কোথায়?'

মেছুয়া খলিফা এবার নিঃসন্দেহ হ'ল, এ-শয়তানটিই চোর। বেমালুম আমার সাজপোশাক ঝেঁপে দিয়ে এখন তামাশা দেখছে।

মেছুয়া খলিফা এবার দৌড়ে এসে হারুণ-অল-রসিদকে একদম সাঁড়াশির মাফিক আঁকড়ে ধরল—'যদি জানের মায়া থাকে তবে আমার সাজপোশাক কোথায় নিয়ে এসো। নইলে এমন এক রাদ্দা মারব গর্দানের হাড্ডি গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাবে। শয়তান কাঁহিকার! আমাকে উলঙ্গ ক'রে তামাশা দেখা জিন্দেগীর মাফিক ঘুচিয়ে দেব।'

—'আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমার সাজপোশাকের ব্যাপারে কিছুই আমার জানা নেই। আমার দিমাকে আসছে না তোমার গায়ের সাজপোশাক কে, কিভাবেই বা বে-পাত্তা করল।'

মেছুয়া খলিফা ঝট্ ক'রে একটি গাছের শুকনো ডাল হাতে তুলে নিয়ে হারুণ-অল-রসিদের দিকে সক্রোধে ধেয়ে যেতে যেতে বল্ল—'শয়তান নক্কড়বাজ কাঁহিকার! আমার সাজপোশাক নিয়ে আয়। নইলে এটা মাথায় বসিয়ে দিয়ে একদম দো-আলাদা ক'রে দেব।'

তার কারবার দেখে হারুণ-অল-রসিদ-এর কলিজা শুকিয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। তার মাথার ওপরের ডালটির দিকে তাকিয়ে কঁকিয়ে উঠে বল্ল—'এক কাম করি, আমার গায়ের কিঁছু সাজ পোশাক খুলে দিচ্ছি, তা দিয়ে শরম বাঁচাও।' কথা বলতে বলতে তিনি নিজের গায়ের মখমলের কোর্তাটি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লেন, এটি দিয়ে শরম ঢেকে ফেল। বিলকুল সাচ্চা বলছি, তোমার সাজপোশাকের ব্যাপারে আমার তিলমাত্রও জানা নেই।'

—'আরে ইয়ার, ধান্দা ছাড়! আমাকে কি বোকা ঠাওরেছ

নাকি? আমার কোর্তা-পাৎলুনের দাম তোমার কোর্তাটির কম সে কম দশগুণ বেশী হবে। সস্তা একটি কোর্তা দিয়ে আমাকে সামাল দেবার কোশিস করলেই আমি মেনে নেব, ভাবলে কি ক'রে?'

—'গোস্‌সা কোরো না মিঞা। আমার সামান্য কোর্তাটি দিয়ে আপাতত শরম তো ঢাক। তারপর না হয় তোমার বহুমূল্য সাজপোশাকগুলির পাত্তা লাগানো যাবেখন।'

হারুণ-অল-রসিদ-এর কোর্তাটি বেটেখাটো মেছুয়া খলিফার গায়ে চাপানোর ফলে তা দিয়েই কোর্তা ও পাৎলুন উভয়ের কাজ মিটে গেল।

সে এবার হঠাৎ একটু নরম হয়ে গিয়ে বল্‌ল—'তোমার আয় উপার্জন কেমন হয় বল তো?'

—'মনে করতে পার ফি মাহিনায় গড়ে দশ দিনার রোজগার হয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার মেছুয়া খলিফা বল্‌ল—'আয় একদম কম! সবই নসীবের ফের কি বল? আমি? আমি দু'-চার লহমার মধ্যে দশ দিনার কামিয়ে ফেলতে পারি। মাত্র একবার জাল ফেল্‌লেই কাজ হাসিল, এই এত্তো মছলি উঠবে।'

—'অসম্ভব! প্রতিবারেই যে এত এত মছলি উঠবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই।'

—'আমি বলছি। উঠবেই। আদৎ ব্যাপার হ'ল পানির নিচে একটি বানর আছে। সেই আমার হয়ে জাল ছড়িয়ে দেয়ামাত্র মছলি জোগান দেয়।' হারুণ-অল-রসিদ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার সে বল্‌ল—'কি গো, লোভ হচ্ছে তাই না? আমার কারবারে আসবে? আসতে পার। আমিই তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নেব। ফি রোজ পাঁচ দিনার ক'রে আমি তোমাকে মজুরি দেব। ভেবে দেখ, রাজী কি না? আরে ভাইসাব, কেন মুখ ব্যাজার করছ? জনমভর পাঁচ দিনার মজুরি থাকবে নাকি! কাম কাজে জবরদস্ত হয়ে গেলে জরুর মজুরিও বাড়বে।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আমি তোমার শর্ত মেনে নিচ্ছি।'

—'তবে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে এখনই লেগে যাও। করবেই যখন দেরী করে ফয়দা কি? তালিম শুরু করে দেয়া যাক।'

হারুণ অল-রসিদ তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে পানিতে জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁকে তালিম দিতে লাগল। পানিতে জাল ছড়িয়ে দিতেই দড়িতে টান লাগল। পেল্লাই ভারী মালুম হ'ল। উভয়ে মিলে টেনে হিঁচড়ে জাল তুলে দেখে ইয়া বড়া বড়া বহুৎ মছলি উঠেছে।

মেছুয়া খলিফা বল্‌ল—'এক কাম কর, বাজারে গিয়ে জলদি দুটো বড়সড় ঝুড়ি খরিদ করে নিয়ে এসো। তারপর মছলি নিয়ে বাজারে বেচবে। খবরদার দেরী করলে হাড্ডি গুঁড়ো ক'রে দেব, ইয়াদ থাকে যেন।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ ঘাড় কাৎ ক'রে খচ্চরের পিঠে চেপে বিদায় নিলেন।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর গায়ের কোর্তা অনুপস্থিত আর মুখে হাসির ঝিলিক দেখে উজির জাফর তাজ্জব বনে গেলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পানি পান করতে গিয়ে যা-যা ঘটেছে হাসতে হাসতে অবিকল বর্ণনা দিলেন। সবশেষে বল্‌লেন—'জাল ফেলে প্রথম দফাতেই যে-মছলি তুলেছি জিন্দেগী ভর জাল ফেল্‌লেও তেমনটি আর মিলবে না। ইয়া আল্লাহ! ইয়া পেল্লাই পেল্লাই জাল ভর্তি মছলি।'

খলিফা হারুণ অল রসিদ এবার বল্‌লেন—'আমার মনিবটিকে পাহারা দেবার জন্য তোমার সিপাহী-সান্ত্রীদের পাঠাও, তারা এক এক দিনার দাম দিয়ে এক একটি মছলি খরিদ করে নিয়ে আসুক।'

উজির জাফরের নির্দেশে জেলেরা টাইগ্রীসের তীরের দিকে ছুটল। সবাই লুটপাট ক'রে মেছুয়া খলিফার মছলি ছিনতাই ক'রে নিল। দু'-চার ঘা দিলও। ফন্দি ফিকির ক'রে দু'হাতে বাহারি দু'টি মছলি নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল। একটু বাদে ভুস করে উঠে হাতের মছলি দুটো দেখিয়ে বল্‌ল—'সব নিতে পারনি, এই দেখ দুটো মছলি।'

সিপাহী সান্ত্রীরা তার তামাশা দেখতে লাগল। এ সুযোগে মছলিগুলো এক-এক ক'রে লাফিয়ে পানিতে পড়ে গেল।

খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর এক নিগ্রো নফর হাতের বল্লম উঁচিয়ে ধরে মেছুয়া খলিফাকে ওপরে উঠে আসতে বল্‌ল—জান খতম হওয়ার ডরে সে মছলি দুটো নিয়ে উঠে এসে নিগ্রো নফরটির হাতে দিল। সে মছলি দুটো কোর্তার দু'জেবে চালান করে দিল। এবার বল্‌ল—'দাম কিছুই দিতে পারলাম না। আদতে জেব এখন ফাঁকা। কাল ভোরে খলিফার প্রাসাদে গিয়ে খোজা সাঁদাল-এর তাল্লাশ কোরো। তোমাকে খুশী ক'রে দেব।' কথা বলেই সে হাঁটা জুড়ল। মেছুয়া খলিফাও ব্যাজারমুখে নিগ্রোটির চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে বাজারের দিকে এগোতে লাগল।

বাজারের কাছাকাছি যেতেই মেছুয়া খলিফাকে দেখেই তাকে ঘিরে কৌতূহলী আদমিরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তার গায়ের বহুমূল্য কোর্তাটি দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেল।

হারুণ অল-রসিদ-এর দর্জিও তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তার নিজের হাতে তৈরী কোর্তা। স্বয়ং খলিফার জন্য বানিয়েছিল। লেকিন সেটি এর গায়ে চাপল কি ক'রে? আজব ব্যাপার তো? দর্জি কোর্তার ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই মেছুয়া খলিফা তাকে বাছা বাছা কয়েকটি কাঁচা খিস্তি দিয়ে দিল। সব শেষে বল্‌ল—'আমার কর্মচারী দিয়েছে। আমার কাছে সে যে মছলি পাকড়ানোর তালিম

নিয়েছে, জানিস হারামি কাঁহিকার?'

এদিকে খলিফা উন্মুক্ত প্রান্তরে হাওয়া খেয়ে এবং মেছুয়া খলিফার সঙ্গে মস্করা টস্করা ক'রে দিল্ বিলকুল চাঙা ক'রে নিতে পেরেছেন। ফলে বাঁদী মেরিজান-এর মোহ তাঁর দিল্ থেকে অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে। এক মাহিনা বাঁদীটি তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল। ফিন চাচার লেড়কি, প্রধানা বেগমার দিল্ও বিষিয়ে গিয়েছিল। খলিফাকে বুঝি তুক ক'রে বাঁদীটি একদম বশীভূত ক'রে ফেলেছে, এরকম আশঙ্কা ও ঈর্ষায় সে জর্জরিত হতে লাগল।

জুবেদা সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। খলিফা ভ্রমণে বেরিয়েছেন শুনে মওকাটি কাজে লাগাবার জন্য জুবেদা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হতচ্ছাড়ি বাঁদীটিকে আচ্ছা রকম টিট করতেই হবে। কৌশলে খোজা নফর তাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেল।

বাঁদী মেরিজান প্রধানা বেগমের কামরার দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে কুর্নিশ ক'রে তাকে সম্বোধন ক'রে বল্ল—'আমাকে তলব করেছেন মালকিন?'

জুবেদা মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্লেন—'হ্যাঁ, এক মাহিনা হয়ে গেল তুমি প্রাসাদে এসেছ। আজ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে জান পরিচয়ই হ'ল না, আজব কাণ্ড বটে। তাই তোমার খাতিরে একটু খানাপিনার বন্দোবস্ত করেছি। আর তোমার কণ্ঠে দু'-একটা গানা শুনতে চাই।'

—'শোনাব, জরুর শোনাব। আপনি যখন মেহেরবানি ক'রে আমার গলার গানা শুনতে চেয়েছেন আমি তো শোনাতে বাধ্য বেগম সাহেবা।'

বেগম জুবেদার হুকুম তামিল করতে গিয়ে বাঁদী মেরিজান এক এক ক'রে চৌদ্দটি গানা গাইল।

জুবেদা তার সুললিত কিন্নর কণ্ঠের গানা শুনে বিলকুল মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

গানা শেষ করে মেরিজান এবার এক মনমৌজী ভঙ্গিতে নাচা শুরু করল। কী তার ছন্দজ্ঞান ও তালজ্ঞান যা দেখে জুবেদা বিলকুল তাজ্জব বনে গেলেন। বার বার করতালি দিয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। পঞ্চমুখে প্রশংসা করলেন।

নাচা-গানার পর্ব চুকে গেলে বেগম জুবেদা বাঁদী মেরিজান'কে নিয়ে খানাপিনার টেবিলে বসালেন। নিজেও বসলেন।

বাঁদী মেরিজান দু'-একবার খানা মুখে পুরতে না পুরতেই কেমন অস্থিরতা বোধ করতে লাগল। মাথায় ঝিম-ঝিমানি, কলিজায় জ্বালা বোধ করতে লাগল। শরীর রীতিমত টলতে লাগল। আর সে সঙ্গে চোখে আন্ধার দেখতে লাগল সে।

বেগম জুবেদা তার খানার সঙ্গে আফিং মিশিয়ে রেখেছিলেন। তারই ক্রিয়া মেরিজান-এর শরীরে প্রকাশ পেতে লাগল। দু'-এক লহমার মধ্যে মেরিজান কুরশি থেকে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

জুবেদার কামরার ভেতরেই একটি গুপ্ত কামরা রয়েছে। তাতে বিলকুল বেহুঁস মেরিজানকে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ ক'রে দিলেন।

জুবেদা তার নিজের নোকরদের দিয়ে প্রাসাদের লাগোয়া বাগিচায় ঝটপট শ্বেত পাথর দিয়ে একটি নকল তাজিয়া গড়ে তুল্ল।

এদিকে খলিফা হারুণ অল-রসিদ ভ্রমণ সেরে প্রাসাদে ফিরতে না ফিরতেই খোজা তার চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্ল—'জাঁহাপনা, খানাপিনা সারার সময় গলায় গোস্ত'র টুকরা আটকে গিয়ে আপনার পেয়ারের বাঁদীর দম বন্ধ হয়ে যায়। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বিলকুল খতম হয়ে গেল। হেকিম তলব করার ফুসরৎ পর্যন্ত মিল্ল না।'

খোজা নফরটির মুখে মর্মান্তিক খবরটি শুনে খলিফা বিলকুল উন্মাদের মাফিক ছুটতে ছুটতে বাগিচায় সদ্য তৈরী তাজিয়াটির কাছে ছুটে গেলেন। 'মেরিজান! মেরিজান!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক চোখের পানি ঝরিয়ে তিনি নিজের কামরায় গিয়ে দরওয়াজা বন্ধ করলেন। ব্যস, খানাপিনা ছেড়ে দিলেন। কারো সঙ্গে ভেট করেন না। দরবারে যাওয়াও একদম বন্ধ। স্বেচ্ছায় বন্দী-জীবন তিনি বেছে নিলেন।

এদিকে বেগম জুবেদা দেখলেন, তাঁর ফন্দি ফিকির নির্বিবাদেই মিটতে চলেছে। তিনি এবার বাঁদী মেরিজান'কে একটি বাক্সে ঢুকিয়ে দু'জন নফর'কে বল্লেন, বাঁদী-বাজারে নিয়ে যা। যে দাম মিলবে তাতে ঝেড়ে দিবি। আর বলবি লেড়কিটিকে দাওয়াই খাইয়ে নিদে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। এ-অবস্থাতেই যেন নিয়ে যায়।

বাক্সটি খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে নফর দুটো বাঁদী-বাজারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

এদিকে পরদিন ভোরে মেছুয়া খলিফার নিদ টুটল। প্রথমেই মিশমিশে কালো নিগ্রোটির ছবি তার দিলের কোণে জেগে উঠল। দরবারে গেলে মছলি দুটোর দাম চুকিয়ে দেবে, সে বলেছিল। তার নাম খোজা সাঁদাল।

বাদশাহের প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে হাজির হয়ে মেছুয়া খলিফা এদিক-ওদিক অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে খোজা সাঁদাল-এর তাল্লাশ করতে লাগল। প্রহরী তার ব্যাপার দেখে খিস্তি দিয়ে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এল।

খোজা সাঁদাল ফটকের ধারে-কাছেই ছিল। সে প্রহরীর চিল্লা-চিল্লি শুনে ছুটে আসে। মেছুয়া খলিফা'কে দেখেই হেসে ডেকে ফটকের ভেতরে নিয়ে গেল।

মেছুয়া খলিফা কোনরকম বাড়তি বাৎ না বলে সরাসরি মছলি দুটোর দাম চাইল।

খোজা সাঁদাল কোর্তার জেবে হাত ঢোকানো মাত্রই উজির জাফর-এর ডাক কানে এল। মেছুয়াকে বল্‌ল—'ভাইয়া, উজির সাহাব জরুরী তলব দিচ্ছেন, একটু দাঁড়াও। আমি শুনেই এক্ষুনি ফিরে আসছি। মছলির দামের জন্য ঘাবড়িয়ো না। এক দিরহামও কম দেব না। দাঁড়াও, আসছি।'

মেছুয়া ঠায় দাঁড়িয়ে রইল তার ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে। আবলুস নিগ্রোটি সেই যে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে আর ফেরার নামটিও নেই। তাজ্জব ব্যাপার তো! আদমিটি শয়তান বেতমিস নয় তো? মওকা বুঝে সটকে পড়ল না তো? তার ভেতরে সন্দেহ ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল। শেষে অস্থির হয়ে, সাধ্যমত গলা নামিয়ে খোজা সাঁদাল-এর নাম ধরে ডাকাডাকি জুড়ে দিল। লেকিন, ফিরে আসা তো দূরের ব্যাপার, কোন সাড়াও সে দিল না।

মেছুয়া খলিফা এত সহজে হাল ছেড়ে ভেগে যাওয়ার আদমি নয়। সে দরবার-কক্ষের দিকে দু'চার কদম এগিয়ে গিয়ে অধিকতর জোরে চিল্লিয়ে উঠল—'কই গো কালাচাঁদ সাঁদাল, আমার মছলির দাম চুকিয়ে দিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে আমার হাঁটুতে দর্দ শুরু হয়ে গেল। জেবে দিনার-দিরহাম না থাকলে সাফ বাৎ বলে যাও, অক্ষমতা স্বীকার কর, ক্ষমাঘেন্না ক'রে দিয়ে কেটে পড়ি। আর গরীব মেছুয়ার ক'টা দিনার হজম করে আমির বাদশা বনতে চাও, আপত্তি করব না। যাহোক কিছু তো ব'লে যাবে!'

বৃদ্ধ উজির জাফর মেছুয়া খলিফার কথাগুলো শুনতে পেলেন। খোজা সাঁদাল'কে জিজ্ঞাসা করলেন—ওই আদমিটি চিল্লামিল্লি করছে কেন? ব্যাপার কি? কে তার দিনার হজম করেছে কিছুই তো মালুম হচ্ছে না!'

নিগ্রো নফর সাঁদাল সবিস্ময়ে বল্‌ল—'সে কী উজির সাহাব, ওকে চিনতে পারছেন না? ওর কাছ থেকেই তো আপনি আমাদের মছলি আনতে টাইগ্রীসের ধারে পাঠিয়েছিলেন। শেষমেষ দুটো মছলি নিয়ে এসেছিলাম, ইয়াদ নেই আপনার? আপনি তলব করলেন তাই দাম চুকিয়ে দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।'

—'বহুৎ আচ্ছা! দাম জরুর চুকিয়ে দেবে। লেকিন খবরদার ওকে চলে যেতে দিও না। আমাদের নসীব ভাল যে, সে নিজেই উপযাচক হয়ে এসেছে। তার মত একজন দিল্‌দরিয়া হাসিখুশী আদমিকে পেলে খলিফার দিল্‌ জরুর চাঙা হয়ে উঠবে। আদতে তার সঙ্গে খলিফার বিলকুল হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বলেই তিনি খলিফার কাছে চলে গেলেন।

নিগ্রো খোজা সাঁদাল ফিরে এসে প্রহরীকে ইশারায় সদর দরওয়াজা বন্ধ ক'রে মেছুয়া খলিফা'কে আটক করতে বল্‌ল।

এদিকে উজির জাফর ধীরে ধীরে খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর কামরার দরওয়াজায় এলেন। দরওয়াজার ফাঁক দিয়ে দেখেন, খলিফা পালঙ্কে শুয়ে চোখের পানি ঝরাচ্ছেন।

উজির জাফর আলতো ক'রে ধাক্কা দিয়ে দরওয়াজা খুলে কুর্নিশ ক'রে মৃদুস্বরে বল্‌লেন—'খোদা মেহেরবান! জাঁহাপনা, আপনার তো অজানা নয় খোদাতাল্লা-র মর্জির ওপর আমাদের কোন হাতই নেই। নসীবে যা লিখা আছে, মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কি।'

খলিফা মুখ তুলে উজির জাফর-এর দিকে তাকালেন। চোখে মুখে শোকের ছাপ সুস্পষ্ট। আচমকা গর্জে উঠলেন—'বে-আক্কেল বেতমিস কাঁহিকার, কার হুকুমে আমাকে জ্বালাতন করতে এসেছ জাফর? ঝুটমুট কেন আমাকে জ্বালাতে এলে? আমার হুকুম শোন নি, বেয়াদপ?'

জাফর মুখ কাচুমাচু ক'রে, হাত কচলে নিবেদন করলেন—'জাঁহাপনা, কসুর স্বীকার করছি, আপনার হুকুম অমান্য ক'রে আমার এখানে আসা জরুর কসুর হয়েছে। এক খবর দেয়ার

জন্যই আমাকে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা। গতকালের যে-মেছুয়া খলিফা—সে শিক্ষাগুরু, রসিক সজ্জন এখন প্রাসাদে হাজির। আপনার বিরুদ্ধে তার নাকি বহুৎ আর্জি আছে। আমি তার বক্তব্যের টুকরো টুকরো অংশ যেটুকু শুনেছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে—'এক ব্যাপার কিছুতেই আমার দিমাকে আসছে না, আদমি কি ক'রে এমন নিমকহারাম বেইমান হতে পারে!' আরও বলছে—'যে আমাকে গুরু ব'লে মেনে নিল। আমি তাকে মছলি পাকড়ানোর কায়দা-কসরৎ হাতে ধরে শিখালাম।... প্রথমবার জাল ফেলেই বিলকুল তাক লাগিয়ে দিল!... যে ওস্তাদের ইজ্জৎ করতে জানে না তার যতগুণই থাক না কেন, ওস্তাদের অভিশাপে তার কোন উন্নতিই হওয়া সম্ভব নয়।... সে আমার অমর্যাদা ক'রে কোনদিন বড় হতে পারবে না।'

জাঁহাপনা, আপনি যদি দিল্ থেকে তাকে ওস্তাদ ঠাওরে থাকেন তবে তার ইজ্জতের ব্যাপারে জরুর ভাববেন। আর যদি ধান্দা অন্য থাকে তবে তাকে সামনাসামনি খোলসা করে বলে দিন। বলে দিন, যেটুকু শিখেছি, এপর্যন্তই থাক।

গতরাত্রের পর এবার প্রথম খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা উঁকি দিতে দেখা গেল। শোক সন্তাপ অনেকাংশে লাঘব হ'ল।

খলিফা এবার মুখ খুল্লেন—'জাফর, আমি তার যা কিছু পাওনা বিলকুল চুকিয়ে দেব। খোদাতাল্লার মর্জিতে সে যদি এসে থাকে। তিনি যদি চান তাকে দিয়ে আমাকে উচিত সাজা দেওয়াবেন তবে তাই হোক। আর যদি তার মর্জি হয় সে আমার মর্যাদা লাভের অধিকারী, আপত্তি নেই।'

খলিফা এবার উজির জাফরকে দিয়ে একটি কাগজ আনিয়ে চল্লিশটি চিরকূট বানালেন। তার কুড়িটি জাফর-এর হাতে দিয়ে বললেন—'এদের একটিতে এক হাজার দিনারের যেকোন একটি সংখ্যা লেখ। আর আমার দরবারের উজির থেকে নফর-নোকর পর্যন্ত যেকোন একটি পদের নাম লেখ। স্পষ্টাক্ষরে লিখবে। আর বাকী কুড়িটিতে বিভিন্ন সাজার নাম লেখ।'

উজির এবার কাগজের চিরকূটগুলোতে খুশী মাফিক এক থেকে হাজারের মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যা লিখলেন।

আর বাকী কুড়িটি কাগজের গায়ে সাধারণ মারধোর থেকে শুরু ক'রে গর্দান নেয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সাজার উল্লেখ করলেন। তারপর চিরকূটগুলো একটি পাত্রে রেখে খলিফার হাতে তুলে দিলেন। খলিফা খোদাতাল্লা-র নামে কসম খেয়ে বল্লেন—মেছুয়া পাত্রটি থেকে যে-চিরকূটটি তুলবে তার গায়ে লেখা নির্দেশ মাফিক কাজ করব। যে-সাজাই লেখা থাক না কেন, তাকে তা জরুর দেয়া হবে।

উজির জাফর এবার সদর-দরওয়াজার কাছে এসে মেছুয়া খলিফাকে দেখতে পেলেন। তাকে অন্দরমহলে খলিফার কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। মেছুয়া খলিফা বেঁকে বসল। অন্দর মহলের নাম শুনেই সে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল।

উজিরের নির্দেশে নিগ্রো খোজা সাঁদাল মেছুয়ার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে অন্দর মহলে হাজির করল। সামনে খলিফা হারুণ অল-রসিদ'কে দেখেই সে আচমকা ভূত দেখার মত থমকে গেল। 'এ কাকে সে দেখছে! অনুসন্ধিৎসু নজরে খলিফার আপাদমস্তক বার কয়েক দেখে নিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। এক সময় সবিস্ময়ে বলে উঠল—'কি গো, তুমি যে বিলকুল খলিফা সেজে বসে গেলে! তোমার মতলবটি কি শুনি তো? আমার কাছ থেকে মছলি পাকড়াবার বিদ্যা শিখে নিয়ে বেশ তো বেমালুম কেটে পড়লে। এখন একদম পুরোদস্তুর খলিফা সেজে গেছ! আর আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে নিমকহারামি। তুমি ঝুড়ি খরিদ করতে গেলে তো গেলেই। এ ফাঁকে এতগুলো সৈনিক আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধড়ক পিটতে লেগে গেল! সুযোগ বুঝে কম সে কম এক শ' দিনারের মছলি নদীর পানিতে লাফিয়ে পড়ে গেল। এখন মালুম হচ্ছে, তোমার ফন্দি ফিকিরেই এ কাজ হয়েছে। কারণ, কাল যারা আমাকে পিট্টি দিয়েছিল, মছলি ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই এখানকার আদমি। এসব বাৎ ছাড়ান দাও। এখন বল তো, তোমাকে এখানে আটকে রেখেছে কে? কেনই বা আটক ক'রে রেখেছে, বল তো?'

খলিফা হারুণ অল-রসিদ মুচকি হেসে কাগজের চিরকূট-ওয়ালা পাত্রটি বের ক'রে দিয়ে বল্ল—'শোন, এগুলো থেকে একটি চিরকূট তুলে নাও। দেরী কোরো না, তোল।'

মেছুয়া খলিফা চিল্লিয়ে উঠল—'ইয়া খোদা! তুমি যে কামাল করলে! তুমি কি তবে জ্যোতিষীও জান নাকি? তবে ইয়াদ রাখবে, যত বেশী কারবারের ধান্দা করবে মুনাফার অঙ্কও ততই কমে আসবে।'

—'বাজে ধান্দা ছাড়! এগুলো থেকে ঝটপট একটি চিরকূট তুলে নাও।' মেছুয়া পাত্রটি থেকে একটি চিরকূট তুলে খলিফার হাতে দিয়ে বল্ল—যা লিখা আছে সাচ্চা বলবে। কিছু ছিপাবে না বলে দিচ্ছি।'

সুলতান চিরকূটটির ভাঁজ খুলে সেটি উজির-এর হাতে তুলে দিল। উজির পড়ে দেখে, লেখা রয়েছে—'এক শ ঘা চাবুক।'

খলিফা হারুণ অল-রসিদ দেহরক্ষী মাসরুর'কে তলব ক'রে বল্লেন—'একে এক শ' ঘা চাবুক মার।'

মাসরুর চাবুক চালাতে শুরু করল। মেছুয়া নীরবে তা হজম করতে লাগল। এমন ভাব দেখাল যে, কিছুই যেন তার হয় নি।

চোখ-মুখ একদম স্বাভাবিক।

উজির জাফর বল্লেন—'জাঁহাপনা, এ-হতভাগাকে আরও একটি সুযোগ দেয়া হোক। যদি নসীব ভাল থাকে তবে ভাল চিরকূটটিই তুলবে।'

খলিফা বেশ একটু রাগত স্বরেই বল্লেন—'তোমার মাফিক বে-আক্কেল আদমি আমি জিন্দেগীতে দেখি নি। এবারের চিরকূটে যদি লেখা থাকে গর্দান নেয়া হোক—তখন? তাই বলে আমার পক্ষে তো আর জবান নষ্ট করা সম্ভব নয়।'

—'লেকিন যা হ'ল এর চেয়ে গর্দান যাওয়ার চিরকূট তোলা ঢের ভাল ছিল।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তোমার মর্জি মাফিক কাজ করা যাক তবে।'

মেছুয়া খলিফাকে ফিন আর একটি চিরকূট তুলতে বলায় সে একদম আপত্তি করল। আমাকে বাদশাহ-সুলতান যা-ই হতে বলা হোক না কেন, আমি একদম রাজী নই। শেষমেষ উজিরের বিশেষ অনুরোধে সে প্রবল আপত্তি জানিয়েও রাজী হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে একটি চিরকূট তুলে খলিফার হাতে দেয়। খলিফা এক ঝলক দেখে নিয়ে সেটি উজিরের হাতে দিয়ে তিনি বল্লেন—'দেখ, কি হুকুম দেয়া আছে।'

উজির কাগজ খুলে লেখা পড়তে গিয়ে থমকে গেলেন। কাগজটি বিলকুল সফেদ। কিচ্ছু লেখা নেই।

উজির জাফর খলিফাকে বল্লেন—'এতে কিছুই লিখা নাই। বিচার ঠিক হ'ল না।'

খলিফা বল্লেন—'বহুৎ আচ্ছা, তবে আর একটি মাত্র চিরকূটই সে উঠাতে পারবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

শেষবারের চিরকূটটির গায়ে লেখা ছিল—এক দিনার। মেছুয়া তর্জন গর্জন জুড়ে দেয়—'শয়তানের কারসাজি। বিলকুল ধান্দাবাজী। নয় তো এক শ' ঘা বেত মেরে মাত্র এক দিনার। খোদাতাল্লা এর বিচার করবেন, দেখে নিও।'

উজির বে-গতিক দেখে মেছুয়াকে প্রধান ফটকের দিকে নিয়ে গেল। সে ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কোশিস করলে নিগ্রো খোজাটি দৌড়ে কাছে এসে খেঁকিয়ে উঠল—'এই, এ কিরকম কাজ হে তোমার! ভাগ না দিয়েই ভেগে যাচ্ছ যে বড়! সুলতানের কাছ থেকে ইনাম বকশিস যা কিছু পেয়েছ, তার ভাগ। আমার হকের পাওনা আমায় দেবে না!'

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' উনসত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা মেছুয়াটি বেশ রাগত

স্বরেই বলে উঠল—'তোমার হকের পাওনা যখন তখন বুঝে নাও, আমি এক শ' ঘা বেত খেয়েছি। তুমি আধাআধি নিয়ে নাও। আর পেয়েছি এক দিনার। তুমি বরং এর পুরোটাই নিয়ে নাও। আমার কিছুমাত্রও আপত্তি নেই।' বলেই সে হনহন করে হাঁটা জুড়ল। সাঁদাল তার হাতে একটি থলি দিল।

মেছুয়া থলিটি খুলে দেখে তাতে এক শ' দিনার রয়েছে। মছলি দুটোর দাম। খুশী হয়ে সে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল।

তার মকানে যেতে গেলে বাঁদী-বাজারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সে যেতে গিয়ে দেখল, দু' আদমি চিলাচিল্লি করছে। তাদের সামনে লম্বা একটি বাক্স। তারা চিল্লাচ্ছে—সস্তা দামে খুবসুরৎ বাঁদী! সস্তা দামে খুবসুরৎ মাল!

মেছুয়া খলিফা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কৌতূহল হ'ল, কত সস্তা দামে, কেমন আচ্ছা মাল কারা দিচ্ছে দেখার জন্য।

কাছে যেতেই আদমি দু' জন বল্ল—'বেগম জুবেদা বাক্সটিকে পাঠিয়েছেন। হারেমের মাল। এক দম সস্তায় দিয়ে দেব। যদি দিল্ চায় খরিদ করে ফেল মিঞা।'

নিলামে উঠল বাক্স-বন্দী মালগুলি। মেছুয়া খলিফা একশ' দিনার দামে মাল সমেত খরিদ করে নিল। এবার বাক্সটিকে মাথায় নিয়ে হাঁটা জুড়ল। পথে যেতে যেতে ভাবল, বাদশাহের হারেমের মাল যখন, জরুর আচ্ছা মালই হবে।

কামরায় গিয়ে বাক্সটি মাথা থেকে নামাল। একা থাকে। শাদী-নিকা করেনি। তবে ইয়া পেল্লাই বাক্স তার কোন্ কাজে লাগবে? কি-ই বা আছে বাক্সটির মধ্যে জানার জন্য মহল্লার আদমিদের কৌতূহল হ'ল। আর যে-আদমি দিন এনে দিন খায় সে ইয়া পেল্লাই বাক্স খরিদ করার অর্থই বা কোথায় পেল? সবাই ভাবল, নির্ঘাত চুরি জোচ্চুরি করে কোথাও থেকে বাক্সটি নিয়ে এসেছে। খলিফার হারেম থেকে গায়েব করে আনাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাদের ডর হয়। খলিফার সৈন্যরা হয়ত এক্ষুণি হানা দিয়ে খানাতাল্লাশী শুরু করে দেবে। তারপর কার দোষ, কার ঘাড়ে চাপিয়ে সাজা দেবে ঠিক ঠিকানা থাকবে না। ডরে আতঙ্কে সবাই সটকে পড়ল।

মেছুয়া খলিফা পড়ল মহা ফ্যাসাদে। সে ভেবেছিল তাদের কারো সাহায্যে বাক্সটিকে কামরার ভেতরে ঢোকাবে। সবাই সরে পড়ায় সে আশা আর রইল না। বহুৎ ফন্দি ফিকির করে সে বাক্সটিকে কামরার ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। এবার বেশ খুশীই হ'ল। যাক, এতে পালঙ্কের অভাব মিটবে। একবার শুয়ে পরীক্ষা করেও নিল। না, বেড়ে বন্দোবস্ত হয়েছে। মৌজ করে ঘুমিয়ে নেয়া যাবে।

এবার সে ভাবল, একশ' দিনার দামে তো বাক্স ও সামানপত্র খরিদ করে আনল। এর ভেতরে কি যে আছে, কে জানে?

মেছুয়া খলিফা সামানপত্রের ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে এক

সময় ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝ-রাত্রে তার ঘুম ভেঙে গেল। মালুম হ'ল বাক্সের ভেতরে কে যেন গোঙাচ্ছে। আন্ধার কামরা। এমন আজব ব্যাপার। ভূত-প্রেত হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সে ঝট করে উঠে বসল বাক্সটির ওপর। তার ডালা খুলেই চমকে যায়। দেখে এক লেড়কি। ভাবল নির্ঘাৎ কোন জিন।

এক দৌড়ে কামরার বাইরে বেরিয়ে গলাছেড়ে চিল্লাচিল্লি করতে থাকে—'কে আছো—বাঁচাও! বাঁচাও! আমার কামরায় জিন ঢুকেছে। বাঁচাও, আমাকে জিনের হাত থেকে বাঁচাও।'

মেছুয়া খলিফার চিল্লাচিল্লি শুনে মহল্লার আদমিদের নিদ টুটে গেল। তারা ডাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে এল।

ইতিমধ্যে খুবসুরৎ বাঁদী মেরিজান বাক্সের ভেতরে উঠে বসেছে।

সবাই লাঠিসোটা নিয়ে খলিফার দরওয়াজায় আসে। ভাবল, খোয়াব টোয়াব দেখেছে। তাই তাকে খুব করে ধমক ধামক দিয়ে যে যার কামরায় চলে যায়।

মেছুয়া খলিফা ব্যাজারমুখে ফিন কামরায় ঢুকল। ভেতরে পা দিয়েই থমকে যায়। দেখে খুবসুরৎ এক লেড়কি বাক্সটির মধ্যে বসে রয়েছে। মেছুয়া খলিফাকে কামরায় ঢুকতে দেখেই সে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে বল্‌ল—'আমি কোথায়? আমি এখানে কি ক'রে এলাম?'

মেছুয়া খলিফা কাঁপা কাঁপা গলায় পাল্টা প্রশ্ন করে—'কে তুমি? কি-ই বা তোমার পরিচয়?'

খুবসুরৎ লেড়কিটি ফিন ব'লে উঠল—'আমি এখন কোথায়? তুমিই বা কে? কে তুমি?'

মেছুয়া খলিফা বার দুই ঢোক গিলে শুকনো গলাটিকে একটু

ভিজিয়ে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল—'আমার নাম খলিফা। মেছুয়া খলিফা। নদীতে মছলি পাকড়ে দিন গুজরান করি। এটি আমার গরীবখানা। আমার হালৎ তো নিজের চোখেই দেখছ। আর আমি ছাড়া আমার আপনজন বলতে কেউ-ই নেই। খানাপিনার ভাগ বসাবার কেউ নেই। আজ তুমি এলে। কি করবে তা তুমিই জান।'

—'আমি তবে এখন আর খলিফার হারেমে নেই?'

—'না। তবে খলিফারই গরীবখানায় আছ। আমার নাম খলিফা তা-তো তোমাকে বলেছি-ই। তবে তুমি এখন আমার সম্পত্তি। একদম আমার। কারণ বাঁদী-বাজার থেকে নিলামে নগদ একশ' দিনার দিয়ে তোমাকে খরিদ করে এনেছি।'

—'তুমি কি জেনে শুনে আমাকে খরিদ করেছিলে? আমি বাক্সের ভেতরে এলাম কি করে?'

—'শোন, বাঁদী-বাজার থেকে তোমাকে খরিদ করার সময় তোমার মালিকের শর্ত ছিল বাক্স না খুলে, মাল না দেখেই খরিদ করতে হবে। নিজের মকান নিয়ে গিয়ে বাক্স খুলতে হবে, তার আগে নয়। আদত ব্যাপার হচ্ছে, তুমি যে বাক্সের ভেতরে রয়েছ, জানা ছিল না। আমার ধারণা ছিল বেগম জুবেদার হারেমের পুরনো মাল কিছু বাক্সের ভেতরে রয়েছে।'

মেরিজান এবার ইয়াদ করতে পারে—নাচা-গানা, তারপর খানাপিনার আসর। সবশেষে মাথার ঝিমঝিমানি। ব্যস, তারপর আর কিছু সে জানে না।

মেরিজান এবার বুঝতে পারে, জুবেদা নির্ঘাৎ তার খানার সঙ্গে ঘুমের দাওয়াই কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল। আদৎ উদ্দেশ্য ছিল তাকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়ে খলিফার ওপর নিজের প্রভাব ফিরিয়ে আনা।

কিছু সময় বাদেই ভোর হয়ে গেল। মেরিজান বল্‌ল, মেছুয়া খলিফা আমার যে খিদে পেয়েছে। পেটের ভেতরে একদম জ্বালা করছে। তোমার ঘরে কি কিছু খানা আছে? থাকলে আমাকে দাও, পেটের জ্বালা নেভাই।

মেছুয়া খলিফা পড়ল মহাসমস্যায়। সে বাজারে না গিয়ে খানা পাবে কোথায়। এদিকে নতুন এসেই যদি মেরিজান খানা বিনা কষ্ট পায় তবে তো বিলকুল ইজ্জতের ব্যাপার। তাই অনন্যোপায় হয়ে সে কামরার বাইরে গেল।

পাশের কামরার দরওয়াজায় গিয়ে ফিসফিসিয়ে বল্‌ল—'শুনতে পাচ্ছ, আমার জিন ভুখা আছে। খিদে পেয়েছে। খানা-পানি কিছু দাও। আমার যে ইজ্জৎ খোয়াবার জোগাড়।'

দরজা দিয়ে একটি আধ-পোড়া রুটি আর শসা বেরিয়ে এল।

মেছুয়া খলিফা আধ-পোড়া রুটি আর শসাটি কুড়িয়ে নিয়ে

কামরায় ফিরে এল। সে দুটো মেরিজান-এর হাতে নিয়ে বল্‌ল—'এই নাও। এ দুটো দিয়ে কোনরকমে পেটের জ্বালা নেভাও। পরে দেখছি, কি বন্দোবস্ত করা যায়।'

মেরিজান রুটি আর শসা দিয়ে নাস্তা সারল। বদনা থেকে ঢকঢক করে পানি গলায় ঢাল্‌ল। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে পানির বদনাটি হাত থেকে নামিয়ে রাখল। তারপর বল্‌ল—তোমাকে বহুৎ তকলিফ দিলাম। আদতে দু'দিন পেটে দানাপানি কিছুই পড়ে নি। একদম জ্বালা ধরে গিয়েছিল।'

—'এবার দিল্‌ তো ঠাণ্ডা হয়েছে? এবার তোমার কাহিনী খোলসা ক'রে বল তো, কেন তোমাকে বাক্স-বন্দী ক'রে বাঁদী-বাজারে বেচে দিয়েছে?'

বাঁদী মেরিজান খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। তার হাসিতে নওজোয়ান মেছুয়া খলিফা-র দিল্‌ নেচে উঠল। কলিজা নাচানাচি শুরু ক'রে দিল।

মেরিজান তার কাহিনী শুরু করল—'জুবেদা, খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর চাচার লেড়কি। তার ওমর এখন বেড়ে গেছে। দৈহিক সুরৎ বিকেলের সূর্যের মাফিক পশ্চিম-আশমানে হেলে পড়েছে। তাই খলিফা যে তাকে ছেড়ে আমাকে পেয়ার মহব্বৎ করেন তা একদম সহ্য করতে পারে না। জুবেদার-ই দোয়ায় আমি আজ বাঁদী-বাজার হয়ে তোমার কামরায় আসতে পেরেছি।

মেছুয়া খলিফা ভ্রূ কুঁচকে বল্‌ল—'এ-ই কি তোমার খলিফা যে আমার কাছে মাছ ধরতে শেখার তালিম নিয়েছিল? যাকে দেখলাম, প্রাসাদের ভেতরে ইয়া পেল্লাই একটি কুর্সিতে বন্দী হয়ে রয়েছে? এ-ই কি তোমার খলিফা হারুণ-অল-রসিদ?'

—'হ্যাঁ। হ্যাঁ, একদম সাচ্চা বলেছ।'

—'তা-ই যদি হয় তবে আদমিটি সবচেয়ে বড়া বেতমিস। নচ্ছারটি আমার কোর্তা-পাৎলুন গায়েব ক'রে নিল। একশ' ঘা চাবুক মেরে মাত্র একটি দিনার আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে খালাস হয়ে গেল। শয়তান বদমাইশটিকে একবার বাগে পেলে আচ্ছা সাজা দিয়ে ছাড়ব দেখে নিও।'

মেরিজান চোখে ইশারা ক'রে তাকে ঠাণ্ডা হতে বলে। বলা তো যায় না, এক কান-দু' কান ক'রে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, ক্ষমা। অপরে কে, কি করল না ভেবে নিজে ভাল হওয়ার কোশিস করা দরকার। দুনিয়ায় ক্ষমাই হচ্ছে আদৎ ধর্ম। সমাজের নিচ তলার আদমিদের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তার জিন্দেগীতে কিছুই হবার নয়।'

মেছুয়া খলিফা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক বাঁদী মেরিজান-এর বক্তব্য শুনছিল। বহুৎ আচ্ছা লাগল। এমন সারগর্ভ বক্তব্য বহুৎ দিন কারো মুখে শোনে নি। তার দিলের অজ্ঞতার আন্ধার ক্রমে কেটে যেতে লাগল। আদর্শ আদমি হতে গেলে মেছুয়া খলিফাকে কি কি করতে হবে বিলকুল মেরিজান খোলসা ক'রে বুঝিয়ে দিল।

মেছুয়া খলিফা বল্‌ল—'তোমাকে পেয়েই আমি দারুণ উপকৃত হয়েছি। এখন বল, কিভাবে আমি তোমার খুশী উৎপাদন করতে পারি?'

—'তোমাকে তেমন কিছুই করতে হবে না। যদি পার তবে এক চিলতে কাগজ আর দোয়াত-কলম এনে দাও।'

মেছুয়া খলিফা মহল্লার এক কামরা থেকে কাগজ-কলম এনে দিল। মেরিজান দু'-চার ছত্রের মাধ্যমে ইবন কিরনাস-এর নামে একটি চিঠি লিখে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করল। সম্প্রতি মেছুয়া খলিফা বাঁদী-বাজার থেকে একশ' দিনারের, বিনিময়ে তাকে খরিদ করে নিজের কামরায় রেখেছে।

চিঠি লেখা শেষ করে মেরিজান সেটি মেছুয়া খলিফা-র হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এটি জহুরী কিরনাম-এর হাতে দেবে। ইয়াদ রাখবে, তোমার আচরণে যেন অশালীন কিছু প্রকাশ না পায়। সে যা-যা বলে ভাল ক'রে শুনবে।'

মেছুয়া খলিফা বাজারে গিয়ে জহুরী কিরনাম-এর হাতে চিঠিটি দিল।

জহুরী কিরনাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভাঁজ করা কাগজটি পাশে রেখে দিল। ভাবল, একটু বেশী ভিক্ষা আদায় করার জন্য বিশিষ্ট কোন আদমির কাছ থেকে মোসাবিদা করে দু'-চার ছত্র লিখে এনেছে। তাই কর্মচারীকে বল্‌ল—'একে একটি আধলা দিরহাম দিয়ে দাও তো, বিদেয় হোক।'

মেছুয়া খলিফা ফিন আদাব জানিয়ে বল্‌ল—'মেহেরবান, আমি ভিখ্‌ মাঙ্গতে আসি নি। আপনাকে যে চিঠিটি দিয়েছি তার ওপর মেহেরবানি ক'রে একবারটি চোখ বুলালে বহুৎ খুশী হব।'

চিঠিটি খুলে এক লহমায় চোখ বুলিয়েই জহুরী খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে। মেছুয়া খলিফাকে আদর ক'রে বসতে দিল। মিঠা স্বরে বল্‌ল—'ভাই সাহাব, কোথায় তোমার ঘর? কি কারবার করা হয়? ঘরে কে কে আছে?'

মেছুয়া খলিফা সৌজন্য সহকারে নিজের নাম ও পাত্তা জানায়।

জহুরী এবার এক কর্মচারীকে বল্‌ল—'মোসেস'কে বল, একে যেন এক হাজার দিনার ইনাম দিয়ে দেয়? বহুৎ বড়িয়া আদমি।'

একটু বাদে মেছুয়া খলিফা এক হাজার দিনার পিরানের জেবে পুরে ফিন জহুরীর গদিতে ফিরে এল।

মেছুয়া খলিফা ফিরে আসতেই জহুরী একটি খচ্চর দেখিয়ে তাকে বল্‌ল—'একদম দেরী কোরো না। ঝটপট চেপে বস।'

—'জী, আমি খচ্চরের পিঠে চাপতে পারি না। আপনি খচ্চরের পিঠে চেপে চলুন। আমি বরং পয়দলই যাচ্ছি।'

জহুরী কিরনাস তার হাত ধরে খচ্চরটির পিঠে চাপিয়ে দিল। লাগাম ধরে সে বসে রইল। দু'-চার কদম গিয়েই খচ্চরটি জোরকদমে ছুটতে শুরু করল। ব্যস, মেছুয়া খলিফা আছাড় খেয়ে পথের ওপর পড়ে গেল।

জহুরী কিরনাস তার নফরদের বল্‌ল—'বেচারাকে আমার মকানে নিয়ে যাও। সাবুন মাখিয়ে আচ্ছা করে গোসল করিয়ে কোর্তা-পাৎলুন পরিয়ে দাও। না, পুরণো কোর্তা-পাৎলুন নয়। বাজার থেকে সুলতান-বাদশার কোর্তা-পাৎলুন খরিদ করে নিয়ে এসো। ইয়াদ রেখো, তোমাকে একদম বাদশা বানিয়ে দেবে।'

নফরদের হুকুম দিয়ে জহুরী কিরনাম দ্রুত খচ্চর ছুটিয়ে চল্‌ল মেছুয়া খলিফা-র ঠিকানা অনুযায়ী।

সন্ধ্যার কিছু আগে জহুরী কিরনাম বাদী মেরিজান'কে নিয়ে ফিরে এল।

মেরিজান বেগমের সাজে সজ্জিতা হয়ে একটি সিংহাসনের ওপর হাসি মুখে বসে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দাসী-বাঁদী। সবাই কোন না কোনভাবে তার সেবায় মগ্ন।

এমন সময় বাদশাহের সাজে সজ্জিত মেছুয়া খলিফা দুই নফরের সঙ্গে মেরিজান-এর কামরায় হাজির হ'ল।

মেছুয়া খলিফা'কে দেখে দাসী বাঁদীরা মেরিজান'কে একা রেখে কামরা ছেড়ে চলে গেল।

মেছুয়া খলিফা'কে দরওয়াজায় দেখেই মেরিজান ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে এগিয়ে এল। তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপরে বসাল।

মেরিজান বল্‌ল—'শোন, একটু বাদে তোমাকে খলিফা হারুণ-অল-রসিদের সামনে হাজির হতে হবে। সেখানে যাওয়ার আগে আমি কিছু উপদেশ দিচ্ছি, শুনে যাও। তুমি দরবারে প্রবেশ ক'রে খলিফাকে কুর্ণিশ ক'রে বলবে—'জাঁহাপনা, আপনার ইয়াদ আছে কি, এ-গরীব মেছুয়া একদিন আপনাকে জালফেলার কায়দা-কসরৎ শিখিয়েছিল?'

খলিফা তোমার বক্তব্য স্বীকার ক'রে নেবেন।

খলিফা তোমার বক্তব্য মেনে নেয়ার পর তুমি বলবে—'জাঁহাপনা কি আজ রাত্রিটি আমার গরীব খানায় মেহমান হয়ে কাটাতে পারেন না? ব্যস, এতেই কামাল করে দেবে। দেখবে, সুলতান সুড় সুড় করে তোমার কামরায় হাজির হবে।

মেছুয়া খলিফা এবার কয়েকজন প্রহরী নিয়ে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর প্রাসাদে হাজির হ'ল।

নিগ্রো নফর সাঁদাল-এর হাতে খলিফার নজরানা হাজার দিনার দিয়ে বল্‌ল—'এই নাও খলিফার নজরানা। এবার তাঁর সঙ্গে ভেট করার বন্দোবস্ত করে দাও।'

বেচারা নিগ্রো নফর সাঁদাল মেছুয়া খলিফার দিকে বিস্ময় ভরা চোখে পিট পিট ক'রে তাকাতে লাগল। ভাবল, এক রাত্রের মধ্যে হতচ্ছাড়া মেছুয়াটি এমন জমকালো বাদশাহী সাজপোশাক পেল কোথায়?

নিগ্রো নফর সাঁদাল দরবারে পৌঁছে খলিফাকে অবনত মস্তকে কুর্ণিশ করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, মেছুয়া খলিফা নির্ঘাৎ কোন না কোন সুলতানিয়তের সুলতান বা বাদশাহ বনে গেছে। তার সাজ পোশাকই তার হালৎ ফেরার প্রমাণ দিচ্ছে। শুধু কি এ-ই! আপনার সঙ্গে ভেট করার জন্য পুরো এক হাজার দিনার নজরানা আমার কাছে জমা দিয়েছে।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর নির্দেশে মেছুয়া খলিফাকে দরবারে হাজির করা হ'ল। সে খলিফাকে যথোচিত ভঙ্গিতে কুর্ণিশ ক'রে বলল—'জাঁহাপনা, খোদাতাল্লা আপনার মঙ্গল করুন। আপনার সুলতানিয়তের প্রজারা সুখে দিনাতিপাত করুক।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ তার বাৎচিৎ শুনে বিলকুল তাজ্জব বনে গেলেন। ভাবলেন—এক রাত্রের মধ্যে কেবল তার আর্থিক অবস্থার উন্নতিই হয়নি, আচার-আচরণেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বল্‌লেন—'বল, আমার কাছে তোমার এমন কি দরকার যার জন্য এক হাজার দিনার নজরানা দিয়ে ভেট করলে?'

—'জাঁহাপনা, আপনাকে আমার গরীব খানায় নিমন্ত্রণ জানাতে

এসেছি। আশা করি আপনি মেহেরবানি করে আমার মেহমান হয়ে আমার বাঞ্ছা পূরণ করবেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা। এক বাৎ—তুমি কি একা আমাকেই তোমার মাকানে নিমন্ত্রণ করছ, নাকি আমার পারিষদবর্গও আমার সঙ্গে যাবে?'

মেছুয়া খলিফা নির্দ্বিধায় বল্‌ল—'না, না জাঁহাপনা, একা যাবেন কেন? আপনার দরবারে যত উজির-নাজির, আমীর-ওমরাহ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন সবাইকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে বহুৎ খুশী হব। আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাতেই আমি কর্মচারী কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই ছুটে এসেছি।'

হারুণ-অল-রসিদ-এর ইশারায় উজির জাফর এগিয়ে এসে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা, ধর্মাবতার খলিফার নির্দেশে আমরা তোমার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলাম।'

মেছুয়া খলিফা আর অপেক্ষা না ক'রে হারুণ-অল-রসিদ'কে কুর্ণিশ সেরে বিদায় নিল।

সে বিদায় নিলে খলিফা হারুণ অল-রসিদ চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বল্‌লেন—'আমি তো মেছুয়াটির আচরণে ক্রমেই তাজ্জব বনছি জাফর। কাল যে-মেছুয়াকে আমরা ন্যাকা চৈতন্য এক সাধারণ আদমি দেখেছিলাম তাকেই আজ একদম আমীর-বাদশাহ ব'লে মালুম হ'ল। কিছু ঠাহর করতে পারছ কি?'

উজির জাফর চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বল্‌লেন—'আমিও তো তা-ই ভাবছি জাঁহাপনা। এক রাত্রের মধ্যেই আদমিটি বিলকুল পাল্টে গেল!'

—'আর একটি ব্যাপার, তার পোশাক আশাকই কেবল নয় আদব কায়দাও বিলকুল বদলে গেলে। এক রাত্রের মধ্যেই এসব কিছু সে কি করেই বা রপ্ত ক'রে নিল! তা-ও তো তাজ্জব বনার মত ব্যাপারই বটে। সাচ্চা ব্যাপার শোন জাফর, এমন ব্যাপার এক রাত্রের মধ্যে রপ্ত করার নয়। দিনের পর দিন অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে রপ্ত করতে হয়। আরও একটি ব্যাপার, এক রাত্রের মধ্যে সে এত অর্থই বা পেল কোথায়?'

রাত্রির আন্ধার নামতে না নামতেই খলিফা হারুণ অল-রসিদ উজির-জাফর, আমীর-ওমরাহ পারিষদদের কয়েকজন নামজাদা আদমি এবং দেহরক্ষী মাসরুর'কে নিয়ে হাজির হলেন মেছুয়া খলিফা-র বিশালায়তন ইমারতের ফাটকের সামনে।

হারুণ-অল-রসিদ খচ্চরের পিঠ থেকে নামতে না নামতেই মেছুয়া খলিফা দৌড়ে এসে তাকে করজোড়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ ইমারতের ভেতরে ঢুকে বিলকুল তাজ্জব বনে যান। সর্বত্র ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। তাঁর নিজের প্রাসাদও বুঝি এমন সুন্দর করে সাজানো নয়। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইমারতের একান্তে বিশালায়তন একটি কক্ষ। আগাগোড়া মার্বেল পাথরে মোড়া। তার কেন্দ্রস্থলে হাতির দাঁতের তৈরি ধবধবে একটি তখতের মাফিক সুদৃশ্য একটি আসন। মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি। মেছুয়া খলিফা-র বিনীত প্রার্থনায় খলিফা হারুণ-অল-রসিদ তাতে উপবেশন করলেন। তাঁরই পাশে রক্ষিত অন্য আর একটি সুদৃশ্য আসনে বসতে দেয়া হ'ল উজির জাফর'কে।

নফর-নোকররা খানাপিনার বন্দোবস্ত করল। বিলকুল বাদশাহী খানা। আর পেয়ালায় পেয়ালায় সাজিয়ে দিল বহুৎ আচ্ছা খুসবুওয়ালা গুলাবী সরাব।

মেছুয়া খলিফা অতিথি অভ্যাগতদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আপনি এবং আমার অন্যান্য মেহমানরা খানাপিনায় তৃপ্তি পেলে আমার দিল্ খুশীতে
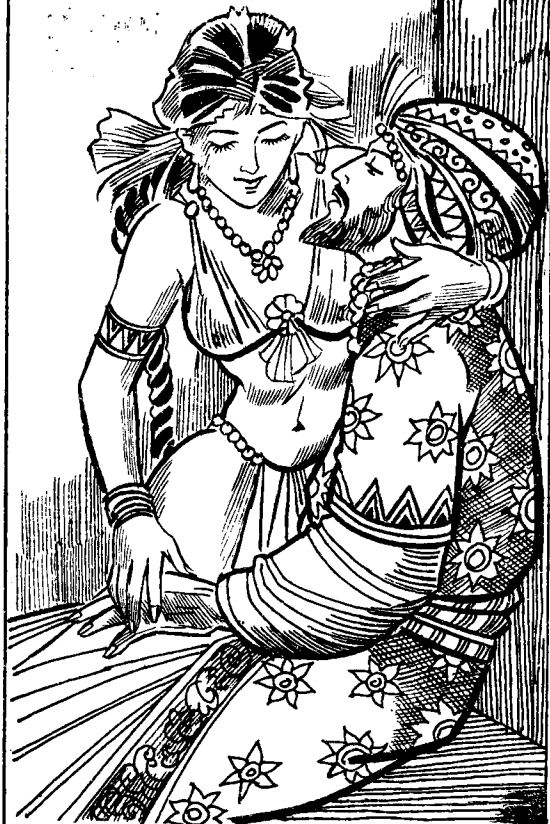
ভরে উঠবে।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ উজির জাফর-এর দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বল্‌লেন—'জাফর, এখন পর্যন্ত যা দেখলাম তাতে ক'রে বলতেই হচ্ছে, মেছুয়া খলিফা-র আচরণে এতটুকুও অহমিকা প্রকাশ পাচ্ছে না বরং সে একদম বিনয়ের অবতার। আমি তার আচরণে পুরোপুরি মুগ্ধ।'

জাফর বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কে বলতে পারে। এ-মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যেটুকু প্রত্যক্ষ করলাম আদতে হয়ত তা আসলের সামান্য একটি ভগ্নাংশমাত্র। ভবিষ্যতে আর যা কিছু দেখব তাতে হয়ত আমাদের চোখ বিলকুল ট্যাঁড়া হয়ে যাবে।'

এবার খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর অনুমতি নিয়ে গৃহকর্তা মেছুয়া খলিফা এক খুবসুরৎ বাদীকে দিয়ে গানা গাইবার বন্দোবস্ত করল।

খুবসুরৎ বাঁদীটি হ'ল স্বয়ং মেরিজান। সে বোরখায় প্রায় আপাদমস্তক জড়িয়ে গানা গাইতে এল। হারুণ-অল-রসিদ তার মুখ দেখতে না পাওয়ায় তাকে একদম চিনতে পারলেন না। লেকিন সে উদাত্ত কিন্নর কণ্ঠে গানা ধরামাত্র খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর কলিজা শুকিয়ে আসার জোগাড় হ'ল। সর্বাঙ্গে তার ঘাম দেখা দিল। মুহূর্তে শেরওয়ানি, কোর্তা ও পাৎলুন ঘামে বিলকুল জবজবে হয়ে গেল। কয়েক লহমার মধ্যে ঢলে পড়ে যান।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ায় তার পারিষদরা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ান।

বাঁদী মেরিজান খলিফার হালৎ দেখেও একদম নির্বিকারভাবে বসে রইল। আদতে সে তো জানেই এর প্রকৃত কারণ কি?

বাঁদী মেরিজান-এর নির্দেশে মেছুয়া খলিফা সবাইকে কামরা থেকে বাইরে চলে যেতে অনুরোধ করে। উজির জাফরসহ পারিষদরা কামরা ছেড়ে গেলেন।

সবাই বাইরে যেতেই মেরিজান নিজের গায়ের বোরখা ও ইজের খুলে ফেল্‌ল। কেবলমাত্র খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর সবচেয়ে প্রিয় সেমিজটি গায়ে রাখল। এবার গণ্ডুষ ভরে গুলাব পানি ছিঁটিয়ে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল। সে-ও মাত্র কয়েক লহমার জন্য।

চোখ মেলে তাকিয়েই মেরিজান'কে সামনে দেখতে পেয়ে তিনি ফিন সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। সংজ্ঞাহীন খলিফা হারুণ-অল-রসিদ'কে বুকে জড়িয়ে ধরে মেরিজান আদর-সোহাগ করতে শুরু করলেন।

—'আমি কি জেগে, নাকি খোয়াব দেখছি? আজই তবে শেষ বিচারের দিন এসে গেল?' সামান্য সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে কাঁপা কাঁপা ক্ষীণ কণ্ঠে হারুণ-অল-রসিদ উচ্চারণ করলেন।

মেরিজান কেঁদে কেটে বল্‌ল—'আপনি এসব কি বলছেন জাঁহাপনা। আমি জীবিতা। এই তো আমি আপনার পাশেই রয়েছি। আপনি অবশ্যই খোয়াব দেখছেন না, আর শেষ বিচারের দিনও এ নয়।'

ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখুন, আমি খুন-গোস্তের মেরিজান আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার মোউৎ হয় নি। গোরও দেয় নি আমাকে।'

হারুণ-অল-রসিদ চোখ মেলে তাকালেন।

মেরিজান তাঁর মুখের ওপরে ঝুঁকে আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এই তো আমি। আমিই আপনার আদরের মেরিজান। মেছুয়া খলিফা-র জন্যই আপনাকে ফিন বুকে ফিরে পেয়েছি। তারা আপনাকে স্রেফ ধোঁকা দিয়েছে। আপনাকে ঝুট বাৎ বলেছে, আমার মোউৎ হয়েছে। ঝুটা কবর বানিয়ে ধাপ্পা দিয়েছে। আমি জিন্দা—'

হারুণ-অল-রসিদ-এর চোখে পানির ধারা দেখা দিল। আনন্দাশ্রু। খুশীর চোখের পানি। গভীর আবেগভরে মেরিজান'কে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি ঠোঁটে, গালে ও কপালে ঘন ঘন চুম্বন করতে লাগলেন। মেরিজানও বিলকুল নিজেকে হারিয়ে বসল। তাঁরা যেন এ-দুনিয়ার কেউ নয়। অন্য কোনখানে, অন্য দুনিয়ার, একদম বেহেস্তে অবস্থান করছেন।

দীর্ঘসময় ধরে একে অপরকে আদর-সোহাগের মধ্য দিয়ে কাটানোর পর তাঁদের হুঁস হ'ল, এ-তো প্রাসাদের হারেম নয়। তবে তো নিজেদের একটু সামলে সুমলে থাকা দরকার।

মেছুয়া খলিফা দু'-বার কেশে, গলা খাঁকারী দিয়ে নিজের উপস্থিতি তাঁদের জানিয়ে দেয়ার কোশিস করল।

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ তাকে কামরার মধ্যে তলব করলেন। সে সলজ্জ ভঙ্গিতে দরওয়াজায় দাঁড়াতেই তিনি ব'লে উঠলেন—'খলিফা, তোমাকে বহুৎ বহুৎ সুক্‌রিয়া জানাচ্ছি। তোমার জন্যই আমার জান, আমার কলিজার সমান মেরিজান'কে বুকে ফিরে পেয়েছি। আমার দিল্‌ চাইছে, তুমি পাকাপাকিভাবে আমার পাশাপাশি কাছাকাছি থাক। আমি তোমাকে সুবেদারের পদে নিযুক্ত ক'রে সে-সাধ পূরণ করতে চাই।'

—'জাঁহাপনা, আমি তো আপনার বান্দা। স্রেফ এক বান্দা। বান্দা হয়ে মনিবের হুকুম অমান্য করা তো সম্ভব নয়।'

হারুণ-অল-রসিদ এবার আসন ছেড়ে উঠে মেরিজান'কে মেছুয়া খলিফা-র সামনে, মুখোমুখি দাঁড় করালেন। উভয়ের হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে আবেগ-মধুর স্বরে উচ্চারণ করলেন—'খলিফা, তুমি যাকে কায়দা-কসরৎ ক'রে মোউতের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছ তাকে আমি নিজে ভোগ-দখল করলে ধর্মে সইবে কেন?

তাই মেরিজান'কে আমি তোমার হাতে তুলে দিয়ে যথাযথ কর্তব্য পালনের আনন্দ পেতে চাই। আশা করি তুমি বা মেরিজান—কেউ-ই আমাকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে না।'

মেছুয়া খলিফা নতজানু হয়ে কুর্ণিশ ক'রে নিবেদন করল—'জাঁহাপনার হুকুম আমার কাছে আল্লাতাল্লা-র হুকুমের সমান। অতএব এ-হুকুম অমান্য করার হিম্মৎ আমার নেই।'

মেরিজান গায়ের ওড়নাটি সামান্য টেনে মুচকি হেসে মেছুয়া খলিফা-র দিকে আড়চোখে তাকাল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শেষ ক'রে চুপ করলেন

জহুরী হাসানের সফরের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে এক নওজোয়ানের দুঃসাহসিক অভিযানের কিস্‌সা শোনাব। কিস্‌সাটির নামকরণ করা হয়েছে 'জহুরী হাসানের সফরের কিস্‌সা।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' সাতাত্তরতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে তাঁর নয়া কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বহুদিন আগেকার কথা, তখন বসরাহ নগরে এক খুবসুরৎ নওজোয়ান ছিল। তার নাম ছিল—'হাসান।' বুড্ডা আব্বা আম্মার সে ছিল বহুৎ পেয়ারের একমাত্র লেড়কা। কারণ, তাদের একদম শেষ উমরে হাসান পয়দা হয়েছিল।

হাসান-এর আব্বা বহুৎ ধনদৌলত রেখে বেহেস্তে যান।

আব্বা বেহেস্তে যাবার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই সে আব্বার রেখে যাওয়া ধন দৌলত ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে আনন্দ-ফূর্তি ক'রে উড়িয়ে দিয়ে বিলকুল নিঃস্ব হয়ে গেল।

হাসান-এর আম্মা লেড়কার হালৎ দেখে হতাশায় একদম ভেঙে পড়লেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখে নিজের ভাগের অংশ বেচে দিয়ে লেড়কাকে একটি হীরা-জহরতের দোকান করে দিলেন।

হাসান খুবসুরৎ নওজোয়ান। বাৎচিৎ ও আচার আচরণ বহুৎ মোলায়েম। ফলে দু'-চারদিনের মধ্যেই তার দোকান জমজমাট হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশী ভিড় করতে লাগল নওজোয়ান লেড়কিরা। হীরা-জহরৎ খরিদ করার চেয়ে তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল চোখের সামনে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু সময় নওজোয়ান হাসান-এর সুরৎ দেখে জিন্দেগী সার্থক ক'রে তোলা।

এক বিকালে হাসান তার গদিতে বসে হিসাব নিকাষে ব্যস্ত। এমন সময় এক মাঝ-বয়সী পারসী তার দোকানে এল। তার মুখে ইয়া লম্বা দাড়ি আর মাথায় পাগড়ি। আর তার হাতে একটি কোরাণ শরিফ রয়েছে।

পারসীটি একটি টুল টেনে নিয়ে বসতে বসতে বল্‌ল—'বেটা বহুৎ বড়িয়া দোকান সাজিয়েছ দেখছি। তোমার সুরৎ আর আদব কায়দা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এক প্রস্তাব তোমার কাছে রাখতে চাই। যদি রাজী হও তবে বহুৎ খুশী হ'ব।'

হাসান মুচকি হেসে বল্‌ল—'প্রস্তাব! কি সে-প্রস্তাব?'

—'শোন বেটা, আমার নিজের কোন বালবাচ্চা নাই। আমি তোমাকে দত্তক নিতে আগ্রহী, তুমি কি রাজী?'

হাসান নীরবে মুচকি হাসল।

পারসী সাহাব এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'বেটা, আমি জিন্দেগীভর যা কিছু শিখেছি, আমার বুকে যা কিছু জিম্মা আছে তা দিয়ে যাবার মত কেউ-ই নেই। আমি গোরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব বিলকুল মুছে যাবে। এ-ব্যথা আমার পক্ষে একদম অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার অধীত বিদ্যা তোমাকে দিয়ে যেতে আগ্রহী। আর আমি জিন্দেগীভর যা কিছু জমিয়েছি, ধন-দৌলত যা আছে বিলকুল তোমার হাতে তুলে দিতে চাইছি। তাই তো তোমাকে দত্তক নেয়ার জন্য আমার কলিজা ছটফট করছে। হবে? আমার দত্তক বেটা হবে?'

হাসান যেন আশমানের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে বল্‌ল—'আমাকে দত্তক নিলে আপনার দিল্ যদি তৃপ্ত হয় তবে আমি রাজী।'

—'তবে আগামীকাল সব বন্দোবস্ত করে ফেলা যাবে, কি বল? এখন তবে আসছি।' পারসী সাহাব বিদায় নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

পারসী সাহাবের ইচ্ছার কথা শোনার পর থেকে হাসান-এর দিল্ চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘরে ফিরে আম্মার কাছে বিলকুল ঘটনা ব্যক্ত করল।

লেড়কার অভিপ্রায় জানতে পেরে তার আম্মা চমকে ওঠে। যেন একদম আশমান থেকে পড়ল। তার মধ্যে উত্তেজনাও প্রকাশ পেল। লেড়কার সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের জন্য তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌ল—'কেন ঝুটমুট ওসব বাজে ধান্দা নিয়ে মাতছিস বেটা? পারসীরা কস্মিনকালেও সৎ হয় না। তাদের জাতটিই ফড়েকবাজ। আর তাদের জন্মেরও কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না। ওসব বাজে ধান্দা ছাড়ান দে, দিল্ থেকে একদম ঝেড়েমুছে ফেল বেটা।'

হাসান প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—'কীসব বাজে বকছ আম্মা! আমার বাৎ শোন। মহানুভব পারসী সাহাবটি কিছুতেই বেজন্মা হতে পারে না। এমন কি সে মাথায় যে পাগড়ীটি ধারণ করেছে

সেটি পর্যন্ত আদৎ মুসলমানের। আমার বাৎ মান আম্মা, পারসী সাহাবটি সাচ্চা মুসলমান। মুসলমান পীর ছাড়া এমন পাগড়ী আর কারো মাথায় তোমার নজরে পড়বে না।'

তার আম্মা তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌ল—'বেটা, পাগড়ী দেখে মজে গেলে বিলকুল ভুল করবে। পারসীরা ঠগ, বদমাইশ ও ধাপ্পাবাজ। তাদের যা কিছু শেখানো হয় সবই অসৎ কাজ সিদ্ধ করার মতলবে। নিজের ধান্দা ছাড়া তারা জিন্দেগীতে কারো উপকার করার কোশিস পর্যন্ত করে না। মায়ের পেটের ভাইয়ের সর্বনাশ কি ক'রে সাধন করা যেতে পারে হরবখত সে-ফিকিরই তারা খোঁজে। তাই বলছি কি বেটা, তোর পারসী সাহাবটিকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দে।'

পারসী সাহাবটির প্রতি আম্মার বিরূপ মন্তব্য শুনে হাসান তো হেসে একদম লুটোপুটি হতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে বল্‌ল—'আম্মা, আমরা তো গরীব। একদম ভিখমাঙ্গার সামিল। তাই কারো ভাল কিছু দেখলে আমাদের চোখ টাটায়। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তামাম বসরাহ নগরে ওই পারসী সাহাবের মাফিক দিলদরিয়া ও মহান দ্বিতীয় কোন আদমিই নেই। আদমির মুখেই তার দিলের পাত্তা মিলে যায়। আমি বলছি, বিশোয়াস কর, সাহাবটি জরুর পীরটির কিছু হবে।'

হাসান-এর আম্মা নিশ্চিত হ'ল পীর সাহাবের ভূত বেটার ঘাড় থেকে নামানো বিলকুল অসম্ভব। তাই উপায়ান্তর না দেখে মুখে কলুপ-এঁটে বসে রইল।

তার পরদিন খুব ভোরে পারসী সাহাব পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাসান-এর দোকানের দরওয়াজায় হাজির হ'ল।

হাসান তাকে টুল এগিয়ে দিল বসার জন্য।

পারসী সাহাব বল্‌ল—'বেটা, এক বাৎ—তুমি কি শাদী করেছ?'

—'না, আম্মা জোর জুলুম বহুৎ করেছেন। লেকিন আজও মাথা পাতিনি।'

—'বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ আচ্ছা বেটা! তুমি যদি ইতিমধ্যেই শাদী করে থাকতে তবে আমার গুপ্তবিদ্যা তোমাকে দান করা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না।'

হাসান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

পারসী সাহাব হেসে বল্‌ল—'বেটা, আমি তো আগেই বলেছি, তোমাকে যা শিখাতে চাইছি তা নিতান্তই গুপ্তবিদ্যা। শাদী-নিকা করলে গুপ্তবিদ্যা তো তুমি ইচ্ছা থাকলেও কিছুতেই গোপন রাখতে পারতে না। একদিন না একদিন তোমার বিবির কাছে ফাঁস করে দিতেই।

পারসী সাহাব এবার হাসান-এর কাছ থেকে একটি তামার

রেকাবি নিল। তার নির্দেশে হাসান তার হাপরটি জ্বালিয়ে দিল। এবার পারসী সাহাব সেটি আগুনে দিয়ে টকটকে লাল ক'রে নিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেল্‌ল। তারপর দোকানের ধাতু নিষ্কাষণের পাত্রে করে তামার কুচিগুলি গালিয়ে নিল। হাপর জ্বলছে। সে হাপরের একদম ধারে এগিয়ে এসে কোরাণ শরিফটি খুলে অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব পাঠ করল। দুর্বোধ্য স্বরে কেটে কেটে কিছু বর্ণ উচ্চারণ করল।

এক সময় গলা চড়িয়ে বলে উঠল—'শয়তান, হারামি ধাতুর পো কাঁহিকার! তোর জানের মায়া থাকে তো এখনও বলছি—কাছে আয়। আমার কাছে, একদমই কাছে আয়। নইলে গালিয়ে একদম রূপ-ঢঙ বদলে ছাড়ব। জান বিলকুল খতম ক'রে দেব।'

এভাবে তড়পাতে তড়পাতে পাগড়ীর ভেতর থেকে পুরিয়া বের ক'রে তার ভেতর থেকে হলদেটে এক কিসিমের গুঁড়ো বের ক'রে গলিত তামার মধ্যে ছুঁড়ে দিল। ব্যস, মুহূর্তে পানির মাফিক তরল তামা জমে গিয়ে একদম কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল।

তার দিকে তাকিয়ে হাসান ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ যে একদম আদৎ সোনা বনে গেল!'

তবু সে নিঃসন্দেহ হতে পারল না। কিছু না কিছু সন্দেহ তার রয়েই গেল। সে হাত বাড়িয়ে কষ্টিপাথরটি নিল। বার কয়েক কঠিন বস্তুটি কষ্টিপাথরের গায়ে ঘষল। এবার আর তার তিলমাত্র সন্দেহও রইল না।

পারসী সাহাব বল্‌ল—'জলদি সোনাটুকু বাজারে বেচে দিয়ে এসো। এক বাৎ, খবরদার বিক্রি করা দিনার বা দিরহাম মোটেই দোকানে রেখে দেবে না বেটা। যা পাবে বিলকুল মকানে নিজের কামরায় নিয়ে সযত্নে রাখবে।

হাসান সোনাটুকু বেচে দু' হাজার দিনার আমদানি করল। পারসী সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী বিলকুল অর্থ তার আম্মার কাছে গচ্ছিত রেখে এল। আর তাকে পুরো ব্যাপারটি খোলসা করে বল্‌ল।

সব শুনে তার আম্মার কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে বল্‌ল—'বেটা করেছিস কি! এ যে বিলকুল কয়েদ খাটার কাজ! এক আদৎ ধাপ্পাবাজের খপ্পরে পড়েছিস দেখছি! কেলেঙ্কারীর ব্যাপার করে বসেছিস!'

—'কয়েদ? কেন কয়েদ খাটতে যাব কেন? আমি তো কাউকেই ধাপ্পা দেই নি। সোনা দিয়েছি, বিনিময়ে নায্য দাম নিয়ে এসেছি। রীতিমত কষ্টি পাথরে ঘষে, যাচাই ক'রে নিঃসন্দেহ হয়ে তবেই তো বাজারে বেচতে নিয়ে গেছি। যারা খরিদ করেছে তারাও তো আর অন্ধ নয় । যাচাই করে তবেই নিয়েছে।'

তার আম্মা তেমনি ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বল্‌ল—'তুই এখন আর গুড়া বাচ্চা নয়, তোর উমর হয়েছে বটে, লেকিন বুদ্ধি একদম পাকা হয় নি। আরে বেটা, পারসী সাহাবরা কেবল ধাপ্পাবাজই নয় তারা যাদু জানে। তুকতাকে পারদর্শী। তুই সোনা বলে যা চালিয়ে এসেছিস তা কিছুতেই আদৎ সোনা নয়। সোনার গুণ দীর্ঘসময় অক্ষুণ্ণ থাকে না। কিছু সময় বাদে সোনার গুণ নষ্ট হয়ে আদৎ ধাতুর গুণ ফিরে আসে। বিলকুল ধান্দাবাজী কারবার!'

—'তুমি যা-ই বল না কেন আম্মা, আমি তার কাছ থেকে সোনা বানাবার বিদ্যাই রপ্ত ক'রে নেব। আজ প্রথমে মৌলিক ধাতুকে আদৎ সোনায় পরিণত করার কায়দা কসরৎ শিখিয়েছেন। এবার থেকে আমি তার প্রয়োগ শুরু করব।'

হাসান এবার তার আম্মার মশল্লা গুঁড়ো করার হামানদিস্তাটি নিয়ে এসে কামরার মেঝেতে রাখল। হাপর ধরাবার উদ্যোগ করল। পারসী সাহাব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকায়। হাসান বল্‌ল—'খাঁটি পিতলের হামানদিস্তা। বহুৎ ভারীও বটে। একে সোনায় পরিণত করব।' হাতে তুলে নিয়ে ওজন সম্বন্ধে ধারণা নিতে গিয়ে বল্‌ল—'ওজন কত হবে, বলুন তো?'

—'না, তা-তো হবার নয় বেটা। এ-বিদ্যা তামাম দিনে একবার মাত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে। আজ যেটুকু পেয়েছ তাতেই খুশী থাক। কাল ফিন বানাতে পারবে। লোভ সম্বরণ কর। বেশী লালচ থাকলে ফয়দা তো কিছুই হবার নয়।'

হাসান বিলকুল বিমর্ষ হয়ে গেল। বার কয়েক ঢোক গিলে বল্‌ল—'জী, আপনার সোনা বানাবার গোপন রহস্যটি কি মেহেরবানি ক'রে বল্‌বেন?'

—'তুমি দেখছি, পাগলের মাফিক উদ্ভট এক কাজ করছ হে! এত ছটফট করলে বিলকুল ভেস্তে যাবে।' এবার তার দোকানের ওপর এক লহমায় চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে বল্‌ল—'শোন বেটা, যদি তোমার শেখার আগ্রহ এতই প্রবল হয়ে থাকে তবে দোকানে যা কিছু আছে বিলকুল পোটলা বেঁধে আমার মকানে চল। সেখানে হাতে ধরে তোমাকে আমার ভেতরে যা কিছু বিদ্যা রয়েছে বিলকুল উজাড় ক'রে তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেব।'

হাসান মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক তার দোকানের যা কিছু সঙ্গে নেয়া সম্ভব সেগুলো পোটলা বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে পারসী সাহাবকে অনুসরণ করতে লাগল।

কিছুদূর গিয়ে পারসী সাহাব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বল্‌ল—'বেটা, মালুম হচ্ছে, তুমি দিল্ খোলসা ক'রে আমার সঙ্গে যেতে পারছ না। দ্বিধা কিছু না কিছু রয়েছেই। বহুৎ আচ্ছা বাৎ! আমার মকানে তবে আর গিয়ে কাজ নেই। চল, তোমার মকানে গিয়েই আমার গুপ্তবিদ্যা তোমাকে শিখিয়ে দেব, খুশী তো?'

—'বহুৎ সুক্‌রিয়া। আচ্ছা বাৎ বটে। আমার আম্মা আপনার কায়দা কানুন নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলে দ্বিধামুক্ত হতে পারবেন।'

পারসী সাহাব এবার হাসানকে অনুসরণ করতে লাগল।

হাসান পারসী সাহাব'কে নিজের মকানে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসতে দিল। তার আম্মার কাছে গিয়ে বল্‌ল—'পারসী সাহাব আমাদের মেহমান হয়ে এসেছেন। এখানেই খানাপিনা সারবেন।'

—'মেহমান হয়ে যখন এসেছেন তখন তাকে জরুর খাতির যত্ন করতে হবে বেটা। খানাপিনার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আমি মহল্লারই কারো মাকানে রাত্রি গুজরান করতে যাব। এখানে আমি জরুর থাকছি না। কাল সে বিদায় নিলে আমি আচ্ছা ক'রে কামরা ঝাড়পোছ ক'রে তবে এখানে খানাপিনা সারব।'

হাসান-এর আম্মা করলও তা-ই। রুটি-সব্জী বানিয়ে রেখে পাশের এক মকানে চলে গেল।

পারসী সাহাব খানাপিনা সেরে বল্‌ল—'হাসান তোমার নুন আজ খেতেই হ'ল। এর অস্বীকার করার জো নেই। আর এ-ঋণ শোধ দেয়ার উপায় নেই। আর আমার জানা গুপ্তবিদ্যা তোমাকে শেখাব বলেই আমি তোমাকে নিজের জানের চেয়েও বেশী পেয়ার করি।'

পারসী সাহাব এবার পাগড়ীর ভেতর থেকে ছোট্ট একটি

কাগজের মোড়ক বের ক'রে হাসান-এর হাতে দিল।

হাসান মোড়ক খুলে দেখে তাতে হলদেটে এক কিসিমের গুঁড়া রয়েছে। পারসী সাহাব গুড়াগুলোর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বল্ল—'এর এক চিমটে গুঁড়া দিয়ে পাঁচ সের পিতলকে পাকা সোনায় পরিণত করা যাবে। এক সহস্র গাছ গাছড়ার মূল শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে এ-বস্তুটি বানানো হয়েছে। ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য। কোন্ কোন্ গাছের শিকড়, কোন্ প্রক্রিয়াতে এটি বানাতে হয় তা সুযোগ মাফিক তোমাকে জরুর শিখিয়ে পড়িয়ে দেব। গুঁড়োটুকু তোমার জিম্মাতেই থাক।'

হাসান-এর কৌতূহল হ'ল। সে ঝট্ করে গুঁড়োগুলো নাকের কাছে ধরে তার খুসবু নেয়ার কোশিস করল। ব্যস, এক লহমার মধ্যেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

হ্যাঁ, পারসী সাহাবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। সে স্বগতোক্তি ক'রে উঠল—'কাজ হাসিল! হাসান তোমাকে পাবার জন্য আমি এতদিন উতলা ছিলাম। বহুৎ ফন্দি ফিকির করে তবে আজ তোমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। আমার কব্জা থেকে তুমি আর অব্যাহতি পাচ্ছ না, কিছুতেই না।'

পারসী সাহাব এবার কামরার এক কোণ থেকে একটি বড়সড় বাক্স টেনে নিয়ে তার ভেতর থেকে কাপড়া ও অন্যান্য সামগ্রী বের করে তাতে সংজ্ঞাহীন হাসানকে ঢুকিয়ে দিল। এক কুলীর মাথায় চাপিয়ে সেটি সোজা দরিয়ার কিনারে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে বাক্সটি এক জাহাজে চাপিয়ে চম্পট দিল।

এদিকে খুব ভোরে হাসান-এর আম্মা কামরায় ঢুকেই যেন আচমকা এক হোঁচট খেল। তার আশঙ্কা অভ্রান্ত। দরওয়াজা খোলা। পেল্লাই বাক্সটি হাফিস। কাপড়া-পিরান বিলকুল কামরার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হাসান নেই, শয়তান বেতমিস পারসী সাহাবও বে-পাত্তা।

বুড়ি, লেড়কার শোকে বিলাপ পেড়ে কেঁদে মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। তার কান্নাকাটি শুনে মহল্লার সবাই ছুটোছুটি করে এল। নানা ভাবে প্রবোধ দিল। কেউ কেউ ছুটোছুটি করে হাসান-এর তল্লাশ করতে লেগে গেল। কোথায় পাবে তাকে? সে যে বাক্স বন্দী হয়ে এক জাহাজে চেপে দরিয়ার বুকে ভেসে চলেছে। একদম বেহুঁস।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচশ' বিরাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় ঢুকলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন—'জাঁহাপনা, বেহুঁস হাসান'কে নিয়ে জাহাজ দরিয়ার বুক চিরে এগিয়ে চল্‌ল। ধড়িবাজ পারসী সাহাবের বাৎ কি আর বলব আপনাকে। হতচ্ছাড়া শয়তানটির নাম বাহরাম। ফি সাল সে একটি ক'রে খুবসুরৎ মুসলমান নওজোয়ান নিয়ে হাফিস্ হয়ে যায়। কেন? তার বিকৃত কামনার শিকার হতে হয় নওজোয়ানটিকে। একে কুকুরের কাণ্ড কারখানা মনে করতে পারেন। তাকে বরং একটি কুকুর বলাই ভাল। কুকুরদের মতিগতি যার মধ্যে রয়েছে তাকে তো কুকুর বলতেই হয়।

পুরো একদিন এক রাত্রি বাদে হাসান-এর সংজ্ঞা ফিরে আসে। পারসী সাহাব নিজে গিয়ে তাকে মাঝে-মধ্যে বাক্সের খানাপিনা দিয়ে আসে।

দীর্ঘদিন এক নাগাড়ে জাহাজ চলার পর এক উপকূলে জাহাজ ভিড়ল। পারসী সাহাব দুই খালাসীর সাহায্যে বাক্সটিকে জাহাজ থেকে নিচে নামিয়ে আনল।

জাহাজটি ফিন মাঝ-দরিয়ার দিকে এগিয়ে গেলে বাহরাম বাক্সের ডালাটি খুলল। যাদুমন্ত্র চালিয়ে হাসান-এর আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে দিল। হাসান বাক্সের মধ্যেই উঠে বসল। আড়মোড়া ভেঙে জড়তা কাটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার কোশিস্ করল। ধীরে ধীরে বাক্সটি থেকে বেরিয়ে সে এবার বাইরে এল। হাসান-এর পরিষ্কার মালুম হ'ল, সে আর নিজের কামরা তো দূরের ব্যাপার নিজের মুলুকেও নেই। লেকিন, কেন তাকে এ-দরিয়ার কিনারে এনে ফেলা হ'ল? এ প্রশ্নের জবাব দেবার মত তো কেউ-ই নেই, পারসী সাহাব তো অবশ্যই নয়।

হাসান ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে অদূরবর্তী এক টিলার ওপর বসে পারসী সাহাব তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। হাসান-এর চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসতে চায়। তার আম্মার ভবিষ্যৎবাণী এক এক ক'রে স্মরণ হয়। বুড্ডী তাকে এত ক'রে সতর্ক ক'রে দিয়েছিল, পাত্তাই দেয়নি।

হাসান গম্ভীর মুখে পারসী সাহাবের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর স্বরে বল্ল—'আমি এখানে, অজানা-অচেনা দরিয়ার উপকূলে এলাম কেন? আমাকে হাজির করার পিছনে কোন্ মতলব্ কাম করছে? তোমার আদৎ ধান্দাটি খোলসা করে বল তো।'

পারসী সাহাব টিলাটির ওপর বসে থেকেই সরবে হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে এক সময় স্বাভাবিক কণ্ঠেই বল্ল—'মতলব্ জানতে চাও? শোন তবে—আমি এর আগে পর্যন্ত করীব্ এক হাজার ন'শ নিরানব্বই জন খুবসুরৎ মুসলমান লেড়কাকে ব্যবহার করেছি। পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছি তাদের ওপর। লেকিন তারা কেউ-ই তোমার মাফিক এমন খুবসুরৎ ছিল না। তোমাকে দিয়েই আমি এক হাজার সংখ্যা পূরণ করব। আমি ধারণাই করতে পারি নি তোমাকে এত সহজে কাবু করে ফেলতে পারব। আগে তুমি

আমার ধর্মমত গ্রহণ কর।'

হাসান গর্জে ওঠে—'শয়তান বেতমিস্ নক্কড়বাজ কাঁহিকার।'

—'আরে এত গোস্‌সা করছ কেন, বল তো? তোমার সঙ্গে একটু মস্করা করছিলাম। এতে আমি প্রমাণ পেলাম, ইসলাম ধর্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় বিশ্বাস।'

হাসান ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে।

—'এবার শোন, আমি তোমাকে কেন এরকম নির্জন-নিরালা দরিয়ার উপকূলে নিয়ে এসেছি। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, আমি তোমাকে যে-বিদ্যায় তালিম দিতে চেয়েছি তা একটু-আধটু নিরালা জায়গা না হলে ঠিক জমে না।'

এ-পাহাড়টির চূড়ায় উঠলেই আদৎ জায়গা পাওয়া যাবে। তুমি যদি নিজের ইচ্ছাতে সেখানে যেতে না চাও তবে বলপ্রয়োগ করতে হবে, কায়দা কসরৎ চালাতেই হবে, ইয়াদ রেখো। এ-পথ যদি নিতেই হয় তবে তোমাকে ফিন আগের মাফিক বাক্সবন্দী করতে হবে। এবার তোমার মত কি, বল। আদতে পাহাড়ের ওপরেই ওষধি গাছগাছড়া থাকে, জানই তো। আর তোমাকে শিক্ষার তালিম দিতে হলে সেগুলো সংগ্রহ করতেই হবে, আশা করি তোমার মালুম হচ্ছে?

হাসান বুঝল, বেগড়া দিয়ে ফায়দা কিছুই হবার নয়। আদমিটা মহা ধাপ্পাবাজ, ধড়িবাজও বটে। পাহাড়ের দিকে এক লহমায় তাকিয়ে নিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল—'তাজ্জব ব্যাপার তো! এত উঁচা পাহাড়, কি করে উঠব ভেবেই তো আমার দিমাক্ খারাপ হবার জোগাড়।'

—'আরে ধ্যুৎ! ঝুটমুট তুমি ভেবে মরছ, আমি যাদুমন্ত্র লাগিয়ে তোমাকে একদম পাহাড়ের চূঁড়ায় চালান দিয়ে দেব।'

পারসী সাহাব এবার তার আলখাল্লার জেব থেকে একটি তামার পাত বের করল। তাতে কি যেন সব লেখা রয়েছে। তার গায়ে বার কয়েক টোকা দিতেই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর তুফান শুরু হয়ে গেল। আশমানের এক কোণে দেখা দিল ঘন কালো জমাটবাঁধা এক টুকরো মেঘ। মেঘের টুকরোটির গা থেকে বেরিয়ে এল এক খুবসুরৎ পক্ষীরাজ ঘোড়া।

ঘোড়াটি এসে নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মাফিক পারসী সাহাবের সামনে দাঁড়াল। প্রথমে পারসী সাহাব নিজে ঘোড়ার পিঠে চাপল। তারপর তার পিছনে হাসান'কে বসিয়ে নিল। ব্যস, বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে পক্ষীরাজটি দিব্যি আশমানের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

পারসী সাহাব দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল—'হাসান, কেমন মালুম হচ্ছে? আশা করি আন্দাজ করতে পারছ বেগড়বাই ক'রে কোনই ফায়দা হবার নয়।' শয়তানের মাফিক অট্টহাসি আশমান

কাঁপিয়ে তুল্‌ল। হাসি থামিয়ে এবার বল্‌ল—'হাসান, তোমাকে আমি বিলকুল হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছি। আমার কব্জা থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারে এ রকম আদমি আজও দুনিয়ায় পয়দা হয় নি। জানবে, দুনিয়ায় অগ্নি বিনা অন্য কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। এবার আমার কামনা যাতে পূর্ণ হয় তার জন্য সচেষ্ট হও। অন্যথায় জান খতম হয়ে যাবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

পারসী সাহাবের বাৎচিৎ শুনে হাসান বিকট আর্তনাদ ক'রে ওঠে—'ইয়া আল্লাহ্! এ-ই কি তোমার মর্জি! শয়তান বেতমিস কাঁহিকার! শোন্, আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় দ্বিতীয় কারো অস্তিত্ব আমি মানি না। তুই কি জানিস না, আমি সাচ্চা মুসলমান। ব্যস, চোখের পলকে সে যাদুকর পারসীর তলপেটে আচমকা এক লাথি মারে। টাল সামলাতে না পেরে সে শূন্যে ভাসতে ভাসতে ছিটকে গিয়ে পড়ল একদম দরিয়ার কিনারে।

ব্যস, খতম্। যাদুকর পারসীর জান বিলকুল খতম্ হয়ে গেল। যাদুকরকে খতম করতে পারায় হাসান-এর মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। যাদুকরের হাতের দণ্ডটি তার হাতে মুঠো ক'রে ধরা। এটি দিয়েই যাদুকর অলৌকিক কাণ্ডকারখানা সম্পন্ন করত।

হাসান স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে পাহাড়টির চূড়া থেকে নিচের

দিকে তাকাল। আচমকা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লাহ! এত উঁচা!' একদম খাড়া পাহাড়! কি ক'রে সেখান থেকে সে নিচে নামবে তা ভেবেই তার বুকের ভেতরে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।

যাদুদণ্ডটি কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার কিছুই জানা নেই। আচমকা কিছু করতে গেলে একদম হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তাই সেটিকে কোমরে গুঁজে রাখল।

আচমকা হাসান-এর নজরে পড়ল, পাহাড়ের ওধারে কে বা কারা যেন আগুন জ্বেলেছে। কুণ্ডুলি পাকিয়ে ধোঁয়ার মাফিক উঠছে। তবে কি সেখানে কোন আদমি-টাদমি আছে নাকি?'

হাসান পা টিপে টিপে একদম সন্তর্পণে সামান্য এগিয়ে যাওয়ার কোশিস্ করল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীটিকে লক্ষ্য করে সামান্য এগিয়ে যেতেই একটি গম্বুজ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আদতে আগুনের শিখার মাফিক আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে।

গম্বুজটি নজরে পড়া মাত্র হাসান-এর দিল্ উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠল।

কয়েক কদম গিয়েই হাসান আচমকা চমকে গেল। সে ভাবল, এমনও তো হতে পারে প্রাসাদটিতে কোন আফ্রিদি দৈত্য, জীন, পরী-টরীর বাস হতে পারে। এমনও হতে পারে, এটি কোন সুলতান-বাদশাহের নাচমহল। যা-ই হোক না কেন, হাসান সেখানে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। আর ভাবল, 'প্রাসাদে গিয়ে দরবাররক্ষীকে সবার আগে এক টুকরো রুটি আর পানি দিতে অনুরোধ করবে। পানিবিনা কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। আর এ-মতলবে আরও একটি ব্যাপার ফয়সালা হয়ে যাবে, যদি সে সাধারণ আদমি হয়ে থাকে তবে কিছু না কিছু দয়া মায়া তার মধ্যে প্রকাশ পাবেই। আর যদি আফ্রিদি দৈত্য বা জীন-পরী হয় তবে অন্য কিসিমের আচরণ সে প্রদর্শন করতে বাধ্য।

হাসান বেপরোয়া দিল্ নিয়ে প্রাসাদটির দিকে এগোতে থাকে। এক সময় প্রাসাদের সদর দরওয়াজায় এসে দাঁড়ায়। আজব কাণ্ড! সদর দরওয়াজায় কোন প্রহরীর অস্তিত্ব হাসান-এর নজরে পড়ল না। দুরু দুরু বুকে ভেতরের দিকে কয়েক কদম এগোতেই নজরে পড়ল দুই নওজোয়ান খুবসুরৎ লেড়কি এক শ্বেতপাথরের বেদীতে বসে মাথাগুঁজে দাবা খেলছে। তাদের মধ্যে ছোটা লেড়কিটি খেলার ফাঁকে মুখ তুলে তাকিয়েই সামনে হাসানকে দেখেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল।

সে লেড়কিটি বড়া লেড়কিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বল্ল—'বহিনজী, ওই দেখ এক খুবসুরৎ নওজোয়ান!'

—'লেকিন কে এই নওজোয়ান? তবে কি শয়তান পারসী যাদুকরের কব্জা থেকে অব্যাহতি পেয়ে এখানে ভেগে এসেছে? কি ক'রে যে সে শয়তান বেতমিসটিকে জব্দ করল, মালুম হচ্ছে না।'

হাসান বিস্ময় মাখানো নজর মেলে লেড়কি দুটোর সুরৎ নিরীক্ষণ করতে লাগল। অপরূপ সুরতের আভায় চোখ দুটো বিলকুল ঝলসে দিচ্ছে। তার মালুম হ'ল, বেহেস্তের হুরীরা বুঝি জমিনে নেমে এসেছে।

হাসান বল্ল—'তোমার ধারণা বিলকুল সাচ্চা। বিকৃত কাম-জ্বালা মেটানোর জঘন্য মনোবৃত্তি নিয়ে আমাকে শয়তান বাহরাম এখানে হাজির করেছিল। লেকিন পারল না। আমি সুযোগ মাফিক তাকে ধাক্কা দিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে একদম জমিনে ফেলে দিয়েছি। ব্যস, তার জান খতম হয়ে গেছে।'

—'সে কী মিঞা! জব্বর এক কাজ তুমি হাসিল ক'রে ফেলেছ দেখছি! তুমি তো একদম কামাল করে দিয়েছ! শয়তান বাহরাম কত লেড়কাকে যে জবরদস্তি পাকড়াও করে এখানে নিয়ে এসে তার জঘন্য কাম-ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে ইয়ত্তা নেই! তুমি তো বাহাদুর নওজোয়ান দেখছি,' ছোটা লেড়কিটি বল্ল।

সে এবার বড়া লেড়াকিটির দিকে তাকিয়ে বল্ল—'বহিনজী, এ সাহসী নওজোয়ানটিকে আমি ভাইয়া ব'লে মেনে নিলাম। সে-ও আমাকে বহিন সম্বোধন করবে।'

তারপর সে হাসানকে গোসল করিয়ে খানাপিনা সাজিয়ে দিল।

তিন জনে খানাপিনা সারতে সারতে হাসান'কে বল্ল—'ভাইয়া তোমার নামটিই তো শোনা হ'ল না। কি নাম তোমার, বলতো?'

হাসান খানা চিবোতে চিবোতেই জবাব দিল—'হাসান, হাসান আমার নাম।'

লেড়কি দুটো উত্তেজনা প্রকাশ ক'রে বল্ল—'ভাইয়া হারামী পারসীটিকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে তুমি জব্বর এক কাজ করেছ। শয়তানটি ছিল এক সাক্ষাৎ দোজখের কীট। জিন্দা থাকলে সে যে আরও কত লেড়কার সর্বনাশ করত ইয়ত্তা নেই।

ছোটা লেড়কিটির নাম গুলাবী। সে এবার তাদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হাসান-এর সামনে তুলে ধরতে গিয়ে বল্ল—'ভাইয়া আমরা উভয়েই বাদশাহের লেড়কি। আমার বহিনজীর নাম জামিলা আর আমার নাম গুলাবী। আমাদের আরও পাঁচ-পাঁচ বহিন আছে। তাদের সুরৎ আমাদের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয়, তারা দলবেঁধে শিকার করতে গেছে। কিছুক্ষণ বাদে ফিরবে। এক আব্বার ঔরসে আমরা সাত বহিন পয়দা হয়েছি। আমরা পৃথক পৃথক আম্মার গর্ভে পয়দা হয়েছি। আমার আর বহিনজীর আব্বা জীনদের সম্রাট। একদম জেদী পুরুষ। সে জন্য কেউ-ই আমাদের শাদী করতে উৎসাহী হয় নি। কে চায় সখ ক'রে বিপদের ঝুঁকি মাথায় তুলে নিতে, বল! তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে, তাঁর লেড়কিদের

সমান সুরৎ দুনিয়ার কোন লেড়কির মধ্যেই দেখা মিলবে না, তাই তিনি তাঁর মন্ত্রীকে বল্‌লেন—'এমন এক জায়গার পাত্তা লাগাও যার খোঁজ কোন জীন বা আফ্রিদি পাবে না।'

শোন ভাইয়া, আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর পরীকে পয়দা করেছে কেবলমাত্র পুরুষদের সঙ্গে যৌনক্রীড়ায় লিপ্ত হতে সুখ দেয়া নেয়ার জন্য।

হাসান বল্‌ল পয়গম্বর তো বলেই গেছেন—'কোন লেড়কির পক্ষেই কুমারীত্ব নিয়ে জিন্দা থাকা সম্ভব নয়। তাই সম্রাটের এরকম সিদ্ধান্ত বিলকুল শরমের ব্যাপার। আর লেড়কিরাও জিন্দেগীভর হতাশা আর দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জিন্দেগী কাটাবে।'

—'লেকিন আমাদের আব্বার এক গোঁ। তাই মন্ত্রীকে কড়া হুকুম দিলেন—তুমি যদি তাদের জিন্দেগীভর কুমারী থাকার উপযুক্ত জায়গার তাল্লাশ করতে না পার তবে তোমাকে শূলে চড়াবো। না, তোমার গর্দান নেব, ইয়াদ রেখো।'

শেষ পর্যন্ত আমার আব্বার জেদ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মন্ত্রী এ-মেঘমালা পর্বতটিতে নির্বাসিন করলেন।

সম্রাট সুলেমান-এর বিদ্রোহী সেনাপতিরা দুর্গম এ পর্বতে ভেগে এসেছিল। তারা বসবাসের জন্য একটি সুরক্ষিত ও খুব সুন্দর এ-প্রাসাদটি বানিয়েছিল। তাদের পর থেকেই এ-পার্বত্য প্রাসাদটি একদম ফাঁকা পড়ে। সেনাপতির মুখে এ-প্রাসাদটির বিবরণ শোনামাত্র আমার আব্বা আমাদের সাত বহিনকে তাঁর কয়েকটি জীন আর মরিদস্‌'কে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ব্যস, সে থেকে আজ অবধি আমরা এখানেই রয়ে গেছি। আমাদের পৌঁছে দিয়েই তারা ফিন নিজেদের মুলুকে ফিরে গেল।

'এক আজব জায়গা ভাইয়া। এখানে গ্রীষ্মের ছটফটানি নেই, হাড্ডি কাঁপানো শীত কাকে বলে এখানে আসার পর আমরা বিলকুল ভুলে গেছি।

ভাইয়া, বিশ্বাস কর, আমরা এখানে জব্বর খোস মেজাজে দিন গুজরান করছি। আল্লাতাল্লা-র কাছে আমরা হরবখত। একজন পুরুষ-সঙ্গীর জন্য আর্জি জানাতাম। তিনি আমাদের সে-বাঞ্ছা পূরণ করেছেন। তিনি তোমার মাফিক খুবসুরৎ নওজোয়ানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা সাতবহিন তোমার মাফিক এক ভাইয়াকে মাথার মণি করে রাখব।'

এক লহমায় হাসান-এর দিল্ থেকে সব দুঃখ অভিমান কর্পূরের মাফিক উবে গেল। নিখাদ খুশীর আমেজে তার দিল্ কানায় কানায় ভরে উঠল। আজব ব্যাপারই বটে, এতগুলো খুবসুরৎ লেড়কির মাঝে থেকেও তার মধ্যে তিলমাত্রও যৌবন-চাঞ্চল্যের উদয় হয় না।

সাত বহিনের সঙ্গে শিকার করে ঘুরে বেড়িয়ে, খানাপিনা করে হাসান-এর দিনগুলি গুজরান হয়ে যায়। সে যেন এক নয়া জগতে, নয়া জীবনের স্বাদ পেয়েছে। এখানে সে যে অনাবিল আনন্দের সন্ধান পেয়েছে মিট্টির দুনিয়ায় তা যেন খোয়াবেও ভাবা যায় না।

সাত বহিনের কাছে হাসান তার মুলুকের বিবরণ দেয়, সেখানকার আদমিদের সুখ-দুঃখ আশা-হতাশার ব্যাপারে কিস্‌সা বলে আর সাত লেড়কি মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক তন্ময় হয়ে শোনে। তারা সে সব কিস্‌সা—কাহিনী শুনে তাজ্জব বনে, আঁৎকে ওঠে আবার কখনও অনাস্বাদিত আনন্দ পায়।

হাসান এর কাছে সব লেড়কিই সমান আদরের। লেকিন ছোটা লেড়কি গুলাবী'কেই তার বেশী পছন্দ হয়।

একরোজ তারা হাসানকে নিয়ে দলবেঁধে টুঁড়ে বেড়াচ্ছিল। শিকার করল বনে বনে টুঁড়ে। তারপর এক হ্রদের ধারে বসে দীর্ঘ সময় ধরে বাৎচিৎ সারল।

হঠাৎ ঈশান কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। দেখতে দেখতে উঠল তুফান। প্রলয়ঙ্কর তুফান। গুলাবী আচমকা হাসান-এর একটি হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বল্‌ল—'জলদি চল, এখান থেকে ভেগে যাই। নইলে তুফানে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

গুলাবী হাসান এর হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে অদূরবর্তী একটি ঝাউবনে নিয়ে গিয়ে বলল—'এখানে একদম ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাক। কোন বাৎ নয়। এমন কি নড়বে চড়বেও না। এক লহমার মধ্যে সম্রাট জিনিস্থানের জিন-বাহিনী এসে পড়বে। এখানে তারা নামবে। যে কালো মেঘ আর তুফান দেখছ, এ তারই পূর্বাভাষ। ফি সাল আমাদের আব্বার প্রাসাদে এক উৎসব হয়। তাতে পরদেশী বহু আফ্রিদি ও জিন সম্রাটরা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। আব্বা আমাদের তখন সেখানে নিয়ে যান। উৎসব অনুষ্ঠানের সামিল হই আমরা সাত বহিন। যদি কোনক্রমে আফ্রিদি বা জিনদের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই তাই বিশাল এক সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। আমাদের পাহারা দিয়ে তারা প্রাসাদে হাজির করে। সম্রাটের হুকুম, আমাদের অমান্য করার জো নেই। তোমার অবশ্য এখানে একা পড়ে থাকতে তকলিফ্ হবে। উপায় নেই, একটু মানিয়ে নিতেই হবে। তবে উৎসব মিটে গেলেই আমরা ফিরে আসব।'

সেদিন বিদায় মুহূর্তে সাত লেড়কিই চোখের পানি ঝরাতে লাগল। ছোটা লেড়কি গুলাবী একগোছা চাবি হাসান-এর হাতে তুলে দিয়ে বল্‌ল—' হুশিয়ার, ভুলেও যেন পাশের ওই কামরাটিতে যেও না। তোমার যাতে ইয়াদ থাকে তার জন্য এই দেখ, চাবিটির গায়ে বিশেষ এক চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। ভাইয়া আমার, ও দিকে যেওনা যেন, ইয়াদ থাকবে তো?'

হাসান ঘাড় কাৎ করে তার কথা রাখার সম্মতি জানালো।

—'আর শোন, অন্য যে কোন কামরায় তোমার অবাধ গতি।

খানাপিনা, পানি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামানপত্র সাজানো আছে। আশা করি তোমার কোনই তকলিফ্ হবে না।'

সাত বহিন হাসান -এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিন বাহিনীর সঙ্গে চলে গেল।

হাসান একা একা ইয়া পেল্লাই প্রাসাদে মহাফাঁপরে পড়ে গেল। সময় যেন আর ফুরাতে চায় না। ছোটা লেড়কি গুলাবীর 'নিষেধ বাক্য'-টি তার বুকের ভেতরে খচ্খচ্ করতে থাকে। সে স্বগতোক্তি করল—গুলাবী ওই কামরাটিতে না যাওয়ার জন্য এত ক'রে বারণ ক'রে গেল কেন! এমন কি আছে ওই কামরাটিতে যার জন্য তার এমন আকুলি বিকুলি।

হাসান কুরশি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কৌতূহলের শিকার হয়ে নিষিদ্ধ কামরাটির দিকে দু' কদম এগিয়ে গেল। ঠিক সে-মুহূর্তেই গুলাবী-র কাতর অনুনয় বিনয় বুকের ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কামরাটি খুলে দেখার জন্য বহুৎ কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন দিয়ে শোবার ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। দিল্ থেকে কৌতূহলটুকু মুছে ফেলার কোশিস্ করল।

লেকিন শত কোশিস্ করেও নিষিদ্ধ কামরাটির ব্যাপার দিল্ থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারল না। নিজেকে সংযত রাখা হাসান-এর পক্ষে কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত সে কৌতূহলের শিকার হতে বাধ্য হ'ল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। নসীবে যা আছে হবে। বড় জোর মরতে হবে, এই তো ? এর বেশী কিছু তো নয়? তবু এ ভাবে প্রতিনিয়ত একটি ব্যাপার দিল-কলিজাকে কুঁরে কুঁরে খাওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। জান কবুল করে হলেও সে খুলে দেখবে, এমন কি গোপন রহস্য ওই কামরাটিতে রয়েছে যার জন্য গুলাবী ও তাকে এমন ক'রে কাতর মিনতি জানিয়ে গেল।

হাসান উদ্ভ্রান্তের মাফিক এগিয়ে চল্ল নিষিদ্ধ কামরাটির দিকে। দরওয়াজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সময় নষ্ট করলে যদি ফিন মতিগতি বদলে যায় তাই ঝট করে চাবি ঘুরিয়ে তালাটি খুলে ফেলল।

হাসান এক লাফে নিষিদ্ধ কামরাটির ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। তাজ্জব বনে গেল। কামরাটি একদম ফাঁকা। কোন আসবাবপত্র পর্যন্ত নেই। কেবল মাত্র একটি কাঠের সিঁড়ি দেয়ালে ঠেসে দিয়ে দাঁড় করানো। ছাদের কাছাকাছি যেখানে সিঁড়িটির মাথা রয়েছে সেখানে দেয়ালের গায়ে একটি গর্ত। বিলকুল ঘুলঘুলির মাফিক। একটি আদমি কোন রকমে গলে যেতে পারে। ব্যস, এর বেশী কিছুই নয়।

হাসান-এর কৌতূহল হ'ল। সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। গর্তটি দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল। নিচের দিকে সমতল জমিন আর মাথার ওপরে আশমান। দূরে বনভূমির সবুজের বিচিত্র সমারোহ। হ্যাঁ, আরও আছে। সবুজ বনের ধারে একটি মনলোভা হ্রদ। তার চারদিকে জানা-অজানা গাছের বিচিত্র সমাবেশ যেকোন সৌন্দর্য পিপাসুর দিল্‌কেই আকর্ষণ করবে। হ্রদটির গায়ে বিশালায়তন এক ইমারত। আগাগোড়া মার্বেল পাথরের তৈরী। প্রাসাদ থেকে হ্রদটি পর্যন্ত একটি মার্বেল পাথরের সিঁড়ি নেমে এসেছে। দু'ধার সোনার পাত দিয়ে মোড়া। প্রবাল আর পান্না প্রতি ধাপের গায়ে জায়গায় জায়গায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

সিঁড়িটির সবচেয়ে ওপরে, চাতালের একটি ধারে রয়েছে একটি কারুকার্য মণ্ডিত মসনদ।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচ শ' সাতাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, হাসান ওই নিষিদ্ধ কামরাটির দেয়ালের গর্তটি দিয়ে বিস্ময় মাখানো নজরে বাইরের প্রকৃতিকে দেখতে লাগল। হঠাৎ এক ঝাঁক পাখি বাতাসে ডানা মেলে হাল্কাভাবে উড়তে উড়তে হ্রদটির ঘাটে এসে বসল। দশটি পাখি, ধবধবে সফেদ তাদের গায়ের রঙ। তাদের মধ্যে যার উমর সবচেয়ে বেশী সে কারুকার্য মণ্ডিত ওই মসনদটির ওপর উঠে বিচিত্র ভঙ্গিতে বসল।

কিছু সময় বাদে পাখিগুলো ভোজবাজীর মাফিক বদলে গিয়ে দশটি খুবসুরৎ লেড়কির অবয়ব ধারণ করল। সবাই পূর্ণ যৌবনা। তাদের সবার গা থেকে সুরৎ যেন উপচে পড়ছে। তারা এবার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিচিত্র ভঙ্গিতে সাঁতার কাটতে লাগল। এক সময় তারা এক এক করে পানি থেকে উঠে সিঁড়িতে দাঁড়াল। সবাই বিলকুল বিবস্ত্রা। সদ্য স্নাতা। উন্মুক্ত কেশরাশি সুনিবিড় কৃষ্ণ মেঘের মাফিক প্রত্যেকের পৃষ্ঠদেশে এলায়িত। আবরণ বলতে যা কিছু বিলকুল ওই কেশদাম। তাতেই তাদের যৌবন চিহ্নের যে টুকু হাসান-এর দৃষ্টি আড়াল করে রাখছিল। ব্যস, এর বেশী কিছুই নয়। তাদের শরীরের অবশিষ্ট অংশ বিলকুল উদোম।

হাসান নিষ্পলক চোখে অভাবনীয় দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করতে লাগল। এবার সে অনুমান করতে পারছে, কেন গুলাবী তাকে এ-কামরাটিতে প্রবেশ করতে বার বার নিষেধ করেছিল। এমন দৃশ্য চাক্ষুষ করলে যেকোন নওজোয়ানের দিল্ চনমনিয়ে উঠত, কলিজার ছটফটানি শুরু হতে বাধ্য। হাসান-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। তার শিরায় শিরায় খুনের গতি অনেকাংশে চড় চড় ক'রে বেড়ে গেল। কলিজায় তথাকথিত জ্বালা অনুভব করতে লাগল। সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মাথার ঝিমঝিমানি।

খুবসুরৎ লেড়কিটি মসনদটির ওপরে মনলোভা এক ভঙ্গিতে বসল। আগোছাল কেশদামে তার ঠিকরে বেরিয়ে আসা যৌবনচিহ্নগুলোর খুব সামান্য অংশ চাপা পড়েছে। হাসান কৌতূহলী নজর মেলে সব কিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল। সে ভাবতে লাগল, যে-শিল্পী এর সুরৎ গড়ে তুলেছে সে না জানি কতবড় শিল্পী। নইলে এমন নিখাদ, নিভাঁজ ও নিখুঁত শিল্পকর্ম কারো পক্ষে গড়ে তোলা কি ক'রে সম্ভব?

সম্রাজ্ঞী মসনদে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে বসে। আর তাকে ঘিরে রয়েছে নয়টি বিবস্ত্রা লেড়কি।

হাসান কামরাটি থেকে বেরিয়ে গুটি গুটি হ্রদটির দিকে এগিয়ে যায়। অদূরে একটি মোটা গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে সে উঁকি ঝুঁকি মেরে খুবসুরৎ লেড়কিদের কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করতে লাগল। তার দিল্ ক্রমেই চনমনিয়ে উঠতে থাকে। নিজেকে আর সামলে রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভাবল, এক পা-দু' পা করে এগিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবে।

হাসান সবে এক কদম এগোবার কোশিস্ করে এমন সময় তার কানে এল, লেড়কিদের মধ্য থেকে একজন বলছে—'রাজকুমারী, ভোর হয়ে এল ব'লে। আমাদের যাত্রা করার সময় হয়ে এল।'

লেড়কিরা ফিন পাখির ডানা ধারণ করল। তারপর ডানা মেলে শূন্যে উড়তে শুরু করল। হাসান তাদের ফেলে যাওয়া পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। এক সময় তারা মেঘের আড়ালে চলে গেল। হাসান-এর ফুসফুস নিঙড়ে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

হাসান বুকভরা হতাশা নিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এল। ওই রাজকুমারী ও তার সহচরীদের চিন্তা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হ'ল।

এবার থেকে সন্ধ্যার আন্ধার ঘনিয়ে আসতে না আসতেই হাসান সে-কামরাটিতে ঢুকে সিঁড়ি-বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

দেয়ালের ছিদ্রটি দিয়ে মাথা গলিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় তামাম রাত্রি গুজরান করে দেয়। লেকিন তার বহু আকাঙ্ক্ষিতা রাজকন্যা এবং তার সহচরীরা এল না। এমনি ক'রে একের পর এক রাত্রি কাটতে থাকে। কিন্তু তার দিল্ পাগল করা খুবসুরৎ লেড়কিদের আর দেখা মেলে নি।

হাসান খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছে। হরবখত কেবল সে-রাজকুমারীর ধ্যানে ডুবে থাকে।

একদিন গুলাবী ও তার বহিনরা তাদের আব্বার প্রাসাদ থেকে উৎসব-অনুষ্ঠান চুকিয়ে ফিরে এল।

গুলাবী হাসান-এর কামরায় গিয়ে দেখে সে পালঙ্কের ওপর শুয়ে। তার শরীর শুকিয়ে একদম পোড়াকাঠ হয়ে গেছে। চোখের মণি দুটো গর্তে বসে গেছে। চোখের কোলে কালি। মাথার চুল উসকো-খুসকো। তার হালৎ দেখে গুলাবী যেন আচমকা এক হোঁচট খায়। ইতিমধ্যে এমন কি ঘটতে পারে যার জন্য হাসান-এর এ-হালৎ হতে পারে? সে তার শিয়রে এসে দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলে—'ভাইয়া, তোমার কি হয়েছে? তোমার হালৎ এমন হ'ল কি ক'রে? তোমার কি হয়েছে আমাকে খোলসা করে বল। আমি কোশিস্ ক'রে দেখি, তোমার মুশকিল আসান করতে পারি কিনা।'

হাসান আর্তনাদ করে বলে—'বহিন, বিলকুল কসুর আমার। একদম আমার। আমি সাধ করে জিন্দেগী বরবাদ করতে বসেছি। আমার কসুরের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে দাও। মৌউৎ আমায় টানছে, নইলে তুমি এত ক'রে নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন নিষিদ্ধ কামরাটিতে যাব। কেনই বা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ছিদ্রটি দিয়ে তাকাতে যাব, বল?'

গুলাবী চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'ভাইয়া, তুমি বেহেস্তে যাবার আগে আমিই বেহেস্তে পাড়ি দেব। শোন, যা ঘটানোর তা-তো ঘটিয়েই ফেলেছ। এখন ঝুটমুট কপাল চাপড়ে ফায়দা কিছুই হবার নয়। চোখের পানি মোছ। আমি কোশিস্ ক'রে দেখছি তোমার কলিজার জ্বালা কিভাবে নেভানো যায়। আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, তোমার বাঞ্ছিত রাজকুমারীকে তোমার সামনে জরুর হাজির করে দেব, এতে যদি আমার জান কবুল করতে হয় তবু আমি পিছুপাও হ'ব না। লেকিন তোমাকে আমার কাছে কসম্ খেতে হবে—'

—'বল, কি করতে হবে আমাকে?'

—'তোমাকে কসম খেতে হবে এ-ব্যাপারে আমার বহিনদের কাছে মোটেই মুখ খুলবে না। কারণ, তারা যদি জানতে পারে এত ক'রে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি নিজের মর্জি মাফিক কাজ করে ঝামেলা বাঁধিয়ে বসেছ, তবে তারা গোস্‌সা করবে। আর তার পরিণাম হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর। তাই আদৎ ব্যাপারটি একদম চেপে যাবে, ইয়াদ থাকবে তো?'

—'থাকবে। জরুর ইয়াদ থাকবে।'

—'আর শোন, আমার বহিনরা কিন্তু তোমার এ-হালৎ দেখে তোমার পেট থেকে আদৎ ব্যাপার বের করার কোশিস্ করবে। তোমাকে এমনও বলবে, ওই নিষিদ্ধ কামরায় যদি না-ই গিয়ে থাক তবে তোমার হালৎ কেন এমন হ'ল? এমন বহুৎ বাৎচিতের মাধ্যমে তারা আদৎ ব্যাপারটি বের করার জন্য তোমার ওপর সামান্য হুজ্জতিও চালাতে পারে।'

—'তখন আমি কি জবাব দেব?'

—'হ্যাঁ, বহুৎ বড়িয়া প্রশ্ন করেছ ভাইয়া! তুমি জবাব দিতে গিয়ে বলবে, আমরা তোমাকে এখানে একেলা ফেলে যাওয়ার পর থেকে তোমার দিল্ হাহাকার করতে থাকে।'

খানাপিনা বিলকুল উঠে যায়। নিদবিনা রাতভর ছটফট করতে থাকে। দিনের পরদিন এমনি অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে তুমি বিছানা নিতে বাধ্য হও। ব্যস, এতেই তারা বুঝবে, তুমি নিষিদ্ধ কামরায় যাওনি। তোমার বিমারি সঙ্গত কারণেই হয়েছে।

হাসান-এর কামরা থেকে বেরিয়ে গুলাবী তার বড়া বহিনজীর কামরায় গেল। তাকে বল্‌ল—'আমাদের অনুপস্থিতিতে হাসান আজ দশদিন বিমারিতে ভুগছে। আমাদের অদর্শনই তার বিমারির একমাত্র কারণ ব'লে আমার মালুম হয়েছে।'

গুলাবীর মুখে হাসান-এর বিমারির ব্যাপার শুনে তার বহিনরা ছুটোছুটি করে এল। তারা যা আশঙ্কা করেছিল সে রকম কিছুই হাসান'কে জিজ্ঞাসাবাদ করল না। গুলাবী-র বক্তব্যকেই অকপটে মেনে নিল। অর্থাৎ তাদের দীর্ঘ অদর্শনেই সে বিমারির কবলে পড়েছে ব'লে ধরে নিল।

দু'-একদিন বাদে লেড়কিরা শিকারে গেল। গুলাবী হাসান'কে দেখভাল করার বাহানা ক'রে প্রাসাদেই রয়ে গেল।

বহিনরা বিদায় নিলে গুলাবী হাসান'কে নিয়ে কাঠের সিঁড়িটি বেয়ে ওপরে উঠল। দেয়ালের গায়ের গর্ত-টি দিয়ে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বল্‌ল—'ভাইয়া, এবার বল তো তোমার মেহেবুবা খাটের কোন্ জায়গায় বসেছিল?'

—'ওই যে মসনদটি দেখা যাচ্ছে, তার ওপরে।'

—'ইয়া আল্লা! সে যে জীন সম্রাটের লেড়কি! বহুৎ বড়া সম্রাট! আমার আব্বার চেয়েও বড়া! তুমি যে বামন হয়ে আশমানের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছ ভাইয়া! ব্যাপার যে একদম গড়বড়ে!'

শোন ভাইয়া, জিন সম্রাটের সাত লেড়কি। তুমি কলিজায় যার তসবির এঁকে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছ সে সবচেয়ে ছোটা লেড়কি। তার

নাম রোশনি। আর তার সহচরীরা তার আব্বার উজির-নজির আর আমির-ওমরাহদের লেড়কি। যাক গে, যে-মতলব তোমাকে বলতে চাইছি—'তারা যখন পাখির খোলস খুলে রেখে হ্রদের পানিতে নামবে তখন তোমাকে চুপিচুপি গিয়ে রোশনির খোলসটি হাফিস্ করে দিতে হবে। তার আশমানে ওড়ার ব্যাপারটি বিলকুল ওই খোলসটির ওপর নির্ভর করছে, ওটি বিনা সে একদম উড়তে পারবে না।'

গোসল সেরে সে উপরে উঠে যখন ডাঙায় খোলস পাবে না তখনই দেখবে আদৎ খেল্ শুরু হয়ে গেছে। ব্যস, তখন তোমার সঙ্গে রফা করার জন্য সে-ই কায়দা-কসরৎ শুরু করে দেবে। তুমি শুধু মজা দেখে যাবে। অনায়াসেই সে বিলকুল তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ওই যে বল্লাম ডানার খোলসটি বাগিয়ে নেবার জন্য সে কায়দা-কসরৎ শুরু করে দেবে। তুমি কিন্তু তাতে মজে গিয়ে সেটি দুম্ করে ফেরৎ দিয়ে বসো না যেন। তবেই কম্ম ফতে হয়ে যাবে। কপাল চাপড়ানো ছাড়া তোমার তখন আর কোনই গত্যন্তর থাকবে না, ইয়াদ থাকে যেন। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানও বিলকুল খতম হয়ে যাবে। আমার আব্বার সাম্রাজ্য তছনছ করে দেবে। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে তার মিঠা কথায় মজে না গিয়ে নিজের দিল্‌কে শক্ত রাখবে।

গুলাবী-র পরামর্শ শুনে হাসান ঘাড় কাৎ ক'রে ব'লে—'তোমার বাৎ না শুনে যে-গাড্ডায় পড়ে আমি বিলকুল হাবুডুবু খাচ্ছি আর সে-পথে পা দেব না। কসম্ খাচ্ছি, তোমার পরামর্শ এবার একদম অক্ষরে অক্ষরে পালন করব বহিন।'

পরদিন সন্ধ্যার আন্ধার নামতে না নামতেই হাসান ঘাটের কাছাকাছি একটি মোটা গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু বাদেই প্রতিপদের চাঁদ উঠবে।

কিছু সময় বাদে দশটি সফেদ পাখি ঘাটে এসে নামল। হাসান এবার মেহেবুবাকে দেখেই চিনতে পারল। তার দিল্ চনমনিয়ে উঠল। কলিজার অস্থিরতা শুরু হয়ে গেল।

এদিকে দশটি লেড়কি তাদের গায়ের পাখির খোলস খুলে ফেলে একদম বিবস্ত্রা হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাসান মওকাটিকে গুলাবী-র পরামর্শ অনুযায়ী কাজে লাগাল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে তার মেহেবুবা রোশনি-র খোলসটিকে হাতিয়ে নিয়ে সটকে পড়ল। গোপন অন্দরে লুকিয়ে রাখল।

কিছু সময় বাদে গোসল সেরে লেড়কিরা এক এক করে পানি ছেড়ে উঠে এল। নিজ নিজ খোলস গায়ে চাপিয়ে নিল। লেকিন রোশনি তো তার নিজের খোলসটি না পেয়ে বিলকুল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

রোশনি এ ব্যাপারটি খেয়াল করতে না পেরে অন্য লেড়কিরা আশমানে ডানা মেলে উড়ে গেল। ব্যস, রোশনি একেলা বিবস্ত্রা হয়ে হাপিত্যেশ করতে লাগল। তার সহচরীরা তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়ায় সে পুনরায় গোস্‌সা করল। কালনাগিনী মাফিক ফুঁসতে লাগল।

এমন সময় হাসান আচমকা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বিবস্ত্রা রোশনি-র মুখোমুখি দাঁড়ায়। এমন এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হবে রোশনি খোয়াবের মধ্যেও ভাবে নি কোনদিন। আকস্মিক শরমটুকু সামলে নেবার জন্য রোশনি দু'হাতে তার যৌবন চিহ্নগুলো চাপা দেবার ব্যর্থ কোশিস্ করতে লাগল। সাধ্যমত কিছুদূরে সরেও গেল।

হাসান নির্বিকার। এক সময় সে চিল্লিয়ে বল্‌ল—'শোন মেহেবুবা, আমার কাছে শরমের কোন ব্যাপার নেই। আমাকে দেখে ভয় ডরেরও কিছুই নেই। কাছে এসো, কিছু বলার থাকলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পার।'

রোশনি তবু তার শরমের স্থানে হাত দুটো চেপে রেখে নীরব চাহনি মেলে জুল্‌জুল্ ক'রে তাকাতে থাকে।

তাকে নিশ্চল—নিথরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসান তার দিকে এগোতে থাকে। রোশনি অনন্যোপায় হয়ে ছুটতে লাগল। হাসান অধিকতর ক্ষীপ্রতার সঙ্গে ছুটে তাকে ধরে ফেল্‌ল। এক ঝটকায় তাকে একদম নিজের প্রশস্ত বুকে টেনে নিল। দুবাহুর বন্ধনে তাকে পিষ্ট করতে লাগল। পেষণ ও চুম্বনে তাকে অভিভূত ক'রে তুলতে লাগল।

হাসান এবার রোশনি'কে দু'হাতে জাপ্টে ধরে কোলে তুলে নিল। পাঁজাকোলা ক'রে তাকে নিয়ে এল প্রাসাদে নিজের কামরায়।

রোশনি'কে কামরায় রেখে হাসান বাইরে থেকে দরওয়াজার শিটকানি বন্ধ করে দিল। এবার ব্যস্ত-পায়ে হাজির হ'ল গুলাবী-র কামরায়।

গুলাবী কামরায় ঢুকে রোশনি'কে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'মহামান্যা রাজকুমারী, মেহেরবানি করে আপনি যখন আমাদের গরীবখানায় পদধূলি দিয়েছেন তখন আমাদের প্রাসাদ আলোকিত ক'রে অবস্থান করুন। আশা করি আমাদের বাঞ্ছা পুরণ করতে আপনি গররাজী হবেন না।'

গুলাবীকে সামনে দেখেই রোশনি একদম তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। গরম তেলে পানি পড়ার মাফিক ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল—'গুলাবী, তবে এ-কারসাজী তোমারই? তুমিই ফন্দি ফিকির করে আমাকে বে-ইজ্জৎ করার কোশিস্ করছ? তোমার কি ইয়াদ নেই, তোমার আব্বা যার গোলামী ক'রে আজ সম্রাট বনেছে আমি সেই জিন সম্রাটের লেড়কি? তামাম দুনিয়ার জিনদের শিরোমণি তিনি। আর তুমি কিনা ষড়যন্ত্র করে তার লেড়কিকে আদমির বাচ্চা দিয়ে

বে-ইজ্জৎ করতে চাইছ। তার যৌন-ক্ষুধা মিটাবার জন্য ফাঁদ পেতেছ! আর তুমি নিজে জিন-সম্রাটের লেড়কি হয়ে এক আদমির বাচ্চাকে তোমার প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছ শুনলে জিনদের সমাজে তোমার আব্বা আর তোমার কি হালৎ হবে একবার ভেবে দেখারও দরকার মনে করলে না?'

গুলাবী বিলকুল নরম গলায় জবাব দিল—'সাচ্চা বটে, আপনার আব্বা আমার আব্বার মালিক। অতএব আপনি জরুর আমার নমস্যা। আঁপনার মাফিক খুবসুরৎ লেড়কি জিনদের মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি মিলবে না। গোস্‌সা করবেন না। কার নসীবে কি লিখা আছে কে বলতে পারে? নইলে আদমির দুনিয়ায় এত লেড়কি থাকতে আদমির বাচ্চা হয়ে আপনার মহব্বতের জালে আমার ভাইয়া জড়িয়ে পড়বে কেন, বলুন? তাই স্বীকার করতেই হবে এতে জরুর খোদাতাল্লা-র মর্জি কাজ করে চলেছে।'

এ বাৎ তো ঝুটা নয়—'মহব্বতে গোস্তাকি অমার্জনীয় নয়। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি এর মহব্বৎ নিখাদ। আপনাকে সে মাথার মণি করেই রাখতে চায়। আপনাকে প্রথম দর্শনের পর থেকে সে খানাপিনা বিলকুল ছেড়ে দিয়ে বিছানা আশ্রয় নিয়েছে। জানবেন, আপনাকে বুকে না পেলে এর জিন্দেগী একদম বরবাদ হয়ে যাবে।

গুলাবী-র বাৎ শুনে রোশনি বুঝতে পারল হাসান-এর মহব্বৎ ঝুটা নয়, বিলকুল সাচ্চা।

গুলাবী এবার তাকে বড়িয়া সালোয়ার-কামিজ এনে দিল। শরম ঢাকার জন্য। বাদশাহীখানা দিয়ে আপ্যায়ন করল। লেকিন তার ডানার খোলস, সেটি ব্যবহার না করে সে আশমানে উড়তে পারবে না সেটি অবশ্যই তাকে দেয়া হ'ল না।

রোশনি এখন আর তার ডানার খোলসটির জন্য কাতর নয়, ইতিমধ্যে তার অনেকখানি ভাবান্তর ঘটেছে। সে তো এক সময় বলেই ফেল্‌ল—'গুলাবী, এখন মালুম হচ্ছে, এর পিছনে বুঝি খোদাতাল্লা-র মর্জি রয়েছে। নইলে এমন এক অবাস্তব কাণ্ড ঘটবেই বা কেন!'

গুলাবী রোশনি-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসান-এর কাছে ফিরে এল। তাকে বল্‌ল—'তোমার মেহেবুবার দিল্ এখন অনেক নরম হয়েছে। কামরায় ঢুকেই একদম তার পায়ে পড়ে যাবে। তারপর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে। এর আগে কিন্তু ভুলেও কিছু বলবে না।'

গুলাবী-র পরামর্শ মাফিক হাসান কাঁপতে কাঁপতে রোশনি-র কামরায় ঢুকল। দুম্ করে তার পায়ে পড়ে গেল। তারপর উঠেই তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মাফিক চুমু খেতে লাগল। তারপর ক্রমে গালে, ঠোঁটে ও কপালে চুমু খেতে খেতে তাকে একদম বিহ্বল করে তোলে। এবার আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল—'মেহেবুবা রোশনি, এমন করে মুখ ফিরিয়ে থেকো না। তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই আমার কলিজার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। আমি তোমাকে আমার কলিজার সমান পেয়ার-মহব্বৎ করি। তোমাকে শাদী করে তোমার আর আমার উভয়ের জিন্দেগীকে আমি সার্থক করে তুলতে চাই। শাদীর পর আমি তোমাকে আমার মুলুক বাগদাদে নিয়ে যাব।

তোমাকে আমার বেগমের মর্যাদা দেব। আমার আম্মাও জরুর তোমাকে নিজের লেড়কির মাফিক পেয়ার করবে।'

হাসান থামল। ভাবল এবার রোশনি-র মতামত শুনবে, এমন সময় দরওয়াজার কড়া নড়ে উঠল।

হাসান এগিয়ে গিয়ে দরওয়াজা খুলে দিল। গুলাবী-র বহিনরা শিকার সেরে ফিরে এসেছে। হরিণ, খরগোস প্রভৃতি শিকার করেছে। সবাই সেগুলো নিয়ে হৈ হুল্লোড় জুড়ে দেয়। হাসান অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সবাই হৈ হুল্লোড়ে মেতে থাকায় রোশনি-র দিকে কারো নজর পড়েনি।

গুলাবীই ব্যাপারটি ফাঁস করে দেয়। তাদের হাসি-আনন্দের মাঝে সে বলে ফেলে,—'আমাদের ভাইয়া আজ কামাল করে দিয়েছে। সে তার মেহেবুবা রোশনিকে কামরায় কয়েদ করে ফেলেছে। খানাপিনা সেরে সে এখন মৌজ ক'রে বিশ্রাম নিচ্ছে।'

তার বহিনরা সমস্বরে বলে উঠল—'তাই বুঝি? তবে তো দেখছি আমাদের ভাইয়া করিতকর্মা নওজোয়ান বটে। চল ভাইয়া দেখাবে তোমার সাধের চিড়িয়াটিকে।'

হাসান'কে একদম টানতে টানতে তার বহিনরা রোশনি-র কামরায় নিয়ে এল।

সাত বহিন এক সঙ্গে রোশনি'কে নতজানু হয়ে কুর্ণিশ করল। বড়া বহিন বিনম্র-বিস্ময়ে বল্‌ল—'রাজকুমারী, আপনার পায়ের ধূলো পেয়ে আমাদের গরীবখানা আজ বিলকুল পবিত্র হয়ে উঠেছে। আমরা সাত বহিনও ধন্য হলাম, আমাদের ভাইয়া কেবলমাত্র এক খুবসুরৎ নওজোয়ানই নয়। জানবেন হাজারো গুণের সমাবেশ ঘটেছে তার চরিত্রে। আশা করি তাকে জীবন-সঙ্গী করলে আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হয়ে উঠবে।'

গুলাবী বল্‌ল—'আর বিরক্ত করব না। আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি। তোমরা দিল উজাড় ক'রে বোঝাপড়া করে নাও।' সাত বহিন হাসতে হাসতে বিদায় নিল।

কামরা খালি হ'লে রোশনি এবার তার মেহেবুব হাসান-এর কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়। চোখের ইশারা করে তাকে কাছে ডাকে, চোখের বাণ মেরে প্রলুব্ধ করার কোশিস্‌ করে।'

হাসান এগিয়ে গিয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে রোশনি'কে জড়িয়ে ধরে, বলিষ্ঠ দু'হাতের বন্ধনে তাকে নিজের বুকের মধ্যে পিষ্ট করতে থাকে।

রোশনি এই প্রথম বুঝল পুরুষের বাহুর বন্ধনে পিষ্ট হওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে যত সুখ, যত আনন্দ।'

হাসান-এর যৌবন উন্মত্ততায় মেতে ওঠে। খুনে মাতন জাগে। পেষণ, চুম্বন আর সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে তাদের রাত্রি যে কি ক'রে গুজরান্‌ হয়ে যায় তা না হাসান, না রোশনি—কেউ-ই ঠাওর করতে পারে না।

হাসান তার মেহেবুবাকে চুম্বনে চুম্বনে অভিভূত ক'রে দিয়ে আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌ল—'মেহেবুবা, আল্লাহ কেন যে রাত্রিটিকে এত ছোটা করে বানিয়েছে, মালুম নেই।'

এভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গসুখ লাভের মধ্য দিয়ে এক-দুই-তিন ক'রে চল্লিশটি দিন গুজরান্‌ করে দিল। একচল্লিশ দিন রাত্রে হাসান তার আম্মাকে খোয়াবের মধ্যে দেখতে পেল। খোয়াব দেখতে দেখতেই সে আম্মা-আম্মা ব'লে চিল্লিয়ে উঠল। তার চিল্লাচিল্লি শুনে রোশনি-র নিদ টুটে যায়। হুড়মুড় ক'রে পালঙ্কের ওপর উঠে বসে। ভাবতে লাগল' একি সাচ্চা, নাকি সে খোয়াব টোয়াব দেখেছে।

গুলাবী দরওয়াজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, সাচ্চা ব্যাপারই বটে। হাসান-এর কামরায় হাসান তার রোশনি-র বাৎচিৎ হচ্ছে।

গুলাবী আতঙ্কিত বুকে এককদম দু'কদম ক'রে হাসান-এর কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রোশনি চোখে আতঙ্কের ছাপ এঁকে দরওয়াজায় এগিয়ে এসে গুলাবী-র মুখোমুখি দাঁড়াল।

গুলাবী বল্‌ল—'ব্যাপার কি বহিনজী? হয়েছে কি?'

—'তোমাদের ভাইয়া খোয়াবের মধ্যে আম্মা-আম্মা বলে চিল্লিয়ে ওঠে।'

গুলাবী কামরার ভেতরে গিয়ে হাসান-এর সামনে দাঁড়ায়। সমবেদনা প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—'ভাইয়া তোমাকে আর আমরা আটকে রাখতে চাই না। তুমি নিজের মুলুকে তোমার আম্মার কাছে ফিরে যাও। তিনি বুড্ডি হয়েছেন। তোমাকে দীর্ঘ অদর্শনে তার কলিজা তো ছটফট করতেই পারে। তাঁর প্রভাব তোমার দিলের ওপর পড়া কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। তুমি রোশনি'কে নিয়ে তোমার মিট্টির দুনিয়ায় ফিরে যাও।'

ইতিমধ্যে গুলাবী-র বহিনরাও সেখানে জড়ো হয়েছে। তারাও বল্‌ল—'তোমাকে ছাড়তে আমাদের দিল্‌ চাইছে না সাচ্চা বটে। তবু তোমাকে আমাদের ছাড়তেই হবে। লেকিন তুমি কসম খাও ফি-সাল একবার ক'রে আমাদের প্রাসাদে আসবে। কিছুদিন আমাদের সঙ্গে হৈ হল্লোড় ক'রে কাটিয়ে যাবে।'

হাসান বল্‌ল—'তোমাদের কাছ থেকে যে-আন্তরিকতা পেয়েছি তা আমি জিন্দেগীতে ভুলতে পারব না। তোমরা আমার চোখের আড়াল হলেও কিছুতেই দিলের আড়াল হবে না বহিন।'

হাসান তার মেহেবুবা রোশনি'কে নিয়ে নিজের মুলুক বাগদাদে যাবে পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। লেকিন মিট্টির দুনিয়ায় সে যাবে কি ক'রে? হঠাৎ তার ইয়াদে এল যাদুকাঠিটির ব্যাপার। সেটিকে পালঙ্কের বিছানার তলা থেকে বের করল। লেকিন সমস্যা হ'ল, তার ব্যবহার-পদ্ধতি তো তার একদমই জানা নেই। এখন উপায়?

গুলাবী যাদুকাঠির ব্যাপার শুনে বল্‌ল—'আমি এর ব্যবহার পদ্ধতি জানি। তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি ভাইয়া।'

যাদুকাঠিটির ওপরে মোরগের চামড়া মোড়া। গুলাবী সেটিকে হাতে নিয়ে তার গায়ে আলতো ক'রে টোকা দিল। এক লহমার মধ্যে কয়েকটি উট ও খচ্চর তাদের সামনে হাজির হ'ল।

বিদায় মুহূর্তে হাসান তার মেহেবুবা রোশনি'কে নিয়ে উটের

পিঠে বসল। বিদায় নিতে গিয়ে রোশনির দু'চোখ দিয়ে পানির ধারা ঝরতে লাগল।

গুলাবী ও তার বহিনরা এক-এক ক'রে এসে সেখানে হাজির হ'ল। তাদের দু'চোখ দিয়েও অনর্গল পানি ঝরে চলেছে। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে গুলাবী ও তার বহিনরা হাসান ও রোশনি'কে বিদায় জানাল।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কয়েকদিন বাদে রোশনিকে নিয়ে হাসান তার নিজের মকানে পৌঁছল। হাসান-এর আম্মা লেড়কার শোকে চোখের পানি ঝরিয়ে ঝরিয়ে অন্ধা হয়ে গেছে। লেড়কাকে ফিরে পেয়ে বুড্ডি যেন খুশীর দরিয়ায় ভাসল।

হাসানকে তার আম্মা পরামর্শ দিল, বসরাহ-র পাট চুকিয়ে বাগদাদ নগরে গিয়ে বসতি গড়ার জন্য। হাসান সঙ্গে ক'রে বহুৎ ধন দৌলত নিয়ে এসেছে। কয়েক পুরুষ ধরে পায়ের ওপর পা তুলে নিশ্চিন্তে বসে খেলেও রুটির অভাব হবে না, কয়েক দিনের মধ্যেই হাসান ভিটেমাটি বেচে বাগদাদে গিয়ে বহুৎ বড়িয়া এক মকান খরিদ করল। টাইগ্রীস নদীর একদম ধারে প্রাসাদ প্রমাণ সে মকানটি।

হাসান তার বিবি রোশনি আর আম্মাকে নিয়ে পরম সুখ ও শান্তিতে দিন গুজরান্ করতে লাগল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই রোশনি গর্ভবতী হ'ল। যথা সময়ে ফুটফুটে সফেদ ও খুবসুরৎ যমজ লেড়কা পয়দা করল সে। তাদের একটির নামকরণ করা হ'ল মনসুর আর অন্যটির নাসির।

দেখতে দেখতে একটি সাল পেরিয়ে গেল। এবার হাসান-এর ইয়াদে এল সেই সাত লেড়কি, সাত বহিনের কাছে কসমের ব্যাপার। সে কসম্ খেয়ে বলেছিল—ফি সাল একবার করে এসে তোমাদের দেখে যাব। তাই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য হাসান ইরাকে বহিনদের কাছে যাবার প্রস্তুতি নিল।

হাসান যাত্রা করার আগে তার আম্মাকে একান্তে ডেকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্‌ল—'আম্মা একটি ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, তোমার কামরার পালঙ্কের তলায় এক জোড়া পাখির ডানার খোলস রয়েছে। সে দুটো যেন কিছুতেই রোশনির হাতে না পড়ে। রোশনি হয়ত ডানা জোড়ার তল্লাশ করতেও পারে। খবরদার, সেটি তার হাতে পড়লে সে হয়ত আশমানে উড়তে পারে, তারপর আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তাই বলছি, ডানা জোড়ার ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার থাকবে।'

হাসান-এর আম্মা ঘাড় কাৎ করে লেড়কার বর্ণিত পাখির ডানা জোড়ার ব্যাপারটি সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিল।

যাত্রার প্রাক্কালে হাসান তার আম্মাকে আর একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে গিয়ে বল্‌ল—'রোশনি-র খানা নোকরদের হাত দিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত না করে তুমি নিজের হাতে পরিবেশন করবে। কারণ, তারা তো আর তার মেজাজ মর্জির ব্যাপার স্যাপার জানে না। আর ইয়াদ রাখবে, সে যেন মকানের বাইরে না যায়। আর ছাদে যেন না যায়। লক্ষ্য রাখবে জানলা দিয়ে যেন বাইরের দিকে বেশী মুখ না বাড়ায়। মোদ্দা বাৎ, রোশনি আমার কলিজা, আমার জান, আর আমার জিন্দেগীর সাধ-আহ্লাদ।'

হাসান-এর আম্মা বল্‌ল—'বেটা, আমাকে বেশী বলতে হবে না। আমি তো জানিই, রোশনি ঘর-সংসার করছে, লেড়কা পয়দা করেছে বটে, লেকিন তার দিল্ পড়ে থাকে আশমানে, তাকে নজরে নজরে তো রাখতেই হবে বেটা।'

আম্মা আর বেটা নিভৃতে শলা পরামর্শ সেরে নিশ্চিন্ত হতে পারল।

হাসান এবার তার বিবি রোশনি, আম্মা আর দুই বেটা মনসুর ও নাসির-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইরাকে বহিনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বিদায়ের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

যাদুকাঠিটিতে টোকা দিতেই উট ও খচ্চর এসে তার সামনে

দাঁড়াল। খচ্চরের পিঠে বহিনদের জন্য উপহার সামগ্রী চাপিয়ে, নিজে উটের পিঠে চেপে ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। উট ও খচ্চরটি চোখের পলকে আশমানপথে বাতাসের বেগে ধেয়ে চল্‌ল।

হাসান'কে কাছে পেয়ে সাত বহিন খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বেশী খুশী হ'ল গুলাবী। সাতবহিন তাদের ভাইয়া হাসান'কে ফিরে পেয়ে নাচ-গান আর শিকারে একদম মেতে উঠল।

এদিকে হাসান বিদায় নেবার পর দুটো দিন রোশনি তার শিশু দু'টির সঙ্গে সঙ্গে কাটাল। মুহূর্তের জন্যও তার পিছন ছাড়ল না তার শাশুড়ি। মোটামুটি স্বস্তি পেল। ভাবল, রোশনি-র দিল্ তবে আশমানে ওড়ার দিকে নেই। স্বামী আর লেড়কা দুটোর আকর্ষণ তাকে একদম কামরায় বন্দী করে ফেলেছে।

তৃতীয় দিনে রোশনি তার শাশুড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। মিনতির স্বরে বল্‌ল—'আজ দিল্ চাইছে একটু আচ্ছা ক'রে গোসল করি। বাচ্চা দুটো আমাকে হরদম চটকেছে। একদম গা ঘিন ঘিন করছে। তাই হামামে গিয়ে গোসল ক'রে আসতে চাই।'

—'সে কী বেটি! এ নগর আমার কাছেও বিলকুল অজানা-অচেনা। আমরা সবাই এখানে প্রথম এসেছি। হামামই বা কোথায় আছে তা-ও আমার জানা নেই। তার চেয়ে বরং আর দু-চার রোজ একটু তকলিফ্ ক'রে কাটাও। হাসান ফিরে এলে তোমরা দু'জনে গিয়ে গোসল সেরে এসো। যদি একদম বে-সামাল হয়ে গিয়ে থাকে। তবে আমি না হয় এক গামলা পানি গরম করে দিচ্ছি। সাবান দিয়ে ঘসে মেজে আচ্ছা ক'রে গোসল করে নাও।'

শাশুড়ীর বাৎ শুনে রোশনি খুশী হতে পারল না। সে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—'আম্মা, রাস্তাঘাট অজানা অচেনা এটা একটা বাহানা মাত্র। আমি কি গুঁড়া বাচ্চা নাকি যে, মকানের বাইরে গেলেই হারিয়ে যাব? আমার বুঝতে আর বাকী নেই, আপনি আমাকে বিলকুল সন্দেহ করেন। যে-লেড়কি নষ্ট হবে ফাটকে আটক ক'রে রাখলেও তাকে আটকাতে পারবেন না, ইয়াদ রাখবেন। আপনি আমার সতীত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করছেন। এ হেন পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে জিন্দেগী খতম করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখছি না।'

রোশনি গোস্‌সায় একদম ফেঁটে পড়ার জোগাড় হয়েছে দেখে তার শাশুড়ী পড়ল মহা মুশকিলে। সে অনন্যোপায় হয়ে বল্‌ল—'বেটি, তোমার যখন এতই ইচ্ছা তখন চল, আমি সঙ্গে করে তোমাকে হামাম থেকে গোসল করিয়ে নিয়ে আসি।'

হাসান-এর আম্মা রোশনিকে বাগদাদের এক অভিজাত হামামে গোসল করাতে নিয়ে গেল। নসীব, হ্যাঁ, নসীবই তাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেল। রোশনির গোস্‌সা অগ্রাহ্য ক'রে, দাঁতে দাঁত চেপে আর মাত্র ক'টি দিন কি সে কাটিয়ে দিতে পারত না? তবে তো তাকে আর চক্করে পড়তে হ'ত না।

রোশনি হামামে পা দিতে না দিতেই গোসলের জন্য অপেক্ষামান লেড়কিরা তার সুরৎ দেখে বিলকুল স্তম্ভিত হয়ে গেল। মিট্টির দুনিয়ার কোন লেড়কির সুরৎ যে নওজোয়ানদের তো সাধারণ ব্যাপার এমন কি লেড়কিদেরও দিমাক ঘুরিয়ে দিতে পারে তাদের মালুমই ছিল না।

কয়েক লহমা বাদে রোশনি যখন সাজপোশাক খুলে একদম উলঙ্গ হয়ে গোসলের জন্য তৈরী হ'ল তখন তাদের তো বিলকুল ভিরমি খাওয়ার জোগাড় হ'ল। তারা ভাবল বেহেস্তের হুরী-পরী ছাড়া এমন সুরৎ কারো দেহে থাকতে পারে না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রোশনি-র সুরতের ব্যাপার বাতাসের

কাঁধে ভর দিয়ে তামাম বাগদাদ নগরে ছড়িয়ে পড়ল।

যারা গোসল করার জন্য হামামে অপেক্ষা করছিল, রোশনি-র সুরৎ দেখে বিলকুল স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে এক লেড়কির নাম তুহফা। সে গোসল সেরে হামামের সদর দরওয়াজার সামনে দাঁড়িয়ে রোশনি-র জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

রোশনি গোসল সেরে দরওয়াজায় আসতেই তুহফা তার সামনে এগিয়ে এসে আলাপ পরিচয়ের বাহানা করল। সুবিধা করতে পারল না। কারণ রোশনি ও তার শাশুড়ি কেউ-ই তাকে পাত্তা দিল না। তুহফা কিন্তু তাদের পিছন ছাড়ল না। তাদের অজান্তে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে গোপনে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। তারা কোন্ মকানে বাস ক'রে দেখে নিল।

তুহফা বাদশাহের প্রাসাদে থাকে। প্রাসাদের বাঁদী। সে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর প্রধানা বেগম জুবেদার কাছে রোশনি-র সুরতের বর্ণনা দিল। সব শেষে বল্‌ল—'বেগম সাহেবা, মিট্টির দুনিয়ায় তার মাফিক সুরৎ কোন লেড়কিরই হতে পারে না। সে নির্ঘাৎ বেহেস্তের কোন না কোন হুরী-পরী। টাইগ্রীস নদীর ধারে এক প্রাসাদোপম ইমারতে তারা বাস ক'রে, দেখে এসেছি।

ব্যস, আর দেরী নয়। বেগম জুবেদা বাদশাহের দেহরক্ষী মাসরুর'কে তলব করে বল্‌লেন—'টাইগ্রীসের গা-ঘেঁষে যে বিশালায়তন ইমারৎ রয়েছে তাতে খুবসুরৎ এক নওজোয়ান লেড়কি বাস করে। যত শীঘ্র সম্ভব তাকে আমার সামনে হাজির কর। আর শোন, ইমারতটির মালিক হাসান কিছুদিন হ'ল এখানে নতুন ইমারৎ বানিয়ে বাস করছে। আগে বসরাহতে সওদাগরী কারবার করত। যে লেড়কিটির ব্যাপারে তোমাকে বল্‌লাম সে এখন তার বিধবা শাশুড়ির সঙ্গে থাকে। হাসান পরদেশে সফর সারতে গেছে। যাও, শীঘ্র সে-লেড়কিটিকে আমার কামরায় হাজির কর।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচশ' সাতানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় হাজির হলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বললেন খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর হাসান-এর মকান-এর উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

মাসরুর, হাসান-এর আম্মার সঙ্গে ভেট ক'রে তাকে বল্‌ল—'আপনার মকানে' যে এক খুবসুরৎ জেনানা থাকে তাকে মহামান্য বেগম জুবেদা-র সামনে হাজির করার হুকুম আমার ওপর বর্তেছে। আমি তাকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। আপনি মেহেরবানি করে তাকে আমার হাতে তুলে দিন।

হাসান-এর আম্মা নরম গলায় বল্‌ল—'তুমি খলিফার দেহরক্ষী। হুকুম তামিল করাই তোমার কর্তব্য। লেকিন তোমার কাছে আমার এক আর্জি আছে। আমার লেড়কা হাসান এখন আমার মকানে অনুপস্থিত। এমন কি বাগদাদেই সে নেই। এ-অবস্থায় তার বিবিকে আমি কি ক'রে তোমার সঙ্গে খলিফার প্রাসাদে বেগম সাহেবার কাছে পাঠাই, বল তো? দিমাক ঠাণ্ডা ক'রে একটু বিবেচনা করলেই আমার অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে। হাসান ফিরে আসুক। তারপর যেখানে দিল্‌'চায় তাকে নিয়ে যাবে আপত্তি করব না।'

—'কেন যে আপনি ব্যাপারটি নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা করছেন, মালুম হচ্ছে না। বেগম সাহেবা স্রেফ একটি বারের জন্য তাকে চোখের দেখা দেখবেন। ব্যস, তারপরই আমি ফিন তাকে আপনার মকানে পৌঁছে দিয়ে যাব। আমি বলছি, তার কোনই অনিষ্ট হবে না। নির্দ্বিধায় তাকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিন। আমি খাতির যত্ন ক'রে তাকে নিয়ে যাব।'

হাসান-এর আম্মা নিঃসন্দেহ হ'ল, মাসরুর বেগম সাহেবার হুকুম তামিল করতে এসেছে, হুকুম তামিল সে না ক'রে ছাড়বে না।

হাসান-এর আম্মা এবার রোশনির কামরায় গেল। বেগম সাহেবার হুকুমের ব্যাপার তার কাছে ব্যক্ত করল। তাকে বুঝাল। অনন্যোপায় হয়ে রোশনি প্রাসাদে যেতে রাজী হ'ল। হাসান-এর আম্মা রোশনি এবং তার যমজ লেড়কা দুটোকে নিয়ে খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর-এর সঙ্গে প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

মাসরুর প্রাসাদে পৌঁছে তাদের নিয়ে সোজা বেগম জুবেদা-র কামরায় হাজির করল।

হাসান-এর আম্মা নতজানু হয়ে বেগম সাহেবাকে কুর্ণিশ করল। বেগম সাহেবা হাতের ইসারা করে রোশনি'কে কাছে ডেকে নিলেন।

বেগম সাহেবার নির্দেশে তুহফা এগিয়ে এসে রোশনি-র গা থেকে বোরখাটি সরিয়ে নিল। ব্যস, এক লহমার মধ্যে পুরো কামরাটি যেন অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় বিলকুল আলোকিত হয়ে উঠল।

বেগম সাহেবা রোশনির সুরৎ দেখে বিলকুল তাজ্জব বনে গেলেন। এমন সুরৎ মিট্টির দুনিয়ার কোন লেড়কির দেহে থাকতে পারে তা যেন তার একদম ধ্যান ধারণার বহির্ভূত। ভাবল বেহেস্তের হুরীদের পয়দা করার পর যেটুকু সুরৎ অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু কুড়িয়ে এনে এ-লেড়কিটির দেহে বুলিয়ে দেয়া হয়েছে। খলিফার হারেমে তো সাধারণ ব্যাপার। এমন কি তামাম আরব দুনিয়ায় এমন

খুবসুরৎ লেড়কি দ্বিতীয়টি আর আছে কিনা সন্দেহ। তিনি তখ্‌ত ছেড়ে উঠে এসে রোশনি'কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। কপালে-গালে চুম্বন করলেন। হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে সস্নেহে তখ্‌তে নিজের পাশে বসালেন।

বেগম জুবেদা নিজের গলা থেকে হীরা জহরতের বহুমূল্য হারছড়াটি রোশনি-র গলায় পরিয়ে দিয়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌লেন—'রোশনি, তুমি আমার তামাম সুলতানিয়তের গৌরব। তোমার দিল্‌ পাগল করা সুরৎ দেখে মালুম হচ্ছে, তুমি নাচা-গানা জান। আর তা আচ্ছাই জান। আমি তোমার কণ্ঠের একটি গানা শুনতে আগ্রহী। আশাকরি আমাকে হতাশ করবে না।'

রোশনি বিনম্র বিনয়ের সঙ্গে বল্‌লেন—'মহামান্য বেগম সাহেবা, আমাকে একদম শরমে ফেল্‌লেন! বিশোয়াস করুন, নাচা বা গানা কোনটিই আমি জানি না।'

বেগম জুবেদা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বল্‌লেন—'নাচা গানা তো লেড়কিদের চরিত্রের ভূষণ। তোমার এমন মনমৌজী সুরৎ! আর বলছ কি না এদের কোনটিই জান না!'

আকস্মিক শরমে রোশনি-র মুখ এক লহমার মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। সে এবার বল্‌ল—'বেগম সাহেবা, আমি নাচা-গানা জানি না বটে। লেকিন পাখির মাফিক আশমানে উড়ে আপনাকে বিলকুল তাক লাগিয়ে দিতে পারি। আমি হলফ ক'রে বলতে পারি, এমন আজব ব্যাপার কেবল আপনি কেন আপনার তামাম সুলতানিয়তের কেউ-ই দেখেনি।'

—'লেকিন কি ক'রে তা সম্ভব করবে, বলতো? আশমানে ওড়ার জন্য তো ডানা চাই। ডানা বিনা কি ক'রে তুমি এমন আজব ব্যাপার ঘটাবে, বল তো রোশনি।'

—'ডানা বিনা নয় বেগম সাহেবা। আশমানে ওড়ার এক জোড়া ডানা আমার জরুর আছে। আমার শাশুড়ীর কামরায় পালঙ্কের নিচে আমার ডানা জোড়া রক্ষিত আছে। আপনি মেহেরবানি ক'রে সে দুটো আনার বন্দোবস্ত করে দিন। তবে আমি বিলকুল কামাল ক'রে দিতে পারব বেগম সাহেবা।'

রোশনি-র বাৎ শুনে হাসান-এর আম্মার মাথায় আশমান ভেঙে পড়বার জোগাড় হ'ল। সে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল—'এর বাৎ একদম শুনবেন না। আজকাল এর দিমাক একদম কাজ করছে না। এখন দেখছি, বিলকুল পাগল বনে গেছে! নইলে কেউ আশমানে উড়তে চায়, আপনিই বলুন তো বেগম সাহেবা? আপনি—'

রোশনি তাকে থামিয়ে দিয়ে ব'লে উঠল—'বেগম সাহেবা, আমি আল্লাতাল্লা-র নামে কসম খেয়ে বলছি, আমার ডানার খোলাটি আমার শাশুড়ীর কামরায়, পালঙ্কের নিচে লুকিয়ে রাখা আছে।

বেগম জুবেদা মণি-মুক্তা খচিত বহুমূল্য এক জোড়া বালা হাসান-এর আম্মার হাতে তুলে দিয়ে বল্‌লেন—'আমি খুশী হয়ে তোমাকে এ-দুটো ইনামস্বরূপ দিলাম। পরে আরও পাবে। এখন জলদি মকান থেকে এর আশমানে ওড়ার ডানার খোলাটি নিয়ে এসো। ইয়াদ রাখবে, বেগড়বাই কিছু করলে গর্দান যাবে।'

হাসান-এর আম্মা বালাজোড়া হাতে নিয়ে নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বেগম জুবেদা-র দিকে তাকিয়ে রইল। কিভাবে ব্যাপারটি সন্তোষজনক ভাবে চাপা দিয়ে দেয়া যায় তার ফিকির বের করার কোশিস্‌ করতে লাগল।

বেগম জুবেদা বুঝলেন, সোজা আঙুলে ঘি ওঠার নয়। মাসরুর'কে পাঠিয়ে দিলেন হাসান-এর মকানে। ব'লে দিলেন তামাম মকান তোলপাড় ক'রে ডানার খোলার তল্লাশী চালাবে। সবার আগে দেখবে হাসান-এর আম্মার কামরার পালঙ্কের তলাটি। যাও, জোরদার তল্লাশী চালাবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

মাসরুর হাসান-এর আম্মার পালঙ্কের তলায় তাল্লাশী চালাতে গিয়ে পাখির দুটো ডানার খোলা পেয়ে গেল। ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরী না ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে খলিফার প্রাসাদে হাজির হ'ল। বেগম জুবেদা-র হাতে তুলে দিল তার বাঞ্ছিত পাখির ডানার খোলা দুটো।

বহু আকাঙ্ক্ষিত ডানার খোলা দুটো দেখামাত্রই রোশনি ছটফটানি শুরু ক'রে দিল। তার দিল্‌ চনমনিয়ে উঠল।

রোশনি সে দুটোকে চোখের পলকে পরে নিল। ব্যস, এবার সোজা আশমানের দিকে উড়ে চল্‌ল। তার ব্যাপার দেখে বেগম জুবেদা ও উপস্থিত সবাই বিলকুল তাজ্জব বনে গেলেন। কিছু সময় বাদে সামান্য নেমে এসে সে হাসান-এর আম্মাকে চিল্লিয়ে বল্‌ল—'আপনার লেড়কাকে বলবেন, সে যদি আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে চায় তবে যেন 'ওয়াক ওয়াক' দ্বীপে চলে যায়।

হাসান-এর আম্মা গলা ফাটিয়ে চিল্লিয়ে উঠল 'রোশনি! বেটি আমার! রোশনি! ফিরে এসো। তোমার বেটা মনসুর ও নাসিরকে ফিরিয়ে দিয়ে যাও। এসো রোশনি—ফিরে এসো।'

রোশনি কর্ণপাত করল না। জোরে জোরে ডানা চালিয়ে একদম ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেল। সেখানে কারো কণ্ঠস্বরই পৌঁছতে পারবে না।

হাসান-এর আম্মা বিলাপ পেড়ে কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিল।

বেগম জুবেদা বিমর্ষকণ্ঠে এবার বল্‌লেন—'হাসান-এর আম্মা, যা কিছু ঘটেছে সব কিছুর মূলে আমি। আমার সামান্য খেয়ালের জন্যই এমন একটি একদম অপ্রত্যাশিত ও মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে গেল! আমার এ গুনাহের জন্য যে দোজখেও আমার জায়গা হবে না। আমার জন্যই হাসান তার বিবিকে হারাল।

হাসান-এর আম্মা আকস্মিক শোকটুকু সামাল দিতে না পেরে সংজ্ঞা হারিয়ে প্রাসাদের ছাদের ওপর লুটিয়ে পড়ল। যখন সংজ্ঞা ফিরে পেল তখন চারদিক যেন বিলকুল অন্ধকার দেখতে লাগল। রোশনি এবং দু'দুটো নাতিকে হারিয়ে সে যেন একদম দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

হাসান ও তার আম্মা আশঙ্কা করেছিল, সুযোগ পেলে রোশনি ভেগে যাবে। লেকিন তার চোখের সামনে এমন ক'রে সে চম্পট দেবে এ যেন খোয়াবেও ভাবতে পারে নি। রোশনি ও নাতি দুটোর শোক তো রয়েছেই, সে সঙ্গে তার জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চিত পুত্র শোক। সে বুকফাঁটা আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! আমার নসীবে এ-ই কি লিখে রেখেছিলে?'

বেগম জুবেদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'হাসান-এর আম্মা, তুমি যদি একটিবার আমাকে বলতে যে, তোমার বেটা একজন পরীকে শাদী ক'রে এনেছে তবে এত বড় কলঙ্কের দায় আমি অবশ্যই ঘাড়ে নিতাম না।

চোখের পানি মুছতে মুছতে হাসান-এর আম্মা বল্‌ল—'বেগম সাহেবা, নসীব যেখানে বিরোধিতা করছে তখন আপনার তো কোন কসুর থাকতে পারে না। এ যে আমার ভবিতব্য! বিলকুল ভবিতব্য।'

চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে হাসান-এর আম্মা মকানে ফিরে গেল। মকানেরই এক ধারে তিনটি তাজিয়া বানিয়ে দিন-রাত্রি চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

হাসান ইরাক থেকে এল। তাজিয়া তিনটির ধারে বসে তার আম্মাকে চোখের পানি ঝরাতে দেখে আদৎ ব্যাপার কি তার বুঝতে আর বাকী রইল না। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য তার আম্মার কামরায় গিয়ে পালঙ্কের তলায় উঁকি দিল। ব্যস, সে বুক ও কপাল চাপড়ে কাঁদতে লেগে গেল।

হাসান-এর আম্মা লেড়কাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল—'বেটা, রোশনি আশমানে ওঠার সময় একটি মাত্র বাৎ-ই আমাকে বলে গেছে।'

হাসান অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বল্‌ল—'কি? কোন বাৎ? কি বলে গেছে আম্মা?'

—'বলে গেছে, হাসান যদি আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে চায় তবে যেন ওয়াক ওয়াক দ্বীপে চলে যায়।'

হাসান সচকিত হয়ে ঝট ক'রে সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর্তনাদ ক'রে উঠল—'আম্মা, আমি যাব, জরুর যাব ওয়াক ওয়াক দ্বীপে। মিট্টির দুনিয়া, আশমান, এবং পাতালের ভেতরেও সে যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে তবু আমাকে তল্লাশ ক'রে তাকে বের করতেই হবে। তাকে কাছে না পেলে আমার জিন্দেগী বিলকুল খতম হয়ে যাবে।'

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

পাঁচশ' নিরানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—জাঁহাপনা, হাসান তার আম্মার মুখে ওয়াক ওয়াক দ্বীপের নামটি শোনামাত্র ভাবতে লাগল, কোথায় ওয়াক ওয়াক দ্বীপ, কত দূরে? কোনদিকে গেলে সেখানে পৌঁছোতে পারবে? লেকিন সে কোনই কিনারা করতে পারল না।

হাসান সিদ্ধান্ত নিল সবার আগে পাহাড়ের গায়ের প্রাসাদে যাবে। লেড়কি সাতটির সঙ্গে ভেট করবে। তারা নিশ্চয়ই ওয়াক ওয়াক দ্বীপের নিশানা বাৎলে দিতে পারবে।

হাসান মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে কোমর থেকে যাদু-কাঠিটি এক হেঁচকা টানে হাতে নিয়ে নিল। এবার তার গায়ে বার দু'তিন টোকা দিতেই একটি ইয়া তাগড়াই উট এসে তার সামনে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াল। হাসান উটটির পিঠে চেপে চল্‌ল সাত বহিনের

সাথে ভেট করতে। হাসান তার সাত বহিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার দু'চোখ বেয়ে হরদম পানি ঝরতে লাগল। ছোটা বহিন গুলাবী আতঙ্কিত কণ্ঠে বল্‌ল—'ভাইয়া, কি সমাচার? তোমার চোখে পানি কেন, খোলসা ক'রে বল।'

হাসান তার বিবি আর লেড়কাদের আকস্মিক কাণ্ডের ব্যাপার বহিনদের কাছে সবিস্তারে ব্যক্ত করল। সবশেষে ওয়াক ওয়াক দ্বীপের নিশানা জানতে চাইল।

সবকিছু শুনে গুলাবী চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'ভাইজান, নিজেকে এত সহজে এক লেড়কির পায়ে বিকিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। নিজের দিল্‌কে শক্ত ক'রে বাঁধ। ঝোঁকের মাথায় সব কাজ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শীঘ্রই সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে, মিলিয়ে নিও।'

—'লেকিন বহিন, আমার কলিজা, আমার জান রোশনি'কে না পেলে আমার জিন্দেগী বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। আমি এ-জান টিকিয়ে রাখ্‌তে পারব না। তুমি আমাকে ওয়াক ওয়াক দ্বীপের নিশানা বাৎলে দাও। তাকে বুকে নিয়ে আমি কলিজা ঠাণ্ডা করি।'

—'ভাইয়া, ওয়াক ওয়াক দ্বীপের নিশানা আমি জানি বটে, লেকিন তুমি সে-দ্বীপে কি ক'রে যাবে? তার চেয়ে তুমি যদি বল বেহেস্তে বা দোজখে যাবে—আমি বাধা দেব না। লেকিন ওয়াক ওয়াক দ্বীপে অসম্ভব! কোন আদমির পক্ষেই সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। ভয়ঙ্কর সে দ্বীপ! একদম অসম্ভব। কিছুতেই তুমি সেখানে পৌঁছতে পারবে না! আমি বলছি, এ ধান্ধা তুমি ছাড়।'

—'না, বহিন তা হয় না। আমার বিবি আর লেড়কা দুটোকে আমি কিছুতেই দিল্ থেকে মুছে ফেলতে পারব না।'

—'আমি তোমাকে তোমার বিবি আর লেড়কা দুটোকে ফিরিয়ে দেবই, কসম খাচ্ছি।'

লেড়কিদের এক চাচা কিসান একবার ক'রে প্রাসাদে এসে তাদের দেখভাল ক'রে যায়। তার নাম আবদ অল-কাদ্দুস। গত সালে তিনি যখন আসেন তখন তাঁর বড়া ভাইঝিকে একটি বহুৎ আচ্ছা খুসবুওয়ালা আতরের শিশি উপহার দিয়ে যান। আতরটির গুণ অত্যাশ্চর্য। শিশিটির মুখ খুলে নাকের সামনে ধরে যে সাদৃশ্যতা প্রকাশ করা যাবে তা জরুর পূরণ হতে বাধ্য।

গুলাবী তার বড়া বহিনের কাছ থেকে তুলোয় ক'রে সামান্য আতর নিয়ে এল, তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া মাত্র চাচা হাজির হয়। গুলাবী করলও তা-ই। আতরের তুলোয় আগুন ধরিয়ে দিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বুড্ডা আবদ অল-কাদ্দুস হাতীর পিঠে চেপে আশমান পথে এসে হাজির হ'ল। গুলাবী তার সঙ্গে হাসান-এর পরিচয় করিয়ে দিল। আর রোশনি-র লেড়কা দুটো সহ পলায়নের কাহিনী তার কাছে সবিস্তারে ব্যক্ত করল।

গুলাবী এবার বল্‌ল—'চাচাজী, হাসান-এর বিবি রোশনি ওয়াক ওয়াক দ্বীপে ভেগেছে। সে তার বিবি আর লেড়কাদের কাছে যেতে চায়। লেকিন কোথায়, কোন্‌দিকে সে-দ্বীপ কিছুই তার জানা নেই। এখন একমাত্র আপনিই ভরসা। আপনি ছাড়া আর কারো পক্ষে তার নিশানা বাৎলে দেয়া সম্ভব নয়। আপনি মেহেরবানি ক'রে তাকে ওয়াক ওয়াক দ্বীপের নিশানা বাৎলে দিন চাচাজী।'

গুলাবী-র বাৎ শুনে বুড্ডা আবদ অল-কাদ্দুস উবু হয়ে বসে মিট্টিতে কতগুলি আঁক কাটল। খোপ বানাল। তারপর ঘাড় ঝাঁকিয়ে 'না-না' উচ্চারণ করল।

এক সময় চোখে-মুখে হতাশার ছাপ এঁকে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল। তারপর বল্‌ল—'না, বেটা, কোন ফিকিরই দেখছি না। ওয়াক ওয়াক দ্বীপে পাঁচ হাজার জিন বাস করে। সবাই কুমারী। তারা সম্রাট জিনিস্থানের সেনানী। কোন আদমির বাচ্চা সে-দ্বীপে যেতে পারে না।'

গুলাবী বল্‌ল—'চাচাজী, আপনি আমাদের ভাইয়া হাসান'কে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলুন। নইলে আমাদের পক্ষে তাকে সামাল দেয়া বিলকুল অসাধ্য।'

বুড্ডা আবদ অল-কাদ্দুস এবার হাসান'কে পাশে বসিয়ে, গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌ল—'বেটা, দুঃখ যন্ত্রণা দিল্ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। দিমাক ঠাণ্ডা ক'রে ভাব। শোক জ্বালা চিরস্থায়ী নয়। আজ না হোক কাল তা বুক থেকে মুছে যাবেই। তোমার ক্ষেত্রেও এর বিপরীত কিছু হবার নয়। আমার জিন্দেগীতেও এমনই ঘটনা ঘটেছিল। সে-শোকজ্বালায় যদি নিজেকে দগ্ধে মারতাম তবে কি আজ তোমার মুখোমুখি বসে এমন বাৎচিৎ সম্ভব হ'ত, বল? তাই বিলকুল ব্যাপার দিল্ থেকে ঝেড়ে দিয়ে নিজেকে হাল্কা কর। কোন মতেই তুমি ওয়াক ওয়াক দ্বীপে যেতে পারবে না, সে দ্বীপের দূরত্বের ব্যাপার বলছি শোন—সাত সাতটি দরিয়া ডিঙোতে হবে। পেরিয়ে যেতে হবে সাতটি মহাদেশ, আর ডিঙোতে হবে সাতটি অত্যুচ্চ পর্বত। তারপর মিলবে তোমার বাঞ্ছিত ওয়াক ওয়াক দ্বীপ। তারপর তোমার শ্বশুর সম্রাট একদম রগচটা ও জেদী। দুনিয়ার শেষ প্রান্তে তার এক্তিয়ারভুক্ত রাজ্যে তুমি যেতে পারলেও অথৈ দরিয়ায় গিয়ে পড়বে। তাই আমার মত তুমি এখানে তোমার বহিনদের সঙ্গে হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে জিন্দেগী গুজরান করে দাও। বাজে ধান্ধা একদম ঝেড়ে মুছে ফেল।

হাসান-এর দু'চোখের কোল বেয়ে পানি ঝরতে লাগল। বুড্ডা হাসান-এর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌ল—'বেটা, তুমি কি লেড়কি, নাকি জেনানা যে, চোখের পানি ঝরাচ্ছ? পানি মোছ। দিল্ আর কলিজাকে ঠাণ্ডা কর।'

এবার চাচা হাতীটির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে কি

যেন বল্‌ল। হাতীটি ঘাড় কাৎ ক'রে তার বক্তব্য বোঝার বাহানা করল। এবার আগে নিজে চাপল তার পিঠে। তারপর হাসানকে চাপাল। হাতীটি তার ইঙ্গিত পেয়ে বাতাসে ভর দিয়ে উল্কার গতিতে আশমান পথে চলতে শুরু করল। এক নাগাড়ে তিনদিন তিনরাত্রি তারা উড়ে চল্‌ল। সাত বছরে যে-পথ অতিক্রম করা যায় সে-পথ তারা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে এসেছে।

নীলচে এক পাহাড়ের চূড়ায় এসে হাতীটি নামল। তার গায়েই বিশালায়তন একটি গুহা। তার মুখে লোহার দরওয়াজা। চাচা দরওয়াজটির গায়ে পরপর তিনটি টোকা দিতেই সেটি খুলে গেলো। এক বিশালদেহী নিগ্রো তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। চাচা হাসান'কে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

কয়েক কদম এগোতেই সামনে একটি সিঁড়ি পড়ল। খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে। হাসান-এর হাত ধরে চাচা তর-তর ক'রে নিচে নেমে যেতে লাগল। এক সময় সামনে একটি বিশাল সোনার দরওয়াজা দেখতে পেল। সেটি খুলে তারা ভেতরে ঢুকে একদম বে-পাত্তা হয়ে গেল।

চাচা এবার হাসান'কে দাঁড় করিয়ে সোজা ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে নীল একটি ঘোড়া নিয়ে সে ফিরে এল। হাসান'কে এবার তার পিঠে চাপিয়ে নিল ঘোড়াটি শূন্যে উড়ে চল্‌ল।

সামান্য এগিয়ে চাচা বল্‌ল—'বেটা, একদম দুর্গমপথ। নিজেকে শক্ত রেখো। খবরদার, একদম ঘাবড়াবে না। একটু বেগড়বাই কিছু করলে জান খতম হয়ে যাবে। যদি সাহসে না কুলোয় তবে কিন্তু এখনও সময় আছে। ঘরে, তোমার সাত বহিনের কাছে ফিরে চল।'

—'না, ফেরার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মোউৎ যদি সামনে এসে দাঁড়ায় তবু আমাকে ফেরাতে পারবে না চাচাজী।'

মুলুকে তোমার আম্মা আছেন। হরদম চোখের পানি ঝরাচ্ছেন। তোমার কি বিবেচনা করা উচিত নয়? তোমাকে বুকে ফিরে পেলে তিনি ধড়ে জান ফিরে পাবেন। এবং তার কাছে ফিরেই যাও বেটা।'

—'না, চাচাজী বিবি-লেড়কা বিনা তাঁর কাছে ফিরব না।' বুড্ডা আবদ অল-কাদ্দুস বুঝল তার কলিজা শক্তই আছে। এবার একটি ভাঁজকরা কাগজ তার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'বেটা, এটি সঙ্গে রাখ। কোর্তার জেবে ঢুকিয়ে দাও।'

হাসান চিঠিটিকে জেবে চালান দেবার আগে তার গায়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—শেখ আলী শেখ-এর ওস্তাদ, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু সুমহান পালক—আব্বা।

চাচা এবার হাসান-এর পিঠ চাপড়ে বল্‌ল—'বেটা আল্লাতাল্লার নাম নিয়ে এগিয়ে যাও। ঘোড়াটিই তোমাকে নিশানা মাফিক নিয়ে যাবে। আমার কাজ মিটেছে। এবার আমি ফিরছি। একটু বাদে কালো একটি পাহাড়ে হাজির হবে। সামনে একটি গুহা নজরে পড়বে। ঘোড়াটিকে গুহার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি মুখের কাছে থেকে যাবে। একটু বাদে আবলুশ কালো এক আদমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। তার সাজ পোশাক—এমন কি গহনাপত্রও কুচকুচে কালো মালুম হবে কয়লাও বুঝি এত কালো নয়। তার লম্বা দাড়িগুলো ছাড়া তার শরীরের সফেদ বলতে কিছুই নাই। সে-আদমি আমার ওস্তাদ। তোমার ব্যাপারে আমার সুপারিশ করাই আছে। চিঠিটি তার কাছে পৌঁছে দিলেই তোমার দায়িত্ব খতম হয়ে যাবে। তোমার ব্যাপার ফয়শালা ক'রে দিয়ে তিনি তোমার মুশকিল আসান করে দিতে পারবেন। তবে, তোমার একমাত্র কাজ হবে তাকে খুশী করা।'

বুড্ডা চাচা বিদায় নিলে হাস্যান ঘোড়ার পিঠে চাপল। ঘোড়া আশমানে উঠল। উল্কার বেগে শূন্যে ধেয়ে চল্‌ল।

এক সময় সেই কালো পাহাড়ের ওপরে এসে ঘোড়াটি নামল। সামনেই একটি গুহা তার নজরে পড়ল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এবার বুড্ডার পরামর্শ মাফিক ঘোড়াটিকে গুহার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। নিজে গুহাটির মুখে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘণ্টা খানেক বাদে চাচার বর্ণিত লম্বা সফেদ দাড়িওয়ালা

সে-ই কালো আদমিটি এসে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। হাঁটুর কাছাকাছি তার সফেদ দাড়িগুলো নেমে গেছে। এরই নাম শেখ

আলী। ইনি আল্লাহ্-র পয়গম্বর সুলেমান-এর বিবি বিলপিস-এর লেড়কা। হাসান তাকে সভক্তি কুর্নিশ করল। তারপর চাচা আবদ অল-কাদ্দুস-এর দেয়া চিঠিটি তার হাতে তুলে দিল।

চিঠিটি নিয়ে বুড্ডা শেখ আলী নীরবে গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। দীর্ঘ সময় বাদে সে ফিরে এল। এবার তার সাজ পোশাক ও আভরণাদি বিলকুল সফেদ। হাতে ইশারা করে হাসানকে গুহার ভেতরে নিয়ে গেল। এক বিশালায়তন কামরায় নিয়ে তাকে বসতে দিল। সেখানে চার কোণে চারজন বুড্ডা বসে। কালো সাজ পোশাক পরিহিত। প্রত্যেকের সামনে এক গাদা করে পাণ্ডুলিপি এলোমেলো ভাবে পড়ে। ধূপ জ্বলছে, আরও সাতজন শিষ্য কি যেন লিখছে। বুড্ডা শেখ আলী হাসান'কে বল্‌ল—'বেটা, এবার তোমার কি আর্জি বল।'

হাসান এবার তার ব্যাপার গোড়া থেকে খোলসা ক'রে তার কাছে ব্যক্ত করল। এমন কি রোশনি'কে উদ্ধার করার জন্য শেখ আবদ অল-কাদ্দুস-এর সঙ্গে আসার কায়দা কসরতের সবিস্তারে বর্ণনা দিল।

হাসান-এর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই পালক-আব্বাসহ সবাই সমস্বরে ব'লে উঠল—'বেগম বিলফিস-এর যোগ্য লেড়কাই বটে। আমরা একে জবুর সাহায্য-সহযোগিতা করব। এর মুশকিল আসান ক'রে দিল্ খুশীতে ভরিয়ে তুলব। এর সবচেয়ে বড়া কারণ, এ-নওজোয়ান দু'দিক থেকে বঞ্চিত, শোকে মুহ্যমান। একে স্বামী হিসাবে বিবির পলায়নে দিলে দাগা পেয়েছে, অন্যদিকে দুই বাচ্চার আব্বা হিসাবে কলিজায় ব্যথা অনুভব করছে। অতএব এ যাতে বিবি ও লেড়কাদের ফিরে পেয়ে স্বস্তি লাভ করতে পারে তার বন্দোবস্ত আমাদের অবশ্যই করা দরকার।'

বুড্ডা শেখ আলী বল্‌ল—'এ কাজ আমাদের জবুর করতে হবে। লেকিন এর জন্য আমাদের বহুৎ ফন্দি-ফিকির ও তকলিফ করতে হবে, ইয়াদ থাকে যেন। ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গিয়ে নিরাপদে কাজ হাসিল করে ফিরে আসা কঠিন সমস্যা।

সবচেয়ে বড়া ব্যাপার সম্রাটের পাঁচ সহস্র উড়ন্ত সেনা হরদম আশমানে চক্কর মেরে সম্রাট ও তাঁর লেড়কিদের কড়া পাহারায় রেখেছে।'

ওস্তাদের চেলাচামুণ্ডারা বল্‌ল—'জী, আপনার বাৎ বিলকুল সাচ্চা বটে, লেকিন আমাদের ইয়াদ রাখতে হবে আমাদেরই ধর্ম-ভাইয়া আবদ অল-কাদ্দুস এ-নওজোয়ানকে পাঠিয়েছেন, তাই আমাদের পক্ষে ব্যাপারটিকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই।'

হাসান এবার পালক-আব্বার ঠ্যাঙ্ দুটো জড়িয়ে ধরে হাউমাউ ক'রে কেঁদে বল্‌ল—'একমাত্র আপনার পক্ষেই আমার বিবি-বাচ্চাদের ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। মেহেরবানি করে আপনি আমার কলিজা ঠাণ্ডা করার বন্দোবস্ত করুন।'

—'ওঠো বেটা, বিবি-বাচ্চার প্রতি তোমার পেয়ার মহব্বৎ দেখে আমি বিলকুল মুগ্ধ। লেকিন কাজ বহুৎ মুশকিলের বটে। তবু বলছি, তোমার খুশী উৎপাদন করতে আমি কসুর করব না।'

এবার বুড্ডা শেখ আলী নিজের দাড়ি থেকে একটি চুল ছিঁড়ে এনে হাসান-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'যদি দেখ, সামনে কঠিন সমস্যা, মোউৎ অবশ্যম্ভাবী তখন এতে অগ্নি সংযোগ করে দেবে। ব্যস, এক লহমার মধ্যেই আমি তোমার সামনে হাজির হয়ে যাব।'

এবার বুড্ডার হাতের ইশারায় এক অতিকায় ভয়াল দর্শন আফ্রিদি দৈত্য তার সামনে হাজির হ'ল। করজোড়ে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। তার নাম দানাস ইবন কাকতাস। বুড্ডা দৈত্যটিকে ইশারায় কি যেন বল্‌লেন। তারপর সজোরে উচ্চারণ করলেন—'বেটা, এ আফ্রিদি দৈত্যটির কাঁধে চাপ। এক বাৎ, তোমাকে সফেদ-কর্পূর দ্বীপে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসবে। তারপর তোমাকে একদম একেলা এগোতে হবে। দ্বীপের বিপরীত প্রান্তে গিয়ে দেখবে আর একটি দ্বীপ। সেটিই তোমার বাঞ্ছিত ওয়াক ওয়াক দ্বীপ। তারপর খোদাতাল্লা-র ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দেবে। তিনিই তোমাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে নিয়ে যাবেন।

আফ্রিদি দৈত্য হাসান'কে সফেদ কর্পূর দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

হাসান এবার বিলকুল সফেদ প্রান্তরের ওপর দিয়ে একেলা পথ পাড়ি দিতে লাগল। কয়েক কদম যেতেই তার চোখে পড়ল এক অতিকায় দৈত্য। ঘাসের ওপর চার হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে। বিকট তার চেহারা। এক ঝলক দেখেই হাসান-এর কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল।

বিকট দর্শন দৈত্যটি হাসান-এর দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে শূন্যে তুলে নিল। আতঙ্কে হাসান-এর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। সংজ্ঞা বিলকুল হারিয়ে ফেল্‌ল। বার কয়েক খেলনার মাফিক লোফালুফি করে তার ঠ্যাঙ্ ধরে মাথাটি নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখল।

হাসান সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে নিজের হালৎ দেখে একদম চিপসে গেল। হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে বল্‌ল—'তোমার ঠ্যাঙ্ পাকড়াচ্ছি দৈত্য সাহাব! মেহেরবানি ক'রে আমার জান খতম করবে না। আমাকে ছেড়ে দাও! আমার কলিজা শুকিয়ে গেছে।'

দৈত্যটি বিকট স্বরে হেসে বল্‌ল—'তুমি তো দেখছি বহুৎ আচ্ছা গানা গাইতে পার! বহুৎ মিঠা তোমার কণ্ঠস্বর! হুজুরের সামনে হাজির করলে বহুৎ ইনাম-বকশিস মিলতে পারে।'

দৈত্যটি এবার হাসান'কে হাতের তালুর ওপর বসিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বন-জঙ্গল ভেঙে চলতে লাগল। কয়েক লহমার

মধ্যেই এক গুহায় হাজির হ'ল। সেখানে প্রায় পঞ্চাশজন ভয়াল দর্শন দৈত্য এক বিশালদেহী দৈত্যকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, সে অতিকায় একটি পাথরকে তখ্‌ত বানিয়ে মৌজ ক'রে বসে। এ-ই দৈত্যদের সম্রাট। প্রায় পঞ্চাশ হাত লম্বা তার বপু। চওড়াও সেরকমই অস্বাভাবিক।

হাসান'কে ধপ্‌ ক'রে সম্রাটের সামনে নামিয়ে দৈত্যটি কুর্ণিশ ক'রে বল্‌ল—'হুজুর, আপনার জন্য ভেট নিয়ে এলাম। বহুৎ মিঠা এর গলা। গানাও বহুৎ আচ্ছা গায়। একবার শুনলে আপনার দিল্‌ একদম তাজা হয়ে উঠবে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয়শ' তিনতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার অন্দরমহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির অবশিষ্টাংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, দৈত্যদের সম্রাট এবার তখ্‌তে সোজা হয়ে বসতে বসতে বল্‌ল—'নয়া চিড়িয়া!—গানেওয়ালা চিড়িয়া হাজির করেছ? বহুৎ আচ্ছা, একটি বড়িয়া গানা শোনাও তো বুলবুল।'

দৈত্যদের সম্রাটের হুকুম বুঝতে না পেরে হাসান হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে উঠল। আদতে সে যে কি বলেছে হাসান বুঝতেই পারে নি। তবে এটুকু বুঝেছে, তার মোউৎ আর বেশী দূরে নয়।

হাসান-এর কান্না শুনে দৈত্য-সম্রাট ভাবল, এটিই বুঝি তার গানা। তাই বার বার সোল্লাসে বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, ব'লে তারিফ করতে লাগল।

দৈত্যদের সম্রাট ভাবল, এমন বড়িয়া গানা একবারটি তার লেড়কিকে শোনাতে না পারলে আফশোস থেকে যাবে। তাই হাসান'কে একটি পিঞ্জরে পুরে তার লেড়কির কামরায় ঝুলিয়ে রেখে আসতে হুকুম করল।

দৈত্যটি সম্রাটের আদেশ পালন করল। পিঞ্জরে বন্দী করে হাসান'কে সম্রাট-নন্দিনীর কামরায় পালঙ্কের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে গেল।

হাসান নিরুপায় হয়ে হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল। লেড়কিটি ভাবল নাচা-গানা একসঙ্গে চালাচ্ছে। সে হাসান'কে পেয়ার করে ফেল্‌ল। এমন গুণ যার তাকে তো পেয়ার না ক'রে পারা যায় না।

হাসান এবার এক নয়া পথ ধরার কোশিস্‌ করল। সে লেড়কিটিকে মহব্বৎ জানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। আকার ইঙ্গিতে সম্ভোগের ব্যাপার স্যাপার বুঝাতে চাইল। এর জন্য মুখে কিছু বলা, ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ না করলেও অপরকে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে। সম্রাট-নন্দিনীও নওজোয়ান বটে। তারও সম্ভোগের ব্যাপার স্যাপারে উৎসাহ রয়েছে।

এক সন্ধ্যায় সম্রাট-নন্দিনী-হাসান'কে পিঞ্জর থেকে বের করল। কোর্তা-পাৎলুন খুলে তাকে বিলকুল উলঙ্গ ক'রে ফেল্‌ল। বিলকুল উলঙ্গ হাসান'কে সে কৌতূহলী নজরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে একদম তাজ্জব বনে গেল। সে স্বগতোক্তি ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এর যে দেখছি বিলকুল লেড়কাদের মাফিক ইয়েটিয়ে সবই আছে! পুরুষ চিড়িয়া। এবার সে উলঙ্গ হাসান'কে বাঁ-হাতের তালুর ওপর বসিয়ে ডান-হাত দিয়ে তার দেহের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ ক'রে পুরুষাঙ্গে বার বার হাত বুলাতে লাগল। হাসান ভেতরে ভেতরে ভাবছে, আমিও তো এরকমই চাচ্ছিলাম।

সম্রাট-নন্দিনীর কলিজায় সম্ভোগের তৃষ্ণা জেগে ওঠে। তাকে পুতুলের মত বুকে চেপে ধরে। নিজের বুকটি, ইয়া পেল্লাই স্তন দুটোকে বার বার হাসান-এর বুকে ঘষতে লাগল। স্বগতোক্তি করল—ছোটা হলে কি হবে, আরাম সমানই। এবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেই পালঙ্কের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। নিজের ডাটার মাফিক ঠোঁট জোড়া হাসানের ক্ষুদে ঠোঁট দুটোর ওপর বুলাতে লাগল। রতিসুখ লাভের জন্য বিলকুল উতলা হয়ে পড়ল। চিৎ হয়ে শুয়ে তাকে আলতো করে নিজের তলপেটের ওপর বসিয়ে দিল। হাসান মেতে উঠল রতিক্রীড়ায়। দীর্ঘ সময় ধরে চল্‌ল দলন, পেষণ আর সম্ভোগের মাধ্যমে উভয়েই খুশীতে বিলকুল চনমনিয়ে উঠতে লাগল।

এক সময় চরম তৃপ্তি লাভের পর সম্রাট-নন্দিনী হাসান'কে বুকের সঙ্গে একদম লেপ্টে নিয়ে আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে ব'লে উঠল—'মিঠা চিড়িয়া লেড়কিদের খুশী করার সব কিছুই আছে বটে। লেকিন সুখ খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। আর একটু বেশীক্ষণ ইয়ে করতে পারলে পুরোদমে সুখ পাওয়া যেত। যাকগে, এতেই কাজ চলে যাবে। তুমি বহুৎ আচ্ছা চিড়িয়া বটে।'

ব্যস, এবার থেকে হাসান সম্রাট-নন্দিনীর পোষা চিড়িয়া বনে গেল। একটু বাদে বাদেই তাকে পিঞ্জর থেকে বের ক'রে চুমু খায়, নিজের গায়ের সঙ্গে জাপ্টে ধরে রাখে। তার মধ্যে সম্ভোগস্পৃহা জাগিয়ে তোলে। তারপরই উভয়ে রতিসুখ লাভে তৎপর হয়ে ওঠে। লেকিন তার একই আক্ষেপ, কবুতরের মাফিক অল্পেতেই হাসান-এর দম ফুরিয়ে যায়। নিস্তেজ হয়ে এলিয়ে পড়ে।

দিনের পর দিন ধরে এরকম সুখ-লাভের ব্যাপার স্যাপার চলতে লাগল। সাচ্চা বটে, হাসানও সম্রাট-নন্দিনীর মজার খেলায় বিলকুল মজে গেছে। লেকিন তার আদৎ উদ্দেশ্য, বিবি রোশনি আর লেড়কাদের উদ্ধারের ব্যাপারটি দিল্‌ থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

সম্রাট-নন্দিনীর ছলাকলায় মজে গিয়ে দিন কাটিয়ে দেবার পর ভাবতে লাগল—এ তো আজব ব্যাপার হতে চলেছে! এভাবে দিনের পর দিন পিঞ্জরার মধ্যে আটকা পড়ে থাকলে আদৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি ক'রে?

হাসান-এর সঙ্গে দুটো শক্তিশালী কামান ছিল বটে, তাদের একটি যাদুকাঠি আর দ্বিতীয়টি বুড্ডা শেখ আলী-র দেয়া দাড়ির একটি সফেদচুল। বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। সম্রাট-নন্দিনী তার গায়ের কোর্তা-পাৎলুন খুলে নেয়ার সময় সে দুটোকে সরিয়ে ফেলতে পারে নি। সে কোশিস্ করলে হয়ত সে সন্দেহ করত। কোর্তার জেবেই রয়ে গেছে। সমস্যা হচ্ছে, সম্রাট-নন্দিনী তার বিলকুল সাজ পোশাক নিজের জিম্মায় রেখে দিয়েছে। কোথায় রেখেছে হদিস জানে না।

যাদু-কাঠি আর সফেদ চুলটি ফেরৎ পাবার কোশিস্ সে যে করেনি তাও নয়। লেকিন সে যতবারই চেয়েছে, হাত-পা ছুঁড়ে সে-দুটো ফেরৎ চেয়েছে ততবারই সম্রাট-নন্দিনী ভেবেছে তার পোষা চিড়িয়া বুঝি সম্ভোগের জন্য ছটফট করছে। তখনই তাকে পিঞ্জর থেকে বের করে রতিসুখে মেতে উঠেছে। ব্যস, কিছুতেই সে তাকে নিজের কথাটি বুঝাতে পারছে না। আজব ব্যাপার তো! কিছু বুঝাতে গেলেই যদি ভাবে সম্ভোগের জন্য উতলা হচ্ছে তবে তাকে নিজের ব্যাপার স্যাপার বুঝাবে কি করে।

হাসান তবু আশা ছেড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল না। মওকার ধান্ধায় রইল। দেখা যাক খোদাতাল্লা কবে মুখ তুলে তাকান।

একদিন মওকা পেল বটে। সে-রাত্রে সম্রাট-নন্দিনী হাসান'কে পিঞ্জর থেকে বের ক'রে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে নিজের বুকের ওপর তাকে চেপে ধরে আদর সোহাগ করতে লাগল। নিজের অজান্তেই ক্লান্তিতে তার চোখ বন্ধ হয়ে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজে একদম বেহুঁশ হয়ে পড়ল।

হাসান এতক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে ঘাপ্টি মেরে ছিল। সম্রাট-নন্দিনী নিজে আচ্ছন্ন বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে পালঙ্ক থেকে নেমে এল। মওকাটিকে কাজে লাগিয়ে যাদু-কাঠি এবং দাড়ির সফেদ চুলটি হাতিয়ে নেয়ার জন্য তৎপর হ'ল। পাশের কামরায় যেতেই সামনেই তার সাজ পোশাক পড়ে থাকতে দেখল। ব্যস্ত-হাতে কোর্তার জেব থেকে সে দুটোকে বের করে নিল। এবার চুলটিতে অগ্নি সংযোগ করল।

ব্যস, এক লহমার মধ্যেই বুড্ডা পাল আব্বা আবির্ভূত হলেন। হাসান'কে কোলে নিয়ে অলৌকিক ক্ষমতাবলে একদম গুহার বাইরে চলে আসেন।

হাসান এবার বুড্ডা শেখ আলীর-র কাছে সম্রাট-নন্দিনীর সঙ্গে তার ব্যাভিচারের কাহিনী ব্যক্ত করল। কিছুই বাদ দিল না।

সবকিছু শুনে তো বুড্ডা তার ওপর ক্ষেপে একদম আগুন হয়ে গেলেন। গর্জে উঠলেন—'তোমার যদি এই মতিগতি হয় তবে তোমার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক থাকবে না। আমার দেয়া দাড়ির চুল যা অবশিষ্ট আছে ফেরৎ দিয়ে দাও। আদৎ কাজ ফেলে তুমি নষ্টামিতে মজে রইবে তা আমি বরদাস্ত করব না। তোমার নিজের যদি হিম্মৎ থাকে বিবি আর বাচ্চাদের উদ্ধার করবে। আর যদি আমার উপর আস্থা রাখ তবে এসব বাজে ধান্দা একদম ছাড়তে হবে। আমি তোমার বিবি আর বাচ্চাদের উদ্ধারের ফিকির ক'রে দেব, ভরসা রাখতে পার।'

হাসান কেঁদে তার ঠ্যাঙ্ জড়িয়ে ধরল। বল্ল—'বিশোয়াস করুন, বিবি আর লেড়কাদের উদ্ধার করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আর তা করতে এসে দৈত্যদের সম্রাট-নন্দিনীর মোহিনী মায়ায় মজে যাওয়ার পদস্খলন ঘটে গেছে। অকেজো ক'রে দিয়েছে।'

এবার যাদু-কাঠিটির দিকে তাকিয়ে বুড্ডা বল্‌লেন—'বেটা, যাদু-কাঠি আমার পরিচিত। এটি বাহরাম তোমাকে দিয়েছে, ঠিক কিনা? সে ছিল অগ্নির উপাসক। আমার শিষ্য। এক সে-ই খোদাতাল্লার ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছিল। তার এটি এখানে কোন কাজে আসবে না। কারণ জিনিস্থানের সম্রাট তার রাজ্যে বিলকুল যাদু অকেজো করে রেখেছে। তার নিজের যাদু ছাড়া আর কিছুই এখানে কার্যকরী হবে না।'

হাসান বল্‌ল—আপনার কাছে আমার একমাত্র আর্জি আপনি আমাকে নিশানা বাৎলে দিন, আমি কাজ হাসিল করতে পারবই পারব।'

এবার বুড্ডা—পালক আব্বা শেখ আলি চোখের পলকে উধাও হয়ে গেলেন। হাসান বিলকুল তাজ্জব বনে গেল, সে এখন আর সফেদ কর্পূর দ্বীপে নেই। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা এক দ্বীপে সে দাঁড়িয়ে। চারদিকে হীরা-জহরতের ছড়াছড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার আন্ধার নেমে এল। ওয়াক ওয়াক আওয়াজ করতে করতে এক ঝাঁক পাখি, দৈত্যাকৃতি পাখি তার মাথার ওপরে চক্কর খেতে লাগল।

হাসান-এর বুঝতে বাকী রইল না, সে এখন বহু আকাঙ্ক্ষিত ওয়াক ওয়াক দ্বীপের নিষিদ্ধ সে-মুলুকে দাঁড়িয়ে। হাসান আতঙ্কিত হয়ে এক দৌড়ে একটি পাতার ছাউনিতে আশ্রয় নিল।

আচমকা ধূলার ঝড় উঠে চারদিক আন্ধার করে ফেল্‌ল। এবার হাজার হাজার ঢাল-তলোয়ার এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। হাসান বুঝল নিষিদ্ধ মুলুকের নারী সেনার আস্ফালন। কয়েক লহমার মধ্যে সোনার ঘোড়ার পিঠে চড়ে লেড়কিদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উঁচা-লম্বা ও জবরদস্ত দেখতে, তলোয়ারে সজ্জিত এক লেড়কি হাসান-এর কাছে এসে লাগাম টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল। ঘোড়া থেকে নেমে এল সেই দর্পিনী।

লেড়কিটি কাছে আসতেই হাসান তার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গলা ছেড়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। কেঁদে আকুল হয়ে বল্‌ল—'আমি ভিন্‌দেশী মুসাফির। নসীবের ফেরে এখানে ছুটে আসতে হ'ল। আপনি আমার জান রক্ষা করুন। বিবি আর লেড়কাদের খুইয়ে আমি জিন্দেগী—' আচমকা তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই হাসান-এর কলিজাটি যেন আচমকা ডিগবাজী খেল। গলা পর্যন্ত শুকিয়ে এল। এমন কিম্ভুত-কিমাকার কোন লেড়কির অবয়ব হতে পারে তার অন্ততঃ ধারণা ছিল না। আনমনে দু'কদম পিছিয়ে গেল। সে দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে বুকফাঁটা আর্তনাদ করে উঠল। সেনাপতি লেড়কিটি ভাবল—মিট্টির দুনিয়ার আদমিরা বুঝি এভাবে মুখ ঢেকে এবং চিল্লিয়ে সম্মানীয়কে সম্মান প্রদর্শন করে।

লেড়কিটি বল্‌ল—'বেটা, ভয়-ডরের কিছু নেই। আমি তোমার আচরণে মুগ্ধ। ভরসা দিচ্ছি, শাস্তি দেব না। মুখ তোল। আমার দিকে তাকাও।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয়শ' সাততম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, ওয়াক ওয়াক দ্বীপের সেনাপতি লেড়কিটির কাছ থেকে অভয় পেয়ে হাসান মুখের ওপর থেকে ধীরে ধীরে হাত দুটো সরিয়ে দুরু দুরু বুকে তার দিকে তাকাল।

লেড়কিটি বল্‌ল—'বেটা, বল তো, এ-নিষিদ্ধ মুলুকে কেন এসেছ? আজ অবধি কোন আদমির বাচ্চাতো সাহস করে এমুখো হয় নি। আর এমন দুর্গম পথ ডিঙিয়ে তুমি এখানে এলেই বা কি ক'রে? তোমার উদ্দেশ্যই বা কি, খোলসা ক'রে বল তো।'

হাসান তার দুঃখের কিস্‌সা সবিস্তারে তার কাছে ব্যক্ত করল।

সবকিছু শুনে সেনাপতি লেড়কিটি বল্‌ল—'বেটা, তোমার বিবির নাম কি? লেড়কাদেরই বা কি নাম?'

—'আমার বিবির নাম রোশনি। আর লেড়কাদের একজনের নাম মনসুর আর দ্বিতীয় জনের নাম নাসির।' হাসান চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

তাকে প্রবোধ দিতে লেড়কিটি বল্‌ল—'বেটা, চোখের পানি মোছ। তোমার বিবি হয়ত আমার জেনানা-সেনাদেরই কেউ হবে। কারণ তারা ছাড়া তো এখানে আর কোন লেড়কি নেই। কাল ভোরে সবাইকে তোমার সামনে হাজির করব! উলঙ্গ ক'রে দেখাব। হয়ত তোমার রোশনি'কে আলাদা করে নিতে পারবে।'

পরদিন ভোরে সেনাবাহিনীর লেড়কিরা হাসান-এর সামনে সাজ পোশাক খুলে বিলকুল উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সেনাপতি লেড়কিটি তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখাল। হাসান বল্‌ল—'না, এদের কেউ-ই আমার বিবি, আমার রোশনি নয়।'

—'বেটা, তবে মালুম হচ্ছে তোমারই ভুল। সে এ-দ্বীপের লেড়কি নয়।'

—'তা কি করে হবে? সে উড়তে উড়তে আমার আম্মাকে বলেছিল, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে ফিন মোলাকাৎ হবে।'

—'লেকিন বেটা, যাদের দেখলে তারা ছাড়া আর মাত্র সাতটি লেড়কি এ-দ্বীপে রয়েছেন। তারা সবাই সম্রাটের লেড়কি। তোমার বিবির সুরতের ব্যাপারে কিছু বলতো শুনি।'

হাসান এবার তার বিবি রোশনি-র দৈহিক গঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিল।

সেনাপতি লেড়কিটির চোখে মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে এবার বল্‌ল—'বেটা, তোমার বাৎ শুনে মালুম হচ্ছে

তিনি নির্ঘাৎ সম্রাট-নন্দিনীদের মধ্যে কোন একজন। তুমি বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছ। তাকে পাবার আশা ছেড়ে দাও। আমার সেনানীদের তো উলঙ্গ করেই দেখালাম। যদি তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমার দিল্ চায় বল, বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

আপনার মহানুভবতার জন্য হাজারো সুক্রিয়া জানাচ্ছি। লেকিন যৌবনের তাড়নায়, কাম-লিপ্সা চরিতার্থ করতে ভয়ঙ্কর সব বিপদ মাথায় নিয়ে আমি সাত দরিয়া ডিঙিয়ে দুনিয়ার শেষ মাথায় ছুটে আসি নি। আমার মেহেবুবা রোশনি'কে উদ্ধার করার জন্যই জিন্দেগীর মায়া ত্যাগ করে ছুটে এসেছি। আর খোদাতাল্লা-র মেহেরবানির জোরেই আপনার চরণে ঠাঁই পেয়েছি। আমি নিঃসন্দেহ, আপনিই আমার জান, আমার কলিজার সমান রোশনির পাত্তা লাগাতে পারবেন। পারবেন বিবি আর লেড়কাদের আমার হাতে তুলে দিতে।'

—'বেটা, আমি বুঝতে পারছি, বিবি আর লেড়কাদের তুমি নিজের জানের চেয়েও বেশী পেয়ার কর।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, তোমাকে এ ওয়াক ওয়াক দ্বীপের রানী, সম্রাটের বড়া লেড়কির সামনে হাজির করছি। মালুম নেই, তোমার নসীবে কি আছে।'

সেনাপতি-লেড়কিটি হাসান'কে নিয়ে রানীর সামনে হাজির করল। রানীর নাম নুর অল হুদা।

সেনাপতি লেড়কিটি বল্‌ল—আপনার কাছে এক আর্জি নিয়ে এসেছি। এ খুবসুরৎ নওজোয়ানটি দরিয়ার কিনারে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে এক বড়ই হৃদয়বিদারক কাহিনী শোনাল। এক জিন-লেড়কি তার বিবি। এর ঔরসে তার গর্ভে দু-দুটো লেড়কাও পয়দা হয়েছে। আর বিদায় নেবার সময় বলে এসেছিল, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে আমার সঙ্গে মোলাকাৎ হবে। আমার সেনানী লেড়কিদের দেখিয়েছি। তাদের কেউ-ই এর বিবি নয়। আমার দিল্ বলছে, তোমার বহিনদের মধ্যে হয়ত কেউ এর বিবি হতে পারে।'

তার বক্তব্য শুনে অল হুদা তীরবিদ্ধ বাঘিনীর মাফিক গর্জে উঠল—'তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি। মিট্টির দুনিয়ার এক আদমির বাচ্চাকে আমার দরবারে হাজির করেছ! তোমার ভয় ডর ছাড়া এতটুকু শরমেও বাঁধল না! তোমার গর্দান নিলে আমার কলিজার জ্বালা মিটতে পারে। কয়েক মুহূর্ত দাপাদাপির মধ্যে কাটিয়ে অল হুদা এবার হাসান-এর দিকে ফিরে বল্‌ল—'তোমার কলিজার জোর দেখে আমি তাজ্জব বনছি! কোন সাহসে তুমি আমার দ্বীপে পা রাখলে, জবাব দাও!'

হাসান কুরবানির পশুর মাফিক নীরবে কাঁপতে লাগল। তার প্রশ্নের কি জবাব দেবে হঠাৎ ক'রে গুছিয়ে উঠতে পারল না।

অল হুদা একই স্বরে এবার বল্‌ল—'তোমার নাম কি? মুলুক কোথায়?'

—'আমার নাম হাসান। আরব দুনিয়ার বসরাহতে আমার মকান। আমার বিবির নাম রোশনি। অবশ্য অন্য কোন ভাল নাম আছে কিনা, মালুম নেই।'

—'তোমার লেড়কাদের নাম?'

—'এক জনের নাম মনসুর আর দ্বিতীয় জনের নাম নাসির।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তোমার বিবি কোথা থেকে ভেগে গেছে কেনই বা সে ভেগেছে?'

—'বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর প্রাসাদ থেকে ভেগেছে। আর কেন যে সে আমাকে ছেড়ে ভেগেছে তা আমার মালুম নেই। যাওয়ার সময় আমার আম্মাকে বলে গেছে, আপনার বেটা যদি চায় তবে ওয়াক ওয়াক দ্বীপে আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে পারে। আমি তখন মুলুকে ছিলাম না।'

অল হুদা কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে বল্‌ল—'শোন পরদেশী নওজোয়ান, এখানে দুটো ব্যাপার ভাববার আছে। পহেলি ব্যাপার—'তোমার বিবি যদি তোমাকে না চাইত তবে জরুর তোমার আম্মাকে তার ঠিকানা দিত না। দুসরা ব্যাপার—সে যদি তোমাকে পেয়ার-মহব্বৎ-ই করবে তবে তোমাকে ছেড়ে ভেগে আসবে কেন?'

—'মেহেরবানি করে আমার বাৎ বিশোয়াস করুন। আমার বিবি আমাকে নিজের কলিজার সমান মহব্বৎ করে। আমি জানি, এখন তার মহব্বৎ জরুর অক্ষুণ্ণ আছে। আমার একটিই বিশ্বাস খোলা আশমানে উড়ে যাবার আকর্ষণ-ই তখন তাকে অস্থির করে তুলেছিল বলেই সে এ-কাজ করেছে।'

আল হুদা দীর্ঘ সময় গালে হাত দিয়ে গম্ভীর হয়ে ভাবল। তারপর এক সময় মুখ খুলল—'দেখ, আমি ভাবছিলাম, কোন সাজা তোমার জন্যে বরাদ্দ করলে সমুচিত হবে। লেকিন কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।'

কথা বলতে বলতে অল হুদা বোরখা খুলে ফেল্‌ল। হাসান-এর দিকে আড়চোখে তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্‌ল।

হাসান এক লহমায় তাকে দেখেই বিকট আর্তনাদ ক'রে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

খানিক বাদে হাসান চোখ মেলে তাকাল। হাত দুটো ঊর্দ্ধে উত্থিত ক'রে ব'লে উঠল—'শোভন আল্লাহ! এ আমি কাকে দেখলাম, কি দেখলাম, এ যে দেখতে অবিকল আমার বিবির মাফিক। বিলকুল এক ছাঁচে গড়া।'

সম্রাট-নন্দিনী হাসান-এর বাৎ শুনে হেসে একদম লুটোপুটি খাওয়ার জোগাড়। হাসতে হাসতে বল্‌ল—'এ আদমীর বাচ্চা কী

আজব বাৎ শোনাচ্ছে। আমি কুমারী। আর এ বলে কিনা আমি অবিকল এর বিবির মাফিক। দিমাক টিমাক খারাপ নাকি।' হাসি থামিয়ে এবার বল্‌ল—'সাচ্চা বল তো, আমাকে তোমার বিবির মাফিক ঠাওরালে কেন? তার সঙ্গে আমার সাদৃশ্য কোনদিকে তোমার চোখে পড়েছে?'

—'দেখুন, আমার বিবির সমান সুরৎ তামাম দুনিয়ার অন্য কোন লেড়কি বা জেনানার আছে ব'লে আমার অন্ততঃ বিশোয়াস ছিল না। লেকিন আপনার সুরৎ আমার ধারণা বদলে দিয়েছে, সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। আপনার মুখে বিলকুল তারই আদল যেন বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তফাত খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে। তবে ফারাক কেবলমাত্র চোখে। আর কণ্ঠস্বর শুনে কিছু ফারাক অনুমান করা যায়।'

সম্রাট-নন্দিনী নিশ্চিত, এ-নওজোয়ান অন্য কোন লেড়কি বা জেনানার দিকে ঝোঁকার পাত্র নয়। বিবি-অন্ত প্রাণ। লেকিন সে নিজেকে এবার সামাল দেবে কিভাবে? একে দেখা ইস্তক তার কলিজা পুরো দমে মোচড়ামুচড়ি জুড়ে দিয়েছে। একেই কি বলে পেয়ার-মহব্বৎ? আর একেই কি বলে পুরুষের প্রতি আসক্তি?

সম্রাট-নন্দিনী অল হুদা সিদ্ধান্ত নিল, তার বিবিকে তাল্লাশ ক'রে বের করবেই। আর সে বিবি নিশ্চয়ই তারই ছয় বহিনের মধ্যে কোন একজন।

সেনাপতি-লেড়কিকে অল হুদা বল্‌ল—'আমার ছয় বহিনকে তলব দাও। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হয় না।'

সম্রাট-নন্দিনীর হুকুম তামিল করতে সে এক-একটি দ্বীপে গিয়ে তার এক-একটি বহিনকে নিমন্ত্রণ করে এল। এবার আর এক দ্বীপে হাজির হ'ল সবচেয়ে ছোটা বহিনকে তার বহিনজীর হুকুমের ব্যাপার জানাতে। সম্রাট-নন্দিনী তাকে মানা করে দিয়েছিল, ভুলেও যেন আগন্তুক নওজোয়ানের ব্যাপারে মুখ না খোলে। সে তা করেওনি। মুখে একদম কুলুপ এঁটে রেখেছিল।

অল-হুদার ছোটা বহিনটির কাছে তার বুড্ডা আব্বা, সম্রাট থাকেন। জিনিস্থানের সম্রাট। ছোটা লেড়কির মুখে তার বহিনজীর নিমন্ত্রণের ব্যাপার শুনে তিনি বিলকুল মুষড়ে পড়লেন। তাকে কাছছাড়া করতে মোটেই রাজী নন। কারণ, গত রাত্রে তিনি এক খারাপ খোয়াব দেখেছেন। তার আশঙ্কা সে দিনই সে বে-পাত্তা হয়ে যেতে পারে।

ছোটা লেড়কি আব্বার মুখে খোয়াবের ব্যাপার শুনে তার আব্বাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে, তিনি খোয়াবে এমন কি দেখেছেন যার জন্য তিনি তার বহিনদের কাছে পর্যন্ত যেতে দিতে নারাজ।

সম্রাট বললেন—'বেটি, খোয়াব দেখলাম, আমি আমার গুপ্তধনাগারের সাতটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন দেখলাম। তাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড়িয়া রত্নটিকে হাতে তুলে নিলাম। ঠিক সে-মুহূর্তেই এক বাঁজপাখি ছোঁ মেরে সেটিকে আমার হাত থেকে নিয়ে নিল। আমি চিল্লিয়ে উঠলাম। নিদ টুটে গেল। ভোরে গণৎকারকে তলব করলাম। তারা গণনা ক'রে বল্‌ল—'ছোটা যে-রত্নটি খোয়া গেছে বললেন সেটি আপনার ছোটা লেড়কিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। মালুম হচ্ছে, কোন আকস্মিক ব্যাপারে আপনার ছোটা লেড়কিকে খোয়াতে পারেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সম্রাট এবার বল্‌লেন—সেই থেকে তোমাকে যেকোন দিন হারাতে পারি এরকম আশঙ্কায় আমার কলিজা হরদম ছটফট করছে। তাই তো তোমাকে আমার কাছছাড়া করতে দিল একদম সরছে না।

আব্বার বাৎ শুনে ছোটা লেড়কি তো হেসেই খুন। সে খোয়াবের ব্যাপারটি মোটে আমলই দিল না। সবশেষে বল্‌ল—'আব্বা, আমি খুশি হয়ে কারো সঙ্গে ভেগে না গেলে কার সাধ্য আমাকে জোর জুলুম করে নিয়ে যায়। সেবার আমি আমার ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে ঢুঁড়তে গিয়ে এক আদমির বাচ্চার মোহে পড়ে গিয়েছিলাম। সুযোগ বুঝে তো ভেগেই এসেছি। তাই বলছি কি, দিল্ থেকে ওরকম বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দাও। তামাম ওয়াক ওয়াক দ্বীপ তোমার কব্জায়। হাজার হাজার সৈন্য আশমানে টহল দিচ্ছে। এদের চোখে ধুলা দিয়ে আমাকে হাফিস্ করে দেবে এত বড়িয়া হিম্মৎওয়ালা কে আছে?'

লেড়কির বাৎ শুনে তার আব্বার দিল্ কিছুটা নরম হ'ল। সম্রাট এক হাজার নারী-সৈন্যের প্রহরায় লেড়কির সফরের বন্দোবস্ত করলেন।

রোশনি তার বড়া বহিন অল হুদা-র দরবারে হাজির হ'ল।

দরবারে মসনদে অল-হুদা উপবিষ্টা। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসান। চোখে-মুখে তার বিষাদের সুস্পষ্ট ছাপ। তার ওপারে তরবারি উঁচিয়ে কয়েকজন নারী-সৈন্য।

অল-হুদা-র নির্দেশে তার বহিনদের এক এক ক'রে হাসান-এর সামনে হাজির করা হ'ল। হাসান এক-একজনকে দেখছে আর জবাব দিচ্ছে, এ-তার বিবি নয়।

সবার শেষে সবচেয়ে ছোটা বহিন রোশনি তার বহিনজীর হুকুমে পরদেশী নওজোয়ান হাসান-এর সামনে এসে দাঁড়াল। আর বোরখা খুলতেই হাসান বিকট আর্তনাদ ক'রে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার সংজ্ঞা লোপ পেল।

অল হুদা-র বুঝতে দেরী হ'ল না। তার ছোটা বহিনই আগন্তুক নওজোয়ান হাসান-এর বিবি।

অল-হুদা-র নির্দেশে কয়েকজন বেহুঁস হাসান'কে দরিয়ার ধারে নিয়ে গিয়ে একদম পানির কাছাকাছি ফেলে দিয়ে এল।

আর রোশনি'কে কয়েদখানায় থামের সঙ্গে বেঁধে রাখার বন্দোবস্ত করল। এবার বাকী রইল সে সেনাপতি-লেড়কিটি। অল-হুদা তার শাস্তির বন্দোবস্ত করতে গিয়ে থমকে গেল। ক্রোধে গর্জে উঠল—'তুমি দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, তোমার মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য। তবে তোমার শাস্তি আমি নিজে হাতে দিতে চাই না। তোমাকে আব্বাজীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনিই তোমার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন।'

ইতিমধ্যে দরিয়ার পানির ছিটা পেয়ে হাসান-এর সংজ্ঞা ফিরে এল। সে দেখল, তার পাশে, মাত্র কয়েক হাত দূরে দুটো লেড়কি একটি টুপির মালিকানা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়েছে। একটি লেড়কি টুপিটি মাথায় দিয়ে অন্য লেড়কিটিকে হাত উঁচিয়ে মারতে গেল। তাকে ছোঁয়ামাত্র তারা দু'জনই কর্পূরের মাফিক উবে গেল। একদম বে-পাত্তা। কেবল টুপিটি দরিয়ার কিনারে বাতাসে গড়াগড়ি খেতে লেগে গেল। হাসানের কৌতূহল হ'ল। সে টুপিটি কুড়িয়ে নিল।

ঠিক তখনই সেনাপতি-লেড়কিটি সে পথে এল। হাসানকে দেখেই সে চিনতে পারল। হাসান-এর কাছে এসে বল্‌ল—' সে কী, তুমি এখনও জিন্দা আছ! আমি যে শুনলাম তোমাকে বেহুঁস অবস্থায় দরিয়ার পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে?'

হাসান বল্‌ল—'সে না হয় হ'ল, লেকিন সম্রাট-নন্দিনী তোমাকে কি ইনাম বখশিস দিল?'

—'আমার শাস্তি হয়ত আরও বড় রকমই কিছু হবে। আমাকে আমার মোউৎ সম্রাটের কাছে পাঠানো হবে। আমাকে হয় শূলে চড়াবে, নয় তো গর্দান নিয়ে এক লহমায় বেহেস্তে পাঠিয়ে দেবে।'

—'চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে জান বাঁচাই।'

—'পালাবে? লেকিন কোন ফন্দি ফিকির—'

—'ফিকির আমি আগেই করে রেখেছি।' টুপিটি দেখিয়ে বল্‌ল—'এটি মাথায় দিয়ে আমি যাকে ছোঁব সে-ও আমার সঙ্গে সঙ্গে বেমালুম হাফিস হয়ে যাবে। তুমি আমারই জন্য আজ জান দিতে বসেছ। তোমাকে রক্ষা না করলে বেইমানি করা হবে। আগে তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে তো পৌঁছে দেই। তারপর তোমার ধান্ধা তুমি করবে আর আমি নিজের রাস্তা খুঁজব, কি বল, রাজী?'

নিশ্চিত মোউৎ-এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার বন্দোবস্তের কথা শুনে-সেনাপতি লেড়কিটি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

হাসান এবার কুড়িয়ে পাওয়া যাদু-টুপিটি মাথায় পরে তাকে স্পর্শ করামাত্র উভয়েই বেমালুম হাফিস হয়ে গেল, তাকে যারা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা বিলকুল বেকুব বনে গেল। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটি সম্বন্ধে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। কারো মুখ থেকেই কোন সদুত্তর বেরোল না।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয়শ' তেরোতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, যাদু-টুপিটি মাথায় চাপিয়ে হাসান সেনাপতি-লেড়কিটিকে নিয়ে পাতালের কয়েদ খানায় হাজির হ'ল। হাসান সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে তার বিবি রোশনি'কে দেখতে পেল। সেদিনই তাকে এখানে এনে অল-হুদার সৈন্যরা বেঁধে রেখে গেছে।

হাসান ব্যস্ত হাতে রোশনি-র বাঁধন খুলে দিল। গোড়ার দিকে রোশনি ব্যাপারটি বুঝতে পারেনি। কিছু সময় বাদে হাসান তার মাথার টুপিটি খুলে ফেলতেই রোশনি বুঝতে পারল, তার স্বামী হাসান রশির বাঁধন আলগা ক'রে তাকে মুক্ত করেছে। রোশনি তার বুকে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

হাসান বল্‌ল—'রোশনি, মেহেবুবা আমার, এ কান্নার সময় নয়। ঝটপট আমাদের এ-কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমাকে তুমি স্পর্শ করে থাক। ব্যস, তারপর কয়েদখানার বাইরে যাবার দায়িত্ব আমার।'

রোশনি তাকে স্পর্শ ক'রে রাখল। হাসান এবার টুপিটি মাথায় চাপাতে না চাপাতেই এক লহমার মধ্যে রোশনি'কে নিয়ে কয়েদ

খানার বাইরে চলে এল।

হাসান রোশনি'কে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল—'রোশনি, আমার জান, কলিজা আমার—তোমাকে বাগদাদে নিয়ে যাবার জন্য আমি হাজারো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে এসেছি।'

চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে রোশনি বল্‌ল—'আমি বড্ড দেরীতে বুঝেছি। লেড়কিদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল তার স্বামী। স্বামীর মকান। এখানে থাকলে এরা আমাকে কোতল করবে, গর্দান নিয়ে ছাড়বে। যত শীঘ্র পার আমাকে-এ অভিশপ্ত ওয়াক ওয়াক দ্বীপের বাইরে নিয়ে চল।'

হাসান আবার টুপিটি মাথায় চাপিয়ে রোশনিকে নিয়ে হাজার হাজার যোজন পেরিয়ে হাজির হ'ল তার নিজের মুলুক বাগদাদে।

রোশনি প্রাসাদে ঢুকল। সে-বুঝল এ-ই তার মকান, সংসার। এখানেই তাকে জিন্দেগী কাটাতে হবে।

হাসান যাদু-টুপির সাহায্যে ওয়াক ওয়াক দ্বীপ থেকে তার লেড়কা মনসুর আর নাসির'কে নিয়ে এল নিজের মকানে। তাদের দীর্ঘ অদর্শনে রোশনি-র কলিজা ছটফট করছিল। এবার সে শান্ত হ'ল।

হাসান তার বিবি ও লেড়কাদের নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুল্‌ল।

কিস্‌সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। তাঁর ছোটা বহিন মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক এতক্ষণ তার বহিনজীর মুখ থেকে কিস্‌সা শুনছিল। সে এবার আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে সে বলে উঠল—'বহিনজী বড়িয়া তোমার কিস্‌সাটি! এবার আর একটি চটকদার কিস্‌সা বল।'

বেগম শাহরাজাদ মুচকি হেসে বল্‌ল—'বহিন, এবার তোমাদের কাছে বলব—এক 'কাম-পিয়াসী লেড়কির কিস্‌সা।'

দুনিয়াজাদ সোল্লাসে ব'লে উঠল—বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!'

কাম-পিয়াসী লেড়কির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন 'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে এক নগরে এক সওদাগর বাস করত। সে ছিল নওজোয়ান। সওদাগরী কারবারের তাগিদে তাকে হরবখত ভিন্‌দেশে যেতে হ'ত।

নওজোয়ান সওদাগরটির এক বিবি ছিল। সে ছিল পুরোদস্তুর কামুক প্রকৃতির। প্রতিনিয়তই যেন সে কাম-জ্বালায় দগ্ধ হ'ত।

লেড়কিটির স্বামী যখন ভিন্‌দেশের বন্দরে-বাজারে সওদা নিয়ে টুঁড়ে বেড়াত তখন তার বিবি সে মওকার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করত। ফি রোজ সে খুবসুরৎ একটি ক'রে নওজোয়ান'কে নিয়ে রাতভর মজা লুঠত। তারপর এক নওজোয়ান'কে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নেয়। সওদাগর ফিরে আসার সময় হলে লেড়কাটিকে তার নিজের মকানে পাঠিয়ে দেয়।

এক বুড্ডা শেখের অদ্ভুত কামতৃষ্ণা ছিল। বিকৃত-কাম। কুত্তার স্বভাব যাকে বলে। খুবসুরৎ। লেড়কাদের পটিয়ে পটিয়ে কামজ্বালা নির্বাপিত করত। নওজোয়ানটি বিকৃত-কামপটু বুড্ডা শেখটির খপ্পরে পড়ল। তার ঘৃণিত প্রস্তাব শুনেই সে ক্ষেপে লাল হয়ে যায়। প্রথমে মুখের ভাষায় তাকে কাবু করার কোশিস করে। তাতেও যখন শেখটি সংযত হ'ল না তখন বাধ্য হয়ে কিল-থাপ্পড়-ঘুষি চালিয়ে তাকে একদম ধরাশায়ী করে দেয়। নওজোয়ানটি সওদাগরের বিবির নাগর।

আহত বুড্ডা শেখ কোতোয়ালের শরণাপন্ন হ'ল। কোতোয়াল নওজোয়ানটিকে কয়েদখানায় পুরে দিলেন।

নওজোয়ান নাগরটির কয়েদের খবর সওদাগরের বিবির কানে পৌঁছাল। সে গোস্‌সায় ফোঁস ফোঁস করতে করতে কোতোয়ালের দপ্তরে হাজির হ'ল। তার সুরৎ দেখেই কোতোয়ালের জিভ রসিয়ে উঠল। তিনি লোলুপ নজরে জুল্ জুল ক'রে তার ঢেকে ঢুকে বসা যৌবনচিহ্নগুলোর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। আর হবে নাইবা কেন। তার দেহে যে বর্ষার নদীর মাফিক যৌবন উপচে পড়ছে। কোতোয়ালের কলিজা চঞ্চল হয়ে উঠল। শিরা-উপশিরায় খুনের মাতন লাগল। তার শরীর হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাঁক হতে লাগল।

নওজোয়ানটির বিবির সমুন্নত বুকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই কোতোয়াল প্রশ্নটি তার দিকে ছুঁড়ে দিল—'কি গো, কি চাই? কি দরকারে আমার দরবারে ছুটে এসেছ?'

নওজোয়ান সওদাগরটির বিবি বল্‌ল—'কোতোয়াল সাহাব, আপনার কয়েদখানায় আমার ভাইয়া আটক আছে। বুড্ডা শেখটি তার নামে মিথ্যা নালিশ ক'রে আপনাকে দিয়ে তাকে আটক করিয়েছে। মেহেরবানি করে আপনি ওকে মুক্তি দিন। আমাদের সংসারে সে-ই এক মাত্র রোজগেরে। তাকে যদি ঝুটমুট কয়েদখানায় আটক রাখেন তবে খানাপিনাটিনা ছাড়া সবার গোরে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।'

বহুৎ আচ্ছা। তোমার ভাইয়ার মুক্তির বন্দোবস্ত আমি করে দেব। লেকিন এখন হবে না। কিছু দেরী করতে হবে। আমার হাতে জরুরী কাজ রয়েছে। তুমি এখন আমার হারেমে গিয়ে বস। একটু বাদেই আমি হাজির হয়ে সব শুনছি।

নওজোয়ান সওদাগরটির বিবি বুঝতে পারল, বুড্ডা কোতোয়ালের কলিজায় আগুনের জ্বালা শুরু হয়ে গেছে। তাকে একটু উচিত দাওয়াই দিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। তাই আমতা আমতা

ক'রে বল্ল—'লেকিন কোতোয়াল সাহাব, আপনার হারেমে কি ওসব কাজের সুবিধা হবে? তার চেয়ে বরং আমার মকানে চলুন। কোন ঝামেলা নেই। নির্বিবাদে দিল্ ও কলিজা ঠাণ্ডা করতে পারবেন। আমি নির্ভয়ে সবকিছু খোলসা ক'রে আপনাকে বলতেও পারব, যাবেন?'

—'যাব। জরুর যাব। লেকিন তোমার মকান কোথায়, বলতো?'

—'চাঁদনী বাজারের ধারে লাল রঙের একটি পাকা মকান আছে, জরুর দেখেছেন? সেটিতেই আমি থাকি। সন্ধ্যার আগে আগে হাজির হতে পারলে সব চেয়ে ভাল হয়। কি, আসছেন তো?'

—'বহুৎ আচ্ছা, তখনই আমি হাজির হ'ব। তুমি দরওয়াজার কাছাকাছি থেকো। বেশী ডাকাডাকি করতে হয় না যেন।'

সওদাগরটির বিবি ঘাড় কাৎ ক'রে কোতোয়ালের বক্তব্যে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল। সোজা এবার সে কাজির দরবারে হাজির হ'ল।

লেড়কিটিকে দেখামাত্র নওজোয়ান কাজীর কলিজায় কামজ্বালার সঞ্চার হয়। বুকের ভেতরে কোন্ অদৃশ্য হাত যেন অনবরত হাতুড়ির আঘাত হানতে থাকে। বুড্ডা কাজী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল—' কি গো, হঠাৎ কি মনে করে আমার দরবারে হাজির হয়েছ?' এক লহমায় তার ভারী নিতম্ব দুটোকে দেখার কোশিস করতে গিয়ে সামান্য কাৎ হয়ে কাজী এবার বল্লেন—'হয়েছে কি? তোমার ওপরে কেউ জুলুমটুলুম করেছে বুঝি?'

—'আমার ওপরে কেউ-ই জুলুম করে নি। জুলুম করেছে আমার ভাইয়ার ওপরে। সে একদম নিরপরাধ। অথচ কোতোয়াল সাহাব তাকে ফাটকে আটক ক'রে রেখেছে।'

—'ফাটকে আটক করেছে?' বৃদ্ধ কাজীর নিস্তেজ চোখের মণি দুটো এবার লেড়কিটির উন্নত বুকের ওপর চক্কর খেতে লাগল। সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বল্ল—'কেন? ফাটকে আটক করেছে কেন? কোন কসুর টসুর—'

—'না কাজী সাহাব, কোন কসুরই সে করে নি। এক বুড্ডা শেখ তার নামে ঝুটমুট নালিশ করে। শুনলাম, কয়েকজনকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষীও নাকি জোগাড় করে নিয়ে এসেছিল। দু'তরফের বাৎচিৎ শুনে তবে তো কোতোয়াল কাউকে ফটকে আটক করবেন। তিনি তা না করে আমার ভাইয়াটিকে ফাটকে ঢুকিয়ে দেন।

—'তবে তোমার অভিযোগ ভাল করে শোনা দরকার। লেকিন আমার হাতে এখন কিছু জরুরী কাজ জমা হয়ে রয়েছে। তুমি বরং কিছুক্ষণ আমার হারেমে গিয়ে অপেক্ষা কর। কাজ সেরে আমি একটু বাদে গিয়ে তোমার সব অভিযোগ ভাল ক'রে শুনব।'

নওজোয়ান সওদাগরটির বিবি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্ল। বুড্ডা কাজীর মতলব বুঝতে তার আর বাকী রইল না। সে সঙ্গে সঙ্গে বল্ল—'কাজী সাহাব, আপনার হারেমে আমার একটু মুশকিল রয়েছে। সেখানে আপনার বাঁদীরা কেউ আমার পরিচিত নয়। শরমটরমের ব্যাপার আছে, বুঝতেই তো পারছেন। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে সেখানে আমি দিল্ খোলসা করে কোন বাৎ বলতে বা কিছু করতে পারব না। আমার মকান একদম ফাঁকা। কোন অসুবিধাই হবার নয়। মেহেরবানি ক'রে যদি আপনি একবারটি সেখানে পায়ের ধুলা দেন তবে কোন সমস্যাই থাকে না।'

—'তোমার মকান! কোথায় তোমার মকান? কোথায় থাক তুমি?'

—'চাঁদনী বাজারের কাছেই। সেখানে পথের ধারে যে লাল পাকা বাড়িটি রয়েছে—সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসুন, সবচেয়ে ভাল হবে।'

কাজীর মতামত নিয়ে লেড়কিটি এবার সোজা উজির সাহাবের কাছে হাজির হ'ল।

উজির সওদাগরটির বিবির খুবসুরৎ মূর্তি দেখে বিলকুল কুপোকাৎ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। এক লহমায় তার ভারী নিতম্ব, উন্নত বক্ষ এবং সরু কোমর ও পাকা ডালিমের মাফিক রক্তাভ গাল দুটোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাম-জর্জর উজির বল্ল—'কি মতলব? কি চাই তোমার? তোমার জন্য কি করতে পারি, বল তো?'

—'হুজুর আমার ভাইয়াকে ফেরেফবাজ কোতোয়াল ঝুটমুট ফাটকে আটক করে রেখেছে। একমাত্র তার রোজগারেই আমাদের সংসার চলে। সে-ই যদি আটক থাকে খানাপিনা বিনা শুকিয়ে মরতে হবে। আপনার কাছে আর্জি জানাতে এসেছি মেহেরবানি করে আপনি তার খালাসের বন্দোবস্ত করে দিন।'

—'তোমার ভাইয়াকে কোতোয়াল বিনা কসুরে ফাটকে আটক করেছে। যত্তসব শয়তান বেতমিস কাঁহিকার। আমি এসব অপদার্থ কোতোয়ালগুলি ধরব আর এক এক করে গর্দান নেব। কাজের কাজ করার হিম্মৎ নেই, অকাজ করতে ওস্তাদ। তুমি ঘাবড়াও মাৎ। তোমার ভাইয়া যাতে বেকসুর খালাস পায় তার বন্দোবস্ত আমি জরুর করব। তবে তোমার সব বাৎচিৎ খোলাসা করে বলবে, আমি শুনে নিতে চাই। তুমি আমার হারেমে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। একটু হাল্কা হলেই আমি তোমার কাছে হাজির হ'ব।'

নওজোয়ান সওদাগরের বিবিটির উজিরের মতলব বুঝতে আর বাকী রইল না। সে ঠোঁট টিপে টিপে পুরুষের কলিজায় জ্বালা ধরানো হাসি হেসে বল্ল—'হুজুর, আমি সামান্য এক ব্যাপারীর লেড়কি। আপনাদের হারেমে আমি সহজ হতে পারব কেন? বরং

আপনি যদি মেহেরবানি করে আমার গরীবখানায় একবারটি যান তবে বহুৎ আচ্ছা হয়। আমার মকান একদম ফাঁকা। নির্বিবাদে কাজ মিটতে পারে।'

উজির রাজী হলেন। লেড়কিটি তার মকানের ঠিকানা দিয়ে বিদায় নিল।

উজিরের মকান থেকে বেরিয়ে লেড়কিটি সোজা সুলতানের কাছে হাজির হয়। সুলতান তো তার যৌবনের জোয়ার লাগা ঢলঢল দেহটি দেখেই কামজ্বালায় দগ্ধ হতে লাগলেন। তার সুরৎ সুলতানের কলিজায় একদম জ্বালা ধরিয়ে দিল। কাম-জ্বালায় জর্জরিত সুলতান বার-কয়েক ঢোক গিলে বল্‌লেন—'কি ব্যাপার? আমার কাছে তোমার কি দরকার, বলতো সুন্দরী?'

—'আপনার কাছে আমি একটি আর্জি নিয়ে এসেছি জাঁহাপনা। কোতোয়াল সাহাব এক শেখের মিথ্যা আর্জি শুনে আমার ভাইয়াকে ফাটকে আটক করে রেখেছে। সে-ই আমাদের সংসারে একমাত্র রোজগেরে পুরুষ। তাকে ফাটকে আটক রাখলে আমাদের খানাপিনা কে জোগাবে, আপনিই বলুন, জাঁহাপনা?'

লেড়কিটির যৌবনভরা টসটসে শরীরটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সুলতান এবার বল্‌লেন—'কোতোয়াল তোমার ভাইয়াকে বিনা কসুরে ফাটকে আটক করে রাখলে জরুর অন্যায় করেছে। আমি গর্দান নিয়ে ছাড়ব! তুমি এক কাজ কর। আমার হারেমে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর। হাতের জরুরী কাজ মিটিয়ে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, সব শুনব।'

সওদাগরের বিবি বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার হারেমে যাওয়া কি আমার মাফিক এক অতি সাধারণ লেড়কির পক্ষে সম্ভব, বলুন? আপনার বাদীদের পাশে তো আমি শরমে একদম মিইয়ে যাব। তার চেয়ে বরং আপনি যদি মেহেরবানি করে একবারটি আমার ভাঙা কুটীরে পায়ের ধূলা দেন তবে নিরিবিলিতে কাজ মিটতে পারে।'

সুলতান সওদাগরের বিবির প্রস্তাবে রাজী হলেন। সে এবার বল্‌ল—'হুজুর, তবে সূর্য ডোবার ঘন্টাখানেক বাদে আপনি হাজির হবেন। আমি একদম তৈরী হয়েই থাকব। একদম দেরী হবে না।'

সুলতানের সম্মতি পেয়ে সওদাগরের বিবি তাঁকে নিজের বাড়ির নিশানা বাৎলে দিয়ে বিদায় নিল। সে এবার এক ছুতোর মিস্ত্রির কারখানায় হাজির হ'ল। বেশ বড়সড় পাঁচটি তাকওয়ালা একটি আলমারি খরিদ করে নিল, আর তাকে বল্‌ল—'রাত্রি দশটায় আমার মকানে একবারটি তোমাকে হাজির হতে হবে। আরও কিছু সমানপত্র বানাতে হবে। দু'জনে তামাম রাত্রি ধরে মাপজোক করব, হিসাব জুড়ে আলমারির দামও তখনই পাবে, যাবে তো?'

এমন খুবসুরৎ লেড়কির বাড়ি রাত্রি গুজরান করার সুযোগ পাওয়া তো নিতান্তই নসীবের ব্যাপার। সে মিস্ত্রীটি সহজেই রাজী হয়ে গেল। লেড়কিটি এবার পাঁচ তাকওয়ালা ইয়া পেল্লাই আলমারিটি কয়েকটি কুলীর মাথায় চাপিয়ে নিজের মকানে হাজির হ'ল।

ব্যস্ত হাতে সে এবার ঘরদোর সাফ সুতরা করতে লেগে গেল। সূর্য ডোবার কিছু সময় বাদেই কোতোয়াল সাজগোছ করে, খুসবুওয়ালা আতর কোর্তা-কামিজে মেখে ছিঁটিয়ে সওদাগরের মকানে হাজির হলেন। সওদাগরের বিবি তাকে আদর করে কামরায় বসতে দিল। খানা সাজিয়ে দিল। সরাব দিল পেয়ালা ভরে ভরে। সরাবের পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে লেড়কিটিকে আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়ায়। লেড়কিটি জবরদস্ত। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সুরুৎ করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

সওদাগরের বিবি একটি ফতুয়া আর লেংটি এনে তার হাতে দিয়ে বলে—'ওসব কাজ এমন বাহারী ও দামী সাজপোশাক পরে করলে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে যে। ওসব খুলে আগে এ দুটো পরে নিন। নিজেকে হাল্কা লাগবে। কাম কাজ করেও খুশী হবেন। কোতোয়াল পোশাক বদলে একদম জবরদস্ত কুলি সেজে গেল।'

হঠাৎ দরওয়াজার কড়া নড়ে উঠল। লেড়কিটি কাঁপা কাঁপা গলায় বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! আমার স্বামী। অসময়ে আমার স্বামী হাজির হয়েছে।' আলমারি খুলে নিচের তাকটি দেখিয়ে বল্‌ল—'এক কাজ করুন, ঝটপট এখানে শুয়ে পড়ুন। একদম চুপ। টু-শব্দও করবেন না।'

কোতোয়াল আলমারির ভেতরে নিচের তাকটিতে ঢুকে গুটি সুটি মেরে শুয়ে পড়ল। তার ওপরে একটি কাপড়া চাপা দিয়ে ডালার তালা বন্ধ করে দিল।

সওদাগরের বিবি এবার দরওয়াজা খুলে কাজীকে কামরার ভেতরে নিয়ে এল। সাধ্য মাফিক আদর আপ্যায়ন করল খানা ও সরাব দিয়ে।

কাজী সরাব পান করতে করতে হাত বাড়িয়ে লেড়কিটিকে ধরার কোশিস করলেন। লেড়কিটি কায়দা-কসরৎ ক'রে দু'হাত সরে গিয়ে বল্‌ল—'এত উতলা হবার কি আছে কাজী সাহাব! তামাম রাত্রি তো পড়েই রয়েছে। এমন জবরদস্ত পোশাক পরে ইয়েটিয়ে করতে গেলে দামী সাজ পোশাকগুলি বরবাদ হবে, কাজেরও অসুবিধা। এবার একটি ফতুয়া ও এক চিলতে ন্যাকড়া এনে দিয়ে বল্‌ল—'লেংটি পরে ফতুয়াটি গায়ে চাপিয়ে নিন।' কাজী পোশাক বদলে বল্‌লেন—'এক কাম কর, কাগজ-কলম নিয়ে এসো। তোমার আদৎ কাজটি আগে সেরে ফেলি। পরে ওসব ধান্ধায় মজে গেলে ফুসরৎই পাওয়া যাবে না।'

লেড়কিটি কাগজ-কলম এনে কাজীর হাতে দিল। কাজী খস্ খস্ ক'রে কয়েদখানায় হাবিলদারকে একটি ফরমান লিখে দিলেন

লেড়কিটির ভাইকে বে-কসুর খালাস করে দেবার জন্য।

ফরমানটিকে বুকে, কামিজের ভেতরে লেড়কিটি চালান করে দিল।

এবার কাজী হাত বাড়িয়ে লেড়কিটিকে যেই পাকড়াও করতে যাবেন অমনি সদর-দরওয়াজার কড়া নড়ে উঠল।

লেড়কিটি চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! সর্বনেশে কাণ্ড ঘটতে চলেছে! আমার স্বামী অসময়ে হাজির হয়েছে। এখন উপায়?' আলমারির ডালা খুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল—'নিচের থেকে দ্বিতীয় তাকে গুটি সুটি মেরে শুয়ে থাকুন। কাজী অনন্যোপায় হয়ে আলমারির তাকে নিজেকে ঢুকিয়ে নিলেন। লেড়কিটি তার ওপর এক চিলতে কাপড়া চাপা দিতে দিতে বল্‌ল—'মুখে একদম কলুপ এঁটে দিন। কিছুতেই নড়াচড়া করবেন না।'

আলমারির তাকে কাজী গুটিসুটি মেরে অসার হয়ে পড়ে রইলেন।

এবার ব্যস্ত পায়ে দরওয়াজা খুলে সওদাগরের বিবিটি এক গাল হেসে বুড্ডা উজিরকে কামরায় নিয়ে এল। তার কোর্তা পাৎলুন থেকে খুসুব বেরিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। সওদাগরের বিবি তাকে পালঙ্কে বসতে দিল। খানা সাজিয়ে সমাদর করল। সরাবের পেয়ালা ভরে হাতে তুলে দিল। এক ঢোক সরাব গলায় ঢেলেই হাত-বাড়িয়ে লেড়কিটিকে ধরতে গেলেন।

লেড়কিটি মুখে মোহিনী হাসি ফুটিয়ে তুলে সুরুৎ করে সামান্য সরে গিয়ে বল্‌ল—'সন্ধ্যা হতে না হতেই একদম বেহুঁস হয়ে গেলেন উজীর সাহাব! তামাম রাত্রি তো পড়েই রয়েছে। সময় মত দেখা যাবে আমাকে নিয়ে কত লদকালদকি করতে পারেন। আপনার ইয়ের হিম্মৎ!' এবার একটি ফতুয়া ও একটুকরো ন্যাকড়া এনে তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এমন বাহারী ও দামী সাজ পোশাক পরে রাতভর ধস্তাধস্তি করলে এগুলোর হালৎ যা হবে তা পরে ভোরে আর মকানে যেতে পারবেন না, উজির সাহাব। বরং ওসব খুলে এদুটো পরে নিন। সাজপোশাকও বাঁচবে, কাম কাজেরও সুবিধা হবে।'

বৃদ্ধ উজির আর আপত্তি না করে ফতুয়া আর লেংটি পরে বিলকুল বাজারের কুলি সেজে লেড়কিটির সামনে দাঁড়ালেন।

এমন সময় আচমকা সদর-দরওয়াজার কড়া নড়ে উঠল। লেড়কিটি বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! আমার স্বামী! অসময়ে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন। এবার আলমারিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে সে বল্‌ল—'হুজুর, জলদি আলমারির তাকে ঢুকে পড়ুন। নইলে আমার স্বামীর হাতে নাজেহাল হতে হবে।'

উজির মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে নিচের দিক থেকে আলমারির তৃতীয় তাকে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লেন। আলমারির ডালা বন্ধ ক'রে সওদাগরের বিবি এবার দরওয়াজা খুলে সুলতানকে কামরার মধ্যে নিয়ে এলেন।

সুলতান পালঙ্কের ওপর পা তুলে বাদশাহী ঢঙে বসলেন। সওদাগরের বিবি বাদশাহী খানার রেকাবি এনে সুলতানের হাতে তুলে দিল। সুলতান এক হাতে সরাবের পেয়ালা ধরে অন্য হাতে সওদাগরের বিবির হাত চেপে ধরলেন।

সওদাগরের বিবি কায়দা কসরৎ করে সুলতানের খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বল্‌ল—'কী যে করছেন, জাঁহাপনা

নিজেই জানেন না! শেরওয়ানি, কোর্তা ও পাৎলুন পরে এসব কাজ করা যায় নাকি! তাছাড়া রাতভর ধস্তাধস্তি করলে আপনার সাজ-পোশাকের ইজ্জৎ থাকবে? ভোরে সেগুলো পরে পথে বেরোলে প্রজারা আড়ালে আপনাকে নিয়ে মস্করা করবে।' একটি ফতুয়া ও লেংটি পরার জন্য এক চিলতে কাপড়া দিয়ে বলল—'এগুলো পরে নিন। কাম কাজ করতে গিয়ে আরাম পাবেন। ইয়েটিয়ে করতে হলে হাল্কা পোশাকই ভাল।'

সুলতান প্রতিবাদ না করে লেংটি ও ফতুয়া পরে কয়েদখানার আসামী সেজে নিলেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বলা বন্ধ করলেন।

ছয়শ' কুড়িতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটির পরবর্তী অংশ বলতে লাগলেন। জাঁহাপনা, সুলতান উপায়ান্তর না দেখে লেংটি ও ফতুয়া পরে বিলকুল জাহাজের খালাসী সেজে সওদাগরের বিবির সামনে দাঁড়ালেন।

এমন সময় সদর-দরওয়াজার কড়া ঘন ঘন নড়তে লাগল।

কড়া নড়ার শব্দ শুনে সুলতানের কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। তিনি চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ এঁকে সওদাগরের বিবির মুখের দিকে তাকালেন।

সওদাগরের বিবি ব্যস্ততা প্রকাশ ক'রে ব'লে উঠল— 'জাঁহাপনা, আমার স্বামী। তিনি হঠাৎ অসময়ে হাজির হয়ে গেছেন।' সুলতান আতঙ্কিত হয়ে বল্লেন—'সে কী! ধরা পড়লে যে একদম বে-ইজ্জৎ হতে হবে! যা হোক ফন্দি ফিকির কিছু বের কর।'

সওদাগরের বিবি এবার সুলতানের হাত ধরে তাকে আলমারির তাকে ঢুকিয়ে দিতে গিয়ে বল্ল—'এখানে ঢুকে মুখে একদম কুলুপ এঁটে ঘাপটি মেরে বসে থাকুন। টু-শব্দটিও করবেন না।'

সুলতান উপায়ান্তর না দেখে আলমারির তাকে ঢুকে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইলেন। তাকটিতে তালা বন্ধ করে দেয়া হ'ল।

সওদাগরের বিবি দরওয়াজা খুলে দেখল ছুতোর মিস্ত্রি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। তাকে কামরার ভেতরে নিয়ে এল।

ছুতোর মিস্ত্রি কামরায় ঢুকতেই সওদাগরের বিবি মুখ ঝাপ্টা দিয়ে উঠল—'এ কী আলমারি বানানো হয়েছে? সমানপত্র ঢোকানোই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব ঠিক ঠাক করে দিয়ে দাম নিয়ে যাও।'

—'কি যে বলেন মালকিন! সামানপাত্র ঢুকবে না বলছেন কী! আমি তো একজন একদম নাদুসনুদুস আদমি। কোশিস করলে আমিও বিলকুল এক একটি তাকে ঢুকে যেতে পারি।' কথা বলতে বলতে সে ওপরের তাকটি খোলা পেয়ে গুটিসুটি মেরে ওপরের তাকটিতে ঢুকে যায়। ব্যস সওদাগরের বিবি এবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা বন্ধ করে তালা আটকে দিল।

এবার সে কাজীর চিঠিটি নিয়ে সোজা কোতোয়ালের কয়েদখানায় চলে গেল। সেখানে কর্মরত হাবিলদারের হাতে কাজীর চিঠিটি দিল। হাবিলদার তালা খুলে তার নওজোয়ান নাগরটিকে খালাস করে দেয়।

নাগরটিকে নিয়ে সে মকানে ফিরে এল। পরদিন সকালে কামরার দামী দামী বিলকুল সামানপত্র বেচে দিয়ে সে নাগরটিকে নিয়ে অন্য সুলতানের সুলতানিয়তে চলে গেল।

কেবল মাত্র পাঁচ-পাঁচটি আদমিসহ আলমারিটি রয়ে গেল খালি কামরার ভেতরে।

দু'দিন বাদে সওদাগর আরব দুনিয়ার বহুৎ মুলুক ঢুঁড়ে নিজের মকানে ফিরে এল। কামরায় ঢুকে দেখল নয়া একটি আলমারি ছাড়া কামরায় আর কিছুই নেই। সে ভাবল, ডাকাতরা তার সামানপত্র ও বিবিকে নিয়ে ভেগেছে। হঠাৎ আলমারির ভেতর থেকে চাপা গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল। সওদাগর তো ডরে একদম কাপড়ে চোপড়ে করে ফেলার জোগাড়। সে রোয়াকে দাঁড়িয়ে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল। মহল্লার আদমিরা লাঠিসোটা নিয়ে দৌড়ে এল।

সওদাগর বল্ল—'ভাইসব, আমার কামরায় জিন ঢুকেছে আলমারির ভেতর থেকে হরদম গোঙানির আওয়াজ বেরোচ্ছে।

উপস্থিত সবাই কৌতূহলাপন্ন হয়ে আলমারির গায়ে কান ঠেসে ধরল। নিঃসন্দেহ হ'ল, হ্যাঁ। গোঙানির আওয়াজই বটে।

সবাই একমত হয়ে সওদাগরকে পরামর্শ দিল—'ভাইয়া, এক কাম কর, আলমারিতে আগুন ধরিয়ে দাও। জিন পরী বা আফ্রিদি দৈত্য যা-ই হোক না কেন জ্বলে পুড়ে একদম সাফা হয়ে যাবে। যতই ফন্দি ফিকির করুক না কেন বন্ধ আলমারির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। একদম আলুপোড়া হয়ে তার জান খতম হবে।'

উজির ভেতর থেকে মহল্লার আদমিদের বাৎচিৎ শুনতে পেয়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'আমরা জিন-পরী বা আফ্রিদি দৈত্য নই, সবাই আদমির বাচ্চা। কোন ডর নেই তোমাদের। আলমারির ডালা খুলে আমাদের খালাস কর। খোদার কসম, আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মেরো না।'

মহল্লার আদমিরা আলমারি ভেঙে এক-এক ক'রে সুলতান থেকে শুরু করে কোতোয়াল পর্যন্ত সবাইকে উদ্ধার করল। কেউ বুঝল না সুলতানিয়তের এতগুলো গণ্যমান্য ব্যক্তি কি ক'রে আলমারির ভেতরে ঢুকল!

এদিকে সুলতান, উজির, কাজী বা কোতোয়াল—সবাই শরমে এতটুকু হয়ে গেলেন। কেউ কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারলেন না। সবার গা থেকে সাজ-পোশাক পর্যন্ত হাফিস। ব্যাপার দেখে সওদাগরটি পর্যন্ত তাজ্জব বনে গেল। শেষ পর্যন্ত সওদাগর মহল্লার আদমিদের বিদায় ক'রে দিল। সে এবার বাজার থেকে সাজ-পোশাক খরিদ ক'রে এনে সবার শরম ঢাকার বন্দোবস্ত করে দিল।

সুলতান তাঁর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে সওদাগরটিকে দরবারে তলব করলেন। তাকে সহকারী উজিরের পদে নিযুক্ত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

কিস্সাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে বেগম এবার বল্লেন—'জাঁহাপনা, ভোর

হতে এখনও দেরী আছে। এখন বরং আপনাকে 'উদাসী নওজোয়ান আবু হাসানের কিস্‌সা' শোনাচ্ছি।

নয়া কিস্‌সাটির নাম শোনামাত্র দুনিয়াজাদ বেগমের গলা জড়িয়ে ধরে সোল্লাসে ব'লে উঠল—'বহুৎ আচ্ছা! বহিনজী, জলদি শুরু কর। ভোর হয়ে গেলে আর কিস্‌সাটি শুরুই করতে পারবে না।

উদাসী নওজোয়ান আবু হাসানের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, হারুণ অল-রসিদ তখন বাগদাদের খলিফা। তখন বাগদাদ নগরে আবু হাসান নামে এক উদাসীন প্রকৃতির নওজোয়ান বাস করত। তার শাদীর উমর অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। লেকিন শাদী নিকার ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তার তিল মাত্র খেয়াল নেই।

পথের ধারের এক বাঁশের সাঁকোর ওপর কখনও ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে, কখনও বা একা সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। বাগদাদে নতুন এসেছে এরকম কোন আদমিকে দেখলে সে তার কাছে এগিয়ে যায়। করজোড়ে নিবেদন করে—'জী, আজকের রাত্রিটুকু যদি আমার কামরায় মেহমান হয়ে কাটান তবে খুশী হতাম। তার অনুরোধ রক্ষা করতে তেমন কেউ-ই হয়ত উৎসাহী হ'ত না। এক আধজন কি ভেবে রাজী হয়ে যেত। ব্যস, এতেই সে খুশীতে ডগমগ হয়ে যেত।

ভোর হওয়ার পর কিন্তু কোন মেহমানকেই সে আর থাকতে অনুরোধ করা তো দূরের ব্যাপার, মেহমানটি থাকার জন্য উৎসাহী হলে সে সাফ জবাব দিত,—'জী, আমার এখানে আর সুবিধে টুবিধে হবার নয় এবার পথ দেখুন, ধারে কাছে প্রচুর সরাইখানা রয়েছে, বলে কয়ে বন্দোবস্ত করে নিন গিয়ে। আজব ব্যাপার। যাকে আদর যত্ন করে রাতভর রেখে ভোরে বিদায় করে দেয় পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ তার মুখোমুখি পড়ে গেলেও কোন কিছু না বলে স্রেফ মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। এমন ভাব দেখায় কোনদিন তাকে যেন সে দেখেও নি। কোনক্রমেই ধরা দিতে চায় না।

নওজোয়ানটির এরকম আজব আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মহল্লার বহু জ্ঞানী-গুণী আদমি পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

এক সন্ধ্যার কিছু পরে আবু অল-হাসান এক প্রমাদ ঘটিয়ে বসল। সে খলিফা হারুণ-অল-রসিদকে পরদেশী ভেবে তার কামরায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এল।

সুলতানিয়তের প্রজাদের হালৎ দেখার জন্য খলিফা হররোজ উজির জাফর আর দেহরক্ষী মাসরুর'কে নিয়ে বেরোন। সে রাত্রেও একই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আজব নওজোয়ান আবু অল-হাসান-এর মকানে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সেদিন তাঁর গায়ে ছিল পরদেশী সওদাগরের সাজ-পোশাক।

আবু অল-হাসান ভ্রুকুঁচকে খলিফা'কে বল্‌ল—'আপনার সুরৎ ও সাজ-পোশাক দেখে মালুম হচ্ছে, আপনি মশুলের অধিবাসী, সাচ্চা কি?'

—'ভাইয়া, তোমার অনুমান বিলকুল অভ্রান্ত, লেকিন কেন? আমার মুলুকের তাল্লাশ করছ কেন?'

—'জানতে চাইছি, আপনার কোন নিকট আত্মীয় এ-নগরে থাকেন, নাকি সরাইখানায় রাত্রি গুজরান করবেন স্থির করেছেন?'

নওজোয়ানটির এরকম আকস্মিক প্রশ্ন শুনে খলিফা প্রথমে একটু ভড়কে গেলেন, পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলেন তার এরকম প্রশ্ন করার কারণ কি? এমন কোন্ মতলব এর পিছনে থাকতে পারে? নওজোয়ানটি কোন ঠগ-জোচ্চোর নয় তো?

খলিফা বেশ দেরী করেই নওজোয়ানটির প্রশ্নের উত্তর দিলেন—'না, তেমন কোন আত্মীয় স্বজন আমার এখানে নেই যার মকানে রাত্রি গুজরান করতে পারি। তাই কোন এক সরাইখানায় গিয়েই উঠব ভাবছি। লেকিন, এ-ব্যাপারে তোমার উৎসাহের কারণ কি ভাইয়া?'

আবু অল-হাসান হাত কচলে নিতান্ত মিনতির স্বরে এবার বল্‌ল—'যদি মেহেরবানি করে আমার মকানে রাত্রি গুজরান করার তেমন কোন আপত্তি না থাকে তবে আপনাকে সানন্দে আশ্রয় দিতে পারি। আদতে এ-বান্দা আপনার সেবায় নিযুক্ত হতে পারলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবে।'

খলিফার দিল্ থেকে কৌতূহল মুছে যাওয়া তো দূরের ব্যাপার বরং আরও বেশী ক'রে চেপে বসল। তিনি তাকে বল্‌লেন—'এ তো আমার পক্ষে খুশীর ব্যাপারই ভাইয়া। সরাইখানার ময়লা গন্ধার মধ্যে না থেকে তোমার মকানে সসম্মানে মেহমান হয়ে থাকব। চল, কোথায় তোমার মকান, নিয়ে চল।'

আবু অল-হাসান-এর আম্মা তো নিঃসন্দেহ, অন্য দিনের মাফিক সে রাত্রেও কোন না কোন পরদেশী মেহমানকে নিয়ে তার বেটা ফিরবে। তাই খানা কিছু বেশীই পাক ক'রে রেখেছে।

আবু অল-হাসান খলিফা'কে নিজের মকানে নিয়ে গিয়ে বদনা ভরে পানি আর গামছা দিল। সাধ্যমত আচ্ছা খানাপিনা দিয়ে আপ্যায়ন করল।

খানাপিনা সেরে পালঙ্কের ওপর আয়েস করে বসে খলিফা বললেন—'ভাইয়া, তুমি তো বল্‌লে, হর রাত্রে তুমি একজন ক'রে পরদেশী মেহমান নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আস। খানাপিনা দিয়ে আদর

আপ্যায়ন কর। আর তোমার বক্তব্যের সত্যতা তো আমি নিজেই পেয়েছি এবং পাচ্ছি। লেকিন কেন? কেন তুমি নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে এসব কর, বলবে কি?'

—'জী, এর পিছনে কারণ কিছু না কিছু তো জরুর আছে। তবে তার নীতিশিক্ষামূলক কারণ আমার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।' শুনুন তবে বলছি—'আমার আব্বা বাগদাদের এক নামজাদা সওদাগর ছিলেন। বেহেস্তে যাবার সময় তিনি প্রভূত ধন-দৌলত রেখে যান। আমি তার একমাত্র লেড়কা। অতএব মালুমই হচ্ছে, আমার কোন ভাগীদার নেই। ইয়া পেল্লাই মকান, হীরা-জহরৎ আর নগদ দিনার দিরহাম যা আমার আব্বা রেখে গেছেন তা কয়েক পুরুষ ধরে দু'হাতে খরচাপাতি করলে ফুরোবে না। তবে আব্বাজী জীবিত থাকাকালীন ভোগ বিলাস কাকে বলে আমার জানা ছিল না। কঠোর শাসন আর সাধারণ আদমীর মাফিক জিন্দেগী কাটানো ছিল তাঁর কাছ থেকে পাওয়া আমার শিক্ষা।

আব্বা বেহেস্তে গেলে আমি ইয়ার দোস্তদের নিয়ে দু'হাতে দিনার উড়িয়ে দেদার মজা লুঠে জিন্দেগীকে উপভোগ করার জন্য বিলকুল মেতে উঠলাম। এর পরিণতি কি হতে পারে আশাকরি অনুমান করতে পারছেন। আমার ক্ষেত্রেও জরুর এর ব্যতিক্রম হয় নি। অচিরেই আমি একদম নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে গেলাম। তখনই আমি কসম খেলাম, একমাত্র পরদেশী মুসাফির ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিসিমের আদমিকেই আমি মকানে আশ্রয় দেব না।

আরও আছে। আমি এ-ও নিয়ত করলাম, কোন আদমির সঙ্গে, নিজের মুলুকের কেউ বা পরদেশী কারো সঙ্গে আর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলব না। মেলামেশা আচার ব্যবহার বিলকুল থাকবে ওপর ওপর, যে মুসাফিরকে মকানে আশ্রয় দেব তা স্রেফ এক রাত্রির জন্য। ভোর হ'ল কি তার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই থাকবে না।

খলিফা অনুসন্ধিৎসু নজরে হাসান-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাসান ব'লে চল্‌ল—'জী, পরদেশীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার বিপদ আছে। আদৎ বাৎ, ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জিন্দেগীর শান্তি-সুখ বিলকুল বরবাদ করে দেয়। ভবিষ্যতে যদি কোনক্রমে পথ চলতি বা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে হঠাৎ আমার মোলাকাৎ হয়ে যায় তখন আমি আপনাকে চিনি ব'লে জরুর ধরা দেব না।'

খলিফা হেসে বল্‌লেন—'ভাইয়া, তোমার মাফিক আজব, খামখেয়ালি আদমি দুনিয়ায় খুব বেশী আছে বলে আমার মালুম হয় না।'

এবার বল্‌লেন—'শোন, তুমি খামখেয়ালি আজব বা একগুঁয়ে যা-ই হও না কেন তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, দিলে ধরেছে। তুমি তো কিছু হীরা-জহরৎ ইয়ার-দোস্তদের ধরা ছোঁয়া থেকে সরিয়ে রেখেছিলে, ঠিক কিনা?'

—'জী হুজুর।'

—'আশা করি তুমি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লেও সেগুলো জায়গামতই সংরক্ষিত রয়েছে। তুমি একটু আগে তো জানালে কাল ভোর হওয়া মাত্র আমার সঙ্গে তোমার বিলকুল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ব্যাপারটি শোনার পর থেকে আমার দিল্ একদম বিষিয়ে উঠেছে। তবে ব্যাপারটি রাত্রির আন্ধার থাকতে থাকতেই চুকিয়ে নিতে হয়। শোন, আমার বহুৎ ধন-দৌলত আছে। তোমার দিল্ যা চায় আমার কাছে বল। কি চাও, নিঃসঙ্কোচে বল। খোদাতাল্লা আমাকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন, লেকিন এমন কেউ নেই যে, আমার অবর্তমানে সেগুলো ভোগ দখল করবে। তাই আমার ধন-দৌলতের অংশ নিলে তুমি নিজে যতটুকু খুশী হবে তার চেয়ে আমি ঢের খুশী হ'ব তোমাকে হাতে তুলে দিতে পারার জন্য। বল, নিঃসঙ্কোচে বল, কি চাও তুমি?'

খলিফার বাৎ শুনে উদাসী আবু অল-হাসান-এর মধ্যে কোনরকম ভাবান্তর লক্ষিত হ'ল না। সে শান্ত-স্বাভাবিক কণ্ঠেই বল্‌ল—'জী, একরাত্রির জন্য আপনার সাহচর্য পাওয়াতেই আমি ধন্য। খুশী হয়ে আপনি আমাকে কিছু দিতে চাইছেন মালুম হ'ল। লেকিন একাজে আমি বিলকুল অপারগ। আমার ছিঁটেফোঁটা যেটুকু রয়েছে তা নিয়েই আমি খুশীর তাল্লাস করতে চাইছি।'

—'শোন ভাইয়া, আল্লাতাল্লার নামে বলছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। কথা রাখ, কিছু অন্ততঃ চেয়ে নাও। লেকিন, মেহমানকে তো জান কবুল করেও খুশী করতে হয়, হাদিস বলে গেছেন, জরুর জান?'

গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে আবু অল-হাসান মুখ খুল্‌লেন—'দেখুন, মেহমানের খুশীর খাতিরে একটি বস্তুই আমি হাত পেতে নিতে পারি—'

খলিফা অকস্মাৎ তার দিকে ঝুঁকে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—'কি? কি চাইছ? বস্তুটি কি হাসান?'

—'আমি আপনার কাছে তা প্রকাশ করলে আপনি তো আমাকে বিলকুল পাগল ঠাওরাবেন। তবু বলছি, আমার মুশকিল আসান করা একমাত্র স্বয়ং খলিফার পক্ষেই সম্ভব। আপনি যদি কোনক্রমে আমার এ-জীর্ণ কুটীরে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর পায়ের ধূলা ফেলতে পারেন তবে জিন্দেগীভর আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। ভেবে দেখুন, আপনার পক্ষে এ-কাজ কোনদিন সম্ভব হবে কি না।'

—'বহুৎ আচ্ছা। তোমার এখানে তিনি যদি এক রাত্রির জন্য

মেহমান হয়ে আসেন তবে তোমার এমন কি ফয়দা হবে ব'লে মনে কর?'

—'জী, আপনি পরদেশী। বাগদাদ নগরের হালচাল সম্বন্ধে একদমই ওয়াকিবহাল নন। এখানকার বাড়িওয়ালাগুলো যে এক একটি কেমন পাজির পা ঝাড়া তা আপনি ভাবতেই পারবেন না। ঠিক এমনই এক বজ্জাৎ বাড়িওয়ালা আমার বরাতে জুটেছে। জিন্দেগী একদম বরবাদ করে দিল। তার আচার ব্যবহার দেখে আমি মাঝে মধ্যে ভাবি সে জরুর আদমীর বাচ্চা নয়। বিলকুল এক জঙ্গলী, অসভ্য জানোয়ার।

হুজুর, জানোয়ারের বাচ্চাটির দু'দুটো সাকরেদ রয়েছে। তারাও বিলকুল দুটো চীজ। দোজখে যাওয়ার জন্য যা-যা করা দরকার সবই বহুৎ আগেই সেরে রেখেছে ।

হুজুর, আরও আছে। তাদের একজন নোকর। খর্বাকৃতি চেহারা। তার উমর যে কত তা বোধ করি তার নিজেরও ভাল খেয়াল নেই। লেকিন গোঁফ-দাড়ি আজও গজায় নি। কোনদিন গজাবে বলেও মালুম হয় না। তার একমাত্র কাজ কাঁচা-রসিকতা করা। যৌন ব্যাপার স্যাপারের আলোচনাতে তার আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। আমার মাঝে মধ্যে খেয়াল চাপে তার ইয়া বড়া টাকটি ফাটিয়ে চৌচির করে দেই। হুজুর, যদি ভবিষ্যতে মহামান্য খলিফার সঙ্গে আমার মোলাকাৎ নসীবে কোনদিন জোটে তবে তার কাছে ধন-দৌলত চাইব না। বলব, মেহেরবানি করে ওই জানোয়ারের বাচ্চাগুলোর হাত থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। ব্যস, আমার কিছু চাইবার নেই। আপনি বিচার করে উপযুক্ত সাজার মাধ্যমে নচ্ছার দুটোকে বুঝিয়ে দিন, এ নগর জরুর ইতর লম্পটদের জন্য নয়। একমাত্র শেরিফ আদমিরাই এখানে বসবাসের যোগ্য। নইলে আমার মহল্লার শান্তি পুনঃস্থাপন কিছুতেই সম্ভব নয়।'

খলিফা এবার বল্লেন—'তবে তোমার মতে এ ধরনের অবাঞ্ছিত আদমিদের বাগদাদ নগরে বসবাসের কোনই অধিকার নেই, তাই না? তোমার আর্জি বিলকুল সাচ্চা ও সঙ্গত। কারণ, তারা সমাজের কলঙ্ক, সমাজকে কলুষিত করছে।

শোন, তোমার বাসনার ব্যাপারটি যদি খলিফার কানে কোনক্রমে তুলে দেয়া যায় তবে বোধকরি একটিমাত্র রাত্রির জন্য তোমার মেহমান হয়ে আসতে তিনি তিলমাত্রও আপত্তি করবেন না। এরকম অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই তো তিনি রাত্রের নিদ জলাঞ্জলি দিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঢুঁড়ে বেড়ান।'

আবু অল-হাসান অকস্মাৎ মিইয়ে গিয়ে বল্ল—'থাক এসব ব্যাপার স্যাপার যেন সাচমুচ খলিফার কানে তুলে দেবেন না। তিনি শুনলে আমার জায়গা করে দেবেন একদম পাগলা গারদে। দোহাই আপনার, ব্যাপারটি ভুলেও যেন পেট থেকে টেনে বের করবেন না হুজুর।'

—'বহুৎ আচ্ছা। আমি না হয় মুখফুটে কারো কাছে প্রকাশ করব না। লেকিন তিনি যদি নিজে থেকেই হঠাৎ তোমার দোর গোড়ায় হাজির হয়ে পড়েন, তবে কি হবে?'

হাসান পেয়ালায় বোতল থেকে সরাব ঢালার কোশিস করতে লাগল। খলিফা বল্লেন—'আমি তোমার পেয়ালা সরাবে ভরে দিচ্ছি।' এ-সুযোগে তিনি তার সরাবের পেয়ালায় সামান্য আফিং মিশিয়ে দিলেন।

আবু অল-হাসান এক নিঃশ্বাসে সবটুকু সরাব গলায় ঢেলে দিল। ব্যস, আফিং-এর কাজ শুরু হয়ে গেল। সে মেঝেতে ঢলে পড়ল।

খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর বাইরে অপেক্ষা করছিল। খলিফার ইঙ্গিত পেয়ে সে এবার কামরায় এসে আবু অল-হাসান-এর সংজ্ঞাহীন দেহটিকে কাঁধে তুলে তাকে একদম প্রাসাদের অন্দর-মহলে নিয়ে এল। খলিফা তাকে নিজের কামরার পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দিল।

খলিফা এবার তার প্রাসাদের সব দাসী-বাঁদী, চাকর নোকরকে বল্লেন—'ভোরে যখন এ-নওজোয়ান শয্যা ত্যাগ করবে তখন তোমরা তাকে খলিফার মাফিক সম্মান-খাতির প্রদর্শন করবে, ইয়াদ থাকে যেন। যেমন আমাকে কুর্নিশ কর, সম্বোধন ক'রে হুকুম প্রার্থনা কর অবিকল সেরকম আচরণই এর সঙ্গে করবে। অন্যথায় নসীবে কি সাজা জুটবে তা কল্পনাও করতে পারবে না।'

খলিফা এবার উজির জাফর-এর মারফৎ তার দরবারের নাজির, আমির, ওমরাহ প্রভৃতিকে তলব করলেন। সবাই তাঁর সামনে হাজির হলে বল্লেন—'কাল ভোরে তোমরা নওজোয়ান আবু অল-হাসান'কে খলিফার মর্যাদা দিয়ে তখ্‌তে বসাবে। তার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তার মতের বিরোধিতা করার হিম্মৎ তোমাদের তো সামান্য ব্যাপার এমন কি আমারও থাকবে না, ইয়াদ থাকে যেন।'

উজির থেকে শুরু করে আমীর ওমরাহ পর্যন্ত প্রত্যেকে খলিফার মতিগতি দেখে বিলকুল তাজ্জব বনে গেলেও তখনকার মত আবু অল-হাসান-এর হুকুম তামিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ নিজ মাকানে ফিরে গেলেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয়শ' আটাশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, খলিফা হারুণ অল-

রসিদ-এর পারিষদরা নওজোয়ান আবু অল-হাসান'কে খলিফার সম্মান-খাতির প্রদর্শন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

পাখির ডাকে ভোর হ'ল। আবু অল-হাসান তখনও নিদে বেহুঁস। জানালা দিয়ে রোদ এসে তার মুখে পড়ল। তবু তার নিদ টুটল না। এক বাঁদী তুলোয় করে ভিনিগার এনে তার নাকের সামনে ধরল। ব্যস, বার-কয়েক হাঁচি হ'ল। আফিং-এর নেশা গেল টুটে। সে চোখ-মেলে তাকাল। কামরার চারদিকে চোখের মণি দুটো বার বার বুলাতে লাগল। যত দেখছে ততই সে তাজ্জব বনে যাচ্ছে। সে ভাবছে, তবে কি তার নিদ টুটে নি! খোয়াব দেখছে!

বৃদ্ধ উজির জাফর এসে কুর্নিশ করল। তারপর বল্‌ল—'মহামান্য খলিফা, আপনার নামাজের সময় হয়ে আসছে। শয্যা ত্যাগ করে রুজু সেরে নিন।'

হাতের পিঠ দুটো দিয়ে চোখ কচলে আবু অল হাসান নিঃসন্দেহ হবার কোশিস করল, সে জেগে, নাকি নিদের ঘোরে খোয়াব দেখছে?

এক সময় আচমকা চিল্লিয়ে উঠল—'আমি তো জেগেই আছি, দেখছি! লেকিন কোন্ যাদুকর এক রাত্রির মধ্যে আমাকে একদম খলিফা বানিয়ে দিল? কে-ই বা আমাকে প্রাসাদে হাজির করল?'

উজির জাফর ফিন কুর্নিশ করে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, নামাজের সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে। উঠুন, রুজু সেরে নিন।'

উজির-এর বক্তব্য শোনার মত মানসিকতা আবু অল-হাসান-এর তখন নেই। সে গভীর ভাবনায় তলিয়ে রইল, রাত্রে শোবার সময়ও তো এদের কাউকেই সে দেখেনি। নিজের কামরাতেই শুয়ে পড়েছিল। এক মেহমান ছিল তার রাত্রের সঙ্গী হিসাবে। ব্যস, তারপরই সে গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপরের ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে কিছুই তার ইয়াদে আসছে না। এবার খলিফার

দেহরক্ষী মাসরুর তার সামনে এসে কুর্নিশ করামাত্র আবু অল-হাসান তো গোস্‌সায় একদম কাঁই হয়ে গেল। হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢেকে গোস্‌সায় গজরাতে লাগল। একটু বাদে ব্যাপারটি আবু অল-হাসান-এর ভেতরেও হাসির উদ্রেক করল। সে সরবে হেসে ব'লে উঠল—'তাজ্জব ব্যাপার। আমি নাকি খলিফা! খলিফা খলিফা খেলায় সবাই আমাকে নিয়ে মেতেছে। আমাকে সবাই পাগল ঠাওরেছে নাকি?' আচমকা লাফিয়ে সে পালঙ্কের ওপর উঠে বসে পড়ল।

এমন সময় খুবসুরৎ এক বাঁদী কামরায় ঢুকে আবু অল-হাসান'কে কুর্নিশ করল।

আবু অল-হাসান তাকে কাছে আসতে বল্‌ল। সে পালঙ্কের ধারে এগিয়ে এলে ডান হাতের তর্জনিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এতে জোরসে কামড়ে দাও তো। দেখি, আমি কি জেগে, নাকি খোয়াব টোয়াব দেখছি।'

ডরে কাঁপতে কাঁপতে বাঁদীটি কোনরকমে আলতো ক'রে তার তর্জনিটি কামড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ ক'রে উঠল—'আরে, ছাড়! ছাড়! লাগছে, ছাড়!'

এবার আবু অল-হাসান-এর পায়ের কাছে এক নিগ্রো খোজা সোনার জরির কাজ করা এক জোড়া চপ্পল ধরল। সে তাতে পা গলাতে গিয়ে থমকে গেল। মুহূর্তকাল ঝিম্ মেরে থাকার পর চপ্পল জোড়ায় পা গলিয়ে দিল।

নিগ্রো খোজাটির কাঁধে ভর দিয়ে সে এবার হামামে গিয়ে ঢুকল।

হামাম থেকে বেরিয়ে দেখে এক দঙ্গল বাঁদী তার জন্য দরবারের সাজ-পোশাক নিয়ে দাঁড়িয়ে। হাসান রাত্রের কোর্তা-পাৎলুন খুলে দরবারের পোশাক পরে তৈরী হয়ে নিল। সে এবার নিজের শরীরের দিকে এক লহমায় তাকিয়ে নিয়ে স্বগতোক্তি করল—'কে বলে আমি দীন হীন আবু অল-হাসান? আমি তো খলিফা। খলিফা হারুণ অল-রসিদ। আমার উজির-নাজির, প্রাসাদ আর হারেম বিলকুল আমার। বেগম-বাঁদী যত আছে বিলকুল আমারই। আমি খলিফা না হলে আমাকে দরবারে নিয়ে যাবে কেন? কেনই বা তখ্‌তে বসাতে যাবে? আমার হুকুম তামিল কবার জন্য সবাই যেমন এমন ব্যস্ত, ভবিষ্যতেও একই রকম ব্যস্ত থাকবে'।

উজির-নজির ও আমীর-ওমরাহরা এবার হাসান'কে দরবার কক্ষে নিয়ে গিয়ে তখ্‌তে বসিয়ে দিল। উপস্থিত সবাই তাকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করল। হাসান তর্জনির সাহায্যে সবাইকে নিজনিজ আসনে বসতে নির্দেশ দিল।

সেদিন দরবারে কার, কি আর্জি আছে তা একটি ফর্দে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ফর্দটি উজির হাসান-এর দিকে বাড়িয়ে দিল। সেটি হাতে নিয়ে হাসান ফিন উজিরের হাতেই ফিরিয়ে দিল উপস্থিত সবাইকে পাঠ ক'রে শোনাবার জন্য।

উজির গলা ছেড়ে লম্বা ফর্দের ফিরিস্তি পাঠ করতে লাগলেন। এবার আদৎ সমস্যা দেখা দিল। ফর্দে লেখা ফিরিস্তিগুলির মধ্যে কোনটিকে 'হাঁ' বলে সম্মতি দিতে হবে, আর কোন্‌টি কেই বা 'না' বলে বাতিল করে দিতে হবে তা-ই ভেবে সে অস্থির হ'ল। ব্যাপারটি অবশ্য পরে উজিরই সামাল দিয়ে দিল।

এবার হাসান সিপাহীদের প্রধান আহমদ'কে তলব করল। আহমদ এসে কুর্নিশ ক'রে সামনে দাঁড়াল। হাসান এবার তাকে হুকুম করল—'মোস্তাফা-অঞ্চল থেকে রমজান শেখ আর তার দুই সাকরেদকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে আমার সামনে হাজির কর।'

আহমদ ছুটল নকল বাদশাহ হাসান-এর হুকুম তামিল করতে। নগরের পহেলা নম্বরের শয়তান, ধাপ্পাবাজদের সনাক্ত ক'রে দরবারে হাজির করল মহাবীর আহমদ।'

শয়তান বেতমিস রহমান শেখকে রশি দিয়ে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে গরম লোহার শিক তার চোখে ঢুকিয়ে দেয়া হ'ল।

আবু অল হাসান-এর নির্দেশে এবার খাজাঞ্চী আবু অল হাসান-এর মায়ের হাতে এক হাজার দিনারের একটি থলি পৌঁছে দিল।

সেদিনকার মত দরবারের কাজ সাঙ্গ করা হ'ল।

দুপুরে খানাপিনা সারার সময় একদল খুবসুরৎ বাঁদী গানা-বাজনার আয়োজন করল। সু-মধুর গানা শুনতে শুনতে আবু অল হাসান ভাবল—সত্যি তো আমি খলিফা হারুণ অল-রসিদ বনে গেছি। এ-তো আর খোয়াব টোয়াবের ব্যাপার নয়। তখ্‌তে বসে দিব্যি খলিফার কাজ পরিচালনা করলাম। এখন গানা-বাজনার মাধ্যমে আমাকে খুশী করার জন্য বাঁদীরা মেতে উঠেছে। একটু আগে তিন-তিনটি শয়তানকে প্রাণদণ্ড দিয়েছি। কেউ-ই আপত্তি করেনি খলিফার হুকুমের ওপর।

হাসান হরেক কিসিমের বাদশাহী খানাসহযোগে খানাপিনা সারল। খুসবুওয়ালা গুলাবী সরাব পান করল একের পর এক পেয়ালা।

একদল বাদী এবার হাসান'কে তার কক্ষে নিয়ে গেল। বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক সাজিয়ে দিল। মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রাম। তারা খোঁজা নফরটিকে তার পরিচর্যায় রেখে বিদায় নিল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসায় বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয়শ' পঁয়ত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় ভাগে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, খোজা নোকর আবু অল হাসান-এর কামরার দরওয়াজায় ঠায় বসে রইল।

সামান্য দিবানিদ্রা সেরেই হাসান পালঙ্কের ওপর উঠে বসল।

তার জাগরণের সংবাদ পেয়ে একদল খুবসুরৎ বাঁদী কামরায় প্রবেশ করল। তাদের কারো হাতে সরাবের বোতল আর কারো হাতে সোনার পেয়ালা। তারা পেয়ালা ভরে ভরে সরাব তার হাতে তুলে দিতে লাগল। হাসান খুসবুওয়ালা গুলাবী সরাব পান করে পরমতৃপ্তি লাভ করল। ইতিমধ্যে একটি পেয়ালায় সরাবের সঙ্গে সামান্য আফিং মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। এবার আফিং-এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। হাসান-এর শরীর টলতে শুরু করেছে। তার শরীর টলছে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। সে পালঙ্কে শরীর এলিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর নির্দেশে একদল খোজা নোকর হাসান-এর গা থেকে খলিফার সাজ-পোশাক খুলে তার আগেকার সাজ-পোশাকগুলি পরিয়ে দিল। এবার খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর সরাব ও আফিং-এর নেশায় সংজ্ঞাহীন আবু অল-হাসান'কে তার

চাঁদনী বাজারের মকানে চৌকির ওপর শুইয়ে দিয়ে আসা হ'ল।

ভোর হ'ল। একটু বেশী বেলাতেই হাসান-এর নিদ টুটল। সে চৌকির ওপর শুয়ে, চোখ দুটো আধ-বোজা রেখেই হাঁক দিল —'দাসী-বাঁদীরা সব গেলে কোথায়। এদিকে এসো সবাই।'

হাসান-এর হুকুম তামিল করতে কেউ-ই ছুটে এল না। হাসান চোখ মেলে তাকাল। ভ্রূ কোঁচকালো, দেখল সে তার নিজের কামরায় চৌকির ওপর শুয়ে। ব্যাপারটি তার কাছে কেমন অবিশ্বাস্য মালুম হ'ল। মাথাটিকে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিল। কেমন যেন ভারী ভারী ঠেকল। গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে ডাকল—'জাফর জাফর।'

না, কেউ-ই তার কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কুর্নিশ জানাল না। সে বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। তার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে একটু বাদে উজির জাফর-এর পরিবর্তে ছুটে এল তার বুড়ি আম্মা।

বুড়ি বল্‌ল—'বেটা, এখনও তুমি খোয়াব টোয়াব দেখছ, নাকি জেগে আছ?'

হাসান তার আম্মাকে যেন চিনতেই পারে নি এমন ভাব ক'রে বল্‌ল—'বুড়ি কাঁহিকার। মস্করা করার আর জায়গা পাওনি! আমি হলাম গিয়ে, খলিফা হারুণ অল-রসিদ। আব্বাস-এর পঞ্চম পুরুষ আমি। আর আমাকেই কিনা বলছ, খোয়াব দেখছি!'

বুড়ি আকুল হয়ে কেঁদে ব'লে উঠল—'হাসান, ভাল ক'রে চেয়ে দ্যাখ হাসান—আমি তোর আম্মা, তোর গর্ভধারিণী। তুই আমার একমাত্র লেড়কা।'

—'ওসব বুজরুকি ছাড়। তুমি হলেই বা আমার আম্মা, আমি তো স্বয়ং খলিফা। বাগদাদের খলিফা, সবাই যেমন কুর্নিশ করে আমাকে সম্মান খাতির দেখায় তোমাকেও ঠিক সেভাবে সমীহ করে আমার সঙ্গে বাৎচিৎ করতে হবে। খলিফার মসনদকে অপমান করা কারো পক্ষে এমন কি আম্মার পক্ষেও সম্ভব নয়। কেন, কাল আমার হিম্মতের প্রমাণ পাও নি? খাজাঞ্চি এক হাজার দিনারের একটি থলি তোমার হাতে পৌঁছে দিয়ে যায় নি?'

আবু অল-হাসান-এর আম্মা ঘাড় কাৎ ক'রে বল্‌ল—'হ্যাঁ বেটা, তা দিয়ে গিয়েছিল বটে।'

—'তবেই দেখ, খলিফার হিম্মৎ কেমন আশমান ছোঁয়া! আমার ডরে উজির থেকে শুরু করে আমীর-ওমরাহ পর্যন্ত সবাই থরথরিয়ে কাঁপে আর তুমি তো কোন ছার!'

হাসান-এর আম্মা এবার নিঃসন্দেহ হ'ল, বেটার দিমাক বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে। সে বিলাপ পেড়ে কান্না জুড়ে দিল।

হাসান কড়া সুরে ধমক দিয়ে উঠল।

হাসান-এর আম্মা চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'সে রাত্রে ব্যাপার দেখে আমার মালুম হচ্ছিল, নির্ঘাৎ কিছু একটি অঘটন ঘটতে চলেছে। নইলে এত রাত্রি পর্যন্ত কিসের ফুসুর ফাসুর হচ্ছিল? ওই বুড্ডা পরদেশী সওদাগরটিই তোর সর্বনাশ করেছে।'

হাসান এবার অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে কামরাটির চারদিকে তাকাতে লাগল। তার মুখে কেমন এক হাসির আভা দেখা দিল। সে এবার চিল্লিয়ে ব'লে উঠল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-ই তো আমার সে-কামরা! এখানেই তো আমি বাস করতাম। এর বিলকুল সামানপত্রই তো আমার চেনা, নিজের হাতে খরিদ করা।'

তার আম্মা কিছুটা অন্ততঃ স্বস্তি পেল, তবে লেড়কার দিমাক টিমাক খারাপ হয়নি।

তার আম্মা স্বস্তি ফিরে পেয়ে সরাইখানার দিকে পা বাড়াতেই আবু অল-হাসান গলাফাটানো চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল। শয়তানী কাঁহিকার। আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তবে কামরা ছেড়ে যাবি। বল, আমাকে প্রাসাদ থেকে কে এখানে রেখে গেছে? আমার প্রাসাদ, আমার মসনদ, আমার হারেম, আমার দরবার আমার নফর-বাঁদী বিলকুল গেল কোথায়? সেগুলো থেকে কে বঞ্চিত করেছে, না বাতালে আমি তোকে একদম খুন ক'রে ফেলব। গর্দান নেব। জলদি বল, কে ষড়যন্ত্র করে আমার বিলকুল ধন দৌলত সরিয়ে নিয়েছে, তর্জন গর্জন করতে করতে সে চৌকি থেকে এক ঝটকায় নেমে এল। আম্মার চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টানে তাকে মেঝের ওপর ফেলে দিল। তার বুড্ডি আম্মা বিলাপ ফেলে কেঁদে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিছু সময় বাদে বুড্ডি ক'টি সব্জি দিয়ে নাস্তা সাজিয়ে লেড়কার কামরায় ফিরে এল।

আম্মার হাত থেকে নাস্তার থালা নিয়ে হাসান রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। তার বুড্ডি আম্মার মুখে ফিন হাসির ঝিলিক দেখা দিল। সে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল—'বেটা, কাল খলিফার সিপাহীরা এসে এক বহুৎ বড়িয়া কাজ করে গেছে। তাদের সঙ্গে হাবিলদার আহমদও ছিল। তারা শয়তান বেতমিস জুলুমবাজ শেখটিকে রশি দিয়ে বেঁধে আচ্ছা ক'রে চাবুক মারতে মারতে মহল্লা ঘুরিয়ে কয়েদখানায় নিয়ে গেছে। তার দুই সাকরেদকেও কোমরে রশি বেঁধে কয়েদখানায় আটক করেছে।' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বল্‌ল—' তারপর। লোচ্চার শেখটিকে কয়েদখানায় নিয়ে লোহার শিক টকটকে লাল করে তার চোখে-মুখে ঢুকিয়ে দেয়। ব্যস, শয়তানটি একদম খতম হয়ে গেছে। তারপর তার লাশটিকে ময়লা-গন্ধা পানি ভরা নালার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। মহল্লার আদমিরা এবার স্বস্তিতে দিন গুজরান করতে পারবে।'

হাসান ইতিমধ্যে নিজের মেজাজ মর্জি অনেকাংশে সামলে নিয়েছে। লেকিন আম্মার মুখে নচ্ছার শেখটির মৌউতের ব্যাপার শোনার পর তার মধ্যে ফিন খলিফার মেজাজ মর্জি ফিরে এল। সে চিল্লিয়ে আম্মাকে বলতে লাগল—'মহল্লার আদমিদের শান্তি-স্বস্তি এনে দিয়েছে কে, বলতে পারিস? আমি। আমার হুকুমেই হাবিলদার সৈন্যদের নিয়ে এসে বেতমিস, হারামি আর লুঠেরা শেখ'কে খতম করেছে। জানিস আমার পূর্বপুরুষ আব্বাস। তিনি পয়গম্বর মহম্মদের চাচা। ইয়াদ রাখবি, আমি যে-সে আদমি নই। আর তুই কিনা আমার বক্তব্য একদম উড়িয়ে দিচ্ছিস। জানিস, আমি হুকুম করতে না করতেই তোর গর্দানটি ধূলোয় গড়িয়ে পড়বে?'

এবার হাসান উন্মাদের মাফিক তর্জন-গর্জন করতে করতে এক লাফে ঘরের কোণায় চলে গেল। হেঁচকা টানে দেয়ালে ঝুলানো ছুরিটি হাতে নিয়ে তার আম্মার দিকে ধেয়ে গেল। চিল্লিয়ে বল্‌ল—'শয়তানী কাঁহিকার। জল্লাদের হাতে নয়, আমার হাতেই তোর জান খতম হবে। আমিই তোর মৌউৎ হয়ে বেহেস্তে পাঠিয়ে ছাড়ব।'

হাসান-এর আম্মা বিকটস্বর ক'রে চিল্লাতে চিল্লাতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার চিল্লা-চিল্লি শুনে মহল্লার আদমিরা ছুটোছুটি ক'রে এল। তারা হাসান'কে জাপ্টে ধরে তার হাতের ছুরিটি ছিনিয়ে নিল। তাদের দু'একজন তাকে শাসাতে লাগল—'বেশরম, বেতমিস কাঁহিকার। আম্মার গায়ে হাত তুলছিস তোর শরম লাগে না। তোর বিচার হবে। খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তোকে মহল্লা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

আবু অল-হাসান এবার কোমরে হাত দিয়ে তড়পাতে লাগল—'তোরা আমার বিচার করবি। তোদের হিম্মৎ তো কমতি নয় দেখছি বেকুব কাঁহিকার। জানিস আমি কে? আমার হিম্মৎ কত, জানিস কি?'

—'জানি। জরুর জানি। তুই তো পাগলা হাসান। তোর দিমাক এখন বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে।'

—'আমার দিমাক খারাপ হয়ে গেছে? আমি খলিফা হারুণ অল-রসিদ। আর তোরা বলিস কিনা আমার দিমাক খারাপ! আমি তোদের এক এক করে শূলে চড়াব। না, না—শূলে নয় গর্দান নেব। তোদের সবার গর্দান নিয়ে ছাড়ব।'

হাসান-এর দিমাক একদম খারাপ হয়ে গেছে ভেবে মহল্লার আদমিরা আর ঝুটমুট কথা বাড়াল না। তারা তার আম্মাকে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল—'কবে থেকে এর হালৎ এরকম হয়েছে? দিমাক খারাপের ব্যাপারটি প্রথম কবে ধরা পড়েছে?'

তার আম্মা চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'লেড়কা আমার একদম আচ্ছাই তো ছিল। গত পরশু রাত্রে এক পরদেশী মুসাফির নিয়ে এল। রোজই এরকম একজন করে মুসাফির নিয়ে আসে। খানাপিনা করায়। রাতভর রাখে। ভোর হলেই বিদায় করে দেয়। পরশু সে-মুসাফির এল, সে কখন ফিরে গেছে মালুম নেই। ভোরে দেখলাম, তার কামরার দরওয়াজা খোলা। মুসাফির হাফিস। আমার বেটা হাসানও কামরায় নেই। কাল রাত্রে সে যে কখন তার কামরায় ফিরে এসেছে তা-ও আমার মালুম নেই। ভোর থেকেই দেখি পাগলের মাফিক বাৎচিৎ বলছে আর নটঘট কাম কাজ করছে। ব্যস, তারপরই তো আপনারা ছুটে এলেন। চোখের সামনে তার কারবার দেখলেন।'

মহল্লার আদমিরা তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বলল—'ঝুটমুট চোখের পানি ঝরিয়ে তো কোনই ফয়দা হবার নয়। এ তো বিলকুল নসীবের ব্যাপার। নসীব তোমার বেইমানি করছে, কি করবে, বল?'

মহল্লারই দু'-চার হিতাকাঙ্ক্ষী বল্‌ল—'শোন, বিপদের সময় বুকচাপড়ে কাঁদলে, চোখের পানি ঝরালে তো আর তোমার লেড়কার দিমাক ঠিক হয়ে যাবে না। বিমারি হয়েছে, হেকিম ডাকতে হবে। হেকিম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দাওয়াই দেবেন। বিমারি সেরে যাবে। এখন বিমারির ইলাজ করা দরকার।'

চোখের পানি মুছতে মুছতে হাসান-এর আম্মা বল্‌ল—'আমি আর কি বলব, বল তো? আমি বুড্ডি হয়েছি। দিমাক ঠিক কাজ করছে না। তোমরাই যা হোক ফিকির কর।'

মহল্লার আদমিরা হাসান-এর পায়ে শিকল বেঁধে জানোয়ারের মাফিক টেনে হিঁচড়ে তাকে পাগলা গারদে হাজির করল।

বুড্ডা হেকিম জুল্ জুল করে কিছু সময় তার দিকে চেয়ে থেকে এক সময় বল্‌ল—'বেটা, কি ব্যাপার! আম্মার গায়ে হাত তুলেছিলি কেন?' মুহূর্তকাল বাদে ফিন চিল্লিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'মুখে কলুপ এঁটে রাখলে ফয়দা কিছু হবে না। বল আম্মার গায়ে হাত তুলেছিলি কেন?' প্রশ্ন শেষ করে সে দুম্ দুম্ ক'রে ঘা কতক পিঠে চাপিয়ে দিল। হাসান মেঝেতে পড়ে একদম জানোয়ারের মাফিক গোঙাতে লাগল।

হেকিমের হুকুমে দু'-তিন আদমি তাকে টেনে হিঁচড়ে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিল।

কয়েক ঘণ্টা বাদে হেকিম ফিন ইলাজ শুরু করল। দাওয়াই একই দামাদম পিট্টি।

হেকিম পিটানির পরিমাণ দিন দিনই বাড়াতে লাগল। বেদম পিট্টি বরদাস্ত করতে না পেরে এক রোজ হাসান বিলকুল সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌ল। তিন রোজ সে বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল।

চার রোজের মাথায় তার হুঁস ফিরে এল। দুই গাট্টা গোট্টা প্রহরী এসে বল্‌ল—'চল্, তোর আম্মা এসেছে তোকে দেখতে।'

লেড়কার সুরৎ দেখে তার আম্মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হাসান চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'আম্মা, কসুর আমারই হয়েছিল। খোয়াবকেই আমি সাচ্চা ভেবে বিলকুল বরবাদ করে দিয়েছি। আর তারই ফলে আমার দিমাক গড়বড় হয়ে যায়। তোমার ওপর হাত উঠাতেও দ্বিধা করিনি। এখন আমার দিমাক বিলকুল ঠিক হয়ে গেছে। আমাকে হেকিমের হাত থেকে ছাড়িয়ে মকানে নিয়ে চল।

হাসান-এর আম্মা বুঝল, লেড়কার দিমাক সাচমুচ ঠিক হয়ে গেছে। হেকিমের কাছ থেকে ছাড়িয়ে লেড়কাকে নিয়ে মকানে ফিরে গেল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয়শ' একচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আবু অল-হাসান তার নিজের কামরায় বসে তার আম্মার সঙ্গে বাৎচিৎ করছে। হাসান বল্‌ল—'আম্মা, খোয়াবকেই আমি আদৎ ব্যাপার জ্ঞান করে তোমার ওপর অবিচার করেছিলাম। যখন আমার হুঁশ ফিরল তখন শরমে আমার মাথা কাটা যাবার জোগাড় হ'ল। আমার কাঁধে শয়তান চেপেছিল।'

তার আম্মা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'বেটা খোদাতাল্লার দোয়ায় হেকিম আমাদের তেমন ক্ষতি করতে পারে নি।'

হেকিম হাসান-এর ইলাজের নামে যে বেধড়ক পিটুনির বন্দোবস্ত করেছিল তাতে তার গায়ে কয়েক জায়গায় কেটে গিয়ে ঘা হয়ে যায়। তার আম্মা সে-ক্ষতস্থানগুলি গরম পানি দিয়ে ধুইয়ে পাতার রস লাগিয়ে দিল। অল্পদিনের মধ্যেই তা শুকিয়ে গেল।

একমাস বাদে হাসান ফিন পরদেশী মুসাফিরের তল্লাশ করতে গিয়ে সে-সাঁকোটির ওপরে গিয়ে বসল। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল। ক্রমে নেমে এল রাত্রি। অন্ধকারে চারদিক বিলকুল চাপা পড়ে গেল। না, কোন মুসাফিরের সঙ্গেই মোলাকাৎ হ'ল না। হতাশ হয়ে

সে যখন উঠে আসার ধান্দা করছে তখন আচমকা এক পরদেশীর দেখা পেয়ে গেল। সেই মশুলের সওদাগর। শয়তানটির মুখোমুখি হওয়ার একদম ইচ্ছা তার নেই। এরই জন্য তাকে এত হুজ্জতি পোহাতে হয়েছে। জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল।

হাসান শয়তানটিকে এড়িয়ে যেতে চাইলে কি হবে, মশুলের সওদাগরটি কিন্তু তাকে দেখেই চিনতে পারে। দাঁত বের ক'রে হাসতে হাসতে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। মুশাফিরের ছদ্মবেশী খলিফা হারুণ অল-রসিদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। তিনি মুখ খুল্‌লেন—'হাসান ভাইয়া যে! কি খবর? আছ কেমন?' প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়েই খলিফা তার কাঁধে হাত রাখলেন।

হাসান চরমতম বিতৃষ্ণায় কাঁধের ওপর থেকে তাঁর হাতটি সরিয়ে দিল।

এ কী রকম ব্যাপার হাসান ভাইয়া! আজব ব্যাপার তো। এই মাত্র ক'দিন আগেই তো আমায় মকানে নিয়ে গিয়ে কতই না খাতির যত্ন করলে। আর আজ কিনা তাকেই বরদাস্ত করতে পারছ না!'

—'আপনার নাড়িনক্ষত্র চিনি বলেই তো আজ আর আপনার আদর-সোহাগ বরদাস্ত করতে পারছিনা। মেহেরবানি করে ভাগুন তো এখান থেকে।'

—'না, ভাগব তো না-ই, বরং তোমার মকানে আজ রাত্রির জন্য মেহমান হ'ব। তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী আলোচনা করার রয়েছে, তাই তো আজ জরুর তোমার পিছু নেব।'

—'জরুরী আলোচনা? লেকিন আপনার আলোচনার দরকার থাকলেও আমার কোনই দরকার নেই। ভাগুন আমার সামনে থেকে।'

—'তুমি না চাইলেও আমি তোমার মকানে যাবই যাব। তুমি সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে আমি একেলাই যাব। একে জুলুম জ্ঞান করতে পার। তবে আমি বলব এটি পেয়ার মহব্বতের জুলুম।'

—'পেয়ার মহব্বৎ! নক্কড়বাজী করার আর জায়গা পান নি?' পিঠের দাগগুলো দেখিয়ে হাসান এবার বল্‌ল— 'আপনার পেয়ার মহব্বতের নমুনা দেখুন। আপনিই আমার ঘাড়ে সেদিন শয়তানকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যস, তারপরই আমার দিমাক বিলকুল খারাপ হয়ে গেল। আম্মা পাঠালেন হেকিমের কাছে। হেকিম ইলাজের নামে রোজ দু'-চার বার পিটিয়ে হাড্ডি গুঁড়া করে দিতে লাগলেন। তখনই হেকিম সাহাব মেহেরবানি ক'রে ষাঁড়ের চামড়ার চাবুক দিয়ে আমার পিঠে আপনার পেয়ার-মহব্বতের এ চিহ্নগুলি এঁকে দিলেন। ইয়া খোদা। আপনি ফিন আমাকে সে পাগলা গারদে ঢোকাবার ফিকির করছেন। আপনার ঠ্যাং পাকাড়াচ্ছি, আমি আপনাকে আজ আর মেহমান ক'রে আমার মকানে নিয়ে যেতে রাজী নই।'

খলিফা সচকিত হয়ে হাসান'কে বুকে জড়িয়ে ধরে ব'লে উঠলেন—'খোদা মেহেরবান! একী আজব বাৎ শোনালে হাসান! আমার জন্য তোমার এ-দশা হয়েছে! তোমার দশা দেখে আমার কলিজা ফেঁটে যাচ্ছে। আমার জন্য তোমাকে যতই তকলিফ ভোগ করতে হোক না কেন, আর মাত্র একটি বার আমাকে তোমার মকানে নিয়ে চল। আমি কসম খাচ্ছি, তোমাকে যে তকলিফ আমি দিয়েছি তার কিছু ক্ষতিপূরণের অন্ততঃ বন্দোবস্ত করার সুযোগ আমাকে দাও হাসান।'

—'ছ্যাঃ! ক্ষতিপূরণ করবেন? আমার যে-ক্ষতি আপনি করেছেন কোন মতেই তা পূরণ হবার নয়। আমার তা দরকারও নেই। আপনি আমার সামনে থেকে কেটে পড়লেই আমি সবচেয়ে খুশী হ'ব।'

—'তবু আমি বলছি, কেবলমাত্র আজকের রাত্রিটুকু তোমার মকানে কাটাবার সুযোগ দাও। ভবিষ্যতে তোমাকে আর জ্বালাতে আসব না। তোমার খুটিনাটি আমাকে শুনতেই হবে। আর সাধ্যমত তোমার জন্য কিছু করার কোশিস করব।'

হাসান আর কিছুই বল্‌ল না। গোস্‌সায় গস্‌গস্ করতে করতে হাঁটা জুড়ল। খলিফা হারুণ-অল-রসিদ নীরবে তাকে অনুসরণ ক'রে চল্‌লেন।

আবু অল-হাসান খলিফাকে নিজের কামরায় নিয়ে গিয়ে বসাল। খানাপিনা দিল। খানা খেতে খেতে খলিফা তার কাহিনী শুনতে লাগলেন।

হাসান-এর মুখ থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর খলিফা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন— 'স্বীকার করে নিচ্ছি, বিলকুল আমার কসুরের জন্যই এত কাণ্ড ঘটে গেছে। কিভাবে এর খেসারত দেয়া যেতে পারে সে ভাবনাই এখন আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে হাসান ভাইয়া।'

— 'যা ঘটার তা-তো ঘটেই গেছে। ঝুটমুট ভাবনা চিন্তা করে ফয়দা কিছুই হবে না। ওসব ব্যাপার ছাড়ান দিন।'

—'হাসান, সাচ্চা বলবে— খোয়াবের মধ্যে তুমি সেদিন যেসব বাঁদীকে দেখেছিলে তাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তোমার কাছে খুব-সুরৎ— বিলকুল মনমৌজি ব'লে বোধ হয়েছে, বল তো?'

—'খুব সুরৎ? একদম মনমৌজি? চুমকী। চুমকীর সুরৎ-ই আমার দিলে দাগা দিয়েছে। আমার এত উমর হ'ল লেকিন শাদী-নিকা করিনি কেন, বলতে পারেন? আদতে এতদিন শাদী করার যোগ্যা কোন লেড়কিই আমার নজরে পড়েনি। লেকিন চুমকী আমার দিল্ কেড়ে নিয়েছে, কলিজায় একদম জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তাকে শাদী ক'রে সংসার পাতবো সাধ ছিল। লেকিন খোয়াবের হুরী তো খোয়াব টুটার সঙ্গে সঙ্গেই হাফিস হয়ে যায়।' হাসান সরাবের পেয়ালাটি ঠোঁটে তুলে নিল। সরাবের নেশা ক্রমে তাকে গ্রাস করতে

লাগল।

খলিফা ভাবলেন—এ-ই মোওকা। তিনি তার সরাবের পেয়ালায় ছোট্ট একটি আফিঙের গুলি ছেড়ে দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আফিঙের কাজ শুরু হয়ে গেল। হাসান ক্রমে নেশায় বেঁহুশ হয়ে চৌকিতে এলিয়ে পড়ল।

খলিফার নফররা দরওয়াজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। তারা খলিফার নির্দেশে সংজ্ঞাহীন হাসানকে কাঁধে তুলে নিয়ে একদম প্রাসাদে হাজির হ'ল। খলিফার কামরায় পালঙ্কের ওপর তাকে শুইয়ে দিল।

আগের দিনের মত হাসান-এর গা থেকে কোর্তা-পাৎলুন প্রভৃতি খুলে ঝলমলে বাদশাহী সাজ পোশাক পরিয়ে দেয়া হ'ল।

খলিফার তলব পেয়ে বৃদ্ধ উজির জাফর ছুটে এলেন। খলিফা তাকে বল্লেন— 'দরবারের আমির-ওমরাহদের জানিয়ে দাও কাল ভোরে সবাই যেন হাসান-এর সঙ্গে খলিফা জ্ঞানে আচরণ করে। আর প্রাসাদের নফর-বাঁদী, দাস-দাসী যত আছে তাদের প্রতিও একই আদেশ রইল, সবাইকে জানিয়ে দাও।'

ভোর হতে না হতেই হাসান-এর কামরায় একদল বাঁদী হাজির হ'ল। সবার সামনে রইল খুবসুরৎ বাঁদী চুমকী।

হাসান চোখ মেলে তাকিয়েই চুমকী'কে দেখতে পেল। সে দু'হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ডলে দৃষ্টি স্বচ্ছ করে নেয়ার কোশিস করল। চোখ মেলে এবারও হাস্যময়ী খুবসুরৎ চুমকীকেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ভাবল, তবে কি আবারও খোয়াবের ব্যাপার স্যাপার শুরু হ'ল। সে আতঙ্কে চিল্লিয়ে উঠল। হাসান-এর মধ্যে গতবারের সে দৃশ্য তসবিরের মাফিক ফুটে উঠল। সে ফিন চিল্লিয়ে উঠল—'না, নক্কড়বাজি আর নয়। আমাকে ছেড়ে দাও—মুক্তি দাও! শয়তান নক্কড়বাজ মশুলের সওদাগর ফিন আমাকে চক্করের মধ্যে ফেলেছে! এত ঝামেলা ঝকমারিতেও আমার উচিত শিক্ষা হয়নি! ধান্দাবাজটির ফাঁদে ফিন মাথা গলিয়ে দিলাম! তার এমন কি পাকা ধানে মই দিয়েছি। যে আমার পিছনে সে কুত্তার এঁটুলির মাফিক লেগে রয়েছে! মালুম হচ্ছে, আমার জান বিলকুল খতম না করে সে পিছন ছাড়বে না।'

সে ফিন চোখ বন্ধ করল। যতক্ষণ নিদের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে থাকে ততক্ষণই সে ভাল থাকে।

খলিফা আড়াল থেকে হাসান-এর কাণ্ড কারখানার ওপর নজর রাখতে লাগলেন।

হাসান ঘুমের বাহানা ক'রে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলেও স্বস্তি নেই।

চুমকী তার শিয়রে বসে মধুঝরা কণ্ঠে ডাকল— 'জাঁহাপনা, অনেকক্ষণ ভোর হয়েছে। উঠুন, রুজু ক'রে নামাজ সেরে নিন।'

— 'ভাগ! আমার সামনে থেকে ভাগ। খোদাতাল্লা তোদের সাজা দেবেন। বিচার করবেন আমার সঙ্গে নক্কড়বাজি করার সাজা তোদের পেতেই হবে, ইয়াদ রাখবি।'

চুমকী হেসে বলে—'জাঁহাপনা, কেন ঝুটমুট আমার ওপর গোসসা করছেন? ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন, আমি চুমকী। আপনারই চুমকী আমি। উঠুন, নামাজ সেরে নাস্তা করবেন, চলুন জাঁহাপনা।'

—'জাঁহাপনা! কে তোর জাঁহাপনা শয়তানী? আমি কারো জাঁহাপনা টাহাপনা নই। আমি হাসান, আবু অল-হাসান।' এবার সে বিলকুল উন্মাদের মাফিক তার গায়ের রত্নালঙ্কারাদি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিল।
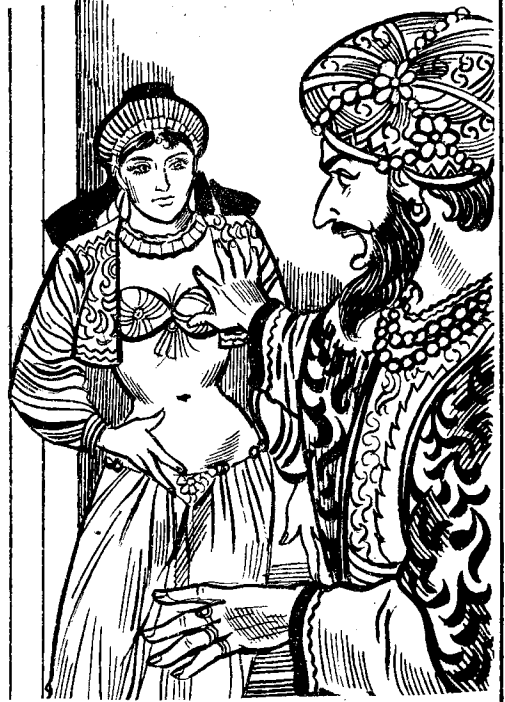
হাসান-এর ব্যাপার দেখে খলিফা আর আড়ালে থাকতে পারলেন না। তিনি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে হাসান এর কামরায় এলেন। হাসান'কে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন— 'হাসান, তুমি আমার ওপর গোস্সা করেছ তাই না? বল, আমার প্রতি তুমি কোন্ শাস্তি বরাদ্দ করছ? তুমি যে-শাস্তি দেবে আমি তা-ই মুখ বুজে মাথা পেতে নেব।'

হাসান গোস্সায় একদম ফেঁটে পড়ার জোগাড় হ'ল। গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠল—'এবার মালুম হ'ল, এসব তোমারই

নক্কড়বাজি? তুমিই আমাকে বদ্ধ পাগল বানাবার জন্য এমন ক'রে উঠে পড়ে লেগেছ, ঠিক কিনা?'

—'আবু অল-হাসান ভাইয়া, আল্লাহ-র নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমাকে আমি আমার ভাইয়ার সমান জ্ঞান করি। আমি তোমার বিলকুল কামনা-বাসনা পূরণ করব। আমি খেয়ালের বশীভূত হয়ে তোমাকে বহুৎ তকলিফ দিয়েছি বটে। আমি তার জন্য দুঃখিত। আজ থেকে তুমি আমার আত্মজনদের একজন হয়ে গেলে। বুকে ঠাই দিলাম তোমাকে।'

হাসান খলিফার দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টি মেলে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

খলিফা আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বল্‌লেন—'হাসান, এসব আমার নেহাৎই মুখের বাৎ নয়। আমি অন্তর থেকে বলছি, আজ থেকে তুমি যে কোনদিন, যেকোন সময় আমার প্রাসাদের যে কোন কামরায় এমন কি হারেমের যেকোন বাঁদীর কামরায় যেতে পারবে। আমার খাস বেগম জুবেদার কামরায় কারোরই প্রবেশাধিকার নেই। লেকিন যেকোন সময় তার কামরায় পর্যন্ত তুমি যেতে পারবে।'

হাসান সে রোজই তার আম্মার কাছে ছুটে গিয়ে যা-যা ঘটেছে হুবহু সব বর্ণনা করল। বল্‌ল—'মশুলের সওদাগরের ছদ্মবেশী আদমিটিই আসলে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ। তিনি আমাকে আফিঙের নেশায় মসগুল ক'রে প্রাসাদে নিয়ে হাজির করেছিলেন। আজ থেকে আমি প্রাসাদেই বসবাস করব। তবে হ্যাঁ, রোজ একবার ক'রে এসে তোমাকে দেখে যাব।'

হাসান তার আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খলিফার প্রাসাদে ফিরে এল।

খলিফা হাসান'কে যে তার জিগরী দোস্ত হিসাবে গণ্য করছেন তা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে তার তামাম সুলতানিয়াতে চাউর হয়ে গেল।

খলিফা তার জন্য খুবসুরৎ একটি ইমারৎ গড়ে দিলেন। আর হাসান জীবন-সঙ্গিনীরূপে পেল তার মনপছন্দ বাঁদী চুমকী'কে। কাজীকে তলব করা হ'ল। কাজী প্রাসাদে হাজির হয়ে হাসান আর চুমকী-র শাদীনামা তৈরী করলেন। সাক্ষীরা শাদীনামায় স্বাক্ষর করল। মহা ধুমধামের মধ্য দিয়ে তাদের শাদীর পর্ব মিটে গেল।

হাসান ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় খুশীর আসর বসায়। বাদশাহী খানাপিনা চলে। খুসবুওয়ালা গুলাবী সরাব পেয়ালা পেয়ালা চলতে যাকে। এমনি ক'রে দু'হাতে অর্থ ব্যয় ক'রে হাসান-এর ধন-সম্পদ অল্পদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। তার জেব একদম ফাঁকা হয়ে গেল। ইয়ার দোস্তদের সংখ্যা কমতে কমতে এক সময় এমন হ'ল যে, ডাকাডাকি করেও তাদের আর তার মকানে আনতে পারে না।

এদিকে খলিফা হাজার কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে গিয়ে হাসান-এর জন্য বরাদ্দ ভাতা পাঠাতে বিলকুল ভুলে গেলেন। ব্যস, হাসানের হালৎ এমন হয়ে উঠল যে, তার পক্ষে খানাপিনার বন্দোবস্ত করাই কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিল।

এদিকে আর এক মুশকিল দেখা দিল, হাসান বা চুমকী কারো পক্ষেই খলিফা বা জুবেদার কাছে তাদের আর্থিক দৈন্যদশার ব্যাপার জানিয়ে ভাতার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হ'ল না।

এক সকালে হাসান চুমকী'কে বল্‌ল—'শোন, আমার মাথায় চমৎকার এক মতলব এসেছে।'

—'মতলব? চমৎকার মতলব? কিন্তু তোমার মতলবটি কি শুনতে পারি কি?' চুমকী আগ্রহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল।

হাসান বার কয়েক আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'বলব? তবে বলেই ফেলি। মতলবটি হ'ল—আমরা মরে যাব।'

চুমকী চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—মরে যাবো। এ আবার কি রকম বাৎ! খোদার কসম, আমি কিন্তু মরতে টরতে পারব না। তুমি কি করবে জানি না, লেকিন আমার দ্বারা ওটি হচ্ছে না।'

হাসান গোস্‌সা না ক'রে বরং মুচকি হেসেই বল্‌ল—'কেন শাদীটাদী না ক'রে একেলা জিন্দেগী কাটিয়ে দেব নিয়ত করেছিলাম, এবার তোমার মালুম হচ্ছে? আদতে এক দিল্, এক পথ না হলে কাউকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রে সুখ নেই।

তুমি যখন বলেছিলে, সবদিক থেকে আমাদের মিল হবে তখনই আমি শাদী করতে রাজী হয়েছিলাম। এখন দেখছি, তুমি শাদীর ব্যাপারটি কোনরকমে মিটিয়ে ফেলার জন্যই আমাকে ধাপ্পা দিয়ে শাদীতে রাজী করিয়ে নিয়েছিলে। আদতে আমাদের দু'জনের মতের ব্যাপারে বিস্তর ফারাক রয়ে গেছে। আমি তাজ্জব বনছি, তুমি কি করে ধারণা করলে যে, সামান্য একটি কারণে আমরা মৃত্যুবরণ করতে চাচ্ছি? আদতে আমাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যই তো আমি এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে সাচমুচ মরতে হবে না তোমাকে। আসলে তোমাকে মরার ঢঙ্ করতে হবে। বিলকুল মরার মাফিক পড়ে থাকতে হবে। অবিকল মরার মাফিক পড়ে থাকা যাকে বলে, মালুম হচ্ছে। মরার অভিনয় ক'রে কিছুক্ষণ শিটকে লেগে পড়ে থাকতে পারলে কাজ হাসিল। তখন দেখবে, দিনার দিরহামে তোমার কামরা ভরে যাবে।'

চুমকী কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। স্বামীর আদৎ মতলবটি ধরতে পারল না।

হাসান একটু নড়ে চড়ে বসে এবার বলল্—'আদৎ মতলবটি আরও খোলসা করে বলছি, শোন—আমাকে কামরার মাঝখানে শুইয়ে কালো কাপড়া দিয়ে শরীর ঢেকে দেবে। আর টুপিটি দিয়ে

দেবে মুখে। ইয়াদ থাকে যেন মড়া আদমির ঠ্যাং থাকে পবিত্র কাবাহর দিকে।

ব্যস, কাজ সেরে তুমি ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে মড়াকান্না জুড়ে দেবে। যাকে বলে বিলকুল বিলাপ পেড়ে কান্না। কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়াবে, দেয়ালে মাথা ঠুকবে, চুল ছিঁড়বে, গহণাপত্র যেটুকু আছে ছিঁড়ে-ছুড়ে ফেলবে। কামিজটামিজও ছেঁড়ার বাহানা করবে। মোদ্দা বাৎ, স্বামী বেহেস্তে গেলে তার বিবি যা-যা করে তোমাকে অবিকল সে-অভিনয় করতে হবে।

তোমার কান্নাকাটি শুনে মহল্লার আদমির ছুটোছুটি করে এসে জড়ো হবে। তারাই ব্যস্ত হয়ে খলিফা-র প্রধান বেগম জুবেদা'কে দুঃসংবাদটি দেবে। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবেন। তাঁকে দেখামাত্র তুমি আমার ওপর আছাড় খেয়ে পড়বে। ব্যস, একদম বেহুঁশ হয়ে এলিয়ে পড়বে। ইয়াদ রাখবে, গোলাপ পানি চোখ-মুখে ছিঁটিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কিছুতেই চোখ-খুলবে না। তোমার হুঁশ ফিরে এলে বেগম জুবেদা তোমায় আচ্ছা করে বুঝাতে আরম্ভ করবে। তুমি চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে তার বাৎ শুনবে। তবেই দেখবে, একদম কামাল করে দেবে। বাজী মাৎ। ব্যস, এতেই দেখবে ধন-দৌলত আমাদের কামরা বোঝাই হয়ে গেছে।'

—'ইয়া আল্লাহ! একদম বেড়ে মতলব তো! তাই তো, মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। যে কোনো সময়েই, সামান্য কারণেও মানুষ মারা যেতে পারে। কারো সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকতে পারে না। বহুৎ আচ্ছা, তবে তুমি মরে যাও। যা কিছু বন্দোবস্ত করা দরকার আমি সব করছি।'

হাসান-এর নির্দেশ অনুযায়ী চুমকী হাসান'কে' উলঙ্গ করে মেঝেতে মাদুর পেতে শুইয়ে দিল। তার পা দুটো মক্কার কাবা মসজিদের দিকে রাখতে ভুল করল না। গায়ে কালো কাপড় চাপিয়ে দিল। আর টুপিটি দিয়ে তার মুখটি ঢেকে দিল।

কাজ সেরে এবার চুমকী দুয়ারে পা ছড়িয়ে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল। বিলকুল গলা ছেড়ে বিলাপ পেড়ে কান্না যাকে বলে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদে খবরটি চাউর হয়ে গেল হাসান-এর মৃত্যু হয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটে এল। খলিফার প্রধানা বেগম জুবেদাও ছুটে এলেন।

চুমকী বিলাপ পেড়ে কাঁদতে কাঁদতে অনবরত বুক চাপড়াতে লাগল, মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, দেয়ালে কপাল ঠুকতে লাগল আবার কখনও বা দু'হাতে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলতে লাগল—'বেগম সাহেবা, এ অবস্থায় আমার আর জিন্দা থেকে ফয়দা কি? জিন্দা থাকার ইচ্ছা নেই, জান একদম খতম ক'রে দেব। স্বামীর অবর্তমানে জেনানাদের কোনই দাম নেই।'

বেগম সাহেবা চুমকীকে আদর সোহাগ ক'রে নানাভাবে প্রবোধ

দিতে লাগলেন।

চুমকী তার প্রবোধবাক্যে কান না দিয়ে বরং আরো চিল্লিয়ে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে করতে সজোরে বুক চাপড়াতে লাগল।

বেগম সাহেবা বল্‌লেন—'ঝুটমুট কান্নাকাটি করে ফয়দা তো আর কিছু হবার নয়। হাসান'কে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবি নে। কান্না থামিয়ে, দিমাক ঠাণ্ডা ক'রে যা-যা করা দরকার কর। আমি প্রাসাদে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে দশহাজার দিনার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার মরদেহটিকে গোর দেয়ার বন্দোবস্ত কর। তারপর আর যা অর্থ লাগবে খলিফাকে বলে সময় মত পাঠিয়ে দেব। স্বামীর শেষ কাজটুকুতে যেন কোন গলতি না থাকে।'

প্রাসাদে গিয়েই বেগম জুবেদা এক খোজাকে দিয়ে দশ হাজার দিনারের একটি পুঁটুলি পাঠিয়ে দিল। খোজাটি বিদায় নিতেই চুমকী তার শিটকে লেগে পড়ে থাকা স্বামীকে টেনে তুল্‌ল। হাসান মোহরের পুঁটুলিটি বুকে জড়িয়ে ধরে খুশীতে নাচানাচি শুরু করে দিল। চুমকীও খুশীতে বিলকুল ডগমগ।

হাসান-এর একদম হুঁশ নেই যে, সে বিলকুল উদোম, কোমরে সামান্য কাপড়া পর্যন্ত নেই। চুমকি একটি দিনার ছুঁড়ে মেরে হাসতে হাসতে বল্‌ল—'তোমার তো লাজ শরমের ব্যাপার নেই! খুশীতে এমন মাতোয়ারা হয়ে পড়েছ যে, তুমি যে বিলকুল উদোম সে খেয়ালটুকু পর্যন্ত নেই।' পাৎলুনটি তার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌ল—'নাও, শরমস্থান ঢাক। বে-শরম কাঁহিকার।'

হাসান এবার চুমকীকে জড়িয়ে ধরে, তার ঠোঁটে, গালে এবং কপালে চুমু খেতে খেতে বল্‌ল—'বিবিজান, দশ হাজার দিনারে খুশী থাকলেই চলবে না। আরও দিনার কামিয়ে নিতে হবে। দিনার কামাই করার এমন মোওকা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এবার তোমার পালা। তোমাকে মরতে হবে। আমি যেমন মড়ার মাফিক শিটকে লেগে পড়েছিলাম তোমাকেও তা-ই করতে হবে।'

—'আরে আমি কি আর তোমার মাফিক মাত্র দশ হাজার দিনার কামাব নাকি? একবার কোনক্রমে অভিনয়টি পাকা ক'রে খলিফাকে দেখিয়ে দিতে পারলে একদম দিনারের পাহাড় জমে যাবে। কথা বলতে বলতে চুমকি তার গা থেকে সাজ পোশাকগুলি খুলতে লাগল। হাসান তাকে একদম উদোম হতে সাহায্য করল। চুমকীকে বিলকুল উদোম করে হাসান মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে চিৎ ক'রে সোজাভাবে শুইয়ে দিল। কালো কাপড়া দিয়ে ঢেকে দিল। বল্‌ল—'খুব হুঁশিয়ার হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে। খবরদার কেউ যেন তোমার মৃত্যু সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহও করতে না পারে।'
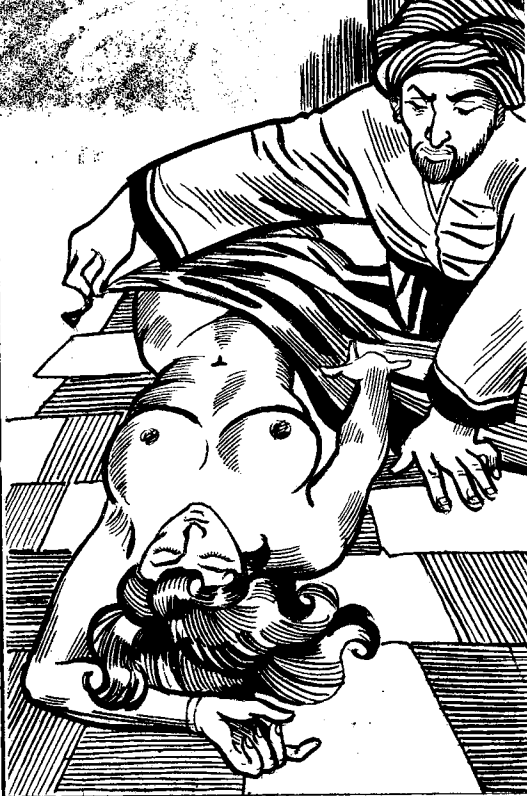
হাসান এবার মাথার টুপি খুলে মেঝেতে ফেলে দিল। ব্যস্ত হাতে মাথার চুল উসকো খুসকো করে দিল। দু'চোখে পিঁয়াজের রস মেখে নিল। এবার গলা ছেড়ে বিলাপ জুড়ে দিল। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাজির হ'ল দরবারে খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর কাছে। বিলাপ পেড়ে কাঁদতে কাঁদতে খলিফার কাছে চুমকী-র আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটি ব্যক্ত করল। সে মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। সে কী বিলাপ! তার বিবি সাচমুচ মারা গেলেও বোধ হয় এত আকুলি বিকুলি করত না।

খলিফা চোখের পানি মুছতে মুছতে হাসান-এর হাত ধরে টেনে ওঠাতে গিয়ে বল্‌লেন—'ভাইয়া, যে যাওয়ার সে তো চলেই গেছে। তার জন্য ঝুটমুট কান্নাকাটি ক'রে তো আর ফয়দা কিছুই হবে না, তাকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। চোখের পানি মোছ দিমাক ঠাণ্ডা করে তার পারলৌকিক ক্রিয়া সারার বন্দোবস্ত কর।' চোখের পানি মুছতে মুছতে এবার বল্‌লেন—'আমার ধারণা ছিল আমার হারেমের চেয়ে সে তোমার কাছে গিয়ে বেশী সুখ পাবে। আদতে তার নসীবে সুখ নাই, তুমি-আমি কি করব, বল?'

খলিফার হুকুমে খাজাঞ্চী দশ হাজার দিনারের একটি থলি এনে হাসান-এর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'যাও, এগুলো দিয়ে তোমার বিবির গোর দেয়ার বন্দোবস্ত কর।'

খলিফা চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌লেন—'হাসান, দেখো ভাইয়া, চুমকীর শেষকৃত্যের যেন কোন ত্রুটি না হয়। আমি পরে আরও কিছু দিনার পাঠিয়ে দিচ্ছি, ভেবো না।'

হাসান চোখের পানি মুছতে-মুছতে দরবারকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে এল। মকানে ফিরে নাচতে নাচতে কামরায় ঢুকল। এক হেঁচকা টানে চুমকী-র ওপর থেকে কালো কাপড়টি সরিয়ে ফেলে বল্‌ল—'উঠে পড়। অভিনয়ের কাজ চুকে গেছে। এই দেখ, তুমি কেমন কয়েক-মুহূর্তের মধ্যে পুরো দশ হাজার দিনার কামিয়ে ফেল্‌লে।'

এমন সময় প্রাসাদসংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রে বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন ভোর হয়ে এল ব'লে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয় শ' পঞ্চাশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, হাসান এবার এক হেঁচকা টানে বিবস্ত্রা চুমকীকে মেঝে থেকে একদম বুকে তুলে নিল। তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তার ঠোঁটে, গালে ও কপালে বার বার চুমু খেতে খেতে বল্‌ল—'চুমকী, কৌশলে খলিফা ও বেগম সাহেবার কাছ থেকে বিশ হাজার দিনার তো কামিয়ে নেয়া গেল। চুমকি বলল—'লেকিন তাঁরা যখন জানবেন আমরা বিলকুল ধোঁকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে দিনারগুলো আদায় করছি, তখন?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। কি করা যায়, বল তো?'

চুমকী স্বামীর বুকে মুখ ঢেকে বল্‌ল—'তুমিই মতলবটি এঁটেছ। আর মুশকিল কিছু হলে তুমিই তার আসানের ফিকির বের করবে।'

এ-ঘটনার দু'-চারদিন বাদে এক বিকালে খলিফা তাঁর দেহরক্ষী মাসরুর'কে সঙ্গে নিয়ে প্রধানা বেগম জুবেদার কাছে এলেন। আদতে চুমকীর শোক তাঁকে একদম কাহিল করে দিয়েছে। একটু-আধটু শান্তি-স্বস্তি লাভের প্রত্যাশায় তিনি অন্দরমহলে জুবেদার কাছে ছুটে এসেছেন।

খলিফা কামরার দরওয়াজায় পা দিয়েই দেখেন, জুবেদা চোখের পানি ঝরিয়ে কেঁদে আকুল হচ্ছেন।

ব্যথিত-মর্মাহত খলিফা বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, চুমকী তোমার যে কী আদরের বাঁদী ছিল তা-তো আর আমার অজানা নয়। তাইতো তার ইন্তেকাল হওয়ায় তুমি একদম ভেঙে পড়েছ। সবই আল্লাহ-র মর্জি।'

জুবেদা চোখের পানি ঝরিয়ে খলিফাকে হাসান-এর ইন্তেকালের খবর দিতে যাবেন তার আগেই খলিফা একী আর এক নয়া দুঃসংবাদ দিলেন। নিজের কান দুটোর ওপর যেন আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তবু চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, চুমকী পরমায়ু লাভ করুক, আপনার বুকের জ্বালার ব্যাপার বিবেচনা করে আমি চোখের পানি ঝরাচ্ছি। হাসান ছিল আপনার দোস্ত—জিগরী দোস্ত। তার মৃত্যু তো আপনার বুকেও সমান জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।'

জুবেদার বাৎচিৎ খলিফাকে একদম তাজ্জব ক'রে দিল। এমন এক শোকের মুহূর্তে কেউ যদি এমন মস্করা করে তবে কার না দিমাক খারাপ করে দেয়। তিনি এ-ও ভাবলেন, বেগম সাহেবা হয়ত ইন্তেকালের খবর এখনও পান নি। এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, মালুম হচ্ছে চুমকীর মৃত্যু তোমার দিমাক একদম খারাপ করে দিয়েছে। তাই তো হাসানের ইন্তেকালের সঙ্গে চুমকীর ইন্তেকাল ঘটিয়ে দিচ্ছ। অস্বাভাবিক একটি ঝুটা খবর দিয়ে আমাকে তুমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুখে ঠেলে দিতে চাইছ। খানাপিনার সঙ্গে বিষক্রিয়া ঘটায় চুমকীর ইন্তেকাল ঘটেছে, শোন নি বুঝি?'

জুবেদা এতে নিজেকে শান্ত করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, তাঁর শোক-জ্বালাকে হ্রাস করতে, ঠাণ্ডা করতে খলিফা এ-ফিকির করছেন। ভাবল তারই শেখানো বুলি খলিফার লোকটি ব'লে চলেছে।

রীতিমত রাগত স্বরেই জুবেদা বল্‌লেন—'এরকম একটি বিশেষ মুহূর্তেও কি আপনি মস্করা করতে ছাড়বেন না, জাঁহাপনা। আমি তো নিজে হাতে হাসান-এর মরদেহ গোর দেয়ার পুরো দশ হাজার দিনার চুমকীর হাতে দিয়েছি, আপনার কোষাধ্যক্ষ এর সাক্ষী।'

খলিফা চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লেন—'একি অবিশ্বাস্য ব্যাপার আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ বেগম সাহেবা!' এবার আমতা আমতা করে বল্‌লেন—'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বোধকরি তোমার দিমাক কিছু গড়বড় হয়েছে, বহুৎ আচ্ছা, আমার বক্তব্য সাচ্চা কি ঝুটা এখনি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি। এবার তিনি মাসরুর'কে তলব করলেন। সে এলে বল্‌লেন—'শোন, আমি অবশ্য দরকার বোধ করছি না, তবু নিদেনপক্ষে বেগম সাহেবার সন্দেহ দূর করার জন্যই তুই ছুটে গিয়ে দেখে আয় তো, হাসান আর চুমকী-র মধ্যে কে জীবিত রয়েছে।'

বেগম জুবেদা তাঁর বক্তব্যকে অধিকতর দৃঢ় করতে গিয়ে বল্‌লেন—'আমার বক্তব্যের সমর্থনে বাজী ধরছি আবু হাসান যদি জীবিত থাকে তবে আমার তসবীর মহলটি নিঃসঙ্কোচে আপনার হাতে তুলে দেব।'

খলিফা-ও এত সহজে দমবার পাত্র নন। তিনিও নিজের বক্তব্যকে জোরদার করতে গিয়ে বল্‌লেন—'ঠিক আছে, মাসরুর যদি ফিরে এসে বলে চুমকী জীবিতা তবে আমার শখের ইমারৎ রঙমহলটি তোমাকে দান করে দেব। জিন্দেগীভর তাতে একমাত্র তোমারই দখল থাকবে।'

এবার তারা পবিত্র কোরাণ পাঠ ক'রে একে-অন্যের কাছে কসম খেলেন। পবিত্র ফতিয়াহ পাঠের মাধ্যমে বক্তব্য অধিকতর দৃঢ় হয়ে উঠল। মাসরু লম্বা লম্বা পায়ে হাসান-এর মকানের দিকে চল্‌ল। হাসান জানালা দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল।

হাসান ভয়ার্ত কণ্ঠে চুমকীকে বল্‌ল— 'বিবিজান, ওই দেখ, মাসরু এদিকেই আসছে। আমাদের বিপদ আসন্ন। মালুম হচ্ছে, খলিফা আর বেগম সাহেবার মধ্যে জোর তর্কাতর্কি বেধে গেছে, আর সে তর্কাতর্কির মূলে রয়েছি আমরা। আমাদের কে বেহেস্তে গেছি আর কে ই বা জিন্দা রয়েছি তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে জোর তর্ক বেঁধেছে। মাসরুর দেখে গিয়ে যে বক্তব্য পেশ করবে তা-ই সত্য ব'লে বিবেচিত হবে।'

হাসান রশিতে ঝুলিয়ে রাখা একটি কালো-কাপড়ের টুকরো টান দিয়ে হাতে নিয়ে বল্‌ল—'চুমকী, জলদি মক্কার কাবা মসজিদের দিকে পা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। আমি এ কাপড়াটি দিয়ে তোমাকে ঢেকে দিচ্ছি। জলদি কর।' একদম মড়ার মাফিক চুমকী হাসান-এর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী শুয়ে পড়ল। হাসান হাতের কালো কাপড়াটি দিয়ে তাকে ঢেকে দিল। নিজের মাথার টুপি খুলে হাতে নিয়ে নিল।

মাসরুর ব্যস্ত-পায়ে কামরায় ঢুকে মাথার টুপি হাতে নিয়ে শোক সন্তপ্ত হাসান-এর পাশে নিশ্চল-নিথরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বল্‌ল—'দোস্ত, সবই

খোদাতাল্লা-র মর্জি। তাঁর মর্জির বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। কি আর করবে, নিয়ম মাফিক গোর দেয়ার বন্দোবস্ত কর।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কামরা ছেড়ে চলে গেল।

মাসরুর প্রাসাদে ফিরে জানাল, খলিফার বক্তব্যই সাচ্চা বটে। হাসান-এর বিবি চুমকীরই ইন্তেকাল হয়েছে। গতকাল রাত্রেই দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছে।

খলিফা শেরওয়ানীর জেবে হাত ঢুকিয়ে, বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, পেশকারকে তলব করছি, তোমার কলিজার সমান মহলটি আমার নামে লেখাপড়া ক'রে দাও।'

জুবেদা কালাপানীর মাফিক ফোঁস করে উঠলেন— 'হতচ্ছাড়া মিথ্যাবাদী কাঁহিকার। জাঁহাপনা, আমি মাসরুর-এর বক্তব্য মানতে পারছিনা। একদম বিশ্বাস করছি না। আদতে আপনার দেহরক্ষী তো আপনার মতামত অনুযায়ীই বক্তব্য রাখবে।'

এবার পা থেকে চপ্পল খুলে নিয়ে মাসরুর-এর দিকে ছুঁড়ে মেরে বললেন—'শয়তান বেতমিস কাঁহিকার। আমার চোখের সামনে থেকে ভাগ! নইলে তোর জান একদম খতম ক'রে দেব!'

এবার গোস্‌সায় একদম লাল হয়ে গিয়ে বল্‌লেন— 'জাঁহাপনা, শয়তান মাসরুর-এর বক্তব্য আমি মানতে নারাজ। সাচ্চা-ঝুটা যাচাই করার জন্য আমার বিশ্বস্ত কাউকে পাঠাচ্ছি। সে ফিরে এসে যা বলবে আমি নির্দ্বিধায় তা মেনে নেব। তাতে তসবীর মহল লিখে দিতে হলেও কিছুমাত্র আপত্তি করব না।'

জুবেদা এবার তার সব চেয়ে বিশ্বস্ত বুড়ি ধাইকে হাসান-এর মকানে পাঠালেন।

হাসান খোলা জানালার ধারেই দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বুড়ি ধাইকে দেখতে পেয়ে এক দৌড়ে কামরার ভেতরে চলে গেল। চুমকী-র হাতে কালো কাপড়ার টুকরোটি দিয়ে বল্‌ল—'আমি মক্কার কাবা মসজিদের দিকে পা রেখে চিৎ হয়ে মড়ার মাফিক শুয়ে পড়ছি, তুমি কাপড়াটি দিয়ে আমাকে ঢেকে দিয়ে চোখের পানি ঝরাতে থাকবে।'

হাসান শুয়ে পড়ল। চুমকী কালো কাপড়াটি দিয়ে তাকে ঢেকে দিয়ে চোখে পিঁয়াজের রস দিয়ে চেখের পানি ঝরাতে লাগল।

বুড়ি ধাই কামরায় ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে মুখে বিষণ্নতার ছাপ এঁকে সে চুমকী-র পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌ল—'সবই নসীবের ব্যাপার। আল্লাহ নসীবে যা লিখে দিয়েছেন তাকে খণ্ডন করার সাধ্য আমাদের কোথায়। তার মর্জি আমাদের মুখ বুজে মেনে নিতেই হবে। আমি চলি।'

বুড়ি ধাই ফিরে এসে বল্‌ল— 'বেগম সাহেবা, আপনার বক্তব্যই সাচ্চা বটে, হাসান-এরই ইন্তেকাল হয়েছে। তার বিবি একদম আছাড়ি পিছাড়ি করে কান্নাকাটি করছে। সে কী চোখের পানি, দেখা যায় না।'

বেগম জুবেদা খলিফার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বল্‌লেন—'কি গো, তোমার মাসরুর এখন কোথায়? তাকে বল, এবার এসে গলা চড়িয়ে তার বক্তব্য বলে যাক। যত্তসব মিথ্যাবাদী ধাপ্পাবাজ নিয়ে তোমার কারবার। বজ্জাতটি ব'লে কিনা আমি ঠিক বলিনি!'

এদিকে মাসরুর তো বুড়ি ধাইটির ওপরে রেগেমেগে একদম অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। পারলে তাকে গিলেই খেয়ে ফেলে। সুযোগ বুঝে সে বুড়ির ওপর এক হাত নিয়েও নিল।

বুড়িও এত সহজে ঘায়েল হবার পাত্রী নয়। সে নিজের চোখে যে-দৃশ্য দেখে এসেছে তার উল্লেখ ক'রে মাসরুর-এর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লেগে গেল। মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল একদম তুলকালাম কাণ্ড।

মাসরুরও হাতের মাংসপেশীগুলি ফুলিয়ে বার বার বুড়িকে তেড়ে যেতে লাগল। এই মারে কি সেই মারে।

বেগম জুবেদা এগিয়ে এসে বল্‌লেন— 'জাঁহাপনা, আপনার, দেহরক্ষী মাসরুর এতবড় ঝুটা বাৎ ব'লে পার পেয়ে যাবে, তা-তো

হতে পারে না। আমি শুধু একবারটি দেখতে চাই, কৃত অপরাধের জন্য আপনি তাকে কোন্ শাস্তি দেন।'

খলিফা বল্‌লেন—'মাসরুর যদি ঝুট বলেই থাকে তবে সে জরুর কসুর করেছে। সাজাও পাবে। ঝুট বাৎ তো দেখছি আমরা—মাসরুর, বুড়ি ধাই, তুমি আর আমি সবাই বলেছি। তবে একেলা

মাসরুর কেন শাস্তি পাবে বেগম সহেবা?' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে খলিফা এবার বল্‌লেন— 'শোন, ব্যাপারটিকে আমরা যত সহজ-সরল ভেবেছি আদতে কিন্তু ঠিক তা নয়। সাচ্চা বলতে কি, আমি এর মধ্যে গভীর রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখা দরকার।'

এবার খলিফা ও জুবেদা উভয়েই নিজ নিজ বিশ্বস্ত নফর, বাঁদী আর নোকর-দের বিশাল বাহিনী নিয়ে হাসান-এর মকানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। উভয়েরই ইচ্ছা ব্যাপারটির ফয়সালা করা।

এদিকে চুমকী জানালা দিয়ে বিশাল বাহিনী সহ খলিফা ও বেগম জুবেদা'কে এগোতে দেখে তার স্বামীকে ডেকে বল্‌ল— 'তোমার ধান্দাবাজীর ফল দেখ। এবার পরিস্থিতি কি দিয়ে সামাল দেবে, ভেবে দেখ।'

হাসান মুখে স্বাভাবিক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল— 'কুছ পরোয়া নেই। চলে এসো, এখানে শুয়ে পড়। এবার আমরা দুজনে এক সঙ্গে মরব।'

খলিফা ও বেগম জুবেদা হাসান-এর কামরার দরওয়াজায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে। চোখের তারায় বিস্ময়, কারো মুখে রা পর্যন্ত সরল না।

ঠিক সে-মুহূর্তে অধিকতর মর্মান্তিক ঘটনা দেখে বেগম জুবেদা কেমন অস্থির হয়ে পড়লেন, মাথাটি চক্কর মেরে উঠল। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লেন।

এক সময় কণ্ঠস্বরে আবেগ ও বিস্ময় প্রকাশ ক'রে তিনি বলে উঠলেন— 'শোভন আল্লাহ! চুমকীর মহব্বৎ অতুলনীয়! স্বামী যদি না-ই রইল তবে জেনানাদের জানের আর কী দাম! সে তো আমাকে সাফ বাৎ বলেই দিয়েছিল,— 'বেগম সাহেবা, হাসান'কে ছেড়ে আমি জান রাখতে পারব না। আমার সে-সাধও নেই। সে জবান রেখে এক নয়া নজীর গড়ল। আদতে চুমকী ছিল সাচ্চা সতী এখন মালুম হ'ল।'

—'ঝুটা, বিলকুল ঝুটা বাৎ বেগম সাহেবা। স্বামীর শোকে চুমকী জান দেয় নি। চুমকী-র ইন্তেকাল আগেই হয়েছিল। মহব্বতের আদৎ দাম দিয়েছে হাসান। বিবির বিরহ-জ্বালা সইতে না পেরে সে জান দিয়েছে। সে চুমকীকে নিজের কলিজার চেয়েও বেশী পেয়ার করত বলেই তো হাসিমুখে চুমকী-র সহগামী হতে পেরেছে। তুমি যদি ভেবে থাক তুমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলে ব'লে সবাই তোমার মন্তব্যকে স্বীকার করে নেবে তবে ভুলই করবে বেগম সাহেবা।

—'সাচ্চা বটে জাঁহাপনা, আপনার এক নচ্ছার নক্কড়বাজ দেহরক্ষী আছে বলে সবাই আপনার বক্তব্য হাসি মুখে মেনে নেবে ভেবে থাকলে আপনিও বিলকুল ভুল করবেন।'

খলিফা ও বেগম নানা যুক্তির অবতারণা করে নিজ নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কোশিস করতে লাগলেন। উপায়ান্তর না দেখে খলিফা হাসান-এর নোকরকে তলব করলেন।

এমন সময় কামরার ভেতর থেকে কার যেন চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল— 'জাঁহাপনা, ওই দশ হাজার আমাকে দিন তবে আমি আদৎ ঘটনা বলে দিতে পারি।

জাঁহাপনা, আমি স্বয়ং আবু অল-হাসান বলছি, বিশোয়াস করুন। আদৎ ঘটনা আমার মুখ থেকেই শুনুন— 'বিবি চুমকী-র শোকে আমার ইন্তেকাল হয়েছিল।'

ব্যাপার দেখে বেগম সাহেবা সহ সেখানে যত জেনানা ছিল সবাই 'জিন' ও 'আফ্রিদি' প্রভৃতি শব্দ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারণ করে কামরা ছেড়ে পড়ি কি মরি ক'রে ভেগে যায়।

আদৎ ব্যাপারটি কেবলমাত্র খলিফাই ধরতে পারলেন। তিনি হাসতে হাসতে মেঝেতে একদম গড়াগড়ি খাবার জোগাড়।

হাসতে হাসতে খলিফা বল্‌লেন— 'আবু অল-হাসান, তোমার মস্করা এখন রাখ। আমি আর হাসতে পারছি না। হাসতে হাসতে আমার যে দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। আর নয়। এবার তোমার মস্করা থামাও। তুমি যে এত রসিক তা-তো আগে একদম জানা ছিল না।' এ পর্যন্ত বলে খলিফা আবার হো হো করে হাসতে লাগলেন।

বেগম জুবেদা-র কাছে এবার পুরো ব্যাপারটি খোলসা হ'ল। তিনি বুঝলেন, হাসান ও চুমকী মস্করায় লিপ্ত হওয়ার জন্যই এতগুলো লোকের হয়রানির চূড়ান্ত।

আতঙ্ক ও ভয় ডর কাটিয়ে হাসান ও চুমকী কালো কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে এক লাফে উঠে বসে পড়ে। হাসান খলিফার পায়ে পড়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে ব'লে উঠল—'বান্দার গোস্তাকি মাফ করুন জাঁহাপনা।'

এদিকে চুমকী জুবেদা-র পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌ল— 'বেগম সহেবা, যদি কিছু কসুর ক'রে থাকি মাফ করে দেবেন।'

খলিফা হাসি থামিয়ে বল্‌লেন—'ওঠো, পা ছাড়। খুব হয়েছে। আমি তোমাদের অভিনব মস্করায় খুশী হয়ে প্রত্যেককে দশ হাজার দিনার ক'রে বকশিস দিলাম। এবার তিনি উজির জাফরকে লক্ষ্য করে বললেন— 'জাফর এখন থেকে আমি খেয়াল করি আর না-ই করি তুমি প্রতি মাসে হাসান আর চুমকী-র ভাতার অর্থ পৌঁছে দেবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর অকৃত্রিম হৃদ্যতা ও মহানুভবতার মধ্য দিয়ে আবু অল-হাসান ও চুমকী সুখে-শান্তিতে জিন্দেগীর পরবর্তী দিনগুলি কাটিয়ে গিয়েছিল।

কিসসাটি শেষ করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

অনন্য মহব্বতের কিস্‌সা

বাদশাহ্ শারিয়ার-এর অনুরোধে বেগম শাহরাজাদ 'অনন্য মহব্বতের কিস্‌সা' নামে একটি নয়া কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বহুৎ দিন আগেকার কথা। কোন এক নগরে আনিস নামে এক নওজোয়ান বাস করত। সে ছিল খুবসুরৎ। তার ওপর সে ছিল যথার্থই একজন শিক্ষিত সৎ চরিত্র এবং সদা হাস্যময় নওজোয়ান। তামাম দুনিয়াটিই ছিল তার কাছে এক সুখ ও সৌন্দর্যের নগর। নওজোয়ান লেড়কিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, ইয়ার-দোস্তদের হাসি-মস্করা, নাচা-গানা, সাজ-পোশাক কোন কিছুর মধ্যেই সে অ-সুন্দরের চিহ্ন মাত্রও খুঁজে পেত না।

নওজোয়ান আনিস চারদিকে অফুরন্ত সৌন্দর্য ও সুখ শান্তি নিয়ে বিলকুল খুশীর আমেজের মধ্যে দিন গুজরান করছিল।

আনিস একদিন তার মকান সংলগ্ন বাগিচায় ঢুঁড়ে বেড়িয়ে একটি গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে আয়েশ ক'রে বসল। এ-ব্যাপার সে-ব্যাপার নিয়ে ভাবতে ভাবতে সে এক সময় গাছে হেলান দিয়েই গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সে খোয়াব দেখতে লাগল একটি ঘুঘুর সঙ্গে চারটি খুবসুরৎ চিড়িয়া খেলা করছে। ঘুঘুটি চিড়িয়া চারটিকে যারপরনাই আদর সোহাগ করছে। আর তারাও পরম তৃপ্তিতে তার আদর-সোহাগটুকু বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে। এমন সময় ইয়া পেল্লাই একটি কাক আচমকা উড়ে এসে ঘুঘুটির ঘাড় ঠোঁট দিয়ে আঁকড়ে ধরে উধাও হয়ে গেল। কাণ্ডটি এমনই আচমকা ঘটে গেল যে, নওজোয়ান আনিস বিলকুল তাজ্জব বনে গিয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে কেবল দেখল। কিছু করার উপায় ছিল না, কোশিসও করে নি।

আচমকা আনিস-এর নিদ টুটে গেল। তার দিল্ একদম বিষিয়ে উঠল। গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসেই সে বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে ব্যাপারটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে লাগল। লেকিন স্বপ্নের ঘটনাটির কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ সে উদ্ধার করতে পারল না। অকথিত ও অসহনীয় এক যন্ত্রণা তার কলিজাটিকে যেন ক্রমেই অস্থির থেকে অস্থিরতর করে তুলতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে থেকে থেকে ছটফট করতে লাগল।

আনিস আচমকা খাড়া হয়ে বসে পড়ল। ভেতরে ভেতরে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, খোয়াবে দেখা দৃশ্যটির যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ তাকে উদ্ধার করতেই হবে।

হাতের কাছে এমন কাউকেই পেল না যাকে ধরে সে খোয়াবের ব্যাপারটির অর্থ উদ্ধার করতে পারে।

আনিস হতাশায় জর্জরিত দিল্ নিয়ে বিমর্ষ মুখে চলছিল, এমন সময় পথের ধারে কারুকার্য মণ্ডিত এক ইমারতের ধারে পৌঁছতেই তার ভেতর থেকে কিন্নর কণ্ঠের সুমধুর গানা ভেসে আসতে লাগল। আনিস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কৌতূহলাপন্ন হয়ে ইমারতটির ওপর একটিবার চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিল। এবার উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল কে যেন দিল্ উজাড় করে গানা গাইছে, যার মর্মার্থ হ'ল—'ভোরের নির্মেঘ নীল আশমানের গায়ে পাখিরা গলা ছেড়ে মহব্বতের গানা গাইতে গাইতে দিগন্তের পানে উড়ে চলেছে। লেকিন আমি তো তা পারি না। আমি কয়েদখানায় বন্দিনী এক জেনানা, কেমন করে সূর্য উদিত হয়, কেমন করেই বা অস্ত যায়, আর কেমন করেই বা কুঁড়িগুলো ফুটে খুবসুরৎ ফুলে পরিণত হয় তা দেখা আমার নসীবে বুঝি আর কোনদিনই জুটল না।

আনিস ইমারতটির দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগল—এতো গানা নয় যেন বেদনা আর যন্ত্রণার এক ডালি। গানার করুণ ভাবধারা আনিস-এর দিল্‌কে কুরে কুরে খেতে লাগল। সে ভাবল, জিন্দেগী তো মধুময়। তবে তাতে এমন শোক-তাপ কি করে আসে! কেনই বা দুঃখ-দুর্দশায় জিন্দেগীকে এমন ক'রে বিষিয়ে তোলে?

এমন কলিজা অস্থির করা গানা কে গাইছে তা জানার জন্য আনিস-এর দিল্ চঞ্চল হয়ে উঠল। অন্যমনস্ক ভাবে সে বন্ধ দরওয়াজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ইমারতটির লাগোয়া বাহারী ফুল ও ফলের একটি চমৎকার বাগিচা তার নজরে পড়ল। আনিস বাগিচার সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে এক পা-দু'পা ক'রে বাগিচার ভেতরে ঢুকে একটি মোটা সোটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। দেখতে পেল, একদল লেড়কি ছুটোছুটি করে খেলায় মেতে রয়েছে। তারা খেলায় এতই মত্ত যে, অন্য কোনদিকে তাদের কিছুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই।

আনিস পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটি তোরণের সামনে দাঁড়াল। দেখল, তার গায়ে লাল রঙ দিয়ে কিছু লেখা রয়েছে। সে কৌতূহলাপন্ন হয়ে লেখাটি পাঠ করতে লাগল—"আমাদের দরজাটি এতই সঙ্কীর্ণ যে, তার ভেতর দিয়ে দুঃখ-দুর্দশা আর বিশালদেহী কালস্রোত প্রবেশ করতে পারে না। লেকিন ঝর্ণার মাফিক উচ্ছল মহব্বতের পথ কোনদিনই রুদ্ধ হবে না।"

আনিস এবার কয়েক কদম এগিয়ে দ্বিতীয় তোরণটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, তার গায়ে সোনালী রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে—" পাখিরা যতদিন এ-বাগিচায় ফুলের খুসবু নিতে আসবে ততদিন ইয়ার দোস্তরা প্রতিটি কামরায় খুসবু ছড়াবে আর ফুলের দল প্রস্ফুটিত হবে রঙের বাহার নিয়ে। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সবুজ ঘাসের সমারোহ নজরে পড়বে। যতদিন লতা গুল্ম আর গাছ গাছলা পয়দা হবে ততদিন আমার এ সুখের নীড় খুশীর আনন্দে দোল খেতে থাকবে।"

আনিস দ্বিতীয় তোরণটির লেখা পাঠ করে আবার পায়ে পায়ে

সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তৃতীয় তোরণটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, তার গায়ে সবুজ রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে—"আমার এ মকানের দোলা লাগানো প্রতিটি বিলাস-কক্ষের মাথার ওপর থেকে সময় ও সূর্য প্রতিনিয়ত সরে সরে যায়। লেকিন মহব্বতের ছায়া চুঁহার মাফিক নিরালায় আত্মগোপন করে থাকে। সময় বা সূর্য— কেউ-ই তার হদিস পায় না।"

আনিস তৃতীয় তোরণের লেখা পাঠ ক'রে ফিন হাঁটা জুড়ল। সে এবার পথের শেষ প্রান্তে হাজির হয়ে থমকে যায়। দেখল, শ্বেত-পাথরের একটি সিঁড়ি বাগিচা থেকে সোজা ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

আনিস কৌতূহলাপন্ন হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একটি সুসজ্জিত কামরায় দরওয়াজার সামনে এসে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল, কামরার ভেতরে সুদৃশ্য এক গালিচায় আধ-শোয়া অবস্থায় এক কাজল নয়না হরিণী ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রয়েছে। চোখের মণি দুটোতে মায়া-কাজলের প্রলেপ। তার পনের

বছরের দেহটিতে জুড়ে রয়েছে যৌবনের প্রারম্ভের কাছে টানার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। লেড়কি নয়ত যেন পুরুষের কলিজা ঘায়েল করার এক সুতীক্ষ্ণ তীর।

আনিস দু'কদম এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে খুবসুরৎ বেহেস্তের হুরীটিকে কুর্নিশ সেরে বল্‌ল— 'শাহজাদী, বান্দার অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

লেড়কিটি তার ডাগর ডাগর চোখ দুটোতে বিস্ময়ের সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে বল্‌ল—'কে তুমি? এ নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করার সাহস কি ক'রে তোমার হ'ল? তাজ্জব হচ্ছি!'

—'শাহজাদী এর জন্যে আমার কোনই কসুর নেই। যদি কসুর কিছু থেকে থাকে তবে তা আপনার নিজের ও খুবসুরৎ ওই বাগিচাটির।' লেড়কিটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকাল। সে এবার বল্‌ল—'জরুর, কসুর তো আপনারই। দরওয়াজা খোলা থাকলে সুরতের পূজারীরা তো চোখ ও দিল্‌কে সার্থক করার তাগিদে এলাকা নিষিদ্ধ হলেও তাতে ঢুকে যেতেই পারে। আদতে বাগিচার বাইরে দাঁড়িয়ে ফুলের খুসবু পেয়ে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি নি। পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছি।'

মুক্তোর সমান ঝকঝকে দাঁতের পাটি মেলে লেড়কিটি হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দিয়ে বলল—'বহুৎ আচ্ছা! কি নাম তোমার?'

আনিস কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'বান্দার নাম আনিস।'

—'বহুৎ আচ্ছা নাম তোমার! তোমার বাৎচিৎ আমার দিল্‌কে নাড়া দিয়েছে, মুগ্ধ হয়েছি। এগিয়ে এসে আমার পাশে এ-গালিচাটিতে বস। তোমার সঙ্গে খেলাধুলা হাসি-তামাশা করতে চাই। তুমি দাবা খেলতে জান কি?'

আনিস ঘাড় কাৎ করে জানাল—'জানি। ভাবতে পারেন, একটু-আধটু জানি।'

—'ঠিক আছে, তাতেই চলবে।' আবলুশ কাঠ আর হাতীর দাঁত সহযোগে তৈরী ছক আর সোনার পাত দিয়ে মোড়া কারুকার্য মণ্ডিত ঘুঁটিগুলো সাজিয়ে নিয়ে সে খেলার জন্য তৈরী হ'ল। ঘুঁটিগুলোর কিছু লাল আর কিছু সফেদ রঙের। আনিস সফেদ রঙ বেছে নিল। আর লেড়কিটি নিল লাল ঘুঁটি। খেলা শুরু হ'ল।

একের পর এক দান এগিয়ে চলেছে। আনিস কিন্তু কিছুতেই দাবার ছক আর ঘুঁটির ওপর দিল্ বা চোখ আবদ্ধ রাখতে পারল না। আদতে তার কৌতূহলী চোখের মণি দুটো লেড়কিটির সুরতের ডালির ওপরই বার বার চক্কর মেরে চলেছে। ঘুঁটি চালার ফাঁকে লেড়কিটির তুলতুলে আঙুলগুলোর সঙ্গে আচমকা তার আঙুলের টোকা লেগে গেল। ব্যস, তার সর্বাঙ্গে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চের সঞ্চার ঘটল। শিরা উপশিরায় খুনের গতি তরতর করে বেড়ে যেতে

থাকে। আর মাথার স্নায়ুগুলো একসঙ্গে ঝনঝনিয়ে ওঠে। আনিস অকস্মাৎ চিল্লিয়ে উঠল—'এরকম আঙুলের সঙ্গে তো আমার লড়াই করা সম্ভব নয়।'

—'আমিও তা-ই ভাবছি। এসো আমরা বরং বাজী ধরে খেলি। এক শ' দিনার বাজী।'

—'আমার আর আপত্তির কি থাকতে পারে, বাজীতে আমি রাজী।' ইয়া আল্লাহ! লেড়কিটির নামই তো এখনও বলা হয়নি। হ্যাঁ, তার নাম জাইন মুস্তয়ামিফ।

বাজীর ব্যাপারে বাৎচিৎ চুকে গেলে জাইন মুস্তয়ামিফ ঘুঁটি সাজিয়ে গোড়া থেকে খেলা শুরু করার জন্য তৈরী হ'ল।

খেলা শুরু হতেই আনিস পর পর এমন ক'টি চাল দিল যা সামাল দিতে গিয়ে জাইন-এর নাকের পানি আর চোখের পানিতে একাকার হয়ে গেল। সে খেলার ফাঁকে গায়ের পাতলা ওড়নাটি খুলে পাশে রেখে দিল।

আনিস আড় চোখে জাইন-এর উন্নত বক্ষের দিকে এক লহমায় তাকাতেই তার সব কিছু যেন বিলকুল ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল। সে এত অন্য মনস্ক হয়ে পড়ল যে, জাইন-এর ঘুঁটিই চালতে শুরু করে দিল। জাইন হৈ হৈ ক'রে উঠল। সে আচমকা আনিস-এর একটি হাত চেপে ধরল। খুবসুরৎ লেড়কি জাইন-এর মাখনের মাফিক তুলতুলে একটি হাত দিয়ে আনিস-এর একটি হাত চেপে ধরল। আনিস হাতটি সরিয়ে নেবার কিছুমাত্র কোশিসও করল না, আদতে তার কিছু করার মত ক্ষমতাও নেই। রোমাঞ্চে ভরে উঠল তার দিল্-কলিজা। শিরায় শিরায় জাগল খুনের মাতন। ভাবটি এমন যে, সে যদি জিন্দেগীভর তার মাখনের মাফিক তুলতুলে হাতটি দিয়ে তার হাতটি এভাবে ধরেই রাখে লোকসান কোথায়? সে চোখের ভাষায় কিছু বুঝাবার জন্য জাইন-এর দিকে তাকাতেই জাইন আচমকা কেমন যেন মিইয়ে যায়। চারচোখ এক জায়গায় হতেই জাইন সলজ্জ ভঙ্গিতে চোখ দুটো নামিয়ে দাবার ছকের ওপর নিবদ্ধ করল। সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বল্ল—'একী রকম ব্যাপার শুনি? আমার ঘুঁটি নিয়ে তুমি বেমালুম চাল দিতে লেগে গেলে!'

—'হ্যাঁ, আদতে চাল দিতে গিয়ে তোমার-আমার ভেদাভেদ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঠিক আছে, এবার থেকে বাজীর ব্যাপারটি ইয়াদ রেখে চাল দেব।'

দু-চার চাল দেবার পর আনিস আর দাবার ছক আর ঘুটির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে পারল না। ফলে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ার কোশিস করল। জাইন সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চেপে ধরে বসিয়ে দেবার কোশিস করল। মুচকি হেসে বল্ল—'তোমার মোটে খেলার দিকে মতি নেই, ঘুঁটির দিকে চোখ না রেখে হরবখত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে খেলতে গিয়ে ধৈর্যচ্যুতি তো ঘটবেই। আমার মুখে দাবার ঘুঁটি বা ছক কোনটিই নেই।' বক্তব্য শেষ করেই সে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

জাইন এবার বল্ল—'এক শ' দিনারের খেলায় তেমন জুঁত নেই, তার চেয়ে বরং বাজীর মান বাড়িয়ে এক হাজার করা হোক, আপত্তি নেই তো?'

—'কিছুমাত্রও আপত্তি নেই, তুমি সামাল দিতে পারলেই হ'ল।' বাজির পরিমাণ এক শ' দিনার থেকে বেড়ে এক হাজার দিনার হওয়াতেও আনিস-এর চোখের মণি দুটো জাইন-এর মুখাবয়ব থেকে নেমে গিয়ে দাবার ছকে নিবদ্ধ হ'ল না কিছুতেই।

জাইন বল্ল—'এর পর আর একশ' বা হাজার নয়। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যার যা আছে সর্বস্ব বাজী করে খেলায় নামতে হবে। রাজী তো?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে আনিস বল্ল—'তোমার কাছে তো আমি আমার সর্বস্ব হারাতে পারি। ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছিও, আর তো কিছু হারাবার ভয় ডর আমার থাকার কথা নয়।'

—'হারতে যে আমিও পারি। আমার বিলকুল সম্পত্তি, ধন দৌলত এখন তোমার হতে পারে।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই আনিস তার সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়ে গেল।

জাইন এবার বল্ল—'তোমার তো সবই গেছে, আর কেন? এবার এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়।'

দোহাই তোমার। আমার স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি আছে বিলকুল তোমাকে দানপত্র করে দিচ্ছি। এতে আমার কলিজা এতটুকুও দুর্বল হবে না। লেকিন মেহেরবানি করে আমাকে তোমার সামনে থেকে চলে যেতে বোলো না। তোমার অদর্শনে আমার জান টিকবে না মেরে জান। দোয়া কর, তোমার মুখোমুখি বসে থাকার অনুমতি দাও।'

আনিস এবার কাজী ডেকে তার বিলকুল সম্পত্তি জাইন-এর নামে দানপত্র করে দিল।

দানপত্রটি হাতে নিয়ে জাইন ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বল্ল—'শোন, এ মুহূর্ত থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একদম চুকে গেল।'

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে জাইন এবার বল্ল—'শোন গো, আমারও দিল্-কলিজা চায় তোমার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তুলি। তোমাকে নিয়ে সম্ভোগ করি। লেকিন খালি হাতে সম্ভোগ তো আর হতে পারে না, ঠিক কি না? মজা লুটবে আর চিৎ হাত উপুর করবে না, আজব বাৎ শোনাচ্ছ তো!'

—'শোন চার হাজার সোনার মোহর। চার বোতল চমৎকার

খুসবুওয়ালা আতর আর চারটি খচ্চর তো আগে নিয়ে এসো, পরে আর যা কিছু সব বিবেচনা ক'রে বলছি। এগুলো হাজির করলেই তোমার কামনা-বাসনা বিলকুল পূর্ণ করব।'

আনিস ঘাড় কাৎ ক'রে বল্‌ল—'ঠিক আছে, তোমার দাবী আমি জরুর পূর্ণ করব।' সে এবার কামরা থেকে বেরিয়ে পথে নামল।

জাইন-এর নির্দেশে তার প্রধানা সখী হুবুব 'আনিস'কে অনুসরণ করতে লাগল। সে এমন দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটতে লাগল যাতে আনিস কিছু বুঝতে না পারে।

এদিকে আনিস'কে হুবুব অনুসরণ করছে বুঝতে পেরে তার কোন ইয়ার-দোস্তও তাকে কোনরকম সাহায্য করল না।

আনিস ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার পর হুবুব এগিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'আমার মালকিন আপনাকে একবারটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।'

হুবুব-এর সঙ্গে আনিস ফিরে এল, কামরায় ঢুকেই আনিস চমকে ওঠে। দেখল, জাইন শাহজাদীর ঝলমলে সাজ-পোশাক পরে একটি আসনে গম্ভীর মুখে বসে। বেহেস্তের হুরী যেন জমিনে নেমে এসেছে। অপলক চোখে আনিস তার রূপ-সৌন্দর্যসুধা পান করতে লাগল। জাইন মুচকি হেসে আসন ছেড়ে উঠে এসে আনিস এর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তার পাশের একটি শূন্য আসনে বসাল।

পরিচারিকারা খানাপিনা সাজিয়ে দিল। পাশাপাশি বসে তারা খানা সারল। এক পেয়ালায় দু'জনেই সরাব পান করল।

জাইন আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌ল—'একই টেবিলে বসে আমরা উভয়ে যখন নিমক-রুটি খেলাম তখন তুমি আমার মেহমান বনে গেলে। তাই তোমার কাছ থেকে একটি কানাকড়িও আমি আর হাত পেতে নিতে পারব না, তুমি দলিল ক'রে আমাকে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি দিয়েছ বিলকুল তোমার হাতে ফিরিয়ে দিলাম।'

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের আনাগোনা লক্ষ্য ক'রে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয় শ' আটান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, জাইন এবার আনিস-এর হাত ধরে পালঙ্কে নিয়ে গেল, তাকে বসাল। এবার নতুন করে দাবা খেলা শুরু হ'ল। দাবার সফেদ ঘুঁটি আনিস-এর ভাগে পড়ল। আর লাল ঘুঁটি পড়ল জাইন এর ভাগে।

এক-দুই-তিন ক'রে পর পর পাঁচ বার জাইন নওজোয়ান আনিস-এর কাছে হেরে একদম ভূত হয়ে গেল।

আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে জাইন এবার আনিস'কে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! তোমার সফেদ ঘোড়া যে একদম বাজীমাৎ ক'রে ফেল্‌ল। তোমার সফেদ ঘোড়ার পাল্লায় পড়ে আমার জান খতম হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল।'

এক পরিচারিকা সরাবের পেয়ালা আর খুসবুওয়ালা গুলাবী সরাবের বোতল দিয়ে গেল। জাইন পেয়ালা ভরে সরাব নিয়ে একটি দিল মেহমান আনিস-এর হাতে গুলাবী সরাবের নেশায় কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ে একদম মশগুল হয়ে গেল।

জাইন পালঙ্কে শরীর এলিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'আনিস, তোমার সান্নিধ্য আজ যে সুখ দিল তা জিন্দেগীভর ইয়াদ থাকবে। তুমি আমার দিল্ বিলকুল চুরি করে নিয়েছ।

এর পর থেকে তুমি এক রোজের জন্যও আমার চোখের আড়াল হলে আমার জান খতম হয়ে যাবে। বেহেস্তে চলে যাব আমি।'

রাতভর তারা পরস্পরকে আদর, সোহাগ-আলিঙ্গন, দলন আর পেষণে নিজেদের লিপ্ত রাখল।

পরের রাত্রি তারা সম্ভোগ সুখ লাভ করল। আনিস-এর জিন্দেগীর প্রথম সম্ভোগ সুখ উপভোগ।

তুলার মাফিক নরম, তুলতুলে এক তাল জেনানা-গোস্ত যে, একটি পুরুষকে এমন সুখ-সায়রে ভাসিয়ে দিতে পারে, আনিস এর আগে কোনদিন খোয়াবের মধ্যেও তা ভাবতে পারে নি।

জাইন মুস্তয়ামিফ বিবাহিতা। তার স্বামী পরদেশে সওদাগরী কারবারে লিপ্ত। এক ভোরে সে তার স্বামীর এক চিঠি পেল। পরদেশের কাম কাজ মিটিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই সে নিজের মুলুকে ফিরে আসছে।

আনিস'কে বুকে জড়িয়ে ধরে জাইন চোখের পানি ঝরাতে লাগল। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বল্‌ল—'মেহেবুব আমার, তোমাকে ছাড়া যে আমার জান টিকবে না। এখন উপায়?'

—'তোমার স্বামী তো আর হরবখত কামরায় পড়ে থাকবে না। আমরা ফন্দি ফিকির বের করে ঠিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে

পারব। একটি পুরুষের চোখে ধোঁকা দিতে না পারলে কেমন জেনানা তুমি?'

—'আমার স্বামী রত্নটিকে তো আর তুমি চেন না। যদি চিনতে তবে আর এরকম কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হতো না, তাকে জল্লাদের চেয়ে পাষাণ হৃদয় ভাবতে পার। আমি তোমাকে নাগর বানিয়ে সম্ভোগ সুখে লিপ্ত। যদি সে একথা জানতে পারে তবে তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে, নয় তো এক কোপে ধড় থেকে তোমার মুণ্ডুটি নামিয়ে দেবে।'

—'ধ্যুৎ, কেন ঝুটমুট মিছে ভেবে মরছ মেহেবুবা? সময় মাফিক ফিকির কিছু না কিছু বেরিয়েই যাবে, দেখে নিও।'

—'সাচ্চা বটে, তুমি তো তাকে চেন না। দুনিয়ার কোন লেড়কি বা জেনানাকেই সে বিশোয়াস করে না। তার মতে দুনিয়ার বিলকুল জেনানাই নাকি একজন করে নাগরের তসবির বুকে এঁকে রাখে। এরকম পরিস্থিতিতে তুমি যে কি ক'রে নিজের অধিকার অব্যাহত রাখবে, ভেবে আমার দিল্ হাহাকার করে উঠছে।'

দীর্ঘ সময় ধরে জাইন ফন্দি-ফিকির নিয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে থাকে। এক সময় সোল্লাসে বলে উঠল—'মিলেছে মতলব একটি মিলেছে বটে, একদম বেড়ে মতলব। তুমি কাঁধে একটি ঝোলা নিয়ে আমার স্বামীর দোকানে হাজির হবে। বলবে, মসল্লাপাতি, হিং আর খুব জাদা খুসবুওয়ালা আতর ফেরি ক'রে বেড়াও। তারপরের কাজ আমার। তবে ইয়াদ রাখবে, ভুলেও যেন তার কাছে দু'রকম বাৎ বোলো না। সে যত জেরাই করুক না কেন ভুলেও বক্তব্য নড়চড় করবে না, ইয়াদ থাকে যেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা মতলব। লেকিন সওদাপত্রগুলোর দাম জানা দরকার। আর একটু-আধটু তালিম নেয়াও দরকার। তবে আজ থেকেই ঝুলে পড়ি, কি বল?'

একদিন জাইন-এর স্বামী পরদেশে সওদাগরি কাজ মিটিয়ে মুলুকে, নিজের মকানে ফিরে এল। দরওয়াজায় পা দিয়ে বিবির চোখ-মুখের দিকে চোখ পড়তেই সে যেন আচমকা একটি হোঁচট খেল। চোখ দুটো বিলকুল কপালে তুলে বল্‌ল—'বিবিজান, তোমার একী সুরৎ হয়েছে! চোখ-মুখ ফ্যাকাসে, চকের মাফিক সফেদ। তোমার কোন বিমারি-টিমারি হয়েছে নাকি?'

জাইন-এর ছল চাতুরী তার স্বামী ধরতে পারল না। সে জাফরানের পানি গায়ে মেখে শরীরের চামড়াকে এমন ফ্যাকাসে ক'রে তুলেছে। আর এর ফলে তাকে এক লহমায় দেখলে বিমারিগ্রস্ত বলে মালুম হচ্ছে।

জাইন কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'তুমি তো দিব্যি পরদেশে মৌজ ক'রে ঢুঁড়ে এলে। আর আমি এদিকে বিমারির সঙ্গে লড়াই করে তোমাকে শেষ দেখা দেখার আশায় কোন-রকমে জান টিকিয়ে

রেখেছি। তোমার চিঠিটি হাতে পাওয়ার পর কলিজাটি ঠাণ্ডা হয়েছে। আমাকে যে ফ্যাকাসে, চকের মাফিক সফেদ দেখাচ্ছে সে কিন্তু বিমারির জন্য নয়। তোমাকে দীর্ঘদিন চোখের সামনে না দেখার ফলে আমার খানাপিনা উঠে গেছে, রাত্রে দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না—স্রেফ তোমার জন্য আমার এ হালৎ হয়েছে। এবার থেকে পরদেশে গেলে জেনানা কাউকে আমার কাছে রেখে তবে যাবে, ইয়াদ থাকে যেন। একটি জেনানা একদম একেলা এতবড় এক ইমারতে থাকলে ভয়-ডর তো লাগতেই পারে।'

বিবির মুখের বাৎ শুনে সওদাগর তো আহ্লাদে একদম গদগদ। তার একটি হাত চেপে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে ব'লে উঠল—'বিবিজান, আমি কসম খাচ্ছি, তোমার মতামত ছাড়া আমি মুলুক ছেড়ে যাওয়া তো দূরের ব্যাপার এমন কি মকানের বাইরেও কোনদিন যাব না। যাক আমি তো বহাল তবিয়তেই তোমার কাছে ফিরে এসেছি। আশা করি এবার তোমার উৎকণ্ঠা দূর হয়েছে, কি বল? এবার সে বিবি জাইন'কে আলিঙ্গন ক'রে তার ঠোঁটে গালে, ও কপালে বার-বার চুমু খেয়ে দোকানের উদ্দেশ্যে পা-বাড়াল।

সওদাগর দোকান খুলে গদিতে বসতে না বসতেই আনিস আতর, হিং আর মসল্লার ঝোলা কাঁধে তার দোকানের সামনে এসে আদাব জানাল। জাইনের স্বামী সওদাগর আনিস'কে জলচৌকি পেতে বসতে দিল। ব্যবসাপাতির ব্যাপারে বহুৎ আলোচনা হ'ল উভয়ের মধ্যে। এবার বাজার অপেক্ষা সস্তা পেয়ে সে আনিস-এর কাছ থেকে সওদা খরিদ করল।

এবার আনিস তার কাছে ঘন-ঘন আসতে লাগল। কয়েক দিনের বাৎচিতেই সওদাগর আনিসের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়। সে এবার আনিস'কে প্রস্তাব দিল—'ভাইয়া কেন আর ঝুটমুট সওদার ঝোলা কাঁধে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঢুঁড়ে বেড়াবে। তার চেয়ে বরং আমার কারবারের অংশীদার বনে যাও। আমাকে মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়াতে হয়। তুমি যদি তখন এ-দোকানটি দেখ-ভাল কর তবে আমি নিশ্চিন্তে পরদেশে গিয়ে সওদা খরিদ করে নিয়ে আসতে পারব। বেশী নয়, মাত্র হাজার দশেক দিনার জোগাড় কর তবে আমার কারবারের অংশীদার বনে যেতে পারবে।'

আনিস এরকম একটি মওকা হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে হাতছাড়া করতে নারাজ। আর দশহাজার দিনার তার কাছে সামান্য ব্যাপার। হাতের ময়লার সামিল। পরদিন সকালেই আনিশ দশ হাজার দিনার নিয়ে সওদাগরের দোকানে হাজির হ'ল। বাজারের দু'জন নামজাদা সওদাগরকে সাক্ষী রেখে কারবারের অংশীদার হওয়ার দলিল বানানো হ'ল। উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করল। কাজ চুকে গেল। আনিস সওদাগরের কারবারের অংশীদার বনে গেল।

আনিস আরও খুশী হ'ল যখন সওদাগর একসঙ্গে বসে খানাপিনা

সারবে বলে তাকে নিজের মকানে নিয়ে গেল। আদতে সে তো এরকমই কিছু চাইছে।

আনিস'কে মকানে নিয়ে বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে সওদাগর নিজে অন্দরমহলে চলে গেল। বিবি জাইন'কে বল্‌ল—'বিবিজান, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই এক কাজ করে বসেছি। কারবারের একজন অংশীদার নিয়ে নিয়েছি। এ ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। আমি পরদেশে সওদা খরিদ করতে গেলে এদিকে কারবার বিলকুল বন্ধ হয়ে যায়। ঠেকা বে-ঠেকায় অংশীদার এদিকটি সামাল দিতে পারবে। একদম সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

জাইন তো আগেই জানালা দিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার মেহেবুব আনিস'কে আসতে দেখেছে। আর তাকে কারবারের অংশীদার ক'রে নেয়ায় তার দিল্‌ খুশীতে নেচে উঠবে, আশ্চর্য কি! তবু খুশী চেপে রেখে বল্‌ল—'তুমি যখন বুঝেছ অংশীদার রাখলে কারবারের সুবিধা হবে তাতে আমার আর কি-ই বা বলার থাকতে পারে। তা তোমার অংশীদারটির ব্যভার, মানে স্বভাব-চরিত্র কেমন আঁচ পেয়েছ কিছু?'

—'সে ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না বিবিজান। আমি দুনিয়া চষে বেড়াই। আদমির চরিত্র যাচাইয়ের ব্যাপারে আমাকে তুমি কষ্টি-পাথর জ্ঞান করতে পার। এ-আদমির সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে। একদম মিট্টির তৈরী আদমী জ্ঞান করতে পার। সঙ্গে ক'রে নিয়েই এসেছি। বাইরের কামরায় আছে। আজ সে আমাদের মেহমান। আজ আমাদের খুশীর দিন। তাই এক সঙ্গে খানাপিনা সারব।'

জাইন চোখে-মুখে কৃত্রিম বিষণ্ণতার ছাপ এঁকে এবার বল্‌ল—'এক পরপুরুষকে একদম মকানে নিয়ে এলে? তার ব্যভারের ব্যাপারটি সম্বন্ধে আর একটু ভাবনা-চিন্তা করে নেয়া উচিত ছিল না কি?'

—'আরে ধুৎ, আমার দোস্ত, আমার কারবারের অংশীদার তো একদম আমার নিজের আদমি। তার জন্য তুমি ঝুটমুট ভয় ডর কিছু কোরো না। আমি বুঝে শুনেই তো তাকে মকানে নিয়ে এসেছি।'

—'তুমি যা-ই বল না কেন, পরপুরুষের সামনে আমি বোরখা টোরখা খুলে যেতে পারব না।' কৃত্রিম গোস্‌সা প্রকাশ ক'রে জাইন বল্‌ল।

—'তুমি ব্যাপারটি নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছ বিবিজান। আমরা তো আর সাচ্চা মুসলমান নই, ইহুদী। মুশা কি কোথাও বলেছেন, জেনানাদের বোরখা প'রে কামরার কোণে বসে থাকতে হবে? বরং বলেছেন, দিল্‌ খোলসা ক'রে সবার সঙ্গে দোস্তি কর, বিলকুল আপনাজনের মাফিক ব্যভার কর।'

—'তুমি যখন এতজোর দিয়ে বলছ তখন আর পরপুরুষ হলেও তার ব্যাপারে তেমন আপত্তি থাকবে না। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলে যদি তোমার কারবারের সুবিধা হয় তখন তো ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে বাৎচিৎ করতেই হবে।'

আনিস ঘাঘু মাল। ভুলেও জাইন-এর দিকে তাকাল না, ভেজা বেড়ালের মাফিক ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইল।

জাইন-এর স্বামী সওদাগর ভাবল, দু'-চারদিন আসা-যাওয়া করলেই উভয়ের জড়তাটুকু কাটিয়ে তারা উভয়ে সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে।

এদিকে আনিস-এর বাইরের লাজুক লাজুক স্বভাব ও বিনয় জাইন-এর স্বামী সওদাগরকে মুগ্ধ করল, পুরোপুরি বিশ্বাস এনে দিল।

সে-রাত্রে তারা মুখোমুখি বসে খানাপিনা সারল। পরদিনও আনিস সওদাগরের সঙ্গে তার মকানে এল। এক সঙ্গে খানাপিনা সারল। দু'চারদিন এভাবে চলার পর আনিস ও জাইন তাদের কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশটুকু খুলে ফেলে ক্রমে সহজ হয়ে উঠতে লাগল। সওদাগর নিঃসন্দেহ হল আনিস সাচ্চা নওজোয়ান। সাচ্চা তার চরিত্র, একদম নিরাপদ। বাজে ধান্ধার কোন লক্ষণই তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না। নিশ্চিন্ত হতে পারল।

এবার থেকে আনিসকে বাড়িতে রেখে সওদাগর নিশ্চিন্তে কাজের ধান্ধায় বেরিয়ে যায়।

বাইরে চলে যায়। এমন অনেক দিন হয় রাত্রে মকানে ফিরতেই পারে না। এরজন্য তার মধ্যে কোনরকম দুশ্চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না।

একদিন সওদাগর একটু বেশ রাত্রি করেই মকানে ফেরে। দরওয়াজায় পা দিয়েই থমকে যায়। আনিস আর জাইন-এর আচরণ তার কাছে তেমন ভাল ঠেকল না। সন্দেহের বীজ তার মধ্যে দানা বাঁধল। একদম বেশরম আদমিদের যে স্বভাব হয় তাদের মধ্যে তা-ই ক্রমে প্রকাশ পেতে লাগল। সওদাগর ভাবল নির্ঘাৎ জাইন তার সঙ্গে ছল চাতুরিতে লিপ্ত হয়েছে।

সওদাগর এবার থেকে গোপনে আনিস আর তার বিবি জাইন-এর মতিগতির ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল। সুযোগের সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে লাগল। একদিন বাগে পেলে তাদের হাতে নাতে ধরবে। ফাঁদ ছড়িয়ে দিল। শত্রুকে জালে আটক করতেই হবে।

সওদাগর এক বিকালে অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগেই মকানে ফিরে এল। কোতোয়ালকে সে নিমন্ত্রণ করেছে। একসঙ্গে খানাপিনা সারবে স্ত্রীকে বলে গিয়েছিল। তার স্ত্রী যথাসময়ে হরেক কিসিমের খানাপিনা পাকিয়ে ফেলেছে। কোতোয়াল নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন, কম ব্যাপার!

সওদাগর মকানে ফিরে এসে দেখল সব বন্দোবস্ত পাকা। এবার

সে কোতোয়ালকে নিয়ে আসার বাহানা করে মকান ছেড়ে চলে গেল। মকানে রইল আনিস আর জাইন। তাঁরা ভাবল কোতোয়ালকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে।

এদিকে সওদাগর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও ফিন গোপনে

বাড়িতে ঢুকে গোপন স্থানে আত্মগোপন করে রইল।

সওদাগর মকান ছেড়ে চলে গেছে অনুমান ক'রে জাইন আনিস-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার কণ্ঠলগ্না হয়। আনিস'কে বার বার চুম্বন করতে লাগে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার কলিজার জ্বালা শুরু হয়ে যায়। এক হেঁচকা টানে আনিস'কে পালঙ্কের ওপর ফেলে দেয়। এবার শুরু হয়ে যায় পুরোদমে দলন ও পেষণ। আনিস-এর মধ্যে সম্ভোগের তৃষ্ণা শুরু হয়ে যায়।

এদিকে গোপন অন্তরাল থেকে সওদাগর তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ভাবতে লাগল—জাইন-এর মাফিক নওজোয়ান বিবির খাই মেটাতে হলে আনিস-এর মাফিক তাগদ থাকা চাই। তার মাফিক ভাঁটা পড়া যৌবন নিয়ে লড়া সম্ভব নয়। ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মাফিক কামড়ে, চুম্বন ক'রে, ঠোঁট চুষে আনিস'কে সে যেভাবে নাস্তানাবুদ করছে তার এক কণামাত্রও সে তাকে নিয়ে ক্ষিপ্ত হতে পারে না। আদতে তাকে নিয়ে শুলে জাইন-এর যৌবন জ্বালা এখন আর তেমন মাথাচাড়া দিয়েই ওঠে না। লেকিন আনিস-এর সমান যৌবনের জোয়ার সে কোথায়ই বা পাবে?

এক সময় জাইন এক ঝটকায় পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। সালোয়ার কামিজ পরতে পরতে বলে—'আনিস, কোর্তা-পাৎলুন জলদি চাপিয়ে নাও। সময় হয়ে এসেছে। নচ্ছার সওদাগর যে কোন সময় ফিরে আসতে পারে।'

আনিস ব্যস্ত-হাতে পাৎলুনের ডুরি বাঁধতে বাঁধতে বল্‌ল—'আর একটু আগে খেয়াল করবে তো!'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সওদাগর দরওয়াজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌ল—'নসীব মন্দ। কোতোয়াল সাহাবের সঙ্গে ভেট হ'ল না। তিনি এক খুনের মামলার ব্যাপারে নগরের বাইরে চলে গেছেন। আর না ফেরারই সম্ভাবনা। জাইন, খানা সাজাও। আমরাই সদ্ব্যবহার করি।'

খানাপিনা সেরে আনিস তার নিজের জায়গায় শুতে চলে যায়। সওদাগরের পাশে এসে জাইন শুয়ে পড়ে। তাকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করতে থাকে।

সওদাগর নিরাসক্ত। সে আড়ষ্ট হয়ে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে। সওদাগর কোর্তার জেব থেকে একটি চিঠি বের করতে করতে বল্‌ল—'আমার এক দালাল চিঠিটি পাঠিয়েছে। বহুৎ দূরের মুলুকে থাকে। বহুৎ বহুৎ জরুরী দরকার। খুব ভোরেই আমি রওনা হয়ে যাব।'

স্বামীর বাৎ শুনে জাইন-এর কলিজা খুশীতে নাচানাচি শুরু করে দেয়। লেকিন বহুৎ কায়দা-কসরৎ করে নিজেকে সামলে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে থাকে।

সওদাগর বলে—'বহুৎ দূরের মুলুক। ফিরতে দেরী হবে। তাই আমি ঠিক করেছি, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বিবিজান। নয়া নয়া মুলুকে আর বন্দরে ঢুঁড়লে দিল্ খুশীতে নেচে উঠবে।'

—'ইয়া আল্লাহ!' ধরতে গেলে জাইন আর্তনাদই ক'রে উঠল। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য মেতে ওঠে। চোখ-মুখের ভাব বদলে নিয়ে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! কী খুশীতে না দিল্ ভরে উঠবে। নয়া মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়ানো ক'জন জেনানার নসীবে কুলায় বল তো!'

—'তবে ইয়াদ রাখবে, রাত থাকতে উঠে বাক্স-পেটরা গোছ-গাছ ক'রে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

জাইন-এর মাথা ইতিমধ্যেই চক্কর মারতে শুরু করেছে।

—'কি গো, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে যে, ব্যাপার কি?' জাইন হকচকিয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—'ভাবছি, আমার নসীবে তবে নয়া নয়া মুলুক দেখার—'

—'ধ্যুৎ, এতে ফিন নসীবের কি দেখলে? তোমার আগ্রহ থাকলে তো কবেই আমার সঙ্গে তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে ফেলতে পারতে বিবিজান। যাক, খুব ভোরে উঠতে হবে। কোশিস ক'রে দেখ যদি

নিদ আসে।'

কাকডাকা ভোরে একটি উটের পিঠে সামানপত্র চাপিয়ে নিয়ে সওদাগর তার বিবি জাইনকে নিয়ে তার পিঠে চেপে বসল। আর তাদের সঙ্গে চল্‌ল জাইন-এর চার সহচরী আর উট আর খচ্চরের মালিক।

বিদায় নেবার আগে জাইন এক টুকরো খড়িমাটি দিয়ে দরওয়াজার গায়ে একটি কবিতা লিখে রেখে যায় যার সারমর্ম হল—'দোস্ত, আজ তুমি কতদূরে। তবু তোমার কলিজার তুফানের উত্তাপ আমি আমার কলিজার মাধ্যমে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। খোদাতাল্লার কসম। তোমার বুক থেকে কেউ-ই আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না একটি মুহূর্তের জন্যও। দুনিয়াটা যদি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধূলোয় পরিণত হয় তবুও আমরা দু'জনে এক সঙ্গে, পাশাপাশি-কাছাকাছি অবস্থান করব।'

সকাল হ'ল। বেশ বেলা হয়ে গেছে। অন্য দিনের চেয়ে একটু বেলা করেই আনিস দোকানে আসে। আজব ব্যাপার, দেখে সওদাগর দোকান খুল্‌ল না। ব্যাপারটি আনিস'কে ভাবিয়ে তুল্‌ল। লম্বা লম্বা পায়ে সে জাইন-এর মকানে চলে এল। দরজার কাছে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখে পড়ে দরওয়াজায় লেখা কবিতাটি। কবিতাটি পড়তেই তার কলিজা মোচড় খেয়ে ওঠে। সে এক লাফে কামরার মধ্যে ঢুকে যায়। তাদের প্রতিবেশীরা বলে—সওদাগর তার বিবিকে নিয়ে দূর মুলুকে চলে গেছে। কয়েক বছরের মধ্যে তারা ফিরে আসবে ব'লে সম্ভাবনা খুবই কম।'

মেহেবুবার অন্তর্ধানে আনিস একদম ভেঙে পড়ল। হরদম চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

এদিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পথ চলার পর সওদাগর তার বিবিকে নিয়ে এক শহরের একান্তে উঠের পিঠ থেকে নামল। দরিয়ার ধারে সে তাঁবু ফেলল।

সওদাগর হঠাৎ একদম অগ্নিমূর্তি ধারণ করল। আচমকা বিবি জাইনের চুলের মুঠি ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে গর্জে উঠল—'বেশ্যা মাগী কাঁহিকার। তাড়াতাড়ি সালোয়ার-কামিজ খুলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়া আমার সামনে। আজ দেখব, তোর কাম-জ্বালা কতখানি! তোর সব জ্বালা আজ নিভিয়ে ছাড়ব।'

জাইন তো স্বামীর আচরণে একদম আশমান থেকে পড়ল। ডরে তার দম আড়ষ্ট হয়ে গেল। কেন স্বামী এমন রুষ্ট হয়েছে, কিছুই সে মালুম করতে পারল না।

সওদাগর ফিন বাজখাই গলায় তড়পাতে থাকে—'কী রে মাগী, আমার বাৎ কানের ছ্যাদা দিয়ে যাচ্ছেনা বুঝি? দাঁড়া তোর কামড় কত আমিই দেখছি।' বলতে বলতে সে খ্যাপা নেকড়ের মাফিক জাইন-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজেহাতেই তার সালোয়ার-কামিজ প্রভৃতি যা কিছু গায়ে ছিল এক এক ক'রে ছিঁড়ে ফাঁতা ফাঁতা ক'রে দিতে লাগল। এক লহমার মধ্যে তাকে বিলকুল ন্যাংটা ক'রে ফেলল। এবার চামড়ার একটি চাবুক এনে তার বুকে, পিঠে, তলপেটে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল। জাইন মিট্টিতে পড়ে একদম কাৎরাতে লাগল। এক লহমায় তার তুলতুলে-সফেদ শরীরটি খুনে জবজবে হয়ে গেল। তবু চাবুক বন্ধ হল না। এক সময় যন্ত্রণাকাতর জাইন এলিয়ে পড়ল। বেঁহুস হয়ে হাত-পা ছেঁড়ে দিল। হাতের চাবুকটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সওদাগর ব'লে উঠল,—'বজ্জাত ছিনাল মাগী, এ-ই তোর উচিত দাওয়াই। থাক পড়ে।'

সওদাগর এবার ছুটে গিয়ে এক কামারকে ডেকে এনে বল্‌ল—'এই বজ্জাৎ চরিত্রহীনা মাগী আমার চোখে ধুলো দিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে ছিনালি ক'রে বেড়ায়। দাওয়াই দিয়ে বেহুঁস করে রেখেছি। তুমি এর পায়ের বেড়ি বানিয়ে দাও।'

খুনে জবজবে বেহুঁস জাইনকে দেখে কামারের মাথায় খুন চেপে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। সে সওদাগরের ওপর গর্জে উঠল—'জানোয়ার কাঁহিকার' জেনানার ওপর অত্যাচার চালাতে তোর শরম লাগল না! আমি কোতোয়ালের কাছে চল্‌লাম। তোর বিচার হবে, ফাটকে আটক করিয়ে ছাড়ব তোকে।'

একটু বাদেই এক দল সিপাহী ছুটে এল। সওদাগর ও তার খুনে

মাখামাখি বিবিকে নিয়ে গেল কোতোয়ালের দরবারে।

জাইন-এর সুরৎ দেখে কোতোয়ালের তো দিমাক একদম ঘুরে যাবার জোগাড় হ'ল। এক লহমায় তাকে দেখেই তার জিভ রসিয়ে উঠল। কলিজায় দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল।

কোতোয়াল সওদাগরের দিকে আঙ্গুল-নির্দেশ ক'রে জাইনকে বল্‌ল—'এ জানোয়ারটি কে হয় তোমার?'

—'হুজুর, এ আমার কেউ-ই হয় না। হতচ্ছাড়াটি এক শয়তান ইহুদী আমার আব্বা আর আম্মাকে বেদম মারধোর করে এখানে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে। তারপর দরিয়ার ধারে, নির্জন জায়গায় নিয়ে এসে বেধড়ক চাবুক চালায় আর বলে বজ্জাৎ মাগী, বল ইসলাম ছেড়ে খ্রীষ্টান হবি কিনা, বল? বলে আর সপাং সপাং করে বেধড়ক চাবুক চালায়। আপনিই বলুন তো হুজুর, চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম কি এক লহমায় ছেড়ে দেয়া যায়। লেকিন শয়তান ইহুদীটি বেদম হুজ্জতি চালাতে লাগল।' পিঠ ও হাত-পা দেখিয়ে এবার বল্‌ল—'এই দেখুন হুজুর, নচ্ছারটি আমাকে আদর-সোহাগ করে কি হালৎ ক'রে ছেড়েছে।' এবার সলজ্জভাবে হাঁটুর ওপরের ও বুকের কাছাকাছি কিছু অংশের কাপড়া তুলে দেখাল।

কোতোয়াল জুল্ জুল্ করে তাকিয়ে সাধ্য মাফিক জাইন-এর দেহের যৌবন চিহ্নের যতটুকু দেখে নেয়া যায় সে কোশিসের ত্রুটি করল না।

জাইন বল্‌ল—'হুজুর, আমার বাৎ বিশোয়াস না হয় তো কামার ভাইয়ার কাছে কি রকম জানোয়ারের মাফিক নির্মম-নিষ্ঠুর প্রস্তাব দিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করে দেখুন। শয়তানটি বলেছিল—আমার পায়ের বেড়ি বানিয়ে দিতে। খোদা ভরসা, কামার ভাইয়া রাজী না হয়ে আপনার দরবারে আর্জি জানিয়ে আমার জান রক্ষা করে। হুজুর, বিচার করবেন। আল্লাহ-ই আমার একমাত্র উপাস্য, আপনি আমাকে শূলে চড়ান, গর্দান নেয়ার হুকুম দিন, হাসিমুখে মেনে নেব। লেকিন আমাকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দুসরা কোন ধর্ম গ্রহণ করাবেন না।'

কোতোয়ালের চোখ দিয়ে যেন আগুনের গোলা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। তীরবিদ্ধ চিতার মাফিক গর্জে উঠলেন—'শয়তান বেতমিস ইহুদী কাঁহিকার। চোখে দেখ, তোর মৌউৎ হাজির, সবার আগে জবাব দে, কেন লেড়কিটিকে তার আব্বা আর আম্মার হেফাজত থেকে ছিনিয়ে এনে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করানোর জন্য এমন জানোয়ারের মাফিক জুলুম চালিয়েছিস?'

সওদাগর কোতোয়ালের কথা জবাব দিতে গিয়ে জানাল, জাইন তার শাদী করা বিবি। সে-ও বটে ইহুদী, তাকে ইসলাম ত্যাগ করার প্রস্তাব দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আদৎ ব্যাপার সে পরপুরুষের প্রতি আসক্তা। সেজন্যই গোস্‌সায় হামলা-হুজ্জতি চালিয়েছে, চাবুক মেরে তার চরিত্র শোধরাবার কোশিস করেছে।

কোতোয়াল তার সাফাই গাওয়ার ব্যাপারটিকে আমলই দিল না। জাইন একে খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি তার ওপর চাবুকের ঘায়ে তার সারা গা দিয়ে খুন ঝরছে। কোতোয়ালের দিল্ কোনমতেই নরম হ'ল না, হওয়ার ব্যাপারও নয়।

কোতোয়াল জল্লাদকে হুকুম দিলেন—'একে উলঙ্গ করে পাছায় এক শ' আর সারা গায়ে এক শ' ঘা চাবুক লাগাও। তারপর এর হাত-পা কেটে ফেল।'

জাইন কোতোয়ালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। তার হাসি দেখে কোতোয়ালের কলিজা মোচড় মেরে উঠল। সাধ হ'ল তাকে একটু আদর-সোহাগ করতে। লেকিন সিপাহী-জল্লাদের সামনে তো আর সেসব কাম কাজ সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না দেখে নিজেকে সামলেই রাখতে হ'ল।

জাইন এবার কোতোয়ালি থেকে বেরিয়ে সোজা তাঁবুতে ফিরে গেল। তাবু গুটিয়ে উট-খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে সে সহিসদের সঙ্গে পথ চলা শুরু করল।

জাইন সহিসদের সাহায্য-সহযোগিতায় একনাগাড়ে তিনদিন-তিনরাত্রি চলার পর সহিসরা বল্‌ল—'আন্ধার হয়ে আসছে, সামনে এক খ্রীষ্টান গীর্জা। এ-জায়গা ভাল না। ডাকাতদের উৎপাত হরদম চলে।'

গীর্জার পাদরী বুড্ডা। একদম বুড্ডা। দাঁড়ালে হাঁটু কাঁপে। লেকিন বুড্ডা হ'লে কি হবে, নওজোয়ান লেড়কি দেখলে তার দিমাক ঠিক থাকে না। কলিজার ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। আর দিল্ একদম চনমনিয়ে ওঠে।

সহিসদের সঙ্গে জাইন রাত্রি কাটাবার আশায় গীর্জায় হাজির হ'ল। বুড্ডা পাদরীর সামনে হাজির হয়ে সে আশ্রয় ভিক্ষা করল। খুবসুরৎ জেনানা জাইন'কে সামনে দেখে-বুড্ডা পাদরী জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিতে নিতে নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে জুল্ জুল্ ক'রে নাচাতে লাগলো। বিকৃত কামনার জ্বালায় তার কলিজা একদম ছটফট করতে লাগল। এক লহমার মধ্যেই তার শ্বাসক্রিয়া দ্রুত হয়ে উঠল।

জাইন তার অভিজ্ঞতা সম্বল ক'রে বুড্ডা পাদরীর হালৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করে নিল। চরম দুঃসময়েও তার হাসির উদ্রেক করল। সাধ্যাতীত কোশিস ক'রে নিজেকে একটু সামলে নিল। কণ্ঠস্বরে মিনতি ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'ঠাকুরদা, মাত্র একটি রাত্রির জন্য আমরা আশ্রয় প্রার্থী। মেহেরবানি করে যদি রাত্রিটুকু গুজরান করার বন্দোবস্ত করে দেন তবে ধন্য হই।'

'ঠাকুরদা' শব্দটি কানে যেতেই বুড্ডা পাদরীর তোবড়ানো গালের হাসিটুকু নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। তবু উৎসাহ প্রকাশ করেই জাইন ও তার সঙ্গীদের রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত ক'রে দিল।

ব্যাপারটি জাইন-এর কাছে মোটেই সুবিধের মালুম হ'ল না। মাঝ রাত্রে নখ-দাঁতহীন অক্ষম অপদার্থ বুড্ডা যদি তার চেলাদের সাহায্যে সালোয়ার-কামিজ খোলার জন্য জুলুম শুরু করে দেয় তবেই ইজ্জৎ খোয়া যাবে। এরকম চিন্তা ক'রে জাইন তাঁবু তোলার নির্দেশ দিল। এ-বুড্ডার হাতে বে-ইজ্জৎ হওয়ার চেয়ে পথে ডাকাতদের কবলে পড়ে জান খোয়ানোও শতগুণে শ্রেয়।

জাইন-এর হুকুমে তাবু গুটিয়ে নেয়া হ'ল। এবার বুড্ডা পাদরী ও তার চেলাদের চোখে ধূলা দিয়ে তারা রাত্রির অন্ধকারেই নিজেদের মুলুকের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।'

পথের দুর্গমতা আর ডাকাতদের হামলা-হুজ্জতি এড়িয়ে জাইন কিছুদিনের মধ্যেই নিজের মুলুকে পৌঁছে গেল।

নিজের মকানে পৌঁছে জাইন তার সহচরী হুবুব'কে পাঠাল আনিস'কে ডেকে আনার জন্য।

আনিস আসতেই জাইন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁর গালে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ, তোমার চেহারার এ কী হালাৎ হয়েছে মেহেবুব!'

—'কেন ব্যস্ত হচ্ছ জাইন? আমার কলিজা, আমার জান তোমাকে যখন বুকে ফিরে পেয়েছি তখন দেখবে দু'দিনেই বিলকুল ঠিক-ঠাক হয়ে যাবে মেহেবুবা।'

—'আনিস, আল্লাহ্-র মর্জিতে আমার সবচেয়ে বড়া শত্রু দূর হয়েছে। পথের কাঁটা সরে গিয়ে আমাদের মিলনের পথ একদম সাফ সুতরা হয়ে গেছে। জল্লাদ আমার নচ্ছার স্বামীটিকে খতম করে দিয়েছে। এখন আমি শুধুই তোমার। আমার এ দেহ, যৌবনের জোয়ারলাগা দেহটি একদম একেলা ভোগ করার অধিকার তুমি পেয়ে গেছ। আমরা শাদী-নিকা ক'রে নয়া ঘর বানাব। নয়া জিন্দেগী পাব আমরা।'

সন্ধ্যায় কাজী এলেন। সাক্ষীরাও এক-এক ক'রে জড়ো হ'ল। তৈরী হ'ল শাদীনামা। তাতে সাক্ষীরা স্বাক্ষর করল। সবাই মিঠাই মণ্ডা খেয়ে খুশী হয়ে ফিরে গেল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা খতম ক'রে চুপ করলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা খতম করামাত্র দুনিয়াজাদ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে গালে-কপালে চুম্বন ক'রে বল্‌ল—'বহিনজী রাত্রি তো এখনও ঢের বাকী রয়েছে। আর একটি কিস্‌সা শুরু কর।'

বেগম শাহরাজাদ বহিন দুনিয়াজাদ-এর গালে আলতো ক'রে একটি টোকা দিয়ে বল্‌ল—'ঠিক আছে এবার এক অলস আদমির কীর্তি নামে বহুৎ আচ্ছা এক কিস্‌সা শোনাচ্ছি।'

আলসের শিরোমণির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার এক অলস আদমির কীর্তির ব্যাপারে আপনাকে কিছু শোনাব যার তুল্য অলস আপনি জিন্দেগীতে চোখে তো দেখেনই নি, এমন কি শোনেনও নি কারো মুখে।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি বন্ধ করলেন।

ছয় শ' সাতষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক সকালে বাগদাদের খলিফা হারুণ অল-রসিদ তাঁর দরবারে পারিষদদের নিয়ে এক জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় প্রাসাদের এক খর্বাকৃতি খোজা বহুমূল্যের হীরা জহরৎ খচিত একটি সোনার তাজিয়া হাতে দরবারে হাজির হ'ল। নতজানু হয়ে কুর্নিশ ক'রে সে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, বেগম সাহেবা এ তাজিয়াটি আপনার দরবারে পাঠিয়ে দিলেন, এর এ-খালি জায়গাটিতে একটি বহুমূল্য মণি ছিল। হঠাৎ সেটি হাফিস হয়ে গেছে। এখানে বসানোর জন্য অন্য একটি মণির তাল্লাশ ক'রে নফর বাগদাদ নগরের সব ক'টি জহুরীর দোকানে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে। লেকিন সবাই হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। তাই আপনার দরবারে আমাকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে দিতে পারলে তিনি বহুৎ খুশী হবেন।' খোজা হাতের তাজিয়াটি বাদশাহের হাতে তুলে দিল।

খলিফা স্বগতোক্তি করলেন—'তামাম আরব দুনিয়া আমার পদানত আর আমি আমার দিল কা টুকরা বেগমের সামান্য আব্দার রক্ষা করতে পারব না! এ-তো হতে দেয়া যায় না। কিছুতেই তার কলিজায় ব্যথার সঞ্চার হতে দেয়া সম্ভব নয়।'

খলিফা যখন বেগম জুবেদা-র তাজিয়ার মণিটির ব্যাপারে ভাবনা চিন্তায় মগ্ন ঠিক তখনই দরবারে এক সওদাগর হাজির হয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল।

খলিফা তার পরিচয় জানতে চাইলে সে বল্‌ল তার নাম আবু মহম্মদ। সবাই অবশ্য তাকে আলসে আবু বলেই জানে। সে বল্‌ল—জাঁহাপনা, আপনার বাঞ্ছিত মণিটির মাফিক একটি মণি বসরাহের এক নওজোয়ানের হেফাজতে রয়েছে।'

খলিফা আর সময় নষ্ট না ক'রে বসরাহের সুবেদার জুবাইদির কাছে একটি খৎ লিখে মণিটির ব্যাপারে জানালেন।

খলিফার খৎ কুর্তার জেবে ভরে তার দেহরক্ষী মাসরুর ঘোড়ার পিঠে চাপল।

আবু মহম্মদ খলিফার দূত মাসরুর-এর উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে নিজেই হন্তদন্ত হয়ে সদর-দরওয়াজায় ছুটে এসে সমাচার জানতে চাইল। মাসরুর খলিফার খৎটি তার হাতে দিল। তারপর বল্‌ল—'দেরী করা সম্ভব নয় সুবাদার সাহাব। জলদি তৈরী হয়ে

নিন। এখনই একবারটি আমার সঙ্গে আপনাকে বাগদাদে যেতে হবে।'

মাসরুর এতটা পথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত। তাই আবু মহম্মদ বল্‌ল—'আমি তৈরী হয়ে নিতে নিতে আপনি মেহেরবানি ক'রে সামান্য খানাপিনা সেরে একটু চাঙা হয়ে নিন।'

মাসরুর আর আপত্তি করতে পারল না।

আবু বাদশাহী খানা ও দামী সরাব দিয়ে মেহমান মাসরুরকে আপ্যায়ন করল।

মাসরুর খানাপিনা চুকাবার আগেই আবু মহম্মদ তৈরী হয়ে নিয়েছেন।

মাসরুর আবু মহম্মদকে নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। খলিফার দরবারে পৌঁছে আবু মহম্মদ বাদশাহকে কুর্নিশ করে বল্‌ল—'জাঁহাপনা ঠিকই শুনেছেন বটে, আপনার প্রেরিত দূত আমাকে আপনার জরুরী তলবের কারণ সম্বন্ধে কিছু বল্‌লেও আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, আপনি জরুর কোন না কোন মণি মাণিক্যের তল্লাশ করছেন। তবে আমার সংগ্রহে যেসব গ্রহরত্ন রয়েছে তা আমি বেচতে নারাজ। আপনার যদি কোনকিছু দরকার হয়, বলুন। আমি বিনামূল্যে আপনাকে দিয়ে যেতে রাজী আছি। এবার সে কোর্তার দুই জেব থেকে ছোট ছোট দুটো বাক্স বের করে তালা খুল্‌ল। সে দু-টো বাদশাহের সামনে ধরে বল্‌ল—'দেখুন জাঁহাপনা, এদের কোন একটি যদি আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারে তবে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।'

এবার আবু মহম্মদ আর একটি ছোট্ট বাক্স বের করে তার ডালা খুলে খলিফার সামনে ধরল।

খলিফা বাক্সটির দিকে এক লহমায় তাকাতেই একদম তাজ্জব বনে গেলেন। দেখেন, বিচিত্র কারুকার্য মণ্ডিত একটি সোনার গাছ। তার কাণ্ড ও ডালপালা খাঁটি সোনার। পাতাগুলো পান্না দিয়ে তৈরী। আর প্রত্যেকটি ফল হীরা আর মণিমাণিক্য দিয়ে তৈরী। গাছের ডালে ডালে সোনার চিড়িয়া বসে। তাদের ঠোঁটের ডগা আর চোখে অমূল্য রত্ন বসানো। একদম জ্বল জ্বল করছে। আজব ব্যাপারই বটে।

এমন আজব গাছ ও চিড়িয়া খলিফা বা তাঁর পারিষদরা কেউ-ই কোনোদিন চাক্ষুষ করেন নি। আবু বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এতেই আপনাদের চোখ টেঁড়া হয়ে যাচ্ছে? আরও তাজ্জব ব্যাপার রয়েছে। দেখুন—' বলেই সে গাছটিকে সামান্য নাড়া দিল। ব্যস, ডালপালা সমেত গাছটি নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াগুলো গানা গেয়ে নাচানাচি জুড়ে দিল। আরও আছে। তারা এ-ডাল থেকে সে-ডালে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগল।

খলিফা নিজেকে একটু সামলে সুমলে বল্‌লেন—'আবু, তোমার আব্বা তো একজন সামান্য ভিস্তিওয়ালা ছিলেন। সামান্য রোজগেরে,

অতএব উত্তরাধিকার সূত্রে তুমি এগুলো পাওনি। তবে তুমি এমন সব আজব বস্তু কি ক'রে সংগ্রহ করলে? তারপর আবার তামাম বসরাহের আদমিরা তোমাকে একজন অলসের শিরোমণি বলে জানে। সে নগরের আদমিরা নাকি তোমাকে কোন কাম-কাজের ধান্ধায় কোনদিন পথে বেরোতে পর্যন্ত দেখে নি। এমন এক বিচিত্র চরিত্রের আদমি হয়ে এমন অমিত ধন দৌলতের মালিক তুমি কি ক'রে হ'লে, বল তো আবু।'

—'জাঁহাপনা, আমার সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছেন, বিলকুল সাচ্চা বটে। আমরা কয়েক পুরুষ ধরে গরীব ছিলাম। এমন দিনও গেছে, নুন-রুটি জোগাড় করাই ছিল কষ্টকর। আর আমি? পয়দা হওয়ার পর থেকেই আলসের শিরোমণি। এমন কি নিজে হাতে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও আমার কুড়েমি প্রকাশ পেত। এমনও সময় গেছে আমি দাওয়ায় শুয়ে, গায়ে সূর্যের তাপ এসে লাগছে। একটু সরে বা পাশ ফিরে শুলে সূর্য তাপের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। লেকিন কুড়েমির জন্য পাশ ফিরে শোয়ার কোশিস করতাম না, ইচ্ছাও হ'ত না।'

জাঁহাপনা, আমার কুড়েমির বহুৎ আজব সব কিস্‌সা রয়েছে যা শুনলে আপনি একদম হাঁ হয়ে যাবেন। মোদ্দা ব্যাপার, আমার সমান কুড়ে ও অপদার্থ তামাম আরব দুনিয়ায় দ্বিতীয় একজন খুঁজে পাওয়া যেত না, আপনি চাইলে আমার কুড়েমির দু'-একটি কিস্‌সা শোনাতে পারি।

জাঁহাপনা ছোট্ট একটি কিস্‌সা আপনার দরবারে পেশ করছি, যার মাধ্যমে আমার কুড়েমির কিছু নমুনা আপনার কাছে ধরা পড়তে পারে।

আমার আম্মা এক সন্ধ্যায় অন্যের বাড়ি ঝি-গিরির কাজ সেরে মকানে ফিরে আমাকে বল্‌লেন—'বেটা মহম্মদ, মহল্লার মুজাফ্‌ফর সওদাগরী কারবারের তাগিদে পরদেশে যাচ্ছে। সে নাকি চীন দেশে যাবে। মহল্লার অনেকেই তাকে অর্থকড়ি দিয়ে সে মুলুকের বড়িয়া সামানপত্র আনতে বলছে।' এবার মাত্র পাঁচটি দিরহাম আমার হাতে দিয়ে আম্মা বল্‌ল—'মুজাফ্‌ফরকে দিয়ে আয় চীন মুলুকের কিছু না কিছু নিয়ে আসার জন্য।'

আমি চোখ দুটো আধ বোজা অবস্থায় রেখেই বল্‌লাম—'তুমি আর সময় পেলে না! আমার চোখ দুটো নিদে একদম জড়িয়ে আসছে। এধার থেকে ওধারে ফিরে শোবার হিম্মৎ পর্যন্ত আমার নেই। আর তুমি কিনা আমাকে মুজাফ্‌ফরের কাছে যেতে বলছ! 'তুমি কি কিছুই বোঝ না? বুঝবে আর কবে?'

আম্মা দমবার পাত্রী নন। একদম পীড়াপীড়ি জুড়ে দিলেন—'বেটা, তকলিফ একটু-আধটু হলেও দু' কদম হেঁটে দিয়ে আয়গে।

সবাই বলে চীন মুলুক থেকে যারাই কিছু আনিয়েছে তারাই আমীর বনে গেছে। দিনারের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে। কার কখন, কি ভাবে নসীব ফেরে স্বয়ং আল্লাতাল্লাও জানেন না।'

আমি বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বল্‌লাম—'তুমি কি খোয়াব টোয়াব দেখছ? পাঁচ দিরহাম দিয়ে আমাদের জন্য এমন কি খরিদ করে আনবে যা দিয়ে একদম আমীর-বাদশা বনে যাবে। এ সব বাজে ধান্ধা ছেড়ে আমাকে একটু আরাম ক'রে নিদ যেতে দাও তো।'

—'মোদ্দা বাৎ শোন আবু! মহল্লার মকানে মকানে বরতন মেজে, কামরা সাফাই ক'রে আর কাপড়া ধুয়ে তোকে আর বসিয়ে বসিয়ে খানাপিনা জোগানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এবার রুজিরোজগারের ধান্ধা কিছু কর।'

আমার দিমাক খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। বল্‌লাম, 'বহুৎ আচ্ছা। এক কাজ কর, আমাকে ধরে একটু উঠিয়ে দাও। আমার চপ্পল জোড়া দাও।'

আমার হাত ধরে বসাতে বসাতে আম্মা বল্‌লেন—'চপ্পল জোড়া তো সামনেই রয়েছে, পরে নে।'

—'পরে নে বল্‌লেই হয় নাকি? একা একা কখনও চপ্পল পরা সম্ভব?'

আমার পায়ে চপ্পল জোড়া গলিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'এবার মেহেরবানি করে এক ছুটে গিয়ে দিয়ে আয়। দেরী হলে ফিন জাহাজ ছেড়ে দেবে।'

আমি বিমর্ষ মুখে বল্‌লাম—'চপ্পল না হয় পরিয়ে দিলে এবার চৌপায়া থেকে মেঝেতে পা রাখি কি ক'রে?'

আম্মা বল্‌লেন—'নে আমার কাঁধে হাত রেখে নেমে আয়।'

আমি বন্দরের পথে বহুৎ মেহনৎ ক'রে এগিয়ে চলেছি, আদমিরা সব পথের ধারে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—'একী আজব কাণ্ড আবু? তুমি পথে, তা-ও একদম পয়দল হেঁটে চলেছ?'

—'আর বলো না ভাইয়া, আম্মার কেটর কেটর সইতে না পেরে পথে নামতেই হ'ল।'

জাহাজঘাটে কোনরকমে তো পৌঁছনো গেল, আমাকে দেখেই মুজাফ্‌ফর সাহাব চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন—'আরে আবু যে। তুমি কামরার বাইরে বেরিয়েছ! এত মেহনত করে একদম জাহাজ ঘাট পর্যন্ত চলে এসেছ! তুমি যে কামাল করলে হে!'

আমি মুচকি হেসে তার রসিকতার জবাব না দিয়ে কোর্তার জেব থেকে দিরহাম পাঁচটি বের করলাম। তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌লাম—'আপনি তো চীন মুলুকে যাচ্ছেন, আম্মার ফরমাস সেখান থেকে আমাদের জন্য আপনার পছন্দ মাফিক কিছু খরিদ ক'রে নিয়ে আসবেন।'

তিনি হেসে বল্‌লেন —'জরুর আনব বেটা। তোমার আব্বা আমার জিগরী দোস্ত ছিলেন। তোমার আম্মাকে বলবে, আমি পছন্দ মাফিক যা হোক কিছু জরুর খরিদ করে নিয়ে আসব।'

জাহাজ নোঙর তুল্‌ল। তরতর করে এগিয়ে চলল গভীর দরিয়ার দিকে।

এবারের ঘটনা বহুৎ চমকদার। মুজাফ্‌ফর মহল্লায় আদমিদের ফরমাস অনুযায়ী সওদাপাতি খরিদ করে জাহাজে উঠল, জাহাজ নোঙর তুল্‌ল। পালে বাতাস লেগে পত্ পত্ আওয়াজ তুলে জাহাজ বসরাহ বন্দরের দিকে এগোতে লাগল। জাহাজ যখন মাঝ-দরিয়ায় তখন মুজাফ্‌ফর সাহেবের খেয়াল হ'ল— আমার দিনার পাঁচটি তো রুমালের কিনারে তেমনি বাঁধা রয়ে গেছে, কিছুই খরিদ করা হয় নি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিলকুল ঘুলিয়ে ফেলেছেন। তার তো একদম মাথায় হাত। জাহাজের কাপ্তেনকে বললেন— 'এক জরুর গলতি হয়ে গেছে। জাহাজের মুখ ঘোরাও।'

কাপ্তেন আমাকে সাধ্যমত বুঝাল, দিরহাম তো মাত্র পাঁচটি। এ দিয়ে এমন কোন্ হাতি-ঘোড়া খরিদ করতে পারবেন? আর তা বেচে মুনাফাই বা কয় লাখ হবে যার জন্য জাহাজ ঘুরিয়ে ফিন চীন মুলুকে

যেতে চাইছেন। তার চেয়ে বরং মুলুকে ফিরে যা হোক কিছু বুঝিয়ে দিরহাম ক'টি ফেরৎ দিয়ে দেবেন।'

—'দেখ, তার কাছে আমার ঝুটাবাৎ বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি তাকে কথা দিয়েছি, কিছু খরিদ করে নিয়ে যাবই, জাহাজ ঘোরাও।'

—'ঝুটা না-ই বা বল্লেন। সে তো কিছু মুনাফার ধান্দায় কিছু সওদা খরিদ করে নিয়ে যেতে দিরহাম পাঁচটি দিয়েছিল। আমরা যদি পুরো পাঁচটি দিনার তাকে দিয়ে দেই তাতে তো খুশী হওয়ার মত ব্যাপারই বটে। পাঁচ দিরহামের সামান বেচে পাঁচ দিনার মুনাফা, একদম অসম্ভব ব্যাপার!'

—'তোমার বাৎ সাচ্চা বটে কাপ্তেন। আমার পক্ষে তো কথার খেলাফ করা হবে। ঝুট ঝামেলার দরকার নেই। আমার লোকসান যা হয় হোক। জাহাজ ঘোরাও।'

কাপ্তেন নিঃসন্দেহ হ'ল, তাকে নিরস্ত করা যাবেনা। জাহাজ ঘুরাতেই হ'ল। চীনের বন্দরে জাহাজ ফিন নোঙর করল।

মুজাফ্ফর জাহাজ থেকে সবে বন্দরে নেমে কয়েক কদম এগোতেই হঠাৎ এক বুড্ডি তার সামনে হাজির হ'ল। একদম জুবুথুবু। খাড়া হওয়ার হিম্মৎ পর্যন্ত তার নেই। বুড্ডির হাতে একটি রশি। তাতে একটি বান্দর বাঁধা। বুড্ডি এসে তাকে বল্ল—'বেটা, বান্দরটি বেচব, খরিদ করবে, আমার হালৎ তো চোখেই দেখছ, নিজেই চলাফেরা করতে পারি না, বান্দরটিকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছি। খরিদ করবে?'

আমি বিবেচনা করে দেখলাম, মাত্র পাঁচ দিরহামের সওদা খরিদ করার বাকী। বুড্ডিকে বল্লাম—'কি গো বুড্ডি, আমি পাঁচ দিরহাম মাত্র দাম দিতে পারি। তাতে তোমার বান্দরটি বেচবে?'

—'জরুর বেচব। এখন ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, বিক্রি না হলে হয়ত আল্লাহর নামে একে ছেড়েই দিতাম। দাও, বেটা পাঁচটি দিরহামই দাও।'

মুজাফ্ফরও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দিরহাম পাঁচটি নিয়ে বেশী ছুটোছুটি করতে হল না। আল্লাহ জব্বর বাঁচান বাঁচিয়েছেন।

জাহাজ ফিন এগিয়ে চল্‌ল দুর্বার গতিতে। উত্তাল-উদ্দাম দরিয়ার বুক চিরে জাহাজ এগোতে এগোতে এক জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাপ্তেন ছোট এক দ্বীপে জাহাজ ভেড়াল। সেখানে এক মেছুয়াকে এক দরিয়ার কিনারে দাঁড়িয়ে জাল দিয়ে মছলি ধরতে দেখলাম। সে জাল ফেলে মছলির বদলে ছোট্ট একটি ঝোলা তুলে আনল। ঝোলার মুখ খুলতেই ছোটা বড়া হরেক কিসিমের পাথর ঝনঝনিয়ে মিট্টিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

বান্দরটিও মেছুয়ার ব্যাপারটি দেখল। তার মধ্যে হঠাৎ অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেল। সে যেন অব্যক্ত ভাষায়, ইঙ্গিতে মুজাফ্ফর'কে কিছু বুঝাতে চাইছে। মুজাফ্ফর তার ইঙ্গিতের অর্থ কিছু ঠাহর করতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বান্দরটির গলা থেকে রশি খোলা ছিল। সে অচানক এক লাফে পানিতে পড়ে গেল। ব্যস, এক লহমার মধ্যে দরিয়ার পানিতে বিলকুল তলিয়ে গেল।

বান্দরটির ব্যাপারে মুজাফ্ফর সাহাব একদম তাজ্জব বনে গেলেন। ভাবলেন, তার দিমাকটি সাফ খারাপ আছে। নইলে কেউ উত্তাল দরিয়ায় লাফ দিতে যায়!

বান্দরটি একটু বাদেই রশি দিয়ে মুখ বাঁধা একটি ঝোলা নিয়ে উঠে এল। ঝোলাটির মুখ খুলতেই হরেক কিসিমের আকৃতি আর রঙ বিশিষ্ট পাথর জাহাজের পাটাতনের ওপর ঝনঝনিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

বান্দরটি ফিন পানিতে ঝাঁপ দিল। নয়া আর এক থলি নিয়ে উঠে এল। তা থেকে বের করল রাশি রাশি হীরা জহরৎ মণি-মুক্তা। তারপর সে আরও কয়েক বার ঝাঁপিয়ে পড়ে দরিয়ার তলা থেকে কয়েকটি ঝোলা তুলে আনল। জাহাজের পাটাতনে হীরা-মণি-মুক্তার রাশি জমে গেল। ব্যাপার দেখে মুজাফ্ফর সাহাব থেকে শুরু করে কাপ্তেন ও খালাসী-পর্যন্ত সবাই বিলকুল তাজ্জব বনে গেল।

বসরাহ বন্দরে জাহাজ নোঙর করলে মহল্লার সবাই হুটো পাটা করে বন্দরে গেল। আমি শুনেও না শোনার বাহানা করে বিছানা আঁকড়ে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলাম।

লেকিন আম্মা আমাকে তিষ্ঠোতে দেবেন কেন? কানের কাছে একদম ঘ্যানর ঘ্যানর জুড়ে দিলেন বেটা, একবারটি গিয়ে দেখে আয় চীন মুলুক থেকে মুজাফ্ফর সাহাব আমাদের জন্য কি নিয়ে এলেন।'

ঠিক সে মুহূর্তেই দরওয়াজায় ঠক্-ঠক্-ঠক্ আওয়াজ হ'ল। কড়া নাড়ার শব্দ, ইয়া আল্লাহ! কী সর্বনেশে কাণ্ড। কে দরওয়াজা খুলে দেখবে, কে এল? ভাবলাম, মা-ও মকানে নেই। উপায় কি হ'বে?

এদিকে বন্ধ দরওয়াজার বাইরে দাঁড়িয়ে মুজাফ্ফর সাহাব চিল্লাতে লাগলেন—'আবু, কামরায় আছ নাকি? দরওয়াজা খোল, খোল— খুলে দেখ, চীনমুলুক থেকে তোমার জন্য কি খরিদ ক'রে নিয়ে এসেছি। আবু, দরওয়াজা খোল।'

মুজাফ্ফর সাহাব-এর গলা শোনামাত্র আমি ধীরে ধীরে চৌকিতে উঠে বসলাম, হ্যাঁ, আমার বাৎ-ই সাচ্চা হ'ল। মুজাফ্ফর সাহাবই মকানে বয়ে পরদেশ থেকে নিয়ে আসা বস্তু পৌঁছে দিতে এসেছেন, আম্মার পরামর্শ অনুযায়ী তার মকানে ছুটলে ঝুট মুট হয়রানি হ'ত।

দরওয়াজা খুলে দিতেই তার কুলি কয়েকটি মালবোঝাই বস্তা

এনে ঝপাঝপ আমার কামরায় ফেল্‌ল। আর গলায় রশিবাঁধা একটি বান্দর।

মুজাফ্‌ফর সাহাব বল্‌লেন— 'বেটা তুমি যে পাঁচটি দিরহাম দিয়েছিলে তা দিয়ে এগুলো তোমার জন্য নিয়ে এলাম।'

আমি চোখ দুটো একদম কপালে তুলে ব'লে উঠলাম— 'চাচা, আমি তো মাত্র পাঁচটি দিরহাম দিয়েছিলাম। তাতে কি এতসব সামান-পত্র—'

আমাকে বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই মুজাফ্‌ফর সাহাব মুচকি হেসে বল্‌লেন— 'হ্যাঁ বেটা, বিলকুল সামানই তোমার।'

— 'বস্তার সামান পত্র—'

— 'বেটা, তোমার দেয়া পাঁচ দিরহাম দিয়ে আমি বান্দরটি কেবলমাত্র খরিদ করেছিলাম। আর বস্তাগুলোর মধ্যে যা কিছু দেখছ, পথে আসতে আসতে বিলকুল সামানপত্র বান্দরটি রোজগার করেছে।

আমি তার বাৎ শুনে যেন অচানক আশমান থেকে একদম জমিনে পড়লাম। তিনি একী আজব বাৎ শোনচ্ছেন, বান্দরটি রোজগার করেছে!'

মুজাফ্‌ফর সাহাব এবার পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে খোলসা ক'রে পেশ করলেন।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুজাফ্‌ফর সাহাব এবার বল্‌লেন— 'বেটা তোমার আব্বা সৎপথে রোজগার করে বহুৎ তকলিফ ভোগ করে গেছেন। তোমার দেখভাল করছেন, সাচ্চা বাৎ বটে, সৎপথে থাকলে আল্লাহ একদিন না একদিন দোয়া করবেনই।'

ব্যস, আল্লাহ-র দোয়ায় আমাদের নসীব ফিরে গেল। সুখের মুখ দেখলাম।

দু'-চারটি জহরৎ বেচে প্রচুর দিনার আমি জেবে পুরলাম, স্বগতোক্তি করতেই হ'ল— 'ইয়া আল্লাহ! দু'-চার জহরৎ বেচেই একদম আমীর বনে গেলাম! কয়েক বস্তা হীরা-জহরৎ বেচলে—' আর ভাবতে পারলাম না। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আমীর আদমিদের মকানে যা কিছু আসবাবপত্র থাকে এক এক ক'রে বিলকুল খরিদ ক'রে ফেল্‌লাম। ব্যস, দু'-চারটে পাথর বেচে যখন সব অভাব মিটে গেল তখন ভাবলাম, আর একটিও পাথর বেচব না। এক একটি পাথরের জন্য কাড়ি কাড়ি দিনার দাম দেবার জন্য বহুৎ জহুরী আমার পিছনে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল। আমি একদম পাক্কা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, কিছুতেই বেচব না। যত লোভই দেখাক, কিছুতেই টোপ গিলব না।

লেকিন জাঁহাপনা, আপনার ব্যাপার বিলকুল আলাদা। আপনি দরকার অনুযায়ী পাথর গ্রহণ করলে আমি ধন্য হ'ব।

লেকিন হ্যাঁ, বিনিময়ে একটি কানাকড়িও আমি নেব না। মেহেরবানি করে এমন কি কোন ইনাম বকশিসও দেয়ার কোশিস
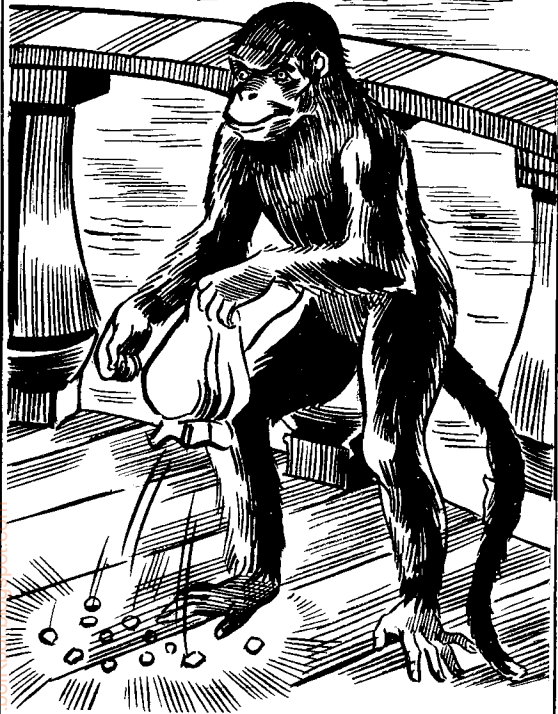
করবেন না, একদম মাগনা নিতে হবে।'

— 'বহুৎ আচ্ছা। লেকিন ওই বান্দরটি কি এখনও তোমার মকানেই আছে?'

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লাম— 'জাঁহাপনা, এখানেই গড়বড় হয়ে গেল, মুজাফ্‌ফর সাহাব বান্দরটি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন— 'বেটা, বান্দরটি বড্ড পয়মন্ত। সাবধানে রাখবে। হুঁশিয়ার। একদম অযত্ন যেন না হয়।'

মহল্লার মকানে মকানে ঢুঁড়ে কাম কাজ চুকিয়ে আম্মা মকানে ফিরে এলে আমি তাঁকে বল্‌লাম— 'তুমি আমাকে আলসেমির জন্য কত গঞ্জনাই না দিয়েছিলে। আমি মুখবুজে বিলকুল সহ্য করেছিলাম, সাচ্চা কিনা? আমি তখন ঠাণ্ডা মাথায় বলেছিলাম, আল্লাহ যখন দেবেন ছপ্পর ছ্যাঁদা ক'রে দেবেন। নইলে ঝুটমুট হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রে ফয়দা কিছুই হবার নয়। এখন দেখলে তো, আল্লাহ কেমন নিজে থেকে একদম কামরায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন?'

আম্মা মুচকি হেসে আমার বক্তব্য মেনে নিলেন।

একটি সোনার তখ্‌ত বানিয়ে বান্দরটিকে বসিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করলাম। সোনার একটি শিকলি বানিয়ে তার গলায়

বাঁধলাম। আর আমরাও বিলাস ব্যসনের মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করতে লাগলাম। একদম সাচ্চা বাৎ, বান্দরটি আসার পর থেকে আলসেমি বিলকুল উধাও হয়ে গেল।

আমি বান্দরটির ওপরে কড়া নজর রাখতে লাগলাম। তার মুখে ভাষা ছিল না সাচ্চা বটে। লেকিন কাগজ-কলম পেলে তার যা কিছু বক্তব্য লিখে জানাত।

এক বিকালে আমি বান্দরটিকে পাশে নিয়ে ইমারতের ছাদে বসে হাওয়া খাচ্ছিলাম। আচমকা বান্দরটি কেমন অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। আমি দৌড়ে গিয়ে কাগজ-কলম এনে তাকে দিলাম। সে ঘসঘস করে লিখল—'আমার জন্য একটি সফেদ মোরগা খরিদ ক'রে নিয়ে আস।'

বাজারে গিয়ে আমি একদম তাজ্জব বনে গেলাম। তামাম বাজার ঢুঁড়ে একটি মাত্রই সফেদ মোরগা মিল্‌ল।

আমি মোরগাটি নিয়ে মকানে ফিরে দেখি বান্দরটি সুযোগ বুঝে বাগিচায় চলে গেছে। দৌড়ে তার কাছাকাছি যেতেই দেখি সে ইয়া পেল্লাই একটি বিষধর সাপকে থাবার মধ্যে ধরে খেলায় মেতেছে। আমার হাত থেকে মোরগাটি নিয়ে সে সাপটির সামনে ছেড়ে দিল। ব্যস, এক লহমার মধ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হয়ে গেল। মোরগাটি সাপের গলায় নখ বসিয়ে দিল। এক টানে তাকে আলাদা করে দিল।

এবার বান্দরটি ফিন সক্রিয় হ'ল। সে মোরগাটিকে দু'হাতে ধ'রে তার গলা ছিঁড়ে ফেল্‌ল। তার গা থেকে পালকগুলো ছিঁড়ে নিল। সেগুলোকে বাগিচার চারদিকে মিট্টিতে পুঁতে দিল। সবশেষে মোরগাটির লাশটিকে মিট্টিতে গর্ত বানিয়ে পুঁতে দিল।

ব্যস, এবার বান্দরটি গলা ছেড়ে বার-কয়েক চিল্লাচিল্লি করল। তারপরই এক লহমার মধ্যে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল। একদম হাফিস হয়ে গেল। আমার কাছে আর ফিরল না।

আমি একের পর এক আজব ব্যাপারের মুখোমুখি হতে লাগলাম। এবার আমাকে বিলকুল তাজ্জব বনিয়ে দিয়ে মিট্টিতে পুঁতে রাখা পালকগুলোর প্রত্যেকটি থেকে একটি ক'রে সোনার গাছ তৈরী হয়ে গেল।

তার ডালপালা সোনার। ফলগুলো হীরা-মুক্তোর। আর পাতাগুলো পান্নার তৈরী। আর যেখানে মোরগটির লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে ইয়া বড়া এক গাছ পয়দা হয়েছে। তার ডালপালাগুলোও বিলকুল সোনার। পাতাগুলো পান্নার তৈরী। আর হীরা-মুক্তোর ফল। এমন পেল্লাই একটি গাছকে তো আর বাক্সবন্দী করে রাখা যায় না। জাঁহাপনা, আপনি চাইলে সেটি আপনাকে দিয়ে দিতে পারি। নেবেন কি?

খলিফা কিস্‌সাটি শুনে একদম তাজ্জব বনে গেলেন। উজির জাফর'কে বল্‌লেন— 'এই কিস্‌সাটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিখে রাখার বন্দোবস্ত করা দরকার।'

জাফর কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি খতম ক'রে চুপ করলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভোর হতে এখনও ঢের দেরী। এবার আপনাকে এক 'লড়াইবাজ লেড়কির কিস্‌সা' শোনাব।

এক লড়াইবাজ লেড়কির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সাটি শুরু করলেন— 'জাঁহাপনা, প্রাচীন কালে মিশরে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বণিক বাস করত। তার নাম ছিল শের আলি। তখনকার মিশরে তার মাফিক আমীর আদমি দ্বিতীয় আর একটি ছিল না।

শের আলি যখন নওজোয়ান ছিল তখন সে তামাম আরব দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়িয়েছিল। ভিন্‌দেশে সওদাগরী কারবার করতে গিয়ে তার অভিজ্ঞতার ঝোলা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল।

শের আলি এখন বুড্ডা। বিলকুল বুড্ডা। চুল-দাড়ি একদম সফেদ। গায়ের চামড়া ঢিলা। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ।

বুড্ডা শের আলি আজ সব খুইয়েছে। লেকিন একটি জিনিস এখনও পুরো দস্তুর রয়েছে। অর্থ। দিনারের কুমীর। যখন ফূর্তি আর মজা লোটার ওমর ছিল তখন সে অন্ধার মাফিক দিনারের পিছু পিছু দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ফূর্তি করার দিল্ ও ফুসরৎ উভয়েরই অভাব ছিল তার।

আজ তার সে-ছটফটানি উধাও, একদম উধাও হয়ে গেছে। দিনারের পাহাড়ের মাঝে বসে সে আজ অবসর-জীবন গুজরান করছে। যৌবন গেছে, ভোগ-বাসনার দিল্ উধাও হয়েছে। ভোগ-লালসার সাধ তার থাকলেও সামর্থ্য নেই।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয় শ' বাহাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, খোদাতাল্লা শের আলি-র দৈহিক শক্তি সামর্থ্য ছিনিয়ে নিয়েছেন সাচ্চা বটে। লেকিন তাকে একটি লেড়কা দিয়েছেন। তার নাম নূর, তার উমর এখন চৌদ্দ। গায়ের রঙ সফেদ। চোখ দুটো টানা টানা। নাদুস নুদুস লেড়কা। সব মিলিয়ে নূর আলি খুবসুরৎ।

শের আলির বাজারে একটি দোকান ছিল। এক সন্ধ্যায় নূর আলি দোকানে, তার আব্বার সঙ্গে বসে। এমন সময় তার কয়েকটি ইয়ার-দোস্ত দোকানে হাজির হ'ল। তারা একটু সরে এসে নিজেদের মধ্যে বাৎচিৎ করতে লাগল। বাৎচিৎ না বলে তাকে

আফশোষ বলাই সঙ্গত। তার এক দোস্ত শের আলি-র কান বাঁচিয়ে নূর আলীকে বল্‌ল—'জিন্দেগীভর কি কামরার ভেতরে খাঁচা-বন্দী হয়েই কাটাবি? কুয়োর ব্যাঙ হয়েই পড়ে থাকবি, নাকি আমাদের সঙ্গে একটু ফূর্তি ফার্তা করবি? আমাদের বাগিচার মজলিশখানায় আজ এক গানার আসর বসবে। আমরা চাই, তুই সেখানে হাজির থাকবি।' 'গানার মজলিশ? মজলিশ কি জিনিস দোস্ত?' নূর আলি বল্‌ল।

তার ইয়ার দোস্তরা সমস্বরে হেসে বল্‌ল—'মজলিস কাকে বলে জান না?' জানবে কি করে তার যে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে একদম সম্পর্ক ছিন্ন। সবে ঘণ্টা দু'-একের জন্য সে ইদানিং দোকানে হাজির থাকার অনুমতি পেয়েছে। মকান থেকে দোকান আর দোকান থেকে মকান। ব্যস, এর বাইরে এক কদমও যাওয়ার হুকুম নেই।

নূর আলি কেঁদে, বহু চোখের পানি ফেলে আব্বার অনুমতি লাভ করল। তারা দলবেঁধে হৈ হল্লা ক'রে যখন বাগিচার ইমারৎটিতে হাজির হ'ল তখন একটু একটু ক'রে আন্ধার ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে।

নফর নোকররা খানার রেকাবি সাজিয়ে দিল। হৈ হল্লা ক'রে সবাই খানার রেকাবি খালি ক'রে ফেল্‌ল। এক নফর সরাবের বোতল আর পেয়ালা নিয়ে হাজির হ'ল।

সরাবের বোতল দেখে নূর আলি-র কলিজা শুকিয়ে আসার জোগাড় হ'ল।

ইয়ার-দোস্তদের পীড়াপীড়িতে নূর আলি সরাবের পেয়ালা গলায় না ঢেলে রেহাই পেল না।

গুলাবী সরাবের নেশা ক্রমে জমে উঠতে লাগল। নূর আলি-র মালুম হ'ল তার সর্বাঙ্গে কেমন যেন এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ, খুশীর আমেজ অনুভূত হতে শুরু করেছে।

কিছু সময় যেতে না যেতেই নূর আলি নেশার ঘোরে এলিয়ে পড়ল। এমন সময় এক দোস্ত তাকে আলতো ক'রে ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল—'নূর, এখনই এমন নেতিয়ে পড়লে চলবে কেন দোস্ত! এখনও তো আসলি কাম শুরু হয় নি। তাকা, চোখ মেলে চেয়ে দেখ, কী বাহারী মাল আমদানী করেছি!'

নূর আলি চোখ দুটো কোনরকমে সামান্য ফাঁক করতেই সচকিত হয়ে উঠল। আচমকা শের দেখার মাফিক তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে সোজা হয়ে বসে পড়ল। নিজের চোখ দুটোর ওপরও যেন বিলকুল আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। হাতের পিঠ দিয়ে ঝট ক'রে বার কয়েক চোখ দুটো ডলে নিল। না, এ তো সরাবের নেশার ঝোঁক বা খোয়াবের ব্যাপার নয়। এ যে সাচ্চা এক লেড়কি। নওজোয়ান লেড়কি। হ্যাঁ, খুন আর গোস্ত দিয়ে গড়া সাচ্চা এক লেড়কিই বটে।

লেড়কিটি খুবসুরৎ বটে। তার সুরতের ঝিলিকে যেন তামাম কামরাটি আলোর রোশনাইয়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে। সে চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে লেড়কিটির সুরৎ-সুধা পান করতে লেগে গেল। এমন সুরৎ কোন লেড়কির হতে পারে তা যেন সে কল্পনাও করতে পারে নি।

লেড়কিটি নূর-এর দিকে তাকিয়ে নীরবে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল। লেড়কিটি এক সময় তার দিকে দু' কদম এগিয়ে আসে। নূর যেন অচানক সম্বিৎ ফিরে পায়। ঝট ক'রে পিছু হটার কোশিস করে। লেকিন পারল না। লেড়কিটি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে। এক ঝটকায় নিজের উন্নত বক্ষের কাছে তাকে নিয়ে আসে। নূর আতঙ্কে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। তার হাতের থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য কোশিস্ করতে থাকে।

লেড়কিটি নূরকে আরও নিজের কাছে টেনে নিলে। নূর-এর মালুম হ'ল, তুলতুলে পেঁজা তুলোর মাফিক কোন বস্তু যেন স্পর্শ করে রয়েছে তার বাঁ-হাতের কনুইটিতে। অনাস্বাদিত এক রোমাঞ্চে তার দেহটি বার বার শিহরিত হয়ে চলেছে। সরে যেতে গিয়েও পারে না। কোন অজানা আকর্ষণ যেন তার দেহ ও দিল্ হরদম আকর্ষণ ক'রে চলেছে।

এক সময় নূর কামরাটির সর্বত্র চোখ বুলিয়ে দেখল, তার ইয়ার দোস্তরা কামরায় অনুপস্থিত। সুযোগ বুঝে বে-পাত্তা হয়ে গেছে। কেটে পড়েছে।

লেড়কিটি এবার নূর-এর দিকে সামান্য এগিয়ে এল। তার প্রশস্ত বুকে নিটোল স্তন দুটোকে ঠেসে ধরল। তারা মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। নূর যেন ক্রমেই নিজের পৃথক সত্তা হারিয়ে ফেলছে।

এক সময় নূর কাঁপা কাঁপা গলায় ব'লে উঠল—'ওরা সব গেল

কোথায়? আমার সঙ্গেই তো ছিল, এরই মধ্যে হাফিস হয়ে গেল।'

লেড়কিটি দু'হাতে নূর আলি'কে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'নাগর, তুমি কি গো, তোমার জ্ঞানগম্যি একদম নেই? এক দঙ্গল নওজোয়ানের মাঝে তুমি আমাকে বে-আব্রু করতে চাইছ? আমার শরমের ব্যাপার না হয় ছেড়েই দিলাম। তোমার শরম লাগবে না?'

লেড়কিটি এবার নূর আলি'কে ছেড়ে দিয়ে এক এক ক'রে নিজের সালোয়ার-কামিজ প্রভৃতি গায়ে যা কিছু ছিল বিলকুল খুলে ফেল্‌ল। ঝট্ ক'রে কাঁচের মাফিক স্বচ্ছ, একদম ফিনফিনে একটি রেশমি কাপড়ার সেমিজ গায়ে চাপিয়ে নিল। তার গায়ে পোশাক বলতে এটুকুই সম্বল।

লেড়কিটি আচমকা নূর আলি'কে চোখের বাণ মেরে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'কি গো নাগর, আমাকে কেমন মানিয়েছে, বল্‌লে না তো?' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধ'রে নূর আলি-র মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য এক লহমা অপেক্ষা করল। তার দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে যন্ত্রচালিতের মাফিক ঝুপ ক'রে তার বুকের ওপরে লাফিয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে তার ঠোঁটে, গালে ও কপালে ঘন ঘন চুম্বন করতে লাগল। তার নিচের ঠোঁটটি নিজের মুখে পুরে নিয়ে চুষতে লেগে গেল। এ যেন পরম তৃপ্তি আর পরম পাওয়া।

এবার নূর-এর ঠোঁটের কাছাকাছি নিজের আপেল-রাঙা ঠোঁট দুটোকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'কি গো নাগর, একদম পাথর বনে গেলে যে! কি করবে, কর।'

নূর শরম-সঙ্কোচ কাটিয়ে তখনও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে নি। ঠোঁট দুটোকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে গিয়েও থমকে যায়, কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দেয়।

নূর আলি-র নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে লেড়কিটি-ই আচমকা তার ঠোঁট কামড়ে ধ'রে। যৌন-ক্ষুধা ও আবেগে-উচ্ছ্বাসে সে বিলকুল অভিভূত হয়ে পড়ে। কামড়ে ধরে তার নিচের ঠোঁটটিকে। কারোরই একদম হুঁস নেই। কোন্ ফাঁকে যে নূর আলির ঠোঁট থেকে তির তির ক'রে খুন, তাজা খুন ঝরতে শুরু করেছে তার মালুমই হয় নি। তবে এটুকু মালুম হয়েছে, খুনের স্বাদ নোনতা।

এবার লেড়কিটি কণ্ঠস্বরে সামান্য উষ্মা প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—'তোমার মত ন্যাকা চৈতন্য জিন্দেগীতে আর দেখি নি! তোমার কি ইয়েটিয়ে বলতে কিছুই নেই? সেমিজটিও কি আমাকেই খুলে দিতে হবে? আজব ব্যাপার তো তোমার!'

নূর-এর সবে হাতে খড়ি। এসব ব্যাপারে সে একদম আনাড়ী। খুবসুরৎ লেড়কিটির মুখ থেকে ধমক ধামক শুনতে, তার দ্বারা নিষ্পেষিত হতেই ভালই লাগছে। আর লাগবে না-ই বা কেন? যৌবন-জ্বালা কি জিনিস এ-বোধটুকু তো তার ঠিক-ই আছে। অবশ্য সাহস সঞ্চয় ক'রে এগিয়ে যাওয়ার মাফিক বুকের পাটা সে আজও অর্জন ক'রে উঠতে পারে নি। ব্যস, এ-ঘাটতিটুকুই নওজোয়ান নূর-এর কলঙ্ক।

লেড়কিটির কাম-জ্বালায় জর্জরিত কলিজাটিকে ঠাণ্ডা ক'রে এবং নিজে উপরি মুনাফা লুঠে নূর আলি যখন নিজের মকানে গেল তখন প্রায় মাঝ রাত্রি।

নূর-এর আম্মা খানার রেকাবি সাজিয়ে তার পথ চেয়ে মাঝরাত্রি রাত্রি পর্যন্ত দাওয়ায় গালে হাত দিয়ে বসে। চোখের তারায় উৎকণ্ঠার ছাপ।

নূর আলি মুখ গুম্ ক'রে কামরায় ঢুকল। সরাবের নেশা এখনও তার মধ্যে ক্রিয়া ক'রে চলেছে। দেয়াল না ধরে এক কদমও সে এগোতে পারছে না।

এমন সময় প্রাসাদসংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয় শ' বাহাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, নূর-এর বুড্ডি আম্মা লেড়কাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে অকাতরে কেঁদেকেটে বল্‌ল—'বেটা, এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? তোর মুখ থেকে সরাবের গন্ধ বেরোচ্ছে, ব্যাপার কি?'

নূর আলি কোন জবাব না দিয়ে দু'পা এগিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

নূর আলি-র আব্বা ব্যাপারটি জানতে পেরে হম্বিতম্বি করতে করতে তার কামরায় এল। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে ব'লে—'বেতমিস কাঁহিকার! তোর স্পর্ধা তো কম নয়। তুই সরাব পান ক'রে এসেছিস।' তাকে বেধড়ক প্রহার করল। সরাবের নেশা নূর আলিকে জানোয়ার বানিয়ে দিয়েছে। তীরবিদ্ধ শেরের মাফিক সে-ও আব্বার ওপরে ধেয়ে এল। তার আব্বা গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে করতে কসম খেয়ে বল্‌ল—'আজ থেকে তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম। এরকম লেড়কা থাকার চেয়ে গোরে যাওয়া ঢের ভাল। আমার ওপর যে-হাত তুল্‌লি সে-হাত কেটে আমি ভোরে তোকে যদি মকান থেকে তাড়িয়ে না দিয়েছি তবে আমি বাপের বেটা নয়।'

নূর আলি-র আম্মা কেঁদেকেটে স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে। তার একই বাৎ, লেড়কার হাত কেটে মকান থেকে তাড়াবেই তাড়াবে। ভোর হলে কিছু ঘটবে। সে রাতভর চোখের পানি ঝরাতে লাগল। খুব ভোরে সে নূর আলি'কে ডেকে তোলে। তাকে বল্‌ল, 'তুই এখান থেকে ভাগ। আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে যা। কিছু দিনার দিচ্ছি, ফুরিয়ে গেলে লোক পাঠাবি। এখনই মকান ছেড়ে ভাগ। তোর আব্বা উঠলে কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে।'

নূর আলি তড়াক্ ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। আম্মার দেয়া দিনারগুলো কোর্তার জেবে ভরে মকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল। হাজির হ'ল আলেকজান্দ্রিয়া নগরে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে নূর আলি ঘুরতে ঘুরতে বাঁদী-বাজারে হাজির হয়। একটু বাদে খচ্চরের পিঠে চেপে এক বুড্ডা খুবসুরৎ এক ষোড়শীকে নিয়ে সেখানে এল। তার বোরখার ফাঁক দিয়ে সুরৎ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

বাঁদীর দালালরা ছুটোছুটি ক'রে খুবসুরৎ লেড়কিটির চারদিকে ভিড় জমাল। তাকে দাঁড় করানো হ'ল উঁচু একটি বেদীর ওপরে। শুরু হ'ল নীলামের ডাক। বণিক-সভার সভাপতি শাহবানদার সবশেষে সাড়ে ন'শ' দিনার বাঁদীটির দাম হাঁকল। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে উপস্থিত ক্রেতাদের আর কেউ সাহস ক'রে এগিয়ে এল না। লেকিন ব্যাগড়া দিল বাঁদীটি নিজে। দালালটি যখন প্রথানুযায়ী বাঁদীটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বুড্ডা শাহবানদার-এর মকানে যেতে রাজী আছ? বাঁদী লেড়কিটি একদম খেঁকিয়ে ওঠে—গোরস্তানের মড়াটির শখ দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। দু'দিন বাদেই তো জমিনের তলায় যাবে। আমাকে নিয়ে যাওয়ার শখ হ'ল কেন? তার দাড়িতে কলপ মাখিয়ে দেয়ার জন্যই কি আমাকে নীলামে খরিদ করতে চাইছে?

বাঁদীটির আপত্তি থাকায় দালাল ডাকটি বাতিল ক'রে নতুন ক'রে নিলাম ডাকার বন্দোবস্ত করল। অন্য এক বুড্ডা এবার সবচেয়ে বেশী দিনার হাঁকল। বাঁদীটি তাকেও বাতিল করে দিল।

দালালটি উপায়ান্তর না দেখে বুড্ডাটিকে বল্‌ল—'হুজুর, এ-বাজারে হ'ল না, আপনি বরং অন্য কোন বাজারে একে বেচবার কোশিস করুন।'

নূর আলি বাঁদী লেড়কিটির বোরখার ফাঁক দিয়ে তার সুরৎ দেখতে লাগল। সাচ্চা বটে, তার সফেদ গায়ের রঙ, অনন্য সুরৎ যেন বোরখার আড়ালে চাপা থাকতে চাইছে না। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে স্বগতোক্তি করল—আজব ব্যাপার বটে। বুড্ডা শকুনগুলো এমন এক খুবসুরৎ লেড়কিকে খরিদ ক'রে নিয়ে গিয়ে কি করতে চাইছে। গোরে যাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, লেকিন লেড়কির শখ মিটল না।

বাঁদীটি নাকাবের ভেতর দিয়ে নূর আলি'কে দেখতে লাগল। নূর যে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ব্যাপারটি লক্ষ্য ক'রে বাঁদীটি বুড্ডাকে বল্‌ল—'ওই নওজোয়ানটি আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বোধহয় ও আমাকে খরিদ করতে চায়।' সে-ই নওজোয়ান নূর-এর কাছে এগিয়ে এসে বল্‌ল—'কি গো নাগর, আমাকে তোমার দিলে ধরেছে? যদি তা-ই হয় তবে কেন নীলাম ডাকলে না?'

—'তোমাকে খরিদ করার সাধ থাকলেও সাধ্যের নিতান্তই অভাব আমার। আমার কাছে কুড়িয়ে কাড়িয়ে বড় জোর হাজার খানেক দিনার হতে পারে।'

—'বহুৎ আচ্ছা। হাজার দিনারই আমার সঙ্গের বুড্ডাটির হাতে দাও। যাতে তুমি আমাকে পেতে পার সে বন্দোবস্ত আমিই করে দিচ্ছি।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

ছয় শ' আটাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, এক হাজার দিনার বুড্ডাটির হাতে তুলে দিয়ে নূর আলি বাঁদীটিকে খরিদ ক'রে নিল। নূর আলি বাঁদীটিকে তো খরিদ করল, লেকিন সমস্যা হ'ল এখন তাকে নিয়ে সে যাবে কোথায়? তার নিজেরই তো মাথা গোজার ঠাই নেই, নেই চালচুলো। এরকম যার হালৎ সে এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কিকে নিয়ে উঠবে কোথায়? উপায়ান্তর না দেখে সে এক মুসাফিরখানায় লেড়কিটিকে নিয়ে উঠল। লেড়কিটিকে বল্‌ল—'শোন, সাফ বাৎ তোমাকে শোনাচ্ছি, আমার জেব ফাঁকা। দিনার-দিরহাম বলতে কিছু নেই। তোমাকে চরম তকলিফ ভোগ ক'রে আমার সঙ্গে দিন গুজরান করতে হবে।'

বাঁদী লেড়কিটির নাম মিরিয়াম। হ্যাঁ, মিরিয়াম-এর মাফিক সুরৎ-ই তার বটে। নূর আলি নিজের হাতের অঙ্গুঠিটি নিয়ে জহুরীর দোকানে গেল। সেটি বেচে বাজার থেকে কিছু খানা খরিদ করে মুসাফির খানায় মিরিয়াম-এর কাছে ফিরে গেল। তা দিয়ে সেদিনকার খানাপিনা সারল।

বাঁদী মিরিয়াম নূর-এর সঙ্গে যারপরনাই অভাব অনটনের মধ্যে দিন গুজরান করতে লাগল।

মিরিয়াম কেবলমাত্র সুরতের বিচারেই অনন্যা নয়, সাচ্চা বাৎ বলতে কি সে সর্বগুণসম্পন্না। সূচীকর্মে সে সুদক্ষা, রেশমী কাপড়ায় জরি দিয়ে পর্দা বানাতে পারে, সোনালী ও রূপোলী জরি দিয়ে নক্সা বানাতেও ওস্তাদ। এমন হাজার কিসিমের কাজ তার জানা আছে।

মিরিয়াম একদিন নূর আলি-র কোলে মাথা রেখে তার জিন্দেগীর অতীত-কাহিনী বলতে লাগল—'আমার বচপনে একবার কঠিন বিমারি হয়। আমরা খ্রীষ্টান তোমাকে তো বলেইছি। যা-ই হোক, আমার বিমারি হলে আব্বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, আমি সুস্থ হয়ে উঠলে, বিমারিমুক্ত হলে আমাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গীর্জায় নিয়ে গিয়ে প্রার্থনা করিয়ে আনবেন। একদিন আমি সুস্থ হলাম। বিমারি দূর হ'ল। আব্বা ধাইমাকে দিয়ে

দরিয়ার পাড়ের গীর্জায় আমাকে প্রার্থনা করতে পাঠালেন। জাহাজ ছাড়তে না ছাড়তেই মুসলমান দস্যুরা জাহাজে হামলা চালাল। যাত্রীদের বেধড়ক মারধোর করল। খুন-জখম করল অনেককেই। আমার মাফিক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কিদের জাহাজের এক জালের কামরায় আটক করে রাখল। লেকিন তারা ভুলেও আমাদের বে-ইজ্জৎ করার কোশিস করে নি। ক'দিন বাদে তারা মিশরের এক বাঁদী-বাজারে আমাদের বেচে দিল। ধ্বজভঙ্গের রোগী এক পারসী বুড্ডা আমাকে খরিদ করে নিল। তার কিছু করার হিম্মৎ নেই। লেকিন সাধ ছিল পুরোদস্তুর। আমাকে ধরে বহুৎ খামচাখামচি করেছে, সাচ্চা বটে। ব্যস, ও পর্যন্তই তার হিম্মৎ। একবার বুড্ডাটি কঠিন বিমারিতে পড়ল। আমি সেবাযত্নের মাধ্যমে তাকে সারিয়ে তুলি। বুড্ডা খুশী হয়ে বল্‌ল—'তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই। বল, তোমার দিল্ কি চাইছে?'

—'আমার পছন্দ মাফিক কোন নওজোয়ানের কাছে বেচে দিন। তবে ইয়াদ রাখবেন, গোরে যাবার সময় হয়েছে এমন কোন বুড্ডার হাতে জরুর তুলে দেবেন না।'

বুড্ডা কসম্ খেল, আমার সাধ পূর্ণ করবে। করলও তা-ই। এরই ফলে আজ আমি তোমার কোলে শির দিয়ে শুতে পেরেছি মেহেবুব, দিল্ কা টুকরা আমার।'

মিরিয়াম এবার ইসলাম ধর্মের পাঠ নিল। নূর আলি তাকে ইসলামের বিধান শিখিয়ে দিল। তাকে সাচ্চা মুসলমানে পরিণত ক'রে নিল। খ্রীষ্টধর্মের কঠিন বাঁধন থেকে তাকে মুক্তি দিল। মিরিয়াম সর্বান্তকরণে মেনে নিল, আল্লাহ-ই একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন। আর একমাত্র পয়গম্বর হচ্ছেন মহম্মদ।

মিরিয়াম নূর আলি-র সংস্পর্শে বাস করার ফলে ইসলাম ধর্মের আচার-বিচার বিলকুল অনায়াসেই রপ্ত ক'রে নিল।

এক পরমাদ ঘটল। কনস্টানটাইন সম্রাটের কাছে খবর গেল, তার কলিজার সমান লেড়কিকে মুসলমান ডাকুরা পাকড়াও ক'রে নিয়ে গেছে। তিনি নেকড়ের মাফিক হিংস্র হয়ে উঠলেন। চারদিকে অশ্বারোহী ফৌজ পাঠালেন। তারা চিরুণি তাল্লাসী চালাল। লেকিন সবাই হতাশ হয়ে ফিরে এল।

সম্রাট এবার এক বেটেখাটো বুদ্ধিমান বুড্ডিকে পাঠালেন তামাম মুসলিম দুনিয়া ঢুঁড়ে গুপ্ত চরবৃত্তির মাধ্যমে তল্লাসী চালিয়ে আমাকে বের করার জন্য। কসম খেলেন, আমাকে বের করতে পারলে তাকে বহুৎ ইনাম বকশিস দেবেন।

বুড্ডিটি নিজেকে অদ্ভুত সাজ পোশাকে সাজিয়ে নিল। সে দু'পায়ে কাপড়ার ফেট্টি বাধল, ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে একটি চোখ জড়িয়ে নিল। আর বাঁ-হাতে বাঁধল ন্যাকড়ার ফেট্টি। এবার কয়েকটি বুড্ডিকে নিয়ে সে পথে নামল। ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল আরব দুনিয়ার বন্দরে আর নগরে। সে তার সহচরীদের নিয়ে হন্যে হয়ে গোপনে মিরিয়ামের তল্লাস চালাতে লাগল।

এক বিকালে গুপ্তচর বুড্ডিটি পাসপি মিনারের ধারে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছিল। মিরিয়াম সেখানে হাওয়া খেতে গিয়েছিল। তাকে দেখেই বুড্ডির কলিজা নাচানাচি শুরু ক'রে দিল। সে এগিয়ে এসে 'রাজকুমারী' ব'লে মিরিয়ামকে অভিবাদন করল। আচমকা তার ডান-হাতটি টেনে নিয়ে সশব্দে চুম্বন করল।

বুড্ডিটির বে-আদপি তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। সে চিল্লিয়ে বল্‌ল—'তফাৎ যাও নচ্ছার বুড্ডি কাঁহিকার!'

বুড্ডিটি তার হম্বিতম্বিতে একদম ঘাবড়াল না বরং স্বাভাবিক স্বরেই বলল, মিরিয়ামের আব্বা কনস্টানটাইন সম্রাট নাকি একদম শয্যাশায়ী। কন্যা চোখের আড়াল হওয়াতেই তিনি কঠিন বিমারির কবলে পড়েছেন। মিরিয়াম ফিরে না গেলে অচিরেই তিনি নির্ঘাৎ কবরে যাবেন।'

বুড্ডির বাৎ শুনে মিরিয়াম গর্জে ওঠে। জানাল, সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এমনও বল্‌ল, তার অদর্শনে তার আব্বার কিছু ঘটে গেলেও তার দিক থেকে কিছু করার নেই।

বুড্ডি তাকে ফিরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। সে এমনও বল্‌ল, সম্রাটের কাছে সে কসম খেয়েছে, যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করে প্রাসাদে হাজির করবেই। খালি হাতে সে কিছুতেই ফিরতে নারাজ।

মিরিয়াম যখন কিছুতেই বুড্ডির প্রস্তাবে রাজী হ'ল না তখন তার সহচরীরা তার মুখে কাপড়া গুঁজে দিয়ে তাকে নিয়ে বন্দরের দিকে ছুটতে থাকে।

এদিকে নূর আলি মুসাফির খানার কামরায় তার মেহেবুবা মিরিয়াম-এর প্রতীক্ষায় বসে থেকে অস্থির হয়ে পড়ল। অজানা ভয় ডরের আশঙ্কায় তার কলিজা ছটফট করতে লাগল। সে মুসাফিরখানা থেকে বেরিয়ে চারদ্দিকে ছুটোছুটি করতে লেগে গেল। কোথাও তার দিল্ কা টুকরা মিরিয়াম'কে না পেয়ে ছুটতে ছুটতে বন্দরে হাজির হ'ল। সেখানে বন্দর-কর্মীদের মুখে শুনল একটু আগেই একটি খ্রীষ্টানদের জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে। আর এ-ও বল্‌ল, একদল বুড্ডিকে একটি খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কিকে টেনে হিঁচড়ে জবরদস্তি জাহাজে তুলে নিতে দেখেছে।

নূর আলি পুছতাছ ক'রে নিঃসন্দেহ হ'ল, জাহাজটি কনস্টানটাইনে যাবে।

উপায়ান্তর না দেখে নূর আলি বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা এক জাহাজের কাপ্তেনের হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি ক'রে বল্‌ল—'খ্রীষ্টানরা আমার বিবিকে জোর জবরদস্তি পাকড়াও করে

ভেগেছে। আপনি মেহেরবানি ক'রে বিধর্মীদের কবল থেকে আমার বিবির ইজ্জৎ রক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে দিন।'

জাহাজের কাপ্তেনটি প্রবীণ। সাচ্চা মুসলমান। খ্রীষ্টানরা এক মুসলমানের বিবিকে চুরি ক'রে নিয়ে ভেগেছে শুনে তার দিমাক গরম হয়ে গেল। খুনে জ্বলে উঠল আগুন। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে সে নূর আলি'কে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। যে করেই হোক কাফেরদের কবল থেকে মিরিয়ামকে উদ্ধার করবেই। জাহাজটি খালি। তার ওপর নয়া ইঞ্জিন বসানো হয়েছে। ফলে সেটি একদম উল্কার বেগে ধেয়ে চল্‌ল।

কনস্টানটাইন বন্দরের কাছাকাছি গিয়ে নূর আলি-র জাহাজ মিরিয়ামের জাহাজটিকে ধরতে সক্ষম হ'ল। লেকিন এতে ফয়দা হ'ল এই যে, সম্রাটের সৈনিকরা জাহাজ ঘেরাও ক'রে নূর আলিকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিল।

বেটি মিরিয়াম'কে ফিরে পেয়ে সম্রাটের খুশী যেন আর ধরে না। প্রাসাদে খুশীর বন্যা বয়ে চল্‌ল। তামাম রাজ্য জুড়ে আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হ'ল।

সম্রাট নন্দিনী মিরিয়াম এক দুপুরে পালঙ্কে তার আম্মার পাশে শুয়ে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'আমাকে তোমরা ঝুটমুট প্রাসাদে আটকে রেখে কেন দুঃখ-যন্ত্রণা দিচ্ছ। আমি তো এখন বিধর্মী ; ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। আল্লাহ-ই আমার একমাত্র উপাস্য।' তার মুখের বাৎ খতম হওয়ার আগেই তার আম্মা চমকে উঠে তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরে ব'লে উঠলেন—'বেটি, কেন ঝুটমুট সর্বনাশের দিকে পা বাড়াচ্ছিস? দেয়ালেরও কান আছে। কেউ শুনে ফেল্‌লে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে যে!'

সাচ্চা বটে, দেয়ালেরও কান আছে। এক বুড়ি ক্রীতদাসী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের বাৎচিৎ শুনতে পেল। সে সম্রাট-নন্দিনীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটি পেটে চাপা রাখতে পারল না। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে প্রাসাদের দাস-দাসীদের সঙ্গে গোপনে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করল। এবার বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে মিরিয়াম-এর খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারটি তামাম প্রজাদের মধ্যে চাউর হয়ে গেল।

সম্রাট-নন্দিনীর অপকর্মের খবরটি গীর্জার পাদরী সাহাবের কানে যেতেও দেরী হ'ল না। তিনি সম্রাটকে বল্‌লেন—'কোই বাৎ নেহি। আমি তাকে ফিন খ্রীষ্টধর্মে ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। লেকিন এক কাম আপনাকে করতে হবে সম্রাট। এক শ'টি নওজোয়ানের খুনে সম্রাট-নন্দিনীকে গোসল করাতে হবে।'

সম্রাট বল্‌লেন—'হ্যাঁ, আমি রাজী। এক শ'র বেশী মুসলমান আমার কয়েদখানায় বন্দী রয়েছে। সবাই নওজোয়ানও বটে। তাদের খুন ক'রে আপনার বাঞ্ছিত তাজা খুনের ফিকির অনায়াসেই ক'রে দিতে পারব।'

কয়েদীদের জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হ'ল। তাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে এক এক ক'রে গর্দান নেয়া হতে লাগল। আর একটি পেল্লাই গামলায় তাদের খুন জমা করতে লাগল। এক সময় জল্লাদরা নূর আলি'কে নিয়ে সম্রাটের সামনে হাজির করল। জল্লাদের সর্দার জানাল, এক শ' যবনকে হত্যা ক'রে খুন সংগ্রহ করার কাজ চুকে গেছে। আর এ-যবনটি অতিরিক্ত। তাই তাকে আর হত্যা করা হ'ল না।

কয়েদীদের মধ্যে একমাত্র নূর আলিই জিন্দা রয়ে গেল। পাদরী-মাতা সম্রাটকে বল্‌লেন—'নূর আলি নামে অতিরিক্ত যবনটিকে আমার হাতে তুলে দিলে খুশী হই। আমার ইচ্ছা তাকে গীর্জার প্রহরীর কাজে নিযুক্ত করি।'

সম্রাট হাসিমুখে নূর আলি'কে পাদরী-মাতার হাতে তুলে দিলেন। এদিকে এক শ' মুসলমান নওজোয়ানের তাজা খুনে সম্রাট-নন্দিনী মিরিয়ামকে শুদ্ধি-গোসল করিয়ে ইসলাম ধর্ম থেকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হ'ল।

পাদরী-মাতা নূর-আলি'কে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—'বেটা, তোমার সুরৎ আর নসীব দেখে আমি মুগ্ধ। একমাত্র নসীবের জোরেই তোমার জান রক্ষা পেয়েছে।'

চোখে-মুখে বিষাদের হাসি ফুটিয়ে তুলে নূর আলি বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দিল—'আপনার দ্বিতীয় বক্তব্যটি আমি সমর্থন করতে একদম উৎসাহ পাচ্ছি না। কারণ, আমার নসীব যদি আমার পক্ষেই থাকবে তবে তো আমার কলিজার সমান মেহেবুবাকে হারাতে হোতো না।'

—'লেকিন তুমি তাকে কি করে খুইয়েছিলে বেটা?'

—'তবে বলছি, শুনুন—মুসলমান ডাক্তুরা সম্রাট-নন্দিনী মিরিয়ামকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে বাঁদী-বাজারে বেচে দেয়। তারা তার ধর্ম কেড়ে নেয়।'

—'হ্যাঁ, সে জন্যই তো এক শ' যবনের খুন দিয়ে তাকে গোসল করিয়ে পবিত্র ক'রে তোলা হয়েছে। সে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। লেকিন বেটা তোমার আদৎ পরিচয় কি? কেনই বা তুমি সম্রাটের ফাটকে আটক হয়েছিলে? তোমাকে দেখে আমি বিশোয়াস করতে উৎসাহ পাচ্ছি না যে, তুমি কোন কসুর করতে পার।'

—'আপনি আমার আম্মার মাফিক, আপনার দরবারে আমার দুঃখ-দুর্দশার কিস্সা পেশ করতে কোনই আপত্তি নেই। আমি মিরিয়াম'কে শাদী করে ঘর বেঁধেছিলাম। সে-ই উৎসাহী হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। একদিন সম্রাটের গুপ্তচররা আমার বিবিকে চুরি করে নিয়ে ভেগে আসে, আমি তাকে বুকে ফিরে পাবার তাগিদে জাহাজে চেপে তাদের পিছু নিয়েছিলাম। তারা আমাকে হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে কয়েদখানায় নিয়ে যায়। ব্যস, আটক ক'রে দিল। আপনি বিশোয়াস করুন, তাকে বিনা আমার জান টিকবে না। আমার সে সাধও নেই। ঘাতকের হাতে জান খতম হয়ে যাওয়াও এর চেয়ে ঢের শান্তির ছিল।'

—'বেটা, তোমার কলিজার জ্বালা আমি অনুমান করতে পারছি। মহব্বৎ জাত-ধর্ম মানে না। মিরিয়াম স্বেচ্ছায় স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার ধর্ম গ্রহণ করেছিল, বিশোয়াস করি। এখনও সে তোমার বুকে ফিরে যেতে আগ্রহী, তার মুখ দেখেই মালুম হয়েছে। তোমাকে গীর্জার প্রহরী করব বলে এখানে এনেছি। এতে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার নয়। তোমাকে পাদরীর পোশাকে সাজিয়ে দিচ্ছি।'

নূর আলি পোশাক বদলে বিলকুল পাদরী বনে গেল। বৈকালে মিরিয়াম গীর্জায় এল। পাদরীর পোশাক পরিহিত হলেও নূর আলি'কে সে ঠিকই চিনতে পারল। তার মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল।

পাদরী-মাতা আড়াল থেকে সম্রাট-নন্দিনীর মুখের প্রতিটি মুহূর্তের পরিবর্তনটুকু সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মিরিয়াম বিদায় নিলে পাদরী-মাতা নূর-আলি-র কাছে এলেন। সস্নেহে বল্লেন—'বেটা, তোমার আর সম্রাট-নন্দিনীর বিরহ-যন্ত্রণা আমার কলিজাকে আহত করেছে। আজ রাত্রেই তোমরা এখান থেকে ভেগে যাও। তোমাদের ভাবতে হবে না, আমি নিজে সব বন্দোবস্ত করে দেব।'

পাদরী-মাতার নির্দেশে তার এক ভক্ত মাঝ-রাত্রে জাহাজ নিয়ে ঘাটে অপেক্ষা করছিল। যথা সময়ে নূর আলি জাহাজ ঘাটে গেল। জাহাজের কাপ্তেন তাকে জাহাজে তুলে নিল। জাহাজ ছেড়ে দিল। নূর আলি তো বিস্ময়ে হতবাক। মিরিয়াম এসে না পৌঁছতেই জাহাজ ছেড়ে দিল! নূর আলি নিঃসন্দেহ হ'ল। বুড়ি পাদরী-মাতা আর জাহাজের কাপ্তেন তাকে নিয়ে নির্ঘাৎ কোন গোপন-জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তবে এর পিছনে কাপ্তেনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য যে নেই এতে তার কিছুমাত্রও সন্দেহ রইল না।

জাহাজ দরিয়ার বুক চিরে তরতর ক'রে এগিয়ে চল্‌ল। ভোর হ'ল। নূর আলি বিষণ্ণমুখে বিড়ে পাকানো নোঙরের দড়ির ওপরে বসে তামাম রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছে। সে মিরিয়াম-এর ব্যাপার, নিজের নসীব নিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবছে। কখন যে রাত্রি কেটে গিয়ে দরিয়ার বুকে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তার হুঁসও নেই। কাপ্তেন গুটিগুটি পায়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। নীরবে তার পাশে বসে পড়ল। বল্‌ল—'নূর আলি, সম্রাট-নন্দিনী মিরিয়াম-এর স্মৃতি দিল্ থেকে মুছে ফেল। সে-ই তোমাকে ধোঁকা দিয়ে তোমার মুলুক আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে, তোমার মালুম নেই?'

—'না, সে আমাকে ধোঁকা দেয় নি। ধোঁকা দিয়েছেন গীর্জার বুড়ি পাদরী-মাতা আর আপনি। মিরিয়াম আমার বিবি। আমাকে সাচ্চা পেয়ার মহব্বৎ করে। জাহাজ ফিরিয়ে আমাকে তার কাছে, কনস্টানটাইনে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। নইলে আমি দরিয়ার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান বরবাদ করে দেব, বলে দিচ্ছি।' নূর আলি পানিতে ঝাঁপ দেবার উদ্যোগ নিল। কাপ্তেন তাকে জড়িয়ে ধরল। নিজের বুকে একদম জাপ্টে ধরল। নূর আলি বুকে কি যেন দুটো তুলতুলে নরম বস্তুর স্পর্শ অনুভব করল। সবিস্ময়ে কাপ্তেনের মুখের দিকে তাকাল। হেঁচকা টানে তার মুখের দাড়ি খুলে ফেলে দিয়ে ব'লে উঠল—'মিরিয়াম তুমি! তুমিই এতক্ষণ আমার সঙ্গে মস্করা করছিলে? বড়িয়া সাজ সেজেছ তো! আমি একদমই তোমাকে চিনতে পারি নি।

নূর আলি মিরিয়াম'কে জড়িয়ে ধরল। তার ঠোঁটে, গালে ও কপালে বার বার চুম্বন করতে লাগল।

মিরিয়াম বল্‌ল—'কাপ্তেনই আমাকে নিজের সাজ পোশাক পরিয়ে দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, একটু তামাশা করার জন্য। পাদরী-মাতার শিষ্য ও সেবক তিনি। তাঁরই দৌলতে আজ আমরা পরস্পরকে বুকে ফিরে পেয়েছি মেহেবুব। তবে হ্যাঁ, আল্লাতাল্লা-র মর্জি না থাকলে কিছুই সম্ভব হ'ত না।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে জাহাজ ভিড়ল। এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' ছয়তম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী

অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, নূর আলি বিবি মিরিয়াম'কে নিয়ে নিজের মকানে গিয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

কনস্টানটাইন সম্রাট এদিকে লেড়কির জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। সে বিকালে গীর্জায় গেছে প্রার্থনা সারতে, ফেরার নামটিও নেই। সম্রাট সেখানে এক নোকরকে পাঠান তার খবর নেয়ার জন্য।

সম্রাট জানতে পারলেন, এক জাহাজে ক'রে চিড়িয়া ভেগেছে। এক বিশালায়াতন যুদ্ধ জাহাজ তৎক্ষণাৎ আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে যাত্রা করল।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছে তারা দেখল, ছোট্ট একটি জাহাজ বন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবে নোঙর করছে। যাত্রীরা কেউ-ই এখনও নামতে পারে নি।

যুদ্ধ-জাহাজটি থেকে সৈন্যরা ছোট্ট জাহাজটির দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল। চোখের পলকে তারা জাহাজটিকে ঘিরে ফেলল।

সম্রাট-নন্দিনী মিরিয়াম'কে সৈন্যরা তাদের জাহাজে তুলে নিল। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে জাহাজ ছেড়ে দিল।

মিরিয়াম'কে সম্রাটের সামনে হাজির করা হ'ল। সম্রাট তো একদম গোস্সায় ফেঁটে পড়ার জোগাড়। তিনি মন্ত্রীকে তলব ক'রে বল্লেন—'মিরিয়াম'কে প্রকাশ্য রাজপথে, প্রজাদের চোখের সামনে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করার বন্দোবস্ত কর।'

বৃদ্ধ মন্ত্রী হাত কচলে নিবেদন করলেন—'মহামান্য সম্রাট, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি রাজকুমারীর ফাঁসির আদেশ প্রত্যাহার ক'রে তার প্রতি অন্য কোন কঠিন শাস্তির বিধান দিন।' সম্রাট চমকে উঠে বল্লেন—'হঠাৎ তোমার মুখে এ-কথা কেন? মৃত্যুদণ্ডাদেশের চেয়ে কঠিন কোন্ শাস্তি হতে পারে, বুঝছি না!'

—'আছে, আলবৎ আছে। আমি তো এক অতি বৃদ্ধ। চুল-দাড়ি বিলকুল সফেদ। দাঁত একটিও অবশিষ্ট নেই। গাল তোবড়ানো, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ আর গায়ের চামড়া বিলকুল ঝুলে পড়েছে। এরকম এক বরের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার চেয়ে বড় কোন শাস্তি আছে ব'লে আমার অন্ততঃ জানা নেই। ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে দেয়ার চেয়েও বড় শাস্তির হদিস আপনাকে দিয়ে দিলাম। এখন বিলকুল আপনার বিবেচনার ওপর নির্ভর করছে।'

বৃদ্ধ মন্ত্রীর পরামর্শটি সম্রাটের দিলে ধ'রে গেল। সম্রাটের প্রাসাদে এমন কি রাজ্যের সর্বত্র হৈ চৈ পড়ে গেল।

রাজকুমারীর ফাঁসির পরিবর্তে শাদী হবে। গীর্জার পাদরী-মাতা বৃদ্ধ মন্ত্রীকে শাদীর শপথ-বাক্য পাঠ করালেন। আর শপথ-বাক্য পাঠ করালেন রাজকুমারী মিরিয়াম'কে। শাদী-পর্ব মহাধূমধামের সঙ্গে মিটে গেল।

এদিকে পুরো দু'দিন নূর আলি জাহাজের মাস্তুলের সঙ্গে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধা অবস্থায় কাটাল। সম্রাট কনস্টানটাইন-এর সৈন্যরা তাকে এ-অবস্থায় বেঁধে রেখে মিরিয়াম'কে নিয়ে চলে গিয়েছিল। জাহাজের কর্মচারীদের কেউ সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিয়েছিল, কেউ পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচিয়েছিল। দু'দিন বাদে এক কর্মচারী ভয়ে ভয়ে জাহাজে ফিরে এসে দেখে নূর আলি মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা। নিদ আর খানাপিনা বিনা কাহিল হয়ে পড়েছে। সে নূর'কে বাঁধন খুলে মুক্ত করে বন্দরের নিকটবর্তী এক মুসাফিরখানায় নিয়ে গেল।

নূর আলি মুসাফিরখানার এক ছোট্ট কামরায় পড়ে তার বিবি মিরিয়াম-এর জন্য শোকে আকুল হতে লাগল। খানাপিনা ছেড়ে দিল। নির্ঘুম অবস্থায় রাত্রি গুজরান করে। মুসাফিরখানার বৃদ্ধ মালিক তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিতে লাগল। নূর আলি তাতে কিছুমাত্রও সান্ত্বনা পায় না।

মহাপরাক্রমশালী সম্রাট কনস্টানটাইন দীর্ঘদিন ধরেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিরোধিতায় লিপ্ত। নূর আলি-র বিবিকে সম্রাটের সৈন্যরা ছিনতাই ক'রে নিয়ে যাওয়ার সংবাদটি তামাম আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রচার হয়ে গেল। মুসলমান নওজোয়ানরা এতে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

একদিন প্রায় শ'খানেক মুসলমান নওজোয়ান মুসাফিরখানায় নূর আলি-র কাছে এসে বল্ল—'আমরা ইসলাম বিরোধী সম্রাট কনস্টানটাইন-এর কবল থেকে তোমার বিবিকে উদ্ধারের কাজে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বল, কিভাবে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব। ইসলাম যখন বিপন্ন তখন আমরা ভয়-ডর, এমন কি মোউৎ-কেও তুচ্ছ জ্ঞান করি।'

ব্যস, আর দেরী নয়। শতাধিক উৎসাহী মুসলমান যুবককে সঙ্গে নিয়ে নূর আলি জাহাজ ভাসাল।

এক নাগাড়ে একান্ন দিন জাহাজ চালিয়ে নূর কনস্টানটাইন বন্দরে জাহাজ নোঙর করল।

সম্রাটের এক গুপ্তচর মুসলমান যুবকদের আগমনবার্তা সম্রাটের কাছে পৌঁছে দিল। সম্রাটের বিরাট ফৌজ জাহাজ ঘিরে ফেল্ল। বন্দী করল নূর আলিসহ শতাধিক মুসলমান নওজোয়ানকে। তাকে নিক্ষেপ করা হ'ল আন্ধার কয়েদখানায়।

এক ভোরে প্রাসাদসংলগ্ন রাজপথে কয়েদীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হ'ল। সম্রাটের নির্দেশে সবাইকে শূলে চড়ানো হবে। এক এক ক'রে সব কয়েদীকে প্রজা ও রাজকর্মচারীদের চোখের সামনে নির্মমভাবে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হ'ল। সবশেষে নূর আলি-র পালা। তাকে এবার বধ্যভূমিতে এনে দাঁড় করানো হ'ল।

সম্রাট কনস্টানটাইন নূর'কে দেখেই চমকে উঠলেন। ভাবলেন, এ-নওজোয়ানকেই তো তিনি পাদরী-মাতার অনুরোধে গীর্জার

দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন। সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার জালে ধরা পড়েছে। এবার একে দু'-দু'বার শূলে গেঁথে হত্যা করা হবে। দেখা যাক, ভগবান যীশু, নাকি এর আল্লাহ্-র মহিমা বেশী।

সম্রাট যখন নূর আলির-র শাস্তির ব্যাপার নিয়ে গভীর ভাবনায় মগ্ন ঠিক তখনই বৃদ্ধ মন্ত্রী তার সামনে এসে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ালেন। বল্লেন—'মহামান্য সম্রাট, আমার তিনজন যবন দরকার। আমার প্রাসাদের দ্বাররক্ষীর কাজে তাদের নিযুক্ত করব।'

সম্রাট হেসে বল্লেন—'তিনজন! তিনজন যবন! ইস! আর একটু আগে জানালে তিনজন তো সামান্য ব্যাপার ত্রিশজনই দিয়ে দিতে পারতাম। এখন মাত্র একজন অবশিষ্ট রয়েছে। যদি চান তবে একে নিয়ে যেতে পারেন।'

বৃদ্ধ মন্ত্রী নূর আলি'কে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। আস্তাবলে দুটো তেজী ঘোড়া রয়েছে। তাদের একটিকে আদর ক'রে ডাকা হয় লাহিক আর অন্যটিকে সাবিক। মন্ত্রী নূর আলি'কে নিয়ে আস্তাবলে হাজির হলেন। তাকে আস্তাবলটির এক কোণা দেখিয়ে বললেন—'এখনকার মত এখানেই থাক। দু'-দশদিন বাদে ভেবে দেখব যদি অন্যত্র তোমার থাকার বন্দোবস্ত করা যায়। অবশ্য যদি এরই মধ্যে আরও দু'জন যবন সংগ্রহ করতে পারি তবে না হয় তখনই বিবেচনা করব।'

নূর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'আপনার উদ্দেশ্য কি মেহেরবানি ক'রে বল্‌বেন কি?'

—'শুনবে? না শুনেই ছাড়বে না? তবে বলছি, শোন—'আমি নিয়ত করেছি, তিনজন যবনকে নিজে হাতে কোতল করব। তুমি তো মাত্র একজন হলে। আরও দু'জন চাই।'

—'হ্যাঁ হুজুর, আমিও এরকমই অনুমান করেছি। আপনার হাতে পড়ায় আমার নসীব ফিরে গেল। আদতে সম্রাট আমাকে আজই শূলে চড়াচ্ছিলেন, দেখলেনই তো। আপনার বন্দোবস্তে দু'-চারদিন পরমায়ু বেড়ে গেল। আমি এতে খুশীই হয়েছি।'

নূর এত দুঃখের মধ্যেও ভেঙে পড়ল না। সে আস্তাবলের ভেতরের দিকে উঁকি দিয়ে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! কী সর্বনেশে কাণ্ড! এমন সুন্দর তেজী ঘোড়া তামাম কনস্টানটাইন ঢুঁড়েও আর একটি মিলবে না। আর তারই কিনা এমন সর্বনাশ ঘটতে চলেছে!'

মন্ত্রী চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ এঁকে বল্লেন—'কি? কি ব্যাপার? ঘোড়াটির কি হয়েছে?'

—'আদতে আপনার আস্তাবলের দায়িত্বে যে হেকিম আছে সে কিছুই জানে না, জানলেও ঠিক মত দায়িত্ব পালন করে না। দেখছেন তো এর চোখ দিয়ে কেমন পিচুটি পড়ছে। শিগগির কানা হয়ে যাবে যে।'

—'সে কী হে! কানা হয়ে যাবে? এমন তেজী ঘোড়া যদি—সর্বনেশে কাণ্ড! হাজার হাজার দিনার খরচ করলেও এমন আর একটি ঘোড়া মিলবে না।'

—'হুজুর, হেকিমেরও দোষ নেই। এ খুবই পাজী রোগ। এর দাওয়াই সবার জানা নেই। আমি যদি আপনার ঘোড়ার বিমারির ইলাজ করে সারিয়ে দিতে পারি তবে কি ইনাম দেবেন, বলুন?'

—'তুমি কি হেকিমি বিদ্যা জান? এর বিমারি সারাতে পারবে? যদি পার তবে তোমাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আমি রাজী।' নূর আলি এবার পাঁচ কোয়া রসুন, সামান্য মোম, কিছু পরিমাণ কলিচুন আর একটি বাছুরের যকৃত সংগ্রহ করল।

বৃদ্ধ মন্ত্রী নূর আলি-র হাত-পায়ের বেড়ি খুলে দিলেন।

নূর আলি সংগৃহীত সামানপত্র একটি বড়সড় খলের মধ্যে রেখে আচ্ছা করে পেষাই করে কাঁই বানিয়ে নিল। কাঁইটুকু একটি ন্যাকড়ায় নিয়ে অসুস্থ ঘোড়াটির চোখে ফেটি বেঁধে দিল।

পরদিন সকালে মন্ত্রী এলেন। নূর ফেটি খুলে দিল। দেখা গেল ঘোড়ার চোখ স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে। পিচুটির চিহ্নমাত্রও তার চোখে নেই।

বৃদ্ধ মন্ত্রী নূর'কে সুক্রিয়া জানাল। আদতে নূর হেকিমির কিছুই জানে না। একবার তাদের ঘোড়ার ঠিক এরকমই বিমারি হয়েছিল। তাদের মহল্লারই এক সহিস দাওয়াই বানিয়ে দিয়ে বিমারি সারিয়ে দিয়েছিল। তার কাছ থেকে শেখা বিদ্যাটুকুকে কাজে লাগিয়ে নূর আলি আজ কামাল ক'রে দিল।

উজির নূর আলি-র ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তার ওপর আস্তাবলের সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দিলেন। আর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে সর্বত্র যাতায়াতের অধিকার দিলেন।

এদিকে মিরিয়াম-এর এক অন্তরঙ্গ সহচরী তাকে বল্ল—'আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রায় এক শ' মুসলমান নওজোয়ান জাহাজে চেপে বন্দরে এসেছিল। সম্রাটের হুকুমে তাদের বন্দী করা হয়েছিল। তাদের একজনকে বাদে বাকী সবাইকে কোতল করা হয়েছে। যে-খুবসুরৎ নওজোয়ানটি রেহাই পেয়েছে তার নাম নূর আলি। তার ওপর আস্তাবলের ঘোড়া দেখভালের দায়িত্ব বর্তেছে। আর সে মন্ত্রীর পেয়ারের পাত্রে পরিণত হয়েছে।'

মিরিয়াম পরিচারিকাটির মুখে নূর-এর খবর শুনে কয়েক মুহূর্তে নীরবে ভাবল। তারপর মুখ খুলল—'আমার একটি কাজ ক'রে দিবি ভাই? তাকে কাল সন্ধ্যায় বাগানে, জানালার ধারে একবারটি নিয়ে আসতে পারবি? তবে হ্যাঁ, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।'

—'আপনি যখন বলছেন, কোশিস আমি জরুর করব। তবে একটি চিঠি লিখে দিলে আরও ভাল হয়।'

মিরিয়াম নুর আলির নামে একটি চিঠি লিখে পরিচারিকাটির হাতে দিল। চিঠিতে লিখল, সেদিন সন্ধ্যায় সে যেন নগরের শেষ প্রান্তের ফটকের ধারে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করে। সে যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে যাবে।

সন্ধ্যায় আন্ধার নামতে না নামতেই নুর আলি লাহিক ও সাবিক-এর পিঠে জিন-লাগাম চাপিয়ে তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে ফটকের দিকে এগোতে লাগল। পথে মন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। নুর আলি-র তো আত্মা খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'আস্তাবলে বাঁধা থেকে থেকে ঘোড়া দুটোর পায়ে বাত ধরে যাবার জোগাড় হয়েছে। তাই দরিয়ার ধার দিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করিয়ে নিয়ে আসব ভেবেছি।'

মন্ত্রী খুশী হয়ে বল্‌লেন—'হ্যাঁ, হাঁটাহাঁটি করাতে পারলে ঘোড়াদুটোর তবিয়ৎ ঠিক থাকবে। যাও, বেশী রাত্রি কোরো না যেন।'

মন্ত্রী বিদায় নিলে নুর জোর কদমে ঘোড়া দুটোকে হাটিয়ে নিয়ে ফটকের সামনে হাজির হ'ল।

এদিকে মন্ত্রী বাড়ি ফিরে সাজ পোশাক বদলে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিলেন। মিরিয়াম সরাবের বোতল আর পেয়ালা এনে তাঁর হাতে দিল। এক পেয়ালা সরাব গলায় ঢালতে না ঢালতেই মন্ত্রী ঘাড় কাৎ ক'রে আরাম কেদারায় ঢলে পড়লেন। মিরিয়াম তার অত্যাবশ্যকীয় সামানপত্র একটি থলির মধ্যে আগে ভাগেই গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল। তাতে মন্ত্রীর সঞ্চিত বিলকুল ধন দৌলত ভরে রেখেছিল। থলিটি আর একটি তরবারি তাড়াতাড়ি কোমরে বেঁধে নিল। এবার একটি মোটা রশি থাম্বার সঙ্গে বেঁধে সেটি বেয়ে তরতর ক'রে বাগানে নেমে গেল।

এবার লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে হাজির হ'ল নির্দিষ্ট ফটকের কাছে।

নুর আলি ঘোড়া দুটো নিয়ে আন্ধারে অপেক্ষা করছে। মিরিয়াম হাজির হতেই দু'জনে দুটো ঘোড়ায় চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

তামাম রাত্রি তারা ঘোড়ার পিঠে কাটাল। সকাল হ'ল। তবু ছোটার বিরাম নেই। দুপুরের কাছাকাছি তারা ছোট্ট একটি নদীর ধারে ঘোড়া দাঁড় করাল। ঘোড়া দুটোকে নদীতে নামিয়ে পানি পান করাল। নিজেরাও গণ্ডুষ ভরে পানি তুলে পান করল। মিরিয়াম-এর শরীর আর চলে না। সারা রাত্রি শরীরের ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে তাতে গায়ে গতরে ব্যথা। শরীর টলছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে।

ঘোড়া দুটোকে গাছ থেকে কয়েকটি ডাল ভেঙে দিল। ক্ষিদের তাড়নায় তাই তারা চিবোতে শুরু করল।

নুর আলি ও মিরিয়াম একটি মোটাসোটা গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। নদীর ঠাণ্ডা ফুরফুরে বাতাসে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তারা কখন যে গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল নিজেরাই জানে না।

এক সময় শতেক খানেক ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনে তাদের নিদ টুটে গেল। মিরিয়াম চমকে উঠল।

নুর আলি বুঝতে পারল, সম্রাটের সৈন্যরা তাদের খোঁজে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

নুর আলি মিরিয়াম'কে দূরে সরিয়ে দিয়ে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একাই মোকাবিলা করার জন্য তৈরী হ'ল।

এদিকে সম্রাট দরবারে হাজির হয়ে দেখেন, মন্ত্রী অনুপস্থিত। আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন। তবু মন্ত্রী এলেন না। এবার আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। এক দূত পাঠালেন মন্ত্রীর মকানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূত ফিরে এসে জানাল মন্ত্রী

আরাম কেদারায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। আর মিরিয়াম প্রাসাদে নেই। দ্বাররক্ষী এ-ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না।

সম্রাট ক্রোধোন্মত্ত নেকড়ের মাফিক গর্জাতে গর্জাতে মন্ত্রীর মকানে এলেন। মন্ত্রীর হাত ধরে টানাটানি করলেন। অসাড় হয়ে পড়ে। কোন জবাব পেলেন না। দু' পা এগিয়ে বারান্দায় যেতেই তার চক্ষু স্থির। দেখলেন, থাম্বার সঙ্গে একটি মোটা রশি বাঁধা। রশিটির অপর প্রান্ত বাগানে ঝুলছে। তার বুঝতে দেরী হ'ল না, মিরিয়াম ওই মুসলমান নওজোয়ানটির সঙ্গে ভেগেছে।

সম্রাট হন্তদন্ত হয়ে দরবারে ফিরে এলেন। সেনাপতিকে তলব করলেন। তারা এলে হুকুম দিলেন-সৈন্যদের নিয়ে নূর আর মিরিয়াম-এর তাল্লাশ কর। যেখানে পাও, পাতালের ভেতর লুকিয়ে থাকলেও আমি তাদের চাই।

সেনাপতি সম্রাটের হুকুম তামিল করতে সদলবলে ঘোড়া নিয়ে ছুটল। শুরু করে দিল একদম চিরুণী তাল্লাশী। শেষ পর্যন্ত নদীর ধারে হাজির হওয়ার আগেই তাদের দেখা হয়ে গেল সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে। সম্রাট তাদের রওনা করিয়ে দিয়ে নিজেও একদল সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সম্রাট, নূর আর তাঁর লেড়কি মিরিয়াম-এর হদিস পেয়ে সৈন্যদের দূরে দাঁড় করিয়ে একাই চললেন লেড়কির কাছে।

লেড়কির সামনে হাজির হয়েই তিনি ক্রোধোন্মত্ত শেরের মাফিক গর্জে উঠলেন—'তোমার দুঃসাহস আমাকে স্তম্ভিত করেছে মিরিয়াম। কোন্ সাহসে তুমি স্বামীর প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ?'

মিরিয়ামও গলা ছেড়ে বল্‌ল—'অতীত নিয়ে আমি ভাবতে নারাজ। যা ঘটতে চলেছে তার মোকাবেলা করার জন্য আমি প্রস্তুত। আপনার সেনা বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করার মত হিম্মৎ আমাদের আছে। আর আমরা প্রস্তুতও।'

মিরিয়াম আর সময় নষ্ট না ক'রে উন্মুক্ত তরবারি হাতে সম্রাটের সেনাবাহিনীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

মিরিয়াম'কে অগ্রসর হতে দেখে সম্রাটের প্রধান সেনাপতি বারটাউট তরবারি হাতে বীর বিক্রমে এগিয়ে এল মিরিয়াম-এর মোকাবেলা করতে। দীর্ঘ সময় ধরে মিরিয়াম ও নূর আলি সম্রাটের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে লাগল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' দশতম রজনী

মধ্য রাত্রে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেনঃ'জাঁহাপনা, মিরিয়াম ও নূর আলি বীরবিক্রমে সম্রাটের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতির বুকের পাঁজরের একটি হাড় খসে পড়ল। মিরিয়াম-এর তরবারির আঘাতে সেনাপতি বারটাউট ধরাশায়ী হ'ল। ব্যাপার দেখে সম্রাট তাজ্জব বনে গেলেন।

এবার সেনাপতির অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এল বারটাউট-এর ছোটো ভাইয়া বারতান। সে-ও খুব হাত-পা ছুঁড়ে লড়াই শুরু করল। মিনিট দু'-তিন তরবারি চালিয়েই সে বুঝে নিল, এ বড়ই শক্ত ঘাঁটি। সহজে একে কব্জা করা তার কাজ নয়। তবু ইজ্জতের খাতিরে জানের মায়া তুচ্ছ করে সে লড়াই অব্যাহত রাখল। লেকিন বেশীক্ষণ তার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

এদিকে সম্রাটের আর এক সেনাপতি আসিয়ান-এর সঙ্গে নূর আলি-র তুমুল লড়াই চলছে। নূর আলি তার দলের বহু বীর যোদ্ধাকেই ইতিমধ্যেই ধরাশায়ী ক'রে ফেলেছে।

সন্ধ্যার আন্ধার নেমে আসার আগেই সম্রাটের জাঁদরেল সব সেনাপতিদের কেউ মিরিয়াম-এর হাতে, কেউ বা নূর-এর অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ দিয়েছে। শেষের দিকে সম্রাটের সেনাবাহিনীর হাল এমন হ'ল কেউ বা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে আবার কেউ বা পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচিয়েছে। যুদ্ধের ইতি হয়ে গেল।

নূর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে মিরিয়াম'কে আলিঙ্গন ক'রে বল্‌ল—'বিবিজান, তুমি যে এতবড় যোদ্ধা আমার কিন্তু আগে জানা ছিল না।'

মিরিয়াম স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বল্‌ল—'মিঞা সাহাব, এটুকু অন্ততঃ জেনে রাখবে, লেড়কিরা সঙ্কটের মুখে পড়লে পারে না এমন কোন কাজই নেই।'

নদীর তীরের তৃণশয্যায় মিরিয়াম স্বামীর সঙ্গে রাত্রি গুজরান করল। সকাল হতে না হতেই তারা ফিন দামাস্কাসের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সম্রাট কনস্টানটাইন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শেয়ালের মাফিক লেজ গুটিয়ে পালিয়ে কোনরকমে জান নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

সম্রাট ভোরে পাদরী-মাতা এবং সভাসদদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হলেন।

সভায় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হ'ল সম্রাট-নন্দিনী মিরিয়াম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কোন অশুভ শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। নইলে এতগুলো জাঁদরেল সেনাপতি ও সুশিক্ষিত সৈন্যদের ঘায়েল করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ত না।

গীর্জার পাদরী-মাতাও এ-মন্তব্য নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিলেন।

তাঁর মতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা হরেক কিসিমের ঝাড়-ফুঁক, তুকতাক জানে যার বলে তারা অনায়াসে অসাধ্য সাধন করতে পারে। সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে এসবের হদিস মেলে না।'

সম্রাট চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—'আমার অগণিত সৈন্য, বিশেষ ক'রে তিন-তিনজন বীরযোদ্ধা আজ নিহত। আমার সৈন্য সংখ্যা আজ মাত্র গুটি কয়েকে এসে ঠেকেছে। কোন কিছুর বিনিময়েই নিহত সেনাপতিদের সমান বীরযোদ্ধা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আজ আমার হালৎ এমন সঙ্গীন হয়ে পড়েছে যে, মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করে আমার লেড়কিকে ফিরিয়ে আনা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এমন কোন ফিকির আছে যার মাধ্যমে আমার লেড়কিকে ফিরিয়ে এনে প্রজাদের কাছে ইজ্জৎ বাঁচাতে পারি, বলুন পাদরী-মাতা।'

—'ফিকির একটিমাত্রই রয়েছে, আপনি খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর শরণাপন্ন হোন। তাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানান,

আপনার কন্যাকে মুসলমান নওজোয়ান নূর আলি কৌশলে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় ভেগে গেছে। তিনি যদি মেহেরবানি ক'রে আপনার লেড়কিকে উদ্ধার করে আপনার হাতে তুলে দেন তবে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আপনি তাকে আপনার রাজ্যের যে

কোন স্থানে মুসলমানদের উপাসনার জন্য মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেবেন। আর মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আর্থিক দিক থেকেও সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন। পাদরী-মাতার উপদেশকে সম্রাট ও তার পারিষদরা সাধুবাদ জানালেন।

সম্রাট পাদরী-মাতার উপদেশ অনুযায়ী এক চিঠি লিখে মন্ত্রী মারফৎ খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এমন সময় ভোর হয়ে এল। বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' বারোতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, সম্রাটের চিঠি নিয়ে তাঁর মন্ত্রী বাগদাদে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর দরবারে হাজির হলেন।

খলিফার বৃদ্ধ উজির জাফর সম্রাটের চিঠিটি পাঠ ক'রে শোনালেন। খলিফা চিঠির বক্তব্য শুনে চারদিকে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন সম্রাট-নন্দিনী মিরিয়াম আর নূর আলি-র তাল্লাশ করার জন্য।

মিরিয়ামকে নিয়ে নূর আলি কিছুদিন দামাস্কাসের মুসাফিরখানায় মহাখুশীতে দিন কাটাচ্ছে। একদিন কোতোয়ালের পেয়াদা তাদের ধরে নিয়ে গেল।

কোতোয়াল তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। নূর আলি নিজেদের পরিচয় গোপন করার প্রয়োজন বোধ করে নি। এ তো মুসলমানদের রাজত্ব। খ্রীষ্টানদের রাজত্ব হলে ভয় ডরের ব্যাপার ছিল। এখানে সে বুক ফুলিয়ে চলতে পারে।

কোতোয়াল সব কিছু শুনে বল্লেন—'তোমাদের তো এখানে থাকা চলবে না। খলিফার হুকুম বাগদাদে যেতে হবে তোমাদের।'

কোতোয়ালের কথা শুনে নূর আলি-র তো কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল! আল্লাতাল্লা-র এ আবার কী মর্জি! দুনিয়ার এক কোণে শাদী করা বিবিকে নিয়ে পড়ে থাকবে তাতেও ফ্যাসাদ!

কোতোয়াল কয়েকজন সৈন্য দিয়ে তাদের বাগদাদে খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দিলেন।

খলিফা মিরিয়াম-এর দিকে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে তাকালেন। তার চোখ-মুখ দেখে তিনি তাকে বিধর্মী খ্রীষ্টান ব'লে মনে করতে পারলেন না। তিনি বল্লেন—'তুমিই কি তবে কনস্টানটাইন সম্রাটের লেড়কি মিরিয়াম?' খলিফা বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বরে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন।

মিরিয়াম ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল—'আপনার অনুমান অভ্রান্ত জাঁহাপনা। আমিই মিরিয়াম। আপনি পয়গম্বর মহম্মদের মহান চাচা আব্বাসের পঞ্চম পুরুষ, আপনি ইসলামের রক্ষাকর্তা। আর

আমাদেরও একান্ত বল ভরসা।'

মিরিয়াম-এর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খলিফার বুক গর্বে ফুলে উঠল। তিনি এবার নূর আলি-র দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বল্লেন—'আর তুমিই তো মিশরের বণিকের লেড়কা নূর আলি, ঠিক কি না?'

—'হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমি কায়রোর বণিকের লেড়কা নূর আলি।'

খলিফা আহত শেরের মাফিক গর্জে উঠলেন—'তোমার সাহস তো কম নয় শয়তান বেতমিস কাঁহিকার! তুমি এক মুসলমান নওজোয়ান হয়ে এক বিধর্মী খ্রীষ্টান লেড়কির সঙ্গে ব্যভিচারে মত্ত হয়েছ। এমন জঘন্য অপরাধের সাজা কি জান?'

নূর আলি করজোড়ে অধিকতর বিনম্র বিনয়ের সঙ্গে বল্লেন—'জাঁহাপনা, আমি কোন গোস্তাকী করেছি বলে তো মালুম হচ্ছে না। আর জ্ঞানত ইসলামের বিধানও তো অমান্য করি নি। আপনি মেহেরবানি করে যদি আমাদের পুরো ব্যাপারটি আপনার দরবারে পেশ করার অনুমতি দেন তবে এ-বান্দা নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবে।'

খলিফার হুকুমে নূর আলি তার বিবি মিরিয়াম'কে লাভ করার ঘটনা থেকে শুরু ক'রে খলিফার দরবারে হাজির হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যা কিছু ঘটনা ঘটেছে সবই খোলসা করে খলিফার কাছে পেশ করল।

খলিফা সব কিছু শুনে কয়েক মুহূর্ত নীরবে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। তারপর মিরিয়াম-এর উদ্দেশ্যে বল্লেন—'তোমার আব্বা কনস্টানটাইন সম্রাট চিঠি লিখে এক দূতকে পাঠিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য আমি যদি তোমাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেই তবে তিনি আমাকে তাঁর রাজ্যে একটি মসজিদ নির্মাণের সুযোগ দেবেন। এ ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে চাই।'

মিরিয়াম এবার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ করেই নিজের মতামত খলিফার কাছে ব্যক্ত করতে গিয়ে বল্ল—'জাঁহাপনা, আপনি ইসলামের রক্ষাকর্তা। সে সঙ্গে আমাদের রক্ষাকর্তাও বটে। আপনার অবগতির জন্য ফিন বলছি, আমি বর্তমানে এক সাচ্চা মুসলমান। আল্লাহ্-ই আমার একমাত্র উপাস্য। এখন আপনিই বলুন, কোন নীতিতে আমাকে বিধর্মীর হাতে তুলে দিতে আগ্রহান্বিত হচ্ছেন? এতে কি আমার ধর্ম, ইজ্জৎ বিলকুল নষ্ট হবে না? আপনি যদি ইসলামের পূজারী আমাকে বিধর্মী, যীশুখ্রীস্টের পূজারীদের হাতে হাসিমুখে তুলে দেন তবে আমি তো আপনাকেই আল্লাতাল্লা-র দরবারে অভিযুক্ত করব, জাঁহাপনা। এখন ক্ষমতাবলে আপনি ত্রাণ পেলেও শেষ বিচারের দিন আপনাকে এ-কাজের জন্য আল্লাতাল্লা-র কাছে যে কৈফিয়ত দিতেই হবে তা কি আপনার জানা নেই?'

মিরিয়াম-এর বক্তব্য শুনে খলিফার কলিজা মোচড় মেরে ওঠে। দু'চোখে পানি দেখা দেয়। অস্থিরভাবে তিনি ব'লে উঠলেন—'কে? কে তুমি বেটি। আমার অজ্ঞানান্ধার কাটিয়ে তুমি আমার জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিলে? কে তুমি? না, আমি জরুর কোন সাচ্চা মুসলমানকে এক বিধর্মী খ্রীষ্টানের থাবার কাছে ছুঁড়ে দিতে পারি না। তোমার জ্ঞানগর্ভ স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য আমি যারপরনাই খুশী হয়েছি। তোমাকে আমি ইনাম বখশিস দিতে আগ্রহী বেটি। বল, আমার কাছ থেকে তুমি কি প্রত্যাশা কর। আমার সুলতানিয়তের অর্ধেকও যদি তুমি প্রত্যাশা কর তবু আমি সে প্রত্যাশা পূরণ করতে কুণ্ঠিত হ'ব না। বল বেটি, নির্দ্বিধায় বল, কি চাও আমার কাছ থেকে? আর যদি কিছু মনে না কর তবে তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই— তোমার আব্বা তো একজন নামজাদা সম্রাট। তামাম দুনিয়া জুড়ে তার খ্যাতি। তুমি তার বেটি হয়ে বিলাস ব্যসনের লোভ সম্বরণ করে কেন নূর আলি-র মাফিক এক অতি দীনহীন লেড়কাকে স্বামী হিসাবে বেছে নিয়েছ?'

—'জাঁহাপনা পরিস্থিতির চাপে পড়ে যে স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তা তো আপনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়েই জানতে পেরেছেন। এখন আমি যদি তাকে না-ই চাই, যদি তাকে ছেড়ে দেই তবে কি সে আমাকে ছাড়বে ব'লে আপনি ভরসা করেন? সে নগদ দাম দিয়ে বাঁদী-বাজার থেকে আমাকে খরিদ করে নিয়েছে, তা-তো শুনেছেনই। আর আমার এ-ও বলতে শরম নেই, নূর আলি'কে আমি দিল্-কলিজা দিয়ে পেয়ার মহব্বৎ করি। সে-ও আমাকে নিজের কলিজার চেয়েও বেশী পেয়ার করে। নইলে সে নিজের জানের মায়া বিসর্জন দিয়ে দু'-দু'বার আমাকে ফিরিয়ে আনতো না। তা যদি না করত তবে আমাকে কনস্টানটাইনের হাড্ডিসার বুড্ডা সেনাপতির বিবি হয়ে তার সেবা করতে হ'ত। আর তাতে আমাকে স্বধর্মচ্যুতও হতে হ'ত। এবার আপনিই বলুন, কেন আমি আমার স্বামী নূর আলিকে আঁকড়ে থাকব না?'

খলিফা সন্তুষ্ট হলেন। তিনি দেরী না ক'রে কাজী ডেকে নূর আলি আর মিরিয়াম-এর শাদী দিয়ে দিলেন।

খলিফা এবার কনস্টানটাইন সম্রাটের মন্ত্রী দূতকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন—'আমার বক্তব্য তো এদের মতামতও আমার কাজের মাধ্যমেই পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। আপনি মুলুকে ফিরে গিয়ে আপনার সম্রাটকে বলবেন, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে আমি অক্ষম।'

কনস্টানটাইন সম্রাটের মন্ত্রী ভুলে গেলেন যে, তিনি খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর দরবারে দাঁড়িয়ে। তাই তিনি কণ্ঠস্বরে রীতিমত উষ্মা প্রকাশ ক'রে বল্লেন—'জাঁহাপনা, সম্রাট-নন্দিনী

যদি হাজার বারও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে থাকে তবু তাকে নিয়েই আমাকে কনস্টানটাইনে ফিরতে হবে। আপনি যদি আমার কাজে বাধা প্রদান করেন তবে আপনাকে জরুর সুবিশাল সুলতানিয়ত হারাতে হবে। এখন আপনি বেছে নিন কোন্ পথ গ্রহণ করবেন।'

—'শয়তান বেতমিস কাঁহিকার। এতবড় স্পর্ধা তোমার। আমারই দরবারে, আমার মুখের ওপর এতবড় মন্তব্য করতে, আমাকে চোখ রাঙাতে তোমার কলিজা এতটুকুও কাঁপল না।' খলিফা এবার গর্জে উঠলেন—'জল্লাদকে তলব কর জাফর। তাকে বল প্রধান ফটকের সামনে এ-কুত্তার বাচ্চাটির গর্দান নিতে হবে। তারপর তার ধড় আর ছিন্ন মুণ্ডুটি টাইগ্রীসের পানিতে যেন ফেলে দিয়ে আসে। আর আমার তামাম সুলতানিয়তে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা ক'রে দাও, খলিফার সামনে স্পর্ধা প্রদর্শনের জন্য তার গর্দান নেয়া হয়েছে।' খলিফা বক্তব্য শেষ করতে না করতেই ক্রোধোন্মত্তা নেকড়ের মাফিক মিরিয়াম এক লাফে মন্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়াল। সে গর্জে উঠল—'উদ্ধত দূতকে আমিই নিজে হাতে শাস্তি দেব।' এক লহমার মধ্যে কোমর থেকে অসিটি টেনে নিয়ে সে তার বুকে আমূল গেঁথে দিল। তার রক্তাপ্লুত ধড়টিকে এবার লাথি মারতে মারতে দরবারের বাইরে বের করে দেয়া হ'ল। বার-কয়েক হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে মন্ত্রীর নিঃসার দেহটি এলিয়ে পড়ল।

খলিফা মুহূর্তের মধ্যে বিলকুল অভাবনীয় এক কাজ ক'রে বসলেন। খুশী আর উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে তিনি নিজের শির থেকে তাজটি খুলে মিরিয়াম-এর শিরে পরিয়ে দিলেন। আর সে সঙ্গে অন্যান্য বহুমূল্য ইনাম বকশিসে তাঁকে ভূষিত করলেন।

পরদিন সকালে খলিফা কয়েকটি উটের পিঠে বহুমূল্য উপহার সামগ্রী দিয়ে মিরিয়াম ও নূর আলি'কে তার মুলুক কায়রোতে পাঠিয়ে দিলেন।

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে নূর আলি তার বিবি মিরিয়াম'কে নিয়ে কায়রো নগরে তার আব্বার কাছে ফিরে এল। তারপর তারা সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল।

কিস্সা শেষ ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। কিস্সাটি শেষ হতে না হতেই দুনিয়াজাদ বেগমের গলা জড়িয়ে ধরে আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ব'লে উঠল—'বহিনজী তোমার কিস্সা যত শুনছি ততই দিল্ উতলা হয়ে উঠছে!' জানালা দিয়ে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচার দিকে এক লহমায় তাকিয়ে নিয়ে সে এবার বল্ল—'বহিনজী ভোর হতে এখনও ঢের দেরী আছে। আর একটি কিস্সা শুরু কর যা শুনে জাঁহাপনা একদম তাজ্জব বনে যান।'

বেগম শাহরাজাদ মুচকি হেসে বল্লেন—'বহুৎ আচ্ছা বহিন, এবার তোমাদের 'দিল্ দরিয়া সুলতানের কিস্সা' নামে বহুৎ আচ্ছা এক কিস্সা শোনাচ্ছি।

দিল্ দরিয়া সুলতানের কিস্সা

জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে বসরাহ নগরে এক দিল্ দরিয়া সুলতান বাস করতেন। তার দিল্ ছিল একদম দরাজ। তাই সবাই তাঁকে 'দিল্ দরিয়া সুলতান' নামে অভিহিত করত। তিনি ছিলেন নওজোয়ান, ফলে তাঁর ইয়ার-দোস্তের অভাব ছিল না। সুলতানের নাম ছিল জাইন। সুলতান জাইন-এর একটি বড় গুণ ছিল, দীন দুঃখী দেখলে, কোন আদমির চরম দুর্গতির মুহূর্তে তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারতেন না। অকাতরে দান করে তার দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করার কোশিস করতেন।

সুলতানের চরিত্রে এত সব গুণের সমাবেশ ঘটা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একদম খামখেয়ালি ও বেপরোয়া।

তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণাবলীর সুযোগ নেয়ার জন্য তাঁর ইয়ার-দোস্ত ও আত্মজনরা হরবখত তাঁর ধার-কাছ দিয়ে ঘুর ঘুর করত।

দরাজ হাতে দান খয়রাত করতে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই সুলতানের ধনাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ল। সুলতান জাইন-এর ইয়ার দোস্তরা প্রায়ই নয়া নয়া খুবসুরৎ বাঁদী সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে। নাচা-গানার মজলিশ বসে। খুসবুওয়ালা দামী গুলাবী সরাবের ঢালাও পরিবেশনে সুলতানের রাজকোষের অর্থ ফুরিয়ে আসতে লাগল। বুড্ডা খাজাঞ্চিও এসে বার বার রাজকোষের দুরবস্থার ব্যাপারে সুলতান জাইনকে হুঁশিয়ার ক'রে দিতে লাগল। এবার তার কানে পানি ঢুকল, সাচমুচ ভাবিত হলেন। এখন সে খালি হাতে ভিখমাঙ্গা হওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর নেই। সুলতান জাইন ভাবলেন, জ্ঞানীরা তো বলেনই—'দারিদ্র্যের নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে কবর শতগুণে শ্রেয়।' এরকম বিবেচনা করে তিনি এক সন্ধ্যায় ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে পথে নেমে পড়লেন।

পথ চলতে চলতে তাঁর হঠাৎ স্মরণে এল, আব্বাজী তো বেহেস্তে যাবার আগে তাঁকে কিছু অমূল্য উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ ছিল—'বেটা যতই বিলাস ব্যসনের মাধ্যমে দিন গুজরান কর না কেন একটি বাৎ ইয়াদ রাখবে—সুখ-শান্তি কারো চিরদিন অব্যাহত থাকে না। নসীবের বিবর্তন ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এ ব্যাপারটি বিবেচনা করে আমি মহাফেজখানায় তোমার জন্য এমন এক সম্পদ লুকিয়ে রেখে যাচ্ছি যা তোমাকে দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে রেহাই দিতে সক্ষম।'

আব্বার উপদেশটি ইয়াদে আসতেই সুলতান লম্বা লম্বা পায়ে মহাফেজখানায় হাজির হলেন।

মহাফেজখানায় যা কিছু সামানপত্র রয়েছে সুলতান বিলকুল পাতি পাতি ক'রে তল্লাশ করলেন। না, কোন ধন দৌলতেরই হদিস

পেলেন না। তিনি তবু হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন না। ফিন জোর তল্লাশী শুরু করলেন। এক সময় স্বগতোক্তি ক'রে বললেন—'ইয়া আল্লাহ!' ছোট্ট একটি বাক্স সামানপত্রের তলা থেকে বের ক'রে আনলেন। তালা ঝুলছে। ভাবলেন, এর ভেতরে আর এমন কোন্ সুলতান-বাদশার ধন-দৌলত থাকা সম্ভব? তবু কৌতূহলের শিকার হয়ে তালাটি ভেঙে ফেল্লেন। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন—'ইয়া আল্লাহ! এ যে বিলকুল ফাঁকা। ধন দৌলত তো দূরের ব্যাপার, একটি কানাকড়িও যে নেই। দেখলেন, বাক্সটির এক কোণে ছোট্ট একটি কাগজের টুকরো পড়ে রয়েছে।

অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে কাগজের টুকরোটি বের ক'রে চোখের সামনে মেলে ধরলেন। তাতে গুটিগুটি হরফে লেখা—একটি খন্তা নিয়ে প্রাসাদের পশ্চিমদিকে যাও। সেখানে একটি নহবতখানা নজরে পড়বে। তার মেঝের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকৃতি সফেদ পাথর চোখে পড়বে। সেটি তুলে ফেলে খন্তাটি দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করবে। তারপর যা কিছু করার আল্লাহ-ই করবেন।

সুলতান কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলেন এর মাধ্যমে আব্বা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন? মালুম হচ্ছে, তিনি কৌশলে কঠোর পরিশ্রমী হতে বলছেন। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার পাত্র হাতে ঢুঁড়ে বেড়ানোর চেয়ে কামলা খাটা শতগুণে শ্রেয়।

সুলতান জাইন মনস্থ করলেন, আব্বার উপদেশ মাফিক জমিন খুঁড়ে দেখবেন, ব্যাপার কি।

খন্তা নিয়ে হাজির হলেন নহবত খানায়। কাগজের বর্ণনা অনুযায়ী গোলাকৃতি সফেদ পাথরটি চোখের সামনে ফুটে উঠল। খন্তা দিয়ে সামান্য চাড় দিয়ে পাথরটিকে তুলে দিলেন। এবার মিট্টি। উন্মাদের মাফিক মিট্টি খুড়ে চললেন। চোখের সামনে একটি সিঁড়ি ভেসে উঠল। খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে। দৌড়ে গিয়ে একটি চিরাগবাতি নিয়ে এলেন। খন্তা আর চিরাগবাতিটি নিয়ে দুরু দুরু বুকে ধীর-পায়ে নিচে নেমে চল্লেন। বেশ কয়েক ধাপ নামার পর একটি বড়সড় কামরায় হাজির হলেন। কামরাটির একধারে চারটি চৌপায়ার ওপরে দশটি সোনার জালা। ইয়া পেল্লাই জালা। গায়ে নক্সা কাটা।

সুলতান জাইন ভাবলেন—জালাগুলো সরাবের পাত্র। হোক না। পান ক'রে মৌজ করা তো যাবে। ব্যস্তহাতে একটি জালার ঢাকনা খুলে মেঝেতে ফেলে দিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'শোভন আল্লাহ! এযে সোনার গুঁড়োয় একদম ভর্তি! উন্মাদের মাফিক পাশের জালার ঢাকনাটি সরিয়ে ফেলতেই দেখলেন, সোনার মোহরে একদম ঠাসা। দশটি জালার কোনটিতে সোনার মোহর, নয় তো সোনার গুঁড়ো ভর্তি। ব্যাপার দেখে তার দিল্ নেচে উঠল। শুরু হয়ে গেল কলিজার ছটফটানি।

জাইন একটি জালা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। কোশিস করলেন মাথায় তুলে নেয়ার। তুলতে তো পারলেনই না বরং সোনার গুঁড়োর সর্বাঙ্গ মাখামাখি হয়ে গেল।

কামরাটির পাশেই হামাম। জাইন গোসল ক'রে সাফ সুতরা হয়ে নিতে চাইলেন। গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে ভাবলেন—'হায় বোকা জাইন, তুমি তো ভিক্ষার থলি হাতে নেয়ার ধান্দা করছিলে? এখন? এ বিপুল ধন-দৌলত দিয়ে কি করবে, ভেবে দেখেছ কি?'

জাইন নিজেই এর উত্তরও ভেবে ফেলেন—এগুলো হয়তো দিল্ খুলে দীন দুঃখীকে দান-খয়রাত করার ইনাম। নসীব বিড়ম্বিত যে, যা চেয়েছে দু'হাত ভরে তাদের তা দিয়েছে এগুলো তার লব্ধফল। এর মাধ্যমে আল্লাহ হয়ত ইঙ্গিত দিচ্ছেন, যে দিল্ উজাড় করে দান খয়রাত করতে আগ্রহী তার অভাব অনটন কোনদিনই হয় না। জাইন জালাগুলো মেঝেতে ঢেলে ফেলে বিলকুল পাহাড় বানিয়ে ফেল্ল। জুল জুলে চোখে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের মণি অচঞ্চল। নিঃশ্বাস দ্রুততর। মুখে রা নেই। আদত ব্যাপার হচ্ছে, তাঁর দিমাকে আসছে না, এমন পর্বতপ্রমাণ সোনা দিয়ে কি করবেন? উন্মাদের মাফিক সোনার মোহর আর গুঁড়োগুলোর ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। সারা গায়ে, মাথায় আর মুখে সোনার গুঁড়ো মাখামাখি হয়ে গেল। তিনি যেন অবিকল একটি সোনার মূর্তি বনে গেছেন। তিনি বদ্ধ উন্মাদের মাফিক হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। হাসি যেন আর থামতেই চায় না।

সুলতান জাইন-এর দিমাকে আসছে না, তার আব্বা জমিনের তলায় এমন সুন্দর একটি কামরা বানিয়ে এমন অগাধ ঐশ্বর্য কি ক'রে সবার চোখের আড়ালে রাখতে পেরেছিলেন? আর এগুলো জোগাড়ই বা কি ক'রে করেছিলেন? তার সুলতানিয়তের প্রজাদের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় হওয়া সম্ভব তাতে এমন একটি মোহরের পাহাড় কিছুতেই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে? এর কোন জবাব নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে বের করতে পারলেন না।

সোনার মোহর ও গুঁড়াগুলোর ওপর দিয়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে করতে এক সময় ছোট্ট একটি কৌটোর দিকে তাঁর নজর পড়ল। সোনার কৌটো। নক্সা করা।

কৌটোটি খুলে তিনি দেখেন, তার ভেতরে রয়েছে একটি চাবি আর এক চিলতে কাগজ। অনুসন্ধিৎসু নজরে কাগজটি পরীক্ষা করতে করতে তাতে দেয়ালের গায়ের একটি চিহ্নের উল্লেখ দেখলেন। দেয়ালের চিহ্নটির গায়ে নখ দিয়ে আঁচড় মারতেই ছোট্ট একটি পাথরের হদিস পান। তার গায়ে চাবির ঘর তৈরী। কৌতূহল বশতঃ চাবিটি ঢুকিয়ে এক পাক মারতেই তর তর করে দেয়ালের

একটি দিক সরে গিয়ে দরওয়াজার সৃষ্টি হ'ল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সুদৃশ্য একটি কামরা। তার মাথার ওপরে তখ্‌তের ওপর বিচিত্র ভঙ্গিতে ছয়টি লেড়কি বসে। খুবসুরৎ লেড়কি। খুন আর গোস্তওয়ালা কেউ-ই নয়। ইয়া পেল্লাই হীরা খোদাই ক'রে ক'রে প্রত্যেকটি লেড়কিকে গড়ে তোলা হয়েছে।

সুলতান জাইন এবার সাচমুচ ভিমরি খাবার জোগাড় হলেন। তাঁর আব্বা এত ধন-দৌলতের অধিকারী কি ক'রে হয়েছিলেন! কোন আদমির পক্ষেই তো এতসব উপার্জন করা সম্ভব নয়! কিছুতেই নয়!

এবার আর একটি সোনার তখ্‌ত দেখলেন। তবে সেটি খালি। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সাধ্যমত উঁচু হয়ে দেখলেন, সেটি বিলকুল খালি নয়। এক টুকরো রেশমি কাপড়া দেখা যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে সেটিকে নিলেন। দেখলেন তার গায়ে সোনার জল দিয়ে লেখা রয়েছে—'বেটা, এসব হীরার তৈরী লেড়কিদের জোগাড় করতে আমাকে বহুৎ বহুৎ তকলিফ স্বীকার করতে হয়েছে। পুরো এক একটি হীরা কেটে কেটে প্রত্যেক মূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে। বেহেস্তের পরীর মাফিক খুবসুরৎ এরা। এদের চেয়েও বেশী সুরৎ কোন লেড়কির নেই। এখানে ছ'টিকে দেখতে পাচ্ছ। সপ্তম লেড়কির তখ্‌তটি শূন্য। সে কায়রোতে রয়েছে। সেখানে গেলে আমার একদম বুড্ডা নফর মুবারক-এর তাল্লাস করবে। সপ্তম লেড়কিটির হদিস সে-ই তোমাকে দিতে পারবে। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারলে বুঝবে যে, তার সুরৎ এ-ছয় লেড়কির চেয়ে কত, কতগুণ বেশী। বেটা জাইন, যদি সম্ভব হয় তবে তাকে এনে এ-শূন্য তখ্‌ৎ-এ স্থাপন কোরো। এ-ই আমার শেষ ইচ্ছা। খোদাতাল্লা তোমার ভালোই করুন।'

সুলতান জাইন মনস্থির ক'রে ফেলেন আগামী কালই কায়রোতে গিয়ে সপ্তম লেড়কিটির সুরৎ চাক্ষুষ করবেনই। সুলতান জাইন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গর্তটির মুখে সফেদ পাথরটি চাপা দিয়ে দিলেন।

সুলতান জাইন পরদিন দরবারে উপস্থিত হলেন পারিষদদের সামনে। কিছুদিনের জন্য প্রধান উজিরের ওপর সুলতানিয়ৎ পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করে আদৎ উদ্দেশ্য ব্যাপার কাউকে কিছুই না বলে কায়রোর পথে পা বাড়ালেন। কয়েকজন নফর, নোকর সঙ্গে নিলেন।

কায়রোতে পৌঁছে তিনি মুবারক-এর প্রাসাদে হাজির হলেন। সোনাদানা ও নগদ অর্থের দিক থেকে তিনি একজন কুমীর। এখানকার সুলতানও অর্থকড়ির দিক থেকে তাঁর সমান নন। তিনি প্রাসাদটির দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, তাঁর আব্বার এক বেতনভুক কর্মচারীর এমন অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হওয়া কি ক'রে সম্ভব হ'ল। দেখলেন সুবিশাল ও সুসজ্জিত কামরার ভেতরে মখমলের আসনে এক বুড্ডা বসে রয়েছেন। একদম বুড্ডা। জাইনকে দেখেই বৃদ্ধ অভ্যর্থনা করে বসতে বল্‌লেন। মুচকি হেসে তাঁর পরিচয় ও আগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

জাইন বুড্ডার সামনের এক আসনে বসতে বসতে বল্‌লেন—'আমার নাম জাইন। বসরাহ নগরে আমার বাস। সেখানকার সুলতান আমি। আমার আব্বাজী বেহেস্তে গেছেন।'

তার বক্তব্য খতম হতে না হতেই বুড্ডা মুবারক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তার চোখের কোণে পানির বিন্দু দেখা দিল। তিনি বল্‌লেন—'আপনার আব্বা আমার মালিক ছিলেন। বেহেস্তে যাবার আগে ফিন মালিক আর নফরের মিলন ঘটল। আমার গরীবখানা ফিন পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। জাঁহাপনা, হুকুম করুন এ-নফর কিভাবে আপনার সেবা করতে পারে?'

—'আমি সপ্তম হীরক লেড়কিকে দেখার প্রত্যাশায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আব্বার এক লেখা থেকে জানতে পেরেছি একমাত্র আপনিই তার হদিস দিতে পারেন। বলুন, কোথায় আমার সে বাঞ্ছিত সম্পদ?'

—'মালিক এ-প্রাসাদ, ধন-দৌলত যা কিছু দেখছেন বিলকুল আপনার। আর সে হীরক-লেড়কিও আপনারই। আমি জরুর তার কাছে আপনাকে নিয়ে যাব। তার আগে আপনি মেহেরবানি করে এ-বান্দার গরীবখানায় দু'-চার রোজ বিশ্রাম করুন।'

—'খুবই সাচ্চা বটে, আপনি আমার আব্বার খরিদ করা নফর ছিলেন। আমার জানা নেই আপনি এখানে আসার সময় তিনি আপনাকে মুক্তি দিয়েছিলেন কি না। তবে আপনার বাৎচিৎ ও ব্যবহার বলছে, আপনি এখনও আমাদের নফরই আছেন। আটক আছেন, মুক্তি হয় নি। যদি আমার অনুমান সাচ্চা হয় তবে আজ আপনাকে আমি নিঃশর্তে মুক্তি দিলাম। আর এক বাৎ, আমি অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে সুদূর বসরাহ থেকে ছুটে এসেছি। অতএব আপনি সবার আগে আমাকে বহু আকাঙ্ক্ষিত হীরক-লেড়কিকে দেখার বন্দোবস্ত করে দিন।'

—'বহুৎ আচ্ছা। জরুর নিয়ে যাব সেখানে। আর কালই যাব। লেকিন জাঁহাপনা, ইয়াদ রাখবেন, পথে বহুৎ ঝুট ঝামেলা পোহাতে হবে। বিপদের ঝুঁকি, বুক দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। রাজী? সপ্তম হীরক-লেড়কি এখন ত্রিভুজ-দ্বীপে আছে। সেখানকার এক অতিবৃদ্ধের জিম্মায় সেটি আছে। কদমে-কদমে বিপদ। হাজারো বিপদ কাটিয়ে কেবলমাত্র দু'জনেরই সেখানে হাজির হওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাদের একজন এ-বান্দা। তাই পথের বিপদের ঝুঁকির

ব্যাপারটি—'

তার বক্তব্য খতম হওয়ার আগেই জাইন ব'লে উঠলেন—'আমি যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে তৈরী আছি বটে। মোউতের ভয় ডর আমার নেই। কাজের মধ্য দিয়েই আমার হিম্মতের পরিচয় পেয়ে যাবেন। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।'

বুড্ডা মুবারক পরদিন ভোরে নামাজ সেরে আমাকে নিয়ে ত্রিভুজ দ্বীপের উদ্দেশ্যে পা-বাড়ালেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' চব্বিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, বুড্ডা মুবারক সুলতান জাইনকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিভুজ দ্বীপের পথে রওনা হয়ে গেলেন। উষর মরুপ্রান্তর। বহুৎ তকলিফ সহ্য ক'রে তবে মরুভূমির মুলুক পেরিয়ে তারা সবুজ শষ্যক্ষেত্রে হাজির হলেন। পথ চলার বিরাম নেই। এবার ডিঙোলেন একের পর এক উচ্চ আর অনুচ্চ পর্বত। তবু বিরাম নেই। নেই কারো এতটুকুও ক্লান্তি। এবার তাঁরা হাজির হলেন এক দরিয়ার কিনারে। থামার সুযোগ নেই। এক বড়সড় নৌকো নিয়ে এগিয়ে চললেন উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুক চিরে।

এক সময় একটি সবুজ দ্বীপের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বুড্ডা মুবারক বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ওই যে ত্রিভুজ দ্বীপ। জাইন অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে দ্বীপটিকে দেখতে লাগলেন।

বুড্ডা নৌকাটিকে কূলে ভেড়ান। এবার দ্বীপের আঁকাবাঁকা সরু একপেয়ে পথ বেয়ে মুবারক তাঁকে নিয়ে পয়দল এগিয়ে চল্‌লেন।

মুবারক এক সময় জাইন-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌লেন—'হুজুর, আমরা হীরক-লেড়কির নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। এবার নিজেকে শক্ত ক'রে বাঁধুন। কলিজা শক্ত করুন। ইয়াদ রাখবেন, আমরা নিরস্ত্র।' এবার একটি অনুচ্চ পাহাড় দেখিয়ে বল্‌লেন—'হুজুর ওই যে পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছেন তার চূড়ায় আমাদের উঠতে হবে।' কোর্তার জেব থেকে ছোট্ট একটি কিতাব বের করলেন। পুরানো। পাতাগুলো পর্যন্ত পচে গেছে। অসাবধানে হাত দিলে পাতা গুঁড়ো হয়ে যায়।

বুড্ডা মুবারক কিতাবটির একটি পাতা বের করে অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব পাঠ করতে লাগলেন। জাইন তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। দৃষ্টি তাঁর পাহাড়টির দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আজব এক কাণ্ড ঘটে গেল। পাহাড়টি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। ব্যস, এক পেয়ে পথ সৃষ্টি হয়ে গেল। সে পথ দিয়ে আগে মুবারক, পিছনে জাইন এগোতে লাগলেন। তারা পাহাড়টি ডিঙোতে না ডিঙোতে

জাইন'কে অবাক করে দিয়ে পাহাড়টি অলৌকিক উপায়ে ফিন জোড়া লেগে গেল। এবার সামনে একটি পাহাড়ী নদী দেখা দিল। এক লহমার মধ্যে অভাবনীয়ভাবে একটি ছোট্ট নৌকা এসে সেখানে হাজির হ'ল। নৌকায় উঠতে উঠতে মুবারক বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আপনার কাছে আমার একটি আর্জি রয়েছে। যা কিছু চাক্ষুষ করবেন মেহেরবানি ক'রে বিলকুল সহজ-সরল নজরে নেবেন। কিছুতেই ঘাবড়াবেন না। আর ফিরে যাওয়ার ব্যাপার ভুলেও যেন চিন্তা করবেন না। মুখে কলুপ এঁটে, ধৈর্যের সঙ্গে বিলকুল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। ইয়াদ থাকবে তো? নৌকার মাঝি যদি কোনক্রমে ধরতে পারে যে, আমাদের ভেতরে ভয় ডর বা দ্বিধার সঞ্চার হয়েছে তবে কিন্তু সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। সে আমাদের চক্করে ফেলে কলিজাকে দুর্বল ক'রে দেবার কোশিস্ করবে। যদি বোঝে আমাদের ভেতরে ভীতির সঞ্চার হয়েছে তবে কিন্তু আমাদের নৌকা সমেত পানিতে ডুবিয়ে মারার কোশিস্ করবে। একদম হুঁশিয়ার থাকবেন।

বুড্ডা মুবারক জাইনকে নিয়ে নৌকায় উঠে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাটি তাদের নিয়ে দ্বীপে হাজির হ'ল। তাঁরা মাঝির সাহায্যে কূলে নামল। ব্যস, এক লহমার মধ্যে মাঝি আর

নৌকা দু-ই হাফিস্ হয়ে গেল। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বুড্ডা মুবারক এবার জাইন-এর হাত শক্ত ক'রে ধরে দ্বীপটির ভেতরে ঢুকে যেতে লাগলেন। পথের দু'ধারে হরেক রঙ আর ঢঙের পলা, চুণী। মুক্তা আর পলা দিয়ে অনুচ্চ প্রাচীর তৈরী করে রাখা হয়েছে। কোটি কোটি দিনার ব্যয় করেও এ কিসিমের একটি প্রাচীর তৈরী করা সম্ভব নয়। তারা হাঁটছে তো হাঁটছেই। লেকিন কোন আদমি, এমন কি একটি গুঁড়া বাচ্চার দেখা পর্যন্ত তারা পেলেন না। বার বার বাঁক ঘুরে তারা হাজির হলেন ইয়া পেল্লাই একটি প্রাসাদের সামনে।

মুবারক প্রাসাদটির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমাদের এ-প্রাসাদটিই লক্ষ্যস্থল। ওই বুড্ডা এখানেই থাকে।'

প্রাসাদটির কাছে এগিয়েই জাইন-এর চোখ দুটো একদম ছানাবড়া হয়ে গেল। একটি মাত্র পান্না খোদাই করে প্রাসাদটিকে গড়ে তোলা হয়েছে। কে, কোত্থেকে যে পাথরটিকে জোগাড় ক'রে এনেছিল কিছুই বুঝতে পারলেন না।

আরও সামান্য এগোতেই জাইন থমকে গেল। প্রাসাদটির চারদিকে দুর্গের মাফিক পরিখা খনন ক'রে দেয়া হয়েছে। তার বুঝতে দেরী হ'ল না, সাধারণের গতিরোধ করার জন্যই এ-বন্দোবস্ত।

প্রাসাদটির দরওয়াজাগুলি বন্ধ। সদর-দরওয়াজাটি সোনা দিয়ে তৈরী। জাইন হাঁ-ক'রে প্রাসাদটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ভাবতে লাগলেন—প্রাসাদটির সব দরওয়াজাই তো বন্ধ। তবে এর ভেতরে ঢোকার ফিকির কি?

ইতিমধ্যে বুড্ডা মুবারক কোর্তার জেব থেকে চারটি রেশমী ফিতা বের করলেন। তাদের দুটো নিজের কোমরে আর বাকী দুটো জাইন-এর কোমরে বেঁধে দিলেন।

মুবারক এবার কোর্তার অন্য এক জেব থেকে দুটো বড় বড় রেশমী রুমাল বের করে জমিনে পাতলেন। জাইনকে নিয়ে তার ওপরে বসলেন। জেব থেকে একটি আতরের শিশি বের করে উভয়ের গায়ে কয়েক ফোঁটা ক'রে ছিটিয়ে দিলেন। আর, এক বোতল গুলাব পানি বের ক'রে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে দিতে অনুচ্চ কণ্ঠে কি যেন মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন।

মুবারক মন্ত্রপাঠ খতম ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এবার আমি বুড্ডাকে তলব করব। তিনি ভয়ঙ্কর কুটিল রূপ ধারণ ক'রে হাজির হবেন কিনা, মালুম নেই। যদি দেখেন ভয়ঙ্কর কোনরূপ পরিগ্রহ করেছেন তবে একদম ঘাবড়াবেন না বা তাজ্জব বনে তাঁর দিকে তাকাবেন না। তবে কিন্তু একদম কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। আর যদি খোশ মেজাজে হাজির হন তবে বুঝবেন, বরাত আচ্ছা।

বুড্ডা যে-রূপ পরিগ্রহ করেই সামনে হাজির হন না কেন আপনি কলিজা শক্ত রেখে ঠাণ্ডা দিমাকে বলবেন—'হুজুর, আপনি অমিত শক্তির আধার। বাদশাহের বাদশাহ আপনি। আপনার মেহেরবানি প্রার্থনা করার জন্যই আপনার সাম্রাজ্যে হাজির হয়েছি। এ বান্দাই বসরাহের সুলতান। আমার নামই জাইন। আমার আব্বা ছয় ছয় বার এখানে এসে আপনার অনুগ্রহ লাভ করে ছয়-ছয়টি হীরার মূর্তি নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই লিখিত নির্দেশ মাফিক আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার আব্বা আজ বেহেস্তে। কিছুদিন আগে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তিনি জীবিত থাকাকালীন সপ্তম-হীরক লেড়কিটিকে সংগ্রহ ক'রে যেতে পারেন নি। বহুৎ আপশোষ নিয়ে তাকে বেহেস্তে যেতে হয়েছে। এবার সে-দায়িত্ব বর্তেছে আমার ওপরে। আমার আব্বার, বিশেষ ক'রে আমার সাধ একমাত্র আপনিই পূরণ করতে পারেন। তবে এ-ও জানবেন, আপনি যদি নেহাৎই আমাকে হতাশ করে ফিরিয়ে দেন তবু আপনার প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে শ্রদ্ধা ভক্তি এখন রয়েছে ভবিষ্যতে তিলমাত্র হ্রাস পাবে না।'

বুড্ডা নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে জুল জুল ক'রে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন—'বেটা, হীরক লেড়কি দিয়ে তুমি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাও, বাতাও তো?'

জাইন করজোড়ে নিবেদন করল—'হুজুর, আমার আব্বার গুপ্তসংগ্রহশালায় ছয়টি হীরক-লেড়কি রয়েছে। সপ্তম তখ্‌তটি খালি পড়ে রয়েছে। সে শূন্যস্থানটি পূর্ণ করতে না পারা ইস্তক আমার দিল্ ঠাণ্ডা হচ্ছে না।'

—'শোন বেটা, তুমি যে দুর্গমতম পথ পাড়ি দিয়ে আমার মুলুকে হাজির হয়েছ তার জন্য আমি খুশী হয়েছি। লেকিন সপ্তম হীরক-লেড়কিটি লাভ করার পথে একটি বড় বাধা রয়েছে। এটি দান করার ব্যাপারে তোমার আব্বার সঙ্গে একটি শর্ত হয়েছিল। তিনি তা পূরণ করতে না পারার জন্যই তাঁর সাধ অপূরণ রয়ে গিয়েছিল। তুমি এবার সেটি নিতে চাইছ, আমিও দিতে আগ্রহী। আর ছয়টি মূর্তি এক সঙ্গে ছিল। তোমার আব্বা ছয়টি নিয়ে গেছেন। মাত্র একটি এখানে একেলা পড়ে রয়েছে। অতএব তামাম দুনিয়ায় কাউকে সেটি দিতে হলে তোমাকেই দেব। লেকিন শর্তটি পূরণ না করলে আমার পক্ষে সেটি দেয়াও সম্ভব নয়।'

জাইন হেসে বল্‌ল—'শর্ত? কি সে শর্ত আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেটি যত কঠিনই হোক আমি তা পূরণ করতে পারবই। আমার তখ্‌ৎ, আমার তামাম সুলতানিয়ৎ আমার গুপ্ত ধনাগারের বিলকুল ধন-দৌলত—কি চাই আপনার, বলুন?'

বুড্ডা সরবে হেসে উঠলেন—'তোমার আব্বা জিন্দেগীভর

কোশিস্ করেও পারলেন না। আর তুমি কিনা এক লহমায় তা পূর্ণ করে দেবে! আমি তাজ্জব বনছি বেটা।'

—'আমার আব্বা ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমিও সাফল্য লাভ করতে পারব না, আপনি কি ক'রে যে নিঃসন্দেহ হচ্ছেন তা ভেবে আমিও কম তাজ্জব বনছি না। এবার খোলসা করে বলুন তো, আপনি কি কোন অপার্থিব বস্তুর ইঙ্গিত দিচ্ছেন?'

—'আরে না বেটা, তুমি আদমির বাচ্চা, আমি কি জানি না। তোমার কাছে অপার্থিব কোন বস্তু আমি আশাই বা করতে যাব কেন? এবার শোন, কি বলছি। এক খুবসুরৎ পঞ্চদশী কুমারী লেড়কি জোগাড় করে দিতে হবে, পারবে?'

বুড্ডার বাৎ শুনে জাইন যেন একদম আশমান থেকে পড়লেন। আচমকা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'শোভন আল্লাহ!' এ বয়সে কেউ এমন একটি বস্তু কামনা করতে পারে এ যে বিলকুল ধ্যান-ধারণা বহির্ভূত। তবে হ্যাঁ, তাঁর বাঞ্ছা পূরণ করা মোটেই কঠিন কোন সমস্যা নয়। বরং একদমই মামুলি ব্যাপার।'

জাইন এবার মুখ খুল্লেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার হারেমেই কম হলেও কুড়িটি পঞ্চদশী কুমারী লেড়কি রয়েছে। পালিতা। খুবসুরৎই বটে। আজ পর্যন্ত কেউ-ই তাদের ভোগে লিপ্ত হয় নি। আপনার হুকুম পেলে তাদের এনে আপনার সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দেই।'

—'তুমি তো দুধের বাচ্চার মাফিক বাৎ বলছ বেটা! কুমারীত্ব সম্বন্ধে তোমার তিলমাত্র ধারণাও নেই।'

—'যারা সম্ভোগে লিপ্ত হয় নি, ব্যভিচারে কাউকেই সঙ্গদান করে নি এমন লেড়কির বাৎ-ই আমি বলছি।'

—'তোমার বক্তব্যের পরও বলছি কুমারী বলতে যা বোঝায় তাদের কেউ-ই তা নয়। খোলসা ক'রে না বল্লে দেখছি তোমার কাছে ব্যাপারটি সাফা হবার নয়। শোন তবে, যাদের সতীচ্ছদা অটুট আছে তারাই সাচ্চা কুমারী। তোমার হারেমের লেড়কিরা এ-বিচারে জরুর কুমারী বলে গণ্য হবে না।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আপনার দরবারে হাজির করছি। পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হয়ে নিন তারা সাচ্চা কুমারী কিনা।'

বুড্ডা তোবড়ানো গালে হেসে বললেন—'আরে না, না বেটা, আমার আর দরকার নেই, তুমি নিজে পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে নিলেই চলবে।'

আমতা আমতা ক'রে জাইন বল্লেন—'লেকিন সহবাস ছাড়া সতীচ্ছদা অটুট কিনা পরীক্ষা করার তো কোন ফিকির নাই। আর পরীক্ষা করা হয়ে গেলে তো তার কুমারীত্ব আর জরুর অটুট থাকা সম্ভব নয়। আমি বরং শতাধিক কুমারী লেড়কি এনে দিচ্ছি। আপনি নিজে পরীক্ষা করে যাকে সাচ্চা কুমারী জ্ঞান করবেন তাকে রেখে অন্যগুলোকে ফিরিয়ে দেবেন, খারাপ বলেছি?'

—'বিলকুল হাসির ব্যাপার। এ হতে পারে না। এক শ' তো সামান্য ব্যাপার এক শ' হাজারটি লেড়কিকে পরীক্ষা করলেও একটি সাচ্চা কুমারী মিলবে না, হলফ ক'রে বলতে পারি। আর জোগাড় করতে পারলেও এ-উপায়ে পরীক্ষা যে বিলকুল অবাস্তব ব্যাপার!'

জাইন দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দেবার জোগাড় হলেন। বুড্ডা এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে পাশের কামরায় গিয়ে ছোট্ট একটি আর্শি নিয়ে ফিরে এলেন—'শোন বেটা, এটার সামনে কোন কুমারী, যাকে অপাপবিদ্ধা লেড়কি বলে মালুম হয়, সে যদি কুমারীত্ব খুইয়ে থাকে তবে সে তসবির এর মধ্যে ফুটে

উঠবে না বটে, তবে আর্শির কাচটি ঘোলাটে হয়ে যাবে। ঘন কুয়াশার মাফিক ঘোলা। তাতে কিছুই দেখা সম্ভব হবে না। একে কুমারীত্ব যাচাইয়ের কষ্টিপাথর বলতে পার। তামাম দুনিয়া ঢুঁড়েও এর জুড়ির হদিস পাবে না। এটি তোমাকে দান করে দিলাম। তবে হুঁশিয়ার, এটি যদি খোয়া যায় তবে কিন্তু তোমার নসীবে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। যাও বেটা, সাচ্চা কুমারী জোগাড় করে আনতে পারলে সপ্তম হীরক-লেড়কিটি তোমার হাতে তুলে দেব।'

সুলতান জাইন এবার বুড্ডাটিকে কুর্ণিশ করে বল্লেন—'হুজুর, আমার হারেমের বিশটিই কেবল নয়, দরকার হলে তামাম আরব

দুনিয়ার যত পঞ্চদশী রয়েছে তাদেরই পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে দেখব। আপনার বাঞ্ছা পূরণ করার যোগ্যা কোন লেড়কি মিললে দরবারে হাজির করে আমার ঈপ্সিত হীরক-লেড়কিটি নিয়ে যাব।' ফিন কুর্নিশ ক'রে জাইন বুড্ডার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার উদ্যোগ নিলেন। এক লহমার মধ্যে কামরাটি কুয়াশায় ঢেকে গেল। বুড্ডা উধাও হয়ে গেলেন।

সুলতান জাইন আর্শিটি হাতে নিয়ে কামরাটি থেকে বেরিয়ে মুবারক-এর কাছে ফিরে এলেন। মুবারক বল্‌লেন—'হুজুর, আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পহেলা ধাপ খতম হ'ল। এবার আপনাকে দোসরা ধাপের দিকে পা-বাড়াতে হবে।'

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির এ-পর্যন্ত আসতেই প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের কলতান শুরু হয়ে গেল। বেগম কিস্‌সা থামিয়ে চুপ করলেন।

সাত শ' পঁচিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, মুবারক সুলতান জাইন'কে নিয়ে পয়দল নদীটির ধারে পৌঁছোলেন। নৌকাযোগে নদীটি পার হলেন। বিড় বিড় ক'রে মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পাহাড়টিকে দ্বিখণ্ডিত করে রাস্তা বানিয়ে পথ পাড়ি দিয়ে দরিয়ার কিনারায় হাজির হলেন। সেখানে নৌকাটি বাঁধাই ছিল। তাতে চড়ে উভয়ে হাজির হলেন কায়রো নগরে।

মুবারক তাঁর মেহমান হয়ে সুলতান জাইন'কে অনুরোধ করলেন। সে সঙ্গে বল্‌লেন—'কায়রো-মিশরে হাজারো খুবসুরৎ পঞ্চদশী লেড়কি রয়েছে। আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে সাচ্চা কুমারী যদি কাউকে পেয়ে যান তবে ঝুটমুট আপনাকে আর তামাম আরব দুনিয়া ঢুঁড়ে তকলিফ করতে হবে না।'

মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে তুলে মুবারক এবার বল্‌লেন—'আমি ব্যাপারটি নিয়ে এরই মধ্যে ভাবনা চিন্তা সেরে ফেলেছি, হুজুর। আমার জান পহচান এক বুড্ডি রয়েছে। লেড়কি নিয়েই তার কারবার। তার কাছে লেড়কিরা নিজে থেকে আসে। আপনি কেবলমাত্র আপনার চাহিদা অনুযায়ী ফরমাশ দিয়েই বিলকুল খালাস। এবার তার কাজ।'

—'এ-তো মালুম হচ্ছে বহুৎ বড়িয়া বন্দোবস্ত। বহুৎ আচ্ছা, আপনি তবে বুড্ডিটিকে তলব দিন, কাজে লাগিয়ে দেয়া যাক।'

একটু বাদে জাইন ফিন বল্‌ল—'লেকিন সমস্যা হচ্ছে, যদি কোন খানদানি পরিবারের লেড়কিকে বাছা যায় তবে সেক্ষেত্রে লেড়কির আব্বা বা আম্মার মতই শেষ বাৎ নয়। লেড়কির নিজস্ব মতামতেরও দাম দিতে হবে। সব মিলিয়ে যদি কোন গড়বড় হয়ে যায় তবে তো পুরো ব্যাপারটিই ভেস্তে যাবে, কি বলেন?'

—'কুছ পরোয়া নেহী। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। আমার ওপরে তামাম মিশরের কারো মতামতই চলবে না, ইয়াদ রেখো। মিশরে এমন কোন খানদানী আদমি, আমীর, ওমরাহ নেই যারা আমাকে খাতির করে না। আপনি এ ব্যাপারে ঝুটমুট ভেবে মরবেন না। আগে লেড়কি তো বেছে বের করুন। তারপর আমি সক্রিয় হ'ব।' মুহূর্তকাল পরে সে ফিন বল্‌ল—'হুজুর, যদি কোন বেহেস্তের হুরীর সমান লেড়কি জুটে যায় তবে ছেড়ে দেবেন না। নিজেই শাদী ক'র ফেলবেন। যদি পাঁচটি মিশরের খুবসুরুৎ লেড়কি মেলে পাঁচটিই শাদী করে নেবেন। কুমারীত্ব বিচার না-ই বা করলেন। এখানকার পাট চুকিয়ে আমরা ছুটবো দামাস্কাসে। তারপর বসরাহ ও বাগদাদে ধাওয়া করব। দেখবেন খুবসুরৎ লেড়কির হাট বসিয়ে দিতে পারবেন।'

জাইন বল্‌ল—'আপনি কেবল সুরতের দিকটিই গুরুত্ব দিচ্ছেন। আদৎ ব্যাপারটির ধার কাছ দিয়েও যাচ্ছেন না। তাকে যে সাচ্চা কুমারী হতে হবে, ইয়াদ নেই?'

—'ইয়া আল্লাহ! আদৎ ব্যাপারটিই আমি ঘুলিয়ে ফেলেছিলাম।' একটু বাদেই এক বুড্ডি এসে আদাব জানিয়ে সামনে দাঁড়াল। মুবারক বল্‌ল—'বুড্ডি দু-চারটে বেহেস্তের হুরী হাজির করতে পার? তবে উমর পনের সাল হতে হবে। আর একদম আনকোরা মাল চাই, ইয়াদ রেখো।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আজই পাঁচ-সাতটি হাজির করব। সবাই খানদানি পরিবারের খুবসুরৎ লেড়কি। এক লহমায় দেখলেই দিমাক ঘুরে যাবে।'

সন্ধ্যায় আন্ধার নামার সঙ্গে সঙ্গে বুড্ডি পাঁচটি লেড়কি হাজির করল। যেভাবে খুশী যাচাই করে নিন। এদের কাউকেই কোন পুরুষ আজ পর্যন্ত ইয়ে টিয়ে করা তো দূরের ব্যাপার ছুঁতে পর্যন্ত পারে নি। সাচ্চা কুমারী। আমির ওমরাহদের হারেমে এদের বাস। খোজা নফরদের চোখে ধূলো দিয়ে কোন পুরুষ তো কোন্ ছার মশা-মাছি পর্যন্ত যেতে পারে না।'

বুড্ডা মুবারক এবার এমন কায়দা-কসরৎ করে আর্শিটি এমনভাবে ধরল যাতে লেড়কিরা দেখতে না পায় ফিন কাজও হাসিল হয়। পাঁচ পাঁচটি লেড়কিকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হ'ল। লেকিন আপশোষের ব্যাপার হচ্ছে কেউ-ই উত্তীর্ণ হতে পারল না।

বুড্ডি মুখ ব্যাজার ক'রে বল্‌ল—'কাল আরও কয়েকটি হুজুরের দরবারে পেশ করব। দেখবেন যদি কেউ চোখে ধরে যায়।'

পরদিন সক্কালে বুড্ডি এক দঙ্গল লেড়কি নিয়ে হাজির হ'ল। সাচ্চা বটে, দিমাক বিগড়ে যাবার মাফিক সবার সুরৎ। লেকিন আর্শির পরীক্ষা নিতে গিয়ে হতাশ। সবার সামনে আর্শি ধরতেই

তার কাঁচ কুয়াশার মাফিক ঘোলা হয়ে গেল। বুড্ডির মুখ ফিন হতাশার কালো ছায়ায় ছেয়ে গেল।

বুড্ডা মুবারক ও সুলতান জাইন এবার হতাশায় জর্জরিত দিল্ নিয়ে সিরিয়ার পথে পা-বাড়াল।

দামাস্কাসে গিয়ে তাঁরা খুবসুরৎ লেড়কি খরিদ করতে চান খবরটি চাউর হতেই দফায় দফায় লেড়কি হতে লাগল। কিছু তো একদম বেহেস্তের হুরী, ডানাকাটা পরী। তামাম দুনিয়ায় প্রচার আছে, সুরতের বিচারে দামাস্কাসের লেড়কিরা সেরা।

বুড্ডা মুবারক আর্শির বিচারে এক এক করে সবাইকে বাতিল ক'রে দিতে লাগলেন।

সুলতান জাইন-এর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যেতে লাগল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে উঠলেন—'ইয়া আল্লাহ! শেষ পর্যন্ত দামাস্কাসও আমাকে হতাশ করলে!'

বুড্ডা মুবারক এবার সুলতান জাইন'কে নিয়ে কায়রোতে হাজির হলেন। এখানেও আর্শির পরীক্ষায় একই ফল মিল্‌ল।

জাইন দু'বাহু উর্ধ্বে উত্থিত ক'রে ব'লে উঠলেন—'ইয়া আল্লাহ! তামাম দুনিয়ায় কি তবে কুমারী লেড়কি নেই! সবারই চরিত্রে কালির দাগ পড়েছে!'

মুবারক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'হুজুর, এক এক ক'রে বহুৎ মুলুকই তো ঢুঁড়ে দেখা হ'ল। এবার না হয় কায়রোতেই চলুন। সেখানকার হারেমের মালিক আপনি স্বয়ং। আপনার আব্বা একদম কড়া মেজাজের আদমি ছিলেন। তাই আপনিও জরুর একই মেজাজ মর্জির আদমি। আশাকরি আপনার হারেমের লেড়কিরা কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই রেখেছে।

সুলতান জাইন-এর মুখে উৎসাহের ছাপ নজরে পড়ল না। এতগুলো তাবড় তাবড় সুলতান আর আমীর-ওমরাহের হারেম ঢুঁড়ে দেখা গেল। সবার হারেমই অরক্ষিত এরকম মনে করতে তিনি উৎসাহ পাচ্ছেন না। এবার আদৎ ব্যাপার স্বীকার করছি, পাহারা যতই কড়া হোক না কেন কুমারীত্ব খুইয়ে কেউ মজা লুটতে বদ্ধপরিকর হলে ঠেকানো দুষ্কর। আমার আব্বা বা আমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম কি ক'রে সম্ভব? সব কিছু দেখেশুনে আমি এ-ডরেই এখন মরছি। আপনি তো জানেন, আমার আব্বার আমল থেকে দুধের বাচ্চাকে খরিদ করে এনে খোজা নফর নোকরদের কড়া পাহারায় তাদের বড় করে তোলা হয়। খোজা ছাড়া পুরুষ আদমি তো দূরের ব্যাপার ; পুরুষ মশা-মাছি পর্যন্ত ভেতরে যেতে পারে না। এবার বসরাহতে গিয়ে যদি আমি দেখি আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী ও কমতি উমরের লেড়কিটির সামনে আর্শি ধরতেই সেটি ঘোলাটে হয়ে গেছে, তখন আমার হালৎ কি হবে, ভেবে দেখেছেন? তখন আমার শিরে খুন চেপে গেলে কি আমাকে দোষারোপ করা যাবে, বলুন? পরীক্ষা টরীক্ষা করার আগ পর্যন্ত আমি তো নিজেকে অন্ততঃ প্রবোধ দিতে পারব, আমার হারেমের লেড়কিদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণই আছে। এতবড় এক নির্মম-নিষ্ঠুর

স্বপ্নের সম্মুখীন হওয়ার আগেই আমার কলিজা শুকিয়ে আসছে।

—'তবে? তবে এখন কি করতে চাইছেন?'

—'বসরাহের পথ ছেড়ে চলুন আমরা সোজা বাগদাদে হাজির হই। বসরাহের চেয়ে নগর হিসাবেও বাগদাদ বড়। আমীর-ওমরাহদের সংখ্যাও সেখানে বেশী, আল্লাহ-র দোয়া থাকলে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী লেড়কি মিলে যেতেও পারে। সুলতান জাইন ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছেন। তাঁর অন্ধ বিশ্বাস ছিল সাচ্চা মুসলমান লেড়কিরা সতীত্বের দিকে কড়া নজর দেয়। এতবড় পর্দা-বোরখার বন্দোবস্ত তো সতীত্বের তাগিদেই। দলে দলে কাতারে কাতারে লেড়কি এসে খাড়া হয়েছে তাঁর আর্শির সামনে। লেকিন একটিরও সতীত্ব বজায় নেই। আজব ব্যাপারই বটে।

সুলতান জাইন এবার বুড্ডা মুবারকের সঙ্গে বাগদাদের মিট্টিতে পা রাখলেন। এখানেও প্রাসাদোপম ইমারত ভাড়া করলেন তাঁরা!

মুবারক চারদিকে চাউর ক'রে দিলেন বসরাহের দানবীর সুলতান দীন-দুঃখীদের দান ধ্যান করার জন্য হাজির হয়েছেন।

ব্যস, বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে খবরটি তামাম বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি দীন-দুঃখীর মেলা বসে গেল।

তাদের বাসার লাগোয়া বাড়িটি এক ইমামের বাসস্থল। আদমিটি খুবই গরীব। হয়ত বা সে কারণেই সে ধনীদের দান-খয়রাতের ব্যাপার স্যাপারকে আদপেই বরদাস্ত করতে পারে না। তাই সুলতান জাইন-এর কাজটিকেও সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

ইমাম সাহেব রোজ মসজিদে নামাজান্তে ভক্তদের কিছু কিছু উপদেশ দান করেন। একদিন নামাজের শেষে বললেন—'আমার মকানের লাগোয়া এক মকানে এক ভিন দেশী আমীর আদমি ভাড়া নিয়েছে। সে রোজ দিনভর দিল্‌দরিয়া হয়ে গরীব-দুঃখীদের দান ক'রে চলেছে। এত ঐশ্বর্য সে কোথায় পেল? আমার দিল্ বলছে আদমিটি কোন বড়া ডাকু। এখন দানবীর সেজে দেদার দান ক'রে চলেছে। আদমিটির প্রতি একটু নজর দিতেই হয়। আর ব্যাপারটি মহামান্য খলিফার নজরে আনা দরকার। ভবিষ্যতে কোন ঝুট ঝামেলা হলে তো তিনি সবার আগে আমার ঘাড়ে চেপে বসবেন। আর ছাড়বেনই বা কেন? আমারই চোখের সামনে রোজ এতবড় একটি ব্যাপার ঘটে চলেছে। আমি কিছুই টের পাই নি বল্‌লে তো তা বিশ্বাসযোগ্যও হবে না। আমি তখন নাকাল হ'ব। তাঁর কানে তুলে আমাদের দায়িত্ব খতম। তারপরের ব্যাপার বিলকুল খলিফার। তোমরা কি বল?'

উপস্থিত সবাই ইমাম সাহাবকে সমস্বরে সমর্থন করল। ব্যাপারটি খলিফার কানে তোলার সিদ্ধান্তই নেয়া হ'ল।

বুড্ডা মুবারক ব্যাপারটি জানতে পেরে সুলতান জাইন'কে বল্‌লেন—'এসব আদমির চরিত্র আমার ভালই জানা আছে। পাঁচ শ' দিনার রুমালে বেঁধে চুপিচুপি হাতে গুঁজে দিয়ে আসুন, দেখবেন হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি বিলকুল বন্ধ হয়ে গেছে।'

সে সন্ধ্যায় নামাজ সেরে ইমাম সাহাব মকানে ফিরলে জাইন বুড্ডা মুবারক'কে দিয়ে পাঁচ শ' দিনার তার হাতে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বুড্ডা মুবারক ইমাম সাহাবকে মহাধার্মিক সম্বোধন করে পাঁচ শ' দিনারের পুঁটুলিটি তার হাতে তুলে দিলেন। ইমাম সাহাব তো খুশীতে ফেঁটে পড়ার জোগাড়। মুবারক'কে বহুৎ খাতির যত্ন করলেন।

মুবারক মোওকা বুঝে বল্‌লেন—'আমার মালিক মহাধার্মিক। তিনি তো আজই সেজেগুজে তৈরী হয়েছিলেন, আপনার উপদেশামৃত শুনতে আসবেন বলে। আমি বল্‌লাম, আমি আগে গিয়ে তার মেজাজ মর্জি বুঝে আসি। পরে না হয় একদিন আপনাকে নিয়ে যাব।'

—'সে কী! মেজাজ মর্জি বুঝার কিস্যু নেই। তাঁর মাফিক দানবীর ও ধার্মিকদের জন্যই তো আমার জান উৎসর্গীকৃত।'

—'যদি গোস্‌সা না করেন তো বলি—শুনলাম, আপনি নাকি আমার মালিকের দান খয়রাতের ব্যাপার স্যাপারে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন?'

—'ইয়া আল্লাহ! কে আবার এতবড় ডাঁহা ঝুট বাৎ আপনাদের কানে দিল! আদতে দুষ্ট আদমিরা কেবল ঘোট পাকিয়ে বেড়ায়। তবে আপনারা আমাদের, বিশেষ করে খলিফার মেহমান। এখানে আপনাদের কোন তকলিফ হচ্ছে কিনা তা তো জরুর খলিফার দেখা উচিত। তাই তার কানে আপনাদের উপস্থিতির ব্যাপারটি তুলব ভাবছিলাম। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় হাসি-খুশী মুখ দেখে তা তো খোলসা হয়েই গেল।'

ইমাম সাহাব পরদিন নামাজের শেষে ভক্তদের কাছে যে ভাষণ দিলেন তার সুর সম্পূর্ণ বিপরীত। বুড্ডা মসজিদের দোর গোড়ায় আসতেই ইমাম সাহাব মুবারক-এর মুখোমুখি হয়ে গেলেন।

মুবারক একদম বিনীত স্বরে নিবেদন করলেন—'মহামান্য ইমাম সাহাব, আমার মালিক এক পুঁটুলি দিনার বেঁধে রেখেছেন আপনার জন্য। আপনি মেহেরবানি করে যদি আমাদের বাসায় পায়ের ধূলা দেন তবে তিনি আপনার মুখ থেকে অমৃতময় বাণী শুনবেন। আর প্রণামী স্বরূপ দিনারের পুঁটুলিটি আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবেন।'

দিনার—দিনারের পুঁটুলির বাৎ শুনেই ইমাম সাহাবের কলিজার ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। জিভ উঠল বিলকুল রসিয়ে। লম্বা লম্বা পায়ে জাইন-এর বাসার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

জাইন হরেক কিসিমের মুখরোচক বাদশাহী খানার বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলেন। ইমাম সাহাব উপস্থিত হতেই তাঁকে সাদর

অভ্যর্থনা করে কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। দু'-চারটে মামুলি আলাপ পরিচয় সেরে নিয়ে তার সামনে খানার রেকাবি সাজিয়ে দিলেন। একটি রেকাবি মুবারককে দিলেন আর নিজে নিলেন একটি।

খানাপিনা সারতে সারতে ইমাম সাহাব প্রসঙ্গক্রমে জাইন'কে বল্লেন—'একটি ব্যাপার আমার দিমাকে আসছে না। তামাম দুনিয়া, বিশেষ করে আপনার বসরাহ থাকতে আপনি বাগদাদে দান খয়রাত করতে এলেন কেন?'

জাইন মুচকি হেসে বল্লেন—'দান খয়রাত করতে আসা আদতে আমার উদ্দেশ্য নয়। এক জরুরী দরকারে আমাকে এখানে আসতেই হ'ল। কিছুদিন থাকতেও হবে। আর থাকছিই যখন তখন এ সুযোগে দীন-দুঃখীদের জন্য যেটুকু করতে পারি। ব্যস, এর বেশী কিছু নয়।'

—'আপনার জরুরী দরকারটি কি মেহেরবানি ক'রে বলবেন?' অবশ্য যদি দশজনের কাছে ফাঁস করার মত না হয় তবে আর আপনাকে ঝুটমুট বিরক্ত করতে চাই না।'

জাইন ঠোঁট টিপে হেসে বল্লেন—'শাদী। শাদী করার উপযুক্ত এক লেড়কির তল্লাশ করছি। আমার বাৎ শুনে আপনার হয়ত হাসি পাচ্ছে, ঠিক কিনা? সামান্য এক লেড়কির তল্লাশে আমার মাফিক এক আদমি মকান ভাড়া ক'রে বাগদাদে বাস করছি, হাসির ব্যাপারই বটে। তবে আমার রুচি-মর্জির ব্যাপারটি একটু আলাদা ধরনের। যাকে আমি শাদী করব তাকে জরুর খুবসুরৎ হতে হবে। উমর হবে পনের সাল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার প্রকৃত কুমারী হওয়া চাই। আপনার নজরে এমন কোন লেড়কি আছে কি?'

ইমাম সাহাব চোখে-মুখে হতাশার ছাঁপ এঁকে বল্লেন—'হ্যাঁ, সমস্যাটি কঠিনই বটে। এরকম তিনটি গুণের একত্রে সমাবেশ কোন একটি লেড়কির মধ্যে অসম্ভবই বটে। আপনি জরুর এখানকার পেশাদারী বুড্ডিদের বাগদাদের মকানে মকানে তল্লাশীর জন্য পাঠাচ্ছেন। লেকিন তেমন ফল পাবেন বলে মনে হয় না। আপনি চাইলে আমি একটি লেড়কিকে আপনার সামনে হাজির করতে পারি।' বুড্ডা মুবারক খানার টুকরো সমেত হাতটিকে নামিয়ে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বল্লেন—'এক বাৎ ইমাম সাহাব, লেড়কিটির কুমারীত্ব সম্বন্ধে আপনি নিজে কি একদম নিঃসন্দেহ? না, তা-ই বা কি ক'রে সম্ভব? কোন লেড়কির সতীচ্ছদা অক্ষুণ্ণ আছে কিনা জোর দিয়ে বলা আপনার পক্ষে কি করেই বা সম্ভব? হারেমের আন্ধার কামরায় থাকলেই তো আর তার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবেই এমন কোন ব্যাপার নেই।

—'আমি যার ব্যাপারে বলছি তাকে আমি কেন বাগদাদের কোন আদমিই এক লহমার জন্যও দেখে নি। হারেমের বাইরে আদপেই কোনদিন সে পা দেয় নি। তবে আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি যদি তার কুমারীত্ব হানির ব্যাপার প্রমাণিত হয় তবে আমি আমার ডান-হাতটি কেটে নামিয়ে দেব। তবে আপনারা যদি জবরদস্তি মন্তব্য করেন তার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই নেই তবে আমি নাচার। লেকিন শাদীর পহেলা রাত ছাড়া তো কুমারীত্ব প্রমাণও মিলতে পারে না। আমার জবানের ওপর ভরসা করে শাদী করতে হবে। শাদীর পরদিন ভোরে আমাকে বলবেন, সে কুমারী কিনা, ঠিক বলি নি?' আপনার জবানের ওপর নির্ভর করে আমি প্রয়োজনে ডান হাতটি কেটে ফেলব। সুলতান জাইন ভাবলেন আজব আর্শির ব্যাপার তো আর ফাঁস করা যাবে না। গোপনে কাজ সারতে হবে। তাই খানা চিবোতে চিবোতে বল্লেন—'তা-ই হবে। আগে আপনি লেড়কিটিকে হাজির করুন। দেখাবার বন্দোবস্ত তো করুন। তার সুরৎ চোখে লাগলে তবে তো আপনার সঙ্গে বাজী লড়ার ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, আপনার যদি জিৎ হয়, লেড়কিটি যদি যথার্থই কুমারী হয় তবে আপনাকে পুরো দশ হাজার দিনার ইনাম বকশিস্ দেব। হ্যাঁ, আমি বাজিতে হেরে, দশ হাজার দিনার আপনার হাতে তুলে দিতেই আগ্রহী। আমার ফয়দা, এক কুমারী লেড়কিকে তামাম জিন্দেগীর জন্য পেয়ে যাব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আজ সন্ধ্যার আন্ধার নামার সঙ্গে সঙ্গে আমি লেড়কিটিকে আপনার দরবারে পেশ করব।' বলে ইমাম আবু বকর বিদায় নিলেন।

বাগদাদের প্রধান ইমাম সাহাবের এক খুবসুরৎ লেড়কি আছে। তার চরিত্রে বহুগুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। প্রধান ইমাম একদিন ইমাম আবু বকরকে তার লেড়কিটির জন্য পাত্রের পাত্তা লাগাতে বলেছিলেন। শাদীর উমর হয়েছে। শাদী তো দিতেই হবে।

ইমাম আবু বকর এবার প্রধান ইমামের মকানে গিয়ে বসরাহের সুলতান জাইন-এর ইচ্ছার ব্যাপারটি জানালেন। প্রধান ইমাম খবরটি তার লেড়কিকে গিয়ে সোল্লাসে জানালেন। আর পাত্রের বিবরণ দিয়ে লেড়কির মতামত জানতে চাইলেন। লেড়কিটি আব্বার প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

সুলতান জাইন এক লহমায় প্রধান ইমামের লেড়কি লতিফাকে দেখেই একদম মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর বুকের ভেতরে কলিজাটি বার বার নড়ে চড়ে উঠে নিজের অস্তিত্ব জানাতে লাগল।

বুড্ডা মুবারক আর্শিটি যথাস্থানে রেখে লতিফা-র কুমারীত্বের পরীক্ষায় মগ্ন।

লতিফা অজান্তে কামরার এমন এক স্থানে এসে দাঁড়াল যেখান থেকে আর্শিতে তার পূর্ণ অবয়ব ধরা পড়ে।

জাইন আর্শিটির দিকে তাকিয়েই স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তিনি দেখলেন লতিফার সালোয়ার কামিজ, বোরখা ও ওড়না প্রভৃতি

গায়ে থাকলেও আর্শিতে তার বিবস্ত্র প্রতিবিম্ব পড়েছে। তার যৌবনচিহ্নগুলো সুস্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। সুলতান জিন্দেগীভর লেড়কি দেখেছেন লেকিন লেড়কির যৌবনচিহ্নগুলো এমন নিটোল ও সুগঠিত হতে পারে খোয়াবেও ভাবতে পারেন নি।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' একত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, প্রধান ইমামের লেড়কিটির সুরৎ দেখে সুলতান জাইন যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি আচমকা সোল্লাসে লাফিয়ে ওঠেন—'মুবারক ভাইজান, কাজ হাসিল! পেয়ে গেছি!'

চাহিদা অনুযায়ী খুবসুরৎ, পনের সাল উমর আর প্রকৃত কুমারী লেড়কি মিলেছে। একদম হাতের মুঠোর মধ্যে বহু আকাঙ্ক্ষিতা চিড়িয়া।

প্রধান ইমামের লেড়কি লতিফা সুলতান জাইন-এর বেগম হয়ে গেল। সুলতানের বাঞ্ছা পূরণের মাধ্যমে লতিফা-র নসীব খুলে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান জাইন তাঁর বিবি লতিফা'কে নিয়ে ত্রিভুজ দ্বীপে হাজির হলেন। সে-বুড্ডা এবার আর্শির মাধ্যমে লতিফা-র কুমারীত্ব পরীক্ষা ক'রে মুগ্ধ হলেন। বললেন, তুমি প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছ বেটা। আমিও জরুর প্রতিজ্ঞা পূরণ করব। তুমি নিজের মুলুকে ফিরে যাও। আমি মন্ত্রবলে, শূন্যপথে তুমি মুলুকে ফিরে যাওয়ার অনেক আগেই তোমার বাঞ্ছিত হীরক-লেড়কিকে যথাস্থানে পৌঁছে দেব।'

সুলতান জাইন বসরাহতে পৌঁছে গুপ্ত ধনাগারে হাজির হলেন। তার দরওয়াজা খুলতেই তিনি তাজ্জব বনে গেলেন। দেখলেন বুড্ডাটির পাশে লতিফা দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে। বুড্ডা বল্‌লেন—'বেটা, এই তোমার আকাঙ্ক্ষিত হীরক-লেড়কি। একে তোমার পাশে ঠাঁই দিয়ে তোমাদের জিন্দেগীকে মধুময় ক'রে তোল।'

বুড্ডা লহমার মধ্যে বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।

আলাদিন ও আজব চিরাগের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে 'আলা অল-দিনের কিস্‌সা' নামে বহুৎ বড়িয়া এক কিস্‌সা শোনাচ্ছি—কোন এক সময়ে চীন মুলুকে এক মাঝ-বয়সী দর্জি সাজ পোশাক তৈরী করে দিন গুজরান করত। দর্জিটির একটি লেড়কা পয়দা হয়েছিল। তার নামকরণ করা হয়েছিল আলা অল-দিন। তার আব্বার শখ ছিল বেটাকে লিখা-পড়া শিখিয়ে জবরদস্ত ক'রে তুলবে। লেকিন লিখা-পড়ার চেয়ে শয়তানী মতলবের দিকেই তার খেয়াল ছিল সবচেয়ে বেশী। কখন যে কোন্ ফিকির তার মধ্যে ঘুরপাক খেত তার ইয়ত্তা ছিল না।

আলা অল-দিন-এর আব্বা আর আম্মা দশ সাল নানাভাবে কোশিস্ ক'রে নিঃসন্দেহ হ'ল, তার বিদ্যাশিক্ষা কিছুতেই হবার নয়। লেড়কা একদম বকে গেছে।

দর্জিটি এক সকালে লেড়কাকে কাছে বসিয়ে বল্‌ল—'বেটা, আমাদের একমাত্র চোখের মণি, একমাত্র ভরসা তুমি। আমাদের বহুৎ আশা ভরসা ছিলে তুমি। লেকিন আজ ব্যাপারটি সাফা হয়ে গেল। আমাদের আশায় ছাই পড়েছে। এতদিন আমরা অন্ধার মাফিক ছাইয়ে পানি ঢেলেছি।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দর্জি এবার বল্‌ল—'বেটা, যা হবার তা-তো হয়েই গেছে। ঝুটমুট আপশোষ করে বা কপাল চাপড়ে ফয়দা

কিছুই হবার নয়। এখন আমার দোকানে বস। কাজকাম শিখে নাও। পেটের ধান্দা তো করতেই হবে। চোখ-মুখ খুলে কাজ করতে পারলে খানাপিনার অভাব হবে না। দুনিয়ায় টিকে থাকার ফিকির ঠিক হয়ে যাবে।

দর্জি তার লেড়কাকে দোকানে বসিয়ে কাপড়া কেটে কোর্তা, কামিজ, পাৎলুন সেলাই করার উপায় বাৎলে দিয়ে তাকে তৈরী ক'রে তোলার কোশিস্ করতে লাগল। দর্জির তালিম দেয়ার ইচ্ছা পুরো দস্তুর। লেকিন বেটার তালিম নেয়ার কোশিস্ কিছুমাত্রও লক্ষিত হ'ল না। ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে খেলাধূলার দিকেই তার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। তার আব্বা ডাণ্ডা পেটা করেও তাকে পথে আনতে পারে না। ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে দিনভর মাঠে ঘাটে টুঁড়ে বেড়ায়।

নওজোয়ান হওয়ার আগেই দর্জির লেড়কা পাকা এক মস্তান বনে গেল।

লেড়কার মতিগতি দেখে দর্জি একদিন চৌপায়া সম্বল ক'রে দিন গুজরান করতে লাগল। কঠিন বিমারি ধরে ফেল্‌ল। তার বিবি হেকিম ডেকে ইলাজ করাল। দাওয়াই খাওয়াল বোতল বোতল। লেকিন ফয়দা কিছুই হ'ল না। বিবি আর একমাত্র মস্তান লেড়কাকে রেখে দর্জি বেচারা বেহেস্তে চলে গেল।

দর্জির বিধবা বিবি উপায়ান্তর না দেখে সস্তা দামে দোকানটি বেচে দিয়ে ল্যাটা চুকিয়ে দিল। আলা অল-দিন কেবলমাত্র খানাপিনার সময় একবার মকানে আসে। ব্যস, বাকী সময় মহল্লায় মহল্লায় মস্তানি করে বেড়ায়। তার আম্মা মহল্লার আদমিদের ছেড়া ফাটা কোর্তা-কামিজ সেলাই আর তালি-তাপ্পি দিয়ে যা রোজগার করে তা দিয়েই দু'জনের রুটির জোগাড় করে।

আলা অল-দিন-এর উমর চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়ল। সে গায়ে গতরে বেড়ে একদম নওজোয়ান বনে গেল। দেখতেও খুবসুরৎ।

এক বিকালে আলা অল-দিন মাঠে ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে হাসি মস্করায় লিপ্ত ছিল। এমন সময় আচমকা এক বুড্ডা ফকির সেখানে হাজির হলেন। জাতিতে সে মূর। মরক্কোয় তার মুলুক। ফকিরটি আদতে এক যাদুকর। ভেল্কি দেখিয়ে চমক লাগাতে পারে। জ্যোতির্বিদ্যায়ও সে একদম পটু। আদমির নসীবের হদিসে একদম ওস্তাদ।

বুড্ডা ফকির আলা অল-দিনকে দেখেই অপলক চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। তাকে দেখে ফকির সাহাবের লোভ হ'ল। এরকমই লেড়কার ধান্দায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড় ডিঙিয়ে মরক্কো থেকে সুদূর চীন মুলুকে হাজির হয়েছে।

ফকির লেড়কাদের কাছে আলা অল-দিন-এর পাত্তা নিতে লাগল।

ফকির এগিয়ে গিয়ে হাতের ইশারা করে আলা অল-দিনকে কাছে তলব করল।

আলা অল-দিন ফকিরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। ফকির তার মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকেই প্রশ্ন করল—'বেটা, তোমার নামই তো আলা অল-দিন, তাই না?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন বটে। লেকিন আপনি আমার নাম কি করে জানলেন, বলুন তো?'

—'বেটা, তোমার মুখ দেখেই আমি চিনে ফেলেছি। তোমার আব্বা আমার বড়া ভাই ছিলেন। ভাল কথা, তোমাদের দর্জির দোকান ছিল, এখন আছে কি?'

—'না। আম্মা বেচে দিয়েছেন।'

—'বেচে দিয়েছেন? কেন?'

—'আব্বা বেহেস্তে চলে গেলেন। দোকান দেখভাল করবে কে? আমি যে দর্জির কাজ জানি না। তাই দোকানটি চালু রাখার কোন ফিকির করতে না পেরে বেচে দিয়েছেন। আম্মা ছেঁড়া-ফাটা কাপড়া সেলাই করে রুটির জোগাড় করেন।'

ব্যস, ফকিরটি চোখের পানি ঝরাতে লেগে গেল। আলা অল-দিন তাকে কাঁদতে দেখে একদম তাজ্জব বনে গেল। সে চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'আপনার চোখে পানি, কাঁদছেন! কেন? কাঁদছেন কেন?'

—'সে কী বেটা, কাঁদব না! তোমার আব্বা আমার বড়া ভাই ছিল। তার ওপর আমার বহুৎ পেয়ারের পাত্র ছিল। তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আর আমি হয়ে রয়ে গেলাম চোখের পানি ঝরাবার জন্য। কম আপশোষের ব্যাপার, বল বেটা? আর আমার নসীব এতই খারাপ যে, আমি তার খবরাখবরও রাখতে পারি নি।'

ফকির এবার আলা অল-দিন'কে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বল্‌ল—'বেটা, তোমার আব্বা আমাকে ফাঁকি দিয়ে বেহেস্তে চলে গেছে বটে। লেকিন তুমি তো রয়ে গেছ। তোমাকে দেখেই আমি তাকে ভুলে থাকব। খোদাতাল্লার মেহেরবানি যে, তুমি আমার দর্দ ঘুচিয়ে দিতে পারবে। লেড়কার আব্বা বেহেস্তে গেলেও তার ইন্তেকাল হয় না। লেড়কার মধ্যেই আব্বা জিন্দা থাকে।'

ফকির এবার কোর্তার জেব থেকে দশটি সোনার মোহর বের করে তার হাতে দিয়ে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'বেটা, এ ক'টা তোমার আম্মাকে দেবে।' চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'বেটা, তোমাদের মকান কি নজদিকেই, নাকি—'

—'একদম নজদিকে।' অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বল্‌ল—'ওই, ওই যে হোতা। চলুন না, বেশী তো সময় লাগবে না।'

ফকিরের হাত ধরে গলির মধ্যে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে আলা অল-দিন বল্‌ল—'ওই যে মকানটি দেখা যাচ্ছে, ওখানেই আমরা থাকি। চলুন—'

তাকে বাধা দিয়ে ফকির বল্‌ল—'না, বেটা, আজ হঠাৎ ক'রে তোমার আম্মাকে আর বিরক্ত করব না। অন্য একদিন যাওয়া যাবে, কি বল? যদি পারি কাল একবার গিয়ে না হয় তোমার আম্মার সঙ্গে মোলাকাৎ—জান পরিচয় করে আসব। দিনার দশটি তাকে দিয়ে ব'ল চাচাজী ভিন্ মুলুক থেকে এসেছেন। তাকে আমার সালাম জানাতে ভুলবে না যেন।'

ফকিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আলা অল-দিন এক ছুট্টে মকানে গিয়ে আম্মার হাতে দিনার দশটি দিয়ে বল্‌ল—'আমার চাচাজী ভিনদেশ থেকে এখানে এসেছেন। তিনিই এগুলো আমাকে দিয়ে বল্‌লেন, তোমার হাতে দিতে। আমাকে দেখেই বল্‌লেন একদম আমি নাকি অবিকল আমার আব্বার মাফিক দেখতে হয়েছি। আমাদের দর্জির দোকানের খোঁজ খবরও নিলেন। আমাদের খবরাখবর বিলকুল তার নখ-দর্পণে।'

—'তাই বুঝি? আমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেন নি? আচ্ছা, তোর চাচাজী দেখতে কেমন রে?'

—'চেহারা খুবসুরৎ। কাল তোমার সঙ্গে ভেট করতে আসবেন, বলেছেন।'

আলা অল-দিন-এর আম্মার চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে। অতীত স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে বল্‌লেন—'লেকিন বেটা, তোর আব্বার মুখে তো তাঁর কোন ভাই আছে কোনদিন শুনেছি ব'লে তো ইয়াদে আসছে না। হ্যাঁ, তোর এক চাচা ছিলেন। লেকিন বহুৎ আগেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আজ ইনি কোন্ চাচা—'

—'ইনি বহুৎ দিন আগে পরদেশে চলে গিয়েছিলেন। তামাম আরব দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়িয়েছেন। কিছুদিন হ'ল এদেশে এসে বসবাস শুরু করেছেন। এখন এখানেই থিতু হয়েছেন।'

—'কি জানি বেটা, বহুৎদিন আগেকার ব্যাপার তো, হলে হতেও পারে। তোমার আব্বা হয়তো পুরনো ক্ষতটিকে আর বাড়িয়ে দিতে চান নি। সে হয়তো আর জিন্দাই নেই, কোন না কোনভাবে বেহেস্তে চলে গেছেন। তাই পুরনো ক্ষতটিকে চাপাই রেখেছেন।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা, কাল তবে নিয়েই আয়। হাজার হোক খুনের সম্পর্ক তো বটে।'

আলা অল-দিন পরদিন যথাসময়ে সেই খেলার মাঠটিতে গিয়ে ফকিরটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু বাদেই ফকির এল। দুটো দিনার আলা অল-দিন'কে দিয়ে বল্‌ল—'বেটা, মকানে গিয়ে তোমার আম্মার হাতে এ দুটো দিয়ে বলবে, আজ দুপুরে তোমাদের সঙ্গে খানাপিনা সারব। কিছু সওদাপাতি খরিদ ক'রে নিও। আমি কাল তো তোমাদের মকান দেখেই এসেছি। দুপুরে নামাজ সেরেই হাজির হ'ব।'

আলা অল-দিন নাচতে নাচতে মকানে গিয়ে দিনার দুটো তার আম্মার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'চাচাজী দিয়েছেন। সওদাপাতি খরিদ ক'রে নিতে। আজ দুপুরে নামাজ সেরে তিনি আসবেন। আমাদের সঙ্গে খানাপিনা সারবেন।'

দিনার দুটো পেয়ে আলা অল-দিন-এর আম্মা আর অবিশ্বাস ক'রে কি ক'রে। ব্যস্ত হয়ে লেড়কাকে প্রয়োজনীয় সওদাপাতি খরিদ ক'রে আনতে বাজারে পাঠিয়ে দিল।

দুপুরে একটু দেরী করেই ফকির তাদের বাড়িতে এল। আলা অল-দিন দৌড়ে গিয়ে ফকিরকে অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে এল। তার সঙ্গে কুলির মাথায় ইয়া পেল্লাই এক ঝুড়ি। ফলমূল আর লাড্ডু বোঝাই।

ফকিরকে বাইরের কামরায় বসতে দেয়া হ'ল। আলা অল-দিন-এর আম্মা বোরখা পরে দরওয়াজায় এসে দাঁড়াল। বুড্ডা ফকির তাকে সালাম জানাল। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে উভয়ের চল্‌ল আলা অল-দিন-এর আব্বার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে শোক প্রকাশ, চোখের পানি ঝরানো। তারপরই ফকিরটি যন্ত্রচালিতের মাফিক শোক সামাল দিয়ে দিল।

আলা অল-দিন-এর আম্মার বুক থেকে দ্বিধা-সংশয়টুকু নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। স্বীকার ক'রে নিল তার স্বামীর ছোটা

ভাই-ই বটে।

প্রসঙ্গক্রমে ফকির বল্ল—'বড়া ভাইয়ের বিবি, তুমি সেলাই ফোঁড়াই ক'রে যা আয় উপার্জন করছ তাতে কি তোমাদের দু'দুটো পেট ভালভাবে চলে যাচ্ছে?'

—'সে কী আর চলে ভাই। কোনরকমে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলে—মোদ্দা ব্যাপার, না চললেও চালিয়ে নিতেই হয়। তা ছাড়া ফিকিরও তো কিছু নেই।'

—'শোন বড় ভাইয়ের বিবি, আমার ভাইজানের অবর্তমানে আমিই আলা অল-দিন-এর অভিভাবক—একমাত্র চাচা। এতদিন দূরে ছিলাম, জান পহচান্ ছিল না—কর্তব্য করা সম্ভব হয় নি। এবার থেকে তার দায়িত্ব না নিলে আল্লাতাল্লা আমাকে মার্জনা করবেন না। এবার সে আলা অল-দিন-এর দিকে নজর নিবদ্ধ ক'রে বল্ল—'বেটা, তোমার এখন উমর হয়েছে। নওজোয়ান হতে চলেছ। দু'-এক সাল বাদে শাদী ক'রে ঘর-সংসার পাতবে। লেকিন কাজকর্ম না করলে পেট চালাবে কি ক'রে? ইয়ার-দোস্ত আর খেলাধূলা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সবচেয়ে বড়া ব্যাপার তোমার আম্মা আর কতদিন গতর খাটিয়ে তোমার পেটের জোগাড় করবেন।'

'নিতান্ত অপরাধীর মাফিক মাথা গুঁজে আলা অল-দিন তার চাচার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

ফকির ফিন বলতে শুরু করল—'বেটা, কাজে উৎসাহ নেই কেন? পছন্দ মাফিক কাজ জোটেনি বলে? আমি যদি খরচাপাতি ক'রে বাজারে একটি দোকান দিয়ে দেই, করবে?'

—'হ্যাঁ, জরুর করব।'

আলা অল-দিন-এর আম্মা খানাপিনা সাজিয়ে ফকির আর আলা অল-দিন'কে খেতে দিল।

খানাপিনা সারতে সারতে ফকির বল্ল—'বড় ভাইয়ের বিবি, বহুৎ দিনের ব্যাপার, প্রায় বছর ত্রিশেক আগেকার ব্যাপার, আমি মকান ছেড়ে নসীবের খোঁজে, আর উপার্জনের ধান্দায় ভিন্ মুলুকে চলে যাই। হিন্দুস্তান, সিন্ধু মুলুক টুঁড়ে হাজির হই মিশরে। দশ সাল সেখানে সওদাগরী কারবার করি। তারপর চলে যাই মরক্কোতে। সেখানেও আমার কারবার রমরমা। দিনার বহুৎ-ই কামালাম জিন্দেগীভর। লেকিন বড়াভাইয়ের বিবি, শান্তি-সুখ নাই। নিজের মুলুক, নিজের ভাইয়ের জন্য ভেতরে ভেতরে গুমরে মরতে লাগলাম। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বল্ল—'নিজের মুলুকে আসলামও বটে। লেকিন কিছুদিন আগে এলে বড়া ভাইও অশান্তির জ্বালায় বেহেস্তে পাড়ি দিতেন না আর তোমরাও এত কষ্টভোগ করতে হত না। নসীব—বিলকুল নসীবের ব্যাপার।'

আলা অল-দিন-এর আম্মা চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্লেন—'আল্লাতাল্লা-র মর্জির ওপরে কারো হাত নেই। তিনি যাকে কাছে টেনে নিয়েছেন তার জন্য শোকে ভেঙে পড়লে ফয়দা কিছুই নেই। এখন সব ভুলে সামনের দিকে এগোবার ধান্দা করতে হবে। আজ লেড়কা যদি আমার মর্জি মাফিক চলত তবে আমার এত আপশোষ থাকত না।'

—'এখন আমি যখন মাথার ওপরে দাঁড়িয়েছি তখন আর উতলা হবার কিছু নেই। আমি বাজারে একটি দোকান খুলে দিচ্ছি, চালাতে পারবে না?'

আলা অল-দিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'পারব। জরুর পারব। আপনি আমাকে একবারটি দোকানে বসিয়ে দিন, একদম কামাল করে দেব।'

ফকির সেদিনের জন্য বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামল। আলা অল-দিন-এর আম্মা স্বামীর ছোটা ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করল। আল্লাহ-র কাছে তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করল।

পরদিন ভোরে ফকির ফিন দরওয়াজায় এসে দাঁড়ায়। আলা অল-দিন-এর আম্মা এগিয়ে এসে হেসে বল্ল—'এসো ভাই, ভেতরে এসে বোসো।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' চৌত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আলা অল-দিন-এর আম্মা ফকিরকে অভ্যর্থনা ক'রে কামরার ভেতরে নিয়ে চৌপায়ার ওপর বসতে দিল।

ফকির বল্ল—'বড় ভাইয়ের বিবি, এখন আর বসব না। ভাতিজাকে নিয়ে বাজারে যাব, কোর্তা-পাৎলুন খরিদ করতে হবে।'

আলা অল-দিন চাচার সঙ্গে বেরোবার উদ্যোগ নিল। ফকির হেসে বল্ল—'বেটা, তোমার "আলা অল-দিন" নামটি বহুৎ বড়া। আজ থেকে আমি বরং তোমাকে 'আলাদিন' নামে ডাকব, আপত্তি নেই তো?'

আলা অল-দিন হেসে বল্ল—'আপত্তির আর কি থাকতে পারে, চাচা। তাছাড়া আমার বহুৎ ইয়ার-দোস্ত আর মহল্লার আদমিরা আমাকে 'আলাদিন' নামেই সম্বোধন করে।'

ফকির বলল—'তবে চল বেটা আলাদিন, বাজারের দিক থেকে আসা যাক।'

ফকির আলাদিন'কে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে টুঁড়ে পছন্দ মাফিক বহুৎ বড়িয়া কোর্তা-পাৎলুন ও হরেক কিসিমের দরকারী সামানপত্র খরিদ ক'রে আলাদিন'কে দিল।

আলাদিন'কে কোর্তা-পাৎলুন পরিয়ে ফকির একদম শাহজাদা

বানিয়ে ফেল্‌ল। তার চেহারা-ছবি এমনিতেই খুবসুরৎ তার ওপর জরির কাজ করা ঝলমলে সাজ-পোশাক পরিয়ে দেয়ায় সে যেন একদম সুলতান-বাদশার লেড়কার মাফিক দেখনাই হয়ে গেল। ফকির সোল্লাসে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল—'বেটা, তোমার ভবিষ্যৎ-জীবন আজ থেকে শুরু হয়ে গেল।'

বুড্ডা ফকির বাজারের কাছের এক মুসাফিরখানায় আলাদিন'কে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'বেটা, এখানেই আমি সাময়িকভাবে মাথা গুঁজেছি। চল, কামরার ভেতরে চল।'

অতিকায় একটি কামরা। দামী ও বাহারী সামগ্রীতে কামরাটি বোঝাই। আলাদিন ভেতরে পা দিয়েই ভাবল, বুঝি আমীর-ওমরাহের কামরায় এসেছে।

বিকালে ফকির-এর ইয়ার-দোস্তরা এল। সবাই সওদাগর। অগাধ অর্থের মালিক।

ফকির খানাপিনা আর নাচা-গানার বন্দোবস্ত করেছে। আলাদিন-এর সঙ্গে সবার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিল।

নাচা-গানার আসর ভাঙল বেশ রাত্রে। আলাদিন মকানে ফিরে দেখে তার আম্মা রোয়াকে দাঁড়িয়ে তার জন্য পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আলাদিন ঝলমলে সাজ-পোশাক পরে তার আম্মার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের লেড়কাকে তার আম্মা যেন চিনতেই পারল না। আলাদিন কোর্তা-পাৎলুন বদলাতে বদলাতে ফকিরের কামরার আসবাবপত্রের বিবরণ, সুলতান-বাদশাহী খানাপিনা আর বহুৎ বড়িয়া নাচা-গানার ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিল। তার আম্মা তো তার মুখে সবকিছু শুনে একদম হাঁ হয়ে গেল। আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বল্‌ল—'বেটা, খোদাতাল্লা-র মর্জি। তাঁর মেহেরবানি না থাকলে কি আর তোর চাচাজীর সঙ্গে এতদিন বাদে আমাদের মোলাকাৎ হয়? খোদা হাফেজ!'

বিকালে ফকির ফিন এল। এ প্রসঙ্গে আলাদিন-এর আম্মাকে বল্‌ল—'বড় ভাইয়ার বিবি, কাল জুম্মাবার, দোকান-বাজার বন্ধ। পরশু রোজ ভোরেই আলাদিন'কে দোকানে বসিয়ে দেব। ওর জন্য ঘাবড়িও না। আমি ওর পিছু পিছু থাকব, দু'-চারদিন বাদে সে কারবারে একদম পাক্কা হয়ে যাবে। ব্যস, তারপর নিজেই কারবার চালাতে পারবে। মুহূর্তকাল বাদে বল্‌ল—'বড় ভাইয়ার বিবি, কাল তো কোন কাম কাজ নেই, কাল আমার ভাতিজাটিকে নিয়ে নগরের শেষ প্রান্তে এক মকানে যাব ভাবছি। সেখানে আমার কিছু সওদাগর দোস্ত জড়ো হবে। তাদের সঙ্গে আলাদিন-এর আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব। ভবিষ্যতে এতে তার কারবার চালাবার সুবিধা হবে। আদতে কারবারের সবচেয়ে বড়া সহায়ক হচ্ছে, জান পরিচয়। যার যত বেশী জান পরিচয় ও আলাপ থাকবে তার কারবার তত বেশী রমরমা হয়ে উঠবে।'

আলাদিন-এর আম্মা এক গাল হেসে বল্‌ল—'ভাই, এর জন্য ফিন আমাকে বলতে হবে কেন? আপনি এর চাচা, অভিভাবক, যা করলে ওর ভাল হবে তা-তো জরুর করবেনই।'

—'বহুৎ সুক্‌রিয়া! বহুৎ সুক্‌রিয়া। হ্যাঁ, সাচ্চা বাৎ বটে।' মুচকি হেসে বুড্ডা ফকির মকান ছেড়ে বেরিয়ে এল।

পরদিন দুপুরের কিছু বাদেই বুড্ডা আলাদিনদের মকানে হাজির হ'ল। সেদিন আর বসল না। সময়ের অভাব বাহানা দেখিয়ে সে আলাদিন'কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

পয়দল চলতে চলতে ফকির আলাদিন'কে নিয়ে নগরের একদম শেষ প্রান্তে হাজির হ'ল। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়তে না পড়তেই ফকির আলাদিন'কে নিয়ে এক নদীর ধারে গাছের তলায় বসল। পিঠা, লাড্ডু আর কিছু ফল বের করে তাকে খেতে দিল। সে খানা সেরে গণ্ডুষ ভরে নদীর পানি পান করল।

ফকির বল্‌ল—'বেটা, ঠাণ্ডা বাতাসে একটু নিদ নিলে অবসাদ চলে যাবে। আলাদিন সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে নিদ নিল। যখন নিদ টুটল তখন সামনে বিশাল এক জঙ্গল তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আলাদিন তাজ্জব বনল। ফকির বল্‌ল—'বেটা জঙ্গল থেকে কিছু শুকনো ডালপালা জোগাড় ক'রে নিয়ে এসো। তারপর, তোমাকে এমন এক আজব বস্তু দেখাব যা তামাম দুনিয়ার কোন আদমিই এর আগে দেখে নি। যাও বেটা, শুকনো কাঠ কিছু নিয়ে এসো।'

আলাদিন কিছু সময় বাদেই এক গোছা শুকনো ডালপালা নিয়ে ফিরে এল। ফকির তাকে নিজের পিছনে দাঁড় করাল। এবার সে কোর্তার জেব থেকে একটি চকমকি পাথর বের করল। শুকনো কাঠের গোছায় ঠেকাল। দাউ দাউ হাউ হাউ করে কাঠগুলো জ্বলতে শুরু করল। একটু বাদে ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যেতে লাগল। বুড্ডা ফকির অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব মন্ত্র পড়তে শুরু করল। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ধুনোর গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে লাগল। ব্যস, ধোঁয়ার পরিমাণ বেড়ে যেতে লাগল।

ফকিরটি কিছু সময় মন্ত্র পড়তে না পড়তেই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটতে লেগে গেল। একদম আজব ব্যাপার। চারদিক ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হতে শুরু করল। এমন কি পাহাড় পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল। আলাদিন-এর মালুম হ'ল—পাহাড়, জঙ্গল, নদী আর ময়দান বিলকুল ঘন ঘন চক্কর মারছে। ব্যস, বিশাল এক শব্দ ক'রে পাহাড়টি দু-আলাদা হয়ে গেল। আলাদিন একদম তাজ্জব বনে গিয়ে নিষ্পলক নজর মেলে পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে রইল। আজব কাণ্ড—একের পর এক আজব কাণ্ড আলাদিন-এর চোখের সামনে ঘটে যেতে লাগল। ঠিক সে-মুহূর্তেই তার চোখের সামনে বিশালায়তন একটি গর্ত ভেসে উঠল—ঠিক যেন এক ইঁদারা।

ফকিরটি আলাদিন'কে নিয়ে ইঁদারাটির একদম কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বল্‌ল—'বেটা, গাড্ডার ভেতরে একটি সফেদ পাথর দেখতে পাচ্ছ? তার মাঝখানে দুটো আংটা, দেখতে পাচ্ছ কি?'

আলাদিন ঘাড় কাৎ ক'রে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'হ্যাঁ চাচা, একটি সফেদ পাথর, দুটো আংটা লাগানো—'

—'বেটা, ইঁদারার গায়ে খাঁজকাটা আছে, নিচে নেমে যাও। হুঁশিয়ার, পা হড়কে যায় না যেন। আংটা দুটো ধরে সফেদ পাথরটিকে টেনে তুলে ফেলবে।

এক পলকে ইঁদারার ভেতরে ফিন তাকিয়ে নিয়ে আচমকা দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে আলাদিন সচকিত হয়ে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! এ কাজ আমার দ্বারা হবার নয়।'

ফকির তাকে বার বার পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আলাদিন কিছুতেই ইঁদারাটির ভেতরে নামতে রাজী হ'ল না।

ফকির এবার তার কাঁধে হাল্কা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌ল—'আরে বেটা, ঘাবড়াও মাৎ। তুমি খাঁজে পা রাখ, দেখবে নিজেকে পাখির পালকের মাফিক হাল্কা মালুম হবে। ভয় ডর তো না-ই এমন কি কোন তকলিফই হবে না। আমার কথা অমান্য করার কোশিস্ কোরো না। তুমি এমন একগুঁয়ে আর অপদার্থ জানলে তোমাকে কিছুতেই এখানে নিয়ে আসতাম না। যাও, এগিয়ে যাও, ইঁদারাটিতে নামার কোশিস্ কর।'

—'আপনি কেন বুঝছেন না চাচা! ইয়া পেল্লাই পাথরটি তোলা কি আমার একার কর্ম?'

—'যা বলছি, কর। ইঁদারায় নেমে যাও আলাদিন। পাথরটির নিচে বহুৎ, বহুৎ ধন দৌলত রয়েছে। এখানে যে পরিমাণ ধন দৌলত রয়েছে তামাম দুনিয়ার ধন দৌলত একাট্টা করলেও এর সমান হবে না। আমার বাৎ শোন বেটা, বিলকুল ধন দৌলত তোমারই জন্য এতদিন এখানে পড়ে রয়েছে। তোমার কপাল দেখে আমি নিঃসন্দেহ, বিলকুল ধন দৌলত তোমার জন্যই হাজার হাজার সাল ধরে এখানে সফেদ পাথরটির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে। যাও, নেমে যাও—ধন-দৌলত উঠিয়ে নিয়ে জিন্দেগীকে ভোগ করার কোশিস্ কর।'

আলাদিন ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে বার-কয়েক ঢোক গিলে কোনরকমে উচ্চারণ করল—'চাচা, আল্লাহ-র নামে বলছি, এ আমার কম্ম নয়। আমার কলিজা বিলকুল শুকিয়ে আসছে। মেহেরবানি করে আমাকে এ কাজের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না।'

ফকির এবার বেশ একটু গোস্‌সার স্বরেই ব'লে উঠল—'বেটা, বেগড়বাই করার কোশিস্ কোরো না। কলিজা শক্ত কর। আমার বাৎ মানো, বিশোয়াস্ কর, তুমি ছাড়া সেখানকার অপরিমিত ধন দৌলত কেউ-ই তুলে আনতে পারবে না। তাই ধান্দা ছেড়ে যা বলছি, দিমাক ঠাণ্ডা করে সেরে ফেল। যাও, ইঁদারায় নেমে যাও বলছি।' তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে এবার বল্‌ল—'আমি চাইলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটাতে পারি। লেকিন সমস্যা হচ্ছে, ওই কড়া দুটোকে ধরা-ছোঁয়ার অধিকার আমার নেই। আমার মতলব শোন বেটা, পাথরটির তলা থেকে ধন দৌলত যা কিছু মিলবে আধাআধি ভাগ হবে। আধা তুমি আর বাকী আধা নেব আমি। যাও, কাজে লেগে যাও বেটা।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে আলাদিন নিজের কলিজাকে শক্ত ক'রে নিল। এবার বল্‌ল—'চাচা, আমি রাজী।' সে এবার ইঁদারার গায়ের খাঁজগুলিতে পা দিয়ে উন্মাদের মাফিক তরতর করে নিচে নেমে গেল।

বুড্ডা মুর ফকির উপর থেকে চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'আংটা দুটোকে মুঠো ক'রে ধর। তারপর ওপরের দিকে টেনে তুলে ফেল।

আলাদিন হেঁচকা টানে পাথরটিকে তুলতেই তার চোখের সামনে একটি সুড়ঙ্গ ভেসে উঠল। তার গায়ে সিঁড়ি রয়েছে।

বুড্ডা মুর ফকির গলা ছেড়ে বলতে লাগল—'বেটা নেমে যাও, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাও। ধ্যুৎ! ভয় ডরের কিছু নেই, সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাও। কয়েক ধাপ নেমেই দেখতে পাবে একটি দরওয়াজা। তামার পাতে মোড়া পাল্লা দুটো। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। নিজে থেকেই খুলে যাবে। তারপরই পেল্লাই

একটি কামরা। কামরাটিকে তিনটি দরওয়াজা দিয়ে তিন ভাগ করে নেয়া হয়েছে। তিন দরওয়াজায় তিনটি তালা দেখবে। তুমি হাত দিয়ে স্পর্শ করা মাত্র তালাগুলো ঝপাঝপ খুলে যাবে। পহেলা কামরায় দেখবে পাশাপাশি চারটি পেল্লাই তামার জালা। তাদের গলা পর্যন্ত সোনা ভর্তি। দোসরা কামরায় গেলেই তোমার নজরে পড়বে চারটি সেরকমই রুপোর জালা। তাদের প্রত্যেকটি সোনার গুঁড়োয় ঠাসা। তিসরা কামরায় ঢুকেই তুমি ইয়া পেল্লাই চারটি সোনার জালার মুখোমুখি দাঁড়াবে। দেখবে প্রত্যেকটিতে সোনার মোহর জ্বল জ্বল করছে। বেটা, খবরদার এসবের দিকে একদম নজর দেবে না। হুঁশিয়ার! জালাগুলোর কোনটিতেই হাত ঢুকিয়ো না যেন। এমন কি ছোঁবেও না। ছুঁলে কিন্তু তুমি একদম পাথর বনে যাবে।'

বেটা তিসরা কামরা থেকে বেরোলেই তুমি এক বাগিচায় হাজির হবে। বাগিচার ভেতরের দিকে এগোলেই একটি সিঁড়ি নজরে পড়বে। লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাবে। সেখানে এক বারান্দায় হাজির হবে। এবারই আদৎ জায়গায় পৌঁছলে। ইয়াদ থাকে যেন। সেখানে এক থাম্বার ওপরে একটি পিতলের পিলসুজের ওপরে একটি চিরাগবাতি জ্বলতে দেখবে। দু'পা এগিয়ে ফু দিয়ে চিরাগবাতির শিখাটি নিভিয়ে দেবে। তার তেলটুকু ফেলে দিয়ে চিরাগবাতিটিকে তোমার পিরানের জেবে ঢুকিয়ে দেবে। ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরী না করে সিঁড়ি বেয়ে তর তর ক'রে নিচে নেমে আসবে। যে-পথে, যেভাবে তুমি গিয়েছিলে ঠিক সেভাবেই তুমি একের পর এক ধাপ পেরিয়ে ওপরে উঠে আসবে।'

আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে বুড্ডা মূর ফকিরটি এবার তড়াক্ ক'রে এক লাফ দিয়ে সোল্লাসে ব'লে উঠল—'বেটা আলাদিন, যদি চিরাগবাতিটি একবার আমার হাতে এনে দিতে পার—ইয়া আল্লা! আমি, না বেটা আমরা দু'জনে দুনিয়ার সবচেয়ে বড়া ধনী বনে যাব! ধন দৌলতই কেবল নয়, যা চাইব এক লহমায় পেয়ে যাব।'

এবার ফকির নিজের আঙুল থেকে অঙ্গুঠি খুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌ল—'বেটা, এক কাম কর, অঙ্গুঠিটি পরে নাও। এটি মন্ত্রপূত। তোমাকে যাবতীয় বিপদ থেকে এটি উদ্ধার করবে। কোন শয়তানের নজর পড়লেও তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। আর তোমার কলিজায় বল ভরসা বাড়িয়ে দেবে।

এক কাম কর আলাদিন, তোমার কোর্তা-পিরাণ ভাল ক'রে গুঁজে নাও। একদম হুঁশিয়ার! জালাগুলো ছুঁয়ে ফেল্‌লে বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। তোমার জানও খতম হয়ে যাবে। আর আমার আশায় পড়বে ছাই। এত কোশিস্ করে ফয়দা কিছুই হবে না।'

আলাদিন আল্লাহ-র নাম নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। এবার একদম হুঁশিয়ার হয়ে একের পর এক ধাপ পেরিয়ে সে-থাম্বাটির গায়ে গিয়ে দাঁড়াল। তার ওপর থেকে জ্বলন্ত চিরাগবাতিটি নামিয়ে আনল। তার কলিজা খুশীতে ছটফটানি শুরু করে দিল। আর বিলকুল ডগমগিয়ে উঠল তার দিল্। বুকের ভেতরে কে যেন হরদম হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে।

আলাদিন এবার বুড্ডা ফকিরের নির্দেশ অনুযায়ী চিরাগবাতির জ্বলন্ত শিখাটি সজোরে এক ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেল্‌ল। পিরাণের জেবে দিল সেটিকে চালান দিয়ে। ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। এবার তার ফেরার পালা। সিঁড়ি বেয়ে তিন কামরার তিসরাটির সামনে এসে দাঁড়াল। কোর্তা-পিরাণের হালৎ দেখে নিল। না, ভালভাবেই গোঁজা আছে। জালাগুলোতে ছোঁয়াছুঁয়ি হওয়ার কোনই সুযোগ নেই।

আলাদিন এবার একদম হুঁশিয়ার হয়ে জালার কামরা তিনটি পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই সে বুড্ডার মুখোমুখি হ'ল। তার মুখে হাসি। দুনিয়া জয়ের হাসি। খুশীতে একদম ডগমগ। সে উন্মাদের মাফিক চিল্লিয়ে উঠল—'বেটা, আমার চিরাগবাতি, এনেছ আমার চিরাগবাতি? কোথায়? কোথায় আমার অমূল্য রতন! কোথায় - - - কোথায় আমার চিরাগ। দাও, একটিবার আমার হাতে দাও। দাও - - - দাও।'

আলাদিন কোর্তা-পিরাণ স্বাভাবিক করতে করতে বল্‌ল—'আগে আমাকে গোছগাছ করতে দেবে তো?'

—'কেন ঝুটমুট দেরী করছ। দাও - - - তাড়াতাড়ি আমার হাতে একবারটি দাও। দাও, বুকে জড়িয়ে ধরি।'

—'চাচা, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। বল্‌লাম তো, দিচ্ছি। কেন এমন ছটফট করছ? শান্ত হও, দিচ্ছি চাচা।'

—'চাচা? কে তোর চাচা? যেন তার চৌদ্দ পুরুষের চাচা! তার গালে এক থাপ্পড় মেরে গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে করতে এবার বল্‌ল—'শয়তান বেতমিস কাঁহিকার! মওকা খুঁজছ তাই না? দৌড়ে পালাবার ধান্দায় আছ, তাই না?' আলাদিন-এর গালে সজোরে আর এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল। টাল সামলাতে না পেরে আলাদিন সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একদম তলায় পড়ে গেল।

বুড্ডা ফকির ওপরে দাঁড়িয়েই আলাদিন-এর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল। আর হতাশায় চুল-দাড়ি টেনে ছিঁড়তে লাগল।

গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে করতে কাঠের গায়ে আগুন জ্বেলে দিল। তারপর ধূনো ছিটিয়ে গলা ছেড়ে মন্ত্র পাঠ করতে লেগে গেল। ব্যস, পাহাড়টির অংশ দুটো যন্ত্রচালিতের প্রায় এগিয়ে এসে জোড়া লেগে গেল। বেরিয়ে আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

বুড্ডা মূর আদতে ফকির টকির কিছুই নয়। সে এক যাদুকর।

যাদুবিদ্যা বহুৎ আচ্ছা রপ্ত করা আছে। আলাদিন-এর চাচার পরিচয় দিয়ে কাজ হাসিলের ধান্দা করছে। আদতে তার সঙ্গে খুনের সম্পর্ক তো দূরের ব্যাপার তাদের সঙ্গে জান পরিচয়ও ছিল না কোনদিন। গণনার কাজেও সে একদম ওস্তাদ। গণনার মাধ্যমে আজব চিরাগটির ব্যাপার জানতে পেরে সে মরক্কো থেকে চীন মুলুকে পাড়ি জমিয়েছে। গণনার মাধ্যমে সে এ-ও জানতে পেরেছিল পাহাড়ের তলায় এক আজব চিরাগবাতি রক্ষিত আছে। দুর্গম পথ। কোনক্রমে চিরাগবাতিটি হাতাতে পারলে সে অগাধ ধন দৌলতের মালিক হয়ে যেতে পারবে। তামাম দুনিয়ার যে ধন-দৌলত রয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ধন দৌলতের মালিক হতে পারবে। সে সুলতানের সুলতান আর বাদশাহের বাদশাহ বনে যেতে পারবে এক লহমার মধ্যে। তার অত্যাশ্চর্য গণনার মাধ্যমে এ-ও জানতে পেরেছিল মুসতাকে-র লেড়কা আলাদিন-এর নামেই আল্লাতাল্লা চিরাগ বাতিটি রক্ষিত আছে। সে ছাড়া কারো পক্ষেই সেটি হস্তগত করতে পারবে না। সে ধান্দায় ছিল কাজ হাসিল হলে আলাদিন-এর হাত থেকে ফন্দিফিকির করে বাগিয়ে নিয়ে চম্পট দেবে। তাবৎ ধন দৌলত সে একাই ভোগ করবে। কাজ হাসিল করার মুখে আলাদিন তার বিলকুল ফন্দি ফিকির একদম বরবাদ ক'রে দিল। তীরে এনে ঝপাং ক'রে তরী দিল ডুবিয়ে। মারধোর ক'রে ভয় ডর দেখিয়ে চিরাগ বাতিটি একবার তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারলে, একদম বাজী মাৎ। লেকিন দু' থাপ্পড়েই যে আলাদিন ইঁদারাটির মধ্যে পড়ে যাবে এ তো খোয়াবের মধ্যেও ভাবতে পারে নি। গুহায় নামার অধিকার তার নেই। আল্লাহ তার জন্য জায়গাটিকে নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত ক'রে রেখেছেন। যাদুবলে এ-ও নিশ্চিত ক'রে জানতে পেরেছিল। তাই হতাশায় জর্জরিত বুড্ডা মূর ফকির আলাদিন'কে তামাম জিন্দেগীর জন্য সমাধিস্থ করার বন্দোবস্ত ক'রে দিল। সেখানে খানাপিনা বিনা সে তিলে তিলে খতম হয়ে যাক এ-ই তার আন্তরিক ইচ্ছা।

শোকে-দুঃখে আর হতাশায় জর্জরিত বুড্ডা মূর ফকিরটি চীন মুলুক ছেড়ে নিজের মুলুক মরক্কোর পথে যাত্রা করল।

এদিকে আলাদিন পাহাড়ের তলায় গুহাটির মধ্যে বসে ভাবল, চাচা এমন গোস্সায় ফুঁসছেন। গোস্সার একটু ভাঁটা পড়লে ওপরে উঠে যাবে। ঠিক সে-মুহূর্তেই তার মালুম হ'ল গুহাটি বার বার দুলে উঠছে। ভয় ডরে তার বুকের ভেতরে ঢিবঢিবানি শুরু হয়ে গেল। ওপরে উঠে আসার কোশিস্ করল। পারল না। গুহার মুখে পাথরের টুকরো চাপা দেয়া। মরিয়া হয়ে সেটিকে সরাবার কোশিস্ করল। এক চুলও নাড়াতে পারল না। শরীরের সবটুকু তাগত নিয়োগ করে ঠেল্‌ল। না, তবু সেটিকে সরিয়ে গুহার মুখ খালি হ'ল না। সে হতাশায় একদম ভেঙে পড়ার জোগাড়। আলাদিন গলা ছেড়ে চিল্লাতে লাগল—'চাচা, এই যে আপনার চিরাগবাতি, এই নিন—আমাকে ওপরে ওঠার ফিকির করে দিন। এই নিন চিরাগবাতি।'

লেকিন কোথায় তার চাচা? কে-ই বা পাথর সরিয়ে তাকে ওপরে উঠে আসার ফিকির ক'রে দেবে?'

আলাদিন এবার নিঃসন্দেহ হ'ল, শয়তানটি আদতে তার চাচা-টাচা কেউ-ই নয়। কিছুতেই সে তার চাচা হতে পারে না। চাচা-ই যদি হ'ত তবে কিছুতেই সে শয়তান বেতমিস এরকম সব বিশেষণ প্রয়োগ ক'রে তাকে গালাগালি দিতে উৎসাহী হ'ত না। কোন ধান্দাবাজ যাদুকর ছাড়া সে কিছুই নয়। তার মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ হাসিল করার ফিকিরে ছিল। ইয়া আল্লাহ! কোন আদমি যে এমন নক্কড়বাজ হতে পারে এ যে সে খোয়াবের মধ্যেও ভাবতে পারে নি।

অজানা ভীতি ও আতঙ্কে আলাদিন-এর সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরতে লাগল। কোর্তা, পিরাণ, এমনকি পাৎলুনটি পর্যন্ত ভিজে একদম জবজবে হয়ে উঠল। এখন উপায় কি! এমন আন্ধার এ-পাতালপুরী থেকে কি ক'রে সে মুক্তি পাবে। এর চেয়ে কয়েদখানায় বন্দী হওয়াও যে শতগুণে শ্রেয়। বাগিচার দিকে যাওয়ার কোশিস্ করল। দরওয়াজা বন্ধ। হতাশ হয়ে সিঁড়িতে ফিরে এল। এখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না।

এক সময় সে বিলাপ করে কান্না জুড়ে দিল। এ যে দেখতে পাচ্ছে এখানেই তার ইন্তেকাল হয়ে যাবে। একে আন্ধার তার ওপর এক টুকরো রুটি আর পানির অভাবে আব্বার দেয়া জানটা একদম খতম হয়ে যাবে। হাতের নাগালের মধ্যে জালা বোঝাই সোনা। লেকিন তার কোনই দাম নেই। মোউৎ-কে সোনা দিয়ে ঠেকানো যাবে না। মোউৎ তাকে নিয়ে যাবেই যাবে।

আলাদিন চিল্লিয়ে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ কী করলে তুমি। কেন আমাকে এমন ক'রে তিলে তিলে খতম করতে চাইছ? এমন কি গুণাহ আমি করেছি যার জন্য তুমি এমন সাজা আমাকে দিলে!' আলাদিন উন্মাদের মাফিক কখনও কামরার মেঝেতে ফিন কখনও বা দেয়ালে শির ঠুকতে লাগল। আল্লাহ-র কান নেই। নইলে তার এত কান্নাকাটি এমন করুণ প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছেন না। পেলেও তিনি গ্রাহ্যই করছেন না।

পানি—এক বদনা পানি কে তাকে দেবে। পানি বিনা তার কলিজা শুকিয়ে একদম কাঠ বনে গেছে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। অস্থির চিত্ত আলাদিন বার বার তার বুক-গলা ঘষে তকলিফকে একটু ভুলে, একটু কমাতে চাইল। লেকিন সে-মুহূর্তেই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। একদম অবিশ্বাস্য কাণ্ড। অতিকায় এক দৈত্য এসে আলাদিন-এর সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। আফ্রিদি

দৈত্য। বিকট দর্শন। যেমন কালো ঠিক তেমনি কদাকার তার চেহারা। এক পলক দেখেই আলাদিন-এর কলিজা মোচড় মেরে উঠল। একদম লাফালাফি দাপাদাপি শুরু করে দিল। বিকট আর্তনাদ করে সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

আফ্রিদি দৈত্যটি বুক কাঁপানো স্বরে বলে উঠল—'আমি জল, স্থল আর আশমানের বাদশাহ। আমি করতে পারিনা এমন কোন কাজই নেই। লেকিন আমি আঙ্গুঠির নফর নোকর। যার হাতে আঙ্গুঠি থাকবে আমি তারই হুকুম তামিল করতে বাধ্য। এখন এটি তোমার হাতে, আমি তোমারই নফর। বল, কি চাও তুমি? আমার প্রতি কি হুকুম?'

আফ্রিদি দৈত্যটিকে দেখে আলাদিন গোড়ায় একটু মুষড়ে পড়লেও পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল, কলিজাকে শক্ত ক'রে বেঁধে ফেল্‌ল। মোউৎ যার একদম শিয়রে তার কাছে আফ্রিদি দৈত্য তো কোন ছার।

মুখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে আলাদিন কাঁপা কাঁপা গলায় ব'লে উঠল—'শোন, এখন তোমার সবচেয়ে বড়া কাম আমাকে এ গুহা থেকে মুক্ত করা।'

আফ্রিদি দৈত্যটি নতজানু হয়ে আলাদিন'কে অভিবাদন করে বল্‌ল—'জো হুকুম হুজুর।' চোখের পলকে অতিকায় দৈত্যটি তাকে কাঠের পুতুলের মাফিক আলতো করে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে একদম জমিনে, যেখানে মূর ফকির কাঠ দিয়ে ধুনি জ্বেলেছিল সেখানে রেখে দিল। ব্যস, এক লহমায় সে ফিন বাতাসে মিলিয়ে গেল।'

এক অবর্ণনীয় খুশীতে আলাদিন-এর কলিজা নেচে উঠল। মাথার ওপরের নীল আশমানটিকে দিল্ ভরে দেখতে লাগল। যেন সে বাঁচার আনন্দে আত্মহারা হবার জোগাড়। খুশীতে বার-কয়েক উন্মাদের মাফিক লাফালাফি চিল্লাচিল্লি করল।

আলাদিন পিরাণের জেবে রক্ষিত চিরাগবাতিটিতে হাত দিয়ে দেখে নিল। হ্যাঁ আছে, জায়গা মাফিকই আছে তার কলিজার সমান চিরাগবাতিটি। নিশ্চিন্ত হ'ল।

আলাদিন এবার পাহাড় ছেড়ে নিজেদের মকানের দিকে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে লাগল।

আলাদিন বাড়ির দোর গোড়ায় পৌঁছে দেখে তার আম্মা গুচ্ছের খানেক দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

আলাদিনকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে তার আম্মা খানার থালি সাজিয়ে দিল। পাশে রাখল এক বদনা পানি।

আলাদিন গোগ্রাসে খানাগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল। তার আম্মা তার ব্যাপার স্যাপার দেখে হেসে বল্‌ল—'কিরে, তোর চাচা দিনভর কিছু খেতে দেয় নি তোকে?'

খানা চিবোতে চিবোতে আলাদিন বল্‌ল—'চাচা? কে আমার চাচা? হারামি শয়তান কাঁহিকার! ধাপ্পাবাজ শয়তানটি আমার চাচা, আব্বার ভাইয়া সেজে হাজির হয়েছিল। বেতমিসটি আদতে এক মূর যাদুকর। ফকির সেজে আমাদের ধাপ্পা দিয়ে গেছে। কুত্তার বাচ্চাটির চৌদ্দপুরুষের কেউ আমাদের চাচাটাচা হওয়া তো দূরের ব্যাপার আমাদের কারো সঙ্গে জান পরিচয়ও ছিল না। চাচা সেজে, চাচার বাহানা করে আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করার ধান্দায় এসেছিল। শেষে নিজেই হতাশ হয়ে নিজের মুলুকে ভেগেছে।'

তার আম্মা ভ্রূ কুঁচকে বল্‌ল—'বেটা, আমার দিমাকে আসছে না, সে তোকে দিয়ে কোন্ কাজ হাসিল করার ধান্দায় ছিল? তোর কি এমন হিম্মৎ আছে যে, তোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের কাজ হাসিল ক'রে নিতে চাইছিল। বেটা, খোলসা করে বল, আদৎ ব্যাপারটি কি?'

আলাদিন এবার তার আম্মার কাছে বাজারে গিয়ে কোর্তা,

পিরাণ আর পাৎলুন খরিদ করা থেকে শুরু ক'রে আফ্রিদি দৈত্য, পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করা চিরাগবাতি পর্যন্ত বিলকুল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করল।

তার আম্মা তো আজব কাণ্ডকারখানার বাৎ শুনে একদম থ বনে গেল। চোখ দুটো একদম কপালে তুলে সবিস্ময়ে বল্‌ল—'বেটা, সামান্য একটি চিরাগবাতির জন্য শয়তান বুড্ডাটি এমন কাণ্ডকারখানা করল। তা-ও তামার চিরাগবাতি। কতইবা এর দাম। সোনার হলেও না হয় বুঝা যেত। আজব আদমি! আজব তার মর্জি!'

আলাদিন চিরাগবাতিটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বল্‌ল—'আমিও তো তা-ই ভাবছি আম্মা, সামান্য এ চিরাগবাতিটির জন্য ফিরিকবাজটি আমাকে দিয়ে কেন এমন কসরৎ করাতে গেল। আর একটু হলে, আফ্রিদি দৈত্যটি হাজির না হলে আমার জান একদম খতম হয়ে যেত।'

সকাল হ'ল। হাতে একটি দিরহামও নেই যা দিয়ে সওদাপাতি ক'রে সামান্য রুটি-লবণের বন্দোবস্ত করতে পারে। আলাদিন-এর আম্মার মুখ শুকিয়ে গেল। একটুবাদেই তো লেড়কা খানার জন্য ছটফটানি শুরু ক'রে দেবে। এখন উপায়? সে বল্‌ল—'বেটা, আমি একবার মহল্লা থেকে ঢুঁড়ে আসি। দেখি কারো কাছ থেকে যদি কিছু আটা হাওলাৎ ক'রে নিয়ে আসতে পারি কিনা।'

আলাদিন বিছানায় উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বল্‌ল—'আম্মা, এক কাম কর, চিরাগবাতিটি নিয়ে গিয়ে কারো কাছে বন্ধক দাও, না হয় বেচে দাও। যা মিলবে তা দিয়ে আটার জোগাড় হয়ে যাবে।'

—'বড়িয়া বাৎ বলেছিস বেটা। তা-ই করি, চিরাগবাতিটিই নিয়ে যাই।'

—'এক কাম কর, চিরাগটির গায়ে তেল জড়িয়ে আছে। ছাই-মাটি দিয়ে একটু ঘষে-মেজে নিয়ে যাও। ঝকমক করলে হয়ত পুরো এক দিরহামই মিলে যেতে পারে। ঝট করে সবার নজরে পড়ে যাবে।'

চিরাগবাতিটির গায়ে সামান্য ছাই মাখিয়ে ডলা দিতেই আজব এক কাণ্ড ঘটে গেল। এক লহমার মধ্যে অতিকায় একটি আফ্রিদি দৈত্য তার সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়াল। তার বিকট মূর্তি দেখে আলাদিন-এর আম্মার তো কলিজা একদম ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। আশমান-কাঁপানো আর্তনাদ ক'রে একদম জমিনে লুটিয়ে পড়ল। সংজ্ঞা হারিয়ে হাত-পা ছেড়ে অসাড় হয়ে পড়ল।

আম্মার আর্তনাদ শুনে আলাদিন এক লাফে তড়াক্ করে চৌপায়া থেকে নেমে রসুইখানার দাওয়ায় চলে গেল। অতিকায় দৈত্যটিকে দেখে একদম ঘাবড়াল না। আদতে তার তো আফ্রিদি দৈত্য সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছেই। তার কাছে ব্যাপারটি সাফা হয়ে গেল, চিরাগবাতিটির অলৌকিক ক্ষমতাবলেই আফ্রিদি দৈত্যটির আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছে।

আলাদিন ঝট ক'রে চিরাগবাতিটি হাতে তুলে নিয়ে আফ্রিদি দৈত্যটিকে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল—'কে তুমি?'

আফ্রিদি দৈত্যটি করজোড়ে তার কাছে নিবেদন করল—'হুজুর আমি আপনার নফরের নফর, নোকরেরও নোকর। মেহেরবানি করে হুকুম করুন, কি করতে হবে আমাকে? আলাদিন বল্‌ল—'সবার আগে কিছু বড়িয়া খানা জোগাড় করে আন। তারপর আর কি করতে হবে বলছি।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আফ্রিদি দৈত্যটি বাতাসে মিলিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই সে বিশালায়তন এক রূপার থালা নিয়ে হাজির হ'ল। তাতে সোনার থালা আর রূপার বাটিতে বাটিতে সাজানো রয়েছে হরেক কিসিমের মুখরোচক বাদশাহী খানা। সে থালাটি আলাদিন-এর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে পরবর্তী হুকুমের জন্য করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আলাদিন আফ্রিদি দৈত্যটিকে বল্‌ল—'এখনকার মত তোমার ছুটি। যাও, পরে দরকার মাফিক ফিন তলব করব।'

এদিকে আফ্রিদি দৈত্যটির কাণ্ড দেখে আলাদিন-এর আম্মার দাঁত কপাটি লেগে গেল। সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। আলাদিন তার চোখে-মুখে পানির ছিটা দিয়ে সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল।

আলাদিন হাসতে হাসতে বল্‌ল—'আম্মা, উঠে বস। আফ্রিদি দৈত্যকে ভয় ডরের কিছু নেই। ভাবতে পার, সে আমাদের নফর নোকরমাত্র। আমরা তলব করলেই সে অনুগত বান্দার মাফিক হুকুম তামিল করতে ছুটে আসবে। ওঠো, খানাপিনা সেরে নাও।'

আফ্রিদি দৈত্য যে সব খানা দিয়ে গেছে তা দিয়ে তারা দু'দিন ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েও খতম করতে পারল না।

আলাদিন-এর আম্মা রাত্রে শুয়ে তাকে বল্‌ল—'বেটা, ব্যাপারটি আমার কিন্তু মোটেই সুবিধের মালুম হচ্ছে না। ওই সব আফ্রিদি দৈত্য আর জীন-পরীর ব্যাপার স্যাপার মোটেই সুবিধের নয়। আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ তো এদের বরদাস্ত করতে পারেন নি। বরং এদের কাছ থেকে সতর্কতার সঙ্গে তফাতে থাকতে বলেছেন। তিনি আমাদের সতর্ক ক'রে দিতে গিয়ে হাজারো বার বলেছেন—'এরা শয়তানের সাক্ষাৎ চর।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বল্‌ল—'বেটা আলাদিন, এদের ছাড়ান দিয়ে অন্য কোন ফিকির দেখ যাতে দিনে দু'-দশ দিরহাম রোজগারের বন্দোবস্ত হতে পারে।' আলাদিন মুখবুজে শুয়ে রইল। আচ্ছা কি বুড়া কিছুই বল্‌ল না।

পরদিন দুপুরের আগে আলাদিন পিরাণের তলায় একটি সোনার থালা গুঁজে বাজারে এক বুড্ডা ইহুদীর দোকানে গেল। পিরাণের তলা থেকে থালাটি বের ক'রে বুড্ডাটির হাতে দিয়ে বল্‌ল—'আমি থালাটি বেচতে চাই। কি দাম দেবেন, বলুন?'

ইহুদীটি থালাটি হাতে নিয়ে এক লহমায় তার দিকে তাকিয়েই সচকিত হয়ে একদম সোজা হয়ে বসে পড়ল। তারপর পুরু কাঁচের চাঁদির চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে আলাদিন-এর পা থেকে শির পর্যন্ত দেখে নিল। ভাবল, নির্ঘাৎ সে এটি কোন না কোন আমীর-বাদশাহের প্রাসাদ থেকে ঝেঁপেছে। এবার কষ্টি পাথরে বার দুই ঘষে নিয়ে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, তুমিই বল কি দাম পেলে এটি বেচতে পার?'

আলাদিন পড়ল মহাফাঁপরে। কি দাম চাইবে তার দিমাকেই আসছে না। আদতে এর দাম যে কি হতে পারে কিছুই তো তার জানা নেই। ম্লান হেসে সে এবার বুড্ডা ইহুদীটিকে বল্‌ল—'আপনি এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ। হিসাব নিকাষ ক'রে যা হোক দিন না, তবেই ঝামেলা চুকে যায়।

ইহুদীটি এবার ফোকলা মুখে হেসে কাঠের বাক্স থেকে একটি দিনার বের ক'রে আলাদিন-এর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এক দিনার একটু বেশী হয়ে যায়। পুরোটিই নাও। এক-আধ দিরহাম কম দিয়ে কি আর হবে।'

আলাদিন দিনারটি পিরাণের জেবে পুরে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল।

আলাদিন দোকান থেকে বেরনোর সময় ইহুদীটি তার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করল—'কী ভুলই না করলাম। আধ দিনার দিলেও চলত। পুরো একটি দিনার দিয়ে দিলাম। ইস্ কী ভুলই না ক'রে ফেল্‌লাম!'

এদিকে আলাদিন ইহুদীটির দোকান থেকে বেরিয়ে দিনারটি ভাঙিয়ে বড়িয়া কিছু খানা কিনে নিয়ে মকানে ফিরল। খানার ঠোঙাটি আম্মার হাতে দিয়ে ইহুদী দোকানীর সততার ব্যাপারে ভূয়সী প্রশংসা করল।

দু'দিন বাদে দিনারটি খরচ হয়ে গেলে আলাদিন ফিন আর একটি সোনার থালা পিরাণের তলায় ক'রে সে বুড্ডা ইহুদীর দোকানে হাজির হ'ল। বুড্ডা তাকে বহুৎ খাতির যত্ন ক'রে বসাল। থালাটি আর ঝুটমুট কষ্টি পাথরে ঘষাঘষি না করেই সেটি রেখে একটি দিনার তার হাতে গুঁজে দিল। ভুল তো আগের দিনই ক'রে ফেলেছে। আজ আর একই জিনিসের দাম আর কম দেয় কি ক'রে।

আলাদিন তার দোকান থেকে বেরিয়ে দিনারটি ভাঙিয়ে কিছু খানা খরিদ ক'রে মকানে ফিরল।

আলাদিন এভাবে তার থালা-কটি যা ছিল বিলকুল ইহুদীটির কাছে বেচে দিল।

এবার রূপার বড় থালাটি রয়েছে। পেল্লাই থালা, সেটিকে একটি চাদরে মুড়িয়ে আলাদিন ফিন বুড্ডা ইহুদীটির দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। ইহুদী বাছ বিচার না করেই থালাটি রেখে দুটো সোনার মোহর তুলে দিল।' চশমার ফাঁক দিয়ে জুল্ জুল্ ক'রে তাকিয়ে ফোকলা মুখে হেসে বল্‌ল—'যে সামানের যা দাম ঠিক পেয়ে যাবেন মিঞা। আল্লার নামে বলছি, ভুলেও একটি দিরহাম ঠকাব না।'

আলাদিন হেসে বল্‌ল—'তা্ই তো অন্য কোথাও না গিয়ে সবার আগে আপনার দোকানেই ঘুরে ঘুরে আসি সাহাব।'

দুটো সোনার মোহরে আর ক'দিনই বা চলে? একদিন হাত একদম খালি হয়ে গেল।

আলাদিন-এর আম্মা ফিন মুষড়ে পড়ল। হাত তো একদম খালি। এবার চলবে কি দিয়ে?

আলাদিন হেসে বল্‌ল—'আম্মা, এমন ক'রে ভেঙে পড়ার কি আছে, বুঝছি না তো! আফ্রিদি দৈত্যকে তলব করলেই তো মুশকিল আশান হয়ে যেতে পারে।'

আলাদিন-এর আম্মা আর কিছু না ব'লে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আলাদিন এবার চিরাগবাতিটি হাতে নিয়ে দু'-একবার ঘষতেই বিশাল বপুধারী আফ্রিদি দৈত্যটি আবির্ভূত হয়ে করজোড়ে তার সামনে দাঁড়াল। বল্‌ল—'হুজুর, বান্দা হাজির। হুকুম করুন, কি করতে হবে?'

—'সবার আগে কিছু খানার বন্দোবস্ত কর। তারপর ভেবে দেখছি, আর কি তোমাকে দিয়ে করানো যায়।'

আফ্রিদি দৈত্যটি মুহূর্তের মধ্যে হাফিস্ হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই ইয়া পেল্লাই একটি রূপার থালা এনে আলাদিন-এর পায়ের কাছে রাখল। তাতে সাজানো রয়েছে কয়েকটি সোনার থালা ভর্তি খুসবুওয়ালা হরেক কিসিমের খানা।

আলাদিন আর তার আম্মা দু'দিন পেট পুরে খেয়েও খতম করতে পারে না।

আলাদিন এবার পিরাণের তলায় একটি ক'রে সোনার থালা নিয়ে বাজারের দিকে হাঁটা জুড়ল। বুড্ডা হাড্ডিসার ইহুদীটির দোকানে যাবার পথে এক মুসলমান বুড্ডার দোকান দেখতে পেয়ে সে দোকানটিতে গিয়ে দাঁড়াল। থালাটি পিরাণের তলা থেকে বুড্ডা মুসলমান দোকানীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—'আমি এটি বেচতে চাই। আপনি খরিদ করবেন কি? যদি আগ্রহী থাকেন তবে বলুন, কি দাম দেবেন?'

বুড্ডাটি থালাটিকে নিক্তিতে ওজন ক'রে বল্‌ল—'বেটা, এর

বিনিময়ে আমি তোমাকে পুরো দু'শ' দিনার দিতে পারি। এটি যে সোনার থালা আশাকরি তোমাকে আর বলার দরকার নেই, কি বল?'

আলাদিন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে পড়তে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! হতচ্ছাড়া ইহুদীটি আমার সর্বনাশ ক'রে দিয়েছে।'

বুড্ডা মুসলমান দোকানীটি উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—'বেটা, কি হয়েছে? কি সমাচার? তুমি এমন অস্থির হয়ে পড়েছ কেন?'

আলাদিন এবার তাকে বুড্ডা ইহুদী দোকানিটি বারোটি সোনার থালার প্রতিটির দাম এক দিনার ক'রে চুকিয়ে দিয়ে কিভাবে তাকে ঠকিয়েছে, বিস্তারিত সে বিবরণ দিল।

বুড্ডা মুসলমান দোকানীটি চমকে উঠে বলে—'সে কী হে! মাত্র এক দিনারে পুরো দু'শ দিনারের থালা। এ যে একদম দিনে ডাকাতি মিঞা। শয়তান ইহুদীটিকে শূলে চড়ানো নয় তো গর্দান নেয়া দরকার। তবে সমস্যা হচ্ছে, তোমার তো ফিন সাক্ষী সাবুদ কিছুই নেই। কপাল চাপড়ানো ছাড়া এখন আর গত্যন্তরও নেই।'

—'যাক গে, কসুর তো আমারই। আদমি চিনতে ভুল করেছি। যাক গে এবার থেকে কিছু বেচতে হলে সোজা আপনার কাছে চলে আসব।'

আলাদিন এবার থেকে দিনের পর দিন মুসলমান বুড্ডাটির দোকানে থালা বেচে কাড়ি কাড়ি দিনার জমাতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই সে একদম আমীর আদমির মাফিক ধনবান বনে গেল।

একদিন মুসলমান বুড্ডাটি প্রসঙ্গক্রমে আলাদিনকে বল্‌ল—'মিঞা, সোনার থালা ছাড়া তোমার মকানে কি আর কিছুই নেই? রোজ রোজই দেখি থালা নিয়ে হাজির হও, ব্যাপার কি? আলাদিন ভাবল, পাতালপুরীর বাগিচা থেকে তো কিছু সুদৃশ্য পাথরের ফল নিয়ে এসেছিল, ইয়া পেল্লাই পেল্লাই এক একটি ফল।

বুড্ডা মুসলমান দোকানীটি এবার বল্‌ল—'কি মিঞা, এমন ক'রে ভাববার কি আছে, বুঝছি না তো! এ তো সাধারণ ব্যাপার, তোমার মকানে সোনার থালা ছাড়া বেচবার মাফিক আর কিছু

আছে কি?'

আলাদিন বল্‌ল—'আছে, ফল—পাথরের কিছু ফল।'

—'বহুৎ আচ্ছা, কাল নিয়ে এসো তো, দেখব, কেমন তোমার পাথরের ফল।'

আলাদিন পরদিন সকালে একটি পাথরের আনারস কাপড়ায় জড়িয়ে নিয়ে বুড্ডার দোকানে হাজির হ'ল।

কাপড়ার বাঁধন খুলতেই বুড্ডা মুসলমান দোকানীটি নিজের অজান্তে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ!' পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল—'বেটা, এ কিসিমের পাথরের ফল তোমার কাছে কতগুলি আছে, বল তো?'

আদতে বুড্ডা ঘাঘু জহুরী। এক লহমায় পাথরের আনারসটি দেখেই ঠাহর ক'রে নিল বাদশাহ-সুলতানের ধনাগারেও এ-বস্তু মিলবে না।

আলাদিন বুড্ডা মুসলমান জহুরীটির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বল্‌ল—'তা এক শ'-র কম তো নয়ই।'

—'শোন মিঞা, আমি সাচ্চা মুসলমান। জিন্দেগীতে কারো সঙ্গে বেইমানী করি নি, অধর্মের ধার কাছ দিয়েও যাই নি। আমার বাৎ শোন, অন্য কারো কাছে পাথরের ফলগুলো নিয়ে যেয়ো না। কাউকে দেখানো তো দূরের ব্যাপার মুখফুটে বলবেও না যে, তোমার মকানে এ কিসিমের ফল আছে, ইয়াদ থাকবে?'

আলাদিন নীরবে ঘাড় কাৎ করল। বুড্ডা মুসলমান দোকানী আনারসটির দিকে জুল্ জুল্ ক'রে তাকিয়ে সাধ্যমত গলা নামিয়ে এবার বল্‌ল—'মিঞা, আমি জহুরী, অর্থকড়ি কিছু না কিছু জরুর আছে, মান তো? আমার মকান, দোকান, জমি জিরাত ও গহণাপত্তর যা কিছু আছে বিলকুল এককাট্টা করলেও তোমার আনারসটির দাম মেটানো যাবে না। আমার তামাম সম্পত্তি বেচলে দশ-বিশ লাখ দিনার তো মিলবেই। এর দাম তার চেয়েও ঢের বেশী। কেবল আমারই নয়। এ নগরের যত জহুরী আছে তাদের তামাম সম্পত্তির বিনিময়েও এর দাম চুকবে না। আরও বলি শোন, আমাদের সুলতানিয়তের মাফিক সাতটি সুলতানিয়তের যা দাম তার চেয়ে ঢের, ঢের বেশী তোমার এ আনারসটির দাম। তাই বলছি মিঞা এমন অমূল্য পাথর যখন বরাতগুণে হাতে পেয়েছ, খবরদার বে-হাত হয় না যেন, ইয়াদ রেখো।'

বুড্ডা মুসলমান জহুরীর বাৎ শুনে আলাদিন-এর দিমাক এখন ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হ'ল, যে তার বাৎ কিছুই ঠাহর করা গেল না। তবে এটুকু বুঝল, এর বিনিময়ে ঢের দাম মিলতে পারে। ঠিকই বলেছে বটে। বাজারের দোকানীরা হাতে পেলে তাকে ঠকিয়ে একদম মাথায় বাড়ি দিয়ে ছাড়বে।

আলাদিন মকানে ফিরে পাথরের ফলগুলো একটি কাঠের বাক্সে পুরে চৌকির নিচে রেখে দিল। ব্যস, আর কোনদিন এদের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করে নি।

এক বিকালে আলাদিন বুড্ডা মুসলমান জহুরীটির দোকানে বসে বাৎচিৎ করছে। এমন সময় সুলতানের পেয়াদাকে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করতে শোনা গেল—'সুলতানের লেড়কি শাহজাদী বদর অল-বুদুর আজ হামামে গোসল করতে যাবেন। তখন কোন দোকান খোলা থাকলে বা পথে কাউকে হাঁটা চলা করতে দেখলে স্রেফ তার গর্দান যাবে।'

ব্যস, চারদিকে দোকানের ঝাঁপ বন্ধের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। বুড্ডা মুসলমান জহুরী বল্‌ল—'মিঞা, পিছনের দরওয়াজা দিয়ে ভেগে যাও। বেকার জান খোয়াতে যাবে না। শাহজাদী এ-পথে গোসল করতে যাবেন।'

তার বাৎ খতম হতে না হতেই কয়েক শ' ইয়া লম্বা-চওড়া নিগ্রো ঝকঝকে তরবারি হাতে দোকানের সামনের পথ দিয়ে চলে গেল।

আলাদিন দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের মকানে ফিরে গেল না। শাহজাদীর ব্যাপারটি তার ভেতরে কৌতূহলের সঞ্চার করল। ইয়ার দোস্তদের মুখে সে বহুবার শুনেছে, শাহজাদী একদম বেহেস্তের হুরীর মাফিক খুবসুরৎ। তার রূপের আভা নাকি চোখ ঝলসে দেয়। সে নিয়ত করল, নসীবে যখন এতবড় এক সুযোগ জুটে গেছে তখন আর হাতছাড়া করবে না। কিছুতেই না। বড়জোর নিগ্রো খোজাদের হাতে গর্দান যাবে, এর বেশী তো কিছুই নয়। বিনিময়ে বুদুর-এর সুরৎ দেখে জিন্দেগীকে তো সার্থক ক'রে তুলতে পারবেই।

আলাদিন গুটিগুটি খানদানি হামামে হাজির হ'ল। দরওয়াজার আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু পরে নিগ্রো খোজা পরিবেষ্টিত হয়ে শাহজাদী পাল্কি চড়ে হামামের দরওয়াজায় হাজির হ'ল।

শাহজাদী বুদুর হামামের ভেতরে ঢুকে প্রথমে বোরখার নাকাব খোলে। তারপর গা থেকে খুলে ফেল্‌ল মখমলের বোরখাটি। দরওয়াজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আলাদিন এক লহমায় শাহজাদী বুদুর-এর মুখটি দেখেই সচকিত হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে কলিজাটি দাপাদাপি শুরু করে দেয়।

শাহজাদী এবার তার পদ্মের মাফিক পা দুটো ফেলে ফেলে ঢুকে যায় হামামের ভেতরে।

আলাদিন সুযোগ মাফিক সবার চোখে ধূলো দিয়ে হামাম থেকে বেরিয়ে আসে। ব্যস, সোজা মকানের দিকে হাটতে লাগল।

আলাদিন মকানে ফিরে চৌকি আশ্রয় ক'রে পড়ে রইল। কারো সঙ্গে বাৎচিৎ তো দূরের ব্যাপার খানাপিনা-গোসল্ করা পর্যন্ত

ছেড়ে দিল।

আলাদিন-এর আম্মা লেড়কার রকমসকম দেখে ভড়কে গেল। ব্যাপার কি জানার জন্য বহুৎ পীড়াপীড়ি করল। ফয়দা কিছুই হ'ল না। উপায়ান্তর না দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কামরায় চলে গেল।

আলাদিন রাতভর চৌকিতে শুয়ে ছটফট করে কাটাল। দু'চোখের পাতা জুড়তে পারে নি। কলিজার জ্বালা বাড়া ছাড়া কমল না।

সকাল হ'ল। তার আম্মা ফিন কামরায় এসে লেড়কাকে চৌকি থেকে নামিয়ে খানাপিনা করানোর জন্য সাধ্যাতীত কোশিস্ করল। ব্যর্থ প্রয়াস। ফয়দা কিছুই হ'ল না। সে চৌকি আঁকড়ে কামরার চালের দিকে মুখ করে শুয়ে রইল।

তার আম্মা বুঝল, লেড়কার কঠিন বিমারি হয়েছে। নগরের সবচেয়ে বড়া হেকিমকে তলব করে একবারটি দেখাবার কথা ভাবল।

তার আম্মা হেকিমকে তলব করতে চাইছে শুনে আলাদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ ব্যক্ত করল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' ছেচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, আলাদিন তার আম্মার কাছে শাহজাদী বুদুর-এর ব্যাপার খুলে বল্ল। তার সুরৎ তার দিমাক বিলকুল ঘুরিয়ে দিয়েছে। এ-বিমারির ইলাজ কি হেকিম করতে পারবে? এর দাওয়াই যে বিলকুল অন্য কিসিমের।

তার আম্মা অন্য কোন খুবসুরৎ লেড়কিকে পছন্দ ক'রে শাদী করার পরামর্শ দিল। লেকিন শাহজাদী বুদুর যেখানে কলিজার সবটুকু জায়গা দখল ক'রে রয়েছে সেখানে অন্য কোন লেড়কির জায়গা তো হবার নয়।

তার আম্মা কপাল চাপড়ে বলে—'বেটা, সে যে সুলতানের লেড়কি! তোর ব্যাপার স্যাপার চাউর হয়ে গেলে সুলতান তোকে হয় শূলে চড়াবে নয় তো গর্দান নেবে। এমন সর্বনেশে ব্যাপার মুখেও আনবি না। আশমানের চাঁদে হাত বাড়াতে গেলে হতাশা বাড়া ছাড়া ফয়দা কিছুই হবে না।'

কে, কার উপদেশ শোনে? আলাদিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ওঠে—'আম্মা, বুদুর'কে আমার চাই-ই চাই। হয় তাকে পাব, না হয় জান দেব।'

—'বেটা, দিমাক ঠাণ্ডা কর। সুলতানের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে যাওয়া বেকুবের কাজ ছাড়া কিছুই নয়।'

—'সে যা-ই হোক, তুমি যা-ই বল না কেন, পাল্লা আমাকে দিতেই হবে। তামাম দুনিয়ার সুলতানের হিম্মৎ এক সাথে করলে যা হবে তার চেয়ে ঢের বেশী হিম্মৎ আমার কাছে জিম্মা আছে। অর্থ দিয়ে তার দাম হয় না। আর এ-ও সাচ্চা বটে, সুলতান বা শাহজাদীর কাছে তার কদর জরুর হবে। আমি একটিবার পরখ ক'রে দেখতে চাই।' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে ফিন বল্ল—'পাতালপুরী থেকে যে পাথরের ফলগুলি নিয়ে এসেছিলাম, দেখেছিলে কি? বুড্ডা জহুরী আমাকে বলেছিল, সুলতান-বাদশাহ-ই একমাত্র ফলগুলির কদর বুঝবে। আম্মা ফলগুলি নিয়ে তুমি সুলতানের দরবারে হাজির হও। সুলতানকে সেগুলো ভেট দিয়ে আমার মনের খবর তাঁর কাছে তুলে ধরবে।'

সুলতান—সুলতানের দরবার প্রভৃতি শুনেই আলাদিন-এর আম্মার কলিজা শুকিয়ে একসার হয়ে গেল। সে বার কয়েক ঢোক গিলে বল্ল—'আমাকে অন্য যে কোন কাজের কথা বল হাসিমুখে সেরে আসব বেটা, লেকিন আমাকে জবরদস্তি দরবারে পাঠাবার কোশিস্ করিস না। সুলতান ক্ষেপে গেলে হয় ফাঁসি দেবে, না হয় গর্দান নেবে। তবু আমি তোর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজী আছি বেটা। লেকিন তিনি ক্ষেপে গিয়ে যদি আমার বদলে তোকে কোন সাজা দেন তবে আমি সইতে পারব না।'

—'ধ্যুৎ, মিছে কেন ডরে কুঁকড়ে যাচ্ছ? আমি বুদুর'কে না পেলে এমনিতেও জিন্দেগী বরবাদ করে দেব। তা যদি ফাঁসির দড়িতে যায় তবে আপশোষের কি আর থাকতে পারে!'

আলাদিন-এর আম্মা একটি সফেদ চাদর গায়ে দিয়ে ফলের বাক্সটি ঢেকে নিয়ে সুলতানের দরবারে হাজির হ'ল।

সুলতান জরুরী কাজে ব্যস্ত। কোনদিকে তার হুঁসমাত্রও নেই। আলাদিন-এর আম্মা ফলের বাক্সটি নিয়ে এক কোণে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। সুলতান দরবারের কাজ সেরে আমীর-ওমরাহদের সাথে বাৎচিৎ করতে করতে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আলাদিন-এর আম্মার পক্ষে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা সম্ভব হ'ল না। সে মুখ ব্যাজার করে ফলের ঝুড়িটি নিয়ে নিজের মকানে ফিরে এল।

আলাদিন রোয়াকে তার আম্মার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। তার আম্মা কাছে এসে বল্‌ল—'বেটা, বিশোয়াস কর, সুলতান কাজে এতই ব্যস্ত ছিলেন যার জন্য আমার পক্ষে প্রসঙ্গটি পাড়াই সম্ভব হ'ল না। বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।'

আম্মার বাৎ শুনে আলাদিন হতাশায় জর্জরিত হয়ে চৌকিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। লেড়কাকে তার আম্মা প্রবোধ দিল—'মুষড়ে পড়ছিস কেন বেটা? আজ পারি নি বটে, কাল ঠিক পারব, দেখে নিস।'

পরদিনও আলাদিন-এর আম্মা সফেদ চাদর গায়ে দিল। ফলের বাক্সটি তার তলায় নিয়ে সুলতানের দরবারে হাজির হ'ল। দরবারের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল। সুলতান কাজ চুকিয়ে প্রাসাদে চলে গেলেন। বলি বলি করেও আলাদিন-এর আম্মা মাথাগুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। দরবার খালি হলে বিষণ্ণ মুখে নিজের মকানে ফিরে এল।

মকানে ফিরে সে আলাদিন'কে ফিন ভরসা দিল আগামীকাল জরুর সুলতানের কাছে নিজের বক্তব্য তুলে ধরবে।

রোজই আলাদিন-এর আম্মা সফেদ চাদর গায়ে জড়িয়ে দরবারের একধারে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাপারটি সুলতানের নজরে পড়ল। তিনি উজিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'জেনানাটি কে? রোজই দরবারে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে, ব্যাপার কি? কিছু বলতে চায় কি?'

—'জাঁহাপনা, কত আদমিই তো দরবারে এসে নিজ নিজ আর্জি জানায়। জেনানাটির কোন বক্তব্য থাকলে তো বলতই। রোজ দাঁড়িয়ে থাকবে কেন, মালুম হচ্ছে না!'

—'এমনও তো হতে পারে, সাহস করে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারছে না।' সুলতান এবার আলাদিন-এর আম্মা-র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুমি? রোজ দরবারে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক, ব্যাপার কি, বল তো?'

—'জাঁহাপনা, আমার স্বামী এক সময় এ-নগরের এক দর্জী ছিলেন। বহুৎ দিন আগেই তিনি বেহেস্তে গেছেন। এখন আমার একমাত্র লেড়কা আলাদিন'কে নিয়ে কোনরকমে আপনার দোয়ায় দিন গুজরান করছি। জাঁহাপনা ভয় ডরের কারণেই আমার বক্তব্য আপনার দরবারে পেশ করা সম্ভব হয় নি। আমি কোন দুঃখ-কষ্টের আর্জি পেশ ক'রে আপনার বিরক্তির উদ্রেক ঘটাতে আসি নি।'

—'তবে কেন রোজ রোজ দরবারে এসে দাঁড়িয়ে থেকে কষ্টভোগ কর?'

—'জাঁহাপনা, আমার আর্জি একটু অন্য কিসিমের। কসুর নেবেন না, দরবারে এক দঙ্গল আদমির মাঝে আমার আর্জি পেশ করা সম্ভব নয়। যদি মেহেরবানি ক'রে আলাদা কোন স্থানে আমাকে আর্জি পেশ করার সুযোগ দান করেন তবে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।'

সুলতান ইশারা করতেই এক লহমায় দরবার কক্ষ বিলকুল ফাঁকা হয়ে গেল।

সুলতান বল্‌লেন—'এবার নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় তোমার বক্তব্য বলতে পার।'

—'মহামান্য সুলতান মেহেরবানি ক'রে আমার বাৎ শুনে গোস্‌সা করবেন না। আমার নওজোয়ান লেড়কা আলাদিন শাহজাদী বুদুর'কে ঘটনাচক্রে চাক্ষুষ করেছে। সুলতানের ভ্রূ কুঁচকে যায়। —'শাহজাদী বুদুর'কে তোমার লেড়কা চাক্ষুষ করেছে? কি কি উপায়ে?'

—'ক'দিন আগে শাহজাদী খানদানী হামামে গোস্‌ল করতে গিয়েছিলেন। সেদিন পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে সে আগেভাগেই হামামে ঢুকেছিল।

সুলতান তেমনি ভ্রূ কুঁচকে উজিরের দিকে তাকিয়ে ব'লে ওঠেন—'আজব ব্যাপার!'

আলাদিন-এর আম্মা ব'লে চলে—'জাঁহাপনা, আমার লেড়কা আলাদিন হামামে শাহজাদীর সুরৎ দেখে মজে যায়। তার দিমাক ঘুরে যায়। সেই থেকে তার কলিজা মহব্বতের আগুনে জ্বলে পুড়ে খাঁক হতে থাকে। বলছে, শাহজাদীকে না পেলে সে জান খতম করে দেবে। আমি বহুভাবে তার দিল্ থেকে শাহজাদীকে মুছে ফেলার কোশিস্ করি। আমি তো জানি, সে আশমানের চাঁদে হাত দিতে চাইছে। লেকিন আমার লেড়কার একই বাৎ, শাহজাদীকে শাদী করবে, নয়তো জান খতম ক'রে দেবে।' এরকম ব্যাপারে কোন আম্মার পক্ষে মুখ বুজে থাকা সম্ভব? আমার শেষ অবলম্বনটুকু খোয়া গেলে আমি কি নিয়ে টিকে থাকব, আপনিই বলুন? তামাম দুনিয়ায় আমার আপন বলতে আর কেউ-ই যে থাকবে না জাঁহাপনা। আমি জরুর জানি, যে শুনবে সে-ই আমাকে

আর আমার লেড়কা আলাদিন'কে—উভয়কেই পাগল বলবে। জাঁহাপনা, সব জেনে, সব বুঝেও আমি এরকম প্রস্তাব রাখতে বাধ্য হচ্ছি, বাল বাচ্চার আব্বা হয়ে আমার অসহায়ত্বের ব্যাপারটি আপনি জরুর অনুমান করতে পারছেন!'

—'পারছি, আলবৎ পারছি। তুমি লেড়কার আম্মা। আর আমি লেড়কির আব্বা। বালবাচ্চার প্রতি মহব্বত আব্বা আর আম্মা উভয়কেই অন্ধা করে দেয়, একদম সাচ্চা বটে। লেকিন একটি ব্যাপার ভেবে দেখ, তোমার-আমার মধ্যে বিস্তর ফারাক। তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ-প্রস্তাব আমি নাকচ করে দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমার লেড়কি পয়দা হওয়ার পর থেকে বিলাস-ব্যসন আর অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন গুজরান করে বেড়ে উঠেছে। আর তোমার লেড়কা? সাধারণ এক দর্জির সংসারে সে পয়দা হয়েছে, বড়ও হয়েছে অভাব-অনটনের মধ্যে। আমাদের মুলুকে, সমাজে আদমির বিচার হয় ধন-দৌলতের মাধ্যমে। চারিত্রিক গুণাবলী নেহাৎই মামুলি ব্যাপার। তাই এ-পরামর্শই তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও, তোমার লেড়কার দিল্ থেকে আকাশ-কুসুম চিন্তা মুছে ফেলার ফিকির কর।'

চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে আলাদিন-এর আম্মা চাদরের তলা থেকে ফলের বাক্সটি বের ক'রে সুলতানের পায়ের সামনে রাখল। ডালা খুলে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার লেড়কা আপনার জন্য নজরানা পাঠিয়েছে, মেহেরবানি ক'রে গ্রহণ করলে আমরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করব।'

বাক্সের ডালাটি খোলামাত্র হীরা জহরতের অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিতে দরবার কক্ষটি একদম ঝলমলিয়ে উঠল।

আচমকা অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিতে সুলতানের চোখ ঝলসে যাওয়ার জোগাড় হওয়ায় তিনি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ব'লে উঠলেন—'একী! এ যে একদম ঝিল্লা দিচ্ছে!'

বৃদ্ধ উজির কাঁপা কাঁপা হাতে বাক্সটি থেকে একটি ফল তুলে নিয়ে সুলতানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, তামাম দুনিয়ায় আপনার সমান জহুরী তো দ্বিতীয় কেউ-ই নেই। একমাত্র আপনার পক্ষেই এর কদর বোঝা সম্ভব। ইয়া আল্লাহ! আমার দিমাকে আসছে না, এমন বস্তু সে পেল কোথায়!'

সুলতান ফলটি হাতে নিয়ে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বল্‌লেন—'সাচ্চা বটে, তামাম দুনিয়ায় কোন সুলতান-বাদশাহের ধনাগারে এ-কিসিমের বস্তু নেই। লেকিন ব্যাপার হচ্ছে, সামান্য এক দর্জির বিবি এ বস্তু কোথায় পেল? আমার কোষাগারে তো এর একটিমাত্র বস্তুর এউচিত দামই নেই।' এবার আলাদিন-এর আম্মার দিকে ফিরে বল্‌লেন—'দর্জির বিবি, সাচ্চা বলবে—এ-বস্তু তুমি পেলে কোথায়?'

আমার লেড়কা ভিন্ দেশে সওদাগরী কারবার করতে গিয়েছিল। কোন না কোন মুলুক থেকে এনে থাকবে, জাঁহাপনা। আপনি মেহেরবানি ক'রে আমার লেড়কার এ সামান্য ভেট গ্রহণ করলে আমার লেড়কা ও আমি উভয়েই ধন্য হ'ব।'

সুলতান এবার বৃদ্ধ উজিরের দিকে সামান্য ঝুঁকে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'উজির, এবার তো আর বুড়িকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। আমার বেটি বুদুর'কে লাভ করার যোগ্য মূল্য একদম সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। তাকে তো আর হতাশ ক'রে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।'

বৃদ্ধ উজির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—'সে কী জাঁহাপনা, আপনি তো অনেক আগেই আমাকে বলে রেখেছিলেন, শাহজাদীর যোগ্য পাত্র না মিল্‌লে আমার লেড়কার সঙ্গে তার শাদী দেবেন। আজ একী আজব—'

—'না, তা তো আমি একদম ভুলে যাই নি। এখনও একই বক্তব্য রাখছি। আমার যোগ্য ইনাম তুমি জোগাড় করতে পারলে তোমার লেড়কার সঙ্গেই আমার পেয়ারের লেড়কি বুদুর-এর শাদী দেব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আমি জরুর এর চেয়েও মূল্যবান রত্নরাজি আপনার হাতে তুলে দেব।'

—'দর্জির বিবি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দর্জির বিবি, তোমার লেড়কা আলাদিন-এর সঙ্গেই আমার আদরের দুলালী বুদুর-এর শাদী দেব। কেবল মাত্র আমার হলফের সত্যতা রক্ষার জন্য উজিরকে তিন মাহিনার সময় দিতেই হচ্ছে। আমি নিঃসন্দেহ, কেবলমাত্র আমার উজিরই নয়, দুনিয়ার কোন সুলতান-বাদশাহের পক্ষেই এসব গ্রহরত্নর চেয়ে মূল্যবান কোন বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। উক্ত তিন মাহিনা অপেক্ষা করার পর তোমার লেড়কা আলাদিন আমার লেড়কিকে বিবি ক'রে মকানে নিয়ে যেতে পারবে।'

সুলতানের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আলাদিন-এর আম্মা নিজের মকানে ফিরে গেল।

আলাদিন আম্মার মুখে পুরো বিবরণ শুনে খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে উঠল। আম্মাকে জড়িয়ে ধরে সোল্লাসে ব'লে উঠল—'আজ তুমি সাচ্চা কামাল ক'রে দিয়ে এসেছ আম্মা! সুলতানকে যে গ্রহরত্নগুলি আমি ভেট দিয়েছি তা তামাম দুনিয়া ঢুঁড়েও কেউ সংগ্রহ করা তো দূরের ব্যাপার হাজার ভাগের এক ভাগও আনতে পারবে না। বুদুর! তাই আমার সাধের বুদুর আমারই বিবি হয়ে আসছে।'

চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ এঁকে আলাদিন-এর আম্মা বল্‌ল—'লেকিন বেটা, উজিরের চোখ-মুখের ভাব আমার নজরে

আচ্ছা ঠেকল না। মালুম হ'ল, ও শয়তানী চাল চালতে পারে। তোকে কোন চক্করে ফেলে দেবে না তো?'

—'ধ্যুৎ! ছাড়ান দাও তো। নক্কড়বাজ উজিরের কি হিম্মৎ আছে যে আমাকে চক্করে ফেলবে? আমার বাৎ মিলিয়ে নিও। তার নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে আমার সাধের বুদুর'কে আমি শাদী ক'রে মকানে নিয়ে আসব। বুদুর আমার, আমারই বিবি হবে।'

আলাদিন-এর আম্মাকে সুলতান তিন মাহিনা সময় দিয়েছেন। ব্যস, তারপরই তার লেড়কা আলাদিন শাহজাদী বুদুর'কে শাদী ক'রে মকানে নিয়ে আসবে। দো মাহিনা এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। আর মাত্র এক মাহিনা বাদেই তার মকান শাদীর খুশীতে ভরে উঠবে।

আলাদিন-এর শাদীর আর মাত্র এক মাহিনা বাকী। হাতে আর সময় কোথায়? এরই মধ্যে শাদীর কেনাকাটা সারতে হবে। দরকারী সামানপত্র গোছগাছ করতে হবে। এমন সময়ে আলাদিন-এর আম্মা বাজারে গেল। উদ্দেশ্য, কিছু সামানপত্র দেখবে, খরিদও করবে কিছু কিছু।

বাজারে এক সাজ পোশাকের দোকানে গিয়ে আলাদিন এর আম্মা একদম তাজ্জব বনে গেল। এক দোকানে ঢুকে কিছু পছন্দ মাফিক সামানপত্র দর করতে গেলে দোকানী বল্‌ল—'বিলকুল সামানপত্রই বিক্রি হয়ে গেছে। আর এক দোকানে গিয়ে একই জবাব পেল। এমনি ক'রে পর পর কয়েকটি দোকানে একই জবাব পেয়ে দোকানীকে সবিস্ময়ে বল্‌ল—'ভাইয়া, কি ব্যাপার বলুন তো? যে দোকানে গিয়ে সামানপত্রে হাত দিচ্ছি সবাই একই জবাব দিচ্ছে, বিক্রি হয়ে গেছে, তাজ্জব ব্যাপার তো!'

দোকানী একগাল হেসে জবাব দিল—'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ বটে। আমার দোকানে এই যে হরেক কিসিমের সাজ পোশাক দেখছ, বিলকুল বিক্রি হয়ে গেছে। কে খরিদ করেছেন, জান?'

আলাদিন-এর আম্মা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে জবাব দিল—'কি ক'রে জানব ভাইয়া, কে খরিদ করেছেন।'

—'উজির সাহাব। আজ তার বেটার শাদী। তামাম সুলতানিয়তের আদমি জানে আর তুমি কিছুই জান না। নাকে তেল দিয়ে নিদ যাচ্ছিলে নাকি?'

আলাদিন-এর আম্মার শিরে আশমান ভেঙে পড়ার জোগাড় হ'ল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মকানে ফিরল। লেড়কাকে তলব করে বল্‌ল—'বেটা, এ যে সর্বনাশ হতে চলেছে। শাহজাদী বুদুর-এর নাকি আজ শাদী হচ্ছে! বাজারে হৈ হল্লা পড়ে গেছে।'

আলাদিন ভ্রূ কুঁচকে বল্‌ল—'শাদী! কার সঙ্গে শাহজাদীর শাদী হচ্ছে, শুনেছ কিছু?'

—'কার সঙ্গে আবার, শয়তান নক্কড়বাজ বুড্ডা উজিরের লেড়কার সঙ্গে। তামাম সুলতানিয়তের আদমীরা জানে, জানি না কেবল আমরাই।'

আলাদিন হাত মুঠা ক'রে গর্জে ওঠে—'বেইমান কাঁহিকার! তার আম্মা ততোধিক গর্জাতে শুরু ক'রে—'বেইমানের বাচ্চা বেইমান! আমাকে সাফ বাৎ জানিয়ে দিলেন—নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার লেড়কা আলাদিন-এর সঙ্গেই শাহজাদীর শাদী হবে। আর আজ বেইমানী ক'রে—'

আলাদিন তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'আম্মা দিমাক গরম করলে বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। বেইমানের সঙ্গে মোকাবেলা কি করে করতে হয় সে-কায়দা আমার জানা আছে আর সে-হিম্মৎও আমার আছে। শয়তান নক্কড়বাজ উজির খোয়াব দেখছে, শাহজাদীকে বেটার বিবি ক'রে মকানে নিয়ে যাবে। তার সে-খোয়াব আদতে খোয়াবই থেকে যাবে।

আলাদিন-এর আম্মা সুলতানের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে রসুইখানায় খানা পাকাতে চলে গেল। এ-মওকায় আলাদিন চিরাগবাতিটি বের করল। তার গায়ে দো ঘষা দিতেই অতিকায় ভয়াল দর্শন আফ্রিদি দৈত্যটি সামনে হাজির হ'ল। আলাদিন'কে কুর্নিশ ক'রে গম্ভীর স্বরে বল্‌ল—'হুজুর গোলামের গোলাম হাজির। ফরমাশ করুন, কি করতে হবে? আমি বেহেস্ত, দুনিয়া আর পাতালের মালিক। চিরাগই আমার একমাত্র উপাস্য। আপনি চিরাগের জিম্মাদার, তাই আমি আপনার গোলামের গোলাম। আপনার হুকুম তামিল করতে আমি তৈরী। বলুন, আমাকে কি করতে হবে?'

—'শোন, এক জটিল ব্যাপারের ফয়সালা করার জন্য তোমাকে তলব করেছি। সুলতান আমার কাছ থেকে অমূল্য সব গ্রহরত্ন ইনাম স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁর লেড়কি শাহজাদীকে আমার সঙ্গে শাদী দেবেন। তিন মাহিনা বাদে আমাদের শাদী হবে শর্ত ছিল। লেকিন দো মাহিনা হতে না হতেই সুলতান নাকি তার হলফের ব্যাপারটি ভুলে গিয়ে তার লেড়কিকে উজিরের লেড়কার সঙ্গে শাদী দিচ্ছেন। আর সে-শাদী আজই হতে চলেছে। আমার বুদুর'কে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কেউ ভোগ করবে এ কিছুতেই আমি বরদাস্ত করব না। যে কোন ফন্দি ফিকির ক'রে এ-শাদী বন্ধ করতে হবে। আর তার বন্দোবস্ত করতে হবে তোমাকেই।'

—'আপনি হুকুম করুন মালিক, গোলাম তা তামিল করবেই করবে।'

—'শোন, আজ সন্ধ্যায় শাহজাদী বুদুর'কে উজিরের বেটার কামরায় ঢুকিয়ে দিলে। তুমি তাদের চোখে নিদ জোগাবে। নিদে যেন উভয়েই বিলকুল বেহুঁশ হয়ে পড়ে। ইয়াদ রাখবে, উজিরের লেড়কা যেন শাহজাদীকে স্পর্শ না ক'রে। তারা নিদে বিভোর হয়ে পড়লে তাদের দু'জনকেই আমার সামনে হাজির করবে।'

আফ্রিদি দৈত্য কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'আমি এক্ষণি হুজুরের হুকুম তামিল করছি!'

এদিকে আলাদিন-এর আম্মা সেদিন দরবার ছেড়ে চলে এলে সুলতান উজিরকে বল্‌লেন—'আলাদিন শাদীর যৌতুক হিসাবে যা দিয়ে গেছে তার দাম অর্থের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই শাহজাদীকে আলাদিন-এর সঙ্গে শাদী না দিয়ে গত্যন্তর নেই।

—'লেকিন জাঁহাপনা, উপঢৌকন দিয়েই কি শাহজাদীর শাদীর বিচারের সার্বিক মাপকাঠি হওয়া উচিত, আপনিই বলুন? লেড়কা উপযুক্ত কিনা, তার মকান, বংশ মর্যাদার দিকটিও অবশ্যই বিচার্য।'

—'আরে তিন মাহিনা সময় কি এমনিতেই দিয়ে রেখেছি নাকি! আলাদিন-এর সম্বন্ধে বিলকুল পাত্তা তোমাকেই লাগাতে হবে। আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও।'

ক'দিন বাদে এক সকালে উজির সুলতানকে জানাল, আলাদিন পরদেশে ঢুড়ে বেড়াচ্ছে। সওদাগরী কাজের তাগিদে আরও এক মাহিনা সে মুলুকের বাইরে থাকবে।

এক মাহিনা বাদে একদিন উজির সুলতানকে জানাল, ভারত সাগরের বুকে আলাদিন-এর জাহাজ ডুবে গেছে। আলাদিন সে-জাহাজ ডুবীতে খতম হয়ে গেছে।

—'খোদা মেহেরবান, খোদাতাল্লার দোয়ায় শাহজাদী জব্বর বাঁচা বেচে গেছে। শাদী চুকে গেলে সর্বনেশে কাণ্ড ঘটে যেত, কি বল উজির?' মুহূর্তকাল পরে কি ভেবে ফিন বল্‌লেন—'না, উজির, তুমি বরং আরও ভাল ক'রে পাত্তা লাগাও। খোদাতাল্লার দোয়ায় তার জান বেঁচে যেতেও তো পারে।'

—'যে আদমি জাহাজডুবী ও আলাদিন-এর ইন্তেকালের খবর দিয়েছে, সে সাচ্চা আদমি। তার খবর জরুর নির্ভরযোগ্য তবু আপনার যখন দ্বিধা রয়েছে তবু আমি আলবৎ পাত্তা লাগাব।'

ক'দিন বাদে উজির বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার পাঠানো দূতরা ফিরে এসে জানিয়েছে জাহাজের একটিমাত্র আদমি ছাড়া আর সবারই ইন্তেকাল হয়ে গেছে। যে-আদমি জিন্দা আছে সে-ই আমাকে সবার আগে জাহাজডুবীর খবর দিয়েছিল। অতএব আলাদিন-এর ইন্তেকালের ব্যাপারে আর কিছুমাত্র দ্বিধা থাকতে পারে না।'

—'নসীব! সবই নসীবের ব্যাপার। কেউ-ই নসীবকে খণ্ডন করতে পারে না। আর দেরী করা ঠিক হবে না। তবে শাহজাদীর শাদীর বন্দোবস্ত করা দরকার।'

উজির হাত কচলে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আপনি তো আমার লেড়কার সঙ্গে শাহজাদীর শাদীর ব্যাপারে বিবেচনা করেছিলেন। যদি অনুমতি হয়—'

—'হ্যাঁ, তা-ই কর। যত শীঘ্র সম্ভব শাদীর বন্দোবস্ত করে ফেল।' এভাবেই শাহজাদীর শাদীর বন্দোবস্ত হ'ল। উজির বাজারের দোকানে দোকানে কড়া হুকুম দিয়ে দিল, বাজারের সেরা কোন জিনিসই বেচা চলবে না। সব তার লেড়কার শাদী উপলক্ষে চাই।

এদিকে আলাদিন তার আম্মার কাছে তার মতলবের ব্যাপারে কিছুই বল্‌ল না।

আফ্রিদি দৈত্য কুর্নিশ সেরে আলাদিন-এর হুকুম তামিল করতে চলে গেলে সে কামরায় বসে তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সুলতানের প্রাসাদে শাদীর রোশনাই চলেছে। কাজী এসে শাদীর কবুলনামা তৈরী করল। সাক্ষীরা শাদীর কবুলনামায় স্বাক্ষর করল। শাদীর পাট চুকে গেল।

খানাপিনা মিটে গেলে নিমন্ত্রিত আদমি ও মেহমানরা এক এক ক'রে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ মকানে যেতে লাগল।

এদিকে উজিরের লেড়কার সঙ্গে এক কামরায়, এক পালঙ্কে শোয়াবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী উভয়েই বিবস্ত্র হয়ে এক পালঙ্কে শুয়ে রাত্রি কাটাবে। হারেমের বাঁদীরা শাহজাদীকে বিবস্ত্র ক'রে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। উজিরের লেড়কা অনেক আগেই উলঙ্গ হয়ে শাহজাদীর জন্য অপেক্ষা ক'রে চলেছে। বিবিকে কাছে পেয়েই সে

উন্মাদের মাফিক তাকে হাত বাড়িয়ে জাপ্টে ধরার কোশিস্ করল। ঠিক সে-মুহূর্তেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটে গেল। একদম আজব ব্যাপার। পালঙ্কটি কামরার মেঝে ছেড়ে শূন্যে উঠে যেতে লাগল। ব্যস, উভয়েই আতঙ্কে একদম আড়ষ্ট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা সংজ্ঞা হারিয়ে পালঙ্কের ওপর এলিয়ে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আফ্রিদি দৈত্য পালঙ্ক সমেত শাহজাদী ও উজিরের লেড়কাকে আলাদিন-এর হাতে জিম্মা দিল। দৈত্য এবার করজোড়ে নিবেদন করল—'হুজুর, এবার আমার ওপর কি হুকুম বলুন? বান্দা তৈরী।'

—'ছোট্ট একটি কাজ—এ-শয়তানের বাচ্চাটিকে পায়খানার গামলার মধ্যে ফেলে দিয়ে এস।'

আফ্রিদি দৈত্য—'কুর্নিশ সেরে উজিরের লেড়কাকে নিয়ে পায়খানার গামলার মধ্যে ধপাস ক'রে ছেড়ে দিয়ে এল।

আলাদিন বল্‌ল—'এখন তুমি বিদায় হও। সকালে দরকার হলে ফিন তলব করব, চলে এসো।'

আফ্রিদি দৈত্য এবার আলাদিন'কে কুর্নিশ সেরে বিদায় নিল। এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' তিপান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার অন্দর মহলে বেগম শাহরাজাদ-এর কামরায় এলেন। বেগম কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আলাদিন এবার শাহজাদী বুদুর-এর বিবস্ত্র দেহটির দিকে নজর দিল। তার চোখে-মুখে আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ। খড়িমাটির মাফিক ফ্যাকাশে বিবর্ণ তার মুখাবয়ব। সে বল্‌ল—'শাহজাদী, আমার বাৎ শোন, তুমি শঙ্কামুক্ত হও। আমার কাছ থেকে তোমার কিছুমাত্রও ভয় ডরের কারণ নেই, তোমার কোন অনিষ্টই আমার দ্বারা হবে না। কসম্ খাচ্ছি। তোমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করব না। তোমার কোনই অসম্মান করব না, আমার ওপরে ভরসা রাখতে পার। বিশোয়াস কর, ওই জানোয়ারটির কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যই আমাকে এ কাজ, তোমাকে এখানে নিয়ে আসতেই হ'ল। উজিরের লেড়কা জেনানাদের খুবলে খাবলে খাওয়া ছাড়া কিছুই জানে না। দিমাকে বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। তোমার আব্বা যে কেন আমার সঙ্গে তোমার শাদী দিতে কসম্ খেয়েও এমন একটি বে-আক্কেলে কাজ করে বসলেন আমার দিমাকে আসছে না। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট তো হবেই না বরং আমার জান থাকতে কোন শয়তান বেতমিস তোমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। তোমার আব্বা বাক্‌দান করেছেন। আমার বাগ্‌দত্তা তুমি। আইন মাফিক তোমাকে শাদী ক'রে বিবি ক'রে নেয়ার অধিকার একমাত্র আমারই আছে। আর আমি তা করবও। তবে, নিয়ম মাফিক শাদী করার আগে আমি তোমাকে স্পর্শও করব না, নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

ইতিমধ্যে যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে, তার আব্বার সঙ্গে আলাদিন-এর বাৎচিৎ চুকে গেছে সেসব কিছুই বুদুরের জানা নেই। তাই ডুকরে ডুকরে কেঁদে চোখের পানি ঝরানো ছাড়া তার কিছুই করার থাকল না। আলাদিন-এর বক্তব্যের কি-ই বা জবাব সে
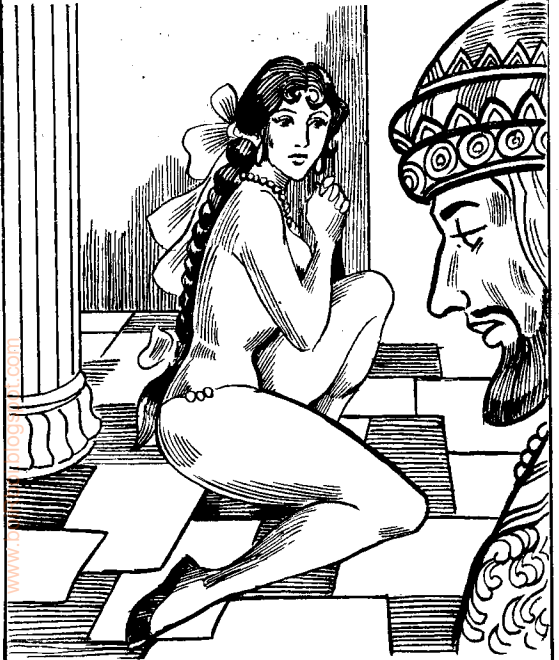
দেবে?

বিবস্ত্রা শাহজাদীর দিকে একটি আলোয়ান ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌ল—'এটি দিয়ে শরম্ ঢেকে নাও, আর আমি একটি পেটরা পালঙ্কের মাঝখানে রেখে আমাদের উভয়ের মাঝে ফারাক সৃষ্টি ক'রে নিচ্ছি। ওধারে তুমি শোবে আর এধারে শোব আমি। আমার দ্বারা তোমার কোনই ক্ষতি হবে না, নিশ্চিন্ত হতে পার। নাও আলোয়ানটি গায়ে চাপিয়ে নির্ভয়ে নিদ যাও।'

শাহজাদী উজিরের লেড়কার জন্য এতটুকুও ভাবিত নয়। শাদীর সময় তার কদাকার মুখটি দেখার পর তার যে গা ঘুলাতে শুরু করেছিল এখনও তা কাটেনি। সে অস্থিরতাটুকুই রাতভর কাটিয়ে উঠতে পারল না। এমন কুৎসিৎ কদাকার এক পুরুষকে নিয়ে জিন্দেগী কাটানোর চেয়ে কবরে গিয়ে আশ্রয় নেয়া বহুৎ শান্তির, ঢের স্বস্তির ব্যাপার। ভোর হ'ল। শাহজাদী বিনিদ্র রাত্রি

কাটিয়ে, আলোয়ান দিয়ে শরম ঢেকে পালঙ্কের ওপর জবুথবু হয়ে বসে রইল। তার চোখে-মুখে বিষাদের ছাপ।

ভোর হতে না হতেই আলাদিন-এর হুকুম অনুযায়ী আফ্রিদি দৈত্য আলাদিন-এর সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—'হুজুর, ফরমাশ দিন আমাকে কি করতে হবে।' ব্যাপার বুঝতে না পেরে শাহজাদী ঝট্ করে পালঙ্কের একধারে সরে গিয়ে আতঙ্কে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে আফ্রিদি দৈত্যকে দেখতে পাচ্ছে না, কেবল তার হুঙ্কার শুনেই কলিজা ফেঁসে যাওয়ার জোগাড়। আলাদিন কিন্তু তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সে পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে আফ্রিদিকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল।

আফ্রিদি এবার পায়খানার গামলা থেকে মল মাখামাখি অবস্থায় উজিরের লেড়কাকে এনে ধপাস্ ক'রে পালঙ্কের ওপর ফেল্‌ল। পালঙ্কটি ফিন শূন্যে উঠল। শাহজাদী ও উজিরের লেড়কা সমেত পালঙ্কটিকে আফ্রিদি দৈত্য সুলতানের প্রাসাদের সেই কামরাটিতে রেখে ফিরে এল।

একটু বেলা হলে বেগম সাহেবা লেড়কি বুদুর-এর কামরায় এসেই থমকে যান। ভ্রূ-কুঁচকে লেড়কির দিকে তাকান। দেখেন, তার লেড়কি হরদম চোখের পানি ঝরিয়ে চলেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে জোর ক'রে হাসি ফুটিয়ে বল্‌ল—'চোখ মোছ বেটি, শাদীর প্রথম রাতে অনেকেরই এরকম ভয় ডর হয়। ও কিছু না। কলিজা শক্ত কর। দেখবে দো দিন বাদে বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে।' এবার কাছে এগিয়ে গিয়ে লেড়কির কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌লেন—'বেটি, ব্যথা-বেদনা লাগছিল?

একদম প্রথম তো, ব্যথা বেদনা একটু লাগেই। খুন বহু ঝরেছে কি? ব্যস, এ পর্যন্তই। এবার দেখবি, সামাল দিতে পেরেছিস, বিলকুল ঠিক ঠাক চলবে। ডরের যা কিছু ব্যাপার কেটে গেছে।'

শাহজাদী বুদুর চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'না, আম্মা, ওসব ব্যাপার স্যাপার কিছুই হয় নি। একদম আলাদা এক কারণে আমি চোখের পানি ঝরাচ্ছি। আতঙ্কে আমার কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

—'আলাদা কারণ! তবে কি তোর স্বামী তোর সঙ্গে আচ্ছা ব্যাভার, কাম কাজ ঠিকঠাক করে নি? কিছু করার হিম্মত কি তার—'।

বুদুর এবার শির নিচু ক'রে মুখে কলুপ এঁটে বসে রইল। উজিরের বেটার মুখেও কোন বাৎ নেই। তার দৃষ্টি কামরার মেঝের দিকে। বিষণ্ণ তার মুখ। সে সবে হামাম থেকে ময়লা ধুয়ে সাফ সুতরা করে কামরায় ফিরে এসেছে। যে শরমের ব্যাপার ঘটে গেছে তা-তো আর মুখ ফুটে কারো কাছে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শাহজাদী বুদুরও ভাবছে, রাতভর যে বীভৎস অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছে তা তার আম্মার কাছে কি ক'রে ফাঁস করবে! সে-অবিশ্বাস্য ব্যাপার স্যাপার বিশ্বাস করবেই বা কে! অনন্যোপায় হয়ে সে হাঁটুতে শির ঠেকিয়ে নীরবে চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

বেগম সাহেবার মধ্যে এবার অস্থিরতা ভর করল। এবার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বল্‌লেন—'বেটি, তোকে আগেই বল্‌লাম শাদীর প্রথম রাতে একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়ই। ভয় ডর লাগতেই পারে। দু'রাত্রি বাদে বিলকুল ঠিকঠাক হয়ে যাবে, সামাল দিতে পারবি। বেটি, এখন যার জন্য ভয় ডর, দেখবি দু'দিন বাদে তাকেই কাছ ছাড়া করতে তোর কলিজা ফেঁটে যাবে। কান্না বন্ধ কর, চোখের পানি মুছে এবার সাচ্চা করে বল তো, তোর স্বামী রাতভর তোর সঙ্গে কেমন ব্যাভার করেছে, কি কি কাম কাজ করেছে?'

শাহজাদী বুদুর তবু হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে ঝিম্ মেরে বসে চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

বেগম সাহেবা গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে করতে কামরা ছেড়ে যেতে যেতে বল্‌লেন—'এমন হাঁদা গোবা লেড়কি বাপের জন্মেও দেখিনি। আমি আরও ছুটে এলাম তার খোঁজখবর নিতে আর সে কিনা কেবল চোখের পানি ঝরিয়েই চলেছে। একদম মুখ খুল্‌ল না, আজব লেড়কি বটে।'

লেড়কির ব্যাপারে সুলতান ও বেগম সাহেবা উভয়েই ভেবে অস্থির। বেগম ধৈর্য ধরতে না পেরে ফিন লেড়কির কামরায় না এসে পারলেন না। তিনি কামরায় ঢুকে লেড়কির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলতে লাগলেন—'তোর চোখের পানি দেখে তোর আব্বা আর আমি উভয়েই একদম ঘাবড়ে গিয়েছি। আর মুখ বুজে থাকিস না। বল, তোর কি হয়েছে। কাল রাত্রি তোদের কিভাবে কেটেছে, খোলসা ক'রে আমাকে বল তো শুনি।'

শাহজাদী বুদুর ভাবল ; অন্ততঃ আব্বা আর আম্মার স্বস্তির জন্য মুখ খোলা দরকার। সে চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'আম্মা, শরম, চরমতম শরম আমার মুখ চেপে ধরছে। কাল রাত্রে যা কিছু ঘটেছে বিলকুল অবিশ্বাস্য—অলৌকিক ঘটনা। সে সঙ্গে পুরোপুরি শরমের ব্যাপারও বটে। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে কি ক'রে তোমাদের কাছে সে সব ঘটনা নিজে মুখে প্রকাশ করব তা ভেবেই আমাকে নীরবতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। আশাকরি তোমরা আমার অসহায় হালতের দিকটি বিবেচনা ক'রে মাফ করে দেবে। মোদ্দা বাৎ গতরাত্রে যা ঘটেছে তা আমার নিজের দিমাকেই আসছে না।'

শাহজাদী এবার শরম জলাঞ্জলি দিয়ে গতরাত্রে যা যা ঘটেছে আব্বা ও আম্মার কাছে অবিকল তার বিবরণ দিল। সব শেষে বল্‌ল—'আলাদিন-এর চরিত্র একদম নিষ্কলঙ্ক, সাচ্চা বটে। রাতভর

আমি তার কাছে কাটালাম, লেকিন সে ভুলেও আমাকে স্পর্শ করে নি! ব্যাপারটি আমার কাছে একদম আজব ঠেকল। এক নওজোয়ান এক লেড়কিকে নিজের পালঙ্কে পেয়েও নিজেকে সামলে সুমলে রাখতে পারল, ভাবা যায়!'

চোখের তারার আতঙ্কের ছাপটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই শাহজাদী বুদুর এবার বল্‌ল—'আম্মা, এখনও আমার দিমাকে আসছে না কোন্ অলৌকিক শক্তি পালঙ্ক সমেত আমাদের উড়িয়ে নিয়ে আলাদিন-এর কামরায় রেখেছিল! আজ খুব ভোরে ফিন আমার এ-কামরায় পৌঁছে দিয়ে গেল।'

বেগম ও সুলতান এবার বুঝতে পারলেন লেড়কির চোখে-মুখে কেন আতঙ্কের ছাপ। কেন সে এতক্ষণ মুখে কলুপ এঁটে ব্যাজার মুখে বসেছিল। তারা নিশ্চিত হলেন শাদীর প্রথম রাতের আতঙ্ক নিয়ে লেড়কি নিদ গিয়েছিল। তাই এমন আজব খোয়াব দেখে তার কলিজা বিলকুল চিপসে গেছে।' তার আম্মা মুখে আঙুল দিয়ে লেড়কিকে সতর্ক ক'রে দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'বেটি এ শরমের ব্যাপারই বটে। আমাদের কাছে বলেছিস, ক্ষতি নেই। লেকিন ভুলেও যেন অন্য কারো কাছে ফাঁস করিস নে, ইয়াদ থাকে যেন। ঝুটমুট কেন ওসব ভেবে সারা হচ্ছিস? দিল্ থেকে ওসব মুছে ফেলে একদম সাফ সুতরা হয়ে যা। তোর শাদীতে পরদেশ থেকে কত বড়া বড়া আদমি আসবে। তামাম সুলতানিয়ৎ জুড়ে খুশীর জোয়ার বইছে। আর তুই কিনা এক বাজে ধান্দা নিয়ে মেতে রয়েছিস! খবরদার তোর খোয়াবের ব্যাপার স্যাপার কেউ যেন জানতে না পারে। মুখে কলুপ এঁটে রাখবি। নইলে তামাম দুনিয়া জুড়ে একদম ঢি ঢি পড়ে যাবে।

উজিরের লেড়কা হামাম থেকে ফিরে এলে সুলতান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বেটা, শাদীর রাত্রি কেমন কাটালে তোমরা?'

হাঁদাভোঁদার মাফিক হেসে সে জবাব দিল—'কেন, আপনার লেড়কি আমার নামে যা-তা বলেছে বুঝি?'

—'আরে না না, যা-তা বলবে কেন বেটা? তবে তার ভাবসাব দেখে মালুম হচ্ছে, দশজনের শাদীতে যেমন হয়ে থাকে তোমাদের হুবহু তেমন কিছু হয় নি।' এবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্‌লেন—'বেটা সাচ্চা বলবে। আমার লেড়কি কি তোমার কদর্য চেহারা দেখে ঘৃণায় পাশ ফিরেছিল?'

—'ছিঃ ছিঃ! এমন বলছেন কেন! তার মধ্যে তো তেমন কিছুই লক্ষিত হয় নি। অবশ্য দশজনের শাদীতে যা হয় আমাদেরও তাই হয়েছে, হেরফের কিছুই তো হয়নি।'

উজিরের লেড়কার মন্তব্য শুনে সুলতান বা বেগম সাহেবা কারো আর দ্বিধা রইল না যে, তাদের লেড়কি খারাপ কোন খোয়াবই দেখেছে।'

সুলতান বিষণ্ণমুখে বেগম সাহেবাকে নিয়ে কামরা ছেড়ে চলে গেলেন।

এদিকে আলাদিন খানাপিনা সেরে নিজের কামরায় এল। দরওয়াজা ভাল ক'রে বন্ধ করল। এবার চিরাগবাতিটি বের করে দু'বার ঘষতেই আফ্রিদি দৈত্য হাজির হয়ে করজোড়ে তার সামনে দাঁড়াল। আলাদিন তার উদ্দেশে বলল—'শাহজাদী আর তার স্বামী পালঙ্কে শোয়া মাত্র তাকে আমার সামনে হাজির করবে।'

ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে আফ্রিদি দৈত্য হাফিস হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই তাদের আলাদিন-এর কামরায় হাজির করল। এবার উজিরের লেড়কাকে নিয়ে গিয়ে পায়খানার গামলায় ধপাস্ ক'রে ফেলে দিল।

আলাদিন আগের রাতের মাফিক রাতভর শাহজাদীকে বহুভাবে প্রবোধ দিল। এ-ও বল্‌ল—'শোন, তোমার ইজ্জৎ রক্ষার ব্যাপারে আমার ওপর ভরসা রাখতে পার। আমি আজও তোমাকে স্পর্শ করব না। নিশ্চিন্তে নিদ যাও।'

ভোর হতে না হতেই আফ্রিদি দৈত্য আবির্ভূত হয়ে পালঙ্ক সমেত শাহজাদী আর উজিরের লেড়কাকে সুলতানের মকানের সে-কামরায় গোপনে রেখে দিয়ে এল।

একটু বেলা হলে সুলতান গুটি গুটি শাহজাদীর কামরায় এলেন। বেগম আসতে চেয়েছিলেন। তিনিই থামিয়ে দিয়েছেন। তিনি অল্পেতেই দিমাক গরম ক'রে ফেলেন।

সুলতানের জুতার আওয়াজ পেয়েই উজিরের লেড়কা পিছন দরওয়াজা দিয়ে টুক্ ক'রে হামামে ছুটল।

সুলতান লেড়কির কপালে চুম্বনের মাধ্যমে আদর সোহাগ ক'রে বল্‌লেন—'বেটি, গতরাতে জরুর খারাপ কোন খোয়াব টোয়াব দেখেছিস কি? কি বলিস? বিশেষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু থাকলে ঝেড়েমুছে ফেলে দিল্‌কে সাফা ক'রে ফেল। আরে, গত রাত্রি তোরা কেমন কাটালি, খোলসা ক'রে বল তো।'

শাহজাদী তার আব্বার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে না পেরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। হাঁটু থেকে মুখ একদম তুলতেই পারল না।

লেড়কির ব্যাপার দেখে সুলতান গোস্‌সায় একদম ফেটে পড়ার জোগাড় হলে। শরীরের বিলকুল খুন মুখে গিয়ে যেন জমা হয়েছে। দিমাক ঠাণ্ডা রাখতে না পেরে গর্জে উঠলেন—'বেটি, এখনও বলছি। আদৎ ব্যাপার কি, খোলসা ক'রে আমাকে বল। তা নইলে আমি তোকে একদম খতম ক'রে দেব, ইয়াদ রাখবি! দরকার হলে গর্দান নিতেও দ্বিধা করব না।'

আব্বার তর্জন গর্জনে শাহজাদী বুদুর-এর কলিজা শুকিয়ে গেল। কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল—'আব্বাজী আমার ওপর গোস্‌সা

আর ধারে-কাছে নেই। আমাকে দিয়ে তোর কোন ভয় ডর নেই, খোলসা ক'রে আমাকে বল তো ব্যাপার কি।'

শাহজাদী বুদুর চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে পর পর দু' রাত্রি যা কিছু ঘটেছে বিলকুল খোলসা ক'রে তাঁর কাছে ব্যক্ত করল।

সুলতান বল্‌লেন—'একী তাজ্জব কাণ্ড? অবিশ্বাস্য! এ যে বিলকুল অবিশ্বাস্য কাণ্ড!'

—'আমার মুখের বাৎ যদি সাচ্চা বলে মানতে না পার তবে উজিরের লেড়কাকে পুছতাছ কর, দ্বিধা দূর হবে।'

সুলতান কপাল চাপড়ে ব'লে উঠলেন—'বেটি, গলতি তোর নয়, আমার। হ্যাঁ, সাচ্চা বটে, বিলকুল গলতি করেছি আমি-ই। এমনই এক আহাম্মকের হাতে তোকে তুলে দিয়েছি যার নিজের বিবিকে রক্ষা করার হিম্মৎ নেই। তোকে এমন এক পাত্রের হাতে তুলে দেব ভেবেছিলাম যে তোকে সবদিক থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম। নসীব খারাপ। তাই ইন্তেকালের ডর তোকে গ্রাস করেছে। ইয়া খোদা! একটি লেড়কির পক্ষে এর চেয়ে আপশোষের আর কি থাকতে পারে?' বার কয়েক অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি ক'রে এবার তিনি বল্‌লেন—'শোন বেটি, আমি তোর আব্বা। হতচ্ছাড়া উজিরকে তলব দিচ্ছি। সাফ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করব, কেন তার বেটা এমন ক'রে আমার লেড়কির জিন্দেগী বরবাদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। উজির বা তার বেটা কাউকে ছেড়ে দেব না, জানবি। ভবিষ্যতে যাতে এ-ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার বন্দোবস্ত আমাকে জরুর করতে হবে। মজা টের পাইয়ে ছাড়ব।'

গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে করতে সুলতান দরবারে হাজির হলেন। সুলতানের জরুরী তলব পেয়ে উজির হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সুলতানকে কুর্ণিশ ক'রে আতঙ্কিত মুখে তাকিয়ে রইলেন।

সুলতান জখম হওয়া শেরের মাফিক গর্জে উঠলেন—'তোমার বুরবক লেড়কাটি কোথায়? গত দু' রাত্রে যা কিছু ঘটেছে, শুনেছ কিছু?'

—'জাঁহাপনা, আপনার ইঙ্গিত আমি একদম ধরতে পারছি না। আমার লেড়কা তো আমাকে আচ্ছা-বুড়া কিছুই বলে নি। আপনার হুকুম হলে আমি তাকে তলব ক'রে পুছতাছ করব।'

উজির লেড়কাকে হামাম থেকে বেরোতে দেখেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন—'শয়তান কাঁহিকার। শুয়ার কা বাচ্চা, সাচ্চা বলছি—কি হয়েছে বল? গত দু' রাত্রে কি করেছিস, খোলসা ক'রে আমার কাছে বল। কিছু ঘটেই যদি থাকে তবে আমার নজরে আনিস নি কেন হারামী কী বাচ্চা! ছাল খিঁচে নেব, বলে দিচ্ছি। এখনও সময় আছে, খোলসা করে বল!'

—'আব্বাজী, আমি তোমার কাছে বলতে গিয়েও মুখ ফুটে

কোরো না। মালুম নেই, কেন যে আজ রাতেও একই কারবার ঘটল! আম্মার কানে গেলে আমাকে একদম খতম ক'রে দেবেন। আব্বাজান তুমি তো আমার হালৎ, আমার অসহায়ত্ব কিছুটা অন্ততঃ বিবেচনা করতে পারবে। কী ঝকমারিতে যে পড়া গেল আমার দিমাকে আসছে না। খোদাতাল্লার কাছে কী কসুর যে আমি করেছি কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। তিনি যে কেন আমাকে এমন চক্করে ফেলেছেন, তিনিই জানেন। আমার ইন্তেকালও যদি হ'ত তবুও ঢের সুখের ছিল!'

সুলতান সচকিত হয়ে ব'লে উঠলেন—'বেটি!'

—'হ্যাঁ, আব্বাজান তোমাকে সাফ সাফ বাতাচ্ছি, আজ রাতেও যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে আমি জান একদম খতম ক'রে দেব।'

লেড়কির মুখের বাৎ শুনে সুলতানের কলিজা ছটফট করতে থাকে। তার দিল্ একদম নরম হয়ে গেল। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে এবার বল্‌লেন—'বেটি, ঘটনা? কোন্ ঘটনা? কেমন ঘটনার মুখোমুখি তোকে হতে হয়েছে আমাকে খোলসা ক'রে বল। তোর আম্মা তো

বলতে পারি নি। শরম, হ্যাঁ, শরম বার বার আমার গলা টিপে ধরেছে।'

—'শরম? কেন? শরম কেন? খোলসা ক'রে বল, ব্যাপার কি?'

উজিরের লেড়কা এবার বার-কয়েক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে তার আব্বার কাছে গত দু' রাতের ঘটনা সবিস্তারে ব্যক্ত করল।

লেড়কার মুখে ব্যাপারটি শুনে তাঁর মুখে বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এল। আহাম্মক কাঁহিকার। এ কথা বলার আগে তোর ইন্তেকাল হয়নি কেন? নদীতে কি পানি ছিল না? পানিতে ডুবে জান খতম করতে পারিস নি বুরবক কাঁহিকার।'

—'আব্বাজী, ঠিক বাৎ-ই বটে। এর চেয়ে আমার ইন্তেকাল হয়ে গেলে ঢের আচ্ছা হ'ত। আমার বাৎ শোন, ও লেড়কিকে নিয়ে ঘর করার চেয়ে তালাক দেয়াই শ্রেয়। আমি ওকে তালাক দিয়ে খালাস হতে চাই। তুমি সুলতানকে বল আজই যেন আমাদের শাদিনামা বাতিল করার বন্দোবস্ত ক'রে দেন। খুবসুরৎ বিবি, সুলতানিয়ৎ আর ধন দৌলতের মোহ আমার দিল্ থেকে বিলকুল উবে গেছে। পায়খানার গামলায় পড়ে হাবুডুবু খাওয়া—ইয়া খোদা! সে কী দুঃসহ যন্ত্রণা তোমাকে ব'লে বুঝাতে পারব না!'

লেড়কার বাৎ শুনে উজির একদম ভেঙে পড়লেন। তার লোভ ছিল, বেটা একদিন তখ্‌তে বসবে, তামাম সুলতানিয়তের মালিক বনবে আর নিজে হবেন সুলতানের আব্বা। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষায় মুহূর্তে ছাই দিতে চায় আহাম্মক লেড়কা!'

উজির লেড়কার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে এবার বল্‌লেন—'বেটা, আমার মালুম হচ্ছে, তোকে যারপরনাই তকলিফ বরদাস্ত করতে হচ্ছে। লেকিন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে, পিছিয়ে গেলে বহুত লোকসানের বোঝা তোকে বইতে হবে। তার চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আর একটি রাত দেখ, কি হয়। আমি কামরার বাইরে পাহারাদার নিয়োগ করব। রাতভর অস্ত্রহাতে টহল দেবে।'

—'আব্বাজী, পাহারাদার যতই বন্দোবস্ত করুন না কেন আমি আর শাহজাদীর কামরায় মাথা গলাচ্ছি না। আর ভাবলে আমার গায়ের কাঁটা এখনও খাড়া হয়ে যাচ্ছে।'

উজির দেখলেন, পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল নয়। অনন্যোপায় হয়ে মুখ ব্যাজার ক'রে সুলতানের কাছে ফিরে গেলেন। সুলতানকে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদীর বক্তব্য বিলকুল সাচ্চা। তবে তার জন্য আমার লেড়কার তিলমাত্রও কসুর নেই, ব্যাপারটির ফয়সালা করার জন্য আমার লেড়কা তাকে তালাক দেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আদতে শাহজাদীকে উদ্ভূত আতঙ্ক থেকে রেহাই দিতেই সে এ-পথ বেছে নিতে চাইছে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! আমার ভাবনাও বিলকুল তাই। এ শাদী সুখদায়ক হবে না, হতে পারে না। সবদিক বিবেচনা করে তালাকের পথই বেছে নেয়া নিরাপদ। ফয়সালা হয়ে গেল। তামাম সুলতানিয়তে ঢেড়া পিটিয়ে প্রচার করে দাও শাহজাদী ও তোমার লেড়কার শাদী বাতিল ক'রে দেয়া হ'ল। আর এ-ও প্রচার ক'রে দাও শাহজাদী আজও সাচ্চা কুমারী।'

তামাম সুলতানিয়তে প্রচার হয়ে গেল, শাহজাদী বুদুর ও উজিরের লেড়কার শাদীনামা বাতিল হয়ে গেছে। আলাদিন-এর কানে খবরটি পৌঁছতে দেরী হ'ল না। আজব চিরাগবাতির দৌলতে তার দিলে আজ খুশীর জোয়ার বইতে লাগল। আফ্রিদি দৈত্য ছাড়া এমন শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাপারটির ফয়সালা করতে পারা কারো হিম্মতে কুলাতো না।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতশ' ছাপ্পান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আলাদিন সুলতানের দেয়া বাৎ অনুযায়ী পুরো তিন মাহিনা ধৈর্য ধরল। তারপর একদিন সে তার আম্মাকে সুলতানের দরবারে পাঠাল।

আলাদিন-এর আম্মা দরবারে হাজির হয়ে সুলতানকে কুর্ণিশ করে নিবেদন রাখল—'জাঁহাপনা, আপনার ওয়াধা অনুযায়ী আমি তিন মাহিনা অপেক্ষা করেছি। এখন আপনার ওয়াদা পূরণ করুন।'

আলাদিন-এর আম্মাকে সামনে খাড়া দেখেই উজিরের কলিজা শুকিয়ে গেল। তিনি বার-কয়েক ঢোক গিলে সুলতানকে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, খোদাতাল্লার মেহেরবানিতে জাহাজ ডুবীতে আলাদিন-এর জান খতম হয় নি। সে ক'দিন হ'ল নিজের মকানে ফিরে এসেছে। খবরটি আপনাকে দেব দেব করেও কাজের চাপে দিতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমার অনিচ্ছাকৃত গুস্তাকী মাফ করবেন, জাঁহাপনা।'

—'উজির, খোদাতাল্লাই আমাকে ওয়াধা পূরণ করতে সাহায্য করেছেন। তিনিই মেহেরবানি করে আমাকে সত্যভ্রষ্ট হতে দেন নি। তোমার লেড়কা যদি আমার লেড়কিকে তালাক দিয়ে খালাস ক'রে না দিত তবে আজ আমার গুণাহের সীমা-পরিসীমা থাকত না। আজ আলাদিন আমার লেড়কিকে দাবী করছে। তার এ-দাবী জরুর সঙ্গত। তোমার বেটার বয়ন তালাকই আমার মুখরক্ষা করেছে।'

ব্যাপারটি উজির-এর কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দিল। তিনি হিংসায় ভেতরে ভেতরে গর্জাতে লাগলেন। হাত মুঠো ক'রে স্বগতোক্তি করলেন—'আমি শেষবারের মত একবার কোশিস

ক'রে দেখব।' মুহূর্তে নিজের কলিজাকে শক্ত ক'রে নিলেন। হাত কচলে সুলতানের কাছে নিবেদন করলেন—'জাঁহাপনা, এক বাৎ ইয়াদ ক'রে দেখুন। আপনি আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন, আলাদিন-এর ব্যাপারে পাত্তা লাগাতে, সাচ্চা কিনা?'

সুলতান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, সাচ্চা। বিলকুল সাচ্চা।'

—'আমি গোপনে তল্লাশ চালিয়ে জেনেছি, আলাদিন-এর আব্বা এ-নগরেরই এক দর্জি ছিল। খুবই ছোট দোকান। সামান্য কারবার। কোনরকমে লবণ-রুটির বন্দোবস্ত করত। বেহেস্তে যাবার সময় সে একটি দিরহামও লেড়কার হাতে দিয়ে যেতে পারে নি। আপনিই বিবেচনা করুন, এ-ই যার হালৎ তার হাতে আপনার লেড়কিকে তুলে দেয়া উচিত হবে কিনা। আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করতে পারি না, সে সততা রক্ষা ক'রে দিন গুজরান করছে।'

—'হ্যাঁ, একদিন সে জরুর গরীব ছিল। এখন তার আর্থিক পরিস্থিতি আর আগের মাফিক নেই। যে সব হীরা জহরৎ সে নজরানা পাঠিয়েছে সেগুলো চাক্ষুষ করার পর জরুর তোমার আর কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।'

—'আমারও তো একই বক্তব্য, দু' দিন আগে যার লবণ রুটির জোগাড় ছিল না সে এত সব ধন দৌলত্ কি ক'রে সংগ্রহ করতে সক্ষম হ'ল?'

—'তোমার মাফিক বেকুব আমি জিন্দেগীতে দেখি নি উজীর। সে আমাকে যেসব গ্রহরত্ন নজরানা পাঠিয়েছে তার পক্ষে তা রোজগার করা কখনই সম্ভব নয়। আল্লাহ-র মেহেরবানি ছাড়া তা কিছুতেই হস্তগত হওয়া সম্ভব নয়। লেকিন সেগুলো সে কিভাবে সংগ্রহ করেছে তার পাত্তা নেয়ার কিছুমাত্র দরকার আমার আছে ব'লে মালুম হয় না। তবে যা বুঝেছি, সে এক অনন্য নসীব নিয়ে দুনিয়ায় পয়দা হয়েছে। এ ব্যাপারটি বিবেচনা করে আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, আমার লেড়কিকে তার হাতে তুলে দেয়া সঙ্গত।'

উজির ভেতরে ভেতরে একটু ভেঙে পড়লেও কলিজাকে শক্ত করে বেঁধে এবার শেষবারের মাফিক কোশিস করতে প্রবৃত্ত হলেন। বল্লেন—'জাঁহাপনা, আলাদিন-এর আর্থিক সঙ্গতি পরীক্ষা করে দেখার জন্য আর একবার শাদীর যৌতুক দাবী করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তবেই ব্যাপারটি খোলসা হয়ে যাবে।'

—'বহুৎ আচ্ছা!' এবার আলাদিন-এর আম্মাকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—'শোন, ওয়াদার ব্যাপার আমার ঠিকই স্মরণ আছে। তোমার লেড়কার সঙ্গেই আমার লেড়কি শাহজাদীর শাদী দেব। দ্বিধা নেই। তবে এবার শাদীর যৌতুকের ব্যাপারটি বলি। আমার লেড়কির সুরতের ব্যাপারটি তামাম দুনিয়ার কারো অজানা নয়। অতএব তার যোগ্য যৌতুকাদি তো দেয়া দরকার, ঠিক কিনা?'

—'জাঁহাপনা ঠিকই বলেছেন। হুকুম করুন, কি ধরনের যৌতুক আপনি আমার লেড়কার কাছ থেকে প্রত্যাশা করছেন। সে আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করবে, নিঃসংশয় হতে পারেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা। আমার লেড়কির অভিলাষ, তিন মাহিনা আগে যে গ্রহরত্নগুলো আমাকে নজরানা দিয়ে ছিল, ঠিক সে কিসিমেরই চব্বিশটি সোনার থালায় গ্রহরত্নের ফল দিয়ে চব্বিশটি খুবসুরৎ লেড়কি আমার দরবারে হাজির হবে। চল্লিশজন নিগ্রো নফর তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসবে। তারা কালো হোক, লেকিন গাট্টাগোট্টা নওজোয়ান হয় যেন। বাদশাহের দরবারের উপযুক্ত সাজপোশাক তাদের পরণে যেন থাকে। ব্যস, এটুকুই আমার চাহিদা। তবে তোমার লেড়কা আগে আমাকে যে-নজরানা পাঠিয়েছে তার সমান একটি গ্রহরত্নও সে আর জোগাড় করতে পারবে না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই এরকম ইচ্ছাই আমি তার কাছে রাখছি। সে আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে আমি জরুর প্রীত হ'ব। যাও, তোমার লেড়কাকে গিয়ে আমার ইচ্ছার ব্যাপার জানাও।'

আম্মার মুখে সুলতানের অভিপ্রায় জানতে পেরে আলাদিন যারপর নাই আতঙ্কিত হ'ল। এ যে কেলেঙ্কারী ব্যাপার, এ কিসিমের দাবী কি কারো পক্ষে পূরণ করা সম্ভব! সে বিষণ্ণমুখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

আলাদিন-এর আম্মা চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্ল—'বেটা, আমি গোড়াতেই তোকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিলাম বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার কোশিস করিস না। বাদশাহ-সুলতানের ধারে কাছে যাসনে। আখেরে পস্তাতে হবে। হাজারবার বলেছি, শাহজাদীকে লাভ করার ধান্দা দিল্ থেকে মুছে ফেল। এখন তো নিজের হাত নিজেকেই কামড়াতে হবে।'

আলাদিন ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্ল—'এত ঘাবড়াচ্ছ কেন আম্মা? আমি জরুর সুলতানের অভিলাষ পূর্ণ করতে পারব, দেখে নিও। দেখবে, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই তার চাহিদামাফিক বিলকুল সামানপত্র জোগাড় হয়ে গেছে। যাও, তুমি রসুইখানায় গিয়ে খানা পাকাবার বন্দোবস্ত কর। আমিও এদিকে কাম কাজ চুকিয়ে নিচ্ছি।

লেড়কার বক্তব্য শুনে আলাদিন-এর আম্মা চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ এঁকে কামরা ছেড়ে চলে গেল। রসুইখানায় যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল—আজব ব্যাপার তো! কিসের ভরসায় লেড়কা আমার এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বাৎচিৎ করছে, দিমাকে আসছে না। সে ঝোলা হাতে সওদা খরিদ করতে বাজারের উদ্দেশে পা বাড়াল।

এদিকে আম্মা কামরা ছেড়ে গেলে আলাদিন চিরাগ বাতিটি বের ক'রে আনল। তার গায়ে পর পর দু' বার ঘষা দিতেই অতিকায় আফ্রিদি দৈত্যটি আবির্ভূত হয়ে কুর্ণিশ ক'রে বল্‌ল—'হুজুর, ত্রি-সংসারের মালিক আমি। আমার চেয়ে হিম্মৎওয়ালা কেউ-ই নেই। লেকিন ওই চিরাগবাতিটি আমার প্রভু। এখন তা যখন আপনার জিম্মায় তখন আপনিই আমার প্রভু। মেহেরবানি ক'রে ফরমাশ করুন, আমাকে কি করতে হবে।'

—'আফ্রিদি, সুলতান শাহজাদিকে আমার সঙ্গে শাদী দিতে রাজী। লেকিন আমাকে যৌতুক স্বরূপ চল্লিশটি সোনার থালা বোঝাই ক'রে গ্রহরত্ন তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। জমকালো সাজ পোশাক পরিহিত চল্লিশজন খুবসুরৎ লেড়কিকে সেগুলো বহন করে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে। আর চল্লিশজন গাট্টাগোট্টা নিগ্রো নওজোয়ান তাদের পাহারা দিয়ে পৌঁছে দেবে। বিল্‌কুল বন্দোবস্ত তোমাকেই করতে হবে আফ্রিদি। কি, তোমার দ্বারা সম্ভব তো, কি বল?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে আফ্রিদি গম্ভীর স্বরে বল্‌ল —'ধ্যুৎ, এ এমন কি কাজ? আমি মুহূর্তের মধ্যে বিলকুল আপনার সামনে পেশ করছি।' ব্যস, আফ্রিদি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

এক মুহূর্তের মধ্যেই আফ্রিদি দৈত্য চল্লিশজন গাট্টা গোট্টা নিগ্রো নওজোয়ান, বড়িয়া সাজ পোশাক পরিহিতা চল্লিশজন খুবসুরৎ লেড়কি আলাদিন-এর সামনে হাজির করল। লেড়কিদের সবার কাঁধে একটি করে ইয়া পেল্লাই সোনার থালা। আর তাদের প্রত্যেকটিতে রয়েছে গ্রহরত্নের একটি করে আলাদা আলাদা কিসিমের ফল।'

আলাদিন-এর ইঙ্গিতে আফ্রিদি দৈত্যটি এবার হাফিস হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই আলাদিন-এর আম্মা সওদা সেরে বাজার থেকে ফিরে এল।

আলাদিন এবার আম্মাকে বল্‌ল—'আর সময় নষ্ট না ক'রে তুমি এদের নিয়ে রওনা হয়ে যাও। থালাগুলো সুলতানের পায়ের কাছে রেখে বলবে,—'জাঁহাপনা, সামানপত্র আপনার চাহিদা অনুযায়ী হয়েছে কিনা, মেহেরবানি ক'রে মিলিয়ে নিন।' মুহূর্তকাল পরে ফিন মুখ খুল্‌ল—'জাঁহাপনা, শাদীর যৌতুক প্রদান ক'রে আপনার বাঞ্ছা তো পূরণ করলামই। এবার শাদীর বন্দোবস্ত করুন, শাদীর হুকুম দিন।'

আলাদিন-এর আম্মা এবার বড়িয়া সাজ পোশাক পরিহিতা চল্লিশজন খুবসুরৎ লেড়কির প্রত্যেকের কাঁধে গ্রহরত্নের একটি ফল সমেত একটি ক'রে থালা দিয়ে সুলতানের প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। চল্লিশজন গাট্টাগোট্টা নিগ্রো নওজোয়ান তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চল্‌ল। আলাদিন-এর আম্মা তাদের পথ দেখিয়ে প্রাসাদে নিয়ে গেল। সুসজ্জিতা খুবসুরৎ লেড়কিরা নিজ নিজ থালা সুলতানের পায়ের কাছে নামিয়ে অবনত শিরে দু' ধারে সারিবদ্ধভাবে খাড়া হয়ে পড়ল। আর নিগ্রো রক্ষীরাও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল।

আলাদিন-এর আম্মা সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ সেরে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার বাঞ্ছিত সামানপত্র আপনার দরবারে পেশ করলাম। প্রয়োজনে আপনি মেহেরবানি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মিলিয়ে নিতে পারেন।'

সুলতানের বিস্ময় মাখানো চোখের মণি দুটো থালাগুলোর

ওপর বারবার চক্কর মারতে লাগল।

আলাদিন-এর আম্মা ফিন কুর্ণিশ সেরে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার লেড়কার পাঠ্যানো সামানপত্রাদি সাচমুচ যদি আপনার ওয়াদা অনুযায়ী হয়ে থাকে তবে এবার শাদীর মত ব্যক্ত করলে খুশী হ'ব। এখন বিলকুল ব্যাপারটি আপনার মর্জির ওপরই নির্ভর করছে।'

আলাদিন-এর কারবার দেখে সুলতানের চোখ দুটো একদম কপালে উঠে গেল। অপলক চোখে তখনও সামানপত্র দেখে চলেছেন। একবার বহুৎ আচ্ছা সাজ পোশাকে সজ্জিতা খুবসুরৎ লেড়কিগুলোর দিকে, পর মুহূর্তেই সুদর্শন নিগ্রো নওজোয়ানদের দিকে, তারপরই নজর ফিরিয়ে থালা ও তাদের ওপরে রক্ষিত অত্যুজ্জ্বল গ্রহরত্নগুলোর দিকে নজর দিতে লাগলেন। তার চোখের মণি দুটো একদম অস্থির-চঞ্চল। আলাদিন-এর আম্মা যে তার আর্জি জানাচ্ছে সেদিকে কিছুমাত্রও হুঁশ তাঁর নেই।

আলাদিন-এর আম্মা ভাবছে—এযে সর্বনেশে কাণ্ড ঘটতে চলেছে! সামানপত্র বুঝিবা সুলতানের ওয়াদা মাফিক হয় নি। নইলে এমন গম্ভীর হয়ে মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন কেন? বার কয়েক ঢোক গিলে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, গুস্তাকী কিছু হলে মাফ করে দেবেন। যদি কিছু গলতিই হয়ে থাকে তবে মেহেরবানি ক'রে বলুন, জরুর শুধরে নেয়ার কোশিস করব।'

সুলতান হুঁস ফিরে পেলেন—চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লেন—'উজির আমার ধনাগারের ধন দৌলত তো এ সবের কাছে একদম নগণ্য, কি বল?'

ইতিমধ্যে উজিরের কলিজা একদম চিপসে গেছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কোনরকমে একটু দম নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'সাচ্চা বটে জাঁহাপনা।'

—'উজির এক বাৎ, আমার লেড়কির সুরতের প্রশংসা তামাম দুনিয়ার আদমিদের মুখে মুখে ঢুঁড়ে বেড়ায়, সাচ্চা বটে। লেকিন এমন অপরিমিত ধন দৌলতের অধিকারী যে তার স্বামী হবে এ যে আমি খোয়াবের মধ্যেও ভাবতে পারিনি।'

—'জাঁহাপনা, আপনার বক্তব্য সাচ্চা বটে। লেকিন যদি গোস্‌সা না করেন তবে একটি ব্যাপারে দু'-চার বাৎ বলি। আপনিই বলুন, শাহজাদীর সুরতের দাম কি ধনদৌলতের মাধ্যমে হিসাব করা যাবে, নাকি করা উচিত?'

সুলতান সহজেই ধরতে পারলেন, উজির মিঠা বাৎচিতের মাধ্যমে তার দিল্‌কে গলানোর কোশিস করছে। তাই তিনি হেসে বল্‌লেন—'দেখ উজির, মিঠা বাৎচিতের মাধ্যমে আদৎ ব্যাপারটিকে চাপা দেবার কোশিস করলে ফয়দা কিছু হবে না। আলাদিন যে সম্পদ শাদীর যৌতুক স্বরূপ পাঠিয়েছে তামাম দুনিয়া দিয়েও তার দাম চুকানো সম্ভব নয়।' এবার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে তিনি ব'লে উঠলেন—'উজির, আশা করব তুমি আর মন্তব্য করতে পারবে না যে আমার লেড়কি শাহজাদীকে আমি দরিয়ার পানিতে ছুঁড়ে দিচ্ছি, ঠিক কিনা?'

বেচারা উজির ফ্যাকাসে, বিবর্ণ মুখে কোনরকমে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'না—না জাঁহাপনা, তা কি সম্ভব। এরকম কোন মন্তব্য করা যে এক্কেবারেই অবান্তর।'

সুলতানের পারিষদ যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুলতান তাদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

তারা ব্যস্ততা প্রকাশ ক'রে ঝটপট উঠে দাঁড়ালেন। সুলতানকে নতজানু হয়ে কুর্ণিশ সেরে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আপনার পছন্দ একদম অনন্য। শাহজাদীর জন্য যে-পাত্র আপনি নির্বাচন করেছেন, তামাম দুনিয়াতেও তার যোগ্য পাত্র দ্বিতীয় আর একটি মিলবে না।'

সুলতান এবার ঘাড় ঘুরিয়ে আলাদিন-এর আম্মার দিকে ফিরে বল্‌লেন—'শাদী-নিকার ব্যাপারে বহুৎ কিছু বিবেচনা করতে হয়। তোমার লেড়কার ধন দৌলত আমার দিল্‌কে জয় করেছে বটে। লেকিন এই তো সব নয়। তোমার লেড়কার কি কি গুণ আছে সে ফিরিস্তি আমার দরবারে প্রকাশ কর, সবাই শুনুক।'

—'গুণ?' আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, নিজের পেটের লেড়কার গুণের ফিরিস্তি নিজেমুখে কি ক'রে প্রকাশ করি, বলুন? তবে যারাই তাকে চাক্ষুষ করেছে সবার মুখেই এক বাৎ—আমার আলাদিন-এর সুরৎ নাকি সাচ মুচ অনন্য। এ-নগরের খুব কম নওজোয়ানের দেহেই নাকি তার সমান সুরৎ নজরে পড়ে। এবার আপনিই যা-ই হোক বিচার করবেন। আমি তার আম্মা—'

সুলতান এবার তাকে থামিয়ে দিয়ে ব'লে উঠলেন—'ব্যস, ব্যস, আর কিছু শোনার আগ্রহ আমার নেই। নওজোয়ান—খুবসুরৎ নওজোয়ান অপরিমিত ধন দৌলতের মালিক—শাদীর পাত্র নির্বাচন করতে গিয়ে যদি কারো মধ্যে এ-তিনের সমন্বয় ঘটে থাকে তবেই তা যথেষ্ট ব'লে আমি জ্ঞান করি। আজ শুভ সন্ধ্যাতেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সাক্ষী ক'রে আমি আমার আদরের দুলালী শাহজাদী বুদুর'কে আলাদিন-এর হাতে তুলে দিতে চাই।' এবার আলাদিন-এর আম্মার দিকে ফিরে সোল্লাসে বল্‌লেন—'কি গো, আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন? জলদি মকানে যাও বুদুর আর আলাদিন-এর শাদী-নিকা শীঘ্রই চুকিয়ে ফেলা হবে। যাও, জলদি লেড়কার শাদীর বন্দোবস্ত করগে।'

সুলতানের মুখে পাকা বাৎ শুনে খুশীতে আলাদিন-এর আম্মার কলিজা একদম নাচানাচি শুরু ক'রে দিল। সে একদম নাচতে নাচতে লেড়কার কামরায় ঢুকে তাকে সুলতানের মতের ব্যাপার জানাল।

আম্মা কামরা ছেড়ে গেলে আলাদিন চিরাগবাতিটি বের করল। তার গায়ে আলতো ক'রে দু'বার ঘষা দিতেই বিশালদেহী আফ্রিদি দৈত্য হাজির হ'ল। আলাদিন'কে কুর্ণিশ ক'রে সে গম্ভীর স্বরে বল্‌ল—'হুজুর গোলামের গোলাম হাজির, ফরমাশ করুন, আমাকে কি করতে হবে।'

আলাদিন বল্‌ল—'আজ আমার শাদী। আমাকে শাদীর পোশাকে সাজতে হবে। তুমি এমন ঝলমলে সাজপোশাকের বন্দোবস্ত কর যা সুলতান-বাদশাহেরও চোখ টেঁড়া ক'রে দেবে। তামাম দুনিয়ার কেউ-ই চাক্ষুষ করা তো দূরের ব্যাপার, যার কথা খোয়াবেও ভাবতে পারে না। যে দেখবে সে-ই যেন ভাবে এর দাম এক কোটি দিনারেরও বেশী, ইয়াদ থাকে যেন। তবে সবার আগে আমাকে হামামে নিয়ে চল, আচ্ছা ক'রে গুলাব পানিতে গোসল করা দরকার। তুমি বন্দোবস্ত কর আফ্রিদি।'

আফ্রিদি দৈত্য কুর্ণিশ ক'রে বল্‌ল—'হুজুর আপনি চিরাগবাতির মালিক। আমি চিরাগবাতির গোলাম। আপনার হুকুম তামিল করাই আমার একমাত্র কাজ।' এবার উবু হয়ে বসে বল্‌ল—'হুজুর, মেহেরবানি ক'রে আমার কাঁধে বসুন, আপনাকে সবচেয়ে নামজাদা হামামে নিয়ে যাচ্ছি, যার কথা বাদশাহ, সুলতান এবং আমীর-ওমরাহরা ভাবতেও পারে নি কোনদিন।'

আলাদিন আফ্রিদি দৈত্যের কাঁধে বসামাত্র সে তাকে নিয়ে শূন্যে উড়ে চল্‌ল। হামাম থেকে গোসল করিয়ে ফিন তার মকানে ফিরিয়ে আনল।

আফ্রিদি দৈত্য আলাদিন'কে কাঁধ থেকে নামিয়ে ফিন কুর্ণিশ ক'রে বল্‌ল—'হুজুর, এবার আমাকে কি করতে হবে ফরমাশ করুন।'

একটি তেজী, একদম চনমনে একটি ঘোড়া আর আটচল্লিশটি নওজোয়ান বান্দা বন্দোবস্ত কর।'

আলাদিন চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে আফ্রিদি দৈত্য তার উঠোনে ইয়া তাগড়াই চনমনে এক ঘোড়া হাজির করল। আর আটচল্লিশটি সুদেহী বান্দাকে সারিবদ্ধভাবে উঠোনে দাঁড় করিয়ে দিল।

আলাদিন খুশী হয়ে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা। এবার তোমার কাজ বারোটি খুবসুরৎ বাঁদী হাজির করা। তারা আমার আম্মাকে ঘিরে সুলতানের প্রাসাদে নিয়ে যাবে। তোমাকে যে আটচল্লিশজন বান্দা হাজির করতে বলেছি তাদের প্রত্যেকের গলায় একটি ক'রে দিনারের থলি ঝোলানো থাকবে। আর তাদের প্রত্যেকটিতে পাঁচ হাজার ক'রে দিনার জমা থাকবে যাতে দরকার মাফিক আমি দেদার খরচ খরচা করতে পারি, ইয়াদ থাকে যেন।'

—'জো হুকুম, হুজুর। কুর্নিশ সেরে আফ্রিদি দৈত্যটি বিদায়
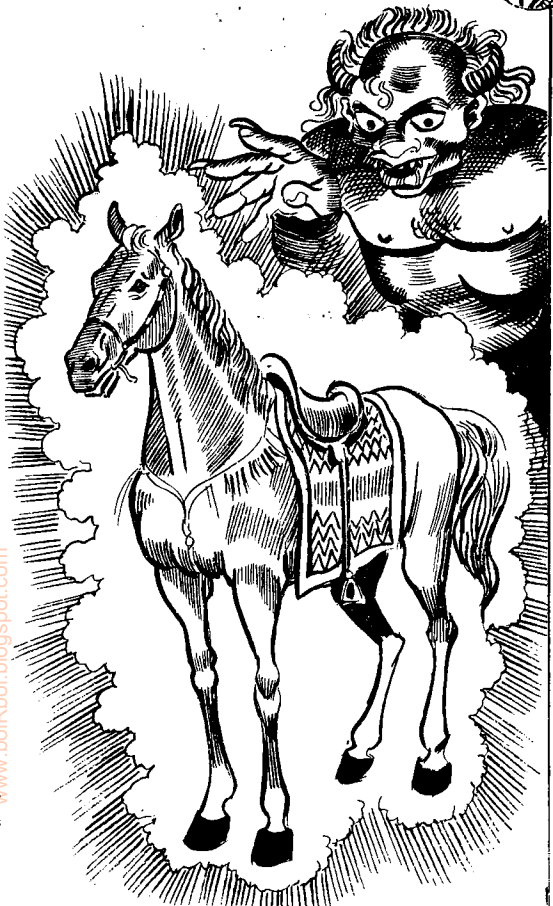
নিল। এক লহমার মধ্যে আফ্রিদি দৈত্য আলাদিন-এর ফরমাশ মাফিক বান্দা, বাঁদী ও দেহরক্ষীদের এনে তার সামনে হাজির করল। সবই আলাদিন-এর চাহিদা অনুযায়ী হওয়ায় তার মুখের হাসির ঝিলিক যেন আর মিলাতে চায় না।

জমকালো পোশাক গায়ে চাপিয়ে আলাদিন তেজী ঘোড়াটির পিঠে বসল। বান্দারা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে ঘোড়ার দু' ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। তার আম্মাকে ঘিরে দাঁড়াল খুবসুরৎ ও সুসজ্জিতা বাঁদীর দল। আর দেহরক্ষীরা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে আলাদিন-এর আগে-পিছে দাঁড়াল। ব্যস, এবার ঘোড়া দুল্‌কি চালে এগিয়ে চল্‌ল আলাদিন'কে নিয়ে নগর পরিক্রমায়।

আলাদিন'কে নিয়ে মিছিল নগরের প্রধান প্রধান সড়ক ধ'রে ঢুঁড়ে শেষে এসে হাজির হ'ল প্রাসাদের প্রধান ফটকে।

সুলতান ভাবী জামাতাকে বরণ ক'রে প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ বন্দোবস্ত সেরে রেখেছিলেন। হাজার হাজার অত্যুৎসাহী প্রজা পথের দু' ধারে সারিবদ্ধভাবে জমায়েৎ হয়েছে শাহজাদীর বরকে দেখার জন্য। লেড়কি ও জেনানারা পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে লাগল। সুলতান উজির ও আমীর-ওমরাহদের নিয়ে গেলেন। আলাদিন এবার এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে সুলতানকে কুর্ণিশ করল। সুলতান হাত তুলে হবু জামাতাকে আশীর্বাদ করলেন।

সুলতান এবার আলাদিন'কে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌লেন—'বেটা, নসীবকে এড়ানোর সাধ্য কারো নেই। আল্লাতাল্লা যে তোমাদের কপালে লিখে রেখেছেন তোমার আর শাহজাদীর মিলন হবে। তাঁর অভিপ্রায়েই আজ সে মিলন পর্ব সম্পন্ন হতে চলেছে। তোমাদের শাদী অনেক আগেই হয়ে যেত। লেকিন ঘটনাচক্রে তা পিছিয়ে গেল। এ-ও হয়ত আল্লাতাল্লারই মর্জি ছিল। এ নিয়ে মিছে আপশোস ক'রে ফয়দা তো কিছু হবার নয়। এখন যা সামনে রয়েছে সেদিকেই আমাদের নজর রাখতে হবে।'

—'একদম সাচ্চা বাৎ। পিছনে না তাকিয়ে আমাদের নজর রাখতে হবে সামনের দিকে। আর সবকিছু উপযুক্ত সময় না হলে সম্পন্ন হবার নয়। আমরা যতই ছটফট করি না কেন, আল্লাতাল্লার মর্জি হলে তবেই তা বুঝতে পারি।'

—'বহুৎ আচ্ছা বাৎ বলেছ বেটা! বিলকুল সাচ্চা বাৎ বটে।'

বাদশাহী খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছে। সুলতান তাঁর দরবারের উজির-নাজির আর আমীর-ওমরাহদের খানাপিনার আসরে বসালেন। তাদের মাঝে হবু জামাতা আলাদিন'কে নিয়ে নিজে বসলেন।

খানাপিনা মিটলে সুলতান তাঁর সুলতানিয়তের সবচেয়ে নামজাদা কাজীকে তলব করলেন। কাজী আসরে হাজির হয়ে শাদীনামা বানালেন। সাক্ষীরা শাদীনামায় স্বাক্ষর করলেন। শাদী-পর্ব হাসি-খুশীর মধ্য দিয়ে চুকে গেল।

সুলতান এবার আলাদিনকে বল্‌লেন—'বেটা, শাদীর আদৎ কাজ চুকে গেল। এবার তুমি তোমার বিবিকে নিয়ে বাসর ঘরে সহবাস করবে, নাকি—'

সুলতানকে বক্তব্যটি খতম করতে না দিয়ে আলাদিন বল্‌ল—'জাঁহাপনা, যে-শুভ কাজের জন্য এতদিন ধৈর্য ধরে বুক বেঁধেছি আজ সে-সুযোগ হাতে পেয়ে কেন ঝুটমুট দেরী করব, বলুন? শাহজাদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমার দিল্ ও কলিজা অস্থির হয়ে উঠেছে। লেকিন আমার একটি আর্জি আছে জাঁহাপনা।'

সুলতান মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'আর্জি? কি সে-আর্জি বেটা? লাজ শরম ত্যাগ ক'রে তুমি আমার কাছে দিল্ খোলসা ক'রে বলতে পার।'

আলাদিন শির নামিয়ে দ্বিধাজড়িত ক্ষীণ কণ্ঠে এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এমন হৈ হট্টগোলের মধ্যে আমি আমার বিবিকে নিয়ে—'

হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে সুলতান ব'লে উঠলেন—'হ্যাঁ, বুঝেছি বেটা। তুমি তোমার বিবিকে একান্তে, নিরালা পরিবেশে পেতে চাও, ঠিক কিনা? বহুৎ আচ্ছা। আমি তার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। আমার বাগিচায় নির্জন-নিরালা পরিবেশে প্রমোদ-বিহারের জন্য যে প্রাসাদ রয়েছে সেখানে তোমাদের বাসরের আয়োজন ক'রে দিচ্ছি, খুশী তো?'

আলাদিন শরমে অবনত মুখে মুচকি হেসে কামরার মেঝের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের পাখিদের কিচির মিচির শুনে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' ষাটতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সুলতানের অভিপ্রায় জানতে পেরে আলাদিন আপত্তি জানাল—'জাঁহাপনা, আপনার বাগিচায় যে প্রাসাদ রয়েছে, সেখানে আপনি আমাদের বাসর শয্যার বন্দোবস্ত করতে চাচ্ছেন তাতে আমার আপত্তি রয়েছে।'

সুলতান মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ এঁকে বল্‌লেন—'আপত্তি? কেন বেটা, আপত্তি কিসের? সে তো বহুৎ বড়িয়া প্রাসাদ।'

—'হ্যাঁ, জরুর বড়িয়া, লেকিন সে তো আপনার নাচ মহল। তামাম আরব দুনিয়ার পেশাদারী বাঁদীরা এসে নাচা-গানা করে। আমার বিবিকে এরকম এক প্রাসাদে তুলতে আমি একদম নারাজ। আমি মনে করি এতে তার মান ইজ্জৎ খোয়া যাবে।'

—'বহুৎ আচ্ছা বেটা। তোমার বুদ্ধিমত্তার তারিফ আমি করছি। লেকিন কোথায় তোমাদের বাসর গড়তে চাইছ, আমার কাছে নির্দ্বিধায় ব্যক্ত কর। আমি সেখানেই বন্দোবস্ত করে দেব।'

আলাদিন এবার জানালা দিয়ে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, প্রাসাদের অদূরবর্তী ওই যে ফাঁকা ময়দানটি রয়েছে ওখানে আমি একটি নয়া প্রাসাদ বানিয়ে নিতে চাই। ওখানেই আমি আমার বিবিকে নিয়ে বসবাস করব, ভাবছি। এবার আপনার হুকুম পেলেই আমি কাজ শুরু করব।'

—'বেটা, এ তো খুশীর ব্যাপার। তুমি পছন্দ মাফিক নয়া এক

প্রাসাদ বানিয়ে আমার লেড়কিকে নিয়ে বসবাস করবে—আমার কাছে জরুর খুশীর ব্যাপার বটে। তুমি আমার সুলতানিয়তে যেখানে খুশী প্রাসাদ বানাও, তিলমাত্রও আপত্তি নেই। তবে আর ঝুটমুট দেরী না ক'রে কাজ শুরু ক'রে দাও। আমার সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা তুমি পাবে, ভরসা রাখতে পার।'

—'তবে আমাকে অনুমতি দিন আমি আমার মকান থেকে একবারটি চক্কর মেরে আসি। দেরী হবে না। যাব আর আসব, ব্যস।'

সুলতানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আলাদিন নিজের মকানে ফিরে এল। কামরায় ঢুকে দরওয়াজা বন্ধ করল। চিরাগবাতিটি বের করল। দু' বার হাত দিয়ে তার গায়ে ঘষামাত্রই আফ্রিদি দৈত্য আবির্ভূত হ'ল। আলাদিন'কে নতজানু হয়ে কুর্ণিশ সেরে বল্‌ল—আমি চিরাগবাতির গোলাম। আপনি চিরাগবাতির মালিক। আমি আপনার গোলামের গোলাম হুজুর। ফরমাশ করুন আমাকে কি করতে হবে।'

—'শোন আফ্রিদি, এ পর্যন্ত তুমি যা কিছু করেছ তাতে আমি যারপরনাই খুশী হয়েছি, এবার তোমাকে এক গুরুদায়িত্ব দিতে চাই।'

আফ্রিদি বিকট স্বরে উচ্চারণ করল—'হুজুর, মেহেরবানি ক'রে ফরমাশ করুন, কি আমাকে করতে হবে।'

—'শোন আফ্রিদি, সুলতানের প্রাসাদের লাগোয়া যে ফাঁকা মাঠটি রয়েছে সেখানে এক মনোরম প্রাসাদ বানাতে হবে। এমন এক প্রাসাদ আমার চাই যার তুল্য প্রাসাদ তামাম দুনিয়ার কোথাও নেই, কেউ কখনও দেখা তো দূরের ব্যাপার ভবিষ্যতে দেখার নিশ্চিত সম্ভাবনা নেই, ঠিক এমনই এক প্রাসাদ আমার চাই, ইয়াদ থাকবে?'

—'থাকবে হুজুর। আমি প্রাসাদটি বানাব পান্না দিয়ে। পুরোটাই থাকবে পান্না। আর তার ফাঁকে ফাঁকে থাকবে অতুলনীয় কারুকার্য। প্রাসাদটির ভেতরে থাকবে হীরা, মুক্তা, চুনী, পলা, পোখরাজ আর নীলার বাহার।'

আলাদিন চোখ দুটো একদম কপালে তুলে সবিস্ময়ে বল্‌ল—'একী আজব কাণ্ড করতে চাচ্ছ আফ্রিদি? পুরো প্রাসাদটি পান্না দিয়ে বানাতে গেলে যে গোটা একটি পান্নার পাহাড় তোমাকে এনে হাজির করতে হবে!'

—'হোক না। সে যা করার আমিই করব হুজুর। আপনাকে তা নিয়ে একদম ভাবতে হবে না। হুকুম করলেই আপনি খালাস।'

—'না আফ্রিদি, আর কিছু আমার দিমাকে আসছে না। তুমি তোমার পছন্দ মাফিক একটি প্রাসাদ আমাকে গড়ে দাও। তবে হ্যাঁ, প্রাসাদটি দেখে সবাই যেন হাঁ হয়ে যায়। ইয়াদ রেখো, প্রাসাদটির শীর্ষদেশে, ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি সুবিশাল গম্বুজ বানিয়ে দেবে। আর গম্বুজটি দাঁড়িয়ে থাকবে কয়েকটি সোনা আর চাঁদির থাম্বার উপর। গম্বুজটিকে তৈরি করতে হবে স্ফটিক দিয়ে। সূর্য রশ্মি পতিত হলে তার কিরণচ্ছটায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এক মনোরম দৃশ্য সৃষ্টি হবে তখন। আর একটি ব্যাপার, নব নির্মিত প্রাসাদটিতে নিরানব্বইটি জানালা থাকবে। তার কার্ণিশগুলো তৈরি করতে হবে প্রবাল দিয়ে। চৌকাঠ আর পাল্লাগুলিতে হীরা আর মণি-মাণিক্যখচিত থাকে যেন।'

আফ্রিদি দৈত্যটি ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানাতে গিয়ে বল্‌ল—'হুজুরের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।'

—'আর শোন, প্রাসাদটির ঠিক সামনে একটি মনোরম বাগিচা বানিয়ে দেবে যা একমাত্র বেহেস্তেই হওয়া সম্ভব। কি পারবে তো? আরে ভাল কথা, একদম ইয়াদ ছিল না—প্রাসাদটির তলদেশে, মিট্টির তলায় একটি বড়সড় গুপ্ত কামরা বানিয়ে দিও। বহুমূল্য হীরা-জহরতে—ধনদৌলতে কামরাটি বোঝাই থাকবে। একপাশে আস্তাবল, রসুইখানা, নফর-নোকরদের থাকার কামরা—সবই তোমার পছন্দ্ মাফিক বানাবে। সোজা ব্যাপার তামাম দুনিয়ায় কোথাও যেন এরকম কামরা না থাকে, ভবিষ্যতেও কেউ বানাবার পরিকল্পনা না করতে পারে, খেয়াল রেখে সব কিছু করবে।'

আফ্রিদি দৈত্য আলাদিনকে কুর্ণিশ ক'রে আদেশ পালন করতে চলে গেল।

আফ্রিদি দৈত্যটি পর দিন খুব ভোরে আলাদিন-এর সামনে হাজির হল। কুর্ণিশ ক'রে হাসি মুখে বল্‌ল—'হুজুর, বান্দা আপনার হুকুম তামিল করেছে. মেহেরবানি ক'রে একবার চাক্ষুষ ক'রে এলে খুশী হ'ব।'

আলাদিন আফ্রিদি দৈত্যের কাঁধে চড়ে শূন্য পথে ভেসে চল্‌ল। সুলতানের প্রাসাদের অদূরবর্তী ময়দানে সদ্য নির্ম্মিত ইমারতটির সামনে তাকে নামিয়ে আফ্রিদি বল্‌ল—'হুজুর, বিলকুল আপনার আজ্ঞামাফিক হয়েছে কিনা, মেহেরবানি করে মিলিয়ে নিন।'

প্রাসাদটি এক লহমায় দেখেই আলাদিন-এর চোখ তো একদম ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড়। অচানক তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লাহ! তুমি যে কামাল করে দিলে আফ্রিদি! তামাম দুনিয়ার কারিগররা যে এমন এক প্রাসাদ বানাবার কথা খোয়াবেও ভাবতে পারবে না। প্রাসাদটির ব্যাপারে আমার যে ধ্যায়ান ছিল এ যে তার চেয়ে হাজার গুণ বড়িয়া হয়েছে।'

আফ্রিদি দৈত্য কুর্ণিশ ক'রে বল্‌ল—'হুজুর, মেহেরবানি ক'রে একবার প্রাসাদটির ভেতরে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখুন, বিলকুল আপনার মর্জি মাফিক হয়েছে কিনা।'

আলাদিন বার বার এদিক-ওদিক নজর দিতে দিতে প্রাসাদটির
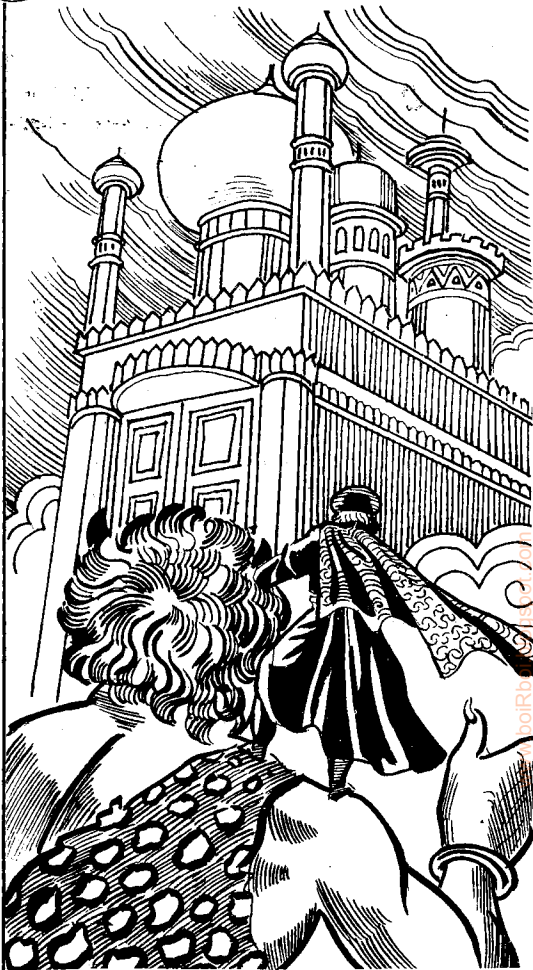
ভেতরে ঢুকে গিয়ে একদম থ বনে গেল।

আফ্রিদি বল্ল—'হুজুর, আপনি শুধু দেখে নিন, আপনার আজ্ঞা মাফিক হয়েছে, কিনা।'

—'আজ্ঞা মাফিক বলছ কি আফ্রিদি! তার চেয়ে ঢের ঢের বড়িয়া হয়েছে তোমার বানানো প্রাসাদটি। কেবল মিট্টির দুনিয়ায় নয়। বেহেস্তেও এমন আর একটি প্রাসাদের তল্লাশ করতে গেলে হতাশ হতে হবে।' এবার সুলতানের প্রাসাদের দিকে নজর ফিরিয়েই সখেদে ব'লে উঠল—'ইস, আমার একদম ইয়াদ ছিল না! আর এক কাম যে করতে হবে আফ্রিদি। আমার প্রাসাদের মাথা থেকে সুলতানের প্রাসাদ অবধি একটি সুদৃশ্য গালিচা বিছিয়ে দাও। আমার বিবি তো আর জমিনে পা দিয়ে এ-প্রাসাদ থেকে ও-প্রাসাদে যাবে না।'

—'ঘাবড়াবেন না হুজুর, বান্দা এক লহমায় গালিচা বিছিয়ে দিচ্ছে।'

আলাদিন আঁখির পাতা ফেলতে না ফেলতেই আফ্রিদি দৈত্য কুর্ণিশ ক'রে বল্ল—'হুজুর, মেহেরবানি ক'রে একবারটি প্রাসাদের ওপরে গিয়ে আপনার বাঞ্ছিত গালিচাটি দেখে আসবেন কি?'

আলাদিন ঘাড় ঘুরিয়ে প্রাসাদটির শীর্ষদেশের দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে বল্ল—'কি দেখতে যাব, আগে গালিচা বিছাও আফ্রিদি, তবে তো দেখতে যাব। এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে প্রাসাদের ওপরে কিছু নেই। সুলতানের প্রাসাদ অবধি একদম ফাঁকা।'

—'মেহেরবানি ক'রে একবারটি ওপরে গিয়ে চাক্ষুষ করলেই ব্যাপারটির ফয়সালা হয়ে যাবে হুজুর।'

প্রাসাদের শীর্ষদেশে গিয়ে আলাদিন একদম হাঁ হয়ে গেল। আদতে এমন আজব কাণ্ডের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তার চোখ দুটো তৈরি ছিল না। সে দেখল, অবিকল মেঘের মাফিক একটি গালিচা সোজা সুলতানের প্রাসাদ অবধি চলে গেছে। আলাদিন খুশীতে ডগমগ হয়ে দু' বাহু তুলে নাচানাচি শুরু ক'রে দিল। সাচ্চা, আফ্রিদি দৈত্যের কাজ পঞ্চমুখে তারিফ করার মাফিকই বটে।

এদিকে সুলতানের প্রাসাদের নফর-নোকর ও বাঁদীরা বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে যেতেই একদম তাজ্জব বনে গেল। প্রাসাদের অদূরবর্তী ময়দানে দৃষ্টিনন্দন এক প্রাসাদ দেখে তারা ছুটোছুটি-চিল্লাচিল্লি ক'রে একে অপরকে আজব ব্যাপারটি দেখাতে লাগল।

নফরদের কয়েকজন হন্তদন্ত হয়ে সুলতানের সামনে হাজির হ'ল। বৃদ্ধ উজিরও এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে কুর্ণিশ ক'রে বল্লেন—'জাঁহাপনা, আপনার জামাই নির্ঘাৎ এক মস্ত বড় যাদুকর! সাধারণ আদমি তো একের পর এক এমন কামাল করতে পারে না।'

সুলতান ভ্রূ কুঁচকে বল্লেন—'কি? ব্যাপার কি? আলাদিন এমন কি করল যার জন্য তোমরা এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছ?'

—'মেহেরবানি ক'রে একবারটি চলুন জাঁহাপনা। এক রাতের মধ্যে সে ইয়া পেল্লাই ও খুবসুরৎ এক প্রাসাদ বানিয়ে ফেলেছে।'

সুলতান জানালার ধারে এসে এক লহমায় এক নজরে দেখে নিয়ে স্বাভাবিক স্বরেই বল্লেন—'উজির, আলাদিন-এর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। নইলে সে, তামাম দুনিয়ার ধন দৌলতের চেয়ে ঢের, ঢের মূল্যবান গ্রহরত্ন এক লহমায় জোগাড় ক'রে ফেলতে পারে, তার অসাধ্য কিছু আছে ব'লে আমার অন্ততঃ মালুম হয় না।

এদিকে আলাদিন সাজপোশাক সেরে তেজী ও খুবসুরৎ ঘোড়ার পিঠে চেপে তার আম্মাকে নিয়ে সুলতানের প্রাসাদে হাজির হ'ল।

সুলতান তাঁর দরবারের উজির-নাজির ও আমীর-ওমরাহদের নিয়ে প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আলাদিন-এর আম্মাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বল্‌লেন—'চলুন, ভেতরে গিয়ে আপনার বেটার বিবিকে দেখবেন, চলুন। কয়েকজন সুদেহী ও সুবেশী বাঁদীকে দেখিয়ে বল্‌লেন—'ওদের সঙ্গে গিয়ে আপনার বেটার বিবিকে দেখে আসুন।'

বাঁদীরা তাঁকে নতজানু হয়ে সালাম জানিয়ে বুদুর-এর কামরায় নিয়ে গেল। গোলাবপানির সরবৎ আর হরেক কিসিমের বড়িয়া মণ্ডা মিঠাই এনে দিল নাস্তা সারার জন্য।

শাহজাদী, তার বেটার বিবি এগিয়ে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে কুর্শি এগিয়ে বসতে দিল।

আলাদিন-এর আম্মা তার বেটার বিবিকে এই প্রথম দেখল। তার মুখের দিকে এক লহমায় তাকিয়ে চমকে উঠল। কোন লেড়কির মধ্যে এমন সুরৎ থাকতে পারে এ যেন তার একদম ধারণা বহির্ভূত। ভাবতে লাগল, আল্লাহ-র কী অপূর্ব সৃষ্টি। সে শুনেছে বেহেস্তের হুরী-পরীদের সুরৎ বহুৎ দেখনাই, চটকদার বটে। লেকিন খুন-গোস্তওয়ালা মিট্টির দুনিয়ার মধ্যে সুরতের এমন বিচিত্র সমাবেশ ঘটতে পারে এ যেন একদম তার জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত। মোদ্দা ব্যাপার আলাদিন-এর আম্মা এখনও ভাবতে পারছে না মিট্টির দুনিয়ায় এমন লেড়কি কি ক'রে পয়দা হ'ল।

সন্ধ্যার আন্ধার নেমে এল। বাঁদীরা বুদুর'কে সাজ পোশাক পরাতে বসে গেল। একটু বাদে তাকে স্বামীর নয়া প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে।

সন্ধ্যা হওয়ার একটু বাদেই প্রাসাদাভ্যন্তরের সুপ্রশস্ত চত্বরে বাদ্যকররা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করল।

সুলতান ও তাঁর পারিষদবর্গসহ প্রাসাদে আগন্তুক মেহমানরা বাজনার তালে তালে পা চালিয়ে আলাদিন ও বুদুরকে নিয়ে মিছিল ক'রে হাজির হ'ল সদ্য তৈরি প্রাসাদটিতে।

আফ্রিদি দৈত্য দুনিয়ার নানা দেশের হরেক কিসিমের খানার পাহাড় বানিয়ে ফেল্‌ল। আর নিয়ে এল বড়িয়া খুসবুওয়ালা হরেক গুলাবী সরাব। মেহমানরা মুখরোচক খানা খেতে খেতে বিলকুল তাজ্জব বনে গেল, আলাদিন এমনসব খানার বন্দোবস্ত করল কি ক'রে? সবচেয়ে আজব ব্যাপার, রসুইখানা একদম সাফসুতরা। রসুইকর বলতে কেউ-ই নেই। লেকিন খানাপিনার বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

খানাপিনা মিটতে মিটতে রাত্রি গভীর হয়ে গেল। এবার সুবিশাল ও জমকালো কারুকার্যমণ্ডিত এক কামরায় নাচা-গানার মজলিস বসল। দুনিয়ার হরেক মুলুকের খুবসুরৎ লেড়কিরা আজব সব পোশাক পরে নাচাগানার মাধ্যমে মেহমানদের খুশীতে একদম ডগমগ ক'রে দিল।

এদিকে আলাদিন তার সদ্য শাদী করা বিবি বুদুরকে হাত ধরে বাসরকক্ষে হাজির করল। দেহের সাজপোশাক খুলে এক ধারে রেখে দিল। শাহজাদী বুদুর একদম উলঙ্গ হয়ে পালঙ্কের একধারে গিয়ে লজ্জাবনত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এবার আলাদিন নিজের কোর্তা, পিরাণ, পাৎলুন খুলে উলঙ্গ হ'ল। সে-ও চলে গেল তার বিবির পাশে। এ-ই শাদীর প্রথম রাতের প্রচলিত রীতি। আলাদিন বিবিকে কোলে তুলে নিয়ে পালঙ্কে শুইয়ে দিল। তারপর যা ঘটার রাতভর তা-ই ঘটল।

প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ভোরের পাখিদের কিচির মিচির শুরু হয়ে গেল। শাহজাদী বুদুর-এর বাহুবন্ধন থেকে আলাদিন নিজেকে মুক্ত ক'রে নিল। সাজপোশাক পরে তার তেজী ঘোড়ায় চেপে চল্‌ল সুলতানের প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে ভেট করতে।

আলাদিন সুলতানের সামনে হাজির হয়ে নতজানু হয়ে কুর্ণিশ করল।

সুলতান উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি বেটা, আশা করি তোমাদের শাদীর প্রথম মিলনের রাত্রি আচ্ছাই কেটেছে, কি বল? বুদুর-এর তবিয়ৎ ঠিকঠাক আছে তো?'

—'হ্যাঁ জাঁহাপনা আমরা উভয়েই রাতভর খুশীর আমেজে মজে ছিলাম। বুদুর রাত্রের নিদের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নিতে এখন গভীর নিদে আচ্ছন্ন। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে এলাম। আজ আপনি আপনার দরবারের পারিষদবর্গ ও সম্মানীয় আদমিদের নিয়ে মেহেরবানি ক'রে আমার প্রাসাদে পায়ের ধূলা দিলে খুশী হ'ব। এক সাথে বসে সবাই মিলে হৈ হল্লা ক'রে খানাপিনা সারতে চাই।'

গতরাত্রে সুলতান তাঁর পারিষদবর্গকে নিয়ে মিছিলের সঙ্গে লেড়কি ও জামাতাকে এগিয়ে দিতে এসে প্রাসাদের প্রধান ফটক অবধি এসেছিলেন। নিজে প্রাসাদের ভেতরে ঢোকেন নি। আজ প্রাসাদে ঢুকে একদম ভড়কে গেলেন। তিনি প্রাসাদের শোভার যে-বিবরণ এর-ওর মুখে শুনেছিলেন আজ চাক্ষুষ ক'রে বুঝলেন আদতে এর শোভা তার চেয়ে ঢের বেশী। দুনিয়ায় কোন মুলুকে এমন সুদক্ষ কারিগর থাকতে পারে যার দ্বারা এমন বহুমূল্য গ্রহরত্নের কারুকার্য সম্বলিত একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারে! তিনি যত দেখছেন ততই যেন তাজ্জব বনছেন।

সুলতান লেড়কি-জামাতা ও অন্যান্য মেহমানদের নিয়ে

আফ্রিদি দৈত্যের সংগৃহীত হরেক কিসিমের মুখরোচক খানা ও বড়িয়া খুসবুওয়ালা সরাব সহযোগে খানাপিনা সারলেন।

বিকালে সুলতান উজিরকে বল্‌লেন—'আমার সুলতানিয়তে যত নামজাদা জহুরী রয়েছে তাদের তলব দাও।'

সুলতানিয়তের নামজাদা তাবড় তাবড় জহুরীরা সুলতানের তলব পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

সুলতান জহুরীদের আলাদিন-এর প্রাসাদের একটি জানালা দেখিয়ে বল্‌লেন—'এই যে জানালাটি দেখছ ; হুবহু এ কিসিমের আর একটি জানালা বানিয়ে দিতে হবে। খরচাপাতির জন্য ঘাবড়াবার কিছু নেই—আমি আছি।'

মুলুকের তাবড় তাবড় জহুরীরা দীর্ঘসময় ধরে জানালাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করল। তারপর ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এ একদমই অসম্ভব। আদতে এতে ব্যবহৃত হীরা-জহরতগুলি একদমই দুষ্প্রাপ্য। জোগাড় করা গেলেও কারুকার্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁত ক'রে তোলা কেবল আমরা কেন দুনিয়ার কোন জহুরীর পক্ষে সম্ভব ব'লে মালুম হচ্ছে না। কোন অর্থের বিনিময়ে এমন আর একটি জানালা তৈরি করা সম্ভব নয় জাঁহাপনা।'

আলাদিন দেখল, সুলতান তার প্রাসাদের ব্যাপারটি নিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন। তাই সে বুদ্ধি খরচ ক'রে তাড়াতাড়ি নাচা-গানার আসর বসিয়ে সুলতানের মগজ থেকে প্রাসাদের ব্যাপারটিকে মুছে দেয়ার কোশিস করল।

নাচা-গানার আসর বসিয়ে তেমন কিছু ফয়দা হ'ল না। তবু অস্থির চিত্ত সুলতান আসরে বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। সেখান থেকে উঠে এসে উজিরকে বল্‌লেন—'আমার ধনাগারে যত হীরা জহরৎ আছে নিয়ে এসো।'

উজির হুকুম তামিল করল। হীরা জহরতের একটি পুঁটুলি এনে সুলতানের হাতে দিলেন।

জহুরীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে মন্তব্য করল—'জাঁহাপনা, এতে যে হীরা-জহরৎ রয়েছে তার আটগুণ হলে যদি কোনরকমে একটি মাত্র জানালা তৈরি করা যেতে পারে।'

সুলতান মুখ ব্যাজার ক'রে, হতাশ দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আলাদিন এবার সুলতানকে নিয়ে তার বিবি বুদুর-এর কামরায় গেল। বল্‌ল—'জাঁহাপনা, মেহেরবানি ক'রে আপনি এখানে বসে লেড়কির সঙ্গে বাৎচিৎ করুন। আমি একটু বাদে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হ'ব।

আলাদিন এবার পাশের কামরায় গিয়ে দরওয়াজা বন্ধ ক'রে চিরাগবাতিটি বের করল। তার গায়ে আলতো ক'রে দু'বার ঘষা দিতেই অতিকায় আফ্রিদি দৈত্যটি হাজির হ'য়ে কুর্ণিশ করে বল্‌ল—'আমি চিরাগবাতির গোলাম। চিরাগবাতিটি যেহেতু আপনার জিম্মায় তাই আমি এখন আপনার গোলামের গোলাম। ফরমাশ করুন, কি করতে হবে।'

আলাদিন তার প্রাসাদের একটি জানালা দেখিয়ে বল্‌ল—'অবিকল এ কিসিমের একটি জানালা জলদি হাজির কর।'

আলাদিন চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে আফ্রিদি দৈত্য একটি জানালা তার সামনে হাজির ক'রে গম্ভীর স্বরে বল্‌ল—'হুজুর, মেহেরবানি করে মিলিয়ে নিন জানালাটি আপনার ফরমাশ অনুযায়ী হয়েছে কিনা।'

আলাদিন মুচকি হেসে বল্‌ল—'হ্যাঁ। তোমার কাজে আমি

খুশী, এখন তুমি বিদায় নাও। ভবিষ্যতে দরকার হলে ফিন তলব করব।'

আলাদিন এবার তার বিবির কামরায় গিয়ে সুলতানকে নিয়ে এল। জানালাটি দেখিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার জানালা তৈরি। মেহেরবানি ক'রে মিলিয়ে নিন আপনার চাহিদা মাফিক হ'ল কিনা।'

আলাদিন-এর কাণ্ড দেখে সুলতান তো একদম হাঁ হয়ে গেলেন। আচ্ছা, কি বুড়া, কিছু বলার হিম্মৎ-ই তাঁর আর রইল না. কোন্ অদৃশ্য হাত যেন তার কণ্ঠ সজোরে চেপে ধরেছে।

আদতে সুলতান নিরানব্বইটি জানালা থেকে সদ্য সংগৃহীত জানালাটিকে বেছে আলাদা করতে পারলেন না।

এবার বার-কয়েক ঢোক গিলে কেটে কেটে কোনরকমে উচ্চারণ করলেন—'না, আলাদিন, আমি হেরে গেলাম। তোমার

সদ্য তৈরি জানালাটিকে আলাদা করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তুমি কামাল করলে আলাদিন।'

উজির বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি তো আগেই বলেছি, আলাদিন'কে আমি এক কৃতী যাদুকর ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না।'

সুলতান বল্‌লেন—'আমিও তো তা-ই ভাবছি উজির। আলাদিন এক লহমার মধ্যে একের পর এক আজব কাণ্ড কি ক'রে ঘটিয়ে চলেছে?'

—'গোস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা। যদি বান্দার কসুর না মানেন তবে দু'-একটি কথা আপনাকে বলি। ক্রমেই আমার ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। আলাদিন কেবলমাত্র এক কৃতী যাদুকরই নয়, গ্রহরত্নাদি বানাতেও সে ওস্তাদ।' সে আদতে বলতে যাচ্ছিল, 'নকল গ্রহরত্নাদি বানাতে ওস্তাদ। বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। বলা তো যায় না হিতে বিপরীত হয়ে যেতে কতক্ষণ। অনন্যোপায় হয়েই ভেতরের কথা ভেতরেই সামলে সুমলে রাখল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতশ' পঁয়ষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশটুকু শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সুলতান রোজ একবার ক'রে লেড়কিকে দেখে যেতে এসে আলাদিন-এর প্রাসাদে নিত্যনতুন বাহারী সব সামানপত্রের আমদানি দেখে তাজ্জব বনতে লাগলেন।

আলাদিন সুলতান-বাদশাহের মাফিক ভোগ-ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করলেও বাল্য কৈশোরের অভাব অনটন ও দুঃখ দুর্দশার ঘটনাগুলিকে দিল্ থেকে একদম মুছে ফেলতে পারল না। বরং নিজের মুলুকের অনাহার ক্লিষ্ট আদমিদের জন্য সে ব্যথিত-মর্মাহত হ'ল। তার দিল্ হরবখত দগ্ধ হতে লাগল। নিজের আর্থিক উন্নতির ফলে তার দিলে এদিকটি আরও বহুৎ, বহুৎগুণ বেড়ে গেল।

আলাদিন চিরাগবাতিটি হাতে নিয়ে পর পর দু'বার ঘষা দিল। মুহূর্তের মধ্যে আফ্রিদি দৈত্য তার সামনে হাজির হ'ল। আলাদিন বল্‌ল—'শোন আফ্রিদি, আমার মুলুকের অনাহারক্লিষ্ট আদমিদের খানাপিনার বন্দোবস্ত তোমাকে করতে হবে। তারা ফি রোজ আমার প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে হাজির হবে। তারা যাতে পাতপেতে পেট পুরে খানাপিনা সারতে পারে তার জন্য তোমাকে খানা জোগাতে হবে। পারবে তো?'

আফ্রিদি দৈত্য ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানাতে গিয়ে বল্‌ল—'হুজুর, আমি চিরাগের গোলাম। যেহেতু চিরাগটি আপনার হেফাজতে আছে তাই আপনারও গোলাম। আপনার হুকুম আমি জরুর তামিল করব। আপনার হুকুম মাফিক আমি ফি রোজ খানা জুগিয়ে যাব।'

পরদিন থেকে ফি রোজ আফ্রিদি দৈত্য হরেক কিসিমের খানা জুগিয়ে মুলুকের গরীব আদমিদের খানাপিনার বন্দোবস্ত করতে লাগল। গরীব আদমিরা পেটের জ্বালা নেভাতে পেরে যারপরনাই খুশী হয়ে দু'বাহু ওপরে তুলে আল্লাহ্-র কাছে আলাদিন ও তার বিবি বুদুর-এর জন্য মোনাজাত করল।

এদিকে সে বুড্ডা মূর যাদুকরের তল্লাশ করা যাক। সে তো আলাদিনকে সে আন্ধার গুহার ফটকে আটক রাখার মাফিক আটক ক'রে সেই যে হাফিস হয়ে গেল তারপর থেকে কিছুদিন তার আর হদিসই মিল্‌ল না। মিট্টির তলায়, আন্ধার গুহায় খানা-পিনা বিনা শুকিয়ে কুঁকড়ে আলাদিন-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল, নাকি জিন্দা আছে এসব ব্যাপার নিয়ে তার তিলমাত্রও ভাবনা চিন্তা ছিল না। সে নিজের হাত নিজেই কামড়াতে লাগল এ-ই ভেবে যে, এত কোশিস-মেহনৎ ক'রে চিরাগবাতিটিকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও হারাতে হ'ল। আর একটু ধৈর্য ধরলে, কোশিস করলেই আলাদিন'কে ধাপ্পা দিয়ে চিরাগবাতিটিকে হাতিয়ে নিতে পারত। ভেবেছিল, দু'-চারটে চড় থাপ্পড় মারলেই সে গোস্‌সা করে চিরাগবাতিটি তাকে দিয়ে দেবে। ফিন আর এক ঝামেলা ছিল। গুহার মধ্যে যাওয়া তার এক্তিয়ার বহির্ভূত। হতচ্ছাড়া আলাদিনও চিরাগবাতিটি নিয়ে কিছুতেই গুহাটি ছেড়ে বেরিয়ে এল না।

চিরাগবাতি সম্বন্ধে বুড্ডা মূর যাদুকরের অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখে আলাদিন-এর সন্দেহ জেগেছিল, এমন তেল-কালিমাখা একটি চিরাগবাতির ব্যাপারে সে এত উতলা কেন? কেনই বা জান হাতে নিয়ে মিট্টির দুনিয়া ছেড়ে একদম পাতালপুরীতে হাজির হয়েছে?

বুড্ডা মূর যাদুকর পরে অবশ্য ভেবেছিল, চিরাগবাতিটি পাবার জন্য এত কোশিস না করাই বোধ করি উচিত ছিল। এতদিন বাদেও তার দিল্ থেকে চিরাগবাতিটির লিপ্সা তিলমাত্রও মুছে যায় নি। এক সকালে বুড্ডা মূর যাদুকরটির গুহার ভেতরে আলাদিন-এর ইন্তেকাল কিভাবে হ'ল তা জানার জন্য কৌতূহলের উদ্রেক হ'ল। টেবিলের ওপর সামান্য বালি বিছিয়ে সে তার যাদুকাঠি দিয়ে হরদম নাড়াচাড়া করতে করতে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াতে লাগল। লেকিন যাদুকরের প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় লাঠিটি বালির গণ্ডী থেকে বার বার বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। যাদুকরের ভেতরে দু' কিসিমের ভাবনার উদয় হ'ল—হয় আলাদিন এখনও জিন্দা, বহাল তবিয়তেই আছে, নতুবা তার গণনারই ভুল হচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ মন্ত্র আওড়ে বুড্ডা মূর যাদুকরটি নিঃসন্দেহ হ'ল, আলাদিন-এর ইন্তেকাল হয় নি। সে জিন্দা আছে, একদম

বহাল তবিয়তেই আছে। সে চীন মুলুকের সুলতানের লেড়কিকে শাদী ক'রে বিবিকে নিয়ে সুখে দিন গুজরান করছে। মুলুকের আদমিদের কাছে সে এখন 'দয়ার অবতার' আলাদিন। বচপনের ভিখমাঙ্গা আলাদিন এখন একদম দয়ার অবতার বনে গেছে। লেকিন কিভাবে তার হালতের এরকম আমূল পরিবর্তন হ'ল তা সুলতান বা তার সুলতানিয়তের আদমিরা না জানালেও তার অন্ততঃ জানা আছে। চিরাগবাতির দৌলতেই আলাদিন-এর দিন ফিরে গেছে।

বুড্ডা মূর যাদুকর সখেদে ব'লে উঠল—'শয়তান বেতমিসটি তবে আমার অস্ত্র আমারই বুকে গেঁথে দিয়েছে! বহুৎ আচ্ছা! আমিও তৈরি হলাম। এবার দেখা যাবে কে, কাকে ঘায়েল করে। তোকে যদি আমি খতম না করেছি তবে আমি মূরের বাচ্চাই নই।'

বুড্ডা মূর যাদুকর আর মরক্কোয় পড়ে না থেকে সোজা চীন মুলুকের উদ্দেশে পাড়ি জমাল। যাদুবল সম্বল ক'রে তিন মাহিনার পথ মাত্র ঘণ্টা তিনেকে পাড়ি দিয়ে সে হাজির হয়ে গেল একদম চীন মুলুকে।

বুড্ডা মূর যাদুকরটি একে-ওকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে হাজির হ'ল আলাদিন-এর সদ্য নির্মিত প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে। বেহেস্তের প্রাসাদের মাফিক ইয়া পেল্লাই খুবসুরৎ প্রাসাদটির দিকে চোখ পড়তেই তার কলিজার জ্বালা যেন আরও হাজার গুণ বেড়ে গেল। সে গর্জে উঠল—'কুত্তার বাচ্চা, ভিখমাঙ্গা আলাদিন, আমাকে ঠকিয়ে তুমি আজ একদম সুলতান বাদশা বনে গেছ! তোমার বে-আদপির বদলা কি ক'রে নিতে হয় তা এবার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়ব।'

বুড্ডা মূর যাদুকর ভেতরে ভেতর গর্জাতে গর্জাতে মতলব আঁটতে লাগল, কি ক'রে আলাদিন-এর কাছ থেকে চিরাগবাতিটি হাতানো যায়। পরমুহূর্তেই সে স্বগতোক্তি করল—'চিরাগবাতি তো আলাদিন-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব, লেকিন কি ক'রে তা সম্ভব? এমন এক অমূল্য সম্পদ তো আলাদিন আর বাইরে, হাতের নাগালের মধ্যে ফেলে রাখে নি। বরং কোন গুপ্ত কামরায়, গুপ্ত সিন্দুকে যক্ষের ধন দৌলতের মাফিক আগলে রেখেছে। তার ওপর নিগ্রো প্রহরীরা হরবখত কড়া পাহারা দিয়ে চলেছে।

বুড্ডা মূর যাদুকর এবার হতাশায় জর্জরিত দিল্ নিয়ে ফিরে এল মুসাফিরখানায়। তার সম্বল যাদুকাঠি আর বালির ঝোলাটিকে নিয়ে ফিন মন্ত্র আওড়াতে শুরু করল। যাদুদণ্ডটি সক্রিয় হ'ল। সে গর্জে উঠল—'বল, আলাদিন চিরাগবাতিটিকে কোন কামরায় কোথায় রেখেছে? সে-ই বা এখন কোথায় অবস্থান করছে?'

এবার যাদুকাঠিটি বালির ওপর আঁক কেটে কেটে বাৎলে দিল—আলাদিন এখন প্রাসাদে অনুপস্থিত, ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে শিকারে গেছে। প্রাসাদ ছাড়ার সময় চিরাগবাতিটিকে সঙ্গে নিতে বা সিন্দুকে রেখে যেতে একদম ভুলে গেছে। সেটি টেবিলের ওপর রেখেই প্রাসাদ ছেড়ে গেছে।

আলাদিন মাঝে-মধ্যেই ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে শিকারে যায়। বিবি বুদুর'কে প্রতিবারেই সঙ্গে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। লেকিন বুদুর কোনবারেই যেতে উৎসাহী হয় নি, এবারও না। তার মতে স্বামী দুদণ্ডের জন্য চোখের আড়াল হলে বরং তার কদর অনেকাংশে বেড়ে যায়। তাকে অনেক, অনেক মধুময় মালুম হয়।

বুড্ডা মূর যাদুকর তড়াক্ ক'রে এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোর্তা-পাৎলুন বদলে ছুটতে ছুটতে বাজারে হাজির হ'ল। একটি তামার চিরাগবাতি খরিদ ক'রে নিল। বরাত আচ্ছা যে, দোকানী প্রথমেই যে-চিরাগবাতিটি দেখাল সেটি অবিকল যাদু-চিরাগবাতিটির মাফিক। দাম মিটিয়ে দিয়ে সে সেটিকে পিরানের জেবে চালান দিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল। এবার লম্বা লম্বা পায়ে হাজির হ'ল আলাদিন-এর প্রাসাদটির প্রধান ফটকের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'চিরাগবাতি বদল করবে! পুরানো চিরাগবাতি বদলে নয়া চিরাগবাতি মিলবে। পুরানোর বদলে নয়া চিরাগবাতি বদল করবে?'

বুড্ডা মূর যাদুকরটির হাঁক ডাক শুনে মহল্লার লেড়কারা পাগল ভেবে তার পিছু নেয়। সাচ্চা বটে, পাগল না হ'লে কেউ পুরানো চিরাগবাতির বদলে নয়া চিরাগবাতি দিতে চায়!

এদিকে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুদুর বাঁদীদের সঙ্গে বুড্ডাটির মজা দেখতে লাগল। গায়ে একটি বিচিত্র আলখাল্লা চাপিয়ে এক বুড্ডা আজব এক বুলি আওড়ে চলেছে— 'পুরানো চিরাগবাতির বদলে নতুন চিরাগবাতি দেয়া হবে।' বুদুর তার সঙ্গী বাঁদীদের বলতে লাগল—'এ আবার কেমন ফেরি করার রীতি। আদমিটির দিমাক একদম গড়বড় হয়ে গেছে। নইলে এমন আজব কাম কেউ করে! হাতের ঝকমকে চিরাগবাতিটির বদলে পুরানো চিরাগ নেবে'—পাগল কাহিকার বলেই সে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে।

শাহজাদী বুদুর-এর সঙ্গী বাঁদীরাও তার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়।

এদিকে মহল্লার লেড়কারা দলবেঁধে বুড্ডাটির পিছনে লেগেছে। বুড্ডা মূর যাদুকরের কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। সে গলাছেড়ে চিল্লিয়েই চলেছে—'পুরানা চিরাগবাতির বদলে নয়া চিরাগবাতি কে নেবে?'

শাহজাদী বুদুর এক বাঁদীকে বল্‌ল—'আমাদের কামরার যে-পুরানো চিরাগবাতিটি আছে সেটি নিয়ে আয় তো।' তারপর অন্য এক বাঁদীকে বল্‌ল—'ফটকের পাহারাদারকে দিয়ে এক খোজা

নফরকে তলব কর'। খোজা নফরটি মালকিনের তলব পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। ইতিমধ্যে বাঁদীটি কামরা থেকে চিরাগবাতিটি নিয়ে এসে মালকিনের সামনে দাঁড়াল।

বুদুর খোজা নফরটিকে বল্‌ল—'যা এ-চিরাগবাতিটি নিয়ে গিয়ে দেখতো বুড্ডাটি নয়া একটি চিরাগবাতি দেয় কিনা। বলছে তো দেবে।'

দু' আঙুলের সাহায্যে তেল-কালি মাখানো চিরাগবাতিটিকে কোনোরকমে ধরে নিয়ে খোজা নফরটি গোস্‌সায় বিড় বিড় করতে করতে চল্‌ল প্রধান ফটকের দিকে। সে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল—যত্তসব নক্করবাজের আমদানি হয়েছে। ধান্দাবাজী কারবার শুরু করেছে। নইলে পুরানো চিরাগবাতির বদলে কেউ নয়া চিরাগবাতি ফেরি করে! নির্ঘাৎ চিরাগবাতি বদলের নামে শয়তান বেল্লিক বুড্ডাটি অন্য কোন না কোন বদ ধান্দায় রয়েছে।

খোজা নফরটি আগের মাফিকই দু' আঙুলে চিরাগবাতিটি ধরে বুড্ডা মূর যাদুকরটির সামনে গিয়ে বল্‌ল—'কি গো ফেরিওয়ালা, এ-চিরাগবাতিটির বদলে একটি নয়া চিরাগ দেবে?'

চিরাগবাতিটি দেখেই তার চোখ দুটো একদম জ্বল জ্বল করতে লাগল। পারলে সে যেন তার হাত থেকে সেটি ছিনিয়ে নিয়ে সোজা দৌড় দেয়। চিরাগবাতিটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। এ-ই তার তামাম জিন্দেগীর স্বপ্ন-সাধের চিরাগবাতি। এক দফা হাতের মুঠোয় এসেও বরাত গুণে হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। না, আর দিল্লাগী নয়। ঝটপট কাজ সেরে এখান থেকে চম্পট দিতে হবে।

বুড্ডা মূর যাদুকরটি এবার একদম বাজপাখির মাফিক ছোঁ মেরে নফরটির হাত থেকে চিরাগবাতিটি নিয়ে নিল। উন্মাদের মাফিক বার কয়েক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। পর মুহূর্তেই তার হাতের নয়া চিরাগবাতিটি গুঁজে দিয়ে শাঁই শাঁই ক'রে হাঁটতে লাগল। বলা তো যায় না। বরাত মন্দ হলে আলাদিন হয়ত সদলবলে শিকার সেরে ফিরেও যেতে পারে। ব্যস, তবেই বিলকুল পরিকল্পনা একদম বরবাদ হয়ে যাবে।

বুড্ডা মূর যাদুকর হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হ'ল মুসাফির খানার কামরায়। দরওয়াজা বন্ধ ক'রে চিরাগবাতিটির গায়ে পর পর দু' বার হাত দিয়ে ঘষা দিল।

চোখের পলকের মধ্যে ইয়া দশাসই দেহধারী আফ্রিদি দৈত্যটি আবির্ভূত হয়ে তার সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল—'হুজুর, আমি চিরাগবাতিটির গোলাম। যেহেতু চিরাগবাতিটি এখন আপনার জিম্মায় তাই আমি আপনার গোলামের গোলাম।'

বুড্ডা মূর যাদুকরটি বাজখাই গলায় ধমক দিয়ে

উঠল—'তোমার বকবকানি থামাও হে পালোয়ান। আর গলা একটু নামিয়ে বাৎচিৎ কর। কানের পর্দা ফেটে যাবে যে!' এবার চিরাগবাতিটি আলখাল্লার জেবে রাখতে রাখতে বল্‌ল—'শোন আফ্রিদি, ক'দিন আগে তোর আগের মালিকের জন্য যে-প্রাসাদটি বানিয়েছিলি সেটিকে আলতো ক'রে তুলে নিয়ে আমার মুলুক মরক্কোতে এক নির্জন-নিরালা প্রান্তরে রেখে দিয়ে আয়।'

আফ্রিদি দৈত্যটি কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জো হুকুম হুজুর!' আফ্রিদি দৈত্য বাতাসে মিলিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই সে বুড্ডা মূর যাদুকরের সামনে হাজির হয়ে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'হুজুর, প্রাসাদটিকে মরক্কো মুলুকে রেখে এসেছি। এবার মেহেরবানি করে ফরমাশ করুন আমাকে আর কি করতে হবে।'

—'এবার আমাকে আমার মুলুক মরক্কোতে পৌঁছে দিয়ে এসো।' আফ্রিদি দৈত্য বুড্ডা মূর যাদুকরকে কাঁধে চাপিয়ে মরক্কোয় তার প্রাসাদে পৌঁছে দিল।'

এদিকে আলাদিন তখন ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে শিকার সেরে ফিরে আসে নি। পরদিন ভোর হওয়ার একটু বাদেই সুলতান লেড়কি বুদুর-এর সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্য নিজের প্রাসাদ ছেড়ে আলাদিন-এর প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা হলেন। কয়েক কদম এগিয়েই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ দুটো কপালে তুলে স্বগতোক্তি ক'রে উঠলেন— 'ইয়া আল্লা! আলাদিন-এর প্রাসাদ গেল কোথায়!' ভাবলেন, তিনি কি খোয়াব টোয়াব দেখছেন নাকি, না, নিজের চোখ দুটোর ওপর একদম আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

তার বুকের ভেতরে কলিজাটি তিরতির ক'রে কাঁপতে শুরু করেছে। তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—'ইয়া আল্লাহ! আমার লেড়কি—আমার লেড়কি বুদুর'কে তুমি কোথায় নিয়ে গেলে? আমার জান, আমার কলিজার সমান বুদুর'কে তুমি ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও আমার একমাত্র লেড়কিকে।'

সুলতান এবার নিঃসন্দেহ হলেন, উজির তবে ঠিকই বলেছিল, আলাদিন এক যাদুকর। যাদুবল সম্বল করেই সে নিত্য নতুন বুজরুকি দেখাচ্ছে। তবে তো তার বাৎ-ই সাচ্চা বটে।

সুলতান লেড়কির শোক সামলাতে না পেরে উন্মাদের মাফিক ছুটতে ছুটতে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন। কামরায় পায়চারি ক'রে একদম দাপাতে লেগে গেলেন। কলিজা তার নিস্তেজ হয়ে আসার জোগাড় হ'ল। নিজের চুল-দাড়ি নিজেই ছিঁড়তে লাগলেন। দু' হাত ওপরে উত্থিত ক'রে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্লেন—'খোদা, তুমি না মেহেরবান! তবে আমার লেড়কিকে কোথায় তুমি লুকিয়ে রেখেছ, বল? কোথায় আমার বেটি বুদুর বাৎলে দাও।'

ক্রোধোন্মত্ত সুলতানের হুকুম তামিল করতে চারদিকে সশস্ত্র সিপাহী ছুটল ফেরেফবাজ আলাদিনকে ধরে আনার জন্য। কড়া হুকুম, পাতালের ভেতর লুকিয়ে থাকলেও আলাদিনকে তাঁর সামনে হাজির করতে হবে।

বুড্ডা উজির ঠোঁট টিপে টিপে হেসে বল্ল—'জাঁহাপনা, আমি তো আগেই বাৎলেছিলাম, শয়তান নক্করবাজ যাদুকর আলাদিনকে এত সহজে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। আপনি তাকে এতই বিশ্বাস ক'রে ফেল্লেন যে, তড়িঘড়ি শয়তান ধাপ্পাবাজটির সঙ্গে একদম লেড়কির শাদী পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। এখন নিজের আঙুল নিজে কামড়ানো ছাড়া গত্যন্তরও কিছু দেখছি নে। বেল্লিকটি শাহজাদীকে শাদী ক'রে নির্ঘাৎ তাকে নিয়ে কেটে পড়েছে।

সুলতানের কিছু বলার মুখই নেই। তিনি নিতান্ত অপরাধীর মাফিক জমিনের দিকে স্থির নজরে তাকিয়ে রইলেন।

কয়েকজন সশস্ত্র সিপাহী জঙ্গলে গিয়ে শিকাররত আলাদিন'কে খুঁজে বের করল। তাকে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে সুলতানের অভিপ্রায়ের ব্যাপার ব্যক্ত করল।

সিপাহীরা আলাদিন-এর কোমরে রশি বেঁধে দরবারে সুলতানের সামনে হাজির করল।

এদিকে প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে কৌতূহলী প্রজারা দলে দলে কাতারে কাতারে হাজির হতে লাগল। সুলতানের জামাতার কোমরে রশি চড়েছে, কম ব্যাপার। কারো মুখে এতটুকু হাসি তো নেই-ই, বরং জমাট বাঁধা বিষণ্ণতা সবার চোখে-মুখে ভর করেছে। তারা থেকে থেকে সমস্বরে জিগির তুলতে লাগল—'দয়ার অবতার আলাদিন-এর বেকসুর খালাস চাই। দয়ার অবতার আলাদিনকে খালাস দিতে হবে—দিতে হবে!'

সুলতান গোসসায় বিলকুল কাঁপছিলেন। আলাদিনকে চোখের সামনে দেখেই জল্লাদকে বল্লেন—'নিয়ে যাও, ফেরেফবাজ আলাদিন'কে কোতল কর।'

আলাদিন চোখে-মুখে এতটুকুও ভীতু নয়। আল্লাহর ওপর পুরো ভরসা রেখে সে জল্লাদের রশির টানে এগিয়ে যেতে লাগল। জল্লাদ আলাদিন'কে নিয়ে প্রাসাদের ছাদের ওপর হাজির হ'ল।

আলাদিন জানে আল্লাহ্ আজ না হোক কাল বিচার করবেন। পাপের ফল সুলতানকে ভোগ করতে হবেই হবে।

ঘাতকের হুকুমে আলাদিন হাঁটুগেড়ে বসে ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতের জন্য তৈরি হ'ল। জল্লাদ তার চোখে কালো কাপড়ার ফেটি বেঁধে দিল। এবার হাতের খড়্গটি মাথার ওপরে উঁচিয়ে ধরল। এবার শুধু বাকী খড়্গ সমেত হাতটিকে নামিয়ে দেয়া। ব্যস, তবেই কাজ হাসিল।

এদিকে প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত প্রজারা হরদম ধ্বনি দিয়ে চলেছেন—'দয়ার অবতার আলাদিন'কে খালাস দিতে হবে! দয়ার অবতার আলাদিন-এর খালাস চাই—খালাস দাও!'

প্রজাদের আকুল আর্তস্বরে ঘাতকের খড়্গটি ধীরে ধীরে নেমে এল। পারল না তার গর্দান নিতে।

লেকিন সুলতানের হুকুম তামিল না করলে ঘাতককে কঠিন সাজা পেতে হবে। নোকরি তো খতম হবেই ; উপরন্তু গর্দান যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সে উপায়ান্তর না দেখে ঝট করে খড়্গটিকে ফিন মাথার ওপরে তুলে নিল। সবে আঘাত করতে যাবে তখনি প্রধান ফটকের সামনে থেকে জোর চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল। এবার আর কেবলমাত্র চিল্লাচিল্লি করেই তারা রেহাই দিল না। ইয়া বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারতে শুরু করল ছাদের ওপর। ঘাতক এবার প্রমাদ গুণল।

সুলতান একতলা থেকে চিল্লিয়ে ঘাতকের উদ্দেশে বলতে লাগলেন—'শয়তান—বেতমিস—বেল্লিক কাঁহিকার। জলদি আমার হুকুম তামিল কর। নইলে তোর গর্দান যাবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

প্রজাদের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চল্ল। দ্বাররক্ষীরা তাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। জোয়ারের পানির মাফিক হুড়মুড় ক'রে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে একদম ছাদে চলে গেল।

সুলতান বেকায়দা বুঝে জল্লাদকে নিরস্ত হতে হুকুম দিলেন। জনতার উত্তেজনা এবার কিছুটা প্রশমিত হ'ল। সুলতান আলাদিন-এর জান রক্ষার আশ্বাস দিলেন। প্রজারা এবার এক এক ক'রে যে

যার মকানে ফিরে গেল।

সুলতানের হুকুমে আলাদিন'কে তাঁর সামনে হাজির করা হ'ল। সুলতান বাজখাই গলায় গর্জে উঠলেন—'শোন আলাদিন, প্রজাদের অনুরোধে এবারের মত তোমার জান বাঁচল বটে। লেকিন আমার লেড়কি বুদুরকে যদি ফিরিয়ে এনে না দাও তবে তামাম দুনিয়ায় কারো হিম্মৎ নেই তোমার ইন্তেকাল রোধ করে। কোথায় আমার লেড়কি বল?'

সুলতানের ব্যভারে আলাদিন বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। সে কিছুই ঠাহর করতে পারলে না, সুলতান কেন তার গর্দান নেয়ার হুকুম দিলেন। কেনই বা আচমকা তাঁর লেড়কিকে ফিরিয়ে দিতে বলছেন? সে বিলকুল তাজ্জব বনে গিয়ে সুলতান'কে প্রশ্ন করল—'জাঁহাপনা, আমার দিমাকে তো কিছুই আসছে না। আমার শাদী করা বিবি আমার প্রাসাদে থাকবে, আমার ঘর করবে এ-ই তো স্বাভাবিক। আপনি যেমন ফি রোজ একবার ক'রে তাকে দেখে আসতেন ভবিষ্যতেও তা-ই যাবেন। শাদী দেয়া লেড়কিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আপনি কি যে ফয়দা উঠাতে চাইছেন, আমার দিমাকে আসছে না। কেনই বা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আপনি এমন উতলা হচ্ছেন? আমার যদি কোন গুস্তাকী হয়েই থাকে তবে সাফ সাফ বাতান, আমি জরুর নিজেকে শুধরে নেব।'

—'বেল্লিক কাঁহিকার! তুমি কি এদিককার ব্যাপার কিছুই জান না? তোমার ব্যাপার স্যাপার দেখে মালুম হচ্ছে, একদম আশমান থেকে পড়ছ? জানালা দিয়ে ময়দানের দিকে এক ঝলক নজর দিয়ে দেখ তো তোমার প্রাসাদ দেখতে পাও কি না?'

আলাদিন জানালার পর্দা সরিয়ে ময়দানের দিকে এক লহমায় তাকিয়েই বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। হতাশায় কলিজা চিপ্‌সে গেল। আফ্রিদি দৈত্যের তৈরি প্রাসাদটি একদম হাফিস হয়ে গেছে। ফাঁকা ময়দান খা-খা করছে। আদৎ ব্যাপারটি বুঝতে তার বাকী রইল না। মরক্কোর ফেরেফবাজ শয়তান যাদুকর-ফকিরটিরই কাজ। তা নইলে এমন আজব কাজ করতে পারে দুনিয়ার কোন আদমিরই হিম্মৎ নেই।'

আলাদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার বাইরে থেকে নজর ফিরিয়ে এনে সুলতানের দিকে তাকানো মাত্র ক্রোধোন্মত্ত সুলতান আহত নেকড়ের মাফিক গর্জে উঠলেন—'আলাদিন, আমার সাফ বাৎ শোন, তোমার প্রাসাদ নিয়ে আমার ভাবনার কিচ্ছু নেই। আমার লেড়কিকে ফেরৎ দাও। ব্যস, তোমার সঙ্গে আমার যাবতীয় সম্পর্ক চুকে যাবে। তা নইলে এবার তোমাকে রেয়াৎ করলেও আখেরে তোমার জান রক্ষা করতে পারে এমন হিম্মৎ দুনিয়ার কারোরই নেই।'

আলাদিন হাত কচলে জবাব দিল—'জাঁহাপনা, দুনিয়ায় কেউ, কারো ইন্তেকাল ঠেকাতে যেমন পারে না তেমনি কারো জানও খতম করতে পারে না। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে নসীব। ইন্তেকালের ভয়-ডর আমার তিলমাত্রও নেই। তবে ইয়াদ রাখবেন, শাহজাদী বুদুর যেমন আপনার জানের চেয়ে বড়া তেমনি সে আমারও কলিজার সমান বিবি। তার অভাবে আমার জান টিকবে না। যেখান থেকে হোক, যেভাবেই হোক তাকে তাল্লাশ ক'রে আমাকে বের করতেই হবে!'

—'তোমার মামুলি বাৎ রেখে আমার সাফ বাৎ শুনে রাখ—আমি তোমাকে চল্লিশদিন সময় দিচ্ছি। যদি এর মধ্যে আমার বুদুর'কে ফিরিয়ে আনতে না পার তবে তোমার নসীবে যে কি আছে তা তুমি অনুমানও করতে পারছ না। আর যদি পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচাবার কোশিস কর তবে তুমি দুনিয়ার যেখানেই যাও না কেন আমার সৈন্যরা তোমাকে পাকড়াও করে, আমার সামনে হাজির করবেই।'

—'জাঁহাপনা পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি আজ, এ মুহূর্তেই বুদুর-এর তল্লাশে বেরোচ্ছি। যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে না পারি তবে আমি নিজেই আমার জান খতম করে দেব। আপনাকে ঝুটমুট তকলিফ করতে হবে না।'

আলাদিন তার বিবি বুদুর-এর তল্লাশে পথে বেরলো। এক এক ক'রে গ্রাম-গঞ্জ-নগর পেরিয়ে দিনের পর দিন অফুরান তকলিফ করে তার বিবির তল্লাশ চালাতে লাগল। লেকিন কোন মুলুকে, কারো কাছেই তার কলিজার সমান বিবি বুদুর-এর হদিস মিল্‌ল না। মহাধড়িবাজ বুড্ডা মূর যাদুকর। সে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে বুদুর'কে লুকিয়ে রেখেছে আলাদিন তার কোন পাত্তাই করতে পারল না। মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে তার কোন ফয়দাই হ'ল না।

একদিন আলাদিন এক নদীর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতের কাছে কোন নৌকাই পেল না যেটা চেপে সে নদী ডিঙোতে পারে। কোন ফিকির করতে না পেরে নদীর কিনারে গালে হাত দিয়ে বসে সে ভাবতে লাগল, বুদুরকে না পেলে এ জান থাকা আর না থাকা তো দু-ই সমান।

নদীর পানি যেন কুল কুল স্বরে তাকে ডাকছে, তোমার দুনিয়ার খেল্‌ খতম হয়ে গেছে, এবার পানিতে এসে চিরশান্তি লাভ কর।

অস্থিরচিত্ত আলাদিন-এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে উন্মাদের মাফিক দাপাদাপি ক'রে দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে লেগে গেল। আচমকা সে চিল্লিয়ে উঠল—'খোদা, আমি এমন কি ঘোরতর গুণাহ করেছি যার জন্য তুমি আমাকে এমন এক কঠিন সাজা দিলে? সে সমানে চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

অচানক এক আজব ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। আলাদিন-এর হাতে বুড্ডা মূর যাদুকরের দেয়া অঙ্গুঠিটি ছিল। সেটি পাহাড়ে নিচে, ইঁদারায় নামার পূর্বমুহূর্তে বুড্ডা নক্কড়বাজ যাদুকরটি তাকে দিয়ে অভয় দেয়। আত্মরক্ষার কোশিস বাৎলে দেয়। সেটিতে নিজের অজান্তে হাতের ঘষা লাগতেই এক আফ্রিদি দৈত্য তার সামনে আবির্ভূত হয়ে কুর্নিশ ক'রে বলে—'জাঁহাপনা আমি অঙ্গুঠির মালিক, তাই আমি আপনার নফরের নফর।'

আফ্রিদি দৈত্যকে সামনে দেখেই খুশীতে আলাদিন-এর দিল নেচে উঠল। সে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বল্‌ল—'শোন, অঙ্গুঠির দৈত্য, মরক্কোর বুড্ডা মূর যাদুকর আমার সঙ্গে নক্কড়বাজী শুরু করেছে। আমি পাহাড়ের তলা থেকে যাদু-চিরাগবাতি উদ্ধার করে এনেছিলাম। বুড্ডা মূর যাদুকর আমার প্রাসাদ থেকে সেটি ধাপ্পা দিয়ে নিয়ে ভেগে যায়। চিরাগবাতিটির গোলাম আফ্রিদি দৈত্য আমার গোলাম ছিল। আর তাকে কাজে লাগিয়ে আমি হীরা-জহরতের ফল আমদানি ক'রে সুলতান'কে শাদীর যৌতুক মিটিয়ে শাহজাদী বুদুর'কে শাদী করি। তারপর আফ্রিদি দৈত্যই আমার বসবাসের জন্য একটি সুদৃশ্য ও সুবিশাল প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছিল। চিরাগবাতিটি হাতিয়ে নিয়ে গিয়ে সে বুড্ডা মূর যাদুকরটি আফ্রিদি দৈত্যকে দিয়ে আমার বিবিকে সমেত প্রাসাদটিকে যে কোথায় নিয়ে চলে গেছে মালুমই নেই। এ মুহূর্তে তুমি ছাড়া আর কার ওপরই

বা ভরসা করি, বল তো? এখন তোমার ওপর আমার হুকুম রইল আমার বিবি ও প্রাসাদটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে, ইয়াদ থাকবে তো?'

আফ্রিদি দৈত্যটি কুর্নিশ ক'রে ব্যাজার মুখে বল্‌ল—'হুজুর, মেহেরবানি ক'রে কসুর মানবেন না। আপনার অন্য যেকোন হুকুম আমি মুখ বুজে তামিল করব। লেকিন এ-কাজটি করতে আমি অক্ষম। মেহেরবানি ক'রে আমাকে রেয়াৎ ক'রে দিন।'

—'এ কী আজব বাৎ শোনাচ্ছ আফ্রিদি? তুমি তো আমাকে তাজ্জব বানালে! তুমি তো আগেই আমাকে বলেছিলে, তোমার অসাধ্য কোন কাজই নেই। আর এখন একদম আশমান থেকে জমিনে ছুঁড়ে মারছ যে?'

—'গোস্‌সা করবেন না হুজুর। আদতে চিরাগের দৈত্য আমার ওস্তাদ। তার ওপর তো আমার হুকুম চলবে না মালিক।'

—'তুমি যে আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে চাইছ আফ্রিদি। এখন ফিকির কি করা যায়, বল তো? শাহজাদী বুদুর'কে উদ্ধার করার ফিকির কি বাতাও।'

—'হুজুর, যদি হুকুম করেন তবে ওই প্রাসাদের ফটকের সামনে আপনাকে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি। তারপর আপনি ফন্দি ফিকির যা হয় ক'রে নেবেন।'

আফ্রিদি দৈত্যের বক্তব্য শুনে আলাদিন-এর কলিজায় পানি এল। সে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, তবে তা-ই কর। আমাকে তবে প্রাসাদটির ফটকের সামনেই ছেড়ে দিয়ে এসো।'

আফ্রিদি দৈত্য এবার আলাদিন'কে কাঁধে চাপিয়ে শাঁই শাঁই ক'রে উড়ে চল্‌ল। কয়েক লহমার মধ্যেই মরক্কোর ফাঁকা ময়দানের বুড্ডা মূর যাদুকরটির ইয়া পেল্লাই প্রাসাদটির ফটকের সামনে নামিয়ে দিল।

আলাদিন ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে প্রাসাদটিকে দেখতে লাগল। নিঃসন্দেহ হ'ল—হ্যাঁ তার সে-প্রাসাদটিই তো বটে। সে ভাবল, ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে দ্বাররক্ষীর সন্দেহ হতে পারে, বুড্ডা মূর যাদুকরটির নজরে পড়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সে প্রাসাদটির পিছনের দিকের এক ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে রইল। তার বিবি বুদুর-এর কামরার দিকে ঝোঁপের ফাঁক দিয়ে নজর রাখতে লাগল। আজব কাণ্ড বটে, দীর্ঘ সময়েও বুদুর'কে জানালার ধারে দেখতে পেল না। তার কলিজায় মোচড় মেরে উঠল, তবে কি নক্কড়বাজ শয়তান বুড্ডা তাকে হাফিস ক'রে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছে? ঝোঁপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে প্রাসাদের চারদিকে চক্কর মেরে তাল্লাশ করবে, ভরসা পাচ্ছে না। হারামী বুড্ডার নজরে পড়ে গেলে পুরো ব্যাপারটিই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

ভেড়ার মগজ রসুইখানায় খানা পাকাবার জন্য পাঠিয়ে ক্ষুধার্ত আদমি যেমন পেটে হাত বুলাতে বুলাতে অপেক্ষা করতে থাকে, বিলকুল সেরকম ধৈর্যে বুক বেঁধে আলাদিন ঝোঁপের আড়ালে সুযোগের অপেক্ষায় বসে রইল।

এদিকে বুদুর-এর হালৎ সসমিরা। স্বামীর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার পর সে যে কলিজার জ্বালা নিয়ে শয্যা নিয়েছে তারপর সে আর উঠে বসে নি পর্যন্ত। গোসল আর খানাপিনার তো প্রশ্নই ওঠে না।

বুদুর-এর দিমাকে এখন একমাত্র চিন্তা কি ক'রে সে ফিন,
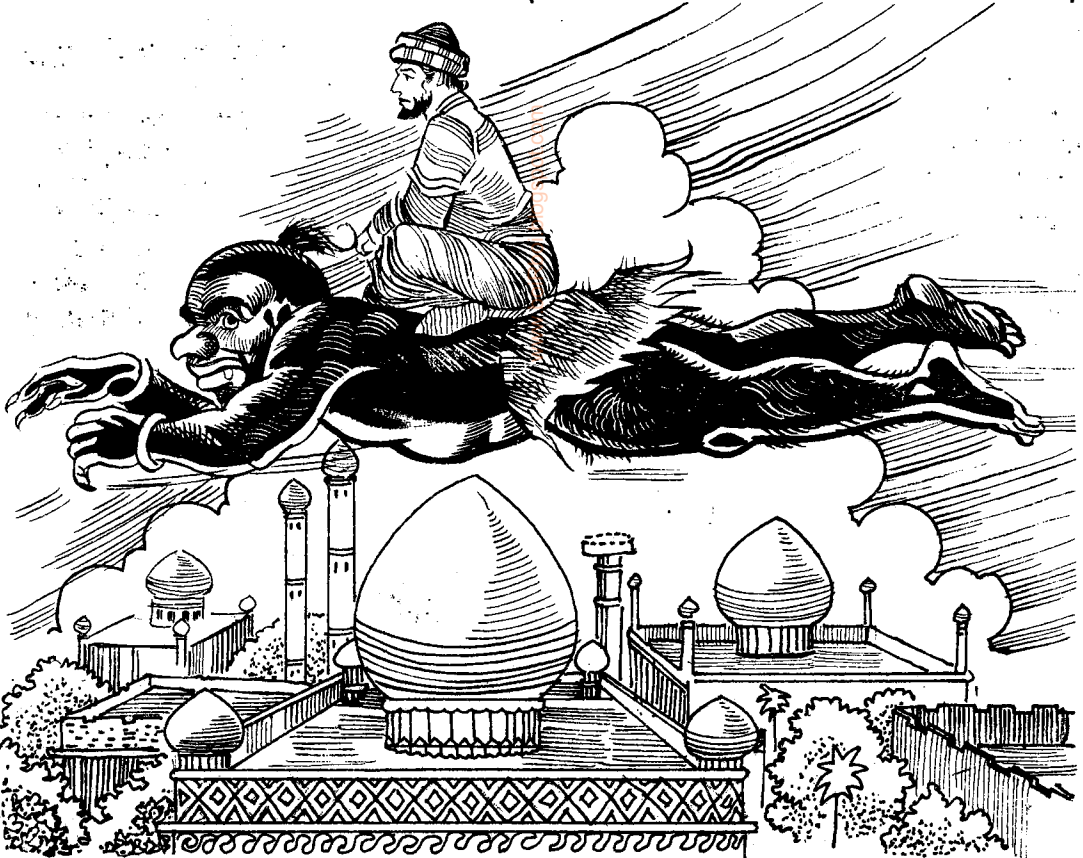
কলিজার সমান স্বামীর কাছে ফিরে যাবে, তার বুকে মুখ গুঁজে স্বস্তি লাভ করবে।

শয়তান বেতমিস বুড্ডা যাদুকরটি ফি রোজ একবার ক'রে শোকসন্তপ্তা বুদুর-এর কামরায় আসে। মিঠা বাৎ ব'লে তার দিল্‌কে গলাবার কোশিস করে। কোশিস করে আলাদিনের দিক থেকে তার দিল্‌কে নিজের দিকে ফেরাবার। ব্যর্থ হয়। হতাশায় জর্জরিত দিল্ নিয়ে সে ফিরে যায়।

বুদুর-এর বুকের সবটুকু জায়গা যে আলাদিন দখল ক'রে রয়েছে সেখানে কবরখানার যাত্রী বুড্ডা মূর যাদুকরটির জায়গা হবে কেন? লেকিন সে নিঃসন্দেহ ফেরেফবাজ শয়তান বুড্ডাটি তাকে কিছুতেই মুক্তি দেবে না। সে এখন মিঠা বুলি আওড়ে তার দিল্ ভিজাবার কোশিস করছে বটে। লেকিন দু' দিন বাদেই তার আদৎ চেহারা বেরিয়ে পড়বে। কি ক'রে সে তার জানোয়ার সুলভ লালচের সঙ্গে মোকাবেলা করে সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে ভেবে ভেবে তার দিমাক খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়।

এদিকে আলাদিন ঝাঁকড়া গাছটির আড়ালে বসে জানালার দিকে নজর রেখেই চলেছে। কখন যে বিকালের আলো নিভে ক্রমে সন্ধ্যার আন্ধার নেমে এসেছে, লক্ষ্যই করে নি। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'আমার জান, আমার কলিজা বুদুর কি তবে সে কামরায় নেই? আজব ব্যাপার তো!' সে আবার অঙ্গুঠিটি ঘষে আফ্রিদি দৈত্যটিকে নিয়ে এল।

আফ্রিদি দৈত্যটি কুর্ণিশ ক'রে বল্‌ল—'হুকুম করুন হুজুর। বলুন, কি করতে হবে ফরমাশ করুন।'

—'শোন আফ্রিদি, আমি তামাম দিন জানালাটির দিকে এক নজরে চেয়ে রয়েছি। লেকিন আমার বিবি এক লহমার জন্যও জানালায় এল না। তুমি পাত্তা লাগিয়ে আমাকে জানাও, সে এ-প্রাসাদে আছে, কি না? যাও, ফিকির ক'রে ঠিক পাত্তা নিয়ে ফিরবে।'

আফ্রিদি দৈত্য মুহূর্তের মধ্যে হাফিস হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই ফিরে এসে কুর্ণিশ সেরে বল্‌ল—'হুজুর, আপনার বিবি ও কামরাতেই আছে। পালঙ্কে হরদম চোখের পানি ঝরিয়ে চলেছে। চোখ দুটো ফুলে একদম ঢোল হয়ে গেছে।'

—'আফ্রিদি, তুমি এক খোজা নফরের বেশ ধরে বুদুর-এর কাছে হাজির হও। তাকে আমার হয়ে বলবে, একবারটি যেন জানালায় এসে বাইরের দিকে নজর দেয়, ইয়াদ থাকবে?'

আফ্রিদি দৈত্যের মুখে স্বামীর সমাচার শোনামাত্র বুদুর-এর কলিজা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। তড়াক্ ক'রে পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। চিল্লিয়ে বলতে থাকে—'তুমি এসেছ বুদুর। আমার কলিজা আমার জান বুদুর, তুমি এসেছ? কাছে এসো। একদম জানালার গায়ে এসে দাঁড়াও। ভয় ডরের কোন ব্যাপার নেই। ফেরেফবাজ শয়তান বুড্ডাটি এখন প্রাসাদে অনুপস্থিত। কখন ফিরবে ঠিক ঠিকানা নেই। কার পাকাধানে মই দিতে, কার কলিজা উপড়ে আনতে বেরিয়েছে, কে জানে।

আলাদিন এক লাফে ঝাঁকড়া গাছটির তলা থেকে বেরিয়ে জানালাটির কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

বুদুর চোখের পানি মুছতে মুছতে বল্‌ল—'আমি জানি, আমার তল্লাশ করতে করতে আজ না হোক দু' দিন বাদে তুমি আমার কাছে আসতেই।'

খোজা নফরটি এবার বুদুর-এর হুকুমে প্রাসাদের ফটক খুলে দিল।

বুদুর অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় আলাদিন'কে বল্‌ল, ফটক খুলে দিয়েছে। চুপি চুপি ভেতরে চলে এসো।

আলাদিন চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে তার বিবি বুদুর-এর কামরায় পৌঁছে গেল।

বুদুর ডুকরে ডুকরে কেঁদে আলাদিন-এর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলাদিন তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌ল—'কেঁদো না, চোখের পানি মোছ। আমি একবার যখন তোমার কাছে আসতে পেরেছি, মেরে দিল্ কা টুকরা, তোমাকে আমি নক্কড়বাজ শয়তান বুড্ডার থাবা থেকে উদ্ধার করবই। আর শয়তানটিকে উচিত শাস্তি দিয়ে ছাড়ব, দেখে নিও। সবার আগে বল, তোমার কামরায় লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত কোন জায়গার হদিস দিতে পার কিনা।'

—'পারি। খুব পারি।' তর্জনি নির্দেশ ক'রে এবার বল্‌ল—'ওই যে পেল্লাই আলমারিটি দেখতে পাচ্ছ, আমার সাজপোশাক ওতে থাকে। বিলকুল সামানপত্র আমি একটি তাকে তুলে দিচ্ছি. ব্যস, তুমি আরাম ক'রে শুয়ে বসে—রাত্রে নিদও যেতে পারবে।'

—'রেখে দাও তোমার আরাম আর নিদ। শয়তান বুড্ডাটির হাত থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেই হ'ল। আজ রাত্রেই কাজ চুকিয়ে তোমাকে নিয়ে চম্পট দেয়ার ধান্দায় আছি।'

বুদুর ব্যস্ত হাতে আলমারিটি খালি করতে লেগে গেল।

আলাদিন বল্‌ল—'আর এক বাৎ, যাদু চিরাগবাতিটি বুড্ডা কোথায় রেখেছে, হদিস জান?'

—'বুড্ডা আবেগের মুহূর্তে আমাকে বলেছে বটে, যাদু চিরাগটির দৌলতেই নাকি সে আমাকে প্রাসাদটি সমেত চীন মুলুক থেকে একদম মরকোতে নিয়ে আসতে পেরেছে। আর তার দৌলতে তুমিও নাকি এ-প্রাসাদটি বানিয়েছিলে। আমার নসীব মন্দ, নইলে নক্কড়বাজ শয়তান বুড্ডাটির ভাঁওতায় ভুলে পুরানো

চিরাগবাতিটি বদল ক'রে এক নয়া চিরাগবাতি নিতে যাই। আমার কি ছাই মালুম ছিল, ওই বাঁকাচোরা-ভাঙা চিরাগবাতিটি দিয়েই তামাম দুনিয়াটিকে কব্জায় নিয়ে আসা সম্ভব? বুড্ডাটি আমাকে এ-ও লালচ দেখিয়েছে, মাত্র একটিবার তার মতে মদত দিলেই সে তামাম দুনিয়ার সুখ-সম্পদ আমার পায়ে এনে জড়ো ক'রে দেবে। আমি চাইলে সুলতান-বাদশার বেগম এনে হাজির করবে আমার বাঁদী হয়ে সেবা করার জন্য। তার বদলে কেবল একটিবার আমাকে তার প্রস্তাবে রাজী হতে হবে, ব্যস।'

—'একদম সাচ্চা বটে, চোখের সামনে তো চিরাগবাতিটির হিম্মৎ দেখছ। নইলে তামাম দুনিয়ার সুলতান-বাদশাদের ধন দৌলত এককাট্টা করলেও এমন আর একটি প্রাসাদ তৈরি করা সম্ভব নয়। মিট্টির দুনিয়ার কোন আদমির পক্ষেই এমন আজব ব্যাপার সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এখন আগে আদৎ বাৎ সেরে ফেলা যাক। চিরাগবাতিটির হদিস দিতে পার? সেটি কি শয়তান বুড্ডাটি জেবে ক'রে নিয়ে ঢুঁড়ে বেড়ায়, নাকি কোথাও লুকিয়ে রেখে যায়। বল তো?'

—'হারামি বুড্ডা ভুলেও চিরাগবাতিটি জেব থেকে বের ক'রে কোথাও রাখে না। বুড্ডা পহেলা নম্বরের ফেরেফবাজ শয়তান। রাতে নিদ যায় দরওয়াজায় ভাল ক'রে খিল এঁটে। তবু সেটা কোর্তার জেব থেকে খুলে রাখে না।'

—'ঘাবড়াবার কোন ব্যাপারই নয়। তবে তোমাকে একটু-আধটু দিমাক খাটাতে হবে। ফন্দি-ফিকির ক'রে চিরাগবাতিটি বুড্ডার কাছ থেকে হাতাতে হবে। আজ রাত্রে তো সে একবার না একবার তোমার সঙ্গে ভেট করতে আসবেই, কি বল? আজ তোমাকে মতলব নিয়ে নয়া এক চাল চালতে হবে। আগে থেকেই বড়িয়া সাজ পোশাক পরে শাদীর লেড়কির মাফিক সেজেগুজে থাকবে। শয়তান বুড্ডাটি কামরায় হাজির হলেই মুখে মেকি হাসি ফুটিয়ে তুলে এগিয়ে যাবে। হাত ধরে পালঙ্কে এনে বসাবে। কামাতুর বুড্ডাকে চোখের বাণ মেরে কলিজা ভিজিয়ে দেবে। মোদ্দা ব্যাপার, তাকে ছলাকলার মাধ্যমে বুড্ডাকে বুঝিয়ে নিতে হবে তুমি বিলকুল পাল্টি খেয়ে গেছ। আমাকে দিল্ থেকে মুছে ফেলে তার দিকে বিলকুল ঢলেছ! তোমার দিল্ থেকে আমার বিরহ যন্ত্রণা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। এখন আর তার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে তোমার কিছুমাত্রও ওজর আপত্তি নেই। ইয়াদ থাকবে? এক পাক্কা অভিনেত্রী তোমাকে হতে হবে।'

বুদুর আঁৎকে উঠে বলে—'ইয়া আল্লাহ! শয়তান বুড্ডাটিকে নিয়ে পাশাপাশি শোয়া আমার দ্বারা হচ্ছে না। তার মুখটি চোখে ভাসলেই আমার গা ঘিন ঘিন করে। তুমি হয়ত ফন্দি ফিকির করছ বুড্ডাটি গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আমি তার কোর্তার ভেতরের জেব থেকে চিরাগবাতিটি অনায়াসেই বের করে নিতে পারব? একদম ভুল। বুড্ডার নিদ পাতলা। তার ওপর চিরাগবাতিটির ব্যাপারে আতঙ্ক। সামান্য আওয়াজটাওয়াজ হলেই চিল্লিয়ে ওঠে—'কে—কে?' ব্যস, তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠে।

—'জানি। বুড্ডা-বুড্ডিদের নিদ একদম পাতলা হয় তা কি আমার জানা নেই? জহর দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। সরবতের পেয়ালায় জহর মিশিয়ে খাওয়াতে হবে, পারবে না?'

—'জহর! ইয়া আল্লাহ! সরবতের সঙ্গে জহর মিশিয়ে শয়তানটিকে খাওয়াতে হবে? শুনেই তো আমার হাত-পায় কাঁপুনি লেগে গেছে!' পরমুহূর্তেই কলিজা শক্ত ক'রে বল্‌ল—'লেকিন এখানে জহর কোথায় মিলবে?'

—'জহরের বন্দোবস্ত আমিই তোমাকে করে দেব। তুমি আগে বাহারী সাজ পোশাক পরে তৈরি হয়ে নাও।' কথা বলতে বলতে আলাদিন নিজের আঙুলের অঙ্গুঠিটির গায়ে পর পর দু'বার ঘষা দিতেই আফ্রিদি দৈত্যটি হাজির হয়ে কুর্নিশ ক'রে গম্ভীর স্বরে বল্‌ল—'ফরমাশ করুন হুজুর।'

—'শোন আফ্রিদি দুনিয়ার সবচেয়ে কড়া জহর জোগাড় ক'রে নিয়ে এসো।'ইয়াদ রাখবে, এমন জহর নিয়ে আসবে যেন এক ছিঁটে জিভে লাগালেই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়।'

বুদুর চমকে উঠে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! অমন জহর আমি হাত দিয়ে শয়তানটির মুখে দিতে পারব না। তবে হয়ত তোমাকে বুকে ফিরে পাওয়ার লিপ্সায় তোমাকে ছেড়ে বহুৎ দূরে, একদম বেহেস্তে চলে যেতে হবে।'

—'ধুৎ, হাত দিতে যাবে কেন? পেয়ালায় গুলাব পানির সরবৎ বানিয়ে আলতো ক'রে তাতে ঢেলে দেবে, পারবে তো?'

বুদুর ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানাল।

আলাদিন বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা। যাও, জলদি সাজ পোশাক পরে তৈরি হয়ে নাও।'

এদিকে আফ্রিদি দৈত্য চোখের পলকে আলাদিনের পায়ের কাছে এক ডিবা সেঁকো জহর রাখল। পরমুহূর্তেই সে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বুদুর ঝলমলে সাজপোশাক পরে একদম বেহেস্তের হুরী সেজে আলাদিন-এর সামনে এসে দাঁড়াল।

আলাদিন চোখ দুটো কপালে তুলে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ তুমি করেছ কি মেহবুবা! শয়তান বুড্ডা তো দূরের ব্যাপার, তোমার সুরৎ দেখে আমারই যে দিমাক ঘুরে যাচ্ছে।'

—'থাক ঢের হয়েছে, আর তোয়াজ ক'রে আমাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ঢোল বানাতে হবে না। এখন আদৎ মতলবটিকে চুকিয়ে ফেলার ফন্দি বাৎলাও।'

—'শোন বুদুর, বুড্ডা বলতে পারে, আজ আমার তবিয়ৎ আচ্ছা নেই, কিছু খাওয়ার দিল্ নাই। তোমার সরবৎ তো পড়ে থাকবে, কি করবে তখন?'

—'কই বাৎ নাহি! ঘাবড়াও মাৎ। সে ফিকির আমি ঠিক করেই রেখেছি। চোখে সোহাগের ঢল নামিয়ে বুড্ডাকে চোখের বাণ মারব। দু'হাতে জড়িয়ে ধরব। আদর সোহাগের বাহানা করব। নক্কড়বাজ শয়তানটির দিল্ তখন খুশীতে নেচে উঠবে। তখন তোবড়ানো গাল আর ঝুলেপড়া ঠোঁট দুটো আমার মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে আনবে। আমি তখন খিল খিল ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ব তার বুকে। পরমুহূর্তেই আলতো ক'রে এক ধাক্কা দিয়ে চোখের বাণ মেরে বলব—'কি গো মিঞা তর সইছে না যে! এমন আঁকুপাঁকু করার কি আছে, মালুম হচ্ছে না তো! তামাম রাত্রি তো পড়েই রয়েছে! আজ থেকে তো আমি তোমার, শুধুই তোমার! খানাপিনা সেরে তাগদ বাড়িয়ে না নিলে দম পাবে কেন? তখনই কম্ম ফতে ক'রে নেব।'

—'বহুৎ আচ্ছা! বড়িয়া মতলব! তুমি পারবে বিবিজান।'

সব বন্দোবস্ত পাক্কা হয়ে গেলে আলাদিন আলমারির ভেতরে ঢুকে গেল। শয়তান বুড্ডাটি থপ্ থপ্ করতে করতে বুদুর-এর কামরায় হাজির হ'ল। সাজগোজ দেখে বুড্ডার চোখ দুটো বিলকুল ছানাবড়া হয়ে গেল। জিভে পানি দেখা দিল। নিষ্পলক চোখে তার দিকে কামাতুর নজর হেনে তাকিয়ে রইল।

বুদুর তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুল্‌ল। আচমকা চোখের বাণ মেরে তাকে খানাপিনার টেবিলে নিয়ে গেল। একটু বাদেই সে বুকে হাত ঘষতে ঘষতে কুর্শিতে এলিয়ে পড়ল। ব্যস, কাজ হাসিল।

বুদুর এবার উল্লসিত হয়ে হেঁচকা টানে আলমারিটি খুলে ফেল্‌ল। আলাদিন'কে বের করে নিয়ে এল। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠল—'খতম! নক্কড়বাজ শয়তান বুড্ডা খতম হয়ে গেছে।'

আলাদিন এক লাফে বুড্ডার কাছে চলে গেল। তার কোর্তার ভেতরের জেব থেকে চিরাগবাতিটি বের ক'রে ফেল্‌ল।

চিরাগবাতিটির গায়ে পর পর দুটো ঘষা দিতেই অতিকায় সে-আফ্রিদি দৈত্যটি তার সামনে হাজির হ'ল। কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'গোলাম হাজির, হুজুর। আমি চিরাগবাতির গোলাম। আপনি চিরাগের মালিক। অতএব আমি আপনার গোলামের গোলাম। হুকুম করুন, কি করতে হবে আমাকে।'

আলাদিন বল্‌ল—'চিরাগবাতির গোলাম, প্রাসাদটি আলতো ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে আগে যেখানে ছিল রেখে এসো।'

আফ্রিদি দৈত্যটি কুর্নিশ সেরে বল্‌ল—'হুজুর, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।' মুহূর্তের মধ্যে প্রাসাদটিকে সুলতানের প্রাসাদের অনতিদূরে, ফাঁকা ময়দানটিতে বসিয়ে দিল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' সত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আফ্রিদি দৈত্য প্রাসাদটিকে যথাস্থানে রেখে কুর্নিশ ক'রে বিদায় নিল।

পাখির ডাকে ভোর হ'ল। নিদ টুটলে সুলতান আড়মোড়া ভেঙে খোলা-জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর ফেরানোমাত্র ময়দানে আলাদিন-এর প্রাসাদটিকে দেখতে পেলেন। হকচকিয়ে খাড়া হয়ে বসে পড়লেন। ভাবলেন, তিনি জেগে, নাকি খোয়াব দেখছেন। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ দুটো ডল্‌লেন। না, খোয়াব তো নয়। এ যে বিলকুল সাচ্চা ব্যাপার।

রাত্রের সাজপোশাক পরেই তিনি উন্মাদের মাফিক ছুটতে ছুটতে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এমন কি পায়ে চপ্পল পর্যন্ত পরার হুস নেই।

সুলতানকে আসতে দেখে আলাদিন হন্তদন্ত হয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। তাঁকে অভ্যর্থনা করে শাহজাদী বুদুরের কামরায় নিয়ে গেল। তিনি লেড়কিকে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর-সোহাগ করতে লাগলেন।

শাহজাদী বুদুর দীর্ঘ অদর্শনের পর আব্বাকে দেখে চোখের

পানি ধরে রাখতে পারল না। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বেল্লিক শয়তান বুড্ডা মূর যাদুকরের কাণ্ডকারখানা সবিস্তারে বর্ণনা করল।

লেড়কির বক্তব্য শোনার পর সুলতান নিঃসন্দেহ হলেন, আলাদিন-এর কোনই গলতি নেই, একদম সাচ্চা বটে।

সুলতান কুর্শি ছেড়ে উঠে আলাদিন-এর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লেন—'বেটা, আমি তোমার দিকটি বিবেচনা না করেই বহুৎ কটু বাৎ বলেছিলাম। অপত্যস্নেহে আমি বিলকুল অন্ধা হয়েই তোমার ওপর কঠোর হয়ে পড়েছিলাম। কিছু মনে কোরো না। দিল্ থেকে সে সব ব্যাপার ঝেড়ে মুছে সাফা করে দাও। তোমার তো অজানা নয়, বুদুর আমার একমাত্র লেড়কি। সে আমার নজরের বাইরে চলে যাওয়াতেই দিমাক আমার গরম হয়ে গিয়েছিল। তুমি আমার ওপর গোস্‌সা ক'রে অবিচার কোরো না বেটা।'

আলাদিন মুচকি হেসে প্রসঙ্গটিকে ওখানেই চাপা দিয়ে দিল।

আলাদিন কয়েকজন নফরকে ডেকে বুড্ডা মূর যাদুকরের লাশটিকে গোর দেয়ার বন্দোবস্ত করবে ভাবল। পরমুহূর্তেই ভাবল না, উচিত কাজ হবে পায়ে রশি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে ভাগাড়ে ফেলে আসা। শকুন, শেয়াল আর কুকুরে তার দেহের গোস্ত টেনে-ছিঁড়ে খাক। নফররা এ-বন্দোবস্তই করল।

শাহজাদী বুদুর ফিরে আসায় সুলতান খুশীর জোয়ারে ভাসতে লাগলেন। খুশীতে ডগমগ হয়ে তিনি নিজের প্রাসাদে খানাপিনা আর নাচা-গানার আয়োজন করলেন। কয়েদীদের কয়েদখাটা থেকে অব্যাহতি দিতে গিয়ে খালাস দিয়ে দিলেন। ধনাগার থেকে দীন-দুঃখীদের অকাতরে দান করতে লাগলেন। আমীর-ওমরাহ থেকে শুরু ক'রে পথের ভিখমাঙ্গা পর্যন্ত সবাই পেট পুরে খেয়ে খুশী হয়ে নিজ নিজ মকানে ফিরল।

আলাদিন তার কলিজার সমান, দিল্ কা টুকরা বিবি বুদুর'কে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল।

দিন যায়, মাহিনা কাটে। দেখতে দেখতে পুরো একটি সাল কেটে গেল। বুদুর-এর দিল্ থেকে শান্তি-সুখ তিলে তিলে নির্বাসিত হতে লাগল। লেড়কি-জেনানাদের সবচেয়ে খুশীর ব্যাপার যে গর্ভধারণ, তার কোন লক্ষ্মণই বুদুর-এর মধ্যে দেখা গেল না।

বুদুর গোমড়ামুখে সর্বদা বসে থাকে। কারো সঙ্গে বাৎচিৎ নেই, মুখে এতটুকুও হাসি কারো নজরে পড়ে না। সাচ্চা বটে, বালবাচ্চাই যদি পয়দা না হ'ল তবে লেড়কিদের জিন্দেগীর কি-ই বা দাম। তাদের দুনিয়াতে আসাই যে বৃথা। চোখের পানি তো ঝরারই ব্যাপার বটে।

আলাদিন বিবি বুদুর'কে প্রবোধ দেয়—'কেন ঝুটমুট আকুল হচ্ছ বিবিজান? কেনই বা এভাবে দিন-রাত্রি চোখের পানি ঝরাচ্ছ? সবে তো নওজোয়ান কাল শুরু হয়েছে। বাকী দিন তো সামনে পড়েই রয়েছে। দিন তো আর খতম হয়ে যায়নি যে এভাবে হাহাকার সম্বল ক'রে তোমাকে দিন গুজরান করতে হবে। তা ছাড়া বালবাচ্চা দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাতাল্লা। সময় হ'লে তিনি জরুর মুখ তুলে চাইবেন।'

স্বামীর প্রবোধবাক্যে বুদুর-এর দিল্ আরও উতলা হয়ে উঠল। সে হাউমাউ ক'রে কেঁদে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজল। এক সময় নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বুদুর বল্‌ল—'তোমাকে একটি বাৎ বলছি, গোস্‌সা কোরো না। এর-ওর মুখে শুনতে পেলাম, এ-নগরেই এক বুড্ডি এসেছে। গুণীন ফকিরের মাফিক আচরণ। বহুৎ তুক্‌তাক্ জানে। যে সব বন্ধ্যা জেনানা আছে তারা তাকে এক লহমায় দেখলেই নাকি পেটে বালবাচ্চা আসে। আমার দিল্ চাইছে একটিবার পরখ ক'রে দেখি। তোমার কি মত?'

আলাদিন সরবে হেসে বল্‌ল—'দিল্ যখন চাইছে তখন পরখ ক'রে দেখতে বাধা কোথায়? বহুৎ আচ্ছা, আমি তাকে এখানে আনার বন্দোবস্ত করছি।'

খোজা এক নিগ্রো বুড্ডিকে আলাদিন-এর প্রাসাদে নিয়ে এল। কালো কাপড়ের বোরখায় বুড্ডিটির আপাদমস্তক ঢাকা। গলায় ইয়া লম্বা, হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসা আজব এক মালা। হাড্ডির মালা, পাথর, তামা আর দস্তার চাকতি, আর হরেক কিসিমের গাছের শেকড় বাকড়ের মালা দেহের এখানে-ওখানে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। হাতে কমসে কম চার পাঁচবার বাঁক-খাওয়া একটি লাঠি। আর এক হাতে একটি চামর আর জ্বলন্ত ধুনচি। বুড্ডিটির গাল দুটো একদম তোবড়ানো, চোখ দুটো গর্তে বসা ও দাঁত বলতে একটিও নেই। আর পায়ে একজোড়া খড়ম।

বুড্ডিটি বুদুর-এর সামনে হাজির হয়ে ধুনচি ও চামর সমেত হাতটি সামান্য উঁচু ক'রে তাকে দোয়া জানাতে গিয়ে বল্‌ল—'খোদা মেহেরবান! খোদা হাফেজ!'

বুদুর সালাম জানিয়ে বল্‌ল—'আপনি নাকি আল্লাহর সাক্ষাৎ পয়গম্বর। আর এমন কিছুই নেই যা আপনার পক্ষে অসাধ্য। তাই—'

বুড্ডি ফোকলা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'বেটি, আমি তোমার অভিপ্রায় এরই মধ্যে জানতে পেরে গেছি। বহুৎ আচ্ছা, ঠাণ্ডা দিমাকে ধ্যায়ান কর, আমার মতলব মাফিক কাম কাজ যদি করতে পার তবে তোমার গর্ভে জরুর বালবাচ্চা পয়দা হবে।'

বুড্ডির বাৎ কানে যেতেই বুদুর-এর কলিজা নেচে ওঠে। শিরা-উপশিরায় খুনের গতি বেড়ে যায়। দিল্ অজানা পুলকে উপছে পড়তে থাকে। সে আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে ব'লে ওঠে—'আম্মা, কি করতে হবে আমাকে, মেহেরবানি ক'রে বলুন?

সে কাজ যত কঠিনই হোক—'

—'তবু বেটি, তুমি কি পারবে? আমি যা বলব তুমি কি তা জোগাড় করতে পারবে?'

—'আলাদিন আমার স্বামী। তার দ্বারা সম্ভব নয় এমন কোন কাজই দুনিয়ায় নেই। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন, কি সে বস্তু।'

—'একটি রকপাখির ডিম জোগাড় করতে হবে। সেটিকে তোমার শোবার কামরায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। স্রেফ এ-ই তোমার দাওয়াই। যেদিন সেটি ঝুলবে তার দশমাস দশদিন বাদে তোমার লেড়কা পয়দা হবে। তোমার হয়ত জানা নেই কোথায় গেলে রকপাখির ডিম মিলতে পারে। ইয়াদ রাখবে, ককেসাস পর্বতের মাথায় রকপাখিদের আড্ডা। সেখানে গেলেই তোমার বাঞ্ছিত বস্তু মিলতে পারে। আর এক ব্যাপার, ডিম নিয়ে সেখান থেকে জমিনে নেমে আসা হিম্মতের ব্যাপার বটে।'

—'আপনি এ নিয়ে ঝুটমুট ভেবে সারা হবেন না। আমার স্বামী আলাদিন-এর কাছে এ কোন সমস্যাই নয়।'

বুড়ি ওঠার উদ্যোগ নিল।

বুদুর বল্‌ল—'ডিমের ব্যাপার বাদে যদি আর কিছু করণীয় থাকে তবে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।'

ফোকলা মুখে হেসে বুড়ি বল্‌ল—'না বেটি, এতেই তুমি লেড়কা লাভ করতে পারবে। তোমার লেড়কা এখন মরার মাফিক নিঃসার হয়ে তোমার গর্ভে অবস্থান করছে। ডিমটির গুণে তার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হবে।'

বুড়িটি বিদায় নিয়ে ফিন খড়ম, লাঠিতে ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ তুলে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিল। বুদুর তাকে বহুৎ ধনদৌলতে খুশী করল।

রাত্রে পালঙ্কে শুয়ে বুদুর আলাদিন'কে আদর-সোহাগ করতে করতে এক সময় বল্‌ল—'বুড়ি সন্ত আজ এসেছিল। আমার বালবাচ্চা হওয়ার উপায় বলে গেছে।'

তার মুখের বাৎ খতম হওয়ার আগেই আলাদিন একলাফে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ে। বুদুর বল্‌ল—'আমার শোবার কামরায় ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি রকপাখির ডিম রাখতে পারলেই তোমার আর আমার বাসনা পূর্ণ হবে, লেড়কা পয়দা হবে আমার গর্ভে।'

আলাদিন আর সময় নষ্ট না ক'রে তখনই চিরাগবাতিটি হাতে নিয়ে তার গায়ে দু'বার ঘষা দিল। এক লহমার মধ্যে আফ্রিদি দৈত্য তার সামনে হাজির হয়ে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'হুজুর, গোলামের গোলাম হাজির। ফরমাশ করুন, আমাকে কি করতে হবে।'

আলাদিন বল্‌ল—'শোন আফ্রিদি, এক সাল পার হয়ে গেছে আমাদের শাদী হয়েছে। লেকিন এখনও আমাদের বালবাচ্চা পয়দা হ'ল না। ব্যাপারটি আমাদের বিশেষ ক'রে আমার বিবির পক্ষে মর্মান্তিক। এক বুড়ি সন্ত আমার বিবিকে বাৎলে গেছে, আমাদের শোবার কামরার কেন্দ্রস্থলে একটি রকপাখির ডিম ঝুলিয়ে রাখলে তার গর্ভে লেড়কা পয়দা হবে। ককেসাস পর্বতের মাথায় নাকি রকপাখিদের আড্ডা। সেখানে গেলে ডিম মিলতে পারে। তোমাকে একটু তকলিফ ক'রে একটি ডিম নিয়ে আসতে হবে। যাও, হুকুম তামিল কর।'

আলাদিন-এর মুখের বাৎ খতম হতে না হতেই আফ্রিদি দৈত্যটি বিকট আওয়াজ তুলে গর্জাতে থাকে। তার চোখ দুটো ইয়া বড়া ও খুনের মাফিক লাল হয়ে উঠল। গোস্‌সায় সে যেন ফেঁটে পড়ার জোগাড় হ'ল।

আফ্রিদি দৈত্যটির আকস্মিক উগ্রমূর্তি দেখে আতঙ্কিত হয়ে আলাদিন কাঁপা কাঁপা গলায় ব'লে উঠল—'এ কী তোমার ব্যাভার আফ্রিদি! হঠাৎ তোমার দিমাক গরম হয়ে গেল কেন, বল তো? গোস্‌সা হবার মত কোন কিছু কি—'

—'সে কী হুজুর! এ কী ভয়ঙ্কর এক বাৎ শোনালেন। এর বদলে যদি আপনি আমার পিঠে দু'-চার ঘা বসিয়ে দিতেন তবু আমি মুখ বুজে সহ্য করতাম। এতদিন আপনার মধ্যে উদার দিলের পরিচয় পেয়েছি বলেই খুশী হয়ে আপনার বিলকুল হুকুম তামিল করেছি। এতদিন আপনার সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে উভয়ের মধ্যে দোস্তি-ভাব গড়ে উঠেছে। নইলে আমি আপনাকে এক লহমার মধ্যে গলা টিপে খতম ক'রে দিতাম।'

—'শোন—শোন আফ্রিদি, এখনও আমার দিমাকে আসছে না, তোমাকে এমন কি খারাপ বাৎ আমি শুনিয়েছি! কি ব্যাপার, খোলসা ক'রে বাতাও তো।'

আফ্রিদি এবার নিজেকে একটু সামলে সুমলে নিয়ে বল্‌ল—'হুজুর, শুনুন তবে বলছি—'এখন মালুম হচ্ছে, আপনি জেনে শুনে বক্তব্যটি আমার কাছে পাড়েন নি। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, বুড়িটি আপনাকে জাহান্নামে পাঠাবার জন্য আপনার বিবির মাথায় মতলবটি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। আপনার হয়ত জানা নেই জীন, পরী, আফ্রিদি দৈত্যদের একমাত্র দেবতা রকপাখি। আমাদের পরমারাধ্য।' এবার সে নাক, কান ও দু' কাঁধে হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে বল্‌ল—'আমার মালিক চিরাগবাতি। লেকিন রক আমাদের মাথার ওপরে—ঈশ্বর। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাই একবারটি নিজের দিলের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে দেখুন তো, কার ডিম ছিনিয়ে এনে গুনাহ করতে আপনি আমাকে হুকুম দিচ্ছেন?'

—'আফ্রিদি, তুমি বিশোয়াস কর, তোমাকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়ার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। তোমার ঈশ্বরের প্রতিও আমি এতটুকু অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছি না, ইচ্ছাও নেই।'

—'আমি নিশ্চিত যে, কারো না কারো দুর্বুদ্ধি আপনার ওপর দিয়ে খাটাতে চাইছে। এর পিছনে আপনার বা আপনার বিবির কুমতলব নেই, গুণাহ তো জরুর নেই।'

—'লেকিন চিরাগবাতির গোলাম, কিছুতেই আমার দিমাকে আসছে না, বুড়ি কেন আমার সর্বনাশ করতে উৎসাহী হ'ল। আমি তো জ্ঞানত তার কোন অনিষ্ট করি নি।'

—'হুজুর এ কী কি রকম বাৎ বলছেন? আপনি তার কোনই অনিষ্ট করেন নি? জরুর করেছেন।'

—'করেছি? বুড্ডির অনিষ্ট করেছি? লেকিন কখন, কিভাবে তার অনিষ্ট করেছি, বল তো।'

—'হুজুর, বলছি তবে শুনুন—আপনি বুড্ডা মুর যাদুকরকে বিষ খাইয়ে খতম করেছেন, ঠিক কিনা? ওই বুড্ডা এর বড়া ভাইয়া। তার বদলা নেবার জন্যই বুড্ডি ঘুর ঘুর করছিল। এবার মওকা পেয়ে উসুল নিতে এগিয়ে এসেছে। এবার বলুনতো যে বুড্ডি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিল আদতে কে সে?'

ভ্রূ কুঁচকে আলাদিন বল্‌ল—'কে? কে সে বুড্ডি? কি তার আদৎ পরিচয়?'

—'যাকে আপনারা বুড্ডি ভাবছেন, আদতে সে জেনানাই নয়। ওই বুড্ডা মুর যাদুকরের ছোটা ভাইয়া। এক আম্মার গর্ভে তারা উভয়েই পয়দা হয়েছে। ভাইয়ের হত্যার বদলা নিতে সে এ-নগরে হাজির হয়েছিল। আর এমন কোন কিসিমের হিম্মত, বিদ্যা তার নেই যা প্রয়োগ ক'রে আপনাকে আঘাত হেনে কুপোকাৎ করতে সক্ষম। তাই ফন্দি ফিকির বের করেছে যাতে আমি আপনার ইন্তেকাল ঘটাই। তার তো জানাই আছে আপনি আমার কাছে রকপাখির প্রস্তাব দেয়ামাত্র আমি আপনার ওপর জরুর ঝাঁপিয়ে পড়ব। একদম খতম ক'রে তবে ছাড়ব। বহুৎ বড়িয়া চক্রান্ত, ঠিক কিনা? লেকিন তার ধান্দা মাফিক কাজ হ'ল না। তার চাল বিলকুল বানচাল হয়ে গেল। আদতে আমি তো আপনার মুখে শুনেই অভিসন্ধি টের পেয়ে গেছি। তবে এ-ও সাচ্চা বটে, অন্য সব হুজুরের মাফিক আপনি যদি আমাকে সরাসরি হুকুম করে বসতেন, যাও রকপাখির ডিম হাজির কর। জলদি নিয়ে এসো। ব্যস, তবে আমি সে মুহূর্তেই আপনার ঘাড় মটকে দিতাম। এতে কোন গলতি নেই। আপনার মোউৎ ঠেকায় হিম্মৎ কারোরই ছিল না। লেকিন আপনি করলেন কি, পুরো ব্যাপারটি আগে আমাকে খোলসা ক'রে বলে নিলেন। গোড়ায় যদিও আমি আপনার ওপর একটু-আধটু গোস্‌সা প্রকাশ করেছি, সাচ্চা বটে। একটু বাদে দিমাক ঠাণ্ডা হলে আদৎ ব্যাপারটি আমার কাছে একদম পানির মাফিক সাফা হয়ে গেল। ব্যস, এতেই আপনার ইন্তেকাল হ'ল না, জান রক্ষা পেল। তা নইলে এতক্ষণে আপনার গোরে মিট্টি চাপা দেয়ার কাজ শুরু হয়ে যেত ; হুজুর।

আলাদিন আচমকা আঁৎকে উঠল। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। বার-কয়েক ঢোক গিলে বল্‌ল—'খোদাতাল্লার মর্জি ভালই হয়ে থাকে।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' তিয়াত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আফ্রিদি দৈত্যটি সবশেষে বল্‌ল, হুজুর আমাদের মধ্যে বহুৎ বড়িয়া এক প্রবাদের প্রচলন আছে—ছোটা কুত্তা বুড়া কুত্তার চেয়ে ঢের, ঢের বদমায়েশ হয়ে থাকে। বুড্ডা মুর যাদুকরের চেয়ে একশ' গুণ বদমায়েশ তার এ-ছোটা ভাইটি। হুজুর যাবার আগে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে যাচ্ছি ; সে আপনার জান খতম করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে, চারদিকে কড়া নজর রেখে চলবেন। তবে হ্যাঁ, আমি হরবখত আপনার কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে আপনাকে আগলে আগলে রাখব। ঘাবড়াবেন না কাঁটার আঁচড়টিও দিতে দেব না।'

আফ্রিদি দৈত্য আলাদিন'কে কুর্নিশ ক'রে বিদায় নিল। আলাদিন এবার বুদুর'কে তলব করল।

বুদুর এলে বল্‌ল—'বুদুর, আমি বুড্ডির মুখ থেকে ব্যাপারটি শুনতে চাচ্ছি। রকপাখির ডিমটিকে সে কিভাবে ব্যাভার করতে চাইছে নিজে কানে শুনে তবে সেটি আনানোর বন্দোবস্ত করব। ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমি খোলসাভাবে বিলকুল না শুনে কি ক'রে এমন ভয়ঙ্কর একটি কাজে ঝাঁপ দেই, তুমিই বল?'

—'বহুৎ আচ্ছা, কাল ভোরেই সে ফিন আসবে, বলে গেছে।'

—'কাল ভোরে?' ভোরেই আসবে শুনে তার চোখের মণি

দুটো ঝলমলিয়ে ওঠে।

—'হ্যাঁ, তাই তো বলে গেল। তুমি বরং একটি পর্দার পিছনে বসে তার বক্তব্য নিজে কানে শুনে নিও, তবে হবে তো?'

—'বড়িয়া মতলব। তাই হবে।'

ভোর হতে না হতেই বুড্ডা মূর যাদুকরটির ছোট ভাইয়া বুড়ি জেনানার সাজ পোশাক গায়ে চাপিয়ে আলাদিন-এর প্রাসাদে হাজির হ'ল।

আলাদিন এক হাতে একটি সুতীক্ষ্ণ তরবারি আর অন্য হাতে একটি রশির ফাঁস নিয়ে পর্দার আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে বসে অপেক্ষা করছে।

বুড়ি বুদুর-এর দিকে এগিয়ে যেতে রশির ফাঁসটি আচমকা ছুঁড়ে দিল। ব্যস, একদম বুড়ির গলায় গিয়ে সেটি আটকে গেল। বুড়ি গলা ছেড়ে চিল্লাতে লেগে গেল। ফাঁস ক্রমে শক্ত হয়ে গলায় আটকে যেতে লাগল। কিছু বলার আর সুযোগ রইল না। এবার অস্পষ্ট স্বরে গোঙাতে লেগে গেল।

বুড়িটির দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হ'ল।

আলাদিন এবার আল্লাহ-র নাম নিয়ে হাতের তরবারিটি দিল ঝপাং ক'রে ঝেড়ে। ব্যস, তার শিরটি ধড় থেকে আলাদা হয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

বুদুর আঁৎকে উঠে কোনরকমে উচ্চারণ করল—'এ কী সর্বনেশে কাজ করলে!' তার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। গোসসায় গস্‌গস্ করতে লাগল—'বেকুব কাঁহিকার। এ কী গুনাহ করলে? জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাবে। তোমার গুণাহ তোমার চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে, ইয়াদ রেখো।'

আলাদিন তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'বিবিজান, তুমি এর আদৎ পরিচয় জানলে আর এরকম বাৎ কখনই বলতে পারতে না।'

আলাদিন এবার হাতের তরবারিটি দিয়ে বুড়ির সাজে সজ্জিত বুড্ডা মূর যাদুকরের ভাইটির সাজ পোশাক ছিঁড়তে ছিঁড়তে বল্‌ল—'দেখ, ভাল ক'রে নজর দিয়ে দেখ বিবিজান, আদতে এ জেনানা, নাকি মরদানা? এর আদৎ পরিচয় হচ্ছে, শয়তান বুড্ডা মূর যাদুকরের ছোটা ভাইয়া। বড়া ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে। কুমতলব হাসিল করার জন্যই সে এমন দাঁতে দাঁত চেপে আমার সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। আল্লাতাল্লার দোয়াতেই আমার জান রক্ষা পেয়েছে। আর একটু হলেই আমাকে একদম খতম করে দিত। তাঁর কাছে তো আমরা একদম সাচ্চা। আল্লাতাল্লার কাছে কোন গুণাহই করি নি কোনদিন।'

—'আমি তো ভয়ে ডরে একদম কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। লেকিন, তুমি কি ক'রে এর আদৎ পরিচয় জানলে কিছুতেই আমার দিমাকে আসছে না! আজব কাণ্ড বটে।'

আলাদিন হেসে বল্‌ল—'বিবিজান, চিরাগবাতির গোলামই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। তার মুখেই আমি এর সমাচার জানতে পারি! বুদুর, আল্লাহ-র দোয়াতে আর চিরাগবাতির গোলামের সক্রিয় পরামর্শেই আজ আমার জান রক্ষা হয়েছে! নইলে এখন আমার স্থান হ'ত মিট্টির তলায় কবরে।'

তারপর আলাদিন ও বুদুর দীর্ঘদিন সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন। বুদুর বন্ধা জেনানা এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পরবর্তীকালে সে একাধিক বালবাচ্চা পয়দা ক'রে তার বদনাম ঘুচিয়েছিল, পেয়েছিল আম্মা হবার অধিকার।

কিস্‌সা খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভোর হতে এখনও ঢের দেরী। আপনার যদি মেজাজ মর্জি শরিফ থাকে, যদি হুকুম দেন তবে আপনাকে 'হালিমা ও কামরের মহব্বতের কিস্‌সা' শোনাতে পারি।

হালিমা ও কামরের মহব্বতের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বহুৎ দিন আগে কোন এক নগরে এক ধনী সওদাগর বাস করত। তার নাম ছিল আবদ অল-রহমান। তার কারবার ছিল একদম রমরমা। অগাধ ধন-সম্পদের মালিক ছিল সে। তার বিবি এক খুবসুরৎ লেড়কি ও এক খুবসুরৎ লেড়কা পয়দা করেছিল।

লেড়কা ও লেড়কির অনন্য সুরৎ দেখে সওদাগরের সর্বদা ডর

ছিল কেউ বুঝি তাদের কোনরকম ক্ষতি ক'রে ফেল্ল্। তাই সে তাদের কামরার মধ্যে বন্দী ক'রে রাখার বন্দোবস্ত করল। কারো নজরে যাতে না পড়তে পারে সে-আশঙ্কা করেই সে এ-পথ বেছে নিয়েছিল। তবু তার মধ্যে এতটুকুও স্বস্তি ছিল না।

শত্রুর ডরে সওদাগর আবদ লেড়কা-লেড়কিদের দেখভাল করার জন্য দু' জন বিশ্বস্ত নফর রেখে দিয়েছিল। নফর দু'জনের তত্ত্বাবধানেই তারা কামরায় বন্দী হয়ে দিন গুজরান করতে লাগে।

এক-দুই-তিন ক'রে চৌদ্দটি সাল পেরিয়ে গেল। লেড়কা নওজোয়ান হতে চলেছে। তার মধ্যে যৌবনের চিহ্নগুলি এক এক ক'রে প্রকাশ পেতে লাগল।

একদিন স্বামীকে হাতে নাস্তার থালা তুলে দিতে দিতে তার বিবি বল্ল—'লেড়কার উমর যে বেড়ে চলেছে, নওজোয়ান হতে চলেছে, লক্ষ্য করেছ কি?'

—'কি যে বল বিবিজান, লক্ষ্য করব না কেন? চৌদ্দসাল উমর পূর্ণ হতে চলেছে, ঠিক বলি নি?'

—'তুমি ভাবছ, তোমার লেড়কা এখনও গুঁড়া বাচ্চাটিই আছে? লেড়কার শাদীর বন্দোবস্ত যে করতে হবে, খেয়াল নেই? তার আগে কারবারটার বুঝে নেয়া তো দরকার। আন্ধার কামরার মধ্যে আটকে রাখলে তার চোখই বা কি ক'রে ফুটবে? সবার চোখের আড়ালে রেখে দিলে ফয়দা যে কি হবে, আমার অন্ততঃ দিমাকে আসছে না।'

সওদাগর আবদ গলা নামিয়ে বল্ল—'বিবিজান, তুমি কেন বুঝছ না আমার বেটা কামার অন্য দশটি লেড়কার মাফিক সাধারণ সুরৎ নিয়ে পয়দা হয়নি।' বিবির দিমাক ঠাণ্ডা করতে গিয়ে বল্ল—'এক বাৎ কি জান? আমার বেটা কামর-এর খুবসুরৎ চেহারার দিকে তাকালে ডরে আমার কলিজা শুকিয়ে যায়। এমন সুরৎ কোন লেড়কার মধ্যে থাকতে পারে, আমার চৌদ্দ পুরুষেও কোনদিন ভাবতে পারে নি। আদতে আল্লাতাল্লা-র বুদ্ধিভ্রম হয়েছিল বলেই এমন সর্বনাশা সুরৎ আমার বেটাকে দিয়েছেন। বেটা আমার কোন নবাব-বাদশার ঘরে পয়দা হ'লে না হয় অন্য ব্যাপার হত। আমার বেটাকে তো কোন কাজ ক'রে রুটির জোগাড় করতে হবে, তার ইয়াদ ছিল না।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতশ' আটাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—সওদাগরের বিবি তার স্বামীর বক্তব্য শুনে মুহূর্তকাল গম্ভীর মুখে কাটিয়ে এক সময় মুখ খুল্ল—'তোমার মুখে এ কী অলক্ষুণে বাৎ গো!' সওদাগরের বিবি তম্বি করতে লাগল—'বালবাচ্চা খুবসুরৎ হবে এ তো সব আম্মা আর আব্বাই চেয়ে থাকে গো! তাদের সুরৎ দেখে তো তোমার কলিজা খুশীতে ডগমগ হওয়ারই ব্যাপার। আর তুমি কিনা তার বদলে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছ আর আল্লাহ-র ওপর বেশ এক হাত নিয়ে নিচ্ছ!'

—'বিবিজান, তুমি আমার আদৎ কথাটিই ধরতে পার নি। বেটাবেটির সুরৎ দেখনাই হবে, কোন্ আম্মা আর আব্বা না চায় বল তো? লেকিন আমাদের মাফিক দীন দরিদ্রের ঘরে কোন লেড়কাকে পাঠিয়ে হুজ্জতিই পোহাতে হবে।'

—'হুজ্জুতি? হুজ্জুতির ব্যাপার কেন খোলসা করে বল তো?'

—'ঠিক আছে, আগে বল তো বেটাকে কেন দিনের পর দিন কামরায় আটক করে রাখা হয়েছে? তোমার উমর তো বাড়ছে বৈ কমছে না। কতদিন আর একভাবে কারবারের ঘানি টানতে পারবে? বেটাকে কারবারে বসিয়ে কারবারের রীতিনীতি শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে না? তুমি কি শ-শ- সাল জিন্দা থেকে কারবার চালিয়ে যাবে? কারবারের ব্যাপার না হয় ছাড়ানই দিলাম। তার রুজি রোজগারের বন্দোবস্ত ক'রে দেয়া কি তোমার কর্তব্য নয়? তার ওপর বিপদ আপদের ব্যাপার তো আছেই। তোমার আর আমার মধ্যে কে আগে যাব, কার ইন্তেকাল আগে হবে, কেউ বলতে পারে? কিছু একটা ঘটে গেলে লেড়কা-লেড়কি দুটোকে তো থালা হাতে নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ভিখ মাঙ্গতে হবে।'

—'সে কী, ভিখ মাঙ্গতে হবে কেন? বাজারে আমার কত বড় কারবার, কত শ'-হাজার খদ্দের, জান তা? একটু নজর রেখে কারবার চালাতে পারলে—'

—'বলি নজর রাখার হিম্মৎ তো থাকা চাই! ওই যে বল্লাম, কারবার চালাতে গেলে তো আঁটঘাট জানা চাই। কামরায় ফাটকের মাফিক লেড়কাকে আটক রাখলে কারবার জ্ঞান-বুদ্ধি তার মগজে কি আল্লাতাল্লা অচানক ঢুকিয়ে দেবেন নাকি, শুনি?'

সওদাগর আবদ বিবির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তার বিবি ব'লে চলেছে—'আর এক বাৎ। একদিন না একদিন তোমার ইন্তেকাল তো হবেই, এ-তো আর ঝুটা নয়। তোমার অবর্তমানে তোমার খুবসুরৎ লেড়কা যদি অচানক কারবারে গদিতে গিয়ে বসে, যদি বলে আমিই এ-কারবারের মালিক, কেউ বিশোয়াস করবে? শুনবে কেউ? সবাই আড়ালে আবডালে নানারকম বলাবলি করবে, ঠোঁট টিপে টিপে হাসবে, ঠিক কিনা? অন্য ব্যাপারীরা চোখে মুখে অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে বলবে 'না, সওদাগরের কোন লেড়কা আছে আমরা আগে তো কোনদিন শুনিনি!' তখন তোমার লেড়কাকে যদি তারা একাট্টা হয়ে ঢুকতে না দেয় তবে কি আমি কাজী-কোতোয়ালের দরবারে ধর্ণা দেব, নাকি সুলতানের দরবারে জানাতে যাব? দুনিয়ায় টিকে থাকতে

গেলে সমাজের সাথে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়। তাই বলছি কি সময় থাকতে হুঁশিয়ার হও। নইলে পাছে পস্তাতে হবে।'

ফ্যাকাশে বিবর্ণমুখে বিবির দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সওদাগর অসহায়ভাবে বল্‌ল—'বিবিজান, এখন তবে আমাকে কোন মতলব দিতে চাচ্ছ, খোলসা ক'রে বল তো?'

—'লেড়কাটিকে কামরা থেকে বের করে কারবারে নিয়ে যাও। নিজের কাছাকাছি পাশাপাশি হরবখত বসাবে। সবার সঙ্গে পরিচয়-খাতিরের বন্দোবস্ত ক'রে দাও। সবাইকে বল, এ-আমার বেটা, আমার ঔরসজাত সন্তান।'

—'বহুৎ আচ্ছা মতলব বটে।'

—'হ্যাঁ, তারপর ধীরে ধীরে কারবারের আঁটঘাঁট, অন্ধিসন্ধি শিখিয়ে দাও। এতে অন্য ব্যাপারী ও খদ্দেরদের সঙ্গে জানপহছান হবে। কারবারের যা গোড়ার ও আদৎ ব্যাপার।'

—'কামর-এর আম্মা তুমি কিছুই গলতি বলনি। আজ অচানক আমার ইন্তেকাল হয়ে বিলকুল গড়বড় হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাকে আচমকা দেখে মহল্লার আদমি ও বাজারের কারবারীরা তাকে আমার লেড়কা ব'লে স্বীকার না-ও করতে পারে। ফিন এমন ধারণা করাও কিছুমাত্র অসম্ভব নয় যে, কামর তাঁর আম্মার কোন গোপন মেহেবুবার লেড়কা। তোবা তোবা! কী তার শরমের ব্যাপার হবে, বল তো! হ্যাঁ, তোমার বাৎ মানছি, দশজনের সঙ্গে কামর-এর জান পহচান দরকার বটে। আর দেরী নয়, আজই আমি তাকে সঙ্গে ক'রে বাজারে নিয়ে যাব।'

একটু বেলা বাড়তে সওদাগর আবদ লেড়কার হাত ধরে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ল। ইয়া আল্লাহ! দু'-চার কদম যেতে না যেতেই মহল্লার পথচারীরা তাকে একদম বোলতার মাফিক ঘিরে ধরল। সবার চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ। দু'-চার আদমি কামর-এর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে আবদ'কে বল্‌ল—'কি গো ব্যাপারী, এমন খুবসুরৎ আশমানের চাঁদকে মিট্টির দুনিয়ায় নামিয়ে আনলে কি ক'রে?' কেউ বা হাত বাড়িয়ে চুমু খেয়ে বল্‌ল—'ব্যাপারী, এঁকে কোত্থেকে আমদানি করলে, বল তো?'

সওদাগর তো পড়ল মহাফাঁপরে। দু' হাতে ভিড় সরিয়ে পথ ক'রে এগিয়ে যাওয়াই তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। লেকিন কার হিম্মৎ আছে যে, দু' কদম এগোয়। সে সঙ্গে চামড়ায় জ্বালা ধরানো হাজারো প্রশ্ন বাণ তো রয়েছেই। এ মুহূর্তে তার সবচেয়ে বড়া ডর ঠেলা ধাক্কায় তার আদরের দুলাল জখম হয়ে না যায়। ১৪

সওদাগর আবদ তাদের কথায় কান না দিয়ে করজোড়ে চিল্লাতে লাগল—'তোমরা সরে যাও, ছেড়ে দাও একে। বেটার আমার জান খতম হয়ে যাবে যে।'

কা কস্য পরিবেদনা—কে, কার অনুরোধে কান দেয়। বরং বেশী ক'রে হল্লা জুড়ে দেয়।

সওদাগর আবদ বাজপাখির মাফিক ছোঁ মেরে লেড়কাটিকে কৌতূহলীদের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে দোকানে হাজির হ'ল।

দোকানে এসেও রেহাই পেল না। এখানেও একই ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। বাজারের দোকানী ও খদ্দেররা আবদ-এর দোকানের সামনে একদম মেলা বসিয়ে দিল।

বেগতিক দেখে আবদ খিড়কি দরওয়াজা দিয়ে কামর'কে দোকানের পিছনে চালান ক'বে দিল ঠিক তখনই ভিড় ঠেলে এক বুড্ডা তার দোকানে হাজির হ'ল। ইয়া লম্বা সফেদ দাড়ি। মাথার
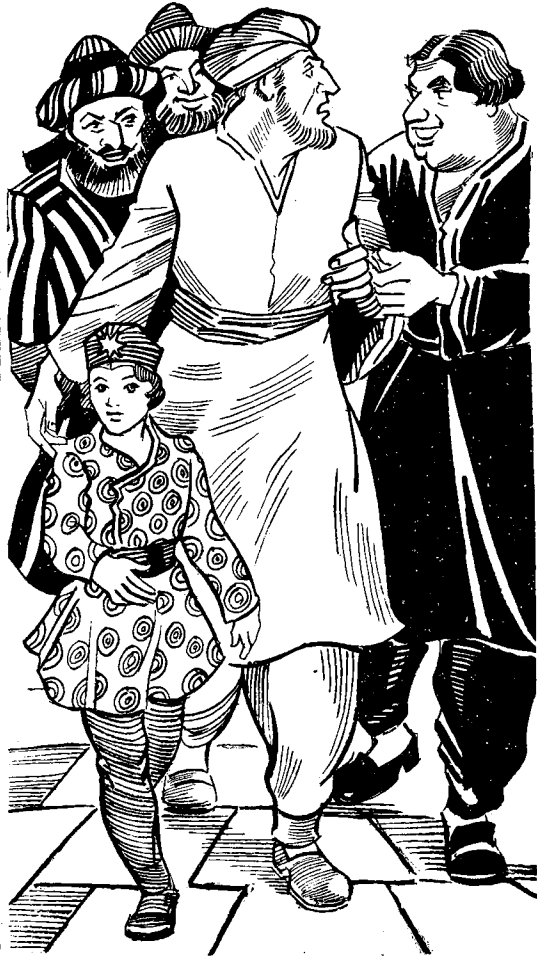
চুলও সফেদ। গায়ে কালো আলখাল্লা। গলায় হরেক কিসিমের পাথরের মালা। হাতে আঁকাবাঁকা এক লাঠি আর অন্য হাতে একটি চামর। কাঁধে ঝুলছে রঙ বেরঙের কাপড়ার টুকরো জুড়ে বানানো একটি ঝোলা। ফকিরকে দেখে সওদাগর এগিয়ে গিয়ে সালাম জানাল। আদর ক'রে বসার বন্দোবস্ত ক'রে দিল।

ফকির ফোকলা মুখে হেসে বল্‌ল—'বেটা, তোমার লেড়কা কোথায়?'

—'দোকানের পিছনে চালান ক'রে দিয়েছি। সামনে হাজারো আদমির হামলা হুজ্জুতি, দেখছেনই তো।'

ফকির দোকানের পিছনে গিয়ে কামর-এর মুখোমুখি বসল।

এদিকে হাজার কণ্ঠের চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল—'ফকির সাহাব'কে বের করে দিন। এরা লেড়কাদের বরবাদ করতে ওস্তাদ।'

সওদাগর আবদও এর-ওর মুখে শুনেছে, ফকির দরবেশগুলো আচ্ছা আদমি নয়। সে বিলকুল দো-টানায় পড়ে গেল। কি ক'রে যে হতচ্ছাড়া ফকিরটিকে ভাগাবে? তার এমন কি সুরাহা হতে পারে?'

সে উপায়ান্তর না দেখে আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'ফকির সাহাব, গোস্‌সা করবেন না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, দোকান বন্ধ করব।'

সওদাগর আবদ তো দোকান বন্ধ ক'রে লেড়কাকে নিয়ে পালাবার মতলব আঁটিছে, লেকিন ফকিরের ওঠার কোন লক্ষণও নেই। এবার তার হাতে মোহরের একটি পুঁটুলি দিয়ে বল্‌ল—'নিন, এবার আমাকে রেহাই দিন। নিজের ধান্দায় যান। দোকান বন্ধ ক'রে নিজের মকানে যাই।'

ফকির আরও গ্যাট হয়ে বসল।

সওদাগর আবদ-এর শিরে খুন চাপার জোগাড় হ'ল। তার যত গোস্‌সা গিয়ে পড়ল বিবির ওপর। ভাবল, লেড়কাকে নিয়ে একবার মকানে ফিরতে পারলে বজ্জাত বিবিকে মজা টের পাইয়ে ছাড়ব। ইয়া আল্লাহ! বলে কি না লেড়কাকে কারবার শিখিয়ে তৈরি করতে হবে। এখন ঠ্যালা সামাল কে দেবে? বেটাকে সঙ্গে দিয়ে তার আম্মাকে পাঠাব দোকানে, কারবার শেখাক্। তখন মালুম হবে, ঠ্যালা কাকে বলে।

আজব ব্যাপার। ফকির মোহরের পুঁটুলিটি নেয়া তো দূরের ব্যাপার একবার ছুঁলোও না। সওদাগর দোকান বন্ধ করার মুখে সুড়সুড় ক'রে তাদের সঙ্গে দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

দোকান বন্ধ ক'রে শক্ত ক'রে লেড়কার হাত ধরে নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে মকানের দিকে হাঁটা জুড়ল। কয়েক কদম গিয়ে পিছন ফিরতেই নজরে পড়ল, হতচ্ছাড়া ফকিরটি তার পিছু নিয়েছে। সে কয়েক কদম এগিয়ে আবদ-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফোকলা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'বেটা আবদ, আজকের রাত্রিটি তোমার মকানে মেহমান হয়ে থাকতে চাই।'

সওদাগর আবদ-এর শিরে খুন চাপার জোগাড় হ'ল। তার দিল্ চাইল কি, হতচ্ছাড়া ফকিরটির টুঁটি টিপে একদম খতম ক'রে দেয়। কী নচ্ছার ফকিরটি! বলে কিনা রাত্রের জন্য তার মকানে মেহমান হয়ে যাবে। এখন কোন্ ফন্দি ফিকির ক'রে তাকে ভাগাবে? সমস্যাও তো আছে। হাদিস তো বলেছে—কোন মুসাফির যদি কারো মকানে মেহমান হতে চায় তাকে ফিরিয়ে দিলে তার মহা গুণাহ হবে। আর যা-ই হোক, ইসলামের নির্দেশ তো আর অমান্য করা যাবে না। ফিন আদমিটির মতলব জরুর আচ্ছা নয়, কি করেই বা আপদটিকে মকানে নিয়ে গিয়ে তুলবে!

মুখফুটে যখন আদমিটি বলেই ফেলেছে, মেহমান হবে তখন আর ওজর আপত্তি তুলে তাকে ভাগিয়ে দেবে না। লেকিন নিজের কামরায় জায়গাও দেবে না। ভোর হলেই নাস্তা করিয়ে ভাগিয়ে দেবে। তবে হতচ্ছাড়া বেল্লিকটি যদি তার লেড়কার দিকে কুমতলব নিয়ে তাকায়, কিছু করতে চায় তবে তাকে ছেড়ে দেবে না। রেয়াত করার প্রশ্নই ওঠে না। বাগিচায় একদম জিন্দা পুঁতে ফেলবে। এতে যদি ফাটকে ঢুকতে হয় তবু একদম দমবে না।

অনন্যোপায় হয়ে আবদ ফকিরকে নিজের মকানে নিয়ে গেল। হতচ্ছাড়াটি বাহানা জানে পুরোদস্তুর। মকানে পা দিয়েই আবদ'কে বল্‌ল—'বেটা, নামাজের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, বন্দোবস্ত কর।' মেহমানকে তো হেলাফেলা করা ঠিক নয়। নামাজের জায়গা ক'রে দিল ছোট্ট একটি মাদুর বিছিয়ে। নামাজ পাঠ সেরে হতচ্ছাড়াটি কোরাণ শরিফ ধ'রে বসল।

সওদাগর ভাবল অনেকেই নিয়মমাফিক ফি রোজ কোরাণশরিফ-এর কিছু কিছু অংশ পাঠ করে। লেকিন নচ্ছার ফকিরটি আর কোরাণ শরিফ থেকে মুখই তুলছে না। সওদাগরের তো কপালে হাত পড়ে গেল। রাত্রি গভীর হয়ে এল। তবু ফকির কোরাণ-এর পাতা উল্টেই চলেছে। এ পরিস্থিতিতে কি করেই বা ফকিরকে বলে, খুব হয়েছে, এবার ছাড়ান দাও দেখি। খানাপিনা সেরে শোবার বন্দোবস্ত কর ফকির সাহাব। ভোর হলেই বিদায় নিতে হবে। তবু সে থামল না। সওদাগর আবদ কিছু সময় হাত-আঙুল কামড়ে, অস্থিরভাবে পায়চারি করে কামরা ছেড়ে চলে গেল।

নিজের কামরায় গিয়েও স্বস্তি পেল না সওদাগর আবদ। ভাবল, মেহমানকে একা ফেলে ভেগে আসা মোটেই সঙ্গত নয়। ফিন হতচ্ছাড়াটির ভড়ং ভাড়ং আর চোখের সামনে বরদাস্তও করতে পারছে না। উপায়ান্তর না দেখে লেড়কা কামর'কে বল্‌ল—'বেটা, ফকির সাহাবের কাছে একটু বস গে তো। বহুৎ
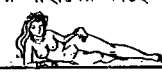
আচ্ছা কোরাণ পাঠ করছে, শোন গে। ধর্মগ্রন্থের ব্যাপার স্যাপার শোনারও জরুরৎ রয়েছে।'

কামর ব্যাজার মুখে বল্‌ল—'আব্বাজান, বুড্ডাটি দোকানে অচানক আমার গাল ধরে টিপ দিয়ে দিয়েছিল।'

—'কিছু না বেটা। বুড্ডা আদমি আদর সোহাগ টোহাগ করেছিল। এ তো বিলকুল মামুলি ব্যাপার। এখনও যদি একটু আদর টাদর করে তবে উঠে ভাগিস নে যেন। আর যা-ই হোক মেহমান তো বটে। আমার তবিয়ৎ আচ্ছা নেই। তুই-ই ওর পাশে গিয়ে একটু বস গে।

লেড়কাকে ফকিরের কাছে পাঠিয়েছে বটে। লেকিন এতে সওদাগর আবদ দিল্ থেকে শঙ্কা ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারল না। ওপর তলার এমন এক কামরায় গিয়ে বসল যেখান থেকে ফকিরটিকে পুরোপুরি চোখে চোখে রাখা যায়। লেকিন ফকিরের নজরে সে পড়বে না।

কামর ফকিরের কামরায় এল। হতচ্ছাড়া ফকিরটি কোরাণ শরিফ থেকে চোখ তুলে তার মুখের দিকে নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে তাকিয়ে রইল কিছু সময়।

এক সময় বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ব'লে উঠল—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! বেটা, কাছে এসো। এসো, আমার কোলে এসে বোস। বহুৎ আচ্ছা লেড়কা বটে!'

কামর তার কোলে বসল না বটে। তবে তার কাছাকাছি প্রায় গা-ঘেঁষে বসল।

ফকির ফিন কোরাণ শরিফ-এর পাতায় চোখ রাখল। বিড় বিড় ক'রে পাঠ করতে লাগল। সে ভক্তিভাবে এমনই আপ্লুত হয়ে পড়ল যে, চোখের পানি জোয়ারের পানির মাফিক গল্ গল্ ক'রে বেরিয়ে আসতে লাগল।

সওদাগর আবদ আড়ালে বসে এ-দৃশ্য দেখে নিজের প্রতি বার বার ধিক্কার দিতে লাগল। আমার দিল্ এমনই কালো যে, এমন এক মহাত্মাকে আমি কিনা কতভাবে সন্দেহ করেছি! আদতে আদমিটি একদম সাচ্চা মুসলমান। মহাধার্মিক।

সওদাগর আবদ এক দৌড়ে নিচতলায় নেমে এসে বল্‌ল—'ফকির সাহাব, এক বাৎ, আপনার চোখে পানির ধারা কেন? আমার আদর যত্ন কি আপনার দিল্ ব্যথিত-মর্মাহত করেছে?'

—'না বেটা, এসব ব্যাপার স্যাপার নয়। আদতে আমার পুরানো ক্ষত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আপনি কি তাতে লবণের ছিটা দিতে চাইছেন? বহুৎ আচ্ছা, শোন তবে—দেখতেই পাচ্ছ, আমি একদম রিক্ত-নিঃস্ব ফকির। দুনিয়ায় আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। আপন বলতেও নেই কেউ-ই। আল্লাতাল্লা-র দোয়ার ওপর নির্ভর করে দিন গুজরান করি, পথ চলি। তাই এ-ধর্মগ্রন্থটি হরবখত সাথে সাথেই রাখি।'

হারা উদ্দেশ্যে পথ পাড়ি দিয়ে দিয়ে এক জুম্মাবারে আমি বসরাহ বন্দরে হাজির হলাম। তখন ভোর। তাজ্জব বনলাম। পথে কোন আদমিকেই দেখলাম না। আরও তাজ্জব বনলাম যখন দেখলাম দোকান পাঠ বিলকুল খোলা, লেকিন দোকানী বা খদ্দের নেই। দোকান একদম ফাঁকা। বেঁহুস হয়ে ছুটোছুটি করলাম। তবু কারো দেখা মিল্‌ল না। মালুম হ'ল আমি বুঝি এক নিঃঝুম-নিস্তব্ধ গোরস্তানে খাড়া রয়েছি। নিজের দিল্‌কে তখন বুঝিয়ে দিলাম, যে কোন অজানা কারণেই হোক দোকানী ও খদ্দেরপত্র উধাও হয়ে গেছে।

বেলা পড়তে লাগল। দু'দিন ভুখা। পেটে দানাপানি পড়েনি। পেটে চুলা জ্বলছে। সামনেই এক মিঠাইয়ের দোকান। বারকোষে লাড্ডু-মিঠাই সাজানো। দোকানের মালিক যখন নেই-ই তখন আমিই মালিক ভাবলে গোস্তাকী কোথায়। দোকানের ভেতরে ঢুকে গিয়ে গপাগপ লাড্ডু-মিঠাই দিয়ে পেট ভরে নিলাম। বাকীটুকু ভরলাম ঠাণ্ডা পানি দিয়ে। জান রক্ষা পেল।

আমি ফিন পথে নামলাম। সাচ্চা বটে, চারদিক গোরস্তানের মাফিক নিস্তব্ধ। ব্যাপারটি এমন দাঁড়াল, থেকে থেকে নিজের পায়ের শব্দ পেয়েও যেন ডরে কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে আসার জোগাড় হ'ল। গোরস্তানের মধ্য দিয়ে হাঁটলে অবিকল যে রকম মালুম হয়।

অচানক বাজনার আওয়াজ আমার কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে শোনার পর আমার মালুম হ'ল বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত ধ্বনি কোন শুভ সঙ্কেত ঘোষণা করছে না বরং অশুভ কোন কিছুরই ইঙ্গিতবাহী।

আমি ঝট্ করে একটি গুদামের বস্তার আড়ালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইলাম। জায়গাটি এমন যেখান থেকে আমি সব কিছু দেখতে পাব লেকিন আমি কারোরই নজরে পড়ব না।

একটু বাদেই ব্যাপারটি আমার কাছে সাফা হয়ে গেল। দেখলাম বাজনা বাজিয়ে একটি মিছিল এগোচ্ছে. অবিকল হুরী-পরীর মাফিক খুবসুরৎ চল্লিশটি লেড়কি পথের দু' ধার দিয়ে সারি বেঁধে পথ চলেছে। আর? তাদের পিছনে এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি খচ্চরের পিঠে চেপে এগিয়ে চলেছে। মুখে তার হাসির ঝিলিক।

আমি জিন্দেগীভর মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি। খুবসুরৎ লেড়কি আর জেনানাও কম দেখি নি। লেকিন এ-লেড়কিটি একদম অদ্বিতীয়া। এক পলক দেখলেই মালুম হয় বুঝিবা বেহেস্তের হুরী পরী মিট্টির দুনিয়ায় নেমে এসেছে। এ যেন বেহেস্তের হুরী-পরীদের বানাবার পর যে-সুরৎটুকু বেঁচে গিয়েছিল তার সবটুকু এনে এর গায়ে মাখিয়ে দেয়া হয়েছে। সাচ্চা বলতে তার সুরৎ

অবর্ণনীয়।

বাজনা বাজিয়ে আশমান জমিন কাঁপিয়ে দিয়ে মিছিল এগিয়ে গেল। এবার এক আজব ব্যাপারের মুখোমুখি আমাকে হতে হ'ল। একটু আগে যেসব দোকানপাট খোলা ছিল লেকিন বিক্রেতা বা ক্রেতা কেউ-ই ছিল না, এখন বস্তার আড়াল থেকে বেরিয়ে উল্টো ব্যাপারের মুখোমুখি হলাম। দোকান-বাজার রাস্তা ঘাটে একদম আদমির মেলা বসে গেছে।

কৌতূহলের শিকার হয়ে এক আদমিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'মিঞা সাহাব, খুবসুরৎ লেড়কিরা কাকে মিছিল ক'রে নিয়ে গেল মেহেরবানি ক'রে বলবেন কি?'

মিঞা সাহাবটি আমার প্রশ্নটি শোনামাত্র অচানক কেমন যেন মিইয়ে গেল। ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখে এক ঝলক আমার আপাদমস্তক চোখের মণি দু'টোকে বুলিয়ে নিয়েই ভয়ে-ডরে কেটে পড়ল। আমার প্রশ্নে আচ্ছা বা বুড়া কোন জবাবই দিল না।

আমি উপায়ান্তর না দেখে দু'কদম এগিয়ে গিয়ে আর

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে-ও ভয়ে ডরে সিঁটকে যাওয়ার ভাব দেখিয়ে পিছিয়ে গেল। তার চোখে মুখেও সন্দেহ আর আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করলাম।

আজব ব্যাপার তো। যাকেই জিজ্ঞাসা করছি সে-ই কোন জবাব

তো দিচ্ছেই না, বরং একদম ঘাবড়ে গিয়ে সুরুৎ ক'রে কেটে পড়ছে। আমি নাছোড়বান্দা। ব্যাপারটির হিল্লে করার জন্য আমার মধ্যে জেদ চেপে গেল। সবশেষে এক নাপিতকে হাতের কাছে পেয়ে চেপে ধরলাম—'নাপিত ভাইসাহাব, একটু আগে মিছিল ক'রে কাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, বল তো?'

এ-ও দেখি এক আজব কাণ্ড ক'রে বসল। আমার প্রশ্নটি খতম হতে না হতেই সে ঝট ক'রে কানে আঙুল দিয়ে বসল। তবে অন্যান্যদের থেকে এর ফারাক কিছু তো ছিলই। এ মুখ আমসি ক'রে কেটে পড়ল না। আমার কানের কাছে ঝুঁকে বল্ল—'শোন এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করা অনুচিত, জবাবও দেয়া চলে না।'

নাপিতটি এবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বল্ল—'ভাইসাহাব, দেখে মালুম হচ্ছে আপনি পরদেশী মুসাফির, ঠিক কিনা। সাফ বাৎ শুনুন, এ-নগরে আপনার থাকা মোটেই নিরাপদ নয়, ভেগে যান। এর বেশী কিছু প্রশ্ন করলে জবাব মিলবে না। জানের মায়া থাকলে এ-মুহূর্তেই এ-নগর ছেড়ে কেটে পড়ুন।'

আমি তো তার বক্তব্য শুনে একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

নাপিতটি ব'লে চল্ল—'সাহাব, বরাতের জোরে আপনি মিছিল আসার আগেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। না হলে আপনার ধড় থেকে মুণ্ডটি খসে পড়ে পথে মিট্টি মাখামাখি হ'ত। আমরা তো ডরে একদম কুঁকড়ে থাকি। একটু আগে রাস্তাঘাট আর দোকান পাটের হালৎ দেখে আপনার কিছুই মালুম হয় নি?'

মোদ্দা বাৎ, নাপিতের বাৎচিৎ শুনে, কমসে কম একটি ব্যাপার আমার কাছে খোলসা হয়ে গেল, আমার মাফিক হাবাগোবা সাদাসিধা আদমির জায়গা এটি নয়। আর এক লহমাও থাকা সঙ্গত নয়। ব্যাস, সে-নগর ছাড়লাম। ফিন পথে নামলাম। এ-মুলুক সে-মুলুক ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে আজ এখানে হাজির হলাম।

এখানে পা দিয়েই তোমার লেড়কার সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল। তার সুরৎ দেখে আমার চোখ দুটো তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে গেল। বিচার ক'রে দেখলাম, এর জুড়ি হওয়ার একমাত্র যোগ্য বসরাহের সে-লেড়কি। এক বাৎ তো সাচ্চা যে, আল্লাহ যখন সে-হুরীকে পয়দা করেছেন তখন তার জুড়ি কোন না কোন নওজোয়ানকেও জরুর পয়দা করেছেন। আল্লাহ-র কি মর্জি জানি না, তবে এদের মিলনে একে অন্যের পরিপূরক হবে, সন্দেহ নেই।

ফকিরটি তার কিস্‌সার এ-পর্যন্ত বলার পর মুচকি হেসে বল্ল—'আজ এটুকুই থাক। আমি অন্যত্র চলে যাচ্ছি। তবে এক বাৎ ব'লে যাচ্ছি, তোমার লেড়কা বসরাহের হুরীকে শাদী ক'রে সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করুক। ব্যাস, ফকির কামরা ছেড়ে বেরিয়ে রাত্রির আন্ধারে মিলিয়ে গেল।

ফকির বিদায় নিলে কামর বাকী রাত্রিটুকু বিছানায় শুয়ে এপাশ

ওপাশ ক'রে কাটিয়ে গুজরান করল।

বুড্ডা ফকির কামর-এর কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে গেল। সে এবার থেকে গোমড়ামুখে বসে কল্পনার মাধ্যমে সে-হুরীর ছবি আঁকার কোশিস করল। লেকিন পারল না কিছুতেই।

ভোরে কামরা থেকে বেরিয়ে কামর সোজা তার আম্মাকে পাকড়াও করল। কোন ভনিতা না ক'রে সরাসরি বল্‌ল—'আম্মা, আমি বসরাহ নগরে যাত্রা করব। বসরাহের সে হুরীকে না মিল্‌লে আমার জিন্দেগী বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। আমার সামানপত্র গোছগাছ ক'রে দাও।'

চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে তার আম্মা তার আব্বাকে বল্‌ল—'তোমার গুণধর লেড়কার মর্জির ব্যাপার কিছু শুনেছ? বসরাহ নগরে যাবে। সেখানকার সে-খুবসুরৎ লেড়কিকে ছাড়া সে জিন্দেগীতে নাকি শাদীই করবে না। শোন, তোমার পাগল বেটার বাৎ।'

সওদাগর আবদ লেড়কাকে বুঝাতে কোশিস করল। পরদেশ। সেখানকার কিছু জান পহচান নেই। কোথায় গিয়ে টুঁড়ে মরবি বাপজান? ওসব বাজে ধান্ধা দিমাক থেকে ঝেড়ে মুছে ফেল।

কামর বিলকুল বিগড়ে গেছে। সে সাফসাফ জানিয়ে দিল, যাবেই যাবে।

সওদাগর বিবির ঘাড়ে বিলকুল কসুর চাপিয়ে দিয়ে তড়পাতে লাগল—'তোমার, হ্যাঁ, তোমার জন্যই বেটার দিমাক বিগড়েছে। তোমার বুদ্ধি কাজে লাগাতে গিয়ে তাকে দোকানে নিয়ে গিয়েই তো সর্বনাশের বোঝা আজ ঘাড়ে চাপল।'

সওদাগর আবদ নিজেকে চালাক ভেবে লেড়কাকে কামরায় আটক ক'রে রেখেছিল। ভেবেছিল, এতেই লেড়কাকে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারবে। আর তার দাম তাকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। হতাশায় সে একদম ভেঙে পড়ল।

নসীব সবচেয়ে বড়া। যার নসীবে যা লিখা আছে তাকে এড়াবে কে?

সওদাগরের বিবি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে স্বামীকে বুঝাবার কোশিস করল—'ঝুটমুট ভেঙে পড়লে ফয়দা তো কিছুই হবার নয়। বরাতে যা আছে তা তো ঘটবেই।'

শেষ অবধি কামর-এর আব্বা ও আম্মা উভয়েই তাকে পরদেশে, বসরাহ নগরে যাওয়ার মত দিল।

রওনা হবার সময় কামর-এর আম্মা কিছু হীরা-জহরৎ লেড়কার জেবে পুরে দিয়ে বল্‌ল—'বেটা, এগুলো সঙ্গে রাখবি। মুসিবতে পড়লে ব্যভার করবি।' আর তার সঙ্গে দু' জন বিশ্বস্ত বান্দা দিয়ে বল্‌ল—'এরা তোমার সঙ্গে থাকবে। তোমাকে দেখভাল করবে। এদের পরামর্শ মাফিক চলবে। অগ্রাহ্য ক'রে কোন কাজই করবে না। এরা বান্দা হলেও তোমার চেয়ে বয়সে ঢের বড়া। এদের পাকা বুদ্ধিকে চলার পথে কাজে লাগাবে, মুসিবতে পড়লে উদ্ধার করতে পারবে।

কামর বসরাহতে হাজির হ'ল। সেদিন জুম্মাবার ছিল। নগরে পা দিতেই সে-বুড্ডা ফকিরের বক্তব্য সাচ্চা প্রমাণীত হ'ল। আজব ব্যাপার তো! পথঘাট একদম ফাঁকা। দোকান থেকে দোকানী ভেগেছে। খদ্দেরের চিহ্ন নেই। রাস্তাঘাটে কোন আদমিই নেই।

খিদেতে পেটের মধ্যে তার আগুন জ্বলছে। পথের ধারে একটি দোকানে ঢুকে গেল। মণ্ডা মিঠাই তুলে জোরসে সেগুলো পেটে চালান দিতে মেতে গেল। ঠাণ্ডা পানি গলা অবধি ঢেলে দিল।

দাম মেটাবার ভাবনা তো আর নেই। ফলে খানাপিনার দাম দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই বাজনার আওয়াজে কামর-এর দিল্ উতলা হয়ে ওঠে। সে বস্তার আড়ালে গিয়ে গা-ঢাকা দিল।

মিছিল করে বাজনাওয়ালারা যেতে লাগল। তাদের পিছনে দু'সারি জমকালো পোশাকে সজ্জিত খুবসুরৎ চল্লিশটি নওজোয়ান

লেড়কি। দরবেশের মুখে এদের সুরতের যে-বিবরণ শুনেছিলাম এখন চাক্ষুষ ক'রে দেখছি তার বিবরণ ঠিকঠাক নয়। তার দেয়া বিবরণের চেয়ে ঢের বেশী সুরতের অধিকারিণী। পরমুহূর্তেই দেখি কয়েক কদম দূরে খুবসুরৎ লেড়কিদের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে এক নওজোয়ান লেড়কি মুখে মিঠা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে এগোচ্ছে। হুরী—হ্যাঁ, বেহেস্তের হুরীকেও বুঝি এর সুরৎ হার মানাবে। দরবেশ বলেছিল, সে জিন্দেগীভর তামাম দুনিয়া টুঁড়ে বেড়িয়েছে। বহুৎ, বহুৎ খুবসুরৎ লেড়কি ও জেনানাকে চাক্ষুষ

করেছে বটে। লেকিন কোন লেড়কি বা জেনানার মধ্যে এমন দিল্ উতলা করা, কলিজায় জ্বালা ধরানো সুরতের বিচিত্র সমাবেশ কারো মধ্যেই চাক্ষুষ করেনি। ঠিক যেন বেহেস্ত থেকে এক হুরী মিট্টির দুনিয়ায় নেমে এসেছে। লেকিন খুবসুরৎ এ-নওজোয়ান লেড়কিটিকে চাক্ষুষ করার পর মালুম হচ্ছে ফকিরটি এর সুরতের যথাযথ বিবরণ দিতে পারে নি। তবে? কিভাবে ভাষার মাধ্যমে এর বিবরণের ঘাটতিটুকু পূরণ করে তার সুরতের ব্যাখ্যা হুবহু দেয়া যেতে পারে তার ভাষাও আমার মধ্যে নেই। তবে এটুকু হলফ ক'রে বলতে পারি এর সুরৎ এক লহমায় দেখেই আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। আর দোসরা কোন লেড়কিই আমার চোখ দুটোকে এমন করে মুগ্ধ করতে পারবে না। আজ দু' চোখ ভরে যে-সুরৎ চাক্ষুষ করলাম এবার যদি আমার ইন্তেকালও হয়ে যায় তবে কিছুমাত্র আপশোষ থাকবে না।

একটু বাদেই মিছিল চোখের আড়ালে চলে গেল। কামর ধীর পায়ে বস্তার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। এদিক-ওদিক চোখের মণি দুটোকে ঘুরাতেই একদম তাজ্জব বনে গেল। এতক্ষণ যেখানে কবরখানার নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল এখন সেখানেই যেন প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। দোকানে দোকানে দোকানী দাঁড়িয়ে, ক্রেতারা ছুটোছুটি করছে আর পথেঘাটে আদমিদের ব্যস্ততা। ব্যাপারটি এমন যে, মালুম হচ্ছে, এক লহমায় পুরো নগরটি যেন জিন্দা হয়ে উঠেছে। সবার ব্যস্ততা আর চনমনে ভাব দেখে বিশ্বাসই হয় না একটু আগে এরা গর্তের ভেতরে ভয়ে ডরে সিঁটিয়ে লেগে আন্ধার গর্তের মধ্যে পড়েছিল।

কামর কয়েক কদম এগিয়ে এক দোকানে ঢুকে জমকালো বড়িয়া সাজপোশাক খরিদ করল। হামামে ঢুকে আচ্ছা করে গোসল সারল। সাজপোশাক গায়ে চাপিয়ে একদম সুলতান-বাদশা বনে গেল।

সামান্য এগিয়ে কামর এক নাপিতের দোকানে ঢুকল। তাকে দরওয়াজায় দেখেই মাঝ-বয়সী নাপিত সেলাম ঠুকে একটি কুরশী দেখিয়ে বসতে বল্ল।

কামর বল্ল—'ভাইসাহাব, তোমার সঙ্গে দুটো জরুরী বাৎ ছিল যদি একটু সময় দিতে পার—'

নাপিতটি এক গাল হেসে বল্ল—'বলুন, কি বলতে চাইছেন?'

কামর একটু ইতস্তত ক'রে বল্ল—'একটু গোপনও বটে। এখানে তো তোমার খদ্দেররা রয়েছে, বলা সম্ভব নয়। মেহেরবানি ক'রে যদি একটু বাইরে আস তবে খোলসা ক'রে বাৎচিৎ হতে পারে। বক্তব্য পেশ করতে করতে তার হাতে একটি দিনারের থলি ঢুকিয়ে দিল।

নাপিতটি দোকান ছেড়ে নিরালা স্থানে গিয়ে কামরকে নিয়ে গিয়ে বল্ল—'বলুন হুজুর, আপনার জন্য আমি দোজখের দক্ষিণ দুয়ারেও যেতে রাজী।'

—'না, এত করতে হবে না। একটি ব্যাপার হচ্ছে, শুনেছিলাম জুম্মাবারে এ-পথ দিয়ে একটি জমকালো মিছিল যায়। আর যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন, তখন দোকান-বাজার এমন কি পথঘাটও নাকি একদম ফাঁকা হয়ে যায়। লেকিন কেন এমন হয় বলতে পার? কার ভয় ডরে সবাই অন্তরালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে থাকে? সাচ্চা বটে, আমি এ-নগরে নয়া এসেছি। লোভ সম্বরণ করতে না পেরে আমি আজ মিছিলটি চাক্ষুষ করেছি।'

নাপিতটি সঙ্গে সঙ্গে একদম আঁৎকে উঠে বলে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! আপনি করেছেন কি সাহাব! ধরা পড়লে জান আপনার এক লহমায় খতম হয়ে যেত।'

কামর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্ল—'তার জন্য কুছ পরোয়া নেই। যে-খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কিকে চাক্ষুষ করলাম তার বিনিময়ে যদি জান দিতে হ'ত আপশোষের কিছু ছিল না। সুরতের এমন বিচিত্র সমাবেশ কোন লেড়কির মধ্যেই ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করি নি। ভবিষ্যতেও করব বলে মালুম হয় না।'

নাপিতটির চোখে-মুখে গাম্ভীর্য ও হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। শুকনো গলায় জবাব দিল—'হুজুর, আমার ঠিক মালুম নেই, তবে যেটুকু বুঝেছি তা হ'ল শুক্রবার সকালে মিছিলটি চলে না যাওয়া অবধি কেউ দোকানে থাকে না, পথেও বেরোয় না। কারো সাহস—'

—'কেন? কেন কারো সাহস হয় না? কিসের এত ভয় ডর? নাপিত ডরে আমসি হয়ে যাওয়ার মুখে ব'লে উঠল—'হুজুর, মেহেরবানি করে এর বেশী আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি জানি না, আপনাকে বলতেও পারব না। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বল্ল—'হুজুর, আমার বিবি সব জানে। আপনি চাইলে তার মুখ থেকে ব্যাপারটি সম্বন্ধে বিলকুল জানতে পারবেন।'

নাপিতটি তার দোকানে অপেক্ষমান আধা-কামানো খদ্দেরটির ব্যাপার একদম ভুলে গিয়ে বল্ল—'হুজুর, এক কাম করুন, একটু অপেক্ষা করুন আমি ছুটে গিয়ে আমার বিবিকে জিজ্ঞাসা করে আসছি। সে যদি এ-ব্যাপারে আপনাকে খোলসা করে বলতে রাজী থাকে তবে তার সামনে আপনাকে হাজির করব।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতশ' তিরাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্লেন—'জাঁহাপনা, কামর'কে দোকানে বসিয়ে নাপিতটি তার মকানের দিকে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটা জুড়ল।

মকানে গিয়ে সে বিবির হাতে মোহরের থলিটি গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—'শোন, কাছে এসো।' বিবির কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্‌ল, এক আমীর সওদাগর নিজে এসে ধরা দিয়েছে। বলতে পার বরাতের জোরে জুটে গেছে। দোকানে বসিয়ে রেখে এসেছি। এখনি গিয়ে নিয়ে এসে তোমার সামনে হাজির করছি। যদি পার আরও কিছু খিঁচে নিও। তবে আমি গিয়ে নিয়ে আসি, কি বল?'

নাপিতটি তার বিবির জবাবের অপেক্ষা না করেই ছুটতে ছুটতে দোকানে গিয়ে কামর'কে নিয়ে এল। সদর-দরওয়াজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌ল—'ঘাবড়াবার কোনই ব্যাপার নেই, সোজা চলে আসুন সাহাব। বিবির সঙ্গে আমি বাৎচিৎ সেরেই নিয়েছি। সে আপনাকে সাহায্য করবে ওয়াদা করেছে। বলুন, আপনার যা কিছু জিজ্ঞাস্য জেনে নেবেন।'

নাপিতের বিবি প্রায় বুড্ডা। কামর'কে কামরায় নিয়ে গিয়ে মেহমানের সমান আদর যত্ন করল। গুলাব পানির সরবৎ ক'রে দিল। নিজের পেটের লেড়কার সমান আদর-সোহাগ করল তাকে।

কামর নাপিতের বিবির আচরণে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মালুম হ'ল পরদেশে এসে যেন আম্মার সমান এক জেনানার দেখা মিল্‌ল।

একটু বাদে নাপিতের বিবি কামর'কে আদর ক'রে রেকাবিতে খানা দিল।

খানাপিনা সেরে কামর কোর্তার জেব থেকে এক গোছা দিনার বের ক'রে নাপিতের বিবির হাতে দিতে গিয়ে বল্‌ল—'আম্মা, তোমার বেটা এগুলো ভালবেসে তোমাকে দিচ্ছে, নাও। শরমটরমের কোন ব্যাপার নেই, রেখে দাও। তোমার কাছ থেকে যে আদর-সোহাগ পেলাম তা সামান্য ধন-দৌলত দিয়ে শোধ দেবার নয়। তুমি তো জান, আমি ভিন্‌দেশী। এর বেশী কিছু দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই। নাও রেখে দাও।'

নাপিতের বিবি দিনারগুলো বুকের কাছে কামিজের ভেতর চালান ক'রে দিতে গিয়ে বল্‌ল—'বেটা, অমন ক'রে বলছ, আমাদের গরীবখানায় তোমাকে তো দিল্ ভরে উপযুক্ত আদর-যত্নই করতে পারলাম না।'

—'ছিঃ অমন বলতে নেই আম্মা! নিজের পেটের বেটা ভাবলে দেখবেন দিলের ধুকপুকানিটুকু একদম উবে যাবে। যাক, আমার এখানে আসার আদৎ ব্যাপার একটি আছে।'

—'আদৎ ব্যাপার? কি তোমার আদৎ ব্যাপার? কি-ই বা তোমার উদ্দেশ্য? তুমি কি আমার কাছে কিছু জানতে চাইছ, বল তো বেটা? আমার যদি জানা থাকে তবে হাজারবার বলব।'

—'জুম্মাবারে লেড়কিরা যে এক খুবসুরৎ লেড়কিকে বাজনাবাদ্যি বাজিয়ে মিছিল ক'রে নিয়ে যায়, ব্যাপারটি কি?'

—'বলছি তবে শোন বেটা। আমাদের বসরাহের সুলতান একবার ইয়া বড় এক মুক্তা উপঢৌকন স্বরূপ পেলেন। উপহারটি পাঠিয়েছেন ভারতের সুলতান। আমাদের ধারণা, এত বড় মুক্তা নাকি হয় না। তার গা থেকে হরদম আলোর চিকনাই ঠিকরে বেরোয়।

মুক্তাটি পাবার পর সুলতানের শখ হ'ল সেটি গলায় পরবেন। লেকিন তার গায়ে এমন কোন ছিদ্র নেই যাতে সূতা পরিয়ে গলায় ধারণ করা যেতে পারে।

মুক্তাটি বাজারের সেরা জহুরীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল। এক এক ক'রে বহুৎ জহুরীর হাতে মুক্তাটি ঘুরল। লেকিন কারো হিম্মতে কুলোল না তার গায়ে সূতা পরাবার উপযুক্ত একটি ছিদ্র ক'রে দেয়। তারা একই বাৎ সুলতানকে জানাল—'জাঁহাপনা, এ কিসিমের হীরা আমরা জিন্দেগীতে চোখে দেখতে পাই নি। এ-ই প্রথম দফে দেখলাম বটে। এর দাম সম্বন্ধেও আমাদের কোন ধারণা নেই।'

সুলতান ভ্রূ কুঁচকে জহুরীদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জহুরীরা ব'লে চল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমরা হাজার হাজার মুক্তো নাড়াচাড়া করেছি। লেকিম মালুম হচ্ছে, মোহরের বিনিময়ে এ দ্রব্য খরিদ করা যায় কি না তা-ও জানা নেই। তাই এমন একটি অমূল্য সম্পদের গায়ে অস্ত্র চালাতে দিল্ একদম টানছে না। মেহেরবানি ক'রে গোস্‌সা করবেন না, কসুর মানবেন না।'

সুলতান চোখ দুটো একদম কপালে তুলে বল্‌ল—'এ কেমন বাৎ বলছ তোমরা? তোমরা তো আরব দুনিয়ার সেরা সেরা জহুরী। তোমাদের হিম্মতে না কুলালে কে বা কারা পারবে, বলতো? মুক্তোটি গলায় পরব ব'লে এত শখ ক'রে তোমাদের কাছে পাঠালাম, সূর্যের টুকরোর মাফিক তামাম দিন আমার কণ্ঠের শোভা বর্ধন করবে। যে দেখবে, বিলকুল তাজ্জব বনে যাবে। আর তোমরা আমার এ-শখটি পূরণ করবে না?'

সুলতান-এর বক্তব্য খতম হলে জহুরীদের মধ্য থেকে একজন বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমাদের এ-নগরেরই একপ্রান্তে এক বুড্ডা জহুরী রয়েছে। উবেদ তার নাম। তাকে তলব করলে আপনার শখ পূরণ হতে পারে।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তাকে তলব দাও। আমার সামনে জলদি হাজির হয় যেন।'

সুলতানের জরুরী তলব পেয়ে বুড্ডা জহুরী উবেদ সুলতানের সামনে হাজির হ'ল। নতজানু হয়ে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এ-অধমকে কেন তলব করেছেন, মেহেরবানি ক'রে বলুন?'

—'শোন উবেদ, এ মুক্তাটি আমি গলায় ধারণ করব। তোমাকে

এর গায়ে একটি ছিদ্র ক'রে দিতে হবে। তবে একদম হুঁশিয়ার, যেন মুক্তাটির কোথাও চটে না যায়। আমার শখ মেটাতে পারলে তোমাকে খুশী ক'রে দেব, ওয়াদা করলাম।'

বুড্ডা জহুরী উবেদ একটি তুরপুণ দিয়ে এক লহমার মধ্যে মুক্তাটির গায়ে একটি ছিদ্র ক'রে দিল। সেটি এবার সুলতানের হাতে ফিরিয়ে দিল।

মুক্তাটি গলায় পরে সুলতান খুশীতে ডগমগ হয়ে বল্‌লেন—'জহুরী উবেদ, তোমার কাজ আমাকে খুশী করেছে। এবার তুমি বল, কি পেলে তোমার দিল্ ভরবে, একদম খুশী হবে?

বুড্ডা জহুরী উবেদ বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার বিবির পরামর্শ বিনা আমি তো আপনাদের কাছ থেকে কিছু মাঙতে পারব না। আমি বুড্ডা হয়েছি, জ্ঞান-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। আমার বিবি পাকা বুদ্ধি ধরে। তার পরামর্শ নিয়ে আপনাকে জানাতে পারি।'

—'যাও। জলদি গিয়ে তার পরামর্শ নিয়ে ফিরে এসো। আমি তোমাকে ওয়াদা যখন দিয়েছি, জরুর পূরণ করব।'

উবেদ তার বিবির পরামর্শের জন্য লম্বা লম্বা পায়ে মকানে

ফিরে গেল। সুলতানের ওয়াদার ব্যাপার তাকে বলতেই সে খুশীতে একদম নেচে উঠল। উল্লসিত হয়ে ব'লে উঠল—'তবে এতদিনে আমি সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে পারব।'

—'আরে বিবিজান তুমি একবার মুখফুটে বল না, কি চাই? যা মাঙবে, মিলে যাবে। বিবিজান, আমার যে কী খুশী হচ্ছে, বলে বুঝাতে পারব না। এবার আমরা একদম আমীর ওমরাহ বনে যাব। আরে দেরী কোরো না। চট ক'রে বলে ফেল সুলতানের কাছ থেকে কি মাঙব।'

—'এ নিয়ে ফিন ভাববার কি আছে? আমি তো অনেক আগেই কি মাঙব স্থির করে ফেলেছি।'

—'ঠিক ক'রে ফেলেছই যখন তবে আর ঝুটমুট দেরী করছ কেন? বল, বলেই ফেল, কি মাঙব সুলতানের কাছ থেকে।'

—'শোন, আমার বাসনাটি একদম সামান্য। তুমি বলবে; ধনদৌলত কিছুই আমার চাই না। সুলতানকে বলবে, আমার বিবি হররোজ জুম্মাবারে নগর পরিক্রমায় বেরোবে। তখন দোকানপাট ও রাস্তাঘাটে কেউ বেরোতে পারবে না। যদি কেউ পথেঘাটে থাকে তবে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনামাত্র, যে যার নিকটবর্তী মসজিদে ঢুকে আত্মগোপন ক'রে থাকবে। এক বাৎ দোকানপাট যেমন খোলা থাকবে তেমনি থাকবে, দোকানী সামনে থাকবে না। যদি কাউকে দেখা যায়, এমন কি মাথার এতটুকু অংশও দেখা যায় তবে আমার বিবির প্রহরীদের হাতে তার গর্দান যাবে। তখন কিন্তু আমি বা আমার বিবি খুনের দায়ে জাঁহাপনার কাছে দোষী সাব্যস্ত হ'ব না।'

জহুরী উবেদ তো বিবির বাৎ শুনে একদম তাজ্জব বনে গেল। চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'এ কী রকম চাওয়া হ'ল আমার দিমাকে ঢুকছে না। একদম নটখট ব্যাপার দেখছি।' দুনিয়ায় চাওয়ার বস্তুর ঘাটতি নেই। তবে এরকম ব্যাপার স্যাপারের চাওয়া—আজব ব্যাপার।'

জহুরী উবেদ বিবিকে তার মোউতের মাফিক ডর করে। সে বিবিকে ঘাটাতে সাহসী হ'ল না। সে ভেতরে ভেতরে গর্জাতে লাগল—'একদম ফালতু ব্যাপার হয়ে গেল। জেনানাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে গেলে আখেরে ফল এমনই হয়ে থাকে। বুড্ডা জহুরী তার নওজোয়ান বিবিকে ঘাটিয়ে ফ্যাসাদ বাড়াতে চাইল না।

জহুরী উবেদ বিষণ্ণ মুখে সুলতানের সামনে এসে দাঁড়াল। কুর্ণিশ ক'রে সে সুলতানের কাছে তার বিবির বাসনার ব্যাপার ব্যক্ত করল। সুলতান শুনে হেসে ফেললেন—'বহুৎ আচ্ছা, আমি ঢেরা পিটিয়ে খবরটি নগরের মহল্লায় মহল্লায় চাউর করে দেবার বন্দোবস্ত করছি।'

ব্যস, এবার থেকে হররোজ জুম্মাবারে জহুরী উবেদ-এর বিবি নগর পরিক্রমায় বেরোয়। আর সে-বন্দোবস্ত আজও একই ভাবে চলে আসছে।

নাপিতের বিবি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে কামর'কে বল্‌ল—'বেটা মালুম হচ্ছে আমার বর্ণিত কিস্‌সা শুনে তোমার দিল্ ঠিক ভরল না। বেটা জহুরী উবেদ-এর বিবির সুরৎ দেখলে তোমার দিল্ উতলা হয়ে উঠবে, দিমাক ঘুরে যাবে।'

—'আপনার অনুমান একদম সাচ্চা। তাকে একবারটি স্বচক্ষে দেখার জন্য, তার সঙ্গে পরিচয় ও দু'-চারটি বাৎ বলার জন্য আমি

নিজের মুলুক ছেড়ে বসরাহতে পাড়ি জমিয়েছি। মকানে আমার আম্মা আমার অদর্শনে হরদম চোখের পানি ঝরাচ্ছেন। তার চোখের পানির দাম না দিয়ে আমি এখানে পড়ে রয়েছি। কবে তার দেখা মিলতে পারে বলুন।'

—'আরে ঘাবড়াও মাৎ বেটা, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। এবার সাফ সাফ বাতাও তো সঙ্গে ধন-সম্পদ কি নিয়ে এসেছ?'

—'কিছু হীরা-জহরৎ আমার কোর্তার জেবে রয়েছে। আর আশি হাজারের কাছাকাছি নগদ দিনার একটি থলিতে রয়েছে।'

—'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! তবে চল বেটা আমার সঙ্গে বাজারে যাবে চল। জহুরী উবেদ-এর একটি দোকান আছে। তোমার হীরা-জহরতগুলো সঙ্গে নিয়ে চল। পথে যেতে যেতে আমি যা কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দেব ঠিক সেভাবে কাজ করবে। ইয়াদ থাকবে তো?'

কামর ঘাড় কাৎ করে সম্মতি দিল।

নাপিতের বিবি বল্‌ল—'আর এক বাৎ ইয়াদ রাখবে। বড় কোন কাজ হাসিল করতে হলে সময় লাগবে, ধৈর্যেরও দরকার। বেটা কাজ হাসিল হয়ে গেলে এ গরীব আম্মাকে দিল্‌ থেকে মুছে ফেল না যেন। আমার স্বামী একদম গরীব। দিনভর দোকানে চুল দাড়ি কামিয়ে কোনরকমে রুটির বন্দোবস্ত করে।

নগরের একান্তে জহুরী উবেদ-এর দোকান।

কামর দোকানে পা দিতেই উবেদ অভ্যর্থনা ক'রে তাকে বসতে দিল। তার সুরৎ ও জমকালো সাজপোশাক দেখে সে ধরেই নিল নির্ঘাৎ কোন না কোন আমীর-ওমরাহের লেড়কা।

কামর তার জেব থেকে এক টুকরো জহরৎ বের ক'রে উবেদ-এর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'একটি অঙ্গুঠি বানিয়ে তাতে এটি বসিয়ে দিতে হবে।'

—'কোন নক্সা পছন্দ্‌ ক'রে দেবেন তো?'

—'আরে না না। আমি পাত্তা নিয়ে এসেছি, আপনি উঁচুদরের জহুরী। আপনার পছন্দ্‌ মাফিক নক্সা হলেই চলবে। সামান্য কিছু অগ্রিম দিচ্ছি, রেখে দিন।' একটি ঝোলা বের করে তার থেকে কিছু দিনার জহুরী উবেদ-এর দিকে ছুঁড়ে দিল।

এরই মধ্যে ঘটে গেল এক ব্যাপার। তার সুরৎ দেখে কিছু বদমায়েশ প্রতিবেশী দোকানী ও পথচারীরা ভিড় করতে লাগল জহুরী উবেদ-এর দোকানের সামনে। কামর তার ঝোলা থেকে এক মুঠো সোনার মোহর বের ক'রে এক একটি ক'রে সবার হাতে দিল।

কামর এবার জহুরী উবেদ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামল। জহুরী উবেদ এবার হাতের কাজ ফেলে কামর-এর অঙ্গুঠি বানাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আগেই সেটি তৈরি হয়ে গেল। সেটি যেমন সূক্ষ্ম ও লোভনীয় কারুকার্য মণ্ডিত হয়েছে তেমনি মজবুতও হয়েছে খুবই। কাজটি উবেদ-এর নিজেরই দিল্‌কে একদম ভরিয়ে দিল। এমন একটি কাজ বিবিকে না দেখানো পর্যন্ত তার অস্থির দিল্‌ শান্ত হ'ল না।

মকানে ফির উবেদ অঙ্গুঠিটি বিবির হাতে দিয়ে বল্‌ল—'নক্সাটি কেমন হয়েছে, বল তো? পছন্দ মাফিক আমি নিজেই বানিয়েছি। দুনিয়ার কোন জহুরী এমন আর একটি অঙ্গুঠি বানাতে পারবে না।'

জহুরী উবেদ-এর বিবি অঙ্গুঠিটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। তার স্বামী জহুরী উবেদ-এর হাতের নক্সা, নাকি হীরাটি—কোন্‌টিকে রেখে কোন্‌টিকে দেখবে?'

এক সময় জহুরী উবেদ-এর বিবি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'যে আদমি এমন বহুমূল্য খুবসুরৎ হীরা দিয়ে অঙ্গুঠি বানায় সে আদমিটির সুরৎ না জানি কেমন হতে পারে!'

জহুরী উবেদ উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠল—'সুরৎ? সে-নওজোয়ানের সুরতের বর্ণনা দেয়া বাস্তবিকই কঠিন। নিজের চোখে প্রত্যক্ষ না করলে মুখের ভাষায় কাউকে বুঝানো সম্ভব নয়। আমি হলফ ক'রে বলতে পারি, তুমি এক লহমায় তাকে দেখলে তোমার দিমাক একদম ঘুরে যাবে। এ-হীরাটিকে ঘোরালে দ্যুতি বেরোয়, ঠিক কিনা? লেকিন তাকে না ঘোরালেই তার গা থেকে ঝিল্লা বেরোতে থাকে। তোমার চোখ দুটোকে একদম ধাঁধিয়ে দেবে। আমি একে পুরুষ, তার ওপর বুড্ডা বনে গেছি। তাকে দেখে আমারই দিমাক গড়বড় হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল।'

জহুরী উবেদ-এর নওজোয়ান বিবির চোখ দুটো জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে। বার কয়েক ঢোক গিলে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা, তার উমর কত হতে পারে, বল তো?'

—'আদতে পনের টনের হবে হয়ত। তোমারই সমান। তবে শরীর বাড়ন্ত। হঠাৎ ক'রে দেখলে মালুম হয় বুঝি বিশ-বাইশ সাল উমর। মোদ্দা বাৎ, একদম গাট্টা গোট্টা এক নওজোয়ান।'

স্বামীর মুখের বাৎ শুনে উমর-এর বিবির জিভ রসিয়ে উঠতে থাকে। বুকের ভেতরে কলিজা ক্রমে চঞ্চল হতে থাকে। কামনার জ্বালা একটু একটু ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। শাদী হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বুড্ডা অক্ষম অপদার্থ স্বামী উবেদ তাকে গ্রহণ করে নি। আদতে কিছু করার হিম্মৎই তার নেই। তাগদ কোথায় যে নওজোয়ান বিবির সঙ্গে সাহস করে লড়তে যাবে। লেকিন তার যৌবনের জ্বালা তো বাড়ছে বৈ কমতি হচ্ছে না। তবে উবেদ-এর বিবি এ-ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল না। বলা তো যায় না স্বামী যদি কোনরকম সন্দেহ ক'রে বসে। অক্ষম-অযোগ্য আদমিদের দিল্‌ এমনিতেই হরবখত সন্দেহের জ্বালায় জ্বলতে থাকে। যদি ধরে বসে অজানা-অচেনা নওজোয়ানটির দিকে

তার দিল্ ঢলে পড়েছে, তখন?

উবেদ-এর বিবি তার সঙ্গে বাৎচিৎ করতে করতে অঙ্গুঠিটি নিজের আঙুলে পরে নিল। সবিস্ময়ে বল্‌ল—'কী মানিয়েছে, বল?'

—'বহুৎ আচ্ছা, কাল ভোরে সে-নওজোয়ানটি দোকানে আসার পর তাকে জিজ্ঞাসা করব, অঙ্গুঠিটি বেচতে রাজী আছে কিনা? রাজী হলে দাম যা-ই চাক তোমার জন্য খরিদ করে নেব।'

এদিকে কামর জহুরী উবেদ-এর দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল নাপিতের বিবির কাছে। নাপিতের বিবি বল্‌ল—'বেটা, এবার তোমার কাজ, কাল ভোরে জহুরী উবেদ-এর দোকানে গিয়ে অঙ্গুঠিটি দেখে বলবে, নক্সা বহুৎ আচ্ছা হয়েছে বটে, লেকিন মাপ একটু ছোট হয়েছে, আঙুলে লাগছে। আপনি বরং এটি রেখে দিয়ে নয়া একটি অঙ্গুঠি বানিয়ে দিন। আর এটি দিয়ে আমি কিই-বা করব। আপনাকে ইনাম দিলাম। এ বলে কোর্তার জেব থেকে বড়সড় একটি হীরা বের করে তার হাতে তুলে দেবে।

কামর পরদিন ভোরে জহুরী উবেদ-এর দোকানে হাজির হ'ল। উবেদ অঙ্গুঠিটি তার হাতে তুলে দিল। সেটিকে নিজে আঙুলে পরতে গিয়ে বল্‌ল—'কেমন একটু ছোট ছোট মালুম হচ্ছে।' মুহূর্তকাল পরে বল্‌ল—'আপনাকে আমি এ-অঙ্গুঠিটি ইনাম দিলাম।' এবার কোর্তার জেব থেকে একটি হীরা বের করল। সেটি জহুরী উবেদ-এর হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এ-হীরাটি দিয়ে আপনি বরং অন্য একটি অঙ্গুঠি বানিয়ে দিন। থলি থেকে ষাটটি সোনার মোহর বের ক'রে উবেদ-এর হাতে গুঁজে দিয়ে হাত কচলে বল্‌ল—'আপনার হাতের কাজের দাম দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সামান্য এ-মোহরগুলো আপনাকে সরবৎ [illegible] দিলাম। মেহেরবানি করে রেখে দিন জনাব।'

মুচকি হেসে কামর দোকান ছেড়ে পথে নামল। বুড্ডা জহুরী তার দিকে বিস্ময় মাখানো নজর মেলে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—'কোন আদমি এমন দিল্ দরিয়া হয়, এ যে খোয়াবেও ভাবা যায় না!'

সে সন্ধ্যায় মকানে ফিরে অঙ্গুঠিটি বিবির হাতে দিয়ে বল্‌ল—'আমার সে-খুবসুরৎ নওজোয়ানটির আঙুলে এটি লাগল না, নাকি পছন্দই হয় নি, মালুম হ'ল না। যা-ই হোক আমাকে ইনাম স্বরূপ দিয়ে গেল।'

—'এ কী আজব কাণ্ড! পছন্দ হ'ল না? এমন বড়িয়া একটি অঙ্গুঠি পছন্দ হ'ল না!'

—'বিবিজান, সে পুরো দস্তুর এক আমীর-বাদশাহের লেড়কা, তোমার-আমার পছন্দ থেকে কিছু না কিছু ফারাক তো হবেই। এখন মালুম হচ্ছে, নিজের অজান্তে হলেও তোমার আঙুলের মাপেই বানিয়ে ছিলাম। আল্লাতাল্লা-র মর্জি দেখ, ঘুরে ফিরে অঙ্গুঠিটি তোমার বরাতেই জুটে গেল। এবার খুশী তো?'

—'না, ব্যাপারটি তো ঠিক হ'ল না। তিনি বানালেন আর পরবেন না? তিনি তবে পরবেন কি? তাঁর শখের অঙ্গুঠি—'

—'আরে বিবিজান সে ব্যাপারও মিটে গেছে। আরও বড়া মাপের অন্য একটি হীরা তিনি দিয়ে গেছেন অঙ্গুঠি বানিয়ে দেবার জন্য।

জহুরী উবেদ-এর বিবির দিল্ চনমনিয়ে উঠল নওজোয়ানটিকে একটিবার চোখে দেখার জন্য। লেকিন হাইফাই করা একদম ঠিক হবে না। বুড্ডা সন্দেহ ক'রে ফেল্‌লেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা, তার অঙ্গুঠিটি কি বানিয়ে ফেলেছ?'

—'কি যে বল বিবিজান। এমন পয়মন্ত খরিদ্দারের কাজ ফেলে রাখার বান্দা আমি?' পিরানের জেব থেকে অঙ্গুঠিটি বের ক'রে বিবির হাতে দিয়ে জহুরী উবেদ এবার বল্‌ল—'এই যে, দেখ। এটিও আমি নিজ হাতে বানিয়েছি। কেমন হয়েছে, বাতাও তো শুনি?'

জহুরী উবেদ-এর বিবি অঙ্গুঠিটি নিজের আঙুলে পরে সোল্লাসে ব'লে উঠল—'দেখ-দেখ, কেমন মানিয়েছে।'

—'আরে বিবিজান সুন্দর অঙ্গুঠি এমন সুন্দর আঙুল না হলে মানাবে কেন?' মুচকি হেসে বল্‌ল—'তোমার নসীব যদি খুলে যায় তবে এ-ও হয় তো তোমার হাতেই ফিরে আসতে পারে। দেখাই যাক না, আদতে কি হয়।'

এদিকে নাপিতের বিবির কাছে ফিরে এসে কামর গোড়াতেই এক মুঠো সোনার মোহর গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—'এবার আমার কাজ কি, বলুন আম্মা।'

—'হ্যাঁ, কাল ভোরে জহুরীটির দোকানে গিয়ে একই বাহানা করবে। মুখ ব্যাজার ক'রে বলবে, এ-অঙ্গুঠিটি কেমন ঢিলা হয়েছে, মাপের চেয়ে একটু বড়া মালুম হচ্ছে। থাক, আপনি বরং অন্য আর একটি আমাকে বানিয়ে দিন। এবার যে-হীরাটি দেবে সেটা যেন আরও এক আচ্ছা—দামী হীরা হয়। আর মাপ হবে আগের দুটোর মাঝামাঝি আকারের।'

পরদিন ভোরে কামর জহুরীটির দোকানে গিয়ে নাপিতের বিবির পরামর্শ মাফিক বাহানা করল। অন্য একটি অঙ্গুঠি বানিয়ে দেবার জন্য মাঝারি আকারের একটি হীরা দিয়ে বল্‌ল—'এটি দিয়ে আমাকে আর একটি অঙ্গুঠি বানিয়ে দেবেন। আর এটি আপনার হারেমে কোন বাঁদীটাদীকে দিয়ে দেবেন। আমার তরফের ইনাম।'

সেদিনও সে দোকান থেকে বেরিয়ে নাপিতের বিবির কাছে ফিরে এসে বল্‌ল—'আম্মা, আপনার পরামর্শ মাফিক আজকের অঙ্গুঠিটিও জহুরীকে দিয়ে এলাম।' এবার থেকে সে ফি রোজ

জহুরী উবেদ-এর দোকানে গিয়ে একটি করে নয়া অঙ্গুঠি গড়তে দেয়। গড়া হয়ে গেলে সেটি তাকেই ইনামস্বরূপ দিয়ে নাপিতের বিবির কাছে ফিরে আসে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে।

এদিকে ফি রোজ একটি ক'রে অঙ্গুঠি হাতে পেয়ে জহুরীর বিবি তাজ্জব বনে গিয়ে তার স্বামীকে বল্‌ল—'তোমার কি জ্ঞান গম্যি দিমাক থেকে একদম উধাও হয়ে গেছে? যে তোমার বিবিকে একটি ক'রে অঙ্গুঠি ইনাম দিয়ে যাচ্ছে আর তুমি কি না তাকে একটি দিনের জন্য আমাদের মকানে মেহমান হয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছ না। চোখের পর্দা বলে কি তোমার কিছুই নেই?'

—'ইস, কী গলতিই না হয়ে গেছে! ব্যাপারটি আমার দিমাকে একদম যায় নি! তুমি তো আমার চেয়ে জাদা বুদ্ধি ধর বিবিজান। কই তুমিও তো আমার গলতিটুকু ধরিয়ে দিলে না?'

—'ঠিক আছে, গলতি শুধরে নেয়ার কোশিস কর। কাল তাকে বলবে মেহেরবানি ক'রে একবারটি আমাদের গরীবখানায় পায়ের ধূলা দিতে।'

ভোরে কামর অভ্যাস মাফিক জহুরী উবেদ-এর মকানে গেল। সে দোকানে পা দিতেই উবেদ ব'লে উঠল—'মেহেরবানি করে আপনাকে আজ একটিবার আমাদের গরীবখানায় পায়ের ধূলা দিতেই হবে। জানি, আপনি খানদানি বংশের নওজোয়ান, আপনাকে মেহমান ক'রে মকানে নিয়ে যাওয়া নসীবের ব্যাপার, তবু মেহেরবানি ক'রে একবারটি পায়ে পায়ে চলুন।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' চুরাশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জহুরী উবেদ-এক কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে কামর উচ্ছ্বাস চেপে রেখে বল্‌ল—'এ তো খুশীর ব্যাপার। তাছাড়া আপনি যখন এত ক'রে বলছেন তখন তো জরুর যাওয়া উচিত। আমি সন্ধ্যায় তৈরী থাকব। আপনি দোকান বন্ধ করে মকানে যাওয়ার সময় মেহেরবানি ক'রে মুসাফিরখানা থেকে নিয়ে যাবেন।'

সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ ক'রে জহুরী উবেদ মুসাফিরখানা থেকে কামরকে নিয়ে মকানের উদ্দেশে রওনা হ'ল।

জহুরী উবেদ-এর বিবি টেবিলে খানা সাজিয়েই রেখেছে। সরাবের বোতল ও পেয়ালাও সেখানেই রেখে দিয়েছে।

খানা সেরে জহুরী একটি সরাবের পেয়ালা কামর'কে দিল। অন্য একটি নিল নিজে। সরাবের বোতলে উবেদ-এর বিবি আগেই দাওয়াই মিশিয়ে রেখেছিল। তারা এক পেয়ালা ক'রে সরাব পান করতেই ক্রমে ঢলে পড়তে লাগল। কয়েক লহমার মধ্যেই উভয়েই একদম গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

এদিকে কাম-জ্বালায় জর্জরিতা উবেদ-এর নওজোয়ান বিবি গা থেকে সাজপোশাক খুলে ফেলে উন্মাদের মাফিক কামর-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ঠোঁটে, গালে ও কপালে হরদম চুম্বন করতে লাগল। সে রাতভর কলিজার জ্বালা নেভাতে গিয়ে নিদে আচ্ছন্ন কামর-এর সুঠাম দেহটিকে নিয়ে যে কি করেছিল তা একমাত্র আল্লাতাল্লাই সাক্ষী।

রাতভর সে কামর-এর এলিয়ে পড়ে থাকা দেহটিকে নিয়ে কচলাকচলি লদকালদকিতে মেতে রইল। ভোর হবার আগেই কলিজায় দ্বিগুণ জ্বালা নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল।

কামরা ছেড়ে যাবার আগে সে আঙুলের ডগায় কাজল নিয়ে নিদ্রাতুর কামর-এর বুকে চার-চারটি কালো দাগ এঁকে দিয়ে গেল। আর তার সাজপোশাক ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে যায়। তার এক সহচরীকে দরওয়াজার আড়ালে রেখে দিল নিদ ভাঙার পর তাদের পরিস্থিতি কেমন হয় লক্ষ্য করতে। জানালা দিয়ে সূর্যের কিরণ চোখে পড়ামাত্র জহুরী উবেদ-এর নিদ টুটলে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নামাজের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

কামর-এর নিদও একটু বাদেই টুটে যায়। ইতিমধ্যে কি যে ঘটে গেছে, কিছুই সে জানে না। তার সারা গায়ে ফোড়ার মাফিক ব্যথা-বেদনা অনুভব করল। লেকিন কেন, আন্দাজ করতে পারল না।

নামাজের আগে রুজু করতে গিয়ে ঠোঁটে পানি লাগতেই লাফিয়ে উঠল। অসহ্য জ্বালা করছে। ঠোঁট দুটো ফুলে ইয়া পুরু হয়ে গেছে। দু-এক জায়গায় দাঁতের দাগ। কেটে গেছে। গাল দুটোর হালৎ-ও একই। কি করে যে এমন ব্যাপার ঘটল কিছুই তার

মালুম হ'ল না। সন্ধ্যায় জহুরী উবেদ-এর বাড়ি আসার পরও তো ব্যথা-বেদনা বা কাটা-ছেঁড়া তো দূরের ব্যাপার সামান্য আঁচড়ও তার ঠোঁটে বা গালে ছিল না। তবে? কিছুই ভেবে পেল না।

কামর গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল, এমন এক আজব কাণ্ড কি করে ঘটল। লেকিন কোনই কিনারা করতে পারল না।

জহুরী উবেদ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বল্‌ল—'ও কিছু না। মশা কামড়েছে। মশারও রসবোধ আছে দেখছি! ঠিক বেছে বেছে খুবসুরৎ গালে গিয়ে কামড়েছে। যাক গে, ঘাবড়াবার কিছু নেই। নিদ যাবার আগে মশারি না খাটানোর ফল।

কামর রুজু সেরে, নামাজ পড়ল। তারপর নাস্তা সেরে জহুরী উবেদ-এর কাছ থেকে বিদায় নিল।

কামর-এর ঠোঁট ও গালের হালৎ দেখে এবং তার মুখে সবকিছু শুনে নাপিতের বিবি বল্‌ল—'বেটা, তোমার মুখের হালৎ দেখেই আদৎ ব্যাপারটি অনুমান করে নিয়েছি।'

কামর ব'লে উঠল—'আপনি যা ধারণা করছেন বিলকুল ঝুটা। আদতে মশারী না খাটিয়ে শোবার ফল।'

—'মশা? মশার কামড়?' সরবে হেসে নাপিতের বিবি এবার বল্‌ল—'ঠোঁট ও গালের দাগ ছাড়া শরীরের আর কোথাও কিছু দেখতে পাও নি?'

—'হ্যাঁ, সাচ্চা বটে, পেয়েছি। আমার বুকে কালো দাগ। আঙুলের ডগার চারটে চিহ্ন। ব্যাপার কিছুই মালুম হচ্ছে না, কি ক'রে এগুলো আমার বুকে লাগল?'

—'বেটা, আঙুলের ছাপ চারটে দিয়েছে কেন, বল তো? দাসখত স্বাক্ষরের চিহ্ন। সে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে. তারই প্রমাণ। এবার থেকে তোমার, শুধুই তোমার। এবার শুধু তোমার কাজ। আমার দিল্ বলছে, বুড্ডা জহুরী তোমাকে ফিন মেহমান হয়ে তার বাড়ি যাবার জন্য বলবে।'

এদিকে বুড্ডা জহুরী উবেদ-এর নওজোয়ান বিবি তাকে জিজ্ঞাসা করল গত রাত্রি কিভাবে তোমরা কাটিয়েছ? এক মেহমানকে নিমন্ত্রণ ক'রে কেমন ব্যাভার করলে একবারটি ভেবে দেখ তো? নিদেন পক্ষে একটি মশারীর বন্দোবস্ত করে দাওনি।'

—'হ্যাঁ বিবিজান, গলতিই হয়েছে বটে। তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে একদম আপ্যায়ন করা হয়ে ওঠে নি। আমি কখন যে নিদে বিভোর হয়ে পড়েছিলাম, মালুমই ছিল না। আজ রাত্রে ফিন কোশিস করব, যদি নিয়ে আসা যায়। এবার ঠিক দিল্ ভরে আদর যত্ন করব।'

বুড্ডা জহুরীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কামর ফিন জহুরী উবেদ-এর মকানে এল।

জহুরীর বিবি সে-রাত্রেও সরাবের সঙ্গে দাওয়াই মিশিয়ে রেখেছিল। এক পেয়াল্য সরাব ঢালতে না ঢালতেই বুড্ডা জহুরী ও কামর উভয়েই বেহুঁস হয়ে সতরঞ্চির উপর এলিয়ে পড়ল। গভীর নিদে একদম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

কাম-জ্বালায় জর্জরিতা জহুরী উবেদ-এর বিবি আগের রাত্রির মাফিক সাজপোশাক খুলে নিদ্রাতুর কামর-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর রাতভর তার সংজ্ঞাহীন দেহটিকে নিয়ে জাপ্টাজাপ্টি পেষণ, দলন আর গালে ও ঠোঁটে চুম্বনে লিপ্ত রইল।

ভোরে নিদ টুটলে কামর সর্বাঙ্গে একই রকম ব্যথা-বেদনা অনুভব করল। লেকিন বুড্ডার কাছে কিছুই বল্‌ল না। এমন কি হাবভাবেও কিছুই তাকে ঠাহর করতে দিল না। রুজু করতে গিয়ে ঠোঁটে ও গালে জ্বালা অনুভব করল।

বুড্ডা জহুরী জিজ্ঞাসা করল—'সাহাব, কাল রাত্রে মশা কামড়েছিল?'

—'না। বহুৎ নিদ গিয়েছি।'

কামর নাপিতের বিবির কাছে ফিরে গিয়ে জানাল, গতরাত্রে একই রকমভাবে রাত্রি গুজরান করেছে। আর একটি চাকু দেখিয়ে বল্‌ল—'কে যেন আমার কোর্তার জেবে এটি ঢুকিয়ে রেখেছে। এর অর্থ আমার কিছুই মালুম হ'ল না।'

নাপিতের বিবি বল্‌ল—'বেটা, হুঁশিয়ার! জহুরীর বিবি তোমার ওপর চটে একদম টং হয়ে গেছে। চাকুটি দিয়ে তোমাকে বুঝাতে চেয়েছে, আজ রাত্রে যদি ওরকম বেহুঁশ হয়ে নিদ যাও তবে তোমার বুকে চাকু চালিয়ে খতম ক'রে দেবে। একটি ব্যাপার, লেড়কিটি কাম-জ্বালায় রাতভর জ্বলে পুড়ে খাক হয়। লেড়কিরা এ সময় একদম হিংস্র হয়ে ওঠে। তারা তখন নেকড়ের স্বভাব ধারণ করে।

একা একা কি আর ভোগ করা যায়, নাকি তৃপ্তি আসে, বল? তাই সে তোমাকে জাগ্রত পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে।'

—'লেকিন সমস্যা হচ্ছে, আমার চোখে যে নিদ জড়িয়ে আসে। দু'চোখের পাতা মেলে রাখা দায় হয়ে পড়ে। এ যদি হয় তবে কি ক'রে জেগে থাকা সম্ভব, দিমাকে আসছে না। আমি তো শখ ক'রে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকি না। বিশোয়াস করুন, কাল রাত্রে আমি বহুৎ কোশিস করেছিলাম যাতে জেগে থাকা যায়। লেকিন চোখ দুটো বেইমানী করলে আমার আর কি করার থাকতে পারে, আপনিই বলুন? আদতে সরাবের পেয়ালা গলায় ঢালতেই আমার ঝিমুনি শুরু হয়ে যায়।'

নাপিতের বিবি গলা নামিয়ে বল্ল—'বেটা, আজ রাত্রে বুড্ডা জহুরী যখন তোমার হাতে সরাবের পেয়ালা তুলে দেবে তখন তুমি ফন্দি ফিকির করে সরাবটুকু ঢেলে ফেলে দেবে। ইতিমধ্যে বুড্ডা জহুরী দাওয়াই মেশানো সরাব পান ক'রে বিছানায় লুটিয়ে পড়বে। একটু বাদে নিদে একদম বেহুঁস হয়ে পড়বে। তুমি জেগেই থাকবে। তারপরের ব্যাপার তোমার ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসবে।'

কামর সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল—'ব্যস, তবে আজ রাত্রেই একদম কামাল করে দিচ্ছি।'

সে রাত্রেও জহুরী উবেদ খানার পাট চুকিয়ে কামর-এর হাতে সরাবের পেয়ালা তুলে দিল। আর নিজে এক পেয়ালা সরাব নিয়ে গলায় ঢেলে দিল। কামর কায়দা ক'রে সরাবটুকু ঢেলে ফেলে দিল।

দু'-এক লহমার মধ্যেই বুড্ডা জহুরী নিদে একদম বেহুঁস হয়ে পড়ল।

একটু বাদে বুড্ডা জহুরীর নওজোয়ান বিবি সালোয়ার কামিজ খুলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মাফিক এক লাফে কামর-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হ'ল। এক বাঁদী গিয়ে খবর দিল কামর ঘুমিয়ে পড়েছে। খবরটি শোনামাত্র জহুরীর বিবি হালিমা-র শিরে খুন চেপে গেল। হিংস্র নেকড়ের মাফিক তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। একটি চাকু হাতে নিয়ে কামরায় ঢুকে কামর-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চাকু সমেত হাতটি তুলতেই কামর খপ্ ক'রে তার হাতটি চেপে ধরে সরবে হেসে উঠল। উবেদ-এর বিবি হালিমা হকচকিয়ে যায়। ঠোঁট টিপে হেসে ব'লে উঠল—'ও এবার মালুম হ'ল, ঘুমের বাহানা ক'রে শিটিকে লেগে পড়েছিলে। মস্করা করছিলে আমার সঙ্গে? এতসব কোথায়, কার কাছে শিখলে, বল তো?'

কামর এক হেঁচকা টানে হালিমাকে বুকে টেনে নিল। আপেলের মাফিক রাঙা তুলতুলে ঠোঁটেতে নিজের ঠোঁট দুটো রাখল। ক্ষীণ কণ্ঠে বল্ল—'এক নাপিতের বিবি।'

—'তাই বুঝি? বহুৎ চালাক জেনানা তো। তার কাছে তালিম পেয়ে তুমি লায়েক বনে গেছ? আমি আজ তোমার এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাচাই ক'রে ছাড়ব। দেখব, কেমন সেয়ানা, কেমন লায়েক হয়েছ তুমি? কলিজার জ্বালা যদি নেভাতে পার তবে বুঝব তোমার হিম্মৎ আছে।'

—'তুমিই কি আমার কলিজার জ্বালা নেভাতে পারবে মেহেবুবা?'

—'কসম খাচ্ছি, আমি নিজেকে, আমার ভরা যৌবনকে বিলকুল উজাড় ক'রে দেব তোমার কাছে। তামাম দুনিয়া যদি একদিকে চলে যায় তবু আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না, মেরে দিল্ কা টুকরা। আমি তোমার যৌবনকে ভোগ করতে লালায়িত বটে। লেকিন দু'-চারদিন বা দু'-চার মাহিনা বা সালের জন্য জরুর না, জিন্দেগীভর আমি তোমাকে দিয়ে আমার যৌবনের জোয়ার লাগা এ-দেহটিকে সুখ দিতে চাই, আর চাই তোমাকেও খুশী করতে। অক্ষম-অপদার্থ নপুংসক বুড্ডাটির হিম্মৎ তো কিছুই না-ই বরং ঝুটমুট দেহটিকে নিয়ে জাপ্টাজাপ্টি ধস্তাধস্তি ক'রে কলিজার জ্বালা বাড়িয়ে দিয়ে নিজে এক সময় নিস্তেজ হয়ে এলিয়ে পড়ে। ব্যস, রাতভর গণ্ডারের মাফিক নাক ডাকিয়ে নিদ যাবে। এর
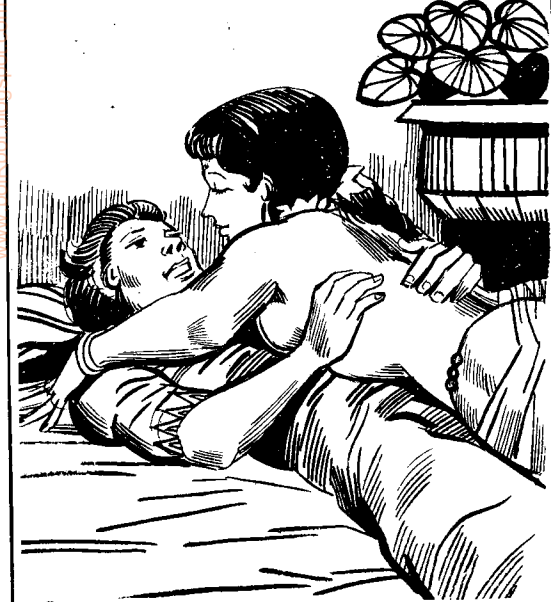
খুশীর খোরাক জোগাবার জন্য আমি এখানে আর একটি রাতও থাকতে চাই না। এখন যা বলি ধ্যায়ান কর, তোমাকে ছাড়া আমার কলিজার জ্বালা তো নিভবেই না, এমন কি জানও টিকবে না। আমি তোমার সাথে তোমার মুলুকে চলে যেতে চাই। তুমি ওজর আপত্তি তুলো না মেহবুব, মেরে জান। জিন্দেগীভর তোমার যৌবনটিকে

উপভোগ করার সুযোগ দাও। তার আগে তোমার প্রধান কাজ হবে আমাদের এ-মকানের ধারে কাছে কোন কামরা ভাড়া করে থাকা।'

কামর-এর কলিজা নেচে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল —'তারপরও তুমি কি ভাবছ, তোমার স্বামী বুড্ডা জহুরীটি রোজই আমাকে ডেকে এনে তোমার সঙ্গে মহব্বতের বেহেস্ত তৈরীর সুযোগ করে দেবে?'

—'আরে ধ্যুৎ। তোমার দিমাকে কিচ্ছু নেই দেখছি। বুড্ডা জহুরী তোমাকে নিমন্ত্রণ করলে, মেহমান হয়ে নিজের মকানে নিয়ে আসতে চাইলে তুমি জোরদার আপত্তি জানাবে। সে জবরদস্তি শুরু করলে তুমি বলবে—'না মিঞা সাহাব, ফি রোজ কারো মকানে যাওয়া শোভন নয়। পর পর তিন রোজ তো গেলামই। ব্যস, এ-ই যথেষ্ট। এবার গেলে একদম বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আদতে তুমি কাছেই তো থাকছ। বুড্ডা হাড়গিলাটির চোখে ধূলা দিয়ে কি ক'রে লদকালদকির ফিকির ক'রে নিতে হয় তা-তো আজ নিজের চোখেই দেখছ, বন্দোবস্তও তো নিজেই করে নিলে মেরে মেহবুব।'

কামর এবার হালিমা-র হাত দুটো জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের ওপর রেখে বল্‌ল—'আল্লাতাল্লা-র নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমার ফন্দি আর মর্জি মাফিকই কাজ করব।'

জহুরীর নওজোয়ান বিবি হালিমা এবার নিজের সালোয়ার-কামিজ আর যা কিছু গায়ে ছিল এক এক ক'রে খুলে ফেল্‌ল। কেবলমাত্র একটি ফিনফিনে মখমলের সেমিজ গায়ে রেখে দিল। এটা থাকা আর না থাকা দু'-ই সমান। তার নিটোল সুডৌল স্তন দুটো যেন পাৎলা সেমিজটিকে অগ্রাহ্য করে ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হালিমা-র প্রায় উলঙ্গ যৌবনের জোয়ারলাগা পনের সালের নিটোল নিখাঁজ দেহটির দিকে কামর লালসামাখানো নজর মেলে দেখতে লাগল। চোখের পলক পড়া পর্যন্ত বন্ধ বুকের ভেতরে কলিজাটি লাফালাফি দাপাদাপি শুরু ক'রে দিল। খুনে লেগে গেল মাতন।

হালিমা-র বাৎ কানে যেতেই সে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। সে ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমিভরা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে চোখের বাণ মেরে বল্‌ল—'কি গো নাগর, বুড্ডা হাড়গিলে জহুরীটির মাফিক দূর থেকে চোখেই আমাকে গিলে খাওয়ার কোশিস করবে, নাকি আমার কলিজার জ্বালা নেভাবে? কোর্তা-কামিজ খোল। নইলে'—অধৈর্য হয়ে নিজে হাতে কামর-এর কোর্তা কামিজ খুলতে লেগে গেল।

হালিমা কামর'কে জাপ্টে ধরে পালঙ্কের ওপর আছাড় মেরে ফেলে দিল। তারপর রাতভর দু'জনে যা স্বাভাবিক তা নিয়েই মেতে রইল।

ভোর হওয়ার আগেই কামর জহুরীর মকান ছেড়ে নাপিতের বিবির কাছে ফিরে গেল। বিকালের শেষে, সন্ধ্যার ঠিক আগে জহুরী উবেদ ফিন্ কামর'কে নিমন্ত্রণ করল তার মকানে খানাপিনা সারতে ও রাত্রিবাস করার জন্য। কামর নানা বাহানা দেখিয়ে তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল। সবশেষে বল্‌ল—'মুসাফিরখানায় বহুৎ তকলিফ হচ্ছে। তাই মনস্থ করেছি আপনাদের মহল্লাতেই একটি মকান ভাড়া নিয়ে থাকব।'

বুড্ডা জহুরী সাদাসিধা আদমি। একটু-আধটু মাথা মোটাও বটে। তাই উল্লসিত হয়ে ব'লে উঠল—'বহুৎ আচ্ছা। বড়িয়া মতলব। যদি বলেন তো আমি পাত্তা লাগিয়ে বড়িয়া একটি মকানের বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি সাহাব।'

কামর-এর অনুমতি নিয়ে বুড্ডা জহুরী তার নিজের মকানের একদম লাগোয়া একটি বড়িয়া মকান ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে তার বসবাসের উপযোগী ক'রে দিল।

ফি রোজ সকালে জহুরী নাস্তা সেরে দোকানে চলে গেলে তার বিবি হালিমা পিছনের দরওয়াজা দিয়ে কামর-এর মকানে গিয়ে ঢোকে। তামাম দিন ধরে তারা রঙ্গ তামাশায় মেতে থাকে। আর একে অন্যকে সোহাগ, চুম্বন, দলন ও পেষণের মধ্য দিয়ে দিন যে কোন্ দিক দিয়ে গুজরান হয়ে যায় তাদের মালুমই হয় না।

একদিন হালিমা তার মেহবুব কামর'কে নিয়ে মতলব ভাজতে থাকে কি ক'রে বুড্ডা হাড়গিলেটির কব্জা থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে হালিমা বল্‌ল—'শোন মিঞা, তোমাকে এক কাম করতে হবে, পারবে না?'

—'কি কাম, কি ব্যাপার আগে বলবে তো? নইলে কি ক'রে বলি পারব, কি পারব না।'

হালিমা বুকের ভেতর থেকে একটি চাকু বের ক'রে কামর-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'দেখ, কেমন বড়িয়া চাকু। বুড্ডা হাড়গিলেটা এর বাটটি নিজে হাতে বানিয়েছে। তুমি চাকুটি নিয়ে বুড্ডার দোকানে যাও। এটা তাকে দেখাবে, আর বলবে বাজারের এক আদমির কাছ থেকে নগদ এক শ' দিনারের বিনিময়ে তুমি খরিদ করেছ। তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি জিতেছ, নাকি আদমিটি তোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছে।'

—'লেকিন এতে ফয়দা কি হবে, মালুম হচ্ছে না।'

—'ফয়দার ব্যাপার স্যাপার পরে নিজেই বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বুড্ডা আচ্ছা বা বুড়া যা-ই বলুক না কেন, শুনেই তুমি চলে আসবে। ব্যস।'

বুড্ডা জহুরী কামর-এর হাতে ছুরিটি দেখে একদম সামনে ভূত দেখার মাফিক আঁৎকে উঠে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! এটি আপনি কি ক'রে হাতে পেলেন সাহাব?'

—'এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে নগদ এক শ' দিনার দিয়ে খরিদ করেছি।'

—'না হুজুর, ঠকবেন কেন? বহুৎ দামী মাল। জরুর জিতেছেন।' ব্যস, আর এক লহমাও দেরী না ক'রে বুড্ডা দোকানের ঝাপ বন্ধ ক'রে সোজা মকানে এসে বিবিকে তলব করল। তার বিবি হালিমা ছুটে এলে বল্‌ল—'আমার চাকুটি কোথায়? জলদি নিয়ে এসো।'

—'এ কী আজব কাণ্ড। চাকুটির জন্য অসময়ে দোকান বন্ধ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলে? সে তো আমার হেফাজতেই যেমন ছিল, এখনও আছে। রাত্রে দোকান বন্ধ ক'রে এসে চাইলেই তো চলতো।'

—'বাহানা ছেড়ে আগে আমার হাতে চাকুটি তুলে দাও।'

—'বললাম তো আমার হেফাজতেই আছে। লেকিন এখন সেটি তোমার হাতে তুলে দিতে চাইছি না। যে কারণেই হোক না কেন, তোমার দিমাক এখন গরম। মেজাজ-মর্জি আগে ঠাণ্ডা হোক। এ কিসিমের মারাত্মক একটি অস্ত্র তোমার হাতে এখন তুলে দেয়া ঠিক হবে না। দিমাক ঠাণ্ডা কর। তোমার চাকু আমার হেফাজতেই ছিল, আছেও।'

—'না। এ জরুর ঝুটা বাৎ। তোমার হেফাজতে আগে ছিল বটে, এখন আর নাই। জরুর বে-হাত হয়ে গেছে।'

হালিমার দু'চোখের কোল বেয়ে পানির ধারা নেমে আসে। ডুকরে ডুকরে কেঁদেকেটে বলতে থাকে—'তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর! এর চেয়ে আর বড় ব্যাপার কি ঘটতে পারে। সবই আমার নসীব। জানের মায়া আমি করি না। মোউতের ভয়-ডর আমার নেই।' পেটরা খুলে চাকুটি বের ক'রে স্বামীর হাতে দিয়ে এবার বল্‌ল—'এই যে, বুক পেতে দিয়েছি। দাও, হাতের চাকুটি আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে গায়ের ঝাল মিটাও। স্বামীর অবিশ্বাসিনী হয়ে কোন বিবির জিন্দা থাকা উচিত নয়, আমিও থাকতে চাই না। তুমি যদি আমার ওপর আস্থাই না রাখতে পার তবে এ-জান রেখে কি-ই বা ফয়দা?'

ব্যাপার দেখে জহুরী উবেদ তো একদম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কি করবে, কি-ই বা বলবে অচানক গুছিয়ে উঠতে না পেরে নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। এক সময় বিলকুল শুকনো গলায় ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'বিবিজান, আমার গলতি হয়ে গেছে। আমি তোমার কাছে মাফি মাঙছি। আমার কি দিমাক টিমাক খারাপ হয়ে গেল। নইলে তোমার মাফিক এক সাচ্চা সতী বিবিকে সন্দেহের চোখে দেখি। নির্ঘাৎ শয়তান আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।'

পরদিন সকালে ফি রোজের নিয়মে জহুরী উবেদ নাস্তা সেরে দোকানে চলে গেলে তার বিবি হালিমা এক আজব কাণ্ড ক'রে বসল। গায়ে মুখে রঙ মেখে, বাহারী সাজপোশাক গায়ে চাপিয়ে কামর-এর মকানে হাজির হ'ল। খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বল্‌ল—'কি গো নাগর, দেখেই জিভ একদম রসিয়ে উঠল নাকি? কলিজার ছটফটানিও জরুর শুরু হয়ে গেছে, ঠিক কিনা?'

কামর হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার কোশিস করল। হালিমা অচানক দু'হাত তফাতে চলে গিয়ে বল্‌ল—'আরে করছ কি মিঞা! বাঁদীর বেশেই আমাকে বেশী মানায় নাকি? তোমার যে আর তর সইছে না। এখন জাপ্টাজাপ্টি শুরু করে দিলে রঙ উঠে যাবে, খেয়াল নেই? তার আগে বল, আমাকে বাঁদীর বেশে মানিয়েছে কিনা?'

—'বহুৎ বড়িয়া সাজ গায়ে চড়িয়েছ মেহবুবা। কে বলবে তুমি বুড্ডা হাড়গিলা জহুরীর বিবি—বরং মালুম হচ্ছে সদ্য বাঁদী বাজার থেকে খরিদ করা মাল।'

—'বহুৎ আচ্ছা। আমিও তা-ই চাইছি। এখন তোমার কাজ হচ্ছে আমাকে নিয়ে আমার স্বামী বুড্ডা জহুরীর দোকানে হাজির হও। তাকে বলবে, বাঁদী বাজার থেকে খরিদ ক'রে নিয়ে এসেছ। চার হাজার দিনারের বিনিময়ে আমাকে পেয়েছ।'

বুড্ডা জহুরী উবেদ, উপুড় হয়ে জরুরী একটি অলঙ্কারে নক্সা তৈরীর কাজে আত্মমগ্ন। এমন সময় কামর বাঁদী বেশে সজ্জিতা হালিমা'কে নিয়ে তার দোকানে হাজির হ'ল। তাদের পায়ের আওয়াজ শুনে জহুরী মুখ তুলে তাকিয়েই একদম তাজ্জব বনে গেল। একবার হালিমা-র মুখের দিকে, পরমুহূর্তেই কামর-এর মুখের দিকে বার কয়েক তাকিয়ে নিয়ে আচমকা সামনে ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ব'লে উঠল—'গুস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আপনাদের উপস্থিতি ঠিক ঠাহর করতে পারি নি। মেহেরবানি ক'রে বসুন।'

কামর বল্‌ল—'না, বসব না। হাতে একদম সময় নেই। যে ব্যাপারে আপনার কাছে ছুটে আসতে হ'ল। বাঁদী বাজারে গিয়েছিলাম। টুঁড়তে টুঁড়তে এ-বাঁদীটিকে চোখে ধরে গেল। ব্যস, চার হাজার দিনার দাম নিয়ে নিল। তার জন্য পরোয়া নেই। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, বলুন তো মালটি কেমন হ'ল? ঠকে যাই নি তো?' বলতে বলতে হালিমা-র মুখের নাকাব সরিয়ে দিল।

হালিমা-র মুখের দিকে নজর দিতেই বুড্ডা জহুরীর বুকের মধ্যে কে যেন অচানক এক হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিল। ব্যস, সে-মুহূর্তেই সে বুকফাঁটা আর্তনাদ ক'রে আছাড় খেয়ে যন্ত্রপাতির ওপর পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা লোপ পেল। এলিয়ে পড়ল। বরাতের জোর আছে বটে। শরীরের কোথাও কেটে যায় নি, বা ছড়েও যায়

নি সামান্যতম।

কিছু সময় বাদে বুড্ডা জহুরী সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে লম্বা লম্বা পায়ে মকানে ফিরে এল। দরওয়াজা ঠেলে কামরায় ঢুকেই সে বিলকুল বেকুব বনে গেল। আজব ব্যাপার তো। তার বিবি আয়নার সামনে বসে সাজগোজ সারছে। সাজগোজের আগে তার মুখটি তো তার একদম চেনা। তবে কি একটু আগে দোকানে যে-দৃশ্য দেখল তা খোয়াব টোয়াব গোছেরই কিছু। অবিকল হালিমা যেন বাঁদীর বেশ ধারণ ক'রে তার দোকানে মোহিনী মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল! এই তো তারই হালিমা, আয়নার সামনে সর্বদা পরার সেমিজ গায়ে চাপিয়ে সাজগোজ সারছে। হ্যাঁ, খোয়াব না হলেও অবিকল খোয়াবের সামিলই কিছু একটি সে নির্ঘাৎ দেখেছে। তার বিবি বাঁদী বাজারে যাবে কেন? নওজোয়ান কামরই বা তাকে পাবে কেন?'

হালিমা কিছু না-বোঝার, কিছু না-জানার বাহানা ক'রে বল্‌ল—'কি গো, তোমাকে যেন কেমন অস্থির দেখাচ্ছে? চোখ-মুখ কেমন শুকনো। তোমার তবিয়ৎ খারাপ হয় নি তো? আমার যেন কেমন কেমন মালুম হচ্ছে।'

—'ধ্যুৎ, তবিয়ৎ খারাপ হতে যাবে কেন। আদতে আমি এক ধাঁধায় পড়ে বিলকুল খাবি খাচ্ছি।'

—'ধাঁধা? ইয়া আল্লাহ! আবার কোন ধাঁধা তোমার ঘাড়ে চাপল? ব্যাপারটি হচ্ছে, কামর সাহাব আজ বাঁদী-বাজার থেকে এক বাঁদী খরিদ ক'রে আমার দোকানে নিয়ে হাজির হয়েছিল। সাচ্চা বলছি বিবিজান, লেড়কিটির মুখের দিকে নজর পড়তেই আমার শির একদম চক্কর মেরে উঠল। বেহুঁস হয়ে লুটিয়ে পড়লাম। তার মুখের আদল অবিকল তোমারই মাফিক। যেন তোমার মুখটি তার গর্দানের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।'

—'তোমার দিমাক টিমাক খারাপ হতে চলেছে, মালুম হচ্ছে। আমার ওপর তোমার সন্দেহ যেন বেড়েই চলেছে। তুমি আমাকে কাজী ডেকে শাদীনামা লিখিয়ে শাদী ক'রে নিয়ে এসেছ। আর আমাকেই যদি এখন প্রতিমুহূর্তেই সন্দেহ করতে থাক তবে জোর ক'রে শাদীর বন্ধন টিকিয়ে রাখার কোশিস না-ই বা করলে। দু'জনের মুখের আদল হুবহু এক হতেই পারে। লেকিন নিজের বিবিকে চিনতে গলতি ক'রে এমন আদমি—মুহূর্তকাল পরে ফিন বল্‌ল—'মালুম হচ্ছে তোমাকে বুড্ডা বিমারিতে ধরেছে। কামর সাহাবের বাসায় গেলেই ধন্দ চুকে যেতে পারে। তোমার সাধের হালিমা কিনা ফয়সালা হয়ে যাবে।'

—'হালিমা, তোমার বুদ্ধি সাচ্চা পাকা। কামর সাহাবের মকানে গেলেই তো ফয়সালা হয়ে যেতে পারে।'

জহুরী উবেদ কামর-এর মকানে। হালিমা বাঁদী বেশ ধরে কামরায় এসে দু'জনকে দু' পেয়ালা গুলাব পানির সরবৎ দিল। উবেদ'কে সালাম ক'রে পাশের কামরায় চলে যায়।

উবেদ বুঝল, তারই ভুলচুক হয়েছে। আর তারই জন্য এ-ফ্যাসাদ। সে ব্যাজার মুখে দোকানে ফিরে গেল।

উবেদ বিদায় নিলে হালিমা হো হো ক'রে হেসে পালঙ্কে গড়িয়ে পড়ল। এক সময় হাসি থামিয়ে কামর'কে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল—'বুড্ডা জহুরীটির দিমাক বলতে কিছুই নেই দেখছি। নইলে সে কি ধরতে পারছে না সাধের ময়না হালিমা তাকে ছেড়ে আশমানে ওড়ার ফিকির খুঁজছে?'

সেদিনই তারা গোপনে উটের পিঠে চেপে বসরাহ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। এগিয়ে চল্‌ল সিধা কায়রোর দিকে।

কামর মকানে পৌঁছে তার আব্বাকে বল্‌ল—'ফকির সাহাব যে লেড়কির পাত্তা দিয়েছিল এ-ই সে লেড়কি। এর নাম হালিমা। আমি একে শাদী করব।'

কামর এবার তার আম্মা ও আব্বাকে বসরাহের বিলকুল ঘটনার ব্যাপার স্যাপার খোলসা ক'রে বলল।

কামর-এর আব্বা তো ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে একদম বেঁকে বসল। সে যুক্তি দেখাল, নির্দোষ স্বামীকে যে লেড়কি ছেড়ে আসে সে নির্ঘাৎ দুশ্চরিত্রা আর বেইমান। এমন লেড়কিকে বিশোয়াস করা ঠিক হবে না। সে আরও বল্‌ল—'শোন বেটা, আমার ইয়ার-দোস্তদের বড়িয়া, খুবসুরৎ বহুৎ লেড়কি রয়েছে। আমার বাৎ মান,

বাজে ধান্দা ছেড়ে পছন্দ মাফিক অন্য কোন লেড়কিকে শাদী কর।'

কামর একদম মাথা পাততে নারাজ। সে ফোঁস ক'রে উঠল—'আজ তোমার মুখে এ-বাৎ কেন আব্বা? তোমার মত নিয়েই তো আমি বসরাহতে গিয়েছিলাম। তোমরা যখন আপত্তি করলে তখন আমি হালিমাকে শাদী করব না। তোমাদের পছন্দ মাফিক লেড়কিকেই আমি শাদী করব।'

কামর-এর আব্বা আবদ এবার কৌশলে হালিমা'কে এক গুদামে নিয়ে আটক ক'রে রাখল।

এবার খুবসুরৎ এক লেড়কিকে কামর-এর সঙ্গে শাদী দেয়া হ'ল। আবদ দু' হাতে দিনার উড়িয়ে খুশীর রোশনাই বসিয়ে দিল পুরো মহল্লা জুড়ে।

এক সময় কামর সচকিত হয়ে স্বগতোক্তি ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ যে সে-বুড্ডা জহুরী উবেদ।' সে ছুটে গিয়ে তার আব্বাকে খবরটি দিল। মেহমানদের সঙ্গে উবেদ বসে বাৎচিৎ করছে।

উবেদ-এর সাজপোশাক একদম ভিখ মাঙ্গার মাফিক। ব্যাপার কি? আবদ তার হালতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে উবেদ বল্‌ল—'আমার বিবি বেইমানী ক'রে ভেগে যাওয়ার পর আমি বসরাহ 'ছেড়ে পথে নামি। নসীব খারাপ। আরব-দস্যুরা আমার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে একদম নিঃস্ব ক'রে দেয়। জিন্দেগীভর আমি যা কিছু আয় উপার্জন করেছি বিলকুল ধন-দৌলত নিয়ে ভেগে গেল। খোদাতাল্লা-র দোয়ায় জান রক্ষা পেয়েছে, ব্যস।'

আবদ নয়া সাজপোশাক এনে উবেদকে পরতে দিল। করজোড়ে বল্‌ল—'আজ আমার খুশীর দিন। আপনি আমার মেহমান। আপনার অমর্যাদা করলে আমার গুণাহ হবে। বিশোয়াস করুন, আপনার বিবি হালিমা, সে নিরাপদ ও নিষ্কলঙ্ক। আমি আপনার হাতে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে বহুৎ খুশী হ'ব। আপনি তাকে নিয়ে নিজের মুলুক বসরাহতে ফিরে যান। আর খুশী হলে আপনার সঙ্গে বেইমানীর জন্য বদলা নিতে তাকে প্রাপ্য সাজাও দিতে পারেন।

আবদ বুড্ডা জহুরী উবেদ'কে নিয়ে খানাপিনা সারতে সারতে বল্‌লেন—'ইয়াদ রাখবেন, কোন লেড়কী যখন কোন পুরুষকে পাকড়াও করার জন্য জাল ছড়িয়ে দেয় তখন তাতে সে-পুরুষটিকে একবার ফেলতে পারলে তার কম্ম কাবার। সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে একদম সম্ভব হয় না। উবেদ সাহাব, যে-বিবি আপনার চোখে ধুলা দিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে মহব্বতে মেতে ছিল, বেইমানী করে আপনাকে ছেড়ে ভেগে এসেছে, সে বিবিকে ফিন খাঁচায় পোরার কোশিস ক'রে আপনি কোন ফয়দা উঠাতে চাইছেন, আমি ভেবে পাচ্ছি নে। তার দ্বারা আপনি অতীতে আদৎ সুখ পান নি, ভবিষ্যতেও পাবেন না।'

—'আপনি একদম সাচ্চা বাৎ বলেছেন সাহাব। আমি আপনার লেড়কার কোনই কসুর দেখছি নে। গলতি বা কসুর যা-ই বলুন না কেন বিলকুল আম্মার বিবিই করেছে। লেকিন সে এখন কোথায়?'

—'চলুন, নিয়ে যাচ্ছি। এই তো, এখানেই এক মকানে তাকে আটক ক'রে রেখেছি।'

আবদ রহমান বুড্ডা জহুরী উবেদ'কে তার বিবি হালিমা-র কাছে নিয়ে গেল। স্বামীকে দেখেই হালিমা চমকে উঠল। তার কলিজা একদম শুকিয়ে গেল।

ক্রোধোন্মত্ত নেকড়ের মাফিক জহুরী গর্জে উঠল—'বেইমান বজ্জাত মাগী কাঁহিকার।' জহুরী এক লাফে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে তার টুটি টিপে ধরল। গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠল—'বেশরম মাগী, তোর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় তোকে চুকিয়ে দিলাম।'

ব্যস, খতম। জহুরী উবেদ তার বিবি হালিমা'কে একদম দোজখে চালান ক'রে দিল।

কামর তেমন কোন কসুর না করলেও কামর-এর আব্বা আবদ রহমান হালিমা-র ইন্তেকালে দিলে বহুৎ দাগা পেল। বুড্ডা জহুরী তো জিন্দেগীতে কারো কোন সর্বনাশ করে নি তবু তার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাওয়ায় আবদ রহমান অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতে লাগল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাত শ' সাতাশীতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বেচারা বুড্ডা জহুরী উবেদ তার বিবিকে নিজে হাতে খতম ক'রে বেইমানির প্রতিশোধ নিল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি খতম ক'রে থামলেন। একটু বাদে বেগম শাহরাজাদ ফিন মুখ খুল্‌ল—'জাঁহাপনা, রাত্রি এখনও ঢের বাকী। এবার আপনাকে 'এক ফুল দুই মালী' নামে একটি বহুৎ বড়িয়া কিস্‌সা শোনাচ্ছি। আশাকরি এটি আপনার দিলে খুশীর জোয়ার বইয়ে দিতে পারবে।

এক ফুল দুই মালী

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আমাদের এবারের কিস্‌সাটির নায়িকা এক বহুৎ চালাক-চতুর লেড়কি। সে একই সঙ্গে দু'-দু'জন পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ ক'রে নিজের কামজ্বালা নিভাতে ফিন উভয়কেই খুশী রাখত। তার এক স্বামী পকেটমার। নাম তার আকিল। হাত

সাফাইয়ের কাজে সে একদম পাক্কা ওস্তাদ। সে দিনের আলোতে তার কারবার চালাত। তার হাতের সুদক্ষ আঙুলগুলো এক লহমার মধ্যে আদমিদের পকেট একদম সাফা করে দিত। দ্বিতীয় জনের নাম হারাম। রাত্রের আন্ধারে অপরের ধন-দৌলত গায়েব করার কাজে তার জুড়ি নেই। সে রাতভর নিজের ধান্দায় কাটিয়ে ভোরে ফিরে আসত নিজের মকানে। তারপর বিবিকে নিয়ে শুয়ে ফষ্টিনষ্টিতে মাততো। দিনভর বিবির সঙ্গে কাটিয়ে ফিন গভীর রাত্রে শাবল-খন্তা নিয়ে বেরিয়ে মহল্লার মকানে মকানে সিঁদ কাটতো। এভাবেই সে একের পর এক সাল গুজরান ক'রে দিতে লাগল।

এদিকে পকেটমার আকিল দিনভর আদমির পকেট কেটে মাল হাতিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার কিছু বাদে ফিরে আসত নিজের মকানে। তারপর বিবিকে নিয়ে রাতভর লদকালদকি ক'রে কাটিয়ে দিত।

একদিন হতচ্ছাড়া চোরটি তার বিবিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে আক্ষেপ ক'রে বল্‌ল—'বিবিজান, নগরের কোতোয়াল বহুৎ জ্বালাতন ক'রে খাচ্ছে। একদম কড়া মেজাজের আদমি। মালুম হচ্ছে, এ-নগরে আর চুরির কারবার বেশীদিন চালানো যাবে না। কোতোয়ালের সিপাইদের ঘুম দিন দিন পাৎলা হয়ে যাচ্ছে। বহুৎ মুসিবতে পড়া গেল তো! আমদানি না হলে পেটের জোগাড় হয় কি ক'রে, বল তো? তাই ভাবছি, দু'-একদিনের মধ্যেই রোজগারপাতির ধান্দায় অন্য কোন নগরে গিয়ে মাথা গুঁজতে হবে। বেশ্যার বেটা হারামী নয়া কোতোয়াল একদম বিচ্ছুর মাফিক আমার পিছনে লেগেছে। তাই এ-নগর ছাড়তেই হচ্ছে।'

নষ্টা জেনানাটি পকেটমারকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ ক'রে এমন কান্না জুড়ে দিল যেন তার স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। ডুকরে কেঁদে সে বল্‌ল—'না, তোমার যাওয়া হবে না। কিছুতেই না। তুমি পরদেশে গেলে আমার কলিজায় যে হরবখত আগুন লেগেই থাকবে। সাফ বাৎ, আমি একলা থাকতে পারব না।'

পকেটমার তাকে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে বল্‌ল—'এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন চিরকালের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। চোখের পানি মোছ। আমি মালকড়ি আমদানির ধান্দায় যাচ্ছি। কিছু হাতিয়ে নিয়ে, রুটির জোগাড় ক'রে তো ফিন তোমার কাছে ফিরে আসছি।'

পেটরা গোছগাছ ক'রে তার মেহবুবাকে আদর-সোহাগ ক'রে পরদেশে পাড়ি জমাল।

এবার চোর হারাম এসে তার মেহেবুবা সে-নষ্টা জেনানাটিকে বল্‌ল—'না, এখানে আর থাকার জো নেই। হারামীর বাচ্চা টিকটিকিটি এঁটুলির মাফিক একদম আমার গায়ে গায়ে সেঁটে থাকে। রাতে মকানের বাইরে গেছি কি তার সিপাহীরা পিছু নেয়।

মালুম হচ্ছে আমাকে ফাটকে আটক না ক'রে ছাড়বে না। আমার কোর্তা-কামিজ যা আছে পেটরায় বেঁধে দাও। আমি এ-নগরকে ঠ্যাঙ দেখিয়ে পরদেশে চলে যাব।'

নষ্টা জেনানাটি এবারও একই ছলনায় মেতে গেল। কাঁদার বাহানা জুড়ে দিল—'তুমি দূরে চলে গেলে আমার কলিজা একদম শুকিয়ে যাবে। তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে এ-জান রাখবো? তুমি কাছে না থাকলে আমি একটা দুপুরও দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না।'

—'ধ্যুৎ! এমন শুরু করলে যে, আমি যেন জিন্দেগীভর তোমাকে ছেড়ে পরদেশে কাটাতে যাচ্ছি। নাকি মৌউৎ এসে আমাকে বেহেস্তে বা দোজখে নিয়ে যাচ্ছে যে, এ-দুনিয়ায় আর দেখা হবে না। চোখের পানি মোছ। ভয় নেই তোমার স্বামী অন্য কোন জেনানার বুকে মাথা গুঁজবে না, জিন্দেগীভর তোমারই থাকবে। বেহেস্তের হুরী-পরী এলেও আমার দিল্ গলাতে পারবে না। ইয়াদ রেখো।'

ছলনাময়ী জেনানাটি ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'সাচ্চা তো! আদতে বেশ্যায় মুলুক ছেয়ে গেছে। পুরুষের দোষ কি? তাই কলিজাটা ছটফট করে। তাগদওয়ালা এক মরদ দেখলেই তাদের কলিজার ছটফটানি শুরু হয়ে যায়, লালচে জিভে জল আসে। তাকে নষ্ট না করা অবধি ছাড়ান দেবে না। লেকিন তোমার ব্যাপার আলাদা। চোরকে নিয়ে নষ্টা জেনানাটি দিনভর বারকায়েক লদকালদকির মাধ্যমে কলিজা ঠাণ্ডা করল। আদর-সোহাগ দেখাল মাত্রাতিরিক্ত। এমন ভাব দেখাল, তাকে পরদেশে পাঠাতে বুঝি তার কলিজাটিই খসে পড়তে চাইছে।

এদিকে পকেটমার আকিল দিনভর পয়দল পথ পাড়ি দিয়ে

সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে এক সরাইখানায় এসে মাথা গুঁজল। সেখানে মাত্র এক আদমি তার আগে আশ্রয় নিয়েছে। সরাইখানাটি একদম ছোটো। একটি মাত্র কামরা, কয়েকটি চৌপায়া পাতা। তাইতে রাত্রি কাটিয়ে যাত্রীরা ভোরে ফিন পথে নামে।

আকিল গিয়ে তার আগে-আসা যাত্রীটির পাশের চৌপায়াটি দখল করল। আকিল আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে বাৎচিৎ শুরু করল—'কি মিঞা, দিনভর পথ চলে তবিয়ৎ গড়বড় হয়ে গেছে বুঝি? চৌপায়া ছেড়ে যে একদম উঠছেনই না। কাহিল লাগছে?'

—'বলছ কি, কাহিল লাগবে না ভাই সাহাব? কায়রো থেকে এক নাগাড়ে হেঁটেই চলেছি। ঠ্যাঙ দুটোর আর নেই কিছু। মালুম হচ্ছে ফোঁড়ার দর্দ শুরু হয়ে গেছে।'

—'আমার হালৎও একই দাঁড়িয়েছে। আমিও কায়রো থেকেই পয়দল আসছি। খোদাতাল্লার দোয়ায় আপনাকে পেলাম মিঞা। নইলে এখানে, নির্জন-নিরালা সরাইখানায় বিলকুল বোবা বনে একেলা রাত কাটাতে হ'ত। আমাদের পয়গম্বর তো বলেই গেছেন, সঙ্গীই হচ্ছে পথচলার সবচেয়ে আদৎ সম্বল। আপনার সাথে জান পরিচয় হওয়ায় বহুৎ খুশী হলাম। আজ আমরা দোস্তীর বন্ধনে আবদ্ধ হই আসুন মিঞা সাহাব।'

তারা উভয়ে হাতে হাত রেখে দোস্তী পাতিয়ে নিল। এরা একজন পকেটমার আকিল আর দোসরা জন চোর হারাম। একই জেনানাকে উভয়ে বিবি সমঝে ঘর সংসার করে লেকিন তাদের জান পহছান হ'ল পরদেশের এক সরাইখানায়। খোদাতাল্লার আজব মর্জি বটে।

প্রায় মাঝ রাত্রি পর্যন্ত আকিল আর হারাম পরস্পরের কাছে নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কিস্‌সা বল্‌ল। তারপর বদনা ভরে পানি নিয়ে খানাপিনা সারার বন্দোবস্ত করল। উভয়ের নিজ নিজ পোটলা খুলে ভাগ বাটোয়ারা ক'রে খানা খাবে স্থির করল। আর যেটুকু বেশী হবে তা দিয়ে পরদিন ভোরে নাস্তা সারবে।

উভয়ে পেটরা খুলে রুটি, সব্জি, ভুজিয়া ও চাটনী একই খানা বের করল। তারা খানাগুলির দিকে কয়েক মুহূর্ত বিস্ময় মাখানো নজরে চেয়ে রইল। কি বুঝল, কে জানে! পরস্পরের চোখাচোখি হওয়াতে ফিক ক'রে হেসে ফেল্‌ল।

চোর হারাম মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বল্‌ল—'ভাই সাহাব, আমি ভাবলাম কি, আমাদের উভয়ের খানা আলাদা কিসিমের হবে। লেকিন আদতে দেখছি একই। আজব ব্যাপার বটে।'

হারাম এবার নাস্তার ডিব্বাটি খুল্‌ল। তাতে কিছু ভেড়ার টেংরীর খানা। আজব ব্যাপার, আকিল-এর ডিব্বা থেকেও ভেড়ার টেংরীই বেরল।

ব্যাপার দেখে উভয়েই একদম তাজ্জব বনে যায়। আকিল চোখ দুটো কপালে তুলে বলে—'মিঞা আপনি নাস্তা এনেছেন কোত্থেকে?'

—'কেন, আমার বিবি খানা-নাস্তা বিলকুল নিজে হাতেই বানিয়ে দিয়েছেন।'

—'কাইরোতে আপনার মকান কোন মহল্লায়, বলুন তো?'

—'বিজয় দরওয়াজা মালুম আছে? ওখানেই আমার মকান। মকান ঠিক নয়, আস্তানা বলা চলে।'

—'তাজ্জব ব্যাপার তো! আমার ডেরাও তো ওখানেই। পাশাপাশি রয়েছি অথচ আমাদের কারো সঙ্গে কারো জান পহছন নেই!'

আকিল ও হারাম এবার নিঃসন্দেহ হ'ল হারাম রাত্রে যখন মকানে মকানে সিঁদ কাটার ধান্দায় ঢুঁড়ে বেড়ায় তখন তার বজ্জাত বিবি রাতভর পকেটমার আকিল-এর সঙ্গে রতি-রঙ্গে মজে থাকে, কলিজার জ্বালা মেটায়। ফিন আকিল দিনভর পকেটমারার ধান্দায় ঢুঁড়ে বেড়ায়। তখন সে দেহের সুখ মেটায় হারামকে নিয়ে। একদম উল্টে পাল্টে তাকে দিয়ে সম্ভোগ-সুখ উপভোগ করে, এভাবে বেশ্যা মাগীটি একই সঙ্গে দু'-জন স্বামীর সহবাস-সুখ গামছা নিঙড়ানোর মাফিক একদম নিঙড়ে নেয়।

আকিল ও হারাম পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের খুটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে জেনে নিয়ে বজ্জাত জেনানাটি সম্বন্ধে একটু-আধটু সন্দেহ যা ছিল কাটিয়ে নিল।

আকিল চিল্লিয়ে ব'লে—'বজ্জাত মাগী আমাকে এতদিন ধোঁকা দিয়ে এসেছে। আমি চাকু বসিয়ে দেব! জান খতম ক'রে গায়ের ঝাল মিটিয়ে ছাড়ব।'

হারাম চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'ভাই সাহাব, দিমাক গরম করলে বিলকুল গোলমাল হয়ে যাবে। এমন এক মতলব আমাদের বের করতে হবে যাতে মাগীর বজ্জাতি আমরা হাতে নাতে ধরে ফেলতে পারি। ব্যস, একদম ফয়সালা হয়ে যাবে।'

আকিল আর হারাম গিয়ে তাদের মকানের দরওয়াজায় হাজির হ'ল। নষ্টা জেনানাটি খোয়াবের মধ্যেও ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারে নি যে, এমন খাঁচাকলে সে কোনদিন পড়তে পারে। আর রক্ষা নেই ভেবে তাদের দেখেই সে গলাছেড়ে বিলাপ জুড়ে দিল। একবার এর পায়ে, পরমুহূর্তেই ওর পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে সে বল্‌ল—'তোমাদের কাউকেই ঠকাবার ধান্দা আমার ছিল না। আদতে আমার কামজ্বালা একটু বেশী-ই। সে-জ্বালা নেভাতেই আমাকে দু'-দুটি নওজোয়ানকে পাকড়াও করতে হয়েছে।'

এদিকে হারাম আর আকিল উভয়েই লেড়কিটির মহব্বতের

জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিল। তাকে ছেড়ে থাকা তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই তার চোখের পানিতে উভয়ের কলিজাই নরম হয়ে উঠল। তাকে মাফ করে দিল।

এবার তারা সমস্বরেই জেনানাটিকে বল্‌ল—'সাফবাৎ শোন, ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যাবার পর আর তোমার নক্কারজনক ধান্দাটি ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে। বল, কার সঙ্গে তুমি থাকতে চাও?'

চতুরা বেশ্যা মাগীটি সাচ্চা কঠিন সমস্যায় পড়ে গেল। তার বিশোয়াস, উভয়েই নওজোয়ান। গায়ে হাতীর বল-শক্তি। হিম্মৎ-ও সমান। একজনকে নিয়ে ঘর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, অন্যজন নির্ঘাৎ ছেড়ে দেবে না। সে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'সাচ্চা বাৎ শোন, তোমরা কেউ-ই আমার কাছে কোনদিক থেকে কমতি নও। বরং সমান। উভয়েই আমার কলিজার মহব্বতের সামগ্রী। কাকে ফেলে কাকে বাছাই করি, বল তো?'

—'ওসব ছেঁদো বাৎ আমাদের মালুম আছে। ধান্দা ছেড়ে নক্কারবাজী ছেড়ে সাফ সাফ বল, তুমি কার সঙ্গে থাকতে চাও?'

—'দেখ, মহব্বৎ আর মেহেবুব এমনই ব্যাপার যাকে তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে, বিচার করা চলে না। কার দিকে আমার দিল্ বেশী ঝুঁকেছে, বিচার করব কি ক'রে?'

—'ফিন নক্কারবাজী ধান্দা ধরেছ! এক্ষুণি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে সাফসাফ বাতাও—জলদি কর।'

—'জেনানাটি এবার গলা ছেড়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়—'আমি নাচার—আমি পারছি না—অক্ষম। দু' জনের ওপরই আমার মহব্বৎ সমান। একমাত্র গুণ-বুদ্ধির দিক থেকেই তোমাদের আলাদা করা যেতে পারে। আচ্ছা বা বুড়া বের করা সম্ভব। এক কাম কর। তোমরা উভয়েই নিজ নিজ কেরামতি-হিম্মৎ আমাকে দেখাও। তবে আমি কোশিস ক'রে দেখতে পারি যদি তোমাদের মধ্যে থেকে একজন বেছে নেয়া সম্ভব হয়।'

জেনানাটির বাৎ শুনে উভয়েই সোল্লাসে বলে ওঠে—'বহুৎ আচ্ছা। সেরা মতলব বের করেছ। যার বুদ্ধি-কৌশল বেশী তাকেই তুমি বেছে নিও। নসীবের পরীক্ষা দেবার সুযোগ আকিল প্রথমে লাভ করল।

আকিল তার ফন্দি-কৌশলের পরীক্ষা দিতে গিয়ে হারাম'কে সঙ্গে ক'রে হাটে হাজির হ'ল। সে এক ইহুদী জহুরীকে দেখিয়ে বল্‌ল—'মিঞা সাব, এ-আদমি জহুরীর কারবারের চেয়ে সুদের কারবারকেই বেশী পছন্দ্ করে। দোকানে দোকানে দিনার ধার দেয়। দু' হাতে সুদ পিটে। তার কাঁধের থলিটি সুদের দিনারে আর গহনাপত্রে একদম বোঝাই। আমি কি ক'রে, ওটি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেই একবারটি চোখ মেলে দেখে নাও।'

বুড্ডা ইহুদী সুদখোরটি একটি চিরাগবাতি নিয়ে আন্ধার পথে এগিয়ে চলেছে। আকিল অচানক তাকে একটি ধাক্কা মেরে তার কাঁধের থলিটি একদম ছোঁ মেরে নিয়ে সটকে পড়ল। এক লহমার মধ্যে একদম বে-পাত্তা হয়ে গেল। প্রতিবেশী দোকানেও খরিদ্দাররা তাকে ধাওয়া করল। লেকিন সে উধাও হয়ে গেল। কাজ যেটুকু হ'ল এক নিরীহ-নিরপরাধ পথচারী ধরা পড়ে হাটুরে মার খেয়ে জান খতম হওয়ার জোগাড় হ'ল।

একটু বাদে অবিকল হাসিমুখে হারাম-এর কাছে ফিরে এসে বল্‌ল—'কি? কেমন মালুম হ'ল? মতলবটি বেড়ে, ঠিক কিনা?'

—'বহুৎ আচ্ছা! হাত সাফাইয়ের ফন্দি-ফিকিরটি বড়িয়া বটে।' এবার একটু তফাতে নির্জন-নিরালা আন্ধার গলিতে এসে হারাম থলিটি খুলতে খুলতে বল্‌ল—'দেখা যাক, বুড্ডা ইহুদী এমন কি ধন দৌলত দিয়ে ঝোলা বোঝাই করেছে। থলের মুখ খুলতেই চোখে পড়ল শুধুই সোনার মোহর। আকিল এক মুঠো মোহর তুলে নিয়ে বল্‌ল—'মিঞা, এগুলো কোর্তার ভেতরের জেবে ঢুকিয়ে দাও।'

এবার আকিল নিজের হাতের 'আকিল' নাম লেখা একটি অঙ্গুঠি খুলে থলের মোহরগুলোর মধ্যে ছেড়ে দিল। আচ্ছা ক'রে থলের মুখটি বাঁধল।' এবার সে বল্‌ল—'মিঞা, এবার বুড্ডা ইহুদীটিকে তাল্লাশ ক'রে বের করতে হবে। চল, ঢুঁড়ে দেখি, কুত্তার বাচ্চাটি গেল কোথায়।'

হারাম তো তার বাৎ শুনে তাজ্জব বনে গেল। ভাবল, আকিল এ কী আজব কাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছে! সে চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'ভাই সাব, ঝুটমুট কেন ইহুদীটির তল্লাশ করতে যাচ্ছ? ধরা পড়লে ফাটকে আটক করে ছাড়বে, ইয়াদ রেখো।'

—'আরে মিঞা, মুখে কলুপ এঁটে আমার পিছু পিছু চলই না একটিবার দেখ না কাণ্ডটি কি করি। তাজ্জব বনে যাবে আমার মতলব দেখলে।'

কয়েক কদম গিয়েই তারা বুড্ডা ইহুদীটির দেখা পেয়ে গেল। আকিল লম্বা-লম্বা পায়ে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার কাঁধে থলেটিকে ঝটপট ঝুলিয়ে দিল। ব্যস, চোখের পাতা পড়ার আগেই একদম চম্পট দিয়ে দিল।

খোয়া-যাওয়া থলেটি ফিরে পেয়ে বুড্ডা ইহুদীটি খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে গেল। কে ছিনতাই করেছিল? কেনই বা ফেরৎ দিয়ে গেল, ভাববার দরকার মনে করে নাই। ইহুদীটি খুশীতে নাচতে নাচতে কয়েক কদম যেতে না যেতেই আকিল ইহুদিটির একদম মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বুকের কাছে কোর্তাটি মুঠো ক'রে ধরে গর্জে উঠল—'হারামী কী বাচ্চা! আমার থলেটি হাতিয়ে নিয়ে সটকে পড়ার ধান্দায় ছিলে, তাই না? বিধর্মী হতচ্ছাড়া ছিনতাইবাজ কাঁহিকার। আজ তোমার একদিন, কি আমারই একদিন। আজ তোমার জান নিয়ে ছাড়ব।'

বুড্ডা ইহুদীটি যেন অচানক একদম আশমান থেকে জমিনে পড়ল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্‌ল—'বেটা, বলছ কী তুমি! তুমি হয়ত সঠিক আদমি পহছান্তে কোথাও ভুলচুক করছ!'

—'ভুলচুক? শয়তান কী বাচ্চা। তোমাকে পহছান্তে ভুলচুক হয়েছে? তুমি হর রোজ একই কৌশলে এ-নগরের বহুৎ আদমির মাল হাফিস ক'রে বেড়াও। বিধর্মী নক্কারবাজ কাঁহিকার, আমার থলেটি চিনতেও আমার ভুলচুক হচ্ছে?' কোর্তা ছেড়ে এবার ঝোলাটি মুঠো ক'রে ধরে অধিকতর গলা চড়িয়ে এবার বল্‌ল—'চল, কোতোয়ালের দরবারে তোমাকে হাজির করছি। সেখানেই প্রমাণ হয়ে যাবে, এ-থলেটি আমার, কিনা। আমি নিজের হাতে আইন তুলে নিতে চাই না। কোতোয়ালই আইন ঘেঁটে ব'লে দেবেন, থলেটির আদৎ মালিক কে।'

কাজী পুরো বৃত্তান্ত শুনবে। তারপর আইনের দোহাই দিয়ে যে-রায় দিবে তা বুড্ডা ইহুদীটির তো কলিজা ফেঁসে যাওয়ার জোগাড় হবে। ঠোঁট বাঁকিয়ে কাজী বল্‌বে—'মোহর আর গহনাপাতি তো আদতে সুদের। সরকারী দপ্তরে এসব অসৎ উপায়ে জমাপড়া অর্থ উদ্ধার কি আর হয়।'

বুড্ডা সুদখোর ইহুদীটি হাতে-পায়ে ধরে বহুৎ চোখের পানি ঝরাল। ফয়দা কিছুই হ'ল না।

ইহুদীটি আকিলকে বল্‌ল—'শোন, জাফর আর আব্রাহাম-এর নামে শপথ করে বলছি, মোহরের থলিটির মালিক আমি-ই। তোমার গলতি হচ্ছে। আমার থলি আমি-ই চিনব না।'

—'পেঁদিয়ে একদম ঠাণ্ডা ক'রে দেব ; শয়তান বিধর্মী বুড্ডা কাঁহিকার! পাক্কা চোর হয়ে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে ভাবছ! তোমাকে কাজীর দরবারে নিয়ে একবার ফেলতে পারলে জিন্দেগী ভর কি করে ফাটকে আটক রাখতে হয় সে ফিকির আমার মালুম আছে। জেনে রাখ বুড্ডা তোর নসীবে কঠিন সাজা নাচছে।'

আকিল-এর চিল্লাচিল্লি শুনে পাশের দোকানদাররাও পথচারী জনতা ভিড় করল। তাকে ঘিরে মেলা বসে গেল। আকিলের মুখে ব্যাপারটি শুনে সবাই দিমাক গরম ক'রে আচ্ছা ক'রে দাওয়াই দিয়ে দিল।

পিটতে পিটতে প্রায় আধ-মরা ক'রে বুড্ডা ইহুদীটিকে কাজীর দরবারে হাজির করা হ'ল।

কাজী আকিল আর বাজারের আদমিদের লক্ষ্য ক'রে বল্‌ল—'কি ব্যাপার বল তো! একে এখানে হাজির করেছ কেন? এর কসুর কি?'

আকিল ও অন্যান্যরা বুড্ডা ইহুদীটির ঘাড়ে কসুর চাপিয়ে দিয়ে ফাটকে আটক রাখতে অনুরোধ করল।

বুড্ডা ইহুদীটি চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'না' কোতোয়াল সাহাব, বিলকুল ঝুটা বাৎ, ও থলি আমার। এতে আমার পাঁচশ মোহর আছে।'

আকিল বল্‌ল—'হুজুর, ঝুটা—বিলকুল ঝুটা। এ থলি আমার।'

কাজী বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, থলি যদি তোমারই হয়ে থাকে তবে এতে কি আছে বলতে পারবে তো?'

—'জরুর পারব। হুজুর বুড্ডা ইহুদী বল্‌ল পাঁচশ' সোনার মোহর আছে। আমি বলছি চার শ' পঁচানব্বইটি সোনার মোহর এতে রয়েছে। তা বাদে আমার এক মূল্যবান বস্তুও এর ভেতরে রয়েছে। আমার নাম লেখা একটি অঙ্গুঠিও থলের ভেতরে রয়েছে। তার অর্থমূল্য নেই বল্‌লেই চলে। লেকিন আমার কাছে এটি এক অমূল্য সম্পদ।'

—'হুজুর, একদম ঝুটা বাৎ। বানানো ব্যাপার।'

কাজীর হুকুমে থলেটি টেবিলের ওপর উপুড় ক'রে ফেলা হ'ল। মোহরের সঙ্গে একটি তামার অঙ্গুঠিও পড়ল। কাজী অঙ্গুঠিটি হাতে নিয়ে দেখল, সাচ্চা বটে—'আকিল' নামটি তার গায়ে খোদাই করা রয়েছে। কাজীর সিপাহীরা মোহর গুনতি ক'রে দেখে চারশ' পঁচানব্বইটি মোহরই তাতে ছিল। ব্যস, কাজী গর্জে উঠলেন—'প্রতারক বিধর্মী ইহুদী কাঁহিকার। ঝুটা বাৎ বলে কিস্তি মাৎ করার জায়গা পাও নি? যাও, এবার কয়েদ খাটো গে। মজা

টের পাবে।'

কাজীর হুকুমে বুড্ডা ইহুদী বেচারাকে পঁচিশ ঘা বেত মারা হ'ল আর সে নিজে হাতে আকিল-এর হাতে মোহরের থলিটি তুলে দিল।

আকিল হাতের মোহরের থলিটি নাচাতে নাচাতে কাজীর বিচারালয় থেকে বেরিয়ে এল। মুচকি হেসে হারাম'কে বল্‌ল—'কি মিঞা আমার কৌশল তো নিজের চোখেই দেখলে।'

হারাম হেসে বল্‌ল—'ভাই সাহাব, হিম্মৎ আছে তোমার! জব্বর খেল্ দেখালে।'

—'মিঞা, এবার তোমার খেল্ শুরু কর।'

তারা হাঁটতে হাঁটতে সুলতানের প্রাসাদের ঠিক পিছনে হাজির হ'ল। হারাম থমকে খাড়া হয়ে পড়ল। আকিল'কে বল্‌ল—'মিঞা সাহাব, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা কর। আমি এক গাছি মোটা রশি নিয়ে এখনই ফিরে আসছি।' তাকে অপেক্ষা করতে ব'লে হারাম এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছু সময় বাদে হারাম এক গাছি মোটা রশি কাঁধে নিয়ে ফিরে এল।

এবার আজব এক উপায়ে রশিটিকে সুলতানের প্রাসাদের ওপরে ছুঁড়ে মারল। রশির প্রান্তটি ছাদের সঙ্গে আটকে গেল।

হারাম দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা শুরু করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বল্‌ল—'ভাই সাহাব, মজার ব্যাপারটি দেখার জন্য তোমাকেও আমার সঙ্গে রশি-বেয়ে ওপরে উঠতে হবে, পারবে না?'

আকিল ঘাড় কাৎ ক'রে বল্‌ল—'জরুর পারব। তুমি আগে ওঠ মিঞা সাহাব, বাদে আমি উঠছি।'

রশি-বেয়ে উপরে উঠে উভয়ে প্রাসাদের এক কামরার সামনে হাজির হ'ল। হারাম হাত বাড়িয়ে পর্দাটি সামান্য ফাঁক করল। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল সোনার পালঙ্কে সুলতান এলিয়ে পড়ে। আধো নিদ-আধো জাগরণ। তন্দ্রাভাব। এক নফর কিশোর—সুলতানের পা টিপছে।

হারাম আকিল'কে সেখানে দাঁড় করিয়ে গুটিগুটি কামরার ভেতরে ঢুকে গেল। ব্যাপার দেখে ডরে আকিল-এর হাত-পা পেটের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। ইয়া আল্লাহ! সুলতানের তন্দ্রা যদি টুটে যায় তবে তো কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত ক'রে ছাড়বেন।

হারাম পা টিপে টিপে একদম লেড়কাটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। লেড়কাটি সুলতানের পায়ের পাতায় আলতো ক'রে হাত বুলিয়ে চলেছে। হারাম কোর্তার জেব থেকে ঝট্ ক'রে একটি রুমাল বের ক'রে লেড়কাটির মুখ বেঁধে ফেল্‌ল। তারপর চ্যাঙ দোলা করে বাইরে নিয়ে পিঠমোড়া করে থাম্বার সঙ্গে বেঁধে দিল।

হারাম নিজেই এবার লেড়কাটির জায়গায় বসে সুলতানের পা টিপতে লেগে গেল। সুলতান তেমনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রইল।

কড়া-হাতের ছোয়া লাগায় সুলতান চোখ দুটো বন্ধ রেখে ধমক দিয়ে উঠলেন—'ব্যাপার কিরে তোর? এত জোরে জোরে পা টিপছিস কেন?'

হারাম এবার গলা নামিয়ে শিশুর মাফিক কণ্ঠস্বরে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, একটি কিস্‌সা শোনাব?'

—'কিস্‌সা? বহুৎ আচ্ছা! বল, তোর কি কিস্‌সা, শুনি।'

হারাম গলা নামিয়ে কিস্‌সা শুরু করল—'কোন এক নগরে দুই দোস্ত বাস করত। জিগরী দোস্ত। তাদের একজনের নাম আকিল আর দ্বিতীয়জনের নাম হারাম। হারাম চুরিচামারি ক'রে রুটির জোগাড় করে। আর আকিল-এর অর্থোপার্জনের রাস্তা পকেটমারা।

এবার সে সবিস্তারে বর্ণনা করল, আকিল কিভাবে সুদখোর বুড্ডা ইহুদীর ঝোলার ভেতর নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুঠি চালান দিয়ে কাজীর কাছে তাকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে যায়। কাজী বিচার ক'রে থলির আদৎ মালিক বুড্ডা ইহুদীকে কয়েদখানায় পুরে দেয় আর তার থলিটি তুলে দেয় পকেটমার আকিল-এর হাতে।

এবার হারাম নিজের হিম্মৎ দেখাবার জন্য রশির সাহায্যে সুলতানের প্রাসাদে ঢুকে যায়। সাক্ষী স্বরূপ আকিলকেও নিয়ে আসে প্রাসাদে। তার লক্ষ্য সুলতানের কামরায় ঢুকে তাকে কিস্‌সা শোনাবে। কলিজার জোর আর বুদ্ধি সম্বল ক'রে সে সাচমুচ সুলতানকে কিস্‌সা শোনাল। সুলতান তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিজের পালঙ্কে শুয়ে। তাঁর পা টিপছিল এক ছোকড়া নফর। ঝিমোতে ঝিমোতে সে সুলতানের পা টিপছিল। রুমাল দিয়ে তার মুখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে তাকে থাম্বার সঙ্গে বেঁধে রেখে ঘাঘু চোর হারাম সুলতানের পা টিপতে টিপতে তাঁকে কিস্‌সা শোনাতে শুরু করল। তার কাণ্ড দেখে তার পকেটমার দোস্ত আকিল-এর চোখ দুটো একদম ট্যারা হয়ে গেল।

'জাঁহাপনা, আপনি বিচার ক'রে বলুন তো তাদের দু'জনের মধ্যে কার হিম্মৎ বুদ্ধি আর ফন্দি-ফিকির বেশী আকর্ষণীয়?'

সুলতান তন্দ্রাচ্ছন্ন থেকেই জবাব দিলেন—'হারাম। ওই চোর হারাম-এর বুদ্ধি আর কৌশলই বেশী আকর্ষণীয়। কারণ, সুলতানকে যে ফাঁকি দেবার হিম্মৎ রাখে তার হিম্মৎ তো সবার চেয়ে বেশী, মানতেই হবে।'

দোস্ত আকিল'কে নিয়ে তেমনি রশি বেয়ে হারাম প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল।

সুলতান কখন যে গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন তা নিজেই জানেন না। নিদ টুটল একদম ভোরে। দেখলেন তাঁর কিশোর নফরটি বারান্দার থাম্বার সঙ্গে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধা। তার মুখ-বাঁধা বড়সড় একটি রুমাল দিয়ে।

কিশোর নফরটি সুলতানের কাছে আগের রাত্রের ঘটনা সবিস্তারে ব্যক্ত করল।

সুলতান চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লেন—'একী তাজ্জব বাৎ শোনাচ্ছিস রে! আমি তো আরও ভাবলাম, তুই-ই পা টিপতে টিপতে আমাকে কিস্‌সা শোনাচ্ছিলি! আমাকে বিলকুল বেকুব বানিয়ে দিয়ে গেল।'

সুলতান দরবারে গিয়ে উজিরকে বল্‌লেন—'মহল্লায় মহল্লায় ঢেঁড়া পিটিয়ে দাও—হারাম নামধারী চোরটি আমার সঙ্গে ভেট করুক। তার কোন সাজা হবে না। নির্ভয়ে দরবারে এসে আমার সঙ্গে ভেট করতে পারে।'

সুলতানের কাছ থেকে অভয় পেয়ে হারাম দরবারে এসে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমিই সেই হারাম। আপনি যার তল্লাশ করছেন, আমি সে —হারাম।'

সুলতান হারাম-এর ফন্দি-ফিকিরের তারিফ ক'রে তাকে তাঁর সুলতানিয়তের কোতোয়ালের প্রধান রূপে নিযুক্ত করলেন।

হারাম আর আকিল তাদের বিবির কাছে হাজির হ'ল। উভয়ের মুখ থেকে তাদের হিম্মৎ, বুদ্ধি আর ফন্দি-ফিকিরের ব্যাপার স্যাপার শুনল। মুচকি হেসে আকিল'কে বল্‌ল—'তুমিই বল, তোমাদের মধ্যে কে বড়? সে বুদ্ধি কৌশল আর হিম্মতের বলে সুলতানের দিল্ কেড়ে নিতে পেরেছে। শুধু কি এ-ই? সুলতানের কাছ থেকে কোতোয়ালের প্রধানের পদও আদায় করেছে। তাই ওয়াদা অনুযায়ী হারাম-ই আমাকে লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আমি বিবি হয়ে তার কাছে থাকলেও তোমাকে আমার বুক থেকে মুছে ফেলতে পারব না। তুমি আমার দিলের গভীরে স্বামী হয়েই জিন্দা থাকবে।'

কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

একটু বাদে তিনি ফিন মুখ খুল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে 'লাল গন্ধকের কিস্‌সা' নামে একদম ভিন্ন স্বাদের একটি কিস্‌সা শোনাচ্ছি।

লাল গন্ধকের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক সময় মিশরের সুলতান ছিলেন মহম্মদ ইবন থাইলুন। তিনি যেমন একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তেমনি একজন সুদক্ষ শাসক হিসাবেও তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। লেকিন তাঁর আব্বা ছিলেন একদম আলাদা চরিত্রের। বিদ্যা শিক্ষার একদম বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর রাজত্বে প্রজারা করভারে জর্জরিত হ'ত। তার কবল থেকে প্রজাদের সঞ্চিত অর্থ রক্ষা করা ছিল সমস্যার ব্যাপার।

লেকিন মহম্মদ-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রজাদের সুযোগ-সুবিধা ও সুখ উৎপাদন করা।

মহম্মদ হরবখত ভেবে অস্থির হতেন, প্রজায় প্রজায় ধন-বৈষম্য কেন? কিছু সংখ্যক আদমি ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবে থাকবে আর বাকী প্রজারা দিনভর কঠোর মেহনৎ করেও রুটির জোগাড় করতে পারবে না। অসহ্য।

সুলতান মহম্মদ একদিন তাঁর দরবারের উজির নাজির ও আমীর ওমরাহদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠকে সামিল হলেন।

সুলতান উপস্থিত পারিষদদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'আমার দরবারে আপনারা ধনী, আমীর আদমিরা যেমন আছেন তেমনি দ্বাররক্ষী ও অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্মচারীরাও রয়েছেন। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চাই, আমার কর্মচারীরা যে, যেমন বেতন পায় তা দিয়ে তারা কিভাবে দিন গুজরান করছে। কাউকে যদি দরকারের চেয়ে বেশী বেতন দেয়া হয় তবে আমি তার বেতন কেটে ছেঁটে ঠিক ঠাক করে দেব। ফিন যারা বেতনের অর্থ দিয়ে তকলিফ ক'রে দিন কাটাচ্ছে তবে তাদের বেতন দরকার মাফিক বাড়িয়ে দেব।'

চল্লিশজন উজির প্রথমে সুলতানের তলব পেয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের পরনে সোনার জরি ব্যবহার করা সুলতান বাদশাহের মাফিক ঝলমলে পোশাক পরিচ্ছদ। দ্বিতীয় দফায় তাঁর সামনে এসে খাড়া হ'ল আলাদা আলাদা প্রদেশের সুবাদাররা। তারপর এলেন সেনাপতিরা। এবার এল কাজীরা। এবার সুলতানকে কুর্নিশ ক'রে সামনে খাড়া হ'ল প্রাসাদের দুই খোজা নোকর। তারা অলস প্রকৃতির হলেও চোখে মুখে দুঃখ দুর্দশা হতাশা সুস্পষ্ট ছাপ। তারা দরবারে যেন বিলকুল বে-মানান।

খোজা নোকর দু'জন সুলতানকে কুর্নিশ ক'রে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আপনি সুলতানিয়তের সর্বস্ব—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আপনার আব্বার সুলতানিয়তে আমরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করতাম। তাঁর ইন্তেকাল হওয়ার পরই আমাদের নসীব একদম মন্দ হয়ে গেল। লেকিন আমাদের তকলিফের ব্যাপার কার কাছেই বা তুলে ধরব? তবু আমরা খোদাতাল্লা-র কাছে আমাদের সুলতানের দীর্ঘায়ু কামনা করি।'

সুলতান মহম্মদ মর্মে মর্মে অনুভব করলেন, এ-খোঁজা নোকর দুটো বহুৎ তকলিফের মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করছে। তিনি তাদের আশা ভরসা দিলেন, তাঁর সুলতানিয়তের এ-বৈষম্য তার দিলে সাচমুচ দাগা দিয়েছে। এবার থেকে তিনি তাদের জন্য ফি সালে দু'শ দিনার ক'রে ইনামের বন্দোবস্ত করলেন।

সবাই দরবার-কক্ষ ছেড়ে যাবার সময় এক বুড্ডাকে একধারে খাড়া থাকতে দেখলেন। সুলতান তাকে তলব করলেন, কাছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

বুড্ডা দু'চার কদম এগিয়ে গিয়ে সুলতানকে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এ-বান্দা আপনার বিশেষ কোন পদে বহাল নেই। তবে জাঁহাপনার পিতার আমলে আমি তাঁর বিশেষ অনুগত এক নফর ছিলাম। তার একটি ছোট্ট ডিব্বা আমার কাছে জিম্মা ছিল। তিনি যখন জিন্দা ছিলেন তখন তিনি চাইলেই আমি ডিব্বাটি তাঁর হাতে তুলে দিতাম। দরকার চুকে গেলে তিনি ফিন সেটি আমারই জিম্মায় রেখে দিতেন। বহুৎ সাল আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ডিব্বাটি নিয়ে হাজির থাকতাম। অচানক একদিন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। ব্যস, সেই থেকে ডিব্বাটি আমার জিম্মাতেই রয়ে গেছে। এখন ডিব্বাটি নিয়ে মহামুসিবতে পড়ে গেছি। নেহাৎই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী। মুশকিল হচ্ছে, অন্য কারো জিম্মায় সে ডিব্বাটি রাখব সেরকম কোন হুকুম তো তিনি দিয়ে যান নি। আজ পর্যন্ত সেটি আমার জিম্মাতেই রয়েছে। আর তার মধ্যে যে কোন্ বস্তু আছে তা-ও আমার অজানা।

জাঁহাপনা, আমি আশী সাল উমর করলাম। কোনদিন কারো কাছে হাত পেতে কিছু চাই নি। চাওয়ার দরকারও হয় নি কোনদিন। তাঁর ইন্তেকাল ঘটলে আমার দিকে নজর দেয়ার মত আজ কেউ-ই নেই। আমি দীর্ঘ দিন আপনার নোকরী করেছি। আশা ছিল, জাঁহাপনার দোয়া থাকলে, এ-বান্দার দিকে নজর পড়লেই আপনি কাছে টেনে নেবেন।'

সুলতান মহম্মদ সবিস্ময়ে বল্‌লেন—'হুকুমৎ? তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটি কৌটোর জন্য হুকুমৎ। এরজন্য হুকুমতের কোন দরকার আছে ব'লে তো আমি অন্ততঃ মনে করি না। আর এমন কি অমূল্য সম্পদ এর মধ্যে রয়েছে যে যার জন্য মাসে মাসে কাড়ি কাড়ি দিনার ব্যয় ক'রে একজন কর্মচারী রাখা হয়েছে? কৌটোটির মধ্যে কি আছে বল তো?' বুড্ডা বলে —'আনজানেই আমি কৌটোটিকে বুকে আগলে আগলে রাখছি হুজুর।'

—'ঠিক আছে, নিয়ে এসো তো কৌটোটিকে। আমি একবারটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে দেখি ব্যাপার কি?'

বুড্ডাটি ব্যস্ত-পায়ে দরবার কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে ছোট্ট একটি সোনার কৌটো নিয়ে ফিরে এল। সুলতানের হুকুমে তাঁর সামনে কৌটোটি খুলে ধরলেন।

সুলতান মহম্মদ কৌটোটির দিকে নজর ফেরাতেই চোখে-মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। দেখলেন তার ভেতরে রয়েছে ছাগলের চামড়ার ছোট্ট একটি টুকরো আর এক টুকরো রাঙামাটি, ব্যস। ছাগলের চামড়াটির গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে অবোধ্য ভাষায় কি সব লেখা রয়েছে। সুলতান তা পাঠোদ্ধার করার কোশিস করলেন। পারলেন না। দরবারের পারিষদরাও পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে হতাশ হলেন।

সুলতানের হুকুমে পারস্য, মিশর, সিরিয়া এবং ভারতীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের তলব দেয়া হ'ল। তারাও এক এক ক'রে মুখ ব্যাজার করে বিদায় নিলেন।

সুলতানের হুকুমে দুনিয়ার সর্বত্র দুত পাঠিয়ে প্রচার ক'রে দেয়, কেউ লেখাটি পাঠ করতে পারলে তাকে প্রচুর ইনামে ভূষিত করা হবে। কেউ যদি লেখাটি পাঠোদ্ধার করতে পারে এমন ব্যক্তিকে তল্লাশ ক'রে দরবারে হাজির করতে পারে তবে তাকেও প্রচুর ইনাম বকশিস দেওয়া হবে।

এক সকালে দরবারে সাদা-পাগড়ীধারী এক বুড্ডা হাজির হ'ল। সুলতানকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি আপনার পিতার এক নফর ছিলাম। আমার পক্ষেই এ-কৌটোর চর্মপত্রের লেখার মর্ম ব্যাখ্যা করা সম্ভব। লেখাটি পাঠোদ্ধার করতে পারে একমাত্র অল আসারের লেড়কা শেখ হাসান আবদাল্লাহ।'

—'কোথায় সে? তার মুলুক কোথায়?' সুলতান বল্‌লেন।

—'কয়েদখানায়। আপনারই কয়েদখানায় জাঁহাপনা। চল্লিশ সাল আগে আপনার আব্বা তাকে কয়েদখানায় ভরে দিয়েছিলেন। এখনও সেখানেই সে ধুঁকছে।'

—'কয়েদখানায়? কেন? কয়েদখানায় পাঠিয়েছিলেন কেন?'

—'জাঁহাপনা, আপনার আব্বা জোরজুলুম করেও হাসান'কে দিয়ে ছাগলের চামড়ার গায়ে লেখা পাঠোদ্ধার করাতে পারেন নি। তারই বস্তু, সে নিজেই পাঠ করতে পারছে না, তাজ্জব বনে গেলেন তিনি। তারপর তার কাছ থেকে তিনি সেটি কেড়ে নিজের জিম্মায় রেখে দিলেন আর হাসানকে চালান ক'রে দিলেন কয়েদখানায়।

সুলতান মহম্মদ-এর হুকুমে হাসান'কে কয়েদখানা থেকে বের ক'রে দরবারে হাজির করা হ'ল। বুড্ডা। একদমই বুড্ডা। তার মুখে ও গায়ের এখানে ওখানে জুলুমের চিহ্নগুলি জ্বলজ্বল করছে।

সুলতান ঝট ক'রে মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বুড্ডা হাসানকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। কুরশি দেখিয়ে বসতে দিলেন। করজোড়ে বল্‌লেন—'শেখ সাহাব, আমার আব্বা যে আপনার মাফিক এক জ্ঞানী-গুণীর ওপর জুলুম চালিয়ে কসুর করেছিলেন তার জন্য আমি আপনার কাছে মাফি মাঙছি। আমি কারো দ্রব্যাদি জোর করে নিজের জিম্মায় রাখতে চাই না। যদি তা তামাম দুনিয়ার সম্পদও হয়, তবু না।'

বুড্ডা হাসান-এর দু'চোখ বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। সে হাত দুটো ওপরে উত্থিত ক'রে শ্লেষ্মা জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল—'খোদা মেহেরবান। তুমি যে আছ তার প্রমাণ আমি হাতেনাতেই পেয়ে গেলাম। আমি কয়েদখানার অন্ধকারে পড়ে হরবখত তোমার নাম স্মরণ করেছি। তোমারই মর্জিতে যে আমাকে কয়েদখানায় পাঠিয়েছিলেন এত দিন বাদে তাঁরই লেড়কা স্বেচ্ছায় আমাকে কয়েদখানা থেকে মুক্তি দিলেন।'

বুড্ডা হাসান এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা এতদিন ধরে কয়েদখানায় নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করেও আমি সে ব্যাপারে মুখে কলুপ এঁটে রেখেছি, আজ আমি হাসিমুখে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আমি খুশী হয়ে এ-চামড়ার লেখাটি পাঠ করে দিচ্ছি।'

একটু দম নিয়ে বুড্ডা হাসান এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, একদম সাচ্চা বাৎ, এ বস্তুটি সঙ্গে থাকায় আমি অবশ্য ইবন আদাত-এর নগর ছেড়ে চলে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। বিশোয়াস করুন, আজ অবধি সেখানে কোন আদমির পক্ষেই যাওয়া সম্ভব হয় নি।'

সুলতান মহম্মদ বুড্ডা'কে বল্‌লেন—'আপনি মেহেরবানি ক'রে ছাগলের চামড়াটির গায়ে লেখা পাঠোদ্ধার করে দিন। আর সাদ্দাত ইবন আদাত-এর আজব নগরটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।'

—'জাঁহাপনা, শুনুন তবে—আমার আব্বাজী কায়রো নগরের এক প্রতিষ্ঠিত বণিক ছিলেন। তাঁর কেবলমাত্র অঢেল ধন-দৌলত ছিল না, সবাই সম্মান-খাতিরও তাকে করত। আমি ছিলাম তার একমাত্র লেড়কা। আমার বিদ্যা-শিক্ষার জন্য নগরের সবচেয়ে নামজাদা মৌলভী ও পণ্ডিতদের ওপর দায়িত্ব দেন।

আমার উমর যখন প্রায় বিশসাল হ'ল তখনই আমি পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে আলোচনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালাম। বিশেষ ক'রে পুরনো পুঁথিপত্র ও শিলালিপি পাঠে আমার সমকক্ষ কেউ-ই তখন ছিলেন না।

এক খুবসুরৎ লেড়কির সঙ্গে আমার আব্বা আমার শাদী দিলেন। আমার বিবির উমর তখন সবে চৌদ্দ। সে বিদ্যাবুদ্ধিতে একদম চৌখোস ছিল। শাদীর পর দশ সাল আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম।

নসীব। হ্যাঁ। নসীবকে খণ্ডাবে কে? আব্বা বেহেস্তে চলে গেলেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

চারশ উননব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—' জাঁহাপনা, শেখ হাসান আবদাল্লাহ তার কিস্‌সা ব'লে চলেছেন—'হ্যাঁ, আমার আব্বাজীর ইন্তেকাল ঘটে গেল। কারবারে দ্রুত লোকসান হতে লাগল। মহাজনদের কাছে ঋণের বোঝা ক্রমেই ভারী হয়ে উঠতে লাগল। তার ওপর নসীব অন্য দিক থেকেও পুড়ল। আমার বিশালায়াতন অট্টালিকায় আগুন ধরে সব পুড়ে গেল। বিপদ নয়া পথ ধরে আমার

কাঁধে এসে চাপল। আমার তখনকার একমাত্র অবলম্বন জাহাজটিও ঝড়ের মুখে পড়ে ডুবে গিয়ে আমাকে একদম পথে বসিয়ে গেল। ব্যস, আমি একদম ভিখ মাঙ্গা হয়ে গেলাম। ঝোলা কাঁধে মুলুকে মুলুকে টুঁড়ে বেড়াতে লাগলাম। আল্লাহকে দিল্ থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। মসজিদের ফকির-সন্তরাই আমার একমাত্র সঙ্গী হয়ে দাঁড়ালেন।

নসীব ফেরাবার ধান্ধা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে হতাশ মনে নিজের মুলুক কায়রোতে ফিরে এলাম। আমার বুড্ডি আম্মা বিবি আর বালবাচ্চারা রুটি কাপড়ার জন্য যে তকলিফ ক'রে চলেছে তা দেখে আমার কলিজা ফেঁটে যাওয়ার জোগাড় হ'ল।

একদিন নসীব এমন করে বেগড়া দিল যে, বহু কোশিস-কসরৎ করেও রুটি-লবণের বন্দোবস্ত করতে পারলাম না। আমার বিবি চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে তার পরণের শেষ কাপড়ার টুকরাটি খুলে আমার হাতে দিয়ে বল্ল—'এ দিয়ে রুটি খরিদ ক'রে এনে বালবাচ্চাদের হাতে দাও, পেটের জ্বালা নেভাও।'

আমি কাপড়াটি নিয়ে বাজারে ঢোকার মুখেই এক বাদাবীর মুখোমুখি হলাম। খয়েরী এক উটের পিঠে সে জাঁকিয়ে বসে।

বাদাবী আমাকে দেখে অচানক সালাম ঠুকে এক লাফে উটের পিঠ থেকে নামল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—'জী, অল আসারের বেটা হাসান আবদাল্লার মকান কোন্ দিকে, মেহেরবানি করে দেখিয়ে দেবেন?'

আমি মুহূর্তে কুঁকড়ে গেলাম। হয় তো আমার আর্থিক অভাব অনটনের জন্যই হয়তো আমার মধ্যে আকস্মিক সঙ্কোচ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এমনও তো হতে পারে আল্লাতাল্লাই তাকে আমার সাহায্যার্থে পাঠিয়েছে। সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে উঠতে না পেরে ঝট ক'রে ব'লে উঠলাম—'কই, এমন কোন আদমি এ-নগরে আছে তো শুনিনি কোনদিন।' ব্যস, কথাটি তার উদ্দেশে ছুড়ে দিয়েই লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটা জুড়লাম। এমন সময় এক আজব ব্যাপার ঘটে গেল। বাদাবীটি একলাফে এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে করুণ সুরে বল্ল—'জী, মেহেরবানি করে সাচ্চা বাৎ বলুন তো, আপনিই শেখ হাসান আবদাল্লা নয় তো? আপনার আব্বাই তো অল আসার, সাচ্চা কি না?' আপনি আপন মর্জি মাফিক মেহমানকে এড়াতে চাইছেন। মেহমানের আদর আপ্যায়নের ব্যাপারে আপনি ভাবিত বলেই এ পথ বেছে নিয়েছেন, ঝুটা বলেছি?'

বাদাবীটির বাৎচিৎ শুনে আমি আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। আমি করজোড়ে বল্লাম—'আমি মাফি মাঙছি। মেহেরবানি ক'রে আমাকে দিল্ থেকে মুছে ফেলুন।'

—'কেন? দ্বিধা-সঙ্কোচেরই বা কি আছে? জিন্দেগীভর কি সবার একই রকম ভাবে যায়, বলুন? আমি আপনার আম্মার পেটের ভাইয়া হলে কি আমাকে দূর ক'রে দিতে পারতেন?'

অনন্যোপায় হয়ে তাকে নিজের মকানে নিয়ে এলাম। বিবিকে বল্লাম—'আল্লাই হয়ত মেহমানকে পাঠিয়েছেন। পথ পাড়ি দিতে দিতে আমি ভাবতে লাগলাম, এক কণা দানাও তো নেই যা দিয়ে মেহমানকে সামাল দেয়া যেতে পারে। মকানে গিয়ে বিবিকে বল্লাম মেহমানের ব্যাপারটি।

আমার বিবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—'মেহমান'কে তো আর উপোষ ক'রে থাকতে বলা যায় না। লেকিন কি দেব তার সামনে?' সে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্ল—'হাদিস তো বলেছেনই, এমন কি বালবাচ্চাদের খানাও মেহমানদের প্রাপ্য। যাও, বাজারে গিয়ে আমার কাপড়টি বেচে খানা খরিদ ক'রে নিয়ে এসো।'

লেকিন আমার কি এখন মকান ছাড়া ঠিক হবে? বাইরের কামরায় মেহমান বাদাবী যে রয়েছে। তার সামনে দিয়ে যেতে গেলে তো জানতে চাইবে, কোর্তার তলায় কি নিয়ে যাচ্ছি!'

বিবি তবু জোর ক'রে পাঠাল। যা আশঙ্কা করেছিলাম মেহমান বাদাবীটি বল্ল—'দেখি কোর্তার তলায় ক'রে কি নিয়ে চলেছ?'

উপায়ান্তর না দেখে বিবির কাপড়াটি তাকে দেখাতেই হ'ল। বিবির বড় শখের কাপড়া। উপায় তো নেই। তাই বাজারে নিয়ে চলেছি বেচে সওদা খরিদ করব।'

—'একী আজব ব্যভার তোমার! তুমি না আমাকে বড়া ভাইয়া মেনেছ?' জেব থেকে দশটি দিনার বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্ল—'যাও, এ দিয়ে সওদা নিয়ে এসো।

সে থেকে ফি রোজ বাদাবী আমাকে সওদা খরিদ করার জন্য দশটি ক'রে দিনার জোর ক'রে আমার হাতে গুঁজে দেয়, আমি সওদাপাতি খরিদ ক'রে নিয়ে আসি। তা দিয়ে খাবার খানাপিনা চলে।

এক-দুই-তিন ক'রে এভাবে পনেরটি দিন গুজরান হয়ে যায়। ষোল দিনের সকালে বাদাবীটি আমাকে অচানক ব'লে উঠল—'হাসান ভাইয়া, এক বাৎ তুমি কি নিজেকে বেচে দিতে চাও, বল তো?'

মস্করা ভেবে আমি মুচকি হেসে জবাব দিলাম—'ভাইসাব, আমি তো আমার মাথা আপনার কাছে বেশ ক'দিন আগেই বেচে দিয়েছি।'

—'সাচ্চা বলতো, কত দাম পেলে তুমি নিজেকে বেচবে?'

আমি তখনও মস্করা ভেবেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলাম—'একখণ্ড কোরাণ-শরিফ, আর নগদ এক হাজার দিনার, ব্যস।'

—'এক হাজার নয়, দেড় হাজার নগদ দিনার দেব, রাজী তো?' আমি তাজ্জব বনে গিয়ে বাদাবীটির মুখের দিকে তাকালাম। মালুম হ'ল সে তো মস্করা করছে না। সাচমুচ করাবারীর ঢঙে দর

কষাকষি শুরু করেছে। 'ইয়া আল্লাহ! আমি যে নিজের কাঠগড়ার নিজেই গলা বাড়িয়ে দিয়েছি। সখেদে স্বগতোক্তি করলাম। হাজার দিনার বুঝে পেলেই আমি তার কেনা গোলাম হয়ে যাব। সে দেড় হাজার হেঁকে ঔদার্য প্রদর্শন করেছে। পর মুহূর্তে ভাবলাম, প্রস্তাবটি তো মন্দ নয়। দিনারগুলো পেলে বিবি আর বালবাচ্চার জান তো টিকবে, নিজের জন্য ভাবনা আমার নেই। ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবার জন্যও যদি কেউ আমাকে খরিদ করতে চায়, কিছুমাত্রও আপত্তি নেই। তবে ব্যাপার হচ্ছে, আমি নিজেই তো আমার সব নই। আম্মা, বিবি আর বালবাচ্চার অনুমতিও তো নেয়া চাই। বাদাবীটির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌লাম—'ভাই সাহাব, বিবির সঙ্গে একটু আলোচনার দরকার আছে। তারও তো মত চাই।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তবে বিবির সঙ্গে পরামর্শ করেই নাও।' সে নিজের ধান্ধায় বেরিয়ে গেল।

বিলকুল ঘটনা শুনে আমার আম্মা আর বিবি তো কেঁদে আকুল হতে লাগল।

আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌লাম—'এবার যদি হতচ্ছাড়া বাদাবীটি এ ক'দিনের দিনারগুলো চেয়ে বসে, তবে?'

আমার আম্মা ও বিবি আমার মন্তব্য শুনে আতঙ্কিত হ'ল।

বাদাবীটি বিকালের দিকে ফিরে এল। আমি আগ বাড়িয়ে বললাম 'হ্যাঁ, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী।'

সে কোর্তার জেব থেকে দেড় হাজার দিনার বের ক'রে আমার দাম চুকিয়ে দিল। আমি দিনারের থলিটি নিয়ে আম্মা আর বিবির কাছে হাজির হলাম।

তারা তো গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। আমি তাদের বুঝাবার বহুৎ কোশিস করলাম। বাদাবীটি আমাকে নিজের ভাইয়ের মাফিক আপন করে বুকে রাখবে। লেকিন মিঠা বুলি দিয়ে তো আর আপনজনকে ভুলানো সম্ভব নয়।

আমার বিবি ডুকরে ডুকরে কেঁদে বল্‌ল—'ওই দিনারে গুণাহ জড়িয়ে আছে, আর তার গায়ে খুন মাখা আছে। আমি তা স্পর্শ করতে পারব না। খানাবিনা শুকিয়ে কুঁকড়ে জান দেব তবু ওগুলো আমি নিতে পারব না।'

উপায় নেই। আমার বাঞ্ছিত দামের চেয়ে বেশীই বাদাবীটির কাছ থেকে বুঝে পেয়ে আমি তো তার কেনা গোলাম বনে গেছি। অনন্যোপায় হয়ে আমাকে আমার মালিক বাদাবীটিকে অনুসরণ করতেই হ'ল।

আমি বাদাবীটির সঙ্গে এক নাগাড়ে দশদিন মরুভূমির দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম। এগার দিনের দিন আমরা মরুভূমি ডিঙিয়ে এক সবুজ প্রান্তরে হাজির হলাম। অদূরে এক অনুচ্চ পাহাড় নজরে পড়ল। অচানক মালুম হ'ল পাহাড় তো নয় যেন এক বিশালদেহী নওজোয়ান শীর্ষাসনরত। তার ডান-হাতে অতিকায় পাঁচটি চাবি। তার মধ্যে প্রথমটি সোনার তৈরী, দ্বিতীয়টি রূপার, তৃতীয়টি সীসার, চতুর্থটি লোহার আর পঞ্চমটি তামার। চাবিগুলোর সব ক'টি নসীবের প্রতীক। সোনার চাবিটি দুঃখ দুর্দশার প্রতীক, রূপারটি তকলিফের, সীসারটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, লোহারটি খ্যাতির আর তামারটি মৌউৎ-এর।

আদতে এসব ব্যাপার স্যাপার কিছুই আমার জানা ছিল না। তাই তো আমাকে দুঃখ দুর্দশার ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

পাহাড়ের পাদদেশে বাদাবীটি আমাকে নিয়ে হাজির হল। সে উটের পিঠ থেকে নামল। আমি নামার কোশিস করতেই সে আমাকে থামিয়ে দিল। সে একটি তীর-ধনুক নিয়ে পাহাড়ের ওপরের সে-নওজোয়ানের মূর্তিটি লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়ল। ব্যর্থ হ'ল। তীরটি পাশ দিয়ে চলে গেল।

বাদাবীটি এবার আমাকে উটের পিঠ থেকে নামতে বল্‌ল, আমি নামলে আমার হাতে তীর-ধনুকটি দিয়ে বল্‌ল—'আমি ব্যর্থ হয়েছি। এবার তুমি কোশিস ক'রে দেখ।' ব্যাস, মূর্তিটিকে তাক ক'রে প্রথম তীর দিয়েই সোনার চাবিটি নামিয়ে দিলাম। চাবিটি

বাদাবীটির দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে নিল না। আমার কাছেই রেখে দিতে বল্‌ল। আমি কি জানতাম ছাই ওই চাবিটিই আমাকে দুঃখ কষ্টের দরিয়ায় ফেলে হাবুডুবু খাওয়াবে। জানা তো সম্ভবও নয়।

দ্বিতীয়বার তীর ছুঁড়ে রূপার চাবিটিকে নামিয়ে আনলাম। আজব ব্যাপার, বাদাবী সেটিও আমার কাছে রেখে দিতে বল্‌ল, আমি কি জানতাম, এ চাবিটি আমাকে অথৈ তকলিফের দরিয়ায় ফেলে নাস্তানাবুদ করবে?

এবার পর পর দু'বার তীর নিক্ষেপ করে সীসা আর লোহার চাবিটি নামিয়ে ফেল্‌লাম। এর প্রথমটি সমৃদ্ধি অর্থাৎ আর্থিক সুযোগ সুবিধার আর দ্বিতীয়টি খ্যাতির। চাবি দুটি আমি হাতে তুলে নিতেই বাদাবীটি চিলের মাফিক ছোঁ মেরে দুটো ছিনিয়ে নিল। তখনও আর একটি চাবি মূর্তিটির হাতে রয়েছে। আমি কোমর থেকে সোনা আর রূপার চাবি দুটো কোর্তার জেব থেকে বের করে বাদাবীটির দিকে এগিয়ে দিলাম। সে হেসে বল্‌ল—'এ দুটো তোমাকে দিলাম। জেবেই রেখে দাও। আজ থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি আর আমার কেনা গোলাম রইলে না। আর আমিও তোমার মালিক নয়।'

আমি অবশিষ্ট চাবিটি পেড়ে আনার উদ্দেশ্যে ধনুকে তীর সংযোজন করলাম। বাদাবীটি বাধা দিয়ে বল্‌ল—'দুঃখ-দুর্দশাতো জেবেই রাখলে। ফিন ওই চাবিটি কেন নামাতে যাচ্ছ?'

তার বাৎ শুনে আমি একদম ভড়কে গেলাম। নিজেকে সামাল দিতে পারলাম না। অচানক তীর সমেত ধনুকটি নিচের দিকে নেমে গেল। এক লহমার মধ্যেই ব্যাপারটি ঘটে গেল। তীরটি হাত থেকে ফসকে আমার একটি পায়ের পাতায় গেঁথে গেল। ব্যস, আমার দুঃখ-দুর্দশার সূত্রপাত হয়ে গেল।

বহুৎ কায়দা কসরৎ করে তীরটি তুলে ফেল্‌লাম। খুনে একদম মাখামাখি। ফিন পথ চলা শুরু হ'ল। এক নাগাড়ে তিনদিন তিনরাত্রি মরুভূমির ওপর দিয়ে পথ চলতে লাগলাম। পায়ের যন্ত্রণা আমাকে কাহিল ক'রে ফেল্‌ল। বাদাবী আমাকে বুঝাল—'জিন্দেগীতে দুঃখ-তকলিফ থাকবেই, মোকাবেলা করার জন্য দিল্‌কে শক্ত ক'রে বাঁধতে হবে।'

আমিও যে বুঝি না তা-তো নয়। লেকিন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-তকলিফ আর কত সহ্য করা যায়?

পেটে তখন আগুন জ্বলছে। প্রায় তিনদিন পেটে দানা পানি পড়েনি। বাদাবী বল্‌ল—'ভাইয়া, আর একটু তকলিফ ক'রে এগিয়ে চল। সামনে একটি নদী আছে। তারই গায়ে একটি বাগিচা আছে। সেখানে তল্লাশ করলে ফলটল কিছু পেয়ে যাব।'

বাগিচায় ঢুকে কেমন যেন মিইয়ে গেলাম। অজানা-অচেনা গাছে খুবসুরৎ ইয়া পেল্লাই লাল লাল ফল ঝুলছে। ভাবলাম, বিষাক্ত ফল নয় তো? পেটের জ্বালা বাছবিচারের সুযোগ দিল না। একটি ফল ছিঁড়ে কামড়ে কিছু অংশ মুখে পুরতেই গোঙাতে লেগে গেলাম। মালুম হ'ল দু'চোয়ালে পেরেক গেঁথে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা। মিট্টিতে পড়ে গোঙাতে গোঙাতে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম। বাদাবীটি দৌড়ে এসে মুখে তর্জনি ঢুকিয়ে কোনরকমে ফলের টুকরোটি বের ক'রে আনল। স্বস্তি পেলাম।

বাদাবী একটি ফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে বুঝল তার গায়ে অসংখ্য লালচে শুঁয়ো পোকা জড়িয়ে রয়েছে। খিদের জ্বালায় আমার সে সব বিচার করার অবসর ছিল না বলেই প্রমাদ ঘটে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মুখ ফুলে হাড়ি হয়ে গেল। সে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা তো রয়েছেই। পাক্কা তিন দিন ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করলাম। সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। বাদাবী কিন্তু আমাকে ফেলে সটকে পড়ল না।

তিনদিন বাদে একটু সুস্থবোধ করলে বাদাবী ফিন আমাকে নিয়ে উটের পিঠে উঠল। আমরা এগিয়ে চল্‌লাম।

সামান্য এগোতেই পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলাম। বাদাবী বল্‌ল—'খোদাতাল্লা-র ওপর ভরসা রাখ, তাঁকে ডাক, যন্ত্রণার উপশম হয়ে যাবে।'

আমরা এগিয়ে চল্‌লাম। গভীর জঙ্গল। বাদাবী কন্দ ধরনের এক বস্তু নিয়ে এল। ভেতরটি বেশ নরম, মিঠা, উভয়ে পেটপুরে খেলাম। রাতভর গভীর নিদে ডুবে রইলাম। ভোরে বাদাবী বল্‌ল—'এক কাজ করতে হবে। ওই পাহাড়টির চূড়ায় উঠে যাও। সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করবে। কসরৎ ক'রে পাহাড়ে ওঠার ক্লান্তিতে চোখে নিদ জড়িয়ে আসতে পারে। খবরদার নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ো না যেন। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে নামাজ পড়ে তবে নেমে আসবে।'

বহুৎ কায়দা কসরৎ ক'রে পাহাড়টির চূড়ায় উঠে গেলাম। পাহাড়টির উপরিভাগ ন্যাড়া। দাঁড়িয়ে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। ফলে বসে পড়তেই হ'ল, তাতেও অসুবিধা বোধ করতে লাগলাম। শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তি ও অবসাদের জন্য চোখে নিদ জড়িয়ে আসতে লাগল। কখন যে গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম মালুমই হ'ল না। সূর্যরশ্মি চোখে লাগায় নিদ টুটল। খাড়া হবার কোশিস করলাম। তাজ্জব বনে গেলাম। মালুম হতে লাগল, কে যেন বল-পূর্বক আমার পা-দুটোকে পাহাড়টির সঙ্গে আটকে দিয়েছে। আর আমার পা-দুটো ফুলে-ফেঁপে একদম ঢোল হয়ে গেছে। পেটের হালৎ-ও একই রকম। তবু আমি সাহস ক'রে উঠে বসলাম। কোনরকমে ভোরের নামাজ সারলাম।

নামাজ শেষ হতেই মুসিবৎ নতুন পথ ধরে হাজির হ'ল। এক লহমার মধ্যেই আশমান কালো হয়ে এল। হতাশ হয়ে নিচে নামার কোশিস করতে লাগলাম। পা ও পেটের যা হালৎ তা নিয়ে পাহাড় বেয়ে নামা সম্ভব হ'ল না। তার ওপর ঝড়ের দাপট তো রয়েছেই। এক সময় হাত ফসকে গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে এলাম। কিভাবে যে সেদিন আমার জান রক্ষা পেয়েছিল তা একমাত্র বাদাবীই বলতে
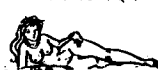
পারবে। ক'দিন সেখানেই থাকতে হ'ল। বাদাবীর আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে কোনরকমে একটু সুস্থ হয়ে উঠলাম। বরাতের জোর না থাকলে পাহাড়ের ওপর থেকে ওভাবে পড়ার পর কারো জান রক্ষা পায়।

এক ভোরে বাদাবী আমাকে বল্‌ল—'নিজের দিল্‌কে শক্ত কর। কলিজায় সাহস সঞ্চয় কর। এবার আমাদের এক নতুন পথে পা-বাড়াতে হবে। আল্লাহ-র ওপর ভরসা রাখ। আমি তাঁরই সন্ধানে একের পর এক সাল ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি। এবার বোধ হয় তিনি মুখ তুলে তাকাবেন।'

বাদাবী কোমর থেকে তরবারিটি খুলে এনে আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এক কাজ কর, এখানে গর্ত খুঁড়তে লেগে যাও। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত গুপ্তধন এখানেই মিলবে।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

সাতশ' একানব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, শেখ হোসেন আবদাল্লা তার কিস্‌সা ব'লে চলেছে—বাদাবী আমার ওপর জুলুম চালাতে লাগল গর্ত খোঁড়ার জন্য। আমার পিঠ চাপড়ে বল্‌ল—ভাইয়া, গুপ্তধনের সন্ধান মিল্‌লে বেহেস্তও তুচ্ছ মালুম হবে। নাও কাজে লেগে যাও।'

আমার তখন শরীর এমন বেগড়া দিচ্ছে যে, গর্ত খোঁড়া তো দূরের ব্যাপার সোজা হয়ে খাড়া হতেই পারছিলাম না। বাদাবী জেব থেকে একটি সুঁচ বের করে আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফুটিয়ে ফুটিয়ে বিষাক্ত পানি জাতীয় পদার্থ বের ক'রে দিল। কিছুটা অন্ততঃ স্বস্তি বোধ করলাম।

এবার বাদাবীর নির্দেশিত স্থানটিতে গর্ত খুঁড়তে মেতে গেলাম। কিছুটা খুঁড়তে চোখের সামনে পাথরের একটি গম্বুজের শীর্ষদেশ ভেসে উঠল। পাশের মাটি সরাতেই মালুম হ'ল সেটি একটি ঢাকনা। বিশাল একটি লম্বাটে চোঙের মাফিক বস্তুর ঢাকনা। ঢাকনাটি খেলার জন্য সবটুকু তাগদ নিঙড়ে উভয়ে টানাটানি শুরু ক'রে দিলাম। বহুৎ কায়দা কসরৎ ক'রে ঢাকনাটি খোলা গেল। আমরা একদম তাজ্জব বনে গেলাম। ঢাকনাটির তলায় দেখলাম, ছোটা বড়া আদমির কঙ্কাল তাতে পাঁজামারা রয়েছে আর ছাগচর্মে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি, এখন আপনার হাতে যেটি রয়েছে।

বাদাবী আমার হাত থেকে পাণ্ডুলিপিটি ছিনিয়ে নিয়ে পাঠোদ্ধার করার কোশিস করতে লাগল। পারল না। তার মধ্যে ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। এক সময় সে উন্মাদের মাফিক চিল্লিয়ে উঠল—'হাসান, মিল গিয়া—পেয়ে গেছি! আর চিন্তা নাই। গুপ্তধনের সঠিক পথের হদিস পেয়ে গেছি! মিনার পুরীতে পৌঁছোতে পারলেই আমার বহুদিনের সাধ পূরণ হবে। লাল গন্ধকের ডিব্বাটি অনায়াসেই আমি উদ্ধার করে আনতে পারব।'

আমি ভ্রূকুঁচকে ব'লে উঠলাম—'গন্ধকের ডিব্বা? কি হবে গন্ধকের ডিব্বা দিয়ে?'

—'পাগল কাঁহিকার!' আমার পিঠ চাপড়ে বাদাবী বল্‌ল—'তুমি একদম বেকুব দেখছি! কিছু জান না। আরে তামাম দুনিয়ার ধন দৌলত হাতানোর বীজমন্ত্র ওই ডিব্বাটির মধ্যে মিলবে।'

আমি মুখ ব্যাজার ক'রে বল্‌লাম—'বহুৎ হয়েছে, তামাম দুনিয়ার ধন দৌলতের প্রতি আমার কোনই মোহ নেই। আমি এখন জান নিয়ে আম্মা, বিবি আর বালবাচ্চাদের কাছে ফিরে যেতে পারলেই খুশী হই, বর্তে যাই। আদতে আমার বরাতে ওসব সইবে না। আর এক ব্যাপার জরুর লক্ষ্য করেছেন, আমাদের উভয়ের বরাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলে চলেছে? তাই আমি নিশ্চিত, যে সব ধন দৌলতের লোভ দেখাচ্ছেন তার ভোগ আমার নসীবে নেই।'

বাদাবী আমার বক্তব্য শুনে আর সময় নষ্ট করতে রাজী নয়। তরবারিটি হাতে নিয়ে জঙ্গল থেকে ওই সাদা-মিঠা কন্দজাতীয় খানা এক গাট্টি নিয়ে এল। চাপিয়ে দিল উটের পিঠে। আমরা পাহাড়ের গা-বেয়ে পশ্চিম দিকে এগোতে লাগলাম। একটি নদীর তীরে হাজির হলাম। পানির বদলে গলিত পারদের স্রোত নদীটি দিয়ে বইছে। একটি সেতু রয়েছে পারাপার করার জন্য। সেতুটি একদম পিছনে।

বাদাবী দু'জোড়া পশমের মোজা বের করে এক জোড়া আমাকে দিল আর অন্য জোড়া নিজে পরতে লাগল।

আমরা পশমের মোজা পায়ে দিয়ে সেতুটির ওপর দিয়ে নদীটির ওপারে গেলাম।

আমরা এগিয়ে চল্‌লাম। এক সময় হাজির হলাম কৃষ্ণ উপত্যকায়। দুর্গম পথ। দু'পাশে খাড়া পাহাড়, মাঝখান দিয়ে সরু-পথ, পাহাড়ের গায়ে, পথের দু'ধারে দেবদারু ও পাইন বন। অতিকায় সব পাহাড়ী সাপ গাছে গাছে ঝুলছে। বিশাল হাঁ। মানুষ তো কোন্ ছার। হাতী ঢুকে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। গাছে গাছে ঝুলন্ত সাপগুলি দেখেই আমার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। পথের ওপর বসে গলা ছেড়ে কাঁদতে লেগে গেলাম। খোদাতাল্লা-র নাম ধরে বহুৎ ডাকাডাকি করলাম। এক সময় বাদাবীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউমাউ ক'রে কেঁদে বল্‌লাম—'আপনার দোয়ায় আমার বিবি-বাচ্চার জান রক্ষা পেয়েছে। লেকিন এখন একী বিপদের মুখে আমাকে এনে

ফেল্‌লেন? এর বদলে তরবারি দিয়ে আমার গর্দানটি নামিয়ে দিলেও আমার হিত সাধন করা হ'ত। কী যে দুর্মতি আমার হয়েছিল যার জন্য আপনার সাহায্য নিতে গিয়েছিলাম। এর চেয়ে বালবাচ্চা নিয়ে উপোষ ক'রে জান খতম ক'রে দেয়া হাজার গুণ শ্রেয় ছিল।'

আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বাদাবী নানাভাবে আমাকে প্রবোধ দিতে লাগল। সে বল্‌ল—'কাজ চুকিয়ে আমরা কায়রো যাবই, দেখে নিও। যার জন্য আমরা জানের মায়া ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছি তা হস্তগত করতে পারলে তামাম দুনিয়ার ধন দৌলত আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। মুলুকে ফিরে গেলে অভাব অনটন বলতে কিছুই আমাদের থাকবে না।

আমি বিলকুল তাজ্জব বনে গেলাম। সে নিঃশঙ্কচিত্তে ছাগচর্মের পাণ্ডুলিপিটি চোখের সামনে ধরে বসে পড়ল। তার কলিজার জোর দেখে আমি বিলকুল স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটু বাদে আমাকে বল্‌ল—'হাসান, এ-জায়গা ছেড়ে আমরা এক্ষুণি চলে যেতে পারি। লেকিন তার আগে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।' তীর-ধনুক আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—'ওই যে সাপগুলো দেখতে পাবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়া একটি সাপ নজরে পড়বে। কালো ফণাধারী এগিয়ে গেলেই নজরে পড়বে, বেশী তাল্লাশ করতে হবে না। তাকে তীর-বিদ্ধ ক'রে খতম করতে হবে। তারপর তার কলিজা আর শির কেটে আমার হাতে তুলে দেবে। ব্যস, তোমার দায়িত্ব খতম।'

বাদাবীর মুখে কালো ফণাধারীর শির আর কলিজার আব্দার শুনে আমার নিজের কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। আমি চমকে উঠে বল্‌লাম—'আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি তো বলেই খালাস। এত সহজ ব্যাপার হলে আপনি নিজে না গিয়ে আমাকে কেন ঠেলে দিচ্ছেন মোউতের মুখে। আপনি নিজে যান, আমি পারব না।'

আমি তার দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করায় সে বাজখাই গলায় চিল্লিয়ে উঠল—'পারবে। জরুর পারবে। পারতে তোমাকে হবেই। ইয়াদ রেখো, এরই জন্য তোমার বিবি আর বালবাচ্চার মুখে দানাপানি উঠছে।'

তার বাৎ শুনে আমি একদম মিইয়ে গেলাম। যা বাস্তব সত্য তাকে তো আর অস্বীকার করা যাবে না। বিবেকের তাড়নায় কোমরে চাকু আর হাতে তীর-ধনুক নিয়ে আল্লাহ-র নাম নিয়ে কালো ফণাধারীর তাল্লাশে এগিয়ে গেলাম। চূড়ান্ত কায়দা-কসরৎ ক'রে ইয়া পেল্লাই, একদম ড্রাগনের মাফিক ভয়ঙ্কর সাপটিকে খতম ক'রে তার কলিজা আর শির এনে আমার মালিক বাদাবীর হাতে তুলে দিলাম।

বাঞ্ছিত সম্পদ বুঝে পেয়ে বাদাবী আমাকে বহুভাবে তারিফ করল। তারপর আগুন জ্বালাতে হুকুম করল।

মালিকের হুকুম, তামিল করতেই হবে। শুকনো লতা-পাতা জোগাড় করে আগুন জ্বালালাম। সে ঝোলা থেকে একটি ছোট্ট পাত্র বের ক'রে বল্‌ল—'এর মধ্যে কি আছে জান হাসান? আমি মুখ ব্যাজার করে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সে নিজেই জবাব দিল—এর মধ্যে ফিনিক্স পাখীর খুন রাখা আছে।'

এবার সে থলে থেকে একটি ছোট কড়াই বের ক'রে আগুনের ওপর চাপাল। এবার সে খুনটুকু গরম কড়াইয়ে ঢেলে দিল। একটুবাদে সাপটির শির আর কলিজাটিও কড়াইয়ে ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ বাদে আগুন থেকে কড়াইটি নামিয়ে নিয়ে বাদাবীটি বল্‌ল—'হাসান, এক কাম কর, কড়াইয়ের পাচনটুকু আমার গর্দানে আচ্ছা ক'রে মালিশ ক'রে দাও। ডর কি, দাও, মালিশ কর।'

আমি কড়াই থেকে বার বার পাচন তুলে নিয়ে তার গর্দানে মালিশ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ মালিশ করার পর এক আজব ব্যাপার মালুম হ'ল। তার গর্দানটি যেন একদম তুলার মাফিক নরম হয়ে গেছে। আরও তাজ্জব বনে গেলাম, যখন দেখলাম তার দু'দিকে দুটো ডানা বেরিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে ডানা দুটো প্রমাণ মাপের হয়ে গেল।

বাদাবী ডানা দুটো মেলে দিল। আমি খপ্ ক'রে ওর কোর্তাটি চেপে ধরলাম। হ্যাঁ, আমার ধারণাই সাচ্চা। সে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আশমানের দিকে উড়তে লাগল। আমি তার কোর্তা শক্ত

ক'রে ধরে ঝুলে রইলাম।

একটু বাদে সে একটি পাহাড়ের ওপর নামল। তার ডানা দুটো বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল। সেখানে অগণিত মিনার।

বাদাবী বল্‌ল—'হাসান, আমরা এখন মিনারের মুলক, সাদ্দাতের নগরে দাঁড়িয়ে। চল ভেতরে যাওয়া যাক। আমরা পর পর সাতটি দরওয়াজা ডিঙিয়ে নগরের ভেতরে ঢুকে গেলাম।

খুবসুরৎ এক বাগিচা। তার কেন্দ্রস্থলে একটি প্রাসাদ। আমরা প্রাসাদে ঢুকে গেলাম। একের পর এক কামরা ডিঙিয়ে আমরা একটি বিশালায়তন কামরায় হাজির হলাম। কামরাটিকে একটি দরবার ব'লে মালুম হ'ল। তাতে একটি তখ্‌ত রয়েছে নজরে পড়ল। তখ্‌তটিকে ঘিরে রয়েছে কিছু কুরশি। আজব ব্যাপার, ইয়া পেল্লাই প্রাসাদ। লেকিন কোন আদমিই নজরে পড়ল না। সুলতান বাদশাহ আর আমীর ওমরাহ তো দুরের ব্যাপার কোন নফর-নোকর পর্যন্ত নজরে পড়ল না। তখ্‌তটির দিকে দু'কদম এগিয়ে যেতেই এখন আপনার হাতে যে ছোট্ট সোনার ডিব্বাটি দেখা যাচ্ছে সেটিকে তখ্‌তের ওপরে দেখতে পাওয়া গেল। বাদাবী ডিব্বাটি খুলে ফেল্‌ল। তার ভেতরে সামান্য লাল রঙের গুঁড়া ছিল যা এখনও রয়েছে।

হাসান গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠল 'ইয়া আল্লাহ! হাসান, এই দেখ, লাল রঙের যে গন্ধকের ব্যাপারে তোমাকে বলেছিলাম, এতে রয়েছে।'

আমি ততক্ষণে উপুড় হয়ে কুড়িয়ে কোর্তার পকেট বোঝাই ক'রে হীরা জহরৎ নেয়ার কোশিস ক'রে বল্‌লাম—'ধ্যুৎ, লাল রঙের গন্ধক ফেলে দিয়ে হীরা জহরৎ পুটুলি বেঁধে নিয়ে চলুন। আখেরে কাজ দেবে।'

বাদাবী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব'লে উঠল—'এখান থেকে হীরা-জহরৎ বয়ে নিয়ে গিয়ে ঝুটমুট মেহনৎ করতে যাব কেন? একবিন্দু লাল রঙের গন্ধক দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি হীরা-জহরৎ বানানো যাবে। খবরদার এখানকার হীরা জহরৎ নেবার কোশিস কোরো না। জান খতম হয়ে যাবে।'

সে লম্বা-লম্বা পায়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। আমিও ব্যস্ত হয়ে তাকে অনুসরণ করলাম।

আমরা সে পারদ নদীর ধারে এলাম। সেতুটি পার হলাম। আমাদের উট দুটো যথাস্থানেই বাঁধা দেখলাম। উটের পিঠে চেপে বাদাবী বল্‌ল—এবার আমাদের গন্তব্যস্থল সোজা মিশর।

আমার কোর্তার জেবে তখনও সোনা আর রূপার চাবি দুটো ঠুং ঠাং আওয়াজ ক'রে চলেছে। এরাই আমাকে বার বার দুর্বিপাকে ফেলছে। বহুৎ আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে বহুৎ বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে একদিন আমার নিজের মুলুক কায়রো নগরে হাজির হতে পারলাম। আল্লাহ-র দোয়াতেই এমন একটি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারা গেল।

বহুৎ দিন যাবৎ বিবি-আর বালবাচ্চার জন্য আমার কলিজা ছটফট করছিল। আল্লাহ-র দোয়ায় এবার তাদের মুখ দেখতে পাব ভরসা নিয়ে আমার মকানে ঢুকলাম। ফটক পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করতে লাগল। মকানে কোন আদমির চিহ্নমাত্রও নেই। ভেদ-বমি বিমারীতে সবাই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আমি শিরে হাত দিয়ে বসে চোখের পানি ঝরাতে লাগলাম।

বাদাবী আমার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বল্‌ল—'ওঠ। চোখের পানি ঝরিয়ে ফয়দা তো কিছুই হবার নয়। যারা চলে গেছে তাদের তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। আজ না হোক কাল ইন্তেকাল সবারই হবে। চোখের পানি মোছ।'

আমি ফিন বাদাবীর পিছু নিলাম।

নীল নদীর ধারে একটি বিশালায়তন ইমারত খরিদ করা হ'ল। আমরা সেখানে বাস করতে লাগলাম। আমি যাতে শোক-তাপ ভুলে যেতে পারি সে জন্য বাদাবী তার বিলকুল সম্পত্তির আধা আমাকে লিখে পড়ে দিল। আর গন্ধকের গুঁড়া ব্যবহার ক'রে কিভাবে সীসাকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায় তা-ও আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিল। ফি রোজ বেশ কয়েক মণ সীসাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে লাগল। সব একা ভোগ করত না, আধা-আধি ভাগ করে আমাকে দিত। ধনদৌলত কিন্তু আমার মধ্য থেকে বিবি-বালবাচ্চার শোক মুছে দিতে পারল না।

বাদাবী কাড়ি কাড়ি সোনা পেয়ে ভোগ-বিলাসে মেতে উঠল। সন্ধ্যার আন্ধার নেমে আসতেই ইয়ার-দোস্তদের ভিড় জমে যেত তার মকানে। আসত মুলুকের সেরা নাচনেওয়ালী। বাদশাহী খানা আর দামী সরাবের জোয়ার বইত। রাতভর চলত নাচা-গানা। আমীর-ওমরাহরাও তার মকানে মজা লুটতে হাজির হতে লাগল।

আমি পেঁচার মাফিক আন্ধারকেই সম্বল ক'রে দিন গুজরান করতে লাগলাম। আদতে শোক জ্বালা আমাকে বিলকুল পাথর বানিয়ে দিয়েছিল। তাই মাইফেলের হৈহট্টগোল আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না।

এক সন্ধ্যায় বাদাবী এক খুবসুরৎ লেড়কিকে নিয়ে আমার কামরায় এল। একদম বেহেস্তের হুরী। সে আমার গা ঘেঁষে বসে লেড়কিটিকে নিজের উরুর ওপর বসাল। আমার কাঁধে হাত রেখে বল্‌ল—'আজ আমিই তোমাকে গানা শোনাচ্ছি হাসান। তোমাকেও আমি খুশীর জোয়ারে ভাসাতে চাই।' সাচমুচ সে গানা ধরল।

গানা খতম ক'রে বুড্ডা বাদাবী আজব এক কাণ্ড ক'রে বসল। লেড়কিটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার পালঙ্কে ধপাস্‌ ক'রে

পড়ে গেল। আমি ভাবলাম, চোখে নিদ জড়িয়ে আসছে। নিদ যাওয়ার ধাপ্পা করছে।

এক লহমার মধ্যেই লেড়কিটি ঝট্ ক'রে উঠে বসে পড়ল। তার চোখে-মুখে গভীর আতঙ্কের ছাপ। ভয় ডরে একদম জুজু বনে গেছে।

আমি তার আকস্মিক ব্যভারে চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—কি গো, তুমি উঠে পড়লে যে? তোমাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি?'

লেড়কিটি আমাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল। বাদাবী, আমার সুঃখদুঃখের ভাগীদার বাদাবী, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। আমার ব্যস্ত হাতটি তার গায়ে রাখলাম। সাচ্চা বটে, বাদাবী চিরবিদায় নিয়েছে। আতর পানি দিয়ে তার নিঃসার দেহটিকে ধুইয়ে দিলাম। আমীর-ওমরাহ ও ইয়ার-দোস্তদের উপস্থিতিতে তাকে গোর দেয়া হ'ল। মালা ফুলে তার কবর ঢেকে দিলাম।

দীন-দুঃখীকে দু'হাত ভরে দান-ধ্যান করলাম। ধনী-দরিদ্র বাছবিচার না ক'রে ক'দিন ভরে পেটপুরে খাওয়ালাম। মালিকের প্রতি শেষ কর্তব্যের কিছুমাত্রও ঘাটতি রাখলাম না।

আমার মালিক দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে পাড়ি জমিয়েছে। এখন তার আর আমার উভয়ের ধন দৌলতের মালিক হলাম আমি, একমাত্র আমি।

তখন আপনার হাতের লাল গন্ধকের ডিব্বাটি প্রায় খালি হয়ে গেছে। সামান্য গুঁড়াই তার ভিতরে ছিল। এখনও তা-ই আছে। আমি একদমই খরচ করিনি। আদতে আমার দরকারই পড়ে নি। আমার অর্থের দরকার পড়েনি বলেই ওতে আর হাত দেইনি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমার লোভও ছিল না।

সুলতান সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

হাসান ব'লে চল্‌ল—'জাঁহাপনা, ডিব্বাটির মধ্যে এখনও যে লাল গন্ধকের গুঁড়াটুকু রয়েছে তার দাম আপনার ধনাগারের ধন-দৌলত তো সাধারণ ব্যাপার তামাম সুলতানিয়তের ঐশ্বর্যের চেয়ে বেশী।'

সুলতান বল্‌লেন—'ছাগলের চামড়ার গায়ে যে সব লেখা দেখা যাচ্ছে তার ব্যাপার কি?'

—'হ্যাঁ, আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমার কাছে যে সোনা ও রূপার চাবি দুটো রয়েছে তা-ই আমার যত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। হ্যাঁ, যা বলা হয় নি, বাদাবী-ই আমাকে ওই লেখা পাঠ করতে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, ঠিক তখনই আমি অভিশপ্ত চাবি দুটোকে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম. চাবিদুটো আগুনে পুড়ে যখন গলার জোগাড় হচ্ছে তখনই সুলতানের পেয়াদা এসে আমাকে বন্দী ক'রে দরবারে নিয়ে গেল। আপনার আব্বা সুলতান থাইলুন-এর ব্যাপার বলেছি।

পেয়াদারা আমাকে সুলতান থাইলুন-এর সামনে হাজির করতেই সুলতান গর্জে উঠলেন—'তুমি আমার সুলতানিয়তে নকল সোনা বানাবার কারবার চালাচ্ছ, আমার কাছে খবর আছে। সোনা বানাবার কায়দা কানুন আমাকে দেখাও নইলে কঠোর সাজা তোমার কপালে রয়েছে।'

আমি রাজী হলাম না।

ব্যস, আমার ওপর চাবুক পড়তে লাগল। তবু আমি সোনা বানাবার কৌশলের ব্যাপারে কিছু বল্‌লাম না। ফিন সপাং সপাং চাবুক পড়তে লাগল। আমি মুখে কলুপ এঁটেই রইলাম। সুলতানের হুকুমে আমার হাতে-পায়ে গহনা পরিয়ে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিল। আমার কৌটোটি তাঁর জিম্মাতেই রয়ে গেল। আর ক্রোধোন্মত্ত সুলতানের হুকুমে আমার প্রাসাদোপম ইমারতটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হ'ল।

কয়েদখানায়ও আমার ওপর নিয়ম ক'রে ফি রোজ চাবুক চলতে লাগল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন। দিনের পর দিন নির্যাতন চলতে থাকলে আজ না হোক কাল আমি সোনা বানাবার গোপন কৌশল ফাঁস করবই। লেকিন জিন্দেগীভর আমার ওপর চাবুক চালিয়েও তাঁর কোশিস সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয় নি। আমাকে শক্ত থাকতে সাহায্য করেছিল আমার জেদ। তার কাছে নিজেকে

বিকিয়ে না দেয়ার জেদ।'

সুলতান বল্‌লেন—'আজ? আজ তুমি কোন্ পথ বেছে নিতে চাইছ?'

আজ আমি আর সে-হাসান নেই। চল্লিশ সাল কয়েদ খেটে একদম বদলে গেছি। আগেকার সে হাসান-এর ইন্তেকাল ঘটে গেছে। আজ তার ভেতরে অন্য এক হাসান পয়দা হয়েছে।

জাঁহাপনা আজ আমার একমাত্র সম্বল আল্লাহ। তাঁর নাম গানের মাধ্যমে জিন্দেগীর বাকী দিনগুলো গুজরান ক'রে দিতে চাই। আপনি তামাম সুলতানিয়তের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনার ধন-দৌলতের দরকার রয়েছে। আপনাকে তো ডিব্বার লাল গন্ধক ব্যবহার ক'রে সোনা বানাবার কায়দা-কৌশল শিখিয়েই দিয়েছি যত খুশী সোনা বানান, আমি দেখতে যাব না। আপনি ডিব্বাটি নিয়ে আমাকে মেহেরবানি ক'রে রেহাই দিন।'

সুলতান মহম্মদ খুশী হয়ে হাসান আবদাল্লা'কে তাঁর দরবারের প্রধান উজিরের পদে বহাল করলেন।

আর ডিব্বার লাল গন্ধক ব্যবহার করে শ'শ' মন সীসাকে সোনায় পরিণত করা হয়েছিল। সুলতান কিন্তু তার এক কণাও নিজের কাজে লাগান নি। তা দিয়ে সুবিশাল এক মসজিদ বানিয়ে দিয়েছিলেন যা মহম্মদ ইবন থাইলুন-এর মসজিদ নামে তামাম দুনিয়ায় খ্যাতি লাভ করে। সাত হাজার কর্মী এক নাগাড়ে সাত বছর কঠোর মেহনৎ ক'রে মসজিদটিকে গড়ে তুলেছিল।

কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। কিস্‌সা খতম হতেই বাদশাহ শারিয়ার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'নসীব! নসীবই আদৎ। নসীবকে খণ্ডন করার সাধ্য কারো নেই।'

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে 'আবু তাহিরের কিস্‌সা' শোনাচ্ছি।'

বাদশাহ শারিয়ার নয়া কিস্‌সাটি শোনার জন্য একটু নড়ে চড়ে আয়েশ ক'রে বসলেন।

আবু তাহিরের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নয়া কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে কাইরো নগরে আবু কাশেম নামে এক উনুনী ছিল, সে ছিল একদম অর্থপিশাচ। অর্থ ছাড়া যে দুনিয়ায় আরও কিছু ভোগ্য থাকতে পারে তার আদৌ জানা ছিল না।

আবু কাশেমকে আল্লাতাল্লা দু'হাত ভরে ধন দৌলত দিয়েছিলেন। তবু অর্থলিপ্সা তার দিল্ থেকে জিন্দেগীর শেষ পর্যন্ত এতটুকুও ম্লান হয়নি। দিন-রাত তার চিন্তা ছিল কি ক'রে ধন দৌলত রোজগার করা যায় আর খরচ খরচা কমিয়ে ধন-দৌলতের পুঁটুলিটিকে বড়, আরও বড় করা যায়।

আবু কাশেম-এর সাজ পোশাক ছিল একদম সাধারণ। ভিখমাঙ্গারাও বুঝি এর চেয়ে আচ্ছা সাজ পোশাক ব্যবহার করে। তার মতে পোশাক হচ্ছে শরম নিবারণের একমাত্র উপায়। তা শরম কি মখমলের কোর্তা পাৎলুনে বেশী ঢাকা পড়বে? হাজার তালি দেয়া পিরান-পাৎলুনে কি শরম ঘোচে না। এমন পাক্কা বন্দোবস্ত সে করেছিল। আর শিরে যে পাগড়ী ব্যবহার করত তা-ও একদম তেলচিটে পড়া। খরিদ করার পর আর তাতে পানির ছোঁয়া লাগেনি। পানি নাকি সুতোকে পচিয়ে দেয়। সাচ্চা বাৎ, সাজ পোশাক গায়ে চাপিয়ে সে রাস্তায় বেরোলে তা থেকে যে-খুসবু বেরতো তার ভয়ে সবাই তার কাছ থেকে তফাতে থাকত। খুসবুতে নাকি উল্টি আসতো।

আবু কাশেম-এর পা দুটোকে যে-জুতো জোড়া ঢেকে ঢুকে রাখত তা-ও নাকি একদম বিচিত্র প্রকৃতির। তার গায়ে তাপ্পি পড়তে পড়তে নাকি জুতার আদৎ রঙ চাপা পড়ে যেত।

একদিন কাশেমের কারবারে আশাতীত মুনাফা হ'ল। সেদিন হাড়কঞ্জুস কাশেম অচানক দিল্‌দরিয়া হয়ে উঠল। সে হামামে গিয়ে গোসল করার পরিকল্পনা ক'রে বসল। তার যে এমন দুর্মতি কোনদিন হতে পারে তা তার মহল্লার আদমি ও ইয়ার-দোস্তরা খোয়াবের মধ্যেও ভাবতে পারে নি। শখ হ'ল। তাই বলে হাড়কিপ্টেরও কি একটু-আধটু শখটখও থাকতে পারে না?

ব্যস, আর দেরী নয়, আবু কাশেম দোকানের ঝাপ বন্ধ ক'রে তার বাহারী পিরান আর জুতা জোড়া পরে চল্‌ল হামামের উদ্দেশে। একটু বাদে পা থেকে জুতোজোড়া খুলে, ফিতা দুটোতে গিঁট মেরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। ইদানিং এটিই তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তার গায়ে ময়লার পুরু আস্তরণ জমে গেছে। হবে না-ই বা কেন? প্রায় এক মাস সে গায়ে পানি ছোঁয়ায় নি। গোসলখানার কর্মীরা ঘণ্টা খানেক ধরে তাকে একবার চিৎ ক'রে পরমুহূর্তেই উপুড় ক'রে বুরুশ চাপিয়ে গায়ের ময়লা তুলে তাকে সাফ সুতরা করার সাধ্যাতীত কোশিস করল। তারপর বদনা বদনা পানি ঢেলে তাকে গোসল করিয়ে দিল।

গোসল সেরে আবু কাশেম দরওয়াজার কাছে এসে চমকে উঠল। আর্তনাদ ক'রে উঠল ইয়া আল্লাহ! তোমার এ-ই বিচার! আমার সাধের জুতা জোড়া শেষ পর্যন্ত গায়েব হয়ে গেল! হুটোপাটা ক'রে তাল্লাশী চালাল। মিল্‌ল না। তবে চোর বেটার রসবোধ আছে দেখা যাচ্ছে। আবু কাশেম-এর জুতা জোড়ার প্রতি

তার লোভ আছে, সাচ্চা বটে। লেকিন বেইমানী করে নি। নিজের বাহারী ও নতুন জুতা জোড়া সে জায়গায় রেখে গেছে।

আবু কাশেম চোরের ফেলে যাওয়া জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিল। হ্যাঁ, বেশ মাপ মাফিকই হয়ে গেছে। আজব ব্যাপার, হতচ্ছাড়া চোরটি কখন, কোন্ ফাঁকে সে তার পায়ের মাপ নিয়ে গেছে। যে জুতো জোড়া পাল্টানোর চিন্তা করছিল। চোর বেটাই সে বন্দোবস্ত করে দিল।

আবু কাশেম জুতা জোড়া পায়ে গলিয়ে সোজা মকানের দিকে হাঁটতে লাগল।

আদৎ ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটু তলিয়ে দেখা যাক। কাশেম হামাম থেকে বেরোবার একটু আগেই কাজী সাহাব সেখানে গোসল করতে গেলেন। তিনি গোসল করতে হামামে ঢুকে গেলেন। তাঁর জুতো জোড়া দরওয়াজার বাইরে রেখে গেছেন। এদিকে আবু কাশেম বাইরে বেরিয়ে নিজের জুতো না পেয়ে তল্লাশী চালাতে লাগল। একটু বাদে কাজী সাহাবের জুতো জোড়া দেখে ভাবল চোর বেটাই তার ছেঁড়াফাঁটা জুতো নিয়ে গিয়ে বাহারী ও নয়া জুতোজোড়া রেখে গেছে।

লেকিন আবু কাশেম-এর সাধের জুতো জোড়া কে বা কারা হাফিস করেছে? আদতে কেউ চুরি করে নি। একজন পা দিয়ে ঠেলে ধাক্কে দরজার পাল্লার আড়ালে রেখে দিয়েছে। এমন সাফ সুতরা এক হামামে যদি হাজার তাপ্পিমারা, ছেঁড়া ও ময়লা জুতা পড়ে থাকে তবে খদ্দেরদের তো অসুবিধা হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সবার চোখের আড়ালে, দরজার পাল্লার পিছনে ঠেলে দিয়েছিল। লেকিন আবু কাশেম-এর দরকারের সময় কে সেটি বের ক'রে দেবে? তাই কাজির জুতো জোড়াকে তার প্রাপ্য ভেবে নিয়ে চলে গেছে।

এদিকে কাজী সাহাব গোসল সেরে বাইরে এসে দেখেন তার জুতো জোড়া হাফিস হয়ে গেছে। তার পেয়াদারা হামামের বাইরে অপেক্ষা করছিল। কাজী সাহাবের তলব পেয়ে তারা পড়ি কি মরি ক'রে হামামে ঢুকে গেল। পাতি পাতি ক'রে মালিকের জুতোর তল্লাশী করল। এবার আবু কাশেম-এর দুনিয়ার সেরা বাহারী জুতো জোড়া দরওয়াজার পাল্লার আড়াল থেকে টানাটানি ক'রে বের করে আনল। জুতোর মালিক তাদের পরিচিত।

কাজী কড়া হুকুম দিলেন, কাশেমকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এসো।

কাশেম জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে গরু চোরের মাফিক মুখ কাচু-মাচু ক'রে কাজীর সামনে এসে দাঁড়াল। কাজী সাহাব কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই কাশেমকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। কয়েদখানায় আদর আপ্যায়নের বন্দোবস্তও পুরোদস্তুর রয়েছে। গায়ে গতরে ব্যথা-বেদনা। হাড্ডি যে গুঁড়া ক'রে দেয় নি তার চৌদ্দপুরুষের বরাতের জোর। কয়েকদিন বাদে তাকে কয়েদখানা থেকে ছেড়ে দেয়া হ'ল। ইনাম স্বরূপ তার সঙ্গে দিয়ে দেয়া হ'ল দুনিয়ার সেরা বাহারী জুতো জোড়া।

আবু কাশেম দেরী না ক'রে সোজা চলে গেল নীল নদের ধারে। সেখানে গিয়ে ঝামেলার কারণ জুতো জোড়াটিকে নদীর পানিতে ছুঁড়ে মারল।

ক'দিন বাদে এক মেছুয়া নীল নদে মছলি পাকড়াও করতে গিয়ে পানিতে জাল জড়িয়ে দেয়া মাত্র আবু কাশেম-এর বাহারী জুতো জোড়া তার জালে ছড়িয়ে উঠে এল। লেকিন তার জালটিকে একদম ফাঁসিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটি জেলে বেচারার মধ্যে দুঃখ ও ক্ষোভ উভয়েরই সঞ্চার করল। ক্রোধোন্মত্ত মেছুয়াটি জানে এ-জুতো জোড়ার মালিক কে। ফলে সে ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে আবু কাশেম-এর দোকানে হাজির হ'ল। পথে দাঁড়িয়েই কাদা মাখানো জুতো জোড়া তার দোকানে ছুঁড়ে মারল। ব্যস, জুতোর আঘাতে তার কাচের আলমারি, দাওয়াইয়ের বোতল, শিশি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কামরার মেঝেতে কাচের টুকরোর ছড়াছড়ি। সে সঙ্গে হরেক রঙের দাওয়াই তো রয়েছেই।

মেছুয়া গোসসায় গস্ গস্ করতে করতে বল্ল—'দিল্লাগী করছিলে নীল নদীর পানিতে জুতো জোড়া রেখে, তাই না? এবার মালুম হ'ল, দিল্লাগীর ফল কি?'

আবু কাশেম কপালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, অপয়া জুতো জোড়ার জন্যই যত ঝকমারি পোহাতে হচ্ছে, এবার সেটিকে জমিনে পুঁতে রেখে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে।

আবু কাশেম আর দেরী না ক'রে জঙ্গলের ভেতরে খন্তা দিয়ে গর্ত খুঁড়তে লেগে গেল। এবার আর এক নয়া পথ ধরে ঝামেলা তার কাঁধে এসে ভর করল। কোতোয়ালিতে খবর গেল। আবু কাশেম সুলতানকে ফাঁকি দিয়ে বস্তা বস্তা মোহর জমিনের তলায় পুঁতে রাখছে।

কোতোয়ালের সিপাহীরা ছুটে গিয়ে আবু কাশেমকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে গেল।

কোতোয়াল বাজখাই গলায় জিজ্ঞাসা করল—'জমিনে গর্ত ক'রে কি পুঁতে রাখছিলে?'

—'আমার এক জোড়া ছেঁড়া জুতো হুজুর।'

—'ছেঁড়া জুতো হুজুর! শয়তান নক্করবাজ কাঁহিকার। দিল্লাগী করার আর জায়গা পাওনি?'

কোতোয়াল একের পর এক এমন জেরা শুরু করে দিল যে, আবু কাশেম-এর নাকের পানি আর চোখের পানি এক সাথে হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রচুর মোহর পিছন-দরওয়াজা দিয়ে তল গোঁজা ক'রে তবে ফাটকে আটক হওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পায়। মকানে আসার পর অপয়া জুতো জোড়ার দিকে নজর পড়তেই আবু কাশেম-এর গালে জ্বালা ধরে যায়। রাতের আন্ধারে জুতো জোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জুতোজোড়ার কোন এক নির্ভরযোগ্য বন্দোবস্ত করে তবে মকানে ঢুকবে। নগরের একান্তে একটি বড়সড় নালার মধ্যে সে দুটোকে ফেলে দিয়ে পরম স্বস্তি ও নিশ্চিন্তে সে মকানে ফিরে এল।

বরাত! বিলকুল বরাতের ব্যাপার না হলে জুতো জোড়া তাকে নয়া এক ঝকমারিতে ফেলে দেয়? বরাতের ফেরে নালার পানিতে ভাসতে ভাসতে জুতো জোড়া এক জল-সেঁচ কলের চাকায় জড়িয়ে যায়। ব্যস, কলটি একদম বিগড়ে গেল। চাকার দাঁত ভেঙে একদম গুঁড়িয়ে গেল।

জল-সেঁচ কলের মালিক তাল্লাশী ক'রে বের করল জুতোর মালিককে। সে আবু কাশেমের নামে মামলা রুজু করল। বিচারে কল-মালিককে প্রচুর মোহর ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ল। আর কয়েক মাসের জন্য তাকে ফাটকে আটক থাকতে হ'ল।

নসীবের জোর যে আবু কাশেম-এর একদমই নাই জোর দিয়ে বলা চলে না। ফাটকের হাবিলদারের নজর মোহরের দিকে। মোহর পেলে সে দিনকে রাত ক'রে দিতে পারে। আবু কাশেম সুযোগটির সদ্ব্যবহার করল। প্রচুর মোহর তার হাতে গুঁজে দিয়ে পিছনের দরওয়াজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঝামেলা ঝকমারির নায়ক জুতো জোড়াকে এবার নিজের মকানের ছাদের পিছনে বাইরের দিকে বেঁধে রাখল। অপয়া জুতো জোড়াকে যেখানে রাখা যাচ্ছে, ঝকমারির চূড়ান্ত হয়ে যাচ্ছে। অতএব সে আর কোথাও চালান দেবার কোশিস করবে না।

ইয়া আল্লাহ! এখানেও বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে। আবু কাশেম-এর মকানের পিছনে এক নামজাদা আদমির মকান। তাঁর পোষা পেয়ারের কুত্তাটি জুতো জোড়ার লোভে সে ছাদ থেকে এয়সা জোরে এক লাফ দিয়ে একদম আবু কাশেম-এর ছাদের মাঝখানে এসে পড়ল। আবু হোসেন তখন ছাতে বিপরীত দিকে মুখ ক'রে আরাম-কেদারায় বসে।

হতচ্ছাড়া কুত্তাটি একদম তার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল। সে হাসান-এর গালে সজোরে এক কামড় বসিয়ে দিল। এক খাবলা গোস্ত তুলে নিল। ব্যস, খুনে একদম মাখামাখি। মহল্লার আদমিরা তাকে হেকিমের বাড়ি নিয়ে গেল। মুখে ইয়া পেল্লাই এক পেঁটি বেঁধে মকানে ফিরল। প্রচুর মোহর খরচ হয়ে গেল।

একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হয়ে আবু কাশেম-এর পক্ষে দিমাক ঠিক রাখা সম্ভব হ'ল না। তার সাধের জুতো জোড়া বগলে নিয়ে হাজির হ'ল কাজীর দরবারে। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'হুজুর, এ-জুতো জোড়া আমার মোউৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে যেখানে রাখছি, আমার বিপদ ডেকে আনছে। খুন ঝরছে, কয়েদ' খাটছি, নয় তো কাড়ি কাড়ি নোট গাঁট থেকে খসে যাচ্ছে। এখন আমি বিলকুল পথের ভিখমাঙ্গা বনে গেছি। এ-জুতো জোড়াকে যেখানেই নিয়ে আসছি সেখান থেকে রোজ দিন নিত্য নতুন ফ্যাসাদ নিয়ে আমার কাছে ফিন ফিরে আসছে। এবার থেকে এর জন্য যদি কারো কোন ক্ষতি হয় তবে কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।' তার এক সময়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী জুতো জোড়াটি মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে হন হন ক'রে কাজীর দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কিস্‌সা খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ থামলেন।

একটু বাদে বেগম শাহরাজাদ একদম আলাদা স্বাদের এক কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে 'তহশীলদার আর তার বিবির কিস্‌সা' নামে এক সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের কিস্‌সা শোনাচ্ছি!

তহশীলদার আর তার বিবির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক সময়ে মিশরে এক তহশীলদার বাস করত। রাজস্ব আদায়ের তাগিদে তাকে হরসালের অধিকাংশ সময়ে নিজের মকান ও মহল্লার বাইরে কাটাতে হ'ত।

তহশীলদারের বিবি ছিল একদম নওজোয়ান। খুবসুরৎ লেড়কি হিসাবেও তার বহুৎ নাম ডাক ছিল। তার স্বামী মাহিনার পর মাহিনা বাইরে কাটাত। ফলে তাকে দিবারাত্রি চোখের পানি ঝরাতে হ'ত,

তা বাদে তহশীলদারের উমর ছিল খুবই বেশী। তার ওপর যখন মহল্লায় থাকত তখনও দিনভর হাঁটাহাটি ক'রে ক্লান্ত দেহে মকানে ফিরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিত। শুতে না শুতেই নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। ভোর হওয়ার আগে তার চোখের পাতা খুলতই না।

তহশীলদারের নওজোয়ান বিবি কামজ্বালায় জর্জরিত কলিজা নিয়ে রাতভর বিছানায় এপাশ ওপাশ ক'রে বেড়াত। কিছুদিন নিজেকে দন্ধে মেরে এক সময় অসহ্য হয়ে মেহেবুব জুটিয়ে ফেল্‌ল।

মরদটি একে নওজোয়ান তার ওপর দেহে তাগদও রয়েছে যথেষ্ট। আর তহশীলদারের বিবি সুযোগ-সুবিধা বুঝে যখনই তাকে তলব ক'রে তখনই চুপিসারে এসে চুম্বন, দলন, পেষণ আর সম্ভোগের মাধ্যমে তার কলিজার জ্বালা নিভিয়ে যায়। তখন লেড়কিটি একদম চনমনিয়ে ওঠে। সে দু'-চার রোজ বাদে বাদে নানা বাহানা ক'রে নওজোয়ানটিকে কোর্তা, পিরান ও পাৎলুন খরিদ করে দেয়, আর কাড়ি কাড়ি মোহর জোর ক'রে তার জেবে গুঁজে দেয়, মোদ্দা ব্যাপার যে কোনভাবেই হোক তাকে খুশী রাখা তার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

এভাবে নওজোয়ান ও জেনানাটি প্রায়ই গোপনে অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে থেকে দশ-দশটি সাল হাসি-খুশীর মাধ্যমে কাটিয়ে দিল।

তহশীলদার একদিন তার বিবিকে বল্‌ল—'আমাকে একটু বাদে এক জরুরী কাজে মহল্লার বাইরে যেতে হবে। এক কাম কর, ঘোড়াটিকে আচ্ছা দানাপানি খাইয়ে দাও আর আমাকেও কিছু খানা দাও।

তার বিবি তো খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে উঠল। লেকিন স্বামীর কাছে সতর্কতার সঙ্গে নিজের ভেতরের বল্গাহীন খুশীটুকুকে দমিয়ে রেখে কাম কাজে নিজেকে সঁপে দিল।

তহশীলদার খানা খেতে বসল, তার বিবি খানা সাজাতে গিয়ে দেখল, রুটি-সব্জী কিছুই তৈয়ার নেই। ক্রীতদাসীটিকে বল্‌ল—'হাত চালিয়ে কিছু গম পেষাই ক'রে আটা বনিয়ে দে তো, তোর মালিকের জন্য খানা পাকাতে হবে।'

তহশীলদার বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—'ধ্যুৎ, রেখে দাও তোমার গম পেষাই। এত ঝক্কি ঝামেলা করে দরকার নেই। তাতে দেরীও হয়ে যাবে। বরং দোকান থেকে রুটি-সব্জী খরিদ ক'রে নিয়ে আসছি।'

ব্যস, সে বাজারের দিকে হাঁটা দিল, এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহারাজাদ কিস্‌সাটি বন্ধ করলেন।

আট শ'তম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, তহশীলদার খানা খরিদ ক'রে ফিরে আসার আগেই নওজোয়ানটি কামরায় ঢুকল। তার মেহেবুবাকে বল্‌ল—আমাকে এখনই তিন শ' দিরহাম দাও। এ অর্থ আজ আমার চাই-ই চাই।'

—'লেকিন এখনই আমি এতগুলো দিরহাম কোথায় পাব বল তো? আমার হাত একদম খালি।'

—'খালি বল্‌লে তো আমার চলবে না। বল্‌লামই তো, আমার জরুরী দরকার। এক কাম কর, তোমাদের খচ্চরটি দাও, বিক্রি ক'রে অর্থ সংগ্রহ করে ফেলি।'

—'সে কী! আমার স্বামী ফিরে এসে খচ্চরটি দেখতে না পেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবে না? তখন? আমি তখন কি জবাব দেব? আমাকে একদম খতম ক'রে ফেলবে না?'

লেকিন লেড়কাটি দমবার পাত্র নয়। সে একরকম জোর করেই খচ্চরটি নিয়ে বাজারের দিকে চলে গেল।

একটু বাদেই তহশীলদার রুটি-সব্জী খরিদ করে মকানে ফিরল। আস্তাবলে ঢুকল, রুটি-সব্জি তার থলের মধ্যে পুরে নিতে চাইল। সেখানে খচ্চরটিকে দেখতে না পেয়ে তার দিমাক গরম হয়ে গেল। লাগাম জীন বেবাক পড়ে, খচ্চরটি হাফিস। সে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে বিবির কাছে ফিরে বল্‌ল—'কি গো,

আমার আস্তাবল যে ফাঁকা, খচ্চরটি গেল কোথায়?'

তার বিবি মুখ ব্যাজার ক'রে বল্ল—'ইয়া আল্লাহ! তোমাকে আজব ব্যাপারটি বলার ফুরসৎ পাইনি। তুমি বাজারে খানা খরিদ করতে গেলে এক আজব ব্যাপার ঘটে গেছে। খচ্চরটি আমাকে বল্ল—"যাদুবলে আমাকে খচ্চর বানিয়ে রাখা হয়েছে।" আদতে সে খচ্চর নয়। আদমির অবয়ব ধারণ ক'রে সে আমাকে বল্ল—"আমি আদতে সুলতানের কাজী, দরবারে যাবার নাম করে সে হন হন করে এগিয়ে গেল।'

—'বিবিজান, তামাশা রেখে সাচ্চা বল, আমার খচ্চর গেল কোথায়?'

—'কি যে বল, আমি তামাশা করতে যাব কেন গো? যা সাচ্চা ঘটনা, বললাম। আদতে খচ্চরটি প্রায়ই আদমির অবয়ব ধারণ ক'রে আমার সঙ্গে বাৎচিৎ করত। তোমাকে ব্যাপারটি বলতে আমার সাহসে কুলোয় নি। তার ব্যাপার দেখে আমি তো শরমে কুঁকড়ে থাকতাম। উপায় না দেখে নাকাবে মুখ ঢেকে আস্তাবলে এসে মুখ ঢাকতাম। লেকিন আজ একদম অভাবনীয় এক কাণ্ড ঘটে গেল। আমি দাওয়ায় বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ব্যস, অচানক মুখ তুলে তাকিয়েই একদম ঘাবড়ে গেলাম, দেখি এক বুড্ডা উঠোনে খাড়া, আস্তাবল থেকে এসেছে। আমি শরমে ভাগার কোশিস করলাম। সে আমাকে "মা" সম্বোধন ক'রে একদম তাজ্জব বানিয়ে দিল। সে আমাকে বল্ল—"মা, আমাকে ভয় ডর বা শরম টরমের ব্যাপার কিছুই নেই। আমাকে তোমার আব্বার মাফিক জ্ঞান করতে পার। নসীবের ফেরে এতদিন খচ্চর বনে ছিলাম। আজ আমার নসীব ঘুরেছে। মুক্তি পেয়ে আদমির অবয়ব ফিরে পেয়েছি। আমি সুলতানের কাজী তোমাদের আশ্রয় ছেড়ে দরবারে ফিরে চল্লাম।'

বিবির বাৎ শুনে তহশীলদার তো একদম বোবা বনে গেল, এমন আজব বাৎ তার চৌদ্দ পুরুষেও শোনে নি। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সে বল্ল—'লেকিন বিবিজান, খচ্চর ছাড়া আমি কাম কাজ সারব কি ক'রে? মহল্লায় মহল্লায় আমাকে ঢুঁড়ে বেড়াতে হবে। এখন কি ফিকির করি বল তো?'

—'এক মতলব বলে দিচ্ছি, এক আঁটি খড় নিয়ে কাজীর দরবারে যাও। দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে কাজী সাহাবকে দেখাতে থাক। তবেই তোমার হালৎ তিনি বুঝতে পারবেন। খচ্চরের অভাবে তুমি কী মুসিবতে পড়েছ। ব্যস, তিনি সমঝদার আদমি। তখন তিনি দরবার ছেড়ে তোমার পিছু নেবেন।'

বিবির মতলবটি তহশীলদারের পছন্দ হ'ল। সে ঝট করে এক আঁটি খড় নিয়ে কাজীর দরবারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল।

তার বিবি এগিয়ে এসে বল্ল—'শোন, এক বাৎ ইয়াদ রেখো, কাজী আর খচ্চর কিন্তু একই কিসিমের জন্তু। হুঁশিয়ার। তারা কিন্তু হরবখত বদলা নেবার ফিকিরে থাকে। তুমি এতদিন তার ওপর যে হামলা হুজ্জুতি করেছ, অত্যাচার চালিয়েছ তা কিন্তু তার দিল্ থেকে মুছে যায় নি। তোমাকে বাগে পেয়ে গেলে পুরোপুরি উসুল ক'রে ছাড়বে।'

তহশীলদার তার বিবির বাৎ শুনে ঘাড় কাৎ করল। চারদিকে কড়া নজর রেখে সে কাজীর দরবারে হাজির হল। দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে হাতের খড়ের আঁটিটি কাজীর দিকে বাড়িয়ে বার বার উঁচু করে ইশারায় তার নজর কাড়ার কোশিস করতে লাগল।

দু'চার বার খড়ের আঁটি নাচিয়ে ইশারায় কাজীকে ডাকা ডাকি করার ফলে ব্যাপারটি কাজীর নজরে পড়ল। সে তহশীলদারকে ভেতরে যেতে বল্ল।

তহশীলদার দরওয়াজায় দাঁড়িয়েই বল্ল—'উফ্! আপনি বাইরে আসুন।'

কাজী তহশীলদারকে চেনে, সে যে সুলতানের তহশীলদার, খাজনা আদায় করে, বহুৎ আগে থেকেই জানে। কাজী ভাবল, নির্ঘাৎ কোন গোপন পরামর্শের জন্যই কোতোয়াল তাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে দরওয়াজার কাছে এসে বল্ল—'কি ব্যাপার, বল তো? কোন জরুরী বাৎচিৎ আছে কি?'

তহশীলদার তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে মুখে চুকচুকে আওয়াজ তুলে তাকে কামরার বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোশিস করতে লাগল।

কাজী ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে কামরার বাইরে বেরিয়ে এল। তহশীলদার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্ল—'আপনার নসীবের চক্করের ব্যাপারটি শুনে আমি যারপর নাই দুঃখিত। বিনা কারণে আপনার দরবারে এসে আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটানোর ইচ্ছা আমার একদম নাই। বিশোয়াস করুন, খাজনা আদায়ের কাজে আজ আমাকে বহুৎ দুর দুর গাঁয়ে যেতে হবে, তাই এখানে ছুটে আসতেই হ'ল। গোস্সা করবেন না। ঝটপট খচ্চরের অবয়ব ধারণ করুন। আমি আপনার পিঠে চেপে এখনই কাজে বেরিয়ে পড়তে চাইছি।'

তহশীলদারের বাৎ শুনে কাজী বেচারা তো একদম আশমান থেকে পড়ল। নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

তহশীলদার বল্ল—'কেন ঝুটমুট ভয়ে ডরে একদম মুষড়ে পড়ছেন? একবার যখন জানতে পেরেছি, আপনি আদতে জন্তু-জানোয়ার নয়। নসীবের ফেরেই আপনাকে খচ্চরের আকার ধারণ করতে হয়। আদমিদের পাছাগুলো যে একদম নরম। চাবুকের ঘা খেলে যন্ত্রণা হয়। তাই ওয়াদা করছি, আর চাবুক টাবুক আপনার পাছায় মারব না। আজ থেকে খড়ের বদলে দানাই শুধু আপনাকে

খেতে দেব। নিন, ঝটপট খচ্চরের অবয়ব ধারণ করুন, আমি আপনার পিঠে চেপে খাজনা আদায়ের ব্যাপারটি সেরে আসি।'

কাজী এবার তহশীলদারের দিকে তাকিয়ে নীরবে ভাবতে লাগলেন—এ আদমী জরুর পাগলাগারদ থেকে ভেগে এসেছে! ফলে ডরে কুঁকড়ে গিয়ে এক কদম দু'কদম করে পিছু হটার কোশিস করতে লাগল। তার মতলব বুঝে তহশীলদার তাকে ধরার জন্য কামরায় ঢুকে গেল। কাজীর দরবারে কোন কর্মচারিই হাজির নেই। ফলে একদম বে-কায়দায় পড়ে গেল। মালুম হচ্ছে, আপনার খচ্চরটি রশি ছিড়ে ভেগে গেছে। আর তাকে না পেলে আপনার কামকাজ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তহবিল থেকে আপনাকে তিন শ' দিরহাম দিচ্ছি। একটি খচ্চর খরিদ ক'রে আনুন। ব্যস, এবার আমাকে রেহাই দিন। কাজের সময় আর ঝামেলা করবেন না, কেটে পড়ুন, দিরহামের পুঁটুলিটি তার হাতে দিয়েই কাজী ঝট করে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

তহশীলদার ভাবল, সে কাজীর আদৎ পরিচয় জানতে পারায় কাজী লাজে পড়েছে। তাই কামরা ছেড়ে দৌড়ে একদম অদৃশ্য হয়ে গেছে। খচ্চরের দাম বুঝে পেয়ে তহশীলদার আর ঝুটমুট ব্যাপারটিকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে চাইল না।

তহশীলদার এবার দিরহামের পুঁটুলিটি নিয়ে বাজারে গেল তাগড়াই একটি খচ্চর খরিদ ক'রে নিয়ে আসার জন্য।

এক দালাল একটি খচ্চর এনে তাকে দেখাল। এক লহমায় তাকে দেখেই সে অচানক চমকে উঠল। সে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ যে মালুম হচ্ছে একদম আমার সে খচ্চরটিই। তার গায়ে যা কিছু চিহ্ন ছিল সবই রয়েছে। সে দালালটিকে বলল—'মিঞা, তোমার খচ্চরটি সবদিক থেকে নজর কাড়ার যোগ্য বটে। লেকিন, আমি একটি আদৎ খচ্চরের তাল্লাশ করছি।'

—'আদৎ খচ্চর? আদৎ জন্তু? এ কোন্ কিসিমের বাৎ হ'ল, দিমাকে আসছে না! এ কী তবে ঝুটা, নকল খচ্চর নাকি হে? বাজারে সওদা খরিদ করতে চান। নাকি তামাশা-মস্করা করতে চাইছেন?'

—গোস্সা কোরো না মিঞা। আমার বাৎ শোন, মোদ্দা ব্যাপার, আমি এটি খরিদ করব না। অন্য খচ্চর থাকে তো দেখাও।'

বহুৎ তাল্লাশী করে, তহশীলদার নগদ তিনশ' দিরহাম দিয়ে একটি পছন্দ মাফিক তাগড়াই খচ্চর খরিদ করে মকানে ফিরে এল।

মকানে ফিরে সে চৌপায়ায় বসে আগাগোড়া ঘটনা বিবির কাছে ব্যক্ত করল।

বেগম শাহরাজাদ ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আট শ'একতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, তহশীলদারের মুখে তার বিবি পুরো ঘটনাটি শুনে যারপরনাই আনন্দিত হ'ল। তার বুদ্ধি-কৌশলের ফলে সবদিক বজায় রইল। স্বামীর খচ্চরের অভাব পূরণ হ'ল আর পেয়ারের নাগরটিও খচ্চরটি বেচে বাঞ্ছিত তিনশ' দিরহাম পেয়ে দরকার মেটাতে পারল।

কাজী সাহাবকে অবশ্য বে-কায়দায় পড়ে তিনশ' দিরহাম খোয়াতে হল। তার জন্য আপশোষের কিছু নাই, আদালতের দক্ষিণা কিছু বাড়িয়ে দিলে একমাসের মধ্যে তার অর্থ উঠে আসবে।

কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

বাদশাহ শারিয়ার-এর অত্যুগ্র আগ্রহে বেগম শাহরাজাদ নয়া আর একটি কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা আপনার মর্জি মাফিক আমি এবার একটি আলাদা স্বাদের কিস্‌সা শুরু করছি।

বুড্ডা কাজী ও নওজোয়ান বিবির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময় এক গরীব দম্পতি কায়ক্লেশে দিন গুজরান করত। তাদের অর্থোপার্জনের একমাত্র ফিকির ছিল পথে পথে ফেরি ক'রে ভুট্টার খই বেচা। তারা উভয়েই ছিল মাঝ বয়সী। বিবি মকানে বসে খই ভেজে দিত আর স্বামীটি টুঁড়ে টুঁড়ে বেচত। তাদের খুবসুরৎ এক নওজোয়ান লেড়কি ছিল।

এক সকালে নগরের কাজী ফেরিওয়ালার মকানে হাজির হ'ল। একথা-সে-কথার পর তার লেড়কিটিকে শাদী করার প্রস্তাব দিল।

ফেরিওয়ালা তো কাজী সাহাবের প্রস্তাবটি শুনে খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে উঠল। কাজী সাহাবকে জামাতা হিসাবে পেলে তার মাফিক এক ফেরিওয়ালার তো আশমানের চাঁদ হাতের মুঠায় পাওয়া হয়ে যাবে বটে। তবে হ্যাঁ, কাজীর উমর আশির কিছু বেশী হবে। আপত্তির কি-ই থাকতে পারে। এরকম উমরে বহুৎ, বহুৎ আদমিই তো শাদী ক'রে থাকে। আর সুরতের ব্যাপার স্যাপার? ধ্যুৎ, সোনার আংটি বাঁকা, কি সোজা বিচার করতে কে যায়? সোজা পথে আর পিছনের দরওয়াজা দিয়ে যা আমদানি হয় তাতে সে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারুক আর না-ই পারুক ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে তো রাখতে পারবে।

লেড়কির আব্বা ফেরিওয়ালাটি ব'লে উঠল—'কাজী সাহাব, আপনার হাতে আমি লেড়কিকে তুলে দিতে পারলে আমি তো নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব। আর ভাবব, নসীবের জোর ছিল বলেই সে আপনার ঘর করতে যেতে পারছে।'

সে সন্ধ্যাতেই কাজীর সঙ্গে লেড়কিটির শাদী হয়ে গেল। শাদী তো চুকে গেল। লেকিন কাজীকে তো যে কোন ফিকিরে লেড়কিটিকে খুশী করতে হবে, জয় করতে হবে তার দিল্, তাই সে ফি রোজ চুল-দাঁড়িতে কলপ চড়াতে লাগল। আর জমকালো পোশাকে হরবখত নিজেকে ঢেকে রাখার কোশিস করতে থাকল। আর ফি রোজ হরেক কিসিমের উপহার-উপঢৌকন খরিদ করে এনে বিবিকে দিতে লাগল। সদ্য শাদী করা বিবিকে যদি খুশীই না করা যায় তবে তো জিন্দেগীই বরবাদ হয়ে যাবে।

উপঢৌকন কি আর নওজোয়ান লেড়কির দিলে খুশীর ঢেউ বইয়ে দিতে পারে? তার কলিজা যে কাম-জ্বালায় জর্জরিত। আদৎ উপহার যদি স্বামীর কাছ থেকে না পাওয়া যায় তবে কোন্ লেড়কি স্বামীকে আচ্ছা নজরে দেখতে পারে। ধন দৌলতে পেট ভরে বটে, দিল্ ভরে না।

কাজী তার নওজোয়ান বিবিকে মাঝ রাত অবধি জাগিয়ে রেখে দু'হাতে তার যৌবনে ঢল নামা নিটোল-নিভাঁজ দেহটিকে নিয়ে জাপ্টাজাপ্টি করে, তোবড়ানো গাল দিয়ে বারবার চুম্বন করে। এতে তার খিদে মেটা বা কলিজার জ্বালা নেভা তো দূরের ব্যাপার বরং হু হু ক'রে তা বেড়ে যায়। এক সময় কাজী বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়। ভোঁস ভোঁস ক'রে নাক ডাকিয়ে গভীর নিদে ডুবে থাকে। আর কাম-জ্বালায় জর্জরিতা তার নওজোয়ান বিবিটি বিছানায় পড়ে ভোর অবধি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছটফট ক'রে কাটায়। কাজী সাহাব বিবিকে একটি ব্যাপারেই সুখ দিতে পারে না বটে। লেকিন তাকে খুশী করতে বাকী সব দিক থেকেই কোশিসের ত্রুটি রাখে না। একটু বাদে বাদে অন্দর মহলে গিয়ে বিবির খোঁজখবর নিয়ে আসে। মজার মজার বাৎ ব'লে তার দিল্‌কে তাজা রাখার কোশিস করে। লেকিন তার বিবির মুখে কিছুতেই হাসির ঝিলিক ফোটাতে পারে না, দিন কে দিন তাকে হতাশ হতে হচ্ছে, এক সময় হালৎ এমন হ'ল যে, তার বিবি তার দিকে ফিরেও তাকায় না। পরম বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে থাকে। কোন্ খুবসুরৎ নওজায়ান বিবির দিল্ চায় অক্ষম স্বামীর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বাৎচিৎ করতে?

কাজী এক মতলব ভাজল। সরকারী কাম কাজে তাকে সহযোগিতা করার জন্য এক তাগদওয়ালা খুবসুরৎ নওজোয়ানকে পেশকারের পদে নিযুক্ত করল। কাজী তাকে প্রায়ই নানা কাজের বাহানা ক'রে অন্দরমহলে পাঠায়। তার বিবির খোঁজ খবর নিতে তবিয়ৎ আচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করে আসার জন্য!

মালিকের হুকুম তামিল করতে নওজোয়ানটি নিয়ম মাফিক অন্দর মহলে যাতায়াতের ফলে তাদের মধ্যে দু'-চারটি ক'রে বাৎচিৎ হতে থাকে। এরকম কিছুদিন চলার পর উভয়ের মধ্যে লাজ-শরমের যেটুকু বাধা বিপত্তি ছিল, ঘুচে গেল। তাদের মধ্যে একটু একটু ক'রে মহব্বৎ উঁকি দিতে লাগল। ব্যস, নয়া সম্পর্কের জালে তারা বাধা পড়ে গেল।

কাজী সাহাবের উমর বহুৎ হয়েছে। একদিন সে-ও তো নওজোয়ান ছিল। আশি সালের জিন্দেগীতে অভিজ্ঞতাও তার ঝোলায় কম জমা হয় নি। কারো চোখ দেখলেই দিলের খবর টেনে বের করে আনতে পারে। অতএব তার বিবি আর নয়া নিযুক্ত পেশকারটির মধ্যে যে বিশেষ একটি সম্পর্ক দানা বাঁধতে বাঁধতে ক্রমে মহীরুহের আকৃতি লাভ করেছে বুঝতে পারল। মহব্বত! হ্যাঁ, তারা মহব্বতের জালে জড়িয়ে পড়ল। কাজী সাহাব সব বুঝেও না বোঝার বাহানা ক'রে চোখ উল্টে থাকে।

মৌখিক প্রেম নিবেদনের ব্যাপার স্যাপার চুকে গেলে কাজীর বেগম আর নওজোয়ানটি আর পরস্পরকে দূরে রাখতে চায় না। এক দুপুরে কাজী তার দপ্তরের কাজে ডুবে থাকলে তার পেশকার নওজোয়ানটি তার মেহবুবার কামরায় আসে। খোঁজ খবর নেয়। কাজীর বেগম কাছেই ছিল। সুযোগ বুঝে সে তার মেহবুব, তার পেয়ারের নওজোয়ানটির একটি হাত খপ্ ক'রে পাকড়াও ক'রে ফেল্‌ল। এক হেঁচকা টানে তাকে একদম নিজের বুকে নিয়ে নিল। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আবেগ ভরে। তার নিটোল সমুন্নত স্তন দুটো পিষ্ট হতে লাগল নওজোয়ানটির প্রশস্ত বুকের চাপে। তার ছাই চাপা পড়া যৌন কামনা অচানক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে কলিজাটি ছটফট করতে থাকে।

সন্ধ্যায় দপ্তরের কাম কাজ চুকিয়ে কাজী সাহাব মকানে ফিরে এল। বিবির মুখে হাসির প্রলেপটুকু দেখে আদৎ ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিশ্চিৎ ধারণা করতে অসুবিধা হ'ল না।

কাজীর নওজোয়ান পেশকার আর তার নওজোয়ান বিবির মধ্যে মহব্বতের গোপন খেল দ্রুত তালে এগিয়ে যেতে লাগল। তারা বিচিত্র এক ফিকির বের করল। কাজীর বেগম জানালায় দুটো রুমাল বেঁধে রাখার বন্দোবস্ত করল। তাদের একটি লাল আর অন্যটি সফেদ। লাল রুমালটি বিপদের প্রতীক। সেটি বাঁধা থাকলে নওজোয়ানটি বুঝত কাজী সাহাব মকানে রয়েছেন। আর যদি সফেদ রুমালটি ঝুলত তবে বুঝত কাজী সাহাব মকানের বাইরে। চলে এসো। এই মওকা।

তারা এভাবে কৌশলে, ফন্দি ফিকিরের মাধ্যমে মহব্বতের খেল্ জোর-সে চালিয়ে যেতে লাগল। রুমালের নিশানা মাফিক নওজোয়ানটির আসা-যাওয়া নির্ব্বিবাদেই চলতে লাগল।

চোখে ধূলা দিয়ে কাম হাসিল করা চিরদিন সমান যায় না, কাজীর বিবি আর নওজোয়ান পেশকারটির মহব্বতের খেল্ও একনাগাড়ে বেশীদিন নির্ব্বিবাদে চল্‌ল না।

কাজী এক বিকালে সাজ পোশাক পরে খচ্চরের পিঠে চেপে বাইরে যাবার সময় বিবিকে বল্‌ল—'শোন, জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। আর রাতে ফেরা সম্ভব হবে না। চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।'

কাজী খচ্চরের পিঠে চেপে কিছুদূর যেতে না-যেতেই তার বিবি জানালায় সফেদ রুমালটি বেঁধে দিল।

বিছানা গোছগাছ ক'রে তার মেহবুবের আগমনের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় প্রতিটি লহমা কাটাতে লাগল। তার কলিজা চঞ্চল, এই আসে এই আসে।

একটু বাদেই দরওয়াজার কড়া নড়ে উঠল। কাজীর বিবি খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে উঠল। কলিজা নাচানাচি শুরু ক'রে দিল। দৌড়ে গেল দরওয়াজা খুলে দিতে। দরওয়াজার খিল খুলেই সে অচানক চমকে উঠল। সামনে ভূত দেখলেও কেউ এমন চমকে ওঠে না। সে দেখল, তার বহু আকাঙ্ক্ষিত মেহবুব নওজোয়ানটির বদলে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার স্বামী কাজী সাহাবের দাড়ি বোঝাই তোবড়ানো মুখ। এক লহমার মধ্যে তার দিল্ বিলকুল বিষিয়ে উঠল।

কাজী এক খোজা নফরের কাঁধে ভর দিয়ে দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে বল্‌ল—'বিবিজান, তবিয়ৎ তো ভালই ছিল। অচানক শরীরটি কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। তাই ফিরেই এলাম।'

—'বহুৎ আচ্ছা কামই করেছ। তবিয়ৎ আচ্ছা না থাকলে মকানের বাইরে থাকা ঠিক নয়। চল, বিছানায় শুয়ে পড়বে, চল।'

কাজী সাহাবকে তার বিবি বিছানায় শুইয়ে দিল। তার পর তার গা থেকে এক এক ক'রে কোর্তা, পিরান, পাৎলুন প্রভৃতি বিলকুল সাজপোশাক খুলে একদম উলঙ্গ ক'রে দিল। এবং অঞ্জলি ভরে গুলাপ পানি সারা গায়ে, চোখে মুখে ছিটিয়ে চাদরচাপা দিয়ে বল্‌ল—'চোখ বন্ধ ক'রে দাও। দেখবে, শীঘ্রই নিদ এসে যাবে।' বুড্ডা কাজী-এই প্রথম দফে তার বিবির সেবাযত্ন পেল। এর আগে তার প্রতি এত দরদ মহব্বৎ প্রকাশ পায় নি। খুশীতে কাজির দিল্ কানায় কানায় ভরে উঠল। স্বস্তিতে তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল। গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

এবার পেশকার নওজোয়ানটি জানালায় সফেদ রুমাল বাঁধা দেখে খুশীতে নেচে উঠল। সে ভাবল, কাজী সাহাব তবে মকানের বাইরে কারো শাদীর কবুলনামা পড়াতে গেছে। নির্ঘাৎ রাত্রে ফিরবে না। সে তড়িৎ গতিতে পাইপ-বেয়ে ওপরে উঠে গেল। পা টিপে টিপে কামরায় ঢুকে গেল। কামরায় এক ধারে একটি মৃদু চিরাগবাতি

জ্বলছে।

পেশকার নওজোয়ানটি পালঙ্কের দিকে তাকিয়ে দেখে চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে রয়েছে। সে ভাবল, কাজী সাহাব যখন মকানের বাইরে তখন তার মেহবুবা ছাড়া কে-ই বা ঘাপটি মেরে এভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবে? সে দু'-একবার তার মেহেবুবার নাম ধরে ডাকাডাকি করল। কোনই সাড়া পেল না। এবার নিঃসন্দেহ হ'ল তার সঙ্গে মস্করা করার লোভে তার মেহেবুবা এ ভাবে চাদরমুড়ি দিয়ে নিদের বাহানা করছে। সে আর ডাকাডাকি করল না। পা টিপে টিপে গিয়ে পালঙ্কের একদম গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। নিঃশব্দে চাদরের তলা দিয়ে ডান-হাতটি ঢুকিয়ে দিল। সে বলে উঠল—ইয়া আল্লাহ! এ করেছ কী মেহেবুবা, কামিজ পাৎলুন খুলে একদম তৈরী হয়েই শুয়েছ যে! অন্যদিন কত কায়দা কসরৎ ক'রে তবে তোমাকে উলঙ্গ করতে হয়। আর আজ কিনা নিজেই তৈরী হয়ে শুয়ে পড়েছ!

সে এবার নিদ্রাতুর আদমিটির দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে হাতটি চালিয়ে দেয়। ধান্ধা এই যে কাম কাজ শুরু করার আগে একটু আধটু আদর সোহাগের মাধ্যমে তার মধ্যে কামোন্মাদনা জাগিয়ে তোলা। লেকিন অচানক এক অত্যাশ্চর্য বস্তুর স্পর্শে সে চমকে ওঠে। ঝট্ ক'রে চাদরের তলা থেকে হাতটি বের করে নেয়ার কোশিস করল। লেকিন তার প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। কাজী সাহাব দুই উরু দিয়ে তার হাতটিকে চেপে ধরলেন। একদম সাঁড়াশীর কামড় যাকে বলে।

পেশকার নওজোয়ানটি চমকে উঠে বলে—'ইয়া আল্লাহ! এ যে কাজী সাহাব!' ইতিমধ্যে তার কলিজার কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল। ডরে শরীরের শক্তি যেন উধাও হয়ে গেছে।

এদিকে পরিস্থিতি বুড্ডা কাজী সাহাবের গায়ে যেন হাতীর শক্তি জুগিয়ে চলেছে। ফলে তার হাতটি কাজী সাহবের পায়ের বন্ধন থেকে ছাড়া পেল না। কাজী ঝট ক'রে লাফিয়ে উঠে তাকে জাপ্টে ধরে বেশ বড়সড় একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে তাকে পুরে ফেল্‌ল।

কাজীর বিবি তখন হামামে গেছে। কাজী গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে হামামে গিয়ে ঢুকেছে। ইতিমধ্যে কি যে ঘটেছে, কিছুই জানে না।

কাজী পেশকার নওজোয়ানটিকে বাক্সে পুরে দিয়ে গোস্সায় গর্জাতে লাগল—বিবিকে জিজ্ঞাসা করব, সে যদি বলে হারামী শয়তানটিকে সে চেনে না তবে তার গর্দান নেব, আর যদি স্বীকার করে হতচ্ছাড়াটি তার পরিচিত, তাদের মধ্যে মহব্বৎ টহব্বৎ রয়েছে তবে এক সঙ্গে দুজনকেই কোরবানির পশুর মাফিক জবাই করার হুকুম দেব। আমি কাজী, আমার বিচারে এ-সাজারই বন্দোবস্ত হবে।

হামাম থেকে বেরোতেই কাজীর বিবির হুঁস হ'ল। সফেদ রুমালটি খুলে ফেলতে একদম ভুলে গিয়েছিল। কখন তার নাগরটি অচানক মকানে ঢুকে যায় এ-ভাবনাতেই অস্থির হয়ে পড়ল।

কামরায় ঢোকার আগে এক বুড্ডি বাঁদীকে বল্‌ল—তার কামরায় এক পেয়ালা পানি আর একটি নিদে বিভোর হওয়ার বড়ি নিয়ে যেতে। কায়দা-কসরৎ ক'রে কোনক্রমে কাজীকে সেটি খাইয়ে দেবে।

বুড্ডিকে হুকুম দিয়ে কাজীর বিবি কামরায় ঢুকেই চমকে উঠে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! তোমার নিদ টুটে গেছে। তুমি যে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়েছ। হেকিম সাহাব যে তোমাকে একদম উঠতে নিষেধ ক'রে গেছেন। শুয়ে পড়! জলদি শুয়ে পড়!'

কাজী সাহাব ধমক দিয়ে ব'লে উঠল—'চুপ যাও। হেকিম সাহাবকে ফিন কখন তলব দিয়েছিলে?' একটু নরম হয়ে এবার বল্‌ল—'তুমি গুলাব পানির নির্যাস দিয়ে গা, হাত-পা মুছিয়ে আমাকে স্বস্তি দিয়েই গেলে। ফিন হেকিম টেকিমকে ঝুটমুট কেন তলব দিতে গিয়েছিলে?'

—'তোমাকে তো বল্‌লামই, ঝিম মেরে শুয়ে থাক।' এমন সময়ে বুড্ডি পানির পেয়ালায় পানি আর ঘুমের বড়ি হাতে নিয়ে দরওয়াজায় দাঁড়াল।

তার হাত থেকে পানির পেয়ালা ও বড়িটি নিয়ে কাজী সাহাবকে বল্‌ল—'নিদ যখন টুটেই গেছে তখন হেকিম সাহেবের দাওয়াইয়ের বড়িটি খেয়ে ফেল।'

কাজী দেরী না ক'রে বিবির হাত থেকে পানির পেয়ালা ও বড়িটি নিয়ে খেয়ে ফেল্‌ল। তারপর বলল—'বিবিজান, একটি জরুরী বাৎ তোমাকে জিজ্ঞাসা করার আছে। দেরী হলে আদমিটি ইন্তেকাল হয়ে যাবে। বাক্সটির ভেতরে—'

—'কার ইন্তেকাল হবে? যদি কারো ইন্তেকাল ঘটেই ঘটুক। তুমি আগে শুয়ে পড়। কাল ভোরে যা বলার বলবে।'

ইতিমধ্যে দাওয়াইয়ের কাজ শুরু হয়ে গেল। কাজীর চোখ দুটো নিদে বন্ধ হয়ে আসতে লাগল. একটু বাদেই সে নিদে একদম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

কাজীর বিবি এবার বাক্সটির দিকে এক লাফে এগিয়ে গেল। ঝট্ ক'রে বাক্সের ডালাটি খুলে পেশকার নওজোয়ানটিকে বাক্স থেকে বের ক'রে নিয়ে এল। বল্‌ল—'ডর নেই। শয়তান বুড্ডা কাজী এখন লাশ বনে গেছে, কাটা সৈনিকের মাফিক!'

কামরার মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে সে রাতভর সম্ভোগ সুখে তৃপ্তি দান করে। নিজেও পরম তৃপ্তি লাভ করে।

ভোর হওয়ার আগে কাজীর বিবি তার মেহেবুবকে নিয়ে আস্তাবলে হাজির হয়। একটি গাধাকে খুলে এনে কামরার সামনে

হাজির হ'ল। রশি দিয়ে তার পা চারটি আচ্ছা ক'রে বেঁধে ফেল্‌ল। এবার দু'জনে ধরাধরি করে তাকে কাঠের বাক্সটির মধ্যে পুরে ডালা বন্ধ করে দিল।

ইতিমধ্যে কাজী একবার পাশ ফিরে শোয়। তার বিবি বুঝল, দাওয়াইয়ের ক্রিয়া প্রায় খতম হতে চলেছে। তাই দেরী না করে তার মেহবুব নওজোয়ান পেশকারটিকে চলে যেতে বলল্‌। সে বিদায় নিলে কাজীর বিবি তার পাশে শুয়ে চোখ বুজে গভীর নিদের বাহানা ক'রে পড়ে রইল।

ভোরে কাজীর নিদ টুটল। তার বিবিকে ডাকল। তার বিবি তখনও ঘুমের বাহানা ক'রে ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে রইল। কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—'কেন? ডাকছ কেন? এত ভোরে উঠে করব কি, বলবে তো?'

—'ডাকছি কেন, বুঝবে একটু বাদেই। ওঠ শিগগির, তোমার বিচার হবে।'

তার বিবি তখনও পাশ ফিরে শুয়েই র[illegible]স। ঘুম জড়ানো চোখে বল্‌ল—'বিচার? কিসের বিচার হবে।'

—'আমি মহল্লার পাঁচজন নামজাদা আদমিকে তলব করেছি। তারা সাক্ষী থাকবে। তারা আসুক, বুঝবে কেন বিচার, কার বিচার?'

তার বিবি তারপরও শুয়েই রইল, না শোনার, না বোঝার বাহানা ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে পড়েই রইল।

একটু বাদে মহল্লার পাঁচ আদমি কাজীর মকানে হাজির হ'ল।

কাজী বল্‌ল—'আপনাদের তকলিফ দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে এক জরুরী ব্যাপারের ফয়সালা আর সাক্ষী থাকার জন্য।'

কাজী সাহাব এবার দু'-চার কদম এগিয়ে গিয়ে ঝট ক'রে কাঠের ডালা তুলে ফেল্‌ল। ডালাটি উঁচু হতেই গাধাটি বাক্সের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে দিল। ব্যাপার দেখে আগন্তুকরাই কেবল নয় এমন কি কাজী সাহাবও তাজ্জব বনে গেল।

কাজী তার বিবির ওপর গর্জে উঠল—'হারামজাদী, নচ্ছার মাগী কোথাকার! বল্‌, সে কোথায় গেল?'

তার বিবি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে নীরব চাহনি মেলে দাঁড়িয়ে রইল। কাজী তড়পে চলেছে—'বজ্জাত মাগী কাঁহিকার! তোকে গলা টিপে একদম খতম ক'রে দেব।' হাত বাড়িয়ে তার গলা টিপে ধরার কোশিস করল।

তার বিবি গলা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল—'কে কোথায়, আছ—বাঁচাও-বাঁচাও!'

কাজী তাকে অনুসরণ করতে চায়? সাক্ষীরা তো ব্যাপার দেখে বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। তারা কাজী সাহাবকে নিরস্ত করার কোশিস করল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফেল্‌ল।

লেড়কিটি উঠোনে দাঁড়িয়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'আপনারা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, রশি দিয়ে আচ্ছা ক'রে বাঁধুন। কাল রাত্রি থেকেই ওর দিমাক গড়বড় হয়েছে। নিজেরাও চোখের সামনে কিছু কিছু দেখছেন। রশি দিয়ে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধুন।'

কিস্‌সা খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

তিন শাহজাদার কিস্‌সা

নয়া এক কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বহুৎ সাল আগে কোন নগরে এক সাহসী সুলতান তাঁর সুলতানিয়ৎ শাসন করতেন। তিনি কেবলমাত্র অমিত শক্তিধরই ছিলেন না, তাঁর সাহসও ছিল অদম্য।

সুলতানের তিনটি লেড়কা ছিল। সবচেয়ে বড়া লেড়কার নাম ছিল আলী, দুসরাটির নাম হাসান আর সবচেয়ে ছোটা লেড়কাটির নাম ছিল হুসেন।

সুলতানের তিন বেটা সুসজ্জিত বিশালায়তন প্রাসাদে ভোগ বিলাসের মধ্যে দিয়ে দিন গুজরান করতে লাগল। লেড়কাদের সঙ্গে একই প্রাসাদে তাদের এক মাসতুতো বোনও বাস করত। তার নাম ছিল নুর অল-নিহার। সে ছিল এক খুবসুরৎ লেড়কি। বুদ্ধিও ছিল তীক্ষ্ণ।

সুলতানের ইচ্ছা ছিল, নুর-এর উমর বাড়লে প্রতিবেশী কোন সুলতান-বাদশার লেড়কার সঙ্গে তার শাদী দেয়ার বন্দোবস্ত করবেন।

নূর-এর দেহে যৌবনের ঢল নামতে শুরু হলে সুলতান তাঁকে অন্দর মহলে চালান দিতে গিয়ে এক আজব ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝলেন, তার তিনটি লেড়কাই নূর-এর মহব্বতে পড়েছে। তিনজনই তাকে পেয়ার মহব্বৎ করে। এ-পরিস্থিতিতে এক লেড়কার সঙ্গে নূর-এর শাদী দিলে বাকী দুই লেড়কা গোস্‌সায় একদম ফেঁটে পড়বে। ভাইদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যাবে। অশান্তির চূড়ান্ত হবে। আর যদি অন্য কোন মুলুকের কোন লেড়কার সঙ্গে শাদী দেয়া যায় তবে সে-মুলুকের সঙ্গে বিবাদ শুরু হবে।

সুলতানের দিমাকে আসছে না কিভাবে উদ্ভুত এ-সমস্যা থেকে উৎরাবেন।

এক সকালে সুলতান তিন লেড়কাকেই তলব করলেন। তাদের বল্‌লেন—'শোন, তোমরা সবাই সমান। কারো সঙ্গে কারোরই তফাৎ নেই। তাই কারো পক্ষ নিয়ে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই বলছি কি, তোমরা বিবেচনা ক'রে দেখ, তোমাদের তিনজনের সঙ্গেই তো আর নূর-এর শাদী দেয়া যেতে পারে না। তাই কোশিস ক'রে কিছু না কিছু ফিকির বের করতেই হবে। কিভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবে নূর-এর শাদী দেয়া যেতে পারে। তোমরা যাতে এখন যেমন মিলে মিশে আছ ভবিষ্যতেও তেমন তোমাদের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক অটুট থাকে তার কোন না কোন ফিকির তো আমাকে করতেই হবে।

সুলতান এবার বল্‌লেন—'শোন, আমি এক বড়িয়া ফিকির বের করেছি। তোমরা তিন ভাই নিজেদের পছন্দ মাফিক তিন মুলুকে যাও। তোমরা আমার কাছে তোমাদের নিজনিজ হিম্মতের পরিচয় দেবে। তার পরিচয় দেবে তোমাদের কাজের মধ্য দিয়ে। যে কাজের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী আমাকে মুগ্ধ করতে পারবে তার হাতেই আমি খুবসুরৎ নূর'কে তুলে দেব।

কোষাগার থেকে মোহরের বস্তা বের করা হ'ল। খাজাঞ্চী সুলতানের লেড়কাদের নিজনিজ চাহিদা অনুযায়ী মোহর দিল।

সুলতানের তিন লেড়কাই সওদাগরের ছদ্মবেশে তিন মুলুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সুলতান তাদের বলে দিলেন, এক সাল বাদে, ঠিক এ দিনেই তারা যেন প্রাসাদে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে ভেট করে।

সুলতানের তিন লেড়কা গোড়ার দিকে একই সঙ্গে, একই দিকে যাত্রা করল। দিনভর পথ চলার পর তারা সন্ধ্যায় এক মুসাফির-খানায় হাজির হ'ল। এখান থেকে তিনটি সড়ক তিনদিকে বয়ে গেছে। এবার তারা তিন জন তিনটি সড়ক ধরে এগিয়ে যাবে।

রাত্রে খানা খেতে খেতে তিন ভাইয়া শলাপরামর্শ করল, তিনজন আলাদা আলাদা তিন মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়িয়ে এক সাল বাদে ফির মুসাফিরখানাতেই এসে এক সাথে মিলবে। ব্যস, তিনজন তিনটি সড়ক ধ'রে এগিয়ে চল্‌ল।

ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তিন মাহিনা বাদে সুলতানের বড়া লেড়কা আলী একদিন বিশালগড় মুলুকে হাজির হ'ল। এটি ভারতের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। সেখানকার এক মুসাফিরখানায় এক কামরা ভাড়া ক'রে বসবাস করতে শুরু করল। দিনভর শুয়ে বিশ্রাম করল। ক্লান্তি কিছুটা কাটলে সন্ধ্যার মুখে নগর দেখতে বেরলো।

নগরের কেন্দ্রস্থলে এক বাগিচা। তাতে একটি ফোয়ারা। হরেক কিসিমের ফুল আর ফলের বিচিত্র সমারোহ।

বাগিচার গায়েই দোকান-পসার। ভারতীয় দ্রব্য সামগ্রী বেচার কেন্দ্র। আলী সামানপত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়।

আলী এখানে পরদেশী। সদ্য এসেছে। তার বাৎচিৎ-ই কেবল নয়, চলাফেরা ভাবগতিক দেখে সবাই বুঝতে পারে মোটেই সে এ-মুলুকের আদমি নয়। এক কারবারীর সঙ্গে তার জানপরিচয় হ'ল। সে আলী'কে সঙ্গে নিয়ে নিজের মকানে গেল। বাইরের কামরায় তাকে বসিয়ে নিজে চলে গেল অন্দর মহলে।

আলী খোলা জানালা দিয়ে দেখল, সড়ক দিয়ে এক ফেরিওয়ালা গালিচা ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে। সে হাঁকছে—গালিচা নেবে? গালিচা। আজব এক গালিচা। পানির দরে বেচে দেব। মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা দিলেই গালিচাটির মালিক হওয়া যাবে।

আলী গালিচাটির দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—'ইয়া আল্লাহ! ফেরিওয়ালাটি বলে কি! ত্রিশ হাজার টাকা সামান্য একটি গালিচার দাম! এটি পেতে বড়জোর নামাজ পড়া যেতে পারে। দুনিয়ার সেরা পারস্যের গালিচা হলেও তামাম একটি কামরা জোড়া হয়ে যাবে ত্রিশ হাজার টাকা দাম দিয়ে গালিচা কিনলে।

আলী ফেরিওয়ালাটিকে হাতের ইশারা করে কাছে ডাকল। হাত দিয়ে গালিচাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে বল্‌ল—'তুমি কি খদ্দেরদের আহাম্মক পেয়েছ? এমন কি বাহারী তোমার গালিচাটি, বলতো? এরই দাম একদম ত্রিশ হাজার হেঁকে বসছ! তবে নির্ঘাৎ তোমার গালিচাটির অন্য কোন বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে, কি বল?'

—'হ্যাঁ, মিঞা, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। যাদু-গালিচা। এর ওপর ব'সে আপনি যেখানে দিল্ চায় চলে যেতে পারবেন। ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রস্থলে চলে যান, আপত্তি নেই। ফিন হিমালয় পর্বতের মাথায় যদি যেতে চান তা-ও পারবেন। নদী, নালা, দরিয়া বা পাহাড় অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা, প্রমাণ দাও। যদি তোমার বাৎ যে সাচ্চা তা প্রমাণ করতে পার তবে ত্রিশের পরিবর্তে চল্লিশ হাজার টাকাও আমি হাসিমুখে দিয়ে দেব।'

—'মিঞা, আগে দিতে হবে না। যদি এক চল্লিশ হাজার দিনার

আমাকে দেখাতে পারেন তবে এক লহমার মধ্যেই আপনাকে এক আজব খেলা দেখাতে পারব।'

—'দেখাতে তো কিছুমাত্র আপত্তি বা অসুবিধা কোনটাই ছিল না। লেকিন আমার সঙ্গে তো আর দিনারের থলে নেই। মুসাফির-খানায় গেলে জরুর তোমাকে দেখাতে পারব। আমার সঙ্গে চল। আমার পছন্দ্ হয়ে গেলে এক হাতে তোমার দাম চুকিয়ে দেব, অন্য হাতে মাল নেব, যাবে?'

—'মুসাফিরখানা?' ইয়া আল্লাহ! সে তো অনেক পথ সাহাব!' তা যদি যেতেই চান, পয়দল বা ঘোড়ার পিঠে গিয়ে তকলিফ করার দরকার কি? আসুন, আমার গালিচায় বসুন। এক লহমায় পৌঁছে যাব। গালিচার ওপরে বসে আপনি আপনা আপনি স্মরণ করুন। ব্যস, জায়গা মাফিক পৌঁছে যাবেন।'

আদতেও তা-ই হ'ল।

সে ফেরিওয়ালার পাশে গালিচাটির ওপরে বসল। তার মুসাফিরখানার কামরাটির ব্যাপারে ভাবতে লাগল। ব্যস! চোখ চেয়ে দেখে তার কামরায় পৌঁছে গেছে।

আলী আর একটি বাৎ-ও বল্ল না। এক চল্লিশ হাজার টাকা চুকিয়ে দিয়ে গালিচাটি নিয়ে নিল।

আলী ভাবল, এত পথ পাড়ি দিয়ে, এত তকলিফ সহ্য ক'রে ভারতের মিট্টিতে আসা সার্থক হয়েছে। এমন আজব বস্তু তার অন্য দুই ভাই কি করে সংগ্রহ করবে। অসম্ভব। বিলকুল অসম্ভব ব্যাপার। তারা দুনিয়ার যে-মুলুকেই যাক না কেন। অতএব সে-ই বাজী মাৎ করবে। খুবসুরৎ, বেহেস্তের হুরী নুর তার বিবি না হয়েই যায় না।

নয়া এক সমস্যা তার দিমাকে চক্কর মারতে লাগল। এক মাস বাদে মুলুকে গিয়ে তার আব্বাজীর সামনে সব ভাইকে হাজির হতে হবে, মাত্র তিন মাহিনা পার হয়েছে, পুরো নয়টি মাহিনা এখনও বাকী। এতদিন কোথায়, কিভাবে সে গুজরান করবে?

সে টুঁড়ে টুঁড়ে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে তৃপ্তি-লাভ করতে লাগল। নগর জুড়ে হিন্দুদের কারুকার্যমণ্ডিত বহুৎ মন্দির রয়েছে। এক এক ক'রে সব দেখে মুগ্ধ হতে লাগল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব মূর্তি। কোনটি পাথরের, কোনটি বা পিতলের তৈরী। সকাল ও সন্ধ্যায় হরেক কিসিমের বাদ্যযন্ত্র ও ঘন্টাধ্বনি হয় যা দিলে বিশেষ খুশীর সঞ্চার করে, হাজার হাজার ভক্ত মন্দিরে আসে। ভক্তি ভরে পূজা দেয়। পুরোহিত দক্ষিণা পায়, প্রণামী লাভ করে আশীর্বাদ করে।

এক আজব ব্যাপার তাকে বিস্মিত করল। সব পুরোহিত মাস-মাহিনা পায় না। ভক্তদের প্রণামীতেই পুরোহিতদের সংসার চালাবার একমাত্র ফিকির।

ভারতবর্ষে, হিন্দুদের মাসভর পূজা-অনুষ্ঠান লেগেই আছে। মেলার বন্দোবস্তও আছে। সওদাগর, দোকানী এসে এক-জায়গায় ভিড় জমায়। খরিদ্দাররা এসে-পছন্দ্ মাফিক মাল খরিদ করে। ছোটা-বড়া হরেক কিসিমের বস্তু মেলায় কেনা-বেচা হয়। খানার বন্দোবস্তও থাকে।

সাল ঘুরতে আরও কিছুদিন বাকী। আর বাকীদিনগুলি সরাই-খানাতেই গুজরান করে দেবে মনস্থ করল।

এদিকে আলী-র দ্বিতীয় ভাই হাসান এমুলুক-সেমুলুক ঢুড়ে হাজির হ'ল পারস্যে। সঙ্গে তার এক নফর রয়েছে। নফরটিকে নিয়ে এক মুসাফিরখানায় তারা হাজির হ'ল। একটি বড়-সড় কামরা ভাড়া করল। সেদিন সন্ধ্যার আগেই হাসান নগর দেখতে বেরিয়ে পড়ল। তার সঙ্গী নফরটি রইল মুসাফিরখানাতেই। এক সওদাগরের সঙ্গে তার খাতির জমে যায়। সে সওদাগরটির দোকানে বসে বাৎচিৎ করছে। এমন সময় সামনের সড়ক দিয়ে এক ফেরিওয়ালাকে যেতে দেখল। একদম বুড্ডা। তার হাতে ছোট্ট একটি হাতীর দাঁতের চোঙ। সেটির সাহায্যেই সে হাঁকাহাঁকি করছে—একদম পানির দাম। মাত্র ত্রিশ হাজার দিনার দিলেই দিয়ে দেব। এমন আজব বস্তু তামাম দুনিয়ায় টুঁড়েও দ্বিতীয়টি মিলবে না। একদম পানির দামে বিকিয়ে দেব। মাত্র ত্রিশ হাজার দিনার। মাত্র ত্রিশ হাজার।'

হাসান সওদাগরকে বল্ল—'সওদাগর সাহাব, ফেরিওয়ালা বুড্ডাটি উন্মাদের মাফিক চিল্লিয়ে চলেছে। ধান্দাবাজী করার আর জায়গা পায় নি।'

—'সাহাব, বুড্ডা ধান্ধাবাজ নয়। আদতে সে একদম সাচ্চা আদমি। খেলনা, পুতুল ফেরি করে। কাউকে এক দিরহামও ঠকিয়েছে বলে তো আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি। আদতে তার পেশা আজব ও দামী সামানপত্রের দালালী করা। দালালী যা পায় তা-

ই সংসার চালাবার একমাত্র উপায়।

হাসান উঠে গিয়ে হাতের ইশারা ক'রে বুড্ডাকে ডাকল। বুড্ডা কাছে গিয়ে মুচকি হেসে সালাম ঠুকল।

হাসান বল্‌ল—'কি গো মিঞা, তোমার হাতের চোঙটি এমন কি এক আহামরি সামগ্রী? হতে পারে হাতীর দাঁতের তৈরী। এর এমন কোন্ গুণ আছে যার জন্য ত্রিশ হাজার দিনার দাম হেঁকে বসেছ?'

—'সাহাব, এটুকু ভরসা রাখতে পারেন। ঠকিয়ে একটি কানাকড়িও নেয়ার ধান্ধা করব না। আদতে আমার মালিক বার বার বলে দিয়েছেন, চল্লিশ হাজার দিনারের কমে যেন না বেচি। লেকিন সমস্যা হচ্ছে, সকাল থেকে চিল্লিয়ে তামাম শহর ঢুঁড়ে বেড়ালাম। কেউ হাত দিয়ে সামানটি দেখলও না। আদৎ জিনিসের কদর তো সবাই বোঝে না।'

—'মিঞা সাহাব, তোমার সামানটির এমন কোন্ আজব গুণ আছে, বলতো?'

—'সাহাব, এ-চোঙটি চোখে লাগিয়ে আপনি যা দেখতে চাইবেন তা-ই দেখতে পাবেন। বিশোয়াস না হয় একবারটি চোখে লাগিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমার বাৎ সাচ্চা কি ঝুটা।'

বুড্ডা ফেরিওয়ালার বাৎ শুনে হাসান-এর গভীর কৌতূহল হ'ল। তার বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য চোঙটি হাতে নিয়ে চোখে লাগাল। এবার তার কলিজা, তার জান অল-নিহার'কে দেখার জন্য তার মুখটি ভাবতে লাগল। ব্যস, এক লহমার মধ্যেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার মেহেবুবার খুবসুরৎ মুখটি। তার দেহ-দিল্ বিস্ময়-রোমাঞ্চে একদম ভরপুর হয়ে গেল। সে চোঙটি চোখ থেকে নামিয়ে বল্‌ল—'মিঞা, আমার সঙ্গে তো এত দিনার নেই। আমি মুসাফিরখানায় উঠেছি। একটু তকলিফ ক'রে আমার সঙ্গে গেলে আপনার বাঞ্ছিত দাম চুকিয়ে দিতে পারি। ত্রিশ নয় পুরো চল্লিশ হাজারই পাবেন। তার ওপরে, তোমার দস্তুরি হিসাবে আরও এক হাজার্ দিনার দিয়ে দেব, রাজী?'

বুড্ডাটি মুখে কিছু না বলে হাঁটতে শুরু করল।

হাসান মুসাফিরখানায় এসে বুড্ডাকে পুরো এক চল্লিশ হাজার দিনার চুকিয়ে দিয়ে হাতীর দাঁতের চোঙটি খরিদ ক'রে নিল। এবার পারস্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঢুঁড়ে বেড়িয়ে পূর্ব-নির্দিষ্ট মুসাফিরখানায় হাজির হ'ল। তার বড়াভাইয়া আলী গালিচাটি নিয়ে সেখানেই হাজির ছিল।

এবার সবচেয়ে ছোটা ভাইয়া হুসেন-এর ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। সে অন্য দুই ভাইয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এ নগর সে নগর ঢুঁড়ে হাজির হ'ল সমরখন্দে। সে এক ফেরিওয়ালাকে পেল্লাই একটি আপেল ফেরি করতে দেখে কৌতূহল হয়ে আপেলটি সম্বন্ধে জানতে চাইল। ফেরিওয়ালাকে পুছতাছ করে জানতে পারল আপেলটি নাকি গাছে ফলে নি। এক বৈজ্ঞানিক এর সৃষ্টিকর্তা। আর দামের ব্যাপারে বল্‌ল, মাত্র ত্রিশ হাজার দিনার।

—'ত্রিশ হাজার দিনার। ইয়া আল্লাহ! যত পেল্লাই হোক না কেন আর এর মধ্যে যতই কারিগরী ব্যাপার স্যাপার থাক না কেন, ত্রিশ হাজার দিনার এক আজব ব্যাপার। ফালতু মস্করা সে পছন্দ্ ক'রে না এমনও বল্‌ল।

—'মস্করা! সাহাব মস্করা করতে যাব কেন? আপনার সঙ্গে আমার জান পহছান থাকলে না হয় তবু মস্করার ব্যাপার আসত। আমার আপেলের গুণাগুণ আছে বলেই না আকাশ ছোঁয়া দাম আমি চাইতে পারছি। আপনি মেহেরবানি ক'রে একবারটি আঘ্রাণ নিন তবেই মালুম হবে কেন আমি—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে হুসেন ব'লে উঠল—'ধুৎ, তুমি দেখছি মস্করা করেই যাবে মিঞা। আপেলের আঘ্রাণেই—খাওয়ার দরকার হবে না?'

—'না, হুজুর খাওয়ার দরকার হবে না, আঘ্রাণেই কাজ হবে। শুধু পেটই ভরবে না, সে সঙ্গে শরীরের বিলকুল ক্লান্তি ও অবসাদ কেটে সে শরীর একদম ঝরঝরে হয়ে যাবে। কি ব্যাপার-সাহাব, তাজ্জব বনলেন নাকি? বহুৎ আচ্ছা প্রমাণ হাতে হাতেই দিয়ে দিচ্ছি।' ঠিক সেই মুহূর্তে এক গাট্টাগোট্টা আদমি এক কুষ্ঠরোগীকে ঝোলায় ক'রে পিঠে বহন ক'রে সে-সড়ক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ফেরিওয়ালাটি কুষ্ঠ রোগীটির নাকের কাছে আপেলটি ধরতেই সে তড়াক্ ক'রে ঝোলা থেকে লাফিয়ে সড়কে খাড়া হয়ে পড়ল।

ব্যাপার দেখে হুসেন তো বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। তার দেহের কোথাও কুষ্ঠের চিহ্নমাত্রও নেই।

হুসেন খুশীতে ডগমগ হয়ে ভাবতে লাগল—'এমন অত্যাশ্চর্য এক বস্তু যদি তার কব্জায় থাকে তবে তার ভাইয়াদের সহজেই সে টিট ক'রে দিতে পারবে। তারা এর সমান গুণ সম্পন্ন কোন বস্তু তামাম দুনিয়াটি ঢুঁড়ে এলেও জোগাড় করতে পারবে না।'

আর মুহূর্তমাত্রও দেরী না ক'রে হুসেন ফেরিওয়ালাটিকে সঙ্গে ক'রে মুসাফিরখানায় হাজির হ'ল। ত্রিশ হাজারের পরিবর্তে নগদ চল্লিশ হাজার দিনার তাকে বুঝিয়ে দিল। আর এক হাজার দিনার তাকে বক্‌শিস দিল।

ইতিমধ্যে বৎসর পূর্তি হতে আর দেরী নেই। সে বিশালায়তন আলৌকিক আপেলটি নিয়ে সে মুসাফিরখানায় হাজির হ'ল। দেখল, তার বড়া ভাইয়ারা আগেই সেখানে হাজির রয়েছে।

তিন ভাইয়া একত্রিত হ'ল। খুশীভরা দিল্ নিয়ে এক সঙ্গে বসে খানাপিনা সারল।

খানাপিনা সেরে তারা একটি কামরায় জড়ো হ'লো। আলী তার

যাদু-গালিচাটির গুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলল। অন্য দু'ভাইয়াকে গালিচাটির ওপর বসিয়ে শূন্য পথে নদী-দরিয়া-পাহাড় ডিঙিয়ে এক মুলুকে হাজির হ'ল। কয়েক লহমার মধ্যে ফিন ফিরে এল।

এবার তার পরের ভাইয়া হাসান তার হাতীর দাঁতের চোঙটি বের ক'রে বল্‌ল—'এতে চোখ রেখে দুনিয়ার যেকোন বস্তু ও আদমিকে স্মরণ করলে তাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে যাবে।'

সে নিজেই চোখের সামনে চোঙটি ধরে বিলাপ পেড়ে কান্না জুড়ে দিল। শ্লেষ্মা জড়িত কণ্ঠে বল্‌ল—'কার জন্য আমরা এত তকলিফ ক'রে এসব জোগাড় করছি? নূর রোগ শয্যায়! মালুম হচ্ছে, তার হালৎ এমন হয়ে গেছে যে, ইন্তেকাল হ'ল বলে!'

বড়া ভাইয়া আলী তার বক্তব্য যাচাই করার জন্য চোঙটি নিয়ে চোখে ধরতেই চমকে ওঠে। সে বলে উঠল, আর এক লহমাও দেরী করা সঙ্গত হবে না। চল, আমাদের মুলুকের দিকে যাত্রা করা যাক।'

তিন ভাইয়া যাদু-গালিচায় চেপে প্রাসাদে হাজির হ'ল। দেখল, নূর বিছানার সঙ্গে একদম মিশে গেছে। গলা দিয়ে রা পর্যন্ত বেরোচ্ছে না। একদম বেহুঁস হয়ে এলিয়ে পড়ে রয়েছে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি বন্ধ করলেন।

আটশ দশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—' জাঁহাপনা, হাসান রুগ্‌ণা নূর-এর নাকের সামনে বিশালায়তন আপেলটি ধরতেই সে ঝটকরে উঠে বসে পড়ল। একদম সুস্থ-স্বাভাবিক।

এবার তিন ভাইয়া হাত ধরাধরি ক'রে সুলতানের কামরায় গেল। তারা তিনজনই নিজ নিজ বস্তুর অলৌকিক গুণাবলী হাতে নাতে প্রমাণ ক'রে দেখাল।

সুলতান এবার সাচমুচ বড়ই মুশিবতে পড়ে গেলেন। কোন লেড়কাকেই ছোটা ক'রে দেখতে পাচ্ছেন না। নূর'কে তো তিন লেড়কার হাতে দেয়া যায় না। তাই তিনি স্থির করলেন, তাদের আর একটি পরীক্ষা নেবেন।

তিন লেড়কাকে নিয়ে সুলতান এক পোলোখেলার ময়দানে হাজির হলেন। তিনি তাদের সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—'তোমাদের প্রত্যেককে তীর ছুঁড়তে হবে। যার তীরটি সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়বে, সে-ই নূর'কে লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। দেখা গেল, হাসান-এর তীরটিই সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়েছে। সুলতান হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মুসকিল আসান হ'ল। মাথা থেকে বোঝা নেমে গেল। হাসান নূর'কে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করায় বাকী দু'ভাইয়াকে সুলতান বল্‌লেন—'তোমরা ব্যাপারটিকে হাসিমুখে মেনে নাও। কোন খেদ রেখো না।'

আলী হতাশায় জর্জরিত হয়ে পড়ল। সে সুলতান'কে বল্‌ল—'আব্বাজী আপনার তখ্‌তে আমার কোন লালসা নেই। সুলতানিয়তের মায়া কাটিয়ে আমি দরবেশের সাজ-পোশাক পরে

প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' সে সাচমুচ বিবাগী হয়ে প্রাসাদ ছাড়ল।

সুলতানের ছোটা লেড়কা হুসেন প্রাসাদ ছাড়তে পারল না। তার ভেতর একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তীর ছোড়ার প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করার পর থেকেই কাজ ক'রে চলেছে। আদতে নাকি তার তীরটি কিছু বেশি দূরে গিয়েছিল। হাসান-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক'রে সুলতান তাকে বিজয়ী ঘোষণা করছেন। আদতে হুসেন-এর তীরটি নজরের বাইরে চলে গিয়েছিল। লেকিন সুলতান হাসান-এর তীর আরও বেশী দূরে চলে গেছে বলে রায় দিয়ে তাকে বিজয়ী ঘোষণা ক'রে দিলেন।

হুসেন বদ্ধপরিকর, সে-তীরটির তল্লাশ ক'রে বের করবেই। হুসেন তল্লাশ করতে করতে পাহাড়ের গা পর্যন্ত চলে গেল্ল। তীরটির হদিস পেল না। অনন্যোপায় হয়ে সে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সামান্য উঠতেই এক নিশানা পেয়ে সেদিকে ধাওয়া করল। কিছুদূর গিয়ে এক দরওয়াজার সামনে হাজির হ'ল। দরওয়াজাটি বন্ধ। তার পাল্লার গায়ে তার তীরটি গেঁথে রয়েছে দেখতে পেল। সে নিজেই বিলকুল তাজ্জব বনে গেল। তার তীরটি

কি ক'রে এতদূরে এসে দরওয়াজায় গেঁথে গেল! তীরটি টেনে খুলতেই দরওয়াজাটি খুলে গেল। সে-মুহূর্তেই তার সামনে হাজির হ'ল এক খুবসুরৎ লেড়কি। একে খুবসুরৎ তার ওপর ঝলমলে সাজপোশাক গায়ে রয়েছে। অতএব সে শাহজাদী না হয়ে যায়-ই না।

লেড়কিটি হাসান'কে তাজ্জব ক'রে দিয়ে বল্‌ল—'শাহজাদা হুসেন কেমন আছেন?'

হুসেন চোখ দুটো বিলকুল কপালে তুলে বল্‌ল—'কী তাজ্জব ব্যাপার! আমার নাম যে হুসেন, জানলেন কি ক'রে? কে আপনি, বলুন তো?'

লেড়কিটি মুচকি হেসে তার হাতদুটো ধরে বল্‌ল—'আগে ভেতরে চলুন, পরে সবই জানতে পারবেন। ভেতরে নিয়ে গিয়ে পাশে বসিয়ে লেড়কিটি বল্‌ল—'শুনুন শাহাজাদা, আমার পরিচয়, আমি জিন-সম্রাটের লেড়কি, আমার আর তোমার নসীবে আমাদের মিলনের ব্যাপারই লেখা আছে। তোমার তীরটিকে আমিই এখানে, দরওয়াজায় গেঁথে রেখেছিলাম। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, তুমি তীরটির তল্লাশ করতে করতে এখানে হাজির হবেই। তোমরা, তিন ভাইয়া, যাদু-গালিচা, হাতীর দাঁতের চোঙ, আর অলৌকিক হিম্মৎওয়ালা আপেলও সংগ্রহ ক'রে এনেছিলে। এখন তোমার লক্ষ্য কি? তোমার তীরটি বুকে গেথে জান খতম ক'রে দেবে কি?'

জিন-সম্রাটের লেড়কি এবার সরবে হেসে ব'লে উঠল—'শাহজাদা, আমার দিকে চেয়ে দেখ তো, তোমার বহু আকাঙ্ক্ষিতা নুর-এর চেয়ে আমার সুরৎ কি সাচমুচ কমতি? আমাকে কি তোমার পছন্দ্‌ নয়? তোমার যদি মত থাকে তবে আমাকে শাদী ক'রে সংসারী হতে পার।'

—'আমি রাজী হলেই কি আর আমাদের শাদী হয়ে যাবেই? তোমার আব্বার মতও তো জরুর নিতে হবে।'

—'আরে ধ্যুৎ, আমিই আমার অভিভাবক। আমার আব্বা বা আম্মার মত আমার ওপরে খাটে না। তাঁরা খাটাতে চানও না।'

লেড়কিটি এবার হুসেন'কে দু'হাতে ধ'রে নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে নিল। বার বার চুম্বন করল।

এবার খিল খিল ক'রে হেসে বল্‌ল—' কি বুঝলে? চুম্বনের মাধ্যমেই আমাদের শাদীর পাট চুকে গেল। ব্যস, এখন থেকে আমরা স্বামী আর বিবি বনে গেলাম।'

রাত্রে খানাপিনা সেরে জিন সম্রাটের লেড়কি হুসেন'কে নিয়ে পাশের কামরায় গেল। বাসর। সেখানেই তারা মধুযামিনী যাপন করল।

দু'মাহিনা দেখতে দেখতে কেটে গেল। হুসেন নিজের আব্বা, আম্মা আর প্রাসাদের অন্যান্যদের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করতে লাগল। জিনিয়াহ তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে চোখের পানি ঝরাল। তাকে ছাড়তে কিছুতেই দিল্ চাইল না। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনদিনের জন্য তাকে ছাড়ল। বিদায় মুহূর্তে জিনিয়াহ চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'এক বাৎ ইয়াদ রেখো, তোমার আব্বা আর আম্মাকে যেন ভুলেও বোলো না এক জিন-লেড়কিকে তুমি শাদী করেছ। তাদের বোলো তোমার জন্য যেন তারা না ভাবেন। ব্যস, আর কিছু বোলো না।'

হুসেন প্রাসাদে ফিরে এল। বহুৎ দিন বাদে লেড়কাকে ফিরে পেয়ে সুলতানের চোখে পানি দেখা দিল। খুশীর পানি।

হুসেন বল্‌ল—'আব্বাজান, আমি এক আজব কাজ করে ফেলতে পেরেছি, আমার দিল্ থেকে নুর'কে মুছে ফেলতে পেরেছি বটে। সে এখন আমার বড়া ভাইয়ার বিবি। তার সম্বন্ধে কিছু ভাবতে বসাও গুণাহ। যাক গে, আমার জন্য ঝুট মুট ভেবো না।

আমি বহুৎ আচ্ছাই আছি। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি, আপনি ঘাবড়াবেন না। সাচ্চা বাৎ কি জানেন? আমি এক আদমির কাছে হলফ করে এসেছি। আমার ঠিকানা? তবে, আপনি নিশ্চিত জানবেন, আমি মাঝে-মধ্যে এসে আপনাকে আর আম্মাকে দেখে যাব।'

চতুর্থ দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই হুসেন তার বিবি জিনিয়াহ-র কাছে ফিরে এল।

আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে হুসেন ও জিনি-র দিন গুজরান হতে লাগল। এক মাহিনা বাদে হুসেন-এর খেয়াল হ'ল সে আব্বার কাছে কসম খেয়ে এসেছিল, ফি মাহিনায় একবার ক'রে অন্তত তাঁকে দেখা দিয়ে আসবে।

হুসেন এল প্রাসাদে আব্বার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। এদিকে সুলতানের দরবারের কিছু কুচক্রী সুলতানকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল—'শাহজাদা যে সব সাজ পোশাক পরে এসেছেন তা তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও কোন আমীর-উজীর তো দূরের ব্যাপার সুলতান-বাদশাহের কাছেও মিলবে না। আর এক বাৎ, আপনি তার আব্বা, আপনার কাছে তার ঠিকানাই বা ছিপাচ্ছে কেন? আমাদের বিশ্বাস, তার কাম কাজের পিছনে কোন না কোন গূঢ় রহস্য রয়েছে।'

অন্য এক পারিষদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, গুস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা, আর এক ব্যাপার লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, শাহজাদার সঙ্গে যে সফেদ নফর-নোকর এসেছে তার সাজ পোশাকও রীতিমত ঝলমলে। যতই ধুলো-বালি ঘাটুক একতিলও ময়লা লাগছে না। আর সব মিলিয়ে মালুম হচ্ছে, শাহাজাদা বেশী দূরে ঘাঁটি গাড়েন নি।' বৃদ্ধ উজিরও তাদের মন্তব্যেই সায় দিল।

সুলতানের মধ্যে গোস্‌সার ছাপ ফুটে উঠল—'আমার ঠিক মালুম হচ্ছে না তোমরা কি বলতে চাইছ। তোমাদের বক্তব্য খোলসা করে বল।'

উজির হাত কচলে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আমাদের দৃঢ় বিশোয়াস, শাহজাদা আমাদের নগরের একদম কাছে কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন, একটু তল্লাশ করলেই ব্যাপারটির ফয়সালা হয়ে যেতে পারে। মেহেরবানি করে গোস্‌সা করবেন না। শাহজাদা বোধ করি গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। অতি শীঘ্রই সে আপনাকে তখত্ থেকে নামিয়ে নিজে সুলতান হয়ে বসার ধান্ধায় রয়েছে, বিশোয়াস করতে পারেন।'

—'হতেই পারে না। এ বিলকুল অসম্ভব। আমার বেটাকে আমার চেয়ে বেশী কেউ চেনে না, আমার হুসেন এরকম জঘন্য কাজ করতে পারে না, এ তোমাদের দুর্বল দিলের ফসল।'

—'জাঁহাপনা, খোদাতাল্লা-র মর্জিতে আপনার মন্তব্যই যেন

সাচ্চা হয়। আর এক ব্যাপার নিয়ে ভাবতেই হয়। নূর-অল-নাহার তার এক সময় দিল্‌কা টুকরা ছিল। সে অনায়াসে তার দাবী ছেড়ে দিল। লেকিন তার দিল্ ব্যাপারটিকে সহজে মেনে নিতে চায় নি। তারপরই সে গা-ঢাকা দিল। যদি কোন গূঢ় রহস্য না থাকত তবে সে জরুর আপনার মুখোমুখি হয়ে নিজের মত ব্যক্ত করত। এখন কিন্তু সে আপনার চেয়ে ঢের, ঢের বেশী ধন-দৌলতের অধিকারী। মোদ্দা বাৎ, তার গায়ে যে যে সাজ পোশাক রয়েছে তার দামই আপনার ধনভাণ্ডারের ঐশ্বর্যের চেয়েও বেশী। জাঁহাপনার দিল্ একদম সাদা, সহজ সরল। সহজ কোন কিছুকে কুটবুদ্ধি দিয়ে দেখতে পারেন না। আদতে কিন্তু সে ঐশ্বর্যের ব্যাপারটি আপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়। ধন-দৌলত ছড়ালে তামাম দুনিয়া হাতের মুঠোয় চলে আসে, মানেন তো? আপনাকে তখ্ত থেকে নামিয়ে দিয়ে তখ্তে বসে পড়া তার পক্ষে কিছুমাত্রও কঠিন ব্যাপার নয়।'

—'একী বলছ উজির, আমার হুসেন কখনই এমন কাজ করতে পারে না।'

—'লেকিন জাঁহাপনা, ইতিহাসে যে এরকম নজীরও কম নয়।'

—'উজির, এরকম মন্তব্য ক'রে আমার দিমাক গড়বড় ক'রে দেয়ার কোশিস কোরো না। আমার হুসেন -এর দিল্ কখনই এমন হতে পারে না, তোমাদের অনুমান ভ্রান্ত—বিলকুল ঝুটা। তবে আমি এ-ব্যাপারে জরুর সজাগ থাকব।'

উজির ও অন্যান্য পারিষদরা সুলতানকে কুর্নিশ ক'রে, সেদিনের জন্য বিদায় নিল, একটু বাদে শাহজাদা হুসেন সুলতানের কাছে এসে যথোচিত সম্ভাষণ সেরে তার শরীর ও মেজাজ-মর্জির সমাচার জানতে চাইল।

লেড়কাকে কাছে পেয়ে সুলতানের দিল্-কলিজা খুশীতে ভর পুর হয়ে উঠল। তার সহজ-সরল ও নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতান স্বগতোক্তি করলেন—উজির ও অন্যান্য পারিষদরা তার প্রতি সন্দেহ পোষণ ক'রে অবিচারই করছে।

সুলতান লেড়কাকে বিশোয়াস করলেও উজির ও পারিষদদের উক্তিকে একদম দিল্ থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। বরং অবাঞ্ছিত এক খুঁৎ খুঁতানি তার মধ্যে কাজ ক'রে চলেছে। ফলে পরদিন সকালে এক বুড্ডি যাদুকরকে তলব ক'রে প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

বুড্ডি যাদুকরী এলে সুলতান বল্‌লেন—'শোন বুড্ডি, আমার লেড়কা এ-নগরেরই ধারে-কাছে কোন এক গোপন ডেরায় বাস করছে। লেকিন সে আমাকে কিছুতেই তার পাত্তা বলল না, তোমার যাদু-বিদ্যা প্রয়োগ করে এ কাজটি ক'রে দিতে হবে।'

বুড্ডি যাদুকরী সুলতানকে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা,

আমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে আপনি নাকে তেল দিয়ে নিদ যেতে পারেন।'

এক মাহিনা প্রাসাদে আব্বার সঙ্গে কাটিয়ে তার বিবি জিন-এর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করল।

কিছু দূর যেতে না যেতেই দেখল, এক বুড়ি পথের ধারে পড়ে বিমারির জ্বালায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। হুসেন ঘোড়া থামাল। বুড়ির কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কি গো বুড়ি, কে তুমি? যাবে কোথায়?'

—'নগরে যাব। লেকিন যাই কি করে ভাবছি। ব্যথা-বেদনায় একদম অস্থির হয়ে পড়েছি।'

হুসেন তাকে সঙ্গে ক'রে প্রাসাদে নিয়ে গেল। পাহাড় -প্রাসাদে। প্রাসাদে এক নফরকে দিয়ে হেকিমকে তলব দিল। অভিজ্ঞ হেকিম তার দাওয়াইয়ের ঝোলা নিয়ে ছুটে এল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দাওয়াইয়ের বন্দোবস্ত দিল।

জিনিয়াহ নিজে বুড়ির সেবা শুশ্রূষায় হাত লাগাল।

সেদিনই হুসেন'কে জিনি বল্‌ল —'শোন, আমি মন্ত্রবলে বুড়ির দুরভিসন্ধির ব্যাপার জানতে পেরেছি। তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ফিকিরও আমি করে রেখেছি। তোমার তিলমাত্র ক্ষতিও সে করতে পারবে না।'

জিনি'র এক সহচরী এক পেয়ালা পানি এনে বুড়িকে দিয়ে বল্‌ল—'পানিটুকু খেয়ে নাও, দাওয়াই থেকে বহুৎ আচ্ছা ফল পাবে। তোমার বিমারি এক লহমায় সেরে যাবে। সিংহ ঝর্নার পানি, যেকোন বিমারি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।'

বুড়ি পানিটুকু গলায় ঢেলে দিল। ব্যস, ঝট করে লাফিয়ে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ল।

পরিচারিকাটি বুড়িকে এক বিশালায়তন সুসজ্জিত কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে বহুমূল্য মণি মাণিক্য খচিত এক তখ্‌তে জিনি বসে। তার মুখে হাসির ঝিলিক। বুড়ি জিনি'কে কুর্নিশ জানাল। বল্‌ল—'আপনার পরিচারিকাদের অকৃত্রিম সেবা ও আপনার প্রেরিত দাওয়াই খেয়ে আমার বিমারি একদম সেরে গেছে, এখন আমাকে আমার মকানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

—'আপনি যদি প্রকৃতই নিজেকে সুস্থ বোধ করেন তবে আপনার দিল্ যা চায়, যা মর্জি হয় তা-ই করতে পারেন।'

বুড়ি যাদুকরী কামরাটির চারদিকে চোখ বুলিয়ে ভাবতে লাগল এত ধন দৌলত জেনানাটি কি ক'রে সংগ্রহ করল। তামাম দুনিয়ার ধন দৌলত একাট্টা করলেও বোধ হয় এমন ক'রে আর একটি প্রাসাদ বানানো যাবে না।

বুড়ি আরও দু'-চারদিন জিনি-র আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তার প্রাসাদে কাটাল।

এক সকালে-জিনি-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুলতানের প্রাসাদে ফিরে গেল। সুলতানের নিকট জিনি-র ধন দৌলতের বিস্তারিত বিবরণ দিল।

বুড়ির মুখে বিলকুল সমাচার শুনে উজির ও অন্যান্য পারিষদরা আতঙ্কিত হয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আশা করি এখন আপনি স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন, আমাদের আশঙ্কাই সাচ্চা বটে। আপনি কিন্তু কালসাপ নিয়ে খেলায় মেতেছেন। এখনও সময় আছে, নিজের দিলকে শক্ত করুন, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে শাহজাদাকে কয়েদখানায় আটক ক'রে দিন। অন্যথায় আপনাকেই সে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে ছাড়বে,. ইয়াদ রাখবেন।'

ইতিমধ্যে শাহজাদা হুসেন প্রাসাদ ছেড়ে গেছে এক মাহিনা পূরণ হয়ে গেল।

শাহজাদা হুসেন প্রাসাদে এল নিয়মমাফিক তার আব্বার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

আব্বাকে কুর্নিশ ক'রে তার তবিয়তের সমাচার জানতে চাইল।

সুলতান তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন—'বেটা, জানতে পারলাম তুমি তোমার গরীব আব্বার চেয়ে ঢের বেশী বড় হয়েছ। মোদ্দা বাৎ, এখন তোমার হিম্মৎ আমাকে টেক্কা দিতে পারে। এ জরুর আমার পক্ষে খুশীর ব্যাপার। তোমার কাছে আমি একটি উপহার মাঙছি। লড়াই করতে গিয়ে বড়িয়া এক তাঁবুর অভাব বোধ করি, তুমি আচ্ছা একটি তাঁবুর বন্দোবস্ত যদি করে দাও খুশী হ'ই।'

—'আব্বাজান, আপনার সামান্য আব্‌দার আমি জরুর পূরণ করব। তাঁবুর ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

প্রাসাদ ছেড়ে জিনি-র কাছে গিয়ে হুসেন বল্‌ল —'বিবিজান, আমার আব্বা আমার কাছে একটি তবু আব্দার করেছেন।'

জিনিয়াহ সবিস্ময়ে বল্‌ল—'তাঁবু, একটি মাত্র তাবু? দুনিয়ায় এত কিসিমের আচ্ছা আচ্ছা সামানপত্র থাকতে তিনি সামান্য একটি তাঁবুর আব্দার করেছেন! বহুৎ আচ্ছা। আমি এখনই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

গোটা একটি সেনাবাহিনী যাতে এক সঙ্গে শুয়ে আরাম ক'রে নিদ যেতে পারে এ কিসিমের বড়িয়া একটি তাঁবুর বন্দোবস্ত করল।

এক আফ্রিদি দৈত্য এক কাঁধে একটি লোহার গদা আর অন্য কাঁধে ছোট্ট একটি তাঁবুর গাট্টি নিয়ে হাজির হ'ল জিনি-র মকানে।

জিনি এবার হুসেন'কে বল্‌ল—'আশা করি এতে তোমার আব্বার চাহিদা পূরণ হবে।' আফ্রিদি দৈত্যের দিকে ফিরে এবার বল্‌ল—'আমার স্বামীর পিছন পিছন সুলতানের প্রাসাদে যাও। তাঁকে এ-তাবুটি ভেট দিয়ে আসবে।'

আফ্রিদি দৈত্য কুর্নিশ ক'রে হুসেন'কে অনুসরণ করল। হুসেন সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে তাকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ ক'রে

বল্‌ল—'আব্বাজান, আপনার বাঞ্ছিত তাঁবু নিয়ে এসেছি। এতে আপনার গোটা সেনাবাহিনী আরামে নিদ যেতে পারবে।'

সুলতান এক নজরে বাহারী তাঁবুটি দেখে নিয়ে তখ্‌ত থেকে উঠে এলেন। শাহজাদা হুসেন-এর পিঠ চাপড়ে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা বেটা। তোমার কাজে আমি প্রীত। আর শোন, আমার উমর হচ্ছে। বুড্ডা হয়েছি। এত বড় সুলতানিয়াত শাসন করার হিম্মৎ এখন আর আমার নেই।' তাকে তখতে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'আজ থেকে তুমি-ই সুলতান, তখ্‌তে বসে প্রজা পালন কর। আমি আল্লাতাল্লা-র নামগান করে জিন্দেগীর বাকী দিনগুলি গুজরান ক'রে দেব।'

এবার থেকে হুসেন তখ্‌তে বসে প্রজাপালন করতে লাগল।

আবু হাসান ও মুক্তাবানুর কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ নয়া একটি কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে মুতাসিব বিল্লাহ নামে এক সুলতান বাগদাদে বাস করতেন।' তিনি ছিলেন খলিফা হারুণ অল-রসিদের পৌত্র অল-মুতাবাকিল-এর তস্য পৌত্র। তিনি ছিলেন সদাহাস্যময়, নিরীহ নম্র স্বভাব ও খুবসুরৎ এক নওজোয়ান।

সুলতান মুতাসিব-এর দরবারে আটজন কুচক্রী ও পরশ্রীকাতর উজির নোকরী করত। সুলতানিয়তে শাসনকার্যের প্রায় সার্বিক দায়িত্বই তাদের ওপর বর্তেছিল।

আহমদ ইবন হামদুন ছিলেন সুলতান মুতাসিব-এর জিগরী দোস্ত।

এক বিকালে দুই নওজোয়ান সুলতানের প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে বসে সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত ছিলেন, তারা উভয়েই উমরের বিচারে নওজোয়ান। কল্পনার রঙিন খোয়াব দেখা তাদের চরিত্রের, একটি বিশেষ দিক, তাঁদের একজন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'পাখির মত যদি আশমানে ডানা মেলে উড়তে পারতাম কী মজাই না হ'ত!'

দ্বিতীয় জন বল্‌লেন—'দোস্ত, দুনিয়ার আদমি হরবখত কাম কাজে মেতে রয়েছে, দুনিয়ার এই যে অপরূপ শোভা সেদিকে নজর দেয়ার মত ফুসরৎ ক'জনের তা আছে, বল? ফুল বাগিচায় ক'জন ঢুঁড়তে আসে, বল দেখি? ক'জনই বা পাখীর গানা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে? জিন্দেগীকে মধুময় করে তোলার জন্য খানাপিনা ছাড়া হাজারো কিসিমের বন্দোবস্ত রয়েছে। যে পারে প্রকৃতির সম্পদ লুটে নিয়ে খুশীর জোয়ারে ভেসে বেড়ায়।

এমন সময় সওদাগরের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে সুলতান মুতাসিব আর তাঁর জিগরী দোস্ত হামদুন নওজোয়ান দু'টির পিছনে এসে

নিঃশব্দে দাঁড়ালেন। তাদের বাৎচিৎ শুনতে লাগলেন।

একসময় সুলতান বল্‌লেন—'দোস্ত এমন কাঁচা উমরে এরা এমন ভাবপ্রবণ হ'ল কি ক'রে, বল তো?'

—'আমিও একই ব্যাপার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছি। এদের বাৎচিৎ শুনে আমি বিলকুল তাজ্জব বনে গেলাম।

হামদুন দু'কদম এগিয়ে গিয়ে নওজোয়ান দুটোকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—'শোন, আমরা পরদেশী সওদাগর। তোমাদের মালিকের প্রাসাদে আমরা মেহমান হয়ে রাত্রি গুজরান করতে চাই।'

নওজোয়ান দুটো সুলতান ও হামদুন'কে সুরম্য ইমারতে নিয়ে গেল।

কিছু সময়ের মধ্যেই গৃহকর্তা এসে মেহমানদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বলুন—'আপনাদের মেহমানরূপে পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। এখন ফরমাশ করুন, সেবার মাধ্যমে কিভাবে আপনাদের খুশী উৎপাদন করতে পারি। আপনারা নিঃসঙ্কোচে আপনাদের অভিপ্রায় পেশ করতে পারেন।'

সুলতান ও হামদুন ঘুরে ঘুরে কামরাটির বহুমূল্য সামানপত্র দেখতে লাগলেন।

চারশ' পনেরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতান মুতাসিব ও তাঁর জিগরী দোস্ত হামদুন ঘুরে ঘুরে ইমারতটির কারুকার্য ও বহুমূল্য সামানপত্র দেখতে লাগলেন।

গৃহর্কতা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'আমার নাম আবু অল হাসান আলী ইবন আহমদ। আমি খুরাসনবাসী

সুলতান বল্‌লেন—তবে আমার পরিচয় দিচ্ছি শুনুন—আমি সুলতান মুতাসিব।

মেহমানের আদৎ পরিচয় পেয়ে গৃহকর্তার কলিজায় কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল।'

সুলতান মুতাসিব বল্‌লেন—'শোন, তোমার ভয় ডরের কোনই কারণ নেই। তোমার আতিথ্যে আমি প্রীত। লেকিন একটি ব্যাপারে আমি তাজ্জব বনছি, তোমার ইমারতে যা কিছু দামী দামী সামানপত্র দেখছি বিলকুল আমার ঠাকুরদা সুতাবাকিল আল্লা আল্লাহ-র। এক বাৎ এখানে যা কিছু নজরে আসছে এগুলো ছাড়া তাঁর আর নথিপত্র কি তোমার হেফাজতে আছে? আশা করি আমার কাছে তুমি কিছুই ছুপাবার কোশিস করবে না। যদি করই তবে জরুর জেনো তার ফল তোমার পক্ষে আচ্ছা হবে না।'

—'জাঁহাপনা, আমি আপনার কাছে তিলমাত্র ব্যাপারও ছিপাবার কোশিস করব না। যা কিছু বলব বিলকুল সাচ্চা। তবে শুনুন—আমি আদতে কোন শাহাজাদা অর্থাৎ কোন সুলতানের লেড়কা নই। তা সত্ত্বেও কি ক'রে, এমন আজব এক ব্যাপার ঘটেছিল সে কিস্‌সাই আপনাকে শোনচ্ছি। আমার ইমারৎ, সামানপত্র আর সাজ পোশাক আপনাকে কৌতূহলী ক'রে তুলেছে। ফলে আপনার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছে, লেকিন আমার বক্তব্য শোনার পর আপনার দ্বিধা ও ক্ষোভ আশা করি অন্তর্হিত হবে।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে গৃহকর্তা আবু হাসান স্মৃতি মন্থন ক'রে নিয়ে বলতে শুরু করলেন—আমি সুলতান-বাদশাহের লেড়কা না হলেও খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের বিচারে আমার পূর্ব পুরুষরা কোন দিক থেকেই কমতি ছিলেন না। আমার আব্বা ছিলেন এক নামজাদা সওদাগর। আমি তাঁর একমাত্র লেড়কা। তামাম আরব দুনিয়া জুড়ে তাঁর সওদাগরী কারবার, এ-নগরের বিভিন্ন প্রান্তে আমার আব্বার দোকান ছিল। কর্মচারীরাই দোকানগুলো দেখভাল করত।

আগেই বলেছি, আব্বার একমাত্র লেড়কা আমি। তাই কেবলমাত্র ভোগ বিলাসই নয়, কোন ব্যাপারেই আমার ওপর কোন রকম বিশেষ হুকুমই তাঁর ছিল না।

একদিন তিনি দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে চলে গেলেন, তাঁর বিলকুল ধন দৌলতের একমাত্র উত্তরাধিকারী হলাম আমি। আমিও আব্বার মাফিকই দোকান-কারবার নিয়ে মেতে গেলাম। তখন দু' চারজন ক'রে ইয়ার-দোস্তের সংখ্যা বাড়তে লাগল। অল্পাধিক আনন্দ-স্ফূর্তির দিকে আমি ভিড়লাম। লেকিন আমার অগাধ ঐশ্বর্য ও দোকানের আয় উপার্জন অব্যাহত থাকায় আমার ধনাগার শূন্য হতে পারে নি।

আমার ইয়ার-দোস্তরা বহুৎ কোশিস করেও আমাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে নি। আমার অটুট মনোবলেই এর পিছনে সবচেয়ে বড়া সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দীর্ঘদিন নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। আমি হেরে গেলাম। মাত্র চৌদ্দ সাল উমরের এক লেড়কি আমার সত্ত্বাকে একদম ভেঙে চুরে তছনছ ক'রে দিল। ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে একদিন যখন বাৎচিতে মগ্ন ছিলাম তখন সে-লেড়কিটি দোকানের সামনে এসে খাড়া হ'ল। মুখে তার মুচকি হাসির ঝিলিক। সে এক জিপসী লেড়কি। নাচা গানা ক'রে রুটির বন্দোবস্ত করে। মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে চোখের বাণ মেরে বসল। ব্যস, আমার শিরা উপশিরায় যেন বিজলির ঝিলিক খেলে গেল।

চৌদ্দ সালের এক লেড়কির শরীরে যে যৌবনের এমন ঢল নামতে পারে, আগে কোনদিন নজরে পড়েনি, খোয়াবের মধ্যেও ভাবতে পারিনি। সাচ্চা বটে, সে এক সর্বনাশা কলিজা কাঁপানো লেড়কি।'

আমাকে বিলকুল তাজ্জব বনিয়ে লেড়কিটি আচমকা জিজ্ঞাসা ক'রে বসল—'একি আবু অল হাসান-এর দোকান?'

—'হ্যাঁ, এ তারই দোকান বটে, আপনি এখন তারই সঙ্গে বাৎচিৎ করছেন।'

বিচিত্র ভঙ্গিতে, সর্বাঙ্গে কলিজা কাঁপানো ঢঙে কদম এগিয়ে সে দোকানে উঠে এল।

—'আমিই হাসান। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

—'মেহেরবানি ক'রে আপনার কর্মচারীকে বলুন তিন শ'টি দিনার গুণে ফিন একটি বটুয়ার মধ্যে ভরে দিতে।'

এক কর্মচারী আমার হুকুমে তিন শ'টি দিনার একটি বটুয়ার মধ্যে পুরে তার সামনে রাখল। লেড়কিটি বটুয়াটি বাজপাখীর মাফিক ছোঁ মেরে তুলে নিল। ব্যস, একদম হাফিস হয়ে গেল।

কর্মচারিটি জিজ্ঞাসা করল—'হুজুর, এ-তিন শ'টি দিনারের হিসাব কার নামে লিখব?'

আমি জবাব দিলাম—'সে আমি কি বলব? আমি কি তার নাম ধাম জানি নাকি?'

—'সে কি জানা পরিচয় নেই, অথচ এতগুলো টাকা বেমালুম দিয়ে দিতে বল্‌লেন?'

—'সে এসে তিন শ'দিনার মাগুল যে! তাকে আর না বলতে পারলাম না।'

—'চাইল, আর দিয়ে দিলেন!' কোন রকমে আমার কথার জবাব দিয়ে সে এক লাফে দোকান থেকে বেরিয়ে লেড়কিটির তল্লাশে ছুটল। একটু বাদেই সে ফিরে এল। ব্যাজার মুখ। প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে সে বল্‌ল—'হুজুর, আমি গিয়ে দিনারের ব্যাপারটি বলতে লেড়কিটি বেমালুম আমার মুখে চোখের কাছে এক ঘুষি চালিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।'

পরদিন ভোরে লেড়কিটি ফিন এল। তার চোখে-মুখে গতদিনের সে-মুচকি হাসির রেখা। আমি নিষ্পলক চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

সে দোকানে উঠতে উঠতে বল্‌ল—'গত কাল সামান্য ক'টা দিনার দিয়ে আপনার কলিজা বোধ হয় দড়কচা মেরে গেছে, তাই না?'

আমি মুহূর্তে চিপ্‌সে গিয়ে বল্‌লাম—'সে কী! কেন এরকম ভেবে ঝুটমুট নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন। আদতে এ-দোকানপাট যা কিছু বিলকুল তো আপনারই।'

—'তবে এক কাজ করুন, আপনার কর্মচারীকে বলুন, পাঁচ শ' দিনার যেন আমার এ-বটুয়াটির মধ্যে পুরে দেয়।'

আমি তার মুখের দিকে চোখের নজর নিবদ্ধ রেখেই কর্মচারী-তহশীলদারকে হুকুম দিয়ে দিলাম, পাঁচ শ' দিনার গুণে তার বটুয়াটির মধ্যে পুরে দিতে।

দিনার ভর্তি বটুয়াটি পেয়েই সে আমাকে সুক্রিয়া জানিয়ে বিদায় নিল। দোকান ছাড়ার মুহূর্তে আমার দিকে অচানক এক চোখের বাণ মেরে খিল খিল ক'রে হেসে হাঁটা জুড়ল।

এবার থেকে এক অভাবনীয় দুর্ভাবনা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠল। ভাবলাম, যদি ফি রোজ এমন ক'রে শ'পাঁচেক ক'রে দিনার হাতিয়ে নিয়ে যায় তবে অচিরেই একদম ভিখমাঙ্গা হয়ে উঠব।

পরদিনও একই রকম হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে সে দোকানে উঠে গেল। মুখে টু-শব্দটিও করল না, ইশারা ক'রে তা থেকে একটি মখমলের বটুয়া দিতে বল্‌ল। আমিও একদম বোকার মাফিক জড়োয়ার অলঙ্কার সমেত একটি বটুয়া এনে তার হাতে দিলাম। এ দিন সে তেমনি নিঃশব্দে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লেড়কিটিকে অনুসরণ করলাম।

লেড়কিটি ইতিমধ্যেই লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে টাইগ্রিসনদীর ধারে পৌঁছে গেছে। এক লাফে একটি ডিঙিতে চেপে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল। বিপরীত পাড়ে আমার ঠাকুরমার একটি নাচমহল ছিল। লেড়কিটি ডিঙি থেকে নেমে তার ভেতরে ঢুকে গেল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মকানে ফিরে এলাম। আম্মার কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম।

আম্মা চমকে উঠে বল্‌লেন—'সে কি বেটা, সে খলিফার নাচমহলে ঢুকে গেল! খবরদার আর ওদিকে ঝুঁকবি না। আমীর-বাদশাহের ব্যাপারে নাক গলাতে নেই। আমি তোকে গর্ভে ধারণ করেছি, তকলিফ ক'রে বড় ক'রে তুলেছি, আমার কলিজায় দাগা দিসনে বেটা।'

—'আম্মা, ঝুটমুট কেন ভেবে মরছ? আমার নসীবে যা লেখা আছে হাজার কোশিস করেও তাকে খণ্ডন করা যাবে না।'

পরদিন আমি দোকানে বসে রয়েছি। এমন সময়ে আমার দাওয়াখানার প্রধান কর্মচারী আমাকে বিমর্ষ দেখে বল্‌লেন, কি ব্যাপার? তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? তোমার আব্বার ইন্তেকালের পর তো এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে এমন গোমড়া হয়ে বসে থাকতে দেখি নি। ব্যাপার কি, খোলসা ক'রে বল তো।'

আমি আমতা আমতা ক'রে বারকয়েক ঢোক গিলে পুরো ঘটনা তার কাছে ব্যক্ত করলাম।

তিনি বল্‌লেন—'তাই তো' মহামুশকিলের ব্যাপার তো! যাক গে, ফিকির যা হয় আমিই করছি বেটা। এক দর্জি আমার বিশেষ পরিচিত। তাকে কিছু কাজ দিয়ে হাত ক'রে নিতে হবে, পারবে তো? তবেই সে তোমার মুশকিল আসানের ফিকির করে দেবে।'

তিনি আমাকে সে-দর্জিটির কাছে নিয়ে গেলেন। বাৎচিৎ অমায়িক। কোর্তার ছেঁড়া জেবটি তাকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নিলাম।

আমি হেসে পুরো দশটি দিনার তার হাতে গুঁজে দিলাম। বোকার হদ্দ দর্জিটি। আমার দিকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ ক'রে তাকাল। আমি থতমত খেয়ে ব'লে উঠলাম—'আপনাকে আমার দিলে ধরে গেছে। এটা মেহেরবানি ক'রে আপনি রেখে দিন মিঞা সাহাব।'

—'আপনার সাজ পোশাক আমীর আদমির মাফিক হলেও ব্যবহার সে রকম মার্জিত নয়। এমন কাজ সুলতান-বাদশাহ করে। আর কে বা কারা করে, জানেন? যে আদমি সবে মহব্বতে পড়ে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে। তাই যদি হয় তবে বলুন তো, তার চোখ দুটো কি হরিণীর মাফিক ডাগর ডোগর?'

—'হ্যাঁ, আপনার অনুমান বিলকুল সাচ্চা।'

—'ব্যস, তবে বরাত খুলে গেল। তাদের ঘায়েল করার দাওয়াই আমার কাছে আছে হুজুর। বলুন তো কি নাম তার?'

—'নাম? আল্লাতাল্লা জানেন। আর কোশিস করলে হয়ত আপনার পক্ষে জানা সম্ভব হতে পারে।'

—'যাকগে, দেখতে কেমন?'

আমি তাকে যতটুকু দেখেছি, বুঝেছি সাধ্যমাফিক। তার যৌবনের জোয়ার লাগা সুরতের বিবরণ তাকে দেওয়ার কোশিস করলাম।

আমার মুখের বাৎ খতম হতেই সে আঁৎকে উঠে বল্‌ল—'আরে এ-তো মুক্তাবানু-র ব্যাপারে বলছ। খলিফার নাচমহলে বাঁশী বাজানো তার কাজ। তার এক খোজা নফর আমার কাছে হরদম আসা-যাওয়া করে।'

ঠিক সে-মুহূর্তে এক খুবসুরৎ লেড়কা এসে একটি কামিজের দাম জানতে চায়। মুক্তাবানু নাকি সেটি খরিদ করতে এসেছে।

আমি কামিজটি তার হাতে দিয়ে বল্‌লাম—'তুমি নিয়ে যাও। দাম আমিই দিয়ে দেব। এটি আমার তরফের উপহার।'

লেড়কাটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'আপনি কি আবু অল হাসান ইবন আহমদ? খুবাসনে আপনার মকান, ঠিক কিনা?'

—'তুমি আমাকে কি ক'রে চিনলে, বল তো?' আমি তার ওপর খুশী হয়ে নিজের হাতের অঙ্গুঠি খুলে তার আঙুলে পরিয়ে দিলাম। তারপর মুচকি হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'বহুৎ আচ্ছা। লেকিন আমাকে তুমি চিনলে কি ক'রে বল তো?'

লেড়কাটি হেসে বল্‌ল—আপনাকে চিনতে না পারার কোনই কারণ নেই। দিনভর হাজার বার আপনার ব্যাপারে আলোচনা হয়। শুনে শুনে আপনার চেহারা আমার এখন মুখস্ত হয়ে গেছে। এক লহমায় আপনাকে দেখেই আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আমার মালকিনের মুখে এসব ব্যাপার শুনে আমি ঠিক বুঝতে পারি তিনি আপনাকে পেয়ার মহব্বৎ করেন। আপনিও যদি আমার মালকিনকে পেয়ার ক'রে থাকেন তবে আমি জরুর সব ব্যাপারে সাহায্য করব, কসম খাচ্ছি।'

—'শোন, তোমার মালকিনকে প্রথম দেখার পর থেকেই আমার কলিজায় আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। জানি না সে আমার আগুনে পানি ছিঁটিয়ে নেভানোর কোশিস করবে, নাকি ঘি ঢেলে তাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবে। তাকে না পেলে আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে, আমি অন্ততঃ জানি।'

আমার কাছ থেকে কিছুক্ষণ সময় চেয়ে নিয়ে লেড়কাটি চলে গেল। একটু বাদেই একটি মোড়ক নিয়ে সে ফিরে এল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কি? কি আছে এতে?'

—'সুলতান মুতাবাকিল আলা আল্লাহ-র সান্ধ্য-পোশাক, এক শিশি আতরও আছে নাচমহলের দরওয়াজার সামনে। এ-আতর ছিটিয়ে দিলেই আপসে দরওয়াজাটি খুলে যায়। আর পোশাকটি পরে সুলতান নাচ মহলে আসেন, আপনি সন্ধ্যায় এ পোশাক গায়ে চাপিয়ে চলে আসবেন। তারপর যা কিছু করণীয় আমিই করব,

আপনাকে ভাবতে হবে না।'

আমি লেড়কাটির পরামর্শ মাফিক পোশাকটি গায়ে চাপিয়ে নাচমহলে হাজির হলাম। প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে লাগলাম। নাচমহল ছাড়িয়ে আমি অন্দরমহলে হাজির হলাম। আমার বুকের ভেতরে ধুঁকপুঁকানি শুরু হয়ে গেল। হারেমের দরওয়াজা বন্ধ। আতর ছিটিয়ে দিলাম দরওয়াজার ধারে। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে সেটি খুলে গেল। অচানক আমার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। আমি একদম স্বয়ং সুলতান মুতাবাকিল আলা আল্লাহ-র সামনে হাজির হলাম। চিরাগবাতি হাতে তার গাট্টাগোট্টা দেহরক্ষীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। উপায়ান্তর না দেখে এক দৌড়ে হারেমে ঢুকে গেলাম। কোথায় গিয়ে যে গা-ঢাকা দেবো ভেবে পেলাম না। হাঁপাতে হাঁপাতে একটি কামরায় ঢুকে গেলাম।

আমাকে দরওয়াজা দিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকতে দেখেই প্রায় উলঙ্গ এক খুবসুরৎ লেড়কি পালঙ্কের এক ধারে বসে ডরে কাঁপতে লাগল। আমার পক্ষে সে-মুহূর্তে কর্তব্য নির্ধারণ করা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

আমি দরওয়াজার দিকে ঘাড় ঘোরাতেই লেড়কিটি কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল—আপনিই তো আবু অল হাসান আলী ঠিক কিনা?'

আমি ঘাড় কাৎ ক'রে তার প্রশ্নের জবাব দিলাম।

সে এবার বল্‌ল—'মুক্তাবানু, আমার ছোটা বহিন। সে আপনাকে পেয়ার-মহব্বৎ করে ফেলেছে।' আপনি ডর পাচ্ছেন কেন? এ-কামরায় কেউ-ই আসবে না। এক বাৎ—সে আপনাকে পেয়ার করে সাচ্চা বটে। লেকিন আপনার দিল্ ও মর্জির ব্যাপারে তার কিছুই জানা নেই।'

—'আমি শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারি, মুক্তাবানু'কে ছাড়া কোন লেড়কির ছবি আমার কলিজায় আঁকা নেই, স্থানও পাবে না কেউ-ই।'

লেড়কিটি মুচকি হাসল। মৃদু হাততালি দিল। সে খুবসুরৎ লেড়কাটি দৌড়ে কামরায় ঢুকল।

লেড়কিটি বল্‌ল—'মুক্তাবানু'কে তলব দে।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মুক্তাবানু নীলচে রঙের একটি বোরখা পরে কামরায় ঢুকল। তাকে এক লহমায় দেখেই আমার সে কী হালাৎ হয়েছিল তা আপনাকে বুঝাবার ভাষা আমার নেই। কিসের যেন আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসল। উত্তেজনার ব্যাপার তো রইলই। সে মুখে কলুপ এঁটে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কখন, কিভাবে যে সে আমার প্রশস্ত বুকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল আজও আমি মালুম করতে পারছি না। আমিই তাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলাম, নাকি সে-ই স্বেচ্ছায় আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, খোদাতাল্লাই জানেন।

আমরা একাত্মা হয়ে কতক্ষণ যে ছিলাম তা-ও আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আমরা যখন প্রেমালাপে ডুবেছিলাম ঠিক তখনই সুলতানের পদধ্বনি কানে এল। আমি ঝট ক'রে মুক্তাবানুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কামরার এক কোণে গিয়ে ডরে কাঁপতে লাগলাম। সে-রাত্রে সুলতানের মুক্তাবানু-র বহিনজী পিস্তাবানু-র কামরায় থাকার কথা আগেই ঠিক করা ছিল। তাই তারা আমাকে ঝটপট একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ডালাবন্ধ করে দিল।

আমি বাক্সর ভেতরে শুয়ে সুলতানেব ক্ষীণকণ্ঠ শুনতে পেলাম—'মুক্তাবানু, ব্যাপার কি, তুমি তোমার বহিনজী-র কামরায় যে? আর তোমাকে গত ক'দিন নাচমহলেও দেখছি নে। আজ যখন ধরা পড়ে গেছ, একটি গানা শোনাও।'

মুক্তাবানু ভালই জানে, সুলতান তার বহিনজী পিস্তাবানুকে পেয়ার-মহব্বৎ করে। তার কণ্ঠের গানা ছাড়া সুলতানের কাছে তার আর কোনই কদর নেই।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটশ' উনিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতানের হুকুমে মুক্তাবানু বড়িয়া একটি গানা গেয়ে তাঁকে শোনালেন। বাক্সের ভেতরে শুয়ে সে গানা শুনে আমার কলিজার ছটফটানি শুরু হয়ে গেল।

সুলতান তার গানা শুনে খুশী হয়ে তাকে ইনাম দিতে চাইলেন। তিনি বল্‌লেন—'মুক্তাবানু, তোমার কি চাই বল? আমার সুলতানিয়তের অর্ধেকও যদি চেয়ে বস তবু আমি কুণ্ঠিত হ'ব না। বল, কি চাও?'

—'জাঁহাপনা, আমার কিছুই চাইবার নেই। আমার বহিনজী পিস্তাবানু'কে আপনার পাশে পাশে রাখবেন তবেই আমি খুশী। আর যদি নেহাৎই আমাকে কিছু দিতে চান তবে মেহেরবানি ক'রে আমাকে মুক্তি দিয়ে দিন। আর একটি ছোট্ট অনুরোধ, এ-প্রাসাদের বিলকুল সাজপোশাক আমি নিয়ে যেতে চাই, দেবেন কি?'

—'বহুৎ আচ্ছা, এ-মুহূর্ত থেকে বিলকুল সাজ-পোশাকের মালিক হলে তুমি, খুশী তো?'

সুলতান সে কামরা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

পরদিন ভোরে নাচমহলের বিলকুল সাজ পোশাক ও দলিল দস্তাবেজ নিয়ে আমার প্রাসাদে হাজির করলাম। মায়, এই যে পেল্লাই কাঠের বাক্সটি দেখতে পাচ্ছেন, আমাকে যার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল সেটিও নিয়ে এলাম।

ব্যস, আর দেরী নয়। সেদিনই কাজী ডেকে আমি মুক্তাবানুকে শাদী করলাম।'

জাঁহাপনা আমার কিস্‌সা খতম হ'ল। এবার নিশ্চয়ই মালুম হচ্ছে, আপনার নানাজীর সাজপোশাক ও অন্যান্য সামানপত্র কি ভাবে আমার প্রাসাদে হাজির হয়েছে?'

সুলতান বল্‌লেন—'আলী, তোমার সঙ্গে মোলাকাৎ ও বাৎচিৎ হওয়ায় আমি যারপরনাই খুশী হয়েছি। আমাকে এক চিলতে কাগজ আর কলম এনে দাও। কিছু ইনাম তোমাকে আমি দিতে চাই। সুলতান এবার হামদুন'কে বল্‌লেন—'হাসান আলী যতদিন জিন্দা থাকবে তাকে যাবতীয় করভার থেকে মুক্তি দেয়া হ'ল—হুকুমনামা লিখে দাও।'

হামদুন হুকুমনামাটি লিখে সুলতানের হাতে দিলেন। সুলতান তাতে দস্তখৎ দিয়ে হাসান-এর হাতে তুলে দিলেন।

আর সুলতান হাসান আলী'কে তার দরবারে প্রধানতম আমিরের পদে বহাল করলেন। তারপর থেকে সুলতান ও আবু অল-হাসান আলী-র মধ্যে অকৃত্রিম সম্প্রীতি জিন্দেগীর শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিস্‌সাটি খতম করে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

সুলতান মামুদের কীর্তির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ সুলতান 'মামুদের কীর্তির কিস্‌সা' নামে নতুন একটি কিস্‌সা শুরু করলেন—কোন এক সময়ে সুলতান মামুদ ছিলেন মিশরের সুলতান। অনন্য জ্ঞান ও বিচক্ষণতার জন্য তাঁর দুনিয়া জোড়া খ্যাতি ছিল। অগাধ ধন দৌলতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সুলতান মামুদকে বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গভাবে দিন গুজরান করতে হ'ত। প্রাসাদে একান্তে, নিরালায় তাঁকে পড়ে থাকতে হ'ত। খোদাতাল্লা তাকে কেবলমাত্র অঢেল ধন দৌলতই যে দিয়েছিলেন তা-ই নয় ; সুঠাম দেহ ও কামনা-বাসনা ভরা যৌবনদীপ্ত চেহারা প্রভৃতি কোন কিছুরই অভাব তাঁর ছিল না। নারীসঙ্গ লাভেরও কোনই অভাব তাঁর ছিল না। চাইলেই দু'-পাঁচটি খুবসুরৎ লেড়কি অনায়াসেই তিনি হাতের মুঠোয় পেয়ে যেতেন।

লেকিন দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্যবস্তু তাঁর কাছে বিষবৎ ছিল। দরবারে উজির-নাজিরদের সঙ্গে রাজকার্যাদি সেরেই তিনি সোজা প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে হাজির হতেন। ব্যস, কেউ আর তাঁর মুখ দর্শন করতে পারত না। কেন যে তিনি এমন নিভৃত কক্ষ বেছে নিয়েছিলেন, তার দুঃখ, কি যে অকথিত ব্যথা-বেদনায় তিনি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরতেন তা কারোরই জানা ছিল না। সুলতান মামুদ নিজেও তা জানতেন না।

এক বিকালে সুলতান মামুদ তার প্রিয় নিভৃত কক্ষে অবস্থান করছেন। এমন সময় বৃদ্ধ উজির এসে জানাল, পশ্চিমের মুলুক থেকে অলৌকিক গুণসম্পন্ন এক পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছে। তিনি নাকি এক অনন্য গুণ সম্পন্ন হেকিম। যে কোন কঠিন বিমারী সারাতে তামাম আরব দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর কেউই নেই।

সুলতানের অনুমতি পেয়ে বৃদ্ধ উজির প্রায় এক শ' সাল উমরের এক বৃদ্ধকে সুলতানের কামরায় নিয়ে এল। চুল-দাড়ি বিলকুল সফেদ। চোখ দুটো গর্তে বসা। তোবড়ানো গাল। আর গায়ের চামড়া ঢিলে, একদম ঝুলে পড়েছে।

বৃদ্ধ সুলতানকে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার ছোটা ভাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি তোমার ইলাজ করতে চাই।' বলেই সে সুলতানকে হাত ধরে একটি বন্ধ জানলার ধারে নিয়ে গেল। বল্‌ল—'জাঁহাপনা, জানালাটি খুলে ফেল।'

সুলতান মন্ত্রমুগ্ধের মাফিক হাতবাড়িয়ে জানালাটি খুলে দিলেন। ব্যস, তাঁর চোখের সামনে অনুচ্চ একটি পাহাড় ভেসে উঠল। একদল সৈন্য পাহাড়ের গা-বেয়ে দ্রুত নেমে আসতে দেখলেন। সবাই সশস্ত্র। সুলতান ভাবলেন, একটু বাদেই তারা নগরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইন্তেকাল অবশ্যম্ভাবী জেনে তিনি

ভয়ে বিকট আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—'ইয়া খোদা, আমার মোউৎ এসে গেছে, জান বাঁচাবার আর কোন ফিকির নেই, দেখছি।'

বৃদ্ধ ব্যস্ত-হাতে জানালাটি বন্ধ ক'রে দেয়। পরমুহূর্তেই ফিন জানালার পাল্লা খুলে ফেল্ল। সুলতান জানালা দিয়ে বাইরে নজর দিলেন। সৈন্য-টৈন্য কিছুই নেই। ভোজবাজীর মাফিক বিলকুল হাফিস হয়ে গেছে। পাহাড়াটি কেবল মাথা উঁচিয়ে খাড়া হয়ে আছে।

বৃদ্ধ এবার অন্য একটি বন্ধ জানালার ধারে নিয়ে গেল। জানালার পাল্লা খুলতেই সুলতানের চোখের সামনে তাঁরই সমৃদ্ধ নগরটি ভেসে উঠল। ফিন সে বুকফাঁটা আর্তনাদ জুড়ে দিলেন। দেখলেন, নগরের চারদিকে অগণিত মকান, মসজিদ আর দোকানপাট বিলকুল জ্বলছে। সে-আগুন বাতাস বাহিত হয়ে সুলতানের প্রাসাদের দিকে ধেয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝি বিলকুল জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সুলতান ভাবতে লাগলেন, তাঁর নগর আর প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়ে পড়লে তাঁর সুলতানিয়ৎ নিকটবর্তী মরুভূমির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ হেকিম জানালাটি মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে ফিন খুলে দিলেন। ভোজবাজীর মাফিক আগুন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দিব্যি সাজানো গোছানো নগরটি সুলতানের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বৃদ্ধ পাশের আর এক জানালা খুলে দিতেই সুলতানের চোখের সামনে নীল নদের দৃষ্টি নন্দন শোভা ভেসে উঠল। উত্তাল-উদ্দাম তার জল স্রোত, তাঁর নগরের দিকে ধেয়ে আসছে। এক লহমার মধ্যে তার সমৃদ্ধ নগরটিকে বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ডরে চিল্লিয়ে উঠলেন তিনি। এমন অভাবনীয় দৃশ্য চাক্ষুষ করলে ভয় ডর তো লাগবেই। নীলনদের পানি যদি নগর ভাসিয়ে নিয়ে যায় কতশত আদমি আর জন্তু জানোয়ারের ইন্তেকাল হয়ে যাবে তার ইয়ত্তা আছে।'

সুলতানের কাঁপুনি দেখে বৃদ্ধ হেকিম মুহূর্তের জন্য জানালাটি বন্ধ ক'রে ফিন খুলে দিলেন। সুলতান সোল্লাসে বলে উঠলেন—'ইয়া, খোদা, আমার নগর যে একদম নিরাপদ!'

সুলতান কিছুই ঠাহর করতে পারছেন না, তিনি কি জেগে, নাকি গভীর নিদের মধ্যে খোয়াব-টোয়াব দেখছেন। নাকি বৃদ্ধ হেকিম তাঁর বিমারীর ইলাজ করার নামে তাঁর ওপর যাদুবিদ্যা প্রয়োগ ক'রে চলেছে?'

সুলতানকে এবার একটি ফোয়ারার কাছে নিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'এক কাম কর, পানির দিকে নজর ফেরাও।'

সুলতান সামান্য ঝুঁকে পানির চৌবাচ্চাটির দিকে নজর ফেরাতেই বিকট স্বরে চিল্লিয়ে উঠলেন, তার মালুম হ'ল, বৃদ্ধটি বুঝি তাঁকে পানির দিকে ঠেসে ধরেছে।

বৃদ্ধের ওপর গোস্‌সায় একদম ফেটে পড়ার জোগাড় হলেন—'শয়তান বেতমিস কাঁহিকার। তুমি আমাকে দরিয়ার পানিতে ডুবিয়ে মারার ফিকির করছ! আমি তোমাকে মজা টের পাইয়ে ছাড়ব, ইয়াদ রেখো।'

নদীর ধারে, পাহাড়ের গা-ঘেঁষে কিছু ইয়া তাগড়াই-তাগড়াই, ইয়া দশাসই চেহারার কিছু আদমি যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হো হো করে হাসছে। দেখে সুলতান ক্ষোভে কাঁপতে লাগলেন। একদম ক্ষেপে গেলেন, পারলে যেন এক দৌড়ে গিয়ে তাদের গলা টিপে এক্ষুণি করে দেন। সুলতানের হালাৎ দেখে আদমিগুলো দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগল। কী কদাকার তারা দেখতে। এক লহমায় তাকালেই গা ঘিন-ঘিন করে উল্টি আসে।

কদাকার আদমিগুলোর সর্দার লম্বা লম্বা করে বিক্রমে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সুলতানের গা থেকে কোর্তা, পিরান ও পাৎলুন প্রভৃতি সাজপোশাক খুলে ফেলে একদম উলঙ্গ করে দিল। তারপর ডোরাকাটা একটি পিরান ও পাৎলুন তাঁকে পরিয়ে দিল। আর হলদে একটি চপ্পল পায়ে পরিয়ে দিল। বিকট স্বরে এবার বল্‌ল—'চল, আমাদের মকানে, গতরে খেটে রুটির বন্দোবস্ত করবে।'

অসহায় নজর মেলে তাকিয়ে মামুদ কাতর মিনতি করল,—'ইয়া খোদা! আমি তো গতর খাটিয়ে কাজ কি ক'রে করতে হয়, জানি না।'

—'না-ই বা জানলে। মাথায় ক'রে বোঝা তো বইতে পারবে। গাধার মাফিক বোঝা বইবে। গাধা যে বোঝা বয় তার কায়দা-কৌশল জানা বা বুদ্ধির খরচা করতে হয় না।'

আদমিগুলো আদতে ডাকু বা চোর টোর না। গায়ে গতরে খেটে রুজিরোজগার করে। মাঠের কাম কাজ, বোঝা বওয়া থেকে শুরু ক'রে যেকোন গতর খাটানোর কাজে তারা অভ্যস্ত।

মামুদের মাথায় ইয়া পেল্লাই একটি বোঝা চাপিয়ে দিল। তিনি সেটি নিয়ে কাৎরাতে কাৎরাতে তাদের ডেরায় হাজির হলেন। তারা তাঁকে রুটি, লবণ আর মরিচ খেতে দিল।

পরদিন মামুদের কাঁধে চাপিয়ে দিল একটি পেল্লাই বোঝা। ব্যস, সুলতানের হালৎ কাহিল হয়ে পড়ল। নড়াচড়ার হিম্মৎ পর্যন্ত তাঁর রইল না। একজন তার ঘাড়ে এক মৃদু ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল—'কি মিএগ্র, একদম ভড়কে গেলে যে? গতরটতর একটু নাড়াও।' এবার তার পাছায় বেমক্কা এক থাপ্পড় মেরে বল্‌ল—'বাহানা রেখে গতর নাড়াও। তোমার জন্য আমরা এখানে বসে থাকব না।'

উপায়ান্তর না দেখে সুলতান কোনরকমে পা দুটোকে টেনে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন।

এবার সুলতানকে মাঠে না নিয়ে জুড়ে দেয়া হ'ল কলুর ঘানির সঙ্গে। দিনভর ঘানি কাঁধে নিয়ে চক্কর মেরে চললেন।

এক-দুই-তিন ক'রে পাঁচ পাঁচটি সাল গুজরান হয়ে গেল। একদিন ঘানির জোয়াল মড়াৎ ক'রে ভেঙে গেল। এ মওকায় সুলতান কেটে পড়লেন।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এক অজানা অচেনা মুলুকে সুলতান মামুদ হাজির হলেন। এক বুড্ডা সওদাগর পরদেশী মুসাফির দেখে তাকে নিজের মকানে নিয়ে গেল। বুড্ডা বল্‌ল—' বেটা, এ-নগরে নওজোয়ান লেড়কাদের বহুৎ কদর। এখানে থেকে যাও, কি বল?'

সুলতান মামুদ বল্‌লেন—'থাকতে তো পারি। লেকিন আমাকে যেভাবে কাঁচা তিলগুলো গেলাচ্ছেন, আপত্তি এখানেই। আমার গা ঘিন ঘিন করে। পাঁচ সাল আমাকে এসব খেতে হয়েছে।'

—'কাঁচা বলে খেতে দিচ্ছে। সে কী হে। ঘোড়া-গাধাকে তো এগুলো খেতে দেয়। তোমাকে আমি জরুর ওসব খেতে দেব না বরং আমি তোমার জন্য গোস্তের হরেক কিসিমের খানার বন্দোবস্ত ক'রে দেব। তোমাকে এসব নিয়ে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আমি তবে এ-নগরেই থেকে যাচ্ছি। আমাকে কি করতে হবে, বলুন?'

—'আমি তোমাকে আগামী কাল সকালে হামামের সদর-দরওয়াজায় দাঁড় করিয়ে দেব। যেসব লেড়কি হামামে গোসল করতে যাবে তাদের জিজ্ঞাসা করবে—'তোমার কি শাদী-নিকা হয়েছে? যে-লেড়কি প্রথম বলবে নিকা হয় নি, তুমি তাকেই শাদী ক'রে ফেলবে। এ-মুলুকেই এ-ই প্রচলিত আইন। লেকিন হুঁশিয়ার, যত লেড়কি হামামে ঢুকে প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করতে হবে, ইয়াদ থাকে যেন। কুমারী লেড়কির খোঁজ না মেলা পর্যন্ত কাউকে যেন বাদ দিও না। আমাদের মুলুকের এটিই আইনের মধ্যে পড়ে।'

পরদিন সুলতান মামুদকে নিয়ে হামামের সদর-দরওয়াজায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হ'ল। তিনি প্রথম যে-লেড়কিটিকে শাদী-নিকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তার উমর তের। সে সাফ-সাফ জবাব দিল, তার নিকা চুকে গেছে।

দ্বিতীয়জন এক বুড়ি। একদম কদাকার। তাকে দেখেই মামুদের কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। বলা তো যায় না, যদি বলে বসে শাদী-নিকা হয় নি, তবে কম্ম হতে হয়ে যাবে। উপায় নেই এ-মুলুকের আইন, প্রশ্ন করতেই হ'ল।

বরাতের জোর আছে বটে। বুড্ডিটি জবাব দিল—'হ্যাঁ, আমার নিকা বহুৎ দিন আগেই চুকে গেছে।

এবার পেল্লাই মোটা, হাতীকেও পিষে ফেলে দেবে এমন চেহারা নিয়ে থপ্ থপ্ ক'রে এক লেড়কি হামামের দরওয়াজায় হাজির হ'ল। হাঁটা চলা তো দূরের ব্যাপার সোজা হয়ে খাড়া থাকাই যেন তার পক্ষে কঠিন ব্যাপার। হালৎ একদম বেখাপ্পা বেসামাল। আদতে বুড্ডিটির সুরৎ-ও বুঝি এর চেয়ে আচ্ছা ছিল। তবে তার গায়ে দামী সাজ পোশাক ও গহনাপত্রের ছড়াছড়ি।

সুলতান মামুদ মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে, বার-কয়েক ঢোক গিলে মুটকিটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার কি শাদী-নিকা চুকে গেছে?'

লেড়কিটি সাফ-সাফ জবাব না দিয়ে বল্‌ল—'মেহেবুব, তোমায় পথ চেয়েই তো জিন্দেগীর এতগুলো দিন গুজরান ক'রে দিয়েছি। সেই তো এলে। একদম সূর্য পাটে বসতে শুরু করেছে, তখন। বরাত গুণে আজ তোমার সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল।' লেড়কিটি বক্তব্য পেশ করতে করতে সুলতান মামুদ-এর কাঁধে হাত রাখার জন্য একটি হাত বাড়িয়ে দিল।

ব্যাপার দেখে মামুদ-এর কলিজা অবশ হয়ে আসতে লাগল। এক লাফে দু'কদম পিছিয়ে গেলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় কোন রকমে উচ্চারণ করলেন—'আরে, করছ কী? আমি তো আদতে একটি বলদ। দেখছ না, কলুর ঘানি টেনে টেনে আমার কাঁধে কাল

সিঁটে পড়ে গেছে। চাচী, আমাকে শাদী ক'রে তোমার জিন্দেগীটিকে নিজে হাতে বিলকুল বরবাদ ক'রে দেবে নাকি?'

লেকিন কে, কার বাৎ শোনে, চাচী অচানক তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ইয়া মোটা মোটা ঠোঁট দুটো দিয়ে তাঁকে চুম্বন করতে করতে একদম অস্থির ক'রে তুল্‌ল। মামুদ অনবরত মোচড়ামুচড়ি শুরু ক'রে দিলেন। লেড়কিটি তার নিজের ঠোঁটটি কামড়ে ধ'রে রেখেছে। তাকে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতেই হ'ল। তবু সে বলতে লাগল—'বুঝছ না কেন, আমি আদৎ আদমির বাচ্চা নই, মাল বওয়া গাধা আর কলুর ঘানি টানা বলদ! আমাকে ছেড়ে দাও চাচী। আরে করছ কী! এমন জোরসে তোমার টপ্‌কা টপ্‌কা বুকে ঠেসে ধরলে দম বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল হয়ে যাবে। বুকের খাচা নড়বড়ে হয়ে যাবে। 'ছাড়! ছাড়! জান খতম হয়ে গেল!' সুলতান মামুদ এক ঝটকায় মুটকিটির ইয়া পেল্লাই মোটা হাত দুটোর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ছিটকে গিয়ে পানির চৌবাচ্চায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। পর মুহূর্তেই চৌবাচ্চা থেকে মুখ তুলে দেখলেন, তিনি নিজের প্রাসাদের গোসল খানার চৌবাচ্চাটিতে পড়ে রয়েছেন, তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হারেমের খুবসুরৎ বাঁদীরা আর উজির। আর অদূরে এক বুড্ডা ফকির। ফকির হাত তুলে বল্‌ল—'বেটা, মামুদ, এবার তোমার হতাশার বোঝা বুক থেকে নেমে হাফিস হয়ে গেল। কিভাবে যে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল কেউ আর তার হদিস পেল না।'

কিস্‌সা খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

বেগম শাহরাজাদ নতুন কিস্‌সাটি শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বাগদাদের হারুণ অল-রসিদ এক বিকালে প্রাসাদে তাঁর নিজের কামরায় বিশ্রামে মগ্ন ছিলেন। এমন সময়, তাঁর প্রধান উজির জাফর তাঁর কামরায় হাজির হয়ে বক্তিমে দিতে লাগলেন—'জাঁহাপনা, আপনি আমাদের চোখের মণি। তামাম দুনিয়ার আলো আপনিই। আজ আপনাকে দু'চারটি ব্যাপারে বক্তব্য শোনাচ্ছি বলে যদি কিছু গুস্তাকী হয়েই থাকে তবে নিজগুণে মাফ ক'রে দেবেন। যে আদমী ধর্মঅন্তঃপ্রাণ হবে, সে আল্লাহ-র কাছে পুরোপুরি আত্মনিবেদন ক'রে দেউলিয়া হয়ে যাবে। আদমির গৌরব, যা কিছু সম্মান খাতির বিলকুল আল্লাহ-র অপার করুণা বলে সম্ভব হয়েছে। এর জন্য কোন আদমিরই অহঙ্করী হওয়া সঙ্গত নয়। সে-পরম পিতা ছাড়া এর জন্য কেউ-ই দায়ী না। গাছ কি তার ফলের জন্য, দরিয়া কি তার পনির জন্য আত্মম্ভরী হয়? ফিন আশমান কি তার উচ্চতার জন্য বুক ফুলায়? যে আদৎ মহৎ সে কিন্তু তার গুণের জন্য কাজের জন্য কখনই আত্মম্ভরী হয় না। তাই বলছি কি, জাঁহাপনা আপনার বলতে যা কিছু ধন দৌলত রয়েছে বিলকুল গরীব গোবরাদের পিছনে খরচা ক'রে ফেলুন। দীন দরিদ্ররা আল্লাহ-র প্রিয়জন। তাদের মধ্যে আপনার বিত্ত সম্পদ বিতরিত হলে তার চরণে তা গিয়ে পৌঁছোবেই, ইয়াদ রাখবেন।

জাঁহাপনা, এক বাৎ, আপনার এই যে অগাধ বিষয় আশয় আপনি একেলাই কি এসবের মালিক? আপনার একের দ্বারাই কি এতসব সম্ভব হয়েছে? তাই কি খোদাতাল্লা আপনাকে সবকিছু দান করেছেন, বলুন?

আপনি কি জানেন জাঁহাপনা, বসরাহ নগরে এক ধনকুবের সওদাগর রয়েছে?' তার কোথায় যে কোন্ সম্পত্তি রয়েছে, তার দামই বা কি পরিমাপ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার ধন দৌলত নাকি সুলতান বাদশাহের চেয়ে ঢের বেশী। তাকে দেশের আদমিরা মাথায় তুলে রাখে কেবলমাত্র এরই জন্য নয়। তার দান-খয়রাতের জন্যই তাকে সবাই পেয়ার করে। আদতে জাঁহাপনার চেয়েও তার দান খয়রাতের পরিমাণ বেশী।'

উজির জাফর-এর বক্তিমে শুনে খলিফা গোস্‌সায় একদম লাল হয়ে উঠলেন। গর্জে উঠলেন—'শুয়ার কা বাচ্চা, কাঁহিকার! তোমার কলিজা এতই শক্ত যে, আমার মুখের ওপর এসব বাৎ বেমালুম বলে যাচ্ছ! তোমার কি ইয়াদ নেই, আমার কাছে ঝুটবাৎ বলার অর্থই হচ্ছে ইন্তেকাল হয়ে যাওয়া?'

—'জাঁহাপনা, খোদাতাল্লা-র নামে কসম খেয়ে কাউকে বসরাহ নগরে পাঠিয়ে পাত্তা লাগান। আরও বলছি, আমি একবার বসরাহ নগরে গিয়ে আবু কাশেম-এরই মেহমান হয়ে তার মকানে ছিলাম। যা কিছু বল্‌লাম বিলকুল নিজের দেখা, পরীক্ষা করা। আমি ফিন দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি, তার মাফিক দান-খয়রাৎ করতে দ্বিতীয় কাউকে জিন্দেগীতে দেখিনি।'

খলিফা ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে জাফর'কে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় পাঠাতে হুকুম দিলেন।

ক্রোধোন্মত্ত খলিফা লম্বা লম্বা পায়ে তাঁর প্রধানা বেগম জুবেদা-র কামরায় চলে গেলেন।

খলিফার বিষণ্ণতা লক্ষ্য ক'রে জুবেদা তাঁকে আর ঘাটালেন না। পেয়ালা ভরে খুসবুওয়ালা গুলাবী সরবৎ এনে তাঁর সামনে ধরলেন। মুচকি হেসে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, জিন্দেগীর দুটো রঙ। একটি সফেদ যাকে আমরা খুবসুরৎ বলি। আর দ্বিতীয়টি কালো, যাকে আমরা আন্ধারের সঙ্গে তুলনা করি। আমি চাই আপনি হরদম হাসি-মস্করায় ডুবে থাকুন।'

—'জান জুবেদা, শয়তান, বেতমিশ উজির জাফর আমার মেজাজ মর্জি বিলকুল কয়লা ক'রে দিয়েছে। তার কলিজা এতই শক্ত যে, সে আমার কাম কাজ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে!'

খলিফা এবার জাফর-এর বক্তব্য বেগম জুবেদা-র কাছে

খোলসা ক'রে বল্‌লেন। বেগম বুঝলেন, জাফর এক গলতি ক'রে বসেছে। পানি যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, আন্দাজও করতে পারছেন না। তিনি বিলকুল উভয় সঙ্কটে পড়লেন। জাফর-এর পক্ষে বেশী কিছু বলাও নিরাপদ নয়। কিন্তু তার পক্ষ অবলম্বন না ক'রে তো তাকে রক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাই দিমাক খাটিয়ে তিনি বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, বসরাহতে একজনকে পাঠিয়ে উজির জাফর-এর বক্তব্যের সাচ্চা-ঝুটা যাচাই ক'রে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ততদিন তার সাজা দেয়া মুলতুবি রাখুন।'

খলিফা জুবেদার বক্তব্যকে মূল্য দিয়ে বসরাহতে গিয়ে খোঁজ খবর নেয়াই সঙ্গত জ্ঞান করলেন। তবে এ ব্যাপারে অন্য কারো ওপরে দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই বসরাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তবে সওদাগরের ছদ্মবেশ ধারণ করে সেখানে গেলেন।

খলিফা বসরাহ নগরে পৌঁছে এক মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিলেন। সেখানকার এক কর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন—'ভাইসাব, এখানে আবু কাশেম নামে এমন কোন নওজোয়ান আছে কি দান খয়রাতে যার তুলনা মেলে না?' বৃদ্ধ কর্মচারীটি হাত দুটো ওপরে তুলে বল্‌ল—'আল্লাহ যেন তাকে দীর্ঘায়ু করেন। আদৎ কথা শুনুন জনাব, দান-খয়রাতে তার তুলনা হয় না? এ-নগরে এমন কোন আদমিকেই মিলবে না সে তার নাম শুনে কপালে হাত না তোলে, তার গুণকীর্তন করতে পারলে আমরা যেন নিজেদের ধন্য জ্ঞান করি।

মুসাফিরখানায় রাত্রি গুজরান করে খলিফা ভোরে বাজারের দিকে হাটতে লাগলেন। এক দোকানে ঢুকে দোকানিকে জিজ্ঞেস করলেন—'জনাব, এখানে আবু কাশেম-এর মকানটি কোন্‌দিকে বলতে পারেন?'

দোকানি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—হুজুর কি পরদেশী? এখানে সদ্য এসেছেন? একটি গুঁড়া বাচ্চাও তো আবু কাশেম-এর মকান চেনে, আর আপনি—'

খলিফা তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'জনাব, সাচ্চা বটে, আমি পরদেশী, গতকালই এখানে হাজির হয়েছি।'

দোকানি তার এক কর্মচারী-লেড়কাকে খলিফার সঙ্গে দিয়ে বল্‌ল—'এর সঙ্গে যান, আবু কাশেম-এর মকানে নিয়ে যাবে।'

লেড়কাটি বার দুই বাক ঘুরে এক প্রাসাদোপম মকানের সামনে গিয়ে বল্‌ল—'জনাব, এ-ই আবু কাশেম-এর মকান।'

আবু কাশেম-এর মকানটি বাস্তবিকই প্রাসাদোপম। আগাগোড়া শ্বেতপাথরের তৈরী। প্রাসাদের সামনে একদল গুঁড়া-বাচ্চাকে খেলা করতে দেখলেন। তাদের এক জনকে ডেকে তিনি বল্‌লেন—'আবু কাশেম-এর সঙ্গে ভেট করতে চাই। তাকে একবারটি ডেকে দাও।'

একটি লেড়কা এক ছুট্রে বাইরে চলে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবু কাশেম মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে দরওয়াজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুসাফির মেহেমানকে অভ্যর্থনা ক'রে মকানের ভেতরে নিয়ে গেলেন। মখমলের চাদর বিছানো কেদারায় বসতে দিল। বসতে না বসতেই বারোটি খুবসুরৎ বাঁদী খুসবুওয়ালা গুলাবী সরবতের পেয়ালা নিয়ে হাজির হ'ল।

খলিফা সরবৎ পান ক'রে বিস্মিত হলেন। বল্‌লেন, সরবতের এমন মিষ্টি খুসবু হতে পারে আগে জানা ছিল না তো।

কিছু সময় বাদে খানা পিনার আসর বসল। টেবিল জুড়ে হাজার কিসিমের বাদশাহী খানার বন্দোবস্ত।

খানাপিনা মিটলে আবু কাশেম মেহমানের সম্মানার্থে নাচা-গানার মাইফেলের আয়োজন করল।

এক খুবসুরৎ লেড়কী মধুঝরা কণ্ঠে গানা গাইতে শুরু করল। গানা যখন জমে উঠেছে, সওদাগরবেশী খলিফা যখন গানার মধ্যে বিলকুল ডুবে গেছেন তখন সুযোগ বুঝে গৃহকর্তা আবু কাশেম এ অবসরে গানার আসর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছোট্ট একটি চারাগাছ নিয়ে খলিফার কাছে ফিরে এল। গাছটির কাণ্ড রূপার, পাতাগুলো পান্নার, আর পলার তৈরী ফলগুলো। আর গাছটির মাথায় পাখা ছড়িয়ে বসে রয়েছে একটি সোনার তৈরি ময়ূর। তার মাথায় ছোট্ট একটি লাঠি দিয়ে সামান্য টোকা দিতেই সেটি হরদম ঠক্কর মারতে শুরু করল তা থেকে মিঠা খুসবু বেরিয়ে কামরাটিকে আমোদিত ক'রে তুল্‌ল।

খলিফা হারুণ অল-রসিদ স্বগতোক্তি করলেন—'ইয়া খোদা, দুনিয়ায় এমন আজব পক্ষী থাকতে পারে এ যে চোখে না দেখলে বিশোয়াসই করা যাবে না!'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সাটি বন্ধ করলেন।

আটশ' একুশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহ্‌রাজাদ বাদশাহ শারিয়ার-এর উপস্থিতিতে কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশটুকু বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, গৃহকর্তা আবু কাশেম একটু বাদেই চারাগাছটি নিয়ে সেখান থেকে উঠে দ্রুত পাশের কামরায় চলে গেল। ব্যাপারটি খলিফার কাছে আচ্ছা বোধ হ'ল না। ভাবলেন, গাছটি কি তিনি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতেন যে, এমন তৎপরতার সঙ্গে আবু কাশেম সেটিকে নিয়ে সরে পড়ল। অথচ জাফর তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে বার বার বলেছিল, তামাম দুনিয়া টুঁড়ে এলেও তার সমান দ্বিতীয় কোন দাতার হদিস মিলবে না।

আবু কাশেম একটু বাদেই একটি খুবসুরৎ লেড়কাকে নিয়ে কামরায় ফিরে এল। তার গায়ে হরেক কিসিমের মণি মুক্তো বসানো

ঝলমলে পোশাক। সে কামরায় ঢুকেই খলিফার হাতে একটি পেয়ালা তুলে দিল। সরাব ভর্তি। খলিফা এক নিঃশ্বাসে সরাবটুকু পান ক'রে ফেল্‌লেন। আজব ব্যাপার তো। মুহূর্তের মধ্যে আপসে পেয়ালাটি ফিন সরাবে পূর্ণ হয়ে গেল। সরাবটুকু গলায় ঢেলে তিনি লেড়কাটির হাতে ফেরৎ দিতে গিয়ে দেখেন সেটি ফিন পূর্ণ হয়ে গেছে। বিলকুল আজব ব্যাপারই বটে।'

আবু কাশেম মুচকি হেসে বল্‌লেন—'জনাব, তাজ্জব বনার মাফিক কোন ব্যাপারই এ নয়। এক প্রবীণ দার্শনিক পেয়ালটির নির্মাণ কর্তা। এমন কোন কিসিমের গুপ্তাবিদ্যা ছিল না, যা তার অজ্ঞাত।'

ব্যস, এবারও পেয়ালাটি নিয়ে হন হন ক'রে আবু কাশেম কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। খলিফা ভাবলেন উজির জাফর এরই গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ। এ যে সামান্য সৌজন্যটুকুও জানে না। এক একটি আজব বস্তু নিয়ে এসে ভোজবাজীর খেল্ দেখিয়ে ফিন সেটি অন্দরমহলে নিয়ে লুকিয়ে রাখছে। আর আমার মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার ঘটছে বুঝেই সেটি নিয়ে হাফিস হয়ে যাচ্ছে। এমন বেয়াদপ বেতমিস—জাফর গিয়ে মজা টের পাইয়ে ছাড়ব।'

একটু বাদে আবু কাশেম এক কিশোরী লেড়কিকে নিয়ে ফিরে এল। খুবসুরৎ, বেহেস্তের হুরী বল্‌লেও বাড়িয়ে বলা হবে না। সে হরদম বাঁশী বাজাতে লাগল। একের পর এক ক'রে চব্বিশটি রাগিণী বাজাল।

খলিফা সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—'জনাব, সাচ্চা বটে, তোমার সংগ্রহ অনন্য!'

খলিফার মুখের বাৎ খতম হতে না হতেই আবু কাশেম লেড়কিটিকে নিয়ে ঝট ক'রে আন্দর মহলে চলে গেল।

ব্যাপার দেখে খলিফা তো ভেতরে ভেতরে রীতিমত গর্জাতে লাগলেন—'বেয়াদপির একটি সীমা-পরিসীমা থাকা দরকার। এমন অশোভন ও অসম্মানজনক কাজকে আর বরদাস্ত করা যায় না, উচিতও নয়।

আবু কাশেম ফিরে এলে তিনি কিন্তু কিছুমাত্রও উষ্মা প্রকাশ করলেন না। বরং স্বাভাবিক কণ্ঠেই বল্‌লেন—'আবু কাশেম, তোমাকে আজব ব্যাপার! এবার আমি বিদায় নিচ্ছি।'

আজব ব্যাপার! আবু কাশেম ভুলেও বল্‌ল না, আর একটু বসুন বা আজকের রাত আমার মেহমান হয়ে থেকে যান।'

খলিফা মুসাফিরখানায় ফিরতে ফিরতে ভাবলেন—'এমন কঞ্জুস আদমি দুনিয়ায় আর একটি মিলবে কিনা সন্দেহ, আর উজির জাফর কিনা গলা চড়িয়ে এর সুখ্যাতি করে! একবার তাকে নাগালের মধ্যে পেলে ঠ্যালা কাকে বলে বুঝিয়ে ছাড়ব!

খলিফা মুসাফিরখানার দরওয়াজায় পা দিয়েই থমকে গেলেন। দেখলেন তাঁর সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বাঁশীওয়ালি কিশোরী, পেয়ালাধারী লেড়কা। আর দুটো ক্রীতদাস আজব সে-গাছটি নিয়ে তাঁরই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।
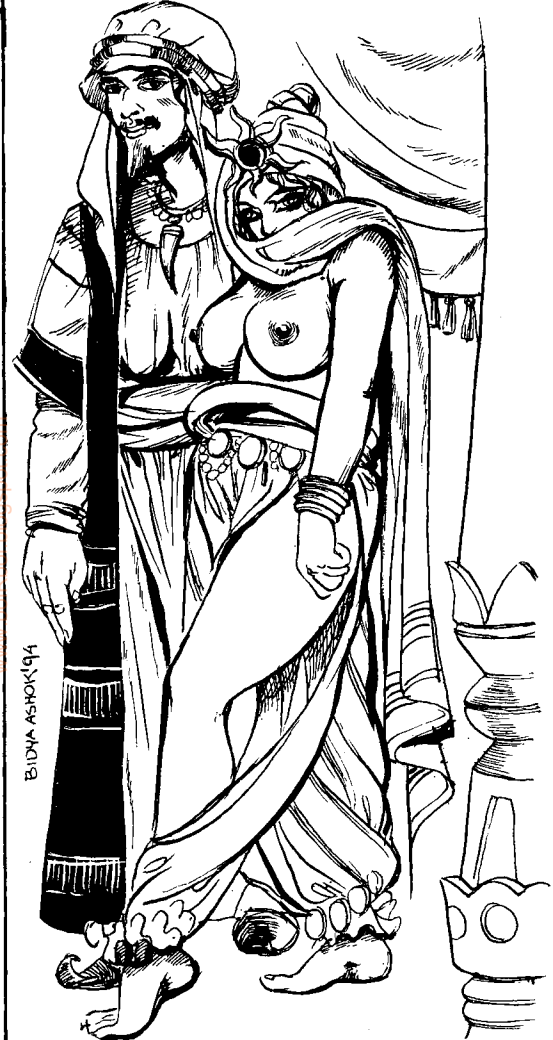
তারা আবু কাশেম-এর লেখা একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি খলিফার হাতে তুলে দিল—"জনাব, আপনি যে আমার গরীবখানায় কিছু সময়ের জন্যে মেহমান হয়ে এসেছিলেন তার জন্য আমি আন্তরিক কৃতার্থ। সামান্য উপঢৌকন পাঠালাম। গ্রহণ করলে বান্দা নিজেকে

ধন্য জ্ঞান করবে।"

খলিফা এবার স্বগতোক্তি করলেন—'উজির জাফর বিলকুল সাচ্চা বলেছে বটে। আবু কাশেম-এর সমান দাতা আর দ্বিতীয়টি নেই।

খলিফা মুসাফিরখানায় নিজের কামরায় আবু কাশেম প্রেরীত সামানপত্র রেখে তিনি ফিন তার প্রাসাদে ছুটলেন। আবু কাশেম-এর হাত দুটো ধরে আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌লেন—'কাশেম ভাইসাব, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি যদি আচরণে কোন অসঙ্গতি প্রদর্শন করে থাকি তবে মার্জনা ক'রে দিও। তুমি যদি এভাবে দান খয়রাত করতে থাক তবে আজ না হোক কাল তা ফুরোতে বাধ্য। তোমার ধন দৌলত বহুৎ হলেও জরুর অপরিমিত নয়।'

ম্লান হেসে আবু কাশেম বল্‌ল—'এর জন্য চিন্তা করবেন না ফি রোজ আমি আল্লাহ-র কাছে মোনাজাত করি যাতে দুনিয়ার ঋণ শোধ করে যেতে পারি। মেহমান কেউ এলে তাকে যেন তুষ্ট করতে পারি। সাচ্চা বটে, আল্লাহ আমাকে অফুরান ধন দৌলতই দিয়েছেন। খইয়ের মাফিক দু'হাতে বিলিয়ে গেলেও ফুরোবার নয়। আমার ব্যাপার আপনার কাছে খোলসা করে বল্‌লে আর কোন দ্বিধা থাকবে না। মেহেরবানি ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, সে কাহিনী আপনাকে শোনাচ্ছি। জনাব, আমার আব্বার নাম ছিল আবদ অল আজিজ। তিনি কায়রোর নামজাদা জহুরী ছিলেন।

আমার নানা আর তার আব্বা মিশরের বাদশাহের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁরা বাদশাহের ছত্রছায়ায় থেকে কাড়ি কাড়ি ধন দৌলত সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন, তারা মিশরে দিন গুজরান করলেও বসরাহে তাদের জান পড়ে থাকত। মিশরে উপার্জিত বিলকুল ধন দৌলত তাঁরা উভয়েই বসরাহতে এনে জড়ো করেছিলেন। আমি আমার আব্বার একমাত্র লেড়কা। একমাত্র সন্তানও বটে। তাই পূর্বপুরুষের বিলকুল সম্পত্তির মালিক আমি একা। বরাবরই আমার দরাজ হাত। অগাধ ধন দৌলত আমি দু'দিনেই উড়িয়ে দিলাম। আমি ভিঙমাঙ্গা বনে গেলাম। মকান ও জমি জিরাত যা ছিল বেচে দিয়ে বসরাহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আল্লাহ-র নাম নিয়ে হারা উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম। এক সওদাগর আমাকে কাছে টেনে নিলেন। আল্লাহ ভরসা করে তার সঙ্গে আগে মশুল ও পরে দামাসকাসে হাজির হলাম। তারপর গেলাম মরক্কো হয়ে কায়রো নগরে। কায়রোয় থাকাই স্থির হল। কায়রো নগরের ইমারৎ মসজিদও পথঘাট আমাকে মুগ্ধ করল। আমার পিতৃপুরুষরা এখানে বাদশাহী চালে জিন্দেগী কাটিয়ে গেছেন ভেবে পুলকে আমার দিল্ নেচে উঠল।

একদিন নীলনদের ধারে সুলতানের নাচ মহলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নদীর শোভা দেখছিলাম। হঠাৎ নাচমহলটির পর্দা সরে গেল। এক খুবসুরৎ লেড়কির মুখ ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। আমার দিল্ নেচে উঠল, এক লহমার মধ্যেই জানালা থেকে আমার বাঞ্ছিত মুখটি সরে গেল। আমি সেখান থেকে কিছুতেই সরে আসতে পারলাম না। আশায় আশায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি ফিন সে রূপসী জানালায় আসে। সন্ধ্যায় আন্ধার নেমে এল। সে কিন্তু ফিন দেখা দিল না।

অনন্যোপায় হয়ে আমাকে মুসাফিরখানায় ফিরে আসতে হ'ল। রাতভর তার মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে রইল।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আমি ফিন নীলনদের ধারের সে নাচমহলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালম। তামাম দিনেও সে-মুখটি জানালায় আর এল না।

আমি হাল ছাড়তে পারলাম না। তৃতীয় দিনেও হাজির হলাম

নাচমহলটির ধারে। দিনভর তীর্থের কাউয়ার মাফিক দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার নসীব সদয় হ'ল। জানালার পর্দাটি সরে গেল। আমার বহুৎ আকাঙ্ক্ষিত মুখটি ভেসে উঠল। আমার অত্যুগ্র আগ্রহী চোখ দুটোর সামনে। রোমাঞ্চে আমার দিল্ একদম ভরপুর হয়ে গেল। আমি একদম বেসামাল বেপরোয়া হয়ে গেলাম। গলা ছেড়ে

চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম—'সুন্দরী, আমি এক মুসাফির। তোমার খুবসুরৎ মুখাবয়ব দেখতে পেয়ে আমার এখানে আসা সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আমি মুগ্ধ। সাচমুচ ধন্য। লেড়কিটির মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। অনুচ্চকণ্ঠে সে বল্‌ল—এখন ভাগ। মাঝ-রাত্রে এখানে এসো।

আমার কলিজা নাচানাচি শুরু ক'রে দিল। মাঝ-রাত্রে সেখানে গিয়ে দেখি জানালা থেকে একটি রশি নিচে নেমে এসেছে। আল্লার নাম নিয়ে রশি-বেয়ে ওপরে উঠে দেখি আমার খোয়াবের হুরীটি পালঙ্কের ওপরে শুয়ে। আমি এক কদম দু'কদম করে পালঙ্কের ধারে গেলাম। সে আমাকে দু'হাতে বেষ্টন ক'রে পালঙ্কের ওপর ফেলে দিল। ব্যস, তার পর যা ঘটার এক-এক ক'রে তা-ই ঘটল। রাতভর আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পালঙ্কে পড়ে রইলাম। লেড়কিটি তার দুঃখের কিস্‌সা আমাকে শোনাল। সে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে যা বলেছিল তা হ'ল—লুবিবাহ তার নাম। সুলতানের বেগম। নাচমহলে সে নির্বাসনে দিন গুজরান করছে। সুলতানের অন্যান্য বেগমরা গোপন ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে সুলতানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করেছে। আজ সে এ-প্রেত পুরীতে একা বন্দিনী হয়ে দিন গুজরান করছে। বাৎচিৎ বলার মত লোকও কেউ-ই নেই। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নীল নদের ধারে তোমাকে দেখে খুশীতে আমার দিল্ নেচে উঠল।

দীর্ঘ দিনের অতৃপ্ত কামনার আগুনে তুমি ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিয়েছ। এক বাৎ শোনাও তো, আজকের রাত্রিটিই কি আমাদের শেষ রাত্রি হবে, নাকি তুমি ফিন আমার কাছে আসবে? আসবে তো?'

আমি তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলাম। বল্‌লাম—'তোমাকে বুকে নিয়েই আমি জিন্দেগী কাটিয়ে দিতে চাই মেহেবুবা।'

ঠিক তখনই দরজায় করাঘাত হ'ল। বেগম লুবিবাহ আঁৎকে উঠে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! কেলেঙ্কারী ঘটতে চলেছে; সুলতানের করাঘাত।'

এখন ফিকির কি করা যায়! জানালার রশিটি কেটে দেয়া হয়েছে। আমি সুরুৎ ক'রে পালঙ্কের নিচে সিঁধিয়ে গেলাম। শেষ রক্ষা হ'ল না। বিশজন নিগ্রো খোজা আমাকে টেনে হিঁচড়ে বের ক'রে নীলনদের পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমার জান, আমার কলিজা লুবিবাহকেও আমার সঙ্গেই পানিতে ছুঁড়ে দিল।

লুবিবাহ যে কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল হদিস মিল্‌ল না। হতাশা আর হাহাকার সম্বল ক'রে সাঁতরে পাড়ে উঠে এলাম।

কায়রো আমার কাছে বিষবৎ মালুম হতে লাগল। যাক সে জায়গা ছেড়ে বাগদাদে হাজির হলাম। আমার সম্বল আর মাত্র কয়েকটি দিনার। তা দিয়ে মিঠাই খরিদ ক'রে ফেরি করতে লেগে গেলাম। কারবার ভালই জমে গেল, আমার আয়ের সামান্য অর্থ ব্যয় করে খানাপিনা সেরে বাকী অর্থ জমাতে লাগলাম।

একদিন এক বুড্ডা মিঠাই খরিদ করার সময় আমার পরিচয় জানতে চাইল। আমি ঝুটমুট অতীতের পাতা ঘাটাঘাটি ক'রে নতুন ক'রে অশান্তির জোয়ারে ভাসতে চাইলাম না। বুড্ডাও পীড়াপীড়ি করল না। সে সামান্য মিঠাই নিয়ে পুরো দশটি দিনার জোর করে আমার হাতে গুঁজে দিল। আপত্তি করেও ফয়দা কিছুই হ'ল না।

আমি মিঠাই ফেরি করতে করতে পরদিন সেই বুড্ডাটির দোকানের সামনে যেতে সে ফিন আমাকে দোকানে তলব করল। গেলাম। সালাম জানালাম। সামান্য মিঠাই নিয়ে ফিন জবরদস্তি দশটি দিনার আমার হাতে গুঁজে দিল। আমার পরিচয় জানতে চাইল। সেদিন তার কাছে নিজেকে আর গোপন রাখতে পারলাম না। আমার বিলকুল পরিচয় তার সামনে তুলে ধরতেই হ'ল।

বুড্ডাটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'বেটা, তোমার আব্বা এক সময় আমার জিগরী দোস্ত ছিল। সে সুবাদে তুমি আজ থেকে আমার বেটা বনে গেলে।'

বসরাহ তার আদি নিবাস। পরদিন সে আমাকে নিয়ে বসরাহতে চলে গেল। নিঃসঙ্গ বুড্ডার সান্নিধ্যে সুখ-বিলাসের মধ্যে দিন গুজরান করতে লাগলাম।

প্রায় এক মাস বাদে বুড্ডা ইন্তেকালের কালে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌ল—'বেটা, আমি তোমার জন্য ধন দৌলত যা কিছু রেখে যাচ্ছি তার তুল্য অর্থকড়ি কোন সুলতান বাদশাহের কোষাগারেও নেই। আমি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে যে-উপদেশামৃত পেয়েছিলাম আমি তোমাকে অবিকল সে-বাৎ-ই বলে যাচ্ছি। দিল্ খোলসা ক'রে দান খয়রাত করবে। তোমার ধনভাণ্ডার কোনদিনই শূন্য হবে না। আর এক বাৎ, যে কোন হালতেই খুশী থাকবে। খোদাতাল্লা তোমাকে রক্ষা করবেন। ভুলেও মুষড়ে পড়ে কোন কাজ থেকে পিছিয়ে যাবে না।

তার উপদেশ শিরে ধারণ করে আমি দু'হাতে দান খয়রাত ক'রে চলেছি। আজ পর্যন্ত আমার ধনভাণ্ডার শূন্য হওয়া তো দূরের ব্যাপার সামান্যতম বে-কায়দায়ও মুহূর্তের জন্য আমাকে পড়তে হয় নি।

আমি বুড্ডার পরামর্শ মাফিক দেদার দান-খয়রাত করতে লেগে গেলাম। আমার ব্যাপার স্যাপার দেখে সুলতানের উচ্চ পদস্থ কিছু কর্মচারী ঈর্ষায় জর্জরিত হতে লাগল। এক রোজ সুলতানের কোতোয়াল আমার সামনে হাজির হ'ল। দাঁত বের ক'রে ফিক্ ক'রে হেসে বল্‌ল—আরে কাশেম ভাইয়া, তুমি শুরু করেছে কি,

শুনি? যা দিনকাল পড়েছে আমাদের মাফিক উঁচু বেতন-ধারীরা পর্যন্ত খাবি খাচ্ছি। আর তুমি কিনা দু'হাতে দিনার উড়িয়ে চলেছ! একটু দুধ-রুটি—তা-ও জোগাড় ক'রে উঠতে পারি না। মাত্র দিনে দশ দিনার দরকার, হররোজ জোগাড় হয় না।'

আমি একশ' দিনার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লাম—'এখন এটুকু নিয়ে যান, মাসের শেষে ফিন আসবেন। দেখি, কি বন্দোবস্ত করতে পারি।'

কোতোয়াল দিনারগুলো জেবে পুরতে পুরতে আমার হাতে চুম্বন করার কোশিস করল। আমি মুচকি হেসে হাতটি সরিয়ে নিয়ে বল্‌লাম—'আরে জনাব, আপনাকে যা দিলাম বিলকুল আল্লাহ-র দান। আমার নিজের বলতে নেই। তাঁরই নামগান ক'রে দিন গুজরান করছি, ব্যস।'

ক'দিন বাদে বসরাহের সুবেদার আমাকে তার দপ্তরে তলব করলেন। আমি হাজির হতেই তিনি বল্‌লেন—'আমার কাছে খবর আছে, তুমি হরদম দান-খয়রাত করে চলেছ। আর তোমার হাতে অপরিমিত ধন দৌলত আছে। ব্যাপার কি, খোলসা করে বল।'

সুবেদার সাহেবের মতলব বুঝতে আমার দেরী হ'ল না। আমি ম্লান হেসে বল্‌লাম—'দেখুন, দান-খয়রাত আমার দেদার কিনা তা-ও জানি না। তবে সাচ্চা বটে, কেউ আমার কাছে হাত পাতলে তাকে ফেরাতে পারি না। ব্যস। এর বেশী কিছু জানি না।'

—'শোন কাশেম, বসরাহ নগরে হাজার দুই গরীব আদমি রয়েছে। তাদের দু'বেলা রুটির জোগাড় হয় না। তুমি যদি ফি রোজ আমাকে দু'হাজার দিনার ক'রে দাও তবে আমি তাদের রুটি জোগাতে পারি, দেবে কি?'

আমি বুঝতে পারলাম, গরীব গোবরাদের নাম ক'রে সুবেদার নিজের ইয়া পেল্লাই ভুড়িটিকে আরও মোটা করতে চাইছে। তবু না বুঝার বাহানা ক'রে বল্‌লাম—'বহুৎ আচ্ছা, আপনার মর্জি মাফিকই কাজ হবে। আমি ফি রোজ আপনাকে দু'হাজার ক'রে দিনার পাঠিয়ে দেব, খুশী তো?'

এদিকে খলিফা হারুণ অল-রসিদ আবু কাশেম-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রী নিয়ে খুশী ভরা দিল্ নিয়ে বাগদাদে ফিরে গেলেন। প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে উজির জাফর'কে ডেকে বল্‌লেন—'আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আবু কাশেম-এর সঙ্গে আমি নিজে ভেট করেছি। প্রমাণ পেয়েছি আবু কাশেম সম্বন্ধে তুমি যা কিছু বলেছ বিলকুল সাচ্চা তো বটেই, বরং তার দান খয়রাতের পরিমাণ যা বলেছ তার চেয়ে ঢের বেশী। আমি তাকে কিছু উপহার দিতে চাই। লেকিন কি ক'রে তা সম্ভব হতে পারে, মালুম হচ্ছে না। ধন দৌলতের দরকার তো তার আদৌ নেই।'

উজির জাফর বল্‌ল—'জাঁহাপনা, অর্থের কদর সবাই দেয় না। অর্থ তো আজ আছে কাল না-ও থাকতে পারে। যদি আমার পরামর্শ নেন তবে আবু কাশেম'কে বসরাহের সুলতানের পদে বহাল করুন। এ বিনা দুনিয়ার কোন কিছুই তার যোগ্য পুরস্কার ব'লে গণ্য হবে না।'

—'ঠিক, একদম ঠিক বাৎ। তাকে আমি বসরাহের সুলতানের পদেই বহাল করব। তুমি তার আয়োজন কর।'

আবু কাশেমকে খলিফা বসরাহের সুলতানের পদে বহাল করলেন। আবু কাসেম ভাবতে লাগল 'একেই বলে নসীব। নীলনদের পানিতে যে একদিন ডুবে যাচ্ছিল আজ সে-ই বসরাহের সুলতানের পদ লাভ করল।'

এদিকে লুবিবাহ'কে এক জেলে উদ্ধার ক'রে বাঁদী-বাজারে বেচে দিল। খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর হারেমে তাঁর স্থান হ'ল। আবু কাশেম লুবিবাহ'কে ফিরে পেল। তাকে বুকে ফিরে পেয়ে খুশীতে তার দিল্ একদম ডগমগ হয়ে গেল। এবার থেকে তারা খুশী-আনন্দে জিন্দেগীর বাকী দিনগুলি গুজরান করতে লাগল।

কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভোর হতে এখনও ঢের দেরী। যদি হুকুম দেন তবে একটি নয়া কিস্‌সা শুরু করতে পারি।

এক জারজ খলিফার কিস্‌সা

বাদশাহ শারিয়ার-এর হুকুম পেয়ে বেগম এক জারজ খলিফার কিস্‌সা নামে এক নয়া কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে আরবের এক নগরে তিন জিগরী দোস্ত বাস করত। এক মুসাফিরখানায় তারা মাথা গুঁজে কোনরকমে দিন গুজরান ক'রে দিন কাটাত। তাদের পেশা ছিল স্রেফ ধান্ধাবাজী। লোক ঠকিয়ে রুটির জোগাড় করা। তাদের খানাপিনার চেয়েও অত্যাবশ্যক বস্তু ছিল চরস, গাঁজা আর ভাঙ প্রভৃতি হরেক কিসিমের নেশার সামগ্রী। দিনভর দিনার-দিরহামের ধান্ধায় ছুটোছুটি ক'রে সন্ধ্যায় মুসাফিরখানায় ফিরে তিন দোস্ত নেশার সামগ্রী নিয়ে গেঁট হয়ে বসত।

একদিন নেশা ভাঙ একটু মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় তাদের নেশা একদম চরমে উঠে গিয়েছিল। সেদিন হাসি-মস্করা করতে করতে শেষে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু ক'রে দিল। হুটোপুটি দাপাদাপি করে তারা সুলতানের প্রাসাদসংলগ্ন বাগিচায় ঢুকে পড়ে।

সুলতান তাদের বেয়াদপিতে উত্যক্ত হয়ে প্রহরীদের হুকুম দিলেন তাদের কয়েদখানায় পুরে দিতে।

পরদিন দরবারের কামকাজ শুরু হলে সুলতানের হুকুমে তিন ধান্ধাবাজ দোস্তকে সুলতানের সামনে হাজির করা হ'ল।

সুলতান তাদের দেখেই গোস্‌সায় একদম ফেঁটে পড়লেন—'শয়তান বেতমিস কাঁহিকার। তোমাদের পরিচয়? কে তোমরা? পেশাই বা কি? তোমাদের কলিজা কি এতটুকুও কাঁপল না যে, আমার প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় ঢুকে মাতলামি শুরু ক'রে দিলে?'

—'জাঁহাপনা, আপনি ঝুটমুট গোস্‌সা করছেন। আমরা কোন চোর-ডাকু নই। আমরা বিচার করে যে কোন প্রাণীর জন্মবৃত্তান্ত বাৎলে দিয়ে অর্থোপার্জন করি, ব্যস। বিলকুল সৎ পথে রুটির জোগাড় করি।'

এবার নেশাখোরদের একজন সুলতানকে তাদের কারবারের ব্যাপারটি আরও খোলসা ক'রে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি গ্রহরত্ন সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছি। পান্না, হীরা বা চুনী প্রভৃতি যেকোন গ্রহরত্ন আমার সামনে রাখলে আমি চোখ বন্ধ রেখেই বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ছুঁয়েই কোষ্ঠী বা ঠিকুজী বিচার ক'রে ভূত-ভবিষ্যৎ বাৎলে দিতে পারি।'

অন্য এক চরসখোর এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি যেকোন জানোয়ারের জন্মবৃত্তান্ত বাৎলে দিতে সক্ষম। যেমন ধরুন, কোন একটি ঘোড়াকে আমার সামনে হাজির করলে আমি গণনার মাধ্যমে তার গতি বা পিতৃপুরুষের যাবতীয় তথ্য আপনাকে দিতে পারব।'

সবশেষে তৃতীয় চরসখোর সুলতান'কে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি যেকোন আদমীর কোষ্ঠী বা ঠিকুজী বিচার ক'রে তার বংশপরিচয় বা ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা আপনাকে দিতে সক্ষম।'

সুলতান বল্‌লেন—'তোমরা তিনজনই তোমাদের অধীত বিদ্যার ব্যাপারে বল্‌লে। লেকিন তোমাদের বাৎ যদি সাচ্চা না হয় তবে কিন্তু তোমাদের জরুর কঠিন সাজা পেতে হবে। রাজী? প্রয়োজনে ফাঁসীতে ঝুলাবো, ইয়াদ রেখো।'

তিনজন চরসখোরই সমস্বরে জবাব দিল—'জাঁহাপনা, আমরা যদি আমাদের বিদ্যার সত্যতার প্রমাণ দিতে না পারি তবে আপনি যে-সাজা দেবেন, আমরা মাথা পেতে নেব।'

কিছুদিন বাদে সুলতান এক মুলুকের সুলতানের কাছ থেকে হরেক কিসিমের সামান-পত্র ভেট পেলেন। তাদের সঙ্গে ইয়া বড়া এক হীরাও রয়েছে। সুলতান প্রথম চরসখোরকে তলব দিলেন। সে এলে তাকে বল্‌লেন—'এই হীরাটি আদৎ, নাকি নকল তা তোমাকে বিদ্যাপ্রয়োগ ক'রে বাৎলে দিতে হবে। যদি না পার গর্দান নেব, ইয়াদ থাকে যেন।'

—'জাঁহাপনা, হীরাটি আমার হাতে দেয়ার দরকার নাই। টেবিলের ওপর রাখুন, আমি বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ছুঁয়েই আপনার প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি।' এবার সে হীরাটিতে বাঁহাতের কড়ে আঙুলটি ছুঁইয়েই আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে গেলাম। আমার আঙুল পুড়ে গেল।

জাঁহাপনা, এ ঝুটা! বিলকুল ঝুটামাল। জরুর আদৎ হীরা নয়।'

সুলতান গোস্‌সায় একদম ফেঁটে পড়ার জোগাড় হলেন। গর্জে উঠলেন—'এ-শয়তানটির গর্দান নে। আমার দোস্ত নাকি ঝুটা হীরা দিয়ে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। এর গর্দান নে।'

ঘাতক দৌড়ে এসে নেশাখোরটিকে রশি দিয়ে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে ফেল্‌ল।

বুড্ডা উজ্জির প্রমাদ গণলেন। তার গণনার সাচ্চা-ঝুটার বিচার না করেই সুলতান তার জান খতম করার হুকুম দিয়ে বসলেন। তিনি কুর্নিশ সেরে সুলতানকে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আদমিটি নেশা ভাঙ করে বটে। লেকিন তার বক্তব্যগুলো যে ঝুটা তারও প্রমাণ তো আমাদের নেয়া চাই।'

—'লেকিন তার জন্য পরীক্ষা নেয়ার কি দরকার আছে? আমার জিগরী দোস্ত জরুর আমাকে হীরা ভেট দিতে গিয়ে কাঁচ ভেট দেবে, হয় কখনও, নাকি ভাবা যায়?'

—'আমি হাজারবার মানি তিনি জ্ঞাতসারে এক টুক্‌রো কাঁচ পাঠিয়ে আপনাকে ধোঁকা দেবেন, এ-বাৎ আমি বিশোয়াস করতে ভেতর থেকে উৎসাহ পাচ্ছি নে জাঁহাপনা।'

—'সাচ্চা বলেছ তো। হীরাটিকে যাচাই করার জন্য কোন অভিজ্ঞ জহুরীর কাছে পাঠাও। হীরার চেয়ে তার জানের দাম ঢের ঢের বেশী।

—'বিচার করে নিঃসন্দেহ হতে গেলে আপনাকে হীরাটির মায়া ছাড়তে হবে। এবার ঘাতককে বল্‌লেন—হীরাটি কোপ দিয়ে দো আলাদা করে ফেল।'

ঘাতকটি তার হাতের তরবারি দিয়ে এক কোপ দিতেই দো আলাদা হয়ে গেল।

উজির বল্‌লেন—জাঁহাপনা, নেশা ভাঙ করলেও লেড়কাটি সাচ্চা বাৎ-ই বলেছে বটে। এটি জরুর নকল, আসলী হীরা নয়।'

সুলতানের প্রশ্নের জবাবে নেশাখোর লেড়কটি বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার এ-কড়ে আঙুলটির স্পর্শশক্তি অস্বাভাবিক যেকোন গ্রহরত্ন ছুঁইয়েই বুঝতে পারি, আদৎ মাল, নাকি নকল।'

—'এর গর্দান নেয়ার বদলে সুলতান-বাদশাহের মান বরাদ্দ কর।'

সুলতান এবার একটি তেজী ঘোড়া খরিদ ক'রে দ্বিতীয় চরসখোরটির সামনে হাজির করলেন।

লেড়কাটি এক লহমায় ঘোড়াটিকে দেখে নিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এটি সাচমুচ আদৎ জানোয়ার। তবে সামান্য খুঁৎ রয়েছে।'

—'দোষ? খুঁৎ ধরছ? এমন তেজী ঘোড়ার মধ্যে খুঁত—তোমাকে ফাঁসি—না, না ফাঁসি নয়, তোমার গর্দান নেব আমি।'

জাফর বল্‌ল—'জাঁহাপনা, লেড়কাটি যা বলছে তা ঝুটা হওয়াও অসম্ভব নয়। ফিন সাচ্চাও হতে পারে। তাই বলছি কি সাচ্চা বা ঝুটা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সাজা দেয়া ঠিক হবে না।'

খলিফা উজিরের উক্তি শুনে থমকে গেলেন। মিইয়ে গিয়ে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা, ঘোড়াটির কোন্ খুঁৎ তোমার চোখে পড়েছে, বল?'

—'ঘোড়াটির আব্বা আরবী বংশোদ্ভুত। লেকিন আম্মা ম্লেচ্ছ, তার আম্মা সিন্ধুঘোটকের ঔরস জাত।'

খলিফা ঘোড়াটির সহিসকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ঘোড়াটিকে তুমি কোত্থেকে সংগ্রহ করেছিলে বল তো?'

—'জাঁহাপনা, আমার কারবারই হচ্ছে, ঘোড়ার বাচ্চা পয়দা করিয়ে বাজারে বিক্রি ক'রে অর্থোপার্জন করা।'

—'তা-ই যদি হয় তবে বাতাও এর আব্বা আর আম্মার পরিচয় কি?'

—'এর আব্বা সাচ্চা তাজি বংশোজাত। লেকিন এর আম্মার ক্ষেত্রে একটু গড়বড় হয়েছে বটে। সে তাজি বংশের নয়। সে সিন্ধু ঘোটকের ঔরস জাত। এরা জারজ হলেও বহুৎ তেজী হয়। তাগড়াইও হয়। আব্বা আর আম্মা উভয়েই যদি আরবী ঘোড়া হয় তবে এমন খুবসুরৎ তাগড়াই কখনও হয় না। ঘোড়ার কারবারীরা আরব দরিয়ার কিনারে মাদী ঘোড়া আচ্ছা ক'রে বেঁধে রাখে। দরিয়া থেকে পুরুষ সিন্ধুঘোটক মাদি ঘোড়ার গায়ের খুসবু পেয়ে চনমনিয়ে ওঠে। ব্যস, হুড়মুড় ক'রে পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে। মাদী ঘোড়াটিকে সম্ভোগ ক'রে ফিনদরিয়ায় ভেগে যায়। তারা গর্ভ ধারণ করে। বাচ্চা হয়। তাগড়াই হয়। বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। মাদী আরবী ঘোড়াকে দিয়ে পাল খাওয়ানো হয়। এদের গর্ভে যে বাচ্চা পয়দা হয় তারা তাগড়াই ও চেকনাই হয়ে থাকে। তারা সাধারণ তেজি ঘোড়ার চেয়ে বেশ কয়েকগুণ চড়া দামে বিক্রী হয়। জাঁহাপনা ঘোড়াটি এভাবেই পয়দা হয়েছে।

খলিফা এবার মুচকি হেসে লেড়কটিকে বল্‌লেন—'হ্যাঁ, তোমার হিম্মৎ আছে বটে। তোমার বিচার নিখুঁত। লেকিন এমন বিচার তুমি কি ক'রে করলে, বল তো?'

লেড়কাটি ম্লান হেসে জবাব দিল—'জাঁহাপনা, এতো বুঝানো যাবে না। বিলকুল চর্চার ব্যাপার।'

খলিফা উজির জাফর'কে বল্‌লেন—'একে গুণীজনের সমান খাতির যত্নের বন্দোবস্ত কর।' তিনি এবার তৃতীয় লেড়কাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এবার তোমার বক্তব্যের প্রমাণ দেবে। চল, আমার সঙ্গে হারেমে চল।'

খলিফা তাকে নিয়ে প্রাসাদের হারেমে প্রবেশ করলেন। তিনি তার সবচেয়ে পেয়ারের বেগমের কামরার দরজায় হাজির হলেন। সঙ্গের লেড়কিটিকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—'তুমি বল্‌লে আমি এর বোরখা খুলে তোমাকে দেখাতে রাজী আছি। আচ্ছা ক'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখতে পার।'

লেড়কাটি বল্‌ল—'জাঁহাপনা, কোনই জরুরৎ নেই। আমার যেটুকু দেখার এরই মধ্যে দেখে নিয়েছি।'

—'ব্যস, চল বাইরে। এখানে, এর সামনে কোন আলোচনা করতে চাইনা।'

দরবারে ফিরে এসে খলিফা, লেড়কাটি আর উজির ছাড়া বাকী সবাইকে দরবার ত্যাগ করতে বল্‌লেন। দরবার খালি

হলে তিনি বল্‌লেন—'যে বেগম সাহেবাকে তুমি দেখে এলে তার বংশ পরিচয় আমি জানতে চাই। তোমার বিচার কি ব'লে ব্যক্ত কর।'

—'জাঁহাপনা, বেগম সাহেবা খুবসুরৎ। এমন সুরৎ সচরাচর নজরে পড়ে না। লেকিন, আমার বিচারের ফলাফল শুনলে আপনি জরুর খুশী হবেন না। যদি অভয় দান করেন—'

—'বল, তুমি যা বলতে চাইছ নির্ভয়ে বলতে পার।'

—'জাঁহাপনা, বেগম সাহেবার আব্বা সৎ বংশোদ্ভুত। লেকিন তাঁর আম্মা ছিলেন বারবণিতা।'

লেড়কাটির বক্তব্য শুনে সুলতানের কান লাল হয়ে গেল। তিনি গর্জে উঠলেন—'উজির, বেগম সাহেবার আব্বাকে আমার সামনে হাজির কর। যেখানে থাকুক তাল্লাশ করে বের কর।'

কিছু সময় বাদে উজির এক বুড্ডাকে দরবারে খলিফার সামনে হাজির করলেন। খলিফা বল্‌লেন—'তোমার লেড়কির জন্মবৃত্তান্ত জানতে চাই। বল, যা বলবে একদম সাচ্চা যেন হয়।'

এবার বললেন—'তোমার বিবির ব্যাপারে জানতে চাইছি, তোমার বংশ পরিচয় নয়। তোমার বিবির বংশ-পঞ্জী কিছু তোমার

জানা আছে কি? ইয়াদ রেখো, কোন কিছু ছিপাবে না।'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে বুড্ডা বলতে শুরু করল—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে আমি মক্কায় হজ করতে যাওয়ার সময় কিছু মজরোওরালি লেড়কির সঙ্গে মোলাকাৎ হয়। মক্কাগামী পথচারীদের খুশী ক'রে অর্থোপার্জনই তাদের পেশা। আমরা তাঁবু ফেলে রাত্রি গুজরান করছিলাম। সন্ধ্যার পরে তুফান উঠল। মরুভূমির বালি চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিপদ বুঝে কে যে কোথায় ছিট্‌কে পড়ল ঠিক ঠিকানা ছিল না।

ভোরে আমি তাকিয়ে দেখি, বালির ওপর পড়ে। তাঁবু বা সহযাত্রীদের কোন হদিসই নেই। কোনরকমে উঠে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর যেতেই দেখি, একটি গাছের গুঁড়ির কোটরে এক লেড়কি বসে রয়েছে। খুবসুরৎ। উমর একদম কম। ব্যাপার দেখে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কে গো? তোমার সঙ্গে কেউ নেই; তোমার আব্বা বা আম্মা সঙ্গে নেই?'

সে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। নীরবে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

আমি তাকে সঙ্গে ক'রে আমার মকানে নিয়ে এলাম। আমাদের পরিবারের অন্যান্য বালবাচ্চাদের সঙ্গে বড় হতে লাগল।

লেড়কির গায়ে ক্রমে যৌবনের চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল। খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কিটির দিকে আমার দিল্ ঝুঁকে পড়ল। আমি কাজীকে তলব দিলাম। শাদী নামা লিখা হয়ে গেল। স্বাক্ষীরা তাতে দস্তখৎ দিল। ব্যস বিধি মাফিক আমাদের শাদী চুকে গেল। জাঁহাপনা, এর বেশী তো আমার কিছুই জানা নেই।'

খলিফা এবার উজিরকে বল্‌লেন—'এ লেড়কাটিরও খাতির যত্নের বন্দোবস্ত কর।'

পরদিন ভোরে খলিফা তৃতীয় লেড়কাটিকে তলব করলেন।

লেড়কাটি খলিফার সামনে হাজির হলে তিনি বল্‌লেন—'তোমার কাজ হবে আমার জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করা। এবার যা কিছু বক্তব্য খোলসা ক'রে বল।'

—'জাঁহাপনা, আপনাকে কসম খেতে হবে, আপনার জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করতে গিয়ে কোন কিছু না ছিপিয়ে যদি একদম যা সাচ্চা তা যদি বলি তবে আপনি গোস্‌সা করবেন না। আর আমাকে কোন সাজা দেবেন না। রাজী?'

—'তোমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে পারলে তুমি সাজার বদলে ইনাম পাবে, ওয়াদা করছি।'

—'বহুৎ আচ্ছা। এবার দরবার খালি করার বন্দোবস্ত করুন। আপনি ও আমি ছাড়া তৃতীয় কেউ-ই এখানে থাকবে না।'

খলিফার হুকুমে দরবার কক্ষ খালি হ'লে লেড়কাটি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, সাচ্চা বাৎ

শুনুন, আপনি এক জারজ সন্তান। প্রমাণ চান, পেয়ে যাবেন।'

লেড়কাটির বক্তব্য কানে যেতেই খলিফার মুখ-চোখ একদম লাল হয়ে গেল। তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হ'লে, সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

বহুৎ কোশিস ক'রে খলিফা নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বল্লেন—'তোমার বক্তব্যের প্রমাণ চাই। প্রমাণ না দিতে পারলে কঠিন সাজা পাবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

লেড়কাটি ম্লান হেসে নির্ভয়ে বল্ল—'জাঁহাপনা, আমি জানি, আপনার আম্মা একদম বুড্ডি হয়ে গেলেও জিন্দা আছেন। তাকে পুছতাছ ক'রে এলেই আপনার দ্বিধা ঘুচে যাবে। আশা করি তিনি কিছুই ছিপাবেন না।'

—'বহুৎ আচ্ছা। এখনই ব্যাপারটির ফয়সালা করা দরকার।'

খলিফা হন্তদন্ত হয়ে তার বুড্ডি আম্মার সামনে হাজির হলেন। হাতে তার খোলা তরবারি। চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে।'

লেড়কার হালৎ দেখে তার আম্মার তো ডরে কলিজা শুকিয়ে গেল। কাঁপাকাঁপা গলায় বল্লেন—'বেটা, কি সমাচার? হয়েছে কি, বল তো?'

—'আমি জানতে চাই, আমার আব্বা কে? কি-ইবা তাঁর পরিচয়? কিছু ছিপাবার কোশিস করবে না। একদম যা সাচ্চা তাই বলবে। সাচ্চা বল্‌লে রেহাই পেয়ে যাবে। আর যদি ঝুটা—'

খলিফার বক্তব্য খতম হওয়ার আগেই বুড্ডিটি হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্ল—'বেটা, তুই আমায় জানের ডর না দেখালেও আমি কিছু না ছিপিয়ে সাচ্চা বাৎ-ই বলব। যা বলছি ধ্যায়ান ক'রে শোন—'আমার দেহে যখন যৌবনের ঢল নেমেছে তখন তোর আব্বা আমাকে হারেমে নিয়ে আসে। সে আমার কামরায় রাত্রি গুজরান তো করতই এমন কি প্রায় দিন ভর আমার কামরায়ই পড়ে থাকত। পুরো এক সাল পেরিয়ে গেল। আমার গর্ভে বাচ্চা এল না। আর এক সাল গেল, বাচ্চার কোন লক্ষণই নেই। আমার শাশুড়ী ধৈর্য হারিয়ে প্রায়ই আমাকে বাঁজা লেড়কি ব'লে ধমক ধামক দিতে লাগল। বুকে জ্বালা ধ'রে গেল। ভাবলাম, আমার শাশুড়ীই হয়ত সাচ্চা বলছেন।

একদিন হারেমে নয়া এক বেগম আমদানি করা হ'ল। খুবসরৎ। দেহে যৌবনের জোয়ার। তোমার আব্বা নয়া বেগমকে নিয়ে মেতে গেল। আমি হারেমের কোণে পড়ে রইলাম। আমার কামরায় পা-ই দেয় না। লেকিন পুরো দু'-দু'টি সাল গুজরান হয়ে গেল। তার পেটেও বাচ্চা এল না।

ব্যস, আমি নিঃসন্দেহ হলাম, আমার বা নয়া বেগমের কারোরই কসুর নয়। যদি কিছু কসুর টসুর থেকে থাকে তবে তা বিলকুল তোর আব্বার। তার বীর্য মরা। মরা বীর্যে লেড়কা পয়দা হতে পারে না। আর তখন একমাত্র চিন্তা লেড়কা পয়দা যদি না-ই হয় তবে বংশ থাকবে না। সুলতানিয়ৎ দেখারও কেউ-ই থাকবে না। আমি কলিজা শক্ত ক'রে ফেল্‌লাম, বংশ আর তখ্‌ত রক্ষা করতে আমার দিমাকে একই ভাবনা তখন চেপে ধরল। যেকোন ধান্ধা ক'রে একটি তাগড়াই নওজোয়ান জোগাড় করতেই হবে।

ধান্ধায় থেকে ফিকির কিছু না কিছু একটি বের করতেই হবে। ফিকির খুঁজতে খুঁজতে একদিন হারেমের কর্তাটিকে তলব করলাম। তার গাট্টাগোট্টা চেহারা। ব্যস, তাকে পালঙ্কে টেনে নিলাম। মেতে উঠলাম সম্ভোগে। সে আমার বুকে আসতে পেরে জিন্দেগী সার্থক বোধ করল। যখন বুঝলাম, কাজ হাসিল হয়েছে, আমার পেটে বাঞ্ছিত বাচ্চা এসে গেছে তখন আমি তার বুকে চাকু বসিয়ে দিয়ে খুন ক'রে ফেল্‌লাম। সহচারীদের সাহায্যে তাকে গোর দিয়ে দিলাম, ঝামেলা চুকে গেল। বুঝতেই পারছ বেটা, এ ছাড়া তোমার আব্বার বংশ রক্ষার আর কোন ফিকিরই খোলা ছিল না।'

বুড্ডি আম্মার বাৎ শোনার পর খলিফা আর টু-শব্দটিও করতে পারলেন না। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

লেড়কাটি তখনও কুর্শিতে ঠায় বসে। সুলতান অন্য একটি কুর্শি টেনে বসে বল্লেন—'এ-বিদ্যা তুমি কি ক'রে রপ্ত করেছ, বল তো?'

—'জাঁহাপনা, এ-তো কাউকে বলে বুঝানো যায় না। এতো বিলকুল দিল্ দিয়ে মালুম করার ব্যাপার। আদতে আমার ভেতরে এসব ব্যাপার কি ক'রে যে রপ্ত হয়েছে তা আমিও জানি না। মালুম হচ্ছে এসব আপসে এসে যায়।'

খলিফা এক লহমার মধ্যে আজব এক কাজ ক'রে বসলেন। নিজের শির থেকে তাজটি খুলে নিয়ে লেড়কাটির শিরে চাপিয়ে দিয়ে তাকে তখ্‌তে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন—'বেটা, এ তখ্‌তে আমার কোন দাবী নাই। আমি এ তখ্‌ত তোমাকেই দান ক'রে দিলাম। তুমি এ-সুলতানিয়তের দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে আমাকে মুক্তি দাও। আমি ফকিরের ঝোলা কাঁধে নিয়ে ভিন্‌দেশে চলে যাচ্ছি।'

খলিফা উজির নাজির আর আমীর-ওমরাহদের সাক্ষী রেখে সে লেড়কাকে তখ্‌তে বসিয়ে ফকিরের ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথে নামলেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটশ' একত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, খলিফা সাজ পোশাক গায়ে চাপিয়ে ঝোলা কাঁধে ভিন্‌দেশে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগলেন। এ মুলুক সেমুলক ঢুঁড়ে তিনি হাজির হলেন কায়রো নগরে। সেখানকার সুলতান এক সময় তাঁর জিগরী দোস্ত ছিলেন। আজব ব্যাপার, খলিফা সুলতান মামুদ-এর দরবারে হাজির হলে তিনি তাঁকে চিনতেই পারলেন না। চিনবেনই বা কি ক'রে? খলিফা যদি ফকিরের সাজ পোশাক গায়ে চাপিয়ে কারো সামনে হাজির হন তবে চিনতে না পারারই তো ব্যাপার। তিনি ফকিরকে খাতির ক'রে বসতে দিয়ে বল্‌লেন—'ফকির সাহাব, আপনি আমার দরবারে অচানক কেন হাজির হয়েছেন, বলুন তো?'

—'কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই। আমি সর্বত্যাগী ফকির। আমার আর কি-ই বা বাসনা থাকতে পারে? চাইবারও তো কিছুই নেই।'

—'বহুৎ আচ্ছা। লেকিন আপনি কেন মকান, বিবি আর বালবাচ্চা ছেড়ে ফকির দরবেশের সাজ গায়ে চাপিয়ে মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছেন, মেহেরবানি করে বলবেন কি?'

—'জাঁহাপনা, আপনার দরবারের কাম কাজ চুকে গেলে নিরালায় বসে আমি আমার কিস্‌সা শোনাব।'

খলিফার কিস্‌সা শুনে সুলতান মামুদ ব্যথিত হলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌লেন—'আমরা পাশাপাশি মুলুকের সুলতান। জিগরী দোস্ত। লেকিন এতদিন কেউ কাউকে চাক্ষুষ করার সুযোগই পাইনি। আজ যখন মোলাকাৎ হ'ল তখন আপনি ফকির দরবেশ আর আমি সুলতান। তাজ্জব কী বাৎ! আমাদের দোস্তী এতে বরং পাকা হ'ল। আপনি সুলতানের মর্যাদা নিয়ে আমার প্রাসাদে যতদিন দিল্‌ চায় অবস্থান করুন। সঙ্কোচের কোনই কারণ নেই।'

ফকির-দরবেশ বেশধারী খলিফা সুলতান মামুদের প্রাসাদের মেহমানা হয়ে রয়ে গেলেন।

এক ভোরে দুই জিগরী দোস্ত প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পায়চারী করছেন। সুলতান মামুদ তার জীবনের কিস্‌সা শোনাতে গিয়ে বল্‌লেন—'দোস্ত, আপনি বচপন থেকেই বাদশাহী পরিবেশে দিন গুজরান ক'রে এক সময় উত্তরাধিকার সূত্রে তখ্‌ত লাভ করেছেন। আমার সুলতান হওয়ার কিস্‌সা একদম আলাদা। আমি গোড়াতে ফকির দরবেশ হয়ে মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি। পরবর্তীকালে নসীবের চাকা একদম ঘুরে যায়। আমি এ-সুলতানিয়তের তখ্‌ত লাভ করি। আমার আব্বা এক গরীব গোবরা আদমি ছিলেন। পথে পথে ঢুঁড়ে পানি বেচে কোনরকমে দিন গুজরান করতেন। আমার উমর বাড়লেও পিঠে তিনটি ইয়া পেল্লাই মশক চাপিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'যাও, পানি বেচে জান বাঁচাবার ধান্দা কর গে। পানির মশক বইতে যে তাগদ দরকার তা আমার মোটেই ছিল না। ফলে পানি বেচে আব্বার মাফিক রুটির জোগাড় আমার হ'ল না।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ফকির দরবেশ সেজে পথে নেমে পড়লাম। আল্লাহ-র নামগান ক'রে দিন গুজরান করতে মেতে গেলাম। দিনভর মকানে আর দোকানে দোকানে ভিখ মাঙ্গি আর মসজিদের রোয়াকে গুটি গুটি মেরে রাত্রি গুজরান করি। যেদিন তবিয়ৎ গড়বড় হয়ে যেত কুয়ার পানি দিয়ে পেট ভরিয়ে নিতাম। পয়সাওয়ালা কোন আদমির নজরে পড়ে গেলে মোটা পয়সা জুটে যেত। আচ্ছা কোন খানা খরিদ ক'রে জিভটিকে একটু রসিয়ে নিতাম। ফিন মোটা ইনামও দু'এক আমীর দিয়ে বসত।

এক বিকালে মোটা ইনাম কিছু জুটে যাওয়ায় ছুটে বাজারে গেলাম। খানা খরিদ করতে একটি দোকানে ঢুকতে যাব অমনি দেখি কিছু আদমি এক জায়গায় ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। তাদের কেন্দ্রস্থলে একটি বান্দর হরেক কিসিমের খেল্‌ তামাশা দেখাচ্ছে। আদতে বান্দরটির মালিক তাকে বেচতে চায়।

আমার আলখাল্লার জেবে তখন পাঁচ পাঁচটি দিরহাম ঠুং ঠাং আওয়াজ ক'রে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। দিল্‌ চাইল বান্দরটিকে তার মালিক পাঁচ দিরহামে বেচতে রাজী হলে খরিদ করে নেব।

দরদাম চুকে গেল। বান্দরের মালিক মাত্র পাঁচ দিরহামেই আমাকে বান্দরটি দিয়ে দিল। ব্যস, মসজিদ থেকে আমার ঠাই উঠে গেল। বান্দরটি নিয়ে মসজিদে থাকার হুকুম মিলল না। অনন্যোপায় হয়ে আমার ভাঙা ডেরাতেই ফিরে আসতে হল। বান্দরটিকে নিয়ে খেল্‌ দেখিয়ে কিছু রোজগারপাতির ধান্দা আমার ছিল। তাকে কিছু কায়দা কসরৎ শেখাতে হবে। লেকিন তার আগেই পেটের জ্বালা আমাকে অস্থির করে তুলল। এবার মালুম হল বান্দরটি খরিদ না করাই বুঝি উচিত ছিল। আমি যখন নিজের কাজের জন্য আক্ষেপ করে আঙুল কামড়ে চলেছি ঠিক তখনই এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার আমার নজরে পড়ল। বান্দরটির দিকে চোখ ফেরাতেই সে ইয়া পেল্লাই এক জানোয়ার বনে গেছে। অচানক ব্যাপারটি দেখে আমার দিমাক বিগড়ে যাওয়ার জোগাড় হল। শুধু কি এ-ই, এবার সে এক লহমার মধ্যে এক খুবসুরৎ লেড়কার রূপ ধারণ করল।

সদ্য রূপান্তরিত লেড়কাটি বলল, মাহমুদ সাহাব, আপনি শেষ দিরহামটি পর্যন্ত খরচা করে আমাকে খরিদ করে নিয়েছেন। এখন আপনার হালৎ এমন হয়েছে যে সামান্য খানা খরিদ করে পেটের জ্বালা নেভানোর অর্থও আপনার জেবে নেই।

আমি জবাব দিলাম—'খোদা মেহেরবান, একদম সাচ্চা বটে। লেকিন কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? কোথায় তোমার মুলুক? আর কেনই বা আমার মাফিক এক অভাগার সঙ্গ নিয়েছ, বলতো?' লেড়কাটি বলল— 'এক এক করে আপনার বিলকুল প্রশ্নের জবাব মিলে যাবে। লেকিন এটি দিয়ে কিছু খানা খরিদ করে নিয়ে আসুন। একটি দিনার আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লেড়কাটি আমাকে বলল।'

আমি ঝুটমুট দেরী না করে বাজারে গিয়ে বড়িয়া কিছু খানা খরিদ করে নিয়ে এলাম। খানাপিনা চুকতেই ক্লান্তিতে আমার চোখ দুটো জড়িয়ে এল। ছেঁড়াফাটা একটি মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন যে নিদে একদম বেহুঁস হয়ে গিয়েছিলাম, মালুমই ছিল না। একসময় নিদ টুটল। চোখ মেলতেই আমি তাজ্জব বনে গেলাম। দেখি, খুবসুরৎ লেড়কাটি হাফিস হয়ে গেছে। তার জায়গায় বান্দরটি নাক ডাকিয়ে নিদ যাচ্ছে।

কয়েক লহমার মধ্যে বান্দরটির নিদ টুটে গেল। সে ঝট করে লাফিয়ে খাড়া হয়ে পড়ল। ব্যস, সে ফিন খুবসুরৎ লেড়কা বনে গেল। আমি স্বগতোক্তি করলাম—'ইয়া ইল্লাহ! এ কী আদব খেল তুমি শুরু করেছ!'

লেড়কাটি আমাকে তাজ্জব বানিয়ে বলে উঠল—'মাহমুদ সাহাব, আমাকে যখন লাভ করেছেন তখন তামাম দুনিয়ার ঐশ্বর্যের চেয়ে বেশী আপনাকে পাইয়ে দেব, ওয়াদা করছি।'

লেড়কাটি আমার জন্য ঝলমলে সাজপোশাক এনে দিল। ইয়া পেল্লাই এক প্রাসাদ ভাড়া ক'রে ফেললাম। ফকির দরবেশের সাজপোশাক খুলিয়ে ঝলমলে সাজপোশাক পরিয়ে আমাকে একদম শাহজাদা বানিয়ে দিল।

লেড়কাটি বল্ল—'মাহমুদ সাহাব, মিশরের সুলতানের দরবারে চলে যান। তাঁর কোন লেড়কা পয়দা হয়নি। দু'-দুটো খুবসুরৎ লেড়কি রয়েছে। আপনি দরবারে হাজির হয়ে সুলতানকে নতজানু হয়ে কুর্নিশ জানাতে কসুর করবেন না। সুলতান তাঁর একটি লেড়কির পাণিগ্রহণ করতে অনুরোধ করবেন। তখন আপনি কোন্ রাস্তা ধরবেন বলুন তো?'

—'সুলতান যদি খুশী হয়ে তাঁর লেড়কিকে আমার হাতে তুলে দিতে চান তবে তা আমার পক্ষেও জরুর খুশীর ব্যাপারই হবে।'

লেড়কাটি নিজেই ধন দৌলত দিয়ে একটি পেটরা গুছিয়ে দিল সুলতানকে ভেট দেয়ার জন্য।

আমি সুলতানের দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে কুর্নিশ করলাম। এবার বাক্সটির ডালা খুলতে খুলতে বল্লাম—'জাঁহাপনার জন্য যৎসামান্য নজরানা নিয়ে এসেছি। মেহেরবানি ক'রে যদি গ্রহণ করেন তবে এ বান্দা খুশী হবে।'

বুড্ডা উজির আমার হাত থেকে বাক্সটি নিয়ে সুলতানের সামনে ধরল। হীরা জহরৎ, মণি-মাণিক্যে বাক্সটি একদম ঠাঁসা। সুলতান এক লহমায় বাক্সের ধন দৌলতগুলি দেখে নিলেন।

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সুলতান বল্লেন—'আমি আপনার আচরণে মুগ্ধ। এবার নির্দ্বিধায় বলুন, আমার কাছ থেকে আপনি কি প্রত্যাশা করছেন।'

—'জাঁহাপনা, আমার প্রত্যাশা আদপেই সামান্য নয়, বরং বলতে পারেন একটু বেশীই। আমি আপনার প্রথমা লেড়কির পাণিপ্রার্থী।'

কয়েক লহমা মৌন থাকার পর সুলতান গম্ভীর স্বরে বল্লেন —'বহুৎ আচ্ছা, আপনার প্রত্যাশা পূর্ণ করব, ওয়াদা করছি।'

বৃদ্ধ উজির বল্ল—'জাঁহাপনা, একে লেড়কি তা-ও ফিন আপনার প্রথমা লেড়কি। এমন ঝটপট সিদ্ধান্ত না নিয়ে দু'-চার দিন ভাবুন, বিচার-বিবেচনা করুন।'

—'বিচার-বিবেচনা? কোনদিক থেকে, কিভাবে বিচার করতে বলছ, উজির?'

—'এক কাজ করুন, আপনার ধনভাণ্ডারে যত হীরা-জহরৎ

রয়েছে তাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সেরা সেটি দেখিয়ে বলুন, যদি এর সমান আর একটি হীরা আনতে পারে তবেই আপনি তার প্রত্যাশা পূর্ণ করবেন। দেনমোহর হিসাবে সে আপনাকে হীরাটি দেবে।'

—'বহুৎ বড়িয়া মতলব!'

সুলতানের বাৎ শোনামাত্র আমার কলিজা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে গেল।'

ধনভাণ্ডার থেকে ইয়া পেল্লাই একটি হীরা এনে সুলতানের হাতে দেয়া হ'ল। সুলতান সেটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—'এর সমান একটি হীরা তোমাকে সংগ্রহ ক'রে আমার হাতে এনে দিতে হবে, পারবে? সেটি তোমার তরফ থেকে শাহজাদীর শাদীর দেনমোহর হিসাবে গণ্য হবে। যদি তুমি আমার বাঞ্ছিত হীরাটি এনে দিতে পার তবে আমি তোমার হাতে আমার প্রথমা লেড়কিকে তুলে দেব। ওয়াদা করছি।'

আমি অনুসন্ধিৎসু নজরে হীরাটি দেখে নিয়ে বল্লাম—'কাল মকানে আপনার সঙ্গে ভেট করব।'

সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মকানে ফিরে এলাম। বান্দরটি জিজ্ঞাসা করল—'ব্যাপার কি? খবর আচ্ছা তো?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমি বল্লাম—'না, তিলমাত্র আশার আলোও আমার নজরে আসছে না। ইয়া পেল্লাই এক হীরা সুলতান তাঁর লেড়কির দেনমোহর হিসাবে দাবী করছেন। কোথায় পাব তার বাঞ্ছিত সে-হীরা?'

বান্দরটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বল্ল—'কেন ঝুটমুট ঘাবড়াচ্ছেন? আমি ইয়া পেল্লাই এক হীরা এনে দেব যা এক নজরে দেখামাত্র সুলতানের দিমাক ঘুরে যাবে। কাল সকালেই একটির বদলে দশটি হীরা আমি হাজির করব।'

সকাল হতেই বান্দরটি সুলতানের বাগিচায় এক চক্কর মেরে কবুতরের ডিমের মাফিক ইয়া পেল্লাই দশ-দশটি ডিম নিয়ে আমার কাছে এল।

আমি তো হীরাগুলো এক নজরে দেখেই খুশীতে নাচানাচি শুরু করে দিলাম। ব্যস, আর দেরী নয়, হাঁফাতে হাঁফাতে সুলতানের দরবারে হাজির হলাম তাঁকেকুর্নিশ জানিয়ে হীরাগুলো সুলতানের সামনে তুলে ধরলাম।

আমার হিম্মৎ দেখে সুলতানের চোখ দুটো একদম ছানাবড়া হয়ে গেল।

উজির মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্ল—'জাঁহাপনা, এবার আমি মেনে নিচ্ছি, এ নির্ঘাৎ কোন আমীর-ওমরাহের বেটা। শাহজাদীর শাদীতে রাজী হয়ে যান। সাচ্চা বলছি, ঠকবেন না।'

সুলতান কাজীকে তলব দিলেন। তাঁর সুলতানিয়তের সবচেয়ে নামজাদা কাজী হাজির হ'ল। সাক্ষীরাও এসে পড়ল। শাদীনামা বানানো হয়ে গেল। সাক্ষীরাও দস্তখৎ করল, টিপছাপা দিল।

আমি আগেভাগেই আমার পয়মন্ত বান্দরটিকে শাদীর আসরে নিয়ে গিয়েছিলাম। নসীবের ফেরে আমার তো পেটে একদম কালির অক্ষর নেই। তাই বান্দরটির সামনে শাদীনামাটি ধ'রে বল্লাম—'পড়ে দেখ তো কি লিখা রয়েছে?'

সে গলা নামিয়ে শাদীনামাটির আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে আমাকে শুনিয়ে দিল। আমি খুশী হলাম। তার মুখেও হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। এরপর সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বল্ল—'এক কাম করতে হবে। আমার অনুমতি ভিন্ন আপনি বিবিকে সম্ভোগ করবেন না, ইয়াদ রাখবেন।'

—'হ্যাঁ, জরুর ইয়াদ রাখব।'

আমি সদ্য শাদীকরা বিবিকে নিয়ে পর পর দু'রাত্রি একই পালঙ্কে কাটালাম। বান্দরটির নির্দেশ মাফিক সম্ভোগ সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখলাম। স্বাভাবিক ভাবেই আমার বিবির রাত্রিও নিরামিষই কাটল।

পর পর দু'দিন ভোরে এসে আমার বিবির আম্মা লেড়কির কুমারীত্ব সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে এসে যখন জানলেন তার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে তখন তিনি হতাশ হয়ে গলা ছেড়ে কান্নাকাটি শুরু করলেন। আদৎ ব্যাপার না জানলে যা হয়।

অনন্যোপায় হয়ে বেগম সাহেবা ব্যাপারটি সুলতানের কানে তুললেন। সুলতান গোস্সায় একদম ফেটে পড়ার জোগাড় হলেন—'এসব কী বেয়াদপি কারবার শুরু হয়েছে। আমার লেড়কির জিন্দেগী বরবাদ করবে আর আমি মুখবুজে হজম করব, অসম্ভব। ধান্ধাবাজীর বদলা আমি নিয়ে ছাড়ব, দেখে নিও বেগম সাহেবা। আর একটি মাত্র রাত্রির সুযোগ তাকে আমি দেব। আজও যদি সে আমার লেড়কিকে সম্ভোগ না করে তবে গর্দান নিয়ে ছাড়ব, এ-ই আমার ওয়াদা রইল।'

সুলতানের ওয়াদার ব্যাপার আমার কানে যেতেই আমি হন্তদন্ত হয়ে একমাত্র ভরসা বান্দরটির কাছে গেলাম। তাকে বিলকুল খোলসা ক'রে বল্লাম। সে এবারও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসল। তারপর বল্ল—'এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন মালিক? আপনি নিশ্চিন্তে আপনার বিবির কাছে ফিরে যান। তার হাতের বাজুটি আপনি চাইবেন। সে দিয়ে দেবে। সেটি নিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসবেন। সেটি আমার জিম্মায় রেখে তার কাছে ফিরে গিয়ে রাতভর সম্ভোগে মেতে থাকবেন, বারণ করব না।'

রাত্রে খানাপিনা সেরে আমার বিবি কামরায় ফিরে এলে আমি

তার কাছে বাজুটি চেয়ে বসলাম। সে হাত থেকে সেটি খুলে নির্দ্বিধায় আমার হাতে দিয়ে দিল। আমি এক দৌড়ে মকানে এসে বান্দরটির জিম্মায় সেটি রেখে ফিন বিবির কাছে ফিরে গেলাম।

সে-রাত্রে আমরা প্রথম সম্ভোগে লিপ্ত হলাম। আমরা দলন, পেষণ, চুম্বন আর সঙ্গম সহবাসের মধ্য দিয়ে পুরো রাত্রি কাটালাম। ভোরের মুখে শরীর আর বরদাস্ত করল না। আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে এলিয়ে পড়ে রইলাম। আমি নিজে একদম বেহুঁস হয়ে পড়ে রইলাম। তখন মালুম হ'ল কে যেন আমার গা থেকে ঝলমলে বহুমূল্য বাদশাহী সাজ পোশাক খুলে নিয়ে আমাকে সে ফকিরের পোশাক পরিয়ে দিল। নিদ টুটলে আমি নিজের চোখ দুটোকেই

বিশোয়াস করতে পারলাম না। ইয়া আল্লাহ আমি সেদিন ফকির দরবেশ বনে গেলাম। ফিন ভিখমাঙ্গা ফকির দরবেশ সেজে বসে রয়েছি। আমার বেগমের কাছে ফকিরের আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে দাঁড়াতে শরমে মাথাকাটার সামিল। আমি চুপিসারে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলাম। উদ্ভ্রান্তের মাফিক চলতে চলতে এক সময় এক বুড্ডা মুর যাদুকরের কামরায় হাজির হলাম। বুড্ডা মুরটি বল্‌ল—'কি হে, এত ভোরে হামলা—কোন বিপদ আপদ ঘটে নি তো? কোন মতলব টতলব—?

আমি তার কাছে বিলকুল কাহিনী খোলসা ক'রে বল্‌লাম। ওই বান্দরটি কোন আদমির বাচ্চা বান্দর সেজে তোমার আশ্রয়ে বাস করছে না। বান্দরটি আদতে এক জিন, আর সুলতানের প্রথমা লেড়কিটির ওপর তার দীর্ঘদিনের লালচ। তার হাতের যে বাজুটি ছিল সেটি থাকার জন্য সে কায়দা করতে পারছিল না। এবার মওকা হাতে মিলেছে। তোমাকে দিয়ে কাজটুকু হাসিল ক'রে নিয়ে তোমাকে ফিন ফকির দরবেশ সাজিয়ে দিয়েছে। সে এখন সুযোগ পেলেই শাহজাদীকে একের পর এক রাত্রি সম্ভোগের মাধ্যমে আয়েশ মিটিয়ে ছাড়বে।

বুড্ডা মুর যাদুকরটি বল্‌ল—'কোই বাৎ নেহি। আমি শয়তানটিকে এমন শিক্ষা দেব যে, বুঝবে ঠ্যালা কাকে বলে।'

মুর যাদুকরটি এক চিল্‌তে কাগজ আমার হাতে দিল। যা বলছি ধ্যায়ান ক'রে শোন—এক সময় দেখবে এক নওজোয়ান ফৌজদার তার ফৌজ নিয়ে চলেছে। তাকে ঝট্ ক'রে সালাম জানাবে। তারপর এ-কাগজের চিল্‌তেটি তার হাতে দেবে। বাদশাহী কেতায় কুর্নিশ করবে। শোন বেটা, তোমার বাঞ্ছা পূরণ হলে আমাকে যা পার বকশিষ দিয়ে যেয়ো। এখন সোজা উত্তর দিকে পয়দল হেঁটে যাও।'

আমি তিনদিন তিনরাত্রি পয়দল হেঁটেই চল্‌লাম। রাস্তা আর ফুরোয় না। ফৌজদের সঙ্গে দেখা হয়। ক্লান্তি অবসাদ আমাকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌ল। এক রাত্রে গাছের তলাতেই গুজরান করতে স্থির করলাম।

দূর থেকে মনে হয়েছিল এ বুঝি মরুদ্যান। কাছে যেতেই ভুল ভাঙল। ইয়া আল্লাহ! এযে দেখছি সবাই ঘাস আর ঝোপ-ঝাড়। গত্যন্তর তো কিছুই নেই। সামান্য জায়গা হাতড়ে সাফ সুতরা ক'রে নিয়ে বসার যোগ্য জায়গা ক'রে নিলাম। হরেক কিসিমের রাতজাগা পাখি বিশ্রী স্বর ক'রে থেকে থেকে ডেকে উঠতে লাগল। ভয়ে আমার কলিজা দরকচা মেরে যাবার জোগাড় হ'ল। মালুম হ'ল ভোর হওয়ার আগেই বুঝি জান খতম হয়ে যাবে। খোদা তাল্লার নাম স্মরণ ক'রে বসে রইলাম।

কিছু সময়ের মধ্যেই অচানক সোজা হয়ে বসে পড়লাম। ডরে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখি হাজার খানেক অত্যুজ্জ্বল বাতি আমার দিকে ছুটে আসছে। আল্লাতাল্লা-র নাম স্মরণ করতে লাগলাম। আমি নিশ্চিত, এবার জান খতম হবেই। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো হিম্মৎ নেই আমাকে রক্ষা করে।

অবাঞ্ছিত বাতিগুলো আমার একদম মুখোমুখি হয়ে এল।

অত্যুজ্জ্বল সে আলোক রশ্মির মধ্যে এক অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম—সুলতান তখ্‌তে বসে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। আর আমাকে অনুসন্ধিৎসু নজরে দেখছে, আমার পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে বার বার পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি হতে লাগল। এমন সময় সুলতান কর্কশ স্বরে ব'লে উঠলেন—'মূর যাদুকরের দেয়া কাগজের টুকরোটি কোথায়? কোথায় রেখেছ, জলদি দিয়ে দাও।'

আমি কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজটি তার হাতে তুলে দিয়ে তখনকার মত জান রাখার বন্দোবস্ত করলাম। কাগজটি হাতে পেয়েই সুলতান আতবাস নামে তাঁর এক কর্মচারীকে হুকুম করলেন—'যাও, শয়তান বেতমিস জীনটিকে জলদি পিঠ মোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে এসো।'

ঘণ্টা খানেকের ভেতরেই সে-বান্দরটিকে শিকল দিয়ে আচ্ছা ক'রে বেঁধে সুলতানের সামনে হাজির করল। সুলতান তার দিকে কটাক্ষ হেনে গর্জে উঠলেন—'এ আদমির বাচ্চাটির সঙ্গে ছল-চাতুরীতে মত্ত হয়েছ কেন, জবাব দাও। কেন তার সামনের লবণ-রুটি ছিনিয়ে নিয়েছ? জবাব দাও—জলদি জবাব দাও। নইলে এক্ষণি তোমাকে খতম ক'রে দেব।'

সুলতানের হুমকি শুনেও জীনটি এতটুকুও দমল না। সে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বল্‌ল—'আমার হকের ধন আমি হাতিয়ে নিয়েছি। এতে তো আমার কোন কসুরই নেই।'

—'তোমার হকের ব্যাপার না হয় পরে শুনব, আগে এর বাজুটি ফিরিয়ে দাও। নইলে তোমার—'

সুলতানের মুখের বাৎ খতম হওয়ার আগেই জীনটি বলতে শুরু করল—'না। দেব না। শাহজাদীকে লাভ করার জন্য আমি বহুৎ কায়দা-কসরৎ করেছি। বহুৎ তকলিফও ভোগ করতে হয়েছে আমাকে। বাজুটি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার হিম্মৎ আপনার নেই।'

সে কোর্তার জেব থেকে বাজুটি বের ক'রে এক লহমার মধ্যে মুখে পুরে টপ ক'রে গিলে নিল।

সুলতানও এতে এতটুকুও দমলেন না। বান্দরটিকে আঁকড়ে ধরে মাথার ওপরে তুলে মারল সজোরে এক আছাড়। পর পর কয়েকটি আছাড় খেয়ে তার হাড্ডি গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেল। ব্যস, তার জান একদম খতম হয়ে গেল।

সুলতানের এক রক্ষী বান্দরটির গলা চিরে বাজুটি বের ক'রে ফেল্‌ল। সেটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সুলতান চোখের পলকে সদলবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আমি ফিন রাত্রির গাঢ় আন্ধারে তলিয়ে গেলাম।

ঘুটঘুটে আন্ধারেও আমার বেশ মালুম হ'ল আমার গায়ে ফিন শাহজাদার সাজ পোশাক চেপে গেছে। শুধু এ-ই নয়, আমি যেন ঘাসবন ছেড়ে পালঙ্কের ওপর বসে। আন্ধারে হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম। মালুম হ'ল শাহজাদী, আমার বিবি সম্ভোগের ক্লান্তি অবসাদ গুজরান করতে গভীর নিদে মগ্ন। আলতো ক'রে বাজুটি তার হাতে পরিয়ে দিলাম।

আমার বিবির নিদ টুটে গেল। সে ঝট ক'রে হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। চুম্বনে চুম্বনে আমাকে একদম মাতোয়ারা ক'রে দিল।

সকাল হ'ল। দরওয়াজা খুলে দিলাম। সুলতান ও বেগম সাহেবা লেড়কির মুখে আমাদের সঙ্গম সহবাস-সম্ভোগের ব্যাপার স্যাপার শুনে খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে উঠলেন।

এর পর থেকে পেয়ার মহব্বতের মধ্য দিয়ে খুশীর আমেজে আমরা দিন গুজরান করতে লাগলাম। সুলতান বেহেস্তে যাবার আগে আমাকে তার তখ্‌তে বসিয়ে সুলতানের পদে বহাল করলেন। ভাই সাহাব, তখন থেকেই আমি সুলতানের পদে বহাল আছি।'

ফকির দরবেশ সুলতান এবার থেকে দীর্ঘদিন সুলতান মামুদ-এর প্রাসাদে মেহমান হয়ে অবস্থান করলেন।

প্রথম উন্মাদের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে 'প্রথম উন্মাদের কিস্‌সা' নামে একদম আলাদা স্বাদের এক কিস্‌সা শোনাচ্ছি। আশা করি আমার এ-কিস্‌সাটিও আপনার মেজাজ মর্জি একদম শরিফ ক'রে দেবে। আর এক অনাস্বাদিত খুশীর জোয়ারে আপনার দিল্‌ উপচে পড়বে।

এক সকালে রক্ষীরা সুলতান মামুদ-এর দরবারে তিনজন নওজোয়ানকে হাজির করল।

সুলতান মামুদ অনুসন্ধিৎসু নজরে নওজোয়ানদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'তোমরা কারা? কি নাম?'

নওজোয়ানদের একজন সুলতান'কে কুর্নিশ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি একজন সওদাগর। কাপড়ের কারবার করি। আমার আব্বাও একই কারবারে লিপ্ত ছিলেন। হিন্দুস্থান থেকে চটকদার কাশ্মিরী রেশমের কাপড় আমদানি ক'রে বাগদাদের বাজারে চড়া দামে বেচে প্রচুর মুনাফা পিটি।

এক সকালে আমি দোকানে বসে আছি, এমন সময় এক বুড়ি খুবসুরৎ এক নওজোয়ান লেড়কিকে নিয়ে আমার দোকানে হাজির হ'ল। দামী সাজ পোশাক দেখাতে বল্‌ল। আমি ব্যস্ত হাতে একটি

কাপড় দেখাতেই তার দিলে ধরে গেল। দাম একটু বাড়িয়েই হাঁকলাম। পাঁচশ দিনার্। তাতেই রাজী হয়ে দাম মিটিয়ে দিল। দেড়শ' দিনারের কাপড় নিয়ে গেল পাঁচশ' দিনার দিয়ে, সে ফি রোজ আসে। পাঁচশ' ক'রে দিনার দাম চুকিয়ে একটি ক'রে কাপড় নিয়ে যায়। আশাতীত মুনাফা হওয়াতে আমার মুলধন বেড়ে যেতে লাগল।

একদিন খুবসুরৎ লেড়কিটি বটুয়াটি খুলেই আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! দিনারগুলো গোছগাছ করেও বটুয়ায় ভরতে ভুলে গেছি!'

আমি মুচকি হেসে বল্লাম—'কোই বাৎ নেহি—তাতে কি হয়েছে। আপনি কাপড়টি নিয়ে যান। পরে সুযোগ সুবিধা মাফিক দাম চুকিয়ে দেবেন।'

—'না, ভুলচুক হয়ে গেলে—'

—'যদি ভুলচুকই হয় তবে আমি বরং খুশীই হ'ব।'

—'দরকার নেই। কালই ররং এসে নগদ দাম দিয়ে কাপড়াটি নিয়ে যাওয়া যাবে।'

আমি বিবেচনা ক'রে দেখলাম, খুবসুরৎ এ-লেড়কিটি ইতি-মধ্যে পনেরটি কাপড় খরিদ করেছে, তার বদলে আমি মুনাফা যা পিটেছি তাতে সে যদি একটি কাপড় মাগনাও নিয়ে যায় তাতেও 'আমার লোকসান হবার নয়। তাই আমি লেড়কিটির সঙ্গে সৌজন্য প্রদর্শনের লড়াইয়ে মেতে গেলাম। দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে ফয়সালা হ'ল। লেড়কিটি বল্ল—'কাপড়াটি আমি নিতে পারি যদি আপনি আমার কুড়েঘরে আমার সঙ্গে যান। দাম চুকিয়ে দেব। ব্যস, ফিরে আসবেন, রাজী?'

—'আপনার মকানে যাওয়ার লালচ আমার আছে বটে, লেঁকিন পাওনা আদায়ের জন্য জরুর নয়।'

—'বহুৎ আচ্ছা, মহাজন সেজে না যেতে চান তো মেহমান হয়ে, চলুন।' আর সময় নষ্ট না করে দোকান বন্ধ ক'রে তার পিছু নিলাম। বার কয়েক বাঁক ঘুরে একটি রুমাল দিয়ে লেড়কিটি বল্ল—'কিছু মনে করবেন না, এ রুমালটি দিয়ে চোখ দুটো বেঁধে বুড্ডিটির হাত ধ'রে এগিয়ে চলুন।'

আমি সবিস্ময়ে বল্লাম—'সে কী! চোখ বেঁধে কেন?'

—'আর বলবেন না। এ-গলিতে কিছু খুবসুরৎ লেড়কি দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের কাউকে যদি আপনার নজরে ধরে যায়, তাই এ-বন্দোবস্ত।'

আমি সরবে হেসে চোখ দুটো বেঁধে নিলাম। বুড্ডিটির হাত ধরে কয়েক কদম এগিয়ে একটি কামরায় হাজির হয়ে গেলাম। আমার চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হ'ল। দেখলাম, এক সুসজ্জিত কামরায় আমি দাঁড়িয়ে। বুড্ডিটি আমাকে কামরাটিতে বসিয়ে দিয়ে অন্দর মহলে চলে গেল। কামরাটির এদিক-ওদিক নজর ফেরাতেই লক্ষ্য করলাম, আমার দোকান থেকে খরিদ করা কাপড়াগুলি কামরাটির কোণায় ঢাই ক'রে ফেলে রাখা হয়েছে।

আমি যখন কাপড়াগুলির নসীব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছি ঠিক তখনই দুটো লেড়কি দুটো পানির গামলা নিয়ে কামরাটিতে এল।

তারা আমার দোকানের রেশমী কাপড়াগুলো থেকে একটি ক'রে কাপড় নিয়ে পানিতে ভেজায়। তারপর সেগুলো দিয়ে কামরাটির মেঝে মুছতে লেগে গেল।

কারবার দেখে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। অর্থ থাকলেই কি এমন ক'রে অপচয় করতে হবে! আমার গায়ে জ্বালা ধরে গেল।

একটু বাদেই বুড্ডিটি এসে আমাকে ঝকঝকে চকচকে এক কামরায় নিয়ে গেল। পুরো কামরাটি নিপুণ হাতে সাজানো। ডরে আমার কলিজা শুকিয়ে গেল। ভাবলাম, এবার নির্ঘাৎ আমার মোউৎ এসে হাজির হবে।

না, মোউৎ নয়, খুবসুরৎ সে-লেড়কিটি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমার মুখোমুখি এসে খাড়া হয়ে গেল। আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পালঙ্কের ওপর বসিয়ে দিল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

আটশ' ছত্রিশতম রজনী

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বাদশাহ শাহরিয়ার-এর উপস্থিতিতে কিস্সার পরবর্তী অংশটুকু বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কাপড়ের কারবারীটি তার কিস্সা ব'লে চলেছে—'আমাকে তো খুবসুরৎ সে লেড়কিটি পালঙ্কে নিয়ে বসিয়ে দিল। আমি তার ব্যাপার দেখে এমনই তাজ্জব বনে গেলাম যে, প্রতিবাদ করা তো দূরের ব্যাপার, আমি টু-শব্দটিও বলতে পারলাম না।

লেড়কিটি আমার একদম গা-ঘেঁষে বসে বল্ল—'কি গো নাগর, আমাকে নজরে ধরেছে তো? আমি তোমাকে তামাম জিন্দেগীর জন্য লাভ করতে চাই। স্বামী হয়ে আমার পাশে পাশে থাকবে, থাকবে না?'

—'লেকিন আমার মাফিক এক সওদাগর আপনার-স্বামী হওয়ার যোগ্য কি? আমাদের মধ্যে যে আশমান-জমিন ফারাক। আমি যে খোয়াবের মধ্যেও এমন আজব কিছু প্রত্যাশা করি না।'

—'মালুম হচ্ছে, তুমি ধান্দা ক'রে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছ। দিল্ খোলসা ক'রে বল। তুমি সম্মত কিনা? আমি আবেগের বশে এসব বলছি না। আমার দিল্ কলিজা তোমাকে নিজের ক'রে পাবার জন্য উন্মুখ। বল—আমাকে নিশ্চিন্ত কর। একটু বাদে ফিন বল্ল

—'না, এভাবে মুখে কলুপ এঁটে থেকো না। বল, তুমি আমার হবে, কি না? আজ রাত্রি আমাদের প্রথম মিলন-রাত্রি হোক, মানছ তো?'

আমার মুখ দিয়ে না, শব্দটি কিছুতেই বেরলো না। তাজ্জব বনার মাফিক কাণ্ডই ঘটে গেল বটে। সে-রাত্রেই কাজী এল। শাদী-

নামা লিখে ফেল্‌ল। নির্বিবাদে আমাদের শাদী চুকে গেল।

এক-দুই তিন ক'রে পর পর বিশটি রাত্রি আমরা মহানন্দে আলিঙ্গন, দলন, পেষণ, চুম্বন আর সম্ভোগের মধ্য দিয়ে গুজরান ক'রে দিলাম।

এক সময় আমার বুড়ি আম্মার জন্য আমার দিল্ খচখচিয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে বিবিকে বল্‌লাম—'দীর্ঘদিন আমার কাছ ছাড়া। তিনি হয়ত চোখের পানি ঝরিয়ে ঝরিয়ে অন্ধা হয়ে গেছেন। আর দোকানের তালাও খোলা হচ্ছে না। কারবারে যে লালবাতি জ্বলবে। আমি বরং একবারটি মকান থেকে ঘুরে সব কিছুর তদ্বির তদারক ক'রে আসি, কি বল?'

সে রাজী হয়ে গেল। বন্দোবস্ত হ'ল ফিরোজ আম্মাকে দেখা আর দোকান খোলার জন্য আমি বাইরে যেতে পারব। লেকিন রাত্রির আন্ধার নেমে আসতে না আসতেই আমাকে তার কাছে

ফিরতে হবে। আমাকে ছাড়া আমার সোহাগের বিবি নাকি একটি রাত্রিও একেলা কাটাতে পারবে না। আরও বন্দোবস্ত হ'ল—বুড়িটি আমাকে ফিরোজ চোখ বেঁধে নিয়ে যাবে, ফিন আমার কামরায় নিয়ে আসবে।

আমি বিবির বন্দোবস্তই মেনে নিলাম। তিন মাহিনা এভাবে যাওয়া আসা চল্‌ল।

আমি সুযোগ বুঝে একদিন এক নিগ্রো দাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এক বাৎ, সাচ্চা বলবে। তোমাদের মালকিনের বহু ধন দৌলত আছে, ঠিক কি না? লেকিন আমার মাফিক এক ভিখমাঙ্গাকে কেন তার জীবনসঙ্গী করল, বলতে পার?'

নিগ্রো বুড়িটি আঁৎকে উঠে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! এসব ব্যাপারে আমাকে কেন জড়াচ্ছেন সাহাব? মালকিনের কানে গেলে একদম আমার জান নিয়ে ছাড়বে।' পর মুহূর্তেই সে চারদিকে নজর ফিরিয়ে দেখে নিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌ল—'সাহাব, সুযোগ মাফিক আপনাকে বিলকুল ব্যাপার খোলসা ক'রে বলব। বহুৎ ধান্ধ বাজী কারবার এর মধ্যে রয়েছে।' বুড়ি লম্বা লম্বা পায়ে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

কয়েকদিন বাদের ঘটনা। আমি দোকানে বেচাকেনা করছি, এমন সময় বছর ষোল উমরের এক লেড়কি ঝলমলে সাজ-পোশাক পরে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই একদম বে-শরমের মাফিক আমার মুখের দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। একটু বাদই ফিন ফিরে এল। কয়েক কদম এগিয়ে আমার দোকানে উঠে এল। তার হাতে একটি ছোট্ট ঝোলা রয়েছে দেখলাম।

লেড়কিটি ঝোলাটি থেকে একটি ছোট্ট মোরগা বের ক'রে বল্‌ল—'এর চোখে হীরা বসানো রয়েছে। বিপদে পড়ে বেচতে এনেছি। আপনি কি খরিদ করতে উৎসাহী?'

আমি হাতে নিয়ে মোরগাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ভাবলাম, নিয়ে গেলে আমার বিবি হয়ত খুশী হবে। আমি নিজেই দাম বল্‌লাম—'পুরো একশ'টি দিনার দিতে পারি, বেচবে কি?'

লেড়কিটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বল্‌ল—'কী যে বলেন সাহাব! যে কেউ হাজার দিনারে তো হেসে খেলে খরিদ করে নেবে। আর আপনি কিনা মাত্র একশ' দিনার হাঁকছেন?'

আমি হেসে বল্‌লাম—'এর দাম যে হাজার দিনারেরও বেশী তা আমার অজানা নয়। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, আমার এটি খরিদ করার দরকার নাই। আপনি দায়ে পড়ে বেচতে বেরিয়েছেন বল্‌লেন, তাই বড়জোর একশ'টি দিনার খরচা করতে পারি। অন্য কোন আদমি বেশী দাম দিতেও পারে, এগিয়ে গিয়ে দেখুন।'

—'ঢুঁড়ে এসেছি। শৌখীন সামানপত্র কেনার আদমি খুব কমই মেলে। আর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে আপনিই বরং খরিদ ক'রে নিন সাহাব।'

আমি বল্লাম—'আমি আর উঠতে রাজী নই। দিলে দিয়ে যেতে পারেন।'

—'আমি তাতেই রাজী। লেকিন একটি আব্দার রাখতে হবে। আপনার আপেল-রঙা গালে একটি মাত্র চুমু খেতে দিতে হবে, রাজী?'

আমি স্বগতোক্তি ক'রে বললাম—'ইয়া আল্লাহ, এযে আমারই চাওয়ার ব্যাপার। এমন খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কির চুম্বন—বিলকুল নসীবের ব্যাপার। আমি বল্লাম—'আমি রাজী।'

ইতিমধ্যে খদ্দেরপত্র বিদায় নিয়েছে। দোকানে কেবল সে আর আমি। সে ঝট ক'রে মুখের ওপর থেকে নাকাবটি সরিয়ে নিয়ে আমার বাঁ-গালে আচমকা একটি চুম্বন ক'রে বসল। গালে এমন ক'রে দাঁত বসিয়ে দিল, কেটে গিয়ে তিরতির ক'রে খুন ঝরতে লাগল।

লেড়কিটি আমার গদিতে মোরগাটিকে ছুঁড়ে দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে এক দৌড়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি মকানে গিয়ে সোনার মোরগাটি বিবির হাতে তুলে দিয়ে বল্লাম—'তোমার জন্য খরিদ ক'রে আনলাম।'

সে মোরগাটি সমেত আমার হাতটি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বল্ল—'থাক, ঢের হয়েছে। আর সোহাগ দেখাতে হবে না। এক নওজোয়ান লেড়কির কাছ থেকে চুম্বনের বিনিময়ে জোগাড় করা সামান স্পর্শ করতে আমার গা ঘিন ঘিন করছে।' ব্যস, আমার গালে একটি চড় বসিয়ে দিয়ে সে এবার বল্ল—'তুমি এমন জঘন্য! এত নীচ তোমার দিল্, তাজ্জব বনছি।'

আমি মেজেতে লুটিয়ে পড়লাম। বিবির মুখের দিকে অসহায় নজরে তাকালাম। দেখলাম, তারই ইশারায় চারটি নিগ্রো ক্রীতদাসী এক লেড়কির লাশ টেনে হিঁচড়ে এনে আমার সামনে রাখল। আমি অচানক ভূত দেখার মাফিক চমকে উঠলাম। যে-লেড়কিটি দোকানে আমাকে চুম্বন ক'রে গালে ক্ষতের সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিল তারই লাশ আমার সামনে খুনে মাখামাখি হয়ে পড়ে রয়েছে।

এক লহমায় লেড়কিটির লাশটি দেখামাত্রই আমি মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে হুঁস হারিয়ে ফেল্লাম।

সে-ঘটনার পর থেকে আমার দিমাক বিগড়ে গেল। আপন খেয়ালে হরবখত বিড় বিড় ক'রে বকতে লাগলাম। কারণে অকারণে মেজাজ ক'রে উঠি। এর-ওর প্রতি অশিষ্ট আচরণ করি।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে প্রথম উন্মাদটি বল্ল—'জাঁহাপনা, এবার হয়ত আপনি স্বীকার করবেন, আমি আদপেই শয়তান বেতমিস নই, আমার নসীবই আমার এ-হালৎ ক'রে দিয়েছে। এখন আপনার হাতে পড়েছি। মেহেরবানি করে জান বরবাদ ক'রে দেবেন না।'

সুলতান মামুদ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে এক সময় মুখ খুললেন—উজির, এতো একদম তাজ্জব কি বাৎ! লেড়কিটি দোকানীটিকে কেনই বা পেয়ার মহব্বৎ দেখিয়ে নিজের মকানে নিয়ে গেল! শাদী করল। আর কেনই বা তাকে উন্মাদ বানিয়ে মকান থেকে ভাগিয়ে দিল! আদৎ ব্যাপারটি আমি জানতে চাই। একে সঙ্গে ক'রে তবে লেড়কিটির কাছে যাই।'

উজির বল্ল—'তবে এক কাজ করা যাক, একে রেখে বাকী দু'জনকে ছেড়ে দেই, কি বলেন?'

সুলতান মামুদ বল্লেন—'তবে তা-ই কর।' এবার সুলতান মামুদ ও উজির উন্মাদ সওদাগর নওজোয়ানটিকে নিয়ে সে-গলিটির মুখে যেতেই সে বল্ল—'এখানেই বুড্ডিটি আমার চোখ বেঁধে দিত। ব্যস, এর পর আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সুলতান মামুদ বল্লেন—'এ-গলিতে বড়সড় পাকা মকান মাত্র একটিই রয়েছে। এক বিধবা বুড্ডি তার একমাত্র খুবসুরৎ লেড়কিকে নিয়ে সেখানে থাকে। বুড্ডিটি বেগম। তার লেড়কি শাহজাদী-ই তবে একে শাদী করে এবং স্বামীকে উন্মাদ ক'রে দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।

মকানে ঢুকতেই এক খোজা নফর অন্দরমহলে চলে গেল। একটু বাদেই খুবসুরৎ এক নওজোয়ান লেড়কি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে এগিয়ে এসে সুলতানকে কুর্নিশ করল। অভ্যর্থনা ক'রে বসতে দিল। এ-ই সে খুবসুরৎ লেড়কি।

সুলতান মামুদ সুলতানের প্রথমা লেড়কিকে শাদী ক'রে প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ খুবসুরৎ লেড়কিটি তাঁরই বহিন।

সুলতান মামুদ তাঁর শালিকাকে নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তাকে নানাভাবে বুঝালেন। স্বামীর সঙ্গে বিবির নটখট কম-বেশী লাগতেই পারে। তাই বলে স্বামীকে ভাগিয়ে দিয়ে সুখের তাল্লাশ করতে গেলে তা কেবল বেমানানই নয় নিজেরও ক্ষতি। দিল্ থেকে বিলকুল দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে নিয়ে ঘর-সংসার কর।'

শাহজাদী এবার নিজের গল্তি মেনে নিয়ে স্বামীকে বুকে টেনে নিল।

সুলতান তার ভায়রা নওজোয়ান সওদাগরকে দরবারে আমিরের পদে বহাল ক'রে দিলেন।

আমির সাহেব সুলতানের ছত্রছায়ায় থেকে দীর্ঘদিন বিবিকে নিয়ে সুখে দিন গুজরান করেন।

প্রথম উন্মাদের কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

দ্বিতীয় উন্মাদের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ দ্বিতীয় উন্মাদের কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, সুলতানের হুকুম পেয়ে দ্বিতীয় উন্মাদটি এবার তার কিস্‌সা শুরু করল—'আমি একজন বণিক। মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে সওদা কেনা-বেচা করা আমার পেশা। আর অবসর সময়ে বাজারে এক জহুরীর দোকান চালাই।

বচপন থেকেই আমার ধর্মে মতি ছিল। কাউকে কোনদিন একটি দিরহামও ঠকাইন। তার ওপর আমার লাজ শরম একটু বেশীই ছিল। মহল্লার কত যে জেনানা আমার আম্মাকে বাসনা জানাত আমার সঙ্গে তাদের লেড়কির শাদী দেবার জন্য, তার ইয়ত্তা নেই। আমার আম্মা বলতেন 'শাদীর এখনই কি হয়েছে। উমর আরও বাড়ুক। পিছে বিবেচনা করা যাবে।'

আদতে আমারও শাদী-নিকার ব্যাপারে কোন ঝোঁকই ছিল না। কাম কাজের ফাঁকে কোরাণ শরিফ খুলে দিব্যি সময় গুজরান করে দিতাম।

এক সকালে দোকান খুলে বসে আছি। এক সময় ইয়া পেল্লাই চেহারার এক নিগ্রো নওজোয়ান লেড়কি আমার দোকানে এল। একটি ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে দিয়ে সে বল্‌ল—'আমার মালকিনের চিঠি। আগে পড়ুন। তারপর জবাব লিখে দেবেন।'

কাগজটির ভাঁজ খুলে চোখের সামনে ধরলাম। মহব্বতের চিঠি। মহব্বৎ না জানিয়ে সরাসরি নিজের কামজ্বালার খবর আমার কাছে চিঠির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। তার ওপর ভাষার মারপ্যাচের ব্যাপার স্যাপার বা রাখ ঢাকের কারবার নেই। বলা চলে কামজ্বালা জর্জরিতা এক জেনানার কামপিয়াস নিভিয়ে দেয়ার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়েছে। এমন বে-শরম কারবার দেখে আমার কলিজায় জ্বালা ধরে গেল। চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে চিঠিটি মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে চেপে ধরলাম।

পরমুহূর্তেই মুটকিটির পাছায় সজোরে এক লাথি বসিয়ে দিলাম। সে টাল সামলাতে না পেরে দোকানের বাইরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে চিল্লিয়ে উঠলাম—'তোর মালকিনের কাম জ্বালা যদি এতই বেশী হয়ে থাকে তবে বেশ্যা পাড়ায় গেলেই তো জ্বালা নিভাতে পারে। এদিকে নজর দিলে সর্বনাশ ক'রে ছাড়ব। ইয়াদ রাখে যেন।'

আমার কাণ্ড দেখে প্রতিবেশী দোকানিরা সমস্বরে ব'লে উঠল—'সাবাশ! সাবাশ!'

আমার ষোল সাল উমরের সময় উক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল। তারপর আরও কয়েক সাল বাদে আমি উপলব্ধি করলাম, সেদিন চারিত্রিক দৃঢ়তা এত বেশী প্রকাশ না করলেই বোধ হয় আচ্ছা হ'ত। তখন স্পষ্ট মালুম হ'ল, সেদিন বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছিলাম।

আমি নওজোয়ান বনে গেলাম। এখন আমার ভেতরে মহব্বতের বাতি জ্বলছে। মহব্বৎ কি বস্তু বুঝতে শিখেছি।

আমি নওজোয়ান হওয়ার পর আমার শরীরে বসন্তের বাতাস এসে আমাকে উত্যক্ত করতে লাগল। আমার বিবেক বল্‌ল—'শাদী কর। জিন্দেগীকে উপভোগ কর। এ-ই সময়। এ-মওকায় যা পার ক'রে নাও। নইলে পরে পস্তাতে হবে, ইয়াদ রেখো।'

তখন একদিন পাঁচ-ছয়টি নফরানী আমার দোকানে হাজির হ'ল। তারা এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কিকে ঘিরে রেখেছে। তার উমর বছর ষোল হবে। গায়ে তার সুরতের জোয়ার, যৌবনের

ঢল নেমেছে। তার কামিজের বন্ধন অগ্রাহ্য ক'রে যেন যৌবন-চিহ্নগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

খুবসুরৎ লেড়কিটি মধুঝরা কণ্ঠে বল্‌ল—'এক জোড়া তাগার তাল্লাশ করছি। আপনার দোকানে মজুত আছে কি?'

আমি আমার দোকানের সবচেয়ে দামী তাগাজোড়া আগন্তুক লেড়কিটির সামনে রাখলাম। বড়িয়া সাজ। লেড়কিটিকে দেখানোমাত্র সে একটি হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—'পরিয়ে দিন তো, দেখি আমার হাতে এটি মানানসই হয় কিনা?' নফরানীরা এগিয়ে এসে তার কামিজের আস্তিন গুটিয়ে তুলনায় একটু বেশী ওপরেই তুলে দিল।

আমি তার নিরাবরণ বাহু দুটোর দিকে বিস্ময় মাখানো নজরে তাকিয়ে রইলাম। চোখের পাতা ফেলে সময় কমাতেও দিল্ সরল না। বেলনের মাফিক একদম নিটোল নিখুঁত কারো বাহু যে হতে পারে আমার অন্ততঃ ধারণা ছিল না।'

আমি অন্যমনস্কভাবে তার দু'হাতে তাগা দুটো বেঁধে দেয়ার পর মালুম হ'ল একদম বে-মানান হয়েছে। আমি মুখে আক্ষেপ-সূচক শব্দ উচ্চারণ ক'রে বল্‌লাম—'আমার নসীব খারাপ। আপনার কাছে আমার তাগাজোড়া বেচা হ'ল না। আপনার হাতে এ দুটো একদম মানায় নি। আপনি বরং মেহেরবানি ক'রে অন্য কোন দোকানে তল্লাশ করুন।'

—'বহুৎ আচ্ছা। তাগার ব্যাপার ছাড়ান দিন। পায়ের জন্য পছন্দ মাফিক এক জোড়া মল দেখান তো।'

আমি বেছে বেছে আমার দোকানের সেরা ও সবচেয়ে দামী এক জোড়া মল বের ক'রে তার চোখের সামনে ধরলাম।

তার সঙ্গী নফরানীরা তার সালোয়ারটির বোতাম ঝট ক'রে খুলে সেটিকে হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরল। বল্‌লে—'দিন, আগে এ-পায়ে একটি তো পরান।'

আমি মল জোড়া হাতে ধরে রেখেই মুখ ব্যাজার ক'রে বল্‌লাম—'এবারও আমাকে শরমে ফেল্‌লেন দেখছি। মলজোড়াও আপনার পায়ে একদম বে-মানান। বেহেস্তের হুরীর মাফিক খুবসুরৎ পায়ে এ-সাধারণ মলজোড়া তো মানাবার নয়।'

—'মলের ব্যাপারটি ছাড়ান দিন। এবার এক ছড়া হার বের করুন তো। বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়ে যেন।'

আমি আলমারি খোলার কোশিস করতেই সঙ্গী নফরানীরা বাধা দিয়ে বল্‌ল—'আরে করছেন কি? আগে বুকের মাপ না নিলে কোনটি মানানসই হবে, বুঝবেন কি ক'রে?'

মুহূর্তের মধ্যে তারা খুবসুরৎ লেড়কিটির সাজ পোশাক এক এক ক'রে খোলা শুরু ক'রে দিল। একটি পাতলা ফিন ফিনে শেমিজ ছাড়া আর সবই খুলে ফেল্‌ল।

আমি ফুটা বেলুনের মাফিক একদম চিপ্‌সে গেলাম। গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। দাঁড়িয়ে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠল। ঠিক এমনই মুহূর্তে দুটো সমুন্নত নিটোল স্তন আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। চলে এল আমার একদম বুকের কাছে।

লেড়কিটি অচানক শেমিজটি তুলে ফেলে দিয়ে মুচকি হেসে বল্‌ল—'নিন, বুকের মাপ নিন। মাপ না নিলে বুঝবেন কি ক'রে কোন হারছড়া আমার বুকে মানানসই হবে?'

আমার বুকের মধ্যে ইতিমধ্যেই কামারের হাতুড়ির ঘন ঘন আঘাত শুরু হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা গলায় ব'লে উঠলাম—এমনিতেই মাপ নিতে পারব। আপনি ঢাকুন, ও দুটো চাপা দিন।'

—'কেন? চাপা দিতে যাব কেন, শুনি? আমি কি কুরূপা যে, শরম লাগবে, চাপা দিতে যাব?'

—'কুরূপা, এ বলছেন কি! বেহেস্তের হুরী ছাড়া এমন খুবসুরৎ লেড়কি দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে ব'লে আমার অন্ততঃ জানা নেই। তবু মেহেরবানি ক'রে শেমিজটি দিয়ে ও দুটো চাপা দিন।'

—'আমার আব্বা বলেন, আমার চেহারা নাকি একদম বে-ঢক। আপনিই বলুন তো মিঞা, আমার নাকি শাদী-নিকা কিছুই হবে না, সাচ্চা কি?'

—'কী! আপনার সমান সুরৎ তামাম মুলুকে কয়টি মিলবে! আপনি চাইলে কত সুলতান, বাদশাহ আর শাহজাদা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।'

—'ঝুটা! বিলকুল ঝুটা বাৎ! আপনি স্রেফ আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে এমন সব বাৎ বলে চলেছেন। আমার আব্বা আমার শাদীর জন্য সুলতান, বাদশাহ্ বা শাহজাদা তো দূরের ব্যাপার একজন বণিক পর্যন্ত আমার জন্য জোগাড় করতে পারেন নি।'

—'আমি অন্ততঃ মানতে পারছি না।' রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লাম।

ব্যস, ফাঁদে পড়ে গেলাম। লেড়কিটি বল্‌ল—'তাই যদি সাচ্চা হয় তবে আপনিই রাজী হয়ে যান না। লটকে পড়ি। তবে আমার একটা গতি হয়ে যায়, রাজী তো?'

—কি 'মস্করা শুরু করেছেন, দিমাকে আসছে না। আপনি আমাকে নিকা করবেন? এমন এক বেহেস্তের হুরীকে আশা করতেই যে আমার কলিজা শুকিয়ে আসছে।'

—'বুঝেছি, আপনি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ধান্দায় এমন রঙচড়িয়ে বলছেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা। আমি রাজী।'

—'তবে সোজা আমার আব্বার কাছে গিয়ে বলুন, আপনার

লেড়কির ব্যাপারে বিলকুল আমি জেনে নিয়েছি। তাকে আমি শাদী করতে চাই।'

—'ঠিক আছে, তা-ই যাব।'

—'শুনুন, তবু আমার আব্বা আপনাকে বলবেন, আমার লেড়কি একদম কুৎসিৎ। তার জবাবে আপনি বলবেন—আমি তাকে দেখেছি। জানিও সব। তা সত্ত্বেও শাদী করতে আগ্রহী। তার পর আমার আব্বা দ্বিতীয় বাণ ছুড়বেন, আমার লেড়কির এক চোখ বরবাদ হয়ে গেছে, কানা, বাতগ্রস্তা, পিঠে ইয়া পেল্লাই কুঁজ তার ওপর ল্যাংড়িও বটে।'

—'লেকিন তিনি নিজের লেড়কির ব্যাপারে এমন সব ঝুটা বাৎ কেন বলতে যাবেন, ফায়দা কি—আমার দিমাকে আসছে না।'

—'আদতে তিনি আমার শাদী দিতে ইচ্ছুক নন। আমি তার একমাত্র আদর সোহাগের লেড়কি। আমাকে শাদী দিয়ে দূরে পাঠাতে উৎসাহী নন। ফিন শাদী দেয়ার কোশিস না ক'রে দিন গুজরান ক'রে যাচ্ছেন। আমার শাদীর ব্যাপারটি লোক দেখানো। নইলে মহল্লায় বদনাম হবে। তাই ভেবে চিন্তে এমন এক মতলব শুরু করেছেন।'

—'আমাকে কোন অছিলাতেই ভাগিয়ে দিতে পারবেন না। তিনি যা-ই বলুন না কেন তার জবাবে আমি বলব—সব জানি। আমি বিলকুল জেনেশুনেই এগিয়েছি। আপনার কুরূপা লেড়কিকেই আমি শাদী ক'রে বিবির মর্যাদা দেব। আপনি কাজী ডেকে শাদীর বন্দোবস্ত করুন। আমি তৈরী।'

—'ব্যস, এবার আমার আব্বা শেখ ইসমাইলের মকানে চলে যান। তাঁর কাছে শাদীর প্রস্তাব দিন।'

আমি দোকান বন্ধ ক'রে ঠিকানা অনুযায়ী হাঁটা জুড়লাম।

ইমারত। পেল্লাই এক ইমারত। দেখে মালুম হ'ল বেশ খানদানি পরিবার।

এক নিগ্রো নফরের সঙ্গে সুসজ্জিত এক কামরায় ঢুকলাম। কামরায় এক ধারে এক বুড্ডাকে চোখে চাঁদির চশমা লাগিয়ে বেশ সুর ক'রে কোরাণ শরিফ পাঠ করতে দেখলাম, তবে একটি চোখে কালো কাপড়ের পট্টি বাঁধা। চোখটি খুইয়েছে মালুম হ'ল।

আমি সালাম জানিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। বুড্ডাটিও আমাকে বিনিময়ে সালাম জানাল। কোরাণ শরিফ থেকে চোখ তুলে তাকাল। ছোট্ট ক'রে বল্‌ল—'কি চাই বেটা?'

—'আপনার লেড়কির পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি তাকে শাদী করব।'

আমি নিঃসন্দেহ, বুড্ডা এবার তার লেড়কির কুৎসা গাইতে শুরু করবে। তাই তাকে সুযোগ না দিয়েই ব'লে উঠলাম—'আপনি যা

কিছু বলবেন, আমি বিলকুল জেনেই এসেছি। সব জেনেই আমি আপনার লেড়কিকে শাদী করতে আগ্রহী হয়েছি। আপনার মত পেলেই শাদী চুকিয়ে নেয়া যেতে পারে।'

লেড়কিকে কাছ ছাড়া করার অবশ্যম্ভাবী বক্তব্য শোনার পর বুড্ডাটির দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। শোক সামলানো তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামাল দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে বল্‌লেন—বেটা, তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মত বটে। লেকিন আমার একটি আর্জি তোমাকে মানতে হবে। শাদীর পর তোমাদের আমার মকানেই থাকতে হবে। তবে ওয়াদা করছি, তোমার ইজ্জৎহানিকর কোন কাজ আমি করব না।'

আমি তার প্রস্তাব সোল্লাসে মেনে নিলাম।

কাজীকে তলব করা হ'ল। কাজী শাদীনামা লিখলেন। সাক্ষীরা তাতে দস্তখৎ দিলেন। শাদী নির্বিবাদে চুকে গেল।

আমার দিল্ খুশীতে ডগমগ। আমি ভাবতে লাগলাম, কিভাবে আমার মেহেবুবা বিবিকে আলিঙ্গন করব, চুম্বনে চুম্বনে মাতোয়ারা ক'রে তুলব, আরও কত কী ক'রে রাতভর জেগেই কাটিয়ে দেব।

লেকিন এক লহমার মধ্যে আমার স্বপ্ন-সাধের বেহেস্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। বাসর ঘরে ঢোকামাত্র আমার শির তড়াক্ ক'রে চক্কর

মেরে উঠল। আমার বিবির আব্বা বুড্ডাটি তার কদাকার চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে তা তার আসলি কুরূপের তুলনায় সামান্য একটি ভগ্নাংশ মাত্র। মালুম হ'ল আমার দিমাক বুঝি গড়বড় হয়ে যাবে। আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাব।

খুব ভোরে দোকানে হাজির হলাম। শাদীর পরের ভোরে এত ভোরে দোকান খোলা অভাবনীয় ব্যাপারই বটে। ফলে প্রতিবেশী দোকানি ও অন্যান্য ইয়ার-দোস্তরা দোকানের সামনে এসে হাল্কা মস্করা শুরু করল।

এমন সময় ভোর হয়ে আসছে অনুমান ক'রে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটশ' চল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা দ্বিতীয় উন্মাদটি তার কিস্‌সা ব'লে চলেছে—ইয়ার-দোস্তদের হাল্কা রসিকতায় আমার দিল্ বিষিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত মিঠাই মণ্ডা দিয়ে তাদের মুখ কোনরকমে বন্ধ করা গেল।

একটু বাদে নিগ্রো নফরানীদের নিয়ে সে-খুবসুরৎ শাহজাদী আমার দোকানে ঢুকল। চোখে মুখে আগেকার সে দুষ্টুমিভরা মিটি মিটি হাসির ছোপ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বল্‌ল—কি গো মিঞা, বাসর-রাত্রি কেমন কাটালে, শুনতে এলাম।'

আমি গর্জে উঠলাম—'আল্লাহ তোমার বিচার করবেন। তোমার মাফিক এক বেশ্যার ছলনায় জড়িয়ে আমার জান বরবাদ হতে চলেছে। যে-গুস্তাকী তুমি আগবাড়িয়ে করলে তার জন্য দোজখেও তোমার জায়গা মিলবে না, ইয়াদ রেখো।'

—'এত চটাচটি করছ কেন মিঞা? তুমি আমার মহব্বতকে, আমার মহব্বতের চিঠিকে পায়ের তলায় পিষে অবজ্ঞা করেছিলে, ইয়াদ নেই? তারই বদলা নিতে পেরে আমার দিল্ আজ খুশীতে একদম ডগমগ। এখন তোমার দিল্ যেমন বিষিয়ে উঠেছে তার বেশী খুশী হয়েছি আমি।'

লেড়কিটির দু'চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা ঠিকরে বেরোতে দেখলাম। এক ক্রোধোন্মত্তা কালনাগিনী যেন আমার সামনে খাড়া। হরদম ফুঁসছে। আমি দু'হাত দিয়ে তার কোমরটি জড়িয়ে ধরে ব'লে উঠলাম—'শাহজাদী, মেহেবুবা আমার, না জেনে, না বুঝে যে কসুর ক'রে ফেলেছি তার জন্য আমি তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।'

লেড়কিটির গোস্‌সা ধীরে ধীরে নরম হতে লাগল। শোন, তোমার ঔদ্ধত্যে আমার কলিজায় আগুন ধরে গিয়েছিল। তাই তোমাকে কিছু শিক্ষা দেবার জন্যই আমি যা কিছু করেছি। ইসমাইল-এর মকানে গিয়ে তোমার বিবিকে বয়ান তালাক দিয়ে এসো। দেনমোহরের জন্য ঘাবড়াবে না, আমি আছি। সন্ধ্যায় আমার নফর এসে তোমাকে আমার প্রাসাদে নিয়ে যাবে।

বুড্ডা ইসমাইলকে বিশ হাজার দেনমোহর আক্কেল সেলামি দিতেই হ'ল। তার লেড়কিকে বয়ান তালাক দিয়ে ফিরে এলাম।

সে রাত্রেই আমার মেহেবুবা শাহজাদীর সঙ্গে আমার শাদী চুকে গেল।

শাদীর প্রথম রাত্রেই আমি পাক্কা সমঝে গেলাম, আমার বিবি মাত্রাতিরিক্ত কামুক। রাতভর সে আমাকে কামড়ে খুব্‌লে একসার ক'রে ছাড়ে।

কিছু দিনের মধ্যেই আমার মালুম হ'ল, আমার সম্ভোগের ক্ষমতা দিনই দিন হ্রাস পাচ্ছে। এতে আমার বিবির ভেতরে ক্ষোভের সঞ্চার হ'ল।

এক রাত্রে আমার শরীর আর চলছিল না। সঙ্গম-সম্ভোগ তো দূরের ব্যাপার আমি মাথাই তুলতে পারছিলাম না। আমার বিবি আমাকে তার ওপরে চড়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। ব্যস, সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। চাবুক টেনে নিয়ে সপাং সপাং ক'রে চাবুক চালাল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লাম। কতক্ষণ বেঁহুস হয়ে মেঝেতে পড়েছিলাম, বলতে পারব না। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বুঝলাম, আমার দিমাক বিলকুল গড়বড় হয়ে গেছে, আমি উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ বনে গেছি।'

সুলতান এবার মুখ খুললেন—'আমাকে তোমার বিবির মকানে নিয়ে চল।'

দ্বিতীয় উন্মাদটি এবার সুলতান মামুদকে নিয়ে তার বিবির সামনে হাজির করল। তার বিবি শাহজাদী তাদের কুর্শি এগিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করে বসতে দিলো। সুলতান মামুদ বললেন—'শাহজাদী, তুমি আমার এক শ্যালিকা। তোমাদের মধ্যে সামান্য কারণে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা, তোমরা ফিন সুখে ঘর-সংসার কর। আজ এ মুহূর্ত থেকে আমার ভায়রাটিকে আমার দরবারের এক আমীরের পদে বহাল করলাম।

সুলতান মামুদ-এর পরামর্শ শাহজাদী মেনে নিল। স্বামীকে ফিন কাছে টেনে নিল। তারপর দীর্ঘদিন তারা সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করল।

তৃতীয় উন্মাদের কিস্‌সা

সুলতান তৃতীয় উন্মাদকে তলব করলেন তার উন্মাদ হওয়ার কিস্‌সা শোনাবার জন্য।

তৃতীয় উন্মাদ সুলতানের সামনে হাজির হয়ে তার কিস্‌সা শুরু

করল—'জাঁহাপনা, আমার বচপনেই আমাকে আব্বা ও আম্মাকে খোয়াতে হয়েছিল। তাদের ইন্তেকাল হয়ে গেলে আমি এর-ওর আশ্রয়ে থেকে গায়গতরে বাড়তে লাগলাম। গায়ে গতরে বলার অর্থ লিখা পড়া বা অন্য কোন কিসিমের শিক্ষালাভের সুযোগ আমার তখন আসে নি।

এক দুপুরে একটি ভুতুড়ে মকানে ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে চড়ুই পাখির পিছনে ধাওয়া করতে করতে অচানক এক বুড্ডার সামনে হাজির হতেই আঁৎকে উঠলাম। একদম বুড্ডা। সোজা ভাবে খাড়া হতে পারে না। মাথায় ইয়া বড়া রুক্ষ বুষ্ট সফেদ চুল, মুখেও নাভি পর্যন্ত নেমে যাওয়া সফেদ দাড়ি। চোখ দুটো গর্তে বসা। জ্বলজ্বলে চোখের মণি দুটো কোটরের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। গাল একদম তোবড়ানো। কণ্ঠস্বর ভাঙা। জনমানব শূন্য কোন মকানে অচানক এরকম কোন বুড্ডাকে দেখলে কলিজা শুকিয়ে যাবার মত ব্যাপার বটে। আমি ধরেই নিলাম সে কোন জীন বা আফ্রিদি দৈত্য ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। আমি তার মুখোমুখি হওয়া মাত্র পিছন ফিরে দৌড়ে ভেগে যাওয়ায় কোশিস করলাম।

পিছন থেকে বুড্ডাটি হাঁকল—'আরে, করছ কী! ভাগছ কেন? শোন—এদিকে এসো। শোন—শোন।'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিছন ফিরে ভীত-চকিত চোখে বুড্ডাটির দিকে তাকালাম। সে বলল—'কি ব্যাপার, ভাগছ কেন? আমি এক বুড্ডা ফকির দরবেশ, দেখে মালুম হচ্ছে না তোমার? তুমি কি ভাবছ, আমি কোন জীন বা আফ্রিদি দৈত্য? ভুল। বিলকুল ভ্রান্ত ধারণা তোমার। ওসব কিছুই আমি নই। স্রেফ এক ফকির-দরবেশ। এসো, আমার কাছে এসে বোসো বেটা।'

বুড্ডাটির বাৎ শুনে আমার কলিজায় জল এল। আমি এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সামান্য ফারাক রেখে তার মুখোমুখি বসলাম। বুড্ডার মুখে কাতর অনুরোধ শোনলাম—বেটা, আমার কাছে থাকবে? আমি তোমাকে নিজের ঔরসজাত লেড়কার মাফিক পালন করব। থাকবে আমার কাছে আমার বেটা হয়ে? সাচ্চা বটে, আমার আপনজন বলতে কেউ-ই নেই। আমার বেটা হয়ে থাকবে আমার কাছে?'

বুড্ডাটির কাতর মিনতি শুনে আমার কলিজা ভিজে গেল। দিল দুর্বল হয়ে গেল। আমি নীরবে ঘাড় কাৎ করে বুড্ডাটির প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম।

বুড্ডাটি এবার সোল্লাসে বলল—'বেটা, আমার কাছে যদি থাক তবে আমার ভেতরে যে বিদ্যা আছে তা তোমাকে বিলকুল শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যাব। গুপ্তবিদ্যা। জিন্দেগীভর আমি যে-বিদ্যা রপ্ত করেছি বিলকুল তোমাকে শিখিয়ে যাব।

সেদিন থেকে আমি সে-ভূতুড়ে মকানটিতে, বুড্ডাটির আশ্রয়ে রয়ে গেলাম।

এক ভোরে বুড্ডা আমাকে বলল—'বেটা মসজিদের সদর-দরওয়াজায় গিয়ে খাড়া হয়ে যাও। ভিখ মেঙ্গে কিছু অর্থ জোগাড় করে নিয়ে এসো।'

আমি অসহায় দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে বুড্ডার মুখের দিকে তাকালাম।

বুড্ডা তোবড়ানো গালে হাসি ফুটিয়ে বলল—'ঘাবড়াও মাৎ বেটা। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। অন্য সব ভিখ মাঙ্গাদের পাশে, পথের ধারে একটি গামছা বিছিয়ে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকবে। পুণ্যার্থী মুসলমানরা ফি রোজ ভোরে নামাজ পড়তে এসে পুণ্য

সঞ্চয়ের লোভে ভিখমাঙ্গাদের দু-চার দিরহাম দান-খয়রাৎ করে থাকে। তোমারও কিছু মিলে যাবে।'

আমি বুড্ডাটির পরামর্শ মাফিক মসজিদের সদর দরওয়াজার সামনে অন্যান্য ভিখমাঙ্গাদের দলে ভিড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সেদিন মসজিদে পুণ্যার্থীদের বহুৎ ভিড় জমেছে। সুলতানের সিপাহীরা ভিড় সামলাতে গিয়ে নাজেহাল হতে লাগল।

এক সময় খোজা প্রহরী বেষ্টিতা হয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন শাহাজাদী সুলতানের আদর-সোহাগের দুলালী। খুবসুরৎ এক লেড়কি। উদ্ভিন্ন যৌবনা। তার শরীরে সুরতের জোয়ার বয়ে চলেছে। একমাত্র বেহেস্তের হুরী-পরী ছাড়া মিট্টির দুনিয়ার অন্য কোন লেড়কির দেহে এরকম সুরতের ঢল নামতে দেখা যায় বলে আমার অন্ততঃ ধারণা নেই।

শাহজাদীকে এক লহমায় দেখামাত্রই আমার কলিজা অস্থির হয়ে উঠল। শিরা-উপশিরার খুনে লাগল মাতন। মগজের স্নায়ুগুলো বার বার ঝনঝনিয়ে উঠতে লাগল।

আমার ফুসফুস নিঙড়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলাম—'তোফা! ইয়া আল্লাহ! তোমার দুনিয়ায় এমন সব সম্পদ রয়েছে যা ভোগ করা থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলাম। বৃথা, দুনিয়ায় পয়দা হওয়াই বৃথা।'

আমি সে-ভূতুড়ে মকানে ফিরে বুড্ডার কাছে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। চোখ দুটো বন্ধ ক'রে শাহজাদী, সে-খুবসুরৎ লেড়কিটির কলিজায় জ্বালা ধরানো সুরতের তসবিরটি বুকের ভেতরে আঁকতে লাগলাম।

বুড্ডাটি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন—'বেটা, সমাচার কি? কি হয়েছে, মুখ ব্যাজার করে মকানে ফিরলে? গুম্ হয়ে শুয়ে পড়ে রইলে, ব্যাপার কি, খোলসা ক'রে আমাকে বল্ বেটা, আমার কাছে কিছুই ছিপাবার কোশিস করবে না। আমি যাদুবলে বিলকুল ব্যাপার জানতে পারি।'

আমি আর মুখে কলুপ এঁটে থাকতে পারলাম না। খুবসুরৎ শাহজাদীর ব্যাপার খোলসা ক'রে তার কাছে ব্যক্ত করলাম। শাহজাদীকে না পেলে আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে, বলতে বাদ দিলাম না।

বুড্ডাটি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌ল—'বেটা, আমরা ফকির দরবেশ আর সে সুলতানের লেড়কি—শাহজাদী। একদম আশমান জমিন ফারাক। স্রেফ দুটো আলাদা জাত। ওদের দিকে নজর ফেরালে আমাদের গুণাহ হয়।'

—'কেন? গুণাহ কেন হবে? ওরা আদমি, আমরাও তো আদমি। ফারাক কোথায়, দিমাকে আসছে না।'

—'কেন যে তোমার দিমাকে আসছে না—তারা আমীর-বাদশাহ। ঢের আছে তাদের। আর আমরা ফকির-দরবেশ। ভিখমাঙ্গার সামিল।

আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিজের মত ও পথ থেকে এক চুলও নড়তে নারাজ। আপনি যাই বলুন না কেন, একটি রাত্রি, একটি বারের জন্য হলেও আমি, আমি তাকে ভোগ করবই—আমার একমাত্র ওয়াদা।

আমাকে অনড় দেখে বুড্ডাটি বল্‌ল—'বেটা, শোন তবে ধ্যায়ান দিয়ে আমি কি যাদুমন্ত্র জানি। আমার কাছে বিশেষ এক কিসিমের সুর্মা আছে।' একটি ডিব্বার মুখ খুলে এবার বল্‌ল—'এর বাৎ বলছি। এ থেকে একটু নিয়ে দু'চোখে লাগিয়ে দিলে তুমি সবাইকে দেখতে পাবে, লেকিন তোমাকে কেউ-ই দেখতে পাবে না। শাহজাদীকে সম্ভোগ করার জন্য তোমার কলিজা ছটফট করছে, মালুম হচ্ছে। তোমার চোখ দুটোতে আমি সুর্মা লাগাবার উপায় বাৎলে দেব। সামনের জুম্মাবারে আমার ইন্তেকাল হবে। আমাকে গোর দিয়ে তবে তুমি সুর্মা ব্যবহার করবে। শাহজাদীর কামরায় গিয়ে দিল্ যতবার চায় ততবার তার সঙ্গে সঙ্গম করবে। সম্ভোগের স্বাদে দিল্ কানায় কানায় ভরে উঠলে তবেই তুমি তার কামড়া ছেড়ে এসো। তবে ইয়াদ রাখবে, ভোরের আলো ফোটার আগেই ভেগে এসো।'

পরবর্তী জুম্মাবার ভোরে বুড্ডা সাচমুচ দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে চলে গেল। আমি যথাবিধি তার মরদেহ গোর দিলাম।

ব্যস, আমি এবার মুক্ত। বাধা-বন্ধনহীন। সন্ধ্যার কিছু বাদে সুরমার ডিব্বাটি খুলে আচ্ছা ক'রে দু'চোখে লাগিয়ে নিলাম। সড়কে নামলাম। পথচারীদের ব্যভারে আমি নিঃসন্দেহ হলাম, কেউ-ই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

সুলতানের প্রাসাদের সদর দরওয়াজায় হাজির হলাম। গটমট ক'রে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে গেলাম। আমি তো কারো নজরে পড়ছি না। তাই বাধা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বীর বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র শাহজাদীর কামরায় ঢুকে গেলাম। শাহজাদী প্রায় বিবস্ত্রা। একটি মাত্র মখমলের ফিনফিনে শেমিজ গায়ে রেখে পালঙ্কের ওপর শরীর এলিয়ে গভীর নিদে আচ্ছন্ন। উদ্ভিন্ন যৌবনা শাহজাদীর নিটোল ও সমুন্নত স্তন দুটো ফিনফিনে শেমিজটির সামান্য আবরণ ভেদ ক'রে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমার কলিজা তিরতির ক'রে নাচতে গেলে লেগে। আর? জিভটি একদম রসিয়ে উঠল। আমি কখন যে পালঙ্কে উঠে গিয়েছিলাম! আর হাত দুটোই বা কখন তার বুকের ওপর ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল, মালুমই ছিল না।

শাহজাদীর মধ্যে যে কামোন্মাদনার সঞ্চার হতে শুরু করেছে তা আমার প্রথম মালুম হয়েছিল যখন তার চোখ দুটো এক লহমার জন্য জন্য খুলে পর মুহূর্তেই ফিন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তার চোখ দুটো বিলকুল আবেশে জড়িয়ে গিয়েছিল। সে থেকে থেকে কঁকিয়ে উঠতে লাগল। আদপেই এ যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ নয়, সুখানুভূতির প্রকাশ। আমি তার গাল, বুক, তলপেট এবং শরমের স্থানটিতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার মধ্যে পুরোপুরি কামোন্মাদনা

জাগিয়ে তোলার কোশিস করতে লাগলাম। তারপর আর কি কি ঘটেছিল তা বোধ করি আর খোলসা ক'রে বলার দরকার নেই।

আমি রাতভর শাহজাদীর যৌবনের জোয়ার লাগা দেহটিকে খুশী মাফিক ভোগ করলাম। প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে মালুম হ'ল ভোর হয়ে এল বলে। আর নয়। একটু বাদেই শাহজাদীর সহচরীরা কামরায় আসবে। আমাকে তারা না-ই বা দেখতে পেল, শাহজাদীর এলোমেলো ভাব, বিশেষ ক'রে তার শেমিজটি উঠানো দেখলে তাদের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার ঘটাই স্বাভাবিক। আমি শেষবারের মত তার যৌবনের চিহ্নগুলোকে দেখে নিয়ে তার শেমিজটিকে গোছগাছ ক'রে দিয়ে কামরার এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। এদিকে শাহজাদী বিছানা ছেড়ে নামতেই তার পরিচারিকাদের একজন তার দিকে নজর দিয়ে আঁৎকে উঠল—'তোবা! তোবা!' ইয়া আল্লাহ একী কেলেঙ্কারী কাণ্ড! তার শেমিজটিতে তাজা খুন জড়িয়ে রয়েছে।'

পরিচারিকাটি হারেমের নফরানীদের বুড্ডিকে তলব দিল। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে বল্‌ল—'শাহজাদীর সতীচ্ছেদ ঘটে গেছে। এ যে একদম আজব ব্যাপার। হারেমে পরপুরুষ কি ক'রে এল? কার এত বড় বুকের পাটা? কারই বা এমন কলিজার জোর!

শাহজাদীকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে আমতা আমতা ক'রে জবাব দিল। আমিও তো ব্যাপার কিছু মালুম করতে পারছি না। তবে আমি যখন নিদে আচ্ছন্ন ছিলাম তখন প্রথমে আমার মালুম হ'ল কে যেন আমার বুকে, তলপেটে আর শরমের স্থানে হাত বুলাচ্ছে। একটু বাদে মালুম হ'ল কোন একটি অদৃশ্য ভারী বস্তু আমার ওপর চেপে দাপাদাপি করতে লেগে গেল। সব মিলিয়ে ব্যাপারটি আমার কাছে বিলকুল আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল, লেকিন কে, কিভাবে রাতভর যে কি করল মালুম হ'ল না। পরিচারিকাদের তো কলিজা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে গেল। ব্যাপারটি সুলতানের কানে গেলে হয় ফাঁসির দড়িতে লটকে দেবেন, নতুবা গর্দান নিয়ে ছাড়বেন।

এক বাঁদী বল্‌ল—'শাহজাদীর খানা টেবিলে রাখা ছিল। তিনি খানাপিনা না সেরেই শুয়ে পড়েছিলেন। লেকিন এখন দেখছি থালা-বাটি খালি। কে যেন এসে খানা খেয়ে গেছে। তাজ্জব কী বাৎ!'

বুড্ডিটি ভেবে চিন্তে মন্তব্য করল—'জরুর কোন জীন বা আফ্রিদি দৈত্যের কারবার মালুম হচ্ছে। শয়তান বেতমিসটি এখনও কামরা ছেড়ে ভাগতে পারেনি।'

বুড্ডির হুকুমে কামরার মেজেতে উটের গোবরের ঘুটে পাঁজা করা হ'ল। বুড্ডি বল্‌ল—'এবার যা বন্দোবস্ত করতে হয় আমিই করছি।' বুড্ডি সবাইকে কামরার বাইরে বের ক'রে দিল। তারপর দিল ঘুটের গাদায় আগুন ধরিয়ে। ধোঁয়ায় কামরা আন্ধার হয়ে গেল। দরওয়াজা-জানালা বন্ধ। আমার দমবন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হ'ল। দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমি হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ডলতে লাগলাম। যা আশঙ্কা করেছিলাম কার্যতঃ হলও তাই। আমার চোখের সুর্মা মুছে গেল। আমার তুকতাক খতম হয়ে গেল। আমার আদৎ রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। দৃশ্যমান হয়ে গেলাম।

বুড়ি আমাকে দেখেই গলা ছেড়ে চিল্লাতে লেগে গেল—'জলদি আয়। শয়তান বেতমিস জীনটি ধরা পড়ে গেছে। কে আছিস, জলদি আয়।'

একদল নিগ্রো খোজা তরবারি হাতে হুড়মুড় ক'রে কামরার ভেতরে ঢুকে এলে।

একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন, তখন আমার হালৎ কি হয়েছিল। জাঁহাপনা, আমি তো একদম পৌনে মরা হয়ে গেলাম।

আমার মাথার ওপরে কয়েকটি ঝলমলে তরবারি উঁচিয়ে নিগ্রো নফরগুলি তড়পাতে লেগে গেল—'শয়তান বেতমিস, শুয়ার কা বাচ্চা কাঁহিকার। কে তুই? কি তোর পরিচয়, সাচ্চা বলবি। হেরফের কিছু করার কোশিস করলে জান একদম খতম ক'রে দেব।'

—'আমার জান খতম কোরো না। যদি সে কোশিস কর তবে আমার ভাইয়া জীন-সম্রাট তোমাদের গোষ্ঠী সুদ্ধ কোতল করবে, ইয়াদ রেখো।'

কাজ হয়েছে। আমার ঝুটা বুলি শুনে তাদের কলিজা শুকিয়ে গেছে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল—'থাক একে খতম

ক'রেদরকার নাই। একে বরং ফাটকে আটক ক'রে রাখা যাক। পরে বিচার ক'রে সাজা দেয়া যাবে।'

তৃতীয় উম্মাদ সুলতান মামুদ-এর কাছে তার কিস্‌সার আদ্যোপান্ত ব্যক্ত ক'রে চুপ করল।

একটু বাদে সে ফিন বল্‌ল—'জাঁহাপনা, যৌবনের উন্মাদনাই আমাকে সেদিন গুণাহ করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আমার গুস্তাকী মাফ করবেন।'

সুলতান আমাকে কয়েদখানা থেকে মুক্তি দিলেন। তারপর বল্‌লেন—'তুমি আমার শ্যালিকার কুমারীত্ব নষ্ট করেছ। অতএব তোমাকে তাকে শাদী করতেই হবে। আর তুমি আজ থেকে আমার দরবারের আমীর রূপে গণ্য হবে।'

—'মহামান্য সুলতানের হুকুম আমার শিরোধার্য।'

বেগম শাহরাজাদা এক এক ক'রে তিন পাগলের কিস্‌সা খতম ক'রে চুপ করলেন।

আলিবাবা ও কাসিমের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, পারস্যের এক নগরে কোন এক সময়ে আলিবাবা ও কাসিম নামে দুই ভাইয়া বাস করত। তাদের মধ্যে কাসিম ছিল বড়া, আর ছোটা ছিল আলিবাবা।

তাদের আব্বা বেহেস্তে যাবার সময় সামান্যই সম্পত্তি রেখে যেতে পেরেছিল। দু'ভাইয়া পৈত্রিক সম্পত্তিটুকু সমান দুই ভাগ করে নিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তারা পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ যেটুকু পেয়েছিল তা পেটের আগুন নেভাতে গিয়েই খতম ক'রে, ফেলেছিল। শেষে এমন হ'ল যে, লবণ রুটির জোগাড় করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল।

কাসিম বরাৎ গুণে এক পাগলা বুড্ডার সুনজরে পড়ে গেল। কাসিম বুঝল,তাকে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি হবে। তাই তার শত অত্যাচার বরদাস্ত করেও তার কাছে মিট্টি কামড়ে পড়ে রইল। পাগলা বুড়োটিও কাসিমকে নিজের জানের সমান পেয়ার করে। নিজের তাগদ গেছে যখন তার মালুম হ'ল তখন কাসিম-এর ব্যাপারে উৎসাহী হ'ল। খুবসুরৎ এক লেড়কির সঙ্গে তার শাদী দিয়ে ঘর-সংসার পেতে দিল।

লেড়কিটির কিছু ধন দৌলত রয়েছে। বাজারে একটি বেশ বড় সড় দোকানও রয়েছে তার নামে। ফলে শাদীর দৌলতে কাসিম লেড়কিটির সঙ্গে তার ধন দৌলত ও সম্পত্তির মালিকানাও লাভ করল। তার বরাত খুলে গেল। নসীবের খেল। শাদী করার মধ্য দিয়ে তার হালৎ বিলকুল বদলে গেল। দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে সে অব্যাহতি পেয়ে গেল।

আলিবাবা-র আর্থিক অভাব অনটনের কোন পরিবর্তন হ'ল না। তার দুঃখ দৈন্য তো ঘোচার কোন লক্ষণ দেখাই গেল না বরং আরও কঠিন রূপ নিয়ে দেখা দিল। সে অনন্যোপায় হয়ে কুড়ুল নিয়ে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ ক'রে লবণ-রুটির জোগাড় করতে লাগল। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, আর উপার্জন সামান্য।

আলিবাবা একদম মিতব্যয়ী। যৎ সামান্য যা আয় হয় তা দিয়েই সে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করতে লাগল। সাধ্য মত কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে সে বাজার থেকে একটি তাগড়াই দেখে গাধা খরিদ করল। দিনভর জঙ্গলে জঙ্গলে কাঠ কেটে তা মাথায় ক'রে টুঁড়ে টুঁড়ে বেচা সাচমুচ কঠিনসাধ্য ব্যাপার। গাধা খরিদ করার ফলে তার মেহনৎ কিছুটা কমতি হ'ল। এর কিছুদিন বাদে আরও একটি গাধা খরিদ ক'রে নিজেকে আরও হাল্কা ক'রে নিল। শুরু ক'রে দিল পুরোদমে কাম কাজ।

আলিবাবা ফি রোজ জঙ্গল থেকে মোটা মোটা লকড়ি কেটে গাধা দুটোর পিঠে চাপিয়ে বাজারে নিয়ে আসে। তা বেচে যা অর্থ লাভ হয় তার একটি বড় ভগ্নাংশই সঞ্চয় করে।

আলিবাবা যতই তকলিফ ক'রে কাঠ লকড়ি কেটে অর্থ উপার্জন করুক, সঞ্চয় করুক না কেন তার বড়া ভাইয়ার তুলনায় সে নিতান্তই গরীব। এবার আর এক গাধা খরিদ ক'রে সে কারবার জোরদার করে নিল।

এক দুপুরে আলিবাবা জঙ্গলে যখন লকড়ি কাটছে তখন এক বুড্ডা কাঠুরে কাজের ফাঁকে তাকে শাদীর প্রস্তাব দিল। তার উমর হয়েছে, নওজোয়ান। এ-ই তো শাদীর সময়। বুড্ডা তার লেড়কিকে শাদী করার প্রস্তাব আলিবাবা-র কাছে পেশ করল। তিনটি গাধার সে মালিক। সে তো শাদীর পাত্র হিসাবে পহেলা সারির। বুড্ডা বল্‌ল—শাদীর নগদ দেনমোহর আমার চাই না বেটা। তোমার গাধা তিনটিকে দেনমোহর হিসাবে লিখে পড়ে দাও ব্যস, ব্যাপারটি চুকে যাবে।

গরীবের কাছেই গরীব ভেড়ে। বুড্ডাটি শাদীর যৌতুক কিছুই দিতে পারল না। আক্ষেপ করল বহুৎ। লেকিন ফয়দা কি?

শাদীর পর এক সাল যেতে না যেতেই আলিবাবা-র একটি খুবসুরৎ লেড়কা পয়দা হ'ল। কয়েক সালের মধ্যে এক এক ক'রে আরও কয়েকটি বালবাচ্চা হয়ে তার সংসার জমজমাট হয়ে উঠল। অভাবের সংসার। লকড়ি বেচে যা কিছু আয় উপার্জন হয় তাই দিয়ে আলিবাবা-র বিবি ক্লায়ক্লেশে বালবাচ্চাদের টিকিয়ে রাখতে লাগল।

দিন কারো জিন্দেগীভর একরকম থাকে না। উত্থান ও পতন ঘুরে ফিরে আসে। আলিবাবা-র ক্ষেত্রেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল না।

এক ভোরে আলিবাবা গাধা তিনটিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। গাধা তিনটি চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিল। নিজে এবার কুড়ুল-

কাঁধে লকড়ির খোঁজে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ইয়া লম্বা এক গাছে শুকনো মোটা এক ডাল দেখতে পেয়ে কুড়ুল নিয়ে তাতে তরতর করে উঠে গেল। একটু বাদে ঘোড়ার খুরের ঠক্ ঠক্ আওয়াজ কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে শুনল। হ্যাঁ, অনেকগুলো ঘোড়া এক সঙ্গে ছুঁটলে যে-আওয়াজ হয় ঠিক সে কিসিমের আওয়াজ তার মালুম হ'ল। আর সে-আওয়াজ যেন তার দিকেই আসছে এ-ও স্পষ্ট মালুম হ'ল তার।

আলিবাবা ঝট ক'রে গাছের এক ঝাঁকড়া ডালের আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে বসে সজাগ নজর মেলে তাকিয়ে রইল। কয়েক লহমার মধ্যেই তার নজরে পড়ল, একদল ডাকু ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে তার গাছটির অদূরে থেমে গেল। ইয়া দশাসই সবার চেহারা। গাট্টা গোট্টা। এক দম জবরদস্ত। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। এক নজরে দেখেই আলিবাবা-র কলিজা মোচড় মেরে উঠল। আর ডাকুদলের সর্দারের দিকে তো তাকানোই যায় না। মুখে একগাদা দাড়ি-মোচ পাকানো। দু'গালের দিকে পাকিয়ে যেন বেঁধে দেয়া হয়েছে। কপালে ইয়া বড়া এক কাটা দাগ। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। আগুন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে. সব মিলিয়ে এমন কদাকার তার চেহারা, দেখলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে ডাকুরা নেমে পড়ল। প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে মোটা কাপড়ের থলে। গাছের তলায় সবাই বসে পড়ল। ঝোলা খুলে শুকনো রুটি বের করল। পাতার মোড়ক খুলে কিছু লবণ মাঝখানে রাখল। লবণ আর শুকনো রুটিগুলোর সদ্ব্যবহারে মেতে গেল তারা। আলিবাবা গাছের উঁচু ঝাঁকড়া ডালের ফাঁক দিয়ে এক-দুই-তিন ক'রে গুণতে শুরু করল। দেখল, ডাকুরা মোট চল্লিশ জন। চল্লিশ ডাকু খানাপিনা সেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে ইয়া পেল্লাই বাক্স পেটরা নামিয়ে মাথায় চাপিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগল।

জঙ্গলের শেষে এক অনুচ্চ পাহাড়। পাহাড়টি গায়ে গিয়ে ডাকুরা থামল। আলিবাবা গাছের পাতার ফাঁক দিয়া ডাকুদের কারবার দেখতে লাগল। অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

ডাকুরা তাদের মাথার বাক্স পেটরা পাহাড়টির গায়ে নামাল। ডাকুদের সর্দার পাহাড়টির দিকে মুখ ক'রে গলা ছেড়ে চিল্লাতে লাগল—'চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক!'

এক লহমার মধ্যে পাহাড়ের গা থেকে একটি বিশালায়তন পাথরের টুকরো তর তর ক'রে সরে গিয়ে এক রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। ডাকুরা বাক্স পেটরাগুলো ধরাধরি ক'রে আজব রাস্তাটি দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। আলিবাবা রুদ্ধনিঃশ্বাসে ডাকুদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। সবার শেষে ডাকুদের সর্দারটি ভেতরে ঢুকে

গেলো। ভেতর থেকে ফিন সর্দারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্!' ফিন মৃদু আওয়াজ তুলে পাথরটি সরে এসে রাস্তাটি বন্ধ ক'রে দিল।

একটু বাদে পাথরের টুকরোটি ফিন মৃদু আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে রাস্তা তৈরী ক'রে দিল। ডাকুরা ব্যস্ত পায়ে গুহাটি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

ডাকুদের সর্দার ফিন চিল্লিয়ে বল্‌ল—'চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্!' পাথরটি সরে এসে গুহার মুখটি বন্ধ ক'রে দিল।

আজব ব্যাপার! কারো বুঝার সাধ্য নেই যে এখানে এক যাদু-দরওয়াজা রয়েছে।

ডাকুরা এবার গাছটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আলিবাবা ঝোপের আড়ালে একদম জড়োসড়ো হয়ে, ঘাপ্‌টি মেরে বসে রইল। তার কলিজা শুকিয়ে গেল। বুকের ভেতরে হরদম কামারের হাতুড়ি পিটে চলেছে। কোনক্রমে চল্লিশটি চোরের মধ্যে কোন একটির নজর তার দিকে পড়ে গেলে কম্ম ফতে হয়ে যাবে। জান একদম খতম ক'রে ছাড়বে।

বরাত ভাল। ডাকুরা সোজা ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। টপাটপ ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। খটাখট আওয়াজ তুলে বন থেকে বেরিয়ে গেল। সবার পিছনে গেল ডাকুদের সর্দার।

আলিবাবা গাছের মগডালে বসেই হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে অনুচ্চ কণ্ঠে ব'লে উঠল—'খোদা মেহেরবান। তোমার অশেষ দোয়া না থাকলে এ-যাত্রায় আমার জান রক্ষা পেত না।'

জানের ডর আলিবাবা-র ভেতরে এখনও কাজ ক'রে চলেছে। পাহাড়ের গায়ের যাদু-দরওয়াজা ও গুহাটির ব্যাপারে তার কৌতূহলও অদম্য। সে শেষ পর্যন্ত কলিজা শক্ত ক'রে গাছ থেকে নেমে এল। এক পা-দু'পা ক'রে পাহাড়টির দিকে এগোতে লাগল। জান যায় যাবে তবু ব্যাপারটির একটি হিল্লে তাকে করতেই হবে। দেখতে হবে, কি রয়েছে যাদু-দরওয়াজার ওদিকে, গুহাটির ভেতরে।

আলিবাবা নিঃসন্দেহ হ'ল—ডাকুরা ইতিমধ্যে জঙ্গল পেরিয়ে নগরের দিকে, তাদের গন্তব্য স্থলের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিছু সময়ের জন্য অন্তত নিশ্চিন্ত।

পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে সে ভুলে গেল তার বিবি, বালবাচ্চা আর একমাত্র সম্বল গাধা তিনটির কথা। অদম্য কৌতূহল তার সম্পূর্ণ সত্তাকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে। নসীবে যা-ই থাক না কেন দরওয়াজার ওপারে কি আছে সে দেখবেই, দেখতেই হবে।

আলিবাবা পাহাড়টির দিকে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে একবারটি তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নিল। হ্যাঁ ডাকুরা এখানেই এসে থেমেছিল। ডাকুদের সর্দারটি এখানে দাঁড়িয়েই চিল্লিয়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, সে বিলকুল এক ভেল্কি দেখিয়ে গেল। একদম আজব কাণ্ড। তবে কি 'চিচিং ফাঁক' 'চিচিং বন্‌ধ্' শব্দগুলোর মধ্যেই ভেল্কির মন্ত্র রয়েছে?

আলিবাবা একদম সোজা খাড়া হয়ে পড়ল। সজোরে দম নিয়ে বুকে বল-শক্তি সংগ্রহ ক'রে নিল। তারপর গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠল—'চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক!'

ব্যস, ভেল্কি শুরু হয়ে গেল। মৃদু আওয়াজ তুলে ইয়া পেল্লাই এক পাথরের চাই ধীরে ধীরে সরে গিয়ে রাস্তা বানিয়ে দিল। আকস্মিক আতঙ্কে আলিবাবার বুকের ঢিব্ ঢিবানি অনেকাংশে বেড়ে গেল। দু' কদম এগিয়ে গুহাটির দিকে উঁকি দিতেই আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ভেতরে জমাট বাঁধা আন্ধার। পা দু'টো থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। পিছন ফিরে দৌড়ে ভাগবে কিনা ভাবতে লাগল। সে আর কতক্ষণ? পর মুহূর্তেই দিল্‌কে শক্ত ক'রে বাঁধল। নসীবে যা আছে পরে দেখা যাবে।

সাহসে ভর ক'রে আলিবাবা ফিন ভেতরের দিকে উঁকি দিল। অস্পষ্ট হলেও সে দেখতে পেল, বিশালায়তন একটি গুহা। দু'ধাপ সিঁড়ি। তারপর প্রায় সমতল মেঝে। সে খোদাতাল্লা-র নাম স্মরণ ক'রে সে-সিঁড়ি দুটো ডিঙিয়ে আবছা আন্ধারে এগিয়ে যেতে লাগল। কৌতূহলী নজর মেলে চারদিকে নজর ফেরাতে লাগল। মাথার ওপরের ছাদ আর দু'ধারের দেয়াল অমসৃণ। সে আরও দু'কদম এগিয়ে গেল। দেখল, গুহাটির কেন্দ্রস্থলে ঢাই ক'রে সামানপত্র রাখা হয়েছে। বাক্স পেটরা সাজিয়ে রাখা।

আলিবাবা ব্যস্ত-হাতে একটি বাক্সের ডালা খুলে ফেল্‌ল। অচানক তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'ইয়া খোদা, এ যে সোনার মোহর, দিনার!' তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠল। আর একটি বাক্সের ডালা তুলতেই সে নতুন ক'রে বিস্ময়াভিভূত হ'ল। চাঁদীর ঢেলাই বাক্সটিতে একদম বোঝাই। সে উন্মাদের মাফিক সবগুলি বাক্সের ডালা খুলে ফেল্‌ল। সবগুলো পেটরাই সোনা আর চাঁদীতে ঠাসা। আর কয়েকটিতে রয়েছে সোনার গহনাপত্র আর হীরা-জহরৎ।

গুহাটির এককোণে রেশমী কাপড়া দিয়ে কি যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। আলিবাবা এক লাফে তার কাছে গিয়ে খাড়া হ'ল। কাপড়াটি তুলতেই তার শরীরের সব ক'টি স্নায়ু একসঙ্গে ঝন্ ঝনিয়ে উঠল। সেখানে ঢাই ক'রে রাখা হয়েছে জড়োয়া গহনা পত্র আর হরেক কিসিমের মূল্যবান হীরা-জহরৎ, মণি মাণিক্য।

আলিবাবা তাজ্জব বনে গেল। এত সব ধন দৌলত ডাকুরা জোগাড় করল কি ক'রে! ডাকাতি করা সম্পদ সে তো বুঝাই যায়। লেকিন তার পরিমাণ এতই বেশী যে, তামাম সুলতানিয়তেও বুঝি এত ধন দৌলত নেই। এর সঙ্গে কত হাজার বুড্ডা-বুড্ডি, নারী-বালবাচ্চার খুন জড়িয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আলিবাবা বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে ধন দৌলতগুলির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কোটি কোটি দিনারের এত সব ধন দৌলত চল্লিশজন চোর জিন্দেগীভর ডাকাতি-রাহাজানি করেও জরুর সঞ্চয় করতে পারে নি। অসম্ভব, একদম অসম্ভব। এক পুরুষ তো দূরের ব্যাপার দু'পুরুষের পক্ষেও পর্বত-প্রমাণ ধন দৌলত সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। যুগের পর যুগ ধরে বহুৎ পুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এসব। আলিবাবার মালুম হ'ল, এরা নির্ঘাৎ ব্যাবিলনের দুর্ধর্ষ ডাকুদের বংশধর। নইলে অন্য কোন মুলুকের চোর-ডাকুদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এরকম অঢেল ধন দৌলত সম্রাট আলেকজান্দার অথবা সম্রাট সুলেমানও জিন্দেগীতে চোখে দেখতে পান নি।

গুহার ভেতরে খাড়া হয়ে আলিবাবা ভাবতে লাগল, তার ধর্মনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, পারিবারিক কর্তব্যবোধ আর দুর্বলের প্রতি মমত্ববোধের জন্য প্রীত হয়ে আল্লাতাল্লাই তাকে হাত ধরে এখানে নিয়ে এসেছে। জিন্দেগীর পরবর্তী দিনগুলো যাতে সুখে কাটাতে পারে সে ফিকির করে দিয়েছেন। আলিবাবা এ-ও ভাবল, ডাকু চরমতম গুণাহ ক'রে, নরহত্যার মাধ্যমে, খুন ঝরিয়ে এসব ধনদৌলত সংগ্রহ করেছে। যে গুণাহের বিনিময়ে তারা এসব সংগ্রহ

করেছে তা যদি এখান থেকে খুন না ঝরিয়ে, কাউকেই খুন না ক'রে নির্বিবাদে এখান থেকে নিয়ে যায় ডাকুদের গুণাহের তুলনায় তার গুণাহ তিলমাত্রই হবে। আল্লাতাল্লা পাপীদের ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, তাদের কোন অধিকারই রাখেন না।

আলিবাবা পাক্কা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। এখান থেকে ধন দৌলত নিয়ে গিয়ে সে তার নিজের ও বিবি-বালবাচ্চার দিনগুলোকে সুখময় করে তুলবেই। আর আল্লাতাল্লারও এ-ই মর্জি।

আলিবাবা এবার একটি খানাবোঝাই থলি টেনে আনল। ব্যস্ত-হাতে মেঝেতে খানাগুলো ঢেলে দিয়ে থলিটি খালি ক'রে নিল। তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে সোনার মোহর আর হীরা-জহরৎ দিয়ে থলিটি বোঝাই ক'রে ফেল্‌ল। রশি দিয়ে শক্ত ক'রে থলিটির মুখ বেঁধে নিল। এবার ঝট ক'রে গুহাটির দরওয়াজায় গিয়ে উঁকি দিয়ে চারদিকে অনুসন্ধিৎসু নজর চালিয়ে দেখে নিল। না, ধারে কাছে কেউ-ই নেই। এক লাফে ফিন মোহরের থলিটির কাছে এল। শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে থলিটিকে কোন রকমে কাঁধে তুলে নিল। গুহার দরওয়াজার কাছে গিয়ে কাঁধ থেকে সেটি নামাল। এবার ফিন ছুটে গেল গুহার ভেতরে, আর একটি ঝোলার খানা ঢেলে দিয়ে তাতে সোনার মোহর আর হীরা-জহরৎ ঠেসে ঠেসে বোঝাই করল। সেটিও কাঁধে ক'রে নিয়ে গেল গুহার দরওয়াজায়। এমনি ক'রে সে অনেকগুলি ঝোলা সোনা আর হীরা মণিমাণিক্যে বোঝাই ক'রে গুহাটির দরওয়াজায় নিয়ে পাঁজা ক'রে ফেল্‌ল। এক লহমায় ঝোলাগুলির দিকে তাকিয়ে আন্দাজ ক'রে নিল, তিনটি মাত্র গাধার পক্ষে এগুলোই বে-সামাল হয়ে পড়বে। আজ এ পর্যন্ত থাক। ভবিষ্যতে মওকা বুঝে ফিন কোশিস ক'রে দেখা যাবে।

আলিবাবা ঝোলাগুলো গাধা তিনটির পিঠে চাপিয়ে রশি দিয়ে আচ্ছা ক'রে বেঁধে নিল।

এবার সে ডাকুদের সর্দারটির যাদুমন্ত্রটি উচ্চারণ করল 'চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্!' ব্যস, পাথরটি মৃদু আওয়াজ তুলে এগিয়ে এসে গুহার মুখটি বন্ধ ক'রে দিল।

আলিবাবা এবার গাধা তিনটিকে তাড়িয়ে নিয়ে মকানের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

মকানের সামনে এসে আলিবাবা দেখে তার মকানের দরওয়াজা ভেতর থেকে বন্‌ধ্। অচানক তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক!' ব্যস, যাদুমন্ত্রের গুণে দরওয়াজাটি আপনা আপনি খুলে গেল। গাধাগুলোকে তাড়িয়ে সে মকানের ভেতরে ঢুকে গেল। এবার সে যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করল—'চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্!' ব্যস, দরওয়াজটি ফিন আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

আলিবাবা-র বিবি স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে ব্যস্ত পায়ে কামরার বাইরে এসে একদম তাজ্জব বনে গেল। দরওয়াজা বন্ধ ছিল। তবে সে গাধাগুলোকে নিয়ে মকানের ভেতরে ঢুকল কি ক'রে!

আলিবাবা-র বিবি চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'কী আজব কাণ্ড! দরওয়াজা তো বন্ধ ছিল। তুমি মকানের ভেতরে এলে কি ক'রে?'

আলিবাবা বিবির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বল্‌ল—'বিবিজান, আল্লাহ-র মর্জিতে আজ আমার নসীবের চাকা ঘুরে গেছে, আমার দিকে তিনি নজর মেলে তাকিয়েছেন। এসব ব্যাপার পরে হবে। এখন এক কাম কর, ঝোলাগুলোতে হাত লাগাও, কামরায় ঢুকিয়ে ফেলি।'

—'গিয়েছিলে লকড়ি আনতে, নিয়ে এলে কতগুলো ঝোলা! কি আছে এগুলোতে।'

—'বল্‌লাম তো ওসব বাৎ পরে হবে। আগে ধর ঝট পট ঝোলাগুলোকে কামরায় ঢুকিয়ে ফেলি।'

ঝোলার গায়ে হাত বুলিয়েই আলিবাবা-র বিবির মালুম হ'ল, ঝোলায় মোহর ভর্তি। সোনার মোহরের ব্যাপার তার দিমাকেই এল না। এমন আজব কাণ্ড যে ব'লে দিলেও বিশোয়াস করার নয়। ফিন এ-ও ভাবল তামার চাকতি টাকতি কিছু হলে হতেও পারে।

যা-ই হোক না কেন লকড়ি আনতে গিয়ে বস্তা বস্তা মোহর নিয়ে আসা জরুর স্বাভাবিক পথে রোজগারের ব্যাপার নয়। ডরে তার হাত-পা তিরতির ক'রে কাঁপতে লাগল। কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে আসার জোগাড়। সে অচানক ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! একী সর্বনেশে কাণ্ড ক'রে বসেছে! কার মাথায় বাড়ি দিয়ে এতগুলো মোহর নিয়ে ভেগে এসেছে! লেকিন সে তার স্বামীকে যতদূর জানে কারো সর্বনাশ ক'রে একটি দিনারও নিতে সে নারাজ। তবে? তবে বস্তা বস্তা মোহর—না, আর ভাবতে পারছে না। মাথা ঝিম ঝিম করছে। তবে কি তার স্বামী ডাকাত দলে নাম লিখিয়েছে? ডাকাতি করা মোহর? বিবিকে অচল অনড় দেখে আলিবাবা তাকে বেমাক্কা এক ধমক দিয়ে ওঠে—'কী ব্যাপার! ঝোলাগুলো ধরতে বল্‌লাম। কান দিয়ে যায় নি নাকি? কই এসো, আমার সঙ্গে হাত লাগাও। ঝটপট কামরায় ঢুকিয়ে দেই।'

নিজেকে সামাল দিতে না পেরে আলিবাবা-র বিবি চোখ দুটো বিলকুল কপালে তুলে ব'লে উঠল—'একী সর্বনেশে কাণ্ড করেছ! শেষমেষ তুমি চোর-ডাকুর দলে ভিড়েছ! জঙ্গল থেকে লকড়ি এনে যা আয় উপার্জন হচ্ছিল তাতেই লবণ-রুটির ফিকির হয়ে যাচ্ছিল। তবে কেন এ সর্বনেশে কাজে হাত লাগাতে গেলে? গতর খাটিয়ে রুটির জোগাড় করার কাজে দিল্ নেই। গতরে কি ঘুণ ধরেছে নাকি? একবার কি ভেবে দেখেছ, তুমি ফাটকে আটক হলে খানাপিনার অভাবে কচি বালবাচ্চাগুলির কি হালৎ হবে? তুমি ভেবেছে, কোতোয়ালের চোখে ধূলো দিয়ে পার পাবে? ইয়া আল্লাহ! একী গুণাহের পথে নিয়ে গেলে একে! একী সর্বনাশ আমার করলে। আমি তো কারো একটি কানাকড়িতেও হাত দেই নি। তবে কেন আমার এমন সর্বনাশ করার জন্য তুমি উঠে পড়ে লেগেছে?'

আলিবাবা-র বিবি গলা ছেড়ে চিল্লাতে চিল্লাতে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল।

আলিবাবা বাজখাই গলায় চিল্লিয়ে উঠল—'শয়তানী কাঁহিকার! চিল্লিয়ে মহল্লার আদমিদের জড়ো করার ফিকির করছিস! বাজে ধান্দা ছেড়ে যা বলছি কর। আগে ঝোলাগুলোতে হাত লাগা, কামরায় তুলি। তারপর রাত ভর চোখের পানি ঝরাতে চাইলেও আমি বাধা দেব না।'

—'না আমি ওগুলো ছুঁতেও যাব না। তুমি কেন অমন গুণাহ করতে গেলে? কেন অন্যের মাথায় বাড়ি দিয়ে তার সামানপত্র মকানে নিয়ে এলে? এত গুণাহ কি আল্লাতাল্লা বরদাস্ত করবেন! আমি থাকতে তোমাকে আমার বালবাচ্চাদের অমঙ্গল করতে দেব না। কিছুতেই না।'

—'ফিন বিলাপ জুড়ে দিয়েছিস?'

—'একশ' বার বিলাপ করব। হাজার বার করব। আগে তুমি গাধার পিঠে চাপিয়ে গুণাহে ভরা ঝোলাগুলোকে মকানের সীমানার বাইরে রেখে এসো। তারপর তোমার বাৎ শুনব, আগে নয়। তোমার পায়ে পড়ছি। এ-গুণাহের সামানপত্র কামরায় তুলো না। আমার বাৎ মান। তোমার গুণাহ যে আমার কচি বালবাচ্চাগুলোর ওপরেও বর্তাবে। যাও, এগুলো সীমানার বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে এসো।'

আলিবাবা পড়ল মহা ফ্যাসাদে। ভাবল, বিবির চিল্লাচিল্লিতে মহল্লার আদমিরা ছুটে এলে মোহর আর হীরা জহরৎ বোঝাই ঝোলাগুলো দেখলে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে ছাড়বে। উপায়ান্তর না দেখে সে ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠল—'ঝুট মুট কী ঝামেলা শুরু করেছ, বল দেখি! তোমার কি ধারণা আমি এসব ধন দৌলত চুরি ডাকাতি ক'রে নিয়ে এসেছি? আমার দিমাকে আসছে না। আমার সম্বন্ধে তোমার এরকম ধারণা হ'ল কী ক'রে? তুমি নিঃসন্দেহ হতে পার কোন নীচ কাম কাজের মাধ্যমে আমি এগুলো জোগাড় করি নি। আল্লাতাল্লা আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে বিলকুল ধন দৌলত তুলে দিয়েছেন।'

—'আল্লাতাল্লা-র সাফাই গাইছ! তোমার শরমে আসছে না, এমন এক ব্যাপার ক'রে গলা চড়িয়ে বাৎচিৎ করতে?'

—'শরম লাগবে কেন, শুনি? সকালে লকড়ি আনতে জঙ্গলে গিয়ে এসব পেয়েছি। পড়ে পাওয়া এত ধন দৌলত পায়ে ঠেলে দিতে কার দিল্ চায়, বলতে পার? আমি লালচ সম্বরণ করতে পারি নি। নিয়ে এসেছি। ব্যস, এর বেশী কিছু তো নয়। যা সাচ্চা, তোমার কাছে পেশ করলাম। নাও, জলদি হাত লাগাও, ঝোলাগুলি কামরায় ঢুকিয়ে ফেলা যাক।'

—'ব্যাপার কি আগে বল। তারপর তোমার হুকুম তামিল করব।'

—'সে বহুৎ বড়া কিস্‌সা বিবিজান। সময়ের ব্যাপার। জুটমুট দেরী না ক'রে হাত লাগাও, জরুরী কাজ আগে চুকিয়ে নেয়া যাক।'

আলিবাবা-র বিবি এবার বস্তায় হাত লাগল।

আলিবাবা আগেভাগেই কামরার মেঝেতে একটি খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে রেখেছিল। মোহর, গহনাপত্র ও হীরা জহরৎ যা কিছু বিলকুল পাটির ওপর ঢেলে দিল। পর্বত না হোক, কামরার ভিতরে ছোটখাটো একটি টিলার সৃষ্টি হ'ল।

আলিবাবা মোহর ও হীরা-জহরতের টিলাটির ওপর গাঁট হয়ে বসে আল্লাহ-র দোয়ায় ধন দৌলতের খনি আবিষ্কারের কাহিনী বিবির কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল। কিছুই ছিপাল না।

স্বামীর মুখে আজব ধন দৌলতের খনির ব্যাপার স্যাপার শুনে তার বিবি তো একদম যেন খুশীর সাগরে ভাসতে লাগল। মাত্রাতিরিক্ত খুশীতে তার দু'চোখের কোল বেয়ে পানি ঝরতে

লাগল। গায়ের ওড়নার খুঁট দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে সে বলতে লাগল—'ইয়া আল্লাহ! এ কী হালৎ হ'ল আমাদের। আমরা যে আর গরীব রইলাম না। সুলতান বাদশাহের সমান আমাদের ধন দৌলত হয়ে গেল! খোদা মেহেরবান, তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন। আমরা ধনী—একদম আমীর ওমরাহ বনে গেলাম।' স্বামীকে জড়িয়ে ধ'রে এবার বল্ল—'খোদাতাল্লা-র ওপর ভরসা রাখার ফল এবার মালুম হচ্ছে তো? সৎ পথে, ন্যায়ের পথে থাকলে খোদাতাল্লা একদিন না একদিন মুখ তুলে তাকাবেনই, প্রমাণ পেলে তো?'

আলিবাবা-র বিবির দশা উন্মাদিনীর মাফিক হয়ে গেল। সে একটা একটা ক'রে মোহর তুলে নিয়ে গুণতে লেগে গেল।

তার কাণ্ড দেখে আলিবাবা তো হেসেই খুন। হাসতে হাসতে বল্ল—'আরে, এ তুমি করছ কি বিবিজান? পাহাড় প্রমাণ মোহর কি আর গুণে পারবে? রেখে দাও। গুণে আর কাজ নেই। চল, রসুইখানার কামরার মেঝেতে পেল্লাই একটি গর্ত বানিয়ে বিলকুল মোহর পুঁতে রাখব। কোতোয়াল তো দূরের ব্যাপার, তার চৌদ্দপুরুষেরও সাধ্য নেই তল্লাশ ক'রে বের করতে পারবে। চল, চটপট চল। মহল্লার কেউ এসে পড়লে বিলকুল ব্যাপার ভেস্তে যাবে।'

আলিবাবা-র বিবি স্বামীর বক্তব্যে কান না দিয়ে সে মোহর গুণেই চলেছে। আদতে সে জানতে চায়, সে কত দিনারের মালিক বনে গেছে। বড়লোক, লেকিন কেমন বড়লোক।

আলিবাবা-র বিবি স্বামীর হাতে কোদালটি তুলে দিয়ে বল্ল—'তুমি চটপট গর্ত খুঁড়ে ফেল। আমি চট ক'রে মহল্লার কারো বাড়ি থেকে একটি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসিগে। গুণে খতম করতে না পারলেও অন্ততঃ মেপে দেখা যাক কয় সের সোনার মালিক বনে গেছি। তোমার গর্ত খোঁড়ার কাজ চুকে যাওয়ার আগেই আমি মেপে-নিতে পারব। আর এক ব্যাপার, ফি রোজ তো আর গর্ত খুঁড়ে মোহর বের করা যাবে না। বালবাচ্চার জন্য কিছু মোহর আলাদা ক'রে রাখতে হবে। কত মোহর রাখলাম তা-ও তো জানা দরকার।'

আলিবাবা বুঝল, কাজটি একদম আহাম্মকের মাফিক। তবু বিবিকে নিরস্ত করার কোশিস করল না। বিবিকে ডেকে সে বল্ল—'শোন, আর যা-ই কর না কেন, ভুলেও যেন মোহরের ব্যাপারে কারো কাছে মুখ খুলো না। যাও, দেখ যদি দাড়িপাল্লা মেলে। মোহরগুলো ওজন করেই ফেল। আমি এ ফাঁকে গর্তটি খুড়ে ফেলি।'

আলিবাবা-র বিবি গুটি গুটি কাসিম-এর মকানে হাজির হয়। কাসিম-এর বিবির সুরৎ যেমন কদাকার, তার ব্যভারও তেমনি জঘন্য। সে কস্মিনকালেও আলিবাবা-র মকানে আসে না। স্বামীকেও আসতে দেয় না। আলিবাবা গরীব, সংসার চালাতে পারে না ঠিকভাবে। বলা যায় না, যদি দু'-দশ দিনার চেয়ে বসে তবেই বে-কায়দা। কিছু নিলে আর চিৎ হাত উপুড় করবে না।'

কাসিম-এর বিবি দরওয়াজা খুলেই আলিবাবার বিবিকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। বিমর্ষ মুখে বল্ল—'কি ব্যাপার, অচানক কি ভেবে?'

—'তোমাদের দাড়িপাল্লাটি কিছুসময়ের জন্য দেবে? একটু বাদেই ফিন পৌঁছে দিয়ে যাব।'

দাড়িপাল্লার কথা শুনে ভ্রূকুঁচকে আলিবাবা-র বিবির দিকে তাকায়। ভাবতে লাগল, আলিবাবা যা রোজগার করে তাতে বালবাচ্চারা পেটপুরে খেতেই পায় না। তা এমন কি অমূল্য সম্পদ সে আজ নিয়ে এল যে, একদম দাড়িপাল্লা দিয়ে মাপতে হবে।'

সে ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্ল—'দাড়িপাল্লা তো নিবি, লেকিন কোন্‌টি দরকার বল তো? ছোট না বড় দাড়িপাল্লা? তোর সোয়ামী এমন কি তামাম দুনিয়ার সুলতান-বাদশাহের ধন দৌলত নিয়ে এসেছে যে, একদম দাড়িপাল্লা দিয়ে না মাপলে আর চলছে না? চট পট বলে ফেল, কোন্ দাড়িপাল্লা দেব?' আদতে সে আন্দাজ ক'রে নিতে চায় আলিবাবা কোন্ কিসিমের এবং কি পরিমাণ সামানপত্র নিয়ে এসেছে।

আলিবাবা-র বিবি বল্ল—'তা যদি ছোট দাড়িপাল্লাটি দিতে চাও তবে তা-ই দাও। ছোটটি দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে পারব।'

দাড়িপাল্লা বের করার জন্য কাসিম-এর বিবি কামরার ভেতরে চলে গেল। তার মগজ বোঝাই দুর্বুদ্ধি। সে পাল্লা দুটোর তলায় সামান্য আঠা মাখিয়ে দিল। এর উদ্দেশ্য আলিবাবা বা তার বিবি দাড়িপাল্লাটি দিয়ে যা-ই মাপুক না কেন পাল্লার তলার আঠায় তার কিছু না কিছু লেগে থাকবেই। এতে জেনে নিতে পারবে আলিবাবা এমন কোন্ সামান নিয়ে এসেছে যা দাড়িপাল্লা দিয়ে না মেপে উপায় ছিল না।

দাড়িপাল্লাটি হাতে পাওয়ামাত্র আলিবাবা-র বিবি লম্বা লম্বা পায়ে মকানে ফিরে দরওয়াজা বন্ধ ক'রে মোহর মাপতে লেগে গেল। এক-এক পাল্লা মেপে সে কাঠের অঙ্গার দিয়ে মেঝের গায়ে দাগ কাটতে লাগল।

ব্যস্ত-হাতে মোহর মাপলেও সে কিছুতেই সন্ধ্যার আন্ধার নামার আগে কাজ চুকাতে পারল না।

মোহর মাপার কাজ চুকিয়ে আলিবাবা ও তার বিবি রসুইখানায় সদ্য খোঁড়া গর্তে মোহরগুলো ঢুকিয়ে মিট্টি চাপা দিয়ে দিল। ব্যস, এবার নিশ্চিন্ত।

আলিবাবা-র বিবি এবার নিশ্চিন্তে কাসিম-এর মকানে গিয়ে

দাড়িপাল্লাটি ফিরিয়ে দিয়ে এল।

আলিবাবা-র বিবি একদম সাদাসিধে লেড়কি। ঘোরপ্যাঁচ কাকে বলে জানে না। তার মালুমই হ'ল না কাসিম-এর বিবির খপ্পরে পড়ে গেছে।

কাসিম-এর বিবি পাল্লাটি উল্টেই একদম কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। সে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ যে চাল, গম, যব বা ভুট্টা নয়, মোহর! সাচ্চা মোহর! আলিবাবা এতই মোহর আমদানি করেছে যে, গুণে খতম করতে পারল না, পাল্লা দিয়ে মাপতে হয়েছে। হায় খোদা! এ কী করলে তুমি! আমার একী সর্বনাশ করলে? আলিবাবা-র হালৎ যে বিলকুল ফিরে গেল!'

ব্যাপার দেখে কাসিম-এর বিবির বুকের পাঁজর যেন খসে পড়ার জোগাড় হ'ল। গলা ছেড়ে বলতে লাগল—'শয়তান বেতমিস কাঁহিকার! শয়তান আলিবাবা এত মোহর কোত্থেকে আমদানি করেছে, আমাকে পাত্তা লাগাতেই হবে। খোদা-তাল্লা! হ্যাঁ, একমাত্র খোদাতাল্লাই এর হিল্লে করতে পারবেন। ওর মাথায় যদি বজ্রাঘাত হয় তবে আমি পীরের দরগায় একমণ দুধের সিন্নি দেব। শয়তান বেতমিসটি যদি একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তবে মহল্লায় আর টেকা যাবে না।

কাসিম সন্ধ্যার কিছু পরে দোকান বন্ধ ক'রে মকানে ফিরে গেল। দেখল, তার বিবি কোরবানির বকরির মাফিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে দরওয়াজায় দেখেই তার বিবির ক্রোধ ও আক্ষেপ যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল।

বিবি অচানক কেন এমন দাপাদাপি করছে কাসিম-এর কিছুই মালুম হ'ল না। তিলমাত্র আন্দাজও করতে পারল না। কাসিম চোখ-মুখ কাচুমাচু ক'রে জিজ্ঞাসা করল—'বিবিজান, কি হয়েছে তোমার? অসময়ে নোকর'কে পাঠিয়ে আমাকে তলব করেছ—তবিয়ৎ খারাপ হয়েছে কি?'

কাসিম-এর বিবি গোস্সায় একদম ফেঁটে পড়ার জোগাড় হ'ল—'বলি, তোমার চোখে কি ন্যাবা হয়েছে? কিছুই দেখ না, বোঝও না কিছুই—চোখে ঠুলি পরে থাক নাকি?'

—'কী হাঙ্গামা শুরু করলে বিবিজান! ব্যাপার কি বলবে তো? এরই মধ্যে এমন কি ঘটে গেল যে, তুমি এমন দাপিয়ে বেড়াচ্ছ?'

তার বিবি হাতের সোনার মোহরটি কাসিম-এর দিকে ছুঁড়ে মারল। সেটি দুম ক'রে তার কপালে গিয়ে আঘাত হানল।

কাসিম কপালে হাত দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা মোহরটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

তার বিবি তেমনি বাজখাই গলায়, তড়পে চলেছে—'কি, মালুম হচ্ছে কিছু? তোমার কলিজার সমান ছোটো ভাইয়ার মকান থেকে এ-মোহরটি ভেট এসেছে। তুমি সামান্য এক সওদাগর, বাজারে এক দোকান রয়েছে। সে দেমাকেই তো হরবখত চোখ উল্টে থাক।'

—'আদৎ ব্যাপার কি খোলসা ক'রে বলবে তো। আমার দিমাকে তো কিছুই আসছে না বিবিজান। আর তুমি তো কালনাগিনীর মাফিক ফুঁসেই চলেছ।'

—'আমার আর ফোঁসফোঁসানির কি আছে! তুমি দেমাকের ঠেলায় এতদিন মাটিতে পা রাখতে না। আমীর আদমির সমান নাকি তোমার ধন দৌলত। এবার থেকে হুঁশিয়ার হও। এতদিন নিজের ব্যাপারে তোমার যে-বড়াই ছিল আজ তোমার ভাইয়া আলিবাবা তোমার মুখে একদম ঝামা ঘষে দিয়েছে। লকড়ি বেচে যে রুটির জোগাড় ক'রে আজ সে মোহর গুণে সারতে পারে না। পাল্লা দিয়ে ওজন করতে হয়। মোহর রাখার জায়গা নেই। তার একটি নমুনা তো চোখের সামনেই পড়ে রয়েছে।'

—'মোহর? সোনার মোহর? দাড়িপাল্লা দিয়ে মাপতে হয়? আজব ব্যাপার তো!'

—'ব্যাপারটি তোমার কাছে আজব হতে পারে। লেকিন তোমার ভাইয়ার কাছে এ-ই আজ স্বাভাবিক। বেকুব অপদার্থ কাঁহিকার! আমার আব্বা শাদীর সময় যে-দোকান তোমাকে যৌতুক হিসাবে

দিয়েছিলেন তা-ই নেড়েচেড়ে রুটির জোগাড় করছ। নিজের মুরোদে তো কুলোল না তাকে একটু-আধটু বাড়িয়ে বড় সড় একটি কারবার ফাঁদতে। তোমার মাফিক নিষ্কর্মা তামাম সুলতানিয়ৎ ঢুঁড়ে এলেও দ্বিতীয় আর একজন মিলবে না।'

বিবির বক্তব্য শুনে কাসিম বিলকুল চিপ্‌সে গেল। সে অচানক গুছিয়ে উঠতে পারল না, কি জবাব দেবে।

কাসিম-এর বিবি এত সহজে দমবার পাত্রী নয়। সে জখমী নেকড়ের মাফিক তর্জন গর্জন চালিয়ে যেতে লাগল—তোমার মুরোদ আমার শাদীর পর পরই মালুম হয়ে গেছে। লেকিন আর না, ভেজা বিল্লির মাফিক তোমার ভাইয়া আলিবাবাকে টিট করতেই হবে, তোমাকে। মুখ বুজে না থেকে গুটি গুটি ভাইয়ার মকানে যাও। মিঠা-মিঠা বাৎচিতের মাধ্যমে জেনে নাও, সে এত মোহর কি ক'রে জোগাড় করল? কোন্ সে ফিকির? তোমাকে জেরা ক'রে ক'রে তার মুখ থেকে আদৎ ব্যাপারটি বের করতেই হবে। সে তো তোমার আদর-সোহাগের ছোটা ভাইয়া। তার পেট থেকে সামান্য একটি হদিস বের করতে পারবে না? জরুর পারবে। পারতে তোমাকে হবেই।

বিবি হুড়পাড় ক'রে ব্যাপারটিকে এমন জটিল ক'রে তুলেছে যার ফলে কাসিম-এর পক্ষে আদৎ ব্যাপারটি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেয়াই সম্ভব হ'ল না। তবে সব মিলিয়ে মোদ্দা ব্যাপার যা তার মালুম হ'ল তা হচ্ছে—যে কোনো ফন্দি-ফিকিরেই হোক তার ছোটা ভাইয়ার নসীবের চাকা ঘুরেছে। সে এখন বহুৎ ধন দৌলতের মালিক। ভাইয়ার নসীব ফেরায় সে-ও আদপেই খুশী হতে পারল না। ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে খাঁক হতে লাগল।

বিবির মুখ থেকে আদৎ ব্যাপারটি জানার দুরাশা ছেড়ে দিয়ে কাসিম গুটিগুটি আলিবাবার মকানে হাজির হ'ল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য যেকোন কায়দা কৌশলে তার নসীব কি ক'রে ফিরল তার হদিস নিয়ে নেয়া।

আলিবাবা সবে রসুইখানার মেঝেতে ধন দৌলত পোঁতার কাজ চুকিয়ে কোদালটি সাফ সুতরা করছে। এমন সময় জুতা জোড়ায় মচ্‌মচ্ আওয়াজ তুলে কাসিম তার মকানে ঢুকল। কোন রকম সৌহার্দ্যপূর্ণ বাৎচিৎ না বলেই কাসিম ব'লে উঠল—'কি রে আহাম্মক, আমার সঙ্গে নাকি তুই পাল্লা দিতে শুরু করেছিস? তোর হিম্মৎ তো কমতি নয়, আমাকে টেক্কা দিতে চাস! কলিজার জোর বুঝি বেড়ে গেছে, তাই না? মানছি, তোর ধন দৌলতের ছড়াছড়ি, তাই বলে দাড়িপাল্লায় মোহর গুঁজে দিয়ে আমাকে দেমাক দেখাচ্ছিস! জেনে রাখিস আলিবাবা, আমি কারো দেমাক টেমাকের ধার ধারি না! আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে এলে এমন ল্যাঙ্গি মারব যে, জিন্দেগীতে আর কোমর সোজা ক'রে খাড়া হতে পারবি না, ইয়াদ রাখবি।'

বড়া ভাইয়ার বাৎচিৎ শুনে আলিবাবা একদম ভড়কে গেল। কি ব্যাপার, কি যে কি হয়ে গেল তার দিমাকে আসছে না। সে হতভম্ব হয়ে নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। সে ভয় ডরে একদম কেঁচোর মাফিক কুঁকড়ে গেল। তার বড়া ভাইয়া আর তার বিবির চরিত্র তো আর তার অজানা নয়। তারা উভয়েই সমান ধড়িবাজ। শেয়ালও বুঝি এদের চেয়ে কম ধূর্ত।

আলিবাবা বার-কয়েক ঢোক গিলে আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'ভাইজান, তুমি কি বলতে চাইছ, মালুম হচ্ছে না। খোদার কসম, তোমার বাৎচিৎ আমার কাছে একদম হেঁয়ালি ঠেকছে। মেহেরবানি ক'রে খোলসা ক'রে বল, আমি কি কসুর করেছি যার জন্য তুমি আমার ওপর গোস্‌সায় ফুস্‌ছ? তোমার আর আমার শরীরে তো একই খুন বইছে। একই আম্মার গর্ভে আমরা পয়দা হয়েছি। আমি কিভাবে বালবাচ্চা নিয়ে দিন গুজরান করছি তুমি কি ভুলেও তল্লাশ করেছ কোনদিন? সে তোমার মর্জি। লেকিন আজ আমি এমন কি কসুর করলাম যার জন্য তুমি এসেই আমার ওপর এক হাত নিয়ে নিলে? চটাচটি না ক'রে আমার কাছে কি জানতে এসেছ দিমাক ঠাণ্ডা ক'রে বল। আমি ওয়াদা করছি, তোমার কাছে কিছুই ছিপাব না।'

—'শোন আলিবাবা, তুমি ফন্দি ফিকির ক'রে আমাকে দমিয়ে দিতে চাইছ। আমি জানি, তুমি না বুঝার বাহানা ক'রে আদৎ ব্যাপারটিকে চাপা দিবার কোশিস কোরো না। ছিপাতে চাইলেই আমার কাছে ছিপাতে পারবেনা।'

হাতের সোনার মোহরটি দেখিয়ে এবার বাজখাই গলায় তড়পে উঠল—'এটা কি, চিনতে পারছ কি? এরকম মোহর কতগুলি আমদানি করেছ, সাচ্চা বল। চোর, ডাকু শয়তান কাঁহিকার!'

আলিবাবা এবার পুরো ব্যাপারটি সম্বন্ধে আঁচ ক'রে নিতে পারল। সে এর কি জবাব দেবে, অচানক ঠিক ক'রে উঠতে পারল না। তার বিবির বুদ্ধি-বিবেচনার অভাবেই তাকে যে ফাঁদে পড়তে হয়েছে, বুঝতে দেরি হ'ল না। সে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বল্‌ল—'ভাইজান, বিলকুল খোদাতাল্লা-র মেহেরবানি। তাঁর নজরে পড়লে ফকির বাদশাহ বনে যেতে পারে, আর বাদশাহও দু'দিনে ফকির হয়ে পথে পথে ঢুঁড়ে বেড়ালে তাজ্জব বনার কিছুই নেই।'

—'আলিবাবা, তুমি ফিন ধান্ধাবাজীর পথ ধরতে চাইছ। বাহানা ক'রে আদৎ ব্যাপার থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। ছিপাবার কোশিস না ক'রে খোলসা ক'রে বল তুমি কাড়ি কাড়ি সোনার মোহর কিভাবে আমদানি করেছ। গুণতি করার হাঙ্গামা এড়াতে তুমি দাড়িপাল্লা দিয়ে মোহর মেপেছ। দু'-দশটি মোহর হলে তুমি জরুর দাড়ি পাল্লার তল্লাশ করতে না। সাচ্চা কি না?'

—'ভাইজান, আমি আগেই ব'লে রেখেছি, তোমার কাছে কিছুই ছিপাব না। সে কোশিসও করব না। তুমি আমার এক মায়ের পেটের ভাইয়া। তোমার কাছে আমার কিছুই লুকোছাপা করার থাকতে পারে না, উচিতও নয়। আমার সাচ্চা বাৎ শোন, আমি যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু আমদানি করেছি তাতে আমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। তুমি দিমাক ঠাণ্ডা ক'রে বস, যা পেয়েছি, আধাআধি ভাগ বাটোয়ারা ক'রে তোমার ভাগ নিয়ে যাও। আমি খুশী হয়ে—'

—'আমাকে খুশী করার দরকার নেই।' ধূর্ত ও লোভী কাসিম তো আলিবাবা-র আধাআধি বখরা নিতে নারাজ। সে শুধু জানতে চায় মোহর আমদানি করার সূত্রটি। তারপর যা কিছু করতে হয় সে নিজেই করবে। কি ক'রে মোহরের পাহাড় বানাতে হয় ফন্দি ফিকির তো তার নিজের কাছে।

কাসিম এবার চোখ লাল ক'রে বল্‌ল—'আলিবাবা, আমাকে ধোকা দেবার কোশিস ক'রে ফয়দা কিছু হবে না। তুই শুধু বাৎলে দে মোহরগুলো কোত্থেকে আমদানি করেছিস।'

—'পাহাড়ের জঙ্গলের ধারের এক গুহা থেকে।'

—'এবার ঠিক ঠিক বাৎলে দে, কোন্ কায়দা কৌশল প্রয়োগ ক'রে গুহার ভেতরে ঢুকতে হয়? খবরদার, ভুল নিশানা বাৎলে দিয়ে আমাকে ধোঁকা দেবার কোশিস করলে, জান একদম খতম ক'রে ছাড়ব। ব্যস, ইয়াদ রাখবি। কোতোয়ালিতে গিয়ে তোর নামে এজাহার দিয়ে আসব। ব্যস, কোমরে রশি পরিয়ে ফটকে আটক ক'রে রাখবে। তুই চোর-ডাকু। অস্বীকার করতে পারিস? চোরাই মাল তোর কামরা থেকে বের করতে পারলে তোর হালৎ কি হবে, ভেবে দেখেছিস? জিন্দেগীতে খালাস পাবি না, ইয়াদ রাখবি।'

আলিবাবা তার সহোদরটিকে তো হাড়ে হাড়ে চেনে। সে পারে না এমন কোন জঘন্য কাজই নেই। সে একটু কায়দা কৌশল করলেই যে অনায়াসে তাকে কয়েদখানায় ঘানি টানিয়ে নিতে পারে, তার অসাধ্য কিচ্ছু নেই। যদি সে সাচমুচ তাকে কয়েদ-খানায় পাঠায় তবে তার বালবাচ্চারা যে থলি হাতে ভিখ মাঙ্গতে বেরোবে। তার বিবি কয়েদখানায় দরওয়াজায় বসে কেঁদে সারা হবে। মুহূর্তে এসব ব্যাপার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ক'রে নিয়ে আলিবাবা গুহার দরওয়াজা খোলার 'চিচিংফাক' যাদুমন্ত্রটি বড়া ভাইয়াকে শিখিয়ে দিল। এবার সে যদি গুহার ভেতর থেকে ধন দৌলত নিয়ে এসে আমীর-বাদশাহ বনে যায় তবে তার তো কোন লোকসান হবার ব্যাপার নয়।

গুহার দরওয়াজা খোলার যাদুমন্ত্র শিখে নিয়ে কাসিম আর এক লহমাও সেখানে অপেক্ষা করল না। সুলতান-বাদশাহ বনে যাওয়ার খোয়াব দেখতে দেখতে সে লম্বা লম্বা পায়ে নিজের মকানের দিকে হাঁটা জুড়ল।

সে রাতভর নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে কাকডাকা ভোরে দশটি খচ্চরের পিঠে ইয়া পেল্লাই দশটি ঝোলা বেঁধে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে গেল। জঙ্গলের শেষ সীমানায় পাহাড়ের ধারে এসে খচ্চরগুলিকে দাঁড় করাল। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে সে এক অনাস্বাদিত খুশীর জোয়ারে ভাসতে লাগল। যাদুমন্ত্রটি একবার স্বগতোক্তি করল। হ্যাঁ, ইয়াদ আছে বটে। ব্যস, কিছু সময়ের মধ্যেই তামাম দুনিয়ার ধন দৌলৎ তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। যে-কোন সুলতান বাদশাহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। সে তামাম দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা ধনী বনে যাবে। ইয়া আল্লাহ! ভাবলেও যে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। খুশীতে বিলকুল মশগুল হয়ে সে চিল্লিয়ে উঠল—'চিচিংফাঁক! চিচিংফাঁক! চিচিংফাঁক!'

কী আজব কাণ্ড! ইয়া পেল্লাই একটি পাথরের চাই যাদুমন্ত্রের জোরে তরতর ক'রে সরে গিয়ে একটি রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। রোমাঞ্চেও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কাসিম দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে গুহার ভেতরে উঁকি দিল। হ্যাঁ, আলিবাবা গুহাটির যে বর্ণনা দিয়েছিল অবিকল একই দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আল্লাহ'কে সুক্রিয়া না জানিয়ে পারল না। তার আর তর সইছে না। এক লাফে গুহাটির ভেতর ঢুকে গেল। আবছা আন্ধারে সে চোখের মণি দুটোকে গুহার চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে আলিবাবা-র বর্ণিত দৃশ্যের সঙ্গে সে সাদৃশ্য খোঁজার কোশিস করতে লাগল। দেখল, একদম সাচ্চা বটে, চারদিকে কেবল মুখবাঁধা ঝোলার বিচিত্র সমারোহ। দুনিয়ার কোথাও এমন অপরিমিত ধন দৌলৎ থাকতে পারে সে খোয়াবের মধ্যেও ভাবতে পারে নি।

কাসিম-এর আর তর সইছে না। একের পর এক জালা টেনে নিয়ে উন্মাদের মাফিক সেগুলোকে সোনার মোহর আর হীরা-জহরৎ দিয়ে বোঝাই ক'রে নিতে লাগল। রূপা বা সাজ পোশাক নিয়ে ঝুটমুট বোঝা ভারী করতে সে নারাজ।

কাসিম মোহর ও হীরা-জহরৎ বোঝাই জালা গুলোকে কোনরকমে কসরৎ ক'রে টেনে হিঁচড়ে গুহাটির মুখে নিয়ে জড়ো করল। ব্যস, এবার বাইরে বেরিয়ে খচ্চরগুলোয় পিঠে জালাগুলো বেঁধে মকানের দিকে যাত্রা করতে পারলেই কাজ হাসিল।

সর্বশেষ জালাটিকে আনার পর সে কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিল। এবার গুহার মুখের দরওয়াজাটি খুলে বাইরে যেতে পারলেই একদম বাজীমাৎ। সে গুহার মুখে দাঁড়িয়ে দরওয়াজাটি খোলার কোশিস করতে গিয়ে একদম বেকুব বনে গেল। 'কোন্ ফাঁক' বল্‌লে সে দরওয়াজাটি খুলবে তা-ই সে কিছুতেই ইয়াদ করতে পারছে না। সে চিল্লিয়ে ওঠে' আলু ফাঁক, সীম ফাঁক।'

ইয়া খোদা! দরওয়াজাটি খোলা তো দূরের ব্যাপার সামান্য ফাঁক পর্যন্ত হ'ল না।

কাসিম এবার উন্মাদের মাফিক চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল—'আলু ফাঁক, সীম ফাঁক, ক্ষীরা ফাঁক...লেকিন দরওয়াজা আর ফাঁক হ'ল না। কাসিম-এর মুখ শুকিয়ে একদম চুণ হয়ে গেল। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরতে লাগল। কোর্তা, পিরাণ আর পাৎলুন যা-যা গায়ে ছিল বিলকুল ভিজে একদম জবজবে হয়ে গেল। হাজার কোশিস করেও সে কিছুতেই 'চিচিং' শব্দটিকে আর মনে আনতে পারছে না।

হতাশা ও আকস্মিক দুঃখ-দুর্দশার ব্যাপার চিন্তা ক'রে সে গুহার দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু ক'রে দিল। লেকিন ফয়দা কিছুই হ'ল না। চোখে পানির ধারা দেখা দিল। চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে ক্লান্তি ও অবসাদে সে গুহাটির মেঝেতে শুয়ে পড়ল। চোখের পাতা

বন্ধ হয়ে আসে। সর্বতোভাবে কোশিস করেও যখন ফয়দা কিছু হ'ল না তখন সে উন্মাদের মাফিক প্রায়ান্ধকার গুহাটির ভেতরে ধন দৌলতের ঝোলাগুলিকে পাশ কাটিয়ে সে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল। শস্য, সব্জী আর হরেক কিসিমের ফলের নাম তার স্মৃতির পটে ভেসে উঠতে লাগল। লেকিন আদৎ শব্দটি যে কি তা সে কিছুতেই স্মরণে আনতে পারল না।

কাসিম আল্লাতাল্লা-র ওপর বিলকুল কসুর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে হাল্কা করার কোশিস করতে লাগল। আদতে আল্লাতাল্লাই তো কাসিম-এর সঙ্গে বেইমানী করছে। তাকে ধন-দৌলতের লালচ দেখিয়ে এখানে টেনে আনা তার কারসাজি ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে? তিনিই তার মাত্রাতিরিক্ত লালচের জন্য এরকম কঠিন সাজার বন্দোবস্ত করেছেন।

চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে কাসিম বলতে লাগল—'হে আল্লাহ, আমার যা কিছু কসুর এবারের জন্য মাফ ক'রে দাও। আমাকে হীরা-জহরতের কয়েদখানা থেকে মাত্র একটিবারের জন্য মাফ ক'রে দাও। ওয়াদা করছি, ভবিষ্যতে আর কোনদিন অন্যের সম্পদের জন্য লালসা করব না।'

লেকিন কাসিম-এর চোখের পানি আল্লাহ-র দিল্ ভেজাতে পারল না।

গুহার মেঝেতে শুয়ে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে কাসিম কখন যে নিদে একদম বেঁহুস হয়ে গেল, নিজেই কিছু আন্দাজ করতে পারল না। একটু বাদে সে খোয়াব দেখতে লাগল, কে যেন গুহাটির মুখ খুলে দিয়েছে। অচানক এক টুকরো অত্যুজ্জ্বল আলো এসে তার চোখে মুখে পড়েছে। ইয়া আল্লাহ! তবে কি সে আন্ধার এ কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাচ্ছে? তার মালুম হ'ল, একদল আদমি জোয়ারের পানির মাফিক হুড়মুড় ক'রে গুহার ভেতরে ঢুকে এল।

চল্লিশটি ডাকু ঘোড়া ছুটিয়ে গুহাটির কাছে হাজির হয়েই চমকে উঠল? দশ-দশটি খচ্চর গুহাটির কাছাকাছি গাছের সঙ্গে বাঁধা। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—'জঙ্গলের শেষ সীমানায়, পাহাড়ের গায়ে এতগুলো খচ্চরকে এনে কে বেঁধে রেখেছে?' চারদিকে নজর চালিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে তারা আরও তাজ্জব বনে গেল। সর্দারের চোখে আতঙ্কের ছাপ—'ইয়া আল্লাহ' তবে কি আমাদের আস্তানার খোঁজ কেউ পেয়ে গেছে! কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটতে চলেছে দেখছি! হারামী শয়তানটি নির্ঘাৎ আমাদের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢোকার যাদুমন্ত্রটি শিখে নিয়েছিল। সে চিল্লিয়ে উঠল—'চিচিংফাঁক! চিচিংফাঁক! চিচিংফাঁক! ব্যস তরতর ক'রে গুহার মুখের পাথরটি সরে গিয়ে দরওয়াজা তৈরী হয়ে গেল।

ডাকুদের সর্দার তার সাকরেদদের নিয়ে হুড়মুড় ক'রে গুহার ভেতর ঢুকতে লাগল। গুহার মুখে ইয়া পেল্লাই জালাগুলো দেখতে পেয়ে তারা নিঃসন্দেহ হ'ল কোন শয়তান বেতমিস তাদের আস্তানায় হানা দিয়েছে।

তরবারি হাতে নিয়ে তারা ক্রোধে গর্জন করতে করতে আবছা আন্ধার গুহাটির ভেতরে ঢুকে গেল।

এতগুলো আদমির পায়ের শব্দে কাসিম-এর নিদ টুটে গেল। সে ঝট করে লাফিয়ে খাড়া হয়ে পড়ল। ডাকুদের সর্দার তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, নিজেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে হাতের তরবারিটি বেমালুম চালিয়ে দিল। চোখের পলকে কাসিম-এর মুণ্ডুটি ধড় থেকে আলাদা হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। ফিন্‌কি দিয়ে খুন বেরিয়ে এল। সর্দারের ক্রোধ তবু প্রশমিত হ'ল না। সে ঘন ঘন তরবারি চালিয়ে তার দেহটিকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেল্‌ল।

সর্দারের নির্দেশে তার কয়েকজন সাকরেদ কাসেম-এর দেহের টুকরোগুলোকে বস্তা বোঝাই ক'রে গুহার মুখটি থেকে কয়েক হাত দূরে ফেলে রেখে এল। কাসিম-এর কাজের হিসাব চুকিয়ে নিল ডাকুরা।

তারা এবার জালার মোহর ও হীরা-জহরৎগুলোকে ফিন ঝোলায় বোঝাই ক'রে আগের জায়গায় সাজিয়ে রাখল।

ডাকুদের সর্দার তার সাকরেদদের নিয়ে আলোচনায় বসল। লেকিন কিছুতেই বের করতে পারল না এ-আদমিটি কে। কিভাবেই বা গুহায় ঢুকে চোরের ওপর বাটপাড়ি করার কোশিস করছিল। না, কোন সিদ্ধান্তেই তারা পৌঁছতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিল শয়তান বেতমিস বাটপাড়টিকে যখন খতম করা হয়েই গেছে তখন আর ঝুটমুট তার পরিচয় জানার কোশিস ক'রে ফয়দাই বা কি? যাকে সাবাড় ক'রে হিসাব চুকিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে নিয়ে আর হাঙ্গামা ক'রে ফয়দা কিছুই হবার নয়।

সর্দার বল্‌ল—'এবার থেকে আমাদের আরও হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে। দরওয়াজা খোলার সময় আরও সাবধান, গলা নামিয়ে যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

আর দেরী নয়। গুহার কাজ মিটিয়ে ডাকুরা গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে দরওয়াজা বন্ধের জন্য সর্দার—'চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্! চিচিং বন্‌ধ্!' যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করল। ব্যস, এক লহমার মধ্যে দরওয়াজার পাথরটি সরে এসে গুহার মুখ বন্ধ ক'রে দিল। ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল।

কাসিম-এর ইন্তেকালের জন্য তার লোভী ও পরশ্রীকাতর বিবিই একমাত্র দায়ী। সে যদি তাকে মোহরটি দেখিয়ে উত্যক্ত না করত তবে সে জবুর উদ্ভ্রান্তের মাফিক আলিবাবা-র কাছে যেত না। আর সে মরণ গুহায় যাওয়ার তো প্রশ্নই উঠত না। তবে হয়ত তাকে এমন ক'রে বেঘোরে জানটি খোয়াতে হ'ত না।

এদিকে কাসিম-এর বিবির কলিজা খুশীতে বার বার নেচে নেচে উঠতে লাগল। তার স্বামী এতগুলো জালা নিয়ে গেছে, একটু বাদেই সোনার মোহর আর হরেক কিসিমের হীরা-জহরৎ নিয়ে মকানে ফিরে আসবে। ব্যস, তারা দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা ধনী বনে যাবে। ইয়া আল্লাহ—খুশীতে যে তার দিল্ একদম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। সে এত মোহর আর হীরা-জহরৎ কোথায় রাখবে? কিভাবে রাখবে? কোন শয়তান যাতে টের না পায় সে ফিকির জবুর করতে হবে।

কাসিম-এর বিবি খুশীতে ডগমগ হয়ে দিন কাবার ক'রে দিল। সন্ধ্যার আন্ধার নেমে এল। সে ভাবল, তার স্বামী দিনের আলো থাকতে থাকতে জবুর শহরের পথে ফিরবে না। ধান্ধাবাজ শয়তান ছিনতাইবাজরা তো ওৎ পেতেই থাকে। খচ্চরের পিঠে এতগুলো জালা দেখলে তাদের নজরে তো পড়তেই হবে। সে ভাবতে লাগল, তার স্বামীর বুদ্ধি-বিবেচনা একটু-আধটু কম থাকতে পারে বটে। লেকিন এতবড় আহাম্মক নয় যে সূর্যের আলো থাকতে থাকতে কোটি কোটি দিনারের মোহর আর হীরা-জহরৎ নিয়ে লোকালয়ে হাজির হবে।

ক্রমে রাত্রি বাড়তে লাগল। কাসিম-এর বিবির দিল্ এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। হাজারো কু-চিন্তা তাকে অস্থির ক'রে তুল্‌ল। সন্ধ্যার আন্ধার নামার পরও যদি সে পাহাড়ের কাছ থেকে রওনা দেয় তবে এর অনেক আগেই তার মকানে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। তবে? আদমিটি বাঘের পেটে যায় নি তো! তবে তো কপাল একদম পুড়বে। মোহর তো যাবেই, স্বামীটিকেও খোয়াতে হবে।

আলিবাবা তখন রোয়াকে বসে কুড়ুলে শান দিচ্ছে।

কাসিম-এর বিবি ব্যাজার মুখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এত রাত্রে তাকে দেখে আলিবাবা ভড়কে গেল। আঁৎকে উঠে বল্‌ল—'কি ব্যাপার? কোন খারাপ খবর—'

—'আর বোলো না, তোমার ভাইজান সেই কাকডাকা ভোরে দশটি খচ্চরের পিঠে ইয়া পেল্লাই জালা চাপিয়ে সেই যে মকান থেকে বেরিয়েছে এখনও ফেরার নামটি নেই। কি ব্যাপার, আমার তো কিছুই দিমাকে আসছে না!'

—'ঘাবড়াবার কিছু নাই। ভাইজান বহুৎ হুঁশিয়ার আদমি। তোমার তো আর অজানা নয়। দশ জালা মোহর নিয়ে নগরের ওপর দিয়ে আসতে গেলে ছিনতাইবাজ আর চোর-ডাকুর ব্যাপার না হয় ছাড়ানই দিলাম। সরকারের কোতোয়ালের চর চারদিকে হরদম চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে। বেফাঁস কিছু দেখলেই সোজা নিয়ে ফাটকে আটক ক'রে দেবে। মালুম হচ্ছে, ভাইজান এসবদিক বিবেচনা করেই একটু রাত বাড়লে রওনা দিয়েছে। চলে আসবে। ঘাবড়াবার ব্যাপার কিছু নয়। তুমি নিশ্চিন্তে মকানে ফিরে যাও।'

একটু বাদে কাসিম-এর বিবি ফিন আলিবাবা-র দরজায় এল, আলিবাবা জানালার ধারে বসে তার ভাইজানের আগমন প্রতীক্ষায় জেগেই রাত গুজরান করছে। হাজারো কু-চিন্তা তার মাথায় এসে ভর করছে। অস্থির ক'রে তুলেছে তাকে।

কাসিম-এর বিবিকে দরওয়াজায় দেখে আলিবাবা বিষণ্ণ মুখে, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'না গো, আজ রাত্রে আর ফেরার কোন আশাই দেখছি নে। এখন আমার মালুম হচ্ছে, মোহর আর হীরা-জহরৎ দিয়ে এতগুলো জালা বোঝাই করতে করতেই সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের আন্ধার নেমে এসেছিল। পথে চোর-ডাকুর উৎপাতের চেয়ে বেশী ডর হচ্ছে জঙ্গলের সাপখোপ আর বাঘ-ভাল্লুকদের থাবা থেকে। তাদের নজরে পড়লে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই জান খতম ক'রে দেয়। আমার ভাইজান বহুৎ হুঁশিয়ার আদমি। সে জরুর ঝুঁকি নিতে রাজী হয় নি। তাই ভোর রাতে গুহা থেকে রওনা দেবে। আদমিরা পথে নামার আগেই ভাইজান মকানে পৌঁছে যাবে। আমার বাৎ সাচ্চা কি ঝুটা মিলিয়ে নিও।'

ভোর হ'ল। সূর্য উঠল। বেলা বাড়তে লাগল। সূর্য ক্রমেই মাথার ওপরে উঠে যেতে লাগল। আলিবাবা-র বাৎ মিল্‌ল না। কাসিম তবু মকানে ফিরল না। আলিবাবা এবার আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। সাচমুচ তার টনক এবার নড়ল। ভাবল, না, আর নিশ্চিন্তে বসে থাকা ঠিক হবে না।

আলিবাবা এবার কাসিম-এর বিবিকে বল্‌ল—'ঘাবড়িয়ো না। আমি যাচ্ছি ভাইজানের তল্লাশে। দেখে আসি ব্যাপার কি।'

কুড়ুল কাঁধে নিয়ে গাধার পিঠে চেপে আলিবাবা জঙ্গলের পথ ধরল। পাহাড়ের গুহাটির কাছাকাছি যেতেই তার নজরে পড়ল, শুকনো-চটচটে খুনের দাগ, চাপ চাপ শুকনো খুন। দুরু দুরু বুকে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে এদিক-এদিক তাকাতেই কাসিম-এর দশটি খচ্চরের টুকরো টুকরো দেহ দেখে সে আঁৎকে উঠলো। বুকের ভেতরে কলিজাটি মোচড় মেরে উঠল। সে আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! তবে তো আমার ভাইজান জিন্দা নাই! জরুর ভয়ঙ্কর ডাকুগুলোর হাতে পড়ে তার জান খতম হয়ে গেছে!'

আলিবাবা কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল—'চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক!'
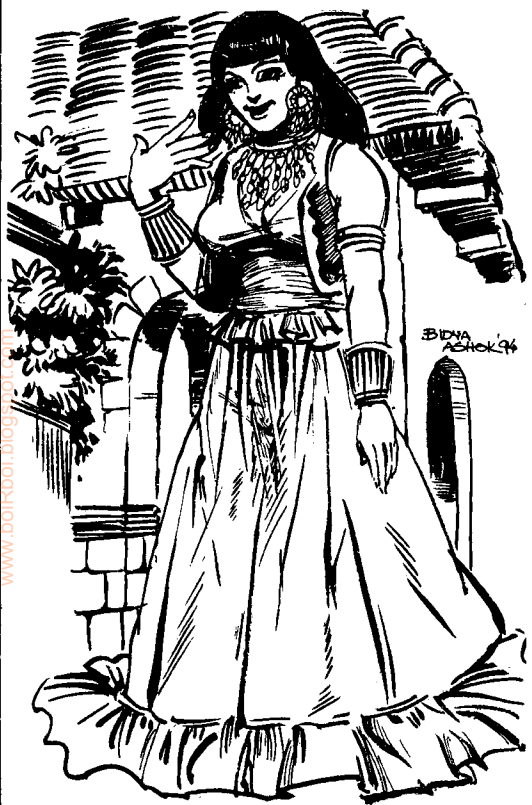
এক লহমার মধ্যে পাথরের চাইটি সরে গিয়ে গুহার মুখটি খুলে গেল। সে ব্যস্ত-পায়ে গুহাটির ভেতরে ঢুকে গেল। গুহার আনাচে কানাচে তল্লাশী চালিয়েও কাসিম-এর লাশের দেখা মিল্‌ল না। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সঙ্গে ফিন গুহা থেকে বেরিয়ে এল। গুহার দরওয়াজাটি থেকে অদূরে এক ঝোপের আড়ালে একটি খুন মাখানো বড়সড় বোড়া দেখে এক লাফে তার কাছে হাজির হ'ল। বোড়াটির মুখের রশির বাঁধন খুলেই সে বিকট আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! ভাইজান! ভাইজান!'

আলিবাবা-র বুঝতে বাকী রইল না, ডাকুরা তার ভাইজানকে কোতল ক'রে বোড়ায় ক'রে ঝোপের আড়ালে ফেলে গেছে।

আলিবাবা বোড়াটিকে গাধার পিঠে চাপিয়ে দ্রুত মকানের দিকে রওনা হয়ে গেল। বলা তো যায় না, ডাকুরা এসে পড়লে তাকেও তার ভাইজানের সঙ্গে বেহেস্তে পাঠিয়ে ছাড়বে।

আলিবাবা-র এক খরিদকরা বাঁদী মর্জিনা। নওজোয়ান লেড়কি। গাট্টাগোট্টা চেহারা। গায়ে গতরে শক্তিও ধরে বহুৎ। আর তেজ! সেদিক থেকেও মর্জিনা অতুলনীয়া।

আলিবাবা মকানের সদর-দরওয়াজায় পৌঁছেই হাঁক দিল—'মর্জিনা, মর্জিনা।'

মালিকের ডাক কানে যেতেই মর্জিনা দৌড়ে দরওয়াজায় হাজির হল। আলিবাবা বল্‌ল—'বেটি, একটু এগিয়ে আয়। বোড়াটিতে একটু হাত লাগা, কামরার ভেতরে নিয়ে যেতে হবে।'

তারা দু'জনে মিলে কায়দা কসরৎ ক'রে বোড়াটিকে কামরার ভেতরে নিয়ে গেল।

মর্জিনা যে কেবল গায়ে গতরে শক্তি ধরে তা-ই নয়, দিমাকে বুদ্ধিও ধরে যথেষ্ট।

আলিবাবা অসহায় নজর মেলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মর্জিনা-র দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'বেটি, তোর বুদ্ধি বিবেচনার খবর তো আর আমার অজানা নয়, এমন বিপদ-হাঙ্গামা আমার কাঁধে চেপেছে যা সামাল দেবার হিম্মৎ আমার নেই। আদতে আমার দিমাক ঠিক মত কাজ করছে না। তুই বিবেচনা ক'রে এমন এক ফন্দি ফিকির আমাকে বাৎলে দে যাতে ব্যাপারটিকে আমি সামাল দিয়ে উঠতে পারি।'

—'মালিক ঘাবড়াবেন্‌ না। আমার ওপরে ভরসা রাখুন। আমি বিলকুল ব্যাপারটি সামাল দিয়ে নেব। কাকপক্ষীও টের পাবে না।'

—'মর্জিনা, ভাইজানের লাশটিকে গোর দিতে হবে। সবার আগে সে-বন্দোবস্তই করা দরকার।'

—'তা-ও আমিই সেরে ফেলব।'

—'লেকিন ভাইজানের লাশের টুকরোগুলি দেখলে মহল্লার আদমিরা যে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসবে!'

—'আপনার দিমাক টিমাক কি খারাপ হয়েছে মালিক? এরকম হালৎ থাকলে কি আর তাঁকে গোর দেয়া যাবে?'

—'তবে? তবে কোন্‌ পথ নিতে চাইছিস?'

—'সবার আগে এক চর্মকারকে ডেকে লাশের টুকরাগুলিকে এমন নিখুঁত সেলাই করিয়ে নেব যাতে কারো মালুমই হবে না এতসব কাণ্ড করা হয়েছে। এমন কি আপনিও তাজ্জব বনে যাবেন মালিক। কারো চৌদ্দপুরুষের হিম্মৎ হবে না সেলাই বা জোড়া দেয়ার ব্যাপারটির হদিস করে।'

কাসিম-এর বিবি তার নসীব, কপাল পোড়ার খবর পেয়ে চিল্লাতে চিল্লাতে আলিবাবা-র মকানে ঢোকে। মর্জিনা দৌড়ে গিয়ে তার মুখে ওড়না গুঁজে দিয়ে থামিয়ে দেয়। ধমক দিয়ে ওঠে—'মালকিন, চুপ করুন! একদম কাঁদবেন না। চিল্লাচিল্লি করলে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে। সবার আগে চর্মকার ডেকে লাশটি জোড়াতাপ্পি দেয়ার বন্দোবস্ত করি। তারপর গলাছেড়ে কাঁদবেন, মেঝেতে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি করবেন, কিছুমাত্রও আপত্তি করব না। কিছু সময়ের জন্য শোক তাপ চাপা দিয়ে রাখুন।'

ব্যাপারটির গুরুত্ব সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরে কাসিম-এর বিবি মুখে কলুপ এঁটে দিল।

মর্জিনা পায়ে চপ্পল গলিয়ে দ্রুত মহল্লার হেকিমের মকানে হাজির হ'ল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটশ' ছাপ্পান্নতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—জাঁহাপনা, মর্জিনা হেকিমের মকানে হাজির হয়ে বল্‌ল—'হেকিম সাহাব, আমার মালিকের বিমারি হয়েছে। বুকে কফ জমে শ্বাসবন্ধ হওয়ার জোগাড়, গা গরম, বুকে দর্দ—জলদি দাওয়াই দিন।'

বুড্ডা হেকিম এক বোতল দাওয়াই বানিয়ে মর্জিনা-র হাতে দিল।

মর্জিনা পরদিন ভোরে চোখের পানি মুছতে মুছতে হেকিমের সামনে হাজির হ'ল। ডুকরে ডুকরে কেঁদে বল্‌ল—হেকিম সাহাব, আপনার দাওয়াইয়ে বিমারি তো সারলই না বরং দর্দ হাজার গুণ বেড়ে গেছে। মালিকের বুকের দর্দ বন্ধ হয় এমন এক আচ্ছা দাওয়াই বানিয়ে দিন। দামের জন্য ঘাবড়াবেন না। যা চাইবেন, চুকিয়ে দেব।'

বুড্ডা হেকিম এবার আরও কড়া এক শিশি দাওয়াই বানিয়ে মর্জিনা-র হাতে দিয়ে বল্‌ল—'বেটি, বড়িয়া দাওয়াই দিলাম। দর্দ কমবে, বিমারি একদম সেরে যাবে।'

মর্জিনা দাওয়াইয়ের বোতল-হাতে হাকিমের মকান থেকে বেরিয়ে এল।

একটু বাদে মর্জিনা গলা ছেড়ে হাউ মাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে হেকিমের মকানে গেল। কামরায় ঢুকে বুড্ডা হেকিমের পা দুটো জড়িয়ে ধরে, বলল—'হেকিম সাহাব, রোগীর হালৎ একদম খারাপ হয়ে গেছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার ফিকির—নাভি থেকে শ্বাস উঠছে! আপনি আরও কড়া দাওয়াই—'

চশমার ফাঁক দিয়ে বুড়ড়া হেকিম জুলজুল্‌ ক'রে তাকিয়ে

বল্‌ল—'নাভি থেকে শ্বাস উঠে আসছে ? তবে ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসছে। দাওয়াই দিয়ে আর কাজ হবার নয়। আল্লাহ্-র নাম করতে বল গে।'

মর্জিনা হেকিম সাহাবের মুখ থেকে এমন বাৎ শোনার জন্য এত কায়দা কৌশল করেছে।

মর্জিনা এবার খুশীতে নাচতে নাচতে আলিবাবা-র মকানে গিয়ে কাসিম-এর বিবিকে বল্‌ল—' আদৎ কাজ চুকিয়ে এসেছি। এবার গলা ছেড়ে কেঁদে কেটে স্বামীর জন্য শোক করুন মালকিন।'

মর্জিনা কাসিম-এর বিবি ও আলিবাবা-র সঙ্গে গলা মিলিয়ে এবং সাধ্য মত গলা চড়িয়ে নিজেও কাঁদতে লেগে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাসিম-এর ইন্তেকালের খবরটি বাতাসের কাঁধে ভর ক'রে মহল্লার সর্বত্র, আনাচে কানাচে পৌঁছে গেল। মহল্লার সবাই জেনে গেল, কাসিম মাত্র দু'দিন বিমারিতে ভুগে বেহেস্তে চলে গেল। মহাল্লার হেকিম দাওয়াই দিয়েছে, যথাসাধ্য ইলাজ করেও তাকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। কঠিন বিমারি তার দেহে ভর করেছিল।

মর্জিনা তার কাজের পহেলা ধাপ নির্বিঘ্নেই চুকিয়ে নিয়েছে। সে এবার দ্বিতীয় ধাপের দিকে পা-বাড়াল। গুটি গুটি পায়ে মহল্লারই এক চর্মকারের কাছে হাজির হ'ল। জুতা সেলাই ক'রে সে দিনগুজরান করে।

বুড্ডা চর্মকার এক পুরানো জুতার ওপর ঝুঁকে তার গায়ে তাপ্পি মারার কাজে ব্যস্ত। তার হাতের কাজ বহুৎ আচ্ছা। সূক্ষ্ম কাজ এমন নিখুঁত ভাবে সে করতে পারে যার পরিচয় মর্জিনা ইতিপূর্বে একাধিকবার পেয়েছে। মালিকের যাবতীয় সেলাই ও তাপ্পি মারার কাজ সে নিজেই করিয়ে আনে। মর্জিনা বুড্ডাটির সামনে খাড়া হয়ে মিঠা সুরে বল্‌ল—'মুস্তফা সাহাব, এক জরুরী কাজের জন্য তোমাকে বড্ড দরকার হয়ে পড়েছে।'

বুড্ডা মুস্তফা মর্জিনা-র মুখে 'সাহাব' কথাটি শোনামাত্র আহ্লাদে একদম গদ গদ হয়ে গেল। হাতের কাজ ফেলে মর্জিনার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'জরুরী কাজ ? কি এমন জরুরী কাজ বেটি যে, একদম হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছ?'

—'মুস্তফা সাহাব, আমার মকানে গিয়ে তোমাকে এক জরুরী কাজ ক'রে আসতে হবে। এতে তোমার এদিককার কাম কাজ কামাই যাবে, আমার খেয়াল আছে। ওয়াদা করছি, তোমাকে পুষিয়ে দেব।' একটি গোটা সোনার দিনার বুড্ডার মুখের সামনে ধরে এবার বল্‌ল—'এখন এটি রেখে দাও, কাজ চুকে গেলে আরও মিলবে।'

জুতো সেলাইয়ের কাজে গোটা একটি সোনার দিনার মজুরি পাওয়া মুস্তফা-র কাছে সাচমুচ অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। ফিন আরও দেবে বলেছে। তার দিমাক ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। সে একবার মোহরটির এবং পর মুহূর্তেই মর্জিনা-র মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এক সময় বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটিয়ে সে বল্‌ল—'বেটি কি এমন কাজ যে, পুরো একটি সোনার দিনার বায়না দিয়ে বসলে?'

—'কাজটি বহুৎ জরুরী তো বটেই আর গোপনীয়ও, ইয়াদ রাখবে। তোমাকে কসম খেয়ে বলতে হবে মুস্তফা সাহাব—জিন্দেগীতে কারো কাছে ব্যাপারটি ফাঁস করবে না, রাজী?'

—'কী যে বলছ বেটি, নিজেই জান না, তুমি আমাকে মানা করেই দিচ্ছ যে, তার ওপর ফিন কসম টসমের ব্যাপার আসবে কেন? তবু ধ্যায়ান কর, আমি যদি কারো কাছে ব্যাপারটি ফাঁস করি তবে যেন আমার জিভ একদম খসে পড়ে, মুখে যেন পোকা পয়দা হয়।'

মর্জিনা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে বুড্ডা চর্মকারের চোখ দুটো নিজের গায়ের ওড়না খুলে আচ্ছা করে বেঁধে দিল। এবার তার হাত ধরে নিয়ে হাজির করল আলিবাবা-র মকানে। এর উদ্দেশ্য চর্মকারটি যাতে তার ঠিকানা জানতে না পারে।

বুড্ডা চর্মকারটিকে কামরার মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার চোখের বাঁধন খুলে দিল। সে দেখল তার সামনে একটি লাশ। তিন টুকরো ক'রে দেয়া হয়েছে। সে অচানক ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এ এক সর্বনেশে কাণ্ড!'

মর্জিনা ধমক দিয়ে ব'লে উঠল—'ওসব ছাড়ান দাও। এখন যা বলছি, ধ্যায়ান দিয়ে শোন—'একটা লাশ সেলাই ক'রে পুরো একটি লাশ তোমাকে বানিয়ে দিতে হবে। জোড়া তাপ্পি দেয়ার কাজে তোমার হাতের গুণ সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে। তুমি জবুর পারবে, বাহানা ছেড়ে কাজে হাত দাও।' দুটো দিনার তার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—'হাতের কাজ দেখিয়ে খুশি করতে পারলে আমিও তোমাকে খুশী ক'রে দেব।'

বুড্ডা চর্মকার দেখল, ছিনে জোঁকের হাতে পড়েছে, কাজ না করিয়ে কিছুতেই রেহাই দেবে না। উপায়ান্তর না দেখে সে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে লাশটি জোড়া দেয়ার কাজে লেগে গেল।

লাশটি জোড়া তাপ্পি দিয়ে মর্জিনা-র কাছ থেকে মোটা বকশিস নিয়ে বিদায় নেবার জন্য তৈরী হ'ল।

মর্জিনা চর্মকারের চোখে ওড়না জড়িয়ে তাকে সীমানার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এল।

ইতিমধ্যে মহল্লার আদমিরা এসে জড়ো হয়ে গেছে। কাসিম-এর মরদেহ নিয়ে শোক-মিছিল ক'রে মহল্লা পরিক্রমা সেরে গোরস্তানে নিয়ে গেল। চোখের পানি ঝরিয়ে আলিবাবা ও কাসিম-এর বিবি কাসিম'কে শেষ বিদায় জানাল। তার গোরে এক মুঠো সাদা ফুল ছড়িয়ে ও এক গোছা আগরবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে তারা চোখ

মুছতে মুছতে মকানে ফিরে এল।

এদিকে ডাকুদের সর্দার তার সাকরেদদের নিয়ে এক মাহিনা বাদে তাদের গুহায় ফিরে এল, লেকনি তারা কাসিম-এর লাশের টুকরো বাঁধা বোড়াটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় না দেখতে পেয়ে তাজ্জব বনে গেল।

সর্দার বাজখাই গলায় গর্জে উঠল—'ইয়া আল্লাহ। এখন দেখছি। যাকে আমরা টুকরো টুকরো ক'রে বোড়ায় বেঁধে রেখেছিলাম, সে একেলা নয়, দুশমন আরও আছে। এখন সবার আগে আমাদের দ্বিতীয় দুশমনটিকে তল্লাশ ক'রে বের করতে হবে। তোমরা ওয়াদা কর, দুশমনকে খুঁজে বের করবেই করবে।'

তার সাকরেদরা সমস্বরে চিল্লিয়ে উঠল—'ওয়াদা করছি, দুশমনকে আমরা তল্লাশ ক'রে বের করবই।'

—'তবে আমার বাৎ শোন। আমাদের চরমতম দুশমনটি বেশী দূরে নয়, জঙ্গলের ওপারের নগরেই সে ঘাপটি মেরে রয়েছে। জোরদার তল্লাশী চালাও, পাত্তা লাগাও। ঠিক বেরিয়ে যাবে।'

—'হ্যাঁ, কাল ভোর থেকেই আমরা কাজ শুরু করব, দুশমনের বংশে যদি একটি আদমিও জিন্দা থাকে তবে আমাদের পক্ষে ধন দৌলত রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না, ইয়াদ থাকে যেন। বরাত খারাপ হলে হয়ত ফাটকে আটক থাকতে হবে।'

সর্দার এবার তার সাকরেদদের মধ্য থেকে একজনকে ফকির দরবেশের ছদ্মবেশ পরিয়ে দুশমনকে পাকড়াও করার কাজে লাগিয়ে দিল।

গায়ে আলখাল্লা চাপিয়ে, মুখে ইয়া লম্বা সফেদ দাড়ি লাগিয়ে গলায় হরেক রঙের পুঁথির মালা পরে সাচ্চা দরবেশ সেজে ডাকুটি কাঁধে ঝোলা আর হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নগরের পথে পথে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল।

বুড্ডা চর্মকার মুস্তফা মাথা গুঁজে জুতো সেলাইয়ে কাজে ব্যস্ত। ডাকু দরবেশটি এক ধারে দাঁড়িয়ে তার সেলাইয়ের কেরামতি দেখতে লাগল।

এক সময় ডাকু-দরবেশটি বল্‌ল—'মুস্তফা ভাইয়া, তুমি যে কামাল ক'রে দিচ্ছ! তোমার হাতের কেরামতি আছে বটে! সেলাই করছ, ধরার উপায় নেই আদপে এখানে সেলাই আছে কিনা।'

মুস্তফা গর্বে বুক ফুলিয়ে বল্‌ল—'এ আর কি সেলাই দেখেছ দরবেশ সাহাব। এতো জানোয়ারের গা থেকে খুলে আনা চামড়া সেলাই করছি, একদম পানির মাফিক সোজা কাজ। জানোয়ার, এমন কি কোন আদমিকে তিন টুকরো ক'রে দিন তখন দেখিয়ে দেব সেলাই কাকে বলে। এই তো দু'দিন আগেই তিন টুকরো এক লাশ সেলাই ক'রে পুরো লাশ বানিয়ে দিলাম। সেলাইয়ের কাজ চুকে গেলে আমার নিজেরই দিমাক ঘুরে যাবার জোগাড় হয়েছিল। মালুমই করতে পারলাম না, কোথায় সেলাই করে লাশটিকে জোড়া তাপ্পি দিয়েছি।'

চর্মকার মুস্তফা-র বাৎ শুনে দরবেশধারী ডাকুটির চোখ দুটো জ্বল জ্বল ক'রে উঠল। সে অত্যুগ্র উৎসাহী হয়ে বল্‌ল—'ধ্যুৎ, এ হতেই পারে না। তিন তিনটি টুকরো জোড়া দিয়ে পুরো লাশ বানিয়ে দিয়েছ?'

—'খোদার কসম, বিশোয়াস করুন দরবেশ সাহাব। সেলাই তাপ্পি চুকিয়ে আমি নিজেই ধরতে পারিনি ঠিক কোথায় কোথায় সেলাই করা হয়েছে। আমি একদম তাজ্জব বনে গেছি। কাজ চুকিয়ে জেব ভর্তি ক'রে মোহর নিয়ে ফিরেছি।'

আমার কাজ চুকে গেলে আমাকে যেমন ওড়না দিয়ে চোখ দুটো বেঁধে মকানে নিয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি চোখ বেঁধে ফিন এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল। চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে এবং পৌঁছে দিয়ে গেছে ব'লে আমার লোকসান তো কিছু হয় নি। মোটা ইনাম তো মিলেছে, কি বলেন দরবেশ সাহাব?'

—'এক বাৎ, সাচ্চা বলবে। এ-মুলুকের কি এ-ই প্রচলিত প্রথা কোন আদমির ইন্তেকাল হলে তাকে তিন টুকরো ক'রে নিয়ে শেষ মেশ সেলাই ক'রে তবে গোর দেয়া হয়?'

—'তোবা! তোবা! সে কী দরবেশ সাহাব! প্রথা হতে যাবে কেন? লাশটির আদৎ ব্যাপারটি কি ছিল আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারি নি। কেন যে তাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। আর কেনই বা ফিন সেলাই ক'রে জোড়া তাপ্পি দেয়ার দরকার হয়, খোদাতাল্লাই জানেন। আমি কাজ চুকিয়ে মজুরি আর ইনাম নিয়ে ভেগে এসেছি, এর বেশী কিছু জানার কোশিসও করি নি।'

—'দরবেশ সাহাব, ব্যাপারটি সম্বন্ধে জানার জন্য আমার কলিজা ছটফট করতে লেগে গেছে। তুমি একবারটি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?'

—'ইয়া আল্লা! আমার পক্ষে কি ক'রে তা সম্ভব, আপনিই বলুন? আমি তো গোড়াতেই আপনাকে বলেছি, ওড়না দিয়ে আচ্ছা ক'রে আমার চোখ দুটো বেঁধে তবে সে মকানে নিয়ে গেছে। কাজ চুকে গেলে ফিন চোখ বেঁধেই আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কোন্ মকানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা হাজার বার কোশিস করলেও আমি সেখানে হাজির হতে পারব না।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আমিও তোমার চোখ দুটোতে কালো কাপড়া দিয়ে ফেটি বেঁধে দিচ্ছি। তারপর তুমি হাতড়ে হাতড়ে নিশানা মাফিক আমাকে সে-মকানে নিয়ে চল, পারবে তো?'

—'এ হতে পারে। আন্ধা আদমিরা তো হামেশাই পথ হাতড়ে হাতড়ে নিশানা মাফিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়। চোখ বেঁধে দিলে আমিও এক দফে কোশিস ক'রে দেখতে পারি।'

দরবেশধারী ডাকুটি মুস্তফা-র হাতে একটি মোহর গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—'তোমাকে কাম কাজ কামাই দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে বহুৎ লোকসান হয়ে যাবে। এটা জেবে রেখে দাও।' সে এবার চর্মকার মুস্তফা-র চোখ দুটোতে এক টুকরো কালো কাপড় দিয়ে পটি বেঁধে দিল।

মুস্তফা দরবেশধারী ডাকুটিকে নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে পথ পাড়ি দিতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের মকানটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলল—'দরবেশ সাহাব, এ-মকানেই আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল, আমার চোখের পটি খুলে দিন।'

দরবেশধারী ডাকুটি মুস্তফার চোখ থেকে কাপড়ার টুকরোটি খুলে দিল, সে এবার দু'কদম এগিয়ে ঝোলা হাতড়ে এক টুকরো খড়িমাটি বের করল। দু'কদম এগিয়ে মুস্তফা-র নির্দেশমত মকানের দরওয়াজায় খড়িমাটিটি দিয়ে একটি চিহ্ন এঁকে দিল।

সে এবার খড়িমাটির টুকরোটি ঝোলার ভেতরে চালান দিয়ে তা থেকে দুটো দিনার বের করল। মুস্তফা-র হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—'তোমার কাজের বকশিস, জেবে রেখে দাও।'

চর্মকার মুস্তফা খুশীতে নাচতে নাচতে নিজের দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

দরবেশধারী ডাকুটি যুদ্ধ-জয়ের আনন্দে ছুটতে ছুটতে গুহায় ফিরে গিয়ে তার সর্দারকে বৃত্তান্তটি বল্‌ল।

এদিকে মর্জিনা মকানে থেকে বেরিয়ে বাজারে সওদা খরিদ করতে যাবার জন্য সদর দরওয়াজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে খড়িমাটির চিহ্নটি দেখতে পেয়ে ভড়কে যায়। ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছুই আঁচ করতে পারল না।

মর্জিনা এবার একটুকরো খড়িমাটি জোগাড় ক'রে পথের ধারের সব মকানের দরওয়াজার গায়ে অবিকল একই চিহ্ন এঁকে দিল।

পরদিন ভোরে চল্লিশটি ডাকু দু'জন দুজন ক'রে বিশটি দলে বিভক্ত হয়ে নগরে ছড়িয়ে পড়ল। লেকিন পথের ধারের সব মকানের দরওয়াজায় একই চিহ্ন দেখে সর্দারের শিরে খুন চাপার জোগাড় হয়। যাকে দরবেশের সাজপোশাক পরিয়ে কাজে লাগিয়েছিল, যে মকানের গায়ে খড়িমাটির চিহ্ন এঁকে দিয়ে গিয়েছিল তাকে নাগালের মধ্যে পেলে যেন হয়ত খতমই ক'রে ছাড়বে।

ক্রোধে উন্মত্ত সর্দার গুহায় ফিরে গিয়ে তরবারির এক কোপে দরবেশের সাজ পোশাকধারী ডাকুটিকে দু'আলাদা করে দেয়।

ডাকুদের সর্দার এবার অন্য এক সাকরেদকে চর্মকার মুস্তফার কাছে পাঠাল।

নয়া গুপ্তচরটিও মুচির চোখে পটি বেঁধে তাকে নিয়ে আলিবাবার মকানের সামনে হাজির হ'ল। সে এবার একটুকরো নীল রঙের খড়িমাটি দিয়ে দরওয়াজাটির গায়ে এক আলাদা কিসিমের চিহ্ন এঁকে দিল। তারপর নাচতে নাচতে গুহায় ফিরে গেল।

পরদিন ভোরে ডাকুরা দু'জন দু'জন ক'রে বিশটি দলে বিভক্ত হয়ে নগরের পথে পথে ছড়িয়ে পড়ল। এ যে বিলকুল আজব কাণ্ড। দেখা গেল পথের দু'ধারের সবক'টি মকানের দরওয়াজাতেই নীল রঙের খড়িমাটি দিয়ে একই কিসিমের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। বেকার হয়রানি হওয়াতে সর্দারের খুন টগবগিয়ে উঠল। সে হন্ত দন্ত হয়ে গুহায় ফিরে গিয়ে গুপ্তচর ডাকুটির গর্দান নিল।

দু' দু'বার বেকার হয়রানি হয়ে ডাকু-সর্দার এবার আর কারো ওপর দায়িত্ব দিতে ভরসা পেল না। নিজেই দরবেশের সাজপোশাক পরে চর্মকার মুস্তফা-র কাছে হাজির হ'ল। সে সর্দারকে আলিবাবার দরওয়াজায় পৌছে দিয়ে মোটা বকশিস জেবে পুরে বিদায় নিল। ডাকু-সর্দার এবার এক টুকরো লাল খড়িমাটি দিয়ে আলিবাবা-র মকানের দরওয়াজায় বিশেষ একটি চিহ্ন এঁকে দিয়ে গুহায় ফিরে গেল।

এদিকে মর্জিনা তক্কে তক্কে ছিল। ডাকু-সর্দার বিদায় নিতেই সে লাল খড়িমাটি দিয়ে পথের দু'ধারের মকানগুলির দরওয়াজায় একই

কিসিমের চিহ্ন এঁকে দিল।

সর্দার ইতিপূর্বে দু' দু'বার ধোঁকা খেয়েছে। তাই কেবলমাত্র খড়িমাটির চিহ্ন একেই নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। আলিবাবা-র মকানটির গঠন-বৈচিত্র্য, গাছপালা, ডান-বাঁয়ে মকানের গড়ন বিলকুল লক্ষ্য ক'রে গিয়েছিল। এবার আর বিভ্রান্তির সম্ভাবনা একদম নেই বল্‌লেই চলে।

গুহায় ফিরে গিয়ে ডাকু-সর্দার তার সাকরেদদের তলব করল। সবাই এককাট্টা হ'লে সে গর্বের সঙ্গে বল্‌ল—'এবার আর সব মকানে চিহ্ন এঁকে আমাকে নাজেহাল করতে পারবে না। একদম পাক্কা কাজ ক'রে এসেছি। যাক, তোমরা জলদি হাট থেকে বড় সড় আটত্রিশটি মাটির জালা খরিদ ক'রে নিয়ে এসো। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটিতে জলপাইয়ের তেল বোঝাই করে আনতে হবে। আর বাকী সব জালা থাকবে একদম খালি।

সাকরেদরা সর্দারের হুকুম তামিল করল।

সর্দার এবার বল্‌ল—'তোমরা সবাই সাজ পোশাক খুলে বিলকুল উলঙ্গ হয়ে যাও। তারপর মাথায় পাগড়ী বেঁধে নেবে। আর পিঠে ঝুলিয়ে নেবে নাগরা জুতো। তারপর প্রত্যেকের ঘোড়ার দু'দিকে দুটো ক'রে জালা রাশি দিয়ে বেঁধে নেবে। যাও, জলদি হুকুম তামিল কর। সবাই উলঙ্গ হয়ে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে ও পিঠে এক জোড়া ক'রে নাগরা জুতো ঝুলিয়ে সর্দারের সামনে হাজির হ'ল। এবার রশি দিয়ে ঘোড়ার পেটের দু'পাশে দুটো ক'রে জালা ঝুলিয়ে দিল। প্রত্যেক জালায় এক একজন ঢুকে জড়ো সড়ো হয়ে বসে পড়ল। জালাগুলোর মুখে নারকেলের ছোবড়া গুঁজে দিল। তার পর তালপাতা দিয়ে জালাগুলোর মুখ ঢেকে দেয়া হ'ল। এতে জালার ভেতরে অবস্থানরত আদমির শ্বাসক্রিয়া চালাতে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা রইল না। এভাবে ছত্রিশ জন ছত্রিশটি জালার মধ্যে ঘাপটি মেরে রইল। ডাকু সর্দার এবার প্রত্যেকটি জালার গায়ে রঙ-বে-রঙের খড়িমাটি দিয়ে বিচিত্র সব চিত্র এঁকে দিল। আর প্রত্যেকটি জালার সঙ্গে বেঁধে দিল একটি ক'রে মসৃণ কাটারি।

একজনকে আগেই তেলের জালাটি যেদিকে ঝুলানো রয়েছে তার বিপরীত পাশের জালায় বসিয়ে দিল। এতে তেল বোঝাই জালাটির ভারসাম্য বজায় রাখার বন্দোবস্ত হ'ল।

ব্যস, কাজ চুকিয়ে নেয়া হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো এবার জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে নগরের দিকে চলতে লাগল।

সন্ধ্যার আঁধার নামতে না নামতেই ঘোড়াগুলোকে নিয়ে ডাকু-সর্দার আলিবাবা-র মকানের দরওয়াজায় হাজির হ'ল। আলিবাবা তখন সদর-দরওয়াজার ধারে একটি চৌপায়ায় বসে ঝিমোচ্ছে। একটু আরামের বন্দোবস্ত বলা যেতে পারে।

ডাকু—সর্দার আলিবাবা-র সামনে দাঁড়িয়ে সালাম ঠুকে বল্‌ল—'হুজুর, আমি তেলের কারবারী, সওদাগর। এ নগরে একদম আনকোরা। প্রথম পদার্পণ করেছি। মেহেরবানি ক'রে আজকের রাত্রিটুকু আপনার মকানের উঠোনে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিলে উপকার হয়।'

পরোপকারী ও পরদুঃখকাতর আলিবাবা বিনম্র বিনয়ে নিবেদন করল—'আপনি ভিনদেশী সওদাগর, আমার মকানে মেহমান হয়ে রাত্রিটুকু গুজরান করতে চান। এতো আমার পক্ষে নসীবের ব্যাপার। আপনি আমার গরীবখানায় থাকলে বরং খুশীই হ'ব।'

আলিবাবা ডাকু-সর্দারকে অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে গেল।

ব্যাপারটি মর্জিনা-র কানে গেলে সে গুটি গুটি সেখানে হাজির হ'ল।

আলিবাবা-র নির্দেশে মর্জিনা কয়েকজন নফর-নফরানীকে নিয়ে মাটির জালাগুলোকে নামিয়ে উঠোনের এক পাশে সাজিয়ে রাখল। ঘোড়াগুলোকে খানা খেতে দিল।

একটি আলাদা কামরায় ডাকু-সর্দারের থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেয়া হ'ল।

আলিবাবা তার মেহমান ডাকু-সর্দারকে নিয়ে রাত্রের খানাপিনা সারল। নিজের কামরায় শুতে যাওয়ার আগে তার পায়খানাটি দেখিয়ে বল্‌ল—'রাত্রে যদি দরকার হয় তবে ওটি ব্যবহার করবেন। কোন করম ইতস্তত করবেন না। মোদ্দা বাৎ নিজের মকান জ্ঞান ক'রে থাকবেন।'

আলিবাবা তার মেহমান ডাকু-সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কামরায় শুতে চলে গেল।

একটু বাদে ডাকুসর্দার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল ধারে-কাছে কেউ নেই। সব কামরার বাতি নিভে গেছে। এবার সে গুটি গুটি জালাগুলোর কাছে গিয়ে বল্‌ল—'আমার সাকরেদরা শোন, আমি যখন যে কোন একটি জালার গায়ে পাথর ছুঁড়ে ঠক্ ক'রে আওয়াজ করব তখন তোমরা শীঘ্র নিঃশব্দে জালা থেকে বেরিয়ে আসবে। ব্যস, কাজ শুরু ক'রে দেবে। মকানের সব আদমিকে এক এক ক'রে ধরবে আর কচুকটা করবে। হুঁশিয়ার, একটি বালবাচ্চাও যেন জিন্দা না থাকে। মোদ্দা বাৎ, এর বংশ একদম খতম করতে হবে।'

ডাকু-সর্দার সাকরেদদের কাছ থেকে নিজের কামরায় ফিরে এল। মর্জিনা রসুইখানায় কাম কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এবার সে একটি চিরাগবাতি নিয়ে ডাকুসর্দারের কামরায় ঢুকল। সেটির চাবি ঘুরিয়ে বাতি কমিয়ে দিল। এবার দরওয়াজা ভেজিয়ে নিজের কাজে গেল।

মর্জিনা ফিন রসুইখানায় ঢুকল। থালা বাসন গোছগাছ আরও বহু

কিসিমের খুট্‌খাট কাম সেরে তবে সে শুতে যাবে। কাজের ফাঁকে দু'কদম এগিয়ে লক্ষ্য করল মেহমানটির নাকডাকার আওয়াজ আসছে।

মর্জিনা লক্ষ্য করল তার চিরাগবাতির তেল ফুরিয়ে এসেছে। আদতে মেহমানটিই তার কাম কাজ বিলুকল বরবাদ করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় সে এসে পড়ায় দোকানে তেল আনতে যেতে পারেনি। সে মুখ ব্যাজার করে আলিবাবা-র দরওয়াজায় এসে বল্‌ল—'মালিক, তেল একদম খতম! ঢের কাজ এখন পড়ে রয়েছে।'

আলিবাবা বল্‌ল—'এই নিয়ে এত ভাববার কি আছে, বুঝছি না তো! কাম কাজ যা বাকী আছে ভোরে সেরে নিলেই হবে যা, এখন নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়।'

মর্জিনা মালিকের কামরা থেকে বেরিয়ে রোয়াকে এল। পাশের কামরা থেকে মেহমানের নাকডাকার আওয়াজ সমানে চলেছে। সে সন্তর্পণে পা ফেলে জালাগুলোর কাছে এল। ভাবল একটু তেল তুলে নিয়ে রাত্রের মত চিরাগবাতি জ্বালানোর কাজ চালিয়ে নেবে।

মর্জিনা জালাগুলোর কাছে গিয়ে তাদের একটির তালপাতার ঢাকনা ও নারকেলের ছোবড়া সরিয়ে তেল তোলার জন্য হাতের পাত্রটি ভেতরে ঢোকাতেই পাত্রটির গায়ে কি যেন শক্ত বস্তুর ঠোকাঠুকি লাগল। আলতো ক'রে হাত চালিয়ে বুঝল, পাগড়ি—আদমির মাথা, সে চমকে উঠে পাশের জালার মুখের তালপাতা ও নারকেলের ছোবড়া সরিয়ে দেখে এতেও এক শয়তান গুটিশুঁটি মেরে বসে। এবার তার টনক নড়ল। ব্যস্ত হাতে এক করে সব ক'টি জালা পরীক্ষা ক'রে দেখল, প্রত্যেকটিতে মাথায় পাগড়ী বেঁধে একজন ক'রে বসে। সে স্বগতোক্তি করল—'ইয়া আল্লা, এ যে ভয়ঙ্কর এক চক্রান্ত! মকানের সবাইকে খতম করার চক্রান্ত। আরও একটি জালা পরীক্ষা করতে তখনই বাকী। সে তাতে হাত ঢুকিয়েই বুঝল, কেবল মাত্র একটি জালাতেই তেল রাখা আছে। আর বাকী গুলোতে নারকেলের ছোবড়া আর তাল পাতা মুখে চাপা এক একটি ক'রে আদমিকে বসিয়ে দেয়া আছে।

মর্জিনা-র মাথায় ঝট ক'রে একটি মতলব খেলে গেল, সে চিরাগ বাতি জ্বালার মত সামান্য তেল নিয়ে ব্যস্ত-পায়ে রসুইখানায় এল। চুল্লিতে কয়েক টুকরো শুকনো লকড়ি গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বালানোর বন্দোবস্ত করল। কাপড় সিদ্ধ করার ইয়া পেল্লাই কড়াইটি দিল চুলায় চাপিয়ে। তারপর জালা থেকে গামলা ভরে ভরে তেল এনে কড়াইয়ে ঢাল্‌ল। তেলে কড়াই প্রায় ভরে উঠল। এবার চুলায় দিল লকড়ি ঠেলে। দমকা আগুন পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কড়াইয়ের তেল ফুটতে শুরু করল।

মর্জিনা এবার চিরাগবাতি নিয়ে আস্তাবলে ঢুকল এবং বড়সড় একটি বালতি আর মগ নিয়ে রসুইখানায় ফিরে এল।

গরম তেল বালতি বোঝাই ক'রে নিয়ে মর্জিনা গুটিগুটি উঠোনে নেমে জালাগুলোর কাছে এল। মগ ভরে গরম তেল তুলে নিয়ে খপ ক'রে দিল প্রথম জালাটির ভেতরে ছেড়ে। ব্যস, ভেতরের শয়তান বেতমিস ডাকুটি বিকট এক আর্তনাদ ক'রে দাপাদাপি জুড়ে দিল। ব্যস, এলিয়ে পড়ল। একটি শয়তান খতম হয়ে গেল।

মর্জিনা এবার বালতি নিয়ে দ্বিতীয় জালার কাছে এসে অতর্কিতে আর এক মগ গরম তেল দিল জালার মধ্যে ছেড়ে। এবারও কোরবানির খাসির মাফিক বার-কয়েক দাপাদাপি ক'রে জালার

ভেতরের ডাকুটি এলিয়ে পড়ল।

মর্জিনা এভাবে গরম তেল ঢেলে একেলাই এক এক ক'রে সাঁইত্রিশটি ডাকুকে খতম ক'রে দিল।

মর্জিনা এবার খালি বালতি ও মগটি নিয়ে তেমনি সন্তর্পণে ফিরে এল রসুইখানায়। চিরাগবাতিটিকে কমিয়ে দিল। নিভন্ত চিরাগটিকে কামরার এক কোণে রেখে, দরওয়াজা ভেজিয়ে দিল। সামান্য ফাঁক রাখল, যাতে ডাকু-সর্দারটির কামরার দরওয়াজা দেখা যায়।

একটু বাদে ডাকু-সর্দারের নাক ডাকার আওয়াজ থেমে গেল। মর্জিনা দরওয়াজার পাল্লার ফাঁকে চোখ রেখে তার কারবার দেখতে লাগল। হারামী দামড়া শয়তানটি চৌপায় থেকে নেমে এল।

ভেজানো দরওয়াজা খুল্‌ল, একদম পা টিপে টিপে বাইরে, রোয়াকে এসে খাড়া হ'ল। কোর্তার জেব বোঝাই পাথরের টুকরো রাখা ছিল। জেবে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটি পাথরের টুকরো বের ক'রে আনল। টপাটপ ছুঁড়ে মারল জালা লক্ষ্য করে। পাথরের টুকরো জালার গায়ে আঘাত হানল। খট্‌ ক'রে আওয়াজ হ'ল। সে স্বগতোক্তি ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! কই, সাকরেদেরা যে কেউ-ই জালা থেকে বেরনো তো দূরের ব্যাপার সামান্য গলা পর্যন্ত তুলছে না। সে তাজ্জব বনে গেল। ফিন আর একটি পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারল। এবারও পাথর ছুটে গিয়ে জালার গায়ে আঘাত হানল। আওয়াজ ঠিকই হল কিন্তু বাঞ্ছিত ব্যক্তিদের কেউ-ই জালা থেকে বেরিয়ে এল না।

উপায়ান্তর না দেখে অস্থিরচিত্ত ডাকু-সর্দার দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নেমে এল। ব্যস্ত পায়ে জালাগুলোর দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাক সিঁটকোতে লাগল। পোড়া-চামড়ার উগ্র গন্ধ নাকে এসে লাগছে।

মর্জিনা রসুইখানার দরওয়াজার আড়ালে থেকে তার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল।

ডাকু-সর্দার অবাঞ্ছিত গন্ধটাকে একটু সামাল দিয়ে এক কদম-দু' কদম ক'রে এগিয়ে গিয়ে জালাগুলোর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। একটি জালার ভেতরে উঁকি দিল। ঘুটঘুটে আন্ধার। কিছুই মালুম হ'লনা। অনন্যোপায় হয়ে অস্থিরচিত্ত ডাকু-সর্দার এবার জালার ভেতরে হাত ঢুকিয়েই চমকে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! জালার ভেতরের সাকরেদটির যে ইন্তেকাল হয়ে গেছে!'

জালা থেকে হাত উঠিয়ে বুঝতে পারল, হাতে চটচটে পোড়া জলপাইয়ের তেল লেগে। গরম তেল ঢেলে তার সব ক'টি সাকরেদের ইন্তেকাল ঘটানো হয়েছে। সে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল।

রসুইখানার দরওয়াজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মর্জিনা একেলাই হেসে গড়াগড়ি যাবার জোগাড় হ'ল।

ডাকু-সর্দার বেগতিক দেখে সদর-দরওয়াজা খুলে দৌড়ে ভেগে গেল। ছুটতে ছুটতে আল্লাতাল্লা'কে হাজারো সালাম জানাতে লাগল। আল্লাতাল্লার মেহেরবানি ছাড়া সে সাক্ষাৎ মৌউতের হাত থেকে জান নিয়ে কিছুতেই ভাগতে পারত না।

এদিকে মর্জিনা দেখল, বিপদ পুরোপুরি না কাটলেও সাময়িক ভাবে হলেও চুকে গেছে। ফলে সে আর মাঝ-রাতে আলিবাবাকে ডাকাডাকি ক'রে তার নিদের ব্যাঘাত ঘটাল না।

ভোরে আলিবাবা দরওয়াজা খুলে বাইরে বেরোলেই মর্জিনা হাসিমুখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তাকে হাসতে দেখে আলিবাবা বল্‌ল—'কি রে মর্জিনা, অকারণে হাসছিস যে বড় তোর কি দিমাক টিমাক খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

মর্জিনা মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বলুল—'মালিক, অকারণে মোটেই নয়। হাসির কারণ ঘটেছে বলেই তো হাসি দমিয়ে রাখতে পারছি না। ভেতর থেকে ঠেলে হাসি বেরিয়ে আসছে, আসুন আমার সঙ্গে, এক তামাশা দেখাচ্ছি।'

মর্জিনা এবার আলিবাবাকে নিয়ে উঠোনের জালাগুলোর দিকে এগোতে লাগল, কয়েক কদম এগিয়েই আলিবাবা নাকে আঙুল দিয়ে হরদম ওয়াক ওয়াক্‌ করতে লেগে গেল।

মর্জিনা হেসে বল্‌ল—'মালিক, এবার মালুম হ'ল তো, কাকে মেহমান ক'রে মকানে ঠাঁই দিয়েছিলেন?'

আলিবাবা-র কাছে মর্জিনা-র কদর এবার থেকে হাজার গুণ বেড়ে গেল। তারই কায়দা কসরতের জন্যই তো তার ও তার পরিবারের সবার নিশ্চিন্ত ইন্তেকালের হাত থেকে জান রক্ষা পেয়েছে।

আলিবাবা এবার আবদাল্লা ও অন্যান্য নফর নফরানীদের সাহায্যে ডাকুদের লাশগুলির গোর দেয়ার বন্দোবস্ত করল।

প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় পাখিদের কিচির মিচির লক্ষ্য ক'রে বেগম শাহরাজাদ বুঝলেন ভোর হয়ে এল ব'লে। তিনি কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আট শ' ষাটতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আলিবাবা তার নফর আবদাল্লা ও অন্যান্য নফর-নফরানীদের সক্রিয় সহযোগিতায় সাঁইত্রিশটি ডাকুর লাশ একই গাড্ডায় গোর দিয়ে ল্যাটা চুকিয়ে ফেল্‌ল।

কাসিম-এর ইন্তেকাল ঘটায় তা কারবারের হাল ধরল আলিবাবা-র বড়া লেড়কা। সে ফি রোজ দোকানে গিয়ে বেচাকেনা ক'রে। এক ভোরে দোকানে যাবার মুখে সে আলিবাবা'কে বল্‌ল—'আব্বাজান, বাজারের এক নয়া কারবারী আমাকে বহুৎ পেয়ার করেন। তিনি নিজে হাতে আমাকে কারবারের ফন্দি ফিকির শিখিয়ে তৈয়ার ক'রে তুলছেন। তাঁর সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা না থাকলে এতদিনে কারবারে লাল-বাতি জ্বলে যেত। তিনি প্রায়ই দুপুরে খানাপিনা করার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যান। হরেক কিসিমের বড়িয়া সব খানা খেতে দেন। না বল্‌লেও শোনেন না। শরম লাগে। আমি ভাবছি আব্বাজান তাকে একদিন মেহমান ক'রে আমাদের মকানে নিয়ে আসব।'

—'এতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে বেটা? আগেই তোমার ব্যাপারটি নিয়ে ভাবা উচিত ছিল। উদার মহৎ আদমিরা মকানে পা রাখলে মালিকের ভালই হয়। আর এতে পুণ্যি সঞ্চয় হয়ে থাকে। তুমি কালই হুসেন মিঞাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে।

আমি বড়িয়া খানা আর সরাবের বন্দোবস্ত করছি।'

আলিবাবা-র লেড়কা পরদিন হুসেন'কে নিমন্ত্রণ ক'রে মকানে নিয়ে এল। মাঝবয়সী এক তাগদদার আদমি। মুখে চাপদাড়ি। দু'দিকে গাল পর্যন্ত নেমে এসেছে ইয়া মোটা ঝুলফি। মুখে মিঠা মিঠা বুলি, আলিবাবা তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে খুশী হ'ল।

হুসেন খানাপিনা করতে নারাজ হ'ল। সে নাকি ওসব ব্যাপারে বহুৎ বাছাবাছি ক'রে থাকে। তবে বার বার বল্ল—আলিবাবা-র সঙ্গে জানপহছান হওয়াতে সে বহুৎ খুশী হয়েছে।

আলিবাবা চোখ দু'টো কপালে তুলে বল্ল—'সে কী! আপনি কিছুই খানাপিনা করবেন না, সে কী ক'রে হয়। আপনি মেহমান, শুধু-মুখে আমার মকান থেকে বিদায় নেবেন তা-তো হয়না। বাছাবাছি থাকে তো সাফ সাফ বলুন, আপনার খুশী মাফিক খানার বন্দোবস্ত করছি।'

—'দেখুন সবার আগে গোস্ত বা গোস্তের তৈয়ারী কোন খানা লবণ দিয়ে খাওয়া আমার বারণ আছে।'

—'তাতে কি আছে, বারণ থাকলে আপনার খানায় লবণ দেয়া হবে না। সাধারণ ব্যাপার। লবণ ছাড়াই আপনার জন্য খানা পাকিয়ে দেয়া হবে।'

আলিবাবা মর্জিনা'কে দিয়ে লবণ ছাড়াই খানা পাক করাল।

আলিবাবা মেহমান হুসেন এবং নিজের লেড়কাকে নিয়ে খানার টেবিলে বসল। মর্জিনা খানা পরিবেশন করতে লাগল। পরিবেশন করতে করতে মর্জিনা লক্ষ্য করল মেহমানটি তার ঢলঢলে যৌবনের জোয়ার লাগা দেহটির দিকে লোভাতুর নজরে তাকাচ্ছে।

খানপিনা সেরে আলিবাবা মেহমানকে নিয়ে এক সুসজ্জিত কামরায় বসাল। তার লেড়কাও পাশে বসল। এমন সময় ঘাগরা ও ওড়না প্রভৃতি ঝলমলে নাচের সাজ পোশাক পরে মর্জিনা তাদের সামনে হাজির হ'ল। তার কোমরে ঝোলানো একটি চাকু। পিছন পিছন ঝলমলে পোশাক পরিহিত আবদাল্লাও কামরায় এল।

মর্জিনা কামরায় এসে আলিবাবাকে কুর্নিশ করল। পর মুহূর্তেই শুরু করল নাচা-গানা।

আবদাল্লা নাচার তালে তালে বাজনা বাজাতে লাগল। মেহমান হুসেন মর্জিনা-র সুরৎ দেখে এমনিতেই পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। তার ওপর এমন সুললিত কণ্ঠের গানা তার ভেতরে তুফান জাগিয়ে তুল্ল।

হুসেন ভাবল—'লেড়কিটির অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের জোয়ার লেগেছে। কলিজায় জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। সে যেন নিজে নাচছে না, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নাচাচ্ছে। তার উন্নত বক্ষ আর নিতম্বদ্বয়ের দিকে নজর গেলেই কলিজা অচানক সচল হয়ে ওঠে। ইয়া আল্লাহ, কোন লেড়কির মধ্যে দিল্ উতলা করা এমন সুরতের বিচিত্র সমাবেশ থাকতে পারে এতকাল তার যেন অজানা ছিল।

মর্জিনাও যেন একই রকম উতলা হয়ে একের পর এক জিপসী, পারসী, গ্রীক ও ইহুদীদের নাচ নেচে চলেছে।

দর্শক তিনজন নাচা-গানায় একদম মাতোয়ারা হয়ে উঠল। তারা মেঝেতে গানার তালে তালে হরদম পা ঠুকে চলেছে। মেহমান হুসেন-এর অন্য কোনদিকে তিলমাত্রও হুঁশ নেই। তার চোখের মণি দুটো দিয়ে নৃত্যরতা মর্জিনা-র অঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলোতে চক্কর মেরে বেড়াতে লাগল। দর্শক তিনজনের কারো যখন অন্য কারো দিকে খেয়াল নেই, ঠিক তখনই মর্জিনা ঝট ক'রে কোমর থেকে চাকুটি টান দিয়ে হাতে নিয়ে নিল।

মর্জিনা এবার চাকুটিকে মুঠো ক'রে ধ'রে নাচতে লেগে গেল। সে মাঝে মাঝে গানার তালে তালে এমন ক'রে চাকুটিকে বাগিয়ে ধরতে লাগল যেন এই বুঝি কারো বুকে সেটি আমূল গেঁথে দেবে।

ব্যাপারটি দেখে আলিবাবা-র কলিজা শুকিয়ে যেতে লাগল। সে ভাবল, ইয়া আল্লাহ! মর্জিনা একী ভয়ঙ্কর নাচা-গানা শুরু করল! তার যা ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে, কারো বুকে না গেঁথে দেয়।

মর্জিনা এবার আবদাল্লা-র দিকে নজর ফিরিয়ে ইশারা করল। আবদাল্লা রেকাবিতে সরাবের পেয়ালা সাজিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হ'ল।

আলিবাবা ভাবনা চিন্তার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছল, মর্জিনা কিছু বকশিস না পেয়ে এ-প্রলয়ঙ্কর নাচা-গানা থামাবে না। তাই সে কোর্তার জেব থেকে একটি মোহর বের ক'রে মর্জিনা-র দিকে বকশিসস্বরূপ ছুঁড়ে দিল। মর্জিনা সেটি কুড়িয়ে নিয়ে নতজানু হয়ে তাকে কুর্নিশ করল। আব্বার দেখাদেখি তার লেড়কাও একটি মোহর মর্জিনা'কে বকশিস দিল।

মেহমান হুসেন ভাবল, তারা উভয়েই যখন নাচনেওয়ালিকে একটি ক'রে মোহর বকশিস দিয়েছে তখন সে কিছু না দিলে বেমানান দেখায়। তাই সে কোমর থেকে থলে খুলে বকশিস দেয়ার কোশিস করল। ইতিমধ্যে মর্জিনা নাচার তালে তালে হুসেন-এর একদম সামনাসামনি এসে পড়েছে। এবার মওকা বুঝে এক লহমার মধ্যে হাতের চাকুটি মেহমান হুসেন-এর বুকে গেঁথে দিল। কলিজা একদম ফাঁসিয়ে দিল। হুসেন বিকট আর্তনাদ ক'রে লুটিয়ে পড়ল। ফিনকি দিয়ে খুন বেরিয়ে এল। খুনে জবজবে হয়ে গেল তার কোর্তা-পাৎলুন।

হুসেন কোরবানির খাসির মাফিক বারকয়েক হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি দাপাদাপি ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ব্যস, খতম।

আলিবাবা গর্জে ওঠে—'মর্জিনা। একী ব্যবহার করলি, মর্জিনা! আমার মেহমানকে খুন করলি। আমার যে দোজখেও জায়গা হবে না। তোর কি দিমাক টিমাক খারাপ হয়ে গেছে?'

মর্জিনা হাসতে হাসতে বল্‌ল—'দিমাক খারাপ হয় নি দিমাক খারাপ হয় নি বলেই তো নির্বিঘ্নে কাজটি সারতে পেরেছি।'

—'হুসেন সাহাব আমার মেহমান, তাকে খুন ক'রে—?'

—'মেহমান? হ্যাঁ, মেহমানই বটে। মালিক আপনি যাকে মেহমান ভেবে সম্মান খাতির করছেন আদতে সে ডাকু-সর্দার। শয়তান বেতমিসটি আর এক দফে মেহমান হয়ে এসেছিল, ইয়াদ আছে তো?'

—'সে কী! কী তাজ্জব বাৎ—লেকিন তার মুখে তো গোঁফ-দাড়ি ছিল না। তার মুখ একদম সাফা—'

—'সাফা? হ্যাঁ, একদম সাচ্চা বটে এর মুখেও একদম গোঁফ-দাড়ি নেই। এই দেখুন, একদম সাফা।' সে ঝট ক'রে একটান দিয়ে এলিয়ে পড়ে থাকা ডাকু-সর্দারের মুখ থেকে নকল গোঁফ-দাড়ি খুলে ফেল্‌ল।' এবার সে বল্‌ল—'দেখুন তো মালিক, এ-ই আপনার সে তেলের কারবারী কিনা?'

আলিবাবা বল্‌ল—'মর্জিনা বেটি আমার, তোর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তুই পর পর দু'বার আমার পরিবারের জান রক্ষা করেছিস। বাজার থেকে খরিদ করা বাঁদীর কাছ থেকে এরকম অকৃত্রিম সেবা কল্পনাও করা যায় না। তুই নিজের জানের মায়া ছেড়ে আমাকে ও আমার গোটা পরিবারকে যে রক্ষা করেছিস তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি তোকে আজ এ-মুহূর্ত থেকে মুক্তি দিলাম। আজ থেকে তুই আর বাঁদী না, আমার পরিবারেরই একজন।

মর্জিনা মালিকের মুখের দিকে ভাববিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল।

আলিবাবা এবার দু'কদম এগিয়ে গিয়ে মর্জিনা-র গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বল্‌ল—'মর্জিনা, সাচ্চা বলছি, আজ থেকে তুই আমার পরিবারের একজন হয়ে যা। আমার বেটাকে নিকা ক'রে সুখে দিন যাপন কর। রাজী?'

মর্জিনা মাথা নীচু ক'রে, নীরবে ডান-পায়ের বুড়ো আঙুলটি মেঝেতে ঘষতে লাগল। তার মুখ জুড়ে আকস্মিক শরমের রক্তিম আভা।

সে রাত্রেই কাজীকে তলব করা হ'ল।

বুড্ডা কাজী ছুটে এল। আলিবাবার লেড়কা আর মর্জিনা-র শাদীর কবুলনামা বানানো হ'ল। সাক্ষীরা কবুলনামায় দস্তখৎ করল। ব্যস তাদের শাদী চুকে গেল।

আলিবাবা দু'একবার পাহাড়ে সে-গুহায় যেতে চেয়েছিল। লেকিন মর্জিনা প্রতিবারেই রুখে দাঁড়িয়েছে। তাকে যেতে দেয় নি। সে যুক্তি দেখিয়েছে, ডাকুরা ছিল সংখ্যায় চল্লিশজন। আটত্রিশজনকে তো খতম করা হয়েছে। বাকী দু'জন? তারা তো গুহাতেই রয়ে যেতে পারে। আদতে তাদের তো আর জানা নেই, সর্দার নিজে হাতেই দু'জনকে খতম করেছিল।

এক মাহিনা দু'মাহিনা ক'রে পুরো একটি সাল গুজরান হয়ে গেল। আলিবাবা লেড়কাকে সঙ্গে নিয়ে, গাধার পিঠে চেপে জঙ্গলে যায় লকড়ি আনতে। মর্জিনা মকানে থেকে সংসারের কাম কাজ সামলায়।

এক সন্ধ্যায় আলিবাবা মর্জিনা'কে ব'লে—'বেটি, ঢের দিন তো পার হয়ে গেছে, আমার দিল্ বলছে, ডাকুদের কেউ-ই আর জিন্দা নেই।'

মর্জিনা চুপ ক'রে শোনে।

আলিবাবা ব'লে চলে—'বেটি ডাকুদের যদি কেউ জিন্দাই থাকত তবে জরুর আমাদের ছেড়ে দিত না। তুমি আর ঝুটমুট আপত্তি কোরো না। আমি একবার গুহায় গিয়ে ধন-দৌলৎ যা কিছু আছে নিয়ে আসি। তুমি কিছু ভেবো না। দেখো, আমি ঠিক নির্বিঘ্নে ফিরে আসব।'

মর্জিনা বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, লেকিন আপনাকে আমি একেলা ছাড়ব না। যদি যেতেই হয় তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ওয়াদা করুন আমাকে নিয়ে যাবেন?'

—'বহুৎ আচ্ছা, তবে তা-ই চল।'

পরদিন কাকডাকা ভোরে আলিবাবা তার বেটা আর মর্জিনা'কে নিয়ে গাধার পিঠে চেপে গুহাটির মুখে হাজির হ'ল।

এক অজানা ভীতিতে আলিবাবা-র কলিজার ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় সে অচানক ব'লে উঠল—'চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক!' ব্যস, আপসে গুহামুখের পাথরটি সুর সুর ক'রে সরে গিয়ে রাস্তা ক'রে দিল।

আলিবাবা তাদের নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে ঢুকে আলিবাবা কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল। গুহার ভেতরে যে-দৃশ্য দেখে গিয়েছিল হুবহু তা-ই রয়েছে। ইতিমধ্যে কোন বস্তা সরেনি, বাড়েও নি একটি বস্তা। অতএব ভয় ডরের কোন ব্যাপারই নেই।

আলিবাবা এবার মর্জিনা-র সহায়তায় মোহর আর হীরা-জহরৎ পরীক্ষা ক'রে দামী দামী গুলো তিনটি বোড়ায় বোঝাই ক'রে নিল। রশি দিয়ে আচ্ছা ক'রে বোড়া তিনটির মুখ বেঁধে ধরাধরি ক'রে সেগুলো নিয়ে এল গুহার মুখে। বস্তা তিনটি গাধার পিঠে চাপিয়ে তারা যখন মকানে পৌঁছল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে শুরু করেছে।

আলিবাবা যে ধন দৌলত নিয়ে এসেছে তা দিয়েই তারা তামাম মুলুকের সেরা ধনী বনে গেল। আর কোনদিন সে গুহায় তাদের যাওয়ার দরকার পড়ে নি, যায়ও নি।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি খতম ক'রে চুপ করলেন।

বাদশাহ শারিয়ার বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, তোমার মুখের কিস্‌সা শুনলে দিল্ উতলা হয়ে যায়। যত শুনি, দিল্ চায় আরও একটি শুনি।' জানালা দিয়ে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বল্‌ল—'বেগম সাহাব, ভোর হতে এখনও ঢের বাকী। আর একটি বড়িয়া কিস্‌সা শুরু কর।'

অন্ধা ভিখমাঙ্গার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ একটি নয়া কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এক দিন খলিফা হারুণ-অল-রসিদ উজির জাফর ও তাঁর দেহরক্ষী মাসরুর'কে নিয়ে ছদ্মবেশে তাঁর সুলতানিয়তের হালচাল পর্যবেক্ষণ করতে বেরোলেন।

খলিফা সঙ্গীদের নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি ছোট সেতুর ওপরে হাজির হলেন। দেখলেন, এক অন্ধা ভিখমাঙ্গা নানা বুলি আওড়ে ভিখ মাঙ্গছে। খলিফা জেব থেকে একটি মোহর বের ক'রে ভিখমাঙ্গাটির থালায় সশব্দে ছুঁড়ে দিলেন।

ভিখমাঙ্গাটি ঝট্ ক'রে খলিফার হাতটি চেপে ধরে বলল—'হুজুর, আপনি এই যে দান করলেন তার প্রতিদান আপনার জরুর মিলবে। খোদাতাল্লা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সামান আপনাকে দান করবেন। লেকিন মেহেরবানি ক'রে আপনাকে এক কাজ করতে হবে। ব্যাপারটি হচ্ছে, যে আমাকে কিছু দান করেন তার হাতের একটি কিল না মারা অবধি আমি তার কিছুই গ্রহণ করিনা।'

চোখ দুটো কপালে তুলে খলিফা সবিস্ময়ে বল্‌লেন—'এ কী আজব বাৎ শোনাচ্ছ হে! তুমি অন্ধা-আতুর, ভিখ মেঙ্গে দিন গুজরান করছ। আর আমি একজন সুস্থ-সবল আদমি হয়ে তোমাকে কিল-ঘুষি মারতে যাব কেন? সাধ্য অনুযায়ী দান-খয়রাৎ করব, বিনিময়ে মারধোর করার কি আছে, দিমাকে আসছেনা তো।'

—'মালিক, আমি ওয়াদা করেছি, ঘুষি না মারলে আমি কারো কাছ থেকে কিছুই নেব না। তবে এক কাজ করুন, আপনার মোহরটি আপনি ফিরিয়েই নিন।'

বুড্ডা ভিখমাঙ্গাটি যখন কিছুতেই ছাড়বে না তখন বাধ্য হয়ে খলিফা তার গালে মৃদু একটি ঘুষি মেরে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করলেন।

কয়েক কদম এগিয়ে খলিফা উজির জাফর'কে বল্‌লেন—'জাফর, আজব ব্যাপার তো! তুমি ভিখমাঙ্গাটিকে ব'লে এসো আগামী কাল সকালে দরবারে যেন হাজির হয়।'

খলিফা একটু বাদে ফিন সঙ্গীদের নিয়ে হাঁটা জুড়লেন। পথে যেতে যেতে খলিফা বল্‌লেন—'জাফর, ভিখমাঙ্গাটিকে এমন এক

পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিল যার জন্য সে এমন এক ওয়াদা করতে বাধ্য হয়েছিল।

খলিফা আরও কয়েক কদম এগিয়ে অন্য আর এক ভিখমাঙ্গার মুখোমুখি হলেন। আদমিটি ল্যাংড়া। তার ওপর ঠোঁটের কিছু অংশ কাটা। বাৎচিৎ প্রায় অবোধ্য। খলিফা তার থালাতেও একটি মোহর ছুঁড়ে দিলেন।

ভিখমাঙ্গাটি আড়চোখে মোহরটির দিকে তাকিয়ে অচানক ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ। এযে পুরো একটি সোনার দিনার। এক সময় যখন মক্তবের মৌলভী ছিলাম তখনও গোটা একটি দিনার চোখে দেখা নসীবে ঘটে নি, আর ভিখ মাঙ্গতে বসে—'

ভিখমাঙ্গাটির বক্তব্য খতম হওয়ার আগেই খলিফা ব'লে উঠলেন—'একী আজব ব্যাপার জাফর। মক্তবের মৌলভী আজ ভিখ মাঙ্গতে বসেছে কেন? মালুম হচ্ছে, এর জিন্দেগী সোজা সরল পথে গুজরান হয় নি, কিছু না কিছু গড়বড় জবুর আছে। একেও কাল সকালে দরবারে আমার সঙ্গে ভেট করতে ব'লে দাও।'

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ উজির জাফর ও দেহরক্ষী মাসরুর'কে নিয়ে ফিন হাঁটতে লাগলেন। এবার তিনি অন্য আর এক ভিখমাঙ্গার মুখোমুখি হলেন। দেখলেন, এক বুড্ডা বণিক ভিখমাঙ্গাটিকে মুঠো মুঠো মোহর দান করছে। ভিখমাঙ্গাটি নানাভাবে তাকে আশীর্বাদ ক'রে চলেছে। খলিফা এক লহমায় দেখে নিয়ে বুঝলেন, বুড্ডাটি প্রচুর মোহরই তাকে দিয়েছে। খলিফা নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে লাগলেন। তিনি একজন খলিফা, তামাম সুলতানিয়তের মালিক। সামান্য এক বণিক যেমন দিলদরিয়া হয়ে দান-খয়রাৎ ক'রে চলেছে তিনি খলিফা হয়েও তা পারেন না। খলিফা এবার জাফর'কে বল্‌লেন—'কাল সকালে বণিকটি যেন দরবারে আমার সঙ্গে ভেট করে।'

খলিফা ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা এগিয়ে চল্‌লেন। কিছুদূর যেতেই খলিফা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, ধারে-কাছে যত পথচারী রয়েছে সবাই পড়ি কি মরি ক'রে ছুটে পালাচ্ছে। সবার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। ঠিক তখনই দেখলেন—এক ঘোড়সওয়ার সিপাহী চিল্লাচ্ছে—'চীন সম্রাটের রাজকন্যার স্বামী হিন্দুস্থানের সম্রাট এ-পথে যাবেন। রাস্তা খালি কর, একদম খালি চাই।'

ঘোড়সওয়ারটি এগিয়ে যেতে না যেতেই এক খুবসুরৎ নওজোয়ান সম্রাটের সাজ পোশাক পরে প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে এগিয়ে আসছে। খলিফা এক নজরে আগন্তুককে দেখে নিয়ে বল্‌লেন—'জাফর, আমার সুলতানিয়তে এমন নামজাদা পরদেশী মেহমান এসেছেন তার সঙ্গে আলাপ করতেই হয়, কি বল? তুমি ঘোড়া হাকিয়ে তাঁর পিছন পিছন যাও। কোথায় রাত্রি বাস করেন, পাত্তা লাগাও। কাল দুপুরে আমার প্রাসাদে তাকে আমন্ত্রণ জানাবে আমি মাসরুর'কে নিয়ে প্রাসাদে ফিরছি।'

খলিফা এবার তাঁর একমাত্র সঙ্গী মাসরুর'কে নিয়ে সামান্য এগিয়ে দেখলেন, এক খুবসুরৎ নওজোয়ান একটি শাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে তাকে হরদম চাবুকের ঘা মেরে চলেছে। এমন বেধড়ক মার যে, চোখে দেখা যায় না। একটু বাদে ঘোড়াটির চামড়া ফেঁটে দরদর ক'রে খুন ঝরতে লাগল। তবু সে চাবুক ছাড়ল না।

নওজোয়ানটির আমানবিক আচরণে খলিফা যারপরনাই ক্ষুণ্ন হলেন। তিনি আশে পাশের কয়েকজনকে ডেকে নওজোয়ানটির ক্রোধের কারণ সম্বন্ধে পুছতাছ করলেন। তারা জবাব দিল—'কেন ক্রুদ্ধ হয়েছে খোদাতাল্লাই জানেন, আমরা কিছুই জানি না।'

পথচারীদের একজন বলল—'নওজোয়ানটি ফিরোজ এসময়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে এখানে আসে। চাবুক দিয়ে ঘোড়াটিকে বেধড়ক পিটতে পিটতে ছালবাকল তুলে খুন ঝরাতে থাকে। লেকিন এর কারণ কি কারোরই জানা নেই।
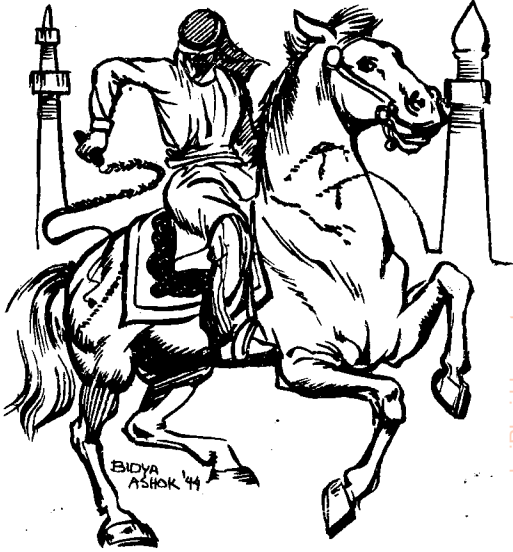
খলিফা জাফর'কে বল্লেন—'কাল এ সময়ে তুমি এখানে হাজির থাকবে। কালও যদি একই দৃশ্য দেখতে পাও তবে একে হাতকড়া পরিয়ে দরবারে নিয়ে যাবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

মাসরুর কুর্নিশ ক'রে বল্ল—'জো হুকুম জাঁহাপনা।'

খলিফা এবার বুকভরা দর্দ নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। সদ্য দেখা ঘটনাবলী খলিফার বুকে জগদ্দল পাথরের মাফিক চেপে রইল। রাতভর একই চিন্তা পরপর তার মাথায় টক্কর মারতে লাগল।

পরদিনও তার মধ্যে খুশীর চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হ'ল না। দুপুরের নামাজ সেরে তিনি দরবারে হাজির হলেন।

উজির জাফর খলিফার হুকুম তামিল করতে গিয়ে সে-পাঁচ আদমিকে দরবারে হাজির করল।

খলিফা সবার আগে সে-উদ্ধত নওজোয়ান ঘোড়সওয়ারটিকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—'কাল আমি চাক্ষুষ করেছি তুমি একটি অবলা জানোয়ারের পিঠে চেপে তার ওপর নির্মম নিষ্ঠুরভাবে চাবুক চালাচ্ছিলে। কেন? কেন তুমি তার ওপর এমন ক্রোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিলে? ঘোড়ার পিঠে জরুর চাপবে। তাতে কোন গুনাহ হয় না। লেকিন এমন বেধড়ক চাবুক চালানো আদমির কাজ জরুর নয়। কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। আর এক বাৎ, আশেপাশের আদমিরা তোমার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত। তোমার ব্যাপারে বার বার পুছতাছ করেও কারো মুখ থেকে কোন কথাই বের করতে পারলাম না। আদতে তোমার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে কেউই সাহসী হ'ল না। উপযুক্ত কারণ দেখাবার জন্যই তোমাকে দরবারে হাজির করা হয়েছে। তুমি উপযুক্ত যুক্তির মাধ্যমে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই তুমি এখান থেকে হাসি মুখে ফিরে যেতে পারবে। অন্যথায় কঠোর সাজা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, ইয়াদ রেখো নওজোয়ান।'

ঘোড়সওয়ার নওজোয়ানটি খলিফার মুখের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে রইল। এক সময় তার দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল।

নওজোয়ানটির চোখের পানি দেখে খলিফার কলিজা দুর্বল হয়ে গেল। তিনি স্নেহ ও মমত্বের স্বরে বল্লেন—'ঝুটমুট তুমি ভয় ডরে কাতর হয়ে পড়েছ। দিল্ থেকে মুছে ফেল যে, তুমি দরবারে খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করছ। তোমার কিস্সা শোনাও। ওয়াদা করছি, কোন সাজাই তোমাকে দেব না, তবে হ্যাঁ, খোলসা করে, কোন কিছু না ছুপায়ে সাচ্চা ঘটনা পেশ করতে হবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

চোখের পানি মুছতে মুছতে নওজোয়ানটি এবার তার কিস্সা শুরু করতে গিয়ে বলল—'জাঁহাপনা, সিদিনুমান আমার নাম। আপনার সামনে যে-কিস্সাটি পেশ করছি, তার মূল বক্তব্য হচ্ছে আমাদের পরিবারের ধর্মবিশ্বাস। আমার আব্বা বেহেস্তে গেলে আমিই তাঁর অগাধ ধন দৌলতের একমাত্র অধিকারী হলাম। সাচ্চা বলতে কি, আমাদের মহল্লায় আমিই সবচেয়ে ধনী বনে গেলাম।

আমাদের বংশ মর্যাদা ও পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতির জন্যই আমি চার দেয়ালে ঘেরা মকানের মধ্যে বচপন থেকেই নিঃসঙ্গ হয়ে দিন গুজরান করতে লাগলাম, উমর বাড়ল। নওজোয়ান হয়ে উঠলাম। লেকিন আমার দিন গুজরানের সে উপায়-পদ্ধতির আর পরিবর্তন ক'রে উঠতে পারলাম না। আব্বাজীর ইন্তেকাল হলে তো আর আগেকার সে শাসন আমার মাথার ওপরে ছিল না। তবু আমি কারো সঙ্গে দিল্ খোলসা ক'রে মিশতে পারতাম না। আদতে আমি এব্যাপারে নিজের দিলের কাছ থেকে কোন তাগিদই পেতাম না, আর যত আনন্দ-সুখ একেলা থাকাতেই। মালুম হচ্ছে, একমাত্র এজন্যই আমি শাদী ক'রে কাউকে নিজের কাছে নিয়ে আনতে পারি নি। আমার ওপরে কেউ খবরদারি করবে, হুকুম চালাবে, এ বরদাস্ত

করতে হবে ভাবতেই আমার কলিজা শুকিয়ে যেত। জাঁহাপনা বিবি আর ইয়ার-দোস্ত ছাড়া একদম একেলা জিন্দেগীকে ভোগ করার ভেতরে যে কী অভাবনীয় খুশী-আনন্দ জড়িয়ে রয়েছে তা আপনাকে বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এক সকালে অচানক আমার হাসি-আনন্দ-খুশীতে ভাঁটা পড়ে গেল। আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস এক লহমায় ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল। আমার মধ্যে নয়া এক চিন্তা দানা বাঁধল। ভাবলাম, শাদীনিকা ক'রে নয়া জিন্দেগীর দিকে নিজেকে এগোতে হবে, আর একেলা নয়। আমার সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা আর হাসি-আনন্দের ভাগীদার জোগাড় করতে হবে। দুনিয়ায় ভোগ করার কিছু রয়েছে, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখব?

শাদীর ব্যাপারে হাঙ্গামা দেখা দিল। কাকে শাদী করব? শাদী তো সমান সমান পরিবারের মধ্যে করা চাই। লেকিন তামাম আরব দুনিয়ায় আমাদের সমান বংশমর্যাদা সম্পন্ন পরিবার তো সাকুল্যে কয়েকটিই রয়েছে? কয়েকটা থাকলেও তাদের সঙ্গে যোগ সাজোস কি করেই বা করা যেতে পারে? আমাদের পরিবারে নীচুতলার কোন লেড়কিকে বিবির মর্যাদা দিয়ে নিয়ে আসা একদমই অসম্ভব। কভি নাহি হো সেকতা।

ভাবলাম আমিই তো আমার অভিভাবক। যিনি বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতেন তিনি তো আজ বেহেস্তের বাসিন্দা। কুছ পরোয়া নেহি। লড়ে যাব। ব্যস, একদম বাদী-বাজারে হাজির হলাম। ভাবলাম এক বাদী খরিদ ক'রে এনে যদি পছন্দ মাফিক হয় তবে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে কাজী ডেকে শাদী ক'রে বিবির মর্যাদা দেব। আমি বাদী-বাজারে ঢুঁড়তে লাগলাম। দালালরা আমার সামনে বাঁদীর সারি খাড়া ক'রে দিল। সবাই নওজোয়ান লেড়কি, খুব সুরৎ। যেন সবে বেহেস্ত থেকে হুরীরা নেমে এসে আমার সামনে হাজির হয়েছে। যার সামনে খাড়া হই সে-ই আমার দিলে নাড়া দেয়। এমন খুবসুরৎ লেড়কি যেন জিন্দেগীতে দেখি নি। স্বগতোক্তি ক'রে ওঠলাম—'ইয়া আল্লা! একী সমস্যায় জড়িয়ে পড়া গেল! এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে বাছাবাছি করেও আমি মনস্থ ক'রে উঠতে পারলাম না কাকে খরিদ ক'রে মকানে নিয়ে আসব। লেকিন মকান থেকে ওয়াদা ক'রে বেরিয়েছিলাম, কাউকে না নিয়ে ফিরব না। আর কিছু সময় বাদে যে-লেড়কিটির উমর সবচেয়ে কমতি তাকে কাছে তলব করলাম। দালালের কাছে দাম জানতে চাইলাম। আদতে তার সুরৎ তো জরুর অনন্য। তা বাদেও একদম নম্র স্বভাব। মধুঝরা কণ্ঠস্বর। সব মিলিয়ে লেড়কিটি আমার দিল্‌ কেড়ে নিল।

লেড়কিকে খরিদ ক'রে মকানে নিয়ে এলাম। লেকিন হাঙ্গামা দেখা দিল। আমরা কেউ, কারো ভাষা বুঝি না। সেজন্য আমার পক্ষে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয় না। জিজ্ঞাসা করলেও তার দিক থেকে কোন জবাব মেলে না। মুখের ভাষা হলই বা অবোধ্য। লেকিন বুকের ভাষা, একমাত্র মহব্বতের ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়।

আমরা পরস্পর পরস্পরকে মহব্বতের ডোরে বাঁধতে পারলে মুখের ভাষা কিছুতেই বাঁধার প্রাচীর গড়তে পারবে না।

আর এক হাঙ্গামা দেখা দিল। লক্ষ্য করলাম, লেড়কিটি আমার কাছে ঘেঁষতে একদম অনাগ্রহী। আমি বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির ক'রে তাকে কাছে আনার কোশিস চালাতে লাগলাম। লেকিন তার দিক থেকে তিলমাত্র উৎসাহও লক্ষিত হ'ল না। বচপন থেকেই কোন ব্যাপারে কারো ওপর জোর জুলুম করা আমার ধাতে সয় না। সেজন্য তার ওপর বেশী জবরদস্তি চালাতে দিল্‌ চাইল না।

আমি লেড়কিটিকে নিজের মর্জি মাফিক চলতে দিলাম, সে আমার কাছ থেকে দূরে দূরেই থেকে।

ক'দিন বাদে এক রাত্রে আমার নিদ টুটে গেল। বাদীটি আমার পাশের কামরায় থাকে। সে কেমন নিদ যাচ্ছে দেখার জন্য কৌতূহল হ'ল। গুটিগুটি এগিয়ে জানালার ধারে যেতেই একদম তাজ্জব বনে গেলাম। মাঝ-রাত্রি। তবু সে বিছানা আশ্রয় করে নি। কামরার মধ্যে হরদম চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে। নিজের কাজের জন্য নিজেকে অপরাধী করতে লাগলাম। ভাবলাম, তাকে খরিদ ক'রে মকানে নিয়ে আসা ঠিক হয় নি। খরিদ করার আগে তার মতামত নেয়া দরকার ছিল। একদম গড়বড় ক'রে ফেলেছি। সে যদি ভাবে তাকে এখানে ফাটকে আটক করা হয়েছে তবে এভাবে আটক রাখা কিছুতেই সঙ্গ সঙ্গত নয়।

আমি ঠায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নজর রাখতে লাগলাম, লেড়কিটি কতক্ষণ এভাবে জেগে কাটায়। একটু বাদে সে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। আমি ঝট ক'রে এক থাম্বার আড়ালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে রইলাম।

লেড়কিটি ক্রমে মকানের সদর-দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে সড়কে নামল। তাকে বুঝতে না দিয়ে, তার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে আমি সন্তর্পণে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

লেড়কিটি আমার মকানের অদূরবর্তী গোরস্থানে গিয়ে ঢুকল। তার ব্যাপার দেখে মালুম হ'ল, জায়গাটি যেন তার একদম চেনা। সে সামান্য এগিয়ে একটি কবরের ধারে থমকে খাড়া হয়ে পড়ল।

একটুবাদে যে-দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাতে আমার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। দেখি কবরটি থেকে একটি গাঢ় কালো ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে উঠে এল। লেড়কিটিকে

ছায়ামূর্তিটি আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। তাকে জড়িয়ে ধরে একটি বেদীর ওপর নিয়ে গেল। উভয়ে কাছাকাছি পাশাপাশি বসল। ছায়ামূর্তিটি একটি কবর থেকে একটি আদমির মুণ্ডু উঠিয়ে লেড়কিটির হাতে দিল। সে সেটিকে পরম তৃপ্তিতে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। ব্যাপার দেখে আমার কলিজা দাপাদাপি জুড়ে দিল। নিজেকে আর বেশি সময় সামলে সুমলে রাখতে পারলাম না। মাথা চক্কর মারতে লাগল। ব্যস, ধপাস ক'রে পড়ে গেলাম। এক লহমার মধ্যে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে এলিয়ে পড়লাম। লেড়কিটি আমার দিকে কয়েক কদম ধেয়ে এল। অনুচ্চ কণ্ঠে, অবোধ্য ভাষায় কি যেন ব'লে চল্‌ল। আমি আদমির অবয়ব হারিয়ে একটি কুত্তার রূপ ধারণ করলাম।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটশ' তেষট্টিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, নওজোয়ান ঘোড়সওয়ারটি তার কিস্‌সা ব'লে চলেছে—আমি তো কুত্তা বনে গেলাম, লেড়কিটি এবার সবেগে আমার ওপর আছড়ে পড়ল। আমাকে হরদম কিল, চড়, ঘুষি লাথি মারতে লাগল। শেষ মেষ লাথি মারতে মারতে আমাকে একদম গোরস্থানটির বাইরে দিয়ে গেল। আমি জান বাঁচাতে লেজ তুলে ছুটতে লাগলাম। হাঙ্গামা আরও কঠিন রূপ নিয়ে দেখা দিল। পথের বেওয়ারিশ কুত্তার দল আমাকে তাড়া করতে লাগল। তাদের শাসনাধীন এলাকায় অপরিচিত অনধিকার

প্রবেশ করলে কেনই বা ছেড়ে দেবে।

আমি বেগতিক দেখে এক কসাইখানায় ঢুকে এক কোণে গিয়ে ঘাপটি মরে রইলাম। কসাইটি লাঠি হাতে তাড়া করল। আক্রমণকারী কুত্তাগুলি জান নিয়ে ভাগল। ভোর হতে না হতেই আমি কসাইখানা থেকে বেরিয়ে চম্পট দিলাম। এক রুটির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খিদেতে পেটে জ্বালা ধরে গেছে। বুড্ডা রুটিওয়ালাটিকে ধার্মিক বলেই মালুম হ'ল। ভোরের নামাজ চুকিয়ে নাস্তা সারছে। আমার দিকে একটি রুটি ছুঁড়ে দিল। এক লহমার মধ্যে সেটি উদরস্থ ক'রে ফেল্‌লাম। এমন সময় তাগড়াই এক নেড়ী কুত্তা আমার ওপর চড়াও হ'ল। আমি লেজ গুটিয়ে দোকানটির ভেতরে ঢুকে ডরে কাঁপতে লাগলাম। আমার হালৎ দেখে বুড্ডা দোকানির দোয়া হ'ল। সে লাঠি দিয়ে সে কুত্তাটিকে ভাগিয়ে দিল।

কেন জানি না আমার ওপর বুড্ডা দোকানিটির মায়া জড়িয়ে গেল। দুপুরে দোকান বন্ধ ক'রে মুখে চুক্‌চুক আওয়াজ তুলে আমাকে ডেকে নিজের মকানে নিয়ে গেল।

আমাকে দেখামাত্র বুড্ডার একমাত্র নওজোয়ান লেড়কি ঝট ক'রে নাকাবে মুখ ঢেকে নিল।

লেড়কিটি এবার বল্‌ল—'আব্বাজান, তুমি যাকে কুত্তা ভেবে মকানে নিয়ে এসেছ আদতে সে এক ধনী নওজোয়ান। যাদু বলে একে কুত্তা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

আমি এবার আমার কিস্‌সা বুড্ডাটির কাছে ব্যক্ত করলাম। লেড়কিটি বল্‌ল—'সে যাদুওয়ালী তো তোমার মকানে ঘাটি গেড়েছে। সুযোগ পেলেই ফিন তোমার ওপর যাদু চালাবে। মন্ত্রঃপূত পানি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। মকানে গিয়েই সে-শয়তানী লেড়কিটির গায়ে পানি ছিঁটিয়ে বলবে, তুমি মাদী-ঘোড়া বনে যাও। ব্যস, সে লেড়কির রূপ ছেড়ে মাদী-ঘোড়া বনে যাবে। তবে ইয়াদ রাখবে, তাকে কিছু করার মওকা না দিয়েই তোমাকে কাম সেরে ফেলতে হবে। তাকে মাদী-ঘোড়া বানাবার পর তুমি ফি রোজ তার পিঠে চেপে বেধড়ক চাবুক চালাবে। চাবুকের ঘায়ে তার চামড়া কেটে যেন খুন বেরিয়ে যায়। মুখ দিয়ে যেন অনর্গল ফেনা ঝরে। ফি রোজ একই ঘটনা ঘটাবে। তার যেন মালুম হয় কী জঘন্য ব্যবহার সে তোমার ওপর করেছিল। সে যতই কাহিল হয়ে পড়ুক না কেন, এক রোজের জন্যও চাবুক যেন কামাই না যায়।

কিস্‌সা খতম ক'রে নওজোয়ান ঘোড়সওয়ারটি বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি স্রেফ সে-লেড়কিটির হুকুম তামিল করছি। আপন মর্জিতে জরুর নয়। এতে আমার কোন কসুর থাকলে আপনি আমাকে যে-সাজা দেবেন মাথা পেতে নেব।'

খলিফা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'সাজা দেয়ার কোন কাজ তো তুমি করনি নওজোয়ান। লেড়কিটি তোমাকে যে ভাবে শয়তানীটিকে শায়েস্তা করতে বলেছে তার জরুরৎ রয়েছে। তোমার কাজে এক বিন্দুও কসুর নেই।'

খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর হুকুমে চীনসম্রাটের জামাতা, ভারত সম্রাটের নওজোয়ান লেড়কা এবার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আপনার মুলুকে আমি রাজপ্রতিনিধি হয়ে হাজির হইনি। আর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেও আমি এখানে আসতে উৎসাহী হইনি। তবে জরুর একদম অকারণে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এত তকলিফ করে আপনার মুলুকে আসি নি। কেন আমি এখানে এসেছি, তাই না? জাঁহাপনা বলছি তবে শুনুন—'একমাত্র আমার জন্মভূমিকে একবারটি চাক্ষুষ করার জন্যই আমার এখানে আসা।'

হ্যাঁ, জাঁহাপনা, বাগদাদ নগরেই আমি একদিন পয়দা হয়েছিলাম। আমার আব্বা ছিলেন এক গরীব কাঠুরিয়া। আমিও জঙ্গল থেকে লকড়ি কেটে এনে টুঁড়ে টুঁড়ে বাগদাদের মকানে মকানে বেচতাম। এত তকলিফ করেও আমার আর আমার বিবির রুটির জোগাড় করতে পারতাম না।

পেটের ধান্ধা তো ছিলই। তার ওপর আমার মুখরা-খাণ্ডারী বিবির জ্বালা-যন্ত্রণায় আমি একদম অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার হতচ্ছাড়ি বিবির না ছিল সুরতের ঝেল্লা, না ছিল তেমন কোন গুণ। লেকিন বদবুদ্ধি তার পেটে একদম গস্‌গস্ করত। দিনভর কেবল জিলিপির প্যাঁচ কষত, কি ক'রে আমার ওপর তম্বি করবে, আমাকে নাজেহাল করবে। একটু কিছু হলেই মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে আমাকে তাড়া করত। দুঃখ যন্ত্রণায় আমার জান খতম হয়ে ছিল।

আমি মকানে পা দিতেই সে আমার কোর্তা ও কামিজ প্রভৃতির জেব হাতিয়ে দেখে নিত দু'-এক দিরহাম কোথাও লুকিয়ে রেখেছি কিনা।

এক সকালে আমি বিবিকে বল্‌লাম—'এক গাছি রশি খরিদ করা দরকার। কয়েকটি দিরহাম দিলে তা বাজার থেকে খরিদ ক'রে নিয়ে আসি। রশিটি জরুরী দরকার।'

দিরহামের ব্যাপার শুনেই তার দিমাকে যেন এক লহমার মধ্যে খুন চেপে গেল। বাজখাই গলায় সে রীতিমত গর্জে উঠল—'রশি কোন্ কাজে লাগবে, শুনি? রশি গলায় পরে ঝোলার শখ হয়েছে বুঝি? ওসব ধান্দা ছাড়ান দাও। তোমাকে আমার চেনা আছে। দু'-চারটে দিরহাম জোগাড় করতে পারলেই তো বাজারের বেশ্যা মাগীদের দরজায় গিয়ে ধর্না দেবে। হুঁশিয়ার, ওসব ভূত ঘাড় থেকে নামাও। নইলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব, বলে রাখছি।'

—'কি যে বল ছাই, দিমাকে আসে না। ঝুটমুট কেন

আজেবাজে ভাবনায় নিজেকে উত্যক্ত করছ। সাচ্চা বাৎ, বড়সড় গাছ কেটে নামাতে গেলে লম্বা রশি একটি চাই-ই চাই। আর তেমন গাছ কাটতে না পারলে রোজগারপাতি বাড়াবই বা কি ক'রে বল তো?'

আমার বাৎ শুনে মুহূর্তকাল মুখে কলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিন মুখে খই ফোটাতে লেগে গেল—'এখনও বলছি, আমার সঙ্গে দিল্লাগী করার কোশিস কোরো না। তোমার মতলব আমার বুঝতে আর বাকী নেই। ধোঁকা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু খাবার ধান্দা। রশি যদি খরিদ করতে হয় তবে আমার সঙ্গে দোকানে চল, দরকার মাফিক রশি একটি খরিদ ক'রে দিচ্ছি। তোমার হাতে একটি দিরহামও দেব না, শুনে রাখ।'

ব্যস, আমার হাত পাকড়ে কোরবানির খাসির মাফিক টানতে টানতে আমাকে নিয়ে দোকানে হাজির হ'ল। একগাছি মোটা রশি আমি পছন্দ করলাম। কিন্তু সে একদম বেঁকে বসল। ফোঁস ক'রে উঠল—'না, এত দাম আমি দিতে পারব না।'

আমার পছন্দ-অপছন্দের কোন দাম না দিয়ে এক গাছি সরু রশি খরিদ ক'রে আমাকে নিয়ে ফিরে এল। আমার চাহিদা পূরণ হ'ল না।

আমি বল্লাম—'কতগুলো দিরহাম দিয়ে দড়ি খরিদ করলে বটে। লেকিন বড়সড় কোন গাছ কেটে এ দিয়ে নামানো অসম্ভব। দিরহাম ক'টি স্রেফ বরবাদ করলে।'

—'একদম চুপ ক'রে থাক। বরবাদ করলাম? কোন ফয়দা হবে না। আমি তোমার সঙ্গে আজ জঙ্গলে যাব। দেখব কত মোটা গাছ তুমি কাটতে চাও। দেখি ফয়দা হয় কি না।'

—'ইয়া আল্লাহ! পার্বত্য জঙ্গলে তুমি যাবে কি?'

—'কেন যাব না? এত ওজর আপত্তি কেন? জঙ্গলে কি কোন জেনানা রাখা আছে নাকি যে, আমি সঙ্গে গেলে তোমাদের রঙ্গ তামাশায় ব্যাঘাত ঘটবে?'

আমার কোন আপত্তিই কানে নিল না। আমার আগেই তাগড়াই এক গাধার পিঠে সে চেপে বসল। আমার কলিজা চিপসে গেল। বাসস্থলকে তো সে বিষাক্ত করেই রেখেছে। এবার কর্মস্থলে গিয়ে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছে।

আমার দিমাকে এক বেড়ে মতলব খেলে গেল। বেশ মোলায়েম স্বরে তাকে বল্লাম—'বিবিজান, আদৎ বাৎ-ই তো তোমাকে বলা হয়ে ওঠে নি। তুমি যখন সঙ্গে এলেই তখন তোমার কাছে গোপন রাখার আর দরকার কি।'

—'আমি জানি বলেই তো তোমার পিছু নিয়েছি। মরদদের বদ মতলব আমি চোখ দেখলেই টের পাই।'

—'আরে বজ্জাতি টজ্জাতি আদপেই নয়। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, এ-ইঁদারাটিতে নাকি বহুৎ ধন দৌলত রয়েছে। তাই তো একটি মোটাসোটা রশি খরিদ করার জন্য ঝকমারি করেছিলাম। মতলব এঁটেছিলাম এর ভেতর থেকে ধন-দৌলত তুলে নিয়ে গিয়ে তোমাকে একদম চমকে দেব।'

—'ঢের হয়েছে। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। শয়তান বেতমিস কাঁহিকার! আমার চোখে ধূলো দিয়ে মালকড়ি সব নিয়ে তোমার সে মাগীর হাতে তুলে দিতে। তোমার ওপর আমার একটুকুও আস্থা নেই। তোমাকে কূয়োয় নেমে ধন দৌলত মোটেই ছুঁতে দিচ্ছি না। আমি নিজে নেমে ধনদৌলত যা পাব একটি একটি ক'রে কুড়িয়ে তুলে আনব। রাখবও একদম নিজের জিম্মায়। খবরদার তুমি নিচে নামার কোশিস করবে না। আমার কোমরে রশি বেঁধে নিচে নামিয়ে দাও।'

সে নিজেই হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দেয়ায় আমার পক্ষে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সহজ হয়ে গেল। আমিও এরকমটিই চেয়েছিলাম। ব্যস, আর দেরী নয়। তার কোমরে রশিটি বেঁধে আল্লাহ-র নাম নিয়ে দিল্ম পাতালপুরীতে চালান দিয়ে। কূয়োয় নামিয়ে দিয়ে আমি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বল্লাম—'বজ্জাত মাগী কাঁহিকার! আমার সঙ্গে দিনের পর দিন যে আচরণ করেছিস তার মাশুল সুদে-আসলে তুলে নেব। থাক পড়ে এ-আন্ধার গুহায়। দেখি, তোর কোন্ ভাতার এসে কূয়ো থেকে তুলে আনে।'

ব্যস, আর এক লহমাও আমি সেখানে রইলাম না। কুড়ুল নিয়ে বনে চলে গেলাম লকড়ি জোগাড় করতে।

বিবিকে কূয়োর ভেতরে রেখে আসায় দুটো দিন খুশীতেই কাটালাম। তৃতীয় দিন ভোরে দোকান থেকে একটি মোটাসোটা রশি খরিদ করে জঙ্গলে গেলাম। আদতে দু'-দুটো দিন সে আন্ধার কূয়োর মধ্যে উপোষ ক'রে কাটাচ্ছে। ঢের সাজা হয়েছে। এবার কিছু খানা না দিলে জরুর ইন্তেকাল ঘটে যাবে।

কূয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে, নিচের দিকে মুখ ক'রে চিল্লিয়ে বল্লাম—'শোন গো আমার সতী সাধ্বী বিবি। মালুম হচ্ছে দু'দিন আন্ধার এ-পাতালপুরীতে উপোষ ক'রে কাটানোয় তোমার যোগ্য সাজা হয়েছে। আশা করি আর আমার সঙ্গে খারাপ ব্যভার করতে চাইবে না।'

তাজ্জব বনে গেলাম। আন্ধার পাতালপুরী থেকে কোন সাড়াশব্দই এল না। ডরে কুঁকড়ে গেলাম। তবে কি ডরে আর খানাপিনার অভাবে তার ইন্তেকালই ঘটে গেছে! তবু কাঁপা কাঁপা হাতে রশিটি কূয়োর মধ্যে নামিয়ে দিলাম। একটু বাদে রশিতে টান লাগল। ভরসা হ'ল। নিঃসন্দেহ হলাম, বিবি আমার জিন্দা আছে বটে। শরীরের সবটুকু তাগদ লাগিয়ে রশিটি টেনে ওপরে তুলতে লেগে গেলাম। একটু বাদেই আমি চমকে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ!

এ যে এক আফ্রিদি দৈত্য। হ্যাঁ, একদম সাচ্চা বাৎ, আমার বিবির বদলে রশিটি ধরে কূয়ো থেকে উঠে এল ইয়া তাগড়াই এক আফ্রিদি দৈত্য। ভয়ে ডরে আমার কলিজা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল।

আমি তো ডরে কাঁপাকাঁপি জুড়ে দিলুম। ভয়ঙ্কর সে-আফ্রিদি দৈত্যটি বাজখাই গলায় আমাকে অভয় দিল—'আমার থেকে তোমার কোনই ডর নেই। কূয়ো থেকে উদ্ধার ক'রে তুমি আমার যে উপকার করেছ জিন্দেগীতে তা ভুলতে পারব না। এক হতচ্ছাড়া দৈত্য অভিশাপ দিয়ে আমার আশমানে ওড়ার হিম্মৎ কেড়ে নিয়েছে। উপকারের বদলা তুমি পাবে, নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

তার বাৎ শুনে আমার কলিজায় পানি এল।

আফ্রিদি দৈত্য এবার বল্‌ল—'শোন, হিন্দুস্তানের সুলতানের এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি আছে। তার সঙ্গে তোমার শাদীর বন্দোবস্ত আমি করে দেব।'

আমি হেসে বল্‌লাম—'আমি জঙ্গলে জঙ্গলে লকড়ির তল্লাশে কাটাই। এক ছাউনিতে মাথাগুঁজে রাত্রিগুজরান করি। আর তুমি আমাকে ক'রে দেবে হিন্দুস্তানের সুলতানের জামাতা। ইয়া আল্লা! আজব এক লালচ আমাকে দেখাচ্ছ, আফ্রিদি!'

—'আরে হাসাহাসি করছ কেন? আমার ওপর ভরসা রাখতে পার। দুনিয়ায় এমন কোন কাজ নেই যা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

আফ্রিদি দৈত্য এবার বল্‌ল—'শোন ধ্যায়ান ক'রে। হিন্দুস্থানের সুলতানের লেড়কির দেহে প্রবেশ ক'রে তার মুখ দিয়ে এমন কথা বলাব যাতে সবাই ধরে নেবে নির্ঘাৎ তার দিমাক গড়বড় হয়ে গেছে। সুলতান পরদেশ থেকে হেকিমদের তলব দেবে। ইলাজ করাবে। হরেক কিসিমের দাওয়াই খাওয়াবে। আদতে তো সে উন্মাদিনী নয়। দাওয়াইয়ে কাম কাজ হবে কেন? লেড়কিকে বিমারিমুক্ত করতে সুলতান যে কোন ওয়াদা করতে রাজী হবেন। ফয়দা কিছু হবে না। শেষমেষ হতাশ হয়ে সুলতান ফরমান জারি করবেন, যে তার লেড়কির বিমারি সারাতে পারবে তার সঙ্গে শাহজাদীর শাদী দেবেন আর অর্ধেক সুলতানিয়ৎ দান করবেন। তুমি তখন সুলতানের দরবারে হাজির হয়ে বলবে—'আমি আপনার লেড়কির বিমারির ইলাজ ক'রে তার পাগলামি সারাতে পারব।'

—'ইয়া আল্লাহ! আমি কি হেকিমি বিদ্যা জানি যে, ইলাজ করে শাহজাদীকে সারিয়ে তুলতে পারব?'

—'ধুৎ, তোমাকে ইলাজ টিলাজ করতে হবে না। কেবল মাত্র কিছু বাহানা করতে হবে। এক বদনা পানি নিয়ে কেবল ঠোঁট দুটো নাড়বে। যেন মালুম হয় তুমি যাদুমন্ত্র আওড়াচ্ছ। ব্যস, তারপর সে পানি গণ্ডুষ ভরে নিয়ে শাহজাদীর গায়ে ছিটিয়ে দেবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসব। সে সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। সুলতান তোমার সঙ্গে শাহজাদীর শাদী দিয়ে নিজের তখ্‌তের পাশে তোমার আসন পেতে দেবেন।'

আমি আজই হিন্দুস্তানে পৌঁছে যাচ্ছি। তোমার কিন্তু দু' মাহিনা সময় লেগে যাবে সে-মুলুকে যেতে।'

—'লেকিন এক বাৎ, এ আন্ধার কূয়োর ভেতরে আমার বিবি ছিল। তার কি হালৎ হয়েছে, জানা দরকার।'

আফ্রিদি দৈত্য ভ্রূ-কুঁচকে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ। সে শয়তানী তোমার বিবি ছিল? আরে সে তো আমার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে কামজ্বালা নেভাতে চেয়েছিল। আমি ধাক্কা দিয়ে তফাতে সরিয়ে দিয়েছিলাম। তবু দমল না। আদমির বাচ্চার এমন জোরদার কামজ্বালা হতে পারে আমার মালুমই ছিল না। সে আমার ওপর এমন জুলুম চালাতে লাগল যে, সহ্য করতে না পেরে এক আছাড় মেরে একদম খতম করে দিয়েছি।'

আমার বিবির এরকম পরিণতির খবর শুনে বুকে শেল বিঁধল। কলিজা খচখচিয়ে উঠল। যাই হোক না কেন, কাজী ডেকে শাদীকরা বিবি তো বটে।'

আফ্রিদি দৈত্যটি এবার হিন্দুস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করল। তারপর আফ্রিদি দৈত্যটির বক্তব্য অনুযায়ীই এক এক ক'রে ঘটনা ঘটতে লাগল। সবশেষে আমি শাহজাদীকে শাদী ক'রে হিন্দুস্তানের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছি। এভাবে আমার বরাত ফিরল। কাঠুরে থেকে আমি হিন্দুস্তানের সুলতানের জামাতা বনে গেলাম। রয়ে গেলাম সে-মুলুকে।

আজ দীর্ঘদিন বাদে আমি জন্মভূমিকে চাক্ষুষ করতে বাগদাদে হাজির হয়েছি। ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখে আমার জিন্দেগীকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করে তুল্‌লাম। খুশীতে দিল্ কানায় কানায় ভরে উঠেছে।'

খলিফা হারুণ অল-রসিদ হিন্দুস্তানের সুলতানের জামাতার কিস্‌সা শুনে সোল্লাসে বল্‌লেন—'তোমার সঙ্গে জান-পরিচয় হওয়াতে আমিও কম খুশী হইনি। তিনি এবার তাকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের তখ্‌তের পাশের আসনে বসতে দিলেন।

খলিফা গত সন্ধ্যায় যে দানবীর বুড্ডাকে দিল্ দরিয়া হয়ে এক ভিখারীকে দান খয়রাৎ করতে দেখেছিলেন তাকে কিস্‌সা শোনাতে হুকুম করলেন।

বুড্ডাটি আসন ছেড়ে উঠে নতজানু হয়ে খলিফাকে কুর্ণিশ সেরে তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আমি এক সওদাগর। রশি কেনা-বেচা করি। এটি আমাদের জাত ব্যবসা। দিনভর কারবার করে যে আয় উপার্জন হয় তা দিয়ে আমার পরিবারের ভরণপোষণ দিব্যি চলে যায়। একটু থেমে বুড্ডাটি এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি আপনাকে যে-কিস্‌সা শোনাচ্ছি, তার জন্য আপনাকে ওয়াদা করতে হবে, আমার ওপর আপনি গোস্‌সা করবেন না, কোন সাজাও আমাকে দেবেন না।'

খলিফা মুচকি হেসে বুড্ডাটিকে অভয় দিতে গিয়ে নিজের রুমালটি তাকে দিয়ে বল্‌লেন—'এই নাও অভয়-রুমাল। এবার নির্ভয়ে তোমার কিস্‌সা শোনাতে পার।'

বুড্ডা রুমালটি কোর্তার ভেতর জেবে রেখে কিস্‌সাটি বলতে লাগল—'হ্যাঁ, জাঁহাপনা, আমি রশির কারবার ক'রে দিন গুজরান করি। তাতে যা আমদানি হয় আমি তাতেই খুশী। বাড়তি কিছু চাই না। যেদিন আয় উপার্জন চাহিদার তুলনায় বেশী হয়ে যায় তা দান খয়রাৎ করে দেই। আমার বিশোয়াস, আল্লাহর এই নির্দেশ। আর আমি তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি।'

এক সকালে দু'জন ধনী আদমি আমার দোকানে হাজির হ'ল। একদম দিনারের কুমীর। তারা আমার দোকানে ঢুকে সালাম জানাল। আমি কুর্শি দেখিয়ে তাদের বল্‌লাম—'মেহেরবানি ক'রে আসন গ্রহণ করুন।'

তারা মুচকি হেসে কুর্শি টেনে বসল। তাদের একজনের নাম সাদী আর অন্য জনের নাম সাদ।

একদিন সাদ সাদীকে বল্‌ল—'দেখ হে, আমি গভীর বিশোয়াস পোষণ করি যে, আদমির হাত দুটো। তাদের একটি ধনী আর অন্যটি গরীব। ধনীদের মগজে বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি খাটিয়ে তারা ধন দৌলত উপার্জন করে। আর বুদ্ধির জোরে তা রক্ষাও করতে পারে। লেকিন গরীবরা বোকার হদ্দ। মূর্খও বটে। রোজগার করার ধান্দা তাদের নেই। যদি কিছু রোজগারপাতি করেও তাদের তা রক্ষা করার বুদ্ধির নিতান্তই অভাব। একে তাদের নসীব বলে মানতে হবে।'

সাদী বল্‌ল—'দোস্ত, তোমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে জোরদার কিছু বলার ইচ্ছা আমার নেই। ফিন তোমার মতকে আমি পুরোপুরি মানতেও নারাজ। ধন দৌলত সবাই চায়। দরকারও বটে। লেকিন বিত্তবান যদি অর্থ পিশাচ হয় তবে তার চেয়ে নীচ আদমি আর হয় না। আমার রোজগারের অর্থ অন্য কারো চরমতম বিপদেও খরচা করব না—এ রকম ভাবকে চরমতম গুনাহ জ্ঞান করবে। তোমার সামনে বসে রয়েছে এ-দোকানের মালিক। হাসান। তার ব্যাপারটি একবার ভেবে দেখ তো। দিনভর রশির কারবার করে। সৎ পথে রোজগার করে গ্রাসাচ্ছাদনের দরকার যেটুকু তা রেখে বাকী অর্থ দান খয়রাৎ করে দেয়। আমি বলব আমাদের সবার উচিত এর কাছ থেকে শিক্ষা নেয়া। মোদ্দা ব্যাপার, আল্লাতাল্লা যাকে দেন সে যত দান খয়রাৎ করুক না কেন ফুরাবে না। নইলে হাজার কোশিস করেও একটি কানাকড়িও জমাতে পারবে না।'

বুড্ডা দানবীর এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার নিজের কিছু ঘটনা আপনার দরবারে পেশ করছি যাতে ব্যাপারটি আপনার কাছে আরও খোলসা হয়ে যাবে। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি রশির কারবার করি। এমন কিছু আয় উপার্জন হয় না যাতে আমি সঞ্চয় ক'রে আমীর-বাদশাহ বনে যেতে পারি। সাচ্চা বাৎ, আমি তা চাই-ও না। খানাপিনা আর সাজ পোশাক চলে গেলেই আমি খুশী। এর বেশী চাইবারই বা কি থাকতে পারে? ধন দৌলতের লালসা আমার কোনদিন ছিল না, আজও লালায়িত নই। তবে এও সাচ্চা বটে, খোদার মেহেরবানিতে আমি আজ নগরের সবচেয়ে বেশী ধন দৌলতের অধিকারী। ভাবছেন হয়ত রশির কারবারী কি ক'রে আঙুলফুলে কলাগাছ হয়ে গেল, ঠিক কিনা?'

জাঁহাপনা শুনুন তবে বলছি—আমি জিন্দেগীতে কাউকে একটি কানাকড়িও ঠকাই নি। সততাকে মূলধন করে আমি কারবারে লিপ্ত রয়েছি। বহুৎ দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেছি। এর জন্য খোদাতাল্লা বোধ করি আমাকে পরীক্ষা করার জন্যই দু'হাতে আমাকে ধন-দৌলত দিয়েছেন।

দোকান বন্ধ করে এক সন্ধ্যায় মকানে ফেরার পথে আমার পাশে কি যেন এক ভারী সামানপত্র ঠেকল। নিচু হয়ে তুলে দেখি, জালের কাঠি। সীসার তৈরি। কোন কাজে লাগলে লেগেও যেতে পারে। তাই কোর্তার জেবে ঢুকিয়ে দিলাম। মকানে গিয়ে দেয়ালের তাকের এক কোণে ফেলে রাখলাম।

মাঝ-রাত্রি, আমি বিভোর হয়ে নিদ যাচ্ছি। অচানক নিদ টুটে গেল। শুনলাম, কে যেন দরওয়াজার কড়া নাড়ছে। দিল্ বিবিয়ে

উঠল। ব্যাজার মুখে দরওয়াজা খুলে দেখি আমাদের মহল্লারই এক মেছুয়া।

সে চোখ-মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌ল—'বড় ঝকমারিতে পড়ে তোমাকে বিরক্ত করতে হ'ল মিঞা সাহাব। জাল নিয়ে মছলি পাকড়াতে যাব। দেখি, জালের একটি কাঠি খোয়া গেছে। তল্লাশী চালিয়েও সেটি ফিরে পেলাম না। এক টুকরো সীসা হলেই কাম চুকে যায়। আপনার কামরায় একটু তল্লাশী চালিয়ে দেখুন না যদি একটু-আধটু সীসা মিলে যায়। সীসা বা লোহা—ভারী কিছু মিল্‌লেই জালটিকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যেতে পারে।'

—'সীসা? জালের কাঠি? একটু অপেক্ষা কর, আসছি।' মেছুয়াটিকে খাড়া করিয়ে তাকের কোণা থেকে পথে পড়ে পাওয়া সীসাটি এনে তার হাতে দিল্‌াম।

মেছুয়াটি খুশী হয়ে সালাম জানিয়ে বিদায় নিল। ভাবলাম, গরীব মেছুয়াটি একদম তুচ্ছ একটি সীসা পেয়েই খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে গেল। তাদের চাহিদা কত কম। যাবার সময় ফিন ব'লে গেল, কাজ চুকিয়ে ফিন ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আরও ব'লে গেল, যে মছলি পাকড়াও করবে তার মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় মছলিটি আমাকে দিয়ে যাবে। গরীব হলেও জেলেটির কৃতজ্ঞতা বোধ কত টনটনে। নিজের অজান্তে আমার হাত দুটো ওপরে উঠে গেল। আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বল্‌লাম—'খোদা মেহেরবান, ওই গরীব মেছুয়াটির মাফিক দিল্ যদি আমাকে দিতে!'

ভোর হওয়ার কিছু সময় বাদে দেখি মেছুয়াটি দরওয়াজায় হাজির। ইয়া পেল্লাই একটি মছলি তার হাতে। সোল্লাসে সে বল্‌ল—'মিঞা সাহাব, টাইগ্রীস নদীর সেরা মছলি। খেয়ে দেখবেন, দু'দিন জিভে লেগে থাকবে।'

—'এ কী মেছুয়া ভাইয়া, এত বড় একটি মছলি এমনি কেন দেবে, আমিই বা নিতে যাব কেন?'

—'মিঞা সাহাব, সাচ্চা বলছি। আপনার দোয়াতেই কাল রাত্রে এত্তো মছলি পাকড়েছি। কাল যা মছলি পেয়েছি জিন্দেগীতে এত মছলি কোনদিন জালে পড়ে নি। মেহেরবানি ক'রে আপনি এটি রাখলে আমি খুশী হ'ব।

ইয়া পেল্লাই মছলি দেখে তো আমার বিবি একদম আহ্লাদে গদগদ হয়ে গেল। কাটারি দিয়ে মছলিটিকে দু' আলাদা করতেই সে একদম তাজ্জব বনে গেল। তার পেটের ভেতর থেকে ইয়া পেল্লাই এক পাথর দুম্ ক'রে মাটিতে পড়ল। রঙিন পাথর। একদম ঝলমল করতে লাগল। ভাবনা হ'ল দরিয়ার মছলি টাইগ্রীস নদীতে এসে পড়েছিল। দরিয়ার মছলি নাকি হরেক কিসিমের পাথর গিলে ফেলে।

পাথরটি ধুয়ে মুছে টেবিলের ওপর রেখে দিল্‌াম। বাহারী পাথর। টেবিলেই মানাবে।

সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করে মকানে পা দিতেই আমার বিবি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বল্‌ল—'মছলির পেট থেকে যে-পাথরটি মিলেছে তার গা থেকে অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। কামরাটি আলোয় আলোয় একদম ঝলমল করছে! চল, দেখে একদম তাজ্জব বনে যাবে।'

আমি লম্বা লম্বা পায়ে কামরায় গিয়ে দেখি, আমার বিবি কিছুমাত্র ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে নি। অত্যুজ্জ্বল আলোয় পুরো কামরাটি ঝলমল করছে।

বিবি আমার করিতকর্মা বটে। চিল্লাচিল্লি করে মুহূর্তের মধ্যে মহল্লার আদমিদের একাট্টা করে ফেল্‌ল। সবাই এসে আজব চিরাগবাতি নিজের চোখে দেখে গেল। ভোর হতে না হতেই বুড্ডা জহুরীর বিবি হাজির হ'ল। আমার বিবির সাথে দু'-চারটি মামুলি বাৎচিৎ সেরে বল্‌ল—'মহল্লার জেনানাদের মুখে শুনলাম, তোমরা এক আজব চিরাগবাতি আমদানি করেছ। আদতে এটি একটি পাথর, বাতির ব্যাপার সবাই বাড়িয়ে বলেছে, ঠিক কিনা?'

—'হ্যাঁ, পাথরই বটে, লেকিন আন্ধারে একদম ঝলমল করে।'

—'হরেক কিসিমের পাথর আছে। সব পাথরের গুণও হরেক। আমার লেড়কার বিবির ব্যাপারটিরই বিবেচনা করে দেখ বহিন, তার লেড়কা হবে। দিন পার হয়ে যাচ্ছে। লেকিন লেড়কা গর্ভেই

রয়ে গেছে, পয়দা হচ্ছে না। এক ফকির দরবেশ এসে একটি পাথরের মাদুলি তাকে দিয়ে গেছে।'

—'কাজ হয়েছে? লেড়কা পয়দা হয়েছে কি?'

—'আরে বহিন, সে আপশোষেই তো সারা হয়ে গেলাম। ফকির বলে গেছে একই কিসিমের আর একটি পাথর দরকার। লেড়কা পয়দা না হওয়া অবধি দু'পাথরের মাদুলিটি গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। নইলে তার ঘাড় থেকে ভূত নামবে না। দু'-চারদিনের জন্য তোমার পাথরটি দিলে আমার বেটার বিবিটির জান রক্ষা হয়। আর আমিও প্রথম নাতির মুখ দেখতে পাই। আর কিছু দাম দিয়ে যদি বেচতে চাও তবে আমি খরিদ করেও নিতে পারি। বল, পাথরটির বিনিময়ে তুমি কি দাম আশা করছ বহিন?'

ইতিমধ্যে আমি ভোরের নামাজ সেরে কামরায় এলাম। আমাকে দেখেই সে নাকাবটি গলা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'ব্যাপারী, পাথরটি আমাকে একবারটি দেখাবে?'

আমি তাকে নিয়ে সে-কামরায় গিয়ে পাথরটি তাকে দেখালাম। সে এক লহমায় পাথরটি দেখে নিয়ে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! একদম এ কিসিমের পাথরই ফকির আমার বেটার বিবির জন্য দিয়ে গেছে।' বুড্ডা জহুরীর বিবির আগ্রহ দেখে আমার বিবি হেসে বল্‌ল—'কি চাই জিজ্ঞাসা না ক'রে আপনিই বলুন না কেন, কি দাম দিয়ে খরিদ করতে চাইছেন? আদতে আমরা তো আর পাথরটি খরিদ করিনি। ইয়া পেল্লাই এক মাছের পেট থেকে পেয়েছি।'

—'তা যদি বল তবে পুরো দশটি সোনার মোহর নগদ চুকিয়ে দিয়ে আমি পাথর তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব।'

আমি সাজ পোশাক গায়ে চাপিয়ে দোকানে যাবার সময় বিবিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্‌লাম—'ব্যাপার সুবিধার নয়, মালুম হচ্ছে। এ-বুড়ি বা যে কেউ দাম যতই দিতে রাজী হোক না কেন, খবরদার কারো কাছে পাথরটি বেচবে না। আর দেখাবেও না কাউকে, ইয়াদ রেখো। মালুম হচ্ছে পাথরটি বহুৎ দামী। আমি দোকানে চল্‌লাম। ফিরে এসে যা হয় বিচার-বিবেচনা করব।'

আমি সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে দোকানে ফিরলাম। বুড্ডা ইহুদীর বিবি আমার সামনে হাজির হ'ল। সালাম জানিয়ে বল্‌ল—'স্রেফ আপনার জন্যই আমাকে ফিন ছুটে আসতে হ'ল। একদম মুশকিলে পড়ে গেছি। পাথর যদি বেচেন তবে মুশকিল আসান হতে পারে বটে। তরতাজা বেটার বিবিটির জান রক্ষা পায়। লেড়কা পয়দা তো হচ্ছেই না, পরন্তু ভূতের ভয়ে রাতের নিদ পর্যন্ত উঠে গেছে। আমি সঙ্গে পুরো একশ' মোহর নিয়ে এসেছি।' রুমালে বাঁধা মোহরগুলো আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এগুলো রেখে পাথরটি আমাকে দিন।'

—'ধ্যুৎ! কি যে বলছেন, দিমাকে আসছে না। এটি এক আদৎ দরিয়ার রত্ন। বহুৎ দাম এর।'

—'ঝুটা, ঝিলকুল ঝুটা বাৎ সাহাব। আদতে এটি একটি ঝলমলে বাহারী কাঁচ। দাম কিছুই নেই। পাথরটি পেলে আমার লেড়কার বিবির জান রক্ষা হতে পারে বলেই আমি খরিদ করতে আগ্রহী। আপনার পাথরটিই তার জান রক্ষার একমাত্র ভরসা। মেহেরবানি ক'রে মোহরগুলো নিয়ে পাথরটি আমায় দিন।'

—'আমিও দিতে আগ্রহী। লেকিন আমি জেনেছি, এর দাম দশ লাখ দিনার। আপনি এক লাখ দিনার দাম চুকিয়ে পাথরটি নিয়ে যান।'

—'আমার স্বামী জহুরী, তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি তো জহুরী নই যে, হীরা-জহরতের দাম বুঝব।' সালাম জানিয়ে সে চলে গেল।

একটু বাদেই দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ কানে এল। আমার বুঝতে দেরী হ'ল না, বুড্ডা জহুরী হামলা করতে এসেছে। দরওয়াজা খুলেই দেখি তোবড়ানো গালে হাসি ফুটিয়ে বুড্ডা জহুরী দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই সে সালাম জানাল।

আমি আগন্তুক জহুরীকে কামরার ভেতরে এনে কুর্শি এগিয়ে বসতে দিলাম। বুড্ডাটি পুরোমাত্রায় ধার্মিক ও বিনয়ের বাহানা শুরু ক'রে দিল। একটু বাদে বাদেই আব্রাহাম জ্যাকব-এর নাম উচ্চারণ ক'রে আমার সঙ্গে বাৎচিৎ করতে লাগল।

বুড্ডা জহুরী বহুৎ কায়দা-কসরৎ ক'রে আমাকে বুঝাবার কোশিস করল, সাচ্চা জহুরী ছাড়া আদৎ পাথর আর নকল পাথরের ফারাকটুকু ধরা সম্ভব নয়। আমার পাথরটি নকল কাঁচ। তবে একদম আদৎ জহরতের মাফিক দেখতে।'

বুড্ডাটির বাৎ শুনে ভেতরে ভেতরে গোস্‌সায় কাঁপতে কাঁপতে পাশের কামরা থেকে পাথরটি নিয়ে এলাম। দরওয়াজা-জানালা বন্ধ ক'রে পাথরটি তার সামনে ধরলাম। সে নিষ্পলক চোখে লালচ মাখানো নজরে জুল্ জুল্ করে পাথরটির দিকে চেয়ে রইল। পাথরটির ঝিল্লায় পুরো কামরাটি ঝলমল করতে লেগে গেছে।

বুড্ডা ইহুদীটি নিজেকে সামাল দিতে পেরে অচানক চমকে উঠে ব'লে ফেল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! এ যে দেখছি তামাম দুনিয়ার সুলতান-বাদশাহের ধন-দৌলতের সমান! ইয়া পেল্লাই জহরৎ। এত বড় পাথর তো তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে দ্বিতীয় একটি মিলবে না!' পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বক্তব্যটি অন্য দিকে চালান দিতে গিয়ে আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'হ্যাঁ, একদম সাচ্চা জহরতের মাফিকই দেখতে। আদতে নকল পাথর।'

আমি ঝট ক'রে পাথরটি কোর্তার জেবে চালান দিয়ে বিমর্ষ মুখে ব'লে উঠলাম—'দেখুন, নকল পাথর দিয়ে আপনাকে ঠকাবার কিছুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। আমি বেচব না—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বুড্ডা জহুরী ভড়কে গিয়ে বল্‌ল—'মালুম হচ্ছে, আপনি গোস্‌সা করেছেন। আদতে দাম কম বলে আজকাল নকল মালে বাজার ছেয়ে গেছে। তা-ই আসলি ব'লে চালিয়ে দিচ্ছে কোন কোন ধাপ্পাবাজ জহুরী। আপনি আর একটু বিচার বিবেচনা—'

—'দেখুন, বিচার বিবেচনা ক'রে দর চাইতে হ'লে পুরো দশ লাখ মোহরই আমি দাবী করব। এক লাখে মাল ছেড়ে দেব একবার যখন জবান দিয়েছি আদতেও তা-ই করব। আপনি পরে এলে কিন্তু দাম আর থাকবে না, জবানের ব্যাপারও আর উঠবে না, ইয়াদ রাখবেন। তখন বিশ লাখ চাইলেও কিছু বলতে পারবেন না।'

—'না, পরেটরের মধ্যে আমি নেই। এখনই ফয়শালা ক'রে তবে যাব।'

বুড্ডা জহুরীর নির্দেশে তার নফর গাধার পিঠ থেকে এক বস্তা সোনার মোহর নিয়ে এসে আমার সামনে রাখল। দেখেই আমি চমকে উঠলাম। আদতে এর আগে এত মোহর একসঙ্গে দেখা নসীবে কুলোয় নি। ব্যস, আমি একদম ধনী বনে গেলাম। জাঁহাপনা, একে আল্লাহর মর্জি ছাড়া আর কি-ই বা আপনি ভাবতে পারেন, বলুন? ধন দৌলত লাভ করে আমরা দেমাক দেখাই, বিলকুল মূর্খের কাজ। আদতে সে ধন দৌলতের মালিক আল্লাতাল্লা ছাড়া কেউ-ই নন, আমরা ভুলেও ভাবি না। আমার ওপর স্রেফ ধন দৌলত রক্ষার দায়িত্ব। ক'জন ভাবি, বলুন?'

জাঁহাপনা, তাই আমি ফি রোজ আল্লাতাল্লার দান ধন দৌলত গরীবদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা ক'রে দেই। যার ধন দৌলত তারই সৃষ্ট আদমিদের মধ্যে বিলিয়ে দেই। ব্যস, এতে আমার বড়াই করার তো কিছু থাকতে পারে না।'

খলিফা বল্‌লেন—'তোমার দান খয়রাতের কিস্‌সা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বুড্ডা ইহুদীটি তোমার পাথরটি এক লক্ষ দিনার দিয়ে খরিদ ক'রে আমার কাছে দশ লক্ষ মোহরের বিনিময়ে বেচেছে। আমার ধনভাণ্ডারে এখনও সেটি জিম্মা আছে।'

খলিফা এবার মক্তবের মৌলভীকে তলব ক'রে বল্‌লেন—'মৌলভী সাহাব, এ বার তোমার কিস্‌সা শুরু কর।'

মৌলভী এবার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আপনি তো জানেনই আমি এক মক্তবের গরীব মৌলভী। এক সময় আমার মক্তবে চব্বিশটি পড়ুয়া ছিল।

ছাত্রদের কাছে আমার পরিচয় ছিল, বহুৎ কড়া মৌলভী হিসেবে। পড়ুয়ারা আমাকে দেখে ডরে একদম গুটিসুটি মেরে থাকত। তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার জিম্মায় থাকত। ছুটিছাটার ব্যাপার কিছু ছিল না।

একদিন আমি কিতাব হাতে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছি। অচানক এক ছাত্র আমাকে বলে বসল—'মৌলভী সাহাব, আপনার মুখটি কেমন যেন হলুদ হলুদ মালুম হচ্ছে—কেন?'

আমি ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলাম।

ছাত্রটিকে ঠাণ্ডা করলাম বটে। লেকিন একটু বাদে আমার এক সহকর্মী মৌলভী আমাকে বল্‌ল—'মৌলভী সাহাব, সাচ্চা বটে, আপনার মুখটি অস্বাভাবিক হলুদ দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি? মালুম হচ্ছে, আপনাকে বিমারিতে ধরেছে। আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমিই এদের পড়িয়ে দেব।'

এবার ছাত্ররা সবাই আমার মুখের দিকে এমন কৌতূহলী নজর নিয়ে তাকাতে লাগল যার ফলে আমি সাচমুচ রোগী বনে গেলাম।

মকানে ফিরে গিয়ে বিবিকে বল্‌লাম—'বিবিজান, জলদি এক পেয়ালা সরবৎ বানিয়ে দাও তো। তবিয়ৎ গড়বড় করছে।' আমার ডর ধরে গেল, আমার ন্যাবাট্যাবা হয় নি তো!'

বিকালের দিকে আমার সহকর্মী মৌলভী সাহাব এসে চব্বিশটি দিরহাম আমার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'আপনার ছাত্ররা নাস্তার খরচা বাঁচিয়ে চাঁদা তুলে দিল, যাতে আচ্ছা খানার বন্দোবস্ত করতে পারেন।'

অচানক আমার দিল্‌ খচখচ ক'রে উঠল। আমার ছাত্ররা কী দিল্‌দরিয়া! আর আমি এমনই পাষণ্ড যে, তাদের ওপর নির্মম-নিষ্ঠুর ব্যভার ক'রে থাকি! তাদের আচরণে আমার দিল্‌ খুশীতে ভরে উঠল। দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল।

ক'দিন বিশ্রামের মধ্য দিয়ে গুজরান করলাম। মালুমই হয় না

যে, আমি বিমারিতে ভুগছি। আমি বেশী অস্থির হয়ে পড়লাম আচ্ছা আচ্ছা খানা আর বিশ্রাম থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য। কাহাতক আর চৌপায়া আশ্রয় ক'রে হাত-পা গুটিয়ে পড়ে থাকা যায়। আদতে আচ্ছা খানা আমি কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারি না।

পরদিন আমার সহকর্মী মৌলভীটি ফিন আমাকে দেখতে এল। বল্ল—'একী তাজ্জব কাণ্ড। আপনি যে আরও হলুদ হয়ে গেছেন।'

আমি তাকে বরদাস্ত করতে না পারলেও মুখ বুজেই রইলাম।

এক ভোরে ছাত্ররা দলবেঁধে আমাকে দেখতে এল। দেখেই চমকে উঠল—'মৌলভী সাহাব আপনার চেহারার কী হালৎ হয়েছে! চোখ-মুখ যে একদম ফুলে গেছে! শুনলাম, আপনি চোয়াল নাড়তে পারছেন না, সাচ্চা কি?'

ঠিক তখনই আমার বিবি কয়েকটি রুটি আর দু'টো সিদ্ধ আণ্ডা এনে আমার সামনে রাখল। নাস্তা।

আমি তাদের ধমক দিয়ে বল্লাম—'আমি চোয়াল নাড়তে পারি না, কে রটিয়ে বেড়াচ্ছে, বল তো?'

আমার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে দু'দুটো আণ্ডাই এক সঙ্গে মুখে পুরে দিলাম। তখন গরম। এত গরম যে মুখের নরম মাংস বরদাস্ত করতে পারল না। লেকিন এত বড়াই করার পর মুখ থেকে সে দুটো ফেলেও দিতে পারলাম না। তাদের বক্তব্যই যে তবে সাচ্চা ব'লে স্বীকার পাবে।

তাই বলে দু'-দুটো সিদ্ধ ডিমকে তো এত সহজে কব্জা করা সম্ভব নয়। দু'গালে দুটো ডিম আস্তই রয়ে গেল। ফল যা হবার হলও তা-ই। গরম ডিমের স্যাঁকা লেগে গেল গালের নরম মাংসে। ঘা হয়ে গেল। হরেক কিসিমের দাওয়াই দিয়েও সে ঘায়ের হাত থেকে রেহাই পেলাম না। তারপর শুরু হ'ল পচন। গালের মাংস খসে খসে পড়ে কি হালৎ হয়েছে নিজের চোখেই তো দেখছেন জাঁহাপনা। আর সে সঙ্গে উৎকট গন্ধ।

আবার মক্তবে পড়ুয়াদের নিয়ে বসেছিলাম। মুখের ঘায়ের জন্য তাদের পড়াতে বহুৎ তকলিফ হ'ত। তবু হাল ছাড়ি নি। সমস্যা দেখা দিল পড়ুয়া বালবাচ্চাগুলোকে নিয়ে। দীর্ঘদিন দড়িছাড়া গাইয়ের মাফিক থেকে তারা একদম বেয়াড়া বনে গিয়েছিল। ভয় ডর বলতে কিছুই ছিল না।

জাঁহাপনা, নসীবই আদৎ ব্যাপার। নসীবকে এড়াতে পারবে কে? আমিও পারি নি। একে দু'গালে দগদগে ঘা তার ওপর একটি পা-ও আমাকে হারাতে হ'ল। আমি ল্যাংড়া বনে গেলাম।

মক্তবে এক দুপুরে পড়াচ্ছিলাম। প্রচণ্ড গরম। রোদ খা-খা করছে। পড়ুয়ারা পানি খেতে চাইল। মক্তবের জালা অনেক আগেই খালি হয়ে গেছে। তেষ্টা পেলে তো আর বলা যায় না, পানি খতম। খেতে হবে না। পানির কষ্ট সহ্য করা মুশকিল। পাশের এক কুয়া আছে। পানি তোলার রশি-বালতি কিছুই নেই। আমি পড়ুয়াদের নিয়ে কুয়ার ধারে গেলাম। ফিকির তো কিছু না কিছু করতেই হবে।

আমার মাথায় প্রখর বুদ্ধি। তখন এক বুদ্ধি খেলে গেল। পড়ুয়াদের মাথার টুপিগুলো নিয়ে নিলাম।

আমার মাথার পাগড়ি খুলে তার এক প্রান্ত ধরে কুয়ায় নামার কৌশিস করতে লাগলাম। শেষে তারাই ফিন আমাকে ওপরে তুলে নেবে। টুপিগুলো সঙ্গে নিয়ে নিলাম। টুপি ভরে ভরে তাদের পানি তুলে দেব—এ-ই ছিল আমার মতলব। অনেকখানি নেমেও ছিলাম। আর একটু হলেই পানি ছুঁয়ে ফেলতাম। শেষ রক্ষা হ'ল না।

কুয়ার ভেতর থেকেই আমার মালুম হ'ল ওপরে হৈ হল্লা হচ্ছে। গাধা বা ঘোড়া যা-ই হোক কিছু পড়ুয়াদের ধাওয়া করেছিল। ব্যস, পাগড়ি ছেড়ে জান নিয়ে তারা ভাগতে লাগল। ব্যস, আমি ঝপাং ক'রে পানিতে আছাড় খেয়ে পড়লাম।

তবু বরাতের জোর আছে বলতে হবে। কুয়ায় পানি বেশী ছিল না। লেকিন আচমকা আছাড় খাওয়াতে জখমি পাটিতে নতুন ক'রে আঘাত লাগল। তখন তেমন মালুম হয় নি। মালুম হ'ল কিছু বাদে। পা ফুলে একদম কলাগাছ বনে গেল। যন্ত্রণা হলই। দাওয়াই খেয়ে ফোলা সারানো গেল। যন্ত্রণা তামাম জিন্দেগীর জন্য রয়ে গেল। এখন লাঠি সম্বল দেখতেই পাচ্ছেন।'

খলিফার নির্দেশে এবার অন্ধা ভিখমাঙ্গাটি তার কিস্‌সা শোনাতে উঠল। খলিফাকে কুর্ণিশ সেরে সে বলতে লাগল—'জাঁহাপনা, আমি যখন নওজোয়ান ছিলাম তখন এক জবরদস্ত উট চালক ব'লে আমার খ্যাতি ছিল। আমার নিজের বুদ্ধি-কৌশল সম্বল করেই আমি আশিটি উটের মালিক বনে গিয়েছিলাম। উট ভাড়া খাটানো ছিল আমার পেশা। রোজগারপাতিও ছিল বহুৎই। আর অর্থ সঞ্চয়ের ফিকির জানা ছিল বলে, কিছুদিনের মধ্যেই আমি পরিচিত মহলের মাঝে ধনী ব'লে গণ্য হয়ে পড়লাম।

আমি একবার এক কারবারীর সামানপত্র নিয়ে বাগদাদ থেকে বসরাহ নগরে যাই। সামানপত্র খালাস ক'রে দিয়ে ফিন বাগদাদের পথে রওয়ানা হলাম। গরমকাল। পথ পাড়ি দিতে দিতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মাথার ওপরে সূর্য। চারদিকে খা-খা করছে। এক ঝাঁকড়া গাছের নিচে উটটিকে দাঁড় করালাম। গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলাম।

আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। তখন এক ফকির সেখানে এল। বুড্ডা। মুখের সফেদ দাড়ি নাভি পর্যন্ত নেমে এসেছে। ইয়া লম্বা আলখাল্লা পরনে। এক সময় খুবসুরৎ চেহারা ছিল। এক লহমায় দেখলেই মালুম হয়, আর মালুম হয় আল্লাহ-র নামে

নিজেকে সঁপে দিয়ে মুক্তপুরুষ বনে জিন্দেগী কাটিয়ে দিচ্ছে। যাকে বলে একদম আল্লাহ অন্তঃপ্রাণ।

ফকির সাহাবকে সালাম জানালাম। পাশে বসিয়ে খানাপিনা দিলাম।

সূর্য পশ্চিম-আশমানে হেলে পড়েছে। এবার ওঠার ধান্দা করলাম। ফকির সাহাব আমাকে বল্‌লেন—'বেটা আবদাল্লাহ, তুমি বিবি আর বালবাচ্চা নিয়ে সংসারে ডুবে রয়েছ। অর্থের জন্যই মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছ। আমিও মুলুকে মুলুকে চক্কর মারি। লেকিন বিত্তের তল্লাশে জরুর নয়। আল্লাহ'কে পাবার ধান্দায়। আমাদের উভয়ের ভিতর বিস্তর ফারাক।

তার বক্তব্য আমার কাছে সাফা হ'ল না। তাই মুচকি হেসে বল্‌লাম—'ফকির সাহাব, আপনার হয়ত বহুৎ ধন দৌলত জমা রয়েছে তাই আমার মাফিক রোজগারের ধান্দায় হরদম ঢুঁড়ে বেড়াতে হয় না। আর আমি? কিছুই জমাতে পারি নি। তাই তো আমাকে অর্থের পিছনে ঢুঁড়ে হরদম ছুটতেই হয়।'

ফকির সাহাব আমার মুখের দিকে অর্থপূর্ণ নজরে তাকাল। বল্‌ল—'ধন-দৌলত পেলেই কি তোমার ছুটোছুটি থামবে আবদাল্লাহ? কত অর্থ, কত মোহর চাই তোমার, বল তো?'

—'বিবি আর বালবাচ্চার চাহিদা মেটাতে মোহর তো বহুৎ-ই দরকার।'

—'বহুৎ—বহুৎ বলতে কত? কত হলে তোমার দিল্ ঠাণ্ডা হবে, সাফসাফ বল? দু'—পাঁচশ। হাজার বা কোটি—কত?'

—'ইয়া আল্লাহ! অত দিয়ে কি হবে? এক লাখ হলেই আমি খুশী হয়ে যাব। ব্যস, এক লাখ মোহর হলেই হয়ে যায়?'

—'বেটা, তবে তো আজই তোমার আর বাগদাদে যাওয়া চলবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। চল। আমার সঙ্গে এক গুপ্ত ধনাগারে যাবে। সেখান থেকে তোমার যত খুশী ধন দৌলত উটের পিঠে চাপিয়ে নিজের মুলুকে চলে যাবে। আমি হাঁটব বসরাহ নগরের পথে।'

ফকির সাহাব আমাকে নিয়ে এক পাহাড়ের ধারে হাজির হ'ল। গুহার ভেতর উটগুলো যেতে পারবে না বলে গাছের সঙ্গে তাদের বেঁধে দিলাম। এবার পেল্লাই একটি বোড়া নিয়ে নিলাম। ফকির সাহাব বল্ল—'তোমার কি দিমাক টিমাক খারাপ আছে? একটি বোড়া দিয়ে কি করবে? বারবার আসা হবে না। তোমার সঙ্গে যতগুলো উট আছে ততগুলি বোড়া নিয়ে নাও। একবারে কাজ চুকিয়ে এখান থেকে চলে যাবে।'

—'ইয়া আল্লাহ! উট তো আশীটি? এত ধন দৌলত কি এখানে মিলবে?'

—'মিলবে, মিলবে বেটা। তার বেশীও মিলে যাবে। বহুৎ আচ্ছা, আশীটি বোড়াই নিয়ে নাও। ধন দৌলতের আধা আধি ভাগ—আশী বস্তা আমি নেব, রাজী তো?'

আমি আর ঝুটমুট তর্ক ক'রে সময় বরবাদ করলাম না। আশীটি বোড়া গাট্টি বেঁধে মাথায় চাপিয়ে নিলাম।

কিছুদূর যেতেই এক নজরে দেখে নিলাম, পাহাড় একদম খাড়া হয়ে উঠে গেছে। হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওপরে ওঠা একদম অসম্ভব। ঝুটমুট কোশিস ক'রে ফয়দা কিছু হবার নয়।

ফকির সাহাব এক আজব কাজ করল। তার হাতের জ্বলন্ত ধুনুচিতে খুসবুওয়ালা কিসের যেন গুঁড়া ছিঁটিয়ে দিল। ব্যস, ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে ফেল্‌ল। একদম আন্ধার হয়ে গেল। পাহাড় চাপা পড়ে গেল। একটু বাদে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি গুহার মুখ। আমাকে নিয়ে ফকির গুহাটির ভেতর ঢুকে গেল। ইয়া বড়া এক কামরায় গিয়ে পড়লাম। আমার চোখ দুটোতে ধাঁ-ধাঁ লেগে গেল। সোনার ঢেলা পাহাড় সমান টাঁই করা রয়েছে। আর একদিকে মোহরের পাহাড়। হীরা জহরতের পরিমাণ করা মুশকিল। এদের একটি লক্ষ লক্ষ মোহরের দামের সমান তো হবেই।

আমি উন্মাদের মাফিক মোহর দিয়ে বোড়াগুলো বোঝাই করতে মেতে গেলাম। ফকির ধমক দিয়ে উঠল—'ঝুটমুট মোহর দিয়ে বোড়া বোঝাই করছ কেন? হীরা-জহরৎ চোখে পড়ছে না? ওজনে হাল্কা অথচ দাম বেশী এমন সব বস্তু নাও। তুমি কি বেকুব নাকি যে, মোহর টানতে যাবে?'

আমি শরমে মাথা নোয়ালাম।

মোহর ফেলে দিয়ে আশীটি বোড়াই হীরা-জহরৎ আর মণি-মুক্তা দিয়ে বোঝাই ক'রে নিলাম।

ইয়া পেল্লাই ভারী বোড়াগুলোকে টানতে টানতে গুহার বাইরে নিয়ে এসে উটের পিঠে চাপাতে লাগলাম। আমি যখন বোড়াগুলোকে নিয়ে মেতে রয়েছি তখন নজরে পড়ল ফকির সাহাব একটি জালার ভেতর থেকে ঝট ক'রে ছোট্ট একটি ডিব্বা তুলে তার আলখাল্লার জেবে চালান ক'রে দিল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আটশ' চুয়াত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা অন্ধা ভিখমাঙ্গা আবদাল্লাহ্ কিস্‌সা বলছে—ফকির সাহাব ছোট্ট ডিব্বাটি আলখাল্লার জেবে চালান ক'রে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাজ বন্ধ রেখে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম—'ফকির সাহাব, ওটা কি? কি আছে ওতে?'

ফকির সাহাব ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'কিছু না বেটা। ছোট্ট এক ডিব্বা। এতে মলম আছে, মলম।'

ফকির সাহাবের ব্যাপার দেখে ধন্দে পড়ে গেলাম। লেকিন তাকে বেশী ঘাটাতেও ভরসা হ'ল না।

আমার উট নিয়ে সে-ফাঁকা ময়দানে ঝাকড়া গাছটির নিচে হাজির হলাম। সেখান থেকে আমি বাগদাদের পথ ধরব। আর ফকির সাহাব সোজা চলে যাবে বসরাহ নগরে।

ফকির সাহাব তার আধাআধি বখরা দাবী করল। ইতিমধ্যে আমার দিল্ অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাকে সরাসরি বল্‌লাম—'ফকির সাহাব, আপনার দিল্ তো আল্লাহ-র মুখী হয়ে রয়েছে। আল্লাহ-ই আপনার একমাত্র ধ্যান। ধন-দৌলতের দাম তো আপনার কাছে মিট্টির চেয়েও কম। বেকার এত ধন দৌলত কেন নিয়ে যাবেন? আপনার কি ফয়দাই-বা হবে এসব নিয়ে ; মালুম হচ্ছে না।'

একদম সাচ্চা বটে। আমি ফকির। এসবে আমার নিজের জরুরৎ নেই। তবে দীন দরিদ্র তাদের খানাপিনার বন্দোবস্ত করতে এসব আমার দরকার। তুমি আমাকে যে বখরা দেবে তা অসহায় আর্ত আদমিদের সেবায় লাগাব বেটা। তুমি তো তোমার বিবি আর বালবাচ্চাদের সুখের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করছ। আর আমি আল্লাতাল্লার বিশাল পরিবারের দীন দরিদ্রদের মুখে খানা যোগাবার দায়িত্ব যে আমার ওপর বর্তেছে।'

আমি আমতা আমতা ক'রে বল্‌লাম—'তাই তো, তবে তো দিতেই হয়। ঠিক আছে, এক কাজ করুন, আশীটি বোড়া থেকে আপনি বিশটি নিয়ে যান আর বাকী ষাটটি আমার থাক।'

—'বেটা বিশটি বস্তা দিলে তোমার উটও তো বিশটি আমাকে দিতে হবে।'

ফকির সাহাবের বাৎ শুনে আমার কলিজা মোচড় মেরে উঠল। উপায় নেই। খুশী হতে না পারলেও বিশটি উট আর বিশ বোড়া হীরা-জহরৎ ফকির সাহাবকে দিয়ে দিতেই হ'ল। সে উটগুলো তাড়িয়ে বসরাহের পথ ধরল।

আমি ফকির সাহাবের ফেলে যাওয়া পথের দিকে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইলাম। বুকের ভেতরে কলিজাটি যেন জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ছুঁটতে ছুঁটতে গিয়ে ফকির সাহাবকে ধরে ফেল্লাম। হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লাম—'দেখুন, বিশটি উট আপনি নিয়ে যাচ্ছেন বটে। লেকিন তাদের বশে আনা আপনার ফকিরি কেরামতিতে কুলোবে না। আমাকে কাছে না দেখে এরা হুজ্জুতি জুড়ে দেবে। বেকার হয়রান হবেন। তার চেয়ে বিশের জায়গায় দশটি ক'রে নিন। তবু বাঁচোয়া হবে।'

—'হ্যাঁ, মালুম হচ্ছে কলিজায় জ্বালা ধরে গেছে, ঠিক কিনা। বহুৎ আচ্ছা, দশটি উট ফিরিয়েই দিচ্ছি।'

দশটি উট নিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, ফকির সাহাব স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে দশটি উট আর বিশ/বোড়া হীরা-জহরৎ নিয়ে কেটে পড়ছে। আদতে সে তো কোন মেহনতই করল না। পার্বত্য পথে উট না থাকলে বোড়াগুলো কিছুতেই নিয়ে আসা সম্ভব হ'ত না। যত হয়রানি হতে হয়েছে আমাকে আর আমার উটগুলিকে। মাঝখান থেকে ফকির সাহাব ফয়দা লুটে নিল।

ফিন ফকির সাহাবকে গিয়ে পাকড়াও করলাম। তাকে বল্লাম —'ফকির সাহাব, আপনি চাইলেই তো তামাম দুনিয়ার ধন-দৌলত হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারেন। হাজারবার ওই ধন ভাণ্ডারে গিয়ে মর্জি মাফিক ধন দৌলত নিয়ে আসতে পারেন. আমি কিন্তু আর সেখানে যাওয়ার মওকা পাব না। আপনি বরং আমাকে উট আর ধন দৌলত পুরোটাই দিয়ে দিন। নেহাৎই যদি দরকার হয় সেখান থেকে বিলকুল ধন দৌলত নিয়ে আসবেন।'

—'বহুৎ আচ্ছা। এতে যদি তোমার দিল্ ভরে, খুশী হও তবে নিয়েই যাও বেটা।'

আমি দু' কদম গিয়ে ফিন ফিরে এলাম। ফকির সাহাবের হাতের সোনার থালাটির দিকে লোভাতুর নজর মেলে চেয়ে রইলাম।

বুড্ডা ফকির তোবড়ানো গালে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্ল—'বেটা, এ-ও নিয়ে যেতে চাইছ? নাও, নিয়ে যাও।'

আমি আমতা আমতা ক'রেও বলতে পারলাম না, 'না, থাক। আমাকে নীচ ভাবছেন কেন? আমার দিল্ এত ছোট নয় যে, আপনার শেষ সম্বল এ-থালাটি পর্যন্ত নিয়ে কেটে পড়ব।' তাই নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার হাতের সোনার থালাটির দিকে চেয়ে রইলাম।

ফকির সাহাব হাত বাড়িয়ে আমাকে থালাটি দিল। আমি বেমালুম বেশরমের মাফিক তার হাত থেকে সেটি নিয়ে নিলাম।

ফকির ফিক ক'রে হেসে বল্ল—'জরুর খুশী হয়েছ? যাও এবার নিজের মুলুকে ফিরে যাও বেটা।'

ফিরতে চাইলেই আমাকে ফিরতে দেয় কে? ফকির সাহাবের আলখাল্লার বুকের জেবটিতে আমার নজর আটকে পড়ে গেল। শরমের মাথা খেয়ে বলেই ফেল্লাম—'ফকির সাহাব, মেহেরবানি ক'রে আপনার জেবের ওই ডিব্বাটি আমাকে দিন।'

সে এক মুহূর্তও দেরী না ক'রে জেবটিতে হাত চালিয়ে ডিব্বাটি বের করে এনে আমার হাতে দিয়ে বল্ল—'বেটা, যা কিছু ছিল বিলকুল তোমাকে দিয়ে আমি খালাস হয়ে গেলাম। ব্যস, এবার খুশী তো?'

আমি একটু দম নিয়ে বল্লাম—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুশী বটে। লেকিন ডিব্বার বস্তুটি কিভাবে ব্যাভার করতে হবে, বলে দিন।' আমার মালুম হ'ল, ডিব্বাটি হাতে নেয়ার পর থেকে আমার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে কর্কশ হয়ে যাচ্ছে।

ফকির বল্ল—'জরুর বাৎলে দেব। ডিব্বাটির ভেতরে যাদু-মলম আছে। সুর্মার মাফিক বাঁ-চোখে সামান্য লাগিয়ে দিলেই তোমার চোখের সামনে তামাম দুনিয়ার ধন-দৌলত চোখের সামনে ভেসে উঠবে। লেকিন খুব হুঁশিয়ার, ভুলেও যেন এ-মলম ডান-চোখে লাগাবে না। তবে তোমার দু' চোখই খতম হয়ে যাবে।' বিলকুল অন্ধা বনে যাবে, ইয়াদ রেখো বেটা।'

আমার অনুরোধে ফকির সাহাব ডিব্বাটি থেকে সামান্য মলম নিয়ে আমার বাঁ-চোখের পাতায় মাখিয়ে দিল, তারপর ডান-চোখটি বন্ধ করতে বল্ল।

আমি ডান-চোখটি বন্ধ করতে নদী, দরিয়া, পাহাড়, মরুভূমি বিলকুল আমার চোখের সামনে এক এক ক'রে দেয়ালে টাঙানো তসবিরের মাফিক ভেসে উঠতে লাগল। আমি একদম তাজ্জব বনে গেলাম। তারপর? তামাম দুনিয়ায় যত ধন-দৌলত রয়েছে তা-ও আমার চোখের সামনে দেখা দিতে লাগল। আমি সবিস্ময়ে ব'লে উঠলাম—'ইয়া আল্লাহ! দুনিয়ায় এত ধন দৌলত ছড়িয়ে রেখেছ তুমি!' দেখে দেখে আমার দিমাক গড়বড় হয়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল।

আমি ভাবলাম, এক চোখে মলম লাগানোর ফলে যদি এত সব ধন-দৌলত সামনে হাজির হয় তবে হয়ত এ মলম দু' চোখে লাগিয়ে দিলে আরও কত কি দেখতে পাব। ফকির সাহাবকে তখন ধোঁকাবাজ বলেই মালুম হতে লাগল।

শেষমেষ নিজেকে সামাল দিতে না পেরে বলেই ফেল্লাম —'ফকির সাহাব, আপনি আমার সঙ্গে দিল্লাগী করছেন। স্রেফ

ধোঁকা দেবার জন্য আপনি দু' চোখে মলম লাগাতে বারণ করলেন। ডান-চোখে মলম লাগালে আমি তামাম দুনিয়ার ধন দৌলতের মালিক বনে যেতে পারব। দিল্লাগী ছেড়ে আমার ডান-চোখেও মলম লাগিয়ে দিন।'

ফকির সাহাব তবু আমাকে বোঝাবার কোশিস করলেন। নসীব যাকে গাড্ডায় ফেলতে চাইছে সে তো কারো উপদেশ বারণ শুনতে পারে না। আমিও সে-পথই বেছে নিলাম। ডান-চোখে মলম লাগিয়ে দেয়ার জন্য জোরদার পীড়াপীড়ি শুরু ক'রে দিলাম। না দিলে হুজ্জুতি চালাব, এমনও বল্‌লাম।

ফকির অনন্যোপায় হয়ে আমার ডান-চোখের পাতায় মলম মাখিয়ে দিল।

ব্যস, একলহমার মধ্যে আমার কপাল পুড়ে গেল। আমি অন্ধা বনে গেলাম। আমি গলা ছেড়ে চিল্লাতে লেগে গেলাম। ফকির কোন সাড়াই দিল না। কে-ই বা সাড়া দেবে। সে যে আমার উটগুলোকে নিয়ে ততক্ষণে বসরাহর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে।

আমি পথের মাঝে পড়ে কাৎরাতে লাগলাম। বরাতগুণে এক দেশওয়ালি বণিক মেহেরবানি ক'রে আমাকে সঙ্গে ক'রে বাগদাদে পৌঁছে দিল।

ভিক্ষা আমার পেশা হয়ে দাঁড়াল। ফি রোজ ওই পুলের ধারে গিয়ে বসি। মেহেরবানি ক'রে কেউ কিছু দান খয়রাত করতে চাইলে অনুরোধ জানাই যেন আমার গালে এক ঘুষি বসিয়ে দেয়। আদৎ ব্যাপার করুণার বদলে ঘুষিটাই যে আমার প্রাপ্য 'জাঁহাপনা।'

অন্ধাটি তার কিস্‌সা খতম করলে খলিফা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—'নসীবের দোহাই দেয়া ঠিক হবে না। তোমার লালসাই তোমার চোখ দুটো খোয়ানোর জন্য দায়ী। যা হবার তা-তো হয়েই গেছে। এখন আর আপশোষ ক'রে কি হবে? আমি খাজাঞ্চিকে হুকুম দিচ্ছি, মক্তবের ল্যাংড়া মৌলভী আর তোমাকে যেন ফি রোজ দশ দিরহাম ক'রে সাহায্য হিসাবে দেয়। আর মহাধার্মিক বুড্ডা হাসান, নওজোয়ান ঘোড়সওয়ার আর হিন্দুস্তানের সুলতানের জামাতাকে যেন যোগ্যতা অনুসারে বকশিস প্রদান করে।

বোকা হাঁদা নওজোয়ানের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবারের কিস্‌সাটি একদম আলাদা কিসিমের। আশা করি এ-কিস্‌সাটি খুশীর সঞ্চার করবে। শুনুন জাঁহাপনা এক মহল্লায় এক মহাধার্মিক বুড্ডা বাস করত। আল্লাহ-র প্রতি তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। তার সংসারে চারজন খানেওয়ালা। সে, তার বিবি, এক লেড়কা আর এক লেড়কি। তার লেড়কাটি ছিল একদম বোকার হদ্দ। তার দিমাকে বুদ্ধি বলতে ছিটেফোটাও ছিল না। আর তার লেড়কিটি? সে ছিল প্রতিবন্ধী। শরীরের তুলনায় তার পা দুটো ছিল অস্বাভাবিক খাটো।

বুড্ডাটির ইন্তেকাল ঘটার পূর্ব মুহূর্তে সে তার বিবিকে কাছে তলব ক'রে বল্‌ল—'আমি বেহেস্তে চল্‌লাম। আমার অবর্তমানে তোমাকেই সংসারের হাল ধরতে হবে। আমার বেটাটি একদম আহাম্মক। জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে কিছুই তার দিমাকে নেই। তার কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা পাবে ব'লে মালুম হয় না। আর এক বাৎ—লেড়কাকে মোটেই শাসনের গণ্ডীর মধ্যে আটক রাখার কোশিস করবে না। তাকে তার মেজাজ মর্জি মাফিকই চলতে দেবে। যদি দেখ, তার মর্জি তাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তবু তার পথে ভুলেও যেন বাধা হয়ে দাঁড়িও না।

স্বামী বেহেস্তে চলে গেলে তার শেষ নির্দেশ জিন্দেগীর শেষ দিন পর্যন্ত সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। তারপর অপদার্থ ও নিষ্কর্মা লেড়কা-লেড়কিটিকে রেখে সে-ও দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বিদায় নিল। ইন্তেকাল ঘটার কালে সে লেড়কিকে ব'লে গেল—'বেটি, তোমার ভাইজানের ঘটে বুদ্ধি-বিবেচনা কম, তা তো জানই। আরও গুণ আছে—একদম গোয়ার গোবিন্দ। অল্পেতেই দিমাক গরম ক'রে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয়। ইন্তেকালের কালে তোমার আব্বা আমাকে বার বার হুঁশিয়ার ক'রে যান আমি যেন তার কোন কাজে প্রতিবন্ধকতা না করি। তোমার প্রতি আমারও একই হুকুম, তার কাজে কোনভাবেই বাধা সৃষ্টি কোরোনা। লেড়কিটি তার আম্মার কাছে ওয়াদা করল, তার ভাইজানের কাজে সে কোন পরিস্থিতিতেই বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না।

আম্মার ইন্তেকাল ঘটার কিছুদিন বাদে আহাম্মক লেড়কাটি তার বহিনকে বল্‌ল—'বহিন, মকান, আসবাবপত্র, সাজ পোশাক যা কিছু রয়েছে আমি আগুনে পুড়িয়ে বিলকুল ছারখার ক'রে দেব, নিয়ত করেছি।'

আঁৎকে উঠে লেড়কিটি বল্‌ল—'সে কী ভাইজান, তবে আমাদের কি গতি হবে। মাথা গুঁজব কোথায়, খাব কি?'

তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই লেড়কাটি একটি নুড়ি জ্বেলে মকানে আগুন ধরিয়ে দিল। ব্যস, কয়েক মুহূর্তের ভিতর বিলকুল পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

লেড়কিটি ব্যাপার বেগতিক দেখে কামরার কিছু সামানপত্র মহল্লার এর-ওর মকানে সরিয়ে ফেলেছিল। লেড়কাটি তা বুঝতে পেরে সে-রাত্রেই তাদের মকানেও আগুন ধরিয়ে ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌ল।

মহল্লার আদমিরা লাঠিসোটা নিয়ে তাকে একদম খতম ক'রে দেবে ব'লে চিল্লাচিল্লি ক'রে ছুটে আসছে দেখে লেড়কিটি তার ভাইজানের হাত ধরে আন্ধারে গা-ঢাকা দিল।

তামাম রাত্রি তারা হারা উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়াল। যখন ভোরের আলো ফুটে উঠল তখন দেখল, নয়া ও অজানা-অচেনা এক মুলুকে তারা হাজির হয়েছে। তারা সামনে এক চাষীর মকান দেখতে পেয়ে তার মালিককে বল্‌ল—'আমরা পরদেশী। আব্বা ও আম্মা কেউ-ই জিন্দা নেই। মেহেরবানি ক'রে আমাদের আশ্রয় দিন। আমরা আপনার কাম-কাজ ক'রে দেব। মকানটির বুড্ডা মালিক তাদের আপাদমস্তক এক লহমা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌ল—'তোমাদের এ-ইতো উমর, কি-ই কাম কাজ করতে পারবে? যাক গে, কাম কাজ কিছুই করতে হবে না। তোমাদের সমান উমরের আমার লেড়কা-লেড়কি আছে। তাদের সঙ্গে মিলেঝুলে খেল্ কুদ ক'রে দিন গুজরান ক'রে দেবে। আর ভোরে ও সন্ধ্যায় একটু-আধটু লিখা পড়া করবে, ব্যস।'

বুড্ডা চাষীর মকানে আশ্রয় পেয়ে ভাইয়া ও বহিনটি সুখেই দিন গুজরান করতে লাগল।

লেড়কিটি নিজে থেকেই সাধ্য অনুসারে কাম কাজ ক'রে, লিখা পড়াও ক'রে থাকে। লেকিন লেড়কাটি কাম কাজ তো দূরের ব্যাপার ভুলেও কিতাব ছুঁয়ে দেখে না। দিনভর ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে হল্লা-হুজ্জুতি ক'রে দিন গুজরান করে।

সে একদিন চাষীর লেড়কাদের সঙ্গে লাঠি নিয়ে বাগানে লড়াই লড়াই খেলায় মাতল।

লেড়কিটি তা শুনে চিন্তায় পড়ল। তিন তিনটি গুঁড়া বাচ্চাকে নিয়ে বাগানে লাঠি নিয়ে তার ভাইজান খেলতে গেছে। ফিরতে দেরী হওয়ায় সে চিন্তায় পড়ল। সে তার ভাইজানের কাণ্ড-কারখানা তো জানে। কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে দেয়া তার পক্ষে কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়। সে আতঙ্কিত হয়ে তাদের তল্লাশে বাগানে গিয়ে আঁৎকে উঠল। আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! ভাইজান, তিনটে বাচ্চাকেই জানে খতম ক'রে ফেল্‌লে!'

বোকা হাঁদাটি হাতের লাঠিটি শক্ত ক'রে ধরে চোখ বড়বড় ক'রে ব'লে উঠল—'কেন খতম করব না, শুনি? একে আমার প্রতিপক্ষ, তারওপর আমাকে বে-কায়দায় ফেলে দিয়েছিল। আমি ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছি। ব্যস, খতম ক'রে দিল্‌াম। লড়াইয়ের নিয়ম, শত্রুকে খতম কর, নতুবা জান দাও।'

—'ইয়া আল্লাহ! তুমি এখনও তড়পে চলেছ ভাইজান। যদি জানে বাঁচতে চাও, চল এখান থেকে ভেগে যাই। নইলে চাষী তোমাকে একদম খতম ক'রে দেবে, নয়তো ফাটকে আটক ক'রে ছাড়বে। উৎকর্ণ হয়ে মুহূর্তকাল লক্ষ্য ক'রে সে এবার বল্‌ল—'ভাইজান, ওই শোন কিসের যেন হল্লা হচ্ছে। মালুম হচ্ছে লাঠিসোটা নিয়ে একদল আদমি ধেয়ে আসছে। এখনও সময় আছে, ভাগ!'

তারা পড়ি কি মরি করে ছুটতে শুরু করল। এদিকে মহল্লার আদমিরা লাঠিসোটা ও তীর-ধনুক ও বর্শা নিয়ে তাদের তাড়া করল। লেড়কিটি বুদ্ধি খরচ ক'রে সোজা পথ ছেড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে তার ভাইয়াকে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লেগে গেল।

লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে তারা সন্ধ্যার মুখে এক বাগিচায় হাজির হ'ল। ক্রমে আন্ধার হয়ে আসতে লাগল। জন্তু-জানোয়ারের কবল থেকে জান বাঁচাতে তারা গাছের ওপর উঠে গেল।

একটু বাদে বাগিচা ঘুটঘুটে আন্ধারে চাপা পড়ে গেল। এক সময় তাদের মালুম হল, গাছের গোড়ায় কারা যেন বাৎচিৎ করছে। তারা গাছের ঝাঁকড়া ডালের আড়ালে রাতভর ঘাপ্‌টি মেরে রইল।

ভোর হ'ল। আবছা আন্ধারে তারা দেখল, চাষীটি ও তার মহল্লার কয়েকজন আদমি লাঠি, বর্শা ও তীর-ধনুক শিয়রে রেখে বেহুঁস হয়ে নিদ যাচ্ছে।

লেড়কিটি বল্‌ল—'ভাইজান, চুপি চুপি গাছ থেকে নেমে চল ভেগে যাই।'

লেড়কাটি তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'চুপ যা, এমন সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়ে হাতছাড়া করব, ক্ষেপেছিস!' তার মাথায় এক সর্বনাশা বদবুদ্ধি খেল্‌ল। এবার 'সে' বল্‌ল—'একটু অপেক্ষা কর্। দেখ্, কেমন তামাশা করি, হতচ্ছাড়াগুলোর মুখে আমি প্রস্রাব ক'রে দেব। দেখবি, কেমন মজা হয়!' সে মুহূর্তেই সে গভীর নিদে আচ্ছন্ন আদমিগুলোর মুখে ছড়ছড় ক'রে প্রস্রাব ক'রে দিল। সবাই তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে পড়ল। ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছুই মালুম করতে পারল না। ভাবল, জিন বা আফ্রিদি দৈত্যের কাজ এটি।

লেড়কিটি তার ভাইজানকে নিয়ে আরও ওপরে, একদম মগডালে উঠে গেল। গাছের ডাল দুলতে লাগল। নিচে অবস্থানরত আদমিগুলো এবার ব্যাপারটি ধরতে পেরে তীর ছুড়তে লাগল।

বুড্ডা চাষীটি বল্‌ল—'ওদের সঙ্গে কি ধরনের অস্ত্রপাতি আছে, আমাদের মালুম নেই। তার চেয়ে বরং গাছটিকেই কেটে দেয়া যাক। তখন হারামীরা ধরা দিতে বাধ্য।

ব্যস, আর দেরী নয়, এক মরদ গাছের গোড়ায় কুড়ুল চালাতে লেগে গেল।

লেড়কিটি তার ভাইজানকে বল্‌ল—'আর পালাবার ফিকির নেই। ইন্তেকাল সামনে। আল্লাহর নাম কর।'

—'হ্যাঁ রে বহিন, আমার জন্য তোরও ইন্তেকাল হয়ে যাবে!'

গাছটি পড়ো পড়ো হয়ে গেল। লেড়কিটি গলা ছেড়ে কাঁদতে লেগে গেল—'ভাইজান, কী সর্বনেশে কাজ করলে বল তো! এখন দু'জনকেই জান খোয়াতে হবে।'

হুড়মুড় ক'রে গাছটি পড়ে গেল।

আল্লাহ ভরসা। এক বক এসে ভাইয়া আর বহিন উভয়কে নিয়ে আশমানে উড়ে চল্‌ল। লেড়কিটি ডরে জড়ো সড়ো হয়ে রইল। লেড়কাটির ভয় ডরের ব্যাপার নেই। সে বকটির পেটের কাছে কাতুকুতু দিয়ে মজাক করতে লাগল। তার কাণ্ড দেখে লেড়কিটি বল্‌ল—'ভাইজান, একী আজব কাণ্ড করছ। বকটি যদি আমাদের ছেড়ে দেয় তবে তো জমিনে পড়ে জান খোয়াতে হবে! তোমার পায়ে পড়ি এসব ধান্দা ছাড়ান দাও।'

লেড়কাটি তবু থামল না।

পাখিটি তাদের নিয়ে এক পাহাড়ের গায়ে গিয়ে বসার কোশিস করল। লেকিন কি ভেবে, বসল না। ফিন তাদের নিয়েই আশমানে ডানা মেল্‌ল। এবার সে দরিয়ার উপর দিয়ে উড়ে চল্‌ল।

বোকা হাঁদাটি সুড়সুড়ি দেয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিল। পাখিটি নখের বাঁধন আলগা ক'রে তাদের ছেড়ে দিল। তারা দরিয়ার পানিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। উভয়েই সাঁতারে পটু। তাই কোনরকমে জান রক্ষা পেল। উভয়ে সাঁতরে তীরে উঠল।

রাত্রির আন্ধার নেমে এল দরিয়ার বুকে। তারা তীরে বসে রাত্রি গুজরান করতে লাগল। শুকনো ডালপালা এনে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাল। এক প্রহর রাত্রিতে অচানক বিকট গর্জন তাদের কানে এল। হাজার হাজার মোষ দল বেঁধে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এমন সময় বিশালদেহী এক ভয়ালদর্শন দৈত্য এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। দৈত্যটি আলো বরদাস্ত করতে পারে না। তাই সে পুরো অঞ্চলটি অন্ধকার ক'রে রেখেছে। সে বহুকাল এখানে সূর্য উঠতে দেয় না। সে পিঠ দিয়ে সূর্যটিকে ঢেকে রেখেছে।

দৈত্যটি রেগেমেগে আগুনটিকে নিভিয়ে দিতে চাইল। লেকিন বোকা হাঁদাটি আগুন কিছুতেই নেভাতে দেবে না। ব্যস, উভয়ের লড়াই শুরু হয়ে গেল। সে কী লড়াই! মিট্টি কেঁপে উঠতে লাগল। বোকাহাঁদা লেড়কাটি জ্বলন্ত লকড়ি নিয়ে দৈত্যটিকে আক্রমণ করল। শেষ পর্যন্ত সে-ই জিতে গেল। মিট্টি কাঁপিয়ে দৈত্যটি চিৎপটাং হয়ে জমিনে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগল। বোকাহাঁদাটি জ্বলন্ত এক লকড়ি দিয়ে দৈত্যটির চোখ অন্ধ করে দিল। বার-কয়েক কাৎড়ে সে চার হাত পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়ল।

লেড়কিটি চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌ল—'ভাইজান, তোমার শরীরে এত তাগদ আছে, জানতাম না তো। তোমার মগজে বুদ্ধি কম বটে। লেকিন বুদ্ধি-বিবেচনা একদম যে নেই তা-তো নয়।

—'আরে বহিন, দৈত্য-দানো আমার কড়ে আঙুলের সমানও হিম্মত রাখে না। নিজের চোখেই তো দেখলি, আফ্রিদি দৈত্যটিকে এক লহমায় কেমন খতম ক'রে দিল্‌াম।'

ভোর হতেই তার দৈত্য নিধনের খবরটি বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ল।

সম্রাট হুকুম দিলেন। দৈত্য নিধনকারীকে দরবারে হাজির করতে হবে।

সম্রাটের হুকুম তামিল করতে সৈন্য সামন্ত নিয়ে চারদিকে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে দরিয়ার পাড়ে এসে তাদের দেখা পেলেন। তারা তখন এক গাছের নিচে গভীর নিদে আচ্ছন্ন। সেনাপতি তাদের জাগিয়ে দিয়ে সম্রাটের হুকুমের ব্যাপারটি জানাল।

সেনাপতি বোকা হাঁদা লেড়কা ও লেড়কিটিকে দরবারে সম্রাটের সামনে হাজির করল।

সম্রাট খুশী হয়ে বোকা হাঁদা নওজোয়ানটির সঙ্গে নিজের

লেড়কির শাদী দিলেন। আর নিজে তার বহিনকে শাদী ক'রে হারেমের প্রধানা বেগম করে দিলেন। তারা পরবর্তীকালে সুখে দিন গুজরান করতে লাগল।

কিস্সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

তিন বহিনের কিস্সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, এক নগরে তিন বহিন একই মকানে, একই সঙ্গে বাস করত। তাদের আব্বা একজন হলেও মা ছিল আলাদা আলাদা। তিন বহিনই ছিল খুবসুরৎ। কারো চেয়ে কেউ কমতি নয়। তবে সূক্ষ্ম বিচার করলে বলতেই হয় ছোটো বহিনটির সুরৎ সবচেয়ে বেশী। ফিন হাতের কাজের ব্যাপারেও দু'বহিনের সঙ্গে তার আশমান জমিন ফারাক। তারা তাঁতে কাপড়া বুনে রুটির যোগাড় করত। ছোটা বহিন সুরৎ ও কাপড়া বোনা প্রভৃতি ব্যাপারে অন্য দু' বোনের চেয়ে সেরা ছিল ব'লে বড়া দু'জন ছোটা বহিনকে হরবখত ঈর্ষা করে।

এক সকালে ছোটা বহিনটি হাট থেকে একটি দিল্‌বাহার ফুলদানি খরিদ ক'রে নিয়ে এল। বড়া বহিনটি মুখ বিকৃত করে তম্বি করতে লাগল—'মেহনতের অর্থকড়ি খরচা ক'রে এত দাম দিয়ে এটি খরিদ করা কোনই দরকার ছিল না। শখ-আহ্লাদ একচেটিয়া ধনীদের ব্যাপার। খেটে খাওয়া আদমিদের এত শখ মানায় না।'

ছোটা বহিনটি তার বহিনজীর গোস্সায় পাত্তা না দিয়ে গুলাব ফুল দিয়ে ফুলদানিটি সাজিয়ে টেবিলের ওপর খোলামেলা এক জায়গায় রেখে দিল।

আদতে ফুলদানিটি এক আজব যাদুবস্তু। তার সামনে দাঁড়িয়ে ঝলমলে সাজপোশাক বা হরেক কিসিমের খানাপিনা যা চাওয়া যাবে তা-ই মিলবে। ছোট বহিন ব্যাপারটি তাঁর বহিনজীদের কাছে গোপন রাখল। এর কারণ, তারা জানলে হিংসায় কলিজা জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাবে।

বড়া দু'বহিন গভীর রাতে যখন নাক ডাকিয়ে নিদ যায় তখন ছোটা বহিনটি দরওয়াজা-জানালা বন্ধ করে ফুলদানিটির কাছে থেকে খানাপিনা ও বাহারী সাজপোশাক চেয়ে নেয়। পেটপুরে খানা খায়। শেষে বাহারী সাজপোশাক চাপিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সুরৎ দেখে খুশীতে মশগুল হয়ে ওঠে। ভোর হওয়ার আগেই ব'লে—'এগুলো ফিরিয়ে নাও।' ব্যস চোখের পলকে বিলকুল হাফিস হয়ে যায়। দিনে সে গরীব বটে। লেকিন সে রাত কী বেগম-শাহজাদী!

সে-মুলুকের সুলতানের ঘোষক মহল্লায় মহল্লায় ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে তাঁর সুলতানিয়তের আদমিদের নিমন্ত্রণ করল।

বড়া বহিনটি তার সবচেয়ে ছোটা বহিনকে বল্‌ল—'তোর গিয়ে কাজ নেই বহিন, আমরা দু'জন গিয়ে নিমন্ত্রণ সেরে আসি। তুই বরং মকানে থেকে দেখ ভাল কর।'

ছোটা বহিন ভাল-মন্দ কিছুই বল্‌ল না।

দু' বহিন সাজপোশাক পরে সুলতানের প্রাসাদে চলে গেল। বড়া বহিনরা চলে গেলে ছোটা বহিন ফুলদানীর কাছ থেকে জরির কাজ করা মখমলের পোশাক আর হীরা-জহরতের গহনাপত্র চেয়ে নিল। সেগুলো গায়ে চাপিয়ে সে বিলকুল শাহজাদী সেজে গেল। এবার সে গাধার পিঠে চেপে সুলতানের প্রাসাদের সদর-দরওয়াজায় হাজির হ'ল।

ছোটা বহিনটি গটমট ক'রে প্রাসাদে ঢুকলে সবাই সরে গিয়ে তাকে পথ ক'রে দিল। তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে সবাই ভাবতে লাগল। নির্ঘাৎ কোন আমীর-ওমরাহের খুবসুরৎ লেড়কি।

ঝলমলে সাজ-পোশাক ও হীরা-জহরতের গহনা পরিহিতা ছোটা বহিনকে দেখে তার বাকী দু'বহিনরা তাকে চিনতেই পারল না।

খানাপিনার পাট চুকে গেলে নাচা-গানার মজলিশের বন্দোবস্ত হ'ল। ছোটা বহিনটি আর প্রাসাদে রইল না। সে সোজা নিজেদের মকানে ফিরে এল। বাকী দু' বহিন নাচা-গানা দেখে তবে ফিরবে। ছোটা বহিনটিকে সাজ-পোশাকগুলি ফুলদানীর কাছে জমা দিতে হবে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, বাঁ-পায়ের মলটি কোথায় যেন পড়ে গেছে। ব্যাপারটি নিয়ে তেমন ভাবল না, চাইলেই তো ফুলদানিটি দিয়ে দেবে।

শাহজাদা ফিরোজ ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। আস্তাবলে এসে দেখল, কয়েকজন সহিস একটি মল নিয়ে জটলা করছে।

শাহজাদা ব্যাপারটি জানতে চাইলে যার হাতে মলটি রয়েছে সে থতমত খেয়ে বল্‌ল—'হুজুর, আমার কোনই কসুর নেই। আমি স্রেফ পড়ে পেয়েছি। এর বেশী কিছুই জানি না।'

শাহজাদা মলটি হাতে নিয়েই তার মালুম হ'ল কোন না কোন সুলতান-বাদশাহের লেড়কির পা থেকে হীরা-জহরৎ খচিত এ-মলটি খসে পড়েছে। সে ভাবল, এমন মূল্যবান ও বাহারী মল যার পায়ে শোভা পেত সে না জানি কতই অপরূপা! তাকে একবার চোখে দেখতে, বুকে পেতে তার দিল্ উতলা হয়ে ওঠে। শাহজাদা প্রাতঃভ্রমণ স্থগিত রেখে নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মহব্বতের আগুন তার বুকের মধ্যে ধিক্‌ধিক্ ক'রে জ্বলতে লাগল।

শাহজাদা যে মহব্বতের জ্বরে ভুগছে এ-ব্যাপারটি সুলতানের কানে গেল। তিনি শাহজাদার হৃত হাসি-খুশী ফিরিয়ে আনার জন্য তার মেহেবুবার তল্লাশ করার জন্য তার সুলতানিয়তের সর্বত্র চর পাঠালেন।

বুড্ডা উজির বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার মালুম হচ্ছে, শাহজাদীর শাদীতে যেসব জেনানা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল এ-মলটি জরুর তাদেরই কারো না কারো হবে।'

উদভ্রান্ত সুলতান বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা, তা-ই যদি ধারণা হয়ে থাকে তবে তাদেরই তল্লাশ করার বন্দোবস্ত করুন।'

এতে সমস্যা দেখা দিল। সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ-ই বল্‌ল না—'মলটি আমার।'

বুড্ডা উজিরের মতলব ভেস্তে গেল। ফয়দা কিছুই হ'ল না।

ভেবে চিন্তে উজির এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার সুলতানিয়তের সর্বত্র জেনানা-গুপ্তচর নিয়োগ করুন। তারা মকানে মকানে ঢুঁড়ে শাহজাদার মেহেবুবার তল্লাশ করবে।'

সুলতান এবারও বুড্ডা উজিরের মতলব অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে চারদিকে জেনানা-গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন।

সুলতানের জেনানা-গুপ্তচররা চারদিকে তল্লাশী চালাতে চালাতে এক সময় সে-তিন বহিনের মকানে হাজির হ'ল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটা বহিনটির পায়ের গোছা সবচেয়ে সরু লক্ষ্য ক'রে তারা সন্দেহ করল, মলটি নির্ঘাৎ তার পা থেকেই খসে পড়েছে। জেরা করতে করতে তারা তাকে স্বীকার করাতে বাধ্য করল।

ছোটা বহিনটি বল্‌ল—'শাদীর খানাপিনা সেরে প্রাসাদ ছেড়ে আসার সময় তারই পা থেকে মলটি খসে পড়েছিল। এবার জেনানা গুপ্তচররা তাকে খাতির যত্ন করে প্রাসাদে সুলতানের সামনে হাজির করল।

খুশীতে ডগমগ হয়ে সুলতান বল্‌লেন—'বেটি, আমার একমাত্র লেড়কার সঙ্গে তোমার শাদী দিতে চাই। তুমি এতে গররাজী নও তো?'

ছোটা বহিনটি লাজে শরমে মুখ লাল ক'রে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

সুলতানের প্রাসাদে শাদীর সানাই বেজে উঠল। মেহমানদের উপস্থিতিতে প্রাসাদটি একদম গমগম করতে লাগল। সবার বুকেই খুশী, শাদীর আমেজ।

এদিকে বাকী দু'বহিন ছোটা বহিনের অচানক নসীব ফিরে যাওয়ায় হিংসায় জ্বলেপুড়ে খাঁক হতে লাগল। সহজ-সরল ছোটা বহিনটি তাদের বল্‌ল—'সুলতানের এত বড় প্রাসাদ। বাঁদী ও নফর-নফরানীরা সবাই অপরিচিত। সেখানে আমি অচানক হাজির হয়ে একদম বে-সামাল হয়ে পড়ব। মালুম হবে, আমি বুঝি দরিয়ায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। বহিনজী, তোমরাও আমার সঙ্গে প্রাসাদে চল। তিন বহিন এক সঙ্গে থাকব। এতে সুলতান ও শাহজাদা খুশীই হবেন।'

হিংসায় জর্জরিতা দু'বহিন ভেতরে ভেতরে এরকমই চাচ্ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

সাড়ম্বরে শাদী-পর্ব চুকে গেল।

শাদীর খুশীতে ছোটা বহিনটি আজব যাদু-ফুলদানীটির ব্যাপার তার দু' বহিনজীর কাছে ফাঁস ক'রে দিল। আর সে-তো শাহজাদার বিবি বনেই গেছে। তার পোশাক ও হীরা-জহরতের আভরণের তো আর অভাব রইল না। তাই সে খুশী হয়ে আজব যাদু-ফুলদানীটি বাকী দু' বহিনকে দিয়ে দিল। ব্যস, এতেই তার কপাল পুড়ল। নসীবের ফেরে পড়ল।

একদিন সে হামাম থেকে গোসল সেরে বহিনজীদের সামনে এসে বসল। তারা আদর-সোহাগ ক'রে তার চুল বেঁধে দিতে লাগল। চুলে কাঁটা গেঁথে গেঁথে তাকে সাজিয়ে দিতে থাকলে সে অচানক এক ঝুটিওয়ালা বুলবুলি পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সে অদূরবর্তী একটি গাছের ডালে বসে প্রাসাদের দিকে মুখ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের পানি ঝরাতে লাগল। বাকী দু' বহিন খুশী হয়ে প্রাসাদ ছেড়ে নিজেদের মকানে ফিরে এল। ছোটা বহিনের দেমাক ভাঙতে পেরেছে এতেই তারা খুশী।

সন্ধ্যার কিছু পরে শাহজাদা তার কামরায় ফিরে এসে দেখে তার বিবি নেই। কামরা খালি। সঙ্গে সঙ্গে নফর-নফরানীরা প্রাসাদে তন্নতন্ন ক'রে তল্লাশ করল। পাত্তা মিল্‌ল না।

শাহজাদা বিবির অদর্শনে মুখ গোমড়া করে নিজের কামরায় দরওয়াজা বন্ধ ক'রে শুয়ে রইল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে শাহজাদা ফিরোজ দেখে জানলার ধারের একটি ফুলগাছের ডালে এক বুলবুলি পাখি তার দিকে মুখ ক'রে, অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। আর মুখে হরেক কিসিমের আওয়াজে তাকে যেন কি বুঝাবার কোশিস করে। পাখিটির ওপর তার কেমন মায়া পড়ে যায়। শাহজাদা হাত বাড়িয়ে তাকে আদর করে। সে মাথা নিচু করে আদর-সোহাগ নেয়। ডরে উড়ে যায় না। পাখিটিকে পেয়ে শাহজাদার দিল্ থেকে বিবির শোক অনেকাংশে লাঘব হয়ে যায়।

একদিন শাহাজাদা পাখিটির ঝুটিতে হাত বুলাতে বুলাতে হাতে শক্ত কোন এক অজ্ঞাত বস্তুর স্পর্শ পেয়ে চমকে ওঠে। তল্লাশ করে দেখে, ছোট্ট একটি সোনার কাঁটা। তাজ্জব বনে যায়। একটি নয়, আট-আটটি কাঁটা।

শাহজাদা সতর্কতার সঙ্গে পাখিটির মাথা থেকে কাঁটাগুলি তুলতে লাগলেন। সর্বশেষ কাঁটাটি টেনে তুলতেই পাখিটি থেকে তার বিবি নিজ অবয়ব ফিরে পেল। ব্যাপার দেখে শাহজাদা তো মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়।

বড়া দু' বহিন আজব যাদু-ফুলদানীটির কাছ থেকে সোনার

কাঁটা আটটি চেয়ে নিয়েছিল। তা দিয়েই তারা ছোটা বহিনটির সর্বনাশ সাধন করেছিল।

এদিকে শাহজাদা তার হৃত বিবিকে ফিরে পেয়ে খুশীর দরিয়ায় ভাসতে লাগল। বিবিকে আদর-সোহাগ আর সম্ভোগের মধ্য দিয়ে পরবর্তী দিনগুলি গুজরান করতে লাগল। বাকী দু' বহিনের দূর থেকে ছোটা বহিনের সুখ-ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষায় জর্জরিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

শাহজাদী ও তার পাঁঠা স্বামী

জানালা দিয়ে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভোর হতে এখনও ঢের বাকী। এবার আপনার দরবারে একদম আলাদা স্বাদের একটি কিস্‌সা পেশ করছি— হিন্দুস্থানের এক প্রদেশে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক সুলতান রাজত্ব করতেন। তার কোন লেড়কা ছিল না। তিনটি খুবসুরৎ লেড়কির আব্বা ছিলেন তিনি। লেড়কিদের দিয়েই তিনি লেড়কার শখ মেটাতেন। সুলতানের বিবি শাহবানুও খুবসুরৎ ছিলেন।

সুলতান এক রাত্রে শুয়ে বিবিকে আদর সোহাগ করতে করতে বল্‌লেন—'আমাদের তিন তিনটি লেড়কিই নওজোয়ান বনে গেছে। এবার তাদের এক এক ক'রে শাদীর বন্দোবস্ত করা দরকার। এমন লেড়কার সঙ্গে তাদের শাদী দিতে হবে যাতে তারা সুখ-শান্তিতে জিন্দেগী কাটাতে পারে।'

তাঁর বিবি শাহবানু বল্‌লেন—'তার চেয়ে বরং তারা নিজেদের পছন্দ মাফিক লেড়কাকেই স্বামী হিসাবে বেছে নিক।'

বিবির পরামর্শ অনুযায়ী সুলতান তার লেড়কিদের স্বয়ম্বরের আয়োজন করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে দুনিয়ার বিভিন্ন মুলুক থেকে আমীর-ওমরাহ, সুলতান-বাদশাহ ও শাহজাদারা সুলতানের দরবারে হাজির হলেন।

প্রাসাদের ওপরের কামরার জানালার ধারে শাহজাদীরা নিজেদের প্রিয়জনটিকে বাছাই করার কাজে লেগে গেল। বার কয়েক পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক আমন্ত্রিতদের মুখে নজর চালিয়ে দু' বহিন দু' জনের গায়ে রুমাল ছুঁড়ে মারল। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া গেল, তারা তাদের পছন্দ্ মাফিক স্বামী নির্বাচন ক'রে নিয়েছে।

সবচেয়ে ছোটা শাহজাদীর নজর তখনও শাদীর পাত্রদের মুখের ওপর বার বার চক্কর মেরে চলেছে। একটু বাদে সে-ও হাতের রুমালটি এক নওজোয়ানকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মারল।

উপস্থিত সবাই সমস্বরে চিল্লিয়ে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! একী সর্বনেশে কাণ্ড ঘটে গেল!'

আদতে ছোটা শাহজাদীর রুমালটি ওপর থেকে নিচে পড়ার সময় অচানক দমকা বাতাস পেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল উঠোনের এককোণে বেঁধে রাখা একটি ইয়া তাগড়াই পাঁঠার গায়ে।

একদম অপ্রত্যাশিত কারবার দেখে সুলতান মুষড়ে পড়লেন, তিনি শাহজাদীকে বল্‌লেন—'বেটি, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি নতুন ক'রে রুমাল ছোঁড়।'

শাহজাদী তা-ই করল। কিন্তু নসীব খণ্ডাবে কে! রুমালটি পর পর তিনবারই গিয়ে ওই তাগড়াই পাঁঠাটির গায়েই গিয়ে পড়ল।

আজব ব্যাপারটিতে সুলতান একদম মুষড়ে পড়লেন। ছোটা শাহজাদী কলিজা শক্ত ক'রে আব্বার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাঁকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বল্‌ল—'আব্বা, ঝুটমুট নিজেকে তকলিফ দিয়ে কি করবেন। খোদাতাল্লা-র হয়ত এ-ই মর্জি। আমি পাঁঠাটিকেই স্বামীত্বে বরণ ক'রে নেব। আপনি ভাববেন না। আমি একে পেয়েই

খুশী হতে পারব।'

উপায়ান্তর না দেখে সুলতান একে খোদাতাল্লা-র মর্জি বলেই মেনে নিলেন।

শুভ দিনে শুভ মুহূর্তে সুলতান কাজী ডেকে লেড়কিদের নিজ নিজ নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে শাদী দিলেন।

শাদীর পাট চুকে গেলে তিন লেড়কিকে আলাদা আলাদা বাসর-ঘরে দিয়ে দেয়া হ'ল।

ছোটা শাহজাদী বাসর ঘরের দরওয়াজা বন্ধ ক'রে তার স্বামী পাঁঠাটিকে ধরে সামান্য ঝাঁকুনি দিতেই সে চোখের পলকে এক খুবসুরৎ নওজোয়ানে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সে বল্‌ল —'শাহজাদী, আমি আদৎ পাঁঠা নই। বরাতগুণে অভিশম্পাতের ফলে আমি পাঁঠা বনে রয়েছি। আমার একটিই অনুরোধ, মেহেরবানি ক'রে এ-গোপন ব্যাপারটি কারো কাছে ফাঁস করো না। যদি তা কর তবে হয়ত তামাম জিন্দেগীর জন্য আমাকে হারাতে হবে, ইয়াদ রেখো।'

—'ওয়াদা করছি, কারো কাছেই ফাঁস করব না। লেকিন কে তুমি? তোমার আদৎ পরিচয় কি? কি করেই বা তুমি পাঁঠার অবয়ব ধারণ করেছ?'

—'মেহেবুবা, আমার আদৎ পরিচয় বলার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি কোরো না। আর কেনই বা আমার কপাল পুড়েছে তা-ও এখন তোমার কাছে ফাঁস করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র এটুকু জেনেই খুশী থাক, ক্ষমতা ও ধন দৌলতের দিক থেকে আমি তোমার আব্বার চেয়ে কোনদিক থেকেই খাটো তো নই-ই বরং সবদিক থেকেই বড়। তোমার বাকী দু'বোনের শাদী যাদের সঙ্গে হয়েছে তারা আমার চেয়ে তো কোনদিক থেকেই বড় নয়।'

তুমি হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবে আমি বহুৎ দিন যাবৎ তোমাদের প্রাসাদের ধার-কাছ দিয়ে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি। আদতে তোমাকে প্রথম দেখার মুহূর্তেই তুমি আমার নজরে লেগে গেছ। তোমাকে দূর থেকে মহব্বতের জালে জড়িয়ে ফেলেছি। আল্লাতাল্লা-র কাছে আর্জি জানিয়েছি—তোমাকে যেন বিবি রূপে বুকে পাই। তিনি আমার আর্জি শুনেছেন। মঞ্জুরও করেছেন। আমার বুকে তোমাকে এনে দিয়েছেন। আমাদের মহব্বতের ডুরি যাতে চিরস্থায়ী হয় তার জন্য তোমাকে আমার কাছে ওয়াদা করতে হবে। কারো কাছেই আমার আদৎ পরিচয় ফাঁস করবে না।'

—'আমি ওয়াদা করছি, আমার মৌউত এসে সামনে দাঁড়ালেও আমি তোমার আদৎ পরিচয় কারো কাছে ফাঁস করব না। সবার চোখে তুমি পাঁঠা হয়েই থাকবে।'

তারপর তারা আলিঙ্গন, দলন, পেষণ, চুম্বন ও সম্ভোগ সুখের মাধ্যমে বাকী রাত্রি গুজরান ক'রে দিল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই ছোটা শাহজাদীর বর ফিন পাঁঠার অবয়ব ধারণ করল।

প্রচলিত রীতি অনুসারে বেগম শাহাবানু এক এক ক'রে দুই লেড়কির বাসরঘর ঘুরে শেষমেষ ছোটা লেড়কির কামরায় এলেন। তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন, সে নির্ঘাৎ রাতভর চোখের পানি ঝরিয়েছে। লেকিন কামরায় পা দিয়েই তিনি তাজ্জব বনে যান। দেখেন, সে একদম হাসিখুশী।

বেগম শাহবানু লেড়কিকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌লেন—'বেটি, আমি আরও ভেবেছি, চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে তুই বিছানা নিয়েছিস। নতুবা শোক-জ্বালা সইতে না পারায় তোর ইন্তেকালই ঘটে গেছে।'

ছোটা লেড়কি আম্মাকে জড়িয়ে ধরে খুশীতে ডগমগ হয়ে বল্‌ল—'আম্মা, পাঁঠাটিকে শাদী ক'রে আমি খুশীই হয়েছি। ঝুটমুট আমার জন্য ভেবে আকুল হয়ো না। আমি দিব্যি আছি।'

বেগম শাহবানু কি ভাবলেন, তিনিই জানেন। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামরা ছেড়ে চলে গেলেন।

শাদীর কয়েক মাস বাদে সুলতান এক আড়ম্বরপূর্ণ পোলো প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। তাঁর দুই জামাতা খেলায় অংশগ্রহণ করবে। সুলতান ছোটা জামাতা পাঁঠাটিকে আর এর মধ্যে জড়ালেন না।

পোলো খেলা শুরু হ'ল। তামাম সুলতানিয়তের উজির, নাজির, আমীর, ওমরাহ ও অন্যান্য বহুৎ সম্মানীয় আদমিরা খেলা দেখতে ময়দানে জড়ো হয়েছেন। খেলা যখন পুরোদমে চলছে ঠিক তখনই এক খুবসুরৎ ও সুঠামদেহী নওজোয়ান পোলোর দণ্ডহাতে ময়দানে হাজির হ'ল। সে হাতের দণ্ডটিকে এমন অত্যাশ্চর্য কৌশলে চালাতে লাগল যা দেখে উপস্থিত দর্শকরা একদম তাজ্জব বনে গেল। কয়েক লহমার মধ্যেই সুলতানেরই বাকী দুই জামাতা তার দণ্ডের ঘায়ে জমিনে পড়ে কাৎরাতে লাগল।

আদতে অজ্ঞাত পরিচয় এ-নওজোয়ানটিই সুলতানের ছোটা লেড়কির স্বামী রামপাঁঠা। সে-ই নিজ মূর্তি ধারণ করে পোলোর ময়দানে হাজির হয়েছে।

এদিকে ব্যাপার দেখে সুলতানের ছোটা লেড়কি খুশীতে আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড়। তার মুখের হাসি যেন লেগেই রয়েছে।

সুলতান তাঁর ছোটা লেড়কির আচরণে একদম ক্ষেপে লাল হয়ে গেলেন।

তৃতীয় দিনের লড়াই শুরু হ'ল। সর্বশেষ লড়াই। এদিনও সে-ই লড়াইয়ে জিতল। ছোটা লেড়কিটি আর নিজেকে সামলে সুমলে রাখতে পারল না। দোতলার বারান্দা থেকে ইয়া পেল্লাই

একটি ফুলের মালা তার গলায় পরিয়ে দিল।

তার আচরণে সুলতানের দিমাকে খুন চড়ার জোগাড় হ'ল। তিনি গোস্সায় কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—'হতচ্ছাড়ি লেড়কি আবার বে-শরমের মাফিক কাণ্ড করছে। নিজের মর্জিতে এক পাঁঠাকে শাদী ক'রে নিজেই নিজের জিন্দেগী বরবাদ করেছে। আর এখন পরপুরুষের দিকে তার লালচ! বে-শরম বেতমিস কাঁহিকার! আমি একে নিজে হাতে কোতল করব। কাঁপতে কাঁপতে তিনি লেড়কির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চুলের গোছা ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে তাকে মেঝেতে ফেলে দিলেন। গর্জে উঠলেন—'তোর এত বড় বুকের পাটা! পরপুরুষকে মালা দিয়ে সোহাগ দেখাচ্ছিস! তোকে খতম ক'রে তবে আমি পানি স্পর্শ করব!' সুলতান দু' হাতে তার গলা টিপে ধরলেন। লেড়কিটি কেঁদে বলতে লাগল—'আব্বা,

তুমি মিছেই আমার ওপর গোস্সা করছ! আমি নিজের স্বামী ছাড়া পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তো দূরের ব্যাপার মুহূর্তের জন্যও কারো দিকে ফিরেও তাকাই নি। যাকে পরপুরুষ ভেবে তুমি আমার ওপর জুলুম চালাচ্ছ, আদতে সে তোমার ছোট জামাতা, আমার নিকা করা স্বামী। সে পাঁঠার অবয়ব ধারণ ক'রে দিনভর কাটায় বটে। আদতে সে জানোয়ার নয়। সে আদমির অবয়ব ধারণ ক'রে রাতভর আমার সঙ্গে কাটায়। ফিন ভোর হওয়ার আগেই পাঁঠার অবয়ব ধারণ করে। আদতে সে বিরাট এক সুলতানের লেড়কা, শাহাজাদা।'

সুলতান, বেগম শাহবানু আর তাঁদের বাকী দু' লেড়কি তো ছোটা লেড়কির বক্তব্য শুনে বিলকুল থ বনে গেল। এমন আজব বাৎ শুনলে তো তাজ্জব বনার ব্যাপারই বটে।

এ-ঘটনার পর থেকে পাঁঠাটিকে আর কেউ-ই দেখতে পেল না। ছোটা লেড়কি তার অদর্শনে একদম মুষড়ে পড়ল।

লেড়কির হালৎ দেখে সুলতান অস্থির হয়ে পড়লেন। চারদিকে চর পাঠালেন পাঁঠাটির তল্লাশ করার জন্য।

সুলতানের ছোটা লেড়কির এবার মালুম হ'ল, সে স্বামীর কাছে ওয়াদা করেছিল তার আদৎ পরিচয় কারো কাছে ফাঁস করবে না। দায়ে পড়ে হলেও সে তার আব্বার কাছে সে-ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। সে কারণেই তার স্বামী পাঁঠাটি অন্তর্হিত হয়েছে।

অসহনীয় দুঃখ-তাপ সইতে না পেরে একদিন সে সবার চোখের আড়ালে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। দু' দিন বাদেই সে ফিন প্রাসাদে ফিরে এল।

সে এবার গৃহত্যাগের পরিকল্পনা বাতিল ক'রে নগরের কেন্দ্রস্থলে একটি হামাম তৈরির পরিকল্পনা নিল। এমন এক হামাম তৈরি করবে যার তুল্য হামাম তামাম হিন্দুস্তান ঢুঁড়ে দ্বিতীয় আর একটিও মেলে না।

বহু অর্থ ব্যয়ে অনন্য এক হামাম তৈরি করা হ'ল। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচার ক'রে দেয়া হ'ল—ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই এ নব নির্মিত হামামে গোসল করার অধিকার পাবে। আর এখানে গোসল করতে অর্থকড়ি দিতে হবে না। তবে হাঁ একটি শর্ত থাকবে—যে-জেনানা এ-হামামে গোসল করতে আসবে তাকে তার জিন্দেগীর সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা ব্যক্ত করতে হবে। আর জিন্দেগীতে যে দুঃখ-দুর্দশার কবলে পড়ে নি সে হামামটিতে গোসল করার অধিকার পাবে না।

সুলতানের ছোটা লেড়কি ফি-রোজ হামামে হাজির হয়। দিনভর সেখানে থেকে হামামের গোসলার্থীদের দুঃখ-বেদনার কিস্সা শোনে। কোন কিস্সাই তার নিজের দুঃখ-বেদনার কিস্সাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

কিছুদিন বাদে এক বুড্ডি হামামে গোসল করতে এল। সে বল্ল—'শাহজাদী, আমার বুকভরা দুঃখ-দুর্দশা আর হতাশার কিস্সা কতই বা শুনবেন। তার চেয়ে আমার জিন্দেগীর শেষ দুঃখের

কিস্‌সাটি সংক্ষেপে বলছি, শুনুন—'ঘটনাটি একদম সদ্য ঘটেছে। গতকাল, তাই মালুম হচ্ছে না কতখানি মর্মাহত হওয়া উচিত, বা উচিত নয়। সে যা-ই হোক, ব্যাপারটি আপনার দরবারে পেশ করছি শাহজাদী, আপনিই যা হোক বিচার-বিবেচনা করবেন। আমার গায়ে যে নীল কামিজটি রয়েছে এটিই আমার শেষ সম্বল। এটি ফেঁসে গেলে অন্য আর একটি বানানোর অর্থ আমার নেই। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। একটি কামিজে আমি কি ক'রে শরম নিবারণ করছি, ঠিক কি না? ময়লা-গন্ধা হবে। ধোয়ার দরকার পড়বে, সাচ্চা বটে। বলছি তবে শুনুন—গভীর রাতে, দরিয়ার কিনারে গিয়ে একদম উলঙ্গ হয়ে কামিজটি পানিতে ধুয়ে দেই। দরিয়ার দমকা বাতাসে রাতভর এটি শুকিয়ে যায়। ভোর হওয়ার আগেই ফিন গায়ে চাপিয়ে শরম ঢাকি।

অন্য রাত্রের মাফিক গত রাত্রেও আমি সাবুন দিয়ে কামিজটি ধুয়ে দেবার জন্য দরিয়ার ধারে গিয়েছিলাম। এটি ধুয়ে দিয়ে এক পাথরের চাঁইয়ের ওপর মেলে দিলাম। আর আমি একদম বিবস্ত্র হয়ে পাথরটির আড়ালেই ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে রইলাম। এমন সময় আবছা আন্ধারে একটি খচ্চরকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ব্যস, ঝট ক'রে কামিজটি গায়ে চাপিয়ে নিলাম। আমার ডর ছিল খচ্চর যখন আসছে তখন নির্ঘাৎ তার পিছনে তার মালিকও রয়েছে। যদি আমাকে উলঙ্গ দেখতে পায়, কী শরম কী বাৎ!

খচ্চরটি আরও এগিয়ে এলে দেখলাম তার পিঠে এক বোঝা ভেড়া আর বকরির ছাল। সে বেমালুম আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তার পিছনে কোন আদমিকেই দেখতে পেলাম না। তাজ্জব বনে গেলাম। খচ্চরটির পিছু নিলাম। সে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় একটি ছোট্ট পাহাড়ের গায়ে এসে থামল। এবার একটি পা চালিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। আরও তাজ্জব বনে গেলাম যখন দেখলাম জমিন দু'ভাগ হয়ে গেল। সেখান দিয়ে খচ্চরটি বেমালুম হাফিস হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

কয়েক কদম এগিয়ে খচ্চরটি একটি গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করেই চল্‌লাম।

খচ্চরটি এবার এক সুবিশাল প্রাসাদের সামনে দাঁড়াল। প্রাসাদটির কারুকার্য দেখে আমার চোখ ট্যাঁড়া হয়ে যাবার জোগাড়। তার ভেতরে ঢুকে তাক্ লেগে গেল। মণি-মাণিক্য খচিত তার প্রতিটি থাম্বা। আসবাবপত্রও বহুমূল্য। একটি কামরার ভেতরে ঢুকে দেখি টেবিলে হরেক কিসিমের বাদশাহী খানা সাজানো রয়েছে। কী যে তাদের রঙ আর খুসবু ব'লে বুঝানো সম্ভব নয়। আমি খানা বোঝাই একটি রেকাবির দিকে হাত বাড়ালাম। ব্যস, সঙ্গে অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর কানে এল—'হুঁশিয়ার! স্পর্শ করবে না। আমাদের মালকিনের জন্য এসব খানা সাজিয়ে রাখা আছে।' দু'কদম এগিয়ে রেকাবি থেকে একটি রুটি তোলার কোশিস করলে ফিন সে-অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর কানে এল—'হুঁশিয়ার! স্পর্শ করবে না। আমাদের মালকিনের জন্য এসব খানা সাজিয়ে রাখা আছে।'

আমি ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। সফেদ পাথরের বিশাল প্রাসাদ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে কিসিমের মণি-মুক্তা খচিত কামরা একমাত্র তোমার আব্বাই বানাতে পারেন। হয়ত বা আছেও। সুবিশাল কামরাটিতে সারিবদ্ধভাবে চল্লিশটি বহুমূল্য মসনদ সাজানো। আমি সবিস্ময়ে চারদিকে নজর ঘুরিয়ে সব দেখছি ঠিক তখন চল্লিশটি পাঁঠা কামরার ভেতরে ঢুকে এল। এক একটি এক এক মসনদে বসে পড়ল। এবার তারা এক সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। ব্যস, পাঁঠাগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি খুবসুরৎ নওজোয়ানে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কী তাজ্জব কী বাৎ, ভেবে দেখুন।

যে-লেড়কাটি সবচেয়ে বড় ও জমকালো তখ্‌তে বসে রয়েছে তাকে অচানক আকুল হয়ে কাঁদতে দেখলাম। সে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'মালকিন, আমাদের ফেলে আপনি কোথায় গেলেন। আপনি আমাদের কাছে ফিরে আসুন।'

কিছুক্ষণ বিলাপ পেড়ে কান্নাকাটি করার পর তারা তখ্‌ত থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। পরমুহূর্তেই তিনবার মাথা ঝাঁকালো। তারা ফিন পাঁঠার অবয়ব ফিরে পেল।

ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি একদম তাজ্জব বনে গেলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাসাদ ছেড়ে, গুহা দিয়ে হামামের দিকে ছুটতে লাগলাম। আমার মতে আমার জিন্দেগীতে যা কিছু করুণ ঘটনা ঘটেছে তাদের মধ্যে এটিই করুণতম ঘটনা।'

শাহজাদী বিস্ময় মাখানো নজরে বুড্ডিটির দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ তার কিস্‌সা শুনছিল। এবার সে নিঃসন্দেহ হ'ল, জমকালো তখ্‌তে যে পাঁঠাটি বসে আকুল হয়ে কান্নাকাটি করছিল সে-ই তার অন্তর্হিত স্বামী।

শাহজাদী বুড্ডিটির কাছে আকুল নিবেদন রাখল—'তুমি মেহেরবানি ক'রে একবারটি আমাকে সে-গুহাভ্যন্তরের প্রাসাদটিতে নিয়ে চল। আমি জিন্দেগীভর তোমার নোকরানী হয়ে থাকব।'

শাহজাদীকে নিয়ে বুড্ডিটি দরিয়ার কিনারে সে-পাথরের চাঁইটির কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। যথা সময়ে চামড়ার বোঝা পিঠে নিয়ে সে-খচ্চরটি তাদের গা-ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগল। একই উপায়ে খচ্চরটি সে-বিশালায়তন প্রাসাদের সামনে হাজির হ'ল। শাহজাদীকে নিয়ে বুড্ডিটিও তাকে অনুসরণ ক'রে প্রাসাদটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

খানাপিনার কামরাটিকে পাশ কাটিয়ে বুড়ি এবার শাহজাদীকে নিয়ে সুসজ্জিত বিশালায়তন সে-কামরাটিতে গেল। চল্লিশটি মণিমুক্তা খচিত সোনার তখ্ত একইভাবে সাজানো। শাহজাদী সবিস্ময়ে কামরাটির চারদিকে নজর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। একটু বাদেই চল্লিশটি পাঁঠা কামরাটির মধ্যে ঢুকে এল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে তাগড়াই যে-পাঁঠাটি সে গিয়ে জমকালো তখ্তটিতে বসল। বুড়িটি আড়ালে দাঁড়িয়ে শাহজাদীর ওপর নজর রেখে চল্‌ল।

শাহজাদীর আকাঙক্ষা পূর্ণ হ'ল। সবচেয়ে জমকালো তখ্তে যে-পাঁঠাটি বসে ছিল শাহজাদী তার দিকে এগিয়ে গেল। চিনতে পারল তার হারানো স্বামীকে। পাঁঠাটিও তার বিবিকে চিনতে পেরে তখ্ত থেকে নেমে তার কাছে এগিয়ে এল।

বুড়িটি শাহজাদী ও তার স্বামীর পুনর্মিলন ঘটাতে পেরে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করল।

স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন পাতালপুরীতে কাটিয়ে শাহজাদী তাকে নিয়ে সুলতানের প্রাসাদে ফিরে এল।

এবার থেকে শাহজাদী তার পাঁঠা স্বামীকে নিয়ে সুলতানের প্রাসাদে মহা খুশীতে দিন কাটাতে লাগল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি খতম ক'রে চুপ করলেন। বাদশাহ শারিয়ার উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, তোমার মুখের কিস্‌সা যত শুনছি ততই যেন আর একটি শোনার জন্য দিল্ একদম আনচান করছে। এবার আর একটি আলাদা স্বাদের কিস্‌সা শোনাও যাতে আমার দিল্ খুশীতে কানায় কানায় ভরে ওঠে।

ফেরিওয়ালার লেড়কির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, শুনুন তবে বলছি—কায়রো নগরে কোন এক সময় এক ফেরিওয়ালা বাস করত। সে নগরের দুয়ারে দুয়ারে ঢুঁড়ে মুরগীর আণ্ডা বেচত। দিনভর ফেরি ক'রে তার যা আয় উপার্জন হ'ত তা দিয়ে কোনরকমে তার পরিবারের রুটির জোগাড় হয়ে যেত।

ফেরিওয়ালাটির তিনটি খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি ছিল। তাদের মধ্যে ছোটো লেড়কিটির নাম ছিল জাইনাহ। সে যে কেবল সুরতের বিচারেই অন্য বহিনদের থেকে আলাদা ছিল তা-ই নয়, বিদ্যা ও উপস্থিত বুদ্ধিতেও সে ছিল অনন্যা। লেড়কিদের লিখাপড়া হওয়ার মূলে ছিল ফেরিওয়ালা ও তার বিবির অত্যুগ্র আগ্রহ। এক বৃদ্ধা লেড়কি তিনটিকে সেলাই ফোড়াইয়ের কাজ শেখাত। তারা তিন বহিন তার বাড়ি গিয়ে কাজ শিখে আসত। সুলতানের প্রাসাদের লাগোয়া সড়ক দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হ'ত।

তিন বহিন যাতায়াতের সময় দেখতে পেত সুলতানের নওজোয়ান লেড়কা খোলা-জানালার ধারে বসে তাদের দিকে লোভাতুর নজরে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা গায়ে পড়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে, কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসা করে।

ফেরিওয়ালার ছোটা লেড়কিটি অন্য দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে হেঁটে চলে যায়। শাহজাদার প্রশ্নের উত্তর দেয়া তো দূরের ব্যাপার; ফিরেও তাকায় না। লেকিন প্রথম ও দ্বিতীয় লেড়কি ঠোঁট টিপে টিপে হেসে শাহজাদাকে কুর্নিশ ক'রে।

লেকিন ছোটা লেড়কিটি? তার কাছ থেকে অবজ্ঞা ও অবহেলা পেয়ে পেয়ে শাহজাদা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুলতানের লেড়কাকে সামান্য এক ফেরিওয়ালির লেড়কি যদি দিনের পর দিন অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে তবে তো তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এত বড় ঔদ্ধত্য তো বরদাস্ত করা যায় না। শাহজাদা ওয়াদা ক'রে বসল, তার ঔদ্ধত্যের বদলা নিতেই হবে।

শাহজাদা একদিন ফেরিওয়ালাকে তলব হুকুম দিল—'কাল ভোরে নামাজের সময় হাজির থেকো। আমার হুকুম তামিল করতে হবে। আমি তোমাকে একবার কোর্তা-পাৎলুন খুলতে, একটু বাদেই ফিন গায়ে চাপাতে হুকুম করব, তামিল করতে হবে। আর একবার হাসতে, ফিন একটু বাদে কাঁদতেও হুকুম করব। তাও তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে তামিল করতে হবে। ফিন যখন হুকুম করব, ঘোড়ার পিঠে চাপ, চাপবে। যখন নামতে হুকুম করব, ঝপাং ক'রে লাফিয়ে নেমে পড়বে। হুকুম মাফিক কাজ করতে যদি দেরী কর তবে তোমাকে কোতল করব, হুঁশিয়ার।'

শাহজাদার নির্দেশ শুনে তো ফেরিওয়ালার কলিজা শুকিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। কোনরকমে কুর্নিশ সেরে সে কাঁপতে কাঁপতে বিদায় নিল।

ফেরিওয়ালা মকানে ফিরে গোমড়া মুখে বসে রইল। আব্বাকে চিন্তিত দেখে লেড়কিরা ভীতা-সন্ত্রস্তা হয়ে তার আকস্মিক বিষণ্ণতার কারণ জানতে চাইল।

ফেরিওয়ালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহজাদার আজব ফরমানের ব্যাপার লেড়কিদের কাছে ব্যক্ত করল।

ফেরিওয়ালার মুখে বিলকুল ঘটনাটি শুনে তার ছোটা লেড়কি হেসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্‌ল—'আব্বাজী, এ নিয়ে তোমার ঘাবড়াবার কোন কারণই নেই। আমি তোমাকে এক ফন্দি বাৎলে দিচ্ছি। আগে মেছুয়া পট্টিতে গিয়ে একটি জাল নিয়ে এসো। আমি এমন কৌশলে সেটি তোমাকে পরিয়ে দেব যা দেখলে শাহজাদা একবার ভাববেন, তুমি একদম উলঙ্গ। পরমুহূর্তে ফিন ভাববেন তোমার গায়ে সাজ-পোশাক রয়েছে। তোমার কোর্তার জেবে

একটি পিঁয়াজ রাখবে। তার সামনে হাজির হওয়ার মুখে পিঁয়াজটি থ্যাঁতো ক'রে তার রস দু' চোখে লাগিয়ে যাবে। এতে তুমি কাঁদতে পারবে, পরমুহূর্তেই হাসতে পারবে।

ফেরিওয়ালা লেড়কি জাইনাহ্-র মতলবটি শুনে তাজ্জব বনে গিয়ে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার ছোটা লেড়কিটি এবার বল্‌ল—'আর এক কাজ করবে, তুমি একটি খচ্চরের পিঠে চেপে শাহজাদার সঙ্গে ভেট করতে যাবে। তাতে তুমি পা দুটো দিয়ে কোনরকমে জমিন স্পর্শ করতে পারবে। এতে পা উঁচু ক'রে তুল্‌লে তোমার খচ্চরের পিঠে চাপার ব্যাপার মিটবে। আর পা দুটো নামিয়ে দিলে জমিনে নামাও হয়ে যাবে। তারপরের ব্যাপার আল্লাহ্-র ওপর ছেড়ে দেবে।'

ফেরিওয়ালা পরদিন ভোরে নামাজের পূর্ব মুহূর্তে একটি খচ্চরের পিঠে চেপে শাহজাদার সঙ্গে ভেট করতে চল্‌ল।

ফেরিওয়ালা লেড়কি জাইনাহ্-র ফন্দি-ফিকির কাজ করায় শাহজাদা একদম তাজ্জব বনে যায়। ইচ্ছা থাকলেও তার কোন কসুর বের করতে না পারায় কোন সাজাই তাকে দিতে পারল না।

ফেরিওয়ালার ছোটা লেড়কি জাইনাহ কিন্তু এতে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। সে নিঃসন্দেহ, শাহজাদার এবার অন্য রূপ নিয়ে হাজির হবে। এখানেই ব্যাপারটি চুকে যায় নি। সে তার আব্বাকে দিয়ে নিজের জন্য একটি বর্ম আনাল।

জাইনাহ্ এবার বর্ম পরে যুদ্ধের সাজে নিজেকে সাজিয়ে নিল। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিল একটি ধারালো ক্ষুর, একটি ইয়া পেল্লাই কাচি আর লম্বা হাতলওয়ালা একটি কাঁটা চামচ। সে এবার প্রাসাদের দিকে হাঁটা জুড়ল। শাহজাদার কামরার দরওয়াজায় গিয়ে গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকাল।

জাইনাহ্-র উদ্ভট সাজ পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র দেখে শাহজাদা একদম ভড়কে গেল। অচানক কর্তব্য নির্ধারণ করতে না পেরে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কেঁদে কেটে বলতে লাগল—'ইফ্রিত সাহেবা, মেহেরবানি ক'রে আমার জান খতম কোরো না। আমার কোন গলতি নেই, কোন কসুরও করি নি।'

জাইনাহ্ তার অর্ধেক মাথা কামিয়ে দিল। তারপর একধারের গোঁফ ও ভুরু নামিয়ে দিল। বার বার হাতের কাঁটা চামচটি এমনভাবে তার দিকে বাগিয়ে ধরতে লাগল যার ফলে সে ডরে কুঁকড়ে একদম পাথরের মূর্তির মাফিক নিশ্চল-নিথর ভাবে বসে রইল। বলা তো যায় না, জানে খতম না করলেও চোখ গেলে অন্ধা ক'রে দেওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

জাইনাহ্ প্রাসাদের একদল বাঁদী, নফর ও নফরানীর সামনে দিয়ে বীরদর্পে গটমট করে বেরিয়ে এল।

পরদিন ভোরে ফেরিওয়ালার তিন লেড়কি প্রাসাদের ধারের

সড়ক দিয়ে সেলাই শিখতে চল্‌ল। প্রাসাদের সামনে আসতেই শাহজাদা তার অভ্যাস মাফিক তাদের কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসা করল।

জাইনাহ্ তার দিকে তাকিয়েই হেসে ফেল্‌ল। হাসি থামিয়ে বল্‌ল—'শাহজাদা, এ কী আজব কাণ্ড! আপনার এ-হালৎ কে করল! অর্ধেক মাথা, এক পাশের গোঁফ আর ভুরু কামিয়ে দিয়ে আপনাকে এমন কিম্ভূতকিমাকার কে ক'রে দিল?'

ফেরিওয়ালার অন্য দু'লেড়কিও হো-হো রবে হেসে উঠল। ব্যাপারটি এমন হ'ল যে, শরমে শাহাজাদা মুখ লুকোবার জায়গা পেল না। ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। লেকিন উপায়ই বা কি! চুল, গোঁফ ও ভুরু না গজানো অবধি তাকে কামরার মধ্যে বন্দী হয়েই দিন গুজরান করতে হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই শাহজাদার চুল, গোঁফ ও ভুরু গজিয়ে অন্যদিককার সমান সমান হয়ে গেল। ব্যাপারটিকে কোনরকমে

সামাল দিয়ে নিল।

শাহজাদা ফিন ফেরিওয়ালাকে তলব করল।

পরদিন ভোরে নামাজ সেরে ফেরিওয়ালা বাদশাহের প্রাসাদে হাজির হ'ল। শাহজাদাকে কুর্ণিশ ক'রে তলবের কারণ জানতে চাইল।

শাহজাদা তাকে সরাসরি বল্‌ল—'তোমার ছোটা লেড়কিকে আমি শাদী করতে আগ্রহী। প্রথম দর্শনেই আমি তাকে পেয়ার মহব্বৎ করে ফেলেছি। আমার বাৎ যদি অমান্য কর তবে তোমার গর্দান নেব। ভেবে দেখ, কোন্ পথ তুমি বেছে নেবে।'

—'জাঁহাপনা, আপনি মেহেরবানি ক'রে যে আমার লেড়কিকে শাদী করতে চেয়েছেন, এ তো আমার কাছে খুশীর ব্যাপার। তবে লেড়কির মতামতেরও দাম দিতে হয়। আপনি মেহেরবানি ক'রে আমাকে কিছু সময় দিন।'

—'জরুর। তোমার লেড়কির মতামতই আদৎ। বহুৎ আচ্ছা, তোমাকে তিনদিনের সময় দিলাম। ইয়াদ থাকে যেন, তোমার লেড়কি যদি গররাজি হয় তবে তোমার সঙ্গে তোমার লেড়কিরও গর্দান যাবে।'

ফেরিওয়ালা ব্যাজার মুখে মকানে ফিরে লেড়কিকে বল্‌ল—'বেটি, শাহজাদা তোকে শাদী করতে চান। তুই আপত্তি করলে তোর ও আমার উভয়েরই গর্দান যাবে। তুই রাজী হয়ে যা।'

জাইনাহ রাজী হ'ল।

লেড়কির মত পেয়ে ফেরিওয়ালা, খুশীতে নাচতে নাচতে প্রাসাদে গিয়ে শাহজাদাকে শাদীতে মত দিল।

এদিকে ফেরিওয়ালা প্রাসাদে রওনা হয়ে গেলে জাইনাহ সোজা বাজারে চলে গেল। এক মিঠাইওয়ালাকে একটি চিনির পুতুল বানিয়ে দিতে বল্‌ল। তবে সেটি যেন অবিকল তারই মত দেখতে হয়।

শাদীর রাত্রে জাইনাহ-র বড়া বহিনরা চিনির মূর্তিটিকে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখল। একটু বাদে শাহজাদা বরবেশে কামরায় ঢুকলেন। বহিন দুটো মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'শাহজাদা আমাদের বহিনটির শরীর একদম চিনির পুতুলের মাফিক; অল্পেতেই বে-হাল হয়ে পড়ে। মেহেরবানি করে তার গুস্তাকী মাফ ক'রে দেবেন।' তারা কামরা ছেড়ে চলে গেল।

ব্যাপার দেখে শাহজাদার মাথায় খুন চড়ে গেল। তরবারি দিয়ে চিনির পুতুলটিকে এক কোপ বসিয়ে দিল। মুণ্ডটি ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। সে তাজ্জব বনে গেল। কার মুণ্ডু এটি? এতো জাইনাহ-এর মুণ্ডু নয়!'

উন্মত্ত শাহজাদা এবার তরবারিটি নিজের দিকে ঘোরাতেই জাইনাহ পর্দার আড়াল থেকে ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরে বলে উঠল—'আমার গুস্তাকী মাফ কর মেহেবুব। তুমি আত্মঘাতী হলে আমার গুনাহ রাখার যে জায়গা থাকবে না।'

জাইনাহ'কে দেখে শাহজাদা বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থায় তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারা নতুন ক'রে মহব্বতের দরিয়ায় গা ভাসিয়ে দিল।

সওদাগরের বয়ান তালাকের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ এবার 'সওদাগরের বয়ান তালাকের কিস্‌সা' নামে এক নয়া কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, দামাস্কাস নগরে এক খুবসুরৎ নওজোয়ান বাস করত। তার সুরৎ এমনই চমকপ্রদ ছিল যে, নগরের তাবড় তাবড় আদমিদের বেগম-বিবিদের দিমাক ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সে দোকানে বসতে না বসতেই কারণে-অকারণে বিবাহিতা-অবিবাহিতা লেড়কি-বিবিরা তার দোকানে এসে হাজির হ'ত।

এক সকালে এক জেনানা তার দোকানে এল।

দোকানি-নওজোয়ানটি মুচকি হেসে বল্‌ল—'মেহেরবানি ক'রে বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি।'

তার বাৎ শুনে জেনানাটি হকচকিয়ে গেল। আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'না, তেমন কিছু না।' বটুয়া খুলে একগোছা নোট বের ক'রে দোকানি-নওজোয়ানটির হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এগুলো রেখে দিন। আজ সামান্য কিছু সওদা নেব। বাকী সব কাল এসে নিয়ে যাব।'

সামান্য ক'টি সওদা নিয়ে সে চলে গেল।

পরদিন এক নওজোয়ান লেড়কিকে নিয়ে জেনানাটি সওদাগরের দোকানে এল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আট শ' উননব্বইতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, জেনানাটি নওজোয়ান লেড়কিটিকে নিয়ে দোকানে এল। লেড়কিটির একদম কচি বয়স। উন্নতবক্ষ। কোমর সরু। মুঠো ক'রে ধরা যায়। নিতম্ব ভারী। চোখ দুটো টানা টানা। মায়া কাজল পরানো। সব মিলিয়ে একদম খাসা মাল।

সওদা খরিদ করতে করতে জেনানাটি দু' কদম এগিয়ে। সওদাগরের দিকে ঝুঁকে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল—'লেড়কিটিকে তোমার চোখে ধরেছে কি? যদি দিল্ চায় আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পার। লাজ শরমের কোন ব্যাপার নেই। তুমি চাইলে আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি। এ আমারই লেড়কি। কোন বাধা নেই।'

—'আল্লাহ-র কসম, আমি এক নজরে একে দেখেই একদম বে-সামাল হয়ে পড়েছি। এবার আপনার দোয়া হলে আমার সাধ পূর্ণ হতে পারে। আমার কলিজা আপনার দোয়াতেই ঠাণ্ডা হতে পারে। তবে এক বাৎ, আপনার লেড়কি খুবসুরৎ। একদম বেহেস্তের হুরীর সমান। এর যোগ্য দেনমোহর কি আমি দিতে পারব?'

—'আরে লেড়কি তো আমার। আমার মর্জি মাফিকই কাজ হবে। ঘাবড়াও মাৎ, দেনমোহরের জন্য আটকাবে না। তোমার যা খুশী দিয়ে শাদী চুকিয়ে নাও। তা-ও যদি আপত্তি থাকে শাদীর বিলকুল খরচ-খরচা আমিই চুকিয়ে দেব। অর্থই কি সব, বল? শান্তিও তো চাই। আমার লেড়কি তোমাকে বুকে পেলে খুশী হবে। ব্যস, আমার আর কিছুর জরুরৎ নেই।'

—'তবে আপনি বন্দোবস্ত করুন। আমি এ-শাদীতে রাজী।'

কাজীকে তলব করা হ'ল। শাদীর কবুলনামা তৈরি হ'ল। সাক্ষীরা তাতে মৎ দিল। আড়ম্বরভাবে শাদীর পাট চুকে গেল।

বাসর ঘরে লেড়কিকে পৌঁছে দিয়ে তার আম্মা বিদায় নিল। তাদের শাদীর রাত্রি আলিঙ্গন, দলন, চুম্বন ও সম্ভোগ-সুখের মধ্য দিয়ে কাটল।

সকালে নওজোয়ানটি দোকানে গিয়ে বসল। সন্ধ্যার কিছু বাদে দোকান বন্ধ করে মকানে ফিরেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, তার সদ্য শাদীকরা বিবি অন্য এক নওজোয়ানের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পেয়ার মহব্বতের জোয়ারে ভাসছে।

তার চোখের সামনে দুনিয়াটি যেন চক্কর মারতে লাগল। এক লাফে সে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল। শাশুড়ী মুখোমুখি হতেই সে তর্জন গর্জন শুরু করে দিল।

শাশুড়ী দিমাক ঠাণ্ডা রেখে ম্লান হেসে স্বাভাবিক স্বরেই বল্‌ল—'যে-নওজোয়ানটি তোমার বিবিকে নিয়ে শুয়ে, তার ব্যাপারে বলছ তো? তোমার শাদী তো দেনমোহর বিনাই চুকে গেছে। এভাবে কি আর শাদী হয়, তুমিই বল? তার চেয়ে বরং ওর সঙ্গে তুমি তোমার বিবিকে আধাআধি ভোগ করার বন্দোবস্ত করে নাও।'

আমি বাধ্য হয়ে বিবিকে তালাক দিয়ে দিলাম।

পরমুহূর্তেই কামরা থেকে এক লেড়কি বেরিয়ে এল। তার গায়ে লেড়কার সাজ পোশাক।

সওদাগর তো একদম আশমান থেকে পড়ল। তার মাথায় বাজ পড়ার জোগাড়।

তার শাশুড়ী বল্‌ল—'শোন, তুমি যাতে আমার লেড়কিকে বয়ান তালাক দাও সে জন্যই এ-ধান্দা আমাকে করতে হয়েছে।'

সওদাগর চোখ দুটো একদম কপালে তুলে বল্‌ল—'কারণ

কি?'

—'কারণ ক'দিন আগে এক নওজোয়ানের সঙ্গে আমার লেড়কির শাদী হয়েছিল। লেকিন নসীবের ফেরে সে আমার লেড়কিকে বয়ান তালাক দেয়। কারণ একই। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, এ-লেড়কিটি ছোটো। এর শখ লেড়কা সেজে থাকবে। সেদিন আজকের মাফিকই এর বহিনজীর সঙ্গে লেড়কার সাজপোশাক পরে শুয়ে ছিল। নওজোয়ানটি সে-দৃশ্য দেখামাত্র বিবিকে বয়ান তালাক দিয়ে দিল। লেকিন সমাজের বিধান তো মানতে হবে। তাই একরাত্রের জন্য তোমাকে শাদী করতে হয়েছিল। এবার সে নওজোয়ানটি ফিন আবার লেড়কিটিকে পেতে পারবে, বাধা রইল না। গোস্‌সা কোরো না সওদাগর, বাধ্য হয়ে আমাকে এ-ফন্দি করতে হয়েছে।

কোতোয়ালের বিবির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ এবার আর একটি আলাদা স্বাদের কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কায়রো নগরে কোন এক সময়ে এক খুবসুরৎ লেড়কা বাস করত। প্রতিভার বিচারেও সে পরিচিত মহলে সবার নজর কেড়েছিল। তার সুঠাম চেহারা ও রূপে মুগ্ধ হয়ে গুজবাসি নামে এক কোতোয়ালের দুশ্চরিত্রা বিবি তাকে মহব্বতের ডোরে বেঁধে ফেলে। আদতে কোন খুবসুরৎ লেড়কাকে দেখলেই কোতোয়ালের বিবিটির কলিজার ছটফটানি শুরু হয়ে যেত। তাকে বুকে পাবার জন্য কায়দা কসরৎ শুরু করে দিত।

একদিন কোতোয়াল গুজবাসি কয়েকজন ইয়ার-দোস্তকে নিয়ে দূরবর্তী এক বাগিচায় খানাপিনার আসর বসাতে গেল। বিবিকে বলে গেল, ফিরতে ঢের রাত্রি হবে। যেন হুঁশিয়ার থাকে। আর জরুরী কোন দরকার হলে নোকরকে পাঠিয়ে দেয়।

তার বিবি হেসে বল্‌ল—'তুমি আনন্দ-স্ফূর্তি করতে যাচ্ছ আর তোমাকে ডেকে হয়রানি করব, কিছুতেই না। আমার জন্য ভেবো না। আমি ঠিক মকান সামলে রাখতে পারব।'

কোতোয়াল বেরিয়ে গেলে তার বিবি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এ মওকায় কয়েক ঘণ্টার জন্য একটু আধটু মজা লোটা যাবে। নোকরকে বল্‌ল—'বেটা, এক কাম কর্—এক ছুটে তাকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি, মকান খালি।'

কোতোয়ালের বিবির মেহেবুব নওজোয়ানটি সবে নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে বসেছে। সামান্য মাত্রই কামানো হয়েছে।

নোকরটি তার সামনে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল—'হুজুর, মকান খালি। মালকিন আপনাকে জলদি যেতে বলেছেন।'

যুবকটি নাপিতের কাছ থেকে ঝট করে মুখটি সরিয়ে নিয়ে বল্‌ল—'মিঞা, আজ এ পর্যন্ত থাক, ফিন কাল দেখা যাবে। জরুরী তলব এসেছে, আমাকে যেতেই হবে।'

—'ইয়া আল্লাহ! এ যে সবে আধা কামানো—'

—'হোক গে। আর দেরী করার জো নেই।' জেব থেকে একটি দিরহাম বের ক'রে নাপিতের দিকে ছুড়ে দিয়ে হাঁটা শুরু করল।

এদিকে সামান্য কাজ ক'রে পুরো একটি দিরহাম পেয়ে খুশীতে নাপিত একদম ডগমগ হয়ে উঠল। ভাবল, এমন এক আমীর-বাদশাহ খদ্দেরকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। নসীবের জোরে আমার খদ্দের বনে এসেছে। তার পিছু নিল।

নওজোয়ানটি লম্বা লম্বা পায়ে কোতোয়ালের মকানে হাজির হ'ল। তার বিবির কামরায় ঢুকে জানালা দিয়ে বাইরে নজর দিতেই দেখে সড়কের একধারে নাপিতটি দাঁড়িয়ে মকানটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চমকে উঠল। স্বগতোক্তি করল—'তাজ্জব কী বাৎ! হারামজাদা নাপিতটি এখানে এল কি ক'রে? কেনই বা এল? মতলবই বা কি?'

নাপিতটি সেখান থেকেই চিল্লিয়ে বল্‌ল—'হুজুর, গরীবকে ভুলবেন না। মেহেরবানি করে ইয়াদ রাখবেন। কাল যাবেন। একদম সুলতান-বাদশাহের মাফিক কামিয়ে দেব। মেহেরবানি করে ইয়াদ রাখবেন হুজুর।'

নওজোয়ানটি বল্‌ল—'যাব। জরুর যাব। কাল ফিন ভেট হবে।' দুম্ ক'রে জানালাটি বন্ধ ক'রে দিল।

আজব ব্যাপার। নাপিতটি আর দোকানে ফিরল না। সড়কের ধারেই জমিনের ওপর বসে রইল।

এদিকে কোতোয়াল গুজবাসি তার ইয়ারদোস্তদের নিয়ে বাগিচার মকানে ভোজের আসর জমাতে হাজির হ'ল।

মকানের মালিক মুখ কাচুমাচু ক'রে গুজবাসিকে বল্‌ল—'দোস্ত, শরমের ব্যাপার বটে। তোমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এসে আদর আপ্যায়ন করতে পারছি না। একটু আগেই আমার বুড্ডি আম্মার ইন্তেকাল ঘটে গেছে। তাকে গোর দেয়ার জন্য আমাকে যেতে হচ্ছে।'

কোতোয়াল গুজবাসি বল্‌ল—'সে কী বাৎ দোস্ত! তোমার আম্মার চেয়ে আমাদের আনন্দ-স্ফূর্তিই বড় ব্যাপার হ'ল। তুমি ঝুটমুট দিল্ খারাপ কোরো না। তুমি তৃপ্তিতে আম্মার শেষকৃত্য সার। আমরা না হয় পরেই একদিন আসব।'

গৃহকর্তা দোস্তটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুজবাসি মকানের দিকে হাঁটা জুড়ল।

নিজের মকানের কাছে এসে সে দেখল, নাপিতটি ঢ্যাবা ঢ্যাবা চোখ মেলে তার মকানটির দিকে তাকিয়ে। সে গর্জে উঠল—'হারামীর বাচ্চা কাঁহিকার! আমার মকানের দিকে তাকিয়ে দেখছিস কি?'

নাপিতটি লাফিয়ে তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল। করজোড়ে বল্‌ল—'সালাম কোতোয়াল সাহাব।'

—'ওসব রাখ্। এখন সাচ্চা বল্, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? আমার মকানের জানালা বরাবরই বা কেন তাকিয়ে?'

—'কোতোয়াল সাহাব, স্রেফ রোজগারের ধান্দা। নইলে কি আর পথের ধারে বসে থাকতে কারো সাধ হয় বলুন? আদতে আমার এক জাদরেল খদ্দেরের ওপর নজর রেখে চলেছি।'

—'এমন রজ্জাতদের একদম জান খতম হয়ে যাবে। হারামী নক্করবাজ কাঁহিকার। আমার মকানের জানালা দিয়ে তোর মক্কেলের ওপর নজর রাখছিস। দিল্লাগী করার আর জায়গা পাস নি!'

—'গোস্‌সা করছেন কেন হুজুর? আমার আমীর খদ্দেরটি যে

এ-মকানেই ঢুকেছেন। আমার বাৎ বিশোয়াস না হয় তো অন্দরে গিয়ে নিজের চোখেই দেখুন। আপনি কোতোয়াল, আপনার সঙ্গে দিল্লাগী করতে গেলে আমার জান খতম হয়ে যাবে, আমার কি আর জানা নেই? মেহেরবানি করে অন্দরে গেলেই এ-জানালা বরাবর কামরাটিতে এক খুবসুরৎ নওজোয়ানের দেখা মিলবে। তিনি-ই আমার খদ্দের।'

কোতোয়াল গুজবাসি যখন নাপিতের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত তখন জানালার ছিদ্র দিয়ে কোতোয়ালের বিবি দৃশ্যটি দেখতে পেল। বে-কায়দা বুঝে সে নওজোয়ানটিকে নিয়ে পায়খানার মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরওয়াজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে দরওয়াজা খুলে দিল।

কোতোয়াল বল্‌ল—'বিবিজান, তোমার তবিয়ৎ আচ্ছা তো? এক বাৎ, অন্দরে কেউ আছে কি?'

অচানক কানে আঙুল দিয়ে তার বিবি বলে উঠল—'একী আজব বাৎ বলছ! কী বে-শরম কী বাৎ! এ যে শুনলেও গুনাহ হয়। তুমি নেই আর আমি কোন পুরুষকে অন্দরে আসতে দেব! তুমি সরাবটরাব টেনে এসেছ, নাকি দিমাক খারাপ হয়ে গেছে?'

সে বিবির ওপর আস্থা না রাখতে পেরে অন্দর মহলে চলে গেল। আতিপাতি ক'রে তল্লাশী চালাল মকানের আনাচে কানাচে সর্বত্র।

কোতোয়াল মকানে বাইরের কোন পুরুষের হদিস না পেয়ে লম্বা লম্বা পায়ে নাপিতটির কাছে গেল। তার গর্দান চেপে ধরে গর্জে উঠল—'শয়তান, বেতমিস কাঁহিকার। তোকে আজ জিন্দা গোরে দেব, একদম খতম ক'রে ছাড়ব।'

নাপিতটি গোঙাতে গোঙাতে বল্‌ল—'হুজুর, আমি এক বর্ণও ঝুটা বলিনি। আমার খদ্দেরটিকে আমি নিজের চোখেই মকানটির অন্দরে ঢুকতে দেখেছি। তখন থেকে আমি অপলক চোখে তাকিয়ে। তারপর থেকে কেউ বেরিয়ে আসা তো দূরের ব্যাপার, দরওয়াজা পর্যন্ত খুলতে দেখি নি। তবে পিছন দরওয়াজা বলে যদি কিছু থাকে আলাদা ব্যাপার।'

—'চুপ কর বেতমিস কাঁহিকার। আমার মকানের এই একটিই দরওয়াজা। লেকিন তোর জান নেবার আগে মকানের ভেতরটি আর একবার ভাল ক'রে তল্লাশী চালিয়ে দেখে নিতে চাই।'

কোতোয়াল নাপিতকে নিয়ে মকানের অন্দরে ঢুকল। ব্যস্ত হয়ে দু' জনে মিলে তল্লাশী চালাল। লেকিন কোথাও নওজোয়ানটির হদিস মিল্‌ল না। নাপিত ভাবল, এবার তার গর্দান নিয়ে ছাড়বে। সে কিন্তু তবুও হাল ছাড়ল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তার খদ্দেরটি মকানের ভেতরেই কোথাও না কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে। সে এবার পায়খানার দিকে ধাওয়া করল।

কোতোয়ালের বিবি এবার তম্বি জুড়ে দিল—'তুমি কি পুরুষ, নাকি অন্য কিছু? তোমার চোখের সামনে সামান্য নাপিত বেলেল্লাপনা শুরু করেছে। তোমার বিবির চরিত্র নিয়ে টানাটানি করছে। একটি পাগল আর শয়তান বেতমিসের কাণ্ডকারখানাকে বেমালুম মদত দিয়ে চলেছ! তুমি কোতোয়াল হয়ে সামান্য এক নাপিতের চক্করে পড়ে নিজের বিবির মান ইজ্জৎ ঢিলা করার কাজে—'

—'সাচ্চা বটে বিবিজান।' এক লাফে নাপিতের কাছে চলে গেল। তার গর্দান চেপে ধরে বল্‌ল—'হারামী বেতমিস কাঁহিকার! তুই আমার মকানে ঢুকে আমারই বিবির মান ইজ্জৎ বরবাদ করছিস? আজ তোর জান খতম ক'রে ছাড়ব!'

কোতোয়ালের বিবি চুল্লীর আগুনে একটি চাকু পুড়িয়ে টকটকে লাল ক'রে নিয়ে এল। সেটি দিয়ে কোতোয়াল গুজবাসি তার অণ্ডকোষ দুটো কেটে দিল।

নাপিতটি মেঝেতে পড়ে কাৎরাতে লাগল। কোতোয়াল তার পা ধরে কুত্তার মাফিক টানতে টানতে পথের ধারে ফেলে দিয়ে এল।

সকাল হ'ল কোতোয়াল কোর্তা পাৎলুন গায়ে চাপিয়ে নিজের দপ্তরের উদ্দেশে চলে গেল।

কোতোয়ালের বিবি সে-নওজোয়ানটিকে গুপ্ত স্থান থেকে বের ক'রে নিয়ে এল। নাস্তা খাইয়ে তাকে বিদায় করল।

এক নক্করবাজ পরদেশীর কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ আর একটি নয়া কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, আল্লাতাল্লা নিজের মেজাজ-মর্জি মাফিক দুনিয়ার এক এক মুলুকের আদমিকে আলাদা আলাদা প্রকৃতি দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। যেমন সিরিয়ার জেনানাদের দিকে যদি নজর দেয়া যায় তবে দেখা যাবে সে-মুলুকের প্রত্যেকটি জেনানার বুকভরা ঈর্ষা। কারো কোনদিক থেকে নসীব ফিরলে তারা একদম জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। তামাম সিরিয়া মুলুক ঢুঁড়ে এলেও এমন কোন আদমির সঙ্গে মোলাকাৎ হবে না যার দোষের চেয়ে গুণের পরিমাণ বেশী।

এবার যদি কায়রোর দিকে নজর দেন তবে দেখবেন তারা সৎ, ভদ্র, বিনয়ী ও পরোপকারী। তাদের চরিত্রে বিলকুল সৎগুণের একত্রে সমাবেশ ঘটেছে। এমন কি বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারেও তারা অগ্রগণ্য। শুধু কি এ-ই? বদমাইশি, রাহাজানি, চুরি ও মস্তানির ব্যাপারেও কায়রোবাসীদের সমকক্ষ অন্য কোন মুলুকের আদমিরা কিছুতেই হতে পারবে না।

এক সিরিয়ার কারবারী কায়রো নগরে হাজির হ'ল। বাজারের ধারে একটি কামরা ভাড়া নিল। রেশমী কাপড়া ও কামিজ-সালোয়ারের আর পিরান-পাৎলুনের তার কারবার।

এক সকালে বাজারের এক দোকানে সে হাজির হ'ল। তার কোর্তা, কামিজ ও পাৎলুন প্রভৃতির যারপরনাই গুণগান জুড়ে দিল।

এক বিকেলে সে এক সড়ক দিয়ে যাবার সময় তার নজরে পড়ল তিনটি খুবসুরৎ লেড়কি হাসাহাসি করতে করতে তার আগে আগে যাচ্ছে। তাদের যৌবনের জোয়ার লাগা দেহ পরদেশীটির মধ্যে আবেগের সঞ্চার করল। কলিজা ছটফট করতে লেগে গেল। সে একদম বে-সামাল হয়ে পড়ল। লম্বা লম্বা পায়ে কয়েক কদম এগিয়ে পথচারিণীদের লক্ষ্য ক'রে বল্‌ল—'শুনছো, বাজারের মুসাফিরখানায় আমি আশ্রয় নিয়েছি। আজ সন্ধ্যায় আসবে কি? এক সঙ্গে খানাপিনা আর গানাটানা করা যাবে, চলে এসো। আর যদি বল তোমাদের ডেরায় যেতে তবুও আপত্তি নেই। বল, আমি যাব, নাকি তোমরাই আসবে?'

—'আমাদের সবারই স্বামী আছে। আমাদের মকানে গেলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। আমরা বরং তোমার ওখানেই যাব।'

লেড়কিগুলো এগিয়ে গেল। আদমিটি দোকানে গিয়ে ঝটপট কিছু দামী বাদশাহী খানা ও খুসবুওয়ালা গুলাবী সরাব খরিদ ক'রে সোজা মুসাফিরখানায় চলে গেল।

সন্ধ্যার আন্ধার নামতে না নামতেই লেড়কি তিনটি ঝলমলে সাজপোশাক গায়ে চাপিয়ে, তার ওপর বোরখা গায়ে মুসাফিরখানার কামরায় হাজির হ'ল। কামরায় ঢুকেই তারা তিনজনই সালোয়ার-কামিজ খুলে একদম বিবস্ত্রা হয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

পরদেশী নওজোয়ানটি বুঝল মওকা একদম হাতের মুঠোর মধ্যে চলে এসেছে। সে ঝটপট খানাপিনার রেকাবি ও খুসবুওয়ালা গুলাবী সরাবের বোতল নিয়ে এল।

লেড়কিগুলো সাধ্য মত খানা গিল্‌ল। তারপর গলা পর্যন্ত সরাব ভরে নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সরাবের কাজ শুরু হয়ে গেল। তারা হাসাহাসি মাখামাখি শুরু ক'রে দিল। পরদেশী লেড়কাটি একের পর এক জেনানাকে আলিঙ্গন, দলন, চুম্বন ও সম্ভোগের মাধ্যমে নিজের কামতৃষ্ণা নিবৃত্ত করতে লাগল। এভাবে পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে কি ক'রে যে রাত্রি বাড়তে লাগল কারোরই হুঁশ নেই।

এক লেড়কিকে বুকে জড়িয়ে ধরে পরদেশী নওজোয়ানটি জিজ্ঞাসা করল—'সাচ্চা বলবে, আমার আগে এরকম কোন তাগদওয়ালা আদমির সঙ্গে সম্ভোগ করার সুযোগ পেয়েছ? এত সুখ কি আর কেউ দিতে পেরেছিল। বল তো?'

লেড়কি তিনটি এক সঙ্গে তাকে জাপ্‌টে ধ'রে সমস্বরে ব'লে উঠল—'আরে ধ্যুৎ! কি যে বল! তোমার মত সুখ কোন পুরুষই আজ পর্যন্ত দিতে পারে নি।'

আদমিটি বেহেড মাতাল বনে গেল। বিবস্ত্রা লেড়কি তিনটিকে দু'পাশে নিয়ে জাপ্‌টা জাপ্‌টি গড়াগড়ি খেতে লাগল। খুনে তার মাতন লেগে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সরাবের নেশা তাকে আরও জেঁকে ধরল। একদম বুঁদ হয়ে পড়ল। মওকা বুঝে লেড়কি তিনটি তার মোহর আর হীরা-জহরৎ যা কিছু তল্লাশী ক'রে পেল বিলকুল পুটুলি বেঁধে বেমালুম চম্পট দিল।

সকাল হ'ল। পরদেশী নওজোয়ানটির নিদ টুটল। চোখ মেলে দেখে কামরার সামানপত্র ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রয়েছে। লেড়কি তিনটি হাফিস হয়ে গেছে। তার বুঝতে দেরী হ'ল না, খুবসুরৎ লেড়কিগুলি তার যথাসর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তাকে একদম ভিখমাঙ্গা বানিয়ে দিয়ে গেছে।

নিঃস্ব রিক্ত নওজোয়ানটি নিজের মুলুক সিরিয়ার দিকে পা বাড়াল।

কিস্‌সা থামিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন, জাঁহাপনা, সিরিয়ার সে-নওজোয়ানটির যা পাওনা ছিল তা-ই পেয়ে গেছে। পরদেশে

এসে নক্করবাজিতে মাতলে তার হালৎ এরকমই হয়, দরকারও।

কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

এক যাদু কিতাবের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ জানালা দিয়ে প্রাসাদের অদূরবর্তী বাগিচার দিকে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, ভোর হতে এখনও ঢের দেরী। এখন আর একটি মজাদার কিস্‌সা আপনার দরবারে পেশ করছি—'এক মাঝ রাত্রে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর নিদ টুটে গেল। এপাশ-ওপাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ ক'রে রইলেন। লেকিন নিদ আর এল না।

এক সময় তিনি দেহরক্ষী মাসরুর'কে তলব করলেন। সে এসে কুর্নিশ ক'রে হুকুমের অপেক্ষায় খাড়া হ'ল। খলিফা বল্‌লেন—'কিছুতেই নিদ আসছে না, কি করি বল তো। বাইরে ঢুঁড়তে যেতেও দিল্ সরছে না। বহুৎ মুসিবতে পড়া গেল তো!'

মাসরুর কুর্নিশ সেরে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, যদি কসুর না নেন তবে এক বাৎ বলছি, আপনার হারেমে তো তিন শ' ষাটটি খুবসুরৎ বাঁদী রয়েছেন। পছন্দ মাফিক কারো কামরায় গিয়ে অনায়াসে রাত্রি গুজরান ক'রে দিতে পারেন।'

—'ওসব ধান্দা চলবে না। জলদি জাফর'কে তলব দে।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

আট শ' পঁচানব্বইতম রজনী

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশ বলতে লাগলেন—'জাঁহাপনা, খলিফার জরুরী তলব পেয়ে উজির জাফর ছুটে এসে কুর্নিশ জানাল।

খলিফার অভিপ্রায় শুনে জাফর বল্‌ল—'জাঁহাপনা, রাতের আন্ধারে প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ, বাঁদীদের সঙ্গ—যদি কোন কিছুতেই দিল্ না সরে তবে একমাত্র ভরসা বড়িয়া কোন কিতাব পাঠের মাধ্যমে দিল্‌কে চাঙ্গা ক'রে তোলা।'

—'বহুৎ আচ্ছা! কোন্ কিতাবকে তুমি বড়িয়া কিতাব আখ্যা দিতে চাইছ তা আমার সামনে হাজির কর।'

উজির জাফর আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে একটি মোটাসোটা কিতাব এনে খলিফার হাতে তুলে দিল।

খলিফা কিতাবটি হাতে নিয়ে দু'-চার পাতা উল্টে এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কয়েক ছত্র পাঠ করেই সরবে হেসে উঠলেন। পরমুহূর্তেই মুখে নেমে এল বিষণ্ণতাব ছাপ। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আর এগোতে পারলেন না। কিতাবটি বন্ধ ক'রে দিলেন। পালঙ্কে উঠে গেলেন।

জাফর বার-কয়েক হাত কচলে বুকে সাহস সঞ্চার করে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, একটি ব্যাপার আমার কিছুতেই মালুম হচ্ছে না। কিতাবটি পাঠ করতে করতে আপনি হাসলেন, পরমুহূর্তেই মুখে বিষণ্ণতার ছাপ, চোখের কোণে পানি দেখা দিল, কেন?'

—'আচ্ছা বেকুবের পাল্লায় পড়া গেল তো! আমি হাসি, বিষণ্ণ হই বা চোখের পানি ঝরাই, তোমার মাথা ব্যথা কেন?'

—'তবু যদি মেহেরবানি ক'রে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে খলিফা বল্‌লেন—'যদি পার এমন একজনকে তলব কর যে ব্যাপারটি খোলসা ক'রে বলতে পারবে, আমি কেন হেসেছি এবং একই সময়ে কেন চোখের পানি ঝরিয়েছি, পারবে? কিতাবটিতে এমন কি আছে যার ফলে আমার মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাবের সঞ্চার ঘটেছে?'

—'জাঁহাপনা, যিনি এ-দুনিয়া পয়দা করেছেন সেই আল্লাতাল্লাই এক মুহূর্তের মধ্যে এ-কাজ চুকাতে পারেন নি। পুরো দু'দিন সময় নিয়েছেন দুনিয়াটিকে পয়দা ক'রে পুরোপুরি সাজিয়ে নিতে। আমার মাফিক এক সামান্য আদমির পক্ষে কি ক'রে সম্ভব যে এমন এক আদৎ গুণী আদমিকে আপনার দরবারে হাজির করি, আপনিই বলুন।'

—'আমি কোন বাহানা শুনতে চাই না জাফর। যেখান থেকে পার তেমন একজন আদমির পাত্তা লাগাত যে কিতাবটির বক্তব্য খোলসা ক'রে বাৎলাতে পারবে। যদি না পার, নির্ঘাৎ তোমার গর্দান যাবে, ইয়াদ রেখো।'

—'মেহেরবানি ক'রে আমাকে অন্ততঃ তিনটি দিন মঞ্জুর করুন জাঁহাপনা।'

—'তিনদিন? বহুৎ আচ্ছা তিনদিনই তবে দিলাম। কাজ শুরু কর।'

উজির জাফর তার আব্বা বুড্ডা ইয়াহিয়া এবং তার বেটার শরণাপন্ন হ'ল।

তারা উজির জাফর-এর মুখে তার বিপদের সমাচার শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'এখন তুমি যাকে চরম বিপদ ব'লে জ্ঞান করছ তা-ই দু'দিন বাদে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তোমাকে মুলুকও ছাড়তে হবে না আর তোমার গর্দানও যাবে না। তখন দেখবে, খলিফা নিজেই তোমাকে ডেকে মার্জনা ক'রে দিয়েছেন।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে তার বুড্ডা আব্বা বল্‌ল—'তোমার বাৎ-ই ঠিক। এক কাম কর, দামাস্কাসে ভেগে যাও। নইলে ক্রোধোন্মত্ত খলিফা তোমার জান খতম ক'রে দেবেন।'

আব্বার বাৎ শিরোধার্য ক'রে জাফর কিছু মোহর কোর্তার জেবে পুরে, খচ্চরের পিঠে চেপে দামাস্কাসের পথে রওনা হ'ল। এক নাগাড়ে দশদিন খচ্চরের পিঠে চেপে শেষমেষ এক সকালে দামাস্কাসের অদূরবর্তী এক গাঁয়ে হাজির হ'ল। জায়গাটির নাম

মার্জ। তাঁর গতি অব্যাহত রইল। খচ্চরটি তাকে নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। এবার হাজির হ'ল এক পুরানা নগরে। এক সময় এর নাম ছিল জিল্লিক। এখন নামটি বদলে দামাস্কাস নামকরণ করা হয়েছে। দুনিয়ার সুন্দরতম মুলুক ব'লে এর খ্যাতি রয়েছে। নগরটি জাফর-এর দিল্ কেড়ে নিল।

জাফর এগিয়ে চল্ল। কিছুদুর যেতেই তার নজরে পড়ল কয়েক জন কুয়া থেকে পানি তুলে সড়ক ভিজিয়ে দিচ্ছে। তারই অদূরে এক বাগিচা। বাগিচাটির কেন্দ্রস্থলে একটি বাহারী তাঁবু খাটানো রয়েছে।

কৌতূহলের শিকার হয়ে জাফর খচ্চরটিকে তাড়িয়ে নিয়ে তাঁবুটির গায়ে হাজির হ'ল। দেখতে পেল এক খুবসুরৎ নওজোয়ান ইয়ার দোস্তদের নিয়ে বসে। তাদের কেন্দ্রস্থলে এক খুবসুরৎ লেড়কি অভাবনীয় ভঙ্গিমায় বসে। তার মুখে খুশীর জোয়ার। এক লহমায় দেখলে মালুম হয় বেহেস্তের হুরী বুঝি সবে মিট্টির দুনিয়ায় নেমে এসেছে।

জাফর অচানক নওজোয়ানটির নজরে পড়ে গেল। তার হুকুমে পরদেশী মুসাফির জাফরকে এক নওজোয়ান সমাদর ক'রে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেল।

জাফর তাবুতে প্রবেশ করতেই খুবসুরৎ নওজোয়ানটি তাকে সাদর সম্ভাষণ ক'রে বসতে দিল।

সে জাফরকে হরেক কিসিমের বাদশাহী খানা দিল আর দিল জব্বর খুসবুওয়ালা সরাব। জাফর মৌজ করে খানাপিনা সারল।

এবার নাচা-গানার মজলিস শুরু হ'ল। জাফর-এর দিল্ কিন্তু চলে গেল বাগদাদে খলিফার দরবারে। তার দিল্ একদম বিষিয়ে উঠল।

জাফর-এর অন্যমনস্কতা ও বিষণ্ণতাটুকু নওজোয়ানটির নজর এড়াল না।

জাফর মওকা বুঝে তার অভিপ্রায়ের ব্যাপারটি নওজোয়ানটির কাছে ব্যক্ত করল।

নাচা-গানার মজলিস খতম হতে হতে ভোর হয়ে গেল। নওজোয়ানটি এবার জাফরকে নিয়ে দামাস্কাসের সুলতানের প্রাসাদে হাজির হ'ল।

নওজোয়ানটি অভ্যর্থনা ক'রে তাকে বসতে দিয়ে বল্ল—'এবার আদৎ ব্যাপার নিয়ে ভাবা যাক। মেহেরবানি ক'রে আপনার নাম-পরিচয় বলবেন কি?'

—'আমি খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর প্রধান সেনাপতি। ক'দিন আগে খলিফার সঙ্গে আমার মত বিরোধ ঘটায় মুলুক ছেড়ে চলে এসেছি। মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়াতে বেড়াতে মিট্টির দুনিয়ার বেহেস্ত দামাস্কাসে হাজির হয়েছি। আর নাম? আপনার আমার

একই নাম।'

—'তবে কি আপনার নামও হাসান অল-দিন? তবে তো আমরা দোস্ত বনে গেলাম। জিগরী দোস্ত। বহুরাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড়ুন। কাল ভোরে ফিন বাৎচিৎ হবে।'

জাফর তামাম রাত জেগে কাটাল। চোখের পাতা এক করতে পারে না।

ভোরে নওজোয়ান হাসান জাফর-এর কামরায় এসে দেখে জাফর অস্থির ভাবে কামরায় পায়চারি করছে।

হাসান গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে বল্ল—'সে কী দোস্ত! আপনি তামাম রাত জেগেই কাটালেন! আপনার তবিয়ৎ তো তবে গড়বড় হয়েছে।'

সে নগরের সেরা হেকিমকে তলব দিল। হেকিম এসে পরীক্ষা ক'রে বল্ল—'কোন বিমারি নেই। মাথায় জমাট বাঁধা দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার জন্যই তবিয়ৎ খারাপ হয়েছে। এর একমাত্র দাওয়াই

খুশী থাকা। দিল্‌কে চাঙ্গা রাখা।'

জাফর এবার নিজের দুশ্চিন্তার ব্যাপার নওজোয়ান হাসান-এর কাছে ব্যক্ত করতে গিয়ে বল্‌ল—'দোস্ত, তুমি যখন আমাকে দোস্ত ব'লে মেনে নিয়েছ তখন আর তোমার কাছে কিছুই লুকা-ছাপা করব না।' জাফর এবার নিজের আদৎ পরিচয় জ্ঞাপন করল। তবে অনুরোধ করল, যেন অন্য কারো কাছে ফাঁস না করে।

এক ভোরে দু' দোস্ত বাগিচায় বসে বাৎচিৎ সারছে। এমন সময় এক খুবসুরৎ লেড়কি বাগিচায় ঢুকে গাছের গোড়ায় পানি দিতে লেগে গেল।

জাফর উল্লসিত হয়ে ব'লে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! এযে একদম বেহেস্তের হুরী। এমন সুরৎ সচরাচর কোন লেড়কির মধ্যে নজরে পড়ে না।'

—'লেড়কিটিকে আপনার নজরে ধরেছে? বন্দোবস্ত করব? রাজী? আপনি রাজী থাকলে রাতে আপনার পালঙ্কে হাজির করার দায়িত্ব আমার।'

—'সে কী! এমন জোর দিয়ে কি ক'রে বলতে পারছেন আমার দিমাকে আসছে না! লেড়কিটি আপনার কে হয়, যে এমন আত্মবিশ্বাস!'

—'জোর আছে বলেই না বলছি' দোস্ত। ও আমার বিবি। শাদীকরা বিবি। আপনি একে আমার দোস্ত তার ওপর মেহমান। মেহমানকে খুশী করাই তো ধর্ম। আমি ওকে তিন তালাক দিয়ে খালাস ক'রে দেব। ব্যস, আপনি শাদী করে নিজের মুলুকে নিয়ে যাবেন, রাজী তো?'

—'কেন তালাক দেবেন দোস্ত? ওর কসুর কি যে, তালাক দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দেবেন? ওসব দিমাক থেকে ঝেড়ে ফেলুন।'

—'মেহমানকে সন্তুষ্ট করা সবার আগে উচিত। আমি তালাক দিয়ে আপনার শাদীর বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।'

—'আমি তো পরদেশী মুসাফির। শাদী যে করব, দেনমোহর লাগবে না। কি ক'রে তা জোগাড় করব?'

—'আমি যোগাব। দান নয়, ধারও নয়। মেহমানের প্রতি কর্তব্যের খাতিরেই আমি অর্থ দেব।'

জাফর বহু ফন্দি ফিকির ক'রে হাসান'কে নিরস্ত করার কোশিস করতে থাকে। লেকিন হাসান বলে—'জবান যখন দিয়েছি তখন জরুর নড়চড় হবে না। এ-শাদী হবেই।'

একদিন সাচমুচ হাসান-এর তালাক দেয়া বিবির সঙ্গে জাফর-এর শাদী চুকে গেল। হাসান সামনে দাঁড়িয়ে বিলকুল বন্দোবস্ত ক'রে দিল।

জাফর এবার হাসান-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সদ্য শাদী করা বিবিকে সঙ্গে ক'রে বাগদাদের পথে রওনা হ'ল।

জাফর মুলুকে ফিরেছে শুনে খলিফা নিজে এলেন তার সঙ্গে ভেট করতে।

জাফর খলিফাকে তার দামাস্কাসের কিস্‌সা কিছুমাত্র গোপন না ক'রে হুবহু বর্ণনা করলেন।

খলিফা সবকিছু শুনে ব'লে উঠলেন—'জাফর, তুমি দেখছি চরম অকৃতজ্ঞ! যে তোমাকে এমন সম্মান-খাতির করল তার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে তার বিবিকে নিয়ে নিজের মুলুকে পাড়ি দিলে অকৃতজ্ঞ বেইমান কাঁহিকার! তোমার জরুর উচিত তার বিবিকে সসম্মানে ফেরৎ আনা।'

লেকিন জাঁহাপনা, এখন আমার পক্ষে দামাস্কাসে যাওয়া উচিত হবে না। বরং হাসান তলব দিচ্ছে, সে এসে তার বিবিকে নিয়ে যাক।'

জাফর দামাস্কাস ছেড়ে আসার পর দামাস্কাস নগরীর বালবাচ্চা থেকে শুরু ক'রে বুড্ডা-বুড্ডী পর্যন্ত সবাই জেনে গেল যে-আদমি হাসান-এর মেহমান হয়ে এসেছিল, তার বিবিকে শাদী ক'রে নিজের মুলুকে নিয়ে গেছে সে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর প্রধান উজির স্বয়ং জাফর।

ব্যাপারটি শুনে নায়েব মশাই চটে গেলেন। হাসানের সঙ্গে উজির জাফর-এর দোস্তী হওয়ায় তার নায়েবী শীঘ্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সে হাসান'কে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে তার সামনে হাজির করার হুকুম দিল।

নায়েবের আদমীরা হাসানের মকানে এসে তাকে আচ্ছা ক'রে ঘা-কতক দিয়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে নায়েবের সামনে হাজির করল।

নায়েবের হুকুমে হাসানের গর্দান নেয়ার বন্দোবস্ত করা হ'ল। হঠাৎ আমির এসে নায়েবকে হুঁশিয়ার ক'রে দিল—'হাসান উজির জাফর-এর জিগরী দোস্ত। জাফর-এর বদলা নেবেনই। তখন আপনার গর্দান ঠেকোবে কে? অতএব হাসান'কে জানে খতম করা ঠিক হবে না।'

আমিরের পরামর্শে নায়েব ভড়কে গিয়ে হাসান-এর গর্দান নেয়ার হুকুম বাতিল করল। তাকে ফাটকে আটক ক'রে রাখা হ'ল।

এক রাতে ফাটকের রক্ষী হাসান-এর খানাপিনা দিয়ে ফাটকের দরওয়াজা বন্ধ করতে ভুলে গেল। হাসান মওকাটি হাতছাড়া করল না। মাঝ-রাতে সে দরওয়াজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। আন্ধারে গা-ঢাকা দিয়ে দিল। ভোর হতেই পথচারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে নগরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার সে আলেপ্পীর পথ ধরল। তারপর আলেপ্পীতে গিয়ে বাগদাদের একদল যাত্রীর সঙ্গে ভিড়ে পড়ল। এক নাগাড়ে বিশদিন পয়দল চলার বাগদাদে হাজির হতে পারল।

তাল্লাশ ক'রে ক'রে সে এবার উজির জাফর-এর প্রাসাদের সদর-দরওয়াজায় হাজির হ'ল। দ্বাররক্ষী তাকে ভিখমাঙ্গা ভেবে দূর দূর ক'রে ভাগিয়ে দিল। দু'-চার ঘা পিঠে দিতেও ভুল্‌ল না।

কয়েক কদম গিয়ে হাসান এক কাগজের দোকান দেখতে পেয়ে দোকানের সামনে হাজির হ'ল। কাকুতি মিনতি ক'রে দোকানির কাছ থেকে এক চিলতে কাগজ আর কলম নিল। খস্ খস্ ক'রে উজির জাফর-এর নামে এক চিঠি লিখে ফেল্‌ল। এখন উপায়? কার মারফৎ এটিকে উজির জাফর-এর কাছে পৌঁছে দেবে। তাতে নসীবের ফেরে সে যে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিল সে সব ব্যাপার খোলসা ক'রে লিখল।

চিঠিটি হাতে নিয়ে হাসান এক পা দু' পা ক'রে ফিন দ্বাররক্ষীটির কাছে এল। সালাম জানিয়ে তার হাতে চিঠিটি দিয়ে অনুরোধ করল। রক্ষীটি চিঠিটির ওপর এক লহমায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে ক্ষেপে একদম লাল হয়ে গেল। সে গর্জে উঠল—'হারামী নক্করবাজ কাঁহিকার! উজির সাহাব তোর দোস্ত, তোর ভাইয়া, তাই না? চাপকে একদম ছাল খিঁচে নেব।' বলেই তাকে বেদম লাঠি-পেটা করতে লাগল। ব্যাপার দেখে অন্য রক্ষীরা ছুটে এলো। হাসান'কে জমিন থেকে তুলে তারা জানতে চাইল, তার দরকার কি? কেনই বা এখানে এসে বেকার মারধোর খেল?

হাসান রক্ষীটিকে বল্‌ল—'চিঠিটি উজির জাফর'কে পৌঁছে দিলে বড়ই উপকার হয়।'

রক্ষীটি তার হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে প্রাসাদের অন্দরে চলে গেল। জাফর-এর হাতে চিঠিটি পৌঁছে দিল।

জাফর তখন সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে বসে খোস মেজাজে সময় গুজরান করছে। চিঠিটি হাতে নিয়ে পড়ার ক্ষমতা তখন তার নেই। ফলে চিঠিটির ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই রক্ষীটির ওপর তর্জন গর্জন শুরু ক'রে দিল। হাতের পেয়ালাটি দেয়াল বরাবর ছুঁড়ে মারল। টুকরো টুকরো হয়ে তার একটি টুকরো তার কপালে এসে আঘাত করল। ফিন্‌কি দিয়ে খুন বেরিয়ে এল। হাতের চিঠিটি দলা মোঁচড়া ক'রে ফেলে দিয়ে বলল—'যা হারামীটিকে পাঁচশ' ঘা বেত মেরে কোতোয়ালের হাতে জমা দিয়ে আয় ফাটকে আটক ক'রে রাখতে বলবি।'

কোতোয়াল হাসান'কে ফাটকে আটক ক'রে রাখল।

দু' মাহিনা বাদে খলিফা-র লেড়কা পয়দা হ'ল। সে খুশীতে কয়েদীদের খালাস ক'রে দেয়ার হুকুম দিলেন। হাসানও অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে খালাস পেয়ে গেল। ফাটকের বাইরে এসে সে আরো মুসিবতে পড়ে গেল। দামাস্কাসে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। বাগদাদে থাকারও কোন ফিকির নেই। এখন ভিখ মেঙ্গে যে রুটির জোগাড় করবে তারও উপায় নেই। পরদেশীকে ভিক্ষে দেবে কে? হারা উদ্দেশ্যে তামাম দিন সে পথে পথে ঢুঁড়ে বেড়াল। ভাবল, মসজিদে আশ্রয় নেবে। লেকিন মসজিদে রাত্রে থাকা নিষেধ। একটু বেশী রাতে এক পোড়ো বাড়ি পেয়ে ঢুকে পড়ল। ভেতরে ঢুকতেই অচানক আদমির দেহে পা ঠেকল। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল, এক

আদমি পড়ে রয়েছে। তার দেহ খুনে একদম জবজবে।

হাসান এক লাফে সেখান থেকে বেরিয়ে পথে নামার কোশিস করল। বলা যায় না ফিন কোন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়বে। পথে নামার আগেই একদল সিপাহী সেখানে পৌঁছে গেল। তাকে ধরে ফেল্‌ল। খুনের দায়ে তাকে জড়িয়ে ফেল্‌ল। তার পিঠে দমাদম ডাণ্ডা মারতে লাগল। সে খুন করেনি বল্‌লেই বা শোনে কে।

ডাণ্ডার বাড়ি সমানে পড়তে লাগল।

হাসান ফিন ফাটকে আটক হ'ল।

সকালে কোতোয়াল উজির জাফর-এর কাছে গতরাতের খুনের ব্যাপারটি ব্যক্ত করল। খুনীকে ফাটকে আটক করা হয়েছে এ-ও বল্‌ল।

জাফর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি করল—'খুনীর মাফ নেই। তার গর্দান নাও।'

কোতোয়াল হাসান-এর গর্দান নেয়ার হুকুম দিল। ঘাতক হাসান'কে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে গর্দান নেয়ার বন্দোবস্ত করল। কৌতূহলী পথচারীরা চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে।

এমন সময় উজির জাফর সে-পথ দিয়ে দরবারে যাবার সময় পথে বহুৎ আদমি জমায়েৎ হয়েছে দেখে ভিড় ঠেলে খুনীকে একবারটি দেখার কোশিস করল। খুনীর দিকে নজর পড়ল। জাফর হাসান'কে চিনতে পারল না। পারার ব্যাপারও তো নয়। গায়ে ছেঁড়া কোর্তা-পাৎলুন। চুল-দাড়ি রুক্ষ রুষ্ট। তার ওপর দামাস্কাসের আদমি, তার দোস্ত হাসান বাগদাদে এসে খুন করতে যাবেই বা কেন?

জাফর তাকে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কি পরদেশী? কোন্ মুলুকে তোমার মকান?'

হাসান করুণ স্বরে জবাব দিল—'দামাস্কাসে।'

—'দামাস্কাসে এক মহাধার্মিক, অতিথিবৎসল ও সৎ আদমি বাস করে—নাম হাসান, চেন তাকে?'

—'চিনি হুজুর। আপনি যখন তার মকানে মেহমান হয়ে বাস করেছিলেন, তখন আমি তাকে চিনতাম। আপনারা বাগিচায় যখন টুঁড়ে বেড়াতেন তখনও চিনতাম। তিনি নিজের বিবিকে বয়ান তালাক দিয়ে আপনার সঙ্গে শাদী দিয়েছিল তখনও তাকে আমি চিনতাম। সে আলেপ্পী পর্বত পর্যন্ত এসে আপনাকে যখন বিদায় জানাল তখন আমি তাকে ভালই চিনতাম।'

—'বহুৎ আচ্ছা, এবার বল তো আমার দোস্ত হাসান ভাইয়া এখন কোথায়, কিভাবে সময় গুজরান করছে?'

—'হুজুর, নসিবের ফেরে সে আজ প্রতারিত, অত্যাচারিত। তার ওপর বেকার জুলুম করা হচ্ছে। জান রক্ষার তাগিদে সে বাগদাদে এসেছিল। আজ তার ওপর ঝুটা অভিযোগ চাপিয়ে তার গর্দান নেয়া হচ্ছে।'

এত কিছু শোনার পরও উজির জাফর তাকে ইয়াদ করতে পারল না।

অনন্যোপায় হয়ে হাসান চিল্লিয়ে উঠল—'দোস্ত জাফর, তুমি কি আমাকে কিছুতেই ইয়াদ করতে পারছ না?'

হাসান-এর কাছে ব্যাপারটি এবার এক লহমার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। ঝট ক'রে দু'কদম এগিয়ে তাকে বুকে তুলে নিল।

ঠিক তখনই ভিড়ের মধ্য থেকে এক বুড্ডা এগিয়ে এসে বল্‌ল—'গতরাতে যে-আদমিটি খুন হয়েছে তার জন্য পুরো দায়ী আমি। আমি নিজে হাতে তাকে খুন করেছি। যাকে সাজা দেয়া হচ্ছে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাই একে খালাস দিয়ে আমাকে সাজা দিন উজির সাহাব। লেড়কাটি আমার যা কিছু রোজগারপাতি বিলকুল ছিনিয়ে নিয়ে যেত। আপশোষ থাকত না যদি সে ওই অর্থ দিয়ে জুয়া না খেলত। আরও আছে—বোতল বোতল সরাব পান করত, বেশ্যা নিয়ে পড়ে থাকত। মওকা মিলছিল না কিছুতেই। কাল রাতে মওকা মিলে গেল। আমার নিজের লেড়কা হওয়া সত্ত্বেও তার বেলাল্লাপনা বরদাস্ত করতে না পেরে নিজে হাতে খতম করেছি। চোখের সামনে নিজের লেড়কার এমন কসুর কোন্ আব্বা বরদাস্ত করতে পারে, বলুন হুজুর?' উজির জাফর এবার বল্‌ল—'তারপর কি হ'ল বল, ঘটনাটি শুনেই আমার মালুম হয়েছিল, এর মধ্যে কিছু না কিছু গড়বড় রয়েছে। আমি তোমার সাজা মকুব করলাম। কেবলমাত্র সন্দেহ ক'রে কাউকে কোতল করা বা গর্দান নেয়া সঙ্গত নয়। তারপরও যদি কোন কসুর তোমার থেকেই থাকে তবে খোদাতাল্লা-র চোখে ধরা পড়বেই। তাঁর সাজা থেকে রেহাই পাবে না।

জাফর এবার হাসান'কে গোসল করিয়ে আচ্ছা সাজ-পোশাক পরিয়ে খলিফা-র সামনে হাজির করল। তার পরিচয় দিল।

হাসান খলিফার কাছে চোখের পানি ঝরিয়ে তার নসীবের বিড়ম্বনার ব্যাপার কিছুমাত্র ছিপাছাপা না ক'রে সবিস্তারে বর্ণনা করল।

খলিফা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। সে-নায়েবকে গ্রেপ্তার ক'রে তাঁর সামনে হাজির করার হুকুম দিলেন। এবার তিনি দামাস্কাসে হাসান-এর কি কি সম্পত্তি ছিল, জাফর-এর কাছে জানতে চাইলেন।

জাফর বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি নিজে হাসান-এর কাছ থেকে ত্রিশ লাখ দিনার কর্জ করেছিলাম। আজই তা শোধ দিয়ে দেব। তার বিবি আজও অক্ষতই রয়েছে তাকে ফিরিয়ে দেব।'

দামাস্কাস থেকে নায়েবকে হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে খলিফার সামনে হাজির করা হ'ল। খলিফার হুকুমে তাকে ফাটকে আটক করা হয়।

হাসান দীর্ঘদিন বাগদাদে ভোগ-বিলাসের ভেতরে কাটিয়ে বিবিকে নিয়ে নিজের মুলুক দামাস্কাসে যাত্রা করল। খলিফা তাকে সেখানকার নায়েবের পদে অভিষিক্ত করলেন।

খলিফা আগেকার নায়েবের বিচার করলেন। তাকে দোশী সাব্যস্ত করা হ'ল। তার গর্দান নিয়ে তিনি ন্যায় বিচারের স্বাক্ষর
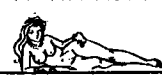
রাখলেন।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি খতম ক'রে চুপ করলেন।

শাহজাদা হীরা ও তার মেহেবুবার কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ 'শাহজাদা হীরা ও তার বিবির কিস্‌সা'টি শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, এক দেশে সামস শাহ নামে এক সুলতান রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন যথার্থই ন্যায়ের পূজারী। সুলতানের একটি লেড়কা ছিল। তার নাম ছিল হীরা।

শাহজাদা হীরা একদিন বিষণ্ণতা কাটাবার জন্য ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে গেল।

হীরা তার ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে এক পাহাড়ের ধারে হাজির হ'ল। অতিকায় এক বটগাছের তলায় তাঁবু ফেলা হ'ল। পাশেই একটি ঝর্ণা কুলকুল রব তুলে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। একটি খরগোস এক সময় ঝর্ণার ধারে পানি খেতে এল। হীরা-র ইয়ার-দোস্তরা খরগোসটিকে ধরার কোশিস করতে লাগল। খরগোসটি পানি না খেয়েই জান নিয়ে ভাগতে লেগে গেল। হীরাও ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গী হ'ল। তার তাকতওয়ালা ঘোড়াটি খরগোসটির গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এঁটে উঠতে পারল না। খরগোসটির পিছু পিছু সে এক মরুভূমিতে হাজির হ'ল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নয় শ' চারতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ বলতে লাগলেন—'জাঁহাপনা, খরগোসটি অচানক এক বালিয়াড়ির আড়ালে হাফিস হয়ে গেল। হীরা বালিয়াড়িটির ওপরে উঠেও তার হদিশ পেল না। বেকার হয়রান হতে হ'ল।

বালিয়াড়িটির ওপর থেকে শাহজাদা হীরা এক সবুজ চাষের ক্ষেত দেখতে পায়। পাশেই এক বাগিচা। সে বাগিচাটির ভেতরে ঢুকল। দেখল, এক ঝাঁকড়া গাছের তলায় এক বহুমূল্য তখ্‌ত পাতা রয়েছে। তার ওপরে এক রাজা অধিষ্ঠিত। মাথায় মুকুট, গায়ে ঝলমলে সাজ পোশাক। লেকিন পা দুটো খালি, জুতা-চপ্পল কিছুই নেই।

হীরাকে দেখে রাজা বল্‌লেন—'কে তুমি? তোমাকে দেখে মালুম হচ্ছে, কোন বাদশাহ বা সুলতানের লেড়কা। আদমির বাচ্চার অগম্য এ-জায়গায় তুমি কি ক'রে এলে? জঙ্গলের পশু-পাখিরাও তো এখানে আসতে সাহসী হয় না। তুমি কি ক'রে এলে, বল তো?'

হীরা তার খরগোসটির ব্যাপার রাজার কাছে ব্যক্ত করল। লেকিন রাজা এখানে আপনাকে ছাড়া আর কোন আদমিকেই তো দেখা যাচ্ছে না। আজব ব্যাপার তো! এর কারণ কি, মেহেরবানি ক'রে বলবেন কি?'

—'বেটা, এক সময় আমি হাজার হাজার সৈন্য, সভাসদ ও ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে রাজত্ব চালাতাম। সাত-সাতটি লেড়কা ছিল আমার। সর্বনাশের চূড়ান্ত হল যখন আমার বড়া লেড়কা সিন মাসিনের রাজকন্যার সঙ্গে মিলিত হ'ল। তাঁর আব্বা ছিলেন সম্রাট কামুস। সম্রাট কামুস-এর লেড়কা ছিলেন তিনি। তামাম দুনিয়ার মধ্যে সম্রাট কামুস ছিলেন সেরা রাজা। তার লেড়কি ছিল খুবসুরৎ। এক লহমায় দেখলেই মালুম হ'ত বুঝি বা সবে বেহেস্ত থেকে কোন হুরী-পরী নেমে এসেছে।

এক সকালে আমার দরবারে এল এক পরদেশী দূত। সম্রাট কামুস-এর লেড়কির শাদীর স্বয়ম্বর হবে। সে খবর দিতে বেরিয়েই ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে আমার দরবারে হাজির হয়েছে।

দূতটি বল্‌ল—'হুজুর, সম্রাটের লেড়কিকে যে শাদী করতে আগ্রহী হবে তাকে তাঁর একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

—'প্রশ্ন? কি প্রশ্ন?' সম্রাট বল্‌লেন।

সম্রাট-নন্দিনী জানতে চান—'ফারকোন আর সাইপ্রাসের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?' এর সঠিক জবাব দিতে পারলেই তিনি সম্রাট-নন্দিনীকে বিবিরূপে চিরদিনের জন্য পেয়ে যাবেন। আর জবাব

সঠিক না হলে গর্দান যাবে। যারা স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হবেন তাঁরা যাতে প্রশ্নের জবাবটি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে যেতে পারেন তাই আমি রাজা-বাদশাহের দরবারে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি।'

দূতের মুখে বিলকুল ব্যাপার শুনে আমার বড়া লেড়কা সম্রাট-নন্দিনীর প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী হ'ল।

তার মুখের বাৎ শুনে আমি ধরেই নিলাম, নির্ঘাৎ তার দিমাক খারাপ হয়ে গেছে। হেকিম তলব করলাম। দাওয়াই দিল। ফয়দা কিছুই হ'ল না। তার জেদ, মাসিনে গিয়ে আজব প্রশ্নটির জবাব দেবে। সম্রাট-নন্দিনীকে খুশী ক'রে শাদী করবে। তাকে নিরস্ত করার আশা যখন ছাড়তেই হ'ল তখন অনন্যোপায় হয়ে তাকে হুঁশিয়ার করতে গিয়ে বল্লাম—'শোন বেটা, সম্রাট-নন্দিনীকে শাদী করার সাধ যদি দিল্ থেকে ঝেড়ে ফেলতে না-ই পার তবে মাসিনেই যাও। লেকিন একা নয়, বিশাল সেনাদল তোমার সঙ্গে দেব। বীরদর্পে সম্রাট কামুস-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তার লেড়কিকে চাও। সে রাজী না হলে তাকে হাতকড়া পরিয়ে আমার সামনে হাজির করবে। আর রাজী হলে তো ল্যাটা চুকেই যাবে। দরকার হলে আমার বিলকুল সেনাকে পাঠাব। এ-ই হচ্ছে রাজার ব্যাভার, রাজী?'

আমার লেড়কা এতে রাজী হ'ল না। সে বল্ল, যুদ্ধের দ্বারা নয়, জ্ঞানের দ্বারা মীমাংসার ব্যাপার। আপনার লেড়কা প্রমাণ ক'রে দেবে যে, তামাম দুনিয়ায় সে-ই সবচেয়ে সেরা জ্ঞানী।

আব্বা আপনি আমাকে সে-সম্মান আদায় ক'রে নেবার হুকুম দিন।

নসীব যাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমি কিভাবে তাকে রুখতে পারি। বলুন? অনুমতি দিলাম। সে সিন মাসিনের পথে পা-বাড়াল।

আমার দরবারে খবর এল, আমার লেড়কা সম্রাট-নন্দিনীর প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দিতে পারে নি। তার গর্দান নেয়া হয়েছে।

কিছুদিন বাদে আমার দ্বিতীয় লেড়কাও ক্ষেপে গেল সিন মাসিনে সম্রাট-নন্দিনীর প্রশ্নের জবাব দিতে যাবে। বহুৎ কোশিস করেও তাকে দমাতে পারলাম না। শেষমেষ সে-ও গেল। নসীবের ফেরে তারও গর্দান গেল।

একই উপায়ে আমি পাঁচ পাঁচটি লেড়কাকে হারালাম। শোক সামলাতে পারলাম না। আমার দিল্ এবার উদাস-বিবাগী বনে গেল। তখ্ত, সুলতানিয়ত, প্রজা—বিলকুল ছেড়ে ছুড়ে পথে নেমে পড়লাম। সবশেষে এ মরুদ্যানে হাজির হলাম। ব্যস, এখানেই বাকী দিন গুজরান ক'রে দেব।'

বেগম শাহরাজাদ এবার বল্লেন—'জাঁহাপনা, এখন শাহজাদা হীরা-র কিস্‌সা আপনার দরবারে পেশ করছি। শাহজাদা খরগোসটির পিছু নেয়ার সময় তার ইয়ার-দোস্তরা তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। সে বাধা দিয়েছিল। তার ফিরে আসতে দেরী হওয়ায় অধৈর্য হয়ে তার ইয়ার-দোস্তরা প্রাসাদে এসে ব্যাপারটি সুলতানের কানে দিল।

এক সময় শাহজাদা হীরা ক্লান্ত দেহে তাঁবুতে ফিরে এল। কারো দেখা না পেয়ে সে-ও ঘোড়া ছুটিয়ে প্রাসাদে ফিরল। লেড়কাকে বুকে ফিরে পেয়ে সুলতান সামস স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লেন। হীরা তার আব্বার কাছে সে-বেদনাময় কিস্‌সাটি ব্যক্ত করল।

সুলতান এক চিঠিতে সিন মাসিনের সম্রাট কামুসকে লিখলেন, পত্র পাওয়া মাত্র তিনি যেন তাঁর লেড়কিকে তার দরবারে পাঠান। তাঁর ইচ্ছা, সম্রাট-নন্দিনীর সঙ্গে তাঁর হীরার শাদী দেবেন।

চিঠিটি দিয়ে এক দূতকে সম্রাট কামুস-এর দরবারে পাঠাবার জোগাড় করেন। সঙ্গে কিছু মূল্যবান উপঢৌকনও দিয়ে দিলেন। সম্রাট যদি এগুলো গ্রহণ করেন তবে ল্যাঠা চুকে যাবে। অন্যথায় যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। যুদ্ধে জরুর সম্রাট কামুস-এর জান খতম হবে, সন্দেহই নেই। দূত যখন রওনা হতে যাবে ঠিক সে-মুহূর্তে শাহজাদা হীরা এসে তার আব্বাকে জানাল সে নিজেই যাবে সম্রাট কামুস-এর দরবারে। বুদ্ধি বলে সম্রাট-নন্দিনী মুরা'কে প্রাসাদে নিয়ে আসবে।

সুলতান সামস বিষণ্ণমুখে বল্ল—'তুমি আমার একমাত্র লেড়কা। সম্রাট-নন্দিনীর আজব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তুমি জান খোয়াও, আমি চাই না।'

শাহজাদা হীরার এক গোঁ, সে যাবেই। নসীবে যা আছে তা তো ঘটবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

উপায়ান্তর না দেখে হীরা-র সিন মসিনে যাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।

সম্রাটের প্রাসাদের সদর-দরওয়াজায় একটি সাবধান বাণী দেখে শাহজাদা হীরা সেটি পাঠ করল—'সম্রাট-নন্দিনীকে কেউ লাভ করতে ইচ্ছুক হলে তবে তাকে বাক্‌যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে।'

প্রহরী সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে শাহজাদা হীরা'কে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে এক সুসজ্জিত কামরায় বসতে দিল।

একটুবাদে সম্রাটের হুকুমে তাকে দরবারে হাজির করা হ'ল। সম্রাট তখ্তে আসীন।

শাহজাদা হীরা সম্রাটকে কুর্নিশ করল। সম্রাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—'বেটা, কত শত সম্রাট, সুলতান-বাদশা আমার লেড়কিকে লাভ করতে এসে গর্দান দিল। আর তুমি সব জেনেশুনেও হাড়িকাঠে শির গলিয়ে দিতে চাইছ। তুমি এ-বাসনা ত্যাগ কর। তোমার সুরৎ দেখে মালুম হচ্ছে, কোন সুলতান-

বাদশাহের বংশজাত। তুমি আমার লেড়কিকে লাভ করার বাসনা দিল্ থেকে মুছে ফেল। আমার দরবারের কোন উচ্চপদে তোমাকে নিযুক্ত করছি। খোদাতাল্লাও জানেন না আমার লেড়কির দিল্ কি দিয়ে তৈরি, তুমি-আমি তো কোন্ ছার। তার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে আর কেউ গর্দান দিক আমার দিল্ চায় না। তার ওই এক ওয়াদা, যে তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে তাকে সে স্বামীরূপে গ্রহণ করবে। তুমি ও ধান্দা ছাড় বেটা।'

শাহজাদা হীরার-ও এক গোঁ। নসীবে যা আছে পরে বিবেচনা করা যাবে। সে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেই হবে। আর তার দৃঢ় প্রত্যয় জয় তার অবশ্যম্ভাবী।

শাহাজাদা হীরা সম্রাটের প্রাসাদে কয়েকদিন তার মেহমান হয়ে অবস্থান করল।

এক বিকালে হীরা প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় বেড়াতে বেড়াতে এক ধারে একটি ঝর্ণা দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে তার একদম গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। পানিতে তার কোর্তা-পাৎলুন ভিজে জবজবে হয়ে গেল। রোদে বেরিয়ে সেগুলো শুকিয়ে নেয়ার কোশিস করে। এক সময় তার নজরে পড়ল এক খুবসুরৎ লেড়কি ঘাসের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় অবস্থান করছে। সম্রাট-নন্দিনী আর একদল দাসী-বাঁদী তাকে বেষ্টন ক'রে রেখেছে।

শাহজাদা হীরা ঝট ক'রে এক ইয়া পেল্লাই মোটা গাছের আড়ালে গিয়ে গা-ঢাকা দিল। অচানক সে সম্রাট-নন্দিনীর এক পরিচারিকার নজরে পড়ে গেল।

সম্রাট-নন্দিনী মুরা সামান্য কাৎ হয়ে শাহজাদা হীরাকে দেখল। চমকে উঠল তার সুরৎ দেখে।

তার পরিচারিকা মতিয়া বল্‌ল—'আমার মালুম হচ্ছে, এ-নওজোয়ানটি মিট্টির দুনিয়ার কেউ নয়। সবে বেহেস্ত থেকে জমিনে নেমে এসেছে। নইলে এমন সুরৎ কখনও আদমির বাচ্চার মধ্যে হতে পারে না।'

মহব্বৎ কাকে বলে, মহব্বতের জ্বালা কী দুঃসহ তা সম্রাট-নন্দিনী মুরা এর আগে কোনদিন অনুভব করে নি। আজ সে খুবসুরৎ নওজোয়ান হীরা'কে প্রথম দর্শনেই মহব্বতের ডোরে বেঁধে ফেল্‌ল। ক্রমেই তার কলিজা অস্থির হয়ে পড়তে লাগল।

সম্রাট-নন্দিনী মুরা অপলক চোখে তাকিয়ে নওজোয়ান শাহজাদা হীরা-র সুরৎ-সুধা পান করতে লাগল। অচানক সে যেন নিজের মধ্যে ফিরে এল—'না, না। এ হতে পারে না! কিছুতেই না! আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিতে পারলে কেউ আমার অধিকার লাভ করতে পারবে না। কিছুতেই না।'

সঙ্গিনীদের সেখানেই রেখে সে গুটিগুটি শাহজাদা হীরার কাছে গেল। শান্তস্বরে বল্‌ল—'আপনি পরদেশী, আমাদের মেহমান। আপনার জন্য আলাদা জায়গার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মেহেরবানি ক'রে সেখানেই অবস্থান করবেন। বাগিচা আমাদের বিহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ-জায়গা পুরুষদের জন্য নয়।'

শাহজাদা হীরা সে-মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ল। অচানক সম্রাট-নন্দিনী মুরা-র একটি হাত ধ'রে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে ভাব বিমুগ্ধ মিঠা স্বরে ব'লে উঠল—'সম্রাট-নন্দিনী, সর্বদা কি হিসাব নিকাষ ক'রে পা ফেলা সম্ভব? কখনও সখনও হিসাবের গড়বড় তো কিছু না কিছু হতেই পারে।'

সম্রাট-নন্দিনী মুরা-র কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। গলা দিয়ে রা বেরল না। কোনরকমে শাহজাদা হীরা-র বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে প্রাসাদের দিকে চলে গেল।

এদিকে হীরা নিজের কামরায় ফিরে এল। তার খানাপিনা আর আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটিই সম্রাট রাখেন নি।

সকাল হ'ল। সম্রাট-নন্দিনীর প্রধানা সহচরী মতিয়া গুটি গুটি শাহজাদা হীরা-র কামরায় হাজির হ'ল। হীরা কামরায় একাই রয়েছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হ'ল। মওকা বুঝে সে হীরা'কে মহব্বৎ নিবেদন ক'রে বসল। সে সঙ্গে এ-ও

বল্‌ল—'আমি তোমার মহব্বৎ লাভে ধন্য হলে তার বদলে তোমার, অশেষ হিতসাধন আমি করব, ওয়াদা করছি। যে-

হাড়িকাঠে মাথা গলাবার জন্য তুমি এখানে হাজির হয়েছ তাতে হাজারো নওজোয়ানের গর্দান গেছে, জরুর ইয়াদ আছে? তোমার জানও একই উপায়ে খতম হবে। একমাত্র আমিই তোমার জান বাঁচাতে পারি। আমার বাৎ মান, নিজের জান নিয়ে এখান থেকে বিদায় হও।'

—'জান বাঁচাবে? কিভাবে জান বাঁচাবে, বল?'

শাহজাদা হীরা ব্যাপারটির মধ্যে রহস্যের গন্ধ খুঁজতে লাগল। তার ধারণা, সম্রাট-নন্দিনীই হয়ত তাকে পাঠিয়েছে। গোপনে তাকে পরীক্ষা করাই হয়ত এর উদ্দেশ্য।

মতিয়া বল্‌ল—'শোন, সাচ্চা বলছি, মুরা-র প্রশ্নের জবাব তোমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়, কোশিসও করতে যেয়ো না। মাঝখান থেকে জান খোয়াবে। তুমি যদি ওয়াদা কর আমাকে শাদী করবে তবে তোমাকে বাঁচার ফিকির আমি বাৎলে দিতে পারি। মোদ্দা বাৎ আমাকে শাদী করতে হবে। আরও আছে, তোমার বেগমদের মধ্যে আমাকে সবার ওপরে ঠাঁই দিতে হবে, ওয়াদা করছ কি?'

শাহজাদা হীরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'ওয়াদা করলাম, তোমাকে সাদী ক'রে আমার প্রধানা বেগমের মর্যাদা দেব।'

—'শোন তবে, সম্রাট-নন্দিনীর পালঙ্কের তলায় এক আদমীকে রাখা হয়েছে। সে হাবশী। ওয়াকাকে তার মুলুক, আজব আজব সব প্রশ্ন তার দিমাক থেকে বেরোয়। সাইপ্রাস ও ফিরকোনের ব্যাপারে প্রশ্নগুলোর মীমাংসা কারো পক্ষেই করা সম্ভব হয় না। তুমি যদি তার প্রশ্নের ঠিক ঠাক জবাব দিতে আগ্রহী হও তবে একমাত্র ওয়াকাক দ্বীপে গেলে তা তোমার দ্বারা সম্ভব হবে। যাওয়া খুবই শক্ত। লেকিন না গেলে তো চলবে না।

ওয়াকাক দ্বীপের হদিস জেনে নিয়ে শাহজাদা হীরা ঘোড়ার পিঠে চাপল, এক মরুদ্যানে এসে এক ফকিরের সঙ্গে তার মোলাকাৎ হ'ল। সবুজ এক আলখাল্লা প্রায় পায়ের পাতা পর্যন্ত নামিয়ে পরেছে। হলুদ এক জোড়া চপ্পল পায়ে। হীরা তার কাছে ওয়াকাক দ্বীপের হদিস জানতে চাইল।

ফকির সাহাব তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বল্‌ল—'বেটা, তুমি সুলতানের লেড়কা। ওয়াকাক দ্বীপ আদমির পক্ষে একদম অগম্য। তোমার দ্বারা সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। বহুৎ তকলিফের ব্যাপার। তুমি সইতে পারবে না। ওখানে গেলে কেউ জান নিয়ে ফিরতে পারবে না। তোমারও জান খতম হয়ে যাবে। নিজের মুলুকে ফিরে যাও।'

—'দেখুন, আপনার বাৎ আমি মানছি। লেকিন ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে করেই হোক অসম্ভবকে আমাকে সম্ভব করতেই হবে। মেহেরবানি ক'রে আমাকে পথের নিশানা বাৎলে দিন। আমাকে যেতেই হবে।'

ফকির সাহাব মালুম করতে পারলেন, কোনক্রমেই একে দমানো যাবে না। কাফ পর্বতমালার একদম কেন্দ্রস্থলে ওয়াকাক অবস্থিত। জীন-পরীদের মুলুক। কোন আদমির বাচ্চার পক্ষে আজ পর্যন্ত সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তিনটি সড়ক ধরে ওয়াকাকে যাওয়া যায়। দুটো একদম অগম্য। তবু ডানদিকে একটি সড়ক ধরলে হয়ত পৌঁছে যেতেও পার। কাল আমি ডানদিকের পথে যাব। তুমি চাইলে আমার সঙ্গী হতে পার।

আর শোন পথে পাহাড়ের গায়ে একটি লিপি উৎকীর্ণ দেখবে, অনায়াসেই তার বক্তব্য উদ্ধার করতে পারবে। তাতেই পথের নিশানা বাৎলে দেয়া আছে।

ফকির সাহাবের সঙ্গে পরদিন শাহজাদা হীরা ডানদিকের সড়কটি ধরে, হাঁটতে লাগল। এক সময় শিলালিপিটির কাছে হাজির হ'ল। তাতে তিন নির্দেশ উৎকীর্ণ রয়েছে—বাঁ-দিকের সড়কে গেলে তোমাকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। আর ডানদিকের সড়কে গেলে, শেষমেষ অনুশোচনায় দগ্ধে মরতে হবে। আর মধ্যবর্তী সড়ক ধরলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে। একদম দুর্গম সে-পথ।

হীরা মধ্যবর্তী সড়কটিকেই নির্বাচন করল। মিট্টির দুনিয়ার এক মুঠো ধূলা বুকে নিয়ে আল্লাহ-র নাম ইয়াদ ক'রে পার্বত্য সড়ক ধরে এগিয়ে চল্‌ল। তামাম দিন সে হাঁটল। রাত্রেও থামল না। সামনে এক বড়িয়া বাগিচা তার নজরে পড়ল। কয়েক কদম গিয়ে দেখল, বাগিচার দরওয়াজায় পেল্লাই এক পাথর চাপিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এক বিশালদেহী নিগ্রো পাহারায় রত। দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়। হাতে ইয়া লম্বা একটি খড়্গ চকচক করছে।

হীরা দরওয়াজার ধারে ঘোড়াটিকে বেঁধে পাথরটি ডিঙিয়ে বাগিচার ভেতরে ঢুকে গেল।

কয়েক কদম এগিয়ে হীরা এক পাতার ছাউনির ভেতরে খুবসুরৎ এক লেড়কিকে দেখতে পেল। তার দিকে বিস্ময় মাখানো নজর মেলে সে তাকিয়ে রইল। লেড়কিটিও তার দিকে হা ক'রে তাকিয়ে রইল। কারো মুখে টু-শব্দটিও নেই।

লেড়কিটি এক সময় মুখ খুল্‌ল—'এখানে কোন জানোয়ার বা পাখি পর্যন্ত আসতে সাহস করে না। আর তুমি আদমীর বাচ্চা হয়ে কি ক'রে ভেতরে ঢুকলে?'

—'তুমি কে, আমার জানা নেই। আমি এক শাহজাদা। আমার নাম হীরা।'

হীরা নিজের মুলুক ও এখানে আসার উদ্দেশ্যের ব্যাপার তার কাছে ব্যক্ত করল। কিছুই ছিপাল না।

লেড়কিটি মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'আমার

নাম লতিফা। বস, এখানে আমার পাশে, পাথরটির ওপর বস। সবকিছু শুনে সে চমকে উঠে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! কী ভয়ঙ্কর পথে তুমি নেমেছ! এতে তোমার জান খতম হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তুমি চাইলে এখানে, আমার মেহবুব হয়ে থাক। আমি তোমাকে দেহ-দিল্‌ বিলকুল সঁপে দিয়ে নিঃস্ব-রিক্ত হ'ব। ভয়ঙ্কর কাজে গিয়ে জান খতম করার চেয়ে আমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পার না কি? আমাকে সম্ভোগ ক'রে তৃপ্তি পাবে। আর এ-ই তোমার উচিত কাজ হবে।'

—'তোমার বাসনা পূর্ণ করতে আমি অনাগ্রহী নই। তবে এক বাৎ, আমাকে ওয়াকাক দ্বীপে পৌঁছে সাইপ্রাস ও ফিরকোনের ব্যাপারে প্রশ্নাদির জবাব তল্লাশ করতেই হবে। কাজ হাসিল ক'রে ফিরতে পারলে তুমি যা চাইছ তা দিয়ে তোমার দেহ ও দিল্‌কে জরুর খুশী করব।'

—'নাহি, কভি নাহি! কিছুতেই তোমাকে আমি ওই মোউতের মুখে ঠেলে দেব না, দিতে পারব না।'

লতিফা-র সহচরী একদল লেড়কি খানাপিনা ও সরাবের পেয়ালা নিয়ে এল। হীরাকে নিয়ে সে খানাপিনা সারল। তার সহচরীরা নাচা-গানায় মাতল। মেহমান হীরা-র খাতিরেই এ-খুশীর আয়োজন।

হীরা এবার নিজের লক্ষ্যে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হ'ল। লতিফা পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। ঠোঁট নেড়ে নেড়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব মন্ত্র আওড়াল। তারপর এক সময় আচমকা হীরা-র বুকে সজোরে এক ঘুষি মারল।

হীরা জমিনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। বার কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করল। তারপরই সে ধীরে ধীরে হরিণের অবয়ব ধারণ করল। হীরা হরিণ শাবক বনে গেল। লতিফা তাকে আঙুর ক্ষেতের দিকে তাড়িয়ে দিল।

হীরা বাগিচায় ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে এক জায়গার প্রাচীর একটু নিচু পেয়ে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এল। ব্যস, এবার লেজ তুলে চোঁ-চোঁ দৌড় জুড়ল। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর তার মালুম হ'ল বেকার হয়রানি হচ্ছে। ঘুরে ফিরে ফিন একই জায়গায় ফিরে আসছে। আজব ব্যাপার, হাজার কোশিস করেও কিছুতেই বাগিচার গণ্ডীর বাইরে যেতে পারছে না।

বাগিচায় ঢুঁড়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রাচীরে এক ফোকর দেখতে পেয়ে সে তার ভেতরে মাথা গলিয়ে দিল। ব্যস, একদম তাজ্জব বনে গেল। সুদৃশ্য এক প্রাসাদ তার নজরে পড়ল। প্রাসাদের জানালার পৈঠায় এক খুবসুরৎ নওজোয়ান শাহজাদী বসে। মুখে তার হাসির ঝিলিক। সে হীরাকে হাতের ইশারা ক'রে কাছে ডাকল। তার নাম জামিলা। লতিফা-র ছোটো বহিন।

জামিলা রেশমি রশি দিয়ে বেঁধে সে হরিণরূপী হীরাকে প্রাসাদের অন্দরে নিয়ে গেল। সে হীরাকে হরেক কিসিমের ফল খেতে দিল।

হীরা জামিলার কোলে মাথা রেখে চোখের পানি ঝরাতে লাগল। জামিলা তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর-সোহাগ করল। বল্‌ল—'তুমি আমার কাছে, আমার হয়ে থাক। তোমাকে আমি পেয়ার মহব্বৎ করব। কি, থাকবে তো?'

হীরা এবার ডুকরে ডুকরে কেঁদে তার উরুতে মাথা ঘষতে লাগল। জামিলা এবার উঠে গেল। তাক থেকে তার বহিনজীর ছোট্ট একটি ডিব্বা নিয়ে হরিণরূপী হীরা-র কাছে ফিরে এল। তার ভেতর থেকে সফেদ বস্তুর ছোট্ট একটি টুকরো বের ক'রে সে তার মুখে ঢুকিয়ে দিল। এক লহমার মধ্যে হীরা নিজ অবয়ব ফিরে পেল। সে কৃতজ্ঞতায় জামিলা-র সামনে মাথা নত ক'রে খাড়া হয়ে রইল। বল্‌ল—'তুমি আমার জান রক্ষা করেছ। কি দিয়ে যে তোমার ঋণ শোধ করব, ভেবে পাচ্ছিনে।'

জামিলা এবার সাজ পোশাক নিয়ে এসে হীরা'কে সাজিয়ে দিল।

হীরা এবার তার বৃত্তান্ত জামিলা-র কাছে ব্যক্ত করল। তার উদ্দেশ্য জানতে পেরে জামিলা আঁৎকে উঠে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ! তুমি বলছ কী? জেনেশুনে মোউতের মুখে যাবে কী! এখানে, আমাকে নিয়েই পেয়ার মহব্বৎ আর সম্ভোগের মাধ্যমে জিন্দেগী কাটিয়ে দাও। ঝুটমুট সর্বনাশের ফাঁদে মাথা গলিও না। আমার বাৎ শোন, এখানেই রয়ে যাও।'

—'শোন, তোমার ঋণ পরিশোধ করার নয়। তুমি মেহেরবানি করে আমাকে আদমির রূপ ফিরিয়ে না দিলে আমি হরিণই রয়ে যেতাম। তোমার কাছ থেকে মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য আমি ছুটি চাইছি। আমাকে হাসিমুখে ছেড়ে দাও। খোদাতাল্লা-র মেহেরবানিতে আমি জরুর তোমার বুকে ফিরে আসতে পারব। উপায় নেই, আমাকে সেখানে গিয়ে সাইপ্রাস আর ফিরকোন সম্বন্ধে কঠিন কঠিন প্রশ্নের জবাব জেনে আসতেই হবে। তোমার কাছে ওয়াদা করছি ওয়াকাক দ্বীপ থেকে নির্বিবাদে ফিরে তোমার শয্যাসঙ্গী হ'ব, সুখে জিন্দেগী গুজরান করব, দেখে নিও।'

হীরা-র জেদ চেপেছে, সে যাবেই। বাধা দেয়া যাবে না—জামিলা নিঃসন্দেহ হ'ল। সে হীরাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বল্‌ল—'যাওয়ার ওয়াদা যখন করেছ তখন না গিয়ে তুমি ছাড়বে না। আমি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া তিনটি সামান তোমাকে দিচ্ছি, সঙ্গে রেখো। সেগুলো সঙ্গে থাকলে সঙ্কটে পড়লে অব্যাহতি পাবে। সে এবার একটি চীন দেশীয় ইস্পাতের তৈরি সুতীক্ষ্ণ তরবারি, একটি সোনার তৈরি তীর-ধনুক আর একটি
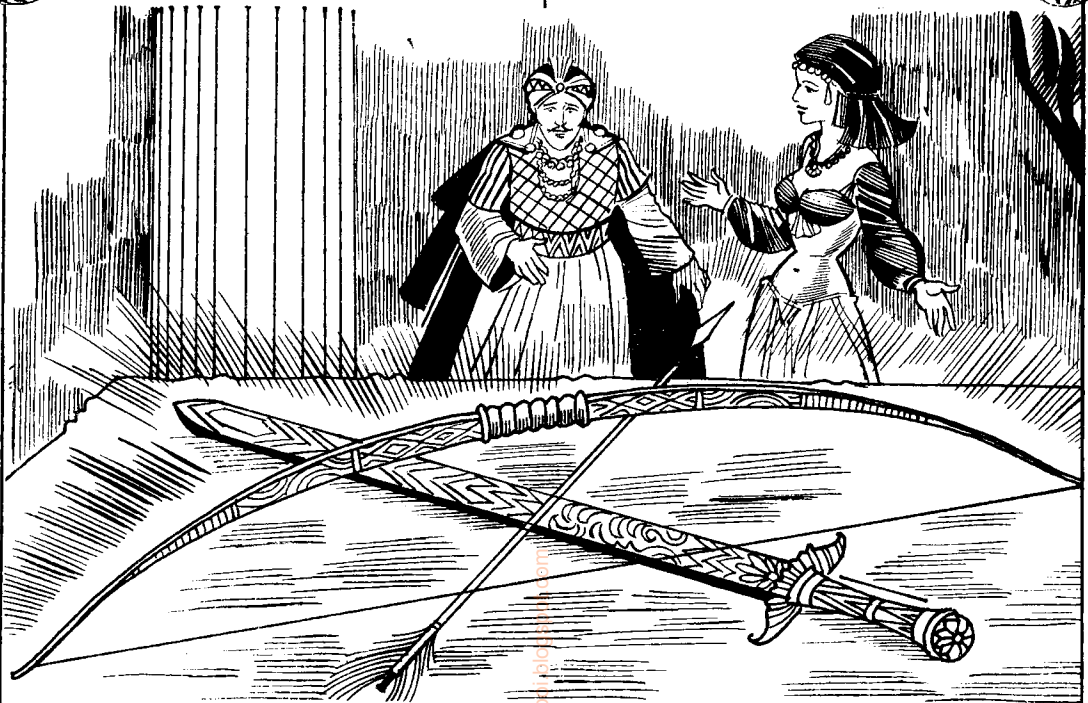
সুতীক্ষ্ণ চাকু তার হাতে তুলে দিল। তরবারিটি দেখিয়ে বল্‌ল—এটি সম্রাট সুলেমান ব্যবহার করতেন, ও তীর-ধনুকটি ছিল পয়গম্বর সালিহ্‌-র। আর এ চাকুটি ব্যবহার করতেন মহাধার্মিক তামুজ। এগুলো সঙ্গে থাকলে কোন শক্তিই তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ফিরে এসে এগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, ইয়াদ রেখো। লেকিন ওয়াকাক দ্বীপে যেতে গেলে দরিয়া পেরিয়ে তোমাকে যেতে হবে। কোন আদমীর বাচ্চা সেখানে যেতে পারে না। কী ক'রে তুমি যাবে, ভেবেছ? তবে আমার চাচাজী সিমুর্গ-এর সাহায্য পেলে তোমার পক্ষে সেখানে পৌঁছনো সম্ভব।' এবার তার কাছে এগিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্‌ল—'কিছুদূরে গিয়ে এক ঝর্ণা পাবে। তার গায়েই সুবিশাল এক প্রাসাদ দেখবে। সেখানকার নিগ্রো সম্রাটের নাম টাক্‌টাক্‌। সর্বদা ইথোপিয়ান সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন।

নিগ্রো-সম্রাট তোমাকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাবেন। তোমার সঙ্গে দোস্তি করবেন। তিনিই তোমাকে লোক দিয়ে আমার চাচার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। একমাত্র আমার চাচাই ওয়াকাক-এর পথের নিশানা দিতে পারবেন। কিছুমাত্র বেগড়বাই যদি কর তবে জান খতম হয়ে যাবে। আর তোমার কিছু হলে আমার জানও খতম করে দেব, ইয়াদ রেখো। আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে দেউলিয়া বনে গেছি। তুমি ছাড়া আমার আর কোন ভাবনা নেই মেহেবুবা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত দিন গুজরান করব। আমার ব্যাপার বিবেচনা ক'রে হলেও তুমি আগুপিছু ভেবে পা ফেলবে।' জামিলা হীরাকে আলিঙ্গন চুম্বনে চুম্বনে উতলা করে তুল্‌ল।

হীরা নিগ্রো টাক্‌টাক্‌-সম্রাটের প্রাসাদ-দরওয়াজায় হাজির হ'ল। তাকে দেখেই দ্বারী হাবসীটির জিভ রসিয়ে উঠল। ভাবল, নাদুসনুদুস চেহারা। প্রচুর গোস্ত মিলবে এর চেহারা থেকে। আচ্ছা ক'রে ভোজ সারা যাবে। স্বোয়াদও হবে খুবই।

এক লহ্‌মার মধ্যেই দশজন গাট্টাগোট্টা প্রহরী তাকে ধরে সম্রাটের কাছে হাজির করার জন্য এগিয়ে এল। পরিস্থিতি সঙ্গীন বুঝে হীরা তরবারি খুলে ঝপাঝপ দশ-দশটি জোয়ান মরদকে কচুকাটা ক'রে ফেল্‌ল।

আজব ব্যাপার দেখে এক হাবসী গিয়ে সম্রাটকে জানাল। তিনি দুনিয়ার সেরা পালোয়ান ও যোদ্ধা মাকসাক'কে হুকুম দিলেন পরদেশী বীরটিকে তাঁর দরবারে হাজির করতে। লেকিন মাকসাক এগোতেই হীরা তার বুকে তামুজ-এর চাকুটি আমূল গেঁথে দিল।

ব্যাস, তার হম্বিতম্বি খতম। হীরা তার কয়েক অনুচরকেও খতম ক'রে ফেল্‌ল।

পরদেশী বীরের কীর্তি শুনে সম্রাটের মাথায় খুন চড়ে গেল। সেনাপতিদের তলব করলেন তাকে হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য। ডরে তাদের হাত-পা পেটের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। কেউ এগোতে ভরসা পেল না।

এদিকে হীরা প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে একটি দরজায় করাঘাত করল। দরওয়াজা খুলে গেল। সম্রাট টাকটাক ঝট ক'রে ইয়া পেল্লাই এক অস্ত্র নিয়ে হীরাকে রুখে দাঁড়াল। হীরা সালিহর সোনার তীর-ধনুক হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে পড়ল। একটি তীরেই সম্রাট টাক্‌টাক্‌-এর দশাসই চেহারা বিকট আর্তনাদ ক'রে আছাড় খেয়ে জমিনে পড়ে গেল। সম্রাটের লেড়কি হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠল। হীরা তাকে প্রবোধ দিল—'চোখের পানি মোছ। এ স্রেফ নসীব। তার নসীবে ছিল আমার হাতে জান খতম হবে।'

চোখের পানি মুছতে মুছতে সম্রাট-নন্দিনী জিজ্ঞাসা করল—'আপনি কে? কোন্‌ ধর্মাবলম্বী?'

—'ইসলাম ধর্ম। এ-ধর্মের মূল কথা আল্লাহ-ই একমাত্র ঈশ্বর। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। মহম্মদ আল্লাহ-র একমাত্র দূত, পয়গম্বর। মুসলমান বাদে আর যারা তারা কাফের। তারা দোজখে স্থান পায়।'

সম্রাট-নন্দিনী আজিজা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তাকে শাদী ক'রে কাছে টেনে নিতে অনুরোধ জানাল।

হীরা তাকে বুঝিয়ে বল্‌ল—'শাদী করতে তার আপত্তি নেই। তবে যে কর্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে এখানে এসেছে তাকে সবার আগে তা চুকাতেই হবে। তবে সম্রাট-নন্দিনী আজিজা যদি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য করে, জামিলা-র চাচা সিমুর্গ-এর কাছে পৌঁছে দেয় তবে তাকে জরুর শাদী ক'রে বুকে টেনে নেবে।

সম্রাট-নন্দিনী আজিজা তাকে নিয়ে প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগিচায় নিয়ে গেল। বাগিচার কেন্দ্রস্থলে এক অতিকায় বটগাছ। তার ছায়ায় এক অতিকায় ঈগল পাখি নিদে একদম বিভোর হয়ে রয়েছে। আজিজা বল্‌ল—'এ-ই জামিলা-র চাচা সিমুর্গ।'

হীরা গাছের তলায় সিমুর্গ-এর নিদ টুটার অধীর প্রতীক্ষায় বসে রইল। ঘণ্টা খানেক বাদে সিমুর্গ-এর নিদ টুটল। হীরা'কে দেখেই সে আঁৎকে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! আদমির বাচ্চা হয়ে তুমি কি ক'রে এ নিষিদ্ধ মুলুকে এলো?'

হীরা তার উদ্দেশ্যের ব্যাপার তার কাছে ব্যক্ত করল। মুচকি হেসে সিমুর্গ বল্‌ল—'জামিলা বেটি তোমাকে যখন পাঠিয়েছে তখন তো ওয়াকাক দ্বীপে তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে বেটা।' দীর্ঘ সময় লাগবে। তাই সিমুর্গ জঙ্গল থেকে কয়েকটা গাধা ও খচ্চর মেরে আনল। ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিল। পথে এগুলোতে খানাপিনা সারবে। এবার অতিকায় ঈগল সিমুর্গ ও হীরা'কে পিঠে চাপিয়ে ওয়াকাক দ্বীপের উদ্দেশে উড়ে চল্‌ল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

নয় শ' তেরোতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সার পরবর্তী অংশটুকু বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, ঈগলরূপী সিমুর্গ পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, দরিয়া আর মরু প্রান্তর অতিক্রম করে হীরা'কে নিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। সাতদিন-সাতরাত্রি সে এক নাগাড়ে উড়ে চল্‌ল। এক সময় সে ঝকঝকে চকচকে মনোরম এক নগরের ওপর হাজির হ'ল। সিমুর্গ বল্‌ল—'বেটা হীরা, এ-ই তোমার বাঞ্ছিত সে-ওয়াকাক নগর। তোমাকে এক সুরম্য প্রাসাদের ওপর নামিয়ে দিচ্ছি। তারই এক কামরায় সম্রাট-নন্দিনী মুরা বাস করে। তার পালঙ্কের তলায় থাকে সে-হাবশীটি। তার কাছেই মিলবে তোমার আকাঙ্ক্ষিত সাইপ্রাস ও ফিরকোন সম্বন্ধী বিলকুল প্রশ্নের উত্তর।'

সিমুর্গ হীরা'কে প্রাসাদটির ছাদের ওপর নামিয়ে দিল।

সিমুর্গ বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে নিজের মাথার একটি ছোট্ট পালক উপড়ে এনে হীরার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'বেটা, যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হও তবে এর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেবে। আমি হাজির হয়ে যাব।' সে আশমানে ডানা মেল্‌ল।

হীরা প্রাসাদের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে কর্তব্য নির্ধারণে ব্যস্ত। এমন সময় ফারাহ নামে এক নওজোয়ান তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেল। সে হীরা'কে প্রাসাদের এক সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গেল। ফারাহ ওয়াকাক-সম্রাটের ডান-হাত। সে হীরা'কে সহজেই দোস্ত ব'লে মেনে নিল। হীরা খানার টেবিলে বসে এখানে তার আগমনের কারণ সম্বন্ধে ফারাহ'কে বিস্তারিত বল্‌ল।

ফারাহ তাকে সার্বিক সাহায্যের ওয়াদা করল। তার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে হীরা নিজের আদৎ ব্যাপার খোলসা ক'রে বল্‌ল—'দোস্ত। আমার আদৎ জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে সাইপ্রাস ও ফিরকোনবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক কি?'

—'তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব না। আর কিছু—'

তার মুখের বাৎ খতম হওয়ার আগেই হীরা বলতে লাগল—'দোস্ত, আর এক প্রশ্নের জবাব আমার চাই—সিন মাসিন সম্রাট-নন্দিনী মুরা-র পালঙ্কের নিচে কেনই বা এক হাবশী নওজোয়ান হরবখত অবস্থান করে?'

—'এ যে সর্বনেশে ব্যাপার। এ দুটো প্রশ্ন ছাড়া তোমার অন্য কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে বল। এসব ব্যাপার একদম গোপন। ওয়াকাক সম্রাটের কড়া হুকুম, কোন পরদেশীর কাছে বেগম সাহেবা ফিরকোন আর সাইপ্রাসের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু বলে তবে তাকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আর সম্রাট-নন্দিনী মুরা আর হাবশী নওজোয়ানটির ব্যাপারে আদপেই আমি কিছুই জানি না।'

—'তবে কি আমার এত তকলিফ আর আশা ভরসা বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে?'

—'দোস্ত, তুমি যদি চাও আমি তোমাকে সম্রাটের সামনে হাজির ক'রে দিতে পারি। তুমি যদি নিজগুণে তার দিল্ জয় করতে পার তবে হয়ত তোমার ফয়দা হতে পারে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে।'

নওজোয়ানটির সঙ্গে হীরা সম্রাটের দরবারে হাজির হ'ল। সে নতজানু হয়ে সম্রাটকে কুর্ণিশ করল। হীরা নিজের গলার মুক্তোর হারগাছা খুলে নজরানা স্বরূপ সম্রাটকে প্রদান করল।

সম্রাট হারগাছা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হলেন, হারটি বহুমূল্যবান। এর দাম তার তামাম ওয়াকাক সাম্রাজ্যের সম্পদের চেয়ে ঢের বেশী।

ওয়াকাক-সম্রাট ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'পরদেশী নওজোয়ান, তুমি আমার মেহমান। তোমার বাঞ্ছা পূরণ করা আমার কর্তব্য। আমি তা করবও। নির্দ্বিধায় বল, আমার কাছ থেকে তুমি কি আশা করছ।'

হীরা এবার সাধ্যাতীত বিনয়ের সঙ্গে তার অবর্ণনীয় তকলিফ ক'রে ওয়াকাক দ্বীপে আসার কারণ বর্ণনা করল। সবশেষে বল্‌ল—'মহানুভব সম্রাট, সবই তো শুনলেন। এবার আপনার ওয়াদা রক্ষা করুন। মেহেরবানি ক'রে আমাকে বলুন, সম্রাজ্ঞী ফিরকোন ও আপনার সঙ্গে আদৎ সম্পর্ক কি? আর সম্রাট-নন্দিনী মুরা-র পালঙ্কের তলায় নওজোয়ান হাবশীটির পরিচয় কি? কেনই বা সে সেখানে থাকে?'

হীরা-র বক্তব্য শুনে সাইপ্রাস-সম্রাট গোস্‌সায় দুম্ ক'রে জ্বলে ওঠার জোগাড় হলেন। বাজখাই গলায় গর্জে উঠলেন—'নওজোয়ান, তোমার ঔদ্ধত্য আমাকে স্তম্ভিত করছে। আমি আগেভাগে ওয়াদা না ক'রে থাকলে তোমার ধড় থেকে মুণ্ডুটি এতক্ষণে নামিয়ে দিতাম।'

—'জাঁহাপনা, আপনার ওয়াদা পেয়েই তো আমি আপনার দরবারে আমার বাঞ্ছা জানাতে ভরসা পেয়েছি। আর এ-ও জানি, আপনি যখন ওয়াদা করেছেন তখন তা পালন করবেনই।'

সাইপ্রাস-সম্রাটের মাথায় আশমান ভেঙে পড়ার জোগাড় হ'ল। ওয়াদা ক'রে নিজের হাড়িকাঠে স্বেচ্ছায় একবার যখন মাথা গলিয়ে দিয়েছেন তখন অব্যাহতির আর প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর মাথা চক্কর মারতে লাগল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক সময় বল্‌লেন—'শোন পরদেশী মেহমান, এ আমার এমন গভীর রহস্যের ব্যাপারে তুমি কেন উৎসাহী হয়েছ তা আমার দিমাকে আসছে না। বরং এদের বদলে তুমি অন্য কোন কঠিনতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, খুশী হ'ব। যদি আমার সুলতানিয়তের অর্ধেকও তুমি প্রার্থনা কর, জরুর মঞ্জুর করব। তবে ওসব ব্যাপার দিল্ থেকে মুছে ফেল।

—'না, আপনার সুলতানিয়ত বা ধন-দৌলতের প্রতি আমার কোনই লিপ্সা নেই। একমাত্র প্রশ্ন দুটোর জবাব বাৎলে দিন, আমি খুশী হ'ব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, ওয়াদা যখন করেছি তখন তোমার বাঞ্ছিত প্রশ্ন দুটোর জবাব জরুর বাৎলে দেব। লেকিন ইয়াদ রেখো, জবাব
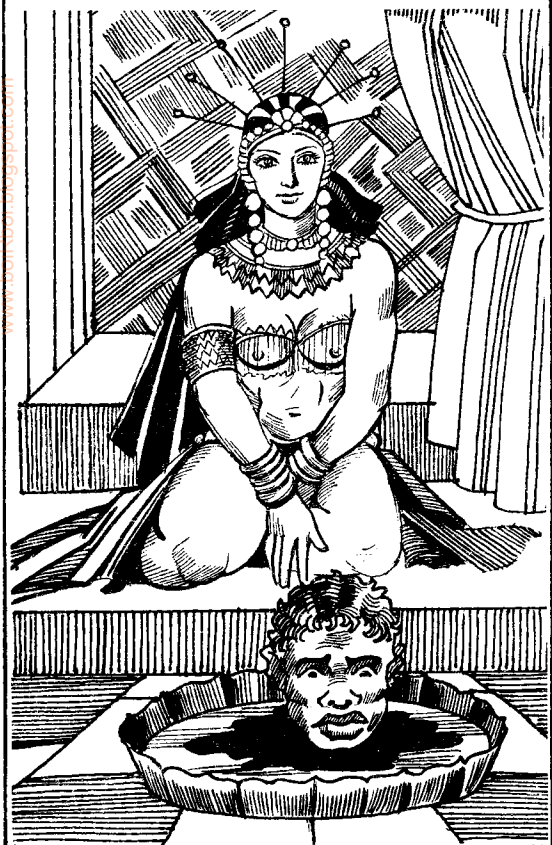
পাওয়ার পরই তোমার ইন্তেকাল ঘটে যাবে।'

—'আমার বাঞ্ছা পূরণের পর আপনি চাইলে আমি নিজেই আপনার অস্ত্রের সামনে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হ'ব না। সাচ্চা বলছি, আমার কোন আক্ষেপ থাকবে না। জানের মায়া আমার নেই। আজ বা কাল জান তো খতম হবেই।'

সাইপ্রাস-সম্রাটের হুকুমে উপস্থিত সবাই দরবার ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সম্রাটের চোখ-মুখে বিষণ্ণতার গভীর ছাপ। এবার বারোজন সশস্ত্র ইথিওপিয়ান সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি সেখানে এল। একটি আসন দখল ক'রে বসল। পরমুহূর্তেই একটি বড়সড় থালায় একটি নিগ্রোর মুণ্ডু এনে রাখা হ'ল।

সাইপ্রাস সম্রাট আমাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন—'আমার সম্রাজ্ঞী ফিরকোন।'

সম্রাজ্ঞী শাহজাদী হীরা-র উদ্দেশ্যের ব্যাপার শুনে অচানক হেসে উঠলেন। পর মুহূর্তেই হাসি থামিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। হীরা ব্যাপার দেখে একদম তাজ্জব বনে গেল। সম্রাজ্ঞীর চোখের পানির এক এক ফোঁটা থেকে এক একটি পান্না পরিণত হতে লাগল। আর তার হাসির সঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল এক একটি তাজা গোলাপ।

সাইপ্রাস-সম্রাট হীরা'কে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন—'নওজোয়ান, একবার আমি শিকার করতে বেরিয়ে মরুভূমির মুলুকে পৌঁছে গিয়েছিলাম। পিপাসায় পানির জন্য ছটফট করতে লাগলাম। লেকিন বালির রাজ্যে পানি কে দেবে? আমি ভয়-ডরে কুঁকড়ে গেলাম, পানি না মিল্‌লে তো জান খতম হয়ে যাবে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নয়শ' ষোলতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশটুকু বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সাইপ্রাস-সম্রাট এবার বল্‌লেন—'আমি হন্যে হয়ে পানির তল্লাশ করতে লাগলাম। এক সময় একটি ভাঙাচোরা কূয়ো নজরে পড়ল। নিচের দিকে নজর দিয়ে দেখলাম পানি বহু নিচে। পানি বলতে গেলে একদম পাতাল পুরীতে পৌঁছে গেছে। আর পানি উঠাতে গেলে বালতির দরকার, আমার কাছে নেই। শেষমেষ আমার শিরস্ত্রাণ খুলে রশি দিয়ে বেঁধে নিলাম। দিলাম সেটি কূয়োর ভেতরে চালান দিয়ে। শিরস্ত্রাণটিতে পানিও ভরল ঠিকই, লেকিন তাজ্জব বনে গেলাম রশিটি টেনে ওপরে তুলতে গিয়ে। সেটি যেন হাজার মন ভারি হয়ে গেছে। মালুম হ'ল, শিরস্ত্রাণের পানিটুকু এরজন্য দায়ী নয়। নির্ঘাৎ কোন জিন-পরী বা দৈত্যটৈত্যের কারসাজি আছে। আমি চিল্লিয়ে বল্‌লাম—'কূয়োর ভেতরে যে-ই থেকে থাক, মেহেরবানি ক'রে আমার শিরস্ত্রাণটি ছেড়ে দাও। পিপাসায় আমার ছাতি ফেঁটে যাওয়ার জোগাড়। এটি ছেড়ে দিয়ে আমার জান রাখ।'

কূয়োর ভেতর থেকে জবাব এল—'আমাকে কূয়ো থেকে তুলে নিশ্চিত ইন্তেকালের হাত থেকে রক্ষা কর। ওয়াদা করছি, আমাকে উদ্ধার করলে তোমাকে ইনাম দিয়ে খুশী করব।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে রশিটি টেনে ওপরে তোলার কোশিস করতে লাগলাম। আমার ভেতরে যে তখন কে অসীম শক্তি যুগিয়ে দিল মালুম নেই। রশিটি ধরে দু'দুটো জেনানা উঠে এলো। উভয়েই বুড়ি। অন্ধা।

বুড়ি দু'জন তাদের নসীবের ব্যাপারে বলতে গিয়ে যা জানাল তা হ'ল—'তাদের সম্রাট জিনের রোষ নজরে পড়ে। চোখ গেলে দিয়ে একদম অন্ধা করে দেয়। তারপর ফেলে দেয় কূয়োর মধ্যে।

বুড়ি দু'টি বল্‌ল—'তুমি মেহেরবানি ক'রে যে আমাদের আন্ধার কূয়োটি থেকে উদ্ধার করেছ তাতে আমরা খুশী। তুমি কোশিস ক'রে যদি আমাদের চোখের নজর ফিরিয়ে দিতে পার তবে তুমি যা বলবে আমরা তোমার জন্য তা-ই করব।'

—'নজর ফিরিয়ে দেব? সে কী! এ যে অসম্ভব ব্যাপার!'

—'বহুৎ তকলিফ হবে বটে। তবে জরুর অসম্ভব নয়। আগে একটি নদী দেখবে। নদীর পাড়ে একটি গাইকে চরতে দেখবে। তার গোবর যদি আমাদের চোখে মলমের মাফিক মেখে দিতে পারে তবেই আমরা নজর ফিরে পাব। 'হুঁশিয়ার, গাইটি তোমাকে দেখে ফেল্‌লে কিন্তু তোমাকে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়তে হবে।'

আমি তাদের নিশানা অনুযায়ী নদীর ধারে গিয়ে গাইয়ের তল্লাশ করলাম। লেকিন দেখা মিল্‌ল না। ভাবলাম যদি কোনও গুপ্তস্থানে থেকে থাকে। অচানক বেরিয়ে আমাকে দেখে ফেলা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাই একটি আবডালে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

সেখান থেকে নজর রেখে চলেছি। একটু বাদে পানি থেকে সফেদ গাই হেলতে দুলতে উঠে এল। ঘাস খেতে লেগে গেল। কিছু বাদে থপ্ থপ্ ক'রে গোবর ছাড়ল। এক কদম দু'কদম ক'রে গিয়ে ফিন পানিতে নেমে হাফিস হয়ে গেল।

ব্যস, আর দেরী নয়, আমি এক খাবলা গোবর নিয়ে কুয়োটির কাছে এগোলাম। বুড়ি দুটোর চোখে সুর্মার মাফিক পরিয়ে দিলাম। এক লহমার মধ্যেই তারা নজর ফিরে পেয়ে খুশীতে ডগমগিয়ে উঠল।'

বুড়ি দু'টি আমার হাত জড়িয়ে ধরে সোল্লাসে বলে উঠল—'বেটা, তোমার মেহেরবানিতে আমরা হারানো নজর ফিরে পেয়েছি। এবার তুমি বল, আমরা কিভাবে তোমার উপকারে লাগতে পারি? খুবসুরৎ কোন লেড়কি, নাকি প্রচুর হীরা-জহরৎ—ধন-দৌলত?'

—'না, ও সবে আমার জরুরৎ নেই।'

বুড়ি দু'টো আমার কাছে এমন এক খুবসুরৎ লেড়কির সুরতের ব্যাপারে বল্‌ল যা আমার পক্ষে ভেবে ওঠা সম্ভব হ'ল না আদপেও সে রকম কোনো লেড়কি মিট্টির দুনিয়ায় আছে কিনা?'

আমার অসহায়ত্বের দিকটি বিবেচনা ক'রে বুড়িরাই ফয়সালা ক'রে দিল—'আরে বেটা, আমাদের জিন-সম্রাটের লেড়কি, খুবসুরৎ, এক নজরে দেখলেই দিমাক একদম ঘুরে যাবে। তাকে মালার মাফিক তোমার গলায় পরিয়ে দেব। একদম ডাঁসা মাল। আলিঙ্গন, দলন, পেষণ, চুম্বন বা সম্ভোগ যা-ই কর না কেন খুশীতে দিল্ একদম কানায় কানায় ভরে উঠবে বেটা।'

আমি নীরব চাহনি মেলে বুড়ি দুটির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারা ব'লে চল্‌ল—'বেটা, এক বাৎ জরুর ইয়াদ রাখবে, জিন-সম্রাট যেন ব্যাপারটি সম্বন্ধে আঁচ করতে না পারে। তবে একদম জান খতম ক'রে ছাড়বে। এখন কি বলছি ধ্যায়ান কর। তোমার গায়ে এক কিসিমের তেল মাখতে হবে। তারপর লকলকে আগুনের শিখার ওপর হাজার বছর শুয়ে থাকলে পুড়ে যাওয়া তো দূরের ব্যাপার, ফোস্কা পড়বে না, চুল বা লোম কিছুই পুড়বে না, তাপ-জ্বালাও সইতে হবে না।'

আমার কলিজাকে রসসিক্ত করার কোশিস করতে করতে তারা আমাকে জিন সম্রাটের প্রাসাদে, সম্রাট-নন্দিনীর কামরায় হাজির করল। দরওয়াজার সামনে হাজির হতেই আমি একদম ভড়কে গেলাম। সামান্যমাত্র সাজ-পোশাক পরিহিতা এক খুবসুরৎ লেড়কির মুখোমুখি হওয়া গেল। যেন মিট্টির দুনিয়ার কেউ নয়, সবে বেহেস্ত থেকে এসেছে কোন হুরী-পরী। তাকে এক লহমায় দেখা মাত্র আমার কলিজা নাচানাচি দাপাদাপি জুড়ে দিল। কামাগ্নি আমার দিল্ আর দেহকে দগ্ধ করতে লাগল। মোদ্দা কথা, একে দেখলে এমন কোন দৃঢ়চেতা পুরুষ নেই যার জিভ রসসিক্ত হয়ে উঠবে না। কেবল এটুকুই বলতে পারি, সে-মুহূর্তে আমার মালুম হয়েছিল একে আলিঙ্গন করতে না পারলে জিন্দেগী একদম বরবাদ হয়ে যাবে।

আমি চমকে উঠলাম। আমার আকাঙ্ক্ষিতা সম্রাট-দুহিতা অচানক ব'লে উঠল—'এ কী আজব ব্যাপার! তোমার কলিজার জোর দেখে আমি তাজ্জব বনছি। তুমি আদমির বাচ্চা হয়ে এখানে, এ প্রাসাদের অন্দরে কি ক'রে এলে? তোমার কি জানের ডরও নেই? একটু বাদেই তোমার দেহ আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে, তোমার মালুম আছে?'

—'জানি, লেকিন তোমাকে দেখে যে পুলকানন্দ লাভ করলাম তার বদলে এবার জান দিতেও কুণ্ঠিত নই। আমার জিন্দেগীকে সফল করার জন্যই তুমি পয়দা হয়েছ মেহবুবা।'

তড়াক্ ক'রে পালঙ্ক থেকে নেমে আমার মেহেবুবা আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে ফেল্‌ল। দলন, পেষন আর চুম্বনে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাকে একদম উতলা ক'রে তুল্‌ল। পরক্ষণেই এক ঝটকায় আমাকে পালঙ্কের ওপর নিয়ে ফেল্‌ল। তার গায়ের মখমলের পাৎলা সেমিজটি তার নিজের অজান্তে কখন যে হাঁটুর কাছে উঠে গেছে তার খেয়ালই নেই।

একদম সাচ্চা, আমি এরকম কোন পরিস্থিতির জন্য একদম তৈরী ছিলাম না। তবে খোদার মেহেরবানিতে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলাম।

প্রাসাদের একদম একান্তে নিরিবিলিতে কেবলমাত্র আমরা তিনজন হাজির ছিলাম। আমি আর আমার কলিজার সমান মেহেবুবা। আর তৃতীয় জন? আল্লাতাল্লা। ব্যস, আর কেউ-ই নয়।

রাতভর, এমন কি তামাম দিন ধরেও আমরা পরস্পরের দেহসুধা পানে মেতে রইলাম, দুনিয়ায় যে এত শান্তি-সুখ আছে আগে জানা ছিল না। আমরা সম্ভোগ-সুখের মধ্যে দিয়ে নিজ নিজ কলিজাকে ঠাণ্ডা করতে লাগলাম।

সুখ কারো জিন্দেগীতেই চিরস্থায়ী হয় না। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখে ছেদ পড়ল। নেমে এল দুঃখের কালো-ছাপ।

এক সকালে আমার কপালে সাচমুচ আগুন লাগল। জিন-সম্রাট তার লেড়কিকে দেখতে এলেন। আমাকে দেখেই তার খুন বিলকুল শিরে চেপে গেল। একটু বাদে ইয়া দশাসাই চেহারার কয়েকজন এল। খপ্ করে আমাকে ধরে ফেল্‌ল। পুতুলের মাফিক আমাকে তুলে কামরার বাইরে নিয়ে গেল।

জ্বলন্ত আগুনে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আজব ব্যাপার, কিছুই হ'ল না আমার। দীর্ঘ সময় ধরে আগুনের কুণ্ডে পড়ে থাকাতেও আমার একটিও লোম পুড়ল না। ফোস্কা পড়ল না, এমন কি জ্বালা-যন্ত্রণাও কিছুই মালুম হ'ল না।

দিনভর, এমন কি তামাম রাত্রি ধরে আগুনে লকড়ি ঠাঁসা হ'ল। আগুন নিভিয়ে আমার অবশিষ্ট হাড্ডিগুলোকে জড়ো ক'রে দেবার কোশিস করতে গিয়ে জল্লাদগুলো একদম ভড়কে গেল। তারা দেখল, আমার দেহের কিছুমাত্রও পরিবর্তন হয় নি। পোড়া কাঠের ওপর শুয়ে মিটিমিটি হাসছি।

জিন-সম্রাট আমার এ-ব্যাপারটিকে আমার অলৌকিক ক্ষমতা ব'লে ধ'রে নিলেন। মুগ্ধ হলেন। তখন আর আমার সঙ্গে তাঁর লেড়কির শাদী দিতে আর কিছুমাত্রও করলেন না। শাদী চুকে গেল। খুব জাঁক জমক ক'রে লেড়কির শাদী দিলেন। আমার সদ্য শাদী

করা বিবিকে প্রাসাদে নিয়ে এলাম।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ থেকে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি বন্ধ ক'রে চুপ করলেন।

নয়শ' আঠারতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, সাইপ্রাস-সম্রাট তাঁর কিস্‌সা ব'লে চলেছেন—'হ্যাঁ, আমি বিবিকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলাম। মেহমান শাহজাদা হীরা, তোমার সামনে যে-জেনানাকে দেখতে পাচ্ছ, ইনিই আমার সে-বিবি—জিন-সম্রাটের লেড়কি। শাদীর কিছুদিন বাদেই আমার বিবি কঠিন বিমারিতে পড়ল। আমি তাকে বিমারির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল—'কই না-তো, আমি তো বহাল তবিয়তেই আছি, আমার গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। হেসে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। আমি স্বস্তি পেলাম।'

কিছুদিন যেতে না যেতেই তার একই হালৎ আমার নজরে পড়ল। শয্যা আশ্রয় নিয়েছে। চোখে-মুখে বিষাদের কালো ছাপ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কি ব্যাপার, তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে যে, বিমারি—'

ম্লান হেসে তড়াক্ ক'রে পালঙ্কে বসে পড়ল। জোর ক'রে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার কোশিস করল। বল্‌ল—'বিমারি? না তো, আমি তো বহাল তবিয়তেই আছি।'

আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। সম্ভোগে মাতল বটে। লেকিন আমি তার কাছ থেকে পুরোপুরি তৃপ্তি পেলাম না।

ব্যাপারটি আমার বুকে গাথা হয়ে রইল। ব্যাপারটি কিছুই মালুম হ'ল না। সে তো এমন ঝিমিয়ে পড়ার লেড়কি নয়। তবে? কিছুই কিনারা করতে পারলাম না।

একরাত্রে আমি পালঙ্কে শুয়েই বাহানা করলাম যেন শরীর একদম কাহিল। আমার বিবি ফির কোন আদর-সোহাগ শুরু করল। আমি পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করলাম। গভীর নিদে যেন এলিয়ে পড়লাম। আমি ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে রইলাম।

একটু বাদেই মালুম হ'ল ফিরকোন পালঙ্ক ছেড়ে নেমে পড়ল। ঝলমলে সাজ-পোশাক পরল। হীরা-জহরতের গহনা গায়ে পড়ল। ব্যস, খুব সন্তর্পণে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

আমিও পালঙ্ক ছেড়ে নেমে তার পিছু নিলাম। সে ঘোড়াশালে গিয়ে একটি জবরদস্ত তেজী ঘোড়ায় চেপে পথে নামল। আমিও ঝটপট সৈনিকের ছদ্মবেশে ঘোড়া নিয়ে তার পিছু নিলাম।

একনাগাড়ে প্রায় দু'ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরকোন নিগ্রোদের আড্ডায় হাজির হ'ল। ভাঙাচোরা সারি সারি মকান। আন্ধারে ভূতের মাফিক খাড়া রয়েছে। আমার কলিজার সমান বিবি ফিরকোন ঘোড়া থেকে নেমে একটি মকানের অন্দরে চলে গেল। আমি দরজা পর্যন্ত যেতেই সেটি দুম্ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে নজর রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। অচানক আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল—'ইয়া আল্লাহ্! আমি কোন্ দোজখে হাজির হয়েছি। একী দেখছি। একী সাচমুচ আমার বিবি ফিরকোন, নাকি অন্য কোন বেশ্যা! পর-পুরুষের কাছে যে বিবস্ত্রা হয়ে দেহ দান করতে পারে সে বাজারের বেশ্যা ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে।

আমি বিলকুল তাজ্জব বনে গেলাম। একটু আগে যে লেড়কিকে বিমারিতে কাবু লাগছিল এখন সে-ই সাত সাতটি ষণ্ডামার্কা নিগ্রোকে দিব্যি বরদাস্ত করছে। তাদের খুশি করছে আর

নিজে সম্ভোগসুখে তৃপ্ত হচ্ছে। এতদিন এত কাম-পিপাসা বুকে নিয়ে যে আমার কাছে বিমারির বাহানা করছিল, সাত-সাতটি নিগ্রো পালোয়ান তার শরীরের ওপর চেপে কিভাবে ধস্তাধস্তি শুরু ক'রে দিল যাতে আমার মালুম হ'ল তার হাড্ডি গুঁড়া গুঁড়া ক'রে বুঝি ছিঁড়েছেঁটে একসার করে দেবে।

আমার দিমাকে খুন চেপে গেল। এক ঘুঁষি মেরে জানালাটিকে ভেঙে উন্মাদের মাফিক কামরার ভেতরে ঢুকে গেলাম। মৌউতের মাফিক নিগ্রোগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

অচানক আমি কামরায় ঢোকামাত্র পাঁচজন নিগ্রো 'জিনি!—আফ্রিদি!' ব'লে চিল্লাতে চিল্লাতে কামরা ছেড়ে ভাগল। বাকী রইল দু'জন। একজনের হাত চেপে ধরলাম। সে ছিটকে বেরিয়ে সোজা চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। সবশেষে কামরায় যে রইল তাকে এক ঝটকায় জমিনে ফেলে দিলাম। ওঠার হিম্মৎ আর রইল না। আমি ফিরকোনকে তোলার কোশিস করতেই বেশ্যাটি দুম্ করে আমার তলপেটে কষে এক লাথি হাঁকল। আমি ছিটকে পড়লাম। শয়তান বেতমিস নিগ্রোটি ঝট্ করে আমার বুকের ওপর চেপে বসল। আমার গলা টিপে ইন্তেকাল ঘটিয়ে দেবার কোশিস চালাতে লাগল। আমার পোষা শিকারী কুত্তাটি কখন যে প্রাসাদ থেকে আমার পিছু নিয়েছিল মালুমই হয় নি। সে-ই আমার জান বাঁচাল। জানালা দিয়ে লাফিয়ে কামরায় ঢুকে শয়তান নিগ্রোটির গলায় সজোরে কামড়ে ধরল। তাকে একদম খতম ক'রে তবে ছাড়ল। আমি এবার ফিরকোনকে রশি দিয়ে আচ্ছা ক'রে বেঁধে ঘোড়ায় আমার সামনে বসালাম। আর শয়তান আধ-মরা নিগ্রোটিকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে প্রাসাদে হাজির করলাম। তাকে আমি নিজে হাতে গর্দান নিয়েছি। রেকাবিতে যে কাটা মুণ্ডুটি দেখতে পাচ্ছ এটি-ই সে-শয়তানটির মুণ্ডু। লবণ মাখিয়ে রাখায় পচে নি। আজও অক্ষতই রয়েছে। আমার হাত ফস্কে যে হতচ্ছাড়া নিগ্রোটি ভেগে গিয়েছিল সে সম্প্রতি সিন মাসিনে, সম্রাট মাসুম-এর আশ্রয়ে রয়েছে। সে-ই তার লেঁড়কি মুরা-র পালঙ্কের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। তার সঙ্গে রঙ্গরসে মজেই সম্রাট-দুহিতা দিন গুজরান করছে। আমার কিস্‌সা মোটামুটি এরকম। এ-কিস্‌সা শোনার জন্যই তুমি জানের মায়া ছেড়ে এখানে হাজির হয়েছ। আমরা দু'জন ছাড়া আমার রাজ্যের আর কেউ-ই এ-কিস্‌সা অবগত নয়। আর আমার হুকুম, কেউ যদি এ-কিস্‌সা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে তাবে খতম ক'রে দেয়া হবে। তোমাকেও তো জিন্দা ফিরে যেতে দেয়া চলে না, পরদেশী। আমার পরিবারের কেলেঙ্কারীর ব্যাপার তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুক, কিছুতেই তো বরদাস্ত করতে পারি না।

—'মহামান্য সম্রাট, আপনি যে-সাজা আমাকে দেবেন তা আমি হাসি মুখে মেনে নেব। এতটুকুও আক্ষেপ আমার থাকবে না। লেকিন আমার জান নেয়ার আগে মেহেরবানি ক'রে একটি ব্যাপার বুঝিয়ে দিন, তামাম দুনিয়া পড়ে থাকতে ওই সপ্তম হাবশীটি কেন সম্রাট-নন্দিনীর পালঙ্কের তলায় আশ্রয় নিয়েছে?' ব্যাপারটি কিছুতেই আমার কাছে খোলসা হচ্ছে না।

—'আমিও তো তোমার ব্যাপার স্যাপার দেখে কম তাজ্জব বনছি না, পরদেশী নওজোয়ান! ব্যাপারটি নিয়ে কেন এত ঘাটাঘাটি করতে চাইছ? তোমার জিজ্ঞাসা নিবারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একান্ত গোপন ব্যাপার, যা কিছুতেই ফাঁস করা চলে না, তার পরিবর্তে তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে দিলাম। তোমার গর্দান নেয়ার ব্যাপারটি থেকে আমি স্বেচ্ছায় সরে গেলাম। তোমার দিল্ যেখানে চায়, চলে যাও। বাধা দেব না।'

শাহজাদা হীরা ব্যাজার মুখে দরবার ত্যাগ করল।

শাহজাদা হীরা-র বাঞ্ছা পূরণ হয়েছে। এবার নিজের মুলুকে ফিরতে হবে। সে সিমুর্গ-এর দেয়া পালকটিতে আগুন ধরিয়ে দিল। এক লহমার মধ্যে ভোজবাজীর মাফিক সে তার সামনে এসে দাঁড়াল। শাহজাদা হীরা তার ডানার ওপর চেপে বসল। উড়তে উড়তে আজিজা-র প্রাসাদের মাথায় এসে থামল। হীরা নামল।

আজিজা তার মেহেবুব হীরা-র জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। তাকে বুকে ফিরে পাওয়ায় তার কলিজা ঠাণ্ডা হ'ল।

আজিজা-র সান্নিধ্যে ক'দিন সুখে কাটিয়ে সিমুর্গ-এর ডানায় চেপে তারা উভয়ে জামিলা-র প্রাসাদে গেল। হীরা'কে বুকে পেয়ে জামিলাও হাসি-আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। হীরা আজিজা ও জামিলা দু'বেগমকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

হীরা এবার লতিফা-র মকানে হাজির হ'ল। তার যা কিছু কসুর ছিল মার্জনা ক'রে দিল। হীরা তাকেও শাদী ক'রে নিজের সুখ-দুঃখের ভাগীদার ক'রে নিল।

হীরা এবার তিন বিবিকে নিয়ে হাজির হ'ল সম্রাট কাসুম-এর রাজ্যে। এবার শুরু হবে তার আদৎ কাজ। সম্রাট দুহিতা মুরা-র সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে তাকে লিপ্ত হতে হবে।

শাহজাদা হীরা এবার তার সঙ্গিনী তিন বিবিকে এক মুসাফিরখানায় রেখে একাই হাজির হ'ল সম্রাটের প্রাসাদে।

হীরা'কে দেখেই মুরার সহচরী মতিয়া ছুটে এল। হীরাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। হীরা তাকে যথোচিত আদর-সোহাগ ক'রে বল্ল—'মেহেবুবা, নগরের প্রবেশ-দ্বারের মুখের মুসাফিরখানায় আমার তিন বিবিকে রেখে এসেছি। দিল্ চাইলে তুমিও সেখানে যেতে পার, যাবে?'

মতিয়া তিলমাত্রও দ্বিধা না ক'রে সম্মত হয়ে গেল। হীরা তাকে নিয়ে মুসাফিরখানায় তার অন্য তিন বেগমের কাছে রেখে এল।

হীরা ফিন সম্রাট কামুস-এর প্রাসাদে ফিরে এল। সম্রাট তাকে দেখেই চিনতে পারলেন।

হীরা কুর্ণিশ সেরে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, খোদাতাল্লা-র দোয়ায় আমি আপনার লেড়কির প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। আশা করি তাকে জরুর খুশী করতে পারব। আপনি মেহেরবানি ক'রে তাকে আমার সামনে হাজির করুন।'

শাহজাদীও হীরা'কে দেখেই চিনতে পারল। হ্যাঁ, এ নওজোয়ান সেই মেহমানটির সঙ্গেই বাগিচায় মুখোমুখি হয়েছিল বটে। এবার সে জান দিতে ফিন ছুটে এসেছে।

ঝুটমুট সময় না কাটিয়ে সে সরাসরি প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল—'বল-তো, ফিরকোন আর সাইপ্রাসের সম্রাটের মধ্যে সম্পর্ক কি?'

—'তাদের সম্পর্ক একদম নটঘট। একদম খারাপ সম্পর্ক। সম্রাজ্ঞী কামজ্বালা নিবারণ করতে কিছু সংখ্যক নিগ্রো নওজোয়ানের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। সে যে কসুর করেছিল, সে জন্য সম্রাট তাকে বন্দী করে রেখেছেন। আজও পিঠমোড়া ক'রে বাঁধা।'

—'সম্রাট-নন্দিনী মুরা তার জবাবটি শুনে চমকে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে এবার বল্‌ল—'লেকিন এক বাৎ, তোমার জবাব যে বিলকুল ঝুটা নয়, প্রমাণ কি?'

—'দেখুন, আমি চাই না সভার মাঝে কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে। অবশ্য যদি আপনি না শুনে ছাড়তে রাজী না থাকেন তবে আমি প্রস্তুত। তবে তার আগে আমার এক প্রশ্নের জবাব দেবেন কি? আপনি এক কুমারী লেড়কি? এসব ব্যাপার আপনি কি ক'রে জানতে পারলেন মেহেরবানি ক'রে বলবেন কি? তবে কি আমি ভাবতে পারি ওয়াকাক নগরের এমন এক আদমির সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যার মাধ্যমে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর গোপন ব্যাপার আপনি জ্ঞাত হয়েছেন, ঠিক কিনা?'

হীরা এবার সম্রাটকে কুনির্শ ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার অনুরোধ আপনি আপনার নিজের আর আপনার লেড়কির ইজ্জতের খাতিরে সম্রাট-নন্দিনী মুরা'কে বিলকুল সাচ্চা ঘটনা খোলসা ক'রে বলতে বলুন।'

সম্রাট কামুস এবার তার বেটির দিকে জিজ্ঞাসু নজর মেলে তাকালেন।

সম্রাট-নন্দিনী মাথা নিচু ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার চোখে মুখে নেমে এল বিষণ্ণতা ও অসহায়ত্বের ছাপ।

শাহজাদা হীরা এবার বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আদৎ ব্যাপার এখনই ফয়সালা হয়ে যেতে পারে যদি আপনি মেহেরবানি ক'রে আমাকে একবারটি সম্রাট-নন্দিনীর কামরায় নিয়ে যান।'

সম্রাট কামুস আর তার মেহমান শাহজাদা হীরা'কে নিয়ে লেড়কির কামরায় এলেন। সে সোজা হামাগুড়ি দিয়ে পালঙ্কের তলায় নিজের আধখানা শরীর চালান ক'রে দিয়ে হাবশী নওজোয়ানটিকে বের ক'রে আনল। এবার সে দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য পেশ করতে লাগল—'জাঁহাপনা, এ-শয়তান বেতমিসটি সাইপ্রাস-সম্রাটের কবল থেকে কোন রকমে রেহাই পেয়ে আপনার লেড়কির কামরায় আশ্রয় নিয়েছে। এরা সাত-সাতটি শয়তান বেতমিস মিলে সাইপ্রাস-সম্রাজ্ঞীকে ভোগ করত। সম্রাজ্ঞীও এদের কাছে নিজের দেহকে সঁপে দিয়ে চরম সুখানুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ত।'

সম্রাট কামুস শরমে এতটুকু হয়ে গেলেন। এক সময় নিজেকে

একটু সামলে নিয়ে বল্‌লেন—'মেহমান নওজোয়ান হীরা, আমি যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে গেছি। আমি হাসিমুখে আমার লেড়কি সুরা'কে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। তুমি চাইলে একে তোমার মুলুকে নিয়ে বিবির মর্যাদা দিতে পার। আর যদি চাও তবে জিন্দা মিট্টির তলায়, গোরও দিতে পার, বাধা দেব না। তবে আমার প্রাসাদ থেকে, আমার চোখের সামনে থেকে দোজখের কীট আমার লেড়কিটিকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও।'

সম্রাট কামুস-এর হুকুমে সে-মুহূর্তেই শয়তান বেতমিস নিগ্রোটিকে শূলে চাপিয়ে খতম ক'রে দেয়া হ'ল।

সম্রাট-নন্দিনী মুরা-র হাত-পায়ে শেকল পরিয়ে হীরা তাকে মুসাফিরখানায় নিয়ে এল।

ফিন সিমুর্গকে তলব করা হ'ল। সে তাদের ছয়জনকে পিঠে চাপিয়ে আশমানে উড়ল। নামিয়ে দিল সুলতান শামস-এর প্রাসাদের ওপরে। সিমুর্গ চিরবিদায় গ্রহণ ক'রে চিরদিনের জন্য তার হীরা-র কাছ থেকে বিদায় নিল।

শাহেনশাহ শামস লেড়কাকে ফিরে পেয়ে খুশীর আনন্দে নেচে উঠলেন। তাঁর সুলতানিয়তের সর্বত্র খুশীর জোয়ার বয়ে চল্‌ল।

শামস বললেন—'বেটা, তোমার বহু আকাঙ্ক্ষিতা সম্রাট-নন্দিনী মুরা'কে তুমি আপনার ক'রে পেয়েছ তার জন্য আমি খুশী ও স্বস্তি পেলাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হীরা বল্‌ল—'আব্বা, এ কুলটা জেনানাকে পেয়ে আমার কি-ই বা ফয়দা হবে, বুঝছি না। বরং হুকুম করুন তার প্রাপ্য সাজা তাকে চুকিয়ে দিচ্ছি।'

—'তোমার বাৎ স্বীকার করছি বেটা। লেকিন জিন্দেগীর মায়া কাটিয়ে এত তকলিফ ক'রে যাকে হাতে পেয়েছে দিমাক গরম ক'রে তার জান খতম ক'রে দিতে আমি অন্ততঃ রাজী নই। সে-ও তো তোমার কাজের জন্য তোমাকে সাজা দেয় নি? তার বাগিচায় বিনা অনুমতিতে হাজির হয়ে তুমি কি কসুর কর নি বেটা? জরুর কসুর করেছিলে। লেকিন সে তো তোমাকে সাজা দেয় নি। তাই তোমারও এত সহজে তাকে সাজা দেয়া উচিত হবে না।

আব্বার বাৎ শুনে হীরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। সম্রাট-নন্দিনী মুরা'কে সাজা দেয়া থেকে বিরত রইল। কাজী তলব ক'রে তাকে শাদী ক'রে বুকে টেনে নিল। শাহজাদা হীরা তার পাঁচ-পাঁচটি বেগম নিয়ে খুশীর জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দিল।

কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

এক আজব আদমির কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, এবার আপনাকে কায়রো নগরের এক আজব আদমির কিস্‌সা শোনাচ্ছি। আজব সে-আদমিটির নাম ছিল গোহা। আদমিটি তামাম জিন্দেগী কেবল চৌপায়ায় শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দেয়ার ধান্দা করেছিল। সে এমনই কুঁড়ে ছিল যে, চোখ মেলে তাকাতেও যেন তকলিফ হয়।

গোহা-র ইয়ার-দোস্তরা একদিন তাকে বল্‌ল—'তোমার কি ব্যাপার হে? চৌপায়ায় আশ্রয় করেই জিন্দেগী কাটিয়ে দেয়ার ধান্দা করেছ নাকি?'

গোহা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—'কী বাজে বকছ দোস্ত! এই তো ক'দিন আগেও একটি বককে পাকড়াও করেছিলাম, জান না? তার ডানা কেটে আশমানের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। ব্যস, একটু বাদে সে জমিনে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। একী একটি কাজ নয়? বলেই সে বেকুবের মাফিক হাসতে লাগল।

—'ইয়া আল্লাহ! কী গুনাহ কী বাৎ! এমন নির্মম হতে গেলে কেন?'

—'আদতে বকটিকে দেখেই আমার ভয় ডর লেগেছিল। মালুম হয়েছিল, বুঝি আমার চোখ দুটো খাবলে নিয়ে পালাবার ধান্দায় রয়েছে।'

অন্য আর একদিন গোহা শুয়ে শুয়ে ইয়ার-দোস্তদের বল্‌ল—'বলতে পারিস, খোদাতাল্লা হাতি আর উটদের কেন পিঠের দু'ধারে দুটো ডানা জুড়ে দেয় নি?' একটু বাদে নিজেই বল্‌ল—'জানিস না তো? শুনে রাখ। ওদের ডানা থাকলে উড়ে গিয়ে অন্যের বাগিচায় ঢুকে গাছগাছালি বিলকুল বরবাদ করে দিত।'

এক সকালে এক দোস্ত এসে তার গাধাটিকে দিন কয়েকের জন্য ধার চাইল।

সে চোখ-মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌ল—'জরুর দিতাম দোস্ত। লেকিন এই তো দিন কয়েক আগেই সে গাধাটিকে বেচে দিয়েছি। একটু বাদেই আস্তাবল থেকে গাধাটি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে লেগে গেল।'

তার দোস্তটি বল্‌ল—'লেকিন দোস্ত তোমার গাধাটি যে তোমার আস্তাবল থেকে ডাকাডাকি করছে?'

—'দোস্ত তুমি আমার বাৎ বিশোয়াস না ক'রে যদি এক গাধার বাতকেই বেশী দাম দাও তবে আমি অসহায়।'

গোহা একদিন মহল্লারই এক আদমির মকানে ভোজ খেতে যায়। গোটা এক মোরগার তন্দুরি নিয়ে সে কিছু সময় কায়দা কসরৎ চালিয়ে শেষমেষ হতাশ হয়ে সেটিকে কপালে ঠেকিয়ে রেকাবির পাশে রেখে দিল।

গোহার ব্যাপার দেখে গৃহকর্তা বল্‌ল—'কি ব্যাপার, মোরগাটাকে সেলাম জানিয়ে রেখে দিলেন যে?'

—'ইয়া আল্লাহ! আপনি একে সাধারণ এক মোরগা ভেবে জবাই ক'রে রসুইখানায় পাঠিয়েছেন। আদতে মোরগাটি পুণ্যাত্মা, আল্লাহ-র ভক্ত। তাই তো আগুনেও একে কব্জা করতে পারে নি। তাই তো কড়াইয়ে চাপাবার আগে এর দেহ-গোস্ত যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। আগুন পাপীদের দগ্ধ করতে পারে বটে। লেকিন আল্লাহ-র প্রকৃত ভক্তদের কাছে আগুন ঘেঁষতেও পারে না. ইয়াদ রাখবেন!'

একবার গোহা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গ নিয়েছিল। পথে তাদের খানা ফুরিয়ে যায়। গোহা-র খানাপিনার দিকে বহুৎ নজর। খানা ভাগ বাটোয়ারার সময় একটি সিদ্ধ ডিম আর একটি পিঠা ভাগ পেল। সে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'মাফি মাঙ্গছি, আমি এর সদ্ব্যবহার করতে অক্ষম। আপনারাই বরং এগুলো দিয়ে গলা পর্যন্ত ঠেসে খেয়ে নিন।'

গোহা একরোজ বাজার থেকে কিছু গোস্ত খরিদ ক'রে এনে তার বিবির হাতে দিয়ে বল্‌ল—'আচ্ছা ক'রে পাক কর। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরে এসে খানাপিনা সারব।'

সন্ধ্যার কিছু বাদে সে ফিরে এসে খানার টেবিলে বসে দেখে রেকাবিতে কিছু রুটি আর সব্জি সাজানো। বিবিকে জিজ্ঞাসা করল, গোস্ত কি হ'ল?'

—'বরাত খারাপ। গোস্ত পাক ক'রে গোসল করতে গিয়েছিলাম। মওকা বুঝে এক বিল্লি কামরায় ঢুকে বিলকুল গোস্ত খতম ক'রে ভেগেছে।'

গোহা ডাণ্ডা নিয়ে বিল্লির তল্লাশে বেরলো। একটু বাদে এক বিল্লিকে পাকড়াও ক'রে এনে বিবিকে বল্‌ল—'বিল্লির ওজন তো বেশী নয়। এতগুলো গোস্ত এ খেল কি ক'রে, রাখলই বা কোথায়? দিল্লাগী পেয়েছ?'

গোহা-র বিবি একদিন তার তিনমাসের লেড়কাটিকে তার কোলে চাপিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'একে একটু রাখ তো। আমি খানা তৈরী করেই নিচ্ছি। দেরী হবে না।'

জেনানাদের কাম কাজে তার একদম অনীহা। একটু বাদে লেড়কাটি তার গায়ে উল্টি করে দিল। সে তৎক্ষণাৎ গোস্‌সায় ফেটে পড়ে লেড়কাটাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে তার গায়ে সমানে থুথু ছিটাতে শুরু করল।

লেড়কার আম্মা ছুটে এসে বল্‌ল—'এ কি! এর গায়ে থুথু ছিটাচ্ছ? এ যে আমাদের আদর-সোহাগের বস্তু!'

—'তোমার কাছে আদর-সোহাগের বস্তু হতে পারে, আমার

জরুর নয়। এ-লেড়কা আমার নয়, অন্য কারো হবে।'

গোহার এক দোস্ত একদিন তাকে বল্‌ল—'দোস্ত, দ্বিতীয়ার চাঁদ এত ছোট ও সরু হয় কেন, বল তো দেখি?'

—'ইয়া আল্লাহ! মক্তব মাদ্রাসায় তোমাকে কিছু লিখা-পড়া শিখায় নি দেখছি! যে ক'দিন চাঁদ ছোট ও সরু থাকে সে ক'দিন খোদাতাল্লা তাকে আশমানে তারা বানাবার কাজে লাগিয়ে রাখেন।'

একদিন গোহা এক ভেড়ার মুণ্ডু পাক করার জন্য মহল্লার এক আদমির কাছে একটি হাড়ি ধার চায়। আদমিটি তার হাতে একটি হাড়ি দিয়ে বল্‌ল, কাল ভোরে খেয়াল ক'রে ফেরৎ দিয়ে যেও।'

পরদিন ভোরে সে হাড়ি নিয়ে এল। হাড়ির মালিক দেখল, হাড়ির ভেতরে অন্য একটি হাড়ি রয়েছে। হাড়ির মালিক চোখ কপালে তুলে বল্‌ল—'এ কী! এ হাড়িটি কিসের?'

—'ভাইয়া, তোমার হাড়িটি হয়ত বাচ্চা পয়দা করেছে।'

—'ইয়া আল্লাহ!' বলে হাড়ি দুটো রেখে দিল। গোহা তারপর দিন ভোরে ফিন হাড়ি ধার চাইতে এল। হাড়ির মালিক ভাবল দুটো হাড়ি দিয়ে দিলে পরদিন চারটি হাড়ি দিয়ে যাবে। এরকম ভেবে সে দুটো হাড়ি এনে তার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'কাম কাজের বাড়ি; দুটো হাড়িই হয়ত দরকার লেগে যাবে। দুটোই নিয়ে যাও, কাল

ভোরে ফেরৎ দিয়ে যেও।'

গোহা দুটো হাড়িই নিয়ে এল।

ব্যস, গোহা একদম চুপচাপ। হাড়ি ফেরৎ দেয়া তো দূরের ব্যাপার হাড়ির মালিকের মকানের ত্রিসীমানায়ও যায় না। বেশ কয়েক মাহিনা গুজরান হয়ে গেল। তবু গোহার দেখা না পেয়ে সে হতাশ হয়ে একদিন তার মকানে এসে হাড়ি ফেরৎ চাইল।'

গোহা কপাল চাপড়ে বল্‌ল—'ইয়া আল্লা! দুঃখের ব্যাপারটি বুঝি তোমাকে বলাই হয় নি? উমর বাড়ছে, আজকাল সব বাৎ ঠিকঠাক খেয়াল থাকে না। হাড়ি দুটো আনার পরদিনই হাড়ি দুটোর দাস্ত-বমি হয়—কলেরা। ব্যস, জান খতম হয়ে গেল।'

—'দিল্লাগী করার আর জায়গা পাওনি! হাড়ির দাস্ত-বমি-কলেরা হয় জিন্দেগীতে কেউ শুনেছে কোনদিন? হাড়ির ইন্তেকাল ঘটে—দিল্লাগী ছেড়ে আমার হাড়ি কোথায় ফেরৎ দাও।'

—'এতে দিল্লাগীর কি দেখলেন, বলুন তো? আল্লাহ-র পয়দা করা সামান যদি বাচ্চা পয়দা করতে পারে তবে তার ইন্তেকাল তো ঘটতেই পারে। আর যে পয়দা হয় তার ইন্তেকালও ঘটবে—এ-ই তো নিয়ম।'

আর একদিনের ব্যাপার। এক মুরগা-চাষী গোহা'কে ইয়া তাগড়াই মুরগা উপহার পাঠাল। গোহা এক সঙ্গে বসে খানাপিনা সারতে তাকে নিমন্ত্রণ করল। রাত্রে তারা একসঙ্গে বসে মুরগাটির সদ্ব্যবহার করল।

ক'দিন বাদে গোহার মকানে এক মেহমান এল। একদম অপরিচিত। গোহা তাকে সম্ভাষণ জানাল। বসতে দিয়ে আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইল।

—'আমি ওই মুরগা-চাষীর দোস্ত। তার মুখে আপনার আতিথ্যের গুণগান শুনে হাজির হলাম। তার বরাতে যখন এত কিছু জুটেছে তখন নির্ঘাৎ আমার বরাতেও কিছু হলেও জুটবেই।

গোহা সাধ্যমত মেহমানের সেবা করল। সে খুশী হয়ে ফিরে গেল।

ক'দিন বাদে আর এক আদমি গোহা-র মকানে এল। গোহা আপ্যায়ন করে কামরায় নিয়ে গিয়ে তাকে বসতে দিল। পরিচয় জানতে চাইলে আগন্তুকটি বল্‌ল—'আমি আপনার যে মুরগা-চাষী দোস্ত আছে, তার দোস্তের এক দোস্ত। আপনার আতিথ্যের সুনাম শুনে হাজির হয়েছি।'

—'বহুৎ আচ্ছা, কুর্শিতে বসুন।' গোহা তাকে বসিয়ে চুলায় এক বাটি পানি বসিয়ে গরম করল। গরম পানিতে সামান্য তেল ছেড়ে দিল। পানির ওপরে তেল ভেসে বেড়াতে লাগল। আগন্তুক সবিস্ময়ে বল্‌ল—'এ কী? এ দিয়ে কি হবে?'

—'মালুম হচ্ছে না? যে পানিতে মুরগাটিকে সিদ্ধ করা হয়েছিল এ-পানি তার খুড়তুতো ভাইয়ের মাসতুতো ভাই। এবার মালুম হ'ল?'

এক সকালে গোহাকে নিয়ে একটু মজাক করতে গিয়ে একটি করে ডিম জেবে নিয়ে গোহা-র বাড়িতে তার কয়েকজন ইয়ারদোস্ত হাজির হলো। তারা গোহা'কে নিয়ে গোসলখানায় এক সঙ্গে গোসল করতে গেল। এক হামামে সবাই এক সঙ্গে ঢুকে গেল। সবাই কোর্তা-পাৎলুন খুলে একদম নাঙ্গা হয়ে গেল। ইয়ার-দোস্তদের মধ্যে থেকে একজন বল্‌ল—'আমাদের মধ্যে কে ডিম পয়দা করতে পার বল।'

একমাত্র গোহা ছাড়া বাকী সবাই সমস্বরে ব'লে উঠল—'আমি পারি, আমি পারি।' বাৎচিতের মাধ্যমে ঠিক হ'ল যে ডিম পয়দা করতে পারবে না তাকে হামামের বিলকুল খরচ বহন করতে হবে। গোহা ডিম পয়দা করতে পারবে না, তাই তাকে হামামের বিলকুল খরচাপতি বহন করতে রাজী হতেই হ'ল।

এবার শুরু হ'ল ডিম পয়দা করার কাজ। গোহা ছাড়া সবাই একটি ক'রে ডিম পয়দা করে এক জায়গায় জড়ো করল। গোড়ার দিকে গোহা ব্যাপারটি দেখে একটু ভড়কে গেল। পরমুহূর্তে ইয়ার-দোস্তদের তাড়া করতে লেগে গেল। তার ব্যাপার দেখে তো সবাই তাজ্জব বনে গেল। তারা বল্‌ল—'হঠাৎ আমাদের এমন তাড়া করছ কেন দোস্ত?'

—'করব না? আমি একা মুরগা, আর তোমরা সবাই যে মুরগী। এতগুলো মুরগীকে পাশাপাশি পেলে কি আর দিমাক ঠিক রাখা সম্ভব, তোমরাই বল দোস্ত?'

গোহা ফি রোজ ভোরের নামাজ সেরে হাত ওপরে তুলে আল্লাহ-র কাছে প্রার্থনা জানায়—'আমাকে একশ'টি দিনার দান কর। পুরো একশ' দিনার। একটিও বেশী বা কম আমি নেব না।'

গোহা-র এক ইহুদী প্রতিবেশী ফিরোজ গোহা-র এ আজব প্রার্থনাটি শুনে এক রোজ ভাবল, ব্যাপারটি একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবে।

গোহা পরের ভোরে রুজু সেরে নামাজ পড়ল। তারপর চোখ বন্ধ ক'রে আল্লাহ-র কাছে তার সে-আজব প্রার্থনা জানাচ্ছে, ঠিক তখনই ইহুদীটি একটি রুমালে নিরানব্বইটি দিনার বেঁধে তার সামনে রেখে দিয়ে গুটিগুটি সরে পড়ল। আবডালে থেকে তার কারবার দেখতে লাগল।

প্রার্থনা সেরে গোহা চোখ খুলে রুমালে বাঁধা দিনারের পুঁটুলিটি দেখে খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে গেল। গণনা সেরে সে বল্‌ল—'আল্লাহ, তুমি যে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছ তাতে আমি কৃতজ্ঞ। লেকিন এতে তো পুরো একশ' দিনার নেই। এক দিনার কম। আমি তো এগুলো নিতে পারছি না। আমার এক গরীব

প্রতিবেশী ইহুদী রয়েছে। বাল-বাচ্চা নিয়ে বহুৎ তকলিফের মধ্যে দিন গুজরান করছে। আদমি হিসাবেও একদম সাচ্চা। আমি দিনারগুলো তাকেই দিয়ে দেব।

সে এবার দিনারের পুঁটুলিটি ইহুদীর জানালা দিয়ে কামরার ভেতরে ছেড়ে দিল।

তার সততা ও দয়াপরায়ণতায় প্রতিবেশী ইহুদীটি মুগ্ধ হ'ল। গোহা পরদিন ভোরে নামাজ সেরে ফিন একই প্রার্থনা শুরু করল। ইহুদীটি এবার পুরো একশ'টি দিনার রুমালে বেঁধে তার সামনে রেখে এল। গোহা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল পুঁটুলিতে একশ' দিনার। দেখে খুশীতে ডগমগ হয়ে বল্‌ল—'আল্লাহ তোমার দান আমি মাথা পেতে নিলাম।'

গোহা রুমালের পুঁটুলিটি নিয়ে পথে নামতেই ইহুদীটি এসে সামনে দাঁড়িয়ে হাত পাতল—'আমার পুঁটুলিটি ফিরিয়ে দাও।'

—'পুঁটুলি? তোমার পুঁটুলি? কিসের পুঁটুলি, বল তো?'

—'তোমার কাছে যে পুঁটুলিটি—তাতে একশ' দিনার রয়েছে।'

—'ইয়া আল্লাহ! তোমার মতলব তো সুবিধের নয়! আল্লাহ খুশী হয়ে যা দেবেন বিলকুল তোমাকেই দিয়ে দেব, ভাবলে কি ক'রে? একটি দিনার বেশী আছে, নিতে পার।' দিনারটি ছুঁড়ে দিল।

এক মসজিদের ইমাম ভক্তদের কাছে ধর্মকথা ব্যাখ্যা করছেন। গোহাও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ইমাম বল্‌লেন—'প্রতিটি আদৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীর প্রতিরাত্রে স্বামীর প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালন করা। এর ফলে খোদাতাল্লা-র উদ্দেশ্যে ভেড়া কোরবানির সমান পুণ্য অর্জিত হয়ে থাকে। দিনের বেলায় শাদী করা বিবির সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হলে বান্দাকে মুক্তি দানের সমান পুণ্য অর্জিত হয়। আর মাঝরাতে যে-আদমি নিজের বিবির সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হয় সে খোদাতাল্লার উদ্দেশ্যে উট কোরবানির পুণ্য অর্জন করে। ইমাম উপদেশামৃত বলা খতম করলে গোহা নিজের মকানে ফিরে এল।

নয়শ'তেইশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, গোহা মসজিদ থেকে মকানে ফিরে এল। বিবিকে কাছে তলব ক'রে ইমামের উপদেশের ব্যাপার বল্‌ল। রাত্রে গোহা বিবিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। তার বিবি দেখল, স্বামী সম্ভোগের জন্য তাকে কাছে টানছে না, অন্যন্যোপায় হয়ে তার বিবি বল্‌ল—'কি গো, অনীহা কেন? এসো, কাছে এসো, ভেড়া কোরবানির পুণ্য অর্জন কর।'

গোহা সম্ভোগ সেরে শুয়ে নাক ডাকতে লাগল।

মাঝ-রাত্রে গোহা-র বিবি ফিন তাকে ধাক্কা দিয়ে ডেকে বল্‌ল—'কি গো, এসো, ওপরে ওঠ। উট কোরবানির পুণ্য অর্জন কর। গোহা নিদের ঘোরে 'হু' বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। শেষমেষ তার বিবির তাড়নায় তার ওপরে উঠতেই হল। নিদ জড়ানো চোখে কোন রকমে সম্ভোগাদি সেরে ফিন শুয়ে চোখ বুজল।

ভোর হতে না হতেই গোহা-র বিবি তাকে ডেকে তুলে বলে—'আরে কত বেলা হয়ে গেল। জলদি ওপরে ওঠ, বান্দা মুক্তির পুণ্যটুকু ছেড়ে দেবে। এস, তা অর্জন ক'রে নাও। গোহা নিদ জড়ানো চোখ দুটোকে বন্ধ রেখেই কোনরকমে উচ্চারণ করল—'আজকে অন্ততঃ পুণ্যটুকু তুমি একাই অর্জন ক'রে নাও। এ-বান্দাটিকে মুক্তি দাও।' পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা তৈমুর লঙ একদিন সসৈন্যে নগরে সীমানায় হাজির হ'ল। নগরের বাসিন্দারা ডরে কাঁপতে লেগে গেল। গোহা বুক ফুলিয়ে বল্‌ল—'হোক গে, দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা। আমি তাকে ডরাই না। আমি তার সামনে হাজির হচ্ছি।'

মাথায় ইয়া পেল্লাই এক মসলিনের পাগড়ী মাথায় বেঁধে নিল। বাজারের কারবারীদের কাছে যত মসলিন ছিল বিলকুল মাথায় জড়িয়ে নিল।

তৈমুরলঙ-এর সামনে হাজির হলে সে জিজ্ঞাসা করল —'কি দিয়ে এ-পাগড়ী বানিয়েছ যে, ইয়া পেল্লাই হয়ে গেছে?'

—'হুজুর, আমার রাত্রের সাজ পোশাকের ছোটা পাগড়ী এটি। আদৎ পাগড়ীটি ব্যস্ততার জন্য নিয়ে আসা হ'ল না। ওটাকে ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে আমার পিছন আনছে।'

দুনিয়ার সেরা যোদ্ধাটি ভাবলেন—'এ তো যে-সে আদমি নয়! রাত্রের পাগড়ী-ই যদি এত বড় হয় আর রাত্রের সাজ পোশাক এমন বহুমূল্য ও ঝলমলে হয় ; তবে তার আদৎ জাঁকজমক না জানি কি হতে পারে!

বাস্তবিকই গোহা-র কারবার দেখে ডরে তৈমুরলঙ-এর কলিজা শুকিয়ে গেল। সে-রাত্রেই ছাউনি তুলে সেখান থেকে চম্পট দিল।

এক বিকালে নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে গোহা-র বিবি পা হড়কে পানিতে পড়ে যায়। স্রোতের মুখে পড়ে এক লহমার মধ্যে একদম তলিয়ে গেল।

গোহা তৎক্ষণাৎ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতরাতে লাগল। তার কারবার দেখে নদীর পাড়ে যারা ছিল বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—'একী আজব কাণ্ড করছ? তোমার বিবি তো স্রোতের মুখে পড়ে স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছে।'

গোহা বল্‌ল—'আদমীরা তলিয়ে গেলে স্রোতের টানে অনুকূলেই যায়, সাচ্চা বটে। লেকিন আমার বিবিকে তো আমি এতকাল দেখেছি, যে সোজা পথে না গিয়ে উল্টো পথের দিকে তার বেশী ঝোঁক।'

বেগম শাহরাজাদ গোহা-র আজব কিস্‌সাগুলো খতম ক'রে চুপ করলেন।

ওস্তাদ ইশাকের কিস্‌সা

এবার জানালা দিয়ে প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচার দিকে এক নজরে তাকিয়ে নিয়ে বেগম শাহরাজাদ বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, রাত্রি এখনও ঢের বাকী। এবার একটি ভিন্ন স্বাদের কিস্‌সা শুরু করছি—'জাঁহাপনা, খলিফা হারুন-অল-রসিদ-এর সভাসদ ছিলেন ওস্তাদ ইশাক অল নাদিম। খলিফার সভাগায়ক ছিলেন তিনি।

খলিফা তাঁর হারেমের জন্য বাঁদীদের সংগ্রহ ক'রে এনে ওস্তাদ ইশাক-এর কাছে গানা শিখতে পাঠাতেন। তালিম নেওয়ার কাজ চুকলে তাকে খলিফার সামনে হাজির করা হ'ত। তাঁকে গানা শুনিয়ে খুশী করতে পারলে বোঝা যেত তালিম সম্পন্ন হয়েছে। নইলে তাকে ফিন ওস্তাদ ইশাক-এর কাছে যেতে হ'ত।

একদিন খলিফার দিলে স্বস্তি ছিল না। কোন কাম-কাজেই আগ্রহ নেই। অনন্যোপায় হয়ে ছদ্মবেশে উজির জাফর, দেহরক্ষী মাসরুর, ওস্তাদ ইশাক, ইউনুস এবং জাফর-এর ছোটা ভাইয়া অল ফাদল-কে নিয়ে পথে নামলেন।

খলিফা সদলবলে টাইগ্রিস নদীর ধারে হাজির হলেন। এবার একটি ছোট্ট নৌকা নিয়ে চল্‌লেন আলতাফের দিকে। তারা এমন রঙ্গ তামাশা শুরু করলেন যেন খলিফা আর পারিষদদের মধ্যে কিছুমাত্রও ফারাক নেই।

কিছু সময় বাদে তারা নৌকো ছেড়ে ফিন পয়দল চলতে লাগলেন। কয়েক কদম যেতেই তারা এক বুড্ডার মুখোমুখি হ'ল।

বুড্ডাটি ওস্তাদ ইশাক'কে নতজানু হয়ে সালাম জানিয়ে বল্‌ল—'আমার কী নসীবের জোর যে, আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ল। এ-বান্দা প্রাসাদের বালবাচ্চাদের লিখা-পড়া শেখায়। আপনাকে দূর থেকে বহুবার দেখেছি বটে। লেকিন কাছে যাওয়া নসীবে কুলিয়ে ওঠে নি।'

এতে মালুম হ'ল, বুড্ডা মৌলভী পুরো দলটির মধ্যে কেবলমাত্র ওস্তাদ ইশাক ছাড়া আর কাউকেই চেনে না।

তারা হাঁটতে থাকেন। বুড্ডা মৌলভী তাদের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বল্‌ল—'হুজুর, আমার একটি খুবসুরৎ বাঁদী রয়েছে। তাকে গলার তালিম দিয়ে খলিফার হারেমের বাঁদীদের যোগ্যা ক'রে তুলতে আগ্রহী। আপনি যদি মেহেরবানি ক'রে তাকে তালিম দেওয়ার দায়িত্ব নেন তবে এ-গরীব বর্তে যায়। আদতে এমন খুবসুরৎ লেড়কিকে তো আর আমার মাফিক গরীবের মকানে রাখা যাবে না। উপায়ান্তর না দেখে কোন সওদাগরের কাছে বেচে দিতেই হবে। হাতে সময় থাকলে একবারটি নিজের চোখে দেখুন, বুঝবেন আমার সমস্যা কি।'

খলিফা চোখে ইশারা করলেন, বুড্ডার লেড়কিকে দেখতে যাওয়ার জন্য।

বুড্ডা মৌলভী খলিফা ও তার সভাসদদের নিয়ে তার মকানে গেল। সাজানো গোছানো একটি কামরায় তাদের বসতে দেবে। একটু বাদে খুব খুবসুরৎ এক লেড়কি তানপুরা হাতে সেখানে হাজির হ'ল। সে গানা শুরু করল। তার কিন্নর কণ্ঠের গানা শুনে খলিফা একদম তাজ্জব বনে গেলেন। খুবসুরৎ লেড়কিটিকে মনে মনে তারিফ করতে লাগলেন—'তুমি কেবলমাত্র রূপসীই নও, গুণধর অসামান্য।' কারণ, খলিফা ছদ্মবেশে থাকার জন্য তাকে মুখফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

ইশাক কিন্তু ঘন ঘন লেড়কিটির মধুমাখা কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন।

লেড়কিটি কানে হাত দিয়ে ব'লে ওঠে—'আপনি দুনিয়ার সেরা ওস্তাদ। আমি আপনার সামনে বসে কোনদিন গানা গাইতে পারব এ বিলকুল নসীবের ব্যাপার। খুশীতে আমার সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছে। মালুম হচ্ছে, আমি আর এক কলি গানাও গাইতে পারব না। আপনারা মেহমান। গানা শুনতে চেয়েছেন। আর আমি তা শোনাতে পারব না, কম আক্ষেপের ব্যাপার।' সে চোখের পানি

ঝরাতে লাগল।

—'এক বাৎ, তোমার আদৎ পরিচয় কি, বল তো?'

—'লেড়কিটি না শোনার বাহানা ক'রে মুখ বুজে রইল।'

—'সবার সামনে বলার আপত্তি থাকলে পাশের কামরায় চল।'

পাশের এক ছোট খাটো কামরায় গিয়ে লেড়কিটি মুখের নাকাব সরিয়ে ফেল্‌ল। অনেকাংশে স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। সে বল্‌ল—'ওস্তাদ, আমি দিনের পর দিন আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। আজ আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম। চোখের পানি আমাকে রোজই ঝরাতে হয়। দেখুন আজ আমার সুরৎ কী হয়েছে।'

—'সে কী রূপসী! তোমার সুরৎ বাস্তবিকই অনন্য। দুনিয়ার ক'টি লেড়কির সুরৎ তোমার সমান, বল তো?'

—'সাচ্চা বটে, এক সময় আমার সুরৎ অনন্যই ছিল। লেকিন দুশ্চিন্তায় আমার এ-হালৎ হয়েছে। ফি রোজ আমাকে নিলামে দাঁড়াতে হচ্ছে। কবে কার কাছে বিক্রি হ'ব ঠিকঠিকানা আছে?'

জিন্দেগীতে আমার একটিই বাসনা ছিল, আপনার কাছে গানার তালিম নেব। বিনিময়ে যেকোন দাম দিতে আমি রাজী। যেকোন তকলিফও আমি মাথা পেতে নেব। মেহেরবানি করে আপনার পায়ে—।

ঠিক সে-মুহূর্তে বুড্ডা কামরায় ঢুকল।

ইশাক জিজ্ঞাসা করল এর আদৎ নাম কি? এর জন্য কত দাম তুমি আশা কর, বল তো?'

—'জী এর নাম তুফা, তুফা-অল-কুলুব। দাম তো কমসে কম দশ হাজার দিনার হবেই। অনেকেই এ দাম দিয়েছেও বটে। দামের চেয়ে লেড়কির মতামতই আদৎ ব্যাপার। তার মত মেলে নি। এর একই বাৎ, আপনার কাছে গানা শিখবে। আপনি রাজী থাকলে দশ হাজারেই ছেড়ে দেব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তার দ্বিগুণ তোমাকে মিটিয়ে দেব। আমার সঙ্গে প্রাসাদে নিয়ে চল, নগদ দাম চুকিয়ে দেব।'

ইশাক পাশের কামরায় গিয়ে খলিফার কানে কানে ব্যাপারটি বল্‌ল। খলিফা শুনে খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে গেলেন। এবার বুড্ডার মকান ছেড়ে তাঁরা ফিন পথে নামলেন।

বুড্ডাটি তুফা'কে ইশাক-এর প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে নগদ বিশ হাজার দিনার নিয়ে মকানে ফিরল।

ইশাক-এর নফরানীরা তুফাকে গোসল করিয়ে ঝলমলে সাজ পোশাক পরিয়ে, হীরা-জহরতের গহনাপত্র পরিয়ে একদম বিবি সাজিয়ে বসিয়ে রাখল।

ইশাক প্রাসাদে ফিরে সুসজ্জিতা তুফা'কে দেখে তাজ্জব বনে গেল। তাকে চিনতেই যেন পারল না। ভাবল, এমন এক বেহেস্তের হুরীকে মাত্র মাস কয়েক গানা-বাজনার তালিম দিয়ে খলিফার হাতে তুলে দিতে হবে। আপশোষের ব্যাপারই বটে।

তুফা তার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছে। ওস্তাদ ইশাক-এর কাছে গানার তালিম নিতে শুরু করেছে।

এক বিকালে তুফা গুন্‌গুন্ ক'রে গানার কলি ভেজে চলেছে। এমন সময় ওস্তাদ ইশাক তার পিছনে এসে দাঁড়াল। তুফা তার উপস্থিতি বুঝতে পারে নি। ইশাক ভাবতে লাগলেন—'যার কণ্ঠ এমন মধুঝরা সে নির্ঘাৎ এ-দুনিয়ার কেউ নয়। বরাতগুণে তার কাছে গানা শিখতে এসেছে। যার এমন সুর-ছন্দবোধ তাকে সে কতখানিই বা শেখাতে সক্ষম হবে! কি-ই বা শেখাবে!'

অচানক ঘাড় ঘুরিয়ে ইশাককে দেখে তুফা চমকে উঠে বল্‌ল—'ওস্তাদ, আপনি এখানে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে—তবিয়ৎ খারাপ হয় নি তো?'

ইশাক গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—'তুফা, সাচ্চা বলবে, কার কাছে এমন বড়িয়া গানা তুমি শিখেছ? এ তো শুধুমাত্র তালিমের মাধ্যমে হবার নয়।'

শরমে মাথা নিচু ক'রে তুফা ওস্তাদজীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় বল্‌ল—'আপনি আমার ওস্তাদ। আমার যা কিছু সুর-ছন্দ বিলকুল আপনার আশীর্বাদেই রপ্ত করতে পেরেছি।'

—'না, তুফা। তুমি যে সুর ও ছন্দের অধিকারিণী তাতে তোমাকে তালিম দেওয়ার হিম্মৎ আমার নেই। তোমাকে খলিফার হারেমে দিয়ে আসি, চল। তাঁর হারেমের সেরা বাঁদীর পদ তুমি পাবে, আমি নিঃসন্দেহ। লেকিন, এ-অধমকে 'দিল্ থেকে যেন কোনদিন মুছে দিও না।'

—'ওস্তাদজী, একী তাজ্জব বাৎ বলছেন। আপনার দৌলতেই আমি নিজেকে তৈরী করতে পেরেছি। আর শেষে কিনা আপনাকেই দিল্ থেকে মুছে ফেলব?'

তুফা-র হাতে একটি কোরাণ শরীফ তুলে দিল ওস্তাদ ইশাক। তুফা সেটিকে কপালে ঠেকিয়ে ভাববিমুগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'দুনিয়ায় যতদিন জিন্দা থাকব, আপনাকে দিল্ থেকে মুছে ফেলতে পারব না।'

নসিবের ফেরেই তোমাকে আজ খলিফার হারেমে যেতে হচ্ছে। আল্লাহ যেন তোমাকে জিন্দেগীভর সুখী রাখেন। আমার শেষ ইচ্ছা, একটু আগে যে গানাটি গাইছিলে, বিদায় নেবার আগে একটিবার আমাকে সেটি শুনিয়ে যাও। আর এক বাৎ, খলিফার সামনে হাজির হয়ে সে-গানাটিই তাঁকে প্রথম গেয়ে শোনাবে। ইয়াদ রেখো।'

তুফা গানাটি ওস্তাদ ইশাক'কে গেয়ে শোনাল। গম্ভীর মুখে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এক সময় বল্‌ল—'তুফা, যাবার আগে তোমার জিন্দেগীর কিস্‌সা শোনাও। যেখান থেকে তোমাকে নিয়ে এসেছি সেটি তোমার আদৎ জায়গা নয়, আমি নিঃসন্দেহ। কার অঙ্গ থেকে, কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুমি ভাসতে ভাসতে সেখানে হাজির হয়েছ, আমার কাছে খোলসা করে বল।'

তুফা বলতে শুরু করল—'আপনি আমার ওস্তাদ। আপনার কাছে কিছুই ছিপাব না। আমার জিন্দেগী বার বার বিচিত্র পথে ধেয়ে গেছে। তবে আজ নয় ওস্তাদ, অন্যদিন—অন্য কোনদিন আমার কিস্‌সা আপনাকে শোনাব। আজ খলিফার প্রাসাদে যেতে চেয়েছেন, চলুন।'

তুফা ঝলমলে সাজ-পোশাক পরে ওস্তাদ ইশাক-এর সামনে এসে দাঁড়াল।

ওস্তাদ ইশাক তুফা'কে নিয়ে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ-এর সামনে দাঁড়াল। তুফা নতজানু হয়ে খলিফাকে কুর্ণিশ করল। খলিফা তখ্‌ত থেকে উঠে এসে নিজে হাতে নাকাবটি নামিয়ে দিলেন। এতে স্বীকৃতি পেল, এখন থেকে তুফা খলিফার হারেমের বাঁদীতে পরিণত হ'ল। এবার তাকে নিয়ে তখ্‌তের পাশের আসনে বসিয়ে দিলেন।

তুফা সে-গানাটি শুরু করল। খলিফা তার সুললিত কণ্ঠের গানা শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—'তোফা! তোফা! তুফা, তুমি আল্লাহ-র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।' এবার ওস্তাদ ইশাক-এর দিকে ফিরিয়ে বল্‌লেন—'এ কী ইশাক, এ যে কামাল ক'রে দিয়েছ! এমন গানা শিখিয়ে দিয়েছ যা তুমি নিজেও গাইতে পারবে না। তাজ্জব কী বাৎ!'

—'একদম সাচ্চা জাঁহাপনা! এর কাছে আমার প্রতিভা তুচ্ছ হয়ে গেছে। মুলুক জুড়ে আমার নাম ডাক। আজ কি-ই বা এর দাম রইল!'

খলিফা হেসে বল্‌লেন—'তবে স্বীকার করছ, ওস্তাদেরও ওস্তাদ আছে, কি বল?'

—'জাঁহাপনা, এ-গানা শোনার পর আমার স্বীকার করতে আর দ্বিধা নেই যে, আমি এতদিন শুধুমাত্র সুরের দুনিয়ার আশপাশ দিয়ে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি মাত্র। আদপেই ভেতরে ঢুকতে পারি নি।'

খলিফার হুকুমে তাঁর দেহরক্ষী মাসরুর তুফা'কে নিয়ে অন্দরমহলে চলে গেল।

খলিফা সবিস্ময়ে বল্‌লেন—'ইশাক, লেড়কিটি কেবলমাত্র যে অনন্য সুরতের অধিকারিণী তা-ই নয়, কণ্ঠস্বরও অতুলনীয়। সে সঙ্গে তার রুচি-বোধেরও তারিফ করতে হয়।

খলিফা উজির জাফর'কে ডেকে বল্‌লেন—'শোন, ইশাক আমাকে যে উপহার দিয়েছে তা কুড়ি হাজার দিনারে পাওয়া যায় না। তাকে এক লক্ষ মোহর পাঠিয়ে দাও। আর দশটি দামী সাজ পোশাকও পাঠিয়ে দিও খেয়াল ক'রে।'

সন্ধ্যার কিছু বাদে খলিফা তুফা-র কামরায় এলেন। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টানলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। পুলকে তার দিল্ নেচে উঠল। নিঃসন্দেহ হ'ল, তুফা সাচ্চা কুমারীই বটে। তার সেবায় লাগার জন্যই তার কুমারীত্বকে এতদিন সযত্নে রক্ষা করেছে। তুফা খলিফার মহব্বতের ডোরে বাধা পড়ে গেল। ফি মাহিনা দু'লক্ষ দিনার তার মাসোহারার বরাদ্দ করলেন। পঞ্চাশটি নফর-নফরানী তার দেখভাল করার জন্য নিয়োগ করা হ'ল।

খলিফা তুফা-র মহব্বতের ডোরে এমনই আটক হয়ে পড়লেন যে, অন্য সব বেগম ও বাঁদীরা তার দিল্ থেকে মুছে গেল। কারো কামরাতেই তিনি এখন রাত্রি গুজরান করেন না।

খলিফা কোন খোজাকেই তুফা-র ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারেন না। কারো ওপরে এতটুকু ভরসা নেই বলেই তিনি কামরা ছেড়ে যাবার সময় নিজে হাতে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে যান।

খলিফা এক সন্ধ্যায় তুফা-র কামরায় গেলেন। তার একটি হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করলেন। আদতে ফল হ'ল উল্টো। তুফা গোস্‌সায় একদম লাল হয়ে উঠল। গোস্‌সা সামাল দিতে না পেরে এক আছাড়ে তানপুরাটি ভেঙে খান খান ক'রে দিল। খলিফা তো একদম বেকুব বনে গেলেন। সমবেদনার সুরে বল্‌ল—'মেহেবুবা কি ব্যাপার? তোমার হয়েছে কি, বল তো? তোমার চোখের পানি

আমার দিল্‌কে টুকরো টুকরো ক'রে দিচ্ছে যে।'

তুফা ডুকরে ডুকরে কেঁদে বল্‌ল—'কি হয়েছে, আপনি নিজে বুঝছেন না? আপনি আমাকে এখন আর আগের মত পেয়ার-মহব্বৎ করেন না।'

—'এ কী বলছ তুফা? তোমাকে চোখের আড়াল করলেও মুহূর্তের জন্যও দিলের আড়াল করতে পারি না। অথচ তুমি বলছ—'

তার মুখের বাৎ খতম হওয়ার আগেই তুফা চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'আপনার মহব্বৎ এখন কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে জাঁহাপনা। নইলে আমার হাতে চুমু খেলেন কেন? আমার বুকের মধু কি ফুরিয়ে গেছে নাকি?

খলিফা ব্যাপার বুঝতে পেরে তুফা'কে এক হেঁচকা টানে এক দম বুকের মধ্যে নিয়ে নিলেন। তারপর চুম্বনে চুম্বনে তাকে একদম উতলা ক'রে তুললেন। তার ঠোঁটে, গালে, স্তন যুগলে, আর

নাভিস্থলে ক্রমাগত চুম্বন করতে লাগলেন। আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌লেন—'তোমার গোস্‌সার কারণ কি এবার মালুম হ'ল। মেহেবুবা, তুমি কি জান না তোমাকে আমি কতই না মহব্বৎ করি? তুমি আমার দিল্‌কা টুকরা, আমার কলিজা।'

একদিন খলিফা কামরা ছেড়ে গেলে বেগম জুবেদা তুফা-র কামরায় এল। অচানক তাকে দেখেই তুফা সঙ্গে সঙ্গে কুর্ণিশ জানিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে কুর্শি এগিয়ে বসতে দিল। সে বল্‌ল—'আপনি হয়ত জানেন বেগম সাহেবা, এ কামরার বাইরে যাওয়ার অনুমতি আমার নেই। তাই আপনার সঙ্গে ভেট করার সাধ আমার থাকলেও সাধ্যে কুলোয় নি। মেহেরবানি ক'রে আপনি নিজে বাঁদীর কামরায় হাজির হওয়ায় বাঁদী আজ ধন্য হ'ল।'

—'শুনলাম, তুমি এক বহুৎ উঁচু দরের লেড়কি। দয়া, মমত্ববোধও তোমার মধ্যে যথেষ্টই রয়েছে। আমার স্বামীর নামে কসম খেয়ে বলছি তুফা, আমার স্বামী যে-সব বাঁদীদের রঙ্গরসে মজে থাকেন তাদের কামরায় কামরায় ঢুঁড়ে বেড়ানোও আমি পছন্দ করিনা। তবে তোমার কামরায় এলাম একটি বাৎ তোমাকে জানাতে। তুমি প্রাসাদে আসার পর থেকে আমার প্রতি খলিফার অনীহা দেখা দিয়েছে। ধরতে গেলে তিনি আজকাল আমার কামরায় যানই না। আমি অবাঞ্ছিতা-অবহেলিতা হয়ে পড়ে রয়েছি প্রাসাদের এক কোণে।' জুবেদা ডুকরে ডুকরে কেঁদে এবার বল্‌লেন—'বহিন, তোমার কাছে একটি আর্জি জানাতে ছুটে এসেছি। আমাকে বড়া বহিন জ্ঞানে খলিফাকে একটিমাত্র রাত্রের জন্য আমার কামরায় পাঠিয়ে দাও। আর তা যেন এক মাহিনার ভেতরে হয়। পারবে না বহিন? আমি তাঁর খরিদকরা বাঁদী নই। দস্তুর মাফিক কাজী তলব করে, কোরাণ শরিফ স্পর্শ ক'রে তবে শাদী হয়েছে।'

তুফা চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে বল্‌ল—'বেগম সাহেবা, কেবল এক রাত্রির জন্যই নয় তামাম মাহিনার প্রত্যেকটি রাত্রিই তিনি আপনার কামরায় কাটাবেন। আপনার চোখের পানি ঝরলে আমার যে গুনাহ হবে। আমি না জেনে, না বুঝে আপনার কাছে গুস্তাকী করেছি। আমাকে মাফ ক'রে দিন। আমি বাঁদী হয়েই থাকব।'

খলিফা শিকার থেকে ফিরে সোজা তুফা-র কামরায় ঢুকলেন। জুবেদা কামরায় থেকেই ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন। খলিফা ঢুকতেই জুবেদা কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

খলিফা কামরায় ঢুকেই তুফা'কে বুকে টেনে নিলেন। খলিফাকে আদর-সোহাগ করতে করতে তুফা বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার একটি বাৎ আপনাকে মানতেই হবে। আজ রাত্রিটি বেগম সাহেবার কামরায় কাটান, আমার আব্দার।—'

খলিফা ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলেন—'বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ আচ্ছা। তবে তা-ই যাচ্ছি। সাচ্চা বটে, বহুৎ দিন তার কামরায় যাওয়া হয় নি। কসুর হয়ে গেছে। লেকিন আমি কামরায় ঢুকে যখন বিবস্ত্র হয়ে শুতে যাবো ঠিক তখন বল্‌লে কেন, আগে বল্‌লেই হ'ত তুফা?'

—'জ্ঞানীরা তো ব্‌লেছেনই—কোন কিছু প্রার্থনা করার সময় বিবস্ত্র হয়ে প্রার্থনা করবে।'

খলিফা এবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পালঙ্কের ওপর চিৎ ক'রে শুইয়ে দিলেন। তারপর? তারপর যা স্বাভাবিক, তা-ই ঘটল।

খলিফা এবার তুফা-র কামরা ত্যাগ ক'রে জুবেদা-র কামরায় চলে গেলেন।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নয়শ উনত্রিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ বলতে শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, এবার থেকে তুফার নসীবে যা ঘটেছিল তা বাস্তবিকই বিচিত্র—একদম অচিন্ত্যনীয়ও বলা চলে।

খলিফা বিদায় নিলে তুফা তানপুরাটি হাতে নিয়ে বাজনা শুরু করল। একদম বিভোর হয়ে পড়ল। এমন সময় এক বুড্ডা কামরায় হাজির হ'ল। সে ডরে কাঁপতে লাগল। ভাবল, খলিফার সুরক্ষিত হারেমে বুড্ডাটি এল কি ক'রে? তবে কি সে খোয়াব দেখছে?

বুড্ডাটি আর এগিয়ে এল না, কিছু বল্‌লও না। তুফা এমন বাহানা করল যেন কিছুই ঘটেনি। সে বাজনার মধ্যে ডুবে যাওয়ার কোশিস করল। একটু বাদে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, বুড্ডাটি বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করেছে।

তুফা থামলে বুড্ডাটির নাচও বন্ধ হয়ে গেল। সে এবার বল্‌ল—'আমাকে দেখে ডর পাবার কিছুই নেই। আমি তোমাকে বহুৎ আগে থেকেই জানি—চিনি। আমার দ্বারা তোমার কোনই ক্ষতি হবে না। ঝুটমুট ডর পেয়ো না। আমার পথে কেউ-ই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।'

—'কে তুমি? তুমি কি আফ্রিদি দৈত্য নাকি কোন জিন?'

—'হ্যাঁ, সাচ্চা বটে, আমি জিন। জিনিস্তান আমার মুলুক। ইবলিস আমার নাম।'

তুফা চমকে ওঠে। বিকট আর্তনাদ ক'রে উঠল—'ইয়া খোদা! কই, বিধর্মের ব্যাপারে আমি তো কোনদিনই ভাবি নি! তবে কেন তুমি আমার পিছু নিলে?' তুফা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

বুড্ডা জিন ইবলিস দু'কদম এগিয়ে তুফার একটি হাত তুলে নিয়ে চুম্বন ক'রে বল্‌ল—'আমার থেকে তোমার ডরের কিছু নেই। আমি জিন হলেও তোমার কোন ক্ষতি করার তিলমাত্রও ইচ্ছা আমার নেই। বহুদিন থেকেই আমি তোমাকে আগলে আগলে রাখছি। আদতে জিন-সম্রাজ্ঞী কামারিয়াহ তোমাকে পেয়ার করেন। তোমাকে ঝড় ঝাপ্টা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। গভীর রাত্রে তিনি প্রায়ই এখানে এসে তোমাকে দেখে যেতেন, আমি জানি। আজ আমি তোমাকে জিনিস্তানে নিয়ে যেতে এসেছি। চল, নিশ্চিন্তে আমার সঙ্গে চল। আজ আমার পরমতম শুভদিন। আজ আমার লেড়কির শাদী হচ্ছে। তার ওপর লেড়কার ছুন্নতেরও দিন। এমন এক খুশীর দিনে সম্রাজ্ঞী তোমার উপস্থিতি আশা করছেন। সেখানে যতদিন খুশী থাকবে। তারপর চাইলেই আমি এখানে ফিন ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

তুফা কিছুতেই তার সঙ্গে যেতে সম্মত নয়। কিন্তু এ-ও জানে' জোর ক'রে হলেও তাকে সে নিয়ে যাবেই।

কার্যতঃ হলও তা-ই। ইবলিস বলপূর্বক তাকে কাঁধে নিয়ে আশমান পথে উড়ে চল্‌ল।

বুড্ডা ইবলিস তাকে নিয়ে ইয়া পেল্লাই ও মনোরম এক প্রাসাদে হাজির হ'ল। প্রাসাদ তো নয় যেন হীরা জহরতের বিচিত্র সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

তুফা'কে জিন-সম্রাজ্ঞীর সামনে হাজির করা হ'ল। তুফা'কে নিজের তখ্‌তের পাশের একটি মণি মানিক্য খচিত আসনে বসিয়ে আবেগ-মধুর স্বরে ব'লে উঠল—'বহিন, তোমাকে যে কী ভালবাসি তা আমি তোমাকে ব'লে বুঝাতে পারব না। আমার দীর্ঘদিনের সাধ তোমাকে কাছে পাই। আজ সে-সাধ আমার পূর্ণ হ'ল।'

তুফা জিন-সম্রাজ্ঞী কামারিয়াহকে নতজানু হয়ে কুর্ণিশ করল। কামারিয়াহ তাকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। উপস্থিত সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'তোমরা শোন, এ আমার বহিন। একে আমার সমান সম্মান খাতির করবে।'

জিন-সম্রাজ্ঞীর দু'ধারে দু'জন ইয়া তাগড়াই ও দশাসই দুই দৈত্য আর একদম কদর্য চেহারার দুই জিন দাঁড়িয়ে। তাদের দেখেই তুফা-র কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল। জিন-সম্রাজ্ঞী তাকে নানাভাবে অভয় দিলেন।

এবার আর তুফার মধ্যে এতটুকুও ভয় ডর রইল না।

জিন-সম্রাজ্ঞীর হুকুমে পরিচারিকারা খানাপিনার বন্দোবস্ত করল। উত্তম খুসবুওয়ালা গুলাবী সরাব আনা হ'ল পেয়ালা ভরে। খানাপিনার পাট চুকলে জিন-সম্রাজ্ঞী তুফা-র গানা শুনতে চাইলেন। তুফা দিল্ উজাড় ক'রে তার সুললিত কণ্ঠের গানা শোনাল। সবাই খুশীর জোয়ারে ভাসতে লাগল।

এদিকে ভোর হতে আর দেরী নেই। জিন-সম্রাজ্ঞীর হুকুমে

ইবলিস আগের মাফিকই তুফা'কে কাঁধে চাপিয়ে খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হ'ল। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে বুড্ডা ইবলিস বল্‌ল—'সুন্দরী, বিদায় মুহূর্তে একটি ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলতে চাই। ধ্যায়ান কর—ওস্তাদ ইশাক তোমার ওস্তাদ, আমি জানি। তার ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলতে চাই। আমারই দৌলতে সে আজ দুনিয়ার সেরা গায়কের সম্মান খাতির লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আর আমারই দোয়ায় তুমি কিন্নর কণ্ঠের অধিকারিণী হতে পেরেছ। এবার আমি তোমাকে যে সুর যোগাব তার ফলে তুমি দুনিয়ার সেরা গায়িকা বনে যেতে পারবে। তোমার গান শুনে সবাই মোহিত হয়ে পড়বে। আর খলিফার মাথায় হবে তোমার স্থান। কি, রাজী তো?'

এবার বুড্ডা ইবলিস তাকে একটি বহুৎ বড়িয়া গানা শিখিয়ে দিল। পরে সে হুবহু তা-ই গাইল। তার গানায় মুগ্ধ হয়ে বুড্ডা ইবলিস এক মোরগার চামড়ায় নিজেহাতে এক মানপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'তুফা, দুনিয়ার কোন আদমিই আজ অবধি এ সম্মান লাভ করতে সক্ষম হয় নি, একমাত্র তুমি আজ এ লাভ করলে। এবার জিন-সম্রাজ্ঞী উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বল্‌লেন—'তুফা, আজ তোমাকে "সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী"-র উপাধিতে ভূষিত করলাম।'

এবার বুড্ডা ইবলিস-এর হুকুমে বারোটি খুবসুরৎ লেড়কি প্রত্যেকে একটি ক'রে সোনার পেটরা তুফা-র সামনে হাজির করল। তাদের প্রত্যেকটি হীরা-মণি-মানিক্যে ঠাঁসা। ইবলিস বল্‌ল—'তুফা, এসব হীরা-জহরতের গহনাপত্র সম্রাজ্ঞীর তরফের উপহার। এগুলো তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

বিদায় মুহূর্তে জিন-সম্রাজ্ঞী তুফা-র হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আবেগ-মধুর স্বরে বল্‌ল—'তুফা, তোমার এ বড়া-বহিনটিকে যেন ভুলে যেয়ো না। সুযোগ-সুবিধা পেলেই চলে আসবে। আমাদের হাসি-আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। তুমি হয়ত ইবলিস-এর মুখে শুনে
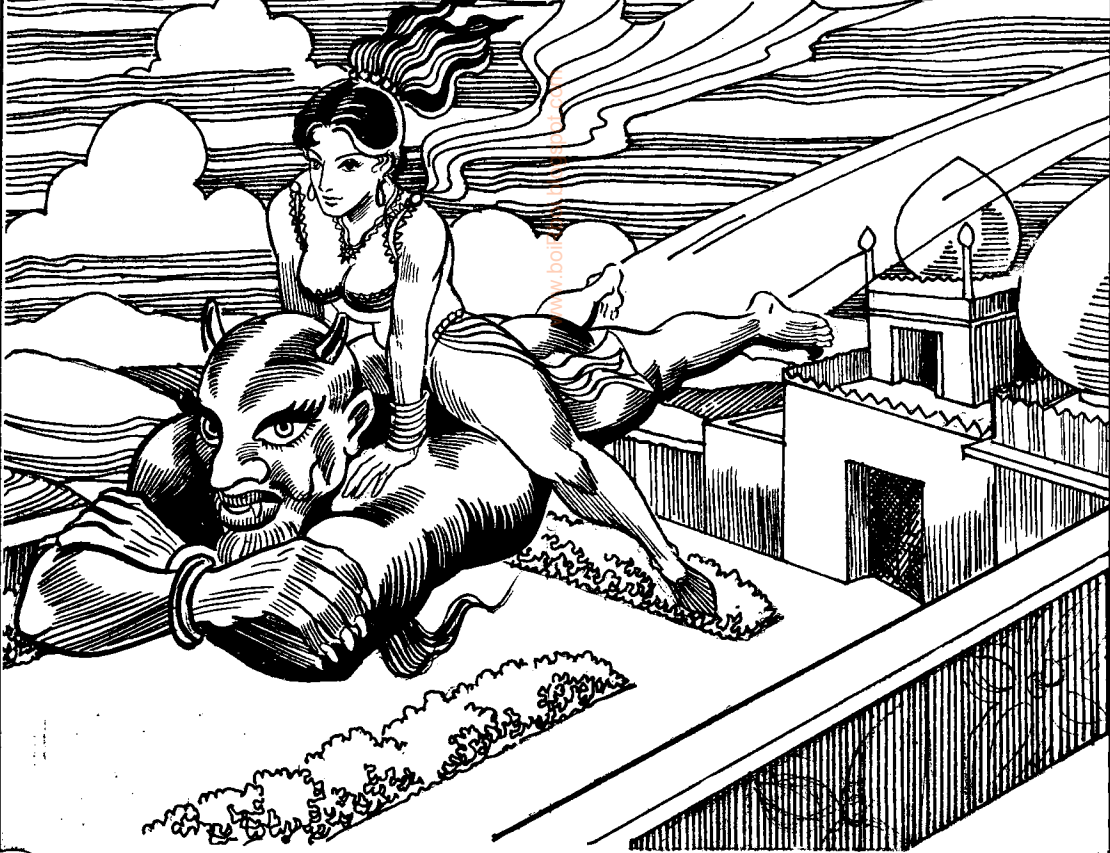
থাকবে, আমি রোজ রাত্রে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি। সশরীরে থাকি না বলেই তুমি আমাকে দেখতে পাও না। এবার থেকে একটি লেড়কির অবয়ব ধারণ ক'রে যদি তোমার কামরায় যাই।' তোমাকে জাগাই, তবে তুমি গোস্সা করবে না তো?'

—'গোস্সা? সে কী! আমি বরং খুশীই হ'ব। আপনি যখন খুশী চলে যাবেন। চুটিয়ে হাসি-আনন্দ করা যাবে।'

জিন-সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তুফা সম্রাজ্ঞীর উপহৃত রত্নালঙ্কারের পেটিকাগুলি সহ বুড্ডা ইবলিস-এর কাঁধে উঠে আশমানপথে উড়ে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ এর প্রাসাদে ফিরে এল।

তুফা-র নড়াচড়ার আওয়াজ শুনে খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। তাকে দেখে সে একদম তাজ্জব বনে গেল। যে তুফাকে এতক্ষণ ধরে আতি পাতি ক'রে খুঁজে এতগুলো নফর-নোকর ও নোকরানী হয়রান হয়েছে তাকে ফিন তারই কামরায় স্বাভাবিক অবস্থায় দেখলে তাজ্জব বনার ব্যাপারই বটে। যে-হারেমে একটি মাছিও প্রবেশ করতে পারে না সেখানে এমন ঘটনা কি করে ঘটতে পারে!

মাসরুর তুফা-র প্রত্যাগমনের খবরটি খলিফার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য হন্তদন্ত হয়ে ছুটল।

মাসরুর-এর মুখে তুফার আগমনবার্তা পেয়ে তিনি বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। বরং মাসরুর মস্করা করছে অনুমান ক'রে গোস্সায় তাকে শাস্তি দেবার চিন্তা করলেন। এমন আজব এক খবর মাঝ-রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে শোনালে গোস্সা তো হওয়ারই ব্যাপার।

খলিফা বল্লেন—শোন মাসরুর আমার সাফ বাৎ—যদি তোর খবর সাচ্চা হয় তবে ইনাম পাবে গোলামী থেকে খালাস করে দেব। আর যদি ঝুটা প্রমাণীত হয় তবে তোমার গর্দান নেব, ইয়াদ রাখবে।

ক্রোধোন্মত্ত খলিফা ব্যস্ত-পায়ে তুফা-র কামরার দরওয়াজায় হাজির হলেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শুনলেন, তুফা-র কামরা থেকে সুললিত কণ্ঠের গানার কলি ভেসে আসছে।

তুফা খলিফাকে দরওয়াজায় দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে তাকে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর হয়। খলিফা ঝট ক'রে দু'কদম সরে গিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—'কে? কে তুমি? কে? কে?'

—'আমি যে আপনার আদর সোহাগের তুফা। আমাকে চিনতে পারছেন না জাঁহাপনা!'

—'তুফা, তুমি জিনের হাতে পড়েছিল। একবার যে জিনের কব্জায় পড়ে তার তো আর রেহাই নেই, জানি। তুমি কি ক'রে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলে, সাচ্চা বল।'

তুফা খলিফার কাছে জিন-সম্রাজ্ঞীর ব্যাপার গোড়া থেকে শেষ অবধি খোলসা ক'রে ব্যক্ত করল। কিছু ছিপা ছাপা করল না। আর হীরা জহরতের বারোটি সোনার পেটরাও তাঁকে দেখাল। খলিফা তার বিলকুল বাৎ বিশোয়াস করলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন।

তুফা খলিফা হারুণ অল-রসিদ-এর বুকে স্থায়ী আসন লাভ করল।

কিস্সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

সুলতান শারিয়ার নিজের আচরণে যার পর নাই বিস্মিত হলেন। তিনি স্বগতোক্তি করলেন—'একী আজব ব্যাপার শুরু হ'ল! কিছুতেই যে উজিরের লেড়কি শাহরাজাদকে হত্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। আদতে সে এমন এক একটি কিস্সা শোনাচ্ছে যার লোভ সম্বরণ ক'রে আর তার ওপর অস্ত্রের আঘাত হানতে দিল্ সরছে না। একে খতম না ক'রে জিন্দা রাখলে বরং আরও বহুৎ বড়িয়া কিস্সা শোনা যাবে। দেখাই যাক, পানি গড়িয়ে কোথায় গিয়ে থামে।

এমন সময় বেগম শাহরাজাদ বল্লেন—'জাঁহাপনা, ভোর হতে এখনও ঢের দেরী। এবার আপনাকে 'সুলতান বাইরাস ও সিপাহী সর্দারের কিস্সা' শোনাচ্ছি। আশা করি আলাদা স্বাদের কিস্সাটি আপনার দিলে খুশীর জোয়ার বইয়ে দিতে পারবে।'

সুলতান বাইরাস ও সিপাহী সর্দারের কিস্সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে মিশরের কায়রো নগরে এক প্রবল পরাক্রমশালী সুলতান রাজত্ব করতেন। তার সম্পূর্ণ নাম ছিল, অল-মালিক অল-জাহির রুক অল-দিন বাইরাস অল-বুন্দুকদারী। তাঁর রাজত্বকালে ইসলাম সমধিক বিস্তার লাভ করে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তামাম অঞ্চল জুড়ে ছিল ইসলামের অখণ্ড প্রভাব।

সুলতান বাইরাস-এর সিপাহী সর্দাররা সবাই ছিল তাঁর একদম অনুগত। তারা সবাই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে সুলতানের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিল।

দিনের শেষে সিপাহী সর্দাররা দরবারে সুলতানের সামনে হাজির হয়ে সুলতানের কাছে তাদের সারাদিনের কাজের ফিরিস্তি পেশ করত। সব শেষে সুলতান তাদের নিয়ে কিস্সার আসর জমাতেন। সিপাহীরা রোজ একজন ক'রে সুলতানকে কিস্সা শোনাত।

প্রথম সিপাহী সর্দার তার কিস্সা শুরু করতে গিয়ে বল্ল—'জাঁহাপনা, আমি কায়রোতে এসে যখন প্রথম সিপাহীর খাতায় নাম লিখাই তখন আলম অল-দিন সঞ্জার ছিলেন আমাদের দলের সর্দার। তাঁর আমলেই আমি সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ

করেছিলাম।

নগরের যতসব দুষ্কৃতকারীরা আমার ডরে কুঁকড়ে থাকত, থরথরিয়ে কাঁপত। যখন আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে বীরদর্পে সড়ক দিয়ে যেতাম তখন নগরের যত চোর, ডাকু আর ছিনতাইবাজ ডরে গর্তের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিত। আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তর্জনি-নির্দেশ ক'রে বলত—ওই, ওই দেখ সাক্ষাৎ মৌউৎ ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে।

অকুতোভয় আমার কোনদিকে খেয়ালমাত্র থাকত না। বুক ফুলিয়ে নগরের পথে টুঁড়ে বেড়াতাম।

এক বিকালে আমি দপ্তরে কুর্শিতে বসে বিশ্রাম করছি, ঠিক তখনই আমার গায়ে একটি পুঁটুলি এসে পড়ল। ভাবলাম দিরহামের পুঁটুলি। গিঁট খুলে দেখি শ'খানেক দিরহাম তাতে বাঁধা রয়েছে।

ব্যাপারটিতে আমি একদম তাজ্জব বনে গেলাম। বিশোয়াস করতেও উৎসাহ পাচ্ছিলাম না।

মালুম হ'ল খোয়াব টোয়াব দেখছি। সাচ্চা বাৎ, ব্যাপারটি সম্বন্ধে কোন পাকা সিদ্ধান্তই নিতে পারলাম না।

এমন ভাব নিলাম, ব্যাপারটি যেন একদমই মামুলি। পাত্তাই দিলাম না। তার পরের দিনের ব্যাপার। সাবধানে পুরো হুঁশিয়ার হয়ে সেদিন আমি কুর্শিতে ব'সে রইলাম। আদতে সে-ব্যাপারটি ফিন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিনা বুঝতে চাইছিলাম।

কলিজা শক্ত রাখলাম। আজ এলে আর তার রেহাই নেই, পাকড়াও করবই করব। দিন ভর শরীরের ওপর দিয়ে বহুৎ ধকল গেছে, বার বার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল। জবর-দস্তি চোখ খুলে রাখার কোশিস করলাম। পারলাম না। চোখে তন্দ্রা জড়িয়ে এল।

অচানক মালুম হ'ল আমার নাভির কাছে কি যেন চক্কর মারছে। কিছু তল্লাশ করছে। ঝট ক'রে চোখ খুলে দিলাম। দেখলাম হীরা জহরতের অলঙ্কারে গা-ঢাকা এক খুবসুরৎ লেড়কি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের চোখ দুটোর ওপরও যেন আমি আস্থা হারিয়ে ফেল্‌লাম। চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বল্‌লাম—'তুমি কে গো? কি তোমার পরিচয়?'

আমার প্রশ্নের কোন জবাব সে দিল না। শরম টরমও তার মধ্যে কিছুমাত্রও লক্ষিত হ'ল না। স্বাভাবিক স্বরে সে উচ্চারণ করল—'আমার সঙ্গে চলুন।' ব্যাপারটি এমন যেন আমাকে সে হুকুম করছে।

—'সে না হয় যাওয়া যাবে। লেকিন কে তুমি? কি তোমার পরিচয়, বলবে তো?'

—'আমার সঙ্গে চলুন, আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।'

আমি কুর্শি ছেড়ে উঠে তার পিছু নিলাম।

লেড়কিটি বল্‌ল—'মুইন, আমার এক জরুরী কাজ যে আপনাকে ক'রে দিতে হবে।'

—'কাজ? কাজ বল কি, জান পর্যন্ত তোমার জন্য কবুল করতে পারি।'

—'এ-নগরের কাজীর লেড়কির সঙ্গে আমার দোস্তী, সে একটু চোখের আড়াল হলেই আমি একদম অস্থির হয়ে পড়ি। আমরা উভয়েই ওয়াদা করেছিলাম, জিন্দেগীতে কেউ-ই শাদী করব না। যা বলতে চাইছি, তাকে কাছে না পেলে আমার দিমাক খারাপ হয়ে যাবে।'

আমরা দু'জনে কাছাকাছি পাশাপাশি বহুৎ দিন গুজরান করেছি। শাদীর ব্যাপার মুখেও আনিনি। কাজী আমাদের দোস্তীর বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। আমার সঙ্গে তার লেড়কির ওঠাবসা একদম বরদাস্ত করতে পারলেন না। লেড়কিকে আটকাবার কোশিস করলেন, পারলেন না। শেষমেষ কামরায় তালা বন্ধ ক'রে রাখলেন। আমাকে চোখ রাঙিয়ে বল্‌লেন, তাদের মকানে গেলে পা ভেঙে দেবেন। ব্যস, তার সঙ্গে আমার বহুৎদিন ভেট হয়নি। আমি দীর্ঘদিন তাকে না দেখতে পেয়ে বিলকুল ঠাণ্ডা মেরে গেছি। এখন আপনিই একমাত্র ভরসা। আপনিই তাকে ফিন আমার কাছে এনে দিতে পারেন, তাই তো আপনাকে তকলিফ দিয়ে দপ্তর থেকে টেনে এনেছি।

আমি যেন অচানক দরিয়ায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। সে নিজে একটি লেড়কি। আর এক লেড়কির সঙ্গে সে দোস্তি করেছে বলছে বটে। লেকিন এ-তো দোস্তি নয় একদম মহব্বৎ, লেড়কিতে-লেড়কিতে মহব্বৎ! তাজ্জব বনে গেলাম।

আমি নিজেকে সামাল দিতে না পেরে চিল্লিয়ে উঠলাম—'তুমি যে কি বলতে চাইছ আমার দিমাকে ঢুকছে না। খোলসা ক'রে বল, এক লেড়কির পক্ষে অন্য কোন লেড়কির জন্য এমন অস্থির হওয়া সম্ভব?'

—'আপনার মাফিক বেকুব দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার অন্ততঃ মালুম নেই। দিমাক ঠাণ্ডা করুন, ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, মহব্বতের খুশীতে জটিল রহস্যের ব্যাপারে কিছু জানেন না দেখছি।' আদতে অনেকেই রাখে না। সে এবার সংক্ষেপে আদৎ ব্যাপারটি খোলসা ক'রে বল্‌ল। তারপর বল্‌ল—"এবার বোধকরি আমাদের উভয়ের মধ্যে যে কি সম্পর্ক তা মোটামুটি মালুম হচ্ছে। আপনার উপকারের প্রতিদানস্বরূপ আমার কাছ থেকে কিছু পাবেনই, ইয়াদ রাখবেন।'

খুশীতে আমার দিল্ নেচে উঠল। বেড়ে বন্দোবস্ত। তাদের মধ্যে থেকে যাকে আমার নজরে ধরবে, যাকে দিল্ চাইবে তাকেই আমি বুকে পাব। লেড়কি-জেনানার কারবার হরেক কিসিমের হয়

জানি, লেকিন এমন আজব কোন ব্যাপার কারো দিমাকে মুহূর্তের জন্যও কি হয়েছে?

আমি আমতা আমতা ক'রে বল্‌লাম—'মালুম হচ্ছে, বহুৎ নটখট এক ব্যাপার। ওয়াদা করছি, আমার সাহায্য-সহযোগিতা তুমি পাবে। ফল কি হবে জানি না।'

—মেহেরবানি ক'রে আপনি মাত্র একবার তার সঙ্গে মোলাকাতের বন্দোবস্ত করে দিন। তার পরের দায়িত্ব আমার।'

—'এক বাৎ, আমি কোতোয়ালিতে থেকেই তোমাদের মোলাকাতের বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আর কাজী সাহাবের লেড়কি তার মকানেই অবস্থান করবে। মালুম হ'ল কিছু?'

—'লেকিন আমার দিমাকে এক মতলব খেলছে। শুনে বলুন, কাজ হাসিল হতে পারে কিনা? মতলবটি হচ্ছে, আজ সন্ধ্যায় আমি বাহারী সাজ পোশাক গায়ে লাগিয়ে কাজী সাহাবের বাইরের দিককার বারান্দায় বসে থাকব, আপনি সিপাহীদের নিয়ে টহল দিতে দিতে সেখানে হাজির হবেন, আমার পরিচয় জানতে চাইবেন এতরাত্রে আমি সেখানে কি করছি, জানতে চাইবেন, মালুম হ'ল কি? আমি আপনার প্রশ্নের জবাবে বলব, আমার আব্বা সুলতানের দরবারের এক আমির। বাজারে সওদা করতে গিয়ে রাত্রি একটু বেশী হয়ে যায়। আমাদের প্রাসাদের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে, কোন চেনাশুনা আদমির সঙ্গে ভেট হয়ে যাওয়ার আশায় পথের দিকে চেয়ে রয়েছি। এ-কাজী সাহাবের মকান, চোর আর ডাকুর উৎপাত। এখানে হবে না, সে-আশায় এখানেই রাত্রি গুজরান করছি।'

—আমার বাৎ শুনে আপনি বল্‌বেন—'তোমার হিসাব ঠিক নয়। এখানে দস্যু তস্করের উপদ্রব বরং বেশী। তোমাকে এখানে আমি একদম অরক্ষিত রেখে তো যেতে পারি না। মোদ্দা বাৎ, তুমি আমিরের লেড়কি। আমার নোকরির ডর তো আছে। তবে দেখি কাজী তোমার মাথা গোঁজার বন্দোবস্ত যদি করে দেন।'

আপনার অনুরোধ কাজী সাহাব পায়ে ঠেলতে পারবেন না। কোন ফিকিরে তার মকানে একটি বার মাথা গলাতে পারলে একদম বাজী মাৎ করতে পারব।

সন্ধ্যায় বেশ কিছু সময় বাদে আমি সিপাহী সান্ত্রীদের নিয়ে নগরের পথে পথে টহল দিতে দিতে কাজী সাহাবের মকানের প্রধান ফটকের সামনে হাজির হলাম। আমাদের পূর্বপরিকল্পনা মাফিক আমি প্রশ্নাদি করলাম। লেড়কিটিও এক এক করে ঠিক সে কিসিমেরই জবাব দিল।

আমি কাজীসাহাবকে বল্‌লাম—'লেড়কিটি বহুৎ মুসিবতে পড়েছে। আপনি মেহেরবানি ক'রে আজকের রাত্রিটুকু গুজরানের বন্দোবস্ত করে দিন। ভোর হলেই সে নিজের মকানে চলে যাবে।'

কাজী সাহাব সাচমুচ আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলতে পারলেন

না। লেড়কিটিকে নিজের মকানে, হারেমে থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তার লেড়কির সঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়ে গেল লেড়কিটি।

আমি সিপাহী সান্ত্রীদের নিয়ে নিজের ধান্দায় চলে গেলাম।

আমি পরদিন ভোরে লেড়কিটির খবর নিতে কাজীর মকানে এলাম। আমাকে দেখেই কাজী গোস্‌সায় ফেঁটে পড়ার জোগাড় হলেন। লেড়কিটি নাকি তার বিলকুল ধন দৌলত নিয়ে চম্পট দিয়েছে। দশ হাজার দিনার নিয়ে ভেগেছে। আমার নামে সুলতানের কাছে নালিশ জানাবেন ব'লে তিনি রীতিমত তড়পাতে লাগলেন।

আমার মাথায় যেন আশমান ভেঙে পড়ার জোগাড় হ'ল। সামান্য এক লেড়কি আমাকে এমন বেমালুম বেল্লিক বানিয়ে দেবে, ভাবতেও পারি নি। কাজী সাহাবকে ভরসা দিলাম, আমাকে ফাঁকি দিয়ে বেশী দূরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাকে পাকড়াও করবই।'

কাজী তবু দমলেন না। শাসাতে লাগলেন, সুলতানকে দিয়ে আমার গর্দান নেয়ার বন্দোবস্ত করবেনই।

আমি ব'লে ক'য়ে তাঁর কাছ থেকে তিনদিনের সময় নিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনদিনের সময় আমাকে দিলেন। তিনি বললেন—'তিনদিনের মধ্যে ধাপ্পাবাজ লেড়কিটিকে হাজির করতে না পারলে আমি সুলতানের শরণাপন্ন হব-ই, ইয়াদ থাকে যেন।'

আমি কাজীর কাছ থেকে তখনকার মত বিদায় নিয়ে নিজের দপ্তরে ফিরে এলাম। এক ভাবনা আমাকে কাহিল ক'রে দিল, এমন নগরে এক লেড়কি কোন্ গাড্ডায় লুকিয়ে রয়েছে, কি ক'রে তাকে বের করব! এবার ইন্তেকাল আমার না ঘটে যাচ্ছে না, উপায়?

তিনদিন পার হয়ে গেল। এখন লুকোচুরি খেলে ফয়দা তো কিছু হবেই না বরং হালৎ আরও খারাপ হবে। অনন্যোপায় হয়ে কাজীর মকানে হাজির হলাম। ভেবেই রেখেছি, কাজীর হাতে-পায়ে ধরে জান রক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে নেব। তিনি মাফ করলে তবেই জান বাঁচবে।

কাজী সাহাবের সদর-দরওয়াজায় পা রেখেছি ঠিক তখনই এক জেনানার কণ্ঠস্বর কানে এল। একদম তাজ্জব বনে গেলাম। নিজের চোখ-কানের ওপর যেন ভরসা হারিয়ে ফেল্লাম। যার তল্লাশে তিনদিন হন্যে হয়ে দাবড়ে বেড়িয়েছি, আজ সে স্বেচ্ছায় আমার হাতের মুঠোয় ধরা দিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লাম। এবার তবে জানটি রক্ষা পেয়ে গেল। তাকে বললাম—'কী তাজ্জব ব্যাপার, ভোরে আমার সঙ্গে ভেট পর্যন্ত করলে না! কাজ মিটেছে, ব্যস চম্পট দিলে! তোমার জন্য আমাকে আর একটু হলে জান খোয়াতে হ'ত, মালুম আছে?'

লেড়কিটি দু'কদম এগিয়ে আমার মুখোমুখি, একদম গায়ের সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বল্ল—'কি ব্যাপার সিপাহী সর্দার? ডরে কুঁকরে গেছেন, মালুম হচ্ছে। আমার কাজ হাসিল। এবার আপনাকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হচ্ছেই, কারো চৌদ্দ পুরুষের সাধ্য নেই আপনার জান রক্ষা করে। লেকিন আমার দ্বারা সম্ভব ইয়াদ রাখবেন।'

তাকে সুক্রিয়া না জানিয়ে পারলাম না। স্বেচ্ছায় যদি ধরা না দিত তবে জিন্দেগী ভর তল্লাশ করেও তার হদিস পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। আমি ঝট ক'রে বুকে টেনে গালে চুমু খেলাম। একদম সাচ্চা, তোমার মাফিক লেড়কিকে তল্লাশ করে ও তামাম নগর চষে বেড়ালেও মিলত না।'

—'আরে! আর, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ওয়াদা তো করলামই কোন ক্ষতিই আপনার হবে না। আসুন।'

সে আমাকে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটি মকানের অন্দরে গেল, কামরায় ইয়া পেল্লাই দুটো কাঠের বাক্স। ডালা খুলতেই চোখে আলোর ঝিলিক লেগে গেল। সে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্ল—'সিপাহী সর্দার, তাজ্জব বনে যাচ্ছেন নাকি? হীরা-জহরৎ—এদের প্রত্যেকটির দাম মালুম আছে? দু'সাত হাজার নয়, ছত্রিশের বেশী ছাড়া কম নয়, এবার বলুন তো এ দুটোতে যে হীরা-জহরৎ রয়েছে তার দাম কত দিনার হতে পারে?'

বার-কয়েক ঢোক গিলে বল্লাম—'মালুম নেই। এসব বিশেষ ক'রে এত হীরা জিন্দেগীতে দেখি নি।'

—'কম করেও লাখ পাঁচেক তো হবেই। আর সবকিছুর হকদার একদম আমি একা। অংশীদারের প্রশ্নই ওঠে না। এবার আমার কি মালুম হচ্ছে না আমি কাজী সাহাবের মাত্র এক দু হাজার দিনারের পুঁটুলি জরুর চুরি করিনি, কি বলেন?'

—'জরুর। এতগুলো হীরা জহরতের মালিক সে যাবে মাত্র ছয় হাজার দিনার আত্মসাৎ ক'রে বদনাম কামাই করতে? আশা করি এখন অন্ততঃ আপনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলাম—'জরুর, জরুর, লেকিন এক বাৎ, কাজী সাহাবের দিনারের পুঁটুলিটি কি হ'ল?'

—'আমিই নিয়ে এসেছি, সাচ্চা বটে। দিনারগুলো আত্মস্মাৎ করার জন্য জরুর নয়। এর পিছনেও এক মতলব রয়েছে। দিনারগুলো গায়েব না করলে আমার আদৎ উদ্দেশ্য সফল হ'ত না, সে রাত্রের মামলার ব্যাপারটি চুকে যেত। চাপা পড়ে যেত। আমার এটা ইচ্ছা ছিল না। আমার আদৎ উদ্দেশ্য জিন্দেগীর জন্য আমি তাকে লাভ করতে চাইছি। তাই তো এরকম এক মতলব আমাকে আঁটতেই হয়েছে।'

মতলবটি বলছি শুনুন—'আপনি কাজীর মকানে যান, একেলা। ডরের কিছু নেই। আমি এখানেই থাকব, ভাগব না, ওয়াদা করছি। কাজীর পক্ষেও আমার গর্দান নেয়া, শূলে চাপানো বা ফাসির দঁড়িতে লটকে দিতে পারবেন না, কিছুতেই না।'

—'ইয়া আল্লাহ! আমাকে দেখলেই একদম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। হাড়কিপ্টে। এতগুলো দিনারের দুঃখ সামাল দিতে পারছেন না। আমার দিনারের পুঁটুলি কোথায়? চোর কোথায় গেল? ব্যস, একবার সুলতানের দরবারেই চল। কাজীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার বুকের পাটা আমার নেই।'

—'আরে, আপনি তার মহানুভবতার কিস্সা জুড়ে দেবেন। আর বলবেন, তামাম নগরে চিরুনি তল্লাশী চালিয়েছি নারী-গুপ্তচরকেও লাগিয়েছি। একদম বে-পাত্তা। এবার আমি ভাবছি, লেড়কিটি আপনার মকানেই কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে। আপনার মকান প্রহরী বেষ্টিত, কড়া পাহারা। হুকুম করলে মকানটি তল্লাশী চালাই।'

আপনার ইচ্ছার ব্যাপার শুনেই তিনি আরও তেলে-বেগুনে

জ্বলে উঠবেন—'আমি বিচারক। ন্যায়ের পূজারী। আমাকেই সন্দেহ?'

তাঁর বাৎ শুনে খবরদার দিমাক গরম করবেন না। একদম বিনয়ের অবতার বনে যাবেন। বলবেন—'কর্তব্য পালন করাই আমার কাজ। তল্লাশী না চালিয়ে আমার উপায় নেই। তবে এ-ও সাচ্চা নয় যে, আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার কাছে ব্যাপারটি চেপে যাচ্ছেন। ফিন এ-ও তো হওয়া সম্ভব, আপনার মকানেরই কেউ গোপনে এ-কাজ করেছে।

—উপায়ান্তর না দেখে কাজী সাহাব গোস্‌সা ক'রে বলবেন—'বহুৎ আচ্ছা, তল্লাশী চালাও, তবে তাকে না মিল্‌লে কঠিন সাজা দেয়া হবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

—'মালুম আছে, ইন্তেকালই জরুর আমার সাজা হবে, ঠিক কিনা? ইন্তেকালের বেশী আর কি সাজা হবে? আমি তৈরী।'

আপনি এবার তল্লাশী শুরু করবেন। কিছু না পেয়ে তাঁর রসুইখানায় হাজির হবেন। সেখানে তাকের ওপর হাত চালিয়ে সালোয়ার-কামিজ বের ক'রে আনবো। দেখতে পাবেন সেগুলোতে খুন জড়িয়ে রয়েছে। ডর পাবার ব্যাপার কিছু নেই। আদমির খুন নয়। কুত্তা জবাই ক'রে তার খুন সেদিন গোপনে কাজীর মকানে নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজীকে বলেছিলাম, বাজারে গিয়েছিলাম। তাই তিনি কোন সন্দেহ করেন নি। তারপর আর আমার পক্ষে মকানে ঢোকা সম্ভব হয় নি। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে সে ফিন বলতে লাগল—'শুনুন, এবার আদৎ মতলবটি বলছি—সালোয়ার, কামিজ ও শেমিজ প্রভৃতি দেখেই জরুর মালুম হবে ওগুলো জেনানার পোশাক। ব্যস, কাজী-সাহাবের কলিজা নেতিয়ে পড়বে। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতে পারেন। ইন্তেকাল ঘটে যাওয়াও কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। যদি তা-ই হয় তবে তো বহুৎ আচ্ছা। ইন্তেকাল যদি না ঘটে তবে বল্‌বেন—'কাজী সাহাব, আমি ন্যায়ের রক্ষক। আর আপনার মকানেই এমন জঘন্য কাজ! সুলতান দেখলে কোন পথ নেবেন, মালুম নেই। আমার যা করণীয় তা তো জরুর করতে হবে। ব্যস, কাজী একদম হতাশ হয়ে পড়বেন।'

তার মতলবটি শুনে আমি খুশীতে চিল্লিয়ে ওঠলাম—'ইয়া আল্লাহ! বেড়ে মতলব বটে।'

আমি তার কাছ থেকে সোজা কাজী সাহাবের মকানে গেলাম। আমার মুখ দেখেই গর্জাতে লাগলেন—'আমার দিনারের পুঁটুলি? আমার আসামীর কি করলে?'

আমি কাজী সাহাবের রুদ্রমূর্তি দেখে গোড়াতে একদম চিপ্‌সে গেলাম। একটু দম নিয়ে বল্‌লাম—'জী, তামাম নগরে চিরুনি তল্লাশী চালিয়েছি। হারেমে হারেমে জেনানা গুপ্তচরও পাঠাই। লেকিন কিছুতেই তার পাত্তা মিলল না। আমার ধন্দ জেগেছে। আমার ন্যায় জবরদস্ত সিপাহীকে ঘোল খাইয়ে নগরের কোথাও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে আমি অন্ততঃ বিশোয়াস করতে পারি না।'

কাজী তড়পাতে লাগলেন—'সিপাহী-সর্দার মুইন, ওসব ধান্ধা ছাড়। তোমাকে দেখছি ফাঁসির দড়ি গলায় পরতেই হচ্ছে।'

—'কাজী সাহাব, জানের মায়া আমি করিনা। তবে আমাকে কর্তব্য করতেই হবে।' তারপর লেড়কিটির মতলব মাফিক এক এক ক'রে কাজ করে শেষমেষ তল্লাশী করতে করতে কাজীসাহাবের রসুইখানায় হাজির হলাম, তাকের ওপর থেকে খুন জড়ানো সালোয়ার-কামিজ আর শেমিজ প্রভৃতি সাজ পোশাক টেনে বের করলাম। একটি লেড়কির পুরো সাজ-পোশাক।

ব্যস, ধড়াস ক'রে আছাড় খেয়ে কাজী সাহাব মেঝেতে ব'সে পড়লেন। হাত দুটো যন্ত্রচালিতের মাফিক মাথায় উঠে

গেল। এবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লেন। এলিয়ে পড়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখ মেলে তাকালেন। কাঁপা কাঁপা ক্ষীণকণ্ঠে কোনরকমে উচ্চারণ করলেন—'বিশোয়াস কর, একদম সাচ্চা বাৎ—আদতেই আমি এর কিছুই জানি না, আমি সাফাই গাওয়ার কোশিস করলে ধোপে টিকবে কেন? এরপর জানাজানি হয়ে পড়বে আমাকে নিজে হাতে নিজের জান খতম করা ছাড়া গত্যন্তর রইবে না। জানের মায়া আমার নেই। তবে আদৎ হচ্ছে, জিগেন্দীভর যে-সম্মান খাতির পেয়ে এসেছি, সবার কাছে ন্যায়ের রক্ষক বিবেচিত হয়েছি তা এক লহমায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। আমি নিজে কোন কসুর করতে পারি কেউ ভাবতেও পারে না, ফলে আমি হয়ে যাব ঘৃণার পাত্র। অসম্ভব। এ বরদাস্ত করার চেয়ে নিজে হাতে নিজের জান খতম ক'রে দেব।'

—'এ ব্যাপারে আমার কর্তব্য বলে দিন কাজী সাহাব।

—'আমাকে রক্ষা কর।' হাউ মাউ করে কেঁদে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন—'আমার মান ইজ্জৎ রক্ষা করা একমাত্র তোমার পক্ষে সম্ভব। জিন্দেগীভর যা কিছু কামাই করেছি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। কেবল ব্যাপারটি জিন্দেগীর জন্য গোপন রাখার বন্দোবস্ত কর।'

—'বহুৎ আচ্ছা, আপনার মর্জি মাফিকই কাজ হবে।' ইজ্জৎ খোয়াবার আশঙ্কাতে বা অর্থের শোকে—যেকোন কারণেই হোক রাত্রির আন্ধার নেমে আসার আগেই কাজী সাহাবের ইন্তেকাল ঘটে গেল।

ব্যস, ফয়সালা হয়ে গেল। বাধা সরে গেল। লেড়কিটির পথ সাফা হয়ে গেল। ওই লেড়কিটি তাঁর লেড়কিকে নিয়ে সোজা চলে গেল নীলনদের তীরবর্তী এক ইমারতে। সেখানেই উভয়ে দিন গুজরান করতে লাগল।

সুলতানের নির্দেশে দ্বিতীয় সিপাহী-সর্দার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আমার শাদীর বাৎচিৎ পাকা হয়ে গেল। আমার চাচার লেড়কির সঙ্গে শাদী স্থির হ'ল। শাদীর আগে আমার চাচার লেড়কি তিনটি শর্ত রাখল—জিন্দেগীতে আমি কোন দিন চরস সেবন করতে পারব না, কোনদিন কুর্শিতে বসতে পারব না আর তরমুজ খেতে পারব না।

শর্ত তিনটে আমার কাছে উদ্ভট মালুম হলেও আমি মেনে নিলাম। শাদীর আর কোন বাধা রইল না। আমাদের শাদী নির্বিবাদে ও আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে চুকে গেল।

শাদী চুকে যাবার বহুৎ দিন বাদেও উদ্ভট শর্তগুলোকে আমি পাথরে খোদাই করার মাফিক বুকে গেঁথে রাখলাম। লেকিন সে গুলো আমাকে হরদম খোঁচাতে লাগল। কেন সে আমাকে কুর্শিতে বসতে মানা করেছে? কেনই বা তরমুজ আর চরস না ছোঁয়ার জন্য আমাকে দিয়ে ওয়াদা করিয়ে নিয়েছে?

ব্যাপারটি আমাকে খোঁচাতেই লাগল। বহুৎ দফে আমি তার কাছ থেকে এসবের আদৎ কারণ জানতে চেয়েছি। লেকিন সে আমার বাৎ এড়িয়ে গেছে। কেবল বলেছে, এত সব তল্লাশী করার কি আছে, মালুম হচ্ছে না তো! ওয়াদা করেছ, মেনে চলবে। ব্যস, এর বেশী তো কিছু নয়।

আমি দীর্ঘদিন ওয়াদা মেনে চলতে পারলাম না। একদিন আমার ঝোঁক চেপে গেল। ঢের হয়েছে, ওয়াদা আর মানা নেই। নিজের মর্জি মাফিক কাজ করব।

আমি সেদিনই দোকানে গিয়ে বড়িয়া একটি তরমুজ খরিদ ক'রে এনে কর্মচারীকে দিয়ে সেটি কাটিয়ে গলা পর্যন্ত ঠেসে খেয়ে নিলাম। তারপর চরস টানলাম দমভর। চরসের নেশায় দিল্‌ ফুরফুরে হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় মকানে ফিরে দেখি আমার বিবি বোরখার নাকাব দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। আর তড়পাচ্ছে—'তুমি আদমির বাচ্চাই নও। যে ওয়াদা ক'রে রাখতে পারে না, যার জবানের ঠিক নেই তাকে আমি আদমিই জ্ঞান করি না। ওসব ব্যাপার নিয়ে ওয়াদা করার কোন্‌ জরুরৎ ছিল? ওয়াদা ক'রে শাদী করলেই বা কেন আর ওয়াদা ভাঙলেই বা কেন, আমার দিমাকে আসছে না। কাজীর দরবারে চল যাই। তোমার ঘর করতে আমি আর রাজী নই। তালাক দিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে নেয়া হোক।'

আমি তখন খোশ মেজাজে। সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লাম—'ঝুটমুট কেন হাঙ্গামা করতে চাইছ, মালুম হচ্ছে না। কই, আমি তো ওয়াদা ভঙ্গ করি নি।'

—'বহুৎ আচ্ছা! এ তোমার সাচ্চা বাৎ হ'ল? মুখের বাৎ এখনও জড়িয়ে আসছে। আর বলছ কিনা চরস সেবন করনি? আর তরমুজ? তরমুজ যে খেয়েছ তার প্রমাণ দিচ্ছে তোমার কোর্তার এ লালচে দাগগুলো। আর তুমি যে কুর্শিতে বসেছিলে তার প্রমাণ তোমার কোর্তার পিছন দিকটি কুঁচকে রয়েছে।'

চরসের নেশা আমাকে বিবির অভিযোগ স্বীকার করতে দিল না। বেমালুম বল্‌লাম, তোমার বক্তব্য একদম ভুল।'

আমার বিবি আমার বাৎ শুনে ফোঁস ক'রে উঠল—'কি বললে, আমার বক্তব্য ভুল? ঝুটা বলছি আমি? বহুৎ আচ্ছা, কাজীর কাছেই তবে চল্‌লাম। এর একটি কিনারা ক'রে ফেলা দরকার। মোদ্দা বাৎ, তোমার মাফিক এক বদমাইশ বেতমিসের সঙ্গে আর একদিনও সংসার করতে আমি চাইনা।'

শেষ পর্যন্ত কাজীর দরবারেই হাজির হতে হ'ল। তিনি একজন জ্ঞানী ও বহুদর্শী। ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে তিনি বললেন, শাদী কি

এতই ঠুনকো যে, দিল চাইছে না ব্লল'ই স্বামীকে ছেড়েছুড়ে যাওয়া যায়? এত সস্তা নয়।

লেকিন সে ছাড়বার পাত্রী নয়। বার বার একই বাৎ আওড়াতে লাগল, আমি ওয়াদা ভঙ্গ করেছি, আমার জবান ঠিক নেই। অতএব আমার সঙ্গে আর একদিনও থাকতে রাজী নয়।

শেষমেশ আমার বিবি কাজীকে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা, আপনার বাৎ আমি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে রাজী। তবে আমার তিন প্রশ্নের সঠিক জবাব চাই। গোড়ায় থাকে হাড্ডির মাফিক শক্ত, বাদে শক্ত পেশী দেখা যায়। তারপর একদম তুলতুলে নরম গোস্তে পরিণত হয়ে যায়। কেন এমন হয়?'

কাজী সাহাব একদম বে-কায়দায় পড়ে গেলেন। আমতা আমতা ক'রে বল্‌লেন—'দিনভর হাজারো ঝামেলা আর কঠিন মামলা নিয়ে কাটাতে হয়েছে। এখন তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছিনা। কাল ভোরে এলে ঠিক জবাব দিয়ে দেব, ঠিক আছে?'

কাজী আজব প্রশ্নটির সমাধান করতে গিয়ে মুসিবতে পড়ে গেলেন। কিছুতেই ভেবে কিনারা করতে পারছেন না, এর কি জবাব দেবেন।

কাজী খানার টেবিলে বসে থালায় হাত রেখে গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেলেন। তাঁর লেড়কি তাঁর এ-আকস্মিক ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য করল। সে বল্‌ল—'আব্বাজান, তুমি কোন্ জরুরী মামলার ফয়সালা করতে গিয়ে মুসিবতে পড়েছ?'

কাজী তার লেড়কির কাছে ব্যাপারটি খোলসা ক'রে বল্‌লেন। তাঁর লেড়কী বিলকুল ব্যাপার শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে জবাব দিল—'আব্বাজান, তোমার মত একজন বিচক্ষণ কাজীর পক্ষে এ সাধারণ ব্যাপারটি মুসিবত হয়ে দাঁড়িয়েছে! আমি বলছি শোন, পনের থেকে পঁচিশ সাল অবধি পুরুষদের লিঙ্গ একদম হাড্ডির মাফিক শক্ত থাকে। উমর বৃদ্ধি পেতে থাকলে ক্রমে বীর্যের তেজ কমতি হতে থাকে। পুরুষদের লিঙ্গ পঁয়ত্রিশ থেকে ষাট সাল অবধি গোস্তের মাফিক নরম মালুম হয়। ষাট সাল থেকে ইন্তেকালের সময় অবধি পুরষদের লিঙ্গ তুলতুলে নরম মাংসপিণ্ড বনে যায়।'

আমার বিবি কাজীর মুখ থেকে বিবরণ শুনে সে-বারের জন্য আমার গুস্তাকী মাফ ক'রে দিয়েছিল। আমি ফিন তাকে নিয়ে আগের মাফিক ঘর-সংসার করতে লেগে গেলাম।

সুলতানের হুকুমে তৃতীয় সিপাহী-সর্দার তার কিস্‌সা শুরু করতে গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি আপনার দরবারে যে, কিস্‌সাটি পেশ করছি তা আমার আম্মা একদিন বলেছিলেন।

এক সাগরের কিনারে এক মেছুয়া তার বিবিকে নিয়ে পাতার কুটীর বেঁধে বাস করত। মেছুয়া রোজ ভোরে সাগরে মছলি পাকড়াতে যায়। দিনভর সে মছলি পাকড়াতে পানিতে পড়ে থাকে না। দরকার মাফিক মছলি জুটে গেলেই জাল নিয়ে মকানে ফিরে আসে। সে রোজ যা কামাই করত তা সেদিন খরচ হয়ে যেত। জমানো টমানোর ধার সে ধারত না।

মেছুয়া একদিন বিমারিতে পড়ল। মছলি পাকড়াও করার শক্ত তার নেই। অথচ মছলি পাকড়াও না করলেই খানার জোগাড় হবে কি দিয়ে? মেছুয়ার বিবি বল্‌ল—'চল, আমি জাল নিয়ে তোমার সঙ্গে যাই। তুমি শুধু সামান্য মেহনৎ ক'রে পানিতে নেমে জাল ছড়াবে। ব্যস, কিছু মছলি পাকড়াও ক'রে আমরা ফিরে আসব। মেছুয়া জিভ কেটে বল্‌ল—'ইয়া আল্লাহ। তোমার মাফিক খুব-সুরৎ বিবিকে নিয়ে গেলে ধান্ধাবাজদের খপ্পরে পড়তে হবে। কিছু না হলেও হাজার হাজার আদমি সাগরের ধারে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে তোমার সুরৎ-সুধা পান করতে লেগে যাবে।'

—'কি যে বল! তোমার বিবি বুঝি বে-হাত হয়ে যাবে, ডর লাগছে বুঝি? এক কাম কর, সুলতানের প্রাসাদের লাগোয়া ঘাটে

চল। সেখানে শয়তান বেতমিসদের হুজ্জুতি নেই বল্‌লেই চলে।

সুলতান সে সময় জানলার ধারে সরোবরের ঠাণ্ডা বাতাস খেয়ে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বসেছিলেন। হঠাৎ মেছুয়ার বিবির দিকে নজর পড়তেই ব'লে উঠলেন—'ইয়া আল্লাহ! কী সুরৎ! এমন এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি মেছুয়ার সংসারে তকলিফের মধ্যে দিন গুজরান করছে! একেই বলে নসীব।'

মেছুয়ার বিবির সুরৎ, সুরতের জোয়ার লাগা দেহটি সুলতানের কলিজাকে অস্থির ক'রে তুলল।

সুলতান নিজের দিল্‌কে সামাল দিতে না পেরে উজিরকে তলব করলেন। তাকে বল্‌লেন—'মেছুয়ার বিবির সুরৎ আমার কলিজায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মেছুয়াটিকে খুন ক'রে তার বিবিকে এনে আমার বুকে তুলে দেয়ার বন্দোবস্ত কর।'

বুড্ডা উজির হাত কচলে নিবেদন করল—'কসুর নেবেন না জাঁহাপনা, আপনি এ-মুলুকের সুলতান। আপনি দেশের, প্রজাদের রক্ষক, ন্যায়ের পূজারী। আপনিই যদি বিনা কসুরে একজনকে খুন ক'রে তার বিবিকে ভোগ করেন তবে প্রজারা হতাশ হয়ে পড়বে। তারা বিদ্রোহ ঘোষণাও করতে পারে। তখন হাল ধরে রাখা আপনার পক্ষে মুশকিলের ব্যাপার, হয়ে পড়বে। মেহেরবানি ক'রে এসব ধান্ধা দিমাক থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিন। আর যদি মেছুয়ার বিবিটিই আপনার কাম্য হয় তবে সে বন্দোবস্ত আমি করছি। ঝুটমুট খুন-জখমের দরকার কি?'

বুড্ডা উজির সিপাহী পাঠিয়ে মেছুয়াকে পাকড়াও ক'রে আনল। ভীত-সন্ত্রস্ত মেছুয়াকে বল্‌ল—'শোন, তিন দিন সময় তোমাকে দেয়া হচ্ছে। এর ভেতরে তোমাকে দরবারের মেঝেটি একটি মাত্র গালিচা ব্যবহার ক'রে ঢেকে দিতে হবে, না পারলে তোমার গর্দান নেয়া হবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

জেলে কেঁদে কেটে বল্‌ল—'এত বড় গালিচা আমি কি করে যোগাড় করব হুজুর? গালিচা তো তাঁতীরা বোনে। আমি তো আর তাঁত বুনতে পারি না। মেহেরবানি করে আমার ওপর থেকে এ-আদেশ তুলে নিন।'

ফিরে বুড্ডা উজির তার চোখের পানির দাম না দিয়ে ধমক ধামক দিয়ে তাকে দিয়ে চুক্তি নামায় টিপছাপা দিয়ে রাখল। মেছুয়াটি উপায়ান্তর না দেখে চুক্তি নামায় টিপছাপা দিয়ে দিল।

মেছুয়া মকানে ফিরে তার বিবির কাছে পুরো ব্যাপারটি খোলসা ক'রে বল্‌ল। সব শেষে সে বিবিকে বল্‌ল—'এসব ঝকমারিতে দরকার নেই। চল, আমরা বরং এ-মুলুক ছেড়ে অন্য কোন মুলুকে ভেগে যাই।'

মেছুয়ার বিবি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্‌ল—'সামান্য একটি ব্যাপারের জন্য ডরে একদম মুলুক ছেড়ে ভাগতে হবে। তুমি চুপ ক'রে দেখ, আমি উজির সাহেবের ফরমাশ অনুযায়ী গালিচা বুনে ফেলছি।'

বিবির বাৎ শুনে মেছুয়া তো একদম আশমান থেকে জমিনে পড়ল। স্বামীকে আশ্বাস দিতে গিয়ে সে এবার বল্‌ল—'আমাদের মকানের পিছনে যে-মোটাসোটা বটগাছটি আছে তুমি তার কাছে গিয়ে উজির সাহেবের ফরমাসের ব্যাপার জানাবে। সে তোমাকে এক গুলি সূতো দেবে। সেটি নিয়ে সোজা উজিরের কাছে চলে যাবে। তার কাছে একটি লোহা মাঙবে। তুমি সেটি নিয়ে কামরার চারদিকে ঘুরাতে লেগে যাবে। ব্যস, দরবার জোড়া এক গালিচা বোনার কাজ মিটে যাবে।

বিবির পরামর্শ মাফিক মেছুয়া বটগাছটির তলায় দাঁড়িয়ে বুড্ডা উজিরের ফরমাশের ব্যাপার জানাল। অচানক এক গুলি সূতো গাছ থেকে তার সামনে পড়ল। সেটি কুর্তার জেবে ঢুকিয়ে সোজা উজিরের সামনে হাজির হ'ল। তার কাছ থেকে একটি লোহা চেয়ে নিল। সেটি দরবারের চারদিকে ঘুরাতে না ঘুরাতেই একটি ইয়া পেল্লাই গালিচা তৈরী হয়ে গেল। সেটি দরবারের মেঝেতে বিছিয়ে দিল।

বুড্ডা উজির ইতিমধ্যে জল্লাদকে তৈরী রেখেছিল। সে তো নিশ্চিত, মেছুয়ার দ্বারা একটি মাত্র গালিচার দ্বারা দরবারের মেঝে ঢেকে দেয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। তখন জল্লাদ চুক্তিনামা অনুযায়ী তার ধড় থেকে গর্দানটি নামিয়ে দেবে।

লেকিন মেছুয়ার কাণ্ড দেখে উজিরের তো চোখ ট্যারা হয়ে যাবার জোগাড়। উজির এবার বিষণ্ণ মুখে বল্‌ল—'গালিচার বন্দোবস্ত তো করলে। এবার তোমাকে সুলতানের হুকুম অনুযায়ী তোমার আটদিনের শিশুকে নিয়ে ঠিক আটদিনের দিন দরবারে তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। সে শিশু এক নাগাড়ে সুলতানকে কিস্‌সা শোনাবে।'

মেছুয়ার দু'চোখ দিয়ে পানির ধারা ঝরতে লাগল। সে বল্‌ল—'হুজুর এমন আজগুবি শিশুই বা আমি কি করে জোগাড় করব? আর আটদিনের শিশু কি করেই বা এমন এক আজব কাণ্ড করতে পারবে?

—তা আমি জানি না। যেখান থেকে, যেভাবে পার তুমি জোগাড় করবে, আমার তা দেখার দরকার নেই। সময় মাফিক সুলতানের হুকুম তামিল করতে না পারলে তোমার গর্দান যাবে, ইয়াদ থাকে যেন।' এবার একটি চুক্তি নামা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে উজির বল্‌ল—'এখানে টিপছাপা দিয়ে মকানে ফিরে যাও।

সুলতানের হুকুম তামিল করার ফিকির বের কর গে। ইয়াদ থাকে যেন, আটদিনের শিশু।'

মেছুয়া বিবির সামনে গিয়ে উজিরের এবারের ফরমাশের ব্যাপারটি বল্‌ল।

তার বিবি স্বামীর মুখে উজিরের শয়তানীর বাৎ শুনে গোস্‌সায় কাঁপতে লাগল। সে গর্জে উঠল—'হতচ্ছাড়া, শয়তান বেতমিস কাহিকার! মালুম হয়েছে, শকুনের নজর পড়েছে আমার দিকে। বাহানা ক'রে আমাকে হাত করার ফিকির তল্লাশ করছে। ঠিক আছে, ঘাবড়িয়ো না। নবম দিনে আমার সঙ্গে এব্যাপারে তোমার বাৎচিৎ হবে। এখন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর গে।'

নবম দিন ভোরে মেছুয়ার বিবি তার স্বামীকে নিয়ে সে মোটা সোটা বটগাছটির কাছে গেল। বল্‌ল—'বটগাছ, এবার আর এক মতলব নিয়ে তোমার কাছে হাজির হয়েছি। আটদিনের লেড়কাকে দরবারে হাজির হতে হবে। সুলতানকে এক নাগাড়ে আটদিন কিস্‌সা শোনাতে হবে তাকে। তুমি সে-লেড়কা জোগাড় করে আমার হাতে তুলে দাও।'

মেছুয়ার বিবির মুখের বাৎ খতম হতে না হতেই জোর ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। এমন সময় অচানক এক শিশু ভোজবাজীর মাফিক গাছতলায় হাজির হ'ল। মেছুয়া শিশুটিকে নিয়ে দরবারে সুলতানের সামনে হাজির হ'ল। বুড্ডা উজির পাশেই তার আসনে বসে। সে বল্‌ল—'হ্যাঁ, চুক্তি আনুযায়ী শিশু আমদানি করেছ বটে। এবার শিশুকে বল কিস্‌সা শোনাতে।

মেছুয়ার হুকুমে শিশুটি কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আমি তখন নওজোয়ান। একদিন ফাঁকা ময়দান অতিক্রম করতে গিয়ে সূর্যের তেজে কাহিল হয়ে পড়ি। তখন তরমুজ খাওয়ার শখ হ'ল। একটি পাকা-টসটসে তরমুজ জোগাড় করতে পারলাম। জাঁহাপনা তরমুজটি দু'আলাদা করেই একদম তাজ্জব বনে গেলাম। দেখি, তরমুজটির ভেতরে একটি নগর। তার ভেতরে বহু মকান, মসজিদ আর বাগিচা প্রভৃতি নগরটি একদম জমজমাট। আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়েই ঝট ক'রে তরমুজটির ভেতরে ঢুকে গেলাম। দেখি, গাছে গাছে সুপক্ক ফল ঝুলছে, তার কয়েকটি ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেতে লেগে গেলাম। চমৎকার খুসবু বেরোচ্ছে ফলগুলির গা থেকে, স্বাদেও যথেষ্ট। দিল্ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবার চলতে চলতে নগর ছাড়িয়ে এক গাঁয়ে হাজির হলাম। যেদিকে নজর যায় কেবল চাষীদের সব্জী ক্ষেত। একটি বরবটি নিয়ে চিবোতে যাব, খোসা ছাড়িয়ে দেখি, তার ভেতরে চাষীরা গরু-লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছে। বরবটিটির মধ্যে ঢুকে গেলাম। এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল জেনানারা ঢেঁকিতে ধান ভেনে চলেছে। কেউবা যাঁতি দিয়ে যবের ছাতু তৈরী করছে। কয়েক জন আদমি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে শষ্য ঝাড়াই বাছাই ক'রে চলেছে। আর একটু এগিয়েই এক আদমিকে আছড়ে আছড়ে ডিম ফাটাতে দেখলাম। ব্যস্, ডিম ফেটে মুরগীর বাচ্চা বেরিয়ে চিঁ-চিঁ ক'রে ডাকডাকি আর ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। আমি এগিয়ে চল্‌লাম। এবার দেখলাম, একটি গাধা একগাদা ডালের রুটি পিঠে ক'রে পথ চলেছে। রুটি খাওয়ার ইচ্ছে হ'ল। গোটা কয়েক রুটি হাতে নিয়ে তার একটিতে কামড় বসাতেই তাজ্জব বনে গেলাম। তরমুজটি আগের মাফিক অক্ষতই রয়ে গেছে। কিস্‌সা খতম ক'রে তৃতীয় সিপাহী সর্দার সুলতানকে কুর্নিশ সেরে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এ-ই আমার কিস্‌সা।'

সুলতান মুচকি হেসে বল্‌লেন—বহুৎ বড়িয়া কিস্‌সা শোনালে!'

এবার চতুর্থ সিপাহী-সর্দার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আমি যে কিস্‌সাটি আপনার দরবারে পেশ করছি তা আগের কিস্‌সাটিরই পরবর্তী অংশ। এক সময় মেছুয়াটির একটি লেড়কা পয়দা হয়। খুবসুরৎ লেড়কা।

এদিকে সুলতানেরও একটি লেড়কা পয়দা হয়, বরাত গুণে সুলতানের লেড়কাটি দেখতে একদম বান্দরের বাচ্চার মাফিক হ'ল। সুলতানের লেড়কা আর মেছুয়ার লেড়কা একই মক্তবে মৌলভীর কাছে লিখাপড়া শিখতে লাগল। মক্তবের অন্য পড়ুয়ারা সুলতানের লেড়কাকে বলে—'ভাইয়া, এসো তোমাকে একটু দলাই মলাই ক'রে দিচ্ছি, তোমার গায়ের চামড়াটি এতে ক্রমে সফেদ হয়ে যাবে। আর তারা মেছুয়ার লেড়কাকে ক্ষেপায় ভিখমাঙ্গার বেটা বলে।

দু'সাল ঘুরতে না ঘুরতেই সুলতানের লেড়কা একদিন গোস্‌সায় গস্‌গস্ করতে করতে সুলতানকে বল্‌ল—'আব্বাজান, আমি আর মক্তব মুখো হচ্ছি না। মেছুয়ার লেড়কা আমার সুরৎ নিয়ে রোজ হাসি মস্করা করে।

সুলতান গোস্‌সায় ফেটে পড়ার জোগাড় হলেন। সে-বেইজ্জতের ঘটনাটি স্মরণ না হলে হয়ত মেছুয়ার লেড়কাকে কোতলই ক'রে ফেলতেন। তা হলে ব্যাপারটি প্রজারা ভাববে, সুলতান মেছুয়ার ওপর আগেকার ঝাল মিটাচ্ছেন।

সুলতান অন্যোনোপায় হয়ে মৌলভীকে ডেকে বল্‌লেন—'মৌলভী সাহাব, আমার মত মাফিক চল্‌লে বহুৎ ইনাম বকশিস পাবে। আর খুবসুরৎ বাঁদীও কিছু দেব তোমার সেবা করতে। যে করেই হোক মেছুয়ার লেড়কাকে খতম করতে হবে, পারবে না?'

মৌলভী আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন—'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না জাঁহাপনা। দেখবেন শয়তানের বাচ্চাটিকে ছড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়েই আমি ওকে খতম ক'রে ফেলব।'

পরদিন মেছুয়ার লেড়কা পাঠশালায় হাজির হতেই মৌলভী

মোটা একটি ছড়ি দিয়ে তাকে বেমক্কা পিটতে লাগল। পিটুনি খেতে খেতে সে একদম বেহুঁস হয়ে পড়ল। সর্বাঙ্গ দিয়ে খুন ঝরতে লাগল। লেড়কাটি নড়াচড়াও করে না। চিল্লাচিল্লি চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ডরে হাতের ছড়ি ফেলে দিল। বলা তো যায় না যদি একদম খতম হয়ে যায়।

মক্তবের ছুটির পর মেছুয়ার লেড়কা মকানে ফিরে তার আম্মা ও আব্বাকে মৌলভীর অকারণে পিটুনির ব্যাপার বল্‌ল। মেছুয়া মক্তব থেকে নাম কাটিয়ে তার হাতে জাল তুলে দিয়ে বল্‌ল—'জেলের বেটার লিখাপড়া শিখে কি-ই বা ফয়দা হবে? তার চেয়ে বরং নদীতে গিয়ে জাল ছড়িয়ে মছলি পাকড়াও কর, রুটির বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।'

মেছুয়ার লেড়কা প্রথম দিন প্রথম জাল ফেলেই একটি ল্যাঠা মছলি তুলে আনল। ল্যাঠাটি আজব এক ঘটনা ঘটাল। সে বোলচাল ঝাড়তে লেগে গেল—'মেছুয়ার বেটা, আমি আদৎ মছলি নই। এক জিন-লেড়কি। আমাকে ফিন পানিতে ছেড়ে দাও। আমি ভবিষ্যতে তোমারই ভালই করব।'

মেছুয়ার লেড়কা তাকে ফিন পানিতে ছেড়ে দিল।

দুদিন বাদে সুলতানের তলব পেয়ে মক্তবের মৌলভী দরবারে

হাজির হল। সুলতান জিজ্ঞাসা করল—'মৌলভী, মেছুয়ার বেটাকে খতম করতে পেরেছ কি?'

মৌলভী বেচারা ডরে কাচুমাচু হয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার জোর পিটুনি খেয়ে সে যে মক্তব ছেড়ে গেছে আর ফেরেনি। এখন তার আব্বার সঙ্গে নদীতে মছলি ধরে বেড়াচ্ছে।'

মৌলভীকে ধমক ধামক দিয়ে দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এবার বুড্ডা উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, মেছুয়ার লেড়কাটিকে কি ক'রে খতম করা যায়!

বুড্ডা উজির ভেবে চিন্তে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমার দিমাকে চমৎকার এক মতলব এসেছে। সবুজ নগরের সুলতানের খুবসুরৎ এক লেড়কি রয়েছে। তার সঙ্গে শাহজাদার শাদী দিলে কাজ কিছু হতে পারে। লেকিন সবুজ নগরের সুলতান বহুৎ জেদী। সহজেই দিমাক গরম করে ফেলে। যে সব শাহজাদা তার লেড়কিকে শাদী করার প্রস্তাব নিয়ে গেছে কেউ-ই আর জান নিয়ে ফিরতে পারে নি। আপনি কায়দা কৌশল ক'রে মেছুয়ার বেটাকে সবুজ নগরের সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিন শাহজাদীর সঙ্গে আপনার লেড়কার শাদীর প্রস্তাব দিয়ে। ব্যস, এতেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। শয়তান বেতমিসটিকে আর জান নিয়ে ফিরতে হবেন না।

সুলতান উল্লসিত হয়ে বল্‌লেন—বহুৎ আচ্ছা মতলব। উজির তুমি তবে মেছুয়ার লেড়কাকে সবুজ নগরের সুলতানের কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর।

উজির এবার মেছুয়ার লেড়কা মহম্মদ'কে তলব ক'রে সবুজ নগরে গিয়ে সুলতানের কাছে শাহজাদার শাদীর প্রস্তাব করতে হুকুম করল। সব শেষে বল্‌ল—'জলদি রওনা হয়ে যাও। সুলতানের হুকুম তামিল না করলে তোমার গর্দান যাবে। ইয়াদ থাকে যেন।'

মহম্মদ ব্যাজার মুখে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে মকানে ফিরে তার আম্মাকে সুলতান আর উজিরের ব্যাপার বল্‌ল। তার আম্মা বল্‌ল—'বেটা ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমাদের নদীটি যেখানে গিয়ে দরিয়ায় পড়েছে সেখানে গেলেই সবুজ নগরে যাওয়ার পথের নিশানা পেয়ে যাবে, দিমাক ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে, ইয়াদ রেখো।'

মেছুয়ার লেড়কা মহম্মদ তার আম্মা আর আব্বার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরিয়া আর নদীর সঙ্গম স্থলে হাজির হ'ল। ঠিক তখনই একটি ল্যাঠা মছলি পানি থেকে লাফিয়ে জমিনে উঠে এল। আমি তোমার জালে ধরা পড়েছিলাম, ইয়াদ আছে তো মহম্মদ?'

তাকে দেখেই মহম্মদ-এর কলিজায় পানি এল। তার কাছে নিজের আকস্মিক মুসিবতের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করল।

ল্যাঠাটি হেসে বল্‌ল—'ঘাবড়াবার কিছু নেই দোস্ত। আমি হরবখত তোমাকে সঙ্গদান করব। কখন কি করতে হবে, বাৎলে

দেব। সবার আগে তুমি উজিরকে গিয়ে বল, সবুজ নগরের শাহজাদীকে আনতে হলে সোনার নৌকা চাই। আর তার দিল্ খুশীতে ভরতে হলে নৌকায় হরেক কিসিমের ভোগ বিলাসের সামগ্রী সাজিয়ে দিতে হবে।

উজির চমৎকার এক সোনার নৌকা বানিয়ে ভোগ বিলাসের সামানপত্র দিয়ে সেটিকে সাজিয়ে দিল।

মহম্মদ নৌকা ভাসাল। তার দোস্ত ল্যাঠা মছলি তাকে পথের নিশানা বাৎলে দিতে লাগল। এক ভোরে সবুজ নগরের ঘাটে নৌকা ভিড়ল।

ল্যাঠার নির্দেশে মহম্মদ নৌকা ছেড়ে জমিনে নেমে এল।

এদিকে সোনার নৌকা দেখার জন্য নগরের পুরুষ, জেনানা আর বালবাচ্চা সবাই ঘাটে ভিড় জমাতে লাগল। আজব খবরটি সে-মুলুকের শাহজাদীর কানে যেতেও দেরী হ'ল না। সুলতানের অনুমতি নিয়ে শাহজাদী সঙ্গীদের নিয়ে দলবেঁধে ঘাটে গেল আজব নৌকাটি দেখতে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নয় শ' তেতাল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদী ঘাটে গিয়ে মহম্মদ-এর আজব সোনার নৌকাটি দেখে একদম তাজ্জব বনে গেল। সে সঙ্গীদের নিয়ে নৌকায় উঠে ঘুরে ঘুরে তার ভেতরে রক্ষিত হরেক কিসিমের বিলাসের সামানপত্র মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল।

এক সময় শাহজাদী বুঝতে পারল, নৌকাটি সবুজ দ্বীপ ছাড়িয়ে মাঝদরিয়ায় চলে এসেছে।

—শাহজাদী মহম্মদ-এর ব্যাপার দেখে গোস্‌সায় একদম ফেঁটে পড়ার জোগাড় হ'ল।

মহম্মদ বল্‌ল—'ডরাচ্ছেন কেন শাহজাদী? আপনাকে আমার মুলুকের শাহজাদার সঙ্গে শাদী দেয়ার ফিকির করতে গিয়েই এ-পথ বেছে নিতে হয়েছে।'

শাহজাদী চোখে পানি ঝরাতে ঝরাতে নিজের হাতের একটি অঙ্গুঠি পানিতে ছেড়ে দিল। লেকিন সেটি তলিয়ে গিয়ে মিট্টিতে পড়ার আগে মহম্মদ-এর দোস্ত ল্যাঠা মছলিটি অঙ্গুঠিটিকে টপ্ ক'রে গিলে ফেল্‌ল।

এক লহমার মধ্যে শাহজাদীর ভাবান্তর ঘটল। সে চোখের পানি মুছে বল্‌ল—'শোন, আমি শাহজাদাকে শাদী করতে রাজী নই। তোমাকে আমার দিল্ চাইছে। আমি তোমাকেই শাদী করব। আশমানের চাঁদকে সাক্ষী রেখে আমি তোমাকে শাদী করলাম।' শাহজাদী মহম্মদ-এর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল।

মহম্মদ আর তার বিবি শাহজাদী সম্ভোগ-সুখের মধ্যে দিয়ে আট-আটটি দিন গুজরান ক'রে দিল।

এক বিকালে মহম্মদ সোনার নৌকাটি তার মুলুকের ঘাটে ভিড়াল।

শাহজাদা নিজে ঘাটে গিয়ে শাহজাদীকে বরণ ক'রে নিয়ে এল।

প্রাসাদে নিয়ে এসে শাহজাদা বল্‌ল—'সুন্দরী, আমি তোমাকে শাদী ক'রে বিবির মর্যাদা দিতে চাই, তুমি রাজী তো?'

শাহজাদী বল্‌ল—'রাজী হতে পারি। লেকিন তার আগে তোমাকে একটি শর্ত পালন করতে হবে। নৌকায় আসার সময় আমার হাতের একটি অঙ্গুঠি দরিয়ার পানিতে পড়ে যায়। সেটি তল্লাশ ক'রে এনে আমার হাতে দিতে হবে।'

শাহাজাদা অনন্যোপায় হয়ে মহম্মদ-এর শরণাপন্ন হ'ল। অবশ্য এতে বুড্ডা উজিরের মতলব কাজ করছে। মহম্মদকে খতম করার জন্যই শাহজাদাকে তার কাছে পাঠানো হয়েছে।

মহম্মদ শাহজাদার মুসিবতের ব্যাপার শুনে বল্‌ল—'আমার এক দোস্ত ল্যাঠা মছলি পানি থেকে কুড়িয়ে এনে অঙ্গুঠিটি দিয়েছিল।' সে শাহজাদার হাতে অঙ্গুঠিটি তুলে দিল।

অঙ্গুঠি ফিরে পেয়ে শাহজাদী এবার নতুন এক মতলব ভাজল। সে বল্‌ল—'শাহজাদা, আমাদের মুলুকে শাদীর এক নিয়ম চালু রয়েছে। বাসর ঘর থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ কেটে শাদীর পাত্রকে গোসল করতে যেতে হয়। আর ফেরার সময় তাকে লকলকে আগুনের শিখার ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে হবে। আমি তোমার জন্য নদীর ঘাটে নৌকায় অবস্থান করব। তুমি আগুন আর পানিতে শুদ্ধ হয়ে আমার কাছে হাজির হবে। তবে ডর পাবার কিছু নেই। শাদীর পাত্রের গায়ে আগুন লাগে না বা তাপও লাগে না। এর পিছনে আল্লাতাল্লার দোয়া কাজ করে।

সুলতান শাহজাদীর শর্ত শুনে চমকে উঠলেন। উজির'কে ব্যাপারটি জানালেন। উজির বল্‌লেন—'এ নিয়ে ডর পাবার কিছু নেই। সুড়ঙ্গে আগুন জ্বেলে মহম্মদকে ঢুকিয়ে দেয়া যাক। সে অক্ষত অবস্থায় ফিরতে পারলে বুঝা যাবে, আল্লাহ-র দোয়া আছে, সাচ্চা বটে।'

সুলতানের হুকুম শুনে মহম্মদ-এর মুখ শুকিয়ে গেল। তার দোস্ত ল্যাঠা তাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিল—'আল্লাহ তোমার দোয়াতেই আমার জান টিকে আছে।' দু'কানে হাত রেখে মন্ত্রটি পাঠ করলেই বিলকুল মুশকিল আসান হয়ে যাবে।

মহম্মদ সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। সুড়ঙ্গের ভেতরে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলতে লাগল। মহম্মদ দু'কানে হাত দিয়ে নির্ভয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদে অক্ষত দেহে সে সুড়ঙ্গের বিপরীত মুখ দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল।

ব্যাপার দেখে সুলতানের ভরসা হ'ল। এবার শাহজাদাকে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। ব্যস, খতম হয়ে গেল।

শাহজাদী হাসিমুখে মেছুয়ার লেড়কা মহম্মদকে আলিঙ্গন করল।

এবার পঞ্চম সিপাহী-সর্দার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, কোন এক মুলুকের সুলতান একদিন তাঁর বুড্ডা উজিরকে বল্‌লেন—'এমন অঙ্গুঠি আমাকে জোগাড় ক'রে দাও যা আঙুলে পরলে আমি নিজের মর্জি মাফিক হাসতে পারব, ফিন মর্জি মাফিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারব।'

বুড্ডা উজির নিজে বাজারে গিয়ে প্রতিটি জহুরীর দোকানে দোকানে ঢুঁড়ে বেড়াল। কিছুতেই সুলতানের ফরমাশ অনুযায়ী অঙ্গুঠি করতে পারল না।

উজির হতাশ হয়ে সুলতানের কাছে ফিরে এলে সুলতান একদম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন—'আজব ব্যাপার উজির, সামান্য একটি অঙ্গুঠি আমার তামাম সুলতানিয়ত ঢুঁড়েও জোগাড় করতে পারলে না। আমি কোন বাহানা শুনতে রাজী নই ফরমাশ মাফিক অঙ্গুঠিটি আমার চাই-ই চাই।'

উজির উপায়ান্তর না দেখে এবার নগর ছেড়ে গাঁয়ে চলে গেল। একে-ওকে পুছতাছ করতে করতে এক বুড্ডা চাষীকে নিজের বিপদের ব্যাপার জানাল। বুড্ডাটি তার লেড়কিকে তলব করে তার খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কিকে উজিরের মুশিবতের ব্যাপার জানাল। সে অনায়াসেই সুলতানের ফরমাশ মাফিক এক অঙ্গুঠি বানিয়ে দিল।

সুলতান অঙ্গুঠিটি হাতে পরে যারপরনাই খুশী হলেন। আর অঙ্গুঠিটির দৈবগুণ দেখে তাজ্জব বনে গেলেন।

সুলতান চাষীর লেড়কি যূঁই-এর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে শাদী ক'রে প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

ক'দিন বাদেই যূঁই বিমারিতে পড়ল। কঠিন বিমারি। হেকিম ডাকা হ'ল। বুড্ডা হেকিম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে জানাল, বেগম সাহেবার কোন বিমারি নেই। তাঁর একমাত্র দাওয়াই গাঁয়ের খোলামেলা পরিবেশ ও মুক্ত বাতাস।

সুলতান বেগম সাহেবাকে তাঁর নদীর তীরের প্রাসাদে রাখার বন্দোবস্ত করালেন।

বেগম সাহেবা এক ভোরে জানালার ধারে বসে মেছুয়ার জাল দিয়ে মছলি পাকড়ানোর দৃশ্য দেখছিল। মেছুয়াকে বল্‌ল আমার নাম ক'রে পানিতে জাল ফেল। যা উঠে আসবে তার মালিক আমি হ'ব। তার বদলে তোমাকে দেব একটি মোহর। মেছুয়া মোহর ছাড়াই কাজ ক'রে দিতে রাজী হ'ল। এমন খুবসুরৎ লেড়কির কাছ থেকে হাত পেতে মোহর নিতে সে অস্বীকার করল।

মেছুয়া জাল ফেল্‌ল। মাছের বদলে ছোট্ট একটি ডিবা উঠে এল। ডিবাটি হাতে নিয়ে বেগম সাহেবা মেছুয়াটিকে একটি মোহর দিতে গেল। সে নিল না। শেষমেষ বল্‌ল—'যদি নেহাৎই কিছু দিতে চান তবে আপনার গালে একবারটি চুমু খেতে দিন। ব্যস, তবেই আমি খুশী।'

বেগম সাহেবা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে গাল বাড়িয়ে দিল। মেছুয়াটি চুমু খেতে যাবে অমনি সুলতান তরবারি হাতে ছুটে এলেন। আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের বাৎচিৎ শুনতে পেয়েছিলেন।

সুলতান যূঁই'কে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যূঁই' হাঁটতে হাঁটতে নগরের ধারের এক দোকানের সামনে হাজির হ'ল। দোকানী অসহায় পরদেশী জেনানা যূঁইকে সঙ্গে ক'রে নিজের মকানে নিয়ে গেল। দোকানীর বিবি তার স্বামীর কারবার দেখে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে খাঁক হতে লাগল। গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে করতে তাকে নিয়ে মুরগীর খামারে তালাবন্ধ ক'রে রাখল।

যূঁই ক্ষিদে তেষ্টায় অস্থির হয়ে পড়ল। কামিজের ভেতর থেকে ছোট্ট ডিবাটি বের করল। তার ঢাকনা খুলতেই সে দেখল, তার ভেতর থেকে চমৎকার এক পানির জগ আর খানা সমেত কিছু বেরিয়ে এসেছে। সে খানাপিনা সারল। এবার ডিবার ঢাকনা খুলতেই দেখতে পেল, তার ভেতরে ছোট্ট ছোট্ট ক'টি পুতুল। সেগুলো বের করেই সে আরও তাজ্জব বনে গেল। পুতুলগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি ক'রে খুবসুরৎ লেড়কির অবয়ব ধারণ করল। দশটি লেড়কি। সবার হাতে একটি ক'রে পুঁটুলি সবাই কোমর দুলিয়ে নাচতে লেগে গেল। কিছু সময় বাদে তারা ফিন ডিবায় গিয়ে আশ্রয় নিল। পুঁটুলি দশটি যূঁই-এর পায়ের কাছে রেখে গেল। সেগুলোতে মোহর বাঁধা। তার আর খানাপিনার অভাব রইল না। ডিবার দৌলতে যখন যা চায়, পেয়ে যায়।

এদিকে দোকানীর বিবি নিঃসন্দেহ মুরগীর খামারে খানাপিনার অভাবে যূঁই-এর ইন্তেকাল ঘটে গেছে। দোকানী জানত, তাকে মকান থেকে বের ক'রে দেয়া হয়েছে। তাকে আটক ক'রে রাখা হয়েছে শুনে সে বিবি'কে গালমন্দ করতে লাগল। এক জেনানা তার মকানে খতম হয়ে প'ড়ে থাকলে আইন এসে ঘাড়ে চাপবে। ব্যস্ত হয়ে মুরগীর খামারে গিয়ে স্বস্তি পেল। খোদা মেহেরবান। জেনানাটি টিকে আছে।

দোকানী তাকে মুরগীর খামার থেকে বের ক'রে আনল। যূঁই তাকে পর্বত প্রমাণ মোহর দিয়ে বল্‌ল—'এগুলো তোমার কাছে রাখ। আমাকে একটি ইমারৎ বানিয়ে দাও।'

দোকানী বাজারের ধারে ইয়া পেল্লাই একটি ইমারৎ বানাল। দামী দামী আসবাবপত্র দিয়ে কামরাগুলো সাজিয়ে তুল্‌ল।

এক বিকালে সুলতান উজিরকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে ইয়া পেল্লাই ইমারতটি দেখে তাজ্জব বনে যান। উজিরকে বল্‌লেন—'এখানে তো কোন প্রাসাদ ছিল না উজির, কে বানাল? আমার অনুমতি না নিয়েই কি কোন পরদেশী সুলতান বাদশাহ আমার সুলতানিয়তে প্রাসাদ বানাল? তুমি পাত্তা লাগাও উজির।'

—'জাঁহাপনা, এর চেয়ে সোজা রাস্তা আছে, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিন, আপনার সুলতানিয়তের কেউ আজ রাত্রে মকানে বাতি জ্বালতে পারবে না। যদি এ-প্রাসাদের মালিক বাতি জ্বালে তবেই প্রমাণ হয়ে যাবে পরদেশী। আপনার এলাকা জবরদখল করেছে।' উজিরের পরামর্শ মাফিক তামাম সুলতানিয়তে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করা হ'ল।

রাত্রে দেখা গেল তামাম সুলতানিয়ৎ জুড়ে ঘুটঘুটে আন্ধার। কেবলমাত্র যূঁই-এর প্রাসাদের বাতির রোশনাই।

আর দেরী না ক'রে সুলতান নিজে উজিরকে নিয়ে প্রাসাদটির মালিকের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে চাইলেন। উজির বাধা দিল। বল্‌ল—'আগেই আপনার যাওয়া সমুচিত হবে না। আমি আগে গিয়ে ব্যাপারটি দেখে আসি।'

শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হ'ল। উজির একাই সেখানে হাজির হলো। যূঁই এক নওজোয়ান সুলতানের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে বুড্ডা উজিরকে অভ্যর্থনা জানাল। মেহমানকে বাদশাহী খানা ও খুসবুওয়ালা দামী গুলাবী সরাব দিয়ে আপ্যায়ন করল। যূঁই উজিরকে ঠিক চিনে ফেলেছে। লেকিন উজিরের পক্ষে ছদ্মবেশী বেগম যূঁইকে চেনা সম্ভব হ'ল না। বিদায় মুহূর্তে যূঁই উজিরকে একটি বড়সড় মোহরের পুঁটুলি উপহারস্বরূপ প্রদান করল।

বুড্ডা উজির প্রাসাদে ফিরে সুলতানকে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, কেবল আপনার প্রাসাদের সাজসজ্জাই নয়, এর মাফিক কয়েকটি প্রাসাদের সাজ-সজ্জাকেও ওই প্রাসাদটির সাজ-সজ্জা টেক্কা দিতে পারে। তার ধন-দৌলতের তো তুলনাই চলে না।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু বাদে উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান নিজে নয়া ওই প্রাসাদটিতে হাজির হলেন। ছদ্মবেশী যূঁই তাদের অভ্যর্থনা ক'রে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেল। প্রাসাদের সাজসজ্জা দেখে তো তাঁর চোখ ট্যাঁড়া হয়ে যাবার জোগাড়।

খানাপিনার অবসরে যূঁই ডিবার ঢাকনা খুলতেই দশটি ক্ষুদে ক্ষুদে পুতুল তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। চোখের নজর ঘুরাতে না ঘুরাতে পুতুল দশটি প্রত্যেকে এক একটি খুবসুরৎ নওজোয়ানে পরিণত হ'ল। তারা কোমর দুলিয়ে, হাত নাড়িয়ে বাহারী নাচ জুড়ে দিল।

সুলতান সে ব্যাপারটি দেখে একদম থ বনে গেলেন। ছদ্মবেশী যূঁইকে বল্‌ল—'সুলতান, এমন আজব ডিবা আপনি কোত্থেকে জোগাড় করলেন?'

—'তকলিফ ক'রে জোগাড় করতে হয়নি। অর্থদিয়ে খরিদও করিনি। এক আদমি আমাকে বকশিস দিয়েছে। মোহর দিয়ে খরিদ করতে চেয়েছিলাম। সে রাজী হয় নি। বিনিময়ে সে আমার কাছে অন্য কিছু দাবী করে।' একটু থমকে গিয়ে এবার বল্‌ল—আপনাকে কি করে যে বুঝাই সুলতান, ভেবে পাচ্ছি না। তবে এটুকু শুনে রাখুন একটি মুরগা একটি মুরগীর কাছ থেকে যা আশা করে। আমি তার দাবী পূরণ ক'রে এটি লাভ করি।' যূঁই ইচ্ছে করেই মিথ্যা ভাষণ দিল।

যূঁই-এর বাৎ শোনামাত্র সুলতান ব'লে উঠলেন—'ওসব কাম কাজে আমি রাজী আছি। একবার কেন, চাইলে দশবারও চলতে পারি। মেহেরবানি ক'রে ডিবাটি আমাকে দিন সুলতান।'

কোনরকমে হাসি চেপে রেখে যূঁই বল্‌ল—'দশবার না হলেও চলবে। তবে চারবার তো চাই-ই, রাজী?'

—'রাজী, ডিবাটি দিন, আমাকে বিমুখ করবেন না।'

—'না, বিমুখ জরুর করব না। তবে এখানে খোলামেলায় তো

ওসব কাম কাজ চলে না। আমার শোয়ার কামরায়—'

তার মুখের বাৎ খতম হওয়ার আগেই সুলতান এক লাফে ঝটক'রে একদম খাড়া হয়ে বল্‌লেন—'বহুৎ আচ্ছা, তা-ই চলুন।'

যূঁই-এর শোয়ার কামরায় গিয়ে সুলতান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর কারবার দেখে যূঁই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কোনরকমে হাসি সামাল দিল। পারল না। হেসেই ফেল্‌ল। এবার সে বল্‌ল—জাঁহাপনা, আপনি এ-সুলতানিয়তের মালিক। সামান্য একটি তামার ডিবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না! এমন একটি হীন কাজেও সম্মত হয়ে গেলেন! এ-ডিবাটি আমি এক মেছুয়ার কাছ থেকে মাত্র একটি চুম্বনের ওয়াদায় রাজী হয়েছিলাম। তার সাধ পূর্ণ হ'ল না, আমি ডিবাটি ঠিক লাভ করলাম। আপনার তরবারির আঘাতে সেদিন তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

এবার সুলতানের মালুম হ'ল, এ-ই তার তাড়িয়ে দেয়া যূঁই ছাড়া আর কেউ নয়। তিনি এবার যূঁইকে দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। বুকে চেপে ধরে চুম্বনে চুম্বনে তাকে অস্থির ক'রে তুল্‌লেন।

সুলতানের নির্দেশে এবার ষষ্ঠ সিপাহী-সর্দার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, কোন এক মুলুকের এক সুলতানের এক খুবসুরৎ লেড়কি পয়দা হয়েছিল। তার উমর যখন সাত সাল তখন একদিন চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াবার সময়, ইয়া পেল্লাই এক উকুন মেঝেতে পড়ল। সেটিকে তেলের বোতলে ভরে কামরার এক কোণে ফেলে রাখল। ব্যস, তার ব্যাপার সে বেমালুম ভুলে গেল। এক এক ক'রে বহুৎ সাল গুজরান হয়ে গেল।

তার উমর পুরো ষোল সাল হ'ল।

শাহজাদী একদিন দরবারে সুলতানের পাশের আসনে বসে। এমন সময় ইয়া দশাসই চেহারার এক কদাকার জানোয়ার ক্ষেপে গিয়ে গর্জাতে গর্জাতে দরবারে ঢুকে গেল। ব্যাপার দেখে শাহজাদী ডরে একদম মুষড়ে পড়ল।

আদতে কদাকার জানোয়ারটি একটি উকুন।

সুলতানের হুকুমে জানোয়ারটিকে মেরে তার চামড়াটি প্রাসাদের সদর-দরওয়াজায় ঝুলিয়ে রাখা হ'ল। সুলতানের হুকুমে তাঁর সুলতানিয়তের সর্বত্র ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচার ক'রে দেয়া হল, যে-আদমি চামড়াটি দেখে বলতে পারবে এটি কোন্ জানোয়ারের গা থেকে তুলে রাখা হয়েছে তার সঙ্গে শাহজাদীর শাদী দেয়া হবে। যদি ঠিকঠাক বলতে না পারে তবে তার গর্দান যাবে।

সুলতানের ফরমান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভিন্‌দেশ থেকেও বহু সুলতান বাদশাহের লেড়কা এল। চামড়াটি দেখে ঠিকঠাক বলতে না পেরে জান দিল। তাদের মুণ্ডুও ফটকে লটকে দেয়া হ'ল। চল্লিশটি মুণ্ডু জমা হ'ল।

শেষমেষ এক শাহজাদা এল। সে চামড়াটি এক লহমায় দেখে নিয়েই বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি নিশ্চিত এটি একটি ইয়া পেল্লাই উকুনের চামড়া। তেলের পাত্রে সে ছিল। তারপর পাত্রটি ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

সুলতান আর দেরী না করে ওয়াদা অনুযায়ী সে শাহজাদার সঙ্গে তার লেড়কির শাদী দিলেন। কাজী এসে শাদীনামা তৈরী ক'রে দিয়ে গেল।

শাদীর পর এক নাগাড়ে চল্লিশদিন কাটানোর পর শাহজাদা তার বিবিকে নিয়ে নিজের মুলুকে যাত্রা করার আয়োজন করল। সুলতান তাঁর লেড়কির সঙ্গে হরেক কিসিমের যৌতুকও উপঢৌকন দিতে চাইলেন।

শাহজাদা বাধা দিয়ে বল্‌লেন—'যৌতুক-উপঢৌকনের ঝামেলা ঝুটমুট বাড়াবেন না। আমার নিজেরই প্রচুর ধন-দৌলৎ রয়েছে। আমার বিবিকেই আমি শুধুমাত্র নিয়ে যাব।'

—'বহুৎ আচ্ছা বেটা। তবে এক বাৎ, লেড়কির সঙ্গে লেড়কির আম্মাও যাবে। তোমার প্রাসাদ ও সুলতানিয়ৎ প্রভৃতি ঢুঁড়ে দেখে আসতে চাইছে, আপত্তি আছে?'

শাহজাদা আমতা আমতা ক'রে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, ওনার উমর হয়েছে। পথের ধকল সইতে পারবেন না। আমি বরং মাঝে-মধ্যে আপনাদের লেড়কিকে এখানে এনে দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

—'বহুৎ আচ্ছা, তোমার মর্জি মাফিকই কাজ হবে।'

আদৎ ব্যাপার, শাহজাদা কোন সুলতান-বাদশাহের লেড়কা নয়। এক দৈত্য। আফ্রিদি দৈত্য।

শাহজাদারূপী আফ্রিদি দৈত্যটি শাহজাদীকে নিয়ে পর্বতের ওপরে তার আস্তানায় নিয়ে হাজির হ'ল।

দু'-চারদিনের মধ্যে শাহজাদী তার স্বামীর আদৎ পরিচয় জানতে পেরে আঁৎকে উঠল। দিনভর সে আস্তানার বাইরে ঢুঁড়ে বেড়ায়। রাত্রির আন্ধার ফিরে এলে তার গায়ে খুন জড়িয়ে থাকে। শাহজাদীর বুঝতে বাকী থাকে না, তার স্বামী অনেককে খতম ক'রে এসেছে।

আফ্রিদি দৈত্যটি একদিন এক আদমির শির এনে তার বিবিকে বল্‌ল—'এটিকে তেল-মশল্লা দিয়ে আচ্ছা করে পাকাও।'

শাহজাদী চমকে উঠে পিছিয়ে গেল। দৈত্যটি জোর জবরদস্তি করল না। আর একদিন তাগড়াই একটি মরা-ভেড়া নিয়ে এসে বিবিকে বল্‌ল—'খানা পাকাও।'

তার ব্যাপার দেখে শাহজাদীর কলিজা শুকিয়ে গেল। সে ভাবল—'এ-কার পাল্লায় এসে পড়া গেল!' সে এক একদিন এক এক মূর্তি ধরে আদমি আর জানোয়ারকে খতম ক'রে বেড়াচ্ছে।

আফ্রিদি দৈত্যটি একদিন শাহজাদীর আম্মার অবয়ব ধারণ

ক'রে আস্তানায় ফিরল। শাহজাদী তার আম্মাকে দেখেই তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

তার আম্মা বল্‌ল—'বেটি, জানতে পারলাম, তোর স্বামী এক মায়াবী দৈত্য, সাচ্চা?'

—'সে কী আম্মা! এমন ঝুটা খবর তুমি কার মুখে শুনেছ? তার মাফিক আদমিই হয় না। সে আমাকে বহুৎ পেয়ার-মহব্বৎ করে। আমার জন্য কিচ্ছু ভেবো না। আমি সুখে শান্তিতেই আছি। নিশ্চিন্তে মুলুকে ফিরে যাও।

তার আম্মারূপী দৈত্য কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল। একটু বাদে সে খুবসুরৎ শাহজাদাটির অবয়ব ধারণ করে শাহজাদীর কাছে ফিরে এল। সে নিশ্চিন্ত, তার বিবি তার ওপর বিরূপ নয়। অন্তর দিয়ে তাকে পেয়ার-মহব্বৎ করে।

দৈত্যটি ফিরতেই তার বিবি বল্‌ল—'তোমার ফিরতে আজ দেরী হয়েছে। আমার আম্মা এসেছিলেন। আর একটু আগে ফিরলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারত।'

দৈত্যটি তার বাৎ শুনে বহুভাবে আক্ষেপ প্রকাশ করল। তারপর বল্‌ল—'তোমার এক মাসী আছেন? আমি কাল গিয়ে তাকে খবর দিয়ে আসব যাতে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করে যান।'

শাহজাদী খুশীতে লাফিয়ে উঠল—'তবে তো বহুৎ আচ্ছাই হয়। কতদিন মাসীকে দেখি না!'

দুদিন বাদে দৈত্যটি শাহজাদীর মাসীর অবয়ব ধারণ ক'রে আস্তানায় ঢুকল। শাহজাদী মাসী মাসী ব'লে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মাসী তাকে দেখেই চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল—'ইয়া আল্লাহ! একী সর্বনেশে খবর শুনলাম বেটি! তোর স্বামী নাকি এক মায়াবী দৈত্য?'

শাহজাদী বুখে ওঠে—'একী আজব বাৎ! এসব বাজে ব্যাপার কে রটিয়ে বেড়াচ্ছে, আমার দিমাকে আসছে না তো! আম্মাও এরকমই খবর শুনে নাকি ছুটে এসেছিলেন। মাসী একদম সাচ্চা বাৎ, আমার স্বামীর মাফিক আদমি হাজারে নয়, লাখেও একটি মিলবে না। আমাকে বহুৎ পেয়ার মহব্বৎ করে। আমার জন্য তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি সুখেই দিন গুজরাণ করছি।'

তার মাসীর অবয়ব ধারী দানবটি ভেড়ার গোস্ত দিয়ে খানাপিনা সেরে বিদায় নিল। একটু বাদেই সে ফিন সে-শাহজাদার অবয়ব ধরে ডেরায়, বিবির কাছে ফিরে এল। সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল একটি মরা ভেড়া।

দু'দিন বাদে দৈত্যটি শাহজাদীর আব্বা সুলতানের অবয়ব ধরে শাহজাদীর কাছে এল।

আব্বাকে দেখে সে খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে গেল।

সুলতান রূপী দৈত্যটি বল্‌ল—'বেটি, কী সর্বনাশ যে আমি করলাম তা ভেবে দু'বেলা কপাল চাপড়াই। আর চোখের পানি ঝরিয়ে দিন গুজরান করি। তুই আমার একমাত্র বেটি, আর আমি কিনা তোকে এক মায়াবী দৈত্যের হাতে তুলে দিয়েছি। বলেই সে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে শাহজাদী আর দিমাক ঠিক রাখতে পারল না। গলা নামিয়ে বল্‌ল—'হ্যাঁ আব্বা, আমার নসীব যে এমন ব্যাপার লিখা ছিল আগে মালুমই ছিল না। সাচ্চা বটে, সে আদতে কোন সুলতান-বাদশার লেড়কা নয়। মায়াবী দৈত্য। আদমীর গোস্ত খায়। তবে আমাকে এ ব্যাপারে জুলুম টুলুম করে নি। কবে আমার জান খতম ক'রে দেয় সে-ডরেই আমি হরবখত মুষড়ে থাকি। নসীবে কি যে—'

শাহজাদীর মুখের বাৎ খতম হওয়ার আগেই দৈত্যটি নিজ অবয়ব ধারণ করল। সে বাজখাই গলায় গর্জে উঠল—'এবার সাফা হয়ে গেল, তুমি আমাকে বিশোয়াস করনা।' সে গোস্‌সায় ফুলতে ফুলতে শাহজাদীকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। শাহজাদী কেঁদে তার পা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'আমাকে জানে খতম ক'রে দিও না। কসম খাচ্ছি, আর কোনদিন, কারো কাছে এসব ফাঁস করব না।'

চুপ কর হারামজাদী! তোর যখন বিশোয়াস হয়েছে, আমি তোর জান খতম ক'রে দেব, তোকে খেয়ে ফেলব তখন আর তোকে একদিনও জিন্দা রাখতে চাই না।'

চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে শাহজাদী বল্‌ল—' তবে তাই কোরো, আমাকে তুমি খেয়ো। লেকিন আজ ছাড়ান দাও। আজ আমার দেহ অপবিত্র। আমি আজ নোংরা হয়েছি। আগে শুদ্ধ হই, তারপর তোমার দিল্ যা চায় কোরো। আমি গোসল সেরে তোমার সামনে আসব। তখন আমার শরীরের যেখান থেকে খুশী গোস্ত কামড়ে-ছিঁড়ে খেয়ো। আজ নয়।'

—'বহুৎ আচ্ছা। তবে তা-ই হোক, আগে শুদ্ধ হও।'

দৈত্যটি তার এক অনুচরকে মায়া বলে গাধার রূপদান করল। শাহজাদীকে তার সাজ-পোশাকের পুঁটুলি সমেত গাধাটির পিঠে চাপিয়ে দিল। আর নিজে গাধার মালিকের অবয়ব ধারণ করল। গাধাটিকে তাড়িয়ে নগরের হামামে হাজির হ'ল।

দৈত্যটি এবার হামামের এক জেনানা-রক্ষীর হাতে তিনটি মোহর দিয়ে বল্‌ল—'ইনি শাহজাদী। আচ্ছা করে গোসল করিয়ে এঁকে ফিন আমার হাতে তুলে দেবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

শাহজাদী হামামের ভেতরে গিয়ে এক বেঞ্চের কোণে বসে অঝোরে চোখের পানি ঝরাতে লাগল।

একদল লেড়কি হামামে গোসল করতে এসে তাকে কাঁদতে দেখে বল্‌ল—'সে কী, গোসল করতে এসে তুমি কেঁদে আকুল হচ্ছ, ব্যাপার কি?' তারা ভাবল, একে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করতে

করতে গোসল করা যাবে।

শাহজাদী বল্‌ল—'আমার নসীব খারাপ, বহিনরা। জিন্দেগীর জন্য আমার সাধ-আহ্লাদ খতম হ'য়ে গেছে। এখন থেকে বাকী দিনগুলি চোখের পানিই আমার সম্বল।'

লেড়কিগুলো বুঝল, ব্যাপার সুবিধার নয়। জেনানাটি শোক-তাপে জর্জরিত। একে নিয়ে মস্করা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। তারা গোসল সারতে চলে গেল।

একটু বাদে এক বুড্ডি ছেঁড়া-ময়লা সাজ-পোশাক পরে হামামে এল। মাথায় একটি টুকরি। বাদাম রয়েছে। বুড্ডি বাদাম ফেরি করে বেড়ায়।

শাহাজাদী তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিজের দামী সাজ-পোশাক বুড্ডিটিকে দিয়ে তার ছেড়া-ময়লা সাজ পোশাক নিজে পরে নিল। মাথায় নিল বাদামের টুকরি। বুড্ডি তো দামী সাজ পোশাক পেয়ে মহা খুশী। ভাবল, জেনানাটির দিমাক টিমাক খারাপ আছে। এ মওকায় যা হাতিয়ে নেয়া যায়।

শাহজাদী বাদামের টুকরি মাথায় নিয়ে 'বাদাম নেবে, বাদাম নেবে'—হাঁকতে হাঁকতে গাধার মালিকরূপী দৈত্যটির পাশ দিয়ে হামাম থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে ক্রমে সন্ধ্যার আন্ধার নেমে আসে তবু শাহজাদী ফিরছে না দেখে দৈত্যটি অস্থির হয়ে পড়ল।

হামাম-এর জেনানা দারোয়ান প্রধান ফটক বন্ধ করার উদ্যোগ নিল। দৈত্যটি চিল্লিয়ে উঠল—'ইয়া আল্লাহ! একী করছ, ভাইয়া? আমার শাহজাদী ভেতরে রয়ে গেছে আর তুমি ফটক বন্ধ করে দিচ্ছ!'

ভ্রূকুঁচকে জেনানা দারোয়ান বল্‌ল—'শাহজাদী! তোমার শাহজাদী হামামের ভেতরে? দিমাক টিমাক খারাপ নাকি? হামামে কেউ-ই নেই। গোসল সেরে যে যার জায়গায় চলে গেছে। হামাম খালি।'

দৈত্যটি জেনানা-দারোয়ানটির গলা টিপে ধরে গর্জে উঠল—'আমার শাহজাদী কোথায়, ফিরিয়ে দাও। দিল্লাগী ছাড়। নইলে জান একদম খতম করে দেব বলে দিচ্ছি!' মুহূর্তে সেখানে পথচারীর ভিড় জমে গেল। ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝে দৈত্যটি টুক্ ক'রে কেটে পড়ল।

এদিকে শাহজাদী বাদাম ফেরী করতে করতে একদিন সে মুলুকের সুলতানের প্রাসাদের ফটকে হাজির হ'ল। এক নফর'কে দেখে বল্‌ল—'ভাইয়া, আমি এক সুলতানের লেড়কি। তোমাদের সুলতানের সঙ্গে একবারটি ভেট করিয়ে দেয়ার ফিকির করতে পার?'

নফরটি সুলতানের কাছে গিয়ে খবরটি দিল। সুলতান শাহজাদীকে তাঁর সামনে হাজির করতে বললেন।

সুলতান খুবসুরৎ শাহজাদীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কাজীকে তলব দিলেন। শাদীনামা তৈরী হ'ল। শাহজাদীর সম্মতি নিয়ে তার লেড়কার সঙ্গে তার শাদী দিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে এক মিঞা সাহাব একটি ভেড়া নিয়ে সুলতানের সঙ্গে ভেট করতে এল।

সুলতান ভেড়াটির দিকে নজর রেখে বল্‌লেন—'ভেড়ার গোস্ত সুস্বাদু। কাল এটিকে জবাই করে গোস্ত দিয়ে খানাপিনা সারা যাবে।'

আগন্তুক মিঞা বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এ-ভেড়াটিকে রাখা মহা ঝকমারি ব্যাপার। জেনানাদের কামরায় ছাড়া অন্য কোথাও একে রাখলে চিল্লিয়ে কান ঝালাপালা ক'রে দেবে। আমার বিবি রোজ রাত্রে একে নিজের শোবার কামরায় রাখত।'

—'বহুৎ আচ্ছা, এক রাত্রির মামলা তো? ব্যস, আজ রাত্রে একে হারেমে রাখার বন্দোবস্ত করছি। ভোরে জবাই করা হবে।' সুলতানের হুকুমে এক নফর ভেড়াটিকে নিয়ে গিয়ে হারেমে বেঁধে রাখল।

মাঝ-রাত্রে ভেড়ারূপী দৈত্যটি আদৎ রূপ ধারণ করল। সে শাহজাদার সদ্য বিবাহিতা বিবির কামরার দিকে এগিয়ে গেল। এক বেহেস্তের জিন তখন হারেমের পাহারায় নিযুক্ত ছিল। সে অচানক দৈত্যটিকে আক্রমণ করল। দৈত্যটির ব্যাপারটি মালুম হওয়ার আগেই জিনটি তার জান খতম ক'রে দিল।

ভোরে প্রাসাদের সবাই দেখল, তাগড়াই ভেড়াটি চার পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। একদম নিশ্চল-নিথর।

এবার সপ্তম সিপাহী-সর্দার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, কিছুদিন আগে আমি যে প্রদেশে নোকরিতে নিযুক্ত ছিলাম একদিন সে প্রদেশের এক চাষীর মকানে আরব ডাকু হানা দেয়। কামরায় ঢুকে সে গমের বোড়া ধরে টান দিতেই মকানের মালিক 'চোর, চোর' ব'লে চিলাচিল্লি জুড়ে দেয়। ডাকুটি অচানক এক আবডালে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। মহল্লার আদমিরা ছুটে এল। জোরদার তল্লাশী চালাল। লেকিন তার হদিস পেল না। আমি হাজির হয়ে তল্লাশীতে লাগি। হদিস না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসার মতলব করছি। এমন সময় গমের বোড়ার পাঁজার দিক থেকে গোঙানির আওয়াজ কানে এল। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, এক আদমি বুকের ওপর পুরো এক বোড়া গম নিয়ে পড়ে।

বোড়া সরিয়ে ডাকুটিকে উদ্ধার করলাম। ফাঁকে এনে জিজ্ঞাসা করলাম—'এমন এক আজব কাজ করলে কেন বল তো? নিজে থেকে আওয়াজ ক'রে ধরা দিলে, ব্যাপার কি?'

ডাক্তুটি মুখ কাচুমাচু ক'রে বলল্‌—'সিপাহীজী, আমি মুখে আওয়াজ করিনি। গমের বোড়াটি পেটের ওপর ডেবে বসায় পেট থেকে বায়ু বেরোবার আওয়াজ হয়েছিল, একদম সাচ্চা বলছি।'

সপ্তম সিপাহী-সর্দার এবার এগিয়ে এসে তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আমার গাঁয়ে এক বাঁশীওয়ালা ছিল। তার বিবি একবার এক লেড়কা পায়দা করল। বাঁশী বাজিয়ে তার স্বামীর আয় উপার্জন করতে গেলে কিছুই হ'ত না। তার পথ জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। উপায়ান্তর না দেখে বাঁশীওয়ালা বাটি-হাতে ভিখ মাঙ্গতে বেরলো।

এক মাঠ দিয়ে যাবার সময় সে দেখতে পেল একটি মুরগী কোক্কর কো কোক্কর কো ব'লে চিল্লাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখল, খাঁচার ভেতরে কয়েকটি ডিম। লোভ সম্বরণ করতে না পেরে এক হাতে মুরগীটিকে এবং অন্য হাতে ডিমগুলো খাঁচা থেকে বের ক'রে নিল।

বাজারের ধার দিয়ে মকানে ফেরার সময় এক ব্যাপারী ডিমগুলো খরিদ করতে চাইল। সে নিজেই বল্‌ল—'শোন, দশ দিনার দাম পাবে, ডিমগুলো আমাকে দিয়ে যাও।'

বাঁশীওয়ালা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার দিকে চেয়ে রইল। ভাবল, ব্যাপারীর দিমাক খারাপ নাকি! নইলে এ-কটি ডিমের দাম দশ দশটি দিনার দিতে চাইছে!'

বাঁশীওয়ালাকে ভ্রূ-কুঁচকে নীরবে চেয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারীটি ভাবল, দশ দিনারে বুঝি সে খুশী হতে পারছে না। এবার বল্‌ল,—'বহুৎ আচ্ছা, পনের দিনার দেব, রাজী?'

বাঁশীওয়ালা ভাবল, খোদাতাল্লা একী ঝকমারিতে ফেল্‌ল। তাকে! নইলে তাকে গরীব পেয়ে ঝুটমুট গায়ে পড়ে মস্করা শুরু ক'রে দিল কেন? সামান্য ক'টি ডিমের দাম তো আর পনের দিনার হয় না।

ব্যাপারী বল্‌ল—'যাক, ঝামেলা দিয়ে দরকার নেই। পুরো বিশদিনার দিয়ে দিচ্ছি, ডিম দিয়ে দাম নিয়ে যাও।'

বাঁশীওয়ালা ডিম ক'টি দিয়ে বিশটি দিনার কুর্তার জেবে ভরে মকানের দিকে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটা জুড়ল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নয় শ' আটচল্লিশতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশটুকু শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, ব্যাপারীটি বাঁশীওয়ালাকে হাঁকাহাঁকি ক'রে থামাল। তার কাছে গিয়ে বল্‌ল—'তোমার কাছে এরকম ডিম আরও যদি থাকে তবে কাল নিয়ে এসো। বিশ দিনারই দাম পাবে।'

—'এখন আর নেই বটে। তবে কাল যদি মুরগী ডিম পাড়ে তবে তোমার কাছে জরুর পৌঁছে দিয়ে যাব।'

—'তোমাকে মেহনৎ ক'রে আসার দরকার নাই। রোজ ভোরে আমি নিজে গিয়ে তোমার মকান থেকে নিয়ে আসব। তুমি কেবল তোমার মকানটি চিনিয়ে দাও।'

বাঁশীওয়ালা ব্যাপারীকে নিজের মকানটি দেখিয়ে দিল। এবার বাজারে গিয়ে বিবির জন্য কিছু খানা খরিদ ক'রে এক হাতে নিল। আর অন্য হাতে মুরগীটি নিয়ে মকানে ফিরল। বিবিকে সোল্লাসে বল্‌ল—'বরাতে যদি থাকে, মুরগীটি যদি মাত্র ক'দিন ডিম পাড়ে তবে আমি একদম আমীর বনে যাব বিবিজান।'

ব্যাপারীটি রোজ ভোরে এসে বাঁশীওয়ালার হাতে বিশটি ক'রে দিনার দিয়ে ডিম নিয়ে যায়।

কিছুদিনের মধ্যেই বাঁশীওয়ালা বেশ কিছু দিনার জমিয়ে

বাজারে একটি দোকান খরিদ ক'রে নিল। এখন সে বাজারের এক মানী ব্যাপারী।

এদিকে বাঁশীওয়ালার লেড়কার লিখাপড়ার উমর হ'ল। সে নিজের খরচায় মক্তব খুলে দিল। বালবাচ্চাদের লিখা পড়ার জন্য এখানে বেতন লাগে না। গরীব লেড়কাদের সঙ্গে তার নিজের লেড়াকাকেও লিখাপড়া শিখতে লাগল।

বাঁশীওয়ালা এবার বহুৎ অর্থ ব্যয় ক'রে মক্কা-মদিনায় গিয়ে তীর্থ সারতে গেল। যাবার আগে বিবিকে বলে গেল,—'খবরদার, কেউ যদি মুরগীটি খরিদ করতে আসে ভুলেও যেন বেচে দিও না।'

বাঁশীওয়ালা রওনা দেবার পরদিন ভোরে ব্যাপারীটি ইয়া পেল্লাই একটি বাক্স নিয়ে তার মকানে এল। বল্‌ল—'এতে মোহর বোঝাই রয়েছে। এগুলো রেখে মুরগীটি আমার কাছে বেচে দাও।'

বলেই সে বাক্সটির ডালা খুলে মোহরগুলো কামরার মেঝেতে ছড়িয়ে দিল। এতগুলো ঝকঝকে চকচকে মোহর দেখে বাঁশিওয়ালার বিবির চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে লাগল। লোভ সম্বরণ করতে না পেরে ব্যাপারীর হাতে মুরগীটি তুলে দিয়ে বাক্সটি রেখে দিল।

ব্যাপারী বল্‌ল—'মুরগীটি আমি মকানে নেব না। তুমিই কেটে গোস্ত পাক কর। আমি এক জরুরী কাজে যাচ্ছি। ফিরে এসে খাব। পুরো গোস্তই আমার চাই। এক টুকরো সরালেও আমি ঠিক ধরে ফেলব। যে খাবে তার পেট চিরে এর গোস্ত বের করব, ইয়াদ রেখো।'

ব্যাপারী বেরিয়ে গেল।

বাঁশীওয়ালার বিবি মুরগীটি জবাই ক'রে তেল-মশলা দিয়ে আচ্ছা ক'রে গোস্ত পাক ক'রে ঢেকে রেখে দিল।

বাঁশীওয়ালার লেড়কা মক্তব থেকে ফিরে তার আম্মার অজান্তে গামলার ঢাকনা তুলে এক টুকরো গোস্ত বেমালুম মুখে চালান ক'রে দিল। বহুৎ বড়িয়া স্বাদ। ব্যস, পুরো এক গামলা গোস্তই সে খেয়ে ফেল্‌ল।

তার আম্মা পাশের কামরায় জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিল। ফিরে এসে দেখে, গোস্তর গামলা খালি। সে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। ব্যাপারী ফিরলে তাকে কি ব'লে সামাল দেবে ভেবে কিছুতেই কিনারা করতে পারল না।

একটু বাদে ব্যাপারী হাজির হ'ল। গোস্ত দাবী করল। বাঁশীওয়ালার বিবি ফ্যাকাশে বির্বণ মুখে তাকে লেড়কার কারবারটি বল্‌ল।

ব্যাপারী তো শুনে একদম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। গর্জে উঠল—'ওসব জানি না, আমার গোস্ত কোথায়, ফিরিয়ে দাও। যে শর্ত তোমার সঙ্গে ছিল তা পূরণ করা চাই-ই। তোমার লেড়কার পেট চিরে গোস্ত বের করব।'

—'জী, লেড়কা তো ডরে কাঁপতে কাঁপতে মকান থেকে বেরিয়ে গেছে।'

—'যাবে কোথায়? পাতালে লুকিয়ে থাকলেও আমি তাকে চাই।' ব্যাপারী গোস্‌সায় গজ্ গজ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল। এবার সে বাঁশীওয়ালার লেড়কার তল্লাশে প্রথমে মহল্লায় মহল্লায় ঢুঁড়ে বেড়াল। তারপর শুরু করল মুলুকে মুলুকে ঢুঁড়ে বেড়ান। শেষমেষ এক বাগিচায় তাকে ধরতে পারল। কোমর থেকে চাকু বের ক'রে যেই চালাতে যাবে অমনি লেড়কাটি খপ্ ক'রে তার হাত থেকে চাকুটি ছিনিয়ে নিল। এবার শুরু হ'ল ধস্তাধস্তি। লেড়কাটি হাতের চাকুটি ব্যাপারীর বুকে আমূল গেঁথে দিল। আর্তনাদ ক'রে সে জমিনে পড়ে বার কয়েক গড়াগড়ি খেয়ে স্থির হ'ল। ব্যস,

খতম।

লেড়কাটি এবার নিশ্চিন্তে মকানে ফিরতে লাগল। পথ ভুলে সে এক সুলতানের প্রাসাদের ফটকে উপস্থিত হল।

সে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে শুনল, ট্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষক চিল্লিয়ে ঘোষণা করছে—'শাহজাদী, তামাম দুনিয়ার যেকোন নওজোয়ানকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করছেন, তাঁকে যিনি হারাতে পারবেন তিনি তাঁকেই শাদী করবেন। আর যিনি লড়াইয়ে হেরে যাবেন তার গর্দান নেয়া হবে।'

বাঁশীওয়ালার লেড়কা সুলতানের সামনে হাজির হয়ে জানাল সে শাহজাদীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে আগ্রহী। চুক্তিনামায় সই সাবুদ মিটিয়ে নেয়া হ'ল।

এক নাগাড়ে দু'ঘণ্টা মল্ল যুদ্ধ হ'ল। কেউ, কাউকে হারাতে পারল না, সেদিনের লড়াই বন্ধ হ'ল।

পরদিন ভোরে ফিন উভয়ে লড়াইয়ে মাতল।

সুলতান এক মতলব ভাঁজলেন। হেকিমকে ডেকে গোপনে বল্‌লেন, এমন কড়া এক দাওয়াই বানাও যাতে সে গভীর নিদে একদম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। একে এর দেহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার, আমার লেড়কি উনচল্লিশ জন ইয়া তাগড়াই নওজোয়ানকে অনায়াসে ঘায়েল ক'রে দিল। আর এ-নওজোয়ান পুরো দু'ঘন্টা কি ক'রে লড়াই ক'রে টিকে রয়েছে? এমন কোন তাবিজ-কবজ তার শরীরে আছে যার ফলে তাকে শাহজাদী কিছুতেই হারাতে পারছে না। সব শেষে হেকিমকে বল্‌লেন—'তুমি দাওয়াই দিয়ে একে বেহুঁশ করে তল্লাশী চালিয়ে এর গা থেকে তাবিজ-কবজ বের করবে। না পারলে তোমার গর্দান যাবে, ইয়াদ থাকে যেন।'

বাঁশীওয়ালার লেড়কা গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে হেকিম তার নাকের সামনে এক দাওয়াইয়ের শিশি ধরল। ব্যস, সে একদম বেহুঁশ হয়ে পড়ল। হেকিম তল্লাশী চালিয়ে বুঝল, এর পেটে বিশেষ এক কিসিমের মুরগীর গোস্ত রয়েছে।

তার তাগতেই সে এমন ক'রে লড়ে যাচ্ছে। এবার চাকু চালিয়ে পেট ফেঁড়ে ফেল্‌ল। মুরগীর গোস্ত যা ছিল বিলকুল বের করে নিল। এবার এক কিসিমের দাওয়াই লাগিয়ে পেট জুড়ে দিল।

সকাল হ'ল। লেড়কাটি বিছানা ছেড়ে উঠতেই তার মালুম হ'ল, তার শরীরে বাড়তি তাগত নাশ হয়েছে। পেটে হাত চালিয়ে বুঝল। মুরগীর গোস্ত হাপিস হয়ে গেছে।

ব্যস, আর দেরী নয়। বাঁশীওয়ালার লেড়কা গোপনে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল। কিছুদূর এসেই সে এক জায়গায় চেঁচামেচি শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, তিনটি দোস্ত জোর লড়াইয়ে মেতেছে। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানতে পারল, একটি গালিচা নিয়ে তাদের লড়াই। গালিচাটিতে চেপে যেখান খুশী যাওয়া যায়। সে কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'ভাই সাহাব, কেন ঝুটমুট নিজেদের মধ্যে লড়াই করছ? আমি তোমাদের লড়াইয়ের ফয়সালা ক'রে দিচ্ছি।'

নওজোয়ান তিনজনে তার বাৎ শুনে লড়াই থামাল।

গালিচাটিকে জমিনে পেতে দিল। এবার ছোট একটি পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে বল্‌ল—'আমি পাথরটি ছুঁড়ে দেব। তোমাদের মধ্যে যে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে সবার আগে আমার হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে সে-ই হবে গালিচাটির আদৎ মালিক।'

নওজোয়ান তিনটি তাতেই রাজী হয়ে গেল।

বাঁশীওয়ালার লেড়কা পাথরটি ছুড়ে দিল। তিন দোস্ত ছুটল তার পিছু পিছু। ব্যস, এ মওকায় বাঁশিওয়ালার লেড়কা গালিচার ওপর বসে তিনবার তুড়ি দিয়ে বল্‌ল—'যাদু-গালিচা ভোরে আমি যে-প্রাসাদ ছেড়ে এসেছি আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও।' ব্যস, গালিচা চোঁ-চোঁ ক'রে ওপরে উঠতে লাগল।

আগের দিন যেখানে শাহজাদীর সঙ্গে সে লড়াই করেছিল প্রাসাদের ঠিক সে-জায়গায় গালিচাটি নামল। সে এবার হুঙ্কার ছাড়ল। আমার সঙ্গে লড়াই করার তাগত ও হিম্মৎ কার আছে চলে এসো।

চিল্লাচিল্লি শুনে প্রাসাদের সবাই দেখল, আগের দিন যে-নওজোয়ানটি লড়াই ক'রে অপরাজিত ছিল সে-ই লড়াইয়ের আহ্বান জানাচ্ছে।

শাহজাদী বেরিয়ে এল। গালিচার ওপর উঠে সে লড়াই শুরু করার জন্য তৈরী হতে লাগল। ঠিক তখনই বাঁশীওয়ালার লেড়কা তিনবার তুড়ি বাজিয়ে বল্‌ল—'কাফের চূড়ায় আমাদের নিয়ে চল।' ব্যস গালিচাটি চোঁ চোঁ ক'রে আশমানের দিকে উঠতে লাগল। উপস্থিত সবাই তো ব্যাপার দেখে একদম হাঁ হয়ে গেল। রা পর্যন্ত করতে পারল না।

গালিচাটি আশমান পথে উড়তে উড়তে কাফের পাহাড়ের চূড়ায় থামল। সে এবার শাহজাদীকে বল্‌ল—'তোমরা যে ফন্দি ক'রে আমার তাগত নষ্ট করেছ তার তুলনায় আমার ছলচাতুরীর কসুর বহুৎ কম শাহজাদী। গোস্‌সা কোরো না।'

—'আমি কসুর স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। মেহেরবানি করে আমাকে আমার আব্বার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ওয়াদা করছি, তুমি-ই আমার স্বামী হবে, একমাত্র স্বামী।'

—'আমি রাজী। লেকিন তোমার কুমারীত্ব খতম ক'রে না দিলে তুমি প্রাসাদে গিয়ে পাল্টি খেয়ে যাবে।'

লেড়কিটি নির্বিবাদে রাজী হয়ে গেল। সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। লেড়কাটি যেই তার ওপর চাপতে যাবে অমনি তার পেটে সজোরে এক লাথি মেরে দিল। ব্যস, লেড়কাটি কয়েক হাত দূরে

ছিট্‌কে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লেড়কিটি তিনবার তুড়ি বাজিয়ে বল্‌ল—'আমার প্রাসাদে নিয়ে চল।'

শাহজাদীকে নিয়ে গালিচা আশমানের দিকে উড়তে লাগল। বাঁশীওয়ালার লেড়কাটি সেদিকে চেয়ে কপাল চাপড়াতে লাগল।

সে পাহাড়ের ওপর থেকে নামতে গিয়ে এক জায়গায় দুটো গাছ দেখতে পেল। তাতে দু'কিসিমের ফল ধরছে। এক কিসিমের ফল হলুদ আর অন্য কিসিমের ফল লাল। খিদেতে তার পেটে জ্বালা ধরে গিয়েছিল। একটি হলুদ ফল ছিড়ে দাঁতে ঠেকাতেই আজব ব্যাপার ঘটতে লাগল। তার মাথা দিয়ে শিং গজাতে শুরু হ'ল। দেখতে দেখতে ষোলটি শিং গজিয়ে গেল। ইয়া লম্বা লম্বা শিং। এক একটি শিং থেকে শাখা বেরিয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে গেল। ইন্তেকাল হবেই যখন মালুম হ'ল তখন একটি লাল ফল ছিঁড়ে আল্লাতাল্লা-র নাম নিয়ে কামড় বসিয়ে দিল। বরাতে যা হবার হোক।

এক লহমার মধ্যে ফিন আর এক আজব কাণ্ড ঘটে গেল। তার মাথার বিলকুল শিং মিলিয়ে গেল।

তার মধ্যে এক মতলব খেলে গেল। কুর্তার দু'জেব ভরে হলুদ আর লাল ফল নিয়ে নিল।

পাহাড় থেকে নেমে সে ফিন সে-সুলতানের প্রাসাদের ফটকে হাজির হ'ল। হলুদ ফল হাতে নিয়ে সে ফেরিওয়ালার মাফিক চিল্লাতে লাগল —'বহুৎ বড়িয়া ফল। আজব ফল। একবার খেলে ফিন খাওয়ার জন্য দিল্ ছটফট করবে।'

শাহজাদী এক নফরকে দিয়ে একটি ফল খরিদ করাল। ফলটি হাতে নিয়ে কামড় দেয়ামাত্র ফলটির কাজ শুরু হয়ে গেল। তার মাথায় এক এক করে ষোলটি শিং ও শাখা প্রশাখা বেরিয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেল। বাঁশীওয়ালার লেড়কা চোখের পলকে সেখান থেকে সরে পড়ল।

এদিকে লেড়কির ব্যাপার দেখে সুলতান মুষড়ে পড়লেন। তাঁর হুকুমে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচার ক'রে দেয়া হ'ল—যে শাহজাদীর শিং নাশ ক'রে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে দিতে পারবে তার সঙ্গে তার শাদী দেয়া হবে।

বাঁশীওয়ালার লেড়কা মওকা বুঝে সুলতানের সামনে হাজির হয়ে জানাল, সে শাহজাদীর স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে দিতে পারবে।

সে একটি লাল ফল জেব থেকে বের ক'রে শাহজাদীকে খেতে বল্‌ল। ব্যস, যাদুমন্ত্রের মাফিক তার মাথা থেকে বিলকুল শিং উধাও হয়ে গেল।

সুলতানের হুকুমে বুড্ডা কাজী ছুটে এল। শাদীর কবুলনামা তৈরী করা হ'ল। সাক্ষীরা তাতে দস্তখৎ করল। জাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে শাদীর পাট চুকে গেল।

সুলতানের নির্দেশে এবার নবম সিপাহী সর্দার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, আমি আপনার দরবারে এক বাজা জেনানার কিস্‌সা বলছি। জেনানাটি দীর্ঘদিন স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেছে। লেকিন তার নসীব মন্দ। সে বাচ্চা পেটে ধরতে পারল না। গোড়ায় সে খোদাতাল্লা-র কাছে লেড়কা-ই চেয়েছিল। এখন প্রার্থনা জানায়, মেহেরবানি ক'রে একটি লেড়কি পেটে এলেই সে খুশী।

এক সময় খোদাতাল্লা মুখ তুলে তাকালেন। জেনানাটি একটি লেড়কি পয়দা করল। তার নামকরণ করা হ'ল সিত্তুখান।

লেড়কিটির উমর যখন দশ সাল তখন একদিন সে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। তখন সে-সড়ক দিয়ে সুলতানের লেড়কা যাবার সময় তাকে দেখতে পেল। এক লহমায় তাকে দেখেই শাহজাদার কলিজা নাচানাচি শুরু ক'রে দিল।

শাহজাদা নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মুখ ব্যাজার ক'রে পালঙ্কের ওপর পড়ে রইল। হেকিম এল। দাওয়াই দিল। লেকিন শাহজাদার বিমারি সারল না।

একদিন এক বুড্ডি শাহজাদাকে পরীক্ষা ক'রে সুলতানকে জানাল, এ তো সাধারণ বিমারি নয়। এ হচ্ছে, মহব্বতের বিমারি।

শাহজাদা বুড্ডির কাছে পুরো ব্যাপারটি খোলসা ক'রে বল্‌ল। বুড্ডিটি বলল—'আমি লেড়কিটিকে জানি। খুবসুরৎ লেড়কিই বটে। তার নাম সিত্তুখান। ঘাবড়াবেন না শাহজাদা, তার সঙ্গে যাতে আপনার মোলাকাৎ হতে পারে তার বন্দোবস্ত আমি করে দেব।'

বুড্ডি এবার লেড়কিটির কাছে হাজির হ'ল। তাকে শাহজাদার মহব্বতের ব্যাপার বল্‌ল। শাহজাদা তার সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্য পাগল, এ-বাৎ বলতেও সে ভুল্‌ল না।

আর কি ভাবে, কোন্ বাহানা ক'রে মকান থেকে বেরিয়ে শাহজাদার সঙ্গে মোলাকাৎ হতে পারে, সে ফন্দি ফিকিরও সে তাঁকে বাৎলে দিল।

লেড়কিটি তার আম্মার অনুমতি নিয়ে তাঁতীর মকানে গিয়ে তাঁত চালিয়ে শনের কাজ শিখতে শুরু করল। এ-মওকায় শাহজাদার সঙ্গে মোলাকাৎ হবে ধান্ধায় রইল।

একদিন তাঁত চালাতে গিয়ে সিত্তুখান-এর নখে শনের শক্ত সূতা গেঁথে গেল। সে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল।

হেকিম এসে সিত্তুখানকে দেখল। তার জখম আঙুলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে—লেড়কিকে নদীর ধারে মুক্ত বাতাসে রাখার নির্দেশ দিল। তার আব্বা একটি বজরা ভাড়া করল। তাতে লেড়কিকে রেখে মুক্ত বায়ু সেবনের বন্দোবস্ত করল।

বুড্ডি এবার শাহজাদাকে গিয়ে বল্‌ল—'সিত্তুখান-এর সঙ্গে মোলাকাতের জব্বর মওকা। সে নদীর ধারে বজরায় দিন গুজরান করছে।'

বুড়ি শাহজাদাকে নদীর ধারে নিয়ে এল। সিত্তুখান মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে, দু'হাত বাড়িয়ে শাহজাদাকে আলিঙ্গন করল। আলিঙ্গন, দলন, পেষণ ও চুম্বনের মধ্যে দিয়ে কখন যে রাত্রির আন্ধার নেমে এসেছে তাদের কারোরই হুঁস ছিল না। বুড়ির ডাকে তারা সম্বিৎ ফিরে পেল। সেদিন এ পর্যন্তই।

পরদিন শাহজাদা ফিন সিত্তুখান-এর কাছে এল। তার পরদিনও এল।

একদিন শাহজাদা সিত্তুখান'কে আলিঙ্গন ক'রে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'মেহেবুবা, আর তোমার কাছে আমার আসা হয়ে উঠবে না। আমাদের উভয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আমি সুলতানের লেড়কা আর তুমি একদম সাধারণ আদমির লেড়কি।'

সিত্তুখান-এর দু'চোখ বেয়ে পানির ধারা নেমে এল। শাহজাদার চোখ দিয়েও পানি ঝরতে লাগল। উভয়ে দীর্ঘসময় আলিঙ্গনাবদ্ধ ভাবে অবস্থান ক'রে কেঁদে আকুল হ'ল।

পরদিন শাহজাদা আর এল না।

একদিন সিত্তুখান ঘাসের ওপর একটি অঙ্গুঠি দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিল। সাধারণ এক অঙ্গুঠি ভেবে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাঁ-হাতের আঙুলে পরল। অচানক ডান হাতের আঙুলের ঘষা লাগল অঙ্গুঠিটির গায়ে। মুহূর্তে এক অতিকায় দৈত্য আবির্ভূত হয়ে তাকে কুর্ণিশ করে বলল—হুকুম করুন মালকিন, কি করতে হবে আমাকে।'

ব্যাপার দেখে সিত্তুখান ঘাবড়ে গেল। পরমুহূর্তেই নিজেকে শক্ত ক'রে বল্‌ল—'সুলতানের প্রাসাদের মাফিক একটি প্রাসাদ বানিয়ে দাও।'

পরদিন ভোরে সিত্তুখান দেখল, সুলতানের প্রাসাদের লাগোয়া আর একটি বিশালায়তন প্রাসাদ দাঁড়িয়ে।

শাহজাদা জানালা দিয়ে নয়া প্রাসাদটি দেখে তাজ্জব বনে যায়। সে তার আম্মাকে বল্‌ল—'তুমি গিয়ে প্রাসাদটির শাহজাদীর সঙ্গে বাৎচিৎ করে এসো। আমি ছাদে এক লেড়কিকে পায়চারি করতে দেখেছি। মালুম হচ্ছে, সে-ই শাহজাদী।'

বেগম সাহেবা সেদিন বিকালেই সিত্তুখান-এর প্রাসাদে এলেন। তার খুবসুরৎ চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তখনই তাকে তাঁর লেড়কার সঙ্গে শাদীর প্রস্তাব দিলেন। সিত্তুখান বল্‌ল—'শাদী করতে পারি তবে একটি শর্তে। শর্তটি হচ্ছে—আপনার লেড়কার ইন্তেকাল ঘটে গেছে। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচার করে দিতে হবে। মড়ার মাফিক কফিনের ভেতরে সে পড়ে থাকবে। শোক-মিছিল
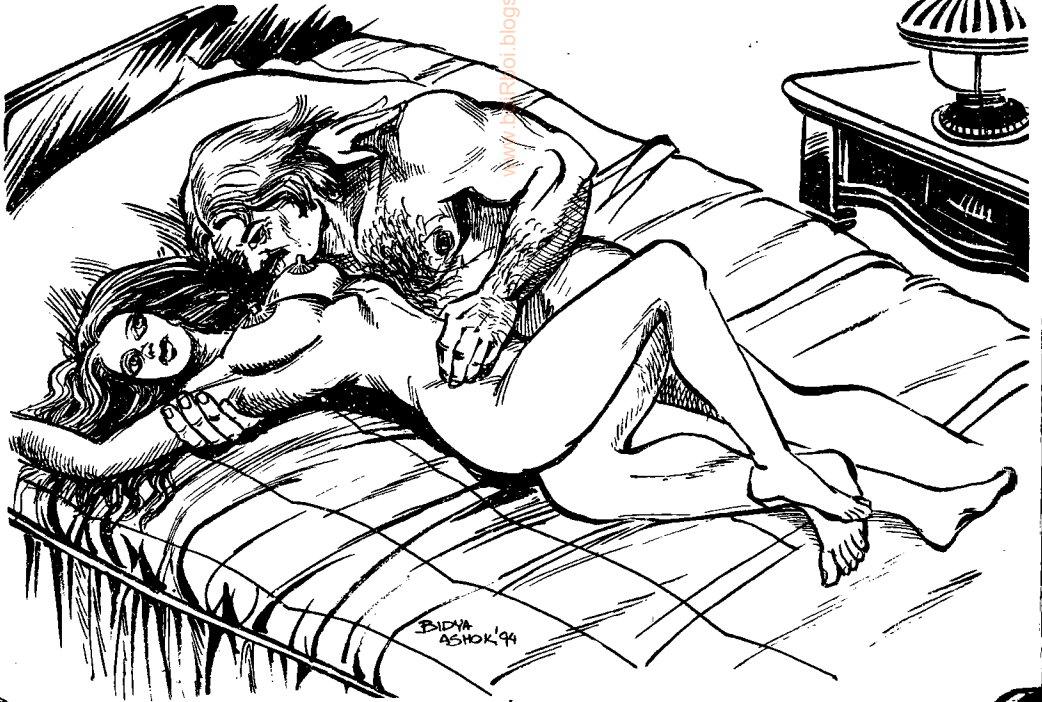
বেরোবে। শেষমেষ আমার ওই বাগিচাটিতে তাকে নামাতে হবে। তারপরই আমাদের শাদী হবে।'

বেগম সাহেবা প্রাসাদে ফিরে লেড়কার কাছে সিত্তুখান-এর শর্তের ব্যাপারে খোলসা করে বল্‌ল। সে রাজী হ'ল।

শোক-মিছিল এক সময় সিত্তুখান-এর বাগিচায় এসে থামল। শাহজাদাকে রেখে এবার সবাই বিদায় নিল।

সিত্তুখান প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বাগিচায় এসে শাহজাদার ওপর থেকে শবাচ্ছাদন সরিয়ে ফেল্‌ল।

শাহজাদা এবার সিত্তুখান'কে দেখে চমকে উঠল। সিত্তুখান মুচকি হেসে তাকে বুকে তুলে নিল।

এবার সুলতানের নির্দেশে দশম সিপাহী-সর্দার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে এক বাদশাহের মহম্মদ নামে এক লেড়কা ছিল। সে একদিন বাদশাহকে বল্‌ল—'আব্বাজী, আমি শাদী করতে চাই।'

বাদশাহ হেসে বল্‌লে—'শাদী করবে, সে তো খুশীর ব্যাপার। তবে সবার আগে তোমার আম্মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি, তিনি যদি আমার হারেমের কোন লেড়কির সঙ্গে তোমার শাদীর কথা ভেবে থাকেন। তা নইলে বাধ্য হয়ে শাদীর পাত্রীর তল্লাশ করতে হবে।'

—'না, আব্বাজান আমি নিজেই পাত্রীর তল্লাশে ঘোড়া নিয়ে বেরোতে চাইছি।'

—'বহুৎ আচ্ছা। এতেও আমি কিছুমাত্রও আপত্তি করব না।' শাহজাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

এক নাগাড়ে দু'দিন ঘোড়া ছুটিয়ে শাহজাদা এক গাঁয়ে হাজির হ'ল। সেখানে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে তার নজরে পড়ল এক চাষী পিঁয়াজ কলি কাটছে আর তার খুবসুরৎ লেড়কি সেগুলো গোছগাছ ক'রে ছোট ছোট আঁটি বাধছে।

শাহজাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে চাষীটির কাছে গিয়ে সালাম জানিয়ে পানি খেতে চাইল। লেড়কিটি এক বদনা পানি এনে তার হাতে দিল। বদনাটি তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চাষীর দিকে দু'কদম এগিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'মিঞা সাহাব, আপনার লেড়কিকে আমি শাদী করতে চাই। আপনি তাকে আমার হাতে তুলে দিতে রাজী?'

চাষীটি সঙ্গে সঙ্গে মত দিয়ে দিল।

শাহজাদা এবার বলল—'তবে আমি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে শাদীর বন্দোবস্ত করে ফিরে আসছি।'

শাহজাদা প্রাসাদে ফিরে বাদশাহকে তার মত ব্যক্ত করল। বাদশাহ এবার তার বিবিকে সে-চাষীর মকানে পাঠালেন, ব্যাপারটি জেনে আসার জন্য।

বেগম সাহেবা সেখানে গিয়ে লেড়কিটির সঙ্গে ভেট করলেন। লেড়কার মত জানিয়ে তার মত জানতে চাইলেন।

লেড়কিটি বল্‌ল—'আমি এমন স্বামী চাই, যে নিজে হাতে কাম কাজ করে। তাই কোন সুলতান-বাদশাহের লেড়কাকে শাদী করার ইচ্ছা আমার নেই।'

বেগম সাহেবা গোস্‌সায় গস্‌ গস্‌ করতে করতে প্রাসাদে ফিরলেন। চাষীর লেড়কির বক্তব্য সুলতানের কাছে পেশ করলেন।

সুলতান এবার হুকুম জারি করলেন, তাঁর সুলতানিয়তের সব চাষী-মজুরকে প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে হাজির হতে হবে।

সুলতানের নির্দ্ধারিত সময়ে মুলুকের চাষী মজুররা যথাস্থানে হাজির হ'ল। তিনি সবার আগে ছুতোর মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার লেড়কাকে তোমার কাজ শেখাতে হবে। তুমি কতদিনে তাকে কাজ শিখিয়ে তৈরী ক'রে নিতে পারবে বল?'

সে দু' সাল সময় চাইল।

তারপর এক কামারকে একই প্রশ্ন করলেন। সে এক সাল সময় চাইল। কেউ কেউ দু'সালের বেশী সময় চাইল।

এবার এক কারিগর বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আমি এক সালের ভেতরেই শাহজাদাকে তৈরী করে দিতে পারব। এক তাঁতী বল্‌ল—'আমি মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে কাপড়া বোনার কায়দা-কসরৎ শিখিয়ে দিতে পারব।'

বাদশাহ এবার শাহজাদাকে তাঁতীর সঙ্গে দিয়ে দিলেন তাকে তাঁতের কাজ শিখিয়ে দেবার জন্য। শাহজাদা কিছু সময়ের মধ্যেই নিজেহাতে একটি রুমাল বানিয়ে ফেল্‌ল।

তাঁতী এবার শাহজাদাকে নিয়ে সুলতানের সামনে হাজির হ'ল। দু'টি রুমাল দেখিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, এ-রুমাল দুটোর মধ্যে শাহজাদা কোনটি নিজে হাতে বুনেছেন, বলুন তো?'

সুলতান একটি রুমাল হাতে তুলে নিয়ে বললেন—'মালুম হচ্ছে এটি, ঠিক তো?'

—'না, জাঁহাপনা, ওটি আমি বুনেছি। শাহজাদার হাতের ওটি।'

বাদশাহ এবার বেগমের কাছে গিয়ে সোল্লাসে বললেন—'তোমার লেড়কা পাকা তাঁতী বনে গেছে। এই দেখ সে নিজে হাতে এ-রুমালটি বুনেছে। এবার চাষীর লেড়কিকে গিয়ে বল, শাদীর জন্য তৈরী হতে।'

চাষীর লেড়কি এবার খুশী হয়ে শাদীতে মত দিল।

সুলতানের হুকুম পেয়ে একাদশ সিপাহী-সর্দার এবার তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, কোন এক মুলুকের সুলতানের বেগম এক সুলক্ষণযুক্ত লেড়কার জন্ম দিলেন।

শাহজাদার উমর যখন বছর বারো তখন বেগম সাহেবা দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে চলে গেলেন। বাদশাহ এবার হারেমের এক বাদীকে শাদী ক'রে বেগমের মর্যাদা দিলেন। তিনি এবার দিন-রাত

তাঁর নয়া বিবির কামরায় পড়ে থাকেন। তাঁর একমাত্র লেড়কা অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে দিন গুজরান করতে লাগল। ইয়া পেল্লাই প্রাসাদে তার আপনজন বলতে কেউ নেই বল্‌লেই চলে।

বাদশাহের নয়া বেগম এক চরিত্রহীনা জেনানা। প্রাসাদের হেকিমের সাথে তাঁর গোপন মহব্বৎ রয়েছে। তাঁরা উভয়ে একদিন মতলব করল, আপদ ওই শাহজাদাটি'কে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলবো। হেকিম বল্‌লেন—'আজই তোমার হাতে বিষ দিয়ে দেব। তার খানার সঙ্গে মিশিয়ে দিও। ব্যস, দেখবে কাজ হাসিল।' সেদিন মক্তব থেকে ফিরেই শাহজাদা তার ঘোড়াটির কাছে গেল। তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর-সোহাগ জানাল। ঘোড়াটি চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে তার সৎ মা ও হেকিম সাহেবের গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বল্‌ল,—'তাকে বার বার বারণ করে দিল যে, রাত্রে এসে যেন কিছুতেই খানা না খায়।'

রাত্রে খানার থালা দিলে শাহজাদা খানায় পোকা পড়েছে বাহানা ক'রে থালাটি উল্টে দিয়ে টেবিল থেকে উঠে গেল। প্রাসাদের পোষা বিড়ালটি গুঁটিগুঁটি এসে সে খানা চেটেপুটে খেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এলিয়ে পড়ল। শাহজাদা ব্যাপারটি দেখেও না দেখার বাহানা করল।

শাহজাদার সৎমা তার মেহেবুব হেকিমকে জিজ্ঞাসা করল—'শয়তানটি কি করে আমাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপার জেনে গেল। আজব ব্যাপার তো!'

শাহজাদা সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে ওই ঘোড়াটি। সে সর্বজ্ঞ। সে দৈব্য বলে বিলকুল ব্যাপার আগেই জানতে পেরে যায়।

—'ঘোড়া? শয়তান হতচ্ছাড়া ঘোড়াটিকে আগে খতম করা দরকার।'

হেকিমের পরামর্শে বেগম বিমারির বাহানা ক'রে পড়ে রইল। হেকিম পরীক্ষা ক'রে বল্‌ল—'এর একমাত্র দাওয়াই, সুলতানের সবচেয়ে আদর-সোহাগের ঘোড়ার কলিজা দিয়ে তৈরী দাওয়াই।'

সুলতান মহা মুসিবতে পড়লেন। ঘোড়াটি শাহজাদার খুবই আদরের। শাহজাদাকে তিনি এ ব্যাপারে জানালেন। শাহজাদা মুখে জোর ক'রে হাসি ফুটিয়ে বল্‌ল—'আব্বা, আমার ঘোড়াটির জানের বদলে যদি আম্মার জান বাঁচে তবে আপত্তির কি থাকতে পারে। তবে আমি একদিনের জন্যও তার পিঠে চড়ি নি। আজ তার পিঠে চড়ে একটি চক্কর মেরে আসি। তবে আর আমার কোন আপশোষ থাকবে না।' সে ঘোড়াটি আস্তাবল থেকে বের করে তার পিঠে চেপে বসল। ব্যস, ঘোড়াটি উল্কার বেগে ছুটে চল্‌ল।

এক নাগাড়ে তিনদিন-তিনরাত্রি চলার পর ঘোড়াটি শাহজাদাকে নিয়ে অন্য এক মুলুকের সুলতানের প্রাসাদের ফটকের সামনে হাজির হ'ল। দেখল পাশের এক বুড্ডাকে কূয়ো থেকে পানি তুলে গায়ে দিচ্ছে। শাহজাদা তার শরণাপন্ন হ'ল। তাকে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানাল। পরদেশী খুবসুরৎ নওজোয়ানটিকে দেখে বুড্ডার দয়া হ'ল। সে তাকে আশ্রয় দিল। ঘোড়াটি বিদায় নেয়ার মুহূর্তে তার ঘাড়ের একটি লোম দিয়ে বল্‌ল—'শাহজাদা, কোন হাঙ্গামায় পড়লে এটিতে আগুন ধরিয়ে দেবে, আমি হাজির হয়ে যাব।'

শাহজাদা বুড্ডা মালীটির কাছে থেকে তাকে বাগিচার কাজে সাহায্য করতে লাগল।

ক'দিন বাদে সুলতান ঘোষণা করলেন, তাঁর সাতটি লেড়কির শাদী দেবেন। তাঁর নিজের মুলুকের ও ভিন্ মুলুকের নওজোয়ানরা সমবেত হতে পারে। তাদের ভেতর থেকে শাহজাদীরা নিজ নিজ স্বামী নির্বাচন করবে।

সুলতানের আহ্বানে হাজার হাজার নওজোয়ান প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে জড়ো হ'ল। লেড়কিরা প্রাসাদের বেয়ারাকে অবস্থানরত লেড়কিরা নিজনিজ পছন্দ মাফিক নওজোয়ানের ওপর মালা ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল।

সুলতানের ছোট লেড়কি ছাড়া সবাই তাদের স্বামী বেছে নিল। ছোট লেড়কি জানাল—'আব্বা আমাদের বাগিচায় যে নওজোয়ান কূয়া থেকে পানি তোলে আমি তাকেই শাদী করতে চাই।'

শাদীর দু'দিন বাদে এক সকালে শাহজাদার প্রিয় ঘোড়াটি প্রাসাদে হাজির হ'ল। সে শাহজাদাকে জানাল, তার আব্বা সুলতানের ইন্তেকাল ঘটেছে। হেকিম তখ্ত দখল ক'রে নিয়েছে। তাকে তাড়িয়ে তখত দখল করতে হবে। শাহজাদা তার বিবিকে নিয়ে ঘোড়াটির পিঠে চাপল। তেজী ঘোড়াটি তাদের নিয়ে উল্কার বেগে ছুটল।

এবার সুলতানের নির্দেশে দ্বাদশ সিপাহী-সর্দার এগিয়ে এসে তার কিস্‌সা শুরু করল—'জাঁহাপনা, কোন এক মুলুকের সুলতানের এক খুবসুরৎ বিবি ছিল। লেকিন বরাত গুণে তিনি ছিলেন বাজা। বহু টোটকা টাটকি, তাবিজ-কবজ ও হেকিমের দাওয়াই দেয়া হ'ল, লেকিন ফয়দা কিছুই হ'ল না।

এক সকালে সুলতানের কাছে এক মূর এসে হাজির হ'ল। সে বল্‌ল—'আমি আপনার বন্ধ্যা বেগমের গর্ভে বাচ্চা এনে দিতে পারব। তবে একটি শর্ত মানতে হবে। শর্তটি হচ্ছে, বেগম সাহেবা প্রথম যে-বাচ্চা প্রসব করবেন তাকে আমার হাতে তুলে দিতে হবে, রাজী তো?'

সুলতান মূরটির প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

মূরটি একটি লাল ও একটি সবুজ লাড্ডু সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, লাল লাড্ডুটি বেগম সাহেবাকে খাইয়ে দেবেন, আর আপনি খাবেন সবুজ লাড্ডুটি।' মূরটি বিদায় নিল।

যথা সময়ে বেগম ফুটফুটে এক লেড়কা প্রসব করলেন। তার নামকরণ করা হ'ল মহম্মদ। বছর খানেক বাদেই বেগম দ্বিতীয় লেড়কা প্রসব করলেন। তার নামকরণ করা হ'ল আলী। আলীর সুরৎ মহম্মদের মাফিক দেখনাই ছিল না। তার মেধাশক্তিও ছিল কম। বেগম কিছুদিন বাদে আর এক লেড়কা প্রসব করলেন। তার নাম রাখা হ'ল মাহমুদ।

বেগম প্রথম লেড়কা প্রসব করার দশসাল বাদে ঘুরতে ঘুরতে মূরটি প্রাসাদে সুলতানের সামনে হাজির হ'ল। তার প্রাপ্য লেড়কাটি দাবী করল। বেগম শুনে চোখের পানি ঝরিয়ে সুলতানকে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, মহম্মদকে আমি ছাড়তে পারব না। আপনি আলীকে নিয়ে মূরটির হাতে তুলে দিন।'

আলীকে পেয়ে মূরটি প্রাসাদ ছাড়ল। দিনভর তাকে নিয়ে মূরটি হাটল। আলী ভুলেও খানাপিনার ব্যাপারে কিছু বল্‌ল না। মূরটি খিদে তেষ্টার ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে মুখে কেবল অস্ফুট এক আওয়াজ করল।

মূরটি বুঝল, সুলতান তার সঙ্গে বেইমানী করেছেন। সে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে বল্‌ল—'জাঁহাপনা, আপনার লেড়কা ফিরিয়ে নিন আর আমারটি নিয়ে আসুন। তিন শাহজাদাকে আমার সামনে

হাজির করুন। তাদের দৌড় দেখেই আমি আমারটিকে ঠিক বাছাই করে নেব। মহম্মদ'কে বেছে নিয়ে মূর আবার পথে নামল। দিনভর তাকে নিয়ে পয়দল হেঁটে মূরটি মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করল—বেটা, খিদে তেষ্টা বোধ করছ না?'

মহম্মদ মুচকি হেসে মোলায়েম স্বরে জবাব দিল—'আপনি যদি খিদে-তেষ্টা বোধ ক'রে থাকেন তবে আমিও জরুর বোধ করছি।' মূরটি তার বিনয় ও বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হ'ল।

মূরটি এক সকালে মহম্মদ'কে নিয়ে মরক্কো নগরে হাজির হ'ল। এক বাগিচায় ঢুকে তারা গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে আয়েশ ক'রে বসল। মূরটি মহম্মদ-এর হাতে একটি কিতাব দিয়ে পাঠ করতে বল্‌ল। মহম্মদ তার একটি বর্ণও পাঠ করতে পারল না। মুখ ব্যাজার ক'রে বসে রইল।

মূরটি মহম্মদ-এর ব্যাপার দেখে গোস্‌সায় ফেটে পড়ার জোগাড় হ'ল। গোস্‌সায় গস্ গস্ করতে করতে কিতাবটি তার হাতে দিয়ে বল্‌ল—'এটি তোমার কাছে রইল। যেমন ক'রে পার পাঠ করতে শিখবে। ফিরে এসে আমি দেখতে চাই তুমি কিতাবটি পাঠ করতে পারছ।' সে লম্বা লম্বা পায়ে বাগিচা ছেড়ে চলে গেল।

এক-দুই-তিন ক'রে ঊনত্রিশ দিন গুজরান হয়ে গেল। লেকিন কিতাবটি পাঠ করতে পারা তো দূরের ব্যাপার তার উল্টো-সোজা দিকই ঠিক করতে পারল না। হতাশ হয়ে একদিন কিতাবটি রেখে দিয়ে উঠে পড়ল। ভাবল, জান যখন যাবেই তখন দু'-চারদিন বাগিচা ও মরক্কো নগরটি ঘুরে ঘুরে দেখে নেয়া যাক।

সেদিনই মহম্মদ বাগিচায় বাগিচায় ঢুঁড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেল এক খুবসুরৎ জোয়ান লেড়কি গাছের ডালে ঝুলছে। গাছের ডালের সঙ্গে চুলের বেণী দিয়ে কে যেন তাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। লেড়কিটির চোখে পানির ধারা। মহম্মদ তাকে ডাল থেকে নামিয়ে আনল। মহম্মদ তার কাছে নিজের পরিচয় দিল। সব শেষে বল্‌ল—'আজ আমার জিন্দেগীর শেষ দিন। কাল এক মাহিনা পূর্ণ হয়ে যাবে। মূরটি ফিরে আসবে।

লেড়কিটি তাকে আশ্বাস দিল। সে কিতাবটি পাঠ করতে শিখিয়ে দিল। মহম্মদ এবার অনায়াসে কিতাবটি পাঠ করতে পারে। সব শেষে লেড়কিটি তাকে সাবধান করে দিল, মূরটি তাকে কিতাবটি পাঠ করতে বললে সে যেন কিছুতেই তা পাঠ না করে। সে পাঠ করতে পেরেছে জানতে পারলে তাকেও মূরটি ওভাবে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেবে।

শাহজাদা বল্‌ল—'আমি কিতাবটি পাঠ করতে না পারলে যে মূরটি আমার ডান-হাতটি কেটে নেবে। জানেও খতম করে দিতে পারে।

লেড়কিটি বল্‌ল—'তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। মূরটি আমাকেও একই ফন্দি করে গাছের ডালে বেঁধে রেখে জান খতম করে দিতে চেয়েছিল। মুষড়ে পড়ার কিছু নেই, আমি আছি।'

পরদিন বিকালে মূরটি উদয় হ'ল। মহম্মদ'কে কিতাবটি পাঠ করতে বল্‌ল। মহম্মদ মুখ কাচু মাচু করে বল্—'আমি কিতাবটি পাঠ করতে জানি না। শেখারও কোন মওকা আসে নি।'

মূরটি গোস্‌সায় ফেঁটে পড়ার জোগাড় হ'ল। কোমর থেকে তরবারি টেনে নিয়ে তার ডান-হাতটি এক লহমার মধ্যে নামিয়ে দিল। বাগিচা ছেড়ে যাবার সময় শাসিয়ে গেল—'আর এক মাহিনা বাদে আমি ফিরছি, তখনও যদি না পার তবে জানে খতম ক'রে দেব, ইয়াদ থাকে যেন।'

মূরটি লম্বা লম্বা পায়ে বাগিচা ছেড়ে চলে গেল।

মহম্মদ চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে ডান-হাতটি খুইয়ে লেড়কিটির কাছে এল। সে জঙ্গল থেকে তিন কিসিমের পাতা এনে তার রস দিয়ে মহম্মদ-এর কাটা হাতটি অনায়াসেই জুড়ে দিল। লেড়কিটি হেসে বল্‌ল—'এ অব্যর্থ দাওয়াই। সে নাকি চল্লিশ সাল তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়িয়েও বানাতে পারে নি। আমি পারি।'

লেড়কিটি এবার কিতাবটি খুলে তার কয়েকটি ছত্র বিড় বিড় ক'রে পাঠ করা মাত্র দু'টি ইয়া তাগড়াই উট তাদের সামনে হাজির হ'ল।

লেড়কিটি বল্‌ল—'এরা সাধারণ উটের থেকে একদম আলাদা, এরা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে আশমান পথে উড়ে যেতে পারে। এবার তারা উটের পিঠে চেপে মহম্মদ তার আব্বার সুলতানিয়তে ভেগে গেল। আর লেড়কিটি গেল তার নিজের মুলুকে। লেড়কি বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে মহম্মদ'কে বল্‌ল—'মেহবুব, তুমি যথা সময়ে আমার আব্বার সামনে হাজির হয়ে আমাকে শাদী করার প্রস্তাব রাখবে।'

নিজের প্রাসাদে ফিরে মহম্মদ তার এক অনুগত খোজা নফরকে বল্‌ল—'এ উটটিকে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে দে। হুঁশিয়ার, লাগামটি এনে আমাকে ফিরিয়ে দিবি। ভুল ক'রে যেন উটের সঙ্গে দিয়ে দিস নে।'

খোজা নফরটি হাটে গিয়ে দালালদের চরসের আড্ডায় ভিড়ে গেল। চরস টেনে বুঁদ হয়ে গেল। ফলে শাহজাদার হুকুম গুলে খেয়ে লাগাম সমেত উটটিকে বেচে দিল।

দালালটি উটটি খরিদ করার পর তার গলা থেকে লাগামটি খুলে পানির গামলার সামনে ধরল। এক লহমার মধ্যেই ইয়া পেল্লাই উটটি ছোট্ট একটি ইঁদুরের অবয়ব ধারণ ক'রে টুপ্ ক'রে পানির গামলায় ডুব দিল। ব্যাপার দেখে দালালটির চোখ একদম ছানাবড়া হয়ে গেল।

মূরটি তো বাগিচায় হাজির হ'ল। শাহজাদা বা লেড়কিটি

কাউকে দেখতে না পেয়ে তার মাথায় খুন চেপে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। সে-মুহূর্তেই সে-শাহজাদা মহম্মদ-এর মুলুকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। এক সময় সে উটের দালালটির মকানের সামনে হাজির হ'ল। দালালটি তখন গামলার ধারে বসে উটটি খোয়া যাওয়ার শোক সামলাতে না পেরে গলা ছেড়ে বিলাপ করছে। তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে যাদুকর মূরটি বল্‌ল—'চোখের পানি মোছ। তোমার উট আমি ফিরিয়ে দেব। তার বদলে উটের লাগামটি আমাকে দিতে হবে, রাজী?' মূরটি জানে মন্ত্রঃপুত লাগামটি দিয়ে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। উটটিকে ফিরিয়ে এনে দেয়া তো সামান্য ব্যাপার।

মূরটি লাগামটি ব্যবহার করে প্রথমে দালালটির খোয়া যাওয়া উটটিকে ফিরিয়ে এনে দিল। তারপর লাগামটির সাহায্যেই সুলতানের প্রাসাদ থেকে শাহজাদা মহম্মদকে তার কাছে হাজির করল। লাগামটির সাহায্যেই তাকে উটে পরিণত ক'রে ফেল্‌ল। এবার লাগাম পরিয়ে উটটির পিঠে চেপে বসল। হাজির হ'ল সে-লেড়কিটির মুলুকে।

তাদের বাগিচার উপরে যখন উটটি হাজির হয়েছে তখনই লাগামটি কেটে গেল। উটরূপী শাহজাদা দাঁত দিয়ে লাগামটিকে প্রায় কেটে ফেলেছিল। এবার একদম খতম ক'রে দিল। লাগামটি টুকরো হয়ে যাওয়ায় তার ভেতরের যাদুগুণ খতম হয়ে গেল। মূরটি বাগিচার এক ডালিমগাছে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। শাহজাদা এ মওকায় সেখান থেকে সরে পড়ল।

মূর এবার লেড়কিটির আব্বা সুলতানের দরবারে হাজির হয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—'জাঁহাপনা, আমার বিবি অন্তঃসত্ত্বা। তার সাধ হয়েছে ডালিম খাবে। আপনার বাগিচার একটি ডালিম দিলে তার সাধ পূর্ণ হতে পারে।'

অসহায় নজরে তাকিয়ে সুলতান বল্‌ল—'লেকিন ফকির সাহাব, অসময়ে ডালিম তো গাছে মিলবে না। মেহেরবানি করে অন্য কিছু চান তো দিতে পারি।'

—'জাঁহাপনা, একটি মাত্র তো ডালিম। তল্লাশ করলে ঠিক মিলে যেতে পারে।'

সুলতান এক নফরকে বাগিচায় পাঠিয়ে দিলেন, গাছে কোন ডালিম আছে কিনা, তল্লাশ ক'রে আসতে।

মালি বাগিচায় গিয়ে সব ক'টি ডালিম গাছ আতি পাতি ক'রে খুঁজে হতাশ হয়ে সুলতানের কাছে ফিরে এল।

মূরটি বেশ জোর দিয়েই বল্‌ল—'জাঁহাপনা, ডালিম জরুর আছে। আপনার নফরটির চোখে পড়েনি। আমি বাগিচা থেকে ডালিম নিয়ে আসতে পারি। ওয়াদা করছি। আমি ব্যর্থ হলে আপনার সামনে মাথা পেতে দেব। আপনি আমার গর্দান নিয়ে নেবেন। আমার কোনই আপশোষ থাকবে না।'

মূরটি এবার সুলতানের অনুমতি নিয়ে নফরটিকে সঙ্গে ক'রে বাগিচায় গেল। একটু বাদেই ইয়া পেল্লাই একটি ডালিম নিয়ে সুলতানের সামনে ফিরে এল। ব্যাপার দেখে সুলতানের চোখ তো কপালে ওঠার জোগাড়। তিনি ডালিমটি মূর যাদুকরটির হাতে তুলে দিলেন। সেটি তার হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পুরো কামরা জুড়ে তার দানা গুলো ছড়িয়ে পড়ল। মূরটি ব্যস্ত-হাতে সেগুলো কুড়িয়ে কোর্তার জেবে পুরতে লাগল। একটি দানা গড়াতে গড়াতে গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। সে উপুড় হয়ে গর্তটির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিতে বিকট আর্তনাদ ক'রে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। যাদুকর বুঝল এ-দানাটির মধ্যে শাহাজাদা মহম্মদ আত্মগোপন করে রয়েছে। তবু লোভ সম্বরণ করতে না পেরে সে নিজেই নিজের ইন্তেকাল ঘটাল। শেষ অবধি নিজেকে সে রক্ষা করতে পারল না। চোখের পলকে শাহজাদা মহম্মদ গর্তটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সুলতানের তখ্‌তের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে মহম্মদ-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলল—'আব্বা, এ-ই আমার মেহেবুব মহম্মদ। এর কথাই তোমার কাছে বলেছিলাম।'

সুলতান মহম্মদকে দেখে মুগ্ধ হলেন। কাজী ডেকে তার সঙ্গে শাহজাদীর শাদী দিলেন।

শাদীর পর শাহজাদা মহম্মদ তার সদ্যশাদী করা বিবিকে নিয়ে সুখে দিন গুজরান করতে লাগল।

শাহজাদা নূরজিহানের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ এবার নতুন এক কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে সারকাস্তেন মুলুকের এক জবরদস্ত সুলতান প্রজাপালক শাসন করতেন। তাঁর নাম ছিল জইন অল মুলুক। তাঁর তিনটি খুবসুরৎ লেড়কা ছিল। সুলতান সবচেয়ে ছোট লেড়কাকে বেশী পেয়ার করতেন। সুলতান একদিন এক বুড্ডা ফকিরকে তলব করলেন তাঁর ছোট লেড়কার নসীব গণনা করার জন্য। ফকির সাহাব মুখে বল্‌লেন—'জাঁহাপনা, আপনার এ লেড়কাটি শুভ নক্ষত্রে শুভ লগ্নে পয়দা হয়েছে। লেকিন এক ব্যাপারে আপনি নিজে হুঁশিয়ার থাকবেন। আপনার অন্য দু'লেড়কার চেয়ে এর দিকে আপনার সবচেয়ে বেশী খেয়াল নজরে আসছে। কোশিস করবেন, যাতে ভবিষ্যতে আপনার ভেতরে এমন ভাব আর লক্ষিত না হয়। যদি আমার বাৎ ইয়াদ না রাখেন, না মানেন তবে আপনার চোখ দুটে বরবাদ হয়ে যাবে।

ফকির-এর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সুলতানের দিমাক বিগড়ে যাবার জোগাড় হ'ল। তিনি তাঁর বিবি ও ছোট লেড়কাকে জিন্দেগীর জন্য নির্বাসন দিয়ে দিলেন।

তারা নির্জন বনে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে দিন গুজরান করতে লাগল।

সুলতান এক-দুই ক'রে বহুৎ সাল পেরিয়ে দিলেন।

জইন অল মুলুক একদিন ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে সে-জঙ্গলে শিকার করতে এলেন। এক সময় তাঁর ছোট লেড়কার সঙ্গে ভেট হয়ে গেল। নসীব। লেড়কার চোখে চোখ পড়তেই তিনি একদম অন্ধা হয়ে গেলেন। ইয়ার-দোস্তদের সাহায্যে কোনরকমে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, তিনি ঘোড়ার পিঠে যে-নওজোয়ানটির মুখোমুখি হয়েছিলেন সে-ই তাঁর ছোট লেড়কা।

নিজের মুলুকের এবং দুনিয়ার অন্য বহুৎ মুলুক থেকে হেকিমেরা এলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। দাওয়াই দিলেন হরেক কিসিমের। লেকিন ফয়দা কিছুই হ'ল না।

সবশেষে হেকিমরা পরামর্শ ক'রে এক আজব দাওয়াই বাৎলালেন—'চীন মুলুকে এক দরিয়া-লেড়কি বাস করে। তার আব্বা বাদশাহ ফিরোজশাহ। শাহজাদীর বাগিচায় দরিয়া-গুলাব

আছে। তা আনতে পারলে চোখের ইলাজ ক'রে বিমারি সারানো যাবে।

সুলতান জইন জল-মুলুক প্রচার ক'রে দিলেন চীন মুলুকের শাহ ফিরোজশাহ-র লেড়কির বাগিচা থেকে যে দরিয়া-গুলাব ...ত পারবে তাকে তিনি নিজের সুলতানিয়তের আধাআধি ...করবেন।

...নের বড় দুই লেড়কা জাহাজ নিয়ে চীন মুলুকের ...রওনা হয়ে গেল।

আব্বার চোখের বিমারি ও দাওয়াইয়ের ব্যাপারটি শুনে সুলতানের ছোট লেড়কা নূরজিহানও চীন মুলুকের দিকে ছুটল। সে ছুটল ঘোড়া নিয়ে, তকলিফ ক'রে।

নূরজিহান একের পর এক মাহিনা ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে চীন মুলুকের দিকে এগোতে লাগল।

এক সময় সে দেখল, দু'দুটি সোনার গোলা তার দিকে ধেয়ে আসছে। কিছু বাদে তার মালুম হ'ল এক অতিকায় আফ্রিদি দৈত্য সেটি। এক সময় সে তার একদম সামনে এসে দাঁড়াল।

নূরজিহান তার থলি থেকে দৈত্যটিকে কিছু খানা দিয়ে তাকে হাত করে নিল। তাদের মধ্যে দোস্তি গড়ে উঠল।

দৈত্যটি পেটপুরে খানা খেতে পেয়ে খুশী হয়ে নূরজিহান-এর উপকার করার জন্য উৎসাহী হয়ে পড়ল। নূরজিহান বল্ল—'দোস্ত নিতান্তই যদি আমার জন্য কিছু করতে চাও তবে আমাকে মেহেরবানি ক'রে চীন মুলুকের বাদশাহের লেড়কি ফিরুজ-এর বাগিচায় নিয়ে চল। সেখানে নাকি দরিয়া-গুলাব মিলতে পারে। সেখান থেকে একটি মাত্র ফুল আমি আনতে চাই।'

—'ইয়া আল্লাহ! বেহেস্তের পরী আর জিনরা সে বাগিচায় পাহারায় নিযুক্ত।'

—'না, ডরে পিছিয়ে গেলে আমার যে চলবে না দোস্ত। তুমি আমাকে বাগিচাটির ফটকের সামনে পৌঁছে দাও। ব্যস, তারপর যা করা দরকার আমি দেখব।'

আফ্রিদি দৈত্যটি অনন্যোপায় হয়ে নূরজিহানকে নিয়ে আশমান-পথে উড়ে চল্ল। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সে বাগিচাটির ফটকের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল।

বাগিচার ভেতরে প্রবেশ ক'রে শাহজাদা নূরজিহান একটি পুকুর দেখতে পায়। হাজারো ফুলের বিচিত্র ফুলগাছ সেখানে জড়ো করা হয়েছে। বাগিচার ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি দীঘির মাঝামাঝি স্থানে একটি ফুলের গাছ মাথা উঁচা ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাতে একটি মাত্রই ফুল। লাল তার রঙ। দরিয়া-গুলাব।

নূরজিহান আর ধৈর্য ধরতে পারল না। দীঘির পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে হাজির হ'ল গাছটির কাছে। ছিঁড়ে নিয়ে এল তার বহু আকাঙিক্ষত ফুলটি।'

ফুলটি হাতে পেয়ে নূরজিহান-এর খুশী যেন আর ধরে না। দীঘির ঘাট থেকে সামান্য এগিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, এক খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি এলিয়ে শুয়ে। বিভোর হয়ে নিদ যাচ্ছে। তার সাজ পোশাক অগোছালো। লেড়কিটির দিকে এক লহমায় তাকাতেই তার চোখ যেন ঝলসে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। সে দীর্ঘ সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে সুরৎ সুধা পান করতে লাগল, তবু তার নিদ টুটল না। এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের হাতের অঙ্গুঠি খুলে লেড়কাটির আঙুলে পরিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে এল।

বাগিচার বাইরে আসতেই নূরজিহান তার দোস্ত দৈত্যটির দেখা পেয়ে গেল। সে তাকে কাঁধে চাপিয়ে তার মুলুকে, প্রাসাদের ছাদে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

নূরজিহান তার আব্বা সুলতান জাইন-এর দু'চোখে দরিয়া-গুলাবটি মাত্র একবার বুলিয়ে দিতেই তিনি হৃত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

ওয়াদা অনুযায়ী সুলতান জইন তার সুলতানিয়তের আধাআধি ভাগ ছোট লেড়কা নূরজিহান'কে দিয়ে দিলেন।

নূরজিহান সুলতানিয়তের ভাগ বুঝে পেয়ে একটি বাগিচা তৈরী করল। বাগিচাটির কেন্দ্রস্থলে একটি দীঘি কাটিয়ে তাতে দরিয়া-গুলাবের ডাটাটিকে পুঁতে দিল।

কিছুদিন বাদে সুলতানের বাকী লেড়কা দুটো ফিরে এল। আব্বার কাম কাজ দেখে তাদের একদম মাথায় হাত। তারা বলাবলি করল, দরিয়া-গুলাবের ব্যাপারটি স্রেফ ভাওতা।

সুলতানের কানে তাদের ক্ষোভের ব্যাপারটি যেতে দেরী হ'ল না। তিনি লেড়কাদের বল্‌লেন—'তোমরা খোদাতাল্লার মর্জির ব্যাপার আর কতটুকুই বা জান? গাছ গাছড়ার গুণাগুণ মান না? আজব ব্যাপার বটে। তবে শোন একটি কিস্‌সা বলছি—

কোন এক সময়ে হিন্দুস্থানে এক বাদশাহ রাজত্ব করতেন। তাঁর হারেমে বাঁদীর ছড়াছড়ি ছিল। তবু তার একটিও বাচ্চা হ'ল না।

এক সময় তার সব চেয়ে ছোট বাঁদী একটি লেড়কি পয়দা করল। বাঁদীটি ডরে একদম কাঠ হয়ে রইল। বাদশাহের একান্ত আশা ছিল একটি লেড়কা পয়দা হবে। লেড়কির বাৎ শুনলে তবে তার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাই বাদশাহকে জানানো হ'ল বাঁদীটি লেড়কা প্রসব করেছে।

সুলতান সন্তানটিকে দেখতে এলেন না। এক গণৎকার ফকির তাঁকে বলেছিলেন, সন্তানের উমর দশ সাল হওয়ার আগে যেন তিনি তার মুখ দর্শন না করেন। যদি তা করেন তবে তাকে বিরাট ক্ষতির বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে।

লেড়কিটি দশ সালে পা দিলে তার আম্মা তাকে হরবখত লেড়কার সাজপোশাক পরিয়ে রাখতে লাগলেন। তা দেখে সুলতান খুশীতে একদম ডগমগ হয়ে গেলেন।

লেড়কিটি পনের সালে পা দিল। সুলতান ভাবলেন, লেড়কার শাদীর উমর হয়েছে। এবার তাকে শাদী দেয়ার বন্দোবস্ত করা দরকার। প্রতিবেশী সুলতানের লেড়কির সঙ্গে তার শাদীর জন্য আব্বার ব্যাপার দেখে শাহজাদী আতঙ্কিত হ'ল। তার এখন এক মাত্র ভাবনা, কি করে ব্যাপারটিকে ঠেকানো যেতে পারে।

এক সন্ধ্যায় শাহজাদী বাগিচায় পায়চারী করছিল, তখন এক জিনের সাথে তার মোলাকাৎ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে দোস্তি গড়ে উঠল। শাহজাদী জিনটির কাছে নিজের বিপদের ব্যাপার জানাল। জিনটি নিজের পুরুষত্ব তাকে প্রদান ক'রে নিজে লেড়কি বনে গেল। তাকে জিনটি বল্‌ল—'কারো কাছে যেচে ভুলেও আমাদের কারবারটি ফাঁস ক'রে দিও না। তোমার কাজ মিটে গেলে আমরা ফিন নিজ নিজ রূপ ফিরিয়ে নেব, ইয়াদ রেখো।'

সুলতান শাহজাদীর শাদী চুকিয়ে ফেললেন। শাদীর রাত্রেই পাত্রীর গর্ভে সন্তান এল। যথা সময়ে এক লেড়কা পয়দা হল।

শাহজাদী সেদিনই জিনটির তল্লাশ করতে জঙ্গলে হাজির হল। শাহজাদী তাকে তার নারীত্ব ফিরিয়ে দিতে বলল। জিনটি বেঁকে বসল। সে বলল—'তোমার নারীত্বকে তো আমি বহুৎ হুঁশিয়ার হয়েই রক্ষা করছিলাম। একদিন একদল জিন উড়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একটি নওজোয়ান জিন ছিল। ...ত পারবে সম্ভোগে লিপ্ত হই। সে যে কী অদ্ভু... করবেন। ...ী করা বিবিকে নিয়ে সাধ্য আমার নেই। পুরুষ থাকা ব...তানের বড় করেছিলাম তার ইয়ত্তা নেই। ...রওনা হ... কিসসা আমি লাভ করিনি দোস্ত। লেড়কি হ... পুরুষকে ... আনন্দ যে কী, তুমি আদৎ লেড়কি হয়েও তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত রইলে দোস্ত। আমার দেহ অপবিত্র হয়ে গেছে। একে ফিরে পেলে তোমার কি-ই বা ফয়দা হবে, বল? তুমি পুরুষের অবয়ব নিয়েই জিন্দেগী কাটাও দোস্ত।

কিস্‌সা খতম করে সুলতান জাইন তাঁর বড় দুই লেড়কার উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—বেটা এবার তোমাদের জরুর মালুম হয়েছে, দুনিয়ায় কোন ব্যাপারই অসম্ভব নয়। আজ আমি ছোট লেড়কার প্রয়াসের ফলে চোখ দুটো ফিরে পেয়েছি, একদম সাচ্চা। তোমরা এবার রাস্তা দেখ। আমি ওয়াদা রক্ষা করতে গিয়ে নূরজিহান'কে আমার সুলতানিয়তের আধা আধি দিয়ে দিয়েছি।

এদিকে শাহজাদী ফিরোজ-এর লেড়কি লিলি তার বাগিচায় রোজ বিকালে পায়চারি করতে হাজির হয়। একদিন এভাবে পায়চারি করতে করতে একটি ঝাঁকড়া গাছের নীচে শুয়ে গভীর নিদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শাহাজাদা নূরজিহান সেখানে হাজির হয়। নিজের হাতের অঙ্গুঠি খুলে তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। নিদ টুটলে আঙ্গুলের অঙ্গুঠিটি দেখে চমকে... দীঘির পানি থেকে দরিয়া গুলাবটি কে যে... ...দিন গুজরান

বাদশাহ বিলকুল ব্যাপার ফিরোজ-এর ... বলল—'আব্বা, দরিয়ার-গুলাব ছাড়া আমার জান থ... দেখতে না পাওয়ায় এরই মধ্যে আমার বিমারি শ... ...স-জঙ্গলে যন্ত্রণা আমি নাবালিকা হলেও ...ড়া ...ট লেড়কার সঙ্গে ভেট

শাহজাদী তার সশস্ত্র জেনান... ...পড়তেই তিনি একদম সুলতানিয়াৎ ছেড়ে সারকাস্তানের ...য় কোনরকমে প্রাসাদে হ'ল সুলতান জাইন-এর নগরে। ...নি ঘোড়ার পিঠে যে-

সুলতান জাইন-এর সুলত... ...তাঁর ছোট লেড়কা। ভাসছে। অন্ধা সুলতান চোখ ফি... ...বহুৎ মুলুক থেকে প্রজারা মেতে উঠেছে। ...দাওয়াই দিলেন

শাহজাদী লিলি খুশীতে ড... যাওয়া দরিয়া-গুলাবের হদিস ত... ...জব দাওয়াই সুলতানের প্রাসাদে হাজির হ'ল ...স করে। তার ...দরিয়া-গুলাব

নর্গিস-ফুলের ফুটে থাকতে দেখল। ফুলটি চুরি ক'রে ভেগে অন্দরে পালাল। লেকিন সে নিজের চোখে চোরটিকে একবারটি দেখতে উৎসুকই হ'ল। একটু বাদে শাহজাদা বাগিচায় এলে তাকে এক নজর দেখেই শাহজাদী একদম মুগ্ধ হয়ে গেল। তার প্রতিবিম্বের অন্তর স্তিমিত হয়ে গেল।

শাহজাদা দ্রুত প্রাসাদে চলে গেল। লিলিকে সে দেখতে পায় নি। যে-চোরকে সাজা দেয়ার জন্য একটু আগেও লিলি-র কলিজা ছটফট করছিল এখন তাকেই কাছে পাওয়ার জন্য সে আকুল।

লিলি নূরজিহানকে একটি চিঠি লিখল। তার পরিয়ে দেয়া অঙ্গুটিসহ চিঠিটি এক নফরানীর হাত দিয়ে শাহজাদা নূরজিহান-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। শাহজাদা তার অঙ্গুঠিটি দেখে তাজ্জব বনে গেল। চিঠি পড়ে তার দিল উতলা হয়ে উঠল। চিঠিতে লিলি তাকে কাছে পাওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছে।

শাহজাদা নূরজিহান চিঠির জবাব লিখতে গিয়ে বল্‌ল, সে যেদিন তাকে প্রথম দর্শন করেছিল সেদিনই তার কলিজার জ্বালা শুরু হয়েছিল। আর তাকে বাগিচায় হাজির হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। বিরহ যন্ত্রণা তার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছে। চিঠিটি লিখে সে এক নফরানীকে দিয়ে তার মেহেবুব লিলি-র কাছে পাঠিয়ে দিল।

বাগিচায় লিলি ও শাহজাদার মিলন হ'ল। মহব্বতের দরিয়ায় তারা গা ভাসিয়ে দিল।

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি খতম ক'রে চুপ করলেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার নওজোয়ান

বেগম শাহরাজাদ সুলতান শারিয়ার-এর অত্যুগ্র আগ্রহে আর একটি ভিন্ন স্বাদের কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক সময়ে আলেকজান্দ্রা নগরে এক নওজোয়ান বাস করত। সে তার আব্বার অগাধ সম্পত্তি লাভ ক'রে নগরের একজন ধনী আদমিতে পরিণত হয়েছিল। অঢেল ধনদৌলৎ হাতে পড়ায় সে ভাবনায় পড়ল কিভাবে লব্ধ সম্পত্তি সংরক্ষণ করা যায়। পরামর্শের জন্য তার আব্বার এক দোস্তের কাছে হাজির হ'ল। বুড্ডাটি বিলকুল ব্যাপার শুনে কয়েক মুহূর্তে নীরবে ভেবে বল্‌ল—'বেটা দীন-দুঃখীদের মধ্যে ধন-দৌলৎ বিলিয়ে দেয়া জরুর পুণ্যের ব্যাপার। সাচ্চা বিবেক ও জ্ঞানীরাই কেবলমাত্র এ-পুণ্যের অধিকারী হতে পারে, ইয়াদ রেখো।'

আব্বার দোস্ত শেখটির কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে সে খুশী হতে পারল না। ভাবল, দেখা যাক, আর কোথাও থেকে কোন সৎ পরামর্শ মেলে কিনা। লেকিন তল্লাশ ক'রে হাতের কাছে কোন নির্ভরযোগ্য আদমিকে পেল না। শেষ পর্যন্ত তাকে ইয়া পেল্লাই সব মুলুকের কিতাব খুলে নিয়ে বসতে হ'ল। লেকিন নিজের মুলুকের কিতাব তাকে খুশী করতে পারল না। অনন্যোপায় হয়ে সে আদমি পাঠিয়ে বাগদাদ, কায়রো, দামাস্কাস, মরক্কো, পারস্য প্রভৃতি মুলুক থেকে ইয়া পেল্লাই পেল্লাই বহুৎ কিতাব আনাল। তার প্রাসাদে কিতাবের পাহাড় গড়ে তুলল। সেগুলোকে সে একটি গম্বুজের ভেতর রেখে তার নামকরণ করল—'কিতাব-গম্বুজ'। নওজোয়ানটি এবার থেকে কিতাব-গম্বুজেই দিনের একটি বড় ভগ্নাংশ কাটিয়ে দিতে লাগল। আর ইয়ার-দোস্ত ও মুলুকের জ্ঞানী আদমীদের সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে কিতাব পাঠের আসর বসাতে লাগল। কিতাব পাঠে কিছুদিনের মধ্যেই তার ভেতরে জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা
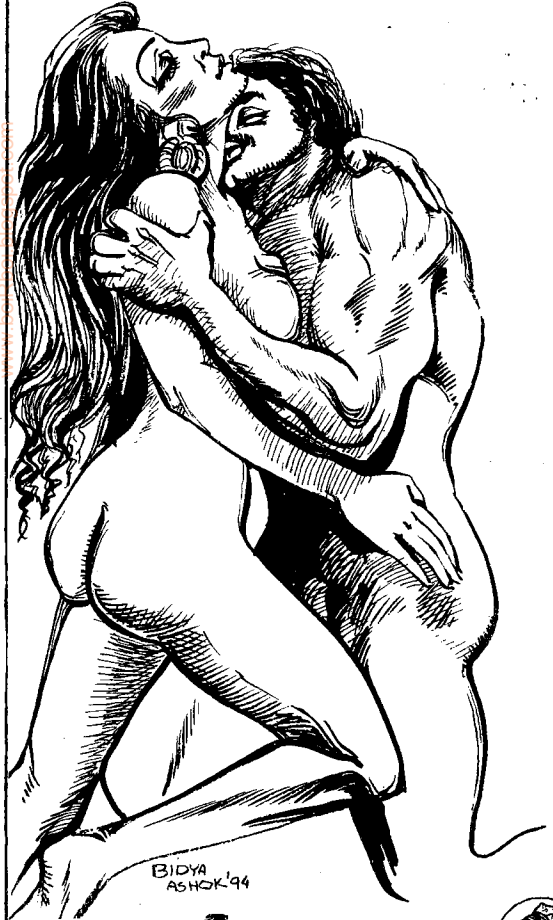
বন্ধ করলেন।

নয় শ' একাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন।

একদিন নওজোয়ানটি তার ইয়ার-দোস্তদের সামনে বল্‌ল—'দোস্তগণ, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কিভাবে দিন গুজরান করতেন সে-ব্যাপারে আমি তোমাদের কাছে সংক্ষেপে কিছু ব্যক্ত করছি। তাঁরা ছিলেন মিট্টির দুনিয়ার সাচ্চা আরব-সন্তান। তাঁরা আদতে জ্ঞানের দরিয়ায় দিন গুজরান করতেন। জ্ঞানলাভের প্রেরণাই তাদের কিতাবের মধ্যে আবদ্ধ রাখত। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে আরব-ভাষা। আল্লাহ-ই সে-ভাষা বেছে নিয়েছেন। সে-ভাষার মাধ্যমেই তিনি পয়গম্বরের বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

তোমাদের কাছে আজ আমি একটি কিস্‌সা বলছি যা শুনলে সবার দিল্ খুশীতে একদম ভরপুর হয়ে উঠবে। একজন বাণী জুশাস উপজাতির সাচ্চা মুসলমান ছিলেন কবি দরাইদ বিন সিমাহ। তিনি যে কেবল কবিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা-ই নয় যোদ্ধা হিসাবেও তিনি বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

বাণী জুশাস ও বাণী ফিরাস উপজাতি দুটির মধ্যে হরদম বিবাদ চলত। আরব দুনিয়ায় রাবিয়াহ ছিলেন একজন সেরা যোদ্ধা।

দরাইদ বিন সিসাহ একবার বাণী ফিরাসদের মুলুক আক্রমণ করে বসলেন। এক সময় তার নজরে এল দূরে এক আদমি একটি উটের পিছু পিছু পয়দল চলেছে। আর উটের ওপরে অবস্থান করছে এক জেনানা। দরাইদ-এর হুকুমে তার এক অনুচর সে-আদমিটির-ওপর চড়াও হ'ল। সে কাছে গিয়ে আদমিটিকে বল্‌ল-'শেখ, যদি জান নিয়ে ফিরতে চাও তো জেনানাটিকে ফেলে ভাগ। বুড্ডাটি তাতে কান না দিয়ে চলা অব্যাহতই রাখল। সে সঙ্গে গুনগুন স্বরে গানা গাইতে লাগল। যার মর্মার্থ হ'ল—'লড়াকু নওজোয়ান' আজ যখন মোলাকাৎ হয়েই গেল তখন যুদ্ধ একটু-আধটু হয়েই যাক না। অকস্মাৎ বর্শার খোঁচায় তার জান খতম করে দিল। এবার তার ঘোড়াটি পাওয়ায় সে তাতে চেপে বসল। জেনানাটিকে কুর্নিশ করে এগিয়ে চল্‌ল। জেনানাটিকে নিয়ে উটটি এবার তার পিছনে পড়ল। তার দিলের কিছুমাত্র ঘটেছে বলে মালুম হ'ল না।

এদিকে অনুচরটির ফেরার নাম নেই দেখে দরাইদ এবার আর এক সশস্ত্র অনুচরকে পাঠালেন। সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে প্রথম অনুচরটিকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে সে আদমিটির পিছু নিল। সে এবারও এর প্রতি আগেকার হুঁশিয়ার বাণী আওড়াল। লেকিন নিহত আদমিটির মাফিক এ-ও তা পাত্তা দিচ্ছে না দেখে আগেকার সে গানাটিই রুবিয়াহু গুনগুন ক'রে গাইল। তারপর মুহূর্তেই হাতের বর্শাটি ঘোড়সওয়ারটির বুকে গেঁথে দিল। আদমিটি এবারও কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ না ক'রে শান্তভাবেই ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চল্‌ল।

এদিকে দরাইদ পড়লেন মহা সমস্যায়। দ্বিতীয় অনুচরটিও ফিরল না দেখে অন্য আর এক যোদ্ধাকে পাঠাল রহস্যজনক আদমিটির কাছে। যোদ্ধাটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা খুনে জবজবে লাশ দুটো ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখল, এক জেনানা উটের পিঠে চেপে এগিয়ে চলেছে। আরও সামান্য এগিয়ে সে খুনী ঘোড়সওয়াটির মুখোমুখি হ'ল। রবিহ ঘোড়ার পিঠে বসেই সে হুঁশিয়ার-বাণী-আওড়াল। যোদ্ধাটি তার কাছে এগিয়ে এলেই সে আগেকার সে গানাটি ধরল। ব্যস, হাতের বর্শাটি সোজা তার বুকে গেঁথে দিল।

হতাশায় জর্জরিত দরাইদ অনন্যোপায় হয়ে এবার নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে রবিয়াহ'কে অনুসরণ করল। তিন-তিন অনুচরের লাশ ডিঙিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। রবিয়াহু ইতিমধ্যে একটি টিলার আড়ালে চলে গেছেন। সেখান থেকে উঁকি দিয়ে ঘোড়সওয়ার কবি জুশাস'কে ঠিক চিনতে পেরে গেলেন। এবার দুঃখে কপাল চাপড়াতে লাগলেন-'ইয়া আল্লাহ! শেষ যোদ্ধাটিকে ঘায়েল করার পর তার বুক থেকে কেন বর্শাটি খুলে আনলাম না।' উপায়ান্তর না দেখে তিনি এবার বর্শার হাতলটি-নিয়েই কবি জুশাক'কে আক্রমণ করলেন!

দরাইদ অস্ত্র হাতে তার দিকে ফিরতেই দেখেন রবিয়াহু নিরস্ত্র। ক্রোধে গর্জন করতে থাকলেও নিরস্ত্রকে আক্রমণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তিনি বল্‌লেন—'তোমার অস্ত্রটি নিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যাও। আর আমি ফিরে যাই আমার সৈন্যদের মাঝখানে।'

রবিয়াহু নিজের মকানে ফিরে এল। কিছুদিন বাদে তিনি দুনিয়া ছেড়ে বেহেস্তে চলে যান। যুদ্ধ করতে গিয়েই তিনি জান দিলেন।

রবিয়াহু-র ইন্তেকাল ঘটলে ফিরাস বীরযোদ্ধারা বাণী জুশাসদের ওপর দারুণ চটে গেল। তারা শত্রুপক্ষের তাঁবুর ওপর অচানক ঝাঁপিয়ে পড়ল। বীরযোদ্ধা দরাইদ'কেও তারা হাতে বেড়ি পরিয়ে দিল।

দরাইদ নিজের নাম গোপন করলেন। কে এ-বন্দী বীরযোদ্ধা, শত্রুপক্ষ জানতে পারল না। তাকে ফিরাজ জেনানাদের অধীনে রেখে দেয়া হ'ল। জেনানাদের মধ্যে উটের পিঠের সে-জেনানাটিও ছিল। সে দরাইদ'কে এক লহমায় দেখেই চিনতে পারল। চিল্লিয়ে উঠল—তোমরা কাকে বেড়ি পরিয়ে নিয়ে এসেছ! এ যে একদিন শত্রু রবিয়াহুকে নিরস্ত্র পেয়েও খুন করে নি। রবিয়াহু তার তিন যোদ্ধাকে খুন করেছেন জেনেও শেষমেষ তাকে খুন করেনি। এমনকি আমার দিকেও হাত বাড়ায় নি।' জেনানাটি নিজের গায়ের

শালটি তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। এর অর্থ তোমার জান রক্ষিত হবে।

জেনানাটির নাম রেয়তা। তার আব্বার নাম গিজল্ আল-তিরুণ। সে বন্দী দরাইদ'কে সৈন্যদের কাছ থেকে চেয়ে নিল। রবিয়াহু'কে সুযোগ না পেয়েও খুন না ক'রে যে মহানুভবতার পরিচয় দরাইদ দিয়েছিলেন সে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য স্বামীর হত্যাকারীকে সে মুক্ত ক'রে দিল। এ জেনানাটিই রবিয়াহু-র বিবি। আর তার মৃত স্বামীর হাতলহীন বর্শাটি কবি দরাইদ'কে ফিরিয়ে দিলেন।

বীরযোদ্ধা দরাইদ আর বাণী ফিবাস উপজাতিদের আক্রমণ থেকে বিরত থেকে কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখেন।

এদিকে দরাইদ-এর উমর বাড়তে লাগল। তার কবিত্ব প্রতিভা ক্রমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বাণী-সোলাইম উপজাতিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। তাদের মধ্যে বাস করত খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কি তুমাদির অল-খানল। সে আমুর-এর লেড়কি।

দরাইদ একদিন ঘোড়ার পিঠে চেপে পথ পাড়ি দেবার সময় দেখতে পান খুবসুরৎ লেড়কি তুমাদির গরমের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সামান্য সাজ পোশাকে নিজের যৌবনচিহ্নগুলোকে ঢেকেঢুকে রেখে তার আব্বার উটটিকে খানাপিনা দিচ্ছে। দরাইদ আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমাদি-র সুরৎ-সুধা পান করতে করতে আপন মনে গানার কলি রচনা করতে লাগলেন।

তিনি তাকে দেখে এতই মুগ্ধ হলেন যে, পরদিন সকালেই কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে তুমাদি-এর আব্বার সামনে হাজির হলেন।

তাঁর প্রস্তাব শুনে আমুর বল্লেন—'মহানুভব দরাইদ, আমি আপনার প্রস্তাবে বাস্তবিকই খুশী হয়েছি। লেকিন আমি আমার লেড়কির জ্ঞান-বুদ্ধির কদর দিতে গিয়ে এ-ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইব। তার মর্জি মাফিকই কাজ আমি করব।

একটু বাদে তিনি লেড়কির কাছ থেকে ফিরে এসে জানালেন, তাঁর বেটি তুমাদির এ ব্যাপারে দু'-চারদিন সময় নিয়েছে। যথা-সময়ে তিনি দরাইদ'কে তার অভিমত জানিয়ে দেবেন।

শেষমেষ তুমাদির তার চূড়ান্ত মতামত জানাতে গিয়ে বল্ল—'আব্বা, আমি ভেবে দেখলাম, সোলাম জাতির কোন নওজোয়ানকে ছাড়া আমার পক্ষে শাদী করা সম্ভব নয়।'

আমুর তার লেড়কির অভিমত দরাইদ'কে যথাসময়ে জানিয়ে দিলেন। এতে পৌরুষত্বে আঘাত লাগল। ক্রুদ্ধ হলেও বাইরে কিছুমাত্রও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে তিনি বড়িয়া এক গানা রচনা ক'রে ফেললেন। গানাটির মূল বক্তব্য হ'ল—কবি দরাইদ আজ বুড্ডা হয়েছেন। তবু এরকম উক্তি আমি তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম। এক নওজোয়ান নোকরই তোমার বাঞ্ছা, আমি ভালই জানি দুনিয়ায় পুরুষের কোমল শয্যা কাম্য হওয়া উচিত নয়। লেকিন বীরদের জন্য বহুৎ কাম কাজ ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তো বলছি না যে, গতকাল আমি তোমার দুয়ারে এসে হাজির হয়েছিলাম।'

ক্রমে সবার মুখে মুখে দরাইদ-এর গানাটি ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক সময় বাণী সোলাইম-দের সমাজেও পৌঁছে গেল। এবার তুমাদির'কে তার জান পহছান আদমিরা পরামর্শ দিল দরাইদকে শাদী ক'রে ব্যাপারটি চুকিয়ে ফেলতে। লেকিন তুমাদির-এর জেদ অব্যাহত রইল।

এদিকে মুরিদ উপজাদিতের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তুমাদির-এর ভাইয়া জান দিল। তুমাদির এবার তার ভাইয়ার বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন এক গানা রচনা করল যা ক্রমে তামাম আরব দুনিয়ার আদমিদের দিল্ কেড়ে নিল। ওফাজে এক কবি সম্মেলনে তার গানাটি কবি-সমাজের দ্বারা সমাদৃত হ'ল। প্রখ্যাত কবি নাবিগাহ্ এমনও বল্‌লেন তুমাদির তামাম দুনিয়ার কবিদের সেরা।

তুমাদির হিজরতের আট সালে তাঁর লেড়কা আব্বাস'কে নিয়ে মহম্মদের কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্য হাজির হয়েছিল। মহম্মদও তার গানা শুনে খুশী হয়ে বহুভাবে তাকে আশীর্বাদ করেন।

কবি দরাইদও কবি তুমাদির-এর কিস্‌সা খতম হওয়ার পর এবার সে-নওজোয়ানটি তার কিস্‌সা শুরু করল—কবি ফিন্দ-এর দুটি লেড়কি ছিল। বড় লেড়কিটির নাম ওয়াইরাহ এবং ছোটটির নাম ছিল হোজাইলাহ।

ফিন্দ-এর উমর যখন পুরো এক শ' সাল তখন তিনি থালাবিদ উপজাতির সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হন। তার লেড়কি দুটি তাঁকে যুদ্ধে সাহায্য করে। এ-যুদ্ধে থালাবিদরা একদম খতম হয়ে যায়। এ-লড়াইয়ে ফিন্দ-এর লেড়কি দু'টি যে-বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তা আজও সে-মুলুকের আদমিদের মুখে মুখে ফেরে।

কোন এক সময় ইরাকের বাদশাহ ছিলেন নেমান। ফতিমা নামে তাঁর এক খুবসুরৎ লেড়কি ছিল। তার মেজাজ মর্জি হরবখত তিরিক্কীই থাকত। ঝুট ঝামেলা এড়াবার জন্য সম্রাট তাকে অন্দর মহলে আটক রাখতেন। লেড়কিটি খোলা জানালা দিয়ে পাহাড় আর জঙ্গল দেখে দেখে তার বিষাদক্লিষ্ট দিল্‌কে চাঙা রাখার কোশিস করত।

একদিন সে দেখতে পেল অনুচ্চ পাহাড়টির চূড়ায় ইবানত ইজলান নামে তার এক নফরানী এক নওজোয়ানের সঙ্গে পেয়ার মহব্বতে লিপ্ত। তল্লাশ করে সে জানতে পারল নওজোয়ানটির নাম মুরাকিশ। নামজাদা এক কবি।

বাদশাহের লেড়কি ফতিমা কবিবর মুরাকিশ'কে দেখার জন্য তার কাছাকাছি পাশাপাশি কিছু সময় কাটানোর জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। লেকিন কি ক'রে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করা যাবে? প্রাসাদের কামরা থেকে বাইরে যেতে হলে নফর-নফরানীদের সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা চাই-ই চাই। লেকিন বাদশাহের লেড়কি হয়ে এমন এক জঘন্য কাজে নিজেকে লিপ্ত করতে সে কুণ্ঠিত হ'ল। ফিন কবি মুরাকিশ-এর আদৎ পরিচয়, তার বংশ বিলকুল বিচার না করেই তো আর শাহজাদীর পক্ষে তার সান্নিধ্য লাভ করা উচিত নয়। তাকে কবিবরের আদৎ পরিচয় দিতে গেলে ফন্দি করেই কাজ হাসিল করতে হবে। করলও তা-ই। সে ইবানত ইজলাস'কে তলব ক'রে বল্‌ল—আগামী কাল এ-দাঁত-কাঠি, আর একটি ধুনুচি নিয়ে তার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে যাবে। খুসবুওয়ালা ধুনা তাতে ব্যবহার করবে, ইয়াদ থাকে যেন। আর এক বাৎ, তীক্ষ্ণ নজর রাখবে, সে দাঁতকাঠিটি মুখে তোলার আগে তার অগ্রভাগ ভেঙে চিকনি ক'র নেয় কিনা। আর ধোয়ার খুসবু দিয়ে তার সাজ পোশাকে খুসবু জড়িয়ে নেয়ার কোশিস করে কিনা, মালুম হ'ল? তা যদি না করেন তবে যত বড় কবিই হোক না কেন বাদশাহের লেড়কির পাশে দাঁড়াবার যোগ্য সে নয়।

নফরানী ইবানত পরদিন কবিবরের সামনে গিয়ে শাহজাদী ফতিমা যা কিছু তার কাছে আশা করেছিলেন উভয় ব্যাপার চোখের সামনে ঘটতে দেখল।

সে ফিরে এসে শাহজাদীকে কবি মুরাকিশ-এর আচরণের ব্যাপার জানাল।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নয় শ' পঁচাত্তরতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, নফরানীর মুখে কবি মুরাকিশ-এর আচরণের ব্যাপার শুনে ফতেমা নিঃসন্দেহ হ'ল যে, সে জরুর উঁচু বংশীয়। এবার আসন ছেড়ে উঠে বলে উঠল—'ফতিমা, আর দেরী নয়, যে করেই হোক কবিবরকে আমার সামনে হাজির কর। তাকে আমার চাই-ই চাই। নইলে আমার জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে।

এখন আদৎ সমস্যা দেখা দিল প্রহরীদের চোখে ধূলো দিয়ে নফরানীটি কি ক'রে মুরাকিশ'কে অন্দর মহলে নিয়ে আসবে। মতলব একটি ঠিকই বেরিয়ে গেল। সে মুরাকিশ'কে নিজের পিঠে চাপিয়ে একটি শাল গিয়ে তাকে জড়িয়ে রাতের আন্ধারে প্রাসাদের অন্দর মহলে হাজির করল। শাহজাদী ফতিমা রাতভর কবিবর মুরাকিশ-এর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পরম তৃপ্তি ও সম্ভোগ-সুখের মাধ্যমে নিজের কলিজাকে ঠাণ্ডা করল। ভোরের আলো ফোটার আগেই নফরানীটি ফিন একই উপায়ে তাকে প্রাসাদের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এল।

এবার থেকে নফরানীটির সাহায্যে কবিবর রোজ প্রাসাদে এসে তার মেহেবুবা শাহাজাদীকে আলিঙ্গন, দলন, চুম্বন আর সম্ভোগ সুখলাভের মধ্য দিয়ে তামাম রাত গুজরান ক'রে ভোর হওয়ার আগে প্রাসাদ ছাড়ে। একের পর এক মাহিনা এভাবে চলে গেল।

এক রাতে আজব এক ঘটনা ঘটল। কবিবরের বদলে তার এক জিগরী দোস্ত ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে, নফরানীটির পিঠে চেপে শাহজাদী ফতিমা-র কামরায় এল। তার ছোঁয়া পেয়েই শাহজাদী ব্যাপারটি ধরে ফেলে। জোর-সে এক লাথি হাঁকিয়ে তাকে পালঙ্ক

থেকে ফেলে দেয়। ঘাড় ধরে কামরা থেকে বের করে দেয়।

শাহজাদী ফতিমা মুরাকিশ-এর বেইমানীতে যার পর নাই ক্ষুব্ধ হ'ল। সে কবিকে আর প্রাসাদের ঢুকতে দিল না। কবিবর মুরাকিশ-এর বিরহ-জ্বালায় দগ্ধ হয়ে যে কবিতা রচনা করে তা আজও মেহেবুব ও **মেহেবুবার** মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। কবিবর মুরাকিশ তার মেহেবুববার বিরহ-জ্বালা সইতে না পেরে শেষ মেষ জান খতম ক'রে দিল।

কবিবর মুরাকিশ-এর কিস্‌সা খতম ক'রে নওজোয়ানটি এবার কিন্ডাইটের বাদশাহ হজর আর তাঁর বিবি হিন্দ-এর কিস্‌সা শুরু করল—বাদশাহ হজর ছিলেন একজন যথার্থই অকুতোভয় ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তার লেড়কা ছিল একজন বিখ্যাত কবি। তার নাম ছিল ইমরু অল কেয়স। আব্বার অন্যায় জুলুম বরদাস্ত করতে না পেরে কবি ইমরু প্রাসাদ ছেড়ে ভেগে গিয়েছিল।

বাদশাহ হজরকে বানী-আসাদ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এ মওকা বুঝে কোদেইদে নামে এক গোষ্ঠী তার রাজ্য চড়াও হয়। তারা অনায়াসেই কিন্ডাইট গোষ্ঠীকে লড়াইয়ে হারিয়ে দেয়। তাদের বাদশাহ জেয়াদ হজর-এর প্রাসাদের বহুৎ জেনানাকে নিয়ে নিজের মুলুকে চলে যায়। আর সে সঙ্গে তাঁর বেগমকেও নিয়ে গেল। বাদশাহ হজর তখন বানী আসাদ গোষ্ঠীর সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। দুঃসংবাদটি পাওয়ামাত্র হজর নিজের মুলুকে ফিরে আসেন।

বাদশাহ এবার তার দুই বিশ্বস্ত গুপ্তচর সাদুস ও সালিহ-কে পাঠান জিয়াদ-এর শিবিরের **খবরাখবর** সংগ্রহ করতে।

মাঝ-রাতে সাদুস গোপনে সম্রাট জিয়াদ-এর তাঁবুর পিছনে হাজির হয়। উৎকর্ণ হয়ে তাঁবুর ভেতরের আদমিদের বাৎচিৎ শোনার কোশিস করে। সে অচানক থমকে গেল। গোড়ায় তার মালুম হ'ল শোনার ভুলচুক হচ্ছে। বেগম সাহেবা হিন্দ-এর কণ্ঠস্বর শুনে পুরো ব্যাপারটি তার কাছে সাফ হয়ে গেল। জিয়াদ আর হিন্দ-এর হৃদ্যতাপূর্ণ বাৎচিৎ ও চুম্বনের আওয়াজ তার কানে এল।

গুপ্তচর সাদুস তার শিবিরে ফিরে এসে বাদশাহ হজর'কে দুঃসংবাদটি দিল। ক্রোধোন্মত্ত বাদশাহ হজর তখনই কোদেইদ গোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিলেন। জিয়াদ-এর বাহিনী লড়াইয়ে সুবিধা করতে না পেরে দলবেঁধে পালিয়ে যেতে থাকে। তাদের ভিড়ে বাদশাহ জিয়াদও পালাবার কোশিস করেন। হজর পলায়নরত জিয়াদ'কে দেখতে পেয়ে তাকে ধরে ফেলেন। গোস্‌সা করতে করতে তার গায়ে অস্ত্রের আঘাত হানলেন। তার শিরটি গর্দান থেকে নামিয়ে দিলেন। এবার সেটিকে নিজের ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিলেন।

বাদশাহ হজর-এর এবারের লক্ষ্য হিন্দ। তার তল্লাশ চালাতে লাগলেন। অল্পেতেই তার হদিশ মিল্‌ল। হজর এবার দুটো ঘোড়াকে পরস্পর বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে তার মাঝখানে হিন্দকে দাঁড় করিয়ে বেঁধে দিলেন। চাবুকের ঘায়ে ঘোড়া দুটো দু'দিকে ছুটতে লাগে। হিন্দ-এর দেহটি **ছিঁড়ে** দু'টুকরো হয়ে যায়।

নওজোয়ানটি কিস্‌সাটি খতম ক'রে এবার আরবের জেনানাদের সম্বন্ধে একটি নয়া কিস্‌সা শুরু করল—তখন আরব দুনিয়ায় সবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন হতে চলেছে। আমাদের প্রিয় নবীর বিবি আয়েশা কিস্‌সাটি বলেন। ইসলাম দুনিয়ার এক আদৎ মহিয়সী জেনানা হিসাবে তিনি ছিলেন সর্ব অগ্রগণ্যা।

নওজোয়ানটি আয়েশার জবানীতেই কিস্‌সাটি পেশ করতে লাগল—ইয়েমেনের কয়েকজন সম্মানীয়া জেনানা একবার আমার সাথে মোলাকাৎ করতে এসেছিলেন। তারা এক সময় তাদের নিজ নিজ স্বামী সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

জেনানাদের মধ্যে একজন বল্‌লেন—আমার স্বামীটি একজন নোংরা চরিত্রের আদমি। তার বুকে তিলমাত্র হাসি আছে ব'লে আমার কোনদিন মালুম হয় নি। একমাত্র অকেজো এ ছেঁড়া মাদুরের সঙ্গেই তার তুলনা চলতে পারে।

দ্বিতীয় জেনানাটি তার কিস্‌সা শুরু করল—দেখুন, আদতে আমার স্বামীর নাম মুখে আনতেও ঘেন্নায় আমার গা ঘিন ঘিন করে। যাকে বলে এক হাড়কিপ্টে। খানা শুরু করলে পাত্রের তলায় পড়ে থাকা খানাটুকুও আঙুল দিয়ে চেটে পুটে খেতে লেগে যায়। আর সরাব পানের সময় শেষ বিন্দুটিকেও বাদ দেয় না। কোন জন্তুকে খানাপিনার জন্য বেছে নিলে দেখা যাবে তার চেয়ে হাড় জিরজিরে জন্তু দ্বিতীয়টি আর মিলবে না। এক আদৎ অপকর্মের ঢেকি।'

এবার তৃতীয় জেনানাটি বল্‌ল—'আমার স্বামী এক আদৎ জানোয়ারের মাফিক। তার মতের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌লেই গলা ছেড়ে চিল্লাতে লাগবে। কারণে অকারণে আমাকে ডর দেখায়, তালাক দেবে। আর যদি আমি মুখবুজে থাকি তবু তার সহ্য হয় না। চিল্লাচিল্লি ক'রে মহল্লার আদমিদের জড়ো করে।'

চতুর্থ জেনানাটি এবার মুখ খুল্‌ল—'আমার স্বামী আদতেই একজন বোকা হাঁদা। আমার স্বামী কাছে থাকলেও যা তিনি দূরে থাকলেও একদম একই ব্যাপার। তার দোষ তল্লাশ করতে গেলে দেখা যাবে তার সবকিছুই দোষে ভরপুর। বোকা হাঁদার মাফিক বাৎচিতের বাহার আছে। মুখোমুখি হলেই হয় পেটে খোঁচা মারবে নয় তো মাথায় গাট্টা মারবে। তার মাফিক হাত চালাতে ওস্তাদ কম পুরুষেরই আছে। তিড়িক্কি মেজাজের একটি জানোয়ার ছাড়া অন্য কিছুই তাকে ভাবা যায় না। আল্লাহ যে তাকে কবে খতম করবেন, তিনিই জানেন!'

পঞ্চম জেনানাটি এবার তার স্বামীর ব্যাপারে বলতে লাগল—'আমার স্বামী এক সাচ্চা আদমি। সাদা-সিধে সহজ সরল। তার স্বভাব। তার বিলকুল ব্যাপারই আমার কাছে মিঠা লাগে। প্রতিটি যোদ্ধা যেমন ডরায় সম্মান-খ্যাতিরও করে ঠিক তেমনই। তার চাল চলন একদম সিংহের মাফিক গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনিও প্রত্যেককে পেয়ার মহব্বৎ করেন। ভোজের সময় পেটপুরে খান না। কারণ, অন্য কারো খানাদি কম পড়ে যায়। ঝুটঝামেলা, হাঙ্গামার সময় নিজে তামাম মহল্লা টুঁড়ে টুঁড়ে পাহারা দেন। সড়কের গায়ে মকান বানিয়েছেন যাতে বিপদে পড়ে আদমিরা মেহমান হয়ে রাত কাটাতে পারে। স্বভাব চরিত্রের মাফিক তার দেহের গড়নও লোভনীয়।'

পঞ্চম জেনানাটি তার স্বামীর কিস্‌সা খতম করলে এবার এগিয়ে এলেন ষষ্ঠ জেনানা। সে তার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে বলতে লাগল—'মালিক আবু জায় আমার স্বামীর নাম। গোষ্ঠীর সবাই তাকে পেয়ার করে। এক গরীব ঘর থেকে তিনি বচপনে আমাকে নিয়ে আসেন। তিনি আমাকে পেয়ার তো করেনই, সম্মানও কম করেন না। তাঁর সান্নিধ্য আমার কাছে এমন মধুর ও আকর্ষণীয় যে, আমি তা বাৎচিতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে অক্ষম। আমাকে তিনি একটি লেড়কি দিয়েছেন। যেমন তার সুরৎ তেমনি নম্র ও বিনয়ী স্বভাব। আমাদের গোষ্ঠীর সবাই তাকে মণির মাফিক মাথায় ক'রে রাখে। স্বামী আর লেড়কি—'দুজনকে নিয়ে আমার সংসার সুখের আগার হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তাদের সুখ উৎপাদন করুন।

এক এক ক'রে ছয় জেনানা তাদের বক্তব্য খতম করল।

তখন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বল্‌লাম, আমার বহিনরা, এবার আপনাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রিয় নবীর বক্তব্য আপনাদের কাছে তুলে ধরছি—আমি একদিন তাঁর কাছে উপদেশ শুনতে গিয়েছিলাম। তিনি বল্‌লেন, আয়েশা মুসলমান জেনানাদের নিজেদের দিকে নজর দেয়া দরকার। বিপদে তাদের ধৈর্যে বুক বাঁধতে হবে। সুখের দিনে উদাসীন হয়ে পড়লে কিছুতেই চলবেনা। সতী সাধ্বী জেনানার মাফিক স্বামী ও বালবাচ্চার প্রতি নজর রাখতে হবে। খোদাতাল্লার দোয়ার কথা দিল্ থেকে মুছে ফেল্‌লে চলবে না। তারা ভুলেও স্বামীকে ঘৃণা করবেন না। যদি কেউ করে তবে বিচারের দিন তাকে আল্লাহ কঠিন সাজা দেবেন। যে জেনানা স্বামী ও বালবাচ্চার প্রতি যত্ন নেবেন আল্লাহ তার জন্য বেহেস্তের দুয়ার খুলে দেবেন।'

নওজোয়ানটি এবার ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের আমলের এক কিস্‌সা শুরু করল—খলিফা ইবন অল-খাতাব ইসলাম ধর্মের এক সাচ্চা সেবক ছিলেন। তার মাফিক ন্যায় নিষ্ঠা ও সত্যবাদী আদমি সে-আমলে দ্বিতীয়টি আর পয়দা হয় নি। তাকে বহুৎ আদমি বিচ্ছেদপন্থী ব'লে গণ্য করতেন। যে নবী মহম্মদের সাজা জানতে চাইত না তার ধড় থেকে শির নামিয়ে দেয়া হ'ত।

তিনি একদম সাধারণ আদমির মাফিক দিনগুজরান করতেন। গরীব-আমীর সবাই ছিল তাঁর কাছে সমান। ইয়েমেন সাম্রাজ্যের ভাণ্ডারের অধিকর্তা ছিলেন তিনি। সব মুসলমানের মধ্যে তিনি সম্পদ সমান ভাগে ভাগ ক'রে দিলেন। এক টুকরো ক'রে ডোরাকাটা কাপড়া সবাই ভাগ পেল। ওমর তাঁর টুকরোটি দিয়ে একটি পিরান বানালেন। সেটি গায়ে চাপিয়ে তিনি মদিনায় তাঁর অনুগামীদের কাছে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। বুঝাতে লাগলেন নাস্তিকদের কোন্ কায়দায় দমন করতে হবে।

ঠিক তখনই এক আদমি উঠে দাঁড়িয়ে চিল্লিয়ে বল্‌ল—'আমরা আপনার বাৎ আর মানতে রাজী নই। কারণ ইমেনের কাপড়া ভাগ ক'রে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, সবার ভাগে সমান কাপড়া পড়ল। লেকিন আপনি নিজে যেমন বিশালদেহী তাতে তো আপনার

পিরানটি তৈরি হতে পারে না। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের ঠকিয়েছেন। আপনি ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন।'

ওমর বল্লেন—'এর উচিত জবাব দাও বেটা, আদমি একদম সাচ্চা বলেছে।'

আবদাল্লা তার জবাব দিতে গিয়ে বল্লেন—'ভাইসব, আমাদের পিরান বানাতে গিয়ে দেখলেন তার শরীরের তুলনায় কাপড়ার টুকরোটি একদম ছোট। আমার ভাগ থেকে কিছুটা কেটে আমি তাকে দিয়েছিলাম। নইলে যে তার গায়ে কোন পিরানই থাকত না।

প্রতিবাদকারী আদমি তখন মাফি মাঙ্গলেন।

এবার জেরুজালেম দখলের সময়কার ব্যাপার বলতে গিয়ে নওজোয়ানটি বল্ল—জেরুজালেম দখল করার সময় সেখানকার পুরোহিত সাফরোনিয়াস শর্ত আরোপ করলেন, খলিফা নিজে হাজির হলে তিনি আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধা করবেন না। ওমর একা উটে চেপে মদিনা থেকে জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করলেন। মরুভূমির দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে জেরুজালেমের প্রবেশ-দ্বারে হাজির হন। নগর অধিকারের সন্ধিপত্রে দস্তখৎ করার পর দ্বার খুলে দেয়া হ'ল। সফরোনিয়াস তার গীর্জায় তাকে আমন্ত্রণ জানাল। তিনি আপত্তি জানান। কারণ দর্শাতে তিনি বলেন, খলিফা যেখানে প্রার্থনা করেন সে-জায়গাটি মুসলমানরা সঙ্গে সঙ্গে দখল ক'রে নেয়।'

প্রার্থনা সারার পর খ্রীস্টান-পুরোহিত বল্লেন—'এ অঞ্চলের মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য কোথায় একটি মসজিদ গড়ে তোলা যায়, বলুন?'

সফরোনিয়াস সুলেমান-এর ধর্মস্থানে তাকে নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, আব্রাহাম-এর লেড়কা ইয়াকুব এখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। সেখানে গড়ে তোলা হ'ল দুনিয়ার সেরা মসজিদটি। এর সঙ্গে তারা জড়িত।

মক্কা ও মদিনার সড়কে সড়কে ওমর ছেড়া একটি কাপড়া পরে লাঠি ভর দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। যেসব সওদাগর আদমিদের ঠকাত, জাল জুয়াচ্চুরি করত তাদের ধরার উদ্দেশ্যেই তার ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘুরে বেড়ানোর একমাত্র উদ্দেশ্যে।

একদিন দুধের বাজারে এক বুড্ডিকে দুধে পানি মেশাতে দেখে তিনি তাকে খুব ক'রে ধমকে দিলেন।

পরদিন ফিন তাকে দুধে পানি মেশাতে দেখে তিনি বল্লেন—'কি গো, তুমি ফিন দুধে পানি মিশিয়েছ?' বুড্ডিটি অস্বীকার করল। সে সাফ জবাব দিল—'দুধে পানি তো মিশাই নি।'

তার লেড়কি তখন বল্ল—'আম্মা, তুমি কার সামনে ঝুটা বাৎ বলছ! দুধে পানি মিশিয়ে কসুর তো করছেই, ফিন ঝুটা বলে গুনাহ বাড়াচ্ছ।'

লেড়কিটির সততায় ওমর মুগ্ধ হলেন। মকানে ফিরে দুই লেড়কা আকিম ও আবদাল্লা'কে বল্লেন, গুণবতী লেড়কিটিকে তোমাদের মধ্যে কে শাদী করতে রাজী?

ছোটলেড়কা আকিম আব্বার প্রস্তাবে মত দিল। তাকে শাদী করতে রাজী হ'ল। খলিফা দুধওয়ালী বুড্ডির লেড়কিটির সঙ্গে আকিম এর শাদী দিয়ে দিলেন। পরবর্তী কালে তাদের লেড়কি আবদ্ অল আজিজ বিন সবোয়ান'কে শাদী করেন। তাঁর লেড়কিই ওমর বিন আবদ আল আজিজ। তিনি ইসলামের রক্ষক পাঁচজন খলিফাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

তিনি একদিন মসজিদে বসে। এমন সময় এক মৃতদেহ নিয়ে কয়েকজন তার কাছে হাজির হয়। মৃতদেহটি পথে পড়েছিল।

তিনি বহুৎ কোশিস করেও হত্যাকাণ্ডটির কারণ বের করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহ-র কাছে প্রার্থনা করেন, আমি যেন এর জান ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হই।

এক সাল বাদে কিছু আদমি এক শিশুকে নিয়ে তার কাছে হাজির হয়। তারা জানায়, শিশুটিকে সে-হত্যাকাণ্ডের জায়গাটিতে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে।

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্সা বন্ধ করলেন।

নয় শ' উনআশিতম রজনী

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—ওমর সোল্লাসে ব'লে ওঠেন,—'এবার আমি জরুর সে খুনের রহস্যটির কিনারা করতে পারব!'

তিনি এবার শিশুটিকে এক জেনানার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—'তুমি একে লালন পালন কর। এর জন্য যা কিছু ব্যয় হবে সবই আমি দেব। এর ব্যাপারে কেউ যদি কিছু বলে, আমাকে জানাবে। অপরিচিত কোন আদমি যদি একে আদর সোহাগ করে বা চুমা খায় সঙ্গে সঙ্গে তা আমাকে জানাবে, ইয়াদ রাখবে।'

জেনানাটি শিশুটিকে নিয়ে তার মালিকের বাড়ি হাজির হওয়া মাত্র মনিবটি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর-সোহাগ জানাতে থাকে।

ব্যাপারটি সে-জেনানাটি ওমর'কে জানিয়ে দিল। সে নগররক্ষী সালে-এর লেড়কি সালেহা।

ওমর একটি সুতীক্ষ্ণ তরবারি হাতে নিয়ে ব্যস্ত-পায়ে মকান থেকে বেরিয়ে পড়েন। নগররক্ষীটির মকানে ঢুকেই দেখেন, সালে হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনায় মগ্ন। তিনি সালেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার লেড়কি কেমন আছে? আমি তার সঙ্গে ভেট করতে চাই।'

সালে তার লেড়কিকে তলব করল। সে এলে খলিফা ওমর তাকে নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—'খবরদার ঝুটা বলার কোশিস করলে এ-তরবারি দিয়ে গর্দান নেব। যে লাশটি মিলেছিল তার ব্যাপারে তোমার কি জানা আছে, বল।'

—'আমার কাছে এক বুড্ডি বাস করতেন। সে ছিল আমার কাছে আম্মার সমান। একদিন এক লেড়কিকে নিয়ে আমার কাছে এল। তাকে আমার কাছে রেখে এক আত্মীয়ের মকানে যাবে। আমি রাজী হয়ে লেড়কিটিকে আশ্রয় দিলাম। আমার কামরাতেই তার শোয়ার বন্দোবস্ত করে দিলাম।

এক বিকালে আমি গভীর নিদে আচ্ছন্ন ছিলাম। অচানক আমার নিদ টুটে গেল। দেখি এক পুরুষ আমাকে জাপ্টে ধরেছে। আমি ধাক্কে সরিয়ে দেবার কোশিস করলাম। পারলাম না। ইতিমধ্যেই সে তার সাধ পূরণ করে নিয়েছে। ব্যস, দিমাক গরম ক'রে তার বুকে চাকু চালিয়ে দেই! ব্যস, খতম হয়ে গেল। তার লাশ পথে ফেলে দিয়ে এলাম। লেকিন তার ঔরসে আমার পেটে বাচ্চা এল। পয়দা হ'ল এক লেড়কা। ঘৃণার ফসল লেড়কাটিকে নিজের কাছে রাখতে দিল না। তার আব্বার সে-জায়গাটিতেই তাকেও ছেড়ে দিয়ে এলাম, লেড়কাটি তখনও জিন্দা ছিল। যা বল্‌লাম, বিলকুল সাচ্চা।'

ধনী নওজোয়ানটি এবার এক নতুন স্বাদের কিস্‌সা শুরু করল—'কুফা নগরের নামজাদা গায়ক ও কবি মহম্মদ এ-কিস্‌সাটি শুনিয়েছিলেন—আমার গানার ছাত্রীদের মধ্যে খুবসুরৎ ছিল সালমা। আমি তাকে আদর ক'রে নীলা ডাকতাম। এর অর্থ জরুর ছিল। তার ঠোঁটের ওপরের দিকটি হাল্কা নীলচে ছিল। সে আমার কাছে যখন গানা শিখত তখন সে ছিল কিশোরী। কুমারী। তার কামিজের ওপর থেকে মালুম হ'ত তলায় এই এতটুকু দুটো স্তন সুঢোল হওয়ার পথে। আমার মালুম নেই, তার দিকে নজর পড়তেই আমার কলিজা ছটফট করতে শুরু করত। মাথা চক্কর মারত। অন্য যারা আমার কাছে গানা শিখত তাদের কারো দিকেই আমার নজর যেত না। কেবল আমার কথাই বলি কেন, যে কোন নওজোয়ানই এক লহমায় তাকে দেখলে কলিজার ছটফটানি থামাতে পারত না। বরং তার সান্নিধ্য লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়ত।

আমার ইয়াদ ছিল, আমি গুরু আর সে আমার ছাত্রী। গুরু-শিষ্যার ভেতরে কাম-প্রবৃত্তি জাগা আদতেই সঙ্গত নয়। তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার না ক'রে পারছি না, তাকে আমি পেয়ার করতাম। বেহেস্তের মহব্বৎ নয়, সম্ভোগ লালসার পেয়ার মহব্বৎ। সে একটিবার মুখ ফুটে হুকুম করলেই আমি যেকোনো অসাধ্য সাধন ক'রে ফেলতে পারতাম। লেকিন কোন হুকুমই সে আমাকে করল না। নসীব। হ্যাঁ, নসীবই বটে।

সালমা একবার ওস্তাদ ইবন ঘানিম-এর সঙ্গে মক্কায় যায়। তখন তার বিরহ-জ্বালায়, জর্জরিত হয়ে আমি একটি গানা রচনা করেছিলাম।

আমি নসীব-বিড়ম্বিত, সাচ্চা, লেকিন আমার চেয়েও অভাগা ছিল ইয়াজিদ ইবন আয়ফু। নীলা-র প্রেমের দরিয়ায় সে-ও হাবুডুবু খাচ্ছিল।

ওস্তাদ ইবন ঘানিম একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করল—'নীলা, এখানকার কেউ কি তোমাকে ব্যর্থ **মহব্বৎ** নিবেদন করেছে কি?'

—'না, তেমন কিছু ঘটে নি। তবে ইয়াজিদ ইবন আয়ুব সাহাব একদিন চুমু খেয়েছিল।'

—'জোর জুলুম করে, নাকি মদৎ ছিল?'

—'না, জোর জুলুম ক'রে নয়, সাচ্চা বটে, চমৎকার দুটো মুক্তো আমার সামনে ধরে লোভ দেখাল, সে'দুটো আমাকেই দেবে। লেকিন হাতে দেবে না। তার মুখে থাকবে, আমাকে মুখ দিয়ে তা বের ক'রে নিতে হবে। আমি লোভ সামলাতে না পেরে তা-ই করেছিলাম। পরে মুক্তো দুটি বেচে আশী হাজার দিরহাম পাই।'

তার বাৎ শুনে ওস্তাদ ঘানিম-এর মুখ গোস্‌সায় লাল হয়ে গেল। ওস্তাদ ইয়াজিদ ইবন **আয়ুব**-এর নসীবে কি জুটতে পারে আশা করি বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না, কি বলেন?'

সালমা'কে গানা শেখাতে একদিন ওস্তাদ ঘানিম-এর মকানে যাওয়ার সময় ইয়াজিদ-এর সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। তার পরনে জমকালো সাজ-পোশাক। আমি জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিল, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ আমিও সেখানেই চলেছি।' এক সঙ্গেই ওস্তাদ ঘানিম-এর মকানে হাজির হলাম। খবর পেয়ে সালমা হাজির হ'ল।

আমি যে-গানাটি তাকে শিখিয়েছিলাম সেটি গেয়ে শোনাতে বল্‌লাম। সে দিল্ উজাড় করে গাইল। ওস্তাদ ঘানিম খানাপিনার বন্দোবস্ত করতে কিছু সময়ের জন্য বাইরে যান। এ মওকায় ইয়াজিদ এবার সালমা-র একদম গা-ঘেঁষে গিয়ে বসল। সালমার এদিকে নজর নেই। গানার মধ্যেই ডুবে রইল।

এবার ইয়াজিদ তাকে দুটো মুক্তো দেখিয়ে বল্‌ল—'ষাট হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছি। তুমি চাইলে নিতে পার। বিনিময়ে কেবল একটি গানা শোনাও।'

সালমা গানা গাইল। এবার হাত বাড়িয়ে মুক্তো দুটো চাইল।

ইয়াজিদ বল্‌ল—'ওয়াদা যখন করেছি তখন দেবও। লেকিন মুক্তো দুটো আমি মুখে রাখব। আর তোমার ঠোঁট দুটো দিয়ে এ দুটো বের করে নেবে, রাজী?' লোভে পড়ে সালমা রাজী হ'ল। ইয়াজিদ-এর মতলব মাফিক কাজ করে মুক্তো দুটো নিল।'

এই নওজোয়ানটি বল্‌ল—'এবার এক কিস্‌সা শোনাচ্ছি। এবং পুরোটাই সাচ্চা, খলিফা ওয়ালিদ এক সন্ধ্যায় তুফেন'কে নিয়ে খানাপিনা সারছিলেন। তুফেন বিনা নিমন্ত্রণেই প্রাসাদে হাজির হয়েছে। তামাম কুফা নগরের বুড্ডা বালবাচ্চা সবাই জানে ইফেন যেখানে খানাপিনার গন্ধ পাবে সেখানেই গুটি গুটি হাজির হবে। খানাপিনার আসরে সে খলিফাকে মজার মজার কিস্‌সা শোনাল।

তুফেন ছিল একজন আদৎ উদরসর্বস্ব আদমি। খানাপিনার দিকে তার ছিল খুবই লিপ্সা।

একদিন এক আমীরের মকানে নগরের সম্ভ্রান্ত আদমিরা খানাপিনা করছেন। এমন সময় ফটকে প্রহরীর সঙ্গে তুফেন ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল। তার আতঙ্ক পেটুক তুফেন আসরে হাজির হলে কেউ আর পেটপুরে খেতে পারবে না। তাই তাকে বাধা দেয়ার কোশিস করছে

শেষ মেষ তুফেন-এরই জয় হ'ল। তুফেন-এর গলা শুনে নিমন্ত্রিতরা বড় মছলিগুলোকে ঢেকেঢুকে রেখে ছোট মছলিগুলো রেকাবির সামনে রেখে দিল।

তুফেন টেবিলের রেকাবির দিকে তাকিয়ে দেখল, ছোট ছোট মছলি।

নিমন্ত্রিতরা হেসে বল্‌ল—'বহুৎ আচ্ছা মছলি। খেয়ে দেখ, কলিজা একদম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

তা শুনে তুফেন শান্ত স্বরে ব'লে উঠল —আমার আব্বা যেদিন দরিয়ার পানিতে ডুব দিয়েছিলেন তার পরদিন থেকে মছলির দিকে আমার আর তিলমাত্রও লালসা নেই। ভাইসব, তোমরাই মছলি খাও।'

—'একী আজব বাৎ শোনাচ্ছ হে! এমন বাৎ তোমার মুখে, তাজ্জব বনছি। আরে ভাইয়া, ভুলক্রমে একটি বার একটি মছলি জিভে ঠেকিয়ে দেখ, বড়িয়া হয়েছে। দিল্ একদম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তুফেন একটি ছোট্ট মছলি, পরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে নাকের কাছে নিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সেটিকে ফিন নামিয়ে জায়গা মাফিক রেখে দিল।'

একজন সবিস্ময়ে বলে উঠল—'একী হে, রেখে দিলে যে খাবে না?' তুফেন আসক্তিহীনভাবে জবাবটি ছুঁড়ে দিল—'না, দিল্ চাইছে না।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহারাজাদ কিস্‌সা শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, মেহমানটি বলল—'দিল চাইছে না? কেন, বলতো?'

—'ভাইসাহাব, পুচকে এ মছলিটিকে খাওয়ার জন্য মুখের কাছে নিয়ে যেতেই কি বল্‌ল, বলতো? সে বল্‌ল, কেন আমাকে খাচ্ছ? সে খেয়েছিল, যে-ওর ভোজ সভায় আমার সঙ্গেই হাজির আছে। তাকে খেয়ে একদম পেটের ভেতরে চালান দিয়ে দিতে পারলে তোমার আব্বাজীকে হত্যা করার বদলা নেয়া হবে। তার বাৎ শুনে আমি তাজ্জব বনলাম। বললাম—'তেমন বড় মছলি এখানে আনা হয়েছে কি?' সে মছলিটিই আমাকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বলে দিল —'আছে, ওই রেকাবিটিতে রেখে ধামা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ওই বিশালায়তন মছলিটিই তোমার আব্বাকে গিলে ফেলেছিল। তাকে খেতে পারলে তবেই তোমার আব্বাকে হত্যা করার বদলা নেয়া হবে। আপনাদের জবুর মালুম হচ্ছে,তার বাৎ শোনার পর থেকে আমার গায়ের খুন ফুটতে শুরু করেছে। হতচ্ছাড়াটিকে কব্জার মধ্যে একবারটি কোনক্রমে পেয়ে গেলে আস্ত খেয়ে তবেই ঠাণ্ডা হব। বলতে বলতে এক লাফে কামরার কোণায় গিয়ে রেকাবি থেকে মছলির লেজটি শক্ত করে ধরে তুলে ফেলল। তারপর একদম নাকের সামনে নিয়ে গেল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে ব'লে উঠল —বেড়ে মছলি! চমৎকার। খেতেযা স্বাদ হবে তা আর বলার নয়। হতচ্ছাড়া শয়তান বেতমিস কাঁহিকার! তুই আমার আব্বাকে উদরস্থ করেছিলি, ইয়াদ আছে? এবার আমি তোকে খেয়ে বদলা নেব, তোর কোন্ আব্বা ঠেকাতে আসে দেখতে চাই। কান্না রাখ। ওসব আমার ঢের শোনা আছে। ছাড়ান দে। কোন বাৎ শুনতে চাইনা। তোকে আস্ত পেটে চালান দিতে পারলে তবেই আমার গোস্‌সা কমবে, খুন ঠাণ্ডা হবে। ব্যস, ইয়া পেল্লাই মছলিটি তুফেন একাই উদরে চালান দিয়ে দিল।

নিমন্ত্রিত মেহমানরা তার আজব কায়দা কৌশল দেখে হেসে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর পড়তে লাগল।

কিস্‌সাটি খতম ক'রে বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন।

একটু বাদে তিনি ফিন মুখ খুললেন—'জাঁহাপনা ভোর হতে এখনও ঢের দেরী। এবার আপনাকে একদম আলাদা স্বাদের একটি কিস্‌সা শোনাচ্ছি।

শাহজাদা জুঁইয়ের কিস্‌সা

বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটি শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, কোন এক মুলুকে নুসান শাহ নামে এক সুলতান রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতেন। তিনি ছিলেন একদম বুড্ডা। ফকিরদের মাফিক সাদাসিদা ভাবে তিনি দিন গুজরান করতেন। মেজাজ ছিল ঠাণ্ডা। মুখে মিঠা বুলি হরবখত লেগেই থাকত।

সুলতান নুসান-এর সাত লেড়কা ছিল। সবাই ছিল খুবসুরৎ। সবচেয়ে ছোট লেড়কা জুঁই ছিল সবার চেয়ে সেরা সুরতের অধিকারী এক শক্ত সামর্থ্য নওজোয়ান।

সুলতান ছোট লেড়কা জুঁইকে গোশালা দেখভাল করার কাজে নিযুক্ত করলেন।

জুঁই একদিন তার গাই আর মোষগুলোকে পাহাড়ের পাদদেশে চরতে দিয়ে এক গাছের তলায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। এমন সময় এক ফকির এসে তার কাছে দুধ মাঙল। খিদেতে তার পেটে নাকি জ্বালা ধরে গেছে।

জুঁই বিনম্র বিনয়ের সঙ্গে বল্‌ল—'সবে গাই-মোষদের দোহন করে বিলকুল দুধ প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলাম। এখন তো আর দুধ দিতে পারব না।'

—'খিদেতে পেটে জ্বালা ধরে গেছে, বেটা। আর একবার দোহন কর, কিছু দুধ পেতে পার।'

জুঁই অগত্যা মেহমানকে তুষ্ট করার জন্য দুধ দোহনে প্রবৃত্ত হ'ল। আজব কাণ্ড। একটি গাইয়ের বাটে আঙুল ঠেকাতেই গলগল করে দুধ ঝরতে লাগল।

ফকির দুধটুকু পান করে বল্‌ল—'বেটা, মেহমানের এই যে সেবা তুমি করলে তা জরুর বৃথা যাবে না। একদিন না একদিন এর ফল তুমি পাবেই। বেটা, তোমাকে এক বহুৎ বড়িয়া খবর দিতে আমি এখানে ছুটে এসেছি। আমি দিব্য চক্ষুতে দেখছি, তোমার দিল্ মহব্বতের জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। তোমার যোগ্যা মেহেবুবার তল্লাশ দিতেই আমার আসা। এ মরুভূমিতে এক শস্য শ্যামল মুলুক আছে। সেখানকার সুলতানের নাম আকবর। তার খুবসুরৎ নওজোয়ান লেড়কির নাম বাদাম। তার সুরৎ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সে-ই তোমার বিবি হওয়ার যোগ্যা।'

এমন সময় ভোরের পূর্বাভাষ পেয়ে বেগম শাহরাজাদ তার কিস্‌সা বন্ধ করলেন।

নয় শ' নিরানব্বইতম রজনী

রাত্রির, দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্‌সাটির পরবর্তী অংশ শুরু করলেন—'ফকিরটি এবার বল্‌ল, সে তোমারই জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। কোশিস কর। তাকে পেয়ে যাবে বেটা, ফকির বিদায় নিল।

ফকিরের মুখে শাহজাদী বাদাম-এর সুরতের বিবরণ শুনে তাকে কাছে পাবার জন্য শাহজাদা উতলা হয়ে উঠল। গাই-মোষ বিলকুল ফেলে সে উতলা হয়ে ছুটল। হাজির হ'ল সুলতান আকবর-এর প্রাসাদে। শাহজাদী বাদাম গভীর নিদে আচ্ছন্ন। সে খোয়াব দেখছে এক খুবসুরৎ নওজোয়ান তাকে চুম্বন করছে। নিদ টুটতেই সে হাফিস হয়ে গেল। চারদিকে তাকিয়ে শাহজাদী তার তল্লাশ করতে লাগল। রাতভর কেঁদে কাটাল। তার কান্না শুনে সুলতান ও বেগম ছুটে তার কামরায় আসেন, তাদের বিশ্বাস, খারাপ খোয়াব দেখে লেড়কির এমন হালৎ হয়েছে। হেকিম তলব করা

হ'ল।

বুড্ডা হেকিম শাহজাদীকে দেখে বল্‌ল—'শাহজাদীর
বদখুন জমেছে। শিরা কেটে বের করে দিতে হবে। শিরা কাটা হ
আজব কাণ্ড একবিন্দু খুনও ঝরল না। হেকিম আশা ছেড়ে বি
নিল।

এর ক'দিন বাদে এক বিকালে শাহজাদী বাদাম তার সহচরী
নিয়ে ফুল বাগিচায় বসে ছিল। এমন সময় এক নওজোয়া
দেখতে পেল। তার বাঁশির সুরে শাহজাদীর দিল্ কেড়ে নি

এক বিকালে শাহজাদী বাদাম'কে এক খোজা নফর
জানাল, এক নওজোয়ান বাঁশী বাজিয়ে প্রাসাদের সবাইকে
লাগিয়ে দিয়েছে। তার নাম শাহজাদা জুঁই।

শাহজাদী সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে
গেল। কয়েক ছত্র লিখে খোজা নফরের হাতে দিয়ে বল্‌ল
ওই বাঁশী বাদককে দিয়ে আয়। জবাব নিয়ে ফিরবি।'

সেদিনই সন্ধ্যার কিছু পরে শাহজাদী বাদাম বাগিচায়
একটু বাদেই শাহজাদা জুঁই সেখানে এল। তাদের প্রথম
ঘটল। মহব্বৎ দানা বাঁধল।

পরদিন শাহজাদী বাদাম তার আব্বার কাছে বলে,—'

...লে আমি বাগিচায় বেড়াতে গেলে আমার তবিয়ৎ সেরে ...ত পারে। আপনার হুকুম পেলে আমি আজ থেকেই আমার ...স্ত সহচরী নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি।'

...লেড়কির তবিয়তের ব্যাপারে সুলতান আকবর বড়ই ভাবিত। ... তিনি সানন্দে তাকে বেড়াতে বেরনোর হুকুম দিয়ে দিলেন।

...চারদিন বাদে শাহজাদী তার আব্বার কাছে এক নয়া আব্দার ... করল—'আব্বা, আমি বাগিচায় বেড়াতে গিয়ে এক বহুৎ ... রাখালকে দেখেছি, গাই-মোষগুলোকে দরদ দিয়ে দেখভাল ... আমাদের গোয়ালের গরুগুলোর দিন দিনই হাড় বেরিয়ে ...। আপনি তাকে গাই-মোষদের দেখভালের দায়িত্ব দিন। ...র তবিয়ৎ তো আচ্ছা হবেই, দুধের পরিমাণও বাড়বে।'

...লতান লেড়কির এ-পরামর্শটির গুরুত্ব দিলেন। এক নফরকে ...য়ে শাহজাদা জুঁইকে তলব করে নিয়ে এলেন, তার ওপর গাই-...দের দেখভালের দায়িত্বভার অর্পণ করলেন।

...কিস্সার এ-পর্যন্ত বলে, বেগম শাহরাজাদ চুপ করলেন। এক ...তম রজনীতে বাদশাহ শারিয়ার ভাববিমুগ্ধ দিল্ নিয়ে তাঁর ... দিকে তাকালেন। এক সময় আবেগ-মধুর স্বরে ...লেন—'বেগম সাহেবা, আজ আর আমার ভেতরে আগেকার ...ন্মাদনা নেই। অস্থির দিল্ আজ শান্ত হয়ে উঠেছে। আমি যেন ...কে ফিরে পেয়েছি। আজ আমার মালুম হচ্ছে ক্ষোভ-ক্রোধ ...কে জানোয়ারে পরিণত ক'রে দেয়। আমার ভেতরের সে-জানোয়ারটি আজ খতম হয়ে গেছে। তোমার দিল্ চাইলে ...ীর এ-মুহূর্তেই তোমার কিস্সা জিন্দেগীর জন্য খতম করে দিতে ...কাটা হ আমাকে দিয়ে তোমার আর তিলমাত্র ভয় ডরের কারণ ...ড়ে বি

...রদিন সকালে বাদশাহ শারিয়ার দরবারে এসে বুড্ডা ...হচরী...কে তলব করলেন। বুড্ডা উজির অন্যান্য দিনের মাফিক ...জোয়...দনের কালো কাপড়া নিয়ে দরবারে হাজির হলেন। ...ড়ে নি...দশাহ শারিয়ার কালো কাপড়াটির দিকে তর্জনি নির্দেশ ক'রে ...নফর ...ন—'উজির, কাল থেকে ওই কাপড়াটিকে আর দরবারে ...াইকে দরকার নেই। ওর দরকার চুকিয়ে নিয়েছি।'

এক সহস্র একতম রজনী

...লিখতে ...ত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটির পরবর্তী ... বল... শুরু করলেন—'জাঁহাপনা, শাহজাদা জুঁই দিনভর গাই-...' ...র নিয়ে ময়দানে ময়দানে ঢুঁড়ে বেড়ায়, রাত্রি একটু গভীর ...গিচা... শাহাজাদী বাদাম-এর কামরায় চুপি চুপি হাজির হয়। ...প্রথম ... রাত-ভর চলে তাদের মহব্বতের খেল।

...দের মহব্বতের ব্যাপারটি সুলতানের এক নিকট আত্মীয় ...লে,— ...য়ে যায়। রাত্রে তাদের গোপন অভিসারের দৃশ্য তার চোখে পড়ে। সে খবরটি সুলতানের কানে তুলতে দেরী করল না।

সুলতান শাহজাদী বাদামকে তলব করলেন। তাকে সাধ্যমত বুঝিয়ে ও মৃদু তিরস্কারের মাধ্যমে মহব্বতের ব্যাপারটি থেকে তাকে সরিয়ে আনার কোশিস করলেন। তার বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

এবার সুলতান আকবর তাঁর নফরদের ডেকে হুকুম দিলেন, 'রাখাল নওয়োজানটিকে পাহাড়ের ওপরে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আমি চাই যাতে রাতের মধ্যেই হিংস্র জানোয়াররা তাকে খেয়ে খতম করে দিক।'

বাদশাহের নফররা তাঁর হুকুম তামিল করল। তারা শাহজাদা জুঁইকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপরের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এল। লেকিন নসীবের জোরে সে পরদিন জান নিয়ে ফিরে এল। হিংস্র জানোয়াররা তার মধুর বাঁশীর সুর শুনে, যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে পড়ল। রাতভর চল্‌ল বাঁশীর সুমধুর সুর। শাহজাদা জুঁই-এর জান রক্ষা পেয়ে গেল। জুঁই জঙ্গল থেকে দুটো সিংহ-শিশু নিয়ে ভোরে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

পরদিন ভোরে শাহজাদা জুঁই দরবারে এসে সিংহ শিশু দুটোকে সুলতানের পায়ের কাছে রাখল।

সুলতান তো রাখাল নওজোয়ান জুঁইকে দেখে একদম তাজ্জব বনে গেলেন।

এদিকে শাহজাদী বাদাম খানাপিনা ছেড়ে দিল। ব্যাপার দেখে বাদশাহের লেড়কারা আব্বার কাজে ক্ষুব্ধ হ'ল। তারা মনস্থ করল, আব্বার অজান্তে তার বহিন বাদাম-এর শাদী দিয়ে দেবে। পাত্র তাদেরই সে-চাচার লেড়কা।

শাদীর বন্দোবস্ত চলতে লাগল। এক নফরাণী এসে জানাল, শাহজাদী তার কামরায় নেই। তামাম প্রাসাদে তল্লাশী চালিয়েও তার হদিস মিলল না।

চারিদিকে গুপ্তচর ছুটল। চিরুনি তল্লাশী চালাল। তামাম সুলতানিয়ৎ চষে ফেলেও ফয়দা কিছু হ'ল না, ব্যস, তার আর কোন হদিসই মিলল না।

শাহজাদা জুঁই আর শাহজাদী বাদাম কোথায় গিয়ে যে ঘর বাঁধল কেউ টেরও পেল না। বেগম শাহরাজাদ কিস্সাটি খতম করে চুপ করলেন।

বেগম শাহরাজাদ শাহজাদা জুঁই ও শাহজাদী বাদাম-এর কিস্সাটি খতম করলেন।

বাদশাহ শরিয়ার আবেগ মধুর স্বরে বললেন—'বেগম সাহেবা, এতো বহুৎ বড়িয়া কিস্সা! আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে যেসব কিস্সা শুনিয়েছ সেগুলো আমার মধ্যে জিন্দেগীভর জাগরূক থাকবে।

তোমার কথিত কিস্‌সাগুলি আমাকে অজানাকে জানাল ও অচেনাকে চেনার সুযোগ এনে দিয়েছে। আমার দিলের আন্ধার দূর করে সেখানে বাতি জ্বেলে আলোর রোশনাই ফুটিয়ে তুলেছ তুমি। আজ আমার ভেতরের সে জ্বলন্ত ক্রোধও ঈর্ষা চির নির্বাসিত হয়েছে সে তো তোমার পেয়ার মহব্বৎ আর অনন্য কিস্‌সাগুলির দৌলতে। বাদশাহ্ বেগম শাহরাজাদকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন।

বেগম শাহরাজাদ-এর ইঙ্গিত পেয়ে তাঁর বহিন দুনিয়াজাদ পাশের কামরায় চলে গেল। একটু বাদে তিনটি শিশুকে নিয়ে বহিন কামরায় ফিরে এল।

বেগম শাহরাজাদ বললেন—'জাঁহাপনা, এরা আপনারই লেড়কা। এদের মধ্যে এই যে এটির উমর দু'সাল। আর ক'দিনের ভেতরেই এদের এক সাল উমর পূর্ণ হয়ে যাবে। এরা যমজ একই দিনে পায়দা হয়েছে। জাঁহাপনা আপনার জরুর ইয়াদ আছে ছ'শ আশিতম রজনী থেকে সাত শ'তম রজনী পর্যন্ত আমি আপনাকে কিস্‌সা ব'লে খুশী রাখতে পারিনি। এর কারণ তখন যমজ লেড়কা দুটো পায়দা হয়। বড় লেড়কা পায়দা হওয়ার সময় মাত্র ক'দিন কিস্‌সা বন্ধ রেখেছিলাম। লেকিন তা জরুর স্বীকার করবেন এক নাগাড়ে প্রায় তিন তিনটি সাল আমি আপনাকে কিস্‌সা শুনিয়ে সাধ্য মাফিক আপনাকে খুশী করার কোশিস করেছি। যদি কোন কিস্‌সা আপনাকে খুশী করার বদলে দিল্‌কে বিষিয়ে তোলে তার জন্য পুরেপুরি আমি দায়ী। আমি মেনে নেব জরুর আমার কিস্‌সা বলার কায়দা কৌশলের ভুলচুক কোথাও না কোথাও রয়ে গিয়েছিল। সে কসুর আমি হাসিমুখে মেনে নিচ্ছি। আর সে গুস্তাকীর জন্য আমি আপনার কাছে মাফি মাঙছি। আর যদি আমার কিস্‌সা সাচমুচ আপনার দিলে দাগ কেটে থাকে, খুশী উৎপাদন করেই থাকে তবে তার জন্য সুকরিয়া জানাবেন আমাকে নয়, যেসব জ্ঞানী গুণী আদমি কিস্‌সাগুলি রচনা করেছেন তাদের।

বাদশাহ শারিয়ার বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে আবেগ মধুর স্বরে বল্‌লেন—'বেগম সাহেবা, সাচ্চা বটে তুমি আমার কলিজার জ্বালা জুড়িয়ে দিলের একটি বড় ভগ্নাংশ দখল ক'রে নিয়েছ। যদি ভেবে থাক তোমার গর্ভের শিশু তিনটির মুখের দিকে নজর পড়ায়ই আমার দিল্ নরম হয়েছে তবে কিন্তু ভুলই কর[illegible] সাহেবা। এরা তোমার মাফিক আমার কাছেও জরু[illegible] সোহাগের পাত্র। লেকিন এর আগেই তুমি আমার দিল্ নিয়েছ, লাভ করেছ নির্ভেজাল পেয়ার মহব্বৎ। তোমাকে [illegible] আড়াল করলে আমার জিন্দেগী জরুর বরবাদ হয়ে জিন্দেগীতে বহুৎ জেনানার সংস্পর্শে আমি এসেছি। লেকি[illegible] মধ্যেই এমন মহব্বতের সুধার সন্ধান মেলেনি। এতে বেগম সাহেবা, আমরা পরস্পরের সান্নিধ্যে—কাছাকাছি হাজার রাত্রি গুজরান করেছি।'

বেগম শাহ্‌রাজাদের দু'চোখ বেয়ে খুশীর পানি ঝরতে তিনি ওড়না দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন—'[illegible] আপনার উজির, আমার বুড্ডা আব্বাজী নিরবচ্ছিন্ন হ[illegible] হাহাকারের মধ্য দিয়ে হাজার এক দিন গুজরান করছে। [illegible] তার কলিজা পাথর বনে গেছে। মেহেরবানি করে তাকে খুশীর খবরটি পৌঁছে—'

—'জরুর। বেগমসাহেবা, আমি এখনই খবর পাঠা[illegible] যেন যত জলদি সম্ভব আমার সঙ্গে ভেট করেন।'

বাদশাহের জরুরী তলব পেয়ে বুড্ডা উজির হাজি[illegible] বাদশাহকে কুর্নিশ ক'রে হুকুমের প্রত্যাশায় খাড়া হলেন।

বাদশাহ মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—[illegible] সাহেব, আপনার লেড়কিকে তামাম জিন্দেগীর জন্য সোহাগের বিবির সম্মান খাতির-সহ আমার হারেমে স্থান [illegible] আমাদের সাথে সাথে আজ আপনারও খুশীর দিন।

বাদশাহ শারিয়ার-এর জরুরী তলব পেয়ে তার ছোট সুলতান শাহজামান প্রাসাদে হাজির হলেন। তিনিও তাঁদে[illegible] ভাগীদার হলেন। বাদশাহের অনুরোধে তিনি বেগম শাহরা[illegible] বহিন দুনিয়াজাদ'কে শাদী ক'রে বিবির মর্যাদা দিয়ে তাকে টেনে নিলেন।

বাদশাহ শারিয়ার এক লেখককে দিয়ে বেগম শাহ[illegible] কথিত কিস্‌সাগুলিকে লিপিবদ্ধ করার বন্দোবস্ত করলেন[illegible] সূরীরা যাতে সেগুলোর রসাস্বাদনের থেকে বঞ্চিত না হ[illegible]

সমাপ্ত
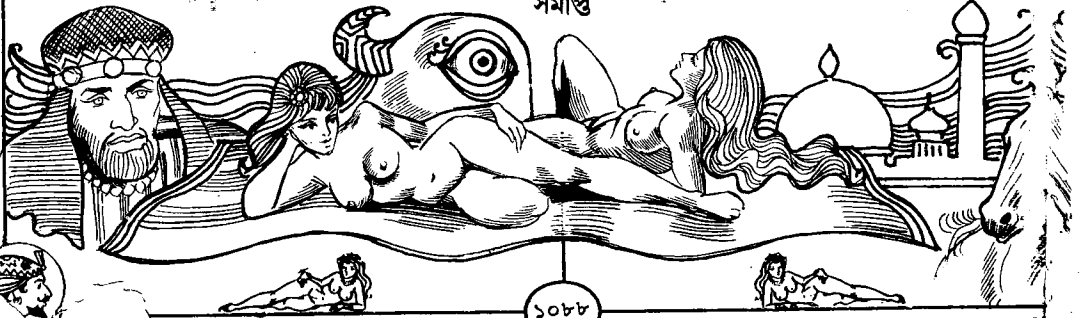
সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900